হরলিক্স

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যে আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে: কারণ, অতুলনীয় হরলিক্স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সৎগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্সকে। সে জানে, হরলিক্স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

''হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।''

হরলিক্স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

চিঠিপত্র

বিবাদী স্বর

গত ৮ই জুলাই তারিখের দেশ পত্রিকায় "রাগ-অনুরাগ" প্রবন্ধের আলোচনায় দেখলাম সুভাষ চন্দ মহাশয় বিবাদী স্বরের প্রসঙ্গে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এক জায়গায় বলেছেন, "...যে সুরটা লাগে না, লাগলে রাগের রূপ নষ্ট হয় তাকে বলি বিবাদী।" সুভাষবাবুর মনে হয়েছে পণ্ডিতজী "বিবাদী" অর্থে "বর্জিত" বোঝাতে চেয়েছেন। যদিও সুভাষবাবু তাঁর আলোচনায় তথ্যসহ "বিবাদী" এবং "বর্জিত" স্বরের আলাদা অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তবুও বলব পণ্ডিত রবিশঙ্করের বক্তব্যে কোনও ভুল ছিল না।

বিবাদী স্বর কাকে বলে? যে স্বর রাগের শত্রু অর্থাৎ যে স্বরের প্রয়োগে রাগরূপ নষ্ট হয়, তাকে বলে "বিবাদী স্বর"। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে রাগের সঙ্গে এ স্বরের বিবাদ। বিবাদী স্বরের প্রসঙ্গে সংগীত শাস্ত্রেও বলা হয়েছে "...স্বরো বিবাদী বৈরী"। সংগীতের বনামধন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিবাদী স্বরের আলোচনায় যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানেও পাওয়া যাচ্ছে "...বিবাদী বর্জিতস্বরঃ", "...বিবাদী তু ত্যাজ্যঃ", "...রাগেষু শত্রুতুল্যাঃ [illegible]দিনঃ" এই রকম সব উক্তি। আমরা [illegible]ন বর্জিতস্বরের প্রয়োগে রাগের রূপ [illegible] হয়ে যায়। তাহলে "বিবাদী" এবং "[illegible]র্জিত" স্বরের দুটি আলাদা অর্থ কি?

তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা [illegible] যে বিবাদী অর্থাৎ বর্জিত স্বরের [illegible] প্রয়োগ রাগের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে [illegible]র। তবে এই রকম প্রয়োগের মধ্যে [illegible] সতর্কতা এবং মুনশীয়ানার [illegible]য়োজন আছে। অনেক বিদগ্ধ সংগীত[illegible]ী ইমন রাগের গান্ধারের সঙ্গে অল্প [illegible]টু শুদ্ধ মধ্যমের স্পর্শ লাগিয়ে [illegible]গের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে [illegible]লেন। এ যেন শত্রুর ঘাড় ধরে নিজের [illegible]জ করিয়ে নেওয়া। তবে সব সময় [illegible]ন রাখা উচিত যে বিবাদী মানেই [illegible]গের বর্জিত স্বর। কাজেই এর স্বল্প [illegible]বহারও সতর্কতা এবং কৌশল[illegible]পেক্ষ। অসাবধান হলেই রাগভ্রষ্ট [illegible]বার সম্ভাবনা।

বিবাদী স্বরের সংজ্ঞা বোঝাতে এতদিন পরে সুভাষবাবু ভরতের নাট্যশাস্ত্র উপস্থিত করেছেন। সুভাষবাবু নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে ভরতের মতে ললিত, বেহাগ এবং দরবারী কানাড়ায় যেসব স্বরের "বিবাদী" হওয়া উচিত ছিলো, সেগুলি ঐসব রাগে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এর কারণ কি? সুভাষবাবু ভুলে গেছেন যে ভরতের যুগের স্বরগ্রাম, শ্রুতি ব্যবস্থা, রাগের নিয়মকানুন প্রভৃতির খোল নলচে এতদিনে সবই বদলে গেছে। এ যুগের সংগীতের আলোচনায় ভরতের মতামত টেনে আনবেন না। সংগীত শাস্ত্র অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

আট দশক আগে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "গীতসূত্রসার" গ্রন্থে "বিবাদী" এবং "বর্জিত" স্বরের আলাদা অর্থ খাড়া করে সেই একই গোলমালের সৃষ্টি করেছেন। তিনিও দেখছি বর্জিত স্বরকে বিবাদী বলতে নারাজ। বর্জিত স্বর যদি রাগের ক্ষেত্রে বিবাদী (বিবাদের সৃষ্টিকারী) না হয়, তাহলে রাগের বিবাদ আর কার সঙ্গে? গায়ের জোরে "বিবাদী" এবং "বর্জিত" স্বর নাম দিয়ে দুটো আলাদা সংজ্ঞা তৈরী করা যায় না। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে "বিবাদী"ই বর্জিত এবং বর্জিতই বিবাদী। যিনি ব্যাঘ্র, তিনিই শার্দূল।

আশা করি উপরোক্ত আলোচনাটি সুভাষবাবুর বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে কিছুটা সাহায্য করবে।

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী
কটক-১

দাদাঠাকুর

গত ৮ই জুলাই তারিখের দেশ পত্রিকায় শ্রীহিমানীশ গোস্বামী মহাশয় আমার 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' গ্রন্থের যে সমালোচনা করেছেন তা পড়লাম। দাদাঠাকুরের বিখ্যাত গান 'কলকাতার ভুল' গ্রন্থের শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয় তাঁর 'দাদাঠাকুর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আমার 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' বইতেও আমি গানটি তুলে দিয়েছি। হিমানীশবাবু লিখেছেন 'নলিনীবাবুর বইতে যে গান ছাপা হয়েছে সেটি নির্মলবাবুর বইতে ছাপা গানের কাছাকাছি হলেও প্রচুর পার্থক্য রয়ে গেছে' এবং আমি কোন সূত্র থেকে গানটি পেয়েছি তার উল্লেখ না থাকায় 'একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এবার আমার পাওয়ার সূত্রটি জানাই। একদা দাদাঠাকুর নিজে হাতে ওই 'কলকাতার ভুল' গানটি আমার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন এবং তিনি যেমনটি লেখেন আমি আমার বইতে হুবহু ঠিক তেমনটি উদ্ধৃত করেছি। দাদাঠাকুরের সেই লেখাটির একটি আলোকচিত্র এই পত্রের সঙ্গে দিলাম। দাদাঠাকুরের কাছ থেকে শুনিনি বা তাঁর কাছ থেকে পাইনি এমন কোনো তথ্য আমার বইতে যে লিপিবদ্ধ করিনি এই আলোকচিত্রটি তার একটি প্রমাণ। হিমানীশবাবু লিখেছেন 'কোন সূত্র থেকে পাওয়া গেছে সেটা জানানো দরকার ছিল বলে মনে হয়।' এই কথার তাৎপর্য আমার বোধগম্য হল না। আমি দাদাঠাকুর সম্বন্ধীয় একাধিক গ্রন্থ বা একাধিক লোকমুখ থেকে এই কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিনি। সুতরাং সূত্র প্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না। দাদাঠাকুর আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং আমাদের সৌভাগ্যবশত দীর্ঘদিন থাকতেন। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনা করতেন সেই সময়। তাঁর সেই সরস আলাপচারিতা থেকেই আমার যা কিছু সংগ্রহ। দাদাঠাকুর আমাদের ভালোবাসতেন বলেই নিজের লেখা আত্মজীবনীর অংশটি আমাদের হাতেই তুলে দিয়ে যান, যা এই গ্রন্থের প্রথমেই ছাপা হয়েছে। তা ছাড়া দাদাঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র, স্নেহভাজন শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত আমার লেখা বইটি পাঠ করে লিখেছিলেন 'বই খুব ভালো হয়েছে।'

এরপর আমার দিক থেকে কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

নির্মলরঞ্জন মিত্র
কলকাতা-১।

[পত্রলেখক কর্তৃক প্রেরিত ফটোস্টাট কপি আমাদের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণ কর্মে অসুবিধার জন্য তা প্রকাশ করা গেল না।—স]

সফদর হুসেনের গান : সমালোচকের জবাব

গত ৮ই জুলাইয়ের দেশে শ্রীসমর ভট্টাচার্য তাঁর 'মেহেদি হাসানের গজল' শীর্ষক চিঠিতে আমার 'সফদর হুসেনের গান' শীর্ষক রচনার কিছু মন্তব্যের মধ্যে 'ত্রুটি' আবিষ্কার করার যে প্রয়াস করেছেন তা তাঁর সংগীত ও গজলের বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণাই প্রকাশ করেছে—আর কিছু না।

প্রথমেই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আমি 'অলংকার' কি তা জানি না। তিনি লিখেছেন ('আমার অবগতির জন্য') : "অলংকার হচ্ছে নিয়মানুগ স্বরের আরোহণ-অবরোহণ" এবং "গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য বা স্বরের কম্বিনেশন আর অলংকার এক জিনিস নয়।" প্রথমত তিনি অলংকার বলতে যা বোঝেন তা অলংকারের দুই শ্রেণীর একটি শ্রেণী মাত্র—অর্থাৎ শার্ঙ্গদেব বর্ণিত বর্ণালংকার। আবার এই শ্রেণীর অলঙ্কারের বিষয়ে তাঁর ধারণাও ভ্রান্ত। শাস্ত্রীয় বর্ণালঙ্কার চার শ্রেণীর—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। শাস্ত্রে একটিও সম্পূর্ণ "আরোহণ-অবরোহণ" দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য অর্থাৎ মীড়, মুড়কী, খটকা, আশ (আমার "আবিষ্কৃত" প ম প অলংকার), গমক, জমজমা, কণ্, ঝটকা, গিটকারী ইত্যাদি সবই অলংকারের পর্যায়ভুক্ত—এইগুলিকে শব্দালংকার বলা হয়। শ্রীভট্টাচার্য আমার সংগীতজ্ঞানের বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন বলেই মনে হয়, কাজেই তিনি বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর 'ভারতীয় সংগীতকোষ" (৪-৬) বা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর "সংগীত প্রবেশ" (তৃতীয় ভাগ,১৩৬-১৩৭) দেখে নিতে পারেন। স্বরের কম্বিনেশন ব্যাপক অর্থে দুই শ্রেণীর অলংকারও বোঝাতে পারে, তবে শ্রীভট্টাচার্য যেভাবে এই কথাটির প্রয়োগ করেছেন তাতে তিনি অলংকারহীন স্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন বলেই মনে হয় এবং তা না হলে তাঁর "বেগম আখতারের গজলে অলংকারের ব্যবহার নেই, আছে স্বরের কম্বিনেশন্ এবং মেহেদির বেলাও তাই" উক্তিটির কোনো অর্থ হয় না। কাজেই তাঁর "গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য বা স্বরের কম্বিনেশন্" কথাগুলিতেও পরস্পর বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে।

শ্রীভট্টাচার্য প্রথমেই তাঁর সংগীতজ্ঞানের যা পরিচয় দিয়েছেন তা নিশ্চয় তাঁর বাদবাকি মতামতের বিস্তৃত বিশ্লেষণ বা আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রাখে না। তবুও ভ্রান্তকে পুরোপুরি ভ্রান্তির অন্ধকারে ফেলে ...

... অবগতির জন্য জানাই বেগম আখতারের গানে দুই শ্রেণীর অলংকারেরই যথেষ্ট প্রয়োগ ছিল এবং মেহেদি হাসানের গানে এইগুলির ব্যবহার লক্ষণীয় ভাবে সীমায়িত। তবে আমি মেহেদি হাসানের গানে কোনো অলংকার নেই এই রকম কোনো কথা লিখিনি—আমি লিখেছি "আজকালকার গজল, অর্থাৎ বেগম আখতারের গজল নয় মেহেদি হাসানের গজল, প্রায় অলংকারবিহীন লম্বা লম্বা স্বর গঠিত......"। অর্থাৎ এই ধরনের গজলে প্রধান অংশ লম্বা লম্বা স্বর, অলংকার বা জটিল কারুকার্য নয়। শ্রীভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য "প্রায়" কথাটি বাদ দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীভট্টাচার্যকে দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে তিনি মেহেদি হাসানের কাজের যে স্বরলিপি দিয়েছেন তাতে আমি বিশেষ কোনো সূক্ষ্ম বা জটিল কম্বিনেশন্ খুঁজে পেলাম না বরঞ্চ বুঝতে পারলাম অতি সরল জিনিস শ্রীভট্টাচার্যকে "বিস্ময়"-এ ভরে দেয়—তিন মাত্রার মধ্যে র্স র্র র্জ্ঞ র্র র্স তান (অর্থাৎ দুনির থেকে একটি স্বর কম) লাগানোর মধ্যেই বা কি জটিলতা আছে এবং তারপর "দমদম জজ্ঞরসর" ব্যবহারেও যে কি সূক্ষ্মতা আছে, আজকালের গজলের লয়ে তা বোঝা আমার পেড়ে খাওয়া সংগীত বিশ্লেষণ ক্ষমতার বাইরে।

"রঞ্জিশহী সহী দিলহী" গজলটিতে গাওয়ার 'যথেষ্ট মুন্শীয়ানা' (মেণ্ডের কাজ বলে তিনি যে স্বরলিপি দিয়েছেন তাতে কিন্তু কোন মেণ্ডের উপাদান খুঁজে পেলাম না) থাক বা না থাক তার সংগে ঢুলু ঢুলু ফিলমি ন্যাকামির কি সম্পর্ক? সেটা যে একটা কণ্ঠস্বরের আমেজের ব্যাপার এবং শ্রীভট্টাচার্য সেটি মেহেদি হাসানের যে নেই তা প্রমাণ করতে পারেননি।

মহফিল শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষর স্বল্পস্থায়ী এবং যে একমাত্র শেষের 'ল্" অক্ষরের উপর কাজ করা যায় সেটা আমার অজ্ঞাত নয়। সফদর হুসেনের কাজের আগে একমাত্র মালিকা পুখরাজের একটি রেকর্ডে—"এহদে রংগীকি ইয়াদগার"—'উন্কো সতায় তমাম রাত' লাইনের 'ন্' অক্ষরের ... চার স্বরের কাজ শুনেছিলাম ... এইটি উল্লেখযোগ্য মনে করেছিলাম। মেহেদি হাসানের "মহব্বত করনে-ওয়ালে"র কথা লেখার সময় মনে আসেনি। কিন্তু শ্রীভট্টাচার্য নিজেই এই গানের কথা টেনে এনে আমার বিচারে নির্ভুলতা প্রমাণ করে দিয়েছেন—তিনি লিখেছেন "শিল্পী 'মহফিল' শব্দে 'প নি সা' এই স্বর তিনটি ব্যবহার করেছেন।" আমি লিখেছিলাম "যেখানে আজকালকার গজল গায়করা মহফিল শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে খুব বেশী করে দু-তিনটি স্বর লাগান......"—দেখুন কি ভাবে মিলে গেছে। এই তিনটি স্বর ব্যবহার করার পর মেহেদি হাসান মাপা লয়ে মুখড়ায় ফিরে এসেছেন কিনা তা অপ্রাসংগিক।

শেষে বলতে চাই আমার লেখার মন্তব্যের লক্ষ্য মেহেদি হাসান ছিলেন না এবং আমি একবারও বলতে চাইনি যে তিনি গজল গাইতে পারেন না। আমার লক্ষ্য ছিল বছর দশ পনেরর ... গজলের ধারা গড়ে উঠেছে ...

(মেহেদি হাসান যার একটি প্রতীক মাত্র) এবং যাঁদের এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে তাঁরা বরকত আলী খাঁ, মালিকা পুখরাজ এবং বেগম আখতারের আদি পর্বের গজলের রেকর্ড বা টেপ শুনে বিচার করতে পারেন যে আজকালকার দিনে গজলের আমূল পরিবর্তন হয়েছে কিনা এবং সে পরিবর্তন ভালোর জন্য হয়েছে না খারাপের জন্য।

নীলাক্ষ গুপ্ত

যীশু কে ছিলেন

আপনার ২৪ জুনের পত্রিকায় যীশু কে ছিলেন?" এই প্রবন্ধটি পড়েছি। শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর কথার সমর্থন কিউপিড এবং আর্মস্ট্রং-এর গ্রন্থে পেয়েছেন। কন্তু যীশু খ্রীষ্টের জীবনচরিত বশ্লেষণ চলছে বহু শতাব্দী থেকে। ইউরোপে যাঁরা খ্রীষ্টান নন তাঁরা ীশুকে সাধারণ স্তরে নামাবার চষ্টা করেছেন। গত শতাব্দীতে রনা থেকে এদেশে রামমোহন দ্য প্রিসেপটস অব যিসাস) পর্যন্ত বহুজনই মানবপুত্রকে মানব করতে চেয়েছিলেন। তিনি মানব তো ছলেনই, উপরন্তু ঈশ্বরের একমাত্র ূর্ণ অবতার ছিলেন—ভক্ত খ্রীষ্ট-বশ্বাসীরা একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস যীশুর দ্বাদশ অন্তরঙ্গ শিষ্যদেরও হয়েছিল। সাক্ষাৎ শষ্যরা ছিলেন সাধারণ মানুষ—জেলে, াজনা আদায়কারী প্রভৃতি—তারা ীশুর মৃত্যুর পর ছত্রভঙ্গ হন। পূর্ব ৃত্তিতে কেউ কেউ ফিরে যান। কিন্তু মন একটি ঘটনা ঘটেছিল—ঘটেছিল লে সেইকাল থেকে খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেছিলেন—যা আবার তাঁদের এক-জায়গায় জমায়েত করে। সেটা হলো ্রীষ্টের পুনরুত্থান। "অ্যাকটস অব া অ্যাপসলস্" গ্রন্থে এ সবের বিবরণ আছে। সাক্ষাৎ শিষ্যরা মনগড়া একটা ্যাপারের কথা জোর গলায় প্রচার করে-ছেন, এ যুক্তি টেঁকে না। কারণ মিথ্যা বানিয়ে তার জন্যে কেউ প্রাণ দিয়েছেন এমনটি কি হয়? তাঁদের বিশ্বাসে সত্যের জোর ছিল। না হলে য়েক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ, াফ্রিকা, এসিয়ার কোন কোন দেশের ংশ বিশেষ, এমন কি ভারতবর্ষের াক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টধর্মে মানুষ দীক্ষিত ত না। এ সব "মিথ" বলে উড়িয়ে বার প্রবণতা সেকাল থেকে একাল র্যন্ত পন্ডিত এবং মূর্খ করেছেন। ্রীষ্টমন্ডলী (চার্চ) এই ঐতিহ্য াক্ষাৎশিষ্যদের কাছেই পেয়েছিলেন। ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের স্বকপোলকল্পিত লে এর জন্যে নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং ৃত্যুবরণ করতে মানুষ রাজি হত । মানবসেবার এমন আদর্শ তাঁরা ক তুলে ধরতে পারতেন?

ভারতবর্ষেও যাঁরা মহৎ মানুষ া খ্রীষ্ট চরিতমানসের অনুপম কটা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। রাম-হন, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে গান্ধীজী খ্রীষ্টকে ্ন করেননি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শুতীর্থ"-এর মত কবিতা লিখে-ছেন। নিয়ে ক্যালভারীযাত্রী খ্রীষ্ট, যামিনী রায় যীশুর জীবনের নানা ঘটনার ছবি, নিখিল বিশ্বাস খ্রীষ্টের যন্ত্রণা-ভোগ এবং মৃত্যুর দৃশ্য এঁকেছেন। খ্রীষ্ট যদি শুধুই সাধারণ মাপের ধর্মগুরু হতেন তাহলে এই ভারতবর্ষের নেতা, ধর্মতত্ত্ববিদ, কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের হৃদয়ের এমন ভক্তি ভালবাসা পেতেন কি? দুই সাহেবের সমালোচনা সত্ত্বেও শ্রীমতী ডাইসনকে এই দিকগুলো সম্বন্ধে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

ইউরোপে "ডিমাইথলজাইস" বা পুরাণের মোড়ক খুলে ফেলার ঝোঁকটা তোলেন জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ রুডলফ বুলটম্যান প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। তারপর অ্যালবার্ট সোয়েৎসার লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইন কোয়েস্ট ফর দ্য হিস্টরিকাল যিসাস"। বুলটম্যান, কার্ল বার্থ থেকে বিশপ জন রবিন-সন পর্যন্ত ধর্মতত্ত্ববিদদের কাছে সমস্যাটা হল—কিভাবে নৈরাশ্য এবং অবিশ্বাসের যুগে খ্রীষ্টের সুসমাচার বোধগম্য করবেন। সুতরাং কিউপিড বা আর্মস্ট্রং যুগান্তকারী কিছু করেছেন শ্রীমতী ডাইসনের এই দাবিটা ভুল। ইউরোপ আমেরিকায় তর্ক চলছে অনেক দিন ধরে। দুই সাহেবের গ্রন্থটি তর্কটা অ্যাকাডেমিক সারকেল থেকে সাধারণ জনপ্রিয় স্তরে এনেছে এইমাত্র।

তর্কটা খুবই জটিল। এর বহু দিক। এসব ভাল করে জানা না থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা। সব ভুলগুলি চিঠির ক্ষুদ্র পরিসরে বলা সম্ভব নয়। না বুঝে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার রূপটা কি দাঁড়ায় সেটা বিনীতভাবে আমি দেখাবার চেষ্টা করব।

তাসিতুসের "অ্যানালস" সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তাও পরের কাছ থেকে ধার করা। তাসিতুসের বই-এর আসল বয়ান নিম্নে দিলাম: (রোমে সম্রাট নীরো আগুন লাগিয়ে-ছিলেন) এই গুজব দূর করার জন্য নীরো ঐ লোকদের (অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের) ওপরে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন এবং তাদের ওপর খুব অত্যাচার চালাতে লাগলেন। তাদের দুষ্কৃতির জন্য তারা সকলের ঘৃণার পাত্র। লোকে তাদের খ্রীষ্টান বলে। এই নামের উৎপত্তি হয় খ্রীস্টাস নামে একটি লোকের নাম থেকে। সে সম্রাট টাই-বেরিয়াসের আমলে পন্টিয়াস পাইলেট কর্তৃক প্রাণদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল। এইভাবে এই ক্ষতিকর কুসংস্কার সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়েছিল। কিন্তু পরে শুধু জুডিয়া প্রদেশেই নয়, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এই কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং শেষে রোমেও এল। সেখানে দুনিয়ার যাবতীয় বিশ্রী জঘন্য কুসংস্কার চারিধার থেকে এসে জড়ো হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।"

শ্রীমতী ডাইসন বলেছেন, তাসিতুসের লেখা থেকে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টবিরোধী কথাগুলো বাদ দিয়েছে। তাই যদি হতো তাহলে উপরের উদ্ধৃত অংশটা তারা কেন রাখবে? তাসিতুস ছাড়াও আরেকজন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ

সম্বন্ধে লিখেছেন। কিন্তু শ্রীমতী ডাইসন সে বিষয়ে কিছুই বলেননি। প্লিনি সম্রাট ট্রেজানের কাছে লেখা একটি চিঠিতে খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে লিখেছেন যে, অনেক খোঁজখবর করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন —"তাদের (অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের) দোষত্রুটির নীট যোগফল এই যে নির্দিষ্ট একটি দিনে তারা একত্র হয়ে খ্রীষ্টের উদ্দেশে স্তবস্তুতি করে এমন-ভাবে যেন তিনি একজন দেবতা। তারা শপথ নেয়—অন্যায় করার জন্য নয়—বরং চুরি, ডাকাতি ব্যাভিচার ও বিশ্বাসভঙ্গ না করার জন্য।........ এই অনুষ্ঠান শেষে........তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। এ ব্যাপারে আমি তাদের কোনো দোষ দেখিনি। আমি আইনজারী করে যাবতীয় গুপ্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করায় ওরা এটা বন্ধ করেছে।" (মূল লাতিন থেকে অনু-বাদ।) মনে হয় শ্রীমতী ডাইসন তাসিতুস বা প্লিনির লেখার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন।

তাসিতুসের লেখার ফাঁকগুলো সম্বন্ধে প্রাচীন লাতিন সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন। তাঁর Annals গ্রন্থের ষোল খণ্ডের মধ্যে তিন খণ্ডের অংশবিশেষ পাওয়া যাচ্ছে। চার খণ্ড লুপ্ত। খ্রীষ্টানরা এই সব গ্রন্থ নষ্ট করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ দেননি। তিনি বোধ হয় জানেনই না এতগুলো গ্রন্থ কালের কবলে পড়েছে। তাসিতুস রোম সাম্রাজ্যের ইতিহা[স] লিখছিলেন। যা তাঁর দৃষ্টিতে ইহুদীদের ধর্মীয় কোন্দল তা তা[র] ইতিহাসে কেন স্থান পাবে? খ্রী[ষ্ট] সম্বন্ধে যেটুকু উল্লেখ আছে তা রো[ম] এবং সম্রাট নীরো সম্পর্কিত বলে স্থা[ন] পেয়েছে।

প্রশ্ন হলো যীশুখ্রীষ্ট যদি "মিথিকল ফিগার" হন তাহলে ধর্ম বিশ্বাস এবং মানবসেবার জন্য যুগে যুগে এত মানুষ এমন অকপটভাবে প্রাণ দিতে পারতেন কি? এ শতাব্দীতেও দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, অলবার্ট সোয়েৎসার, মার্টিন লুথার কিং, মাদার টেরেসা এবং আর অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত মানুষ সে কল্পিত মানবপুত্রের জন্য এভাবে আত্মোৎসর্গ করতেন কি?

ওঁর লেখার কয়েকটি ভুলমা[ত্র] এখানে নমুনাস্বরূপ উল্লেখ ক[রা] হলো। যাতে পাঠকরা বুঝতে পারে[ন] ব্যাপারটা।

বিশপ জেমস ডি রেয়ার
(বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিশপ)
কলকাতা-৮

লালবিহারী দে

১লা জুলাই তারিখের দে[শ] পত্রিকায় সুজিতকুমার সেনগুপ্তে[র] ...পরাগী সমালোচক বনাম শান্ত লেখক প্রসঙ্গে দু-একটি কথা।

লালবিহারী দে বাংলা এ...

.. .. ।
৷ লেখক ও'র দ্বটি বিখ্যাত বই-
উল্লেখ করেন "গোবিন্দ সামন্ত"
"ফোক টেলস অফ বেঙ্গল।"
ীয়টি ইংরেজীতে লেখা কিন্তু
ধটি পড়ে কোন মতেই জানা যায়
"গোবিন্দ সামন্ত" লেখক কোন
য় লিখেছেন। "চন্দ্রমুখীর
খ্যান" প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লেখক বলেন
চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান নামক একটি
। উপন্যাসের লেখক...." অথচ
তে "গোবিন্দ সামন্ত"-র ভাষা
খ করার প্রয়োজন বোধ করেন না।
ধ যখন দেখি চার্লস ডারউইঃ
র প্রশংসা করেন তখন অনুমান
নিতেই হয় বইটি উনি বাংলাতে
ননি।
বইটি লেখক ইংরেজীতেই লিখে-
ন। ভূকৈলাসের সত্যবাদী ঘোষাল
বিন্দ সামন্ত" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের
। অনুবাদ করেন। ১৮৮৩ সালে
ন্দ্র মুখার্জী নামে এক ভদ্রলোক
বিন্দ সামন্ত"-র অনুবাদে অগ্রসর
লালবিহারী দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬
মবর, ১৮৮৩' সংখ্যায় লেখেন,
warn all concerned that
l proceedings will be
n against any person who
ishes the translation of
inda Samanta into Benga-
r any other language".
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কবি
সনও গোবিন্দ সামন্তের
সিত প্রশংসা করেন এবং চার্লস
ইন গোবিন্দ সামন্ত পড়ে বইটির
াক ম্যাকমিলানদের লিখেছিলেন,
hall be glad if you would
him with my compliments
much pleasure and ins-
tion I derived from read-
a few years ago Govinda
anta". (১৮ই এপ্রিল ১৮৮১)
শেষে একটি প্রশ্ন। "আমরা তো
করি না", "বরং আমরা বলি" (১৮
) "কিন্তু আমরা মনে করি"
পাতা, এসব "আমরা"-র লেখকের
ন"-র সঙ্গে আর কে কে আছেন
হলো না। এসব জায়গায়
া লেখা যায় কি-না জানার জন্যেই
ত জিজ্ঞাসা।

াকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
পাড়া, হুগলী।

র্ড সমালোচনা

ত দশই জুন এর "দেশ"-এ
শত শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তর
র্ড-সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য
।
াশগুপ্ত দেবব্রত বিশ্বাসের সম্প্রতি
শত ই-পি রেকর্ড-এর সমালোচনা
গ লিখেছেন "...এদেশের নিয়ম
ায়ী ফিলমে ব্যবহৃত হলেই সকলে
দ্রসঙ্গীত নিয়ে মেতে ওঠেন।"
তিনি এই অসাধারণ গানের
টি ("কেন চেয়ে আছো গো মা')
কোন আলোচনাই করলেন না—
গানটি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।
গানটি প্রসঙ্গে বলা যায় যে
ত্রে ব্যবহৃত হবার আগে অধিকাংশ
ই গানটি শোনেননি। ফলে গানটির
জন্মেছে চলচ্চিত্র শোনার পরেই।
ত চলচ্চিত্রে দেবব্রত বিশ্বাস ও
...... জনে গানটি গেয়েছেন
—প্রধান কণ্ঠ সুশীল মল্লিকের।

দেবাশিসবাবুর লেখা আরেকটি বাক্য—বয়সের জন্য অনেক সময় হয়ত কণ্ঠ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি অথবা "ওই যে ঝড়ের মেঘে" গানে তাঁর কণ্ঠই ঝড়ের দোলা আনতে পারে বেশ গোলমেলে। 'অথবা' বাক্যটির প্রয়োজনের যাথার্থ বোঝা গেল না। তাছাড়া 'ঈপ্সিত লক্ষ্য' জিনিসটি কি? যদি ভাবসঞ্চার-এর কথা বলা হয় তবে প্রশ্ন দেবব্রত বিশ্বাসের গানে ভাবের অভাব কখনও ঘটেছে কি? আর 'কেন চেয়ে আছো গো মা' রেকর্ডটি প্রসঙ্গে বলা যায় 'পারফেক্‌শনের' ওপর কেনো কথা চলে না। অবশ্য এটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। কারণ "রস আর রসায়ন" এক জিনিস নয়। বিশ্লেষণে রস ক্ষুন্নই হয়। দেবব্রত বিশ্বাস সম্প্রতি প্রকাশ্য অনু-ষ্ঠানে গান না গাইলেও দু-তিন বছর আগেও যখন নিয়মিত গাইতেন তখনও তো তাঁর গলার ঐশ্বর্য সন্দেহাতীত ছিল। আর "কেন চেয়ে আছো গো মা" দেবব্রতবাবু ১৯৬৯ সালে রেকর্ড করেন (এই রেকর্ড-এর প্রকাশিত অন্যান্য গানগুলিও মোটামুটি ঐ সময়েই রেকর্ড করা হয়েছিল);—তখনই তাঁর গলায় বয়েসের ছাপ পড়ে যাওয়ায় তিনি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁাছতে পারলেন না। দেবাশিসবাবুর এই আবিষ্কার অত্যাশ্চর্য —সন্দেহ নেই। দেবাশিসবাবুর "ওই যে ঝড়ের মেঘের কোলে"র প্রিলিউড্ মিউজিক অধিকন্তু মনে হয়েছে। ইন্‌স্ট্রুমেণ্টাল মিউজিকেরও তো নিজস্ব একটি ভাষা আছে। তার সাহায্য নেওয়া দোষের হবে কেন?

পরিশেষে বলি দেবব্রত বিশ্বাস আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্বাসিত নায়ক—এই ঘোষণায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ডের ব্যাপারে নানা নিষে-ধাজ্ঞার প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড করা বন্ধ করে দিয়েছেন। (এখন তাঁর যে সমস্ত রেকর্ড বের হয় তা বহুদিন আগেই রেকর্ড করা হয়েছিল।) একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে তাঁর রেকর্ড করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেটি ঠিক নয়।

সত্যজিৎ ঘোষ কলিকাতা-১৭

জয় হোক মানুষের

১৯৭৮, ৮ই জুলাই দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের "জয় হোক মানুষের" লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মানবদেহধারী সব মানুষ যে মনুষ্যত্বগুণসম্পন্ন নয় এটা সর্বত্র সর্বদা দেখতে পাই। মানবিকতা বোধ হারিয়ে মানুষ নিজেও কষ্ট পাচ্ছে এবং অপরকেও কষ্ট দিচ্ছে। এই সময়ে "জয় হোক মানুষের" এই লেখাটি মানুষের চৈতন্যকে জাগাতে সাহায্য করবে। নমস্কারান্তে

কমলা দেবী কলিকাতা-৫৪

ভ্রম সংশোধন

২২ জুলাই, দেশ-এ 'অবসরের গানঃ বোলান' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক সুধীর চক্রবর্তী। ভুলে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হয়েছে।

প্রকাশিত হল

শান্তিদেব ঘোষের

মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্য

দাম ৫.০০

"গুরুদেবের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আদর্শ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষার কর্মসূচী নিয়ে গত তিন দশকে বাংলার শিক্ষাবিদ্‌গণ নানা প্রকার আলোচনা করেছেন, গ্রন্থে ও প্রবন্ধে। কিন্তু এখানকার অন্যান্য শিক্ষণীয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যকে গুরুদেব যেভাবে সম্মানজনক বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে-বিষয়ে পরিষ্কার করে কেউ কিছু বলতে চেষ্টা করেন নি।" তাঁর এই নতুন গ্রন্থের ভূমিকায় শান্তিদেব ঘোষের এই আক্ষেপ থেকেই এই মূল্যবান আলোচনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছয় মাসের শিশু শান্তিদেব শান্তিনিকেতনে আসেন সেই ১৯১০ সালে। সেই থেকে এত কাল তিনি বিশ্বভারতীতে গান-নাচ ও অভিনয়ের শিক্ষকতায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে-বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থ, সে-বিষয়ে আলোচনার যথার্থ অধিকারী বলতে তাই তাঁকেই বোঝায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শের সঠিক পরিচয়টি ফুটিয়ে তুলতে সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ক যে-আলোচনার অভাব এতকাল যাবৎ অনুভূত, সেই অভাবই মোচন করবে শান্তিদেব ঘোষের এই গ্রন্থটি।

কিছু ভালো উপন্যাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তুঙ্গভদ্রার তীরে

দাম ৭.০০

শজারুর কাঁটা

দাম ৬.০০

সুবোধ ঘোষের

কালকেতু

দাম ৭.০০

বাসরদত্তা

দাম ৪.০০

কালকূটের

অমৃত বিষের পাত্রে

দাম ৮.০০

অমাবস্যায় চাঁদের উদয়

দাম ৮.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

লোহার গরাদের ছায়া

দাম ৬.০০

গাছের পাতা নীল

দাম ১০.০০

প্রতিভা বসুর

বেলা-অবেলার গান

দাম ৬.০০

রাঙা ভাঙা চাঁদ

দাম ৪.০০

বিমল করের

ভুবনেশ্বরী

দাম ৪.০০

একদা কুয়াশায়

দাম ৬.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

অনবদ্য হাসির উপন্যাস

পায়রা

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

শিশিরকুমার বসুর

নেতাজীর অন্তর্ধানের অন্তরঙ্গ কাহিনী

মহানিষ্ক্রমণ

দাম ৮.০০
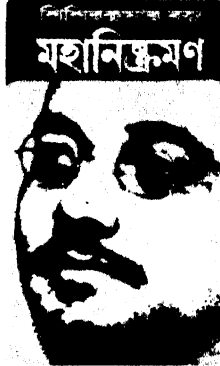
খ্যাতনামা ডাক্তার শিশিরকুমার বসুর আরেকটি বড়ো পরিচয়—তিনি নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের প্রত্যক্ষ সহায়ক। সেই অন্তর্ধানের বহু অগোচর কাহিনী এই বইতে অতি অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে শুনিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

ননীগোপাল চক্রবর্তীর

ছোটদের গল্পের বই

চরকাবুড়ী

দাম ৪.০০

রূপকথা, উপকথা, লোকগাথা—সব কিছুর স্বাদ মেশানো এই বইয়ের অপরূপ গল্পগুলি যাদের জন্য লেখা তাদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে তার উপর রয়েছে চমৎকার চমৎকার আঁকা সব ছবি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কবি ও নর্তকী

দাম ৬.০০

কালো রাস্তা সাদা বাড়ি

দাম ৫.০০

মতি নন্দীর

স্ট্রাইকার

দাম ৬.০০

স্টপার

দাম ১০.০০

দিব্যেন্দু পালিতের

বৃষ্টির পরে

দাম ৬.০০

বিনিদ্র

দাম ৬.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

পারাপার

দাম ১২.০০

দিন যায়

দাম ৮.০০

রমাপদ চৌধুরীর

অ্যালবামে কয়েকটি ছবি

দাম ৫.০০

পিকনিক

দাম ৬.০০

বুদ্ধদেব গুহের

বাতিঘর

দাম ৪.০০

খেলা যখন

দাম ৪.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের

জল দাও

দাম ৩.৫০

একটি বিজ্ঞপ্তি

ভি. পি. তে বই পাঠাবার অনুরোধ করেন যাঁরা, তাঁদের জানানো হচ্ছে যে, অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম টাকা না পাঠালে ভি. পি. তে বই পাঠানো সম্ভবপর নয়।

প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

অসামান্য প্রেমের কবিতার সংকলন

হঠাৎ নীরার জন্য

দাম ৫.০০
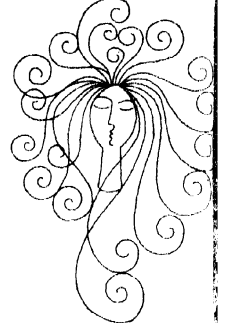
পৃথিবীর যাবতীয় কবিতার আদিতম প্রেরণা নারী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই নারীর নাম নীরা। জানতে ইচ্ছে করে, বনলতা সেন কিংবা অরুণিমা সান্যালের মতো নীরাও কি স্মৃতিমেদুর কোনো কাল্পনিক নাম? নাকি নীরা একটু অন্যরকমের, রক্তমাংসের এক জীবন্ত প্রতিমা? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বহুবার বহুভাবে এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। যে-উত্তর দিয়েছেন, তাতে রহস্য বেড়েছে মাত্র। প্রশ্নটাকেই সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, "এ-প্রশ্নের জবাব দেব না।" নীরাকে কেন্দ্র করে নানা বয়[illegible] নানা সময়ে নানা মুহূ[illegible] যে-সমস্ত কবিতা লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা হিসেবেও সেগুলি অসাধারণ। পৃথিবীর আর কোনো কবি একটি মাত্র নাম ব্যবহার করে এত সার্থক কবিতা লিখেছেন বলে জানা যায় না। সেই সমুদয় কবিতা একত্র করে প্রকাশিত হল প্রেমের কবিতার এই অসামান্য সংকলন—'হঠাৎ নীরার জন্য'। এই বইতে এমন অনেক কবিতা রয়েছে যা এর আগে অন্য কোথাও মুদ্রিত হয় নি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি কাব্যগ্রন্থ :

আমার স্বপ্ন ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

দেশ ৪৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা
২০ শ্রাবণ ১৩৮৫

ূচীপত্র

রবর্তী আকর্ষণ

পাদক : সাগরময় ঘোষ
নন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
াদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
নন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
ত।
এক টাকা
ন মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
ঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

প্রশাসনিক বাস্তবতার দাবি

সম্পাদকীয়

হিরোসিমার উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করবার একটি নৈতিক যুক্তি ও সদর্থ ঘোষণা করেছিলেন সেদিনের মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান। সেই ঘোষণার মর্মার্থ : বহু লক্ষ নিরীহ মানুষের প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা পরিহার করবার জন্য কয়েক হাজার নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করা মানবতার স্বার্থসংগত নীতির অন্যথাচরণ নয়। ট্রুম্যানকথিত এই নীতির সূত্র ধরে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, বহুসংখ্যকের শান্তি ও স্বস্তির জন্য কিছুসংখ্যকের শান্তি ও স্বস্তি অপসারিত করলে সেটা অ-নৈতিক কোন বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে না। ভারতে আটক আইনের সরকারী বিধাতাদের কাজে ট্রুম্যানকথিত এই নীতি বস্তুত একটি আকাঙ্ক্ষিত তত্ত্বের সম্বল বলে বোধ হয়েছে ও সমাদৃত হয়েছে। সাধারণ জনজীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি স্বস্তির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যদি কিছুসংখ্যক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক করে রাখবার দরকার হয়, তবে তাই করতে হবে। 'মিসা' এহেন অনুশাসনের একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন, যার উৎকট মহোৎসবে দেশের হাজার হাজার নাগরিক মানুষকে বিনা বিচারে কারাবাস ও নির্বাসনের শাস্তি স্বীকার এবং সহ্য করতে হয়েছে। উদারতর গণতান্ত্রিক আদর্শের ধারক-বাহক হবার অঙ্গীকার যাঁদের রাজনৈতিক কর্তব্যের একটি প্রধান ঘোষণা, তাঁদের পক্ষে বিনা বিচারে আটক করবার অথবা কারারুদ্ধ করে রাখবার কোন আইন অথবা প্রথার অনুমোদন অবশ্যই সম্ভব নয়। ভারতীয় জীবনে কেন্দ্রীয় শাসনিক ক্ষমতার পদ হতে কংগ্রেসের অপসারিত হবার পর যে জনতা-সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং কয়েকটি রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতা যে অকংগ্রেসী একাধিক রাজনীতিক দলের দখলে এসেছে, তাঁদের প্রত্যেকেই বিনাবিচারে আটক আইনকে অনৈতিক অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করে প্রবল ভর্ৎসনার আঘাত হেনেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বামপন্থী সরকারও তাই করেছেন, বিশেষ করে বামপন্থিতার প্রধানতম নেতৃত্বের দল অর্থাৎ সি-পি-আই-এম। বিনা বিচারে আটক বন্দীদের এবং বিচারাধীন বন্দীদেরও অনেকের মুক্তি ঘোষণা করেছেন রাজ্য-সরকার।

কিন্তু জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে আইন ও শৃঙ্খলার দুরবস্থা এবং স্বস্তি-শান্তি-নিরাপত্তার নানারকম হানির ভয়াল দৃশ্য দেখে দেশের সকল শ্রেণীর নিরীহ-নির্দোষ মানুষের মনে আতঙ্কের যে প্রকোপ দেখা দিয়েছে সেটা নিতান্ত রাজনীতিক ইচ্ছাচারিত কোন দলের প্রচারের মুখরতা বলে মনে করা চলে না। সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্য যাদের কাছে অভ্যস্ত এক জীবিকাকর্মের মতো আচরণিক প্রকৃতি লাভ করেছে, তাদেরও পক্ষে গণতান্ত্রিক সমবেদনার এই যুক্তি আছে যে, তাদের বিনা বিচারে আটক করে না রেখে বিচারের মঞ্চে সমুপস্থিত করাই উচিত। কিন্তু এ ধরনের কোন দায়িত্ব-নীতি রাজ্যের সরকারী চিন্তার নিয়ামক হয়নি। তাঁরা বিনা-বিচারে আটক করা বন্দীদের অবাধ মুক্তি প্রদান করছেন ও করবেন।

কিন্তু বিচারাধীন বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করবার কোন নৈতিক দায়িত্ব কি সরকারের থাকতে পারে? এই প্রশ্নে গণতান্ত্রিক বিবেকের বক্ষ হতে এই বাণীই সদুত্তর হয়ে ধ্বনিত হবে যে, বিচারাধীন বন্দীকে ক্ষমাময় মুক্তি প্রদান করা বা না-করা নিতান্তরূপে বিচারকের বিবেচনার অধীন একটি ক্রিয়াচার। আলিপুর বার এসোসিয়েশন প্রতিবাদ জ্ঞাপিত করে তাঁদের একটি বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারকে এই অনুরোধ করেছেন যে, সরকার যেন বিচারাধীন বন্দীর বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলা তুলে নেবার নীতি পুনর্বিবেচনা করে দেখেন। বিশেষ করে নিদারুণ রকমের ঘৃণ্য ও ভয়াবহ যত ধর্ষণ, হত্যা ও ডাকাতির মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলা প্রত্যাহার ও তাদের মুক্তি যেন নির্দেশিত না করা হয়। এসোসিয়েশনের মন্তব্য : এই শ্রেণীর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার অবসিত করে মুক্তি দিয়ে দিলে সমাজকে অপরাধপ্রবণ দুর্বৃত্তদের করুণার (অর্থাৎ অকরুণার) মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এক আলোচনার আসরে দুর্বৃত্তদের তথা সমাজবিরোধী অপরাধক্রিয়ার দমনের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা এবং পুলিশের অধিকতর তৎপরতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, সেটা প্রত্যেক সভ্য দেশের সামাজিক জীবনের একটি আদর্শিক কর্তব্যের কথা। সামাজিক চেতনা প্রবল হয়ে বাধা না দিলে সরকারের কোন বিভাগীয় কর্মতৎপরতার একক কৃতিত্বে নিরাপত্তা সুবিহিত করা সম্ভব নয়। পুলিশের পক্ষ থেকে একটি অসুবিধার অভিযোগ এই যে, আদালতের সিদ্ধান্ত পুলিশের অভিযোগের নিবেদন প্রমাণসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করতে না পেরে অর্থাৎ প্রমাণাভাবে প্রায়ই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়ে থাকেন। এটা একটা সমস্যা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর কথিত একটি বিস্ময়কর পরামর্শের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি পুলিশকে এমনভাবে অভিযোগের নিবেদন রচনা করতে বলেছেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যেন জামিনে মুক্ত হওয়া সম্ভবই না হয়। ভয় হয়, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য পুলিশের পক্ষে একটি প্রহেলিকার ভাষণ বলে বোধ হবে। তবে কি মামলাকে অর্থাৎ অভিযোগের বয়ানকে বেশ কঠোর করে 'সাজাতে' হবে? এটা কি গণতন্ত্রের সার্থক প্রক্রিয়া? বলা বাহুল্য, এধরনের উপদেশ পুলিশের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতার উৎসাহকারক কোন প্রস্তাব নয়। প্রশাসনিক বাস্তবতার দাবি সব সময় ও সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক বিনয় মেনে চলতে পারে না। এ এক বিচিত্র স্ববিরোধিতার ক্রিয়া। আইন ও বিচার, প্রশাসন ও প্রশাসিত জনজীবন সব ক্ষেত্রের পরিদৃশ্যে যে দুরপনেয় স্ববিরোধিতার প্রকোপ দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর এহেন উক্তিতে সেই স্ববিরোধিতারই একটি ঝলক-দর্শন দেখা গেল।

ব্যঙ্গচিত্র
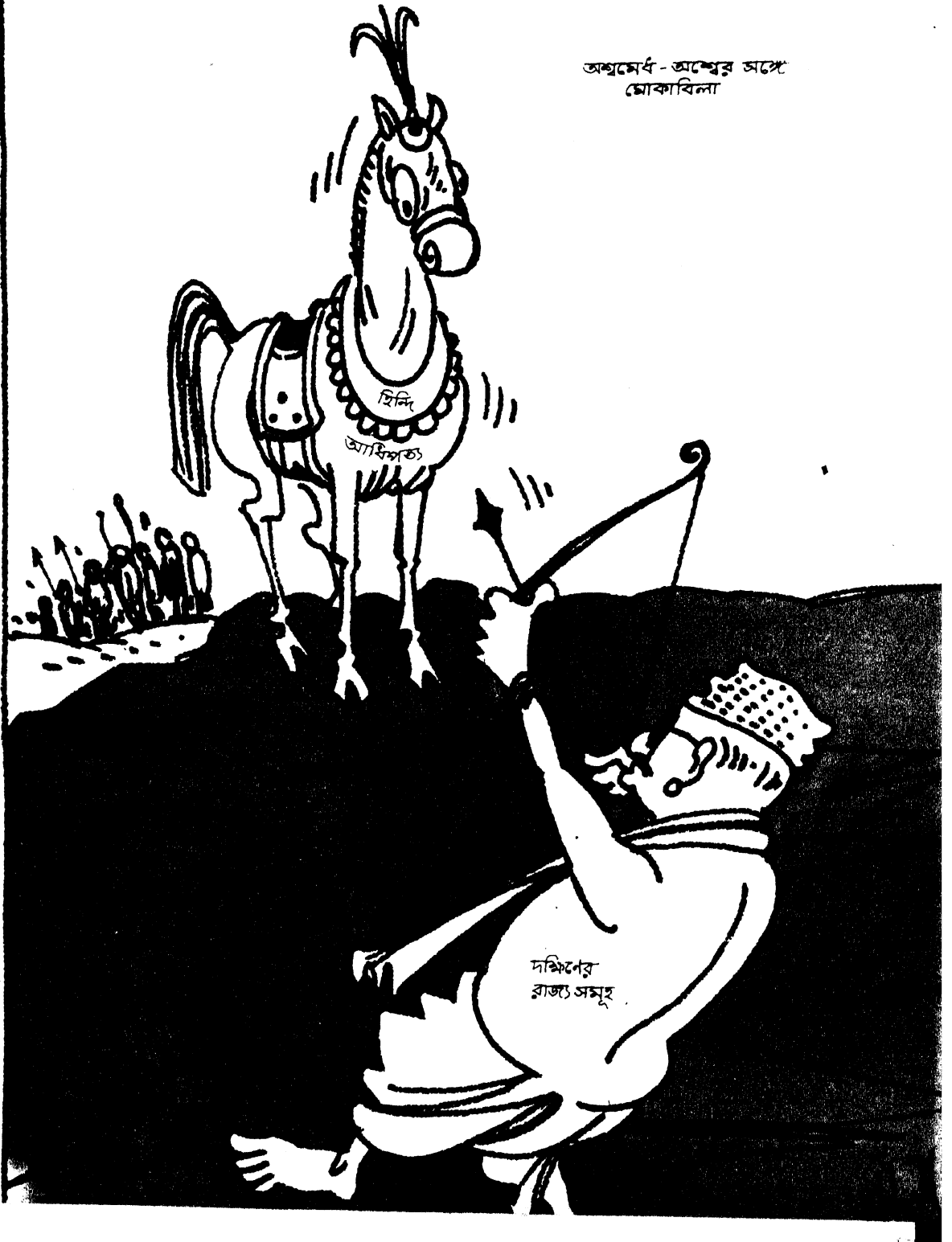
শান্তিনিকেতন: উত্তরায়ণের উদ্যান

দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে উদ্যানের সূচনা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ছাতিম গাছকে কেন্দ্র করে ১৮৬৩ সালে মহর্ষিদেব রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করে তাঁর পরিকল্পিত নির্জন সাধন-পীঠ স্থাপন করলেন। তারপর তিনি এই বৃক্ষহীন জনশূন্য প্রান্তরে কাঁকর মাটি সরিয়ে উৎকৃষ্ট মাটি এনে আম জাম কাঁঠাল হরিতকী মহুয়া নারিকেল তাল শাল দেবদারু বকুল কদম্ব প্রভৃতি ফলবান ছায়াতরু রোপন করলেন। সাধারণ লোকের কাছে শান্তিনিকেতনের নাম হলো 'বাগান'—।

১৯০১ সালের ১৩ অক্টোবর 'UNITY AND MINISTER' নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 'PILGRIMAGE OF SANTINIKETAN OF BOLPUR' নিবন্ধে যা প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮২৩ শকের ফাল্গুন সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তার বিবরণ আছে—

"মহর্ষিদেব কলিকাতার হট্টগোল ছেড়ে মাঝে মাঝে এসে তাঁবু ফেলে শান্তিনিকেতনের ডাঙ্গায় নির্জন বাসে কাটাতেন। ঐ ছাতিম গাছ দুটোর তলা ছিল তাঁর ভগবৎ আরাধনার বিশেষ স্থল। ক্রমে ক্রমে জমি কেনা হোল, গাছ-গাছড়া পোঁতা হয়ে একটি বাগান হোল। একজন মালী এল এর পরিচর্যায়। মালীর একটু পরিচয় আছে। শান্তিনিকেতনের বাগান যে মালীর হাত দিয়ে সে ছিল রাজা রামমোহনের পরিচারক। তার নাম রামদাস। প্রভুর মৃত্যু হলে সে দেশে আসে এবং বর্ধমানের মহারাজার গোলাপ বাগানে নিযুক্ত হয়। খবর পেয়ে মহর্ষি তাকে নিয়ে এসে লাগান শান্তিনিকেতনের বাগান তৈরিতে।

'UNITY AND MINISTER' এর ভাষায়—

"It is a noteworthy fact that the gardener by name Ramdas, who laid the Shantiniketan garden had at first been in the employment of Raja Rammohan Roy who took him to England, and after the death of the master he returned to India and was engaged by the Burdwan Maharaj to his famous "Golap Bug" garden. The Maharshi whose taste in these matter is princely, had engaged this man for doing good work."

মহর্ষিদেব 'শান্তিনিকেতন' বাড়ি তৈরি করলেন, উদ্যান-এর ভিত্তি স্থাপন করলেন। ঠাকুর পরিবারে পুষ্প আর উদ্যানপ্রীতি বংশানুক্রমিক। শান্তিনিকেতনে বাস করতে এসে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর নীচু বাংলার বাড়ির চারপাশ সাজিয়েছিলেন ফুল ফলের বৃক্ষলতায়—তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ সাজিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন বাড়ির চারদিক।

উত্তরায়ণের উদয়ন বাড়ি, বাগান শুরু হয় ১৯২৮-২৯ সাল

স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নাম দিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন— সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, মাধবীকুঞ্জ প্রভৃতি তৈরি করলেন। কিঞ্চিৎ কম চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার স্মৃতিচারণ করে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় "বিশ্বভারতীর অংকুর' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬) লিখেছেন—

"শান্তিনিকেতন একটি প্রকাণ্ড সুন্দর বাগান, বাগানে নানাবিধ ফলকর বৃক্ষ ও ফুলের গাছ, বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকা। অট্টালিকা হইতে দক্ষিণ দিকের ফটক পর্যন্ত একটি সুন্দর সরল বিস্তৃত পথ। ...উত্তর দিকের ঐ পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছ। আমরা যে ছোট ছোট ঝোপ দেখিয়াছিলাম সেগুলি শাল গাছের চারা, অধিকাংশ গাছ কোমর সমান উচ্চ, দুই চারিটা তিন হাত সাড়ে তিন হাত উচ্চ হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে রবীন্দ্রবাবু এই খানে একটা শালবন তৈয়ারি করিতেছেন। ঐ সকল শালের চারা দূর হইতে আনাইয়া রোপন করা হইয়াছে'—।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে পিতার নির্দেশে কৃষির উন্নতির জন্য শিলাইদহে কাজ শুরু করলেন। ১৯২১-২২ সালে পিতার নির্দেশেই শিলাইদহ থেকে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে এলেন; শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু করলেন। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীর অনলস চেষ্টায় বিশেষ করে রথীন্দ্রনাথের কৃষি ও বাগান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও প্রীতির ফলে আশ্রম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। উত্তরায়ণ, ছাতিমতলায়, নন্দনে এক বিশেষ ধরনের বাগান তৈরি হল। ১৯১৯ সাল থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ উত্তরায়ণের ভিতরে বসবাস শুরু করলেন। উত্তরায়ণের বাগান বাড়ির সঙ্গে সমতা রেখে বাড়তে লাগল। উত্তরায়ণে প্রথম বাড়ি কোণার্ক উদয়ন তারপর শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী গড়ে

উঠলো। বাড়ি ও বাগানের পরিকল্পনায় ছিলেন রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবী, আর তাঁদের সাহায্য করলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আর রবীন্দ্র-স্নেহধন্য শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই দুই শিল্পীর কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। আশ্রমের উদ্যান-রচনায় অধ্যাপক জগদানন্দ রায় ও তেজেশচন্দ্র সেনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তাঁদের গাছপালার প্রতি ভালোবাসা বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের 'তালধ্বজ' বাড়িতে তেজেশচন্দ্র থাকতেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বনবাণী কাব্যের 'কুটির বাসী' কবিতায় তাঁর উল্লেখ করেছেন 'তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু' নামে। শান্তিনিকেতনের খবরাখবর দিয়ে প্রবাসী গুরুদেবকে (গুরুদেব তখন ভিয়েনায় ছিলেন) লেখা চিঠির উত্তরে গুরুদেব তাঁকে যে চিঠি লেখেন সেটির অংশ-বিশেষ বনবাণীর ভূমিকার অন্তর্গত হয়েছে। কবি তেজেশচন্দ্রকে প্রথমেই লিখেছেন "তোমার লেখাগুলি শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলির মর্মর ধ্বনি করে উঠবে, তাতেই আমার মন পুলকিত করে দিল।" উত্তরায়ণের বাগান ও আশ্রমের গাছপালা সব সময় তাঁর মনে আলোড়ন তুলেছে। বাগানের কোথায় কোন্ গাছ লাগানো হবে তার জন্য সব সময় তিনি চিন্তা করতেন। উত্তরায়ণের গাছগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'শিমুল গাছ' (কোণার্কের সামনে) কি ভাবে বাড়বে—কি সার দেওয়া হবে—তার গায়ে কোন্ লতা দিলে শোভা পাবে এ বিষয়ে তাঁর সদা-সতর্ক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী 'রবীন্দ্রনাথের পুষ্পপ্রীতি' প্রবন্ধে (প্রবাসী মাঘ ১৩৭৩) এর স্মৃতিচারণ করেছেন—

'কোণার্কের পিছনের জমিতে কষ্টি-কারী এবং নানান রকম কাঁটা গাছ পোঁতালেন, বললেন, এই বাগানটা হবে তোমাদের Civilised ফুলের নয়, এখানে আমার মতো সাধারণ গাছ থাকবে।...গুরুদেব যেমন অন্যান্য ফুল ভালবাসতেন সেই রকম Cactus জাতীয় ফুল, কাঁটা গাছ ও'র খুব প্রিয় ছিল। খোয়াইতে ঝামা পাওয়া যায়, সেই ঝামা দিয়ে তিনি বাগান বানিয়েছিলেন। Cactus এবং এখানে যে সব গাছ জন্মায় তা' দিয়ে সুন্দর করে বাগান সাজানো হল। সে সব দেখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। ঐ সমস্ত গাছ আপনা থেকে বেড়ে বেড়ে ওঠে, বেশী সার লাগাতে হয় না। কাঁটা গাছের বাগান তৈরীর সময় তাঁর বয়স ছিল ষাটের মত। বাবলা জাতীয় এক ধরনের কাঁটা গাছ ছিল ত্রিপুরা থেকে আনা। তার নাম রাখা হয় 'কাঁটা নাগেশ্বর'—।"

উদীচী বাড়ির গায়ে 'বনপুলক' ও মালঞ্চে (কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর বাড়ী) বসে 'অগ্নিশিখা' ফুলের নামকরণ-প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবী উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন:

"ফুলের নতুন নতুন নামকরণও করে গেছেন। কেউ হয়তো কোপাই-এর ধারে গেছে, কোন ফুলের গন্ধ ও বর্ণ ভালো লাগলে বলতেন, ঐ ফুল নিয়ে আসিস। শান্তিনিকেতনে লাগানো হল। এ রকম একটি বনফুল বোধহয় কোপাই থেকে এনে ও'কে দেখায় এবং তার নাম দেন 'বনপুলক'—। সে গাছ উদীচী বাড়ির গায়ে লাগানো হল। এখনও আছে।

আর একটা ফুল আছে, তার ইংরেজী নামও আছে, সাঁওতালরা ঐ ফুল ভালবাসে, তারা একে বলে 'লাঙ্গুল ফুল—ফুল হয় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে, শরতের শেষ পর্যন্ত খুব ফোটে। সুন্দর বাহারে ফুল, সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় পরে—রঙ হচ্ছে লাল আর হলদে, অগ্নিশিখার মতই, তাই গুরুদেব নাম রাখলেন 'অগ্নিশিখা'—।"

উত্তরায়ণের বাগান—এক অভিনব বাগান। নানা বৈচিত্র্যে ভরা —আমাদের এই দেশে নানান জায়গায় বহু বৈচিত্র্যময় উদ্যান আছে কিন্তু শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণের উদ্যানের বৈচিত্র্যের সঙ্গে কোনো বাগানের তুলনা হয় না। কি গঠনবৈচিত্র্য, কি স্বাভাবিকতায় এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে সমস্ত রকম কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে এই বাগান রূপায়িত করা হয়েছে। যে-কোনো ঋতুতেই এই বাগানকে মনে হবে যেন প্রকৃতির সযত্ন রচিত নানা রঙের সম্ভার নিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করছে। উত্তরায়ণের বাগানের আর একটি বৈশিষ্ট্য, এই উদ্যানে আন্তর্জাতিক তরু ও পুষ্পের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। দেশী বিদেশী গাছ কিভাবে পাশাপাশি অবস্থান করছে তাদের সমস্ত সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে—দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই উদ্যানে কোনো গাছই অপাঙক্তেয় নয়। যেন 'আমরা সবাই রাজা।' উত্তরায়ণ বাগানের গঠনশৈলী দীর্ঘ দিনের নিরলস পরিশ্রমে ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এমন সুসমঞ্জস মিলন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে এই উদ্যান এক জীবন্ত পরীক্ষাগার।

উত্তরায়ণ বাগানের প্রবেশ মুখে দু'পাশে সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস আর দেওদার। বাঁ দিকে বিচিত্রা রবীন্দ্র-প্রদর্শ-শালা—তার সামনে ও পাশে কেশিয়া, স্প্যাথোডিয়া, আমলকী, পীলতে মাদার, শিরিষের মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাসের ঘন ছায়া, নীচে শৌখিন গাছের 'ছাছঘর', আর এক-

উদ্যানে বৈকালিক ভ্রমণে রথীন্দ্রনাথ

জোড়া সারস থাকার জন্য খড়ের ছাওয়ানো একটি সুন্দর ঘর। উত্তরায়ণে ঢুকবার দুপাশে স্বল্পচ্ছায়ার দেশী বিদেশী হরেক রকমের ফুলগাছের সারি। তার মধ্যে কোন অসংগতি নেই। ল্যান্ডস্কেপ বলতে যা বোঝায় তার সংগে মানুষের স্বহস্তে রচিত উদ্যান মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তারপরে কাঁকর-বিছানো প্রাঙ্গণে প্রবেশের মুখে কেন্দ আর কেশিয়া গাছ আর মাটির সংগে মিশে-থাকা বোগানভেলিয়া। উদয়ন-বাড়ি—যার এক ছাদের সংগে অন্য ছাদের মিল নেই—এক আশ্চর্য ও মনোরম স্থাপত্য—তার সংগে সংগতি মিলিয়ে দুই সারি নারিকেল গাছ আর সামনে কুরচি মুচকুন্দ—হিমঝুরির সারি। তার সামনেই মোগল কৌণিক নকশায় সাজানো গোলাপ বাগান। যেখানে দাঁড়ালে মনে হবে এক দরবারী পরিবেশ। গোলাপ বাগানের সামনের রাস্তার দিকে—কোন বাড়াবাড়ি নেই—মুচকুন্দ শিরীষ আর শিশু গাছের সারি—যার ছায়া প্রচণ্ড রৌদ্র থেকে অতি কোমল গোলাপের পাপড়িগুলিকে রক্ষা করছে—আর তার নীচে নানা জাতের স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক দেশী বিদেশী ঝোপ—যারা বাগানের মূল শোভাকে কোনোরকমেই উৎপীড়িত করে না। গোলাপ ও অন্যান্য বাগানের বেড়ার বৈশিষ্ট্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টগর, মেহেদি, কামিনী, কনকচাঁপা, বনপুলক, রঙ্গন, তেঁতুল গাছ আর নানা জাতের লতা মালতী, মাধবী, নীলমণিলতা ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে জমাট সবুজের রেখা।

গোলাপ-বাগানের প্রবেশ পথের দুপাশে দুটো বিরাট ও আশ্চর্য গঠনের কলসী। এ দুটি ঐতিহাসিক। এই কলসীতে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে গঙ্গার জল জমিয়ে রাখা হতো 'জীবন-স্মৃতি'তে যার উল্লেখ আছে। এই দুটি জোড়াসাঁকো বাড়ী থেকে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর গোলাপবাগের সামনে বসিয়ে মোগল শৈলীর পাশে একটু চৈনিক আমেজ বুলিয়ে দিলেন। গোলাপ বাগানের ঠিক সামনে কংকর বীথিতে দুপাশে ছাতার মতো কেশিয়া গাছ আর মাঝখানে তাল গাছ—'এক পায়ে দাঁড়িয়ে'...। সামনে কোণার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী বাড়ীর প্রবেশ পথের কংক্রীটের তোরণ নালন্দার বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি। তার উপরে শুভ্র মালতী-যুই, মধু-মালতী ছায়াময় করে রেখেছে। শুভ্রতার দুই পাশে রঙ-বেরঙ-এর বাগান বিলাসের সৌন্দর্য তৃপ্তিদায়ক। প্রথম কোণার্ক বাড়ি—তার সামনে এক মহাবৃদ্ধ শিমুল গাছ—মালতী-মধুমালতী লতার আলিঙ্গনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। কোণার্কের গায়ে সেই বিখ্যাত লতা—যে লতা গাছ নিয়ে এসেছিলেন পিয়ার্সন সাহেব, যখন ফুল ফুটল তখন তার নীল রঙ দেখে গুরুদেব এই গাছের নাম দিলেন 'নীলমণিলতা', কবিতাও লিখলেন—'নীলমণিলতা' নামে।

কোণার্কের পাশে এক কালের 'মৃন্ময়ী' বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর তৈরি হয়েছে 'মৃন্ময়ী চাতাল—যা রাজপুত স্থাপত্যের আমেজ এনে দিয়েছে। তার চার কোণে বাগান বিলাস আর ছোট ছোট মরসুমী বাহারী ফুলের কেয়ারী—যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংগে সামঞ্জস্য সাধন করেছে। এর পাশেই ঐতিহাসিক 'শ্যামলী—মাটির বাড়ি। যার পাশে ও পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াঘন জাম, আম, তেঁতুল, বেল, ইউক্যালিপটাসের অলৌকিক গম্ভীর দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট শ্যামলীর স্থাপত্যকে জীবন্ত করে তুলেছে। মনে হবে যেন বৌদ্ধ বিহারে প্রার্থনার জন্য প্রবেশ করছি। এই জন্য গান্ধীজী ভালোবাসতেন এই শ্যামলীকে। শ্যামলীর সামনে গুলঞ্চ বা কাঠটগর শ্যামলীর অংগসজ্জাকে যেন আরো ঘরোয়া করে তুলেছে। পুনশ্চ উদীচীর সামনে স্থাপত্যের সংগে মিল রেখে হরেক রকমের দেশী বিদেশী খ্যাত অখ্যাত ফুল আর পাতাবাহারের গাছ।

উদয়ন বাড়ির পিছনে প্রধান উদ্যান। যার শোভা অপূর্ব এবং বিচিত্র। এই উদ্যানের প্রবেশ মুখের অংশটি জাপানী ল্যান্ডস্কেপ-গার্ডেনের আদর্শে তৈরি। ফুলের কেয়ারী থেকে শুরু করে বাগান

পম্পার ধারে রথীন্দ্রনাথ

বাতি, ফুলের টব ও গাছ নির্বাচন, কৃত্রিম জলাশয়—সমগ্র ডিজাইনটি জাপানী আমেজে পরিপূর্ণ। সবই এমনভাবে অল্প জায়গায় তৈরি যে একটুখানি জায়গার মধ্যে অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে একটি সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা। সব কিছু মনের মধ্যে উপলব্ধি করলে মনে হবে যেন আমরা জাপানের কোন প্যাগোডা মন্দিরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। এখানে পোলিশ ভাস্করের অপূর্ব রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি, ভাস্কর কারমারকার-খোদিত পাথরের অনুকৃতিটি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়েছে। ঐ ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রথীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত ও নির্মিত কংক্রীটের উপর রঙীন সিরামিকসের (ভাঙ্গা কাপ প্লেট) টুকরো বসিয়ে অপূর্ব টবগুলি এবং সেই টবে বিশেষ ধরনের ক্যাকটাস এবং বাহারী গাছ উদ্যান-প্রেমিদের চমৎকৃত করে। অন্যান্য যে সব টব আছে সেগুলি রবীন্দ্রনাথ জাপান-সহ দ্বীপময় ভারত ভ্রমণের সজীব স্মৃতি বহন করছে (রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)। মাঝের গেট দিয়ে যাবার সময় টিয়া পাখি ও নানান জাতের পায়রার কলরব—অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়—'কে এল রে, কে এল রে...'। ভিতরের বাগানে একটি দ্বীপময় কৃত্রিম হ্রদ—পম্পা। দ্বীপের উপর জলে নুইয়ে পড়া বটলব্রাশ গাছটি নতজানু হয়ে

রথীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী

আছে। জলের উপর দিয়ে দ্বীপে যাবার উঁচু নিচু বাঁধানো রাস্তা। সম্পূর্ণ জাপানী ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনের আদর্শে তৈরি। পম্পার চার পাশে নানা ফুলের গাছ, কৃত্রিম রক্—তার উপর মরসুমী ফুলের কেয়ারী—অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গাছ এবং নানা দেশ বিদেশের ফুলের—এক আন্তর্জাতিক মেলা বসেছে। ফুলের গাছ—বকুল, কেশিয়া, নাগলিঙ্গম, অশোক, কাঞ্চন, জ্যাকারান্ডা, পলাশ, নাগকেশর, ভুর্জপত্র, কদম্ব, সোঁদাল, শিশু, আমলকী; প্যাসিচরী—ইন্সিগনেনসিস্, শ্বেতচাঁপা, স্বর্ণচাঁপা, পারিজাত, সোনাঝুরি পেলটোফোরাম, কুরচি, পত্রনজিভা, বকফুল, গ্লীরিসিডিয়া, নানা জাতের ঝাউ, শ্লিরিসিডিয়া, ম্যাগনোলিয়া; সজিনা, নিম, কৃষ্ণচূড়া; রক্তচন্দন, জারুল, প্রভৃতি এ ছাড়া মশলার গাছ—দারুচিনি-এলাচ-তেজপাতা আর তার সঙ্গে পবিত্র গাছ কর্পূর-চন্দন। নানান দেশী বিদেশী ছোট মাঝারী গাছ—শিউলি কামিনী মেহেদি জবা করবী কল্কে কাঞ্চন রাধাচূড়া ফুরুস রঙ্গন গন্ধরাজ ইত্যাদির পাশে অ্যাকালাইফা, বারলেরিয়া, সাইকাস, ডোমরিয়া, ল্যানটানা, গ্যালফিমিয়া, হ্যামিলটোনিয়া, হ্যামিলিয়া পেটেনস, মুসান্ডা, পয়েনশেটিয়া নানা জাতের কেশিয়া প্রভৃতির পাশাপাশি অবস্থান রয়েছে। বিভিন্ন জাতের দেশী বিদেশী লতা গাছ—অপরাজিতা মাধবী মালতী নীলমণি-লতা যুঁই ঝুম-

কোলতা অ্যাসমাণ্ডা অ্যাসপারাগাস ক্লোরেডেনড্রন, টিকোমা, থানবারজিয়া নানা রঙের বোগেনভিলিয়ার সমারোহ।

পাতাবাহারী গাছ—অ্যানথুরিয়াম, এলোকেসিয়া, একালাইফা, এরেলিয়া কোলিয়াস, নানা জাতের ক্রোটেন, অ্যারেকা পাম, ড্রেসিনা, পরেনশেটিয়া ম্যারান্টা, ইত্যাদি নানা জাতীয় পাতাবাহারী গাছ—গাছ ঘরে বা ঠাণ্ডা জায়গায় শোভা পাচ্ছে।

সারা বৎসর যাতে উত্তরায়ণ বাগান সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা যায়—তার জন্য রথীন্দ্রনাথ—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে—নানা জাতের মরসুমী ফুলের গাছ লাগালেন। গ্রীষ্ম-বর্ষায় পিটুনিয়া গিলর্ডিয়া, জিনিয়া, দোপাটী, কোরিওপসিস ইত্যাদি এবং শীতে ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা কসমস ফ্কস ডায়েন্থাস প্যান্সি অ্যান্টিরিনাম অ্যাস্টার করন ফ্লাওয়ার মেরিগোল্ড বা গাঁদা ফুল, কার্ণেশন ইত্যাদি ইত্যাদি 'মরসুমী ফুল' যখন তাদের অপরূপ সৌন্দর্য, কারুকার্য ও বর্ণের বৈচিত্র্য নিয়ে এক সঙ্গে ফুটে ওঠে তখন মনে হয় যেন কোন যাদুকরের যাদুমন্ত্রে এক অপূর্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে।

ফলের গাছ—আম জাম লিচু সফেদা কাঁঠাল ডালিম চালতা বেল কুল ফলসা তেঁতুল নানা জাতের লেবু, চীনা পেয়ারা পেয়ারার গাছ সমস্ত উত্তরায়ণের এ পাশে ও পাশে ছড়িয়ে আছে। শিশুবিভাগ থেকে আরম্ভ করে বড় ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাগানের লোভনীয় আকর্ষণ এরা বাড়িয়ে চলেছে।

পম্পার গায়ে লাগানো ছোট্ট একটি দ্বিতল বাড়ী—যার নাম চিত্রভানু—আবার অনেকে বলেন গুহাঘর। বাগানের সঙ্গে স্থাপত্যের অদ্ভুত মিলন। চিত্রভানুর উপর তলায় ছিল প্রতিমা দেবীর স্টুডিও, নীচের তলায় রথীন্দ্রনাথের ওয়ার্কশপ এবং বাসস্থান। নীচের ঘর যেন এক জাহাজের কেবিন। গুহাঘরের বাইরের অলঙ্করণ রবীন্দ্রনাথের ছবির আদর্শে অদৃশ্য লোকের জীবজন্তু, পাহাড়, কোটর, স্টাকো ওয়ার্কের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে পাতাবাহার আর উপরে নানান জাতের লতা—দোতলায় কেয়ারিতে লিলি আর ঘাস ফুলের সারি। পারিপার্শ্বিক গাছপালা ফুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিরাজ করছে।

ঠিক উদয়ন বাড়ির পিছনের বাগানটি ইসলামিক শৈলীর (মুঘল শিল্প) আদর্শে তৈরি। গোলকধাঁধার মতো চৌকশ, ত্রিকোণ নকশার বাঁধনে ছোট ছোট গাছ—মাঝখানে কৃত্রিম জলাধার। ফুলের কেয়ারি—সাজানো ছোটো বড়ো পাঁচিল যার উপরে নানান জাতের লতা। মাটি থেকে ছক কাটা বাঁধানো রাস্তা ধরে এক ধাপ উঠলে উপরে বাগান। মাঝখানে কৃত্রিম ফোয়ারার ব্যবস্থা। চার কোণে ছোটো গাছের ব্যাশ। ছোট পাঁচিলের উপর ফুলের কেয়ারি। উপর বাগানের পশ্চিমের কোণে লতাবিতানের তলায় বসবার জায়গা। বাগানের কোণে কোণে ছোটমাঝারী শালুক-পদ্ম ফুলের জন্য জলের আধার। পশ্চিমে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যে এলাকা সেখানে ছোট মাঝারি নানান জাতের ফুলের গাছ আর তার পরেই মালঞ্চ বাড়ির সুসজ্জিত বাগান। উপর বাগানের দক্ষিণ দিকে রথীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত উত্তরায়ণ বাগানের অতি আধুনিক নার্সারী-গাছঘর। ছোট বড় নানা জাতের ছায়াময় গাছের সমন্বয়ে নার্সারী এলাকা—আর সবজি বাগান। বাগানের এই অংশের আর একটি বৈশিষ্ট্য উদয়ন বাড়ির পিছনের ও চিত্রভানু সংলগ্ন বাগানে আম, লিচু, সফেদা গাছের লতানে বেড়া—যা সুন্দর করে সবুজের আস্তরণে দেওয়ালকে আবৃত করে রেখেছে। এই বেড়া দেখলে এলমহার্স্টের ডারটিংটন হলের বাড়ির ছবি চোখে ভেসে ওঠে। বিচিত্রা (রবীন্দ্র-প্রদর্শ-শালার) উত্তরে বিরাট লতানে গাছের বাগান—আম লিচু সফেদা পেয়ারা জামরুল তুত কামরাঙা প্রভৃতি সুদৃঢ় কাণ্ড এবং শাখা প্রশাখা সমন্বিত গাছকে রথীন্দ্রনাথ লতানে গাছে পরিবর্তন করেছেন—যা সকলের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু।

রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবী দেশ বিদেশের নানা জায়গায় গিয়েছেন। উত্তরায়ণের উদ্যানটিতে তাঁরা নানা আদর্শের সমন্বিত রূপ দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংলণ্ডের উদ্যানবিন্যাসের প্রভাব প্রকৃতির উপর বিশেষ হস্তক্ষেপ না করে—প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নষ্ট না করে—যতটা সম্ভব তার সঙ্গে মিল রেখে গাছপালা লাগানো। এরপর জাপানী উদ্যানবিন্যাস, শিল্প কৌশল—যা ঠিক ছবির মতো—অল্প একটু জায়গার মধ্যে অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে একটি সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা। এছাড়া মুঘল প্রভাবও লক্ষণীয়—কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক রীতির সংমিশ্রণ।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে নতুন দিল্লীতে রথীন্দ্রনাথ কৃত কারুদর্শন ও চিত্রাবলীর প্রদর্শনী উপলক্ষে স্টেলা ক্রামরিশ লিখিত নিবন্ধের অংশ—

. . . Rathindranath Tagore knows flowers by his love for them and by science. He is a biologist by training. He is also the architect of his garden in Santiniketan. To its luxuriant harmony he has brought plants from many parks of the earth and from the undergrowth of the Indian jungle, he has made them all thrive together each in the soil it requires. He cares for them, knows and paints them. With loving science he draws the firm logic of their patterns and gives them the space and ground on which they breath their fragrance . . .

[আলোকচিত্র শান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা

কলছাড়া যে মানুষ সাংসারিক
বৃথা কেন ডাকো তারে, নাগরিক?
তোমাদের যন্ত্রখানা সর্বভুখা
ঘটাইছে আকাশের সর্বভুতা,
দুষ্ট সে প্রস্তর-প্রাচীরিক।
মোর মন অন্তরে অন্তরে
ঊনপঞ্চাশবায়ু মন্তরে;
আশ্রয় খোলা তার চারিদিকে;
বৃথা কেন ডাকো মোরে নাগরিক॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩৭ সালে কোন এক সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি আমার অগ্রজ অধ্যাপক শুভেন্দুশেখর বসুকে স্বহস্তে লিখিয়া দেন। শুভেন্দুশেখর ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাশিবিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। পুরানো দিনে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ আনন্দবাজারে ও দেশে লিখিয়াছিলেন। আমি দীর্ঘ ৪১ বছর এই কবিতাটি সযত্নে রাখি। কবিতাটি এখনও অপ্রকাশিত। আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলা দেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, দেশ পত্রিকা দীর্ঘদিন বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে। আর বেশীদিন আমি এই কবিতাটি নিজের কাছে রাখিতে চাই না, দেশ পত্রিকার সম্পাদককে প্রকাশনের জন্য দিলাম।

[illegible]

ভ্রমণ সাহিত্যের সেরা সম্ভার

কালকূট রচনা সমগ্র

সম্পাদনা ঃ সাগরময় ঘোষ ।। ভূমিকা ঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে আগস্টে
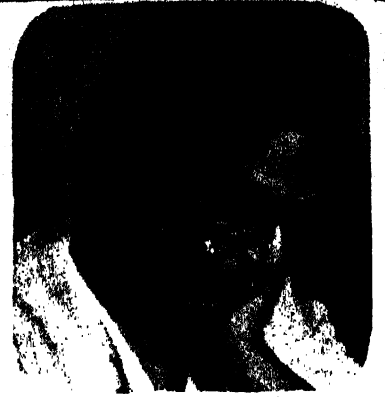
প্রথম খণ্ড	দ্বিতীয় খণ্ড	তৃতীয় খণ্ড	চতুর্থ খণ্ড	পঞ্চম খণ্ড
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, কালকূটের বক্তব্য: গাহে অচিন পাখি, ভোট দর্পণ, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে, প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়। দাম ঃ ২৫·০০	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, নির্জন সৈকতে, বাণী ধ্বনি বেণুবনে, কোথায় পাবো তারে (প্রথমাংশ), দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়। দাম ঃ ২৫·০০	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, কোথায় পাবো তারে (শেষাংশ), মন মেরামতের আশায়, হারায়ে সেই মানুষে, তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়। দাম ঃ ২৫·০০	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, আরব সাগরের জল লোনা, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়, অমৃত বিষের পাত্রে, চতুর্থ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়। দাম ঃ ২৫·০০	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, অমৃত বিষের পাত্রে (শেষাংশ), মিটে নাই তৃষ্ণা, তুষার সিংহের পদতলে, মন চলো বনে, বনের সঙ্গে খেলা, পঞ্চম খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়। দাম ঃ ৩০·০০

সাধারণ গ্রাহকদের প্রতি

দশ টাকা অগ্রিম দিয়ে যাঁরা গ্রাহক হয়েছিলেন তাঁরা পঞ্চম খণ্ড চোদ্দ টাকায় পাবেন। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত খণ্ড সংগ্রহ না করলে যে-কোনো খণ্ডের জন্য পুনর্মুদ্রণের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সুলভ সং সংগ্রাহকদের প্রতি

যাঁরা চার খণ্ডের সুলভ সংস্করণ পেয়েছেন তাঁদের প্রতি অনুরোধ, পুনর্মুদ্রণের ঝামেলা এড়াতে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হবার সাতদিনের মধ্যে খণ্ডটি সংগ্রহ করুন। ডাকযোগে পেতে হলে সাতাশ টাকা পাঠান।

এককালীন গ্রাহক

পাঁচটি খণ্ডের এককালীন গ্রাহক মূল্য : ৯৫ টাকা, সডাক : ১০৫ টাকা। এককালীন গ্রাহক নেওয়া হবে মাত্র ২০০ জন। সাধারণ গ্রাহক আর নেওয়া হচ্ছে না।

প্রতিটি খণ্ড অ্যাণ্টিক অথবা হোয়াইট ওভ কাগজে স্মল পাইকা এবং লাইনো টাইপে ঝকঝকে ছাপা, সুদৃশ্য শক্ত বাঁধাই এবং প্লাস্টিক জ্যাকেট শোভিত। প্রতি খণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র ডাকব্যয়—তিন টাকা। অগ্রিম মূল্য ছাড়া কোনো অর্ডার গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

লাইব্রেরীর জন্য কিছু নির্বাচিত বই

শ্রীমতী কাফে
সমরেশ বসু ॥ ১৬·০০
পরীর সঙ্গে প্রেম
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৮·০০
চিরঞ্জীব সেনের থ্রিলার
ডেড ড্রপ ॥ ১০·০০
অপারেশন সিঙ্গাপুর ॥ ৯·০০
তুষার রায়ের যুগল থ্রিলার
এক্সপেরিমেন্ট ॥ ৭·০০
শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র
মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৫৲

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম
[ধর্ম-আলোচনা গ্রন্থ]
হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৮·০০
সঙ্গীত সম্বন্ধে
[সঙ্গীত আলোচনা গ্রন্থ]
দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার ॥ ৮৲
প্রেমিকার মুখ
[রোমান্টিক গল্প সংগ্রহ]
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬৲

চিরঞ্জীব-এর
কানোজি আংরে ॥ ১০·০০
[অভিযান বিষয়ক]
সেরা সেরা খেলোয়াড় ॥ ৮৲

সমরেশ বসুর
নাচঘর ॥ ৮·০০
বিপরীত রঙ্গ ॥ ৬·০০
কুন্তী সংবাদ ॥ ৮·০০
ছেঁড়া তমসুক ৬·০০

কামনার ক্যাসানোভা
[মড্ সুপার হট উপন্যাস]
পৃথ্বীরাজ সেন ॥ ১৪.০০
টোটো কাহিনী
[তথ্য নির্ভর উপন্যাস]
সুকুমার ভট্টাচার্য ॥ ৭·০০
সমুদ্রে আগুন
[নাবিক জীবনের কথকতা]
শেখর সেনগুপ্ত ॥ ১৮·০০
চেনা অচেনা
মিলন মুখোপাধ্যায় ॥ ১২·০০

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ ১এ কলেজ রো ॥ কলকাতা - ৯
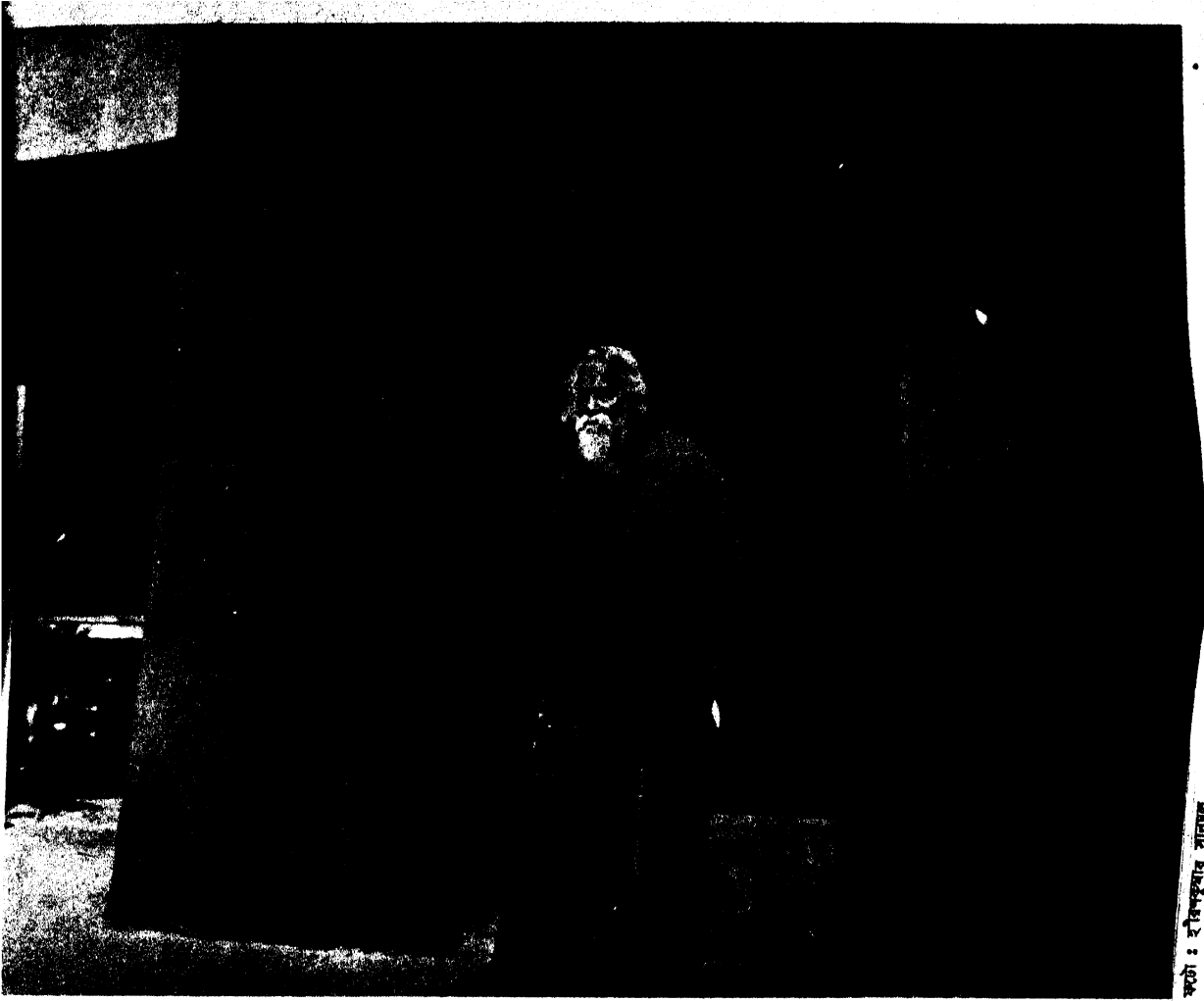
শ্যামলী : কবির ‘শেষবেলাকার ঘরখানি’

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

“সম্প্রতি নেবে এসেছি শ্যামলীর মাটির ঘরে—বাড়িটা পঙ্গু হয়ে আছে—কিন্তু আমার ’পরে এই খোঁড়ার টান আছে বলে মনে হয়। আমার অভিভাবকেরা এটাকে ধ্বংস করবার সংকল্প করচেন। সংসারে আমার পরাভবের তালিকায় এও একটি গণ্য হলো।”

—রবীন্দ্রনাথ। ১১ জানুয়ারি ১৯৩৮

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষবেলাকার ঘরখানি শ্যামলী' তো শুধু একটি মাটির বাড়ি মাত্র নয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অভিনবত্বই যে এই বাড়িখানির প্রসিদ্ধির মুখ্য কারণ—তাও নয়; বস্তুতপক্ষে এই কুটির শ্যামলী হল কবিগুরুর শেষবেলাকার ভাব-কল্পনার এক মূর্ত প্রতীক—তাঁর জীবনের অন্ত্যপর্বের ধ্যানসমন্দির। কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে কবির নিজের হাতে গড়ে তোলা তাঁর এই আবাসমন্দিরকে সযত্নে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করা জাতীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে মনে করি। জীবনের শেষ কয়টি বছর মাটির এই বাড়িখানির সঙ্গে কবিগুরুর যোগ ছিল অতিশয় নিবিড়। তখনো আকাশ ছেয়ে আষাঢ় আসতো এবং শ্রাবণরাতি বরিষণমুখরিত হত। শ্যামলীর বুকে বর্ষা এসে আঘাত করতো—বাড়ির এদিকে ওদিকে মাটি যত খসে, মাটির ছাদ ভিজে জলের ফোঁটা পড়তো ঘরের মেজেতে; কিন্তু কবির মনে এজন্য তখনো দেখা যায়নি কোনো বিচলিত ভাব। বর্ষায় ছাদ ভেঙে পড়বে—এই ভয়ে বাড়ির সকলে তাঁর জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠতেন, কিন্তু শ্যামলী বাড়িতে [illegible] করে নিতেন নিজের ঘরের মধ্যেই। হয়তো তখন তাঁর মন বলতো—

> শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
> তোমারি সুরটি আমার মুখের ’পরে বুকের ’পরে ॥

এই শ্যামলীকে তাঁর জীবৎকালেই কখনো কখনো ভেঙে ফেলার কথা উঠেছিল। কিন্তু তা ঘটে নি। শ্যামলীর উপর কোনো দিন কোনো আঘাত সহ্য করতে রাজি ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে যতগুলি বাড়ি আছে তার মধ্যে শ্যামলীর প্রতিই কবির টান ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর অন্ত্যজীবনের রচনায় শ্যামলী বাড়িটির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও স্থান আছে; যে-ভূমিকা অপর চারটি বাড়ি উদয়ন কোণার্ক পুনশ্চ ও উদীচীর সে-পরিমাণ আছে বলে মনে করি না। সাধারণভাবে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের দুটি কাব্যগ্রন্থের নামে দুটি বাড়ির নাম রাখা হয়—পুনশ্চ এবং শ্যামলী। কিন্তু বস্তুতপক্ষে কথাটা অংশত ঠিক, সবটা নয়। একটি বাড়ি কাব্যগ্রন্থের নামে নামাঙ্কিত, অপরপক্ষে একটি কাব্যগ্রন্থ বাড়ির নামে নামাঙ্কিত। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পাঁচ বৎসর পর পুনশ্চ [illegible] নির্মিত হওয়ার পরের বৎসর শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাড়ির নামে কাব্যগ্রন্থের নামকরণ শ্যামলী ব্যতীত দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

শ্যামলী বাড়ির সঙ্গে শ্যামলী কাব্যগ্রন্থটিই যে শুধু প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তা নয়, পূর্ববর্তী শেষ সপ্তক কাব্যটির কথাও এই সঙ্গে যুক্ত হবে। শ্যামলীর গৃহপ্রবেশ হয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের (১৯৩৫ খৃীঃ) ২৫শে বৈশাখ—কবির পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনে; সেই দিনই প্রকাশিত হয় শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থ। গৃহপ্রবেশের পূর্বেই শ্যামলী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখা হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থে সেটি স্থান পায়।

> আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
> বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
> তার নাম দেব শ্যামলী।
>
> … … …
>
> সেই মাটিতে গাঁথব
> আমার শেষ বাড়ির ভিত

শিশুরা জন্মায় কোমল শরীর নিয়ে
জনসন্স* সেই কোমলতা বজায় রাখে

জনসন্স বেবী ক্রীম
এখানে সবচেয়ে ভাল
কাজ করে কেন—
মলমল-সাদা জনসন্স রোদে পোড়া ত্বকে আরাম এনে দেয় শুকনো ত্বক নরম করে। ল্যানোলিনে সমৃদ্ধ। তেলতেলে করে না কাপড়ে দাগও পড়ে না।

জনসন্স বেবী ক্রীম
এখানে সবচেয়ে ভাল
কাজ করে কেন—
বাতাস, আবহাওয়া, নাক দিয়ে সর্দিঝরা এবং এমন কি চোখের জল ত্বকের ওপর প্রবল ধকল ফেলে। পেলব জনসন্স ত্বক চটপট শুষে নেয় এবং ত্বকের ফাটলে বা ক্ষতে চটপট আরাম এনে দেয়।

জনসন্স বেবী ক্রীম
এখানে সবচেয়ে ভাল
কাজ করে কেন—
কাঁথা বদলে দেবার সময়টুকুর মধ্যে জনসন্স আর্দ্রতা প্রতিরোধের কাজটি করে। শিশুকে শুকনো রাখে, তবে লোমকূপের মুখ বন্ধ ক'রে দেয় না।

জনসন্স বেবী ক্রীম
এখানে সবচেয়ে ভাল
কাজ করে কেন—
হামাগুড়ি দেবার সময় শিশুর কনুই আর হাঁটুতে ঘষা লাগে এবং ত্বকের ছাল উঠে যায়। চটপট কাজ করায় জনসন্স ঘষা জায়গায় আরাম এনে দেয় এবং ত্বক রেশমের মত কোমল রাখে।

*Trademark © J&J 76

Johnson's*
baby cream
PUREST PROTECTION

OBM/7190 RBN

জনসন্স*
বেবী ক্রীম

সারা বিশ্বের মায়েরা এর ওপর আস্থা রাখেন

Johnson & Johnson*

সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে :
যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

… … …

প্রতিদিন আমার ঘরের সমস্ত মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁওয়ায় ;
তার চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়
স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের
নিদ্রাহারা মিতালিতে।

*

শ্যামলী সম্পর্কে কবির অনেকগুলি চিঠিপত্র উদ্ধার করেছি। সেই পত্রগুচ্ছের মধ্য থেকে শ্যামলী সম্পর্কে কবির মনোভাবের একটি স্পষ্ট চিত্র সংগ্রহ করা যায়।

শ্যামলীতে গৃহপ্রবেশের পাঁচ মাস পূর্বে শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৩৪-এর ১১ ডিসেম্বর তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

'এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান ঘরে বাস করে এসেছি—কোথাও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারি নি। এবার কোণার্কের এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্তলোকে ঐটেই আশা করচি আমার শেষ বাসা হবে। তারপরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলবার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহংকারকে লজ্জা দিতে হবে।'

জন্মদিনের এক মাস পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে ৭ এপ্রিল ১৯৩৫ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে কবি লেখেন—

'একটা মাটির ঘর বানাতে লেগেছি। জন্মদিনের মধ্যে সেটা শেষ হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করব, তার পরে শেষ পর্যন্ত আর বাসা বদল করবো না এই আমার অভিপ্রায়।'

১৩৪২-এর ১ বৈশাখ (১৯৩৫ খ্রীঃ) শান্তিনিকেতন থেকে প্রতিমা দেবীকে লিখছেন—

'আমার মাটির ঘর শ্যামলী প্রায় সম্পূর্ণ হলো। জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারব এমন আশা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তোমরা থাকবে না আমি নতুন বাসায় যাব এটা ভালো লাগচে না। উপায় নেই।'

ওই দিন অপর একটি পত্রে নন্দিতা দেবীকে কবি লিখলেন—

'আমার মাটির ঘরের চেহারা দেখলে আশ্চর্য হতিস্। দেশ বিদেশে ওর খ্যাতি রটে গেছে। ভেবেছিলেম মাটির ঘরের নিরালায় থাকব—ঠিক তার উল্টো হবে—আমাকে দেখবার চেয়ে মাটির ঘর দেখবার জন্যে ভিড় জমবে—ফলটা আমার পক্ষে সমানই হবে।'

ওই পয়লা বৈশাখেই অন্য আর-একটি পত্রে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে কবি লেখেন—

'আমার মাটির বাসা অনেক দূর এগিয়েছে। আমার জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারবো এমন আশা পেয়েছি। যদি উপস্থিত থাকতে পারেন আনন্দিত হব। পুরাতন কথদ্রাই নূতন বাসায় পৌঁছিয়ে দেবার ভার নিলে সেটা কল্যাণের হয়।'

২৫শে বৈশাখের গৃহপ্রবেশের বিবরণ পরবর্তী জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী পত্রিকা থেকে জানা যায়। প্রবাসীতে বলা হয়েছে যে কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান শেষ [illegible]

শ্যামলী

নূতন নির্মিত মৃৎকুটির অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বাড়ি এমন মাটিতে তৈরি যে বৃষ্টিপাতে তার বিশেষ বিকৃতি বা ক্ষতি হবে না। এরূপ মাটির এ-রকম বাড়ি এখানে এই প্রথম নির্মিত হল। প্রবাসী আরও লিখেছে যে এই বাড়ির স্থাপত্য-পরিকল্পনা শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের। গৃহে ভিতরে ও বাইরে মৃন্ময় মূর্তিতে ও কারুকার্যে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। এই কুটিরের সামনে সজ্জিত প্রাঙ্গণে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন—

হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল ধ্যানে তব মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যামস্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি। তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্যে রচি আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে।

প্রবাসীর সংবাদদাতা আরও লিখেছেন যে, কবির জন্য শান্তিনিকেতনে যে মৃৎকুটির নির্মিত হয়েছে, গৃহপ্রবেশের দিন তার মেজে ভিজে ছিল।

কবি স্থপতি ও ভাস্করের মিলিত প্রয়াসে শ্যামলীর সৃষ্টি। মাটির ঘর করার ফরমাশ কবির, স্থাপত্য-পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের আর ভাস্কর্য নন্দলাল বসুর।

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত পুরাতন হিসাবের খাতা থেকে শ্যামলী বাড়ি নির্মাণের খরচপত্রের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। মিস্ত্রী গৌর মণ্ডলকে দশ টাকা বকশিস দেবার কথাও লেখা আছে। টি ই লেজার খাতা থেকে জানা যায় শ্যামলী নির্মাণের জন্য তালকাঁড়ি, আলকাতরা, কাঁকর, চুন, সিমেন্ট, তুষ ও ও গোবর কিনতে হয়েছিল। গৃহপ্রবেশের দিন মিষ্টান্নের জন্য খরচ হয় ২৭ টাকা ১৪ আনা ৯ পাই। রবীন্দ্রভবনের শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সহায়তায় এই সংবাদ জানা গেল।

জন্মোৎসব ও গৃহপ্রবেশ উৎসবের পরের দিনই নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কবি লিখলেন—

'কাল জন্মোৎসব হয়ে গেল।...আমার মাটির ঘরটাও তৈরি হলো—খুব চমৎকার হয়েছে, একটা দেখবার মতো জিনিস। ছাদটাও মাটির —এই ব্যাপারটা অভূতপূর্ব। গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে এটা দেখতে আসে। পল্লীবাসীরা যদি খড়ের চালের বদলে মাটির ছাদ করতে পারে তাহলে সেটা তাদের বিস্তর কাজে লাগবে। আগুনের ভয় থাকবে না, আর খড় গোরুকে খাওয়াতে পারবে।'

বিলেতে। ২৯ বৈশাখ তারিখে পুত্রকে লেখা চিঠি—

'২৫শে বৈশাখের হাঙ্গাম চুকে গেল। ওর সঙ্গে গৃহপ্রবেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে—রাত্রে আলো জ্বালিয়েও কাজ চলেছিল। গ্রামের লোকেদের ঔৎসুক্য সব চেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ।'

এই সময় আন্দ্রে কার্পেলেস্‌কে একটি পত্রে (১৪ মে ১৯৩৫) কবি লেখেন—

'Suren has built for me a mud house —a mud casket beautifully worked, for enshrining in it the last few days of my life. All our dwelling places contain varied partnerships of love but this last one of mine will only offer me a perfect solitude of a final departure which will not have the time to allow life's trespassers to invade its loneliness.'

কবির এই পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রভবনের শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়।

গৃহপ্রবেশের কয়েকদিন পরেই কবি কলকাতায় চলে আসেন। শান্তিনিকেতন সে-সময় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ। কবি কলকাতা থেকে এসেছেন চন্দননগরে। সেখান থেকে ২১ মে তারিখে শান্তিনিকেতনে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে একটি পত্রে কবি লেখেন—

'জুলাই মাসে নব মেঘ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমার নতুন বাসায় প্রবেশ করবো। সম্পূর্ণ আশা করি শ্যামলী বাসযোগ্য হবে। [illegible] এবং মানবজাতীয় আপদ নিবারণের [illegible] চারিদিকে বেড়া দেওয়া অত্যাবশ্যক এ-[illegible] মনে রাখিস।...গাঙ্গুলিকে বলিস সের দশেক চিটে গুড় কিনে পাতলা করে গুলে আমার বাতাবী ও আমগাছগুলোর গোড়ায় যেন দেওয়া হয়।'

চিঠির অন্তর্গত গাঙ্গুলি হলেন প্রমোদ গাঙ্গুলি। তিনি কবির কেয়ারটেকার ছিলেন কিছুদিন আর শ্যামলী সামলাবার ভারও ছিল তাঁর উপরে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন সুধাকান্তবাবুর দৌহিত্রী শ্রীমতী আলপনা রায়চৌধুরী।

গৃহপ্রবেশের প্রায় মাস তিনেক পর ১৯৩৫-এর ২ আগস্ট কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে শ্যামলী থেকে লেখেন—

ভালই লাগছে। বাড়িটা দেখবার জিনিস।...
আজ আমার সামনে এই বাড়ির বাইরে কোনো
সম্ভাবনাই আর বড় দেখতে পাচ্ছি নে।'

ওই বছর ১৯ অক্টোবর নন্দিতা দেবীকে কবি লেখেন—

> 'আমার বয়স বেশি হয়েছে এই কথাটার প্রমাণ প্রতিদিন পাচ্ছি।...নিস্তব্ধ হয়ে থাকি শ্যামলীতে, দর্শনপ্রার্থীর দল আসা যাওয়া করে—মাটির বাড়ি দেখে, আর দেখে যায় এই মাটির মানুষটিকে।'

রবীন্দ্রনাথের শেষবেলাকার রচনার ভাণ্ডারী সুধীরচন্দ্র কর তাঁর 'কবি-কথা' বইটিতে শ্যামলী সম্পর্কে যে-বিবরণ দিয়েছেন তা উদ্ধারযোগ্য। ক্রমশই লিখেছেন, 'নিজের ঘরটিকেই তিনি আগাগোড়া মাটির করতে চাইলেন। পাশের গাঁ ভুবনডাঙা থেকে গৌরদাস মণ্ডল এল মিস্ত্রী। তৈরি হল তার থেকে শ্যামলী।... আশ্রমের ভিতরে কলাভবনের ছাত্রাবাসও তৈরি হয় সেই থেকেই মাটির ছাদ দিয়ে। আগুনের হাত থেকে বাঁচা গেল তো পড়া গেল জলের হাতে! বর্ষায় ছাদ যায় ধ্বসে। কিন্তু কবি দমেন নি। নূতন বাড়ি তাঁর জন্য আরো তৈরি হয়েছে। কিন্তু পুরনো ঐ শ্যামলীর ছাদ আবার তিনি মাটি দিয়েই শক্ত করে গড়েছেন, আবার তাতে বসবাস করেছেন।'

শ্যামলীকে কবি সাজিয়ে তুলেছেন নিজের মনের মত করে। কোণার্কের বারান্দা থেকে বেলফুলের টবগুলি এনে রাখা হয়েছে শ্যামলীর সামনে। বাড়ির চারদিকে লাগানো হয়েছে অনেকগুলি বাতাবী ও পাতিলেবুর গাছ। লেবু ফুলের গন্ধ কবি খুব ভালোবাসতেন। বর্ষায় শ্যামলীকে ঘিরে যেখানে যে চারাগাছ উঠল—তা সরাতে দিলেন না তিনি; বলতেন—ওরা ঠিক জায়গা বেছেই উঠেছে, ও আর নড়িও না।

শ্যামলীতে রবীন্দ্রনাথের বাসের চিত্র এঁকেছেন রানী চন্দ তাঁর 'গুরুদেব' বইটিতে। রানী[illegible] লিখেছেন

শ্যামলীর দেয়ালে শিল্পী রামকিংকরের কাজ

শ্যামলীর দেয়ালে টেরাকোটা

'দুপুরে এ কোণায় আছেন তো বিকেলে ঐ কোণে গেলেন: ছবি আঁকতে হলে আর এক কোণ বেছে নিলেন। দিন-ভর চলে এমনি। সন্ধ্যার পরে এসে বসেন শ্যামলীর সামনে খোলা অংগনে। কত রাত অবধি বসেন একা কী স্তব্ধ হয়ে দু চোখ বুজে।'

শ্যামলীর পরে তৈরি হয়েছিল তারই পাশে ছোট আকার বাড়ি পুনশ্চ—এক সময় উঠেও গিয়েছিলেন কবি সে-বাড়িতে; কিন্তু তার পরে আবার সেই 'ফিরে চল মাটির টানে'। নির্মলকুমারীকে ১৯৩৮-এর ১১ জানুয়ারি তারিখে কবি লেখেন:

> 'সম্প্রতি নেবে এসেছি শ্যামলীর মাটির ঘরে বাড়িটা পংগু হয়ে আছে—কিন্তু আমার 'পরে এই খোঁড়ার টান আছে বলে মনে হয়। আমার অভিভাবকেরা এটাকে ধ্বংস করবার সংকল্প করচেন। সংসারে আমার পরাভবের তালিকায় এও একটি গণ্য হলো।'

আমাদের সৌভাগ্য, কবির জীবৎকালে তাঁকে পরাভূত হতে হয়নি।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে (সপ্তর্ষি, চতুর্থ বর্ষ, রবীন্দ্র সংখ্যা) শ্যামলীর কবি সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র উপহার দিয়েছিলেন। সুধাকান্তবাবুর বর্ণনা, 'সে-দৃশ্য কোনোদিন ভুলবো না—শ্যামলী উঠোনের একদিকে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লাগানো ছোট্ট তেঁতুল গাছে যেদিন দেখলেন প্রথম তেঁতুল ধরেছে—বললেন আমাকে—আমার গাছের প্রথম তেঁতুল, পাড় দেখি দু-চারটে, তুইও খা আমিও চেখে দেখি। লম্বা সাদা দাড়ির বৃদ্ধ কী সরল শিশুর মতন তেঁতুল পাড়ার প্রস্তাব করেছিলেন। তেঁতুল পাড়া হলো, খেলেন কি আর। একটা একটু ভেঙে চাখলেন তাতেই কি আনন্দ। এইসব গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে নিজের হাতে খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে বাইওকেমিক ঔষধের গুঁড়ো দিতেন। আমি তো হাসতুম। ভাবতাম শেষটায় মানুষ ছেড়ে গাছের উপর বাইওকেমিকের পরীক্ষা। কী মমতাই ছিল শ্যামলীর উপরে দীর্ঘ দিন।'

শ্যামলী বাড়ির দেওয়াল-ভাস্কর্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দেখা হয় নাই' বইটিতে। তিনি মনে করেন, শ্যামলীর দেওয়াল-ভাস্কর্যগুলির মধ্য দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে মন্দির-টেরাকোটা শৈলীর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হয়েছিল।

*

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা শুধু বিশ্বভারতীর দায়িত্ব হবে কেন? সে-দায়িত্ব শুধু বংগবাসীর নয়—সমগ্র ভারতবাসীর। রবীন্দ্রনাথ নামক মহাপুরুষটি তো শুধু শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর নন— তিনি বিশ্ববাসীর কবি—বিশ্বকবি। তাঁর পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত মাটির বাসা—তাঁর শেষ বেলাকার মানসমন্দির শ্যামলীকে কোনো অবস্থাতেই বিনষ্ট হতে দেওয়া যেতে পারে না। সারাই করতে গিয়ে তার রূপান্তর ঘটানোও ঠিক হবে না কখনোই। তাকে কোনো অবস্থাতেই 'আধুনিক' করে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। এতকাল শ্যামলী যেরূপে ছিল তাকে সেইভাবে রক্ষা করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। লক্ষ্য রাখতে হবে আর যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয়। মন্দিরে শংখধ্বনিতে আপত্তি নেই, কিন্তু মন্দিরগাত্রে হাতুড়ি পিটনোর শব্দ কর্ণ এবং মর্ম উভয়কেই পীড়িত করে। যে-ঐতিহাসিক বাড়িটিকে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য—উইপোকা লেগেছে বলে তার সমস্ত পুরাতন মূল জানলা দরজাগুলি নিঃশেষে ভেঙে ফেলে দেব (এই মুহূর্তে শ্যামলী বাড়ির সমস্ত জানলা, দরজা দেওয়াল কেটে খুলে ফেলা হয়েছে)—এ কেমন কথা হলো! গোবুরায়কে রাজা বলেছিল, 'মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায় ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র?' তখন—

> সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
> কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
> ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
> ভরিয়া দিল রাজার মু[illegible] বক্ষ।

শেষে,

> কহিল রাজা, 'করিতে ধুলা দূর,
> জগত হল ধুলায় ভরপুর।'

শুনেছি বিদেশে টলস্টয়ের মিউজিয়ামে তাঁর ব্যবহৃত এক-পা ভেঙে যাওয়া চেয়ারটি সেই অবস্থাতেই সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। পুত্র কানা হলেও স্নেহময়ী মাতার নিকট সে পদ্মলোচন। একটা পা খোঁড়া বলে সবটাকে ফেলে দিয়ে নতুন আর-একটি তৈরি করে এনে সেখানে বসানো প্রীতি বা মমতার নিদর্শন নয়—ইতিহাসজ্ঞানেরও পরিচায়ক নয়। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে' যে-বাসা রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন 'হয় নি বাঁধা', আমরা কি সেখানে একটা দোতলা বাড়ি বানিয়ে দিলে কাণ্ডজ্ঞানের নিদর্শন হবে? সেই রকম শ্যামলীকেও আজ যদি আমরা নতুন সাজে সজ্জিত করতে চাই, তার ঘরে ঘরে নতুন জানলা দরজা বসাতে চাই, কাঁচের শার্সি দিয়ে এবং নবনির্মিত আসবাবপত্রে সাজিয়ে তাকে নবকলেবর দান করতে চাই—তবে তা যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক হলেও ইতিহাসের মর্যাদাকে রক্ষা করা হবে না, কবির বাসনাকেও অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হবে।

কবির সেই কথাটি মনে রাখতে হবে—'এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহংকারকে লজ্জা দিতে

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ১৭ ॥

পণ্ডিত নেহরুকে অনেক ছোটবেলা থেকে জানতাম, চিনতাম,' এবং অনেক সুযোগও হয়েছিল কাজের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার। বিশেষ করে আরও বেশী হল যখন ১৯৪৫ সালে 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া' ব্যালেটা নিয়ে দিল্লীতে গেলাম। আই এন টি-র মাধ্যমে। তার কিছু দিন পর একটা এশীয় সম্মেলন হয়েছিল। স্বাধীনতার আগেই। তবে ঠিক সালটা চট করে মনে করতে পারছি না। খুব সম্ভবত ১৯৪৭এর গোড়ার দিকটাতেই। পরে আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মিউজিক ডিরেকটার হয়ে তখন ওঁর সঙ্গে বেশ সুন্দর একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। উনি খুব স্নেহ করতেন আমাকে, প্রয়োজন হলেই ডেকে পাঠাতেন। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যাপার থাকলে, হয়তো কোনও বড়সড় বিদেশী অতিথি এলেন বাড়িতে, উনি আমাকে বাজাবার জন্য ডেকে পাঠাতেন। আর তা ছাড়া আমি কিছু শো করেছিলাম 'মেলোডি অ্যাণ্ড রিদম' বলে। ত্রিবেণী কলাসংগম বলে দিল্লীর যে দলটা, যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুন্দরী শ্রীধারানী, ওঁদের সংগঠনের প্রায় ৮০/৯০ জন লোক নিয়ে আমি প্রোগ্রামটা করেছিলাম। এ-দেশে সম্ভবত ওরকম একটা এক্সপেরিমেণ্ট ঐ প্রথম হয়। অর্কেস্ট্রা ছিল, আর সেই সঙ্গে একটা কোরাল গ্রুপের গান। সেই ধ্রুপদ-ধামার থেকে নিয়ে খেয়াল, ঠুংরী, পল্লীসংগীত এবং অর্কেস্ট্রেশন—পুরো আড়াই ঘণ্টা। তো পণ্ডিতজী সেটা দেখতে এসেছিলেন। এবং সেখানে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। ভাবলে আমার এত ভাল লাগে। উনি সেণ্ট্রাল বক্সে বসেছিলেন। ললিতকলা আকাদেমীর হল ছিল সেটা। বেশ বড় স্টেজ। সেণ্ট্রাল বক্সে পণ্ডিতজী। প্রোগ্রামটায় আমি একটা লোরী অঙ্গের অর্থাৎ ঘুম পাড়ানোর গান রেখেছিলাম। 'শো যা রে ললনা, তারে বিছোনা চন্দন কে পালনা'। একটি মেয়ে কোলে বাচ্চা নিয়ে গানটা গেয়েছিল, চারিদি সঙ্গীরা সব দল বেঁধে বসে। আলোর ব্যবহারেও নিদ্রার পরিবেশটা ঘনি তোলা হয়েছিল। আর লক্ষ্মী বউদিকে দিয়ে গাইয়েছিলাম গানটা। তো তা একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। প্রত্যেকটা আইটেমের পরে পরেই তুম হাততালি পড়ছিল। অথচ এই আইটেমের পর দেখলাম পর্দা পড়ে গেল অ কোনও আওয়াজ নেই। কেউ একটা কিছু রেস্‌পন্‌স্‌ জানাচ্ছে না। কি ব্যাপ কিছু বুঝলাম না। পরে জানতে পারলাম। পণ্ডিতজী মাঝখানে ছিলে তো? আর সারা দিনের ঝকমারির ভেতর থেকে সময় করে এসেছিলেন। ত তো ভীষণই খাটতেন উনি। সবাই জানেন কিরকম পরিশ্রম করতেন। পুরো উনি দেখেছিলেন এই শোয়ের। এই লোরীর সময়টায়, গানের পরিবেশে জন্যও বটে, আবার সারা দিনের খাটা-খাটুনির জেরেও বটে, উনি ঘুমি পড়লেন। এবং যখন পর্দাটা পড়ল তখন ওঁর নাক ডাকছিল। ছোট হল তো সবাই দেখল ওঁর মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে এবং উনি নাক ডাকিয়ে গ নিদ্রায় মগ্ন। প্রত্যেকের যেন কি একটা মায়া হল তাতে। কেউ ভেবে করেনি তবে কেউই ঠিক চাইছিল না ওঁকে হাততালি দিয়ে অপ্রস্তুত করতে। পা ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। প্রায় অনেকখানি সময় এভাবে কেটে গেল। Wasn't Sweet? চমৎকার! পরে অবশ্য যখন ওঁর ঘুম ভাঙল উনি স্টেজে এসে আম জড়িয়ে ধরলেন। সে ছবিটা পরে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দেখেছেন বোধ হ উনি আমাকে জাপটে ধরে আছেন। তো যা হোক, উনি আমাকে সত্যিই খ ভালবাসতেন। ওঁর রাজনৈতিক দিকটা নিয়ে অনেক মতবিরোধ থাকতে পারে ওঁর অনেক রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপারই আমি বুঝি না, অনেক ক্রিয়াকলা সমর্থনও করি না। তবে মানুষ হিসেবে ওঁর ওপর আমার ভীষণ শ্রদ্ধা একটা সুপারম্যান বলা চলে ওঁকে। ভগবান যেন ওঁকে রূপে, গুণে, ঐশ্বর্যে পুরোপুরি ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া নিজে তো দেখেছি, খুব আদর্শ বাদী লোক ছিলেন। মানুষকে ভালবাসতেন। এবং গান-বাজনা বেশী বুঝলেও, যতখানি উনি জ্ঞানবিজ্ঞান বা খেলাধুলো বুঝতেন, গান-বাজনা জন্য যে উৎসাহ ওঁর ছিল সেটা ভীষণ চোখে পড়ত। চিত্রকলা বা ভাস্কর্য উনি কতখানি বুঝতেন জানি না। কিন্তু সে-সমস্তর জন্য ওঁর উৎসাহ, পয়সা

গান-বাজনা যে ইন্দিরাজী বড় একটা বোঝেন তা না। কিন্তু শিল্পীদের জন্য যে শ্রদ্ধা যে অনুরাগ, সেটা ওঁর পুরো মাত্রায় আছে। শিল্পীও যে একটা মানুষ একটা সম্মানের পাত্র, সেটা উনি বোঝেন, মানেন। দুঃখের বিষয়, এটা খুব বেশী রাজনীতিবিদদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। ওপরের ছবিতে ইন্দিরাজী দপ্তে বসে আছি আমি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible]

পণ্ডিতজী স্টেজে এসে আমায় জাপটে ধরলেন। সে ছবিটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। পণ্ডিতজীর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে। তবে মানুষ হিসেবে ওঁর ওপর আমার ভীষণ শ্রদ্ধা। একটা সুপারম্যান বলা চলে ওঁকে।

দিক থেকে ঔদার্য এবং সমর্থন—এটা ওঁর সব সময়েই ছিল। অন্য ধরনের মানুষ বুঝলে না? এবং রাজনীতির দিকটা বাদ দিলে এতখানি আমি ইন্দিরাজীর জন্যও বলতে পারি। গান-বাজনা উনিও যে বড় একটা বোঝেন, তা না। কিন্তু শিল্পীদের জন্য যে শ্রদ্ধা, যে অনুরাগ, সেটা ওঁর পুরো মাত্রায় আছে। শিল্পীও যে একটা মানুষ, একটা সম্মানের পাত্র, সেটা উনি বোঝেন, মানেন। দুঃখের বিষয়, এটা তুমি খুব বেশী রাজনীতিবিদের মধ্যে পাবে না। গান-বাজনার লোক মানেই একটা এন্টারটেনার। একটা তাচ্ছিল্যজ্ঞান এ'দের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়। যার অনেকটাই শিল্পকলার বোধশক্তির অভাব থেকেই। ভাবেন, বাজিয়ে? ও তো একটা নীচু স্তরের লোক। বিউরোক্র্যাট, বড় বড় অফিসারদের মধ্যেও এই জিনিসটা আছে তুমি দেখতে পাবে। এটা আমি ভাল করে টের পেয়েছি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে থাকার সময়ে। তখনকার তথ্য এবং জনসংযোগ মন্ত্রী কেসকার সাহেব প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন গাইয়ে-বাজিয়েদের চা-কফির পার্টিতে। সেখানে যাঁরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এই ব্যাপারটা দেখতাম। কাজেই, অন্যান্য গাইয়ে-বাজিয়েরা খুব সেলাম ঠুকে নিত্য হাজির হলেও আমি সেটা পারতাম না। ওঁদের ঐ অ্যাটিচ্যুডটা আমার বরদাস্ত হয়নি। বলতে পারো আমাদের যুগের কিছু মিউজিসিয়ান নিজেদের চেষ্টায় উঠে এর কিছু জিনিস বদলেছেন সমাজে। তবুও চারিদিকে এই মনোভাবটা কিছুটা কিছুটা থেকে গেছে। খুব দুঃখের বিষয় এটা। খুবই দুঃখের। কেসকার সাহেবের সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা সে সময়ে হয়নি অনেকটা এই কারণেই। এবং উনিও আমাকে আমার এই ছোটখাটো অহংকারের জন্য এড়িয়ে চলতেন। এই বিউরোক্র্যাটদের ব্যবহারের মধ্যে অনেক শিল্পী তখন বড় কোনও অসম্মান দেখতেন না। কারণ, যুগ যুগ ধরে নবাববাহাদুর, জমিদার, দেওয়ানদের সভায় কাজ করে এসে এ'দের মধ্যেও একটা হীনমন্যতা গড়ে উঠেছিল। আমাদের যুগেই প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিল এই মনোভাবের বিরুদ্ধে। এবং এখনকার শিল্পীরা তার সুফল পাচ্ছে। অথচ আমাদের কি অপমানের মধ্যেই না যেতে হয়েছিল! আশা করি, দিনে দিনে শিল্পীদের পরিস্থিতির আরও অনেক উন্নতি হবে। আরও সম্মান পাবেন গাইয়ে-বাজিয়েরা। তাঁদের নিজেদের সম্মান তাঁরা তখন আরও জেদের সঙ্গে বজায় রাখতে পারবেন। এই সেলাম করা, ঝুঁকে অভিবাদন করা, বেশী বেশী খাতির দেখানো—এইসব দুর্বলতা আর থাকবে না। যা হোক, ইন্দিরাজীর কথায় ফের ফিরে যাচ্ছি। উনি যে এত বড় হয়েছিলেন তা তো ঠিক বিনা কারণে নয়। এখনকার কথা বলছি না। প্রথম উনি যখন জনসংযোগ মন্ত্রী হয়ে এলেন তখনই ঠিক উনি যে কাজটা করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সে সময়ে সরকারী বিভাগের সংগীতশিল্পীদের কি জঘন্য মাইনের হার ছিল তোমরা ধারণা করতে পারবে না। আর তার ওপর কড়াকড়ি—এখানে যাবে না, ওখানে যাবে না। আরও কত কি। হেন করবে না, তেন করবে না। অথচ যে মাইনে ওরা পেত তাতে কিভাবে চলে বল? সেই আড়াই শ' তিন শ' থেকে শুরু হত, আর শেষ হত গিয়ে পাঁচ শ'য়। আমি গিয়ে প্রথম একটা সর্বনাশ করলাম। আমার অর্কেস্ট্রায় যাদের নিলাম তাদের সবাইকে সাড়ে সাত শ' টাকা দিয়েই শুরু করলাম। তাতেই ওদের একেবারে টনক নড়ে গেল। আমি গ্রেড করেছিলাম পাঁচ শ' থেকে সাড়ে সাত শ' টাকা। তার ওপর আমার কাজে যাদের লাগালাম তাদের গ্রেডের পুরোটাই ধরে ধরে দিলাম। এবং তাতে হইহই পড়ে গেল। যেসব শিল্পী অর্কেস্ট্রায় ছিল না তারা খুব আপত্তি তুলল। কিন্তু ঐ সময়ে ঐ অজুহাতে আমিই বাড়াতে পেরেছিলাম বলে একটা সুবিধে হল। ইন্দিরাজীর সময়ে উনি নিজে হস্তক্ষেপ করে সমস্ত শিল্পীদের মাইনেই খুব ভাল করে বাড়িয়ে দিলেন। এবং সেটাই ওরা এখন পাচ্ছে। আগের তুলনায় যা কিনা অনেক অনেক বেশী। এবং এই সম্মানজনক মাইনের জন্য ইন্দিরাজীর পুরো একার কৃতিত্ব। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয় তরফেই আমার ইন্দিরাজীর সঙ্গে জানাশোনা ছিল। তবে খুব বেশী যাওয়া-আসা করতাম না। কারণ, বড় বড় লোকদের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা তো সব সময়ে লোকে ভাল চোখে দেখে না। তাই ভাবতাম কি দরকার। এই মনোভাবটা আমার পণ্ডিতজী এবং ইন্দিরাজী উভয়ের প্রসঙ্গে খাটে। এক-একটা প্রার্থনা নিয়ে লোকে সব সময়ে ওঁদের কাছে যেত। আমি তাই একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলতাম। এবং সেটাই ভাল। ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁদের কাছে খুব বেশী যাতায়াতটা এক ধরনের হীনমন্যতার লক্ষণ। (ক্রমশ)

মীনা বন্ধুকে সাহায্য করলো!

মন্নু এবার মীনার ছোট্ট বন্ধুর পেছনে লাগলো।

ওর চুল টেনো না বলছি—!

ঠিক হয়েছে!

!

উফ্!

মাকে বলবো আমাকেও নিউট্রামুল দিতে...

দিনে-দুবার নিউট্রামুল খাওয়া অভ্যেস করলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্যেই দেশের হাজার হাজার লোক সব ছেড়ে এখন আমুলের তৈরী শক্তিবর্ধক পানীয় নিউট্রামুল ধরেছেন।

আমুল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামুলে আছে—আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্ত্বেও নিউট্রামুলের দাম কম। নিউট্রামুলের ৫০০ গ্রা টিন মাত্র টা. ১১.০০, ট্যাক্স আলাদা।

মীনা এবং আরো অনেকে নিউট্রামুল খেতে দারুণ ভালোবাসে!

daCunha/N/2e/Ben

মানুষ পাথর

সমরজিৎ কর

॥ ৩ ॥

'ডিপোজিট নাম্বার সেভেনটিন। আর এই জায়গাটার নাম ওয়ানসফি। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ থেকে এখানে আমাদের ড্রিলিং-এর কাজ চলছে।' বললেন গোবিন্দচন্দ্র নাহা। তাঁর ওপরই ওয়ানসফি এই ড্রিলিং স্টেশন দেখাশোনার দায়িত্ব। আরও দুটি জায়গায় ড্রিলিংও তাঁকে দেখতে হয়। একটি খুল্লোখোলায়, অপরটি লালমাটিতে।

প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কাজ। শুধু শ্রমসাধ্য বললে ভুল হবে। দরকার যথেষ্ট হিসাব নিকেশ, সেই সঙ্গে সতর্কতা।

প্রথমে ম্যাপিং। অর্থাৎ যত পার, চষে বেড়াও। এ দায়িত্ব ভূ-তাত্ত্বিক বা জিওলজিস্টদের। ডাক্তারদের সঙ্গী একটি স্টেথোস্কোপ, একটি থার্মো-মিটার এবং ছোট্ট এক বাক্স ওষুধ। আর জিওলজিস্টদের নিত্যসঙ্গী একটি কম্পাস, একটি লেন্স, একটি হাতুড়ি এবং একটি ক্যামেরা। এদের সম্বল করেই তাঁরা চষে বেড়ান। কখনও প্রান্তরে, কখনও উপলসঙ্কুল উপত্যকায়, কখনও গহন অরণ্যে, দুর্গম পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় অথবা নদী, প্রস্রবণ এবং সমুদ্র অধ্যুষিত এলাকায়। কোথাও গাড়ি চলে। কোথাও পথ চলার জন্যে নির্ভর করতে হয় ঘোড়া অথবা খচ্চরের ওপর। তবে বেশীর ভাগই হেঁটে চলা। মাইলের পর মাইল শুধু হেঁটেই চলা। অনেক সময় রাত কাটাবেন, তার আশ্রয় নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চল। হয়ত পাহাড়ী দেশ জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করো। সেখানে বন্য পশুর ভয়; সাপের ভয়। অনেক সময়ে থাকে অজ্ঞাত পোকামাকড়। কখন যে তারা গায়ে এসে বসবে, কেউ জানে না। বিষাক্ত পোকা। একবার দংশন করলে আর রক্ষে নেই। শরীরের কোন অংশ হয়ত ফুলে উঠল। অথবা ক্ষত সৃষ্টি হল। এর পর আছে আদিবাসী। না জানা থাকে তাদের ভাষা, না আচরণ। অনেক সময় তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয় প্রাণ হাতে করে। কিন্তু উপায় তো নেই। ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে প্রথমেই দরকার ম্যাপিং। ওঁরা বলেন 'টপোগ্রাফি'। জানতে হবে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূ-স্তরের চরিত্র। কোথাও পাললিক স্তর, কোথাও আগ্নেয় শিলার কাঠিন্য অথবা পরিবর্তিত শিলা।

কোথাও মাইলের পর মাইল শুধু বালি। মাটি। কোথাও পাহাড় এবং পর্বতমালা। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে সমভূমির মাটির স্তর ভেদ করে নিচে নেমে গেছে। আবার কখনও বা উঁচু পাহাড়, এক হাজার, দু হাজার অথবা তিন হাজার ফুট উঁচু। তার বিস্তৃত চূড়া মাইলের পর মাইল প্রায় সমভূমির মত। যেমনটি দেখেছি চেরাপুঞ্জিতে। দেখা যাবে সমতল-চূড়া সেই পাহাড় হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন শেষ হয়ে গেছে। তার প্রান্ত নদীর খাড়া পাড়ের মত সরাসরি উপর থেকে [illegible] সমভূমির মাটির গভীরে ভূ-তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন 'ফল্ট'। যা চ্যুতি।

ম্যাপিং মানে কোথায় কী রকমের ভূ-স্তর পৃথিবীর বুকে মাথা চাড়া দিয়ে আছে, জেনে নাও। জেনে নাও কোন জায়গা সমুদ্রতল থেকে কতটা উঁচুতে, সেখানকার ভূ-স্তরের প্রকৃতিই বা কেমন?

এর জন্যে দরকার লেন্স। পাথর বা মাটির নমুনা নিয়ে দেখে নাও, তার বাইরের প্রকৃতিটা কী রকম। দরকার হলে হাতুড়ি মেরে খানিকটা পাথর কেটে নাও। তারপর লেন্সের সাহায্যে দেখে নাও তার রঙ, তার গঠনবৈচিত্র্য। এবার সেই নমুনাটি একটি থলের মধ্যে ভরে তার গায়ে লিখে রাখ, এ পাথর কোত্থেকে পাওয়া গেল, কী ভাবেই-বা পাওয়া গেল। ক্যামেরা বের কর। যে স্তর থেকে নমুনাটি পাওয়া গেল, তার ছবি তোল, ছবি তোল আশপাশের অঞ্চলের। রঙীন ছবি তুললেই ভাল হয়। তাহলে আরও বিশদভাবে ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান রেকর্ড করা যায়।

কম্পাস? হ্যাঁ, তারও ভূমিকা যথেষ্ট। শুধু কোন জায়গায় কতটা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সেটা জানাই নয়, সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্রের স্বরূপটিও জানতে হয় কম্পাসের সাহায্যে।

পাথরের স্তূপ। কোথাও খাড়া। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। কোথাও পুরু স্তর। পর পর সাজান। মাটির সঙ্গে সমান্ত-রাল অবস্থায় এগিয়ে গেছে এদিক থেকে ওদিক। একদা, কতকাল আগে এখানে ছিল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের বুকে জমেছে পলি, নদী স্রোতে বয়ে আনা বালি, পাথর। কালে কালে তারা শিলায় পরিণত হয়েছে। কখনও ভূ-তাত্ত্বিক চাপে উত্তপ্ত হয়ে তাদের কোন কোন অংশ গলে গিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে পরিবর্তিত শিলায়। মাটির ভেতর থাকে নানা রকম রাসায়নিক বস্তু। এ পরিবর্তন তারাও ঘটায়। তৈরি হয় নতুন ধরনের শিলা। মেটামরফিক রক। পাথরের এই বৈচিত্র্য দেখে ভূ-তাত্ত্বিকরা বলে দিতে পারেন কোথায় কী ধরনের খনিজ সম্পদ প্রকৃতি তার আঁচল দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে।

'মুখ দেখে আপনারা মানুষ চেনার চেষ্টা করেন, আর আমরা পাথর দেখে অনুমান করি প্রকৃতি তার কোন সম্পদটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।' মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু। 'ড্রিলিং তো অনেক পরে। প্রথমে এই হাতুড়ি। পাথরের বুকে হাতুড়ি মেরে প্রথমে নমুনা নিন। তারপর আছে রাসায়নিক পরীক্ষা। আছে ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীদের নিরীক্ষণ। দেখে শুনে তাঁরা যখন

বলবেন, মাল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরই তো ড্রিলিং। ড্রিলিং-এ খরচ তো কম নয়। লাভজনক কিছু পাওয়া যাবে কী না, সেটা না দেখে ড্রিল করা চলে না।'

আমাদের সামনেই ড্রিলিং চলছে। ডিজেল ইঞ্জিনের কান ফাটানো শব্দ। সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে লোহার নল ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাথরের বুকে। গভীরে। যেমনটি আমরা টিউবওয়েল তৈরির সময় দেখে থাকি।

তবে এখানে কাজটি আরও শক্ত। প্রথম নলটির ডগায় একটি বোরার লাগিয়ে নাও। বোরারের সামনে বসান থাকে এক ধরনের ছোট ছোট হীরের টুকরো। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শক্তিতে পাথরের বুকে চেপে বসে বোরারের সামনের অংশ যখন ঘুরতে থাকে, পাথর ক্ষয়ে গিয়ে তৈরি করে ছিদ্র। বোরারের পেছনে আঁটা নল এবার সেই ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে ঢুকতে থাকে ভূ-স্তরের গভীরে। সেই নলই সংগ্রহ করে নিয়ে আসে ভূ-স্তরের নমুনা।

দেখেছি। দেখেছি ওয়াসাফির বিস্তৃত অঞ্চল। এক সময় সিলিমেনাইটের স্তর ওপরেই ছিল। ওপর থেকে কেটে তাদের সংগ্রহ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তৈরি হয়েছে খাদ। মূল্যবান এই বস্তুর সংগ্রহে জিওলজিকাল সার্ভে এবার হাত বাড়িয়েছে গভীর ভূ-স্তরের নীচে।

দিতেই তো হবে। কোন ভাণ্ডারই তো আর অসীম হতে পারে না। সিলিমেনাইটের সঙ্গে এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে করান্ডাম। সে তো অনেক দিনের কথা।

সোনাপাহাড়ে সিলিমেনাইট এবং করানডামের এই যে সমাবেশ সে খবর প্রথম জানিয়েছিলেন একজন ব্রিটিশ ভূ-বিজ্ঞানী। নাম এফ আর ম্যালেট। সেটা ১৮৭৯। পরে ১৯২৯ সালে এই নিয়ে এ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালান জে এন ডান, ১৯৩৮ সালে সি এস ফক্স, এবং ১৯৩৯ সালে ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক ডি পি সেনথী। এর পর এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কাজে ভাটা পড়ল। যুদ্ধের পর স্বাধীনতা। এবার [illegible] উদ্যমে এবং পরিকল্পনায় সোনাপাহাড়ের বিস্তৃত অঞ্চলে অনুসন্ধানের কাজে হাত দিল জিওলজিকাল সার্ভে। আবিষ্কৃত হল, সোনাপাহাড় তার ১৩০ বর্গ কিলোমিটার ধরে সঞ্চিত করে রেখেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানের সিলিমেনাইট। মোট সাতাশটি ডিপো-জিটের সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু সোনাপাহাড়েই নিশ্চিতভাবে ১,২৬,০০০ মেট্রিক টনের মত এই আকরিকটি সংগ্রহ করা যাবে বলে জিওলজিকাল সার্ভের ভূ-তাত্ত্বিকরা মনে করেন।

তরুণ জিওলজিস্ট ওয়াধাবনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। পাথরের সঙ্গে তার একাত্মতা এই তো সম্প্রতি। তবু মনে হল, দিল্লির এই স্মার্ট ছেলেটির কাছেও এখন যেন পাথরই জীবন। পাথর তাঁর স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা।

'জানেন তো, সিলিমেনাইট মানে অ্যালুমিনা এবং সিলিকার সমাবেশ। বলতে পারেন তাদের জটিল রাসায়নিক যৌগও।' বললেন ওয়াধাবন। 'এখানে আমরা যে সিলিমেনাইট পেয়েছি তাতে

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১০ ॥

হেয়ার সাহেব শাস্তি দেবেন শুনে গঙ্গানারায়ণ তেমন ভয় পায়নি। ওঁর কাছ থেকে শাস্তি পাওয়া একটা মজার অভিজ্ঞতা। পিঠে দু'চার ঘা পড়ে বটে কিন্তু তারপর হেয়ার সাহেব নিজেই এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েন যে তখন তাঁকেই সামলাবার জন্য বলতে হয়, না মহাশয়, অতি অল্পের ওপর হয়েছে, বিশেষ বেদনা বোধ নাই।

কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বিস্মিত হয়েছে বেশী। এই সকালবেলা যে হেয়ার সাহেব স্বয়ং তাদের বাড়িতে উপস্থিত হবেন, সে ভাবতেই পারেনি। কলেজের বালকরা কেউ দু-চারদিন অনুপস্থিত হলে বা কেউ অসুস্থ হলে হেয়ার সাহেব খোঁজ-খবর নিতে গেছেন বা নিজের হাতে সেবা করেছেন, একথা গঙ্গানারায়ণ শুনেছে বটে। তবে হালে হেয়ার সাহেব ছোট আদালতের কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার কলেজে আগেকার মতন অত বেশী সময় দিতে পারছিলেন না। বহুদিন ধরে ডেভিড হেয়ার নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। নিজের ব্যবসা-পত্র তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। এক সময় বহু ধন উপার্জন করেছিলেন বটে কিন্তু এত বৎসরে তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি কোনো দিন কোনো বেতন গ্রহণ করেন নি, বরং নিজ অর্থ ব্যয় করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর মোটা বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সে অর্থও দান করে দিয়েছেন তিনি।

সন্ন্যাসীর হেয়ারকে কিছুতেই আর্থিক সাহায্য করা যাবে না বুঝেই সরকার সুকৌশলে তাঁকে আদালতকর্মে নিযুক্ত করেছেন। সেই জন্য ইদানীং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে স্কুলে পড়াতে দেখা যায় না। আবার বুঝি তিনি নবোদ্যমে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

এক হাত গঙ্গানারায়ণের কাঁধে রেখে অন্য হাতে মোটা ছড়িটা ঠকঠকিয়ে হাঁটতে লাগলেন হেয়ার সাহেব। খানিক দূরে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতার সহিত যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বসিয়াছিলেন, তিনি কে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, উনি আমার খুড়া। আমার পিতার [illegible]

—হুঁ। তুমি ফ্রান্সিস বেকনের প্রতিমূর্তি কখনো দেখিয়াছ কি?

গঙ্গানারায়ণ দু'দিকে মাথা নেড়ে জানালো যে সে দেখেনি।

হেয়ার আবার বললেন, দেখিলে বুঝিতে, ঐ লোকটির সহিত ফ্রান্সিস বেকনের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। একই রকমের চোখ। আমি প্রায়শই অবাক হইয়া দেখি যে অনেক এ-দেশীয় ব্যক্তির সহিত অনেক ইউরোপীয়ের মুখাকৃতির খুব মিল থাকে। শুধু গাত্রবর্ণের তফাৎ।

ফ্রান্সিস বেকনের নাম শেক্সপীয়ার পাঠের সময় দু-একবার শুনেছে মাত্র গঙ্গানারায়ণ। বিশেষ কিছু জানে না। হঠাৎ সেই সাহেবের সঙ্গে বিধুশেখরের কেন মিল খুঁজে পেলেন হেয়ার সাহেব, তা সে বুঝলো না।

খানিক পথ গিয়ে হেয়ার সাহেব আবার থমকে দাঁড়ালেন। সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, তোমার ক্ষুধা লাগে নাই তো? উপবাস-ভঙ্গ করিয়াছিলে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হাঁ, মহাশয়।

—সত্য বলো। ভয় নাই, আমার গৃহে খাওয়াইয়া তোমার জাত মারিব না। কোনো মিঠাইওয়ালার দোকানে ভোজন সারিয়া লইতে পারো!

গঙ্গানারায়ণ দৃঢ়ভাবে জানালো যে তার কোনো প্রয়োজন নেই। সে সত্যিই খেয়ে এসেছে। আসলে যদিও সে কিছুই খায়নি। খাবার দেওয়া হয়েছিল, খেয়ে আসে নি।

হেয়ার তবু দাঁড়ালেন না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে বলো, কোন্ কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, দুধ।

—শুধু দুধ? ব্যাস, আর কিছু নহে?

—আম, কলা, সন্দেশ।

—উত্তম। তবে এত ধীরে ধীরে হাঁটিতেছ কেন? আমার সহিত দ্রুত পা মিলাও।

হেয়ার সাহেব হাঁটেন রীতিমতন ধুপধাপ শব্দ করে। বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, এখনো পদব্রজে বেশ দড়। ওঁর হাবভাব দেখলে যেন ঠিক ধোপদুরস্ত সাহেব মনে হয় না, মনে হয় যেন কোনো বৃহৎ পরিবারের আপনভোলা বড় মামা।

—তোমাদের সহপাঠী ভোলানাথ সরকারের কুঠী কোথায় তুমি জানো?

—হাঁ, জানি।

—বাহির সিমলায় জগমোহন সরকারের কুঠী কি?

—জগমোহন সরকার ভোলানাথের জ্যাঠা। পাশাপাশি দুই পৃথক বাড়ি।

—চলো, সেখানে যাইব। ভোলানাথের কোনো সংবাদ জানো? জানো না। শুনিয়াছি সে গুরুতর পীড়ায় পড়িয়াছে। তোমাদের কোনো সহপাঠী বাঁচিল কি মরিল, সে সংবাদও তোমরা রাখো না। আজ সারাদিন তুমি ভোলানাথের সেবা করিবে, এই তোমার শাস্তি।

গঙ্গানারায়ণের শরীরে দারুণ একটা সুখানু-ভূতি হলো। এই রকম কোনো মানুষের সংস্পর্শে এলেই মন উন্নত হয়ে যায়। হেয়ার সাহেব সর্বক্ষণ পরের জন্য চিন্তা করেন, নিজের কথা কিছুই ভাবেন না। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হয়েও মানুষ যে কত আনন্দে থাকতে পারে, ইনি তার অবিশ্বাস্য উদাহরণ।

হেয়ার সাহেব বললেন, জগমোহন সরকারের সহিত আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে উঁহার সাহায্য পাইব মনে হয়। সুতরাং ভোলানাথের নিকট আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। তুমি থাকিবে।

গঙ্গানারায়ণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয় কি এবার স্ত্রীলোকদের জন্য বিদ্যালয় খুলচেন?

হেয়ার সাহেব কৃত্রিম ধমক দিয়ে বললেন, কেন,

"আমিই সেই রূপসী অনন্যা টিয়ারা বিউটি সুকন্যা"

"টিয়ারা বিউটি শ্যাম্পু ব্যবহার করতে আমার দারুণ ভাল লাগে। কারণ, এই কনসেনট্রেট করা শ্যাম্পু, অল্প একটু চুলে লাগালেই একরাশ ঘন ফেনা হয়, যা আমার একঢাল চুলের সমস্ত ময়লা ধুয়ে সাফ করে, চুল করে তোলে চিকণ ঝলমলে। আপনিও টিয়ারা বিউটি সুকন্যা হোন—এর জন্যে আপনার খরচ মোটেই বাড়বে না।"

সবরকম চুলের যত্নের জন্যে টিয়ারা, সবার সেরা।

- **টিয়ারা এগ শ্যাম্পু**
  ভিটামিন এ এবং ডি থাকার দরুন নির্জীব চুল করে তোলে ঝলমলে প্রাণবন্ত।
- **টিয়ারা ল্যানোলিন শ্যাম্পু**
  শুকনো চুল করে তোলে চিকণ, ঝলমলে।
- **টিয়ারা শিকাকাই শ্যাম্পু**
  এতে মেশানো আছে আমলা ...
  যা একঢাল লম্বা চুলের যত্ন ...
- **টিয়ারা লেমন শ্যাম্পু**
  তেলতেলা চুলের যত্ন নেয়।
- এছাড়া **টিয়ারা হেয়ার কণ্ডিশনার**ও পাওয়া যায়।

- **টিয়ারা ব্যান + ড্যান ক্রীম শ্যাম্পু**
  খুসকি নির্মূল করে চুল করে তোলে পরিষ্কার।

টিয়ারা শ্যাম্পু

HELENE CURTIS

হেলীন কার্টিস্-চুলের যত্নের ব্যাপারে যাঁরা জগতে সবার অগ্রণী

everest/78/JKH/39-bn

—আশীর্বাদ দূরে থাক, আমন্ত্রণ করলো। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব ?

—কেন সম্ভব নয়। তোমরা সাহায্য করিলেই সম্ভব। ফিমেল সোসাইটি স্থাপন করিয়া এক সময় বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে আর বড়মানুষদের আগ্রহের অভাবে তাহা বেশীদিন চলে নাই। তোমরা বালিকা-স্ত্রীলোকদের অন্ধকারে রাখিয়া দিতে চাও ?

—আমি চাই না।

—জগমোহন সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। লোকটি অতি সদাশয়। উহার সাহায্যে শীঘ্রই একটি বালিকাদিগের স্কুল স্থাপন করিব। আমি যদি আর দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে এ-দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া যাইব নিশ্চয়।

গঙ্গানারায়ণের অমনি বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়লো। পড়াশুনো করার কী তীব্র সাধ ছিল বিন্দুর! সে জিজ্ঞেস করলো, এইস্থলে কি বিধবা স্ত্রীলোকরাও পাঠ নিতে আসবে ?

হেয়ার সাহেব মাথা নীচু করে প্রশ্ন করলো, কী কহিলে, আবার কহো তো ?

গঙ্গানারায়ণ তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। হেয়ার সাহেবের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি অভিমানের সঙ্গে বললেন, এ কথা কহিতে তোমার শরম বোধ হইল না ? আমি স্কুল খুলিলেই কি তোমরা বিধবা বালিকাদের সেথা পাঠাইবে ? তাহারা সূর্যালোক দেখে না, তাহাদের বিদ্যার আলোক দেখাইবে কে ?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, শোনো গঙ্গা, আমি হিন্দু নই, কিন্তু হিন্দুজাতির বিধবা বালাদের কথা মনে আসিলেই আমার চক্ষে জল আসে। স্ত্রী জাতি মাতৃজাতি, তবু তাহাদের এত কষ্ট দেওয়া কি মানুষের উচিত কাজ হয় ?

গঙ্গানারায়ণ অধোবদন হয়ে রইলো।

হেয়ার সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বললেন, বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ, যদি পারো তো দেশবাসীকে বুঝাইয়ো। মাতৃজাতির দুঃখ দূরে করিবার জন্য কিছু যত্ন করিয়ো। ও কাজ আমি পারিব না। তোমাদিগেরই কাহাকেই উদ্যোগ লইতে হইবে।

খানিকটা পথ আবার দুজনে নিঃশব্দে হাটিতে লাগলো। মাঝে মাঝেই পথ চলতি কেউ কেউ হেয়ার সাহেবকে দেখে অভিভাদন জানাচ্ছে। প্রায় কুড়ি বাইশ বছর ধরে বহু ছাত্র হেয়ার সাহেবের অধীনে থেকে পড়াশুনো করে গেছে। শহরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে হেয়ার সাহেবকে চেনে না। হেয়ার সাহেব কারুর সঙ্গেই দুটো একটার বেশী কথা বলছেন না। আজ যেন হেয়ার সাহেবকে একটু আলাদা রকম মনে হচ্ছে গঙ্গানারায়ণের। মুখে কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব। রঙ্গপ্রবণ লঘু মেজাজটি একেবারেই নেই।

মে মাসের শেষের দিক। সকালবেলাতেই রোদ উঠেছে চড়চড়িয়ে। রোদের আঁচে হেয়ার সাহেবের মুখখানা লাল হয়ে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ তবু হেয়ার সাহেবের কোনো হুঁশই নেই।

প্রথমেই জগমোহন সরকারের বাড়ি পড়লো। জগমোহন আর বিরাজমোহন দুই ভাই। এঁদের মধ্যে জগমোহনই বেশী অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিশেষ পাননি কিন্তু ভাগ্য খুলে গেছে আমদানি রপ্তানির ব্যবসা খুলে। সরকার, আঢ্য অ্যান্ড কোং এ শহরের নামকরা প্রতিষ্ঠান। শুধু অর্থ জুটলেই কৌলীন্য জোটে না। শেরবোর্ণ সাহেবের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ে ইংরেজি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছেন জগমোহন। যুবা বয়েসে কিছুদিনের জন্য খৃস্টান হবার দিকে ঝুঁকেছিলেন. সেই খবর পেয়ে তাঁর মাতাঠাকুরানী বিষের পাত্র নিজের ওষ্ঠের সামনে ধরে বলেছিলেন, আর এক বার বল ও কথা! বল! তুই জাত খোয়াবি, আর আমি বেঁচে থাকবো ? এখন ওসব চুকেবুকে গেছে. জগমোহন মহা ধুমধাম করে বাড়িতে প্রতি বৎসর দোল দুর্গোৎসব লাগান. পাবলিক কাজে দান করেন মুক্ত হস্তে, দু-দশজন মোসাহেব প্রতিপালন করছেন, সভায় রামগোপাল ঘোষের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন এবং মাঝে মাঝে ইংরেজি কাগজে কৃষকদের দুরবস্থা অথবা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে জ্বালাময়ী আর্টিকেল লেখেন। শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে তাঁর এখন বেশ নাম ছড়িয়েছে।

জগমোহন সপারিষদ বসেছিলেন বৈঠকখানা ঘরে। তার ঠিক ডান পাশেই বসে আছে একজন দীর্ঘকায়, শীর্ণ, খড়্গনাশা মানুষ। এ আমাদের পূর্ব পরিচিত রাইমোহন। সুকৌশলে সে এ গৃহে নিজের স্থান করে নিয়েছে। জগমোহন বহু ব্যাপারে তার ওপরে নির্ভর করেন।

হেয়ার সাহেব আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দ্বারের কাছে হেয়ার সাহেবকে দেখেই জগমোহন বিশালবপু নিয়ে প্রায় ছুটে এলেন সেদিকে। দু'হাত বাড়িয়ে বললেন. কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! আপনি এসেচেন! মহামতি হেয়ার আজ আমার বাড়িতে। আজই আপনার কথা স্মরণ কচ্ছিলুম। আগামী মাস থেকেই আমি বালিকা বিদ্যালয় খুলে ফেলচি। আমারই এ বাড়িতে। শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রচুর উৎসাহ দিয়েচেন....সব বলচি আস্তে আস্তে, মহাশয় বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক।

হেয়ার সাহেব বসলেন না, গঙ্গানারায়ণের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, খুবই সুসংবাদ। আমার যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আপনারই গৃহে স্কুল, কিন্তু শিক্ষিকা কোথায় পাইবেন ?

জগমোহন বললেন, লণ্ডনের ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটিতে পত্র পাঠিয়েচি. দ্বারকানাথ-বাবু ওদের সঙ্গে নিজে কথা কইবেন, একজন লেডি টিচার পাওয়া যাবে মনে হয়। খরচ-খর্চা আমি দোবো। এ-দেশের মেয়ে শিক্ষিকা আর পাবো কোতায়। প্রথম দু-চার মাস বুড়ো বুড়ো পণ্ডিতদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নোবো...নাম দিইচি ফিমেল পাঠশালা।—

হেয়ার সাহেব বললেন. আগে আর একটি কথা জানিয়া লই। সে পাঠশালে ফিমেলরা আসিবে তো? পূর্বে দেখিয়াছি, ছাত্রী জোটানোই ভার।

—আলবাৎ আসবে!

—আপনার নিজ পরিবারের কন্যারা যাইবে আশা করি।

—হায় হায়! আমার তো কোনো কন্যা সন্তানই নাই। থাকলে নিশ্চয় যেত। আমি এ পল্লীর প্রতি বাড়ি বাড়ি ঘুরে গিন্নীদের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলিচি, মা জননীরা, দেশ আজ জেগেচে, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানের ঊষালোক প্রস্ফুটিত হচ্চে. আর দ্বিধা করবেন না. আমাদিগের কন্যাসমা, ভগ্নীসমা বালিকাদের জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করুন। মুশকিল কি জানেন, হেয়ার সাহেব, এখনো অনেক লোকের ধারণা, সেই অনেকের মধ্যে অনেক আচ্ছা আচ্ছা বড়মানুষ, শিক্ষিত লোক রয়েচে. যারা মনে করে, নেকাপড়া শিখলে মেয়ে-সন্তানরা বিধবা হয়! বুঝুন! হাউ ইগনোরেণ্ট!

—আর বিধবারা লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের কী হয়? তাহারা তো দ্বিতীয়বার বিধবা হইতে পারিবে না! এই যুবকটি প্রশ্ন করিতেছিল যে বিধবারা লেখাপড়া শিখিতে পারিবে কি-না।

—বিধবাদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কী হবে? এই ছেলেটি........ইটি কে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি ভোলানাথের সহপাঠী। আমার নাম গঙ্গানারায়ণ সিংহ। পিতার নাম রামকমল সিংহ।

রামকমল সিংহের নাম শুনে জগমোহনের ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। রামকমল সিংহ গঙ্গানারায়ণের তুলনায় আরও তিন চার ধাপ উঁচু তলার বড় মানুষ। সেজন্য জগমোহনের খানিকটা ঈর্ষাবোধ আছে।

তিনি শুকনো গলায় বললেন অ। তারপর হেয়ার সাহেবের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বললেন, এসব ব্যাগড়ার কথা কানে তুলবেন না। বিধবাদের শিক্ষার কথা উচ্চারণ করাও পাপ। বিধবারা আমাদের সংসার পবিত্র করে। ওদের সংযম ওদের সহনশীলতা কত মহান। এতখানি আত্মকৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্র কৃস, ইয়ে কৃচ্ছ্রতা শুধু হিন্দু রমণীতেই সম্ভব। বিধবারা আছে বলেই আমাদের ধর্ম টিঁকে আছে।

রাইমোহন বকের মতন গলা উঁচিয়ে বললো, ঠিক কতা! লাক কতার এক কতা।

জগমোহন আবার বললেন, রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বই লিখে প্রমাণ করেচেন যে প্রাচীনকালে বড় ঘরের হিন্দু মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার চলন ছেল। মোছলমান আমলেই আমরা মেয়েছেলেদের ঘরে সেঁদিয়ে রেখিচি। বুঝলেন সার, তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করবার পরই আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা অন্ধকারে ডুবে গ্যাচে। আবার আমরা মেয়েছেলেদের ঘরের বার করবো, তবে ধীরে ধীরে।

রাইমোহন বললো, রাজাবাহাদুর বেধবাদের নেকাপড়া শেকাবার কতা কিছু বলেন নি।

জগমোহন গঙ্গানারায়ণের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ও সব কথা তুললে সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে। বুঝলেন, মিঃ হেয়ার, এমনিতেই পাঁচরকম কথা উঠবে। লোকে বলবে আমরা বুঝি ঘরের মেয়েদের মেম বানাবার হুজুগে মেতিচি। লোকে তো সুদ্যাকে না কু-টাই বড় করে দ্যাকে, কেউ হয়তো আমাদের চরিত্রে কটাক্ষ করবে।

রাইমোহন জিভ কেটে বললো, না মশায়, ও কতা বলবেন না। আর যার সম্পর্কে যাই বলুক, আপনার মতন দেবতুল্য মানুষের চরিত্র তুলে কত বললে ধর্মে সইবে না।

জগমোহন উদার ভাবে বললেন, সবাই কি সব বোঝে।

হেয়ার সাহেব বললেন, আপনারা বিজ্ঞ, আপনারাই ভালো বুঝিবেন। বিধবাদের প্রয়োজন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাদের লইয়াই কার্য শুরু হোক।

জগমোহন বললেন, বসুন মিঃ হেয়ার। অনেক কতা আচে। পুরুষেরা যেসব কেতাব পড়ে, বালিকারাও কি সেই একই কেতাব পড়বে? আমার তো মনে হয়, বালিকাদের জন্য নীতিশিক্ষার পৃথক পাঠ্যবই লেকানো দরকার। স্কুল বুক সোসাইটি কি এ কাজে সাহায্য করবে?

হেয়ার সাহেব বললেন, আমি আলোচনা করিব। পরে আসিয়া আপনার সহিত কথা কহিব, আগে ভোলানাথকে দেখিয়া আসি। তার কোন্ ব্যাধি হইয়াছে?

জগমোহন বললেন, ভোলানাথ? ও বাড়ির ভোলা? দু'দিন ধরে তার অনেকবার দাস্ত পায়খানা হচ্চে শুনিচি।

জগমোহন বিষয়টিতে কোনো গুরুত্বই দিলেন না। তিনি অনেক বৃহৎ বৃহৎ সমস্যা নিয়ে চিন্তিত, ভাইপো ভাগ্নেদের সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তাঁর।

হেয়ার সাহেব বেরিয়ে এলেন গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে। গঙ্গানারায়ণ মনে মনে বললেন, বিন্দু তোর ভাগ্য খারাপ। এ জীবনে তুই আর কিছু পাবি না। পরজন্মে যেন বিধবা না হোস।
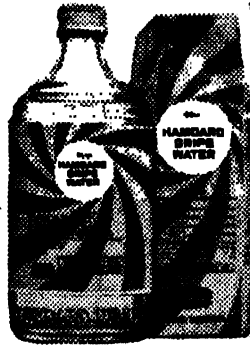
হেয়ার সাহেব যেন ঠিক তার মনের কথাটাই পড়ে ফেলে মুখ ঝুঁকিয়ে গঙ্গানারায়ণের কানে কানে বললেন, প্রিয় বৎস, দেখিয়া লইয়ো, ক্রমে ক্রমে বিধবা বালারাও বিদ্যালয়ে আসিবে। যদি আমি আর দশ বৎসর বাঁচি, তবে সকল শ্রেণীর বালিকাদের জন্যই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যাইব। এই আমার শেষ ইচ্ছা।

কথাটা শুনে গঙ্গানারায়ণের শরীরে খানিকটা রোমাঞ্চ হলেও সে তেমন খুশী হতে পারলো না। দশ বছর পর বিন্দুবাসিনীর কি আর পড়াশুনো করার আগ্রহ থাকবে? অত বেশী বয়েসে সে স্কুলে যাবেই বা কী করে!

পাশের গৃহটির দ্বার খোলা বৈঠকখানাটি খাঁ-খাঁ করছে। গঙ্গানারায়ণ প্রথমে একলা ভেতরে ঢুকে ভোলানাথের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলো। অচিরেই ভোলানাথের বাবা বিরাজমোহন নেমে এসে ওদের দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, হেয়ার সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, সাহেব, আপনি এয়েচেন। কিন্তু ভোলা বুঝি বাঁচে না।

ভোলানাথ চলৎশক্তিহীন হয়ে দ্বিতলের এক কক্ষে শুয়ে আছে শুনে হেয়ার সাহেব বললেন, আমি কি উহাকে উপরে যাইয়া দেখিতে পারি?

হেয়ার সাহেবকে শুধু যে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো তাই না, ভোলানাথের মা ও পিসী, উপস্থিত রইলেন সেখানে, হেয়ার সাহেব যেন এ গৃহের একজন পরমাত্মীয়।

ভোলানাথ একখানি পালঙ্কে দু হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মুখখানি দারুণ বিবর্ণ। চোখ বোজা। বিরাজমোহন তার মাথার কাছে গিয়ে বললেন, বাবা ভোলা, দ্যাকো, কে এয়েচেন। দ্যাখো! একবারটি চোখ ম্যালো—

ভোলানাথ অতিকষ্টে চোখ মেললো। চিনতে পারলো কি না বোঝা গেল না, কিন্তু কিছু একটা কথা বলতে গিয়েই ওয়াক তুলে বমি করলো। সেই বমি খানিকটা পড়লো বিছানায়, খানিকটা মেঝেতে।

হেয়ার সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, কলেরা! শহরে সর্বত্র কলেরার মহামারি শুরু হইয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে এমন হয়। বৃষ্টি না নামিলে কমিবে না।

তারপর তিনি বিরাজমোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একটি সম্মার্জনী ও একপাত্র জল চাই। সত্বর আনিয়া দিবেন কি?

গঙ্গানারায়ণকে তিনি নিম্নস্বরে বললেন, তোমাদিগের হিন্দুদিগের গৃহগুলি বড় অপরিচ্ছন্ন। রোগীর কক্ষ সর্বদা উত্তম রূপে পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। তোমরা ইহা পালন করো না বলিয়াই রোগ বেশী ছড়ায়।

জল ও ঝাঁটা এসে পৌঁছোনো মাত্র হেয়ার সাহেব নিজে সেই বমি পরিষ্কারে প্রবৃত্ত হলেন। অমনি হা-হা করে উঠলো বাড়ির লোক। বিরাজমোহন সাহেবের হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিতে এলো। হেয়ার সাহেব কিছুই শুনলেন না। কাজ শেষ করে বললেন, আমি এই ছাত্রটিকে রাখিয়া যাইতেছি। ভোলা বমন করিবামাত্র সে পরিষ্কার করিবে। আমি উহাকে এই দায়িত্ব দিয়াছি। এবার এক খণ্ড পরিষ্কার বস্ত্র চাই—

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল একটি আট ন বছরের বালিকা। সে তার শাড়ির আঁচলটা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ফেলে সেই টুকরোটা এগিয়ে দিল সাহেবের দিকে। মেয়েটিকে চিনতে পারলো গঙ্গানারায়ণ। মাত্র মাস ছয়েক আগেই সে এ-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছে। এই মেয়েটি ভোলানাথের স্ত্রী মানকুমারী। ভোলানাথের অসুখের জন্যই নিশ্চয়ই তাকে আনানো হয়েছে পিতৃগৃহ থেকে।

হেয়ার সাহেব সেই বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজিয়ে ভোলানাথের মুখখানা ভালো করে মুছে দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, ভোলা, মনে জোর আনো, তোমাকে বাঁচিতেই হইবে, ভোলা, জীবন বড় সুন্দর ইহা ছাড়িয়া যাইতে নাই। না ভোলা, আমরা তোমাকে রাখিব।

ভোলানাথ চোখ বুজেই রইলো। অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীর কুঁকড়ে উঠছে কিন্তু সে কোনো শব্দ করছে না। তার চোখের দুপাশে বিন্দু বিন্দু জল।

হেয়ার সাহেব ভোলানাথের চিকিৎসার বিষয়ে কিছু খোঁজখবর নিলেন। বড় বড় কবিরাজরা ভোলানাথকে দেখে প্রায় জবাব দিয়ে গেছে। হেয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, মেডিক্যাল কালেজের ছাত্রদের চিকিৎসার উপর আপনাদিগের ভরসা আছে কি?

ভোলানাথের মা বললেন, সাহেব, আপনি যা বলবেন, আমরা তাই শুনবো।

হেয়ার সাহেব বললেন, তবে আমি পত্র দিতেছি, শীঘ্র কাহাকেও তথায় প্রেরণ করুন।

হেয়ার সাহেব আর সেখানে বেশীক্ষণ রইলেন না। যাবার সময় গঙ্গানারায়ণকে বলে গেলেন, আগামীকল্য কালেজে তুমি আমাকে ভোলার সংবাদ দিও।

হেয়ার সাহেব দ্বারের কাছে যেতেই মানকুমারী হঠাৎ আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন। সকলেই থমকে গেল এক মুহূর্ত। হেয়ার সাহেব মুখ ফেরালেন, তাঁর দু'চোখে জল, খুব সম্ভবত ভোলার সম্পর্কে তিনি নিজেও খুব আশা পোষণ করেন না। ধরা-

গলায় তিনি বললেন, মন দুর্বল করিও না, মা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

তারপর তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কিন্তু পরদিন গঙ্গানারায়ণ কোনো সংবাদ দেবার আগে নিজেই এক সাংঘাতিক সংবাদ শুনলো।

গঙ্গানারায়ণ সেদিন ভোলানাথের সেবায় জন্য বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি। বিরাজমোহন খানিকবাদে প্রায় জোরাজুরি করেই তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। গঙ্গানারায়ণ যে বড় মানুষের ছেলে তা তিনি জানেন, সংক্রামক রোগীর পাশে বসে থেকে যদি সেও অসুখ বাধিয়ে বসে তা হলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। গঙ্গানারায়ণ যেতে চায় নি, কিন্তু ভোলানাথের মা পর্যন্ত বললেন এবার তুমি বাড়ি যাও বাবা। আমরা তো রয়িচিই তোমার জননী আবার তোমার জন্য চিন্তে করবেন। আবার না হয় কাল এসো।

পরদিন সকালে বন্ধু গঙ্গানারায়ণের বাড়িতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মহা সর্বনাশ হয়েচে। শিগগির চ।

গঙ্গানারায়ণ শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলো, ভোলা কি

বন্ধু বললো, ভোলার খবর জানি না। হেয়ার সাহেব মারা গেছেন।

একটুক্ষণ থমকে থেকে তারপর দুই বন্ধুই কেঁদে উঠলো ডুকরে।

হেয়ার সাহেব থাকতেন লালবাজারের বাঁ-দিকে সাহেবের বাড়িতে। পাল্কি ডাকার সময় হলো না. দুজনে ছুটতে লাগলো সেদিকে। ততক্ষণে শহরের বহু লোকই ছুটছে খবর শুনে। গঙ্গানারায়ণের কাছে খবরটা এত আকস্মিক যে কিছুতেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কাল যে মানুষটি তাদের বাড়িতে এসেছিল, এতক্ষণ যার সঙ্গে সে ছিল....

গ্রে সাহেবের ভবনের সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য। কোনো বৃটিশ ব্যক্তির বাড়ির সামনে এর আগে এত দেশীয় মানুষ জড়ো হয় নি। বস্তুত, এ শহরের আর কোনো ঘটনাতেই বুঝি একসঙ্গে এত মানুষের সমাবেশ হয় নি কখনো।

হিন্দু স্কুলের বর্তমান, প্রাক্তন কোনো ছাত্রই বাদ যায় নি। এসেছেন ডিরোজিওর শিষ্যরা। সম্ভ্রান্ত, বুনিয়াদী ঘরের ব্যক্তিরাও আসছেন এক এক করে। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গোল হয়ে। এমনকি যে মধুর ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়, সে-ও হাজির হয়েছে আজ। মধু মুখে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলে, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতে ভালবাসে। কিন্তু আসলে তার মনটি বড় নরম। সে-ও মুখ লুকিয়ে কাঁদছে ফুলে ফুলে। যারা দেরিতে এসেছে, তারা বারবার শুনতে চাইছে সব খবর। কী ভাবে হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হলো, সে কথা শতবার বলাবলি করে বা শুনেও আশ মিটছে না।

রাত একটায় ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ হেয়ার সাহেব বমি করতে শুরু করলেন। পেটে অসহ্য ব্যথা। তবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি স্থির ভাবে রইলেন। তাঁর সর্দার বেহারাকে ডেকে তুলে তিনি বললেন, বাপু একবার গ্রে সাহেবের নিকট যাও তো। তাঁহাকে গিয়া বলো, আমার জন্য একটি শবাধার তৈয়ার করাইয়া নিয়া আসিতে। সে কথা শুনে বেহারা বাইরে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

সেই চেঁচামেচিতে জেগে উঠলো আরো অনেকে। ছুটে এলেন গ্রে সাহেব। সেই গভীর রাত্রেই চিকিৎসকের জন্য পাল্কি পাঠানো হলো। তাঁর প্রিয় ছাত্র মেডিক্যাল কলেজের সাব-অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন প্রসন্ন মিত্তির রাত জেগে বসে রইলো পাশে। পেটের বেদনা প্রশমনের জন্য সে ব্লিস্টার লাগাচ্ছি এক সময় হেয়ার সাহেব বললেন, প্রসন্ন, প্রিয় বৎ ঐ বেলেস্তরা সরাইয়া লও। এবার আমি শান্তি মরি।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শে নিঃশ্বাস ফেললেন।

জুড়ি গাড়ি, ল্যান্ডো, ফিটনে ভরে গে পল্লী। আকাশে গুম গুম করে গজরাচ্ছে মে বাতাসের বেগ ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। রেভারেন্ড চার্ল আয়ার এসে পৌঁছোবার পর শুরু হলো শবযাত্র অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি কিন্তু মিছিল ছত্রভঙ্গ হলো না। একজনও কে বৃষ্টির ভয়ে শবানুগমন বন্ধ করলো না। নিঃশব্দে নতমস্তকে সবাই চললো গোলদীঘির দিকে। সাহেব দের জন্য নির্দিষ্ট বেরিয়াল গ্রাউন্ডে নয়। ডেভি হেয়ারের সমাধি হবে তাঁর স্বপ্নজগত হিন্দু কলেজের কাছেই। তাঁর শেষকৃত্যের ব্যয় বহন করবে জনসাধারণ।

গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ছে অনেক কথা। বিশেষত গতকালের কথা। হেয়ার সাহেব বলে- ছিলেন, বৃষ্টি নামলে কলেরার প্রকোপ কমবে। উনি নিজে এ বৎসরের কলেরার শেষ শিকার হয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

রাস্তায় জল জমে গেছে। সেই জল ঠেলে যেতে যেতে গঙ্গানারায়ণের কানে অনবরত একটা কথা বাজতে লাগলো। হেয়ার সাহেব কাল অন্তত দু বার তাকে বলেছিলেন যদি আর দশ বছর বাঁচি, যদি আর দশ বছর বাঁচি......। উনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, জীবনটা কী সুন্দর, আরও অনেক কাজ করতে চেয়েছিলাম........

গঙ্গানারায়ণের চোখ থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা মিশে যেতে লাগলো বৃষ্টির জলে। (ক্রমশ

অ্যালুমিনাই আছে শতকরা একবট্টি ভাগ। পৃথিবীতে আর কোথাও এত বেশী অ্যালুমিনা আছে এমন সিলিমেনাইট আপনি পাবেন না। এ ব্যাপারে ভারতের পর দ্বিতীয় স্থান দক্ষিণ আফ্রিকার। আমাদের এই সিলিমেনাইটের দাম কত জানেন? এক এক টনের দাম পনেরশ' টাকা। ইস্পাত কারখানা থেকে শুরু করে নানা রকম কারখানার চুল্লিতে ভেতরের আস্তরণকে উচ্চ তাপমাত্রায় সহনীয় করার জন্যে সিলিমেনাইটের লাইনিং কাজে লাগান হয়। তাই দেশ-বিদেশে এর চাহিদাও এখন প্রচুর।'

১৯৫৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ওয়ানসফির এই অঞ্চলে সিলিমেনাইট খননের কাজ চালিয়েছিল আসাম সিলিমেনাইট লিমিটেড। ১৯৭২-এর পর এল হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেড। পুরো এলাকা ওই আকরিক সংগ্রহের জন্যে পত্তনি নিল তারা। তারপর থেকে সিলিমেনাইট মাইনিং-এর কাজ তারাই চালিয়ে যাচ্ছে।

আর এর ফল হয়েছে অভূতপূর্ব। প্রস্তরীভূত সভ্যতা এখন সচল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখন এখানে মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে এসে মিশেছে খাসি পুরুষ। এবং নারী। বসেছে নানান পসরার হাট। চায়ের দোকান, মনোহারী সওদা! সিফটে সিফটে কাজ হয় খনির। ভোঁ বাজে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাসি শ্রমিকরা বন্য সর্পিল পথ ধরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে খনিতে কাজ করতে যায়। পথ চলার সময় কারোর কারোর কণ্ঠে হিন্দী গানের কলিও শুনতে পাবেন কখনও সখনও।

বেলা বাড়ছিল।

সুজিতবাবু ডাকলেন, ওয়াধাবন, দুপুরের খাবার—

ওয়াধাবন তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই জবাব দিলেন, আমাদের ক্যাম্পেই তার ব্যবস্থা করেছি। চিন্তার কারণ নেই। কয়েকটি মুরগী আমরা আগে থেকেই রেডি করে রেখেছিলাম। আপনারা যে মুরগী সঙ্গে করে এনেছিলেন তারও সদ্ব্যবহার করার আয়োজন হয়েছে।

ভেরি গুড। সুজিতবাবুর কণ্ঠে স্বস্তি।

স্বস্তিই বটে! শুনেছিলাম, এদিকে নাকি খুব সস্তায় মুরগী পাওয়া যায়। অনেক সময় খাসিরা বন্য মুরগী ধরে নিয়ে এসেও বিক্রি করে। এদিকে সারা বনে নাকি প্রচুর মুরগী। কিন্তু এসব কথা শেষ পর্যন্ত শুধু 'শোনা'-ই হয়ে রইল। এতটা অঞ্চল ঘুরলাম, একটাও বন্য মুরগী চোখে পড়েনি। সাধারণ মুরগীরও দাম বেজায় বেশী। একটি মুরগীর দামই কখনও কখনও কুড়ি টাকার মত চেয়ে বসে খাসিরা মাছ খাবেন, তারও উপায় নেই। ছোট ছোট জলাশয় বা পার্বত্য নদীতে ছোট ছোট কিছু মাছ ধরা পড়ে। অসম্ভব দাম। পনের থেকে ষোল টাকা কিলো। তাও আপনি সব সময় পাবেন না।

ড্রিলিং সাইট থেকে নেমে ড্রিলিং ক্যাম্পে এসে বসলাম আমরা। গোবিন্দবাবু বললেন, এত দূরে এসেছেন, আমরা ক্যাম্পে কী ভাবে [illegible]

দেখে যাবেন না? সেই ক্যাম্পে বসেই এই সব বিবরণ শুনেছিলাম।

চারদিকে পাহাড়। মাঝখানে কিছুটা সমভূমি। উপত্যকার মত। পরপর কয়েকটি কাপড়ের ক্যাম্প। বাঁশ কেটে দুটি ছিটে বেড়ার ঘরও করা হয়েছে। গোবিন্দ বাবুই এই ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। সরকারী স্থায়ী চাকুরে এখানে মোট চারজন। এদের সঙ্গে আছে আরও বাইশজন কর্মী। এদের কেউই স্থায়ী চাকুরে নয়। কনটিনজেন্ট। মানে অস্থায়ী দিন মজুর।

কনটিনজেন্ট। পথে আসতে আসতে কথাটা বহুবার শুনতে পেয়েছি। তাই প্রশ্ন না করে পারলাম না! ব্যাপার কি বলুন তো? আপনাদের কতগুলি কনটিনজেন্ট ওয়ার্কার নিয়ে কাজ করতে হয়?
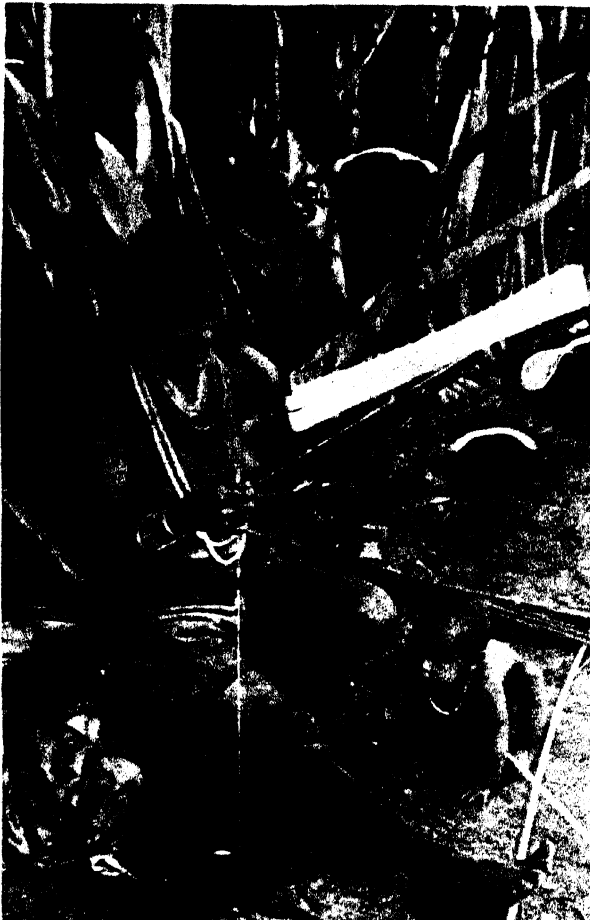
আমার প্রশ্নে সবাই যেন একটু থতমত খেলেন।

বুঝলাম এসব সরকারী তথ্য নিয়ে ওঁরা কেউ মুখ খুলতে চান না।

তবু অবস্থাটা যে কী নিদারুণ, সেটা জানতে আমার অসুবিধে হয়নি। জিওলজিক্যাল সার্ভের শতকরা আশিজন কর্মীই অস্থায়ী। কনটিনজেন্ট। এদের কাছে কাজ মানেই মাইনে। কাজ নেই, মাইনে নেই। এইসব [illegible]

সব রকমই আছে। এদের মধ্যে আছে বাহক, আছে মেকানিক, মোটর গাড়ির চালক। করণিক এবং টাইপিস্টও আছে। এদের অনেকেই বছরের পর বছর কাজ করছে। সাতদিন কাজ, একদিন সবেতন ছুটি। এই হল সোজা হিসেব। ফিলডে যখন থাকে তখন কাজের সময়ও ঠিক থাকে না। অথচ কেউই স্থায়ী চাকুরে নয়। দৈনিক সব চেয়ে বেশি মাইনে মানে, সাড়ে আট টাকা। তার কমও পায় অনেকে।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লিনডো। সুজিতবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন, বেশী দূর যেতে হবে না। এই যে লিনডো। আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। লিনডোও তো কনটিনজেন্ট।

পথে আসার সময় বলেছিলেন বটে আপনি একবার। বললাম আমি।

লিনডো জিওলজিক্যাল সার্ভের জীপ চালাচ্ছে কয়েক বছর। কেমন একসপার্ট ড্রাইভার সে তো পথে আসতে আসতে দেখলেন আপনি। কিন্তু লিনডো এখনও কনটিনজেন্ট। কাজ করলে দৈনিক আয় সাড়ে আট টাকা। ব্যাস। কোন ওভারটাইম নেই। কোন দুর্ঘটনায় জখম হলে বা মারা গেলে কোন কমপেনসেশন নেই।

লাল জামা। পরনে হাফ প্যান্ট।

খাসি পাহাড়ে অনেক মেয়ে এখনও নিজেরাই সুতো কেটে নিজেদের কাপড় তৈরি করে

পাশেই দাঁড়িয়ে। যেন পাথরের মূর্তি। তামাটে মুখের ওপর দুটি পাথরের চোখ। নিস্পৃহ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই যে সে জীপ চালিয়ে যাচ্ছে, তার দৈনিক বেতন মাত্র সাড়ে আট টাকা। তার কোন ওভারটাইম নেই! এত পরিশ্রম তাহলে কেন করে সে? কিসের আশায়? বেসরকারী ট্রাক চালালেও তো সে দৈনিক কম করেও কুড়ি টাকার মত রোজগার করতে পারত?

'হ্যাঁ, তা পারত।' উত্তর দিলেন সুজিতবাবু। 'কিন্তু ওই যে—আশা। এইভাবে কাজ করতে করতে যদি কোন দিন সে স্থায়ী চাকরি পায়, সেই আশায় তো এত পরিশ্রম। দিনের পর দিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যাওয়া। বেসরকারী কাজে রোজগার বেশী। তবে রিকসও তো আছে? ওর বয়েস হয়েছে এখন। একমাত্র পুত্র সন্তান। ওর বোন আছে। মায়ের যা সম্পত্তি সে তো ওই বোনই পাবে। ওর নিজের কোন জমি জমা নেই। তাই ভাবছে, চাকরিটা যদি কোনদিন পাকা হয়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তো আসবে।

ওয়ানসফির এই ড্রিলিং ক্যাম্পে ঠিক ওই একই রকম অনিশ্চয়তা নিয়ে কাল গুণছেন কেরলার এম এল ম্যাথু। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে জিওলজিক্যাল সার্ভের চাকরি নিয়ে হেলপারের কাজ করছে। দৈনিক বেতন সাড়ে আট টাকা। আছেন ভোগাল হো। সাঁওতাল। হারমত আলি। আসামের মানুষ। বি এন সরকার। কলকাতা থেকে এসেছেন। এবং সেকান্দার মাহাতো। দূর বিহার থেকে এসে যিনি এখানে দৈনিক সাত টাকার বিনিময়ে সার্ভের কাজ করে চলেছেন।

পি আর দাস এখানকার রেগুলার স্টাফ। ড্রিলম্যান গ্রেড-১। স্ত্রী মিতা দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল দশ বছর আগে। একটি ছেলে। মিতা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফিল্ডে ফিল্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রায় নয় বছর।

কষ্ট হয় না? মিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে থাকতে কষ্ট হয় না আপনার।

মিতা বললেন, কী করব বলুন। উনি এইভাবে থাকেন। বাড়িতে একা থাকতে আমার ভয় করে। কী জানি, যদি কিছু হয় ওঁর? ভাল কি লাগে আর? বাবা মা আছেন। তাঁদের দেখতে পাইনি কতদিন। এই পাহাড়, জঙ্গল। পাথর ভাঙ্গা কাজ। বুকটা সব সময় দুরদুর করে। ছেলেটা এখন ছোট। আর একটু বড় হলে তার পড়াশুনার যে কী হবে, জানি না। আজকাল খাসি মেয়েরা মাঝে মাঝে আসে। ওদের সঙ্গে গল্প করে নির্জনতা খানিকটা ভুলে থাকি।

সারা ড্রিলিং ক্যাম্প এলাকায় মাত্র দুটি স্ত্রীলোক। তরুণী বধু মিতা দাস। আর গোবিন্দচন্দ্র নাহার মা। বৃদ্ধা মহিলা সুদূর কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন ছেলেকে দেখতে। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বছর দশেকের নাতনী। অল্প কয়েক দিন থেকেই আবার ফিরে যাবেন তিনি।

'কী বলব, বাবা, ছেলেকে

পাহাড়ের কোলে মাঝে মাঝে নামে ধস। প্রতিরোধের মূল সমাধান বের করার দায়িত্ব ভূ-তাত্ত্বিকদের

থেকে বড়ি এনেছি, মুগের ডাল এনেছি। কত রকম রান্না করি। কিন্তু ছেলের আর মুখে দিতে পারি না। বলে, মা, এই আসছি। তুমি রান্না করে রাখো। ড্রিলিং চলছে। দেখে আসি একবার। কিন্তু কে আর আসে বাবা। খাবার ঠান্ডা হয়। কাজ থেকে ছেলে আসে কই? বুড়ো হয়েছি। এখানে এই আমার শেষ আসা। পথঘাটের যা অবস্থা। চলতে হাড়গোড় ভেঙে যায়। আর আমি আসতে পারব না। কী যে হবে আমার ছেলের? কথা বলতে বলতে দু চোখ জলে ভেসে উঠল গোবিন্দবাবুর মা'র।

সমস্যা অনেক। ভাবছিলাম, বাবা, মা, স্ত্রী পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বছরের পর বছর এই যে দুঃসহ জীবন, সে জীবনে সত্যিই কি এ'রা শেষ পর্যন্ত অভ্যস্ত হতে পারেন? এ'দের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না? শুনলাম সরকারী ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা করলে কোন রকম খরচ বা ছুটি মঞ্জুর করার ব্যাপারে সরকার কোন দায়দায়িত্ব নেন না। তা যদি হয়, এই ওয়ানসফির কর্মীকে কি সার্টিফিকেট অথবা ওষুধের জন্যে ছুটতে হবে সেই শিলং অথবা গৌহাটিতে সরকারী ডাক্তারের খোঁজে?

যন্ত্রপাতি বিগড়ালো। চল পাহাড় পর্বত ঠেঙিয়ে ১৩৫ কিলোমিটার পথ সেই শিলং। পেট্রল নেই? চল ১০০ কিলোমিটার দূরে সেই বোকোয়? এমন কি সাপ্তাহিক খাবার দাবার কেনার জন্যেও ওই বোকোতেই যেতে হবে। খাটুনির পর এসব ভালোও লাগে না সব সময়। ভাবছিলাম, এসব ক্ষেত্রে সরকার থেকে কি রেশন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যায় না? যেমন করা হয়ে থাকে সেনা বিভাগের ক্ষেত্রে?

হিন্দুস্থান লিভার থাকত। ও'দের ডাক আনতে যেতে হয় বোকো। রোজই যান ওই সঙ্গে আমাদেরও চিঠিপত্র অথবা টেলিগ্রাম দয়া করে নিয়ে আসেন, তা রক্ষে।

চা এল। এল ডালমুট। বিস্কুট।

গোবিন্দবাবুর মা বললেন, এখানে এক মুঠো খেয়ে গেলে হত না, বাবা বেলা অনেক হয়েছে।

বললাম, আজ থাক মা। আ কোনদিন হবে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি সেরে আজই গৌহাটি পৌঁছতে হ কিনা, তাই দেরি করা উচিত হবে আমাদের।

আর আবার! আবার কি দে হবে, বাবা? একটা করুণ দীর্ঘশ্বা ফেললেন তিনি।

এর অর্থ কী, আমি জানি। কার মানুষই যে মানুষের কাছে সব চে বড় সম্পদ। পাথর-জীবনে কয়ে ঘন্টার জন্যে শোরগোল তুলেছিলাম- হয়ত তিনি চাইছিলেন, সেটা আর কিছুক্ষণ স্থায়ী হোক। এখা খাওয়াটা গৌণ। আসলে যা তি চেয়েছিলেন, তার মর্মার্থ : তোমর থাক। আরও কিছুক্ষণ থাক। তাহলে হৃদয়ের শূন্যতাকে কিছুক্ষণের জন্যে আমি পূর্ণ করে রাখতে পারি।

ওয়াধাবনের ক্যাম্পে যখন ফিরলাম ঘড়িতে তখন দুটো। মাঝে ঝির ঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। রাস্তায় বেশ কাদা জমেছে। জীপের চাকা পিছলে যাচ্ছিল সেই কাদায়।

আড়াইটের মধ্যে খাবার প্রস্তুত। মুরগীর মাংস এবং ভাত। খিদেও পেয়েছিল খুব। শুধু আমার নয়। সবারই। সেটা বুঝলাম, যখন দেখলাম, খাবারের নামেই যে যার আসন বিছিয়ে বসে পড়েছেন।

ডি পি দাসের বাড়ি গৌহাটি। এখানকার সহকারী জিওলজিস্ট। আর ডি পি সরখেল এবং আর এন সাহা সার্ভেয়ার। খাবার দাবার তৈরির ভার নিয়েছিলেন এ'রাই।

ডি পি দাস বললেন, আমাদের রান্না আপনাদের কেমন লাগবে, জানি না, মশাই। ক্যাম্পে থাকতে থাকতে এ কাজটিও আমাদের শিখে নিতে হয়েছে।

বললাম, ভাবতে হবে না আপনাকে। জ্বলন্ত আগুনে যা দেবেন, তাই জ্বালানি হয়ে জ্বলতে থাকবে। এখন যা দেবেন, তাই ডেলিসাস।

খাওয়ার পর কফি।

আর কফি খেতে খেতে সুজিত-বাবুই তুললেন কথাটা। জানেন, মিঃ কর, নংগস্টইনের গুহাটাই আপনার দেখা হল না। ভেবেছিলাম, ওটা দেখিয়ে দেব আপনাকে। কিন্তু আপনি তো এখন যেতে চান গৌহাটি।

বললাম, মানে, সেখানে আমার একটু দরকার ছিল—

না, না। ঠিক আছে। আপনি গৌহাটি যান। সমরজিৎ এবং অজিত-বাবু আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন। দুটো জীপ যাবে। আমি বাকি দুটো জীপ এবং ট্রেইলার নিয়ে শিলং যাচ্ছি। অমরদা আমার সঙ্গে চলুন। আমরা কাল

শিলং থেকে শিলচরের পথে ঠিক এখানেই উনিশ শতকের শেষে বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ওলডহ্যাম প্রথম প্রমাণ করেন, নদীও পাথরের চাঁই বয়ে নিয়ে যেতে পারে

পাহাড়ের অংশটি লক্ষ করুন ওপরের কালো পাথরের বয়েস প্রায় দশ কোটি বছর। নিচের পাথর প্রায় সাত কোটি বছর পুরনো।

শিলং যাব। ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে। তবে স্যার, গৌহাটিতে দেরি করবেন না। কাল যতটা সকালে সম্ভব সেখান থেকে রওনা হবেন। দুপুরের খাবার শিলং-এই খাবেন এখন।

ঠিক হল ডি পি দাসও আমাদের সঙ্গে যাবেন। শনিবার, ১ বৈশাখ। বিহু উৎসব। উৎসবে যোগ দেবেন তিনি।

সুজিতবাবুকে বললাম, নংগ-স্টইনের গুহাটার কথা কী বলছিলেন যেন?

না, তেমন কিছু নয়। তবে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতাম। মুশকিল হয়েছে সেন সাহেবের (শম্ভু সেন) প্রোগ্রাম নিয়ে। এত টাইট প্রোগ্রাম, মশায়। নইলে সেই বুড়ো সিয়ামকেও দেখিয়ে দিতাম আপনাকে। বয়েস হয়েছে বটে, তবে এখনও স্মৃতি-শক্তি লোপ পায় নি তাঁর।

অদ্ভুত রহস্যের জাল সৃষ্টি করে কথা বলতে পারেন সুজিতবাবু। তাঁর ভূমিকাটি আমার কাছে রহস্যজনক বলেই মনে হল।

ব্যাপারটা এই।

তিনি। রিয়াংডো বাজার দিয়েই তো এদিকে এলাম আমরা? আপনার মনে আছে নিশ্চয়, যে পথ ধরে এখানে আমরা এলাম, বাজারের কাছে এসে সেটি ডান দিকে বেঁকে গেছে। আর আমরা এলাম বাঁ দিকের ঘুর পথে। ডান দিকের ওই রাস্তাটাই নংস্টইন এবং হাফলং হয়ে সোজা চলে গেছে শিলং। ওই নংগস্টনের কাছের একটি পাহাড়ে গেলে তিনটে গুহা দেখতে পাবেন আপনি। গুহা না বলে বরং টানেলই বলি। একটি টানেল ছোট। কত আর হবে। ব্যাস এই ধরুন ফুট পনের। গেলে দেখবেন, তার মুখটি কাদা দিয়ে বন্ধ করা। কে করেছে, কেউ বলতে পারে না। আর দুটি টানেলের মধ্যে এই ১৯৭১ সালেও ছিল প্রচুর কার্বন মনোকসাইড। সেখানে আগুন জ্বলতেও দেখেছেন পুরনো লোকেরা।

অনেকে মনে করেন, এই টানেল-গুলি মানুষেরই তৈরি, কোন ভূ-তাত্ত্বিক ঘটনা নয়। ১৯২৪ সালে আসামে তখন একটি বিলেতি কোম্পানি এ অঞ্চলে করান্‌ডাম সংগ্রহের জন্যে হন্যে হয়ে

কোম্পানি। করানডামের নতুন স্তর খোঁজার জন্যেই টানেলগুলি তৈরি করেছিল তারা। তারা বড় বড় যন্ত্রপাতি নিয়ে এ অঞ্চল থেকে প্রচুর করানডাম নিয়ে যায়। মূল্যবান এই বস্তুটি কাঠিন্যের দিক দিয়ে হীরের পরেই পড়ে। কাচ ঘষার জন্যে এর দরকার খুব।

তা একবার হলো কী—ওই ১৯২৪ সালেই। স্টিল ব্রাদার্সের কয়েকজন কর্মী করানডামের সন্ধানে ওই টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পনের দিনের মধ্যেই দেখা গেল তাদের সবাই মরে গেছে। অনেকের ধারণা এ কোন অশরীরীর কাজ। তবে আমরা মনে করি, টানেলের মধ্যেকার বিষাক্ত গ্যাসই তাদের খুন করেছে।

যে বৃদ্ধ সিয়ামের কথা বলছিলাম, তিনিই এ ঘটনার সাক্ষী। তখন তিনি পাঁচ ছয় বছরের বালক। তবে ওই ঘটনা তিনি আজও নাকি ভুলে যাননি। তবে সিয়াম করানডামের কথা বিশ্বাস করতে চান না। তাঁর ধারণা, স্টিল ব্রাদার্স আসলে সোনার সন্ধান পেয়েছিল। সেই সোনা নিতে এসেই তাঁরা দেবতাদের

শুধু নংগস্টইনেই নয়। ঘটনার সঙ্গে অতি প্রাকৃতিক আখ্যান মিশিয়ে এমন গল্প বিস্তর শোনা যায় পূর্বা-ঞ্চলের ট্রাইবদের মধ্যে। এ সব গল্পের ঐতিহাসিক সত্যতা কতটা, জানি না। কিন্তু এই গল্পগুলির মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে তাদের মানসিকতা। এই মানসিকতা যথাযথ বুঝে উঠতে পারলে তবেই ট্রাইবদের সত্যিকারের আশা আকাঙ্ক্ষা কী, তা জানা সম্ভব।

বিকেল চারটে নাগাদ আবার চলা। এবার গৌহাটি হয়ে শিলং। তারপর চেরাপুঞ্জি। সেখান থেকে সিলেটের কাছাকাছি ভোলাগঞ্জ। কিন্তু তখনও কি জানতাম, ওই চেরাপুঞ্জির পথেই এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে যার মুখ দিয়ে আমাকে শুনতে হবে ফ্লাইং সসারের গল্প, ফ্লাইং সসার মানে উড়ন্ত পিরিচ! যে নিজের চোখে সেই পিরিচকে নিজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে! সেও একজন খাসি। নাম পূর্ণকুমার রায়। তার সঙ্গে দেখা মওকডক ডাকবাংলোর সামনে। তার কথায় চমকে না উঠে পারিনি।

সৌন্দর্যের জগতে নতুন আলোড়ন

ল্যাকমে ক্যালামাইন

যা'এর আগে আপনি কখনোই ব্যবহার করেন নি।

ল্যাক্‌মে ক্যালামাইন কত কোমল, কত সহজে ত্বকের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।
একমাত্র ল্যাক্‌মে ক্যালামাইনেই পাচ্ছেন আপনার মনোমত নানান
আকর্ষণীয় শেড যা আপনার রঙ্‌রূপে ফুটিয়ে তুলবে ঝলমলে জৌলুস।
ভেষজ মিশ্রিত একমাত্র ল্যাক্‌মে ক্যালামাইনেই সুরভিত সুগন্ধে ভরা
ল্যাক্‌মে ক্যালামাইন — আপনার কোমল ত্বকের,
শিশুর তুলতুলে নরম ত্বকের, এমনকি পুরুষদেরও কর্কশ ত্বকের পুরোপুরি
যত্ন নিয়ে, আনবে ঝলমলে দীপ্তি।
আপনার রঙ্‌-রূপের যত্নের ভার পুরোপুরি ছেড়ে দিন—
ল্যাক্‌মে ক্যালামাইনের ওপর।

কোমল ও ঝলমলে দীপ্ত

আকর্ষণীয় তিন রকম শেড

সুরভিত সুগন্ধ

daCunha/LC/1 F BEN

উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ নয় ॥

যৌবন আসতে না আসতে বিধবা হয়েছিলেন হেমলতা। স্বামী ছিল, তার মুখ চোখ ভাল করে মনে ধরার আগেই এক রাত্রির অসুখে মরে গেল লোকটা। তারপর এতগুলো বছর শুধু পার করে দেওয়া, এক রাত্রির জন্য নারী হওয়া যাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, মা হবার কোন প্রশ্নই তো ওঠে না। স্বর্গছেঁড়ার নির্জন চা-বাগানে বসে সরিৎশেখর মেয়ের আবার বিয়ে দেবার কথা ভাবতেন। বিদ্যাসাগর মশাই অত চেষ্টা করলেন, হয়তো কলকাতা শহরে অহরহ বিধবা-বিবাহ হচ্ছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ার লোকজন ব্যাপারটা চিন্তা করতে পারে না। এমন কি হেমলতাও। স্ত্রীকে দিয়ে মেয়েকে বলিয়েছিলেন, শুনে হেমলতা বলেছিলেন 'ছি!' আর কথা বাড়াননি সরিৎশেখর। বিয়ের সময় ভাল করে কাপড় পরতো না যে, জীবনে আর শ্লেস করে শাড়ি পরা হল না তাঁর। একেবারে সরুপাড় সাদা শাড়ি অঙ্গে উঠল। বয়স যত বাড়ছে পাড় তত ছোট হতে হতে নরুনে ঠেকেছে। ছোটমা যখন স্বর্গছেঁড়ায় এল তখন হেমলতার বয়স বড়জোর আট। সেই বয়স থেকে হাত পোড়ানো শুরু হয়েছে। মহীতোষ বা পরিতোষকে নাইয়ে-খাইয়ে দেবার জন্য আর কোন লোক ছিল না। সে ছিল এক রকম। ছোটমা আসার পর হেমলতা চট করে অনেক বড় হয়ে গেলেন। বছর ঘোরার আগেই ছোটমা সন্তান-সম্ভবা হলেন। স্বর্গছেঁড়ার চৌহদ্দিতে তখন ভাল ডাক্তার নেই। নতুন ডাক্তারবাবু তখনও আসেন নি। একজন কম্পাউন্ডার কোনরকমে কাজ চালাচ্ছেন। আর তখন লোকজনই বা কত ছিল, এক আঙুল যদি বা ফুরোয়। সরিৎশেখর চেয়েছিলেন বউকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু সেই নদীয়ায় নিয়ে যাওয়া আর হল না। ছোট বউ-এর বাড়ির লোকজন আসব আসব করে শেষ পর্যন্ত এল না। কুলি লাইনের এক বুড়ী যে নাকি মদেশিয়াদের দাই-এর কাজ করে, হেমলতাকে সঙ্গে নিয়ে আঁতুড়-ঘরে ঢুকল। সরিৎশেখরের পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরে যাওয়া, তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে জোরে জোরে মেয়েকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। হেমলতা প্রথম সন্তান জন্ম দেখলেন। একটু ভয় ছিল প্রথমটা, কিন্তু বাড়ি তৈরী করার নিষ্ঠা নিয়ে পরপর কাজগুলো করে গেলেন। ছোটমার প্রথম সন্তান আঁতুড়ঘরেই মারা গিয়েছিল। ছোটমা যতটা না কেঁদেছিলেন, হেমলতা বোধ হয় অনেক বেশী। তখনও তার বিয়ে হয়নি। বিয়ের পর প্রিয়তোষ জন্মালো। সেদিন আর বুড়ী ধাই ছিল না। হেমলতা একাই সব দিক সামলেছেন। রান্না করে সবাইকে খাইয়েছেন, কাপড় ছেড়ে আঁতুড়ঘরে গিয়েছেন, সময় এলে নাড়ি কেটেছেন। এমন কি সেদিন অনি যখন হল, তখন তো ডাক্তারবাবু ছিলেন কিন্তু হেমলতাকে ছাড়া চলেনি। অনি হয়েছিল দুপুরে। সরিৎশেখর ঘরের বাইরে চেয়ারে বসে ঘড়ির ওপর নজর রেখে মাঝে মাঝে উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করছেন। বার বার করে বলেছেন ঠিক জন্ম মুহূর্তে যেন হেমলতা তাঁকে জানান। শিশুর মত ছটফট করেছেন সরিৎশেখর। তারপর যখন হেমলতার খুশীর চিৎকার তাঁর কানে এল, ছেলে হয়েছে', তখন সরিৎশেখরকে দেখে কে! এক হাতে ঘড়ি নিয়ে লাফাচ্ছেন তিনি, 'একটা বেজে পঁনের মিনিট—পাঁজিতে লিখেছে মাহেন্দ্রক্ষণ—শঙ্খ বাজাও শঙ্খ বাজাও, দুর্গা, দুর্গা।'

এখন চিলেকোঠার ঘরে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে মুখ তুলতেই হেমলতা সরিৎশেখরকে দেখতে পেলেন। উদ্বেগ মুখে নিয়ে উঠে আসছেন তাড়াতাড়ি। চোখা-চোখি হতে হেমলতা খুব সাধারণ গলায় বললেন, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকুন, মাধুর বাচ্চা হবে।'

সরিৎশেখর থমকে দাঁড়ালেন। বউমার বাচ্চা হবে তিনি জানতেন, কিন্তু তার তো সময় হয়নি। কোন গোলমাল হল না তো? বোকার মত বললেন, সে কি! তার তো দেরী আছে।'

কোনদিকে না তাকিয়ে হেমলতা বাবাকে বল-লেন, সেসব আপনি বুঝবেন না। তাড়াতাড়ি যান।'

মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে সরিৎশেখর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। মহীতোষ ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে ভাবতে পারেন নি। এখনও তো মাস দুয়েক দেরী আছে। হঠাৎ ওঁর খুব ভয় হল। মাধুরীর যদি কিছু হয়ে যায়। কোন কথা না বলে মহীতোষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, দরকার হলে ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। হেমলতা দেখলেন মাধুরী ছটফট করছে। কি করবেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলতেই দেখলেন অনি সিঁড়ির মুখে গাল চেপে করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় ওপরে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। হেমলতা হেসে বললেন, 'যা বাবা, তাড়াতাড়ি নিচ থেকে একটা বালিশ আর চাদর নিয়ে আয়।' কাজ করতে পেরে অনি যেন বেঁচে গেল।

কোন মতে বিছানা করে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে হেমলতা বললেন, 'অনি, তুই মায়ের কাছে বোস আমি গরম জল করি গে।' পিসীমা চলে গেলে অনি খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে এখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ছোট বাড়ি থেকে চাদর-বালিশ আনতে গিয়ে ও একটু ভিজেছে। অন্য সময় মা নিশ্চয় বকত, এখন কিছু বলছে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কান্না পাচ্ছিল। মা যে খুব কষ্ট পাচ্ছে এটা ও বুঝতে পারছিল। পিসীমা তখন দাদুকে বলল মায়ের বাচ্চা হবে। বাচ্চা হলে এত কষ্ট পেতে হয় কেন? মায়ের মুখটা একদম সাদা হয়ে গিয়েছে। ও মায়ের পাশে এসে সন্তর্পণে বসে পড়ল। এখন কাছেপিঠে কেউ নেই, কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। চিলেকোঠার দরজাটা আলো আসার জন্যে অথবা ভুলে খোলা রয়েছে। অনি এখান থেকে বৃষ্টি পড়া দেখতে পেল। জলের ছাঁট ঘরের মধ্যে সামান্যই আসছে। অনির খুব ইচ্ছে হল মায়ের মুখে হাত বোলাতে। ঠিক সেই সময় মাধুরী চোখ খুললেন। অনি দেখল মাধুরীর চোখের কোণে দু ফোঁটা জল টলটল করছে। মাধুরী একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘরটাতে চোখ বোলালেন। মায়ের চোখে জল দেখতে পেয়ে অনি ফুঁপিয়ে উঠল। মাধুরী খুব ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে ছেলের কোলের ওপর রাখতেই অনি মায়ের বুকের ওপর ভেঙে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছেলেকে বুকের মধ্যে রেখে মাধুরী বললেন, 'ছ্যাঁরে বোকা, কাঁদছিস কেন', ফিসফিসিয়ে অনি বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

আমার কষ্ট হলে তোর খারাপ লাগে, না রে।'

অনি [illegible]

½ লিটার মাপের গেলাসে উঁচু উঁচু ২½ বড় চামচ আমূল মিল্ক পাউডার চালুন। একটুখানি অল্প-গরম জল মিশিয়ে লেইয়ের মত করুন। গরম জলে গেলাস ভরে নিয়ে নেড়ে নিন। আপনার বাচ্চার দুধের গেলাস তৈরী। (বিস্তারিত নির্দেশের জন্যে টিন দেখুন)। আমূল মিল্ক পাউডার চা আর কফির জন্যেও আদর্শ!

ওপরের পদ্ধতিতে দুধ তৈরী করুন। তারপর যেমন টাটকা দুধের দই বসান, তেমনি করে এই দুধ দিয়ে দই পাতুন।

আমূল
মিল্ক পাউডার
ঘরে সবসময়ে দুধের ভাণ্ডার

বিতরণ: গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশান লিমিটেড, আনন্দ।

RADEUS/AMP-1

বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই আমাকে ভুলে যাবি না তো!'

অনি দুই হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল শব্দ করে। মাধুরী কেমন ঘোরের মধ্যে বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক শুনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।'

অনি কোন কথা বলতে পারছিল না, ওর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিল। মাকে এ রকম করে কথা বলতে ও কোনদিন শোনে নি। মা কেন ওকে ছেড়ে চলে যাবে! বাচ্চা হলে কি কাউকে চলে যেতে হয়! ও দেখল মাধুরী একটানা কথা বলে কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছেন, অনেক দূর দৌড়ে এলে যেমন হয় মায়ের বুক তেমনি ওঠানামা করছে। হঠাৎ ও মায়ের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। মাধুরী যেখানে শুয়ে আছেন তার নিচ দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এটা কি সত্যি রক্ত! কোত্থেকে এত রক্ত এল? মায়ের তো কোথাও কেটে যায়নি। এর আগে কতবার তরকারি কুটতে গিয়ে মায়ের হাত বঁটিতে কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছে কিন্তু সে তো কয়েক ফোঁটা মাত্র। অনি আস্তে আস্তে উঠে মায়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। কুঁজো ভেঙে গেলে যেমন জল গড়িয়ে যায় তেমনি একটা মোটা লাল ধারা চলে যাচ্ছে কোণার দিকে। মায়ের পায়ের গোড়ালি সেই স্রোতটা থেকে সরিয়ে দিতে গেল অনি আর তখনি ওর আঙুল চটচটে লাল হয়ে গেল। মাধুরী চোখ খুলে দেখলেন ছেলে চোখের সামনে আঙুল নিয়ে দেখছে। চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে মুছে ফেল, তোর হাত থেকে রক্ত মুছে ফেল।' কিন্তু ক্রমশ কথা বলার শক্তিটা চলে যাচ্ছিল ওঁর। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে। অনি ঝাপসা—মহীতোষ ঝাপসা—দু চোখে এত জল থাকে কেন?
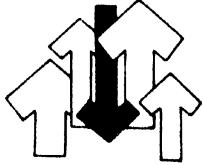
এই সময় সিঁড়িতে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ পেল অনি। একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন দম আটকে যাচ্ছিল ওর, হঠাৎ মনে হল ডাক্তারবাবু এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হেমলতা একটা বড় লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে উঠে এলেন। ছাদের এই ঘরটা এতক্ষণে আবছা হয়ে এসেছে। হেমলতার পিছন পিছন একজন বৃদ্ধ, সরিৎশেখর, মহীতোষকে ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে আসতে দেখল অনি। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সবাই, হ্যারিকেনের আলোয় রক্তস্রোত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধ লোকটি বললেন, 'ব্লিডিং হচ্ছে বলেন নি তো!'

হেমলতা বললেন, 'আমি একটু আগে নিচে গেলাম, তখনো দেখিনি।' অনি বুঝলে এই লোকটিই ডাক্তার, কারণ তৎক্ষণাৎ তিনি মাধুরীর পাশে বসে একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলেন। তারপর খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনারা নিচে চলে যান।' সরিৎশেখর অনিকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নিচে নেমে গেলেন। মহীতোষ খানিক ইতস্তত করে ব্যাগটা মেঝেতে রাখতে হেমলতা বললেন, 'গরম জলের সসপ্যানটা পাঠিয়ে দে শিগগীর।'

মহীতোষ নিচ থেকে জল ওপরে দিয়ে এসে দেখল সরিৎশেখর অনিকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে আছেন। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর বললেন, 'হাসপাতালে রিমুভ করা যাবে?' ছোটঘর থেকে আনা লণ্ঠনটা নামিয়ে মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন, 'জানি না। করতে হলে এখনি করা দরকার। সেনপাড়ার দিকটায় তিস্তার জল ঢুকে পড়েছে।'

সরিৎশেখর বললেন, এ তো প্রতি বছরই হয়।'

মহীতোষ বললেন, 'দেখলেন না মাইকে অ্যানাউন্স করছে। মনে হচ্ছে এবার খুব ভোগাবে।' কথাটা শেষ করে মহীতোষ দেখলেন প্রিয়তোষ দরজায় দাঁড়িয়ে। এদের দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'জল আসছে, সামনের মাঠটা জলে ডুবে গেছে। চটপট মালপত্র ছাদে তোল।'

মহীতোষ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে শুনলেন ওদের উঠোনে বাগানে জল শব্দ করছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগতে টের পেলেন ওর সমস্ত জামাকাপড় ভিজে চুপসে গেছে, সরিৎশেখরেরও এক অবস্থা। অন্ধকারে এতক্ষণ যেটুকু দেখা যাচ্ছিল আর তাও দেখা যাচ্ছে না। ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে আর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই মহীতোষ দেখলেন ঘোলাজলের স্রোত উঠোনময় ঝিলবিল করছে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মহীতোষ দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বন্যা এসে গেছে, এখন তো নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।'

প্রিয়তোষ বলল, কি হয়েছে?'

মহীতোষ বললেন, 'তোর বউদি পড়ে গিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে, অবস্থা সিরিয়াস।'

প্রিয়তোষ বলল, 'সে কি! কখন?'

সরিৎশেখর বিরক্তিচাপা গলায় বললেন, 'বাড়িতে কতক্ষণ থাক যে এসব খবর রাখবে? যাও জিনিসপত্রগুলো যাতে জলে না ডোবে দেখগে যাও।

মহীতোষ একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে জলের মধ্যে নেমে গেল। অন্ধকারে চলতে কষ্ট হচ্ছে, প্রিয়তোষ ওর পিছনে। ছোটঘরে তখন পায়ের পাতার ওপর জল। কি নেওয়া যায় কি নেওয়া যায় ভাবতে না পেরে ওরা আবিষ্কার করল অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত জল বাড়ছে। হাঁটুর কাছটা যখন ভিজে গেল তখন মহীতোষ টর্চটা খুঁজে পেল। খাটের অনেকটা এখন জলের তলায়। লেপ তোশক নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। ওরা দেখল মেঝের রাখা সুটকেসগুলোর ওপর জল বয়ে যাচ্ছে। সেগুলোকেই টেনে-টুনে খাটের ওপর রাখল ওরা। ভিজে গেছে সব। সরিৎশেখরের টাকাপয়সা আলমারিতে আছে, অদ্দুর জল উঠবে না নিশ্চয়ই। ঘরটাকে সামলে কিছু শুকনো কাপড়চোপড় আর গায়ের চাদর নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। আসবার সময় মহীতোষ মাধুরীর সুটকেসটা তুলে নিলেন। মহীতোষের টাকা এই সুটকেসে আছে। সুটকেসটা এর মধ্যে ভিজে ঢোল হয়ে গেছে।

নতুন বাড়ির বারান্দার ইঞ্চি কয়েক নিচে জল। ওরা ছাদের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে দেখল সরিৎশেখর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওদের ছায়া কাঁপছে। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না মহী, ভগবান একি করলে।'

মহীতোষ ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে একটা চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যা অবস্থা—জল শুনলাম বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে?' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন।

'হয়ে গেল তাহলে!' ডাক্তারবাবু ছটফট করে উঠলেন, ভোরের আগে কোনবার জল কমে না। এই জন্যেই আমি আসতে চাইছিলাম না। এখন আমি বাড়ি যাই কি করে। অন্ধকারে জল ভেঙে যেতে কোথায় পড়ব—ইস!' মহীতোষ বললেন, 'ডাক্তারবাবু আপনি চলে গেলে ওকে নিয়ে আমরা—না, আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি ওকে দেখুন, আমি আপনার বাড়িতে খবর দিয়ে আসছি।' কথাটা শেষ হতেই প্রিয়তোষ 'আমি খবর দিয়ে আসি' বলে অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি আর দেখে কি করব! চোখের সামনে মেয়েটা চলে যাচ্ছে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছি। ভগবানকে ডাকুন।'

সরিৎশেখর বললেন, 'মিসক্যারেজ হয়েছে বল-

'সেটা বেরুলে তো বুঝতে পারা যেত। এতগুলো ইঞ্জেকশন দিলাম রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না।' বিড়বিড় করে বকতে বকতে ডাক্তারবাবু ওপরে উঠে গেলেন।
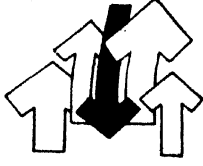
এখন এখানে শুধু ঝড়ো বাতাস ছাড়া কোন শব্দ নেই। বাইরে তিস্তার জল নতুন বাড়ির বারান্দার গায়ে ধাক্কা লেগে যে শব্দ তুলছে তাও বাতাসে চাপা পড়ে গেছে। মহীতোষ পাথরের মত দাঁড়িয়ে। সরিৎশেখর নাতিকে দুহাতে জড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ করে বসে আছেন সিঁড়িতে। লণ্ঠনের আলোয় দেওয়ালে পড়া তাদের ছায়াগুলো নিয়ে বাতাস উদ্ভট ছবি এঁকে এঁকে যাচ্ছে। সময় এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে ওপর থেকে কোন শব্দ ভেসে আসবে এই রকম একটা আশঙ্কায় দুটো শরীর কাঁটা হয়ে রয়েছে। দাদুর বুকের ওপর মাথা রেখে অনি অনেকক্ষণ ধরে দুপ-দুপ বাজনা শুনছিল। এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা এখানে হয়ে গেল তার প্রতিটি শব্দ ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। মা আর থাকবে না! ডাক্তারবাবু ওদের ভগবানকে ডাকার কথা বললেন কিন্তু কেউ ডাকছে না কেন? অনির মনে পড়ল স্বর্গছেঁড়ায় এক বিকেল বেলায় হেমলতা ওকে বলেছিলেন সব চেয়ে বড় ভগবান হল মা। অনি সমস্ত শরীর দিয়ে মনে মনে মাকে ডাকতে লাগল। চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে মা, মা, উচ্চারণ করতে করতে অনি দেখতে পেল মাধুরী ওর কাছে এসে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। মায়ের গায়ের সেই গন্ধটা বুক ভরে নিতে নিতে ও শুনতে পেল পিসীমা সিঁড়ির মুখে এসে বলছেন, 'অনিকে একটু ওপরে নিয়ে আসুন।'

কথাটা শুনে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অনি। অন্ধকারে সিঁড়িগুলো লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসে পিসীমার মুখোমুখি হয়ে গেল ও। অনিকে দেখে হেমলতা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। অনি বুঝতে পারল পিসীমা কাঁদছেন। কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা আবার থমকে দাঁড়ালেন। অনির মাথাটা ওঁর প্রায় কাঁধ-বরাবর। অনি শুনতে পেল কেমন কান্না কান্না গলায় পিসীমা ওকে বলছেন, 'অনি বাবা, আমার সোনাছেলে, তোমার মা এখন ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে তোমাকে দেখতে চাইছে—।' হুহু করে কেঁদে ফেললেন হেমলতা।

অনি বলল, 'মা-ই তো ভগবান। তবে মা কার কাছে যাচ্ছে?'

ফিসফিস করে হেমলতা বললেন, 'আমি জানি না বাবা, তুমি কোন কথা বলো না, বেশী কেঁদ না তাহলে মার যেতে কষ্ট হবে।' পিসীমার বারণ তিনি নিজেই মানছিলেন না।

মা শুয়ে আছেন চুপচাপ। ওঁর শরীর নড়ছে না। ডাক্তারবাবু মাটিতে বাবু হয়ে বসে আছেন। হেমলতা অনিকে এগিয়ে দিলেন সামনে, 'মাধু, অনি এসেছে দ্যাখ।'

চোখের পাতা নাচল, পুরো খুলল না। অনি দেখল মায়ের চোখের কোল দুটো জলে ভরে গেছে। অনি মাধুরীর মুখের পাশে মুখ নিয়ে ডাকল, 'মা, মাগো।'

মাধুরী ঘোরের মধ্যে বললেন, 'অনি, বড় কষ্ট হচ্ছে রে।'

ফুঁপিয়ে উঠল অনি, 'মা মাগো।'

মাধুরী ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোর সংগে থাকব রে, তুই জেলে গেলেও তোর সংগে থাকব।' অনি পাগলের মত মায়ের বুকে মুখ চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বাইরের বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে হেমলতার বুক-ফাটা চিৎকার কানে আসতে অনি মায়ের বুক থেকে মাথা সরিয়ে অবাক হয়ে দেখল পিসীমা আর বাবা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। ওর পাশ দিয়ে দুটো পা দ্রুত ছাদের দিক চলে গেল। পিছন থেকে অনি দেখল দাদু এই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে ছাদে হেঁটে যাচ্ছেন।

মায়ের দিকে তাকাল অনি। স্বর্গছেঁড়ায় অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে ও মাধুরীকে এমনি ভাবে শুয়ে থাকতে দেখত। ঘুমিয়ে পড়লে মাধুরী সহজে জাগতে চাইতেন না। ভীষণ কাথরুম পেয়ে গেলে অনি মায়ের গায়ে চিমটি কাটতো। তখন মাধুরী ধড়মড় করে উঠে বসতেন। অনি বুঝতে পারছিল আর মা উঠে বসবে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনি চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

মাঝরাতেই জল নেমে গিয়েছিল। ভোরের আলো ফুটতে চারধার একটা অদ্ভুত দৃশ্য নিয়ে জেগে উঠল। সমস্ত শহরটার ওপর কয়েক ইঞ্চি পলি পড়ে গেছে। সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছে সেগুলো। ভেসে আসা মৃত গরু-ছাগল আটকে আছে এখানে সেখানে। তিস্তার জল করলার মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় নিচু জায়গাগুলো এখনো জলের তলায়। শ্মশানটা শহরের একপ্রান্তে, মাসকলাইবাড়ির কাছে। উঁচু জায়গা বলে সে অবধি জল পৌঁছয় নি। লোকজন যোগাড় করে এই পাঁকের ওপর দিয়ে হেঁটে শ্মশানে আসতে দুপুর হয়ে গেল। ছোটঘরের অনেক জিনিসপত্র গেলেও খাটটা বেঁচেছে। সরিৎশেখর
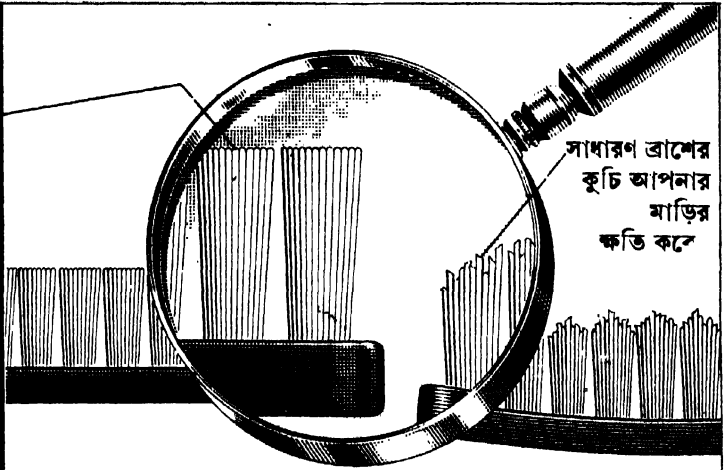
সেখানে সকাল থেকে শুয়ে রইলেন। কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বর হয়েছে ওঁর। বারবার বলছেন, 'আমার অপমান ঠেকাতে পারলো না কেউ।'

মৃতদেহ নিয়ে যাবার লোকের অভাব হয় না। তারা সবাই হরিধ্বনি দিতে দিতে মাধুরীকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রিয়তোষ কাঁধ দিয়েছে। হেমলতা কাল রাত থেকে সেই যে অনিকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন মাধুরীর পাশে একবারও ওঠেননি। কাঁদতে কাঁদতে অনি কখন তাঁর বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার জেগেছে, হেমলতা পাথর। দেহ নিচে নামিয়ে খাটিয়া সাজিয়ে কেউ একজন ডাকল তাকে, 'এয়োস্ত্রীকে যাবার সময় সিঁদুর পরিয়ে দিতে হয়, সিঁদুর নিয়ে আসুন।' ঠিক তখনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন হেমলতা, 'আমি চাইনি গো, কাল সকালে জোর করে আমাকে দিয়ে সিঁদুর পরালো ও, আমি যে বিধবা, সেই পাপে মেয়েটা চলে গেল গো—।'

মহীতোষ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'থাক, সিঁদুর পরাতে হবে না।'

সংগে সংগে গর্জে উঠলেন সরিৎশেখর! ছোট ঘরের খাটে শুয়ে কান খাড়া করে সব কথা শুনছিলেন, 'খবরদার, আমার বাড়ির বউকে সিঁদুর না পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'
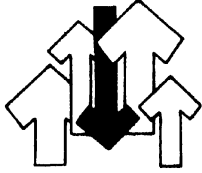
এখন সিঁদুর মাথায় মাধুরী শ্মশানে পৌঁছে গেলেন। ওদের থেকে খানিক দূরত্বে ছেলের হাত ধরে মহীতোষ হেঁটে এলেন। পলি জমা রাস্তায় হাঁটতে ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। মহীতোষ কাল থেকে ছেলের সংগে কথা বলেননি। এখন আসার সময় ভয় পাচ্ছিলেন অনি হয়তো মাধুরীকে নিয়ে কোন প্রশ্ন ওকে করবে। কিন্তু আশ্চর্য, অনি গম্ভীর মুখে হেঁটে এল। মহীতোষের মনে হল এক রাত্রে ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

শ্মশানে ওরা যখন চিতা সাজাচ্ছিল তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসেছিলেন মহীতোষ। ওঁর কাঁদতে ভয় করছিল অনির জন্যে। আজকে এই শ্মশানে আর কোন চিতা জ্বলছে না। একমাত্র যেটি সাজানো হচ্ছে সেটি মাধুরীর জন্য।

হঠাৎ অনি কেমন কাঠ কাঠ গলায় বলল, 'মাকে ওরা শুইয়ে রেখেছে কেন?' মহীতোষ জবাব দিতে গিয়ে দেখলেন তাঁর গলা আটকে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে বললেন, 'ভগবান কাউকে নিয়ে গেলে তাঁর শরীরটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।'

হঠাৎ একজন এগিয়ে এল ওদের দিকে, 'দাদা আর দেরী করা ঠিক হবে না। মুখাগ্নি তো ওই করবে?' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন। ছেলেটি অনির হাত ধরল, 'এসো তুমি।' তারপর অনিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'মা তো চিরকাল থাকে না, আমারও মা নেই, বুঝলে।'

পরপর সুন্দর করে কাঠ সাজিয়ে মাধুরীকে শোয়ানো হয়েছে। মাধুরীর চুল খুব বড়, চিতার একটা দিক কালো করে ঢেকে রয়েছে। প্রিয়তোষ এসে অনির পাশে দাঁড়াল। অনি দেখল কয়েকজন পাটকাঠিতে আগুন ধরাচ্ছে। মাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে এখন। অনি আমি তোমার সংগে আছি। মা, মাগো। অনি ডুকরে কেঁদে উঠতে প্রিয়তোষ বলল, 'কাঁদিস না অনি, কাঁদিস না।' আগের ছেলেটি একগোছা পাটকাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে এনে অনির সামনে ধরল, 'নাও, মায়ের মুখে আগুনটা একটু ছুঁইয়ে দাও।' কথাটা শুনে আঁতকে উঠল ও। সদ্য জ্বালা আগুনের শিখাটা যদিও ছোট কিন্তু লকলক করছে। সেদিকে তাকিয়ে অনি বলে উঠল, আগুন দিলে মুখ পুড়ে যাবে না!'

কথাটা মহীতোষের কানে যেতে মহীতোষ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি আর দেরী করল না, অনির একটা হাত টেনে নিয়ে পাটকাঠির ওপর চেপে ধরে নিজেই জোর করে আগুনের শিখাটা মাধুরীর মুখে ছুঁইয়ে দিল। সংগে সংগে আরো কয়েকটা শিখা চিতার আশেপাশে লকলক করে উঠলো যেন। প্রিয়তোষ অনিকে সরিয়ে নিয়ে এল চিতার কাছ থেকে। ওকে ধরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল সে। কয়েক পা হেঁটে অনি শুনতে পেল পিছন থেকে অনেকগুলো গলায় চিৎকার উঠছে, 'বল হরি, হরি বোল।'

হঠাৎ কাকার হাতের বাঁধন থেকে ছিটকে সরে গিয়ে অনি মায়ের চিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দাউ দাউ করে অজস্র শিখা নিয়ে আগুন জ্বলছে। শব্দ হচ্ছে কাঠ পোড়ার। আগুনটা ক্রমশ দলা পাকিয়ে লাল হয়ে নাচতে শুরু করেছে। অনি আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা অবয়ব দেখতে পেল, যাকে মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না।

যে ছেলেটি ওর হাত ধরে মুখাগ্নি করাল সে অনির দিকে এগিয়ে এল, 'তোমার হাতে কি লেগেছে? শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে!'

নিজের হাতটা চোখের সামনে ধরতেই অনির মনে পড়ে গেল একটা লাল স্রোতের কথা, কাল রাত্রে মায়ের শরীর থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছিল। কখন সেটা শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে, রক্ত বলে চেনা যায় না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলল, 'মার রক্তের দাগ।'

(ক্রমশ)

The New York Times

TRY GARLIC IT MAY HELP

LONDON—Adding garlic to the menu may help prevent diseased arteries researchers reported yesterday.

Long respected as a popular remedy for a variety of ailments, the pungent root has now been shown by medical tests to have "a very significant protective action" in limiting the effects of fat on the rate at which blood clots.

Reporting this in a letter to the medical magazine, the Lancet, doctors Arun Bordia and H.C. Bansal, of R.N.T. Medical College, Udaipur India, said the blood of 10 patients coagulated more slowly when they ate garlic with fatty food than it did when they ate similar food without garlic.

In effect, this means garlic could help prevent fatty deposits building up on the artery walls and clogging them. (Reuters).

THE TIMES OF INDIA

BOMBAY, DEC. 3-1976

Eat Garlic and Cut Cholesterol

NEW DELHI, December 2: A medical study has revealed that garlic is effective in reducing blood cholesterol. An experiment by Dr. R. C. Jain, pathologist at the University of Benghazi in Libya has now shown that garlic reduces the cholesterol level.

He did the experiment on rabbits which he fed with a diet containing large amounts of Cholesterol for 16 weeks. Their aorta (main blood vessel) and liver were deposited with cholesterol but after giving them garlic, he noticed that the fat dissappeared and the blood cholesterol came down. Dr. Jain has reported the results of his experiment in "The Journal of Indian Medical Research" How exactly garlic brings down cholesterol level is, however, not clear, Dr. Jain said-Samachar

SUNDAY STANDARD

Vijayawada, Sunday October 31, 1976

Raw Garlic is anti-bacterial

NAINI TAL Oct. 29 (Samachar) Raw garlic possesses anti-bacterial property against a number of micro-organisms including those which are resistant to commonly used anti-biotics This is revealed in researches conducted at the Pant-nagar University. According to the research findings, anti-bacterial property of garlic is lost on boiling.

Eve's Weekly

July-17-1976

AYURVEDA IN YOUR HOME

Suresh Chandra Chaturvedi

GARLIC

Regular use of garlic helps the digestive system and removes gas and constipation It increases the blood, cures chronic cold and cough, Gastric troubles are cured by taking garlic every day.

বিশেষ ফরমুলায় তৈরী

লসোনা

দুর্গন্ধমুক্ত

প্রকৃত আকার

অনায়াসে গেলা যায়

Lasona

কাঁচা রসুনের অপ্রীতিকর গন্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
আপনাকে একাধিক দিক থেকে উপকৃত করে, যেমন—

* কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয় * হজমশক্তি বাড়ায়
* বায়ু নাশ করে * রক্ত পরিষ্কার করে
* দীর্ঘস্থায়ী দুর্দমনীয় কাশি দূর করতে সাহায্য করে

লসোনা— নির্ভেজাল রসুনের নির্যাস—
সুবিধাজনক গন্ধহীন স্বচ্ছ নরম ক্যাপসুলের আধারে রসুনের সহজাত গুণ নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত।

আপনার শহরের অগ্রণী কেমিষ্ট ও বড় বড় দোকানে এখন অবাধে পাওয়া যাচ্ছে।

টমাস ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড ২০ [illegible] ষ্ট্রীট, বোম্বাই ৪০০০২০

রসুন-চিকিৎসা পদ্ধতিতে পথিকৃত

LA-B-33-R/MI

কষ্টকল্পিত
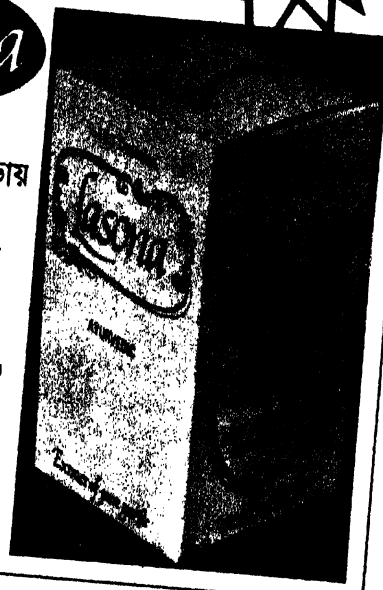
অতুল্য ঘোষ

॥ ৬২ ॥

ব্যোমকেশ (মজুমদার) খুব পীড়াপীড়ি করছিল। বক্তব্যটা অতি সোজা। তার শ্বশুর-মশাইকে অনেক দিন ধরে কথা দিয়েছি। এবার না গেলে অন্যায় হবে। আমারও যাবার খুব ইচ্ছে ছিল, হয়ে ওঠেনি। যেতে হবে বর্ধমানের একটি গ্রামে। এই বর্ধমান জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এক দিকে আসানসোল রানীগঞ্জের কয়লা, তার সঙ্গে সদর, মহকুমার ধান। আর কাটোয়া-কালনায় শুধু ধান নয়, তার সঙ্গে সব সময়েই সবজি এবং তার উপর পাট। যে সময়ের কথা বলছি তখন দুর্গাপুরের শিল্পনগরীও হয়নি আর দামোদর পরিকল্পনার দুর্গাপুর ব্যারেজও হয়নি। কিন্তু সদর মহকুমার সেচের ব্যবস্থা ভালই ছিল। রণ্ডিয়ায় অ্যান্ডারসন ওয়্যার করে দামোদর থেকে জল এনে সদর মহকুমার অনেক গ্রামেই সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। গ্রান্ড ট্রাংক রোডের গোলসি গ্রামের পাশ দিয়ে যে খালটি এসে বর্ধমান শহরের কাছে গ্রান্ড ট্রাংক রোড পেরিয়ে গেছে সেইটি আসল খাল। যেসব জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে সেইসব জমিতে অন্যান্য জমির তুলনায় চার গুণ ফসল হয়। ওই সেচের এলাকায় যার পনর-কুড়ি বিঘা জমি ছিল সেই সম্পদশালী। ওয়্যার, ব্যারাজ, ড্যাম—এসব কথার তখন তখন মানে বুঝতুম না। কিন্তু এটা বুঝতুম অ্যান্ডারসন ওয়্যার দামোদরের খানিকটা জল বেঁধে সদর মহকুমার চাষীদের প্রভূত কল্যাণ করেছে। বোধ হয় আসছিলুম আরামবাগ থেকে। নানাবিধ যানবাহনের আশ্রয় নিয়ে যখন নদীর ধারে গিয়ে পেঁছিলুম তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। খানিকটা নৌকায়, খানিকটা হেঁটে নদী পেরোতে হল। বেশ গাছপালায় ঢাকা একটি ছোট্ট বাড়ি। আশে-পাশে কয়েকটি কুটিরও রয়েছে। একটু দূরেই আর একটি নদী এসে এই নদীতে পড়েছে। বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। শান্ত সৌম্য-দর্শন মানুষটি, গলায় তুলসীকাঠের মালা। শুধুগায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা সংবাদ না দিয়ে গিয়েছিলুম। কি খুশী যে হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা যায় না। আর উনি খুশী হলে ও'র সর্বাঙ্গ দিয়ে সেটা প্রকাশ পেত। আমি তো মহা অপ্রস্তুত। বয়সে বড় পরমশ্রদ্ধেয়, তাঁর অভ্যর্থনার ঘটা দেখে আমি প্রমাদ গুনলুম। আমি অবশ্য তখনও ভবিষ্যতে যে বিপদ আছে তা আঁচ করতে পারিনি। ব্যোমকেশকে একটু সন্দেহে তিরস্কার করলেন—'তুমি ও'কে নিয়ে এলে, একটাও খবর দাওনি। তা বেশ, বেশ। ভাল হয়েছে। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি।' আমি একটু সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে, আপনার জামাই এসেছে—আমার জন্য আবার আলাদা করে কি করবেন!' উনি একটু হেসে বললেন, 'আমি কি আলাদা করে করবার কথা বলেছি! জলযোগ করবেন।' আর কথাগুলো এমন-ভাবে বলছেন যে, কারোর মনে করবার সাধ্য নেই যে, এগুলো সাজানো কথা। ও'র বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত গেলেই এমন আন্তরিক ও ভালবাসা-ভরা সম্বর্ধনা পায় যে, লোকে অভিভূত না হয়ে পারে না। আর এটা ও'র একান্ত স্বাভাবিক। আমি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কথা বলছি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে সস্নেহ প্রাণ এবং স্বাভাবিকভাবে আনন্দোচ্ছল সম্ভাষণ বিদ্যমান, কজন এর খবর রাখে তা জানি না।

হাত-মুখ ধোয়ার পরই চা-পর্ব হল। চা-য়ের সঙ্গে ঘরে তৈরী চিড়ের নাড়ু, তিলের নাড়ু এসব তো ছিলই। আমি তো মনে মনে শিউরে উঠছি যে, এর পর আবার জলখাবার। অনেক কাকুতি-মিনতি করে জানালুম যে, এর পর আর কিছু খেলে আর রাত্রিতে খেতে পারব না। যাই হোক, পরের দিন সকালেই ব্যোমকেশ চলে গেল। তখন আমি বুঝলুম যে কি বিপদে পড়েছি। সকাল থেকে ভাত খাওয়ার মধ্যে বোধ হয় আমায় আটবার খেতে হয়েছিল—একবার ক্ষীরের নাড়ু, একবার তিলের নাড়ু, একবার খানিকটা ছানা। ঘুরছেন-ফিরছেন আর আধ ঘণ্টা বাদে বাদে এসে বলছেন, 'এটা একটু খেয়ে দেখুন তো।' আমার তখন সব্বোনাশ। যাদের চিনি তারা কেউ তখন গ্রামে নেই। ও'র জ্যেষ্ঠ পুত্র জোৎস্নানাথ আমার বিশেষ বন্ধু। আর জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী। তার কাছে অনেক দিন কাটিয়েছি। এখনও কলকাতা থেকে ছুটি নেবার দরকার হলেই তার কাছে গিয়ে কাটিয়ে আসি। অবশ্য এরা বাড়িতে থাকলেও যে আমাকে বিশেষ রক্ষা করতে পারত তা নয়। কবিবর সব বিষয়েই আত্মভোলা। কিন্তু বাড়িতে যদি অতিথি-অভ্যাগত আসে তাদের সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ও সচেতন। আমাদের সেই বৈষ্ণবদের গুণবর্ণনায় আছে যে, তৃণের ন্যায় সুনীচ আর গাছের মত সহিষ্ণু, সদা সর্বদা অমানীকে মান দেয়, আর যাকে দেখলেই মনে হরিনামের উদয় হয়। এইসব গুণ যাদের আছে, তারাই প্রকৃত বৈষ্ণব। এ'কে দেখে মনে হয় যে, প্রকৃত বৈষ্ণব এবং বাঙালী। উচ্চশিক্ষিত, অনেক সুযোগ পেয়েও শহরে চাকরি করতে যাননি। গ্রামে হেডমাস্টারি করে জীবন কাটিয়ে দিলেন। কুনুর নদী এবং অজয় নদীর সঙ্গমস্থলে বাড়ি। অজয়ের বানে প্রায়ই গ্রাম বিধ্বস্ত হয়। ছেলেরা সব কৃতী। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও গ্রাম ছেড়ে আসেননি। একবার বন্যায় বাড়ি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তবু গ্রাম ছাড়েননি। তাঁবুতে বাস করেছেন, যতদিন না নতুন বাড়ি হয়। আর গ্রামের মানুষদেরও প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, আর সব সময়েই তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সাথী হতেন। এ'কে লোক পল্লীকবি বলে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যেও বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। গ্রামের কথা যখন কইতেন তখন কার সাধ্য বোঝে যে, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ... লিখেছেন—

'এই পথেতে আবার আমায়
আসতে যদি হয়
যেখানেতে ছিলাম দিয়ো
সেইখানে আশ্রয়।
সেথায় জেনেছিলাম আমি
তুমিই কর্তা গৃহস্বামী,
তুমি ভিন্ন করতে হয় না
অন্য কারো ভয়।'

আবার স্বগ্রাম সম্বন্ধে লিখেছেন—

'তোমারি যে আমি ভালবাসিয়াছি
কাব্য পড়িয়া নহে
নহে কো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া
অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুঃখভাগী
নয় তা নেহাত অভাবের লাগি,
আমার ভক্তি এ অনুরক্তি
বুকের রক্তে বহে।

আমি নর্মদা মর্মরতটে
বাঁধিতে চাহি না ঘর
উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দ হেরি
ভীত মোর মধুকর।
লেবুর কুঞ্জে—মাধবীর শাখে
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
নয় কাশ্মীর কমলকানন
তার চেয়ে মনোহর।'

এত বড় কবি, এত স্বীকৃতি, কিন্তু একেবারে শিশুর সারল্য। সে সময়ে দু দিন দু রাত ও'র সঙ্গে কাটিয়েছিলুম। সে ক'টি দিনের কথা ভোলবার নয়। বাল্যকালে মাতামহের দৌলতে অনেক কবি ও সাহিত্যিককে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তী যুগে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন ছিলেন সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র অথচ ব্যবহার অতি সাধারণ। আমার মত অর্বাচীনের সঙ্গে কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু কোন দিন কোনও কবি বা সাহিত্যিক সম্বন্ধে অশোভন মন্তব্য করতে শুনিনি। সব সময়েই একটা শিক্ষার্থীর মনোভাব ছিল।

ও'র একটি গান 'মাঝি তরী হেথা বাঁধবো না কো আজকে সাঁঝে' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। উনি লিখেছিলেন কবিতা। এই কবিতাটি সুর দিয়ে তখন অনেকেই গাইতে আরম্ভ করে। এবং গ্রামাফোনেও রেকর্ড হয়। এ সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জন 'সাহিত্যতীর্থে' রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যায় লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমায় বললেন, 'ওহে, তোমার গান যে আমার ওপরও চাপিয়েছে।' আমি তো অবাক! ভাবিলাম, কি বলিতেছেন তিনি! বলিলেন, 'লোকে এখানে এসে বলছে, আমি "ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধবো না কো আজকে সাঁঝে" গানটি বেশ লিখেছি। ত'ারা ভাবছেন কবিতাটি আমার রচনা।' আমি শুনিয়া বলিলাম, 'ভালই তো, নদী যদি সাগরে ...

'আমি সকলকেই বলেছি যে, আমার নয়, ওটা তোমার লেখা।' তখন তিনি পরিতৃপ্তির হাসি হাসিলেন।"

সেবারে দু দিন ও'র বাড়িতে ছিলুম। সকালে উঠে অজয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। এই অজয়ের ধারেই কেন্দুবিল্ব। সেখানে জয়দেব, তারপর রবীন্দ্রনাথ, তারপর চণ্ডিদাস। এই রাঢ় অঞ্চলে যে কত কবি জন্মেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের এটি একটি পীঠস্থান। কুমুদরঞ্জনের মধ্যেও ছিল সমস্ত বৈষ্ণবোচিত গুণ। ও'র বাড়িটি দেখে তপোবনের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে যায়। আমি বাড়ির কাছে এসে দেখি—বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী এসেছেন, আরও অনেকে আসছেন। সেই নদীর ওপার থেকেও আসছেন। আমি ভেবেছিলুম, বুঝি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে এ'দের কোনও কাজ আছে। তারপরই বুঝতে পারলুম, আমার মত অভাজনকে দেখবার জন্য তাঁরা এসেছেন এবং খবর পাঠিয়েছেন কবি নিজে। অবাক হয়ে দেখলুম, যত লোক এসেছেন, তাঁদের সবাইকেই উনি জানেন; সবাইকে উনি চেনেন, শুধু তাঁদের নয়, তাঁদের ছেলেমেয়ে ভাই সকলেরই নাম জানেন। প্রত্যেককেই কুশল প্রশ্ন করছেন। আর আমার সম্বন্ধেও দু-একটা কথা বলছেন। 'সোমনাথ' সম্বন্ধে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। অনেকের কাছে সে কথা বললেন। আমার তো লজ্জায় মাটিতে মেশবার উপক্রম। কুমুদরঞ্জন নিজেই 'সোমনাথ'-এর উপর বহু কবিতা লিখেছিলেন। 'সোমনাথ'-এর উপর লেখা একটা কবিতা আমাকেও পাঠান। গ্রামবাসী যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও দেখলুম কোনও আড়ষ্টতা নেই। কুমুদরঞ্জন একান্ত আপন। কবি কুমুদরঞ্জনকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু মানুষ কুমুদরঞ্জন তাঁদের পরিবারভুক্ত। আমার গ্রামে গ্রামে ঘোরবার বহু বছরের অভিজ্ঞতা আছে। গ্রামের মধ্যে সাধারণত যাঁরা বড় হন, সে অর্থেই হোক বা লেখক হিসেবেই হোক, তাঁদের সঙ্গে গ্রামের লোকেদের একটা স্বাতন্ত্র্য আপনা আপনি জন্মে যায়। এখানে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি ওখানে বাস না করলে, চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। বর্ণনা করা অসম্ভব। কুমুদরঞ্জনের কবিতা ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। তখনকার বহু মাসিক ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত ও'র কবিতা বেরিয়েছে। সব একত্রে প্রকাশিত হয়নি। যা বেরিয়েছে তাতে দেখা যাবে, উনি বহু বিষয়ের উপর কবিতা লিখেছেন। আবাস পল্লীগ্রামে। মায়া পল্লীর উপর, স্বাভাবিকভাবেই পল্লী-কবিতাগুলি বেশী প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত সমস্যা নিয়েই উনি যেসব কবিতা রচনা করে গিয়েছেন, তাও অনবদ্য। আমার মনে হয় সাহিত্যিক-সমাজ ও সাহিত্য-পিপাসুরা ঠিকভাবে কুমুদরঞ্জনকে গ্রহণ করেননি। সেইজন্যই কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ও'র স্থান যে কত উপরে সে বিষয়ে অনেকেরই জ্ঞান কম। তারাশঙ্কর কবির ৭৪তম জন্মজয়ন্তী সম্বর্ধনায় অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখেন— 'একদিন আমরা কুমুদরঞ্জনকে স্বীকার করিনি বুদ্ধকেও আমরা একদিন স্বীকার করিনি। আজ নূতনভাবে তাঁকে পেয়েছি। সারা পৃথিবীও পেয়েছে। আজ আড়াই হাজার বছরের আগেকার মানুষকে আমরা নূতনভাবে স্মরণ করছি। কুমুদরঞ্জনকে তেমনি করে আজ নূতনভাবে স্মরণ করছি।

'কুমুদরঞ্জন অন্যতম শেষ প্রাচীন কবি তাঁর কাছে আজ ক্ষমা চাইব; প্রার্থনা করব এইজন্য যে, আমরা একদিন যে সম্বিৎ হারিয়েছিলাম, তিনি যেন তা ক্ষমা করেন। বাংলা কাব্য-পুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না। তাই আজ দুর্বোধ্য সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। কুমুদরঞ্জন কিন্তু প্রাচীনতায় আস্থাশীল এবং কুমুদরঞ্জনের কবিতা সহজ সুন্দর সুষমায় মণ্ডিত। তাঁর কবিতায় নূতন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেশের গ্রামীণ মানুষ ও প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যেই।'

বহুবার কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রতিবারই তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে অভিভূত হয়েছি। 'কো গ্রামে' তাঁর কাছে যে দু দিন দু রাত ছিলুম, জীবনে তা ভোলবার নয়। স্নিগ্ধ, শান্ত, শান্তিময় পরিবেশ।

ডুমুর

নিখিলচন্দ্র সরকার

অমিতোষরা যখন ট্রেন থেকে নামল, তখন সকাল সাড়ে আটটা। বেলা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। মেঘলা আকাশ। ধূসর, পিঙ্গল কিছু মেঘের টুকরো উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আউলা-ঝাউলা বাতাস। একটা ঠান্ডা ঠান্ডা নরম নরম শ্যামল চেহারা।

আজ রবিবার। ট্রেন একেবারে ফাঁকা এসেছে। তারা যে কামরায় ছিল, সেখানে মাত্তর পনের কুড়ি জনের মতন যাত্রী। হাত পা ছড়িয়ে বেশ আরামেই এসেছে, কোন অসুবিধে হয়নি। পুষ্পাকে নিয়েই ছিল বিপদ। ও ভিড়ভাট্টা একেবারেই সইতে পারে না। কলকাতা থেকে এখানে আসতে পাক্কা পৌনে দু ঘণ্টা সময় লাগল। বাড়ি যেতে আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক। খানিকটা রিকশা, খানিকটা হাঁটা। এখন জায়গাটা অমিতোষের কাছে অনেক দূর, অপরিচিত মনে হয়। আগে তা হতো না। তবু মাঝে মধ্যে এখানে এলে, সে গোপনে গোপনে এক ধরনের কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু পুষ্পাকে কিছু বুঝতে দেয় না।

সাকুল্যে এখানে ছ' সাত জন যাত্রী নেমেছে। উঠলও অল্প ক'জন। কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচিতে অস্থির। ট্রেন চলে গেল। আবার ফাঁকা। ছোট্ট স্টেশন। অমিতোষ ভাল করে জায়গাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সেই একই রকম আছে সব। সেই সিগন্যাল কেবিন। সেই পয়েন্টম্যান রামচরণ তেওয়ারী। সেই গুমটি ঘর। গেট-ম্যান শিউচরণ পাঁড়ে। এখন ওর বয়েস হয়েছে। এখনো কি ও খাটিয়ার ওপর বসে দুলে দুলে সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করে! আজো কি ওর রামায়ণ পড়া শেষ হলো না? উত্তরদিকের প্ল্যাটফর্মের দু পাশে এখনো দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ। এখন আরো অনেক ডালপালা ছড়িয়েছে। গাছ ভরতি লাল ফুল। হাওয়ায় ডালগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। পাতা কাঁপছে। ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে। একেবারে কোণার দিকে দুটো বড় বড় কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল গাছের ডালে ডালে সিরসির একটা শব্দ। শব্দটা পাক খেতে খেতে চলে যাচ্ছে। ওপাশে একটা টিউবওয়েল। কাঠের কটা বেঞ্চ দু পাশে গ্যাসবাতির দুটো পোস্ট। কাচের গায়ে লাল অক্ষরে স্টেশনের নাম লেখা। কটা কাক আর শালিক চোখে পড়ল। মুহূর্তে যেন পুরনো দিনের একটা গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। টেনে টেনে সেই ঘ্রাণ নিল অমিতোষ। ক'পা হাঁটলেই একটা চায়ের স্টল।

এবার ওরা এখানে অনেক দিন পরে এল। না এসে কোন উপায় ছিল না। অমিতোষের বাবার পুরনো হাঁপানী, দেখাশুনো করার মতন কেউ নেই এখানে। বাড়িতে শুধু ওর বাবা আর মা। দুজনেরই বয়েস হয়েছে। বয়েসের নানা উপসর্গ। পুষ্পর একটা ইচ্ছে ছিল না আসার। কিন্তু কি ভেবে আবার রাজি হয়ে গেল।

পুষ্পা শাড়ি ঠিক করতে করতেই হয়রান, 'কি অসভ্য হাওয়া রে বাবা!'

অমিতোষ তাকাল ওর দিকে। হাসল সামান্য, বলল, আঁচলটা ভাল করে গিঁট দিয়ে নাও না।

'হয়েছে, তোমাকে আর এর মধ্যে নাক গলাতে হবে না।' ও ততক্ষণে শাড়ির আঁচলটা পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে পেটের কাছে গুঁজে নিয়েছে।

অমিতোষ সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আগে একটু চা খেয়ে নিই চল। 'তাই চল আমারও বড্ড মাথা ধরেছে।'

অমিতোষ ভুরু কুঁচকে এক পলক তাকাল। সিগারেটে ঘন ঘন টান মেরে বলল 'এই সাত সকালেই তোমার মাথা ধরল?' গলায় কেমন যেন একটু সন্দেহ।

পুষ্পা নাক ফুলোয়। চোখে মুখে এক রাশ বিরক্তি। সামান্য কুপিত, উদ্ধত ভঙ্গি। বড় বড় চোখ করে ও পালটা প্রশ্ন করল, 'তোমার কি ধারণা আমি মিছে কথা বলছি?' ওর বলার মধ্যে এক ধরনের রূক্ষতা, ঝাঁজ ছিল।

অমিতোষ এর কোন জবাব দিল না। এসব ক্ষেত্রে সে চুপ করেই থাকে। কথায় কথায় আরো কত কি এসে পড়বে। শেষে আরো অশান্তি। কেন যে ওর এই বিরক্তি, সে খানিকটা অনুমান করতে পারে। সে লক্ষ্য করেছে এখানে এলেই যেন পুষ্পর মেজাজ ঠিক থাকে না। আজো ওর মেজাজ ঠিক ছিল না। অথচ কলকাতায় ও অন্যরকম। যখন তখন বাপের বাড়ি বোনের বাড়ি মাসীর বাড়ি চলে যাচ্ছে। ওরাও আসছে। আরো কত বন্ধুবান্ধবের আসা যাওয়া। বেড়ানো, খেলানো, সিনেমা থিয়েটার সবই ঠিক আছে। এখানে অমিতোষের বাবা মা থাকে। এখানকার ওপর পুষ্পার যেন কোন টান নেই। অমিতোষও এর মধ্যে অনেক বদলে গেছে। এখানকার সংগে তার সম্পর্কও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আগের মতন আর তেমন কোন উত্তাপ সে অনুভব করে না। সময়, পরিবেশ বুঝি মানুষকে দ্রুত পালটে দেয়। এখন ছ' মাসে ন' মাসে আসে তাও কর্তব্যের খাতিরে। পুষ্পাকে সে আর আসতে বলে না। এ নিয়ে সে কোন অশান্তি, ঝামেলা চায় না। এবার কি ভেবে এল, ওই জানে। সিগারেটের টুকরোটা দু আঙুলের ফাঁকে পুড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো। টুকরোটায় জোরে একটা টান মেরে বলল, 'মাথা ধরার কোন ট্যাবলেট আনোনি সংগে?'

পুষ্পা চুপ করে থাকল।

সকালের চা-টা খেয়েই অমিতোষরা

দুটিই সন্তান। মেয়ে বড়। টিমুর বয়েস এখন পনের-ষোলর। সামনের বার ও ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। অমিতোষ ওকেও আসতে বলেছিল। ও রাজি হয়নি। আদুরে আদুরে গলায় ও বলেছে, 'না বাপী, তোমরা যাও।'

তার ছেলেমেয়েগুলোও যেন কি রকম হয়েছে। সে এতে অখুশিই হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সে ফের একবার বলল, 'তোমার দাদুর খুব অসুখ, তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন।'

টিমু বাপের গলা জড়িয়ে ধরল। আহ্লাদে গলে যেতে যেতে টেনে টেনে বলল, 'বাপী, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।'

অমিতোষ কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যিই সে আজকাল অনেক কিছু বুঝতে পারে না।

পুষ্পা কাছে ছিল, বলল, 'দল বেঁধে যাওয়ার কি হলো? আমরা তো আর নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না! যাব, দেখে চলে আসব। না না, ওর গিয়ে কাজ নেই। এমনিতেই ওর শরীর-টরীর ভাল থাকে না, তার ওপর আবার জল কাদা লাগিয়ে একটা বড় কিছু বাধিয়ে বসুক আর কি!'

অমিতোষ চুপসে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'ঠিক আছে।' পরে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ম্লান একটু হাসল, 'তাহলে সাবধানে থেকো।'

'আচ্ছা।' খুশি হয়ে ও ঘাড় কাত করে বাপের গলা ছেড়ে দিল। এক দৌড়ে ও অন্য ঘরে পালিয়ে গেল।

এসব ভাবতে ভাবতে অমিতোষ চা-এর স্টলের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘাড় দেখল একবার। এখানেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। স্টলের ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি করে দু কাপ চা দিতে বলল। পরে বুবাইয়ের দিকে চেয়ে শুধলো, 'তুই কি খাবি?'

'ওমলেট।' বেশ কায়দা করে বুবাই শব্দটা উচ্চারণ করল।

অমিতোষ চা-ঘরের ওই ছেলেটাকে একটা ওমলেটেরও অর্ডার দিল। কি মনে করে সে হেসে ফেলল। বুবাই এ বয়েসেই বেশ চালাক চতুর। পাকা পাকা কথা বলতে পারে। খুব চটপটে ও মিশনারী স্কুলে পড়ে। এ বয়েসেই অনেক কায়দা-টায়দা শিখে ফেলেছে। চলনে বলনে কোন রকম ওর আড়ষ্টতা নেই। অমিতোষ কিন্তু ছেলেবেলায় কখনও এরকম ছিল না। কেমন বোকা বোকা আড়ষ্ট ভঙ্গি। চেহারায় কথাবার্তায় গ্রাম্য ঢং। ছেলেবেলায় সে মামলেট বলত। বড় হয়েও বলেছে। এখন আর বলে না। তার মুখে একদিন এই মামলেট শব্দটা শুনে পুষ্পা তো হেসে কুটিকুটি। সে রীতিমতন অপ্রস্তুত। এসব নাকি গ্রাম্য উচ্চারণ। পুষ্পা কনভেন্টে পড়া বড়লোকের মেয়ে। চালচলন, আদব-কায়দাই আলাদা। হাসতে হাসতে ওকে বলেছিল, 'তুমি আর ওসব মামলেট-টামলেট বলবে না তো, বলবে ওমলেট।' আবার খিল খিল হাসি। যেন কি এক মজার ব্যাপার।

ছেলেবেলার এসব অভ্যেস পালটাতে তার আরো খানিক সময় লেগেছিল। পুষ্পা এমনি করেই তার আরো কিছু কিছু গলদ—যা ওর কাছে গলদ বলে মনে হতো তা সারিয়ে দিয়েছিল। আসলে পুষ্পা ধীরে ধীরে তাকে তার নিজের মতন করে তৈরি করে নিতে চেয়েছে। তবু কি সে ওর মনের মানুষ হতে পারল?

তাড়াতাড়ি করে ওরা চা খাওয়া শেষ করল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে এক সময় স্টেশনের বাইরে এল। রিকশায় উঠল। এখনো অনেকটা পথ। স্টেশনের গায়ে গায়ে কিছু দোকানপাট, লোকজনের ভিড় কোলাহল। স্টেশনের রাস্তা গুঞ্জন সব পেছনে ফেলে ওরা ডান পাশের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরল। রাস্তার দু পাশে বড় বড় তেঁতুল বট আর নিমগাছ। খানিকটা গিয়েই বাজার। আজ হাটবার। হাটুরেরা এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছে। কারো মাথায় ঝিঙের ঝুড়ি ঢ্যাঁড়স। কেউ ধামায় করে কুমড়ো নিয়ে চলেছে। কেউ লতাপাতা, পুঁই শাক ডাঁটা শাক। আরো সব নানা জাতের শাক সবজি। সবাই ওদের বড় বড় চোখ করে দেখছে। বাজারের একেবারে কোণায় হারু মণ্ডলের মিঠাইয়ের দোকান। রিকশা এগিয়ে চলেছে। হারুর দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অমিতোষ সেদিকে তাকাল একবার। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। গরম গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। অমিতোষের কেমন লোভ হলো। হঠাৎ যেন সে কিরকম ছেলেমানুষ হয়ে গেল। কি যেন একটা ভর করেছে তার মাথায়। সে রিকশা থামাতে বলল। গতি একটু মন্থর হতেই রিকশা থেকে সে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল। বুবাইয়ের দিকে চেয়ে সে শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, গরম গরম জিলিপি খাবি নাকি?'

বুবাই যেন হকচকিয়ে যায়। সে কি যে বলবে, ভেবে পেল না।

পুষ্পা কাণ্ড দেখে অবাক। লোকগুলো ওদের হাঁ করে দেখছে। ওর চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। মানুষটার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে যদি। তাদের বসিয়ে রেখে ছুটল জিলিপি খেতে! গেঁয়ো আর কাকে বলে!

অমিতোষ এগিয়ে গেল। হারুদা জিলিপি ভাজছে। ওর বয়েস হয়েছে। মাথা ভরতি পাকা চুল। হাতটা শুধু পাক করে ঘুরে যাচ্ছে। ওকে দেখে হারু খুশির গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কখন এলে গো?'

'এই তো সকালের ট্রেনে।'

'তোমরা তো এখন এদিকের পথ ভুলেই গেলে।' ওর গলায় আন্তরিক এক দুঃখ।

অমিতোষ এসব কথায় আমল দিল না। হাসি হাসি মুখ করে সে বলল, আগে গরম গরম জিলিপি খাওয়াও তো হারুদা।'

হারু একটা ছেলেকে ডেকে কড়াই থেকে জিলিপি দিতে বলল।

অমিতোষের যেন তর সয় না। জিলিপির ঠোঙাটা হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে শুরু করে দিল। খেতে খেতেই বলল, 'আগের সেই স্বাদ আর নেই

'থাকবে আর কোত্থেকে, আগের দিনই কি আর আছে? নেই। সবেতেই তো এখন ভেজাল।'

'তা মিথ্যে বলনি হারুদা।'

অমিতোষের চোখের সামনে ছেলেবেলার দিনগুলো যেন উঁকিঝুঁকি মারে। এখানে এসে কত জিলিপি, বালুসাই, জিবেগজা খেয়েছে। হাটবারের দিনে তো কথাই নেই। হাতে কিছু পয়সা হলেই ওরা বন্ধুরা মিলে এখানে চলে আসত। সে-সব দিন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

একটু পরে আবার রিকশায় এসে উঠল অমিতোষ, হাতে জিলিপির ঠোঙা। ঠোঙাটা বুবাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল 'নে খা।'

পুষ্পা ফোঁস করে উঠল, 'না, ও খাবে না। তুমিই খাও।'

অমিতোষ এখন আর রাগ করল না। হি হি করে হাসল। চারপাশের এই গাছ-গাছালি মাটি আকাশ দেখে ওর খুব ভাল লাগছিল। কলকাতায় এসব চোখে পড়ে না। চোখে পড়ার মতন ফুরসতও নেই তার। সারাক্ষণ কি এক প্রতিযোগিতা আর কোলাহল নিয়ে মেতে থাকা। একটু খোলামেলা, নিজের সংগে নিজের মুখো-মুখি হওয়ার কোন সুযোগ নেই যেন। একটার পর একটা প্রয়োজন চারপাশ থেকে কেবলই ঘিরে থাকে। এর শেষ নেই। এখানে তার পেশা সামাজিক মর্যাদা প্রতি-পত্তির সংগে তাল রেখে তাকে চলতে হয়। তার পদমর্যাদার কথাটা সব সময় মগজের মধ্যে পাক খাচ্ছে। ভুলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তা ছাড়া, সে যদি কখনো সখনো ভুলেও যায়, পুষ্পা ভোলে না। সময় মতন ঠিক মনে করিয়ে দেয়। সে একজন এঞ্জিনীয়ার। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সে দেখেছে তার নামের পাশের এই তকমাটা তার গৌরব বাড়িয়েছে। সমাজে এক ধরনের মর্যাদাও এনে দিয়েছে। এটাই এখন তার মুখ্য পরিচয়। আড়ালের সোজা সরল অকপট মানুষটা কখন যেন একদিন গৌণ হয়ে গেছে। পুষ্পার কাছেও তার বাইরের পরিচয়টা আজ বড়। বরং, এই পরিচয়টা তার ছিল বলেই পুষ্পার মতন মেয়ে আজ তার ঘরনী। পুষ্পা কথায় কথায় তাকে এ কথাটা অনেকবারই মনে করিয়ে দিয়েছে। সে ছিল গাঁয়ের ছেলে। যতই লেখাপড়া শিখুক, ভাল চাকরি করুক, পুষ্পার সংগে তার আলাপ না হলে, সে ওই রকমই থেকে যেত। এতে তার লাভ হয়েছে কি, লোকসান; এখন তা খতিয়ে দেখার আর ইচ্ছে হয় না। কেমন নিস্পৃহ, উদাসীন। একটার পর একটা অভিজ্ঞতা। সে নিজেও বুঝতে পারে, তার ভেতরে এখন অন্য এক অমিতোষ।

আসলে, পুষ্পা শুধু তার বাইরের পরিচয় নিয়েই তুষ্ট থাকেনি। এক এক করে ও পরিচয়ের এই চৌহদ্দিটা আরো বাড়িয়ে নিয়েছে। যেমন, প্রথমেই কলকাতার খুব কাছে বনেদী, অভিজাত পাড়ায় একটা বাড়ি করেছে ওরা। একটা বাড়ি না থাকলে সমাজে ঠিক মাথা উঁচু করে বাঁচা যায় না। আবার যেমন তেমন বাড়ি হলেও চলবে না। মোজাইক, গ্রিল, একটু ব্যালকনি থাকবে, পুব-দক্ষিণ খোলা। সামনে ফুলের বাগিচা, সবুজ ঘাসের গালিচা মোড়া ছোট্ট একটা লন, এই সব আর কি! একেবারে আধুনিক কায়দায় বাড়ি। দেখলে যেন প্রথমেই লোকের চোখ আটকে যায়। যেন বিস্ময়ে বলতে পারে, হ্যাঁ, এঞ্জিনীয়ারেরই বাড়ি বটে। তার ওপর জানলায় বাহারে পর্দা। মোট কথা, পয়সার দেমাক এবং রুচি, দুই-ই যেন ফুটে বেরোয়। এখানেই এর শেষ নয়। বাড়িতে একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর না হলে কি চলে? তা নাহলে আর বাড়ির সৌন্দর্য কি! অমিতোষ একদিন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা কুকুর বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। ওটারও এখন বয়েস হয়ে গেছে। তারপর ছেলেমেয়ের এডুকেশন। তার মধ্যেও যেন একটা গর্ব থাকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন একগাল হেসে বলতে পারে : হ্যাঁ, ছেলেটাকে মিশনারী স্কুলে দিয়েছি। মেয়েটাও কনভেন্টে পড়ে। যাই বলুন, বাংলা স্কুলে আজকাল আর তেমন পড়া-শুনো হয় না। ওসব জায়গায় এখন ন্যাস্টি পালিটিক্স।

অমিতোষের স্ট্যাটাস এখন একেবারে আলাদা। এরকম জীবন-যাপনের জন্যে যে যে উপকরণ থাকা দরকার, তার সবই আছে। যেমন, টেলিফোনটা খুবই প্রয়োজন। রেডিও পুরনো হয়ে গেছে। স্টিরিও রেকর্ড-প্লেয়ার, সেও বাসীর পর্যায়ে। ফ্রিজ টেলিভিশন? হ্যাঁ, তাও এসে গেছে। ফ্রিজে দুটো তিনটে ব্র্যান্ডের মদের বোতল সাজানো থাকে। মাঝে মাঝে শরীর-টরীরটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করলে, বা কাজের চাপে মাথাটা গরম থাকলে, ঘরের নীলচে ঝিমঝিম আলোয় ও আর পুষ্পা একসংগে মদ খায়। ছেলেমেয়ের সামনেই। ওরা কিছু মনে করে না এতে। পুষ্পারও কোন সংকোচ নেই। বরং এক ধরনের ফুর্তিতে মত্ত হয়ে ওঠে। পোশাক-আশাকেও হাল ফ্যাশনের চমক। একে একে অমিতোষ এ সবই সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এত করেও তার কোথায় যেন একটা অভাব, অতৃপ্তি থেকে গেল। কোন কোন নিভৃত, নিঃসংগ মুহূর্তে তার মনে হয়েছে, এগুলোই কি তার আসল পরিচয়পত্র? সে গাঁয়ের কথা ভুলে গেছে। ওখানে তার মা বাবা থাকে। গাঁয়ে তার টিনের বাড়ি। ওদের কথা মনে পড়ে। ওরা কি নিয়ে বেঁচে আছে? কি নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল? এসব ভাবতে গেলেই তার বুকের ভেতর মেঘ জমে। গুরগুর করে ওঠে।

বিয়ের পর পুষ্পা এখানে বার পাঁচেক এসেছে। টিমু একবার কি দুবার, বুবাই এ নিয়ে তিনবার। হঠাৎ অমিতোষের মনটা কি এক খুশিতে ভরে উঠছে। মনের ওপর থেকে যেন এই মুহূর্তে কি একটা ভার সরে গেল। আজ অনেকদিন পর আবার কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। মুখের ওপর এখন আর তার সেই গাম্ভীর্য নেই। পুষ্পার রাগ এখন তার গায়ে লাগছে না। হাসতে হাসতে সে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া গিলতে গিলতে বলল, 'তুমি জানো না পুষ্পা, হারুদা খুব ভাল মিষ্টি তৈরী করে।'

'আমার জেনে কাজ নেই, ও তুমিই জানতে থাক।'

'তুমি তো আর হারুদার মিষ্টি খাওনি তাই, একবার খেলে আর ভুলতেই পারতে না।' অমিতোষ [illegible]

চায় না যেন। রাস্তার লোকজন তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। বুবাইও ব… মুখের দিকে চেয়ে খিল খিল করে হাসল।

পুষ্পা বিরক্ত হলো। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। ও ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে … বড় চোখ করে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এত হাসির আবার কি হলো তোমার…

অমিতোষ কি একটা বলতে গেল। হাসির চোটে বলতে পারল না। একটু প… সামলে নিয়ে খুশি খুশি গলায় বলল, 'জান, ছেলেবেলায় একবার বন্ধুদের সং… বাজি ধরে এই হারুদার দোকানে দু' সের জিলিপি খেয়ে ফেলেছিলাম। ভাব… এখনো আমার হাসি পায়।'

বুবাই অবাক, 'দু সের জিলিপি, বল কি বাপী?'

'হ্যাঁ রে, এরকম আরো কত মজার মজার সব কান্ড!' অমিতোষ যেন ছেলে… মানুষ হয়ে গেছে।

পুষ্পা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ও তোমাকে দেখেই বোঝা যায়, জিলি… খাওয়ারই চেহারা তোমার।'

'দেখলি তো বুবাই, তোর মা আমাকে ঠাট্টা করছে। করুক!' সে আরো জোরে জোরে হেসে ওঠে।

বাজার পেছনে ফেলে রিকশা চলছে। অমিতোষ সিগারেট টানতে টানতে সতৃষ্ণ চোখে চারপাশে তাকাচ্ছিল। এখানকার ঘাস মাটির গন্ধই যেন আলাদা। দু পাশে ক্ষেত। চাষীরা মাঠে নেমে পড়েছে। ফসল বোনার কাজ চলছে। আকাশ মেঘে ভারে নুয়ে পড়েছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে। যে-কোন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে।

অমিতোষকে যেন আজ কথায় ভর করেছে। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে হালকা উচ্ছল ভঙ্গি। সে দু পাশে তাকাতে তাকাতে এক সময় বুবাইকে বলল 'ওই দেখ বুবাই।'

বুবাই তাকাল। কতগুলো লোক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাতা সরিয়ে সরিয়ে কি যেন তুলছে। ওদের সঙ্গে বড় বড় মাটির হাঁড়ি। তুলে তুলে হাঁড়িতে রাখছে।

অমিতোষ হালকা গলায় প্রশ্ন করল, 'ওরা কি তুলছে বল তো?'

বুবাই নিরুত্তর।

অমিতোষ হেসে ফেলল, 'তুই আর কি করে বলবি, কখনো দেখিস নি তো। ওরা পানিফল তুলছে রে, পানিফল।'

বুবাই অবাক হয়ে ওদের দেখল খানিকক্ষণ।

রিকশা বাই বাই করে ছুটছে। একটার পর একটা দৃশ্য পেছনে পড়ছে। কে… সাপলা তুলছে। একটা মেয়ে কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে কলমিশাখ তুলছে। ঘাস-ফড়িং তিড়িং তিড়িং করে উড়ছে। প্রজাপতি উড়ে উড়ে লতাপাতায় বসছে। কোথা… কোথাও চোরকাঁটা, ভেরেন্ডা গাছে ছেয়ে আছে। কোথাও শেওড়া, বনতুলসী… মাথায় ফড়িং, পোকামাকড়। ঘন ঝোপ। ঝোপের মধ্যে ডাহুক ডাকছে। অমিতো… অন্যমনস্ক হয়।

বুবাই অবাক। এরকমটা এর আগে আর কখনো ও দেখেনি। কত রকমে… সব ছবি। কতগুলো লোক জলে ডুবে ডুবে যেন কি করছে। হঠাৎ ও বাবার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোকগুলো কি করছে বাপী?'

'ওরা? ওরা মাছ ধরছে, সিঙি মাগুর ট্যাংরা কই-টই হবে!'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। পুষ্পা একটাও কথা বলছে না। সে মুখ গোমড়া করে অন্য দিকে চেয়ে আছে। ছোট একটা ছেলে তখন জলের কিনারে কিনারে কি যেন খুঁজছে। নিচু হয়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছেলেটা কি তুলছে মনে হলো। বুবাই আবার প্রশ্ন করল, 'ওই ছেলেটাও কি মাছ ধরছে বাপী?'

অমিতোষ হেসে উঠল, বলল, 'না রে, ও গেঁড়ি তুলছে।'

বুবাই শব্দটা আগে কখনো শুনেছে বলে মনে হলো না। … বাপের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকল।

অমিতোষ ছেলের দিকে চেয়ে আবার হাসল বলল, হ্যাঁ রে, গেঁড়ি মানে ছোট ছোট শামুক। এগুলো ওরা খায়, হাটে বিক্রী করে। পেটের পক্ষে নাকি খুব ভাল।

পুষ্পা চোখ মুখ কুঁচকে কেমন ঘেন্না ঘেন্না গলায় বলল, 'মা গো, এ আবার লোকে খায় নাকি?'

অমিতোষ ওর চোখে চোখে তাকাল একবার। যেন বলতে ইচ্ছে হলো : তুমি আর মানুষের কতটুকু খবর রাখ পুষ্পা। জানই বা কি! মানুষের দুঃখ তো তুমি বুঝবে না! সে মন তোমার নেই। আর হবেও না কোনদিন। আমিও এখন কিছু বুঝি না। বুঝতে চাই না। বড় স্বার্থপর হয়ে গেছি। আমার আরামের জন্যেই আমি এখন সারাক্ষণ ব্যস্ত। গাঁয়ের বেশীর ভাগ মানুষই এভাবে বেঁচে থাকে পুষ্পা, এভাবেই বেঁচে থাকে।

বুবাই এক সময় হাততালি দিয়ে উঠল, 'ওই দেখ বাপী, কত বক।

অমিতোষ ওদিকে চেয়ে কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, 'বক দেখেই এত খুশি?'

এমন সময় জলের ওপর ঝুপঝাপ করে কতগুলো পাখি ঝাঁপিয়ে পড়ল হাঁসের মতন দেখতে অনেকটা। গায়ের রঙ ঘন কালো। গলাটা লম্বা ধরনের পাখনাগুলো বড় বড়। বুবাই কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, 'ওই দেখ বুবাই, কত পানকৌড়ি! নে নে, চিনে রাখ। গাঁয়ের কিছুই তো আর দেখলি না চিনলি না! আমি এই গাঁয়েই বড় হয়েছি রে!'

পুষ্পা টিপ্পনি কাটল, 'ওসব ওরা না চিনলেও কিছু হবে না।'

অমিতোষ কিছু বলল না। অন্য দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেও তো একদিন একটু একটু করে এখানকার সবই চিনেছিল। কিন্তু কি হলো? আজ সে তার এই পরিচিত, অন্তরঙ্গ ক্রীড়াভূমি থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে

কানাচে তার ছেলেবেলার দিনগুলো যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বড় মায়া, বড় কষ্ট। বুবাইটা এসব কিছুই দেখল না, জানল না। ও কি নিয়ে সংসারে বড় হবে? মনের সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে কি কেউ পুরো মানুষ হয়? পুষ্পার মতের সংগে তার মেলে না। মনের ঐশ্বর্য কি এত সহজে সংগ্রহ করা যায়? পুষ্পা তাকে বুঝল না! ছেলেমেয়েরাও কেউ তাকে বুঝতে চায় না! আজো কেন এখানকার এই মাটি, এই ঘাস তাকে পিছু ডাকে? হাতছানি দেয়?

অমিতোষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো। একটা আমলকী গাছের ডালে বসে দোয়েল শিস দিচ্ছে। উঁচু ঢিবির মতন একটা জায়গা। ভাঙা একটা মসজিদ। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। পাশেই একটা দীঘি। পদ্মপাতায় ছেয়ে আছে। কাঁঠাল আম গাছে জায়গাটা ঘেরা। ওদিকে চেয়ে চেয়ে সে বলল 'বুঝলি বুবাই, এটা একটা পীরের দরগা।'

বুবাই কিছুই বুঝল না। সে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল।

অমিতোষ তখনো বলে চলে, 'এখানে একজন মুসলমান ফকির থাকতেন। এখন আর বেঁচে নেই। বড় ভাল দয়ালু মানুষ ছিলেন রে! কত লোক আসত ফকির সাহেবের কাছে। দূরে দূরে গাঁ থেকে ওঁর কাছে কঠিন রোগ-টোগ সারাতে আসত। ভালও হয়ে যেত অনেকে। ওঁর ঝাড়ফুঁক, মন্তরের গুণই ছিল অন্য রকম। শীতের সময় এখানে মস্ত মেলা বসে।'

রিকশা এবার বাঁয়ে ঘুরল। খানিকটা গিয়েই মরাখলা। গাঁয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। আর খানিকটা গিয়ে একটা বাঁক ঘুরলেই রিকশার-রাস্তা শেষ। মরাখলার কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা কেন তার এমন করে গুরগুর করে ওঠে! রাস্তার পাশ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। আশপাশের গাঁয়ের কেউ মরলেই এখানে এনে পোড়ানো হয়। ভাঙা কলসীর কানা, কিছু তুলসী গাছ। পাশেই বড় একটা বিল। আসশেওড়া, তেঁতুল গাছ। কেমন নিঃঝুম, গা ছমছম করা ভাব। গাঁয়ের অনেকেই হয়তো এখন আর বেঁচে নেই। হঠাৎ তার বাবার কথা মনে পড়ল। বাবার অসুখ হয়েছে। তার বাবা মা, তারাও তো একদিন চলে যাবে! বুকের ভেতরটা কেন যেন টন টন করে ওঠে। কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে না। হঠাৎ তার চোখের সামনে বুড়ীর মুখটা ভাসতে থাকে। কানাইয়ের বোন। কানাই তার বন্ধু। দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। বড় বড় টানা টানা চোখ, ঘন ভুরু, গায়ের রঙ কালো। যখন তখন ও তাদের বাড়ি আসত। মার সংগে কত গল্পটল্প করত। মাও খুব ভালবাসত ওকে। কত হাসি ঠাট্টা। আড়ালে ও মুখ ভেংচাত। মার খুব ইচ্ছে ছিল ওকে বউ করে ঘরে আনে। অমিতোষ তখন ভালভাবে পাস করে কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। সুযোগ বুঝে বুড়ী একবার তাকে বলেছিল, 'আজকাল তুমি আমাদের ভুলে যাচ্ছ অমিতদা।' 'না না, ভুলব কেন?' বুড়ী ঠোঁট বেঁকিয়ে ফের বলেছিল, 'আমার মন বলছে।' আবার অন্য একদিন তার হাত ধরেও বলেছিল, 'তুমি আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?' সে হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছে, 'হুঁ, আগে পাসটাস করি, চাকরি করি, তারপর।' তার আর সুযোগ এল না। কবে সে পাস করবে, চাকরি করবে, তারপর বিয়ে। বুড়ীর বাপ এতদিন সবুর সইতে পারল না। পাশের গাঁয়ের হারাণ ঘোষের ছেলের সংগে বুড়ীর বিয়ে দিয়ে দিল। ওদের জমিজিরেত অনেক। খাওয়া পরার অভাব হবে না। অমিতোষ তখন কলকাতায়। বুড়ী নাকি তার মায়ের গলা জড়িয়ে খুব কেঁদেছিল। সেও তো মনে মনে ওকে খুব পছন্দ করত। খবরটা শুনে সে খুব কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু বুড়ী কি এতে সুখী হয়েছে? খবরটা জানার ভীষণ ইচ্ছে হতো তার। একদিন সুযোগও এল। অমিতোষ তখন ছুটিতে বাড়ি আছে বুড়ীও বাপের বাড়ি এসেছে। মার কাছে সে শুনেছিল, বুড়ীর বরটা নাকি মদটদ খায়, ওকে মারধর করে। শুনে কেন যেন তার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একদিন বিকেলে বুড়ী তাদের বাড়ি এসেছিল। ওকে সেদিন যেন বেজায় হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। খুব সাজগোজ করেছে। অমিতোষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'কি ব্যাপার বুড়ী?' বুড়ী উজ্জ্বল ভংগিতে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তোমাকে দেখতে এলাম, তুমি নাকি কালই চলে যাচ্ছ?' অমিতোষ চুপ করে থাকে। ওর দিকে চেয়ে থেকে এক সময় অস্ফুটে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি সুখী হয়েছ তো বুড়ী?' ও তার চোখের দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর খল খল করে ওর কি হাসি! কেন যেন ও আর দাঁড়াল না। দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেদিনই ভর সন্ধ্যেটার সময় ও গলায় দড়ি দিল। অমিতোষ সেদিন শ্মশানে এসেছিল ওর সংগে। কলকাতায় ফিরতে তার আরো ক'দিন দেরি হয়েছিল।

বুকের ভেতরটা তার আজো কেন এমন করে টনটন করে? কেন এসব কথা আজো তার মনে পড়ে? সে তো ভুলেই গিয়েছিল। ভুলতেই চায়। বুড়ী বড় অসময়ে চলে গেল! ওর অভিমানটা কার ওপর? বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে সব। আর কি কখনো সে এ জীবনে তা ফিরে পাবে? জীবন কি এতই ছোট? দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বুকের ভেতরে হাহাকার। ভাবতে ভাবতে কোন্ গভীরে যেন সে তলিয়ে গেল। কখন এসে রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে, তা টেরও পেল না সে। মুখের ওপর চাপা এক কষ্ট।

পুষ্পা তেরছা চোখে ওকে দেখল। পরে উপহাসের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এমন করে কার এত ধ্যান করছ?'

অমিতোষের এতক্ষণে খেয়াল হলো। এর পর রিকশা আর যাবে না। এখান থেকে কাঁচা, সরু রাস্তার শুরু। ভাড়া মিটিয়ে রিকশাঅলাকে সে বলল, 'আমরা আবার পাঁচটার ট্রেন ধরব কিন্তু। পৌনে চারটে নাগাদ এখানে চলে এসো।'

আকাশ কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস। কোথাও নিশ্চয়ই বৃষ্টি

ওপর দিয়ে সর সর করে কি যেন একটা চলে গেল। 'পুষ্পা, সাপ!' অমিতোষ ওর হাত ধরে জোরে টান মারল।

'মা গো!' পুষ্পার বুকটা ধক করে উঠল, ভয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি। পরে রাগে ফেটে পড়তে পড়তে বলল, 'এসব জায়গায় আবার কেউ আসে নাকি? এখন দেখছি না এলেই ভাল হতো।'

অমিতোষ চুপ করে থাকল।

এমনি করেই ওরা কখনো পুকুর পাড়, কখনো লেবুতলা, কখনো বা কারো বাড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে এক সময় নিজের বাড়ি এল। বাড়ির সামনেই দুটো বকুল গাছ।

দূর থেকেই উমাতারা ওদের দেখতে পেয়েছেন। তিনি ছুটে এলেন দরজার কাছে। ওরা এসে প্রণাম করল। অমিতোষ মায় মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন গভীর এক কষ্ট অনুভব করল। এ কি চেহারা হয়েছে তার মায়! চেনাই যায় না। শরীর খুব ভেঙে পড়েছে। মুখের ওপর কত দুঃখ যেন জমে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শুধোয়, 'বাবা এখন কেমন আছে মা?'

'এখন একটু ভাল।' পরে তিনি পুষ্পার দিকে চেয়ে বললেন, 'ঘরে এসো বউমা। আমার দাদুভাইটা এত চুপচাপ কেন?'

ওরা উঠোন পেরিয়ে তুলসীমঞ্চ, বাতাবী লেবুর গাছটা ডান দিকে রেখে ঘরে এল।

মেঝেটা মাটির। দরমার বেড়া। ওপরে টিন। বাড়ির ভেতরে অনেক আগাছা জংগল হয়েছে। বাড়ির এ দশা দেখে অমিতোষের কষ্ট হলো। জুতো খুলে সে সোজা বাবার কাছে চলে এল। প্রণাম করল।

হরনাথবাবু পুরনো কাগজ পড়ছিলেন। তিনি খুশি হলেন। কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। পরে নাতির দিকে চেয়ে একগাল হেসে বললেন, 'এদিকে আয় দাদুভাই। ইস, কি রোগা, লিকলিকে চেহারা রে। এ বয়েসে তো এরকম স্বাস্থ্য থাকা উচিত নয়।'

বাবাই গটগট করে এগিয়ে গেল। হরনাথবাবু নাতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। শেষে বললেন, 'শরীর আর ভাল হবে কি করে, ওর পেটে তো ভরতি কৃমি।'

পুষ্পা বলল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। সবসময়ই ওদের পেছনে ডাক্তার আছে।'

'ওই তো তোমাদের দোষ বউমা। কিছু হলেই ডাক্তার, ওষুধ। ওসব ওষুধ খাইয়ে কোন লাভ নেই। সাময়িক রোগটা চাপা থাকে মাত্র। একেবারে কখনো সারে না। ক'দিন পর আবার উপদ্রব বাড়ে।'

উমাতারা কাছেই ছিলেন, বললেন, 'তুমিও তো বউমা মাঝে মধ্যে ওদের একটু চুনের জল, শিউলী পাতা বা মটকলা পাতা থেতো করে খানিকটা রস করে খাইয়ে দিতে পার! এতে পেট ভাল থাকে, বাড়তি কৃমিটৃমি মরে যায়। অমিকে কি এসব কম খাইয়েছি। কাঁচা আনারস পাতার রসও খাওয়াতে পার।'

পুষ্পা চুপ করে থাকে। অমিতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাকে একবার দেখল।

উমাতারা সরল মনে আবার বলতে লাগলেন, অমিটা ছেলেবেলায় কি কম ভুগিয়েছে আমায়। প্রায়ই তো ওর জ্বর, সর্দিটর্দি লেগে থাকত। এখানে আর যখন তখন ওষুধ পাব কোথায়! সর্দি হলে মধু দিয়ে তুলসী পাতা বা বাসক পাতার রস খাওয়াতাম। পেটের জন্যে থানকুনি পাতা, কালমেঘের পাতা, ডুমুর খুব উপকারী। এসব কি ও কম খেয়েছে!'

'কলকাতায় আর ওসব পাব কোথায়?' পুষ্পা ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল।

অমিতোষ কি ভেবে হাসল একটু। এটা পুষ্পার চালাকির কথা। ও কি এসব গাছ গাছড়ার কখনো নাম শুনেছে? এগুলো তো ও চেনেই না। কিছু মানে না। কে বলেছে, কলকাতায় ওসব পাওয়া যায় না! পুষ্পার ধারণা, এসব লতাপাতা ব্যবহারের মধ্যে কোন কৌলীন্য নেই। দামী দামী ওষুধ না কিনলে আর মান থাকে কোথায়! ওসব গাছগাছড়া গরীবের জন্যে। পয়সা দিয়ে যারা ওষুধ কিনতে পারবে না, ওসব বিধান তাদের জন্যে।

উমাতারা অমিতোষের দিকে চেয়ে থাকলেন এক পলক। পরে সস্নেহ গলায় বললেন, 'তোরও তো শরীরটা খুব ভেঙে গেছে রে?'

অমিতোষ হাসল সামান্য। মার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'কিছু খেয়ে এখন আর হজম করতে পারি না মা! খালি চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।'

'তোর চেহারার দিকে আর চাওয়া যায় না।'

হরনাথবাবু একবার তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বললেন, 'তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর গে।' তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন!

'যাই।' উমাতারা পুষ্পাকে নিয়ে চলে গেলেন। বুবাইও ওদের পেছন পেছন গেল।

হরনাথবাবু ছেলের চোখে চোখে তাকালেন এবার, শুধোলেন, 'টিমুকে আনলি না?'

'ওর শরীরটা ভাল নেই।' সেও বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

হরনাথবাবুকে খুব কাহিল, দুর্বল দেখাচ্ছিল। চোখ মুখ ফেকাসে। শ্বাস-প্রশ্বাসে এখনো কষ্ট। তবু, বাইরে থেকে তিনি তা বুঝতে দিতে চান না। কেন, অভিমান?

অমিতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটু পরে কি ভেবে সে শুধলো, 'আপনার শরীর এখন কেমন?'

'এখন অনেক ভাল আছি আমি। অনাদি কবিরাজ ওষুধ দিচ্ছে। তা ছাড়া

কষ্ট। কি ভেবে আবার বলতে শুরু করলেন, 'বুকে শ্লেষ্মা জমে গিয়েছিল। গাছ-গাছড়ার গুণই আলাদা। অর্জুন গাছের ছাল সেদ্ধ করে জলটা খেতে বলেছিল অনাদি। পিপুল গুঁড়ো করে মধুর সঙ্গে দিয়ে খেতে দিল। আরো কি সব শেকড়-বাকড় রস করে খেতে দিয়েছিল। এখন বেশ ভাল আছি।' এতগুলো কথা বলতে যেন তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তবু তিনি তা গায়ে মাখলেন না।

অমিতোষ কি যেন ভাবল। আমতা আমতা করল বার কয়েক। শেষে বলেই ফেলল, 'একবার কলকাতায় চলুন। বড় কোন ডাক্তার দেখিয়ে নিলে ভাল।'

হরনাথবাবু গম্ভীর হলেন। বালিশের তলা থেকে একটা ছোট মতন কৌটো বের করলেন। কৌটোর ভেতরে বিড়ি। একটা বিড়ি ধরালেন তিনি। ধোঁয়া ছেড়ে ম্লান একটু হেসে বললেন, 'না, এখানেই খুব ভাল আছি রে, বেশ আছি! বাঁচবই বা আর কটা দিন। সব তো হয়ে এল!'

অমিতোষ জানত তার বাবা এরকমই কিছু একটা বলবেন। 'একবার মাত্র সে তার বাবাকে জোর করে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি দেখে খুব খুশি। কিন্তু ক'দিন থেকেই তিনি চলে এসেছিলেন। ওখানে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। পুষ্পা, তার বাবার এই ঘন ঘন বিড়ি খাওয়া, লুঙ্গি পরে গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে ঘোরাফেরা করা কেন যেন পছন্দ করত না। আকারে প্রকারে ওর অসন্তোষ, বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেলেছিল। তার অসাক্ষাতে পুষ্পা কি বাবাকে রূঢ়, অবাঞ্ছিত কিছু বলেছিল? পুষ্পার আরো বেশী রাগ হয়েছিল, তিনি নাকি ওর বাবার সামনে একটার পর একটা বিড়ি খেয়েছিলেন। এতে লজ্জায় ওর মাথা কাটা গিয়েছিল। এটা ওর ভাল লাগেনি, কেন, সিগারেট খেলে কি হতো? অমিতোষ কি করে বোঝাবে যে এটা ওর বাবাকে অসম্মান করা নয়,-যার যে নেশা। এটা তো একটা দিক। অন্য কারণেও বাবা তার ওপর বিরক্ত ক্ষুব্ধ। এ বিয়েতে বাবার একেবারেই মত ছিল না। বাবার অমতেই সে পুষ্পাকে বিয়ে করেছে। পুষ্পার দাদা অবনী তার সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ত। অবনীর সঙ্গেই সে প্রথম ওদের বাড়ি যায়। পুষ্পার সঙ্গে আলাপ। দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা। পুষ্পার তখন দুরন্ত যৌবন। আকর্ষণ দুর্নিবার, উদ্ধত বেপরোয়া ভঙ্গি। একে উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না অমিতোষের। সে যেন আজ অপরাধী। মুখের ওপর তার বিষণ্ণ ছায়া পড়েছে। শেষে বিনম্র গলায় ধীরে ধীরে সে বলল, 'তবু একটু সাবধানে থাকবেন। বেশী ঠাণ্ডাটাণ্ডা লাগাবেন না।'

হরনাথবাবু অন্যমনস্ক হলেন। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর সময় এগিয়ে আসছে। যাওয়ার আগে সবাইকে তিনি ক্ষমা করে যেতে চান। তাঁরও মুখের ওপর যেন কি এক বেদনা তির তির করে। ছেলের ওপর আর কোন রাগ নেই তাঁর। তিনি তাকে অনেক আগেই ক্ষমা করেছেন। তিনি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু সময়। পরে মায়া জড়ানো গলায় বললেন, 'যা অমি এবার, জামা প্যাণ্ট ছাড়।'

এমন সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। টিনের চালে তার শব্দ। কতকাল ও শব্দ সে শোনে নি। একদিন এ শব্দটা তার কাছে নেশার মতন ছিল। আহা, কতকাল পরে আবার তা ফিরে পেয়েছে। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে। ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। জামা প্যাণ্ট ছাড়ল। অন্য একটা কাপড় পরল। গায়ে গামছা জড়িয়ে নিল। তেল মাখল বুকে। খুঁজে পেতে খেপলা একটা জাল বের করল। ডোলা নিল। তারপর এই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল।

উমাতারা সাবধান করলেন, 'জলে ভিজিস না অমি, সর্দিটর্দি লাগবে।'

অমিতোষ শুনলে তো! আজ আর সে কারো কোন কথা শুনবে না! জলে ভিজতে তার কি মজাটাই না লাগছে। কতকাল পরে আবার সে এ রকম বেপরোয়া হতে পারল! একা একাই সে খালে বিলে জাল ফেলল। মাছ ধরল। জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে এক সময় ঘরে ফিরে এল। ছেলেমানুষের মতন খুশিতে সে চিৎকার করে উঠল, 'দেখ, দেখ বুবাই কত মাছ।' বলেই ডোলাটা উপুড় করে দিল।

অমিতোষের গা বেয়ে জল ঝরছে। উমাতারা তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে একটা গামছা নিয়ে এলেন। ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শঙ্কিত গলায় বললেন, 'আগে গা মাথা মুছে নে অমি।' 'আমি বরং চানটা সেরেই ফেলি।' বলেই সে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল।

উমাতারা মাছ কুটতে বসলেন। অন্য রান্নাটান্না হয়ে গেছে। মাছগুলো শুধু রাঁধবেন। পুষ্পা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে তিনি বললেন, 'আজকাল আর চোখে ভাল দেখি না। বয়েস তো হয়েছে। শরীরও আর চলে না।'

পুষ্পা কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। সে চুপ করে থাকে। অস্বস্তি বোধ করে।

উমাতারা কি মনে করে শুধোলেন, 'তুমি চান করবে না বউমা?'

'না আমি চান করে এসেছি।'

খেতে খেতে বেলা হয়ে গেল। সময় যে কি করে চলে যায়! অনেকদিন পর অমিতোষ আজ বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছে। মায় হাতের রান্নার স্বাদই যেন আলাদা। সে যা যা একদিন পছন্দ করত, তাই রেঁধেছে মা। ডুমুরের সুক্তো, আলু পোস্ত, মাছের টক। বড় তৃপ্তি, বড় স্বাদ! আহা, মা বড় স্নেহময়ী, মমতাময়ী।

উমাতারার খেতে খেতে আরো বেলা হলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি এ-ঘরে এলেন। হাতে পানের বাটা। [illegible]

একটা দিলেন, আর একটা অমিতোষকে। তিনি মোড়া টেনে নিলেন।

বুবাই ঠাম্মির গা ঘেঁষে বসল।

পুষ্পা পান চিবোতে চিবোতে এক সময় বলল, 'ঘড়িটা দেখেছ?'

'তোমরা কি আজই চলে যাবে বউমা?' তিনি আহত হলেন। মুহূর্তে তাঁর মুখটা কালো হয়ে গেল।

'থাকার কোন উপায় নেই। বুবাইয়ের কাল স্কুল। টিমু বাড়িতে একা।'

'তোমরা তো আর আসই না! এসেও থাকলে না একদিন।' গলায় গভীর কষ্ট। সুর কেটে গেল।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশে তখনো মেঘ। আবার হয়তো নামবে। দেখতে দেখতে আড়াইটা বেজে গেল। সোয়া তিনটের বেরোতেই হবে। অমিতোষ পুষ্পার দিকে চেয়ে বলল, 'গেলে তৈরি হয়ে নাও, দেরি করছ কেন?' 'ওমা, এ আবার কি কথা আমি কোথায় দেরি করলাম?'

উমাতারা কেমন দুঃখীর গলায় বললেন, 'আজ না গেলেই কি নয় অমি?'

অমিতোষেরও কষ্ট হচ্ছে। তারও মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে এখানে এসে কদিন থাকে। কিন্তু পারে না। পুষ্পা এখানে কিছুতেই থাকবে না। এখানে বাথরুম-টাথরুম নেই। বড় অসুবিধে। আস্তে আস্তে বলল, 'আজ যাই মা, পরে এসে একদিন থাকবো।'

'এখন তো আর অফিস-টফিস না রে!' ভাঙা ভাঙা শোনাল গলার স্বর।

'বড় কাজের চাপ মা।'

উমাতারা চুপ করে থাকলেন। কি ভেবে এক সময় তিনি উঠে পড়লেন।

পুষ্পা তৈরি হয়ে নিয়েছে। অমিতোষও জামা প্যান্ট পরে নিল। বাবার ঘরে গেল একবার। প্রণাম করল। তিনি ওদের আশীর্বাদ করলেন, 'সুখে থাকো তোমরা। আমাদের জন্যে এত ভেবো না। আমাদের দিন তো শেষই হয়ে এল। আর তো কদিন!' তিনি অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

অমিতোষ কোন জবাব দিল না। তার বুকের ভেতরটা খচ করে ওঠে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। মাকে প্রণাম করল।

উমাতারার হাতে কাগজের একটা মোড়ক। তিনি এটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আড়ষ্ট গলায় বললেন, 'এটা নিয়ে যা অমি।'

'এতে কি আছে মা?'

'গিয়েই দেখতে পাবি।' তাঁর গলা ধরা ধরা। চোখ ঝাপসা। তিনি ফের কি একটা কথা বলতে গেলেন। ঠোঁট কাঁপল। শেষে অনেক কষ্টে বললেন, 'আমিও তো পেটে ধরেছিলাম রে!' শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে গেল। তিনি চোখে আঁচল চেপে ধরলেন। তিনি ওদের পেছন পেছন অনেকটা পথ গেলেন।

অমিতোষের বুকটাও গুমরে গুমরে উঠছে। সে বলল, 'তুমি এবার চলে যাও মা। সাবধানে থেকো।'

উমাতারা একটা সজনে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ওদের পথের দিকে চেয়ে থাকলেন। চোখ ফেটে তাঁর জল বেরিয়ে এল। উদাস দৃষ্টি। বড় মায়া।

হাঁটা পথ পেরিয়ে ওরা আবার রিকশায় উঠল। প্যাকেটটা অমিতোষ বুবাইয়ের হাতে দিল। সে গম্ভীর। রিকশা ছুটছে। হাটুরেরা ঘরে ফিরছে। অমিতোষরাও ফিরে যাচ্ছে। যার যে ঘর। একে একে সব পেছনে পড়ছে। বুবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তখন বলে যাচ্ছে, 'এই পীরের দরগা বাপী, এই পানকৌড়ি, এগুলো পানিফল, ঠিক বলছি না বাপী?'

অমিতোষ ছেলেটাকে দেখল একবার। পরে গম্ভীর গলায় বলল, 'ওসব না জানলেও তোমার চলবে বুবাই।'

পুষ্পা আড়চোখে একবার দেখল ওকে।

ওরা ঠিক সময়ই পাঁচটার ট্রেন ধরল। দিন দেখতে দেখতে শেষ হয়ে আসে। সন্ধ্যে হয় হয়। অমিতোষ গম্ভীর।

ওই কাগজের প্যাকেটটার ওপর তখন থেকেই পুষ্পার চোখ। ওটার মধ্যে কি আছে, জানবার খুব লোভ হচ্ছিল ওর। কৌতুকের গলায় ও বলল, 'ওতে তোমার মা কি এমন মূল্যবান সামগ্রী দিয়েছে দেখি।'

বুবাইয়েরও খুব উৎসাহ। বলল, 'খুলব বাপী?'

'খোল।'

বুবাই তাড়াতাড়ি করে ওটা খুলে ফেলল, 'ওমা, এ আবার কি?'

অমিতোষও অবাক হলো। আর জন্যে তার এই মুহূর্তে কেন যেন কষ্ট হচ্ছিল। তার শরীর খারাপ হয়েছে শুনে এগুলো দিয়ে দিয়েছে মা। এসব আবার কেন দিতে গেল মা! কি দরকার ছিল এর! একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে সে বলল, 'এগুলো ডুমুর বুবাই, ডুমুর। এ পেটের পক্ষে খুব ভাল। লিভার ভাল থাকে, রক্ত হয়।

পুষ্পা মুখ বিকৃত করল, 'এ দিয়ে কি হবে?'

অমিতোষ চুপ করে থাকল। ওর এই উপহাস তার এখন ভাল লাগছিল না। তার বলতে ইচ্ছে হয়: এ তুমি বুঝবে না পুষ্পা, বুঝবে না। এগুলো যে আমি একদিন খুব ভালবাসতাম। ভালবাসতাম পুষ্পা।

'যত্ত সব।' বলেই পুষ্পা ঝট করে প্যাকেটটা টেনে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

অমিতোষ অন্ধকারে শুধু সেদিকে চেয়ে থাকল। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা।

ইংলণ্ডে কেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিপর্যয়

পাকিস্তানের ক্রিকেটে এমন দুর্দিন বোধ হয় আগে কখনো আসেনি। এবার ইংলণ্ড সফরে দুটি টেস্টে শুধু ইনিংসে পরাজয় নয়, সম্পূর্ণ ব্যর্থতারও পরিচয়। সফরে জয় মাত্র একটি কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে। তাও তৃতীয় ও শেষ টেস্টের আগে একটি জয়ের স্বাদ দেবার জন্য সারের অধিনায়ক ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ছিলেন বলে। না হলে কোনো জয়ের স্বাদ না পেয়েই পাকিস্তান দলকে দেশে ফিরে আসতে হত এবং হয়তো তৃতীয় টেস্টেও হার স্বীকার করতে হত বৃষ্টিতে ৩০ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৯ ঘণ্টা খেলার সময় নষ্ট না হলে।

অবশ্যই এই ব্যর্থতার কৈফিয়ত আছে। কেরি প্যাকারের ওয়ার্লড সিরিজের জন্য ইংলণ্ড যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পাকিস্তানের ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশী। ইংলণ্ডের যে পাঁচজন খেলোয়াড় প্যাকারের শিবিরভুক্ত তাদের মধ্যে টনি গ্রেগ, অ্যালান নট এবং ডেরেক আণ্ডারউড টেস্ট দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। এঁদের জায়গা দখল করার মত খেলোয়াড়ও আছে ইংলণ্ডে। কিন্তু মজিদ খাঁ, মুস্তাক মহম্মদ, জাহির আব্বাস, আসিফ ইকবাল ও ইমরান খাঁ—ক্রিকেটের এই পাঁচ রত্নের শূন্য স্থান পূর্ণ করার মত অবস্থা পাকিস্তানের কেন, কোনো দেশেরই নেই। তার উপর আবার পাকিস্তানের নামী পেস বোলার সরফরাজ নওয়াজের চোট থাকায় প্রথম দুটি টেস্ট খেলতে পারেননি। তা হলে দাঁড়াচ্ছে, এক নম্বর থেকে ছয় নম্বর পর্যন্ত খেলোয়াড় ছাড়াই পাকিস্তানকে ইংলণ্ডের সংগে ব্যাট-বলে লড়াই চালাতে হয়েছে।

এর উপর আবার প্রকৃতি এবং ভাগ্যদেবীও বিমুখ ছিলেন পাকিস্তানের উপরে। ভিজে আবহাওয়ার জন্য ইংলণ্ডের মাঠে যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া শক্ত। তাই বলা হয়, ইংলণ্ডের পিচে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলে কোনো ক্রিকেটার কমপ্লিট ক্রিকেটার হতে পারে না। ছিঁচকাঁদুনে ইংলিশ মরসুম এবার ছিল একেবারেই রোদনভরা। মরসুমের গোড়ার দিকটায় চোখের জল কোনো সময়ই শুকোয়নি। প্রথম ১৭ দিনের খেলার মধ্যে পাকিস্তান দল ৮ দিন মাঠেই নামতে পারেনি। বাকী ৯ দিন মাঠে নেমে বৃষ্টির সংগে চোর-পুলিস খেলেছে। একবার প্যাভিলিয়নে ঢুকেছে, একবার মাঠে নেমেছে। ম্যানেজার মামুদ হোসেন, যিনি পাকিস্তান ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি, দুঃখ করে বলেছিলেন—আমরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সে দাবি জানাব, ইংলণ্ডে সফরের সময় শুধু ক্রিকেট পিচটুকুই নয়, সারা মাঠই আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বৃষ্টি থেমে গেলেই খেলা আরম্ভ করা যায়। অধিনায়ক ওয়াসিম বারি বলেছিলেন—“আমার দুই-তিনজন খেলোয়াড় তো এখনো মাঠেই নামতে পারেনি। যাদের উপর আমাদের বেশী ভরসা সেই হারুন রসিদ, স্পিনার আবদুল কাদির ও ইকবাল কাশিম আগে কোনো দিন ইংলণ্ডে খেলেনি। ওরা যদি একটু আধটু প্র্যাক্টিস না পায়, খেলবে কিভাবে? আমরা যারা আগে ইংলণ্ডে খেলেছি তাদেরও তো একই অবস্থা।”

সত্যি কথাই। পাকিস্তান খেলোয়াড়রা ইংলণ্ডে গিয়ে টেস্টের আগে নিজেদের প্রস্তুত করার মোটেই সুযোগ পায়নি। ভাগ্যদেবীও হয়তো পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। না হলে যে ইয়ান বথামকে কমাস আগে পাকিস্তানে একটিও টেস্ট খেলানো হয়নি সেই বথাম এই সিরিজের নায়ক হয়ে ওঠেন? মুখ্যত বথামই পাকিস্তানের উপর বড় আঘাত হেনেছেন পর পর দুটি টেস্টে সেঞ্চুরি করে এবং দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে একাই ৮টি উইকেট নিয়ে। সামারসেটের ওই অল রাউণ্ডারের অত্যুজ্জ্বল কৃতিত্বের কথায় পরে আসছি। তার আগে বলে নিই, অন্য ব্যাপারেও পাকিস্তানের অভিযোগের কারণ আছে।

ন্যায়-নীতি এবং আচার-আচরণ ক্রিকেটের এক মাহাত্ম্য এবং ক্রিকেট মাঠের সংগ্রাম ওই কারণেই ধর্মযুদ্ধ হিসাবে স্বীকৃত। [illegible] আশ্রয় নেয়নি? অন্তত দুর্বলের প্রতি আচরণে সবলের যে ক্ষাত্রধর্ম পালনের কথা তা কি পালন করেছে?

কথাটা খুলেই বলা যাক। ব্যাটসম্যান হিসাবে দলে যার স্বীকৃতি নেই, বোলার হিসাবেই স্বীকৃতি, তার বিরুদ্ধে বাম্পার প্রয়োগ শুধু ক্রিকেটের নীতি-বিরুদ্ধ নয়, বেআইনীও বটে। ক্রিকেটস্রষ্টা ইংলণ্ড কিন্তু সেটা মেনে চলেনি। যার উপর বাম্পার প্রয়োগ করেছে সে দলের ফাস্ট বোলারও নয়, নিরীহ স্পিনার ইকবাল কাশিম।

প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন পাকিস্তান যখন খেলতে নামে তখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। আগের দিন করেছিল এক উইকেটে ৯৪ রান। নাইট ওয়াচম্যান ইকবাল কাশিম দৃঢ়তার সংগে ব্যাট করছিল হার বাঁচানোর জন্য। মিনিট চল্লিশ পরে বব উইলিস বীরত্ব দেখাতে আরম্ভ করলেন নিরীহ বালকটির বিরুদ্ধে বাম্পার ছুঁড়ে। বাম্পারে ঠোঁট ফেটে গেল কাশিমের। রক্তমাখা মুখ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাঠে। ইংলণ্ডের পক্ষে পরের কাজ আর কঠিন হয়নি। ইকবাল কাশিমকে হাসপাতালে নিয়ে কাটা ঠোঁট স্টিচ করার সময়ের মধ্যেই প্রায় কাজ শেষ করে ফেলে। কাশিম আর ব্যাট করতে পারেনি। ৯ উইকেটেই পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২৩১ রানে। পুরো একদিন এবং দেড় ঘণ্টা সময় হাতে রেখে ইংলণ্ড এজবাসটনের প্রথম টেস্ট জেতে ইনিংস ও ৫৭ রানে।

ধরে নেওয়া যায়, ইংলণ্ড প্রথম টেস্টে জিততই। কেননা, পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ১৬৪ রানের উত্তরে ৮ উইকেটে ৪৫২ রান করে ইনিংস ছেড়ে দিয়েছিল। হার এড়ানো পাকিস্তানের পক্ষে ছিল দুরূহ কাজ। সেই কাজের প্রস্তুতির মুখে অন্যায় যুদ্ধে তাদের 'বধ' করা হল। ইংলণ্ড ন্যায়যুদ্ধে জিতলে ক্রিকেটের মহিমা বাড়ত।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছে নানা মুখ থেকে। পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াসিম বারি আগের দিনই অভিযোগ করেছিলেন—“ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা পিচ নষ্ট করছে। পিচের উপর দিয়ে

ইংলণ্ড-পাকিস্তান সিরিজের নায়ক ইয়ান বথাম

সোজাসুজি অন্তত ৫০ বার দৌড়ে তারা পিচের ক্ষতি করেছে কিন্তু দুজন আম্পায়ারের কেউ তাদের সতর্ক করে দেননি। এই টেস্ট শেষ হবার পর আমার রিপোর্টে অভিযোগটি তুলব। তবে আমি আইনপ্রণেতা নই। জানি না, এর শাস্তি কি হবে। এই গর্হিত কাজের জন্য আইন থাকা উচিত।”

নাইট ওয়াচম্যান ইকবাল কাশিমের উপর বাম্পার প্রয়োগে ফুঁসে ওঠেন ম্যানেজার মামুদ হোসেন। বলেন, “ব্যাটসম্যান হিসাবে যে স্বীকৃত নয় তার বিরুদ্ধে বাউন্সার প্রয়োগ ফাস্ট বোলারের পক্ষে অন্যায় আচরণ। ক্রিকেটের ৪৬ নম্বর আইনেই অপ্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানের জন্য এই রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ড যদি এই অন্যায় প্রথায় টেস্ট জিততে চায় তা হলে আমাকে ব্যাপারটি টেস্ট ও কাউন্টি বোর্ডের দরবারে নিয়ে যেতেই হবে।”

পাকিস্তানের অধিনায়ক ও ম্যানেজারের অভিযোগ না-হয় বাদ দিচ্ছি। ব্রিটিশ সাংবাদিকরাও তো ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখেননি। অনেকেই সোজাসুজি উইলিসের ব্রিয়ারলিকেও ঘটনার জন্য দায়ী করতে দ্বিধা করেননি।

সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন অতীতের খ্যাতকীর্তি খেলার জিম লেকার। অত্যন্ত কড়া ভাষায় লেকার লিখেছেন—“বব উইলিসের ওই বাউন্সারকে দুর্ভাগ্যজনক ব্যতিক্রম বলে হয়তো ধরা যেত, কিন্তু আমি মাঠে বসে তাঁর দুরভিসন্ধিই প্রত্যক্ষ করেছি। বাউন্সার দেবার আগে তিনি 'রাউণ্ড দ্য উইকেটে' বল করতে শুরু করলেন। তারপরেই বড় বীরত্ব দেখিয়ে বাউন্সারে ঘায়েল করলেন কাশিমকে।”

লেকার আরও লিখেছেন—“কে ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকৃত এবং কে স্বীকৃত নয় এ সম্পর্কে দিনের পর দিন তর্ক চলতে পারে। কিন্তু যে খেলোয়াড় কোনো দিন টেস্টে দুই অংকের রান করতে পারেনি, ১২টি টেস্টে যার সংগ্রহ মাত্র ২৯ রান, সেই লেফ্‌ট স্পিনার ইকবাল কাশিমকে কি ব্যাটসম্যান বলা যায়? ব্যাটসম্যান হিসাবে কাশিম যে আনাড়ীর পর্যায়ে পড়ে এটা বোলার উইলিস ও অধিনায়ক ব্রিয়ারলির অজানা নয়। তবু কেন এই বীরত্ব দেখানো?”

পরিশেষে লেকারের মন্তব্য : আমি সব সময়েই স্বীকার করি, বাউন্সার ফাস্ট বোলারের আইনসম্মত অস্ত্র। কিন্তু সে অস্ত্রের প্রয়োগ হবে স্বীকৃত ব্যাটস-ম্যানের উপরে, অস্বীকৃত ব্যাটসম্যানের উপরে কখনো নয়।

ইংলণ্ড দলের ম্যানেজার কেন ব্যারিংটন কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে একটা কৈফিয়ত খাড়া করেছেন। বলেছেন, কাশিম ৪০ মিনিট স্বচ্ছন্দে ব্যাট করছিল। তাঁর ডিফেন্স ছিল খুবই ভাল। সুতরাং, আমাদের বাউন্সার না দিয়ে উপায় ছিল না। এ কেমন কৈফিয়ত? ব্যারিংটন যা বলতে চেয়েছেন তার অর্থ দাঁড়ায়—স্কুলের খারাপ ছাত্র যদি কঠিন প্রশ্নের উত্তর লিখতে থাকে তবে মাস্টারমশাইয়ের তার কলম কেড়ে নেবার অধিকার আছে।

যাই হোক, আগেই লিখেছি, পাকিস্তান ছিল দুর্বল দল। দ্বিতীয়ত, অনুশীলনের অভাব। তৃতীয়ত, প্রথম টেস্টে বিপর্যয়। সব মিলিয়ে ইংলণ্ডে পাকিস্তানের সামগ্রিক ব্যর্থতা। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টেও পাকিস্তান হারে ইনিংস ও ১২০ রানে। ইংলণ্ডের ৩৬৪ রানের উত্তরে মাত্র ১০৫ রানে ইনিংস শেষ করার পর ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসও ১৩৯ রানে শেষ হয়ে যায়, চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হবার আগেই। লীডসে বৃষ্টির জন্য তৃতীয় টেস্টের তিন ভাগ খেলাই তো হয়নি। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ২০১ রানের উত্তরে ইংলণ্ড করে ৭ উইকেটে ১১৮ রান। পাকিস্তানের সাদিক মহম্মদ মাত্র ৩ রানের জন্য তার ষষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরি করতে পারেনি।

প্রথম দুটি টেস্টে ইংলণ্ডের ইনিংসে জয় এবং অতি সহজে 'রাবার' লাভের মূলে তিনজন খেলোয়াড়ের অবদান খুবই বেশী। এরা হচ্ছে ক্রিস ওল্ড, ক্লাইভ র‍্যাডলি ও ইয়ান বথাম। এজবাসটনে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ওল্ড মাত্র ৫০ রানে ৭টি উইকেট পান। র‍্যাডলি (১০৬) ও বথাম (১০০) করেন সেঞ্চুরি। একসময় ওল্ড মাত্র ৫টি বলে ৪টি উইকেট নিয়ে ১৯২৯-৩০ মরসুমে করা মরিস অ্যালমের রেকর্ড স্পর্শ করেন। অ্যালম ওই রেকর্ড করেছিলেন ক্রাইস্ট চার্চ টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ক্লাইভ র‍্যাডলি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পর পর দুটি সেঞ্চুরি করেন। অল রাউণ্ডার ইয়ান বথাম প্রথম টেস্টে ১০০ ও দ্বিতীয় টেস্টে ১০৮ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টি উইকেট দখল করেন মাত্র ৩৪ রানে। একসময় তিনিও পান মাত্র ৮ রানে ৬টি উইকেট। বাইশ বছর বয়সী বথামই পৃথিবীর একমাত্র খেলোয়াড় যিনি একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও এক ইনিংসে ৮টি উইকেট পেয়েছেন। জীবনের সপ্তম টেস্টে বথামের এই কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেঞ্চুরি ও ৭টি উইকেট দখলের রেকর্ড ছিল অস্ট্রে-লিয়ার জে এম গ্রেগরীর। করেছিলেন মেলবোর্নে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯২০-২১ মরসুমে। ৫৮ বছর পরে সে রেকর্ড ম্লান করলেন বথাম।

কারপভ, না করশনয় ?

হিমানীশ গোস্বামী

আনাতলি কারপভ দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু তাঁর মনে ক্ষোভ রয়েছে তিনি যে গৌরবের মুকুটটি ধারণ করে রয়েছেন সেটি কষ্টার্জিত নয়। এর জন্য তাঁকে চূড়ান্ত খেতাবী লড়াই-এ নামতে হয়নি ১৯৭৫ সালে, কেননা ঐ বছরের ১লা এপরিলের মধ্যে ফিশারের সমস্ত শর্ত ফিডে মেনে না নেওয়ায় ফিশার খেলেনই নি। ১লা এপরিলের মধ্যেও যখন ফিশার নীরব রইলেন, তখন ফিডে তার উত্তরের জন্য আরও চব্বিশ ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দিল, কিন্তু নিষ্ফল হল সে অপেক্ষা। ফিশার —যাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তিনি স্পাসকিকে সাড়ে বারো-সাড়ে আট পয়েন্টে হারিয়ে দেবেন এবং বারো বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন থাকবেন, কেবলমাত্র এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম অংশটি পূরণ করতে পেরেছিলেন। এখন ফিশার দাবা জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত। কেবল দাবা নয়; তিনি সম্পূর্ণ একা, সঙ্গীহীন অবস্থায় সময় কাটাচ্ছেন। তাঁকে কেউ কোথাও বিশেষ দেখতেও পায় না। ফিশার দাবা জগতে ফিরে আসবেন এমন সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে।

যখন এই লেখাটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হবে, তখন ম্যানিলায় আর একটি বিশ্ব দাবা লড়াই চলছে। এবারে লড়াই কারপভের সঙ্গে করশনয়-এর। প্রথমজনের পুরো নাম—আনাতলি কারপভ, সাকিন

আনাতলি কারপভ

সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিণ উরাল পর্বতের জ্লাটুস্টু শহরে। জন্ম ১৯৫১, ২৩ মে। সাতাশ বছরের কিছু বেশী এখন তাঁর বয়স। করশনয়-এর বয়স সাতচল্লিশ। পুরো নাম ভিকটর করশনয়। করশনয়ও জন্মসূত্রে সোভিয়েট নাগরিক। দু বছর আগে স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করেছেন, এখনও দেশে ফেরেননি। ফিরতে চানও না। দেশে রয়েছেন স্ত্রী এবং পুত্র। করশনয় বহুদিন থেকেই বলছেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে পাঠানো হোক, তাঁর সঙ্গে মিলতে দেওয়া হোক। তা নইলে তিনি এই লড়াই-এ অংশই গ্রহণ করবেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নীরব। করশনয়-এর সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের চলছে চূড়ান্ত এক ঠান্ডা লড়াই। ...

...দিয়েছিলেন—সে চিঠি তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

করশনয় একজন বড়দরের খেলোয়াড়। বড়দরের খেলোয়াড় না হলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেনজ করা যায় না। স্পাসকিকে পরাজিত করে তিনি এই অধিকার অর্জন করেছেন। আর এটা সকলেরই জানা, স্পাসকিকে হারিয়ে দেওয়া একটা সহজ কথা নয়। ফিশার নিজেও মনে করতেন পৃথিবীতে কেউ যদি তাঁর সমকক্ষ হন তা হলে তিনি হলেন স্পাসকি। কিন্তু স্পাসকি ভদ্র খেলোয়াড়, হাবভাব চালচলনে তাঁর মধ্যে রয়েছে আভিজাত্যের পরিচয়। কিন্তু হলে হবে কি, দাবা খেলতে খেলতে উঁচুর দিকে গেলে তখন আর ব্যক্তিগত ভালত্ব বা মন্দত্বের স্থান থাকে না, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন যেখানে সরকারীভাবে এই খেলাতে চূড়ান্ত আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন তখন দাবা খেলোয়াড়দের অনেক কর্মই করতে হয় সরকারী দেবতার ইচ্ছায়। করশনয় এবং স্পাসকি যখন কারপভের চ্যালেনজার কে হবেন সেই দ্বৈরথে লিপ্ত, তখন স্পাসকি এবং করশনয় দুজনেই দেখিয়েছিলেন 'নার্ভ'-এর খেলায় কে কাকে জব্দ করতে পারে! বলা হয়, এই নার্ভ-এর খেলায় ফিশার ১৯৭২ সালে রিক আভিক-এ স্পাসকিকে কাবু করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, দাবা খেলার জন্য যে ৬৪ ঘরওলা বোরড এবং তার উপরকার ৩২টি ঘুঁটি রয়েছে, সেগুলির সঠিক চাল দেবার চেষ্টা করা ছাড়াও দাবা খেলায় প্রতিপক্ষকে কাবু বা বিভ্রান্ত করতে অন্য অনেক কৌশলই দরকার হয়। ঠিক চারটের সময় দাবা খেলা শুরু হবার কথা। একজন হাজির—অন্যজন এসে পৌঁছননি তখনও। দাবা-ঘড়িতে সময় চলার প্রমাণ মিলছে—কাঁটাটি আস্তে আস্তে সরছে। প্রথম ঘণ্টায় ১৫টি চাল দিতেই হবে। ঘড়িটি টিক টিক টিক টিক করে আওয়াজ করছে। আস্তে আস্তে আওয়াজ করলেও চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই আওয়াজও স্নায়ুর উপর আঘাত করছে। দশ মিনিট চলে যায়—প্রতিপক্ষের দেখা নেই। পনেরো মিনিটের মাথায় সকলে যখন ধরে নিচ্ছিলেন প্রতিপক্ষ আসতে পারবেন না, তখন হঠাৎ তিনি হাজির হলেন। এখন তাঁকে পনেরো মিনিট কম সময়েই ১৫টি চাল দিতে হবে। কিন্তু তাতে তিনি পেছপা নন। স্নায়ুর খেলায় তিনি হয়ত তাঁর প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলেছেন।

এটি মন-প্রাণ ভরায়

এটি নিখুঁত হিসাব করায়

এটি শোনাতে সাহায্য করায়

আর এইটি এই সবকিছুতেই শক্তি যোগায়

নিপ্পো'র অন্যান্য নানান ব্যাটারীর মতই বেশি শক্তিশালী আর অনেক বেশিদিন চলে। জাপানের 'ন্যাশনাল' বানানোর টেকনিক জানালো, ইণ্ডো-ন্যাশনাল দারুণ সব ব্যাটারী বানালো।

পুরোপুরি পেশাদার ব্যাটারী, নিপ্পো হাইপার পেনলাইট

প্রতিপক্ষকে কাবু করার আরও অনেক কাহিনী রয়েছে। পুরনো যুগের পুরোহিত এবং বিখ্যাত খেলোয়াড় স্পেনদেশীয় লুসেনা তো লিখেই গেছেন দাবার বোর্ডটিকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে বোর্ড থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে প্রতিপক্ষের চোখে লেগে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উপদেশটি প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো হলেও এই ধরনের কিংবা অন্য ধরনের অসুবিধে সৃষ্টি করার নজির দাবা খেলার সংগে জড়িত। আর একটা কাহিনীর কথা ধরা যাক। ১৮৫৩ সালে খেলা হচ্ছে হ্যারউইটজ-এর সংগে লোয়েনথালের। খেলার গতি-প্রকৃতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হ্যারউইটজ হেরে যাবেন। তখন নাকি হ্যারউইটজ একজন অর্গান-বাদককে জানালার কাছে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে অর্গান বাজাতে বলেছিলেন। লোয়েনথাল ছিলেন যাকে বলে নারভাস প্রকৃতির। ফলে তাঁর যে অসুবিধে হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এর উপর ছিল চুরুট টানা। চুরুটের ধোঁয়া লোয়েনথাল একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর অনুরোধ ছিল খেলার সময় ঘরে কেউ চুরুট টানবেন না। কিন্তু কে শোনে কার কথা—হ্যারউইটজের সমর্থক বন্ধুরা চুরুট ধরিয়ে লোয়েনথালের যত কাছ থেকে সম্ভব ধোঁয়া ছাড়তে পারেন ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন, এমনকি ধোঁয়ার কুণ্ডলি লোয়েনথালের মুখের দিকেও বাঁক করে ছোঁড়া হতে লাগল। রুশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বটভিনিক সিগারেট টানেন না, কিন্তু প্রতিপক্ষ টানেন, অতএব তাঁর সংগে খেলার আগে তিনি ভিয়াশেস্লাভ রাগোৎসিন-এর সংগে ট্রেইনিং

এই রকম ছক দাবা খেলার পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহার হয়। এটাতে কারপভ এবং করশনয়-এর পুরনো খেলার একটি বিশেষ মুহূর্ত দেখানো হচ্ছে। খেলাটি ড্র হয়ে যায়।

ম্যাচ খেলতে লাগলেন। রাগোৎসিনের প্রধান কাজ ছিল সিগারেট টেনে তার ধোঁয়া বটভিনিকের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া! এককালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইম্যানুয়েল লাসকারও খেলার সময় শস্তা দামের বিশ্রী গন্ধওলা চুরুট টেনে প্রতিপক্ষকে বিরক্ত করতেন। রেটি ঠিকই বলেছিলেন, প্রতিটি খেলার সংগেই যুক্ত থাকে আর একটি যুদ্ধ—আর তা হল স্নায়ুর যুদ্ধ!

এই স্নায়ুর যুদ্ধ আধুনিককালে আরও ব্যাপক হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। আগেই উল্লেখ করেছি, করশনয়-স্পাসকি খেলার সময়ও ভদ্র, অভিজাত স্পাসকিও স্নায়ু যুদ্ধ চালিয়েছেন। চাল দেওয়ার পরই স্পাসকি টেবিল ছেড়ে তাঁর নিজের 'বিশ্রামঘর'-এ চলে যেতেন, আর ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে পরে কি চাল হবে ভাবতেন। আতে আবার করশনয়-এর আপত্তি। করশনয় বললেন, তা হবে না—স্পাসকি যাতে ডিসপ্লে বোর্ড দেখতে না পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলি সবই এখন নিশ্চয় পরামর্শদাতাদের কথায় খেলোয়াড়দের করতে হয়। যে কোনো উপায়েই হোক না কেন, প্রতিপক্ষকে অন্যভাবে চিন্তিত করে তোলা, বা আরো স্পষ্ট করে বলতে হয়, বিচলিত বা দুশ্চিন্তিত করে তোলার কৌশল আজকাল আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারের 'বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন' অবশ্যই ছিলেন ফিশার। তাঁর টাকা চাই, গাড়ি চাই, আওয়াজ একেবারে ঢুকতে পারে না এমন হোটেল ঘর চাই। বসার জন্য তাঁর নিজস্ব চেয়ার চাই, খেলার জন্য তাঁর নিজস্ব দাবার সেট চাই। তাঁর বায়নাক্কার ঠেলায় ফিডে-র এবং খেলার সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নাজেহাল অবস্থা! এগুলির সংগে আসল খেলার কী সম্পর্ক? না, কোনো সম্পর্কই নেই—কিন্তু তবু এগুলি মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। আর দাবা খেলায় মনটিই তো আসল। আর সেই জন্যই এগুলির সংগে আসল খেলার সম্পর্ক রয়েওছে।

খেলা কোথায় হবে? তাই নিয়েই কত না লড়াই, কত বাদ-প্রতিবাদ! যে খেলা ১৯৭৫-এ হয়নি তা নিয়ে কারপভ এবং ফিশারের মধ্যে কত রকম মতবিরোধ! যদি প্রতিযোগিতায় খেলা খেলতে হয় তা হলে ফিলিপিনসের ম্যানিলায় হবে, অন্য কোথাও নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার ফিলিপিনস সরকার সেবারে পুরস্কারের টাকা ঘোষণা করেছিলেন একেবারে আশাতীত! ৫০ লক্ষ ডলার, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা! (এবারে পুরস্কারের মূল্য অনেক কম—প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা।) যাই হোক—এই প্রস্তাবে কারপভ বললেন, না! আমি মিলান-এই খেলতে চাই। তারপর কে মধ্যস্থতা করবেন তা নিয়েও মতভেদ। দুই চ্যাম্পিয়নকে বিশ্বখেতাবী লড়াইতে নামানোর আগে ফিডে-র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের ঘুম একেবারে কেড়ে নিয়েছিল সেবার। কিন্তু ঘুম কাড়াই সার হল—সে খেলা ফিশার-এর জন্য হয়নি।

এবারেও স্নায়ু যুদ্ধ চলছে। আধুনিক যুগের যুদ্ধ—তাই এখন তার মধ্যে এসে পড়ছে আধুনিক কলাকৌশল। বিকইআভিক-এ স্পাসকি অভিযোগ করেছিলেন তাঁর চেয়ারের মধ্যে কোনো যন্ত্র বসানো আছে যে যন্ত্র দূর থেকে তাঁর চিন্তাধারাকে এলোমেলো করে দিতে পারে! স্পাসকির 'দ্বিতীয়' গেলার অনেকগুলি অভিযোগ তুললেন ফিশারের বিরুদ্ধে। সেগুলির মধ্যে একটি হল (গেলার লিখলেন), আমরা কয়েকটি চিঠি পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে বিস্পাসকিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছু ইলেকট্রনিক কলা-কৌশল এবং রাসায়নিক বস্তু খেলার জায়গায় বসানো হতে পারে।' এবারেও ইলেকট্রনিক-এর কলাকৌশলের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। এবারে অভিযোগ করছেন করশনয়। করশনয়-এর সাথে স্পাসকির আগের খেলায় স্পাসকি অভিযোগ করেছিলেন তাঁকে সম্মোহিত করা হচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়! করশনয় বলছেন, ইলেকট্রনিক কলাকৌশল খাটানো হতে পারে এবার, অতএব যাতে সেই কৌশল সোভিয়েট ইউনিয়ন খাটাতে না পারে সে জন্য করশনয় নিজে একটি যন্ত্র সংগে রাখতে চান। যদি ইলেকট্রনিক-এর ঢেউ-এর সাহায্যে তাঁকে কেউ প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তাহলে ঐ যন্ত্রে তা ধরা পড়বে। যদি ঐ যন্ত্র তাঁর কাছে রাখতে দেওয়া না হয় তাহলে তাঁর হয়ে অন্য কেউ সেটা বহন করবে এই রকম একটা অনুমতি তিনি আগেভাগেই চেয়ে রেখেছেন। ইতিমধ্যে খবর এসেছে—করশনয়ের চেয়ারকে এক্স-রে করে দেখা হয়েছে তার মধ্যে কিছু গোপন যন্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা।

বিশ্বখেতাবী প্রতিযোগিতায় প্রথম যিনি ৬টি খেলায় জিতবেন তাঁকেই বিজয়ী বলে ধরা হবে। ড্রগুলোকে ধরা হবে না। ফলে এবারে নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলা হচ্ছে না। এর আগেরবারে ফিশার-স্পাসকি খেলায় ২৪টি খেলা নির্দিষ্ট ছিল। পরে ফিশার-এর জেদ বজায় রাখার জন্য অনির্দিষ্ট সংখ্যক খেলার নিয়ম করা হয়। অতএব এবারের খেলা কতদিন যে চলবে তা বলা শক্ত। আজকাল বড় বড় দাবা প্রতিযোগিতায়, বিশেষ করে 'ম্যাচ'-এ ড্র-এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। দাবা খেলায় ড্র স্বাভাবিক নয়। স্টেইনিৎস্ বলতেন, আদর্শ দাবা খেলায় হারজিৎ নেই, অর্থাৎ দুজনেই যদি সঠিক চাল দেয়, একটিও ভুল না করে তাহলে খেলার ফলাফল হবে ড্র। কিন্তু অন্য পণ্ডিতেরা বলেছেন, এটা একেবারেই অসম্ভব কথা—দাবা খেলায় প্রতিটি সঠিক চাল দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যা সত্ত্বেও ড্র হয়—এবং ড্র-এর পর ড্র হতে হতে দর্শকেরা বিরক্ত হতে থাকেন। আলেখিন-এর সংগে

অ্যালেখিন জিতলেন ৬টি, ক্যাপাব্লাংকা তখন জিত মাত্র তিনটিতে, আর ড্র? ৭৪ দিনের ঐ দাবা 'ম্যারাথন'-এ ড্র হয়েছিল ২৫টিতে। ঐ সময় ক্যাপাব্লাংকার মনে হয়েছিল দাবা খেলার মধ্যেকার নবীনত্ব ফুরিয়ে গিয়েছে! যে কেউ ইচ্ছে করলেই ড্র করতে পারে—অতএব খেলার আইনকানুন পালটানো দরকার। ৬৪টি খোপওলা দাবাতে নতুন চাল ভাবার অবকাশ কই? এদিকে দশ ওদিকে দশ এই রকম একশো খোপওলা দাবা চাই। তবে, পরবর্তীকালে এই প্রস্তাব নিয়ে আর বিশেষ কেউ মাথা ঘামাননি।

এর আগে করশনয় কারপভের যে ২৪টি খেলা হয়েছিল তাতেও ড্র-এর সংখ্যা কম হয়নি। ২৪টি খেলার মধ্যে ড্র-এর সংখ্যা ১৯টি। কারপভ সেবারে জিতেছিলেন ১২½—১১½তে। একটি গেমে এগিয়ে কিউবার ক্যাপাব্লাংকা। এ ছাড়া, তিনি বটভিনিক-এর এক প্রিয় ছাত্রও।

এই স্নায়ু যুদ্ধের খেলায় করশনয় নতুন একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ম্যানিলার এই খেলায় তিনি জিতলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁকে শেষ করে দেবেন, কিন্তু হারলে কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর। করশনয় প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন এটা তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতি থেকেই বোঝা যায়। এরকম ভয়ের মধ্যে তিনি দাবা খেলবেন কেমন করে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। আবার আর একটি বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, আমার রাগ এবং মনোবল দুই-ই বেড়েছে। তবে এ পর্যন্ত কোনো দাবা চ্যাম্পিয়নকে খুন করা হয়েছে বলেও তো শোনা যায়নি। সুতরাং, এটা হল গিয়ে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে একটা প্রোপাগাণ্ডা বলছেন কেউ

সোভিয়েট রাশিয়ায় যখন খেলছিলেন কারপভ ও করশনয়
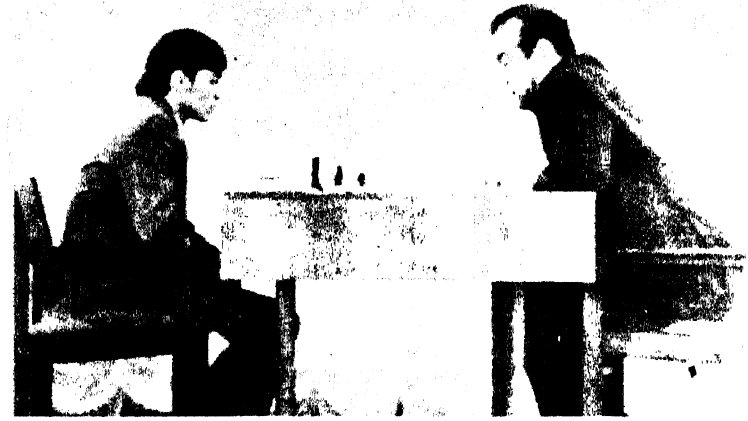
ছিলেন তিনি। যদিও পূর্ব শর্ত ছিল যিনি প্রথম পাঁচটি খেলায় জিতবেন তাঁকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে—কিন্তু ফলাফলে দেখা গেল ২৪টি খেলার মধ্যে ৫টিতে কেউই জিতলেন না, অতএব ২৪টি খেলার পর যাঁর পয়েন্ট বেশী তাঁকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হল। এটাও অবশ্য শর্তের মধ্যেই ছিল। এই খেলার ফলাফলে, বলা বাহুল্য, করশনয় খুশি হতে পারেননি। তিনি নাকি প্রকাশ্যেই কারপভকে বলেন, তুমি জিতে গিয়েছ ঠিকই, কিন্তু আমিই বড় খেলোয়াড়। এই নিয়ে সোভিয়েটের উচ্চতম দাবা মহল আপত্তি করেন। প্রকাশ্যে ওরকম কথা বলা করশনয়ের উচিত হয়নি। এর মধ্যে নাকি আরও একটি নেপথ্য কাহিনী রয়েছে। অর্থাৎ খেলা চলাকালীন সোভিয়েট দাবা কর্তৃপক্ষ করশনয়কে ইচ্ছে করে হেরে যেতে বলেন কেননা, তাঁদের ধারণা ছিল ফিশার-এর সংগে লড়াই-এ কারপভই উপযুক্ততর! এসব কথার সত্যতা কতখানি তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। তবে এটা ঠিক, এই খেলার পর থেকেই করশনয়ের প্রতি সোভিয়েট দাবা কর্তৃপক্ষ কঠোর মনোভাব দেখাতে থাকেন। সেটি অসহ্য মনে হওয়ায় করশনয় দেশ ছাড়েন। ১৯৭২-এর পর স্পাসকি সম্পর্কেও সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচণ্ড বিরোধিতা দেখা দেয়, এবং এক সময় এমনও মনে করা হচ্ছিল, স্পাসকিও দেশত্যাগী হবেন।

যিনি দাবার বিশ্বখেতাবী লড়াই-এ অগ্রসর হবেন তাঁকে হতে হবে অমিত দৈহিক বলের অধিকারী, এই কারণে তরুণতর খেলোয়াড়েরই এই দ্বৈরথে জেতার সম্ভাবনা বেশী। এই কারণেই দাবা খেলোয়াড়দের সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, কুস্তি করা, বোট চালানো (কারপভের প্রিয় ব্যায়াম) এ সব করে শরীরটাকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখতে হয়। বলা হয়, আজকালকার দাবা খেলায় যাঁর বয়স ৪০ ছাড়িয়েছে তাঁর পক্ষে আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভবত এই কারণেই সোভিয়েট দাবা কর্তৃপক্ষ করশনয় এবং কারপভের মধ্যে বেছে নিয়েছিলেন কারপভকেই। কারপভ চমৎকার খেলেন—তাঁর আদর্শ পুরানো আমলের পিগোরিন—

কেউ। করশনয় তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকে তাঁর কাছে আনবার জন্য এই কৌশল করছেন, যাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বজনমতের চাপে তা করতে বাধ্য হন। এই কারণে করশনয়-স্পাসকি খেলায় করশনয় প্রচণ্ড দৃঢ়ত্ব দেখিয়েছিলেন, এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন।

কে হারবে, কে জিতবে? করশনয়, না কারপভ? যে ৫০ ফুট উঁচু ৮ ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল সবে তৈরি হতে শুরু করেছে—তার উপর দিয়ে নির্ভাবনায় দুশো গজ তরতর করে চলে যাওয়া যায়। ৫০ ফুট উঁচু এই দেওয়ালটা তৈরি হবার পর কিন্তু ৮ ইঞ্চি জায়গার উপর দিয়ে যাবার সময় প্রথম পদক্ষেপেই মাথা ঘুরে ওঠে। দাবার বিশ্বখেতাবী লড়াই তাই একটি সাধারণ টেবিলের দু ধারে দুজন দাবা বিশারদের বুদ্ধির লড়াই নয় কেবল। এর বাইরে আছে আরও অনেক কিছু। যাঁরা খেলেন তাঁরা যেন সব সময়েই ৫০ ফুট উঁচু ৮ ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালের উপর দিয়ে হাঁটেন! একজন দাবা বিশারদকে কয়েক হাজার গেম এবং কম্বিনেশন মুখস্ত রাখতে হয়, তাঁকে হিসেব করতে হয় প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সংগে, তাঁকে চাল দিতে হয় প্রায় নির্ভুলভাবে, তাঁকে হঠাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয় এবং নিজেকে প্রস্তুত করতে হয় হঠাৎ আক্রমণের জন্য। কিন্তু এর সংগে তাঁকে বাইরের নানারকম কথাও ভাবতে হয়। কারপভের এই খেলায় তাঁকে কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানকেই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে তা নয়, তাঁকে সমস্ত দেশের সম্মানের দায়িত্বও নিতে হবে। সেটা বড়ই কঠিন কাজ। করশনয়কেও প্রমাণ করতে হবে তিনিই সবচেয়ে বড় দাবা খেলোয়াড় —এবং সে জন্য তাঁর স্নায়ুর উপরও কম চাপ সৃষ্টি হচ্ছে না।

আজকালকার দাবা খেলায়, বিশেষ করে সে খেলা যখন হয় সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পশ্চিম দেশের কারুর সংগে তখন দাবা বিষয়টির গুরুত্ব অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারের কাছে অনেক ছোট হয়ে পড়ে। সেটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি—কিন্তু এটাও ঠিক, 'খাঁটি এবং নির্ভেজাল দাবা' কখনও ছিল কি?

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত : ১৯০০-১৯৩০। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। দাম ৪০ টাকা।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন এবং একই সংগে দেশ ভাগ হওয়ার আগে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায় ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে বাঙালীর সমাজজীবনের যেসব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে, তাতে মুসলমানের কোনো স্থান ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (দুই খণ্ড) এবং বিনয় ঘোষের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (পাঁচ খণ্ড) বই দুটিতে বাঙালী মুসলমানের সামাজিক সমস্যা ও চিন্তাভাবনা স্থান পায়নি। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সমসাময়িক মুসলিম পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা থেকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাভাবনার একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় ঘোষের বই দুটির মতো তাঁর বইয়ের নাম লোকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। এই বইটিতে যে কেবল মুসলমান সমাজের চিন্তাভাবনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, বইয়ের নাম দেখে তা বোঝার উপায় নেই। লেখক বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতিগুলি ৪২৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। এই অধ্যায়গুলি হল— শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম আত্মচেতনাবোধ ও আত্মজাগরণ, মুসলিম বিশ্ব, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য এবং বিবিধ।

বিভিন্ন অধ্যায়ের উদ্ধৃতিগুলি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, প্রতিটি ব্যাপারেই বাঙালী মুসলমান সমাজে একাধিক চিন্তার প্রবাহ আগেও ছিল, এখনও আছে। ১৯১১ সালের আগে কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী এবং স্বাভাবিক কারণে উর্দু-ভাষী ব্যবসায়ী শ্রেণীর মুসলমানদের আধিপত্য ছিল এই শহরে। এই উর্দুভাষী মুসলিম নেতারা বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা যে বাংলা তা স্বীকারই করতে চাইতেন না। আবার তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর কাহিনী ছিল অনেক। তা ছাড়া হিন্দু সাহিত্যিকেরা অহিন্দু চরিত্রগুলি খারাপভাবে চিত্রিত করায় বাংলা ভাষাকে কাফেরের ভাষা হিসাবে আখ্যা দেওয়া হত। এই দুই ধারার কথা মনে রাখলে যেসব আর্থিক সম্বলহীন বাঙালী মুসলমান লেখক ও বুদ্ধিজীবী নিজেদের বাঙালী হিসাবে পরিচিত করার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সহজ হবে। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাফল্য এবং মুসলিম সমাজের উদারনৈতিক সংস্কারী যে, গোটা মুসলমান সমাজ একভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। এই ধারণা যে কত ভিত্তিহীন, আলোচ্য গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। অবশ্য বাঙালী মুসলমানের 'আত্মপরিচয়' নিয়ে যে বিতর্ক ছিল, সে বিতর্ক আজও আছে। এই বিরোধে উদারনৈতিক ভাবধারার প্রবক্তারা বার-বার পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু সেজন্য বাঙালী মুসলমান সমাজে গোঁড়া ইসলাম-পন্থী এবং উদারনৈতিক ভাবধারার মধ্যে বিরামহীন সংগ্রামের কাহিনী অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

যাঁরা গোঁড়া ইসলামপন্থী তাঁরাও কিন্তু নিজেদের সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছেন, তাঁরা কেউই 'স্ট্যাটাস কুয়ো' মেনে চলতে আগ্রহী ছিলেন না। আল এসলাম পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) একটি প্রবন্ধ স্মরণীয় : শরিফ রজিল বা আশরাফ আতরাফের পার্থক্য বঙ্গদেশীয় মোছলমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল। ...পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের অংশ বিশেষে শরাফতের দাবি-দাওয়াটা খুবই বেশী। তত্রত্য তথাকথিত শরিফগণ অশরিফগণকে কুকুর, শৃগাল হইতেও অধম বলিয়া জ্ঞান করে।...উত্তরবঙ্গে যাদিয়া, নিকারী ও আসামের মাটিয়া উপাধিবিশিষ্ট মোছলমানগণ একসঙ্গে অন্য মোছলমানের সহিত আহার করা দূরে থাকুক, এক মছজেদে, এক ঈদগাহ বা মাঠে নামাজ পড়িতেও পারে না। ছালাম আদান প্রদানের অধিকারীও নহে। জুমা জমাতে তাহারা শরিক হইতে পারে না। (পৃঃ ৬২)। মোহম্মদ আকরম খাঁ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুছলমান ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের 'কেহ কি মিশরের অনুকরণে বিবাহ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিতে পারেন না? (পৃঃ ৮৬)। মৌলভী এ লোহানী ভারতে মুসলমান সমাজে অবরোধ প্রথা দূর করার জন্য আরব ইরান তুরস্ক আফগানিস্তান, মিশর মরক্কোর মুসলমান রমণীর হাটেবাজারে অবাধে গমনের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। (পৃঃ ৯১)। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য উপযুক্ত মতবাদ প্রচারকারীরা হিন্দু ও মুসলমান উদারনৈতিকদের প্রতি কখনও সহযোগিতার হাত বাড়ান নি, বরং মুসলমান উদারনৈতিকদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। যেমন 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত লোকটা মুসলমান না শয়তান? প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য : ধূমকেতু প্রত্যেক সংখ্যায় পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে গরল উদগীরণ করিতেছে। এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।...নরাধম ইসলাম ধর্মের মানে জানে কি?...লোকটা শয়তানের পূর্ণাবতার।...খাঁটি ইসলামী আমলদারি থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে, শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়ই। (পৃঃ ৩৭২-৭৩)। ইসলাম দর্শন আবার বলেছে নজরুলের

মুসলমান কবি' উপাধিতে ভূষিত করে।

আমাদের দেশে মার্কসবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা করে থাকেন অর্থনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে' বাঙালী মুসলমানেরা গরিব এবং হিন্দুরা জমিদার ও অবস্থাপন্ন ছিল। তাই মুসলমানেরা হিন্দু-বিরোধী হয়। বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিভিন্ন উদধৃতি পড়লে বোঝা যাবে, মার্কসবাদীদের ওই ধারণা কত ভ্রান্ত। মূলত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব অবিভক্ত বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়কে দুই দিকে নিয়ে গিয়েছে। হিন্দুরা যে কাজ নিজেদের উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় হিসাবে মনে করতেন, সেই কাজই যে এক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান ইসলামের অপমান বলে মনে করতেন, তা হিন্দুরা জানবারও চেষ্টা করেন নি। যেমন, শিব-মন্দির ও মসজিদের ছবি আদর্শরূপে একত্রে স্থাপন করিয়া যদি কোনো স্থানে সভা করা হয়, তবে সেই সভা ও সভার কার্যাবলী সমস্তই মুসলমানদের জন্য হারাম হইবে। ইসলাম দর্শন। শ্রাবণ—১৩২৭। (পৃঃ ২৪৪)। 'যাহারা মাহন আল্লাহ' আকবর ধ্বনির সহিত বন্দে মাতরম বলে তাহারা আরও গুরুতর অপরাধ করে, তাহাদের ধর্ম ও ইমান একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ইসলাম-দর্শন। আশ্বিন—১৯২৮। (পৃঃ ২৪৫)। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সি আর দাশের শব বহন করায় কলকাতা বোম্বাই ও দিল্লিতে তাঁর সম্পর্কে 'কাফেরী ফতোয়া' জারি হয়েছিল।

এ তথ্যও আমরা জানতে পারি ইসলাম-দর্শন থেকে। মওলানা আজাদকে রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলমান সমাজে একঘরে করা হয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক মতামতের জন্য নয়, ধর্মের নামে ফতোয়া দিয়ে। সাহিত্য-পুস্তকে 'যবন' শব্দের বহুল ব্যবহার, আর্যসমাজী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জনা শুদ্ধি আন্দোলন, বাঁকুড়া শহরে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজাইতে দিতে রাজী না হওয়ায় হিন্দুরা মুসলমানদের বয়কট করা প্রভৃতি ঘটনাও মুসলমানদের হিন্দুবিরোধী করতে সাহায্য করেছে। আবার উলটো চিত্রও আছে। আনোয়ারুল কাদিরের ভাষায় আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বেষ আমাদের সমাজের আর একটা গলদ। ছোলতান-এ একটা প্রবন্ধে (৬ জুলাই, ১৯২৩) ছিল, হিন্দু জাতির দর্শনশাস্ত্র পৃথিবীতে অতুলনীয়, তহা জানিতে ও বুঝিতে হইলে এবং প্রচীন যুগের শিক্ষা-সভ্যতার বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংস্কৃত জানা আবশ্যক। এছলাম ধর্মের মূল ভিত্তি একত্ববাদ বেদশাস্ত্রের অন্তর্ভূত বিষয়, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা এছলাম ধর্মবিধির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজনীয়. এসব সত্ত্বেও আরবী ও সংস্কৃত দুই পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় ভাষা হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য মুসলমান সমাজে কি পরিমাণে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় মিলবে ৩৫১-৩৫৭ পৃষ্ঠার উদধৃতি সমূহে। তবে সেই সময়ে দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ প্রভৃতি গ্রন্থের মুসলিম চরিত্রগুলিকে বাঙালী মুসলমান চরিত্র মনে করে (পৃঃ ৩৫৩), বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমালোচনা করা হয়েছিল. ১৯৭২ সালে বাংলা দেশে অবাঙালী মুসলমানদের শত্রুজ্ঞান করে বিতাড়িত করার পর বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐভাবে আর নিন্দা করা যায় কিনা, এ প্রশ্ন উঠতে পারে।

বাঙালী জাতির ইতিহাসে সাহিত্য, অর্থনীতি, ধর্মীয় আলোড়ন ও সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি একটি সম্প্রদায়কে কিভাবে এই শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছর আলোড়িত করেছিল এবং যার পরিণতি ঘটে দেশবিভাগে সেসব জানার ব্যাপারে এটি একটা অমূল্য গ্রন্থ।

নিরঞ্জন হালদার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

মায়াময় ছায়ানগরের শিল্পী

তাহলে সেই দৃশ্য দিয়ে শুরু করা যাক। শীতকালের কুয়াশামাখা সকাল। বালির শেষপ্রান্তে সাহেববাগান। বিস্তৃত ঝিল। ওপাশে বোম্বাই যাবার জাতীয় সড়ক। ডানকুনি লাইনের রাজচন্দ্রপুর ইস্টশন। এই গ্রামের একটি ছোট্ট ছবির মত বাড়িতে একজন শিল্পী জেগে উঠলেন। শিশির মাড়িয়ে বাইরে টিউবওয়েল টিপে মুখ ধুচ্ছেন তিনি। ভাবছেন।

বৃটিশ কাউনসিলে ফিলম অস্ট্রেলিয়া প্রযোজিত এক গুচ্ছ রঙীন তথ্যচিত্র 'এসিয়ান নেবার্স—ইন্ডিয়া' চিত্রমালা দেখানো হল অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের সৌজন্যে (৬—২৩শে জুন)। এর মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ ডকুমেন্টারী ছিল চিত্রশিল্পী বিজন চৌধুরীর ওপর। তাঁর জীবনের একটি গোটা দিনকে ছবিতে ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক ক্লিস নুনান। বৃটিশ কাউনসিল বিজন চৌধুরীর সম্মানে ৯ই জুন ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। বৃটিশ কাউনসিলের জুন মাসের প্রোগ্রামের বর্ণনাটুকু সুন্দর—"অ্যান ইনসাইড ইমপ্রেসন অব কালকাটা থ্রু দ্য পেনটিংস অব বিজন চৌধুরী।"

ছবি থেকে জীবিকানির্বাহ সম্ভব নয়। সুতরাং বিজনকে কলকাতায় আসতে হয়। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক ট্রেনের দৃশ্য। ভীড়ের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছেন বিজন। অন্যদিকে পাড়াগাঁ। পুকুর। গাছপালা। বিপত্নীক শিল্পীর সংসার। স্টুডিও। গ্রামের মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এরই বিপরীতে বোদলেয়ার-এর "আনরিয়াল সিটি।" বহু মানুষের রুটিরুজির শহর। এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সাহেববাগান, বিজন চৌধুরী আর তাঁর

ছবি। এই শহরের সঙ্গেই তাঁর ভাব ভালবাসা আবার মন্বন্তর। ছবি তোলার সময় পশ্চিমবঙ্গ এপেকস কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রধান শিল্পী ছিলেন বিজন, আবার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের নৈশ বিভাগের অধ্যক্ষ। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর ছবি আঁকা। ছবির বিষয় ভাবনা। স্বগত কথনই এর টীকাভাষ্য। এই শহরে যারা খাটতে আসে—ভিক্ষা করতে আসে, আসফাল্ট, ট্রাম বাস এবং জল জঙ্গলে যারা থাকে, তারা ছবিটার বড় অংশ জুড়ে আছে।

বিজন চৌধুরী "পতনশীল নায়ক" চিত্রমালার একটি ছবি আঁকছেন। মাথা নীচু করে ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে একটি লোক। তারপর তৃতীয় ত্রিয়ানালে প্রদর্শিত বিজন চৌধুরীর "মহানগরের আগন্তুক" নামে বিখ্যাত ছবিটা (ক্লিশ নুনান বিজন চৌধুরীর অন্যান্য ছবির সঙ্গে এইটিও সংগ্রহ করেছেন)। একটি আধবুড়ো গ্রাম্য লোক ছেলের হাত ধরে শহরে এসেছে—কোটরে চোখ নেই তার। পেছনে সমস্ত বাড়িঘর উলটে গেছে। শুধু ট্রাফিক সিগনাল ত্রিনেত্রে শৌর্যচিন্তায় মগ্ন। তারপর কলকাতার ভীড়ের মুখ। হঠাৎ মনে হয় এরা সব হুড়মুড়িয়ে বিজন চৌধুরীর ক্যানভাসে ঢুকে পড়তে চায়। আবেগপ্রবণ পূর্ণেন্দু পত্রী এই জায়গাটায় আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন, দারুণ।

ক্লিস নুনান বিজন চৌধুরীর সাতটির বদলে ছত্রিশটি ছবি দেখালেই

আমাদের অবশ্য বেশি ভাল লাগত। মতি নন্দী কিন্তু ছবির শেষে বললেন, 'একজন শিল্পীর সারাদিনের জীবন-যাপন, কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা অল্পের মধ্যে ভালই ধরেছে নুনান।'

সেদিক দিয়ে ছবিতে বিজন চৌধুরীর ওপর অবিচার করা হয়নি। শেষ দৃশ্যে আছে—বিজন সিগারেট খেতে খেতে পায়চারী করছেন ছাদে। চারদিকে গাছপালা, বাঁশঝাড়, পুকুর আর নীল আকাশ। স্বগত বিজন—আমার মনে হয় একদিন কলকাতা বেড়ে উঠে সাহেববাগানকে গিলে নেবে। হঠাৎ হর্নের তীব্র আওয়াজ। সারি সারি গাড়ি ব্যাঙের মতো থপথপিয়ে চলে পর্দা জুড়ে। কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দেয়। শেষ হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

রবিবাসর

৯ জুলাই রবিবাসরের একটি চমৎকার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের গান শোনালেন শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর এবং শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষ। এই দুজনের গান নিয়ে ছিল সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান। শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঠাকুরবাড়ির স্মৃতি; রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির বধূ। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাক্ষাৎভাবে গান শেখবার সুযোগ হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের যে দুর্লভ গায়কী, যে স্টাইল,—তার পরিচয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হোলো শ্রীযুক্তা ঠাকুরের এই বর্ষীয়সী কণ্ঠে। এই গায়নরীতিতে টপ্পার প্রয়োগ আছে, কিন্তু আধিক্য নেই, যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাজ এবং তার সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য গানের ভারসাম্য বজায় রাখা,—যা রবীন্দ্রনাথের গায়কীতে ছিল। যতগুলি গান তিনি গাইলেন সবগুলিই রসে, ভাবে সুরে নিটোল,—বয়সের দরুন কণ্ঠস্বরে যে স্বাভাবিক অভাব দেখা দেয় সেই অনিবার্যতা তাঁর গান গাইবার মনোজ্ঞ পদ্ধতিতে এবং গুণপনায় খুব গণ্য হয়ে আত্মগোপন করে। গানের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু স্মৃতিচারণ করলেন, যা খুব চিত্তাকর্ষক লাগল। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" দিয়ে আরম্ভ করলেন; গাইলেন—'সখি আঁধারে একেলা ঘরে', তারপরে মায়ার খেলার কয়েকটি গান। "বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে" গানটিতে অপূর্ব রসসঞ্চার হল। "দে লো সখি দে পরাইয়া গলে"—গানটির কতগুলি বিশেষত্ব গেয়ে দেখিয়ে দিলেন। "মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে"—শুনতে শুনতে সবাই নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকো ভবনে অনুষ্ঠিত বর্ষামঙ্গল উৎসবে আখরযুক্ত "আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ" গানটি তিনি গেয়ে শোনালেন—যা আজকাল আর শুনতে পাওয়া যায় না। এমনকি গীতবিতানেও সেই আখরগুলির উল্লেখ নেই। শেষ করলেন "কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ" গানটি দিয়ে। এটিও তিনি বিশেষভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছিলেন। কবি নাকি তাঁকে যেভাবে শিখিয়েছেন তাতে প্রচলিত সুর থেকে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। তাঁর গানে যা আমরা পেলুম সেটি একটি বিশিষ্ট আর্ট, যা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ঠিক এই ধরনের গানে পাওয়া যেত। তাঁর সঙ্গে সুন্দর এসরাজ বাজিয়েছিলেন শ্রীসুভাষ চৌধুরী। শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষও

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

সাধারণতঃ রঙ ময়লা হয় কি করে

বছরের পর বছর সাধারণতঃ আপনার রঙ একটু একটু করে ময়লা হতে থাকে। আর তাহয় দুভাবেঃ ভেতরের ও বাইরের প্রক্রিয়ায়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে একটি শরীর রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু লোকের শরীরে অন্যদের তুলনায় বেশী ছড়িয়ে পড়ে। আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, রঙ তত ময়লা দেখায়। তাছাড়া, আপনি যতবার বাড়ীর বাইরে যান সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে, ফলে মেলানিন বেশী করে ছড়াতে থাকে আর আপনার রঙও হতে থাকে আরো বেশী ময়লা।

রঙ ফর্সা করার প্রচলিত উপায়

শত শত বছর ধরে ত্বকের রঙরূপের উন্নতির জন্যে মহিলারা রকমারি উপায় অবলম্বন করে এসেছেন। বেসন, দুধের সর, পাতিলেবু আর গ্লিসারিন, এমনকি শশার রস পর্য্যন্ত! এগুলি সম্ভবতঃ আপনার ত্বকের উন্নতি করে—ত্বক নরম করে, কিন্তু এসব দিয়ে কি সত্যিই রঙ ফর্সা হয়?

অপর পক্ষে আছে—ব্লীচ করার উপাদান। এগুলি যে ত্বকের কত ক্ষতি করে তা আপনাকে বলে দিতে হবে না। আচ্ছা, কোনো দামী আর নরম কাপড় কি আপনি ব্লীচ করবেন? আপনার ত্বকও তো কম দামী আর কোমল নয়।

আবিষ্কার! ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর রঙ ফর্সা করার প্রণালী—প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার—যা পৃথিবীতে এই প্রথম, প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে! আপনার ত্বকের ভেতরে কাজ করে এর 'ভিটামিন ক্রিয়া'। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীতে একটি ভিটামিন আছে, যা ক্রীম মাখবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বকে প্রবেশ করে। মেলানিনের বিস্তার রোধ করবার জন্যে এই ভিটামিন স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে, ফলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হয়ে ওঠে, যা নজরে পড়ে! এই ভিটামিনটির ক্রিয়া আর ফর্সা-ত্বক ওয়ালা লোকের ত্বকের ভেতরের মেলানিন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে প্রকৃতির যে ক্রিয়া তা বলতে গেলে একই রকমের। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ছেঁকে বাদ দেয়। এইভাবে আপনার ত্বক রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, অথচ সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে।

৬ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মাখুন, তারপর দেখুন কি তফাৎ!

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল নিজে চোখে দেখা। ছ'সপ্তাহ নিয়মিত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী ব্যবহার করুন। তফাৎ নিশ্চয়ই নজরে পড়বে আপনার! অন্যদেরও! হাজার হোক, এটি প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে। আর সেইজন্যেই তো আপনার ত্বকে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কাজ এত সহজে হয়!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী রঙ ফর্সা করার ক্রীম তো বটেই...আরো কিছু

আপনি উপভোগ করবেন ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কোমল স্পর্শ আর মনোরম সুগন্ধ! দিনে অন্ততঃ একবার ব্যবহার করুন, সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে দুবার! নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হবে, যা নজরে পড়বে, আর প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে ঐ রকমই থাকবে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী
ফর্সা হবার এক কোমল উপায়

লিনটাস-FALOV.8-2418 BG (R)

অমিয়া ঠাকুর। ফটো : অজিত সেন

বর্ষীয়সী। তিনি কাশীতে মানুষ হয়েছিলেন। সেখানে ভজন গানে তাঁর খুব সুনাম ছিল। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একাধিকবার শান্তিনিকেতন থেকে আহ্বান পেয়ে তিনি সেখানে আসেন এবং কবিগুরুর স্নেহলাভে ধন্য হন। নৃত্যনাট্যগুলি রচনার সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাদের ক্রমবিকাশ লক্ষ করেন এবং নিজেও সেগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ—এই তিনজনের কাছ থেকেই তিনি তাঁর শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়েছেন। পুরোনো দিনের লোকেরা সকলেই তাঁর বলিষ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠের গান শুনেছেন, তাঁর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি অল্প কয়েকটি গান শোনালেন। সেগুলির মধ্যে "আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা" এবং 'জগতে আনন্দযজ্ঞে' গান দুটি ভাল লাগল। একটি মীরার ভজনও তিনি গাইলেন;—বিখ্যাত "শুনি ম্যায় হরি আওন কি আওয়াজ"। তিনি যে সুরে গাইলেন সেইটিই আমাদের পরিচিত।

অনুষ্ঠানটি একান্তই ঘরোয়া। আহ্বায়ক শ্রীঅশোককুমার সরকার একটি ক্ষুদ্র ভাষণে অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। অপর যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীসন্তোষকুমার দে এবং শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

রাজ্যেশ্বর মিত্র

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

ট্রুসি

দেখতে গেলাম চলচ্চিত্র—ফিরলাম একটি নাট্যাভিনয় দেখে। যা দেখলাম তা হল : শর্মিষ্ঠা (সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়) নামক এক মহিলা তার শিশুকন্যা ট্রুসিকে নিয়ে উপস্থিত হল চৌধুরী-বাড়িতে নিজেকে ওই বাড়িরই ছোটছেলে কমলকান্তির (সন্তু মুখোপাধ্যায়) স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে। বড়ভাই বিমলকান্তি (অনিল চট্টোপাধ্যায়), সেজভাই শ্যামলকান্তি (অনুপকুমার), এবং বড়বউ শশীসুধা (সুব্রতা), মেজবউ মাধুরী (সোমা দে) ও সেজবউ সুপ্রিয়া (শিবানী বসু) সকলেই শর্মিষ্ঠার কথা বিশ্বাস করল। বিশ্বাস করল না কেবল মেজভাই অমলকান্তি (দিলীপ রায়)। অমল উঠেপড়ে লেগে গেল শর্মিষ্ঠার কথা মিথ্যা প্রমাণ করতে। আর বিমল চায় শর্মিষ্ঠার জীবনের আসল রহস্য উদ্ঘাটন করতে। শেষে দেখা গেল অমল তার জিদ বজায় রেখে শর্মিষ্ঠাকে এ-গৃহ থেকে বিতাড়িত করতে একটা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বিমল পুলিসের সাহায্যে জুয়াড়ি ও মাতাল পলাতক ছোটভাই কমলকে পাকড়াও করে আনে। কমল স্বীকার করে শর্মিষ্ঠা তার স্ত্রী এবং ট্রুসি তারই সন্তান।

কাহিনীর আধার সমরেশ বসু রচিত 'পরের ঘরে আপন বাসা'। কাহিনীটির অভিনবত্ব এবং চারিত্রিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও চিত্রনাট্যকার-পরিচালক গুরু বাগচী সেটি বিন্যস্ত করেছেন দূরদর্শনের নাটকের ধাঁচে। স্রেফ আবেগ-মাখানো কতকগুলি দৃশ্য তিনি পর পর সাজিয়ে গিয়েছেন। ট্রুসির নামে নামকরণ কিন্তু প্রধানচরিত্র সে নয় বা শর্মিষ্ঠাও নয়—পর্দায় তাদের যেভাবে দেখানো হয়েছে তাতে মনে হয় ওরা ঘটনাবলীর উপলক্ষ মাত্র। যা দেখা যায় তাতে প্রধানচরিত্র বিমলকান্তি আর খলনায়ক অমলকান্তি। শর্মিষ্ঠা ও ট্রুসি চৌধুরী বাড়িতে উপস্থিত হওয়া মাত্রই অমলকান্তি ছাড়া আর সকলেরই কাছে ওরা দীর্ঘদিন পর ফিরে পাওয়া আপনজন হিসেবে চট করে যেমন স্বীকৃতি লাভ করে, তেমনি ওদের দেখামাত্রই অমল-

অনিল চট্টোপাধ্যায়

কান্তির বিরূপতা—সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যেই কেমন যেন একটা কৃত্রিমতার ছাপ। চলচ্চিত্রের যে একটা নিজস্ব ভাষা আছে যা তার প্রকাশভঙ্গিতে একটা স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়—ট্রুসি দেখে তা উপলব্ধি করা যায় না। তবে ঘটনার পরিবেশ আবিলমুক্ত এবং একটা অন্তরঙ্গ পারিবারিক আবহাওয়া উপলব্ধি করা যায়। অনুপকুমর বলেই তার অভিনীত চরিত্র শ্যামলকে ভাঁড় না সাজালেও চলতো। আর, 'যত নষ্টের গোড়া' কমলকান্তিকে শেষদৃশ্যের আগে পর্যন্ত অলক্ষে রেখে যে 'সাসপেনস' সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে সেটা দর্শকদের ধোঁকা দেবারই নামান্তর। ট্রুসিকে নিয়ে শিশু থেকে দশ-বারো বছরের ছেলেদেরও মাতামাতি বেখাপ্পা।

'ট্রুসি'-কে দর্শনীয় করে তোলার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন অভিনয়শিল্পীবৃন্দ। যাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, অনুপকুমার প্রমুখ। জালিয়াৎ-চক্রের সহচরের চরিত্রে দেখা যায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর অভিনয়ভঙ্গি যা তিনি অবলম্বন করেছেন তার দ্বারা কি তিনি জহর রায়ের শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইছেন?

পঙ্কজ দত্ত

কলকাতায় চলচ্চিত্রোৎসব

রাজ্য সরকারের জনসংযোগ ও তথ্য দপ্তর এবং ফেডারেশন অফ ফিলম সোসায়েটিজের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্রোৎসবে যে আঠারোটি *ছবি দেখান হয়েছে তার অনেকগুলির* সঙ্গেই এদেশের চিত্রামোদীরা পরিচিত। চ্যাপলিনের "গোলড রাস" (১৯২৫) বা পুদভকিনের "স্টরম ওভার এশিয়া" (১৯২৯) নির্বাক-যুগের দিকচিহ্নস্বরূপ। এই বহু-আলোচিত ছবি দুটি সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা ছবি দুটি আগে দেখেন নি তাঁরা অবশ্য এই উৎসবে তা দেখবার সুযোগ পেলেন—এইটুকুই নীট লাভ।

বাকি ছবিগুলি— বারগম্যানের "ডেভিলস আই" (১৯৬০) বাদে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৬ এই ন' বছরের ফসল। অর্থাৎ নির্মাতা দেশগুলির সমসাময়িক ভাবধারা ও চিত্রশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায় এই সব ছবির মাধ্যমে। চলচ্চিত্রোৎসবের অন্যতম সার্থকতা এইখানে।

নবজাগ্রত চীনের ছবি "হাই-শিয়া" দিয়ে উৎসব শুরু করবার পরিকল্পনাটি অভিনন্দনযোগ্য। কারণ ওদেশের বিপ্লব পরবর্তী ফিল্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। ফটোগ্রাফি, রঙের সুষম ব্যবহার, পরিবেশ রচনা, অভিনয়ের স্বাভাবিকতা —সব দিক দিয়েই ফিল্মশিল্পে চীনের অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায় ছবিটির মধ্যে। উৎসবের শুরুতেই চীনা ছবিটি তাই বেশ চমক সৃষ্টি করে দর্শকদের মনে।

চীনের সংলগ্ন একটি ছোট দ্বীপের জেলেদের নিয়ে এর গল্প। এরা সবাই কায়েমী স্বার্থের শিকার। মহাজনের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় হাই-শিয়ার বাবা ও কাকা অকালে প্রাণ হারায়। তার মা-ও মারা যায় না খেতে পেয়ে। এক বুড়ো জেলের আশ্রয়ে হাই-শিয়া বড় হয়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালে চিয়াং কাইশেকের লুটেরার দল যখন দ্বীপটি অধিকার করতে আসে তখন চীনের মুক্তি বাহিনী তাদের তাড়িয়ে দ্বীপটিকে মুক্ত করে। তারপর শুরু হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে প্রতিরোধ-বাহিনী গঠনের ব্যাপক উদ্যোগ। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও যোগ দেয় তাতে। হাই-শিয়ার নেতৃত্বে মেয়েবাহিনী শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে। তারই চেষ্টায় শত্রুপক্ষের এক গুপ্তচরের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। স্বাধীনতার মূল্য যে অতন্দ্র প্রহরা এই তত্ত্বের ওপর ছবিটি শেষ করা হয়েছে।

কাহিনীর বিস্তারে বিশেষ কোন মারপ্যাঁচ নেই—সোজা রেখায় তা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে। শিল্পীরা সবাই স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। সবচেয়ে ভাল লাগে হুয়া-সিয়াবেশিনী কিশোরী অভিনেত্রীটিকে যাঁর হাসি-কান্নায় ভরা সাবলীলতা দর্শকদের মন সহজেই

আলজীরিয়ার "জেড" ও কিউবার "মেমরিজ অফ আন্ডার-ডেভেলাপমেণ্ট." আগে একাধিকবার প্রদর্শিত হলেও, এই উৎসবের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলা চলে। রাজনীতির পঙ্কিল স্রোতে নাগরিক জীবন কীভাবে বিপন্ন *হয়ে ওঠে তারই চাঞ্চল্যকর কাহিনী* দুটি ছবিরই ভিত্তি। "জেড"-এ দেখান হয়েছে প্রতিপক্ষের এক নেতাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ক্ষমতাসীন দল কীভাবে তা পথ-দুর্ঘটনা হিসেবে চাপা দেবার চেষ্টা করে। অনেক সাংবাদিকের অনুসন্ধানের ফলে যখন আসল সত্য প্রকাশিত হয়, তখনও নিম্নতম কর্মচারীকে নামমাত্র সাজা দিয়ে যারা আসল দোষী ষড়যন্ত্রকারী সেই ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

কিউবার ছবিটির নায়ক এক বুদ্ধিজীবী লেখক যে ফিডেল কাস্ট্রোর অভ্যুত্থানের পরেও ঐ দেশেই থেকে যায়। তার আত্মীয়স্বজন এমন কি তার স্ত্রীও, আমেরিকায় পাড়ি দেয়। কিন্তু নায়ক যায় না. সে রাজনীতির নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে যাচাই করতে চায়। নানা ঘটনা পরম্পরায় দেখান হয়েছে কীভাবে নায়কের সমস্ত মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে এবং অবশেষে নিজের সত্তা সম্বন্ধেও তার অবচেতন মনে সন্দেহ জাগে।

দুটি ছবিই তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে আঙ্গিকের সুকল্পিত ব্যবহারে এবং পরিচালনার কৃতিত্বে। বিশেষ করে শেষোক্ত ছবিতে রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে নায়কের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে যেভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তা পরিচালক টমাস গুটিয়েরেজ আলিয়ার সৃজনশীল প্রতিভার পরিচায়ক। "জেড"-এর পরিচালক কস্টা-গাভরাসও জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন ঐ ছবিটির জন্যে।

সুইডেনের ইংমার বার্গম্যান ও ফ্রান্সের আলাঁ রেনে দুজনেই দিকপাল পরিচালক। ওঁদের [illegible] দুটি দেখে কিন্তু কিছুটা নিরাশ হতে হয়। তুলনামূলক বিচারে ছবি দুটি নিশ্চয়ই ওঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। তবে পরিচালকদের মুনশিয়ানার ছাপ আছে, দুটি ছবিতেই।

বার্গম্যানের "দি ডেভিলস্ আই" প্রহসনধর্মী কাল্পনিক কাহিনী। নরকাধীশ শয়তান চোখের যন্ত্রণায় ভুগছে। যন্ত্রণার কারণ এক বাগদত্তা তরুণীর অটুট কুমারীত্ব। ডাক পড়ল ডন জুয়ানের, বহু নারী ধর্ষণ করে যে এখন নরকবাসী। ডন জুয়ানকে পাঠান হল মর্ত্যে মেয়েটির কুমারীত্ব নষ্ট করতে। সঙ্গে গেল তার পেয়ারের ভৃত্য পাবলো। মেয়েটি এক পাদ্রীর কন্যা, যার মা চিররুগ্না। পাদ্রীর গৃহে একরাত্রি কাটাতে এসে নরকের দুই দূত কী ওলোট-পালোট ঘটিয়ে গেল তাই নিয়ে কাহিনীর বিস্তার। পাদ্রী গৃহিণী পাবলোর অঙ্কশায়িনী হলেও ডন জুয়ান কিন্তু মেয়েটিকে বশে আনতে পারল না একটি চুমু আদায়

[illegible] ছায়া মজুমদার

…ডেভিল্‌স আই

…াধির উপশম হল। কারণ বিয়ের …াতে মেয়েটি স্বামীকে বলল (যেমন …ব মেয়েই তাদের স্বামীদের বলে …াকে) যে বিয়ের আগে কোন দ্বিতীয় …রুষকে সে চুম্বন করেনি। ব্যঙ্গের …ক্ষ এখানে সুস্পষ্ট। শুধু এই-…কুতেই কিন্তু মন ভরে না। …াগম্যানের ছবিতে দর্শকরা অনেক …বেশী গভীরতা প্রত্যাশা করে। নিরাশ …বার কারণ সেইখানে।

আলা রেনের "স্ট্যাভিসকি" …ানসের রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের একটি

…্যাভিস্কী

…টনাকে কেন্দ্র করে তোলা। জেল-…ফরৎ এক প্রবঞ্চক ঘটনাচক্রে উচ্চ …মাজের কেন্দ্রমণি হয়ে কীভাবে …দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে …দিয়েছিল তাই নিয়ে কাহিনীর …বিস্তার। সে সময়ে ট্রট্‌স্কি আশ্রয়ের …খোঁজে ফ্রানসে রয়েছেন। রেনে যেন …ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন—ফ্রানসের …তখন দুটি মাত্র পথ খোলা : কমিউ-…নিজম অথবা প্রবঞ্চকদের শাসন। প্রায় …রূপকথার ধাঁচেই রেনে বুর্জোয়া …সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরতে …চেষ্টা করেছেন ছবিটির মধ্যে। তবে …রেনে সোজাসুজি কিছু বলেন না। …তাঁর ছবিতে সময়ের পরম্পরার কোন …বালাই নেই। তাই বুঝতে অসুবিধা …য়, দর্শকদের বিভ্রান্তির কারণ ঘটে। …"স্ট্যাভিসকি" এই সব দোষ মুক্ত নয়। …নাম-ভূমিকায় জাঁ পল বেলমোনডোর …অনবদ্য অভিনয় অবশ্য মনকে অনেক-…খানি ধরে রাখে।

পোল্যানডের চিত্রজগতে জানুসি…

ছবি "দি স্ট্রাকচার অফ ক্রিস্ট্যালস"-এ পরিচালকের সৃজনশীল প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। ছবিটি বর্তমান উৎসবের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।

দুই বন্ধুকে নিয়ে গল্প। দুজনেই পদার্থবিদ। জ্যান থাকে গ্রামে, আবহাওয়ার গবেষণায় রত। ম্যারেকও গবেষণা করে—ক্রিস্ট্যালের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে। রাশিয়া থেকে আমেরিকা সারা বিশ্বে তার নামডাক। অনেকদিন বাদে দুই বন্ধুর মিলন ঘটেছে জ্যানের গ্রামের বাড়িতে। জ্যান বিয়ে করেছে। তার স্ত্রী স্থানীয় স্কুলে পড়ায়। ম্যারেক জ্যানকে বোঝাতে চেষ্টা করে তার মত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের স্থান শহরে, গ্রামের আবহাওয়ার চেয়ে অনেক বড় গবেষণায় তার আত্মনিয়োগ করা উচিত। দুই বন্ধুর মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। জ্যানের স্ত্রী আনা মন দিয়ে শোনে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে বুঝি ম্যারেকের দিকে একটু বেশি ঝুঁকেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। জরুরী কাজের ডাকে ম্যারেক শহরে ফিরে যায়। জ্যান তার অভ্যস্ত জীবনের মধ্যেই স্বস্তির আস্বাদ পায়। ওদের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ইঙ্গিত থাকে কোনটার মূল্য বেশী—জড় বিজ্ঞান না মানসিক উপলব্ধি ? উত্তর খুঁজে নেবার দায়িত্ব দর্শকদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জানুসির পরিচালনার বৈশিষ্ট্য কোনরকম মেলোড্রামার অবতারণা না করে চরিত্রদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ মানবিক ভিত্তির ওপর ফুটিয়ে তোলা। এদিক দিয়ে "ক্রিস্টালস্" একটি অসাধারণ ছবি।

যুগোশ্লাভিয়ার "আইডিয়া-লিস্ট" বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রায় ভারতীয় ছাঁচে গড়া। আদর্শবাদী এক শিক্ষকের উত্থানপতন নিয়ে এর গল্প। প্রথম যৌবনে শিক্ষার বিস্তারের জন্যে সে অনেক লড়েছে। তার কথায় কেউ কান দেয়নি। বরং চাকরির ক্ষেত্রে ক্ষতিই হয়েছে সেজন্যে। বিয়ে-থা করে সংসারী হবার পর তার আদর্শ-বাদে ভাঁটা পড়েছে, জীবনের সঙ্গে সে আপোস করতে শিখেছে। ইতিমধ্যে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। নায়ক একদা যেসব আদর্শের কথা বলত তারই প্রতিধ্বনি করে যারা তার বিরুদ্ধপন্থী ছিল তারাই আসর জমিয়ে বসেছে। আর নায়ক অনেক নীচে নেমে গেছে—সুরায় আসক্তি ও পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে। আত্ম-হননের ইঙ্গিত দিয়ে ছবিটি শেষ হয়েছে। পরিচালক ইগর প্রেটনার নায়কের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কনট্রাস্টটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে ছবির গতি অত্যন্ত মন্থর। ফলে জায়গায় জায়গায় রসহানি ঘটেছে।

হাঙ্গেরির প্রাইজ-পাওয়া ছবি "ড্রীমিং ইয়ুথ"-ও আদর্শের লড়াইয়ের কাহিনী। তবে নৈরাশ্যের মধ্যে তা শেষ হয় নি। বরং এর বালক নায়ক যেভাবে নিজের অসহায়তা ঝেড়ে ফেলে শেষ দৃশ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে আভাস রয়েছে নতুন ভবিষ্যতের—দেশে

...কতে। জ্যানস রোজা একাধারে এর পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার।

“অন এ সিলভার প্ল্যাটার” পশ্চিম জার্মানির ছবি। এর নায়ক এক বৃদ্ধ শিক্ষক বারলিনে যার মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু নেই, অথচ শীতের মরসুমটা দক্ষিণাঞ্চলে কাটিয়ে আসবার স্বপ্ন দেখে সে জীবনভোর। সেজন্যে চুরিজোচ্চুরি করেও ব্যাংকে টাকা জমায় সে তিল তিল করে। যুগোস্লাভিয়ার একটি নিরাশ্রয় মেয়ের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। মেয়েটি যখন দেশে ফিরে যায় তখন হতাশা ভেঙে পড়ে বৃদ্ধ। একজন পুলিস কর্মচারী বৃদ্ধের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারই পরামর্শে দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে যাবার সব ব্যবস্থা পাকা করেও বৃদ্ধ বারলিন ছাড়তে পারে না। নিটোল গল্প বলতে যা বোঝায় এ ছবিতে তা নেই। তবে চরিত্রাংকনের অভিনবত্ব ছবিটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বৃদ্ধ শিক্ষকের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন ...ইন রুম্যান। পরিচালকের নাম ...ইকেল ভেরোভেন।

পূর্ব জার্মানির ছবি “ডেসলাইট ভেরিথিং” (পরিচালক : গানটার ...ইখ) ওদেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের রক্তাক্ত কাহিনী। এই ...নের ছবিতে যে ধরনের বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের সংগ্রাম দেখা যায় সেই ধাঁচেই মূল কাহিনী বিন্যস্ত। কার্ল লিবনেট ও রোজা লুকসেমবার্গের নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা...কায় বিপ্লবীদের অবিস্মরণীয় অবদানের কথাই বলা হয়েছে নতুন ...রে।

বাকি ছবিগুলির মধ্যে হাঙ্গেরির “দ কনফ্রনটেশান”-এ নতুন ধারায় গল্প-বলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৭৪ সালে ওদেশে ছাত্র আন্দোলন শুরু ...শিক্ষাকে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত করতে। বিরোধ বাধে ক্যাথলিক ও অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে। ...উজিক ও মাস ড্রিলের মাধ্যমে সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। পুলিস আসে, আন্দোলনকারীরা তাড়া খায়, কিন্তু সংগ্রামের শেষ সেখানে ... না।

জাপানের ছবি “দি বয়” এদেশে আগেই দেখান হয়েছে। মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ এর বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে একটি ছোট ছেলেকে ঘিরে যার বাপ-মা তাকে রুজি-রোজগারের ফিকির হিসেবে ব্যবহার করে। পন্থাটি অভিনব—চলন্ত গাড়ির সামনে দুর্ঘটনার অভিনয় করে মোটরের আরোহীর ঘাড় ভাঙা। পুলিস হাঙ্গামার ভয়ে অনেকেই নগদ টাকার বিনিময়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে চায়। যেখানে তা হয় না সেখানে ছেলেকে নিয়ে বাপ-মাই কেটে পড়ে। ছেলেটির চোখ-দিয়ে-দেখা বড়দের এই নিদারুণ পৃথিবীর ছবি নাগিসা ওসিমার পরিচালনার গুণে বিশেষভাবে মনকে স্পর্শ করে।

সোভিয়েত রাশিয়ার “রোমিও জুলিয়েট” দিয়ে চলচ্চিত্রোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। এ ছবিটিও পূর্বপ্রদর্শিত ছবিগুলির অন্যতম। ব্যালের মাধ্যমে যেভাবে এই বিখ্যাত প্রণয়-কাহিনীটি রূপায়িত হয়েছে তা সত্যিই তুলনাবিহনী।

আরো চারটি ছবি উৎসবের তালিকায় ছিল। সেগুলি দেখবার সুযোগ ঘটেনি লেখকের। তবে উৎসবের রেকর্ড হিসেবে সেগুলির নাম এখানে দেওয়া হল : মিশরের “আরথ” (পরিচালক : ইউসুফ শানিন), ভিয়েতনামের “উই শ্যাল মীট এগেন অ্যাজ প্রমিসড” (পরিচালক : ট্রান-ভু), বুলগেরিয়ার “অ্যামেনডমেন্ট টু দি ডিফেন্স অব দি স্টেট অ্যাক্ট” (পরিচালক : এনজেল ভ্যাগেনস্টাইন) এবং ফ্রান্সের “৩৬ লা গ্রানড তুরনানট” (পরিচালক : হেনরি দা তুরেন)।

তৃতীয় বিশ্বের ছবি দেখাবার আগ্রহ নিয়ে উদ্যোক্তারা এই চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেও নানা কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবুও উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই এই কারণে, যে-সব ছবিগুলি বাছাই করে তাঁরা

বয়

দেখিয়েছেন উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাদের অধিকাংশই মনে রাখবার মত। আন্তর্জাতিক উৎসবের সুযোগে যে ধরনের নগ্নদৃশ্যের বাড়াবাড়ি দেখা যায় পশ্চিম দুনিয়ার ছবিগুলির মধ্যে, আলোচ্য উৎসবে তা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হওয়ায় অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। সেজন্যেও উদ্যোক্তারা ধন্যবাদের পাত্র।

মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

হরেন দাস (১৯২৯—)

ভারতবর্ষের ছাপাই ছবির প্রকৃত ইতিহাস লেখা হলে হরেন দাসের অবদান অবশ্যই স্বীকৃতি পাবে। বিশেষত কাঠখোদাই, কাটাই, ধাতু খোদাই-এ (woodcut, wood engraving, engraving) তাঁর নৈপুণ্য এবং সূক্ষ্ম রসবোধের যে সমন্বয় করেছেন তার তুলনা নেই। শান্ত নির্বিরোধী এই শিল্পী। রমেন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র।

সরকারী চারু এবং কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর স্নাতক তিনি (১৯৪৪)। শিল্পশিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দু বছর পরে (১৯৪৬)। ১৯৪৭ থেকে কলকাতা সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাপাই ছবি বিভাগের প্রধান।

হরেন দাস বারবার পুরস্কৃত হয়েছেন। যথা—অ্যাকাদমী অব ফাইন আর্টসের স্বর্ণপদক (১৯৪৯, '৫০, '৫৪), রৌপ্যপদক (১৯৪৮)। শ্রেষ্ঠ প্রদর্শিত শিল্পকলার জন্যে হায়দ্রাবাদ আর্ট সোসাইটির স্বর্ণপদক এবং রৌপ্যপদক (১৯৪৯)। পাটনা শিল্পকলা পরিষদের স্বর্ণপদক (১৯৫০, '৫১, '৫৮)। মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব পেন্টার্সের স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত ফলক (১৯৫৮)। মহীশূরের রাজার দশেরা প্রদর্শনীর স্বর্ণপদক (১৯৫৩)। নতুন দিল্লির অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস সোসাইটি, সংক্ষেপে আইফেকসের নগদ পুরস্কার (১৯৫০, '৫১, '৫৬)। অমৃতসরের ইণ্ডিয়ান আকাদেমী অব ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটসের প্রদর্শনীর নগদ পুরস্কার (১৯৫২)। হায়দ্রাবাদের আর্টস সোসাইটির নগদ পুরস্কার (১৯৫৫)। মহীশূররাজের দশেরা প্রদর্শনীর নগদ পুরস্কার (১৯৫৫, '৫৬, '৫৭)। এ ছাড়া পেয়েছেন অসংখ্য কাপ, মেডেল, শংসাপত্র।

ভারতীয় ছাপাই ছবির বিবর্তনের ইতিহাসে হরেন দাস কিন্তু নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। ইংরেজ আসার পর থেকে ছাপাই ছবির গতিপ্রকৃতি আলোচনার স্থান হয়তো এটা নয়। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন গগনেন্দ্রনাথের পাথরছাপ ছবি করা থেকে তিরিশের দশকে নন্দলাল এবং তদীয় শিষ্যদের ছাপাই ছবির নানা মাধ্যমে কাজ করা বলা যেতে পারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর পরের ঘটনা হলো রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সরকারী চারু এবং কারু বিদ্যালয়ে (তাঁর চেষ্টায় মহাবিদ্যালয় হয়) যোগদান। রমেন্দ্রনাথ যেমন প্রদোষ দাশগুপ্তকে ভাস্কর্য এবং গোপাল ঘোষ ও রথীন মৈত্রকে চিত্রকলা বিভাগে গ্রহণ করেন, তেমনি হরেন দাসকে নেন ছাপাই ছবির জন্যে বেছে।

কাঠখোদাই কত পুরনো এবং সম্ভাবনাময় মাধ্যম। চীন-জাপানে এই মাধ্যমে অসাধারণ কাজ হয়েছে। ছাপা বইয়ের সচিত্রকরণে লাগানো হয়েছে সব দেশে। চিৎপুরের কারিগরেরা তো সে কাজ এ দেশেও করেছে। টমাস বিউইক হাতের স্পর্শে এই নেহাত কারিগরি বিদ্যা পরিণত হয় আশ্চর্য শিল্পসম্ভারে। দিল্লির চতুর্থ ত্রিয়ানালেতে ইউগোস্লাভিয়ার মারশেদ বারবার কাঠখোদাইতে নানা রঙের টোন বা ছায়ের কাজ করে আমাকে পাগল করে দিয়েছেন। চীন দেশের "ক্লেমোজাইলোগ্রাফ" পদ্ধতির সঙ্গে নিজের উদ্ভাবিত কায়দায় নানা সূক্ষ্ম ছোট ছোট খোঁচ ব্যবহার করে বারবার প্রমাণ করেছেন বড় শিল্পী হতে গেলে তন্ময় এবং পরিশ্রমী হতে হয়। ফাঁকিবাজির সঙ্গে গলাবাজি যোগ করে সাময়িকভাবে খ্যাতি এবং পদ লাভ করা যায়। টমাস বিউইক, এলব্রেকট ড্যুরার বা মারশেদ বারবার হরেন দাস নন। সাধারণ মাপের অসাধারণ শিল্পী।

তাঁর এচিঙ, এনগ্রেভিং এবং কাঠখোদাইয়ের মধ্যে যে রুচি এবং মেজাজ প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা নেই। পরবর্তী প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ছাপাই ছবির কোনো কোনো শিল্পী হরেন দাসের ছাত্র ছিলেন—যথা, সোমনাথ হোড়, অরুণ বসু, শক্তি বর্মণ থেকে তরুণতর তপন ঘোষ পর্যন্ত তাঁর ছাত্রের সংখ্যা কম নয়। হরেন দাস এমন উদ্যানরক্ষক

যাঁর হাতের স্পর্শে লতায় বৃক্ষের নিজস্ব গড়নে আঘাত লাগে না।

"পায়রার ঘর" ছবিটিতে (কাঠখোদাই ৮¼″ × ৬¾″) নীল হলুদ সবুজ নিয়ে মোহময় দৃশ্য রচনা করেছেন। পশ্চাৎপটে মাটির ঘর, গাছপালা আর সম্মুখপটে গাছের ওপর পায়রার ঘর, নীচে জল খাওয়ার পাত্র আর পায়রার নানা ভঙ্গীকে ধরেছেন। সম্মুখপট এবং পশ্চাৎপটের মধ্যবর্তী অংশের দূরত্ব এনেছেন হলুদ এবং ধূসরের নিপুণ ব্যবহারে। গাছের ছায়াকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। সামনে পেছনে গাছের পাতার মধ্যেও অনেক সূক্ষ্ম কাজ আছে।

হরেন দাস বাস্তববাদী শিল্পী অথচ কারিগরি দক্ষতার ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হয়ে ছাপাই ছবিকে কিভাবে শিল্পমাধুর্য দান করতে হয় তিনি জানেন। কাঠখোদাইয়ের মধ্যে সাদা-কালোর কন্ট্রাস্ট—কালো কখনো ঘন চাপ চাপ, কখনো রৈখিক—তাঁর হাতে কবিতা হয়ে গেছে। কখনো কালো ক্রমে ধূসর ছায় নিয়ে নিজেকে বদলেছে। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির রূপ এবং শহরগঞ্জের সৌন্দর্যদৃশ্য সম্বন্ধে তিনি আমাদের সচেতন করেছেন। শুধু নিসর্গ নয়, সাধারণ আটপৌরে জীবনের দৃশ্যের নান্দনিক মজাটুকু এনেছেন ছন্দোবন্ধনে। গভীর কোনো দর্শন নয়, কিন্তু চাক্ষুষী মায়া

ভিভা
স্ট্যামিনা বজায় রাখে
আর রাত-ভর
বিশ্রাম দিয়ে সকালে
একদম চাঙ্গা করে তোলে।
ভিভা দিন-ভর দারুণ স্ট্যামিনা
বজায় রাখে!
রাতে আপনার শক্তি
পুনরুদ্ধার করে ভিভা!
রাতে শোয়ার সময় এক কাপ
গরম, তৃপ্তিদায়ক ভিভা,
এনে দিয়ে, পুরোপুরি বিশ্রামের
যোগায়। ফলে, ভোরবেলা আপনি
জেগে ওঠেন নতুন শক্তি নিয়ে।
JIL
জগৎজিত ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড
পো. অ. জগৎজিত নগর, জিলা কপুরতলা (পাঞ্জাব)
ViVA
The Day and Night Health Drink
BUILDS UP STAMINA
আপনি কি জানেন?
DEPTH OF SLEEP
Hours
0 1 2 3 4 5 6 7 8
আপনাকে ঘুমের সঠিক স্তর নিয়ে
পুষ্টির যোগান দেয়। তার ফলে,
আপনি পরদিন সকালে জেগে ওঠেন
নতুন শক্তি নিয়ে।
মজাদার
ভিভা
দিন ও রাতের জন্যে
বলদায়ক পানীয়।
ASP JIL 1A-78
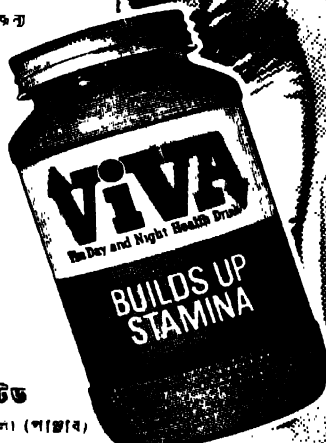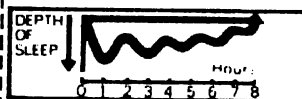
অমর জ্যোতি।

আপনার শিশুর প্রথম শক্ত আহার

নেস্টাম

বেবী সিরিয়েল

যাতে আছে চাল-এর পুষ্টি

তা ছাড়া
১১টি ভিটামিন
ও লৌহ উপাদান

কোটানো দুধ ঢেলে দিন

দুধে নেস্টাম মিশিয়ে দিন

এবার খেতে দিন

আপনার শিশুকে শক্ত আহার দেবার সময় হলে তাকে দিন সুস্বাদু চাল-এর পুষ্টি। এই শক্ত আহারে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থ এবং ১১টি ভিটামিন ও লৌহ উপাদান।

নেস্টাম ক্রীম অফ রাইস সুষম শক্ত আহার। তাছাড়া হজম করাও সহজ।

২ মাস বয়স থেকে বেড়ে ওঠার জন্য প্রত্যেক শিশুর প্রয়োজন সুষম শক্ত আহার—নেস্টাম বেবী সিরিয়েল।

আপনিও ২ মাস বয়স থেকেই আপনার শিশুকে নেস্টাম দিতে আরম্ভ করুন। নেস্টাম-এ আছে পুষ্টি, নেস্টামে-এ আছে স্বাস্থ্য।

স্বাদে ও সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্য নেস্টাম দুধে মিশিয়ে খেতে দিন।

সর্বাধিক মূল্য
৭.০০ টাকা
স্থানীয় কর
আলাদা

সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্য
সুষম এ আহার
দুধে মিশিয়ে খেতে দিন

NBC/CAS-2/78 BEN

চিঠিপত্র

কঃ পন্থা

কঃ পন্থার ওপর শ্রীজিনা শর্মার ৮ জুলাই-এর চিঠি পড়লাম। মানুষকে যন্ত্রের মত কাজ করতে হবে ভেবে তিনি আতঙ্কিত। আসলে তাঁর ধারণাটাই ভুল। বর্তমান জীবনব্যবস্থায় নিঃস্ব মানুষেরা যন্ত্রের থেকেও বেশী জড় ও যান্ত্রিক। দিবারাত্র রুটি-রুজির চিন্তায় প্রতিটি অন্নহীন হাড়জিরজিরে দুঃস্থ মানুষ যেন এক-একটি ভাঙা ঝুটো অকেজো মেশিন। সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থায় সেই যান্ত্রিকতার অবসান হবে। চীনের চাষী-শ্রমিক কি কবিতা লেখে না?

শ্রীশর্মা অশোকবাবুর প্রবন্ধ ভাল-ভাবে পাঠ করেননি কিংবা তাঁর উপলব্ধিতে ভুল রয়ে গেছে। বিগত দীর্ঘ গোটা তিরিশ বছরেও আমাদের দেশের শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি পারেনি মাত্র দেড় কোটির বেশী লোকের কর্ম-সংস্থান করতে। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ৬২ কোটি (?)। ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। ৭০ শতাংশ এত গরীব যে নুন-ভাত জোটে না। ৬৫ ভাগ লোক একেবারেই নিঃস্ব —ভূমিহীন মজুর বা ছিটেফোঁটা জমির মালিক। শহরের সমস্ত বেকারকেও যখন চাকরি দেওয়া শিল্পের পক্ষে সম্ভব হয়নি তখন আশ্চর্য কি যে দেশের অর্থনীতির উন্নতির জন্যে গ্রাম-ভিত্তিক অর্থনীতিকেই আশ্রয় করতে হবে? গ্রাম-ভিত্তিক অর্থনীতি বলতে আমরা সমবায়মূলক কৃষি ব্যবস্থার ও কুটীর শিল্পের উন্নতিকেই বুঝব। ভারতবর্ষের মত বিশাল কৃষিভিত্তিক দেশের মানুষের জীবনমান সামগ্রিকভাবে উন্নতির জন্য একমাত্র গ্রামভিত্তিক অর্থনীতিকেই মানতে হবে। বস্তুত, সমবায়ভিত্তিক কৃষিকার্যে এত কাজ আছে যার জন্য শ্রমের টান পড়বে। এটা কিছু অতিরঞ্জন নয়। এর জন্য অন্যান্য কিছু শর্ত আছে। আমাদের দেশে, যে শিল্পেই হোক আর কৃষিতেই হোক কম শ্রমে বেশী উৎপাদন—এই নীতিকে অবিলম্বে নস্যাৎ করে অধিক শ্রমে অর্থাৎ অধিক কর্মসংস্থানে প্রয়োজনীয় উৎপাদন—এই নীতিকে গ্রহণ করা দরকার। এ সবই অশোকবাবুর অন্যান্য প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

বৃদ্ধদের সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ নেই। সমবায় যদি সামগ্রিকভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকে সেখানে অংশীদার যা উৎপাদন করবে তার সবটাই সে পাবে না। সে পাবে প্রয়োজনমত। তার প্রয়োজনের মধ্যে বৃদ্ধ বাপটিও থাকবে। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধেরা তো সরকার থেকেই পাবে। কোন সমাজবাদী সমাজ-তান্ত্রিক দেশেই অশক্ত ও বৃদ্ধদের মেরে ফেলা হয় না।

শ্রীশর্মা অভিযোগ এনেছেন, শুধু গ্রামের জমির ওপরেই ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের কথা ভাবা হয়েছে, শহরের জমির ওপর থেকে নয়। এতে কোনই ভুল নেই। ভুলে যাওয়া উচিত হবে না কৃষিব্যবস্থার আমূল উন্নতিই আমাদের উদ্দেশ্য এবং হাজার হাজার বিঘা কৃষিযোগ্য জমি গ্রামেই আছে শহরে নেই বললেই চলে। শহরে কৃষির উন্নতি—ব্যাপারটাই হাস্যকর। ১৯৭১-এর আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা ৫,৭৬,৩৪০ এবং শহরের সংখ্যা মাত্র ২,৯২১। তা ছাড়া, আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, শহরে বসবাস করে এরকম বহু ধনীলোকের গ্রামে বহু জমি আছে। শ্রীশর্মা বাস্তব উপেক্ষা যতটা না করেছেন তার থেকে নিছক অ্যাকাডেমিক বিতর্কেই রত। তাই তিনি গ্রামের জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা লোপকে 'ভাঁওতা' ও 'আইন করে ডাকাতি করা' বলেছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলেছেন, 'গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে কোন চিন্তা গ্রামে থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই করতে হবে।' বলা বাহুল্য, শ্রীশর্মা কলকাতা শহরবাসী। গ্রামবাসীর মর্ম কথা বোধ হয় তাঁর জানা নেই। আমি একজন গ্রামবাসী এবং শ্রীঅশোক রুদ্রের গ্রামীণ সমস্যার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

শ্রীশর্মা যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন সে ব্যাপারে কিছু বলি। উদ্যোগী তফশিলি দরিদ্র ব্যক্তিটি অথবা দুধ-ওয়ালাটি যে ৫০।৬০ বিঘা জমি কিনেছে এবং লক্ষাধিক টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স করেছে যারা, খোঁজ নিয়ে দেখুন, তারা হয়তো (হয়তো নিশ্চয়ই) তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের আয়কর ফাঁকি দিয়েছে। যে দেশে ভাত-রুটি যোগাড়ের জন্য একজন মানুষ সামান্য সম্বলটুকুও বেচে দিতে বাধ্য হয় সেখানে অন্য একজন ৫০।৬০ বিঘা জমি করে কিভাবে? সে সৎভাবে করলেও তা কেড়ে নেওয়া হবে শুধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই। শুধু কায়িক পরিশ্রমে এত সম্পত্তি করা অসম্ভব। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিনা শ্রমের আয় ব্যাপকভাবে, শ্রমের বিনিময়ে আয়কে অনেক পিছনে ফেলে দিচ্ছে। শর্মাবাবু এখানে ডারউইন-এর সারভাইভ্যাল অব দা ফিটেস্ট-এর নীতি অর্থাৎ যে লড়ে জিতবে সেই বেঁচে থাকবে—এই নীতিতে বিশ্বাসী, যা যে-কোন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর পরিপন্থী।

শর্মাবাবুর পরবর্তী অন্যান্য বিতর্কগুলি এতই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত-মূলক ও হাস্যকর যে, সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করার প্রয়াসও আমি পাই না। বিশেষ করে চীন সম্বন্ধে তাঁর মনগড়া সন্দেহ। বস্তুত, চীন ও স্তালিন ডবধারাপুষ্ট রাশিয়া কি করেছে তা আজ বিশ্বের প্রতিটি মুক্তি-চেতা মানুষই জানেন। শ্রীসলিল-রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী চিঠিটি যুক্তিগ্রাহ্য। তবে রাজনৈতিক ভাষায় যাকে 'বিপ্লব' বলে সলিলবাবু তাকে 'নৈরাজ্যের নামান্তর' বলার জন্য আর একবার ভেবে দেখবেন। আসল কথা হল, আমরা বিপ্লবের প্রসঙ্গে কিন্তু কিন্তু করি। এর পিছনে কারণ হল আমরা কেউই সর্বতোভাবে চরমতমভাবে শোষিত নই। এটাই সমস্যা। শোষণ চরমতম পর্যায়ে পৌঁছুলে তবেই বিপ্লব হয়। যারা চাকরি করে বা সামান্য চাষবাস করে উপর করে তারা কেউই বর্তমানের মোটামুটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে বিপ্লবে সামিল হবো

চাইবেই না। আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের নেতারা বিপ্লবকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন (শিল্পাঞ্চলে)। কারখানায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বোনাস প্রাপ্তি—ইত্যাদি 'পাইয়ে দেওয়া' তাদেরকে চরমভাবে শোষিত হতে দিচ্ছে না। আমার বক্তব্য, হতে দিচ্ছে না মানে হচ্ছে না হবেও না। শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ বিপ্লব চায় না। অন্যদিকে, গ্রামে, লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব অবলম্বনহীন মানুষ আছে—বেঁচে থাকাটাই যাদের দায়। সর্বতোভাবে শোষিত এই সব মানুষই পারে বিপ্লবী হতে। আর সর্বতোভাবে শোষিত হচ্ছে বেকাররা। এরাই পারে বিপ্লবকে পরিচালিত করতে। হয়তো তা এখনই হবে না, হয়তো তা দীর্ঘদিন হবে না। কিন্তু অন্য দেশে হয়েছে এ নজির আছে। আমাদের দেশে সেই হওয়ার সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে না দিয়ে সেটাকে ত্বরান্বিত করাই উদ্দেশ্য হোক। অশোকবাবুর প্রবন্ধগুলি আর কিছু না হোক সেই উদ্দেশ্যের প্রতি মানুষকে প্রণোদিত করতে পারে। সলিলবাবুর অন্য প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের মত দেশের অর্থনীতি কোনদিনই শিল্প-নির্ভর হবে না। তাকে হতে হবে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক-অর্থনীতি-নির্ভর। এবং স্পষ্টভাবেই বলছি, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য দিকগুলিকে অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়ন্ত্রণ করবে। কৃষির উন্নতিকে ভিত্তি করেই হবে শিল্পের প্রসার। ভারতবর্ষের মত বিশাল কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিভূমিই হল কৃষি-ব্যবস্থা। তাই সলিলবাবুর কথাটা কেই সাজিয়ে নিচ্ছি, শিল্প-ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থা হল একটি অট্টালিকার তৃতীয় তলা তোলার ব্যাপার। দ্বিতীয় তলায় ফেলা যায়, কুটির-শিল্প ইত্যাদিকে—যা গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যেই পড়ে। তৃতীয় তলাকে, সলিলবাবুর উদাহরণ মত, অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধ্বংসপ্রায় একতলাটির প্রয়োজনীয় ও আশু মেরামত।

'কঃ পন্থা'র ওপর ১লা জুলাই-এর শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়ের চিঠি সুচিন্তিত এবং এতে আন্তরিক তাগিদের ছাপ আছে। তবে সুধীরবাবুর 'সঠিক পথ'টি অর্থাৎ 'সব রকম সম্পদের একটা উচ্চতম সীমা বেঁধে দিয়ে তার অতিরিক্ত সমস্ত সম্পদ সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগের জন্য প্রকৃত উৎপাদকদের হস্তে ন্যস্ত করা' সম্বন্ধে একটাই আশঙ্কা থাকে, তা হল উচ্চতম সীমাটাকে কতটা নিম্নতম স্তরে নামানো যায়। কেননা, বর্তমানের উচ্চতম সীমার ওপরের উদ্বৃত্ত জমি মোট ভূমিহীন মানুষের ২৫ শতাংশকেও দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় কথা হল, প্রকৃত উৎপাদকের ধারণা ত্যাগ করে সরাসরি সরকারী উদ্যোগের ব্যবস্থাই কায়েম করতে হবে। তবে সেই সরকারকে অবশ্যই হতে হবে গরীবের সরকার।

হরিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

রাজপুত চিত্রমালা

শ্রী[illegible]

চিত্রমালা' (দেশ, ১৫ জুলাই) আগ্রহে পড়লুম। অনেক প্রয়োজনীয় কথা সুন্দরভাবে বললেও শ্রীচক্রবর্তীর নিবন্ধে এমন অনেক কথা রয়েছে যা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

(১) 'রাজপুত চিত্রমালা' বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন? রাজস্থান ও পাঞ্জাব—হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের ছোট বড় রাজদরবারে যে চিত্রকলা বিকশিত হয়েছিল তাকে, না শুধু পাহাড়ী রাজ্যগুলির চিত্রশৈলীকে? তাঁর লেখায় রাজস্থানের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি, রাজস্থানী চিত্রকলার অঙ্কন রীতি সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকলেও রাজস্থানী চিত্রকলার কোন বিবরণ নেই। তিনি কি মেবার, মারওয়াড়, বুঁদি, কোটা, অম্বর-জয়পুর, বিকানীর, কিষণগড়, আলোয়ার উনিয়ারা, দেবগড়, আজমীরের রাজদরবারে গড়ে-ওঠা সমুন্নত চিত্রশিল্পকে রাজপুত চিত্রমালা বলতে চান না? কিন্তু রাজস্থানী চিত্রশিল্পকেই সত্যিকার রাজপুত চিত্রশিল্প বলা চলে —মালব বুন্দেলখণ্ডের চিত্রশৈলীকে বা পাহাড়ী চিত্রশৈলীকে রাজপুতশৈলী বলা অনুচিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কুমারস্বামী-হ্যাভেল-ও সি গাঙ্গুলীর লেখায় 'রাজপুত' সংজ্ঞায় রাজস্থান-মধ্যভারত পাহাড়ী অঞ্চলের সমগ্র চিত্রসম্ভারকে অভিহিত করা হত। বিগত ২৫।৩০ বছরে খ্যাতনামা শিল্প-ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজস্থানে চিত্রশিল্পের পরম্পরা মুঘলদের ভারতবর্ষে আসার বহু যুগ আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত এবং রাজস্থানের সঙ্গে পাহাড়ী অঞ্চলের শিল্পগত আদান-প্রদান প্রায় অনুপস্থিত। আজকাল 'রাজপুত চিত্রকলা'র এই জাতিগত সংজ্ঞা বোধ করি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে—মধ্যভারতীয়, রাজস্থানী ও পাহাড়ী হিসাবে এই তিন অঞ্চলের চিত্রশিল্প সর্বজন পরিচিত।

(২) শ্রীচক্রবর্তীর নির্বাচিত ছবিগুলি আমাদের ব্যথিত করেছে। প্রচ্ছদের ছবিটি কিষণগড় শৈলীর বিখ্যাত 'রাধা'র প্রতিরূপ—যদিও উল্টো দিকে ছাপা হয়েছে। ৩৭ পৃষ্ঠার নীচের ছবিটিও কিষণগড় শৈলীর একটি সুপরিচিত ছবি, রাজা কিষণ সিং-এর পুত্র রাজা সাহসমলের। এই ছবিটিকে, 'জয়পুর শৈলী, মুঘলচিত্রশৈলী' ধর্মী লেখা অমার্জনীয়। ৩৬ পৃষ্ঠার উপরের ছবি ও ৩৭ পৃষ্ঠার উপরের ছবি—এই দুটি ছবিই বুঁদি শৈলীর (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকলেও প্রথম ক্ষেত্রে যা উল্লিখিত হয়নি) অথচ শ্রীচক্রবর্তীর নিবন্ধে কিষণগড় বা বুঁদি কোন জায়গারই কথা নেই। ৩৩ পৃষ্ঠার তলায় লেখা আছে, 'মুঘলশৈলী, অষ্টাদশ শতক', কিন্তু ছবিটি একটি নিকৃষ্ট মানের 'কপি', যাকে কোন শৈলীর মধ্যেই ফেলা যায় না। ৩৬ পৃষ্ঠার নীচের ছবিটিও নীরেস, কোনভাবেই পাহাড়ী চিত্রকলার 'পূর্বসূরী' হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রত্যেকটি ছবিই এমন বিভ্রান্তিকর রঙে ছাপা হয়েছে যে, আসল ছবির বর্ণসম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের পক্ষে কোন ধারণা করা অসম্ভব

(৩) মুঘল চিত্রকলার সুবর্ণ যুগ তো নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের বহু দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শাহজাহানের রাজত্বের শেষের দিকে অনেক নামকরা মুঘল চিত্রকর বিকানীর, জম্মু, বুন্দি, বুন্দেলখণ্ড, মালব ও মেবার অঞ্চলে চলে যেতে শুরু করেছিল। পাহাড়ী অঞ্চলে, বিশেষ করে বাশোলি, চম্বা ও গুলের-এ ১৬৭৫ সালের মধ্যেই চিত্রশিল্পের বিকাশ লক্ষ করা যায়। এখানে বলা দরকার, পাহাড়ী চিত্রকলার ইতিহাসে কাংড়াশৈলী বাশোলি, চম্বা ও গুলের-এর চেয়ে অনেক নবীন। কাংড়ার রাজবংশের অনুরূপ কাটোচ বংশোদ্ভূত হলেও রাজা দলীপ সিং (১৬৯৫-১৭৪১) কাংড়ার রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন গুলেরের রাজা। গোবর্ধন চাঁদ (১৭৪১-১৭৭৩) ও প্রকাশচাঁদ (১৭৭৩-১৭৯০)ও অত্যন্ত শিল্পোৎসাহী ছিলেন, যার ফলে গুলেরের চিত্রশৈলী অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়ে পাহাড়ী চিত্র কলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেয়। কাংড়ার সুবর্ণ যুগ শুরু হয় রাজা ঘমণ্ডচাঁদের রাজত্বকালে (১৭৬১-১৭৭৪) এবং উচ্চতম শিখরে ওঠে তাঁর পৌত্র রাজা সংসারচাঁদের সময়ে (১৭৭৫-১৮২৩)।

(৪) কোন ছবি বা দলিলে কিষাণলাল বা লক্ষ্মণলালের নাম গুলের বা কাংড়ার শিল্পী হিসাবে পাওয়া গেছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে লছমন দাস নামের এক শিল্পীর সঙ্গে ১৯২৯ সালে কাংড়ায় জে সি ফ্রেঞ্চের সঙ্গে

সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর 'হিমালয়ান আর্ট' বইয়ে লেখা আছে। 'পারো' নামের কোন মহিলাশিল্পীর নামও আমাদের জানা নেই, বরং 'নৈনাকু'কে অনেকে মহিলাশিল্পী মনে করেন, যদিও সে মতের বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার। শ্রীচক্রবর্তী যে সব শিল্পীদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের অধিকাংশই শিল্পী হিসাবে তেমন অগ্রগণ্য নয়, বরং বাশোলির দেবীদাস, গুলেরের পণ্ডিত সেউ ও তাঁর বিখ্যাত বংশধর নৈনাকু ও নয়নসুখ, কাংড়ার খুশলা, ফত্তু, পুরখু ও গৌধু এবং এ ছাড়া রণ্‌ঝা, সজনু, মিক্কা, গুরুসহায়, রামদয়াল, মোশারাম ইত্যাদির নাম পাহাড়ী চিত্রকলার সংক্ষিপ্ততম ইতিবৃত্তেও উল্লিখিত হবার যোগ্য। ঠিক একইভাবে শিল্পী দেবীদাসের পৃষ্ঠপোষক বাশোলির রাজা মেদিনী পাল ও নয়নসুখের পৃষ্ঠপোষক জসরোটার রাজা বলবন্ত সিং চিত্রকলার সমঝদার হিসাবে সংসারচাঁদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন।

(৫) শ্রীচক্রবর্তীর প্রবন্ধে কয়েকটি ছোটখাটো ভুল নজরে পড়ল ঃ যেমন, 'কালকাচার্যকথা' ('কলাকাচার্যকথা' নয়) জৈন ধর্মগ্রন্থ, কোন বৈষ্ণবধর্মী চিন্তা ও মননের ফসল' নয়। 'ইসলামের বহু ধর্মপুস্তকের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রের ফলে হামজানামা, রাজমনামা, কোরানশরীফের পাণ্ডুলিপিসমূহ চিত্রিত করার কাজ শুরু হয়।' রাজমনামা কোন ইসলামী ধর্মপুস্তক নয়, মহাভারতের ফার্সী অনুবাদের নাম। আকবরের শিল্পাগারে যে শতাধিক চিত্রকর ছবি আঁকতেন তাঁদের মধ্যে পারসিক চিত্রকর ছিলেন মাত্র চার/পাঁচ জন। বাকী ভারতীয় শিল্পীদের 'অনুগামী ও ছাত্র' বলা নিশ্চয় সমুচিত হবে না কারণ, বসাওয়ান, দাসবন্ত, কেশবদাস, মিস্কিন, সাঁওলা, নানহা, ভবানীদাস প্রভৃতি শিল্পীগণ স্বকীয়তা ও শিল্পনৈপুণ্যে পারসিক চিত্রশিল্পীদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। শালিবাহন নিজেকে 'পাতিশাহী চিত্রকর' বলে ঘোষণা করলেও জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় তাঁর স্থান নগণ্য ছিল। তাঁর চিত্রিত জৈন গ্রন্থের নাম 'শালিভদ্র চরিত্র'—'শীলভদ্র চরিত্র' নয়—যা কলকাতার [illegible] পত্রিকায়ে সযত্নে রক্ষিত আছে।

(৬) অঙ্কন পদ্ধতি, শিল্পশৈলী ও বিভিন্ন ঘরানার বিকাশ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্তী যে সব কথা লিখেছেন, তা কিছু কিছু আমাদের কোন শিল্পীর ঘরানা বা শৈলী সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও সমগ্র রাজস্থান বা পাহাড়ী অঞ্চল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

অশোককুমার দাস
জয়পুর—২

রেকর্ড সমালোচনা

গত দশই জুন এর 'দেশ'-এ প্রকাশিত শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের রেকর্ড-সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীদাশগুপ্ত দেবব্রত বিশ্বাসের সম্প্রতি প্রকাশিত ই-পি রেকর্ড-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "...এদেশের নিয়ম অনুযায়ী ফিল্মে ব্যবহৃত হলেই সকলে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে মেতে ওঠেন।" ফলে তিনি এই অসাধারণ গানের রেকর্ডটি ('কেন চেয়ে আছো গো মা') নিয়ে কোন আলোচনাই করলেন না—কারণ গানটি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গানটি প্রসঙ্গে বলা যায় যে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হবার আগে অধিকাংশ শ্রোতাই গানটি শোনেননি। ফলে গানটির আগ্রহ জন্মেছে চলচ্চিত্রে শোনার পরেই। প্রসঙ্গত চলচ্চিত্রে দেবব্রত বিশ্বাস ও সুশীল মল্লিক দুজনে গানটি গেয়েছেন—প্রধান কণ্ঠ সুশীল মল্লিকের।

দেবাশিসবাবুর লেখা আরেকটি বাক্য—বয়েসের জন্য অনেক সময় হয়ত কণ্ঠ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি অথবা "ওই যে ঝড়ের মেঘে" গানে তাঁর কণ্ঠেই ঝড়ের দোলা আনতে পারে বেশ খেলমেলে। 'অথবা' বাক্যটির প্রয়োজনের যাথার্থ্য বোঝা গেল না। তাছাড়া ঈপ্সিত লক্ষ্য জিনিসটি কি? যদি ভাবসম্ভার-এর কথা বলা হয় তবে প্রশ্ন দেবব্রত বিশ্বাসের গানে ভাবের অভাব কখনও ঘটেছে কি? আর "কেন চেয়ে আছো গো মা" রেকর্ডটি প্রসঙ্গে বলা যায় 'পারফেক্‌শনের' ওপর কেবল কথা চলে না। অবশ্য এটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। কারণ "রস আর রসায়ন" এক জিনিস নয়। বিশ্লেষণে রস ক্ষুণ্ণই হয়। দেবব্রত বিশ্বাস সম্প্রতি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে গান না গাইলেও দু-তিন বছর আগেও যখন নিয়মিত গাইতেন তখনও তো তাঁর গলার ঐশ্বর্য সন্দেহাতীত ছিল। আর "কেন চেয়ে আছো গো মা" দেবব্রতবাবু ১৯৬৯ সালে রেকর্ড করেন (এই রেকর্ড-এর প্রকাশিত অন্যান্য গানগুলিও মোটামুটি ঐ সময়েই রেকর্ড করা হয়েছিল);—তখনই তাঁর গলায় বয়েসের ছাপ পড়ে যাওয়ায় তিনি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেন না। দেবাশিসবাবুর এই আবিষ্কার অত্যাশ্চর্য—সন্দেহ নেই। দেবাশিসবাবুর "ওই যে ঝড়ের মেঘের কোলে"র প্রিলিউড্‌ মিউজিক অধিকন্তু মনে হয়েছে। ইন্‌স্ট্রুমেণ্টাল মিউজিকেরও তো নিজস্ব একটি ভাষা আছে। তার সাহায্য নেওয়া দোষের হবে কেন? গলার এফেক্ট্‌ ছাড়াও মিউজিকের এফেক্ট্‌ও তো প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়।

পরিশেষে বলি দেবব্রত বিশ্বাস আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্বাসিত নায়ক—এই ঘোষণায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডের ব্যাপারে নানা নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করা বন্ধ করে দিয়েছেন। (এখন তাঁর যে সমস্ত রেকর্ড বের হয় তা বহুদিন আগেই রেকর্ড করা হয়েছিল।) একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে তাঁর রেকর্ড করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেটি ঠিক নয়।

সত্যজিৎ ঘোষ কলিকাতা-১৭

বোলান গান

সুধীর চক্রবর্তীর, 'অবসরের গানঃ বোলান' (দেশ, ৬ শ্রাবণ ১৩৮৪) নিবন্ধটি পাঠ করে উপকৃত হয়েছি। এই নিবন্ধটিতে প্রসঙ্গত তিনি আমার নাম উল্লেখ করেছেন—এই সূত্রেই দু-একটি কথা নিবেদন করতে হচ্ছে।

নিবন্ধটিতে সুধীরবাবু জানিয়েছেন, আমি পুরানো 'বোলান গানের' খাতা পেয়েছি। কথাটিকে আরও সঠিকভাবে বলা প্রয়োজন ছিল। প্রায় ২৮ বৎসর পূর্বে স্বর্গত অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর নির্দেশ ও উপদেশে আমি গ্রামাঞ্চল থেকে কিছু পল্লীসঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলাম। ঐ সময়ে নদীয়া জেলার শিবনিবাস অঞ্চলের কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে ৩৫ খানি বোলান গান সংগ্রহ করি। এই সংগৃহীত গানগুলিকে অবলম্বন করে প্রবাসী (বৈশাখ ১৩৬৪, শ্রাবণ ১৩৬৬) জন-সেবক (নভেম্বর-ডিসেম্বর '৬১), মধ্যবেদ (২য় সংখ্যা—১৯৬২) প্রভৃতি পত্রিকায় 'বোলান গান' বিশেষ করে নদীয়ার এই বোলান গানগুলির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা লিপিবদ্ধ করি। পরে 'সারস্বত' (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩, পৃঃ ১-৪১) পত্রিকায় আমার সংগৃহীত গানগুলি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। 'সারস্বত' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে সুধীরবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে এসে আমার মুদ্রিত নিবন্ধ চতুষ্টয় ও বোলান গানের পাণ্ডুলিপিখানি কৃষ্ণনগরে নিয়ে যান। এগুলি ঐ বৎসরের আগস্টের শেষ দিকে ফিরত পাই। সুধীরবাবুর বর্তমান নিবন্ধটি বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল হলেও বোলান গানের আলোচনায় আমার নিবন্ধগুলিতে ব্যবহৃত তথ্যাদি থেকে কিছু কিছু সহায়তা পাননি এমন নয়—কিন্তু তাঁর আলোচনায় আমার নিবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। কেবলমাত্র বলেছেন, আমি পুরানো বোলান গানের খাতা পেয়েছি।

চৈত্র মাসের শেষ ক'টা দিন বোলান গান ও নাচে পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলগুলি উত্তাল হয়ে ওঠে সুধীরবাবু তার বিবরণ দিয়েছেন। ঐ তালিকায় নদীয়া জেলার শিবনিবাস-কৃষ্ণপুর অঞ্চলের উল্লেখ অত্যাবশ্যক ছিল। গাজন ও বোলান গান এ অঞ্চলের প্রধান উৎসব। এই উপলক্ষে কৃষ্ণপুর গ্রামে মেলা বসে—বহু লোক সমাগম হয়। সুধীরবাবু লিখেছেন, খুব অনুসন্ধান করেও তিনি শতাধিক বৎসরের পুরানো বোলান গান পাননি। আমার সংগৃহীত গানগুলির শতবর্ষ পূর্ণ হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সবিনয়ে লিখি, শিবনিবাস-কৃষ্ণপুরের বোলান গানগুলির কোন কোনটিতে রচয়িতার ভনিতা আছে। অন্যতম গীত রচয়িতা প্রহ্লাদচন্দ্র তরফদারের (পাটিনী) জীবৎকাল পাওয়া গেছে। তাঁর বংশধরগণ শিবনিবাস অঞ্চলের নারান্দা নগর গ্রামে বসবাস করছেন। অন্তত তাঁর জীবৎকাল দৃষ্টান্তে বলা যায়, এই গানগুলি শতাধিক বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলের সংগীতসম্পদরূপে বিদ্যমান ছিল। এখনকার বোলান গানের গীত-পদ্ধতিতেও প্রাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

হারাধন দত্ত বালিটিকুরী, হাওড়া

আশুতোষের জন্মস্থান

১১ই ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের 'কষ্ট কল্পিত' লেখায় তথ্যগত ত্রুটি সংশোধন করে তারাশংকর ব্যানার্জি মহাশয়ের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন যে, জিরাটে স্যার আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে স্যার আশুতোষ ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন বহুবাজারে মলঙ্গা লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ জিরাটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মলঙ্গা লেনে আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন এবং পরে ভবানীপুরে বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

গোপীনাথ বিশ্বাস

প্রকাশিত হল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

অনবদ্য হাসির উপন্যাস

পায়রা দাম ৬·০০

'শ্বেতপাথরের টেবিল'-এর পর 'পায়রা'। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলমে আর-একটি আশ্চর্য নতুন উপহার। হাস্যরস আর করুণরসের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনে বোনা 'পায়রা' আমাদের জীবনের চিড়খাওয়া পারস্পরিক সম্পর্কের একটি অনবদ্য আলেখ্য।
কোন জীবনই শুধু হাসি নয়, শুধু কান্না নয়, জীবন মিলিত-মিশ্রিত এক অনুভূতি। সংঘাত দেখার ধরনে কৌতুক হয়ে উঠতে পারে, আদর্শনিষ্ঠা সময়-সময় নির্বুদ্ধিতার চেহারা নিতে পারে, অনমনীয়তা হতে পারে আত্মঘাতী, আরও কত কী যে হতে পারে তা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ই জানেন। তাঁর কলমে হাসি কখন যে পায়ে-পায়ে করুণরসের চৌকাঠটি ডিঙিয়ে যায়, বলা শক্ত। ইনিই সম্ভবত একমাত্র লেখক যিনি গভীর কথা, ব্যর্থতার কথা, বেদনার কথা হাসির মোড়কে অক্লেশে মুড়ে দেখার ক্ষমতা রাখেন। সেই মোড়কটি, বলা বাহুল্য, একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব। অফুরন্ত কৌতুকের অনাবিল উৎস মানুষের হাসিকান্নার সংসার। সেই সংসারে আমাদের বেঁচে থাকাটাই বিচিত্র বহুবর্ণ এক অভিজ্ঞতা। জীবন পায়রার মতই উষ্ণ অথচ অসহায়। সেই জীবনেরই প্রতিচিত্র 'পায়রা' উপন্যাস।
[illegible] আকর্ষণীয় গ্রন্থ :

ভালো ভালো বই

রমাপদ চৌধুরীর
বনপলাশির পদাবলী
দাম ১৫·০০

পরাজিত সম্রাট
দাম ৭·০০

শংকর-এর
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটারি
দাম ৮·০০

সমরেশ বসুর
বিবর
দাম ৬·০০

সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা
দাম ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
লোকটা
দাম ৩·০০

আমরা যেখানে
দাম ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
দোলনা
দাম ৫·০০

রাতের পাখি
দাম ৪·০০

বিমল করের
অসময়
দাম ১২·০০

সান্নিধ্য
দাম ৫·০০

মনোজ বসুর
রূপবতী
দাম ৩·০০

স্বর্ণসজ্জা
দাম ৪·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দাদার কীর্তি
দাম ৮·০০

শঙ্খকঙ্কণ
দাম ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

এক অসাধারণ উপন্যাস

রাধাকৃষ্ণ দাম ১০·০০

চিরকালের এক প্রণয়-কাহিনীকে চিরকালের এক আশ্চর্য উপন্যাস-রূপে উপহার দিয়েছেন একালের বরেণ্য এক কথাসাহিত্যিক। এর উপাদান সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন শাস্ত্রনির্ভর, এর ভাষা কান্তকোমল পদাবলীর মতো লাবণ্যময় অথচ বর্ণনা-ভঙ্গি পুরোপুরি আধুনিক এবং জীবন্ত। যে-ভাবনা দেবতারে প্রিয় করে, প্রিয়েরে দেবতা, সেই মধুর সুন্দর ভাবনারই মহত্তম শিল্পরূপ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণ' উপন্যাস। এ-দেশের শাশ্বত ভাবনার ভিত্তির উপরে নির্মিত প্রেমধর্মের এই নবীন সৌধ সাহিত্যের জগতে 'তাজমহল'-এর মতোই বিস্ময়কর সৃষ্টি রূপে গণ্য হবার যোগ্য।

এই লেখকের অন্যান্য বই :
ছবির মানুষ ৭·০০ সংসারে এক সন্ন্যাসী ৭·০০ একা এবং কয়েকজন ৩৩·০০ আমিই সে ৭·০০ স্বর্গের নীচে মানুষ ৭·০০ কবি ও নর্তকী ৬·০০ অর্জুন ৭·০০ কালো রাস্তা সাদা বাড়ি ৫·০০ জীবন যেরকম ১৫·০০ তুমি কে? ৪·০০ সরল সত্য ৫·০০ অরণ্যের দিনরাত্রি ৬·০০ আত্মপ্রকাশ ১০·০০

কবিতার বই :
হঠাৎ নীরার জন্য ৫·০০ আমার স্বপ্ন ৪·০০

কিশোর-উপন্যাস :
সবুজ দ্বীপের রাজা ৫·০০ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬·০০ তিন নম্বর চোখ ৫·০০ সত্যি রাজপুত্র ৫·০০ ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রহস্য-উপন্যাস

কস্তুরী গন্ধ

সুবোধ ঘোষের
জিয়া ভরলি
দাম ৮·০০

বন উপবন
দাম ৬·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সেতুবন্ধন
দাম ৭·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আত্মপ্রকাশ
দাম ১০·০০

অর্জুন
দাম ৭·০০

বুদ্ধদেব গুহের
হলুদ বসন্ত
দাম ৪·০০

নগ্ন নির্জন
দাম ৫·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
ঘুণপোকা
দাম ৬·০০

আশ্চর্য ভ্রমণ
দাম ৬·০০

মতি নন্দীর
বারান্দা
দাম ৬·০০

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান
দাম ৪·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
স্মরগরল
দাম ৮·০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের
কথা ছিল
দাম ৮·০০

নীললোহিতের
স্বর্গের খুব কাছে
দাম ৬·০০

একটি বিজ্ঞপ্তি

ভি. পি. তে বই পাঠাবার অনুরোধ করেন যাঁরা, তাঁদের জানানো হচ্ছে যে, অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম টাকা না পাঠালে ভি. পি. তে বই পাঠানো সম্ভবপর নয়।

প্রকাশিত হল

শান্তিদেব ঘোষের

মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্য
দাম ৫·০০

"গুরুদেবের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আদর্শ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষার কর্মসূচী নিয়ে গত তিন দশকে বাংলার শিক্ষা-বিদ্‌গণ নানা প্রকার আলোচনা করেছেন, গ্রন্থে ও প্রবন্ধে। কিন্তু এখানকার অন্যান্য শিক্ষণীয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যকে গুরুদেব যেভাবে সম্মানজনক বিদ্যা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে-বিষয়ে পরিষ্কার করে কেউ কিছু বলতে চেষ্টা করেন নি।"
তাঁর এই নতুন গ্রন্থের ভূমিকায় শান্তিদেব ঘোষের এই আক্ষেপ থেকেই এই মূল্যবান আলোচনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তার পারপ্রেক্ষিতটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছয় মাসের শিশু শান্তিদেব শান্তিনিকেতনে আসেন সেই ১৯১০ সালে। সেই থেকে এত কাল তিনি বিশ্বভারতীতে গান-নাচ ও অভিনয়ের শিক্ষকতায় ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত। যে-বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থ, সে-বিষয়ে আলোচনার যথার্থ অধিকারী বলতে তাই তাঁকেই বোঝায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শের সঠিক পরিচয়টি ফুটিয়ে তুলতে সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ক যে-আলোচনার অভাব এতকাল যাবৎ অনুভূত, সেই অভাবই মোচন করবে শান্তিদেব ঘোষের এই গ্রন্থটি।

দেশ ৪৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা
২৭ শ্রাবণ ১৩৮৫

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

কমলকুমার মজুমদারের প্রবন্ধ
ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা
মধুসূদন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ
ধ্যানমগ্ন হিমালয় : ধ্যানাসন মায়াপীঠ
নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের গল্প
রমণী রতন
তুলসী সেনগুপ্তের গল্প
উৎসবে

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ভারত-চীন মৈত্রীর পথ-বিপথ

চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক চিরকালের বিরোধে বিদিগ্ধ হয়ে থাকুক, এ-হেন কামনা চরম রকমের চীন-বিরোধী কোন ভারতীয় ব্যক্তিরও মনে লালিত হতে পারে না, হয়ও না। ইতিহাসের শিক্ষা দিয়ে বিচার করলে এরকমের চীন-বিরোধিতা বস্তুত ভারত-বিরোধিতারই অন্য নাম। ঐতিহাসিক অভিমতের একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। নেপোলিয়নের শক্তির রাজনীতিক ও সামরিক মৃত্যুর কারণ কী? প্রশ্নের উত্তর—স্প্যানিশ ক্যানসার রোগে নেপোলিয়নের রাজনীতিক মৃত্যু ঘটেছিল। স্পেনীয় শক্তিকে পরাভূত করতে ও স্পেনকে গ্রাস করতে হবে, এই সংকল্পের উৎকট আবেগে চালিত তাঁর ক্লান্তিহীন সামরিক অভিযান স্পেনের শান্তি নিদারুণ রকমে উৎপীড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল বটে, কিন্তু স্পেন পরাভূত হয়নি। এবং স্পেনের সম্পর্কে নিরন্তর বৈরিতার প্রেরণায় পরিচালিত হতে গিয়ে নেপোলিয়নের সামরিক শক্তিকে দুরপনেয় ক্ষতের রোগে জীর্ণ ও শীর্ণ হতে হতে অবশেষে ওয়াটারলুর আঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। ঐতিহাসিকের মন্তব্যের সূত্র ধরে রাজনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে কোন এক জাতির প্রতি অন্য এক জাতির নিরন্তর ও দীর্ঘকালীন বৈরিতাকে স্প্যানিশ ক্যানসার নামীয় একটি ব্যাধি বলে অভিহিত করা চলে। চীনের সম্পর্কে ভারতের জাতীয় স্তরে তো নয়ই, ব্যক্তি-গত বা সঙ্ঘগত কোন স্তরে চিরন্তন বিরোধ জাগিয়ে রাখবার আগ্রহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ ধরণের বিরোধ-প্রবণ উৎসাহ পরিণামে জাতির জীবনেরই উপর একটি দুঃসহ ভার হয়ে দাঁড়ায়।

যে-সব আমন্ত্রিত ভারতীয় ব্যক্তি চীনদেশ দেখে এসেছেন, তাঁদের মন্তব্যে চীনের কৃতিত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে অজস্র প্রশস্তি ভারত-চীন বিরোধের মধ্যে নতুন করে কোন সমস্যা সঞ্চারিত করবার মতো প্রভাবজনক বস্তু নয়। চীনের প্রভূত উন্নতি ও অভিনব প্রগতির যাবতীয় তাত্ত্বিক সত্যতাও ভারত-চীন সম্পর্কের স্বাদ কটু করে তোলবার মতো বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে অদ্ভুত-তত্ত্বভাবের একটি বিস্ময় এই যে, চীনের আচরণ সম্পর্কে সামান্য সমালোচনার প্রকাশ দেখলে ভারত-চীন মৈত্রীর অনুরাগী এক শ্রেণীর ভারতীয় ব্যক্তির প্রতিবাদে উষ্মার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে। চীনেতে এইরূপ ভারত-চীন মৈত্রীর অনুরাগী প্রচারক সংস্থা নিশ্চয়ই নেই, এবং সে-দেশে সাধারণ জনমতে ভারতের সম্পর্কে দু'চারটে নির্দোষ ললিত বাণীরও ধ্বনি শোনা যায় না; কারণ সেটা সে-দেশের জনচিন্তার অধিকারসম্মত নিয়মের অনুগত আচরণ নয়।

ভারত-চীন মৈত্রীর কামনা অক্ষুণ্ন রেখেই প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে ভারত ও চীনের পারস্পরিক অভিযোগের একটি তুলনাচিত্রের উপর দৃষ্টিপাত করা উচিত। স্মরণ করতে হয়, প্রাক্তন চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই উৎসাহিতভাবে ভারত পরিদর্শনে এসেও কাশ্মীরে যেতে আপত্তি করেছিলেন। সেই আপত্তির কারণ ছিল চীনের চিন্তার একটি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মধ্যে আশ্রিত একটি নীতি। কাশ্মীরকে ভারতের রাষ্ট্রীয় অংশ বলে মান্যতা প্রদান না করবার জন্যই, এবং পাকিস্তানকে চীনা-বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতির সঙ্কেত জানাবার ইচ্ছায় তিনি কাশ্মীর যাননি। বান্দুং সম্মেলনে নয়, তিব্বত সম্বন্ধে ভারত-চীনের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তার মুখবন্ধে পঞ্চশীলের প্রথম ঘোষণা ছিল, কিন্তু ভারতীয় উত্তর সীমান্ত সম্পর্কে চীনের অত্যন্ত স্পষ্ট রকমের অপরিচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচয় প্রকট হয়ে পড়তে দেরি হয়নি। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে কিছুটা অসতর্কতার দোষে দোষী করেও বলা চলে যে, চীনের সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ প্রশস্ত করে রাখবার ইচ্ছাতেই ভারত সরকার চীনা অভিমতের নানারকম অস্পষ্টতার অন্ধকার সহ্য করেছিল। তবু চীনা সন্তুষ্টি ভারতের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। চীন ভারতের উপর সামরিক আক্রমণ চালিত করেছে। তেজপুর প্রান্ত ডিব্রুগড় এবং লাদাকের অভ্যন্তরবর্তী অঞ্চলকেও চীনাভূমি বলে প্রচারিত করে চীন এই বক্তব্য তৈরি করেছিল যে, চীনা বাহিনী ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেনি। ভারতকে না জানিয়ে ভারতীয় উত্তর সীমান্তের আকসাই চীনের আয়তন গ্রাস করে সড়ক নির্মাণ করেছে চীন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীরভূমির যে-সব আঞ্চলিক আয়তন আইনত ভারতেরই রাষ্ট্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল, সেই সব অঞ্চলে পাকিস্তানের ইচ্ছার উপহার হিসাবে চীন কারাকোরম সড়ক নির্মাণ করেছে। পঞ্চশীলের উল্লেখ যে চীনের মুখপাত্রদের মুখে আজও উচ্চারিত হয়, সেই চীন মিজো ও নাগাদের অস্ত্রসাহায্য দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্ররোচিত করেছে। এরকম ক্রিয়াকলাপ চীনের দ্বারা এখনও চালিত হয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন কখনও ভারতের পক্ষে একটিও বাক্য পরিস্ফুর্ত করেনি। অপর দিকে অর্থাৎ ভারতীয় বক্তব্যের মানচিত্রে দেখা যায় ভারত আজ পর্যন্ত চীনের বিরুদ্ধে এরকমের বা অন্যরকমের একটিও আঘাতমূলক আচরণ প্রদর্শিত করেনি। ভারত পঞ্চশীলের কোন শীলেরই অমর্যাদা করেনি, কিন্তু চীনের আচরণে পঞ্চশীলের কোন শীল সদাচারিত হয়েছে কি?

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

ছাতা বিষয়ক প্রবন্ধ

ছাতা বলতে আপত্তি নেই, ছাতি বললেও ভুল হবে না। অভিধান দুটি ব্যবহারই সমর্থন করছে। ছাতি থাকে বুকে। যার আড়ালে হৃদয়, মান-অভিমান, প্রেম-ভালবাসা, ক্রোধ-হিংসা, ত্যাগ-লালসা। ছাতা থাকে মাথায়, যার তলায় মগজ, বুদ্ধি, বোকামি দেবত্ব শয়তানী। সায়েবদের হাতে অমব্রেলা—ল্যাটিন আম্ব্রাতে একটু রেলা যোগ করে আমব্রেলা। আমব্রা মানে ছায়া। হাতে ধরা হাতলের মাথায় চাঁদি বাঁচাবার গোল ছায়া। সায়েবদের দেশে রোদই ওঠে না তবু আমব্রা-দাবী আমব্রেলার ব্যবস্থা। ছায়ার জন্যে নয় বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যেই ছাতার প্রয়োজন। ছাতা একটু ছোট হয়ে বেশ চিকনচাকন, সরু মত হলেই সায়েবরা বলবেন—প্যারাসোল। সেই ল্যাটিন। ল্যাটিন ছাড়া নাম জমে না। ল্যাটিন 'প্যারারে' ইংরেজীর কলে উঠে—'প্রিপেয়ার'—তৈরি করে দেওয়া, কি তৈরি। 'সল' মানে সূর্য, সূর্যকে যে তৈরি করে দেয় তিনিই প্যারাসোল।

ছাতা বড় মেয়েলী জিনিস। গ্রীস আর রোমের সুন্দর সুন্দর মেয়েরা, সেই রথের দৌড়ের কালে, সক্রেটিসের কালে ছাতা মাথায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, অলিভ-পাকান-রোদে ফুরফুর করে ঘুরতেন। ছাতা তখন প্রয়োজনের চেয়ে ফ্যাশানের অংগ। রোমের সুদিন যেই চলে গেল ছাতার জনপ্রিয়তাও কমতে কমতে, প্রায় ছাতাহারা হল। ছাতা আবার ফিরে এল রেনেসাঁর রোদবৃষ্টি থেকে সংস্কৃতিবানদের মাথা বাঁচাতে। উত্তর আর দক্ষিণ ইউরোপে 'ছাতার' মত ছাতা দেখা দিল। হাতে হাতে আমব্রেলা, প্যারাসোল। ইংরেজ শিল্পীদের আঁকা ছবিতে প্রথম ছাতা দেখা গেল ১৫৯৬ সালে। ছাতার মত ছাতা এল সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকের রাজপথে। ছাতা তখন আর ছাতা নয়, মহিলাদের পোশাকের অংশ। যার যত পয়সা তার ছাতার তত গরব। গরবিনী তোমাকে দেখি না তোমার ছাতা দেখি। হাড়ের হাতলে কত কারুকার্য। মণি-মাণিক্য বসানো। কালো ঝকঝকে সিল্কের কাপড়ের চার পাশে ঝালরের বাহার। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন খানদানি ইউরোপীয় মহিলা গ্রীষ্মকালে ছাতা না নিয়ে রাস্তায় নামতেন না।

বিলিতি জর্দান দিশী ছাতা

বাঁশ কিংবা বেতের বাঁকানো হাতল। সিকের ওপর চাপানো মোটা পুরু কাপড়। কুচকুচে কালো নয় সাদাটে কালো। তলার দিকে একটা সাঁপি লাগানো। ছাতাটা মুড়লেও ফুলে থাকবে, হাতপা ছড়িয়ে থাকবে। বন্ধ করার সময় ঝপাত্ করে বন্ধ হবে, মাঝে মাঝে আঙুল চিমটে যাবে। ওজন-দার বিবর্ণ, ত্রিভঙ্গমুরারী, এমত একটি আকৃতির নাম দিশী ছাতা। নেটিভদের যেমো বগলে এই বস্তু ঘোরাফেরা করত। এই ধরনের ছাতার হাতলকে বলে—ছাতার বাঁট।

দিশী ছাতার বহুমুখী প্রয়োগ। এই ছাতা মাথায় দিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে জোতদার চাষের মাঠে মজুর খাটান। কনট্রাকটার বাড়ি তৈরি তদারকি করেন। নায়েব চলেন খাজনা আদায়ে। গুরু চলেন শিষ্য-বাড়িতে। হেড পণ্ডিত অবাধ্য ছেলেকে ছাতাপেটা করেন। পাওনাদার ছাতার বাঁট দিয়ে গলা টেনে ধরেন। ক্লান্ত পথিক ছাতা দিয়ে রক পরিষ্কার করে মোড়া ছাতা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েন। গঙ্গার পৈঠেতে ব্রাহ্মণ বসে থাকেন ছাতা মাথায়, যুবতী মহিলার কপালে চন্দনের নকশা করে দেবার জন্যে। রাস্তার পাশে তালিমারা ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকে চর্মকার। জুতো পেলেই সেলাই ফোঁড়াই, চামড়া জোড়া, পেরেক পেটানো।

যত সব দিশী কাজে, দিশী ছাতার সাবেক ব্যবহার। এই সব কাজের লোকের কাজের ছাতা তৈরি হত কারখানায়। মোটাসোটা। শক্ত সমর্থ। শৌখীন নয় টেকসই।

ছাতা যদি নিতেই হয়

ছাতা যদি নিতেই হয় তাহলে কম দামের ছাতা নিয়েই ছাতাভ্যাস করা ভাল। একশো রোগী মেরে যেমন বৈদ্য হয়। বেশ কিছু ছাতা হারিয়ে তবেই জেটারেন ছত্রধারী হওয়া যায়। প্রবীণ মানুষেরা নবীনকে এই উপদেশ দেবেন—ছাতা যদি মাথার ওপর মেলা থাকে ভয় নেই। ধর, রোদ নেই, বৃষ্টিও হচ্ছে না, তখন তুমি ছাতাটিকে মুড়ে ফেলবে। দু হাতেই মুড়বে, কারণ তুমি নভিস। অভ্যাস হয়ে গেলে এক হাতেই মুড়তে পারবে। সেটা অবশ্য সময়সাপেক্ষ। ফুটপাথ থেকে মোটা রবারের একটা গোল রিং কিনবে দশ পয়সা দিয়ে। হাঁসের গলায় গোল আংটা পরাবার কায়দায়, ছাতার গলাতেও ওটিকে পরিয়ে দেবে। জেনে রেখো, এটি বড় উপকারী জিনিস। ছাতার ছ্যাতরানো সিক, অবাধ্য সিক, গলাবন্ধ পরে একান্নবর্তী হয়ে থাকবে। ছাতারও চরিত্র আছে জানবে, যেমনঃ সিক যত মত তত পথের মত কিংবা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইয়ের মত অথবা মন্ত্রিসভার সদস্যদের মত, রাজনৈতিক দলের মত, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে, গলাগলি করে থাকতে চায় না। ওরা ছ্যাতরাবেই, আর সুযোগ পেলেই বস্ত্র ত্যাগ করে নিজের খোঁচা মারা স্বভাবটিকে উলংগ করে রাখতে চাইবে। সিকের ধর্মই হল পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির মাথার চাঁদিতে ঠোক্কর মারা, পরিপাটি চুল অবিন্যস্ত করে দেওয়া, হাত বাড়িয়ে কাছা টেনে ধরা, পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকে পড়ে রুমাল টেনে আনা, যে কোনো জায়গার সুযোগ পেলেই আটকে বসে থাকা। মেয়েদের ছাতার সিক চোখ থেকে চশমা খুলে দেবার জন্যে তাক করেই থাকে। শাস্ত্রের নির্দেশ—মহিলাদের মুখের দিকে তাকাবে না, খুব ইচ্ছে হলে পায়ের দিকে তাকাতে পার এবং মনে মনে ভাববে মা জননীর পায়ে আমার চক্ষু দুটি লুটিয়ে আছে ভ্রমর হয়ে। শাস্ত্রকে আরও একটু প্রসারিত করে দেবে ছত্রধারিণীর বেলায়। এঁদের ছাতা খোলা অবস্থায় চোখের লেভেলে থাকে। মহিলাদের রাঁধিয়ে হাতে ছাতা খেলে হাতার মত। বাবাজীবন খুব সন্নিকটে নাই-বা গেলে! চশমা কিংবা চোখ দুটোই বাঁচবে। মনে রাখবে ছাতার এক একটি সিক এক একটি দুর্দান্ত সন্তানের মত। অভিভাবক হিসেবে তোমার কর্তব্য সিক সামলে চলা।

ছাতার গায়ে ইল্যাস্টিকের যে সুদৃশ্য ফিতেটি ঝোলে, জেনে রাখো ব্যবহারকারীর হাতে তার জীবন নারীর যৌবনের মত, প্রজাতের শিশিরের মত। গলা-বন্ধের গোল বস্তুটিই একমাত্র ভরসা। ওটা যদি হারায় তা হলে কলাবউ চান করানোর মত, নিজের ছাতাকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নাচতে নাচতে রাস্তায়

ছাতার বাঁট

বিভিন্ন স্বভাবের বাঁট আছে। কারুকার্য করা, সুদৃশ্য প্ল্যাস্টিকের বাঁট, সুন্দরী রমণীর মতই অনির্ভরযোগ্য। যে কোন মুহূর্তেই তিনি ছাতাকে ডিভোর্স করে সরে পড়তে পারেন। একবার বিচ্ছিন্ন হলে ইনি আর সংযুক্ত হতে চান না। বেতের বাঁট সাবেককালের মহিলাদের মত ভারি নমনীয়। একবার লেগে গেলে আর ছাড়তে চান না। যেমন চালাবে তেমনি চলবে। যেদিকে চাপ দেবে সেদিকেই নুয়ে পড়বে। ছেড়ে দিলে সোজা হবে। ছাতার কাপড় তোমাকে ত্যাগ করবে, সিক কঙ্কালের মত হয়ে পরিত্যক্ত হবে বেতের ওই ছত্রকাণ্ডটি কিন্তু তোমার বার্ধক্যের যষ্টি হয়ে হাতে হাতে পায়ে পায়ে ঘুরবে। গৃহিণীকে পেটাতে পারবে, রাস্তার নেড়ীকুকুরকে ভয় দেখাতে পারবে, কাছা খুলে দিলে নাতিকে তাড়া করতে পারবে। এটি তোমার তৃতীয়পদ বিশেষ। বাঁশের বাঁট অল্পস্বল্প অত্যাচার সহ্য করতে পারবে, তবে যাঁরা দাঁড়িয়ে আড্ডা মারেন তাঁদের হাতে এর পরম মৃত্যু অত্যাচারী স্বামীর হাতে স্ত্রীর আয়ুর মত। কারণ, আড্ডাধারীদের ভঙ্গিটা সাধারণত এই রকম হয়—ছাতাটা সামনে, তার ওপর দুটো হাত, গল্প চলছে, মাঝে মাঝেই হাতের চাপে ছাতাটাকে বাঁকাতে ইচ্ছে করছে। করবেই। হাতের ধর্মই হল নিষ্পিষ্ট করা। পা ধরে গেলে ছাতাটাকে পশ্চাদ্দেশে লাগিয়ে ক্যামেরার স্ট্যান্ডের মত একটু আরাম করার ইচ্ছে হবেই। আর বাঁশের ধর্মই হল বাঁশ দেওয়া। সে বাঁশ [illegible]

কাঁচাই হোক, তলতা হোক কি মুগলি হোক। মড়াৎ করে মটকে যাবেই, তখন হয় সামনে হুমড়ি না হয় পেছনে ধপাস। বাঁশকে ধারণ করা যায়, বাঁশ কাউকে তেমনভাবে ধারণ করে না।

সাঁপি

ছাতার তলার দিকে যে অংশটা পায়ে হাঁটে সেইখানে লাগানো থাকে লোহার একটি টুপি। এই অংশটি অতি বিপজ্জনক। ছাতা, ছাতার মালিকের সঙ্গে দুলে দুলে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সামনের মানুষটির গোড়ালির পেছনে পা তুলে দেয়। ঘোড়ার পা আর ছাতার পায়ে তফাত কেবল ওজন আর আয়তনের। ফল কিন্তু এক। ধনুষ্টংকার হলেই হল।

ল্যাংমারা ছাতা

তুমি যদি সামনের হাতে ছাতাটি ঝুলিয়ে, সেই হাতটিকে শরীরের পাশে রেখে রাস্তা হাঁটায় অভ্যস্ত হয়ে থাক তাহলে বলে রাখি ছাতা জাতির চরিত্র মহিলাদের মতই—দেবতাই জানেন না মানুষে কা কথা! ওই পাশে ঝুলতে থাকা নিরীহ ছাতা অবশ্যই তোমাকে ল্যাং মারবে। আজ না মারুক কাল মারবেই! যেমন মেরেছিল আমাকে। চৌরঙ্গীর চার মাথায়। লুক টু দি লেফ্ট অ্যান্ড টু দি রাইট দেন ক্রস। তাই করছিলুম। বেআইনী কিছু করিনি। রাস্তা পার হবার সময় যতটা দ্রুত পা চালান উচিত সেইভাবেই চালিয়ে-ছিলুম। ডান দিক থেকে তেড়ে আসছে এক সার, পালের গোদা ডবল ডেকার, বাঁদিক থেকে আর এক সার, নেতা একটি লরি। পাশে দুলতে দুলতে হাঁটছে আমার ছাতা। হঠাৎ কি হল জানি না, পেছন দিক থেকে কে মেরে দিয়েছে ল্যাং। রাস্তায় ফ্ল্যাট। পুলিসের বাঁশি। নানা রকম ব্রেকের ক্যাঁচ, ক্যাচ শব্দ। নড়া ধরে তুলে দিলে পুলিস। পশ্চাদ্দেশে দুটো থাপ্পড় মেরে বললে, উজবুক কাঁহাকা। কাঁপতে কাঁপতে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠে ছলছলে চোখে হাতের ছাতাকে জিজ্ঞেস করলুম—তোর এই কাজ, মাঝ রাস্তায় মারলি ল্যাং! কি কায়দায় মারলি! ও! চট করে পেছন দিক থেকে পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়েছিস। বেশ করেছিস! আপনার লোকের মতই কাজ করেছিস রে!

বগলের ছাতা

যে ছাতা বগলে থাকে, সাবধান! বগল-ধৃত ছাতা কখন কি করবে বলা শক্ত। 'আরই ল্যাংড়া কত করে'—সামনে ঝুঁকলেন মালিক, বগল থেকে বেরিয়ে থাকা সঙিনের মত ছাতা ওপর দিকে ঠেলে উঠল, তিনটে লোক খুন। 'আরে জনার্দন যে', ছাতার মালিক বৃত্তাকারে ঘুরলেন, ছটা লোক হাস-পাতালে চলে গেল। দৌড়ে বাসে ওঠে বগলের ছাতাটাকে দুবার নাচিয়ে দিলেন, দুটো লোক চাকার তলায় চলে গেল। বগলে যার ছাতা সে কি না পারে। 'হ্যাভক' করে দিতে পারে।

ছাতার বাঁটের প্রয়োগ

মুড়ুড়-খোলা বাসে ফুটবোর্ডে একটু স্থান চাই। পাকা পেয়ারার মত বাঁট দিয়ে টেনে টেনে গোটা চারেককে ফেলে দিয়ে, উঠে পড়। উঠে কিছু করতে করতেই বাস ছেড়ে দেবে।

এই শহরে তিন প্রকার ছাতা আছে—সবল ছাতা, দুর্বল ছাতা, ডবল ছাতা। আগে ছিল, সামনাসামনি ছাতা পড়লে যে কোন একটি উঁচু হত অন্যটি বেরিয়ে যেত তলা দিয়ে। এখন রীতিটা অন্য। হামভী মিলিটারি, তোমভী মিলিটারি। ছাতায় ছাতায় গুঁতো-গুঁতি, খোঁচাখুঁচি, ফাঁসাফাঁসি। সবলের ছাতা নয়, সবল ছাতার জয়। দুর্বল ছাতা ভয়ে ভয়ে একপাশ দিয়ে হাঁটে। সুন্দরী হাঁটছেন ততোধিক সুন্দর ফোল্ডিং ছাতা মাথায় দিয়ে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। একটু জোর হাওয়া। ছাতা উল্টে গেল। কষ্টে সোজা হল। একবার, দুবার, বারবার। সাক্ষী যুবক এগিয়ে এলেন। দাঁড়ান দাঁড়ান ছাতার ওপর ছাতা ধরি। ইটস্ অ্যা প্লেজার।

আবহাওয়ার পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার খবর—কৃষকদের জন্যে, মৎসজীবীদের জন্যে, আর ফোল্ডিং ছাতাধারীদের জন্যে—বিকেলে বৃষ্টি হবে। সকাল থেকেই ছাতা খোলার তোড়জোড় করুন। নইলে খুলতে খুলতেই মনসুন চলে যাবে।

[illegible]

বুদ্ধিমান
লোকেদের
বিচক্ষণ
নির্বাচন

উইলসন ৯৬ বলপেন বুদ্ধিমান লোকেদের নির্বাচন ও পছন্দ। হিজিবিজি দাগকাটা থেকে ছবি আঁকা যা কিছুই আপনি বলপেন দিয়ে করতে চান, উইলসন ৯৬ আপনার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ক্রোম-প্লেট মেটাল দিয়ে তৈরী। এর পয়েন্ট এত নিখুঁত যে আপনার লেখার ভঙ্গীকে মানিয়ে নেবে। উইলসন ৯৬ বলপেনের বিভিন্ন গুণ ব্যবহার করে দেখুন।
WILSON 96
বলপেন
বালকৃষ্ণ পেন প্রাইভেট লিমিটেড,
নাগরদাস রোড, আন্ধেরী, বম্বে ৪০০ ০৬৯
টেলিফোন: ৫৭৪৩২১, কেবল: WILSONPEN
টেলেক্স: ০১১.৪১৪১ SANGHVI
পরিবেশক: কিরণ অ্যান্ড কোম্পানী
১৩/১৫, শামসেট স্ট্রীট, বম্বে ৪০০ ০০২, টেলিফোন: ৩২৪৪৩২
ADVERTS/WP/214/B

শিক্ষাচিন্তা: সেকালে ও একালে

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

সময়ের মাপকাঠিতে বাহাত্তর বছর তেমন কিছু লম্বা-চওড়া কাল নয়। অনেকে হয়তো বলবেন, ওটা সমুদ্রে জলবিন্দু। ঠিক বটে। কিন্তু একটি জাতির জীবনে ৭২ বছর একেবারে মামুলী সময় নয়। বিশেষত যদি এই পর্যায়-কালের ভেতর দুটো মহাযুদ্ধ, একটা সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ, দেশ ব্যবচ্ছেদ এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচন—এতগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। যা ঘটেছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। এবং সেগুলির সব ক'টি এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নির্বাসিত হয়ে যায়নি। ঘটনাবিশেষের জের আজও চলেছে, সমাজজীবনে তার প্রভাব অনস্বীকার্য। যেমন, দেশ বিভাগ, ন্যাশানাল কাউনসিল অব এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষাচিন্তা।

১৯০৬-এ বহু সমস্যা ছিল জাতির জীবনে, ১৯৭৮ সালেও আছে এবং একাধিক। এই দুই কালের সমস্যাগুলির মধ্যে খুব বেশী সাদৃশ্য আছে তা কেউ বলবে না। সেদিনের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পরাধীনতার জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ, যার সমাধান হয়ে গেছে ৩০ বছর আগে। আর ন্যায়, নীতি ও সমতার কংক্রীট দিয়ে স্বাধীনতার বনিয়াদের দৃঢ়ীকরণ আজকের মুখ্য উৎকণ্ঠা। কিন্তু ৭২ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও কোনও কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে সেকাল ও একালের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। যথা, শিক্ষাসমস্যা। আলো-আঁধারে ঘেরা স্মৃতিপথে যদি ফিরে যাওয়া যায় ১৯০৬ সালে তা হলে দেখা যাবে সমাজজীবনে বিস্তর সমস্যার অন্যতম ছিল শিক্ষাসমস্যা। আজও আছে সে সমস্যা, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সমাধানের জন্য সেদিন কি করা হয়েছিল আর বর্তমানেই বা কি করা হচ্ছে।

অল্পাধিক সাত দশক আগেকার এমন এক আগস্ট দিনে, প্রকৃতপক্ষে ১৪ আগস্ট ১৯০৬ সাল, এক বিস্ময়কর দৃশ্যপট লক্ষিত হয়েছিল। নেটিভ কলকাতার সমস্ত রাজপথ ওই দিন মিলিত হয়েছিল টাউন হলে। বলা বাহুল্য, আজকের অবহেলিত টাউন হলের সঙ্গে, এর অবস্থিতি কোথায় সেটাই এখন অনেকের অজ্ঞাত, তখনকার সযত্নে রক্ষিত টাউন হলের কোন তুলনা চলে না। সেদিন টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক সভায় সমাজের মনস্বীজনের কেউ অনুপস্থিত ছিলেন এমন নাম উল্লেখ করা কঠিন। কে না ছিলেন ওখানে—রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, এ রসুল, আবদুস সোভান চৌধুরী, আবদুল হালিম গজনভী, মহম্মদ ইউসুফ খান, এম এ আঃতুল্লা, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামেশ্বর সিং, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, রাজশেখর বোস, অম্বিকাচরণ উকিল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ক্ষুদিরাম বোস, ভূপেন্দ্রনাথ বোস, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, নীলরতন সরকার, অমৃতলাল সরকার, আর জি কর, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, প্রিয়নাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস, চন্দ্রনাথ বোস, অমৃতলাল বোস, মতিলাল ঘোষ এবং অরবিন্দ ঘোষ।

উপলক্ষ? কেন এই অভূতপূর্ব সমাগম? জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (ন্যাশানাল কাউনসিল অব এডুকেশন) স্থাপিত বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ ও স্কুল-এর যথাবিধি উদ্বোধন। ওই সভা ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উভয়ের সভাপতি রাসবিহারী তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণে বললেন, "কেন ও কী জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা তা বিশদভাবে আলোচনা করবেন গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। এই বিষয় ব্যাখ্যানের যিনি আমাদের মধ্যে যোগ্যতম এবং যাঁর ভেতর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে, রাডিয়ার্ড কিপলিং এবং তাঁর অনুগামীদের ভিন্ন ধারণা সত্ত্বেও।" জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দৃঢ় অথচ নিরুত্তাপ কণ্ঠে গুরুদাস জানিয়ে দিলেন, "প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সেজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জাতীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়...ইতিহাসের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। ইউরোপে মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার অবসান ঘটে বিদ্যাচর্চার নব উন্মেষ ততক্ষণ সম্ভব হয়নি যতক্ষণ না সেখানে আধুনিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার হয়েছে। এখানেও শিক্ষা-বিস্তার সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মাতৃ ভাষার মাধ্যমে, কেবল প্রাথমিক স্তরে নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও, বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া না হচ্ছে।"

ভিন্ন কণ্ঠস্বরে গুরুদাসের বক্তব্য সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত রাখলেন গুণীজনদের দরবারে। বিশ্বকবির অননুকরণীয় ভাষায়, উদ্ধৃতিটা আকারে একটু বড়, তবে তাতে কারো আপত্তির সঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে বোধ হয় না, "সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা স্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে...যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত, তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া

আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র। মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোন মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই...আমরা কি, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন, সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন মূর্তি কিভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই?...হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে—আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব।" কোন স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসী বলবে যে, ওই আশা আজ পূরণ হয়েছে। অথবা নিকট ভবিষ্যতে তা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বক্তব্যে ফেরা যাক। ১৯০৬ সালের ১৬ অকটোবর ভারতবর্ষের তৎকালীন বড় লাট লর্ড কার্জনের অনেকগুলি অপকর্মের অন্যতমটি, অর্থাৎ বাংলার দ্বিখণ্ডন, অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের ঝড়ে অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। শিক্ষাজগতেও তার জের গড়ায় বহু দূর। অনুমান করি, সেই সময় রাজশক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে সংগঠিত ও সুদূর প্রসারিত প্রতিবাদ উঠেছে শিক্ষাক্ষেত্রে। সমাজের তখন যাঁরা পথিকৃত তাঁদের প্রায় সবাইকেই দেখা গেছে ইংরাজ প্রচলিত শিক্ষার বিকল্প রচনার ক্ষেত্রে। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ, দাবি করেছেন তাঁরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার যা "জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন নয়", যা "বহুদিনের খণ্ডিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে"। দেশের চিন্তানায়করা সেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জাতির সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার চাবিকাঠির সন্ধান মিলবে শিক্ষাজগতে। এই বোধ তাঁদের ছিল, জাতীয়তার আধারে সমাজ নবনির্মাণের, পরাধীনতার গ্লানি থেকে নিষ্কৃতিলাভের যে কয়েকটি পথ জাতির সামনে খোলা ছিল তার অন্যতম প্রধান ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। যা মানুষের মনের ওপর বিদেশী শাসকের দখল হটাতে সক্ষম হবে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উপাদ্য ছিল বয়কট বা বিদেশী জিনিস বর্জন, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা। ন্যাশানাল এডুকেশন কাউনসিলের সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতি গঠনের একটা দুরূহ চ্যালেঞ্জের সদর্থক জবাব, সন্দেহ নেই। অবশ্য জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা একটা অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি নয়। এর পেছনে ছিল কম-বেশী পৌনে এক শতাব্দীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও নিরলস প্রয়াস। আনুপূর্বিক ফর্দাও আলোচনা না ফেঁদেও বলা যায়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই বাংলায় তখনকার সংস্কৃত-ভিত্তিক শিক্ষার অপ্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে একটা চিন্তাভাবনা দেখা দিয়েছিল। সে চিন্তা-ভাবনার পরিষ্কার প্রতিফলন দেখা যায় রামমোহন রায়ের কাজ ও কথায়। বাংলার মনোজগতের যে-আলোড়নের বহিঃপ্রকাশকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলা হয় তার প্রারম্ভও এরই মধ্যে। ১৮২৩-এর ডিসেম্বরে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের কাছে এখানে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তিনি আবেদন পেশ করলেন। রামমোহন চেয়েছিলেন, সংস্কৃত-নির্ভর শিক্ষার আগাগোড়া সংস্কার করে এমন এক "লিবারল অ্যান্ড এনলাইটেন্ড সিস্টেম অব ইনস্ট্রাকসন" উদার ও মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হোক যা সমাজকে সমকালীন সমস্যার মোকাবিলা করতে সহায়তা করবে। এটা স্মর্তব্য, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজের মুক্তি পথের অনুসন্ধান ছিল তাঁর ধ্যানধারণা, বাদামী সাহেব তৈরি নয়। অন্যের ছিদ্রান্বেষণ যাঁদের একমাত্র পেশা তাঁরা ভিন্ন এ ধরনের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ করবে না। গুরুদাসের মতো কিছু সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল ব্যক্তিও রামমোহন সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের তমসা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন সেটাকে বিদূরিত করার জন্য বিধাতার অনুকূল বিধানে যে মহাপুরুষ-দের সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভাব হয় রামমোহন রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি সেই জ্যোতিষ্কেরই একজন যাঁরা দীর্ঘকালব্যাপী অবিচলিতভাবে দীপ্ত থাকে, যাঁদের ঔজ্জ্বল্য কখনও ম্লান হয় না।"

যাই হোক, রামমোহনের আবেদনের প্রায় এক দশক পরে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ও লর্ড টমাস ব্যাবিংটন মেকলের অনুগ্রহে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয় তা নিশ্চয়ই রামমোহনের কাম্য ছিল না। তাঁর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাত। এ ব্যাপারে ইংরাজকে কপটতার দোষে দোষী করা অনুচিত। তাদের প্রধান লক্ষ সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, ভারতবাসীর হাতে তার বন্ধনমুক্তির জন্য সুশিক্ষার হাতিয়ার তুলে দেওয়া নয়। শাসকগোষ্ঠী যে-শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল সেটা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতোই সাম্রাজ্য সংরক্ষণের আরও একটা ধান্দা। না মেকলে, যিনি ওই শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত জনক, না অন্য কোন দায়িত্বশীল রাজপুরুষ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রেখেছিলেন। বরং উলটোটাই তাঁদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। এতটুকু দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে মেকলে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য দক্ষ নকলনবিশ বানানোই ইংরাজী শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে রচিত হয়েছিল শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজনের তাগিদায়, এ দেশের মঙ্গলের জন্য নয়, সেটা অনুভব করতে বিবেচক ব্যক্তিদের অনন্তকাল লাগেনি। সময়ের গতির সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচকদের সংখ্যা, সমালোচনার তীব্রতা। ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ ও নগণ্য লেনাপাওনাই যাঁদের সব কিছু বিচারের একমাত্র মানদণ্ড ছিল না, তাঁরাই মেকলে সৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা

এমন এক ধরনের শিক্ষার যা একদিকে দেশের সমসাময়িক ইন্টালেক্টকে উপেক্ষা করবে না এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতের বৃহত্তর কল্যাণ সম্পর্কে নিস্পৃহ হবে না। এই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য (বস্তুত তাঁর আগে তৎকালীন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের, অর্থাৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা, কোনওটির উপাচার্যের আসনে কোন ভারতীয় বসেন নি) গুরুদাসের বক্তব্যের অথবা রবীন্দ্রনাথের অভিমতের উল্লেখ এখানে অসমীচীন হবে না বোধ হয়। উপাচার্য থাকাকালীন সময় (১৮৯০—১৮৯২) প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণগুলিতে তিনি বারবার বলেছেন, "ব্যাপক ও সুসমৃদ্ধ জাতীয় সংস্কৃতি কখনও গড়ে উঠবে না, যতক্ষণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার না হচ্ছে।"

প্রায় একই ধরনের চিন্তা অভিব্যক্ত হল ৩১ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথের লেখায়। ১২৯৯-এর পৌষ সংখ্যায় "সাধনায়" প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় তিনি বললেন, "আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোন-একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই. ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে...। এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যথার্থ লাভ করিতে পারিব।" এরই একটা যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। যার সঙ্গে, অন্যান্য বিষয় ছাড়া, শিক্ষক, প্রশ্নপত্র রচয়িতা ও পরীক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন রাসবিহারী, গুরুদাস, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, সতীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, জহিরুদ্দীন আহমদ ও হীরেন্দ্রনাথ-এর মতো বিজ্ঞজনেরা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কী? বর্তমান পরিস্থিতিতে ওটা কি নেহাত অবান্তর নয়? আপাতদৃষ্টিতে তাই হয়তো মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেদিনের লক্ষ্য ছিল, শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার। কেননা, ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। সেদিনের পঙ্গু ব্যবস্থাটা ইংরাজের এ দেশ ছাড়বার পর হঠাৎ সক্ষম হয়ে গেছে অনুমান করার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে কী? না, তা নেই। কিন্তু আজব ব্যাপার, সে শিক্ষাব্যবস্থা এখনও বহাল তবিয়তে। সাত দশকের বেশী সময় পার হয়ে গেছে টাউন হলে ১৪ আগস্টের সেই অদৃষ্টপূর্ব সমাবেশের পর, একত্রিশটা শীত-গ্রীষ্ম কেটে গেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, কিন্তু মেকলেদের দায় আজও সমাজ বহন করে চলেছে।

প্রামাণিক তথ্যের প্রতি নজর দিলেই দেখা যাবে, ইংরাজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থা, অবশ্য খানিকটা পলস্তারা করা অবস্থায়, এখনও আসর জেঁকে বসে আছে। যে শিক্ষা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে ধিকৃত হয়েছে, জাতির জীবনে বরাবর অভিশাপ বলে পরিগণিত হয়েছে, সেটা আজও কেমন করে অপরিবর্তিত থাকে তা অনেকের কাছে একটা রহস্য। বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে, গত ৩০ বছর ধরে, অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত থেকে, দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেক সমাজ-সচেতন ভারতবাসী শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার সুপারিশ করে আসছেন। রাষ্ট্রনেতা, প্রশাসক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই অভিন্ন মত যে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে, ওটা বাতিল করে দেওয়া আবশ্যক। কোহিমা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই উপমহাদেশে এমন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে না যিনি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে রায় না দিয়েছেন। যে নামই স্মরণ করা যাক না, এই প্রসঙ্গে—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, সুভাষচন্দ্র বোস, বিবেকানন্দ, আবুল কালাম আজাদ, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জওহরলাল নেহরু। নবচেতনার পথিকৃতদের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

এ দেশে শিক্ষা-সমস্যা একটা কাল্পনিক ব্যাপার নয়। শিক্ষাব্যবস্থা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন তা সন্দেহাতীত। অবশ্য শিক্ষা-সমস্যা নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এটা একটা সর্বজনীন সমস্যা। সারা পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন অব্যবস্থা অবিদ্যমান। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এর প্রণালী, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত তা নিয়ে বিশ্বের সর্বত্রই তর্কবিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ, আলাপ-আলোচনা চলছে। ইউরোপ বা আমেরিকাতে মনীষীদের কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—শিক্ষার প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে কিনা। অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে যে অর্থ, শ্রম ও সময় নিয়োজিত হচ্ছে তার উপযুক্ত আগম পাওয়া যাচ্ছে কিনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সেখানে শিক্ষা-সমস্যার চেহারা ছিল ভিন্ন ধরনের। পরবর্তীকালে সেটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যেমন বদলে গেছে সমাজের চেহারা, তার মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রয়োজন ও অভিরুচি। চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণারও একটা মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কিছুকাল পূর্বেও যে-শিক্ষাব্যবস্থা চলনসই ছিল তা এখন পরিত্যক্ত হয়েছে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে। নিত্য ওখানে শিক্ষা নিয়ে চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণ। কিন্তু একটি বিষয়ে পশ্চিমের চিন্তা-নায়করা একমত—তাঁদের স্থির বিশ্বাস, শিক্ষা সম্পর্কে হোরেসম্যানের ১০০ বছরের পুরানো অভিমত আজও অবান্তর নয়। তাঁর কথায় যা তিনি বলেছিলেন ১৮৪৮ সালে, এডুকেশন ইজ দি গ্রেটেস্ট ইকোয়ালাইজার অব দি কনডিশনস অব ম্যান—দি ব্যালান্স-হুইল অব দি সোস্যাল মেশিনারী—শিক্ষা মানব অবস্থার [illegible]
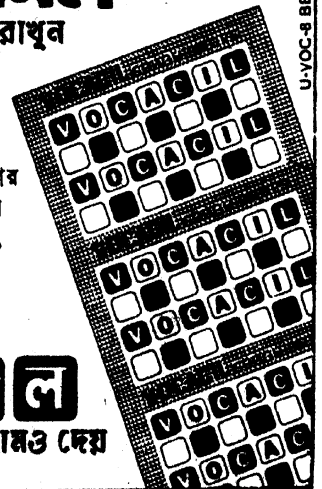
হলে, পশ্চিমের দেশগুলিতে শিক্ষা-সমস্যা অত্যন্ত আত্মাধীন, সতত চলছে সমাধানের সচেতন প্রয়াস।

এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশের সমাজপুরোধারা নাসিকায় সর্ষপ তৈল প্রয়োগ করে সুখনিদ্রায় মগ্ন। কেউ তা বলবে না। আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষা সমস্যা নিয়ে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে এখানে নিরন্তর আলোড়ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা নবনির্মাণের আন্দোলন ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই বিশিষ্ট এক দিক। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিভ্রাট সম্পর্কে হইচই নিতান্ত কম হয়নি। যাঁরা দেশের দিকপাল, এর অগ্রযাত্রার যাঁরা দিক্‌নির্ণয় করেন, তাঁদের বিচারে শিক্ষাব্যবস্থাকে বরবাদ করে দেওয়া উচিত। তাঁদের মতে, বর্তমান শিক্ষার নৌকাটার চড়ে টাইবার নালা পারাপার সম্ভব নয়, সমুদ্রপাড়ি তো দূরের কথা। শিক্ষাব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর সর্বজনমান্য তিনজন শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র ও ডি এস কোঠারি—গঠিত হয় তিনটি শিক্ষা কমিশন। কি রাধাকৃষ্ণন কমিশন (ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন, ১৯৪৮), কি মুদালিয়র কমিশন (সেকেন্ডারী এডুকেশন কমিশন, ১৯৫২), কি কোঠারি কমিশন (এডুকেশন কমিশন, ১৯৬৪) তাঁদের সকলেরই অভিমত, শিক্ষাব্যবস্থায় সমুচিত সংস্কার ও সংশোধন আবশ্যক। কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে অত্যন্ত সরল ভাষায় বলা হল—

"Traditional societies which desire to modernize themselves have to transform their educational system before trying to expand it, because the greater the expansion of the traditional system of education, the more difficult and costly it becomes to change its character."

নিজেদের বর্তমান যুগের উপযোগী করতে ইচ্ছুক এমন সনাতন সমাজগুলিকে তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের আগে পরিবর্তন করতে হবে। কেননা, গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা যত সম্প্রসারিত হবে ততই কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে এর চরিত্র পরিবর্তন।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রকর্ণধারেরা ইয়ত্তা নেই কতবার কোন ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে বলেছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা উৎসন্নে গেছে। এক-আধটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেই যথেষ্ট। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ-এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণ সভায় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা "আদিম এবং এটা আধুনিক যুগের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত।" কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের এক প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছিল তার অর্থ দাঁড়ায়, উচ্চশিক্ষার বেশীর ভাগই ন দেবায়, ন ধর্মায়। বছর দুয়েক আগেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বলতে শোনা গেছে যে, শিক্ষাব্যবস্থার সমূহ পরিবর্তন আবশ্যক। তিনি আক্ষেপ করেছেন, "We have forgotten the past and failed to formulate oursystem to meet the needs of the hour."

অতীতকে আমরা ভুলে গেছি আর বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের ব্যর্থ হয়েছি। প্রায় আড়াই বছর আগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশন্যাল চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিশেষজ্ঞ জে পি নায়ক বলেন, বহুদিন যাবৎ কর্তৃপক্ষ একটা জাতীয় শিক্ষা-নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন। যে-শিক্ষাব্যবস্থা "was to replace the system introduced by the British in 1830."

১৮৩০-এ ইংরেজ প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে। আর গত তিরিশ বছরের জমানাকে বৃন্তচ্যুত করে আজ যাঁরা ক্ষমতার অলিন্দে আসন পেতেছেন তাঁরাও শিক্ষাব্যবস্থার অসংলগ্নতা সম্বন্ধে খোলাখুলি বলছেন।

অন্যেরা এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আরও অপ্রিয় মন্তব্য করেছেন। গুনার মিরডালের ন্যায় প্রাজ্ঞজনেরা নিশ্চয় অনুরাগপরবশ হয়ে বলেননি, চলতি শিক্ষা এতই অন্তঃসারশূন্য যে, এটা অপশিক্ষারই নামান্তর। মিরডালের বক্তব্য, ভারতবর্ষ সমেত দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ "are not merely being insufficiently educated; they are being miseducated on a large scale."
—কেবল অপরিমিত শিক্ষাই পাচ্ছেন না, তাঁরা ঢালাও কুশিক্ষার শিকার। পল গুডম্যান এখানকার শিক্ষাব্যবস্থাকে "কম্পালসরি মিসএডুকেশন"—বাধ্যতামূলক কুশিক্ষা বলেই অভিহিত করেন।

ভিন্ন দিক থেকে আলেখ্যটি একবার দেখলে মন্দ হয় না। বিদেশী শাসন-অবসানের পর থেকে শিক্ষার পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি পায়নি মনে করার কারণ নেই। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০, ও কলেজের সংখ্যা ৬২৫। আজ? ১১৫ বিশ্ববিদ্যালয় আর ৪,৫৬৯ কলেজ। উভয় ক্ষেত্রে বৃদ্ধির গড়পড়তা হার নেহাত খাটো বলা চলে না। সম্পূর্ণ চিত্রটির একটা আভাস পেতে হলে স্মরণ রাখা দরকার যে, দেশে বর্তমানে পঁয়ত্রিশ লক্ষ শিক্ষক ও সাত লক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, ছাত্রের সংখ্যা দশ কোটি ও বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি টাকা। এর নিট ফল?—সেটা অনুক্ত থাকলেই বোধ হয় ভাল ছিল। কেন,—অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু একটা পরিসাংখ্যিক তথ্যের প্রতি চোখ বুলালেই এর জবাব মিলে যাবে। দেশ যখন স্বাধীনতা পায়, তখন সাক্ষর ছিল জনসংখ্যার শতকরা ১০, এখন সেটা মাত্র শতকরা ৩০। অবশ্য এই তিরিশজনের মধ্যে কজন সত্যই অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট তা বলা কঠিন। অবশ্য সাক্ষরতার মানদণ্ড যদি হয় ইউনেস্কোর সংজ্ঞা—"সাক্ষর তাঁকেই বলা যেতে পারে, যিনি নিজ গোষ্ঠী ও সমষ্টির ভেতর সাক্ষরতা নির্ভর ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগের জন্য অত্যাবশ্যক জ্ঞান ও পটুত্ব অর্জন করেছেন এবং যাঁর অধ্যয়ন, লিখন ও পাটীগণিতে অর্জিত পারদর্শিতা তাঁকে সেটা নিজের ও সমষ্টির উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনে কার্যকর অংশ গ্রহণের জন্য ব্যবহার করতে শেখায়।" এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন থেকে নিরক্ষরতার আঁধার মিটিয়ে দেওয়ার সাংবিধানিক নির্দেশক নীতির উল্লেখ সিসিফাসের ট্র্যাজেডির কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেবে, তাই না? শিক্ষা যে এখানে সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে সেটা যেমন স্বতঃপ্রমাণ তেমন স্পষ্ট আর একটি বস্তু—প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে নির্মিত শিক্ষার কাঠামোটা এখনও আপন গৌরবে বিরাজমান।

কম-বেশী আড়াই হাজার কথার মাধ্যমে এতাবৎ যা বলা হল তা কি নিছক নর্দমা পরিদর্শকের খতিয়ান? হ্যাঁ, ঠিক তাই, কুঞ্চিতভ্রূ বিদগ্ধজনেরা জবাব দেবেন। হয়তো প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে বলবেন, শিক্ষাসংকট সম্পর্কে অনেক কথাই শোনা গেল, কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কী, শিক্ষাব্যবস্থা কী ধরনের হওয়া উচিত, কই, সেটা প্রকাশিত হল না তো? তাঁদের কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে [illegible], প্রথম সমাজে নর্দমা পরিদর্শকেরও কখন-সখন দরকার হয়, শহর কলকাতার রাস্তাঘাটের দিকে নজর দিলেই তা বুঝতে বেগ পেতে হবে না। দ্বিতীয়, বিকল্প বাতলাবার মতো বুদ্ধিসুদ্ধির অভাব আছে বলেই এই বাগাড়ম্বর। নতুবা, মাত্র একটি গুরুগম্ভীর বাক্যে বিধেয় কর্তব্যের ফতোয়া জারি করে দেওয়া যেত। তবে নিজের দিকে এবং আশপাশে তাকিয়ে এটুকু বুঝতে পারি যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা হেজেমেজে গেছে, এটা সত্যই, জার্মানদের ভাষায়, "কাপুট"। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা জুড়ে দিতে চাই। শিক্ষাব্যবস্থা কি ধরনের হওয়া উচিত তা তুলাদ বাদে সকলেরই মোটামুটি জানা আছে। সেটা কার্যে রূপায়িত না হওয়ার অন্যতম কারণ ক্ষুদ্র ও তাৎক্ষণিক স্বার্থের নিগড়ে বাঁধা তথাকথিত "এলিট"-এর, মূলত যা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের যৌগিক, সংকল্পের অভাব। যে-শিক্ষাব্যবস্থা একটা বলিষ্ঠ আদর্শ ও লক্ষ্য, নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করে না, জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সাক্ষরতার মৌল অধিকার থেকে দশ কোটি মানুষকে বঞ্চিত করে রাখে, সে শিক্ষাব্যবস্থা একটা দুর্বিষহ বোঝা ভিন্ন আর কিছু নয়। যাঁরা শিক্ষা সম্পর্কে নিত্য কনফারেন্স সেমিনার-সিম্পোসিয়াম-ওয়ার্কশপ বসাতে ব্যস্ত এবং দশ প্লাস দুই বা আট প্লাস চার-এর কচকচিতে অফুরন্ত সময় ও সম্পত্তি ব্যয় করতে এতটুকু কাতর নন, পাণ্ডিত্যের ভারে ন্যুব্জ সেই সকল বুদ্ধিজীবী, পরিকল্পনা বিশারদ ও রাষ্ট্রনেতারা ওই সোজা ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে অপারগ এমন অভিযোগ উত্থাপনের বেআদবি আমার নেই। কিন্তু কপট নিদ্রিতের ঘুম ভাঙাবে কে? এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সহজেই বোধগম্য হবে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থপতিরা আমাদের ঘরে চুরি করেননি। না তাঁদের সম্পাদ্য কর্ম সাধনের জন্য সংকল্প করার মনঃশক্তি বিকল ছিল। অজকের বঞ্চিত [illegible] শিক্ষাপ্রসারীদের সম্পর্কে কি সেটা প্রযোজ্য?

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ১৮ ॥

আমার প্যারিসের জীবনের কথা জানতে চাইছ? প্যারিসে ছোটবেলায় যখন ছিলাম—ঐ ১৯৩০ সাল থেকে—ঐ পিরিয়ডটায় আমরা প্রথমে ভ্যাংগতন্ রু দ্য পারীতে থাকতাম। অর্থাৎ ২১ নম্বর রু দ্য পারী। বছর খানেক, বছর দেড়েক পরে আমরা চলে গেলাম ১৭ রু দ্য বেলভেদেরে। দুটো জায়গাই Paris 16 Arrondismentতে পড়ে। সে সময়ে দারুণ দারুণ সব লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আর প্যারিস তো ছিলই তখন সব ব্যাপারের পীঠস্থান। জগতের সব মাথা-মাথা লোক তখন প্যারিসে জড় হয়েছিলেন। তখন যাঁদের কাছে গিয়েছিলাম তাঁদের একজন রোম্যাঁ রোলাঁ। রোলাঁর তখন চারিদিকে এত সম্মান—লেখক হিসেবে, মানুষ হিসেবে! সবাই ওঁকে ভীষণ শ্রদ্ধা করত। বিশেষ করে ভারতের ওপর কি শ্রদ্ধা ওঁর! রামকৃষ্ণদেবের ওপর, স্বামীজীর ওপর, মহাত্মাজীর ওপর ওঁর সেইসব বই তখন বেরিয়েছে। একবার দেখা করতে গেলাম। অল্পক্ষণের জন্য। ওঁর স্বাস্থ্য তখন খুব ভেঙে গেছে। খুব দুর্বল। একটা জিনিস তখন আমার ভীষণ চোখে পড়েছিল। গায়ের রঙটা তখন ওঁর কাগজের মত সাদা, সেটা আমার এখনও মনে আছে। He looked very sick. খুব অল্প অল্প কথা বললেন। তখন অবশ্য উনি যে ঠিক কত বড় সেটা বুঝতে পারিনি। এখন ভাবলে অবাক হই কত সরলভাবে দেখে এসেছিলাম কত বড় একটা মানুষকে।

আমার মনে পড়ে আর একজনকে। বাংলা দেশের মানুষ তো ওঁকে ভীষণই চেনেন। হয়তো আগেকার অনেকেই এখনও তাঁকে মনে রেখেছেন। সিলভ্যাঁ লেভী। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু দিন ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

১৯৩০ সালের কথা। প্যারিস তো তখন সব ব্যাপারের পীঠস্থান। জগতের সব মাথা মাথা লোক তখন প্যারিসে জড় হয়েছেন। তখন যাঁদের কাছে গিয়েছিলাম তাঁদের একজন রোম্যাঁ রোলাঁ। ওঁর স্বাস্থ্য তখন খুব ভেঙে গেছে। খুব দুর্বল। গায়ের রঙটা তখন ওঁর কাগজের মতন সাদা।

সিলভ্যাঁ লেভী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু দিন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। উনি এসেছিলেন আমাদের রু দ্য পারীর বাড়িতে। দাদা তখন কয়েকটা আইটেম তৈরি করে ফেলেছেন। ওঁকে দেখানো হল।

একেবারে মাটির মানুষ—সরল, প্রাণবন্ত, অথচ গম্ভীর। উনি এসেছিলেন আমাদের রু দ্য পারীর বাড়িটায়। আমাদের রিহার্স্যাল চলছিল তখন। দাদা তখন কয়েকটা আইটেম তৈরি করে ফেলেছেন। তো ওঁকে দেখানো হল। কত কতবার বলা হল, অথচ উনি মাটিতেই বসলেন। কার্পেট-টার্পেট দিলাম। বললেন, না, না, না; কিছু না। আমি মাটিতেই ভাল আছি। বহুক্ষণ ছিলেন। চা-টা খেলেন। ভীষণ ভাল লেগেছিল ওঁকে। একটু একটু বাংলা বলতে পারতেন। আর কি মিষ্টি ব্যবহার! তবে একটা ব্যাপারে পরে আমরা খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। উনি সেই যে বাড়ি ফিরলেন—মাটিতে বসে ওঁর একটা বিচ্ছিরি ঠান্ডা লেগেছিল, সেটাই খারাপের দিকে গিয়ে ওঁর ভারি অসুখ হল—তার কিছু দিন পর উনি মারা যান। খবরটা পেয়ে আমরা দারুণ মর্মাহত হয়েছিলাম। কেন যে জোর করেই ওঁকে কার্পেটে বসালাম না!

তারপর ধর প্যারিসে থাকাকালীন প্রায়ই বিরাট বিরাট সব মিউজিসিয়ানদের শুনতে যেতাম। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। যেমন ফ্রিৎজ ক্রাইসলার। পৃথিবীতে যতদিন বেহালার বাজনা জীবিত থাকবে ততদিন ওঁর নাম কারও ভোলা সম্ভব নয়। হাইফিত্জও তখন পুরোদমে বাজাচ্ছেন। অপরূপ সুন্দর চেহারা—যুবক তখন। হাংগেরীয় বলে ওঁর হাতে একটা অদ্ভুত জিপ্‌সি টাচ্ ছিল। দ্রুতের অধ্যায়টা ওঁর সবাই খুব প্রশংসা করত। দারুণ ভাল লেগেছিল ওঁর বাজনা তখন। আর শুনেছিলাম তস্কানিনিকে। আরতুরো তস্কানিনি। পৃথিবীর সেরা কনডাক্টার উনি তখন। তখন তো ওঁর ভীষণ নাম সমস্ত দিকে।

তারপর ধর শালিয়াপিন—অপেরা গায়ক। মনে আছে প্যারিস অপেরায় আমরা গান শুনতে গিয়েছিলাম। উনি যখন এক-একটা আওয়াজ দিচ্ছেন—বেস্ আওয়াজ—আমার মনে হতে লাগল যেন আমার পেটের ভেতর তার অনুরণন হচ্ছে। খানিক পরে পরে মনে হতে লাগল ঝাড়লণ্ঠনগুলোর মধ্যেও যেন তার ভাইব্রেশন পাচ্ছি। ওরকম একটা আওয়াজ—উফ্!

তারপর ধর পিয়ানো শিল্পী পাদেরুস্কি। চেলোর শিল্পী পাবলো কাসাল। পাবলো কাসালের সঙ্গে আবার বহু দিন পরে খুব আলাপ হল, ১৯৬৮ সালে। আমেরিকার ট্যাংগেলউড ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলেন। দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন। খুব আদরযত্ন করলেন। ওঁকে দেখে আমার বাবার কথা ভীষণ মনে হল। বাবার একটা ভাব পেলাম ওঁর মধ্যে। ঐ টাইপেরই একটা মানুষ, বয়স হয়েছে অথচ ভীষণ প্রাণশক্তি। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মধ্যে যেটা শেষ পর্যন্ত আমরা দেখেছি। পাবলো কাসালও সেই সংগীত নিয়েই বেঁচে ছিলেন। ওটাই যেন জীবন, ওটাই ধর্ম। একেবারে ঋষির মত লোক।

প্যারিসে থাকার ঐ প্রথম দিকটাতেই আন্দ্রে সেগোভিয়ার সঙ্গে খুব আলাপ, খুব ভাব হয়েছিল। সেগোভিয়া এখনও বেঁচে আছেন; বড় কথা, এখনও বাজাচ্ছেন। যদিও তিরাশি-চুরাশি বছর বয়স। এবং এই এখনও ওঁর একক গীটার যে কি যাদু ছড়ায় মানুষের মধ্যে! ওঁর নাম থাকলেই হল বোঝাই হয়ে যায়। সে সময়টায় উনি আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। তখন বেশ ক'বার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। এবং এলে পরে উনি তিমিরবরনের বাজনা খুব শুনতেন। খুব ভাল লাগত ওঁর। আমাদের রিহার্সালও

সে সময়টায়। আমরাও তখন অনেকবার ঘরোয়া পরিবেশে ওঁর বাজনা শুনেছি। ইহুদির সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ তখনই। হ্যাঁ, ইহুদি মেনুহিন। অবশ্য তখন ওঁর চেয়েও ঘনিষ্ঠতাটা আমাদের বেশী ছিল ওঁর যে গুরু জর্জ এনেস্কো, তাঁর সঙ্গে। এনেস্কো তো প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। এই দুজনেরই যাতায়াত আমাদের সঙ্গে খুব বেশী ছিল। সেগোভিয়া আর এনেস্কো। এনেস্কো, যেহেতু উনি রুমানীয়, ওঁর কিরকম একটা দুর্বলতা ছিল প্রাচ্যের সংগীতের ওপর। ওঁর একটা জ্যান্ত কৌতূহল ছিল মধ্যপ্রাচ্যের গান-বাজনার ব্যাপারে। মধ্যপ্রাচ্যের সংগীত উনি খুব শুনতেনও। এই গান-বাজনার কিছু প্রভাবও ওঁর রচনায় ছিল। এ ছাড়া জিপসিদের কিছু কিছু জিনিসও উনি রপ্ত করেছিলেন। তারপর যখন আমাদের গান-বাজনা শুনলেন, অর্থাৎ তিমিরদার সরোদ এবং বিষ্ণুদাস শিরালীর সেতার এবং আমাদের ট্রুপের সমস্ত কম্পোজিশন, তখন এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে, প্রায়ই সময় পেলেই চলে আসতেন। এবং যেহেতু ওঁর সঙ্গে আলাপ ছিল, সাল প্রায়াল বা ঐরকম কোনও একটা হলে ইহুদি মেনুহিনের সঙ্গেও দেখা হল আমাদের ১৯৩২ কি ৩৩এ। সে সময়ে মেনুহিন হাফপ্যান্ট পরে, বয়স তখন ষোল কি সতের। ১৯৩২ই মনে হচ্ছে। কি সুন্দর দেখতে ওঁকে তখন, নাদুসনুদুস। মুখচ্ছবিটাও সুন্দর। ছোট বোন হেফজিবাও ছিল সঙ্গে। পিয়ানো বাজাল। সেই প্রথম দেখি ওকে। পরে কে জানত ওর সঙ্গে এত ভাব হবে আমার!

এখনকার বিদেশী সংগীতজ্ঞ যাঁদের সঙ্গে আলাপ আছে, বা হৃদ্যতাও জন্মেছে, তাঁদের সম্পর্কে দু-একটা কথা বলি। মেনুহিনের সম্পর্কে আমার দুর্বলতার কথা তো প্রায়ই বলি। ওর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, ওর জন্য আমার অশেষ ভালবাসা। আশ্চর্য লোকও সত্যি। এত বছর ধরে ওর এত নাম, এত সম্মান, এত বিরাট লোক একটা ও, অথচ কি বিনয় ওর, কি বিরাট মন! যেখানে যখন পেরেছে আমাকে গুরু বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সে লেকচারে হোক, কোনও প্রবন্ধে হোক, কোনও শো-তে হোক। যেখানে পেরেছে। এতে যে নিজেকে কত ধন্য মনে করেছি আমি, সে তোমায় কি বলব বল। আমাকে ভাল বলেছে বলে বলছি না। আসলে ও এরকমই। যাঁর কাছে যেখানে যেটুকু পেয়েছে উন্মুক্ত গলায় স্বীকার করেছে। এত বড় মানুষ ঠিক যখন-তখন খুঁজে পাবে না। ওর জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি জীবনের মূল্যবোধের প্রতি যে সম্মান সেটাই ওকে এত বড় করেছে। শিল্পী হিসেবে ও তো খুবই বড়, সেই সঙ্গে মানুষ হিসেবে ওর এইসব গুণের জন্যই আজকের দিনে পৃথিবীতে ওর এরকম মহিমা। সবাই মানে, ভালবাসে শ্রদ্ধা করে।

এ ছাড়া কাজ করে মোহিত হয়েছি আর একজনের সঙ্গে। পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সংগীতে একটা অসাধারণ প্রতিভা। বাঁশিতে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বড় আর্টিস্ট। অতুলনীয়। জঁ পিয়ের রামপাল। এত অদ্ভুত, এত উঁচু দরের আর্টিস্ট, সে তোমায় কি করে বোঝাব। তোমাকে শুনতে হবে ওকে। ওর সঙ্গে কিছু দিন আগে আমি একটা রেকর্ড করেছি। সেটা হল আমার 'ওয়েস্ট মিট্‌স ইস্ট' পর্যায়ের কাজের তৃতীয় ভল্যুম। এঞ্জেল রেকর্ডে, ই এম আই গ্রুপের। তাতে একটা দিকে আছে ইহুদি মেনুহিনের সঙ্গে। গত তিন বছরের মধ্যে আমি আর ও যে-সমস্ত কাজ একসঙ্গে করেছি, ওকে যেসব জিনিস এই সময়টাতে শিখিয়েছি এবং বাজিয়েছি একসঙ্গে, তার থেকে দুটো কম্পোজিশনের কথা বলছি। প্রথমটার নাম দিয়েছি..., নামগুলোই মনে আসে না। যা হোক, প্রথমটা নট ভৈরবীতে, পরেরটা পুরিয়া ধানেশ্রীতে। পুরিয়া ধানেশ্রীটার নাম দিয়েছি Twilight mood, নট ভৈরবীর নামটা বোধ হয় Morning Love। না; না, না— Morning Love না; মনে আসছে না। ও, হ্যাঁ—Tenderness। অন্য দিকটায় আছে রামপালের সঙ্গে। রাগ তোড়ীতে, নাম দিয়েছি The Enchanted dawn। ওতে আমি নিজে বাজাইনি। মার্তিন জেলিও বলে একটা মেয়ে—চমৎকার হার্প বাজায়—ওকে দিয়ে করিয়েছি। কাজেই ওতে তুমি পাবে হার্প আর রামপালের বাঁশি। এ ছাড়া আমি নিজে যে অংশে বাজিয়েছি তার নামটা—অবশ্য আগে সেটা বলেছিলাম— Morning Love। এতে আমি বাজিয়েছি রাগ নট ভৈরবী। ভৈরবী, কিন্তু ভৈরব না। যা হোক, যা বলছিলাম রামপালকে নিয়ে। মিউজিসিয়ানশিপ অদ্ভুত। এবং সঙ্গে সঙ্গে অগাধ ভালবাসা আছে। তন্ময় হয়ে বাজায়। এবং সেই তন্ময়তার ব্যাপারটা শ্রোতার মধ্যেও সঞ্চারিত করে।

পান্নালালবাবুর কথা মনে আছে? আর একটা অদ্ভুত জিনিয়াস। বাঁশকে কেটে বাঁশি বাজানো, এটা ওঁর কাজ। বাঁশির অনেক ব্যাপারেই উনি একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। ওঁর পরেও অনেকে তৈরী হয়েছেন, কিন্তু উনিই প্রথম। একটা লোক স্রেফ মেহনত করে কি করতে পারে সেটা উনি দেখিয়ে গেছেন। পান্নাবাবু তো শুরুর দিকে সেরকম তালিম পাননি। সেটা উনি নিজেও স্বীকার করতেন। এমন একটা সময় ছিল—মালাদে—১৯৪৪ সালে। খুব সরল মানুষ ছিলেন। আমাকে বললেন, আমাকে শেখান। আমি বললাম, আপনাকে আমি কি করে শেখাব? আপনি বড় আর্টিস্ট, এত দিনের সিনিয়ার। বললেন, না, তালিম পাইনি। শেখাতেই হবে আমাকে। তারপর তো উনি

১৯৬৮ সালে আমেরিকার ট্যাংলেউড ফেস্টিভ্যালে এসেছিলেন পাবলো কাসাল। তখন কমলা আর লক্ষ্মী বউদিকে নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। [illegible] আমার বাবা আলাউদ্দিন খাঁর কথা মনে পড়ল। বয়স হয়েছে, অথচ ভীষণ প্রাণশক্তি। পাবলো কাসালও সেই সংগীত নিয়েই বেঁচে ছিলেন।

মেনুহিনের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। শিল্পী হিসেবে ও তো খুবই বড়, সেই সঙ্গে মানুষ হিসেবেও পৃথিবীতে বিরাট মহিমা। এত বড় মানুষ ঠিক যখন-তখন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কাজ করে মোহিত হয়েছি আর একজনের সঙ্গে। পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সংগীতে একটা অসাধারণ প্রতিভা। বাঁশিতে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বড় আর্টিস্ট। অতুলনীয়। জাঁ পিয়ের রামপাল।

আসতেন আমার রেওয়াজের সময়টায়। আমরা বসতাম একসঙ্গে। কিছু দিন পর আমিই ওঁকে বললাম, আপনি আমার গুরুদেবের শরণাপন্ন হোন। আপনার ভাল হবে। গুরুদেব অর্থাৎ বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। ওঁর সুযোগও হল একসময়ে সে তালিম নেওয়ার। এ ছাড়া উনি কিছু দিন নাড়া বেঁধেই শিখেছিলেন ভেণ্ডিবাজার ঘরের আমান আলি খাঁ সাহেবের কাছে। অর্থাৎ আমির খাঁ সাহেবের এক গুরু। আমাদের সময়ের শিবকুমার শুক্লও শিখেছিলেন আমান আলি খাঁর কাছে। অদ্ভুত গুণী লোক ছিলেন এই আমান আলি খাঁ। উনি দিল্লীর ঘরানার ছেলে, কিন্তু মহারাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। এবং সে সময়ের একজন মহাপণ্ডিত কর্ণাটকী শিল্পীর কাছে যাতায়াত শুরু করেন। এই কর্ণাটকী শিল্পীর নাম ছিল কৃষ্ণ বিড়ারপ্পা। তাল এবং লয়ের ব্যাপারে ওঁর এমন একটা অধিকার ছিল যে, সংগীতরসিকরা ওঁকে 'তালব্রহ্মম্' বলে ডাকতেন! ওঁর সঙ্গে ওঠা-বসা করে আমান আলি খাঁ চমৎকার চমৎকার সব কম্পোজিশন ফেঁদে ফেলেন। যেমন ধর ওঁর ঐ হংসধ্বনি রাগটির পরিবেষণা। উনিই খুব প্রচার করলেন রাগটি উত্তর ভারতের গান-বাজনায়। বিশেষ করে গাইয়েদের মধ্যে। বাজনায় অবশ্য প্রচারটা পরে বেশী আমিই করি। কিন্তু গাইয়েদের মধ্যে রাগটা ছড়িয়ে পড়ে ওঁর দরুনই। এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ছে ওঁর নানান সব কম্পোজিশন। যেমন ধর, 'বাতাপি গণপতিম ভজে' নাম-করা গান। হংসধ্বনিতে। সেটারই উনি ঠিক নকল করে করলেন 'লাগি লগনপতি সখা'। চমৎকার! শোনার মজা ছিল ওঁর রচনায়। তার কিছু কিছু আমির খাঁ গাইতেনও। শিবকুমার শুক্লও ওঁর দারুণ দারুণ সব রচনা গেয়ে থাকতেন। তবে আজকাল কেন জানি না শিবকুমারের গান আর শুনতেই পাই না। যা হোক, আবার ফিরে যাচ্ছি পান্নাবাবুর কথায়। যেহেতু উনি মেহনত করেই বড় হয়েছিলেন, ওঁর তালিমটা সে তুলনায় গুণী-সমাজের কাছে কম কম ঠেকত। পরে অবশ্য উনি বাবার কাছ থেকে তালিম নিয়েছিলেন। তবে ওঁর সুনাম কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছিল ওঁর তৈরীর জন্য। ওঁর বাজনাকে সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে। তারিফ করেছে। আমি যখন অল ইণ্ডিয়া রেডিও ছেড়ে দিলাম, উনি এলেন আমার জায়গায়। বম্বেতেও উনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন ওখানে যখন প্রথম যান। ফিল্ম লাইনেও ছিলেন কিছু দিন। তবে ওরকম একজন সাধক লোক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। মেহনতী লোক তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে ভীষণ ভক্ত লোক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত ছিলেন। এবং ওঁর বাজনাতেও সেই ভক্তিভাবটা সব সময়ে গেঁথে থাকত। তবে লোকেদের বলতে শুনেছি ওঁর সম্পর্কে এবং তারাপদবাবু—তারাপদ চক্রবর্তী মশাই সম্পর্কে যে, ওঁদের বেসিক তালিম কিছুটা কম হলেও সৃজনীশক্তি, মেহনত, কল্পনা এবং প্রকাশভঙ্গীর কোনও তুলনা ছিল না। এবং এটা খুবই সত্যি কথা। শুনে শুনে, মেহনত করে এবং ভগবানদত্ত শক্তি দিয়ে এঁরা যা কাজ করে গেছেন তা প্রভূত প্রশংসার ব্যাপার। ধন্য শিল্পী দুজনেই। তবে পান্নাবাবুর জন্য কষ্ট হয় আমার এই ভেবে যে, শেষ অবধি বাংলা দেশে কিন্তু উনি সে সম্মান পেলেন না। জীবনের শেষ দিকেও বাংলার বাইরে বাইরে প্রোগ্রাম করে গেলেন, বাঙালী ওঁর কদর বুঝল না। বড় অন্যায় এটা। বড় দুঃখের। একজন ভাল বাঙালী শিল্পী শেষ জীবনেও বাঙালীর ভালবাসার ছোঁয়া পেলেন না—এ বড় কষ্টের কথা ভাই। তারাপদবাবুও তো সেই দুঃখ করে গেলেন!

পান্নাবাবুর জামাই, বন্ধের ছেলে, দেবেন্দ্র মুর্ধেশ্বর। বড় ভাল বাজায়। পান্নাবাবুর তালিম তো পেয়েইছে, সে সঙ্গে গানের তালিম মিশিয়ে একটা ভাল বাজনা তৈরি করেছে। গানের অঙ্গ অনেক আছে ওর বাজনায়। রাগের ভারও চমৎকার আসে ওর বাঁশিতে। ঘরের বাইরের লোকের শুনে শুনে একটা গোছানো বাজনা পেয়ে গেছে দেবেন্দ্র। (ক্রমশ)

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর

গ্ল্যাক্সো মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.GLXMB.2-2416 BG

কৃষিশিক্ষার বর্তমান সমস্যা

সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের কথা ভেবে বর্তমানে কৃষির উন্নতির দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষির উন্নতির জন্য সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল উন্নতি হয়েছে, উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে সব উপাদান দরকার যেমন সেচের জল, সার, কীটনাশক ঔষধ, উন্নতমানের ও জাতের বীজ সেগুলির সরবরাহ ক্রমশ বাড়ান হচ্ছে। কৃষির জন্য স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বা সমবায় সমিতি থেকে দেবার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। বিপণনের উন্নতির প্রচেষ্টা চলছে। এক কথায় বলতে গেলে কৃষির উন্নতির জন্য যা যা করা দরকার সেগুলির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণ প্রযুক্তিবিদ। সেজন্য কৃষি শিক্ষাকে জোরদার করা হচ্ছে। নতুন চিন্তাধারায় ও কর্মপদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষে একুশটি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করা হয়েছে উপযুক্ত সংখ্যক প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীর চাহিদা মেটাবার জন্য। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থক রূপায়ণের জন্য পরামর্শ ও আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্তমানের স্নাতক তৈরী করার উদ্দেশ্যে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কৃষি স্নাতকরা কৃষিকর্মে আত্মবিশ্বাস বা আত্মপ্রত্যয় লাভ করবেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে এবং নিজেদের কৃষির উন্নতির কাজে সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত করতে পারবেন। এটাও আশা করা হয়েছিল যে, কৃষি স্নাতকদের কিছু সংখ্যক স্বনির্ভরশীল হবেন, নিজেদের খেতখামার করবেন ও কৃষিকর্মে লিপ্ত হবেন এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষির উন্নতির ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, স্নাতকরা চাকরির জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল—আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেরা কৃষিকর্মে লিপ্ত হতে পারছেন না, এমন কি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন (বর্তমানে প্রাক্তন) উপাচার্য ডঃ এম এস রানধাওয়ার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাজ ছিল বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সরেজমিনে দেখবেন যে স্নাতক স্তরে পাঠকালে হাতে-কলমে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের কি সুযোগ সুবিধা ও বন্দোবস্ত আছে এবং ছাত্ররা ব্যবহারিক কাজের কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে ও তার সদ্ব্যবহার করছে। সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে, আঞ্চলিক কৃষি সমস্যা সম্বন্ধে তারা কতখানি অবহিত হচ্ছে যার ফলে নিজের উপর প্রত্যয় বা বিশ্বাস অর্জন করতে পারছে। শিক্ষালাভের পর সরকারী, আধা-সরকারী, স্বয়ংশাসিত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করে নিজেরা কৃষিকার্যে লিপ্ত হবার যোগ্যতা ও মনোবৃত্তি লাভ করছে কিনা এটাও দেখবার বিষয় ছিল।

এই কমিটি স্থাপনার ফলে এই কথাটাই স্পষ্টভাবে দেখা দেয় যে কৃষিশিক্ষার বিশেষ সমস্যা বা সংকট দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা মৌলিক—এর সুষ্ঠু মীমাংসার উপর নির্ভর করছে কৃষি শিক্ষার ভবিষ্যৎ, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের সার্থকতা।

ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সুনির্দিষ্টভাবে কৃষি শিক্ষা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৯০৭ সালে। সারা ভারতবর্ষে পাঁচটি কৃষি মহা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমে ডিপ্লোমা পরে ডিগ্রী বা স্নাতক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রবর্তন হয় ১৯৩০ সালে রয়্যাল কমিশন অব এগ্রিকালচার সুপারিশ দেবার ও সেই সুপারিশ মত কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ গঠিত হওয়ার পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দেশে যে খাদ্য সংকট ও কৃষি উৎপাদন সমস্যা দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি শিক্ষার দিকে নজর পড়ে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হতে আরম্ভ করল।

১৯৪৭ সালে সারা ভারতবর্ষে সতেরটি কৃষি মহা-বিদ্যালয় ছিল। ছাত্র-সংখ্যা ছিল মোট দেড় হাজার। ১৯৫১-৫২ সালে স্নাতক স্তরে কৃষি শিক্ষার জন্য ঊনিশটি প্রতিষ্ঠান ছিল এবং বাৎসরিক এক হাজার ষাট জন ছাত্র ভর্তি হত। ১৯৬৫ সালে এই মহা-বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়ে হল সত্তর এবং বাৎসরিক ছাত্র ভর্তির সংখ্যা (সর্বভারতীয়) ১০;০৪৯। ১৯৭২-৭৩ সালে কলেজের সংখ্যা বেড়ে হয় তিয়াত্তর, কিন্তু ভর্তির সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না কেন না বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক কারণে ছাত্র ভর্তি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯৫২-৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে (ঝাড়গ্রাম কলেজকে বাদ দিয়ে) একটি মাত্র স্নাতক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, কৃষিতে বার্ষিক ভর্তির সংখ্যা ছিল ৩৬। বর্তমানে স্নাতক স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যাল ও বিশ্ব-ভারতীতে. স্নাতকোত্তর স্তরে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬-৬৭ সালে স্নাতক স্তরে ভর্তির সংখ্যা ছিল দুশ আশি, বর্তমানে একশ ষাট (বিধানচন্দ্র—একশ ত্রিশ, বিশ্বভারতী—ত্রিশ)।

পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে আটটি প্রতিষ্ঠান বা কলেজে স্নাতক স্তরে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল—বার্ষিক ছাত্রসংখ্যা ২৩৪ (সর্বভারতীয় ...) ...
সালে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয় ২০; ছাত্র ভর্তি ১৫৯৯, ১৯৭২-৭৩ সালে প্রতিষ্ঠান বেড়ে হয় তেইশ, ভর্তির সংখ্যা ১১৫৮ (বিহারের দুটি পশু চিকিৎসা কলেজের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি)। পশ্চিমবঙ্গে পশু চিকিৎসার একটি কলেজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই আছে। ছাত্র ভর্তির সংখ্যা আনুমানিক ত্রিশ-চল্লিশ থেকে বেড়ে একশর কাছাকাছি হয়। বর্তমানে কম, ষাট-সত্তর-এর মধ্যে রাখা হচ্ছে।

স্নাতকোত্তর স্তরেও শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রসার দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়—কিন্তু স্নাতক স্তরে যেমন ১৯৬৫-৬৬ বা ১৯৬৬-৬৭ সালের পর ভর্তির সংখ্যা কমে যায়—স্নাতকোত্তর স্তরে কিন্তু ছাত্র সংখ্যা কমে নি। ১৯৫১-৫২ সালে কৃষিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল চারটি প্রতিষ্ঠানে। ১৯৫৫-৫৬ সালে বেড়ে হয় ছয়টি, বার্ষিক ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ছাপান্ন, ১৯৭২ সালে ঊনপঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং ছাত্র ভর্তির সংখ্যা দু হাজার দু জন। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়ছে—যদিও স্নাতক স্তরে একটা স্থিতাবস্থা এসে গিয়েছে। পশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে একই প্রবণতা লক্ষ্য করা হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মাত্র একটি, ছাত্র মোট নটি। ১৯৭২-৭৩ সালে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় একুশটি প্রতিষ্ঠানে—বার্ষিক ছাত্র ভর্তির সংখ্যা দুশ তেষট্টি। স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে, যদিও স্নাতক স্তরে বেশ কয়েক বৎসর ধরে কোন পরিবর্তন হয়নি।

এই প্রসঙ্গে এটা অনুমান করলে ভুল হবে যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একের পর এক বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষি ও পশুচিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা মহা-বিদ্যালয়গুলি সবই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এসেছে এবং কৃষি-শিক্ষা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৯৭৩-৭৪ সালে (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্যানুযায়ী) ছাত্রসংখ্যার হিসেবে পাওয়া যায় যে, স্নাতক স্তরে মোট ২১,৫০১ জন ছাত্রের মধ্যে ১৫০২১ জন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৬৯৭ জন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বা কনসটিটুয়েন্ট কলেজে ও ৫৮১৩ জন অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে ভর্তি হয়েছে। স্নাতকোত্তর স্তরে ৪১৬২ জন ছাত্রের মধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৫২; ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ ১০৯; অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগে ৩০৬, ও অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে ১০৯৫। পশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৪১১; তার মধ্যে ৪৭৬১ জন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৫১ জন অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে। স্নাতকোত্তর স্তরে ৫৫৯ ছাত্রর মধ্যে ৫৫৬ জন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাকি ৫৩ জন অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে। পশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলি সবই কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে এসে গিয়েছে (স্নাতকোত্তর স্তরে ইন্ডিয়ান ভেটেনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাদে) কিন্তু কৃষি শিক্ষার কিছুটা অংশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে এখনও আছে এবং থাকবে বলেই মনে হয়—স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই।

কৃষি ও পশুচিকিৎসা ধাক্কা খেতে আরম্ভ করে ১৯৬৭ সাল থেকে যখন কৃষিস্নাতককে বিশেষ করে পরীক্ষায় পাশ করার পর উপযুক্ত কর্মসংস্থান করতে না পেরে বাধ্য হয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হতে হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৭০ সালে পরিসংখ্যানে দেখা যায় সারা ভারতবর্ষে কৃষি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত আনুমানিক দশ হাজার বেকার। সীমায়িত সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষি স্নাতকদের মধ্যে ভয়ানক নৈরাশ্য দেখা দেয়।

পশুচিকিৎসার ক্ষেত্রেও অবস্থা অনুরূপ ছিল ১১১৫ জন স্নাতক ও ৬০০ স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক বেকার ছিল। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে দেখা যায় শতকরা ৭৪ ভাগ কর্মে নিযুক্ত, বার ভাগ বেকার, এগার ভাগ কোনও সুনির্দিষ্ট কাজ করেন না অর্থাৎ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কিছু কাজ করে, তিন ভাগ নিজেদের খেতখামার বা কৃষি ব্যবসায়ে লিপ্ত অর্থাৎ প্রায় এক-চতুর্থাংশই এক অর্থে বেকার। কর্মে নিযুক্ত কৃষি স্নাতকদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন সরকারী বিভাগে বা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বার ভাগ, চার ভাগ নিজেদের খেতখামার বা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভারতবর্ষের অবস্থা থেকে আলাদা ছিল না। ১৯৬৭ সাল থেকে বেকারত্ব দেখা দেয়। ক্রমশ ১৯৭১-৭২ সালে বেশ খারাপ পরিস্থিতি[illegible] হয়। কৃষিস্নাতকরা নিম্নমানের চাকুরি নিতে বাধ্য হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষা[illegible] ক্লাসে ভিড় দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য পরিস্থিতির বহুলাংশে উন্নতি হয়েছে।

বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সরকারের কৃষি বিভাগই কৃষি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্তদের সব চেয়ে বড় নিয়োগকর্তা এবং প্রত্যেকটি ছাত্রই পাস করার পর সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে কর্মসংস্থানের জন্য, যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বেশ কিছু স্নাতক ও স্নাতকোত্তরকে কৃষি সংক্রান্ত কাজের জন্য প্রতি বৎসরই নিয়োগ করছেন। কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগ বা লেনদেনের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে ব্যাঙ্কেও কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং বর্তমানে ভাল ছাত্ররা বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কের কাজে যায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান যেমন ভারতীয় সার সংস্থা, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ-এর অধীনে কিছু কর্মসংস্থান হয়। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ 'কৃষি গবেষণা সার্ভিস' বলে নতুন সর্বভারতীয় সার্ভিস চালু করেছেন এবং সেই সার্ভিসে সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বাড়ার সঙ্গে যে সমস্ত

আছেন, তাঁরাও কৃষি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের নিয়োগ করছেন। সামান্য কিছু সংখ্যক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন।

বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রকে আকৃষ্ট করছে কৃষি শিক্ষার দিকে। এদের প্রধান লক্ষ হল কৃষিতে ডিগ্রী পাওয়ার পর সরকারী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা, সেখানে কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান চাহিদা কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে রয়েছেই। ভারত সরকারের বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রদের জন্য যে বৃত্তি বা স্কলারশিপ বিজ্ঞান বিষয়ে পঠনের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে তা কৃষির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ স্নাতক স্তরে ভর্তি শতকরা মেধাবী ছাত্রকে স্টাইপেন্ড দেন। এই অর্থানুকূল্য স্বভাবত আকর্ষণীয়, বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র বা অভিভাবকের কাছে। তাছাড়া ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের কথা তো আছেই। মোটামুটি হিসাব নিলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক কোর্সে ভর্তি ছাত্রর একটি ভাল অংশ এইসব পরিবার থেকে আসে। যদিও সঠিক পরিসংখ্যান নেওয়া সম্ভব এখনও হয়নি, তবু সাধারণভাবে বলা যায় যে ইঞ্জিনীয়ারিং বা মেডিক্যাল কোর্সের পরই কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষির স্থান। সেই হিসাবে বিচার করে দেখলে কৃষি শিক্ষা অনেকটা কৌলিন্য পেয়েছে, বিশেষ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর এবং অনেক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য। কিন্তু এই সব পরিবারের কৃষির সংগে প্রত্যক্ষ যোগ বর্তমানে নেই বললেই হয় এবং অনেকদিন আগেই তা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কৃষি, কৃষক এবং কৃষি পরিবেশ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা আছে এবং অনেকে ছাত্রাবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই মানসিকতা থেকে বিমুক্ত হতে পারে না।

ইঞ্জিনীয়ারিং বা চিকিৎসা শিক্ষার সংগে কৃষি শিক্ষার একটা মূল পার্থক্য হচ্ছে যে কৃষি নিছক বৃত্তি বা পেশা নয়, এর সংগে জড়িত রয়েছে কৃষকের জীবনযাত্রা। সাধারণ শ্রমিক বা আফিসের চাকুরীয়ার সংগে পার্থক্য এই যে, এঁদের কর্মস্থলের বাইরে আলাদা জীবন আছে, কিন্তু কৃষক বেঁচে থাকে তার পেশা বা কৃষিকে—নিজস্ব জমি, বলদ, গাইগরু হাঁস-মুরগী মাছ প্রভৃতিকে নিয়ে। তার চিন্তা, ধ্যান-ধারণা আলাপ-আলোচনা সবই কৃষিকেন্দ্রিক। সেই জন্য কৃষিশিক্ষা সার্থকভাবে গ্রহণ করতে হলে কৃষকের জীবনযাত্রা গ্রামের পরিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কৃষি শিক্ষা পরিবেশনে এই সমস্যা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।

সাধারণ নিয়মে কৃষি স্নাতক কোর্সে ছাত্র ভর্তি হয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এই প্রতিযোগিতাতে অনেক সময় পল্লী অঞ্চলের ছাত্ররা নানা কারণে সুবিধা করতে পারে না। কেন ভাল করতে পারে না সে সম্বন্ধে আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় যে, এটি সর্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। রানধাওয়া কমিটি সুপারিশ করেছেন যে অন্তত শতকরা পঁচিশ ভাগ ক্ষেত্রে কৃষক পরিবারের ছেলেদের অগ্রাধিকার দিতে হবে কৃষি স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য এবং এর জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকার দরকার বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কৃষি শিক্ষা ও কৃষির উন্নতির কথা ভেবে। ঠিক একই কারণে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি স্নাতকশ্রেণীর ছাত্র বেশীর ভাগই কলিকাতা ও তার সন্নিহিত জেলাগুলি থেকেই বেশী আসে, দূরের জেলা থেকে আসা ছাত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

এই ত্রুটি নিরসনের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা নেবার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রথমত ছাত্র ভর্তি হওয়ার পর একটা বিশেষ ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা, যাতে করে ছাত্ররা হাতে-কলমে কৃষির কাজ শিখতে পারে এবং ভর্তি হওয়ার সংগে সংগে কৃষি সম্বন্ধে পরিচিতির সুযোগ হয়। অতীতে এই ব্যবস্থা কল্যাণী বা হরিণঘাটাতে কৃষি মহা-বিদ্যালয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সুফল পাওয়া গিয়েছিল। এই শিক্ষা যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা পরে স্বীকার করেছেন যে ওরিয়েন্টেশন কোর্স থেকে উপকার হয়েছে। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ সুপারিশ করেছেন যে, কৃষি স্নাতক কোর্সের শেষ বৎসরে ফার্ম ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করতে অর্থাৎ চার বা পাঁচ জন শিক্ষার্থী মিলে একটা ছোট গ্রুপকে এক একর বা তার বেশী জমি দেওয়া হবে এবং সেই জমিতে ব্যবসায়ভিত্তিক চাষ করবে। বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হবে, বীজ, সেচ, সার কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতির দাম শোধ করে ছাত্ররা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা নিজ হাতে চাষ করবে, হিসাব রাখবে। লাভের ভাগ ছাত্ররাই নেবে, যদি লোকসান হয় বিশ্ববিদ্যালয় লোকসান বহন করবে। এই পদ্ধতিতে পন্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় ও সুফল পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসা ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষান্তে ছয় মাস বা এক বৎসরের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কৃষি ও পশুচিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রবর্তন করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র। যদিও বাধ্যতামূলক নয়। এই প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং পরিবেশ। যথাযথভাবে পরিচালনা না করতে পারলে এই প্রশিক্ষণ শুধু নামেই থাকবে, অর্থের অপচয় হবে, কোনও উপকার হবে না। শিক্ষালাভকালে রোজগার (আর্ন হোয়াইল ইউ লারন) বলে আর একটি প্রকল্প ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান করার সুপারিশ করেন ও অর্থ সাহায্যও করেন যাতে করে ছাত্ররা হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারেন ও কিছুটা আর্থিক সাশ্রয়ও হয়। এই প্রকল্প সার্থক রূপায়ণ করতে হলে চাই আন্তরিকতা সর্বস্তরে এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। শিক্ষক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে, আলাদাভাবে সময় দিতে হবে। পরিকল্পনাকে

টাকা রোজগারের উপায় ছাড়া শিক্ষালাভের কথাও ভাবতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা মহা-বিদ্যালয়কে সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এই প্রকল্পকে সার্থক রূপায়ণ করাতে। এছাড়া ছোটখাটো প্রশিক্ষণ, জাতীয় সেবা প্রকল্প প্রভৃতির মাধ্যমেও হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে চাকুরিতে কি কাজে লাগবে বা চাকুরির জন্য লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি কাজে লাগবে না ভেবে আত্মনির্ভরতা বা আত্মপ্রত্যয় লাভে কি সাহায্য হতে পারে সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যখন একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম চালু ছিল উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে, তখন কৃষিস্কীমে শিক্ষা অনেক বিদ্যালয়েই দেওয়া হত। এই স্কীমের ছাত্ররা কৃষি স্নাতক শিক্ষা কোর্সে অনেকেই সুবিধা করতে পারতেন না। যদিও এই শিক্ষা

প্রান্তিক বলে অভিহিত করা হয়েছিল। তবু সবাই মহা-বিদ্যালয়ে বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য উদগ্রীব ছিল, সেজন্য এই পাঠ্যক্রমকে আমূল পরিবর্তন করে স্নাতক কোর্সে ভর্তির সহায়ক করা হল। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই উপযুক্ত ব্যবস্থা, পরিবেশ ও শিক্ষকের অভাবে এই পাঠ্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বর্তমানে স্বাদশ কৃষি বিষয়ক বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদের লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চশিক্ষার সুবিধা, কিংবা চাকুরি।

কৃষি শিক্ষার সার্থক রূপায়ণে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৯) বিভিন্ন কৃষি মহা-বিদ্যালয়ের সার্থকতা অনুসন্ধান করে এই মন্তব্য করেছিলেন যে অবিভক্ত ভারতবর্ষে উপযুক্ত পরিবেশে অবস্থিত ছিল বলে পাঞ্জাব (বর্তমান পাকিস্তান) রাজ্যের লায়ালপুর, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর কলেজ ও উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ কৃষি ইনস্টিটিউট অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছিল—ঠিক একই কারণে পন্থনগর সাফল্য অর্জন করেছিল। কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে ফেলার প্রবণতা অনেকের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর সুষ্ঠু পরিবেশে স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কৃষি শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে পরিবেশের কথা ভাবতে হয়। গ্রামীণ সংস্পর্শ না থাকলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং গ্রাম সম্বন্ধে উদাসিকভাব থাকলে এবং দূরত্ব রাখলে হয়তো কৃষি বিষয়ক কিছু বিজ্ঞান বিষয়ের চর্চা সম্ভব, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সার্থক কৃষি শিক্ষা দেওয়া বা গ্রহণ করা হয় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া, হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য চাই ভাল কৃষিক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্র শুধু আয়তনে বড় হলেই হবে না। বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধক হওয়া উচিত, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসাবে উৎকৃষ্ট গবেষণা ক্ষেত্রে সার্থক ও ব্যবসায় ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব সফল হওয়া উচিত। উপযুক্ত হাসপাতাল যেখানে বিভিন্ন ধরনের রোগীকে চিকিৎসায় রেখে নিরাময় করা হয়, মেডিক্যাল কলেজের পক্ষে অপরিহার্য। তেমনি কৃষিশিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত কৃষিক্ষেত্রও অত্যন্ত আবশ্যকীয়। শিক্ষার্থীদের মনে রেখাপাত করতে পারে, কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে, নিরীক্ষণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেতে পারে সেদিকটা দেখা দরকার। অনেকে হাতে-কলমে কাজ করার ব্যাপারকে গুরুত্ব

দিতে চান না। পরীক্ষায় পাস করতে গেলে হয় তো মাঠের কাজের বিষয়ে গাফিলতি করলেও গড়ে পাস করে যান। সুতরাং অনেক ছাত্রই বিশেষ করে যাঁরা অ-কৃষি পরিবার থেকে আসেন এবং যেসব শিক্ষক বৃত্তিমূলক কৃষি শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন তাঁরা উপযুক্ত কৃষিক্ষেত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে সর্বাঙ্গীণ কৃষি শিক্ষাও ব্যাহত হয়। হয়তো ডিগ্রী পেতে কোনও অন্তরায় হয় না, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না।

ছাত্রের মানসিক প্রস্তুতি, শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পরিবেশ ছাড়া সার্থক-ভাবে শিক্ষাদানের কথা ভাবতে গেলে শিক্ষকের কথা স্বভাবত মনে হয়। কৃষি বিষয়ে সামগ্রিক শিক্ষা দিতে গেলে অনেক পরিপূরক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন থাকে। এই সব বিষয়ের শিক্ষা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। সামগ্রিকভাবে দেখলে পর এই সব বিষয়ের শিক্ষক যাঁরা কৃষি বিষয়ে আগে কোন শিক্ষা লাভ করেননি এবং কর্মক্ষেত্রে কৃষিকে বেছে নিয়েছেন কোনও বিশেষ টান বা অভিজ্ঞতার জন্য নয় বরঞ্চ হঠাৎই এসে পড়েছেন, তাঁদের সংখ্যা একেবারে নগণ্যও নয়। এঁদের মধ্যে কৃষিশিক্ষাকে অন্য বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে এক ধাঁচে ফেলার প্রয়াস দেখা যায়। স্নাতক কৃষি শিক্ষা যে স্নাতক বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে আলাদা এবং এর সাদৃশ্য আছে অন্য কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সেটা প্রায়ই বিস্মরণ ঘটে। কৃষি স্নাতক কোর্স বা পাঠ্যক্রম শেষ করার পর একজন স্নাতক কৃষি বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আত্মনির্ভরশীল ও আত্ম-প্রত্যয়ী হবে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করবে কর্মক্ষেত্রে কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাত্রের প্রস্তুতি স্নাতকোত্তর শিক্ষার দিকে। এর অর্থ এই নয় যে কৃষি স্নাতক স্নাতকোত্তর শিক্ষা নেবে না বা তার উপযুক্ত নয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি ছাড়া তার আরও বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্নাতক কৃষিশিক্ষার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী, যেমন ইঞ্জিনীয়ারিং ও চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে। আগেই বলেছি কৃষি বিষয়ক কিছু বিজ্ঞানের শিক্ষায় বুৎপত্তি লাভের থেকে প্রয়োজন কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সেই জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় কৃষি শিক্ষাকে রূপান্তরিত করাকে কৃষিশিক্ষার অগ্রগতি বলে ভাবা যায় না, পরন্তু ক্ষতিসাধক বলেই গণ্য করা যেতে পারে। অল্প সংখ্যক নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রস্তুতি লাভ করবেন, কিন্তু বহুল সংখ্যক এর প্রয়োজন মাঠে কৃষির উন্নত উৎপাদনে। সেইদিক থেকে অনেক শিক্ষকেরই সম্যক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে। অনেক ক্ষেত্রে এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শিক্ষাদান করা হয় এমন ছাত্রদের যাদের কৃষির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই এবং কৃষি পরিবার থেকে আসেননি বলে কৃষিশিক্ষা সার্থকতা লাভ করতে পারে না। এই শিক্ষাপ্রসূত কৃষি স্নাতক কখনই কাজের উপযুক্ত দক্ষতা ও মানসিকতা লাভ করতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে বা ঘটছে বলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং আফিসে বা ডেস্কে বসে কাজ করার কর্মী সৃষ্টি হচ্ছে, মাঠে কাজ করার উপযুক্ত কর্মীর অভাব ঘটছে। এর জন্য শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমকে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন আছে। কৃষি স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রকে কৃষি বিষয়ক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত করতে হবে গোড়া থেকেই। বিশেষ করে মাঠে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে। দেখতে হবে যে সে যেন গোড়া থেকেই বুঝতে পারে যে তাকে কি শিক্ষা লাভ করতে হবে এবং কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য সে যেন ভালভাবে বুঝতে পারে। অন্য মহা-বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ও খরিশস্য লাগাবার মরসুমে, পুজোর অবকাশ কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার কতখানি পরিপন্থী হয়, তা ভাবারও প্রয়োজন আছে। ছাত্র যখন মরসুমের চাষের গোড়া থেকে পরিচিত হবে—সমস্যা বুঝতে শিখবে এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে তখনই সে অনুপস্থিত। এই ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অবাস্তবতার কথা সকলের ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

কৃষি শিক্ষা গবেষণা ও সম্প্রসারণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামগ্রিক কৃষিশিক্ষাকে একটি ত্রিপদের সঙ্গে তুলনা করা হয়—যার তিনটি পদেরই দরকার আছে এবং সেই তিনটি পদ হল—শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ। বর্তমানে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। সেই অগ্রগতির সঙ্গে ছাত্রর অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। প্রযুক্তিবিদ্যা সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাগুলি মোটামুটি জানারও দরকার। এই তিনটি বিভাগের সম্যক বিকাশ না ঘটলে কৃষিশিক্ষা একপেশে ও পুঁথিগত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই মূল তথ্যের বিস্মরণ ঘটলে কৃষিশিক্ষায় অসাফল্য বা অসার্থকতা আসাই স্বাভাবিক।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে ঠিকই, তবে তাতে কোনও সুফল আসছে কিনা ভাববার বিষয়। স্নাতকোত্তর কৃষিশিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি বা হয়তো সাধারণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে মাত্র ৭৪টি স্কুলে বৃত্তিমূলক কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নানা কারণেই হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা অত্যন্তই অপ্রতুল এবং উপযুক্ত মানের শিক্ষকের অভাব। স্বভাবতই এখানে শিক্ষালাভের আগ্রহ কম। এই পাঠ্যক্রম শেষ করে সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু আত্মবিশ্বাস রেখে নিজ হাতে চাষ বা চাষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কোন পেশা বা বৃত্তি নেওয়া সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই পশ্চিমী চিন্তাধারা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে এই সব শিক্ষা ব্যবস্থায় ও পাঠ্যক্রমে। বলা বাহুল্য সুফল পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের কথা মতো দ্বাদশ শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাত্রদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়নি। সামগ্রিক কৃষিশিক্ষার কথা ভাবতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচের স্তরের শিক্ষার কথা ভাবা দরকার।

আসে, তারা কৃষি বিষয়ক শিক্ষা হাতে-কলমে পেলে কৃষির অগ্রগতির কাজে অনেকটা সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মামুলিভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামের কৃষি পরিবারের ছেলে কৃষিতে মন নিয়োগ করতে পারছে না এবং এর উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি, সুতরাং সে শহরের দিকে যাচ্ছে কাজের জন্য। অবশ্য এর পিছনে শিক্ষার অভাব ছাড়া আরও দুটি দিক আছে, যথা—কৃষিকাজ অনেক পরিশ্রমশীল এবং কৃষিকর্মে অনেক সময় ভাল মুনাফা থাকে না, উপরন্তু লোকসানও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ সমাজে অন্তত কৃষিকাজে লিপ্ত লোকেরা যথোপযুক্ত মর্যাদা পায় না যেটা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র-প্রদেশ প্রভৃতিতে পেয়ে থাকে। সুতরাং শহরে যে চাকুরিই করুক না কেন গ্রামের লোকের কাছে তার সম্মান বেশী। বৃত্তিমূলক কৃষিশিক্ষাকে সার্থক করার কথা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। জাতীয় কৃষি কমিশন সমীক্ষা করে দেখেছেন কৃষি স্নাতক কোর্সে বৎসরে দশ হাজার ছাত্র ভর্তি হয় ভারতবর্ষে, অথচ সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হত মাত্র দু-হাজার, কয়েক বৎসর আগেও। সম্প্রতি এই সংখ্যা যে বিশেষ বেড়েছে তা অনুমান করার কোন কারণ নেই। সাধারণ মাপকাঠিতে যত সংখ্যক কৃষি স্নাতক আছেন তার তিন গুণ ডিপ্লোমা বা সার্টি-ফিকেটপ্রাপ্ত কৃষি ফিল্ডম্যান বা ওভারসিয়ার থাকার দরকার। জাপানে প্রতি কৃষি স্নাতকপিছু দশ জন ডিপ্লোমাধারী বা সার্টিফিকেটধারী লোক কাজ করে। এই মধ্যস্তরের প্রযুক্তিবিদদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে কৃষি পদ্ধতি আধুনিকীকরণের ব্যাপারে। এই চাহিদার উপর ভিত্তি করেই 'কৃষি পলিটেকনিক' স্থাপনের চিন্তা-ধারা উদ্ভূত।

কোঠারী কমিশন কৃষি পলিটেকনিক'এর কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন। এই চিন্তাধারাকে রূপায়ণ করতে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ শ্রীমোহন সিং মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি স্থাপনা করেন। এই কমিটির সুপারিশক্রমে মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি স্থাপনা করেন। এই কমিটির সুপারিশক্রমে 'কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র' স্থাপনার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হাতে-কলমে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যাতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া সেই সব-কৃষকদের যাঁরা নিজ হাতে কৃষিকর্মে লিপ্ত আছেন। সরকারী, আধা-সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যাঁরা চাকুরী চান তাঁদের জন্য কোন ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে থাকবে না। এতে নিরক্ষর কৃষকদেরও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য সাক্ষরতার আবশ্যক নেই। কোনও নির্দিষ্ট সিলেবাস বা পাঠক্রম থাকবে না। যে এলাকাতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র অবস্থিত সেই এলাকার কৃষি সমস্যার কথা ভেবে, সেই এলাকার উৎপাদন বাড়াবার জন্য যথোপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়াই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। যে সব এলাকা অনুন্নত, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষক বা কৃষিজীবী আছেন এবং উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োজন আছে, সেই সব এলাকাতেই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের কথা ভাবা হবে আগে। প্রথমে পাঁচটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে পাঁডচেরীতে তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, কর্নাটক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রায়চুরে, জাতীয় ডেয়ারী গবেষণা কেন্দ্রের কর্নালে, ভারতীয় ফসল গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে কর্নাটকের চেত্তালীতে, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের খরাপীড়িত অঞ্চলের গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে অন্ধ্র-প্রদেশের হিমায়েতনগরে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে সারা ভারতবর্ষে পঞ্চাশটি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে জনহিত-মূলক সেবা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ঝাড়গ্রামের কাছে কাপগারীতে সেবা ভারতীর অধীনে ঝাড়গ্রাম এলাকার আদিবাসী অধ্যুষিত খরাপীড়িত অঞ্চলে একটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। চব্বিশ পরগনার জয়নগরের কাছে 'নীমপীঠ'এ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে একটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কথা ভাবা হচ্ছে। কাছাকাছি বিহারে রাঁচীতে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনায় একটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে। ঠিক মত পরি-চালিত হলে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সহজ ও ব্যাপক হবে বলে মনে হয়। সার্থকতার পথে চালনার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও সেবাব্রতে নিষ্ঠাবান কর্মী। আঞ্চলিক সমস্যা-গুলি সঠিকভাবে বোঝার দরকার আছে, সেই সংগে আবশ্যক আছে সেই অঞ্চলের উপযোগী প্রযুক্তিবিদ্যার। শুধু জল-মাটি-আবহাওয়ার দিক লক্ষ্য রেখে প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা করলেই চলবে না। অঞ্চলের কৃষিকর্মে লিপ্ত লোকদের আর্থিক সঙ্গতির কথাও ভাবতে হবে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে। শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ যদি মামুলিভাবে চলে তাহলে উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক না কেন সার্থকতা লাভ করবে না। বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি মহা-বিদ্যালয় স্থাপনার প্রস্তাব আসে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনার কথা ভাবা উচিত।

বর্তমানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্তরে কৃষিশিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। অনেক নতুন চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী প্রবর্তন করা হয়েছে ও হচ্ছে। নতুন ভাবে অনেক কিছুই চিন্তা করা হচ্ছে। কৃষিশিক্ষার ব্যাপকতা অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও তার সমস্যা অনেক। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে কৃষি শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার যেমন কোনও যৌক্তিকতা নেই, তেমনি অন্য শিক্ষাকে অন্ধ অনুকরণ করে সেই ধাঁচে ফেলার প্রয়াসও ঠিক নয়। কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কৃষি তথা কৃষকের উন্নতি সাধন করা। যদি সেই লক্ষ্য বা আদর্শ থেকে কৃষি শিক্ষা বিচ্যুত হয় তাহলে যতই তা জাঁকজমকপূর্ণ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১১ ॥

সন্ধের মুখে আবার একদিন গুপী স্যাকরার দোকানের ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলো রাইমোহন। গুপী তখন বেরুবার উদযোগ করছিল, রাইমোহনকে দেখে বসে গেল।

—ঘোষালমশাই যে! বহুৎদিন পায়ের ধুলো দ্যাননি ইদিকে। ভাবলুম বুঝি গরীবকে ভুলেই গ্যালেন।

বেতের মোড়ায় হাটু উঁচু করে বসে পানের ডিবে বার করলো রাইমোহন। গুপীকে একটি দিয়ে, নিজে একটি মুখে পুরে বললো, দিনদিন যত গরীব হচ্চিস গুপী, তেম্নি তোর ভুঁড়িখানাও তো দিব্যি নেওয়া-পাতি হচ্চে বেশ!

—ওদিকে নজর দেবেন না! গরীবের তো এটাই সম্বল। আরও বেশী দুর্দিনের জন্য জমিয়ে রাখতে হয়।

—বসত বাড়িটে একতোলা থেকে দোতেলা করিচিস দেকলুম য্যানো!

—সেইজন্যই তো হাত একেবারে খালি। বাড়ি কত্তে গিয়ে একেবারে সর্বোস্বান্ত হলুম।

—এমন সর্বস্বান্ত হওয়াও ভাগ্যের কতা। তা একদিন বাড়িতে ডেকে নুচি মণ্ডা খাওয়া! তোর বাড়ি মানে তো আমাদেরই বাড়ি, আমাদেরই টাকায় করিচিস যখন—

—আপনাদের মতন লোক এই অধমের কুঁড়েতে আসবেন, এ তো মহাভাগ্যের কতা। কবে পায়ের ধুলো দেবেন, বলুন!

—সহজে দিতে পারবো না, অ্যাখন পায়ের ধুলো বড় আককারা, যা বৃষ্টি বাদলা চলচে। আমাদের এই চিৎপুরের রাস্তায় তো মেঘ ডাকলেই হাটু জল। পদ কাদা দিতে পারি।

—তাই-ই দেবেন না হয়। আপনার পা ধুয়ে একটু চরণামৃত খেয়ে নেবো।

—কী ব্যাপার বে, গুপী! এত খাতির কচ্চিস কেন রে আমাকে? অতি ভক্তি কিসের লক্ষণ ব্যানো?

—আপনাকে খাতির করবো না তো করবো কাকে? আগে পায়ে হেঁটে ঘুরতেন, তারপর দেখলুম পাল্কি ধরেছেন, অ্যাখুন আবার দেখচি জুড়ি গাড়ি হাঁকাচ্ছেন। গত মঙ্গলবারে আমার পাশ দিয়ে ধাঁ করে চলে গেলেন, আমি কত ডাকাডাকি কল্লুম, আপনি গেরাহ্যিই কল্লেন না। তবে বড় খুশী হইচি, আপনার উন্নতি দেখলে আমাদেরও আনন্দ হয়।

—র, র, আর কটা দিন সবুর কর, আরও কত দেকবি! এই তো সবে ছিপ ফেলিচি। অ্যাখুন জুড়ি গাড়ি হাঁকাচ্চি, এরপর দেকবি তেঘুড়ি চৌঘুড়ি হাঁকাবো, নিজের, একেবারে নিজের!

—সিদিনকে তবে কার গাড়িতে যাচ্চিলেন? আপনার নিজের নয়!

—না রে, পাগলা। ও গাড়ি রামকমল সিংগীর।

—সিংগী বাড়িতে আবার ভিড়লেন কবে? এই যে ক'দিন খুব সরকার মশায়ের সংগে ঘোরাঘুরি কচ্চিলেন। তেনাকে ছেড়ে এবার বুঝি রামকমল সিংগীকে ধরলেন?

—ছাড়িনি, তেনাকেও ছাড়িনি। দুজনকে দুহাতে খেলাচ্চি বুজলি, পুকুরের দু ঘাটে চার ফেলিচি।

তাহলে আপনাকে একটা কাজ কত্তেই হবে আমার জন্যে। বাবু রামকমল সিংগী শুনলুম শিগগিরই ছেলের বে দিচ্চেন। কিছু না হোক, লাখখানেক টাকা খরচা হবে নিশ্চয়!

—লাখখানেক কি রে ব্যাটা! এক লাখ তো আমার মতন বারো ভূতে লুটে পুটেই খাবে। শুনেচি, গয়নার হিসেবই হয়েছে আড়াই লাখ।

—ঘোষাল মশাই, ওর থেকে আমায় কিছু কাজ ধরে দিতেই হবে। হাজার পঞ্চাশেক পেলেই আমার যথেষ্ট।

নিঃশব্দ হাসিতে রাইমোহনের মুখখানা কুঁচকে গেল। তার হাসির মধ্যেও খানিকটা হিংস্রতা আছে। এই পৃথিবীর কাছে কখনো নিজে জব্দ হয়ে যাবার আগেই সে নানারকম বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়ে দিতে চায়।

বাঁ হাতটি তুলে গুপীর দিকে অভয় মুদ্রা দেখিয়ে সে বললো, এই কতা! মোটে পঞ্চাশ হাজার পেলে তুই সন্তুষ্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যদি আরও বেশী কাজ দিই?

—সে আপনার দয়া।

—বিধু মুকুজ্জেও মেয়ের বে লাগাবে, সে খপর শুনিচিস?

—কোন্ বিধু মুকুজ্জে? যিনি বড় উকিল?

—হ্যাঁ, আমাদের রামকমল সিংগীর ফে ফি গা—

—কী বললেন?

—ফেরেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। এ টকুও জানিস না?

—এসব জানলে তো আমিও বাজারে নেমে পড়তুম। মুখ্যু বলেই না সারাদিন আগুনের ধারে বসে হাঁপর চালাই।

—সেই বিধু মুকুজ্জের বাড়ির কাজেরও বায়না যদি জোগাড় করে দিই?

—তাহলে আপনাকে রোজ দু'বেলা পেন্নাম ঠুকবো!

—শুধু পেন্নাম! হিস্যে দিবি না ব্যাটা বজ্জাত!

—সেও আপনার দয়া। আপনি হিস্যে চাইলে কি আর আমি কখনো না বলতে পারি?

—টাকায় এক আনা বাটা দিবি তো বল এখন থেকেই কাজে লেগে যাই। সিংগী বাড়িতে মাধব স্যাকরার কাজ বাঁধা।

দপ করে জ্বলে উঠলো গুপী। আর পাঁচজন নিরীহ, দুর্বল মানুষের মতন সে-ও নিজের পেশায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম সহ্য করতে পারে না। ইদানীং স্বর্ণকার হিসেবে মাধবের খুব খ্যাতি। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন রাইমোহন ওর নামটা তুলেছে।

—মাধব! সে তো এক নম্বুরি চোর। বিষকুম্ভ, বুঝলেন ঘোষালমশাই, বিষকুম্ভ, এই বলে দিলাম আপনাকে। ও গুখেগোর ব্যাটাকে কেউ সেঁকো বিষ খাওয়াতে পারে না!

—তবেই বোজ! মাধবকে সরানো চাট্টিখানি কতা নয়। গণ্ডুর মতন মেহনৎ করতে হবে, বুদ্ধি খর্চা করতে হবে। কিছু আগাম দে!

—আজ্ঞে?

PONDS
VANISHING CREAM
GREASELESS FOUNDATION
MADE IN INDIA

—একবার বললে বুঝে কতা বুঝিস না? দু'বার তিনবার করে বলতে হবে? কিছু আগাম দে আমায়। এত বড় একটা কাজের পত্তন করবো, কিছু মালকড়ি ছাড়তে হবে না?

—আগাম! এখন তো আমার হাতে কিছু নেই। আগে কাজ করি, বাবুদের কাছ থেকে পয়সা পাই, তারপর কড়ায় ক্রান্তিতে আপনার হিস্যে বুঝে দেবো।

—আরে ব্যাটা, আগে দারোয়ানগুলোনকে হাত কত্তে হবে না? সে জন্য খর্চাপাতি নেই? এসব বড় বড় বাড়ির দারোয়ানরা এক একজন কাঁচাখেকো দেবতা, এদের খুশী না করে কিচ্ছুটি করার উপায় নেই।

—ঘোষাল মশাই, বিশ্বাস করুন, হাত একেবারে খালি।

—দে দে ব্যাটা, বেশী ভ্যানতাড়া করিস না, শুভ কাজে অমন ব্যাগড়া দিতে নেই, অন্তত পঞ্চাশটা টাকা বার কর।

—আজ নয়, আর একদিন বরং—

—তবে কি মাধবের কাচে যাবো বলতে চাস? তোর ভালো চাই বলেই বলচি, নইলে আগ বাড়িয়ে আমার এত গরজ দেখাবার ঠ্যাকাটা কী? সিংগী বাড়িতে একবার যদি ঢুকতে পারিস...টিকটিকি হয়ে ঢুকবি, পাঁচ বছর বাদে কুমির হয়ে বেরিয়ে আসবি!

—তবে আজ তিরিশ টাকা নিন!

—অ্যাই তো। অমনি দরাদরি শুরু করে দিলি। স্বভাব যায় না মলে, অভাব যায় না ধুলে। স্বভাবটা যাবে কোতায়! লাখ লাখ টাকার কারবার, আর তুই দশ-বিশ টাকা নিয়ে ঝামেলা কচ্চিস!

—পঁয়তিরিশ নিন। তার বেশী আজ আর কিছুতেই দিতে পারবো না!

—আর একটু ওঠ্। আর একটু বাড়। আচ্ছা বেশী কতার দরকার নেই। দে, পঁয়তাল্লিশই দে। বাকি পাঁচ টাকা তোর ছেলে-মেয়েদের আমি মোয়া মিছরি খেতে দিলুম।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গা মোচড়া-মুচড়ি করতে করতে গুপী কাঠের ক্যাশ বাক্সটা খুললো। ঘর থেকে টাকা বার করে দিতে গুপীর যেন হাড় পাঁজরা ভেঙে যায়। কিন্তু উপায়ও তো নেই, রাইমোহন ঘোষালের সঙ্গে সে কথায় এঁটে উঠতে পারবে না। কাজটাও বড় বেশী লোভনীয়। এই সব বড় মানুষদের বাড়ির একটা বিয়ের কাজ করেই অনেকে ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়। মাধবের নাম করেই রাইমোহন গুপীর একেবারে ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে। মাধবের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নেবার আনন্দে গুপী পঞ্চাশ-একশো টাকা অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে।

টাকাগুলো গুণে বেনিয়ানের জেবে ভরে নিয়ে রাইমোহন তৃপ্তির হাসি হাসলো। নিজের কৃতিত্বে সে নিজেই মুগ্ধ। উদারভাবে সে আবার পানের ডিবেটা বাড়িয়ে দিল গুপীর দিকে।

—তাহলে কাজ ঠিক হাসিল হবে তো, ঘোষাল-মশাই?

তুই নিশ্চিন্ত থাক। তোর বাড়ি এবার তিনতোলা হলো বলে!

—আজ মাল আনেন কি কিছু?

—নাঃ!

—তাহলে এবার গা তোলা যাক। আজ খবর-টবরও কিছু শোনালেন না।

—বোস্, আরও কাজ আছে। খবর আর কী, দেশে মড়ক লেগেচে, ওলাউঠোয় কত মানুষ পটাপট মরে যাচ্চে! লোকে আর মড়া পুড়োবারও ফুরসোৎ পাচ্চে না। গঙ্গায় হাজারে হাজারে শব ভাসচে। দেকে আয় গে, সে এক দ্যাকার মতন জিনিস!

—রাম কহো! ও আবার কেউ দেকতে যায়।

—ঘাটে এত মড়া ভাসচে যে সাহেবরা জাহাজ ভিড়োতেও পাচ্ছে না। বড় বড় কত্তারা এই নিয়ে মিটিং কত্তে লেগেচে। শীতকালেও এমন মড়কের কথা জন্মে শুনিনি। এর মধ্যে শুনলুম দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরলেন।

গুপী চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলো, বলেন কী? উনি বিলেত গেলেন কবে? কিছুই শুনিনি তো। কালাপানি পেরুলেন? জাত ধম্মো সব জলাঞ্জলি দিলেন?

—ওঁর আর জাত ধম্মো আছে কী? বড় মানুষদের জাতে কখনো ফোস্কা পড়ে? কেউ পাঁতি দিতে গেলে তাদের গায়ে চাঁদির জুতি কষাবেন, অমনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঁর গুরুঠাকুর কালাপানি পেরিয়েছেল আর উনি পেরুলেন না? যাকগে, শোন, এক ছড়া সোনার হার দে তো আমাকে। ছোট হলেই চলবে, বেশী বড়-র দরকার নেই।

—হার? আপনি কিনবেন?

গুপী যদি অতিরিক্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়ে, তা হলেও তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। রাইমোহনই এদিক সেদিক থেকে হাত সাফাই করে আনা সোনার জিনিস বিক্রয় করে গুপীকে। বস্তুত সেই উপলক্ষেই তার এখানে পদার্পণ ঘটে। আজ ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে।

—হ্যাঁরে ব্যাটা, আমি কিনবো। কেন, ক্ষ্যামতা নেই নেই নাকি আমার সোনা কেনার?

—না, বলছিলুম কি, আপনি নিজেই আবার বে-শাদী কচ্ছেন নাকি?

—কতা বাড়াসনি। তোর কাছে হারটার কী আছে, দ্যাকা, আমার তাড়া আছে।

গুপী ছোট বড় নানা মাপের চার পাঁচটি হার বার করলো। কোনোটিতে পাথরের লকেট বসানো, কোনোটি সাধারণ নক্সাকাটা। এর মধ্য থেকে একটি ছোট মফচেন তুলে নিয়ে রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, এটা ওজন কর, দ্যাক কতোটা সোনা—

হারটি ছোট হলেও বেশ ভারী, পুরো দেড় ভরি। গুপী তার দর হাঁকলো পঁয়তিরিশ টাকা। রাইমোহন তাই শুনে গুপীর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বললো, বা বা বা বা বা বা! বলিহারি আক্কেল রে! আমি বেচতে এলে বলবি উনিশ টাকা ভরি, তার বেশী একটা আধলা না, আর আমাকে তুমি বেচবি বেশী দরে? অ্যাঁ?

আজ্ঞে আমার বাণীটা ধরবেন তো!

—চশমখোর, আমার কাছ থেকেও বাণী চাইছিস!

অনেক দরাদরি করে বত্রিশ টাকায় রফা হলো। গুপী তার কমে কিছুতেই দেবে না? শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাইমোহন বললো, আচ্ছা দে! আর পারি না তোর সঙ্গে।

ছোট বাক্সে হারটি ভরে দিতে দিতে গুপী বললো, কিন্তু ঘোষালমশাই, এত ছোট হার তো কোনো হুরী-পরীর গলায় মানাবে না। লাল পাতর বসানোটি নিলে পাত্তেন, বেশ দ্যাখনদার ছিল।

—তার দামটিও যে দ্যাখনদার! দে, দে, ওতেই হবে! তোকে আর ফোঁপরদালালি করতে হবে না।

—কার গলায় পরাবেন?

—চুপ্ মার!

রাইমোহন যেন একটু লজ্জা পেয়েছে মনে হয়। আর কথা বাড়াতে চায় না। মোড়া থেকে টক করে উঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে গুঁতো খেল মাথায়। তার দৈর্ঘ্যের তুলনায় এ ঘরের ছাতটি যে নীচু, সে কথা তার প্রায়ই মনে থাকে না।

—চলি রে, গুপী!

—দামটা দিলেন না?

—অ! ভুলেই গিসলাম। আমি নগদা নগদির কারবারই পছন্দ করি। ধারধোর রাখা আমার স্বভাব নয়।

বেশ সাড়ম্বরে রাইমোহন একটু আগে গুপীরই দেওয়া সিক্কা টাকাগুলি বার করলো জেব থেকে। গুণে গুণে বত্রিশ টাকা তুলে দিল গুপীর হাতে। তারপর কোটোটি ট্যাঁকে গুঁজে নিষ্কান্ত হলো।

এবার গুপীও মুচকি হাসলো একটু। সব দুঃখেরই সান্ত্বনা আছে। রাইমোহন চিনতে পারেনি। এই হারটিই রাইমোহন কিছুদিন আগে গুপীর কাছে বিক্রি করে গিয়েছিল আঠাশ টাকায়। গুপী তার ওপর চার টাকা লাভ রেখে দিল। ভগো না থাকলে এরকম দাঁও জোটে না।

রাইমোহনের গন্তব্য জানবাজার। গুপীর দোকান থেকে বেরিয়েই অদূরেই পথে পড়লো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে রাইমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

আপনার ছেলেমেয়েদের
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়,
তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে...
কোকোর স্বাদে ভরা বোর্নভিটা!
বোর্নভিটাতে এখন পাবেন আরও
বেশী কোকো, ফলে আরও বেশী
স্বাদ আর পুষ্টিগুণ।
শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর
চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।
এক কাপ গরম দুধে দু' চামচ বোর্নভিটা দিয়ে এক
সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় তৈরী করুন।
আপনার ছেলেমেয়েদের রোজই বোর্নভিটা খাওয়ান
দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত দেহের মূল্যবান
পুষ্টিগুণ দরকার, বোর্নভিটা তা যোগাতে সাহায্য
করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার...
ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।
ক্যাডবেরিস
বোর্নভিটা
Bournvita
More Cocoa
৭৫ পয়সা বাঁচান
৫০০ গ্রামের কম খরচের
রিফিল প্যাক কিনলে।
জরুরী কথা: বোর্নভিটা টাটকা
রাখতে—রিফিল প্যাক খোলার
সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার একটি
সাধারণ টিনে ঢেলে রাখুন।

OBM 8376 BEN

এই বাড়িটির ওপর তার রাগ আছে। রাইমোহন এ বাড়িতে ভিড়তে গিয়েছিল, কিন্তু ঠোক্কর খেয়ে ফিরে এসেছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ি গতায়াত করতে পারলে দেশের দশটা লোকের কাছে ইজ্জত বাড়ে। রাইমোহনের কাকা দ্বারকানাথের বয়স্য ছিলেন। তিনি অকালে চোখ বুজেছেন। খুড়োর জায়গায় উপযুক্ত ভাইপোরই কাজ পাবার কথা। তা দ্বারকানাথ তো এখন আর দিশী লোকদের আমোলই দ্যান না। সাহেব সুবো ছাড়া কথা নেই, ঘুরে এলেন খোদ সাহেবদের মুল্লুক থেকে। সে যাই হোক, তাঁর ছেলে দেবেন্দ্র এখন লায়েক হয়েছে, বিষয় কর্ম দেখছে, তাঁরও এখন পারিষদের প্রয়োজন। গোড়ায় গোড়ায় দেবেন্দ্রবাবু যে-রকম ফূর্তি ফার্তা শুরু করেছিল, তাতে বেশ আশা হয়েছিল রাইমোহনের। কয়েকবার সে ঘুরঘুর করেছিল দেবেন্দ্রবাবুর আশে পাশে। কিন্তু ঠিক পাত্তা পায়নি। দেবেন্দ্রবাবুর নাকি মতিগতি বদলে গেছে, মদ মেয়ে-ছেলেতে আসক্তি নেই, নাচ গানের আসর বসান না পুরুষ মানুষের যোগ্য কাজ কিছুই করেন না। সংস্কৃত শোনার খুব ঝোঁক হয়েছে নাকি। এটা একটা অন্যায় কথা নয়? অত বড় বংশের ছেলে, একটু আধটু বখামি না করলে আর পাঁচজন লোকের অন্ন সংস্থান হবে কী করে? দেবেন্দ্রবাবুকে বাইরে আর প্রায় দেখাই যায় না, কিছু মেনিমুখো মন্দার সংগে দিনরাত কী সব গুজুর গুজুর ফুসুর ফাসুর করেন। রাইমোহন ঠিক তাল ধরতে পারছে না। লোকে বলাবলি করছে, দ্বারকানাথের মোসাহেবরা ছিল এক একটি গড়ুর পক্ষী, আর সেই মানুষের ছেলে হয়ে দেবেন্দ্রবাবু চাট্টি বায়স পুষেছেন।

রাইমোহন মনে মনে বললো, কেটে যাবে, এসবও কেটে যাবে। এসব নিরিমিষি ভড়ং আর কতদিনের। জমিদার বাড়ির ছেলে রক্ত চাটবে না এ কখনো হয়।

জানবাজারে কমলা সুন্দরীর বাড়িতে আজ দারুণ আসর জমেছে। লখনৌ থেকে কালোয়াতী গানের এক ওস্তাদ আর তবলা বাজনাদার আনিয়েছেন রামকমল সিংহ। এ সবই কমলাসুন্দরীর মনোরঞ্জনের জন্য। কমলা সুন্দরীর নৃত্যের খ্যাতি দিকবিদিক ছড়িয়েছে, সে আরও তালিম নিতে চায়। ব্যয়ের ব্যাপারে রামকমল সিংহের কোনো কার্পণ্য নেই, কমলাসুন্দরীর যে-কোনো আবদার তিনি রক্ষা করতে প্রস্তুত। বাবু তো বাবু রামকমল সিংহ। এ কথা স্বীকার করছে সকলে। পাঁচজন লোক ডেকে নিজের রক্ষিতার নাচ দেখানো, এমন কাজ আগে কেউ কখনো করেনি। বাঈ নাচের আসর বসাতে হলে সকলেই বাঈজী ভাড়া করে আনে, নিজের মেয়েমানুষকে রাখে আড়ালে। কিন্তু কমলা সুন্দরীকে আর পাঁচজনে তারিফ করলে রামকমল সিংহ যেন আরও বেশী আনন্দে মেতে ওঠেন।

সন্ধে থেকে বসে নাচ গানের আসর। জানবাজারের বাড়িটি সম্প্রতি রামকমল সিংহ কিনেই ফেলেছেন। ইয়ার বন্ধুদের সেখানে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনেন তিনি, খাদ্য মদ্য থাকে অঢেল, কিন্তু স্ত্রীলোক ঐ একটিই। রাত বাড়ার সংগে সংগে ফূর্তির মাত্রাও চড়তে থাকে। কমলাসুন্দরীর গাত্রবর্ণ ভ্রমরকৃষ্ণ, লাল রঙের ঘাঘড়া ও ওড়নাই তার পছন্দ, আসরের মাঝখানে তাকে মনে হয় একটি ঘুরন্ত রক্তবর্ণের শিখা। এক একবার নাচ থামলেই কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এনকোর এনকোর চিৎকারের হুলুস্থুলু পড়ে যায়। উত্তেজনা যখন তুংগে, তখনই এক সময় রামকমল সিংহ উঠে আসরের মাঝখানে এসে কমলাসুন্দরীর কোমর বেষ্টন করেন। সে সময় যুগল নৃত্যের জন্য সমস্বরে অনুরোধ আসে মুহুর্মুহু, কিন্তু রামকমল সিংহ সকলের সামনে নিজেকে এতটা খেলো করতে চান না। তাঁর মুখে ফুরফুরে হাসি, চক্ষু ঢুলুঢুলু, তিনি সেই অবস্থায় কমলাসুন্দরীকে পাশের শয়ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে দেন।

এই প্রকার ব্যবহারে রামকমল সিংহ বেশী আনন্দ পান। লাস্যময়ী কমলাসুন্দরী যখন উপস্থিত ভদ্র পঞ্চজনের কাছে কামনীয়া হয়ে ওঠে, যখন সে সকলেরই বুকে লালসা বহ্নি জেলে দেয়, সেই সময়ই রামকমল সিংহ যেন তাদের বোঝাতে চান, দেখো, এই রমণী

রাইমোহন এ আসরে নিয়মিতই উপস্থিত থেকে এই মজা দেখে। আজ সে সেই গৃহের কাছাকাছি গিয়েও অন্দরে প্রবেশ করলো না। প্রথমে ভেবেছিল, কিছুক্ষণ অন্তত বসে খানিকটা পয়স্মৈপদী সুরা টেনে আসবে। কিন্তু মন বদল করে ফেললো। সে চললো হীরামণির গৃহের দিকে।

ছিপছিপ ছিপছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা সংগে রাখে না রাইমোহন, ভিজতেই লাগলো। লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলো খানাখন্দ বাঁচিয়ে। তার মনের মধ্যে একটা দো-টানা চলছে। তার ফূর্তিপ্রিয় মনটা তাকে টানছে পেছনের দিকে, গান বাজনা সম্পর্কে তার একটা সহজাত প্রীতি আছে, প্রথম যৌবনে সে অনেক শখ করে সংগীতের চর্চা করেছিল। তখন উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ আনন্দ, এখন অবশ্য সে সংগীতকে অন্য কাজে লাগায়। তবু এখনো উঁচু জাতের গান তাকে আকৃষ্ট করে, সঠিক তালের নাচের মধ্যে সে লাস্য ছাড়া আরও কিছু পায়। কমলাসুন্দরী রামকমল সিংহের বলতে গেলে ক্রীতা রমণী, সেদিকে রাইমোহনের নজর নেই, কিন্তু তার নাচ দেখলে তবু অন্তত নাচটাই দেখা হয়। তাছাড়া সন্ধের পর মজলিশে মজলিশে সময় কাটানো তার অনেক কালের অভ্যেস, দু' পাত্তর টানার জন্য গলার ভেতরটা শক শক করছে। অথচ এ কথা রাইমোহন বোঝে যে একবার ঐ মজার মজলে সে আর সহজে বেরুতে পারবে না। প্রায় রাতেই রাইমোহন কমলাসুন্দরীর নাচঘরের ফরাসেই গড়াগড়ি দেয়।

আবার হীরেমনির কাছেও পাঁচ সাতদিন আসা হয়নি। সে জন্য রাইমোহন একটু একটু অপরাধী বোধ করে। শেষ পর্যন্ত পিছুটান উপেক্ষা করে সে জোরে জোরে পা চালালো।

পায়ের ইংলিশ জুতো জল কাদায় মাখামাখি। মসজিদের পাশের পুকুরে ভালো করে পা ধুয়ে নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো হীরেমনির বাড়ির সামনে।

এ গৃহ আজ বর্ণহীন। জানালাগুলি বন্ধ, ভিতরে কোনো জনমনুষ্য আছে বলেই বোঝা যায় না। রাইমোহন অবাক হলো না। সদর-দ্বার খোলাই ছিল, সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পা ঘষে ঘষে কোনোক্রমে সে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। হীরেমনির নোকরটি পালিয়েছে, রাইমোহন আগের দিন এসেই দেখেছিল, তার বদলে কাজ করছিল একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক। আজ বোধহয় সে-ও নেই। হীরেমনি আছে তো?

ওপরে উঠে এসে বড় ঘরটির দরজা ঠেলে সে সভয়ে ডাকলো, হীরে হীরেমনি।

এ ঘরটিও অন্ধকার প্রায়। এক কোণে একটি মাটির মালসায় তুষের আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি করে। ঘরে কেউ আছে কি না বোঝা যায় না।

দু' তিনবার ডাকবার পর ক্ষীণ গলায় সাড়া এলো, কে?

নিশ্চিন্ত হয়ে রাইমোহন ঢুকে পড়লো ঘরে। চক্ষু সংকুচিত করে আঁধার সইয়ে নিয়ে সে দেখলো জাজিমের ওপর লম্বমান এক নারীকে।

—কেমন আছিস, হীরেমনি?

—তুমি ফের এয়েচো?

রাইমোহন চলে গেল তুষের মালসার কাছে। সে জানে, পাশেই গন্ধক মাখানো টুকরো টুকরো পাটখড়ি রাখা থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেইরকম একটি পাটখড়ি পেয়ে সে তুষের আগুনের মধ্যে ঠেসে ধরলো, অমনি ফস করে জ্বলে উঠলো সেটা। সেই জ্বলন্ত পাটখড়ি উঁচু করে ধরে সে জিজ্ঞেস করলো, মোমবাতি কোতায় রে?

বেশী খুঁজতে হলো না, মোমবাতি সে নিজেই পেল, সেটা ধরাবার পর সে বললো, একটা গামোছা কোথায় পাই বল দিদি? মাতাটা ভিজে জবজবে হয়ে গ্যাচে।

ম্লান আলোয় মেঘলুপ্ত চাঁদের মতন দেখায় হীরেমনির মুখখানি। দু' চোখের নীচে মৃত্যুর পাণ্ডু রং। শরীর কঙ্কালসার। কণ্ঠে জোর নেই, তবু হীরেমনি বললো, পোড়ামুখো মনিষ্যি, তুমি ফের মরতে এয়েচো এখেনে! দূর হও! দূর হও!

করচিস কেন রে? লোকে কুকুর বেড়ালকেও এমনিভাবে তাড়ায় না।

হীরেমনি বললো, তোমায় কতবার আসতে বারণ করিচি! আমি তো মরতে বসিইচি, তোমারও মরার সাধ হয়েচে বুঝি?

হীরেমনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। তার ধারণা, তার সংস্পর্শে এসে রাইমোহনও পড়বে সেই অসুখে। তিন মাস হয়ে গেল হীরেমনিকে আঁকড়ে আছে এই কালরোগ, নিচ্ছেও না ছাড়চেও না। হীরেমনির কাছে অনেকদিনই আর কেউ আসে না। তার জিনিসপত্রও ক্রমে ক্রমে উধাও হয়ে গেছে। যৌবন চলে গেলে বারবনিতার আর কিছুই থাকে না, কিন্তু হীরেমনির বয়েস এখনো কুড়ি পূর্ণ হয়নি, তবু তার এই দুরবস্থা।

—চাঁদু কোতায়? চাঁদু?

—ঘুমুচ্ছে পাশের ঘরে।

—এই সন্দেবেলা ঘুমুচ্ছে? খেয়েচে কিছু?

—তোমার অত কতার দরকার কী?

—আ মোলো, অমন কতায় কতায় মুখ ঝামটা দিচ্ছিস কেন? ছেলেটা খেয়েচে কিনা জানবো না? সেদিন যে মাগীকে দেখে গেসলুম তোদের রান্না করে দিচ্চে, সে গেল কোতায়?

—কে জানে!

—রাইমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বেঘোরে মরতে বসেও হীরেমনির অহংকার যায়নি, সে কিছুতেই রাইমোহনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতে চায় নি। রাইমোহন টাকা দেওয়ার চেষ্টা করলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হীরেমনির ছেলে চন্দ্রনাথের বয়স এখন তিন বছর, মায়ের এই অসুখে তারও দুরবস্থার একশেষ হচ্ছে। কেই বা দেখাশুনো করবে। যা অবস্থা, তাতে চোর ডাকাতরা যে-কোনোদিন মা ছেলেকে কেটেকুটে বাকি সব জিনিসপত্রও নিয়ে চলে যাবে। রাইমোহনের সংসারে কেউ নেই, কবেই সব উৎসন্নে গেছে, সুতরাং চন্দ্রনাথকে সে নিজের কাছে নিয়ে রাখতেও ভরসা পায় না। আর কার কাছেই বা রাখবে, বেশ্যার ছেলেকে কে নেবে?

পাশের ঘর থেকে ঘুমন্ত চন্দ্রনাথকে তুলে নিয়ে এলো রাইমোহন। ছেলেটার চোখের নীচে শুকনো জলের দাগ, তাই দেখে কঠিন হৃদয় রাইমোহনেরও বুকটা একটু মুচড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হলো তার।

হীরেমনির পাশে বসে সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, তুই এখনো বল, হীরেমনি, এ ছেলে কার? আমি তার গলায় গামছা দিয়ে এখেনে হিড়হিড় করে টেনে আনবো! গোটা কলকেতা শহরে খবর রটিয়ে দোবো!

হীরেমনি ফোঁস করে উঠে বললো, ফের ঐ কতা? দূর হয়ে যাও আমার চোকের সুমুখ থেকে। ছেলে আমার, ভগবান আমায় দিয়েচেন।

এ কি বিস্ময়কর বিশ্বস্ততা হীরেমনির! মৃত্যু শিয়রে রেখেও সে সততার জেদ ছাড়বে না। এই ব্যাপারটাই রাইমোহনকে বেশী টানে। তঞ্চকতাই তার পেশা, ভণ্ডামি, জুয়াচুরি ও মিথ্যের অস্ত্রগুলি সে সারা জীবন শাণিয়ে বেড়াচ্ছে, আর একজন সামান্য স্ত্রীলোক হারিয়ে দিচ্ছে তাকে। সতীত্ব নেই অথচ সততা আছে, এমন স্ত্রীলোকও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকে?

—যদি জগমোহন সরকার হয় তো একবারটি বল, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। সে নচ্ছারটা ফিমেল উদ্ধারের নাম করে ভদ্দরলোকের বাড়ির অন্দরে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্চে। মাথা ভরা কুমতলব, আর মুখে বড় বড় কতা! কত পিরীত ছিল তোর সঙ্গে, এখুন আর ইদিকে আসবার নামটি নেই।

—হাজার বার বলিচি তিনি নন্।

বেশ, তবে আজ থেকে আমিই চাঁদুর বাপ হলুম।

না, তোমার মুরোদে কুলোবে না। ওর বাপ কেউ নয়। ওর বাপ নেই। আমি মরলে চাঁদুও আমার সঙ্গে মরবে।

—হীরে, আমার ওপর কেন অত রাগ কাঁরস? সুখের খোঁজে লোকে তোদের মতন মেয়েমানুষের কাছে আসে। অসুখে-পড়া মাগ দেখতে কেউ ভুলেও আসে না। কিন্তু আমি তো এসিচি।

—বেশ কোরেচো। এখন বিদেয় হও।

—চাঁদুকে আমি আজ থেকে পুষ্যি নিলুম। এই দ্যাখ।

ট্যাঁক থেকে সোনার হারটা বার করে সে পরিয়ে দিল চন্দ্রনাথের গলায়। তারপর ছোট একটি হাততালি দিয়ে বললো, বাঃ, দিব্যি মানিয়েচে।

—খুলে নাও, এক্ষুনি খুলে নাও। কার ঘর ঠেঙে চুরি করা মাল তুমি এখেনে গচাতে এয়েচো!

—চুরি করা? তোকে কিরে কেটে বলচি, এ আমার হকের জিনিস। ওকে আজ ছেলে বলে ডাকলুম, খালি হাতে আসা যায়? তোকে আর একটা কতাও বলচি, আজ থেকে আমি এখেনেই ঠাঁই নেবো। অর যাচ্চিনি। আমি এখুনি বেরিয়ে খাবার দাবার কিনে আনচি। তুই ভেবেছিস আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাবি?

চন্দ্রনাথের মুখশ্রী সুন্দর, গৌরবর্ণ, সোনার হারটি পরানোতে সেই শিশুকে আরও সুশোভন দেখায়। রাইমোহন সেদিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইলো। পুষ্যি নেওয়ার দিন একটা কিছু স্বর্ণালঙ্কার দেওয়া নিয়ে কথা। তারপর আবার টাকা পয়সায় হঠাৎ ঘাটতি পড়লে ঐ হারটিই বেচে দিয়ে আবার দু' পাঁচ দিন চালানো যাবে।

হীরেমনি আর পারলো না, নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করলো। রাইমোহন হীরেমনির শীর্ণ গ্রীবায় হাত রেখে বললো, তোকে আমি সারিয়ে তুলবোই! তুই ভালো হয়ে ওঠ, হীরে, তারপর তেতে আমতে মিলে আগুন জ্বালাবো! তোকে আমার খুব দরকার। (ক্রমশ)

মানুষ পাথর

সমরজিৎ কর

॥ ৪ ॥

আগে ছিল আসামের অন্তর্গত। ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ গারো, খাসি এবং জয়ন্তিয়ার পার্বত্য জেলাগুলি একত্রিত করে তৈরি হল নতুন প্রদেশ। মেঘালয়। উত্তর-পশ্চিম ' উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা বরাবর আসাম। আর দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলা দেশ। আয়তন তেইশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। আর জনসংখ্যা দশ লক্ষের মত।

পাহাড় এবং পাহাড়। থাকে থাকে সাজান। সমুদ্রতল থেকে সেই পাহাড়ের উচ্চতা কোথাও দেড়শ' মিটার। কোথাও প্রায় দু হাজার মিটার। উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী নদীর লুকোচুরি খেলা। সে নদী কখনও গভীর অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। কখনও বা চলার পথে সৃষ্টি করে ছোট ছোট জলাশয়। তার কাকচক্ষু জলের ওপর গাঢ় সবুজের ছায়া। হয়ত বা চোখে পড়বে কোন খাসী ললনা। জলের ধারে একখন্ড পাথরের ওপর তার সমস্ত দেহবাস পড়ে। নিরাবরণা। নিঃসংকোচ। পৃথিবীর কোন দিকেই যেন তার দৃষ্টি নেই। স্ফটিকশুভ্র নগ্ন পিঠের ওপর ঘন কালো চুলের মেঘ বিস্তার করে কখনও একখন্ড পাথরের ওপর বসে কাপড় কাচছে। কখনও বা দেবকন্যার সৌন্দর্য ছড়িয়ে ভেসে রয়েছে জলে।

তবে সাবধান। মনের আগ্রহ মনে রাখাই ভাল। পুরুষের কৌতূহলকে ওরা ঘৃণা করে। বিশেষ করে সে পুরুষ যদি ভিনদেশী হয়।

এ ঘৃণা যে কত তীব্র তাও দেখেছি।

আমরা শিলং-এর দিকে যাচ্ছিলাম। মাঝে পড়ল একটি উপত্যকা। সেই উপত্যকার সবুজ জমিতে চাষ করছিল কয়েকটি মেয়ে। দু একজন প্রবীণাও ছিল তাদের মধ্যে। নানা রঙের পোশাক পরা ওই মেয়েদের দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। পাশেই বসে ছিলেন অজিতবাবু।

বললাম, ছবি তুলতে হবে। রঙীন ছবি।

লিনডোর কানে আমার কথা যেতেই সে গাড়ি থামিয়ে দিল।

অজিতবাবু বললেন ছবি তুলছি। কিন্তু তার আগে ওদের একটু পারমিশন নিলে হত না?

আমি বললাম, মশাই, পারমিশন পরে নেবেন। আগে ক্যামেরায় ক্লিক তো করুন। পারমিশন টারমিশন নিতে গেলে ন্যাচারাল পোজটাই মাটি হবে।

সংগে সংগে ক্লিক।

আর তারপরই মারমুখী ব্যাপার।

মেয়েগুলি আমাদের মতলব বুঝতে পেরেছিল। সংগে সংগে চিৎকার। মুহূর্তে ক্যামেরার দিক পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। আর সেই সংগে দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল। কেউ কেউ আমাদের দিকে কাদা ছুঁড়তে লাগল। ভাগ্য ভাল, আমাদের রাস্তাটা থেকে ওদের দূরত্ব ছিল অনেক বেশী। অতএব লিনডো সংগে সংগে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা লক্ষ করলাম, মেয়েরা তখনও আমাদের উদ্দেশ্যে হাত পা ছুঁড়ে গালাগাল দিয়ে চলেছে। সেই সংগে আমাদের লক্ষ করে থুতু ছুঁড়ছে।

এই ঘৃণা শুধু মেয়েদের মধ্যে নয়, পুরুষদের মধ্যেও লক্ষ করেছি। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় সামনাসামনি তারা স্বাভাবিক ভাবে অনাদের সংগে মেলামেশা করে ঠিকই, কিন্তু মনে মনে সমতলভূমির মানুষকে এখনও তারা বন্ধুভাবে মেনে নিতে পারে নি।

'তবে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।' বললেন শ্রীশম্ভু সেন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিভাগের ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেল।

শম্ভু সেন। জিওলজিক্যাল সার্ভের সবার কাছে তিনি শুধু 'স্যার' নন। শম্ভুদা।

সত্যি কথা বলতে কী, এ ধরনের মানুষ আমি কমই দেখেছি। প্রচন্ড স্মার্ট, রসিক, কথা বলতে ভালবাসেন এবং সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক কর্মকান্ড তাঁর নখদর্পণে। দেখেছি, বড় সরকারী অফিসারদের অনেকেই হন স্নব, আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজেদের স্ট্যাটাস সম্পর্কে বড় বেশি স্পর্শকাতর। শম্ভুদাকে দেখলে মনে হয়, এসব ধ্বংস করার জন্যেই তিনি যেন জন্মেছেন। তাঁর কাছে কাজের প্রতিশ্রুতিতেই মানুষের পরিচয়। এবং যিনি যে কাজই করুন না কেন, ভাল কাজ করলে তিনিই নমস্য। সিনিয়ার জিওলজিস্ট থেকে শুরু করে জীপের ড্রাইভার, হেলপার সবারই তিনি প্রিয়পাত্র। সবারই শম্ভুদা।

একজন বললেন, দারুণ ভাল মানুষ। কিন্তু পান ' থেকে চুন খসলে রেহাই নেই। দারুণ রেগে যান তিনি। শাসন। শোধন। কারোর ক্ষতি করা নয়।

শিলং-এ জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার দপ্তরে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, কী একটা ব্যাপার নিয়ে সিনিয়র জিওলজিস্টদের সংগে মিটিং করছিলেন শম্ভুবাবু। আমরা যেতেই মিটিং শেষ হল।

ও'র সংগে আগেই পরিচয় হয়েছিল। সে অন্য পরিবেশে। কলকাতার গ্রান্ড হোটেলে রোটারি ক্লাবের আহ্বানে ভারতের হীরক নিয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। তখন। সেখানে তাঁর ভূমিকা ছিল অ্যাকাডেমিসিয়ানের মত। একজন অধ্যাপক অথবা বিজ্ঞানী। আর এখানে প্রথম দর্শনেই মনে হল তিনি একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। যিনি প্রতিটি কাজের ছক বেঁধে নেন অনেক আগে। যার এতটুকু পরিবর্তন তাঁর পছন্দ নয়। যাকে বলে পুরোদস্তুর প্রফেশনাল।

'ধন্যবাদ! ওয়েলকাম টু জি এস আই শিলং। বড্ড দেরি হয়ে গেল আপনাদের। আমি ভেবেছিলাম, এগারোটার মধ্যে আপনারা পৌঁছে যাবেন। এখন প্রায় দেড়টা। আই ফিল ইউ আর অল ভেরি মাচ হাংগারি।' বললেন শম্ভুবাবু।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, 'মানে গৌহাটিতেই আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল।'

এবার আমিই খানিকটা কিন্তু কিন্তু স্বরে বললাম, 'আমার জন্যেই আপনার রুটিনে খানিকটা চিড় ধরল। মানে'—

'জানি। সুজিত আমাকে বলেছে।' আমার মুখের উত্তর লুফে নিয়ে মৃদু হেসে নিজেই জবাব দিলেন শম্ভুবাবু। 'আপনারা কামাখ্যা দর্শনে গিয়েছিলেন। তাই দেরি হল। ভেরি গুড। আজ নববর্ষ। বিহু উৎসব। এই দিনে মত কাজ করি, কেমন?' বলেই তাঁর রুটিনও শুনিয়ে দিলেন তিনি।

বুঝলাম, আমাদের প্রথম কাজ হবে এখানকার অরুণাচলের গেস্ট হাউসে গিয়ে তল্পিতল্পা রেখে একটু ফ্রেস হয়ে নেওয়া। তারপর কোন একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ। বিকেল সাড়ে তিনটেয় বসবে প্রেস কনফারেন্স। রাতে শম্ভু বাবুর বাড়িতে ডিনার।

এপ্রিলের মাঝামাঝি। এ সময় শিলং-এর আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা ভার। জিওলজিক্যাল সার্ভের দপ্তরে যখন ঢুকেছিলাম, আকাশে তখন রোদ ছিল। আর আধ ঘন্টা পর যখন বেরিয়ে এলাম তখন চারপাশের পাহাড়ে পাইন গাছের মাথায় নেমে এসেছে ঘন কালো মেঘের স্তূপ। তার মানে, মিনিট দশেকের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। আর বৃষ্টি মানেই কনকনে শীত।

হলোও তাই। অরুণাচল গেস্ট হাউসের পথেই বৃষ্টি নামল। প্রথমে প্রবল বর্ষণ। তারপর ঝিরঝিরিয়ে। সেই সংগে শীত।

তা হোক। হাতে সময় কম। গেস্ট হাউসে গিয়ে তল্পিতল্পা রেখে প্রথমে গরম জলে স্নান। তারপর গরম পোশাক পরে একটা রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়েই দৌড়ে আবার জিওলজিক্যাল সার্ভের দপ্তরে। রুটিন মাফিক সাড়ে তিনটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে।

গিয়ে দেখি শম্ভুবাবু কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত। তাঁর পাশে বসে রয়েছেন আরও কয়েকজন জিওলজিস্ট।

কোনরকম ভূমিকা না করে তিনি একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁদের সংগে। ইনি ডঃ প্রেম প্রকাশ সৎসঙ্গী। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জীবাশ্ম বিষয়ক অনুসন্ধানের দায়িত্ব এ'র ওপর। ইনি শ্রীঅতনু বিহারী গোস্বামী। এ'র গ্রুপ কোয়ারটারনারি জিওলজি নিয়ে কাজ করছেন। শ্রীউদ্ধব

রডোডেনড্রন গুচ্ছ

বাড়ন্ত বয়সের আর এক নাম-
ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®
এখন পাওয়া যাচ্ছে এক অসাধারণ প্যাকে যার জন্য কোন ও বাড়তি খরচ লাগবে না।
মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠার সময় থেকেই সন্তানের হাড় ও দাঁত গড়ে ওঠা শুরু হয়ে যায়। শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের পক্ষে অপরিহার্য।
বাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তার বাড় থেমে যাবে। তখন গাদাগাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যাবে না।
সুতরাং আজ থেকেই তাকে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ খাওয়াতে শুরু করুন।
দিনে ৪ টে করে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে, বিশেষতঃ তার দাঁত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে।
ভিটামিন সি, ডি ও বি ১২ সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেটে ভ্যানিলার গন্ধ দেওয়া এমন এক লোভনীয় স্বাদ আছে, যা' বাচ্চাদের দারুণ ভালো লাগে।
ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ—সুইজারল্যাণ্ডের স্যাণ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত দুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম।
ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®
শক্ত দাঁত ও সুস্থ সবল হাড়ের জন্যে
SANDOZ
daCunha/CS/25G BEN

[illegible] [illegible] জিওলজিস্ট [illegible] ওপর দায়িত্ব শিলং-এর। এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরিচয়ের প্রথম পাঠ চুকতেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে এখানে কাজে লাগানোর আয়োজন করা হয়েছে। তত্ত্ব কথা থাক। বিজ্ঞানের কোন কোন আঙিনা ভূ-তাত্ত্বিক রহস্য অনুসন্ধানে কীভাবে সাহায্য করে, সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তার আগে, ঠিক ওই মুহূর্তে প্রথম যে প্রসঙ্গটি আমার মনে উঁকি দিয়ে উঠল, সেটা এই। এত যে আয়োজন, আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ, তাদের প্রয়োজন কতটুকু মেটাতে পেরেছে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়া?

পরিচয় পর্বের শেষে আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল এই রকম: শম্ভুবাবু, জটিল ভূতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কতটা আগ্রহ, জানি না। তবে যতটুকু জানি, দুটি ব্যাপারে আপনাদের কাজ-কর্ম নিয়ে তারা আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। তারা মনে করে, দেশের খনিজ সন্ধান দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। এবং দেশের কোথায় কখন ভূমিকম্প হতে পারে তার পূর্বাভাস দেবেনও আপনারা। এ দুটি বিষয় নিয়ে ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এ পর্যন্ত আপনারা কতটা কাজ করতে পেরেছেন?

'ভূমিকম্প!' আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটিই লুফে নিলেন শম্ভু সেন। মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন যেন। তারপর খানিকটা স্বগতোক্তির মত কী যেন বলে ফেললেন তিনি। এমনভাবে বললেন, যেন সেকথা নিজেকেই বলা।

মুদ্রাদোষ? জানি না। এরপর আরও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করেছি। কোহিমা এবং কিমফ্রেতে গিয়ে সরকারী অতিথিশালায় তিন তিনটে রাতও কাটিয়েছি একই ঘরে। তখনও দেখেছি, এই কথা বলছেন আবার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকে চলেছেন।

'ভূমিকম্প!' কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন আবার। তারপর বললেন, 'আসুন। দেয়ালে ঝোলানো ওই ম্যাপটা দেখলেই এই অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন।

বিরাট এক রঙীন মানচিত্র। উত্তরে অরুণাচল। তারপর নিচের দিকে পর পর সাজান আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড মণিপুর এবং মিজোরাম।

শম্ভুবাবু বললেন, এই প্রদেশগুলি নিয়েই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল. এবং পুরো অঞ্চলটাই ভূমিকম্পের প্রাণকেন্দ্র। ভূ-কম্পন এদিকে প্রায় সব সময়ই চলছে। তবে ১৮৬৯, ১৮৯৭, ১৯৩০ এবং ১৯৫০ সালে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়ে গেছে ইতিহাসে তাদের নজির বড় অল্প। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের ১৫ অগাস্ট যা ঘটেছিল অত বড় বিধ্বংসী ভূমিকম্প সারা পৃথিবীতে এপর্যন্ত খুব কমই ঘটেছে। রিখটার স্কেলে ওই ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৮-৫ তার ধ্বংসলীলা—লখিমপুর, ডিব্রুগড় এবং শিবসাগর জেলার প্রায় পনের হাজার বর্গমাইল জুড়ে জীবন এবং সম্পত্তির যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার তুলনাই নেই। এই ভূমিকম্পে কোথাও সৃষ্টি হয়েছে গভীর গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে স্তূপে স্তূপে বালি ভূস্তরের বাইরে বেরিয়ে এসে নদী নালার গতিমুখ পালটে দিয়েছে। কোন কোন জায়গায় ঘটেছে চ্যুতি, প্রবল বন্যা। যে সব অঞ্চল বন্যা-অধ্যুষিত ছিল না, এখন সেখানে নিয়মিত বন্যা হচ্ছে।

না। সুদূর অতীতের কথা থাক। গত একশ' বছরের বেশি সময়ের কয়েকটি উদাহরণই হয়ত যথেষ্ট।

যেমন ধরুন, ১০ জানুয়ারি, ১৮৬৯। আসামের কাছার এলাকায় ওই দিন যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার এপি-সেনটার বা উৎপত্তি স্থল শিলং মালভূমিরই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এলাকায় এই কম্পন অনুভূত হয়। তবে ১২ জুন, ১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের যেন কোন নজিরই মেলে না। এবারও উৎপত্তি স্থল এই শিলং মালভূমি। এখানকার ডাউকি চ্যুতির প্রায় কাছাকাছি অঞ্চলে। ভূমিকম্পের মাত্রা ৮-৫ রিখটার-এরও বেশি। প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ, ওই সময় শিলং-এর বহু পাহাড়ের চূড়া ফেটে পড়ে। সেই ফেটে পড়া অঞ্চল থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই ঊর্ধ্বাকাশে প্রক্ষিপ্ত হয়। এই ভূমিকম্পের ফলেই শিলং-এর ব্যাপক অঞ্চলে প্রচুর জলপ্রপাত তৈরি হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল তিরিশটিরও বেশি প্রাকৃতিক হ্রদ। কম্পনের পর আরো দশ বছর ধরে পূর্বাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে তার প্রতিক্রিয়া সমানে চলতে থাকে।

'এই ভূমিকম্প আধুনিক ভূ-কম্পন পরিমাপ বিদ্যার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের উত্তরণ। বরং বলি নতুন ভিত্তি প্রস্তর।' মন্তব্য করলেন শম্ভুবাবু। 'বিশিষ্ট ভূ-তাত্ত্বিক আর ডি ওলডহ্যাম এই ভূমিকম্পকালীন যে সব বর্ণনা নথিভুক্ত করে [illegible]

সেই প্রাচীনতম ডাকবাংলো। এখানেই ফ্লাইং-সসারটি নেমেছিল

[illegible] করে সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্বই তৈরি হয়ে গেল। প্রমাণিত হল, ভূমিকম্পের সময় ভূ-স্তরে দু রকমের কম্পন হতে দেখা যায়। অনুদৈর্ঘ্য বা লংগিচুডিনাল এবং অনুপ্রস্থ বা ট্রানসভার্স। প্রথমটির ক্ষেত্রে কম্পন যে দিকে এগিয়ে যায়, ভূ-স্তর সে-দিক বরাবর কাঁপতে থাকে। দ্বিতীয়টির বেলায়, কম্পন যে দিকে এগোয়, ভূস্তর তার লম্ব বরাবর কেঁপে চলে। তরঙ্গ দুটির বেগ পৃথক হওয়ায় ভূ-কম্পন জ্ঞাপক যন্ত্র তাদের উপস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধরা পড়ে।

বার বার। বহুবার। ৮ জুলাই ১৯১৮ আসামের শ্রীমঙ্গল থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে, দক্ষিণে, পাললিক স্তরের নিচে ধরা পড়ল উৎপত্তি-স্থল। সে কম্পন ছড়িয়ে পড়ে আট লক্ষ বর্গ মাইল এলাকায়। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩; ৩ জুলাই, ১৯৩০; ১৪ আগস্ট, ১৯৩২; ...২১ জানুয়ারি, ১৯৪১; ২৩ অকটোবর, ১৯৪৩; ২৯ জুলাই ১৯৪৭। অবশেষে ১৫ অগাস্ট, ১৯৫০ এর সেই প্রলয়ংকর ঘটনা। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল জানার জন্যে মার্কিনদেশ, ফ্রান্স এবং ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিকরা যুগপৎ চেষ্টা করেছিলেন। তাতে দেখা যায়, এবারকার উৎপত্তিস্থলটি ছিল সইদিয়া থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। অরুণাচলের মিসমি-পার্বত্য অঞ্চলে।

শম্ভুবাবু বলে চললেন, কেন ভূমিকম্প হয়, সে নিয়ে ব্যাখ্যা আছে অনেক। তবে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের ভূমিকম্পগুলির প্রধান কারণ হয়ত এই: আপনারা দেখেছেন, কেউ কেউ ঘরের মেঝে তৈরি করেন শ্লেট দিয়ে। খণ্ড খণ্ড শ্লেট দিয়ে ঢেকে দেন মেঝে। আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিকরা মনে করেন, পৃথিবীর ভূ-স্তরও কতকটা সেই রকম। খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ড পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থেকে সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর তাবৎ ভূ-ভাগ। মুশকিল এই, এই [illegible]

ধীর গতিতে এরা সঞ্চরণ করে চলেছে। আর এই সঞ্চরণের সময় সেই খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ড, ভূ-তাত্ত্বিকরা যাদের বলে থাকেন প্লেট, সেইসব প্লেট, কখনও সামনা সামনি এগিয়ে এসে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে কখনও পাশাপাশি জুড়ে থাকা দুটি প্লেট পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যায়, আবার কখনও বা একটি প্লেট এগিয়ে এসে অপর একটি প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভূ-স্তরের গভীর অঞ্চলে ধাবিত হয়। এধরনের ঘটনায় সময় পরস্পর দুটি প্লেটের সীমানা অঞ্চলই হয় যত সব বিপত্তির মূল কারণ। ওই সব অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে ওঠে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। দুটি প্লেটের পরস্পর আঘাত, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, কিংবা পাশ থেকে প্রচণ্ড চাপে ঠেলা মারার সময় কঠিন ভূস্তরের বিস্তৃত অঞ্চলে যে চাপ সৃষ্ট হয় তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত ভূ-কম্পন হিসেবে ধরা পড়ে। মিজোরাম, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড এমন একটি এলাকার ওপরই দাঁড়িয়ে। শিলং-এর উপত্যকার ওপর দিয়ে আসামের দিকে এগিয়ে গেছে ভূ-কম্পন সম্ভাবনার বেশ বড় রকমের একটি এলাকা। ব্রহ্মপুত্রের পাললিক অঞ্চলও বিপজ্জনক কম নয়। তাই বলছিলাম, সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলই ভূ-কম্পন অধ্যুষিত এলাকা। আশার কথা শুধু এই, এপর্যন্ত যত জায়গায় উৎপত্তিস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের বেশির ভাগই গভীর অরণ্য অঞ্চল শহর লোকালয় থেকে দূরে। তাই এর জন্যে সম্পত্তি এবং জীবনের ক্ষয় ক্ষতি তেমন হয়ত হয় নি।

হয় নি ঠিকই, তাই বলে দায়িত্ব তো এড়ান যায় না? ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে এক সময়ে জনবসতির সংখ্যা ছিল কম। এখন সেকথা কিন্তু বলা চলে না। অতএব নিরাপত্তার দিকটিও তো এখন ভাবতে হবে?

একথা ভেবেই ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজে হাত দিয়েছেন জিওলজিকাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ভূ-তাত্ত্বিকরা। বিমান বাহিনীর প্লেনের সাহায্যে আকাশ থেকে ব্যাপক অঞ্চলের ছবি তোলা হয়েছে। হচ্ছেও। ছবি তোলা হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড থেকে শুরু করে অরুণাচলের দীর্ঘ সীমানা বরাবর। এই সব ছবির সাহায্যে এ অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি সুষ্ঠু চেহারা দাঁড় করানর চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে বড় বড় বড় চ্যুতি। সেই সব চ্যুতির কোথায় কোথায় ভূকম্পনের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা জানার জন্যেও কাজ শুরু হয়েছে।

এটা গেল একটা দিক। মেঘালয়ের খনিজ সম্পদও কি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়?

খাসি এবং জয়ন্তিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে কয়লাখনি। উম রিলাং, সিরমাং, বাপুং, মওসিনরাম, শেলা-মাওলং, চেরাপুঞ্জি-লাইটিংগিড পিনুরস্লা, লাকাডং, লুমসং, টেংগ্লা, প্রভৃতি জায়গায় গেলে চোখে পড়বে প্রচুর কয়লাখনি। গারো পাহাড়ের

গেলেও দেখতে পাবেন কয়লা। এছাড়া চীনে মাটি, চুনা পাথর প্রচুর। দেখতে পাবেন মওসিনরাম, ভোলাগঞ্জ, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নংমসং, খাদ্রুম, আরও কত জায়গায়। আছে, আরও অনেক কিছু আছে। সে বিবরণ সময় মত দেব।

ভূ-তাত্ত্বিকদের সংগে কথাবার্তা শেষ করতে রাত প্রায় আটটা। শম্ভু-বাবুর বাড়ি থেকে ততক্ষণে ঘন ঘন টেলিফোন। খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে। চটপট চলে আসুন। তা ছাড়া আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। হয়ত অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। আর বৃষ্টি মানেই শীতের বাড়াবাড়ি।

উদ্ধবকৃষ্ণ বরদলৈ বললেন, 'আজ বরং থাক। মাঝে মাঝে আমাদের কারোর না কারোর সংগে দেখা হবেই। তখন অনেক কিছুই আমরা আলোচনা করতে পারব।'

'সেই ভাল।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, সেই ভাল।' পেছন থেকে আমার কথার প্রতিধ্বনি করলেন অজিতবাবু। তাঁর গলার শব্দ শুনেই বুঝলাম ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

অতএব 'মন, চল যাই নিজ নিকেতনে।'

তার আগে অবশ্য খাওয়া। আর খাওয়ার কথা মনে পড়তেই মনে হল, তখন সবচেয়ে মূল্যবান কোন কাজ যদি থাকে, তবে ওই খাওয়া। সত্যি কথা বলতে কী, খিদেও পেয়েছিল খুব। বিকেলের দিকে 'লাঞ্চ' নামক যে বস্তু খেয়েছিলাম তা অনেকক্ষণ হাওয়া হয়ে গেছে। আর হাওয়া হওয়া ছাড়া থাকবেই বা কতক্ষণ? এক খুরি ভাত এবং দু টুকরো মাংস। পার্বণী আট টাকা। ওই দাম শোনার পর অতিরিক্ত আরও এক খুরি ভাত এবং দু টুকরো মাংসের কে অর্ডার দেবে, বলুন? শম্ভুবাবুর নিমন্ত্রণকে মনে হল, যেন 'মুশকিল আসান'।

পথে যেতে যেতে অমরবাবু বললেন, 'বেজায় দাম, মশায়। সব জিনিসেরই বেজায় দাম। বাজারে মাছ পাবেন না। বড় মাছ বলতে যা, তার বেশীর ভাগই আসে বাইরে থেকে। আপনি এখানে চিল্কা, কিংবা রাজস্থানের মাছও পাবেন। লোকাল ফিস বলতে ওই পাহাড়ে নদীর ছোট ছোট মাছ। পাবদা, বাটা, এই সব। খাসিরাই নিয়ে আসে। আর যা মেজাজ ওদের! মুখ দিয়ে ওদের একবার যে দাম বেরোবে সেই দামেই নিতে হবে আপনাকে। এক পয়সা কম নয়। প্রথম যখন এদিকে আসি, ভেবেছিলাম মুরগী-টুরগী খুব পাওয়া যাবে। শস্তাও হবে নিশ্চয়। হা, ভগবান! শস্তা! এ ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। ওজনটোজন নেই। দেখলেন, একজন খাসি ঠ্যাং-এ ঝুলিয়ে নিয়ে এল এক মুরগী। এক কিলোও হয়তো হবে না। দাম জিজ্ঞেস করলেন: সংগে সংগে উত্তর এল, কুড়ি টাকা। মশায়, মনে হল, পায়ের রক্ত যেন মাথায় চড়ে গেল মুহূর্তে। ভাবলাম, মারি ওর গালে এক থাপ্পড়। চিটিংবাজীর জায়গা পাও না! প্রথম প্রথম খুবই বিশ্রী লাগত। পরে দেখলাম, এটাই এদিকের রেওয়াজ। শুধু মাছ মাংস নয়, ... অন্তত পায়ে পড়ে ঝগড়া করে না। গোলমাল শুধু এই শহুরেদের নিয়ে। যারা খুসি নয়, তাদের বড় একটা পছন্দ করে না এরা।'

শম্ভুবাবুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে গেস্ট হাউসে ফিরলাম রাত পায় এগারোটায়। মাঝে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় শীত পড়েছিল। পথ নির্জন। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ। খোলা শুধু দুএকটি বার এবং হোটেল। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক অথবা বাসের ড্রাইভার এবং যাত্রীদের জন্যই হোটেলগুলি খোলে রাখা হয় সারা রাত। বারগুলির ভেতর থেকে আসছে বিলেতী বাজনার শব্দ। দু'একটির সামনে কমবয়েসী ছেলেমেয়ের ভিড়। কিছু বড় লোকের ছেলেমেয়ে। অন্দর অনেকেই নেশায় বুঁদ।

আলাপ হয়েছিল একজনের সংগে। বছর তিরিশ বয়েস। ভদ্রলোকের কাঠের ব্যবসা। তাঁর সংগে কথা বলতে গিয়েই বুঝলাম বেশ খানিকটা বে-হেড হয়ে রয়েছেন।

পথ চলতি আলাপ। একটি পানের দোকানে। এক খিলি পান মুখে পুরে লাইটারে যখন সিগারেট ধরাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হল, একটি নয়, আমার লাইটারের আগুনের সামনে যেন আরও একটি সিগারেট। নিজেরটিতে আগুন ধরানো শেষ হতেই দ্বিতীয় সিগারেটটিতেও আগুন ধরলাম আমি।

তারপরই শুনতে পেলাম, থ্যাংক্স!

'বুঝলেন কী না, এই একটু ওখানে গিয়েছিলাম।' সামনের বারটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন তিনি।

আমি 'বুঝলাম'—এমন একটি ভাব দেখিয়ে মৃদু হাসলাম।

অতঃপর কয়েক মিনিট সংলাপ।

নিজের মনেই বলে গেলেন: বিজনেস করি, মশায়। কাঠের কারবার। পয়সা আছে ঠিক, কিন্তু লাইফ হেল। জংগলে জংগলে ঘোরো, কাদা আর পাথরে পথ। বাঁচা যায় এভাবে? তাই মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই এদিকে চলে আসি। একটু পান ভোজন। অ্যান্ড দে আর সাইটিজ। খাসি গার্লস, বুঝলেন কি না। দে আর গ্রেট!

দেখ ব্যাপার! এক খিলি পান খেতে এসে এখন কি সারা রাত গপ্প শুনতে হবে?

এ সব ক্ষেত্রে বেশী কথা বলতে নেই। কথা বললেই প্রতিপক্ষের কথা বেড়ে যায়। বরং চুপ করে থাকলে এক সময়ে ওরাই কেটে পড়ে। পড়লও তাই।

ছোট্ট অভিজ্ঞতা। পরে এক ভদ্রলোককে শুনিয়েছিলাম। শোনার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এ আর এমন বিচিত্র কী! কামিনী এবং কাঞ্চন নিয়েই তো ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা। শোনেন নি, যুদ্ধের সময় সেনারা দুটি জিনিস লুঠ করতে আসে। মেয়েছেলে এবং টাকা পয়সা। আর এইভাবেই তো শেকড় গাড়ে যত সব বিদ্বেষ।

ঠিক একই ধরনের কথা শুনে-ছিলাম অরুণাচলেও। সে প্রসংগে পরে আসব।

পর দিন ঘুম ভাঙল সকাল ছটায়।

ঝকঝকে সকাল। মনে হল, এরই মধ্যে বেলা অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের গেস্ট হাউসটা এক পাশ থেকে দেখলে মনে হবে, যেন একটা টিবির ওপর দাঁড়িয়ে। টিবির ঢাল নেমে গেছে নীচের উপত্যকা বরাবর। এদিকটার ঢালে থরে থরে সাজানো গরীব মানুষ-দের বসতি। বেশীর ভাগই নেপালী। উপত্যকার ওপারে খাড়াই পাহাড়। পাইনের জংগলে আচ্ছন্ন। গেস্ট হাউস থেকে অল্প দূরে ওয়ার্ড লেক। তার ধারে মখমলের মত ঘাসের শয্যা। তার জলে বিভিন্ন বর্ণের মাছ। মাছগুলি টুরিস্টদের হয়তো চেনে। তাই জলের ধারে কেউ এসে যখন দাঁড়ায় তারা

চেরাপুঞ্জির পথে
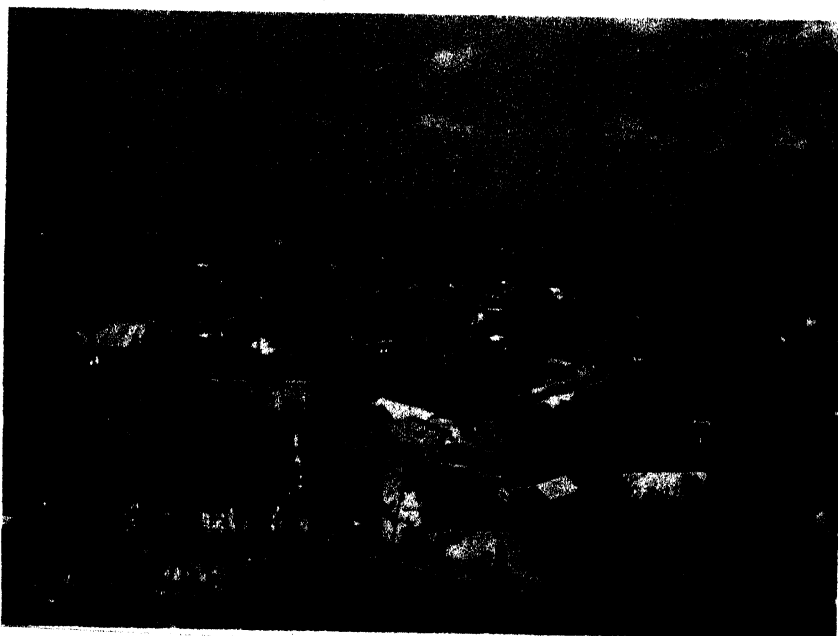
সেখানে ভিড় করে। হয়তো কিছু খাবারের আশায়। খাবার পায় বলে। এই লেকের ধারে গিয়ে বসুন। মনে হবে, জীবনের সব ক্লান্তি, সব ভাবনা কোথায় চলে গেছে। প্রকৃতি এখানে প্রশস্ত। শান্ত।

আছে হাইড পার্ক। আছে পাথরের খাঁজে খাঁজে অজস্র জলপ্রপাত। চলতে চলতে কখনও তাদের চোখে পড়ে, কখনও বা পাথর অথবা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়। তখন কানে আসে তাদের একটানা ঝিরঝির শব্দ। দেখবেন, স্প্রেড-ঈগল, বিশপ, বীডন, এলিফ্যান্ট এবং সুইট জলপ্রপাত। এদের নিরুপম সৌন্দর্য স্কটল্যান্ডের সৌন্দর্য মনে করিয়ে দেয় বলেই এক সময়ে শিলংকে বলা হত, 'স্কটল্যান্ড অব দা ইস্ট'।

ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল আটটার মধ্যেই আমরা প্রস্তুত। শম্ভুবাবু এলেন। সংগে সুজিতবাবু, অমরবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী।

শম্ভুবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যস্ততা নিয়ে বললেন, 'শরীর ফিট তো? চলুন, আজ আপনাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে নিয়ে যাই। রডোডেনড্রন দেখবেন, চলুন। রঙীন ছবি তুলব।'

রডোডেনড্রনের কথা শুনতেই মনটা নেচে উঠল।

শিলং-এ আজ বেশীক্ষণ কাটানো যাবে না। কারণ, আজকের প্রোগ্রামটি বড় লম্বা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জোয়াগঞ্জের পথে রওনা হতে হবে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই রওনা হলাম। হাইওয়ে ধরে লেডী হায়দারি পার্কের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে গেল। বাঁদিকে লাবং। একটু এগিয়েই হ্যাপি ভ্যালি। প্রশস্ত উপত্যকা। শিলং বেড়ে চলেছে। নতুন নতুন কলোনী গড়ে উঠছে। হ্যাপি ভ্যালি তার একটি বড় রকমের উদাহরণ। এদিকটায় ধনীদের পল্লী।

শিলং-জোয়াই পথ ধরে আমরা চলেছি। এগিয়ে যাচ্ছি আপার শিলং-এর দিকে। পথের উচ্চতা বাড়ছে। সেই সংগে জনবসতিও কমছে। পথের দুপাশে শুধু নেপালীদের ঘর-বাড়ি। দু-একটি খাসি কলোনীও আছে দু'এক জায়গায়।

শম্ভু সেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিকম্পের উৎস-কেন্দ্রগুলি দেখিয়ে দিচ্ছেন

এ দিকটায় ভীষণ জলকষ্ট। কাছে কোলে ঝরনা নেই। পাম্প করে এত উঁচুতে পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জল সরবরাহ করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতএব সাধারণ মানুষ যারা, তারা জলের জন্যে নির্ভর করে ভিন্নতর উৎসের ওপর। সে উৎস বৃষ্টি। এ দিকে বৃষ্টি নামে যখন তখন। সেটুকুই যা ভরসা। বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার জন্যে ওরা বড় বড় বাঁশ লম্বা বরাবর আধখানা করে চিরে নেয়। চেরা বাঁশের ভেতরে গাঁটের কাছে যে পাঁচিলের মত অংশ থাকে তাদের পরিস্কার করে। লম্বা বাঁশের খণ্ডটি তখন তৈরি হয়ে যায় একটি নালার মত। এবার বাঁশটিকে তারা ঝুলিয়ে দেয় ঘরের টিনের চালের সংগে। বৃষ্টির জল চাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বাঁশের নালায়। আর নালা থেকে ঝরে পড়ে নীচে বসিয়ে রাখা একটি পাত্রে। এই জলেই স্নান, এই জলেই গৃহস্থালির কাজ। এই জল তারা পানও করে।

শিলং-পিকের দূরত্ব মূল শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার। এ অঞ্চলে এটাই উচ্চতম শৃংগ। উচ্চতা ৬৪৩০ ফুট। আকাশ পরিস্কার থাকলে এখান থেকে দূরে হিমালয় শৃংগের বরফ দেখা যায়। সে দৃশ্য আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। দূর দিগন্ত তখন মেঘে ঢাকা ছিল। এদিকটা জংগলে ভরা। রিয়াত লাবং ফরেস্ট। কাছেই বিশপ জলপ্রপাত। এখানকার জল সুদূর বরপানিতে গিয়ে কাপিলি নদীতে মিশছে।

এ অঞ্চলটা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে পড়ে। এখানে রয়েছে সেনাদলের ছাউনি। শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এদিকে আসতে গেলে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

শম্ভুবাবুর গাড়ির সামনে ছিল অশোক স্তম্ভ। অতএব মিলিটারি চেকপোস্ট পার হতে অসুবিধে হল না। আমাদের পেছনে দুটি জিপে আর সবাই অনুগামী হলেন। চেকপোস্ট থেকে ডান দিকে ঘুরে জংগল। পাইন এবং আরও নানান নাম-না-জানা গাছ। এই পথ ধরে মিনিট পাঁচেক চলার পর আমাদের গাড়ি একটি ঢিবির মত জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

'এই হল শিলং পিক। আর ওই যে লম্বা লম্বা গাছ, পাতার ফাঁকে অদ্ভুত লাল রঙের ফুল। গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ঝুলছে—ওই রডোডেনড্রন! ইস! ফুলই যে নেই দেখছি।' গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে চক্কর দিতে লাগলেন শম্ভুবাবু। সংগে সংগে ক্লিকের পর ক্লিক। নাগাড়ে রঙীন ছবি তুলতে লাগলেন।

রডোডেনড্রন!

নামটা কানে যেতেই কেমন যেন এক শিহরণ। পলকে চাইতেই মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কয়েকটি কলি : প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে/অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ/উদ্ধত যত

অনুপ্রেরণা ছিল লাবণ্য। আর আমার প্রেরণা? সংগে তো কয়েকজন জিওলজিস্ট! ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'ইয়ারো ভিজিটেড'-এর কথা মনে পড়ল। স্কটল্যান্ডের শীর্ণা পার্বত্য সেই নদীকে দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন : 'ইজ দিস দা ইয়ারো অব হুম মাই ড্রিম চেরিসড?' পরে বুঝতে পেরেছিলেন, 'ইয়ারো'কে দেখতে হলে চাই অন্য চোখ। হৃদয় এবং কল্পনা।

শুনেছিলাম, সার্থক শিল্প সব সময়ই নাকি স্বতঃস্ফূর্ত হয়! কথাটা যে কতখানি সত্যি তার পরিচয় পেয়েছিলাম একবার প্যারিসের লাভর মিউজিয়ামে। মনে পড়ে, বিরাট ঘর। তার দেওয়াল জুড়ে ঐতিহাসিক সেই ছবি : লাস্ট সাপার। তার সামনে দাঁড়িয়ে বুকটা যেন ধড়াস করে উঠেছিল আমার। কতকাল আগে আঁকা। তবু ছবির সেই চরিত্রগুলি এত জীবন্ত? মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল সেই 'সাপারে' আমি যেন একজন অতিথি। সেই প্রথম বুঝেছিলাম, যাঁরা বলেন, ছবির গ্রামার পড়ে তবে ছবির চরিত্র বুঝতে হয়, কথাটা হয়তো ঠিক নয়। সার্থক শিল্পের একটা শাশ্বত আবেদন আছে। এবং তা কালোত্তীর্ণ। আর প্রকৃতি নিজেই যেখানে শিল্পী, সেই শিল্পে আমি নিজেই তো অংগীভূত?

হয়তো এই কারণেই সবুজ পাতার ফাঁকে স্নিগ্ধ লাল রডোডেনড্রনের গুচ্ছের দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ কানের পর্দায় কে যেন একটা পাথর ছুঁড়ে মারল।

কে যেন পাশ থেকে বলল, য্যা! য্যা! এর জন্যে এত সব কাণ্ড! এত পয়সা খরচা করে সেই শিলং থেকে এই বুনো ফুল দেখতে আসা?

চাইতেই দেখি কখন দুটি পরিবার এসে সেখানে হাজির হয়েছে। দুটি স্বামী দুটি স্ত্রী। এবং তাদের জনা তিন বাচ্চা। মহিলারা খুশি। কিন্তু ওঁদের মধ্যে এক ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, যেন খুব বিরক্ত। দেখলাম, তিনিই তাঁর স্ত্রীকে বকছেন।

চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'আপনারাও বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি? উঃ মশায়, এখানে আসতে কী ধকল। গাড়ি পাওয়া যায় না। পেলেও ড্রাইভাররা চড়া ভাড়া চায়। কিন্তু এই রডডেনড্রনের মধ্যে কী এমন আছে বলুন তো? আর ওই যে, 'এলিফেন্ট ফলস' না কী? আরে, রামো, রামো! স্রেফ পাথরের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির জল পড়ছে। এই হল 'এলিফেন্ট ফলস'। আমি ভেবেছিলাম, কী না, কী। এর জন্যে এত পয়সা খরচা?'

কথা শুনে কী আর বলব আমি। এতক্ষণ শম্ভুবাবু ক্যামেরায় ক্লিক করে চলছিলেন। তাঁর দিকে চাইতেই দেখলাম, তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। চোখাচোখি হতেই আমাকে লক্ষ করে চোখ টিপলেন তিনি। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'উটি কে? আমদানি কোত্থেকে?'

'আমরা আসছি কলকাতা থেকে। ব্যাংকে চাকরি করি। ছুটি পেলাম, আর তার সংগে আসা-যাওয়ার ভাড়াটাও স্যাংশন হয়ে গেল। তাই ভাবলাম, যাই শিলং থেকে ঘুরে আসি। শিলং-এর কথা সবাই বলে কী না—?' সম্ভবত আমার উত্তরটি কানে যাওয়ায় ভদ্রলোক নিজে থেকেই কথাগুলি বললেন।

সংগে সংগে শম্ভুবাবুর স্বগতোক্তি শোনা গেল। বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বললেন তিনি : অ! নোট গুনতে গুনতে আর খাতা লিখতে লিখতে হিসেব গুলিয়েছে। ভেবেছিল ভিক্টোরিয়া, নায়াগ্রা একটা কিছু হবে। ওদের হিসেবটা অঙ্কে কী না?

প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম এখানে। কিছুটা নীচে নেমে এলিফ্যান্ট ফলসও ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তার জল কখনও পাথরের গা দিয়ে ঝরে পড়ছে। কখনও একটা বিরাট পাথরের চাঁই-এর মধ্যে এপাশ থেকে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

লোকালয় থেকে এতটা দূরে ছোট্ট একটি চায়ের দোকানও দিয়েছে একটি ছেলে। সেখানে চা, ডিম সেদ্ধ এবং কয়েক খণ্ড বিস্কুট খেয়ে আবার যাত্রা।

তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

শম্ভুবাবু শিলং ফিরে গেলেন। আর দুখানা জিপ নিয়ে সুজিতবাবু, অমরবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী রওনা হলাম ভোলাগঞ্জ। সিলেট সীমানায়। সংগে ক্যামেরা হাতে অজিতবাবু।

আঁকাবাঁকা পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের প্রাচীর। এবার গাড়ি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ঘন্টাখানেক হবে হয়ত।

আমার পাশেই বসে ছিলেন সুজিতবাবু।

আমরা মাওকডকে এসে গেছি। কাছেই ডিমপেপ। 'মিঃ কর, আসুন, এখানে আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।' কথা বললেন সুজিতবাবু। বলেই ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, ডান দিকের ওই পথ ধরে ওই ডাকবাংলোর কাছে একটু চলো লিনডো।

আমরা চলেছি চেরাপুঞ্জির পথ ধরে। একটা বাঁকের কাছে এসে লিনডো ডান পাশের একটা বাঁকা পথ ধরল। এবং মিনিট তিনেকের মধ্যেই পাহাড়ের ওপর একটা সমভূমির ওপর এসে আমরা হাজির হলাম।

জিপ থেকে নামলাম আমরা। বেশ ঠান্ডা।

সামনে বেশ বড়সড় একটি বাংলো। টালির চাল। বিলেতী প্যাটার্নের বাড়ি।

'দা ওলডেস্ট ডাকবাংলো ইন দা ইস্টার্ন রিজিয়ন।' বললেন সুজিতবাবু। ভাবতে পারেন, 'এখানে ফ্লাইং সসার নেমেছিল?'

তার মানে? ফ্লাইং সসার মানে উড়ন্ত পিরিচ? যা নিয়ে গত দু তিন দশক ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে হইচই চলছে? দূর নক্ষত্র জগতের কোন অধিবাসী যাতে চড়ে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসে আপনি নিশ্চয় তার কথা বলছেন না?

তার কথাই তো বলছি। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন সুজিতবাবু। তারপর বললেন, দাঁড়ান, সেই চৌকিদারটিকে এখানে পাওয়া যায় কিনা

বাংলো। এরই চৌকিদার ছিল সে। জানি না বেঁচে আছে, কী না?

বাংলোর কিছু দূরে কয়েকটি বাড়ি। একটি লোককে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

সুজিতবাবু লিনডোকে ওই লোকটিকে ডাকতে বললেন।

লোকটি এল।

খাসি। বছর পঞ্চাশ বয়েস। ভাঙা ভাঙা হিন্দী বোঝে। সুজিতবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন শোন, আজ থেকে দশ এগারো বছর আগে এখানে যে চৌকিদার ছিল, সে এখন কোথায় আছে?

কে? পূর্ণকুমারের কথা বলছেন? সে তো এখানেই আছে হুজুর? ওই তার ঘর। বলল লোকটি।

'পূর্ণকুমার বাড়ি আছে?'

'আছে। ডাকব?'

'ডাকো দেখি একবার।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সংগে একটি বৃদ্ধ এসে সেলাম করে দাঁড়াল

পূর্ণকুমার রায় ফ্লাইং-সসার দেখেছিলেন

আমাদের সামনে। বুঝলাম হঠাৎ এত গাড়ি এবং পোশাকী লোক দেখে সে যেন একটু ঘাবড়েও গেছে। বয়েস প্রায় সত্তরের মত হবে। খাসি।

'কী নাম তোমার?' সুজিতবাবুর জিজ্ঞাসা।

'পূর্ণকুমার রায়, হুজুর।' সে বলল।

'আচ্ছা পূর্ণকুমার তুমি এই ডাকবাংলোয় অনেক দিন চৌকিদারি করেছ, কেমন?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'আচ্ছা, তোমার মনে আছে, আজ থেকে প্রায় দশ এগারো বছর আগে আকাশ থেকে কী যেন একটা আলো এসে নেমেছিল এখানে?'

সুজিতবাবুর কথায় লোকটি মৃদু হাসল। একটু অন্যমনস্কও হল যেন। বলল, 'সে তো অনেক দিনের কথা।'

'জানি। সেই কথাটাই তো তোমার কাছে শুনতে চাই।'

'এদিকে আসুন বাবু।' বলে আমাদের নিয়ে বাংলোর লনের এক প্রান্তে এসে দাঁড়াল পূর্ণকুমার। যেখানে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম, সেখান থেকে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। অন্তত সাত আটশ ফুট। সেখানে দেখা গেল একফালি জলের মত পার্বত্য নদী। কোন গাছপালা নেই কাছাকাছি।

সেই জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'ওখানেই তো নেমেছিল সেটা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখলাম, আলোর মত কী যেন ছুটে এদিকে ধেয়ে আসছে। কোন ভুল হয়নি আমার। পরিষ্কার দেখলাম একটা লম্বা চোঙার মত জিনিস। তার গা থেকে আলো ফুটে বেরোচ্ছে। চোঙাটা, এই যে, আমরা যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে কিছু দূরে, পথে আকাশ থেকে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হল ওই নদীটির ওপর। তবে নামে নি নীচে। নদীর ওপরই ঝুলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর কী তার হিস্ হিস্ শব্দ। মনে হল জল শুষছে কোন পাগলা হাতী। খুব সামান্য সময়ের জন্যেই ছিল। তারপর আবছা আলোয় দেখলাম, সেটা সেই নদী থেকে উঠে একেবারে চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ওই গাছগুলির পাশ দিয়ে পুব বরাবর আকাশের দিকে চলে গেল। আর দেখতে পেলাম না। যাওয়ার সময় কিছু গাছ কেটে ফেলে যায়।

পূর্ণকুমার যে জায়গাটা দেখাল তার দূরত্ব এখান থেকে এক ফার্লং-এর মত হবে। অর্থাৎ যে দূরত্বে থাকলে বড়সড় কোন জিনিসকে চোখের ভুল হওয়ার কথা নয়। পূর্ণকুমার বলল, মোটা মোটা গাছ, হুজুর। এখন যেমন দেখছেন ঠিক তেমনই। ব্যাপারস্যাপার দেখে আমার তো ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা। পরদিন ওখানে গিয়ে দেখি, বেশ কয়েকটি গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। দেখে মনে হল কে যেন করাত চালিয়ে পরিষ্কার করে গাছগুলি কেটে গেছে।'

১৯৬৬-৬৭ সালের ঘটনা। ঘটনাটি তখন আসামের কোন একটি ইংরেজি দৈনিকে বেরিয়েও ছিল। অনেকের ধারণা এটা একটা ফ্লাইং সসার। মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু।

পূর্ণকুমারের দিকে চাইলাম। সে নির্লিপ্ত। এ ঘটনার কথা তার মনে এখনও পরিষ্কার—যেন গতকালের কোন কাণ্ড। এখন তার এই বয়েসেও বিরাম নেই। ১৯৭৫-এর সেপটেমবরে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর যৎসামান্য চাষের ওপর নির্ভর করে জীবন চলছে তার। ভেবেছিল অবসর নেওয়ার পর সরকার থেকে কিছু টাকা পাবে। দান না। হকের টাকা। প্রভিডেন্ড ফান্ড-এর টাকা। কিন্তু দেখতে দেখতে বছর তিন চলে গেল সে টাকা এখনও পায়নি। কবে পাবে, জীবিত অবস্থায় আদৌ পাবে কী না তাও জানে না।

এই বঞ্চনা সে কতখানি উপলব্ধি করে জানি না। করলেও কে ভাবছে সে কথা? সরকারী অব্যবস্থা কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষকে কী নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে ছুঁড়ে দিতে পারে পূর্ণকুমার তার একটি উদাহরণ মাত্র।

আর এর কয়েক ঘণ্টা পরই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আরও একটি উদাহরণের। একটি তরুণী। তারুণ্যের পূর্ণতায় জীবনে যখন ভরা জোয়ার ঠিক সেই সময় মানুষকে কখনও কখনও যে কতখানি আপস করে চলতে হয়, সে উদাহরণ তারই সাক্ষ্য। সেটা ভোলাগঞ্জে। যেখানে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়া চালাচ্ছে চুনাপাথরের বুকে কঠিন ড্রিলের কাজ। আর মানুষ দিন গোণে, একটির পর এক।

হাইওয়ে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিয়ের পর বিয়ে এখন
সাদা, সটান
রজনীগন্ধার চাষ চলেছে।
খাল বিল আর
হাজা-মজা পুকুরের ইজারা নিয়ে
ফোটানো হচ্ছে পদ্ম।
অভদ্রা বর্ষাকাল,
শেয়ালে চাটে বাঘের গাল,
উঠোনে এক-হাঁটু কাদা।
অল্প-একটু রোদ উঠতেই
গালফোলা গোবিন্দ সামন্তের বুড়ী-ঠাকুমা তাই
পিচঢালা
হাইওয়ের উপরে তার
সাড়ে তিন কাঠা জমির ধান শুকিয়ে নিচ্ছে।

গোবিন্দ কোথায় ?
জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে,
যেহেতু এখন 'জমিতে আর কিছু নাই, বাবু' তাই
হাওড়ার ছেলে গোবিন্দ গিয়ে
মেদিনীপুরের দেউলিয়াবাজারের চায়ের দোকানে
কাজ নিয়েছে।

নদী পেরুলে কোলাঘাট,
কোলাঘাট ছাড়ালে দেউলিয়াবাজার।
সেখানে
বাস থেকে নেমে
উইকএন্ডের শৌখিন বাবুরা
গোবিন্দ সামন্তের মালিকের দোকান থেকে
একঠোঙা মুড়ি,
বিটনুন-ছেটানো দু-দুটো আলুর চপ, আর
একভাঁড় চা খেয়ে ফের বাসএ ওঠে।
তারপর
কেউ ঝাড়গ্রাম, কেউ টাটানগর, কেউ
জুনপুট কি দিঘার দিকে
চলে যায়।

রজনীগন্ধা আর পদ্মগুলো
ঝুড়ি-বোঝাই হয়ে ট্রাকে ওঠে, তারপর
ট্রাক-বোঝাই হয়ে
বিয়েবাড়ি, জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের মঞ্চ আর মড়ার খাটিয়া
সাজাবার জন্যে
হাওড়া ব্রিজ আর নতুনবাজারের ফুলের দোকানে চলে আসে।
কিন্তু বুড়ী-ঠাকুমা তার ধান কিছুতেই
ছাড়তে চায় না।
এন এইচ সিক্সের উপরে সারা দুপুর সে তার
ধান আগলে বসে থাকে।
আর
তেরপলে-ঢাকা ট্রাক দেখলেই
লাঠি উঁচিয়ে
কাক তাড়াবার ভঙ্গিতে বলে—হুশ্!

আয়োজন

আলোক সরকার

ক্রমবিকাশমান একটা বৃক্ষ তার ডালপালা মেলে দিচ্ছে
নিস্তব্ধ নিমন্ত্রণ মেলে-দেওয়া।
এ এমন একটা আয়োজন যা স্নায়ুর অস্তিমে কাজ করে
নিশ্চিত আর অমোঘ একটা দ্যুতি নিয়তির মতো অপ্রতিরোধ্য—
দাঁড়াও এর মুখোমুখি।
দুহাত উঁচু ক'রে দাঁড়াও অস্ত্রহীন বর্মহীন দাঁড়াও
এ এমন একটা আক্রমণ যার দাঁত কোথাও খুঁজে পাবে না
যার নখ তমসাময় শূন্যতা।
কেবল একটা অপ্রতিরোধ্য আর সেই অন্ধকার অসহায়
যেন মধ্যাহ্নরৌদ্রের পথ খেজুরগাছ বাবলাগাছ
পথ সরু হচ্ছে ক্রমশ।
দাঁড়াও এর মুখোমুখি ক্রমবিকাশমান এই বৃক্ষ
অসংযোজিত মূক নিশীথিনী তার ভিতরের জাগরণ—
আদিম আর প্রথম আর একক।
অসংযোজিত একটা অপেক্ষা অকম্পন বিদ্যুতি জাগরণ
আর সেই আবহমান—অস্ত্রহীন বর্মহীন দাঁড়াও।
আয়োজন সম্পূর্ণ হচ্ছে ক্রমশ।

দিনগুলি

শামসের আনোয়ার

সমুদ্র, সমুদ্র, সমুদ্র ফেটে পড়ছে চামড়ার বেল্ট থেকে,
টেলিফোন থেকে
ওষুধের বোতল থেকে সমুদ্র ফেটে পড়ছে......
ফেটে পড়ছে সমুদ্র আমাদের সমস্ত পুরনো দিনের
জানা এবং পুরনো দিনের না জানার থেকে—!
তোমার খোঁপা থেকে, জিভ ও জিভের রক্ত থেকে
ফেটে পড়ছে কালো, বিচূর্ণ, অন্ধকার ও লাল সমুদ্র।
সমুদ্র ফেটে পড়ছে ইলেকট্রিকের বাল্ব, লাল রেক্সিন ও
নন্দন, জটিল গ্রীবার শোভা থেকে
আমাদের সমস্ত ভুল, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা না রাখা,
খণ্ড খণ্ড মূঢ় অনুতাপের শরীর ভেঙে
লাফিয়ে উঠছে সমুদ্র ও সমুদ্রের একটানা নিরুপায় গান।

সারা অরণ্য আনন্দে আত্মহারা.....
অরণ্যদেবের বিয়ে...অরণ্যদেবের বিয়ে...
আমরাও তো বিয়ে করলে পারি...

বুম... বুম.. বুম.. বুম.. বুম.. বুম..বুম
ব্যাপারটা কী? দিবারাত্রির এত ঢাক বাজছে কেন?
কী জানি! জঙ্গলে উৎসব-টুৎসব হয়তো!

বর ও বধূর জীবন যেন সুখে-শান্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে!
অরণ্যে বিশাল ভোজ।
এখানে মদ পরিবেষণ করা হয় না!
জল?

অরণ্যদেবের জন্মের সময় আমিই ছিলুম ডাক্তার।
আর আমি হচ্ছি অরণ্যদেবের শাশুড়ী।
যাক, মা তাহলে খুশি!

এসো, আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই!
বেশ তো!

থরে থরে সাজানো রয়েছে অরণ্যদেব - বংশের ইতিহাস।
পূর্বপুরুষরা, দ্যাখো, এই আমার স্ত্রী ডায়ানা।
আশীর্বাদ করুন, আমি যেন এই বংশের যোগ্য বধূ হতে পারি।
12/25

তাহলে চলি, মা।
এসো, ডায়ানা।
লক্ষ্মী হয়ে থাকিস রাজা।

চলি...
শুভেচ্ছা!
শুভেচ্ছা!
আগামী সপ্তাহে : হনিমুন

উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ ১০ ॥

'তাঁকে প্রশ্ন করা হল, যিনি তোমাকে গর্ভে ধরেছেন, স্তন্যদান করে জীবন দিয়েছেন, তোমাকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছেন সেই তিনি আর যিনি মাতৃজঠর থেকে নির্গত হওয়া মাত্র তোমার জন্য জায়গা দিয়েছেন, তাঁর সংস্কৃতি তাঁর সংস্কার রক্তে মিশিয়ে দিয়েছেন এই তিনি—কাকে তুমি আপন বলে গ্রহণ করবে?' তিনি বললেন, 'দুজনকেই। কারণ একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন ছিন্ন হওয়া মাত্রই আর একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ছিন্ন না হলে যে যুক্ত হতো না। তাই দুজনেই আমার আপন।'

তাঁকে বলা হল, যদি একজনকে ত্যাগ করতে বলা হয় তবে কাকে ত্যাগ করবে? তিনি বললেন, 'এই মাটি তো তাঁরও জননী। তাই এর জন্য জীবন দিলে তিনিই ধন্য হবেন। যে ত্যাগ মানে আরো বড় করে পাওয়া সে ত্যাগেই আমার আনন্দ।'

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ, নতুন স্যার একটু থামলেন, তারপর উদগ্রীব হয়ে থাকা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেই মায়ের পায়ে যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজরা তখন তাঁর এমন কত দামাল ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুখিনী মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে। একেবারে না পারলে বলেছিল, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। এই মা দেশমাতৃকা। তোমরা নতুন ভারতবর্ষের নাগরিক। আজ আমাদের মায়ের পায়ে বেড়ি নেই'কো, অনেক রক্তের বিনিময়ে তিনি আজ মুক্ত কিন্তু এতদিনের শোষণে তিনি আজ রিক্তা, মলিন, শীর্ণা তোমাদের ওপর দায়িত্ব তাঁর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনবার। নাহলে তোমরা যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ভাই। ব্যাস, আজ এই পর্যন্ত।' টেবিলের ওপর থেকে ডাস্টার বই তুলে নিয়ে নতুন স্যার ক্লাসরুম থেকে সোজা মাথায় বেরিয়ে গেলেন। তাঁর খদ্দরের পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ বুঝতে পারেনি ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এইসব কথা এই স্কুলে নতুন স্যার আসার আগে কেউ বলেনি। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন হয়ে যায় মনটা। নতুন স্যার বলেছেন শিবাজীও একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা ছিলেন। শিবাজীর কথা মনের মধ্যে কিছু হয় না কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেন 'গিভ মি ব্লাড' তখন হৃৎপিণ্ড দপদপ করে। এই ব্লাড শব্দটা উচ্চারণ করার সময় নতুন স্যার এমন জোর দিয়ে বলেন অনিমেষ চট করে সেই ছবিটা দেখতে পায় নিজের আঙুলগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ও। ভীষণ কান্না পেয়ে যায়।

নতুন স্যার থাকেন হোস্টেলে। ওদের স্কুলের সামনে বিরাট মাঠ পেরিয়ে হোস্টেল। ক'দিনের মধ্যে অনিমেষের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল নতুন স্যারের। ওদের স্কুলের অন্যান্য টিচাররা দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছেন। ওরা [illegible]

মেলামেশা ঠিক পছন্দ করেন না। একমাত্র ড্রিল স্যার বরেনবাবুর সঙ্গে নতুন স্যারের বন্ধুত্ব আছে। ওঁরা দুজন এক ঘরে থাকেন।

অনিমেষের পড়ার চাপ পড়েছে বলে সরিৎশেখর ভোরে আর ওকে বেড়াতে যেতে বলেন না। কিন্তু এইটুকু ছেলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ছটফটানি থাকার কথা অনিমেষের মধ্যে তা নেই। সারাদিন যখনই বাড়িতে থাকে তখনই মুখ গুঁজে বই পড়ে। বই পড়ার এই নেশাটা ওর মধ্যে ঢুকিয়েছিল প্রিয়তোষ। ঢুকিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে সে। সরিৎশেখরের জীবনে আর একটি আঘাত এই ছোট ছেলে। দিন-রাত বাড়ির বাইরে পড়ে থাকত, কখন যেত কখন আসত হেমলতা ছাড়া কেউ টের পেত না। রাগারাগি করতে করতে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন সরিৎশেখর। চাকরি বাকরি করে না, তাঁর কোন সাহায্য হচ্ছে না, এছাড়া এই ছেলের বিরুদ্ধে ওঁর অভিযোগ করার অন্য কারণ নেই। অনি তখন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাড়ি এলে অনির সঙ্গে আড্ডা হত খুব। স্বর্গছেঁড়ায় ওর যে আকর্ষণের আভাস তিনি হেমলতার কাছে পেয়েছেন সেটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু ও যে আর স্বর্গছেঁড়ায় যায় না, জোর করেও তিনি তাকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠাতে পারেননি সে কথাও তো সত্যি।

তারপর সেইদিনটা এল। তিন দিন বাড়ি আসেনি প্রিয়তোষ। সরিৎশেখর এখানে সেখানে ওকে খুঁজেছেন। যে কজন ওর সমবয়সী ছেলেকে ওর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছেন তারাও ওর হদিশ দিতে পারেনি। বিরক্ত চিন্তিত সরিৎশেখর ঠিক করেছিলেন প্রিয়তোষ এলে পাকাপাকি কথা বলে নেবেন ভদ্রভাবে সে বাড়িতে থাকতে পারবে কিনা।

তখন ও'রা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন। ছোট বাড়িটায় পুরোন জিনিসপত্রের গুদাম করে রাখা হয়েছে। মাঝখানের বড় ঘরটায় সরিৎশেখর একা শোন, লাগোয়া ঘরটায় হেমলতা। বাইরের দিকের ঘরটায় প্রিয়তোষ এবং অনিমেষ থাকত। অনিমেষকে সে বছরই প্রথম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, খুব কড়া স্কুল। এ জেলার মধ্যে এই স্কুলের নামডাক সবচেয়ে বেশী। সরিৎশেখর নিজে গিয়ে ওকে ক্লাসে বসিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলেন, ক্লাসে ঢুকে ছেলেটা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করবে। কিন্তু অনি ও'র চলে আসার সময় খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার। সেই জন্ম থেকে তিনি ওকে দেখছেন ওর নাড়িনক্ষত্র জানা, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেটা রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে চুপচাপ ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। প্রিয়তোষ ওর দিদিকে বলেছে রাত দুপুরে অনি নাকি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে কথা বলে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন সরিৎশেখর। কিন্তু অন্য সময় ও ভুলেও মায়ের কথা বলে না। হেমলতাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন অনির কাছে মাধুরীর গল্প বলতে। অনি একা একা নিজের মত করে বড় হোক—সরিৎশেখর এটাই চাইছিলেন।

মাধুরী বেঁচে থাকতে কাকার সঙ্গে অনির খুব একটা ভাব ছিল না। বরং কারণে অকারণে প্রিয়তোষ ওর ওপর অত্যাচার করত। অনির কান দুটো প্রিয়তোষের আঙুলের বাইরে থাকার জন্য তখন প্রাণপণ চেষ্টা করত। মা মরে যাবার পর প্রিয়তোষের ব্যবহার একদম পাল্টে গেল।

নতুন স্যার তখন সদ্য স্কুলে এসেছেন। ওঁর কথাবার্তা, হাসি অনিমেষদের খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে যখন খুব শক্ত শক্ত কথা বলেন তখন অনিমেষরা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন দেশের গল্প করেন তখন অনিমেষের খুব ভাল লাগে। একদিন ক্লাসের সব ছেলের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে নতুন স্যার জানতে পারলেন অনির মা নেই। অনি দেখল, ক্লাসের সমস্ত মুখগুলো ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। যেন মা নেই ব্যাপারটা কেউ ভাবতে পারছে না। নতুন স্যার ওকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, মা নেই বলো না। আমাদের তো দুটো মা, একজন চলে গেছেন [illegible]

তার কথা ভাববে, দেখবে আর খারাপ লাগবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলে একজন বিরাট সাহিত্যিক ছিলেন, তিনি এই দেশকে মা বলেছিলেন, বলেছিলেন বন্দেমাতরম্।'

প্রিয়তোষ সেই রাত্রে বাড়িতে ছিল। অনেক রাত জেগে কাকাকে বইপত্র পড়তে দেখত অনিমেষ। নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে প্রিয়তোষকে নতুন স্যারের কথা বলল অনিমেষ। ভবানী মাস্টারমশাই, নতুন দিদিমণি যখন বন্দেমাতরম্ শব্দটা ওদের উচ্চারণ করিয়েছিলেন তখন শব্দটার মানেটা ও ধরতে পারেনি। নতুন স্যার ওকে সে রহস্য থেকে মুক্ত করেছেন। সব শুনে প্রিয়তোষ বলল, 'শালা কংগ্রেসী।'

এই প্রথম অনিমেষ কাকাকে গালাগাল দিতে শুনল। স্বর্গছেঁড়ার বাজারের রাস্তায় অনেক মদেশিয়া মাতালকে এই শব্দটা ব্যবহার করতে শুনেছে ও। মাধুরীর শ্রাদ্ধের সময় নদীয়া থেকে অনির মামারা এসেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন, ওঁরা হলেন মহীতোষের শালা। রেগে গেলে এই সম্বোধনটাকে কেন লোকে গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করে বুঝতে পারে না অনিমেষ। আবার মদেশিয়াদের মুখে শব্দটা শুনতে যতটা না খারাপ লাগত এই মুহূর্তে কাকার মুখে খুব বিচ্ছিরি লাগল। কংগ্রেসী শব্দটা ও খবরের কাগজ থেকে জেনে গিয়েছিল। যেমন মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসী, জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসী। দেশের জন্য যারা কাজ করে তারা কংগ্রেসী, তাদের মাথায় একটা সাদা টুপি থাকে। নতুন স্যারের মাথায় সাদা টুপি নেই, তাহলে তিনি কংগ্রেসী হবেন কি করে? আর যারা দেশের জন্য কাজ করে, দেশ-মায়ের জন্য জীবন দান করে তারা শালা হবে কেন? কিন্তু কাকার সঙ্গে তর্ক করা বা কাকার মুখে মুখে কথা বলতে সাহস পেল না অনিমেষ। কথা বলার সময় কাকার মুখ চোখ দেখেছিল ও, ভীষণ রাগী দেখাচ্ছিল তখন। কিন্তু কাকার কথা মেনে নিতে পারেনি, নতুন স্যারকে গাল-গালি দিয়েছে বলে কাকার ওপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। সেদিন মাঝরাতে অনির ঘুম ভেঙে গেলে দেখল কাকা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বই ওর মাথার তলায় চাপা পড়ে দুমড়ে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোটা কমানো হয়নি। অনেক রাত অবধি আলো জেলে রাখলে দাদু রাগ করেন, কেরাসিন তেল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অনি উঠে আলো নেবালো না, কাকাকে ডাকল না। দাদু যদি এখন এখানে আসে বেশ হয়। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও। একটা দুটো করে তারা গুনতে গুনতে আস্তে আস্তে সেগুলো মায়ের মুখ হয়ে গেল। অনি স্থির হয়ে অনেকক্ষণ মাকে দেখল তারপর নিজের মনে বলল, 'মা, যাঁরা দেশকে ভালবাসতে বলে তাঁরা কি খারাপ?'

(না সোনা, কক্ষনো না।)

'তাহলে কাকা কেন নতুন স্যারকে গালাগালি দিল?'

(কাকা রেগে গেছে তাই।)

'আমি যদি দেশকে ভালোবাসি তুমি খুশী হবে তো?'

(আমি তো তাই চাই সোনা।)

'মা তোমার জন্য বড় কষ্ট হয় গো' কথাটা বলতেই অনির চোখ উপচে জল বেরিয়ে এল আর সেই জলের আড়াল ভেদ করে অনি কিছুই দেখতে পেল না। অনি লক্ষ করেছে যখনই সে মায়ের সঙ্গে কথা বলে কষ্টের কথা বলে তখনই চোখ জুড়ে জল নেমে আসে আর সেই সুযোগে মা পালিয়ে যায়। চোখ মুছে আর খুঁজে পায় না সে।

কদিন কাকা বাড়িতে আসেনি। দাদু অনেক খুঁজেও ছোট কাকার খবর পাচ্ছেন না। জলপাইগুড়িতে হঠাৎ একটা মিছিল বেরিয়েছে। অনি দ্যাখেনি, কিন্তু ক্লাসে বন্ধুদের কাছে শুনেছে সেটা নাকি কংগ্রেসীদের মিছিল নয় তারা কংগ্রেসীদের গালাগালি দিচ্ছিল। পুলিস নাকি খুব লাঠির বাড়ি মেরেছে। গোলমাল হবার ভয়ে স্কুল কদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় খবরের কাগজ পড়ে দাদু খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে [illegible]

রাখতে আরম্ভ করলেন তিনি ওতে নাকি অনেক বেশী খবর থাকে।
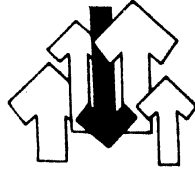
কদিন বাদে অনেক রাতে দরজায় টকটক শব্দ হতে অনিমেষের ঘুম ভেঙে গেল। কাকা না থাকলেও একা শুতো ও। হেমলতা আপত্তি করতে ও বলেছিল ওর ভয় করবে না। পিসীমার বা দাদুর ঘর থেকে জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। শব্দ শুনে ও দেখল পাশের জানলার নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ও চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিল হঠাৎ চাপা গলায় নিজের নাম শুনতে পেয়ে বুঝল, কাকা এসেছে। চট করে উঠে গিয়ে দরজা খুলতে কাকা মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ওকে চুপ করতে বলল, তারপর ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। অনিমেষ দেখল এই কয়দিনে কাকার চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাজামা আর শার্ট খুব ময়লা, গাল ভর্তি ছোট ছোট দাড়ি গজিয়েছে, স্নানটান হয়নি বোঝা যায়। ঘরে এসে কাকা প্রথমে হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিল তারপর ওর খাটের তলা থেকে একটা টিনের স্যুটকেশ টেনে বের করল। তালা খুলে ফেলতে দেখল, সামান্য কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া অনেকগুলো বই আর পত্রিকায় সেটা ভরতি। কাকা ওর সঙ্গে কথা বলছে না, এক মনে বইপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে। তারপর অনেকক্ষণ দেখেশুনে কতগুলো বই আর পত্রিকা আলাদা করে বেঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলে যেতে গিয়ে কি ভেবে আবার অনির কাছে ফিরে এসে অনির খাটের ওপর বসল কাকা। অনি দেখল, কাকার হাতের বাণ্ডিলের ওপরের পত্রিকাটার ওপর বড় বড় করে লেখা আছে—'মার্কসবাদী'। কাকা খুব ফিসফিস করে বলল 'অনি কেউ যদি আমার খোঁজে এখানে আসে তাহলে তাকে কক্ষনো বলবি না যে আমি এসে বইগুলো নিয়ে গেছি। বুঝলি?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, তারপর বলল, 'তুমি কেন চলে যাচ্ছ?'

কাকা বলল 'ওদের পুলিস আমাদের ধরে জেলখানায় নিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের পার্টিকে ব্যান করে দিয়েছে ওরা। মুখে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলবে অথচ কাউকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে না।'

অবাক হয়ে অনি বলল, 'কারা?'

কাকা থমকে গেল প্রথমটা, তারপর হেসে বলল ঐ বন্দেমাতরম্ পার্টি, কংগ্রেসীরা। তুই এখন বুঝবি না, বড় হলে যখন জানবি তখন আমার কথা বুঝতে পারবি।'

অনিমেষ বলল 'কিন্তু নতুন স্যার বলেছেন কংগ্রেসীরা দেশসেবক।'

ঘৃণায় মুখটা বেঁকে গেল যেন, কাকা বলল, 'দেশসেবা? একে দেশসেবা বলে? ভিক্ষে করার নাম দেশসেবা। ইংরেজদের পা ধরে ভিক্ষে করে রাতের অন্ধকারে চোরের মত ক্ষমতা হাতে নিয়ে দেশসেবা হচ্ছে! আমরা বলেছি এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। আমরা এই রকম স্বাধীনতা চাই না, যে স্বাধীনতা শোষকের হাত শক্ত করে। তাই ওরা আমাদের গলা টিপতে চায়। ওদের হাতে পুলিস আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু আমাদের শরীরে রক্ত আছে—থাক, এ সব কথা এখন তুই বুঝবি না।'

আমাদের শরীরে রক্ত আছে। কথাটা শুনেই অনি নিজের আঙুলের দিকে তাকাল, তারপর ওর মনে পড়ল, 'গিভ মি ব্লাড', আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সুভাষচন্দ্র বসুর দুই রকম ছবি দেখেছে ও। একটা ছবিতে সাদা টুপি আর আর একটা ছবিতে মিলিটারি জামা টুপিতে একটা [illegible]

কংগ্রেসী ছিলেন না। ও কাকার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'তোমরা কি সুভাষচন্দ্র বসুর লোক হয়েছ?'

অবাক হয়ে গেল প্রিয়তোষ, তারপর বলল, 'না, আমরা কম্যুনিস্ট। আমরা চাই এই দেশে গরীব বড়লোক থাকবে না, সবাই সমান, তাহলেই আমরা স্বাধীন হবো। আমি যাচ্ছি অনি, তুই কাউকে বলিস না আমি এসেছিলাম। আর মনে রাখিস এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

খুব সন্তর্পণে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল প্রিয়তোষ। দরজা বন্ধ করে একা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষ। কাকা যে সব কথা বলে গেল তার মানে কি? আমরা কি স্বাধীন হইনি। নতুন স্যারের কথার সঙ্গে কাকার কথার কোথাও মিল নেই কেন? নতুন স্যার বলেছেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমরাই আমাদের রাজা। ইংরেজরা যে শোষণ করে দেশকে নিঃস্ব করে গেছে এখন আমাদের তার শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে। আর কাকা বলে গেল, এ স্বাধীনতা মিথ্যে, তবে কি আমরা এখনও পরাধীন? কিছুই ঠাওর করতে পারল না অনিমেষ। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ও দেখল, কাকা তাড়াতাড়িতে বইপত্র নিয়ে যাবার সময় ভুল করে স্যুটকেশ বন্ধ করেনি। পায়ে পায়ে অনিমেষ স্যুটকেশটার কাছে এল। দুটো ধুতি, পাজামা, দুটো সার্ট রয়ে গেছে স্যুটকেশে। জামাকাপড় তুলতেই তলায় একটা পুরনো খবরের কাগজ। অনিমেষ দেখল, কাগজ জুড়ে একটা মানুষের ছবি, যার অর্ধটা দেখা যাচ্ছে না। কৌতূহলী হয়ে কাগজটা তুলতে ও দেখল কাগজটা কাটা, ছবির মুখ নেই। হঠাৎ একটা নীল কাগজ স্যুটকেশের তলায় সেঁটে থাকতে দেখল সে। কাগজটা বের করে আবার সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখে স্যুটকেশটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল ও।

নীল কাগজটা খুলতেই সুন্দর করে লেখা কয়েকটা লাইন দেখতে পেল অনিমেষ। গোটা গোটা করে লেখা, কোন সম্বোধন নেই। লেখার শেষে নামটা পড়ে অবাক হয়ে গেল ও। তপুপিসী লিখেছে? কাকে লিখেছে? তাহলে শ্রীচরণেষু বা পূজনীয় নেই কেন? তপুপিসী তো কাকার চেয়ে অনেক ছোট। গুদামবাবুর বাড়িটার কথা মনে পড়ল। তপুপিসী কুচবিহারে পড়ত। চিঠিটা পড়া শুরু করল অনিমেষ। 'পৃথিবীতে চিরকাল মেয়েরাই ঠকবে এটাই নিয়ম, আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আমি খুব সাধারণ মেয়ে, আমি সুন্দরী নই, তোমার ওপর জোর করব সে অধিকার আমার কোথায়? এখানে যখন ছিলে তখন তোমায় কিছুটা বুঝতাম। শহরে যাওয়ার পর তুমি কি দ্রুত পাল্টে গেলে। তোমার রাজনীতিই এখন সব, আমি কেউ নই। হঠাৎ মনে হল, তুমি তো আমাকে কোনদিন কথা দাওনি, তোমাকে দোষ দিই কি করে। তুমি তো যৌবনের ধর্ম-পালন করেছিলে! কি বোকা আমি। তাই তুমি যত ইচ্ছে রাজনীতি কর, আমি দায় তুলে নিলাম। তপু।'
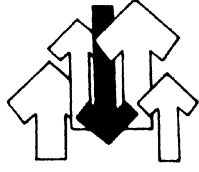
তপুপিসী কেন এই চিঠি লিখেছে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। কিন্তু তপুপিসী খুব দুঃখ পেয়েছে, কাকা রাজনীতি করে বলে তপুপিসী ঠকে গেছে। রাজনীতি করা মানে কি? এই যে কাকা বাড়িতে থাকে না আজকাল, উস্কোখুস্কো হয়ে ঘুরে বেড়ায় চোরের মত, একে কি রাজনীতি করা বলে? এ সব করলে কি আর তপুপিসীর সঙ্গে ভাব রাখা যায় না? কিন্তু তপুপিসী কেন লিখেছে আমি সুন্দরী নই? সারা স্বর্গছেঁড়ায় তপুপিসীর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তো কেউ নেই, এক সীতা ছাড়া। কিন্তু সীতা তো ছোট। বড় হলে নাকি চেহারা পাল্টে যায়। বড় হবার পর সীতা তপুপিসীর মত সুন্দরী নাও হতে পারে। এমন সময় অনিমেষ শুনতে পেল একটা গাড়ি খুব জোরে এসে শব্দ করে বাড়ির সামনে থামল। তিন চারটে গলায় কথাবার্তা, জুতোর শব্দ দ্রুত চারধারে ছড়িয়ে পড়তে ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারেনি, শেষতক লক্ষ করল সার দিয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার বুঝতে না বুঝতে দরজায় প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ উঠল। আওয়াজটা ওর ঘরের দরজায় দ্রুত হাতে কে শব্দ করছে, দরজা ভেঙে ফেলার যোগাড়। অনি কি করবে বুঝতে পারছিল না, এমন সময় সরিৎশেখরের গলা শুনতে পেল ও। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে চিৎকার করছেন, 'কে? কে?' শব্দটা থেমে গেল আচমকা, একটা রুক্ষ খাঁই গলায় কে বলে উঠল, 'দরজা খুলুন, পুলিস।'

পুলিস! অনিমেষ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে? পুলিস তাদের বাড়িতে আসবে কেন? ছেলেবেলা থেকে পুলিস দেখলে ওর কেমন ভয় করে। সরিৎশেখরের চেঁচানি বন্ধ হয়ে গেল আচমকা। অনিমেষ শুনল দাদু উঠে তার নাম ধরে ডাকছেন। সে দেখল তার গলা শুকিয়ে গেছে, দাদুর ডাকে সাড়া দিতে পারছে না। বিদ্যাসাগরী চটিতে শব্দ করতে করতে ভেতরের দরজা খুলে দাদু এ ঘরে এলেন। ঘরের মধ্যিখানে আলো জ্বালিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাদু খুব অবাক হলেন, 'কি হল, তুমি ঘুমোওনি।' ঘাড় নেড়ে অনিমেষ বলল, 'পুলিস।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমি দেখছি, তুমি পিসীমার কাছে যাও।' কথাটা শুনে অনিমেষ ভেতরের ঘরে ঢুকে
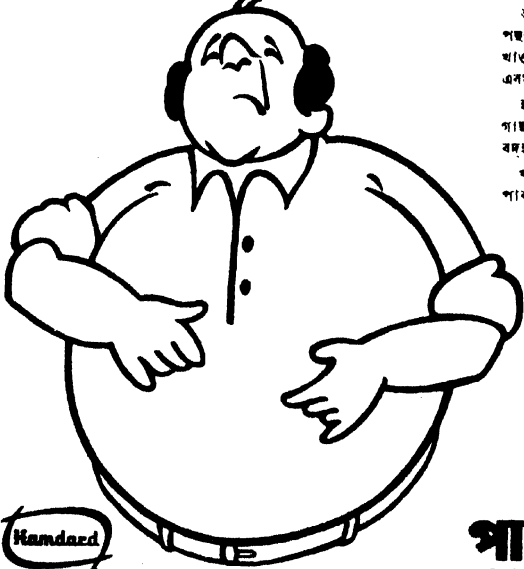
থমকে দাঁড়াল। ঘরটা অন্ধকার, একদিকে পিসীমার ঘরে, অন্যদিকে দাদুর ঘরে যাবার দরজা। অনিমেষ শুনতে পেল পিসীমা বিড়বিড় করে 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলে যাচ্ছেন। অনিমেষ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখল দাদু দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে কয়েকজন পুলিস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রথমে যে এল তার হাতে রিভলভার। এই প্রথম সামনা-সামনি একটা রিভলভার দেখল অনিমেষ। পুলিসরা ঘরে ঢুকে পড়তেই সরিৎশেখর ধমকে উঠলেন, 'কি ব্যাপার, এত রাত্রে আমার বাড়িতে আপনারা কেন এসেছেন, কি চান?' রিভলভার হাতে পুলিসটা বলল 'আপনার ছেলে কোথায়?' সরিৎশেখর অবাক হলেন, 'ছেলে? ও, আমার বড় ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!'

পুলিসটা বলল, 'ন্যাকামো করবেন না, আপনার ছোট ছেলে প্রিয়তোষের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন, 'জানি না।'

চিবিয়ে চিবিয়ে লোকটা বলল, 'জানেন না! এই, বাড়ি সার্চ করো।'

কথাটা বলতেই অন্য পুলিসগুলো রিভলভার বের করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। সরিৎশেখর দু হাত তুলে তাদের থামাতে গেলেন, 'আরে কি করছেন কি আপনারা? আমি কালই ডি সি-র সঙ্গে কথা বলব। আমাকে আপনারা অপমান করতে পারেন না। কি করেছে আমার ছেলে?'

প্রথম লোকটি বলল, 'বাপ হয়ে জানেন না ছেলে কম্যুনিস্ট হয়েছে। দেশ উদ্ধার করছেন সব। সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। ওর নামে ওয়ারেণ্ট আছে। কাজে বাধা দেবেন না, ওর বইপত্র আমরা দেখব। ও বাড়িতে এসেছে এ খবর আমরা পেয়েছি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'এত কদিন সে বাড়ি নেই। আমি বলছি সে বাড়ি নেই। কিন্তু সে কম্যুনিস্ট হল কবে?'

লোকটি বলল, 'এই তো, বাপ হয়েছেন অথচ ছেলের খবর রাখেন না।'

সরিৎশেখর রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন 'মুখ সামলে কথা বলবে। জানেন, সারা জীবন আমি কংগ্রেসকে সাহায্য করেছি। দরকার হলে এই জেলার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি কি ভাবছেন এখনও ব্রিটিশ আমল রয়েছে যে এই সব কথা বলবেন?'

পুলিসটা বলল, 'মশাই, আমল বদলায় আপনাদের কাছে, আমরা হুকুমের চাকর। আমাদের কাছে ব্রিটিশরাও যা এই কংগ্রেসীরাও তা, হুকুম করলেই তামিল করব। সবাই আমাদের সাহেব। যান, বেশী বকাবেন না, আমাদের সার্চ করতে দিন।'

অসহায়ের মত সরিৎশেখর ধপ করে অনিমেষের খাটে বসে পড়লেন। অনিমেষ শুনল, দাদু বিড়বিড় করছেন, 'প্রিয় কম্যুনিস্ট হয়েছে কম্যুনিস্ট।' ততক্ষণে পুলিসগুলো ঘর তছনছ করে ফেলেছে। অনির বইপত্র ছত্রাকার, কাকার স্যুটকেশটা খালি হয়ে ঢং করে মাটিতে পড়ল। একটা লোক বলল, 'এ ঘরে কিছু নেই স্যার।'

প্রথম পুলিস বলল, 'পালাবে কোথায়? বাড়ি ঘেরাও করা আছে। অন্য ঘর দেখ।' পুলিসগুলোকে এদিকে আসতে দেখে অনিমেষ দৌড়ে পিসীমার ঘরে চলে এল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল হাতের মুঠোয় তপুপিসীর চিঠিটা রয়ে গেছে। এই চিঠিটা পেলে পুলিসরা নিশ্চয়ই কাকার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে। তপুপিসী তো লিখেছে কাকা রাজনীতি করে। অনিমেষের মনে হল, রাজনীতি করা মানে কম্যুনিস্ট হওয়া। চিঠিটা লুকিয়ে ফেলা দরকার। কি করবে কোথায় রাখবে বুঝতে না পেরে সে চিঠিটাকে পেটের কাছে প্যান্টের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেঞ্জিটা টেনে দিল। দিতেই সে দেখল হেমলতা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ঘরের এককোণে ঠাকুরের ছবির তলায় একটা ডিমবাতি জ্বলছে। হেমলতা নিজের বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন। চোখে-চোখি হতে তিনি ওকে ইসারা করে ডেকে পাশে বসতে বললেন। অনি বসামাত্র একদল পুলিস টর্চ জেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। একজন ওদের মুখে টর্চ ফেলতে হেমলতা বললেন, 'চোখে আলো ফেলবেন না, কি চাই আপনাদের?'

একটা লোক খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, 'রাত দুপুরে জেগে বসে আছেন যে, প্রিয়তোষ কোথায়?'

হেমলতা সজোরে উত্তর দিলেন, 'রাতদুপুরে বাড়িতে ডাকাত পড়লে কেউ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয় না। আমার ভাই বাড়িতে নেই।'

লোকগুলো তন্নতন্ন করে ঘরের জিনিসপত্র ঘাঁটছিল। হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন, 'খবরদার, আমার ঠাকুরের গায়ে কেউ হাত দেবেন না।' যে লোকটা সেদিকে এগিয়েছিল সে হেমলতার মূর্তি দেখে থমকে গেল। পেছন থেকে একজন বলল, 'ছেড়ে দে, ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কম্যুনিস্ট পত্রিকা থাকে না।'

হঠাৎ একটা লোক অনিমেষের দিকে এগিয়ে এল গটগট করে 'ওহে খোকাবাবু, তোমার নাম কি?'

অনিমেষ কোন রকমে বলল, 'অনিমেষ।'

লোকটি ওর চিবুক ধরতে অনিমেষের হাত পেটের কাছে চলে গেল সড়াৎ করে, 'এই যে মিঃ মেষ, প্রিয়বাবু তোমার কে হয় বল তো?'

'কাকা।' মুখ উঁচু করে ধরে থাকায় অনিমেষের ঘাড়ে লাগছিল।

'কাকা! গুড। একটু আগে সে এখানে এসেছিল আমরা জানি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

অনিমেষ কোনদিন মিথ্যে কথা বলেনি। মা বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। অনি এখন কি করবে? সত্যি কথা বললে কি কাকার খারাপ হবে? কাকা তো চলে গিয়েছে এখান থেকে, এই বাড়িতে কাকাকে খুঁজে পাবে না ওরা। তাহলে? সত্যি কথাটা বলে দেবে? লোকটা তখনও ওর মুখ এমন জোরে উঁচু করে রেখেছে যে ঘাড় টনটন করছে। মার মুখটা ভাবতে চাইল অনি চোখ বন্ধ করে। লোকটা ধমকে উঠল, 'কি হল?'

অনিমেষ ফিসফিসিয়ে বলল, 'মা।' লোকটা বলল, 'কি? না?' বলে অনিমেষের মুখটা ছেড়ে দিল, 'শালা বাড়িসুদ্ধ লোক ট্রেইণ্ড হয়ে রয়েছে। বুঝলে মিত্তির, এই বাচ্চাটা যখন বড় হবে তখন এই প্রিয়তোষদের চেয়ে থাউজেণ্ড টাইমস ফেরোসাস হবে। এই সব থিওরিটিকাল কম্যুনিস্টগুলো তখন পাত্তাই পাবে না। শালা এইটুকুনি বাচ্চাও কেমন ট্রেইণ্ড লায়ার।' কথাগুলো বলে লোকগুলো অন্য ঘরে চলে গেল।
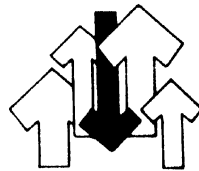
পাথরের মত বসেছিল অনিমেষ। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পুলিসটা ওকে লায়ার বলল। লায়ার মানে মিথ্যুক। কক্ষনো না, ও মিথ্যুক নয়। ও কিছুই বলে নি, পুলিসটা নিজে নিজে মনে করে নিয়েছে। ও দৌড়ে পুলিসটার কাছে যেতে উঠে পড়তেই হেমলতা ওকে চট করে ধরে ফেললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?' অনিমেষ ছটফট করছিল, 'ওরা আমাকে লায়ার বলে গালাগালি দিল। আমি কক্ষনো মিথ্যে বলি না। মা তাহলে রাগ করবে। বলো আমি কি মিথ্যুক?'

দু হাতে ওকে কাছে টেনে নিলেন হেমলতা, 'কাছু কি এসেছিল?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, এসে বইপত্র নিয়ে গেছে।' হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই?' অনি বলল, 'জানি না। একটা বই-এর নাম মার্কসবাদী। আমাকে ছাড়, আমি ওদের সত্যি কথা বলে দিয়ে আসি, আমি লায়ার নই। মা বলে গেছে সত্যি বলতে।'

হেমলতা কেঁদে ফেললেন, 'অনি বাবা, যুধিষ্ঠিরও এক সময় মিথ্যে বলেছিলেন। কিন্তু তুমি তো মিথ্যে বল নি, ওরা তোমার কথা ভুল বুঝেছে। আমার কাছে বসে তুমি মনে মনে মাকে ডাকো, দেখবে তিনি একটুও রাগ করবেন না।'

স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়াম দেখে, এসেই সেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্রিরের নিমন্ত্রণ রাখতে ছুটতে হলো। ভদ্রলোকের পদবী ডেকার, নাম মনে নেই। অথচ কতো বন্ধুতাই হয়েছিলো তখন। নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে কোনো একটা কলেজের অধ্যক্ষ। পঞ্চাশের উপরে বয়েস, দেখে কে বলবে সে কথা। একেবারে একটা তাজা টগবগে যুবক। স্ত্রীর নাম মেরী, মেরীকে বেশ বুড়ো মনে হয়। বয়সেও খানিকটা বড়ো। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চমৎকার। থাকেন সেণ্ট্রাল পার্কের ধারে একটা অতি সুন্দর অ্যাপার্টমেণ্টে। জানলায় তাকিয়ে সমস্ত পার্কটা চোখে পড়ে।

পার্ক তো পার্ক নয়, একটা ছোটোখাটো শহর। আগে একদিন বিকেলে চায়ে বলেছিলেন, সেদিন গাড়িতে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন অনেকটা। পার্কের মধ্যেই হ্রদ, বাগান, দীঘি, জঙ্গল, জলপ্রপাত, বল খেলার মাঠ, গলফ খেলার মাঠ, টেনিস খেলার লন, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বলনাচের হল—সব আছে। ঘুরতে ঘুরতে রাত হলো, আলো জ্বললো, তারপর দেখা গেল কোনো বিবাহের পার্টি নাচতে এসেছে সেই বলনাচের হল ঘরে। ডক্টর ডেকার বললেন 'ঢুকবে নাকি ?'

আমি উৎসুক হয়ে বললাম, 'ঢুকতে দেবে ?'

'কেন দেবে না ? দাঁড়াও টিকিট কাটি।'

'নাচ দেখতে পাবো ?'

'নিশ্চয়ই। চাইলে নাচতেও পারবে।

আমি হেসে বললাম, 'এই বলনাচ যে কী বস্তু তাই আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি, তায় আবার নিজে নাচবো !'

'বলনাচ না হয় নাই দেখেছ, এমনিতেও কি কোনোদিন কোনো নাচ নাচনি ?'

'কোনোদিন না। নাচ বিষয়ে আমার এ বি সি ডি জ্ঞানও নেই।'

'তবে চলো নাচ দেখাই তোমাকে।'

ঢুকে দেখলাম থিক-থিক করছে লোক, বিশাল হলে কতো যে মানুষ জড়ো হয়েছে তার ঠিক নেই। মাঝখানে মসৃণ চত্বর। কোণ ঘেঁষে একটু উঁচুতে বাজনাদাররা বসেছে, গম গম করছে বাদ্য। জোড়ায় জোড়ায় দুলছে সব। চারদিকে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে কেউ দেখছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ প্রেম করছে, কেউ তাল দিচ্ছে, অবাধ এক প্রমোদের মেলা।

নাচের জুটিরা সবাই প্রায় প্রেমিক-প্রেমিকা। ডক্টর ডেকার কৌশলে ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে আমাদের নিয়ে দিব্যি সামনের টেবিলে চলে এলেন, ইশারায় কোনো বেয়ারাকে পানীয় অর্ডার দিলেন, আর কিছু খুচরো খাবার।

টেবিল ঘিরে চারটেই চেয়ার ছিলো। আমি বুদ্ধদেব আর মেরী তিনজনেই বসে পড়েছিলাম, ডক্টর ডেকার দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন 'এসো।' আমি বললাম, 'কোথায় ?'

'এসো না।'

উঠে গেলাম। সঙ্গে করে সেই চত্বরের কাছে গিয়ে সহসা হাত ধরে প্রায় নৌকোর পালের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন ফ্লোরে। আমি 'এ কি! এ কি!' বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠতেই বললেন, তোমাকে নাচ দেখাবো বলেছিলাম দ্যাখো।'

'আমি জানি না, আমি পারি না—।'

'তোমাকে পারতে হবে না, নাচবো আমি তুমি শুধু দয়া করে স্টেপটা দিয়ে যাও। লক্ষ্মী মেয়ে শুধু স্টেপটা দাও।'

আমি লজ্জায় ঘেমে উঠলাম। কিন্তু ডেকার ওস্তাদ নাচিয়ে, সেই আনাড়ি আমাকে নিয়েই চষে বেড়াতে লাগলেন অতবড়ো জায়গাটা। সুতো ধরে যেমন পুতুল নাচায়, ঠিক তেমনিই নাচাচ্ছে আমাকে হাতে ধরে। কখনো ঝড়ের বেগে, কখনো দোলায়মান, কখনো বিদ্যুতের মতো গমকে চমকে। মধ্যে মধ্যে খুব মৃদু স্বরে উৎসাহ দিচ্ছেন, 'অপূর্ব, চমৎকার, একসেলেণ্ট, তালে তালে এমন নিখুঁত পা ফেলা মোটেও সহজ নয়।'

এইরকম বিপদে আমি কোনোদিন পড়িনি। আমার বুকের ভিতরে যেন একটা কবুতরের বুক ধুকপুক করছে। আমার কান বন্ধ হয়ে গেছে, চোখ খুলে তাকাতে পারছি না, ডক্টর ডেকারের কিছু গ্রাহ্য নেই। আমার অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হচ্ছে না, স্মিতহাস্যে নতুন নতুন সংযোজন দেখাচ্ছেন নাচে। হাততালি হাততালি হাততালি।. পঞ্চাশ মিনিট সমানে এই করে নেমে এলেন ফ্লোর থেকে। আমি হাঁপাচ্ছিলাম। মিসেস ডেকর আমার পিঠে হাত রাখলেন, 'কী অন্যায়, কী অন্যায়' স্বামীর দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রুট, স্যাভেজলি ক্রুয়েল, আমি তোমাকে বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দেব।'

আমি মেরীর নরম-নরম হাতে হাত বুলিয়ে বললাম, না না, আমার কিছু হয়নি, তুমি রাগ কোরো না। আমি তো নাচ জানি না, [illegible] মেয়েরা খেলাচ্ছলে নাচে আমি কখনো সেটুকুও নাচিনি, আমার খুব [illegible] করছিলো, খুব অপদস্থ মনে হচ্ছিলো—'

বুদ্ধদেব বললেন, 'দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগছিলো। একবারও মনে হচ্ছিলো না তুমি কোনোদিন নাচনি।'

মিসেস ডেকার [illegible]

কি আর নিয়ে নাচতে হয় ? ওই নাচায়। সব অর্থেই নাচায়। আর পছন্দসই মেয়ে হলে কি উপায় আছে ?'

এ কথায় আমরা হেসে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম ডক্টর ডেকার দূরে গিয়ে অন্য টেবিলে বসেছেন। হাসিগল্পে খুব মত্ত। ফ্লোরে বৈবাহিক পার্টির নাচিয়েরা নতুন জুটি খুঁজছে। আমার কাছে তিনটি অফার এলো আমি সবেগে আপত্তি জানিয়ে জনান্তিকে বুদ্ধদেবকে বললাম, 'চলো এবার পালাই।'

ডক্টর ডেকার এলেন, কী, খুব পরিশ্রম হয়েছে ? আমি বললাম 'না পরিশ্রম আর কি। শীতের মধ্যে শরীর গরম হলো একটু।'

'আমার স্ত্রী খুব রেগে যাচ্ছেন তোমাকে কষ্ট দিয়েছি ভেবে।'

মিসেস ডেকার বললেন, 'নিশ্চয়ই রেগেছি। তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞা[ন] নেই। নিজের ইচ্ছেটাই তোমার সব।'

এদের সঙ্গে এসো আলাপ করিয়ে দি—আমার আর বুদ্ধদেবের দুই কাঁ[ধে] হাত রেখে অতি উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত এক মহিলা এবং তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বললেন, এঁদের কাছে জিজ্ঞেস করো মিসেস বোসে[র] নাচটা ওদের কেমন লেগেছে। আমাকে ডেকে নিয়ে তাই বলছিলেন।'

মহিলা উচ্ছ্বসিতভাবে মাথা নাড়লেন, 'কী পোশাক! ম্যাজেণ্টা রং কাঁ[চু]লিটি, কালো হলুদ বর্ডার নিয়ে সিলকের ঘের যখন নাচের সঙ্গে সঙ্গে দোল খায়, সেটাও দেখবার। এমন পোশাক নিয়ে সেন্ট্রাল পার্কের হলে আর কে ক[বে] ঢুকেছে। ডক্টর ডেকার তুমি ভাগ্যবান।'

বলামাত্রই ডক্টর ডেকার আমার হাত ধরে টানলেন, 'মিসেস বোস, চলো চলো, লেট্স গো এগেইন।'

'অসম্ভব। অসম্ভব।'

'একবিন্দুও অসম্ভব নয়। আর একবার, আর একবার।'

'নুনো' মেরী ধমকে উঠলো।

ডেকার সহাস্যে বললেন, 'রাগ কোরো না ডিয়ার, তুমিও এসো না ফ্লো[রে] মিস্টার বোস এসো, তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে নাচো।'

'তবেই হয়েছে।' বুদ্ধদেব হাসতে হাসতে অস্থির।

ডেকার সজোরে আমাকে টেনে নিলেন, শোনো মিসেস বোস, সুখ বড়ো কৃপণ, বড়ো কম ধরা দেয় জীবনে আমি সুযোগ ছাড়তে চাই না। অনেককা[ল] বাদে আমি নাচতে নামলাম, মনোমত পার্টনার না পেলে কি কৃতিত্ব দেখানো যায়, এসো এসো—'

এবার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আয়নার মতো স্বচ্ছ, চকচকে ঝকঝকে পিচ্ছিল কালো ফ্লোরটা যেন শূন্যে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। তারপ[র] গোল হয়ে প্রদক্ষিণ করলেন দুবার, মনে হলো আমি হাঁসের মতো জলে ভে[সে] আছি, উনিই ভাসিয়ে রেখেছেন, আস্তে বললেন, 'আমার উপর ছেড়ে দা[ও] শরীর, ভয় পেয়োনা. বাজনায় কান রাখো স্টেপ ঠিক বাধা—'

সুখ সত্যিই কৃপণ। ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়, আর আসে না। আম[রা] গাছের মতো পুরোনো হই না, বস্তুর মতো পুরোনো হই। গাছের আয়ু[র] প্রয়োজন ফুরোয় না, আমাদের মনুষ্যকুলের প্রয়োজন সন্তান বড়ো হলেই ফুরি[য়ে] যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই মলিন কিরণ নিয়েই আমরা প্রয়োজনের পরেও বেঁ[চে] থাকি। তারপর শুধু স্মৃতি স্মৃতি আর স্মৃতি।

সেই রাত্রে ডক্টর ডেকারের বাড়িতে গিয়ে সেইরকমই একটি স্মৃতি সর্ব[স্ব] মলিন কিরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। বৃদ্ধ লোকটি যেন ইতিহাসের পাতা ফুঁ[ড়ে] বেরিয়ে এলেন, ট্রটস্কির সহকর্মী কনডেনস্কি।

স্টালিন দলে ভারী ছিলেন বলেই মতভেদ তিনি মেনে নেননি, শুনে[ছি] ট্রটস্কিকে অতি নিষ্ঠুরভাবেই হত্যা করা হয়েছিলো। ইনি পালাতে পে[রে]ছিলেন। সোজা এই দেশে। তারপর থেকে এই তাঁর দেশ। বয়স এখন আ[শি] প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া মানুষ ঢিলে হয়ে গেছে, মুখ শত সহস্র বলিরেখ[ায়] চিত্রবিচিত্রিত। উঠে দাঁড়িয়ে রাশান উচ্চারণে ইংরিজি ভাষায় একটি নাতিদী[র্ঘ] বক্তৃতা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বলতেই অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সে নাম দু-একবার উচ্চারণ করেই কাস্ত্রো কেনেডি জওহরলালে চলে এলেন রাজনীতি তখনো তাঁর অস্থিমজ্জাতে বাজনা বাজায়। উনি যে গীতাঞ্জলি প[ড়ে] কতো মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই কবির দেশেরই আর একজন কবিকে দেখে ক[তো] খুশি হয়েছেন ডেকারের নির্দেশমতো সেই কথা বলতে ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষে কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনা প্রকাশ করলেন। তখনো তিনি পু[রো] মাত্রায় বিপ্লবী। বুদ্ধদেব মাঝখানে একবার পাস্টারনাকের কথা তুলেছিলে[ন] সঙ্গে সঙ্গে স্টালিনের বিষয়ে একটা সাংঘাতিক কটূক্তি করে অনেকক্ষণ থমা[থম] থেকে রাগ সামলে বললেন, 'ওর যে এই পরিণতি হবে তা আমি জানতাম পাপিষ্ঠ। তোমাদের বলি, স্টটস্কির মতো মানুষ হয় না। তার সততা ছি[লো] তুলনাহীন। সে তার নিজের দেশ আর নিজের জাতকেই বড়ো বলে ভাবতো [না] সে ছিলো সমস্ত মানবজাতির বন্ধু, সমস্ত জগতের প্রেমিক। ত[ার] হৃদয়ভরা শুধু ভালোবাসা ছিলো।' গলা ধরে এলো, বসে পড়লেন।

আর একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন কিছু বলতে। আত্মপরিচয় দিলে[ন] রোদাঁর সমসাময়িক এক বিখ্যাত ভাস্কর। এখানকার আধুনিক চিত্রশা[লা] [illegible]দাঁর ঘরের পাশেই এঁর কাজ আমরা দেখে এসেছিলাম। এঁর বয়ে[স] [illegible]র ঘরে। খ্যাতির শিখরে উড্ডীন। নাম [illegible]।

অনেকক্ষণ থেকেই একটি তরুণী, দেখতে একেবারে কুমারটুলির সরস্বতীর মতো মুখ নিয়ে, সৌন্দর্যে আমাকে মুগ্ধ করে, কালো ঝলম[লে] পোশাকে গা ঘেঁষে বসে ভারতবর্ষ বিষয়ে অনেক খবর নিচ্ছিলো। বর্ণাঢ্য

মেয়েটির বয়েস চব্বিশ পঁচিশ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনজন তোমার স্বামী ?'

সে ভিড়ের মধ্যে কোনো একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, 'দ্যাট এলডারলি পার্সন।'

এখানে নিমন্ত্রিতরা তো সবাই এলডারলি পার্সন। কাকে সে উদ্দেশ করেছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। যেই আর্চিপেংকো উঠে দাঁড়ালেন, মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হলো। সব কথা থামিয়ে একমনে তাকিয়ে রইলো তাঁর মুখের দিকে। বার্ধক্যের জন্যই বোধহয় ভদ্রলোকের কথা খুব জড়ানো, মেয়েটি সস্নেহে বললো, 'একটু দাঁতের অসুবিধে আছে কি-না ? কানেও শুনতে পান না, যন্ত্র দেখছো না ? তবে আর্চিপেংকো ইজ আর্চিপেংকো। এর তো কোনো জবাব নেই ? তাঁকে দেখতে পাওয়াই সৌভাগ্য। এরকম স্বামী পেয়েছি বলে ঈশ্বরকে আমি প্রতিদিন ধন্যবাদ জানাই।'

আমি বললাম—ঠিক বললাম না, মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'তোমার স্বামী ?'

'তখন দেখালাম তোমাকে ?'

হা ঈশ্বর! এই নাকি ওর এলডারলি পার্সন ?

মেয়েটি ছাত্রী ছিলো, গুরুভক্তির প্রাবল্য শেষপর্যন্ত পতিভক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আলাপ হবার পরে এক রাত্রে আর্চিপেংকোও নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাদের। আমরা আর ডক্টর ডেকার দম্পতি। সেদিন গিয়ে 'প্রেমের বিচিত্র গতি' কাকে বলে সেটাই প্রত্যক্ষ করা গেল। আর্চিপেংকো যা করছেন যা বলছেন সবেতেই সেই আশি বছরের বৃদ্ধের পঁচিশ বছরের স্ত্রী রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। মেরী আমার হাত টিপে চুপে চুপে বললো, 'মিসেস আর্চিপেংকোর কাণ্ডটা দেখছো ? কী রকম আদেখলামি করছে স্বামীকে নিয়ে ?'

ডক্টর ডেকার স্ত্রীর কাঁধে চাপ দিলেন, 'শেখো শেখো, শিখে নাও।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিসেস ডেকার ভ্রূকুটি করলেন, 'ন্যাকামি কোরো না।'

ডেকার আমার দিকে তাকালেন, 'সম্ভাষণ শুনলে তো ? তোমরা ভারতীয় মেয়েরা নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করো না। ইস্‌স্‌ যৌবনে কেন যে একবার সেখানে গেলাম না।'

আর্চিপেংকোর বাড়ি থেকে তাঁর স্টুডিয়ো মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। খাওয়া দাওয়া আড্ডা সেরে রাত দশটায় রাস্তা পার হয়ে সেই স্টুডিয়োতে যাওয়া হলো। পথ নির্জন, নীরব। শুধু হুসহুস গাড়ি যাচ্ছে দু-চারটা। এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে, খুব ভালো লাগছিলো হাঁটতে। কাঁপা কাঁপা গলায় আর্চিপেংকো গান ধরলেন একটা, প্রেমের গান। মিসেস আর্চিপেংকো মনে হলো আবেগে সেইখানেই মূর্ছা যায়। মিসেস ডেকার আবার আমার হাতে চাপ দিলেন।

স্টুডিয়োতে ঢুকে আমরাও মূর্ছা গেলাম। কল্পনা করা শক্ত হলো, একজন আশি বছরের বৃদ্ধের শরীরে এতো শক্তি। বিশাল বিশাল সব মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণতা পাবার আশায়। কোনো মূর্তি ব্রোঞ্জের, কোনো মূর্তি পাথরের। বয়সের এই ভার নিয়ে এই মানুষ এই ধাতুর সঙ্গে লড়াই করে! প্রতিভার সঙ্গে প্রেমে পড়লে যে বয়সের কোনো মানে থাকে না সেটুকু অন্তত বোঝা গেল। চব্বিশ বা পঁচিশ বছরের সুন্দরী কন্যা কেন আর্চিপেংকোর প্রতি পদক্ষেপে রোমাঞ্চিত হন তার কারণ সহজ চেহারায় দেখা দিল। সমাপ্ত অর্ধ-সমাপ্ত, সদ্য শুরু করা সব মূর্তি যেন পিপাসার্ত হয়ে আছে তাদের সৃষ্টি-কর্তার স্পর্শের আশায়। আর্চিপেংকো এক একটি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে এক একরকম আলো চোখে নিয়ে তাকাচ্ছেন তাদের দিকে। আমাদের ভুলে গেছেন তখন। নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজেই নিমগ্ন।

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল সেদিন। ডক্টর ডেকারই পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ডেসকে চাবি নিতে গিয়ে শুনলাম, কবি গলওয়ে কিনেল ফোন করেছিলেন, কাল সকাল দশটায় আসবেন। ফোনের মেয়েটি সহাস্যে চিরকুটটি এগিয়ে দিল।

এসে থেকে আর গলওয়ে কিনেলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কোথায় যে আছে সেটাও ঠিক জানা ছিলো না বলে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয় নি। স্বভাবতই আমরা খুব খুশি হয়ে উঠলাম। এই সুদর্শন আধুনিক কবিটির অবস্থান যদিও কলকাতাতে মাত্রই কয়েক দিনের ছিলো, তথাপি সৌহার্দ্য হয়েছিলো খুব। পুনরুল্লেখ করলে বোধহয় দোষ হবে না, নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব এঁর আগ্রহ এবং অনুরোধেই অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে গরঠিকানা হয়ে গিয়ে আমরা খুব মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলাম।

ঝমঝম বৃষ্টি দিয়ে শুরু হওয়া দিনটা তা হলে ভালই কাটলো। রাত্রি-বেলা শুতে যাবার আগেও সুখবর।

পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটাতেই সখীসহকারে এসে দরজায় টোকা দিল গলওয়ে। নিয়মানুবর্তিতা এদের মজ্জায় মজ্জায়। গলওয়ে বেশ কবি কবি ভাব নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু এই নিয়মানুবর্তিতা থেকে সরতে পারে না। শ্বেতাঙ্গদের আসল উন্নতির উৎসই এই ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিকই করা। তার মধ্যে মার্কিনীরা সম্ভবত এ-বিষয়ে আরো কঠোর। প্রয়োজনেই কঠোর। তাদের বিশাল ভূখণ্ডে লোকসংখ্যা এমন দুঃসহ-ভাবে কম যে যাদের আমরা কাজের লোক বলি, সেই কাজের লোক এখানে নেই বললেই হয়। জীবনযাপনের পক্ষে যা করণীয় তা এক মিনিটের জন্যে ফেলে রাখলে চলে না। অথচ এর মধ্যেই একশোতলা বাড়িও যেমন উঠছে তেমনি মানসকীর্তিতেও কিছু পিছিয়ে নেই। তাই বিছানায় বসে চা [illegible]

এরা জানে না। ইয়োরোপের একটা সাধারণ দেশ হলেও যে সেবা মনুষ্যের স্বপ্ন জেগা এখানে সেটা প্রায় বিলাসিতার পর্যায়ভুক্ত। এইজন্যেই ছুটির দিনের সমস্ত কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য এমন নির্মমভাবে অবরুদ্ধ। ছুটির দিনগুলোকে এরা রসে রসে উপভোগ করে। তবে এই লোকস্বল্পতা একদিকে যেমন আশীর্বাদ, অন্যদিকে কিছুটা ক্ষতিও করেছে। সবই মেশিনজাত। বোতাম টিপলেই চা কফি স্যান্ডুইচ, দুধ, চকোলেট সবই মেলে, মেলে না শুধু মানবিক স্পর্শ। হস্তশিল্প বলতে কিছুই নেই এ-দেশে। সময় কোথায়?

এই যন্ত্রজীবন নিয়েও এরা কিন্তু অতুলনীয়ভাবে দক্ষ এবং মসৃণ। মাটির তলায় ট্রেন নির্ভুল নিয়মে চলে এবং যাতায়াত সচল, রোববার বন্ধ তাই রোববারের অসংখ্য সংবাদবাহী আয়তন ওজনের কাগজটি শনিবার রাত্রেই বেরিয়ে যায়, কলকাতা থেকে তিনদিনেও অনেক সময়ে চিঠি পেয়েছি—

যাই হোক গলওয়ে ফিরেন এলেন, হাতে একখানা স্বরচিত নতুন কবিতার বই। হেলাফেলায় রেইন কোটটা কোনদিকে যেন রাখলেন বা রাখলেন না, সখী ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়লেন 'কিন্তু যদি এর ঠিক থাকে—'

আমাকে দেখে খুব খুশি, 'তা হলে এসেছো?' আমি কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে বললাম, 'তোমার সাহায্যই তার কারণ, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কোথায় হঠাৎ হারিয়ে গেলে বলো তো? কবে বিয়ে করলে? কিছু তো জানাওনি।

সংগের মেয়েটিকে আমি স্ত্রী ভেবেছিলাম। মেয়েটির আচরণে প্রেমিকার চেয়ে স্ত্রীর ভূমিকাটাই বেশী প্রকট ছিলো।

গলওয়ে নরম করে হাসলো, 'না বন্ধু, স্ত্রী নয়, সংগিনী। আমি বিবাহে বিশ্বাস করি না।'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম, মেয়েটি নিজেই সেটা ভেঙে দিয়ে বললো, 'ছ'মাস একসংগে আছি, যদ্দিন ভালো লাগে থাকবো, আমিও বন্ধনে পড়তে চাই না।'

এরপর গলওয়ে সাংসারিক কথায় এলো, বুদ্ধদেবকে বললো, 'এরা যা দিচ্ছে তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'স্ত্রীকে নিয়ে এসে দেখছি খরচ অনেক কম লাগে। এর আগেরবার একা এসে অসুবিধেও যেমন হয়েছে, খরচও হয়েছে এলোমেলো। সব সময়েই তো বাইরে খেতে হয়েছে?'

'বিলাসী হোটেলে আছ, ভাড়া নিশ্চয়ই অনেক বেশী—'

বুদ্ধদেব তাঁর নিজের লেখা এবং পড়া ছাড়া সংসারের অন্য সব কাজকেই কৃতান্তের মতো সভয়ে বর্জন করেন। তাই হেসে বললেন, 'আরো বেশী দিতে রাজি আছি যদি দিনরাত জৈবিক প্রয়োজনে এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে না থাকতে হয়। তোমরা লেখো কী করে? দিনের অর্ধেক সময়ই তো ঘরকন্নার কাজে চলে যায়। আমি তো কোনো কিছুতেই নিবিষ্ট হতে পারছি না।

গলওয়ে সহজভাবে বললো, 'ও এই কথা? শোনো সম্প্রতি কয়েকটা হোম হয়েছে লেখকদের জন্য। সেখানে সবরকম আরামের ব্যবস্থা আছে। সেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। সেই নির্জন পল্লীগৃহের সর্বসুবিধাযুক্ত ঘরে বসেই খাদ্য বস্ত্র শয্যা সেবা সব তুমি পাবে। যাবে সেখানে?'

'খরচ?

'খরচ?' খরচ কিছুই নেই। সেদিক থেকে অনেক টাকা বাঁচবে তোমার। চলো না থেকে আসবে মাস দুই। তোমার কতো সুবিধে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই লেখক দুজনেরই খরচ ওরা দেবে। আমি এখন সেই হোমেই আছি। একটা বই লিখছি, আর ও সংগিনীকে দেখালো, 'ও আমার সেক্রেটারি হিসেবে আছে। ওর জন্য সামান্য কিছু দিতে হয় বটে। আমি যে তোমাদের কোনো চিঠিপত্র লিখিনি বা ঠিকানা জানাইনি, ওই জন্যেই। এখানে কেউ আমার খোঁজ জানে না।'

এই ধরনের হোমের খবরে আমরা অবাক। খরচ আমাদের সত্যিই অনেক হয়, অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করা আমাদের ব্যাধি, হোমে গিয়ে দু'মাস থাকলেও হাতে অকাতরে দশ হাজার টাকা জমে যায়, সেটা কিছু কম কথা নয়। টাকার অংকে অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াই তো মাসে প্রায় আড়াই হাজার, সেখানেই তো তো পাঁচ হাজার বাঁচে।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে গলওয়ে বললো, 'তা হলে রাজী? আমি গিয়ে বন্দোবস্ত করবো?'

বুদ্ধদেব ইতস্তত করে বললেন, 'একটু ভেবে নিয়ে চিঠিতে জানাবো।'

গলওয়ে সেদিন সারাবেলা কাটালো আমাদের সংগে। দুপুরে আমিই রান্না করে খাওয়ালাম। সন্ধ্যায় আমাদের নিয়ে গিয়ে গলওয়ে খাওয়ালো।

যাবার সময় আবার বললো, 'আসবে?' বুদ্ধদেব আবার বললেন, 'একটু ভাবি।'

রাত্রিবেলা আমাকে বললেন, 'তুমি কি বলো?'

আমি বললাম, 'আমার অত আরামে বই লেখার অভ্যাস নেই। হঠাৎ সিংহাসনে বসলেই কি আর রানী হতে পারবো?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'যা বলেছ, শেষে একটা নৈতিক দায়িত্বে দাঁড়িয়ে যাবে, কেবলি মনে হবে যে উদ্দেশ্যে যারা আমাকে পোষণ করছে তাদের ঋণ আমার শোধ করা উচিত। সে কথা ভেবে ভেবে উদ্বেগেই বিকল হয়ে আর কলম ধরতে পারবো না।'

অতএব সে আশ্রম আমাদের সেখানেই বাতিল হলো।

বিশ্বভারতীর কর্মধারা প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত নির্দেশ

চিত্তরঞ্জন দেব

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিশ্বভারতীর সূচনাকালে (১৯১৮-২১) বিশ্বভারতী ছিল একটি নূতন প্রতিষ্ঠান। ১৯১১ সালের পূজার ছুটির পর থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমসহ সমগ্র বিদ্যায়তনের নাম হল বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর দুই প্রধান বিভাগ—১। উত্তরবিভাগ বা বিদ্যাভবন, ২। পূর্ব বিভাগ বা পাঠভবন। এখানেই সম্ভবত ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামের বিলুপ্তি ঘটল। উত্তরবিভাগ বা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ হলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। পূর্ববিভাগ বা পাঠভবনের অধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক প্রমদারঞ্জন ঘোষ।

পূর্ব প্রচলিত ধারায় সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠভবনের শিক্ষাদান চলছে; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণী থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। বিশ্বভারতীর নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে পাঠগ্রহণেচ্ছু ছাত্রদের জন্য নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী পরিষদ-সভার প্রথম অধিবেশনে বিশ্বভারতীর সংস্থিতি (constitution) গৃহীত হয়েছে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে (১৯২১ সালের ৮ই পৌষ) সভাপতির ভাষণে আচার্য শীল বললেন,

"এদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও standardized product তৈরি হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalness-এর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneity-র দিকে দৃষ্টি থাকবে। য়ুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজমের দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interest-এ এরূপ একটি য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা গেল।"

—(আংশিক উদ্ধৃতির জন্য দ্রঃ 'বিশ্বভারতী' পুস্তিকার পরিশিষ্ট)

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ এই দিনেই বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ করেন। এই তারিখটিই বর্তমানকালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে স্বীকৃত।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ভাষণাদির অধিকাংশ বিশ্বভারতী (১৩৫৮ পৌষ ৭) পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এই পুস্তিকার বাইরেও বিশ্বভারতীর কর্মপ্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ-সংবলিত তাঁর স্বহস্তলিখিত কিছু পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দর থেকে বিশ্বভারতী-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহযোগী বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লেখা তাঁর একখানি পত্রের নিম্নলিখিত রূপ নির্দেশ লক্ষ্য করবার মতো—

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"উত্তর বিভাগের [বিদ্যাভবনের] যে সব ছাত্র এখন আছে বিশ্বভারতীর জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হবে, সেইজন্য তাদের দুই বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকা থেকে তাদের দুই বা দুইয়ের অধিক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে হবে :—

বৈদিক সংস্কৃত	আয়ুর্বেদ	ক্ষিতিবাবু
সংস্কৃত সাহিত্য	প্রাচীন সাহিত্য	

পালি	আবেস্তা	তিব্বতীয়	যদি অধ্যাপক জোটে
প্রাকৃত		চিনীয়	
ভারতের পুরাতত্ত্ব		ফরাসী আরবী	

বাংলা (বাংলার বাহিরের প্রদেশের ছাত্রদের জন্য) সাধারণ হিন্দী ও হিন্দুস্থানী দ্রাবিড়ীয় ভাষা

ফরাসী

জর্মন (যখন জর্মন পণ্ডিত পাওয়া যাবে) য়ুরোপীয় ইতিহাস (নেপালবাবু)

শব্দতত্ত্ব (Collins-এর কাছে) ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত ইত্যাদি

য়ুরোপীয় দর্শন (সরোজবাবুর কাছে)

ইংরেজি সাহিত্য (এখনও পড়াবার লোক পাওয়া যায়নি—
অমিয় [ডঃ অমিয় চক্রবর্তী] অনায়াসে এই ভার নিতে পারেন ... ... × ×

নারী বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। এই বিভাগের ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষভাবে করা কর্তব্য। আমাদের সাধ্যমত এদের ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত ভাষায় যথোচিত পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে।...এই নারী বিভাগের ছাত্রীরা কালক্রমে কেহ কেহ বিশ্বভারতীতে স্থান অধিকার করতে পারবে।

বিশ্বভারতীতে কলাবিভাগ ও কারুবিভাগের নিয়ম স্বতন্ত্র।

অধ্যাপকদের প্রধান কর্তব্য হবে ছাত্রদের বিশ্বভারতীর জন্য তৈরী করে তোলা। আচার্যদের প্রধান কর্তব্য হবে অনুসন্ধান ও তত্ত্ব প্রচার। বিশ্বভারতীর উপযুক্ত ছাত্রদের মধ্যেও কাউকে কাউকে কোনো কোনো বিষয়ে গোড়ার দিক থেকে শেখানো দরকার হবে। কেউ হয়ত য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু সংস্কৃত জানেন না বা অল্পই জানেন। এঁদের খেয়া পার করবার ভার অধ্যাপকদের উপর। বলা আবশ্যক, বিশেষ প্রয়োজনস্থলে যা স্বেচ্ছাক্রমে আচার্যেরাও এই ভার গ্রহণ করতে পারেন।

...নূতন অধ্যাপক ও আচার্য নিয়োগের সামর্থ্য আমাদের বেশি নেই। ...ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক দরকার হবে। চেষ্টা করে দেখছি যদি এদিক থেকে কাউকে পাওয়া যায়। আপাতত যাঁরা আচার্য ও অধ্যাপক আছেন বা শীঘ্র হতে পারেন তাঁদের নাম দিচ্ছি—আমার স্মৃতিশক্তির ত্রুটি বশত কিছু ভুল হতে পারে—সংশোধন করে নেবেন :—

আচার্য

বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, কলিনস; কালিদাস নাগ; নন্দলাল বসু, এলমহার্স্ট।

অধ্যাপক

নেপালচন্দ্র রায়, বেনোয়া, মিশ্রজী [কপিলেশ্বর]; সাংখ্যতীর্থ (রমেশচন্দ্র), ভীম শাস্ত্রী (পণ্ডিত ভীম রাও), সুরেন্দ্রনাথ কর; সন্তোষ (মজুমদার), লাল (প্রেমচাঁদ), আর কে কে আছেন আপনারা ভেবে স্থির করবেন।"

—(উক্ত পত্রের আংশিক উদ্ধৃতির জন্য দ্রঃ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের **'শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতী'**)

বিশ্বভারতীর কর্মধারা-প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা [সম্ভবতঃ অপ্রকাশিত] আরও একটি নির্দেশলিপি পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে। তারিখবিহীন এই নির্দেশলিপিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর চারি অংশের পরিষ্কার একটি ছক এঁকে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। মূল **পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশের ফটোচিত্র সহ নির্দেশলিপিটি নিম্নে প্রকাশিত হল :—**

"**বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিভাগ** সাধারণ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুবর্তী নহে।

এখানে কতকগুলি নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় ক্লাস করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা পাণ্ডিত্যে প্রবীণ ও জ্ঞানসাধনায় কালক্ষেপ করিতে প্রস্তুত তাঁহারা **আচার্যরূপে** বিশ্বভারতীতে আশ্রয়, অবকাশ ও আনুকূল্য

তাঁহারা জ্ঞানচর্চার উদ্দেশে বিশ্বভারতীতে ছাত্ররূপে যোগ দিতে পারিবেন।

ছাত্রদিগকে যাঁহারা অধ্যাপনার দ্বারা সাহায্য করিবার যোগ্য সেই বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে গৃহীত হইবেন।

যাঁহারা বিশ্বভারতীর সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া রচনার দ্বারা, ব্যাখ্যানের দ্বারা, অর্থ দান বা অর্থ সংগ্রহের দ্বারা অথবা যে কোনো উপায়ে ইহার সাহায্য করিবেন তাঁহারা বিশ্বভারতীর বান্ধবরূপে গণ্য হইবেন।

বিশ্বভারতীর চারি অঙ্গ : আচার্য, ছাত্র, অধ্যাপক ও বান্ধব।

আচার্য

বিশ্বভারতী যাঁহাদিগকে আচার্যরূপে বরণ করিয়া লইবেন সংসারভাবনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতি মাসে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিবেন। তাঁহারা আশ্রমে বাসস্থান পাইবেন এবং সেখানে যে গ্রন্থাগার আছে তাহা ব্যবহার করিতে তাঁহাদের বাধা থাকিবে না।

বৎসরে অন্তত ছয়টি করিয়া ব্যাখ্যান (Lecture) বিশ্বভারতী তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিবেন। এই ব্যাখ্যান গ্রন্থাকারে বা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে অথবা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হইবে।

ছাত্রদের মধ্যে কেহ অধ্যয়নের বিষয় সম্বন্ধে আচার্যদের সাহায্য প্রার্থী হইলে অবকাশমত তাঁহারা সাহায্য করিবেন।

কলাবিভাগের আচার্যের নিকট হইতে ব্যাখ্যানের পরিবর্তে বৎসরে অন্তত দুইটি স্বকল্পিত চিত্র বিশ্বভারতী প্রত্যাশা করিবেন।

সংগীত বিভাগের আচার্য বৎসরে দুইবার প্রদর্শনীতে ছাত্রদের রচিত কারুশিল্প দেখাইবেন।

বিশ্বভারতীতে আচার্য তিন শ্রেণীর—আশ্রমস্থ, বহিঃস্থ ও অভ্যাগত।

আশ্রমস্থ আচার্য ছুটির নিয়ম পালন করিয়া আশ্রমে সম্বৎসর বাস করিবেন।

বহিঃস্থ আচার্য আশ্রমের বাহিরে থাকিয়াও কর্মসূত্রে বিশ্বভারতীর সহিত যোগ রাখিতে পারিবেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যানের সংখ্যা তাঁহাদের সুবিধা অনুসারে স্থির হইবে।

অভ্যাগত আচার্য ভারতের বাহির হইতে আসিয়া যথানির্দিষ্টকাল যথানির্দিষ্ট নিয়মে কোনো বিশেষ বিষয়ে ব্যাখ্যান দিবেন। বিশ্বভারতী তাঁহাদের পাথেয় ও দক্ষিণার ব্যবস্থা করিবেন।

ছাত্র

বিশ্বভারতীতে প্রবেশার্থী ছাত্রদের যোগ্যতা বিচার করিবার জন্য বৎসর দুইটি করিয়া রচনা তাঁহাদের অধ্যাপকের অনুমোদনপত্র সহ নির্দিষ্ট সমিতির হাতে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে।

বৎসরের শেষ পর্যন্ত যাহারা অকৃতকার্য হইবেন অথবা অন্য কারণে সমিতি কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত হইবেন তাঁহারা ছাত্র থাকিতে পারিবেন না।

আচার ব্যবহার ও দৈনিক কৃত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই ছাত্রদিগকে বিশ্বভারতীর নিয়ম পালন করিতে হইবে।

তাঁহাদের স্বকীয় নির্দিষ্ট অধ্যয়নের বিষয় ছাড়াও যে কোনো বিষয় সমিতি অবশ্যাধ্যয়ন (Compulsory) বলিয়া স্থির করিবেন ছাত্রদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

বিশ্বভারতীর ছাত্র তিন শ্রেণীর—আশ্রমস্থ বহিঃস্থ ও অভ্যাগত।

আশ্রমস্থ ছাত্র ছুটির নিয়ম রক্ষা করিয়া আশ্রমে তাঁহাদের অধ্যয়নকাল নিয়ত যাপন করিবেন।

বহিঃস্থ ছাত্র বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে আসিয়া কখনো সভায় যোগ দিতে পারিবেন।

অভ্যাগত ছাত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়া কিছুকালের জন্য আশ্রমে শিক্ষালাভ করিবেন। সমিতি ইচ্ছা করিলেই ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, কোনো বিশেষ পরীক্ষার আবশ্যকতা থাকিবে না।

অধ্যাপক

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সমিতি কর্তৃক অবধারিত নিয়ম অনুসারে অধ্যাপনা করিবেন। অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিশেষ বিষয়ের চর্চার কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন এবং সে সম্বন্ধে বৎসরে অন্তত একটি করিয়া রচনা সমিতির হাতে দিবেন।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক দুই শ্রেণীর—আশ্রমস্থ ও বহিঃস্থ।

আশ্রমস্থ অধ্যাপক ছুটির নিয়ম রক্ষা করিয়া সম্বৎসর আশ্রমে বাস করিবেন।

বহিঃস্থ অধ্যাপক সমিতি কর্তৃক অবধারিত বিশেষ নিয়মে মাঝে মাঝে আসিয়া অধ্যাপনা করিয়া যাইবেন।

বান্ধব

বিশ্বভারতীর বান্ধব দুই শ্রেণীর—আশ্রমস্থ ও বহিঃস্থ। আশ্রমে বাস করিয়া যাঁহারা বিশ্বভারতীর ধর্মসাধনা বা কর্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবশত বিশ্বভারতীর সেবার জন্য স্বেচ্ছাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই আশ্রমস্থ বহিঃস্থ বান্ধব।

যাঁহারা দূরে থাকিয়া কর্মের দ্বারা বা ইহার মূল নীতির সমর্থন দ্বারা বিশ্বভারতীর আনুকূল্য করিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার বহিঃস্থ বান্ধব।' *

ঝালবনির শচীনাথ

প্রলয় সেন

বাগালপাড়া থেকে ফিরছিল শচীনাথ। নাকে-মুখে দুটো গুঁজেই ছুটেছিল সুরথের ঝুপড়িতে। গোটা ঝালবনিতে রিকশা চালায় মোটে দুজন। কানাই আর সুরথ। কানাই নেশাড়ু দিওয়ানা অন্দ। গত সনে ওর পালাধড়াকি বউটাকে কেষ্টপুরের যতীন হাঁসদা পাঁচকুড়ি টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যাবার পর থেকেই কানাই আগলবাগল। ওর কথার কোন দাম নেই। শচীনাথের ভয় ছিল হয়ত সুরথ রাজি হবে না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। গাড্ডায় পড়লে যদুমধুকেও তোয়াজ করতে হয়। আজ সকালের দিকে বেশ কিছু বেল পেড়েছে শচীনাথ। কালকের ভেতর ওগুলোর হিল্লে করতে না পারলে বেকায়দায় পড়ে যাবে সে।

সুরথ ঝুপড়ির বাইরে রোদ্দুরে তেঠ্যাঙা বসে চুটা ফুঁকছিল। শচীনাথ কথাটা পাড়তে বুক থেকে খানিকটা গয়ের তুলেছিল, [illegible] জোরে। যা ঠান্ডা, বুড়া হইচি, পারব না বাবু।'—ইদানীং একটা [illegible]

মানুষ পাথরের ঢেলা অব্দি সেদ্ধ হয়ে যায়। বলেছিল, 'এটুকু উপকার না করলে যে মারা পড়ে যাব সুরথ।'—শেষ পর্যন্ত সুরথ মাথা নেড়েছিল, 'ঠিক আছে যাস।'

বাতি-অবাতি মিলিয়ে বেল শ' দেড়েকের মত। সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে সাড়ে তিন মাইল রাস্তা চড়াই ভেঙে টাউনে নিয়ে যাওয়া শচীনাথের কম্ম নয়। বছর কয়েক আগে হলেও কি এসব আলতু-ফালতু লোককে তোষামোদ করত সে। বাগান জমির পেছনের মাঠে তখন কুড়ি-বাইশ কুইন্টাল ধান হত ফি বছর। প্রচুর কুমড়ো ফলত ক্ষেতে। কাজুবাদাম থেকেও দুটো পয়সা আসত। আর আমের সিজনে তো কথাই নেই। তখন তুড়ুকদার পাইকাররা এসে ঘরের দুয়ারে ধর্না দিত। সে সব সুখের দিন ফুটে গেছে। এখন সম্বল ক'টা কাঁঠাল পেঁপে পেয়ারা আর কুলগাছ। দোকান তো উঠে যাবার মুখে। এ ছাড়া দাদা দিবানাথের কাছ থেকে সে মাসোহারা বাবদ পায় পঞ্চাশটি টাকা। চারটে পেট। আক্কার দিনগণ্ডায় সংসারটা যে কিভাবে চলছে তা নিজেই বুঝে উঠতে পারে না শচীনাথ। অভাব হিসেবী করে মানুষকে। এখন আর সে পাইকারদের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না। নিজেই ফলটল নিয়ে টাউনে যায়। ভোর ভোর পৌঁছুতে না পারলে বেচা দায়। খুচরোর খদ্দের। কোন কোনদিন বিক্রিবাটা সারতে বেলা হয়ে যায়। এতে দুদশটা টাকা বেশি আসে হাতে। সময়ের চেয়ে এখন পয়সার দাম শচীনাথের কাছে ঢের বেশি।

মেঠো রাস্তায় উঠে হাতের পেয়ারা ডালটা দিয়ে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে এগুচ্ছিল শচীনাথ। পাড়াগাঁয়ে লাঠিটাঠি নিয়ে চলাফেরা একটা অভ্যাস। আর এই ধুলো ওড়ানো, এটা শচীনাথের খুশির অভিব্যক্তি। সকাল থেকে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ছিল। দশ-বারোটা গাছ একা ঝাড়ানাড়া করা কি সহজ কাজ, তারপর ফলগুলো ঘরে তুলে দিয়ে উঠোনে নেমে হাত-পা ধুতে গিয়ে ছাঁচতলার দিকে ধোঁয়া দেখে চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। অনু তনু টাউনের বরদাসুন্দরী স্কুলে পড়ে। পথে আমতলির মাঠে বছর দুয়েক হল একটা বড় পেপার মিল হয়েছে। সেই মিলটা দেখে ছেলে দুটো কোত্থেকে ইটপাথর জুটিয়ে এনে সাজিয়ে গেঁথে এক মানুষ উঁচু একটা নকল কারখানা বানিয়েছে। তার মাথায় ক্যানেস্তারা পিটিয়ে একটা চোঙা বসিয়েছে। শীতকাল। শুকনো কাঠকুটোর অভাব নেই। খেপে খেপে আগুন জ্বালিয়েই চলছে। সেদিন প্রতিবেশী গোবিন্দ হাতা, সেটেলমেন্ট অফিসের কেরানি, সুপুরী কিনতে এসে বলেছিল, 'বাহ্, খাসা বানিয়েছে তো। বড় হলে দেখো শচী ছেলে দুটো নির্ঘাৎ ইঞ্জিনীয়ার হবে।'—গোবিন্দ হাতার কথার খোঁচটুকু ধরার মত বুদ্ধি ঘটে আছে শচীনাথের। ইঞ্জিনীয়ার! লেখাপড়ায় লবডংকা। অনেক কেৎরে-কুৎরে দু-তিন সাবজেক্টে ডাব মেরে এবার ক্লাসে উঠেছে। শালার ব্যাটা শালা। তোদের বাপ কি পড়াশুনোয় খারাপ ছিল! দেখছিস না তার হাল। শুধু ধ্যাষ্টামো করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন কেবল নিজের হাত নিজেই কামড়াচ্ছে।

শচীনাথ ছুটে ছাঁচতলায় গিয়ে ছেলে দুটোর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে উঠোনে নিয়ে এসেছিল। তনু ছোট, কাঁপছিল চড়াইছানার মত। রক্ত আমাশায় সাইভোগা ভুগে গোকুল মাস্টারের হোমিওপ্যাথি বড়ি খেয়ে কদিন হল অন্নপথ্য করেছে। মারবার মত জায়গা ছিল না শরীরে। তনুকে ছেড়ে দিয়ে অনুকে ধরেছিল শচীনাথ। রান্নাঘর থেকে ততক্ষণে বেলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। এলোপাথাড়ি ঘুসি-লাথি চালিয়ে শেষটায় ছেলেকে শুইয়ে ফেলে মাটিতে মুখ ঠেসে ধরেছিল। বেলা একটা কথাও বলে নি। ও ওই ধারার। তনু হবার পর থেকে মেয়েলি অসুখে ভুগে ভুগে আরো দ' মেরে গেছে। মরামাছের মত অর্থহীন চোখের চাউনি। দেখলে মনে হয়, কেউ যেন ওর ভেতর থেকে শাঁসটুকু বের করে নিয়েছে। ভালতে মন্দতে একই রকম।

রাস্তার দুধারে থলকলমি কিংবা বাবলার বেড়া। তার ওধারে নিচু নিচু মেটে ঘর। মুরগীর ছানা পগারে নেমে ময়লা খুঁটে খাচ্ছে। উঠোনের এক কোণে ছাগল খুঁটোয় বাঁধা। কোথাও বলদের মুখ জাবনায় ঢোকানো। খাটিয়ায় বসে আড় ভাঙছে মরদেরা। দাওয়ায় কঞ্চিবেড়ার চিকের ওধারে আগুন লকলকাচ্ছে। এই জাড়েও ন্যাংটো বাচ্চাগুলো মাটিতে হুটোপুটি খাচ্ছে। কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশ আছে এরা। ভাবল শচীনাথ। জুটল খেল, নইলে হরিমটর। আর টেঁসে গেল তো আপদ বালাই। ভূতভবিষ্যৎ নিয়ে যত ভাবনা তাদের। ভদ্রলোকদের।

শনিবার। উদয়ন সংঘের মাঠে মোরগের লড়াইর আসর বসেছে। চলবে বিকেল অবধি। পেপার মিল, চালের স্মাগলিং, সরকারী জংগল থেকে শালবীজ চুরি করা, ক্যানেলের কাজ—ঝালবনির কিছু কিছু সাঁওতাল লোধা আজকাল কাঁচা পয়সার মুখ দেখছে। এখন তো ওদেরই কাপ্তানী করার দিন।

মাঠ জুড়ে হরেকরকম মোরগের চেল্লাচেল্লি। রাস্তার ধারে খাটিয়ায় চাদর বিছিয়ে, কেরাসিন কাঠের বাসক উপুড় করে পসার সাজানো হয়েছে। ছোলাসেদ্ধ, তেলেভাজা, ডালা মিষ্টি, পানবিড়ি ইত্যাদি। ক্যানেলের ধার ঘেঁষে রাম্মাবুড়োর খড়ো ঝুপড়ির কাছে কিছু লোকের জটলা। পচাই গিলছে। কৌতূহল চাপতে পারল না শচীনাথ। গুটি গুটি মাঠে নেমে পড়ে এক সময় সুড়ুৎ করে ভিড়ের ভেতর সেঁধিয়ে গেল।

মাঠের মাঝখানে কিছুটা জায়গা জুড়ে লড়াই চলছে। একজন একটা খেজুরের শুকনো ডাল নেড়ে চারপাশ ঘুরে ঘুরে লোক হটাচ্ছিল। হঠাৎ একটা [illegible]

লাল হলুদ কালোর ছোপ। রে.গাটে, ঢ্যাঙা। আরেকটা সাদা, লাল ঝুঁটি। তুলনায় বেঁটে হলেও তাগড়াই। নিচে নামিয়ে দিতেই খয়েরীটা মাটি আঁচড়ে মালিকের হাত থেকে ছিটকে বেরুতে চাইল। সাদাটা কিন্তু নির্বিকার। মাথা গোঁজ করে চোখের লালচে পর্দা সরিয়ে খয়েরীটার দিকে ধারালো দৃষ্টি ফেলে গলা দোলাচ্ছে।

'হে-ই—ই—স—স।' অদ্ভুত একটা জান্তব শব্দ। মোরগ দুটোকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে মুহূর্তের মধ্যে দমচাপা নীরবতা নেমে এল। খয়েরীটা ছুটে এসে মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। সাদাটা স্বস্থানে। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। খয়েরীটা ধীরে ধীরে পাতাবাহারের মত পাখনা দুটো মেলে দিচ্ছে। শচীনাথের বুকের ভেতর রক্ত দাপিয়ে উঠল। উত্তেজনায় শিরদাঁড়া নুয়ে আসতে দু হাতের তালু দিয়ে হাঁটুর মুড়ো দুটো চেপে ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল সে।

'কক্—কক্—কক্।' সাদাটা বিশ্রি ডেকে উঠল। ওর চোখ দুটো বড় সাইজের কাচের গুলির মত ঠিকরে বেরুতে চাইছে। গলার চার পাশের আঁশগুলো ফুলতে ফুলতে একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকা ফুল হয়ে উঠল। ঝুঁটিটা মাছের লেজের মত নড়ছে। দেখতে দেখতে এক এক করে অনেকগুলি হাত বর্শাফলকের মত শূন্যে উঠে যাচ্ছে। হাতের মুঠোয় টাকা, কাগজের নোট। বিশৃংখল এলোমেলো চিৎকার ফণা তুলল: 'ধবা, ধবা... ঝিংঝরা, ঝিংঝরা...

খয়েরীটা লাফ দিতে ওর পায়ের তলার বাঁকানো ছুরির ফলাটা ঝলসে উঠল। শচীনাথ আর স্থির থাকতে পারল না। ভেতর কণ্ঠনালী থেকে একটা শব্দের দলা ছিটকে বেরিয়ে এল : 'মার, মার, শালাকে'। সাদাটা নিমেষে খয়েরীটার তলা দিয়ে মাঠের অন্য প্রান্তে ছুটে চলে গেলে চিৎকার ক্ষণিকের জন্য শান্ত হল। পাশ থেকে কে যেন বলল, 'কি শচীদা, ধরবে নাকি বাজী। দু' টাকা।'—নিজের মধ্যে ফিরে আসতে শচীনাথ দেখল হামরু। লোধাবস্তীর ছেলে। ওর বাপ সুখা নাম করা সিঁধেল চোর। হামরুর গায়ে চক্‌রা বক্‌রা পলিয়েস্টারের জামা, ডান হাতে ঘড়ি, তেড়িকাটা চুল। কিছুদিন হল পেপারমিলের গেটম্যান হয়েছে।

'না', ভুরু কোঁচকাল শচীনাথ। কবে থেকে সে হামরুর দাদা বনে গেছে জানে না। বলল দায় সারা, 'এই এমনি একটু দেখতে এসেছি।' ফের মোরগ দুটো মুখোমুখি হয়েছে। এবার খয়েরীটা লাফিয়ে উঠবার আগেই সাদাটা ধাঁ করে ডান পা তুলে দিল ওর গলায়। হায় হায় করে উঠল শচীনাথ। খেল খেতম। খয়েরীটা মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর গলা দিয়ে চলকে চলকে বেরিয়ে আসছে রক্ত। মাটি ভিজে যাচ্ছে। হামরু ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে। শচীনাথ ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। একটা পলকা গাছের মত কাঁপছিল সে।

ক্যানেল ছাড়িয়ে তেরাস্তার মোড়ে ইউনিয়ন বোর্ডের টিউবওয়েল। পাশে গোকুল মাস্টারের মাঠকোঠা। সেখান থেকে ডাইনে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে দিবানাথের বাগানবাড়ি। খবরটা সকালেই কানে এসেছে শচীনাথের। অনুর মারফত। দাদা বউদি ইস্পাতে এসেছে। যেমন আসে প্রায়ই। সংগে রবীনবাবু, এবার বউবাচ্চা নিয়ে। রবীনবাবুর কলকাতায় ব্যবসা-ট্যবসা আছে। দিবানাথের প্রতিবেশী। সজ্জন মানুষ। এর আগেও এসেছেন এখানে বার কয়েক।

দিবানাথের ইচ্ছেতেই শচীনাথের ঝালবনিতে আসা। দ্বিতীয় পক্ষের বউ বেলাকে নিয়ে। দিবানাথ কম চেষ্টা করেনি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বেশ কয়েক বছর হোড্ডা হোড্ডা করার পর ভাইকে তারাতলার এক এনামেল ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। প্রথম দু বছর অ্যাপ্রেনটিস্। তারপর পাকা কাজ। এতদিনে মাইনে সাত আট শ' টাকা হয়ে যেত। কপালের লিখন খণ্ডাবে কে। দাদা সাহেব কোম্পানীর মস্ত বড় চাকুরে। তখন শচীনাথের মালা কত। কয়েক মাস কাজ করার পর একদিন বউদিকে জানিয়ে দিল : 'সাত আট ঘণ্টা মেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা। ভীষণ খাটুনি। এ কাজ আমার পোষাচ্ছে না।' দিবানাথ হাল ছাড়েনি। ছাড়লে ধরবেই বা কে। অপোগণ্ড ভাইকে এক সিমেন্টের গোডাউনে বাঁধা মাইনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই সংগে বিয়ে দিয়ে সোনারপুরে [illegible] কাঠা জমির ওপর দু' কামরার টালির ঘর তৈরি করে আলাদা করে দিয়েছি... এবার আরো কেলো। প্রথম পক্ষের বউ শেফালী দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি গিয়ে আর ফিরল না। তার কিছুদিন বাদে চাকরিটাও খোয়াল শচীনাথ। তখনই ঝালবনির বাগানবাড়ি কেনে দিবানাথ: দালান সমেত একলপ্তে বাহান্ন বিঘা জমি। সেই সময় তার মাথায় বুদ্ধিটা খেলে। ঝালবনির উত্তর পাড়ায় তখন সিকদাররাও জমি বেচছে। সেই সুযোগে ভাইয়ের জন্য বিঘা পঁচিশেক জমি কিনে ফেলে দিবানাথ। একটা মাটির বাড়িসুদ্ধ। তারপর ফের ভাইকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসে এখানে।

গোকুল মাস্টারের মাঠকোঠার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল শচীনাথ। কান পাতল। মাস্টারের বউ দীপ্তি গান গাইছে। সপ্তাহে একদিন করে টাউনে গিয়ে সঙ্গীতবীথিতে গান শিখে আসে। তাও নিজের চেষ্টায়। ভারি মিষ্টি আর সুরেলা গলা দীপ্তির। শচীনাথ কতদিন বলেছে মাস্টারকে। কলকাতায় গিয়ে রেডিও স্টেশনে অডিশন দিয়ে আসতে। বনবাদাড়ে এ গলার মাহাত্ম্য কে বুঝবে। মাস্টার গাছাড়া মানুষ। কানে তোলেনি কথাটা। তিন মেয়ের বাপ। সংসারের কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চায় না। উড়ুনচণ্ডে স্বভাবের। নইলে প্রাইমারি স্কুলের টীচারি, টুকটাক হোমিওপ্যাথি, মাঝে মধ্যে এর দলিল ওর কোবালা লিখে যা রোজগার করে তাতে একটু বিষয়বুদ্ধি থাকলে ঢের সুখে থাকতে পারত মাস্টার।

'মন্দিরে মোর নিশি হল ভোর...।' চারপাশে ঘন গাছগাছালি। সুনসান রাস্তায় ধুলো আর শুকনো পাতার ওড়াউড়ি। শীত দুপুরের রোদে চারদিক কেমন মায়াময়। আবেশে চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠছিল শচীনাথের। শেফালীও নাকি ভাল গান গাইত। ওকে প্রথমবার দেখে এসে বউদি গলার সুখ্যাতি করেছিল। শচীনাথ অবশ্য শেফালীর গান শোনেনি। মানে শোনার মত সুযোগ ঘটেনি। শুভ-
[illegible] বেঁকিয়ে দুই ভুরু জোড়া করেছিল তা আর খোলেনি

কখনো। তারপর ধ্যসরজমি, ফুলশয্যা। স্মৃতি খুবই তিক্ত। যতবার শচীনাথ এগিয়ে গেছে ততবারই নিস্ক্রিয় করে দিয়েছে মুহূর্তগুলো। সে লম্বা, ঢ্যাঙা, গায়ের রঙ মিশকালো, মাথার মাঝখানে কুমড়োকে লুচির মত টাক, দাঁতাল হাসি—এ সবই কি শেফালীর অপছন্দের কারণ ছিল। না, তার কথায় আদু আদু ভাব আছে বলে! এতদিনেও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি শচীনাথ।

'ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং...।' সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ। গোকুল মাস্টার স্কুল থেকে ফিরছে। শচীনাথের সামনের দিকে এগিয়ে এসে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে বলল, 'ভরদুপুরে আড়াল থেকে পরস্ত্রীর গান শোনা, এত ভাল কথা নয় শচীবাবু। ভেতরে চলুন—'

'না, আজ আর যাব না।' হাসল শচীনাথ।

'আরে, চলুন না মশাই। আপনার সুবাদে আমারও এক কাপ চা জুটবে।'—গোকুল মাস্টার সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

তাড়াহুড়ো করে বাড়িতে কি গিলেছে খেয়াল নেই শচীনাথের। এ সময় পেটে একটু গরম চা পড়লে মন্দ হয় না। কিন্তু দিবানাথের সংগে কিছু জরুরী কথা আছে তার। বলি বলি করেও বলা হচ্ছে না। লোভ সামলাল সে, 'একটু কাজ আছে। আরেক দিন আসব।'

ফের কুমড়োর চাষে নেমে পড়ার ইচ্ছে মাস কয়েক হল চাগাড় দিচ্ছে শচীনাথের ভাবনায়। ঝালবনির মাটির তুলনা নেই। ঠিকমত তত্ত্বাবধান করতে পারলে বারো চোদ্দ কেজির কুমড়ো দেদার ফলানো যায়। আগেও ফলিয়েছে সে। ঝামেলা একটাই। উটকো গরু ছাগল আর চোরের উপদ্রব। সেই বয়স আর নেই যে দিনের পর দিন রাত জেগে খেত পাহারা দেবে। এর জন্যে দরকার চারদিকে ভাল করে বেড়া দেওয়া। বিঘা তিনেক জমি ঘিরতে কম করে হাজার খানেক টাকা লাগে। বেশ কিছুদিন ধরেই পাঁয়তাড়া কষছে শচীনাথ। এ ব্যাপারে বেলার ঘোরতর আপত্তি। বলে, কত আর বলবে দাদাকে। বাড়ির দক্ষিণে মজা গোঁতার পয়কস্তী জমি কিনে সেখানে ধান চাষের জন্য সার জোগানো, দোকানে টাকা ঢালা, বাড়ির ভিৎ পাকা করে দেওয়া—দিবানাথ ভাইয়ের পেছনে কম পয়সা খরচ করেনি। এসব কথার উত্তর যে শচীনাথের জানা নেই তা নয়। ইনকিউবেটর এনে ডিম ফুটিয়ে পোলট্রি করা, মধুর চাষ, ডাহিতে জমি কিনে পাম্পসেট বসানো মায় ট্রাক্টর কেনা—দাদাও পনের বছরে যথেষ্ট পয়সা উড়িয়েছে। কিন্তু হলটা কি। লাভের গুড় সব পিঁপড়ের গর্তে গেছে। এখনো যাচ্ছে। মুনিষ হরি আর সুধন্যার পেছনে। কিন্তু এসব কথা বলবে কে। বললেও শুনতে বয়ে গেছে দিবানাথের। নিজের রোজগারের টাকা। তা সে যেমন করেই ওড়াক না কেন তাতে অন্যের কি।

কাঠের গেট ছাড়িয়ে সোজা এগুলে দালান। দালানের সামনে এবং ডাইনে চওড়া বারান্দা। চেকনাই গ্রীলে ঘেরা। এসব নতুন করেছে দিবানাথ। রাস্তা থেকেই শচীনাথ দেখল বারান্দার সিঁড়ির ধাপে পা ছড়িয়ে বসে আছে বউদি। পাশে এক ভদ্রমহিলা। সম্ভবত রবীনবাবুর স্ত্রী। বউদির খোলা চুল। ভাতঘুমে টসটসে চোখ। দু' ছেলেই পাসটাস করে চাকরি করছে। ঝাড়া হাত পা। মাসে বার দুয়েক কলকাতা ঝালবনি করছে। সংগে কেউ না কেউ আসছে। বেশ ফুর্তিতে সময় কাটাচ্ছে বউদি।

ভেতরে ঢুকে লজ্জায় সিঁটিয়ে উঠল শচীনাথ। পায়ে হাওয়াই, গোড়ালি অবধি ধুলো। পরনে লুঙ্গি আর নোংরা চাদর। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বকে বকে হয়রান বেলা। বউদি বলে : 'মিছিমিছি এক কথা বলে মুখ নষ্ট করছ কেন বেলা। ঠাকুরপোকে তো ছেলেবেলা থেকে চিনি। বরাবর একই রকমের।' ফিটফাট হয়ে থাকা, সত্যি তার স্বভাবে নেই। তাই বউদির কথায় রাগ করে না শচীনাথ, বরং হাসে।

'দাদা কোথায়?' প্রশ্ন করতে গিয়ে ঢোক গিলল শচীনাথ। সেই সুযোগে এক ঝলক দেখে নিল রবীনবাবুর বউকে। দেখতে এমন কিছু আহামরি নয়। রঙ চাপা, বেঁটে। গা ভরে গয়না। একটা দামী সিল্কের শাড়ি পরনে। যা সাজগোজের বহর। এরকম থাকতে পারলে বেলাকেও ওর চেয়ে খারাপ দেখাত না।

'বাগানে।' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর করে বউদি ফের রবীনবাবুর বউর সংগে বকর-বকর করতে লাগল। সাদা চোখে, একটা গা-বাঁচানো ভাব দেখালেও বউদি মানুষ নেহাত খারাপ নয়। অল্পবিস্তর সবদিকেই নজর আছে। এসে বেলার খবর নেয়। ছেলেদের পড়াশুনো কদ্দুর এগুচ্ছে জানতে চায়। ভালটা-মন্দটা রাঁধলে সুধন্যাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

দালানের ডাইনে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে নিকোনো উঠোন। উঠোনের পাশের খোলা ভিটেয় সেদ্ধধান শুকোচ্ছে। ভিটের ওধারে ইঁদারা। ভটভট শব্দে পাম্পে জল উঠছে। তারপর সবজি খেত। পেছন দিকে বিরাট বাগান। উঠোনে রবীনবাবুর দুই মেয়ে, গায়ে রঙদার সোয়েটার, মাথায় সাদা চওড়া ফিতের ফেটি, আপেলের মত টুসটুসে লাল গাল। বেশ দেখতে। ওরা প্রেমসে নাচানাচি করছিল। মনে মনে ভিরকুটি কাটল শচীনাথ। খুব মজা, তাই নয়। শহরে পাকা বাড়িতে ফ্যানের হাওয়ায় গদী আঁটা স্প্রিংয়ের বিছানায় শুয়ে গড়িয়ে মানুষ। কাজের মধ্যে শুধু পড়াশুনো। তাও পেছনে প্রাইভেট টিউটর। ভাল খাওয়া-দাওয়া। পড়তে এই বনবাদাড়ে। ঘুচে যেত সব জারিজুরি।

বাগানের সামনে লেবু ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি সব যেন বোঝাচ্ছিল দিবানাথ। রবীনবাবু এক মনে তার কথা শুনছিলেন। আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিলেন। দেখে উষ্ণ হয়ে উঠল শচীনাথ। হবারই কথা। দাদার মত চৌকশ, বিত্তবান, বিবেচক কজন আছে।

শচীনাথকে দেখতে পেয়ে রবীনবাবু বলে উঠলেন, "আরে, শচীদা যে। এতক্ষণে এলেন?'

'একটা জরুরী কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।' মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল। এগিয়ে আসতে আসতে বলল শচীনাথ। দিবানাথের অতিথি অভ্যাগতদের সংগে আজকাল সে সমঝে কথা বলে। এ ব্যাপারে শুধু যে বেলা তাকে সতর্ক করে দিয়েছে তা নয়, শচীনাথ নিজেও বুঝতে শিখেছে—উল্টোপাল্টা বেফাঁস কিছু বলে ফেললে দিবানাথের সম্মান নষ্ট হবার ভয় রয়েছে। নইলে অনেক আগেই আসতে পারত সে। সকালে গাড়িতে এসেছে ওরা। আসার ধকল। তারপর খাওয়া-দাওয়া, জিরেনোর জন্য সময় না দিয়ে সে হুট করে চলে এলে দিবানাথ হয়ত বিরক্ত হত।

হরি হেঁসো হাতে বাগানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দিবাকর ওর সংগে জমিখেত নিয়ে কথাবার্তা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আসলে ভাইকে দেখলে দিবানাথ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। শচীনাথও তাই। যা কথাবার্তা বউদির মারফত হয়।

'যাবেন নাকি একবার আমাদের ওদিকে?' খাটো গলায় বলল শচীনাথ।

'নিশ্চয়ই', ফস করে গ্যাসলাইটার জ্বালিয়ে নীলচে আলোয় সিগারেট ধরালেন রবীনবাবু, 'আপনার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি।' দিবানাথ প্র্যাকটিকাল মানুষ। কেজো কথার বাইরে বাক্যব্যয় করে না। দেখার মত অবশ্য তেমন কিছু নেই ঝাল-বনিতে। তবু উইক এণ্ড কাটাতে এসে ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে বরং ঝোপ জংগল গাছপালা ঘুরে ঘুরে দেখার মধ্যে একটা রোমান্স আছে। উপরন্তু কিছুক্ষণের সংগী হিসেবে শচীনাথ মন্দ নয়। গেঁয়ো সাদা সরল লোক। মজা করে কথা বলে।

দিবানাথ হরিকে নিয়ে সবজি খেতের দিকে যাচ্ছে। ওরা দুজন উঠোন পেরিয়ে সামনের দিকে এল। রবীনবাবুর বউকে দেখা গেল না। হয়ত ঘরে। মুখে স্নো-পাউডার ঘষছে। বউদি চুল আঁচড়াচ্ছিল। বলল, 'কাল একবার বেলাকে পাঠিয়ে দিও ঠাকুরপো। তোমার দাদা ওর জন্য একটা তাঁতের শাড়ি এনেছে।'

'আচ্ছা।' মাথা নাড়ল শচীনাথ।

কাল সকালের দিকে হাটবাজার নিয়ে ব্যস্ততা। বিকেলের ইস্পাতে এরা সবাই চলে যাচ্ছে। গতবার আভাস দিয়ে রেখেছিল শচীনাথ। আজ যে করেই হোক রবীন-বাবুকে আশু হালদারের বসত জমি দেখাতে হবে। পথ তো কম নয়। এদিকে শীতের বেলা, বুনো মোষের মত ছোটে, রোদের রঙ কালচে হয়ে উঠছে। রাস্তায় নেমে মেজাজটা টকে গেল শচীনাথের।

আশু হালদারের প্লট শচীনাথের পাশেই। মহা খচড়া বদ মেজাজী লোক। গত বর্ষায় এক অমাবস্যার রাতে বউটাকে মেরে কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে ঘুষঘাষ দিয়ে পুলিসের মুখ বন্ধ করে। তারপর বাচ্চাগুলোকে শ্বশুর বাড়িতে পাচার করে সাঁওতাল পাড়ার ডবকা ছুঁড়ি পরীর সংগে লটরপটর চালাচ্ছে। খুব বাজে লোক। ছুতোনাতায় বাড়িতে চড়াও হয়ে মুখ খিস্তি করে। কিছুদিন আগে ওর পেয়ারা বাগানে ঢুকে তলা থেকে দুটো ফল কুড়োতে গেলে অনুকে লাঠিপেটা করেছিল। বউটাকে খুন করার পর থেকেই শচীনাথকে বলছে : 'দাও না শচী, একটা ভাল খদ্দের জুটিয়ে। জংগল আর ভাল লাগছে না।' আসল ধান্ধা এখানকার সব ফুঁকে দিয়ে পরীকে নিয়ে টাউনে কেটে পড়া। হকের সম্পত্তি তো নয়। ব্যাটার বাপ ছিল শালতোড়ের রাজাদের পাইক। লাঠিবাজি করে হাতানো জমি। তা সে যাই হোক, রবীনবাবু মালদার পার্টি, পটিয়ে-পাটিয়ে রাজী করাতে পারলে আখেরে শচী-নাথেরই লাভ। দুর্জন প্রতিবেশী নিকেশ হবে। সেই সংগে এই আতান্তরে দেখা শোনার সুবাদে দু' দশটা ফল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ঘরে তোলা যাবে।

নীলকুঠির ঢিবি ছাড়িয়ে শর্টকার্ট করে সোঁতার দিক থেকে ওরা আশু হালদারের জমিতে উঠল। সামনেই মস্ত বাঁশ ঝাড়। বাঁয়ে শচীনাথের ধান জমি। শচীনাথের আফসোস উথলে উঠল। কুড়েমি করে চাষ ছেড়ে দিয়ে জমিটা বর্গা দিয়েছিল পঞ্চানন কাহারকে। তিন বছর আগে। এখন ব্যাটা বছরে দশ মণ ধানও দেয় না। জল নেই, সারের দাম বাড়ছে—ধানাই পানাই অজুহাত দেখায়। কিছু করারও নেই। দেশের আইন-কানুন পাল্টাচ্ছে। জমির ওপর চাষীর স্বত্ব বাড়ছে দিনে দিনে।

আশু হালদার বাড়িতে ছিল না। শচীনাথ ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছিল রবীন-বাবুকে। বাঁশঝাড় থেকে বছরে অন্তত দু শো বাঁশ বিক্রি করা যাবে। কাঁঠালের ফলন, চাক্ষুষ না দেখলে প্রত্যয় হবার নয়, মাটি থেকে ডগা পর্যন্ত। পেয়ারা বাগানটা দেখার মত। কুল গাছ অনেকগুলো। আম গাছ সংখ্যায় আটটা হলে কি হবে, সব ভাল জাতের। হিমসাগর ল্যাংড়া ভুতোবোম্বাই।

বুকের ভেতরটা মোচড়ে উঠল শচীনাথের। সবচেয়ে আহাম্মকী হয়েছে সাতাশ শ' টাকায় পনেরটা আমগাছ টাউনের কাঠের কারবারি মতি সাউকে বেচে দেওয়াটা। ঝালবনির মাটিতে সোনা আছে ঠিকই, কিন্তু সে মাটি বড় খামখেয়ালি। ধৈর্য ধরতে না পারলে সর্বনাশ। পর পর তিনটে বছর একটা বউলও ধরল না গাছ-গুলোয়, হাতখালি, রেগেমেগে শচীনাথ বাগান সাফ করে দিল। তার পরের বছর থেকেই সে কি ফলন। পাতার চেয়ে আম বেশি। ঝালবনির সবাই যখন আম বেচে দুটো পয়সার মুখ দেখছে তখন সে পেটে গামছা বেঁধে দাপাচ্ছে।

শেষের দিকটায় রবীনবাবু অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সন্ধ্যা উৎরে যাচ্ছে। আজ আর নয় শচীনদা। কাল সকালের দিকে এসে আবার দেখা যাবে।'

বাড়ির সামনের দিকের ঘরটায় দোকান। ঝাঁপ আধখোলা ছিল। ভেতরে টেমি জ্বলছে। দোকান না ছাই। দিনে পাঁচটা টাকাও বিক্রি হয় না। ভদ্রলোকেরা সব টাউন থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে নিয়ে আসে। খদ্দের বাগাল সাঁওতাল-লোধারা, যত গরীব-গুরবো। দশ পয়সার তেল চার পয়সার পান দু পয়সার নুন এই সব আর কি

চারদিকে ভালুকে অন্ধকার নামছে। সেবার শাতে বেড়াতে এসে পথে শিয়রচাঁদার লেজ মাড়িয়ে দেবার পর থেকেই রবীনবাবুর সাপের ভয় বেড়ে গেছে। ব্যাটারা সূর্য ডোবার আগেই পথের বালি কাঁকরের নীচে সেঁধিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। বললেন, 'আজ আর ভেতরে যাব না। আপনি বরং পারলে সিগারেট দিন।'

অনু তনুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। পিনপিনে শব্দে ট্রানজিস্টারে হিন্দী গান বাজছিল। আশু হালদারের বউ মারা যাবার পর থেকে সন্ধ্যে হলেই বেলা ভূতের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে।

দোকানের সামনে এসে গলা চড়িয়ে ডাকল শচীনাথ, 'কই গো, রবীনবাবু এসেছেন। ক' প্যাকেট চারমিনার আছে দেখো তো।'

সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় নামলেন রবীনবাবু। বাগালপাড়া অবধি শচীনাথ তার পেছু নিল। অনেক করে বোঝাল। কুড়ি হাজার টাকা। জলের দাম। ফলপাকুড় থেকে হাতে যা আসবে তাতে চার পাঁচ বছরের মধ্যেই আসল টাকাটা পকেটে উঠবে।

রবীনবাবু টর্চের আলো ফেলে সতর্ক পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বলেছিলেন, 'এবার কলকাতার গিয়ে ওয়াইফের সংগে কথা বলেই আপনাকে পাকা চিঠি দেব।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ', লাঠি দিয়ে রাস্তার ধুলো সরাতে সরাতে মাথা নেড়েছিল শচীনাথ, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন কিনে নিন মশাই। আশপাশের সকলের জমিটার ওপর খুব লোভ।'

সারা দিনের ক্লান্তি। বকে বকে মুখ ব্যথা হয়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে ভেতরের বারান্দায় উঠল শচীনাথ। কেরাসিন আক্রা। তবু আবার ভোর ভোর উঠতে হবে। গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'ভাত বাড়ো।'

বেলা রান্নাঘরেই ছিল। পিঁড়ি পেতে বসে পড়ে শচীনাথ শুধোল, 'ছেলে দুটো কই?'

ভাতের থালা এগিয়ে দিল বেলা, 'তনুর খাওয়া হয়ে গেছে।'

'অনু খাবে না?' তরকারির বাটি টেনে নিল শচীনাথ।

'না, ওর বিকেল থেকে জ্বর। দেরকোর ওপর টেমি জ্বলছে। বেলাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। ও ঝিমুতে ঝিমুতে বলল।

ডাল ভাত আলু কুমড়োর ঘণ্ট সব একসাথে চটকে নিয়ে বড় বড় গরাস মুখে তুলতে লাগল শচীনাথ।

পর পর দুটো খাট। জোড়া করা। লেপ একটাই। অনু তনু সেটার ভেতর জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল শচীনাথ। এবারেও দাদাকে কথাটা বলা গেল না। ওদের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ার আগে অনুর কপালে হাত রাখতে বুকের ভেতর হিমেল হাওয়ার ঝাপটা বয়ে গেল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটার। এমনিতে রাগটাগ নেই শচীনাথের। কিন্তু হলে সে চণ্ডাল। চিন্তাটা আরো গভীরে চারিয়ে যেতে লাগল। কাল ভোরে ওকে নিয়ে বাজারে যাওয়া হবে না। একলা মানুষ। বেলগুলো বিক্রি আর টুকিটাকি কেনাকাটা, একলা সবদিক সামলানো দায় হয়ে উঠবে। বেলা ঠিকই বলে : 'প্রায়ই যদি বাজারে গিয়ে স্কুল কামাই করে তা হলে পড়াশুনো কি করে হবে ছেলেটার।'

বেলা বারান্দায়। এঁটোকাঁটা ধুচ্ছে। তনুর বাইরে বেরিয়ে থাকা হাতটা লেপের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে গোকুল মাস্টারের কথা মনে পড়ে গেল শচীনাথের। মাস্টার বলেছিল : 'রক্ত আমাশা, বিশ্রী রোগ। শরীরের সব রক্ত বের করে দেয়। পারলে একটু সিংমাছের ঝোল খাওয়াবেন।' এক আধ দিন মাছের বাজারে ঢুকে দর করেছে শচীনাথ। কিলো চোদ্দ টাকা।

হ্যারিকেনের আলো ডিম করে পাশে এসে একটা হাই ছাড়ল বেলা। ঘরটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে উঠছে। শুধু চালের বাতায় এক পরত আলো ছটফট করছে।

শচীনাথ বলল, 'বুঝলে, এবার যা ভাবগতিক দেখলাম—মনে হচ্ছে রবীনবাবু আশু হালদারের বসতজমি কিনে ফেলবে।'

'হুঁ।' দায়সারা বলে কাঁথা টেনে নিয়ে কোলকুঁজো মেরে শুয়ে পড়ল বেলা।

'না, মানে, যদি কেনে তো—', কথায় জোর পেল না শচীনাথ।

কিছুক্ষণের নীরবতা। আলোর পরতটুকু মুছে গেছে। পাশ ফিরল শচীনাথ। বলল, চাপা গলায়, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না কেন?'—নড়েচড়ে উঠল বেলা।

'দাদা তোমার জন্য একটা দামী তাঁতের শাড়ি কিনে এনেছে', বেলার কাঁথার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল শচীনাথ, 'সকালের দিকেই যেয়ো কিন্তু। ওরা আবার বিকেলের গাড়িতেই ফিরে যাচ্ছে—'

'ওহ্।' একটা তীক্ষ্ণ কাতরোক্তিতে শচীনাথের কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। বেল কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত তার বুক। তবু সে আস্তে আস্তে দু' হাত দিয়ে বেলাকে কাছে টেনে নিল। বেলার চোখে জল, শীর্ণ দেহটা কাঁপছে থর থর করে। শচীনাথ জানে—এই কাতরোক্তি কোন শারীরিক কষ্ট থেকে নয়। বেলা একটা ছবি আঁকছিল মনে মনে। সেই ছবিটা এই হিম অন্ধকারেও শচীনাথ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

কাল সকাল। ও বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেলা। ঘোমটায় ঢাকা মুখ। মাথা নিচু করে শুধু শাঁখা পরা রোগাটে কাঁপা কাঁপা ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিবানাথের

কণ্টকাকল্পিত
অতুল্য ঘোষ

॥ ৬০ ॥

বিশের দশকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে খুব মতান্তর হয়েছিল। যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন তাঁদের অভিহিত করা হত 'নো-চেঞ্জার' বলে, আর যাঁরা প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে ছিলেন তাঁদের বলা হত 'প্রো-চেঞ্জার'। দেশবন্ধু এবং মতিলালের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয়। পরে অবশ্য কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানো হবে। ১৯৩০এর আন্দোলনের প্রাক্কালে কংগ্রেস পক্ষীয় সমস্ত আইনসভার সদস্য পদত্যাগ করেন। তারপর ১৯৩৭এর নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ থেকে আবার প্রার্থী দাঁড় করানো হয়। ১৯৩৬এ ফৈজপুরে কংগ্রেস হয়। সেখানে মোটামুটি বোঝা যায় যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠনে দ্বিধা আছে। সেইজন্য ফৈজপুরে কংগ্রেসে স্থির হয় যে, কংগ্রেস পক্ষে নির্বাচিত সব সদস্যদের নিয়ে একটি কনভেনশন হবে। দিল্লীতে ১৯৩৭এ ১৯ এবং ২০ মার্চ কনভেনশন হয় এবং সেই কনভেনশনে প্রথমেই উপস্থিত সব সদস্যরা নিম্নলিখিত শপথবাক্য পাঠ করেন :

'I, a member of this All-India Convention, pledge myself to the service of India and to work in the legislature and outside for the independence of India and for ending the exploitation and poverty of her people. I pledge myself to work under the discipline of the Congress for the furtherance of Congress ideals and objective to the end that India may be free and independent and her millions freed from the heavy burdens that they suffer from.'

১৯৩৭এর নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়জয়কার। পাঁচটি প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, বোম্বেতে প্রায় অর্ধেক, আর বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হলেও একক দল হিসেবে সর্ববৃহৎ।

প্রদেশের নাম	আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যা	নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যসংখ্যা
মাদ্রাজ	২১৫	১৫৯
বিহার	১৫২	৯৮
বাংলা	২৫০	৫৪
সি পি	১১২	৭০
বোম্বে	১৭৫	৮৬
ইউ পি	২২৮	১৩৪
পাঞ্জাব	১৭৫	১৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০	১৯
সিন্ধু	৬০	৭
আসাম	১০৮	৩৩
উড়িষ্যা	৬০	৩৬

আর কেন্দ্রীয় আইনসভায় ৯৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সমর্থিতগণ ৫৫টি আসন লাভ করেন। নির্বাচনের ফলাফল দেখে সারা ভারতবর্ষে এক উল্লাসের বন্যা বয়ে যায়। এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন :

'The Committee has therefore come to the conclusion and resolves that Congressmen be permitted to accept office where they may be invited thereto. But it desires to make it clear that office is to be accepted and utilised for the purpose of working, in accordance with the lines laid down in the Congress election manifesto and to further in every possible way, the Congress policy of combating the new Act on the one hand and of prosecuting the constructive programme on the other.

'The Working Committee is confident that it has the support and backing of the A.I.C.C. in this decision and that this resolution is in furtherance of the general policy laid down by the Congress and the A.I.C.C. The Committee would have welcomed the opportunity of taking the direction of the A.I.C.C. in this matter but it is of opinion that delay in taking a decision at this stage would be injurious to the country's interest and would create confusion in the public mind at a time when prompt and decisive action is necessary.'

এই প্রস্তাব নেওয়ার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। ১৯৩৬এর এপ্রিল মাসে লখনৌতে এ আই সি সি-র অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার জন্য নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ থেকে অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে কোনও মতামত গ্রহণ না করাই বিধেয়। অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটির মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা সম্বন্ধে জুলাই মাসের প্রস্তাব এ আই সি সি-র ২৯, ৩০ ও ৩১ অক্টোবরে '৩৭এর অধিবেশনে সমর্থিত ও গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

প্রদেশের নাম	মন্ত্রী	পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী
বোম্বে	৭	৬
মাদ্রাজ	১০	১০
ইউ পি	৬	১৩
বিহার	৪	৮
সি পি	৭	—
উড়িষ্যা	৩	৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪	—

পরে আসামেও কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না ; বলা হত প্রধানমন্ত্রী। প্রদেশগুলিতে প্রধানমন্ত্রী হন যথাক্রমে :

প্রদেশের নাম	প্রধানমন্ত্রী
বোম্বে	বি জি খের
মাদ্রাজ	চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী
ইউ পি	গোবিন্দবল্লভ পন্থ
বিহার	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
উড়িষ্যা	বিশ্বনাথ দাস
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	ডঃ খান সাহেব
আসাম	গোপীনাথ বড়দলৈ
সি পি	ডঃ এন বি খারে

(ডঃ খারে ১৯৩৮-৩৯এ অপসারিত হন। তাঁর জায়গায় আসেন রবিশঙ্কর শুক্লা।)

এঁদের সকলকেই জানতুম। কয়েকজনের সংগে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শ্রীবিশ্বনাথ দাসের কথা আগেই লিখেছি। শ্রীবিশ্বনাথ দাস, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ বড়দলৈকে আমরা হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে উত্তরপাড়ায় সংবর্ধনা জানাই। সেই সময় সরোজিনী নাইডুও এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার একটি অংশ মনে পড়ছে। বাংলার মহিলাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের মহিলারা সাদা শাড়ি কেন পরেন ? রঙিন শাড়ি পরা উচিত। তুমুল হাস্যরোলের মধ্যে তিনি আরও বলেন যে, তিনি নিজে রঙিন শাড়ি পরেন বলে অনেক পুরুষমানুষ তাঁর কথা শোনেন।

শ্রীবাবু অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। খেতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর খাওয়ার সময়েই তাঁকে ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়া হত। একটা ভাল অভ্যেস ছিল তাঁর, যা অনেকের মধ্যেই নেই। নিয়মিতভাবে বই কিনতেন এবং পড়তেন। দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি—এইসব বিষয়েই আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। স্বল্পভাষী লোক ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও নিরহঙ্কার। কি কারণে জানি না, বিহারে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি প্রবল দল ছিল। এক দিকে শ্রীবাবু, অন্য দিকে শ্রদ্ধেয় অনুগ্রহবাবু। শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ। কারণ জানি না, কিন্তু কেন্দ্র থেকে এঁদের দুজনের পার্থক্য বরাবর জীইয়ে রাখা হয়েছিল। দুজনেরই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবদান প্রচুর। প্রশাসক হিসেবে দুজনেরই নাম ছিল। অথচ তাঁদের মধ্যে যে ভেদ আছে সেটা সব সময়েই প্রকট হয়ে উঠত। আমি শ্রীবাবুর কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছি। দিল্লীতে যখনই গিয়েছেন, আমায় খবর দিয়েছেন এবং আমার বাড়িতেও অনেকবার এসেছেন। রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপার নিয়ে হয়তো মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ; কিন্তু ব্যবহারে কোনও দিন তা প্রকাশ পায়নি। ফজল আলি কমিশন যখন বিহারে ঘুরছিলেন, আমিও তখন বিহারের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। মুখ্যমন্ত্রীরূপে শ্রীবাবু আমার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। যদিও সেই সময়ে আমার বিহারে যাওয়াটা তাঁর মনঃপূত হয়নি।

বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবালাসাহেব খের

দের আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। এবং যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতেন। বোম্বের প্রধানমন্ত্রী হবার ফলে তাঁকে আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়। এরকম ভদ্র, শান্ত, সংযত মানুষ খুব কম দেখা যায়। প্রশাসক হিসেবেও অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন।

শ্রীরবিশঙ্কর শুক্লারও রায়পুরের বাড়িতে গিয়েছি, নাগপুরেও গিয়েছি। আরও অনেক জায়গায় অনেকভাবে তাঁকে দেখেছি। ৮০ বছর বয়স অবধি মুখ্যমন্ত্রিত্ব করেন। যেমন সোজা চেহারা তেমনি কথাবার্তাও ছিল সহজ ও সরল। উনিও বেশ ভাল খেতে পারতেন। আর বৈঠকী গল্প করতে ওঁর জুড়ি খুব কমই ছিল। কথাবার্তায় এত মিষ্ট ও ভদ্র যে, প্রথম আলাপেই মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ত।

রাজাজীর বিষয় সকলেরই জানা। আমি একবার ওঁর ব্যাপারে কি বিপদে পড়েছিলুম তা আগেই 'কণ্টকাকীর্ণপথ'তে লিখেছি। উনি যখন পশ্চিম বাংলায় প্রথম গভর্নর হয়ে আসেন সেই সময়ে সুরেশদা (মজুমদার) ও প্রফুল্লদা (সেন) দুজনে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে একটি চিঠি দেন। চিঠি বহন করে নিয়ে যান অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। চিঠিতে লেখা ছিল যে রাজাজীকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিশেষ পছন্দ করে না। তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য এবং ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে-সমস্ত উক্তি তিনি করেছিলেন তার কোনটাই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য চিঠিতে কোনও কাজ হয়নি। জওহরলাল একান্তভাবেই রাজাজীকে পশ্চিম বাংলায় পাঠাতে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ সম্বন্ধে পূর্বেই অনেক কথা লিখেছি। আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে যে বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন তা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। পার্লামেন্টে তাঁর বক্তৃতাগুলি যেমন সংযত তেমনি তীক্ষ্ণ অথচ রসকষবিহীন ছিল না। বিরুদ্ধপক্ষের তর্কজাল ছিন্ন করার সময় তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা অনেক সময়ে বিরোধী পক্ষও উপভোগ করত। একটা ভুল ধারণা অনেকের মনে আছে যে, ওঁর সব সময়েই মাথা নড়ত। সেটা 'সাইমন কমিশন' বর্জন আন্দোলনে আহত হওয়ার ফল। আহত হয়েছিলেন এটা ঠিকই, কিন্তু সেজন্য মাথা নড়ত না। ওটা ছিল একটা স্নায়বিক ব্যাধি।

ডঃ খান সাহেবের চেয়ে নাম বেশী ছিল আবদুল গফুর খানের। দুই ভাই-ই স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য অনেক নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগ-স্বীকার করেছিলেন। ডঃ খান সাহেবের ক্যাবিনেটে ডঃ চারুচন্দ্র ঘোষ বলে একজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বাড়ি হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রামে। তাঁকে আমরা একবার সংবর্ধনা জানিয়েছিলুম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করার ফলে পাঠান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালীর রসবোধটুকু যায়নি।

শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ মহাশয় অতি শান্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন। যেমন মধুর ব্যবহার, সেই-রকম সাদর অভ্যর্থনা। তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল, নেতা, উপনেতা, সহ-নেতা ও কর্মীর মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য করতেন না।

সবচেয়ে বিস্ময় লাগত যে, প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও এঁদের কারও মাথা খারাপ হয়নি। সকলেই কংগ্রেসের সেবক হিসেবেই জীবনযাপন করতেন এবং প্রতিদিনকার ব্যবহারেও সেটা প্রকাশ পেত। আমাদের মত ছোট কর্মীরাও অসংকোচে সব সময়ে এঁদের কাছে যেতে পারত। মন্ত্রিত্ব যে কোনও কোনও মানুষকে ভয়াবহ করে তুলতে পারে, এঁদের ব্যবহারে কোনও দিন তা লক্ষ করিনি। এঁরা যে শুধু প্রশাসনের কাজ করতেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামও করে যেতে হত। উড়িষ্যার গভর্নর নিয়ে যে সমস্যা উদ্ভূত হয়, শ্রীবিশ্বনাথ দাস মহাশয় তাতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সে ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন সরকারকে অচল করে দেবার একটা সংকল্পও ছিল। আমার মনে হয়, সেই সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ফলে ভারতবর্ষ অনেকগুলি দক্ষ প্রশাসক পেয়েছে।
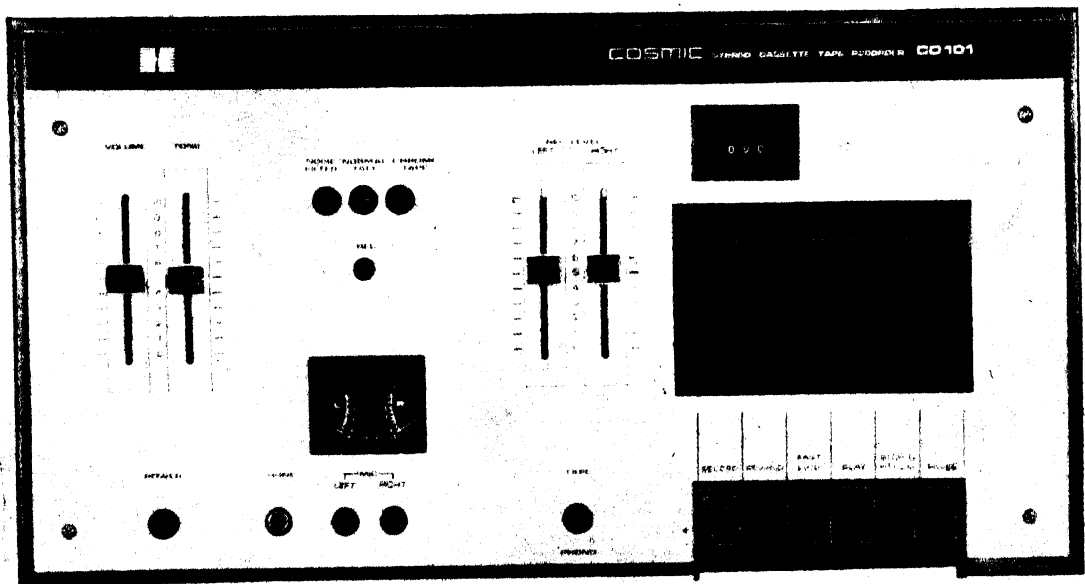
টেনিসে দেশত্যাগী দুই চেক চ্যাম্পিয়ন

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার তিনজন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন। এই তিনজনের মধ্যে দুজনই কিন্তু দেশত্যাগী। ১৯৫৪ সালে জারোস্লাভ ড্রবনি যখন পুরুষদের খেতাব জেতেন তখন তিনি স্বেচ্ছানির্বাসিত মিশরের খেলোয়াড়। এ বছর মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন নাভ্রাতিলোভা স্বেচ্ছানির্বাসিতা মার্কিন মুলুকে। শুধু ইয়ান কোডেসই চেক খেলোয়াড় হিসাবে ১৯৭৩-এ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।। সেটা অবশ্য কিছুটা ভাগ্যজোরে। কারণ ওই বছর এক প্রোফেশনাল খেলোয়াড়ের শাস্তিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর নামী খেলোয়াড়রা উইম্বলডন বয়কট করেছিলেন।

সে যাই হোক খেলোয়াড়দের দেশত্যাগের কথাটাই বলছিলাম। রাজনৈতিক কারণে অনেক নামী খেলোয়াড়কে স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। ফিলিপিনসের বাগুইও সিটির শিলাবাসে এখন যে বিশ্ব দাবার খেতাবী খেলা চলছে সে খেলার চ্যালেঞ্জার ভিক্টর করশনয় তো সোভিয়েট রাশিয়ার দেশত্যাগী খেলোয়াড়। গৃহযুদ্ধের পর দেশত্যাগ করতে হয়েছিল হাঙ্গেরীর অসাধারণ ফুটবল খেলোয়াড় ফেরেঙ্ক পুসকাসকেও

জারোস্লাভ ড্রবনি

কাকে কি কারণে দেশত্যাগ করতে হয়েছে, কিংবা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের নীতি দায়ী না দায়ী ব্যক্তিবিশেষের গোঁ সেটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমি বলতে চাইছি একটি মেয়ের তুলনাহীন মানসিক দৃঢ়তার কথা, যে মেয়েটি সমাজ সংসার মা-বাবার স্নেহ এবং দেশের বন্ধন কাটিয়ে একলাফে টেনিস কোর্টের নেট লাফিয়ে পার হবার মত লৌহ যবনিকা পার হয়ে চলে এসেছে শুধু খেলায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের ঐকান্তিক আগ্রহে। শুধু দেশ ছেড়ে চলে আসাই নয়, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রমাণও করেছে—ভাবাবেগের বশে সে এতবড় হটকারিতা করেনি, টেনিসে বিশ্বশ্রেষ্ঠ হবার জ্বলন্ত বাসনাই তাকে ঘর ছাড়া করেছে।

বাসনাটা পূরণ নাও হতে পারত। এবং নাভ্রাতিলোভা উইম্বলডন বিজয়িনী না হলে তাকে নিয়ে লেখারও এমন সুযোগ ঘটত না। কিন্তু সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে একটি অপরিণত মেয়ের পক্ষে খেলার জন্য এত বড় ঝুঁকি নেওয়া কি সম্ভব?

আজ নাভ্রাতিলোভার বয়স একুশ বছর। চার বছর আগে যখন আমেরিকায় আশ্রয়প্রার্থী হয় তখন কি বুদ্ধি বৃত্তি তার পরিণত? উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবার কি তার কোন সম্ভাবনা ছিল?

মেয়েদের টেনিসে পৃথিবীর এক নম্বর হব—এই ইচ্ছে-তুলটা মোটে কোলাতেই · [illegible]

থেকে ইচ্ছেমত খেলায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।" নাভ্রাতিলোভার এই কথা যদি সত্যি হয়, যদি আর কোন উদ্দেশ্য না থেকে থাকে তবে বলব, এ এক নতুন দৃষ্টান্ত। আগে যেসব খেলোয়াড়ের নাম করেছি তারা খেলায় যথেষ্ট নাম কেনার পর দেশত্যাগ করেছেন। নাভ্রাতিলোভা কিন্তু দেশত্যাগ করেছে খেলায় নাম কেনার জন্য। পৃথিবীতে বোধ হয় এর দ্বিতীয় নজীর নেই।

আগেই লিখেছি, ১৯৫৪ সালে জারোস্লাভ ড্রবনি যখন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হন তখন তিনি মিশরে বাস করছেন। স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু তার অনেক আগেই টেনিসে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪৬ এবং ১৯৫৯ দুবারই অল্পের জন্য উইম্বলডন খেতাব থেকে বঞ্চিত হন। প্রথমবার চতুর্থ রাউণ্ডে জ্যাক ক্রামারের মত অসাধারণ খেলোয়াড়ের সঙ্গে ৬৭টি গেম খেলে জয়ী হবার পর সেমিফাইনালে হেরে যান অস্ট্রেলিয়ার জিওফ ব্রাউনের কাছে। দ্বিতীয়বার আমেরিকার টেড শ্রোডারের কাছে ফাইনালে হেরে যান পাঁচ সেট লড়ে এবং মীমাংসাসূচক পঞ্চম সেটে এগিয়ে থেকে। খেলার ফল ছিল ৩—৬, ৬—০, ৬—৩ ৪—৬ ও ৬—৪। সুতরাং তখনই জারোস্লাভ ড্রবনি ছিলেন বিশ্ব টেনিসের এক গালভরা নাম! মিশরের খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডন খেলেন ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত। ৫২-র ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রাঙ্ক সেজম্যানের কাছে পরাজিত হন। ৫৪-র বিজয়ী হন ফাইনালে কেন রোজওয়ালকে পরাজিত করে। ওটি ছিল উইম্বলডনের এক স্মরণীয় ফাইনাল। তখন ড্রবনির বয়স ৩২, রোজওয়ালের ১৯। দুই ঘণ্টা ৩৫ মিনিট তীব্র টেনিস যুদ্ধের পর ড্রবনি জিতেছিলেন ১৩—১১, ৪—৬, ৬—২ ও ৯—৭ গেমে।

ড্রবনি ছিলেন সেবার ১১ নম্বর বাছাই। সবাই ধরে নিয়েছিল তার গৌরবের দিন অস্তমিত। কিন্তু প্রতিটি ম্যাচে টেনিসের ঐশ্বর্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন উইম্বলডনের সেণ্টার কোর্টে। সেমিফাইনালে তখনকার উঠতি তারকা অস্ট্রেলিয়ার লিউ হোডকে হারিয়েছিলেন স্ট্রেট সেটে। অপরদিকে টেনিসের সর্বকালের শিল্পী খেলোয়াড়দের অন্যতম কেন রোজওয়াল তখন তাজা তরুণ হাতের মধ্যে লালিত্যলাবণ্য। রোজওয়াল সেমি-ফাইনালে হারান যুক্তরাষ্ট্রের টনি ট্রাবার্টকে, যিনি পরের বছর উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হন। ড্রবনির সঙ্গে ফাইনালে প্রথম সেটে রোজওয়াল যখন ১০—৯ গেমে এগিয়ে তখন সেট পয়েণ্টের জন্য সার্ভ করেও সেট জিততে পারেন না। আবার চতুর্থ সেটে হারেন ৭—৭ গেমে সমান অবস্থায় থেকে। ওই সময় ড্রবনির একটি পাসিং শট নেটকর্ডে লেগে কোর্টে না পড়লে রোজওয়ালই হয়তো ৮—৭ গেমে এগিয়ে যেতে পারতেন। খেলা হয়েছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে। তাই বলেছি ওটি ছিল উইম্বলডনের এক স্মরণীয় ফাইনাল। উইম্বলডন ফাইনালে আর একটি সেটই ১৩—১১ গেমে নিষ্পত্তি হয়েছে। সেটি ১৯৫৮-র অ্যাসলে কুপার ও নীল ফ্রেজারের চতুর্থ সেট।

কয়েকটি বিষয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার দেশত্যাগী দুই পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে বেশ মিল আছে। দুজনেরই জন্ম প্রাগে। দুজনই লেফটিস্ট। মানে বাঁ হাতের খেলোয়াড় এবং দুজনেরই প্রথম উইম্বলডন অভিযান মাত্র ১৬ বছর বয়সে। ড্রবনি খেলতেন চোখে সোনার ফ্রেমের নীল চশমা পরে ও হাতে রিস্টব্যাণ্ড বেঁধে (কলকাতার সাউথ ক্লাবেও তাঁকে ওইভাবে খেলতে দেখেছি)। নাভ্রাতিলোভা মেয়ে বলেই খেলে গলায় সোনার হার ও হাতে ব্রেসলেট পরে। অবশ্য ব্রেসলেট থাকে ডান হাতে, মারের হাতে নয়। জোরালো সার্ভিস এবং ভলি দুজনেরই বৈশিষ্ট্য।

ড্রবনি অবশ্য খেলাধুলার আর একটি দিকেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। ১৯৪৮-এর উইণ্টার অলিম্পিকে তিনি ছিলেন আইস হকিতে চেক দলে অপরিহার্য। ১৯৪৭ এবং ৪৯-এ বিশ্বজয়ী চেক দলেরও খেলোয়াড়। মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা হাতে টেনিস র‍্যাকেট পায় পাঁচ ছয় বছর বয়সে। বাবা টেনিস

শিক্ষাও বাবার কাছে থেকে। চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়েদের জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হবার পর নাভ্রাতিলোভার মুখে আত্মবিশ্বাসের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। ধারণা জন্মে যায় টেনিসে অনেক বড় হতে পারবে। উইম্বলডনে খেলতে শুরু করে ১৯৭৩ থেকে। আগেই লিখেছি, বয়স তখন ১৬ বছর। প্রথম আবির্ভাবেই বেশ একটু চমক দেখায়। তৃতীয় রাউন্ডে হেরে যায় গোলাগঙের কাছে। ৭৪-এ অবশ্য প্রথম রাউন্ডেই জানোভেকের কাছে হারস্বীকার করে। মনটা আগে থেকেই হয়তো খিঁচড়ে ছিল। ঠিক করেই এসেছিল আর দেশে ফিরবে না। ফেরেওনি। ফরেস্ট হিলসে যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার পর ওই দেশেই আশ্রয়প্রার্থী হয়। সেটা মঞ্জুর হয় ১৯৭৫ সালে। স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধে ক্যালিফোর্নিয়ায়। এখন আছে ডালাসে। এ ক'বছরই খেলছে আমেরিকার প্রতিনিধি হয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব কিন্তু এখনো পায়নি। হয়তো পাবেও না ১৯৮০ সালের আগে। কেননা ডালাসের এক সিনেট সদস্য পাঁচ বছরের বদলে তিন বছরে নাভ্রাতিলোভাকে নাগরিকত্ব দেবার জন্য যে সুপারিশ করেছিলেন সিনেটের সাব-কমিশন তা বাতিল করে দিয়েছেন। সুতরাং আরও বছর দুই দেশহীন মেয়ে হিসাবেই নাভ্রাতিলোভাকে থাকতে হবে।

সত্যিই কি নাভ্রাতিলোভা স্বদেশে ইচ্ছেমত খেলার সুযোগ পাচ্ছিল না? বলা শক্ত। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—ও আমেরিকার জীবনধারার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বেশি ঝোঁক ফ্যাশানের দিকে, আগ্রহ চটুল সংগীতে, ইচ্ছা অবাধভাবে চলাফেরার।

অভিযোগের মূলে অবশ্যই কিছু সত্য আছে। নাভ্রাতিলোভা নিজেও স্বীকার করেছে—"ক্যালিফোর্নিয়ার আমি খুশিমত ঘুরে বেড়াতাম, যখন তখন পার্টিতে যেতাম, প্রচুর আইসক্রিম খেতাম। জীবনে নিয়মানুবর্তিতার কোন বালাই ছিল না।"

কিন্তু মেয়েটির বড় গুণ নিজেই নিজেকে শুধরে-

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

...রছে। আর যেজন্য স্বদেশ ছেড়েছে সেই উদ্দেশ্যটা মনে রেখে টেনিস জগতে এগিয়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ভাব জমে যায় ক্রিস এভার্টের সঙ্গে যাকে হারিয়ে ওর উইম্বলডন খেতাব। খেলায় তালিম নিয়েছে বিলি জিন কিংয়ের কাছ থেকে। সারা বছরে সপ্তাহ দশেক থাকে ডালাসে। বাকি সময় পৃথিবীর নানা টেনিস কোর্টে। টেনিসে উন্নতির জন্য প্রচুর অনুশীলনের মাধ্যমে দেহের মেদ কমিয়েছে। আগে ওজন ছিল ১১ স্টোন ৬ পাউন্ড। এখন ১০ স্টোন ৬ পাউন্ড। ৫ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি মাথার উঁচু মেয়েটির খেলার মধ্যে আছে পুরুষালী বিক্রম। আগে ভাল মার ফলতো ছিল সার্ভ ও ভলি। এখন ব্যাককোর্টে গেমে পারদর্শিনী।

টেনিসে পৃথিবীর প্রথম সারির মেয়েদের মধ্যে স্থান করে নেয় ৭৫-এ। সেবার উইম্বলডনে খুবই ভাল খেলে কোয়ার্টার ফাইনালে হারে মার্গারেট কোর্টের কাছে, ৭৬-এ সেমিফাইনালে এভার্টের কাছে এবং ৭৭-এ বেটি স্টোভের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয়, বাছাইয়ে দুই নম্বর থেকেও। বলা হয়েছিল সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফল। এবারও ছিল দুই নম্বর বাছাই। আগে থেকে চমৎকার ফর্মে ছিল। জিতেছিল ৭টি প্রতিযোগিতা এবং টানা ৩৭টি গেম। ৬২টি খেলার মধ্যে জয় ছিল ৫৯টিতে। শীর্ষ বাছাই এভার্টকে ফাইনালে ২—৬ ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে হারিয়ে উইম্বলডন জয় ওই ধারাবাহিক ভাল খেলারই প্রমাণ।

মেয়েটি এখন প্রশংসা ও প্রাচুর্যের ভাজির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। ডালাসে থাকে ১৬ লক্ষ টাকা দামের এক বাড়িতে। টেনিস থেকে এ বছরের ৭ মাসেই উপার্জন করেছে ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এত প্রাচুর্য এত সম্মান তবু কিন্তু মনে বড় ক্ষোভ—দেশের প্রতি অভিমান। ওর মা-বাবা ওর খেলা দেখতে পারেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার সংবাদপত্রে ওর কথা লেখা হয় না। উইম্বলডনের বয়েজ সিঙ্গলসে চেক চ্যাম্পিয়ন আইভান লেন্ডল সংবাদপত্রে যেটুকু জায়গা পেয়েছে নাভ্রাতিলোভা তাও পায়নি।

মুকুল

উর্বশী-কিন্নর-কথা

দেবাশিস দাশগুপ্ত

জনমেজয় কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "হে দ্বিজেন্দ্র, মর্তধামে দেবগণ ব্যতিরেকে, যে সুর্বসজ্জন মানবাত্মার জন্মদিন উপলক্ষে যে বিরাট উৎসব হয়, আপনি তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। যে মানুষ দৈবী মহিমাকেও অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি ও প্রয়োগ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিয়া আমাদিগের একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ, মর্তধামে দেবগণের পূজা অনুষ্ঠিত হয়, এক, দুই বা তিন দিবসের জন্য। আবাহন সময় নির্দিষ্ট থাকিলেও বিসর্জন সময়-সীমা পক্ষকাল হইতে মাসাধিক কাল অতিক্রম করিয়া থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব শুধুমাত্র রবীন্দ্র সদনেই পঞ্চত্রিংশদ্দিন ব্যাপী চত্বারিংশ অনুষ্ঠান হয়। মর্তধামে অন্য কোথাও কবির জন্মোৎসবে এই বিরাট অনুষ্ঠান হয় না। গীত, কাব্য, নাটক, নৃত্যনাট্যের এত অজস্র সম্ভার অন্য কোন কবির ভাণ্ডারে নাই।"

জনমেজয় কহিলেন, "হে তপোধন, শুধুমাত্র নৃত্য-গীতাদি বিনোদন চর্চাতেই কি ওই কবি অবসিত। আমাদের ঋষিকুল-সৃষ্ট দর্শনাদির মত কি কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া ধ্যান করা যাইতে পারে।" বৈশম্পায়ন কহিলেন, "সাধারণত আলোচনা সভায় মর্তধামে বিশেষ অনুরক্তি নাই। কোন সভার প্রারম্ভে সভাপতির ভাষণ, নৈবেদ্যের উপর সন্দেশ স্থাপনের মতই একটি আচার অনুষ্ঠান মাত্র, ভাষণের সময় শ্রোতা বা দর্শকদের বিশ্রম্ভালাপই নিয়মে পর্যবসিত। এতাবৎ কাল, রবীন্দ্র সদনের উৎসবে আলোচনা সভার কোন স্থান ছিল না, নতুন সরকার—ঘটনাটি একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন—স্বর্গে সুরাসুরের যুদ্ধ থাকিলেও অনাদিকাল হইতে ইন্দ্র যেমন দেবরাজ আখ্যায় ভূষিত হন, মর্তধামে সেইরূপে কায়েমী বন্দোবস্তের প্রচলন নাই। বিভিন্ন দেশের মনুষ্যজাতি মাঝে মাঝেই সিংহাসনের অধিকারী পরিবর্তন করিয়া থাকে, উত্তরাধিকার কথায় বিবেচিত হয় না। যাঁহারা রাজত্ব পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের লৌকিক ভাষায় 'সরকার' বলা হইয়া থাকে। যে কবির সৃষ্টি লইয়া এই উৎসবে, সেই কবির জন্মস্থানে এবার 'সরকার' পরিবর্তিত হইয়াছে। নতুন সরকার এই প্রথম রবীন্দ্র জন্মোৎসবে একটি প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার সূত্রপাত করিয়াছেন। প্রদর্শনীটি ক্ষুদ্র হইলেও মনোরম হইয়াছিল, আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ সভার মত, পাঠান্তে দিনের শেষে কোন একটি বৃহৎ পরিসর কক্ষের আলোচনা সভায় তাঁহারা যোগদান করতঃ পাঠক্রম বক্তৃতার উপরন্তু আর একটি সারগর্ভ আলোচনা শুনিতেও পারে. অবসর যাপনের জন্য অন্যত্রও গমন করিতে পারে—কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে মানরক্ষা হয়। এবারের উৎসবে আলোচনা নিতান্তই মানরক্ষা পর্যায়ের।"

জনমেজয় কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, এই উৎসবে নৃত্য, নাটক, কথা, গীত প্রভৃতির মধ্যে কোনগুলি লোকরঞ্জনী?"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে রাজন, মর্তধামে পূজামণ্ডপের অভিজ্ঞতা যদি আপনার থাকে, তবে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বলিপ্রদান অথবা সন্ধ্যারতির সময় প্রচণ্ড নরনারী সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। অপরপক্ষে অঞ্জলি প্রদানের জন্য 'মাইক্রোফোন' নামে একটি যন্ত্র দ্বারা জনগণকে কাকুতি মিনতি করিতে হয়। পুরোহিত গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া শান্তিজল প্রদান করিয়া থাকেন, সকলকে একত্র সমবেত করা যায় না। রবীন্দ্রপূজার নৃত্যনাট্য, গান কিঞ্চিৎ আবৃত্তির আসরে সন্ধ্যারতি বা বলিপ্রদান সমাবেশের অনুরূপ। নাট্যানুষ্ঠানে 'অঞ্জলিপ্রদানের' কাকুতিমিনতিই ভরসা। অঞ্জলিপ্রদানান্তে অনেক ভক্ত সামর্থ্যানুযায়ী কিছু কিছু মুদ্রা দান করেন কিন্তু নাট্যানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ-লিপিটি প্রধান অবলম্বন মর্তধামে ইহা 'কমপ্লিমেন্টারি'

শাপমোচন

নামে অভিহিত। আর আলোচনা পুরোহিতের শান্তি-জল সিঞ্চন ব্যবহার বিধির অনুরূপ।

জনমেজয় কহিলেন, "হে মুনিসত্তম! বলিতে লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু রাজন্যর প্রসাদে আমিও নৃত্যনাট্য বিষয়ে অনুরক্ত। আমি সেই অপ্সরা-কিন্নরকীর্তির আদ্যোপান্ত শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করুন।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "তথাস্তু। হে রাজন, আমি সবিস্তারে নৃত্যনাট্য কাহিনীর বর্ণনা করিতেছি—অবধান করুন। উৎসবে দ্বিবিধ নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। প্রথমতঃ কবিসৃষ্ট নৃত্যনাট্য, দ্বিতীয়তঃ কবিসৃষ্ট কোন কাহিনী বা কাব্যের নৃত্যনাট্য-রূপ। এবারকার উৎসবে কবিসৃষ্ট মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, বাল্মীকি প্রতিভা, শাপমোচন, চণ্ডালিকা, শ্যামা, কালমৃগয়া, তাসের দেশ সমুদয় নৃত্যনাট্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কবির নাটক বিচারে অনেক মতবিরোধ থাকিলেও নৃত্যনাট্যগুলির মহিমা তর্কাতীত। এই নৃত্যনাট্যগুলি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ দর্পণতুল্য নাটক কদাচ দৃষ্ট হয়। কিন্তু নৃত্যনাট্যে প্রযোজনা সাধারণতঃ যন্ত্রবৎ হইয়া থাকে। একই ধরনের মুদ্রা, নৃত্যের একই ভঙ্গিমা—প্রযোজকরা অতি ভদ্রলোক, একথা সর্বত্রই বিদিত 'ভদ্রজনের এক কথা'। নৃত্যনাট্য শিল্পীর সংখ্যা খুবই সীমায়িত। প্রতিষ্ঠানের নাম যাহাই হউক না কেন গীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী প্রায়শই এক। সুতরাং, হে রাজন, বিচার করিয়া দেখিবেন, এই উৎসবে রবীন্দ্রসংস্কৃতিচর্চা প্রসারিত হইল অথবা বাণিজ্যিক প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল। এই শিল্পী-স্বল্পতার জন্য মায়ার খেলায় (স্বরলিপি) স্বর্গীয় প্রেম দেখিতে পাইলাম। অমর (অনাদিপ্রসাদ) প্রমদা (অলকানন্দা রায়) শান্তা (আরতি মজুমদার) বয়সের প্রভেদ হরপার্বতীর অসমবয়েসী প্রেমকেই স্মরণে আনিয়া দেয়। সঙ্গীতাংশে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইলেও অন্য সকলে ম্রিয়মান। নৃত্যশিল্পীদের বড়ই কঠিন দায়িত্ব। তাঁহাদের পদযুগলকে সর্বদাই সতর্ক রাখিতে হয়, সঙ্গীতশিল্পীর অনুগ্রহের জন্য। তাঁহারা কখন কোন পঙ্‌ক্তি গাহিবেন তাহার স্থিরতা নাই, অকস্মাৎ পদস্খলনে বিপদ ঘটিতে পারে—অনন্যোপায় হইয়া প্রায়শই একটি চরণ ঊর্ধ্বে তুলিয়া নটরাজকে প্রতিবিম্বিত করিতে হয়। স্বরলিপি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রযোজিত চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে শান্তি বসুর নৃত্যপরিচালনার অন্তরালে চিন্তা সক্রিয় ছিল। নৃত্যে শান্তি বসু, আরতি মজুমদার, অলকানন্দা রায় সম্মোহিত করিয়াছেন, সঙ্গীত ও পাঠে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন যথেষ্ট পৌরুষ ও নাটকীয়তা সঞ্চারে সার্থক হইয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গীতাংশে বাণী ঠাকুর বৎপরোনাস্তি বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠ কখনই সাবলীল নহে, প্রতিটি গানই তাঁহার কাছে কষ্টসাধ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। মানুষের দেহ ব্যাধির আকর, কণ্ঠ সম্ভবত প্রত্যেকের প্রতিদিন

নায়িকা

[illegible] মত, আঁশড় ছন্দের দ্রেভের গানের [illegible] হয়। হে রাজন! চিত্রাঙ্গদার 'বঁধু কোন [illegible] লাগল চোখে' গানটিতে চিত্রাঙ্গদার মর্মবেদনা [illegible]। কিন্তু প্রতি কথায় আড়ি ছন্দ ব্যবহারে [illegible] তিন রূপ রাতি' ভুবনাদি: সাম্যাভিনোদন [illegible] রূপ সেরা বাহকে লোভে তাহার মেহ্‌কিল [illegible] থাকে। এইরূপ বিপত্তি সমগ্র গানেই [illegible]। পক্ষান্তরে গীতা ঘটকের গান আমার শ্রবণকে মুখরিত করিয়া দিয়াছে। বহু দিবস চিত্রাঙ্গদার এবম্বিধ নাটকীয় অথচ সুরমহিমান্বিত গান শ্রবণ করি নাই। এ বি ডি এনটারপ্রাইজের শাপমোচন নৃত্যনাট্যে অনেক নতুনত্ব ছিল। এই নৃত্যনাট্যে সাধন গুহ, পলি গুহের নৃত্যে নয়নমনোহর এবং বন্দনা সিংহ ও কনানী ঘোষ-এর সঙ্গীত শ্রুতিলোভন। এই নৃত্যনাট্যে কনিষ্ক সেনের আলোক প্রক্ষেপণ ও মঞ্চসজ্জা প্রকৃতই মঞ্চমায়া রচনা করিয়াছিল। ছন্দোবতী প্রযোজিত 'কাল মৃগয়াতে' ঋষিকুমারের ভূমিকা প্রাণবন্ত হইলেও প্রয়োগ পদ্ধতি মূল নাট্যমহিমাকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি, কবিবর রবীন্দ্রনাথ রচিত এই নৃত্যনাট্যগুলি ঘনপিনদ্ধ, উহার উপর খোদকারি করিতে গেলে রূপবিকৃতি ঘটে। যেহেতু কালমৃগয়ার ঘটনাস্থল তপোবন এবং কুশীলব ঋষি, ঋষিতনয় এবং অন্ধরাজ, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রারোপিত কিছু বেদগান ইহাতে যুক্ত হইল। হে রাজন, বলিতে লজ্জা বোধ হয় মর্ত্যে আজ দেবভাষা বড়ই অবহেলিত। সম্ভবত ঋষির বড়ই অভাব বলিয়া ঋষিদের দর্শন, ভাষ্য সবই বিস্মৃত। এই নৃত্যনাট্যে সন্ধ্যার পরিবেশে সকালের বেদমন্ত্র যুক্ত হয়। সূর্যোদয়ের সহিত অবশ্যই 'জবাকুসুম সঙ্কাশং' যুক্ত হইয়াছে, কারণ ওই শ্লোকটি সকলেই জ্ঞাত আছেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি ঘটনা বিবৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এক সজ্জন ব্যক্তি প্রত্যহ উঠিয়াই পুষ্পচয়ন করিতে করিতে গীতা চণ্ডী অনর্গল আবৃত্তি করিতেন। প্রতিবেশী সকলে লোকান্তরের অলৌকিক আভাস পাইত। কালপ্রাপ্তির পর সেই ব্যক্তির দেহান্তরের পর তাঁহার সন্তান পিতার ঐতিহ্য রক্ষার্থে প্রভাতে উঠিয়া সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিত—প্রতিবেশীগণ সহর্ষে অধোমুখে আবিষ্কার করিল, পুত্রটি আবৃত্তি করিতেছে চাণক্য শ্লোক। সে গীতা, চণ্ডী অধ্যয়ন করে নাই, পরীক্ষা উত্তীর্ণার্থে যে চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিল সেইটুকুই তাহার সংস্কৃত পুঁজি। কালমৃগয়া নৃত্যনাট্যে অন্ধ মুনির গান যে গায়ক গাহিয়াছিলেন, হে রাজন! আপনার অসীম সৌভাগ্য, সেই গান শ্রবণ করেন নাই। আমি অদ্যাবধি সেই কণ্ঠনাদ দুঃস্বপ্নে শ্রবণ করিয়া আতঙ্কিত হই। 'দশরথের গান অবশ্য শ্রুতিমধুর। 'শ্রুতি' নিবেদিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। এই নৃত্যনাট্যে শিল্পীরা সকলে মঞ্চে গাহিয়াছেন ও নাচিয়াছেন। নৃত্য বলিতে অবশ্য সহজ সরল কিছু ভঙ্গিমা। তৎসত্ত্বেও এই সাহস বর্তমানে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষত প্রতিষ্ঠিত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্মীকির ভূমিকা সমকালীন রবীন্দ্র সংস্কৃতিতে একটি স্মরণযোগ্য অধ্যায়। এই নৃত্যনাট্যে পিয়ালী ঘোষের নৃত্য-পরিকল্পনা ও দস্যু দলের নৃত্যকলা নয়নলোভন হইয়াছিল।'

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবান। নৃত্যনাট্যরূপ বিষয়ে আপনি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করুন।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "হে নরনাথ, রবীন্দ্রচর্চা যেহেতু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, শুধুমাত্র কবিকণ্ঠ নৃত্যনাট্য অনেকের কাছে হয়তো ক্লান্তিকর বোধ হয়, তাই সকলেই নিরত নবতর সাজে নৃত্যনাট্যকে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী বা কথাকে সূত্র ধরিয়া অনেক দূর নিজেদের রুচি মত গান নির্বাচন, ও নৃত্য সংযোজন করা যায়। কাহিনী নির্বাচনে অনেক সময় বিবেচনা করা হয় না তাহা নৃত্যনাট্যের উপযোগী কিনা। 'সুরঙ্গমা' পরিবেশন করিয়াছেন, 'ওগো শোন কে বাজায়' রাধাকৃষ্ণের বিরহ, মিলন, অভিসার চিরন্তন [illegible] কবি সত্য ভানু সিংহের পদাবলীর গান ছাড়াও বাঁশিসম্পর্ক অন্যান্য গান লইয়া যে নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাবানুকম্পী। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ পরিচালনায় ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার—নৃত্য পরিকল্পনা পূর্ণিমা ঘোষের। 'তাসের দেশ'-এর মত নাটক খুব কম আছে কিন্তু ইহা সর্বত্রই নৃত্যনাট্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়—সংলাপ অংশ নৃত্য-শিল্পীরাই বলিয়া থাকেন। ফলত, কোন সময়েই নাটকীয় রস প্রতিষ্ঠিত হয় না (ত্রিবেণী)। ক্যালকাটা সিপাস [illegible] নামে একটি গোষ্ঠী সম্মেলক গীতির পরীক্ষায় সম্প্রতি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে রবীন্দ্র উৎসবে 'তাসের খেলা'র নৃত্যনাট্যরূপ পরিবেশন করিয়াছেন। অন্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের যে পরীক্ষার সাহস অভিনন্দিত এই রবীন্দ্রগীতি দৃশ্যকাব্যে পরীক্ষার সাহস স্পর্ধা হিসাবে প্রতীয়মান এবং নিন্দিত হইয়াছে। 'রবিমল্লার' নিবেদন করিলেন 'পলাতকা', ইহা সম্পূর্ণই কাব্যরস হইতে 'পলাতকা' ক্ষণে ক্ষণে বিচ্যুতি, সম্পূর্ণ পরিকল্পনা অবিন্যস্ত। আচার্যের পোশাক যেন চিকিৎসালয়ের শল্য চিকিৎসকের মত। রাজপুরুষের পোশাক মোগল যুগের মত, হাবভাব হাস্যকর, সখীরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীলা। বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলীর নৃত্যপরিকল্পনায় একটি সুন্দর দৃশ্য আছে, প্রদীপ নৃত্য—এই বৎসর এই প্রদীপ নৃত্যের ব্যবহার অনেক স্থলেই দেখা গেল—পাশ্চাত্ত্য ভাষায় যাহাকে 'হট' বলা হইয়া থাকে। গান নির্বাচন অনেক স্থলে কোনক্রমে জুড়িয়া দেওয়া। একটি বিষয়ে সাধুবাদ জানাইতে হয়, এই নৃত্যনাট্য একটি সর্বভারতীয় আকৃতি পাইয়াছে। সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গে কর্ণবিদারী কাঠ-খঞ্জনী সংগত রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যকে তুলসীদাসের রামায়ণের নিকটবর্তী করিয়াছিল—নয়নমুদ্রিত করিয়া আমি আনন্দে অভিষিক্ত হইলাম—সেই আনন্দ পূরবী মুখোপাধ্যায়, পূর্বা দাম ও রাজেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গীত শ্রবণ নিমিত্ত। 'সুরতীর্থ' প্রযোজনায় বিদায় অভিশাপ

একটি সুপ্রযোজিত অনুষ্ঠান। পশ্চাৎ প্রেক্ষণ (ব্যাক ড্রপ) পরিকল্পনাটি সুন্দর। এই নৃত্যনাট্যে সাধন গুহ, গীতা গুহ, শম্ভু ভট্টাচার্য, বটু পাল সকলেই আন্তরিক ও সযত্ন ছিলেন। সঙ্গীতাংশে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় কেন যে কয়েকটি সুশ্রাব্য গান গাহিলেন, তাহা বুদ্ধির অগোচর—অন্য গান গাহিলেন গৌতম মিত্র—এই কণ্ঠস্বর পরিবর্তনে চরিত্রভ্রষ্ট হইল। শুধুমাত্র একই চরিত্রে দুইরূপ কণ্ঠের জন্য নয়, গায়কীর প্রভেদেও। নৃত্যনাট্যরূপে গান নির্বাচনে সচরাচর বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় থাকে। বিদায় অভিশাপ নৃত্যনাট্যে দেবযানী (সুমিত্রা সেন) কচের উদ্দেশ্যে গাহিতে থাকেন, 'জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে' সম্পূর্ণ গান গাহিয়া যান, খেয়াল থাকে না 'এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে/মুখর নূপুর বাজে না চরণে/তাই হোক তবে তাই হোক এসো সহজ মনে/ওই তো মালতী ঝরে পড়ে যায় মোর আঙিনায়/শিথিল কবরী তোমার লও না তুলে।' বেচারী কচ! কোথায় তার আভরণ, নূপুর, কোথায় বা শিথিল কবরী!! অনুরূপ ত্রুটি কিন্তু সংশোধিত 'রঙ্গিনী' নিবেদিত 'সাগরিকা'য়। এখানে সমুদ্র উপকূলে ভারতপুত্রের সঙ্গে সাগরিকার দেখা। সাগর সেন ভারতপুত্রের কণ্ঠে গান করেন, 'কিছু বলব বলে এসেছিলেম' অন্তরা বর্জন করিয়া সোজা সঞ্চারীতে চলিয়া যাওয়া হয়। যথার্থ প্রয়োগ। কারণ, সাগর-উপকূলে 'দেখিলাম খোলা বাতায়নে' বলা বাতুলতার নামান্তর হইত। অসিত চট্টোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা এবং কয়েকটি অসাধারণ নৃত্যবিন্যাস (কম্পোজিশন) সত্ত্বেও সাগরিকা দর্শক চেতনায় অনন ভূত থাকিয়া যায়। ইহার কারণ সম্পূর্ণ নাট্যরূপের দুরূহ পরিকল্পনা। এই অনুষ্ঠানে ভাল লাগে সাগর সেন ও শিবানী দেবীর গান। বাণী ঠাকুর আবারও হতাশ করিয়াছেন—অত্র মনোমুগ্ধকর কনিষ্ক সেনের আলোক প্রক্ষেপণ।

জনমেজয় কহিলেন, 'হে পুণ্যাত্মন্! আমি মর্তের নৃত্যকলার বিষয় কিঞ্চিৎ জানিতে আগ্রহী।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে মুদ্রা একই প্রকার থাকে। ভাল-মন্দ বিচার হয় শুধু মহলার নিষ্ঠায়—নচেৎ বারবারই একই ভঙ্গিমা ফিরিয়া আসে। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে সখীদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, যাত্রানাটকে বিবেকের মত তাহারা আসিয়া মূল ঘটনার ভাব সংবৃদ্ধি করে। বর্তমানে সখীর দল সব সময়েই লাস্যময়ী, বাসরঘরের শ্যালিকাকুলের মত। নৃত্যনাট্যরূপে ইহাদের প্রগলভতা মাত্রাতিরিক্ত। প্রায়শই নায়ক-নায়িকা মনের আশ মিটাইয়া পর পর গান গাহিয়া যান, হঠাৎ সখীর দল ঢোকে বিবেকরূপে নয়, 'তোমাদের নিভৃত আলাপন দেখিয়া ফেলিয়াছি' গোত্রের চটুল হাসির ছটায় পরিবেশকে লাঘব করিতে এবং আরো কয়েকজন ব[illegible]ভূত নৃত্যশিল্পী [illegible]শিল্পীকে সুযোগ দিতে। এই নৃত্যশিল্পীরা [illegible] দর্শকদের মূর্খ ভাবিয়া থাকেন তাই প্র[illegible]ট[illegible] নয় কথায় অঙ্গসঞ্চালন করিয়া ব্যাখ্যার প্রয়াস পান যার জন্য সৌকুমার্যের বিপত্তি ঘটে। 'আমার অঙ্গে সঙ্গে কে বাজায় বাঁশি' বলিতে অঙ্গ হেলাইতে হয় এবং বাঁশি বাজানো দেখাইতে হয়। 'কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম স্বর' বুঝাইতে, চক্ষুকে দেখাইয়া তীর ছোড়ার ভঙ্গি করিতে হয়, 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' বলার সঙ্গে বীণা বাজানোর মুদ্রা করিতে হয়। অপর পক্ষে অনেকের গম্ভীর অভিব্যক্তি রাজসভার আনন্দকে শোকসভার রূপ পরিগ্রহ করিতে সাহায্য করে। বীণা বাজানোর ভঙ্গি অনেক সময় পাশ্চাত্য দেশীয় 'গীটার' বাজানোর মত কখনও বা আশ্রমে চরকা কাটার মত। এই কথার অনুষঙ্গী মুদ্রার ফলে অনেক কিছুই ঘটিয়া যায়, কোন এক মহিলা শিল্পী—'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতে দোলে, দোলাও' বুঝাইতে যে সহজিয়া পন্থা ধরিলেন—রাজন আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি ব্রহ্মচারী, সেই মুদ্রা বুঝাইতে আমি অক্ষম। নৃত্যনাট্যরূপে দস্যুর দল আসিলে কোটালের নৃত্যভঙ্গিমা যুক্ত হয়—ব্যঙ্গ করিতে 'তাসের দেশ'—হাহাকার করিতে বজ্র সেন বিহ্বলতা বুঝাইতে উত্তীয়, কৌতুক কিছু করিতে চণ্ডালিকা অর্থাৎ প্রধান অবলম্বন ওই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য।

চিত্রাঙ্গদা

পলাতকা

জনমেজয় কহিলেন, 'হে মহাত্মন—এই নৃত্যনাট্যে অনুষঙ্গ কিরূপ ?'

বৈশম্পায়ন কহিলেন 'রাজন! এই সব নৃত্যনাট্যে শিল্পীদের মত যন্ত্রশিল্পীরা মোটামুটি একই। প্রায় প্রতিদিনই একই দক্ষ শিল্পী দীনেশচন্দ্র, অমর চন্দ, রমেশচন্দ্র, বিপ্লব মণ্ডল, খোকন সেনগুপ্ত প্রভৃতি। বহু ক্লান্তি ইহাদের যন্ত্রনৈপুণ্যে অপনোদিত হয় আবার ঘনশ্যাম পাইনের শব্দ সহযোগ অনেক সময় বাহুল্য মনে হয়। আবৃত্তি ভাষ্য পাঠে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, কাজল চৌধুরী অনেক দুর্বল নাট্যরূপকেও সজীব রাখিয়াছেন। আবার গৌরীশঙ্কর পাণ্ডার অবান্তর নাটকীয়তা 'ছন্দোবতী' প্রযোজিত শ্যামার গানকে বিধ্বস্ত করিয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিজো! আপনি প্রতি বৎসরই এই অনুষ্ঠান অবলোকন করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে কি এই সুবর্ণজয়ন্তী বিশৃঙ্খলার কিছু উন্নতি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'মহারাজ, অন্যান্য বৎসরের সংগঠনগত বিশৃঙ্খলার তুলনায় এবার কম! প্রস্তুতিতে অনাসক্তি, চর্চায় অনীহা মনে হয় অনেক রহিত হইয়াছে। এবার বিশেষ কিছু গোলযোগ হয় নাই—নৃত্যশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী অনেকেই সচেষ্ট ছিলেন নিজ দায়িত্বে। এবারের উৎসব প্রসঙ্গে ওই দেশে আর একজন অমর রসিক সুকুমার রায়ের ভাষায় বলা যায়, পাগলা দাশু এবার বিশেষ কিছুই করে নাই—শুধু মঞ্চের সামনে একবার পানের পিক ফেলিয়াছিল মাত্র।

অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্য—মায়ার খেলা (স্বরলিপি) শোন কে বাজায় (সুরঙ্গমা) চিত্রাঙ্গদা (স্বরলিপি মহাবিদ্যালয়), তাসের দেশ (ত্রিবেণী), বাল্মিকী প্রতিভা (দ্যুতি), শাপমোচন (এ বি ডি এনটার প্রাইজ), ঝড়ের খেয়া (ক্যালকাটা পিপলস কয়্যার), চণ্ডালিকা (নৃত্যাঙ্গন), পলাতকা (রবিমণ্ডল), বিদায় অভিশাপ (সুরতীর্থ) [illegible]

সারা বিশ্বে পরীক্ষিত বেগন® স্প্রে
'অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া' শক্তিশালী বলে আপনার ঘরদোর সব রকম কীট থেকে সুরক্ষিত রাখে দীর্ঘকাল ধরে

এই দেখুন সুখের, স্বাস্থ্যকর কীটমুক্ত বেগনগৃহ

সবরকম কীটের কবল থেকে দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিলাভ করুন— মাত্র একবার স্প্রে করেই।
বেগন স্প্রে এক সাধারণ স্প্রে নয়। একবার স্প্রে করলেই সবরকম কীটের সমস্যার ব্যাপারে শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী 'অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া' সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে। তার মানে বেগন-স্প্রে যেমন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল তেমনি খরচও কম।

আরশোলা খতম করতে:
ময়লা ফেলার পাত্রে, ড্রেনে এবং লুকিয়ে থাকবার অন্য আর সব জায়গায় বেগন-স্প্রে ব্যবহার করুন।

মাছি ও মশার জন্যে
যেখানে ওরা বসে সেখানে স্প্রে করুন: জানলার কাঠে ও ফ্রেমে, পর্দায়, ফিটিঙে, তেমনি দেওয়াল, সিলিং আর আসবাব পত্রেও...

ছারপোকা খতম করতে
যেখানে ওরা বাসা বেঁধেছে সেই সব আসবাবপত্রে গদিতে এবং গৃহসজ্জার জিনিষপত্রে বেগন-স্প্রে ব্যবহার করুন।

আরশোলা, মাছি, মশা, ছারপোকা... ঘরের সবরকম কীটের ক্ষেত্রে কেবল বেগন-স্প্রে সত্যিসত্যি কাজ করে:

১) **তাড়া করার ক্রিয়ায়**
লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে কীট বার ক'রে দেয় এবং এদের মেরে ফেলে।

২) **পরিচিত 'স্পর্শজনিত' ক্রিয়ায়**
স্প্রে-করা সমস্ত জায়গায় স্পর্শজনিত শক্তিশালী ক্রিয়ার ফলে— এখানে যে সমস্ত কীট চলে ফিরে বেড়ায় বা বসতে চায় তাদের নিশ্চিত ভাবে মেরে ফেলে।

৩) **অবশিষ্টাংশের ক্রিয়ার ফলে**
দীর্ঘস্থায়ীভাবে কার্য্যকরী। স্প্রে মুছে বা ধুয়ে না গেলে স্প্রে করা জায়গাটি অনেক দিন ধরে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে।

একমাত্র স্প্রে যার অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া'র কীট থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা পাওয়া যায়।

বায়ারের আন্তর্জাতিক গবেষণার এক প্রমাণিত কীটনাশক

OBM-7822-BEN

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

রাখী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত) বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ ১৩৮৫. মূল্য ত্রিশ টাকা।

আমরা সেই যুগের স্বাদ পাইনি যখন রবীন্দ্রনাথের নিত্য নতুন বই বেরুনোর উত্তেজনায় বাঙালীর নাড়ী ছুটতো দ্রুত তালে। কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের কল্যাণে এ যুগের পাঠক দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন, নিত্য নবীন রবীন্দ্রনামাঙ্কিত সংকলন হাতে পেয়ে। 'দীপিকা' 'বিচিত্রা'র পরে এসেছে 'পূর্ব বাংলার গল্প', 'খৃষ্ট' ইত্যাদি—এবারে হাতে এলো 'রাখী'। "বর্তমানের ও ভাবীকালের নব নব দম্পতির" উদ্দেশে নিবেদিত এই ছন্দোবন্ধ 'রাখী'—ভূমিকা (এবং হলুদ ছোপানো মলাটে কবির সেই অতি পরিচিত বরবধূর ছবিটিও) তাই বলে। বৈশাখ মাসে প্রকাশিত এই সংকলন বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এসেছে, ছাপা-বাঁধাই-কাগজ চমৎকার। তথা রবীন্দ্র-গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-নন্দলালের শিল্পকর্মে এবং রবীন্দ্রলেখাঙ্কনে বইটি সুসমৃদ্ধ। বিবাহ-ব্যবসায়ে এ বইয়ের সাফল্য হওয়াই উচিত। যদিও অতি-হিসেবী ক্রেতা হয়তো ভাববেন ত্রিশ টাকাতে তো ললিতকলা আকাদমি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রলিপিই দেওয়া যাবে, কিংবা 'সমগ্র গীতবিতান' কিংবা 'সঞ্চয়িতা' তাছাড়া এখনও বারো টাকায় 'বিচিত্রা'—ইত্যাদি। কিন্তু অনতি-হিসেবীদের মধ্যে এ বইয়ের ব্যবসায়িক সাফল্য অমোঘ।

রাখীর রূপের বাহার অবিতর্কিত, আর কাব্যগুণে তো প্রশ্নাতীত। সমস্যা কেবল এর চরিত্রের বিষয়ে। এমনই একজন তদ্‌গতপ্রাণ, নিপুণ রবীন্দ্র-সাধককে এই সংকলনের ভার দেওয়া হয়েছে, যাঁর কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী। তাঁর তুল্য রবীন্দ্রকর্মী আর মাত্র দু-একজনই আছেন। রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পাদনা এবং রবীন্দ্রপাঠভেদের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তাঁর অক্লান্ত, নিরবসর মূল্যবান পরিশ্রম প্রতিটি রবীন্দ্রভক্তকে কৃতজ্ঞ করে রেখেছে। 'রাখী'র সম্পাদনা বিষয়ে, বিশেষত বর্জিত অংশের চিহ্ন-হীনতা নিয়ে হয়ত প্রশ্ন ওঠা সম্ভব, সংকলিত গানগুলির উৎসের পরিচয় দেবার নীতির প্রসঙ্গেও কিছু কিছু প্রশ্ন করা চলে, কিন্তু 'রাখী' সম্পাদনার কর্মটি রবীন্দ্রগবেষণার ক্ষেত্রে শ্রীকানাই সামন্তের সামগ্রিক অবদানের তুলনায় এতই নগণ্য যে এ নিয়ে বেশি কিছু বলা অসমীচীন।

কিন্তু নব বিবাহিতের যুগল হৃৎস্পন্দনের যে-ছন্দটি মলাটের ছবিতে প্রাণ পায়, 'রাখী'র কাব্যপরিসরে তার যোগ্য অনুরণন জাগেনি! সংকলিত রচনাগুলির মধ্যে কোনো গাঠনিক তাৎপর্য, বা চয়নের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায় না। থীমগত বাঁধুনি নেই বলে 'রাখী'র স্বকীয় কোনো চরিত্র গড়ে ওঠেনি। এখানেই 'রাখী'র দুর্বলতা। চিত্তের একটি সামগ্রিক রূপরেখা যদি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এ থেকে তাহলেই এ প্রয়াস সার্থক বলতে হবে"—ভূমিকাতে এই বিনীত নিবেদন আছে। কিন্তু এই উদ্ভাস পাঠকচিত্তে ধরা দেয় কি? 'সামগ্রিক রূপরেখা'র লক্ষ্যে পৌঁছতে গিয়ে 'রাখী'র মূল চরিত্র হারিয়ে গিয়েছে। এ-রাখী যে কেন—তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এ-রাখী যে কী, সেটা বোঝা কঠিন।

"প্রেমের কবিতা"র চেয়ে এতে "প্রেম বিষয়ক" কাব্যের প্রাবল্য—তাই এই সংকলন রক্তাল্পতায় দুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সবচেয়ে মর্ত্যকবি, সেখানেই তিনি অমর। কবির 'হৃদয়রক্তরাগে' যেসব কবিতা মন্ত্রের মতো চিরায়ত, তাদের পরিবর্তে এখানে প্রায়ই জায়গা জুড়েছে এমন সব কাব্য (যাদের এক
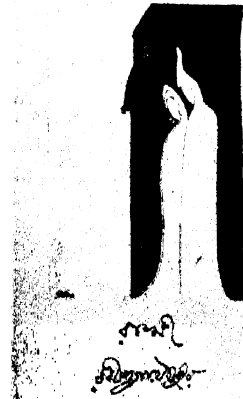
অর্থে অবশ্য 'ব্রহ্ম'-স্বাদ-সহোদর বলা যায়—!) কোনো নব দম্পতিরই যা হৃদয়ে পৌঁছুবে না। যেমন 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'নিষ্ফল কামনা', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'ধ্যান', 'শেষ', 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'দুই বোন'—ইত্যাদি। বধূবরণের পক্ষে 'উর্বশী' (নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ...) বা 'সবলা' (যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী) যথাযথ কি? 'নারীপ্রগতি' পদটি কি এখানে না দিলেই চলত না? এমনি অজস্র অযোগ্য কবিতার উদাহরণ আছে। এখানে কচ নেই দেবযানী নেই, মানস সুন্দরী, লীলাসঙ্গিনী, চিরায়মানা নেই। আছেন সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। এখানে নেই অজস্র সখি মুহুমুহু, একটুকু ছোঁয়া লাগে, আমার পরাণ যাহা চায়, বা এমন দিনে তারে বলা যায়, আছে জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে, এই ক্ষণে তোমার প্রেম ওগো, লক্ষ্মী যখন আসবে —ইত্যাদি। প্রহর শেষের আলোর রাঙা ফাগুন চৈত্রের মারাত্মক সব কবিতার বদলে 'লেখনে'র কিছু অপ্রাসঙ্গিক পদ্য, নারী এবং নরনারী 'সম্পর্কিত' হাজারটা নৈর্ব্যক্তিক রচনা। এ-রাখীতে এক মৃদু, মিস্টিক, অতীন্দ্রিয় সুরভির অধরা মাধুরী জড়ানো, কিন্তু নব দম্পতির দুতস্পন্দিত মণিবন্ধে কি তা মানায়? আরেকটু তীব্রতর বর্ণগন্ধ বুঝি কাম্য ছিলো। 'মহুয়া', 'পূরবী', এবং 'ক্ষণিকা'র চয়নে বিশেষভাবে এই প্রেমে, পূজায়, নারীতে মিশে গিয়ে সংকলনটি কিঞ্চিৎ উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সামগ্রিকতার দিকে নজর না দিয়ে বরং কিছুটা সংকীর্ণতর ভাব-পরিসরে একমুখী; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কবিতার সংকলন করলেই হয়তো সংকলনের ভাবসংহতি রক্ষিত হতো; 'রাখী' একটি শাণিত চরিত্র পেতো। এবং নব দম্পতির পক্ষেও গ্রন্থটি হতো যোগ্যতর। চির-পরিচিত কাব্যমূর্তির ওপরে যদি একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তীক্ষ্ণতর আলোকসম্পাত নাই করা গেল, তাহলে আর পুরোনো কবিতাকে নতুন মলাটে পরিবেশন করার প্রয়োজন কিসের?

'রাখী' দেখে মনে হলো, রবীন্দ্র-নাথের নারী বিষয়ক কবিতার পৃথক একটি সংকলন সমুচিত হতো [১৯৮৫ পর্যন্ত নারীদশক]—'রাখী'র অনেক কবিতাই সেখানে পুনঃ সংকলিত হবার যোগ্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের কাছে এবারে একটি সবিনয় অনুরোধ। এই যে উত্তররৈবিক রবীন্দ্র-সংকলনগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের মলাটে যেভাবে রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে বইয়ের নাম এবং সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরটি থাকে, তাতে হঠাৎ দেখলে ধারণা হতে পারে এই বইগুলিও বুঝি কবি স্বয়ং সংকলিত করে গিয়েছেন 'চয়নিকা' 'সঞ্চয়িতা'র মতো। (লক্ষ করা যায়, 'রাখী'তে ব্যবহৃত স্বাক্ষরটি রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের। কাঁপা হাতের, এতে কেমন-যেন একটু জালিয়াতির মতোও দেখায়।) তাই মাঝে মাঝে মনে হয় এসকল বইয়ের মলাটে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর না থাকাই বাঞ্ছনীয়, ভবিষ্যৎকে বিভ্রান্তির সুযোগ না দিতে। এছাড়া সম্পাদকের নামের উল্লেখটি টাইটেল পেজেই থাকা উচিত, বিশ্বের সাধারণ নিয়ম মাফিক। 'রবীন্দ্ররচনার ভাণ্ডারী' শ্রীপুলিন-বিহারী সেনের বিনয়বশত সম্পাদকের নামটি 'প্রিন্টার্স' লাইনে দেবার ঐতিহ্য বিশ্বভারতীতে চালু হয়ে গেছে, সেটি অহংশূন্য হলেও, অন্যদিকে তার একটা ব্যবহারিক অসুবিধে আছে। বিশেষত দূর ভবিষ্যৎ ও অমনোযোগী পাঠকের কথা মনে রাখলে।

নবনীতা দেব সেন

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি

বৃত্তি পেয়ে চারজন শিল্পী কারুকলা সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে এসেছিলেন বরোদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। বাঙলা দেশে ফেরার পথে তাঁরা কলকাতায় প্রদর্শনী করে গেলেন।

গত ত্রিশ বছরে বাঙলা দেশের ছবি প্রধানত বিমূর্ত হয়েছিল জয়নাল আবেদিনের প্রভাব সত্ত্বেও। উপমহাদেশীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন কিছু করার জন্যে শাসক সম্প্রদায়ের চাপ ছিল পরোক্ষ। সুখের বিষয় নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা এসবের তোয়াক্কা রাখেন না। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীরা বৃত্তি পেয়ে যেতেন ফ্রান্সে, ইংলন্ডে, পশ্চিম জার্মানী বা পূর্ব ইউরোপীয় দেশে। ছিটকে ছাটকে কেউ হয়তো স্ক্যান্ডেনেভিয়া বা আমেরিকায়।

ছাত্রীকে ভারতবর্ষে পাঠানো হচ্ছে অন্তত।

এঁদের মধ্যে এ এম আলমগীরের কাঠখোদাই, পাথরছাপ, এচিং খুবই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল। ছাপাই ছবির প্রতিটি মাধ্যমের ওপর দখল থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব শৈলী তিনি গড়ে তুলতে পারেননি এখনও।

আবদুস সাকুরের এক বা একাধিক মুখ দারুণ আকর্ষণ করে। কাগজ জলরঙ দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তার ওপর খড়ি বা প্যাস্টেলের মুখ। এই সব মুখগুলো চেনা অচেনা বহু মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ মুখগুলো কোনো বিশেষ মানুষের প্রতিকৃতি নয়। অজ্ঞাত পরিচয় হলেও কিন্তু তাদের মনুষ্যত্ব স্পষ্ট। সকল মানুষের নির্যাস নিয়ে তাদের আঁকা হয়েছে।

ফরিদা জামানের ক্যানভাসে গুজরাতী এবং মহারাষ্ট্রীয় বাজারের দৃশ্য। পটে রঙের পোঁচ দিয়ে ভেঙে পুরো রচনাটা আঁকা হয়েছে। তৈল-

আবদুল সাকর

চিত্রের রঙের ওজ্বল্য এবং দ্বিমাত্রিকতা বজায় রেখে। কিন্তু ফরিদা হিসাবী বড়। ভাঙা রূপবন্ধ এবং জটিল বুনোটের কারিকুরির জন্যে জমেছে। বিশেষত একটি মেয়ে আছে লাল, নীল, বেগুনী সমতল রঙের বিরোধের মধ্যে যাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে—পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। সবই ভাল কিন্তু আরেকটু ছটফটানি দরকার। যে বিষাদ এবং নৈরাশ্য আধুনিকতার লক্ষণ তারই অভাব বড়। এঁর একটি হলুদ নিসর্গ দৃশ্য হাওয়া আলো ছায়া মিলিয়ে আবেশ তৈরী করেছিল।

অলোক রায়ের পোড়ামাটির রিলিফ ভাস্কর্য ছিল। পটে পোস্টারের ধরনটা কাজে লাগিয়েছেন। পোস্টারে মুখগুলো

ফরিদা জামান।

অলোক রায়

মাটি ফুলিয়ে কমিকসের রূপারোপ নিয়ে মজাদার করা হয়েছে। কিছুটা হয়তো নাটকীয়। চৌকো ঘর কেটে বসিয়ে কোথাও সমতল আর কোথাও খুটিদার করেছেন। মুখগুলোর বিকৃতি-করণের ভঙ্গী কিন্তু বিদেশী। তাঁর কালো সাদা অংকনে মাটির হাতেগড়া পুতুলের মজাটা বজায় রেখেছেন। বিশেষত কালো থেকে ছাই ছায়ের বিচিত্র ব্যবহার।

পরবর্তীকালে এঁদের কাজে বাঙলা মানুষ জন নদী গাছপালা কোঠা কুঁড়ে নিশ্চিত আসবে— আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

নয়রঙ্গের প্রথম অনুষ্ঠান

ওস্তাদ বরকত আলী খাঁর স্মৃতি চিরস্থায়ী করার জন্য ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সংগীত সংসদ 'নয়রংগ' নামক এক সংস্থা গড়ে তুলছেন। বরকত আলী তার ঠুংরী ও দাদরাগুলি 'নয়রংগ' নামে লিখতেন। এই সংস্থার প্রথম অনুষ্ঠান হয় গত ৫ই জুলাইয়ে কলামন্দিরে। আসরের শিল্পীরা ছিলেন বরকত আলী খাঁর ভাগ্নে এবং শিষ্য সফদর হুসেন খাঁ এবং বাংলার নামকরা গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

সফদর হুসেন একটি তড়িৎগতি পাঞ্জাবী ঠুংরী—'না জা পি পরদেশ'—গেয়ে আসর শুরু করেন। এতে রঙ্গ বেরঙের স্বরের নকশা ও কিছু উপ-ভোগ্য চক্রাকার হরকতের কাজ ছিল। পরের গানটি ছিল একটি গজল—'আজিব হুসনুসে' (ভৈরবী)—যাতে তার ষড়জের উপর দীর্ঘ অধিষ্ঠান ও বিচিত্র মেজাজি অলঙ্কারের তুবড়ি এক অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। এর পরে শোনা গেল দুটি দাদরা—'বরসন লাগি' (পিলু) ও 'মার ডালা নজরিয়া মিলাইকে' (পাহাড়ি)। প্রথমটিতে ছন্দ, প্রাণবন্ততা ও আকর্ষণীয় সুরের কাজ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টিকেই তাঁর আসরের শ্রেষ্ঠ নিবেদন বলে মনে হয়েছে। মুড়কি ও হরকতের সংগে দীর্ঘ স্বরের শিল্পী-সুলভ মিশ্রণ সত্যই শ্রবণীয় হয়েছিল, তাছাড়া বড়ে গুলাম আলী পাহাড়ি গেয়ে আমাদের যে এক অনুভূতির

মায়াকাননে নিয়ে চললেন তারও একটা আভাস পাওয়া গেল এই গানে। এর পরে শোনা যায় শিল্পীর বৈঠকের একমাত্র ঢিমা ঠুংরী—বিজুরি চমকে' (খাস খাম্বাজ)—এবং অনুভূতিপূর্ণ বোল-বানাওয়ের মসৃণ প্রবাহ বুঝিয়ে দিল সফদর হুসেন একজন জাত ঠুংরী গায়ক। পরের দাদরাটিতে (ম্যায়া মানলে পপইয়ারা) ঝিঁঝোটি ও মল্লের এক মজাদার মিশ্রণ লক্ষ করলাম এবং মিশ্রণটিকে শিল্পী যথাযথভাবে ব্যবহার করেছিলেন। শ্রোতাদের অনুরোধে শিল্পী অনুষ্ঠানের শেষে 'তেরি মহফিল' গজলটি গেয়ে শোনান।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বাগেশ্রীতে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল গেয়ে শোনান। তাঁর বিস্তারের কাজ দৃঢ় ও মোটামুটি সুপরিকল্পিত হয়েছিল এবং দ-প, ণ-গ এবং প-ম, সঙ্গতিগুলি ভালভাবে ব্যবহার হয়েছিল। বিলম্বিত খেয়ালটির তান ও সরগমের কাজও ভালই হয়েছিল কিন্তু দ্রুত খেয়ালটির কিছু কিছু সরগমে যেন একটু ছেলেমানুষি লক্ষ করলাম।

তবে তাঁর গলা তারের সা ও তার উপরে চড়তে বেশ বেগ পাচ্ছিল ফলত এই অংশে প্রায়ই সুর ঠিকমত লাগেনি। এই কারণে বেশ কিছু তান ও বিস্তারের কাজ কানা হয়ে যায়। তাঁর শেষের খাম্বাজ ঠুংরীটি অবশ্য অতি উৎকৃষ্ট হয়েছিল এবং বোল-বানাওয়ের আমেজ ও অলংকরণ বোম্বা ও সাধারণ শ্রোতা সবাইকেই আনন্দ দিয়েছিল।

নীলাক্ষ গুপ্ত

এবারেও তাঁর মান অক্ষুন্ন ছিল। বিজয় সিংহের গান শুনে তৃপ্তি হল না। সুমিত্রা রায়ও এবার তৃপ্তি সঞ্চারে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' বেশী প্রাণবন্ত। প্রসূন দাশগুপ্তের কণ্ঠ সমৃদ্ধ। তাঁর ভরা গলার দুটি গানই ভালো লেগেছে। পূরবী মুখোপাধ্যায় শুরুতেই জমিয়ে দিলেন আসর। খোলামেলা এক নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁর কণ্ঠে 'আমাদের পাকবে না চুল' স্মরণীয় নিবেদন হয়ে থাকবে। অন্য গান দুটিতেও পূরবী মুখোপাধ্যায়কে পুরোপুরি পাওয়া গিয়েছে। সেদিনের আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ঐতিহ্যবান শিল্পী এবারের আসরে যেন তাঁর পুরনো দিনের পূর্ণ মেজাজ ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁর এবারের গান শুনে

ফটো : সুবীর চ্যাটার্জি

সুশীল চট্টোপাধ্যায়

যে-রোমাঞ্চ অনুভব করা গেল বহুদিন তার স্বাদ থেকে শ্রোতৃমন্ডলীকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন তিনি। সপ্রাণ সনিষ্ঠ তাঁর ভঙ্গি, উদাত্ত বিবশকারী তাঁর কণ্ঠ চারখানি গানেরই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্ট ও অভিভূত করে রেখেছিল।

দু-দিনের আসর : নানা পর্যায়ের গান

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে এবার দুটি দিন নির্ধারিত হয়েছিল নানা পর্যায়ের গানের জন্য। প্রেম-পূজা-প্রকৃতির পর্যায়-বহির্ভূত এই গানের আসরের প্রথম দিনে—২৮ মে সকালে—ছিল নৃত্যনাট্য ও নাটকের গান। দ্বিতীয় দিনটি—১ জুন সন্ধ্যা—চিহ্নিত হয়েছিল বিচিত্র, স্বদেশ, আনুষ্ঠানিক ও হাসির গানের জন্য।

প্রথম দিনের একক আসর শুরু হল জয়ন্ত সাহার গান দিয়ে। নতুন শিল্পী, কিন্তু পরিবেশনে কোনো দুর্বলতা ছিল না। স্বচ্ছন্দ ও দরাজ কণ্ঠে গান করেছেন জ্যোৎস্না দত্তও। সুশীল মল্লিককে মধ্যে দু-এক বছর পূর্ণ মেজাজে পাওয়া যায় নি। তাঁর এবারের গানে অনেকটা মেজাজ ফিরে এসেছে বলে মনে হল। বন্যা মজুমদারের গান তেমন ছাপ ফেলে নি। বীরেন চট্টোপাধ্যায় শোনালেন তাঁরই পুরনো রেকর্ডের গান—'জাগরণে যায় বিভাবরী।' একই জায়গায় আছেন তিনি। রত্না সিংহের কণ্ঠটি চমৎকার। গানও করেন সুন্দর। শুধু মাইকটিকে পুরো ব্যবহার করেন নি। গীতা সেনের 'আমি কারেও বুঝি নে' বেশী ভালো লেগেছে। 'বড়ো বিস্ময় লাগে' গানটি তিনি যে-ভঙ্গিতে শোনালেন তা প্রচলিত সুর থেকে একটু অন্য রকমের। নিশ্চিত এ-রকম আছে কোথাও। প্রভাত পালের 'হায় রে নূপুর' মেজাজী পরিবেশন। সুমিত্রা বসু ...

১ জুন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের সূচনা বেশ ভালোভাবেই হয়েছিল। 'বাণী বিদ্যাবীথির সুন্দর সম্মেলক গান দিয়ে শুরু। একক আসরের প্রথম শিল্পী নির্মল বিশ্বাসও ভরা গলায় দু-খানি গান শুনিয়ে পরিবেশকে আরও নির্মল করে গেলেন। মুশকিল বাধালেন কণিকা ফণি। অসম্ভব 'নারভাস' হয়ে পড়েছিলেন এই নবীন শিল্পী। প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন আসরে। তাঁর গান অন্যবারের থেকে ভালো হয়েছে, কিন্তু গানের নির্বাচন নিয়ে সংশয় জাগে। যে-দুটি গান গাইলেন তিনি, দুটিই চিহ্নিত ছিল এই দিনের আসরের অন্য দুই শিল্পীর নামে। তাঁরা নিশ্চিত অসুবিধায় পড়েছেন। ধীরা মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানই ভালো লেগেছে। আশিস ভট্টাচার্য খুবই দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন 'এ ভারতে রাখো নিত্য' গানটি। অনুভা মৈত্র খারাপ গান করেন নি, এটুকু বলা যায়। অমল নাগ প্রতিবারই এই আসরে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিবেদনে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। এবারেও তাই থাকবেন। শুধু একটিই দুঃখ, তাঁর মতো পরিণত শিল্পীকে

হয়। এ-সুযোগ এদিনের আসরের আরেক বিশিষ্ট শিল্পী পূর্বা দামের ক্ষেত্রেও অনুভব করা গেল। পূর্বা দামকে যে-কোনো আসরে একই রকম প্রাণবন্ত মনে হয়। এবারের আসরেও তিনি দু-খানি গানেই শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত হরণ করেছেন। শুধু একটি সংশয়ের কথা সবিনয়ে ব্যক্ত করব। ‘ওরে মাঝি’ গানের সঞ্চারী অংশে ‘মন্দ-মধুর’ কথাটির সঠিক উচ্চারণ কী? মন্দ না মোন্দ? অ-কারান্ত উচ্চারণেই বেন কানের পক্ষপাত। বিজয়া চৌধুরীর কণ্ঠে মাধুর্য কিঞ্চিৎ কম। কিন্তু তাঁর গায়কী সুষ্ঠু। অলোকা দে উঁচু পর্দায় স্বচ্ছন্দ। প্রতিমা মুখোপাধ্যায় শোনালেন ‘মধুর মধুর ধ্বনি বাজে’ ও ‘দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়’। সত্যিই যে তাঁর দিনগুলি সোনার খাঁচায় আর নেই, ফলে ‘মধুর মধুর ধ্বনি’ অন্তর থেকে কণ্ঠে শরীরী হয়ে ওঠে না—দেখে কষ্ট হল। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নিজেরই রেকর্ড-করা গান গাইলেন ‘কমল বনের মধুপ রাজি’। তাঁর রেকর্ডের থেকেও খারাপ লাগল আসরের গান। শুধু ‘যাওয়া আসা’ গানটিতে ‘লাজে ভয়ে ত্রাসে’র পর তাঁর নিজস্ব সংযোজিত ক্ষান্তি (Pause) কেন, এ-প্রশ্নও থেকে গেল। অরবিন্দ বিশ্বাস ‘হাসির গান’ শুনিয়েছেন যতটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে, শ্রোতৃমণ্ডলীও ততটাই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। হিমাংশু রায়চৌধুরীর ‘কাটাবনবিহারিণী’ বরং হাসির গান হিসেবে বেশী মেজাজী নিবেদন। তবে এ-দিনের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলিয়ে দিয়েছেন আরেক প্রবীণ শিল্পী—তাঁর নাম সুশীল চট্টোপাধ্যায়। সুর যে তাঁর কণ্ঠের পোষাপাখি রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই আসরে তিনখানি অনবদ্য নিবেদনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ রেখে গেলেন তিনি। একটি গানে তিনি যখন গাইছিলেন—‘আমরাও খেলা খেলেছিলেম আমরাও গান গেয়েছি। হারায় নি তা হারায় নি—’তখন তাঁর সঙ্গেই গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল—সত্যিই ‘হারায় নি, তা হারায় নি’।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

ভূমিকা

শ্যাম বেনেগলের ‘ভূমিকা’তে নায়িকা উষার বিবিধ ভূমিকা। বালিকা বয়সেই সে অশান্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সে শান্তি খোঁজে। দিদিমার কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিতে তার ভাল লাগে। কিন্তু উষার মা চায় না তার মেয়ে গায়িকার বৃত্তি নেয়। এই নিয়ে পারিবারিক অশান্তি।

বাপের আকস্মিক মৃত্যুতে সব-কিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়। প্রতিবেশী কেশব পরিবারের অভিভাবক হয়ে ওঠে, এবং সে-ই উষাকে বোম্বাইয়ের ফিল্ম-জগতে নিয়ে যায় রোজগারের আশায়। বালিকার সুরেলা কণ্ঠস্বর সাফল্যের দরজা খুলে দেয়। প্রথমে ছোট পার্ট, তারপর বাড়তে বাড়তে একেবারে স্টার।

ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। নায়ক রাজনের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই নায়িকার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে হাতছাড়া করবার মত বোকা কিন্তু কেশব নয়। তাই কোন-কিছু ঘটবার আগে সে নিজেই উষাকে বিয়ে করে তাদের বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও। উষার মায়ের সঙ্গেও কেশবের অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে ছবিটিতে। ফলে মা-মেয়ের সম্পর্ক—যা কোনদিনই মধুর নয়—তিক্ততর হয়ে ওঠে।

যথাসময়ে উষার একটি মেয়ে হয়। সে তখন ফিল্মের পাট চুকিয়ে পুরোপুরি ঘর-গৃহস্থালি নিয়ে থাকতে চায়। সেখানেও বাধা আসে কেশবের দিক থেকে। সংসারের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তার নেই। সুতরাং, অভিনয় করেই উষাকে উপার্জনের পথ খোলা রাখতে হয়। তাতেও কিন্তু শান্তি নেই। কর্মক্ষেত্রে উষাকে সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলে কেশবের ক্লেদাক্ত মনে সন্দেহের ইন্ধন জোগায়। ফলে উষার জীবন বিষিয়ে ওঠে। নিজের হীনমন্যতা কেশব ঢাকতে চেষ্টা করে স্ত্রীকে মারধোর করে।

এই অবস্থায় উষা একদিন রাজনের আশ্রয়প্রার্থী হয়। কিন্তু আশ্রয় মেলে না। উষার সম্ভোগে রাজনের আপত্তি নেই, কিন্তু তার পুরোপুরি ভার নিতে সে নারাজ। এই সময়ে উষার জীবনে আর এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। নাম সুনীল, উষার নতুন ছবির নবীন পরিচালক। যেমন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, তেমনি কথার ধার। বাকচাতুর্য বিভ্রম ঘটায়। উষা সন্তানসম্ভবা হয়।

স্ত্রীর অসতীত্বের নিদর্শন জীইয়ে রাখবার পাত্র কেশব নয়। সে উষাকে বাধ্য করে অঙ্কুরেই তাকে বিনষ্ট করতে। অবস্থার চাপে উষার মানসিক ভারসাম্য বিশেষভাবে নাড়া খায়। সংসারের শিকল কেটে সে এবার বেপরোয়ার মত বেরিয়ে পড়ে অন্য আশ্রয়ের খোঁজে। এক জমিদারগৃহে আশ্রয়ও মেলে—অবশ্য তার রক্ষিতা রূপে।

বিচিত্র সেখানকার জীবনধারা। স্ত্রীর সঙ্গে উপপত্নী সহাবস্থান সে গৃহে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। একজন জোয়ান মরদের একাধিক আওরতের প্রয়োজন সেখানে সর্বজনস্বীকৃত। বিশেষ করে গৃহস্বামী যে ক্ষেত্রে প্রভূত বিত্তশালী।

সকলকার দেখাশোনার ভার, অসুস্থ জমিদার-গৃহিণীর পরিচর্যা, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে উষা অল্পদিনের মধ্যেই এ-গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে ওঠে। এই নূতন ভূমিকা তার জীবনে আনে এক অনাস্বাদিত পরিপূর্ণতা যার স্বাদ স্বামীর ঘরে সে কোনদিন পায় নি। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের আঘাতে উষার স্বপ্ন একদিন ভেঙে যায়। সে বুঝতে পারে নিজের গণ্ডির মধ্যে তার যত স্বাধীনতাই থাক, তার বাইরে পা বাড়াবার কোন অধিকারই তার নেই। অর্থাৎ জমিদারের রক্ষিতা-রূপে সে এ গৃহে চিরবন্দিনী।

অবশেষে উষাকে আবার কেশবের

অমল পালেকর ও স্মিতা পাতিল

সাহায্যে জমিদারের খপ্পর থেকে নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু ততদিনে সব কিছু পাল্টে গেছে। তার মেয়ে বিবাহিত জীবনে নিজের সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু বহুবিধ ভূমিকার নায়িকা অভিনেত্রী ঊষার জীবন নিরর্থক হয়ে গেছে সব দিক থেকে। এই করুণ উপলব্ধির মধ্যে ছবির সমাপ্তি।

শ্যাম বেনেগলের আগেকার ছবিগুলির তুলনায় এ-ছবিটি ভিন্ন স্তরের। অংকুর, নিশান্ত বা মন্থনের মধ্যে যে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে, ব্যক্তি-জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি আলোচ্য ছবিতে। অবশ্য বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করতে পরিচালক ছাড়েন নি—“নিশান্তে”র ভূস্বামী পরিবারের সঙ্গে “ভূমিকা”র জমিদারগৃহের হালচাল সহজেই তুলনীয়। এ ব্যাপারে দুটি ছবিই এক ছাঁচে ঢালা। তবুও বিষয়বস্তুর আবেদন দুটি ছবিতে স্বতন্ত্র। “ভূমিকা”র কাহিনী যতটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক তার সামাজিক ভিত্তি সে তুলনায় কিছুটা শিথিল। ফলে নায়িকা চরিত্রের ওপর ছবির কাঠামো পুরোপুরি নির্ভরশীল।

এ ব্যাপারে স্মিতা পাতিল পরিচালকের প্রচেষ্টা সব দিক দিয়ে সার্থক করে তুলেছেন অনবদ্য অভিনয়ের গুণে। নায়িকার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ একান্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ছবির পর্দায় ফুটে উঠেছে। এই অভিনয়ের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত পুরস্কার।

স্বার্থ-সর্বস্ব স্বামীর ভূমিকায় অমল পালেকারও প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুলভা দেশপাণ্ডেও চমৎকার অভিনয় করেছেন নায়িকার মায়ের ভূমিকায়। পার্শ্ব চরিত্রগুলির রূপায়ণে নাসিরউদ্দীন শা (সুনীল), অমরিশ পুরী (জমিদার), অনন্ত নাগ (রাজন) এবং বেবি রুকসানা (বালিকা ঊষা) প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির গতি কিছুটা মন্থর। কারণ, দুই দশকের ওপর এর আখ্যানভাগ বিস্তৃত। বোম্বাই সংবাদ ও ফিল্ম স্টুডিওর খুঁটিনাটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিচালক যেভাবে এই দুই দশকের বিস্তৃতির ইংগিত দিয়েছেন তা পরিণত শিল্প-প্রতিভার পরিচায়ক। সুরের ব্যবহারেও (সুরকার বনরাজ ভাটিয়া) পরিমিতির পরিচয় সুস্পষ্ট।

অনুজেন্দ্র ভক্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

প্যান্টোমাইম

ক্ষুধা বড় অশ্লীল। ঈশ্বর কৃপায় নাকি মূকও বাচাল হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষুধাকে মূলধন করে, সমাজ-বিধাতা বাঙ্ময় মানুষকেও বোবা করে দেয়। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন বোবা-কান্নার শেষ হবে না। শপথবদ্ধ দৃঢ়-মুষ্টি কিন্তু বোবা নয়।

দিব্যেন্দু পালিতের একটি স্কেচ অবলম্বনে নভেন্দু সেনের নাটক ‘প্যান্টোমাইম’। নভেন্দু সেন লেখেন কম, কিন্তু তাঁর লেখা নাটক এত গভীর ও মননধর্মী, হয়ত বহু প্রসারী হলে সম্ভব হত না। এবারের নাটক পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর নাটকের সংলাপের মত তাঁর পরিচালনাও দৃঢ়পিনদ্ধ। প্যান্টোমাইম প্রযোজনা শুধু ক্লান্তিকালকে নয়, নতুন নাটকের কালবদলকেও চিহ্নিত করবে।

অদ্ভুত শিল্পশোভন এই প্রযোজনা যা প্রায় কবিতার মত। আজকাল অনেক কবিতার আসরের পর এমন নাটক

প্রযোজিত হয় যা কবিতার মেজাজকে ভঞ্জন করে। এই নাটক কবিতার মেজাজকে আরও নিবিড় করে। অসম্ভব পরিশীলিত এই নাটকের অভিনয় ও মূকাভিনয়। সুযোগ সন্ধানী এই সমাজের পুরোধা যাঁরা নগদ মূল্যে সব কিছু কিনতে চান; এমন কি রাজ-

মুখে, আদর্শ মুখে নয়। শ্যামেন আর আমার সাহেব বলেন তাঁরে বাঁয়ে সচমুচ কোই ক্যারাক নাই। সমাজটা তো মায়ের মতো। ডাইনের দুধে ঘাটা পইড়লে বাঁয়ের, বাঁয়ের দুধে ঘাটা পইড়লে ডাইনের খাবো। ঠিকঠাক টানতে পারলে পুষ্টি দুটোতেই আছে।" অভিনয়ে দুই তিন রকম ডায়ালেক্ট নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত। আর আছে মূকাভিনয়, যা ছবির মতো, গানের মত মনকে ছুঁয়ে যায়, ভাষা বোঝার দরকার করে না। অভিনয়ে হিমাংশু গুহ, দুলাল চক্রবর্তী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিমল দত্ত প্রত্যেকেই সজীব প্রযোজনাকে প্রাণবন্ত করেছেন; আর মূকাভিনয়ের দলে বিমল ভট্টাচার্য, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় সরকার প্রমাণ করেছেন গ্রুপ-থিয়েটার শুধু নিষ্ঠা নিয়েই কতখানি এগিয়ে যেতে পারে। এই দলের সঙ্গে বেমানান লাগে সন্ধ্যা-মুখোপাধ্যায়কে। রথীন চক্রবর্তীও ভাল অভিনয় করছিলেন, দর্শকদের দাবিতে তিনি জোরে সংলাপ বলাতে তাঁর অভিনয় খেই হারালো, সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হলো ওই প্রযোজনা এমন সুরে বাঁধা, যার একটু বিচ্যুতিতেই কানে লাগে, এখানেই প্রয়োগনৈপুণ্য।

এই নাটকের আলো (বিক্রম দাশগুপ্ত ও অমিত ঘোষ) মঞ্চ (অমিত ঘোষ, অশোক দাশ) ধ্বনি (শ্রীপতি দাস) নাটকের মর্যাদা বাড়িয়েছে। সমগ্র নাটকের মধ্যেই আলো ও ধ্বনি পাকামত অথচ অব্যর্থ।

নভেন্দু সেনের আগের নাটক নয়ন ফকিরের পালায় সঙ্গে পরিবেশ ও ঘটনায় এই নাটকের অনেক মিল আছে, যেমন সার্কাসের ক্লাউন, তাঁবু। স্টেজ থেকে ডাইরেকশন। সব শেষে নয়ন ফকিরের পালায় যেমন 'সময় নেই সময় নেই' বলে দ্রুত পদচারণায় মধ্যে দিয়ে পর্দা পড়ে—সশব্দ হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ সচকিত হয়। এখানে ক্লান্তভাবে বেটপ কাঁধে বোঝা নিয়ে ধীর পায়ে সিল্যুয়েট রচনা করে নিষ্ক্রান্ত—বেদনায় বিমূঢ় দর্শক হাততালি দিতে ভুলে যায়। নভেন্দু সেন এইভাবেই এগোচ্ছেন। এই ধরনের নাটক বাংলা মঞ্চে বহুদিন অনুপস্থিত ছিল। নভেন্দু সেন তাঁর রীতি পরিবর্তন করেন নি, কিন্তু বিষয়বস্তুকে দুর্বোধ্য কুয়াশায় না রেখে আরো আলোয়, আরো কাছে নিয়ে এসেছেন, এতে বাংলা নাটকেরই লাভ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আজব সে এক যাদুকর

এ শহরে ছোটদের নাটকের সত্যিই অভাব। এই সময় শিশুরঙ্গম ছোটদের মজার নাটক 'আজব সে এক যাদুকর' মঞ্চস্থ করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন। শিশুরঙ্গমের সাম্প্রতিক প্রযোজনা যদিও ছোটদের নাটক বলে

CHAITRA-C-68 BEN

চাইত, তবু বড়দেরও অনায়াসেই ভাল লাগবে। এ-কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই প্রত্যেক বড়োর মধ্যেই একটা শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে। 'আজব সে এক যাদুকর' দেখতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সেই শিশুটার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি।

সে এক আজব যাদুকর। যাদু দেখাতে গিয়ে দর্শক আসনে বড়দের দেখলে যার মুখ ভার হয়। ছোট ছোট মুখে হাসি ফোটানোই যার একমাত্র কাজ। শিশুরূপম এর পূর্বেও ছোটদের জন্যে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। ছোটদের দিয়ে অভিনয় করানোর অনেক অসুবিধা। কিন্তু একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সে সব অসুবিধাকে দূর করতে পারে তার প্রমাণ শিশুরূপমের নাটক। এ নাটকে বয়স্ক অভিনেতাদের সঙ্গে শিশুশিল্পীরাও একযোগে অভিনয় করেছেন।

মানব মুখার্জীর নাটকের বিষয়বস্তু অবশ্যই শিশুদের আকর্ষণ করবে। তবু নাট্যকাহিনীর বিন্যাস আর একটু সবল হলে ভাল হত। সামগ্রিকভাবে আজব সে এক যাদুকর ছোটদের নাটক হিসেবে সার্থক প্রযোজনা। মঞ্চ-স্থাপত্য শিশুদের কাছে অবশ্যই আকর্ষণীয় হবে। রুমুর স্বপ্ন দেখার দৃশ্য পরিকল্পনা সুন্দর। গভীর জঙ্গল, ডাকাতের বন, যাদুকরের ভান্ডার, রুইতনের সাহেব, রুইতনের গোলাম, গুপ্তমণি গাছ এ সব নিয়ে শিশুদের একটা আন্তর্জগতকে ধরে দিয়েছেন পরিচালক।

গোটা নাটকে রুমুর ভূমিকায় শিশুশিল্পী সুস্মিতা মুখার্জী তার অভিনয়ে দর্শকদের বিস্মিত করেছে। যাদুকরের ভূমিকায় অশেষ বন্দ্যো-পাধ্যায় চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। আটুল বাটুল, যারা যাদু শুরু হবার আগে গান গেয়ে আর বাজিয়ে লোক জমায়। এই দুটি চরিত্রে অমল দাস আর মানব মুখার্জী একটি পরিচ্ছন্ন মজার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। অমল দাসের সুরে গানগুলো উপভোগ্য। একটি গান যদিও একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের অনুকরণ বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছে শিশুশিল্পী রাতুল দেব, অসিত কোলে, পাপড়ি বসু, দেবাশিস কুন্ডু, শিবনাথ মুখার্জী, শুভ্রাংশু সর্দার, সুরথী সেন ও অনিন্দ্য পালচৌধুরী। ডাকাত সর্দারের হাসি মাঝে মাঝেই বিরক্তি সৃষ্টি করেছে।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

কবিতা ও পাঁচালী

একটানা অনেক তাপদগ্ধ দিনের পর সেদিন বিকেলে বৃষ্টি হলো, এবং সন্ধ্যায় কবিতার আসর ছিল। আকাদেমিতে সেদিন পরপর আবৃত্তি করলেন অনেক কবি, নামী এবং অনামী আবৃত্তিকার। অনেকক্ষণ রেশ রয়ে গেল কবিতা সিংহের 'প্রেম এলোনা দুঃখ এল' এবং অমিতাভ দাশগুপ্তের ছোট কবিতা 'টেলিপিস'। দুটি উল্লেখযোগ্য ছোট কাব্যনাট্য পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের 'দুজনে মিলে কবিতা' (কবিতা সিংহ), এই কাব্যনাট্য এ'দের নিয়েই লেখা। আর একটি দীর্ঘ আবৃত্তি নীলাদ্রিশেখর বসু ও শুভ্রা বসুর 'নাটকের নাম ভীষ্ম' (মনীন্দ্র রায়)। আবৃত্তির চর্চা এখন অনেক বেড়ে গেছে। ফলে কিছুদিন আগেও যে নাটকীয় ঢং সকলকে মুগ্ধ করত, সেই ধারা এখন প্রায় অন্তর্হিত।

এই আসরে পরপর নানা ধরনের আবৃত্তি শুনে, আবৃত্তির ক্রমবিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। শ্যামল ঘোষ যখন শামসুর রহমান ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা আবৃত্তি করেন, তখন বহুদিন পরে সুরেলা আবৃত্তি যেমন শ্রোতাকে আপ্লুত করে, তেমন পাশাপাশি জগন্নাথ বসুর অনুবাদ কবিতা বা শামসুর রহ-মানের কবিতা শ্রোতাকে আকিষ্ট করে। প্রণতি মিত্র মুস্তাফী যেভাবে কবিতা সিংহের 'ঝাপান' আবৃত্তি করে সকলকে পুলকিত করেন, তেমনি কাজল চৌধুরীর আবৃত্তিতে 'মারী ফারার'এর (ব্রেখট) বেদনা সকলকে স্পর্শ করে। অথচ দুজনের বলবার রীতি সম্পূর্ণ আলাদা। আবার বিজয়লক্ষ্মী বর্মন কলকাতার উপর সুন্দর কবিতায় সকলকে মাতিয়ে তোলেন। আর ভাল লাগে প্রদীপ রায় মিত্র, অমিতাভ ঘোষ এবং স্বপন গাঙ্গুলীর আবৃত্তি।

আবৃত্তির চর্চা অনেক বেড়ে গেলেও কতকগুলি প্রশ্ন মনে আসে। ঘোষক সব সময় আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করেন 'এখন আ..বৃত্তি শোনাচ্ছেন' কবিতা আবৃত্তির আগে অনেকে বলেন 'নোমস্কার'। স্কুলের প্রাইজ বিতরণ সভা থেকে আবৃত্তি এখন জনসমাদৃত শিল্প। কিন্তু অনেকেই এখনও স্কুলের অভ্যাস মত বলেন, 'আমি এখন রবীন্দ্রনাথ টাকুরের ।' ভাবটা এমন যেন 'টাকুর' না বললে আমরা ঘোষ, বোস, মজুমদার ভাবতে পারতাম। বিদেশে শেকসপীয়ার, কীটস শেলী বলাটাই যথেষ্ট।

কবিতার আসরের পর অনুষ্ঠিত হল চেনা-অচেনার 'জিওরদানো ব্রুনো', বলা যায় কবিতার পরে পাঁচালী অর্থাৎ পাঁচালী যেমন নিয়মরক্ষা এই নাটকও সেই নিয়মরক্ষার ব্যতিক্রম নয়। আধুনিক কবিতার আসর দিয়ে নাটকের আকর্ষণ বাড়াতে চাইলেও, ফল হয়েছে উলটো। আধুনিক কবিতার পাশাপাশি নাটকের মান্ধাতা সংলাপের দৈন্য প্রকট হয়ে পড়ে। অথচ প্রযোজনার পিছনে যত্ন ছিল, পরিশ্রম ছিল, চিন্তা ছিল, শুধু ছিল না নাটকীয় ঐশ্বর্য। ফলে সব কিছুই নীরস মহিলার মেকআপের মত লাগে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

জীবনলাল প্রেম (১৯১৮—)

শুধু আমার সঙ্গে নয় কিন্তু কলকাতার শিল্পরসিকদের সঙ্গে জীবনলাল প্রেমের পরিচয় করিয়ে দেন বি আর পানেসার। দুজনের জীবনের মধ্যে মিল অন্য ক্ষেত্রে কৃতী হবার পর শখের শিল্পী হিসেবে প্রদর্শনী শুরু করেন। শেষে শিল্পী হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। দুজনেই সুশিক্ষিত শিল্পী। ১৯৭৬-এর নভেম্বরে জীবনলালের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন পানেসার আকাদেমী অব ফাইন আর্টসে। পানেসারের সংগে জীবনলালের আরেকটা মিল—তাঁরা উভয়ে কোলাজ করেন। অথচ তাঁরা কিন্তু ভিন্ন জগতের বাসিন্দা।

জীবনলাল প্রেম হিন্দী কবি। লাহোরে জন্ম এবং পড়াশুনো। যুদ্ধের ডামাডোলে অস্ত্রশস্ত্র কারখানা থেকে সৈন্যবাহিনীর হিসাবপত্রের দপ্তরে কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। নিয়মিত ছবি এঁকেছেন, ফাঁকে ফাঁকে। পঁয়তাল্লিশে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর হিন্দী ভাষায় অনুদিত 'গীতাঞ্জলি'। যুদ্ধশেষে বেকার জীবনলাল। দাঙ্গা বিধ্বস্ত পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সীমান্ত অভিমুখে পদযাত্রা। অবর্ণনীয় পাঞ্জাব এবং জীবনলালের মনের অবস্থা। খড়কুটোর মতো ভাসমান হতভাগ্য লক্ষ লক্ষ মানুষ। শেষে লখনোউ-এ এসে 'দৈনিক স্বতন্ত্র ভারতে'র রিপোর্টার হলেন (১৯৪৭-৫১)। আকাশবাণীতে চাকরি করলেন (১৯৫১-৫৩)। অবশেষে 'নবভারত টাইমস'-এ যোগদান করলেন। সিনিয়ার সাব এডিটার এবং শিল্পকলা সমালোচক হিসাবে নাম হল (১৯৫৩)। এই বছরে অবসর গ্রহণ করে সমস্ত ক্ষণের শিল্পী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেছেন (১৯৭৮)।

জীবনলালের আরেক পরিচয় পেলাম দিল্লিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে। অদ্ভুত সংবেদনশীল ভাস্কর তিনি। মাটি দিয়ে আদিম ধরনের ভাস্কর্য করেছেন। বললেন, এবার হয়তো প্লাসটার আর ব্রোঞ্জের কাজ শিখে নিয়ে করতে পারব। বললাম বরং পোড়ামাটির করে ফেলুন। খরচ অনেক কম পড়বে।

জীবনলালের কবিতা আর প্রবন্ধের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম একক প্রদর্শনী নয়া দিল্লির প্রেস ক্লাব (১৯৭১)। তাছাড়া আইফেকস, ইউ পি ললিতকলা প্রভৃতি নানা সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেছেন। একক প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইফেকস, নয়াদিল্লির (১৯৭৫), উদয়পুর এবং জয়পুর (১৯৭৬), কলকাতা (১৯৭৬), ফ্যাকালটি অব ফাইন আর্টস, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী (১৯৭৬), আইফেকস নয়া দিল্লি (১৯৭৮)।

জীবনলাল কোলাজ অংকনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে অল্পদিনের মধ্যে সমালোচক এবং রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর বিষয় আলোচনা বেরুবার কারণ তাঁর কোলাজ আলাদা ধরনের। রবীন মণ্ডল এবং বিকাশ ভট্টাচার্যের মতো নামী শিল্পীরা যখন কোলাজ করেন তখন রঙীন পত্র-পত্রিকার ছবি কেটে তাঁরা নানা কায়দায় কাজে লাগান। পানেসার দেখিয়েছেন কোলাজ কত বড় করা যায়। জীবনলাল দেখিয়েছেন কোলাজ কল্পরাজ্যে প্রস্থানের উপায় হতে পারে কেমন করে। চকচকে রঙীন কাগজ, মার্বল পেপার, ঘুড়ির কাগজ কেটে জোড়েন। পটভূমির পুরো জমিটা কিছুটা

কাগজ জুড়ে এবং অনেকটাই ছেড়ে তিনি যাদুকরের মতো আশ্চর্য খেলা দেখান। তাঁর রঙগুলো সর্বদাই শুদ্ধ এবং প্রায়শ সমতল—লাল, সবুজ, নীল, হলুদ, বেগুনী, কমলা রঙের পরিপূরক এবং বিরোধের মধ্যে দিয়ে কল্পনার যবনিকা তোলেন। তাঁর নকশা খুবই সাদামাটা কিন্তু রচনার মধ্যে বাঁধুনির জোর আছে। যা কিছু অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় তা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে দ্বিধা করেন না।

রূপবন্ধের সরলীকরণ এবং সাদামাটা রেখাচিত্র নকশা তবু কী রকম মোহসৃষ্টি। বিশেষত তাঁর নিসর্গধর্মী কোলাজ আর মাছ ভর্তি পুকুরের চিত্রকল্প মন কেড়ে নেয়। মিতব্যয়ী তিনি। ইঙ্গিত আর ব্যঞ্জনাধর্মী কাজ। আদিম সারল্য, সহজতম আদিরূপ। মাটি জল পাহাড় পর্বত গাছপালা সব নিয়ে বেঁচে থাকার জৈব অনুভূতি মনের ভেতর সঞ্চারিত করেন: জীবনপ্রেমী জীবনলাল প্রেম, গীতি কবিতার ছন্দময়তা এবং স্বচ্ছতা আনতে চান দৃশ্যসৃষ্টিতে। তাই সব কিছুর মৌল আকার সহজ প্রকাশ ভঙ্গী দিয়ে শিল্পসম্মত ছবি করে তুলতে চান।

প্রমাণ তাঁর প্রচ্ছদচিত্র 'নিসর্গ' (১০″ × ৪½″ কোলাজ)। এসব সকলেরই চেনা দৃশ্য। মন্তব্য অপ্রয়োজন। পাহাড় আর সূর্য এখানে দারুণ কাব্যিক সারল্য নিয়ে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। অবলীলায় সাদা জমি ছেড়ে গেছেন। আর এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। রূপবন্ধের সারল্যকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যান যা শিশুচিত্রের সহজভঙ্গীকে ধারণ করেও শিশুচিত্র নয়। বরং কিছু বেশি এবং অনেক গভীর। ছবি তাঁর মতে দৃষ্টিগোচর রঙীন অভিজ্ঞতা। গল্পের উপাদান বাদ দিয়ে শুধু চাক্ষুষী হওয়া উচিত তার আবেদন। অতিকথন, চালাকি এসব সযত্নে এড়িয়ে চলেন। অথচ গভীরতর নান্দনিক বোধ তাঁর কাজকে নিয়ন্ত্রিত করলেও, দেখে মনে হয় স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত। আর এইখানে জীবনলাল সার্থক।

REGD. NO. WB/CC/184/74

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত্তের সৃষ্টি হবে।

সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।

সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

দুজনে দুজনার

যেমন উইল্‌স ফিলটার।
ফিলটার আর তামাকের
অপূর্ব মিলন।
স্বাদে পরিপূর্ণ তৃপ্তি—
প্রতিবার, প্রতিক্ষণ।
লক্ষ লক্ষ ধূমপায়ীর
এটি ছাড়া মনে ধরে না।
উইল্‌স ফিলটার।
একবার ধরলে এ ছাড়া
চলে না।

**ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
ফিল্‌টার সিগারেট**

উইল্‌স ফিল...রে বাধা দেয়।

তামাক ও ফিলটা... পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা ...প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ...তের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে
ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

চিঠিপত্র

কল্টকল্পিত

অতুল্যবাবুর কল্টকল্পিত আত্মজীবনী খুবই আকর্ষণীয়। ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের যে চিত্র (এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত তথ্য) আমরা মাঝে মাঝে পাচ্ছি—(যা আগে সাহস করে কেউ তেমন লেখেননি) তার জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আমরা এখন ইন্দিরা গান্ধীর এবং নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেস-সভাপতি হবার ভিতরের খবর পেলাম, আর জানলাম ইন্দিরার সংগে কামরাজের মতভেদের আসল কারণ (ডিভ্যালুয়েশন-এর খবর চেপে যাওয়ার জন্য)। আমাদের দেশের ঐতিহ্য হল 'বীর-পূজো', অর্থাৎ যাঁরা বড় তাঁদের পূজাই করবে, সত্য হলেও তাঁদের সম্পর্কে অপ্রিয় আলোচনা করবে না। অতুল্যবাবু অনেকের সম্পর্কে সত্য কিন্তু কঠোর সমালোচনা করে একটি নতুন পথের পথিকৃৎ হলেন, তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

তবু আমার একটি মাত্র অভিযোগ আছে। লক্ষ্য করেছি তিনি প্রায়ই ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন, যেমন, ৪১ অধ্যায়টিই ধরা যাক। তিনি শুরু করলেন মেঘদূতের 'প্রত্যাসন্নে নভসি' দিয়ে শেষ করলেন বাইবেল তত্ত্বে। আবার ৫১ অধ্যায়েও সেই রকম দেখি।

অবশ্যই আমি একথা বলতে চাই না যে ঐসব আলোচনা তাঁর অনধিকার চর্চা—তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারো চেয়ে কম নয়. কিন্তু আমার বিনীত বক্তব্য হল যে ঐসব ব্যাপারে (সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন) স্বীকৃত পারংগমেরা যখন অজস্র লিখে গেছেন (এবং সবাই সব সময় একই বিষয়ে একমতও নন), তখন ও'র মত রাজনৈতিক প্রতিভার এ নিয়ে নাড়াচাড়া করা বৃথা কালক্ষেপ নয় কি? আর সে জন্যই সমপরিমাণ (এবং অনেক বেশী আকর্ষণীয়) রাজনৈতিক হাঁড়ির খবর থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম নাকি?

আবার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ফাঁক যে থেকে যাচ্ছে না, তাও বলা চলে না। একটি সংখ্যায় (১৩ এপ্রিল কি?) দেখেছিলাম উনি প্রিমিয়ারের সন্ধিক্ষণে পুরুলিয়ার কথা লিখেছেন। আচার্য বিনোবা ভাবে এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন সেখানে এসেছিলেন এবং ঘোষ মহাশয় তাঁদের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ডাঃ বিধান রায়ের সংগে রাষ্ট্রপতির প্লেনে চড়ে কলকাতায় ফিরলেন তাও পড়লাম। ইচ্ছে করলে তিনি এই প্রসংগে আরও একটি আকর্ষণীয় খবর দিতে পারতেন—কেন ভারত সরকারের অনুমোদনের পরেও এবং কিভাবে রাজেন্দ্র প্রসাদ আবদার করে বাংলার ভাগ থেকে চাস ও চন্দন কিয়ারী থানা বিহারের জন্য ছিনিয়ে নিলেন (যার জন্য সম্ভাবনাপূর্ণ বহুল বনভূমি আর প্রচুর কয়লা খনি আমরা হারালাম) আর তা ছাড়া (গোদের উপর বিস্ফোটকের মতই) বিধানবাবুই বা কেন উপযাজক হয়ে চাণ্ডিল আর পটমদা থানা বিহারের [illegible]

পাকুড় কোয়ালিটি স্টোনের অফুরন্ত ভান্ডার হারালাম)। এসব জানতে আমাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এটা ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা যখন নয়, এবং ডাঃ রায় যখন গত এবং অতুল্যবাবু যখন ইনার সার্কেলের লোক (আমরা অবশ্য লোক মুখে তাই শুনতে অভ্যস্ত), তখন তিনি যদি এ বিষয়ে একটু মুখ খুলতেন, তাঁর লেখাটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হতে পারত আর দেশের লোকের প্রতি সুবিচার করাও হত। তা ছাড়া এই বিষয়ে বাংলার কর্ণধারদেরই কি অবদান ছিল তাও জানা যেত।

আমাদের চোখে আরও দু-একজন দেশবরেণ্য নেতার কোন কোন আচরণ শুধু অদ্ভুতই নয়, বিসদৃশও ঠেকে। উদাহরণ স্বরূপ খোদ গান্ধীজীর কথাই ধরা যাক। (ক) সুভাষবাবু যখন পট্টভীকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন তিনি কেন বললেন—পট্টভীজ ডিফিট ইজ মাই ডিফিট, অথচ তখন তাঁর কথার মাত্রাই ছিল 'আই অ্যাম নট ইভন এ ফোর আনা মেম্বার অফ দি কনগ্রেস!' অর্থাৎ তা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছার কাছে কংগ্রেসের মেজরিটি ভোটের কোন মূল্যই নাই! (নাই যে, তা ত দেখাই গেল পরে)। বাংলা কংগ্রেস তাতে সায় দিল কেন? আবার, (খ) সুভাষবাবু যখন সবাইকে চমকে দিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে (তাদেরও তাক লেগে গিয়েছিল), বিদেশে গিয়ে হাজির হলেন, চারিদিকে যখন সাড়া পড়ে গেল, তখন মহাত্মাজীর কণ্ঠে (তাও বিলম্বে) শোনা গেল প্রশংসা—আফটার অল সুভাষ ইজ নট অ্যান এনিমি অফ দি কান্ট্রি! একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিককে ঐ আখ্যা দেওয়া যেন চাঁদ সওদাগরের বাঁ হাত দিয়ে মনসা পূজার ফুল এগিয়ে দিয়ে কম্প্রোমাইজ করা। সুভাষবাবু যখন (১৯৪০ সালের কাছাকাছি) হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে আন্দোলন করে জেলে গেলেন এবং কাগজে এ নিয়ে বেশ হইচই হতে লাগল, তখন দেখা গেল হঠাৎ একদিন মহাত্মাজী কি একটা ছুতোয় রাজকোটে অনশন শুরু করে দিলেন—ব্যাপারটা গুরুতর কিছু ছিল না। শত্রুপক্ষ যখন রটাল যে এটা সুভাষের প্রতি ঈর্ষার জন্যই আর এভাবেই আবার তিনি লাইমলাইটে আসতে চান—খবরের কাগজের হেডলাইনের মাধ্যমে, তখন তা অবিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরও একটি ঘটনা অবশ্যই আমাদের চিন্তার খোরাক জোগায়—এটি হল যখন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েই কয়েকজন ভেজালকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে তাদের শায়েস্তা করতে উদ্যোগী হলেন (১৯৪৮?), তখন মহাত্মা গান্ধীই তাঁকে চিঠি লিখে নিবৃত্ত করলেন। ঐসব অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি মহাত্মাজীর কেন এত দয়া? অথচ জওহরলাল প্রায় প্রত্যেক সভায় ঘোষণা করতেন যে দেশ স্বাধীন হলেই ঐ জাতের ব্যবসায়ীদের তিনি নিকটস্থ ল্যাম্পপোস্ট থেকে লটকে দেবেন এবং প্রচুর হাততালি কুড়োতেন (মহাত্মাজীর হাততালিও) কিন্তু তা সফল করতে তিনি কড়ে [illegible]

চিঠিপত্র

কণ্টকাকীর্ণপত

অতুল্যবাবুর কণ্টকাকীর্ণপত আত্মজীবনী খুবই আকর্ষণীয়। ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের যে চিত্র (এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত তথ্য) আমরা মাঝে মাঝে পাচ্ছি—(যা আগে সাহস করে কেউ তেমন লেখেননি) তার জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আমরা এখন ইন্দিরা গান্ধীর এবং নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেস-সভাপতি হবার ভিতরের খবর পেলাম, আর জানলাম ইন্দিরার সংগে কামরাজের মতভেদের আসল কারণ (ডিভ্যালুয়েশন-এর খবর চেপে যাওয়ার জন্য)। আমাদের দেশের ঐতিহ্য হল 'বীরপূজা', অর্থাৎ যাঁরা বড় তাঁদের পূজাই করবে, সত্য হলেও তাঁদের সম্পর্কে অপ্রিয় আলোচনা করবে না। অতুল্যবাবু অনেকের সম্পর্কে সত্য কিন্তু কঠোর সমালোচনা করে একটি নতুন পথের পথিকৃৎ হলেন, তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

তবু আমার একটি মাত্র অভিযোগ আছে। লক্ষ্য করেছি তিনি প্রায়ই ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন, যেমন, ৪১ অধ্যায়টিই ধরা যাক। তিনি শুরু করলেন মেঘদূতের 'প্রত্যাসন্ন নভসি' দিয়ে শেষ করলেন বাইবেল তত্ত্বে। আবার ৫১ অধ্যায়েও সেই রকম দেখি।

অবশ্যই আমি একথা বলতে চাই না যে ঐসব আলোচনা তাঁর অনধিকার চর্চা—তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারো চেয়ে কম নয়, কিন্তু আমার বিনীত বক্তব্য হল যে ঐসব ব্যাপারে (সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন) স্বীকৃত পারংগমেরা যখন অজস্র লিখে গেছেন (এবং সবাই সব সময় একই বিষয়ে একমতও নন), তখন ওঁর মত রাজনৈতিক প্রতিভার এ নিয়ে নাড়াচাড়া করা বৃথা কালক্ষেপ নয় কি? আর সে জন্যই সমপরিমাণ (এবং অনেক বেশী আকর্ষণীয়) রাজনৈতিক হাঁড়ির খবর থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম নাকি?

আবার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ফাঁক যে থেকে যাচ্ছে না, তাও বলা চলে না। একটি সংখ্যায় (১৩ এপ্রিল কি?) দেখেছিলাম উনি প্রিমার্জারের সন্ধিক্ষণে পুরুলিয়ার কথা লিখেছেন। আচার্য বিনোবা ভাবে এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন সেখানে এসেছিলেন এবং ঘোষ মহাশয় তাঁদের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ডাঃ বিধান রায়ের সংগে রাষ্ট্রপতির প্লেনে চড়ে কলকাতায় ফিরলেন তাও পড়লাম। ইচ্ছে করলে তিনি এই প্রসংগে আরও একটি আকর্ষণীয় খবর দিতে পারতেন—কেন ভারত সরকারের অনুমোদনের পরেও এবং কিভাবে রাজেন্দ্র প্রসাদ অগ্রসর করে বাংলার ভাগ থেকে চাস ও চন্দন কিয়ারী থানা বিহারের জন্য ছিনিয়ে নিলেন (যার জন্য সম্ভাবনাপূর্ণ বহুল বনভূমি আর প্রচুর কয়লা খনি আমরা হারালাম) আর তা ছাড়া (গোদের উপর বিস্ফোটকের মতই) বিধানবাবুই বা কেন উপযাজক হয়ে চাণ্ডিল আর পটমদা থানা বিহারের হাতে তুলে দিলেন ... পাকুড় কোয়ালিটি স্টোনের অফুরন্ত ভাণ্ডার হারালাম)। এসব জানতে আমাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এটা ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা যখন নয়, এবং ডাঃ রায় যখন গত এবং অতুল্যবাবু যখন ইনার সার্কেলের লোক (আমরা অবশ্য লোক মুখে তাই শুনতে অভ্যস্ত), তখন তিনি যদি এ বিষয়ে একটু মুখ খুলতেন, তাঁর লেখাটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হতে পারত আর দেশের লোকের প্রতি সুবিচার করাও হত। তা ছাড়া এই বিষয়ে বাংলার কর্ণধারদেরই কি অবদান ছিল তাও জানা যেত।

আমাদের চোখে আরও দু-একজন দেশবরেণ্য নেতার কোন কোন আচরণ শুধু অদ্ভুতই নয়, বিসদৃশও ঠেকে। উদাহরণ স্বরূপ খোদ গান্ধীজীর কথাই ধরা যাক। (ক) সুভাষবাবু যখন পট্টভীকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন তিনি কেন বললেন—পট্টভীজ ডিফিট ইজ মাই ডিফিট, অথচ তখন তাঁর কথার মাত্রাই ছিল 'আই অ্যাম নট ইভন এ ফোর আনা মেম্বার অফ দি কনগ্রেস!' অর্থাৎ তা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছার কাছে কংগ্রেসের মেজরিটি ভোটের কোন মূল্যই নাই। (নাই যে, তা ত দেখাই গেল পরে)। বাংলা কংগ্রেস তাতে সায় দিল কেন? আবার, (খ) সুভাষবাবু যখন সবাইকে চমকে দিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে (তাদেরও তাক লেগে গিয়েছিল), বিদেশে গিয়ে হাজির হলেন, চারিদিকে যখন সাড়া পড়ে গেল, তখন মহাত্মাজীর কণ্ঠে (তাও বিলম্বে) শোনা গেল প্রশংসা—আফটার অল সুভাষ ইজ নট অ্যান এনিমি অফ দি কাণ্ট্রি। একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিককে ঐ আখ্যা দেওয়া যেন চাঁদ সওদাগরের বাঁ হাত দিয়ে মনসা পূজার ফুল এগিয়ে দিয়ে কমপ্রোমাইজ করা। সুভাষবাবু যখন (১৯৪০ সালের কাছাকাছি) হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে আন্দোলন করে জেলে গেলেন এবং কাগজে এ নিয়ে বেশ হইচই হতে লাগল, তখন দেখা গেল হঠাৎ একদিন মহাত্মাজী কি একটা ছুতোয় রাজকোটে অনশন শুরু করে দিলেন—ব্যাপারটা গুরুতর কিছু ছিল না। শত্রুপক্ষ যখন রটাল যে এটা সুভাষের প্রতি ঈর্ষার জন্যই আর এভাবেই আবার তিনি লাইমলাইটে আসতে চান—খবরের কাগজের হেডলাইনের মাধ্যমে, তখন তা অবিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরও একটি ঘটনা অবশ্যই আমাদের চিন্তার খোরাক জোগায়—এটি হল যখন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েই কয়েকজন কালোবাজারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে তাদের শায়েস্তা করতে উদ্যোগী হলেন (১৯৪৮?), তখন মহাত্মা গান্ধীই তাঁকে চিঠি লিখে নিবৃত্ত করলেন। ঐসব অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি মহাত্মাজীর কেন এত দয়া? অথচ জওহরলাল প্রায় প্রত্যেক সভায় ঘোষণা করতেন যে দেশ স্বাধীন হলেই ঐ জাতের ব্যবসায়ীদের তিনি নিকটস্থ ল্যাম্পপোস্ট থেকে লটকে দেবেন এবং প্রচুর হাততালি কুড়োতেন (মহাত্মাজীর হাততালিও) কিন্তু তা সফল করতে তিনি কড়ে

স্ট্রাট অফ ক্লে! মহাত্মাজীরও পায়ে তা হলে কাদা ছিল বলা চলে কি?

এই প্রসঙ্গে আমার আর একজন বরেণ্য দেশ-নেতা, দেশ-প্রেমিক, বিদগ্ধ রাজনীতিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক রাজাজীর কথা মনে পড়েছে। ভেবে পাই না, সত্যভাষবাবুর প্রচেষ্টাকে তিনি ফুটো কলসীতে জল তোলার উপমা দিয়ে বিদ্রূপ করলেন কেন? আবার, সব কংগ্রেসীরা যখন কারাগারে (ভারত ছাড় আন্দোলন হেতু), তিনি কিভাবে কারাগারের বাইরে কাটালেন, আর অল ক্লিয়ার হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন গবর্নর এবং গবর্নর জেনারেলের চাকুরি পেলেন এ নিয়ে কংগ্রেস কোন বিরূপ মনোভাব কেন নেয়নি, তা হয়ত জানার প্রয়োজন অনেকেরই আছে। শুধু কি তাই, যখন কলকাতার লাটভবন জাতীয় পুস্তকালয়ের জন্য ছেড়ে দেবার প্রস্তাব ওঠে, তখন তিনি চার্চিল-এর বিখ্যাত উক্তির অনুকরণে (আই হ্যাভ নট বিকাম দি ফার্স্ট মিনিস্টার অফ হিজ ম্যাজিষ্টি টু প্রিজাইড ওভার দি লিকুইডেশন অফ দি এমপায়ার) বিদ্রূপ করেছিলেন এবং প্রস্তাবটি নিখুঁতভাবে বানচাল করলেন। আবার এই নেতাই গোটা পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামকে পাকিস্তানের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে বাকী দেশটার (মাদ্রাজ সুদ্ধ) স্বাধীনতা নেবার সুপারিশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন—পরে বাংলারই লাট হলেন! কেউ কি ধিক্কার দিয়েছিলেন? এই অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলার রাজনৈতিক কর্ণধারেরা কে কি করেছিলেন জানাতে স্বভাবতই ইচ্ছে করে।

ইতিহাস সত্যের উপর রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মিহির চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

লেখকের বক্তব্য

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় 'কণ্টকল্পিত' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছেন এবং সেই সঙ্গে কিছু মন্তব্য করেছেন।

(১) গান্ধীজী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন, সে আলোচনায় আমি যাবো না। ওঁর লেখার তথ্যগত অনেক ভুল আছে। একটিমাত্র বিষয়ে ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়—ডঃ ঘোষ যখন ভেজালকারীদের ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন গান্ধীজী হস্তক্ষেপ করেন—যদি অনুগ্রহ করে উনি কাগজে জানান এ তথ্য উনি কোথায় পেলেন এবং তথ্যের সূত্র কি তাহলে আমরা বাধিত হব।

(২) রাজাজী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে পদ তিনি গ্রহণ করেননি। লেখক মহাশয় রাজাজী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন, তার উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কেবল একটা বিষয়ে তাঁর অবগতির জন্য জানাতে চাই যা 'কণ্টকল্পিত' লেখার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কণ্টকল্পিততে আমি লিখেছি যে পশ্চিম বাংলার দুজন কংগ্রেসী নেতা—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজাজীর গভর্নর হওয়ায় আপত্তি জানিয়ে দিল্লীতে রায় কেন ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে কৈফিয়ত দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে যতদিন যাচ্ছে অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে অনুভব করছি তাঁর রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রায় এখন সর্বজনীন রূপ নিয়েছে।

(৪) চাস আর চন্দনকৌঁর সম্বন্ধে ভারত সরকার State reorganisation commission-এর রায় মেনে নিয়েছিল। State reorganisation commission-এর রায় ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে হয়েছিল। মানচিত্র ও তথ্য দিয়ে আমি কণ্টকল্পিততে লিখেছি তাদের রায় ছিল সম্পূর্ণ ভুল। এর প্রতিবাদও করা হয়েছিল।

(৫) আমি কণ্টকল্পিততে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শংকর, চৈতন্য ও আরও অনেকের কথাই উল্লেখ করেছি। পত্রলেখক এটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছেন আমি মনে করি।

(৬) পত্রলেখক বোধ হয় প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পড়েননি। তাতে পরিষ্কার লেখা আছে কণ্টকল্পিতের লেখাগুলি তথ্য নির্ভর হবে না। আরও একটা তিনি ভুল করেছেন কণ্টকল্পিতকে আমার জীবনী মনে করে। এই লেখা প্রকাশ হচ্ছে, তাতে আমি হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করছি, কিন্তু এটা কোন জীবনী নয়। এলোমেলো ভাবে যখন যে বিষয় মনে পড়ছে লিখে গেছি। সালের কোন ধারাবাহিকতা নেই, ঘটনারও নেই। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা খোঁজাও আমার উপর অবিচার করা হবে। যখন যা মনে হয়েছে লিখেছি, সদাশয় দেশ সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করেছেন, সেই জন্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর সঙ্গে এমন কোন চুক্তি আমার হয়নি যে যা লিখবো সব প্রাসঙ্গিক ও তথ্যবহুল হবে।

লেখক মহাশয় নিয়মিত না হলেও যে কয়েকটি সংখ্যা কণ্টকল্পিত পড়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অতুল্য ঘোষ

আন্দামান : লেখকের জবাব

ভারতের শেষ ভূখণ্ডে ২৭ মে তারিখের অংশ পড়ে, ২৪ জুন তারিখের "দেশে" প্রকাশিত শ্রীঅশোককুমার দাসের চিঠির জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রথমেই বলে রাখি শেষ ভূখণ্ডের লেখক প্রাণিতত্ত্ববিদ নয়। এইবার আসা যাক তাঁর বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গে :

১। যে উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলেছেন 'ব্যঙ্গ' সেটি কিন্তু তা নয়। ১৭০০ সালে ওই দ্বীপে যদি কোনো ভ্রমণে বেরোনো হত তা হলে কি চিত্র দেখা যেত, সেইটাই কল্পনা করার চেষ্টা হয়েছিল। আদি মানুষেরা তখনো সভ্য মানুষের সংস্পর্শে আসেনি এবং প্রকৃতই হিংস্র ছিল। উক্তিটির আগে এবং পরে সেইরকম বর্ণনাই আছে। এইবার আসা যাক অতীত থেকে বর্তমান কালে। বর্তমানেও দ্বীপে দ্বীপে যোগাযোগ-ব্যবস্থা তেমন ভাল নয়। ইনফরমেশন অফিসার ঘোরাঘুরির জন্য প্রশাসনের কাছে বারেবারে সামান্য একটি গাড়ির আবেদন করে

হয়েছিল। তখনও সেই একই দৃশ্য! ঘোরাঘ্ররির প্রয়োজন অথচ যানবাহনের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাঁর নিজের উক্তিটাই লেখকের মুখে।

২৬ মার্চ, ১৯৭৮। বেলা তিনটের সময় ষেসাপত্ত বেলেস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরামকিষ্কর প্রেস কনফারেনসে বললেন—

The communication between the islands is poor. The ferry services are inadequate.

২৯ মার্চ ১৯৭৮। বেলা তিনটের সময় সেক্রেটারিয়েটে আয়োজিত প্রেস কনফারেনসে চিফ কমিশনারকে যখন জিজ্ঞেস করা হল—আপনি কি প্ররো আন্দামান নিকোবার ঘ্ররে দেখেছেন? তিনি জানালেন, চারপাশে ২০০ মাইল বিস্তৃত সম্দ্রে ৭৫০ মাইল দীর্ঘ ধন্কের মত পড়ে থাকা ৫৫০টি বড়-ছোট দ্বীপমালা ও পর্বতসমষ্টি ঘ্ররে দেখা সম্ভব কি? ব্হৎ অংশই অদেখা অজানা পড়ে আছে।

প্র্বতন কমিশনার শ্রী বি এল চক, যিনি স্দীর্ঘকাল এই দ্বীপে ছিলেন, তিনিও বলেছেন—

The life in the islands runs at a slow tempo....There are not many district roads in the islands. Against a need of 192 km of district roads, 77 km have been completed and the work is still in progress.

বর্তমান পরিস্থিতি আমার লেখায় উল্লেখ করেছি। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে ওই উক্তি কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য।

২। এইবার সাপ। সাপের আমি কিছ্রই জানি না। নাম শ্রনলে আঁতকে উঠি। জীবনে একবার সোদপ্ররের মাঠে দাঁড়িয়ে কাব্য করতে গিয়ে, ভরদ্প্ররে কেউটে তাড়া করেছিল। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিল্ম— সাপ থেকে শত হস্ত দ্রে। তব্ আন্দামানের জঙ্গলে ঘোরার সময় কেবলই মনে হচ্ছিল, সাপ ছাড়া যেন ঠিক মানাচ্ছে না। তখন অন্সন্ধিৎসা। তার আগে উচ্চারণগত ত্রুটি সম্পর্কে একট্ আলোচনা করা যাক। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বহ্ ইংরেজী ফরাসী শব্দ আমি ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারি না। গ্রীক তো একেবারেই গ্রীক। ইং রে জী - বাং লা মিশিয়ে কম্পোজ করার অস্ববিধে না থাকলে ব্দ্ধিমানের মত লিখতুম—Elapidae. লেখা যখন গেল না তখন খ্রজতে হল বিভিন্ন অভিধান। অক্সফোর্ডে শব্দটি খ্রজে পেল্ম না। হয়তো কোথাও ঝাপটি মেরে বসে আছে দ্রষ্টি এড়িয়ে। ওয়েবস্টারে অবশ্য আছে—

(Webster's Seventh New Collegiate Dictionary, based on Webster's third New International Dictionary—Indian edition Second reprint) ২৬৪ পাতা।

El.a-pid শব্দটি এসেছে গ্রীক e'.ops থেকে। উচ্চারণ-সঙ্কেত el-ə-pəd সাঙ্কেতিক স্ত্র বলছে ə র উচ্চারণ হবে—kitten-এর en-এর e-র মত। অর্থাৎ এল-এ-পেড। অভিধান ঠিক বোঝাতে পেরেছে কিনা বোঝার জন্যে যিনি কোনো একটি মিশনারী কলেজের ইংরেজীর বিভাগীয় অধিকর্তাও বটে, আলোচনা হল। তিনি বহ্ক্ষণ ধরে গ্রীম্‌স্ ল' বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বিন্দ্-বিসর্গও ব্ঝিনি। শেষে বললেন— বহ্বচন বোঝাতে ae য্ক্ত হয়েছে। গ্রীক শব্দ যদিও গ্রীম্‌স্ ল অন্সরণ করে না; কিন্তু ওই শব্দটি আমি হলে এই রকম উচ্চারণ করব— ইলেপেডে। গ্রীনস প্রাণীতাত্ত্বিক। তাঁর অধ্যাপকরা কিভাবে উচ্চারণ করতেন বা করেন, তিনি আমার চেয়ে ভাল জানবেন। কারণ, এটা তাঁর সড়গড় বিদ্যা। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ অধিকাংশই আমি ভুল শিখেছি। ছাত্রজীবনে কেমিস্ট্রি ক্লাসে আমাদের স্কটিশ প্রফেসার যেদিন ত্যুব বলেছিলেন ব্ঝতে পারিনি। পরে জেনেছিল্ম টেস্টটিউবকে তিনি টেস্টত্যুব বলছেন। সাধারণ শব্দ ফিনান্স কি ফাইনান্স, ডিরেক্টর কি ডাইরেক্টর, তাই যখন শিখতে পারল্ম না তখন ওইসব শব্দ — renaissance, entrepreneur ভয়ে উচ্চারণই করি না। আপনার কোল্রিজিরও উচ্চারণ ওয়েবস্টার খ্ললে অন্য রকম হয়ে যেতে পারে— Kōl-(y)ə-brəd — কল-এ-রেদ। এইবার আপনার কোর্টে বল। এখন ওইসব রেফারেন্স ঘেঁটে জানতে পারবেন সঠিক উচ্চারণ কী।

৩। এইবার কোরাল স্নেকস। সাপ সাপ করতে করতে নীল দ্বীপে গিয়ে শ্নল্ম—মাসখানেক আগেই সর্পাঘাতে একজনের ম্ত্যু হয়েছে। হার্বার মাস্টারকে বহ্ অন্রোধের পর সর্পাহত ব্যক্তিকে পোর্ট ব্লেয়ারে নেবার জন্যে স্টিমার এল। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মাত্র এক মাইল দ্রে হতভাগ্যের ম্ত্যু হল জাহাজের ডেকে। ফিরে এসে প্রাচীন রেকর্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেল্ম —পোর্টম্যানের এ হিস্ট্রি অব আওয়ার রিলেশানস উইথ দি আন্দামানিজ। দ্ খণ্ডে লেখা। ১৮৯৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের ৬৫ থেকে ৭১ পাতার মধ্যে এসিয়াটিক রিসার্চেস (ভল্যম ফোর)-এর ১৭৯৫ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত লেফটেন্যাণ্ট আর এইচ কোলর্কের আন্দামান সমীক্ষা প্নর্ম্দ্রিত হয়েছে। শিরোভাগে লেখা—

Accounts of the Andaman Islands written in 1774 by Lieutenant R. H. Colebrooke, being the first really careful and trustworthy account we have of these people.

Colebrooke লিখছেন:

The only quadrupeds yet discovered in these islands are wild hogs, monkeys and rats. Guanas and various reptiles abound, among the latter is the Green Snake, very venomous, Centipedes of ten inches long, and Scorpions.

এইবার গ্রীন স্নেকস সম্পর্কে কিছ্ জানার জন্যে খ্রজতে হল Animal World Encyclopedia (The Hamlyn Publishing Group Limited, Eighth impression 1977). ২৪০ পাতা। সেখানে

inches in length) found either on the ground or in bushes. তারপর আছে কোথায় পাওয়া যায়, স্বভাব কি, খায় কি, ক' জাতের গ্রীন স্নেকস পাওয়া যায়, ডিম পাড়ে ক'টা ইত্যাদি। অথচ কোলব্রুক লিখছেন বিষধর! ব্যাপারটা তা হলে কি? 'সবুজ সাপের ছোবল খেলেই মৃত্যু'—আমার কথা নয় কোলব্রুক সাহেবের কথা। সবুজ সাপ অথচ বিষধর! আপনি ঠিকই বলেছেন, দীর্ঘকাল যাঁরা আন্দামানে রয়েছেন, তাঁদের চোখে কখনও কেউটে-গোখরো পড়েনি। কিন্তু ক্রেট্‌স্ পড়েছে। ক্রেট্‌সকেই বোধ হয় সাধারণ মানুষ করেত বলে থাকেন। ইলেপেদে গোষ্ঠীতে কোরাল, কোবরা, মামবাস, ক্রেটস, সি স্নেকস পড়ে। [এনসাইক্লোপিডিয়া বলছে। উচ্চারণ ঠিক হল কিনা জানি না] চারিদিকে সমুদ্র। স্নেকস আইল্যাণ্ড রয়েছে। সি স্নেকস থাকা স্বাভাবিক। এবং সি স্নেকস হ্যাভ এ পোটেণ্ট ভেনম। উক্ত এনসাইক্লোপিডিয়া লিখছে—Sea snakes, members of the family Elapidae, are found in tropical waters of the Indian Oceans and Western Pacific Oceans.

কোলব্রুক সহেব তাহলে কি সাপ দেখেছিলেন? সি স্নেকস, কোরাল স্নেকস, বুমস্ল্যাং, বুস স্নেকস, কিং স্নেকস, র‍্যাট স্নেকস, ওয়াটার স্নেকস হুইপ-স্নেকস! আপনার কোলুব্রিডির কিছু শ্রেণীতে বিষ আছে। Scme Colubrid Snakes are venomous. Their fangs always in the rear of the jaw, are only slightly enlarged, and the venom flows along a groove in the front of the fang into the bite wound (Hamlyn—Encyclopedia).

এইবার কোরাল স্নেকসের আশায় হাল না ছেড়ে আর একটু দেখা যাক। আমেরিকার ধরন ছাড়াও আর একটি ধরনও তো রয়েছে: Most ornate are the Oriental Coral Snakes (Calliophis and Hemibungarus) and painted snakes (Maticora), found from South-eastern Asia through the East Indies....and have tremendous venom glands.

কোলব্রুক সাহেব কি এই বস্তু দেখেছিলেন? প্রাপ্তিস্থান তো ওই এলাকারই মধ্যে। তাহলে এই সূত্র ধরে আর একটু এগোনো যেতে পারে। 'যোজনা' আগস্ট, ১৯৭৬, আন্দামান-নিকোবার বিশেষ সংখ্যা। ৭৩ পাতা। লেখক শ্রী এস এস চান্দা। পরিচয় কনজারভেটার অব ফরেস্টস এবং চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন অফ দি আন্দামানস। লিখছেন: A variety of lizards and snakes including VIPERS, COBRAS and CORAL SNAKES are reported from these islands.

এই আলোচনার সুযোগ দেবার জন্যে শ্রীদাসকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুটি গানের লয় সম্পর্কে আলোচনা পড়ে প্রসংগত কিছু বলতে চাই। শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের ৪৫ আর পি এম রেকর্ডে গীত অতুলপ্রসাদী সংগীত "বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা" গানটি শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল মাত্র কয়েকদিন পূর্বে। গানটি শোনার পর থেকেই আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি দিয়ে চলেছে।

মূল প্রশ্নে আসার পূর্বে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা অপরিহার্য হিসেবেই কিছু বক্তব্য রাখছি—

ভারতীয় সংগীতে দুটি ধারা প্রবাহিত, 'মার্গ দেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম্। স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতল রঞ্জকম্"
(সংগীত দর্পণ)

অর্থাৎ একটি 'মার্গ' অপরটি 'দেশী'। এই 'দেশী' সংগীতের শাস্ত্রীয় সূত্রে পাই—

"তত্তদ্দেশস্থয়ারীত্যা যস্যা লোকানুরঞ্জনম্ দেশে দেশে তু সংগীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।" লোকানুরঞ্জনই যার কাজ, সেখানে কথার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কেননা কথাই শ্রোতার মনে ভাবটির চিত্ররূপ সোজাসুজি ফুটিয়ে তোলে। এই কথার অনুকূলে তাল-ছন্দ-লয় এবং সুর মিলে উক্ত কথার ভাবকে রসোত্তীর্ণ করাই "দেশী" সংগীতের ধারা। অপর পক্ষে বলা চলে গীতিকবিতা, তাল এবং সুর এই ত্রিবেণী ধারা মিলে মিশে এক ধারায় প্রবাহিত হয়ে এক বিশেষ রস মাধুর্যের সৃষ্টি করে। এককভাবে তাল বা সুর নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পারে না: চলতে বা চালাতে গেলে গীতি কবিতা কখনই 'গান' হয়ে উঠবে না—এটি দেশী সংগীত ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। আর একটুখানি বিশদ হওয়ার চেষ্টা করছি—কবিতা এবং গীতি কবিতা এই দুটি ভিন্ন ভাবধারায় প্রবাহিত। কোনো কবিতা যদি গীতি কবিতা হয়ে উঠতে চায় তবে তা হবে 'গান' হয়ে উঠবার জন্য উক্ত কবিতাটির আকুলি বিকুলি করা থেকেই। "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" কথাটিই ধরা যাক। যখনই 'গান' হয়ে উঠতে চাইলো তখনই কতগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। যেমন, যখন এটি নিছক কবিতা ছিল তখন এটি ছিল ত্রিমাত্রিক ছন্দ—হৃ দ য়। আ মা র। না চে রে। আ জি কে। ইত্যাদি; কিন্তু যখন 'গান' হয়ে উঠতে চাইলো তখন দেখা গেল এর চঞ্চলতা উচ্ছলতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে যে চঞ্চল সুরটি তালের হাত ধরে এলো সে ঐ ত্রিমাত্রিককে হটিয়ে দিয়ে চতুর্মাত্রিক হয়ে কাব্যে ছন্দে সুরে এক নব রসের সৃষ্টি করে কবিতার ভাবরূপকে সংগীতে উন্নীত করে আমাদের কানের ভেতর পেঁৗছে দিল। তখন হয়ে উঠলো—হৃ o দ য় / আ o মা র/ না চে রে o/আ জি কে o/ইত্যাদি চতুর্মাত্রিক ছন্দের দু ফেরতা তালের চঞ্চল রূপসী। এমন কি চতুর্মাত্রিক ছন্দের চার ফেরতা ঢিমা বা মধ্য লয়ের ত্রিতালও প্রবেশাধিকার পেলো না। মোট কথা ঐ গানটিতে ঐ সুর ও কাহারবা ছন্দকে আসতেই হবে যে! এটা চেষ্টাকল্পিত হতেই পারে না, দেশী

সুর ও ছন্দ

'অতুলপ্রসাদী সংগীত' আমরা বলি কারণ তাঁর নিজের রচিত গীতি কবিতার তাঁর আরোপিত সুর ও ছন্দের ধারাটির জন্য। এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির কিছুই অবদান নেই। একক তিনিই ত্রিধারাকে (কাব্য-ছন্দ-সুর) এক ধারায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাই অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামের গান যথাক্রমে অতুলপ্রসাদী কান্ত, রবীন্দ্র, নজরুল সংগীত হয়ে উঠেছে।

অতুলপ্রসাদের জীবিতকালে তাঁর গানগুলি স্বরলিপিতে ধরে রেখেছেন প্রধানত শ্রীমতী সাহানা দেবী ও শ্রীদিলীপকুমার রায়। শ্রীমতী সুবালা আচার্য, সাহানা দেবী, রেণুকা দাশগুপ্ত, কনক বিশ্বাস প্রভৃতি অতুলপ্রসাদের গীতজ্ঞ আত্মীয়বর্গ যাঁরা কবির নিকট সান্নিধ্যে এসে তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিখবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, এই স্বরলিপি রচনায় তাঁদের অবদানও স্মরণীয়।

এইবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি যদি "বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা" গানটি অতুলপ্রসাদের জীবিতকালে সাহানা দেবী কৃত স্বরলিপি থেকে কণ্ঠে তুলে না নিয়ে এর কাব্য-রস, ছন্দ-তাল-লয় এবং সুরের রস-সাধনা থেকে বঞ্চিত হতাম, তবে হয়তো এই লেখার অবতারণা প্রশ্নাতীত থেকে যেতো। কিন্তু উক্ত ৪৫ আর পি এম রেকর্ডটি শোনার পর আমার প্রশ্নগুলি না রেখে পারলাম না। শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়কে ধরে নিচ্ছি তিনি অতুলপ্রসাদী সংগীতের ধারক-বাহক এবং হয়তো বা কর্তৃস্থানীয়া (authority) তাই পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে সবিনয়ে জানাই—

১। মূল গানটি সাত মাত্রায় বাঁধা

৬ ৭ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
বঁ ধু এ ম ন বা — দ

৭ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
লে তু মি কো থা ০ — —।

ছন্দ ভাগ ১ ২ ৩/১ ২/১ ২ এই ছন্দে যে সুরটি অতুলপ্রসাদ আরোপ করে গেছেন তার রূপ ও রস-মাধুর্য এক বিশেষ ধারায় প্রবাহিত। সুর এসেছে কথার তাগিদে, ছন্দ এসেছে সুরের তাগিদে। সব মিলে একটা পূর্ণতা দিয়েছিল দেশী সংগীতের বিচারে এবং কবির মানসিকতায়। এই ছন্দ এবং সুরটি এই গানটির অন্তর্নিহিত ব্যথা ও বিরহকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করেছে সন্দেহাতীত ভাবে।

২। গানটিতে সুরের চাঞ্চল্য তো নেই-ই তদুপরি ঐ সাত মাত্রার ছন্দটি সুরকে সংযত রাখতেও সাহায্য করেছে। এই ব্যাপারগুলি যে অঙ্কের হিসেবে হয়েছে তা তো নয়; এ যে দেশী সংগীতের আন্তরিক প্রবহমান ধারা কবিহৃদয়ের বাস্তব রূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে স্বরলিপি বহির্ভূত দুটো ভূমিকা, একটি ছোট মীড়, কি ছোট ছোট গুঁড়ো কাজ দেবার অধিকার কাউকেই দিয়ে যাননি; পক্ষান্তরে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত বা নজরুলের এমনি ধারা স্বাধীনতা হরণের নথিভুক্ত নজির যদিও নেই এবং শিল্পী এঁদের গানে তথাপিও একটা কথা থেকে যায়—আমরা অতিরিক্ত ভূমিকা, ছোট বড় মীড়, বা কিছু ছোট ছোট গুঁড়ো গুঁড়ো কাজ দিতে পারলেও এমন কিছু যুক্ত করতে পারি না যাতে গানের মূল রস রূপটি ব্যাহত হয়। এবং এটা অনস্বীকার্য যে এর উপর যদি ছন্দটাই পালটে দিয়ে গাইবার দুঃসাহস করি তবে, বলাই বাহুল্য, যে মূল সুরের কাঠামোটিই শুধু বজায় থাকে। ভিন্ন ছন্দে সুরের রূপটি পালটাতে বাধ্য। আমরা যতই স্বাধীনতার সুযোগ নিই না কেন, মূল ভাবটি বজায় রাখতেই হবে যা পালটি ছন্দ আরোপ করে বজায় রাখা একটা দুঃসাহসিকতা বই কি। এইটিই শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় করেছেন। ছন্দ পালটে চতুর্মাত্রিক করে নিয়ে এমনিভাবে তিনি গাইলেন—

৭ ৮ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
বঁ ধু ০ এ ম ন বা ০ দ লে
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
০ তু মি কো থা ০ (বঁ ধু)

ইত্যাদি, এবং এটি করতে গিয়ে সরল ভাবাশ্রয়ী সুরে বহুতর সুরের কাজ প্রয়োগ করেছেন ঐ আট মাত্রাকে বজায় রাখবার জন্য তাঁর কণ্ঠ-সম্পদ ঢেলে দিয়ে। ৩। লক্ষণীয়, প্রতি প্রথম মাত্রাটি বাণী হীন হওয়াতে একটা ধাক্কা খাওয়া মতো ছন্দের সৃষ্টি করেছেন তিনি এই গানটিতে যা অত্যন্ত অমার্জনীয়। কারণ গানের রূপের কাঠামো বজায় রাখতে তালের যে দায়িত্ব রয়েছে তা অনস্বীকার্য। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিল্প মানসিকতা এবং তদুদ্ভূত সত্তাকে রেকর্ড মারফত পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কণ্ঠ মাধুর্যের অনুকূলে সুরৈশ্বর্য ঢেলে দিয়ে। কিন্তু তা কতটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা তর্কাতীত নয়।

৪। তর্কের খাতিরে বলতে পারি—রামের গীতি কবিতায় শ্যামের সুরে যদুর স্বরলিপি বা রেকর্ডের উপর খোদকারি করতে উক্ত রামের গীতি কবিতায় আমি ভিন্ন সুর, সে স্বরলিপি বা রেকর্ড করলো, এটা তবু যেন ভাবা যায়, কিন্তু রাম যেখানে একাই গীতি-কার ও সুরকার এবং তদীয় গীতজ্ঞ আত্মীয় পরিজন যা ধরে রেখে গেছেন, তার উপর খোদকারি চলে কি?

৫। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় যদি কর্তৃ-স্থানীয় (authority) হনও তা হলেও তাঁর কণ্ঠমাধুর্যের অনুকূলে দু-চার দশটি সুরৈশ্বর্য ঢেলে দিতে পারেন, কিন্তু তালটি সুদ্ধ পালটালেন কি করে, বিশেষ করে আমরা এবং তিনি তো নিশ্চয়ই জানেন ছন্দ পালটালে সুরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও পালটাতে বাধ্য বা পালটাবেই। তাঁকে যদি আমরা অতুলপ্রসাদী সংগীতের ধারক-বাহক ধরে নিই তবে তা থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন। জানতে চাওয়া নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না, তিনি গানটির এই ছন্দ ও রূপ বদলের অধিকার কোন সূত্র থেকে আহরণ করেছেন। কোনো কিছু জানার পরিধিকে বাড়িয়ে তোলার আগ্রহেই আমার এই জিজ্ঞাসাগুলো তুলে ধরলাম। মনে হয় আমার মতো ক্ষুধার্ত বহুজনের আন্তরিক জিজ্ঞাসার সমাধান মিলবে।

অনিল দাশগুপ্ত

প্রকাশিত হল

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নতুন রহস্য-উপন্যাস

কস্তুরী গন্ধ

দাম ৭·০০

ধানবাদ শহর থেকে কিছু দূরে প্রাসাদপ্রতিম বাড়ি—'হীরামঞ্জিল।' সেই হীরামঞ্জিলের মাইফেলে জমিদার কন্দর্পকান্তির আমন্ত্রণে গান গাইতে এল বিখ্যাত গায়িকা কস্তুরী। কস্তুরীর স্বামী ছিল, ছিল সংসার। কিন্তু সেই সংসারে আর ফেরা হল না। কস্তুরী থেকে গেল কন্দর্পকান্তির জলসাঘরে। কিন্তু অল্পকাল পরেই ঘটল দু-দুটি দুর্ঘটনা। কস্তুরী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হল হীরামঞ্জিল থেকে, কন্দর্পকান্তির মৃতদেহ ভেসে উঠল হীরামঞ্জিলের ঝিলে। অভিশপ্ত হীরামঞ্জিলের রহস্যের উদ্ঘাটন হয়তো কোনোদিনই হত না। কিন্তু নিয়তির আশ্চর্য পরিহাসে বহু বছর বাদে নতুন এক বিয়োগান্ত নাটক আবার জমে উঠতে দেখা গেল হীরামঞ্জিলের জলসাঘরের রঙ্গমঞ্চে। এবার খুন হল চন্দনা—কন্দর্পকান্তির ছেলে রজতের নবপরিণীতা স্ত্রী। হীরামঞ্জিলের রহস্যময় হাতছানিতে রজত আর চন্দনা এসেছিল হনিমুনে। তখনই ঘটে গেল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কেন ঘটল ? কে খুন করল ফুলের মত এই নিষ্পাপ মেয়েটিকে ? নতুন এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুরনো পাপ আর প্রতিশোধের এক উত্তেজনাকর ও শ্বাসরুদ্ধকারী অধ্যায় উন্মোচিত করেছেন রহস্য-ভেদী কিরীটী রায়

কিছু ভালো বই

প্রফুল্লকুমার সরকারের
লোকারণ্য
দাম ৪·০০

সুবোধ ঘোষের
বসন্ততিলক
দাম ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বহু যুগের ওপার হতে
দাম ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
ময়ূরী
দাম ৩·০০

মনোজ বসুর
আমি সম্রাট
দাম ৫·০০

রমাপদ চৌধুরীর
হৃদয়
দাম ৬·০০

রূপদর্শীর
ব্রজদার গুল্প সমগ্র
দাম ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী
দাম ৬·০০

বিমল করের
দ্বীপ
দাম ৬·০০

সমরেশ বসুর
যার যা ভূমিকা
দাম ১০·০০

কালকূটের
শাম্ব
দাম ৭·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দু'জনে
দাম ৪·০০

ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বিমল মিত্রের

বৃহত্তম ঐতিহাসিক উপন্যাস

বেগম মেরী বিশ্বাস

দাম ৪০·০০
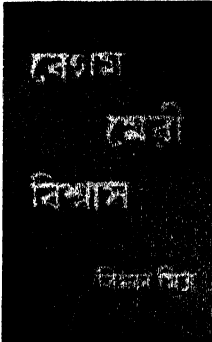
'বেগম মেরী বিশ্বাস' সেই যুগের কাহিনী—যখন তামাম হিন্দুস্থানে একটা বিরাট অবক্ষয়ের প্রবল স্রোত বহমান ;
দিল্লীর বাদশা ক্ষমতাহীন. রাজপুতেরা নির্বীর্য, মারাঠারা ক্লান্ত এবং পূর্বপ্রান্তে বিদেশী বণিকরা চক্রান্তে লিপ্ত। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে একটি সামান্য মেয়ে বাংলা দেশের হাথিয়াগড়ের মত এক অখ্যাত জনপদ থেকে বেরিয়েছিল ঘটনাচক্রের অমোঘ বিধানে। তার বিদ্যে ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, সহায়সম্বল কিছুই ছিল না। তারপর কেমন করে হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল তার ভাগ্য। চোখের সামনে ভাগ্যবিধাতার পরিহাস দেখল, অর্থগৃধ্নুতার চরম বিকাশ দেখল, লালসার অনির্বাণ জ্বালানল দেখল, তারপর একদিন সেই আগুনে আত্মাহুতি দিল।
বিশ্বের বৃহত্তম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বেগম মেরী বিশ্বাস' সেই সাধারণ মেয়েটিকে উপলক্ষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের এক মহান্ চিত্রায়ণ।

সৈয়দ মুজতবা আলীর
প্রেম
দাম ৫·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
ঝড়
দাম ৮·০০

বুদ্ধদেব বসুর
গোলাপ কেন কালো
দাম ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
জীবন যেরকম
দাম ১৫·০০

নীললোহিতের
সুদূর ঝর্ণার জলে
দাম ৮·০০

বুদ্ধদেব গুহের
সুখের কাছে
দাম ৭·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
যাও পাখি
দাম ২৫·০০

দিব্যেন্দু পালিতের
একা
দাম ৬·০০

মতি নন্দীর
কোনি
দাম ৬·০০

মিহির মুখোপাধ্যায়ের
শঙ্খমালা
দাম ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
সেই রাত্রি এই দিন
দাম ৭·০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বিধান সিংহের শাহী কেচ্ছা

ইন্দিরা প্রশ্বের অন্দরমহলের

প্রকাশিত হল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

অনবদ্য হাসির উপন্যাস

পায়রা

দাম ৬·০০

'শ্বেতপাথরের টেবিল'-এর পর 'পায়রা'। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলমে আর-একটি আশ্চর্য নতুন উপহার। হাস্যরস আর করুণরসের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনে বোনা 'পায়রা' আমাদের জীবনের চিড়খাওয়া পারস্পরিক সম্পর্কের একটি অনবদ্য আলেখ্য।
কোন জীবনই শুধু হাসি নয়, শুধু কান্না নয়, জীবন মিলিত-মিশ্রিত এক অনুভূতি। সংঘাত দেখার ধরনে কৌতুক হয়ে উঠতে পারে, আদর্শনিষ্ঠা সময়-সময় নির্বুদ্ধিতার চেহারা নিতে পারে, অনমনীয়তা হতে পারে আত্মঘাতী, আরও কত কী যে হতে পারে তা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ই জানেন। তাঁর কলমে হাসি কখন যে পায়ে-পায়ে করুণরসের চৌকাঠটি ডিঙিয়ে যায়, বলা শক্ত। ইনিই বোধহয় একমাত্র লেখক যিনি গভীর কথা, ব্যর্থতার কথা, বেদনার কথা হাসির মোড়কে অক্লেশে মুড়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন। সেই মোড়কটি, বলা বাহুল্য, একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব। অফুরন্ত কৌতুকের অনাবিল উৎস মানুষের হাসিকান্নার সংসার। সেই সংসারে আমাদের বেঁচে থাকাটাই এক বিচিত্র বহুবর্ণ এক অভিজ্ঞতা। জীবন পায়রার মতই উষ্ণ অথচ অসহায়। সেই জীবনেরই প্রতিচিত্র 'পায়রা' উপন্যাস।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থ :
শ্বেতপাথরের টেবিল ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

দেশ ৪৫ বর্ষ ৪২ সংখ্যা
২ ভাদ্র ১৩৮৫

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
জয়প্রকাশ নারায়ণ ঃ জিজ্ঞাসা ও জবাব
তুলসী সেনগুপ্তের গল্প
উৎসব
মধুসূদন চক্রবর্তীর ভ্রমণ-রচনা
ধ্যানমগ্ন হিমালয় ঃ ধ্যানাসন মায়াপীঠ
প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণা
স্মৃতি সততই সুখের

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদলাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা।
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা।

সম্পাদকীয়

ভাষার আত্মমর্যাদার প্রশ্ন

'বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা'—কবি নিধুগুপ্তের [illegible] চিন্তায় খুবই প্রশ্নাময় অভ্যর্থনা পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করবার যুক্তি আছে যে, শিক্ষিত [illegible] ও লেখক বাঙালী উভয়েই তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই বাণীর সম্যক মর্যাদার প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করবার উপযোগী কর্তব্যনিষ্ঠা, চেতনা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা? প্রশ্নটি বাঙালী শিক্ষিত জনজীবনে ও সাহিত্যের আলোচনার আসরে অবশ্যই বিচারিত হয়েছে এবং মাঝে-মাঝে বিচারিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে চিন্তা ও চেতনায় যতটা সাড়া ও চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, ততটা কার্যত অভিব্যক্ত হতে দেখা যায় নি। ভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের বক্তব্য সন্ধান করবার দরকার হয় না। বিষয়টি সাধারণ কান্ডজ্ঞানের কাছেই একটি সহজ সত্য। মাতৃভাষার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ছাড়া জনজীবনের সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের পক্ষে যথার্থ মর্যাদা অধিগত করা সম্ভবই নয়। বর্তমান অবস্থায় প্রশ্নটিকে বাঙালীর স্বদেশী ভাষার সঙ্গে একটি বিদেশী ভাষা তথা ইংরাজী ভাষার সম্বন্ধের প্রশ্ন বলে মনে করা চলে। উপলব্ধি করতে অসুবিধে নেই যে, জনজীবনের বিগত প্রায় দুশো বছরের অভ্যস্ত রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে গিয়েছে বলেই বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষার দরকারে ইংরাজী ভাষার গুরুত্ব অন্তর্হিত হয়নি। কিন্তু এই বাস্তব সত্যের দৃশ্যটি কি শিক্ষিত বাঙালীর চোখে পড়ে না যে, ইংরাজী ভাষার দুরন্ত এক শাসনের অধীন হয়ে বাঙালীর আপন ভাষা তথা স্বদেশী ভাষার সহজ প্রতিষ্ঠা ও শক্তির স্বাভাবিক উৎকর্ষ যেন একটি অবরোধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সাংস্কৃতিক সত্যের অমোঘ নিয়মের সূত্র ধরে এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হতে হয় যে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে স্বাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ সংস্পর্শ বস্তুত স্বাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যেরই সৌকর্য এবং সমৃদ্ধির একটি প্রেরণাশীল পরিচর্যা। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শ চাই, কিন্তু আধিপত্য অবশ্যই চাই না।

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের আধিপত্য সম্ভব করবার মত বিদেশীয় কোন রাজনীতিক আধিপত্যের ক্রিয়া এখন আর নেই। এখন ইংরাজী ভাষার প্রতি স্থূল প্রকারের একটা দাস্যভাবের ক্রিয়া বাঙালীর মুখের ভাষা এবং লিখিত ভাষার মর্যাদা বিলক্ষণ অবমাননায় বিকৃত করে চলেছে। অভিযোগের তালিকা খুব সংক্ষিপ্ত করেই বলা চলে ঃ এক, ইংরাজী শব্দের ব্যবহার না করে শিক্ষিত বাঙালীরা যেন কথাই বলতে পারে না। বাঙালীর পক্ষে এই অবস্থাটা খুবই খিন্ন ও দুর্বল বাক্‌বিভূতির পরিচয়। বিস্ময়ের বিষয় শিক্ষিত বাঙালীর মুখের চলতি বাংলা ভাষাতে বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যবহার মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে যায়। ইংরাজী ভাষার প্রভাব বাঙালীর মুখের চলতি ভাষাকে যেন কঠোর এক ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রেখেছে। উপলব্ধি করতে হয় বাঙালীর মুখের বাংলা ভাষাতে কি করুণ অথচ কৌতুকাবহ পরিণাম 'গ্রো করেছে'। বিদেশীয় পর্যবেক্ষকও ঘৃণা বোধ করেন এবং মন্তব্য করে ফেলেন যে, একটি শিক্ষিত জাতির প্রাত্যহিক সাংস্কৃতিক জীবনে এ কি অদ্ভুত এক অবমাননার প্রশ্রয়। কোন ইংরাজী-জানা ফরাসী, রুশ ও জার্মান ব্যক্তি মাতৃ-ভাষায় কথা বলতে গিয়ে এরকম মিশ্রিত ভাষার কুস্বাদু খেচরান্ন সৃষ্টি করেন না। বাঙালী লেখক যখন তাঁর জ্ঞানান্বিত সন্দর্ভে ও প্রবন্ধে বিদেশীয় কোন মনীষী অথবা স্মরণীয় ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করেন তখন আবার আর এক ধরনের মানসিক দুর্বলতা প্রদর্শন করেন। গ্রীক সক্রেটিস হোক, কিংবা ফরাসী নেপোলিয়ন হোক, অথবা জার্মান নীৎসে হোক, সবারই উক্তি ইংরাজী ভাষাতে পরিবেশিত হয়ে থাকে, যেন তাঁরা সবাই ইংরাজীতে এইসব বাণী উচ্চারিত করেছিলেন। আরও কদর্যরীতি, বিভিন্ন অ-ইংরাজ মনীষীদের উক্তি ইংরাজী অক্ষরে অর্থাৎ রোমান অক্ষরেই বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। কেন ? বাঙালী ইনটেলেকচুয়াল লেখকের পক্ষে কি ফরাসী জার্মান ও গ্রীক মনীষীর উক্তিকে বাংলাতে অনুবাদ করে নিয়ে পরিবেশন করবার সামর্থ্য নেই ? অনেকেরই আছে, কিন্তু তাঁরা বোধহয় এধরনের ইংরাজীয়ানার হীনতা সম্বন্ধে যথোচিত সচেতন নন। তৃতীয় অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বাঙালীয়ানার উপর আরোপ করা চলে। বাঙালী জনজীবনে সরকারী কর্তৃপক্ষের চিন্তা ও আচরণ স্বদেশী ভাষার মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত করবার প্রয়াস যেন কুণ্ঠা ও আলস্যে প্রতিপালিত একটা ক্ষীণ সৌজন্যাচার। সরকারী শাসন ও প্রশাসনেরই আইন বৃত্তান্ত ও নানা অনুসন্ধানের নানা রিপোর্ট এবং আদালতের বিচারবাণী বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত করবার উদ্যম রাজ্যের সরকারী মনে ও আচরণে সামান্য রকমেও উদ্বোধিত হয়েছে বলে মনে করা চলে না।

সাংস্কৃতিক তত্ত্বের নির্দেশ অনুযায়ী বিচার ও বিবেচনা করলে এই আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয় যে, যে বাঙালী জনজীবনে ইংরাজী ভাষার প্রভুত্বশীল আধিপত্যের কাছে করুণ আত্মসমর্পণ জনজীবনের সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠবের এবং মাতৃভাষারও পূর্ণতর আত্মবিকাশের সহজ প্রতিভা বিনষ্ট করবেই করবে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার মর্ম সন্ধান করে দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এই সাংস্কৃতিক তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছেন। বাইরে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না এবং ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলছে, এটা বৃহত্তর আনন্দের প্রতি বাধাপ্রদ একটি অবস্থা। প্রদীপটি নিবিয়ে দিতেই ঘরের ভিতরটা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল। এই প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে ঘরের ভিতরে এই প্রদীপটিকে ইংরাজী ভাষার প্রতি দাসসুলভ আনুগত্যের প্রতীক বলে মনে করতে হয়, যেটা নিতান্ত ক্ষীণতর এক আলোকের অঙ্গীকার।

ব্যঙ্গচিত্র

কষ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৬৪ ॥

১৯৫৯ সাল। শ্রীমতী ইন্দিরা কংগ্রেস সভাপতি। কেরলে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে জওহরলাল গিয়েছিলেন। জওহরলাল খুবই ক্ষুব্ধ। 'ওখানে যাঁদের হাতে সরকার আছে, তাঁরা পার্টি ছাড়া কিছু বোঝেন না এবং তার অনিবার্য ফল ফলবেই।' জওহরলাল পরে লোকসভায় তাঁর ভাষণে বলেন, 'কেরলের কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধ দলগুলিকে হুমকি দিয়ে যে ভাষণ দেন, তাতে বলেন যে বিরুদ্ধ দলগুলি যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কম্যুনিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে চান তবে জনগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং এক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।' অবশ্য ১৯৫৭য় নাম্বুদ্রিপাদ সরকার গঠন হবার পর থেকেই ধীরে ধীরে নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল। তখন কম্যুনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়নি। তাঁরা হাতে ক্ষমতা পেয়ে 'Dictatorship of the proletariat' করতে গিয়েছিলেন। কেরলে যারা কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নয়, তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার সর্বপ্রকার চেষ্টা সরকার আরম্ভ করেছিলেন। পুলিসকে পার্টির কাজে লাগানো হয়েছিল। যেসব জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট পার্টির কথা অনুযায়ী চলতেন না, তাঁদের বদলি করা বা উন্নতি বন্ধ করা হত। সংবিধানের বাইরে গিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বাসুপিল্লাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। বাসুপিল্লাই হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সুপ্রীম কোর্ট সেই আদেশ বহাল রাখে। কেরলে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা হবার পরই বাসুপিল্লাই-এর মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন রাজ্য মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার জন্য যে আবেদন করা হয়, সেই আবেদন অগ্রাহ্য হবার পর কম্যুনিস্ট সরকার এ কাজ করেন। আরও দশজন বন্দীরও মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করা হয়।

এইসব গুরুতর সংবিধানবিরোধী কাজ করার ফলে যখন কেন্দ্রীয় সরকার নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে বাতিল করে প্রেসিডেন্ট রুল জারি করেন তখন এক শ্রেণীর সংবাদপত্রসেবী তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খুব মুখর হয়ে ওঠেন। এঁদের যুক্তি ছিল অদ্ভুত। যেহেতু কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার, সেহেতু কম্যুনিস্ট সরকারকে বাতিল করা ভুল বা অন্যায় হয়েছে। যদি অকারণে রাজ্য সরকারকে বাতিল করা হয়, তবে সে কাজ সব সময়ে গর্হিত। আর যদি সত্যই বিধিসঙ্গত কোনও কারণ থেকে থাকে, তা হলে যে দলেরই সরকার হোক, তা বাতিল করার বিরুদ্ধে কোনও নিরপেক্ষ সাংবাদিকের মন্তব্য করা উচিত নয়। ১৯৫৯-এর আগে বহু রাজ্যের সরকার বাতিল করা হয়েছিল। সেগুলি সবই কংগ্রেসী সরকার। সেজন্য নিরপেক্ষ (?) সাংবাদিকরা হইচই করেননি। কেরালার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকরকমে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নাম্বুদ্রিপাদ সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবিধান লঙ্ঘন করায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য হতে হয় সরকার বাতিল করবার জন্য।

রাজ্যপালের রিপোর্ট লোকসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ যা পড়েন, তার মধ্যে আছে—

'কার্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা (১) অপর দশজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করিয়া, (২) রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভায় একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সদস্য নিয়োগের প্রশ্নে বিতর্ক তুলিয়া ও (৩) রাজ্যপাল কর্তৃক পূর্বঘোষিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়মাবলী সংশোধন করিয়া সংবিধানিক রীতিনীতির প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন করেন।'

'পুলিসী ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া এবং কম্যুনিস্টদের নানারূপ জুলুমে উৎসাহ দিবার জন্য নূতন পুলিসী নীতি গ্রহণ করিয়া
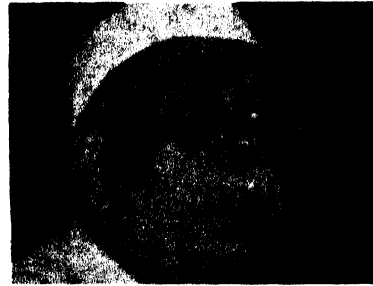
পণ্ডিত পন্থ

সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করা হয়।'

'পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রী মতবাদ প্রচারের জন্য কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করেন। আইনের সাহায্যে তাঁহারা সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া দলের লোকদের ব্যাপক হারে শিক্ষাকার্যে চাকুরি দেন। নবনির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট-চীনের ইতিহাস এবং তাহাদের অগ্রগতির বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অপর পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস, তাহার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিষয় এবং স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে তাহার প্রগতির কথা হয় উপেক্ষা করা হয়, না-হয় বিকৃতভাবে পরিবেশন করা হয়।'

'আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মামলাদির অনুসন্ধান, শুনানি এবং আসামীদিগকে জামিন দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রায়ই সরকারী কার্যে হস্তক্ষেপ করিত।'

'ইহা প্রমাণ করার মত পর্যাপ্ত তথ্য আছে যে, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য বা সমর্থকদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারী অর্থের অপপ্রয়োগ করা হয়। অন্ধ্রের সহিত চাউল-চুক্তি, সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি তাহাদের দুর্নীতি, অসাধুতা ও স্বজনপোষণের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।'

'ইহা প্রমাণ করার মত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই যে, কেরলে কম্যুনিস্টরা কেবল কম্যুনিস্টদের জন্যই শাসন চালায় এবং ২৮ মাস ব্যাপী লাল শাসনে কম্যুনিস্টদের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয়।'

'এইসকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জনগণের মনে নিরাপত্তার অভাব এবং আতঙ্ক দেখা দেয়। ইহাই পরে গণ-অভ্যুত্থানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সুপারিশ করিতে বাধ্য হন। কারণ, রাজ্যপাল মনে করেন যে, সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে দলের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে জনগণের ক্ষতি করিয়াছেন। গণতন্ত্রের আবরণে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরকার গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করেন।'

একটু গোড়ার কথায় যাওয়া যাক। ১৯৫৭-এর নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়নি। এজন্য প্রথম থেকেই ওদের নানারকম উপায়ে সরকার চালাতে হয়। নিম্নে নির্বাচনের ফলাফল দেওয়া হল—

কম্যুনিস্ট	৬০	[ভোটের শতকরা ৩৫ ভাগ]
কংগ্রেস	৪৩	[" " ৩৭ "]
পি এস পি	৯	
মুসলিমলীগ	৮	
নির্দল	৫	

১২৫

কম্যুনিস্ট পার্টির সংখ্যাধিক্য না হওয়ায় সরকার গঠনের জন্য নির্দল পাঁচজনের সহযোগিতা ওঁরা গ্রহণ করেন এবং ফলে তাঁদের মধ্যে দুজনকে মন্ত্রী করতে হয়। প্রদত্ত ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ভোটদাতাই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এটা সম্ভব হয়। মজার ব্যাপার হল—অ-কম্যুনিস্ট দল যদি কোনও জায়গায় শতকরা ৫১ ভাগের কম ভোট পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে, অমনি কম্যুনিস্টরা তারস্বরে চীৎকার করেন যে, এটা অগণতান্ত্রিক, গণতন্ত্রবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এ কাজ করছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, কম্যুনিস্টরাও ক্ষমতা লাভের সুযোগ পেলে ছাড়েন না। এই দুজনের মেজরিটি রক্ষা করবার জন্য নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে অনেক কাজ করতে হয়েছিল, যা তাঁরাও জানতেন সংবিধান-বিরোধী বলে। আর ২৮ মাস শাসনের মধ্যেই সরকারের কার্যকলাপে গোটা কেরল উত্তাল হয়ে ওঠে। কেরলের মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজারের কারাদণ্ড হয়, আরও ১০ হাজারের জরিমানা প্রভৃতি অন্য নানারকম সাজা হয়। যেসব জেলখানা ছিল তাতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেক কলকারখানা রিকুইজিশন করে তা জেলখানায় পরিণত করা হয়। কেরলে ২৭টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ২২টি, জেলার সব-

[illegible]টি সংবাদপত্র ছাড়া কেরলের সব ক'টি সংবাদপত্র এবং শতকরা ৮০টি নির্বাচিত পঞ্চায়েত কম্যুনিস্ট সরকারের পদত্যাগের দাবিতে প্রস্তাব [illegible] করেন। আমি কেরলের প্রায় সব অঞ্চলেই [illegible]য়েছি। একবার নয়, বহুবার। নাম্বুদ্রিপাদ সরকার কিছু কিছু কল্যাণকর কাজ করেছেন—এটাও সত্য। কিন্তু সেসবই পার্টির মেম্বারদের কল্যাণের জন্য। গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধানকে উপেক্ষা করে নাম্বুদ্রিপাদ সরকার তাঁদের স্টীম রোলার চালিয়েছিলেন। কেউ রেহাই পায়নি। আই এন টি ইউ সি-র কত শ্রমিক কর্মী যে লাঞ্ছিত, প্রহৃত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির যারা সদস্য নয়, তাদের জন্য নাম্বুদ্রিপাদ সরকার কোনও শ্রেণীভাগ করেননি—এটা সত্য। বিত্তবান ও বিত্তহীন অ-কম্যুনিস্টরা সমানভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, মনে হত যে, সরকার নেই; কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই আছে এবং তাদের হাতেই সব ক্ষমতা। পরে হয়তো এ নিয়ে আরও বিচার বিশ্লেষণ হবে। কিন্তু আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে মনে হয়েছিল যে, ভারতবর্ষে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, নাম্বুদ্রিপাদ সরকার তা ভুলে গেছেন এবং অ-কম্যুনিস্ট সমস্ত শক্তি তাদের কাজের ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ওখানে মিছিলকে বলে 'জাঠা'। সব ধর্মের, সব শ্রেণীর, সব বয়সের লোক এমন হাজার হাজার 'জাঠা' বার করে সরকারের বিরুদ্ধে। অবস্থা এমন হয় যে, কম্যুনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা, পার্টির সেক্রেটারী শ্রীঅজয় ঘোষ বলেন যে, অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং কেরালায় ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। আর মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ নিজে বলেন যে, অবস্থা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং রোজই অবস্থা আরও ভয়াবহ হচ্ছে। সংবিধানের ৩৫৫ ধারায় আছে—

[It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provitions of the constitution.]

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ ১৯৫৯এর আগস্টে লোকসভায় কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের বক্তৃতায় বলেন,

'That the fact that the situation was serious and it was such that it could not be managed without the aid of the central government was accepted. But it was said that the central government did not give any help. What could the centre do in this circumstances? * * * No request came from Kerala and no suggestion was made for any aid or assistance. How can the centre help a state unless its assistance is sought? The affairs of a state are normally under the control of the state government. We cannot impose any police force which will only lead to confusion. We can not impose any military and we can not do anything unless we are asked to help the state. The state government will be helped whenever any such assistance is sought, and that has been made very clear. But when deliberately no assistance is sought how is the situation to be brought under control and the need-ful to be done? Article 355 only state the condition under which the action can be taken. The operative part is found in article 356 and that is when under 355 situation has arisen, action has to be taken under 356. That a situation under article 355 had arisen is admitted by the Kerala Ministry and also by the leadership of the Communist Party. They did not ask for any sort of assistance either by way of police or the army or any apparatus which is under the control of the central government.'

কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং নাম্বুদ্রিপাদ সরকার—দু পক্ষেই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে বিবৃতি দেন। কিন্তু কেন্দ্র যখন জানতে চায় যে, কি সাহায্য তারা করতে পারে, কোনও উত্তর পাওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় আরও বলেন,

'When they did not ask for assistance, and they admit that the situation is such that the action has to be taken by the centre in order to set matters right, how can we be blamed for doing what they thought was necessary but which they did not choose to ask us to do. They did not accept our advice that mid-term election may be held. They did not ask for any help.'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতায় পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নাম্বুদ্রিপাদ সরকার মধ্যবর্তী নির্বাচন চাননি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনরকম সাহায্যের পরামর্শ দেননি, যদিও তাঁরা ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ উল্লেখ করেছিলেন। এ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাই, অথচ তাঁদের কি সাহায্য চাই তাও জানাব না, আবার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরামর্শও গ্রহণ করা হবে না। এই অবস্থায় যে-কোনও গণতান্ত্রিক দেশে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন—এ অভিযোগ টেঁকে না। আর যদি বিশেষ বিশেষ অভিযোগের কথা উল্লেখ করা যায়, তার তো ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসুপিল্লাই-এর মামলা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন, তা খুবই বিস্ময়কর। 'বাসুপিল্লাই-এর মামলার বিষয় অত্যন্ত চমকপ্রদ। বাসুপিল্লাই কংগ্রেস-কর্মী হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং সুপ্রীম কোর্ট সেই দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমার জন্য আবেদন করা হয় কিন্তু সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। কেরলে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার শাসনভার গ্রহণের বহু পূর্বেই এইসকল ঘটনা ঘটে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাসুপিল্লাই-এর ফাঁসি হয় নাই। শাসনভার গ্রহণের পরই কম্যুনিস্ট সরকার আইনবিরুদ্ধভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ জারি করেন। কেরল সরকার বাসুপিল্লাই সম্পর্কেও অনুরূপ আদেশ জারি করেন। কিন্তু এই ব্যাপার সম্পর্কে সকল বিধিই অবলম্বিত হইয়াছিল এবং বাসুপিল্লাই-এর মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিবার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারের ছিল না। [illegible] জেনারেল তাঁহার অভিমতে বলেন, "রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমার আবেদন অগ্রাহ্য হইবার পর রাষ্ট্রপতির নির্দেশের বিরোধী হইতে পারে এইরূপ কোনও নির্দেশ জারি করা রাজ্য সরকারের উচিত হয় নাই।"

'কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রতি বাসুপিল্লাইকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যদিও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কথা দিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা এইরূপ কার্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা আরও আগাইয়া যান এবং বাসুপিল্লাইকে কেরলের স্পীকারের গ্যালারিতে বসিয়া বিধানসভার অধিবেশন দেখিতে দেওয়া হয়। সৌভাগ্যবান বাসুপিল্লাইকে মন্ত্রীর গাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখা যায়।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তৎকালীন কেরল সরকার দেশে যে সংবিধান আছে, অথবা রাষ্ট্রপতি আছেন অথবা আইনকানুন আছে, সে সম্পর্কে গভীর ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। প্রায় ১৯।২০ বছর আগেকার ঘটনা। তৎকালীন নথিপত্র দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে, তখনকার কেরল সরকার মনে করেছিলেন যে, তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ—সুপ্রীম কোর্টও নেই, রাষ্ট্রপতিও নেই, সংবিধানও নেই। রাজ্যপালের যে চুম্বক রিপোর্ট লোকসভায় পঠিত হয়, তাতে অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল,

'The commutation of sentences of death of ten prisoners even after the President's rejection of mercy petitions earlier, the question of the nomination of an anglo-Indian member by the governor to the assembly and ammendment of the public service commission rules',—

এই তিনটিতেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, রাজ্যপালকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ১০ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর প্রার্থনা না মঞ্জুর করা সত্ত্বেও কেরল সরকার তাদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন।

এখন সে কংগ্রেস সরকারও নেই, সে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারও নেই। কম্যুনিস্ট দল দ্বিধা-ত্রিধাবিভক্ত। কংগ্রেস দলও তাই। এখন যদি বেশ নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, কেরালা সম্পর্কে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যা করেছিলেন, তা বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, কেরল রাজ্য দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে ১৯৫৮-এর পর থেকে কোনও সরকারী যন্ত্র জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন সাধারণত অনেকেই পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার বহুবার বহু কংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে বাতিল করেছেন। সেইসব বাতিলের কারণ এবং কেরল সরকার বাতিলের কারণ নিয়ে যদি তুলনামূলক সমালোচনা হয়, তা হলে দেখা যাবে যে, কংগ্রেসী রাজ্যগুলির বাতিলের কারণ তৎকালীন কেরল সরকারের বাতিলের কারণের চেয়ে অনেক লঘু ছিল।

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ১৯ ॥

বাবার সম্পর্কে এমনিতেই দেশে বহু কিছু লেখা হয়, আলোচনা হয়। লোকে তাঁকে সংগীতের ক্ষেত্রে প্রায় একজন সন্তের মতন দেখে। কিন্তু বাবার আমি আরও নানান রূপ চোখে দেখেছি। মানবিক দিক যেটা। যেটা জানলে মানুষটাকে আরও শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয়, বোঝা যায় ওঁর ঐ অসীম কর্মশক্তির উৎস কোথায়। সেটাই বলছি এখন।

বাবাকে প্রথম দেখি সেই ১৯৩৪এ সেনেট হলে। তার আগে তিমিরদার মুখে শুনে শুনে আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, উনি অত্যন্ত রাগী মানুষ, বিরাট নীতিবাগীশ। কাজেই প্রথম সাক্ষাৎ থেকে ওঁকে বেশ ভয়াবহ মনে হয়েছিল। পরে উনি যখন ১৯৩৫ সালে দাদার ট্রুপে যোগ দিয়ে বোম্বে এলেন, আলি আকবর তখন ছোট্ট ছিল, বছর তেরো বয়স। আমরা বোম্বের ন্যাশনাল না কি একটা হোটেলে তখন ছিলাম। এবং তখন দেখলাম বাবার অন্য একটা রূপ। উনি যে কি মিষ্টি স্বভাবের মানুষ, কি বিনয়ী, কি নরম ভেতরে ভেতরে, সেসব তখনই জানতে লাগলাম। বিশেষ করে উনি আমার মাকে যা সমীহ করতেন! এ কথাটা তো ওঁর মুখে লেগেই থাকত—মা, আপনি তো রত্নগর্ভা! উদয়শঙ্করের মত সোনার ছেলে আপনার! এরকম আরও কত সব কথা-বার্তা! সে সময়ে আলি আকবর ছোট্ট ছিল, উনি বসে বসে শেখাতেন ওকে। আর ঐ শেখাবার সময়টাতেই দেখতাম ওঁর ঐ রণমূর্তি।

দাদার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক? কি আর বলব! দাদাকে উনি যেমন ভাল-বাসতেন তেমনি সম্মান করতেন। অন্য সবাই অবাক হয়ে যেত। দাদাকে তো উনি অনবরতই বলতেন, বাবা, আপনি তো শিবের অবতার! দাদার নাচ দেখে উনি এমনই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, বিশেষ ওঁর সেই শিবপার্বতী নাচ দেখে যে, তার পর থেকে দাদার ওপর অদ্ভুত একটা সম্ভ্রম এবং স্নেহের সৃষ্টি হয়। দুটোই মিশে ছিল ওঁর ভাবে।

যা হোক, সেই সময়ে আলি আকবরকে শেখাবার সময়ে ওঁর ঐ বকাঝকা, রাগ ইত্যাদি দেখে আমার ভীষণই ভয় লাগত। কিন্তু ঐ যে পনরো দিন আমরা বোম্বেতে ছিলাম তার মধ্যেই বাবার সম্পর্কে একটা ভীতির সৃষ্টি হল, অথচ এই ভাবটারই উলটো উলটো কিছু জিনিসও চোখে পড়ল। আলি আকবর ভয়ের চোটে বিলেতে গেলই না। বলল, আমি মাকে ছেড়ে যাব না। মাতুল, অর্থাৎ আমার এক মামাই সে কথা পাড়লেন বাবার কাছে। আমাদের মধ্যে ঐ এক মাতুলই বাবার সঙ্গে একটু খোলাখুলি মিশতে পারতেন, কথা কইতে পারতেন। আমরা তো ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম। আলি আকবর মাইহারে ফিরে-গেল, আমরা রওনা হলাম বিলেতের মুখে জাহাজে। আমার মা কাশী থেকে এসে ঐ ক'টা দিন কাটিয়ে গেলেন। মার সঙ্গে আমার ঐ শেষ সময় কাটে। আমার মনে আছে ডিসেম্বরের শেষাশেষি আমাদের জাহাজ ছাড়ল, মা তখন ডকে আমাদের দেখতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। যখন আমি ওঁকে প্রণাম করলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আর হুহু করে কাঁদলেন। বাবাও ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবার হাতটা ধরে আমার হাতটা তার মধ্যে দিয়ে মা বললেন, দেখবেন এই ছেলেটাকে আমার। ওর বাবা এই কিছু দিন হল মারা গেছেন। আজ থেকে আপনিই ওর বাবা। ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার হাতেই ওকে ছেড়ে দিলাম। আর কোথায় যায়! মা তো সেই কাঁদছেনই, বাবাও সেই দেখে যে কি কাঁদতে শুরু করলেন তখন! বললেন, মা, আপনি দেবী, আপনি রত্নগর্ভা, আমি তো ম্লেচ্ছ। আর আপনার ছেলে আজ থেকে আমার ছেলে। আমার এক ছেলে তো আছেই, আজ থেকে আমার আর এক ছেলে হল। ও আমার বড় ছেলে হবে এবার। আর এই দুজনের কান্না দেখে আমিও কাঁদতে শুরু করলাম। পরে জাহাজ ছাড়ার পর ডেক থেকে মাকে ঐ যে দেখলাম, সেটাই শেষ দেখা। পরে আর মাকে দেখা হয়নি। আমরা বাইরে থাকতে থাকতেই মা মারা গেলেন। মাস নয়েক পরে।

কিন্তু ঐ কান্নাকাটি দিয়েই বলতে গেলে আমার বাবার সঙ্গে আসল সম্পর্কের শুরু। মার সঙ্গে ঐ কথাবার্তার দরুনই হোক, কি অন্য কোনও ভাষা না জানার জন্যই হোক, ঐ জাহাজের ট্রিপেই বাবা আমাকে ভীষণ কাছে টেনে নিলেন। খুব স্নেহ করতেন, কাছে চাইতেন। আমি তখন ওঁর লেফটেনান্ট গোছের হয়ে গেলাম। ওঁর সমস্ত দেখাশোনার ভার তখন আমার ওপরেই এসে পড়ল। আমি আর দুলাল। ঐ জাহাজ থেকে আমাকে শেখাতে শুরু করে-ছিলেন। রোজই বলতেন, যন্তরটা আনো। বাজাতে বাজাতে হয়তো বলতেন, তোমার হাতটা ঠিক না। এভাবে করো। ওভাবে না। এ ছাড়া বহু গানও আমাকে উনি শেখাতে শুরু করলেন তখন। রোজই তখন তো উনি গান বাঁধেন,

আমার বাবা পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর চৌধুরী। পণ্ডিত, কান্তিবান লোক ছিলেন। কিন্তু উনি যখন মারা যান আমি ছোট ছিলাম খুব। ওঁর সঙ্গ বিশেষ পাইনি।

ঐ জাহাজের ট্রিপেই বাবা আমাকে কাছে টেনে নিলেন। খুব স্নেহ করতেন, কাছে চাইতেন।

চারটে-পাঁচটা করে এক এক দিনে। সেই রবীন্দ্রনাথের মতন ব্যাপার আর কি! আমি তখনই ঠিক করে ফেললাম গান্ডা বেঁধে ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করব। একদিন এই কথা বলাতে বললেন, শিক্ষা-দীক্ষা তো হচ্ছে। ঐ বাঁধাবাঁধির জন্যে এত তাড়াহুড়োর কি আছে? মিশরে আমাদের জাহাজ নোঙর করল; কয়েক দিন কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়াতে কাটিয়ে আমরা অধুনা ইসরায়েল—তখন প্যালেস্টাইন ছিল—সেখানে গেলাম। প্রথমে তেল আবিব শহরে উঠলাম আমরা। সেখানে একটা ঘটনা ঘটল।

আমি মনে ভাবলাম উনি গুরু, ওঁকে কিছু উপহার-টুপহার একটা দেওয়া উচিত আমার। এর আগে জাহাজে ওঁকে মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি, একটু তামুক-টামুক অইলে বালো হয়। তো কি দেব এইসব ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল ঐ তামাকের কথাটা। আমি আর দুলাল তখন হোটেলের নীচে একটা দোকানে গিয়ে একটা পাইপ আর এক ডিবে চমৎকার টোবাকো কিনে মহা-সমারোহ করে ওঁর পায়ের পাশে গিয়ে রাখলাম। দিয়ে প্রণাম করলাম। ভাবলাম কতই না খুশী হবেন। উনি কাণ্ডটা দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, এডা কি? ওঁর ঐ 'এডা কি' শুনেই আমার তখন হয়ে গেছে। যা হোক, কোনও মতে কাঁপতে কাঁপতে জিনিসটা খুলে দেখালাম। দেখে যা চটে গেসেন, সে ভাই কি বলব আর! রাগলে যা চেহারা হত ওঁর! ওরকম আমি আর কারো দেখিনি। চুল-টুল দাড়ি-টাড়ি তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। সে অনেকটা বেড়াল বা বাঘের মত। চোখ-টোখ ভাঁটার মত লাল। বললেন, আমায় মুখাগ্নি দিতে আইসো? ঐ যে পাইপ আর তামাক দিয়েছিলাম তাতে উনি মানে করে বসলেন যে, ওঁর মুখে আগুন দিচ্ছি আমরা। বললেন, জানো না, আমি কারের থিকা কিসু নিই না, আর তোমরা আমার মুখে আগুন দিতাসো। আর বারে-বারে সেই এক কথা, আমায় মুখাগ্নি দিতে আইসে! উফ্! সে রাগ ভাই ভোলবার না।...দেখসেন মাতুল, আমার মুখে আগুন দিতাসে।...আর এই ব্যাপার থেকে আমি একটা জিনিস বুঝে গেলাম যে, ওঁকে খুব সাবধানে দেখা-শুনো করতে হবে। শিশুর মত সরল বলে ওঁর মাঝে মাঝে একেবারে অহৈতুকী মেজাজ হয়ে যায়।

পরে বহু দেশ-টেশ ঘুরে আমরা প্যারিসে পৌঁছলাম। বাবার কাজ শুধু একটা করে সোলো বাজানো। ওঁর আগে তিমিরুদার সরোদ বিদেশীরা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সেবারের ট্রুপে ওঁকে তিমিরদার গুরু হিসেবে নিবেদন করা হত। দারুণ কদরও পেতেন। কিন্তু শুধু ঐটুকু বাজিয়েই উনি স্থির থাকতে পারতেন না। প্রায়ই দাদাকে বলতেন, বাবা, আমারে কিসু কাজ দাও। এমনি-ভাবে যে পারি না। সত্যি, মানুষটা এত কাজ ভালবাসতেন যে, ছোট্টখাটো একটা আইটেম বাজিয়ে বসে থাকতে উনি ক্লান্ত হয়ে যেতেন। শেষে উনি চন্দ্রসারং বলে ওঁর নিজেরই তৈরী একটা ছড়ের যন্ত্র নিয়ে নাচের সঙ্গেই বসে যেতে লাগলেন। আর তাতেই কি খুশী উনি! কোনও গর্ব বলে কিছু ছিল না ওঁর। এমন কি, নিজের ইচ্ছেয় অন্যান্য ছোটখাটো যন্ত্রপাতিও উনি বাজাতে শুরু করলেন ইচ্ছেমত। এবং গং বলে যে জিনিসটা দাদা ব্যবহার করতেন ওঁর নাচের বাজনায় তাও পর্যন্ত উনি বাজাতে কসুর করেননি। এত বিরাট এক ক্ল্যাসিকাল ম্যুজিসিয়ান হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের মত উজবুক কাঁচা যন্ত্রীদের সঙ্গে বসে বাজাতে দ্বিধা করতেন না! এরকমই বড় মন ছিল ওঁর। এর চার-পাঁচ বছর পরে যখন বাবা আলমোড়ায় কালচার সেন্টারে সংগীতের গুরু হিসেবে এলেন তখন উনি বাংলা ঢোল শেখাতেও লাগলেন। তা শুনে দাদা কি যে ইনস্পায়ার্ড হলেন! তাঁর নতুন সৃষ্ট ব্যালে লেবার অ্যান্ড মেশিনারিতে এই বাংলা ঢোলের ব্যবহার অনেকখানি ছিল। ভারতে যখন সেই দুবার শীতের সময় ট্যুর হল ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে তখন এই ব্যালে দারুণ হইচইয়ের সৃষ্টি করেছিল। বাবা তখন তাতে বাংলা ঢোলের অংশগুলো বাজিয়ে মাতিয়ে দিতেন সবাইকে। এই ব্যালেতে আর একটা মজার ব্যাপার ছিল। আমার মিনিট আড়াইয়ের একটা কত্থক নাচের টুকরো ছিল। ভাবতে পারো, বাবা তাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝাঁপতালের উপর তবলার সঙ্গে বাংলা ঢোল বাজাতেন। ওঁর তৈরী একটা পরনও আমি নাচতাম মনে আছে—ধা কেটে থু কেটে ক্রিধেট ধাগিনা ধাকিটে ইত্যাদি।

যা হোক, এখন সেই আগের কথায় ফিরে যাই—১৯৩৬ সালের ট্যুরের কথায়। সে কথায় যেটা বলতে চাইছিলাম—মাতুলের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল। ওখানকার সামাজিক জীবন, পরিবার পরিকল্পনা, মেয়েদের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে ওঁদের ভেতর অনেক আলোচনা হত। উনি দেখতেন আর বলতেন, আরে, মেয়েগুলান কি বেহায়া! কি বেহায়া! কি বেহায়া! আর মেয়েগুলো হয়তো সোজাসুজি এসে আমাদের জড়িয়ে ধরছে, চুমু খাচ্ছে। যেরকম আর কি এখানে করে থাকে। অবশ্য আমি খুব কনসাস ছিলাম। চোখ টিপে ওদের সতর্ক করে দিতাম। অন্যখানে যা খুশি করো, কিন্তু ওঁর সামনে ক'রো না। উনি বেলেল্লাপনা পছন্দ করেন না। কখনও কেউ ওঁর সামনে সেসব করলে উনি ঠিক চটে যেতেন না; তবে বলতেন, কি বেহায়া দেখস! এই ধরনের সব মন্তব্য করতেন। সহ্যশক্তি, টলারেন্স যে ছিল ওঁর মধ্যে, সেটা ঐ সময়েই দেখেছি। পরে সেটা কিন্তু চোখে পড়েনি আর। তো এই সময়টাতেই একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল।

মাতুল তো ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ লোক ছিলেন। ওঁর ঝোঁক চাপল বাবাকে প্যারিসের নাইট-লাইফ দেখাবেন। বাবাও প্রায়ই খেয়ালখুশিমত নানান কথা জিজ্ঞেস করতেন। তো একদিন মাতুল কথায় কথায় বলে বসলেন, ঐ রবু জানে ও-সমস্ত। আর ভাবো আমার কি অবস্থা তখন! রবু যেন শুধু ঐ করেই বেড়ায়। যত মেয়েমানুষের সঙ্গ-টঙ্গ আর কি! আমি তো পালিয়ে বাঁচি না। পরে ফিরে একদিন মাতুল সেই কথা বলাতে তিনি আমাদের সঙ্গে সাদা মেয়ের নাচ দেখতে রাজী হয়ে গেলেন। তখন প্যারিসে যাঁরা গেছেন—

দাদার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক? কি আর বলব! দাদাকে উনি যেমন ভালবাসতেন তেমনি সম্মান করতেন। অন্য সবাই অবাক হয়ে যেত। দাদাকে অনবরতই বলতেন, বাবা, আপনি তো শিবের অবতার!

আমার মনে আছে ডিসেম্বরের শেষাশেষি আমাদের জাহাজ ছাড়ল, মা তখন ডকে আমাদের দেখতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। যখন আমি ওঁকে প্রণাম করলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আর হুহু করে কাঁদলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবধি আর কি—তাঁরা জানেন যে, কি খোলাখুলিভাবে দেখা-শোনার সুযোগ ছিল সে যুগে। সেইসব নাম-করা নৈশ আখড়া—স্ফিংক্স, পাঁতেয়ো, নুমেরো ক্যাত্র-দিস্‌ ইত্যাদি। সে সময়টায় মাত্র দশ পাউন্ড খরচ করে এক রাত্রের ভেতর তুমি জীবন সম্পর্কে জ্ঞানচক্ষু খুলে ফেলতে পারতে। উল্লিখিত যে-কোনও বাড়িতে গেলে প্রথমে যেজন দরজা খুলে দাঁড়াত তাকে দেখলে লোক হাঁ হয়ে যেত। সেই বাচ্চাদের বিব্‌-এর মত দুটি মাত্র বস্ত্রখণ্ড সারা শরীরে। তাতে কি আর নগ্নতা বাঁচে ভাই! আর ভেতরে গিয়ে যখন বসবে তখন তো সত্যিই কেলেঙ্কারি! অত অত মেয়ে, কিন্তু শরীরে এক চিলতে করে হার আর আঙুলে দুটো একটা আংটি ছাড়া কিছুই নেই। তারপর তুমি সেখানে যা চাও সব পাবে। যৌনজীবনের যা যা ভেরিয়েশন হতে পারে সমস্ত একেবারে যেন থালার ওপরে সাজানো। আর বিশ্বাস কর, ঐ আট-দশ পাউন্ডের মধ্যেই। আজকাল বিলেত-আমেরিকায় এ-সবই হচ্ছে, কিন্তু আজকের এই ইতরামি, নোংরামি সে যুগে ছিল না। একটা অদ্ভুত সারল্য ছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে। আর এরকমই এক বিবস্ত্রা নারীর আড়তে আমরা নিয়ে গিয়ে ফেললাম বেচারী বাবাকে।

বাবা যেখানে গেলেন আমাদের সঙ্গে সেটা অবশ্য ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না। সেটা এক সোজাসুজি ক্যাবারে। আমি আর দুলাল। বড় এক হল-ঘর ভরতি লোকজন। সবাই টেবিল-চেয়ারে বসে মদ খাচ্ছে। বাবা তো চিরদিনই শরাবের ওপর বিরূপ। কাজেই মদের চড়া গন্ধ ওঁকে একটু নাজেহাল করল। টেবিলে বসতে না-বসতেই নেংটি-পরা একটা টপ্‌লেস মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল খুব কায়দার ওপর, আপনারা কি খাবেন? আমি সটান অর্ডার দিলাম অরেঞ্জ জুসের। প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর একটা শো হয়। আমরা বসতে না-বসতেই একটা ফ্লোর শো শুরু হল। সেই যেমনটা হয় আর কি জগৎময়! স্ট্রিপ টীজ, সিমুলেটেড লাভ-মেকিং ইত্যাদি সব নানান কাণ্ড। পরে পনরো-কুড়িজন পূর্ণবিবস্ত্রা লাস্যময়ী মেয়ে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল স্টেজে। সে কি যৌন আবেদন রে বাবা! আমার তখন অবস্থা ভেবে দেখো! বাবার ভয়েতে কাঠ হয়ে শুধু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। নাচ দেখা তখন কপালে উঠে গেছে। সারাক্ষণ বাবা শুধু আড়ষ্ট হয়ে হাতে একটা চুরুট নিয়ে বসে রইলেন। কেবল একটা মন্তব্য করলেন কোনও একসময়ে, শরীরগুলো তো সুন্দর, তবে মুমের মত সাদা।

উঠি-উঠি করছি, এমন সময়ে ঐ নাচিয়ে মেয়েদের মধ্যে থেকে তিনজন এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। ফরাসীতে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে বসব? মদ খাব? সম্পূর্ণ উলঙ্গ মেয়েটা তো ধপ করে বাবার কোলে বসেই পড়ল। আর বাবার দাড়িতে হাত দিয়ে সোহাগ দেখাতে লাগল। খুব কড়া করে ফরাসীতে আমি তখন বলতে লাগলাম, তোমরা উঠে যাও। উনি একজন মৌলবী। ধার্মিক লোক। বাবা তখন আরও বেশী আড়ষ্ট হয়ে 'তোবা-তোবা' বলছেন। তারপর আমাকে বলতে লাগলেন, রবু, অ্যারে উইঠ্যা যাইতে কও। রবু, অ্যারে উইঠ্যা যাইতে কও। তারপর মেয়েগুলো উঠতেই আমরা পালালাম সে আখড়া থেকে। কে জানে আবার কি উৎপাত শুরু হয়!

বাবার সম্পর্কে এই এতগুলো কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ওঁর জীবনের প্রতিষ্ঠার পেছনে নিছক সংগীত, বুদ্ধি এবং পরিশ্রম ছিল না—একটা পাগল-করা চরিত্রবল ছিল। মেয়েদের দেখে ওঁর ভেতর যে কোনও শিহরন জাগত না তা হয়তো নয়, সেদিক দিয়ে উনি একজন দৈনন্দিন চেতনানুভূতির মানুষই ছিলেন; কিন্তু স্রেফ সংগীতের জন্য এবং ফের বলছি, স্রেফ সংগীতের জন্য তিনি নিজের এইসব বাসনা, সাধ, আহ্লাদ ইত্যাদিকে মেরে মেরে একেবারে একটা আত্মঘাতী নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কখনও হয়তো ওঁর কোনও ওস্তাদকে বাঈজী বা বেশ্যার বাড়ি থেকে তুলে আনতে গেছেন, মেয়েরা নানান আকার-ইঙ্গিত দেখিয়েছে। উনি তখন আওড়ে গেছেন, আপনি আমার ওস্তাদ বা ওয়ালিদের বান্ধবী, তাই আমার মাতৃস্থানীয়া। বলে উন্মত্ত, বেসামাল ওস্তাদকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এসব ওঁর নিজের মুখে শোনা। জীবনে যে বহু বিচিত্র চক্করে পড়েছেন তা উনি নিজেই বলতেন। কিন্তু কোনও মতেই কি শরাব, কি স্ত্রীলোক—এসব কিছুতেই টললেন না। প্রায় একটা নিউরোসিসের মত ছিল ওঁর। সমস্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনা উনি গান-বাজনায় ঢেলে দিয়েছিলেন। ঐ এক গান-বাজনার জন্যই জীবনের সব কিছুই ত্যাগ করলেন। এবং সব কিছু পেলেনও হয়তো।

(ক্রমশ)

নাভিমূলে ফিরে গিয়ে

অমল মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

আবার শিক্ষা নিয়ে একটা শোরগোল পড়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র খবরের কাগজের প্রতিবেদন থেকে ঐ হইচইয়ের পরিমাপটা বোঝা যাবে না। নানা সভা-সমিতি, সেমিনার ও কনভেনসনে বিষম বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। কোথাও কোথাও সেটা ভোটাভুটির পর্যায়ে পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে।

বিষয়টা হল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অধুনা প্রচলিত ১০+২(৩)+২ শিক্ষাক্রমের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার-প্রস্তাব তুলেছেন। শিক্ষার বিষয়গুলিকে মোটামুটিভাবে তাঁরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন. (এক) মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান—যাতে রয়েছে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়। (দুই) প্রকৃতিবিজ্ঞান—যার সুপরিচিত বিষয়গুলি হল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি। (তিন) পেশাভিত্তিক বিদ্যা—কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিকস্, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স ইত্যাদি। আর একটি বিভাগ আছে—সেটি শুধু মেয়েদের জন্য—গৃহবিজ্ঞান।

প্রস্তাবিত সংস্কারের নূতন কথা হল দুটি। প্রথমটি হল, কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে যে একটি কৃত্রিম পাঁচিল অনেকদিন ধরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনড় পাষাণের মত দাঁড়িয়ে আছে সেটিকে ভেঙে ফেলা। অর্থাৎ একজন কলা বিভাগের ছাত্র প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দুটি কলা বিভাগের বিষয়ের সংগে একটি বিজ্ঞান বিভাগের বিষয় নিয়ে পড়ার স্বাধীনতা পাবে। বিপরীতভাবে জনৈক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মানববিদ্যা ও সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের একটি বিষয় অধ্যয়নের স্বাধীনতা পাবে। অর্থাৎ একটি ছাত্র নিজের ক্ষমতা ও ভাল লাগা খারাপ লাগার উপর নির্ভর করে শুধু ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করতে পারে, শুধু সমাজবিদ্যা নিয়ে পড়তে পারে, শুধু বিজ্ঞান বিভাগের বিষয় নিয়ে চলতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে এরা (কলা ও বিজ্ঞানের ছাত্ররা) সকলেই নিজ নিজ বিভাগের দুটি বিষয় নিয়ে অন্য বিভাগ থেকেও একটি পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে পারে। এইভাবে নব প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে বিষয় নির্বাচনে একটি ছাত্রকে সুপ্রচুর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় নূতন কথা হল বর্তমান বহাল ব্যবস্থায় কলা বিভাগে ইংরেজী ও মাতৃভাষা যে আবশ্যিক রূপ নিয়ে আছে, তাকে তুলে দেওয়া। অর্থাৎ কোনো বিষয়েই কারু উপর জোর করে চাপিয়ে না-দেওয়া—এই হল বর্তমান সংস্কার প্রস্তাবের মূল কথা। একটি ছাত্র যদি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী হয়, সে ইচ্ছে করলে তিনটিই ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়তে পারবে। ধরুন ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত, বা সংস্কৃত বাংলা হিন্দী। কিন্তু যে অনিচ্ছুক, কোনক্রমেই তার উপর কোনো বিষয় চাপিয়ে দেওয়া হবে না। না-ইংরেজী না-বাংলা না-অঙ্ক।

বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য কেউ যদি বিরোধিতা না-করেন, তাহলে সকলেই অবশ্য লক্ষ করবেন, প্রস্তাবটির মধ্যে স্বাধীনতার একটি মুক্ত হাওয়ার প্রবাহ দুর্লক্ষ্য নয়। মনে আনন্দ না-থাকলে, বিষয়ের সংগে হৃদয়ের যোগ না-থাকলে সত্যিকারের লেখাপড়া কখনো হতে পারে না—এটি লেখাপড়া শেখার মূল কথা। যতদিন বাপ মা কাঁধের উপর জীবনসঙ্গিনী চাপিয়ে দিয়েছেন, ততদিন কি সংসারগুলি চলেনি? নিশ্চয় চলেছে। আবার স্বাধীন নির্বাচনে জীবনসঙ্গিনী বেছে নিয়ে কেউ কি পস্তায়নি? তেমন ঘটনাও অসংখ্য ঘটছে। তবে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে প্রথম পদ্ধতিকে শিরোধার্য করবেন তারাই যারা নাবালক। যাদের নিজের বোধ বুদ্ধির উপর আস্থা আছে, যাদের নৌকো চলে পাল্লা ভাললাগা ও মন্দলাগা হাওয়ার উপর নির্ভর করে তারা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই বেছে নেবেন। ভুল যদি হয়েই যায়, তবু পদ্ধতিকে দোষ দেবেন না। কারণ সিদ্ধান্তটা তার নিজের। কারু চাপিয়ে দেওয়া নয়। প্রস্তাবটি গণতান্ত্রিক ও একজন প্রাপ্তবয়স্কের অধিকার সম্পর্কে শ্রদ্ধাজাত।

কাজেই এমন একটি সরল প্রস্তাবের পক্ষে যেমন বাগবিস্তারের দরকার নেই, বিপক্ষে বলাটাও যত বেশী বক্তৃতা দেওয়ার লোভনীয়ত্ব তার চেয়ে অনেক কম আর কিছু উপস্থিত করার প্রয়াসে একটি ছেলে ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের মাথায় স্নাতক পর্যায়ে পড়তে যায়। বর্তমান সময়ের বিচারে, এর মধ্যেও যদি সে নিজের ব্যক্তিগত পাঠ্য বিষয়ে ভালমন্দ বোঝার অক্ষম হয়, হয় সেটা স্নাতকপূর্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটি। নয়তো ছেলেটি ডাক্তারী শাস্ত্রের পরীক্ষার বিষয়।

॥ দুই ॥

এতৎসত্ত্বেও বর্তমান সংস্কার প্রস্তাব, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ মহলে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে—কোনটার সংগেই আমি কোনই যোগ অনুভব করছি না। কারণ, আমি মনে করি, শিক্ষা একটি অখণ্ড ব্যবস্থা। সেই অখণ্ড ব্যবস্থাটি, আমাদের দেশে, গোটাটাই ঘুণে ধরে আছে। শিক্ষার গোটা শরীরটা চিকিৎসাধীনে না-এলে, তার একটি মাত্র দেহাংশে চিকিৎসা—হয় চিকিৎসকের টাকা খিচবার অসৎ প্রচেষ্টা, নয়তো যথার্থ চিকিৎসা করবার অক্ষমতাকে ঢেকে রাখবার জন্য দামামা বাজানো।

এই কথাটা, যদি পাঠকবর্গ আত্মশ্লাঘা না-মনে করেন তাহলে বলি, গত কুড়ি বছরে দেশ পত্রিকার পাতায় আমি বলার চেষ্টা করেছি। কাজেই কারু কারু কাছে চর্বিত চর্বণ ঠেকতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। এখানে চীৎকার করলেও কেউ শোনে না। তাই উচ্চতম গ্রামে বার বার চীৎকার করবার এই নিষ্ফল প্রয়াস আশা করি পাঠক ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন।

আসল সত্য কথা হল এই, শিক্ষার আমূল সংস্কার, বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আদৌ সম্ভব কিনা, এই সত্য কথাটা আজ পর্যন্ত একজন শিক্ষাবিদকেও বলতে শুনলাম না। এমন কি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরও বলতে শুনলাম না যে বর্তমান ব্যবস্থায় আমূল শিক্ষা সংস্কার—একটি অকল্পনীয়, অসম্ভব ও অবাস্তব প্রস্তাব। অতএব ছোটখাট তালি ও রিফুর কাজে ব্যস্ত থেকে—পরিতৃপ্তির ঘাম মুছতে হবে। যেন আসল কাজটাই করে ফেলেছি। ঘোল খেয়ে দুধের ঢেঁকুর তোলার অসুবিধা নেই—কারণ দুই ক্ষেত্রেই স্বাদ প্রায় এক রকমের। শিক্ষাকে পালটানোর দায়িত্বে যাঁরা আছেন, এই কথাটাই যদি তাঁরা ঝেড়ে কাশেন, তাহলেই আর কোন ল্যাঠা থাকে না। আমরা অনেকেই তালি এবং রিফুর কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারি।

এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিক্ষার আমূল পরিবর্তনকে আমি কেন অসম্ভব ও অবাস্তব বলছি? সেটা একটু ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

আপনারা সকলেই লক্ষ করেছেন, আমাদের দেশে মোটামুটি দুটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটি ব্যবস্থা ধনীদের জন্য। আর একটি ব্যবস্থা গরীব সাধারণ মানুষের জন্য। কিছুদিন আগেও দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে বিন্দুমাত্র যোগ না-রেখে, কনভেন্ট বা পাবলিক স্কুল থেকে বিদেশে রচিত পাঠক্রম নিয়ে অধ্যয়ন করে এবং স্নাতক পর্যায়ে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে এক শ্রেণীর ছাত্রদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করবার ব্যবস্থা ছিল। এখন ব্যবস্থাটা সামান্য পালটেছে। এখন স্বদেশেই বিদেশী ধাঁচের পণ্য তৈরি হচ্ছে। তা স্বদেশের বাজারে লাগুক বা না-লাগুক। অর্থাৎ গোটা দেশের স্বার্থ ও সম্পত্তিনিরপেক্ষভাবে একটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু আছে। ধনিক শ্রেণীর লোকরাই এই ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা সরকারী সাহায্য চান না। বলাই বাহুল্য, প্রয়োজনও কিছু নেই। সরকারী হস্তক্ষেপও বরদাস্ত করেন না। বলতে সমস্ত ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে অনেক দূরে এঁরা বাস করেন। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার 'বিলাসিতা' নিয়ে এঁরা বহাল তবিয়তে তিন বছর পার করে দিয়েছেন। আরো কত বছর চালাবেন কে জানে। এঁরা সরকারের ধার ধারেন না। সরকারও কিন্তু দেখবেন, কখনো এঁদের ঘাটায় না। বরং একটু ভয় পায় বলেই মনে হয়।

তার একটা বড় প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণটা হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ে আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রধানমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী আসেন নি যিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও দলীয় বক্তৃতায় বারবার স্বীকার করেন নি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন দরকার। তাছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা, পত্র-পত্রিকা, কমিশন এবং সারাদেশের বহু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষার খোল-নলচে পালটাবার কথা অসংখ্যবার বলেছেন। এই তো সেদিনও প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে অকপট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আগে, নেহরু অনেকবার এই কথা বলেছেন। শ্রীমতী গান্ধী অবকাশ পেলেই শিক্ষাকে ঢেলে সাজাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন। নির্বাচনে পরাজয়ের অব্যবহিত পূর্বে বিখ্যাত ৪২তম সংশোধনের দ্বারা তিনি শিক্ষাকে কনকারেন্ট লিস্টে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা দারুণ পরিবর্তন ঘটাবেন বলে। ভাবখানা ছিল 'এতদিন সয়ে সয়ে এইবারে মারবো।'

আমরাও আগে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছি। এখনো সেই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করছি। মোটমাট সব মিলিয়ে সম্ভবত এক লক্ষ বার কথাটা উচ্চারিত ও লিখিত হল। শিক্ষাকে পালটাবার যাদের কোন ক্ষমতা নেই, দায় দায়িত্বের প্রশ্নই আসে না—বলেই খালাস, তাঁদের কথা না-হয় উড়িয়েই দিলাম। কিন্তু পালটাবার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার, সরকারের নেতা—অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী অথবা শিক্ষামন্ত্রীর মুখে যদি কথাটা থেকে থেকে গানের ধুয়ার মত শোনা যায়, অথচ কার্যত কিছু না-হয়, তাহলে কি বললে ভুল হবে যে শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের কথাটা হয় বিলাস, নয় তো রণক্ষেত্র থেকে পালাবার জন্য ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টিকারী বোমা? ওটা মাঝে মাঝে ফাটাতে হয়। তাই ফাটানো হয়।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে যতজন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন উপলক্ষে শিক্ষার ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন প্রত্যেকেই শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন। ব্যাপারটা ভারি মজার। যিনি বা যাঁরা করবেন, তাঁরা 'করা'র চেয়ে কি 'হওয়া উচিত' সেই বক্তৃতাটাই সরকার পরম্পরা দিয়ে যাচ্ছেন। এর পরও কি বুঝতে অসুবিধা থাকা উচিত যে, কোনো জায়গায় নিশ্চয় বড় রকমের একটা অসুবিধা আছে?

কি সেই অসুবিধা? সেই কথাটাই এবার বলার চেষ্টা করবো।

॥ তিন ॥

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলিকে অন্তত নির্বাচনের খরচ বহনের জন্য ধনীর দ্বারস্থ হতে হবেই। নির্বাচনের সরকার-নির্দিষ্ট খরচের সিলিং হাস্যকরভাবে কম। তবু ঐ সিলিং-এর টাকাই একজন যথার্থ ধনীর পক্ষে ছাড়া যোগাড় করা সম্ভব নয়। অতএব কি ব্যক্তিগতভাবে কি দলগতভাবে ধনিক শ্রেণীর কাছে আমাদের নেতৃবর্গ বাঁধা পড়ে থাকতে বাধ্য। কাজেই পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে ছোটোখাটো সংস্কার, তালি ও রিফু প্রস্তাবে ধনীরা হয়তো বিরোধিতা করবেন না—কিন্তু একটি সংস্কার প্রস্তাব—যার অন্যনাম হতে পারে আমূল পরিবর্তন, সেখানে যদি ধনীর স্বার্থ ব্যাহত হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁরা নড়ে চড়ে উঠবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

টাকা যার আছে ব্যবস্থা অবলম্বনের নানান পথ তার কাছে খোলা। ...

যাদের আর্থিক প্রয়োজনের সময় ধনীরা এগিয়ে এসেছিলেন, সরকারী ও বিরোধী পক্ষের সেই সুপরিচিত সদস্যদের ওপর সামান্য চাপ সৃষ্টি করা। প্রস্তাব পাসে ও প্রস্তাবের বিরোধিতায় এই সামান্য চাপ এত সুন্দরভাবে কার্যকরী হয় যে, ধনীরা তার রস পেয়ে গিয়েছেন।—ধনীরাই এখন সমগ্র পৃথিবীতে পার্লামেন্টারী প্রথার সব চাইতে বড় প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন। যেখানে গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারা হয়েছে সেখানেও ধনীরা সাহায্য পাঠান, তবে গোপনে। কিন্তু যেখানে গণতন্ত্রের জয়জয়কার সে সব দেশে ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাঁরা সাহায্য পাঠান। বলেন, ডেমোক্রেসির কোনো জবাব নেই।

তাহলে মানেটা দাঁড়ালো, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধনীর যাতে সুবিধা হয় তেমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে সরকার বাধ্য হয়। অন্তত পক্ষে ধনীর অসুবিধে নেই—এমন ব্যবস্থা হঠাৎ সরকার পাল্টাতে যাবে কেন? আর পাল্টানো মানেই তো বিরাট আর্থিক দায়িত্বের ব্যাপার। টাকার ওপর ভাগ না-বসিয়ে, কেউ যদি বাদুদণ্ডের সাহায্যে শিক্ষার একটা মস্ত উন্নতি ঘটিয়ে দিতে পারে, তাহলে ধনী প্রভাবিত সরকার একটা পর্যায় পর্যন্ত সংস্কার ও ছোটখাট অদল বদলে চুপ থাকতে রাজি আছেন। টাকার অঙ্কে ভাগ বসালেই ফোঁস্।

সরকারী ব্যয়ের অজস্র খাতের মধ্যে, শিক্ষাই সম্ভবত একমাত্র জায়গা যেখানে অনেক টাকা ব্যয় হলে, এক পয়সাও যথার্থ ধনীর ঘরে না-ও যেতে পারে। শিক্ষার ব্যয় বাড়ানো মানেই হল—অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, অনেক শিক্ষক নিয়োগ অনেক ট্রেনিং ব্যবস্থার আয়োজন, অনেক গবেষণাগার স্থাপন, বিবিধ বিষয়ের শত শত পুস্তক অনুবাদ, রচনা ইত্যাদি। তাহলে যথার্থ ধনীর ঘরে কোন পথ দিয়ে টাকা আসবে? ভারতবর্ষের বড় বড় ধনীরা কেউ বইয়ের ব্যবসা করে না, কেউ ল্যাবরেটারী সরঞ্জামের ব্যবসা করে না, বিল্ডিং মেটিরিয়েলের পাতি-ব্যবসায় কেউ বিশ্বাস করেন না। যদি করতেন, যদি কোটি কোটি টাকা আসার পথ খোলা থাকতো, তাহলে নিজেদের স্বার্থেই ও'রা শিক্ষার বরাদ্দ বাড়াবার প্রস্তাব তুলতেন। কারণ বরাদ্দ না বাড়লে—ব্যয় বাড়বে না। ব্যয়ের বন্যা না-বইলে, আয়ের দীঘির পাড় ছাপিয়ে যাবে কেমন করে!

শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে ধনীর আরো ধনী হওয়ার পথ বন্ধ। কাজেই শিক্ষা সমস্যা ভারতবর্ষের ধনীদের কাছে অদ্ভুৎ ও হাস্যকর। রুটি পাও না তো কেক্ খাও না কেন-র মত ভ্রূ কুঞ্চিত জিজ্ঞাসা। দিল্লি বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজের মত বড় বড় শহরগুলিতে তো স্কুলেছেই, তাদের সন্তান-সন্ততি পড়বার মত আরো উপযুক্ত স্থান আছে সিমলা ও সন্নিহিত পাহাড় অঞ্চলে, আছে কার্সিয়াং ও দার্জিলিং-এ। এতেও যদি কারু অসুবিধা হয়, আছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা। সেখান থেকে আশৈশব শিক্ষার ছাপ নিয়ে আসতে পারলে তো কথাই নেই। অতএব দেশীয় শিক্ষা আমাদের ধনীদের তথা সরকারের প্রসন্ন দৃষ্টির কৃপা ভিক্ষা পাবে না, এটা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু কই, প্রতিরক্ষা কৃষি শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য কোথাও সামান্য আন্দোলনেরও প্রয়োজন হয় না? আমাদের সংস্থিত মোট অর্থের তুলনায় কি আশ্চর্য গ্যালপিং স্কেলে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, রেল ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে—সেটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির ব্যয় বরাদ্দ খুলে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনি বলবেন; এগুলি তো জাতীয় স্বার্থেই হতে পারে, কারণ বিভাগগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলবো, ঠিক কথা, ওগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ। বরাদ্দ যত বাড়ে ততই ভাল। কিন্তু প্রশ্ন করবো, সবই গুরুত্বপূর্ণ, বাদে শিক্ষা? আপনি বলবেন, প্রতিরক্ষা স্বরাষ্ট্র রেল কৃষি বাণিজ্য শিল্প ইত্যাদির ওপর জোর দিলে দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হবে। আমি বলবো, যথার্থ শিক্ষার অভাবে চরিত্রহীনতার অদৃশ্য পোকা সব উন্নতি খেয়ে ফেলবে।

অসল সত্য কথা অন্য রকম। যেটা আগে বলছিলাম: প্রতিরক্ষা কৃষি শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে টাকা ব্যয় মানেই ছোট বড় শিল্পপতি ব্যবসায়ী, কন্ট্রাকটার ইত্যাদির ঘরে টাকা আসা। ব্যয়ের অঙ্ক যত বাড়বে, ধনীর ঘরে টাকা ততই আসবে। অতএব সংবিধানে যতই লেখা থাক, দশ বছরের ভেতর শিক্ষাকে সর্বজনীন ও অবৈতনিক করতে হবে—এসব কথা এক কানাকড়ির মূল্যও পাবে না ধনী-শাসিত সরকারের কাছে। আজ পর্যন্ত যতবার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে খরচ সঙ্কোচ বা আপৎকালীন প্রয়োজনে খরচের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে- প্রতিবার শিক্ষা খাত-কে পঙ্গু করে অন্য খাত-কে পুষ্ট করা হয়েছে। তাতে হয়তো অনেক শিল্প বাণিজ্য বেঁচেছে। কিন্তু বাঁচেনি সমগ্র দেশজোড়া অগণিত মানুষের চিত্ত ও চরিত্র। চিত্ত তৈরি না হলে চরিত্র তৈরি হল না। চরিত্র না-থাকলে বিপদের দিনে লড়বার মানুষ থাকে না।

॥ চার ॥

গত ত্রিশ বছরে সৌভাগ্যবশত আমাদের বড় রকমের কোনো পরীক্ষা দিতে হয়নি। একটু যা হয়েছিল ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণে। সমস্ত ব্যবস্থাটা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। একে অন্যের উপর দোষারোপের হোলি-খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। চীন ভারত যুদ্ধের ওপর লেখা অন্তত ছ' সাত খানা বইয়ে সেই দোষারোপের কথা ছাপার অক্ষরে লেখা আছে। মাত্র পনেরোটা বছর যেতে না-যেতেই ইতিহাস আবার নিজেকে রিপিট করে বসলো। আবার সেই দোষারোপের কর্দমাক্ত হোলি খেলায় অনেকেই স্নান করে উঠেছেন।

কেন বার বার এইরকম হচ্ছে? রাজনৈতিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রবণতা লক্ষ করলে অনুমান করা কঠিন নয় যে অচিরেই ঐ রকম ঘটনা আরো ঘটবে। কিন্তু কেন? এর উত্তর হয়তো কঠিন। কিন্তু আমার কাছে একটি সহজ উত্তর আছে।

হয়তো বা দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে, হয়তো বা আত্মরক্ষার আদিম তাগিদে, অথবা নির্লিপ্ত বুদ্ধির

চূড়ান্ত বিকাশের ঐতিহ্যবাহী আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে একটা কনট্রাডিকশান খুব প্রকট। সেটা হল কর্ম ও কথার বৈপরীত্য বা সামঞ্জস্যহীনতা। ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছেন, তবু মনে করি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক নেতারা সকলেই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত। কথায় ও কাজে আশ্চর্য ফারাক। ফলে সন্ততিদের মধ্যেও এই রোগ পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ করার চেষ্টা ঘরে ঘরে জনে জনে। এই মানসিকতার সব চাইতে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত হল আমাদের পূত পবিত্র সংবিধান। তাতে লেখা আছে আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য নাকি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আর সমস্ত রকম চেষ্টাগুলো চলছে, ধনীদের আরো ধনী হতে সাহায্য করা। যেদিন সংবিধান রচিত হয়েছে, তার পরদিন থেকেই।

উদ্দেশ্য ও কর্মের এই যে বৈপরীত্য—দুটো একসংগে কিছুতেই চলতে পারে না। অথচ ভাবি, সংবিধান-রচয়িতা মনীষীগণ কি ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সংস্কারান্ধতার দিকে তাকিয়ে এটুকু বুঝতে পারেন নি, যে-দেশে সাধারণ মানুষ ধনী মুনাফাবাজ, কালোবাজারী, ভেজালদারের হাতে বলির পাঠার মত কৃপাযোগ্য—সে দেশের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বড় বড় হরফগুলি সংবিধান অলংকরণের নিমিত্তে সংযোজিত মাত্র? অর্থবোধক ও কর্মনির্দেশক কোনদিনই হবে না?

সুপণ্ডিত সংবিধান-রচয়িতারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন। তবু যে তাঁরা সংবিধানে তাঁদের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তার কারণ এই নয় যে তাঁরা খারাপ লোক। তার কারণ এই, তাঁরা তাঁদের কনট্রাডিকশানের ঊর্ধ্বে নন।

॥ পাঁচ ॥

তাই বলছিলাম, এমন ব্যবস্থা যেখানে মূলত ধনতন্ত্রকেই মদত জোগানো হবে, অথচ গরীবদের জন্য অনেক কিছু করা হচ্ছে, এমন একটা ভাব রাখতে হবে—তার অন্তঃসারশূন্যতা কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়বেই। শ্রীমতী গান্ধীর বিদায়ে কি সেই দৃশ্যেরই অবতারণা হল না? শ্রীমতী গান্ধী যে অনেক ভাল ভাল কাজ করেছিলেন এবং একটি অসাধারণ মুখরোচক ও হৃদয়রোচক স্লোগান তৈরি করেছিলেন, 'গরিবী হটাও'—যে কোন নিরপেক্ষ লোক তাতে সন্দেহ পোষণ করবেন না। তবু যে তিনি থাকতে পারলেন না, তার প্রত্যক্ষ কারণ যতই কয়েকটি ব্যক্তি বা ব্যবস্থার ফল বলা হোক না কেন, আসলে তিনি যে অবস্থায় এসেছিলেন, তাকেই বলা চলে না-ঘরকা না-ঘাটকা। একদিকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সংগে অতিরিক্ত মিত্রতার সম্পর্ক গড়তে গিয়ে ধনিক শ্রেণীর একটা বড় অংশের লেজে পা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে কর্মের মধ্য দিয়ে গরীব মানুষের আনুগত্য আদায় থেকে ছিলেন অনেক দূরে। গরীব মানুষরাই সংখ্যায় বেশী। ফলে নির্বাচনের দুর্দিনে ধনী চটে গেল, গরীব এগিয়ে এল না শ্রীমতীকে রক্ষা করতে। পতন অনিবার্য হলো।

কাজেই বুঝতে পারছেন, মার্কস্ সাহেব বলেছেন বলেই নয়, যে কোন হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান লোকই বলবে (অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ তো অকপট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন) যে, যতদিন পর্যন্ত দেশের আপামর গরীব সাধারণ মানুষ না-জাগবে, ততদিন দেশের যথার্থ শক্তি উদ্বোধিত হবে না। আর এটা একমাত্র করতে সমর্থ শিক্ষা এবং শিক্ষা। আর এই শিক্ষা সাধারণ মানুষকে জোগাতে সমর্থ সেই সরকার যে বিশ্বাস করে—সমস্ত মানুষকে সমানাধিকার দেওয়ার ভিত্তিতে, মানুষে মানুষে সর্ব প্রকার ব্যবধান ও বৈষম্য ঘুচিয়ে আনাই সমাজতন্ত্রের মূল কথা। যে সরকার মনে করে সম্পত্তির উপর জন্মগত অধিকার স্বীকার না-করলে এবং মানুষের যথেচ্ছ মুনাফা অর্জনের মৌলিক অধিকার স্বীকার না-করলে সমাজের আর্থিক বনিয়াদ শক্ত হতে পারে না—তাঁরা যে সমাজতন্ত্রের নামে ধনতন্ত্রের পূজারী হতে বাধ্য সেকথা আশা করি বুদ্ধিমান লোককে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

অতএব, আমাদের দেশে রাজনীতিতে 'গণতন্ত্র বিপন্ন' বলে মাঝে মাঝেই যে চীৎকার শোনা যায়, তার মধ্যে একটা মস্ত চালাকি আছে। গণতন্ত্র নিয়ে যোগ্য লোকেরা নানা রাগ-রাগিণীর বিস্তার করেন। প্রায়শই শুনি। কিন্তু গণতন্ত্রের সংগে ধনতন্ত্রের যে কোনো বিরোধ নেই, এই কথাটা কিন্তু কাউকে বলতে শুনি না। আসলে গণতন্ত্রের চীৎকার চেঁচামেচি দিয়ে ধনতন্ত্রকে ঢেকে রাখবার নিটোল ব্যবস্থা। আগেই বলেছি, আমাদের মত দেশে যেখানে একটি 'রাগ' ও 'যন্ত্রণাবোধ' যে কোন সময় ফেটে পড়তে পারে—সেখানে গণতন্ত্র বাঁচলে অবশ্যই ধনতন্ত্র বাঁচে।

কাজেই গণতন্ত্রের দুন্দুভি নিনাদ করে যে দল ক্ষমতায় সিংহাসনে অভিষিক্ত হল, সে ধনীর পক্ষে অথবা গরীবের পক্ষে, সে লিখিত সংবিধানের পক্ষে অথবা অলিখিত স্বার্থানুসারী সংবিধানের পক্ষে—সেটা বোঝা যাবে তার কাজ দিয়ে।

কংগ্রেস ত্রিশ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলো। প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কংগ্রেস এই সময়ের মধ্যে অনেক ভাল ভাল কাজ করেছে। ইস্পাত কারখানা তৈরি করেছে। নদী প্রকল্প। অনেক সেতু তৈরি করেছে। ভাল ভাল অনেক রাস্তা। বিমান চলাচল ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ করেছে। আরো নানান ভাল ভাল কাজ।

কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বছরে যা করতে পারেনি, তা হল, (১) সব মানুষের দু বেলা পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা করতে পারেনি। (২) অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু রোধ করতে পারেনি। (৩) সকল ভূমিহীন চাষীদের জমি দিতে পারেনি। (৪) সকল শিশুর জন্য ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি। (৫) সকল বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করতে পারেনি। (৬) মজুরী নীতি নির্ধারণের কোনো চেষ্টাই করেনি। (৭) বেকার সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

যে সরকার ত্রিশ বছর ক্ষমতায় ছিলো, সে-যে কিছু ভাল ভাল কাজ করবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। এবং সেজন্য সে কোনো অতিরিক্ত প্রশংসার দাবি করতে পারে না। জনগণ তাকে ক্ষমতা দিয়েছিল কাজ করবার। সে কাজ করেছে। যেটা সে পারেনি, সেটাই তার ব্যর্থতা। সে দায়িত্ব তাকে অবশ্যই বইতে হবে। সেখানেই তার কলংক। সেখানেই তার চরিত্র। সেখানেই তার শ্রেণী-চরিত্র।

অর্থাৎ ত্রিশ বছর ক্ষমতায় থেকে, কংগ্রেস কোনো মৌলিক পরিবর্তন (সংবিধান-কথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে) তো ঘটাতে পারেইনি, এমন কি গরীবের যে মূল তিনটি সমস্যা (ক) খাওয়া-পরা, (খ) লেখাপড়া শেখা, (গ) রোগে চিকিৎসা পাওয়া—এর একটাতেও সার্থকতার কাছাকাছি যেতে পারেনি। অথচ বড়লোকের যা সমস্যা, যেমন, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল, প্লেন, টি ভি, বিদেশী পানীয়, বিদেশে যাতায়াত, বিদেশে অবসর বিনোদন, বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ, প্রয়োজনাতীত বিলাস দ্রব্যের আয়োজন—এগুলি কিন্তু অত্যন্ত তৎপরতার সংগে করা হয়েছে।

কাজেই কংগ্রেস কতখানি 'জনগণের' আর কতখানি 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্রের' লোকে আন্দাজ করে নিয়েছিল। এবং বিচারের ভার এলে অসংকুচিতচিত্তে রায় দিয়ে দিয়েছে। ঠিক একই নিয়মে জনতারও একদিন বিচার হবে। যে ক্ষমতায় আসবে তারই বিচার হবে। হতে হতে ব্যক্তি চরিত্র, দলের চরিত্র, দলের শ্রেণী-চরিত্র সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। তবে বুদ্ধিমান লোককে এই সত্য অনুধাবনের জন্য ততদিন অপেক্ষা করার দরকার নেই, যে, বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে শিক্ষার কোনো মৌলিক বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

অতএব, ভদ্রমহোদয়গণ, বড় বড় কাজ আমাদের দ্বারা না হলেও, ছোট ছোট কাজে হাত দিয়ে পারদর্শিতা দেখাতে আমরা কোনদিনই পরাঙ্মুখ ছিলাম না। অতএব আসুন, টুকরো কাগজে মুখামৃত সংযোগে তালি এঁটে ঘরের দেওয়ালের অসংখ্য ফুটো জোড়াতালি দিতে লেগে যাই। এটা অবশ্যই কিছু সাময়িক বা তাৎক্ষণিক উপশম আনবে। যেখানে পড়ন্ত ঘর সাহস ভরে ভেঙে নতুন ঘর বানানোর সাহস নেই, যেখানে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সুদূরপরাহত সেখানে তাৎক্ষণিক উপশমই বা কম কি?

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১২ ॥

এবারে কিছু পুরোনো আমলের গালগল্প করা যাক।

দিল্লীর বাদশাহের সনদ নিয়ে খান জাহান আলী নামে একজন সেনাপতি এসেছেন যশোর শাসন করতে। এই খান জাহান আলীকে অবশ্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই, আমাদের আগ্রহ তাঁর এক কর্মচারী সম্পর্কে। তবু খান জাহান আলীর উল্লেখের প্রয়োজন হলো, কারণ এই ব্যক্তিটির নাম আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, ইনি মারা যান ১৪৫৮ খৃস্টাব্দে, তখনও চৈতন্যদেব জন্মাননি।

তৎকালে বাঙালীদের নামের সঙ্গে কেনো পদবী যুক্ত হওয়ার রেওয়াজ ছিল না। গোত্র এবং গ্রামের পরিচয়েই মানুষের পরিচয়। খান জাহানের সেই কর্মচারীটির সঠিক নামও আমরা জানি না। সে ব্রাহ্মণের ছেলে। নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা গ্রামে তার জন্ম। সে এক সুন্দরী মুসলমান রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হলো। সেই প্রণয় এমনই তীব্র যে তার জন্য সে জাত ধর্ম বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। হিন্দু ধর্ম এমনই কঠোর ভাবে গণ্ডীবদ্ধ যে সেখানে অন্য ধর্মের মানুষের কোনোক্রমেই প্রবেশ অধিকার নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে যবনী বিবাহ করলে তার স্ত্রীকে তো কোনোক্রমেই হিন্দুত্বে বরণ করা যাবে না, বরং সে ছেলেটিরই জাত যাবে। সুতরাং প্রণয় পরিণামে এই ব্রাহ্মণ সন্তানটি জাতিভ্রষ্ট হলেও তার নতুন নাম হলো মামুদ তাহির। সে পিরল্যা গ্রাম থেকে এসেছে বলে আগে তাকে পিরল্যাীয়া বলে ডাকা হতো, এই নামটিরও একটি চমৎকার মুসলমানী রূপ পাওয়া গেল, পির আলী।

হিন্দু ধর্ম নতুন কাউকে গ্রহণ করে না বরং নিজের লোকদেরই পরধর্মের দিকে ঠেলে দেয়, পৃথিবীর অপর ধর্মগুলি কিন্তু নবাগতদের সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। এমনকি অনেক সময় কিছু কিছু পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করে। ধর্মান্তরিত হবার পর পির আলী তার প্রভুর নেকনজরে পড়লো এবং খিলাত হিসেবে পেয়ে গেল একটি পরগণা। সেই পরগনাটির নাম চেঙ্গুটিয়া।

ক্রমে এই পরগণাদার পির আলী বেশ একটি মান্যগণ্য লোক হয়ে উঠলো এবং প্রায়ই ধর্মধাম করে কথায় বলে, নতুন মুসলমান গোরু খাওয়ার যম। পির আলী নিজে তো খেতেনই, উপরন্তু সকলকে গো-মাংস ভক্ষণের উপকারিতা বিষয়ে নানা কথা বার্তা শোনাতেন। কিন্তু চেঙ্গুটিয়া পরগণাটি হিন্দু প্রধান এবং এখানে বেশ কিছু ব্রাহ্মণের বাস। সুতরাং পির আলীর মতামত সহজে জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা ছিল না।

কামদেব ও জয়দেব নামে দুই ব্রাহ্মণ দেওয়ানী করতো এই পির আলীর অধীনে। একদিন তারা তাদের সহৃদয় প্রভুর সঙ্গে একটি অপ্রত্যাশিত রসিকতা করে ফেললো। সেইটিই তাদের জীবনের মহত্তম ভুল। অথবা, ভুলই বা বলছি কেন, এইসব ঘটনাই তো ইতিহাসের কৌতুক।

রোজার মাস, উপবাসী পির আলী তাঁর পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন, তাঁর হাতে একটি গন্ধ লেবু। মাঝে মাঝে সেটি নাকের কাছে এনে শুঁকছেন তিনি। এমন সময়ে কামদেব ও জয়দেবের মধ্যে একজন কেউ বললো, উজির সাহেব, আপনার আজকের রোজা তো ভঙ্গ হয়ে গেল।

বিস্মিত পির আলীকে সে আরও বুঝিয়ে দিল যে, তাদের শাস্ত্রমতে ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্। সুতরাং রোজার মাসের নিরম্বু হলো না।

এই শুনে পির আলী হাসলেন। সেই হাসির মধ্যে গভীর মতলব ছিল।

এরপর একদিন পির আলী তাঁর দরবারে বহু হিন্দুকে নিমন্ত্রণ করে কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ ভৃত্য-দের কী এক ইংগিত করলেন। অমনি ভৃত্যরা অনেক-গুলি জ্বলন্ত উনুন নিয়ে এলো সভাকক্ষে, সেইসব উনুনের ওপর কড়াইতে গো-মাংস রান্না হচ্ছে। লোকশ্রুতি এই, সেদিন পির আলী এক শত গো বধ করেছিলেন।

গো মাংসের গন্ধ পেয়ে অনেক হিন্দু নাকে কাপড় দিলেন, অনেকে সভা ছেড়ে পালালেন। কিন্তু পির আলী চেপে ধরলেন কামদেব ও জয়দেবকে। তিনি বললেন, তোমরা পালাচ্ছো কেন? তোমাদেরই শাস্ত্রমতে তোমাদের অর্ধেক ভোজন হয়ে গেছে এবং সেই অনুযায়ী তোমাদের জাত গেছে। সুতরাং আর চক্ষুলজ্জা রেখে লাভ কী? আমার পাশে বসে বাকি ভোজনটাও সেরে নাও!

ধর্মান্তরিত হবার পর কামদেব ও জয়দেবের নাম হলো কামালউদ্দিন ও জামালউদ্দিন। এবং উপহার পেল জায়গীর। কিন্তু ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের মতন, হিন্দু পরিবারের অর্ধেক মুসলমান হলে বাকি অর্ধেকও নিষ্কৃতি পায় না। কামদেব, জয়দেবের আর দুই ভাই ছিল, তাদের নাম রতিদেব ও শুকদেব। সমাজ খড়্গহস্ত হলো এদের প্রতি, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে জল-অচল হলো এবং পির আলীর নামের সুবাদে এদের পরিবারের নামের সঙ্গে পিরালী অপবাদ যুক্ত হয়ে গেল। লোকে এদের পুরোপুরি ব্রাহ্মণ বলে না, বলে পিরালীর বামুন।

আত্মীয় স্বজনদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই দুই ভাইয়ের মধ্যে রতিদেব গৃহত্যাগ করলো। খুব সম্ভব তার কোনো পুত্রকন্যা ছিল না, তাই বৈরাগ্য গ্রহণ তার পক্ষে সহজ হয়েছিল। কিন্তু শুকদেব পড়লো মহা বিপদে। তার নিজের বিবাহ-যোগ্য কন্যা রয়েছে। এক ভগ্নীরও তখনো পর্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয়নি। পরিবারে খুঁত লেগে গেছে বলে এই দুই কন্যার বিবাহের জন্য কোনো পাত্র পাওয়া যায় না। তখন শুকদেব সমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলো তার শেষ অস্ত্র, যার চেয়ে অমোঘ অস্ত্র আর হয় না। টাকা দিয়ে সে কিনে ফেললো দুজন ব্রাহ্মণকে। শুকদেবের ভগ্নীর বিবাহ হলো ফুলে গ্রামের মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং কন্যার স্বামী হলো পিঠাভোগ গ্রামের জগন্নাথ কুশারী। যৌতুক হিসেবে উভয়েই পেল প্রচুর জমি ও ধন। পরবর্তীকালে শুকদেব, মঙ্গলানন্দ, জগন্নাথদের সন্তান সন্ততিরা সকলেই পিরালীর ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

ভালবাসার উপহার—

আজীবনের নিরাপত্তার জন্য.

আগামী জন্মদিনে, ওকে সেরা উপহার
দিন—এমন উপহার সে এযাবৎ পায়
নি—ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার একটি
রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট।

আর সেই সঞ্চয়কে মাসের পর মাস,
বছরের পর বছর বেড়ে যেতে দিন।
এমনি করেই এই আনন্দের দিন
বার বার ফিরে আসুক···

নাবালকের জন্য মাইনর্স ডিপোজিট
অ্যাকাউণ্ট খোলা যায়—আপনার
নিকটস্থ ব্যাঙ্ক শাখার সঙ্গে যোগাযোগ
করুন—এ সম্বন্ধে সব তথ্য জানতে পারবেন।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান)

যেখানে কাজটাই আসলে অন্যরকম

CONCEPT-BOI-3448 BEN.

[illegible] রাজেদের বাসস্থান পাথরঘাটী। সেইজন্যই কুশ গ্রামনিবাসীরা কুশারী। এই কুশ গ্রামটি বর্ধমান শহরের কাছে। ক্রমে এই কুশারীরা বাঁকুড়ার সোনামুখী, খুলনার পিঠাভোগ এবং ঢাকার করকীর্তন গ্রামেও বসতি নেয়। অথবা বলা যায়, সেইসব গ্রামের গ্রামীণ বা গাঞী হয়। আমাদের এই কাহিনীতে, পিঠাভোগের কুশারীদের গুরুত্ব অনেকখানি।

এই কুশারীরা সুদীর্ঘ বংশগৌরব দাবী করতে পারে। আদিশূর নামে গৌড়ের জনৈক রাজা, যিনি পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বলা শক্ত, (আমরা এ পরিচ্ছেদের শুরুতেই এসব কাহিনীকে গালগল্প বলে অভিহিত করেছি) কনৌজ থেকে পাঁচজন খাঁটি ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। ধরে নেওয়া যায়, গৌড় বাংলা তখন ছিল অনার্য অধ্যুষিত। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ থেকেই শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস্য এবং সাবর্ণ গোত্রের উদ্ভব। উত্তরকালে এইসব গোত্র বিভাগ প্রচুর জটিলতার সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টি করেছিল।

শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রথম পুরুষ ক্ষিতীশের এক পুত্রের নাম ভট্টনারায়ণ, যিনি প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটক বেণী সংহারের রচয়িতা বলে অনেকের ধারণা। সেই ভট্টনারায়ণেরই বংশধর আমাদের আলোচ্য কুশারীরা। মূল শাণ্ডিল্য গোত্রের জন্য এঁদের বন্দ্যঘটী বা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু গাঞী নিরিখে এঁরা কুশারী।

এমত বংশ গৌরব থাকলেও যবন সংসর্গ হেতু পিঠাভোগের কুশারীদের পিরালী নাম অর্শে গেল। ধর্ম ও সমাজপতিদের অত্যাচার তাদের সইতে হয়েছে বহু প্রজন্ম ধরে। অনেক কাল পরে তারা এর শোধ নেয়।

এবার কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে আসা যাক। ঐ কুশারী বংশেরই এক সন্তান পঞ্চানন এবং তাঁর খুল্লতাত শুকদেব আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ করে স্বগ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলেন গোবিন্দপুরের খাঁড়ির কাছে। পাঁড়া ব্রাহ্মণ হলেও তাঁদের সাজ-পোশাকের কোনো ত্রুটি ছিল না। পরিধানে পট্টবস্ত্র, মাথায় লম্বা শিখা এবং ললাটে চন্দন, গৌরবর্ণ অঙ্গের জৌলুস। দেখলেই ব্রাহ্মণ বলে চেনা যায়। গোবিন্দপুরের খাঁড়ির পাশে তখন শুধু কয়েকঘর জেলে, মালো, কৈবর্তের বাস। ব্রাহ্মণ দেখে তারা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো এবং সেখানেই অধিষ্ঠিত হবার অনুরোধ জানালো। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আশ্রয় দেওয়া একটি বড় পুণ্যকর্ম।

সেই গোবিন্দপুরের খাঁড়ির নামই ইদানীং আদি গঙ্গা বা টালির নালা। গোবিন্দপুর, সুতানটি এবং কলকাতা নামে তিনটি গ্রাম জুড়ে ইংরেজরা তখন নতুন একটি শহরের পত্তন করছে। এই খাঁড়ি দিয়ে জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য এটিকে কেটে প্রশস্ত করা হচ্ছে এবং গ্রামের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য সাহেবরা যখন আসে তখন গ্রামের জেলেরা নিজেরা কথা বলার সাহস না পেয়ে ব্রাহ্মণ দুজনকে এগিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ দেবতুল্য, তাই গ্রামের মানুষ তাদের ঠাকুর বলে ডাকে। সাহেবরা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না বলে, তারা বলে টেগোর। কুশারী ও পিরালী পরিচয় মুছে ফেলে পঞ্চানন ও শুকদেব ঠাকুর হয়ে গেলেন।

এই ঠাকুররাই কলকাতার আদিযুগের স্টিভেডর এবং কণ্ট্রাকটর। প্রথম প্রথম পঞ্চানন ও শুকদেব সাহেবদের জাহাজে মালপত্র সরবরাহ করতেন। তারপর সাহেবদের সঙ্গে ভালোমতন পরিচয় হয়ে যাওয়ার ফলে আরও নানারকম কাজের ভার পেতে লাগলেন তাঁরা। নতুন শহরে তখন অনেক প্রকার কর্মোদ্যম চলছে। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাটা হলো মারহাট্টা ডিচ। সিরাজউদ্দৌলা হঠাৎ এসে কলকাতার কেল্লা গুঁড়িয়ে দেবার পর ইংরেজরা ময়দানের ফাঁকা জায়গায় মজবুত করে তৈরি করে নতুন কেল্লা বা ফোর্ট উইলিয়াম। এইসব কাজের ঠিকাদারির ভার পায় ঐ দুই ঠাকুরের পুত্র ও পৌত্ররা। ঠাকুরদের তখন এতই ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, শোনা যায় দুর্গম ঘন জঙ্গল সাফ করে তাঁরা যেখানে একটি বাগানবাটি প্রস্তুত করেন, পরে সেখানেই তৈরি হয়েছিল ঐ নতুন কেল্লা।

পরবর্তীকালে এই বংশের আর দুই উল্লেখযোগ্য ভ্রাতার নাম নীলমণি এবং দর্পনারায়ণ। দুজনেই যথেষ্ট ধনাঢ্য, তবে নীলমণি অনেক বেশী কর্মবীর। গোবিন্দপুরের খাঁড়ির কিনারা ছেড়ে ঠাকুরেরা এখন চলে এসেছেন মেছোবাজারের পাথুরিয়াঘাটা নামের অভিজাত পল্লীতে। ছোটভাইকে সংসার দেখাশুনোর ভার দিয়ে নীলমণি প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটান। ইংরেজ কম্পানীর সঙ্গে তিনি চাকরিসূত্রে আবদ্ধ। কখনো তিনি যান চট্টগ্রামে, কখনো উড়িষ্যায়। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়াও তাঁর মধ্যে দুঃসাহস ছিল যথেষ্ট। দেওয়ানি কাজে সেকালে অর্থাগম হতো বিস্তর। সমস্ত টাকা নীলমণি পাঠিয়ে দিতেন ছোট ভাইয়ের কাছে।

একসময় চাকরি ত্যাগ করে নীলমণি গৃহে ফিরলেন। সেখানে তাঁর জন্য এক বিরাট অশান্তি অপেক্ষা করে ছিল। তাঁদের গৃহে তখন অতুল বৈভব। কিন্তু ছোটভাই দর্পনারায়ণ দাবী করলেন যে এর অধিকাংশই তাঁর নিজের উদ্যোগ ও বিচারবুদ্ধির ফল, এর মধ্যে নীলমণির অংশে সামান্যই। নীলমণি বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়েছেন বটে কিন্তু দর্পনারায়ণই নিজ কৃতিত্বে সম্পত্তি বহুগুণ করেছেন।

ভ্রাতৃবিরোধ একসময় এমনই চরমে উঠলো যে এক বর্ষার রাতে নীলমণি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে এবং গৃহদেবতা নারায়ণশিলা সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আর কোনোদিন ফিরবেন না। দর্পনারায়ণ তাঁর দাদার হাতে নগদ এক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন এবং তাঁকে দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে বসতবাটি এবং

Only if you want the best & no compromise!

SONODYNE

OFFERS YOU AN OUTSTANDING NEW TV OF

ALL SOLID STATE DESIGN

NO TV SET PRESENTLY AVAILABLE IRRESPECTIVE OF PRICE CAN BE COMPARED WITH THE CORONATION DELUXE FOR PICTURE SHARPNESS, CONTRAST & SOUND QUALITY.

What else could you want in a TV?
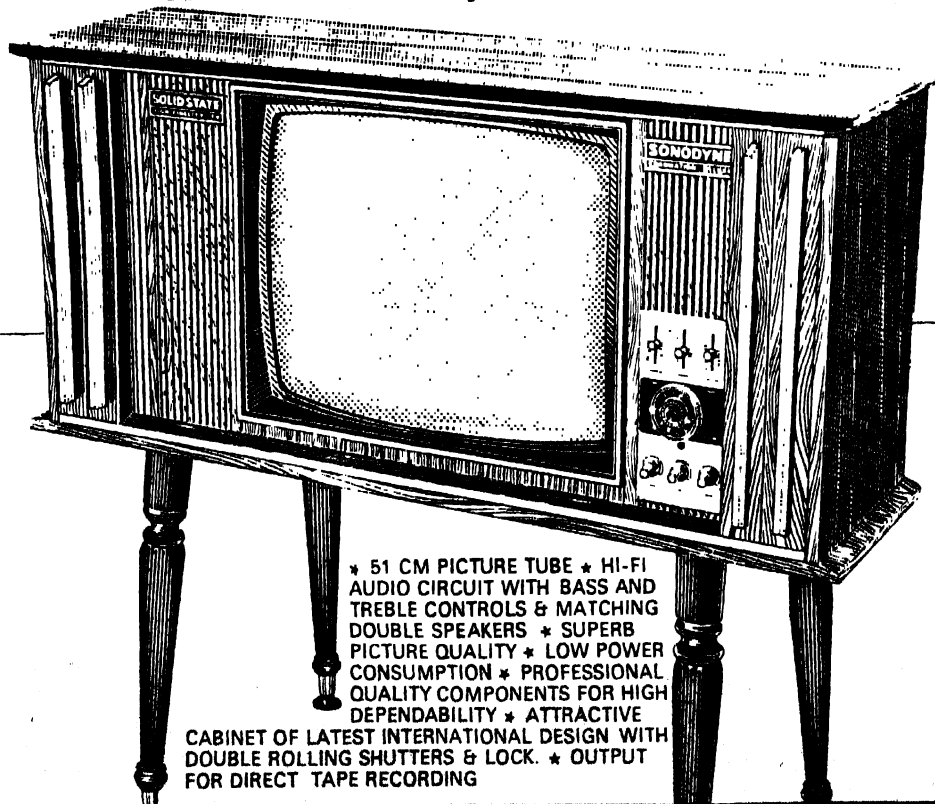
AVAILABLE FROM ALL LEADING TV DEALERS

সম্পত্তির ওপর নীলমণির আর কোনো অধিকার রইলো না।

বৃষ্টির অন্ধকার রাতে নীলমণিকে অবশ্য সপরিবারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হলো না। ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পুণ্য অর্জনের জন্য তাঁদের আশ্রয় দিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত ধনপতি। এঁর নাম শেঠ বৈষ্ণবচরণ। এই বৈষ্ণবচরণ ধনী হয়েছিলেন গংগা-জলের ব্যবসায়ে। হিন্দুদের বিবাহ থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত, এবং প্রতিদিনের পুজো আচ্চায় গংগাজলের প্রয়োজন, এমনকি আদালতেও শপথ নেবার সময় গংগাজল স্পর্শ করতে হয়। মুখবন্ধ মাটির হাঁড়ি ভর্তি গংগাজল চালান যেত গংগাবর্জিত অঞ্চলে। দুধে জল মিশ্রণের চল না হলেও তখনই নিশ্চিত গংগা-জলের ব্যবসায়ে নানারকম কারচুপি ছিল, যে-কারণে অন্যান্য গংগাজল ব্যবসায়ীদের তুলনায় শেঠ বৈষ্ণব-চরণের নামাংকিত শিলমোহর করা গংগাজলই ছিল বেশী বিশ্বাসযোগ্য। এমন কি সুদূর তেলেংগানার রাজাও গংগাজল নিতেন এঁর কাছ থেকে।

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে শেঠ বৈষ্ণবচরণ প্রদত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো ঠাকুর বংশের দ্বিতীয় শাখাটি। নিজে আরও জমি কিনে ক্রমে ক্রমে নীলমণি সেখানে তৈরি করলেন তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ।

নীলমণির তিনটি সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম রাম-লোচন। পিতার মৃত্যুর পর রামলোচনের ওপর পড়লো সংসারের ভার এবং তিনি দক্ষতার সংগেই স কার্য সম্পন্ন করতে লাগলেন। ছোট দু ভাইয়ের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণও করেন তিনি। এবং কিছু কিছু জমিদারি কিনে তিনি আস্তে আস্তে কলকাতার ধনী সমাজে নিজের স্থান করে নেন। রামলোচন ছিলেন শৌখিন এবং বিলাসী পুরুষ। সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও অপরাহ্ণে তিনি একবার হাওয়া খেতে বের হবেনই। পরনে লম্বা কার্তা দোপাট্টা ও তাজ অর্থাৎ মুকুটের মতন পাগড়ি। জুড়ির সামনে নিজস্ব ভাড়ার প্রস্তুত, সেই তাঞ্জামে চড়ে তিনি ময়দানের দিকে যান বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করার জন্য। পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবরাখবর নেওয়াও ছিল তার অভ্যেস। ততদিনে দুই ঠাকুর পরিবারের বিবাদ মিটে গেছে, রামলোচন প্রায়ই যান পাথুরিয়াঘাটের বাড়িতে পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন দেখে আসতে। আসা যাওয়ার পথে যতগুলি দেবালয় পড়ে, সব জায়গাতেই নেমে তিনি ভক্তি ভরে প্রণামী দেন।

মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে বসে মজলিশ। রাম-লোচন ঠাকুরের সাংস্কৃতিক রুচি সমসাময়িক ধনীদের চেয়ে অনেক উন্নত। শুধু বাই-নাচ দেখে প্রমোদ করার বদলে তিনি কালোয়াতি গায়কদেরও ডেকে আনেন, কোনোদিন বা দাঁড়া-কবি বা বসা-কবিদের নিয়ে আসর জমান। রাম বসু, হরু ঠাকুরের মতন কবিগণও এই আসরে এসেছেন।

রামলোচনের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। এক কন্যা জন্মেছিল, সেও অকাল-মৃতা। পত্নী অলকা সুন্দরীর সম্মতি নিয়ে তিনি তাঁর মেজ ভাইয়ের একটি ছেলেকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সাধ ছিল ছেলেটিকে তিনি নিজের আদর্শে গড়ে তুলবেন। কিন্তু উপযুক্ত সময় পেলেন না, একদিন হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ে তিনি বুঝলেন যে তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। পুত্রটির যখন তের বছর বয়েস, তখন রামলোচন ঠাকুর ইহধাম থেকে প্রস্থান করলেন।

রামলোচনের সেই দত্তক পুত্রের নাম দ্বারকানাথ। পালিকা মাতা অলকসুন্দরী এবং নিজের বড় ভাই রাধানাথের তত্ত্বাবধানে দ্বারকানাথ মানুষ হতে লাগলেন। তখনো হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়নি। জোড়াসাঁকোতেই ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে শেরবোর্ন নামে একজন সাহেব একটা স্কুল খুলে বসেছিলেন। শেরবোর্নও পুরোপুরি সাহেব নন, এঁর মা ছিলেন ব্রাহ্মণী এবং সেকথা তিনি প্রকাশ্যে সগর্বে সকলকে জানাতেন। এই শেরবোর্নের স্কুলে দ্বারকানাথ পড়তে লাগলেন এনফিল্ডস স্পেলিং, রীডিং বুক, তুতিনামা বা তোতা কাহিনী, ইউনিভার্সাল লেটার রাইটিং, কমপ্লিট লেটার বুক এবং রয়াল ইংলিশ গ্রামার। আঠারো বছর বয়েস পূর্ণ হলেই দ্বারকানাথ স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পথ প্রস্তুত করতে উদ্যত হলেন।

পালক পিতার কাছ থেকে দ্বারকানাথ জমিদারী সম্পত্তি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার আয় খুব বেশী কিছু নয়। সেই ছোট জমিদারী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মতন মন নিয়ে তিনি জন্মাননি। এ মানুষ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কাছাকাছি অন্য সকলকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন। সরকারের অধীনে তিনি দেওয়ানের চাকরি করেছেন, জমিদারদের মামলা-মোকদ্দমায় তিনি ল এজেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বাড়িয়েছেন পরগণার পর পরগণার নিজস্ব জমিদারী।

জমির মালিকানার প্রতি বঙ্গবাসীদের আকর্ষণ অত্যধিক, কিন্তু দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন যে ভূমিরূপে ধন বক্ষে আগলালেও লক্ষ্মীর আনাগোনা চলে বাণিজ্যেই। বহু রকম ব্যবসায় দ্বারকানাথ নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন, ব্যাংকিং, ইন্সিওরেন্স, রেশম, নীল, কয়লা এবং জাহাজ চলাচল। দ্বারকানাথের পূর্ব-পুরুষ জাহাজে মালপত্র ওঠানো-নামানোর কাজে ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন, দ্বারকানাথ স্বয়ং জাহাজ কিনে দেশ বিদেশে মালপত্র আমদানী রপ্তানি করতে লাগলেন। এমনকি স্বাধীনভাবে ইংরেজদের সংগে অংশীদার হয়ে স্থাপন করলেন এক কোম্পানি। তাঁর যুগে এটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা। দ্বারকানাথের উদ্যম ও ব্যক্তিত্ব এমনই উজ্জ্বল ছিল যে কার টেগোর কোম্পানির প্রতিষ্ঠার পর মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এক চিঠি লিখে দ্বারকা-

নাথকে অভিনন্দন জানালেন যে ইংরেজ ও দেশীয় লোকেরা মিলে যৌথ কারবার পরিচালনায় আপনিই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

অবশ্য একটু ভুল করেছিলেন বেণ্টিংক। এ ব্যাপারে দ্বারকানাথ প্রথম নন, দ্বিতীয়। বাণিজ্য ক্ষেত্রে তখন তাঁর একজন মাত্র যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাঁর নাম রুস্তমজী কাওয়াসজী। এঁরও প্রধানত জাহাজেরই ব্যবসা। কলকাতা তখন জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত, রুস্তমজী একের পর এক জাহাজ তৈরি করিয়ে জলে নামাচ্ছেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে অংশীদারত্বে 'রুস্তমজী টার্নার অ্যান্ড কোং' খুলে ফেলেছেন। বেণ্টিংকের অভিনন্দন বার্তাটিকে সংবাদপত্রের লেখকরা একটু সংশোধন করে নিল। দ্বারকানাথ হিন্দুদের মধ্যে প্রথম। রুস্তমজী হিন্দু নন। তিনি ইরানের অগ্নি উপাসক পারসী জাতীয়। আরবী মুসলমানরা ইরান দখল করে নেবার পর অনেক পারসী এসে আশ্রয় নেয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে, তাদেরই বংশধর এই রুস্তমজী বোম্বাই থেকে জাহাজ যোগে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই নতুন শহরে, যে শহর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভারতের মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় স্থান। রুস্তমজী ব্যবসায়ীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে উঠে গেলেন, একদিকে চীন, অন্য দিকে আফ্রিকা পর্যন্ত যাতায়াত করে তাঁর কোম্পানির জাহাজ। নতুন নতুন জিনিস উৎপাদনের দিকেও তাঁর ঝোঁক আছে। কলকাতা শহরের জন্য বরফ আনাতে হয় আমেরিকার বোস্টন শহর থেকে, এজন্য বরফ এখানে অগ্নিমূল্য। রুস্তমজী কলকাতায় বরফ প্রস্তুত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

কোনো ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়ে দ্বারকানাথের সুখ হয় না। তাই দ্বারকানাথ তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন রুস্তমজীর দিকে। যথা সময়ে অবশ্য রুস্তমজীও ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে এসে দ্বারকানাথ দু রকম ইংরেজের সন্ধান পান। তাঁর প্রন্থের বন্ধু রামমোহনই এদিকে প্রথম তাঁর মনোযোগ ফিরিয়ে দিলেন। এক ইংরেজ দেশ শাসন করে, তারা রাজার জাত, তারা প্রভু। কিন্তু এরা ইংলণ্ডের একটি ছোট শ্রেণী মাত্র, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার এবং তাদের বেতনভুক কর্মচারীগণ। এছাড়াও অন্য ইংরেজ আছে। যারা ভাগ্যান্বেষণে এসেছে ভারতবর্ষে, তাদের আছে স্বাধীন পেশা, রাজ কর্মচারীদের সঙ্গে তাদেরও স্বার্থের সংঘাত হয়, আদর্শগত বিভেদ দেখা দেয়। এদের মধ্যে অনেকে অর্থ পিশাচ, অনেকে নারীলোলুপ, অনেকে নীতিহীন নরপশু। আবার কেউ কেউ মুক্তমনা, উদার, একতরফা শোষণের প্রতিবাদকারী। তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ দেশের ভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে, শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ দেখায়, সংবাদপত্রে সরকারী নীতির সমালোচনা করে।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ দুজনেই বুঝেছিলেন অরাজক এবং নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ভ্রষ্ট ভারতের পক্ষে ইংরেজের শাসন আশীর্বাদ স্বরূপ। তবে, ইংরেজ যেন ভারতীয়দের আত্মসম্মানে আঘাত না দেয়। রামমোহনের তুলনায় দ্বারকানাথ আরও বেশী বুঝেছিলেন যে, ইংরেজদের কাছে ভারতীয়রা ক্রীতদাস। ভারতবাসী বহুকাল ধরে যুদ্ধ বিদ্যায় অনভ্যস্ত, তাদের পক্ষে ইংরেজদের বিরোধিতা করা বাতুলতা। সেই জন্যই ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব ধন মান প্রাণের অধিকার আদায় করতে হলে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজদের সাহায্য নিতেই হবে।

ইওরোপ ভ্রমণে গিয়ে দ্বারকানাথ এই সত্য আরো বেশী উপলব্ধি করলেন। ভারতে ইংরেজ-রাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের অন্য শ্রেণীর ইংরেজদের অনেক প্রভেদ। ভৃত্য বা প্রজার মতন নয়, তারা দ্বারকানাথের সঙ্গে ব্যবহার করেছে সমান সমান মানুষের মতন, কিংবা তারও বেশী সম্ভ্রমের সঙ্গে। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁকে পাশে স্থান দিয়েছেন। বড় বড় ডিউক, লর্ড থেকে শুরু করে ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স পর্যন্ত দেখা করে গেছেন তাঁর বাড়িতে এসে।

ভারত থেকে ইংলণ্ডবাসীদের জন্য নানান উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। ইংলণ্ড থেকেও তিনি ভারতীয়দের জন্য বিশেষ একটি উপহার নিয়ে এলেন। একটি মানুষ। এঁর নাম টমসন। এই টমসন পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়াই-এ প্রস্তুত। এর আগে তিনি আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে অগ্নিস্রাবী ভাষণ দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন জায়গায়। সে জন্য তাঁর প্রাণ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল বারবার। এই বিশেষ মানুষটিকে দ্বারকানাথ ভারতে আমন্ত্রণ করে আনলেন এক গূঢ় উদ্দেশ্যে।

এক শীতের ভোরে দ্বারকানাথের জাহাজ এসে ভিড়লো কলকাতা বন্দরে। আগে থেকেই খবর পেয়ে শত শত ব্যক্তি সেই সকালেই সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। জেটিতে জাহাজটি স্পর্শ করার পর দ্বারকানাথ তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন পোর্ট সাইড ডেকে। তাঁর মুখখানি এক অদ্ভুত হাস্যে সমুজ্জ্বল। সকল অবিশ্বাসীরা এবার দেখুক! বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে অনেকেই তাঁকে বলেছিল যে ইওরোপীয় জল হাওয়া ভারতবাসীর সহ্য হয় না। সেখান থেকে কেউ বেঁচে ফেরে না, যেমন রামমোহন ফেরেননি।

দ্বারকানাথ হাত তুলে বললেন, আমি বেঁচে আছি।

(ক্রমশ)

ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা

কমলকুমার মজুমদার

মাধবায় নমঃ জয় রামকৃষ্ণ তারা ব্রহ্মময়ী। কম্পাস হইতে ঊনিশ শতকের বাষ্পশক্তি পশ্চিমকে বিশাল হইবার সাধ্য দিল, লৌহ যন্ত্র—ইস্পাত সভ্যতার রেখাপাত হইল। যখন, আমাদের পরিবর্তন সম্ভাবনা আসিল একটি যন্ত্রে, অবশ্য যাহা হস্তচালিত, যেটি কাঠের—আদতে ইহা অষ্টাদশ শতকের শেষে আসে—এবং এইটির দ্বারাই আমাদিগের বিগত শতাব্দী আশাতীত সম্ভ্রান্ত মর্য্যাদার হইল; ইহা মুদ্রণ যন্ত্র।

শ্রীপান্থ খুব অবাক চাতুর্য্যে, আমাদের এখানে মুদ্রণযন্ত্রের আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি—ও তাহা হইতে আমাদের মানসিকতা গঠনের সূত্র—যাবতীয় কথা গল্পের মত লিখিয়াছেন। অথচ বিষয়ের গুরুত্ব কোনরূপ অসতর্কতাক্রমে তিলমাত্র বিচালিত হয় নাই, বরং শুধু কয়েকটি পদে বিরাট ভাবনার সংকেত আছে। যেমন, "কল কথাটা ঈষৎ হাল্কা, প্রাচীনরা অতএব বলতেন যন্ত্র। গাম্ভীর্য ঐশ্বর্য মাহাত্ম্য সব যেন নিহিত ওই একটি শব্দে বিধৃত নূতন কালের নূতন তন্ত্রের বীজমন্ত্র বুঝি।"

সব যেন নিহিত ওই একটি শব্দে...।

এবং এই নির্দ্দেশতেই বাঙালী জাতীয় জীবনের বিবিধ পরিবর্ত্তনের ব্যাপার আমরা মনে করিয়া থাকি : 'সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে আমাকে বুঝাইয়া দাও' ইহা অল্পবয়সী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন; আশ্চর্য্য সেই ছাপার অক্ষরেতে লেখা ছিল, "ঈশা বাস্যমিদং...এক মহৎ ছন্দবন্ধ অনুভব, ও ইহাতে তিনি আদিষ্ট হইলেন, এবং ঠাকুরের ইচ্ছায়, তাঁহার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম ধর্ম্মরূপ ধারণ করিল। আবার দেখি : একবার মহাসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী, কোন জিজ্ঞাসুকে বলিলেন, দুই পয়সায় ভক্তি লাভ হয়,...উপহাস করি না...দুটি পয়সা দিয়া বটতলার ছাপার 'নরোত্তম দাসের প্রার্থনা' এনে কিছুকাল পড়ুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।" সুদুর্লভ ভক্তি লোকের হাতের কাছে আসিল।

এবং স্মরণে আসিবে, ডিরোজিও-র পারথেনন কাগজ, ইয়ং বেঙ্গল তৎসহ বিজাতীয় চরিত্রের প্রমত্ততা : রাজনারায়ণবাবু-তে আছে, 'যেদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহা সকল ছাপাইয়া গিয়াছিল অনেক প্রকৃত ধীর ঘটনা : ১৮২৩ খৃঃতে গৌড়ীয় সমাজের সভাতে রামকমল সেন প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার কথা বলিলেন; রামমোহন, তাঁহার ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনে, লিখিলেন, বিজিতদের ধর্ম্মকে নিপীড়ন করা হৃদয়হীনতা।

এবং মহামতি কেরীর বাঙলাভাষা লইয়া রাত্রদিন কত অধীরতা; টাইপ-কাটা মিস্ত্রি পঞ্চানন কর্ম্মকারকে লইয়া মহান কোলব্রুকের সহিত বাকবিতণ্ডা—এই ব্যাপার শ্রীপান্থ লিখিয়াছেন, "...শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কোলব্রুককে ধরে পড়লেন ...পঞ্চাননকে চাই।" কোলব্রুক রাজি হইলেন, তাহার পর দারুণ ঘটনা, "...কোলব্রুক অনেক চেষ্টা করলেন তাঁকে আটকে রাখতে..." এখানে আছে তিনি, "ভারত সরকারের কাছে আরজি পেশ করলেন..." শ্রীপান্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

নিশ্চয় আভাসিত হইবে, মহানুভব হেস্টিংসে, 'রাজনৈতিক জ্ঞান বা তথ্যাদি চাপিয়া রাখিবার—পূর্ব্বকার সরকার কৃত, নীতি কোনরূপ মান্য করিলেন না, তিনি দর্পন-কে সবরকম সাহায্য দিতে লাগিলেন।' এবং ১৮২৩, জন এ্যাডাম-এর প্রেস এ্যাক্ট লইয়া রামমোহন সুপ্রিম কোর্ট এবং দি কিং ইন কাউন্সিল-এর নিকট প্রতিবাদ দাখিল করিলেন। অনেক পরে, কবি কাশীপ্রসাদ তাঁহার, মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়া নামক সাপ্তাহিক বন্ধ রাখিলেন (১৫ই জুন—১৮৫৭)।

এখানে ছাপাখানার ব্যস্ততা লইয়া শ্রীপান্থ ভারী চমকপ্রদ বর্ণনা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন : '...সেখানে তুমি দেখবে ভারতীয়রা নানা ভাষায় শাস্ত্র অনুবাদ করছেন। অথবা প্রুফ সংশোধন করছেন।...ভারতীয় হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান কর্মীরা ব্যস্ত। তারা হরফ সাজাচ্ছেন, সংশোধন করছেন হরফ আবার খোপে খোপে রাখছেন...।' সতের শতকের ইউরোপীয় ছাপাখানার ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে যেন শ্রীরামপুরের বিবরণ।

বাঙালীর জাতির ইতিহাসে ছাপাখানার স্মৃতি ভরিয়া আছে; প্রতিভাবান রামকমল সেন, জীবন আরম্ভ করিলেন ডঃ হান্টারের প্রেসে; মহাত্মা শিশির ঘোষের কথা নবীন সেন হইতে জানিতে পারি— "অমৃতবাজার পত্রিকা, বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা। কাগজ কদর্য্য, ছাপা কদর্য্য, ভাষা কদর্য্য। শুনিলাম উহার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, কম্পোজিটার শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিন্টার শিশিরকুমার ঘোষ, এমন কি উহার প্রেস ও অক্ষর প্রস্তুতকারক পর্য্যন্ত শিশিরকুমার ঘোষ।' ছাপাখানা আমাদের এতই বাস্তবতা, অর্থাৎ জগৎ হইয়া উঠিল যে সাহিত্যেও তাহার প্রসার ঘটিল : নাটুকে রামনারায়ণ-এর 'নব নাটকে আছে, যে আশু চক্রবর্ত্তী তাহার মামা ন্যায়ভূষণের প্রেসে কম্পোজিটার ছিল এবং তাহার ৪ মাহিনা কাটা হয়।'

আর শ্রীপান্থের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফোর্টের প্রেসের বাঙলা, প্রচলিত 'যন্ত্র' শব্দটিকে মহাপণ্ডিতদেরও মান্য করিতে হইল : দেবেন্দ্রনাথ-এ আছে '...এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয় ও একটি পত্রিকা অতি আবশ্যক হইল।' এই সঙ্গে দেখি, বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন '...তর্কালংকারের উদ্যোগে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হইল...।'

এইভাবে ফোর্টের প্রেসের কিছু দেশীয় প্রচলিত শব্দগুলিকে একাধিক নজির আনিলেন—ইহা করিতে তাঁহার লেখা এক চমকপ্রদ খাত ধরিয়া চলিয়াছে : প্রথমে, ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই যন্ত্রটির, অর্থাৎ গুটেনবার্গ আবিষ্কৃত যাহা, আমাদের দেশে ব্যবহার প্রচলন এবং এই সংক্রান্ত তাঁহার পূর্ব্বকার লেখকদের কাজ হইতে পরে উদ্ধৃতি—যাহা তিনি নিজের বক্তব্যে সন্নিবেশিত না করিয়া—সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ৩৫-১২৫ পৃষ্ঠা অবধিতে স্থান দিয়াছেন; সেই সঙ্গে ঐ সকল তত্ত্ব কতখানি যথার্থ তাহা লইয়া কখনও তর্ক কোথাও বা অবিশ্বাস করিয়াছেন। যেখানে নিশ্চয়ই অনেকেই উদ্ধৃতি দিয়াই ক্ষান্ত হইত।

শ্রীপান্থকে ঐরূপ অধিকার আমাদের দিতেই হইবে, এ কারণ যে ছাপাখানার যাবতীয় কিছুর প্রতি নিখাদ ভালবাসা তাঁহাতে আছে; যাহা আগেকার অন্বেষণকারীদের প্রায় ছিল না; ইঁহারা টাইটেল পেইজ-এ আটক পড়িলেন, লেখক, স্থান কাল, লেখার বিষয় লইয়া যথেষ্ট তৎপর; সাট সরঞ্জাম যে বুদ্ধি বিচারের বস্তু তাহা গণ্য করিলেন না। শোনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়-এর যে এই ব্যাপারে উৎসাহ ছিল তাহাই শুধু টুকিয়া রাখিলেন। পঞ্চাননকে অবশ্য বিষয়ীকৃত করিলেন।

মার্শম্যান, ওয়ার্ড ইত্যাদি কোন সূত্রে বলিলেন না, স্যর চার্লস উইলকিন্স কৃত মহা পরিশ্রমের ফল সেই বিরাট টাইপ ফাউন্ড্রি গেল কোথায়; পরবর্ত্তীরা কেহই কাঠের স্ক্রু প্রেস, হইতে লোহের, ক্রমে ট্রেডল, ফ্ল্যাটবেড; ইহাদের ছাপার ক্ষমতা (স্ক্রু প্রেসে ঘণ্টায় ২৫০, তিনজন চালিত) কিরূপ, সাইজই বা কি ছিল—যদিও কোয়ার অফ ফালিও পোস্ট আছে—সঠিক তাহা খোঁজ করিলেন না;

বটতলার পুরোনো কাঠখোদাই

কোথাও টাইপ ছাঁদ লইয়া পাকা বিচার (এমনও যে সুকুমার সেন স্বয়ং হয় নাই) [illegible] না। ব্রজেনবাবু আদি সকলেই 'প্রস্তর' শব্দটা সত্ত্বেও লিথো বলিতে পারিলেন না—পূর্ব্বে পাষান যন্ত্র কথাটার প্রচলন ছিল—পাথুরিয়া রাখিলেন, কোথাও বা সফ্ট মেটাল-এর আজব বাঙলা 'সহজ ধাতু' চালাইয়াছেন। সব থেকে বড় আশ্চর্য্যের কথা মহাত্মা হান্টার শিষ্য ত্রৈলোক্যবাবুর সিদ্ধান্তে, তিনি লিখিয়াছেন, লিথোতে পারসিক টান আদি (অর্থাৎ কলীগ্রাফি।) ভাল খেলিয়া থাকে তাই পশ্চিমে উহার চলন বেশী। —আমরা জানি, কলিকাতার হরফ ফাউন্ড্রীকৃত ঐ অঞ্চলে বাজার পায় নাই; আর বাঙলা টাইপ ১০/১০ই পয়েন্ট অজস্র এবং সস্তা, ফলে লিথোর কথা আসেই না। আবার যখন দেখি সজনীবাবু, স্যর চার্লস উইলকিন্স-কে 'ভারতের ক্যাক্সটন' বলিয়া ঘোষণা দিলেন —এহেন প্রেরণা আমরা ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৫০; হইতেও লাভ করিয়াছি; স্যর চার্লস-এর সহিত ক্যাক্সটন-কে তুলনায় আনা যায় না; ফুর্নিয়ে-র সংজ্ঞায় টাইপোগ্রাফার বলিতে যাহা বুঝায়, স্যর চার্লস তাহাই; ক্যাক্সটন হল্যান্ড হইতে একটি ছাপাখানা খরিদ করিয়া ১৪৭৮ লণ্ডনে লইয়া আসেন। অনুবাদক ও (ভূমিকা) লেখক হিসাবে আজও তাঁহার নাম আছে।

[illegible] পঞ্চানন [illegible]

শ্রীপান্থের অন্যতম বিরক্তি এই হয় যে, হালেদ তাঁহার সংগীত ভূমিকায় মধ্যে এতটুকু জায়গা উহাকে দেন নাই—আমরা জানি, বাঙলা টাইপ কাটিতে যদি সে হতে অন্যে কিছু করিত তাহা হইলে নির্ঘাত হালেদ তাহার নাম বাদ দিতেন না। শ্রীপান্থের বিরক্তি আছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পঞ্চাননকে প্রতিষ্ঠিত করা নিমিত্ত উচ্ছ্বাস তাহাতে নাই; তাই লক্ষ্য করা যায় যে পূর্বগামী মন্তব্য তিনি গ্রহণ করিলেন না: "এই হরফ যে পঞ্চাননই তৈরী করেছিলেন...তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই...সজনী দাস উদ্ধৃতি দিয়েছেন এই যা..."

এবং বহুস্থানে তিনি নিজ মত প্রকাশে দ্বিধা করিলেন না, যেমন, '...আপজন-এর ছাপা বাংলা বইটির হরফ কিন্তু মোটেই ভাল নয়...।' কখনও বা একমত হইয়াছেন যেমন, '...কাঠের হরফ সম্পর্কে আমরা সজনী দাসকে পুরোপুরি সমর্থন করি...' অনেক পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, "...গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল..." এখানে বলা যায় নবীন সেন-এ'তে আছে: "...কাগজখানির নামটি যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় তাহার অক্ষর লোকের বিশ্বাস, লাউ কাটিয়া, কি কাষ্ঠ কাটিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন শিশিরকুমার ঘোষ। পূর্ব্বউক্ত বিশ্বাস অনেকটা এই জাতের। এবং শ্রীপান্থর অধিকার এই জন্য যে, "অধরের টাইপ ফাউণ্ড্রিটি আমরাও দেখেছি, ...এটি পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত এমন বলা যায় না।" যে, অর্থাৎ যে পঞ্চানন উইলকিন্স-এর কাছে কাজ করিয়াছিল।

আমরা প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় মনোভাবসম্পন্ন যে বাঙলা সব বিষয়ে প্রথম স্থানে আছে কিম্বা নাই। এখন যখন পড়ি উইলকিন্স নির্ম্মিত বাঙলা মুভএবল অক্ষরই যাহাতে হালেদ-এর গ্রামার ছাপা হইল, তাহাই দেশীয় ভাষার মধ্যে সর্ব্ব "প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়।" আমরা গর্ব্বিত হই। অবশ্য গোয়ার জেসুইটরা রোমান হরফে কোনকানি ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশের সংগে (?) ইহা ষোড়শ শতকে, তামিল অক্ষর কাটাইয়া (মালবার-তামিল)—মুভএবল টাইপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন —কিন্তু কোন নিদর্শন তাহার নাই—ইহা লিখিত আছে।

যদিও তাহাদের কৃত রোমান অক্ষরে ছাপা বই আছে। যেমন বাঙলাভাষার রোমান অক্ষরে কয়েকটি বই-এর নাম শ্রীপান্থ করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলাদেশে রোমান অক্ষরের বিশেষ ক্ষমতার প্রতি ঔৎসুক্য অনেক লোকের ছিল; শ্রীপান্থ লিখিত 'শোভাবাজারস্থ রোমানাইজিং' এবং বিতর্কের কথা আমরা বলিতেছি না, আমাদের বক্তব্য এই যে, রোমান অক্ষরে আমরা যখন নাম ইত্যাদি লিখিয়া থাকি, ছেলেমানুষ মেয়েরা বন্ধুকে যখন ইতির পরিবর্তে E T ৮০ লেখে, যখন পরশুরাম উচিত স্বর প্রকাশে Zাস্তি অর্থাৎ Z ব্যবহার করিয়াছেন (এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যদি বলি মহর্ষির আত্মজীবনীতে দিবানে হাফি অর্থাৎ দেবনাগরী ব্যবহৃত আছে)—হঠাৎ এসময় খবর আসিল কেমাল আতাতুর্ক, তাহাদের ভাষা রোমান অক্ষরে প্রকাশ হুকুম দিয়াছেন; তখনই একদল রব তুলিল আবার যে বাঙলার নিমিত্ত রোমান অক্ষর বহুত লাগসই হইবে; সুনীতিবাবু যোগেশবাবু (!) ইঁহারা নিশ্চয়ই মন্তব্য করিয়াছিলেন। অনেক তর্ক হয়; যে বাঙলা বড় জটিল, রোমান অক্ষর খুব কাজের। এমনই নির্ঘাত, অষ্টাদশ শতকে সুদূর চট্টগ্রামের কিছু বিদগ্ধ লোকও জটিল রূপে বাঙলার অক্ষরগুলিকে ভাবিয়াছিলেন, এবং তাহারা পারস্যো-আরেবিক অক্ষরে বেশ কিছু রচনা লিখিয়াছেন—(মুন্সী আবদুল করিম বিশারদ সংগৃহীত পুঁথি)।

কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের যে, যে মহান ইংরাজ ভদ্রলোকেরা অদ্য বাঙলা ভাষাকে পৃথিবীর একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠ ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করণে দারুণ পরিশ্রম করিলেন। অথচ তখন বাঙলাভাষার কি বা আদাড়ে গঠনই না ছিল! লিখিত গদ্য গ্রন্থ নাই, অদ্ভুত নৈনেত্তর অবস্থা। সুকুমার সেন মহাশয় হালেদ-এর ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন: '...এখানে একথা বলা বাহুল্য বোধ না হইতে পারে যে বাঙলা দেশের খাঁটি ভাষা এ রাজ্যের বর্তমান খিচুড়ী ভাষা (জার্গন) হইতে বোধব্য নয়। এদেশে বহু রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে, তাহার ফলে ভাষার সরলতা অনেক ক্ষুন্ন হইয়াছে; এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন আচারের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংগে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাষা ব্যবহার থাকায় বাঙালীর কানে বিদেশী শব্দ সহিয়া গিয়াছে...।

এখন, এই ভাষাকে বিশুদ্ধ রূপে দিবার উদ্দেশ্য অথচ 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং...' অথচ তখন ফারসী ছিল—রাজকার্য্যের ভাষা, যাহা, ১৮৩০ খৃঃ অবধি চলিয়াছে—(উর্দ্দু ছিল ও হিন্দি ছিল) কিন্তু মহৎ হেস্টিংস-এর ইচ্ছাতে এই ভাষার কাজ শুরু হইল; এবং কিন্তু ইঁহাদের কাছে বাঙলা অক্ষরসমূহ ভারী জটিল ইহা প্রতীয়মান হয় নাই,—যেহেতু সংস্কৃতর (দেবনাগরী) সহিত পরিচয় ছিল, নিশ্চয়। পরে কোলব্রুক মন্তব্য করিয়াছিলেন: বাঙলা অক্ষর খুব জলদিতে লিখিবার কারণে আদভাঙা দেবনাগরী ছাড়া আর কিছু নহে..."

এবং দেখিব হালেদ, শ্রীপান্থের উল্লেখ অনুযায়ী, 'তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় উইলকিনস-এর কৃতিত্ব সম্পর্কে লিখেছেন: "...এই বইখানির মনোহর সুন্দর অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই সকলকেই দারুণভাবে আকৃষ্ট করিবে...। ...যাহারাই (বাঙলা অক্ষরগুলির) কুট ছিটকান টান, অক্ষরগুলির অসম ছোট বড় আড়া, উহাদের রকমারি স্থিতি ও যুক্ত মিশ্রণ চেহারা বুঝিয়া খতাইয়া দেখিবেন, তাহাদের তখনই স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙলা অক্ষর ইস্পাতে অনুলিপি করা কি পর্যন্ত দিগদারী ব্যাপার।" (মোট কথা এই—আদত উদ্ধৃতি ইংরাজিতে আছে)।

ইতঃপূর্ব্বে এই বাঙলা মুভএবল টাইপ করা জন্য হালেদ অবুত চেষ্টা করিলেন; তিনি বোল্টসকে লিখিলেন: ইনি সেই বোল্টস, যিনি ১৭৬৮ খৃঃ, এখানে যখন, কাউন্সিল হাউস-এর দরজাতে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন, যাহাতে ছিল, প্রথমে এই যে, (মর্মার্থ) "এই শহরে একটি ছাপাখানার একান্ত প্রয়োজন, যাহা না থাকাতে ব্যবসাদি ব্যাপারে দারুণ অসুবিধা হইতেছে সেই সংগে এবং ইহাও যে, যে তত্ত্ব বিষয়গুলি প্রত্যেক বৃটিশ প্রজার নিকট যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ

[illegible] ... হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ঐ বিজ্ঞপ্তির [illegible], আমাদের বইতে উদ্ধৃত আছে : তাহাতে বোল্টস ছাপাখানার জন্য সকল রকম সাহায্য দিতে আগ্রহী আছে। এখন, এত সকল কথার উত্থাপন করা এই নিমিত্ত যে, যদিও বিজ্ঞপ্তিতে ভাষা সম্পর্কে কোন উল্লেখই নাই, তথাপি লোকের মনে হইতে পারে যে বোল্টস বাঙলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিতে নিশ্চয়ই উৎসাহী ছিলেন, অবশ্য এইরূপ ধারণার কারণ হিসাবে বলা যায় যেহেতু এই বোল্টস ভদ্রলোক হালেদ-এর অনুরোধে বাঙলা মুদ্রণের টাইপ তৈয়ারী করাইবার চেষ্টা লণ্ডনে করিয়াছিলেন। ইহারই জের।

এবং লণ্ডনের খুব নামজাদা কোম্পানী বাঙলা টাইপসাট করিবার কাজ হাতেও লইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, ইহা ঐ "কারখানার ১৭৭৩ সনের একটি হরফ তালিকার অন্য হরফের সঙ্গে 'মডার্ণ স্যাংস্কৃট' বা বাংলা হরফেরও উল্লেখ আছে"—দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কাজ না করার হেতু, অমন হাতযশওয়ালা কোম্পানীর দিক হইতে, অনেকবিধ হইতে পারে; তবে আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে—বিশেষত পাশ্চাত্য দেশের বাঙলা অক্ষর অনুলিপির চেষ্টা, যাহার ছবি এখানে আছে, দেখিয়া—যে আসলে কেমন ধারা হস্তলিপি ধরিয়া তাঁহারা কাজ শুরু করিলেন।

এই দিক দিয়া হালেদ ও উইলকিন্স-এর ভাগ্য খুব ভাল; ঐ বিখ্যাত গ্রামার বইখানিতে বাঙলা অক্ষর, কেন না বইটি ইংরাজী বাংলা মিশ্রিত, লিপিকার খুশমৎ মুন্সীর হস্তাক্ষর; এবং ইহা হইতে, বহুকাল যাবৎ প্রচলিত একটি ভদ্রবৃত্তি, লিপি কার্য্য করা, তাহা চিরতরে বন্ধ হইয়া যাওয়ার এই সূচনা হইল। আমাদের এই সূত্রে মনে পড়ে কত শত সন্ন্যাসী শ্রমণ লিপি কার্য্য করিয়াছেন—এই বিষয়ে মহান শিল্পী নন্দলালবাবুর এক ছবি আছে—মহাপ্রভু লিখিতেছেন (শ্রীচৈতন্য টোল)।

মহাপ্রভু চমৎকার হস্তাক্ষরের খুব কাঙাল ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ১ প ইহা আছে যে, রূপ গোস্বামীর হস্তাক্ষর তাঁহারে মুগ্ধ করিল শ্রীরূপ গোস্বামী কবি, একবার—

তাল পত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিল।

ভক্তবৎসল প্রভু,

কাঁহা পুঁথি লিখ বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখ হৈল॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি
প্রীতি হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লেখা সম্পর্কে অনেক পড়ি; ঠাকুর রামকৃষ্ণর হস্তাক্ষর ভারী সুন্দর শ্রীযুক্ত ছিল। সন্তোষ বলিয়াছে, ঠাকুরের লেখা বেশ কিছু কাগজ বেলুড়ে আছে। ছবির মত করিয়া লেখা বাঙলার লিপিকারদের খুব যত্ন ছিল, লেখার সেই মন ইদানীং আর থাকার কথা নহে। এই ভাবনার শেষ হইয়াছে সেই বিরাট বাঙালী রবি ঠাকুরের মধ্যে; পাঠক, আমরা এহেন মানুষকে লিখিতে দেখিয়াছি! তদীয় টান ছাঁদ, দারুণ চাতুর্য্যমণ্ডিত লেখা দেখবার!

এখন সেই বনেদী রোখটান, দলিলাদি লিখনে এবং জাবেদা রোকড় ইত্যাদি খেরোর খাতায় শুধুমাত্র রহিয়া গিয়াছে—এই লহরাচাল হাত এবং কলমের নকাশীছাঁদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; এই কলম বিষয়ে, হিন্দু উচ্চবর্ণদের গার্হস্থ্যাশ্রমও অতীব সচেতন, দানপত্রে, চিঠি লেখাতে, যে ছিল, সে খবর আছে। আর এমনিতে তখনকার দিনে দেশাচার ত বটেই, এতদ্ব্যতীত দশকর্ম্মা বিধিতে কলম, বলিতে যাহা বুঝায়, একটি খুব প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল।

এমন যে আঁতুড়েতে দোয়াত কলম রাখা হইত বিধাতাপুরুষের জন্য, ইনি নিস্তব্ধ রাত্রে আসিয়া, নবজাতকের কপালে ভবিতব্য লিখিবেন। ...পাঁচদিন গত হইলে ষষ্ঠীর রাত্র। আমাদের দেশে ষষ্ঠীর রাত্রকে ছয় কুলার রাত্র কহে। প্রবাদ আছে বিধাতা পুরুষ জাত-ঘরে আসিয়া শিশুর কপালে যা লিখিয়া যান তাহাই শিশুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, কর্ম্মফল সেই ফলই আজীবন ভোগ করিতে হইবে। আর সেই রাত্র বড় সাবধান সতর্কের রাত্র। পেঁচপাঁচির অরি আবদার বেজায় রোখ। সেই রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে ভাল কলম, দোত কালি, সাদা কাগজ, একখানা কলম কাটা ছুরি এই কয়েকটি জিনিস অগ্রে যত্নপূর্ব্বক এক পাত্রে করিয়া উচ্চ কোন স্থানে রাখা হয়—৭৪ পৃ আমার জীবনী|মীর মশাররফ হোসেন। জাতকের ভাতের সময় পরমায় যেমত হইবেই তেমনই, একটি রূপার কাজ করা রেকাবী থাকেই যাহাতে, ধানা দুর্ব্বা, গিনি বা মোহর, এবং কলম (দোয়াতও) রাখার বিধি আছে। সরস্বতী পূজাতে থাক কলমীর কলম লাগিয়া থাকে।

প্রাণতোষিণীতন্ত্রে নানা জিনিষের তৈয়ারী কলমের উল্লেখ দেখিব এবং সেই-গুলি ব্যবহারে কি ফল হয় তাহাও আছে : যে জন, বাঁশের কলমে লিখিবে তাহার দুঃখ ঘুচিবে না; তামার কলমে অক্ষর সমৃদ্ধির অধিকারী হয়; সোনার কলমে শ্রীসৌভাগ্য। ব্রাহ্মণগণ নলের কলমে লিখিবে, ইহাতে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়; সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা, আকৃতি উৎকীর্ণ কাঠের কলম ব্যবহারে, পুত্র-প্রপৌত্র ও ধন সমাগম হইবে; পিতলের কলমে সৌভাগ্য, কিন্তু কাঁসের কলমে নির্ঘাত মৃত্যু। প্রতি কলম আট বা দশ আঙুল লম্বা হওয়া উচিত; যদিস্যাৎ কেহ চারি আঙুল লম্বা কলমেতে লিখে, তবে সে যত অক্ষর লিখিবে, ঠিক ততদিন, তাহার আয়ু হইতে কম প্রাপ্ত হইবে।

আগেকার লিপিকারগণ নিজ ব্যবহার নিমিত্ত কালি ও কলম প্রস্তুত করিত; ইংরাজ আমলে সেই ভাবনা প্রায় আর কাহারও ছিল না—ইংলণ্ড হইতে লিখিবার সরঞ্জামাদি আসিত—যে দুয়েকজনের, গত শতকে ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ভূদেববাবুর কথাই সর্ব্বপ্রথম আসে; ইহা এম এন ঘোষের বয়কট আন্দোলন প্রবর্ত্তনের বহু আগে; ভূদেববাবু ইংরাজের কিছু সহিতে পারিতেন না—অথচ ইঁহার সম্পর্কে এহেন রহস্য ছিল, যে, Bhudev with his C.I.E. and 1000 per month is still anti- British [illegible] লিখিলেন ভূদেব যে কিরূপ স্বদেশ বৎসল ছিলেন, তাঁহার [illegible] দিতে ইচ্ছা করি, বাড়ীতে স্বদেশী যুগের পূর্ব্বে স্বদেশজাত [illegible] হইত, এমন কি স্টীলের পেনের পরিবর্তে বাড়ীতে প্রস্তুত টিনের ও [illegible] সকলকে লিখিতে দেখিয়াছি।'

আমরা জানি, শরের কলম তৈয়ারী করা খুব সাদা ব্যাপার কিন্তু টিনের নিব হাতে করিয়া বিলাতি নিবের মত বানান দারুণ পরিশ্রমসাধ্য, কারণ এইগুলি ভারী চোখা হইত, এতই তাহা যে—ইহা লিখিত আছে, প্রসিদ্ধ লেখক ত্রৈলোক্য মুখুজ্জে ইনি স্টীলের কলম ও 'জি' নিব ব্যবহার করিতেন (তখন মান্নান ছাঁদের নিব ছিল) তাঁহার লিখিবার সময়ে একবার ঝড় আসার দরুণ তিনি কলম হাতেই জানলা বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন তখন হঠাৎ অসাবধানতাবশত কলমের নিবটি দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার বুকে মরাত্মকভাবে ফুটিয়া যায়। এই ক্ষতে তাঁহাকে বারো বছর ভুগিতে হয়।

এখন সাবেক কলমে দলিল ও খাতা লিখনে—এবং এই বিংশ শতকের গোড়ার অনেকদিন পর্য্যন্ত কালীঘাটের রেখাঙ্কিত পটেতে, ব্যবহৃত হইতেছিল; ইহা ছাড়া আর উহার প্রয়োজন রহিল না। তবে লিপিচাতুর্য্য পঞ্চানন লেখার কৌশলে, এখন ভারী নিষ্ঠার সহিত, টাইপকারিগরিকে অভাবনীয় নিখুঁততার দিকে চালিত করিল; এই বিষয় যে, '...দেওয়ালে ইষ্ট দেবতার ছবি ঝুলিয়ে অনোহর মেঝের বসে হরফের ছাঁচ তৈরি করছেন, কিংবা বাইবেল ছাপবার হরফ। এই কয়েক ছত্রে শ্রীপান্থ আমাদের গর্ব্বিত করিলেন। তখনকার দিনে, আরও বহুজন যে টাইপকাটা লইয়া চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন সকল এই বইটির একাধিক ছবিতে আছে। ইহা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।

ইতিপূর্ব্বেতে আমরা কখনও এক সঙ্গে—যাহা এখানে প্রকাশিত আছে—এতগুলি, প্রথম দিককার বিভিন্ন সময়ের মুদ্রিত বইয়ের পাতার ছবি দেখি নাই; ইহাতে মুদ্রণ উৎসাহীদের যে জ্ঞান—যে ধারণা দূরীকৃত হইল তাহা অপ্রত্যাশিত। এবং তৎসহ এই সত্য যে, সংস্কৃতর আটক উজাইয়া বাঙলায় চর্চ্চা—ইংরাজীকে ধরিতে হইবে আরম্ভিল।

যদিও জানি, শ্রীপান্থ ইংরাজী চর্চ্চা লইয়া তামাসা করিয়াছেন : "প্রকৃতের কাছাকাছি পোঁছিবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পথ খুঁজছেন।" এই বেচারাদের সঙ্গে কি আমরা রামমোহন, রাজা স্যর রাধাকান্ত, রামকমল মহাশয়দের গণিব; আ এক কথা যে, যোগেনবাবু সেদিন এমন আক্ষেপ করিলেন, 'বাঙালী মুন্সী রাখি মগবাহার পড়িবে, ইংরাজীনবীশ-এর নিকট 'চাপর' পড়িবে...।' মুসলমান ফারসী শিখিল, আর ইংরাজীতে দোষ! উচ্চবর্ণের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পথ ত উহাই ছিল। কেদারবাবুতে আছে, কোন এক পশ্চিমের ইষ্টিশানে গাড়ী কামরা হইতে কয়েক ছোকরাকে, চুলের ছাঁটা যে কলিকাতায় তাহা দেখিয়া, আমন্ত্রণ হয়, এবং যাহারা বড় হাতের এ বি সি লিখিতে পারে তাহাদের একদিকে, ছোট হাতের আর দিকে—দাঁড় করাইয়া বড়হাতের লেখা জানা ৩০ আর ছোটহাতের ৬০ টাকা বেতনে কাজের কথা পাড়া হইল!

শুধু এই সকল শিক্ষাআগ্রহীদের জন্যই বইয়ের প্রকাশ এমত নহে, রকমারি বই পাঠকদের বিস্মিত করিতেছিল; তখন এখানে প্রেস অনেক কয়েটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যেহেতু টাইপের অভাব নাই, কোন ফাউণ্ড্রীই বাংলা টাইপ সাট অক্ষর বলিয়া বাদ দিতে পারে নাই,—এই সূত্রে শ্রীপান্থ তুলনা করিয়াছেন : "...লাতিনে সাকুল্যে অক্ষর সংখ্যা ২৬টি অথচ অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় যুক্তাক্ষর ইত্যাদি নিয়ে কমপক্ষে ৬০০ হরফ। হাতে সাজিয়ে বই ছাপতে গেলে বাংলায় কমপক্ষে চাই ৩৭০টি। একটি ডবল কেস বোঝাই রোমান হরফ হলে দিব্যি ইংরাজী বই ছাপা চলে।" ইহা চমৎকারভাবে শ্রীপান্থ উত্থাপন করিলেন। এখানে আমাদের কাছে কিছু ফাঁক থাকে, যথা গ্রন্থটির আকার এবং টাইপের পয়েন্ট—ইহা জানান ভাল ছিল।

তবে আমাদের জন্য ওজনও দিলে ভাল হইত, এবং আর একটি কথা বলাতে নিশ্চয় দোষ হইবে না যে, যদিও শেষে রোমান হরফ এবং ডবল কেস—অর্থাৎ আপার ও লোয়ার—আছে; তবে দুই এক লাইন আগে 'লাতিনে সাকুল্যে ২৬টি' হঠাৎ ইহা কেন বুঝিলাম না, এবং সেখানেও বড় হাতের ছোট হাতের আছে, এতদ্ব্যতীত এ-ঈ আর ও-ঈ ইত্যাদি ডিপথং বা লিগাটিউর এবং এ্যাকসেণ্ট যুক্তও আছে। এখন কাজের কথা এই যে, বাঙলায় বিলাজ টাইপকে—৫০৭ বা ৫১০টি ও সাটে খোপ ৫৬৪টি (?)—এক এক টাইপ মিস্ত্রী বিভিন্ন ছাঁদের গড়ন দিল।

এইরূপ ছাঁদ, অক্ষর সমূহে করিতে ঐ সকল কারিগরদিগের অতীব সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কৃত মন্তব্য যে, "রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯ সালের লেখা একখানি বৌদ্ধপুঁথি সকলের চেয়ে পুরাণ...রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময় এখনও সূক্ষ্ম করিয়া বলা যায় না তবে একথা ঠিক যে তিনি ১০ ও ১১ শতকের সন্ধিস্থলে বাংগালায় রাজত্ব করিয়া-ছিলেন।...এই পুঁথিখানির অক্ষরের টান প্রায়ই এখনকার অক্ষরের মত...।" তবে, অতএব কারিগরদের এমন কি ভাবনায় পড়িতে হইল, ইহা অনেকে বলিবেন।

ঐটুকু আকারে অক্ষরের দারুণ স্বতন্ত্র চরিত্র বজায় রাখিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারা বড় কঠিন কাজ। এখানে আমরা পড়িলাম ছেনি তৈয়ারী লইয়া উইলকিন্সকে কি অবর্ণনীয় পরিশ্রমই না করিতে হইল, তাহার পর তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে কি বা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, উইলকিন্স-এর অক্ষররাজি যদি দেখি, তবে নিশ্চয় তাহার কয়েকটি অক্ষর—এখানে যেমন আছে—আমাদের বিশেষ ধন্দে ফেলিয়া থাকে।

যেমন, ক থাকিতেও 'ঠাকুর বা কুরুবীর'-এর 'ক' অনেকটা টানা লেখা হ্রস্ব উকার যেমন, শুধু এখানেই নহে ঐ ছাঁদ ১৭৮৫, ২১নং চিত্রেও দেখা যায়।'

আবার ঙ্গ-এ এখানে ঙ-গ এর মতন (ইহা কি আমাদের উচ্চারণ ধরিয়া গঠিত —'আংগা' তু স্থানে ওমি এবং সোমদত্ত-র ক্ষেত্রে ত্ত-ত্ত যত্ন। ক্ষ-এ ক্রটকী নাই হ্যালহেডজেন্টী-তে ক্ষ্য. অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে বিরাট পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মি ঐ ক্ষটি ব্যবহার করিয়াছেন (১৮৫১) বিবিধার্থ সংগ্রহ।—ইহা নিশ্চয়ই প্রচলি ছিল।

এবং কেরী আদি বহু মিশনারীদের চেষ্টাতে উনিশ শতকের প্রথম হইতে টাইপে ফের দেখা দিল; এখানে বিশেষভাবে নাম করা যায় পীয়ার্স-এর, শ্রীপা বলিয়াছেন, '...আজকের খুঁত ধরা দর্শকও বোধ হয় এক কথায় নাকচ করে দি পারবেন না পীয়ার্স সাহেবের সেই অভিনব বাংলা হরফ।' এই ছাঁদ নিঃসন্দেহে অভিনব—ইটালিক-এর মত। এই কল্পনার মাত্রা পাঠক সকলের দৃষ্টি আকর্ষ করিবে; আমরা জানি না ইহা কত পয়েন্টের টাইপ, এখানে, চিত্রতে, খু অপরিচ্ছন্ন দেখাইতেছে, এতদ্ব্যতীত দুয়েকটি অক্ষর যেমন, দ-ধ এর চেহার ঙ-গ আবার একই পাতাতে ঙ-গ এর চেহারা একই; অথচ 'জন্মান্ধ'র বেলাতে ন-ধ পরিষ্কার!

বাঙলা টাইপ চেহারা এক বিচিত্র উৎকর্ষের দিকে মুখিয়া চলিতে লাগিল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "...ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা পশ্চিমের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। আর দেশের লোকে (অর্থাৎ বৌদ্ধেরা) দেশের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই দুইয়ের লড়াইয়ে দেশের লোকে অর্থাৎ বৌদ্ধেরা জয়লাভ করিল। তেকোণা অক্ষর চলিয়া গেল।'

কোন এক সময়ে আমাদের লেখা এক বিশেষ ধরণকে মান্য করিল; কিন্তু এখনও তাহার স্বতন্ত্র ছাঁদ হারাইল না; এবার, অক্ষরের চেহারাতে আর এক পরিবর্ত্তন ঘটিল, শ্রীপান্থের উক্তিতে '...ব্যক্তি বিশেষের হাতের লেখার আদলে কাটা হলেও যান্ত্রিক কারণে ও প্রয়োজনে চলনশীল ধাতব হরফ নৈর্ব্যক্তিক।'

এখানে এই নৈর্ব্যক্তিক শব্দ আমাদের সত্যিই বড় কষ্ট দিল; আমাদের, এমন যে, জীবনধারার অভিনব সংজ্ঞা উহাতে নিষ্পন্ন হইল! অবশ্য এই শব্দটিকে কাটিতে পারেন ইহা বলিয়া যে অমন ত অনেক যন্ত্র আছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, '...যখন চীনজাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষর-লিপির দাবী মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে...জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল এক উপায় বেরিয়েছে, তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটরের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।' তথাপি মানিতে হইবে, সাধারণভাবে শ্রীপান্থের সিদ্ধান্তই ঠিক।

'যন্ত্রসভ্যতার বৈশিষ্ট্য যে ইউনিফর্মিটি আর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন তাই প্রতি-ফলিত হরফগুলির উদ্যোগ আর তার ফলাফলে।' এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অর্থাৎ প্রথম দিকের চেষ্টাতে যাহা তাহার চমৎকারিত্ব আমাদের গর্ব্বিত করে. আমরা হাতে লেখা হইতে বিশেষ কিছু এখানে বাদ দেখি না। বাঙলা বর্ণমালা খতাইলে বুঝিব, বিবিধ আকৃতি খুব মনোরমত্ব বুনিধতে গঠিত—এই দেশীয় অর পাঁচটা ভাষার অক্ষর লইয়া যদি তুলনা করি, দেখিব আমাদের কথা বৃথা নহে। এই সূত্রে আমরা যদি ইংরাজ আমলের প্রমিসরী নোট দেখি তাহা হইলে নিশ্চিত হইব—এবং সেই সুঠাম মনোজ্ঞতার কিছুই খোয় যায় নাই।

এখন, যদিও আমরা পরিচ্ছন্ন লেখার প্রশংসা করি '...ভাল হাতের লেখাকে আমরা আজ বলি যেন ছাপার হরফ।' ইহা 'আজ' নহে, লিখিত আছে, '...কেশব কয়েকটি প্রার্থনা স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, মা তুমি প্রতিদিন ইহা পাঠ করিও। ঐ কাগজ জননীর গৃহভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়া দিয়া-ছিলেন, হাতের লেখাগুলি এমনি সুন্দর যেন ছাপার অক্ষর।' তবে ছাপার অক্ষর বলিলেও, লেখা কথাটা লুপ্ত হয় নাই। ছাপাকে আমরা লেখা বলিয়া থাকি।

'এই ছাপার অক্ষর কত যে সুন্দর তাহা তখনকার বই-এর পাতার ছবিতে প্রমাণ হয়; সব থেকে একটি বই আমাদের আকর্ষণ করে, ইহা ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবত', এই গ্রন্থের আকার কল্পনা প্রতিটি জনকে—যাহারা গ্রন্থ আকার ও সজ্জা লইয়া চর্চা করেন—তাহাদের অবাক করিবে; ভবানীবাবু নিজস্ব, দেশজ, রুচি কাজে লাগাইতে কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধা করেন নাই—এখানেতে আমরা বাঙালীর দিব্য শিল্পবোধের দারুণ প্রমাণ পাইয়া থাকি।

ঐ বইটিতে টাইপ সাজান বড় পরিপাটি; শুধু যে এখানেই খুব বাঁধিতে সবকিছু ঘটান হইল এমত নহে; সেহেতু এবং তাহার অনেকদিন পরেও ঐ ধারা বহিয়া চলিল—তবে শ্রীমদ্ভাগবত-এর সহিত 'ডোর পাটা' মলাটের বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অতএব পুঁথির সব কিছুই ঐটিতে রহিল—তবে এইগুলি একপাশে বাঁধান—যেমন অদ্যও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পাঁচালী ইত্যাদিতে দেখিয়া থাকি।

অনেকেই নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন এমন অনেক মুসলমানদের বই বাঙলাতে আছে যাহার পাতা আমাদের বিপরীত দিক ধরিয়া শুরু হইয়াছে। হিন্দুর পুঁথি মুসলমানদের বাঁদিক ব্যবহার, আমাদের স্বীয় ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস দিয়াছে ইহার পর ডিলুক্স, রাজ সংস্করণ, শোভন সংস্করণ—বিলাতি সাজ সরঞ্জামে ও জিনিষে, তাহা, ভারী সৌখীন চেহারা, গ্রন্থাদি, ধারণ করিত। তখন অনেক বইতে ছবিও ছিল, যেমন পদ্যাবলী, ইহা মহাপ্রতিভাবান লসন-এর আঁকা ছবি সম্বলিত।

শ্রীপান্থ লসন বিষয়ে বিরল ৫২নং নোটের, এবং সমস্ত, তর্ক ছুট রহিয়াছে; প্রতি হাত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকেই ছবিবিষয়েও প্রমাণসিদ্ধ রূপে ধারণা করেন, আমরা এবিষয় কিছুই জানি না বলিয়া বুঝি না তাঁহার কোন জ্ঞান এবিষয় ছিল কি না। ৫২নং নোটে লেটার প্রেস ছাপাখানার কাজ, জোফানি-দের ছাপার পদ্ধতি কি এক, ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়! (যেমন ৫৯নং নোটে আরচার

আশ্চর্য্য করে।) আমাদের ধারণা লন্ডনকে তুচ্ছ করা সঙ্গত নহে।

ছবি সূত্রে এখানেতে আর একটি উদ্ধৃতি আছে, যে, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সম্পর্কে, যেমন '...ইন্টারন্যাশানাল রিপ্রোডাকশানস' আমায়ন করিল...' কিন্তু তাহা কেমন যাহা জানিতে খুবই উৎসুক শুধু হইলাম্ই কেন না এখানে ৪০নং ও ৪২নং চিত্র, ইহা সংপ্ত রাজপত্র, দুইটি এখানে হাফটোনে করা যদিও—হইতে 'সাকসেসফুল ম্যানার' যে কিরূপ তাহা বুঝা গেল না। (প্রকাশ থাক যে, এই সব কথা সেদিনকার)

প্রথম তারিখ হইতে একশত বছরের মধ্যে বিস্ময়কর, বই প্রকাশনা, উৎকর্ষ সংসাধিত হইল; বিবিধ বিষয়ে, বিবিধ ছাঁদ আকারে বই আমাদের ভাবধারাকে ছাইয়া ফেলিল, এই সূত্রে শ্রীপান্থ অনেক সংবাদ দিয়াছেন, কেহ চাঁদা লইয়া বই ছাপিতেছে,—কেহ বিনামূল্যে বই দিতেছে, কেহ বই বিক্রয়ের টাকাতে ধনী হইতেছে: ফেরিওয়ালা গলি ঘুরিয়া বই বেচিতেছে:—এমনকি গত শতকে মেয়ে ফেরিওয়ালার কথা স্বর্ণময়ী দেবীতে আমরা পড়িয়াছি, লিখিয়াছেন যে "মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস আষাঢ়ে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী ভরা পুতুল খেলনা বস্ত্রাদি থাকিত তেমনি সিন্ধুক বন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।"

সিন্দুক শব্দে আমরা আকৃষ্ট হইলাম—আমরা জানি যে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, দুর্লভ, সাবধানে রাখার, যাহা আনন্দের যাহা সম্ভ্রান্ত অভিজাত তাহাই মানুষ সযত্নে সিন্দুকে রাখিয়া থাকে। এখন পরোক্ষভাবে, বই সিন্দুকে রাখাতে, ইহাই স্বীকৃত হইল যে, বই সকল ঐ ঐ বিশেষত্ব লাভ করিল। এখন বইএর অন্য বিষয় ছাড়া শুধুমাত্র তাহার নির্ম্মাণ ব্যাপার লইয়াই আমাদের কথা—তখনকার দিনে, এমত যে সেদিন পর্য্যন্ত ঐগুলির গঠন কতখানি নয়নাভিরাম হইত তাহা বলা যায় না।

এমন কি সেগুলির যাহা শহরে ব্যাপারীরা প্রকাশক হইতে খরিদ করত, হাটে বা তীর্থে—বাস তেল এবং এটা সেটা উপহার সহ—বিক্রয় করিত, তাহাদের চেহারাও ভারী বাবু। টাইটেল পেজ—ইংরাজী বাংলাতে লেখা, চারিদিকে খাসা লতা আকড়ি দিয়া চকমিলান করা; পাঠ্যর আদি অক্ষর খুবই কেয়ারি করা—পাতাগুলি সতর্কতার সহিত ছাপা।

তখন, আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় লেখকরা পরিপাটি ছাপা পছন্দ করিতেন, যেমন বঙ্কিমবাবু: "...একদিন রাজসংস্করণের 'সাহিত্য' লইয়া বঙ্কিমবাবুকে দিতে যাই। বঙ্কিমবাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন, সাহিত্যখানি তুলিয়া বলিলেন দিব্য Get up হইয়াছে। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে...।"

শুধু তাঁহারাই নহেন, ছাপা বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থরাও খুব মন দিতেন: বিদেশ হইতে বিবাহতে পদ্য লেখার হাওয়া এদেশে আসিল—স্তাঁদাল লিখিত উপন্যাসের, লা সার্ত্র দা পারম-এ, প্রথম পাতাতেই এই খবর, পদ্য লেখার, আছে, আরও অনেক উল্লেখ অন্যত্রেও আছে। এখানে গৃহস্থরা পদ্য ছাপানতে খুবই মুখিয়া উঠিত; পাতাখানি, প্রজাপতি, হাতমিলন, কলাগাছ—বিবিধ মোটিফ দ্বারা বড় মনোহর করিয়া সাজান হইত। কাগজে আতরের ছোঁয়া থাকিত।

আমাদের বইএর মলাটে একমাত্র সোনালী জেল্লা ছাড়া—আর কিছু ছিল না। মলাটে ফের আসিল, এবং ডাস্ট কভারও। সব থেকে মারচস্ মলাট যাহা মনে আছে তাহা রাধারানী দেবীর 'সীঁথিমৌর' কবিতা পুস্তক; বিয়েতে যে সীঁথিমৌর দশকর্ম্ম ভাণ্ডারে পাওয়া যাইত—ইহা তাহাই। বাঁধানতে রবি ঠাকুর মহাশয়ের একখানি বই—ঠিক খেরোর খাতার মতন বাঁধান; আর ঐ বইতে পাতাগুলি ভাঁজ করিয়া, যেহেতু কাগজ পাতলা, অর্থাৎ ডবল করিয়া ছাপান ছিল (?), বই-এর আকার এতাবৎ ষোল পেইজই ক্রাউন ছিল, কচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যাইত—যথা হরিদাসের গুপ্তকথা ইত্যাদি—কিন্তু লড়াই-এর পর (২য় যুদ্ধ) 'দরবারী' বইটি বেওল পেইজ ডিমাই-তে ছাপা হইল। ইহার পর হইতে, রমাপদ চৌধুরীকৃত ঐটির, এখন সব বই ডিমাই আকারের হইয়া থাকে। ডাস্ট কভার আর নাই, মলাটকে চোখমোচড় দিবার প্রয়াস দেখা দিল; বিশেষত অক্ষর ছাঁদে।

দেখনাই অক্ষর হিসাবে—প্রথম হইতে কাঠের অক্ষরেতে নানান ছাঁদ আছে—রকমারি করার দিকে ঝোঁক পুনঃ দেখা গেল, ২০|৩০ দশকে; কোনটির ছাঁদ এত বুদ্ধিসম্মত যে তখনই মনে হইত, হায় যদি ইহার মত টাইপ মিলিত; অবশ্য ইহা আপশোষ নহে,—কেননা আমাদের যে টাইপ সম্ভার আছে তাহা গর্ব্বের বটে: তবে ঐ আশা যে আর এক রকম ফের হইত।

আমাদের এরূপ মনোভাব—অভিমান, কিন্তু শ্রীপান্থের মধ্যে নাই বলিব না, তবে যাহা আছে তাহার জোর তেমনধারা নাই। প্রথমেতে, তিনি বেশ জ্ঞাত করিলেন যে, "এই সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে বাংলা হরফের চেহারা নিয়ে। এখনও হচ্ছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার আদলেও তৈরী হয়েছে বাংলা হরফ। উদ্যোগী হরফ নির্মাতা অতএব একালেও আছেন। আমরা অন্তত একটি প্রতিষ্ঠানকে জানি, উনিশ শতকে যাত্রা শুরু করেও এখন যাঁরা প্রাণে ভগমগ—চতুর্থ পুরুষে পৌঁছেও নূতন নূতন হরফ সন্ধানে অব্যাহত যাদের সাধনা।"

এখানে এই জানিতে চাওয়া—যে সেই 'নূতন হরফ' বলিতে আমরা কি বুঝিব; তবে একথা ঠিক বিশেষত স্মল পাইকা লইয়া অনেক পরিশ্রম হইতেছে; ইহা ব্যতীত ফাউন্ড্রীওয়ালারা ধকল সই টাইপ করিতে—টিন এ্যনটিমনি, ও সীসা ইত্যাদি—সংমিশ্রণে—সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আর এক লক্ষ্য—ওজন কেমনে কমান যায়! ইদানীং দুরেকজন ফাউন্ড্রীওয়ালা, কিছু নূতন চেহারার টাইপ বাজারে এইগুলি সুঠাম দর্শন নহে। আমাদের অক্ষরের একটি নিজ চরিত্র আছে, ইহা মাত্রা ও কাটকীর গা ধরিয়া থাকে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত নামকরণ চেতন, (এ্যাসেন্ডার) লেজুড় (ডিসেন্ডার) যুতসই হইবে, এবং ভিৎ পঙক্তি বেশ জোরভাবে থাকে; এসকল গণ্য করত অক্ষর করা হয় নাই! ফলে উপর দিকটা ভারী হইল। তথাপি স্বীকার আমরা করিব যে, চেষ্টা চলিয়াছে, এবং যাহাকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু আমাদের মনে বড়ই এই মন্তব্য লাগে, যখন শ্রীপান্থ বলেন, "...চালু ফাউন্ড্রিগুলির নমুনা বইয়ের পাতা ওলটালে হঠাৎ মনে হতে পারে বাংলা হরফ বুঝিবা বৈচিত্র্যে আজও অতুলনীয়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমান হরফের নমুনাগুলোর ওপর চোখ বুলালে সে ভুল ভেঙ্গে যায়।...বাংলা হরফ শিল্পে একালে সত্যিকারের যুগান্তকারী ঘটনা বোধ হয় লাইনো এবং মনো টাইপের প্রচলন।"

এবং পরেই

মহাসমালোচক নরমান এলিস-এর আক্ষেপ:

India has no Bodoni, Garamond, Gill or other type designer of the West. India has the mechanical resources to print for her increasingly literate population—and no specifically Indians means to bridge up the gap between mechanics of printing and reader's mind.

শ্রীপান্থ ঐ অদ্ভুত উক্তিতে সায় দিয়াছেন। "তবু মনে হয় নরমান এলিস সাহেবের কথাই ঠিক।" এলিস-এর কথা যে কতখানি চাপল্য তাহা বিচার করিলে বুঝিব, তিনি এমন তিনজনের নাম করিলেন, যাহারা, বিশেষত প্রথমোক্ত দুজন

॥ দশম ইতিহাস ॥

এক সওদাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা কন্দর্পেতে অতি পীড়িতা হইয়া তোতার নিকটে বিদায় হইতে গমন করিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় সুবোধ জানিয়া প্রতি রাত্রেই তোমার সমীপে আসিতেছি তাহাতে যদি তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ না দিবা তবে আর কি দিবে এবং তুমি আমার সহকারিতা না করিলে আর কে করিবে। তোতা উত্তর করিলেক যে ও কর্ত্রী আমি তোমার এই বিষয়ের জন্যে এমত দুঃখী আছি তাহা কি কহিব যদি এ কার্য্য না হয় তবে যত দিন আমার প্রাণ থাকিবেক তত দিবস কদাচিত আমার চিত্তের দুঃখ যাইবে না অত এব শিঘ্র রাত্রিতে তোমাকে তোমার বন্ধুর স্থানে যাইতে কহি কিন্তু তুমি বিলম্ব কর আর আমার উপন্যাস শুনিয়া যাও না যদি

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লন্ডন রাজধানীতে ছাপা তোতা ইতিহাসের একটি পাতার অংশ

মার্ব্বেল নির্ম্মিত; গারামন্ড, ক্লোদ গারামাঁ—ফরাসী ষোড়শ শতকের; জিব বোডানি ইনি ইতালীয় ১৮১৩ মৃত্যু।—ইনি নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। এরিক গিল (১৯২০-৩০) তাঁহার পারপেটুয়া ও স্যানস সেরিফ সৃষ্টি করিলেন। ঐ মহানুভব চারশো বছর ঢুঁড়িয়া এ্যালায়েড এফর্টে—ইহা ইংরাজ সংস্কৃতি—বাঙলা টাইপকে নস্যাত্‌করিয়াছেন। বাঙলা অক্ষরের ন্যায় এত অসংখ্য ছাঁদ করিতে যে কোন চতুর টাইপোগ্রাফারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত;—প্রথমত, আমরা বলি, ইহার সমন্বয়, ব্যালেন্স আনিতে, ইহার হারমনি কল্পনা করিতে যে কোন তাত্ত্বিক (এসথেট) হিমসিম খাইত। নরমান এলিস নিশ্চয়ই এ বিষয় বালকমাত্র—আমরা যেমন!

এখানে ইহা খেয়াল রাখা দরকার, যে আমাদের বারো আনা লেটার প্রেসের কাজ ইংরাজী ভাষাতে রোমান অক্ষরে হইয়া থাকে—এমন কি সংস্কৃত প্রশ্নপত্র পর্য্যন্ত। শুধু বইএর জন্য কত টাইপ উদ্ভব হইবে এবং যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা অভাবনীয়! এতদ্ব্যতীত এক ফন্ট বাংলার ওজন কত তাহা বিচার করা উচিত!! এবং খরিদ্দারই বা কোথায়।

শ্রীপান্থ, লাইনো ও মনো টাইপ ব্যাপারে বলিয়াছেন '...সত্যিকারের যুগান্তকারী ঘটনা বোধহয়...' এই বাক্যে 'বোধ হয়' ব্যবহারে খুব যথাযথ হইল। একারণে যে তিনি মনে বিশ্বাস করেন যে বাঙলা অক্ষরমালা বিষয়ে—মুড এবেল টাইপ করা হইতে, অক্ষর সংস্কার—যাহা অভাবনীয় তাহা গত শতকেই ঘটিল। এখন আমরা বর্জইসে ৮ পয়েন্ট (?) চমৎকার পরিচ্ছন্ন রূপ পাইয়া থাকি (রোমান হরফে ৪½ পয়েন্ট পর্য্যন্ত নামিতে পারে!) অথচ কোথাও এতটুকু বৈলক্ষণ্য নাই; যুক্ত অক্ষরাদি বিস্ময়কর।

টাইপ কাটিয়েদিগের হাতযশ বুঝিব। প্রথমত বলা উচিত, যে আমাদের অক্ষরমালার যেমন ৯কার—একমাত্র ৯কার যেন ডিগবাজী খায়, আমরা পড়িয়া থাকি এবং সুভোবাবু তাঁহার এক কবিতায় নামকরণ করেন, '৯লা জিপসটিক' ইহা ব্যতীত বাঙলা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে থাকিতে পারে তবে উহা জানা আর আমাদের নাই। ঞ, পুরাতন বাঙলায়, আছে—ইদানীং শুধু যুক্ত অক্ষরে, তেমন ব—ক্বচিৎ।

বাঙলা অক্ষর চরিত্র, কিছু চক্রাকার, অধিকাংশ খাড়া রেখা ধরিয়া আছে। এই চক্রাক্ষর, স্বরবর্ণের, অনেক অক্ষরের মধ্যে নিজস্ব চেহারা হারাইয়া আর এক চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়, যেমন ই-ি, এ-ে ইত্যাদি; এবং উচ্চারণ স্থানের পূর্বেই অর্থাৎ যেমন 'কে' শব্দে-লিখিত হয় (উ, ঊ ঋ ৠ উচ্চারণ স্থান ঃ মাথাতে বসিলেও রেফ, অগে 'বিন্দু পরে)। চক্রাকার প্রায় কুঁড়িটির মতন। বাদ বাকি খাড়া রেখা ধরা। (অবশ্য অ, আ, এ ঐ ইত্যাদি খাড়া রেখা আছে) যাহার মধ্যে, পূর্ণ ডান দিকে, মাত্র চ ছ ট ঢ (ং ৎ) দ, ইত্যাদি আর বাম দিকে অনেক কয়েটি, ইহাদের মধ্যে পূর্ণত্রিকোণ, ব। মিশ্র-র, ধ, ক ঋ। আধা—ঘ য য়, ঘ ফ ম থ। খাড়া রেখা আঁকড়ান —গ প শ ণ ন ল স। চক্র—ঙ ড় ড ত ভ হ। রকমারি—ঞ জ ঠ ঃ ँ। (যুক্ত অক্ষর আলোচিত হইল না)

ইহা ব্যতীত মনে রাখিবার, বাহিরে এ কার, ও কার, ণ, ভিতরের (?), হ্রস্বউ কার, যেমন কিন্তু, শু ইত্যাদি আরও চমকপ্রদ ঞ চ-এর চেহারা অবাক রূপ ধারণ করে ঞ। র এর চেহারা একাধিক।

আরও খুঁটাইয়া অনেক কিছুই বিচারে আসিবে; সবথেকে মস্ত গণ্য করিবার হইল—বাঙলা অক্ষরের মাত্রা এবং ফুটকি। এই মাত্রার প্রভাব দারুণ—বহু দিন পূর্বে এক ফরাসী সুভোনীর-এ দেখিলাম লা দাঁস খ্যাদু কজার পেজে ছাপান —এবং সমস্ত অক্ষরের উপর মাত্রা দেওয়া, তাহাতে রোমান হরফ যেন সংস্কৃত অক্ষর হইয়া দাঁড়াইল (ইহা ১৯৩৭ সালে যখন হরেন ঘোষ, সেরাই কেলার ছউ নৃত্য লইয়া বিদেশে যান)। ঠিক তেমনই কয়েকটি টানের তারতম্যে বাঙলা অক্ষরকে আরবী চেহারা দেওয়া যায়—যেমন অবনীবাবু করিতেন। এখন মাত্রা (ফুটকি) সকল অক্ষরের নাই। ফলে পিরার্স-এর অভিনবত্ব খুব সুঠাম হইল না, এখানে যে মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আনুভূমিক সরল রেখার দ্বারা গঠিত হয় নাই; অন্য পক্ষে ঠিক সেই জায়গাতে বেশ একটু চালা দেওয়ার মতন বাঁকা করা আছে—অবশ্য সেই সকল অক্ষরেই যাহার মাত্রা আছে।

আমাদের অক্ষরমালার অনেক অক্ষরে মাত্রা নাই, যেমন ঋ এ ঐ ও ঔ স্বরবর্ণে এবং ব্যঞ্জনবর্ণে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত বেশ কয়েকটিতে; এই মাত্রা এবং ইহার পর ধর্তব্য ফুটকি—কেন না অধিকাংশ অক্ষর ফুটকি সমন্বিত; আমরা ভাবি মাত্রা ও ফুটকি আমাদের লেখার কাঠামো, (পুঁথি ও তাম্রশাসনে, এবং প্রস্তর ফলকে ইহার চমকপ্রদ ব্যবহার দেখিয়া থাকি।) অনেকে মনে করেন ইহাতে গড়ন ধাতুর অপচয় হইতেছে—অথচ অন্য কোন উপায়ে—যাহাতে সৌন্দর্য্য নষ্ট না ঘটে, তাহারা কল্পনা করিতে পারিতেছেন না।

এই সূত্রে আমরা বরজইস টাইপের চেহারা যদি বিচার করি, তবে দেখিব, কোথাও বাক্য বা লাইন, আটাশ এম বা বত্রিশ এম, সাধারণ নিউজপ্রিন্টে—ঐ মাত্রা ও ফুটকির জন্য থমক খায় না, লাইনের শেষাংশ ঘোরাটে নহে (এমন কি এক লেড-এও অর্থাৎ ½ এম)। যেহেতু চৈতন, লেজুড়, বাড়ী, রেফ-চন্দ্রবিন্দু—এবং কিছু মাত্রা ও ফুটকি ছাড়া অক্ষর সকল মিলিয়া, শব্দের গঠনের ইতিমধ্যকার ব্যবধান ইত্যাদি মিশিয়া এক অভাবনীয় সমন্বয় সৃষ্টি হইয়া থাকে! আরও যে, রাজা হরিবর্ম্ম হইতে অক্ষরমালার তারতম্য খুব একটা ঘটে নাই। লিপিতে যে সুবিধা আছে এখানে অথচ তাহা নাই। লাইনো টাইপে ইহা আশা করা যায় না।

ইহা দৈনিক কাগজের জন্যই তৈয়ারী। ১৫০ বছর আগেতে সমাচার দর্পন যেখানে, স্ক্রু প্রেসে, একপিঠ ঘণ্টায় ২০০/৩০০ ছাপান সম্ভব ছিল, সেখানেতে ট্রেডেল, ফ্ল্যাট-বেড উজাইয়া রোটারী। ছেলেবেলাতে, বসুমতীর উপন্যাসের টাইটেলে দেখিতাম লেখা আছে 'বিদ্যুৎ চালিত রোটারী যন্ত্রে মুদ্রিত' (Sic)। এই রোটারীর ক্ষমতা হিসাবে আসে না—ঘণ্টায় না বলিয়া মিনিটে পূর্ন কাগজ কত ছাপা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই রোটারীকেই সামাল দিতেই লাইনো টাইপের উদ্ভব ঘটিল—ইহা আমরা শুনিয়াছি। অবশ্য বেশ কিছুকাল হইতে বাঙলা টাইপের সংখ্যা কমান বা হ্রাস করা যায় সে বিষয়ে তর্ক চলিতেছিল। এইখানে বলিতে পারি শ্রীপান্থ সিদ্ধান্ত অমোঘ সূত্র 'নৈর্ব্যক্তিক' শব্দটি আমাদের মধ্যে কাজ করিল। বটতলা যেখানে টাইপ অভাবে উল্টা 'হ' ইত্যাদি বসাইয়া কাজ চালাইত—(আমাদের মধ্যে উহাই যেন অনুপ্রেরণা হইল!) সেখানে অনেকে অনেক অক্ষর বাদ দিলেন—ঃ বিসর্গ আগে যায়—ইদানীং আসিল চন্দ্রবিন্দু! অরুণ সেন মহাশয় কতদিন না 'সচিত্র ভারত'-এর যীশুবাবু ও অরুণ মুখুজ্জেকে আড়াই কাচ্চা চন্দ্রবিন্দু কিনিতে বলিয়াছেন, উহারা কিন্তু আমল দেয় নাই। ইহার আগে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বানান সংস্কার বা টাইপ কমাইল। এখানে প্রসঙ্গ করি যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বাঙলা শর্ট হ্যাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাঁহার এই বিষয়ে কোন লেখা আছে কিম্বা নাই, তাহা জানা দরকার। অবশ্য যদিও তাঁহার লিপি নিশ্চয় সম্পূর্ণ পৃথক।

এখন কমান কথাটি এক আন্দোলনে পরিণত হইল।

দৈনিক কাগজের জন্য লাইনো-কে কাজে লাগাইবার কারণেই আমাদের বাঙলা ভাষার টাইপ সংখ্যা ও চেহারা কয়েকজন এ্যামেচার দ্বারা (?) বিচারিত হইতেছিল। টাইপ সংখ্যা, ও চেহারা, বাঙলা টাইপ রাইটারে আছে ৪২টি ও ৪টি ডেড। লাইনো টাইপ করিয়ে-দের পরিশ্রমে আমরা পাইলাম, যাহাকে, কমপক্ষে ৩২০টি—৩৬৮টিকে একটা কাজ চলা সাট বলা যায়। এবং মোনোতে ১৫×১৫, ১৫×১৬; ১৫×১৭—

এই লাইনোকে সম্পূর্ণ অভিনব বলিতে হইবে। লাইনো যন্ত্র নিজেই একটি ফাউণ্ড্রি তথা কারখানা। প্রতি হাত ঝকঝকে নূতন টাইপ। পৃথিবীর সর্বত্র ইহার বড় আদর। এইটির জন্য বাঙলা অক্ষর কল্পনা করিলেন, যতীন সেন মহাশয়—ইনি একজন পাকা অংকনবিদ—ইঁহার সব থেকে চাতুর্য্য আমাদের বুদ্ধি বলে, এই যে, ছাড় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চিহ্নতে মাত্রা ঃ যেমন হ্রস্বউ, এ-কার ইত্যাদি। কোথাও কোথাও দারুণ মানানসই বাঁধন ধরিয়াছে।

কিন্তু যেক্ষণে ছাড় চিহ্ন পরপর পড়িল তৎসহ 'বিন্দু আসিল তখনই টাইপের মান নষ্ট হইল যেমন—বিদ্যুৎ, হুঁশিয়ারি, পুঁথিপত্র (ক গঠিত শব্দে ঘটে না, কারণ হ্রস্বউ ইত্যাদি চিহ্ন যুক্ত এখন যদি বিচার করি তবে দেখিব, ঐ ছাড় ঁ, ু, (একটি আ-কারে ঁ এক গড়নও আছে। উ-কার ইত্যাদিতেও আছে (?)) পরে দ্বারা এক বেশ ঘর সৃষ্টি হইয়াছে! এ হেন কাণ্ড ১০/১১ পয়েন্টে বেশ চলিয়া যায়; অবশ্য দৈনিক কাগজেই; কিন্তু কবিতা বা ভাল করিয়া, অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া ছাপাইবার গদ্যতে—যেমন পালামৌ, বা স্যর জগদীশের ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে—আমরা নিশ্চয় ব্যবহার করিব না। কারণ স্পেস! আবার ইত্যাকার লাইনো-অক্ষর যখন বড় করা হইল—(লাডলো সিস্টেম-এ) তখন উহাদের চেহারা আরও বিকট! দেখা যাইবে, কাগজের নামের লিপির ইতিমধ্যার স্পেস আর স্ফীত ৪৮ (?) স্পেস প্রায় এক—যাহা বোল্ড হওয়াতে চোখে পড়ে না। যতীনবাবু শব্দের ইতিমধ্যকার স্পেস যে কি এক মেজাজী সৌন্দর্য্য তাহা নিশ্চয় গণ্য করেন নাই। অথচ ছাপা চেহারা—ধরা যাক এক পাতা—দেখিতে দারুণ হাল্কা, চমৎকার! হায় সেই গুণ খোয়া গেল!

অদ্য হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই লাইনো-র চেহারা কি ছিল, আমাদের সেই বিষয়ে কোন খবর নাই—স্পেস সম্পর্কে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না; পাঠক, ছোট অক্ষর বড় হইলে স্পেসের তারতম্য ঘটিবেই তখন টাইপোগ্রাফারের কর্ত্তব্য শুনিয়াছি, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা!

যেহেতু আমাদের দেশের লাইনো-যন্ত্র অধিকারীরা কেহ টাইপোগ্রাফার নহেন, ফলে এ বিষয়ে তাহারা মন দেন নাই—আর হ্যাণ্ড সেট হইতে এখানেতে অনেক বেশী ধরে—ফলে কিছুই আসে যায় নাই। কিন্তু দৈনিক কাগজের স্পেস-এর দাম অতীব চড়া তথাপি বড় আকারের টাইপ, ইদানীং কিছু বিদেশী শব্দকে যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত করিয়া, কোথাও রেফ তুলিয়া ঃ যেমন পারক, লরড, লনডন!—ইহার যুক্তি যে কি তাহা পরিচ্ছন্ন নহে। পুনঃ বলিব ইত্যাকার শব্দয় বেশ দেখনাই আছে—যেহেতু ঐগুলি বোল্ড!

লাইনো-টাইপের তুলনাতে মোনো-টাইপ যথেষ্ট সুঠাম; টাইপ চেহারা লইয়া কোন হেলা ফেলা নাই, দু-একটি স্থানে স্পেস ব্যাপারে ইতর বিশেষ সত্ত্বেও—এবং লাইনো হইতে চেহারা খুব ভারী হইলেও, সমস্ত নির্ম্মাণ প্রশংসার! ইহার একটা সম্ভ্রান্ত চেহারা আছে! আমরা শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকীর বাঙলা খণ্ডে ইহার ব্যবহার দেখি, এখানে কাগজ ঈষৎ লালচে ও গ্রন্থ ৮ পেইজী ক্রাউন, টাইপের পয়েন্ট আদি, কত লাইন কত এম ইহা মনে নাই। তবে ভারী সুন্দর হইয়াছে। ইদানীং বিজ্ঞাপনে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। তবে দৈনিক ইত্যাদিতে কতখানি যে ইহার ভারী চেহারা যুতসই হইত তাহা বিষয়ে বুঝিতে অসুবিধা হয় না—সেখানে লাইনোই ঠিক! এবং শ্রীপান্থের সিদ্ধান্তকে আমরা মান্য করিব।

পাঠক এখানে, শ্রীপান্থের এই গ্রন্থখানি বিষয়েতে, যে সকল কথা উত্থাপন করা গেল তাহা নেহাৎ, আমরা, সাধারণ পাঠক—যাহার ভাল ছাপা ব্যাপারে আগ্রহ আছে এবং অন্যবিধ অভিমানে না—হিসাবেই করা হইল, অর্থাৎ সকল কিছু আমাদের নিজস্ব কথা! অবশ্য এই সব তত্ত্ব খুবই স্থান লইয়া এবং চিত্র দ্বারা লেখার নিয়ম, আমাদের সেই ধৈর্য্য নাই; তাই অনেক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক পাঠকের নিকট বড়ই এ্যাবস্ট্রাকট লাগিতে পারে। যদি কেহ তাত্ত্বিক থাকিয়া থাকেন!

এখন জানিতে ইচ্ছা হয়, শ্রীপান্থ কাহাদের জন্য এই বিরাট অসাধ্য সাধন করিলেন; এখন সেই উচ্চবর্ণ—ইংরাজদের প্রস্থানের সহিত—লুপ্ত; নিশ্চয় আমাদের বিশ্বাস থাকা উচিত, বঙ্গদেশে বা ভারতে যাহা কিছু উচ্চমার্গীয় যাহা কিছু আমাদের ঐশ্বর্য্য—তাহা সাধক সন্ন্যাসী শ্রমণ, দ্বারাই কৃত! (আমাদের শিক্ষা প্রচারের কি যে প্রয়োজন—কে জানে) এখন সমস্তই নস্যাৎ হইতেছে—অতএব কাহাদের জন্য এই পরিশ্রম করিলেন!—অবশ্য ইহা লিখিত আছে যে, আপন বংশ মর্য্যাদায় অনেক কিছু করিতে হয়, যেমন যুধিষ্ঠির করিতেন! তবে ইহা ঠিক বাঙলা উনিশ শতকের ইতিহাসের মহা লাভ হইল।

এখন আমরা পুনঃ 'নৈর্ব্যক্তিক' শব্দটিকে খুঁটাইয়া বিচার করিতে তাহাদের বলি যাহারা উনিশ শতক সম্পর্কে একটি সূত্র অনুসন্ধান করিতে চাহিতেছে—এই প্রথম একটি শব্দে সমগ্র চেহারা, বাঙালীর মন, ফুটমান হইল! শ্রীপান্থ কতখানি ইহা ইতিহাস অর্থাৎ অন্যান্য দিক বিচার করত স্থির করিলেন তাহা লেখা নাই—তবে পরোক্ষে, হস্তলিপি সূত্রে যাহা, ঐ কথাটি খুব যথার্থ হইল! যাহা আমাদের অনেকানেক কথা বিচার করিতে নির্দ্দেশ দিবে! শ্রীপান্থর নিকট আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এখানে বঙ্গ সংস্কৃতিকে আমাদের আন্তরিক প্রশংসাবাদ জানাইতে হইবেই—এই সময় এরূপ মহৎ কাজ কোন সংস্থা করে ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

প্রসঙ্গ ঃ যখন ছাপাখানা এলো। শ্রীপান্থ। সচিত্র ডিমাই ৮ পেজী ১৫০ পৃষ্ঠা ও ৫৫ পৃষ্ঠা চিত্র। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সৌজন্যে প্রকাশিত।

মানুষ পাথর

সমরজিৎ কর

॥ পাঁচ ॥

পেছনে পড়ে রইল মাওকডকের ডাকবাংলো। বাঁ পাশে গিরিখাত। সেখানে সলতের মত নদীটি নীরবে বয়ে চলেছে। আর আমাদের ডান পাশে জীপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চৌকিদার পূর্ণকুমার। দারিদ্র্য তার সর্বাঙ্গে। রিক্ততার যেন পাথরের মূর্তি। মাওকডকের এই পাহাড়ের মত তার কাছে অতীতই একমাত্র বাস্তব। সেই অতীতকে নিয়েই তার বর্তমান।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, পূর্ণ, আমরা এবার যাচ্ছি। একটু মিষ্টি খেও।

কথাটা বলেই মনে হল, নিজের গালেই কষে থাপ্পড় মারলাম আমি। মিষ্টি! মিষ্টি পাবে কোথায় সে এখানে? মাওকডক কি শহর যে, এখানকার পথের দুধারে সাজান থাকবে মিষ্টির বিপণী? এক মুঠো চাল জোটানই তো এখানে শক্ত। যেমন শক্ত পাথর নিংড়ে জল বের করা?

দু হাত পেতে টাকাটা নিয়ে মাথা নোয়ালো পূর্ণ চৌকিদার।

কৃতজ্ঞতা? হয়ত তাই। কিন্তু কিসের এ কৃতজ্ঞতা? যে মানুষের দিনে এক মুঠো হয়ত খুদ জোটে না তাকে মিষ্টি খেতে বলে আমি নিজেই কি চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলাম না? এর পর পূর্ণকুমারের দিকে আর চাইতে পারি নি।

সুজিতবাবু বললেন, চলুন অনেকটা পথ। দেরি করলে ফিরতে রাত হবে।

এরপর আর অপেক্ষা করিনি।

মাওকডক থেকে ডিমফে। দু কিলোমিটার পথ। তারপর শিলং-চেরাপুঞ্জি রোড।

ভাল রাস্তা। মসৃণ, পিচ ঢালা। বেশ চওড়াও সেই সঙ্গে। এদিকে বন জঙ্গল অনেক কম। যা আছে তাকে ঝোপঝাড়ই বলা চলে। শিলং-এর আশপাশে উঁচু পর্বত চূড়া বেশি। এদিকে মাঝে চূড়ার সে বৈচিত্র্য চোখে পড়েনি। বরং বলা চলে বিস্তৃত প্রাচীরের মত পাহাড়। সে পাহাড়ের ওপরের অংশ সমতলের মত বিস্তৃত। সেই সমতলে মাইলের পর মাইল উদ্ভিদ বলতে যা বোঝায়—একমাত্র সবুজ ঘাস। প্রাকৃতিক অবক্ষয় পাথর মাটিতে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের মাথায় সেই মাটির স্তরে আগাছা আর ঘন ঘাসের দঙ্গল।

মাঝে মাঝে গভীর গিরিখাত। এদিকে পর্বতমালা। পর্বতমালা ওদিকে। মাঝে গিরিখাত। নিচে, অনেক নিচে নেমে গেছে। আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে, এ ধরনের গিরিখাত যে এখানে ছিল না, তারও প্রমাণ পেয়েছেন ভূ-তাত্ত্বিকরা। পার্বত্য নদীর খরস্রোতে পাহাড় ক্ষয়ে গিয়ে যেখানে ছিল এক-খণ্ড শিলাস্তূপ সেখানে তৈরি হয়েছে খাত। সেই খাত পরিধিতে বেড়েছে। ফল পাহাড়ের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে ব্যবধান। খাত গভীর হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও প্রশস্ত। ফলে গিরিখাতের দুপাশে তৈরি হয়েছে দুটি আলাদা পর্বত শ্রেণী।

এদিকের পর্বতশ্রেণী তুলনায় নতুন। রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে চোখে পড়ে স্তরে স্তরে সাজান তার ভূখণ্ড। কোন স্তরে স্লেট। কোন স্তরে নুড়ির সমাবেশ। নুড়ির ওপর কঠিন কোয়ার্টজ পাথরের সমাবেশ।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, একটু লক্ষ করুন, দেখবেন, স্তরগুলি কেমন পর্যায়ক্রমে সাজান। গিরিখাতের ওপারে যে একটানা পাহাড় দেখছেন, যা আমাদের এই রাস্তারই সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে, সেখানে গেলেও দেখবেন তারও শিলাস্তরগুলি ঠিক এইভাবেই সাজান রয়েছে।। শুধু তাই নয়, এখানে যে স্তরটি যতটা উঁচুতে, সেখানেও সেই স্তর ঠিক ততটা উঁচুতেই দেখতে পাবেন। দুটি পর্বতশ্রেণী যে একদিন এক সঙ্গে জুড়ে ছিল এটাই তার প্রমাণ।
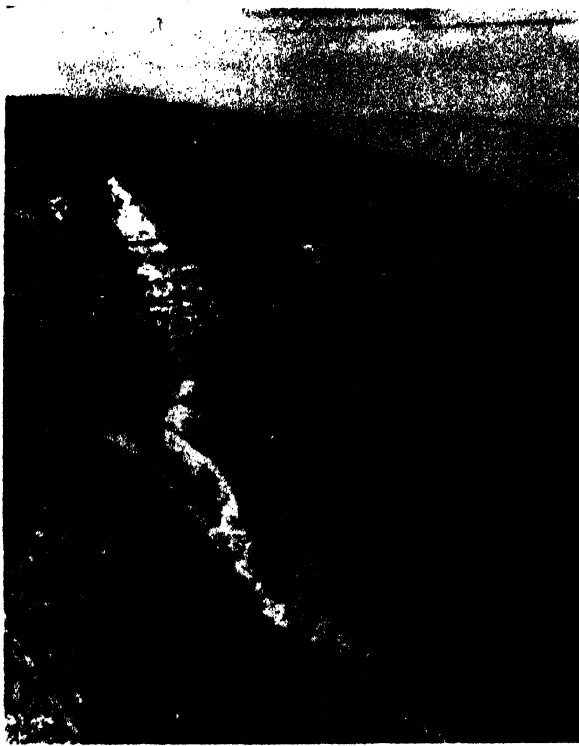
আধুনিক পিচঢালা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মাঝে মাঝে চোখে পড়বে পায়ে চলা পথ। পাথর কেটে খাড়াই উঠে গেছে। চওড়ায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট। এ ধরনের একটি রাস্তার সামনে এসে জীপ থামালাম আমরা।

পথটিকে দেখিয়ে সুজিতবাবু বললেন, দেখে নিন, মশাই। একেবারে ইতিহাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এখন তো পিচ ঢালা পথে উড়ে চলেছি। কিন্তু ভাবতে পারেন, আজ থেকে একশ' বছরেরও আগে ১৮৬৯ সালে পাহাড়ের ওপর এই যে খাড়াই রাস্তাটা দেখছেন এই রাস্তা ধরেই এ অঞ্চলে ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এইচ বি মেডলিকট? তখন তো আর এখনকার মত জীপ ছিল না। এধরনের [illegible] হেঁটে চলা, নইলে খচ্চরই একমাত্র বাহক। প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে তাঁদের। এসব অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রের কাজ তাঁরাই শুরু করেছিলেন প্রথম।

অবাক হয়ে দেখছিলাম সেই রাস্তা জ্ঞানের অন্বেষণে মানুষকে যে কতটা পরিশ্রম করতে হয়, এ পথ যেন তারই নিদর্শন।

'আর ওই যে দেখছেন, ওরই নাম উমশোরিংখিউ নদী।' বললেন সুজিত-বাবু। '১৮৫৯ সাল নাগাদ ওই নদীর পাশ দিয়ে চলতে গিয়েই ওল্ডহাম প্রথম আবিষ্কার করেন, খরস্রোতা পার্বত্য নদী ৩২৭ টন ওজনের পাথরের চাঁই-ও ধাক্কা মেরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই ঘটনা নদীর অপরিসীম বহন ক্ষমতার প্রথম প্রমাণ। ভূমির অবক্ষয়ের ব্যাপারে নদীর ভূমিকা কতটা এই ঘটনা পরবর্তী-কালে ভূ-তাত্ত্বিকদের সে সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে।'

মৌসমী জলস—চেরাপুঞ্জি

আমরা চেরাপুঞ্জির কাছে এসে পড়েছি প্রায়। মাঝে ছোট্ট একটি খাসী গ্রাম পেরিয়ে এলাম। নাম সোহ্রারিম। বড় গ্রাম। কায়দাকানুন সমতলভূমির গ্রামেরই মত। লোকগুলিও মনে হল অনেক বেশি আলোকপ্রাপ্ত। এর কিছু দূরেই লাইতোবিংগকিউ। আর একটি গ্রাম। এখান থেকে শুরু হয়েছে কয়লা-খনি। তবে সে কয়লাখনি আমরা ঝরিয়া, রানীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন দেখি, তেমন নয়। এ অঞ্চলের পাহাড়ে পাথর বলতে বেসল্ট এবং গ্র্যানাইট। এই সব পাথরের স্তরের ফাঁকে কয়লার স্তর। সে স্তর পুরুও তেমন নয়। রাস্তা [illegible] সংগ্রহ করাও বেশ পরিশ্রমের কাজ দেখলাম। পাহাড়ের মাঝে মাঝে গর্ত করা হয়েছে। আচমকা দেখলে মনে হবে গুহা। হয়ত জন্তু জানোয়ারের আস্তা। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই গর্তের মধ্যে ঠিক পশুর মতই হামা দিয়ে ঢুকে কয়লার টুকরো সংগ্রহ করছে। সে কয়লায় গন্ধক প্রচুর। শতকরা চার থেকে ছয় ভাগ। তবু এই কয়লার কল্যাণে কিছু কিছু শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে এখানে। আশপাশে আছে উঁচু মানের চুনা পাথর। আর এই কয়লা। এদের সাহায্যে চেরাপুঞ্জিতে চলেছে সিমেন্টের কারখানা। সারা মেঘালয়ে খনিজ পদার্থকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে এটাই এখন একমাত্র কারখানা। এর দৈনিক উৎপাদন ২৫০ টন। এই উৎপাদন দৈনিক যাতে ৯৫০ টনে বাড়ান যায় তার চেষ্টা চলছে।

আরও কিছু দূরে এগিয়ে রাস্তাটি বাঁদিকে মোড় নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল আধুনিক লোকালয় একেবারে পাক্কা শহর।

আর সুজিতবাবু যখন বললেন 'অ্যান্ড হিয়ার উই কাম। দিস ইজ চেরাপুঞ্জি'—আমার যেন কান্না পেল মনে পড়ল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে সেই কবিতার কলি : চেরাপুঞ্জির থেকে এক ফালি মেঘ ধার দিতে পারো গো সাহারার বুকে?

হায় ভগবান। কোথায় মেঘ চেরাপুঞ্জিতে আমার এই প্রথম আসা ছোট বয়স থেকে শুনে এসে চেরাপুঞ্জির কথা। বার বার শুনেছি শুনেছি, পৃথিবীতে চেরাপুঞ্জিই একমা জায়গা যেখানে নাকি সবচেয়ে বৃ পড়ে বেশী। বছরে গড়ে ১১৪ সেন্টিমিটারের মত। ইদানিং অবশ্য বল হচ্ছে ঠিক চেরাপুঞ্জি নয়, এ গৌর চেরাপুঞ্জিরই কাছে আর এক জায়গার ওপরই বর্ষার বেশী। তার না মৌসিনরাম। সেখানকার বৃষ্টি চেরাপুঞ্জিকেও ছাপিয়ে যায়। তব চেরাপুঞ্জি চেরাপুঞ্জিই। তার স্ব ভুলি কী করে।

চেরাপুঞ্জির কথা মনে এলে ভাবতাম পাহাড় আর পাহাড়। সেখা আকাশচুম্বী গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল সেই জঙ্গলের মাথার ওপর রাশি রা মেঘ। ঘন কালো মেঘের আড়ালে সূ পুরোপুরি অদৃশ্য। থেকে থেকে বা পড়ছে। আর সেই সঙ্গে অবিরাম বর্ষ সেখানে কোন জনবসতি নেই। থাকলে হয়ত দু একটি ডাকবাংলো। কৌতূহ কোন টুরিস্ট অথবা সরকারী কর্মচা সেই ডাকবাংলোর আশ্রয় নিয়ে গু বন্দী হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত যাপন কর পথে জোঁক, এবং সাপ। আর কে প্রাণী নেই। এবং—

কিন্তু কোথায় গেল সেই কল্পন কয়েক কুড়ি বালি ফেললে বাল চেরাপুঞ্জির সঙ্গে গোবি সাহারার মা সত্যিই কি কোন পার্থক্য দেখা যাবে

এ তো শুকনো পাহাড়। না আ গাছ পালা। থাকলেও যৎসামান্য। তা অন্তত জঙ্গল বলা চলে না। খট লাল পাথর। আকাশে এক ফালি মে নেই। খটখটে রোদ্দুরে গলদ অবস্থা। ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদ তার জল এসে এক জায়গায় সংক

স্বাস্থ্যকর শক্তিতে ভরপুর পুষ্টিদায়ক

হরলিকস বিস্কুট

একান্তভাবে আপনার বাড়ন্ত সন্তানের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ব্রিটানিয়া হরলিক্স্ বিস্কুট। পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যে ভরপুর মুচমুচে তাজা। আপনার সন্তান একে লুফে নেবে।

ব্রিটানিয়া ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিন্টাস-BBC. HOR. 1-2415 BG

জন। স্থানীয় আধিবাসীরা সেই জলে স্নান করছে। কাপড় কাচছে। নতুন নতুন ঘরবাড়ি। একটি স্কুলও চোখে পড়ল। আর আছে অফিস কাছারি। এসব নিয়ে দিব্যি একটি ছোটখাটো শহর।

সুজিতবাবুকে বললাম, মশাই চেরাপুঞ্জিতে এলাম, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টির স্পর্শ পেলাম না?

কী করে পাবেন, বলুন? এ তো এপ্রিল মাস। এপ্রিলের গোড়ায় চেরা-পুঞ্জি শুকনো, খটখটে। মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু।

মনে মনে চেরাপুঞ্জির যে ছবিটি এতদিন এঁকে রেখেছিলাম, তাকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি তো প্রায় হো হো করে হেসেই উঠলেন। বললেন, মশাই, এত বৃষ্টি হলে মাটির কিছু থাকে? পাহাড় ক্ষয়ে যেটুকু টপ সয়েল তৈরি হয়, প্রবল বর্ষণে তার সবটাই তো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। গাছ জন্মাবে কোথায়?

রাস্তাটা এগিয়ে গেছে শহরের মধ্যে দিয়ে। তারপর চেরাপুঞ্জির ভিউ-পয়েন্ট। এখানটা ফাঁকা জায়গায়। বাঁ পাশে উপত্যকা। প্রায় এক হাজার ফুট নিচে নেমে গেছে। সেখানে দু একটি গ্রাম। জঙ্গল। কলা বন। মাইল খানেক দূরে মোসমী ফলস্। তার জলের ধারা এদিক থেকে অনেক কষ্ট করেই দেখতে হয় এখন। তবে সে জলের ঝিরঝির শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে এখানেও ভেসে আসে। চেরাপুঞ্জির এদিক থেকে পাহাড় হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেছে। খাড়াই ঢাল সৃষ্টি করে গিয়ে মিশেছে সুরমা উপত্যকায়। ভিউ-পয়েন্ট থেকে দেখলাম সমভূমি। বাংলাদেশ। বিস্তৃত সুরমা নদী। শতধা তার শাখা প্রশাখা। সেদিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। সোনার বাংলা। বাংলাদেশ।

বেলা বাড়ছিল। ঘড়িতে তখন প্রায় একটা। কথা ছিল একটার মধ্যে আমরা ভোলাগঞ্জ পৌঁছব। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা সেখানেই করার কথা। সেখানে অনেকেই অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে। অতএব ভিউ-পয়েন্টের কাছে ছোট্ট একটি দোকানে উঠে চা এবং কিছু স্ন্যাকস উদরস্থ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হলাম।

এবার নিচে নামার পালা। তিন হাজার ফুট থেকে একেবারে সমতলে। আঁকা বাঁকা পথ। দূরে সুরমা নদী। এক জায়গায় এসে সিলেট জেলার ছাটক সিমেন্টের কারখানা চোখে পড়ল। এই কারখানার জন্যে যত চুনাপাথর দরকার তা প্রায় এদিক থেকেই। ভোলাগঞ্জের কাছে কোমোরা। ভারত প্রতি বছর সেখান থেকে দুই লক্ষ টনের মত চুনা পাথর বাংলাদেশে রপ্তানি করে আসছে।

যতই নিচে নামছি জঙ্গল বাড়ছে। ঘন্টা আড়াই-এর মধ্যেই আমরা সেলা, ইশামতী ছাড়িয়ে ভোলাগঞ্জ পৌঁছলাম। এদিকের বনে বনে কাঁঠাল গাছের জঙ্গল। কাঁঠাল গাছ এদিকে ওয়াইলড্ প্ল্যান্টের মধ্যে পড়ে। খাবার লোক নেই। আম গাছেরও সেই অবস্থা। দেখলাম সুজিতবাবু প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। সঙ্গে বস্তা। বললেন, শিলং-এ এ বস্তুটি চট করে পাওয়া যায় না, মশাই। আসার সময় গিন্নী দুটো থলে ধরিয়ে দিয়েছেন।

মেঘালয়ের এই অঞ্চলে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে

এঁচড় আর কাঁচ আম নিয়ে যেতে হবে।

আম কাঁঠালের বাগান। কয়েকটি ছিটে বেড়ার তৈরি হাট। এই নিয়ে ভোলাগঞ্জ ড্রিলিং স্টেশন। যাতায়াতের জন্যে সম্বল দুটি জীপ। ড্রিলিং স্টেশনের পাশে জিওলজিস্টদের ক্যাম্প। আমরা যেতেই বেশ সোরগোল পড়ে গেল। শিলং থেকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইনডিয়ার উত্তরপূর্ব সীমান্তের ড্রিলিং বিভাগের প্রধান শ্রীমুনীশ্বর দত্ত অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। প্রচণ্ড উৎসাহী ভদ্রলোক। আমাদের দেখেই সদলবলে ছুটে এলেন তিনি। বললেন, মশাই, সেই একটা থেকে আমরা বসে আছি। খাবারদাবার সব ঠান্ডা হয়ে গেল। এত দেরি কেন?

ওঁদের মুখ দেখে বুঝলাম, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ওঁদেরও এখনও খাওয়া হয় নি।

খানিকটা কৈফিয়ৎ দেয়ার মত আমিই বললাম, উপায় ছিল না। কিছুটা দেরি হল সেন সাহেবের সঙ্গে রডোডেনড্রন এবং এলিফ্যান্ট ফলস দেখতে গিয়ে। পথে জীপ বিগড়েছিল। তার জন্যে গেল ঘন্টাখানেক সময়। তারপর মাওকডকে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিলাম আমরা।

মানে ক্লাইং সসারের গল্প শুনতে। হেসে ফেললেন মিঃ দত্ত। উত্তর প্রদেশের মানুষ। রসিকতা করতে জানেন।

গল্প মানে? ঘটনাটা তাহলে আপনি কি বিশ্বাস করেন না?

বিশ্বাস করি না বলব না। কারণ এক জ্যান্ত মানুষ আজও তার সাক্ষী হিসেবে বেঁচে আছে। তাছাড়া কাগজেও ঘটনাটা বেরিয়েছিল তখন। তবে ব্যাপার কি জানেন? মনের দিক দিয়ে আমি ঠিক সমর্থন পাই না, এই যা। হেসে ফেললেন শ্রীদত্ত।

এরপর মিলিটারি কায়দায় পরি-চয়ের পালা। প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভোলাগঞ্জে যিনি ড্রিলিং-এর দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন তার সঙ্গে। বললেন, ইনি শ্রীমজুমদার। এখানকার ড্রিলিং সেকশনের ইনচার্জ। ইনি শ্রীপাত্র। জিওলজিস্ট।

আবার মজুমদার? বললাম, মিঃ দত্ত, আপনাদের এখানে দেখছি মজুমদারের ছড়াছড়ি। গোহাটিতে দেখা হল সুজিত এবং অমর মজুমদারের সঙ্গে। এখানেও দেখছি আর একজন মজুমদার। কাল শুনেছি দেখা হবে নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক করপোরেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে। তিনিও এক মজুমদার। শ্রীসুব্রত মজুমদার। ব্যাপার কি বলুন তো? সব এক পাড়ার লোক নাকি?

আমার কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

এখন সমস্যা দাঁড়াল এই, আগে খাওয়া, না ড্রিলিং সাইটটা দেখা?

আমি বললাম এক কাজ করুন। ড্রিলিং সাইটটাই আগে দেখা যাক। এর মধ্যে খাবার দাবার একটু গরম করে নিন। আমরা বরং এক ঘন্টার মধ্যে দেখার কাজ সেরে মার্কিন কায়দায় সন্ধ্যের আগেই ডিনার সারব।

বরং সেই ভাল। বললেন মুনীশ্বর দত্ত।—কাছেই তো। আমরা যাব আর আসব।

ড্রিলিং-এর কাজ চলছিল। মুনীশ্বর বাবুর কথা শুনে ভাবলাম, যাক। কাছে যখন তখন আর ভাবনার কী আছে। জীপের সারি চলল আবার বুনো পথে। সমতল ছেড়ে বাঁ দিকে একটি পথ। কিছুটা পাথর গলা মাটি। তারপরই দাঁত বের করা রাস্তা। হাড়পাঁজরা নড়বড়ে হওয়ার মত অবস্থা। জীপ কখনও বাঁদিকে মোড় নেয়, কখনও ডান দিকে। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। ক্রমে উপরে উঠছি মনে হলো।

তা না হয়, হলো। কিন্তু গাড়ি যে আর থামে না রে, বাবা। মুনীশ্বরবাবুর কাছে এই কি 'নজদিক'? আমারই ঘাট হয়েছে। জিওলজিস্টদের বিশ্বাস করতে নেই। মনে পড়ে বাঁকুড়ায় নেমে হাঁটা পথে একবার কোন এক গ্রামে যেতে হয়েছিল আমাকে। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। পথের আর শেষ নেই। যিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, দূর নেহি। এই বগলমে। স্টিশন সে দু ক্রোশ হোগা। মশাই, দুই ক্রোশ। শেষ পর্যন্ত মাইল দশেক পথ হাঁটিয়ে তবে আমায় সে ছেড়েছিল। এখন দেখছি এই পাথুরে সাহেবরাও তাই। কোথায় নজদিক্। আমি জীপের দূরত্বমাপার যন্ত্রটির ওপর ঠিক নজর রেখে চলেছি। গাড়ি যখন শেষ পর্যন্ত থামল, দেখলাম তার মধ্যে প্রায় সাত আট কিলোমিটার চলে এসেছি।

নির্জন জায়গা। ঝরণার জল আটকে এক জায়গায় ছোট্ট একটি জলাশয় করা হয়েছে। সেখান থেকে পাম্প করে সেই জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট ওপরে। ড্রিলের কাজ চলছে। কঠিন চুনা পাথরের স্তরের সন্ধানে কী প্রচণ্ড আয়োজন। জন দশেক ছেলে কাজ করছে। তাদের বয়েস পনের থেকে কুড়ির মধ্যে। সবাই খাসী। স্থানীয় গ্রামের অধিবাসী।

মুনীশ্বরবাবু বললেন, খুব চালাক, মশাই। বেশ কাজ বোঝে এরা। কাজ করছে বলে তবু ভাল আছে। নইলে নেশাভাঙ করে ঘুরে বেড়াত। এক একজন দৈনিক আয় করছে সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত টাকা। তবে হ্যাঁ, কাজ খুব শক্ত।

খুব উঁচু মানের চুনা পাথরের নতুন স্তর পাওয়া গেছে এখানে। কাছাকাছি দুটি জায়গায় বসেছে দুটি ড্রিল। একটি মাঝারি এবং একটি হাল্কা ধরনের। ওঁরা সন্ধান করছেন এই স্তর কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে সে সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ হয়।

বুঝলেন মিঃ কর, তাত্ত্বিক জ্ঞান সংগ্রহ তো আছেই। তবে তাকে বাদ দিলে আমাদের আসল দায়িত্ব দাঁড়াবে তিনটি। প্রথমত এসব অঞ্চলে কতটা জায়গা জুড়ে চুনা পাথরের স্তর ছড়িয়ে রয়েছে, সেটা জানা। তারপর দেখতে হবে সেই চুনা পাথর গুণের দিক দিয়ে কতটা উচ্চমানের। এ দায়িত্ব আমাদের ভূ-রাসায়নিক বিভাগের। অবশেষে জানা দরকার, মোট চুনা পাথরের পরিমাণই বা কত।

ওঁরা বলেন স্ট্রীক। বাংলা ভাষায় যাকে বলা চলে এক ধরনের শিলা স্তর। এই স্তর উপরেও থাকতে পারে। কয়েক মিটার থেকে কয়েক শ' মিটার গভীরেও থাকতে পারে। চেরাপুঞ্জির পথে আসার সময় এই স্তরের কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েছি। খনিজ পদার্থ হিসেবে শিলাস্তরের গঠনও হয় স্বতন্ত্র। চুনা পাথরের এক রকম, জিপসামের এক রকম, আবার লোহার আকরিক হিমেটাইট-ম্যাগনেটাইটের অন্য রকম। স্তরগুলি যেন বিছানার মত একের পর এক তোশক, চাদর পেতে যেমন শয্যা রচনা করা হয়, তেমনি এক এক ধরনের শিলাস্তর পর পর সজ্জিত হয়ে তৈরি হয়েছে এক একটি পার্বত্য এলাকা। কেউ কম পুরু কেউ বেশি পুরু। কেউ সঙ্কীর্ণ একটি জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কেউ মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে রয়েছে। এই স্ট্রীকদের পরিসীমা বের করাও জিওলজিস্টদের একটা বড় রকমের দায়িত্ব।

ভোলাগঞ্জে চুনা পাথরের স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে এসব কথাই আলোচনা করছিলাম মুনীশ্বর দত্তের সঙ্গে। ভদ্রলোক বললেন, ব্যাপার কি জানেন, এসব জানার জন্যে আমরা নানা রকম পদ্ধতির সাহায্য নিই ঠিকই। তবে যতক্ষণ না ড্রিল করা হচ্ছে, কোথা
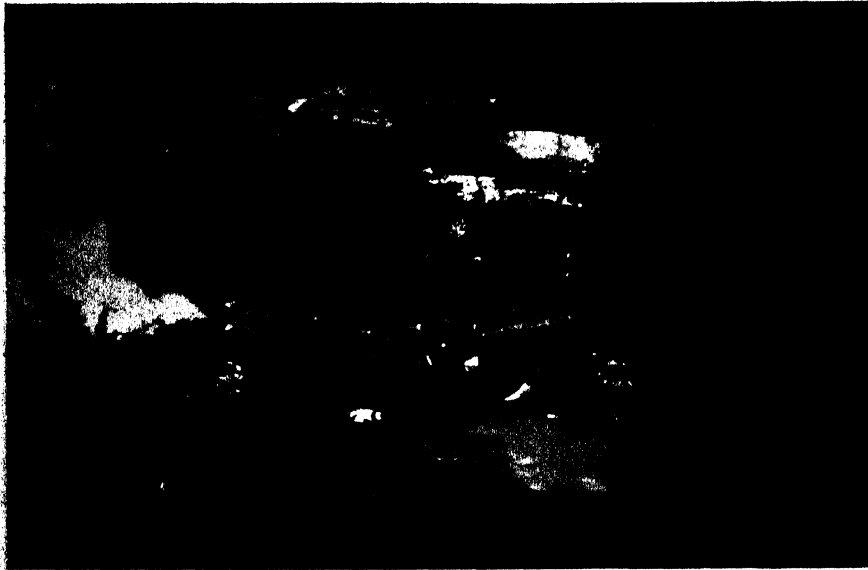
পিলি নদীতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে

কন্তু আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।

জিজ্ঞেস করলাম, কত জায়গায় ড্রিল চালাচ্ছেন?

কত জায়গায় মানে? আপনি কি ুরো উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কথা লছেন? মুনীশ্বরবাবু প্রশ্ন ন্নলেন।

হ্যাঁ, আমি সে কথাই জানতে াইছি, মিঃ দত্ত। আমার জিজ্ঞাসা।

তা, এ পর্যন্ত আমরা মোট তেরোটি ায়গয়া ড্রিলিং চালিয়ে যাচ্ছি। সোনা-াহাড়ে একটি হাল্কা ধরনের ড্রিলের াজ তো দেখেই এসেছেন। এখানে ামরা কাজ করছি দুটি ড্রিল নিয়ে। কটি হাল্কা এবং একটি মাঝারি ড্রিল। ছাড়া এই মুহূর্তে আমরা ড্রিল ালিয়ে যাচ্ছি মেঘালয়ের সুং পত্যকায়। সেখানে আমরা ক্রোমিয়াম, াবল্ট, নিকেল এবং কিছুটা তেজ-ক্রয় বস্তুর সন্ধান পেয়েছি। ঘালয়ের তিরসাদেও চলছে একটি ্রল। তামা, নিকেল প্রভৃতি ছাড়াও ানিকটা সোনার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে খানে। আপনি তো অরুণাচলে চ্ছেনই। সেখানে কিমিনে গিয়ে খবেন আরও দুটি ড্রিলের কাজ। গানদীর দক্ষিণ ধারে তামার স্তর বিষ্কৃত হয়েছে। বলতে পারেন, এটা ড় ডিপোজিট। এ ছাড়া বর্মাডিলা স্তার ধারে টুং, নাগাল্যান্ডের কেপুর এবং বরপানিতেও ড্রিলিং ছে।

প্রশ্ন করলাম, এক একটা ড্রিল বং তার সাজসরঞ্জাম ভারিও তো ম নয়। আর যেসব জায়গায় আপনারা জ করছেন তার সবই যে মোটর স্তার আওতায় পড়বে এমনও তো । আপনাদের অসুবিধে হয় না?

বলেন কি? অসুবিধে হয় না াবার? জিওলজি তো আর সব সময় হরের আশেপাশে হয় না যে, আপনি চ ঢালা রাস্তা দিয়ে আরাম করে ওয়া আসা করবেন। এই ধরুন না—ছু দিন আগে নাগাল্যান্ডের পুকপুরে তো মাথায় হাত। কী বলব, মশাই, কোহিমা হয়ে কিপফ্রে পর্যন্ত না হয় আপনি কষ্ট করেই গেলেন। তারপর? কিপফ্রে থেকে পুকপুরে— সে তো প্রায় আশি কিলোমিটারের মত রাস্তা। জীপে যেতেই ভয় করে। ওই রাস্তায় কী করে যে ভারি ড্রিল এবং তার সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাব, আমরা ভেবেই পেলাম না। চলল মিটিং এর পর মিটিং। অবশেষে সমস্যার সমাধান হল। ভারত সরকারের বিমানবাহিনীর সাহায্য পেলাম। তাঁরাই হেলিকপ্টারে করে সব কিছু পুকপুরে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

আছে। সমস্যা আছে। অনেক সমস্যা। বিশেষ করে অরুণাচলের এক-চল্লিশ পয়েন্টে গিয়ে এর পর যা দেখেছি, তাতে এটাই মনে হয়েছে, এঁদের অনেকেই রীতিমত প্রাণ হাতে করেই তো কাজ করে চলেছেন?

ভোলাগঞ্জে এসে আর একটি জিনিস দেখলাম। ফসিল। জীবাশ্ম। লক্ষ লক্ষ বছর, হয়ত বা কোটি বছরেরও পুরনো। এক একটা পাথরের স্তর কেটে ফেলা হয়েছে। আর তার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে ছোট ছোট প্রাণীর শিলীভূত অবশেষ। এক সময়ে এরা সমুদ্রের জলে বাসা বেঁধেছিল। এখন শিলায় রূপান্তরিত।

পাঁচটা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম। এবার সত্যিই খিদে পেয়েছে। ড্রিলিং ক্যাম্প আসার পর মুখে কারোর আর কথা নেই। সবার পেটেই আগুন।

একটা আম গাছের নিচে টেবিল বিছিয়ে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা সাত আটজন। জিওলজিস্ট এবং অন্যান্য কর্মী মিলিয়ে। আমাদের হোস্ট মিঃ মজুমদার।

খেতে বসলাম আমরা। মিঃ মজুমদার এই [illegible]বর্জিত জায়গাতেও ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেন নি। ভাত, চিকেন, দই, মিষ্টি থেকে শুরু করে, পুডিং এবং ফ্রুট স্যালাড। কিছুই বাদ নেই।

টেবিলের ওপর সাজান খাবার দেখে [illegible] করে বললাম, উঃ! এত সব কাণ্ড পাথুরে সাহেবদের পক্ষে সম্ভব নয়। মিষ্টি হাতের দরকার।

মুনীশ্বরবাবু হেসে বললেন, নিশ্চয়। একেবারে নিখুঁত অনুমান। হিয়ার শী কামস্।

এবং পরক্ষণেই চমক।

অত্যন্ত শান্ত এবং মমতাময়ী এক মূর্তি। দু হাত জোড় করে নমস্কার করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।
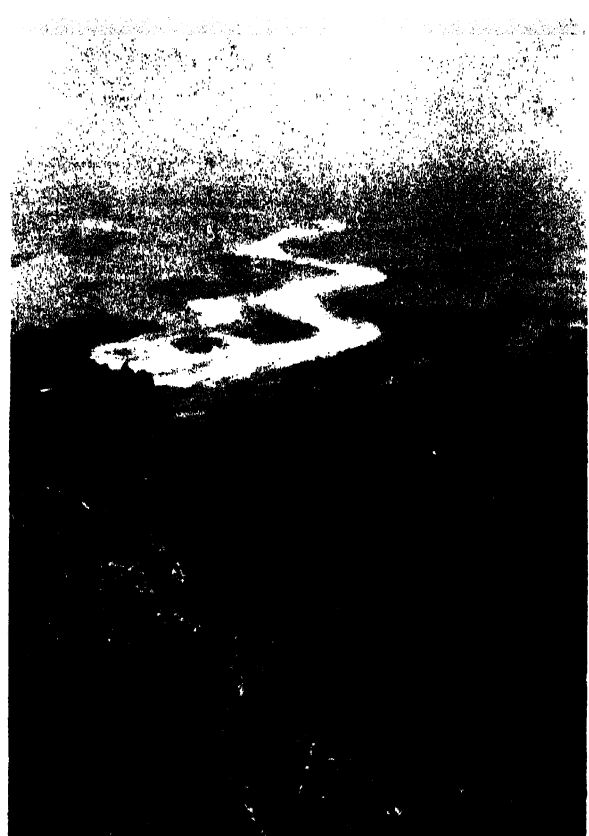
মিসেস মজুমদার। পরিচয় করিয়ে দিলেন মুনীশ্বরবাবু।

আমরা সবাই প্রতি নমস্কার করার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

নিজেকে অপরাধীই বলে মনে হল আমার। বেচারা সেই কখন এসব তৈরি করে সাজিয়ে বসে রয়েছেন। হয়ত নিজেও কিছু মুখে তোলেন নি এতক্ষণ।

শ্রীমজুমদার খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, তা এক আধদিন একটু অনিয়ম হলোই বা। আপনারা তো রোজ আসেন না। আপনারা এলে তবু নতুন মুখ দেখা যায়।

মিসেস মজুমদার বললেন, আপনারা বসুন। খেতে খেতে গল্প শুনব।

কিসের গল্প। গল্প মানে তো জিওলজি।

কত আর বয়েস মিসেস মজুমদারের। বড় জোর সাতাশ আটাশ? দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত রুচি সম্পন্না। স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে তাঁকে আসতে হয়েছে এই ভোলাগঞ্জে। এখানে মেয়ে বলতে তিনিই। না আছে প্রতি-বেশী। অথবা অন্য কোন মহিলা সঙ্গী।

খেতে খেতে কথা বলছিলাম তাঁর সঙ্গে। বললেন, মাঝে মাঝে খুবই অস্বস্তি লাগে। কখনও কখনও ওঁকে

ভোলাগঞ্জের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে সুরমা নদী এবং তার শাখা-প্রশাখা

রাতেও কাজ করতে হয়। না, অন্য কোন ভয় নেই। ভয় শুধু একাকিত্বের। না আছে একটি সিনেমা ঘর যে ছবি দেখব। কখনও সখনও খাসী মেয়েরা আসে। ওদের ভাষাই বুঝি না। আর কতক্ষণই বা ওদের সঙ্গে কথা বলা যায়? এসব দুর্গম এলাকায় ইচ্ছে করলেই যে কোন আত্মীয় স্বজন আসবে তারও উপায় নেই।

ভদ্রমাহলাকে দেখলেই মনে হয়, এক সময়ে বেশ স্পোর্টিভ ছিলেন। হ্যাঁ, ছিলেন। গান বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল। এখন তার সবই গেছে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইণ্ডিয়ার কর্মীদের পারিবারিক জীবনে এটাই একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি, মিঃ কর। ইউ ক্যান নট কম্পেনসেট ইট। খেতে খেতে মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু।

ঘন্টা দেড়েক পর সেখান থেকে আমরা ফিরে এসেছিলাম। আসার সময় মহিলাটি এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পাথরের মূর্তির মত হাত জোড় করে বিদায়ী নমস্কার জানিয়ে বলছিলেন, সম্ভব হলে আসবেন আবার।

গরমপানির এ-সব জঙ্গল কপিলির জলাধারে আর কয়েক বছরের মধ্যেই ডুবে যাবে

আমাদের জীপ ছাড়ল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন পাহড়ের গা বেয়ে। তার আবছা আলোয় তাঁর মুখের ওপর জীবন এবং জীবিকার অন্তর্দ্বন্দ্বের যে প্রকাশটি দেখে এলাম, হয়ত কোনদিন তা ভুলব না।

পথে আসতে আসতে সুজিতবাবু মন্তব্য করলেন, মশাই, এই কারণেই মেয়ের বাবারা ছেলে জিওলজি করে শুনলেই আর মেয়ে দিতে চায় না। জিওলজিস্টদের কোন ফ্যামিলি লাইফ আছে? বিশেষ করে যে বয়সটায় লোকে বিয়ের সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করে, সেই বয়েসে বউ, পরিবারের আর পাঁচ জনকে ছেড়ে যদি বন বাদাড়ে শুধু পাথর ঠুকে বাঁচতে হয়, বলুন, জীবনের ট্র্যাজেডিটা একবার ভাবুন।

এ কথার আমি আর কী উত্তর দেব?

সে রাত্রে শিলং ফিরে আসার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কথা ছিল, রাতে সুজিতবাবুর বাসায় খাব। কিন্তু সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে অজিতবাবু এবং আমি দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সুজিতবাবুকে তাই বললাম, খাবারগুলি ফ্রিজে রেখে দেবেন, মশাই। নষ্ট হবে না। রাতের ডিনারটা না হয় কাল ভোরেই সারা যাবে।

আমাদের অবস্থাটা সুজিতবাবু বুঝতে পেরেছিলেন। আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গল কিছুটা দেরিতে। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখলাম, অজিতবাবু আমার আগেই উঠে পড়েছেন। স্নান সারা। পোটলা-পুঁটলিও বাঁধা শেষ।

বিছানা থেকে উঠেই আমি শশব্যস্ত হলাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললাম, ইস্! করেছেন কি মশাই। ছ'টা বেজে গেল, অথচ আমাকে ডাকেন নি? নিজে তো দেখছি একেবারে পা বাড়িয়েই বসে আছেন।

নরম প্রকৃতির ভদ্রলোক। আমার কথায় হাসলেন শুধু। তারপর বললেন, আপনি খুব ডীপ স্লিপ দিচ্ছিলেন, তাই আর ডাকি নি। কাল ধকলটা তো কম যায় নি?

আর মশাই, ধকল। এই তো শুরু। দেখুন দেখি, আটটার মধ্যে শম্ভুবাবু এসে যাবেন। ন'টার সময় নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক করপোরেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বসার কথা। তার আগে আবার রাতের ডিনারটি শেষ করতে হবে।

অতএব ভোর থেকেই শুরু হলো হুল্লোড়। দাড়ি কামানো, স্নান, জিনিস-পত্র গোছানো সব শেষ করতে সাতটা বেজে গেল। সাড়ে সাতটা নাগাদ এলেন সুজিতবাবু। সঙ্গে অমরবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী। বুঝলাম ফিট রেডি।

সুজিতবাবুর বাসায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো সাড়ে আটটা নাগাদ। তারপরই এলেন শম্ভু সেন। সেই প্রাণ-চঞ্চল মানুষটি। মুখে হাসির প্রাচুর্য।

এসেই হাঁকডাক শুরু করলেন তিনি। বললেন, বলুন, মিঃ কর, শরীর ফিট তো? শুনলাম রাতের দিকে একটু ইনডিসপোজড হয়ে পড়েছিলেন।

বললাম, না, তেমন কিছু নয়। এখন ঠিক আছি।

না, না, মশাই, লজ্জা করবেন না। সঙ্গে ওষুধপত্র ঠিক আছে। ডঃ চক্রবর্তীর কাছে সবরকম ওষুধ পাবেন। অসুবিধে হলে বলবেন।

বিচিত্র চরিত্র। সর্বদিকেই নজর।

আজকের প্রোগ্রাম গরমপানি যাওয়া। প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টার পথ। কপিলি নদীকে বেঁধে সেখানে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে।

গরমপানি যাওয়ার আগে ঘন্টা-খানিকের জন্যে ছোট একটি বৈঠক।

শিলং-এ পা দেয়ার পর থেকেই প্রসঙ্গটা মাথায় ঘুরছিল। ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় সমস্যা—এদিকে এখনও পর্যন্ত আধুনিক শিল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারে তেমন কিছুই করা হয় নি। এবং তার ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ এখনও পর্যন্ত বহু বছর পিছিয়ে রয়েছে। মুশকিল এই কল-কারখানা তৈরি করতে গেলে দরকার বিদ্যুৎ শক্তি। অথচ এ বস্তুটিরই এখানে অভাব।

মনে পড়ে বছর চার আগে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডঃ রাজা রামান্নার সঙ্গে প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, স্বাধীনতার পর দেশে অনেক কিছুরই উৎপাদন বেড়েছে। সমস্যা শুধু তাদের

কপিলির জলপ্রপাত ইয়েল

বিদ্যুতের কথাই ধরুন। বিদ্যুতের অভাবে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যানড—এ-সব জায়গায় কলকারখানাই গড়ে তোলা যাচ্ছে না। তেমন কয়লা নেই যে, ওই সব অঞ্চলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা যাবে। তাই যদি হয়, সেখানে আপনারা একটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তো তৈরি করে দিতে পারেন।

আমার কথা শুনে ডঃ রামান্না বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তারপর মন্তব্য করেছিলেন, বলছ কী? দে হ্যাভ এনাফ্ হাইডেল পাওয়ার সোরসেস। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়—সর্বত্র অজস্র পার্বত্য নদী, ঝরনা, প্রস্রবণ। তাদের জলকে ধরে আমরা যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করতাম, শুধু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নয়, সে বিদ্যুৎ সারা দেশের চাহিদা মেটাতে পারত। তা ছাড়া, ছোট বড় এক একটা জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে গিয়ে যে সব স্থায়ী জলাশয় তৈরি হতো, সেখানে প্রচুর মাছ চাষ করে ওই অঞ্চলে প্রোটিন সমস্যারও সমাধান করা যেতো।

কথাটা শুনে সত্যিই তখন আশান্বিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাই তো, এত বড় সমস্যার একটা সমাধান যে এত সহজ, সে কথা তো আগে মাথায় আসে নি?

গরমপানি যাওয়ার আগে ঘণ্টাখানেকের এক বৈঠকে এ প্রসংগটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীসুব্রত মজুমদারের সংগে।

বয়েস পাঁচের কোঠায়। প্রচণ্ড আশাবাদী ভদ্রলোক। শম্ভু সেন পরিচয় করিয়ে দিতেই ডঃ রামান্নার মন্তব্যটি তুলে ধরলাম তাঁর সামনে।

সুব্রতবাবু বললেন ডঃ রামান্না ঠিকই বলেছেন। আসলে এ অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ কতটা করা যায়, এতদিন সে কথা নিয়ে কেউ ভাবেনই নি, মিঃ কর। আমাদের এই কর্পোরেশনের জন্মই তো হলো সেদিন। বছর দেড় আগে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা একটা হাই-পাওয়ার কমিটি করেছি। এই কমিটিই ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখছেন।

পূর্বাঞ্চলের এই সমস্যাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি তাঁর সঙ্গে। তিনি বললেন এই সব জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পেছনে সমস্যাও যে নেই, তা বলব না। যেমন ধরুন, শুধু অরুণাচলেই পনের হাজার মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু করবেন কী করে। প্রথমতঃ, সেখানে এমন জায়গা আছে, যেখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসালে প্রচুর লাভ। কিন্তু এত দুর্গম সে সব জায়গা, না আছে পথ, না আছে সহজে পথ করার অবস্থা। পায়ে হেঁটে যাবেন, তাতেও সময় লাগবে দশ থেকে পনের দিন। এখন ভাবুন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে গেলে সিমেন্ট চাই, লোহা চাই, বড় বড় যন্ত্রপাতি চাই। সে সব সেখানে নিয়ে যাবেনই বা কী করে? তবে আমাদের ধারণা, সারা পূর্বাঞ্চলে পাঁচ থেকে সাত হাজার মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করাটা হয়ত অসুবিধে হবে না। এই বিদ্যুতে এবং বিহারের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটান যায়।

সুব্রতবাবু বললেন, ১৯৮৫ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে কম করেও যাতে ৬০০ থেকে ৭০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়, আমরা তার চেষ্টা করছি। কাজ চলছে বনগাইগাঁও, কোপিলি, রাঙ্গা নদী এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। এছাড়া নির্ঝর এবং ছোট ছোট নদীর জল বেঁধে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কথাও আমরা ভাবছি। যাদের উৎপাদন ক্ষমতা হবে তিন মেগাওয়াটের মত।

সমস্যা আরও আছে। বললেন, শম্ভু সেন। শুনেছেন হয়ত, ব্রহ্মপুত্রের জল ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে আসাম অঞ্চলের বন্যাটা নিয়ন্ত্রণের কথাও ভাবা হচ্ছে। এর জন্যে ডিহং-কে বাঁধতে হবে। সে বাঁধের উচ্চতা হয়ত দাঁড়াবে আটশ' ফুটের মত। তার জন্যে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দরকার।

শম্ভুবাবুর কথায় মৃদু হাসলেন সুব্রতবাবু। মন্তব্য করলেন, যদি কোন দিন তা সম্ভব হয়, শুধু ডিহং-এর জল ধরেই যতটা বিদ্যুৎ আমরা তৈরি করতে পারব, তা দিয়ে সারা ভারতের চাহিদা হয়ত মিটিয়ে দেয়া যাবে। তবে সেই তৈরি করার আগে দেখতে হবে, তার চাপ সহ্য করার মত অবস্থা ওখানকার ভূস্তরে আছে কী না।

শুধু ডিহং নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজেও হাত মিলিয়েছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের ভূতাত্ত্বিকরা। আর তাঁদের সেই ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি গরমপানিতে গিয়ে। কপিলি বাঁধের কাজ দেখতে দেখতে। সেও আর এক অভিজ্ঞতা।

শিলং থেকে কপিলি যাত্রার মুখেই নামল বৃষ্টি। শম্ভু সেন জীপ চালকদের বললেন, সাবধানে যাবে, ভাই। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। তারপরই ডান হাতের সেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিদায়। আমাকে বললেন আপনার সংগে ফের দেখা হবে কোহিমায়।

এবার জোয়াই-এর পথ। মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্যে কাটালাম মাওরিংনেংগ-এ। দেখলাম, জিওলজিক্যাল সার্ভের এখানেও তাঁবু পড়েছে। দেখা হল ডঃ নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের সংগে। ওঁরা এখানে কাজ করছেন আলট্রামাফিক কার্বোনেটাইটের সন্ধানে। হ্যাঁ পাওয়া গেছে সন্ধান। এ ধরনের শিলাস্তর ভারতের উত্তর অঞ্চলে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, পৃথিবীর প্রায় ২০০ কিলোমিটার অভ্যন্তর থেকে গলিত অবস্থায় কিছু বস্তু একদা উপরে উঠে এসেছিল। তারপর কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

নির্মলবাবু বললেন, বসুন, মশাই। অন্তত চা তো খেয়ে যাবেন?

প্রস্তাব খারাপ নয়। এরই মধ্যেই ঘণ্টা দুই একটানা জীপে চড়া হয়ে গেছে। বৃষ্টি আর নেই। তবে আকাশে মেঘ আছে। একটু শীত শীতও করছিল।

ওদিকে সুজিতবাবুর তাড়া। [illegible] আমাদের দেরি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, হোক দেরি। চা না খেয়ে এক পাও নড়ছি না।

আসলে ওটা উপলক্ষ্য। মতলবটা ছিল কিন্তু অন্য। সুজিতবাবুর কাছে মাওরিংনেংগ-এর নামটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম আমি। মনে মনে দু-তিনবার নামটি আওড়ে নিলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মোটেই ভুল হয় নি আমার। এই তো সেই জায়গা।

তরলের মধ্যে ভারি বস্তু থাকলে সেই ভারি বস্তু যেমন নিচে নেমে যায়, আর হাল্কা বস্তু উপরে ভেসে ওঠে, অতীতে পৃথিবী যখন তপ্ত গলিত অবস্থায় ছিল, তখনও ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক এই রকমই। সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি রাজ্যের হালকা পদার্থ ভেসে রইল তার উপরের স্তরে। আর লোহা, তামা, নিওডিমিয়ম প্রভৃতি ভারি বস্তু পৃথিবীর গভীর অঞ্চলে নেমে গেল। পরবর্তীকালে তা ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে আলট্রামাফিক রক। দুশ' কিলোমিটার গভীর থেকে যে আলট্রামাফিক শিলা এখানে পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে শতকরা দুই ভাগের মত নিওডিমিয়ম অকসাইড। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এর মান অত্যন্ত উঁচু। এছাড়া পাওয়া গেছে ট্যান্টালাম, সিজিয়াম, সিরিয়ম প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। তবে যে কারণে আমি চমকে উঠেছিলাম, সে ব্যাপারে কেউই কিন্তু মুখ খুললেন না। পরে নির্ভরযোগ্য মহল থেকে জেনেছি, এই সেই জায়গা। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে। থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়াম। এখানকার এক জায়গায় ৬৫০ মিটার লম্বা এবং ১৫০ থেকে ২৫০ মিটার চওড়া একটি শিলাখণ্ড পাওয়া গেছে। তার গভীরতা কত এখনও তা জানা সম্ভব না হলেও এটুকু জানা গেছে ওই শিলার প্রতি দশ লক্ষ ভাগের তিনশ' ভাগ থোরিয়াম এবং পঞ্চাশ ভাগ ইউরেনিয়াম। এ তথ্য যদি সত্য হয়, বলতে হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে একটি বড় রকম কাজ করেছেন।

মাওরিংনেংগ-এ আধ ঘণ্টার মত দাঁড়িয়ে আমরা জোয়াইর দিকে এগিয়ে গেলাম। পেঁছিলাম ঘণ্টাখানিকের মধ্যে। সুন্দর শহর। আশপাশের বনে নানান রঙের অর্কিড। প্রাচীন একটি গীর্জা। স্কুল, কলেজ, বিপণী। একটি মিষ্টির দোকানে চা খেতে গিয়ে মনে হল, আমরা ইটালি অথবা স্পেনের কোন কাফেটারিয়ায় ঢুকে পড়েছি। খাসী ছেলেমেয়েরা চা খাচ্ছে। জটলা করছে। রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে জাজ। তার তালে তালে তাদের চলা ফেরা। ছেলে মেয়েদের মুখে কোন পার্থক্য নেই। কারোর কারোর পোশাক, চুল ইত্যাদিতেও সত্যি কথা বলতে কি একজনকে আমি তো প্রায় মিস বলেই সম্বোধন করতে চলেছিলাম। যদি না তার দেহের বিশেষ অংশের দিকে আমার নজর পড়ত, করেও ফেলতাম হয়ত। নইলে না আছে দাড়ি, না গোঁফ—ভুল করাটা অন্যায় কী? মানে পরিবেশটা পুরোপুরি কনটিনেনট্যাল। ওদের কাছে আমরা বিদেশী। ইনডিয়ান।

স্ত্রী পুরুষ গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারে পুরনো একটা স্মৃতি মনে পড়ল। গত বছর পশ্চিম বার্লিন গিয়েছিলাম। ওই সময় একদিন ঠিক করলাম পূব বার্লিনে একবার ঘুরে এলে কেমন হয়? ভাবার সংগে সংগে কনডাকটেড ট্যুরের টিকিট কেটে ফেললাম। তারপর যথাসময়ে বাসের সিটে বসতে গিয়ে দেখি, আমার পাশের সিটে কে একজন বসে রয়েছেন। বেশ ছোটখাটো চেহারা। বোধ হয় শীতকাতুরেও কিছুটা। আপাদ-মস্তক গরম পোশাকে ঢাকা। পাশাপাশি বসে থাকতে থাকতে এক সময় আলাপ হল। তারপর অনর্গল কথাবার্তা। বেশির ভাগই নাটকের কথা। অথবা সিনেমার কথা। প্রসংগত কলকাতার রংগমঞ্চ এবং যাত্রার কথা উঠল। সত্যজিৎ রায়ও বাদ গেলেন না। দেখলাম অনেক খবরই তিনি রাখেন। কথা বলতে ভাল লাগছিল। আমিও সারা পথটা মুখর হয়ে ছিলাম। কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর পিঠে করাঘাতও করেছি।

তারপর যাত্রার শেষে আবার যখন পশ্চিম বার্লিনে ফিরে এসে তাঁর দু-হাত সজোরে চেপে এবং পিঠে মৃদু কর বুলিয়ে বললাম, মিঃ, নাটক নিয়ে কথা বলে দারুণ কাটল সময়টা। আমার কথা শুনে তিনি তো হাঁ। দু' চোখ কপালে তুলে সংগে সংগে প্রতিবাদের সুরে তিনি বললেন, আমি জানি, এ ভুলটা আপনি গোড়া থেকেই করে যাচ্ছেন, মশাই। আমি মিস্টার নই, মিস্।

আমি তো থ। বলেন কী? তাঁকে দেখে কে বুঝবে যে তিনি মিস্, মিস্টার নন। না। শেষ পর্যন্ত জটিলতা কিছু হয় নি। আমরা হেসেই পরস্পর বিদায় নিয়েছিলাম।

জোয়াই-এর রেস্তোরাঁয় এ ধরনের পরিস্থিতি যে ঘটেনি, ভাগ্য ভাল।

জোয়াই-এর পর পাহাড়ী ঢাল নিচের দিকে। এবার সমভূমি না হলেও উচ্চতা অনেক কমে এসেছে। মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। পুকুর। আর সেই সংগে রাস্তার লাল মাটি। এদিকের রাস্তায় এখনও পিচ পড়েনি। ফলে ঘণ্টাখানিক চলতেই আমাদের চেহারাটা পালটে গেল।

বিকেল চারটে [illegible] পেঁছিলাম কপিলি নদীর ধারে। কাকচক্ষু জল। অগভীর নদী। কিন্তু স্রোতস্বিনী। ফেরির সাহায্যে ওপারে চলে গেলাম।

সুজিতবাবু বললেন, আমরা মেঘালয় ছেড়ে এলাম। এ-পাড়টা আসাম। আর আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার নাম গরমপানি। আসুন, এখানকার ইনসপেকশন বাংলোতে আমাদের আশ্রয়টা নিয়ে নিই। তারপর একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার মিঃ বিশ্বাসের সংগে কথা বলাই আছে—তাঁর সংগে দেখা করা যাবে। কপিলি প্রোজেক্ট ঘুরে দেখার সব ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।

মজবুত বাঁধ দিলেও বিরাট একটি জলাধারের জল যে কত রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য পথে হারিয়ে যেতে পারে, কপিলিতে না এলে সে অভিজ্ঞতা হয়ত কোনোদিনই আমি পেতাম না। মানুষের কাহিনীতে রোমাঞ্চ থাকে। মনে হল কপিলিই বা কম রোমাঞ্চকর কি? (ক্রমশ)

এই তো সময়

জগন্নাথ চক্রবর্তী

খাতা ও পেন্সিল নিয়ে ডুবে থাকো,
খেলা করো, অসময়ে ফোলাও দুচোখ
অভিমানে, পুতুল সাজাও বাক্সে, এই তো সময়।

মাকে বকো, বাবাকেও, ভাইকে পাড়াও ঘুম
যেন খেলনাকে, চুলের ভিতর সন্ধ্যা ঘন হোক,
আকাশ-সম্ভব সব স্বপ্নকে বিরলে বাঁধো,
এই তো সময়।
দাও জানলা দিয়ে দৃষ্টিকে পাঠিয়ে
যেখানে বৃষ্টির নখ চিমটি কাটে মৃত্তিকার ত্বকে,
বাতাস খুনসুটি করে, যেন তুমি রং তুলি নিয়ে
মেতে থাকো, আঁকো রং-ধনু।
কে জানে হয়তো
দুয়েক বর্ষার ঢলে ক্ষয়ে যাবে মাটি,
পাহাড় গজাবে বুকে, নটেগাছ উঠবে ভুঁই ফুঁড়ে,
নিষিদ্ধ সংবাদ কেউ ঢেলে দেবে কর্ণলতিকায়,
আপেলাভ গালে দেবে ওষ্ঠের অপ্সরী চুপিসাড়ে,
রক্তে এনে দেবে গান সমুদ্রের উন্মত্ত তুফান।

ততোদিন খেলা করো যতোদিন রাজপুত্র না এসে পৌঁছায়
পক্ষীরাজ-স্কুটার ছুটিয়ে, নিয়ে যায় নিষ্প্রেম হারবারে
এবং তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় খোলামকুচির মতো
নির্বন্ধ নদীর তটে, এবং তারপর
কারা এসে কিনে নেয় যেন পণ্য, আহা যাট,
এবং তারপর অন্ত যায় একদা-রিবনে-বাঁধা
আকাশ-সম্ভব স্বপ্ন।
এই সব অলক্ষুনে কথা
বিশ্বাস কোরো না লক্ষ্মী, খাতা ও পেন্সিল নিয়ে
খেলা করো, অসময়ে ফোলাও দুচোখ
অভিমানে ; মাকে বকো, বাবাকেও,
নিজেকে সাজাও খুব, এই তো সময়।

ভুলে যাও

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে এখনো সবচেয়ে জ্বলজ্বল করছে
যে বিন্দু
তুমি তাকিয়ে থাকো তার দিকে। ওর নাম পৃথিবী।
কয়েক হাজার বছর আগে
তুমি ওখানে থাকতে। তোমার মনে পড়ে এখনো। তোমার
বৌ-বাচ্চা মা-বাপ ভাই-বন্ধু
কারো সঙ্গেই তোমার দেখা হয় না কয়েক হাজার বছর,
এখন তাদের প্রত্যেককেই তোমার আরো বেশী ক'রে
ভালবাসার কথা মনে হয়, ফিরে যাবার কথা মনে হয়।
কিন্তু তা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন
যে গ্রহটায় তুমি আছো, সেটা অন্যরকম, আলাদা,
এখন তোমার হাত-পা-দাঁত সব কিছুই
অন্য ধাতুতে গড়া,
এখানকার টাকা অন্যরকম, এখানে টাক অন্যরকম,
এক্ষুনি আসবে
তোমার ঝাঁক ঝাঁক বন্ধুরা, যাদের মধ্যে একজন
তোমাকে ধমকাবে—'চলো চলো, এখনো কেন
বসে আছো,
রোজ রোজ তোমার মন খারাপ ভালো লাগে না।'
এখানে তোমার পুরোনো সব কিছুই গ্যাছে, শুধু আছে
সেই পুরনো অভ্যাস—পদ্য লেখা ; আজ তার জন্য
একটা প্রাইজ দেওয়া হবে তোমাকে।
দ্রুম দ্রুম ক'রে দরজার নাকাড়া নড়ছে, এসেছে সেই
ক্যামেরাম্যান—যার লোহার বুক, লোহার হাত, লোহা দাঁত ;
আজকের এই রোবট গ্রহের শ্রেষ্ঠ রোবট কবি হিসেবে
তোমার ছবি তোলা হবে এখন। তুমি হাসো, হাসো
হাসো আর ভুলে যাও
দূরে, অনেক দূরে অনেক
গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে এখনো সবচেয়ে জ্বলজ্বল করছে
যে বিন্দু, তার কথা।
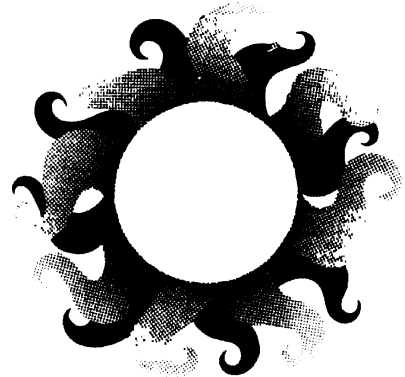
যাও

সুব্রত চক্রবর্তী

টেবিলে কুঁজো ও গ্লাস, ভেজা জুঁই, কয়েকটি আপেল,
হলুদ রঙে ঠাণ্ডা কলাগুলি ;
একগুচ্ছ টসটসে আঙুরে তোমার
বিভ্রান্ত হাতের ছায়া বারবার কাঁপে...কেন প্ররোচিত কর!

শোন, ঐ ঘণ্টা বাজে—ভিজিটিং-আওয়ারের শেষে
সকলেই ফিরে যাচ্ছে, তুমি যাও।
মেট্রনের স্তব্ধ হাসি ঘিরে কি ধরেছে
তোমাকেও! কালো টেবিলের কাঠে তোমার হিরণ্ম-হাত
দেখে বড় ক্রোধ হয়
প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে উঠি—যাও, চলে যাও।

অরণ্যদেব

দিন কয়েক বাদেই ফিরব...
শুভেচ্ছা.....
ফুলের তোড়া!

শুভেচ্ছা...
শুভেচ্ছা..
শুভেচ্ছা...

অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন...
ওঁরা দুজনে গেলেন কোথায়?
কীলাউয়ির সোনা-বেলায়!

পৃথিবীর এটি সুন্দরতম জায়গা!
আমার পূর্বপুরুষেরা এখানেই তাঁদের বিয়ের রাত কাটিয়েছেন।
আমরাও কি ঐতিহ্য অনুসরণ করব?

ঐতিহ্যটা কী?
প্রথমে সমুদ্রস্নান!

তারপর বালিতে গড়ানো।
?

আরে, সারা শরীর যে চকচক করছে!
তার কারণ, এই বালির আধাআধি হচ্ছে খাঁটি সোনা!

সপ্তম অরণ্যদেবকে সম্রাট জুনবায় এই জেডপাথরের ঘরটি দিয়েছিলেন..
বলো কী? তারপর, বলে যাও...

রমণীরতন নির্মল চট্টোপাধ্যায়

অল্প ভ্রূ কুঁচকে অংশু হাতের পোস্টকার্ডখানার দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়িতে ঢুকবার মুখে অভ্যাসবশেই লেটার বকসের দিকে তাকিয়েছিল। দেখল ভেতরে পোস্টকার্ডখানা গড়ানে আকাশের মত হেলে আছে। ডালা খুলে বার করে নিল অংশু। বড়দার নামে চিঠি। বেহালা থেকে লিখেছেন জনৈক যোগেশ চৌধুরী।

পোস্টকার্ডের চিঠি। দেখব না দেখব না করেও পড়া হয়ে গেল। আর পড়তে পড়তেই লজ্জায় ক্ষোভে রাগে অংশুর ভেতরটা রি রি করে জ্বলে যেতে লাগল। কন্যাদায়গ্রস্ত যোগেশ চৌধুরী খুদে খুদে অক্ষরে পোস্টকার্ড ভরিয়ে ফেলেছেন আবেদন নিবেদনে। মাস দুয়েক হল তাঁর মেয়েকে দেখে এসেছে এ বাড়ির লোক, কিন্তু আজ পর্যন্ত পছন্দ অপছন্দ কোনো কিছু জানিয়েই কোনো চিঠি পান নি তিনি। চার পাঁচখানা চিঠি দিয়েছেন এর আগে, কিন্তু জবাব পান নি কিছু। তিনি বৃদ্ধ অথর্ব প্রায় চলৎশক্তি রহিত, নচেৎ সশরীরে এসে খবর নিয়ে যেতেন। পরিশেষে লিখেছেন, "নিজের সন্তান বলিয়া অহংকার শোভা পায় না, আমার কন্যা অদিতি প্রকৃতই রমণীরত্ন বিশেষ। এই রত্ন যে ঘরে স্থান পাইবে, সেই ঘরই উজ্জ্বল আলোকিত হইবে। এখন আপনি যদি এই অক্ষম কন্যাদায়গ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে কৃপা করিয়া—"

ভ্রূ কুঁচকে অংশু পোস্টকার্ডখানার দিকে তাকিয়ে রইল। তার জানা নেই এক এই অভিশপ্ত বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও শুধুমাত্র কন্যাসন্তান জন্মদানের অপরাধে কোনো পিতাকে এই হীনতা এতখানি গ্লানি সইতে হয় কি না—। অথচ সভ্যতা সংস্কৃতির কত অহংকার কত বড়াই বাঙালী হিসেবে।

অংশু জানে, এই মেয়ে দেখাদেখির ব্যাপারে গার্জেন হিসেবে বড়দার নামটাই শুধু স্থান পায় শিরোশোভা হিসেবে, আসলে যা কিছু করার করে বউদিরাই। বউদিদের মধ্যে আবার সেজ বউদি হচ্ছে দলের পাণ্ডা। খবরের কাগজে পাত্রপাত্রী বিভাগে বিজ্ঞাপন দেওয়া, জবাব ধরে ধরে বড়দার বেনামীতে চিঠিপত্র চালাচালি, তারপর বেনারসী গয়নাগাঁটিনা পরে মোটর গাড়ি [illegible]

করতে যাওয়ার মত মেয়ে দেখতে যাওয়া—এ সব কিছুরই প্রধানা উদ্যোক্তা হলেন সেজ বউদি।

সুতরাং, চিঠিখানা হাতে নিয়ে অংশু সরাসরি একেবারে সেজ বউদির ঘরে গিয়ে হাজির হল। সে ঘরে তখন ক্যারম জমে উঠেছে। একদিকে মেজ বউদি আর সেজ বউদি, আর একদিকে ছোট ভাই অঞ্জন আর ভাগনে সন্তু। সেজ বউদির ক্যারমের হাত দারুণ, মেজ বউদি তেমনই ওঁচা। প্রায়ই সেজ বউদি স্টিম লঞ্চ হয়ে মেজ বউদিকে গাধাবোটের মত টেনে নিয়ে যায়।

কুঞ্চিত ভ্রূ অংশু পোস্টকার্ডখানা সেজ বউদির প্রায় নাকের কাছে বাড়িয়ে ধরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "এর মানে কি!"

নাক বাঁচানোর তাগিদে প্রথমে মুখখানা পাশের দিকে সরিয়ে নিল সেজ বউদি ফলে তার নাকের হিরেটা ঝলমলিয়ে উঠল। তারপর অপাঙ্গে চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ স্বরে বলল, "ও আবার বুঝি সেই যোগেশ চৌধুরীর চিঠি—"

"তার মানে?"

"এই নিয়ে বোধ হয় পাঁচখানা চিঠি এল। তাই না মেজদি—"

মেজ বউদিও নিরাসক্তভাবে বলল, "তা হবে।"

"তা হবে—" তিড়বিড়িয়ে উঠল অংশু, "তা চিঠি লিখে ভদ্রলোককে তোমাদের মতামতটা জানিয়ে দিতে কি হয়েছে। এভাবে কাউকে হ্যারাস করা হোক আমি চাই না—"

"ধীরে রজনী, ধীরে—" ফর্সা পেলব হাতখানা তুলে সেজ বউদি বাধা দিল, "কে বলল তোমাকে যে আমরা আমাদের মতামত—মানে অমত জানিয়ে চিঠি দিইনি—"

"দিয়েছ?"

সেজ বউদি নাকের হিরেতে আলো ঝলসিয়ে বলল, "একবার নয় গো মশাই, তিন তিনবার জবাব দিয়েছি। তারপরও যদি যোগেশ চৌধুরী মশাই একই কাঁদুনি গেয়ে বারবার চিঠি লেখেন, তা হলে আর কি করতে পারি বল।"

একটু যেন চুপসে গেল অংশু। অন্তত প্রাথমিক সেই উত্তাপ এবং জ্বর যেন নেমে গেল অনেকটা। বরং ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকতে লাগল তার কাছে। পোস্টকার্ডখানা হাতে নিয়ে একটু হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল সে।

সেজ বউদি বলল, "কি গো। অমন ফিউজ হয়ে গেলে কেন ঠাকুরপো। বস না, একটা গেম খেলবে। একটা নিল গেম। খেলে বেশ সাফ হয়ে যাবে মাথাটা—।"

সেজ বউদির এই সব ঠাট্টা তামাসা শুরু হলেই অংশু ভয় পায়। রূপসী এবং রসিকা হিসেবে সেজ বউদি তুলনাহীনা। বিয়ের সময় ছিল বেতের মত পাতলা ছিপছিপে। ইদানীং আয়েসে আদরে স্থূলতার দিকে অভিযাত্রিণী। কিন্তু তাতে করে সেজ বউদির রূপের রহস্যময়তা বেড়েছে বই কমেনি। যার পেছনে লাগে একেবারে অতিষ্ঠ করে দেয় তাকে—। অংশু পোস্টকার্ডখানা হাতে নিয়েই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে জলস্রোতের শব্দের মত দুই বউদির খিলখিল হাসি।

ব্যাপারটা রহস্যময় নিঃসন্দেহে। বেহালার যোগেশ চৌধুরী নামক মানুষটিকে চেনে না অংশু, তার নারীকুল-রত্ন কন্যা অদিতি রূপেগুণে কেমন তাও সে জানে না। কিন্তু অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারে এক বৃদ্ধ পিতার পক্ষে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার সুবিপুল ব্যাকুলতা। তা সত্ত্বেও কিন্তু ব্যাপারটা দুর্বোধ্য এই কারণে যে, সেজ বউদির কথা মত তিন তিনবার অসম্মতিজ্ঞাপক পত্র যোগেশ চৌধুরী পেলেন না কেন! ঠিকানার গোলমাল? আর একবার পোস্টকার্ডখানা খুঁটিয়ে দেখল অংশু। পোস্টকার্ডের মাথায় ডানদিকে স্পষ্ট অক্ষরে ঠিকানা লেখা রয়েছে। সেজ বউদি প্রতিবারই কি ঠিকানা লিখতে ভুল করেছে?

পাত্র হিসেবে অংশুর এখন বাজার দর খুব চড়া। পাসটাস করে ব্যাংকের অফিসার হয়েছে। বউদিরা বিয়ের জন্য ঝুলোঝুলি করছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। শুধু রাজী হওয়ার অপেক্ষা। রাজী হয়ে অংশু যেন একটা বল ছুঁড়ে দিয়েছে তিন বউদির কোর্টে। আর সংগে সংগে শুরু হয়ে গেছে সেই বল নিয়ে তিন বউদির মধ্যে লোফালুফি খেলা। রাজী হতে গিয়ে একটা শর্তই আরোপ করেছিল অংশু। মেয়ে পছন্দ হলে দেনাপাওনা নিয়ে কোনো রকম চাপ দেওয়া চলবে না কন্যাপক্ষের ওপর। বিয়েটাকে আর যাই হোক দোকানদারীর পর্যায়ে নামিয়ে আনতে রাজী নয় সে।

আর এই শর্তটাই তিন বউদিদের হাতে যুগিয়েছে অতিরিক্ত অতি মারাত্মক এক অস্ত্র। যেহেতু দাবিদাওয়াটা তুচ্ছ বিবেচ্য শুধু মেয়ের রূপ গুণ, তিন বউদি যেন তিন সব্যসাচী বনে গেছে রাতারাতি। দু হাতে খারিজ আর নাকচ করে দিয়ে যাচ্ছে শতেক মেয়ে, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না তাদের কল্পনার সেই তিলোত্তমাকে।

অথবা বউদিরা বুঝি এত সহজে মিটিয়ে ফেলতে চাইছে না ব্যাপারটা। বিগত তিন মাস ধরে যেন এক উৎসবের হাওয়া বইছে বাড়িতে। শনি রবিবার হলেই বিকেলে ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলা, আর সেই গাড়ি দাবড়ে চষে ফেলা কলকাতা শহর—বেহালা বেলেঘাটা পাকপাড়া নাকতলা—উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম। মাঝে মাঝে কলকাতা ছাড়িয়ে চলে যায় বালী উত্তরপাড়া বা জয়নগর মজিলপুর। এ যেন কোনো শিশুর টুকে টুকে সন্দেশ খাওয়া। ফুরিয়ে ফেলতে মন চায় না।

প্রথম প্রথম বউদিরা অংশুকেও তাদের এই সাপ্তাহিক মেয়ে দেখার প্রমোদ ভ্রমণে সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিল। হেসে যোড় হাত করেছিল অংশু, "মাপ কর সেজ বউদি। ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ডে আমাকে বাদ দাও। আমি বরং থার্ড রাউন্ড কি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলব—।"
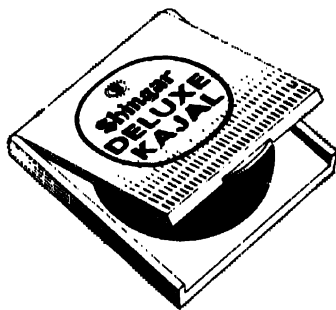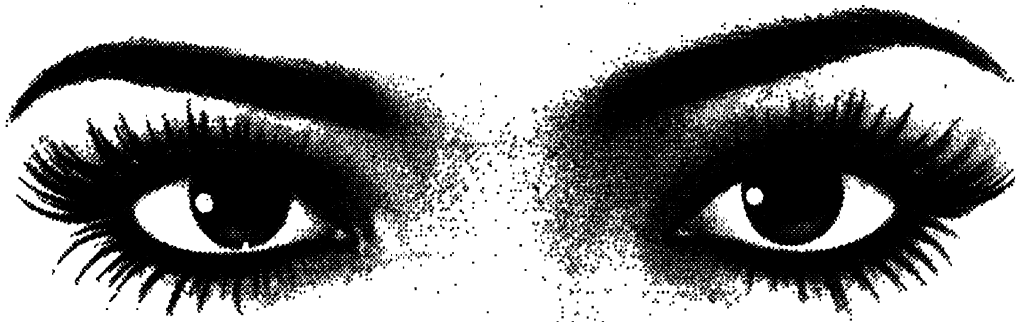
ফেলেছিল। পুরুষগুলোকে বিশ্বাস নেই। ওদের চক্ষুলজ্জা বেশী, মনও নরম, কে কোথায় হয়তো হাত পা আঁকড়ে ধরবে, আর রাজী হয়ে গিয়ে বউ করে ঘরে এনে তুলবে এক খেঁদি কি পেঁচিকে।

সুতরাং, গত তিন মাস ধরে মহাসমারোহে এবং ধুমধামের সংগে বউদিদের মেয়ে দেখা পর্ব চলছে এবং অংশুও চালিয়ে যাচ্ছে তার স্বাভাবিক জীবন অফিসের পর নির্ভেজাল আড্ডা দিয়ে এবং রবিবার ও ছুটির দিনে সিনেমা থিয়েটার দেখে। যথেষ্ট ভরসা আছে তিন বউদির কৃপায় এইভাবেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে আরো বেশ কিছু দিন।

বস্তুত যোগেশ চৌধুরীর এই চিঠিই যেন অংশুকে নতুন করে সচেতন করে তুলল। সে যে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে এবং সেই রাজী হওয়াকে কেন্দ্র করে চলছে একটা আয়োজন—এ কথাটা বুঝি ভুলেই গিয়েছিল সে। এখন যোগেশ চৌধুরীর চিঠিখানা হাতে নিয়ে অংশুর মনে হচ্ছিল এ বাবদে একটা কিছু করা দরকার। যেভাবেই হোক যোগেশ চৌধুরীকে জানিয়ে দেওয়া উচিত, তাদের অসম্মতির কথাটা। এভাবে একজন অথর্ব অশক্ত বৃদ্ধকে মিথ্যে আশায় ঝুলিয়ে রাখাটা শুধু অশোভন এবং অসংগতই নয়, অন্যায়ও।

কিন্তু কি করতে পারে অংশু? সেজ বউদির কাছে ঘেঁষতে সাহস হয় না। তার ঠাট্টা বিদ্রূপ যে কোন দিকে বাঁক নিয়ে কিভাবে আক্রমণ হানবে বোঝা দায়। আর ঐ মেয়েলী ঠাট্টা ইংগিত ইশারা—কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে অংশু। সামাল দিয়ে উঠতে পারে না। তার চেয়ে যদি সে নিজে একখানা চিঠি লেখে?

কিন্তু সে চিঠিও যে যোগেশ চৌধুরীর হস্তগত হবে এমন স্থিরতা কোথায়! আগের তিনখানার মত এ চিঠিরও যে সেই একই অনির্দিষ্ট পরিণতি হবে না এমন নিশ্চয়তা কে দেবে! অথচ যোগেশ চৌধুরী নামক বৃদ্ধটিকে একেবারে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও পারছে না অংশু। তা হলে কি করা যায়—

হঠাৎই যেন বিদ্যুৎ চমকের মত উপায়টা মাথায় খেলে গেল অংশুর। বেহালা এমন কিছু হিল্লি দিল্লি দূরদূরান্ত নয়, ঠিকানাও লেখা আছে পোস্টকার্ডের মাথায়! আসছে কাল রবিবার সে যদি নিজে গিয়েই—

বাড়ির নম্বরের সংগে পোস্টকার্ডে লেখা নম্বরটা আর একবার মিলিয়ে নিশ্চিত হল অংশু, তারপর কড়া নাড়বে কি নাড়বে না এই দ্বিধায় একটু দুলতে লাগল। ঝোঁকের বশে চলে এসেছে এতখানি, রাস্তা খুঁজে নম্বর খুঁজে নির্দিষ্ট বাড়িও বার করেছে। কিন্তু এখন যেন কেমন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে অংশু, আর ভরসা পাচ্ছে না সেই অচেনা অদেখা যোগেশ চৌধুরী নামক বৃদ্ধের মুখোমুখি হতে।

ছোট একতলা বাড়ি। সারা জীবনের সঞ্চয় খুইয়ে তার ওপর বেশ কিছু অতিরিক্ত ধার দেনার ভার মাথায় নিয়ে, শুধুমাত্র নিজের একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই হল, এই চরিতার্থতার বশবর্তী হলে যেমন হয় তেমনই বাড়ির চেহারা। পলেস্তারা লাগান হয়নি পুরো, রঙ লাগানো হয়নি দরজা জানলায়—। অংশু সংশয়পীড়িত হাত রাখল সদর দরজার কড়ায়।

বার দুয়েক নাড়তেই ভেতর থেকে দরজার খিল খোলার আওয়াজ ভেসে এল। কড়া নাড়া থামিয়ে অংশু মনের সমস্ত সাহস জড়ো করে নিয়ে এল এক জায়গায়। দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল বছর দশ বারোর একটি কিশোর।

"কাকে চাই?"

ছেলেটিকে দেখে একটু যেন ভরসা পেল অংশু, "এটা ত যোগেশ চৌধুরীর বাড়ি?"

"হ্যাঁ।—" ছেলেটি বলল, "কিন্তু বাবা তো বাড়ি নেই। কি দরকার বলুন—"

যোগেশ চৌধুরী বাড়ি নেই শুনে বিপন্ন বোধ করল অংশু। এত দূর এল, অথচ যে জন্য আসা সেই কাজটাই হবে না। আবার মনের খুব ভেতরে কোথায় যেন একটু খুশি খুশি ভাবের হাওয়া বইতে লাগল। যাক, সেই বৃদ্ধের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাটা তিরোহিত হয়েছে।

ছেলেটি আবার বলল, "কিছু বলতে হবে বাবাকে?"

অংশু একবার ভাবল এই ছেলেটির কাছেই তাদের অমতের সংবাদটা গচ্ছিত রেখে চলে যায়, যথাসময়ে পৌঁছে যাবে যোগেশ চৌধুরীর কাছে। কিন্তু দ্বিধা হল একটু। ছেলেটি যদিও যথেষ্ট চালাকচতুর ও সপ্রতিভ, তবু তার বয়স এবং চেহারা যেন খবরের গুরুত্বের তুলনায় অপরিণত ও কম দায়িত্বশীল বলে মনে হচ্ছিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে অংশু বলল, "একটু দরকার ছিল ওঁর সংগে। একটা বিশেষ খবর দেওয়ার ছিল।"

ছেলেটি বলল, "আপনি না হয় ঘুরে আসুন একটু। খুব দেরি হবে না বাবার ফিরতে।"

অংশু আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলা দেখল। শেষ বিকেলের ম্লান আলো দিনের গায়ে ময়লা চাদরের মত জড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা আসন্ন। এখন সে এই অপরিচিত অঞ্চলে একা একা কোথায় ঘুরে বেড়ায়। কিভাবে কাটায় কিছুটা সময়।

ছেলেটি চতুর নিঃসন্দেহে। অংশুর মুখে ফুটে ওঠা অনিচ্ছা অসহায়তাটুকু তার নজর এড়ালো না এবং ভুলও হল না তার যথার্থ অনুবাদে। হঠাৎ সে বলে উঠল "আপনি এক মিনিট দাঁড়ান। আমি আসছি—"

বলেই সে ঘুরে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

এক মিনিটও নয়। বোধ হয় আধ মিনিট, আর অংশু জীবনের সেই চূড়ান্ত চমকটা অনুভব করল, যে অনুভব অধিকাংশ মানুষের জীবনেই কদাচ আসে না, কচিৎ কারো কারো জীবনে আসে, আর যখন আসে, সে যেন আসে বন্যার মত—সব কিছু স্রোতের মুখে কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়ে [illegible] আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে, জীবনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে নাড়িয়ে ধ্বসিয়ে দিয়ে—। নগ্ন পায়ে এগিয়ে এসে সে সামনে দাঁড়াল, কিন্তু দৃষ্টিতে নেই কোনো অকারণ সংকোচ বা ব্রীড়া। সরল সহজ দৃষ্টি মুখের ওপর সরাসরি স্থাপন করে কুণ্ঠাহীন মৃদু স্বরে বলল সে, "খুব দরকারী কথা হলে আমার কাছে বলে যেতে পারেন। বাবা তো বাড়ি নেই।"

ওর এগিয়ে আসা সামনে দাঁড়িয়ে ঐ অতি সাধারণ কথা কটা উচ্চারণ—সময়ের অতি ভগ্নাংশের মধ্যেই সব কিছু ঘটে গেল, অথচ অংশুর অনুভবে সে যেন এক অনাদি অখণ্ড মহাকাল। যেন সময়ের শুরু থেকে দাঁড়িয়ে আছে সে, অপেক্ষা করে আছে, আর ও এগিয়ে আসছে অংশুর দিকে ধীরে ধীরে, যেন সময়ের ঢেউ-এ ভেসে ভেসে—। আর অংশুর মুগ্ধ দুই চোখের দৃষ্টি যেন ভ্রমর হয়ে উড়ে গিয়ে ওর মুখের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাজা গৌর গাত্রবর্ণ, বাঁশির মত টিকোলো নাক, কপালটি তুলনায় একটু বেশী প্রশস্ত ও উঁচু—কিন্তু তার দরুনই মুখের চেহারায় আরোপিত হয়েছে এক অপার্থিব ব্যক্তিত্ব, গড়ানে চিবুকের নীচে একটি ছোট ভাঁজ—। যেন কত দিনের চেনা, নির্ভর করা যায় অক্লেশে।

অকূলে কূল পাওয়ার মত অংশু বলে উঠল, "আপনিই অদিতি। তাই না—"

সুঠাম ভ্রূ দুটিতে একটু বিস্ময় ঘনাল অদিতির। বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু—"

বলেই বুঝেছিল অংশু নিতান্ত বোকার মতই বলা হয়েছে কথাটা। কোনো বাতিল পাত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে যে বাতিল করা হয়েছে এই বার্তা দিতে এসে কণ্ঠস্বরে এই খুশীর আমেজ ও আত্মীয়তার সুর একেবারেই বেমানান। তাড়াতাড়ি বলল সে, "আমি বালিগঞ্জ ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস থেকে আসছি। আপনার বাবাকে একটা খবর দেওয়ার ছিল। যদিও চিঠি দেওয়া হয়েছে এর আগে। বোধ হয় সে চিঠি পাননি উনি—"

তলাকার ঠোঁটের কোণা কামড়ে ধরে কি যেন একটু ভাবল অদিতি, কপালে ফুটে উঠল চিন্তার একটি দুটি সূক্ষ্ম ভাঁজ, যেন চকিতে মনস্থির করে নিয়ে সে বলল, "আপনি ভেতরে এসে একটু বসুন—" তারপর একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বলল অদিতি, "ভালই হয়েছে বাবা বাড়ি নেই। আপনাকে গোটা কয় কথা বলতে চাই আমি।"

অদিতির কণ্ঠস্বরে মৃদু অনুরোধ। কিন্তু তাই যেন অকাট্য হুকুম অংশুর কাছে, অমান্য করার কোনো জোই নেই। সে অদিতির পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে ঢুকল এবং নির্দিষ্ট ঘরের নির্দেশিত চেয়ারটিতে বসল চুপচাপ।

অদিতি প্রশ্ন করল, "আপনি চা খাবেন তো এক কাপ?"

ব্যস্তসমস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল অংশু, "না, না। চায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। চা-টা-এর জন্য ব্যস্ত হবেন না আপনি।"

হাসল অদিতি। ছোট সোনার ঘণ্টা বাজার মত মৃদু মিষ্টি আওয়াজ হল সে হাসিতে। একবারই। অপর একখানা চেয়ারে বসে অদিতি বলল, "আপনাকে চা খাওয়ানোর জন্য মোটেই ব্যস্ত নই আমি। আর টা-এর তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, পাত্র পক্ষ বাড়িতে এলে পাত্রী পক্ষ চা-টা এর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে যে কারণে, সেই কারণটাই তো এখানে অনুপস্থিত। তবে বাড়িতে অতিথি এলে এক কাপ চা অফার করাটা রেওয়াজ—। আপনি যদি না খান—"

অংশুর মনে হচ্ছিল, অদিতি যেন ইচ্ছে করেই আঘাত দিয়ে বলছে কথাগুলো। আর সে জন্য মনে মনে একটু যেন অভিমান হচ্ছিল অংশুর। খুব নিকটজনের কাছ থেকে অযাচিত আঘাত পেলে যেমন হয়। আহত মুখখানা নামিয়ে অংশু চুপ করে বসে রইল।

ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা। অদিতি তাকিয়েছিল অংশুর আনত মুখের দিকে। শান্ত নির্বিরোধী ভালমানুষ ভালমানুষ মুখের চেহারা। অথচ বোকা হাবা ধরনের নয়। বুদ্ধি ও অনুভূতির দীপ্তিতে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। তার মধ্যে আবার কেমন যেন অসহায়—। ছোট ভাই বাদল একবার মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল কয়েক বছর আগে। ঘণ্টা কয়েক খোঁজাখুঁজির পর যখন খুঁজে পাওয়া গেল, মেলার অফিসের নিঃসংগ কাঠের চেয়ারে বসে থাকা বাদলের মুখে সেদিন এমনি একটা ভাব দেখেছিল অদিতি। দেখলেই বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে, ঢেউ ভাঙে ছলাৎ ছলাৎ—

হঠাৎ অদিতি বলে উঠল, "আপনি আমাকে মাপ করুন। আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি কথাটা।"

চোখ তুলে চকিত দৃষ্টিপাতে অংশু দেখল অদিতিকে, "না, না। আপনি তো ঠিকই বলেছেন।"

হাসল অদিতি। এবারে নিঃশব্দে। শুধু অংশু দেখল যেন তির্যক কিরণ সম্পাতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল প্রত্যুষের ধরিত্রী। অদিতি বলল, "সব ঠিক কথাই কিন্তু বলা ঠিক নয়।"

এবারে অংশুও যেন একটু সাহসী হয়ে উঠেছে। বলল, "তবু বলা ভাল। তাতে অনেক ভুল ও মোহের অবসান হয়।"

"কিন্তু তাতে নির্লজ্জ ও ঠোঁটকাটা বলে অপবাদ রটে।"

"রটুক। সেটুকু ঝুঁকি নিয়েও মিথ্যেকে চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।"

একটু চুপ করে রইল অদিতি। তারপর তার পাতলা ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল একটু বিদ্রূপের ধারাল হাসি, "সেই ভালটুকু করতেই বুঝি আপনি ছুটে এসেছেন আজ বালিগঞ্জ থেকে?"

"তার মানে?"

"শুনুন—" সহসা অদিতির কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, সেই সংগে সামান্য তীক্ষ্ণ, "আমরা কথার খেলা খেলতে শুরু করেছি। এর একটা নেশা আছে। কিন্তু এতে করে চাপা পড়ে যাচ্ছে আসল কথাটাই। যে জন্য আমি [illegible]

অংশু বলল, "এবারে বলুন সেই কথাটা।"

একটু চুপ করে রইল অদিতি। যেন নিজেকে গুছিয়ে নিল ভেতরে ভেতরে। তারপর বলল, "আপনাদের পাঠানো অপছন্দ ও অমতের সব ক'খানা চিঠিই আমরা —মানে আমি পেয়েছি। কিন্তু বাবা পাননি। যার জন্য বাবার ধারণা আপনারা মতামত জানিয়ে চিঠি দেননি এখনও। হয়তো মনস্থির করতে পারছেন না, হয়তো হাতে রেখে সন্ধান করছেন আরো ভালো মেয়ে—"

"কিন্তু কেন?"

"আপনাদের চিঠি আমিই দেখাই নি বাবাকে। লুকিয়ে ফেলেছি। ঐ চিঠি পেলে খুব আঘাত পাবেন বাবা। কেন জানি না, বাবার খুব ধারণা হয়েছিল এখানে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। ভেতরে ভেতরে বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমার বিয়ের জন্য। শরীর ভেঙে পড়েছে। কবে কি হয়ে যায় কিছু ঠিক নেই। তার আগে আমাকে পাত্রস্থ করতে পারলে উনি খুব নিশ্চিন্ত হতে পারেন।"

এমনভাবে কথাগুলো বলে গেল অদিতি যেন সে নিজের কথা বলছে না। বলছে কোনো তৃতীয়জনের কথা। বলা হয়ে গেলে অংশু দেখলে অদিতির দু চোখে প্রগাঢ় বিষাদ। সে যেন সরাসরি তাকাতে পারছিল অদিতির মুখের দিকে। নিজেকে একটু পাষণ্ড দুর্বৃত্ত বলে মনে হচ্ছিল নিজের। সেই সঙ্গে রাগ হচ্ছিল বউদিদের ওপর। না জেনে না বুঝে কি যে এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে বউদিরা! ছেলেবেলায় পড়া কথামালার গল্পের কথা মনে পড়ছিল। একের পক্ষে যা নিতান্তই ক্রীড়া, অপরের কাছে তাই জীবন মরণের প্রশ্ন—

অদিতি যেন আপন মনেই বলতে শুরু করল আবার, "আমি অবশ্য অনেক বুঝিয়েছি বাবাকে অকারণ ব্যস্ত না হতে। বিয়ে না হলেই মেয়েরা ভেসে যেত যে যুগে সে যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। নিজেকে এবং একটিমাত্র ছোট ভাইকে নিয়ে সৎ এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট যোগ্যতা আছে আমার কিন্তু বাবা আমল দেন না আমার কথায়। ও'র দোষ নেই। ও'র পক্ষে আর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পালটে আধুনিক হওয়া সম্ভব নয়—"

অংশু বলল, "আমি আমার বাড়ির তরফ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। এত সব আমরা কিছুই জানতাম না—"

বাধা দিয়ে অদিতি বলল, "না। আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। ক্ষমা চাওয়ার কোনো কারণই নেই। মেয়ে অপছন্দ হওয়াটা কিছু অপরাধ নয়। যদিও আমার বাবার ধারণা তার মেয়ে লাখে এক—"

অংশু অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "রমণীরত্ন।"

চকিতে অংশুকে কঠিন দৃষ্টিপাতে বিদ্ধ করল অদিতি। সে দৃষ্টিতে রোষ। তীব্র কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ। আমি জানি বাবা ঐ শব্দটা তাঁর চিঠিতে ব্যবহার করেন। ঠাট্টা আপনি করতে পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন সব পিতার চোখেই তাঁর সন্তান একটি রত্ন বিশেষ। স্নেহের স্বভাবই এই—"

থতমত খেয়ে চুপ করে রইল অংশু। চুপ করে রইল অদিতিও। কিন্তু তার নীরবতা উত্তেজনার তীব্রতাবশত। চুপ করে থাকা সত্ত্বেও থেকে থেকে তার নাকের পাটা দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস বইছে ঘন ঘন, আর সেই তালে তালে বুকের ভরন্ত দুই ঢেউ উঠছে নামছে উঠছে নামছে—।

"আমি আপনাকে ঠাট্টা করতে চাইনি—।" আত্মরক্ষার প্রবল তাগিদে কথা ক'টা উচ্চারণ করল অংশু। আর কিছু বলতে পারল না। বলতে পারল না যে সে যা বলেছে তা তার হৃদয়ের সুগভীর থেকে উৎসারিত অতি সত্য এক অনুভূতির অক্ষম ভাষারূপ। শুধু অংশুর মুখে ফুটে উঠল সেই বেদনাচিহ্ন, যার শিল্পীর নাম অকৃত্রিম সততা ও নিষ্ঠা—

দেবী দুর্গার চোখের মত অদিতির দুই টানা টানা বিশাল চোখ খানিকক্ষণ অংশুর মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে এল তার রাগ এবং উত্তেজনা। চোখ সরিয়ে নিয়ে মেঝের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে অদিতি বলল, "আপনি এখন যান। আমার যা বলার ছিল বলা হয়ে গেছে শুধু একটা কথা।। হয়তো আরো কয়েকখানা চিঠি আপনারা পাবেন বাবার কাছ থেকে। তাতে কোনো গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। এক সময় আপনিই বাবা বুঝতে পারবেন। তত্তদিনে সয়ে যাবে ব্যাপারটা। আঘাতটা খুব বেশী হবে না। আপনার কাছে এইটুকুই আমার অনুরোধ। মিনতিও বলতে পারেন—" শেষের দিকে অদিতির কণ্ঠস্বর যেন হঠাৎ বুজে এল।

আর ততক্ষণে অংশু তার অস্তিত্বের অণু পরমাণু থেকে আঁতি পাঁতি করে শেষ বিন্দু সাহসটুকু পর্যন্ত কুড়িয়ে এনে জড়ো করেছে। সাহসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে বর প্রার্থনা করছে সে আকুলভাবে: আমায় শক্তি দাও, সাহস যোগাও—। অস্তিত্বের সেই সংকট ক্ষণে সে এখন সমুপস্থিত, যখন সাহসীরাই বিজয়ী হয়, বীরের কণ্ঠেই দোলে বরমাল্য, ওষ্ঠাধরে বিরাজ করে সাফল্যের তৃপ্তি ও শান্তি, দুই হাতের পাঞ্জায় ধরা পড়ে জীবন-অশ্বের বল্গা—যেমন চালাও তেমনি চলবে ঐ অশান্ত অবাধ্য দুরন্ত তুরঙ্গম। আর যে ভীরু, যে কাপুরুষ—সে ঘৃণিত অবহেলিত পরন্ত পরিত্যক্ত চিরকালের জন্য ভূলুণ্ঠিত। জীবনের নিষ্ঠুর নির্বিকার রথচক্রের তলে নির্মমভাবে পিষ্ট ও দলিত।

চেষ্টাকৃত হালকা স্বরে বলল অংশু, "কিন্তু আমার পক্ষে তো এখন যাওয়া সম্ভব নয়—"

একটু যেন চমকে অংশুর দিকে তাকাল অদিতি। মুক্তোর মত দুটি জলবিন্দু তখনও আটকে আছে দু চোখের তটে, "কেন?"

এতক্ষণ তো আপনার কথাই শুনলাম। আমি কি বলতে এসেছি একবারও তো জানতে চাইলেন না।"

"অনেক জানাই অজানা হয়ে যায়। অনেক খেলাই শুরু হয় খেলা ভেঙে নতুন করে।"

"তার মানে?"

একটু চুপ করে রইল অংশু। তারপর গাঢ় আন্তরিক স্বরে বলল, "আমি যাওয়ার আগে আমাদের মত জানিয়ে যেতে চাই। অমত নয়—"

অদিতি নীরব নিস্পন্দ। একটুও নড়ল না। যেন নিষ্কম্প দীপশিখা। অথচ তার ভিতরে একটা ভূমিকম্প হচ্ছে। ভেঙেচুরে যাচ্ছে অনেক তৈরী বাঁধ, ঠাঁই নাড়া হয়ে যাচ্ছে কত মতামত ও সংস্কার। "কিন্তু আপনি তো অমত জানাতেই এসেছিলেন—" ক্ষীণ স্বরে বলল অদিতি।

"সে এসেছিলাম আপনার দরজা পর্যন্ত। যখনই দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে এলাম অমত আমার মত হয়ে গেল।"

অদিতি অতি কষ্টে বলল, "কিন্তু আপনার মত বা অমতে কি এসে যায়। যাঁরা আগে এসেছিলেন তাঁদের লিখিত অমতের কাছে আপনার মতের মূল্য কি। তাঁদের অমতটাই তো সব—"

"না। তাঁদের অমতটা কিছু নয়। আমার মতটাই সব। কেন না—" একটু থেমে অংশু বলল, "বিয়ে আমি করব। তাঁরা নয়—।"

কয়েক পলক স্থির হয়ে বসে রইল অদিতি। তারপর "আমি আসছি—" বলে উঠে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার আগে হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকার চকিতে অপসৃত হল নিষ্করুণ আলোর প্রহারে।

গুম মেরে বসে রইল অংশু। এতক্ষণে সে ঘামতে শুরু করেছে। কথার এত জারিজুরি মারপ্যাঁচ—এসব তার একেবারে আসে না। যার জন্য সেজ বউদিকে চোরকাঁটার মত এড়িয়ে চলে সে। তাছাড়া কোনো অজানা অচেনা তরুণী মেয়ের সঙ্গে এক নাগাড়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলা—এব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি অংশু।

নিতান্ত মরিয়া হয়েই সে আজ করল এসব। আসলে অংশু একজন অতি ভীতু মানুষ। ভীরু যেমন নিরুপায় ক্ষেত্রে মরিয়া হয়ে অতিরিক্ত সাহসী হয়ে ওঠে, সেও তেমনি আজ মরিয়াভাবেই অদিতিকে জানিয়ে দিল তার মতের কথা মনের কথা। না জানিয়ে উপায় ছিল না। কারণ যে মুহূর্তে সে দরজার ফ্রেমে আঁটা একখানা ছবির মত অদিতিকে দেখতে পেয়েছিল, সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছিল—এই মেয়েই তার নিয়তি, তার ভবিষ্যৎ, তার জীবন অথবা মৃত্যু। একে অবজ্ঞা বা অতিক্রম করে যাওয়ার কোনো উপায়ই নেই আর—।

অথচ বউদিরা এই মেয়েকেই অপছন্দ করেছিল। ভেতরে ভেতরে বিস্ময়টা কাজ করছিল অনেকক্ষণ ধরেই। এখন একা একা একটু গুছিয়ে ভাবতেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। অদিতির মুখে ব্যক্তিত্ব আছে চরিত্র আছে, চরিত্রে তেজ আছে অহংকার আছে। দীপ্তি আছে—মেয়েদের মধ্যে এসব গুণ দোষ হয়ে ওঠে অন্য মেয়ের চোখে। বউদিরা তার জন্য খোঁজ করছে এক রাজকন্যার। অক্ষম চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পীর আঁকা নারী প্রতিকৃতির মত। নিখুঁত নিশ্চরিত্র নিষ্কলঙ্ক সুন্দর! অদিতি কি বউদিদের পছন্দ নয়, কেননা সে রাজপুত্রী নয়। কিন্তু রমণীরত্ন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এল অদিতি। বোধহয় চোখে মুখে জল দিয়ে এল। কারণ তার মুখে এখন এক সদ্যস্নাত বিধৌত পবিত্রতা। সেই ফুল্ল মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বড় দীন হীন অযোগ্য বলে মনে হতে লাগল অংশুর নিজেকে। সে তাকিয়ে রইল।

সেই দৃষ্টির সামনে যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠল অদিতি। এই প্রথম। তাড়াতাড়ি বলল সাদামাটা গলায়, "কিছু বলবেন—"

"না।—" অংশু বলল, "আমার বলা শেষ। শুধু একটা কথা—। আমরা এই মতের কথাটা আপনার বাবার কাছে বলবেন। আর—"

অদিতি দুই ভ্রূতে কৌতূহল ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল।

"আর, আপনার নিজেরও ত একটা মতামত আছে।..." একটু [illegible] করে রইল অংশু। তার বুক কাঁপছিল সংশয়ে ভয়ে, "যদি আমার সেই সৌভাগ্য হয় যে আপনার অমত নেই, তবে আপনার বাবাকে বলবেন যেন দু ছত্র লিখে দেন আমার নামে। তা হলে—"

চোখে চোখ রেখে অদিতি বলল, "তা হলে—"

"তা হলে আমি চতুর্দোলা সাজিয়ে নিয়ে এসে হাজির হয়ে যাব তৎক্ষণাৎ।" হাসির ছলে কথা ক'টা বলে গেল অংশু। কিন্তু চোখে চোখ রেখে অদিতি দেখল অংশুর চোখে মুখে কি দীনতা কি আকুলতা অনুনয় প্রার্থনা, মিনতি: প্রসন্ন হও, দয়া কর দেবী বর দাও—।

চকিতে চোখ নামিয়ে নিয়ে নিতান্ত কেজো গলায় অদিতি বলল, "আপনি একটু বসুন। বাবা রোজ বিকেলে একটু পার্কে গিয়ে বসেন। আসার সময় হয়ে গেল। আপনি নিজের মুখেই বলে যাবেন কথাটা। বাবা খুশী হবেন। আমি বরং আপনার জন্য এক কাপ চা করে নিয়ে আসি—"

দরজার দিকে পা বাড়াল অদিতি। দু পা এগিয়েছে খুব দুঃসাহসে ভর অংশু ডাকল, "অদিতি—"

অদিতি থমকে দাঁড়াল। যেন মন্ত্রবলে পাথর হয়ে গেছে। কাঁপা গলায় সাড়া দিল, "বলুন।"

মৃদু নরম গলায় অংশু বলল, "তুমি কি আমাকে চা খাওয়ানোর জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, অদিতি—"

অদিতি এপাশ ফিরল। চোখের দিকে তাকাল। হাসল। শেষ বর্ষার রৌদ্রস্নাত ধরিত্রীর মত স্নিগ্ধ কোমল সলাজ হাসি। নাকটা অল্প কুঁচকে জবাব দিল, "খুব নয়। একটু—"

বলেই অদিতি ব্যস্ত লঘু পায়ে প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ ১১ ॥

সমস্ত বাড়ি তছনছ করে পুলিসের গাড়ি শব্দ করে ফিরে গেল। ওরা চলে গেলে বাড়িটা আচমকা নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন। কোথাও কোন শব্দ নেই, পিসীমার পাশে অনি গা-ঘেঁষে বসে, সরিৎশেখরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু তিস্তার চরে একগাদা শিয়াল নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এই রাত্রে, এখন, জলপাইগুড়ি শহরটা চুপচাপ ঘুমিয়ে। অনিমেষ প্রিয়তোষের কথা ভাবছিল, কাকা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই। কাকাকে খুঁজতে পুলিসরা চারধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। কাকা তো কাউকে হত্যা করেনি, চুরি করেনি কিন্তু পুলিসগুলোর মুখ দেখে মনে হল সেরকম খারাপ কিছু কাকা করেছে। এখন কাকা কোথায়? কাকা কেন স্বর্গছেঁড়ায় পালিয়ে যাচ্ছে না। স্বর্গছেঁড়ায় কোনদিন পুলিস যায় না, কাকা সেটা ভুলে গেল কি করে!

এমন সময় শব্দ করে বাইরের দরজাটা বন্ধ হল। বিদ্যাসাগরী চটির শব্দটা এঘরের দরজায় এসে থামল। অনি তাকিয়ে দেখল দাদুর চোখে চশমা নেই, কেমন রোগা লাগছে মুখটা। অদ্ভুত শূন্য-গলায় সরিৎশেখর বললেন, 'বুঝলে হেম, এই শুরু হল, আমাকে আরো যে কত দেখে যেতে হবে।'

হেমলতা খুব ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

চিৎকার করে উঠলেন সরিৎশেখর, 'তোমার ভাই কম্যুনিস্ট হয়েছে, আমার গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে।'

হেমলতা বললেন, 'কম্যুনিস্ট? সে আবার কি?'

সরিৎশেখর বললেন, দেশ উদ্ধার করছেন, আমরা যে এতদিন পর স্বাধীনতা পেলাম তাতে বাবুদের মন উঠছে না, সারা দেশ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। মেরে হাড় ভেঙে দেবে জওহরলাল। আমি এসব বরদাস্ত করব না, একটা মাতাল লম্পটকে তাড়িয়েছি, এটাও যেন কোনদিন বাড়িতে না ঢোকে। এই ছেলের জন্য এত রাত্রে আমাকে হেনস্থা হতে হল!'

হেমলতা বললেন, 'প্রিয় আবার কবে ওসব দলে ভিড়ল।'

সরিৎশেখর খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তোমারই তো দোষ, নিজের ভাই কি করছে খেয়াল রাখতে পার না।'

হেমলতা উত্তেজিত হলেন, 'আমার ভাই কিন্তু আপনার তো ছেলে।'

সরিৎশেখর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলে চললেন, 'তখন যদি গুদামবাবুর মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতাম তাহলে আর এই দুর্ভোগ হত না। তুমিই তো তখন খ্যাক খ্যাক করছিলে।'

হেমলতা কোন জবাব দিলেন না। প্রিয়তোষের ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঠিক। কিন্তু গুদামবাবুর মেয়ে তপুকে বাড়ির বউ হিসাবে মাধুরীর পাশে তিনি ভাবতেই পারেন না।

এমন সময় সরিৎশেখর অনিমেষের দিকে তাকালেন, 'তুমি এত রাত্রে জেগেছিলে কেন?'

অনিমেষ ভয়ে ভয়ে দাদুর দিকে তাকাল। রাগলে দাদুকে ভয়ংকর দেখায়। কি বলবে ভাবতে না ভাবতেই সরিৎশেখর ধমকে উঠলেন, 'কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দাও না কেন?' ভাগ্যিস হেমলতার একটা হাত ওর পিঠের ওপর ছিল নইলে সে কেঁদে ফেলত। সরিৎশেখর এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রিয়তোষ কি এসেছিল?' চট করে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, হ্যাঁ। প্রথম থেকেই এইরকম একটা সন্দেহ করছিলেন সরিৎশেখর কিন্তু নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে এখন হতবাক হয়ে গেলেন। পুলিস অফিসারটা যখন ধমকাচ্ছিল তখন অনিমেষ একথা স্বীকার করেনি তো। এইটুকু শিশু—! সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে ডাকনি কেন?'

বিড় বিড় করে অনিমেষ বলল, 'আমাকে শব্দ করতে মানা করেছিল কাকা। আমার মন খারাপ লাগছিল।'

'কেন?'

'কাকার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, জামা-কাপড় ময়লা।'

'হুম্। কি করল সে?'

'বইপত্র নিয়ে চলে গেল।'

'কি বই?'

'অনেক বই। একটার নাম মার্কসবাদী।'

'ও'! সর্বনাশ তাহলে অনেক ভেতরে গেছে। কি বলল?'

'আমি সব কথা বুঝিনি, শুধু একটা কথা মনে আছে—এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

'ছাই হ্যায়।' চিৎকার করে উঠলেন সরিৎশেখর, 'সব জেনে বসে আছে, আজাদীর তোরা কি বুঝিস রে! নেতাজীকে গালাগালি দিস, রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দিস, ক্ষুদিরাম-বাঘাযতীন—এঁদের কথা ভুলে যাস—ননসেন্স।' হঠাৎ অনির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এসব একদম বাজে কথা, তুমি কান দিও না।'

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তার মনে পড়ল ঐ বালকটি আঠারো বছর বয়সে জেলে যাবে। বুকের ভিতর দুরমুশ শুরু হয়ে গেল ওঁর—কি জানি—আজ রাত্রে তার বীজবপন হয়ে গেল কি না। ওর দিকে নজর রাখতে হবে ওকে নিজের মত করে গড়তে হবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সরিৎশেখর দেখলেন পায়ে পায়ে অনিমেষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ওর হাঁটার ধরন দেখে খুব অবাক হলেন সরিৎশেখর। খুব শান্ত গলায় নাতিকে ডাকলেন তিনি, 'কিছু বলবে?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। তারপর সরিৎশেখরের একদম কাছে এসে পেটের ওপর প্যান্টের ভাঁজ থেকে সেই নীল চিঠিটা বের করে দাদুকে দিল। অবাক্ হয়ে চিঠিটা নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন সরিৎশেখর, টেবিলের ওপর রাখা চশমাটা তুলে সেটা পড়লেন। অনেকক্ষণ বাদে ডাক এল অনিমেষের, 'তুমি এটা কোথায় পেলে?'

'কাকার সুটকেসে।'

'পড়েছ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, হ্যাঁ।

চোখ বন্ধ করলেন সরিৎশেখর, 'কিছু বুঝেছ?'

ভয়ে ভয়ে অনি ঘাড় নাড়ল, না।

'যাও। শুয়ে পড়। প্রিয়তোষ যদি কখনো আসে আমাকে না বলে দরজা খুলবে না।'

চলে যেতে যেতে অনিমেষ দেখল দাদু আলমারীর ভেতরে চিঠিটা রেখে দিয়ে তালা বন্ধ করছেন।

হঠাৎ অনির মনটা তপু পিসীর জন্য কেমন করে উঠল।

স্কুলের প্রথম বছরে অনিমেষের স্বর্গছেঁড়ার যাওয়া হয়নি। মহীতোষ ওখানে অত বড় কোয়ার্টারে একা আছেন ঝাড়িকে নিয়ে। সেই রান্নাবান্না করে সংসার সামলায়। গরমের ছুটিতে বা পুজোর সময় সরিৎশেখর ভেবেছিলেন নাতিকে পাঠাবেন কিন্তু মহীতোষই আপত্তি করেছেন। ওখানে গেলে মাধুরীর কথা বারংবার মনে হবে অনিমেষের। হেমলতার হয়েছে মুশকিল, হাজার দোষ করলেও নাতিকে বকামারা চলবে না, সরিৎশেখরের হুকুম। মহীতোষ দুদিন ছুটি থাকলেই শহরে চলে আসেন কিন্তু ছেলের সঙ্গে ইচ্ছে থাকলেও মিশতে পারেন না ঠিকমত। কোথায় যেন আটকে যায়। এইটুকুনি ছেলে একা একা শোয়, একা একা বাগানে ঘোরে, খি গম্ভীর দেখায়। পড়াশুনায় রেজাল্ট ভালই হচ্ছে হেডমাস্টারমশাই সরিৎশেখরকে বলেছেন, হি ইজ একসেপশনাল, অত্যন্ত ভাবুক। জলপাইগুড়ি শহরে কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপারে আর তেমন হইচই হচ্ছে না। কংগ্রেসের মিছিল বেরুচ্ছে ঘনঘন। প্রিয়তোষের খবর পাওয়া যায়নি আর। মহীতোষের এক ক্লাসমেট জলপাইগুড়ি থানায় পোস্টেড হয়ে এল, সেও কোন খবর দিতে পারল না। পরিতোষ আসামে এক কাঠের ঠিকাদারের কাছে সামান্য মাইনেতে কাজ করছে এ খবর মহীতোষ পেয়েছেন। যে খবর এনেছে সে পরিতোষের এক নেপালী বউকে নাকি দেখেছে। খবরটা বাবাকে জানাতে পারেননি মহীতোষ। বড়দার কথা শুনলেই বাবার মেজাজ চড়ে যায়।
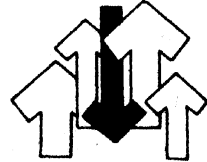
হেমলতা জলপাইগুড়িতে আসার পর হঠাৎ বেড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই অম্বল হচ্ছে আজকাল, কিছু খেলে হজম হয় না ঠিক। সব কাজ শেষ করে খেতে খেতে চারটে বেজে যায়। সেই সময় অনিমেষ আসে পিসীমার আলোচালের ভাত নিরামিষ তরকারী দিয়ে খেতে ও খুব ভালবাসে। সরিৎশেখরের সন্দেহ অনিমেষের সঙ্গে খাবার জন্যেই হেমলতা চারটের আগে খেতে বসা হয় না। অনেক বকাবকি করেছেন, কোন কাজ হয়নি। নিজের হাতে রান্না সেরে সরিৎশেখরকে খাইয়ে, সমস্ত বাড়ি ঝেড়ে মুছে বাসন মেজে তবে নিজের নিরামিষ রান্না শুরু করবেন হেমলতা। একটু পিটপিটে স্বভাব আগেও ছিল সরিৎশেখর লক্ষ করেছেন ইদানীং সেটা আরো বেড়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা জল ঘেঁটে ঘেঁটে দু' পায়ের আঙুলের ফাঁকে সাদা হাজা বেরিয়ে গেছে অনিমেষের মুখে সরিৎশেখর সদ্য সেটা জানতে পারলেন। বিকেলে যখন ওরা মুখোমুখি খেতে বসে সে দৃশ্য বেশ মজার। পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসে অনিমেষ, হেমলতা অত বড় ছেলেটাকে ভাত তরকারি মেখে গোল্লা পাকিয়ে দিয়ে নিজে মাটিতে উবু হয়ে বসে খাওয়া শুরু করেন। প্রায় একই সংলাপ দিয়ে খাওয়া শুরু হয় রোজ, সরিৎশেখর চুরি করে শুনেছেন। অনিমেষ বলে, 'মাকে তুমি ফ্রক পরে দেখেছ?'

হেমলতা খেতে খেতে বললেন, 'পনের বছরের মেয়ে ফ্রক পরবে কি! তবে বিয়ের আগের দিনও নাকি হাফপ্যান্ট... ঘোমটা দেয়নি। তোর দাদু যখন দেখতে গিয়েছিল তখন ওর বাবা খুব ভুজং দিয়েছিল—এ রাঁধতে পারে সেই রাঁধতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! বিয়ের পর আমি শেখাতাম আর তোর দাদু জানতো মাধুরী রেঁধেছে তবে খুব চটপট শিখেছিল।'

'মা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, না?'

'মুখটা খুব মিষ্টি ছিল তবে ভীষণ মোটা হাড়-টাড়গুলো কি, একহাতে ধরা যায় না। মাথায় চুল ছিল বটে, হাঁটুর নীচ অবধি নেমে আসতো। দু' হাতে চুল বাঁধতে হিমসিম খেতে হত। একদিন রাগ করে অনেকটা কেটে দিলাম।'

এক সুকোমল সাথী
কোমল আর মোলায়েম
স্যানিটারী টাওয়েল

আপনার স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে সুরক্ষা।

"মা মোটা ছিল?" অনিমেষের গলায় বিস্ময়।

"হুঁ। বাবার তো ঐরকমই পছন্দ ছিল। আমার প্রথম মায় নাকি পাহাড়ের মত শরীর ছিল। বিয়ের পর আমরা তোর মাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা করতুম। তারপর তুই হতে কেমন রোগা রোগা হয়ে গেল।"

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ, দুজনে কথা না বলে খেয়ে যায়। বিকেলে অনির এই ভাত খাওয়াটা একসময় পছন্দ করেন না সরিৎশেখর। কিন্তু মেয়ের জন্য কিছু বলতেও পারেন না। অনেক কিছু এখন মেনে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। সরিৎশেখর বুঝতে পারছেন তাঁর পুঁজি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এতদিন চা-বাগানে চাকরীতে মাইনে ছাড়া বাড়তি কোন উপার্জন করেননি। বিলাসিতা ছিল না তাই জমানো টাকার বেশির ভাগ দিয়ে এই বাড়িটা তৈরি করার পর হাতে যা আছে তাতে মাত্র কয়েক বছর চলতে পারে। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল, ইচ্ছে করলে এই শহরে কোন দেশী চা-বাগানের হেড অফিসে একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আর গোলামি করতে প্রবৃত্তি হয় না। চা-বাগানের ইতিহাসে এতদিনে পেন্সনের ব্যাপারটাই ছিল না। রিটায়ার করার পর অনেক লেখালেখি করে কলকাতা থেকে তাঁর জন্য পঁচাত্তর টাকার একটা মাসিক পেন্সনের অনুমতি আনিয়েছেন। সরিৎশেখরের ধারণা তাঁর চিঠির চেয়ে বিলেত থেকে মিসেস ম্যাকফার্নের সুপারিশ বেশী কাজ করেছে। মেমসাহেব এখনও প্রতিমাসে তাঁকে চিঠি লেখেন ডিয়ার বাবু বলে। স্বর্গছেঁড়ার জন্য কষ্ট হয় তাঁর, সরিৎশেখরকে তিনি ভোলেননি—এইসব। টানা টানা হাতের লেখা। অনিমেষকে সে চিঠি পড়ান সরিৎশেখর। খামের ওপর ডাকঘরের ছাপ থেকে বিলেত দেশটাকে নাতির কাছে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। মিসেস ম্যাকফার্নন লিখেছিলেন তোমার গ্র্যান্ডসন যখন এখানে ব্যারিস্টারী পড়তে আসবে তার সব খরচ আমার। সরিৎশেখর অনিমেষকে বিলেত পাঠাবেন বলে যখন ঘোষণা করেন তখন সময়ের হিসাব তাঁর হারিয়ে যায়। পেন্সন পাবার পর তাঁর চলে যাচ্ছে একরকম। তিনটে তো প্রাণী, এতবড় বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মহীতোষ তাঁকে টাকা পাঠাতে চেয়েছিলেন প্রতি মাসে, রাজী হননি তিনি। বলেছিলেন তাহলে ছেলেকে হোস্টেলে রাখ। আর কথা বাড়াননি মহীতোষ। টাকার দরকার হলে বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন সরিৎশেখর। প্রচুর লোক আসছে ভাড়ার প্রস্তাব নিয়ে। এতগুলো ঘর খালি পড়ে আছে, কেউ এসে যে থাকবে তারও তো সম্ভাবনা নেই। তবু ভাড়া দেওয়ার কথা চিন্তাই করেন না সরিৎশেখর। এটা তাঁর এক ধরনের আনন্দ। কেউ ভাড়া চাইতে এলে তাকে মুখের ওপর না বলে দিয়ে মেয়ের কাছে এসে বলেন, "বুঝলে হেম, এই যে বাড়িটা দেখছ—এই হল আমার আসল ছেলে, শেষবয়সে এই আমাকে দেখবে।"

এখন প্রতিবছর তিস্তায় ফ্লাড আসে। যেমন ভাবে নিয়ম মেনে বর্ষা আসে শীত আসে তেমনি বন্যার জল শহরে ঢুকে পড়ে। নতুন বাড়িতে ওঠার পর জল আর জিনিসপত্র নষ্ট করার সুযোগ পায় না। শুধু প্রতি বছর সরিৎশেখরের বাগানের ওপর পলিমাটির স্তরটা বেড়ে যায়। এখন দেখলে সরিৎশেখর বুঝতে পারেন দু-একদিনের মধ্যে বন্যা হবে কিনা। এমন কি তিস্তা যখন খটখটে শুকনো, সাদা বালির চরে হাজার হাজার কাশগাছ বাতাসে মাথা দোলায়, যখন ওপরের বার্নিশঘাট অবধি জলের রেখা দেখা যায় না, ভাঙগা ট্যাক্সিগুলো সারাদিন বিকট শব্দ করে তিস্তার বুকে ছুটে বেড়ায়, সেইরকম সময়ে একদিন হঠাৎ মুহূর্তে বোমা ফাটার মত শব্দ ওঠে তিস্তার বুকে আর সরিৎশেখর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিত হয়ে যান কাল ভোরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাবেন তিস্তার শুকনো বালি রাতারাতি ভিজে গেছে। বিকেল নাগাদ হুস করে জল উঠে স্রোত বইতে শুরু করবে। চোখের উপর এই শহরটার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখের উপর অনিকে বড়

পড়ার কথা কখনো বলতে হয় না। আজ অবধি স্যারের কাছ থেকে কোনরকম নালিশ শুনতে হয়নি ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁর ভাবুক অথবা গম্ভীর হয়ে থাকে ছেলেটা। এই বয়সে ওরকম মানায় না। জোর করে বিকেলে স্কুলের মাঠে পাঠাচ্ছেন ওকে, খেলাধুলা না করলে শরীর ঠিক থাকবে কি করে! ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছে ওর শরীর, এই সময় ব্যায়াম দরকার।

অনিমেষ শুনেছিল দাদু সেকালে থার্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলেন। কলেজে যান নি কোনদিন। কিন্তু এত ভাল ইংরেজী বুঝিয়ে দিতে পারেন যে ওদের স্কুলের রজনীবাবু সেকথা বিশ্বাস করতে চাননি। একবার প্রতিশব্দ লিখতে বলেছিলেন রজনীবাবু। অনিমেষ বাড়িতে এসে দাদুকে জিজ্ঞাসা করাতে একটা শব্দের পাঁচটা প্রতিশব্দ পেয়ে গেল। রজনীবাবুর মুখ দেখে ক্লাসে বসে পরদিন অনিমেষ বুঝতে পেরেছিল তিনি নিজেও অতগুলো জানতেন না। ছোট ডিকশনারীতে অতগুলো না পেয়ে রজনীবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোত্থেকে ও এসব লিখেছে? অনিমেষের মুখ থেকে শুনে রজনীবাবু বিকেলে এসে দাদুর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন। ম্যাকফার্নন সাহেব দাদুকে একটা ডিকশনারী দিয়েছিলেন যার ওজন প্রায় দশ সের হবে, অনিমেষ দু' হাতে কোনক্রমে এখন সেটাকে তুলতে পারে। রজনীবাবু মাঝে মাঝে এসে সেটা দেখে যান।
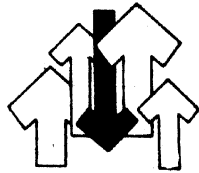
ক'দিন থেকেই বাড়িতে একটা চাপা উত্তেজনা চলছে বুঝতে পারছিল অনিমেষ। দাদু ও পিসীমা যখনই কথা বলেন তখন যদি ও এসে পড়ে হঠাৎ চুপ করে যান ও'রা। মহীতোষ অল্প সময়ের মধ্যে দুবার এবাড়ি থেকে ঘুরে গেলেন। বাবার সঙ্গে ইতিমধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে, এখন ভাল করে কথাও হল না। পিসীমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনিমেষ বেশ বুঝতে পারে তার কাছে কিছু খবর চেপে যাওয়া হচ্ছে। খুব ভাল-ভাবে সেটা পারেন না বলে পিসীমা একটা কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা বলে বসেন আজকাল। সরিৎশেখরের মুখ দেখে তো কিছু বোঝার উপায় নেই।

সেদিন এফ ডি আই স্কুলের সঙ্গে ওদের হকি ফাইনাল খেলা। টিফিনের পর আর ক্লাস হচ্ছে না। স্কুল থেকে তিস্তার পাড় দিয়ে ওদের বাড়ি আসতে কয়েক মিনিট লাগে। বইখাতা থাকলে ভাল করে চেঁচানো যায় না বলে সেগুলোকে বাড়িতে রাখতে এল অনিমেষ। খাঁ খাঁ রোদ্দুর চারধারে। মাঠ পেরিয়ে বাগানের দিকটা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল অনিমেষ। নিঃঝুম হয়ে আছে বাড়িটা। শুধু জলপাই গাছটায় বসে একটা ঘুঘু টেনে টেনে ডেকে যাচ্ছে। বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই ও হেমলতার গলা শুনতে পেল। খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। দরজাটা হাট করে খোলা। সরিৎশেখর ছাড়া আর একজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে ঘরে।

হঠাৎ অনিমেষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল বারান্দায়। তারপর পা টিপে টিপে দরজার আড়ালে চলে এল। ওর মনে হচ্ছিল হেমলতা তাকে যে কথা বলেননি সেকথাই এখন চেঁচামেচি করে বলছেন। অনিমেষ শুনতে পেল দাদু বলছেন, 'এখন আর এসব কথা বলে লাভ নেই।' হেমলতা বললেন 'আমি তো গোড়া থেকে বলে আসছি এ বিয়েতে আমার মত নেই, তাহলে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

হেমলতা বললেন, 'অত বড় একটা ছেলে আছে আর তার বিয়ে করার দরকারটা কি। ও এখনও মাধুরীর কথা ভুলতে পারেনি, শুতে বসতে মাধুরীর কথা জিজ্ঞাসা করে, ও কি একটা নতুন মেয়েকে মা বলে মানতে পারবে?'

সরিৎশেখর বললেন, 'তুমি এসব কথা অনিমেষকে বলেছ নাকি?'

হেমলতা বললেন, 'না, যেন খুব বলার মত কথা যে বলব।'

সরিৎশেখর বললেন, 'কি জানি, যা পেট আলগা তোমার।'

অনিমেষ পাথরের মত দাঁড়িয়ে শুনল তৃতীয় ব্যক্তি কথা বলছে, 'পুরুষমানুষ, সারা জীবন সামনে পড়ে আছে, বিয়ে না করলে মতিভ্রম হতে কতক্ষণ! তোমার বাবাও তো দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন, তাতে তোমাদের অসুবিধার বদলে সুবিধেই হয়েছে। তাছাড়া যে মেয়েটিকে আমি তোমাদের ঘরে এনে দিচ্ছি, তোমার বাবা তো দেখেছেন, একদম লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত চেহারা। আমাদের নদে জেলার মেয়ে এত সুন্দরী হয় না সাধারণত। অবস্থা খুব ভাল নয় বলে ওর বাবা রাজী হয়েছেন। তা তোমার প্রথম ভ্রাতৃবধূকে তো আমি দেখেছি একদম তাঁরই মত স্বভাব, ধীর স্থির, আদৌ উগ্র নয়।'

সরিৎশেখর বললেন, 'হ্যাঁ মেয়েটির সঙ্গে বউমার অনেক মিল আছে।'

হেমলতা বললেন, 'তাহলে আর কি। এইভাবে বারবার বিয়ে করাটাকে আমি ঘেন্না করি। যার সঙ্গে এতদিন ঘর করলাম তার কোন সম্মান নেই? আমার আর কি, যে বিয়ে করছে আর যারা বিয়ে দিচ্ছে তারা বুঝুক, আমাকে আর বলতে আসবেন না।' দুমদুম করে পা ফেলে হেমলতা বাইরে বেরিয়ে এসে চোখে আঁচলচাপা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল অনির, পিসীমা যদি বাঁ দিকে মুখ ফেরাতেন তাহলেই তাকে দেখতে পেতেন। কিন্তু হেমলতার উত্তেজনা অনিকে আড়ালে রেখে দিল। সরে আসতে গিয়ে অনি শুনল সরিৎশেখর বলছেন, 'হেম একটু গোঁড়া। ক'দিন থেকে সমানে ঝগড়া করছে। শচীনকে তো ভাল করে কোনদিন দ্যাখেইনি তবু সে মারা যাবার পর ওকে বিয়ে দিতে পারলাম না। যাক সাধুচরণ, ঐ কথাই রইল, জাঁকজমক করার দরকার নেই। ছেলে হোটেল থেকে বিয়ে করতে যাবে, সেখান থেকে সোজা বউ নিয়ে বাগানে। আশীর্বাদটা বিয়ের দিনেই সেরে নেব।'

তৃতীয় ব্যক্তিটি যে সাধুচরণ এতক্ষণে বুঝল অনিমেষ। 'এ বাড়িতে কোন আয়োজন করবেন না তাহলে?'

সরিৎশেখর বললেন, 'না। আমাদের সময় এক-রকম ছিল, কিন্তু আমার নাতিটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। হেম ঠিকই বলেছে, ওর সহ্য করতে কষ্ট হবে। তাই এ বাড়িতে কোন উৎসব হবে না। সোজা এসে হোটেলে উঠবে মহী, বিয়ের পর স্বর্গছেঁড়ায় ফিরে যাবে।'

সাধারণ কি একটা বলতেই চেয়ারের ক্যাঁচ শব্দ অনির কানে এল। চট করে সে দৌড়ে বাগানে নেমে এল। দাদু বা সাধুচরণ বাইরে আসার আগেই ও পেয়ারা গাছতলায় এসে পড়েছে। এখন গাছপালায় বাগান ভরাট হয়ে আছে। সরিৎশেখর প্রায়ই ছেঁটে-ছুটে পরিষ্কার করান চোরের ভয়ে কিন্তু সামান্য বৃষ্টি হলেই যে কে সেই। এই ভরদুপুরে মাথার ওপরের ঠা ঠা রোদ গাছের পাতার আড়ালে রেখে অনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বারান্দা থেকে অনিকে ওরা কিছুতেই দেখতে পাবে না।

বাবা আবার বিয়ে করতে চাইছেন, বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু ওঁরা খবরটা চেপে রাখছেন কেন? পিসীমা বললেন বাবার আবার বিয়ে করাটাকে উনি ঘেন্না করেন। পিসীমা চাইছেন না যে বাবা বিয়ে করুন। দাদু চাইছেন, সাধুচরণ চাইছেন। কিন্তু অনি সহ্য করতে পারবে না বললেন কেন? বাবার বিয়ের সঙ্গে তার সহ্যের কি এসে যায়! আজ অবধি সে কখনও স্বর্গছেঁড়ায় ফিরে যায়নি, এখানে এই পরিবেশে দাদু পিসীমার সঙ্গে বেশ তো চলে যাচ্ছে ওর, আর অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আকাশের দিকে তাকালে মায়ের সঙ্গে দিব্যি কথা বলা যায়। মা তো এখানেই মারা গিয়েছেন, স্বর্গছেঁড়ায় তো নয়। ওখানে বাবা একা আছেন, রান্নাবান্না অসুখ-বিসুখ—এসবে বাবার বউ বাবাকে দেখবে, সেটাই তো ভাল। এটা ভাবতে তার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না। বাবা যদি তাঁর বউকে নিয়ে স্বর্গছেঁড়ায় থাকেন তাহলে সে আপত্তি করবে কেন? অনিমেষের মনে হল বাবা অনেক দূরের লোক, তাঁর কোন ব্যাপারই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। কিন্তু বাবার বউ—তাকেও কি মা বলে ডাকতে হবে? চট করে মাধুরীর মুখটা মনে করল অনিমেষ, মা, মাগো! বুক থেকে একটা কান্নার দলা চট করে সমস্ত শরীরে হাজারটা হয়ে গড়িয়ে গেল, 'না আমি আর কাউকে মা বলতে পারব না।' ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল রান্নাঘরে গিয়ে পিসীমার পাশে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু হঠাৎ ও মত পালটে ফেলে গম্ভীর মুখে বারান্দায় উঠে এসে ব্যাগটা নিজের ঘরে রেখে আবার বেরিয়ে এল। সরিৎশেখর আর সাধুচরণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা দেখলেন অনি আবার বাগানের মধ্যে নেমে যাচ্ছে। সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছুটি হয়ে গেল নাকি? কোথায় চললে?'

কোনরকমে মাথা দুলিয়ে অনিমেষ জবাব দিল, 'স্কুলে।' তারপরই হঠাৎ ছেলেটা দৌড়তে শুরু করল। গাছপালার ভেতর দিয়ে বাগানের গেটের দিকে তীরের মত বেরিয়ে গেল ছোট শরীরটা, আর দেখা গেল না। সরিৎশেখর খুব অবাক হলেন অনির এই-রকম করে ছুটে যাওয়ায়। হঠাৎ মনে হল ছেলেটার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব যেন এই মুহূর্ত থেকে বেড়ে যাচ্ছে।

(ক্রমশ)
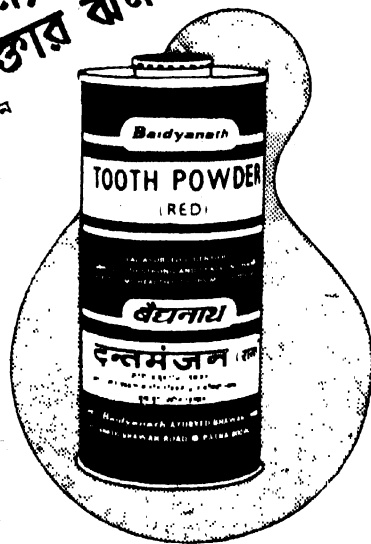
কানের ভিতর দিয়া

জগন্নাথ বসু

এক ভদ্রলোকের কথা বলি। পেশায় কনিষ্ঠ কেরানী, নেশায় দুরন্ত নাটুকে। কোনক্রমে উদরপূরণের জন্য দশটা পাঁচটা সেরে নিয়েই তিনি এ-মঞ্চ থেকে ও-মঞ্চে, উত্তর থেকে দক্ষিণে নাটক দেখে বেড়ান। নাটক শোনার আগ্রহও তাঁর কম নয়—রেডিওর নাটক কবে কখন হয় সব তাঁর মুখস্থ। এমনকি বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপনের রহস্য সিরিজে ডিটেকটিভের চরিত্রে সিনেমার কোন্ নায়কের গলা শোনা যাচ্ছে তাও আগাম বলে দিয়ে বাড়ির ভাইঝিদের তিনি অবাক করে দিতে পারেন। এ হেন নাট্যপ্রেমী ভদ্রলোকটির হঠাৎ সাধ হল রেডিওর কানে শোনা নাটকের অভিনয় স্বচক্ষে দেখে আসবার। একটু চেষ্টা করতেই উদ্যোগী লোকটি আকাশবাণী থেকে স্টুডিও দেখার অনুমতিপত্র পেয়ে গেলেন। কৌতূহল নিবৃত্ত করতে নগদ একটি ক্যাজুয়াল লীভ খরচ করে (রেডিও নাটকের রেকর্ডিং বেশির ভাগই দিনের বেলায় হয়) যথাসময়ে ভদ্রলোক এলেন আকাশবাণীর নাট্যাভিনয় দেখতে। শ্রাব্যনাট্য দর্শনে এলেও ভদ্রলোকের মাথায় কিন্তু তখন হাজরেটা থিয়েটারেরই স্মৃতি ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে নাটকের জন্য নির্ধারিত স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে তিনি কি রকম হকচকিয়ে গেলেন। কাচের আড়ালে প্রযোজকের (ইনিই এখানে নির্দেশক) পাশে বসে তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় একটি বড় মাইক বসানো আর তার দুপাশে জনাকয়েক অভিনেতা-অভিনেত্রী স্ক্রিপ্ট-এর পাতায় চোখ রেখে একমনে অভিনয় করছেন। সহশিল্পীদের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পর্যন্ত তাঁদের নেই। চলাফেরা, অভিব্যক্তি ইত্যাদি যেগুলো সম্বল করে অভিনেতা মঞ্চে চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, এখানে সেগুলো প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে অনুপস্থিত। হঠাৎ ভদ্রলোকের চোখ পড়ল গৃহভৃত্যের ভূমিকাভিনেতার দিকে। স্যুট-টাই চশমা পরিহিত মানুষটিকে দেখলে মনে হবে বিদেশী ফার্মের একজন ডাকসাইটে সেলস এক্সিকিউটিভ। আবার নায়িকার স্লিম সুন্দর চেহারার পাশে নায়কের মেদবহুল শরীর আর মাথাজোড়া টাকটা লক্ষ্য করে ভদ্রলোক বার বার হোঁচট খেতে লাগলেন। আসলে মঞ্চনাটকের দৃশ্যপট আলো, শিল্পীদের হাঁটাচলা, অভিব্যক্তি, রূপসজ্জা, পরিচ্ছদ এ-সব কোন কিছুরই যে প্রয়োজন নেই শ্রুতিনাট্যে, এই ব্যাপারটিই তাঁকে যুগপৎ বিস্মিত ও বিরক্ত করল। থিয়েটারের সংগে বরাবরই তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম, অথচ রেডিওয় এসে থিয়েটারের হরেক জিনিস নেই দেখে মনটা তাঁর খুঁত খুঁত করতে লাগল। রেকর্ডিং-এর পর তিনি প্রযোজককে সোজা প্রশ্ন করে বসলেন, "মশাই, এইসব মাইক্রোফোনস্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট বাদ দিয়ে যদি সরাসরি স্টেজ থেকে রেডিওতে নাটক ব্রডকাস্ট করেন তো ক্ষতি কী?" প্রযোজক কিছু বলার আগেই আপন বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে স্টুডিওর বাইরে বিভিন্ন মঞ্চে পরিবেশিত ক্লাসিকাল গান-বাজনার আসর থেকে সরাসরি বেতার সম্প্রচারের কথা উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন। নাট্যপ্রেমী এই ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে গিয়ে নাট্য-প্রযোজক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কোলকাতার বেতার প্রচারের অতীত দিনগুলো সম্পর্কে শোনা অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে যেতে লাগল তাঁর......আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের জন্ম হয়েছিল উনিশশো সাতাশ খ্রীস্টাব্দের ছাব্বিশে আগস্ট। তখন থেকে উনিশশো উনত্রিশের ডিসেম্বর পর্যন্ত রংগমঞ্চ থেকে রীলে ব্যবস্থা চালু ছিল। রঙমহল, মিনার্ভার পেশাদার নাটক এমন কি ঠাকুরবাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকও রীলে করে শোনান হয়েছে শ্রোতাদের। কিন্তু এই ব্যবস্থা যে যথাযথ নয়—তা কিছু-দিনের মধ্যেই টের পেয়ে গেলেন সেকালের বেতারের কর্মকর্তারা। উনিশশো তিরিশের তেসরা জানুয়ারি বেতার জগৎ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হল "'সাধারণ মঞ্চ থেকে আর কেন রীলে করা হয় না'—এ সম্বন্ধে অভিযোগ করে দু-একজন পত্রাঘাত করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে রীলে করেছি। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেক শ্রোতাই অভিযোগ জানিয়েছেন। তাছাড়া সন্ধ্যায় প্রোগ্রামের জন্য যতটুকু সময় নির্দিষ্ট আছে—সাধারণত অভিনয় হয় তার চেয়ে বেশি সময়। অভিনয়ের খানিকটা শ্রুত ও খানিকটা অশ্রুত থাকলে রসভঙ্গ হয় বড্ড বেশী। এছাড়া অভিনয়ের সংগে সংগে প্রেক্ষাগৃহের অন্যান্য আওয়াজও মাইক্রোফোনের মারফৎ শ্রোতার কানে পেঁ'ছে সমস্ত ব্যাপারটা যে অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই জানা আছে।" কি মশাই কিছু বলুন, সম্বিৎ ফিরল প্রযোজকের। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন, দেখুন আপনি তো থিয়েটারের দর্শক। একথা নিশ্চয়ই জানেন এক একজন অভিনেতা বিশেষ নাট্যমুহূর্ত গড়তে মাঝে মাঝে কি রকম দীর্ঘ Pause নেন—ভদ্রলোক প্রযোজকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ পেশাদার মঞ্চের একজন অভিনেতাকে ইমোশানাল সীনে আমি একবার কুড়ি সেকেণ্ড 'পজ' নিতে দেখেছিলাম"— প্রযোজক : "তবেই ভাবুন ওই একই ব্যাপার যদি রেডিওতেও ঘটে তাহলে কি আপনার মনে হবে যে আপনার সেটটি বিগড়েছে। কিংবা একটু পরেই শুনতে পাবেন মধুরকণ্ঠের ঘোষণা 'যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত।' এরপরও ধরুন আছে প্রমটারের পার্টের কিউ ধরিয়ে দেওয়া, হাসির হুল্লোড় আর করতালিতে পরবর্তী সংলাপের নিমজ্জিত হওয়া এমনি হাজারটা সমস্যা—তাই বলছিলাম দয়া করে থিয়েটারের সংগে একে গুলিয়ে ফেলবেন না। মঞ্চের নাটকের মত এখানেও এক্সপোজিসন থেকে ক্লাইম্যাক্স, ক্যাটাসট্রোফী পর্যন্ত সবকটি সিঁড়ি পেরোনোর দায় যদিও থাকে শ্রুতিনাট্যের, তবু এ অন্যতর শিল্পমাধ্যম। বরং বিদেশী সমালোচকের বিশেষণটা মেনে নিয়ে

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রযোজিত পুরোনো দিনের বেতার নাটক 'ম্যাকবেথ'এ অহীন্দ্র চৌধুরী ও সরযূবালা দেবী

ভদ্রলোক একেবারে চুপ। ঠোঁটের কোণে অপ্রস্তুত হাসি দেখলে মনে হবে ঈষৎ লজ্জিত। প্রযোজক তখন বলে চলেছেন, "আসলে কি জানেন, শ্রুতিনাট্যের নাট্যকারকে মঞ্চের নাট্যকারের মত ইউনিটি অব্ 'টাইম' বা 'প্লেস' নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। তাঁর সামনে কল্পনার অর্গল সবসময় খোলা। কোন চরিত্র একটি পরিবেশে কথা বলছে মুহূর্তে তাকে অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা তাঁর আছে। পৌরাণিক কোন যুদ্ধের দৃশ্য, শান্তি সম্মেলন, দশ হাজার লোকের সমাবেশ, একাকী একটি যন্ত্রণার্ত মানুষের স্বগত সংলাপ আবার চন্দ্রলোকে তুষারঝড়, ক্ষুধার্ত সেপ্টোপাসের সাঁই সাঁই শব্দ, দরজাহীন নরকের ঘর—এইসব সাধারণ, অ-সাধারণ ব্যাপার অবলীলায় লিখে যেতে পারেন শ্রুতি-নাট্যের নাট্যকার, মঞ্চসজ্জাকর, আলোকশিল্পীর মুখের দিকে না তাকিয়েই।" ভদ্রলোক বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু প্রযোজক সেদিকে কর্ণপাত করলেন না..."আপনাকে সার্ত্রের একটা নাটক 'Huis clos' থেকে উদাহরণ দিয়ে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। নরকের একটি দরজাহীন ঘরে তিনটি চরিত্র চিরকালের মত নিমজ্জমান। বলাই বাহুল্য থিয়েটারে এই ব্যাপারটি যথাযথ উপস্থিত করতে নির্দেশক সেট, আলো প্রভৃতি আংগিকগত কলাকৌশলের আশ্রয় নেবেন। অথচ রেডিওর সে সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে অ্যাকোয়াস্টিক অর্থাৎ ধ্বনিগত কলাকৌশলের বিশৃঙ্খলতায় পেঁাছে রেডিওকে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। আটঘাট-হীন চতুর্দিক বন্ধ ঘরে কথা বললে ঠিক যেমনটি শোনায় সেই রকম এফেক্ট এখানে এনে দিতে হবে রেকর্ডিং এডিটিং-এর কুশলতায়। মঞ্চে অভিনয় চলতে চলতে চরিত্রদের সংলাপে কিন্তু ওই যথাযথ অ্যাকোয়াস্টিক প্রয়োগ অসম্ভব। আসলে শ্রুতিনাট্য একান্তভাবেই শ্রবণ আর মননের। শ্রোতার কল্পজগতের অবাধ স্বাধীনতা একমাত্র বেতারনাটকই দিতে পারে। থিয়েটারের মত বাস্তব গাছের আদলে কার্ড-বোর্ডের তৈরী গাছ, গোলাপগুচ্ছ না থাকলেও অনুভবের তৈরী অনেক সত্যতর দৃশ্যপট থাকে বেতারে—যা চোখে দেখা না গেলেও অনুভবের পরতে পরতে তৈরী বলেই অনেক বেশী স্পষ্ট আর সত্য। অর্থাৎ শ্রোতাকে একটিমাত্র ইন্দ্রিয়—শ্রবণকে ব্যবহার করতে হয় বলে অনেক কিছু গড়ে নিতে হয় মনসমঞ্চে নিজের মত করে। ফলে, নাটকের খেলাটা চলে কানের ভেতর দিয়ে গিয়ে মর্মে।

[illegible]

ধরুন ছেলেবেলায় ফেলে আসা কোন নদীর সঙ্গে আপনার জীবনের কিছু সুখ-স্মৃতি জড়িত। এখন যদি কোন ফিল্মে বা থিয়েটারে একটি বিশেষ নদীর ছবি দর্শকদের সঙ্গে উপস্থিত করা যায়ও তবু তা আপনার নস্ট্যালজিক নদীর সঙ্গে কিছুতেই মিলবে না। আসলে ওই বিশেষ দৃশ্যপট আপনার চিত্তপটে আঁকা নদীটিকে কিছুতেই সামনে আনতে দেবে না। বরং শ্রুতিনাট্যে নদীর শান্ত কুলকুল আর সংলাপের ক্যানভাস আপনাকে মুহূর্তে ওই ছেলেবেলার সিকোয়েন্সে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলবে। এমন কি সে ছবি শ্রোতাভেদে পৃথক হলেও আপত্তি নেই।' ভদ্রলোক এমনিতেই রেডিওর নাটক শুনতে ভালবাসতেন—তার ওপর এইসব নানান তথ্য শুনতে পেয়ে উৎসাহী লোকটি দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখে প্রযোজকের মনে হ'ল আরও কিছু শুনতে চাইছেন তিনি।...শ্রুতিনাট্যের সংলাপ রচনায় নাট্যকারকে বাড়তি সচেতন থাকতে হয়। কারণ বেতার নাটকের সংলাপ মঞ্চনাটকের তুলনায় বেশি চিত্রধর্মী আর স্পষ্ট হওয়া উচিত। না হলেই শ্রোতার কল্পনার পৃথিবী অস্পষ্ট হয়ে যাবে। অমনোযোগী হয়ে পড়বেন শ্রোতা। মঞ্চে 'চোখ' যে কাজ করে শ্রুতিনাট্যে 'সংলাপ'কে সেই দায়িত্বের বহন করতে হয়। এখানে 'সংলাপ' শব্দের সাহায্যে শুধু ছবিই দেখায় না মঞ্চের দৃশ্যপট, আলো, পরিচ্ছদ আর অ্যাকশন বা ঘটনাবলীর চেহারাটাও শ্রোতার সামনে তুলে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। রেকর্ডিং-এর পর এডিটিং-এর ঘরেই একটি শ্রুতিনাট্য পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। সাধারণত সংলাপ-এর সঙ্গে পরিপূরক ধ্বনি আর আবহসুর মেশানোর কাজটা হয় শিল্পী-দের অভিনয় রেকর্ডিং-এর পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদনা কক্ষে।"

দীর্ঘ সময় কথা না বলে অন্যের কথা শোনার অভ্যেস ভদ্রলোকের বাল্যকাল থেকেই নেই তাই আবার মুখ খুললেন তিনি, "থিয়েটারের ওই ব্যাপারগুলো রেডিওর নাটকে কিভাবে আনা হয় একটু বলবেন কি..." 'নিশ্চয়ই।' প্রযোজকের উত্তর। 'কিন্তু তার আগে চলুন ক্যান্টিন থেকে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক্।' ভদ্রলোক ঘাড় কাত করে এমন একটা 'বিজনেস' করলেন যাতে বেশ বোঝা গেল এতে তাঁর মোটেই আপত্তি নেই।...চা ও টা পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করে আবার শুরু করলেন প্রযোজক।

"এই দেখুন এটি একটি বহু পুরোনো রেডিওর স্ক্রিপ্ট, 'কানু কহে রাই' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী থেকে বেতাররূপ দিয়েছিলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। অন্তত বছর কুড়ি আগে এটি ব্রডকাস্ট হয়েছিল। এই স্ক্রিপ্ট থেকে দু একটা জায়গা শুনলেই আপনি বুঝবেন 'রেডিও নাটক' কোন কৌশলে দৃশ্যপট, আলো আর চরিত্রের পোশাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত মূর্ত করে তোলে।" তিনি পড়তে শুরু করলেন—

"[দূরাগত বাঁশের বাঁশীতে সান্ধ্য আলাপ ভেসে আসে। একটু পরে তার সঙ্গে মেশে ক্রমাগ্রসরমান মোটরকারের শব্দ। সে শব্দ ক্রমশ কাছে এসে পড়ে। একটানা মোটর চলার শব্দ। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে গাড়ির ভিতরের মোটরগুঞ্জন]

সতী—[সহসা, সোৎসুকে] আচ্ছা দিদিভাই।

মমতা—বল্। শুনতে পাচ্ছি।

সতী—কী ভাববে বল তো?

মমতা—কে কী ভাববে?

সতী—এই—মানে—লোকে যদি কেউ দেখে আর কি এখন আমাদের।

মমতা—কেন? ভাববার আবার কী আছে এতে?

সতী—নেই?

মমতা—কী আছে তা বল্ না?

সতী—ছোটনাগপুরের বাইরে ধু ধু নির্জন রাস্তা। সময়—শীতান্তের অপরাহ্ণ-বেলা। বেলা—ক'টা হ'ল রে?

মমতা—সাড়ে চারটে—

সতী—বেলা সাড়ে চার। [কবিত্ব করে] রাস্তার দুপাশে অসমতল জঙ্গল। কোথাও ঘন, কোথাও বিরল। দূরে সার সার পাহাড়ের নৈবেদ্য। আহা।

মমতা—তারপর।

সতী—রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে একটা মোটরকার। এখানে নেই ট্র্যাফিক-পুলিসের হাতছানি, নেই সিগন্যাল-লাইটের চোখ রাঙানী। তাই কার ছুটেছে কখনও ষাট কখনও আট মাইল স্পীডে।

মমতা—তাতে কার কী?

সতী—মোটরে আরোহী নেই। শুধু দুটি আরোহিণী।

মমতা—পরিচয়?

সতী—একজন পরিপূর্ণ যৌবনা। বয়স এখেনে শোনবার কেউ নেই তাই স্পষ্ট বলছি—এই পঁচিশ ছাব্বিশ। চোখে গগল্স, পরনে কাশ্মীরী পশমের শাড়ি ব্লাউজ। ইনিই চালিকা।"

স্ক্রিপ্ট থেকে মুখ তুলে মৃদু হেসে আত্মতৃপ্তিসহ প্রযোজক বললেন, "তাহলে দেখুন ধ্বনিব্যঞ্জনায় 'গাড়ির ভিতরের মোটরগুঞ্জন' আর সংলাপে দৃশ্যপটের বিকল্পে 'ছোটনাগপুরের ধু ধু নির্জন রাস্তা', আলোর বিকল্পে 'শীতান্তের অপরাহ্ণ বেলা' এমন কি নায়িকার বয়স, কেতাদুরস্ত পোশাকটা পর্যন্ত আপনি দেখতে পেলেন—কি অস্বীকার করবেন? ভদ্রলোক সে কথার কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সদ্য খেয়ে আসা ব্রেইজ্‌ড্ কাট্‌লেটের একটা সশব্দ ঢেঁকুরে বাধা পেয়ে তিনি বললেন, 'সরি তারপর বলুন'। প্রযোজক : 'আর একটা ব্যাপার হচ্ছে মঞ্চে নাট্যকার মূল দ্বন্দ্বের আভাস দেন অন্তত নাটক শুরু হওয়ার দশ মিনিট পরে। তাঁর সর্বদা ভয়—দেরীতে আসা দর্শককুলকে নিয়ে। তাঁর সদাই বিশ্বাস—একেবারে অসহ্য না লাগলে গোটা নাটকটা না দেখে দর্শক প্রেক্ষাগৃহ

শ্রুতিনাট্যের রেকর্ডিং-এর সময়ে স্ক্রিপ্টএ সতর্ক দৃষ্টি রেখে নাট্যপ্রযোজক হাতের ইশারায় শিল্পীদের নির্দেশ দিচ্ছেন

সংশ্লিষ্ট নাট্যগোষ্ঠির আমন্ত্রিত দর্শক হবার দায়।' মঞ্চের দর্শকের মত বেতার শ্রোতার কিন্তু সেরকম কোন দায় নেই। নাটকের শুরুটা চিত্তাকর্ষক না হলে যে কোন সময় রেডিও বন্ধ করে দেবার অধিকার তাঁর আছে। তাই ছোট গল্প আর একাঙ্ক নাটকে যেমন শুরু থেকেই আসল ঘটনার আঁচটুকু অনুভব করা যায় শ্রুতিনাট্যেও তেমনি শুরু থেকেই নাটক শুরু হতেই হয়। নাহলে শ্রোতা দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজকর্ম কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন। আচ্ছা প্রশান্ত চৌধুরীর একটা রেডিও প্লে 'শাস্তি'র শুরুটা আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি...

"[হুইসিল দিয়ে একটা ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার শব্দ। সেটা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজের মধ্যে দূর থেকে একটা শেয়াল বা কুকুরের ডাকের শব্দ]

রমণী : [ফিসফিস কণ্ঠে] কি বিচ্ছিরি স্টেশন। লোকও নেই একটাও। উঃ কী অন্ধকার!

পুরুষ : ভয় করছে?

রমণী : ভাল লাগছে না।

পুরুষ : রাতটা কাটাতেই হবে এখানে, জানো কি। উপায় নেই।...কিন্তু ভয় পাওয়ার মতন কী হল?

রমণী : জানি না। মালগুলো কি তাহলে!

পুরুষ : একটা ওয়েটিং রুম কিন্তু আছে এখানে। আগে একটা লোকের যোগাড় করি দাঁড়াও। তুমি এখানেই থাকো, আমি এখনি আসছি।

[কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মে জুতোর শব্দ। শব্দটা মিলিয়ে গেল। ঝিঁঝিঁর শব্দ। একটু পরেই জুতোর শব্দ ফিরে এল দূর থেকে কাছে] দেখলেন তো একই সঙ্গে নাট্যের ঘটনাস্থল, কাল আর একটা নিরুচ্চার সাসপেন্স কেমন জাগিয়ে দিলেন নাট্যকার একেবারে শুরুতেই। আবার দেখুন অনেক সময় ব্যক্তিত্বের বিচিত্র ছবি ফুটিয়ে তোলবার জন্য মুখ্য চরিত্রের উপস্থিতির আগেই কেমন অন্য পাত্রপাত্রীদের মুখ দিয়ে চরিত্রটির একটি রূপরেখা এঁকে রাখেন শ্রুতিনাট্যের নাট্যকার। মনোজ মিত্র রচিত সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় ফ্যান্টাসী 'চোখে আঙুল দাদা'র নামভূমিকার চরিত্রটি সংলাপ উচ্চারণের আগেই নাটকের অন্য একটি চরিত্র চিত্রগুপ্ত বিধাতাকে বলছে, "ওর পরনে ঢলা প্যান্টালুন, বটের ঝুরির মত চুল

সম্প্রতি প্রচারিত একটি বেতার নাটকের [illegible]
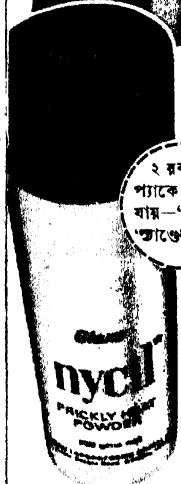
ঝাগ্লে দাড়ি, দু চোখে দুখানি বেগুনে রঙের কাচ...আর সর্বদাই জনান্তর্ভ থাকো সব ফুলঝুরির মত ঝরে ঝরে পড়ছে। এইভাবে চরিত্রটির হিপি ধরনের বিশেষ চেহারা আর আপাত আঁতেলেকচুয়াল ভাবটির অগ্রিম আভাস দিয়ে শ্রোতাদের কৌতূহলী করে রাখলেন নাট্যকার মনোজ মিত্র।"

সব শুনে ভদ্রলোক এবার প্রযোজককে বললেন, 'দারুণ ইণ্টারেস্টিং তো! আর এক কাপ চা পাওয়া যাবে।' প্রযোজক তখুনি ক্যাণ্টিনে টেলিফোন করে দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। ভদ্রলোক বললেন, 'চা আসতে আসতে আরও কিছুটা শুনেনি। হ্যাঁ মশাই, এবারের দামটা কিন্তু আমি দেব'—'ঠিক আছে দেবেনখন' বলে হাসতে হাসতে প্রযোজক ফের বলতে আরম্ভ করলেন।

"ছবিতে যেমন ক্যামেরাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে চালিত করে দৃশ্যগুলিকে অনেক বেশী নাটকীয় ও চলমান করে তোলা হয় বেতারে তা করা হয় সম্পূর্ণ অন্যভাবে। এখানে মাইক্রোফোন সচল হয় না বরং শিল্পীরাই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কাছে, দূরে বা কোনাকুনিভাবে দাঁড়িয়ে, হেঁটেচলে, দৌড়ে ওই নাটকীয় চলমানতার এফেক্ট আনেন। আর প্রযোজক ও তাঁর সহকারী শব্দসংযোজক কণ্ট্রোল থেকে শব্দকে নিয়ন্ত্রিত করে দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেকটিভ সৃষ্টি করে শ্রোতার কল্পনাকে উদ্দীপিত করে তোলেন। প্রসঙ্গত সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীমূলক বেতারনাটক 'সেপ্টোপাসের খিদে'র একটি দৃশ্যের কথা বলি। সাহিত্যিক পরিমল পুজোর লেখা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মাথায় কিছুই না আসায় বেশ বিব্রত। এরই মধ্যে দু একটা টেলিফোন এল যার সবগুলোই রং নাম্বার। শেষে গৃহভৃত্য কার্তিককে ডেকে বলে দিল, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন না থাকলে সে এখন আর কারুর সঙ্গে দেখা করবে না, ফোনও ধরবে না। ইতিমধ্যে—

কার্তিক : কফি দিয়েছি বাবু।
পরিমল : দিয়েছিস? বেশ—
[পরিমল কফিতে চুমুক দেয়]
পরি : আঃ! [আরামের শব্দ]
[দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, পরিমল সশব্দে পেয়ালা রাখে]
পরি : না-না-না এ বাড়াবাড়ি, বাড়াবাড়ি।
[দরজা খোলার শব্দ নেপথ্যে]
কার্তিক (off) কাকে চাই? ...আপনার নাম?
আগন্তুক : কান্তি মুখার্জী।
কার্তিক : আপনি একটু দাঁড়ান।
পরি : কে রে?
কার্তিক : বুড়ো ভদ্রলোক। বললেন আপনাকে খুব চেনেন।
পরি : (বিরক্ত) নামটা কী বলল না!
কার্তিক : আজ্ঞে কান্তি মুখার্জি বলে বললেন—
পরি : সেকি।
[চেয়ার টেনে ওঠার শব্দ। পায়ের শব্দ]
পরি : একি আসুন আসুন—
কান্তি : চিনতে পারছ?
পরি : আরে এই মিনিটখানেক আগে আপনার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল—
কান্তি : অনেকদিন বাঁচব বলছ?
পরি : একশোবার। বসুন।

এই দৃশ্যটিতে পরিমলের ঘর মানে যেখানে বসে সে লিখছে তার থেকে বাইরের দরজাটা যে কিছুটা দূরে—সত্যজিৎবাবুর লেখা 'দরজা খোলার শব্দ নেপথ্যে' থেকে ব্যাপারটি আন্দাজ করে নিলেন প্রযোজক। এখন একই সঙ্গে বাইরের দরজায় কথাবার্তা আর ভেতরের ঘরে পরিমলের প্রতিক্রিয়ায় [illegible] ছবিটা প্রযোজক কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শুনুন। সিনেমার ক্লোজ[illegible] এফেক্ট আনতে মাইকের খুব কাছ থেকে কথা বলেছিলেন পরিমল চরিত্রের অভিনেতা জয়ন্ত চৌধুরী। আর 'নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দটা'—সম্পাদনার সময় শব্দসংযোজক সমরেশ ঘোষ রেখেছিলেন বেশ নিচুতে যাতে নাটক শোনার সময় শ্রোতার মনে হয় পরিমলের ঘর থেকে বাইরের দরজাটা রয়েছে কিছুটা দূরে। দৃশ্যটিতে পরিমলের প্রতিক্রিয়া যেহেতু বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই প্রযোজক দরজার কাছে কার্তিক আর কান্তি-বাবুর সংলাপকে ইচ্ছাকৃতভাবে স্পষ্টতা-অস্পষ্টতার মাঝামাঝি একটা জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন। এতে 'পরিমল' যে ঘরে বসেই বাইরে থেকে কে এল এটা বোঝার চেষ্টা করছে, শ্রোতার মনে এ ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর পরিমলের কণ্ঠ-স্বর দূরে চলে গিয়ে কান্তিবাবুকে নিয়ে আবার মাইক্রোফোনের কাছে চলে এলে শ্রোতা বুঝলেন কান্তিবাবু বাইরে থেকে পরিমলের ঘরে এসে ঢুকলেন। দেখলেন তো রেডিও নাটকে পারস্পেকটিভ কি দারুণ কাজ করে। হ্যাঁ আর একটা নাটকের কথা মনে পড়ছে। মতি নন্দীর 'কোনি'। নাটকটিতে একটি দুরূহ দৃশ্য ছিল। অল্পবয়সী মেয়ে কোনি পুকুরের জলে সাঁতারের ট্রেনিং নিচ্ছে আর ট্রেনার খিদ্দা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তাকে নানাবিধ নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। অবসন্ন, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত কোনি শেষে জলের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে 'আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না।' দৃশ্যটিকে জীবন্ত করার জন্য খিদ্দা চরিত্রের শিল্পী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোনি চরিত্রের অভিনেত্রী শাওলী মিত্র মাইক্রোফোন থেকে একটু দূরে কোনাকুনিভাবে দাঁড়িয়ে একটু উঁচু গলাতেই অভিনয় করতে লাগলেন। আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংলাপে যান্ত্রিক কৌশলে শব্দসংযোজক একটুখানি 'ইকো' মিশিয়ে দিলেন। ফলে পুকুর পাড়ের ফাঁকা জায়গার আবহটাও এসে গেল। কিন্তু সমস্যা হল জলের মধ্যে মুখ রেখে সংলাপ [illegible] এফেক্টটা আসবে কী করে? কিন্তু শেষপর্যন্ত খুব সহজ

'কোনি' নাটকের রেকর্ডিং-এ একটি বিশেষ দৃশ্যের আবহ সৃষ্টি করতে শব্দগ্রহণের কলাকৌশল

একটি জলভর্তি পাত্র। শাওলী ওই পাত্রটির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে যখন কান্নার গলায় 'ক্ষিদ্দা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আর পারছি না—পারছি না' বলে অভিনয় করতে লাগলেন তখন বাঞ্ছিত এফেক্টটা একশো ভাগ পেয়ে প্রোডাকশনের সবাই খুব খুশী হলেন। পরে অবশ্য শ্রোতারাও।" ইতিমধ্যে ক্যান্টিন থেকে চা এল। অনেক অজানা বিষয় জানার উত্তেজনায় এক চুমুকেই ভদ্রলোক চা'টা শেষ করছেন দেখে প্রযোজক বললেন, "মশাই করছেন কী? বিষম খাবেন যে।" ভদ্রলোক সে কথার উত্তর না দিয়ে চা-টুকু নিঃশেষ করে বললেন 'তারপর বলুন।'

প্রযোজক "ভারী পায়ের পাতা, চেয়ার নড়াচড়া, বাচ্চাদের চিলচিৎকার, পাখিদের কিচিরমিচির, রেডিওর নব ঘোরানো—এরকম হাজারটা শব্দ বাস্তব জীবনে আপনি সবসময়ই শুনছেন কিন্তু ওগুলোকে একত্র করে রেডিও নাটককে বাস্তবধর্মী করে তুললে ব্যাপারটা যে কি দাঁড়াবে...!" 'বটেই তো বটেই তো' ভদ্রলোক মাথা দোলাতে থাকেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রযোজক আবার বলতে লাগলেন... "বুঝলেন মশাই শ্রুতিনাট্যে শব্দ প্রয়োগের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকে অনিবার্য হতে হবে। অনেক সময় নাট্যকারেরা বারবার দরজা খোলা বন্ধ, গাড়ি করে যাওয়া আসার বিস্তারিত নির্দেশ লিখে রাখেন কিন্তু একবার নাটক জমে গেলে প্রায়ই প্রযোজককে অল্প বিরতি দিয়ে 'দৃশ্যান্তর' করে ওসব শব্দ এড়িয়ে যেতে হয়। কারণ মূল নাটক যখন পরিণতির পথে অগ্রসরমান তখন ওই জাতীয় শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ নাটকের গতি ব্যাহত করে দিতে পারে। অতএব ঠিক কোন্ শব্দটি ব্যবহার করলে দৃশ্যের মুড আর পরিবেশ যথাযথ হবে—এটার শিল্পসম্মত নির্বাচন করাও প্রযোজকের একটা বড় দায়িত্ব। মনে করুন, কোনো স্ক্রিপ্টে গ্রামজীবনে একটি শান্ত প্রসন্ন রাত্রির দৃশ্য আছে—এখন প্রযোজক যদি অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ, শেয়ালকুকুরের সম্মিলিত চিৎকার—এসব যথেচ্ছ ব্যবহার করেন তাহলে একটি গ্রামের রাত্রির আবহ তৈরী হবে ঠিকই কিন্তু দৃশ্যটির শান্ত প্রসন্ন মুডটি মাঠে মারা যাবে। বরং সংলাপে রাত্রির ছবিটা এনে দিয়ে যদি প্রযোজক শান্ত নিস্তব্ধতার মাঝে হুইসল দিতে দিতে স্টিম ইঞ্জিনযুক্ত একটা ট্রেন দূর থেকে কাছে এনে আবার দূরে সরিয়ে দেন তাহলে দৃশ্যটির প্রসন্ন মেজাজটি সহজেই ধরা পড়বে। এবার আপনাকে বলব শ্রুতিনাট্যে শব্দ বা ধ্বনির অভিনয়ের ব্যাপারটা। ধরুন আপনার কোন বন্ধু বাড়ির কাছে হর্ণ দিয়ে আপনাকে ডাকছে—তখন হর্ণটা বাজবে একভাবে, আবার আপনার বেরুতে মাত্রাতিরিক্ত দেরী দেখে তিনি অধৈর্য হলে হর্ণ বাজবে আর একভাবে। আপনার বন্ধু যখন বিরক্ত তখন ঘন ঘন ছোট মাপের হর্ণ বাজতে থাকবে। দেখলেন তো শ্রুতিনাট্যে শব্দ বা ধ্বনি কি কাণ্ডটা করে। আবার কোন শব্দ প্রয়োগচাতুর্যে কেমন ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে লক্ষ্য করুন। 'সেপ্টোপাসের খিদে' নাটকে মাংসাশী গাছের একটি জ্যান্ত মুরগীকে গিলে ফেলবার দৃশ্য ছিল। শ্রোতাদের সামনে ছবিটিকে পরিস্ফুট করার জন্য মুরগীর ডানাঝটপটটা সত্যিই একটা ছোট ঘরের একটি মুরগীর পিছনে তাড়া করে রেকর্ড করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গাছের গিলে ফেলাটা বোঝাতে শব্দসংযোজক যান্ত্রিক কৌশলে হঠাৎ মুরগীর ডানাঝটপটের আওয়াজটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে শ্রোতার মনশ্চক্ষে ফুটে ওঠে 'গাছটা মুরগীটিকে গিলে ফেলল।' আবার অনেক সময় অতি সাধারণ জিনিসপত্র দিয়েও প্রযোজক শব্দচিত্র তৈরী করেন। একবার একটা নাটকে দরকার ছিল সিনেমার শুটিং-এর দৃশ্য। নায়কের দামি কাচের জানলা ভেঙে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে।" "নাটকটার নাম 'লোহার ভীম' না?" ভদ্রলোকের প্রশ্ন। প্রযোজক বললেন, 'হ্যাঁ উৎপল দত্তর লেখা। এখন শুনুন কিভাবে দৃশ্যটি বেতারে রূপ পেল। কৃত্রিম শব্দের কারবারী নাড়ু মিত্রের শরণাপন্ন হলেন প্রযোজক। তারপর দুখানা নারকোলমালা কাঠের তক্তার ঠুকে ঠুকে হল অশ্বখুর আর পেতলের চাকতিতে ফুটলো ঝমঝম কাচ ভাঙার শব্দ... বলাই বাহুল্য দৃশ্যটি কান দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন শ্রুতিনাট্যের শ্রোতারা। এছাড়া কল্পকাহিনীমূলক নাটকগুলিতে শব্দের গতি বাড়িয়ে কমিয়েও বিচিত্র, উদ্ভট, অতিবাস্তব পরিবেশ রচনা করেন শ্রুতিনাট্যের প্রযোজকরা।"

প্রযোজক বেশি ধূমপান করেন না কিন্তু আজ আলোচনা বেশ জমে ওঠায় আর একটি সিগারেট ধরালেন তিনি। এদিকে ভদ্রলোক কিরকম উসখুস করতে লাগলেন, 'কি হল মশাই আপনার'...প্রযোজকের প্রশ্ন। 'মানে একটুখানি খাব।' ভদ্রলোকের সলজ্জ উত্তর। —'কি খাবেন' প্রযোজকের কণ্ঠে কৌতূহল। 'খইনি! খইনি খাব।' 'অ্যাঁ!' প্রযোজকের কণ্ঠে এবার বিস্ময়। 'হ্যাঁ আমার প্রথম নেশা নাটক দেখা, দ্বিতীয় নেশা খইনি খাওয়া'—এই বলে এক টিপ খইনি হাতে দলে ঠোঁটের তলায় ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ডোন্ট মাইন্ড। তারপর বলুন,' প্রযোজক : "এবার আপনাকে শ্রুতিনাট্যে 'আবহসুর'-এর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলব। কোনো কোনো বিদেশী সমালোচক বলেন, 'রেডিও নাটকে আবহসংগীতের কোনো জায়গা নেই।' তাঁদের যুক্তি, শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় 'সংলাপ আর আবহসুর' এই দুটি উপাদান একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। তাঁদের ধারণা ব্যাপারটি যে শুধু কানের পক্ষেই পীড়াদায়ক তা নয়—শিল্পতত্ত্বের দিক থেকেও সমর্থনযোগ্য নয়। মনে হয়, অসফল কিছু শ্রুতিনাট্যে আবহসুরের অপপ্রয়োগ বা অতিপ্রয়োগের ফলেই তাঁদের এই ধারণা জন্মে থাকবে। অবশ্য অস্বীকার করা যায় না নাটকের গঠন কিংবা অভিনয়ের দুর্বলতা ঢাকতে যে আবহসুরের প্রয়োগ তা কখনই শিল্পসম্মত হতে পারে না। আবার একথাও বলা যায় বহু সফল শ্রুতিনাট্যের সাফল্যের মূলে রয়েছে আবহসুরের পরিমিত শৈল্পিক প্রয়োগ। বলাই বাহুল্য এসব

পূপ-সী বাচ্চাকে তার একান্ত প্রয়োজনীয় সহজ স্বচ্ছন্দ আরাম এনে দেবে।

আপনি হয়তো বাচ্চার মা যাঁকে চাকরি-বাকরি করতে হয় অথবা আপনি হয়তো আপনার ফিগার ঠিক রাখা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। হয়তো এইসব কারণে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে আপনি মন থেকে ঠিকমত সাড়া পান না।

এতে চিন্তার কোন কারণ নেই। এর একটি খুবই সহজ সুন্দর উপায় আছে— তা' হল পূপ-সী। এটি ঠিক আপনার মতই বাচ্চার পুরোপুরি যত্ন করবে পূপ-সীতে লাগানো রয়েছে এমন নিপ্‌ল যা' মায়ের বুকের মত কোমল আর যেটি বাচ্চা খুব সহজে চুষতে পারে। আর এই পূপ-সী ফীডিং বোতলটি এমন বিশেষ ডিজাইনে গড়া, যে বাচ্চা স্বচ্ছন্দে সমানভাবে দুধ টানতে পারে এবং যার দরুন বাচ্চাকে কোনও কষ্টই করতে হয় না। এই বোতলে দুধ খেতে খেতে বাচ্চা কখনো হাঁপিয়ে ওঠে না, যার ফলে তার মেজাজও বিগড়োয় না।

সুতরাং বাচ্চাকে পূপ-সী-ফিডারের সাহায্যে দুধ খাওয়ান। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার মতই এটিতে দুধ খেয়ে বাচ্চা যে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে, সেবিষয়ে আপনি সুনিশ্চিত থাকতে পারেন। আর এর চেয়ে জলজ্যান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আপনার আর কিই বা থাকতে পারে।

পূপ-সী®

ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ফীডার ও নিপ্‌ল

INNOVATION/BLD/B/12

প্রযোজনায় আবহসুর ছন্দে বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে সমগ্র প্রযোজনায় একটি অখণ্ড সত্তা হিসেবে কাজ করেছে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার মধ্যে সংলাপ, ধ্বনি, অভিনয় সবই যখন স্তব্ধ তখন আবহসুর সেখানে ঢুকে পড়ে সমস্ত ঘটনাস্রোতকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রিত করে। ঘটনার উত্থানপতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে। হালকা রোমাণ্টিক পরিবেশ, ভীত সন্ত্রস্ত মনের কুঁকড়ে যাওয়া, 'কী হবে' 'কী হবে' জাতীয় উৎকণ্ঠা এইসব অজস্র বিচিত্র অনুভূতিকে রঙ আর রূপ দিয়ে জীবন্ত করে তোলে আবহসুর। আবার খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলিকে সংহত করে একটি একক দৃশ্য হিসেবে ক্লাইম্যাক্সের দিকেও তা নিয়ে যায়। অবশ্য থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করলে আপনি আরো পরিষ্কার করে বুঝতে পারবেন। থিয়েটারে সেট, স্টেজ প্রপার্টিজ বদলে দিয়ে যেমন দৃশ্যরূপ পরিবর্তন করা হয় —শ্রুতিনাট্যে আবহসুর ব্যবহার করে তেমনি দৃশ্যের পটভূমি বদল করা হয়। ধরুন, কোন চরিত্র কোলকাতার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে তার সম্ভাব্য বিলেত-যাত্রার বিষয়ে কথা বলছে একটি দৃশ্যে। পরের দৃশ্যে প্লেনের আওয়াজ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি বাজনা বেজে উঠলে শ্রোতা বুঝে নেবেন পটভূমি কোলকাতা থেকে বদলে লণ্ডনে চলে গিয়েছে। বিলেতে ওই চরিত্রটির মানসিক অবস্থা যদি হয় আনন্দময় তাহলে ইংরেজী বাজনা বাজবে দ্রুতলয়ে আবার চরিত্রটি যদি বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় ভোগে তবে ওই বাজনার লয় হবে অন্য রকম। বিষাদের স্পর্শ আবহটির গায়ে লেগে থাকবে। এইভাবে শুধু স্থান বা সময়ই নয়, দৃশ্যের অন্তর্লীন মেজাজের বিমূর্ত রূপটিকেও মূর্ত করে আবহসুর। এবার দু-একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলি।

"প্রবীর মজুমদার সুরারোপিত 'সওদাগরের নৌকা' শ্রুতিনাট্যে আবহসুর সিনেমার মন্তাজ-এর মত কেমন কাজ করেছিল লক্ষ্য করুন। নাটকের প্রধান চরিত্র একজন ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন যাত্রাশিল্পী। বর্তমানে অবসন্ন, অবসর-প্রাপ্ত। যাত্রায় আবার যোগ দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা চলছিল তাঁর। যে মুহূর্তে তিনি যাত্রায় যোগ দিলেন অমনি আচমকা বেজে উঠল ক্ল্যারিওনেট। তারপর কনসার্টের সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে আসতে থাকল বাস, ট্রেন, স্টিমার, গরুরগাড়ি ইত্যাদির ছন্দোময় ধ্বনি—ফলে ওই চরিত্রটি যাত্রাদলের সঙ্গে দেশ থেকে দেশান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছেন—এই ছবিটা শ্রোতার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সম্প্রতি এদেশেও বাদ্যযন্ত্র বর্জন করে শব্দবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ইলেকট্রনিক সংগীত রচনা করা হচ্ছে। ফ্যান্টাসী, বা কল্পবিজ্ঞানমূলক শ্রুতিনাট্যে এই বিশেষ ধরনের আবহ খুব কাজে লাগে। যেমন 'চোখে আঙুল দাদা' নাটকের শুরুতে যখন ঘোষক বলেন—এখন শুনতে পাবেন 'চোখে আঙুল দাদা'র স্বর্গযাত্রার ওপর একটি রানিং কমেন্ট্রি.......সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে মহাশূন্যে কারো লাফাতে লাফাতে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত-বাহী হাস্যরসাত্মক বাজনা বেজে ওঠে। আবার ওই একই নাটকে চোখে আঙুল সৃষ্ট মানবপুত্তলিতে যখন বিধাতা প্রাণদান করেন তখনও ইলেকট্রনিক বাজনা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সাইকেলের চাকায় পাম্প করার মত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পাম্প চলতে থাকে তারপর হঠাৎ শুরু হয়ে যায় ফ্র্যাঙ্কেন্সটাইন নবজাতকের উঁয়া উঁয়া জাতীয় কাল্পনিক কান্না। শ্রুতিনাট্যে এইসব এফেক্ট আনতে ইলেকট্রনিক সংগীতের অবদান অপরিসীম। সংগীতের স্পষ্ট কোন ভাষা নেই, আছে ব্যঞ্জনা। সুপ্রযুক্ত হলে বেতার নাট্যে আবহসুর ব্যঞ্জকেরই কাজ করে।" এবার ভদ্রলোক বললেন, "এতক্ষণ ধরে এত কিছু বলছেন কিন্তু নাটকের প্রাণ যে অভিনয় এটা স্বীকার করবেন তো!" প্রযোজক মাথা নাড়েন। "অথচ দেখুন শ্রুতিনাট্যের অভিনয় বাদে সব কিছু আপনি বলে দিয়েছেন" প্রযোজক একটু হেসে বলেন, "রাগ করবেন না। আমার সর্বশেষ আলোচনার বিষয় 'শ্রুতিনাট্যে অভিনয়।' রেডিওর অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চাভিনয়ের অনেক তফাত। তার কারণ থিয়েটারে একজন অভিনেতার হাতে কণ্ঠস্বর ছাড়াও থাকে অনেকগুলি উপাদান—অভি-ব্যক্তি, চলাফেরা, রূপসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ কত কি। কিন্তু বেতারে একজন অভিনেতা শুধু কণ্ঠস্বর ও বাচনিক কলাকৌশল আশ্রয় করেই চরিত্রসৃষ্টি করেন। রাগ, দুঃখ, ঘৃণা, কাম মানব মনের এইসব সত্য আর বাস্তব অনুভূতিগুলোকে শ্রুতিনাট্যে অভিনেতা প্রকাশ করতে পারেন শুধু গলার সাহায্যে। তাই স্বর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাঁর থাকা দরকার প্রশ্নাতীত দক্ষতা। মঞ্চে একটি নাটকে চূড়ান্ত সফল হয়েও একজন শিল্পী ওই একই নাটকে রেডিওয় অভিনয় করতে এসে অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, এটা দেখা গেছে। কারণ মাইক্রোফোন নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে সত্যিই এক সমস্যা। একথা অনেকেরই জানা নেই রেডিওর মাইক্রোফোন কত সূক্ষ্ম। তাই শিল্পীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ, দূর থেকে ফিসফিস করে কথা বলা, স্ক্রিপ্ট-এর পাতা ওল্টানোর খসখস—এ সব অবাঞ্ছিত আওয়াজও রেকর্ডিংএ এসে যায়। তার ওপর মঞ্চ থেকে আসা শিল্পীরা প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারির দর্শককে কথা শোনানোর পুরোনো অভ্যাসে 'ভয়েস থ্রো' করে উচ্চগ্রামে সংলাপ উচ্চারণ করে ফেলেন প্রায়ই—এতে রেকর্ডের ব্যালান্স নষ্ট হয় দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিত গুলিয়ে যায়, কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়। দৈনন্দিন কথাবার্তার স্বাভাবিক ঢংটাই যে শ্রুতিনাট্যের অভিনয়ে খাপ খেয়ে যায় এটা বুঝতে মঞ্চের একজন শিল্পীর কিছুটা সময় লেগে যায়। এঁদের অনেকে আবার ডেডসাইড অর্থাৎ যেদিক থেকে মাইক্রোফোন কোন শব্দ গ্রহণ করে না সেদিকে গিয়ে অভিনয় করে ফেলেন। অভিজ্ঞতা না থাকায় অভিনয় করতে করতে প্রযোজকের দিকে ফিরে এঁরা নির্দেশ নিতেও ভুলে যান যে—এঁদের অভিনয়ের জায়গাটা অর্থাৎ মাইক পোজিসনটা ঠিকমত হয়েছে কিনা।

মঞ্চের একজন দক্ষ শিল্পীর কাছে প্রথম বেতার অভিনয় যে কি সমস্যায় শাঁওলী মিত্রের একটা ছোট লেখায় তা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রযোজক

বললেন, "লেখাটা আছে আপনার কাছে।" প্রযোজক তাঁর ঝোলার থেকে একটা খামের ভেতর থেকে লেখাটা বের করে বললেন, 'এর থেকে লাল পেন্সিলে মার্ক করা জায়গাটা আপনাকে শোনাচ্ছি "ছোটবেলায় ডাকঘর করার সময় মনে আছে অমলের ভাবকে স্বভাব ফোটানোর জন্য চোখ দুটোর ব্যবহার কত কষ্ট করে শিখতে হয়েছে। যেমন সেই পাঁচমুড়ো পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির বউ" বা "ঐ রাস্তার বাঁক থেকে ঐ গাছের সারের মধ্য দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল আমার মনে হচ্ছিল" হঠাৎ বাস্তবে ফিরে "কি জানি কি মনে হচ্ছিল—"এই সমস্ত এবং আরো অনেক জায়গায় শিখতে হয়েছিল চোখ দুটো দূরে পাঠিয়ে দেওয়া। বা প্রথম দৃশ্যে এক বিদেশী পথিকের ঝরনার ধারে ছাতু খেয়ে ঝরনা পার হয়ে চলে যাওয়ার সময় অজান্তেই ধুতি গুটিয়ে নেওয়া যাতে অমলের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ছবির মত প্রকাশ পেয়ে যেত। বড় হয়ে যখন রেডিওতে করতে হলো তখন কেমন করে সেই ছবি প্রকাশ করবো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এই সমস্ত আঙ্গিক ব্যবহার অর্থ-হীন রেডিওতে। তখন ভেবে ভেবে কেবল গলাতে কেমন করে সব মুড প্রকাশ করা যায় তা বার করতে হল। কথা বলতে বলতে গলাটা কোন নোট ব্যবহার করতে করতে একেবারে আলগা করে দিলে মনে হবে যে ছেলেটা অন্য-মনস্ক হয়ে দূরে গেছে সেটা খুঁজে বার করতে হল। বার করতে হল কোন্ গলাটাতে প্রকাশ পাবে অমলের অসুস্থতাটা বাড়ছে, আর তার বিছানা ছেড়ে ওঠবার ক্ষমতা নেই।'"

বেতার অভিনয় সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা চালু রয়েছে যে সুকণ্ঠই শ্রুতিনাটোর অভিনয়ের একমাত্র মাপকাঠি। আজ এ-কথা জোর করেই বলা যায় শুধুমাত্র সুললিত কণ্ঠ সম্বল করে বেতার অভিনয়ে বাজিমাৎ করা যায় না। মস্তিষ্ক সঞ্চালনশূন্য অভিনয়ের ফাঁকি কণ্ঠমাধুর্য দিয়ে ঢেকে দেবার প্রয়াস আজ নিঃসন্দেহে নিন্দিত। বরং সুঅভিনয়ের গুণে অনেক চাপা, ধরা ধরা, ফ্যাসফেসে, ক্ষীণ কণ্ঠও শ্রুতিনাটোর শ্রোতাদের কাছে বন্দিত।

আশ্চর্যের হলেও শ্রুতিনাটো একটু আধটু কায়িক অভিনয় কণ্ঠস্বরকে বাস্তবের প্রতিরূপ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের মত বেতার অভিনয়ে অনেক শিল্পীকেই সমস্ত শরীর ব্যবহার করতে দেখা যায়। অশ্বারোহণের অভিব্যক্তি গলায় আনতে শ্রুতিনাটোর অভিনেতা ঘোড়ায় চলার ছন্দে শরীর সঞ্চালন করে। এক্ষেত্রে নিঃশ্বাস প্রভৃত ওঠানামার দরকার হয় না —শরীর সঞ্চালনের ফলে সংলাপের সামান্য ওঠাপড়াতেই স্বাভাবিক অশ্বারোহণের ব্যাপারটা গলায় এসে যায়। তবে এ সব ক্ষেত্রে কোন ছক বাঁধা নিয়ম নেই। কে কতটুকু কায়িক অভিনয় করবেন তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিল্পীদের নিজস্ব মানসিকতার ওপর। এ প্রসঙ্গে প্রয়াত শিল্পী কেয়া চক্রবর্তীর একটা বেতার অভিনয়ের কথা মনে পড়ছে। নাটকটির নামটা মনে নেই তবে সেই ক্রাইম প্লেতে তিনি এক হতভাগিনী মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন মনে আছে। পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে মায়ের হারানো ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে টেলিফোন করেছে এক কুখ্যাত ডাকাত। মায়ের ভূমিকাভিনেত্রী কেয়া টেলি-ফোনে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কি করে বুঝব যে সে বেঁচে আছে।' ডাকাত বলল, 'নিন আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলুন।' টেলিফোনে হারানো ছেলের গলা শুনে মা অশ্রুরুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, 'কেমন আছিস বাবা, ভালো আছিস বাবা, ভালো আছিস তো, ওরা তোকে খেতে দেয় তো' ইত্যাদি। এই সব সংলাপগুলো বলবার সময় কেয়া চক্রবর্তী এক হাতে স্ক্রিপ্ট নিয়ে অন্য হাতে ছেলেটির গায়ে মাথায় যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এমন ভঙ্গী করছিলেন ক্রমাগত। মনে হয়, এতে তাঁর চরিত্রের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে [illegible]বিধে হচ্ছিল। আবার রেডিওতে শম্ভু মিত্রের অভিনয়ে কায়িক ব্যাপ[illegible] প্রায় থাকেই না। বরং দু-একটি বুদ্ধি আশ্রিত কৌশল তাঁকে অনুসরণ করতে দেখা যায়। যেমন বিমল করের 'ঘাতক' নাটকে শারীরিক নৈকট্যের দৃশ্যে তিনি হাতের তালুতে মুখ ঘষতে ঘষতে এমন আবেশ বশে সংলাপ উচ্চারণ করেছিলেন—যা ওই জাতীয় ঘনিষ্ঠতার ছবিটিকে পলকে দৃশ্যমান করে তুলেছিল।"

আলোচনা শেষ করে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে কব্জি-ঘড়িটার দিকে তাকালেন প্রযোজক। 'ভেরি সরি। আপনার অনেক দেরী হয়ে গেল। আটটা বাজে প্রায়, চলুন উঠে পড়া যাক।'......আকাশবাণী থেকে রাজভবনের পাশের আলো-আঁধারি আবছায়া নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রযোজক বলতে লাগলেন, 'বুঝলেন মশাই মানুষের স্বভাবের গভীরে কোথায় যেন কল্পজগতের একটা আবহ নিয়ত মুক্তির বা প্রত্যক্ষনের কামনায় ব্যাকুল। দর্শন স্পর্শনে তাকে পাওয়া অসম্ভব প্রায়। একমাত্র শ্রবণ মাধ্যমই সেই অন্তর্বর্তী বাসনার তৃপ্তি ঘটাতে পারে। তাই অতিলৌকিক, অলৌকিক, কল্পকাহিনী-ভিত্তিক নাটকগুলির যথাযথ স্ফূর্তি একমাত্র বেতারমাধ্যম। না হলে স্যামুয়েল বেকেট, ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়ের মত মানুষেরা কেন শিল্পের অন্য আঙিনা থেকে এসে শ্রুতিনাটোর জন্য কাজের আনন্দে মেতে উঠবেন!'

কথা বলতে বলতে এসপ্ল্যানেড এসে গেল। প্রযোজক ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আপনি কোন্ দিকে উত্তর না দক্ষিণ?' 'দক্ষিণ' বলতে বলতে হাত ছাড়িয়ে ছুটে টালিগঞ্জের একটা চলন্ত ট্রাম ধরে ফেললেন ভদ্রলোক।

আর প্রযোজক আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টালাপার্কের মিনি বাসে

জাপানে যোগব্যায়ামের জনপ্রিয়তা

শরীরচর্চা, যোগব্যায়াম ও প্রাণায়ামের রেওয়াজ ছিল দুই পরিবারেই। এই দুই পরিবারের এক ছেলে ও এক মেয়ে এখন যোগাসন ও রণক্রীড়ার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সারা জাপানে জাল বিছিয়ে বসেছেন। জাপানে ভারতীয় যোগাসনের সেন্টার খুলেছেন বাইশটি। এইসব সেন্টারে যোগব্যায়ামের মাধ্যমে কিভাবে রোগ নিরাময় করা যায়, কিভাবে নড়বড়ে দেহকে চাঙ্গা করে তুলে দেহটাকে পুরোপুরি পটু রাখা যায় সেসব তো শেখানো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে যোগব্যায়ামের সঙ্গে মিল ঘটানোর চেষ্টা চলছে জুডো, যুযুৎস, আইকিদো ও ক্যারাটের—যেগুলিকে বলা হয় মার্শাল আর্ট। অর্থাৎ রণশিল্প বা রণক্রীড়া। কিভাবে মিলন ঘটানোর চেষ্টা চলছে? আমাদের সেই ঋষি কবির ভাষায়—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে-র নীতিতে। জাপানের কাছ থেকে মার্শাল আর্ট নিচ্ছেন, ভারতের যোগ-শক্তি দিচ্ছেন। আর এক সঙ্গে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন দুই শক্তি।

ওই দুই ছেলে-মেয়ে এখন বিদেশে বসবাসকারী ভারতের এক সুখী দম্পতি—জীবানন্দ ঘোষ ও করুণা
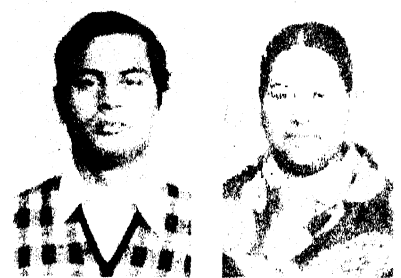
জীবানন্দ ও করুণা ঘোষ

ঘোষ। করুণা হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ ও যোগব্যায়ামের অন্যতম পুরোধা বিষ্ণুচরণ ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা। জীবানন্দর পৈতৃক বাড়ি ব্যারাকপুরে। খুব ভোরে উঠে বাবার গীতাপাঠ ও প্রাণায়াম দেখে এবং দুই দাদার দেহচর্চার আগ্রহ থেকে ফুটবলার জীবানন্দরও দেহচর্চার আগ্রহ জাগে। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত প্রাণায়ামের সুপ্ত চেতনাটা জাগ্রত হয় বিষ্ণু ঘোষের সান্নিধ্যে আসার পর। আর করুণা তো যোগের বাড়িরই মেয়ে। জন্ম থেকেই যোগ ও দেহচর্চার মধ্যে বেড়ে ওঠে।

করুণার জ্যেঠামশাই এবং বাবার গুরু যোগানন্দ মুকুন্দলাল ঘোষই বোধ হয় ভারতের প্রথম পুরুষ যিনি বিদেশে ভারতীয় যোগব্যায়ামকে দারুণ জনপ্রিয় করে গেছেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ক্যালিফোর্নিয়ায় খুলেছিলেন এস আর এফ (সেলফ রিলিজিয়ন ফেলোশিপ) নামে বিরাট যোগ-কেন্দ্র। গত মার্চ মাসে ভারত সরকার ওঁর ছবি দিয়ে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট প্রচার করেন।

যোগানন্দ মুকুন্দলাল দাদা হলেও তিনিই ছিলেন বিষ্ণু ঘোষের গুরু। পরে ঋষিকেশের যোগ ইনস্টিটিউটে বিষ্ণু ঘোষ যোগ শিক্ষা করেন এবং বজরঙ্গ ফিজিক্যাল কালচার সেন্টারের সঙ্গে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ঘোষেস যোগ কলেজ। জীবানন্দ ঘোষের সঙ্গে বিষ্ণু ঘোষের যোগাযোগ ঘটে বোম্বাইতে ১৯৬৬ সালে। ওখানে তখন চলছিল ভারতশ্রী কম্পিটিশন। বিষ্ণু ঘোষই জীবানন্দকে যোগসাধনায় আগ্রহী করে তোলেন এবং নিজের কলেজে টেনে নেন।

এদিকে করুণা ঘোষ বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে ঘোষেস কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের লেডি ইনস্ট্রাক্টর হয়েছিলেন। ওদের বিয়ে হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে, বিষ্ণু ঘোষের মৃত্যুর পর।

বিষ্ণুবাবু আগে দুবার তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ, মেয়ে করুণা ও দলবল নিয়ে জাপানে গিয়েছিলেন ফিজিক্যাল কালচারের ডেমনেস্ট্রেশন দেখাতে। ওঁর সঙ্গে কিছু কিছু যোগব্যায়ামও ছিল এবং জাপানে ওঁদের শো ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তখনই তিনি যোগ সম্পর্কে জাপানের আগ্রহ লক্ষ করে ওখানে একটি যোগ-কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৭০-এ জাপানের (এক্সপো সেভেন্টি) বিশ্ব মেলায় দল নিয়ে আবার যাবার পরিকল্পনা করেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পুত্র বিশ্বনাথ ও ভাবী জামাতা জীবানন্দকে বলে যান, এক্সপো সেভেন্টিতে যোগ দেবেই। বিষ্ণুবাবু মারা যান ১৯৭০-এর ৯ জুলাই। এক্সপো সেভেন্টির উদ্বোধন হয় ২০ জুলাই। সুতরাং ১৪ জনের দলে বিষ্ণুবাবুর শূন্য স্থান খালি রেখে ১৩ জনের দলটি জাপানে গিয়ে ফিজিক্যাল কালচার যোগের ডেমনেস্ট্রেশনে বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করে। ওঁদের ডেমনেস্ট্রেশন টেলিভিশনে দেখানো হয়।

করুণা দেখিয়েছিলেন তীক্ষ্ণ পেরেকের বিছানায় শুয়ে বুকের উপর দিয়ে মোটর বাইক চালকের ভার সহ্য করার কৌশল, ফোরআর্মের উপর হাতি হাতি ও দুইটনী রোলার পাস করানোর শক্তি এবং ছয়টি স্প্রিং পেছন দিকে টেনে পুরোপরি লম্বা করার প্রক্রিয়া। ওই ছয়টি স্প্রিং-এ স্ট্রেংথ ২৪০ পাউন্ডের মত। কোন পুরুষের পক্ষে সামনের দিকে স্ট্রেস করাই শক্ত। কোন মেয়ের পক্ষে পেছনে স্ট্রেস করা অসাধারণ দম, শক্তি ও অনুশীলন সাপেক্ষ।

মাস দুই আগে জীবানন্দ ও করুণা এসেছিলেন কলকাতায়। জীবানন্দ বলছিলেন, এইসব ফিজিক্যাল ডেমনেস্ট্রেশন সার্কাসেও দেখানো হয়। অনেক ফিজিক্যাল কালচারিস্টও দেখিয়ে থাকেন। ওর সঙ্গে যদি যোগ ও প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া যোগ হয় তবে ডেমনেস্ট্রেশন অনেক সহজ হয়ে ওঠে। কোন দুর্ঘটনার ভয় থাকে না, মাসল ড্যামেজ হয় না। যোগের মধ্যে ব্রিদিংটাই একটা বড় টেকনিক।

নিজের কথায় বলছিলেন—ফুটবল খেলতেই বেশী ভালবাসতাম। সেই সঙ্গে করতাম দেহচর্চা। যখন এ বি মডেল স্কুলে পড়ি তখন থেকেই। যখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র তখন থেকে প্রাণায়াম সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি পেয়ে যাই। ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকর ক্লার্কের। নিজে যোগাসন শেখার পর শেখাতাম ব্যারাকপুরের এস ডি ও-কে। তারপরেই জড়িয়ে পড়ি জাপানে যোগ-কেন্দ্রর সঙ্গে। শুরু করেছিলাম ৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে। ওখানে প্রথম দিকে আমাকে ও করুণাকে যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে। যোগ শিখিয়ে যা পেতাম তার চেয়ে একটু বেশীই খরচ হত জুডো, ক্যারাটে, আইকিদোর শিখতে। ক্যারাটের জন্য মাসে দশ-বারো হাজার ইয়েন, আইকিদোর জন্য তিন হাজার ইয়েন এবং জুডোর জন্য সাড়ে সাত হাজার ইয়েন খরচ করতে হত। জাপানের এক হাজার ইয়েন আমাদের ৩০ টাকার সমান। করুণা আবার শিখত 'ইকেবানা'। অর্থাৎ ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট। ফুল দিয়ে কিভাবে সাজাতে হয়, ফুলদানীর উপর কিভাবে ফুল রাখতে হয় এই সব। ওটা জাপানে এক বড় শিল্প। শেখার জন্য স্কুল আছে। বাড়িতে গিয়েও শেখা যায়। ইকেবানাতে করুণা পেয়েছে মাস্টার ডিগ্রি। আমি জুডো, ক্যারাটে ও আইকিদোতে পেয়েছি ব্ল্যাক বেল্ট। যুযুৎসুতে এখন ব্রাউন বেল্টের পর্যায়ে আছি।'

প্রশ্ন করেছিলাম—এই যে জাপানী মার্শাল আর্ট,

এর কোনটার সঙ্গে কি পার্থক্য?

জীবানন্দ ঘোষ বললেন—'পার্থক্য খুব বেশী নয়। আইকিদো, যুযুৎসু ও জুডোর মূল হচ্ছে ধরে রেখে মারার বা ধরা পড়বার পর আততায়ীকে মারার নানা কৌশল। আইকিদোতে দরকার ব্রিদিং ফাংশন এবং কারেক্ট স্টেপিং। যুযুৎসু একটি অ্যাকশানে শেষ। জুডোর জন্য প্রয়োজন বডি ব্যালাংস। সাবেকী কুস্তির সঙ্গে কিছুটা মিল আছে জুডোর। আর ক্যারাটেতে ডিসট্যান্ট ও টাইমিং-এর ব্যাপার। কত দূরে দাঁড়িয়ে মারব, কত কাছে থেকে ব্লক করব। কিংকিং ও পাঞ্চিং নিয়ে ক্যারাটে। ক্যারাটে আছে আবার সাত রকমের। জাপানে কেন্দো (ড্র্যাগারের খেলা), ইয়াইদো (দড়ির খেলা) এবং কিয়োদোও (বেঁটে লাঠির খেলা) বেশ জনপ্রিয়। আমরা এই মার্শাল আর্টের সঙ্গে ভারতীয় যোগের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করছি আমাদের বাইশটি সেন্টারের মাধ্যমে। টোকিওতেই আছে তিনটি সেন্টার। তাইল্যান্ডের তাইপেতেও একটি সেন্টার খুলেছি।'

—এইসব সেন্টারে আপনাদের শিক্ষার্থী-সংখ্যা কত? শেখার পারিশ্রমিকই বা কি? যোগব্যায়ামে শিক্ষা নিয়েছে কতজন?'

—আমাদের সেন্টারগুলি থেকে এগারো-বারো হাজার ছেলেমেয়ে যোগব্যায়াম শিখেছে। শতকরা ৮০ জন জাপানী। মার্কিন, কানাডীয় এবং অন্যান্য দেশের মানুষও শিক্ষা নিয়েছে। এখন সেন্টারগুলিতে শিক্ষার্থী-সংখ্যা পাঁচ শোর মত। সপ্তাহে এক দিন শেখার জন্য মাসে আমরা চার্জ করি সাড়ে পাঁচ হাজার ইয়েন, প্রতি দিনের জন্য মাসিক ১৫ হাজার ইয়েন। ভরতি ফি দশ হাজার ইয়েন। আমাদের সেন্টারে অনেক জাপানী শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা আমাদের কাছ থেকেই যোগব্যায়াম শিখেছেন। ওখানে ইউনেসকোর একটি কেন্দ্র আছে। তা ছাড়া আছে ইন্টারন্যাশনাল মার্শাল আর্ট ফেডারেশনের একটি কেন্দ্র। এই সংস্থার আমিও সদস্য। ওখানেও দুটি বিষয় শেখানো হয়।'

জাপানে যোগব্যায়াম কতখানি জনপ্রিয় হয়েছে তার প্রমাণ জীবানন্দ ঘোষের লেখা 'ইন্ডিয়ান যোগ ফর হেলথ অ্যান্ড হ্যাপিনেস'-এর জাপানী ভাষায় অনূদিত সংস্করণের প্রথম ভাগ বিক্রি হয়েছে ১৫ হাজার। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছে গত জুন মাসের ২০ তারিখে। জীবানন্দ ঘোষ এবং বিশ্বনাথ ঘোষের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মার্শাল আর্টের উপর এক ছায়াছবি তোলা হবে শীঘ্রই, যার ৭৫ ভাগ শুটিং হবে জাপানে, ২৫ ভাগ বোম্বাই ও কলকাতায়।

জীবানন্দ ও করুণা জাপানে এখন দারুণ কর্মব্যস্ত দম্পতি। ওঁদের টোকিওর সৌকিগুচি বিল্ডিং-এর প্রধান কর্মকেন্দ্রে মানুষ আসার বিরাম নেই। টেলিফোন বেজেই চলে। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত সংগঠন নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়।

মুকুল

কয়েকটি যোগাসন

নড়বড়ে সংগঠন, তবু সাঁতারুরা এগোচ্ছে

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্য সাঁতার সংস্থার পরিচালনায় পঞ্চম বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হল বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে। গত চার বছরের বয়সভিত্তিক সাঁতারের বিচারে এ বছরের অনুষ্ঠান ছিল ভিন্নরূপ। এই বছরই প্রথম পশ্চিম বাংলার ছয়টি অঞ্চল,—কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদা আলাদা সত্তা নিয়ে রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিল। আগে আঞ্চলিক ভিত্তিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ক্লাবগুলি রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। রাজ্য সাঁতার সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তাদের সংবিধান পাল্টে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নতুন সংবিধান রচনা করেছে। এতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে সাঁতারের প্রসার হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

পঞ্চম বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় মোট সাঁতারুর সংখ্যা ছিল ১৪৩। কলকাতা অঞ্চল থেকে ৬৮ জন, হুগলি থেকে ৪৪ জন, চব্বিশ পরগণা থেকে ১৪ জন, হাওড়া থেকে ১০ জন, মুর্শিদাবাদ থেকে ৪ জন ও

রত্না চক্রবর্তী

মালদা থেকে ৩জন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। বালিকাদের সংখ্যা ছিল ৪৪ এবং বালকদের ৯৯।

আন্তর্জাতিক নিয়মে বয়স ভিত্তিক সাঁতার চারটি বিভাগে বিভক্ত। দশ ও দশ বছরের নীচে, এগারো-বারো, তেরো-চোদ্দ ও পনেরো-সতের। এই চারটি বিভাগে বালক ও বালিকাদের পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বালক ও বালিকাদের সব গ্রুপ মিলিয়ে মোট ৮৪টি ইভেন্ট ছিল। কিন্তু পাঁচটি ইভেন্ট হয়নি প্রতিযোগীর অভাবে। পশ্চিম বাংলার সাঁতারের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার ছাব্বিশটা ক্লাবের গড়ে আড়াই জন হিসাবে অংশ নেওয়া শুধু লজ্জাকর নয়, হাস্যকরও বটে। কারণ কলকাতার ক্লাবগুলির সমষ্টিগত সভ্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। সুতরাং এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কলকাতার ক্লাবগুলি সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থায় যতটা তৎপর সাঁতারু তৈরীর চেষ্টায় ততটা নয়।

এতকাল আঞ্চলিক ভিত্তিতে সাঁতার কাটার সুযোগ সীমারিত থাকায় গ্রামে-গঞ্জেও সাঁতারকে খেলাধুলার অঙ্গ হিসাবে গ্রামবাসীরা নেয়নি। কোনরকমে জলে ভাসতে শিখে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যারা জলে নামত—তারাও সাঁতার নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে প্রধানত একটি কারণে। সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্কলারশিপের টাকায় পড়ার খরচ চালানো। ফলে কলকাতার আশেপাশের গ্রামগুলিতে সাঁতারের চর্চা যতটা দেখা যায় দূরের গ্রামগুলিতে ততটা হয় না। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত তালদি, ধামুয়া, ক্যানিং, শ্যামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁতারুরা সারা ভারতের মধ্যে সেরা গ্রামীণ সাঁতারু হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বালি, উত্তরপাড়া, চাতরা, শ্রীরামপুর, নালিকুল অঞ্চলের সাঁতারুরা পশ্চিম বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সর্বভারতীয় গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় বাংলার পতাকা তুলে ধরে ছিল। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সদ্যসমাপ্ত গ্রামীণ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় আমাদের গ্রামের সাঁতারুরা শুধু একাধিক বিষয়ে প্রথমই হয়নি, পুরুর রেকর্ডও করেছে।

ক্রীড়া পরিষদের সাঁতারু বিভাগের সাহায্যে ও রাজ্য সাঁতার সংস্থার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গ্রামে সাঁতারের অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গত ৫।৬ বছরের প্রচেষ্টায় গ্রামবাংলায় সাঁতারুদের মনে যে উৎসাহের সঞ্চার করা হয়েছিল—গ্রামীণ সাঁতারে পশ্চিম বাংলার জয়জয়কার তারই ফল।

হুগলি থেকে রাজ্য প্রতিযোগিতায় ৪৪ জনের অংশ গ্রহণ খুব আশাব্যঞ্জক না হলেও চব্বিশ পরগণা থেকে মাত্র ১৪ জনের প্রতিনিধিত্ব হতাশাব্যঞ্জক। তবে জানা গেছে চব্বিশ পরগণার সব অঞ্চলের সাঁতারুরা পুরোপুরিভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ক্যানিংয়ের কেকা ঘোষ জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতারের আসরে দুটিতে প্রথম (যার একটি জাতীয় রেকর্ড) হয়েও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি। ক্যানিংয়ের বালক সাঁতারু হেমন্ত দেবনাথ, যে গ্রামীণ জাতীয় প্রতিযোগিতায় একাধিক রেকর্ড করেছে সেও না। তালদির মেয়ে ছন্দা দে চৌধুরী জাতীয় রেকর্ডকারী। সাঁতারু হয়েও প্রতিযোগিতায় গরহাজির ছিল। আবার এমনও দেখা গেছে তালদির সাঁতারুরা দলবদ্ধভাবে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং একাধিক বিষয়ে রেকর্ডও করেছে। আমার বিশ্বাস চব্বিশ পরগণার সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই আসরে দল হয়ে যোগ দিলে কলকাতার অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া হয়ত সম্ভব হত না।

গত মে মাসে মাদ্রাজের জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতারে প্রতিযোগিতায় বাংলার ছেলেমেয়েরা সব গ্রুপ মিলিয়ে দশটি বিষয়ে নূতন জাতীয় রেকর্ড করে। তেরো চোদ্দ বছরে বালকদের গ্রুপে বিনয় দাস শত মিটার চিৎ সাঁতারে নূতন জাতীয় রেকর্ড করে (সময় ১ মিঃ ১৪·৯ সেঃ)। ঐ গ্রুপে বালি সুইমিং ক্লাবের সাঁতারু অভিজিৎ ঘোষ শত মিটার বাটারফ্লাইতে নূতন রেকর্ড করে (সময় ১ মিঃ ৯·৬ সেঃ)। এগারো-বারো বছরের গ্রুপে হুগলির চাতরা সুইমিং ক্লাবের সাঁতারু সজল ঘোষ শত মিটার বুক সাঁতারে নূতন জাতীয় রেকর্ড করার কৃতিত্ব দেখায়, (সময় ১ মিঃ ২৫·৩ সেঃ)। দশ ও দশ বছরের নীচের গ্রুপে চাতরা শ্রীরামপুরের সাঁতারু জগন্নাথ মণ্ডল ৫০ ও ১০০ মিটার বুক সাঁতারে এবং ওই গ্রুপে পরিতোষ প্রামাণিক ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে নূতন জাতীয় রেকর্ড করে।

বালিকা বিভাগেও পশ্চিম বাংলার পাঁচজন নূতন জাতীয় রেকর্ড করে। এরা হচ্ছে কেকা ঘোষ, ইলা পাল, বুলা নাথ, রত্না চক্রবর্তী ও অর্পিতা মুখার্জী।

রেকর্ড হয়নি অথচ প্রথম হয়েছে বাংলার তিনজন সাঁতারু—সৌরভ সিকদার (শত মিটার ফ্রি স্টাইল), শম্ভু পাল (দুশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক) ও কেকা ঘোষ। পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ সাঁতারু দিলীপ বাগুই গ্রামীণদের মধ্যে একমাত্র সাঁতারু, যে শত মিটার বুক সাঁতারে প্রথম হয়ে চমক সৃষ্টি করে। পশ্চিম বাংলার আর এক সংস্থা ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন আলাদাভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। দশ ও দশ বছরের নীচের বালকদের প্রতিযোগিতায় শত মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম স্থান ছিনিয়ে নেয় ঐ সংস্থার সভ্য সাগর বাসু রায়।

ইলা পাল, বুলা নাথ, জগন্নাথ মণ্ডল ও ন্যাশনালের সাগর বাসু রায় তাদের কৃতিত্বের জন্য ভারত সিংহল দ্বৈত সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রতিনিধিত্ব করার ডাক পায়। কিন্তু অর্থের অভাবে বাংলার কোন সাঁতারুই অংশ নিতে পারেনি। কেবল ন্যাশনালের সাগর বাসু রায় জাতীয় সংস্থার তহবিলে বারশো টাকা জমা দিয়ে শ্রীলঙ্কা যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে।

এবার বয়সভিত্তিক পঞ্চম রাজ্য সাঁতারের তিন দিনের অনুষ্ঠানে মোট রেকর্ড হয়েছে ২২টি। রেকর্ডকারী সাঁতারুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান সেই সব সাঁতারুদের, যারা মাস দুই আগে জাতীয় আসরে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। একমাত্র বুলা নাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য যোগ দেয়নি। বুলা থাকলে রেকর্ডের সংখ্যা বেশি হত। অধিকাংশ রাজ্য রেকর্ডের সময় জাতীয় রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি দুই একটি ক্ষেত্রে গতবারের গড়া রাজ্য রেকর্ড থেকে এবারের রেকর্ড সময় ১৭।১৮ সেকেণ্ড কমাতে পেরেছে। এক বছরে এই উন্নতি আশাতীত। হাওড়ার অভিজিৎ ঘোষের দুশো মিটার বাটারফ্লাইতে ২ মিঃ ৩৪.৯ সেঃ সময় আগের রাজ্য রেকর্ড থেকে ১৮ সেকেণ্ড কম। অভিজিৎ মাত্র দু-মাস আগে নূতন জাতীয় রেকর্ড করে ২ মিঃ ৪৭.৭ সেকেণ্ড সময়ে।

ক্যানিং শহরের মাতলা নদীর উপকূলের মেয়ে রুণু দাস ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নূতন রাজ্য রেকর্ড করে আগের রাজ্য রেকর্ডের চেয়ে প্রায় ১০ সেকেণ্ড কম সময়ে। রুণুর বর্তমান সময় ৬ মিঃ ০১.১ সেঃ। রুণু মোট ছয়টি বিষয়ে অংশ নিয়ে পাঁচটিতে প্রথম হয়েছে, যার মধ্যে নূতন রেকর্ড ৪টি—৪০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে। সাবাস রুণু।

হাওড়ার চোদ্দ বছরের ছেলে অভিজিৎ ঘোষ ১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাইতে নূতন রাজ্য রেকর্ড করেছে বিস্ময়কর সময়ে। তার এই দুটি রেকর্ডই জাতীয় বয়সভিত্তিক রেকর্ড থেকে অনেক উন্নত। তার সময় যথাক্রমে ১ মিঃ ৭.৭ সেঃ ও ২ মিঃ ৩৪.৯ সেঃ। ভারতবর্ষের কোন সাঁতারুই আজ পর্যন্ত ঐ বয়সে এতখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। দু-মাস পরে ভূপালে জাতীয় সাঁতারের আসর বসছে। অভিজিৎ পশ্চিম বাংলার সাঁতারুদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে আশা করা যায়। কারণ বড়দের জাতীয় সময় থেকে অভিজিতের সময়ের পার্থক্য বেশি নয়। বাংলার অপর দুই সাঁতারু নিতাই ও গৌর পুরকায়েত, যারা গত বছর ঐ ইভেণ্ট দুটিতে জাতীয় রেকর্ড ম্লান করার কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদের কাছে অভিজিৎ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। আশা করা যায়, দুই যমজ ভাই নিতাই-গৌর, অভিজিৎ ঘোষ, ওয়েস্টার্ন রেলের সাঁতারু ইয়ান চীন সিন, কেরালার জেকস্ত ও মহারাষ্ট্রের এস চন্দ্রানীর মধ্যে আগামী জাতীয় প্রতিযোগিতায় জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। গৌর পুরকায়েত ১০০ মিটার সিনিয়ারে, চীন সিন ২০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী। জেকস্তের আছে এজ গ্রুপে ন্যাশনাল রেকর্ড। চন্দ্রানীও বয়সভিত্তিক সাঁতারে শত মিটারে জাতীয় রেকর্ডধারী।

রাজ্য বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় হুগলির জগন্নাথ মণ্ডল, ১৯৭৫-এ গড়া ধনঞ্জয় সরকারের ১০০ মিটার বুক সাঁতারের রেকর্ডটিকে ম্লান করে দেয় নূতন সময়ে। দুঃস্থ অভাবী জগন্নাথ শ্রীরামপুরে গঙ্গায় অনুশীলন করে। তার দুই দাদা চায়ের দোকানে কাজ করে। বাবা করেন ঘরামীর কাজ। দশজনের সংসারে জগন্নাথ কতদিন তার এই যোগ্যতা ধরে রাখতে পারবে সেটাই সমস্যা। জগন্নাথ গত জাতীয় বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় দুটি জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী। এবার রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ১০০ ও ৫০ মিটার বুক সাঁতারে নিজের জাতীয় রেকর্ড আরও উন্নত করেছে।

এবার বালকদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতী সাঁতারু কলকাতা অঞ্চলের বিনয় দাস। বিনয় ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে (৫ মিঃ ৪৬.৫ সেকেণ্ড), ২০০ মিটার চিৎ সাঁতারে (২ মিঃ ৪২.৩ সেঃ) এবং

বিষয়েই সে নেমেছিল। প্রথম দুটি ইভেণ্টের রেকর্ড জাতীয় রেকর্ডের চেয়ে ভাল।

কলকাতা অঞ্চলের সুপ্রীতি চক্রবর্তীও চারটি বিষয়ে নূতন রাজ্য রেকর্ড করে। ২০০ মিঃ ব্যক্তিগত মিডলেতে সময় ৩ মিঃ ২২.৯ সেঃ, ৫০ মিটার বাটারফ্লাই-এ সময় ৪২.৪ সেঃ, ১০০ মিটার বাটারফ্লাই-এ সময় ১মিঃ ৩৬.৩ সেঃ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের সময় ৩ মিঃ, ৯.৪ সেঃ। কলকাতার আর একজন মেয়ে শিখা দে ৪টিতে অংশ নিয়ে চারটি নূতন রেকর্ড করে পনেরো-সতেরো গ্রুপে। ৪০০ মিঃ মিডলে, ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ও ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে। শিখার গ্রুপে বাংলার হয়ে জাতীয় আসরে রেকর্ড করে ক্যানিংয়ের মেয়ে কেকা ঘোষ। কেকা মাধ্যমিক পরীক্ষার ভাল ফল করতে না পারায় এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি।

হুগলির গ্রামীণ সাঁতারু দিলীপ বাগুই ১০০, ২০০ মিটার বুক সাঁতারে যথাক্রমে ১ মিঃ ২৫.৮ সেঃ ও ৩ মিঃ ৬.৪ সেঃ সময়ে রেকর্ড করেছে।

এরা ছাড়া সুমতি চক্রবর্তী, অদিতি মুখার্জী, ঋত্বিকা পাল প্রত্যেকেই একটি করে নূতন সময় করার কৃতিত্ব দেখায়।

আমাদের এই রাজ্যে মার্চ, এপ্রিল ও মে-তে পুকুরে জল থাকে না। কলকাতায় জলাশয়গুলিতেও সাঁতারের অনুশীলন হয় না। ফলে প্রতি বছর মে মাসের শেষের দিকে জাতীয় প্রতিযোগিতার আসরে বাংলার সাঁতারুরা ভাল ফল করতে পারে না। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সাঁতারুদের এই অসুবিধা না থাকায় ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। কেরালা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র সাঁতারে অগ্রণী হচ্ছে প্রধানত ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এবং দ্বিতীয়ত সুইমিং পুলে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে। পশ্চিম বাংলার রেকর্ডকারী সাঁতারুরা রাজ্য বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় রেকর্ডের চেয়ে সময় উন্নত করে প্রমাণ করে দিল জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতার অনুষ্ঠান মে মাসের বদলে জুলাই কিংবা আগস্টে হলে তারা অনেক ভাল ফল করতে পারে। পশ্চিম বাংলার সাঁতারের কর্ণধাররা গত কয়েক বছর ধরে জাতীয় সাঁতার সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে সময়ের পরিবর্তনের জন্য আর্জি জানিয়ে আসছে—কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

সর্বভারতীয় স্বার্থে জাতীয় বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতার সময় যদি পিছানো সম্ভব না হয় তবে সাঁতারুদের স্বার্থে পশ্চিম বাংলায় অন্ততপক্ষে একটিমাত্র পুকুরে সারা বছর অনুশীলন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা কি অসম্ভব? অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কলকাতায় বছরে এক থেকে দেড় মাস শীতের প্রকোপে পুকুরে সাঁতারের অসুবিধা হয়ে পড়ে—কিন্তু জল থাকলে কলকাতার যে কোন অঞ্চলের পুকুরেই দশ থেকে এগার মাস অনুশীলন হতে পারে। রাজ্য সাঁতার সংস্থার তৎপরতায় ও পৌরপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কলকাতার সাঁতারের মরসুমকে আরও দুই-একমাস এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় বাংলার সাঁতারুরা এখনও চমক সৃষ্টি করতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলার সাঁতারের রাজনীতিতে গত কয়েক বছর ধরে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে যে, সাঁতারুরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। জাতীয় বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় গত কয়েক বছর বাংলা দল না পাঠিয়ে সাঁতারুদের জাতীয় স্কলারশিপ পাবার সম্ভাবনা নষ্ট করেছে। সাঁতারুদের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে কিশোর কিশোরীদের সাঁতার বিমুখ করে তুলেছে। অহেতুক মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে এই রাজ্যের সাঁতারে দলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সাঁতার সংস্থা এর ফলে ক্রমশই নড়বড়ে সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সাঁতারুরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

সাহিত্য-সম্ভার। প্রথম খণ্ড। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স। এম টি ৭২-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা। মূল্য : পঁচিশ টাকা।

লেবেডেফের রঙ্গিণী বা জব চার্ণকের বিবির লেখক পাঠকসমাজে সুপরিচিত সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি যে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে তেমন আলোচিত হয়নি, এ কথাও সত্য। তা যদি হতো, তবে সাহিত্য-সম্ভারের আলোচ্য প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত দুখানি সামাজিক উপন্যাসের তীক্ষ্ম সমাজসচেতনতা, একটি রোমান্সের দিব্য-অনুভবে উত্তীর্ণ অসহ্য আসঙ্গ-লিপ্সা এবং দুখানি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের অনায়াস সার্থকতা অনেক আগেই আমাদের সাহিত্যে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করতো।

তুমিও পুতুল ও বুভুক্ষা—এই সামাজিক উপন্যাস দুটিতে লেখকের যে-সমাজজিজ্ঞাসার পরিচয় পাই তার মধ্যে এমনিতে কেনো অভিনবত্ব নেই। যে-বৈশিষ্ট্যের জন্য গতানুগতিকতা ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হয়, তা হচ্ছে একটু ব্যাপক অর্থে, লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার দিকে লেখকের ঝোঁক (তুমিও পুতুল), মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যাগুলি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাগুলি চিত্রণ ও বিশ্লেষণের দিকে লেখকের আগ্রহ (বুভুক্ষা)। 'তুমিও পুতুল' উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর নূতনত্বের উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব স্বীকার্য। কিন্তু সেটাও আসলে প্রাথমিক কথা। কারণ, অনেক সময়েই দেখা যায়, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব বৈচিত্র্যবিলাসী পাঠককে ভোলানোর একটি উপায়মাত্র। বহিরঙ্গ-চমক সত্ত্বেও এক জাতীয় রচনার সাহিত্যমূল্য যৎসামান্য। 'তুমিও পুতুল'-এর লেখক সেই বহিরঙ্গ-কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যই এই বিষয়বস্তু নির্বাচন করেননি। এ দেশের পুতুল, পুতুল-নাচ এবং এই বৃত্তিতে যাঁরা আছেন, এই সমস্ত কিছু সম্পর্কেই তিনি দীর্ঘকাল ধরে রীতিমতো গবেষণায় নিয়োজিত করেছেন নিজেকে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই সব কারণেই সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয় না। এতক্ষণ যা বলা চলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক অনুভব করবেন, উপন্যাসের নায়ক মোহন মাস্টার, দলবল নিয়ে পুতুল নাচ দেখিয়ে বেড়ানোই যার পেশা আর নেশা—সে তার পরিজন পরিবেশ সহ কীভাবে এতটা সজীব এবং তাদের সকলের জীবন কীভাবে এমন তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পেরেছে। মোহন মাস্টারের দ্বিধাবন্ধণাময় হতাশাপীড়িত আশাবাদী জীবনানুরাগ অংশত লেখকেরই অন্তর্জীবনের প্রতীক বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। সংগ্রামী এক অপরাজেয় জীবনচেতনার সূত্রেই নায়কের সঙ্গে পাঠকেরও। এখানেই উপন্যাসটির জীবনবাস্তবতা ও সাহিত্য-মূল্য।

'বুভুক্ষা'র লেখক আমাদের প্রায়-সাম্প্রতিক ও সমকালীন নগর-জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। বোমা, টিয়ারগ্যাস, পথে পথে ব্যারিকেড, খাদ্যের দাবিতে মিছিল, মূল্য হ্রাসের ও কালোবাজারী রোখার দাবিতে মিছিল, পুলিসের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের খণ্ডযুদ্ধের বর্ণনা, শহরের এই অভিজ্ঞতায় বিড়ম্বিত তাঁর কোনো চরিত্র ভাবছে 'শহরের চেয়ে গাঁ অনেক ভালো। গলির জমা ময়লার পচা দুর্গন্ধকে ছাপিয়ে যেন তার নাকে একটা ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ লাগল।' আবার সে ভাবে সেই ভাবনা, যা একান্ত সংগত, 'হোক না পরের জমি তবু ফসল তো সে ফলায়। কিছু মজুরি পায়, খেতে পায়। তবু পেট ভরে খেতে পায় না। কেন খেতে পায় না? তারা খাটে, তারা রোদে জলে তেতে পুড়ে ভিজে দিনের পর দিন ফসল ফলায় তবু তারা পেট ভরে খেতে পায় না কেন? জমিকে সে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে ভিজিয়ে দেয়, তবু জমি তার নয় কেন? কেন? কেন?' উপন্যাসের চরিত্র কোনো দুর্দান্ত যুবক পুলিস গুলি চালানোর আগেই বলে ওঠে, 'আমরা পায়ে হেঁটে চলব, আর ওরা গাড়ি চড়বে? আমরা ভুখা মরব, ওরা পোলাও কালিয়া ওড়াবে? এ আর নয়। এই চল্ ঐ গুমটিটা জ্বালিয়ে দি।'—এ অবশ্যই লেখকের অভিপ্রেত পথ নয়। উপন্যাসের উপসংহারে দেখি, তাঁর পাপী নায়কের মনে জাগে অনুতাপ। নিজে থেকেই সে ধরা দিতে যায় থানায়। লেখক আসলে আদ্যন্ত জীবনবাদী। যা দেখেছেন, যা হয়, তা-ও এঁকেছেন, আর যা হওয়া উচিত, তারও আভাস আছে অভ্রান্ত। গান্ধীবাদ লেখককে সত্যনিষ্ঠ করেছে।

'স্মর-গরল-খণ্ডনম্' উপন্যাসের সীমারেখাটি মাঝে মধ্যে স্পর্শ করলেও রোমান্সের রাজ্যেই তার সংগত অধিকার। ঊর্মিলা ও সোমদেবের যে-কাহিনী অসহ্য ভোগাসক্তিকে অব-অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে, পরিণামে প্রেমের দিব্য অনুভবে তা উত্তীর্ণ। কিন্তু এই কাহিনী আমাদের পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের নয়। আসলে, এই গ্রন্থের সমস্যা ও উপলব্ধিটি চিরকালের বলেই লেখক তাকে পরিচিত জীবনের ফ্রেমে না বাঁধিয়ে রোমান্সের সুদূরতায় স্থাপিত করেছেন। ভাষা, পরিবেশ, উপাদান-উপকরণ সবকিছুই এখানে প্রত্যহের অতীত ও রূপকাশ্রয়ী।

'জব চার্ণকের বিবি' ও 'শৃঙ্খলিত' ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। 'জব চার্ণকের বিবি' সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী সরাসরি দাবি করেছেন 'বইখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস আর রাজসিংহ থেকে শুরু করে বাংলাসাহিত্যে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ধারার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।' একটি ক্ষীণ কিংবদন্তী অবলম্বন করে লেখক এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক পরিবেশ এবং ইতিহাস-রস সৃষ্টিতে তাঁর ইতিহাসবোধ, পাণ্ডিত্য, শ্রম ও নিষ্ঠার অসামান্য পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসাশ্রয়ী এই 'রিয়ালিস্টিক ইম্যাজিনেশন'। তীব্র সময়চেতনার সঙ্গে গভীর জীবনবোধের সুষ্ঠু সমন্বয় না ঘটলে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের রস দানা বাঁধে না। ইতিহাসের তথ্যকে কী ভাবে জীবনসত্যে উন্নীত করতে হয়, লেখক তা জানেন বলেই জব চার্ণকের জীবননাট্যের প্রতিটি দৃশ্যই তাঁর হাতে এমন মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। লেখকের নাট্যবোধ ও বর্ণনার কাব্যসুরভিত ভাষা নিঃসন্দেহে এই জাতীয় গ্রন্থরচনায় তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এই গ্রন্থের পটভূমি বিস্তৃত, ঘটনাবলী অসংখ্য, ঐতিহাসিক, আধা-ঐতিহাসিক ও কল্পিত চরিত্রের সংখ্যাও কম না—এই সব কিছুকে একটি সংহত রূপ ও তাৎপর্য দান করে তাকে পরিণামমুখী করে তোলার যে নৈপুণ্য জব চার্ণকের বিবি'তে পরিস্ফুট, প্রতাপচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শৃঙ্খলিত'র সেই মুনশীয়ানা পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত।

সুখপাঠ্য কাহিনীরচনাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। প্রতিটি উপন্যাসে লেখকের জীবন-সম্পর্কিত একটি নিগূঢ় আশাবাদী প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত জয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

কর্তাভজা : ধর্মমত : ইতিহাস। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়। সম্পাদক : সনৎকুমার মিত্র। পরিবেশক : দে বুক স্টোর্স। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য : বারো টাকা (দু' পর্যায় একত্রে)।

পলাশীযুদ্ধের পর এদেশে যে ক'টি লোকায়ত ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় গঠন করবার উদ্দেশ্য যাই হোক, এই ধর্মমণ্ডলীর আচার অনুষ্ঠানে এমন কতকগুলি মানবিক আবেদন আছে, যা আধুনিককালের সমাজ-ভাবনার সহযোগী। তাই এই ধর্মমণ্ডলীর প্রতি আকর্ষণ শুধু ধর্ম-পিপাসুরাই অনুভব করেনি, অনুভব করেছেন অগণিত সমাজ-সংস্কারক, ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। বিদেশী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকরাও এই সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং এঁদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এই সম্প্রদায় সম্পর্কে যত বেশী তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, এমন আর কোনো লোকায়ত ধর্মগোষ্ঠী সম্পর্কে হয়নি। তবে এই সব বিবরণীতে সত্য ও মিথ্যা, নিন্দা ও প্রশংসা সমানভাবেই স্থান পেয়েছে।

এই জন্যেই সনৎকুমার মিত্র ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রেরণায় ও উৎসাহে এই ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে কয়েক বছর আগে বিভিন্ন গবেষকের চিন্তাগুলিকে বিচার ও নিরীক্ষণ করতে শুরু করেন এবং ঘোষপাড়ার মেলায় একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করেন। পরে সেই আলোচনাগুলি সংগ্রহ করে দু'খণ্ডে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ইতিহাস সম্পর্কে এই মূল্যবান সংকলনটি তিনি প্রকাশ করেন। প্রথম

মানস মজুমদার লিখেছেন 'কর্তাভজা সম্প্রদায়—দুটি শতাব্দীর মূল্যায়ন', ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'সেকালের সংবাদপত্রে ঘোষপাড়ার মেলা'। মানিক সরকারের লেখাটিতে আছে প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে-দেখা কর্তাভজাদের ধর্মীয় সাধনতত্ত্ব, তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক সামাজিক ভিত্তি, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাধন-সংগীত ও মেলার চমৎকার বিবরণ। মানস মজুমদারের লেখায় উনিশ শতকের অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন ও যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং এই শতকে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কিত মতামত সংগ্রহ আছে, সিদ্ধান্তও আছে। তাতে সম্প্রদায়টির ঐতিহাসিক বিবর্তনটি স্পষ্ট হয়েছে। সুভাষবাবুর লেখাটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, কিন্তু সেকালের সাংবাদিকের চোখে।

দ্বিতীয় খণ্ডে এই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সাধনপদ্ধতি নিয়ে লিখেছেন জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বিমল মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, উমা রায়, মানিক সরকার (ঘোষপাড়ার মেলার সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যবান সমীক্ষা), সুধীর চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার গোস্বামী, তারকনাথ দাস ও সম্পাদক সনৎকুমার মিত্র। যদিও কিছু প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, তবু জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ও সুকুমার সেনের লেখা দুটি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ধর্মসাধনার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সতর্ক বিবরণ। দুজনেই বাংলাদেশের লোকায়ত ধর্মধারার দিক থেকে এই সম্প্রদায়ের সাধনাকে স্পষ্ট করেছেন। বিমল মুখোপাধ্যায় ও সুধীর চক্রবর্তীর লেখা দুটি গবেষণা-নিষ্ঠার প্রমাণ। প্রভাতকুমার গোস্বামী ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লৌকিক ধর্মের দিক থেকে কর্তাভজাদের বিচার করেছেন। আর সম্পাদক তাঁর প্রবন্ধে কর্তাভজাকেন্দ্রিক সংশয় ও সমস্যাকে আধুনিক ক্ষেত্র-গবেষণার দিক থেকে বিচার করেছেন। সব মিলিয়ে এই ছোট দুটি খণ্ডে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনার ইতিহাস ও পরিণতি স্পষ্ট হয়েছে — সমাজবিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণার পথ পরিষ্কার হয়েছে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

আলোচনা: শিল্প সংক্রান্ত

চিত্রকলা

রঙের ঝরনাধারা

ভারতী দেবী আমার মনে হয় আপনি ভুল করেছেন। ক্যানভাসে আঁকা তৈলচিত্রর দাম মাত্র দু আড়াই শ। খুবই কম। আপনার খরচ পোষাবে না। আজ শেষদিন নাহলে আপনি আমার কথা রাখতেন? কিন্তু আমার কি করে ভুল হল বলুন তো? আমি কি করে ভাবলাম আজ প্রথম দিন প্রদর্শনীর। ডায়রীতে লেখা ৩০শে জুন—আকাদেমী অব ফাইন আর্টস—ভারতী চৌধুরী।

আপনার প্রদর্শনীর ছ দিনই বৃষ্টি। লোকজন কম পেয়েছেন? একা একা বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছেন। আর্টিস্টমাত্রকে প্রদর্শনী করলেই এই অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। মানুষের মধ্যে ইদানীং একটা কথা রটে গেছে যে, চিত্রভাস্কর্য এমন এক খরোষ্টি যা করকোষ্ঠির মতো, একমাত্র বিশেষজ্ঞই না কি বুঝতে পারেন। কথাটার মধ্যে একটা অর্ধসত্য লুকিয়ে আছে। কিছু শিল্পী সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনবার পর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আধুনিক কবিতা, বা ধ্রুপদী সঙ্গীত উপভোগ করতে গেলেও তো প্রস্তুতি লাগে। খেয়াল যিনি শোনেন না তাঁর কাছে রাগ-রাগিণী অর্থহীন কসরৎ। চোখ

থাকতেও যিনি চোখ মেলে সব কিছু দেখেন না—তাঁর কাছে ছবি অর্থহীন

স্বীকার করে নেওয়া যাক প্রথমেই, আপনার ছবি আধা বিমূর্ত। নানা বর্ণছায় রেখা দিয়ে বেঁধে আপনি যে রচনাসৌকর্য তৈরি করেছেন তার মধ্যে চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিমূর্তিকরণ ঘটেছে। দৃশ্যের রূপরসগন্ধস্পর্শময় নির্যাস আপনি পটে এঁকেছেন। কাজগুলো জমেছে। মানুষ নেই। কিন্তু তার জন্যে কোনো অভাব বোধ হয় না। মাঝখানে হয়তো নীল আবছা গোল, চারপাশে কাঁটাতার আর ভূমির মধ্যে জ্যামিতিক আকার। চেনা জগৎটা ছবিতে সৃজনীপ্রক্রিয়ার ছাঁকনিতে ছেঁকে নিয়েছেন বলে অনেক বেশি বিশুদ্ধ এবং মরমী হয়ে উঠেছে। আকাশের নীচে গাছের মতো দেখতে—ধরা যাক এক নৈমিষ অরণ্য। কখনো উষ্ণ রঙের অসংখ্য ঝরনা দ্রুতগতিতে নেমে এসে পটে একটা অদ্ভুত মেদুর কাব্য তৈরি করে। দিগন্ত পর্যন্ত খোলা মাঠ ধু ধু করে ওঠে। বর্ণছায়ের জটলার আরণ্যক নীরবতাও অদ্ভুতভাবে সরব হয়ে ওঠে।

আপনার সংগে কথা বলে বুঝেছি দৃশ্য-জগতের অনুভব আপনি অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করার চেষ্টা করছেন। নান্দনিক অভ্যাসের জঞ্জাল সরিয়ে শুদ্ধরূপের প্রতি আপনার আকর্ষণ। কিন্তু আমরা যা দেখি তার অভাস চোখে এঁটে বসে। সুতরাং আধুনিক 'অপ আর্টে'র দৃষ্টিবিভ্রমের পরীক্ষার কিছু ছায়া পড়েছে আপনার কাছে। রঙ আর তুলিকে সোচ্চার হতে দেননি। বরং আবেগের রাশ টেনে ধরেছেন। ভেতর থেকে লাভার মতো উঠে আসতে চাইছে গলিত ধাতব রঙগুলো, কিন্তু আপনি জ্বালামুখের ওপর ঢাকনা চেপে দিয়েছেন। বিরাট মাছ টোপ গিলেছে, কিন্তু আপনি প্রাণপণে সুতো গোটাচ্ছেন। ছিপ ভেঙ্গে গেলে বা সুতো ছিঁড়ে গেলে আপনার সইবে না। সন্তর্পণে, হিসাব কষে আপনি কাজ হাসিল করতে চাইছেন। কিন্তু আপনার সুরবিস্তারের রীতি দেখে মনে হচ্ছে আপনাকে গলা ছেড়ে আরও দরাজভাবে গাইতে হবে। সূক্ষ্ম কাজের মোচড়গুলো দিতে হবে।

আপনার কাজ আমার ভাল লেগেছে। আপনার আধা বিমূর্ত কাজের সঙ্গে ভারতীয় ভূদৃশ্যের সংগতি আছে, সম্পর্ক আছে। প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে তাই। শান্তিনিকেতন-এ কলাভবনে যদি সুব্রহ্মনিয়াম বছরখানেক অতিথি অধ্যাপক হিসাবে কাটিয়ে যাবার ফলে ছাত্রছাত্রীদের কাজে তেলরঙের জলুষ এসেছে। আপনার কাজেও তার কিছু প্রমাণ পেলাম।

অভ্রের ওপর আঁকা অণুচিত্র

সম্প্রতি আকাদমী অব ফাইন আর্টসের সংগ্রহের একটি অন্য ধরনের প্রদর্শনী দেখলাম। অভ্রের ওপর আঁকা পঞ্চাশখানি ছবি দান করেছিলেন আশারানী বসু। অভ্রের ওপর আঁকা কবে থেকে শুরু হয় ঠিক বলা মুশকিল। কিন্তু কাজগুলো দেখে মনে [illegible] অবক্ষয়ের সময় আঁকা। নবাবী পৃষ্ঠপোষকতায় অণুচিত্র রাজসিক অলঙ্কারবাহুল্য এবং পারিপাট্যের দিকে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও তার আলাদা মহিমা আছে। কিন্তু প্রাসাদের জৌলুসের মালঞ্চের কুসুমের বুকে প্রকাশ পেল গোপন পোকা। অণুচিত্র প্রতিচ্ছবিমূলক হলেও তার মধ্যে কল্পনার বিস্তারের স্থান ছিল। কিন্তু অবক্ষয়ের সময় ননীর মত তনুর ভেতরের কংকাল বেরিয়ে পড়ল।

ইউরোপীয় শিল্পীরা ভারতবর্ষে এসে সাধারণ জীবনযাত্রা, দৃশ্যদৃশ্যের যানবাহন, বাজারহাট এবং ইত্যাদির ছবি আঁকছিলেন। তাঁরা প্রতিচ্ছবিমূলক বাস্তব কাজ করছিলেন। দেশীয় রীতিকে তাঁরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন বলেই অণুচিত্রের বাজার দর পড়ে গেল। মধ্যযুগীয় অণুচিত্রের শেষ কেন্দ্র পাটনার শিল্পীরা শেষের দিকে এই ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। ভগ্ন হলো দুর্গদুয়ার। হুড়মুড় করে বিদেশী চিত্ররীতি বেনোজলের মত ঢুকে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হলেন শিল্পীরা। কেউ কেউ চলে এলেন ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানী কলকাতায়।

প্রথম এই ছবিগুলো খুবই ছোট। স্ন্যাপসটের মতো। কোয়ার্টার থেকে দেশলাই বাক্সের সাইজের রঙীন ফোটোগ্রাফ। মুঘল বা পাহাড়ী কলমের চরম উৎকর্ষ রচনা এবং পঠনের কোনো পরিচয় এতে নেই। ভারতীয় মানুষজন এবং জীবনযাত্রার সচিত্রকরণ। পালকি, গরুর গাড়ি, সদর অন্দর। কল্পনার ধার না ধেরে প্রতিচ্ছবি হিসাবে আঁকা। এসব ছবিতে গভীরতা বা চরিত্র নেই। তবুও বিগত যুগের ছবি হিসাবে মন্দ লাগে না।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

চার ঋতুর গান

জীবনানন্দ দাশকে বাদ দিয়ে ভাবলে, বাংলা কাব্যে উপেক্ষিত ঋতুটির নাম হেমন্ত। রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটল? [illegible] ঋতুটি তো সম্পূর্ণ উপেক্ষিত বটেই, এমনকি হেমন্তের অনুষঙ্গ-জড়ানো গীতও অনাদৃত হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন না কেন, ভারতবর্ষে প্রত্যেক ঋতুরই একটা-না-একটা উৎসব আছে—শিল্পীরা স্রষ্টার এই দাবি মানেন নি। মানেন নি, তার প্রমাণ এবারের রবীন্দ্র জন্মোৎসবে রবীন্দ্রসদন আয়োজিত 'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানের আসরে (২১ মে সকাল) সম্যকভাবে ফুটে উঠল। তেরোজন উপস্থিত শিল্পী ছিলেন সেদিনের একক আসরে। কেউ বাছেন নি হেমন্ত ও শীতের কোনো গান। ফলে প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল চার ঋতুর।

অথচ এই অসম্পূর্ণতা আলাদা করে রাখলে, 'প্রকৃতি'র আসরের সামগ্রিক মান এবার সর্বোৎকৃষ্ট। প্রায় প্রত্যেকেই ভালো গেয়েছেন। ব্যতিক্রম বলতে গেলে বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন গুপ্ত। বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ভঙ্গিতে গান করছেন ইদানীং, যা শুনতে যত না খারাপ লাগে, তার [illegible]

অর্ঘ্য সেন

মায়া সেন

দেখতে। ক্লিষ্ট একটি মুখের ভঙ্গি, যেন গান শোনানো দারুণ কষ্টকর ব্যাপার। গান শুনে শ্রোতার সামান্য আনন্দ যেটুকু হবার, সেটুকুও উবে যায় তাঁর এই ম্যানারিজমে। সুপন গুপ্তের কণ্ঠ জীর্ণতর। সর্বত্র সুর লাগছে না। তাঁর নিজের পুরোনো রেকর্ডের মানও ছুঁতে পারলেন না তিনি এবারের 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়ায়'।

নতুনদের মধ্যে কৃষ্ণা সরকার গান ভালো করেন, গলাটিও মিষ্টি, কিন্তু পুনরুবৃত্তির দিকে বেশী ঝোঁক। সত্যজিৎ বসু এবার চমৎকার গেয়েছেন। তাঁর 'আমার প্রিয়ার ছায়া' সুরেলা সমৃদ্ধ পরিবেশন। এমনই আরেকটি সমৃদ্ধ সজীব নিবেদন সংঘমিত্রা গুপ্তের 'ওগো সাঁওতালি ছেলে'। কানে বেশ লেগে আছে। প্রমিতা মল্লিকের পরিবেশন-ভঙ্গিতেও একই ধরনের সজীবতা। তাঁর দুটি গানই স্বচ্ছন্দ সুন্দর। শৈলেন দাস মাত্রই দুখানি গান গাইলেন কেন, এ নিয়ে দুঃখ থেকে যায়। তাঁর কণ্ঠে 'গগনে গগনে ধায় হাঁকি' এক অবিস্মরণীয় নিবেদন হয়ে রইল। ইন্দ্রাণী সেনের গান ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্রমশ তিনি সুমিত্রা সেনের মতো করে গাইছেন। এটা তেমন সমর্থনযোগ্য নয়। সাগর সেনের 'আকাশ ভরা সূর্য-তারা'কে ছাপিয়ে উঠেছে 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' এবং 'প্রখর তপন তাপে'। বিশেষ করে শেষোক্ত গানটির মেজাজ তাঁর কণ্ঠে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। রাজেশ্বর ভট্টাচার্যের 'একটুকু ছোঁয়া লাগে' ভালো লেগেছে। বাণী ঠাকুরের কণ্ঠ এদিন খুবই স্ফূর্ত ছিল। তিনটি গানই সুন্দর গেয়েছেন তিনি। বিশেষভাবে মনে থাকে 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' এবং 'আমার দিন ফুরালো'। অর্ঘ্য সেন প্রায় সব সময়েই মেজাজ দিয়ে গান করেন। সেদিন তাঁর মেজাজ এক আশ্চর্য তুঙ্গে পৌঁছেছিল। চূড়ান্ত দাপট এবং দক্ষতায় নিজেকে ছাপিয়ে উঠে যে তিনখানি গান শোনালেন তিনি তার তুলনা বিরল। বহুকাল মনে থাকবে তাঁর এই আসরে শোনানো 'সঘন গহন রাত্রি', 'ও চাঁদ তোমার দোলা' এবং 'সেই তো বসন্ত ফিরে এল' গান তিনটি। মায়া সেন ছিলেন এদিনের আসরের শেষ শিল্পী। তাঁর কণ্ঠে আবার শোনা গেল সেই চিরনবীন গান—'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী'। তিনিও বিরল মেজাজে ছিলেন সেদিন। কণ্ঠটি ছিল দারুণ পরিষ্কার। 'মধু রহো রহো' এবং 'মধু গন্ধে ভরা' গান দুটিতে সেই মেজাজের এবং কণ্ঠের পূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠল॥

গীতাঞ্জলির গান

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের শেষ দিনে—১৪ জুন ১৯৭৮—'ইন্দিরা' গোষ্ঠীর প্রযোজনায় নিবেদিত হল 'গীতাঞ্জলির গান'। সব ভালো যার শেষ ভালো' কথাটা যদি নেহাতই কথার কথা না হয়, তাহলে বলতেই হবে যে, রবীন্দ্র-সদনের এবারের এই জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। একক-গোষ্ঠী প্রযোজিত গানের আলাদা অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে 'গীতাঞ্জলির গান'ই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। 'ইন্দিরা'-গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ, এমন একটি সুপ্রযোজিত সঙ্গীত-সন্ধ্যা উপহার দিলেন বলে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আরেকটি বাড়তি ও স্থায়ী ধন্যবাদ তাঁরা পাবেন রবীন্দ্র-অনুরাগী মহলের। সেই ধন্যবাদ তাঁদের প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলির গান' শীর্ষক স্মারকপুস্তিকার জন্য। এমন সমৃদ্ধ ও মূল্যবান স্মারকপুস্তিকা কমই বেরুতে দেখা যায়। শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ যেমন চিন্তাকে উসকে দেয়, তেমনই বহু অগোচর ও দুর্লভ তথ্য সংযোজিত হয়েছে গীতাঞ্জলির গান-গুলি সম্পর্কে। পুস্তিকাটির মুদ্রণ-সৌষ্ঠব রুচিপূর্ণ।

বস্তুত, রুচির ছাপই ইন্দিরা গোষ্ঠীর এই অনুষ্ঠানটির প্রধান আকর্ষণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দারুণ রুচিশীল ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন তাঁরা। ইন্দিরা গোষ্ঠীর বাইরের যেসব শিল্পী নির্বাচন করেছিলেন তাঁরা, সেই আমন্ত্রিত শিল্পী-গোষ্ঠীতে ছিলেন অমিয়া ঠাকুর, সুচিত্রা মিত্র, ঋতু গুহ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, অর্ঘ্য সেন। এ ছাড়া ছিলেন কৃষ্ণা ---দা। কৃষ্ণা হাজরার নাম আলাদাভাবে --- হয় এই কারণে যে, দারুণ

সুরেলা ও লাবণ্যময় কণ্ঠের অধিকারিণী এই শিল্পীকে সচরাচর কোনো আসরে দেখা যায় না। কেন যে যায় না, কে জানে। অথচ সেদিন কৃষ্ণা হাজরার কণ্ঠে 'প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে' যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা নিশ্চিত নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করবেন। সুচিত্রা মিত্রও এবার সদস্য আয়োজিত একক-আসরে অনুপস্থিত ছিলেন। অন্য কোনও অনুষ্ঠানেও যোগ দেননি। তাঁকে দিয়ে শুধু গানই গাওয়াল সি ইন্দিরা গোষ্ঠী, একটি অনবদ্য কবিতাও (যেন শেষ গানে মোর) পড়িয়ে নিয়েছেন। অমিয়া ঠাকুরের কণ্ঠে এখনও মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে' শুনতে পাওয়া দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বন্ধু সুহৃদ 'তোমার সোনার থালায়' বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। তাঁকে দিয়ে এই গানটিই গাওয়ানো হয়েছে। শৈলেন দাসের 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর' অসামান্য পরিবেশন। গানের মেজাজ ও শিল্পীর মেজাজ এক হয়ে গিয়েছিল। অর্ঘ্য সেনের 'আমি যেথায় থাকি' শুনেও মেজাজী নিবেদন। তেমনই নীরব করে দেওয়া মেজাজী অর্ঘ্য অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'এবার নীরব করে দাও হে'।

ইন্দিরা গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নাম মনে পড়ে, তিনি সুপর্ণা চৌধুরী। অসাধারণ দরদ ছিল তাঁর 'আরো আঘাত' গানটির পরিবেশনে। শ্রীনন্দা মল্লিকের গলার প্রসার বহুব্যাপ্ত, কিন্তু ভঙ্গি কেমন সফিস্টিকেটেড। প্রসূন দাশগুপ্তের গায়কী বেশ বলিষ্ঠ। শ্রীনন্দা চৌধুরীর 'এই যে তোমার প্রেম' সুন্দর নিবেদন। কৃষ্ণা রায়চৌধুরী ও অময় বসুর যৌথ কণ্ঠে পরিবেশিত 'আমার এরা ফিরেছে'তে কৃষ্ণা রায়চৌধুরী বড় ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিলেন। অময় বসুর গলা ভালো লাগল। সমবেত কণ্ঠের প্রতিটি গানই সুন্দর।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

গোলাপ বউ

কিছু কিছু গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর দুর্বলতা যে ছবির মনোহরণ ক্ষমতাকে নিষ্প্রভ করে তুলতে পারে তারই একটি দৃষ্টান্ত 'গোলাপ বউ'। কাহিনী এবং চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা, আলোকচিত্র গ্রহণ এবং পরিচালনা এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একাই নির্বাহে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 'মোটামুটি' পর্যায়ের বেশী দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি।

নায়িকার (সন্ধ্যা রায়) নামে ছবি, কিন্তু ঘটনাকে সাজানো হয়েছে নায়কের (সমিত ভঞ্জ) জীবন পরিব্যাপ্ত করে। নায়ক আমোদ নৌকা বায় আর গান গায়। তার স্ত্রী স্বর্ণ—গ্রামে তার পরিচয় গোলাপ বউ নামে। সেই গ্রামের শখের যাত্রাদলে কংস (অর্থাৎ প্রধান চরিত্র) সাজে জমিদার রুদ্রকান্ত (অজিতেশ

সন্ধ্যা রায়

বন্দ্যোপাধ্যায়)। বিবেক সাজে আমোদ—আর তাতেই তার সুনাম। সেই পারুয়া-ভাঙা গ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী রুদ্রকান্তের বড়কুটুম হুতরুহাটার মেজকর্তা (তরুণকুমার)। রুদ্রকান্তকে জব্দ করার অভিপ্রায়ে মেজকর্তা কলকাতা থেকে চপের দল আনায়। দলে মেয়ে না হলে আর চলে না। তাই রুদ্রকান্তর দৃষ্টি পড়ল গোলাপ বউয়ের ওপর। আমোদ তাতে রাজি নয়। ওদিকে মেজকর্তা আমোদকে তাদের দলে টানতে চায়। কিন্তু রুদ্রকান্ত বিবেক সাজার জন্য কলকাতা থেকে একজনকে ভাড়া করে আনায়। অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আমোদ হত্যা করে বসে রুদ্র-কান্তের পরামর্শদাতাকে। পুলিসের ভয়ে আমোদ গ্রাম ছেড়ে যাবার পর আশ্রয় পায় চপের দলের মেয়ে শ্যামার (আরতি ভট্টাচার্য) কাছে। ওরা আলাদাভাবে ঘর বাঁধে। ওদিকে রুদ্রকান্ত প্রতিশোধ নিতে গোলাপ বউ-এর ঘর জ্বালিয়ে দেয়। নিরাশ্রয় গোলাপ বউ রুদ্রকান্তর লালসা থেকে বাঁচতে তাকে খুন করে গ্রাম ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। তারপর ঘটনাস্রোত এমন চেনাপথ ধরে এগিয়ে চলে যে আমোদ আর গোলাপ বউয়ের পুন-র্মিলন ব্যাপারটা আগে থেকেই অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

ছকে বাঁধা কাহিনী যার মধ্যে দীপ্ত চিন্তাশক্তির পরিচয়ের অভাব। শরিকে-শরিকে শৌর্য নিয়ে রেষারেষি, চপের দল ইত্যাদি থেকে কাহিনীর অন্তর্গত ঘটনাকাল এই শতাব্দীর গোড়ায় আমাদের বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চরিত্রাবলী সাজ-পোশাকে, আচরণে এবং বাচনে (এমন কি অশিক্ষিতদের মুখেও মার্জিত সংলাপ) একেবারে আজকের দিনের চেহারা প্রতিভাত করে। শক্তি বন্দ্যো-পাধ্যায় মুখ্যত আলোকচিত্র শিল্পী এবং সেদিক থেকে বেশ কিছু দৃশ্যে কুশলতার পরিচয়ও দিয়েছেন কতক দৃশ্যে আবহ-সঙ্গীতের নাটকীয় প্রয়োগেও তাঁর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রুদ্রকান্তর পরামর্শদাতা মোসাহেব, যাত্রার দালাল, গ্রামের বহুরূপী, স্যাকরা, ডাক্তার প্রভৃতি টাইপ চরিত্রগুলি মজার করে তুলেছেন তপেন চ্যাটার্জী, শ্যামল ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, নিমু ভৌমিক, শোভেন মজুমদার,

রূপ দাশগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। সমিত ভঞ্জের আমোদ চরিত্রাভিনয়ে কেমন যেন ব্যক্তিত্বের অভাব। সন্ধ্যা রায় তাঁর অভিনয়কুশলতায় গোলাপ বউকে রমণীয় করে তুলেছেন—কিন্তু চৌদ্দ বছরের বাসন্ত গ্রাম্য বালিকা বধূ চরিত্রে আর কতকাল তিনি মানিয়ে চলতে পারবেন! ছবির আরম্ভ দৃশ্যেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় কংসের চরিত্রে অভিনয় করতে। অভিনয়ের বাইরেও লম্পট জমিদারের চরিত্রে সাজ-পোশাকবিহীন কংসের মনোভাব ও ভঙ্গিটাই তিনি বজায় রাখতে চেয়েছেন। আমোদের অনুরক্ত পান-সিগারেটওলা বিয়ে-পাগল অনাদি (অনুপকুমার) চরিত্রটি রাখা হয়েছে কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার জন্য।

রুদ্রকান্তকে হত্যার হাতিয়ার গোলাপ বউকে জুগিয়ে দেবার জন্যই যেন নদীর ঘাটে একটা ছুরি পড়ে থাকা; অনাদির বিয়ে করে পায়ে হেঁটে বউ নিয়ে ফেরার পথে নিরুদ্দিষ্ট গোলাপ বউয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ; আমোদ ও গোলাপ বউ-এর পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য শ্যামার আকস্মিক মৃত্যু—এমনি ধারা সাজানো কাকতালীয় ব্যাপার কাহিনী উপভোগে দর্শকমনকে চুপসে দেয়।

প্রকৃত আমোদ দেয় টাইপ চরিত্রগুলি। আর বিশেষ উপভোগ্য গানগুলি (রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)। লংপ্লেয়িং রেকর্ডের মাপে দীর্ঘ হলেও নীতা সেনের সুর এবং মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়ার গুণে গানগুলি বেশ সুশ্রাব্য।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

কালবৈশাখী

কালবৈশাখী শুধু রূপান্তরিত নাটক নয়, কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চেরও রূপান্তর ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিককালে পেশাদার মঞ্চে গম্ভীর বিষয় নিয়ে নাটক হলেও অনেক 'শ্রোতাপসন্দ' মশলায় ভিয়েন চড়ানো হয়। শ্রেমব্রাউন ইনস্টিটিউটে 'কালবৈশাখী' প্রযোজনায় নির্দেশক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ব্যবসায়িক কোন আপস করেন নি। স্বল্পপরিসর মঞ্চ কোন বাধা হয়নি, শিল্পীরা গ্ল্যামারসর্বস্ব হয়ে নাট্য-চরিত্র হনন করেন নি, দর্শকের মনোহরণের জন্য আঙ্গিক নাটককে কেন্দ্রচ্যুত করে নি।

কালবৈশাখী প্রযোজনার মেরুদণ্ড অভিনয় (ইদানীংকালে যে শক্তি প্রায়শই অবহেলিত)। প্রতিটি শিল্পী অভিনয় করেছেন গভীরে। প্রতিটি শিল্পী সচেষ্ট ছিলেন মূল লক্ষ্যে যার পরিণতি নিদারুণ ট্রাজেডিতে। শুভব্রত চরিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে তিনি অবহেলিত শিল্পী। তাঁর ক্ষমতার উপযোগী সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন। সার্থক রূপায়ণ। তাঁর কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গীতে, বেশ কিছুদিন যে ধরনের চরিত্র রূপায়ণের একটি স্মরণীয় শূন্য স্থান ছিল সেটি পূর্ণ হল। অসাধারণ অভিনয় মুকুল ঘোষের। তাঁর কণ্ঠ, অভিব্যক্তি সব কিছুই প্রযোজনাকে ব্যাপ্ত করে অন্য তাৎপর্যে। নীলিমা দাস যে জটিল চরিত্রের রূপ দিয়েছেন, সে চরিত্র রূপায়ণ যে কোন সময় ভারসাম্য হারিয়ে অন্য চেহারা নিতে পারত, কিন্তু অভিজ্ঞতা তাঁকে কোন সময় হেলতে দেয়নি। কল্পনা মুখোপাধ্যায় সম্ভবত এ ধরনের চরিত্রে এ পর্যন্ত অভিনয় করেন নি। এই অন্য ধরনের চরিত্র তাঁর পক্ষে শক্ত হয়েছে। নানা ধরনের চরিত্রের দক্ষ রূপায়ণে শিল্পীর দাপট প্রকাশিত। পাশাপাশি গৌর চট্টোপাধ্যায় অসম্ভব বাস্তবিক অভিনয়ে চরিত্রকে মূর্ত করেছেন, স্বল্প সময়ের স্থিতি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্মৃতি থেকে যায়। চিন্ময় রায় একটি জ্যোতিষীর চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। যদিও চরিত্রটি মজাদার, কিন্তু কোন সময় রসিকতা ভাঁড়ামি হয়ে ওঠেনি। এই পরিমিতিই 'কালবৈশাখী' প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য। নায়িকা বীথি চরিত্রে শমিতা বিশ্বাস যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে চরিত্রের অব্যক্ত বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন।

এই নাটকে প্রথা ভেঙে সুরেশ দত্ত একটি সেটেই নাটককে প্রসারিত করেছেন। শ্রেমব্রাউন ইনস্টিটিউটের দু' পাশের জায়গাকেও কাজে লাগানো হয়েছে। তাপস সেন, এই বিষাদান্ত নাটকের মেজাজ অনুযায়ী আলোক-সম্পাত ছাড়াও প্রথমে ঝড়ের দৃশ্যে ও শেষে ট্রেন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজের ছায়া, স্বল্পপরিসর মঞ্চেই অসাধ্য সাধন করেছেন। অজয় দাসের আবহ নাটকের মুড সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে বহুক্ষেত্রেই।

এতক্ষণ এই প্রতিবেদন পড়ার পর অনেকের ধারণা হতে পারে এটি সমালোচনা নয়, বিজ্ঞাপন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পালাবদলের জন্য কালবৈশাখী নিশ্চয়ই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাই এই সুন্দর প্রযোজনায় সামান্য কিছু অসংগতি পীড়া দেয়। "অল মাই সন্স"-এর বিশ্বস্ত রূপান্তর করেছেন বীরু মুখোপাধ্যায়। রূপান্তরে ভারতীয় মেজাজ অক্ষুণ্ণ। শুধু বিপত্তি ঘটিয়েছে অন্তিম পর্বে। মূল নাটকের ঘটনার পরিবর্তন ঘটিয়ে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট দেখাতে গিয়ে অনেক অবিশ্বাস্যকে মেনে নিতে হয়েছে। মুমূর্ষু অবস্থায় দেবব্রত চিঠি লেখে কি করে এবং তাও শুধু বীথিকেই! চিঠি পৌঁছয়। কিন্তু আর কেউ জানতে পারে না মৃত্যু সংবাদ। অযৌক্তিক এই ঘটনা শুধু বিভ্রান্তিতে ফেলে। অবশ্য তাপস সেনের আলোয় প্রথমেই চমক হেনেছিল, এই দৃশ্যে চূড়ান্ত চমক দেখা গেছে। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে দেখানোর জন্য এই দৃশ্যের অবতারণা কিনা জানি না। যাই হোক শুধু প্রথম ও শেষের চমক নয়, তাপস সেন এই নাটকে অনন্য। সুরেশ দত্তের মঞ্চনির্মিতিতে স্থান-সঙ্কুলানের দক্ষতা

ডাক্তার ভিতর থেকে ঢুকে বলে, 'একি বউদি, এত রাত্রি বাইরে বসে?' ওটা যে করিডোর, বাইরে থেকে আসার পথ, সেটা প্রথমাবধি বোঝা যায়নি। অজয় দাশের আবহ অনেক জায়গায় অতিরিক্ত অর্থাৎ পেশাদারীভাবে যে টার্মস্ ব্যবহার করা হয়। প্যাথোস, কমিক, সাসপেন্স তা প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত। থিম্ মিউজিক-এর সঙ্গে ভোকাল-রিফ্রেন প্রথমেই মেজাজ তৈরি করে দেয়, কিন্তু শেষে হামিং-এ 'বিস্তীর্ণ দুপারের ও গঙ্গা বইছ কেন?' সুর-ব্যবহার নিকটসম্পর্কে আনে না। চিন্ময় রায়ের প্রথম ঢোকার সময় যে 'কমিক্যাল' মিউজিক আছে, ওটা যত তাড়াতাড়ি পরিত্যক্ত হয় ততই মঙ্গল, কারণ ওটা সম্পূর্ণভাবে প্রধানুগত্যকে চিহ্নিত করে। অভিনয়ে চিন্ময় রায়কে সম্পূর্ণভাবেই রসিকতার জন্য রাখা হয়েছে। নাটকের মূল ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব কম। যদিও পরিস্থিতির গুণে তাঁর কখনও মাত্রাজ্ঞান হারায়নি—তবুও পূর্ববঙ্গীয় ভাষা অথবা কয়েকটা ভুল ইংরেজী, উচ্চারণ-বিকৃতি, অনেক বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার পাশাপাশি নেহাতই মামুলী (গ্রেট কে গ্র্যাট বলা বা হোয়াট ইজ দি বিকজ' প্রভৃতি। তুলনায় কল্পনা মুখোপাধ্যায়ের সংলাপে বিকৃত ইংরেজী অনেক সংক্ষিপ্ত হলেও অব্যর্থ। বসন্ত চৌধুরীর অসামান্য অভিনয় সত্ত্বেও সবিনয়ে বলি বহু জায়গায় ঠিক জায়গায় দম না নেওয়ার

জন্য অবাঞ্ছিত জায়গায় ছেদ পড়ে (জানি না যেদিন অভিনয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম, সেদিন একমাত্র এটা হয়েছিল কিনা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এই স্টাইল নেওয়া হয়েছে)। শেষ দৃশ্যে অনেক কিছুই তাড়াতাড়ি ঘটে যায়। এই দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী আক্ষেপের সঙ্গে হাত নাড়েন, সেই অর্ধোন্মত্ত অবস্থা। প্রফুল্ল নাটকের 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' থেকে চলে আসছে। এই আদ্যোপান্ত প্রথাভঙ্গের নাটকে কোন কিছু প্রথাগত ভাবতে ইচ্ছে করে না। শমিতা বিশ্বাস যখন আবেগের সঙ্গে কথা বলেন, তখন শরীর দুলতে থাকে, কণ্ঠও প্রথাসিদ্ধ আবেগের কাছাকাছি চলে আসে—সূচনা যখন হয়েছে, তখন চেষ্টা করেই সব কিছু ভাঙতে হবে। ডাক্তারের ছেলের মুখে কিছু কথা বলানো হয়েছে যেটা নেহাতই ছেলেমানুষী।—"গাছটাকেআটা দিয়ে লাগানো যায় না?" কখনও এই বয়েসের ছেলে বলতে পারে না। তার উপযোগিতা শুধু বিরতির আগে একটি প্রতীকি নাট্যমুহূর্ত রচনার এবং কিছু সংকটের ইঙ্গিত দেওয়া। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি কথা মনে এল। কিছুদিন আগে একটি গ্রুপ থিয়েটার অল মাই সন্স প্রযোজনার কথা ভেবেছিলেন (সম্ভবত এই রূপান্তরটি) কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা নাটকটি করেন নি, কমার্শিয়াল প্রসপেক্ট নেই বলেই। ইলোরা আর্টস-এর সৌজন্যে কমার্শিয়াল স্টেজে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সেই নাটক মঞ্চস্থ করেছেন—এইখানেই তাঁর চ্যালেঞ্জ এবং সার্থকতা।

এতদিন সুদূর মফস্বল থেকে সপরিবারে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, যাদুঘর দেখার পর সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখে ক্লান্ত পরিবার হাসতে হাসতে অথবা তাৎক্ষণিক আবেগে গদগদ হয়ে ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করত। অথবা ক্যাবারে নাচের স্মৃতিতে চকচকে হয়ে জেগে থাকত লোভী চোখ। এইবার ক্রেমব্রাউন থেকে ফেরবার পথে কৃষ্ণনগর অথবা ক্যানিং-এর পথে অনেক ঘুমহীন চোখ শুধু জানলার পাশে বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকবে, নিজেদের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হয়ত শিউরে উঠবে।—স্বগত বিষাদ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

লক্ষ্মণ পাই (১৯২৬—)

সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে লক্ষ্মণ পাই সৃজনীকল্পনা দিয়ে নিজের স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন। জন্ম গোয়ায়। বর্তমানে গোয়ায় চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছেন। তিনি বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল থেকে স্নাতক হলেন 'মেয়ো পদক' পুরস্কার-সহ (১৯৪৩-৪৭)। তারপর জে জে স্কুল অব আর্টের সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ('৪৭)। বোম্বাইতে ১৯৫০-এ তাঁর একক প্রদর্শনী। পরের বছরে প্যারীতে যান তিনি। প্যারীর রু দ্য সেইন এবং লণ্ডনে একক প্রদর্শনী (১৯৫২)। ১৯৫৩-তে ইউরোপ পরিক্রমা। একক প্রদর্শনী প্যারী, ম্যানিক এবং নয়াদিল্লি।

১৯৫৪—বোম্বাই এবং প্যারীতে একক প্রদর্শনী। ১৯৫৫-তে পূর্বাপর কাজের প্রদর্শনী হল প্যারীতে (১৯৪৫-৫৫)। গীতগোবিন্দ ভাবালম্বনে চিত্ররাজির প্রদর্শনী। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। নয়াদিল্লিতে প্রদর্শনী। ১৯৫৬ সালে প্যারী ফিরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ছবি আঁকলেন। রু মসিয়ে না প্রিজে প্রদর্শনী। ১৯৫৭-তে পশ্চিম জার্মানীর রোসেনথাল কারখানার সঙ্গে চীনামাটির বাসনের জন্যে অলংকরণের নকশা এঁকে দেবার চুক্তি হয়। ম্যুনিক, স্টুটগার্ট ন্যু ইয়র্ক, প্যারী এবং বোম্বাইতে একক প্রদর্শনী। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯৫৮-তে নয়াদিল্লিতে একক প্রদর্শনী। রামায়ণ এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে জলরঙে এবং কালিকলমে দুটি চিত্রমালা রচনা। বোম্বাইতে এবং নয়াদিল্লিতে প্রদর্শনী। ১৯৫৯-এ লণ্ডনে "বুদ্ধজীবনী" নিয়ে এচিং রচনা ও প্রদর্শনী। প্যারীতে প্রদর্শনী। ১৯৬১ সালে প্যারীতে রেশমের ওপর আঁকা ছবির প্রদর্শনী। ললিতকলায় জাতীয় পুরস্কার লাভ, ব্রেমেনে একক প্রদর্শনী এবং বিয়েনাল দ্য প্যারীতে অংশ গ্রহণ।

১৯৬২-তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। দুটি করে একক প্রদর্শনী হয় নতুন দিল্লি আর কলকাতায়। পূর্বাপর কাজের প্রদর্শনী বোম্বাইতে (১৯৪৮—৬২)। ১৯৬৩-তে পুনরায় ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার লাভ। কালিদাসের "ঋতুসংহার" অবলম্বনে চিত্রমালা রচনা। বোম্বাইতে প্রদর্শনী। ব্রেজিলের সাও পাওলো এবং টোকিও বিয়েনালে অংশ গ্রহণ। ১৯৬৪-তে নয়াদিল্লিতে দুটি কর্ণোলী এবং বোম্বাইতে একটি প্রদর্শনী। ১৯৬৫-তে কলকাতায় চিত্র প্রদর্শনী। ভারতীয় রাগরাগিণীর মেজাজে "রাগানুরাগ" চিত্রমালা বিমূর্ত-ভাবে আঁকেন। নতুন দিল্লি এবং বোম্বাইতে প্রদর্শনী। নয়াদিল্লিতে "কাশ্মীরী প্রতিকৃতি"গুলিও প্রদর্শিত হয়। ১৯৬৬-তে নয়াদিল্লি এবং কলকাতায় প্রদর্শনী। এই বছরে "পুরুষ ও প্রকৃতি" চিত্রমালা আঁকেন। দিল্লি ও বোম্বাইতে প্রদর্শনী।

১৯৬৭-তে নয়াদিল্লিতে "নৃত্যের ছন্দ" (১৯৪৭—৬৭) নিয়ে আঁকা ছবিগুলির একত্রিত প্রদর্শনী। ১৯৬৮-তে বোম্বাইতে দুটি, নতুন দিল্লি এবং

কলকাতায় একটি প্রদর্শনী হয়। ১৯৬৯-এ নয়াদিল্লিতে দুটি প্রদর্শনী। ১৯৭০ সালে ব্যাঙ্ককের শিল্পাকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, কুয়ালালামপুরের জাতীয় চিত্রশালা, নয়াদিল্লি এবং বোম্বাইতে চিত্র প্রদর্শনী। ১৯৭১-এ গোয়া এবং নতুন দিল্লিতে প্রদর্শনী। বোম্বাইতে "রামায়ণ" চিত্রমালা প্রদর্শনী। ১৯৭২-তে তৃতীয়বার ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার লাভ এবং নয়াদিল্লিতে প্রদর্শনী। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪-এ বোম্বাইতে প্রদর্শনী। এখনও ভারত এবং পৃথিবীর কোনো-না-কোনো দেশে প্রতি বছর তাঁর প্রদর্শনী হয়। তিনি ললিতকলার সদস্য এবং "এমিনেন্ট আর্টিস্ট"। তাঁর ছবি আছে প্যারীর মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট, নয়াদিল্লির আধুনিক শিল্পকলার সংগ্রহশালায়, মার্কিন দেশের বেন অ্যান্ড আবি গ্রে ফাউনডেশনের সংগ্রহশালায়, ন্যু ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে, পশ্চিম বার্লিনের যাদুঘরে এবং অন্যত্র।

লক্ষ্মণ পাই তাঁর কাজে ভারতীয় আধুনিক বোধ একত্রিত করতে চেয়েছেন। রঙ এবং রূপপিপাসা তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বারবার নিজেকে পালটেছেন কিন্তু তাঁর কাজে কল্পনা এবং মায়ার একটা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সচেতনভাবে কাজ করে গেছেন। ভারতীয় সমকালীন চিত্রকলায় তাঁর অবদান তাই এত অসামান্য।

প্রচ্ছদচিত্র "বসন্তে নারী" (১২৭× ৮৭ সি এম তৈলচিত্র ১৯৭৬) ঘন নীল প্রতিবেশে একটি আশ্চর্য নারী। তার আঙুলে বসেছে অচিন পাখি। নায়িকার চুল যেন নববসন্তের মায়াবী পাতা ভরা। ফুল। এ কি নারী, না তরু? উর্বার-শক্তির প্রতীক? বর্ণবিন্যাসের আবেশে ঘোর লাগে। এ কি স্বপ্ন, মায়া বা মতিভ্রম?

ক্লোজ-আপ-তাজা নিঃশ্বাস, আর
ক্লোজ-আপ-সাদা দাঁতের জন্যে চাই
স্বচ্ছ লাল
ক্লোজ-আপ
একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ
Close-up
Close-up
Close-up
এমন নিবিড় মুহূর্তের জন্যে আপনার প্রয়োজন নতুন ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর শক্তিশালী মাউথওয়াশ আপনার নিঃশ্বাসকে করবে ক্লোজ-আপ-তাজা, এর বিশেষ দুটি উপাদান আপনার দাঁতকে করবে ক্লোজ-আপ-সাদা।
কোলকাতায় এবং মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, গোয়া, পশ্চিম বঙ্গ, তামিল নাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের বাছাই করা শহরে পাওয়া যায়।
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-CX.14-2415 BG

হরলিক্স আপনার বিশেষ প্রয়োজনে যোগায় গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি।

অন্তঃসত্ত্বা যখন

অন্তঃসত্ত্বা কালিন মহিলাদের সহজে হজমযোগ্য আর সারাংশ যুক্ত সীমিত খাদ্যের প্রয়োজন। সেইজন্য তৎকালিন নিয়মিত হরলিক্সই একটি আদর্শ পথ্য। মা এবং সন্তান উভয়ের শরীর গড়ার প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা মেটায় হরলিক্স। নিয়মিত রাত্রে পান করলে কোষ্ঠ কাঠিন্যতার সম্ভাবনা দূর করে এবং প্রত্যুষের দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে।
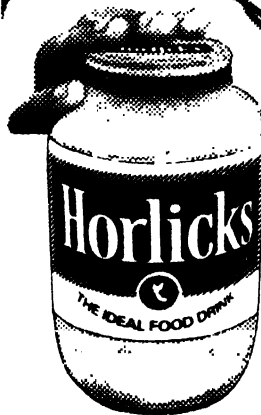
সুস্থতার পথে

অসুস্থতার সময় আপনার শরীরে মূল্যবান প্রোটিন আর আহার্য্যের ক্ষয় হয় যার দরুণ শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। হরলিক্স পথ্য, যাহা সহজে হজমযোগ্য, তৎকালিন যোগায় টিসু তৈরীর প্রোটিন, শক্তি বৃদ্ধির কার্বো-হাইড্রেট আর খনিজ পদার্থ। আপনার শারীরিক ক্ষয় বন্ধ করে, আরোগ্য লাভ দ্রুত করে তোলে এবং ভবিষ্যতে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলে।

সেই সারাবিশ্বের ডাক্তারেরা হরলিক্স সুপারিশ করেন।

হরলিক্স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Hx-4589 Ben.1

রূপের প্রকাশ চুলে...
আর সেখানেই কেয়ো-কার্পিনের
কথা ওঠে।
এক অতুলনীয় কেশ তৈল···
চুল চটচটে হয় না
জামা কাপড়ে দাগ লাগে না
মনোরম গন্ধ
A HAIR OIL OF DISTINCTION
FOOD & TONIC FOR HAIR
DEY'S MEDICAL STORES LTD
Dey's
দে'জ
মেডিকালের
তৈরী
নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখুন-চুলের সৌন্দর্য্য অটুট রাখুন

চিঠিপত্র

রাগ-অনুরাগ

গত ২৯শে জুলাই 'দেশ' সংখ্যায় পণ্ডিত রবিশঙ্করের "রাগ-অনুরাগ" শীর্ষক রচনায় 'ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব সম্বন্ধে ওস্তাদ মুনব্বর আলী খাঁ-এর মন্তব্য পড়লাম।

এ কথা সত্যি যে পাতিয়ালা ঘরানার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিচার করলে তাঁর সংগীত পরিবেশন রীতি ঠিকই ছিল। সদা সঞ্চরণশীল, দ্রুত গতিতে তান কর্তব ও সরগম খেয়াল গানে পরিবেশন করা পাতিয়ালা ঘরানার বৈশিষ্ট্য। খাঁ সাহেবের জীবদ্দশায় ১৯৪৯ থেকে তাঁর পরলোকগমনের পূর্বে দিন পর্যন্ত অনেকগুলি আসরে তাঁর সুমধুর কণ্ঠের গান শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি "মধ্য বিলম্বিত" লয়েই খেয়াল গাইতেন। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী তিনি ছিলেন। মনে হতো সাতটি সুরই যেন তাঁর পোষা পাখি। নিজের ইচ্ছামত তিনি স্বরগুলিকে যে কোন রাগে প্রয়োগ করতেন। এক কথায় তিনি সুরের যাদুকর ছিলেন। অবলীলাক্রমে তাঁর মধুর কণ্ঠ তিন সপ্তকেই বিচরণ করতো। তাঁর খেয়াল গানের বঢ়ত বা রাগ-বিস্তার "কিরাণা" পদ্ধতির মতন শান্ত, ধীর, স্থির ছিল না এবং সেই জন্যই চঞ্চল বলে মনে হতো। কারণ এটাই তাঁর ঘরানার এবং পরিবেশন রীতির বৈশিষ্ট্য।

তিনি সংগীত পরিবেশন খুব দীর্ঘ করতেন না তবে অনেক অনেক আসরেই তিনি এক ঘণ্টা অথবা এক ঘণ্টার মধ্যে একটি বা দুটি রাগও গেয়েছেন মনে আছে। যতক্ষণ তাঁর গান শুনতাম অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হতাম। কিন্তু মনপ্রাণ প্রশান্ত হতো না। কোথায় যেন একটা কিসের অভাব থেকে যেতো সেটা ঠিক বোঝান যায় না।

উস্তাদ মুনব্বর খাঁ সাহেব বলেছেন তান ছাড়া খেয়াল গান হয় না এবং 'তান'কে বাদ দিয়ে খেয়াল গানের বিচার করা যায় না, এটা অতি সত্যি কথা। খেয়ালের কথা বললেই তানের কথা মনে পড়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে, এই কথাও বলতে চাই যে, তানই একমাত্র জিনিস নয় খেয়াল গানে। নিছক তানবাজিতেও সংগীতে রসসৃষ্টি হয় না। যদি না 'খেয়াল' 'রাগ-রূপ' তার শান্ত, সমাহিত, ধীর ও স্থির বঢ়ত সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়। সংগীতের ব্যাকরণ এবং সৌন্দর্য দুটি আলাদা জিনিস এবং দুটিরই প্রয়োজন রয়েছে। সংগীতে 'সৌন্দর্য' প্রতিষ্ঠিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ব্যাকরণ তার ভিত্তি।

খাঁ সাহেবের ঠুংরী, দাদরা ইত্যাদি গান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। যার কোন তুলনাই হয় না। প্রাণের পূর্ণ আবেগের সাড়া পাওয়া যেতো তাঁর ঠুংরীতেই এবং অধিকাংশ শ্রোতাই তাঁর খেয়ালের চাইতে ঠুংরীই বেশী পছন্দ করতেন, শুনতেও চাইতেন। সংগীত-জগতে তিনি একজন জনপ্রিয় মহান শিল্পী বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রফুল্লকুমার সেন [illegible]

যীশু কে ছিলেন

আপনাদের সুবিখ্যাত পত্রিকায় 'যীশু কে ছিলেন ?' প্রবন্ধটির লেখিকা শ্রীমতী ডাইসন Don cupitt এবং Armstrong নামক দুই সাহেব লিখিত একটি গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ডন কিউপিট এবং আর্মস্ট্রং সাহেবের গবেষণা বাঙালী পাঠকদের কাছে নতুন মনে হলেও খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর কাছে তা নতুন কিছু নয়। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের যে বিবরণ বাইবেলে লেখা আছে তাকে নস্যাৎ করার জন্য এর আগে বহু পন্ডিত বহু গবেষণা করেছেন এবং বহু উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং এখনও করছেন। ডন কিউপিট এবং আর্মস্ট্রং সাহেব তাঁদের গ্রন্থে যে গবেষণা করেছেন তা পুরানো তত্ত্বের চর্বিত-চর্বণ মাত্র। যেমন ধরা যাক কুমারী-গর্ভে যীশুর জন্মের কথা। ওল্ড টেস্টামেণ্টে নবী ইসাইয়া কর্তৃক ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ আলমা এবং তার গ্রীক অনুবাদ পার্থেনস এই দুটি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুমুল আলোড়ন সৃষ্ট হয়েছিল। অনেক পন্ডিত তখন এই দুটি শব্দের আপাত পার্থক্যের উপর নির্ভর করে যীশু খ্রীষ্টের কুমারী-গর্ভে জন্মগ্রহণের কথাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। হিব্রু আলমা শব্দটির আভিধানিক অর্থ তরুণী (বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা) এবং গ্রীক পার্থেনস শব্দটিরও আভিধানিক অর্থ কুমারী তরুণী। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেণ্টের গ্রীক অনুবাদ যখন হয় (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) তখন অনুবাদকেরা তৎকালীন প্রচলিত অর্থেই শব্দটির অনুবাদ করেছিলেন। সত্তর জন বিশিষ্ট পন্ডিত মিলে এই অনুবাদ করেছিলেন বলে এই অনুবাদকে বলা হয় সেপটুয়াজিন্ট। সত্তর জন বিশিষ্ট ইহুদী পন্ডিত মিলে যে একটি শব্দের ভুল অনুবাদ করবেন এবং তাঁদের কারও চোখে যে সেই ভুল ধরা পড়বে না সে কথা কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোন লোক বিশ্বাস করবে না। সুসমাচার-লেখক মথি হিব্রু ও গ্রীক উভয় ভাষাই জানতেন, তার প্রমাণ এই যে তাঁর লেখা সুসমাচারে 'হিব্রু রচনাশৈলী ও ব্যাকরণরীতির প্রভাব অত্যন্ত প্রকট—এ কথা বাইবেলের যে কোন স্কলার অবগত আছেন। মথি হিব্রু ও গ্রীক উভয় শব্দেরই তৎকালীন প্রচলিত অর্থে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দু হাজার বছর পরে একটি দুটি হিব্রু বা গ্রীক শব্দের আভিধানিক ও আক্ষরিক অর্থকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল সীমিতবোধই ছিল তার ভিত্তি। প্রসঙ্গত বলা দরকার, কুমারী-গর্ভে যীশুর জন্মের যে কথা খ্রীষ্টীয়-মন্ডলী বিশ্বাস করে তা হিব্রু আলমা বা গ্রীক পার্থেনস শব্দ দুটির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত সত্য। যীশুর জন্মের আগে ঈশ্বর-প্রেরিত

কাছে কুমারী-গর্ভে যীশুর জন্মের ঐশ্বরিক বার্তা ঘোষণা করেছিলেন।

বস্তুত খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস ডিভাইন রিভিলেশন বা ঐশ্বরিক অভিব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে মানুষের মনগড়া কল্পনার স্থান নেই। কিউপিট ও আর্মস্ট্রং সাহেবের মত আরও অনেকে আছেন যাঁরা ডিভাইন রিভিলেশনে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁরাই যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে মুশকিলে পড়েন। যীশু খ্রীষ্টের জীবন, বাণী ও কর্মের যে বিবরণ বাইবেলে লেখা আছে তা তাঁরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন না, আবার বর্জনও করতে পারেন না। কারণ সুসমাচারে যীশুর জীবনের যে বিবরণ আছে তার যে অংশ তাঁরা বিশ্বাস করেন না তা বাদ দিলে বাকী অংশটুকু নিরর্থক ও পারম্পর্যহীন হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা যে অংশটুকু বিশ্বাস করতে পারেন না তার একটা পছন্দসই ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে যত সমালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে অন্য কোন ধর্মের প্রবর্তক বা মহাপুরুষদের নিয়ে তার সহস্রাংশের একাংশও হয়নি। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু, বাণী ও কর্মের যে বিবরণ বাইবেলে আছে তার প্রতিটি কথা, এমন কি প্রতিটি শব্দের চুল-চেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। বাইবেলের টেক্সট ক্রিটিসিজম, ফর্ম ক্রিটিসিজম হাইয়ার ক্রিটিসিজম ইত্যাদি নানা পদ্ধতির সমালোচনা এবং বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্ন-তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক ইত্যাদি যাবতীয় তাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের উক্তি যা নিউ টেস্টামেণ্টে গ্রীকভাষায় লিখিত হয়েছে তার অর্থ বা কদর্থ খুঁজে বের করার জন্য অ্যারামাইক, সিরিয়াক, হিব্রু এমন কি হিব্রু ভাষারও আদি উৎস উগারিটিক ভাষা ও সংস্কৃতি তোলপাড় করে অনু-সন্ধান করা হয়েছে। এত করেও অবশ্য যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর বাণীকে নস্যাৎ করা সম্ভব হয় নি।

প্রবন্ধ-লেখিকা আরও কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন যা তাঁর নিজস্ব ধারণামাত্র। যেমন যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়েছে তা পরবর্তীকালের চার্চের কীর্তি, যীশু নিজে তেমন কোন দাবি করেন নি বা কোন নতুন চার্চ গঠন করতে চান নি। তিনি ইহুদী ধর্মের আওতায় থাকতে চেয়েছিলেন এবং থাকলে তিনি ওল্ড টেস্টামেণ্টের একজন নবী বা পয়গম্বর হিসাবে গণ্য হতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইহুদী ধর্মের রীতিনীতির বিরোধিতা করেছিলেন বলে তারা তাঁকে হত্যা করে। অন্যান্য ধর্মের গুরুদের যেমন শিষ্যেরা দেবতা বানিয়েছে, যীশুর শিষ্যেরাও তেমনি তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে—ইত্যাদি।

কিন্তু লেখিকা যদি ইহুদীধর্ম ও ঐতিহ্যের খোঁজখবর রাখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে ইহুদীরা বিপরীত। তারা ঈশ্বরপ্রেরিত প্রত্যেক-জন নবী ও পয়গম্বরকে অগ্রাহ্য করেছে এবং হত্যা করেছে ঐশ্বরিক সত্য প্রকাশ করার জন্য। যীশু খ্রীষ্টকেও তারা হত্যা করেছিল একই কারণে—যীশু তাদের সমাজ-পতিদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে-ছিলেন যে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত মেসায়া। ইহুদী ধর্মের আওতায় থাকলে যীশু ওল্ড টেস্টামেণ্টের একজন নবী বা পয়গম্বর হতে পারতেন এ কথা কি করে বলা সম্ভব তা ভেবে পাই না। কারণ ওল্ড টেস্টামেণ্টের শাস্ত্র-রচনা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ' বছর আগে সমাপ্ত হয়েছিল। যীশু কি করে সেই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন

যীশু নিজে কোন নতুন চার্চ বা মণ্ডলী গঠন করতে চাননি—সে কথাও ঠিক নয়। শিষ্যদের প্রতি যীশুর শেষ নির্দেশ ছিল : তোমরা জগতের সর্বপ্রান্তে গিয়ে সুসমাচার প্রচার কর এবং সর্বজাতিকে আমার নামে দীক্ষিত কর......ইত্যাদি। খ্রীষ্টের মণ্ডলী বিশ্বস্তভাবে যীশু খ্রীষ্টের সেই নির্দেশ পালন করে চলেছে।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে তা 'মানব হৃদয়ের চিরাচরিত পৌত্তলিকতা' প্রণোদিত কোন ব্যাপার নয়। নিউ টেস্টামেণ্টের বিভিন্ন গ্রন্থ যদি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে প্রথমদিকের গ্রন্থ-গুলিতে যীশু খ্রীষ্টের কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালের লেখায় যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটিই বড় হয়ে উঠেছে এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে ঐশ্বরিক সত্তার প্রকাশ এ জগতে ঘটেছে সেই অনিবার্য সিদ্ধান্তে প্রতিটি লেখক উপনীত হয়েছেন। সেণ্ট পলের মত খ্রীষ্টবিদ্বেষী উগ্রপন্থী ফারিশীও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা কেউ ইচ্ছাকৃত কল্পনার বশবর্তী হয়ে তাঁর উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন নি। এ জগতের ইতিহাসে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঐশ্বরিক সত্তার যে অভিব্যক্তি ঘটেছে তাকেই তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

অধ্যাত্ম সত্য এবং পুরাণের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সেই পার্থক্য যিনি ঈশ্বরে বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করেন না তাঁর চোখে ধরা পড়ে না। বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানপন্থী পণ্ডিতেরা জড়বাদী যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে আধ্যাত্মিক সত্যের মূল্যায়ন করতে চান, কিন্তু ভুল পদ্ধতিতে বিচার করতে গিয়ে তাঁরা বিভ্রান্ত হন এবং বিশ্বাসচ্যুত হয়ে স্ববিরোধিতার শিকার হন। এঁদের উদ্দেশ্যে St Augustine-এর একটি বিখ্যাত উক্তি :

"There are things which we cannot believe unless we understand. There are also things which we cannot understand unless we beli-

বোধগম্য না হলে বিশ্বাস করতে পারি না, আবার কিছু বিষয় আছে যা বিশ্বাস না করলে আমাদের বোধগম্য হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আধ্যাত্মিক সত্য হচ্ছে তেমন ব্যাপার যা বিশ্বাস না করলে কোনকালেই আমাদের বোধগম্য হয় না। গোটা ব্যাপারটাকে তখন পুরাণ এবং কুসংস্কার বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

কিউপিট এবং আর্মস্ট্রং সাহেবদের লেখা একখানা মাত্র বই পড়ে প্রবন্ধ-লেখিকা মন্তব্য করেছেন, 'পণ্ডিতী গবেষণার যেসব ফলাফল বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে তা যুগান্তকারী। তাতে এতদিনকার পরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মের দাবি-দাওয়ার অবসান ঘটলো এবং যীশু সম্পর্কে অখ্রীষ্টান দুনিয়া যে রায় দিয়ে এসেছে তার যথার্থ্য প্রতিপন্ন হলো।' —মন্তব্যটি লেখিকার স্বকপোলকল্পিত। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিউপিট এবং আর্মস্ট্রং সাহেবদের পণ্ডিতী গবেষণা কিংবা অখ্রীষ্টান দুনিয়ার রায় ইত্যাদি কোন কিছুই প্রকৃত খ্রীষ্টানুসারীদের এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়াতে পারবে না।

আচার্য অরবিন্দম নাথ
(বাইবেল সোসাইটি
অনুবাদ বিভাগ)
শ্রীরামপুর।

॥ ২ ॥

গত ২৪ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন লিখিত যীশুখৃষ্ট সংক্রান্ত প্রবন্ধটি পড়ে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। প্রবন্ধটি পড়লে সাধারণভাবে মনে হয়, যে বইটি নিয়ে শ্রীমতী ডাইসন আলোচনা করেছেন, সেটিই বুঝি যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকত্বের ওপর বৈজ্ঞানিক মুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন গবেষণার প্রথম এবং আপাতত একমাত্র প্রচেষ্টা। কিন্তু, পত্রপত্রিকা থেকে যত দূর জানা গেছে, তাতে মনে হয় এই বিষয়ে যুরোপে, বিশেষত মূল ভূখণ্ডে, এ পর্যন্ত বহু গবেষণা, আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক হয়েছে, এমন কি মোটামুটি গোঁড়া মার্কিন মুলুকেও এ জাতীয় গবেষণামূলক বই-এর কোন অভাব নেই। সে কারণে শ্রীমতী ডাইসনের কাছে এই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে আরও একটু বিশদ আলোচনা আশা করেছিলুম যা নাকি বি বি সি কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের ওপর বিধৃত একটিমাত্র বই-এর ওপর নির্ভরশীল নয়।

আসল কথা খৃষ্টধর্মের উদ্ভব, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকত্ব সম্যকভাবে বিচার করা যায় কি? যে যীশুখৃষ্ট মৃতের প্রাণ দিয়েছিলেন, অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সামান্য কয়েকটি মাছ ও রুটি থেকে সহস্রাধিক

ঐতিহাসিকরা, এমন কি স্বয়ং স্থানীয় শাসনকর্তাও শোনেননি, তাঁর ধর্মের প্রথম প্রকাশ দেখছি রোমের ক্যাটাকোম বা ভূগর্ভস্থ সমাধিগৃহের গোপনীয়তায় গুপ্ত সমিতির অনুশাসন হিসেবে এবং পল ইনির লেখায় খ্রীষ্টানদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, রাষ্ট্রের চোখে সন্দেহজনক গোপনীয়তায় বিশ্বাসী কিছু লোক হিসেবে যাদের সম্রাট ট্রায়ান খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিলে হত্যা করায় বিশেষ আপত্তি করেন না। কাজেই, এ কথা অনুমান করা হয়ে থাকে বলে শুনি যে, অত্যাচারী, বর্বর দাসপ্রথার ওপর নির্ভরশীল রোম সাম্রাজ্যকে ভেতর থেকে আঘাত করার জন্যেই দরিদ্র সেমিতিক প্রজামণ্ডলীর একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের বাহকরূপেই রোমে খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। এবং যেহেতু সে যুগে যে কোন আন্দোলনকেই ধর্মীয় রূপ না দিলে তাতে সাধারণ মানুষকে সামিল করা যেত না, সেহেতু একজন সদ্যনিহত সেমিতিক ধর্মগুরুকে সামনে আদর্শরূপে খাড়া করে একটি নবধর্মের সূচনা করা হয়েছিল। এই কর্মকাণ্ডের পুরোধা ছিলেন কয়েকজন অতি বিচক্ষণ সেমিতিক নেতা, সন্ত পল যাঁদের অগ্রণী। এবং যেহেতু ইজরায়েলে ক্রুশে নিহত ধর্মগুরুর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না, মৃতসাগরের তীরে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি না কি সে কথাই বলে, অতএব এই ধর্মগুরুকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নেতারা নানা অলৌকিক কাহিনী তাঁর জীবনীর ওপরে আরোপ করেন, যে কাহিনীগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের লোকগাথা থেকে। যথা, কুমারীর নির্দোষ গর্ভধারণজাত ত্রাণকর্তার আবির্ভাব কোন অতি প্রাচীন রোমক বা এট্রুস্কান ধর্মের প্রভাব যার প্রতিধ্বনি না কি মেলে ওভিডের কোন কবিতায়, বা যীশু ও তাঁর বারোজন শিষ্য অর্থাৎ যাদুশক্তিসম্পন্ন তেরো সংখ্যক মানুষের ভেতরে অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ কোন প্রাচীন গ্রীক ধর্মের বিশ্বাস যার চিহ্ন রয়ে গেছে সম্রাট শার্লামেন বা রাজা আর্থার বা বারবারোসার বারোজন সঙ্গীর কাহিনীর ভেতরে ইত্যাদি। ত্রাণকর্তার জন্মের সময় পাইকারি শিশুহত্যার ট্র্যাডিশনটি তো আরও পুরোনো, সারগন এবং মুসার জীবন-কাহিনীতেও এর উল্লেখ আছে। যখন অনুভূত হল যে, কেবলমাত্র সেমিতিক মার্তিগোষ্ঠীর একক লড়াইয়ে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নেই, তখন অন্যান্য জাতির লোকদেরও এই লড়াইয়ের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে খৃষ্টধর্মকে প্রসারিত করা হল বিভিন্ন ধর্ম থেকে বহু প্রথা ও সংস্কারকে এই ধর্মে স্থান দিয়ে। যেমন, মিশরীয় ফার্টিলিটি কাল্ট থেকে এল মাতা মেরী ও ক্রোড়ে যীশুর কল্পনা, অরফিউসের পূজারীরা দিলেন গুরুর মৃত্যু ও তাঁর পুনর্জন্ম, বৌদ্ধ প্রচারকরা, যারা রোম আলেকজান্দ্রিয়া বা এশিয়া মাইনরে অপরিচিত ছিলেন না, দিলেন প্রান্তরে যীশুর কাছে শয়তানের পরাজয়ের গল্পটি, মিথ্রীয় কাল্ট থেকে এল ২৫শে ডিসেম্বরের বড়দিনের উৎসব ইত্যাদি।

এই কারণেই খৃষ্টধর্ম যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের স্তর থেকে পুরোপুরি ধর্মে উঠে এল, তখন নানা সুসমাচারে দেখা গেল গণ্ডগোল, ফলে বহু রকমের হেরেসির উদ্ভব, ইনকুইজিশন, নরহত্যার তাণ্ডব এবং সংখ্যাহীন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির নির্মম বিনাশ। তবে, এই শেষটা অবশ্য যীশুর সঙ্গে সম্পর্কহীন খৃীষ্টীয় ধর্মসংঘের ইতিহাস।

মোট কথ, সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত জটিল এবং যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকত্ব বিচার করতে বসলে এ সমস্ত ঘটনা এবং অনুমানের ওপর আলোকপাত না করে এককভাবে যীশু-খৃষ্টকে বিবেচনা করলে, বিশেষত একটি মাত্র বই-এর ওপর নির্ভর করলে তা অসম্পূর্ণ এবং সে কারণে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

আর একটা প্রশ্ন। ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুশাসনপর্বে ইহুদিদের যে ধর্ম বিধৃত আছে তাকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিলে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করাটা কি সে যুগের মানসিকতার পক্ষে নেহাতই অযৌক্তিক হয়েছিল?

মনোজ সেন
কলকাতা-২৯

মেঘদূতের উপর চীনা প্রভাব

'দেশ' ৩রা জুন সংখ্যায় শ্রীপ্রভাত-তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও তার উপর ২২ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশশাঙ্কভূষণ মৈত্র মহাশয়ের পত্রখানি পড়লাম। বিভিন্ন দেশকালের দুই কবির মধ্যে কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেই তা যে সর্বদা একের উপর অপরের প্রভাব সূচিত করে না তা ভট্টিকাব্য ও Faerie Queene-এর উদাহরণ শ্রীমৈত্র উপযুক্তভাবেই দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দু' একটি কথা নিবেদন করি।

কালিদাসের মেঘদূতের উপর চৈনিক প্রভাব প্রমাণ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন সাম্প্রতিক কালে স্বর্গত আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (দ্রষ্টব্য তাঁর প্রবন্ধ Journal of the Asiatic Society, 1959, Vol I Pt I pp 89-122)। দুঃখের বিষয়, চু-ইয়ান ও হু-কান নামক প্রাচীন চীনা কবিদ্বয়ের দুটি লিরিক কবিতার সঙ্গে 'মেঘদূত'এর বাহ্য বিষয়গত সাদৃশ্য নির্দেশ ছাড়া তাঁর বক্তব্যের পক্ষে প্রবন্ধে আর কোনও প্রমাণই তিনি দিতে পারেননি। উক্ত দুই কবির কাব্য তথা প্রাচীন চীনা সাহিত্য যে প্রাচীন ভারতের রসিকসমাজে কখনও চর্চা করা হত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বহু চীনা পরিব্রাজক এসেছিলেন; পর্যটনের অভিজ্ঞতাও কেউ কেউ লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। কিন্তু ভারতে কোথাও চীনা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হত এমন সাক্ষ্য তাঁরা কেউ দেননি। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকরা প্রায়ই মূল বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত শিখতেন এবং ভারতীয় বন্ধু ও আলাপীদের সঙ্গে সেইসব ভাষাতেই কথোপকথন করতেন। প্রচুর ভারতীয় বৌদ্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু কোনও চীনা শাস্ত্র কি কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় ভাষান্তরিত হয়েছিল এমন নিদর্শন বা প্রমাণ নেই। সুতরাং স্বর্গত আচার্য সুনীতিকুমারের উপর সমুচিত শ্রদ্ধা বজায় রেখেও বলা যায়, তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

হয়তো এমন কল্পনারও কিছু সার্থকতা থাকত যদি কালিদাসপূর্ব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দূতমুখে বার্তা প্রেরণের একটি স্পষ্ট ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া না যেত। বৈদিক যুগ থেকেই কিন্তু সেটি পাওয়া যাচ্ছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সংখ্যক সূক্তে সরমা নাম্নী কুক্কুরীকে পণিগণের নিকট ইন্দ্রের দূতরূপে প্রেরণের উল্লেখ আছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে রাম কর্তৃক হনুমানকে সীতার নিকট দূতরূপে প্রেরণ এবং সুন্দরকাণ্ডে সীতার বার্তাবহরূপে হনুমানের রাম-সন্নিধানে প্রত্যাগমন এই জাতীয় দৌত্যের উদাহরণরূপে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মহাভারতের বনপর্বে পাওয়া যায় দময়ন্তীর নল সমীপে হংসদূত প্রেরণের কাহিনী। কাকবিলাপ জাতকে (জাতক ২৯৭) বর্ণিত শূলারূঢ় মৃত্যুপথযাত্রী কোনও ব্যক্তির কাকমুখে তার প্রিয়াপত্নীর কাছে শেষ বার্তা প্রেরণের মর্মস্পর্শী বিবরণও স্মরণীয়। এই জাতক কাহিনীর গাথা অংশটি দূতকাব্য গোত্রের একটি উৎকৃষ্ট লিরিক হিসাবে অনায়াসে গণ্য হতে পারে। সংস্কৃতে দূতকাব্যসাহিত্য সম্পর্কে পরলোকগত অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেখানে এই জাতীয় সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণগুলিকে নিপুণভাবে একত্র করা হয়েছে। ('Origin and Development of Dutakavya Literature in Sanskrit'—Indian Historical Quarterly Vol III, No. 2 pp. 273-97) পূর্বসূরী যে কবির প্রভাব কালিদাসের কাব্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে তিনি বাল্মীকি। কালিদাসের পাঠকমাত্রই এ কথা স্বীকার করেন। 'মেঘদূত' কাব্যে কালিদাস যে রামায়ণবর্ণিত হনুমানের দৌত্য-কাহিনী দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা মেঘদূতের একাধিক টীকাকার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণাবর্তনাথ বলেন, "ইহ খলু কবিঃ সীতাং প্রতি হনুমতা হারিতং সন্দেশং হৃদয়েন সমুদ্বহন্ তৎস্থানীয়নায়কাদ্যুৎপাদনেন সন্দেশং করোতি।" মল্লিনাথের উক্তি: "সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎ সন্দেশং মনসি বিধায় মেঘসন্দেশং কবিঃ কৃতবানিত্যাহুঃ।" উত্তরমেঘের একটি পঙ্‌ক্তিতে স্বয়ং কালিদাস এই ব্যাখ্যার পরোক্ষ সুযোগ দিয়েছেন যেখানে তিনি বিরহোৎকণ্ঠিতা যক্ষপ্রিয়াকে সীতার সঙ্গে এবং যক্ষের বার্তাবহ মেঘকে পবনতনয় বা হনুমানের সঙ্গে তুলনা করেছেন ('ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা...' মেঘদূত ২/৩৯)। প্রাচীন ভারতীয় এই সুস্পষ্ট ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এমন কি তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এর বিচার দূরে থাক, উল্লেখমাত্রও না করে ডঃ চট্টোপাধ্যায় যে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত করেছেন তাকে বিচারসহ গণ্য করা যেতে পারে না।

লালবিহারী দে ও দীনবন্ধু মিত্র

আপনার সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকার ১ জুলাই '৭৮ সংখ্যায় শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্তের লেখা 'রাগী সমালোচক বনাম শান্ত লেখক' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন, রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে তিনি যে সকল তথ্য দিয়েছেন তার সঙ্গে ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' গ্রন্থের (জেনারেল প্রিন্টার্স ১৯৬৮) হুবহু মিল রয়েছে। এমন কি গ্রন্থটির 'জীবন-বৃত্ত' অংশের শেষদিকে ডক্টর ভট্টাচার্য যে কবিতাটি ব্যবহার করেছেন, সুজিতবাবুও সেটি একইভাবে উদ্ধৃত করেছেন। এই সব দেখে মনে হয়, প্রবন্ধটির এই অংশ রচনায় সুজিতবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন, অথচ তিনি ঘুণাক্ষরেও একথা স্বীকার করেননি। তা ছাড়া সুজিতবাবু 'অরুণোদয়' পত্রিকা চোখে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। কেননা, তিনি দেবীপদবাবু কর্তৃক উদ্ধৃত পংক্তি ভিন্ন অন্য কোনও পংক্তি উদ্ধৃত করতে পারেননি এবং একথা অনেকেরই জানা যে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' তিনিই ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে আনিয়ে প্রকাশ করেন। সুজিতবাবু ঋণ স্বীকার করলে তাঁর অগৌরব হত না।

ডঃ সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী
কলকাতা-৩১

গাছ থেকে পেট্রোল

গত ৮ই জুলাই তারিখে "দেশ" পত্রিকার 'বিজ্ঞান' বিভাগে সমরজিৎ কর মহাশয় লিখিত 'গাছ থেকে পেট্রোল' পড়ে চমৎকৃত হলাম। ইউফোরবিয়া নামটির সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে। ইউফোরবিয়া জিনাসের (বর্গের) তিনটি species আমার জানা আছে। ইউফোরবিয়া, অ্যানটিকিয়োরাম, বাংলা ভাষায় এর নাম বাজবারাণ। দ্বিতীয়টি হলো : ইউফোরবিয়া নেরিফোলিয়া, বাংলা ভাষায় এটি মনসাসিজ এবং হিন্দীতে শুধু সিজ নামে এটি পরিচিত। শেষেরটি হলো : ইউফোরবিয়া পালচেরিমা; এটি লাল পাতা নামে সুপরিচিত। এইগুলির সবগুলি থেকেই দুধের মত ল্যাটেকস্ বেরোয়। ইউফোরবিয়াসি (Euphorbiaceae) ফ্যামিলির ভিতরে আরো কিছু গাছ আছে, যথা

১। জ্যাট্রোফা গোসিফিফোলিয়া (মরু অঞ্চলে পাওয়া যায়)। এটি সচরাচর লাল পাতার দ্বারা চেনা যায়।
২। জ্যাট্রোফা প্যানডুরাফোলিয়া (পাতা সবুজ)।
৩। ক্রোজফেরা রোটলেরি (হলুদ ফুল চিনবার বৈশিষ্ট্য)।
৪। ক্রটন স্প্যারশিফ্লোরাস্ (সাদা ফুল চিনবার বৈশিষ্ট্য)।
৫। ফ্যাইল্যানথাস নিরুরি।
৬। ইউফোরবিয়া হেটেরোফাইলা।
৭। জ্যাট্রোফা মালটিফিডা (এটি দেখতে খুব সুন্দর; বাগানের শোভা বৃদ্ধি

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি গাছ থেকেই ল্যাটেকস্ বেরোয়, যা সচরাচর দুধের মত (কোন কোন ক্ষেত্রে জলের মত)। তবে ঠিক এইগুলির মধ্যে কোন কোন গাছের ল্যাটেকস অশুদ্ধ পেট্রোলের সমগোত্র তা জানার ইচ্ছা রইল।

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী
পাঁড়রা, ধানবাদ

কঃ পন্থা

"মহাজনদের বাণী" অনুসরণ করে নয়, "একেবারে নিজের মননশক্তির ব্যবহার করে স্বাধীন (?) চিন্তার প্রয়োগে দেশের সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করে" অবশেষে শ্রীঅশোক রুদ্র [দ্রষ্টব্য : তাঁর 'কঃ পন্থা'?] দেশের আর্থনীতিক তথা কৃষি-ব্যবস্থার যে সর্বরোগহর পন্থার কথা ভাবতে পেরেছেন তা হল "জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাই থাকবে না।" এবং এই ব্যক্তিগত মালিকানার উৎসাদন কিছুতেই তিনি গান্ধী-বিনোবা নির্দেশিত হৃদয়-পরিবর্তনের উপর ছেড়ে দিতে রাজী নন, তিনি চান "বড় জোতের মালিকদের জমি জোর করে কেড়ে" নিতে, এবং ছোট জোত মালিকদের বুঝিয়েসুঝিয়ে (এবং সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে?)। ব্যক্তিগত মালিকানা উৎসাদিত করে তিনি মৌলিক কী করতে চান? "আমি সব জমিকে একীভূত করে যৌথ উপায়ে চাষের কথা বলছি।"

বৃহৎ প্রবন্ধটির কোথায়ও তিনি আভাস রাখেননি একীভূত জমির যৌথ চাষের ফলে কৃষি উৎপাদন আদৌ বাড়বে কিনা, কিংবা বাড়লে কত বেশী বাড়বে। এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীন তাত্ত্বিক যুক্তি যা আছে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে তার প্রায়োগিক মূল্য যাচাই করার সুযোগ ঘটে ওঠেনি; তাই ওই তত্ত্বকে ঘিরে আমাদের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে এক আবিষ্ট মোহ অত্যন্ত তীব্রভাবে বর্তমান।

বিমূর্ত এই তাত্ত্বিক যুক্তির বড় দুর্বলতা এই যে, আবেগে উচ্ছ্বাসে ভরা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র দুঃখ, ক্ষুদ্র সুখের আবর্তে আবর্তিত মনুষ্য নামক যে জীব এই ইউটোপিয়ার সাফল্যের প্রধানতম উপাদান, তাদের রাগ, অনুরাগ প্রতিক্রিয়াকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। ধরেই নেওয়া হয়েছে, জমিহীন চাষী, প্রান্তিক চাষী এবং ছোট জোত চাষী সকলেই একীভূত জমির যৌথ চাষের পরিকল্পনাকে হরিবোল বলে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। কেবল বড় জোতের মালিকরাই (যত নষ্টের গোড়া!) এতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু সে বাধা হয় রাষ্ট্রশক্তির প্রচণ্ড থাবায় গুঁড়িয়ে যাবে, নতুবা উত্তেজিত, উদ্বেলিত, ক্রোধোন্মত্ত জমিহীন চাষী অসূয়ার হিংস্র দন্তে সব ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

এইবার শ্রীরুদ্রের থলি থেকে বেড়ালটি টেনে বার করা যাক। এই বেড়ালটির নাম Collectivization যৌথ চাষের মৌলিক পরিকল্পনার সঙ্গে এই Collectivization-এর চরিত্রগত কোন তফাত আছে কি?

না নেই। এবং নেই বলেই একীভূত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা যাক। ১৯২৭ সালে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৮ সাল থেকে রাশিয়ার এক সর্বাত্মক প্রচার অভিযান চালানো হতে লাগল। ব্যক্তিগত মালিকানার চাষের চাইতে যৌথ চাষের সুবিধে কতখানি দিনের পর দিন নিরন্তর তা কৃষকদের বোঝানো হতে লাগল। ১৯২৯-এর নভেম্বরে স্তালিন 'The year of the great change' নামে প্রাভদায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই যৌথ চাষের ফলে তিন বছরের ভেতর সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শস্য উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে। এবং মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত। স্তালিন যা চাইবেন, তা ঘটতে বিলম্ব হবে কেন? তথাপি ১৯২৯ সালে কৃষি জমির মাত্র ১.৭% কোলখোজের (Collectivized forming) আওতায় এল। অতএব চলল জোর, অত্যাচার, নিপীড়ন, জেল; গুলি, ফাঁসি, নির্বাসন। পঞ্চাশ লক্ষের উপর সচ্ছল, দক্ষ চাষীকে মেরে ফেলা হল, দেড় কোটির মত চাষীকে জমি থেকে উৎখাত করে দেশের দূরদূরান্তে নির্বাসন দেওয়া হল, দেশের পঞ্চাশ শতাংশ গাই বলদকে মেরে ফেলা হল ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রায় ২৮।২৯ বছর পরে ১৯৫৭ সালেও তাদের স্বীকার করতে হয়েছে যে, "আমাদের কৃষির প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে সর্বপ্রকার শস্যের উৎপাদন বাড়ানো...। সমগ্র দেশব্যাপী উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম। এ সম্বন্ধে বাগ্‌বিস্তারই প্রচুর হয়েছে, কাজ কিছুই হয়নি।" (প্রাভদা—১৭-১-১৯৫৭) উক্ত প্রবন্ধে আরো স্বীকার করা হয়েছে যে, কোন কোন অঞ্চলে হেক্‌টেয়ার প্রতি উৎপাদন মাত্র ৩০০—৪০০ কিলোগ্রাম। আমাদের হিসেবে বিঘে প্রতি মাত্র ১ থেকে ১½ মণ। [প্রসঙ্গত, আমাদের দেশের খুব নিম্ন শ্রেণীর জমিতেও এখন পদ্মা, কিংবা তাইচুং কিংবা আই আর ৮ জাতীয় ধান বিঘে প্রতি ১২ থেকে ১৫ মণ হচ্ছে।] ১৯৫৭ সালের ২২শে মে ক্রুশ্চভ তাঁর বক্তৃতায় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন,

"We would create a better political atmosphere in the village".

কোলখোজ কৃষিশ্রমিকদের এত বছর বাদে এখনও বোঝাতে হচ্ছে যে, যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ চাষের বিকল্প নেই—কেননা অবুঝ বালকদের মত কোলখোজ কৃষি শ্রমিকরা এখনও এই যৌথ চাষকে মেনে নিতে পারছে না।

রাশিয়ার Collectivized farming-এর ব্যর্থতার মূলে আছে অতি সুপরিচিত মনস্তাত্ত্বিক কারণকে অস্বীকার করার মূঢ়তা। যে কারণে রাম, শ্যাম, যদু, আমি, শ্রীরুদ্র প্রভৃতি আপামর জনসাধারণ (মানসিক রোগগ্রস্ত এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের বাদ দিয়ে) স্বার্থতাড়িত হয়ে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হই, ঘর বানাই এবং তাকে মোজেক সজ্জিত করি, বাগান দিয়ে সাজাই, সেই একই জৈবআড়নাবশে ক্ষুদ্র হলেও নিজের জমিতে রোদে পুড়ে, জলকাদা মেখে আমি নিবিষ্ট [illegible] জমিতে সরকারী কর্মচারীর মত আমি কেবল দায়সারা শ্রম দেব—তাতে হাঁকাহাঁকি হতে পারে, কিন্তু ফাঁকিটাই বেশী থেকে যাবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার যৌথ চাষ পরিকল্পনার এমন হিমালয়সদৃশ ব্যর্থতাকে এক দুর্মর গোঁড়ামির বশে, এক কুসংস্কারের বশে, এক ধর্মান্ধতার বশে অস্বীকার করে যদি চাষীদের উপর জোর করে যৌথ চাষকে চাপিয়ে দিই তবে এ দেশটাও অচিরাৎ স্তালিনী রাশিয়ার কলঙ্কিত পথে বাঁক নেবে। দেশের আর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য অন্য পথ ভাবতে হবে। কৃষি জমির উপরে জনসংখ্যার চাপকে কমিয়ে নিয়ে ছোট ছোট গ্রামীণ শিল্পে তাদের নিয়োগ করতে হবে। চিন্তা করতে হবে কত কম অশ্রু জলে, বিনা রক্তপাতে, মানুষের সুস্থ ভবিষ্যতের আশ্বাস নিয়ে কোন পরিকল্পনা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে।

সামন্ত হোম
মালদা

ভারতের শেষ ভূখণ্ড

আপনাদের ১৫ই জুলাই ৭৮ সংখ্যায় শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতের শেষ ভূখণ্ড লেখাটির একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যার সঙ্গে আদিম জাতি ওঙ্গেদের বংশবৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "নারীরা অজ্ঞাত কারণে বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।" এবং শ্রীমতী সুধা সন্তোষ কুমারীর বক্তব্য "ডায়োস্কোরিয়া থেকেই হয়তো বন্ধ্যাত্ব আসছে।"

শ্রীমতী সুধার বক্তব্য পরোক্ষভাবে সত্য। হোমিওপ্যাথিতে ডায়োস্কোরিয়া নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য আলোচনা নিম্নলিখিত মেটেরিয়া মেডিকাতে পাওয়া যাবে।

1. Allen's — Encyclopedia Materia Medica. Vol. IV; Page-130.
2. Dr. A. C. Cowperthwaite —Text Book of Materia Medica and Therapeutics; Page-311.
3. Dr. Boericke — Materia Medica and Repertory; Page-256.

এই বইগুলির আলোচিত লক্ষণগুলো থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে ডায়োস্কোরিয়া প্রধানত পুরুষের জননেন্দ্রিয়কেই প্রভাবিত করে। এবং এই জন্যেই সঠিক পুরুষত্বের অভাবে নারীরা গর্ভবতী হতে পারছে না। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এটা বন্ধ্যাত্বের কারণ নয়। যদিও অন্যান্য কিছু স্ত্রী ব্যাধির সৃষ্টি করে।

এর একমাত্র আশু সমাধান হচ্ছে, পুরুষের ডায়োস্কোরিয়া খাওয়া বন্ধ করা, এবং বন্ধ করালেই এদের পুরুষত্ব আবার ফিরে আসবে। কারণ ডায়োস্কোরিয়ার কার্যকাল খুবই কম, মাত্র ১-৭ দিন। কাজেই এটি সুগভীর ক্রিয়াশীল নয়।

ডাঃ বোরিক-এর মতে ডায়োস্কোরিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ হচ্ছে ক্যামোমিলা এবং কর্পূর।

প্রকাশিত হল
আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার

বিধান সিংহের
শাহী কেচ্ছা

ইন্দিরা-গ্রন্থের অন্দরমহলের গোপন কথা দাম ১০.০০

ইন্দিরা শাহীর এগার বছরের কাহিনী নিয়ে লেখা অন্যান্য বইয়ের যেখানে শেষ, 'শাহী কেচ্ছা'র শুরু সেখান থেকেই। নির্বাচনের পর থেকে এই ষোল মাসের রাজধানীর নেপথ্য কাহিনী 'শাহী কেচ্ছা' প্রমাণ করে দেবে যে, শাহ কমিশনে যা বলা হয়েছে তার বাইরেও রয়েছে বহু অনন্ত ঘটনা যা আরও অনেক বেশী চাঞ্চল্যকর। কিষেণচাঁদ কেন মরলেন, মানেকা কী করে হঠাৎ ইন্দিরা গান্ধীর এত প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন, নবীন কেন লাক্ষাদ্বীপে সাঁতার কাটেন, টামটা কেন ছেলে-বউকে দিল্লিতে রেখে একা থাকেন আন্দামানে, রূপিকা কেন সোনিয়াকে ধরার জন্য উদ্‌গ্রীব, বিচারপতি শাহর প্রতি ইন্দিরার আক্রোশ কেন গায়ত্রী দেবীর রূপ কেন জনগণনেত্রীর চোখে ঈর্ষা জাগায়, পুষ্প খান্না কেন থাকেন অধ্যাপক গুপ্তের সঙ্গে, কেন গ্রেপ্তার হন চন্দ্রা, গণিকা আর ঘাতিকাদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে চিত্রতারকা স্নেহলতা কীভাবে ভোগ করেন মানসিক মৃত্যু-যন্ত্রণা, শেফালী-পূর্ণিমা-মঞ্জুশ্রী কী বলেছেন একান্ত সাক্ষাৎকারে, ইন্দিরা গান্ধীকে টাকা জোগাচ্ছে কে—এমন বহু চমকপ্রদ তথ্য বিধান সিংহ জোগাড় করেছেন দিল্লি থেকে বাঙ্গালোর পর্যন্ত তোলপাড় করে। অতীত নয়, এখন কী করছে শাহ কমিশনের নায়ক-নায়িকা এবং দর্শকবৃন্দ তারই জীবন্ত বর্ণনা 'শাহী কেচ্ছা'। ক্রাইম এবং সেক্স কীভাবে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-বই না

ভালো ভালো বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কহেন কবি কালিদাস
দাম ৫.০০
বেণীসংহার
দাম ৫.০০

মনোজ বসুর
সেতুবন্ধ
দাম ১২.০০

বিমল মিত্রের
চলো কলকাতা
দাম ৫.০০
পতি পরম গুরু
দাম ৩৫.০০

রমাপদ চৌধুরীর
যে যেখানে দাঁড়িয়ে
দাম ৫.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
ভালোবাসার অনেক নাম
দাম ৬.০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন
দাম ৬.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
দর্শকের ভূমিকায়
দাম ৫.০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
দেহ নয় মন
দাম ৪.০০

বিমল করের
পূর্ণ অপূর্ণ
দাম ১৫.০০
মোহ
দাম ৭.০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
নতুন কবিতার বই
মানুষ বড়ো কাঁদছে

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল
সমরেশ বসুর
মহত্তম উপন্যাস
স্বীকারোক্তি
দাম ৮.০০

'স্বীকারোক্তি' সমরেশ বসুর সেই ধরনের উপন্যাস যা একই সঙ্গে লেখককে দেয় নতুন মহিমা, পাঠককে করে দীক্ষিত। এর বিষয় জীবন্ত, বক্তব্য জীবনান্বেষী, আঙ্গিক রূপকাশ্রয়ী। ঠিক এই ধাঁচের উপন্যাস সমরেশ বসু আর লেখেন নি, বাংলা সাহিত্যেও এই উপন্যাস অপ্রতিম কীর্তি।

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল
সমরেশ বসুর
হত্যা-রহস্য রচনা
একটি অস্পষ্ট স্বর
দাম ৭.০০

'একটি অস্পষ্ট স্বর'ও সমরেশ বসুর আরেক ধরনের নতুন স্বাদের বই। গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর নামে যে-চরিত্রটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি, ফেলুদা অথবা ব্যোমকেশ বক্সীর মতোই তার ক্ষুরধার বিশ্লেষণ ও অসামান্য বুদ্ধিমত্তা বিস্মিত, চমকিত ও অভিভূত করে।

ভালো ভালো বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
ছবির মানুষ
দাম ৭.০০
আমিই সে
দাম ৭.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
সময়, আমার সময়
দাম ৫.০০

বুদ্ধদেব গুহের
যাওয়া-আসা
দাম ৬.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
শ্যাওলা
দাম ৮.০০

বনফুলের
অসংলগ্না
দাম ৪.০০

দিব্যেন্দু পালিতের
আমরা
দাম ৪.০০
বিনিদ্র
দাম ৬.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
পিতৃপুরুষ
দাম ৫.০০

সমরেশ মজুমদারের
দৌড়
দাম ৬.০০

শেখর বসুর
অন্যরকম
দাম ৬.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
শ্বেতপাথরের টেবিল
দাম ৬.০০

অরুণ বাগচীর
আশাবরী
দাম ৬.০০

সুরজিৎ দাশগুপ্তের
বিদ্ধ করো
দাম ১০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

প্রকাশিত হল
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নতুন রহস্য-উপন্যাস
কস্তুরীগন্ধ
দাম ৭.০০

ধানবাদ শহর থেকে কিছু দূরে প্রাসাদপ্রতিম বাড়ি—'হীরামঞ্জিল।' সেই হীরামঞ্জিলের মাইফেলে জমিদার কন্দর্পকান্তির আমন্ত্রণে গান গাইতে এল বিখ্যাত গায়িকা কস্তুরী। কস্তুরীর স্বামী ছিল, ছিল সংসার। কিন্তু সেই সংসারে আর ফেরা হল না। কস্তুরী থেকে গেল কন্দর্পকান্তির জলসাঘরে। কিন্তু অল্পকাল পরেই ঘটল দু-দুটি দুর্ঘটনা। কস্তুরী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হল হীরামঞ্জিল থেকে, কন্দর্পকান্তির মৃতদেহ ভেসে উঠল হীরামঞ্জিলের ঝিলে। অভিশপ্ত হীরামঞ্জিলের রহস্যের উদ্ঘাটন হয়তো কোনোদিনই হত না। কিন্তু নিয়তির আশ্চর্য পরিহাসে ক[illegible] বছর বাদে নতুন এক বিয়োগান্ত নাটক আবার জমে উঠতে দেখা গেল হীরামঞ্জিলের জলসাঘরের রঙ্গমঞ্চে। এবার খুন হল চন্দনা—কন্দর্পকান্তির ছেলে রজতের নবপরিণীতা স্ত্রী। হীরামঞ্জিলের রহস্যময় হাতছানিতে রজত আর চন্দনা এসেছিল হানিমুনে। তখনই ঘটে গেল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কেন ঘটল? কে খুন করল ফুলের মত এই নিষ্পাপ মেয়েটিকে? নতুন এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুরনো পাপ আর প্রতিশোধের এক উত্তেজনাকর ও শ্বাসরুদ্ধকারী অধ্যায় উন্মোচিত করেছেন রহস্যভেদী কিরীটী রায় নীহাররঞ্জন গুপ্তের এই নতুন রহস্য-উপন্যাসে।

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অরূপ দাসের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ
পরমাণুশক্তির বিরুদ্ধে দেশে দেশে
রাজ্যেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধ
পুরাতন বাংলা গান
সমীর রক্ষিতের গল্প
জন্মদাত্রী
প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণা
স্মৃতি সততই সুখের

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ক্রীড়াজগতের পরিবেশ

প্রাকৃতিক ও পারিবেশিক শুদ্ধতার বিকার বর্তমান বিশ্বজীবনে যে-ধরনের সমস্যার সঞ্চার করেছে সেই ধরনের একটি সমস্যার সঞ্চার বিশ্বজীবনের আর একটি ক্ষেত্রে হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কারণটা হলো পরিবেশের শুদ্ধতার বিকার। এটা প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, মানসিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের জল-বাতাস ও আলোকের শুদ্ধতা যে রকম বিকৃত হয়েছে, এই মানসিক পরিবেশের জল-বাতাস ও আলোকের শুদ্ধতা এবং সুস্থতা প্রায় সেই রকমেরই বিকার লাভ করেছে। সমস্যার বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দেবার প্রয়োজনে স্পষ্ট করেই বলতে হয় যে, এটা হলো ক্রীড়াজগতের আচার-বিচারের একটি সমস্যা, যেটা বিশ্ব জনজীবনের পক্ষে উদ্বিগ্ন হবার বিরাট এক হেতু সৃষ্টি করেছে, যদিও বিশ্বের জনমতে এই উদ্বেগের সাড়া খুব কমই দেখা যায়।

ক্রীড়াজগত অবশ্যই আনন্দকর একটি বৃত্তির অনুশীলিত রূপের একটি আয়তন, যার চতুঃসীমা বর্তমান সভ্যতার চতুঃসীমার সঙ্গে একাত্মক অস্তিত্বে মিশে রয়েছে। স্পোর্ট তথা এই ক্রীড়া যেন সভ্যতারই একটি আত্মিক সম্বল হয়ে উঠেছে। হিসেব করে এই ক্রীড়ামোদের বয়স ও ঐতিহ্যের নির্ণয় করতে গেলে এই তথ্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যে, এই ক্রীড়ামোদের প্রকৃতির চেহারাটা বর্তমানকালের চোখে যেমন একটি উপভোগ্য দৃশ্য, অতীতের দু'তিন হাজার বছর আগেকার কালেও তেমনই উপভোগ্য দৃশ্য ছিল। প্রাচীন রোমের কলোসিয়ামে দুই গ্ল্যাডিয়েটেরের মারাত্মক হানাহানির দৃশ্য দেখে দর্শক-জনতার যে উল্লাস প্রমত্ত হয়ে উৎকট এক হল্লায় বিস্ফুর্ত হতো আধুনিক বিশ্বের যে-কোন সভ্যতাশীল জনজীবনের সাংস্কৃতিক স্থাপত্যের 'স্টেডিয়ামে' মুষ্টিযুদ্ধের দুই প্রতিযোগীর হানাহানির দৃশ্য দেখে দর্শক-জনতার আনন্দ ঠিক সেইরকমই প্রমত্ত উল্লাসে বিস্ফুর্ত হয়। একই প্রকৃতির দুই দৃশ্য, যদিও মাঝখানে দু'হাজারেরও বেশী বছর সময়ের ব্যবধান। বিশ্বজীবনের সাংস্কৃতিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও সভ্যতার বিকার অপনোদিত করবার কর্তব্যের আদর্শচারী ব্রতীর পক্ষে এই দুশ্চিন্তার পীড়া সহ্য করতে হচ্ছে যে, স্পোর্ট তথা ক্রীড়ার জগতে ক্রীড়ার চমৎকারিতা ও দক্ষতার উচ্চমান জনতার বিচারে যতটা সম্মানিত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী সম্মানিত হয় ক্রীড়াচারী দুই পক্ষের জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন। দর্শক-জনতার মনোবৃত্তি ও মানসিক অনুগামিতা যেন এই পক্ষের কিংবা ওই পক্ষের দুটি সমর্থনের উৎসর্গ, যেটা দর্শকের মনে দুই বিদ্বেষের প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের আবেদন সঞ্চারিত করে। ক্রীড়ার রীতি-প্রকৃতি যেন একটা যুদ্ধোন্মাদ তরঙ্গিনীর চরিত্র নিয়ে নির্মাণ লাভ করেছে। ক্রীড়ার উৎকর্ষ ও কৃতিত্বে যে-পক্ষ পারদর্শিতা প্রদর্শিত করেছে তারই জয় হোক, এ-ধরনের বিচারবুদ্ধি দিয়ে দর্শকজনের কামনা অনুপ্রাণিত নয়। মারি অরি পারি যে প্রকারে, ক্রীড়ার জগতের আনন্দ এই নীতির ক্রিয়ায় বেশী প্রকুপিত। টাকার জোরে খেলোয়াড়ের আনুগত্য ক্রয় করবার প্রথাটি কম প্রবল নয়, এই অভিযোগও শোনা যায়।

ফুটবলের খেলায় দুই প্রতিযোগী দলের জয়-পরাজয়ের ঘটন দর্শক-জনতার মধ্যে বিদ্বেষের ঘাতপ্রতিঘাত ও দাঙ্গা প্ররোচিত করেছে, এরকম ঘটনা কলকাতার ময়দানের শান্তি ও সৌষ্ঠবের একটি অভিশাপ। এবং এই অভিশাপের দৃশ্য খুব বিরল নয়। সাম্প্রতিক একটি সংবাদে দেখা গিয়েছে যে মধ্যপ্রদেশের ভোপালের জনৈক কৃতী কোচ তথা ক্রীড়াশিক্ষক আততায়ীর আক্রমণে নিহত হয়েছেন। ক্রীড়াজগতের ক্ষোভ বিদ্বেষ ও হিংসা কী ভয়ানক হীনতায় অভিভূত হতে পারে ঘটনাটিকে তারই একটি প্রমাণ বলে মনে করা চলে। প্রাগমেটিক দর্শনের প্রচারক মনস্বী উইলিয়ম জেমস, যুদ্ধের মর্যাল ইকুইভালেন্ট অর্থাৎ নৈতিক বিকল্প হিসাবে সেবাকার্য, মারীব্যাধির দমন, ও ক্রীড়াকর্মের প্রতিযোগিতায় বিশ্বজনতার উৎসাহ লক্ষীভূত করবার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রাগমেটিক দর্শনের শিক্ষায় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার দুরন্ত প্রাণের প্রকৃতিকে বিদ্বেষ মুক্ত করবার কোন অঙ্গীকার নেই। বড়জোর এইটুকু বলা চলে যে, এটা বিদ্বেষকে কয়েকটি সৎ কর্তব্যে নিযুক্ত করবার একটা কৌশলের শিক্ষা। এমন কৌশলের কিছু সার্থকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা সমস্যার চরম সমাধানের নীতি কিংবা পদ্ধতি হতে পারে না। কথিত আছে যে, সাধু টেলিমেকাস একদিন রোমের কলোসিয়ামে মারাত্মক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দুই গ্ল্যাডিয়েটোরের মাঝখানে পড়ে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। শোনা যায়, তাঁর আত্মোৎসর্গের শিক্ষায় ও প্রভাবে ওই মারাত্মক ক্রীড়ার চরম অবসান সম্ভাবিত হয়েছিল।

ক্রীড়াজগতের মানসিক পরিবেশের এই সমস্যা সামান্য রকমের কঠোরতা ও জটিলতা দিয়ে সংগঠিত নয়। সমস্যা বস্তু সভ্যতার সমগ্র স্বভাব আচ্ছন্ন করে বসে আছে। ক্রীড়াতে প্রতি-যোগিতার জয়-পরাজয় সাধারণ দর্শক মনে কোন পক্ষ-বিপক্ষ বোধের সংস্কার সৃষ্টি করবে না, এমন মানসিক পরিবেশের সৃষ্টি দৃশ্যত অসম্ভব বলেই মনে হবে। ভারতীয় ক্রিকেট টীম বিদেশে গিয়ে প্রতিযোগিতায় জয়ী হলে ভারতীয়ের পক্ষে 'স্বাদেশিক' গর্ব বোধ করা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক, কিন্তু পরাভূত বিদেশীয় টীম ও বিদেশের সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট হবার মানসিক স্বভাব কোন যুক্তিতে কাম্য হতে পারে না। এটা বিশ্বাসীর সাংস্কৃতিক স্বভাবের শুদ্ধতা বিধানের প্রশ্নগত বিষয়।
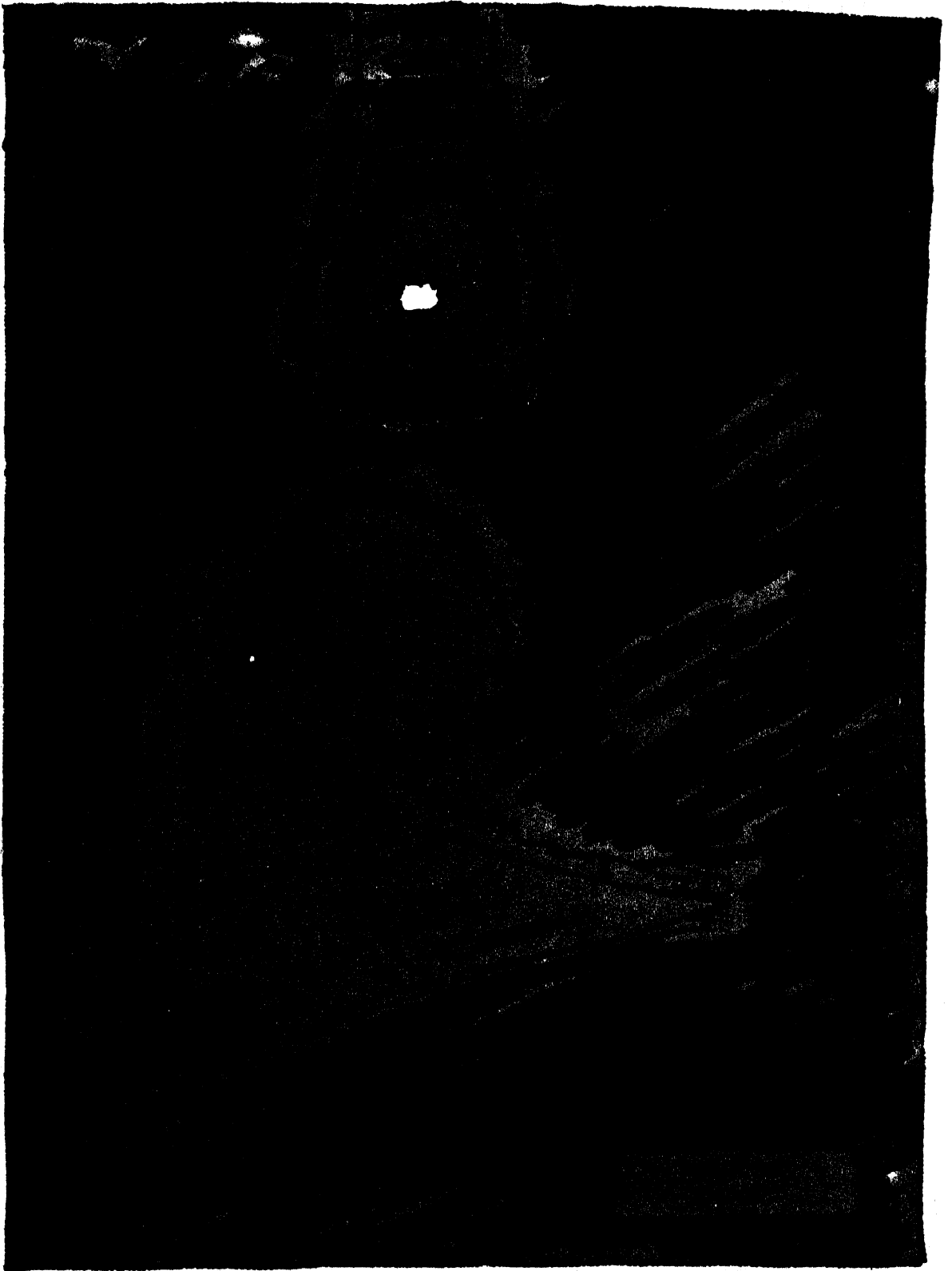
কলকাতা আছে কলিকাতাতেই

সামলে চলি, সামলে রাখি

কিছু জিনিস আমি খুব সামলে চলি। রাস্তায় কিংবা বাসে মাঝে মাঝেই সবার অলক্ষে বুকপকেটের কাছে একবার করে হাত বুলোই। আমার সুশীল দাদু বলেছিলেন—ওটারও একটা কায়দা আছে হে। হাত বুলোতে হবে এমনভাবে কেউ যেন দেখে না ফেলে। তাহলেই মরেছ। ফুসকি ফাস? পকেটমাররা সবচে বড় মনস্তাত্ত্বিক। আমি ওই কারণে খুব ক্যাজুয়েলি হাত বুলোই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! বুকপকেটের তলাতেই হার্ট। মধ্যবয়সী লোকের ভীড়—বাসে হার্টটা একটু উসখুস করতেই পারে। উফ্‌! দীর্ঘ নিশ্বাস! একটু অধৈর্যের ভাব! নীচু হয়ে দেখার চেষ্টা—আর কতটা? মনে মনে—হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুকপকেটের পেছন পকেটে কিছু টাকা, সামনে পেন। থাক, ঠিক থাক, আবার একটু পরে দেখব। রিয়েল পকেটমার কখনও দেখিনি। পকেটমার সন্দেহে বেদম মারা হচ্ছে, এমন লোককে চকিতে উঁকি মেরে দু-একবার দেখিনি তা নয়। সে সব লোক মনে তেমন দাগ কাটেনি। বিশেষত ছাত্রজীবনে আমাদের বাঙলার মাস্টার মশাইকে পকেটমার সন্দেহে মার খেতে দেখে আমার বদ্ধমূল ধারণা, কি জনসাধারণ, কি পুলিস, কি পুলিসের কুকুর, কারুরই রিয়েল অপরাধীকে সনাক্ত করণের তেমন ক্ষমতা নেই। ইনভেরিয়েবলি একটা নিরীহ লোককে ধরবে, ধরে র‍্যান্ডাম ধোলাই দেবে। ওদিকে আসল মাল বসে বসে মাল খাচ্ছে—উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে।

কত রকমের ছবি ছাপা হয়! চিত্রতারকা টেরি বাগাচ্ছে। খেলোয়াড় কঠোর মুখে বলছে—এবারের লড়াই বাঁচার লড়াই। বিশাল প্রতিষ্ঠানের টাক-মাথা চেয়ারম্যান দুঃখ দুঃখ মুখ করে বলছেন—ডিয়ার শেয়ার হোলডারস, এবারে নো ডিভিডেণ্ড। নেপোজ হ্যাড স্টোলেন দি কার্ডস। পুলিশ-চিফ দফতরে বসে বড়-বড় চোখ করে বলছেন—ঠেঙিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দোবো। নেতাদেরও চেনা যায়। সব সময় ছবিতে মুখ দেখছি—এ দেশ, এই আমাদের দেশ, পাতাল রেল, না, না, না, না, চক্রবেড় রেল, উঁহু মোনো-রেল, ফ্লাই-ওভার, হাম্প, ডাম্প, বিদ্যুৎ, চাকরি, পাস্তা, নিরাপত্তা, কত কথাই বলতে চায় ওইসব ছবির মুখ।

যাঁরা ভেজাল দিয়ে মানুষ মারেন তাঁদেরও হয়ত চিনতে পারব। ল্যাম্পপোস্টে রঙীন পোস্টার পড়েছে, ওইসব প্রাণীর। স্পিসিজটাকে হয়ত চিনতে পারব। কুতকুতে চোখ, চোয়ালটা চওড়া, ঠোঁট দুটো পুরু, ভুঁড়িটা ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। কত সুবিধে, বাঘ দেখলে চিনতে পারব, সিংহ, শেয়াল পারব, সাপ পারব, ভিলেন পারব কারণ সিনেমা পোস্টারে প্রাণ, প্রেম চোপরা দেখেছি, ডাকাত পারব, গব্বর সিংকে দেখেছি, ছিঁচকে চোরও চিনতে পারব, পাড়ার পটলদাকে দেখেছি, পটলদা রিয়েল চোর, বলে, বলে চুরি করে, চুরি করে জেলে যায়, জেল থেকে বেরিয়ে চুরি করে, বিদেশী স্মাগলার চিনতে পারব, ইংরেজী ফিল্মে দেখেছি, দিশী স্মাগলার হয়ত পারব না, যেমন দিশী কুকুর চিনব, বিদেশী কুকুর চিনলেও নাম কি জাত বলতে পারব না। পকেটমার তো একদমই চিনতে পারবো না। তারা ঈশ্বরের মত। তাদের কৃতকর্মের ফলটিই আমরা ভোগ করি? চর্মচক্ষে তাদের কখনও দেখিনি। দেখা থাকলে চিনতে আর কি। আর চিনলে ব্যাংক থেকে তোলা মেয়ের বিয়ের টাকা তাকে নিতে দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে মরবই বা কেন আর বেয়াই মশাইয়ের পায়ের তলায় কান ধরে নিল ডাউন হয়ে বসবই বা কেন, আর শেষ পর্যন্ত ইনস্টলমেণ্টে মেয়ে পার করার চুক্তিই বা হবে কেন! প্রেসার কুকার, ফ্রীজ, ফার্নিচার সবই যখন ইনস্টলমেন্টে যায় বেয়াইমশাই, আমার মেয়েই বা যাবে না কেন? জেনে রাখ, মেয়ের পিতা, পকেটমার দেখিয়ে আমার মত ভালমানুষের ছেলের হাতে বড়টিকে পার করলেন, এখনও আর একটি মাথার মাথায় হয়ে আছে, দুটো ইনস্টলমেন্ট একসঙ্গে চালু হলে নিজেই মরবেন, সামলাতে পারবেন না। মাসের দুই কি তিন তারিখের মধ্যে সীলকরা খামে ক্যাশ দিয়ে যাবেন? মনে রাখবেন পকেট একবারই মারা যায়। বাঘ একবারই পালে পড়ে। ফেল করলে মেয়ে ফিরিয়ে দোবো। ওইসব ট্রেডিং কোম্পানীর নিয়ম মনে আছে তো, ইনস্টলমেন্ট শোধ না হওয়া পর্যন্ত স্বত্ব জন্মাবে না। মেয়ে আপনার থাকবে ঠিকই, ঘুরবে ফিরবে তবে পুত্রবধূ হবে যখন আমি নগদের পুরো টাকাটি বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে, গুনে-গেঁথে তুলে রাখব—অ্যা-জুস। চুস্‌। বেয়াইমশায়ের দাঁতের ফাঁকে ঢেঁড়সের ছিবড়ে ঢুকেছিল। দেশলাই কাঠি দিয়ে শব্দ করে বের করতে করতে স্ত্রীকে অর্থাৎ বেয়ানকে বলেছিলেন—পুসু মাংস আর চলে না। যে বয়সের যা, এখন ওই দুধ, সন্দেশ, মালাই, মালপো! হরি হে, মধুসূদন!

ও তুমি যতই সামলাও হে, কলকাতার পকেটমারকে তুমি চেন না ভাই। নৃপেনের কেস জান? জামাইষষ্ঠীর দিন বাবু শ্বশুরবাড়ি চলেছেন, ল্যাজে বউ বেঁধে। জানই তো সারাটা জন্ম ব্যাটা প্যাণ্ট আর হাফ হাতা জামা পরে কাটাল, সেদিন মাজা কি! চুনট করা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, শ্বশুরের দেওয়া সোনার বোতাম, নিউকাট জুতো! কিপটের মরণ! যাচ্ছিস যা, ট্যাকসি ধরে যা। উঠেছে বত্রিশ নম্বর বাসে। আমেজ কত? কানে আতর, ঘাড়ে পাউডার। বউকে বসিয়েছে লেডিজ সিটে, আর নিজে দাঁড়িয়েছে রড ধরে সামনে। কি খেয়ালে ছিল কে জানে। বিডন স্ট্রীটে রোককে, রোককে বলে নামল। উত্তেজনে কম্প ক্লিয়ার! বুক খোলা, হাওদাখানা। বোতাম নেই, সোনার বোতাম খুলে নিয়ে গেছে। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে, এ বলে,—সে কি গো! ও বলে—সে কি গো! বোতাম-মার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—হয় গো হয়, আজকাল এও হয়! ভেবে দেখো, নৃপেন ব্যাটাছেলে বলে বলে তবু বেঁচে গেল, বুক খোলা থাকল তো কি আর হল, খোলা রাখাটাই তো এখনকার ফ্যাশান। মেয়েছেলে হলে কি হত? ছি ছি চোখের সামনে বুক খোলা হয়ে, কোনো মানে হয়?

কলমটা তুমি বাপু বুকপকেটে রেখ না! কি দরকার! পার্কার ফিফটি ওয়ান কলমটা আমার কিভাবে গেল! কত বড় একটা মেমারি! ছুইট মেমারি! ছুইট না সুইট। হ্যাঁ হ্যাঁ ছুইট মেমারি। ফিফটিওয়ান নিয়ে কেউ বাসে ওঠে? আপনি তো একটা রিয়েল গাড়ল। গাড়ল তুমি, না শুনেই আমাকে বাসে উঠিয়ে দিলে সাত তাড়াতাড়ি। ভিকটোরিয়া হাউসের সামনে ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছি, উলটো দিক থেকে আসছে একটা গামছা বিক্রিঅলা। দেখেছ নিশ্চয়, থাক-থাক গামছা কাঁধে আর একটা গামছা হাতে, সেটাকে দু-হাত দিয়ে ধরে মাঝে-মাঝে দোলাতে থাকে। কোণাটা আমার বুকের ওপর দিয়ে সামান্য ঝাপটা মেরে চলে গেল। গেল তো গেল কি হল! নতুন গামছা বুকে লাগলে মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হয়ে গেল? এক মেয়েদের আঁচল গায়ে লাগলে শুনেছি রোগা হয়ে যায়? হাঁটছি হাঁটছি, ওমা লালবাজারের মোড়ে এসে বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখি—কি দেখি? তোমাকে কি বলব মানিক, মেঘলা দিনে বিধবা হলে মেয়েদের মনের অবস্থা যা হয়, আমার ঠিক সেই রকম হল।

আরে! সেম কেস তাহলে আমারও হয়েছিল, গামছা দিয়ে পেন তোলা। শ্যামবাজারে পুরনো রাই-আয়ের সামনে ফুটপাথে। আমারটা অবশ্য পার্কার নয়, সামান্য রাইটার। গ্রাহ্য করিনি তেমন। আমার একটা পার্কার আছে, সেফার্স আছে মঁ-ব্লাঁ আছে। তারা সব বড়লোকের বউদের মত। হাঁড়ি ঠেলার কাজে লাগাই না। তোয়াজে থাকে। রববার, রববার ক্লিনিং পালিশিং।

শুনে রাখ, ওই যে গামছা, ওটাকে নিরীহ গামছা ভেবো না। ওরা হল গামছা-পকেটমার। এর ওপর আছে সুন্দরী-আঁচল-পকেটমার, চুল-পকেটমার। তোমাকে তো আমি চিনি সেই ঘেঁষ্টে ঘেঁষ্টে লেডিজ সিটের সামনেটিতে ধনুক হয়ে দাঁড়াবে। কিস্যুনা, মহিলা ওঠার সময় মাথাটিকে জাস্ট একটু পকেট

ঘেঁষে তুলবেন, তুমি টেরটি পাবে না, পেনটা ক্লিয়ার বুক পকেট থেকে চুলের সঙ্গে উঠে চলে যাবে। যায় যাবে, কলকাতায় এখন মানুষ আর কলম দুটোই ভেরি চিপ। ফুটপাথে কিলবিল, কিলবিল করছে মানুষ আর কলম। কিন্তু বাবা! বাসে, ট্রামে লেডিজ সিটের সামনে দাঁড়ানর চার্মটা একবার ভাব। সব কষ্ট গলে জল হয়ে যায়। তুমি ভাব, পকেটমার যদি সুন্দরী হয়, সে যদি কিছু নেয়, তাকে আমি পকেটমারা বলব না ওটা আমার দেওয়া উপহার! প্রীতি উপহার। কিন্তু একটা গুফো লোক জানলুম না শুনলুম না, বুঝলুম না ঝট করে পকেটটা হাতিয়ে নেমে গেল, সহ্য করা যায়!

হ্যাঁ, যা বলছিলুম, ওইভাবে মাঝে মাঝে, বুক-পকেটের ওপর দিয়ে হালকা হাত চালিয়ে সামলাতে সামলাতে যাই। আর তারপর বাড়ি এসে ভাই, আবার সামলাই, আরও ভালভাবে সামলাই। নোটগুলোকে ভাঁজ খুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একদিন এক একটা বইয়ের মধ্যে রাখি, আর পয়সার ব্যাগটাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় লুকুই। পেপার পাল্পের একটা ফাঁপা প্যাঁচা আছে, কোনদিন তার মধ্যে রাখি। কোনদিন আলমারি আর দেয়ালের মাঝখানে বঁড়শি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখি। কখনও দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামটা যেখানে টিক-টিক করে সেখানে কায়দা করে রাখি। কখনও হাণ্টারশুর ভেতরে রাখি তবু ভাই কেমন যেন মনে হয়, নেই, নেই। দু টাকার একটা নোট নেই, চকচকে একটা আধুলি নেই। গোল ঝকঝকে কাঁচা টাকাটা কি হল রে? পাঁচটা দশ টাকার নোট ছিল না! চারটে কেন!

—জানো কিছু?

—কি করে জানব? পাছে তোমার ব্যাগে, পকেটে হাত দি তাই আজকাল লুকিয়ে রাখা হয়! কত টাকা ছিল আমি জানব কি করে! তোমার পাঁঠা, তুমি বোঝো!

—যাকগে, যাকগে, এখন বল তো, নোটগুলো কিসের মধ্যে রেখেছি—টলস্টয়ের মধ্যে, শেকসপিয়ারে, ওয়েবস্টারে, না প্রেম কথায়!

—এখন ধার নাও, দুপুরে খুঁজে রাখব।

—তাহলে আর একটা কাজও কোরো, ওই ভেন্টিলেটারে পয়সার ব্যাগটা গত রবিবারে লুকিয়ে রেখেছিলাম। হে, হে, তোমার চোখ এড়িয়ে আর ইয়ে করতে পারছিলুম না...ওঠাও তাহলে...।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ছবি : হিরণ্ময় গোস্বামী

অতুল্য ঘোষ

॥ ৬৫ ॥

খুব ছেলেবেলায় একবার বিপাকে পড়েছিলুম। রানী বিড়ি খাচ্ছে দেখে যাত্রা দেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। হতে পারে যাত্রা দলের রানী—কিন্তু রানী তো! আমাদের ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ছিল—

'জয় জয় পঞ্চম জর্জ নৃপোত্তম
জয়তি চ মহিষী মেরী।'

এ তো ছিলই, তা ছাড়া যেসব গল্পের বই আমাদের কাছে আসত, তাতে রাজা, রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর—এসব থাকত। পাড়ায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে কয়েকজন রাজাও ছিলেন। সবচেয়ে বড় রাজা ছিলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁকে আমরা 'বড়রাজা' বলতুম। আর ছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—'ছোটরাজা'। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ির সামনে ছিল 'টেগোর ক্যাসেল', যেন ইউরোপের কোনও ক্যাসেল এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা 'টেগোর ক্যাসেলে' মাঝে মাঝে যেতুম। খুব বড় বড় ঘোড়া ছিল, বলত 'Waler' ঘোড়া। দাম নাকি দশ হাজার, পনর হাজার—এরকম সব। আর ছবি-টবি যা দেখতুম রাজা-মহারাজাদের, মাথায় একটা মুকুটের মত, আর কোমরে তরোয়াল তো থাকতই। প্রথম যখন একজন রাজবংশীয়কে আমাদের মতই সাধারণ। শুনলুম, নলডাঙ্গার রাজপরিবারের লোক। প্রায় সেই সত্তর বছর আগেকার কথা—তখনই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বাবা ও মায়ের গুরুদেব। তবে এ গুরু অন্যরকম। কত জিনিস যে আমাদের দিতেন—আর পুজোর সময় গরদের পাঞ্জাবি বাঁধা ছিল। ও'র সঙ্গে হবে, কি বাবার সঙ্গে হবে, মনে নেই—একবার একটি বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, রাজবাড়ি। বেশ বড় বাগান। আমরা সব বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। দেখা গেল, বেশ বড় বড় পেয়ারা হয়ে রয়েছে। মালীরা কাজ করছিল। তারা গ্রাহ্য করল না। আমাদের পা আর পেয়ারাগাছের কাছ থেকে নড়ল না। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেয়ারা দেখতে লাগলুম। এমন সময়ে এক ভদ্রলোক এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'কি বাবু, পেয়ারা খেয়েছ?' মনে হল বাড়ির বেশ পদস্থ কর্মচারী। মালীরা উঠে দাঁড়াল। উনি তখন একটা গাছের ডাল ধরে নামিয়ে দিলেন। আমাদের আর হাত সরে না। যা হোক, একটা দুটো করে তো পেয়ারা পাড়া হল। উনি তখন আমাদের বললেন, 'চল বাড়ির মধ্যে।' তখন আমার একটু সাহস হয়েছে। বললুম, 'শুনলুম এটা রাজবাড়ি। পেয়ারা নিলুম, রাজামশাই রাগ করবেন না তো?' উনি একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, রাজামশাই একটু বদরাগী আছেন। তা চল না, সব ঠিক করে দেওয়া যাবে।' বাড়ির মধ্যে একটা ঘরে যেতেই সবাই দাঁড়িয়ে উঠে প্রণাম বললেন যে, ওনার ছেলে ; ওকে আমি পেয়ারা খাওয়াচ্ছিলুম। ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করে বললেন, 'মহারাজ কি ওদের সঙ্গে খেলা করছিলেন?' শুনেই তো আমি কিরকম হয়ে গেলুম। মহারাজ মানে? নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর ক্ষৌণীশচন্দ্র। কি সর্বনাশ! আমরা তো বিক্রমাদিত্য আর কৃষ্ণচন্দ্রকে খুব চিনতুম। একজনকে চিনতুম বেতালের জন্য, আর একজনকে গোপাল ভাঁড়ের জন্য। তারপর বর্ধমানের মহারাজকে দেখেছি। ওঁর অনেক বইও ছিল—আর্ট পেপারে ছাপা, প্রতি পাতায় সুন্দর করে ছবি আঁকা। বর্ধমানে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন সাহিত্যিকরা বলেছিলেন যে, এক দিকে সীতাভোগ-মিহিদানার পাহাড় আর তার নীচে দই-ক্ষীরের নদী। আর একজন মহারাজের কথা জীবনে ভুলব না। নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ রায়। 'মানসী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তারপর 'মানসী'র সঙ্গে 'মর্মবাণী' যুক্ত হয়। এই 'মানসী'তে বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বেরিয়েছিল। 'শ্রুতির স্মৃতি' বলে উনি এক Memoirs লেখেন। ভাষা পড়ে লোকে বলত, 'মণিমুক্তা-খচিত ভাষা'। জগদিন্দ্রনাথের এমন একটা মর্যাদাবোধ ছিল, যা খুব কম লোকেরই থাকে। গরিমা এবং অহংকারবর্জিত যে মহিমা এবং মর্যাদা, তার ষোল আনা ছিল জগদিন্দ্রনাথের মধ্যে। আরও অনেককে কাছ থেকে দেখে-

মৌর্য সাম্রাজ্য
(অশোকের রাজত্বকালে)
খ্রীঃ পূঃ ২৫০
আসিকনি নং (চন্দ্রভাগা নং)
মানস সরোবর
কান্দাহার
(গান্ধার)
তোপরা
মিরাট
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
ললিতা পাটন (কাটমাণ্ডু)
সিন্ধু নদ
মথুরা
কপিলাবস্তু
লৌরিয়া
কাশী
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
মগধ
চম্পা
সাঁচি
রূপনাথ
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
নর্মদা নং
মহানদী
তাম্রলিপ্ত
পুলিনদাস
পিটিনিকাস
সোপারা
গোদাবরী নং
অন্ধ্র
কলিঙ্গ
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর
কৃষ্ণা নং
নেল্লোর
শতিয়াপুত্র
চোলস
তাম্রপাণি

গুপ্ত সাম্রাজ্য
(চতুর্থ শতাব্দীর শেষে)
কাশ্মীর
পুরুষপুর
(পেশোয়ার)
সিন্ধু নদ
তিব্বত
মানস সরোবর
ইন্দ্রপ্রস্থ
ব্রহ্মপুত্র নদ
নেপাল
কামরূপ
কনৌজ
বৈশালী
মালাভাস
উজ্জয়িনী
সাঁচি
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
সৌরাষ্ট্র
মহাকোশল
সমতট
তাম্রলিপ্ত
মহানদী
গোদাবরী নং
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর
কাঞ্চী
চোলস
সিংহল

মুঘল সাম্রাজ্য
(সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে)
রাজপুত
বিদ্রোহী জাতি
পেশোয়ার
লাহোর
মুলতান
মানস সরোবর
পানিপথ
দিল্লি
জাঠ
ব্রহ্মপুত্র নদ
রাজপুত
আগ্রা
কামরূপ
এলাহাবাদ
বেনারস
পাটনা
চন্দননগর (ফরাসী)
শ্রীরামপুর (দিনেমার)
ঢাকা
নর্মদা নং
গণ্ডোয়ানা
কলিকাতা
সুরাট
দিউ
(পর্তুগীজ)
দমন (পর্তুগীজ)
বোম্বে
(বৃটিশ)
মারাঠা
গোদাবরী নং
মহানদী
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
(পর্তুগীজ)
পলিকট (ওলন্দাজ)
মাদ্রাজ (বৃটিশ)
সাদ্রাস (ওলন্দাজ)
পণ্ডিচেরি (ফরাসী)
ট্রানকুয়েবার (দিনেমার)
নাগাপত্তম (ওলন্দাজ)
কালিকট
কোচিন
(ওলন্দাজ)

ভারতবর্ষ (১৯৩৯)
ভারতের দেশীয় রাজ্য
ভারতের প্রদেশ
আফগানিস্তান
কাশ্মীর
শ্রীনগর
পাঞ্জাব
সিমলা
তিব্বত
মানস সরোবর
নেপাল
সিকিম
দিল্লি
রাজপুতনা
আগ্রা
আজমীর
সিন্ধু
বিহার
বঙ্গদেশ
মধ্য ভারত
ইন্দোর
বেরার
বোম্বে
হায়দ্রাবাদ
কলিকাতা
বার্মা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরি
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
কলম্বো
ভারত মহাসাগর

র সম্ভ্রম ছিল, ধীরে ধীরে তা অনেক কমে রেছিল। বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে, রোয়ালগুলো ছুয়ো। এ'রা সকলেই ছিলেন মিদার।

'The word Zamindar was ,in the official nomenclature of Bengal, merely a convenient general term which included landholders and tenure-holders of several separate kinds, who were entitled to hold directly under the state, and to pay the land-tax directly to it. The first class of Bengal Zamindars represented the old Hindu and Muhammadan Rajas of the country, previous to the Moghul conquest by emperor Akbar in 1576, or persons who claimed that status. The second class were rajas or great landholders, most of whom dated from the 17th and 18th centuries, and some of whom were, like the first class, "de facto" rulers in their own estates or territories, subject to a tribute or land-tax to the representative of the Emperor. These two classes had a social position faintly resembling the Feudatory chiefs of the British Indian Empire, but the position was enjoyed by them on the basis of custom not of treaties. The third and most numerous class were persons whose families had held the office of collecting the revenue during one, or two, or more generations, and who had thus established a prescriptive right. A fourth and also numerous class was made up of the revenue-farmers, who, since the Dewani grant in 1765, had collected the land-tax for the East India Company under the system first, of yearly leases, then of five years leases, and again of yearly leases. Many of these revenue-farmers had by 1787 acquired the "de facto" status of Zamindars. It is these fundamental differences in origin which have led to such contradictory statements, alike in Indian history and in the Indian law courts, as to the title of the Bengal Zamindars. The result of the Permanent Settlement in 1793 was to place all classes of Zamindars on a uniform legal basis, and so in a short time to obliterate the previous differences in the customary status of several classes which had grown out of differences in origin.'
[Hunter's Bengal MSS records
p.p. 31-32]

এ'দের গভর্নমেন্টের সঙ্গে আরও চুক্তি ছিল যে, সরকারের বিরুদ্ধে কোনও অশান্তি হলে সেই অশান্তি দমন করবার জন্য এ'রা সরকারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। পরবর্তী কালে সত্যিকারের যাঁরা রাজা-মহারাজা, অর্থাৎ যাঁদের দেশীয় রাজ্যের অধিপতি বলা হত, তাঁদের অনেককেই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। এ ইংরাজের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এইসব রাজারা এবং তাঁদের রাজত্বগুলি ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল, কিন্তু ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্ত যে ভারতবর্ষ, তার সঙ্গে এসব রাজা বা রাজ্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এ'দের রাজ্যে এ'রাই প্রধান। কারো কারো নিজের সৈন্যসামন্ত ছিল, কারো কারো ছিল রেল। আচার-ব্যবহার, বিচারপদ্ধতি -সবই আলাদা। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কয়েক শত টুকরো করে ইংরাজ ভারতবর্ষ শাসন করত। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকার শাসন করতেন, তাকে বলা হত 'British India', বাকী ভারতবর্ষ ছিল ভারত সরকারের অধীন। ভারতবর্ষে এর পূর্বে আরও কয়েকটি সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে—মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য। কিন্তু দেশকে টুকরো টুকরো করে কেউ দেশ শাসন করেনি। আর এইসব দেশীয় রাজারা কতরকম সুবিধা উপভোগ করতেন! প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বাধীনই ছিলেন। ভারতবর্ষের ভাইসরয়কে তাঁরা সম্মান দেখাতেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজরা তো ঘোষণা করলেন যে, এইসব দেশীয় রাজারা মুক্ত।

Cabinet Mission's Plan

On 22nd May, the Cabinet Mission issued the memorandum dated May 12, 1946 in regard to state treaties and paramountcy (Appendix-II); it affirmed that the rights of the states which flowed from their relationship with the crown would no longer exist and that the rights surrendered by the states to the paramount power would revert to the states. The void caused by the lapse of paramountcy was to be filled either by the states entering into a federal relationship with the successor government or governments in British India, or by entering into particular political arrangements with it or them. The memorandum also referred to the desirability of the states in suitable cases, forming or joining administrative units large enough to enable them to be fitted into the constitutional structure, as also of conducting negotiations with British India in regard to the future regulation of matters of common concern, specially in the economic and financial field.

ভারত সরকার ১৯৪৭এর ৩রা জুনের এক বিজ্ঞপ্তিতে Cabinet mission এর উপর্যুক্ত memorandum গ্রহণ করলেন:

His Majesty's government wish to make it clear that the decisions announced above relate only to British India and that their policy towards Indian states contained in the cabinet mission memorandum of 12th May 1946, remains unchanged.'

অর্থাৎ ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকার —দু পক্ষ থেকেই ঘোষণা করা হল যে, দেশীয় রাজ্য মুক্ত। তাদের কোনও সরকারের সঙ্গেই কোনও চুক্তি রইল না ; যেসব চুক্তি হয়েছিল, সব বাতিল। এর মানে একটাই। ব্রিটিশ ভারত স্বাধীন হল। আর প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্য —তারাও স্বাধীন। এইসব দেশীয় রাজ্যের বাধ্যবাধকতা ছিল ইংরাজ-রাজের সঙ্গে। ইংরাজ-রাজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তাঁদের কতকগুলো বিধিনিষেধ মানতে হত। ব্যস্! এক ভারতবর্ষ ৬০১টিতে পরিণত হল। ইংরাজ যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল, এক দিকে ভারতবর্ষ তখন বিভক্ত : আর এক দিকে ছয় শতটি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ঘোষণা করে গেল যে, তারা মুক্ত। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে দেশভাগজনিত সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার উপর হল দেশীয় রাজ্যের সমস্যা।

(ক্রমশ)

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ২০ ॥

আমি অন্নপূর্ণার সংগে—যার মধ্যে সংগীতের শিক্ষা-দীক্ষা, রস ছিল—ঘর করতে পারলাম না কেন, সে প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া বড় মুশকিল। আমার মনে হয় যখন কোনও পুরুষ অন্য এক পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, কিংবা এক মহিলাকে বান্ধবী মানে, বা তাকে বিবাহ করে ঘর-সংসার করে, তাদের মধ্যে তখন একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই রসায়নটা কাজ করলে সেটা চমৎকার হয়, যতদিনই সেটা কাজ করুক। সেটা না হলে দুজনের পক্ষে সংগ করা মুশকিলের হয়ে পড়ে। বিশ্লেষণ করে তো অনেক তত্ত্বই খাড়া করা চলে, তবে মৌলিকভাবে যেটা ঘটে থাকে তা এই—যা বললাম। যেটা আমি নিজে অন্তত বিশ্বাস করি।

অন্নপূর্ণার সংগে আমার সম্পর্কটা দেখতে হলে একটু পেছনে যেতে হয়। মাইহারে গিয়েছিলাম বাজনা শিখতে, বিয়ে-থার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি সে ক্ষেত্রে। সেই '৩৮ সাল থেকে ৪১ সাল পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষাই চলছিল। বিয়ে হয়েছিল আমার যাওয়ার তিন বছর পর। এবং এর সূত্রপাতও বেশ অদ্ভুত। আমার সেজো বউদি, অর্থাৎ দেবেন্দ্রশংকরের স্ত্রী, কৃষ্ণা বউদি একবার বেড়াতে এসেছিলেন মাইহারে। আমি তখন বাবার ঐ বাড়ির পাশে একটা জায়গায় বাসা ভাড়া করে থাকতাম। বউদি প্রায়ই যেতেন বাবার ওখানে, সময় কাটাতেন বাবার সংগে, মায়ের সংগে, অন্নপূর্ণার সংগে। আলি আকবরের প্রথমা স্ত্রী, আশিসের মায়ের সংগেও ওঁর খুব ভাব ছিল। তো উনি এসে খালি বলতেন, আহা! অন্নপূর্ণা কি মিষ্টি মেয়ে! ঠাকুরপো, তোমার এরকম একটা বউ হওয়া উচিত।

হয়তো মানুষ যেটা বলাবলি করে সেটা ঠিক যে, আমি যতখানি ভালবাসতে পেরেছিলাম অন্নপূর্ণাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসা ও আমায় দিয়েছে। তবে কথা কি, ভালবাসার তো কোনও বাঁধাছাঁদা মাপকাঠি হয় না। ও আমাকে খুবই ভালবাসত। সে সম্বন্ধে আমি কোনও প্রশ্ন তুলছি না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ওর প্রতি আমার ভালবাসাটা ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধেছিল। ওপরের ছবিতে অন্নপূর্ণা ওর দাদা আলি আকবরের সংগে এক সভায় বসে আছে।

কমলার সংগে ওই আলাপে অন্নপূর্ণা আঘাত পায়। আমাদের সম্পর্কটা এমন কিছুই ছিল না। অথচ ওরকম একটা মিষ্টি মেশামেশির থেকেই কি অশান্তিই না ঘটে গেল আমাদের জীবনে! হায়! ওপরের ছবিটা কমলার অল্প বয়সের একটা।

এইরকম সব কথা। যেভাবে আমাদের বাঙালী বউদিরা ঠাট্টা করেন আর কি! আর এইভাবেই আসল সূত্রপাত বিষয়টার। উনি আলি আকবরকে বলাতে আলি ভাই বলল, বেশ হয়। এই করে করে কোন্ একসময়ে দানা বেঁধে গেল কথাটা। পরে আমি যখন আলমোড়ায় গেলাম দাদার প্রতিষ্ঠানে সেখানে সেজদা গেলেন, সেজো বউদি গেলেন। এবং সেখানেও কথাটা একটু একটু করে উঠল। ওদিকে মাতুল আবার ছিলেন আমাদের সমস্ত সাংসারিক ব্যাপারের মধ্যমণি গোছের। তিনিও এই কথা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। ক্রমে বাবার কানেও উঠল কথাটা। আর ততদিনে কথাটা বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। আমিও এতদিন বেশ মজা দেখছিলাম। তখন আর আমার বয়সই বা কত! কুড়ি-একুশ, আবার কি! এদিকে তখন আমি ঘোর প্রেমে জড়িয়ে আছি উজরার সংগে। দাদার ট্রুপের জোহরা-উজরা বোনেদের উজরার সংগে। উজরা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। খুব শিক্ষিতা, খুব সুন্দরী, ভারি কালচার্ড মেয়ে। ১৯৩৬ সালের শেষে আমাদের ট্রুপে যোগদান করেছিল। আর সেই তখন থেকেই আমাদের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সম্পর্কটা তখন খুবই জমাটী, খুবই সিরিয়াস। তবে তখনও ওকে ঠিক বিয়ে করার কথা ভাবিনি। যা হোক, যখন অন্নপূর্ণাকে বিয়ের কথা উঠল তখন আমিও ঠিক অতখানি ভাবিনি সেটার আসল গুরুত্ব নিয়ে। আর তখন আমাকে যেন সংগীতটাই পেয়ে বসেছে। আর বাবার ওরকম একটা স্নেহ, অত ভালবেসে শেখাচ্ছিলেন! তা ছাড়া নিজের বাবার ভালবাসা তো জীবনে পাইনি। তাঁর সংগই তো সে অর্থে পাইনি কখনও। হিসেব করলে হয়তো সারা জীবনে দেড় মাস কি দু মাস ওঁকে কাছে পেয়েছিলাম। তাও থেপে থেপে, একনাগাড়ে নয়। কাজেই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে যে ভালবাসাটা পাচ্ছিলাম তা আমাকে প্রায় অভিভূত করে ফেলেছিল। এমনিতে তো রাগী মানুষ ছিলেন, কিন্তু আমাকে শেখানোর ব্যাপারে ওঁর আদর যত্ন স্নেহ সব মিলে-মিশে কিরকম যেন আমাকে ওঁর অন্ধ

১৯৪১ সালে আলমোড়ায় আমাদের বিয়ে হল। তখন আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান বাবার ভালবাসা পাওয়া। আমরা যে এক ঘরের লোক, সংগীতের সাধক, সেই সম্পর্কটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেই রক্তের, ভালবাসার বন্ধন। পারতপক্ষে সেই সংগীতের জন্যই পুরো জিনিসটা ঘটে গেল। তবে এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে, ওকে আমার খুব ভাল লাগত সেই শুরুর থেকেই। একসঙ্গে থাকতে থাকতে যে ভাল লাগাটা দানা বাঁধে। এ ছাড়া ওর গুণও ছিল প্রচুর। ওপরের ছবিতে বিয়ের পরে পরেই আমরা দুজন।

ভক্ত করে ফেলেছিল। একটা কৃতজ্ঞতায় ভরে যাচ্ছিল প্রাণটা। তাই কথা যখন হচ্ছিল ওঁর মেয়েকে বিয়ে করার আমি তখন মন দিয়ে ভাববার অবস্থায় ছিলাম না। মনে হল সেটাই যেন হবার। যা বলছিলাম, সংগীতটাই তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। সমস্ত বিষয়টা তলিয়ে দেখার, কি পেছিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। হয়ে গেল বিয়েটা।

১৯৪১ সালে আলমোড়ায় আমাদের বিয়ে হল। ঠিক তার কিছু আগে উজরা দাদার দল ছেড়ে চলে গেল। কি জানি হয়তো এই কারণেই কিনা! ওর সঙ্গে আমার বিদায়ক্ষণ বড়ই বেদনাদায়ক হয়েছিল; কিন্তু তখন আমার একমাত্র ধ্যান বাবার ভালবাসা পাওয়া। আমরা যে এক ঘরের লোক, সংগীতের সাধক, সেই সম্পর্কটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেই রক্তের, ভালবাসার বন্ধন। পারতপক্ষে সেই সংগীতের জন্যই পুরো জিনিসটা ঘটে গেল। আমার তখন নাচের থেকে মনটা একেবারে উঠে গেছে। তো যা হোক, বাবা ওদিকে আবার গোঁ ধরেছিলেন যে, এই বিয়ে যদি হয় তবে সেটা হিন্দু মতে হতে হবে। যেটা খুবই বিরল। এরকম নিশ্চয়ই তুমি কখনই শোনোনি। কোনও মুসলমান এরকম বিয়ে দিলেও মুসলমান মতেই দেবেন। কিন্তু বাবা হলেন উদারপন্থী, হিন্দু ধর্মের ওপর অগাধ শ্রদ্ধা। এবং এই বিয়ে উনি হিন্দু মতেই দিলেন।

অন্নপূর্ণার বয়স তখন খুব কম। সবে পনরো পেরিয়েছে। আমার তখন একুশ। দুজনেই খুব কাঁচা মস্তিষ্কের। শারীরিক দিক দিয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলেও মনে তখন আমরা নিতান্তই কাঁচা। অন্তত বিয়ের মত একটা সিরিয়াস বিষয়ের ব্যাপারে। হয়তো আরো অনেক ভাবার প্রয়োজন ছিল সে সময়ে। কিন্তু ভাবিনি। তবে এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে, ওকে আমার শুরুর থেকেই খুব ভাল লাগত। একসঙ্গে থাকতে থাকতে যে ভাল লাগাটা দানা বাঁধে। এ ছাড়া ওর গুণও প্রচুর ছিল। আর ক্রমে ক্রমে সত্যিই ওকে খুব ভালবেসেছিলাম। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি যেটা শুনে এসেছ কলকাতায় তোমার জানা-শোনা মানুষ এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে, সেটা হয়তো ঠিক যে, আমি যতখানি ভালবাসতে পেরেছিলাম অন্নপূর্ণাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসা ও আমায় দিয়েছে। তবে কথা কি, ভালবাসার তো কোনও বাঁধাছাঁদা মাপকাঠি হয় না। ও আমাকে খুবই ভালবাসত। সে সম্বন্ধে আমি কোনও প্রশ্ন তুলছি না। সেদিক দিয়ে ওর প্রতি আমার ভালবাসাটা ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধেছিল। একেবারে যে প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে ওকে বিয়ে করেছিলাম তা না; সত্যিই তা না। তবে একসঙ্গে থেকে থেকে আমার ভালবাসা ক্রমশই বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভালবাসার যে রসায়নটা সেটা হয়তো একটা মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারও আছে। নিছক সেন্টিমেন্ট এবং ইমোশন তো চিরকাল থেকে যেতে পারে না। একটা-না-একটা স্টেজে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হবেই। যেটা কিনা আমরা পারিনি।

আমাদের বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই শুভর জন্ম হল। আবার তার মধ্যেই জোর দমে রেওয়াজও চলছে। সেই সময়ে বাবার ওখানে থাকতাম, আর চার বেলা জোর দমে খাওয়া-দাওয়া চলত। এর বাইরে আর সব খরচ কিন্তু আমি নিজে চালাতাম। কয়েকবার অন্য কোথাও থাকার কথাও তুলেছিলাম। তাতে বাবার ঘোর আপত্তি ছিল। জোর করেই রাখতেন ওঁর ওখানে। তখন দেখলাম চটে যাবেন উনি, তাই ওখানেই ছিলাম। তবে বাবা সে সময়টা আমাকে রেডিওতে দুটো-চারটে প্রোগ্রাম করতে, কি এখানে-ওখানে জলসায় বাজাতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাতে কিছু পয়সা আয় হত আমার। উপরন্তু মাইহারের ওখানকার একজন মুদীর দোকানের মালিক আমাকে খুব পছন্দ করতেন, যত খুশি ধার দিতেন। এই করে চার-পাঁচ হাজার টাকার ধার হয়ে গিয়েছিল ওঁর দোকানে। পরে আমি বেশী পয়সা আয় করে সে-সমস্ত শোধ করি।

তো যাই হোক, এই বাজনার রেওয়াজ আর নানান নিয়মকানুনের চাপটা বড় বেশী হয়ে গিয়েছিল আমার আর অন্নপূর্ণার ওপর। অন্নপূর্ণার স্বাস্থ্যও

আমাদের বিয়েতে অন্নপূর্ণার পিছনে শঙ্খধ্বনি করছেন অমলা বউদি। অমলা নন্দী তখনও অমলাশঙ্কর হননি। তবে আলমোড়ায় দাদার ট্রুপে ছিলেন।

খারাপ হয়ে গেল শুভর জন্মের পর। শুভর ইনটেস্টিনাল অব্‌স্ট্রাক্‌শন মতন হয়ে গিয়েছিল। সারা রাত্রি ঘুমোতে পারত না, আর আমরা ওকে নিয়ে হাঁটতাম। এ ছাড়া সারা দিনের রেওয়াজ তো আছেই। এটা দুজনের স্নায়ুর ওপর প্রেসার দিচ্ছিল। এবং এইভাবেই ক্রমশ ও দিনে দিনে রগচটা হয়ে উঠতে লাগল। এমনিতে অন্নপূর্ণা সম্পর্কে আমার প্রশংসা ছাড়া কিছু নেই। এত এত গুণ ওর। কিন্তু রাগটা ওর একটু বেশী, একেবারে বাবার মতন। অথবা বলা চলে, ধৈর্যটা অন্যান্যদের থেকে কম। আবার আমারও তখন ভীষণ রাগী স্বভাব ছিল। এখন তো না-হয় নিজেকে মেরে মেরে অন্যরকম করে ফেলেছি। আগে যারা আমার মেজাজ দেখেছে তারা তো আমায় চিনতেই পারবে না এখন। বদরাগী বলতে যা বোঝায়। কাজে-কাজেই ঐ একসঙ্গে প্রায় আমরা রেগে উঠতাম। তার মধ্যে ছেলে মানুষ করা আর রেওয়াজ। সব কিছু মিলে-মিশে একটা ভেতরকার টেন্‌সন শুরু হয়ে গেল।

তারপর তো আমরা বোম্বে এলাম। মালাদে থাকতে ঠিক তার আগে '৪৪ সালের মাঝামাঝি মাইহারে আমার ভীষণ অসুখ হয়। রিউম্যাটিক ফিভার। সেরে ওঠবার পরই চেঞ্জের জন্য বোম্বে এলাম। এর পর আর স্থায়িভাবে মাইহারে থাকা হয়নি। যদিও তারপর বছর দশেক ধরে প্রতি বছর দু-এক মাসের জন্য যেতাম—বাবার কাছে শিখতাম। যা হোক, '৪৪-এর শেষ থেকে বসবাস শুরু হয়ে গেল বোম্বেতে। অসুখ থেকে কিছুটা ভাল হবার পর আই পি টি এ নিয়ে মেতে উঠলাম। অন্নপূর্ণা তখন বেশ কিছু দিনের জন্য মাইহারে চলে গেল। পরে আই পি টি এ ছাড়ার পর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রযোজনায় ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া ব্যালের আমি সংগীত নির্দেশনা দিতে শুরু করলাম। তখন অন্নপূর্ণা ফিরে এল এবং আমার সঙ্গে ওই ব্যালের মিউজিকের কাজে যোগ দিল।

তখন সমস্ত সময়টাই আমাদের খুব স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গেছে। বেশ ক'টা বছর। শুভর শরীর খারাপ, মানসিক অশান্তি, এরকম আরও কিছু কিছু ব্যাপার। তারই মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। আমি যখন ঐ অসুখ থেকে সেরে উঠছিলাম, ঐ সময়টাতে আমি আর একজনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। সে সম্পর্কটায় দৈহিক কোনও ব্যাপার-ট্যাপার কিছুই ছিল না। কিন্তু ঐ যে অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময়, যেটাকে ইংরেজীতে কন্‌ভ্যালেসেন্স বলে, যেটা কিনা অনেকখানি আধা-ঘুম আধা-জাগরণের মতন, সেই পর্যায়ে কমলার সঙ্গে আমার একটা মনের যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। আমার মেজদা রাজেন্দ্রশঙ্করের স্ত্রী লক্ষ্মীশঙ্করের ছোট বোন কমলা। ওর আর এক নাম ছিল সরস্বতী। ওরা দক্ষিণের তামিল ব্রাহ্মণ, কিন্তু জামশেদপুরে জন্ম এবং উত্তর ভারতেই কাটিয়েছে। আমার লক্ষ্মীবউদির গান তো শুনেইছ! যা হোক, কমলার সঙ্গে আলাপ ছিল অনেক আগে থেকেই, ওর সেই বাচ্চা বয়স থেকেই, যখন ও দাদার ট্রুপে নাচতে এল। তারপর বহু দিন পর ওকে ফের দেখলাম, তখন ও বেশ বড় হয়ে গেছে। ষোল-সতের বছর বয়স। কিভাবে-না-কিভাবে, জানি না, সেই পুরনো অনুরাগটা ফের জেগে উঠল আমার। এ কথাটা '৪৪ সালের শেষাশেষির। হয়তো ব্যাপারটা খানিকটা বাড়াবাড়ির মত হয়ে গেল। মূলত আমার তরফ থেকেই। কমলা আর কি করবে! বেচারী তখনও ছেলে-মানুষ। তো তাতে অন্নপূর্ণা মনে নিশ্চয়ই খুব আঘাত পায়। কিন্তু কমলার সঙ্গে সম্পর্কটা এমন কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত ওরকম একটা মিষ্টি মেশামেশি থেকে যে এত অশান্তি হবে আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমি আদৌ ভাবিনি। অথচ তাই হল। হায়!

এর পর আমি মালাদ ছেড়ে আন্ধেরিতে গেলাম আই পি টি এ-র কাজে, অন্নপূর্ণা চলে গেল মাইহারে। এবং কমলার ঐ ব্যাপার থেকেই আমাদের সম্পর্ক বেশ একটু চিড় খেল। এখন এখানে বলতে গেলে অনেক কথাই এসে যায়, কিন্তু বলি কি করে? সাংসারিক অশান্তির নোংরা কাপড় জনসমক্ষে কাচাকাচি করার কি কোনও দরকার আছে? তাতে মানুষের দুঃখ-কষ্টই বাড়ে, উপকার কারোই না। নিজের ওপর দোষ নিতে আমার কোনই দ্বিধা নেই। কারণ, আমি ভগবান নই। দোষ তো আমার আছেই। কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় দোষ কি কেবল একটা মানুষের ওপর বর্তায়? তুমি বলছ বলে, শংকর, আমি কত কথাই তো বলছি! কিন্তু বুকটা ফেটে যাচ্ছে দুঃখে, বেদনায়। আমিও তো সুখী হতে চেয়েছিলাম। নির্ভেজাল সাংসারিক সুখ তো আমিও চেয়ে-ছিলাম। হাজার যশ, খ্যাতি, অর্থ দিয়েও সে সুখ আমি কিনতে পারিনি। মানুষ দেখে বাইরের রবিশঙ্করকে, দুঃখী রবিশঙ্করকে কে চেনে? তার একটা কারণ আমি নিজের বেদনা সংগীতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, কথা দিয়ে মানুষকে শোনাতে চাইনি। চাইও না। আজ এ-সমস্ত প্রসঙ্গ উঠছে, কারণ তুমি সমস্ত কিছু জানতে চাও বলে। তুমি জানতে চাও আমার জীবনের ভালবাসা এবং দুঃখের কথা। দুঃখের তো শেষ নেই, ভালবাসার কথাই বলি বরং।

(ক্রমশ)

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১০ ॥

গোরা সৈন্য ও সিপাহীরা শহরের উপান্তে এক স্থলে বন্দুকের তাক অভ্যাস করে। দিনরাত গোলাগুলির শব্দের জন্য লোকে সেই অঞ্চলের নাম দিয়েছে দমদমা। এই দমদমা বা দমদমে যাবার পথেই এক জায়গার নাম বেলগাছিয়া। যে পল্লীতে যে গাছ বেশী ত্তে হয় সেই গাছের নামেই পল্লীর নাম। যেমন টিতলা, কাঁকুড়গাছি, লেবুবাগান, পেয়ারাবাগান, লতলা, ডালিমতলা ইত্যাদি।

বেলগাছিয়ায় দ্বারকানাথের মনোরম বিলাসপুরী বেলগাছিয়া ভিলা। এক বিশাল উদ্যানের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে মতিঝিল, তার স্বচ্ছ নির্মল জল, সে জলে ফুটে আছে নীল পদ্ম ও রক্ত পদ্ম, যা কবিদের অতি প্রিয়। উদ্যানটিও সযত্নে কেয়ারি করা, এর মধ্যে রয়েছে গোলাপ, কদম্ব, স্থলপদ্ম, যুঁই, বেল, পিটুনিয়া, জিনিয়া, সাকসপার্স, ও অন্য বাহারী ফুল।

বাহির বাড়িটিতে অতি প্রশস্ত সব হলঘর। সেগুলির ত্রুটিহীন সৌষ্ঠবে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দেয়ালগুলি আধুনিক শিল্পীদের চিত্রকলায় সজ্জিত। মধ্যে মধ্যে এক একটি ভাস্কর্যের নিদর্শন। কোনো কোনো কক্ষে দেয়ালজোড়া বেলজিয়াম আয়না। ওপর থেকে ঝুলছে এক শো দেড়শো মোমের ঝাড়বাতি, তার আলো ঠিকরে পড়ছে দর্পণে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মেঝেতে ছড়ানো রয়েছে মীর্জাপুরী গালিচা। বুটিদার লাল রঙের কাপড় ও সবুজ সিল্কে আসবাবগুলি মোড়া। মধ্যে মধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিল, তার ওপরে সাজানো পুষ্পস্তবক। সিঁড়ির দু' পাশে ঝুলছে দুষ্প্রাপ্য অর্কিড, লোহার রেলিং ঢেকে দেওয়া হয়েছে লতাপাতায়।

বাইরে একটি মার্বেল পাথরের ফোয়ারা, তার ওপরে দণ্ডায়মান প্রেমের দেবতা কিউপিড। ফোয়ারাটিকেও আজ আলোকোদ্ভাসিত করা হয়েছে। এ যেন সত্যিই ইন্দ্রপুরী।

মতিঝিলের মাঝখানে একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের ওপরেও রয়েছে আর একটি গৃহ, এটির নাম গ্রীষ্মাবাস। একদিকে একটি ঝুলন্ত লোহার সেতু ও অন্য একদিকে একটি কাঠের সেতু দিয়ে এই গ্রীষ্মাবাসটি বাগানের সঙ্গে যুক্ত। অবশ্য এই দুই [illegible]

স্থানে উড়ছে বহুবর্ণ পতাকা। অতিথিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুযায়ী কেউ বৈঠকখানায় কেউ ঐ গ্রীষ্মাবাসে বসেছেন। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রবাদ্য ও নৃত্যগীতের ধ্বনি। উদ্যানে অবিরাম বাজি পোড়ানো চলেছে।

শীতকাল, ফিনফিনে বাতাস বইছে। আকাশ পরিষ্কার, অজস্র নক্ষত্রের সভাসদ নিয়ে নিশাপতি আজ সেখানে পূর্ণ গৌরবে বিরাজমান। ধরণীতলে, এই বেলগাছিয়া ভিলাতেও যেন দ্বারকানাথ আজ তারকাদের মধ্যে চন্দ্র। ইওরোপ বিজয় করে এসেছেন তিনি, সেই উপলক্ষে আজ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে মিলনোৎসব। তাঁর অভিজ্ঞতা শ্রবণের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব।

বেলগাছিয়া ভিলা স্থাপনের প্রথম দিকে দ্বারকানাথ তাঁর শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ও কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধুদের পৃথক পৃথক দিনে নিমন্ত্রণ জানাতেন। ইদানীং তিনি সেই প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছেন বিশিষ্ট রাজপুরুষ, কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, সামরিক কর্মচারী এবং জেলাশাসকরা যেমন আসেন, তেমনি ভারতীয়দের মধ্যে খ্যাতিমান বিদগ্ধ ব্যক্তি, জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরও তিনি আমন্ত্রণ জানান। বিলাসিতায় দ্বারকানাথের কার্পণ্য নেই কিন্তু বেলেল্লা তিনি পছন্দ করেন না। ফূর্তি ও কৌতুক যদৃচ্ছা হতে পারে, কিন্তু কেউ বে-এক্তিয়ার হয়ে গেলেই জানবে যে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন বেলগাছিয়া ভিলায় তার নিমন্ত্রণ হবে না।

ইওরোপ যাত্রার আগে থেকেই দ্বারকানাথ ফরাসী রুচির অনুরাগী। তাঁর বিলাসপুরীর নৈশভোজে ফরাসী রান্না এবং মোগলাই কাবাব পোলাও, হোসেনীর—এই দুরকমই খাদ্য পরিবেশিত হয়। শ্রেষ্ঠ মদ্য আনয়ন করেন তিনি সরাসরি ফরাসী দেশ থেকে এবং তা অঢেল, অফুরন্ত। ভোগ বাসনার চেয়েও আড়ম্বরপ্রিয়তাই এই মানুষটির চরিত্র লক্ষণ।

মতিঝিলের মধ্যে দ্বীপের ওপরের গ্রীষ্মাবাসটির একটি কক্ষে দ্বারকানাথ নির্বাচিত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান। অতিথিরা উপবিষ্ট, তাঁদের হাতে সুরাপাত্র, কারুর আচরণেই কোনোরকম ব্যস্ততা নেই, কেননা উৎসব চলবে সারারাত।

দ্বারকানাথের পরনে মখমলের পাজামা, তার ওপরে সোনার জরির কাজ করা একটি জানু-ছাড়ানো জোব্বা, কণ্ঠে মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণহার, মাথায় উষ্ণীব। গায়ে স্বর্ণালংকৃত একটি কাশ্মীরী শাল আলগাভাবে জড়ানো, পায়েও সেই অনুরূপ কারুকার্যখচিত শুঁড়তোলা নাগরা। তিনি খুব দীর্ঘকায় নন, কিন্তু উজ্জ্বল চোখ দুটিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। নাসিকার নীচে লম্বা গুম্ফ, তিনি কথা বলেন ধীর স্বরে, প্রতিটি শব্দের ওপর আলাদাভাবে জোর দিয়ে। তাঁর ইংরেজি বাহুল্যবর্জিত এবং পরিষ্কার। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটি টেবিলে এক হাতের ভর দিয়ে, সেই টেবিলের ওপর রাখা একটি রূপোর আলবোলা এবং একটি মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতা। খাতাটিতে তিনি তাঁর ভ্রমণকালীন দিনলিপি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

মাঝে মাঝে খাতাটির পৃষ্ঠা উল্টে তিনি তাঁর ভ্রমণ বর্ণনা শোনাচ্ছেন অতিথিদের।

এক সময় এক ইংরেজ পুরুষ প্রশ্ন করলো, মহাশয়, ইহা কি সত্য যে আপনি যাবতীয় খ্রীষ্টান জগতের গুরু মহামান্য পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

দ্বারকানাথ মৃদু হেসে বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, মহাশয়, ইহা সত্য। রোমের ইংলিশ কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পোপের সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

অপর একজন ইংরেজ বললো, ইহার পূর্বে কোনো পোপ কি কোনো অ-খ্রীষ্টানকে নিজ কক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন?

—তাহা আমি বলিতে পারি না।

প্রথম ইংরেজটি এবার একটু উদ্বিগ্ন স্বরে পোপের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াও আপনার মস্তক হইতে উষ্ণীষ খোলেন নাই?

—হাঁ, ইহাও সত্য

উপস্থিত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা অস্ফুট বিস্ময়ের ধ্বনি করে উঠলো। পোপের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীর রাজাধিরাজরাও মস্তক নত করে।

দ্বারকানাথ বললেন, আপনারা বিচলিত হইবেন না। মহামান্য পোপ আমার উপর রুষ্ট হন নাই, তিনি সাদরেই আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম যে, কোনো ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মস্তকে উষ্ণীষ রাখাই আমাদিগের দেশীয় প্রথা।

অনেকেই এ কথায় তেমন প্রসন্ন হলো না।

তখন ডিরোজিও-শিষ্য উচ্ছ্বাসপ্রবণ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রিন্স দ্বারকানাথ উপযুক্ত ব্যবহারই করিয়াছেন। আমাদের দেশীয় প্রথায় তিনি মাননীয় পোপকে সম্মান জানাইয়াছেন।

আর একজন ইংরেজ প্রশ্ন করলো, ইংলণ্ডে গিয়াও কি আপনি আপনার দেশীয় প্রথা সর্বত্র মান্য করিতে পারিয়াছেন?

দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ বললেন, হাঁ মহাশয়, যতদূর সম্ভব মান্য করিয়াছি। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য, এ বিষয়ে আপনাদের স্বদেশবাসীদিগের মনোভাব যথেষ্ট উদার। প্রতিদিন স্নানের পূর্বে গায়ত্রী জপ করা আমার অভ্যাস। ইংলণ্ডে গিয়াও সে অভ্যাস ত্যাগ করি নাই। এমনও হইয়াছে, আমি গায়ত্রী জপে বসিয়াছি, এমত সময় কোনো সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণী তাঁহার পতি সমভিব্যাহারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমি ভৃত্যদের দিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছি, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করেন। কেননা, আমি জপ ছাড়িয়া উঠিতে পারিব না।......আর এক দিনের ঘটনা আমার স্মরণে আছে। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমন্ত্রণে আমি এক দিবস রাজপ্রাসাদের শিশুসদন পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। সেস্থলে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস এবং রাজকুমারী ছিলেন। মুক্তাখচিত শ্বেত মসলিন পরিহিত সেই অনিন্দ্যকান্তি বালক বালিকাকে দেখিয়া আমি পরম প্রীতি পাইয়াছিলাম। উহারা কখনো কোনো হিন্দু দেখে নাই, সে-কারণে অদ্ভুত বিস্ময়ভরা চক্ষে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমি প্রথমে উহাদের প্রতি কোনো সম্ভাষণ করি নাই। আমার সেদিনের পথ প্রদর্শিকা লেডি লিট্‌লটন আমায় প্রশ্ন করিলেন, অল্প বয়স্কদের আপনারা কোন্ প্রথায় অভিবাদন করেন? এবং উহারা আপনার সহিত করমর্দন করিতে পারে কি? আমি উত্তর করিলাম, বিলক্ষণ! অল্প বয়েসীদের আমরা অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই প্রীতি জানাই। তখন সেই বালক বালিকা আসিয়া কর মর্দন করিল এবং আমিও তাহাদের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া আমার শুভাশিস অর্পণ করিলাম।

উপস্থিত ইংরেজগণ কেউই কোনোদিন ইংলণ্ডের যুবরাজকে চর্মচক্ষে দেখেনি, তার সঙ্গে করমর্দন করা তো স্বপ্নের বিষয়। এই নেটিভ ব্যক্তিটি সেই সৌভাগ্য তো অর্জন করেছে বটেই, এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঈশ্বরী মহামাননীয়া ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত সেরে এসেছে। কিন্তু সেজন্য এঁর মুখে গর্বরেখা নেই।

দ্বারকানাথের আত্মীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, সে দেশের তো বহু প্রকার জাঁকজমকের কথা শুনিলাম। কিন্তু সেথায় এই বেলগাছিয়া ভিলার মতন এমন সুরম্য ভবন আছে কী?

এবার দ্বারকানাথ একটি দীর্ঘশ্বাস নীরবে গোপন করলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভ্রাতঃ, এক সময় এই ভিলার জন্য আমার গর্ব ছিল, কিন্তু বিলাতে গিয়া সে গর্ব আমার চূর্ণ হইয়াছে। সেই কারণেই সে স্থল হইতে আমি আমার পুত্র দেবেন্দ্রকে এক পত্রে লিখিয়াছিলাম, মানুষের যদি ঐশ্বর্য থাকে, তাহা হইলে সে ঐশ্বর্য উপভোগ করিবার উপযোগী দেশ ছটল এই। [illegible]

তুল্য অপ্রিয় বোধহয়।

এক ইংরেজ প্রশ্ন করলো, আপনি ডিউক অব ডেভনশায়ারের কানন-সৌধটি পরিদর্শন করিয়াছেন কি?

দ্বারকানাথ এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আ, আপনি যথার্থ নামটি উচ্চারণ করিয়াছেন। অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু উহার তুল্য আর দেখি নাই। চ্যাটসওয়ার্থে ডিউক অফ ডেভনশায়ারের কানন, তাহাতে যে কত প্রকার দেশী বিদেশী বৃক্ষ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কে জানিত, এই পৃথিবী এতপ্রকার বৃক্ষ ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যান্বিতা। আরও বড় বিস্ময়ের কথা, সেই শীতপ্রধান দেশেও ডিউক মহাশয় কতপ্রকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষরাজি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই উদ্যানের তুলনায় আমার এই ভিলা? যেন সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ।

—ও দেশের আর কোন্ কোন্ বস্তু দেখিয়া আপনি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন?

—আসল কথাটাই তো এখনো বলি নাই। একটি বিস্ময়ই আর সব কিছুকে ছাড়াইয়া বহুদূরে গিয়াছে। শ্বেতাঙ্গজাতি এক অসাধ্য সাধন করিয়াছে। তাহারা এক মহাশক্তিশালী দৈত্যকে বন্দী করিয়া ভৃত্য করিয়াছে।

মহাশয়, রহস্য না করিয়া একটু খুলিয়া বলিবেন কি?

—আমি ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। উহাতে কতকগুলান অত্যুৎকৃষ্ট কিস্যা রহিয়াছে। একটির নাম কলসীর দৈত্যের কিস্যা। কলসীর মধ্যে বন্দী এক দানবকে মুক্ত করিয়া এক ব্যক্তি তাহার সাহায্যে যাবতীয় কর্ম করাইয়া লইত। য়ুরোপে গিয়া দেখিলাম, তাহা অপেক্ষায় অধিকতর শক্তিশালী এক দৈত্য এখন শ্বেতাঙ্গদের দাস। সেই দৈত্যের নাম বাষ্প। আপনারা কল্পনা করিতে পারেন কি, এক বিশাল লৌহ শকট, যাহাতে শতশত লোক বসিতে পারে, সেই শকট বাষ্পে টানিয়া লইতেছে? সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য বটে। বিলাতের কয়েক স্থলে এই শকট চলিতেছে, ইহার গমন পথকে রেইল রোড কহে। আমি জার্মানির কলোন নগরীতে, বিলাতের ম্যানচেস্টারে স্বয়ং এই রেইল যোগে গমনাগমন করিয়াছি। সে যে কী বিস্ময়।

উপস্থিত ইওরোপীয়দের অনেকেরই রেলওয়ে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বাঙালীরাও যে বাষ্পচালিত রেলের কথা আগে শোনে নি, তা নয়, সংবাদপত্রে প্রায়ই এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ থাকে, কিন্তু দ্বারকানাথ স্বচক্ষে রেলগাড়ি দেখে প্রায় যেন শিশুর মতন মুগ্ধ। নিউ ক্যাসেল-এ কয়লাখনি পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সেখানেও কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে বাষ্পশক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, কয়লা বহন করা হচ্ছে রেলগাড়িতে। বাংলাদেশে রানীগঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লাখনির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ নিউ কাসেল-এ গিয়ে আফসোস করেছিলেন, যদি তাঁর নিজের দেশেও কয়লা চালানের এমন সুবিধা থাকতো। এ দেশে রেললাইন পাতা যায় না?

দ্বারকানাথ বললেন, শুধু রেইলগাড়ি কেন, বাষ্প আরও কত অদ্ভুত কর্ম করিতেছে। আমি দেখিলাম, বাষ্পশক্তির সাহায্যে সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়, ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রিত হয়।

একজন কেউ মন্তব্য করলো, জাহাজেও আজিকালি তো বাষ্প কল লাগান হইতেছে।

দ্বারকানাথ বললেন, লিভারপুলে আমি জাহাজ নির্মাণ কারখানাও দেখিতে গিয়েছিলাম। বিলাত গমনের পূর্বেই আমার দুইখানি জাহাজ নির্মাণের জন্য ফকেট কম্পানিকে বরাৎ দেওয়া ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, সেই জাহাজদ্বয়ের এঞ্জিন নির্মিত হইতেছে। আমার আত্মীয়-বান্ধবদের আগ্রহে ও অনুরোধে একটি জাহাজের নামকরণ হইয়াছে, আমার নামে। সেই 'দ্বারকানাথ' জাহাজের এঞ্জিন তিন শো পঞ্চাশ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট। কল্পনা করুন একবার, সার্ধ তিনশত অশ্বের স্থান লইয়াছে শুধু বাষ্প। তাহা হইলে সে কত বড় দৈত্য?

অথৎ রজান নেশায় সকলে হঠাৎ চটপট করে করতালি ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

গল্পে গল্পে ঘন হয়ে এলো রাত দ্বারকানাথের ভ্রমণ বর্ণনা সাহেব ও নেটিভ উভয় দলের কাছেই খুব আকর্ষণীয়। এই প্রথম কোনো সম্ভ্রান্তবংশীয় নেটিভ ইওরোপ পরিভ্রমণ করে এসে চাক্ষুষ বিবরণ পেশ করছেন। এবং দ্বারকানাথ যে সব কিছুরই প্রশংসা করছেন, তা নয়। এবং দ্বারকানাথের বর্ণনার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে একটা কথাও ফুটে উঠছে যে ভারতের সম্পদ আহরণ করেই ইংলন্ডের এতখানি উন্নতি। সাহেবরাও এই প্রথম একজন নেটিভের মুখ থেকে তাদের পিতৃভূমি সম্পর্কে নানা কথা শুনছে। এই এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, নেটিভ হয়েও এই ব্যক্তি এমন এমন স্থানে গমন করেছে, যেখানে যাওয়ার সুযোগ তাদের নিজেদেরই হয় না।

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে যেতে কথা একটু অপ্রিয় দিকে বাঁক নিল এক সময়। সুরার প্রভাবে কারুর কারুর ব্যবহার আরও সুমিষ্ট হয়, কারুর বা ভেতরের তিক্ততা বেরিয়ে আসে।

'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার জনৈক লেখক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, শ্রীযুক্ত ঠাকুর, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইংলন্ড, গৌরবোজ্জ্বল ইংলন্ড আপনাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি কি সেখানে পুনরায় যাইতে পারিবেন?

দ্বারকানাথ দৃঢ়ভাবে বললেন, নিশ্চয়। ফিরিবার পথেই আমার মনে হইতেছিল যে কত কিছুই দেখা হইল না। অতৃপ্তি রহিয়া গেল। আবার আসিব। অনেক নবলব্ধ বন্ধুবর্গকেও বলিয়া আসিয়াছি, আবার আসিব।

—কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া নিষিদ্ধ কালাপানি পাড়ি দিয়াছেন, আপনার সমাজ আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে না? এ বিষয়ে যে একটি আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহা আমরা জানি। আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে নিশ্চয়? ইহা কি সত্য যে হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলে গোময় আহার করিতে হয়?

কেউ কেউ হেসে উঠলো, কেউ কেউ হাসি গোপন করলো। ভ্রূকুঞ্চিত করে দ্বারকানাথ একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' মাঝে মাঝেই তাঁকে কুটুস কুটুস করে দংশন করে। অবশ্য বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল। এখন এই ব্যক্তি তাঁর বেদনার জায়গায় ঘা দিয়েছে। এতকাল ধরে তিনি কত ব্রাহ্মণের ভরণপোষণ করেছেন, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে এঁরা কখনো তাঁর বিরুদ্ধে যাবে। অথচ এঁরাই এখন তাঁকে সমাজচ্যুত করার জন্য কলকোলাহল শুরু করেছে। মূর্খ ও সংস্কারসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের তিনি আজকাল দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। হিন্দুধর্ম আর কতকাল কূপমণ্ডুক হয়ে রইবে? দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণ, মানুষের সুষ্ট এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনেরও বাধা সৃষ্টি করে এই মূর্খরা?

ধীর গম্ভীর স্বরে দ্বারকানাথ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে পরলোকগত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তাঁহার আদর্শে আমি এই সকল ক্ষুদ্র সংস্কার বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ সমাজ যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তবে আমি স্বয়ং সুখী চিত্তে পৃথক সমাজ গড়িব। সে সাধ্য আমার রহিয়াছে।

—আপনার পরিবারের সকলে আপনার পক্ষে যাইবে কি?

দ্বারকানাথ একবার প্রসন্নকুমারের দিকে তাকালেন। তাঁর এই জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। প্রসন্নকুমারের পিতা রামমোহন দ্বেষী ছিলেন কিন্তু প্রসন্নকুমার রামমোহনের মুক্তচিন্তার অনুসারী। অথচ, দুঃখের বিষয়, তাঁর নিজের পিতৃব্য ও ভ্রাতারা সর্বাংশে তাঁকে সমর্থন করেন নি, ম্লেচ্ছ-সংসর্গ দোষের জন্য তাঁরাও দ্বারকানাথের প্রায়শ্চিত্তের দাবি জানিয়ে গুনগুন করছেন।

দ্বারকানাথ বললেন, নিজ পরিবারের মধ্যে সাময়িক মনান্তর হয়ই, তাহাতে গুরুত্ব দিবার কিছু নাই। তবে আবার আপনাদের বলিতেছি, আমি কদাচ প্রায়শ্চিত্ত করিব না। আমি কোনো দোষ করি নাই, বরং দেশ-

বাগানের সম্মুখে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছি।

—আপনার সুযোগ্য পুত্র বাবু দেবেন্দ্র কি আপনার সমর্থক? আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কতখানি নিঃসঙ্গ?

—আমার পুত্র...অবশ্যই সে আমার সমর্থক...... অদ্যকার উৎসব সার্থক করিবার ভার তো তাহারই উপর।

প্রকোষ্ঠের বাইরে অপেক্ষামান ভৃত্যদের উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে দ্বারকানাথ বললেন, ওরে, কে আছিস? দেবেন্দ্রকে একবার ডাক তো!

কেউ কোনো সাড়া দিল না।

অঙ্গের শালখানির একপ্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে দ্বারকানাথ চলে এলেন দ্বারের পাশে। তাঁর ব্যক্তিগত দুজন ভৃত্য সেখানে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে।

তিনি রুক্ষস্বরে বললেন, দেবেন্দ্র কোথায়? সে এখানেই ছিল না?

ভৃত্য দুজন অত্যন্ত ভীত স্বরে বললো, আজ্ঞা না হুজুর।

—সে কি বৈঠকখানা বাড়িতে রয়েছে? যা দেকে আয়। আমার নাম করে বলবি এখুনি আসতে।

ভৃত্য দুজন তাড়াতাড়িতে ছুটে চলে গেল। তবু ওদের ব্যবহারে কেমন একটা খটকা লাগলো দ্বারকানাথের মনে। কয়েক বছর আগে একটি ঘটনা তাঁর মনে পড়লো।

তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, রক্তের ঝলক এসে গেল তাঁর মুখে। তিনি কক্ষের অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা বিশ্রম্ভালাপ করুন, আমি অবিলম্বে আসিতেছি।

জুতো মসমসিয়ে দ্বারকানাথ সেতু পার হয়ে চলে এলেন বৈঠকখানা বাড়ির দিকে। তাঁর ললাটে কুঞ্চন রেখা। ফোয়ারার সামনে আর কয়েকজন ভৃত্যকে দেখে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তোরা কেউ দেবেন্দ্রকে দেখেছিস?

ভৃত্যেরা উত্তর দিতে সাহস পায় না। তারা কর্তাবাবুর মেজাজ জানে। ওঁর অপছন্দমত সত্য কথাও উনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। ভৃত্যেরা সবাই জানে কর্তাবাবুর বড় ছেলে এখানে নেই, তবু তারা খোঁজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল। দেবেন্দ্রবাবু যাবার সময় ভৃত্যদের এবং বৈকুণ্ঠ নায়েবকে বলে গেছেন যে বাবামশাইকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি সুস্থ বোধ করছেন না, তিনি চলে যাচ্ছেন।

বৈকুণ্ঠ নায়েব দূর থেকে দ্বারকানাথকে দেখেই দ্রুত উদ্যানের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। দ্বারকানাথ নিজে 'দেবেন্দ্র' 'দেবেন্দ্র' বলে ডাকতে ডাকতে প্রতিটি কক্ষে উঁকি দিতে লাগলেন। তারপর যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর পুত্র বেলগাছিয়া ভিলার কোথাও নেই, তখন তাঁর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত আকাশের তলায়।

বৎসর কএক আগে বড়লাট লর্ড অকল্যান্ডের ভগিনী মিস ইডেনের সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে তিনি এই বেলগাছিয়া ভিলাতেই মহা সমারোহের সঙ্গে এক ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেদিনও তিনি দেবেন্দ্রকে দিয়েছিলেন পরিচালনার ভার। পুত্রকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এইসব উৎসবের অর্থ ব্যয় কখনো বৃথা যায় না। ব্যবসা ও জমিদারির পরিচালনার জন্য মান্যগণ্য রাজপুরুষদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রাখলে অনেক সুবিধে হয়। সেদিনও দেবেন্দ্র তার কাজে অবহেলা করেছিল, এক সময় দেখা গিয়েছিল যে সে অনুপস্থিত।

কিন্তু আজও সে চলে গেছে? অতিথিরা এ-কথা জানলে সকলের সামনে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তাঁর পুত্র পিতৃগৌরব সম্পর্কে উদাসীন!

পুত্রের মতিগতি তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। কলেজ ছাড়ার পর দেবেন্দ্র হঠাৎ অত্যন্ত বেশী বাবুয়ানি শুরু করেছিল। সে সংবাদ দ্বারকানাথের কানে গেলেও তিনি বাধা দেননি। তিনি বুঝেছিলেন, বয়েস কালে ও দোষ কেটে যাবে। একবার দেবেন্দ্র এমনই এক সরস্বতী পুজোর ধুম লাগালো যে সারা শহরে গাঁদা ফুল আর সন্দেশ বাকি ছিল না. সবই এসেছিল ঠাকুর বাড়িতে। এতটা বাড়াবাড়ি দ্বারকানাথ পছন্দ করেননি। পুজো উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করার চেয়ে যে এইরূপ ভোজের আসরের উপযোগিতা বেশী, তা দেবেন্দ্র বুঝবে না। দেবেন্দ্রর চপলমতি কিছুটা সংশোধন করার অভিপ্রায়ে দ্বারকানাথ ছেলেকে ব্যাংকের হিসাব রক্ষকের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

দ্বারকানাথ লক্ষ করেছেন, দেবেন্দ্র সাহেব সুবোদের সঙ্গে খুব একটা সংসর্গ করতে চায় না। সে ইংরেজিতে কিছু কাঁচা, সে তো শিক্ষক রেখে কিছুদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করে নেওয়া যেতে পারে। দেবেন্দ্র বুদ্ধিমান যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা এ দেশের শিরোমণি, জজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে উচ্চতম পদের ইংরেজের সঙ্গে যাঁর শুধু পরিচয় নয়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাঁর পুত্র পারতপক্ষে ইংরেজদের সংস্পর্শেই যেতে চায় না। দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রকে কার টেগোর কম্পানির অংশীদার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে দেবেন্দ্র সাহেবদের সঙ্গে মিলেমিশে সে কম্পানি চালাবে কী করে?

দেবেন্দ্রর সেই সাময়িক বাবুয়ানি ঘুচে গেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যা শুরু করেছে, তার চেয়ে বাবুয়ানি ছিল ভালো। বড় মানুষের ছেলে মাঝে মাঝে আমোদ-আহ্লাদ করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক অথচ দেবেন্দ্র এখন দিন-রাত সংস্কৃত চর্চা করে, আর কী এক পাঠশালা স্থাপন করে তাই নিয়ে মেতে আছে। একদিন তিনি এ জন্য শাস্ত্রী মশায়কে ধমকে দিয়েছিলেন। এতবড় বিষয় সম্পত্তির তদারকি করতে হবে যাকে, সে কেন ঐসব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নিয়ে পড়ে থাকছে! প্রবাস থেকে ফিরে তিনি এমন কথাও শুনেছেন যে কোনো কোনোদিন দেবেন্দ্র নাকি ঘন্টার পর ঘন্টা কেদারায় বসে থাকে, নাওয়া খাওয়ার ব্যাপারেও হুঁশ নেই, কেউ ডাকলেও সাড়া দেয় না। এসব কিসের লক্ষণ?

দ্বারকানাথ নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে বেদনার গাঢ় ছায়া। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই সব কিছু সংঘটিত হবে। কিন্তু আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হলো। সামান্য অবস্থা থেকে কত কঠোর পরিশ্রমে ও জেদে তিনি প্রায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু কী লাভ হলো? ইংরেজ পুরুষটি প্রশ্ন করেছিল, তিনি আজ কতটা নিঃসঙ্গ। বস্তুত, তাঁর মতন নিঃসঙ্গ মানুষ বুঝি আর কেউ নেই! পিতা নেই, মাতা নেই, সহধর্মিণীও কয়েক বৎসর আগে গত হয়েছেন। আত্মীয় পরিজনরা তাঁর প্রতি হিংসুক। প্রিয়তম পুত্রকে তিনি নিজের আদলে গড়বেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সে দূরে দূরে সরে থাকে, কখনো নিজে থেকে এসে ঘনিষ্ঠ বাক্য বলে না। বাড়ির সকলে তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে, যেন তিনি একটা বাঘ। একটা স্নেহের কথা বলার মতন কেউ নেই। দেবেন্দ্র কি তাঁর জীবন প্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে?

দ্বারকানাথ অভিমানের সঙ্গে চিন্তা করলেন, তাহলে আর বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির জন্য এত শ্রম করে কী হবে? তাঁর জীবন তো শুষ্কই থেকে যাবে। মনে পড়লো, প্রবাসের দিনগুলি কত মনোরম ছিল। কত অভ্যর্থনা, কত স্ফূর্তি। তিনি যেখানেই গেছেন, সকলের দৃষ্টি ঘিরে থেকেছে তাঁকে।

অর্থ উপার্জন তো অনেক হয়েছে, আর নয়, দ্বারকানাথ সংকল্প করলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি আবার সাগর পাড়ের দেশের উদ্দেশ্যে ভেসে পড়বেন। এ পোড়া দেশের জন্য আর মস্তক ঘর্মাক্ত করে লাভ কী?

(ক্রমশ)

৫ই অগাস্টের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত এই উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে একটি গুরুতর মুদ্রণ প্রান্তি রয়েছে। ডেভিড হেয়ার প্রসঙ্গে এক জায়গায় আছে 'ইদানীং সকাল থেকে সন্ধ্যা তিনি স্কুলে পড়াতে আসেন না।' শুদ্ধ পাঠ হবে 'স্কুল-পাড়াতে আসেন না।' সকলেই জানেন, হেয়ার সাহেব অদম্য শিক্ষানুরাগী হয়েও নিজে [illegible]

উৎসব তুলসী সেনগুপ্ত

আমরা তিন ভাই। বড়দা সিদ্ধার্থ, মেজদা গৌতম আর আমি তথাগত। নামগুলো আলাদা হলেও, ওই নামের সকলেই কিন্তু এক। এক অর্থে আমরাও তাই। তিনজন আমরা ভিন্ন দেহধারী হলেও আমাদের বাবা মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ চেয়েছিলেন, আত্মিক দিক দিয়ে আমরা যেন একই থাকি। আমাদের বাবা ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় দর্শনাচার্য। আমার যখন আট বছর বয়েস সে সময় আমাদের মা মারা যান। মার ছিল শান্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব। সকলকেই কাছে টানত, দূরে সরা তো না। মার কথা আমার অত মনে নেই। মার নাম ছিল হিমানী; ছিপছিপে গড়ন, টিকোল নাক, ছোট্ট কপালের একটু ওপরেই কোঁকড়া এক ঢাল কালো চুল ছিল মার।

বাবার কাছে আমি বেশি ঘেঁষতাম না—বাবা যে ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন, সে ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবাকে দেখতাম—বাবা টের পেতেন না। পুরু লেন্সের চশমা চোখে বাবা মোটা মোটা বই পড়তেন আর কখন সখনও টেবিলের উপর ঝুঁকে কি সব লিখতেন।

মার মৃত্যুর আগেই বড়দা ও মেজদার বিয়ে হয়। বড়দা আমার থেকে আঠার বছর এবং মেজদা ষোল বছরের বড়। চল্লিশ বছরও হয়নি, এর মধ্যে মা মারা যান। আমি বাবা-মার শেষ বয়সের সন্তান।

তেতলায় আমাদের পাঁচখানা ঘর, দুখানা দুখানা করে ঘর বড়দা ও মেজদাকে দেওয়া হয়েছিল—আর একখানা ঘর ছিল কমন বৈঠকখানা। বড়দা মেজদার শ্বশুর বাড়ির লোকজন এলে ও'রা ঐ ঘরে বসতেন—রাত্তিরে থাকার দরকার হলে ও'রা ঐ ঘরে শুয়ে থাকতেন।

আমি থাকতাম দোতলায় মার পাশে। যতদূর মনে পড়ে মা সেন্ট পাউডার মাখতে ভালবাসতেন। সাদা ধবধবে চাদর মার বিছানায় টান টান করে পাতা থাকত। মা কুরুস কাটায় এটা-ওটা কী সব বুনতেন—মাঝে মাঝে বুকের নিচে বালিশ রেখে ছোট্ট একটা বাঁধান খাতায় কী সব লিখতেন। মা মারা যাওয়ার পর সেই খাতা আমি খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। এবার আমি একটা সমস্যায় পড়ে গেলাম। আমি থাকবো কার কাছে! বড়দা বললেন, আমার পাশেই শোবে। মেজদাও সেই একই দাবি করে বসলেন। শুনে বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, ওর মার বিছানাতেই থাকতে দাও। মার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটাই ছিল বাবার ঘর; সে ঘরে প্রবেশ নিষেধের অদৃশ্য সাইনবোর্ড ঝুলত সব সময়। আমার বেশ মনে পড়ে, আমি কখনও বড়দা বা মেজদাকে বাবার ঘরে ঢুকতে দেখিনি; মার বিছানায় ও'দের দু'-জনকেই কখনও কখনও শুয়ে থাকতে দেখেছি : বউদিরা এ-ঘরে আসতেন, তবে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বে। বাবাকে খুব কমই মার ঘরে আসতে দেখেছি, মা-ও বাবার ঘরে যেতেন অল্পস্বল্প।

রান্নাঘর ছিল একতলায়; সেখানে ঠাকুর-ঝিদের রাজত্ব। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ওরা খাবার পৌঁছে দিত। কোনদিন ভাল কিছু হলেও দ্বিতীয়বার চেয়ে খেতে পারিনি। অবশ্য মা মাঝে মাঝে স্টোভে হালুয়া রাঁধতেন, লুচি ভাজতেন; গোকুল পিঠে তালের বড়া, পায়েস এই সব রাঁধতেন। সে সব দিন মাকে ভীষণ ভাল লাগত আমার— স্টোভের আঁচে আর পরিশ্রমে মার মুখ লাল হয়ে যেত। সে সব সময় মার নাকের নাকছাবির লাল পাথরটার রং মার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতো মার, মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়লে, মা আমাকে ঘোমটা ঠিক করে দিতে বলতেন। সে সব সময় আমি মার গলা জড়িয়ে পিঠের সঙ্গে লেগে থাকতাম। মা বলতেন, ওরে ছাড়, ছাড়। আমি হি হি করে হাসতাম এবং আরও আরও জোরে মাকে আঁকড়ে ধরতাম। মা কি বুঝে হঠাৎ বলতেন 'দ্যাখ তো খেয়ে গোকুল পিঠে।'

প্লেটে পিঠে পায়েস সাজিয়ে মা বলতেন, 'যা তো খুদে, এটা তোর বাবাকে দিয়ে আয়। দেখিস ভাঙিস নি যেন।' মাঝে মাঝে মা আমাকে আদর করে খুদে বলে ডাকতেন। আমি বাঁ-হাতে প্যান্ট সামলাতে সামলাতে ডান হাতে প্লেট নিয়ে খুব সন্তর্পণে বাবার ঘরে ঢুকতাম। টেবিলের কাছে এসেও আমি বাবার চোখের আড়ালে পড়ে থাকতাম। আমি যে ঘরে ঢুকেছি, বাবা টেরও পেতেন না বোধ হয়। এক সময় আমি বাবাকে খুব ভয়ে ভয়ে ডাক দিতাম। বাবা চোখ তুলে তাকিয়ে খুশির চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে নিতেন। আমার বাঁ হাতে প্যান্ট, ডান হাতে প্লেট, ওভাবে আমার দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ কষ্ট হত। বোধ হয় বাবা আমার মনের ভিতরের খবর মুহূর্তেই টের পেয়ে যেতেন। প্লেটটা নিয়ে আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে মৃদু হাসতেন। আমি বেশীক্ষণ ওখানে থাকতে ভরসা পেতাম না, চলে আসতাম। মা মারা যাবার পর কেন যেন আমি হঠাৎ হঠাৎ বাবার ঘরে চলে আসতাম। দেখে আমাকে বাবা কোলে তুলে নিয়ে বসাতেন, তখন মনের ভেতরে আমার অজস্র ঢেউ উঠত। বাবার লেখার খাতার উপর কলমটা খোলা পড়ে থাকত—আমার ঐ কলমটা ছুঁতে ভীষণ ইচ্ছে হত। কিন্তু ভয়ে আমি সে সব ছুঁতে পারতাম না। বাবা সে সব সময় আমাকে আদর করতেন, কখনও কখনও দু-একটা চুমু খেতেন। আমার লজ্জা করত। বাবা যেন যাদুকর—আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা আশ্চর্য রকমভাবে বুঝে বলে উঠতেন, 'বড় হও, তখন তোমাকে আমার সব কিছু দিয়ে যাবো—এই কলম খাতা, বই চেয়ার টেবিল সব। এবং সেই এক আশ্চর্য মুহূর্তে আমার ভয়টয় হঠাৎই সরে যেত। আমি হাত বাড়িয়ে বাবার সেই কলম ছুঁতাম—খাতার উপর হাত বোলাতাম। বাবা খুব খুশী খুশী চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকতেন।

এই রকম একদিন হঠাৎ বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বউদিরা তোমাকে বেশি ভালবাসেন, না, দাদারা?

সে মুহূর্তে আমি কেমন দিশেহারা হয়ে যেতাম। ভালবাসার আবার বেশি কম কী তা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারি না আমি। অবাক চোখে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম এবং পরক্ষণেই আমার মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তর এসে যেত। বলেছিলাম, লক্ষ্মণদা, লক্ষ্মণদা আমাকে বেশি ভালবাসে।'

সে উত্তর শুনে বাবা গম্ভীর হয়ে যেতেন। শব্দ করে হেসে ফের আমাকে আদর করতেন। এবং এক সময় আমাকে কোল থেকে নামিয়ে বলতেন, 'যাও খেলা করগে যাও।'

আমি আর দাঁড়াতাম না। এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে আসতাম।

আমাদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। বাবা কী একটা কাজে দেশে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে লক্ষ্মণদাকে জুটিয়ে এনেছিলেন, আমার জন্মের বেশ কয়েক বছর আগে। ও ছিল বড়দার সমবয়সী। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের দেখতে যেমন হয়, লক্ষ্মণদাও ছিল সে-রকম দেখতে—গায়ের রং ছিল টকটকে ফরসা—অসম্ভব শান্ত ছিল ওর। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ওর ছিল সহজাত।

মার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণদার হঠাৎ প্রমোশন হয়ে গেল। সতরঞ্চ মোড়া বিছানাটা বগলদাবা করে ও একদিন হাসতে হাসতে এসে আমার খাটের নিচের জায়গাটায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। অনেক রাত্তির পর্যন্ত ও আমাকে ওর বীরত্বের কাহিনী শোনা তো—যার মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ছিল দিগম্বর সরকারের বাড়ির ডাকাত ধরার কাহিনী। শুনতে শুনতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক রাতে আমি টের পেতাম, বাবা আমার মাথার কাছে বসে আছেন। আমার গায়ে সন্তর্পণে চাদর ঢাকা দিয়ে বাবা নিজের ঘরে চলে যেতেন। দাদাদের ও বউদিদের সঙ্গে আমার খুব কম কথা হত; কখনও ও'রা আমাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করতেন না।

বিকেলের দিকে লক্ষ্মণদা আমাকে পার্কে নিয়ে যেত—বাদাম খাওয়াত। ঝাল-নুন দিয়ে বাদাম খেতে আমার খুব ভাল লাগে। বললেও লক্ষ্মণদা একটা বাদামও খেতো না, ও কেবল বাদামের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আমার হাতে দিত। লক্ষ্মণদা বলতো 'হ্যাঁ রে খুদে, তুই স্কুলে পড়া পারিস তো? বাবু বলছিলেন, তুই অঙ্ক-টঙ্ক বুঝিস তো?'

আমি মাথা নেড়ে বলতাম, 'না, অঙ্ক আমি একটুও বুঝি না।' আর আমার বড়দা কলকাতারই বড় একটা কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক।

লক্ষ্মণদা বলতো, 'বাবু বলেছে, যা বুঝবি না, বড়দার কাছ থেকে শিখে নিস।'

আমাকে উত্তর দিতে না দেখে লক্ষ্মণদাও দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করত না। এক-মনে বাদামের খোসা ছাড়াত। আমি বুঝতাম, লক্ষ্মণদাই হচ্ছে আমার আসল নজরদার—যার কাছ থেকে বাবা ঠিক ঠিক সব খবর পেয়ে যান।

একদিন বাবা আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতে পারবে? আমাদের ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না?'

সে কথায় আমার কেমন কান্না পেয়ে গিয়েছিল; এ বাড়িতে তো আমি একা; দাদা-বউদিরা কখনও ডেকে কথাও বলে না; বাবাও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত; লক্ষ্মণদাও মাঝে মাঝে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়—এ সবই আমি বলতে পারতাম, কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাবা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'নিজের ভাল, নিজের মন্দ নিজেকেই বুঝে নিতে হয়। সব কিছু কি অপরের উপর ছেড়ে দিলে চলে।'

মুহূর্তেই আমি বলি, 'যাবো।'

বাবার মুখে চোখে কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। 'প্রতি সপ্তাহে আমি আর লক্ষ্মণ তোমাকে দেখে আসব।' বাবা বলেছিলেন।

এর পর একদিন খুব সকালে বাবা আর লক্ষ্মণদার সঙ্গে আমি অনেক দূরের একটা হস্টেলে চলে আসি। নিচে দাঁড়িয়ে আমি তেতলার জানালায় কিছু একটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করি কিন্তু জানালার পর্দাগুলোকেই শুধু দুলে থাকতে দেখি। চোখ সরিয়ে নি [illegible]

স্বস্তিক ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার পাউডার
দামে কম সবার চেয়ে... কাজে ভাল দেখুন ধুয়ে

Shilpi dm 21/78 Ben

...কিন্তু! (মার দেখাদেখি ও-ও আমাকে খুদে বলে ডাকত)। গাড়ির কাঁচ তুলে দিয়ে বাবা চুরুট ধরালেন। বারকয়েক চুরুটে টান দিয়ে বললেন, 'যেখানে তুমি যাচ্ছ, সেখানে সব কিছু নিজের হাতে করতে হবে। নিজের হাতে জামা-কাপড় ধোবে, থালা গেলাস মাজবে। রোজ মশারি খাটিয়ে শোবে, বেশি রাত করে পড়বে না; জানবে, আমরা সব সময়ই তোমাকে দেখছি; কোন সপ্তাহে যদি যেতে নাও পারি, মনখারাপ করবে না; কখনও চোখের জল ফেলবে না; জানবে, পুরুষের চোখে জল বেমানান।'

ও-দিনের পর থেকে আমি কখনও চোখের জল ফেলিনি।

স্কুল ফাইনাল-এর রেজাল্ট বেরুনোর সংগে সংগে রাতারাতি আমি প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়ে গেলাম। রাখঢাক ঢাকঢাক ব্যাপার-স্যাপারগুলো সরে যেতে লাগল। হস্টেল ছেড়েছিলাম আগেই। বাড়িতে এখন আমার অভিজ্ঞ মানুষের মত গতিবিধি। এই সেদিনও তো বাবার মুখোমুখি বসে কথা কইতে ভরসা পেতাম না। আর এখন বাবাকে আগের মত দূরের মানুষ বলে মনে হয় না। বাবার ডাক পড়ুক আর নাই পড়ুক আমি ও ঘরে ঢুকে যেতে পারি; বাবা ব্যস্ততার মাঝেও মুখ তুলে চান; আমি উল্টো দিকের চেয়ারে বসে সরাসরি দু-একটা প্রশ্নও করতে পারি; আমার প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যান না তিনি, উত্তর দেন, আর তেতলার ঘর-গুলোতে আমার এখন ডাক পড়ে অহরহ।

আমাদের বাড়িতে সব থেকেও কিছু একটার অভাব আছে। বড়দা মেজদার বিয়ে তো আজ কম দিন হল না, কারুরই ছেলেপুলে হয়নি। কেমন যেন শুকনো খসখসে আবহাওয়া ওই উপর তলায়। অধ্যাপক হিসেবে বড়দার নামডাক খুব; মেজদা চাকরি করেন মার্কেন্টাইল ফার্মে। ভালো পোশাক-আশাক। সম্প্রতি মেজদাকে কম্পানী গাড়ি দিয়েছে। ওঁকে অফিসে পৌঁছেই গাড়িটা মাঝে মাঝেই বাড়িতে চলে আসে। মেজবউদি সেজেগুজে কোথায় যেন চলে যান। বউদিরা কোথাও বেরুলে, বাবা বাড়ি থাকলেও বলে যায় না। লক্ষণদা একদিন তাই বলে-ছিল, 'খুদে তোর বউকে কিন্তু এসব শেখাসনি।'

আমি কিছু বলি না; লক্ষণদা নিজে থেকেই জবাব দেয়, 'মা এসব দুঃখ আমার কাছেই তো করতো।'

ওদের দুজনের মধ্যে বড় বউদিকে আমার ভীষণ অসহায় আর দুঃখী মনে হত। এবং সে কারণেই ও'র ঘরটাতেই ছিল আমার বেশী আকর্ষণ। তাগা, তাবিজ, মাদুলিতে বড় বউদির শরীরটা অদ্ভুত হয়ে উঠছিল দিন দিন, ঘরটাও ঠাকুর-দেবতার ছবিতে ভর্তি। আর ঠিক উল্টোটা ছিল মেজ বউদির ঘর। সাদা ধবধবে ঘরের দেয়াল। এতটুকু ঝুল বা ময়লা ওঘরে চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘরের এক কোণে মাঝারি ধরনের একটা ফ্রিজ, জানলাগুলোয় হালকা রং-এর শৌখিন পর্দা; এক পাশে সোফা-কাম-বেড; অদূরে কাশ্মীরী কাজকরা চন্দন কাঠের সেন্টার টেবিল। সোফার ঠিক উল্টোদিকে স্টিলের বুক কেস—দামী দামী বই-এ ঠাসা। মেজ বউদি সেসব ছোঁয়ও না—লেটেস্ট ক্রাইম ফিকশান বউদির পড়া শেষ—ওসবই গড়িয়াহাট থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসেন। ফ্রিজের মধ্যে দামী মদের বোতল থরে থরে সাজান। ওই বোতলগুলো দেখে আমার কি প্রতিক্রিয়া হয় তা জানবার জন্যই যেন একদিন মেজ বউদি জিগ্যেস করেছিলেন, 'ওসব জিনিস জিবে ছুঁয়ে দেখেছ কখনও?' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বউদির কী হাসি। পরে বলেছিলেন, 'দেখবে নাকি একটু টেস্ট করে? এখন তো তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাডাল্ট?'

এবারও আমার কাছ থেকে বউদি কোন উত্তর না পেয়ে রাগত স্বরে বলে-ছিলেন, 'আসলে তোমরা কাওয়ার্ড; মিডলক্লাস সেন্টিমেন্ট তোমাদের শেষ করল।'

বউদির ওকথায় আমি বলেছিলাম, 'আমরা কী তা আপনি ভাল করেই জানেন। মা দুবেলা ঘরে পুজো করতেন; বাবাও এত কাজের মধ্যে আহ্নিক করা, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা ভোলেন না; বড় বউদির ঘরে তো স্বর্গের দেবদেবীরা সশরীরে নেমে এসেছে; সুতরাং বুঝতেই পারছেন...'

দুই বউদি যেন দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী। বড়দা-মেজদাও তাই। শুনেছি বড়দা প্রতি বছর বেশ কিছু ছেলের ফি নিজে থেকে দিয়ে দেন। বড় বউদি কখনও এসব ব্যাপারে নাক গলান না। টাকা পয়সা এত মূল্যবান, পরিশ্রম করতে করতে হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছেন বড়দা, তবুও বউদি এসব বিষয়ে কিছু বলেন না কেন? বউদিকে একদিন সেকথা জিগ্যেস করাতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'কী হবে; কে থাবে বলতে পারো?' অমনি ডান হাতটা বউদির সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'আমাকে কিছু দিন না, বউদি? রিয়েলী আই অ্যাম ইন ট্রাবল।' সত্যি নয়, একেবারেই বানানো মিথ্যে কথা। বউদি আমাকে খুব সতর্ক চোখে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর একসময় খুব করুণ মুখ করে বলেছিলেন, 'তোমার দাদা আমার কাছে তো টাকাকড়ি কিছু রাখেন না; তোমার দাদা সত্যি কত রোজগার আমি জানি না; অথচ, আমি জানি আমার অনেক টাকা।' বড় বউদিকে বিশ্বাস না করে পারি না। কেমন অবাক চোখে চেয়ে থাকি আমি। বউদি ফের বলেছিলেন, 'তোমার দাদার জন্য আমার ভারী কষ্ট। ওঁকে আমি কিছুই দিতে পারলাম না।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বউদি শুধোলেন, 'তুমি মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-বিচার বিশ্বাস কর? আমার মাসতুতো ভাই হারুকে চেনো তো? ও আমাকে দক্ষিণেশ্বরে একজনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটা নাকি সিদ্ধ-পুরুষ—তান্ত্রিক। একটা ছোটমত যজ্ঞ করতে পারলে—' ...একটানা কথা বলে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে থাকে বউদি। আমি হ্যাঁ-না কোন উত্তরই দিতে পারি না। হঠাৎ আমার একটা হাত চেপে ধরে বউদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। একসময় তা শান্ত হলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

আর মেজ বউদি! মেজদার সংগে প্রায়ই পার্টিতে যান। বাড়ির সকলে আমরা

অন্য যেকোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে সুপার রিন-এর চমক বেশী সাদা

নিয়মিত ব্যবহার করুন—দেখুন, সুপার রিন আপনার কাপড়চোপড় কত বেশী সাদা করে তোলে—যেকোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে বেশী সাদা...কারণ সুপার রিন-এ অনেক বেশী সাদা করার উপাদান আছে।

নিজে চোখে দেখুন !

অন্য যেকোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে বেশী সাদা করার শক্তিতে ভরপুর!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.28-2416 BG

স্পষ্ট বুঝি, দাদা-বউদি দুজনই বেসামাল। ঘরে এসেও ওরা ড্রিঙ্ক খুলে ফের মদ খায়। দুজনের অট্টহাসি জড়ান কণ্ঠস্বর আমাদের বাড়ির আবহাওয়াকে ভারী করে তোলে। বাড়ির কারুর সঙ্গেই যেন ওদুটো প্রাণীর যোগাযোগ নেই—কেমন এক অস্থিরতা ওদের দুজনকে ভীষণ টালমাটাল করে তোলে। পরস্পর পরস্পরকে গালাগাল দেয়—বমি করে ঘর ভাসায়; এসবই আমরা টের পাই। আবার পরের দিন খুব ভোরে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে সুন্দর পোশাক পরে গাড়ি চালিয়ে কাজে বেরিয়ে যান মেজদা।

বাবা কী করেন! ইদানীং বাবা দর্শনের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মচর্চায় মন দিয়েছেন। ধর্ম সংক্রান্ত বই বাবা তন্ন তন্ন করে পড়ছেন। বাবা একদিন আমাকে ডেকে একখানা সীলকরা খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা রেখে দাও। এখন থেকে আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক তুমি। শুধু একটা শর্ত আছে। লক্ষ্মণ যতদিন বাঁচবে ওকে তুমি দেখবে। আর একটা কথা, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার এবং তোমার মায়ের মৃত্যুদিন পালন করবে—কেবল একটু মনে ক'রো, আর কিছু নয়।'

বাবা কি সব কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন মনে মনে! কেননা, এর মধ্যেই আমি বি এ পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি—রেজাল্ট বেরুবার কিছুদিন আগেই বাবা মারা গেলেন। বাবা যে আমাকেই সব দিয়ে গেছেন, তা বুঝি বড়দা-মেজদার অজানা ছিল না। আশ্চর্য, ও'রা কিন্তু ওসব নিয়ে আমার সঙ্গে কোন কথাও বললেন না। বাবার মৃত্যু আমি সহজভাবেই নিয়েছিলাম। দেখে অনেকেই বলাবলি করল, আমি নাকি ভীষণ নিষ্ঠুর।

লক্ষ্মণদা একদিন বলল, 'খুদে, এবার তুই বিয়ে কর। ওই-যে মেজো বউদির কাছে আসে প্রায়ই মেয়েটা ওকে তুই বিয়ে কর।'

আমি হেসে উত্তর দিয়েছি, 'হঠাৎ বিয়ে! তা আবার, ওই মেয়েটাকেই—মেজো বউদি তোকে কিছু বলেছে নাকি?'

'না', লক্ষ্মণদা স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল।

মেয়েটা ভাল—সম্পর্কে মেজো বউদির দূর সম্পর্কের কী রকম বোন হয়। মাঝে মাঝে বউদির কাছ থেকে এসে সাহায্য নিয়ে যায়। ওর নাম জয়ন্তী। ঘণ্টা-খানেক থাকে—তারপর যেমন নিঃশব্দে আসে ঠিক তেমনি নিঃশব্দে চলে যায়। মেয়েটার বুদ্ধি আছে কিন্তু সামর্থ্য নেই; লাবণ্য আছে কিন্তু কেমন যেন ম্লান-বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। ওর সঙ্গে আমার সামান্যই আলাপ ছিল।

মজা করার জন্যই মেজো বউদিকে সেদিনই আমি বললাম, 'আপনার কাছে একটা আর্জি আছে; ওই যে আপনার বোন জয়ন্তী, ওকে আমি বিয়ে করব।'

ভীষণ যেন হাসির কথা ওটা। খিলখিল করে হাসলেন বউদি। কোন জবাব দিলেন না। এর পর জয়ন্তীর আসা আমাদের বাড়িতে বন্ধ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণদাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'জয়ন্তী আসে না কেন?'

'ও আর আসবে না; বউদি ওকে বারণ করে দিয়েছে।'

'ওদের চলছে কী করে?' প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

'বউদি ও বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসে।' জবাব দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলেছিল লক্ষ্মণদা, 'তুই এত বোকা কেন রে? জানিস না, জয়ন্তী এ বাড়ির বউ হলে ও আর তোর বউদি সমান সমান হয়ে যাবে।'

আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে হঠাৎই অনেক হাউই দপ দপ জ্বলে ওঠে। একটা তীব্র উষ্ণ স্রোত আমার সমস্ত শরীরে বয়ে যেতে থাকে। যাকে কৃপা করে বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হল, সে-ই এসে একদিন সমান অধিকার দাবি করবে এও কী সম্ভব কখনও। সুতরাং জয়ন্তীর এ বাড়িতে ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে, অতে আর আশ্চর্যের কী।

প্রতিবাদ করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ি—মেজ বউদিকে নিরিবিলিতে পাই না মোটেই। মেজ বউদিও যেন সেদিনের পর থেকে আমাকে কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে থাকেন। জয়ন্তীদের বাড়ির ঠিকানা আমার অজানা। পথেঘাটে কোনদিন আকস্মিকভাবে জয়ন্তীকে কী পেয়ে যাবো না! ভিড় ভাড়ের ফাঁক ফোকর দিয়ে যদি জয়ন্তীকে পেয়ে যাই তা হলে বেশ হয়, এরকম ভাবনা নিয়ে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই। আশ্চর্য, এই যে জয়ন্তী, এর জন্য দুদিন আগে তো এমন আকুলতা মনে মনে অনুভব করিনি। আর এখন? মনে হচ্ছে, জয়ন্তী আমার সেই লক্ষ্য ভূমি যেখানে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমার রেহাই নেই। কেমন এক ক্ষ্যাপামি আমাকে অজানা এক রণক্ষেত্রের দিকে ক্রমশই টানতে থাকে।

সত্যিকারের চাওয়ার মত করে চাইলে পাওয়া যায়, এ ধরনের বিশ্বাস আমাদের আছে এবং এভাবেই একদিন আমি জয়ন্তীকে পেয়ে গেলাম শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে। মেদহীন ফ্যাকাশে চেহারা জয়ন্তীর; চোখ দুটোতে রাজ্যের ক্লান্তি ভিড় করা, ঘন কালো একরাশ চুল বহুদিন বুঝি বা তেল পড়েনি; হঠাৎ দেখতে পেয়েই আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে বেশ জোরেই ডেকে উঠলাম, 'জয়ন্তী!'

কর্মব্যস্ত মানুষজন সে ডাকে থমকে দাঁড়ায় মুহূর্তকাল। আমি সব কিছুকে উপেক্ষা করে জয়ন্তীর কাছে এগিয়ে এসে প্রায় ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেমন আছ জয়ন্তী? এতদিন তোমাকে দেখিনি কেন? তুমি কী রাগ করেছ? লক্ষ্মণদা তোমার কথা কত বলে। রোজ ভাবি তুমি আসবে কিন্তু কী আশ্চর্য তুমি আস না; আমাদের একদম ভুলে গেছো?'

আমার এত প্রশ্নের কোনটার জবাব দেবে জয়ন্তী। শূন্য চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে অসম্ভব উত্তেজিত আমি। 'চলো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে?'

জয়ন্তী কোন বাধা দেয় না; বাধ্য মেয়ের মত আমার পাশাপাশি চলতে থাকে। ছোট্ট মতন একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে মুখোমুখি বসে আমি ফের প্রশ্ন করি, 'কেমন আছ জয়ন্তী?'

তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে যেমন করে মানুষ উত্তর দেয়, ঠিক তেমনিভাবে বলল জয়ন্তী 'আপনারা ভাল আছেন?'

'না। আমাকে দেখে তুমি কিছু বুঝতে পারছ না?'

এ কথায় হাসল জয়ন্তী। বলল, 'হাসপাতালে এক রোগী আর এক রোগীকে যেমন জিজ্ঞেস করে, এও ঠিক তেমনি।' ফের হাসল জয়ন্তী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিছু খাবেন? আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে?'

ওর কথা বলার ভঙ্গি আমাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুলছিল। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরে বেশ সহজ গলায় উত্তর দি, 'কী খাবে খাও; আমার পকেটে এখন অনেক অনেক টাকা।'

বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই জয়ন্তী খুব সামান্য খাবারের অর্ডার দিল। ওমলেট টোস্ট আর চা।

ঠিক সেই ফাঁকে ওকে শুনিয়ে বললাম, 'তুমি কী জানো, ও বাড়িতে তোমার ঢোকা বন্ধ হল কেন?'

জয়ন্তী মাথা নেড়ে জানাল, 'সে জানে।'

'আমার উপর তোমার রাগ হল না?'

জয়ন্তী সে সবের মধ্যেই গেল না। চুপ করে বসে রইল।

'তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

ও আমার মুখের দিকে অপলকে তাকাল। কী যেন দেখল তন্ন তন্ন করে। বেশ বড় করে—একটা হাই তুলল।

বেয়ারা খাবারের প্লেট সাজিয়ে চলে গেল। জয়ন্তী টোস্টে, ওমলেটে নুন মশলা ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'মাথা থেকে পাগলামির ভূতটা সরিয়ে ফেলুন তো? রানুদি আমাকে ভীষণ ভালবাসে। ওর কোন ক্ষতি হয় সে আমি চাই না।'

কী বলছে জয়ন্তী? রানুদি অর্থাৎ মেজ বউদি জয়ন্তীকে ভালবাসে! ঝাঁঝাল গলায় আমি বললাম, 'ভালবাসে না ভিক্ষে দেয়?'

'মিথ্যে কথা! ওসব আমি বিশ্বাস করি না। কে কাকে ঘেন্না করে, তার হিসেব কে রাখে?' কথা ক'টি বলেই আমার মুখের দিকে স্থির চোখে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনি আপনার মেজদাকে কতটুকু চেনেন?'

এভাবে মেজদার কথা এসে পড়বে বুঝিনি। সব কিছু তখন আমার গোলক ধাঁধার মত মনে হয়। সত্যিই তো আমরা কি কেউ কাউকে চিনি? চুপ করে থাকি, উত্তর দি না।

জয়ন্তী ওমলেটের টুকরো মুখে পুরে বলল, 'আপনি আমাকে নিয়ে যা ভাবেন, তা সম্ভব নয়। সম্পর্কে আমি আপনার মেজ বউদির মতই একজন। আমার পেটে এখন তিন মাসের শিশু। রানুদি এ সবই এখন জানে। বাচ্চাটা তার চাই—আমারও একে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আমার কোন অভাবই রাখেনি রানুদি।'

আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল—উত্তেজনার বিন্দুমাত্র তখন আমার মধ্যে নেই। আমি স্থির চোখে চেয়ে জয়ন্তীকে বললাম, 'এ তো আত্মহত্যা?'

'যে যেমন ধরে।' অনুত্তেজিত স্বরে জয়ন্তী উত্তর দিল।

আমি বললাম, 'কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তোমার শরীরে—। তখন লজ্জা লুকিয়ে রাখবে কোথায়?'

জয়ন্তী এবারও বলল, 'লজ্জা তাদেরই যাদের টাকা নেই; আমার টাকা আছে, ডাক্তার আছে, নার্সিং হোম আছে, লজ্জা নেই', একটু থেমে ফের বলল, 'একটু পরেই রাস্তায় বেরিয়ে দেখবেন কত লোক—কে কী ভাবে বেঁচে আছে, আর কে কীভাবে জন্মেছে তার সব কিছু আমরা জানি কি?'

আমার সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে উঠল।

দোকান থেকে দাম মিটিয়ে রাস্তায় নেমে দু জনই অপরিচিত মানুষজনের মত কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে দু দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

আজ বহু দিন পর আমাদের বাড়িতে উৎসব। মেজদা গত স... বউদিকে নিয়ে প্রায় বছর খানেক বাদে ফের ট্রান্সফার হয়ে এলেন কলকাতায়। মেজো বউদির কোলে মাস ছয়েকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা। বড় বউদি মেজো বউদিকে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন—আনন্দাশ্রু! মেজদার হাত ধরে বড়দাকে বলতে শুনলাম, 'এত বড় একটা খবর এমন করে চেপে ছিলি কি করে রে? আমরা তোর অফিসে গিয়েও কোন খোঁজ পেতাম না। তোর কথা জিজ্ঞেস করলে বলত, কিছু বলার থাকলে বলে যান, আমরা খবর ঠিক ঠিক পৌঁছে দেবো।'

মেজদা স্বভাবসুলভ সুরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'জানো তো সংস্কারের চেয়ে মারাত্মক আর কিছু নেই। আমার গুরুদেবের বারণ ছিল, বাচ্চা হবে এমন সংবাদ কাউকে যেন না জানানো হয়—তাই এই ব্যবস্থা করা।'

'বেশ করেছিস, ভালই করেছিস—যা দুঃখের কপাল আমাদের'—বড়দা খুশী হয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

এই মিথ্যের দুর্গটাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিতে পারি আমি। দেবো নাকি ভেঙে?

বড়দা আমাকে ডাকলেন। মেজো বউদির ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়েই দুই বউ-এর কাণ্ডকীর্তি দেখে থমকে গেলাম। 'দ্যাখ দ্যাখ মেজো, কেমন বড় বড় চোখ মেলে আমাদের সব কিছু দেখে নিচ্ছে। ভীষণ বুদ্ধি হবে তোর ছেলের।'

হিহি করে হাসছিলেন মেজো বউদি। আমাকে দেখতে পেয়েই মেজো বউদি বললেন, 'এই যে ঠাকুরপো, এতদিন তুমিই এ বাড়ির ছোট ছিলে; এখন থেকে তোমার ছোটত্ব ঘুচে গেল।'

ঘরের ভেতরে ঢুকে ছেলেটার মুখের দিকে খুব ভাল করে নজর করে বলেছিলাম, 'আপনার মুখটাই যেন বসান মেজো বউদি।' বলেই মেজো বউদির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেজো বউদি কেমন যেন অন্যমনস্ক। বড় বউদি ছেলেটার গায়ের গন্ধ নিচ্ছিলেন পাগলের মত—হঠাৎই আমার মনে হল, এই মুহূর্তটিকে বাঁচিয়ে

মানুষ পাথর

সমরজিৎ কর

॥ ছয় ॥

এক পাশে কপিলি, আর এক পাশে উমরং। এই দুই নদীর স্নিগ্ধ জলধারার উপর নির্ভর করেই গড়ে তোলা হচ্ছে কপিলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। স্নিগ্ধ। হ্যাঁ, স্নিগ্ধ বলেই মনে হয় এখন। এই এপ্রিলে। স্রোত আছে। কিন্তু সে স্রোতে তেমন বেগ নেই। তার দুপাশে উঁচু পাহাড়। জঙ্গলাকীর্ণ। গ্রানাইট পাথরের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। তেমন গভীরও নয়। নদীর বুকে কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ। সেখানে এ ধরনের দৃশ্য এই এপ্রিলেই দেখা যায়। এর পর নামবে বর্ষা। ব্রীড়ানম্র কপিলি তখন রাক্ষসী। পাথুরে দ্বীপগুলি তখন অদৃশ্য হয়। কপিলির গভীরতা এখানে দাঁড়ায় দুশ' ফুটের মত। তার প্রচণ্ড স্রোত, প্রচণ্ড গর্জন বনের পশুপাখিদের বুকও যেন শুকিয়ে দেয়।

গরম পানি ইনসপেকশন বাংলোয় এতটুকু দেরি করি নি। বিকেল অনেকটা গড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যে নামার আগেই আমাদের কপিলি বাঁধের কাজ দেখার কথা।

বাংলোর লাউঞ্জেই দেখা হল শ্রীসুকান্ত রায়ের সঙ্গে। সুকান্তবাবু সিনিয়র জিওলজিস্ট। পাতলা চেহারা। চারের কোঠায় বয়েস। প্রথম সাক্ষাতেই মনে হল, পেশায় ভূ-তাত্ত্বিক হলেও এ লোকটি আরও অনেক কিছু নিয়েই ভাবেন। অনেক কিছুর সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গ। তবে বাইরে থেকে চট করে বুঝে ওঠা শক্ত। প্রচণ্ড আত্মসচেতন।

সুকান্তবাবু বললেন, আসুন। আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, ইনি মিঃ প্রকাশ। কপিলি প্রজেক্টের রেসিডেনসিয়াল জিওলজিস্ট।

বলেই তাঁর পাশের ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঃ প্রকাশের বয়স তিরিশের কোঠায়। আগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইনডিয়াতেই কাজ করতেন। এখন নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের রেসিডেনসিয়াল জিওলজিস্ট হিসেবে কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের হয়ে কাজ করছেন।

প্রকাশ বললেন, সুকান্তবাবু, সময় তো কম। এখন বরং কপিলি বাঁধটার কাছ থেকে ঘুরে আসি আমরা। মিঃ বিশ্বাসকে সেখানে তাঁর অফিসেই হয়ত আমরা পেয়ে যাব। তাঁকে আমি খবর দিয়ে রেখেছি।

সেই ভাল। বললেন সুকান্তবাবু।

বাংলোর চত্বর থেকে আমাদের জীপের দৌড় শুরু হলো আবার। বাংলোর গেট থেকে ঢালু রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে গলি পথ। সেই গলি পথ ধরেই আমরা চলতে লাগলাম।

বাঁকের মুখ পেরনোর সময় সুকান্তবাবু ডান দিকের একটি মেটে পথ দেখিয়ে বললেন, মিঃ কর, এই গলি ধরে মিনিট তিনেক হাঁটলেই দেখতে পাবেন একটি প্রস্রবণ। উষ্ণ প্রস্রবণ। তা, মশাই, জল প্রায় যাট থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের... স্থানীয় লোকেরা প্রস্রবণটিকে বলে গরম পানি। তার থেকেই জায়গাটার নাম গরমপানি হয়েছে। এটা আসামের উত্তর কাছার জেলার মধ্যে পড়ে। কাল সকালে এসে প্রস্রবণটা দেখে নেবেন একবার। ইচ্ছে করলে চানও করতে পারেন। বহু লোকই তো এখানে চান করতে আসে।

আসে তবে বেশির ভাগই তারা স্থানীয় অধিবাসী। কোন দিন এ অঞ্চলে কোন লোকালয় ছিল বলে মনে হয় না। আর দুর্গম এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ কী নিয়েই বা বাঁচবে? না আছে চাষের জমি। শুধু আগাছার বন। এর থেকে একটু এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে বিরাট জঙ্গল। সে জঙ্গলের বিস্তার কাজিরাঙ্গা পর্যন্ত।

মাত্র কয়েক বছর আগে ঠিক হলো, রাক্ষসী কপিলিকে বাঁধতে হবে। তৈরি করতে হবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্ল্যান পাকা হতে গেল আরও কিছুদিন। তারপর কাজের শুরু। জনহীন এই অঞ্চলে একে একে শোনা গেল মানুষের পদধ্বনি। পাথর কেটে, মাটি চষে শুরু হল পথ তৈরির কাজ। দলে দলে মজুর এল। তাদের ছাউনি পড়ল কপিলি নদীর উঁচু পাড় বরাবর।

শিলং-এ কথা প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন, এদিকে বড় বড় প্রজেক্টে হাত দেওয়ার সময় একটা মস্ত বড় সমস্যা ওই মজুরদের নিয়ে। আপনি স্থানীয় মজুর পাবেন না। কনস্ট্রাকশন বলুন, আর মাইনিং-ই বলুন, আপনাকে নির্ভর করতে হবে প্লেনের মজুরদের ওপর। ওদের জোগাড় করে আনে কনট্র্যাকটররা। বেশির ভাগই মালদহ অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার লোক। ওড়িশা থেকেও আসে প্রচুর। এসব মজুর আনতে গিয়ে নানা রকম বায়নাক্কা সহ্য করতে হয় আমাদের। তাদের আগাম গাড়িভাড়া দেওয়া, থাকার ব্যবস্থা, এমন অনেক কিছু। বংশ পরম্পরায় ওরা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে আসে। কোন জায়গায় হয়ত দেখবেন শুধু মুর্শিদাবাদের লোক। এসেছে ফরাক্কা, কিংবা ধুলিয়ানা গ্যাঞ্জেস থেকে। কোথাও বা গঞ্জামের লোকে ভর্তি।

গরমপানির পথ চলতে গিয়ে তার প্রমাণ পেলাম। প্রজেক্টের কাজ যে সব মজুর কাজ করছে তারা সবই প্রায় মুর্শিদাবাদ এবং ওড়িশা থেকে এসেছে।

তৈরি হয়েছে দৈনিক বাজার। দোকানপাট পর্যন্ত বসেছে। তৈরি হয়েছে সরকারী কর্মীদের বাসা, পোস্ট অফিস এবং থানা। খড়ের চালের নিচে চায়ের দোকান অথবা রেস্তোরাঁ, তাও চোখে পড়বে আপনার। অসমিয়া, বাঙালী, নেপালী, আরও অনেক সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে দোকান হাট খুলে বসে আছে। একদার বনরাজ্য 'গরমপানি' ক্রমে শহর হয়ে উঠেছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমাদের জীপ এসে দাঁড়াল একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রণব বিশ্বাসের অফিসের সামনে। আশপাশের তুলনায় এ দিকটা অনেক উঁচু। খানিকটা দুর্গমও বটে।

জীপের শব্দে প্রণববাবু অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুকান্তবাবু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনিই মিঃ প্রণব বিশ্বাস। কপিলি প্রজেক্টের কনস্ট্রাকশনের দায়িত্ব এঁর হাতে।

বয়সে তরুণ। এবং অত্যন্ত আমুদে। সুকান্তবাবুর কথায় মন্তব্য করলেন, আর দায়িত্ব! দায়িত্ব এখানে কার নেই, বলতে পারেন? এখন আমরা মস্ত বড় সমস্যার সামনে পড়ে গেছি। রীতিমত ভূ-তাত্ত্বিক সমস্যা। বলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুকান্তবাবুর দি... চাইলেন তিনি।

লক্ষ করলাম, মুহূর্তে সুকা... বাবু যেন গম্ভীর হয়ে উঠলে... তারপর নিম্ন কণ্ঠে বললেন, জা... সিংক হোল ইজ এ বিগ প্রবলেম।

সিংক হোল মানে? কথাটা ক... যেতেই প্রশ্ন না করে পারলাম না।

কাল সকালে নিয়ে যাব এখ... নিজে চোখেই দেখুন না, সিংক হে... কাকে বলে? জলবিদ্যুৎ উৎপাদ... জন্যে এখানে বিরাট জলাধার তৈ... কাজ চলছে ঠিকই, কিন্তু জলাধা... নিচে যদি এতো ফুটো থাকে, জানি... কতটা জল শেষ পর্যন্ত আমরা জ... রাখতে পারব! বললেন সুকান্ত রায়...

প্রণববাবুর সঙ্গে কথা বল... বলতে আমরা যেখানে বাঁধ তৈরি হ... সে দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রণববাবু বলছিলেন, কপি... জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে আমরা দুটি অং... ভাগ করে নিয়েছি, মিঃ কর। এখ... তো কপিলিকে দেখছেন? আর ওই পশ্চিম দিকের ও দিকটায় আছে আ... একটি নদী। নাম উমরং। কপিলি এ... উমরং দুটি নদীকেই আমরা বে... ফেলার কাজ শুরু করেছি।

এদিকটায় পাহড়ের উচ্চতা বি... বেশী। এ পাড়ে পাহাড়, ও প... পাহাড়। পাহাড়ের পাড় খাড়াই ... গেছে। বলতে পারেন একেবারে ন... ডিগ্রি খাড়াই। পাড়ের ধার বরাবর দাঁড়াতেই সুজিতবাবু খপ করে আ... হাতটি চেপে ধরলেন।—না, না। ... ফার, নো ফারদার। ডিনামাইট দি... পাথর কাটা হয়েছে, মশাই। কো... কোন্ চাঙড় আলগা হয়ে আছে, জানে? পা পড়লে একেবারে পাতা... প্রবেশ।

মুহূর্তে শরীরের শিরা-উপশি...
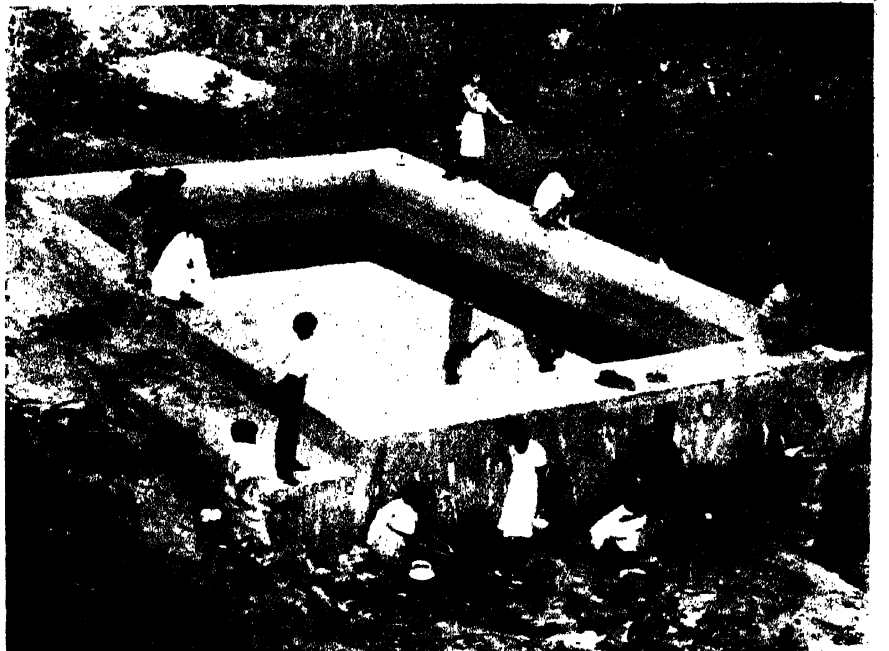
সুটিং,
আর ডেনিম।
MAFATLAL GROUP
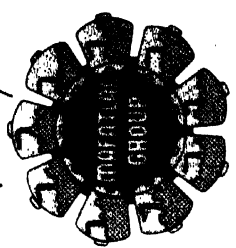
ঘাতিক! আমি তো প্রায় ছিটকেই
ছ্ সরে এলাম।

হাসলেন সুজিতবাবু।—ভয় পেলেন
কি? আরে না। অতটা ভয় পাওয়ার
রণ নেই। তবে এসব জায়গায়
াফেরা করতে গেলে যতটা সম্ভব
বধান হতেই হয়। তবে তাতেও যে
পদ এড়ানো যায় সব সময়, তা বলব
। পায়ের নিচে দেখছেন কঠিন পাথর।
ন্তু তার নিচে যে কী আছে সব সময়
াগাম কি সেটা আমরা বুঝতে পারি?
মন ওই সিংক হোলের কথাই ধরুন।

বাঁধ তৈরি হচ্ছে দুটি। কপিলির
কে তৈরি হচ্ছে খানডং বাঁধ। এটাই
। প্রায় আট শ' ফুট লম্বা। আর
চু প্রায় দু শ' আশি ফুট। বাঁধের
কে থাকবে নয়টি দরজা। কপিলির
লাধার থেকে ওই দরজা থেকে প্রচণ্ড
গে জলের তোড় নেমে আসবে।
দকের মূল পাথর বলতে কঠিন
ানাইট। ডান পাড়ে পাথরের ফাঁকে
ছুটা অভ্রের স্তরও আছে। আছে
াগমাটাইট পাথরের স্তর। ভূ-তাত্ত্বিক-
র ভাষায় যাকে বলা হয় 'ভেইন'।
য় তিন ফুট পুরু। তবে উঁচু পাড়ের
পরের দিকে মাটির স্তরই বেশী।
মরং বাঁধের ভূ-প্রকৃতিও কতকটা এই
ম।

একই সংগে চলছে দুটি টানেল
তরিরও কাজ। একটি খানডং বাঁধের
ংগে জোড়া। এটি লম্বায় হবে ২.৬
কলোমিটার। খানডং জলাধারের জল
টনেলের মধ্যে দিয়েই গিয়ে হাজির
বে জেনারেটার কক্ষে। পরিবর্তে
বে বিদ্যুৎ শক্তি।

তবে উমরং বাঁধের টানেলটি আরও
ড় হবে। প্রায় ৫.১ কিলোমিটার।
মরং জলাধারের জল এই টানেলের
ধ্যে দিয়ে ৫.১ কিলোমিটার পথ
গিয়ে গিয়ে তবেই চালু করবে
ার একটি জেনারেটার।

না প্রচুর মেহনত। প্রচুর অর্থ ব্যয়।
ার অপচয় যতটা বাঁচানো যায় সে
কটাও দেখতে হবে বইকি? আর
র জন্যেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিস্তর।
ানেলের মধ্যে দিয়ে খানডং-এর জল
য়ে গিয়ে প্রথম জেনারেটার স্টেশনের
াজ শেষ করার পর সেই জল ঢাল,
িয়ে দেওয়া হবে উমরং জলাধারের
কে। ফলে শুধু উমরং নদীর জলই
য়, উমরং জলাধার কপিলি নদীর
লেও পরিপুষ্ট হতে পারবে।

পাড় থেকে প্রায় আট শ' ফুট নিচ
ানডং বাঁধ তৈরির কাজ চলছিল তখন।
ত শত মজুর পাথর আর কংক্রিটের
ুড়ি মাথায় করে যন্ত্রের মত চলাফেরা
রছে। ওদিকে পাথরের ঢাল বেয়ে
ড়িয়ে আসছে কপিলির জলধারা।
াধের এক পাশে তৈরি করা হয়েছে
কটি টানেল। সেই জল আল বেঁধে
ক পাশে সরিয়ে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া
য়েছে ওই টানেলের মধ্যে। টানেল-পথে
ল বিভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলেছে।
লে বাঁধ তৈরির জায়গাটা শুকনো।
ুকনো পাথরের বুকে কংক্রিট আর
াশপাশের পাহাড় থেকে কেটে আনা
্যানাইটের চাঁই বসিয়ে চলছে বাঁধ
তরির কাজ।

খানডং জলাধার থেকে কতটা
িদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবেন বলে
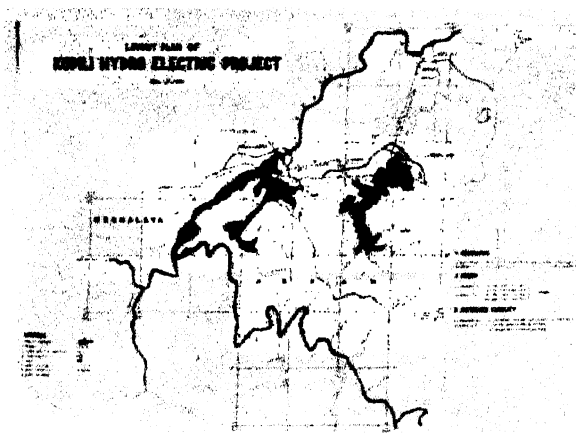
মানচিত্রে : বাঁদিকে কপিলি জলাধার, ডানদিকে উমরং জলাধার। উমরং জলাধার থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার টানেল পথে (জলাধারের নিচে ডান দিক বরাবর) জল আসবে জেনারেটার কক্ষে

ডেইজি
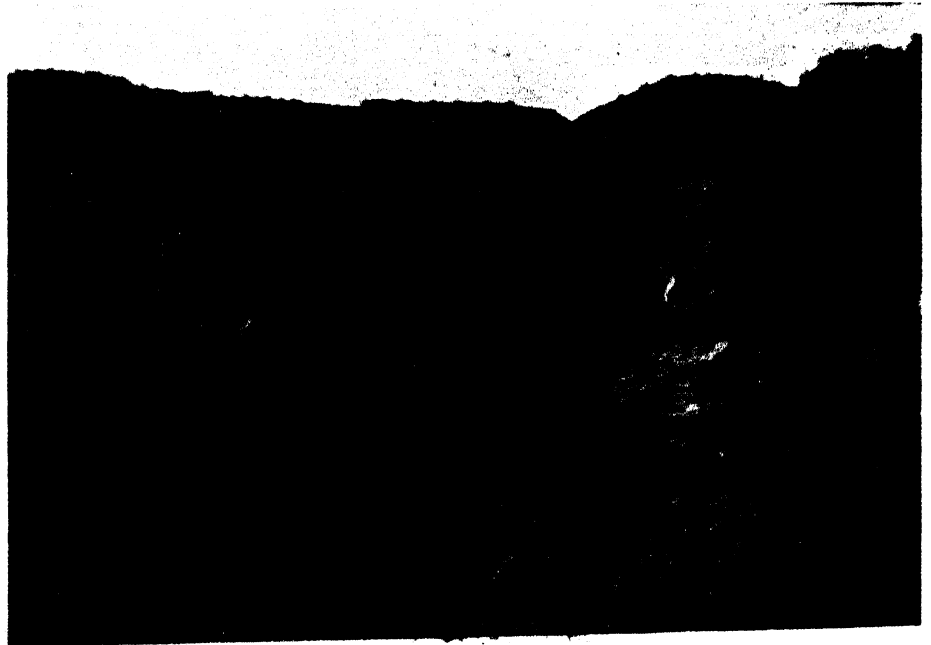
মনে করছেন আপনারা? প্রণববাবুকে জিজ্ঞেস করলাম।

প্রণববাবু বললেন, প্রথম দিকে অকটোবর থেকে মে মাসের মধ্যে পরিমাণটা বারো মেগাওয়াটের মত দাঁড়াবে বলেই মনে হয়। তবে জুন থেকে সেপটেম্বরে এই পরিমাণ বেড়ে পঞ্চাশ মেগাওয়াটের মত হবে। পরে এই পরিমাণ যথাক্রমে ৪০ এবং ৫০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে।

১৯৮১ সালের মধ্যে উমরং বাঁধের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তবে খানডং শেষ হতে সময় লাগবে আরও কিছুটা বেশী।

প্রকাশ বললেন, এই সব অঞ্চলে কাজ করার ঝামেলা অনেক, মিঃ কর। খানডং-এর পাথরের গঠন দেখে গোড়ায় কনস্ট্রাকশনের কাজ তো আমরা ঠিকই চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ কিছু দিন আগে এই বাঁধের কাছেই ধরা পড়ল একটি ফল্ট্। চ্যুতি। এই ফল্টটিকে এখন আমাদের ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। নইলে এত খরচ, এত মেহনত সব পণ্ডশ্রমে দাঁড়াবে। এছাড়া সিংক হোল-ও একটা বড় রকমের সমস্যা।

গত কয়েক বছর ধরে জিওলজিক্যাল সার্ভে এ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে আসছে। খানডং এবং উমরং— দুটি জলাধারই তৈরি হচ্ছে পাহাড় পরিবেষ্টিত দুটি উপত্যকায়। অবশ্য উপত্যকা বললে ভুল হবে। বরং বলি গিরিখাত। এই খাতের ভেতর দিয়েই বয়ে চলেছে কপিলি এবং উমরং। নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে জল আটকিয়ে তৈরি হচ্ছে জলাধার। তা হোক। কিন্তু হঠাৎ একটি বড় রকমের সমস্যা দেখা দিল। জলাধার দুটি যে যে জায়গায় তৈরি হচ্ছে তাদের কাছেই ডিয়াং উপত্যকা। ভূ-তাত্ত্বিকরা দেখলেন, এই উপত্যকাই শুধু নয়, ওই দুই জলাধারের জায়গা থেকে এ অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় ভূ-স্তরের নিচে রয়েছে অজস্র ফাটল। কোন কোন জায়গায় টানেলের মত সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গকেই আমরা সিংক হোল বলি। কোথাও বা বড় বড় গুহা। এসব জায়গায় কঠিন গ্র্যানাইটের পরিবর্তে ছড়িয়ে রয়েছে চুনা পাথরের স্তর।

ভোলাগঞ্জে যে চুনা পাথরের পাহাড় দেখছেন, সেই পাহাড়েরই একটি অংশ মাটির নিচ দিয়ে কঠিন ভূ-স্তর হিসেবে এগিয়ে এসেছে এখানে। মন্তব্য করলেন সুকান্তবাবু। জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এই চুনা পাথরের স্তরে তৈরি হয়েছে বড় বড় সুড়ঙ্গ।

তাতে অসুবিধেটা কোথায়? আমার প্রশ্ন।

বিরাট অসুবিধে। বললেন সুকান্তবাবু। ভাবুন, জলাধার তৈরি হল। বাঁধ দিয়ে তার জল আটকালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জলাধারের নিচে যে কঠিন ভূ-স্তর তার সামান্য নিচেই এক-একটি সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ হয়ত ভূ-স্তরের আরও গভীরে নেমে গেছে। তারপর এক জায়গায় ওই বাঁধের ভিত্তিরও নিচ দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে। যেন আপনার জলের ট্যাঙ্কের নিচে কতকগুলি অদৃশ্য নল। এতে [illegible] কী দাঁড়াতে পারে একবার জমিয়ে রাখা জল যদি চলে যায়, জলাধারে জলের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমে যাবে। যা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করবে।

কতগুলি সিংক হোলের এ পর্যন্ত আপনারা সন্ধান পেয়েছেন?

১১৮টি। তবে মনে হচ্ছে, সন্ধান করলে আমরা আরও পাব। ট্রেসারের সাহায্যে আমাদের কাজ চলছে। ট্রেসার বলতে আমি তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক যৌগের কথা বলছি। এখানকার নদীর জলে কিংবা অন্য কোন জলধারায় সেই রাসায়নিক বস্তুর যৎসামান্য আমরা ছেড়ে দিই তারপর কাউন্টারের সাহায্যে দেখে নিই কতদূর পর্যন্ত তার তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ছে। আর তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়া মানেই বুঝতে হবে সেখানে জল-প্রবাহের সঙ্গে সেই রাসায়নিক যৌগটি গিয়ে হাজির হয়েছে। যদি দেখা যায় এমন জয়গায় সেই রাসায়নিক যৌগের অস্তিত্ব ধরা পড়ল যেখানে নদীর জলাধার চোখে পড়ার মত কোন পথেই এগিয়ে যায় নি, তখন বুঝতে হবে, অন্য কোন পথে রাসায়নিক যৌগ সেখানে এসে হাজির হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সিংক হোল তেমন একটি পথ হতে পারে।

প্রণববাবু বললেন, এর জন্যেই খানডং ড্যামের জল যে টানেলের মধ্যে দিয়ে উমরং ড্যামে নিয়ে গিয়ে ফেলার আমরা পরিকল্পনা করেছি তার কাজ পিছিয়ে যাবে, মিঃ কর। কারণ, যে পথ ধরে ওই টানেলটি তৈরি করার কথা তার আশপাশে বেশ কিছু সিংক হোলের আমরা সন্ধান পেয়েছি। জিওলজিক্যাল সার্ভের সহযোগিতায় এ নিয়ে আরও অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধানের পর দেখতে হবে, কত কম খরচে ওই সুড়ঙ্গগুলি বন্ধ করে দেওয়া যায়। তারপর খানডং এবং উমরং ড্যামের সংযোগ-টানেলটি তৈরি করব।

কথা বলতে বলতে অদূরে অরণ্যের আড়ালে সূর্য কখন অদৃশ্য হয়েছে, বুঝতেই পারি নি।

সুজিতবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ মিলিটারি কায়দায় বললেন, আজকের মত ডিসমিস। সারাদিন বহুৎ হয়েছে দৌড়-ঝাঁপ।

কপিলির পাড় থেকে আমরা ফিরলাম। প্রণববাবুর অফিসের পাশ দিয়ে একটু সামনে এগোলেই পাওয়ার বিদ্যুৎকে আবাহন জানানর জন্যেই বাঁধ ডিজেল জেনারেটার জ্বালিয়ে দিয়েছে বিদ্যুতের আলো। কাজ। আরও কাজ। বিশ্রামের সময় নেই। কাজ চলছে ওয়ার্কশপে। বাঁধে। দিন রাত। অন্তত আরও কিছুদিন। যতদিন না বর্ষা আসে। তন্বী, লাস্যময়ী কপিলি যতক্ষণ না রাক্ষসীর রূপ ধারণ করে। তখন বাঁধের কাজে ভাটা পড়বে। সে এক মস্ত বড় অপচয়।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, প্রণববাবু, কপিলির জলের মাত্রা কত, বলুন তো?

অবাক হবেন, মশাই। বললেন প্রণববাবু। এখন আর কত, বড় জোর নব্বই কিউসেক। কিন্তু এই নদীই ভরা বর্ষণে জল বইবে ৪,৮৮,০০০ কিউসেকের মত।

পার্বত্য নদীর যে কী প্রচণ্ড ক্ষমতা সত্যি, ভাবাই যায় না।

মুহূর্তে একটু অনামনস্ক হয়েছিলাম হয়ত। ক্ষণিকের জন্যে মনের কোণায় একটা ছবি ভেসে উঠেছিল। ভাবছিলাম, আজ থেকে দশ বছরের মধ্যে কপিলি প্রজেকটের কাজ হয়ত শেষ হবে। তখন এ অঞ্চলে গড়ে উঠবে একটি পরিকল্পিত শিল্পনগরী। হাতের কাছে চুনা পাথর। আছে গ্র্যানাইট। তাদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে সিমেন্টের করাখানা। পাশেই বিরাট অরণ্য। সেই অরণ্যের কাঠ, লতাপাতা—এদের নিয়ে হয়ত গড়ে উঠবে কাগজের কল অথবা রাসায়নিক কারখানা। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে তখন এ অঞ্চলের মুখে হাসি ফুটবে।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম প্রণববাবুর কথায়। ভদ্রলোক অদূরে বিরাট জঙ্গলের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, যখন প্রথম এখানে আসি তখন তো ভয়ই করত। দলে দলে হাতি আসত এদিকে। কত রকমের গাছপালা ওই জঙ্গলে। শাল মাকাই, নাগেশ্বর, আরও কত কী। বাঁশ পাবেন অফুরন্ত। এই জঙ্গল কাজিরাঙা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের এই কনস্ট্রাকশন সাইটেই ওই জঙ্গল থেকে দিনের দিকেই কত হরিণ আসতে দেখেছি। আর বন মুরগীর তো কথাই নেই। মাঝে মাঝে চিতাও আসত এদিকটায়। তবে মানুষের ভিড় বাড়ায় ওইসব বন্য পশু এদিকটায় বড় কম আসছে এখন।

অতিথিদের পিঠে করে কাজিরাঙা ঘুরিয়ে এনে বিশ্রাম করছে

ফিরলাম। প্রণববাবু তাঁর বাসায় চলে গেলেন। মিঃ প্রকাশ এলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি এখনও বাসা পান নি। সপরিবার তিনি বাংলোতেই উঠেছেন। পরিবার বলতে অবশ্য তাঁর স্ত্রী এবং ছোট্ট একটি বাচ্চা।

বাংলোতে এসেই প্রথমে স্নান। সারাদিনে গায়ের ওপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু লাল মাটির আস্তরণ জমে গিয়েছিল। শুধু আমরাই নয়, সবারই। মনে হল স্নানের পর কিছুটা ভদ্রস্থ হয়েছি। এখন রিল্যাকস্ করা। সমরজিৎ চক্রবর্তী তাঁর ট্র্যানজিস্টার চালিয়ে দিলেন। অমরবাবু তাঁর ঝোলা থেকে বের করলেন দু প্যাকেট তাস। বললেন, রিক্রিয়েশন বলতে আমদের তো কিছু নেই। কাজের অবসরে ট্র্যানজিস্টার শোনো, আর পার্টনার পেলে তাস খেলো। চলে নাকি মশাই, তাসটাস?

জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, আপনাকেই তো বলছি। অমরবাবুর উত্তর।

কী খেলবেন?

ব্রীজ।

সসঙ্কোচে বললাম, খেলতে পারি, কিন্তু ভুলচুক হলে বকবেন না যেন।

হেসে উঠলেন অমরবাবু। বললেন, পাগল হয়েছেন। কে কাকে বকে। আমরাও নভিস। আসুন, দু হাত হয়ে যাক।

বসতে হলো। আমার পার্টনার হলেন সমরজিত চক্রবর্তী। আর অমরবাবুর সঙ্গে বসলেন অপূর্ব চৌধুরী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হল, হচ্ছেটা কী? তাস খেলা হচ্ছে, না জিওলজির ক্লাস চলছে। তাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে আমার ভূ-তাত্ত্বিক বন্ধুরা কখন যে সিলেট ট্র্যাপ, স্যানডস্টোন, লাইমস্টোন এসব নিয়ে সংলাপ শুরু করেছেন, প্রথমে আমি খেয়ালই করি নি। খেয়াল করলাম তখন, যখন দেখলাম, খেলায় সবাই আমরা আকচার ভুল করতে শুরু করেছি। আর পরক্ষণেই আবিষ্কার করলাম, ভূতত্ত্ব সম্ভবত ওঁদের মজ্জার মধ্যে গেঁথে গেছে। ঘুমের সময়ও হয়ত ওঁরা স্বপ্ন দেখেন পশ্চিম গারো পাহাড়ের গণ্ডোয়ানা [illegible]; মিকির পাহাড়ের বাইওটাইট অথবা জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দিসাং শিলাস্তরের ধূসর বেলে পাথর।

এক সময় হাতের তাস টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ফেলে বললাম, সুজিতবাবু, আপনার অনুকরণেই বলি, ডিসমিস। বুঝতে পারছি, আপনারা হোল টাইম প্রোফেশনাল। আমার শুধু ভয়, আপনাদের গিন্নিরা হয়ত মাঝে মাঝে পাথর নিয়ে তাড়া করেন আপনাদের!

কী বললেন? গিন্নিরা তাড়া করবে হাতের কাছে পেলে তো? আমরা তো সব সময় পাথরের আড়ালেই থাকি, মশাই। আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। মাঝ পথে থেমে পড়ে বাঁকা চোখে চেয়ে নিলেন আমাকে একবার। তারপর বললেন, দুঃখিত। বুঝতে পারছি, খেলাটি মাটি করলাম আমরা।

বাধা পড়ল। ক্যানটিনের ছেলেটি এসে জানালো, রাত সাড়ে দশটা, স্যার। খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে।

অতএব সেদিনের মত এখানেই ইতি।

ক্রমশ:

জয়প্রকাশ নারায়ণ : জিজ্ঞাসা ও জবাব

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের ৯ই আগস্ট। দেশের মুক্তি সংগ্রামের শেষে শেষের শুরু। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ, শৃংখলিত মানুষের প্রতিবাদের উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত। তৎকালীন ভারত সরকারের অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্র সচিব আর টটেনহ্যামের মতে বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের গোড়া থেকেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি এতে একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক জয়প্রকাশ নারায়ণের হাজারিবাগ জেল হতে পালাবার পর থেকেই কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আন্দোলন পরিচালনায় জয়প্রকাশের নেতৃত্ব ক্রমশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং এখন ওই আন্দোলনের সংগে একটা গোপন বৈপ্লবিক সংগ্রামের কোন প্রভেদ নেই।'

প্রায় তেত্রিশ বছরের ব্যবধান ওই দিন থেকে উনিশ শ' পঁচাত্তরের পঁচিশে জুনের মধ্যে। ভারতবর্ষ সেদিন তার স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতিক জীবনের কঠিনতম সংকটের সম্মুখীন। ক্ষমতাসীন দলের শাসক গোষ্ঠী ও তার সহচরদের অভিমত, দেশ জাহান্নমের পথে আর সেজন্য দায়ী একটি মাত্র ব্যক্তি। যত নষ্টের গোড়া বাহাত্তর বছর বয়স্ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, অন্য কেউ নয়। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কণামাত্র দ্বিধা না করে বললেন, জয়প্রকাশ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুখপাত্র। শুধু তাই নয়, দেশদ্রোহী শক্তিগুলিও তাঁর উপর নির্ভরশীল। পঁচাত্তরের ছাব্বিশে জুন অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী অভিযোগ করলেন, 'গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে বানচাল করার প্রচেষ্টা হচ্ছে'। স্পষ্টত জয়প্রকাশকে লক্ষ্য করেই তিনি বললেন, 'ব্যক্তিবিশেষ সৈন্যবাহিনী ও পুলিসকে বিদ্রোহ করতে উসকানি দিচ্ছে।'

জয়প্রকাশ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ও স্বাধীন ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে বলে বোধ হয় না। ইংরেজ শাসকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল জয়প্রকাশ তাঁদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের ঘোরতর শত্রুদের অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে জয়প্রকাশ একান্ত বিপজ্জনক। স্বৈরতন্ত্রের শৃংখলে গোটা দেশকে বাঁধবার যে অপচেষ্টা শুরু হয় পঁচাত্তরের পঁচিশে জুন তা ব্যর্থ করে দিয়ে গণতন্ত্রকে নিজ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অবিসংবাদী অধিনায়ক ওই ব্যক্তি। এ বিষয়ে দ্বিমতের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

বছর তিনেক পরের দৃশ্য। যে ব্যক্তিকে জয়প্রকাশ ইতিহাসের প্রায় বিস্মৃত পৃষ্ঠা থেকে উঠিয়ে নিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসাতে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করলেন সেই মোরারজী দেশাই আটাত্তরের বাইশে জুন নিরাভরণ ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণ ইজ নট দি আরবিটার ইন পার্টি অ্যাফেয়ারস—জনতা পার্টির বিষয়-ব্যাপারে জয়প্রকাশ সালিস নন। অত্যুক্তি হবে না বোধ হয় যদি কেউ বলেন, বর্তমান রাষ্ট্রকর্ণধার ও জনতা পার্টি পরিচালকদের অনেকেই মনে করেন জয়প্রকাশ তাঁদের পথের কাঁটা।

কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই। অকৃতজ্ঞতাই যাদের একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারা বাদে সকলেই স্বীকার করবে যে জনতা পার্টি জয়প্রকাশের সৃষ্টি। পার্টির সংগে কোনও রকম সাংগঠনিক সম্পর্ক না রেখেও গত বছর পয়লা মে এর জন্মক্ষণে একে তিনি আপন প্রতিষ্ঠান হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। এখানে স্মর্তব্য, তাঁর সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের একটা পর্যায় দল ও দলীয় রাজনীতি বিরোধিতার সংগে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। তবুও সমকালীন ইতিহাস ও বাস্তব অবস্থার তাগিদে স্বাধীন ভারতের চরম অভ্যন্তরীণ সর্বনাশের মুহূর্তে জয়প্রকাশ এগিয়ে এসেছিলেন জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠার মুখ্য পুরোহিতের কর্তব্য সমাধা করতে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠানের এক বছরের ভিতরই জনতা পার্টি গোষ্ঠী স্বার্থ ও উপদলীয় চক্রান্তের শিকারে পরিণত হল। সে আজ কেমন-যেন আদর্শচ্যুত। দিশাহারা। এতে জয়প্রকাশ ব্যথিত, চিন্তিত তার চেয়ে অনেক বেশী। অকারণে নয়। স্বৈরাচারী শক্তি যে পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে তা কি হেসে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়। অথবা সাতাত্তরের সংসদীয় নির্বাচন প্রাক্কালে জনগণকে জনতা পার্টি প্রদত্ত অংগীকার যা এখনও পূরণের অপেক্ষায়।

সেজন্য জনতা দলের নেতাদের জয়প্রকাশ বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁকে প্রায়শই বলতে শোনা গেছে স্বৈরতন্ত্রের অচলায়তনটা ভেঙে যাওয়ার ফলে জাতীয় জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়নি। জনতা পার্টি তথা জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে প্রতিশ্রুত সমাজ নির্মাণের সংগ্রাম শেষ হয়নি, শেষ হয়েছে কেবল এর প্রারম্ভিক কাজ। অতএব সম্পূর্ণ বিপ্লবকে সফল করার জন্য তাঁর বারংবার আবেদন, বিশেষত যুবশক্তির কাছে। জনতা দলের গোষ্ঠী-কোন্দল যখন শোভনতার শেষ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ক্ষোভে-দুঃখে তিনি বলেন, 'সেই পুরানো পথেই জনতা সরকার হাঁটছেন যা কংগ্রেস সরকারকে চরম অসাফল্যে ও জাতিকে সর্বনাশের কিনারায় পৌঁছে দিয়েছিল।' তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী দেশাই-এর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন, জয়প্রকাশ যদি ওই কথাই বলতে চান তবে তিনি তা বলতে পারেন। সেজন্য তাঁর সংগে তিনি বাদবিসংবাদে প্রবৃত্ত হতে অনিচ্ছুক। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

স্ফটিকের মতোই এটা আজ স্বচ্ছ যে ক্ষমতা গ্রহণের পর জনতা পার্টি বা গভর্নমেন্টের কার্যকলাপের হিসাব-নিকাশ জয়প্রকাশের প্রত্যয় অর্জন করার মতো উজ্জ্বল নয়। বরং এর বিপরীতটাই সম্ভাব্য। তার প্রমাণেরও অভাব নেই।

জয়প্রকাশ নারায়ণ

রাজনীতিক চিন্তা-ভাবনার নজির যা পাওয়া গেছে তাতে টোটাল রিভল্যুশনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার একমাত্র যোগ্য হাতিয়ার হিসাবে এর উপর নির্ভর করা যায় না। সেটা জয়প্রকাশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেন, অন্য কেউ করুক বা না করুক। তিনি যে করেন তা বিভিন্ন সময় নানানভাবে প্রকাশ করেছেন। গত এপ্রিল মাসে জনতা পার্টি সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে (এটা টেপ করা আছে) বর্তমান লেখকের প্রশ্নের উত্তরে জয়প্রকাশ বলেন, 'জনতা পার্টি একটা হমোজীনিঅ্যাস, সমপ্রকৃতির, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান নয়। পার্টির বিপদের জড় এর ভিতরেই আছে। একটা সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ ও আদর্শনিষ্ঠ দল হিসাবে এর ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। সামাজিক-অর্থনীতিক ক্ষেত্রে একে মধ্যপন্থী বলা চলে। এর ক্রিয়াকর্মে কোনও বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য থাকবে না, তবে এটা একটা প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল সংগঠনে পরিণত হবে না।' তিনি আরও বলেন যে, তাঁর আশা ছিল, 'চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত ও মোহন ধারিয়ার পক্ষে আরও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ সম্ভব হবে। বোধ হয় অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ও মনান্তর লক্ষ্য করে ওরা ধীরে অগ্রসর হওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে।

এখানে একটু প্রসংগান্তরে যাওয়া হয়ত অমার্জনীয় হবে না। একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। জয়প্রকাশের দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে রাজশক্তির সংগে নির্বিরোধ সহ-অবস্থানের নিদর্শন নেই। প্রাক-স্বাধীন বা স্বাধীনতা-উত্তর কোনও পর্যায়েই নয়। অনেকেই হয়ত মনে করেছিলেন, জনতা সরকার প্রতিষ্ঠার পর চিত্রটার কিছু অদলবদল হতে পারে—জীবনভোর বিদ্রোহী বিদ্রোহী জয়প্রকাশকে বোধ হয় দেখা যাবে রাজশক্তির প্রশান্ত সহযোগীর ভূমিকায়। তা হয়নি। আজও তিনি বিদ্রোহী, রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর নিস্পৃহতা অতীতে যেমন প্রবল ছিল এখনও তাই আছে। কোথাও এতটুকু তারতম্য ঘটেনি।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি এই নিস্পৃহতার উৎস কোথায়। অনেকেই প্রশ্নটা উঠিয়েছেন। একবার নয়, বার বার। গোটা বিষয়টির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিজেদের বিচার-বিবেচনা অনুসারে তাঁরা জবাবও দিয়েছেন। নিঃসন্দেহ, জয়প্রকাশের চিন্তাধারার সংগে পরিচিত অনেকেরই, সমালোচকদের কথা নাই বা উল্লেখ করা হল, থেকে-থেকে মনে হয়েছে যে তাঁর চিন্তা ও চর্যায় কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে, তাঁর রাজনীতিক দর্শনে ছিদ্র একাধিক। তাঁদের মতে, জয়প্রকাশের মননশীলতার দুটি বিন্দুর মধ্যে কোনও পারম্পর্য নেই, বরং আছে পরস্পরবিরোধী যুক্তি। নিশ্চয় কেউ দাবি করবে না যে জয়প্রকাশ সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন অবান্তর। অথবা সমস্ত সমালোচনা অযৌক্তিক। তিনি নিজেও তা করেন না। তবে তাঁর বক্তব্য, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর 'রাজনীতিক জীবনের গতিপথ সর্পিল মনে হলেও যথোচিত পর্যালোচনায় এর মধ্যে একটা সুসংগত বিকাশ পরিদৃষ্ট হবে।' সত্য বটে, রাজনীতিক তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি আজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত হতাশা বা অসন্তোষের জন্য তা করেন নি, করেছেন উপযুক্ত হাতিয়ার সন্ধানের উদ্দেশ্যে। যে হাতিয়ার দেশের মজুদ সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য তাত্ত্বিক বনিয়াদ রচনার কাজ দ্রুততর করতে সহায়তা করবে। ক্যাটেগোরিক্যাল ইমপারেটিভ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। কেন ?—উত্তরে এই বললেই যথেষ্ট যে রাজনীতিক দর্শন বহতা জীবনের প্রয়োজন নিরপেক্ষ নয়। তবুও জিজ্ঞাসা ছিল। কয়েকটি, একটি নয়। যার সদুত্তর একমাত্র জয়প্রকাশ দিতে পারেন।

মোরারজী দেশাই

সাক্ষাৎ হয়েছে। নানান বিষয়ে অল্পবিস্তর আলাপ-আলোচনাও যে না হয়েছে তা নয়। কিন্তু এর মধ্যে মূল প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ ছিল না। সে সুযোগ পেলাম পাটনা ছাড়বার ঘণ্টা তিনেক আগে।

ছয় জুলাই বৃহস্পতিবার। পড়ন্ত অপরাহ্ন। সাধারণত এ সময় জয়প্রকাশ শুয়ে থাকেন না। সেদিন ছিলেন। সকাল থেকেই। গতকাল ডায়ালিসিস-এর সময় প্রায় একশ দশ সি সি রক্ত ক্লট করে যায়, অর্থাৎ চাপ বেঁধে যায়। ওটা তাঁর দেহে পুনরায় ঢোকান যায়নি। ফলে, দুর্বলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং চিকিৎসকেরা সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ করে দেন। তথাপি দর্শনার্থীর বিরাম নেই। সকালে চিকিৎসকের উপস্থিতিতেই যখন জয়প্রকাশকে জিজ্ঞেস করলাম যে তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কিনা, তিনি স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তা নিশ্চয় করতে পারি। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় একেবারেই নারাজ। পীড়াপীড়ি করতে একটু বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, বিকালের দিকে জয়প্রকাশের অবস্থার হয়ত খানিকটা উন্নতি হতে পারে। আর তা যদি হয় তখন তাঁকে ইনটারভিউ করা যেতে পারে অল্প সময়ের জন্য। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী বিকালে ফিরে গেলাম জয়প্রকাশের কাছে। তখনও শুয়ে ছিলেন। সে অবস্থাতেই তাঁর অনুমতি নিয়ে কয়েকটা ছবি তোলার পর টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম :

প্রশ্ন : জে পি, আর ইউ অ্যাট পিস উইথ ইওরসেলফ—আপনার মনে শান্তি আছে ?

উত্তর : আমার মনে কোনও অশান্তি নেই, নিজের মনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া করতে পেরেছি এ দাবি করি না। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি—আমার মনে শান্তি আছে। কিন্তু চতুর্দিকে যা ঘটছে তার প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, দুঃখিত হই, নিজেকে অত্যন্ত অসুখী বোধ হয়। আমার মনে তখন এতটুকু শান্তি থাকে না। ভুলভ্রান্তি যা সব হচ্ছে বলে বোধ হয় সেগুলি শোধনের জন্য কিছু করতে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কতকটা শারীরিক অসুস্থতা ও কতকটা অন্যান্য সীমাবদ্ধতা হেতু আমি তেমন কিছু করতে অপারগ। এতে মানসিক অশান্তি খুবই বেড়ে যায় আর সেই সঙ্গে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি অসন্তোষ।

ওটাই সব চেয়ে বড় কথা। জয়প্রকাশের পাঁচ দশকব্যাপী রাজনীতিক জীবনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে প্রার্থকের ভূমিকায় কখনও দেখা যায়নি। এটাও যেমন সত্য তেমন সত্য আরও একটা বিষয়—তিনি সমাজের কাছে যাচ্ঞা করেছেন সব কিছু। আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত জিনিসটা অ্যান্টিথেটিক্যাল বোধ হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সুদূর অতীতের নয়, সাম্প্রতিককালের রাজনীতিক দৃশ্যপট স্মরণ করলেই চলবে। চুয়াত্তর সাল থেকে সাতাত্তরের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংসদীয় নির্বাচন পর্যন্ত সারা দেশে যে গণ-আন্দোলন তিনি চালিয়েছিলেন তার লক্ষ্য ছিল ঘুণ ধরা সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় আঘাত দেওয়া। যাতে সমাজের সর্বস্তরে মৌলিক পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত হতে পারে। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা, একমাত্র নয়, প্রয়োজনীয় উপায় হিসাবেই জনতা পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টা দেখতে হবে। কিন্তু গত ষোল মাসের ঘটনাবলি যে সমস্ত আশা-স্বপ্নের সমাধি রচনার ইঙ্গিত বহন করে জয়প্রকাশ তা ভালভাবেই বোঝেন। আর সেটাই তাঁর মানসিক অস্থিরতার হেতু, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান নয়।

জয়প্রকাশ সম্পর্কে অর্থাৎ তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে বিরোধ-বিতর্কের অবধি নেই। অতীতেও ছিল না, আজও নেই। সে কথা তাঁর কাছে অংশত প্রশ্ন ও অংশত তাঁর রাজনীতিক দর্শনের মূল্যায়নের আকারে উত্থাপন করে তাঁর অভিমত জানতে চাইলাম :—

প্রশ্ন : জে পি, বিভিন্ন ব্যক্তি নানানভাবে আপনাকে চিহ্নিত করেছে। কেউ মনে করে পলায়নী প্রবৃত্তি আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আবার কারো মতে আপনি বিভ্রান্ততাত্ত্বিক, চিরকাল ধোঁয়াটে চিন্তারাজ্যে বিচরণকারী। শুধু তাই নয়, হঠাৎ মত ও পথ পরিবর্তনে আপনার কোনও ক্লান্তি নেই। সম্প্রতি প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য অধ্যাপক রাজকৃষ্ণের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আমার আলোচনা হয়। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায়—আপনার ক্ষেত্রে যা আপাত তা যথার্থ নয়।

বাড়ন্ত বয়সের আর এক নাম—
ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ
মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠার সময় থেকেই সন্তানের হাড় ও দাঁত গড়ে ওঠা শুরু হয়ে যায়। শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের পক্ষে অপরিহার্য।
বাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তার বাড় থেমে যাবে। তখন গাদাগাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যাবে না।
সুতরাং আজ থেকেই তাকে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ খাওয়াতে শুরু করুন।
দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে, বিশেষতঃ তার দাঁত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে।
ভিটামিন সি, ডি ও বি ১২ সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেটে ভ্যানিলার গন্ধ দেওয়া এমন এক লোভনীয় স্বাদ আছে, যা' বাচ্চাদের দারুণ ভালো লাগে।
ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ—
সুইজারল্যাণ্ডের স্যাণ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত ক্যালসিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম।
এখন পাওয়া যাচ্ছে এক অসাধারণ প্যাকে যার জন্যে কোন ও বাড়তি খরচ লাগবে না।
ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®
শক্ত দাঁত ও সুস্থ সবল হাড়ের জন্যে
SANDOZ

চন্দ্রশেখর

চিন্তা ও কর্মজগতে ট্র্যানজিশনল পরিক্রমণের অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে ধোপে টেঁকে না। আপনার রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা থেকে মনে হয় ঈপ্সিত সমাজ নির্মাণের জন্য বিশেষ একটা হাতিয়ার নিয়ে পরীক্ষা করে যখন বুঝতে পেরেছেন যে সেটা সময়ের চাহিদা মেটাতে অক্ষম, তখন তা পরিত্যক্ত হয়েছে। নতুন করে পরীক্ষা শুরু করেছেন অন্য একটা হাতিয়ার নিয়ে। এটা কী ঠিক?

উত্তর : হঠাৎ উদ্দীপিত হয়ে দিক পরিবর্তনের অর্থ কোনও আরব্ধ কাজ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর যে প্রচেষ্টা হচ্ছে তা থেকে সম্পূর্ণ অন্য কিছুতে আত্মনিয়োগ। ওটা আমার সম্পর্কে বোধ করি অপ্রযোজ্য। বরং বলতে পারি যে আমি বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। একটা যখন অসফল হয়েছে তখন খোঁজ করেছি আরও উত্তম পথের যা বাস্তব অবস্থার দাবি মেটাতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা, কারাবাস বা অন্য কোনও কারণে ঘন ঘন যাত্রা-বিরতির ফলে এর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। কিন্তু কখনও অনুভব করিনি যে আকস্মিক প্রেরণায় আমার মত ও পথ পালটে গেছে। একটা নির্দিষ্ট ও সুযোগ্য লক্ষ্য অনুসরণ করতে গিয়ে যখন দেখেছি পথের শেষ বালিয়াড়িতে তখন অন্য পথ অনুসন্ধান করতে হয়েছে। হঠাৎ দিক পরিবর্তন নয় বরং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি দেখা উচিত।

প্রশ্ন : জে পি, স্টেট পাওয়ার, রাজশক্তি ও ম্যাস-পাওয়ার লোকশক্তি—এ দুয়ের মধ্যে আপনি পার্থক্য করেছেন এবং প্রথমোক্তের প্রতি আপনার বিমুখতা সুবিদিত। রাজশক্তির প্রতি নিস্পৃহার মধ্যে খানিকটা হিন্দু অ্যাসেটিসিজম, তপশ্চর্যার উপাদান আছে। তপস্বীর মতোই বরাবর একটা বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন—অর্থ কাম ও ক্ষমতা যত কম হয় ততই মঙ্গল। গান্ধী সম্পর্কেও এটা সমভাবে প্রযোজ্য। আপনাদের উভয়ের সম্পর্কেই বোধ হয় বলা চলে যে, আপনারা হিন্দু তপশ্চর্যার দ্বারা চিহ্নিত ইউনিভারসাল সর্বজনীন অ্যাসেটিসিজম-এর প্রবক্তা। অন্যদিকে, রাজশক্তির পর লোকশক্তির প্রাধান্যে স্থিরবিশ্বাস গান্ধী ও আপনার জীবন দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। এর হেতু মোটেই অস্পষ্ট নয়। ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ অনুন্নত দেশে, যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ভারসাম্যহীন হয়নি বলা চলে না রাষ্ট্রের নীতি ও ক্রিয়াকলাপে জনগণের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বদা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। অনৈতিক আইন সংশোধন, সরকারের ঘোষিত কার্যক্রমের যথোচিত সম্পাদন বা সমাজে মৌলিক পরিবর্তন প্রবর্তন—যেদিক দিয়েই দেখা যাক না লোকশক্তির গঠন, প্রসার ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। আপনার কী অভিমত?

উত্তর : রাজশক্তি লোকশক্তিরই একটা দিক। কিন্তু জনজীবনের নিম্নতম স্তর থেকে লোকচেতনা ও গণপ্রতিষ্ঠান গঠনে আমার বরাবর আগ্রহ। যাতে জনগণ, যারা গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি, তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এটা করার একটা উপায় সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ। তবে আমি চাই এর চেয়েও বেশী কিছু—অন্যের কাজে অংশীদার না হয়ে বরং জনগণ নিজেরাই কিছু করুক। দুর্ভাগ্য, সাংগঠনিক আকৃতিতে এখনও লোকশক্তির অভিব্যক্তি হয়নি। কখন-সখন গণ-আন্দোলনের আকারে লোকশক্তির প্রকাশ দেখা যায়। তখন তা সমাজকে সত্যই নাড়া দেয়, কিছু পরিবর্তন ঘটে, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীও পালটায়। কিন্তু সেটা অল্পকালস্থায়ী ব্যাপার, তার কোনও স্থায়িত্ব নেই। আমি যা দেখতে চাই তা হচ্ছে একটা পারমন্যান্ট রেভলুশন, মানবসমাজের সর্বোত্তম আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ক্রমাগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

প্রশ্ন : জে পি, আর একটা বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই। গান্ধী ও আপনার সম্পর্কে বলা হয় যে, আপনারা দুজনেই রাষ্ট্রক্ষমতার ধারেকাছে ঘেঁষেন নি। গান্ধী দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান কিন্তু তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেননি। উনিশ শ' সাতাত্তর ছিল আপনার সময়—স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে আপনি গণতন্ত্রকে

Interpub/AM/4/78 BN.

পুনরুদ্ধার করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। এর আগেও ক্ষমতা নেওয়ার অনেক সুযোগ ছিল—জওহরলাল নেহরু আপনাকে তাঁর সহকারী করতে চেয়েছিলেন এবং তা বাদে বিভিন্ন সময় ওই ধরনের সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু গ্রহণ করেননি। আপাতদৃষ্টিতে এর একটা ন্যায়সংগত কারণ হয়তো যে পরিমাণ ক্ষমতা চেয়েছেন তা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সাতাত্তরের মার্চ মাসের পর আপনার ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা নিশ্চয় পেতে পারতেন। প্রফেসর রাজকৃষ্ণ ও আমি মনে করি, সমস্ত বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত হওয়া উচিত। লোকশক্তি সংগঠনের উদ্দেশ্যেই রাজশক্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখা—এর মধ্যে অন্য কোনও হেতুর সন্ধান বৃথা। মোট কথা, সুসংগঠিত লোকশক্তি যদি না থাকে তাহলে অবিমৃশ্যকারী রাজশক্তির সংশোধক হিসাবে আর কিছু থাকবে না।

উত্তর : এ বিষয় প্রফেসর রাজকৃষ্ণ ও তোমার বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। এর অধিক কিছু আমার বলার নেই। তোমরা আমাকে ঠিক বুঝেছ।

পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক, জয়প্রকাশ বিশ শতকের সবচেয়ে বিতর্কিত ভারতীয়দের অন্যতম। আজও তাঁর সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। অন্যদের এঁর সম্বন্ধে কী ধারণা, তা জানবার ঔৎসুক্য বোধ করি অসংগত নয়। গত তেরই ও চোদ্দই জুলাই যথাক্রমে জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর ও প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর সংগে মোলাকাত করে সেটাই জানতে চাইলাম। কথার মারপ্যাঁচ না করে প্রধানমন্ত্রী বললেন, নীতিগতভাবে কোনও জীবিত ব্যক্তির চিন্তা ও চর্যার মূল্যায়ন তিনি করতে চান না। তাঁকে বললাম, যদি তাঁর আপত্তি না থাকে তবে ওই জবাবটাই টেপ করে নিতে চাই। সেই সংগে কয়েকটা ছবি তোলারও অনুরোধ পেশ করলাম। সহাস্যে রাজী হলেন।

প্রশ্ন : মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, একটা অত্যন্ত সোজা জিজ্ঞাসা আছে—স্বৈরতন্ত্রের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আন্দোলনে জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কী মূল্যায়ন?

উত্তর : আমি এ কাজ সম্পাদন করতে পারি বলে মনে হয় না। কোনও জীবিত ব্যক্তির মূল্যায়ন ন্যায়সংগত নয়। কেননা, এর নানান ব্যাখ্যা হতে পারে যা কোনক্রমেই অভিপ্রেত নয়। এ কাজ থেকে অতএব আমি বিরত থাকব। আর সেজন্য, আমি দুঃখিত, এ বিষয়ে কোনও মতামত দিতে পারব না এই কারণে যে ওই আন্দোলনে তিনি প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। এ ব্যতিরেকে আর কিছু বলব না।

প্রধানমন্ত্রী দেশাইকে যে প্রশ্ন করেছিলাম সেটাই জনতা দলের সভাপতির কাছে উপস্থাপিত করলাম। এর উত্তরে চন্দ্রশেখর বললেন : ভোলা, জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পর্কে আমার অভিমত তুমি জান। সেটা নতুন কথা নয়, অনেক আগেই তা ব্যক্ত করেছি লিখিতভাবে। এ দেশে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন আজ নয়, উনিশ শ' চুয়াত্তরে করেছিলাম। উনিশ শ' আটচল্লিশের পরে, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরে, জয়প্রকাশ একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমাজজীবনে কতকগুলি মূল্যবোধের যথোচিত স্বীকৃতি আদায়ের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন। আমাদের সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি তখন ক্রমক্ষয়িষ্ণু এবং জয়প্রকাশই ওই সমস্যার প্রতি জাতির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। সমাজের উপরতলায় অপচার, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষণ, ক্ষমতার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব—এগুলি সেই সকল ব্যাধির কয়েকটি যা গণতন্ত্রকে অন্তঃসারশূন্য করে দিচ্ছিল। ওই সমস্যাগুলি নিয়েই জয়প্রকাশের আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, ক্ষমতার গদিতে অধিষ্ঠিতরা সে আন্দোলনের যৌক্তিকতা বুঝতে পারলেন না। সে সময় জয়প্রকাশের সংগে একটা ডায়ালগ শুরু করার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই যাতে সকলে মিলে সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বার করা যায়। সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টার পরিবর্তে শ্রীমতী গান্ধী বোধ হয় ভাবলেন, ক্ষমতাই সর্বরোগহর ঔষধ। একটা বিবৃতির মাধ্যমে তখন বলেছিলাম, জয়প্রকাশের নৈতিক শক্তি ও শ্রীমতী গান্ধীর রাজনীতিক ক্ষমতা, এই দুয়ের মিলন হওয়া উচিত দেশকে সমস্যার নিগড় থেকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু তা হল না।

যাই হোক, ওই সময় যদি জে পি আন্দোলন শুরু না করতেন তাহলে স্বৈরাচারের জাঁতাকলে বোধ হয় দেশ আটকা পড়ত। কংগ্রেসে থাকা সত্ত্বে আমার সাধ্যমত চেষ্টা করি যাতে কংগ্রেস ও দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে না দেওয়া হয়। এতটুকু ইতস্তত না করে স্বীকার করব, তাতে কোনও লাভ হল না, বেশির ভাগ সময়েই অরণ্যে রোদন হয়েছিল। কিন্তু জে পি যখন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন জনগণের ভিতর উদ্দীপনা দেখা দিল, তারা এতে সামিল হলো। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরে যদিও আন্দোলন দমিত হয়, আমার স্মরণে আসে উনিশ শ' বিয়াল্লিশের সংগ্রামের কাহিনী। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পরে অনেকে ভেবেছিল, ইংরাজ চিরকালের জন্য জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা দমন করে দিতে সফল হয়েছে। তা যে হয়নি ইতিহাস তার সাক্ষী। বিয়াল্লিশের পরবর্তীকালে জনসাধারণ যে উৎসাহ, আগ্রহ ও অদম্য সাহস দেখিয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হয় উনিশ শ' সাতাত্তরের ফেবরুয়ারী মাসে। জেল থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই আমরা দেখলাম জে পি উনিশ শ' চুয়াত্তর ও পঁচাত্তরে যা করেছেন তা ব্যর্থ হয়নি। জাতীয় জীবনে নীতিভ্রংশের জন্য যা কিছু দায়ী জনগণ সে সবই স্মরণে রেখেছে। সেই সংগে জে পি'র আত্মত্যাগও। আমার ধারণা, জনগণের মনে সাহস ও সংকল্পের যে বীজ জে পি বুনেছিলেন সেটাই জনতা পার্টির নির্বাচনী সাফল্যের হেতু। তাঁর ওই অবদান ভোলা যায় না। মহাত্মা গান্ধী আমাদের দিয়েছেন স্বাধীনতা, জে পি দিয়েছেন গণতান্ত্রিক জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার সংকল্প।*

* সাক্ষাৎকারের টেপ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটের সোসিওলজিক্যাল

ছবি : ভেল্লা চট্টোপাধ্যায়

ক্লোজ-আপ-তাজা নিঃশ্বাস,আর
ক্লোজ-আপ-সাদা দাঁতের জন্যে চাই
স্বচ্ছ লাল
ক্লোজ-আপ
একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ
Close-up
এমন নিবিড় মুহূর্তের জন্যে আপনার প্রয়োজন নতুন ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর শক্তিশালী মাউথওয়াশ আপনার নিঃশ্বাসকে করবে ক্লোজ-আপ-তাজা, এর বিশেষ দুটি উপাদান আপনার দাঁতকে করবে ক্লোজ-আপ-সাদা।
কোলকাতায় এবং মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, গোয়া, পশ্চিম বঙ্গ, তামিল নাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের বাছাই করা শহরে পাওয়া যায়।
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-CX.14-2415 BG

উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ ১২ ॥

শেষ পর্যন্ত কিছুই চেপে রাখা গেল না। সরিৎশেখর যতই আড়াল করুন মহীতোষের বিয়ের আঁচ এ বাড়িতে লাগতে আরম্ভ করল। মহীতোষ নিজে আসছেন না বটে কিন্তু তাঁর হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানারকম কথাবার্তা বলতে সরিৎশেখরের কাছে না এসে পারছেন না। সরিৎশেখর সকালে বাজারে গিয়ে একগাদা মিষ্টি নিয়ে আসেন, কখন কে আসে বলা যায় না। হেমলতা তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেন। মেয়ের বাড়ি থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা অনিকে দেখে একটু অস্বস্তির মধ্যে থাকে সেটা অনি বেশ টের পায়। দাদু পিসীমা ওকে মুখে কিছু না বললেও ও যে ব্যাপারটা জেনে গেছে সেটা বুঝতে পেরে গেছেন। অনির ধারণা ছিল বিয়ে হলে খুব ধুমধাম হয়, অনেক আত্মীয়স্বজন আসে, কিন্তু ওদের বাড়িতে কেউ এল না। শুধু এক বিকেলে সাধুচরণ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সরিৎশেখরের কাছে এলেন। ও'দের সাজগোজ দেখে কেমন সন্দেহ হল অনিমেষের, পা টিপে টিপে ও দাদুর ঘরের জানলার কাছে এসে কান পাতল। সাধুচরণ বলছিলেন, 'সব ঠিকঠাক আছে. এবার আপনাকে যেতে হয়।'

সরিৎশেখর বললেন, 'সন্ধ্যে সন্ধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে আশা করি, আমি আবার আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ গোধূলি লগ্নেই বিয়ে; আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে-পারবেন।'

সরিৎশেখর বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া? না বেয়াই মশাই, আমি তো খেতে পারব না। আমাকে এ অনুরোধ করবেন না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে কি? তা কখনো হয়?'

সরিৎশেখর বললেন, 'হয়। আমার বাড়িতে আমার নাতি আছে যাকে আমরা এই বিয়ের কথা জানাইনি। তাকে বাদ দিয়ে আমি কোন আনন্দ-উৎসবে আহার করতে অক্ষম।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু তাকে তো আপনি নিজেই নিয়ে যেতে চাননি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিকই। ঐ অনুষ্ঠানে ওর উপস্থিতি কি কারো ভালো লাগবে? তাছাড়া একজনকে যখন এনেছিলাম তখন অনেক আমোদ-আহ্লাদ করেছি তবু তাকে কি রাখতে পারলাম! ওসব কথা থাক। পাত্রের পিতা হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু করতে দিন, এর বেশী কিছু বলবেন না।'

অনি শুনল দাদু গলা চড়িয়ে ডাকছেন, 'হেম, হেম।' রান্নাঘর থেকে সাড়া দিতে দিতে পিসীমা এ ঘরের দরজা অবধি এসে থেমে গেলেন, 'কি বলছেন?'

'আমি চললাম, সেই হারটা দাও তো।'

'ঐ তো, আপনার ড্রয়ারের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনি জামা-কাপড় পাল্টালেন না? ... পাঞ্জাবি পরে লোকে বাজারে যায়, বরকর্তা হয়ে যায় নাকি!'

অনি ড্রয়ার খোলার আওয়াজ পেল। তারপর শুনল দাদু বলছেন, 'আমি আটটার মধ্যে ফিরে আসব। অনিকে বলো ও যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে, একসঙ্গে খাব।'

পায়ের শব্দ পেতেই অনি দ্রুত সরে এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে ও দেখল সাধুচরণ আর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দাদু বাইরে বেরিয়ে এলেন। পিসীমার গলায় দুর্গা দুর্গা শুনতে পেল সে। সাধুচরণ ও সেই ভদ্রলোকের পাশে দাদুকে একদম মানাচ্ছে না। লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, হাঁটুর নিচ অবধি ধুতি, লাঠি হাতে দাদু ও'দের সঙ্গে হেঁটে গলির বাঁক পেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে পিসীমা ডাকলেন. 'অনি, অনিবাবা।'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাদু কোথায় যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পেরে ওর অসম্ভব কৌতূহল হতে লাগল। চট করে এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বারান্দায় ছেড়ে রাখা চটিজোড়া এক হাতে তুলে ও লাফ দিয়ে ভেতরের বাগানে নেমে পড়ল।

বাড়ির পেছন দিয়ে দৌড়ে ও যখন গলির মুখে এসে দাঁড়াল ততক্ষণে সরিৎশেখররা টাউন স্কুল ছাড়িয়ে গেছেন। দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তমনে হাঁটতে লাগল ও। এখন প্রায় শেষ-বিকেল। টাউন স্কুলের পাশের মাঠে ফুটবল খেলা চলছে। রাস্তাটায় লোকজন বেশী, নিরাপদ দূরত্বে অনিমেষ হাঁটছিল। সাধুচরণ একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে কি বলতে সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন। অনিমেষ জানে দাদু রিকশায় উঠবেন না। শরীর ঠিক থাকলে দাদুকে রিকশায় ওঠানো সহজ নয়। অবশ্য এখন যদি দাদু রিকশায় উঠতেন তাহলে অনিমেষ কিছুতেই আর নাগাল পেত না। রিকশায় না ওঠার জন্য সময় সময় ওর দাদুর ওপর খুব রাগ হতো, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওর খুব ভাল লাগল। দাদুর সঙ্গে হেঁটে তাল রাখতে পারছেন না সাধুচরণ। সঙ্গের ভদ্রলোকটি প্রায় দৌড়চ্ছেন। বড় বড় পা ফেলে চলেছেন সরিৎশেখর লাঠি দুলিয়ে। সাধুচরণকে ও কোনদিন দাদু বলতে পারল না। এর জন্য অবশ্য হেমলতা অনেকটা দায়ী। প্রথম থেকেই সাধুচরণকে ভালভাবে দেখেননি হেমলতা। নিজের মেয়েকে যে কষ্ট দেয়, সে মেয়ে মরে গেলে তো কষ্ট পাবেই না—এটা তো জানা কথা কিন্তু তা বলে পাঁচজনকে বলে বেড়াবে অর্ধমুক্তি হল আমার। বাকি অর্ধেকটা যেন স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। হেমলতা কোনদিন ওকে কাকা জ্যাঠা বলতে পারেননি। সেটাই রপ্ত করেছিল অনি। সামনাসামনি কিছু বলত না কিন্তু আড়াল হলে ও পিসীমার মত নাম ধরে বলা অভ্যাস করে ফেলল।

ঝোলনা পুল পার হয়ে করলা নদীর ধার দিয়ে ও'দের থানার দিকে যেতে দেখে অনি দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। এখানে রাস্তাটা অনেকখানি সোজা, চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালে ও ধরা পড়ে যাবে। ঝোলনা পুলে উঠতে ওর বেশ মজা লাগে। দুটো মোটা তারের ওপর পুলটা বাঁধা, বেশ দোলে। নিচে করলা নদীর জল কচুরিপানায় একদম ঢাকা পড়ে আছে। এখনো সন্ধ্যে হয়নি। দাদুদের ওপর চোখ রেখে পুলের মাঝামাঝি এসে নতুন স্যারের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। পুলের তারের জালে হেলান দিয়ে নতুন স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে নতুন স্যার হাসলেন, 'কোথায় যাচ্ছ অনিমেষ?'

কি বলবে বুঝতে না পেরে অনি বলল, 'বেড়াতে।'

'ও, তোমাদের এই নদীটাকে আমার খুব ভাল লাগে, জানো! কেমন চুপচাপ বয়ে চলে যায়। অথচ এর নাম কেন একটা তেতো ফলের নামে রাখল বলতো?' নতুন স্যার বললেন।

অনি দেখছিল দাদুরা খুব দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছেন। কিছু বলা দরকার তাই বলল, 'করলা খেলে তো রক্ত পরিষ্কার হয়।'

'গুড।' খুব খুশী হলেন নতুন স্যার, 'এই নদ', শহরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করছে। এককালে এসব

আমূলে বিকাশের পথ

ASP-AB-3a

ঠিক পথে পা বাড়ান
আমূলস্প্রে
দিতে শুরু করুন

মনে রাখবেন, বাচ্চাদের পক্ষে মায়ের দুধের চেয়ে ভাল আহার আর কিছুই হতে পারে না। এ হ'ল প্রকৃতির এমন এক মহান দান, যার বিকল্প আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে বের হয়নি। সুতরাং সব মায়েরই উচিৎ এই দুধ যতদিন পর্যন্ত বুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বাচ্চাকে তা'খাইয়ে যাওয়া। তবে হ্যাঁ, কোনও কারণে যদি বুকে যথেষ্ট দুধ না থাকে, তাহলে বাচ্চাকে আমূলস্প্রে খাওয়াতে শুরু করবেন।

আমূলস্প্রে কেন?

- খেতে মজাদার
- হজম করা সহজ
- ভিটামিনে ভরপুর
- পুরো মাত্রায় সুষম
- সহজে গুলে মিশে যায়

এগিয়ে চলুন
বালআমূলও
দিন

দুধ ও শস্যের সংমিশ্রিত আহার

(৩ মাসের পর আমূলস্প্রে'র সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার প্রথম শক্ত খাবার)

বাচ্চার পুরোপুরি বেড়ে ওঠা—তার বিকাশের জন্য যত কিছু প্রয়োজন সবই সুস্বাদু বালআমূলে র'য়েছে—আর র'য়েছেও বেশী ক'রে।

- অন্য যেকোন ব্র্যাণ্ডের শস্য-আহারের থেকে ২৫% বেশী প্রোটিন
- বেশী ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' এবং 'সি'
- সহজে হজম হয়। আগে থেকেই দুধে রান্না করা
- অন্য যেকোন খাবারের সাথে খুব ভালভাবে মিশে যায়, যেমন, ডাল, পিষে নেওয়া ফল, পুডিং প্রভৃতি
- অন্য যেকোন ব্র্যাণ্ডের শস্য-আহারের চেয়ে বালআমূলে আপনার পয়সার দ্বিগুণ দাম উশুল করবেন

এইজন্যে আজকাল আরো বেশী ডাক্তারেরা বাচ্চার পুষ্টির চাহিদা মেটাবার জন্যে বালআমূল'ই বেশী ভাল ব'লে মনে করেন!

আমূলস্প্রে বাচ্চাদের জন্য পুষ্টিতে ভরপুর দুগ্ধাহার

বালআমূলে বিকাশ
আপনি প্রতি পদেই দেখতে পাবেন

বিনামূল্যে: গর্ভাবস্থা আর শিশুর সঠিক পরিচর্যা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ সম্বলিত আমূল পুস্তক সংগ্রহ করুন। ইংরাজী, হিন্দী, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু ও মলায়লম ভাষায় এই পুস্তক পাওয়া যায়। এই ঠিকানায় লিখুন: পোস্ট ব্যাগ নম্বর ১০১২৪, বম্বে ৪০০ ০০১। আপনার পুরো নাম ঠিকানা লিখে ১ টাকার ডাকটিকিটের সঙ্গে পাঠান।

বাজারে ছেড়েছেন:
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ

ইংরেজদের সঙ্গে ও'র খুব বন্ধু হয়েছিল। তিস্তার পারে এখনও নাকি একটা কালীমন্দির আছে যেটা শুনেছি ও'রই প্রতিষ্ঠিত। তুমি দেবী চৌধুরানীর নাম শুনেছ?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'না।' নতুন স্যার বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে পরে একদিন ও'র কথা বলব। আজ বরং তোমাকে একটা বই দিই। এটা চিরকাল তোমার কাছে রেখে দেবে।' অনি দেখল নতুন স্যার তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। বইটা নিয়ে অনি দেখল মলাটে পাগড়ি পরা একজন মানুষের মুখ যাকে দেখলে মারোয়াড়ী দোকানদার বলে মনে হয়। আর ওপরে লেখা রয়েছে আনন্দমঠ, নিচে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নতুন স্যার বললেন, 'ইনি হলেন আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। আর এই বই হল ভারতের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বন্দেমাতরমের উৎস। এই বই না পড়লে দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাসকে জানা যাবে না।'

বইটা থেকে মুখ তুলে অনি দেখল থানার রাস্তায় দাদুদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। করলার উপর আবছায়া সন্ধ্যার অন্ধকার কোন ফাঁকে চুঁইয়ে নেমে এসেছে। হঠাৎ কোন কথা না বলে বই বগলে করে ও দৌড়তে লাগল। নতুন স্যার খুব অবাক হয়ে ওকে কিছু বললেন কিন্তু সেটা শোনার জন্য সে দাঁড়াল না।

রাস্তাটা বাঁধানো নয়, একরাশ ধুলো উড়িয়ে ও থানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে শব্দ হতে লাগল। নতুন স্যারের ওপর রাগে ওর চোখে জল এসে গেল কোথাও দাদু নেই। এখান থেকে রাস্তা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোন রাস্তা দিয়ে দাদু গিয়েছেন কি করে বোঝা যাবে? হঠাৎ খেয়াল হল সেদিন দাদু হোটেলের কথা বলছিলেন। থানার ওপাশে কি একটা হোটেলের সাইনবোর্ড দেখেছিল ও একদিন। সেদিকেই পা চালাল অনি।

এখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় তেমন আলো নেই। দুই একটা রিকশা ছাড়া লোকজন কম যাওয়া আসা করছে। থানার সামনে দুটো সিপাই বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। একা সন্ধেবেলায় এইদিকে কখনো আসেনি ও। আনন্দমঠটা দুহাতে চেপে ধরে থানার সামনে দিয়ে হেঁটে এল অনি। সামনেই একটা বিরাট বটগাছ, তার তলায় ভুজাওয়ালার দোকান। অনি গাছের তলায় চলে এল। এদিকে আলো নেই একদম, শুধু ভুজাওয়ালার দোকানের সামনে একটা গ্যাস পাইপ জ্বলছে। সেই আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনি দেখল বেশ কিছু লোক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একটা কালো রঙের গাড়ির সামনের সিটে দাদু বসে আছেন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে সাধুচরণ ছাড়া স্বর্গছেঁড়ার মানেজার হালদার, মালবাবুকে দেখতে পেল ও। একটু বাদেই অনি অবাক হয়ে দেখল কয়েকজন লোক মহীতোষকে দুপাশে ধরে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে। বাবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এখন। এক হাতে টোপর, ধুতি কুঁচিয়ে ফুলের মত অন্য হাতে ধরা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পাঞ্জাবিটা কেমন চকচক করছে আলোয়। বাবা এসে গাড়ির পিছনে উঠে বসলেন। সাধুচরণ আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মালবাবুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা কিন্তু হুস্ করে চলে যেতে পারল না। কারণ গাড়ির সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকজন হেঁটে যেতে লাগল পথ চিনিয়ে। সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে অনি গাড়িটাকে প্রায় ওর সামনে দিয়ে যেতে দেখল। দাদু গম্ভীরমুখে বসে আছেন। বাবা হেসে মালবাবুকে কি বলছেন। মুখ ফেরালেই ও'রা ওকে দেখে ফেলতে পারতেন। দেখতে পেলে কি বাবা ওকে বকতেন? হঠাৎ ওর মনে পড়ল বাবার এইরকম পোশাক পরা একটা ছবি স্বর্গছেঁড়ার বাড়িতে মায়ের অ্যালবামে আছে। না জানতেন, বিয়ের ছবি। আনন্দমঠ জড়িয়ে ধরে অনি চুপচাপ গাড়ির খানিক পিছনে হাঁটতে লাগল।

গলির মুখটায় বেশ ভীড়, গাড়ি ঢুকল না। তিন চারটে রোগা মতন মেয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে এসে বাবাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ভীড়টা সিনেমাহলে ঢোকার মত গলির ভিতর চলে গেল। এখন চারদিকে বেশ অন্ধকার। [illegible]

নেই, শুধু বিয়েবাড়ি বলে গলির মুখে একটা হ্যাজাক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনির খুব কৌতূহল হচ্ছিল ভিতরে গিয়ে দেখতে সেখানে কি হচ্ছে! বাবা যখন মাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখনও কি এইরকম ভীড় হয়েছিল! এইরকম আলো দিয়ে মায়েদের বাড়ি সাজানো হয়েছিল? মা বেঁচে থাকলে বাবা আর বিয়ে করতে পারতো না এটা বুঝতে পারে অনি। কিন্তু এখন, এই একটু আগে বাবাকে যখন মেয়েরা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল তখন তো একদম মনে হল না বাবার মনে কোন কষ্ট আছে! বউ মরে গেলে যদি আবার বিয়ে করা যায় তো পিসীমা কেন বিয়ে করেনি? পিসীমা তো আবার শাড়ি পরে মাছ খেতে পারতো! আজন্ম দেখা পিসীমার চেহারাটায় ও মনে মনে শাড়ি সিঁদুর পরিয়ে হেসে ফেলল, দূর, পিসীমাকে একদম মানায় না। ঠিক ওইসময় ও শুনতে পেল কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করছে, 'কি চাই খোকা? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

অনিমেষ কি বলবে মনে মনে তৈরি করতে না করতে লোকটা এসে দাঁড়াল সামনে, 'নেমন্তন্ন খেতে এসেছ তো এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে যাও।'

লোকটা ওর পিঠে হাত রেখে বলছে, ভিতরে যাও। এখন তো ও বেশ সহজে যেতে পারে। কিন্তু বাবা, দাদু—অনিমেষ এক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল।

কি হল দাঁড়ালে কেন? যাও।' লোকটা কথাটা শেষ করতেই ওর মনে হল এবার এক ছুটে পালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ততক্ষণে একটা সন্দেহ এসে গেছে লোকটার মনে, 'তোমার নাম কি? কোন বাড়িতে থাক?'

'আমি এখানে থাকি না।' অনিমেষ বলল।

'কোন পাড়ায় থাক? কার সঙ্গে এসেছ?'

'আমি নেমন্তন্ন খেতে আসিনি।' অনিমেষ প্রায় কেঁদে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারা পাল্টে গেল, 'তাহলে এখানে ঘুর ঘুর করছিস কেন? চুরিচামারির ধান্দা, অ্যাঁ? যা ভাগ।' অনিমেষ দেখল লোকটা চড় মারার ভঙ্গীতে একটা হাত ওপরে তুলেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সরে যেতে না যেতেই লোকটা খপ করে ওর হাত ধরল, 'তোর হাতে এটা কি! বই। কোত্থেকে মেরেছ বাবা! দেখি!' প্রায় ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে লোকটা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে উচ্চারণ করল, 'আনন্দমঠ, অ্যাঁ? ধান্দাটা কি?'

'আমার বইটা দিন।' অনিমেষ কোনরকমে বলল।

'অ্যাই চোপ্। যা পালা এখান থেকে।' লোকটা তেড়ে উঠতে পিছন থেকে আর একটা গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে শ্যামসুন্দর? চেঁচাচ্ছ কেন?'

'আরে এই ছোকরা তখন থেকে ঘুরঘুর করছে, এ পাড়ায় কোনদিন দেখিনি।' লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল।

'খুব সাবধান। আজকাল চোর-ডাকাতের দল এইসব বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে খবরাখবর নেয়।' অনিমেষ দেখল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল ওর। শ্যামসুন্দর নামে লোকটা কিছু বোঝার আগেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে আনন্দমঠটা ছিনিয়ে নিল। এত জোরে লাফিয়ে উঠেছিল অনিমেষ যে শ্যামসুন্দর ব্যালেন্স রাখতে না পেরে ঘুরে মাটিতে পড়ে গিয়ে 'ওরে বাপরে বাপ' বলে চিৎকার করে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বেটাল হয়ে অনিমেষ মাটিতে পড়তে পড়তে কোনরকমে শ্যামসুন্দরের মুখে একটা পেনাল্টি শট কষিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল. অনিমেষকে ছেড়ে দিয়ে নিজের মুখ দুহাতে চেপে ডাকাত ডাকাত বলে শ্যামসুন্দর চেঁচাচ্ছে আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ গলা ফাটিয়ে একটা বিকট শব্দ তুলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলির ভিতরে অনেকগুলো গলায় হই হই আওয়াজ উঠল। অনিমেষ দেখল পিল পিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে গলি দিয়ে। আর দাঁড়াল না অনিমেষ, এক হাতে বইটা সামলে প্রাণপণে ছুটতে লাগল [illegible]

পেরে শোরগোল বেড়ে গেল। অনিমেষ বুঝতে পারছিল বেশ কয়েকজন তার পিছনে ছুটে আসছে। কি করবে বুঝতে না পেরে ও একটা অজানা অন্ধকার গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। এতদূরে দৌড়ে এসে ওর হাঁপ ধরে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ও বুঝতে পারছিল আর পালাতে পারবে না। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কিছু একটায় পা জড়িয়ে ও ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল। ওর মনে হল ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে চৌচির হয়ে গেছে, একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠছে পা বেয়ে। চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে ও টের পেল পিছনে কোন পায়ের শব্দ নেই। কোন গলা ভেসে আসছে না। তাহলে কি ওরা আর ওর পিছন পিছন আসছিল না? ও কি বোকার মত ভয়ের চোটে দৌড়ে যাচ্ছিল? একটু একটু করে সাহস ফিরে আসতে শরীর ঠাণ্ডা হল, বুকের ভিতর ধুকধুকুনিটা কমে এল। অনিমেষ উঠে বসে নিজের বুড়ো আঙ্গুলে হাত দিতেই আঙ্গুলগুলো চটচটে হয়ে গেল। গরম ঘন বস্তুটি যে রক্ত তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। আঙ্গুলের চটচটে অনুভূতিটা হঠাৎ ওকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলল। একা এই অন্ধকারে মাটিতে বসে ও মাধুরীর মুখটা দেখতে পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে কয়েক পা হেঁটে আসতে ও একসঙ্গে অনেকগুলো আলো দেখতে পেল। আলোগুলো খুব উজ্জ্বল নয়, পর পর লাইন দিয়ে কিছুটা দূরে চলে গেছে। কাছাকাছি হতে অনেকগুলো গলা শুনতে পেল অনিমেষ। বেশির ভাগ গলাই মেয়েলি, কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে। এইরকম গলায় কোন মেয়েকে ও হাসতে শোনেনি কোনদিন। ওকে দেখে মেয়েগুলো মুখের কাছে আলোগুলো তুলে ধরল। অবাক চোখে অনিমেষ দেখল পর পর অনেকগুলো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। কেমন সব সাদা সাদা মুখ আর তাতে পড়েছে লণ্ঠন, কুপির আলো। যেন নিজেদের মুখ অনিকে দেখানোর জন্য ওরা আলোগুলো তুলেছে। একটি মেয়েলি গলায় চিৎকার উঠল, 'এ যে দেখি কেষ্টঠাকুর, নাড়ুগোপাল, ননী খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?'

সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলো নিচে নেমে এল, 'ওমা, এ যে দেখছি পুঁচকে ছেলে। আমি ভাবলাম নাগর এল বুঝি।'

খিলখিল করে হেসে উঠল একজন, 'এগুলো হল ক্ষুদে শয়তান, বুঝলে দিদি, একটু সুড়সুড়ি উঠেছে কি এসে হাজির।'

'ঝ্যাটা মার ঝ্যাটা মার।'

'আঃ থামো তো, রাম না বলতেই রামায়ণ গাইছ।' অনিমেষ দেখল একটা লম্বা মতন মেয়ে লণ্ঠন হাতে ওর দিকে এগিয়ে এল, 'এই ছোঁড়া, এখানে এসেছিস কেন?'

'আমি আর আসব না।' অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ল, 'কান ধরে বলতে বল রে।'

মেয়েটি এক হাত কোমরে রেখে অন্য হাতে হ্যারিকেন ধরে আবার বলল, 'কিন্তু এসেছিস কেন? জানিস না এ মহল্লার নাম বেগুনটুলি, এখানে আসতে নেই। নাকি জেনেশুনে এসেছিস?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, তারপর বলল, 'আসতে নেই কেন?'

মেয়েটি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল তারপর একটু নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন স্কুলে পড়?' হঠাৎ তুই থেকে তুমিতে উঠে গিয়ে অনিমেষের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল, 'জিলা স্কুলে'। বলতে বলতে ও যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। মেয়েটি বলল, 'কি হয়েছে, অ্যামসা করছ কেন?'

অনিমেষ পা-টা তুলে ধরতেই মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওমা, এ যে দেখছি রক্তগঙ্গা ছুটছে ক্যামনা হল?' অনিমেষ দেখল আরো কয়েকজন এগিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে ওর পা দেখছে। একজন বলল, 'ছেড়ে দে, এই সন্ধেবেলায় আর ঝামেলা বাড়াস না।' কে একজন জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছে দেখে সবাই হই হই করে আবার বাতি নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম মেয়েটি সেদিকে একবার দেখে একটু ইতস্তত করে এক হাত অনিমেষের পিঠের ওপর রেখে বলল, 'তুমি আস্তে আস্তে আমার কামরায় উঠে এস তো।'

একটু এগোলেই সার দেওয়া মাটির ঘর দেখতে পেল অনিমেষ। তারই একটায় মেয়েটি ওকে নিয়ে ঢুকল। ঘরের মধ্যে লণ্ঠনটা রেখে মেয়েটি ওকে বসতে বলল। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে একটা তক্তাপোশ, তার ওপর বিছানা করা। দুটো বালিশ, কোন পাশ-বালিস নেই। দেওয়ালে একটা ভাঙ্গা আয়না ঝোলানো, একদিকে দড়িতে কিছু জামাকাপড় এলোমেলোভাবে টাঙানো। ওকে বসতে বলে মেয়েটি তক্তাপোশের তলা থেকে একটা টিনের স্যুটকেস টেনে বের করে তা থেকে অনেকটা পাড় ছিঁড়ে নিয়ে এসে বলল, 'দেখি, গোড় বাড়াও।' ওর খুব সংকোচ হচ্ছিল মেয়েটি পা ধরায় কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হল মেয়েটি খুব ভাল। এত ভাল যে তার কাছে আসতে নেই কেন? তপুপিসীর চেয়ে বেশী বড় হবে না মেয়েটি কিন্তু সাজগোজ একদম অন্যরকম। এরা কারা? এই যে এত মেয়ে একসঙ্গে রয়েছে, সন্ধেবেলায় আলো নিয়ে ঘুরছে কি জন্যে: এটা কি কোন হোস্টেল? ওদের স্কুলে যেমন ছেলেদের বোর্ডিং আছে তেমন কিছু? কিন্তু মেয়েরা এত চেঁচিয়ে হাসবে কেন? ওর মনে পড়ে গেল হেমলতা ওকে যে অপ্সরাদের গল্প বলেছিলেন তারাও তো এই রকম হাসি গান নিয়ে থাকে, দরকার হলে ভগবানদের সভায় গিয়ে নেচে আসে। এরা কি নাচ জানে? দ্যুৎ, অপ্সরারা দারুণ সুন্দরী হয়, এরা তো কেমন কালো কালো। হঠাৎ ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে চাপ লাগতেই অনিমেষের নজর পায়ের দিকে চলে এল। ও দেখল ওর পায়ের ওপর ইয়া জোব্বা একটা ব্যাণ্ডেজ বাধা হয়ে গেছে। ওদের ড্রিল স্যার খুব সুন্দর করে

মীনা বন্ধুকে সাহায্য করলো!

দিনে-দুবার নিউট্রামূল খাওয়া অভ্যেস করলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্যেই দেশের হাজার হাজার লোক সব ছেড়ে এখন আমুলের তৈরী শক্তিবর্ধক পানীয় নিউট্রামূল ধরেছেন।

আমুল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে — আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্ত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের

৫০০ গ্রা. টিন মাত্র ১২ টাকা ২১ পয়সা স্থানীয় কর, সেণ্টাল সেলস্ ট্যাক্স ও মাসুল আলাদা।

মীনা এবং আরো অনেকে নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে!

daCunha/N/2o/Ben/R-1

এই মেয়েটা নিশ্চয়ই সেটা জানে না।

'কি আর দরদ লাগছে?' মেয়েটি ঠোঁট বেঁধে ওর পা কোল থেকে নামিয়ে দিল। ঘাড় নেড়ে না বলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াতেই ওর মনে হল কি একটা যেন ওর কাছে নেই। কি নেই বুঝতে না পেরে ও নিজের হাতের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল অনিমেষ। ও যখন দৌড়ে এই গলির মুখে আসে তখনও বইটা ওর হাতে ধরা ছিল এটা স্পষ্ট মনে আছে। কারণ ঐ সময় ওর কুঁচকির কাছে কি একটা কামড়াতে ও দৌড়তে বইটা হাতজোড়া ছিল বলে একটুও চুলকোতে পারেনি। তাহলে নিশ্চয়ই অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ও যখন আছাড় খেয়ে পড়েছিল তখনই বইটা ছিটকে গিয়েছে। গোড়ালির ওপর ভর করে ও প্রায় দৌড়ে বাইরে আসছিল কিছু না বলে। মেয়েটি চট করে ওর হাত ধরে বলল, 'চলতে পারবে তো?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। মেয়েটি খুব অবাক হচ্ছিল ওর এইরকম পরিবর্তনে, লণ্ঠন হাতে পিছন পিছন খানিকটা এসে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে শোন, সামলেকে যাও।' ততক্ষণে অনিমেষ অনেকটা দূরে চলে গেছে। কিন্তু গলিটার মধ্যে এত অন্ধকার কেন! যে জায়গাটায় ও আছাড় খেয়ে পড়েছিল সে জায়গাটা খুঁজে ছাই বোঝা যাচ্ছে না কোথায়। পা দিয়ে রাস্তাটা হাঁটকে দেখতে লাগল ও অন্ধের মতন। নতুন স্যার বলেছেন, এই বই না পড়লে আমাদের দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাস জানা যাবে না। এই অন্ধকারে অনিমেষ কোথাও বইটার অস্তিত্ব খুঁজে পেল না একা একা। ঠিক এই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটা চিৎকার উড়ে এল, গলাটা ক্যানকেনে, 'কে র‍্যা এখানে ঘুর ঘুর করে, ট্যাঁকখালির জমিদারের পো নাকি, বাপের বাসী বিয়ে দেখার বড় সাধ না রে, যা বেরো এখান হতে।' চারপাশে তাকিয়ে অনিমেষ কাউকে দেখতে পেল না। এই অন্ধকার গলিতে ... অসম্ভব। অথচ ওর মনে হচ্ছে এই কথাগুলো যে বলল সে যেন স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছে। কেমন সিরসির করতে লাগল ওর। এখান থেকে একদৌড়ে ও বড় রাস্তায় চলে যেতে পারে। কিন্তু বইটা? ধীরে ধীরে ও পিছন দিকে তাকাল। একটা আলো পেলে হত, কেউ যদি একটা আলো দিত ওকে!

গোড়ালিতে ভর করে ও আবার ফিরে এল। ওকে দেখে একজন শিস দিয়ে উঠল, 'আ পিয়া মেরা জান— খিলাও দো খিলি পান।' আর একজন বলে উঠল 'হায় কপাল, এ ছোঁড়ার দেখছি জোয়ার এয়েছে, তুই যত ওকে ঘরে ফেরত পাঠাবি, কবুতরী, ও তত এখানে ঘুরঘুর করবে দ্যাখ।'

অনিমেষ দেখল সেই মেয়েটি লণ্ঠন হাতে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে এল। তাহলে এর নাম হল কবুতরী? বেশ সুন্দর নাম তো। ওর কাছে এসে কবুতরী বলল, 'ফিন চলে এলে, ঘর যাও।' এখন ওর কথার মধ্যে বেশ একটা ঝাঁজ টের পেল অনিমেষ। সেই নরম ভাবটা নেই। মুখ ঘুরিয়ে ও আবার গলিটার দিকে তাকাল— একদম ঘুটঘুট করছে। ওর কাছে আলো চাইলে কি খুব রেগে যাবে? কবুতরী সেটা লক্ষ করে বলল, 'ডর লাগছে নাকি? আসতে ডর নেই যেতে ডর! চল, আমি যাচ্ছি। ফির কভি এখানে আসবি না।' লণ্ঠনটা একহাতে ধরে অন্য হাতে অনিমেষকে টানতে টানতে কবুতরী হাঁটতে লাগল। কয়েক পা এগোতেই বাঁ দিকের রকে চোখ যেতে চমকে উঠল অনিমেষ। একটা শুকনো মুখ ফোকলা দাঁতে হাসছে। তার চোখ দুটো খুব বড়, সমস্ত চামড়া ঝুলছে। দুটো শুকনো পায়ের ফাঁকে মুন্ডুটা ঝোলানো যেন, উবু হয়ে বসে আছে। বোধ হয় কেউ সরিয়ে না দিলে নড়তে পারে না। হ্যারিকেনের আলো ওর মুখ থেকে সরে যাবার আগেই সেই ক্যানকেনে গলাটা বেরিয়ে এল ফোকলা মুখ থেকে, 'ক্যারে, বিয়ে দেখলি? অ্যাঁ?'

বুকের ভিতর হিম হয়ে যায় আচমকা। হাঁটতে হাঁটতে কবুতরী বলল, 'ডরো মৎ। ও বহুৎ ভাল বুড়ি আছে। ও আমাদের দেখভাল করে।' হোঁচট খাওয়ার জায়গাটায় এসে অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ল। লণ্ঠনের আলো গলির ভিতর নাচতে নাচতে যাচ্ছে। ব্যাকুল চোখে ও চারধারে খুঁজতে লাগল। সব জায়গায় আলো যাচ্ছে না, বইটা কত দূরে যেতে পারে? কিছু-দূরে এগিয়ে থমকে দাঁড়াল কবুতরী, 'কি হল, খাড়া হয়ে গেলে কেন?' আর ঠিক তখনই ও দেখতে পেল রাস্তার পাশে নর্দমার গায়ে নরম পাঁকের ভিতর বর্শার মত গেঁথে আছে বইটা। একছুটে অনিমেষ বইটাকে তুলে নিল। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা কাদামাখা জল গড়িয়ে পড়ল নিচে, তলার দিকটা কাদায় ভিজে কালো হয়ে গিয়েছে। নতুন স্যার কি বলবেন ওকে? হাত দিয়ে মলাটের কাদা মুছতে গিয়ে কাগজটা আরো কালো কালো হয়ে গেল। আলোটা বেড়ে গেলে ও দেখল কবুতরী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কি ঢুঁড়ছ? কার কিতাব?' অনিমেষ বলল, 'আমার পড়ে গিয়েছিল এখানে। কাদা লেগে গেছে।' লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে কবুতরী হঠাৎ বইটা টেনে নিল। উবু হয়ে বসে মলাটের ওপর পাগড়ী মাথায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিটা খানিকক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কি এই কিতাবের?' অনিমেষ বলল, 'আনন্দমঠ।' বইটা খুলে পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে কবুতরী বলল, 'জাদা নষ্ট হয়নি।' শেষ পাতায় কিছুটা কাদা ছিল, আঙুলে দিয়ে সেটাকে মুছতে খানিকটা দাগ হয়ে গেল। বইটা ফেরত দিয়ে কবুতরী জিজ্ঞাসা করল, 'এখন মুছলে আরো খারাপ হয়ে যাবে। শুখা হয়ে গেলে সাফ করো।'

শেষ পাতাটা খোলা ছিল বইটার। ওপরের কাদার দাগের নিচে শেষ লাইনটা জলে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনিমেষ হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় অনেক চেষ্টা করে লাইনটা পড়ে ফেলল—'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

লাইনটার মানে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না।

(ক্রমশ)

আপনার শিশুর প্রথম শক্ত আহার

নেস্টাম
বেবী সিরিয়েল
যাতে আছে চাল-এর পুষ্টি

তা ছাড়া
১১টি ভিটামিন
ও লৌহ উপাদান

আপনার শিশুকে শক্ত আহার দেবার সময় হলে তাকে দিন সুস্বাদু চাল-এর পুষ্টি। এই শক্ত আহারে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থ এবং ১১টি ভিটামিন ও লৌহ উপাদান।

নেস্টাম ক্রীম অফ রাইস সুষম শক্ত আহার। তাছাড়া হজম করাও সহজ।

২ মাস বয়স থেকে বেড়ে ওঠার জন্য প্রত্যেক শিশুর প্রয়োজন সুষম শক্ত আহার—নেস্টাম বেবী সিরিয়েল।

আপনিও ২ মাস বয়স থেকেই আপনার শিশুকে নেস্টাম দিতে আরম্ভ করুন। নেস্টাম-এ আছে পুষ্টি, নেস্টামে-এ আছে স্বাস্থ্য।

স্বাদে ও সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্য নেস্টাম দুধে মিশিয়ে খেতে দিন।

সর্বাধিক মূল্য
৭.০০ টাকা
স্থানীয় কর
আলাদা

ফোটানো দুধ ঢেলে দিন

দুধে নেস্টাম মিশিয়ে দিন

এবার খেতে দিন

সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্য
সুষম এ আহার
দুধে মিশিয়ে খেতে দিন

নেস্টাম বেবী সিরিয়েল

NBC/CAS-2/78 BEN

খেলা

সেই গোরা শ্যামের বাঁকা গোল

গত ৬ আগস্ট ইস্টবেঙ্গলকে ১—০ গোলে হারাবার পরই মোহনবাগান ১৯৭৮-এর লীগ জয়ের প্রথম অনুষ্ঠান হিসাবে আকাশে সবুজ-মেরুন পতাকা উড়িয়ে দিতে পারত। আর দুটি পয়েন্টের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হত না। চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য প্রয়োজনীয় পয়েন্ট করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত পতাকা তোলার রীতি নেই বলে সেদিন চ্যাম্পিয়ন দলকে আনুষ্ঠানিক কাজটা সারতে হয়েছে মনে মনে। তবে মোহনবাগানের বিপুল সমর্থকদের আনন্দের জোয়ারে কিন্তু ভাটা পড়েনি। হাতে হাতে পতাকা উড়েছে, গ্যালারিতে হাতে হাতে জ্বলে উঠেছে জয়ের মশাল। জয়ও তো একটি নয়, দুটি—লীগ এবং মর্যাদার লড়াই। ইস্টবেঙ্গলের কাছে ওই খেলায় হারলেও হয়তো মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হত। কিন্তু সে আনন্দ কি হত এত মধুর!

অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ওই খেলায় জিতলে কী হত? গর্ব করে বলতে পারত—লীগ না পেলেও চ্যাম্পিয়ন দলকে হারিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি, আমরাই শ্রেষ্ঠ দল। যখন পর পর দুটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল তিনটি পয়েন্ট হারিয়েছিল উয়াড়ি ও পোর্ট ট্রাস্টের কাছে তখনই ইস্টবেঙ্গলের বিপুল সমর্থকদের লীগ জয়ের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। তবু উৎসাহ উদ্দীপনা জীইয়ে ছিল বড় খেলাটিকে কেন্দ্র করে। যদি মোহনবাগানকে হারাতে পারে অন্তত মুখরক্ষা হবে। সেই আশা আরও রংগীন হয়ে উঠেছিল স্টার স্ট্রাইকার সাবির আলীকে খেলানোর অনুমতি মেলায়। কিন্তু সাবির খেলা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল মর্যাদার লড়াইয়ে হেরে গেল মোহনবাগানের কাছে।

মোহনবাগান যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে এবং এবার নিয়ে ১৬ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে একধাপ এগিয়ে গেছে। এতদিন চ্যাম্পিয়নের খেতাবে দুই দল পনেরো-পনেরোয় সমান ছিল। তবে মর্যাদার খেলায় জয়ের হিসাবে ইস্টবেঙ্গল এখনো অনেক এগিয়ে আছে। ১৯২৫ থেকে এ পর্যন্ত লীগে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ৮৯ বার। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের জয় ৩৪ বার, এবার নিয়ে মোহনবাগানের ২৫ বার। দুই দলের জয়ের সংগে একটি করে 'ওয়াক ওভার' ধরলে ইস্টবেঙ্গলের ৩৫, মোহনবাগানের ২৬।

লাল-হলুদ রং সম্পর্কে মোহনবাগানের অ্যালার্জি চিরদিনের। এবারও ছিল। ৬ আগস্টের খেলার আগেও ছিল আত্মবিশ্বাসের অভাব। যে দল প্রতিটি খেলায় দাপটে জিতে চলেছে সে দল জোর দিয়ে বলতে পারেনি—'ইস্টবেঙ্গলকে আমরা হারাবই'। কিন্তু সংগ্রামক্ষেত্রে দেখা গেল সবুজ-মেরুনেরই বেশি দাপট। খেললোও সুরে বাঁধা সুসমঞ্জস একটি বাদ্যযন্ত্রের মত। খেলাটির আলোচনায় আমি পরে আসছি। তার আগে বলে নিই, মাঠের মধ্যে মোহনবাগানের যে ক্রীড়াবিন্যাস সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছে একটু দুর্বোধ্য মনে হয়েছে এবং মাঠের বাইরে, খেলার আগে দুই দলের যে আচরণ সকলের ধিক্কার কুড়িয়েছে সেই সম্পর্কে দু-চার কথা।

প্রথম ক্রীড়াবিন্যাস সম্পর্কে। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী তিন পয়েন্ট পিছিয়ে আছে এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অগ্রগামী দল ১—০ গোলে এগিয়ে গেছে সেখানে নেতিমূলক খেলা কেন? ভাগ্যিস মোহনবাগানকে তার মাশুল গুণতে হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার পর মোহনবাগান রক্ষণাত্মক ক্রীড়াবিন্যাসে বেভাবে

ফটো তারাপদ ব্যানার্জী

খেলার আগের দিন ক্লাব-তাঁবু থেকে বেরিয়ে স্কুটারে চড়ে যাচ্ছে শ্যাম

ফটো তপন দাস

রেফারি সুধীন চ্যাটার্জী মাঠ থেকে বেরিয়ে [illegible]

নজেদের গণ্ডিতে নিয়েছিল এবং ইস্টবেঙ্গল যেভাবে চেপে ধরে আক্রমণ চালাচ্ছিল তাতে গোলটি শোধ হয়েও যেতে পারত। তা হলে প্রথমার্ধে অত দাপটে খেলা সত্ত্বেও মোহনবাগানকে আপসোস করতে হত। অ্যাটাক ইজ দি বেস্ট ডিফেন্সের নীতি থেকে সরে আসার আমি কোন অর্থ খুঁজে পাইনি।

এখন মাঠের বাইরে দুই দলের আচরণের কথা, যার জন্য (১) মাঠের মধ্যের হাজার পঁয়ত্রিশ দর্শক ও মাঠের বাইরের হাজার হাজার ধারাবর্ণনা-শ্রোতা ও টেলিভিশনের দর্শককে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়েছে, (২) নির্দিষ্ট সময়ের ৫০ মিনিট পরে খেলাটি আরম্ভ হয়েছে, (৩) রেফারি ও লাইন্সম্যান দুবার মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, (৪) শ্রোতারা শেষ ১৫ মিনিট খেলার ধারা বিবরণী শুনতে পাননি এবং (৫) শেষ ৮ মিনিট খেলা হয়েছে ফ্লাড লাইটে।

কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি, যদিও যে কারণে এই ঘটনা সে কারণ আগেও ছিল। থাকবেও হয়তো চিরকাল।

কারণটি কি? কুসংস্কার বা মনের বাতিক। চিরদিন দেখে আসছি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় কোনো দল আগে মাঠে নামতে চায় না। এ-পক্ষ ভাবে ওরা আগে নামুক, অন্য পক্ষ ভাবে আগে নামুক ওরা। দুই দলেরই ধারণা, আগে যে দল মাঠে নামবে তারা হেরে যাবে। যখন দুই ক্লাব একই মাঠ (এখনকার ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠ) ভোগ দখল করেছে এজমালীভাবে এবং দুটি ক্লাব-তাঁবু ছিল পাশাপাশি, তখন দেখেছি, মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তারা লক্ষ করেছেন ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা তাঁবু থেকে বের হচ্ছে কিনা। আবার ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা লক্ষ রেখেছেন মোহনবাগান খেলোয়াড়রা কখন বের হয়। তাঁবু থেকে বের হবার পরও কিন্তু কোন দল মাঠে যায়নি। পাশের ছোট্ট লনে বল পেটাপেটি করেছে। তখনো দুই পক্ষ লক্ষ রেখেছেন। তারপর মাঠের দিকে পা বাড়িয়েও গ্যালারির মাঝখানটার প্যাসেজে অপেক্ষা চলেছে, কর্মকর্তারা উঁকি ঝুঁকি মেরেছেন। শেষ পর্যন্ত এক দল আগে মাঠে নেমে পড়েছে। অপর দল নেমেছে পরে।

এবার আগে মাঠে নামা নিয়ে দুই দলের এত দ্বিধার কারণ সম্ভবত গত বছর শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল আগে মাঠে নেমেছিল এবং হেরে গিয়েছিল। তাই তারা সঙ্কল্প করে এসেছিল কিছুতেই আগে মাঠে নামবে না। মোহনবাগানেরও প্রতিজ্ঞা ছিল—'আগে নামব না।'
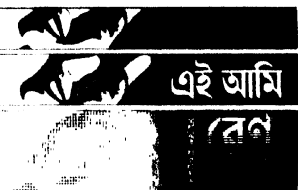
হ্যাঁ, আমি প্রতিজ্ঞাই বলব। না হলে ৫০ মিনিট পরে খেলা আরম্ভ হবে কেন? কেনই বা ভি আই পি-দের সমাধানসূত্র মেনে নিয়ে দুই দলের অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জী ও সুরজিৎ সেনগুপ্তকে এক সঙ্গে মাঠে নামতে হল? দুই অধিনায়ক মাঠে নামার পরেও কিন্তু পুরো দলটির আগে নামা নিয়ে দ্বিধা ছিল। টাচ-লাইনের বাইরে বল মারামারি চলছিল। হয়তো হোম ক্লাব বলেই শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান আগে নামল, ইস্টবেঙ্গল নামল দু মিনিট পরে। সংস্কার ও বাতিক বহু মানুষেরই আছে। কিন্তু একটা কুসংস্কারের মোহে খেলোয়াড়রা মানুষের ধৈর্যের উপর কতখানি অত্যাচার করেছেন ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করব।

দুই অধিনায়কের একই সঙ্গে মাঠে নামা যেমন নতুন ঘটনা, তেমন আগেই লিখেছি, কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে ঘটনাটি এক দুষ্টিকটু দৃষ্টান্ত। কল্পনা করা কঠিন, এত বড় একটি খেলায় রেফারি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বার বার বাঁশী বাজাবেন, খেলাবেন না বলে দুবার মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবেন, বেতার ও দূরদর্শনের ধারা-বর্ণনাকারীরা মুখের সামনে মাইক রেখে কেন খেলা আরম্ভ হচ্ছে না তার বর্ণনা শোনাবেন।

বিকাল ৪টার খেলা আরম্ভের কথা। রেফারি ও লাইসম্যানরা বেশ একটু আগে উপস্থিত হলেন। দল না নামলেও তাঁরা মাঠে নেমে মাপজোক দেখা ও জাল পরীক্ষা সারলেন ৩টা ৫৭ মিনিটের মধ্যে। তারপর মাঠের মধ্যে তাঁদের প্রতীক্ষা শবরীর প্রতীক্ষার মত হয়ে উঠল। রেফারি সুধীন চ্যাটার্জী মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করলেন। ২৮ মিনিট অপেক্ষা করার পর তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে এলে ক্যালকাটা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক সন্তোষ সেন তাঁকে বুঝিয়ে আবার মাঠের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তার পরেও টিম নামার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। দুই মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী ও প্রভাস রায় খেলোয়াড়দের বুঝিয়ে মাঠে আনতে চেষ্টা করে বুঝলেন ওটা খেলার মাঠ, রাইটার্স বিল্ডিংস নয়। রসাত্মক সমালোচনা ও কটাক্ষ চলতে লাগল। কেউ বললেন—'বরপণ বাকী আছে।' কারো টিপ্পনি—'ওরা তো বর, কনে পক্ষকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে।' কেউ বললেন—'পয়েন্ট ভাগাভাগির ফয়সালা এখনো হয়নি।' কারো মন্তব্য—'টস করে ঠিক করা হোক কোন দল পরে নামবে।' প্রশ্ন উঠল রেফারির কতক্ষণ অপেক্ষা করার নিয়ম। ৪টা ৩৮ মিনিটে অর্থাৎ ৪৩ মিনিট অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয়বার রেফারি ও লাইসম্যানরা বেরিয়ে এলেন। এবার তাঁদের গ্রেপ্তার করার মত অবস্থায় অথচ আপ্যায়ন করে কয়েকজন পুলিস ধরে নিয়ে গেল আবার মাঠের মধ্যে, সম্ভবত হোম সেক্রেটারি রথীন সেনগুপ্তর নির্দেশে।

পরিস্থিতিটা বোধ হয় মন্ত্রীদের এবং হোম সেক্রেটারিকে বেশী উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কারণ এই

আপনি কি আপনার পায়খানা সম্বন্ধে সামান্য লজ্জিত?
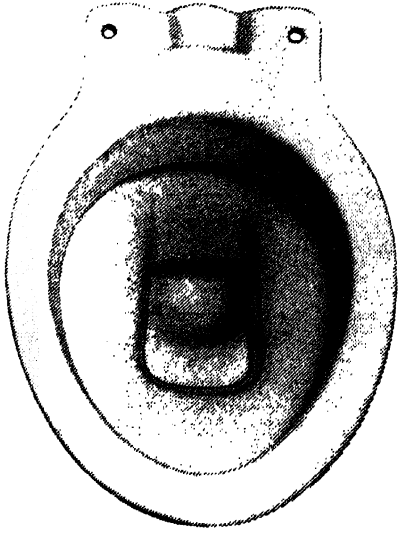
আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিজেদের পায়খানার হাল সম্বন্ধে বিব্রত বোধ করেন। বিব্রত বোধ করাই সবটা নয়। তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হল :

নোংরা পায়খানায় রোগের জীবাণু জন্মায় আর সেখান থেকে রোগ সংক্রামিত হয়। ময়লা পায়খানা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।

সেই জন্যে অবহেলা করবেন না। আপনি কি একেবারে নিশ্চিত জানেন যে, আপনার পায়খানা পরিষ্কার? রোজ সকালে মেথর এলেও সে কি তার কাজ পুরোপুরি করছে? কিম্বা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাচ্ছে? এসব ব্যাপারে আপনি আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে ব্যবহার করুন—স্যানিফ্রেশ।

স্যানিফ্রেশ—পায়খানা পরিষ্কার করার শক্তিশালী পদার্থ।

স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে :

১. স্যানিফ্রেশ সব দাগ উঠিয়ে দেয়

স্যানিফ্রেশ আপনার পায়খানা পুরোপুরি পরিষ্কার করে। এতে রয়েছে এমন জোরালো পরিষ্কার করার পদার্থ যা খুব শক্ত দাগও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এমনকি মরচের দাগও উঠে যায়। ফলে আপনার পায়খানা পরিষ্কার হয়ে ঝকঝক করে।

২. স্যানিফ্রেশ রোগজীবাণু দূর করে

নোংরা পায়খানা সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক, কারণ সেখানে রোগের জীবাণু জন্মায়। সাধারণ 'ফিনাইল' যা রক্ষা করতে পারে না স্যানিফ্রেশ তা রক্ষা করে—আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

৩. স্যানিফ্রেশ দুর্গন্ধ দূর করে।

বিশেষ ক'রে যে পায়খানায় হাওয়া-বাতাস খেলে না সেখানকার দুর্গন্ধ তো যেতেই চায় না। সেই জন্যে স্যানিফ্রেশে রয়েছে এমন অত্যন্ত কার্যকর দুর্গন্ধনাশক পদার্থ যা হাওয়া নির্মল ক'রে তোলে আর বদ গন্ধ দূর করে।

স্যানিফ্রেশ ব্যবহার করা খুবই সহজ

বিশেষ কিছু করতে হয় না বললেই চলে। প্রথমে পায়খানায় জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার গামলার মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন। ৩-৪ ঘণ্টা ওই ভাবে রেখে দিন। আরও ভাল হয় একরাত রেখে দিলে। তারপর জল ঢেলে দিন। তাতে যদি তেমন পরিষ্কার না হয় তাহলে একবালতি জল জোরে ঢেলে দিন। তারপর দেখুন আপনার পায়খানা কেমন ঝকঝকে পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার?
নিয়মিত—প্রত্যেক দিন ব্যবহার করুন।
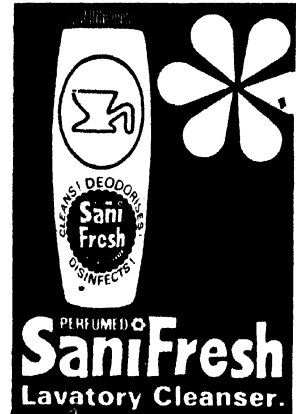
নকল হইতে সাবধান!
প্যাকের ওপর
স্যানিফ্রেশ
নাম দেখে নিন।
এ হলো —বালসারার
সেরা কোয়ালিটির গ্যারাণ্টী

স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

BALSARA বালসারা অ্যান্ড কোম্পানী (প্রা.) লি.
৪১ নাগীনদাস মাস্টার রোড বোম্বাই ৪০০ ০২৩।

CHAITRA-BLS-85 BEN REV

চেরেও হয়তো বড় ঝাক্ক সামলাতে হত খেলা না হলে শান্তি-শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখার প্রশ্নে। তাঁদের চেষ্টায় এবং সমাধানসূত্রে শেষ পর্যন্ত খেলাটি হতে পেরেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য একটি সমস্যা দানা বেঁধে উঠেছে। অন্য ক্লাব যদি বড় ক্লাবদের মত আচরণ করে তখন কী হবে?

ফুটবলের আইনে রেফারিকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তার কোন বিধান নেই। কারণ যারা আইন প্রণয়ন করেছেন এমন ঘটনা হতে পারে তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি। ফুটবলের সাংগঠনিক নিয়মে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষা করার সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। আই এফ এ'র নিয়মেও ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ আছে এবং বলা আছে উপযুক্ত আলোর মধ্যে খেলাটি যাতে শেষ করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু মোহনবাগান মাঠে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা আছে সেহেতু আলোর অভাবের প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু ১০ মিনিটের জায়গায় ৪০ মিনিট অপেক্ষা করার পর রেফারি সুধীন চ্যাটার্জী যদি খেলাটি পরিচালনা না করে চলে আসতেন তা হলে কি তাঁকে দোষ দেওয়া যেত?

সুধীনের সঙ্গে এবং রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, এত বড় একটা খেলা যার ব্যবস্থা করা বেশ শক্ত এবং ওই খেলা না হলে শান্তি-শৃংখলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে এই সব বিবেচনা করেই তাঁরা সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। না হলে প্রহসনমূলক আচরণ বরদাস্ত করার কথা নয়।

ওই খেলাটির প্রশ্নে চুনী গোস্বামীর সঙ্গে আমার ছোট একটু তর্ক হয়ে গেছে। চুনী বললেন, এর জন্য রেফারিই দায়ী। তাঁবুতে এসে দুটি দলকে সঙ্গে করে তাঁর মাঠে নামা উচিত ছিল, যেভাবে বিদেশে দল নামে। আমি বললাম, সে নিয়ম তো এখানে চালু হয়নি। আর [illegible] বা কেন? তাদের নিজেদের তাঁবু থেকেই তো পোশাক পরে আসেন। তা ছাড়া অনেক ঐতিহ্যের অধিকারী দুটি দল এমন আচরণ করবে তাও তো রেফারির জানা ছিল না।

যাই হোক, এখন বিদেশের মত নিয়ম করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ডুরান্ড কমিটি ইতিমধ্যেই নিয়ম করেছে। ডুরান্ডে রেফারি দুই দলকে একসঙ্গে নিয়ে মাঠে নামেন। খেলা আরম্ভের নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৫ মিনিট আগে দুই দলকে এক জায়গায় রেফারির সঙ্গে মিলিত হতে হয়। অচিরে আই এফ এ-রও এমন একটা নিয়ম করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তবে এত ঘটনার পরও মোহনবাগান দু মিনিট আগে মাঠে নেমে যখন জিতে গেছে এবং দু মিনিট পরে নেমে হেরে গেছে ইস্টবেঙ্গল তখন কোন দলেরই কুসংস্কার আঁকড়ে রাখা উচিত নয়।

সংস্কারমুক্ত হয়েছে বোধ হয় খেলার ভাগ্যনিয়ন্তা শ্যাম থাপাও। খেলার আগের দিন কাউকে ছবি তুলতে না দেওয়ার সংস্কার শ্যামকে পেয়ে বসেছিল। এই খেলার আগের দিন আনন্দবাজার ও দেশ-এর ফটোগ্রাফার শ্যামের ছবি তোলার চেষ্টা করতেই শ্যাম আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমি খেলার আগের দিন ছবি দিই না। ফটো তুলবেন না।' সাংবাদিকরা সংবাদ আর ফটোগ্রাফরা ফটোর সাবজেক্ট পেলে কারো বারণ শোনেন? ফটোগ্রাফার শ্যামের ছবি তুলতেই সে মনমরা হয়ে গেল। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ক্লাব থেকে স্কুটার চালিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে শ্যাম থাপা। ফটোগ্রাফারকে কিছুই বলেনি। পরে বন্ধুদের কাছে বলেছে—'আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। খেলার আগের দিন ছবি নিয়ে নিল।'

সেই শ্যাম ওই খেলায় এমন একটি গোল করে মোহনবাগানকে জিতিয়ে দিয়েছে, যে গোল দেখা যায় কালেভদ্রে এবং যেমন একটি গোল করা ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় শ্যামের সাম্প্রতিক কালের গোলগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে। ৭৫-এ ইডেনে লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শ্যামের গোল, ওই বছর শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আরও দুটি, ৭৭-এর শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের পক্ষে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে একমাত্রটি—সবই যেন চোখে ভাসছে। নিঃসন্দেহে লঘু পায়ের ছোট কাজে পাঁচ-ছয় জনকে কাটিয়ে ৭৫-এ লীগের গোলটি ছিল অনবদ্য। কিন্তু ৬ আগস্টের বাইসাইকেল ব্যাক ভলিতে এমন গোল কটি দেখেছি? বোধ হয় মেওয়ালালের পর আর কেউ করতে পারেনি। শ্যামের ব্যাক কিকের গোলটিকে কী অ্যাখ্যা দেব? গৌরবর্ণ শ্যামের বাঁকা গোল?

খেলার সূচনায় ওই ধরনের আর একটি কিক নিয়েছিল শ্যাম থাপা সুভাষ ভৌমিকের সেণ্টার করা বল থেকে। বাধা দেবার কেউ ছিল না। গোলটি না হওয়ায় প্রেস বক্স থেকে আমরাই সমালোচনা করেছিলাম—বলেছিলাম বুকে বল ধরে একটু দেখে কিক করলে নিশ্চয়ই গোল হত। দ্বিতীয়ার্ধের ৮ মিনিটে প্রায় একই ধরনের বাইসাইকেল ব্যাক কিকে খেলার একমাত্র গোলটি করে বুঝিয়ে দিল তার নাম শ্যাম থাপা। এবারও বলটি দিয়েছিল সুভাষ। তবে ইস্টবেঙ্গলের স্টপার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মাথা ছুঁয়ে এবং হাবিবের সুনিয়ন্ত্রিত মাপা হেডে বলটি পৌঁছেছিল উলটো দিকে মুখ করে দাঁড়ানো শ্যামের সামনে। পরের কাজটুকু ছবি হয়ে ফুটে আছে ফুটবল রসিকদের মনে।

স্বাভাবিক কারণেই শ্যাম ম্যান অফ দি ম্যাচ-এর সম্মান পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে আমি ম্যান অফ দি ম্যাচ বলব, ইস্টবেঙ্গলের স্টপার মনোরঞ্জনকে। ছোট খেলায় মনোরঞ্জন অনেক বিক্রমের পরিচয় দিয়েছে। বড় খেলায় এই বোধ হয় প্রথম এবং কখন? যখন মোহনবাগানের আক্রমণের ঢেউয়ে প্রবল গতি।

মুকুল

প্রকাশিত হল

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

একটি বিচিত্র স্বাদের বই

পালকি চলে দুলকি তালে

দাম ৫৲

একদা এই কলকাতাতেই পথ কাঁপিয়ে হমব্রাহো হমব্রাহো করে চলত পালকি। সেই পালকি যে কত রোমান্টিক হতে পারে, তার অনেক বিচিত্র কাহিনী ও ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। দাদু নাতনী সকলেই এই পালকি চড়ে কলকাতা পরিক্রমা করতে পারবেন।

এই লেখকের আরো দুটি বই এখনই পড়ে দেখা দরকার। ডিহি কলকাতা থেকে বাবু গৌরবের কলকাতায় পৌঁছুতে গেলে এবই অবশ্য অপরিহার্য।

ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে
দাম ১৩৲

বাবু গৌরবের কলকাতা
দাম ১৬৲

নাট্যকার দীনবন্ধুকে নিয়ে এই লেখকের রয়েছে আরেকটি অসামান্য গ্রন্থ। নবজাগরণের বিস্তৃত পটভূমি, মানবিকতাবাদের ব্যাখ্যা এবং সেই আলোকে সমস্ত নাটকের ওপর বিশদ আলোচনা। একালের সমালোচনার ইতিহাসে এটি যেমন একটি উল্লেখ্য সংযোজন, তেমনি লেখককে এটি এনে দিয়েছে গবেষকের সম্মান।

নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক
দাম ২২৲

অমরেন্দ্র দাস —এর
(সম্পাদনায় শিউলি দাস)

রাজনারায়ণের কলকাতা
দাম ২৫৲

আনন্দ রায় সম্পাদিত

বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ

দাম ১৫৲

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম প্রাণপুরুষ বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং সমালোচকদের লেখা নিয়ে একটি মূল্যবান দলিল। ইতিপূর্বে বুদ্ধদেব বসুর উপর এই ধরনের সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নি।

ডঃ অমরেন্দ্র গনাই-এর

বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার ও শরৎচন্দ্র

দাম ১০৲

শরৎচন্দ্রের শিল্প ব্যক্তিত্বে পূর্ববর্তী কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের উত্তরাধিকার ও প্রভাব নির্ণয় এবং শরৎচন্দ্রের ভাষা শিল্পের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ।

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র

বীরেন্দ্র দত্ত

দাম ১০৲

শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের বাসভূমি ছিল পানিত্রাস। গ্রামটির সঙ্গে তাঁর ছিল রক্তের আত্মীয়তা। এই গ্রন্থে পানিত্রাসের পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত প্রত্যেকটি কাহিনী, ঘটনা, অন্যান্য প্রসঙ্গ শরৎ-অনুরাগীদের কাছে প্রথম উপস্থাপিত। পরিণত বয়স, মন ও মনন একজন শিল্পীর কাছে, তাঁর এই বাসভূমির পরিবেশ ও সর্বস্তরের মানুষজন কোন কোন দিক থেকে প্রভাবিত করে তাঁর শিল্পীমনের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাকে 'হয়ে ওঠার' পথে সহায়তা করেছে, ব্যক্তি ও শিল্পী কি ভাবে একাত্ম হয়েছেন তারই পরিচয় আছে এ গ্রন্থে।

কমলকুমার সান্যাল

বাংলা নাটক সমীক্ষা

দাম ১০৲

বাংলার সামাজিক পট পরিবর্তনের পটভূমিকায় বাংলা নাটকের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণটি পরিবেশন। লেখকের অনেক মন্তব্য মনুকের মত।

বরুণ সেনের

কালো টাকা

দাম ১০৲

কংগ্রেস শাসনকালে কংগ্রেস শাসনে সাধারণ লোককে বঞ্চিত করে কালো টাকা বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে কিভাবে বেড়েছে? সেই বিশেষ গোষ্ঠী কারা এবং কাদের সঙ্গে তাদের যোগসাজস ছিল।

এই লেখকের

গরিবী হটাও
দাম ১৫৲

ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীবের

খেলাধূলার নেপথ্যে

দাম ১০৲

গ্রামের ছেলেমেয়েদের কিভাবে ধোঁকা দেওয়া হয়। সরকারী টাকা খেলোয়াড়দের হাতে পৌঁছবার আগেই অদৃশ্য। খেলায় দুর্নীতির অচলায়তন ভাঙার ক্ষমতা ক্রীড়া পরিষদের নেই। পাঞ্জাবে খেলাধূলা চলেছে মাঠে মাঠে। বাংলায় শুধু লে ধূলা জমানোর খেলা। ক্রীড়ামন্ত্রী কীম চাইলেন; পেলেনও। অবশেষে বললেন, 'কিস্সু করার জো নেই।' খেলাধূলায় ... শিক্ষার্থ মন্ত্রিসভার সাতশো তিরিশ দিন দশটি জেলায় ক্রীড়া অফিসার নেই।

এই লেখকের দুটি বই

স্মরণীয় খেলা বরণীয় খেলোয়াড় দাম ৯৲

পদ্মা আমার মা গঙ্গা আমার মা দাম ১২৲

নিখিল চন্দ্র সরকারের

নদী যখন সাগরে

দাম ২০৲

অনেক দুঃখ ভুল ভ্রান্তি পেরিয়ে মানুষ কিভাবে একসময় বিরাট অথচ সহজ এক উপলব্ধিতে পৌঁছোয়, এ উপন্যাস ঠিক তাই। লেখক গভীর মমতা আর সহানুভূতি দিয়ে সুন্দরবনের জল মাটি আর মানুষের ছবি এঁকেছেন। সার্থক কি ব্যর্থ, তার বিচার পাঠকদের ওপর। তবে হালফিলের ধারায় এ যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম তা সহজে বলা যায়।

সাংবাদিক

নিশীথ দে'র

পালাবদলের নায়ক

দাম ১২৲

কে সেই নায়ক? পশ্চিমবাংলায় চল্লিশ বছরের রাজনীতির নায়ক আজকের কর্ণধার জ্যোতি বসু। সাতান্ন বছর রাজনীতির উত্থান পতনে নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন প্রফুল্ল সেন। পালাবদলের নায়ক'এর নায়ক এরাই।

এই লেখকেরই আরেকটি বই —

জয়প্রকাশ
দাম ৬৲

সম্রাট সেনের

সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত

দাম
১ম ১৮৲
২য় ২০৲

সম্রাট সেন বাংলা উপন্যাস জগতে এক অনায়াস উচ্চারিত নাম। তার লেখায় কাব্য বোধ ও পরিমিতি বোধ সর্বোপরি চরিত্র চিত্রন নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত। এক ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ কামনা বাসনা, লোভ হিংসা ও বিরহ-মিলনের এক অনবদ্য খতিয়ান। নবতম ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত।

এই লেখকেরই

নেপথ্যে নাটক
দাম ১১৲

সাংবাদিক ধ্রুব মজুমদারের

সাংবাদিকের সংবাদ

দাম ১২৲

সত্যযুগ: সাংবাদিক জীবনের তথ্যচিত্র। একমাত্র দিবারাত্র মদ্যপান করা ছাড়া সাংবাদিকরা আর কোনও কাজ করে—এই বই পড়ে তা মনে হবে না।

যুগান্তর: সাংবাদিকদের নিয়ে ভর্দিষ্ট রচনা। সাংবাদিকদের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসের মত। সত্য যাঁদের কাছে অপ্রিয়, এ গ্রন্থের নায়ক কান্তিপদ ওরফে ধ্রুব মজুমদার ও তাঁদের চোখে অপ্রিয় হয়েই ধরা পড়বে।

এই লেখকের কৈলাস মানস সরোবর ভ্রমণ কাহিনী

সো মাডাং ৯৲

বাংলা ভাষায় এই জাতীয় দুঃসাহসিক বই প্রথম প্রকাশিত হল।

পৃথ্বীরাজ সেনের

প্রচণ্ড চাঞ্চল্যকর বই

কেস অফ পয়জন

দাম ১২৲

সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কুড়িটি জঘন্য বিষ-হত্যার গোপন ও কলঙ্কিত দলিল।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাওয়ার অফ সাইলেন্স ১৫৲

চিরঞ্জীব সেনের

হেডলাইন

দাম ১২৲

দুশো বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র যে সব খবর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে খবরের হেড লাইনের মর্যাদা অর্জন করেছিল তা থেকে চল্লিশটি খবরের সংকলন।

এই লেখকেরই

ইলেকট্রো যৌবনা
দাম ১০৲

সামুয়েল

আমার স্বর্গ আমার সুখ ৮৲

বাণিক রায়

কালো গান ৭৲

সমরজিৎ কর

সমুদ্রের চোখ ১২৲

জাঁ গ্রুশ ৮

ডেড সাইলেন্স

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৲

টুকুনের অসুখ

রত্না সেনদত্ত

দর্পণে একাকী ৮৲

গোবিন্দ বর্মণ

স্নানঘর ১০৲

নীরু চট্টোপাধ্যায় ৯৲

নীল প্রতিহিংসা

ফ্রাঙ্কিয়েন হো ১১৲

কুহকিনি কুগতী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

পলিটিকস অ্যান্ড দি নভেল ইন ইনডিয়া। সম্পাদক যোগেন্দ্র (ভোগেন্দ্র?) মালিক। প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যান। দাম ৫৫ টাকা।

ইংরেজী ভাষায় রচিত এই প্রবন্ধ সংকলন-গ্রন্থের লেখক—কারলো কোপ্পোলা (পলিটিকস অ্যান্ড দি নভেল ইন ইন্ডিয়া : এ পারস-পেকটিভ), এম কে নায়েক (দি পলিটি-ক্যাল নভেল ইন ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ), ওয়াই কে মালিক (কনটেম-পোরারি পলিটিক্যাল নভেলস ইন হিন্দী), সুরজিৎ সিং দুলাই (দি পলিটিক্যাল নভেল ইন পাঞ্জাবী) এম এল আপ্তে (দি পলিটিক্যাল নভেল ইন মারাঠী), ভবানী সেনগুপ্ত (দি পলিটি-ক্যাল নভেল অফ বেঙ্গল), ভি এন রাও (দি পলিটিক্যাল নভেল ইন তেলুগু), জি ভি গোপালন (দি পলিটিক্যাল নভেল ইন গুজরাট), এস এম পুনেকর (দি কানাড়া পলিটিক্যাল নভেল), মুনীবর রহমান (পলিটিক্যাল নভেল ইন উরদু)—মোট দশ জন।

লেখকদের নামের ঠিক তলায় যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে তা থেকে জানা যায় যে এঁরা প্রত্যেকেই অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে এম কে নায়েক ও এস এম পুনেকর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (করনাটক বিশ্ববিদ্যালয়) সঙ্গে যুক্ত। বাকি সবাই যুক্ত আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে ১৯৭৫ কিংবা তার সামান্য কিছু আগে।

সংকলন-গ্রন্থের সাধারণ রীতি এই যে, সম্পাদক শুরুতেই ভূমিকা লেখেন। কিন্তু এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন কারলো কোপ্পোলা। ভূমিকাটি পড়া মাত্র মনটা বিস্বাদ হয়ে যায়। অল্প জ্ঞান নিয়ে এবং স্বল্প পরিসরে (৫ পাতা) 'ভারতীয় উপন্যাস এবং রাজনীতি' সম্বন্ধে বিজ্ঞ মতামত কোপ্পোলা মহাশয়ের না দেওয়াই উচিত ছিল। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে উল্লিখিত রয়েছে যে তিনি নাকি হিন্দী বা উর্দু ভাষায় খুব অভিজ্ঞ। ভালো কথা! তা ঐ দুই ভাষায় ওপরই তো লিখতে পারতেন? তার বদলে কিছু জগাখিচুড়ি মতামত এবং হিন্দী ভাষার আলোচনা শেষে অন্য দু-তিনটি ভাষার লেখকদের নাম খুঁজে দেওয়ার কি প্রয়োজন? তাঁর লেখার ভঙ্গি মোটেই স্বচ্ছ নয়, ধরন-ও একেবারে এলোমেলো। পরাধীন ভারত, ইংরেজ, গান্ধীজী, মার্কসবাদী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধীন ভারত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভারত আক্রমণ, চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ থেকে একেবারে গিরীশ কারনাড—সব তিনি জড়ো করেছেন পাঁচটি পাতায়। সেই সঙ্গে তাঁর গালভরা মন্তব্য তো রয়েইছে। ফল কি দাঁড়াতে পারে পাঠক-ই ভেবে দেখুন!

সংকলন-সম্পাদক ওয়াই মালিক-এর 'হিন্দী ভাষায় রাজনীতিক উপন্যাস' সম্পর্কিত প্রবন্ধটি ভাল। সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য ব্যাপার এই যে, শ্রীমালিক তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত পাঠকের ওপর জোর করে চাপাতে ইচ্ছুক নন। প্রবন্ধকার শুরুতেই বলেন—'রাজনীতিক উপন্যাস' কথাটি তিনি ব্যাপক অর্থে (Broad Sense) ব্যবহার করতে চান। তাঁর মতে—কোনো বিশেষ আদর্শবাদ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো উপন্যাসে বিধৃত হয়, অথবা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবলম্বনে কিংবা পটভূমিকায় কিংবা তার বিচার-বিশ্লেষণ মূল্যায়ন করে যদি কোনো উপন্যাস লেখা হয়, তবে তাকেই রাজনীতিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া যাবে।

প্রবন্ধের শুরুতে তিনি একথা-ও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, স্বাধীনতার এতোগুলি বছর পরেও হিন্দী ভাষার লেখকরা দেশের রাজনৈতিক পরি-স্থিতির বিশ্লেষণ করে যথার্থ ভাল ও সার্থক রাজনীতিক উপন্যাস লেখার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি এখনো, পরিশেষে তাঁর আশা, ভবিষ্যতে হয়তো হিন্দী সাহিত্যের অপূর্ণ বিভাগটি পূর্ণ হয়ে উঠবে।

হিন্দী সাহিত্যের কিছু খোঁজ খবর আমরা রাখি। যে চৌদ্দ জন লেখক তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের প্রায় সকলের রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। একটু আতিশয্য কোথাও কোথাও দেখালেও, শ্রীমালিক এমন কোনো মারাত্মক মন্তব্য বা মূল্যায়ন করেননি, যা কিনা অতিশয় আপত্তিজনক বলে মনে হতে পারে। তবে, তিনি যে দুজন লেখককে অনেকখানি বেশী—প্রায় আট পাতা জায়গা দিয়েছেন, সেই গুরু দত্ত (৭০টি হিন্দী উপন্যাসের লেখক) এবং রাহী মাশুম রেজা সম্বন্ধে অতো কথা না বললেও চলতো, ব্যক্তিগত-ভাবে আমরা মনে করি, গুরু দত্ত ও রেজা সাহেবকে, তাঁদের যোগ্যতার চেয়ে বেশ কিছু বাড়তি মূল্য ধরে দিয়েছেন শ্রীমালিক।

পাঞ্জাবী, মারাঠী, তেলুগু, গুজরাটী, কানাড়া ও উর্দু ভাষায় রাজনীতিক উপন্যাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ-গুলি পড়তে বেশ লাগল।

এই 'বেশ লাগা' অবশ্য আমরা শুধুমাত্র রিডেবিলিটির দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছি। কারণ, কথাটা গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া ভাল, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষার মাধ্যমে উপরিউক্ত ছ'টি ভাষার নানাবিধ রচনার সঙ্গে আমরা সামান্য-মাত্র পরিচিত হলেও, মূল ভাষাগুলি কিন্তু আমরা জানি না। তাই উক্ত প্রবন্ধ গুলিতে প্রবন্ধকারেরা যে বক্তব্য রেখেছেন বা যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা সঠিক কিনা—ঐ ৬টি ভাষায় অজ্ঞতা হেতু আমরা সে সম্বন্ধে মতামত দিতে অক্ষম।

তবে, মেটের ওপর, লেখাগুলি ভারি আন্তরিক, বড় বড় বোলচাল দিয়ে সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা নজরে আসে না। হামবড়াই ভাব নেই বললেই চলে। এবং এমন কিছু আকাশ ছোঁয়া সদর্প দাবি তাঁরা করেন না যা কিনা পাঠকের কাছে দৃষ্টিকটু বা আপত্তিজনক।

আমরা কিন্তু হতবাক ভবানী সেনগুপ্তর 'বাংলা ভাষায় রাজনীতিক উপন্যাস' সম্পর্কিত প্রবন্ধটি [illegible]। অতিশয় নিম্নমানের এই লেখা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে সংকলনটির সব কিছু মর্যাদা। প্রবন্ধটি পড়ামাত্র আমাদের মনে যে ভাবটি জেগেছিল তা এই—সীমায়িত জ্ঞানসম্পন্ন কোনো চতুর লেখক অন্তঃসারশূন্য কথার ধুলো উড়িয়ে সাহিত্যের আসর জমাতে এসেছেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যও অতিশয় সন্দেহজনক।

হঠাৎ প্রগতিবাদী সাজ নেওয়া চতুর সুবিধাবাদী লেখকেরা যেমন লেখার শুরুতেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-এর 'নব-মূল্যায়ন' কিংবা 'পোস্টমর্টেম' মারফত কাদা ছিটিয়ে এগোন, ইনিও এগিয়েছেন সেই পথে।

তাছাড়া তিনি দুটি সম্পূর্ণ নতুন তথ্য দিয়ে রবীন্দ্র-গবেষকদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন—(১) জনকয়েক ইংরেজ বন্ধুর তারিফের ফলেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান; (২) রবীন্দ্রনাথ ১০০০টিরও কিছু বেশী ছোটোগল্প লিখেছেন কিন্তু কোনো গল্প পড়েই দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না।

ভবানী সেনগুপ্তকে জানাতে ইচ্ছে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বমোট ৮৭টি ছোটো গল্প লিখেছেন। এবং যদিও আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না যে, তাৎক্ষণিক রাজনীতির উপস্থিতিই ছোটো গল্পের সার্থকতার মাপকাঠি—তবুও এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য যে, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ অথবা পরিস্থিতির আভাস অত্যন্ত চমৎকার-ভাবে ও শিল্পসম্মত মহিমায় প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি ছোটো গল্পে। ভবানী সেনগুপ্ত মহাশয় কি রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা' বা 'মেঘ ও রৌদ্র'-র মতো অসাধারণ গল্প এখনো পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারেননি?

ভবানী সেনগুপ্ত লিখেছেন, বাংলা ভাষায় রাজনীতিক উপন্যাসের সংখ্যা খুব কম এবং মান অতিশয় শোচনীয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দুটি-একটি রাজনীতিক উপন্যাস লিখলেও সেগুলি নানা দোষে ভরা, অবৈজ্ঞানিক, অসার্থক রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়? তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু লেখা একেবারে যা তা! রাজনীতিক উপন্যাস-সৃষ্টিতে মানিকবাবু সম্পূর্ণ ব্যর্থ! তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়? তিনি তো প্রাচীন জমিদারী প্রথার সুখ-স্মৃতিতেই আকণ্ঠ নিমগ্ন। রাজনীতির উপন্যাস-সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তারাশঙ্কর-ও।

তাহলে কেউ কি সফল নন? বাংলা সাহিত্যের হেঁট মাথা কি আর সমুন্নত হবে না?

হয়েছে। ভবানী সেনগুপ্ত বলেন, সমুন্নত হয়েছে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে। একটি আগমার্কা সত্যিকারের সাচ্চা রাজনীতিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছেন শ্রীচাণক্য সেন। বইটির নাম 'রাজপথ জনপথ'। এবং এই অসাধারণ কীর্তিতেই চাণক্য সেন মহাশয় থেমে থাকেননি। এরপর তাঁর কলমে সৃষ্ট হয়েছে মহত্তর (মহত্তম?) রাজনীতিক উপন্যাস—'মুখ্যমন্ত্রী।'

ভবানী সেনগুপ্ত উল্লসিতভাবে

নীতিক উপন্যাস কেবলমাত্র এই দুটিই সৃষ্টি হয়েছে এ পর্যন্ত।

ভবানী সেনগুপ্ত বলেন, বাংলা সাহিত্যে এই দুটি মহাগ্রন্থ— বিশেষতঃ 'মুখ্যমন্ত্রী' নতুন স্বাদই কেবল নিয়ে এলো না—সৃষ্টি করলো নতুন চেতনার জোয়ার! অসংখ্য সাহিত্যিক চাণক্য সেন নির্দেশিত পথে চলতে শুরু করলেন। 'মুখ্যমন্ত্রী'-র নকলে অনেক বইও লেখা হলো, যেমন 'খাদ্যমন্ত্রী'।

ভবানী সেনগুপ্ত বলেন, গৌর-কিশোর ঘোষ, মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শংকর), সমরেশ বসুদের উপন্যাসে বিক্ষোভ, কিংবা সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা রাজনীতির আভাস পাওয়া যায় বটে—কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেননি কেউ।

পাগলামির বিরুদ্ধে তর্কে নামতে আমরা অনিচ্ছুক। শুধু এ কথাই বলবার—বাংলা ভাষায়, অন্তত পক্ষে কুড়ি বাইশটি উঁচু মানের রাজনীতিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। লিস্টি পেশ করার কি প্রয়োজন? একটি মাত্র বইয়ের নাম করি—সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী'।

ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশিত ১৫৫ পাতার বইয়ের দাম ৫৫ টাকা দেখে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে এ বই বিদেশের বাজারে বিক্রি করার জন্য তাঁরা বেশী উৎসুক। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে চরম ভ্রান্ত তথ্য সমন্বিত এ বই বিদেশীদের হাতে পৌঁছোবে এবং তাঁরা পড়ে ভুল শিখবেন, এটাই বড়ো আফসোস!

পরিশেষে আর একটুখানি তথ্য যোগ করার। ভবানী সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধটি পড়ে কেমন যেন খটকা লাগে। এ ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান করবার পর জানলাম যে ভবানী সেনগুপ্ত ও চাণক্য সেন একই ব্যক্তি!!

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। ক্ষেত্র গুপ্ত ও অর্ধেন্দু বিশ্বাস সম্পাদিত। সেকাল-একাল। ১৮বি টেমার লেন। কলিকাতা ৯। পঁচিশ টাকা।

সাহিত্য ক্ষেত্রে হাস্যরসের নানা প্রকারভেদ আছে, তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে স্থূল সূক্ষ্ম বিদ্রূপ প্রভৃতি নানামুখী পথে। কিন্তু সমস্ত হাস্য-রসিক সাহিত্যিক দু-রকমের। এক যাঁরা প্রয়োজনে হাস্যরসের চর্চা করেন; হাস্যরস তাঁদের রচনার একটি উল্লেখ্য অংশ কিন্তু প্রধান অংশ নয়। দুই, হাস্যরস যাঁদের রচনার সর্বস্ব। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৬-১৩১৭) দ্বিতীয় দলের। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন হাস্যরসিক ও বাগ্‌বিভূতি সম্পন্ন। তাঁর বিদ্যালয় জীবনে ছাত্ররা একদিন মুখে মুখে ইংরাজি কবিতার বঙ্গানুবাদ করছিলেন। প্রত্যেকে এক এক পঙক্তি। ইন্দ্রনাথের পালায় পড়লো Oh! daughter of faith, awake, arise'.

তাঁর রসিক সৃষ্টিশীল মানস তাৎক্ষণিক অনুবাদ করলো, 'ওগো বিশ্বাসের মেয়ে, জাগো, উঠ। সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল ইন্দ্রনাথের জীবনের সত্য তার মানুষের অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যের মধ্যে চিরদিনই

গৌড়জনের অন্তরে করবে মাধুরীকরণ।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড। দীর্ঘকাল পরে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হল এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় তথা শেষ খণ্ড। প্রকাশক ও উদ্‌যোক্তাদের যেমন ঘটলো ব্রতসিদ্ধি, বাঙ্গালী পাঠক তেমনই পেলেন সম্পূর্ণ ইন্দ্রনাথকে। বঙ্কিম-অনুসারী এই সমাজ-চেতন হাস্যরসিক হয়ত এই মুহূর্তে আমাদের সাহিত্য ভাবনার প্রত্যক্ষ স্তরে নেই। কিন্তু রয়ে গেছেন অনেক গূঢ় পরম্পরায়। বস্তুত বিশাল সাহিত্য সমুদ্রে যাঁরা হাস্যরসের লঘু পানসীর একক মাঝিগিরি করেন তাঁদের অস্তিত্ব সর্বদাই থাকে টালমাটাল। সমকালীন যাত্রীরা যদি বা তার পারানি গুণে দেন ভবিষ্যতের যাত্রী উন্নততর জলযানের সংস্পর্শে ভুলে যান মৌলিক পাটনীকে। 'কল্পতরু', 'ভারত উদ্ধার' ও 'পাঁচু ঠাকুর'-এর অলৌকিক লেখক ইন্দ্রনাথ (ছদ্মনাম : পঞ্চানন্দ) উনিশ শতক ও বিশ শতকের পাঠকদের মধ্যে সেতুসম্ভব সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য স্থপতি। কেননা তাঁর লেখা সমকালীনতার ক্ষণজীবী শীর্ণতায় খণ্ডিত নয়, এখনও আদ্যন্ত ঝলমলে। উদাহরণত তাঁর রচনা থেকে দুটি নির্বাচিত অংশ :

(১) দশাবতার বর্ণনায় লিখছেন 'প্রথম, মৎস্য :—ইনি বঙ্গদেশের পুলিস ; গভীর জলে বাস। মৎস্যের আদর তৈলে, পুলিসেরও তাই। ...দ্বিতীয়, কূর্ম :—আদালতের আমলা, পিঠ বিলক্ষণ মজবুত।...তৃতীয়, বরাহ : —গোদ মেজিস্টার, ভয়ানক গোঁ, কাহার সাধ্য ফিরায়।...চতুর্থ, নৃসিংহ :—জেলার জজ ; দেওয়ানী বিচারের কর্তা, কাজেই নর, দাওয়ায় বসিলেই সিংহ।'

এরপরে ইন্দ্রনাথের রসদৃষ্টিতে বামনাবতার বলে প্রতিভাত হয়েছে বঙ্গীয় উকিল। সঙ্গে ব্যঙ্গের রসান হল : 'পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে হাকিম বলা যায়। জিনি উকিল তিনি হাকিম নহেন, অথচ হাকিমের আবশ্যকীয় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইঁহার আছে, সেইজন্য ইনি বামন।' এরপর 'পরশুরাম :—বঙ্গদেশের জমিদার, অতুল প্রতাপ, সর্বদা কুঠারহস্তে মার মার, কাট কাট, শব্দ করিতেছেন। রাম :—ব্রহ্মোত্তরভোগী।...শ্রীকৃষ্ণ :—বাঙ্গালা সংবাদপত্র। চতুর, মন্ত্রণা বিশারদ অথচ স্বয়ং রাজত্ব করেন না, স্বয়ং যুদ্ধ করেন না। যাহার পক্ষাশ্রয় করেন, ধর্ম সেই পক্ষেই জাজ্বল্যমান।...বুদ্ধ :—বাঙ্গালার প্রজা। সমগ্র ভূমির উত্তরাধিকারী, অতএব রাজপুত্র সদৃশ তথাপি সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, নির্বাণ-মন্ত্রের প্রচারক।' এবং লেখা বাহুল্য কল্কী অবতার হলেন পঞ্চানন্দ স্বয়ং।

(২) 'প্রশ্ন। সর্বাপেক্ষা উত্তম বাগ্মী কে?

উত্তর। যুবতীর চক্ষের জল।'

স্থানাভাবে আরও উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না, কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের কাছে তাঁকে সামান্য উদ্‌ঘাটন করা হল মাত্র। এই সামান্য থেকে সমগ্র আজকের পাঠকের জগতে তবেই ঘটবে এই গ্রন্থপ্রকাশের সার্থকতা।

প্রস্তুত খণ্ডে ইন্দ্রনাথের রচিত 'ক্ষুদিরাম ব্যাঙ্গোপন্যাস', 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' ব্যঙ্গকাব্য, অন্যান্য রচনা এবং 'পাঁচু ঠাকুর' নামক রঙ্গ-ব্যঙ্গের চুটকি সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া সম্পাদকীয় ভাষ্য, ইন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার কালানুক্রমিক তালিকা ও গ্রন্থপঞ্জী এই খণ্ডটিকে সমৃদ্ধ করেছে। অবশ্য ইন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র বা আলেখ্য-র জন্য খেদ থেকে যায়।

অন্যতম সম্পাদক শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত একটি মিতায়তন প্রাক্‌কথনে ইন্দ্রনাথ-প্রতিভার মূল প্রবণতা ও বৈপরীত্যকে ধরে দিয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন ইন্দ্রনাথের রচনায় রয়েছে : 'স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা এবং সে বিষয়ে সাংবাদিক সুলভ অতি সতর্কতা' এবং 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার একটি আপোসহীন সুর...অথচ পাশাপাশি সমাজ ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী'।' কিন্তু এ তো গেল ইন্দ্রনাথের মানস প্রবণতার লক্ষণ নির্ণয় ; এর পরে ওঠে তাঁর সার্বিক সিদ্ধি ও মূল্যায়নের দিক। আমাদের মনে হয় ইন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল হাস্যরসের অতি ব্যবহার। সাহিত্যরূপের নানান ছাঁচে তিনি রসের স্রোত বহাতে চেয়েছিলেন। ফলে ব্যঙ্গোপন্যাস, ব্যঙ্গকাব্য, ব্যঙ্গকৌতুককণা, চুটকি, এপিগ্রাম, প্যারোডি এত সব ফর্মের আমদানী করতে হয়েছিল। সবগুলিতে সমান দক্ষতা ও সিদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটেনি। ক্ষেত্র গুপ্ত ইন্দ্রনাথের চরম মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন : 'আসলে সাহিত্য ও "প্রায়-সাহিত্যের" নানা মহলে ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গশিল্পী হিসেবেই ভ্রমণ করেছেন, সে ভ্রমণ স্বচ্ছন্দ এবং সানন্দ।' সেই সানন্দ ও স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা যদি সারস্বত সিদ্ধির সমীপবর্তী হত তবে ইন্দ্রনাথ হতেন অনিবারণীয়, পরাক্রান্ত এবং অমর।

ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী মন দিয়ে পড়লে বাঙালীর রসসাধনার একটি পর্যায় ও পরম্পরার ধারণা স্পষ্ট হয়। সেইদিক থেকেও বইটির প্রচার কাম্য।

সুধীর চক্রবর্তী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

শ্রীমতী ঠাকুরের স্মরণে সভা

চার নম্বর এলগিন রোডের সেই বাড়িতে আর এক শ্রদ্ধা নিবেদন-সভার আয়োজন করেছিলেন বৈতানিকের অনুরাগীরা। যে ঘরে সেদিন এই শ্রদ্ধা নিবেদন-সভার আয়োজন, সেই ঘর এর পূর্বে বহুবার নানা অনুষ্ঠানে মুখর হয়েছে। কিন্তু সে সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে আজ শুধু একটা বিষয়ে মিল নেই। সে সব অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র আজ অনুপস্থিত। ঘরের এক প্রান্তে দুটি ছবি। রজনীগন্ধার মালা আর ফুলে ফুলে অনুরাগীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। শ্রীমতী ঠাকুর আর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীমতী ঠাকুর ছিলেন বৈতানিকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সতেরো জুলাই চিরদিনের মত বৈতানিক ছেড়ে, ছেড়ে চার নম্বর এলগিন রোড বিদায় নিলেন শ্রীমতী [illegible] পরিবার

হাতিসিং পরিবারের মেয়ে বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাণের ছন্দ, আপন করে নিয়েছিলেন বাংলা সংস্কৃতিকে। ঠাকুর পরিবারের বধূও হন তিনি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের তিনি ছাত্রী ছিলেন। প্রতিমা ঠাকুরের কাছে নাচ শিখেছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়িটির নাম ছিল 'শ্রীমতী ভবন।' পরবর্তীকালে কবি বাড়িটির নতুন নাম দেন 'গুর্জরী'। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন হাতিসিং-এর বোন এবং জওহরলাল নেহরুর ছোট বোন কৃষ্ণার ননদ।

কলাভবনের ছাত্রী শ্রীমতী ঠাকুর। তাঁর সাধনার গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলালকে। সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে যেখানেই তাঁর ছোঁয়া লেগেছে সেখানেই মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে নব নব সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে তিনিই প্রথম নৃত্য পরিবেশন করেন। সেদিন কবি মোহিত হয়ে দেখেছিলেন আপন সৃষ্টির নবরূপকে। বলেছিলেন 'কি নির্ভুল নৃত্যভঙ্গিমা'। নিউ এমপায়ারে শ্রীমতী ঠাকুরের একক নাচের অনুষ্ঠান এখনও অনেক স্মৃতিতেই উজ্জ্বল।

অবনীন্দ্রনাথের [illegible]রেনটাল আর্ট সোসাইটিরও তিনি ছিলেন সম্পাদিকা। বিশ্বভারতী কর্মীসংসদ এবং রবীন্দ্র-সদনের সদস্যাও ছিলেন তিনি। সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনীতি-জীবনেরও সঙ্গী ছিলেন তিনি। ৪২-এর আন্দোলনে কারাবরণ করেন।

সম্মুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার—কবির এই গান দিয়ে শুরু হল স্মৃতিসভা। স্মৃতিসভায় এসেছিলেন তাঁর আত্মীয় বন্ধু এবং শিল্প-জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। চিন্তামণি কর শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বার বার নীরব হয়েছেন। তথাগতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—'যার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাই না তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া আর যার সঙ্গে বিযুক্ত হতে চাই না তার কাছ থেকে বিযুক্ত হওয়ার নামই বেদনা।' তিনি বলেন—চিরকাল তাঁর একটা সত্তা বেঁচে থাকবে। তাঁর নির্দেশিত পথ আমরা যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলেই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানো সঠিক হবে।

অমিয়কুমার মজুমদার এই স্মৃতি-সভায় বলেন—'এ এক বিয়োগ-বিহ্বল' সন্ধ্যা। যদিও আমরা নিঃস্বকে স্বীকার করি না। মৃত্যু কখনই আমাদের নিঃস্ব করতে পারে না। অমিয়কুমার মজুমদার তাঁর বক্তৃতায় শ্রীমতী ঠাকুরের সঙ্গে নানা কাজের সময় তাঁর দেখা টুকরো টুকরো ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ যেন আকাশ আর শ্রীমতী মাটি। সৌম্যেন্দ্রনাথের জীবনের সুরটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন। সারা জীবন সেই সুরেই গান গেয়েছেন। অমিয়বাবু বলেন, শ্রীমতী ঠাকুরের জীবনের নানা ঘটনার কথা তিনি তাঁকে লিখতে বলেছিলেন। উত্তরে শ্রীমতী ঠাকুর বলেছিলেন—সৌম্যকে কতবার বলেছি তোমার বক্তৃতাগুলো লিখে রাখ, সৌম্য কথা শোনেনি। 'একবার কিশোরী বয়সে শ্রীমতী ঠাকুর একা পণ্ডিচেরী চলে যান। সে সব ঘটনা গল্পের থেকেও আকর্ষণীয়। কিন্তু সে সব ঘটনা কোথাও লেখা নেই, জানার আর কোন উপায় রইল না'—এই আক্ষেপ করেন অমিয়বাবু। শ্রদ্ধা জানান রমা চৌধুরী, সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু।

প্রসাদ সেন, সাগর সেন, সুবীর ঠাকুর ও বৈতানিকের সভ্য-সভ্যারা সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন। বৈতানিকের সমবেত সঙ্গীতে গলা মিলিয়েছেন মেনকা ঠাকুর। তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতৃবধূ।

ঘরের এককোণে বসে বার বার রুমালে চোখ মুছছিলেন এক মহিলা। অনেকের চোখই ছিল অশ্রুসজল। কিন্তু ওই মহিলার দুটি চোখ বার বার ভাসছিল চোখের জলে। শ্রীমতী ঠাকুরের বোন সরোজিনী দেবী। আমেদাবাদ থেকে ছুটে এসেছেন। স্মৃতিসভার শেষে একান্তে দেখা হওয়ায় বলেছেন—জানি মৃত্যু সব কিছুর শেষ নয়, তবু ওর কথা উঠলেই কোথায় ভীষণ শূন্য লাগছে, ওর ভালবাসা ছিল ব্যাপক, তাই শূন্যতা এত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

জলচিত্র

একসময়ে সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীতে জলরঙের বিভাগটি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করত। রণেন আয়ন দত্ত থেকে শুরু করে প্রদীপ বসু হয়ে বিনোদ দাস পর্যন্ত প্রজন্মের পর প্রজন্মের ছাত্ররা জলচিত্রে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তা ছাড়া গোপাল ঘোষের মতো মাস্টার মশাইয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ ছিল চোখের সামনে। কিন্তু এখন জলরং একটি অপ্রচলিত মাধ্যম। তৈলচিত্র এবং টেম্পেরায় জয়জয়কার।

ফাল্গুনী দাশগুপ্ত কিন্তু দুঃসাহসী। এখনও শুধু জলচিত্র আঁকেন। কাগজ জলে ভিজিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে নেন মেসোনাইট বোর্ডে। শুকিয়ে যাবার পর উইনসর নিউটনের রঙ দিয়ে বড় বড় ছবি আঁকেন। ফাল্গুনী দিল্লি আর্ট কলেজে চিত্রকলার অধ্যাপনা করেন। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় একটি প্রদর্শনী করেন (বিড়লা আকাদমী—২০-২৫

কাজের দক্ষতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। জলরঙে প্রতিটি তুলির টান একবারে দিতে হয়। ভুল করলে শোধরাবার কোনো উপায় নেই। মাধ্যমের ওপরে পূর্ণ দখল থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে জীবনদর্শন সম্বন্ধে। নিজস্ব শৈলী থাকা সত্ত্বেও এত ভিন্ন ধরনের কাজ ছিল যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে বুঝে ওঠা মুশকিল হয়। যেন চরিত্র আত্মনয়ের চেয়ে নানারকম মুখোশ পরায় নট ব্যস্ত। ছবিগুলো যেন নানা সুরের, কিন্তু সব মিলিয়ে ঐকতান হয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া আপেল, পুতুল, কালীমূর্তি, সবই 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত' হয়ে তাৎপর্যহীন। এর মধ্যে "পুতুল" চিত্রমালা এবং "ইহুদী সৃষ্টিপুরাণ" চিত্রমালায় ফলিত চিত্রকলার ছাপ পড়েছে। তাঁর আঁকা "ডনা পাওলা" তাজা টাটকা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে গতবারের প্রদর্শনীতে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল আমাদের। কখনো আবার ছবি অতিকথন দোষদুষ্ট। যেমন ধরা যাক "গণতন্ত্র" ছবিটার কথা। টেবিলের ওপর

একটা আংটি-পরা হাতের মধ্যে পাঁঠার দাবনার সেঁকা মাংস। আর নীচে অন্ধকার সিলুটে বহু মানুষের রোগা রোগা হাত আর কুকুর—ফেলে-দেওয়া হাড়ের জন্যে কাড়াকাড়ি করছে। নীচেরটাই অসাধারণ মুনশীয়ানায় এঁকেছেন, ওপরটা বাহুল্য।

রেখাচিত্রগুলোতেও বাস্তব থেকে কল্পমায়ার জগতে ঘোরাফেরা করেন। এর মধ্যে একটা ভাল কাজ ছিল—কল্পচিত্র—মানকচুর বড় পাতার ছাউনির তলায় একটি মেয়ে এবং ছেলে বসে প্রেম করছে। কাজটা দারুণ। ছবি সম্বন্ধে তাঁকে আরও ভাবতে হবে।

রাজধানী থেকে তিনিও এসেছিলেন। আমি দুলাল মণ্ডলের কথা বলছি। আকাদেমী অব ফাইন আর্টসে জুন মাসে প্রদর্শনী করে গেলেন। "ক্যালকাটা গ্রুপের" অধুনা লোকবিস্মৃত তুলিধর অবনী সেনের ছাত্র। দুলালবাবু অবনী সেনের মৃত্যুর পর দিল্লির রায়সিনহা স্কুলের শিল্পশিক্ষক। দিল্লি আর্ট কলেজের ছাত্র। ভারতবর্ষে তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা মহাবিদ্যালয়ের চারুকলার স্নাতক।

মানুষ, প্রকৃতি এবং গরুমহিষ তাঁর ছবির বিষয়। প্রথমত, পটের শূন্যস্থান কাজে লাগাবার বিষয়ে তাঁর মধ্যে অনিশ্চয়তার লেশমাত্র নেই। দ্বিতীয়ত, দ্বিমাত্রিক পটে ত্রিমাত্রিক বিভ্রম সৃষ্টি করার চেষ্টা না করেও যে সহজে বস্তু-

নির্মিত—বস্তুত রচনা সম্বন্ধে তিনি ভেবেছেন।

মাটি-মানুষের টানে তিনি নীল দিগন্তের কাছে খোলা মাঠের হাওয়ার মধ্যে গেছেন। নিসর্গ আর চারণভূমি এঁকে তার মধ্যে দরাজ বিস্তারের ভাব আরোপ করতে পেরেছেন। রোমান্টিক বা আদর্শায়িত ভূদৃশ্য নয়, বরং মাটির গন্ধ, বাথানের গন্ধ ছবিতে। এই মর্ত্যধূলাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে এনেছেন। তেমনি নারীকে সযত্নে সুফলা বসুমতীর সঙ্গে তুলনাও খুবই বিশ্বস্ত।

তাঁর অঙ্কন, রূপারোপ, রচনা—সবই ভাল। বেশ বোঝা যায়, এসবের পেছনে খুবই সংবেদনশীল মন কাজ করছে। এমন এক আধুনিক মানুষ, মাটির গভীরে প্রোথিত যাঁর শিকড়। ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস-গ্রামকে জানেন।

আঙ্গিক বা অন্য কোনো ব্যাপারে আপত্তি নেই। শুধু রঞ্জক হিসাবে তেলরঙ ব্যবহার তাঁর ছবির একমাত্র অসঙ্গতি বলে মনে হলো। রঞ্জকের (পিগমেন্টের) নিজস্ব ওজন আছে। বর্ণলেপনের কায়দা শিল্পিভেদে ভিন্ন। কিন্তু তেল দিয়ে রঙ পাতলা করে, হালকা করে, জলরঙের মতো করে চাপিয়ে ঝকঝকে তকতকে করা দিল্লির শিল্পীদের রীতি। নব্য ধনী ক্রেতাদের পাকড়াবার এটা এক কৌশল। দুলালবাবুর কাছে ছবি প্রাণের জিনিস, ভেতর থেকে আঁকেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে বেপর্দা স্বর নেই। সুতরাং গড্ডলপ্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিলে তিনি আমাদের আরও ভাল কাজ দেবেন।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

রবীন্দ্র মেলা

নামে মেলা, কিন্তু জায়গাটা খোলামেলা নয়। খোলা জায়গার রবীন্দ্রমেলাকে এবার আশ্রয় নিতে হয়েছিল চার দেয়ালের মহাজাতি সদনে। রবীন্দ্রকাননে নাকি সরকারী অনুমতি মেলেনি। তাই সব দিকেই কমে গিয়েছে পরিসর। অন্যবার হয় পক্ষকাল ধরে, এবারে হল পাঁচ দিন। ২১ থেকে ২৫ জুন।

উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ত্রিভুবন নারায়ণ সিং। অনুষ্ঠান-সভাপতি ছিলেন প্রধান বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র। মেলার সভাপতি অশোককুমার সরকার তাঁর ভাষণে রাজ্যপালকে যে-পরামর্শ দিলেন তা রবীন্দ্র-অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই মনের কথা। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ যদি পড়তেই হয়—মূল বাংলাতেই পড়া শ্রেয়। কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা হারিয়ে যান এবং গেছেন তা আজকের জগৎ সভায় একবার তাকালেই ধরা পড়বে। সম্প্রতি-প্রকাশিত এক প্রবন্ধ-গ্রন্থে শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন এ-সম্পর্কে জরুরী এবং মূল্যবান একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। অবিশ্বাসীদের সেটা পড়ে ফেলা দরকার।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা

সতী দেবী

সুপরিবেশিত। পরবর্তী শিল্পী গৌতম মিত্র 'গহন ঘন ছাইল' যে-ভঙ্গিতে গাইলেন, তা আর যাই হোক, রাবীন্দ্রিক নয়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের আসর জমিয়ে তুললেন তাঁর অসাধারণ কণ্ঠের তিনখানি আবৃত্তিতে। দুর্লভ এক মেজাজে পাওয়া গেল সেদিন তাঁকে। অনুষ্ঠানের তৃতীয় ও শেষ ভাগে ছিল গন্ধর্ব-গোষ্ঠী পরিবেশিত রবীন্দ্র নাটক—'বদনাম'।

দ্বিতীয় দিনের আসর শুরুতেই জমজমাট। সলিল মিত্রের বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর—সঙ্গে রূপেন ঘোষের সঙ্গত। সলিল মিত্রের বেহালা যেমন বাঙ্ময়, রূপেন ঘোষের সঙ্গতও তেমনই প্রাণবন্ত। 'এ কী লাবণ্যে'র মতো দুরূহ গানও অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে নিবেদিত হল। 'মোর ভাবনারে'র সেতারের গৎ বেহালায় করুণ-রঙীন হয়ে ধরা দিল। যন্ত্রকে ছাপিয়ে ওঠা নিবেদন কাকে বলে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল চোখের সামনে। একক আসরে প্রায় সকলেই ভাল গেয়েছেন সেদিন। মঞ্জুশ্রী ভৌমিকের 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' বেশী ভাল লাগল। সুমিত্রা রায়কে কিছুটা ক্লিষ্ট মনে হল শুধু। এ-ছাড়া অর্ঘ্য সেন, অদিতি সেনগুপ্ত এবং সুশীল চট্টোপাধ্যায় চমৎকার। বিশেষত, সুশীলবাবু সেদিনও দারুণ মেজাজ দিয়ে গান শোনালেন। অনুরোধেও একটি অতিরিক্ত গান গাইতে হয়েছিল তাঁকে। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার-এর 'ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্য' ছিল

ফো : [illegible]

পরবর্তী পর্যায়ের আকর্ষণ। কিন্তু যত আকর্ষণীয়ই হোক, রবীন্দ্রমেলার স্বল্প পরিসরে এই মিশ্র-অনুষ্ঠানটি খাপ খায় কিনা সংশয় থেকে যায়। শুধুই 'ঠাকুরবাড়ির গান' যদি পরিবেশিত হত, তাহলে বরং পরিকল্পনাটিকে সুষ্ঠু ভাবার অবকাশ ছিল। কিন্তু ইয়ুথ কয়্যার তেমন সম্পূর্ণ আলাদা-কিছু পরিবেশন করেননি।

তৃতীয় দিনটি ছিল রবীন্দ্রসংগীতের জন্য একান্তভাবে চিহ্নিত। আরম্ভে শুধু একক আবৃত্তি শোনা গেল অশোক পালিতের কণ্ঠে। মার্জিত এবং পরিচ্ছন্ন তাঁর আবৃত্তি। অলক ঘোষ মোটামুটি গান করেন। গোপাল পাত্রের গলা বড় চাপা। তারসপ্তকে অস্বচ্ছন্দও বটে। নামী শিল্পীরা অনেকেই ছিলেন আসরে সেদিন। দারুণ ভালো গেয়েছেন স্বপ্না ঘোষাল, বনানী ঘোষ ও পূরবী মুখোপাধ্যায়। মায়া সেনের গলা ধরা ছিল, ধরা ছিল সাগর সেনেরও। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গানে রবীন্দ্র-মেজাজ ততটা ছিল না, যতটা ছিল তাঁর নিজস্ব মেজাজ। প্রতিমা মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন নিজেদের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি সেদিন। স্বপন গুপ্তের গানে প্রাণ ছিল না। বন্দনা সিংহের 'ঝরো ঝরো বরিষে' বেশী ভাল লেগেছে। ধীরেন বসুর গানের স্টক কম বোঝা গেল। যে-দুটি গান শোনালেন সে-দুটিই এবার রবীন্দ্রসদনে প্রেমের আসরে শুনিয়েছিলেন তিনি।

চতুর্থ দিনের আসরের প্রথম পর্যায়ে আবার ছিল একক সংগীত। সুন্দর সূচনা করলেন কুমকুম মিত্র নামে এক নবীন শিল্পী। কণ্ঠটি বেশ মিষ্টি। গানও করেন অতি সুষ্ঠু ভঙ্গিতে। বিভা সেনগুপ্ত জমাতে পারেননি, পারেননি বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমি তোমায় যত' র শুরুতে পাঁচবার ধরে প্রথম কলিটি গাইলেন। মনে হয়, কিছুতেই মনোমত হচ্ছিল না। বিভা সেনগুপ্ত 'মোর ভাবনারে' গানটির 'মাতালো' অংশে অকারণ ধাক্কা দিলেন। ধাক্কা নিশ্চিত মীড় নয়। নবীন শিল্পী শুভশ্রী মুখোপাধ্যায় অবাক করে দিলেন। হারমোনিয়ামে স্কেল ধরারও কেউ ছিলেন না, তানপুরা ছিল না তাঁর সঙ্গে, তবু কী চমৎকারভাবে সলিল মিত্রের বেহালার সুর কানে নিয়ে গান গাইলেন শুভশ্রী। গেয়েছেনও অতি দরদ দিয়ে। তাঁর সাহস এবং নিবেদন দুইই সমান প্রশংসার। শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্যকে সেদিন তেমন স্বচ্ছন্দ মনে হল না। পরবর্তী শিল্পী কুমকুম চট্টোপাধ্যায় আবার বিস্ময় মানালেন। নিজেকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর সেদিনের পরিবেশন। যেমন মেজাজী গান বেছেছিলেন ('রাখো রাখো রে' এবং 'অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া'), তেমনই অসামান্য মেজাজে শুনিয়েছেন গান দু-খানি। মন-প্রাণ ঢেলে গেয়েছেন তিনি, শ্রোতাদেরও ভরে গিয়েছিল কান এবং প্রাণ। অনুরোধে গাওয়া তৃতীয় গান—'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' তাঁর সেদিনের গান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ও সেদিন পূর্ণ মেজাজে গেয়েছেন। তাঁর 'আমি

শ্রাবণ তাঁর ... গাওয়া 'কথা কোস নে লো রাই' বিরল মেজাজের নিবেদন।

অমল দেবের তারসানাই ছিল পরবর্তী আকর্ষণ। রবীন্দ্রসংগীতের বাণী কানের মধ্য দিয়ে মরমে প্রবিষ্ট হয়ে যায় তাঁর নিপুণ আঙুলের মূর্ছনাতে। কোমল গান্ধার গোষ্ঠী সব শেষে নিবেদন করলেন রবীন্দ্র নাটক—দৃষ্টিদান।

সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারেননি এই প্রতিবেদক। সেদিন রবীন্দ্রমেলার পক্ষ থেকে গুণী-জন সংবর্ধনায় সংবর্ধিত করা হয় রানী মহলানবিশ ও সতী দেবীকে। একক-সঙ্গীতের আসরে ছিলেন সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। সব শেষে ত্রিবেণী-গোষ্ঠী নিবেদন করেন 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

তিস্তা-র লোকগীতির আসর

'তিস্তা'র সাম্প্রতিক লোকগীতি ও লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের লোকগীতিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। রংপুর থেকে আগত এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশ সম্প্রদায়ের লোকগীতিতে উজ্জ্বল ছিল সেদিনের অনুষ্ঠান।

মূলত অনুষ্ঠানটি ছিল একক গানের আসর। যদিও কয়েকটি কোরাস ও লোকনৃত্য অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও প্রণব রায়ের লোকগীতিই ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। 'আমি কি দিয়া বান্ধিয়া রাখবোরে আমার এই নয়া যইবনরে', 'মন মোর ঝুরেরে শুনিয়া সানাই', 'দিদির বিয়ার সানাই শুনি', 'যার কপালে নাই ও মনসুয়া ছাড়িয়া পলাইল রে'—গান তিনটির মধ্যে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। শহরের আসরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিক সুরের প্রক্ষেপ ঘটে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে শুনতে ভাল লাগলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রণব রায়ের গানে মূল সুরের পরিবর্তন ঘটেনি। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশে লোকগীতির মৃত্যু ঘটে অনেক ক্ষেত্রেই। 'তিস্তা'র আসরে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রকে পরিহার করা হয়েছে। প্রণববাবু নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাবান দো-তারা শিল্পী। তিনি নিজেই দো-তারা বাজিয়ে গান গেয়েছেন। ফলে লোকগীতির সামগ্রিক এফেক্ট কোথাও বিঘ্নিত হয়নি।

কোরাস গানের ক্ষেত্রে সব ক'টি কণ্ঠ ঠিক ঠিক না মেলায় বিরক্তির উৎপাদন করেছে। প্রথম গানটি কোরাস গান হিসেবে সার্থক—শালী দে, অনুশ্রী দাস, নন্দিনী মিত্রের গাওয়া 'মইষাল বন্ধুরে' গানটি শুনতে ভাল লাগে।

সব কটি নাচই এক জাতীয় হওয়ায় কিছুটা বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে। তবে 'ও আবুগো, পারুর মতন জোড়া লাগিয়া দে' গানটির প্রমাণ করে। শর্মিলা মিত্র, কেকা মিত্র, সুদেষ্ণা মিত্র ও রিয়া চ্যাটার্জী লোকনৃত্যের ছন্দটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা করেন দিলীপ রায়।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **রেকর্ড**

সুরে সুরে সুর মেলাতে

এইচ এম ভি নিবেদিত রবীন্দ্র সংগীতের দ্বিতীয় গুচ্ছে বেশির ভাগ আগামী দিনের শিল্পী। এই আগামী দিন বলে ভরসা ও ভয় দুই-ই সমান ভাবে কাজ করে। কয়েকজন শিল্পীর গান ভরসা আনে, রবীন্দ্রসংগীত একঘেয়ে হবে না, নতুনতর ভাবে হয়ত সমৃদ্ধ হবে, ভয় জাগে অনেকের গান শুনে, রবীন্দ্র সংগীতের অনুষঙ্গের ঐশ্বর্যের পাশাপাশি কণ্ঠ এত নিষ্প্রাণ ম্রিয়মান—যাতে শঙ্কা হয় বেগবতী নদীও মরুপথে হারাবে কিনা।

ঋতু গুহ বর্তমানে রবীন্দ্র সংগীতের সেই শিল্পী যাঁর গীতসুধার জন্য গীত রসিকদের চিত্ত পিপাসিত থাকে। একটি সুপার সেভেন রেকর্ডে ছয়টি গান—'কী ভয় তব অভয়ধামে' (বেহাগ) 'তারো তারো হরি দীনজনে' (কাফি) 'তোমায় যতনে রাখিব হে' (দেশ-খাম্বাজ) 'শুভদিনে এসেছ দোঁহে' (বেহাগ)। এ ছাড়া বিখ্যাত 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ'—এবং কানে লেগে থাকে বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের 'আমার যাবার সময় হল' (খট)। শৈলেন দাসের গায়কী স্বতন্ত্র যে গায়কীতে পৌরুষ ও আবেগের সার্থক সমন্বয়। তাঁর চারটি গানের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে 'কাছে ছিলে দূরে গেলে' (মুয়ার খেলার জন্য রচিত হয়ে, শেষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়নি) এবং 'তুমি যে আমারে চাও'। পরজবসন্তে 'হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই' অথবা 'হলো না লো হলো না সই' তাঁর গলায় ঠিক স্বতস্ফূর্ত নয়। সম্প্রতি গীতা ঘটকের গান শোনা একটি নতুন অভিজ্ঞতা। গীতা ঘটক সম্পূর্ণ অন্যতর বলিষ্ঠ গায়নভঙ্গীতে প্রায়শই চমকিত করেন। এবারে তাঁর গাওয়া চারখানি গানই অনবদ্য। তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে 'যেদিন ফুটল কমল।' এ ছাড়াও অরুপরতনের 'লুকিয়ে আসে আঁধার রাতে' অথবা মিশ্র কানাড়ায় 'কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে' গানের পাশাপাশি কীর্তনাঙ্গ 'ও কেন চুরি করে চায়' গান শুনে বোঝা যায় সব রকম গানেই তিনি ভাবপ্রকাশে অনন্যা।

স্বপন গুপ্ত যে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অনুগামী, সেই ব্যক্তিত্ব তাঁর গানে শুধু 'ঢং' হয়ে দেখা দেয়। তবু চারখানি গানের মধ্যে ভাল লাগে 'হৃদয় হৃদয়' (সম্ভবত এখানে অনুকরণের সুযোগ ছিল না)। তাঁর গানে একদা যে সম্ভাবনা ছিল, সে সম্ভাবনা সুন্দর অর্কেস্ট্রা সহযোগেও তুলে ধরা যায় না—একটি গানে যেন তাঁরই আত্মকথন 'কিছু তো নাই বাকি' (আমার ভুবন তো আজ হল কাঙ্গাল)। অনুকরণ প্রসঙ্গে মনে আসে গৌতম মিত্রের নাম। ... সাধারণত নকলে একটা ফাঁকিবাজি থাকে, কিন্তু স্কেলে অনেকেই হুবহু অনুকরণ করেন—গৌতম মিত্র 'সি-ন্যাচারাল' স্কেলে গান গেয়ে প্রমাণ করেছেন, কণ্ঠসম্পদ তিনি অর্জন করেছেন। শুধু 'নাসিকা নির্ভরতা' ত্যাগ করলেই তিনি যে স্বমহিম হবেন তার প্রমাণ মেলে 'অনেক দিনের আমার যে গান' এবং 'সে আসে ধীরে' গান দুটি শুনলে। একটি সুপার সেভেন রেকর্ডে তিনজন শিল্পী দুখানি করে গান গেয়েছেন। অদিতি সেনগুপ্তের কণ্ঠে দুটি গানই ভাল লেগেছে। অচসারতনের 'যিনি সকল কাজের কাজি' গানে তার সপ্তকের পঞ্চমে অনায়াসে ছুঁয়ে এসেছেন, এটা অসীম ক্ষমতা নয় তবে নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে। (বি ফ্ল্যাট) এবারে

মহিলা শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন জি সার্প বা এ'তে নয়, ফলে যাঁদের দক্ষতা আছে তাঁদের গান অনেক উজ্জ্বল। 'বি' ন্যাচারাল স্কেল ধরে মঞ্জরীলাল অপূর্ব গেয়েছেন 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না' এবং 'প্রভু আমার প্রিয় আমার'। এই স্বকীয়তা ও দাপট বহুদিন প্রত্যাশিত ছিল। পক্ষান্তরে গোরা সর্বাধিকারীর 'চরাচর সকলি মিছে', বা 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' গান দুটি আরো উঁচু স্কেলে হলে শুনতে আরো ভালো লাগত, বিশেষ, 'চরাচর সকলি মিছে মায়া ছলনা' গানটির খাদ আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। আর একটি সুপার সেভেনের তিনজন শিল্পীর মধ্যে কৃষ্ণা গুহ-ঠাকুরতার 'হরষে জাগো আজি' বা রামপ্রসাদী সুরে 'আমিই শুধু রইনু বাকি' দুটি গান এবং স্বপ্না ঘোষালের 'আকাশ আমায় ভরল আলোয়' এবং মিশ্র টোড়িতে 'গাও বীণা, বীণা গাওরে' আমাদের আশাবাদী করে তোলে, আরও বহুদিন আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীতে আপ্লুত হতে পারব বলে। এই দুজনের মাঝখানে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে খুবই বেমানান লাগে, তিনি শুধুই গেয়ে যান। বাণী ঠাকুর অনেক যত্ন নিয়ে চারখানি গান গেয়েছেন, কিন্তু প্রতিটি গানই আগে ভালভাবে বহুবার শোনা গেছে যাকে অতিক্রম করা তাঁর কঠিন। বেহালায় কাউন্টার পয়েন্ট সহযোগে 'এ গান আর গায়সনে' গানটির অন্য মাধুর্য এনেছে, কিন্তু সেটা গানের গুণ গায়কী আরো অনেক ভাল হতে পারত। তবুও নির্দ্বিধায় বলা যায় অন্যবারের তুলনায় বাণী ঠাকুর এবার

তুলনামূলক উদাহরণ হয়ে রইল। সুমিত্রা বসুর গানে যে নিষ্ঠা ও মেজাজ, বিজয়া চৌধুরীর গানে সেই পরিমাণ হেলেমানুষী ও স্বরলিপি পাঠ। আর একজন নতুন শিল্পী কল্যাণী ঘোষ। চারিটি গান শুনে ভাবনা হয় এইভাবে 'সন্ধ্যাদীপের শিখায় 'জেগে' অথবা 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' গানে থাম রে' বা 'পায় ঠেকাবে' গাওয়া হবে কিনা! সবশেষে 'এতদিন যে বসে ছিলেম' গানে আমরা বুঝতে পারলাম পথ চাওয়া এবং কাল গোণা বৃথা! এবং যেভাবে তিনি 'এ কী গো বিস্ময়ে' সুর লাগান (একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-বাহী কোম্পানী কর্তৃক রেকর্ড হয়) তাতে আমরাও রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবি "এ কী গো বিস্ময়!"

ভারতী রেকর্ড :

অমলেন্দু চৌধুরী একজন নতুন শিল্পী। ভারতী রেকর্ডে তাঁর চারখানি গান প্রমাণ করে তিনি আক্ষরিক অর্থে নতুন। তিনি শুধুই তরীতে পা দিয়েছেন, পারের পানে যাওয়ার এখনও অনেক দেরী!

আমার আছে অসীম আকাশ

'ইনরেকো' নামটি রেকর্ড জগতে নতুন যদিও তালিকাভুক্ত শিল্পীরা এবং রেকর্ডিং অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর সঙ্গীত নির্বাচনে 'ইনরেকো'র প্রয়াস অসীমকে ছুঁতে পেরেছে। এখন কোম্পানীর বয়স খুবই অল্প, কেউ স্পর্ধাভরে বলতে পারবেন না 'আমি আঠার বছর ধরে এই কোম্পানীতে রেকর্ড করছি।' কিন্তু ইনরেকো পরিবেশিত রেকর্ড-গুচ্ছে অনেক গান শোনা গেল যা ছত্রিশ বছর আগে রেকর্ড করা (যখন রেকর্ডিং ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে) অথচ আজও রোমাঞ্চিত করে। নতুন যে রেকর্ড করা হয়েছে, সেই গানও আশা করা যায়, তিন মাসেই হাস্যকরভাবে স্তব্ধ হবে না, হয়ত আঠার বছর বাদেও শোনা যাবে—এইভাবেই কিছু গান অসীমায়িত হয়।

আজকের দিনে নজরুলগীতির রূপ নিয়ে একটা সংশয় জাগে। যাঁদেরই গলার তৈরি, প্রতিসপ্তকেই অনায়াস, সীমায়িত নয় তাঁরা নজরুলগীতিতে নিজেদের বিস্তার করেন—অর্থাৎ রাগপ্রধান গান বা কাব্যগীতি যাই হোক না কেন সেখানে দুজনের গানে রকমফের ঘটবেই। কেউবা কাব্যের আবেদন পৌঁছে দেওয়ার জন্য আত্মমগ্ন, কেউবা রাগসঙ্গীতে দখল শোনানোর জন্য তৎপর। অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অনেক কাজে লেগেছে। প্রবীণা শিল্পী সুপ্রভা সরকার মিশ্র বাগেশ্রীতে 'ছলছল নয়নে' অথবা 'আসিবে তুমি জানি প্রিয়' গানে কখনই ওস্তাদি জবরদস্তি করেননি। দুটি গানে ছন্দের মাধুর্য অথবা 'আসিবে তুমি' গানে বিভিন্ন সুরের প্রয়োগ রোমাঞ্চিত করে। অন্য দুটি গানে লোক সংগীতের সুরে 'কাণ্ডারী গো কর কর পার', অথবা 'খেলা শেষ হল শেষ হয় নাই বেলা' গানে যেভাবে 'কাঁদিও না,
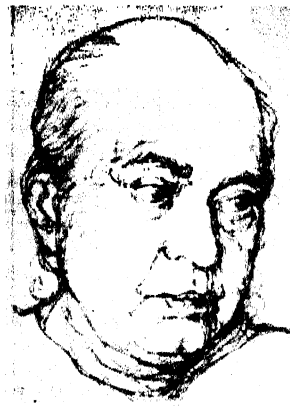
কাজি নজরুল ইসলাম

তুমি কাঁদিও না' গাওয়া হয়েছে, সেই গায়নভঙ্গি সম্পূর্ণ একালের—ক্ষমতা থাকলে যুগের সঙ্গে নিজেকেও মানিয়ে নিয়ে নতুন পথ দেখানো যেতে পারে। শিল্পীর ক্ষমতাই বয়স ভুলিয়ে দিয়ে প্রবীণা শিল্পীকে নতুনতর করে আবার অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর অক্ষম দাম্ভিকতা কয়েক বছরের মধ্যেই 'অলসো র‍্যান'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়। প্রবীণ শিল্পী ধীরেন্দ্র-চন্দ্র মিত্র সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। পটমঞ্জরীতে 'আমি পথ মঞ্জরী' কিংবা 'নিশি রাতে রিমঝিম বাদল নূপুর', আবার 'কথা কও কও কথা', প্রতিটি গানে কাব্যের সঙ্গে রাগের বিবাহ রাজযোটক হয়েছে। বিপরীত অভিজ্ঞতা প্রসূন ব্যানার্জির কণ্ঠে। দরবারী কানাড়ায় 'কেন মেঘের ছায়া' এবং শঙ্করায় 'মধুর নূপুর রুনুঝুনু বাজে' গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কৃতি শিল্পী প্রসূন ব্যানার্জিই প্রতিষ্ঠিত হন, নজরুলগীতি নয়। পূরবী দত্তের চারটি গানই অনবদ্য। এখনকার শিল্পীদের মধ্যে পূরবী দত্ত নজরুলগীতিতে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করবেন। তার সপ্তকে তাঁর কণ্ঠ কোনভাবেই সীমায়িত নয়। রসিয়া রাগে 'পলাশ মঞ্জরী পরায়ে দেগো' গানে হারমোনিয়াম সহযোগিতা সুখশ্রাব্য। আরও অনেক গানে ইউনিভক্সের সঙ্গীতানুষঙ্গ গানের মাধুর্য বাড়িয়েছে। সুকুমার মিত্র অভিজ্ঞ শিল্পী, তাঁর দক্ষতাও প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর গজল 'বকুল চাঁপার বনে' এবং বেহাগ খাম্বাজে 'কেন উচাটন পরাণ এমন করে' গানে তানকর্তব মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং উচ্চারণ কয়েক জায়গায় কানে লাগে। ধীরেন বসু সম্পূর্ণই কাব্যের কাছে সমর্পিত। তাঁর গায়কীতে নজরুলগীতি অন্যতর ব্যঞ্জনা পায়। মিশ্র ভৈরবীতে 'জানি জানি প্রিয়' সিরাজদ্দৌল্লার বিখ্যাত গান 'পথহারা পাখি', 'আরো কত দিন বাকি' গানে কাব্যের আবেদনই বেশি স্পর্শ করে। তুলনায় ভালো লাগেনি গজল 'চেয়ো না সুনয়না'। ধীরেন বসুর গানে সঙ্গীতানুষঙ্গের এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। 'জানি জানি প্রিয়' গানে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার, 'আরো কত দিন বাকি' গানে বাঁশির প্রয়োগ গানকে মধুরতর করেছে। 'পথহারা পাখি' গানের অন্তরার আগে সরোদের সাহায্যে করেছেন। বহুদিন বাদে সনৎ সিংহের গান আবার অনেককে মুগ্ধ করবে। সনৎ সিংহের গানে একটা স্বতন্ত্র মেজাজ আছে, কিন্তু অনেকদিন তিনি অবহেলিত। এবার তিনি একটি ই পি রেকর্ডে নজরুলের চারটি হাসির গান গেয়েছেন। ভাল লেগেছে পিলু সাহানার 'ওরে হুলোরে তুই রাতবিরেতে ঢুকিস নে হেঁসেলে' এবং 'আমার খোকার মাসি, শ্রীঅমুকবালা দাসী', কীর্তনাঙ্গ 'আমার হরিনামে রুচি' গানটি অনেকের ভাল লাগবে। প্যারডির চ্যাংড়ামি ছাড়াও যে হাসির গান হতে পারে, সেটা আজ প্রায় বিস্মৃত। 'হুলোরে তুই' গানটিতে বেড়াল বা কুকুরের ডাক নিতান্তই গিমিক।

একটি লং প্লেইং রেকর্ডে ফিরোজা বেগমের দশখানি গান প্রকাশিত। ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে নজরুলের নানা ধরনের গান সমান মর্যাদায় রূপায়িত হয়। কাব্যগীতি 'ভীরু এ মনের কলি', 'পথে চলিতে যদি চকিতে' গানের ছন্দের রংবাহার। মনে রং লেগেছে (চৈতী) গানের বিচিত্র চলন আবার মাদলের সাথে বাঁকা ছুরির সাথে, সব গানেই যথার্থ নজরুলগীতির রূপ আভাসিত।

আর একটি লং প্লেইং রেকর্ডে শচীনদেব বর্মণ, সুপ্রভা সরকার, ধীরেন বসু, পূরবী দত্ত, দেবব্রত বিশ্বাসের গান সংকলিত। সুপ্রভা সরকারের প্রথম-জীবনের গান 'কাবেরী নদী জলে'র পাশাপাশি এখনকার গান শুনলে বিস্মিত হতে হয় একজন শিল্পী কিভাবে কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে ভাঙছেন, গড়ছেন। মধুমাধবী সারং-এ পূরবী দত্তের 'চৈতালি চাঁদিনী রাতে' এবং 'সই ভাল ক'রে বিনোদ বেণী' গান দুটি বার বার শোনার মত। ধীরেন বসুর 'মোমতাজ মোমতাজ' গানে কাব্যই প্রাধান্য পেয়েছে, 'দূর দ্বীপবাসিনী'তে সংগীতানুষঙ্গ। দেবব্রত বিশ্বাস গেয়েছেন নজরুলসৃষ্ট দুটি নব রাগের গান। 'দোলন চাঁপা' ও 'বনকুন্তলা' দুটি গানে দেবব্রত বিশ্বাসের অনন্যকণ্ঠ সহায়ক হয়েছে এবং রাগরূপ ছাড়িয়ে কণ্ঠ এবং অর্কেস্ট্রাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। নজরুলের বনকুন্তলা গানে রাগের আরোহী প্ ধ্ স র, গপ ধপ, ধর্স, অবরোহী র্সা, ন ধ প গ র, গ স। বাদী পা। সংবাদী রে। অনেক জায়গায় সুরের স্বচ্ছন্দবিহার না হলেও, কে অস্বীকার করবে খাদের পঞ্চম যার মূলে মাধুর্য, সেই মাধুর্যের আস্বাদ দিতে দেবব্রত বিশ্বাস সবচেয়ে 'পারঙ্গম শিল্পী।

'ইনরেকো' একটি সাঙ্গীতিক অপরাধ করেছেন। প্রায় চার দশক আগে রেকর্ড করা শচীনদেব বর্মণের চারখানি পুনঃপ্রকাশিত রেকর্ড যে-কোন আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী (যাঁরা বছরের অভিজ্ঞতায় নিজেদের ক্ষমতা মাপেন না) হতাশবোধ করতে পারেন। মিশ্র খাম্বাজে 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' গানের মত রাগপ্রধান এখন আর শোনে কায়? কিংবা 'রেখল নিশিভোরে' গানে 'বৈরাগী' বা 'গিরিমাটির দেশে' কথাটির অদ্ভুত দরদী উচ্চারণ। রাগ সঙ্গীতের

লোকসঙ্গীতের উদাসী সৌন্দর্য আর কজন দিতে পারবেন?

ইনরেকোর বর্তমান পরিকল্পনা দেখে আমরা আশাবাদী, ভবিষ্যতে তাঁরা কি ব্যবস্থা নেবেন জানি না!

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

নদী থেকে সাগরে

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'—চণ্ডীদাসের এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করে গঠিত কাহিনী (রচয়িতা প্রশান্ত চৌধুরী) ওই বাণীর তুলনায় কিন্তু কিয়দংশে অবিন্যস্ত। নায়িকা প্রধান এ-কাহিনীর প্রধান চরিত্র সোহাগী (সন্ধ্যা রায়)। সোহাগীর জীবনের ইতিহাস হল: কুসুম (শমিতা বিশ্বাস) নামে এক বারবণিতার কন্যা-সন্তান এক রাত্রে মাতৃ-সদনে মারা যায়। কুসুম সেখানকার ধাই ভবদাসীর (ছায়া দেবী) সহায়তায় পাশের বেডে ময়রা বাড়ির একই সময়ে জাত কন্যার সঙ্গে বদল করে সেই শিশুকে গণিকা পাড়ায় নিয়ে আসে। বড় হয়ে সোহাগী ভবদাসীর কাছে তার আসল জন্ম-পরিচয় জানলো। কুসুম সোহাগীকে নিজের ব্যবসায়ে নামাতে চাইল। ঘৃণায় সোহাগী আত্মহত্যায় উদ্যত হয়। সে-পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করল শীতলা মন্দিরের পুরুত শ্যামাপদ (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)। প্রাণে বাঁচলেও কুসুমের অভিপ্রায় পূরণ থেকে সোহাগী নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। সোহাগীরও পিতৃপরিচয়হীন একটি কন্যা জন্মাল। নাম চাঁপা (রুমকী)। কুসুম, শ্যামাপদ ও ভবদাসীর ইচ্ছে চাঁপা লেখাপড়া শিখে নার্স থেকে ডাক্তার হবে; ভদ্র বংশে তার বিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে শ্যামাপদর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। চাঁপাকে স্কুলে ভর্তি করায় সমস্যা দেখা দিতে নিজেকে শ্যামাপদ তার পিতা বলে ফর্মে সই করে। বারবণিতার সংগে সৌহার্দের দরুণ শ্যামাপদর পৌরোহিত্যের চাকরিটি চলে যায়। শ্যামাপদ সোহাগী আর চাঁপাকে নিয়ে অন্যত্র বাসা বাঁধে। এইসময়ে ভবদাসীর একদা স্নেহলালিত ভদ্রবংশের সন্তান সাগরের (মিথুন চক্রবর্তী) সঙ্গে চাঁপা ও সোহাগীর পরিচয় হয়। মেয়ের জন্য ভেবে ভেবে সোহাগী অসুস্থ হয়ে পড়ে। (প্রথম স্লোকে সোহাগীর পরিচর্যা দেখে মনে হয় যেন জ্বরে আক্রান্ত) মৃত্যুকালে সে জেনে যেতে পারল সাগর তার চাঁপাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে। এইভাবে চাঁপার জীবনের ঢেউ 'নদী থেকে বয়ে যায় সাগরে।'

বারবণিতার জীবন নিয়ে চিত্র-কাহিনী এই প্রথম নয়। তবে এ-কাহিনীর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় রচিত চিত্রনাট্যে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মানবিক আবেদন জাগানো কতকগুলি ঘটনা ও পরিস্থিতির উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কাহিনীর বাঁধুনিটা আলগা। কতক দৃশ্য বড় সাজানো মনে হয়। সোহাগীর এক-মন্দিরের ধারে ব্যবসায় বিফল দুটি যুবক—গোবিন্দ (অনুপকুমার) ও মুরারিকে (রবি ঘোষ দিয়ে হাল্কা রসের পরিবেশন—নাটকীয় পরিস্থিতি সামলানোয় পরিচালকের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ। শ্যামাপদ বাচনে একাধিকবার 'সবার উপরে মানুষ সত্য' উক্তি না থাকলেও চলতো।

ছবিখানিতে বিশেষ উপভোগ্যাংশ হল অভিনয় এবং সঙ্গীত (পরিচালনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)। প্রধান চরিত্রাভিনয় শিল্পীরা ছাড়া ভূমিকাগুলিকে সমৃদ্ধ করেছেন গীতা দে ও সুলতা চৌধুরী। এছাড়া ছোট ছোট চরিত্রে অজিত চট্টো-

মিথুন ও রুমকী

পাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে প্রশান্তকুমার, কেষ্টধন, রসরাজ চক্রবর্তী, বিনয় লাহিড়ী, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রমুখ প্রায় ভুলে যাওয়া কতক শিল্পীকেও দেখা যায়। চিত্রগ্রহণে কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং শিল্পনির্দেশনায় সুনীতি মিত্রের কাজও ভাল। শব্দ গ্রহণের ত্রুটি মাঝে মাঝে সংলাপ বুঝতে অসুবিধে ঘটায়।

পঙ্কজ দত্ত

নিশান

জেমিনির প্রথম বাংলা ছবি। যদি না হতো, বাঙালীরা অনেক বড় লজ্জার হাত থেকে বাঁচতাম। অপসংস্কৃতির এমনি নির্জলা উদাহরণ, অর্থের এমন শোচনীয় অপব্যয় বাংলা ছবিতে কদাচিৎ চোখে পড়েছে। ১৬ রীল ধরে বাঙালী রুচিকে নিরন্তর আঘাত করা ছাড়া নিশান আর কিছুই করে না। এ-ছবির সংলাপ ছাড়া আর কোনো কিছুই বাঙালী নয়। বরং বাঙালী সৌন্দর্যবোধে যা কিছুই বহুদিন ধরে লালিত হয়ে এসেছে নিশান তার বিরুদ্ধতা করেছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপারটা হলো

...দশ বাঙালী শিল্পীদের সহযোগিতা পরামর্শে এমন একটি কদর্য রুচির বাঙালী বাংলা ছবি সম্ভব হয়েছে। যত বালকের ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছেন উত্তমকুমার। টালিগঞ্জের ...রিকা আরতি ভট্টাচার্য প্রসাধনে কি ...কিশীভাবে উগ্র এবং পরিচ্ছদে কত ...ব্যাহীনভাবে নির্ভয়! এবং স্বয়ং ...শেখর চট্টোপাধ্যায় এই 'বকজ্বপ' ছবিটির ...সংলাপ লিখেছেন। এবং এ-সব কিছু ...টেছে জাস্ট ফর এ হ্যাণ্ডফুল অফ ...দলভার!

ছবিটির ভাষা বাংলা না-হলে এই ...অপকীর্তির বিরুদ্ধে আমাদের এত-...খানি সোচ্চার হবার কারণ থাকতো না। ...ছবিটির কোনো কিছুর সঙ্গেই বাংলা ...ভাষা যায় না—অন্তত এইটুকু বুঝে ...শেখরবাবুর পিছিয়ে আসা উচিত ছিল। ...এ-দৃশ্যে তিনি কতিপয় অর্ধনগ্না ...রূপসীদের মধ্যে একটি পুঁতির হার ...ছুঁড়ে দিচ্ছেন সেটি অশালীন ইঙ্গিতে ...এমনি অতলস্পর্শী এবং রুচিহীনতায় ...এমনি অকপট যে বাংলা ছবিতে ওটির ...জুড়ি মেলা ভার। এমনি একাধিক দৃশ্য ...আছে এ-ছবিতে যার সঙ্গে বাংলা ...ভাষার সংযোগ একান্ত অবৈধ বলে মনে ...হয়।

নিরন্তর ভাবে পীড়াদায়ক এ-ছবিতে রঙের ব্যবহার। ছবি যখন রঙিন তখন যত পারো রঙ ঢোকাও! কিন্তু মাদ্রাজী ছবির এসথেটিকস যে একটি বাংলা ছবিকে কতদূর চক্ষুশূল করে তুলতে পারে নিশান তার নিদারুণ উদাহরণ। এক কথায় রঙের এই উন্মাদ অপচয় যে-কোনো রুচিবান দর্শকের পক্ষে হজম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন কি একাধিক পূর্ণিমা রাতের দৃশ্যে চাঁদের-রোদ্দুরে রঙের ছড়াছড়ি কোনো অলৌকিক স্বপ্নেরও অতীত।

এ-ছবিতে নাচ-গান — হট্টগোল — অভিনয় এসব কিছুর সমন্বয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মুখে আরো একটি পিণ্ড পড়লো বলা যেতে পারে। নাচের কোনো মা-বাপ নেই। নাভিদেশ প্রদর্শন ছাড়া এসব হাত-পা ছোঁড়ার মধ্যে আর কি গভীর শিল্প লুকিয়ে আছে আমি অন্তত ধরতে পারিনি। গানগুলি পুজো প্যাণ্ডেলের জগঝম্পে সংযুক্ত হবে সেই আতঙ্ক ভয়াবহ। এবং এ-ছবিতে অভিনয়ের ওই নয়টুকুই সত্যি। বিশেষ করে শেখরবাবু ভিলেন। প্রতিটি সংলাপের মধ্যে—একেবারে অকারণে—পাংচুয়েশনের মতো হাসি! স্যার লরেনস—শেখরবাবুর এই ভিলেনের পাশে আপনার রিচার্ড দ্য একেবারে ম্লান হয়ে গেল!

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

কুরুক্ষেত্র সমাচার

হাওড়া দক্ষিণায়ন-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনাকে সৎ-সাহসিক প্রযোজনা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রাজনীতি নাটকে বর্জিত হোক এমন দাবি করি না, কিন্তু রাজনৈতিক দলের রাজনীতি আর নাটকের রাজনীতির নিশ্চয় পার্থক্য থাকবে। নাটকের ক্ষেত্রে যা কিছুই বলা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তাকে নাটক হয়ে উঠতে হবে। কুণাল মুখোপাধ্যায় ...

কুরুক্ষেত্র সমাচার

সীমা ১৯৬৭ থেকে ৭১। এই সময় নিয়ে রচিত একাধিক নাটক কয়েক বছরে রচিত হয়েছে। ৭২ থেকে ৭৭ যদিও বেশির ভাগ নাটকের কাল। এক্ষেত্রে সময়টা ৬৭ থেকে ৭১। অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গের রাজনীতিতে যে সময়টা নানা কারণে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। 'কুরুক্ষেত্র সমাচারে' রিহার্সাল শুরু হয়েছিল মহাভারতের কাহিনী নিয়েই। কিন্তু রিহার্সাল দেখতে এসে বিপ্লব রিহার্সাল রুমেই মহাভারতের কাহিনীর মধ্যেই দেখতে পেয়েছে আর এক অন্য কুরুক্ষেত্রকে। যে কুরুক্ষেত্র এই পশ্চিম-বঙ্গেই। নাট্যকার ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বামপন্থী রাজনীতির সুস্থ সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। সব বামপন্থী দলের কাছেই নিরাশ্রিত এক যুবকের কাহিনী কুরুক্ষেত্র সমাচার। অর্থনৈতিক আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া অর্থনৈতিক সুবিধাবাদকে দেখে বিস্মিত হয়েছে বিপ্লব, বিস্মিত হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনের মোহ দেখে। যখনই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে তখনই আখ্যা মিলেছে প্রতিক্রিয়াশীল।

কিন্তু এই বক্তব্য বড় কথা নয়, উপস্থাপনার গুণে কুরুক্ষেত্র সমাচার-এর নাটক হয়ে উঠতে কোন অসুবিধে হয়নি। প্রায় পঁচিশটি চরিত্রের এই নাটকের দলগত অভিনয় লক্ষ করার মত। রিহার্সাল রুমের মহড়ার দৃশ্যটি গ্রুপ থিয়েটার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যে কোন লোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। একটা নাটকের দলকে যে কিভাবে একটি প্রযোজনার জন্য নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয় তার একটি সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন নির্দেশক তপন মুখার্জি। শেষ দৃশ্যের ফ্রিজের ব্যবহারটি সুপ্রযুক্ত। মঞ্চ-স্থাপত্য, সেট-সেটিং ও আলোর ব্যবহারের দারিদ্র্য মিটে যায় শিল্পীদের অভিনয়ের সম্পদে। সংগীতের ব্যবহারে আরও একটু যত্নবান হবার প্রয়োজন। কোন কোন সময় টেপের অসংযত ব্যবহার নাটকের ক্ষতি করেছে।

বিপ্লবের ভূমিকায় কুণাল মুখোপাধ্যায়-এর অভিনয় কখনও কখনও বড় বেশী কৃত্রিম মনে হয়েছে। চলচ্চিত্রের হিরোদের প্রভাব এক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করেছে বলে মনে হয়। চিরকিশোরের চরিত্রে রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় চরিত্রটিকে যথাযথ উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছেন। উগ্রপন্থী নেতা সতীশদার চরিত্রে তপন মুখার্জির অভিনয় প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সরমা চক্রবর্তী, পঙ্কজ মুখার্জি, স্বপন লাহিড়ী ও সত্যজিত মুখার্জি।

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

বদ্রীনারায়ণ (১৯২৯—)

বদ্রী নারায়ণের জন্ম নিজামের আমলের হায়দ্রাবাদের যমজ শহর সেকেন্দ্রাবাদে। অন্ধ্র প্রদেশ থেকে তিনি গেছেন বোম্বাইতে। তাও অনেক দিন হল। ছবি আঁকা কিন্তু শিখেছেন নিজে নিজে। নানা মাধ্যমে তিনি দক্ষ। আলেখ্য রচনা, কাঠ খোদাই, ধাতু খোদাই, মোজাইক, কাচের ওপর মোজাইক, চীনামাটির টালি এবং থালা। কবিতা, ছোট গল্প, শিশুদের জন্য গল্প রচনা, রেডিও এবং টেলিভিসনের কথিকা, শিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধ, এসবও লেখেন—সব্যসাচী তিনি। আন্তর্জাতিক এবং দেশজ নানা পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কান্তিলাল রাথোড় পরিচালিত ভারতীয় তথ্যচিত্র বিভাগের "টেস্টেড বেরিজ"-এর জন্য তিনি ধারা-বিবরণী এবং চলচ্চিত্রসজ্জা রচনা করেন। বোম্বাই-এর দূরদর্শন তাঁর ওপর একটি তথ্যচিত্র করেছে—"কল ইট এ ডে'।

১৯টা একক প্রদর্শনী সবসুদ্ধ করেছেন (১৯৫৪—১৯৭৬) হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, নয়াদিল্লি, কলকাতা ও মাদ্রাজে। শেষ প্রদর্শনী হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাইনসিয়ামের সূর্য গ্যালারীতে। দেশে-বিদেশে বহু যৌথ প্রদর্শনীতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। পুরস্কৃত হয়েছেন অল ইণ্ডিয়া আর্ট একজিবিশনে, হায়দ্রাবাদ (ব্রোঞ্জ মেডেল, ১৯৪৯); হায়দ্রাবাদ আর্ট সোসাইটি রৌপ্যপদক এবং অর্থ পুরস্কার); কোচিনের সর্বভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী (রৌপ্যপদক) ১৯৫৪; সর্বভারতীয় প্রদর্শনী আলিম্পে (রৌপ্যপদক) ১৯৫৫, অল ইণ্ডিয়া আর্টস প্রদর্শনী, হায়দ্রাবাদ (অর্থ পুরস্কার) ১৯৫৬। ঐ ছাড়া অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন বোম্বাই আর্ট সোসাইটি ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ (রৌপ্যপদক সহ); অল ইণ্ডিয়া একজিবিশন হায়দ্রাবাদ ১৯৬০, ১৯৬২, বোম্বে আর্ট সোসাইটি ১৯৬১, অন্ধ্র ললিতকলা আকাদমী ১৯৬২, আইফেকস নতুন দিল্লি ১৯৬২, ১৯৬৩। ১৯৬৫ সালে জাতীয় ললিতকলা আকাদমীর পুরস্কার পান। সেই বছর পান হায়দ্রাবাদ আর্ট সোসাইটির স্বর্ণ-পদক এবং অর্থ পুরস্কার এবং আরো ৩টি অর্থ পুরস্কার। এ ছাড়া, আরও অসংখ্য পুরস্কার। বর্তমানে বোম্বাই-এর ইণ্টারন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

বদ্রী নারায়ণ প্রধানত প্রাচীন এবং মধ্যযুগের শিল্পকলা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁর কাজে লোকশিল্পের প্রভাব স্পষ্ট। লোকগাথা এবং পুরাণের জগৎ তাঁর ছবিতে এসেছে। এই দেশের শিল্পকলার পরম্পরা থেকে ঋণ গ্রহণ করেও তিনি নিজস্ব ছাঁচে সব কিছু ঢেলে নিয়েছেন। সূর্যকরোজ্জ্বল এক ভূমধ্যসাগরীয় জগতে তিনি আমাদের স্বাগত জানান। উষ্ণ আতিথ্যদান করেন। মূলত মণ্ডনধর্মী কাজ। রূপারোপিত (স্টাইলাইজড)। ভারতীয় চিত্রলেখের ধরনে তিনি পুরাণের জগৎ এবং প্রকৃতি পুনরাবিষ্কার করেন। তাঁর আগেকার সাদা-কালো রেখাচিত্রে মণ্ডনধর্মী মানুষ-মানুষীর উপস্থিতি কাব্যগন্ধ এনেছে। তৈলচিত্র আর লিনোকাটে পেশীবহুল শক্তি প্রত্যক্ষ। সীমান্তবর্তী কালো রেখার মধ্যে বিধৃত কাজগুলি অনেক ক্ষেত্রে রুয়োর কথা মনে আনে। কারণ, কাচচিত্রের ধাতুর পাতের বন্ধনীর মতো দেখায় তাঁর জোরালো কালো রেখাগুলো। কাঠামো এবং রচনা সম্বন্ধে সচেতন বলেই লৌকিক এবং পুরাণ-গন্ধী ছবিগুলোর মধ্যে যাদুকরী গুণে আছে।

বদ্রী নারায়ণ ছাপাই ছবি এবং মোজাইকের মধ্যেও একটা নিজস্ব শৈলী তৈরি করতে পেরেছেন। তাঁর কাছে শিল্পকলা এমন "মধুর মিথ্যা" যা সার্থক হলে মানুষের বোধের গভীরে নতুনতর মাত্রা যোগ হয়। আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্য প্রায়শ চিত্রকর এবং ভাস্করদের স্থান করে দেয় না। এ ক্ষেত্রেও বদ্রী নারায়ণর প্রচুর ভাবনাচিন্তা আর কাজ করেছেন। ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিক পর্যায়ে তিনি সেই কারণে নিজের বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছেন। যথা তাঁর "ভূদৃশ" নামে বিখ্যাত কাজটি কাচ ও মোজাইক কাঠের ওপর করেছেন। হয়তো এসব কাজে

বায়জাইন্টিন প্রভাব আছে, তাতে কিন্তু রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয়নি।

এর পেছনে ছোট্ট ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য। ১৯৫৭ সালে ভিটরাম স্টুডিও খোলেন চীনামাটির কাজের জন্য সাইমন আর [illegible] লিফচৎস। এখানে ডজনখানেক শিল্পী এসে চীনা-মাটির টালি আর থালায় ছবি এঁকে চালিয়ে দিতেন, কাজগুলি কিনে নিয়ে বিক্রি করতেন শ্রীমতী ওয়ালটারবার্গার নাম্নী এক রুশী উদ্বাস্ত। এখানে কাজ করতে করতে ক্রমশ চীনামাটির প্রেমে পড়ে যান বদ্রী। প্লেটের ওপর তাঁর আঁকার মান্দনিক দিকটা খুবই জোরালো। বস্তুত মানুষের ব্যবহৃত ঘর-বাড়ি, আসবাব, বাসনের মধ্যে শিল্পীকে ঢুকে যেতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর কাজের জোর সেইখানে।

"ভিখারী" (২০"×২৪" তৈলচিত্র) —পুরচিত্রের (সিটিস্কেপের) পরিবেশে এক ভিখারীকে দেখিয়েছেন। শিশু-চিত্রের নিষ্পাপ ভঙ্গীর সঙ্গে লোক-চিত্রের সরল রূপারোপ অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর ছবির মানুষগুলির মাথা বড় এবং তার চেয়েও বড় বড় অদেব চোখ। আপাত পশ্চিমী ধরন-ধারণ সত্ত্বেও বদ্রী নারায়ণের ছবির নিভৃত অভ্যন্তরে এক নিবিড় ভারতীয় মন

সারা বিশ্বে পরীক্ষিত বেগন® স্প্রে
'অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া' শক্তিশালী বলে আপনার
ঘরদোর সব রকম কীট থেকে সুরক্ষিত রাখে দীর্ঘকাল ধরে

এই দেখুন সুখের, স্বাস্থ্যকর কীটমুক্ত বেগনগড়

সবরকম কীটের কবল থেকে দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষালাভ করুন— মাত্র একবার স্প্রে করেই।
বেগন স্প্রে এক সাধারণ স্প্রে নয়। একবার স্প্রে করলেই সবরকম কীটের সমস্যার ব্যাপারে শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী 'অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া' সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে। তার মানে বেগন-স্প্রে যেমন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল তেমনি খরচও কম।

আরশোলা খতম করতে:
ময়লা ফেলার পাত্রে, ড্রেনে এবং লুকিয়ে থাকবার অন্য আর সব জায়গায় বেগন-স্প্রে ব্যবহার করুন।

মাছি ও মশার জন্যে
যেখানে ওরা বসে সেখানে স্প্রে করুন: জানলার কাঠে ও ফ্রেমে, পর্দায়, ফিটিংে, তেমনি দেওয়াল, সিলিং আর আসবাব পত্রেও…

ছারপোকা খতম করতে
যেখানে ওরা বাসা বেঁধেছে সেই সব আসবাবপত্রে গদিতে এবং গৃহসজ্জার জিনিষপত্রে বেগন-স্প্রে ব্যবহার করুন।

আরশোলা, মাছি, মশা, ছারপোকা ঘরের সবরকম কীটের ক্ষেত্রে কেবল বেগন-স্প্রে সত্যিসত্যি কাজ করে:

১) **ফ্লাশ করার ক্রিয়ায়**
লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে কীট বার ক'রে দেয় এবং এদের মেরে ফেলে।

২) **পজিটিভ 'স্পর্শজনিত' ক্রিয়ায়**
স্প্রে-করা সমস্ত জায়গায় স্পর্শজনিত শক্তিশালী ক্রিয়ার ফলে— এখানে যে সমস্ত কীট চলে ফিরে বেড়ায় বা বসতে চায় তাদের নিশ্চিত ভাবে মেরে ফেলে।

৩) **অবশিষ্টাংশের ক্রিয়ার ফলে**
দীর্ঘস্থায়ীভাবে কার্য্যকরী। স্প্রে মুছে বা ধুয়ে না গেলে স্প্রে করা জায়গাটি অনেক দিন ধরে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে।

1 Litre Baygon

POISON

একমাত্র স্প্রে যার অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া'র কীট থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা পাওয়া যায়।

বেগন® স্প্রে

বায়ারের আন্তর্জাতিক গবেষণার এক প্রমাণিত কীটনাশক

OBM-7822-BEN

চিঠিপত্র

কঃ পন্থা।

অশোক রুদ্রের লেখা "কঃ পন্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। যেহেতু অশোকবাবু নিজেই বলেছেন, তাঁর নির্দেশিত পন্থা আদৌ নূতন নয়। "অতি পুরাতন ভাব" তাই এ সম্বন্ধে যা বলা হবে, তাও অনেকাংশে পুরাতন।

প্রথমেই ধরা যাক, অশোকবাবু বলেছেন—সকলে মিলেমিশে পরিশ্রম করবে, যে যেমন পরিশ্রম করবে, সে সেই অনুপাতে যৌথ আয়ের ভাগী হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা বাতলানো কথায় যত সহজ কাজে কিন্তু মোটেই তত সহজ নয়। কারণ, বিভিন্ন শ্রমিকের কাজের অনুপাত কিভাবে স্থির করা হবে তার কোন ত্রুটিহীন পদ্ধতি নাই। যদি কেউ বেশী সময় কাজ করে অথচ কম উৎপাদন করে, তার ক্ষেত্রে কিভাবে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হবে? সোজা কথায় পরিশ্রমের মাপকাঠি কি হবে? শ্রমিক কতটা সময় কাজ করল তা, নাকি কতটা উৎপাদন করল সেটা? এ ক্ষেত্রে uniformity বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব।

অশোকবাবুর আর একটি বক্তব্য হল, আমাদের দেশে ভূমিহীন চাষীদের অথবা চাষীর পরিবারের প্রচ্ছন্ন বেকারদের দারিদ্র ও কর্মাভাব ঘোচানোর জন্য শিল্পের উপর একেবারেই নির্ভর করা যাবে না। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের দেশে কৃষি থেকে জনসংখ্যা মোটেই অকৃষি (অর্থাৎ শিল্প, প্রশাসন, শিক্ষা, পরিবহণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যাচ্ছেও না যাবার সম্ভাবনাও নাই। সত্যি কি তাই? ভারতে কৃষি থেকে অকৃষি ক্ষেত্রে যে হারে জনসংখ্যা যাচ্ছে তা হয় তো খুব দ্রুত নয়। কিন্তু একেবারেই যাচ্ছে না বা যাবার সম্ভাবনা নাই—একথা মোটেই সত্যি নয়। কারণ ১৯২১ সালে আমাদের দেশে কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে মোট নিযুক্ত লোকের অনুপাত ছিল ৭৬ : ২৪। ১৯৭১ সালে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৭২ : ২৮।

(Source: A note on the working force estimate 1901—1961. B. R. Kalra, Final Population Tables, Paper No. 1, 1962, and Census of India, 1971)

এত কথার দরকার কি? গত ২০।২৫ বছরের ব্যবধানে লক্ষ করলে দেখা যাবে ২০।২৫ বছর আগে একটা গ্রামের যত জন লোক শিক্ষকতা করত, ছোট ব্যবসা করত, কাছের বা দূরের অফিসে বা কারখানায় কাজ করত। এখন তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় এই সব কাজ করে।

এর পর অশোকবাবু বলেছেন—জমি, জল বা শ্রম এর কোনটারই অভাব আমাদের দেশে নাই। এতো একটা বিরাট সুখবর! আমাদের দেশে শ্রমের অভাব নাই স্বীকার করি। কিন্তু জমি ও জল? বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় মাথাপিছু এক একর জমিও যে আমাদের নাই একথা কে না জানে? কৃষির জন্য যে জলের দরকার তার উৎস নদী পুকুর এবং মাটির নিচের জল। গ্রীষ্মের সময় অধিকাংশ পুকুর-ডোবাই তো শুকিয়ে যায়। আর চাষের প্রয়োজনে নদীর জল কতটুকুই বা পাওয়া যায়? একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। বহু কোটি টাকা খরচ করে কংসাবতী নদী থেকে খাল কাটা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি না হলে বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরের কোন অঞ্চলেই চাষের সময় কংসাবতীর খালের জল পাওয়া যায় না। দামোদর বা ময়ূরাক্ষীর খালের জলের সরবরাহ কতটা ভালো তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। আর মাটির নিচের জলের কথা নাই বা বললাম। সারা দেশের চাষযোগ্য জমিতে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে জল সরবরাহ করতে হলে গভীর নলকূপ বসাতে এবং তা চালু রাখতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন সে সামর্থ্য আমরা কবে লাভ করব তা বোধ হয় কেউই জানে না। তা ছাড়া এর জন্যে পাম্প তৈরী শিল্প ও বিদ্যুৎ শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন দরকার। অশোকবাবুর মতে আমাদের দেশে তা কাম্যও নয় সম্ভবও নয়।

এখন অশোকবাবুর একটা মারাত্মক মন্তব্যের কথায় আসছি। তিনি বলেছেন—সেচ ও রাসায়নিক সার-এই দুই ব্যবস্থার যুগপৎ আশ্রয় না নিয়ে শুধুমাত্র সেচের আশ্রয় নিয়ে কম খরচে অধিকতর উৎপাদন করা সম্ভব। এ তত্ত্ব তিনি কোথায় পেয়েছেন জানি না। তবে একই জমিতে বছরে একটার বেশী ফসল তুলতে হলে কি পরিমাণ সার দিতে হয়, তা জানার জন্যে অর্থনীতিজ্ঞানের কোন দরকার নাই—যে কোন চাষীর সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট।

অশোকবাবু বলেছেন—কৃষিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান গ্রামের মানুষের উন্নতির একমাত্র পন্থা। এটা অনেকগুলো পথের একটা হতে পারে, একমাত্র পথ হতে যাবে কেন? জমির ব্যক্তিগত মালিকানা রেখেও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। একটা নির্দিষ্ট সীমার বেশী জমি কারো থাকবে না। প্রত্যেক গ্রামে service co-operative-এর মাধ্যমে বীজ, সার, চাষের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি চাষীদের সরবরাহ করা হবে—এভাবেও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। অশোকবাবুর কথা ঠিক—আমাদের দেশের চাষীরা মূর্খ হতে পারে কিন্তু বোকা নয়। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সাজ-সরঞ্জাম পেলে এবং উৎপন্ন ফসলের লাভজনক দাম পেলে তারা যে জমি ফেলে রাখে না, তা পশ্চিম বাংলার যে সব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সেচের সুযোগ আছে সেখানে গেলেই দেখা যাবে। তা ছাড়া যৌথ কৃষিব্যবস্থা যে উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র পথ নয়, রাশিয়া ও জাপানের একর প্রতি কৃষি উৎপাদনই তার প্রমাণ। রাশিয়ার যৌথ কৃষিব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার একর প্রতি উৎপাদন জাপানের (যেখানে কৃষিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বর্তমান) চেয়ে কম।

জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার সংগ্রামে দরিদ্র গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দেবে যারা বা যে দল তাদের আবশ্যিক গুণাবলীর যে তালিকা অশোকবাবু পেশ করেছেন সেটাই তাঁর প্রবন্ধে বোধ হয় সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার। কারণ একাধারে এত বেশী সদ্গুণবিশিষ্ট এবং দোষহীন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি?

সবশেষে অশোকবাবুর কাছে একটা [illegible]

এরকম চাষীরাই তাঁর আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য হবে কেন? ধনবৈষম্য না আয়-বৈষম্য? তাদের অপরাধ কি? (অবশ্য সিলিং-এর বেশী জমি যাদের আছে, আমি তাদের কথা বলছি না।) ২০।২৫ বিঘে এক-ফসলী জমির মালিকের আর্থিক অবস্থা আমাদের দেশে কতটুকু ভালো? কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে কি তাদের চেয়ে অবস্থাপন্ন এবং তাদের সমান অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা কম? মাধ্যমিক স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকতা করে, অফিসে বা কারখানায় চাকরি করে, ছোটখাটো ব্যবসার দ্বারা যারা মাসে ৬০০।৭০০ টাকা উপায় করে বর্তমান যুগের সভ্য নাগরিক জীবন-যাপন করে, আমাদের দেশে এরকম লোকের সংখ্যা কি মধ্যবিত্ত চাষীদের সংখ্যার চেয়ে কম? এই সব লোকেদের আয়ের বৈষম্য হ্রাস না করে অশোক-বাবু যে কেবলমাত্র জমির মালিক চাষী-দের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন সেটা কতখানি যুক্তিসংগত?

করুণাময় নন্দী
নরেন্দ্রপুর

কণ্টকল্পিত

গত ৬-৫-৭৮ তারিখের 'দেশ' সংখ্যায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের 'কণ্টকল্পিত' নিবন্ধে কিছু তথ্যপ্রমাদ ঘটেছে। ১৯৩৮ সালে মে মাসে স্যার জন হুবাক উড়িষ্যার তৎকালীন গভর্নর তিন মাসের ছুটিতে যাবার প্রস্তাব করেন। ঐ তিন মাসের জন্য উড়িষ্যার তৎকালীন 'রেভেনিউ কমিশনার' মিঃ ডেন অস্থায়ী গভর্নর মনোনীত হন। কংগ্রেসী প্রধান-মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ দাস একজন অধস্তনকে গভর্নর করায় ঘোরতর আপত্তি জানান, এবং প্রতিবাদে পদ-ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ঘরোয়া আলো-চনায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসী উর্ধ্বতন মহলকে আশ্বাস দেন যে, ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রশাসনিক পরিবর্তন আর ঘটানো হবে না। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ দাস তাঁর সংকল্পে অবিচল থেকে মিঃ ডেনের কার্যভার গ্রহণের দিন (৪ঠা মে) যখন রাজভবনে পদত্যাগপত্র পেশ করতে রওয়ানা হচ্ছেন তখন গভর্নর স্যার জন হুবক-এর কাছ থেকে টেলিফোনে একটি বার্তা পান। স্যার জন জানালেন যে, তিনি ছুটিতে যাবেন না—ছুটি বাতিল করে দিয়েছেন। পরের দিন বিখ্যাত প্রায় সব দৈনিকপত্রের প্রথম সংবাদ—

Sir John Hubbak cancels his leave

কয়েকদিন পরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি (জাতীয় কংগ্রেসের সভা-পতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হত) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আশুতোষ কলেজ হলে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাঁর সম্বর্ধনা সভায় এই ঘটনা উল্লেখ করে বলেন—শ্রীবিশ্বনাথ দাসের হাতে প্রেস্টিজ 'অভিমানী' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি প্রচণ্ড চড় খেল।

মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ

রামেন্দ্রসুন্দরের পত্রাবলী

দেশ সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৮৫) আমার পিতা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ও গুরুদেবের যে সকল পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দিত। আমার স্বর্গগতা মাতা শ্রদ্ধেয়া শ্রীইন্দু-প্রভা দেবী উক্ত পত্রাবলী সযত্নে রাখিয়া-ছিলেন। প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় তাঁহার দ্বারা পরিচালিত "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। আমরা খোঁজ করিয়া সেগুলির কোন সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর পরে যে শ্রীমান উমাপ্রসাদ কর্তৃক প্রদত্ত এই জাতীয় সম্পদ এই পত্রিকা মারফত সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন সে জন্য আমি শ্রীমানকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতেছি। শ্রীমান লিখিত মৎ পিতা প্রসঙ্গে আমার পিতার Sadler Commission Report ও Senate-এ প্রথম বাংলা ভাষায় Lecture প্রবর্তন করার উল্লেখ নাই। পরে বিশদভাবে প্রকাশিত হইলে আনন্দিত হই। গুরুদেবের অসংখ্য বন্ধুবর্গের মধ্যে এক রামেন্দ্রসুন্দর ছাড়া আর কাহাকেও "প্রিয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিনা জানিতে ইচ্ছুক।

চঞ্চলা দেবী
মুর্শিদাবাদ

বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্র

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গবেষণাকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার যে প্রস্তাব শ্রদ্ধেয় অমিত্রসূদনবাবু 'দেশ'-এ দিয়াছেন (সংখ্যা ৪৫।৩৭) তাহা পড়িলাম। লেখক জানাইয়াছেন, ১৯৬৫ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রস্তাবটি আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। ১৯৬৫ হইতে ১৯৭৮ সাল সুদীর্ঘ তেরো বৎসর সময়। সুতরাং ঘটনাটি সত্য সত্যই দুঃখজনক।

সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার মনে হয় যে, বঙ্কিম সাহিত্যের সঠিক পুনঃ-প্রচার প্রয়োজন।

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঔরাঙ্গাবাদ এয়ারপোর্ট

চায়ের চাষ

আপনাদের পত্রিকায় চা শিল্প সম্বন্ধে জনৈক পত্রলেখক আসামে কখন চায়ের চাষ হয়েছিল তা জানতে চেয়ে-ছিলেন। এ বিষয়ে কিছু তথ্য দিলাম। Robert Bruce সর্বপ্রথম আসামে চা আবিষ্কার করেন। তিনি আহম রাজা পুরন্দর সিংহ ও পরে চন্দ্রকান্ত সিংহের এজেন্ট ছিলেন। Bruce ১৮২৩ সালে আসামের এককালীন রাজধানী পাড়গাওয়ান সিংফো নামক পার্বত্য জাতীয় নেতা থেকে জানতে পারেন যে, সেখানে জংগলে চা জন্মে। Mr. Bruce কিছু বন্য চা সংগ্রহ করে তাঁর ভ্রাতা C. A. Bruceকে দেন। অতঃপর এই নমুনা চা উত্তর-পূর্ব

এজেন্ট মিঃ ডেভিড স্কট-এর হাতে পড়ে। মিঃ স্কট চায়ের নমুনা কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের Superintendent-এর কাছে পাঠান। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, এই জংলী চা চীন দেশ থেকে আনীত চায়ের সমগোত্রীয়।

এ সময়ে চীন দেশ থেকে চা আমদানিতে বাধার সৃষ্টি হয়। তখন মিঃ স্কট-এর পরবর্তী গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট Capt. Jenkins-কে আসামে চা পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি Mr. Bruce-এর চা আবিষ্কারের কথা গভর্নর জেনারেলের গোচরে আনেন। সরকার ১৮৩৪ সালে কলিকাতায় একটি চা কমিটি স্থাপন করেন। মিঃ Bruce-কে সরকারী চা বাগানের Superintendent নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৫ সালে সদিয়ার নিকটস্থ কুন্ডালিমুখ চা বাগান স্থাপন করা হয়। এটাই প্রথম সরকারী চা বাগান। ১৮৩৯ সালে আসাম টি কোম্পানী স্থাপিত হয়; চা চাষের ক্ষেত্রে এটাই সর্বপ্রথম যৌথ কোম্পানী। জংলী চা সিলেট ও কাছাড়েও পাওয়া যায়। সিলেটের মহম্মদ ওয়ারীস এগারসতী পরগনায় প্রথম চা আবিষ্কার করেন। তাহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৮৫৮ সালে সিলেট শহরের সংলগ্ন মালনীছড়ায় সিলেটের প্রথম চা বাগান স্থাপিত হয়। আসামের চা শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে Sir Edward Gait-এর History of Assam গ্রন্থে তথ্য আছে। এ সম্বন্ধে আমি আসাম রিসার্চ সোসাইটি জার্নালে ৩য় Volume-এ Early History of Tea in Assam নামক প্রবন্ধে কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছিলাম। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Assam Review পত্রিকায় Dr. Aarole Mann নামক চা বিশেষজ্ঞ The early history of the Tea Industry in North East India নামক একটি মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখেন। চা-এর আবিষ্কার সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে মনিরাম দেওয়ানের উল্লেখ দেখি নি। বলা আবশ্যক সদিয়া অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত। সিংফো ঐ অঞ্চলের একটি পার্বত্য উপজাতি। চার্লস আলেকজান্ডার ব্রুস ১১-১-১৭৯৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন ও ২৩-৪-১৮৭৩ তারিখে মারা যান। তিনি তেজপুরে খ্রীষ্টানদের গোরস্থানে সমাহিত। চা-এর মত কফিও সিলেটের জংগলে পাওয়া যায়। সিলেটের উদ্যোগী কালেক্টর রবার্ট লিণ্ডসের (১৭৭৮-৮৮) আত্মজীবনীতে এই খবর পাওয়া যায়।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী
ঢাকা, বাংলাদেশ

অবসরের গান : বোলান

গত ২২ জুলাই ১৯৭৮ 'দেশ' পত্রিকায় "অবসরের গান : বোলান" প্রবন্ধটি পড়লাম।

আমি লক্ষ করেছি, লাভপুর অঞ্চলে চৈত্র-সংক্রান্তিতে যে বোলান বৃত্তাকার আসরে একজন মূল গায়েন গানের খাতা হাতে [প্রম্পটার নয়] গাইতে গাইতে প্রায় দৌড়ের ভঙ্গীতে কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে পুনরায় নৃত্যের ভঙ্গীতে কয়েক পদ পিছিয়ে আসেন এবং দলের সমস্ত গায়ক মূল গায়েন কর্তৃক গীত পদটি উচ্চকণ্ঠে গাইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৈহিক ভঙ্গীরও অনুকরণ করেন। ফলে বৃত্তের মধ্যে এক অদ্ভুত নৃত্যেরও সৃষ্টি হয়। এক দলের গাওয়া সাঙ্গ হলে অন্য দল গাইতে নামে। এইভাবে বোলানের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়। তবে লেখক যে কারণে একে লোকনাট্য বলেছেন, অনভিজ্ঞ আমি সেই উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বোলান এখনও স্বচক্ষে দেখিনি কিন্তু শুনেছি এবং গানের খাতা দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লাভপুর অঞ্চলে বোলান গানের [ভাদু গানেরও] সমৃদ্ধ এবং প্রায় একমাত্র রচয়িতা অহিভূষণ।

'বোলান' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে লেখক কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। বোলান শব্দের অর্থ শ্রীপুলকেন্দু সিংহের অনুমানে 'বোল্' থেকে বোলানো বা কথা বলানো আর শ্রীদিলীপ বাগচির মতে 'বুল্' ধাতু অর্থে ঘুরে বেড়ানো। কাজেই লেখক যে বলেছেন শ্রীপুলকেন্দু সিংহের 'এই অনুমানের সহায়ক তথ্য মিলছে নদীয়ার গবেষক শ্রীদিলীপ বাগচীর ভাষ্যে, সে তথ্য মিললেও দুজনের মতের পার্থক্য কিন্তু থেকেই যায়। কথা বলানো আর ঘুরে বেড়ানো এক নয়। বোলান শব্দের অভিধানগত অর্থ বোলা+অন=বলানো এবং বোল+অন (আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত)=প্রতিবচন বা উত্তর ['ঘরে গেলা না দিয়া বোলান'—কবিকঙ্কন চণ্ডী অথবা 'ডাকিলে বোলান দেও'—মনসামঙ্গল : বিজয় গুপ্ত] দুই-ই হতে পারে। [দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় শব্দকোষ : দ্বিতীয় খণ্ড—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] অন্যপক্ষে 'বোলাবুলি' শব্দের অর্থ উত্তর প্রত্যুত্তর ['এই মতে দুইজনে করে বোলাবুলি'—চৈতন্যচরিতামৃত]। 'বুল' ধাতু অর্থে ঘুরে বেড়ানো কথাটিও বোলানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব বোলান অর্থে একটি বাক্যে যদি বলি উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক এক প্রকার লোকগীতি, যা পরিভ্রমণ করতে করতে গেয়—তাহলে কি কোন ভুল হবে?

লেখক বলেছেন 'বোলান গান বর্ধমান নদীয়া মুর্শিদাবাদ সীমান্ত ভূখণ্ডের এক সজীব ও পরিবর্তমান লোকনাট্য।' কিন্তু বোলানকে লোকনাট্য বলতে আমার সংশয় আছে। আমি এখানে নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী নাটকের লক্ষণ আওড়াতে চাই না। কিন্তু একথা বলা অকর্তব্য হবে না যে 'উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক কিন্তু সমবেতভাবে গেয়' বলেই বোলানকে নাটক বলে আখ্যাত করা যায় না। তার কারণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হয় না। লেখকের রচনাতেই অন্যতম কারণ সুস্পষ্ট।...'এই উপলক্ষকে লোকায়ত জীবনের সহজ বিনোদনের ছাঁচে ঢালাই করে বোলান গান ও বোলান যাত্রা বানানো হয়। অর্থাৎ শুধু গান নয়, যাত্রাও। কাহিনীধর্মী.

চপল।' কাহিনী-ধর্ম। ও পারিজন এবং নৃত্যছন্দে চপল একথা না হয় মানা গেল কিন্তু অভিনয়িক? আমি যে বোলান যাত্রাগুলি শুনেছি তাতে প্রথমে কৃষ্ণযাত্রার মত বন্দনা অংশ গাওয়ার পর দলের পরিচয় দেওয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই কবির অনুপ্রবেশ ঘটেছে অর্থাৎ অভিনয়কারীদের কবির বক্তব্যও ব্যক্ত করতে হয়। তাছাড়া উনি বলেছেন—"তখন রাম বলে 'ভাইরে লক্ষ্মণ চলেছ কোথায়?' পরবর্তী গায়কদল সম্মেলক-কণ্ঠে গেয়ে ওঠে ঐ একই পঙক্তি। একই গান তিনবার রূপায়িত হয়। প্রথমে মূল গায়ক তারপরে আগদল, সবশেষে সমবেতকণ্ঠে। একক চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ নেই। রামের গান সবাই গায়, লক্ষ্মণের জবাবও সবাই গায়। এই হল বোলানের নিজস্ব গীতরীতি।" নাটকে কি এই ধরনের রীতিনীতি কোথাও দেখা যায়? বোলানকে যদি তিনি লোকনাট্য বলেন তাহলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কেও কোনদিন তিনি লোকনাট্য আখ্যা দিয়ে বসবেন। অথচ আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা নাটক নয়। বোলান সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। অতএব বোলানকে লোকনাট্য না বলে আমার মতে লোকগীতি বলাই শ্রেয়।

অপূর্বকুমার সর
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

নতুন তাল, নতুন ছন্দ

'দেশ' ৪৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যায় "আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি : সঙ্গীত" বিভাগে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের 'নতুন তাল, নতুন ছন্দ' শীর্ষক মনোজ্ঞ আলোচনা পড়লাম। এই প্রসঙ্গে সামান্য একটু তথ্য সংযোজনের প্রয়োজন অনুভব করছি।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আলোচনার শেষের দিকে এক জায়গায় লিখেছেন, "তবে উদাহরণ যেখানে অদ্বিতীয়, সে-রকম ক্ষেত্রে গান যে পালটানো যায়নি, সে-কথা না বললেও চলে। যেমন একাদশী তালের একমাত্র গান 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া'......।" আমাদের ধারণা, গীত-পঞ্চাশিকার (স্বরবিতান ১৬) অন্তর্ভুক্ত 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর' গানটিও একাদশী তালের বলা যেতে পারে। তবে মাত্রার বিভাগ এ গানটির ক্ষেত্রে একটু পৃথক। 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' গানের ক্ষেত্রে বিভাগ ৩।২।২।৪, কিন্তু 'কাঁপিছে দেহলতা' গানটির ক্ষেত্রে সেটা ৩।৪।৪। আরেকটি পার্থক্য হল 'দুয়ারে দাও মোরে' গানটির স্বরলিপিতে (স্বরবিতান ৪, শ্রাবণ ১৩৭৮ সংস্করণ) গানটির তাল একাদশী বলে উল্লেখ রয়েছে। ফুটনোটে বলা হয়েছে "......ইহতে এগারোটি মাত্রা আছে। এ জন্য ইহার নাম একাদশী......।" কিন্তু 'কাঁপিছে দেহলতা' গানটির স্বরলিপিতে কোনো তালের উল্লেখ নেই। তবে আমাদের মনে হয় উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুসারে এ গানটিকেও একাদশী তালের বলা যেতে পারে।

কৃষ্ণব্রত দেব
আগরতলা

সমালোচনায় অশালীনতা

দেশ ১৭ জুন সংখ্যা। সংগীতের আলোচনায় শ্রীনীলাক্ষ গুপ্ত যে একটি বিশেষ সংবাদ দিয়েছেন সেজন্য নিশ্চয়ই তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। জানিয়েছেন শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রর স্বরোদ শিক্ষার হাতেখড়ির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বর উদযাপিত হয়েছে। নিঃসন্দেহ এই হাতেখড়ির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান অভিনবত্বের দাবি করতে পারে। আপনি যেতে পারেননি এই অনুষ্ঠানে, আমিও না, যেহেতু এই আয়োজন ছিল সম্পূর্ণ ঘরোয়া। কিন্তু খুশী হয়েছি এই জেনে যে প্রফেশন্যাল বাজনা থেকে অবসর নিয়েও রাধিকাবাবু এখনও ভালই বাজাচ্ছেন।

ঐ দিনের বাজনার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনীলাক্ষ গুপ্ত অকারণ আক্রমণ করলেন আর একজন শিল্পীকে। সাহিত্য শিল্প বিষয়ে সমালোচনার একটা এথিকস্ সর্বকালে সর্বদেশে মেনে চলা হয়। সমালোচনা তো শুধু নিন্দে নয়! ভাল-মন্দ দুদিকের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তবে তো ক্রিটিকের নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরতে হবে। কিন্তু তা কিছুই না করে আপনাদের নিজস্ব সমালোচক বললেন, "বীণকার ঘরানার তালিম সত্ত্বেও এক বিশ্ব-বন্দিত সেতারীর আলাপ জমে না।" এই বিশ্ব-বন্দিত সেতারী কে সহজেই অনুমান করতে পারি। তিনি নিশ্চয়ই বীণকার ঘরানার রবিশংকর। রবিশংকরের আর্টের কোন কথাই হল না। হঠাৎ শুধু এই অবান্তর মন্তব্য। সুধীজন জানেন যে রবিশংকরের বাজনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল আলাপ, অতিমন্দ্র থেকে তারসপ্তক অবধি যার ব্যাপ্তি, যা ধ্বনি-সুষমায় সমৃদ্ধ, ব্যঞ্জনায় গভীর এবং রসে টইটম্বুর। এমন প্রথাসিদ্ধ, সুসম্বন্ধ কাব্যময় আলাপ এবং ধ্যানগম্ভীর রাগের রূপ কোথায় শুনব? আর্টের বিচারে মত-পার্থক্য স্বাভাবিক। কিন্তু একেবারে অন্ধ না হলে গোলাপকে গোলাপ বলে চিনতে না পারার কোন কারণ নেই।

পরোক্ষে আবার মন্তব্য করলেন আপনার সমালোচক যে রবিবাবু খাম্বাজ রাগের অবরোহণে ভুল করে শুদ্ধ নি ব্যবহার করেন। এই কথার কি অর্থ? এটা তো পাঠশালা মনের তর্ক। খাম্বাজ রাগে ধ্রুপদ, বড় খেয়াল কখনও শুনেছি মনে পড়ে না। খাম্বাজ ভৈরবী এই জাতীয় রাগ, ধ্রুপদীয়া দ্বারা পরিবেশিত না হলে, সাধারণত ঠুংরী অঙ্গে শুনেই আমরা অভ্যস্ত। এইসব রাগে সব বড় শিল্পীই একটু স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন। আমার তো মনে হয় রবিশংকরের মত পরিণত প্রবীণ শিল্পী জেনে-বুঝেই শুদ্ধ নি ব্যবহার করে থাকবেন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির বর্ণবৈচিত্র্য প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায়। এমনটা তো ঠুংরী অঙ্গের গানবাজনায় সব সময়েই অনুমোদিত। বাজনায় সব সময়েই অনুমোদিত। রবিশংকরের মত নিপুণ ক্রিয়াসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিষয়ে বলেন, "কয়েকটা রাগ আছে—শুধু আমি বলে না, সকলেই—ধরুন তিলক-কামোদ, খাম্বাজ, পিলু, গারা—যে সবের বিলম্বিত গৎটা আমরা খেয়ালাঙ্গেই ধরে নি—তাহলেও তার মধ্যে একটু

ঠুংরীর ছোঁয়া। যেটা দিলীপ রায় বলতেন ঠুংখেয়াল, অর্থাৎ তার ভেতর একটুখানি রঙের আমেজ আনা অনুমোদিত চিরদিনই ছিল। যেটা বেহাগ রাগে করতে পারব না। যেটা একটা বড় রাগে করা চলে না, অথচ যেটা in a Raga like Khamaj, Gara or Tilak Kamod আমরা করতে পারি।........অন্যভাবে বলতে গেলে কিছু কিছু রাগে, কিছু লচক, কিছু হরকৎ সেটাকে আরও খুলে দিতে সাহায্য করে। যে সব রাগে ধরুন ঠুংরী গাওয়া হয় সেসব রাগে তো আপনি একটু আধটু ঠুংরীর ভাব আনতেই পারেন।"

শ্রীনীলাক্ষ গুপ্তের আলোচনা ছিল রাধুবাবু এবং বুদ্ধদেবের যুগলবন্দী বাজনার উপর। কিন্তু হঠাৎ আক্রমণ করলেন রবিশঙ্করকে এবং তাও তাঁর নাম উল্লেখ না করে। নীতির দিক থেকে, এথিক্সের বিচারে এটা উচিত নয়।

মধুকর শর্মা
পার্ক স্ট্রীট

সেলুলার জেল

১লা জুলাই তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত 'ভারতের শেষ ভূখণ্ড' নিবন্ধে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। আন্দামান সেলুলার জেল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—ওহাবি অপরাধীদের পর এই জেলে এসেছিলেন থারাওয়াড়ীর বর্মিজ বিদ্রোহীরা। তারপরই এসেছেন ১৯০৮ সালের আলিপুরে বোমা মামলার অপরাধীরা। কিন্তু ওটা ঠিক নয়। কারণ বর্মার থারাওয়াড়ী বিদ্রোহ হয় ডঃ সায়াসানের নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে। সায়াসান সহ ধৃত বিদ্রোহীদের অনেকের ফাঁসী হয় বর্মায়। অন্য বিদ্রোহীদের আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠান হয়। সুতরাং এটা অনেক পরের ঘটনা।

সঞ্জীববাবুর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পলিটিক্যাল পেনসন মাসিক ৭৫ টাকার বেশী। কিছু সংখ্যক তখনকার 'সন্ত্রাসবাদী' এ পেনসনের জন্য কোন চেষ্টাই করেননি। আবার এঁদের কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত, অখ্যাত অবহেলিত ও প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

জ্যোতিষরঞ্জন বড়ুয়া
কলকাতা-৪৫

সধবার একাদশী

শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্তের 'রাগী সমালোচক বনাম শান্ত লেখক' মনোজ্ঞ আলোচনাটি বেশ ভাল লাগল।

বর্তমান নিবন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও শ্রীদীনবন্ধু মিত্রের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে শ্রী মিত্র মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'সধবার একাদশী'র কথা, এই সধবার একাদশী আলোচনাকালে ছোট্ট একটি ত্রুটি লক্ষণীয়।

নাটকের একটি অংশে হিজড়ের সাহায্যে অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীকে গোকুলবাবু অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর কাকা, সুতরাং গোকুলবাবু শ্রীঅটলের খুড়শাশুড়ী, বর্তমান নিবন্ধে খামী শাশুড়ী উল্লেখ আছে।

সুব্রত বসু
হাওড়া-৪

বিশ্বকাপের ফাইনাল

১৫ই জুলাই সংখ্যায় খেলা বিভাগে শ্রীমুকুল লিখিত 'বিশ্বকাপ ফুটবল এবং আর্জেন্টিনার জয়' নিবন্ধটি পড়লাম। বেতারে ধারাবর্ণনার উপর নির্ভর করে ফাইনাল খেলাটির তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, কিন্তু যাঁরা চাক্ষুষ বা টেলিভিশনে খেলাটি দেখেছেন তাঁরা কখনই শ্রীমুকুলের সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। আমি টেলিভিশনে খেলাটি একাধিকবার দেখেছি। কল্পনাও করতে পারিনি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা এমন হতাশাজনক হবে। ব্যক্তিগতভাবে দু'একজন ভাল খেললেও দলগত বিচারে খেলাটি আদৌ প্রশংসনীয় হয়নি। (বরং তৃতীয় স্থানের জন্য ব্রাজিল-ইতালীর খেলাটি উচ্চমানের ছিল)। আরও হতাশ হয়েছি এই দেখে যে দুই দলের খেলোয়াড়েরাই অসংখ্য অক্ষমার্হ ফাউল করেছে। এমন অজস্র ইচ্ছাকৃত মারাত্মক ফাউল কখনই উচ্চমানের খেলার পরিচায়ক হতে পারে না, কেবল ধাক্কাধাক্কি লাথালাথি দেখেই বি বি সি'র বেতার-ভাষ্যকার একসপ্লোসিভ কথাটি বারবার ব্যবহার করেছিলেন—অন্য কোন অর্থে নয়।

প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না, সেটি খেলা শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে হাজার হাজার হ্যাণ্ড বিল দর্শক গ্যালারী থেকে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হল। তুষার পাতের মত সেগুলি সমস্ত মাঠময় ছড়িয়ে পড়ল। কাগজে কাগজে ছয়লাপ হয়ে গেল সারা ময়দানটি; তার উপরেই খেলা শুরু হল,—এমনকি বিরতির সময়েও সেগুলো পরিষ্কার করা হল না। এ কি ধরনের সভ্যতা বা উচ্ছ্বাস জানি না!

অঘোর পাল
নিউ দিল্লী।

রাগ-অনুরাগ

'রাগ অনুরাগ' সম্পর্কে আমার চিঠিটা আপনারা ছেপেছেন বলে কৃতজ্ঞবোধ করছি।

কিন্তু মুদ্রাকর আমাকে মহাবিপদে ফেলেছেন : আমি লিখেছিলাম "পঞ্চম-সওয়ারী"—কিন্তু মুদ্রণ প্রমাদে দু' জায়গাতেই "পঞ্চম-সঞ্চারী" ছাপা হয়েছে।

সুরেশ চক্রবর্তী
কলিকাতা-২৯

ভ্রম সংশোধন

'দেশ' পত্রিকার ২৯ জুলাই সংখ্যায় শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্যকৃত নৃত্য-সমালোচনায় নৃত্যশিল্পীর নাম ভুলবশত কাবেরী সেনগুপ্ত বলে উল্লিখিত হয়েছে। নৃত্যশিল্পীর প্রকৃত নাম স্বস্তী

প্রকাশিত হল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

সব-নতুন কবিতার বই

মানুষ বড়ো কাঁদছে

দাম ৫.০০

দিনযাপনকেই দুর্মরতম কবিতা করে তুলতে পারেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বাংলা কবিতায় তাঁর এক অপ্রতিম আসন। তাঁর স্বপ্ন ও জাগরণ প্রতীক্ষা ও প্রাপ্তি, ভালোবাসা ও অপ্রেম, বাৎসল্য ও আত্মপরতা, ভ্রমণ ও আলস্য, আনন্দ ও অশ্রুপাত, স্মৃতি ও সাম্প্রতিকতা, বিশ্বাস ও সংশয়, আসক্তি ও ঔদাসীন্য, শ্রদ্ধা ও তিরস্কার—সব কিছু, সমস্ত কিছুই কবিতা। তাঁর দিনযাপন নিয়ে যেমন কিংবদন্তী, কবিতা নিয়েও তেমনই তুমুল আলোড়ন। কিংবা কবিতা নিয়ে ঢের বেশী। কেননা, তা আরো বড়ো এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় পাঠককে। 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক রচনাবলীর এক বাছাই সংকলন। কী আছে এই বইতে? এর উত্তরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই বই থেকেই পংক্তি চুরি করে বলতে ইচ্ছে করে—বুকভাঙা গান আছে, ছবির সুড়ঙ্গ আছে, অশ্রুপাত আছে, নদীতীরে খেলা আছে, জ্যোৎস্নার ফাঁদ পাতা আছে, রঙ্গময় পৃথিবীর সব আছে। বাড়তি যা রয়েছে তা হলো, মানুষের প্রতি ভালোবাসা-মেশানো এক আশ্চর্য দৃষ্টিপাত—যা কিনা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতায় এক পালা-বদলের মহিমা যুক্ত করেছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল ৫.০০ ছিন্নবিচ্ছিন্ন

ভালো ভালো বই

সুবোধ ঘোষের

ভারত প্রেমকথা

দাম ১৫.০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

ভ্রষ্টলগ্ন

দাম ২.৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

লোকরহস্য

দাম ৫.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কল্প-কুহেলি

দাম ১০.০০

বিমল মিত্রের

যা ইতিহাসে নেই

দাম ১২.০০

রবি গুহ মজুমদারের

মানুষ দেবতা হবে না

দাম ৩.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

শিব্রামের বারো আড়ি

দাম ৫.০০

সমরেশ বসুর

ফেরাই

দাম ৩.০০

কালকূটের

কোথায় পাবো তারে

দাম ৩৫.০০

সুশীল রায়ের

অদ্বিতীয়া

দাম ৪.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

অরণ্যের দিনরাত্রি

দাম ৬.০০

প্রকাশিত হয়েছে

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের

চাঞ্চল্যকর বই

মুজিব হত্যার

সপ্তম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বিমল করের

আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

অসময় দাম ১২.০০
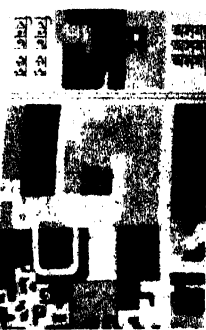
শুধু আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত বলেই নয়, 'অসময়' নিঃসন্দেহে বিমল কর-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। একটি পূর্ণবয়স্কা মহিলার জীবন-সংকটকে কেন্দ্র করে লেখক জীবনের গভীরতর অর্থ অন্বেষণে ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁর এই ধ্রুপদী উপন্যাসে। সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক মুক্ত মনের প্রবল দ্বন্দ্বের পরিণতি নিয়ে এক আশ্চর্য টান উপন্যাসটিকে আদ্যন্ত কৌতূহলকর করে রেখেছে। এর ভাষা আলাদা, আঙ্গিক অন্যরকম, বক্তব্য সম্পূর্ণ নতুন। চরিত্রগুলি কোনোটিই অচেনা নয়, তবু যে-মহিমা নিয়ে তারা উপস্থিত তা যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকে যেত, এই উপন্যাস লেখা না হলে।

বিমল করের অন্যান্য গ্রন্থ :

প্রচ্ছন্ন ১০.০০ দ্বীপ ৬.০০ মোহ ৭.০০ দংশন ৬.০০ সান্নিধ্য ৫.০০ একা একা ৫.০০ ভুবনেশ্বরী ৪.০০ মৃত ও জীবিত ৪.০০ একদা কুয়াশায় ৬.০০ কুশীলব ৩.৫০ আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ৪.৫০ যদুবংশ ৮.০০ পূর্ণ অপূর্ণ ১৫.০০ পরিচয় ৪.০০ বালিকা বধূ ৭.০০ গ্রহণ ৮.০০ খড়কুটো ৭.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

ভালো ভালো বই

মতি নন্দীর

দুঃখের বা সুখের জন্য

দাম ৮.০০

দিবোন্দু পালিতের

উড়োচিঠি

দাম ১০.০০

শুভ্রাংশু গুপ্তের

মহাকরণ

দাম ৪.০০

সমরজিৎ করের

একটি সংকেতের জন্যে

দাম ৬.০০

সুধাংশু ঘোষের

কে বাজায়

দাম ৬.০০

দীপালি দত্ত রায়ের

লাল হলুদ সবুজ আলো নেই

দাম ৬.০০

অভ্র রায়ের

হৃদয়ের শব্দ

দাম ৭.০০

শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমুদ্রস্নান

দাম ৫.০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

আলোকে আঁধারে

দাম ৭.০০

ইন্দ্রমিত্রের

শুভদিন

দাম ৬.০০

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের

এই আমি একা অন্য

দাম ৪.০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সহবাস

দাম ৪.০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

অবনী বাড়ি আছো

দাম ৪.০০

নীললোহিতের

ছবিঘরে অন্ধকার

প্রকাশিত হল

আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার

বিধান সিংহের

শাহী কেচ্ছা

ইন্দিরা-প্রস্থের অন্দরমহলের গোপন কথা দাম ১০.০০

ইন্দিরা শাহীর এগার বছরের কাহিনী নিয়ে লেখা অন্যান্য বইয়ের যেখানে শেষ, 'শাহী কেচ্ছা'র শুরু সেখান থেকেই। নির্বাচনের পর থেকে এই ষোল মাসের রাজধানীর নেপথ্য কাহিনী 'শাহী কেচ্ছা' প্রমাণ করে দেবে যে, শাহ কমিশনে যা বলা হয়েছে তার বাইরেও রয়েছে বহু অনন্ত ঘটনা যা আরও অনেক বেশী চাঞ্চল্যকর। কিষেণচাঁদ কেন মরলেন, মানেকা কী করে হঠাৎ ইন্দিরা গান্ধীর এত প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন, নবীন কেন লাক্ষাদ্বীপে সাঁতার কাটেন, টামটা কেন ছেলে-বউকে দিল্লিতে রেখে একা থাকেন আন্দামানে, রূপিকা কেন সোনিয়াকে ধরার জন্য উদ্‌গ্রীব, বিচারপতি শাহর প্রতি ইন্দিরার আক্রোশ কেন গায়ত্রী দেবীর রূপ কেন জনগণনেত্রীর চোখে ঈর্ষা জাগায়, পুষ্প [illegible] কেন থাকেন অধ্যাপক গুপ্তের সঙ্গে, কেন গ্রেপ্তার হন চন্দ্রা, গণিকা আর ঘাতিকাদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে চিত্রতারকা স্নেহলতা কীভাবে ভোগ করেন মানসিক মৃত্যু-যন্ত্রণা, শেফালী পূর্ণিমা-মঞ্জুশ্রী কী বলেছেন একান্ত সাক্ষাৎকারে, ইন্দিরা গান্ধীকে টাকা জোগাচ্ছে কে—এমন বহু চমকপ্রদ তথ্য বিধান সিংহ জোগাড় করেছেন দিল্লি থেকে বাঙ্গালোর পর্যন্ত তোলপাড় করে। অতীত নয়, এখন কী করছে শাহ কমিশনের নায়ক-নায়িকা এবং দর্শকবৃন্দ তারই জীবন্ত বর্ণনা 'শাহী কেচ্ছা'। ক্রাইম এবং সেক্স কীভাবে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-বই না পড়লে তা জানা যাবে না।

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ
লিও টলস্টয় : সার্ধ জন্মশতবর্ষ
শুভময় ঘোষের রচনা
টলস্টয়-সদন
রতন ভট্টাচার্যের গল্প
সত্যমিথ্যার মায়াবী আলো

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

কৃষ্ণমেঘের বিস্তার

ঘটনার আকার প্রকার দেখে এই ধারণা করতে হয় যে, ভারতীয় জনজীবনের ভাগ্যাকাশে কৃষ্ণমেঘের বিস্তার বেড়েছে ও বেড়েই চলেছে। দৃষ্টান্ত মারাঠাওয়াড়ার ঘটনা। মহারাষ্ট্র সরকার তাদের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন যে, মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে দেওয়া হবে। নতুন নাম হবে—বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে সারা মারাঠাওয়াড় জনজীবনের শান্তি যেন প্রচণ্ড এক বিদ্বেষময় বিস্ফোরণের আগুন ও ধোঁয়ার পরিব্যাপ্ত জ্বালার মধ্যে পড়ে বীভৎস রকমের এক প্রদাহের ছাই উৎক্ষিপ্ত করতে শুরু করে দিল। হানাহানির এই মহোৎসবের প্রেরণা ও প্ররোচনা যুগিয়েছে যে বিদ্বেষ, তাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বলে আখ্যাত না করে বরং জাতভিত্তিক বিদ্বেষ বলে আখ্যাত করাই উচিত। কারণ এই জাতভিত্তিক বিদ্বেষই হল সেই কালমেঘ, যার মধ্যে ভারতের ঐক্য ও সংহতির বিনাশ সাধিত করবার আবেগ পুঞ্জীভূত হয়েছে। এই কৃষ্ণমেঘ এমনই এক ঝড়ের সংকেত বহন করছে যে, যার প্রকোপের আঘাতে জাতির জীবনের ঐক্য তৃণখণ্ডের মত উড়ে যেতে পারে। ভারতের জনজীবনে জাতে-জাতে বিদ্বেষের ক্রিয়া চিরকালই ছিল। কিন্তু ঠিক এইরকম জাতভিত্তিক বিদ্বেষের দাঙ্গা ছিল না, থাকলেও সেটা সীমিত প্রকারের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত ছিল। সেটার অবাধ হিংস্রতার উচ্ছলিত কোন প্রকাশ ছিল না। এই জাতভিত্তিক বিদ্বেষের আঙ্গিক প্রকারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী যে দুই পক্ষের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তারা হলো হরিজন ও বর্ণহিন্দুজন। মারাঠাওয়াড়ার সাম্প্রতিক অশান্তির পটে এই দুই পক্ষেরই উন্মত্ততার দৃশ্যরূপ চিত্রিত হয়েছে। দুই পক্ষই সমান হিংস্রতার আবেগে পরিচালিত হয়ে সরকারী সম্পত্তি অর্থাৎ জাতিরই সার্বজনিক সম্পত্তির বিপুল বিনাশ সম্পন্ন করেছে। আগুন লাগিয়ে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করবার উগ্র ঘটনার সংখ্যাও কম নয়। তার উপর আছে পুলিসের গুলিবর্ষণের এবং দুই পক্ষের মারামারির ফলস্বরূপ নরহত্যার অনেক ঘটনা।

উইলিয়াম পিট, যাঁকে যুব-প্রতিভার এক উজ্জ্বল ও অসাধারণ ব্যক্তিস্বরূপ বলে ব্রিটেনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে কীর্তিত করা হয়েছে, তিনি তাঁর মৃত্যুর আসন্নতার মুহূর্তে বেদনার্ত এক আক্ষেপের বাণী উচ্চারিত করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। 'হে আমার দেশ, আমি তোমাকে কী দুঃখকর অবস্থার মধ্যে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছি'—উইলিয়াম পিটের এই আক্ষেপের সম্যক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন যে-সব গবেষক ঐতিহাসিক, তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রচুর ভিন্নতা থাকলেও মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই প্রধান সমর্থন পেয়ে এসেছে যে, তিনি দেশের তথা জাতীয় জীবনে অনৈক্যের অনাচার দেখে দুশ্চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর মানসিক পরিতাপের কারণ হিসাবে এই দুঃখটাই ছিল প্রধান। মারাঠাওয়াড়ার ঘটনা এই বাস্তবতার সত্যটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভারতের জাতীয় ঐক্য হয়তো বহুরূপে ও বহু প্রকারে খণ্ডিত হবার এক শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন সমালোচকের মন্তব্যে বিবৃত হয়েছে যে মারাঠাওয়াড়ার সংঘর্ষকে হরিজন বনাম অ-হরিজনের সংঘর্ষ বলে অভিহিত করা উচিত নয়। কারণ অন্যদিকের বাস্তব সত্যতার দৃশ্যটি এই যে, হরিজন ও অ-হরিজন সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ এই সংঘর্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে লিপ্ত হয় নি। এমন মন্তব্য নিতান্ত আত্মসান্ত্বনার একটি যুক্তিহীন বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। প্রশ্ন হল, যারা হাতে হাতে লাঠি ধরে নি, তারা কি মনে মনে লাঠি ধরে নি? ধরেছিল বই কি। জনজীবনের সমগ্র মানসিক পরিবেশের বাতাস দুষ্ট বাষ্পে অভিভূত হয়েছে।

দলিত পন্থের [কথাটা কি ইংরেজীর 'প্যান্থার'?] নামে যে সংগঠিত সঙ্ঘ এক্ষেত্রে হিংস্র সংঘর্ষের একটি বড়ো অংশভাক্‌ শিক্ষিত হরিজনদের সঙ্ঘ। এর সঙ্গে আছে, আম্বেদকরী বৌদ্ধদের জনতা। এরাও সবাই হরিজন। অপরদিকে যে অ-হরিজন জনতা বিদ্বেষের হিংস্রতা বহন করে মারাত্মক অনাচারে ও দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছে, তারা কোন হিন্দু সঙ্ঘের অনুচর কি-না বোঝা যায় না। সন্দেহময় অভিযোগ অবশ্য আছে যে, শিবসেনারা সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ আয়োজিত করবার চেষ্টায় এই মারাত্মক বিনাশক বিক্ষোভের সূচনা করেছিল। যাই হোক, ঘটনার দৃশ্যটি দেশপ্রীতির প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে মর্মান্তিক দুঃখের দৃশ্য। তাঁরা বলতে পারেন, হা হতোস্মি, একপক্ষের মুখে মহানেতা শিবাজীর নামে জয়ধ্বনি, আর-এক পক্ষের মুখে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে জয়ধ্বনি। অনৈক্যের দানবিক ইচ্ছা কতখানি ও কতদূর পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছে, তারই প্রমাণ এই জয়ধ্বনির দ্বন্দ্বের মধ্যে খুব ভালরকম প্রকট হয়েছে বলে মনে করা চলে।

কোন সন্দেহ নেই, হরিজনদের ক্ষোভের যুক্তিসঙ্গত অনেক কারণ আছে। কোন সন্দেহ নেই, দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় জীবনাতিপাত করে আসছেন। তার উপর বর্ণহিন্দুদের দুরন্ত ও হিংস্র এক কুসংস্কারের ক্রিয়া অস্পৃশ্যতার আঘাতে অবমানিত এক ক্লেশকর জীবনচর্যা। বঞ্চনার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে গিয়ে হরিজনদের একটি বৃহৎ অংশ ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার সম্যক প্রতিকার ও পরিবর্তন চাই। না হলে কারও ভাল কিছুই হবে না। শুধু রাষ্ট্রিক সত্তা খণ্ডিত হবে, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হতে হতে শেষ পর্যন্ত নানা নতুন নামের স্থান সৃষ্টি করবে, অমুকস্থান তমুকস্থান ইত্যাদি। দলিত পন্থের ও আম্বেদকরী বৌদ্ধদের আচরণ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন থেকে যায়: তাঁরা কি মহাত্মা গান্ধীর ছবিকে জুতোর মালা পরিয়ে, মহারাজ শিবাজীর মূর্তির গায়ে আগুন লাগিয়ে আর দুর্গা কার্তিক ও গণেশের বিগ্রহ চূর্ণ করে জাতীয় ঐক্যের কোন উপকার কিম্বা হরিজন সমাজের স্বার্থগত কোন উপকার সম্ভব করতে পারবেন?

এস ভাই এক হই
কংগ্রেস(ই)

পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে : দেশে দেশে

অরূপ দাস

বিংশ শতাব্দীর জঘন্যতম অধ্যায় : হিরোশিমা শহরের রাস্তা। অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের আগে (উপরে) ও পরে (নীচে)। ছবি দুটো একই রাস্তার ঠিক একই অ্যাংগেল থেকে তোলা। নীচের ছবিটি অবশ্য ধ্বংসাবশেষ রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর তোলা।
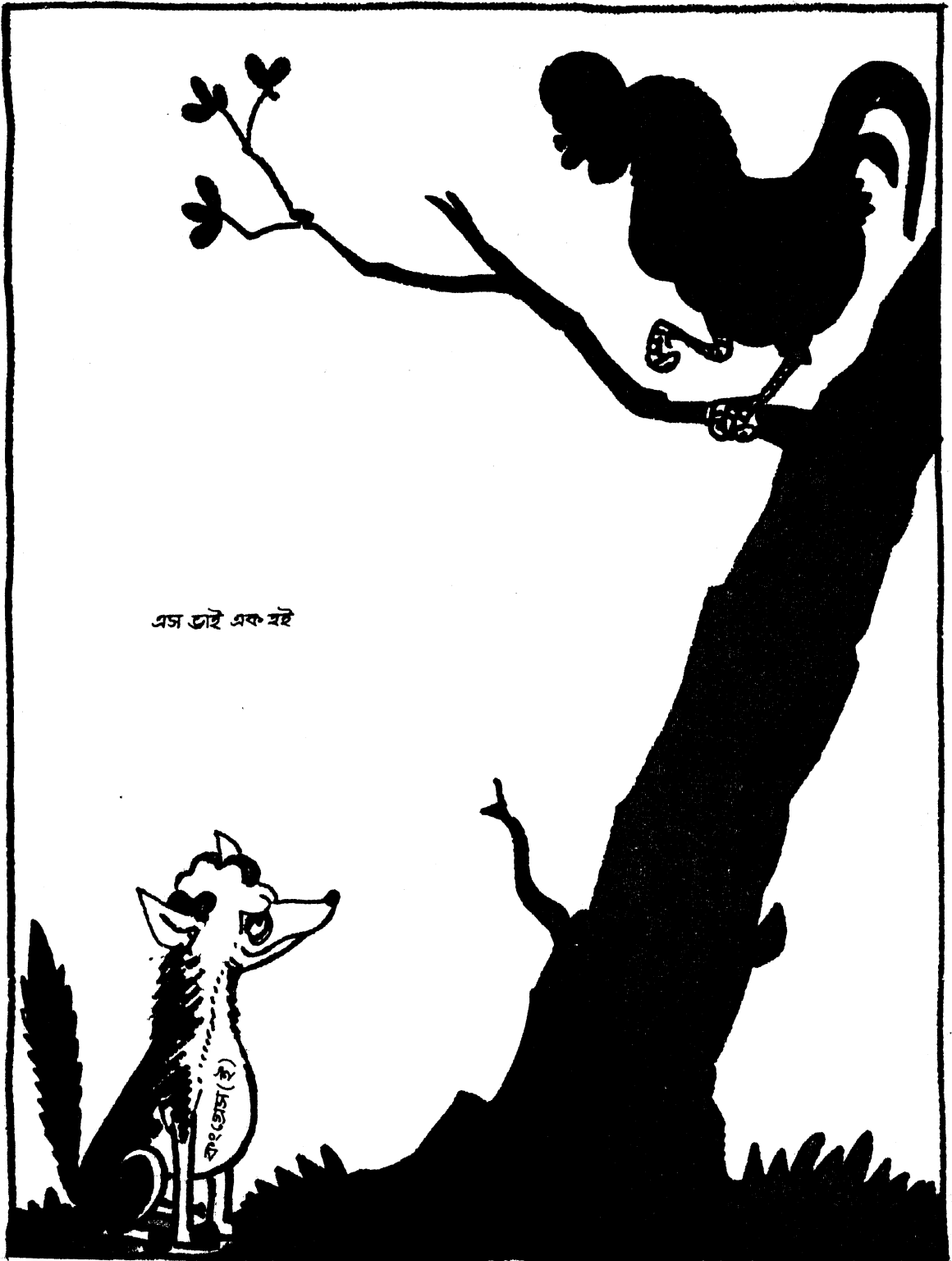
"...স্কুলঘরের জানলার বাইরে নরম উইলো গাছটার দিকে তাকিয়েছিলাম। পুরোনো অন্ধকার ক্লাসরুমের ভিতর চোখ ফেরানো মাত্র হঠাৎ সেই মুহূর্তে একটা আলো ঝলসে উঠল।...যেন সেলুলয়েডের প্রকান্ড একটা টুকরো একসাথে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার মতন। বুঝতে পারলাম আমার মাথা ঘাড় আর পিঠের উপরটা ভরে গেছে প্লাসটার আর ছাদের টাইলের একরাশ ভাঙা গুঁড়োয়। দম আটকানো বিদ্ঘুটে গন্ধ ঝাপটার মত এসে ঢুকল নাকের ভিতর।...শেষ পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের তলা থেকে যখন কোনরকমে বেরিয়ে এসে স্কুলের উঠোনটায় দাঁড়ালাম, দেখলাম আমার চারজন সতীর্থ বন্ধুও হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঠিক একইভাবে আমার মতন। বোবা বিস্ময় নিয়ে সবাই মিলে দাঁড়ালাম সেই উইলো গাছটার নীচে যেটা এখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। নীচু গলায় করুণ স্বরে সবাই গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করলাম স্কুলে শেখানো সেই গানটা। কিন্তু চারদিকে ঘূর্ণায়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বড় বড় বাড়ির ভেঙে পড়ার শব্দে আমাদের গলার স্বর ডুবে যাচ্ছিল বারবার।... এসে দাঁড়ালাম সুইমিং পুলের পাশে আমাদেরই এক বন্ধুকে সাহায্য করতে। ওর চোখের দৃষ্টি গেছে হারিয়ে। জখম হয়েছে একটা পা সাংঘাতিকভাবে। কেউ কেউ আগুনে জ্বলা জামাকাপড় গায়ে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। একটি ছেলে তার নিজের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত আঁজলা করে তারই বন্ধুর গায়ে জ্বলতে থাকা জামার উপর ঢেলে আগুন নেবাবার চেষ্টা করছিল।...ভুলতে পারব না তাদের মুখগুলো যারা শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে গোঙাচ্ছিল, নড়তে পারছিল না এতটুকু। আমরা কি ওদের ফেলে রেখে চলে যাব?...কিন্তু যে বন্ধু, কিছুই করার নেই আমাদের। বন্ধু ক্ষমা করো। ক্ষমা করো আমাদের।"

(A Survivor's Story : Bulletin of the atomic scientists, December, 1977).

বর্ণনাটা হিরোশিমাবাসী কাতাওকা ওসামুর। কাতাওকা সেই সব দুর্ভাগাদের একজন যাঁরা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের হাত থেকে কোনরকমে রেহাই পেয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন, কিন্তু সেই সংগে বয়ে বেড়াচ্ছেন আজও তার বিষাক্ত প্রভাব, মনের গহনে গেঁথে যাওয়া আতংক, যা তাঁদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বিভীষিকার মত প্রতিটি মুহূর্তে।

আসুন এবার অন্য দিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সেই ছোট্ট ফ্লাইট ডায়েরীটার পাতায় যাতে লেখা রয়েছে ককপিটের ভিতর থেকে বসে দেখা বিস্ফোরণের ধারা-বিবরণী। ঠিক এইভাবে শুরু হচ্ছে হিরোশিমা শহরের উপর বোমাবর্ষণের ডায়েরী-নোট।

"8 : 15 a.m.—atomic bomb released
43 secs. later, a flash
Shock Wave, craft careens
Huge atomic cloud
9.00 a.m.—cloud in sight
Altitude more than 12,000 metres."

'এনোলা গে' এই নামের আড়ালে বিমানটি থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর বুকে সেই মারণাস্ত্রটি ১৯৪৫-এর ৬ই আগস্ট—যার অন্য নাম রাখা হয়েছিল 'লিটল বয়'। নামটা নিতান্তই সারকাসটিক। ষাট কেজি ইউরেনিয়াম-২৩৫-এ ঠাসা 'লিটল বয়' হিরোশিমা শহরের মাত্র ৫৮০ মিটার উপরে ফেটেছিল। আর এর ঠিক তিন দিন পরেই ফ্যাট কুড়ি কেজি প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এ ঠাসা 'ফ্যাট ম্যান' নামধারী দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটি নাগাসাকি শহরের মাত্র ৫০০ মিটার উপরে।

তেত্রিশটা বছর এর মধ্যে আমরা পার হয়ে এসেছি। কিন্তু সেই ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তার ফল বা পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করা আজও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি একুশ জন সদস্যের তৈরী একটি বিজ্ঞানী ... পিস্ ব্যুরো'র তরফে ওই দুই শহরের এক লাখ দশ হাজার বাসিন্দার উপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। অবশ্য আরও দু লাখ ষাট হাজার বাসিন্দা সমীক্ষার আওতার বাইরে ছিলেন। অংশ নিয়েছেন এতে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও জাপানের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। ওঁরা দেখিয়েছেন ওই দুই শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে লিউকোমিয়ার হার বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে আগের চেয়ে ঠিক তিন গুণ। সেই সংগে বেড়েছে থাইরয়েড, ফুসফুস আর হাড়ের ক্যানসার আর মহিলাদের মধ্যে ব্রেসট ক্যানসার। বেড়েছে পাকস্থলী আর স্যালাইভারি গ্ল্যানডের ক্যানসার। তবে সবচেয়ে মারাত্মক ফল গিয়ে পড়েছে সেই সব শিশুদের উপর ... হয়েছে মানসিক রোগগ্রস্ত হাজার হাজার পংগু শিশুর দল যাদের প্রত্যেকের মাথার বহর স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে অনেক ছোট, ডাক্তারি ভাষায় যার অন্য নাম 'মাইক্রোকেফালি'। সেই সংগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যা করেছেন অসংখ্য মানুষ। উন্মাদ হয়েছেন আরও বেশী। বাকি যাঁরা মরেছেন তৎক্ষণাৎ কিংবা দিন দশেকের মধ্যে তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে লাখ দুয়েকের উপর। আর এর সবটাই ঘটেছে 'আইওনাইসিং রেডিয়েশন'-এর প্রভাবে, পরিমাণে যা ছিল পরমাণু বোমাগুলি থেকে উদ্ভূত সমস্ত শক্তির মাত্র শতকরা পনের ভাগ।

এ থেকে আন্দাজ করে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয় না, কি সাংঘাতিক হতে পারে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব। কি সুদূরপ্রসারী তার ফল। ...

সেই সব দুর্ভাগাদের একজন যাঁরা আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন তেজস্ক্রিয়তার ভয়াবহ অভিশাপ সারা শরীরে বিভীষিকার অন্ত মন জুড়ে আঁকড়ে আছে আতঙ্ক। পিঠে রেডিয়েশন বার্ন'। নাগাসাকি শহরের জনৈক বাসিন্দা।

ছাপ। তেজস্ক্রিয়তা তিনভাবে শরীরের কোষগুলির উপর কাজ করে। প্রথমত, প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে যে ক্রোমোজোমগুলি রয়েছে তাদের ভেঙে টুকরো টুকরো করে কোষের স্বাভাবিক কাজকর্মকে তছনছ করে দেয়। এর অন্য নাম 'মিউটেশন', যার ফলে আমরা হতে দেখেছি নানান জন্মগত রোগ, বিকলাঙ্গ শিশু। দ্বিতীয়ত, তেজস্ক্রিয়তা কোষের স্বাভাবিক গতিতে বিভাজনের প্রক্রিয়াকে পাগলা ঘোড়ার গতিতে ছুটিয়ে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যানসারের। তৃতীয়ত বেশী মাত্রায় এই রেডিয়েশন কোষগুলিকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। বিশেষত বোন-ম্যারোর কোষগুলির মৃত্যু হতে শুরু করে তাড়াতাড়ি। হিরোশিমা ও নাগাসাকি পরমাণু শক্তির বীভৎস ফলাফলের দিকে আঙুল উঁচিয়ে এটাই প্রমাণ করে, কি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে রেডিয়েশন।

আজও তাই আঁতকে ওঠে মানুষ বারবার, অভিনীত হবে না তো পৃথিবীর বুকে আবার সেই নাটক যাতে শোনা গিয়েছিল হাজার হাজার অসহায় নারীপুরুষের গোঙানি, মৃত্যুযন্ত্রণার শিহরণ? আর ঠিক সেই জন্যেই সত্তরের দশকে যখন পারমাণবিক শক্তিকে "শান্তিপূর্ণ-ভাবে" (?) কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গড়ে উঠছে একে একে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটগুলি, তখন এ প্রশ্ন আবার বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন ইওরোপ আর আমেরিকার মানুষ। ঝড় বইছে দেশে দেশে। মিছিল আর বিক্ষোভ। ও'দের হাতে হাতে পোস্টার। "Heute Fische, Morgen Wir"। —"মাছেরা আজ, আগামী দিনে আমরা।" পোস্টারে আঁকা মাথার খুলির ছবি। হাজার হাজার মানুষ সপ্তাহ শেষে বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায় রাস্তায়। ট্রেনে, বাসে, বাইসাইকেলে, কোচে। দল বেঁধে ও'রা ছুটে চলেছেন প্রতিবাদে। আমরা বাঁচতে চাই। টাটকা বাতাস আর সতেজ আলো প্রাণ ভরে উপভোগ করতে চাই। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তায় পৃথিবীর সুন্দর মাটিতে রোপণ করতে চাই না বিকলাঙ্গ শিশুদের। প্রতিবাদের [illegible] ফ্রানস জারমানি, সুইডেন, স্পেন, হল্যান্ড, কানাডা আর আমেরিকায় [illegible]। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকার মনোনীত জায়গাগুলিতে "অ্যানটি-নিউকের" দল ঝাঁপিয়ে পড়ছেন দখলের জন্য। গড়তে দেবেন না ও'রা আর একটিও পারমাণবিক চুল্লি। লম্বা চুল বেলবটস পরিহিত তরুণ-তরুণীর দল সবাই আজ গলা মিলিয়েছেন। কাঁধে কাঁধ। পুলিসের সাথে মোকাবিলায় ওঁরা আজ সম্পূর্ণ বেপরোয়া। কেননা, এ তো শুধু আজকের সমস্যা নয়। আগামী দিনেরও। যাঁরা পৃথিবীর আলো দেখেননি তাঁদেরও। সারা ইওরোপ তাই আজ কাঁপছে "অ্যানটি-নিউকের" প্রতিবাদী বিস্ফোরণে।

প্রশ্নটা স্বভাবতই আসে, কেন এই প্রতিবাদ? পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে কেন এই মারমুখী মনোভাব? যেখানে দিন দিন শক্তির চাহিদা বেড়েই চলেছে, 'পাওয়ার ক্রাইসিস' ঘনীভূত, সেখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটগুলি তো বৈদ্যুতিক শক্তিসমস্যারই একটা সুরাহা। মাত্র দু দশক আগেও ত রব উঠেছিল চারদিকে পরমাণু শক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিয়ে। তবে আজ কেন এই বিক্ষোভ? আসুন, বিশ্লেষণ করা যাক অ্যানটি নিউকের দল কি বলছেন।

*

পরমাণু শক্তির বিরোধীরা বলছেন, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটগুলির সমস্যাটা তিন ধরনের। প্রথমত, এরকম এক একটা চুল্লি থেকে যে প্রচুর পরিমাণে 'নিউক্লিয়ার ওয়েসট' বা পারমাণবিক অবশেষ বেরিয়ে আসছে তা প্রচণ্ডভাবে রেডিও অ্যাকটিভ বা তেজস্ক্রিয়। আজ পর্যন্ত তাকে নিরাপদ জায়গায় সরানোর কোন সঠিক বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। আর যতদিন এই 'ওয়েসট ডিসপোসাল'-এর সমস্যাটা মিটছে না ততদিন তেজস্ক্রিয়তার দরুণ পরিবেশ দূষিত হতে থাকবেই। সমস্যার চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি আমরা এই মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে নিই আমেরিকার কেনটাকিতে ম্যাকসে ফ্ল্যাটস-এ 'রেডিও অ্যাকটিভ ওয়েসট ডিসপোসাল সাইট'-এর দিকে। সারা আমেরিকায় সতেরোটি তেজস্ক্রিয় অবশেষের কারখানার এটি একটি। মাটি খুঁড়ে এখানে সুগভীর লম্বা ট্রেঞ্চে দু শ' লিটার মাপের ড্রামে পারমাণবিক অবশেষ ফেলে রাখা হয়। এ ধরনের ডাম্পিং চলে আসছিল এখানে গত ১৯৬৩ সাল থেকে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপারটা ধরা পড়ল গত বছরের আগসটের শেষাশেষি যখন ওই এলাকায় কাছাকাছি কোন একটা এ ধরনের অব্যবহৃত ট্রেঞ্চ খুঁড়ে মাটির নীচে জলে পাওয়া গেল রেডিও অ্যাকটিভিটি। অর্থাৎ ডাম্পিং সাইট থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সোজাসুজি মাটি চুঁইয়ে প্রবেশ করছে জলে। আর এই জল যখন শরীরে প্রবেশ করবে তার ফল হবে নিশ্চয় সাংঘাতিক, যেটার কিছুটা নমুনা আমরা পেয়েছি হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের উপর অ্যাটমিক বোমার বিস্ফারণের ফলস্বরূপ। ঠিক কতটা মাপের তেজস্ক্রিয়তা কতদিনে আস্তে আস্তে শরীরে জমতে জমতে তার ফল কতটা কার্যকরী করবে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। অনেকটা 'স্লো পয়জন'-এর মতন। তেজস্ক্রিয়তা প্রবেশ করতে পারে শরীরে দুভাবে। এক, জলের সঙ্গে, শাকসবজি, ফল আর মাছের সঙ্গে। দুই, বাতাস থেকে নাক দিয়ে সোজা লাংগ্‌-এ। শেষ খবর বিক্ষোভকারীদের চাপে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোমপানি আপাতত ম্যাকসে ফ্ল্যাটস-এ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন পুরোপুরি গত পনেরোই ডিসেমবর থেকে।

এমনি তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার টুকরো খবর এসেছে ফ্রান্স থেকে। ফ্রানসের লা হেগ জায়গাটিতে বড় বড় স্টিলের ট্যাংকে জমিয়ে রাখা হয় পারমাণবিক অবশেষগুলি। জমতে জমতে সম্প্রতি এই তেজস্ক্রিয় অবশেষের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 'পারমিসিবল লিমিট'-এর তিন গুণ। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা আমাদের শরীর সহ্য করতে পারে তার তিন গুণ। নরম্যানডি নদীর তীর বরাবর আপনি যদি এখন সোজা এগিয়ে যান দেখতে পাবেন জলের ধারে সেখানে যে সমস্ত ক্র্যাব বা কাঁকড়ার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের গায়ে দেখা দিয়েছে ছোট ছোট আলসার। লা হেগ থেকে মাটি চুঁইয়ে পারমাণবিক অবশেষ [illegible] অসহায় প্রাণীগুলির উপর প্রথম ধাপে এ ধরনের আঘাত হেনেছে। নরম্যানডির তীর বরাবর জলে পাওয়া গেছে প্লুটোনিয়ামের সংকেত। এমনি করে তেজস্ক্রিয়তা জমতে শুরু করেছে নদীর জলে মাছেদের দেহে, যা কিনা ফ্রানসের জেলেরা বাজারগুলিতে বিকোচ্ছে পুরোপুরি অজ্ঞাতসারেই। লা হেগ রিপ্রসেসিং প্ল্যানটে তেজস্ক্রিয়তা এত বেশী মারাত্মক-ভাবে ছড়িয়েছে যে, সেখানে প্ল্যানটের ভিতর এখন বড় বড় হরফে টাঙানো হয়েছে সতর্কবাণী—
'If there is a critical reaction—your best protection is to flee'

অর্থাৎ তোমার শরীরে যদি তেজস্ক্রিয়তাজনিত কোন প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে, তোমার বাঁচার সোজা রাস্তা হল ছুটে পালাও। ব্যপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর। আর সেই জন্য এ বছরের গোড়ার দিকে একই কারণে ইলিনয়সের বাসিন্দারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তাদের এলাকায় তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক অবশেষ সম্বন্ধে। বিক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা যখন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোমপানির প্রেসিডেনট জেমস নোয়েস নিজে স্বীকার করেছেন, ইলিনয়সের শেফিলডে সবুজ পাহাড়ী এলাকায় মাটির নীচে কবর থাকা অবস্থায় পারমাণবিক অবশেষের প্লুটোনিয়াম তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে যাবে চব্বিশ হাজার বছর ধরে। বিক্ষুব্ধ হবারই কথা। ও'রা বলছেন, ও'দের পুরো ব্যাপারটা না জানিয়ে কেন ও'দের এলাকায় এ ধরনের ডামপিং ঘটতে দেওয়া হল। শেফিলডের বাসিন্দাদের বিপদের সম্ভাবনার কথা তুলে আপাতত অ্যানটি-নিউকের দল কোমপানির বিরুদ্ধে আদালতে কেস ঠুকেছেন সোজাসুজি।

ঠিক কতটা পরিমাণ জমবে এই রেডিও অ্যাকটিভ ওয়েসট? বিংশ শতাব্দীর বাঁক নেবার মুখে এই তেজস্ক্রিয় অবশেষের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের এক পরিসংখ্যান জানাচ্ছে 'টাইম' ম্যাগা-জিনের সাম্প্রতিক এক সংখ্যা। আমেরিকার কথাই ধরা যাক। কুড়ি বছর তো হয়ে গেল সেখানে তৈরি হয়েছে প্রথম পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র। ইতিমধ্যে

পরমাণু বোমার শিকার : নাগাসাকি শহরে ওমুরা ন্যাভাল হাসপাতালে তোলা ছবি। তেজস্ক্রিয়তার মারাত্মক ছাপ শরীরের এখানে ওখানে।

শক্তিকেন্দ্র যা থেকে তৈরি হচ্ছে সারা আমেরিকার শতকরা বারো ভাগ বিদ্যুৎশক্তি। আর চাহিদা অনুযায়ী ত্রিংশ শতাব্দীর শুরুতে এখানে প্রয়োজন হবে আরও ৩২০টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানট যার ফলে পারমাণবিক অবশেষের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১,৯০,০০০ টন। সমস্যাটা শুধু আমেরিকার নয়, আরও অনেকের। সম্প্রতি কানাডার সরকারী সংস্থা 'অ্যাটমিক এনারজি ফর কানাডা' জানাচ্ছেন বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি সেখানেও জমে উঠবে অসম্ভব পরিমাণের নিউক্লিয়ার ওয়েসট, যা হিসেবমত গিয়ে দাঁড়ায় আশি হাজার থেকে এক লাখ টন।

*

দ্বিতীয় যে সমস্যার কথা অ্যানটি নিউকের দল তুলেছেন, তা হল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটগুলিতে দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে। দুর্ঘটনা তো যে-কোন পাওয়ার প্ল্যানটেই ঘটতে পারে। তবে এর সাথে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটের দুর্ঘটনার ফারাকটা কোথায়? ফারাকটা এইখানে যে, এ ধরনের এক-একটা শক্তিকেন্দ্রে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম থাকে তা শুধু হিরোশিমা কেন, অনেক অনেক হিরোশিমাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সামান্য কোন যান্ত্রিক গোলযোগ বা দুর্ঘটনার জন্যও যদি অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ রিঅ্যাকটরের বাইরে বেরিয়ে আসে, তবে তা ক্রমশই খুব সূক্ষ্ম কণা বা গ্যাসের আকারে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় এই তেজস্ক্রিয় কণা ঝরে ঝরে পড়বে মাটিতে, কাছাকাছি জলে, পরিভাষায় যার অন্য নাম 'রেডিও অ্যাকটিভ ফল-আউট'। ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনায় শুধুমাত্র ওই প্ল্যানটের কর্মীই নন, ওই এলাকা জুড়ে প্ল্যানটের বাইরে যাঁরা, তাঁরাও তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবেন। তাই প্রশ্ন উঠেছে, এক একটা পাওয়ার প্ল্যানট যখন গড়ে উঠছে তখন তার চার-দিকের অসংখ্য মানুষকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এক একটা সম্ভাব্য বিপদের মুখোমুখি। এই বিপদের কথা ভেবে সম্প্রতি পশ্চিম জারমানির একটি আদালত এই রায় দিয়েছেন যে, সেখানে 'উইল নামের জায়গাটিতে কোন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানট গড়তে দেওয়া যাবে না যতদিন না এটা প্রমাণিত হচ্ছে "প্ল্যানটের ভিতর কোন বিস্ফোরণ কিংবা সরাসরি কোন প্লেনের সঙ্গে প্ল্যানটের ধাক্কায় কোন জাতীয় ক্ষতি হবে না।"

বিপদটা কিরকম হতে পারে তার একটা নমুনা দেওয়া যাক। যেমন তিন'শ মাপের তেজস্ক্রিয়তা যদি হঠাৎ কিছু লোকের উপর ছড়িয়ে পড়ে তবে তাঁদের এক-চতুর্থাংশ মারা যাবেন কিছু দিনের মধ্যেই। আর বাকীদের শতকরা নব্বই ভাগ কোন-না-কোন সাংঘাতিক রোগ নিয়ে বেঁচে থাকবেন কোনরকমে। আর মাপটা যদি ছ'শ র‍্যাডের বেশী হয় তবে হাড়ের ভিতর যেখানে রক্তের কোষগুলি তৈরি হয় সেখানকার কোষগুলির মৃত্যু শুরু হবে, যেটা কিনা প্রতিফলিত হবে রক্তের লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা আর প্লেটলেটের সংখ্যার কমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। এরই অন্য নাম 'ম্যারো-ডেথ'। প্রায় বারো হাজার র‍্যাড পরিমাণের তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে লস অ্যালামস রিঅ্যাকটরে। ভুলবশত একজন কর্মী যখন এখানে একটা বড় ট্যাংকে জমানো প্লুটোনিয়াম সলিউশনের মধ্যে রাখা একটা স্টারার চালিয়ে দেন তখন হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে যায়। সিঁড়ি থেকে ট্যাংকের কাছে ছিটকে পড়ে যান কর্মীটি। তেজস্ক্রিয়তা হেতু তার সারা শরীর তখন জ্বলছিল চেরি ফলের মত টাটকা লাল। ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। আর এর ঠিক ছত্রিশ ঘণ্টা পরেই ঘটে তাঁর মৃত্যু।

সাম্প্রতিক কালে আর একটি তেজস্ক্রিয়তাজনিত দুর্ঘটনার খবর পশ্চিমী দুনিয়ার সংবাদপত্রের পাতায় আলোড়ন তুলেছিল। এটি ঘটেছে ওয়াশিংটন
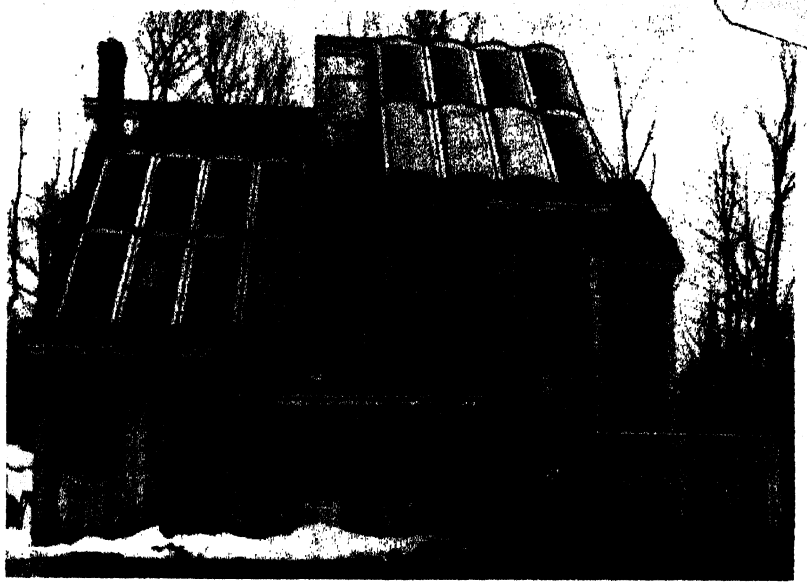
পরমাণু শক্তির বিকল্প সৌরশক্তি : আমেরিকার ভারমনট-এ তিনটি রুমের এই বাড়িটিতে রয়েছে সৌরশক্তিচালিত রুম হীটার, যাতে গড়পড়তায় জ্বালানি খরচ কমে যায় বছরে দুয়ের তিন ভাগ।

রাজ্যে হ্যানফরড নিউক্লিয়ার রিসারভেশনে। বিস্ফো-রণের সময়ে চৌষট্টি বছরের হ্যারলডের মুখের ডান দিকটায় ছিটকে এসে পড়ে অসংখ্য কাঁচের টুকরো আর সেই সঙ্গে এক রাশ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমেরিসিয়াম-২৪১। হ্যারলডের নিজের মুখে, "প্রতিবারই আমি যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছিলাম, রাশ রাশ আমেরিসিয়াম বেরিয়ে আসছিল আমার নাক-মুখ দিয়ে।" যাতে হ্যারলডের শরীর থেকে রেডিও অ্যাকটিভিটি ছড়িয়ে পড়ে অন্য কারো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য আলাদা ঘেরা হাসপাতালে লেড গ্লাস শিলডের মধ্যে চোখ রেখে সারজন আর নারসরা ওঁর অপারেশন সারলেন। ওঁদের মুখে ছিল গ্যাস মাস্ক্। অপারেশনের পর একটা আলাদা রুমে ঘড়ির কাঁটা ধরে ওঁর চিকিৎসা চলেছিল দূর থেকে। আর সেই সময় ঘরের বাইরে দুটো টিভি ক্যামেরা হ্যারলডকে ফলো করে যাচ্ছিল বরাবর আড়াআড়িভাবে!

*

অ্যানটি নিউকের দল তৃতীয় যে বক্তব্যটা রেখেছেন সেটা আরও গুরুতর। ওঁরা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনেছেন। সন্ত্রাসবাদী দলগুলির ব্ল্যাকমেলের প্রশ্ন তুলেছেন। এক একটা পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে (লাইট ওয়াটার রিঅ্যাকটর) ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও ইউরেনিয়াম-২৩৮ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ফিশন প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করা হয়। আর সেই সঙ্গে উৎপন্ন হয় স্পেনট ফুয়েল হিসেবে প্লুটোনিয়াম-২৩৯। এই প্লুটোনিয়ামই হল অ্যাটম বোমা তৈরি করার একটা প্রধান মসলা। প্রতি হাজার কেজি ইউরেনিয়াম তিন বছর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবার পর বেরিয়ে আসে প্রায় ন' কেজি প্লুটোনিয়াম-২৩৯। আর এ থেকে অনায়াসে তৈরি হয়ে যায় টেনিস বলের আকারে ছোট্ট একটা অ্যাটম বোমা যা দিয়ে সত্তর একর জমি জুড়ে ৫০,০০০ লোককে ধূলিসাৎ করতে সময় লাগবে না এতটুকু। ভয়টা এইখানেই। কোন টেররিসট গ্রুপ যদি কোন পাওয়ার প্ল্যানট থেকে প্লুটোনিয়াম হাইজ্যাক করে নিতে সক্ষম হয় (অসম্ভব কিছুই নয়। কেননা এক দশক আগে কেই বা ভেবেছিল বিমানবন্দরগুলিতে সতর্ক নিরাপত্তা বাহিনী আর কড়া পাহারা সত্ত্বেও এয়ারলাইনসগুলিতে আকছার রোমহর্ষক হাইজ্যাক হবে?) তবে কিছু বুদ্ধিশালী মস্তিষ্কের সাহায্যে ম্যাথমেটিক্যাল ইকোয়েশন আর নকশা প্রয়োগ করে অ্যাটম বোমা তৈরি করে নিতে এতটুকু অসুবিধে হবে না। কথাটা সত্যি। কেননা অ্যাটম বোমা তৈরি করার নকশাটা আজ আর এমন কিছু গোপনীয় নয়। ফলে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিয়ে যদি কেউ ব্ল্যাকমেল বা ছিনিমিনি খেলে তবে তা ভাববারই কথা।

আর একটা কথা। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটগুলি থেকে যে স্পেনট ফুয়েল তৈরি হচ্ছে তা নিষ্কাশিত করে বা রিপ্রসেসিং প্রক্রিয়ায় পাওয়া যেতে পারে প্লুটোনিয়াম, যাকে আবার ফুয়েল হিসেবে 'ফাসট ব্রিডার রিঅ্যাকটর'-এ ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তির সমস্যাটা মেটানো যায়। আগেই বলেছি প্লুটোনিয়াম হল বোমা তৈরির আসল মসলা। তাই যে সমস্ত দেশ 'ফাসট ব্রিডার রিঅ্যাকটর' তৈরির কথা ভাবছেন তাঁরা কিন্তু প্লুটোনিয়াম হাইজ্যাকের পথটা খুলে দিচ্ছেন সোজাসুজি। কেননা এতে প্লুটোনিয়াম অনেক বেশী সহজ উপায়ে পাওয়া যায়। প্রেসিডেনট কারটার সম্প্রতি এই নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলের কথা ভেবেই সারা আমেরিকায় প্লুটো-নিয়াম রিসাইকলিং বন্ধ ঘোষণা করেছেন। ব্রিটেন কিন্তু "প্লুটোনিয়াম ইকনমি"-র রাস্তা ধরেছে। ভাবা হচ্ছে সেখানে ফাসট ব্রিডার রিঅ্যাকটর তৈরির কথা। ফলে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা সেখানে খুব চিন্তিত। সারা ব্রিটেনের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলি থেকে স্পেনট ফুয়েল জড় করে উইনডস্কেল-এ রিপ্রসেসিং করা হয়। তাই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সেখানকার মানুষ। হাউস অব কমনসে তর্কযুদ্ধে উইনডস্কেল এখন একটা নিয়মিত হট টপিক। এমন কি এই কিছু দিন আগেও মে মাসের গোড়ার দিকে লনডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে উইনডস্কেল নিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল। এতে জমায়েত হয়েছিলেন প্রায় দশ হাজার মানুষ। আর এর বেশির ভাগই ছিলেন তরুণ-তরুণী।

*

আসুন এবার দেখা যাক পশ্চিমী দুনিয়ায় অ্যানটি নিউকের বিস্ফোরণী চেহারাটা। শুরু করা যাক ফ্রানস দিয়েই। ফ্রানসে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নতুন মোড় নেয় সাতাত্তরের ৩১শে জুলাই, যখন ক্রেস-ম্যালভিল-এ বিক্ষোভকারীদের একজন

মারা যান পুলিসের গ্রেনেডে। ক্রেস-ম্যালভিল-এ নতুন 'সুপারফিনিকস ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাকটর' গড়ে ওঠার কথা। অ্যানটি-নিউকের দল তাই জমা হয়েছিলেন সপ্তাহ শেষে এখানে প্রতিবাদ জানাতে। বৃষ্টিভেজা মাঠে পুলিসের সঙ্গে একটানা সংঘর্ষে চলল ইট-পাথর, গ্রেনেড আর আইরন রড। সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে হাত-পা হারান এক শ' জন। মারা যান একত্রিশ বছরের হাই স্কুলের কেমিস্ট্রীর টীচার ভাইটাল মাইকালন। ফ্রানস সরকার অভিযোগ চাপালেন জারমানদের উপর। বললেন জারমানরাই উসকেছে। এমন কি 'অবজারভার'ও মন্তব্য করলেন, 'a group of 100 hardened German protest fighters,....refusing all contacts with the press'

যদিও এর আগে ফ্রানসের লা হেগ রিপ্রসেসিং প্ল্যানটের কর্মীরা ধর্মঘট করেছেন কিংবা COPEAU (Commando of Opposition by means of Explosives to the Auto-destruction of the Universe. নামের দলটি ১৯৭৬-এর নভেম্বরে ইউরেনিয়াম খনিতে বোমা ছুড়েছেন, তবে তা কখনও ক্রেস-ম্যালভিলের মারমুখী প্রতিবাদের মত মারাত্মক চেহারা নেয়নি। এখন পপুলার ম্যাগাজিন বলতে যা কিছু আছে প্যারিসে তার প্রায় সব ক'টিই ইকোলজি বা পরিবেশ-বিজ্ঞান ঘেঁষা। ফ্রানসে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটের বিরুদ্ধে লড়াই এখন আরও জোরদার হতে চলেছে, যাকে বলে রাজনৈতিক লড়াই।

তবে জারমানির অবস্থা বুঝি আরও মারাত্মক। আওতার বাইরে। ১৯৭৫ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি ফেডারেল রিপাবলিক অব জারমানির উইল-এ wyhl পরমাণু শক্তিকেন্দ্রটি বিক্ষোভকারীরা দখল করে নেন। সারা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা এই প্রথম। এর পরে ছিয়াত্তরের তিরিশে অকটোবর ব্রকডরফের রিঅ্যাকটরটিও অ্যানটি নিউকদের দখলে চলে যায়। পুলিসের সঙ্গে চলে খণ্ডযুদ্ধ। অবশ্য পুলিস বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় সাত দিন পরে। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না-ঘুরতেই ব্রকডরফ দ্বিতীয়বার অ্যানটি নিউকদের দখলে যায়। এবারেও লড়াই। আরও জোরদার। ব্রকডরফ তৃতীয়বার দখল হয় সাতাত্তরের উনিশে ফেব্রুয়ারি। এবার বিক্ষোভকারীদের মুখে ছিল গ্যাস মাস্ক্। হাতে কাঁটাতার কাটার যন্ত্র, চেন আর হুক। পুলিসের সঙ্গে ওঁরা লড়াইয়ে নামলেন আইরন রড আর বেওনেট নিয়ে। ছুঁড়ে দিলেন মোলোটভ ককটেল। ব্রকডরফের ঘটনায় আজও অনেকে জেলে বন্দিজীবন যাপন করছেন। আদালতে চলছে মামলা। তৈরি হয়েছে বন্দীমুক্তি কমিটি। সম্প্রতি 'বুলেটিন অব অ্যাটমিক সায়েনটিসটস' ম্যাগাজিনে এই কমিটির তরফ থেকে আবেদন রাখা হয়েছে সারা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের কাছে। ও'রা বলছেন, আজ যদি আমরা একজোট হয়ে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে না লড়ি তবে সেদিন আর বেশী দূরে নেই যেদিন সারা পৃথিবী জুড়ে অভিনীত হবে হাজার হাজার হিরোশিমা।

এমনিভাবে একজোট হয়েছেন সুইডেনের মানুষ। নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইস্যুকে সম্বল করেই বর্তমান সুইডেন সরকার ছিয়াত্তরের উনিশে সেপটেমবর নির্বাচনে জিতেছেন। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর তৈরি নিয়ে সেখানে এখন ভীষণ কড়া-কড়ি চলেছে, যার ফলে শক্তিচাহিদা মেটানোর ব্যাপারে পরমাণু শক্তির ভূমিকা আপাতত অনিশ্চিত। অনিশ্চিত হয়েছে স্পেনের লেমনিজ পাওয়ার প্ল্যানট তৈরির ভবিষ্যৎ। 'নিউজউইক' জানাচ্ছেন, লেমনিজের চারদিকে এখন কাঁটাতার আর সেই সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন পুলিস-বাহিনী। অ্যানটি নিউকের দল সেখানে চারদিকে জনমত গড়ে তুলছেন। সতর্ক করে তুলছেন সাধারণ মানুষকে। দেখানো হচ্ছে কালার ডকুমেন্টারি ছবি—"NO"। লেমনিজের সবুজ পাহাড় আর বাস্কের তীরের ছবির সঙ্গে একই ফ্রেমে ক্যামেরা ধরেছে আমেরিকার স্কাই-স্ক্রেপার ঘেরা শহরগুলি। সাউনডট্র্যাকে তখন ভাষ্যকারের ধারাবিবরণী: "এই সেই শহরগুলি যেখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানট শিশুদের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছে লিউকোমিয়ার হার।" আমেরিকার কেনটাকির কথা আগেই বলেছি। শুধু কেনটাকি নয়, নিউ মেকসিকো কিংবা ক্যালিফোর-নিয়ার কারুন কাউনটিতেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। মিচিগানের মিড-ল্যানডে অ্যাটমিক প্ল্যানট তৈরির কাজ অসমাপ্ত থেকে গেছে প্রতিবাদকারীদের চাপে। থেমে আছে নিউ হ্যামপশায়ারে সিব্রুক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক-টরটির কাজ। ষাটের দশকের শেষে এই জমিটি কিনেছিলেন পাবলিক সারভিস কোমপানি পরমাণু শক্তিকেন্দ্র গড়বার জন্য, কিন্তু আজও এটির শতকরা দু ভাগ কাজের বেশী সম্পন্ন হল না। প্রেসিডেনট কারটার নিজেও ক্লিনচ রিভার ব্রিডার রিঅ্যাকটর তৈরির ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন। কারটার শাসনতন্ত্র আপাতত পরমাণু শক্তি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নজর দিয়েছেন সৌর শক্তিতে। প্রতিবাদের ঢেউ ইংল্যানডেও। সম্প্রতি 'দি গারডিয়ান' পত্রিকা অ্যানটি নিউকদের সম্বন্ধে সবশেষ যে খবর আমাদের জানিয়েছেন তাতে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না ব্রিটেনেও আবহাওয়া এখন গরম। চার হাজার অ্যানটি নিউকের একটি মিছিল এ বছরের মে মাসের গোড়ার দিকে সপ্তাহ শেষে মিলিত হয়েছিলেন এডিনবারগের তিরিশ মাইল তফাতে টরনেস পয়নট্-এ। কুড়ির কাছাকাছি বয়েসের এই সব ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ এসেছিলেন জারমানি থেকে, কেউ বা ফ্রানস থেকে। ওঁরা টরনেস পয়নট্-এ গড়তে দেবেন না সাড়ে ছ'শ' মিলিয়ন পাউনডের অ্যাডভানস্ড গ্যাস-কুল্ড্ রিঅ্যাকটর। এর আগে মিছিলটি যখন ডানবারের তীর ধরে যাত্রা শুরু করে টরনেসে মিলিত হবার জন্য, তখন পথে ও'দের

একটি জাহাজ—'গ্রীনপিস'। জাহাজের উপর পোস্টার "Go fishin'—not fission", "No nuclear dump in Galloway"

টরনেসে তাঁবু খাটিয়ে সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর খোলা আকাশের নীচে ও'রা শুনলেন প্ল্যাটফরম স্পিচ। শপথ নিলেন এক হয়ে লড়ার। দেখানো হল জারমানিতে প্রতিবাদকারীদের সাথে পুলিসী লড়াইয়ের এক ছোট্ট ডকুমেনটারি ছবি। আর সারা মাঠ উল্লাসে কেঁপে উঠেছিল যখন গ্রীনপিস জাহাজ থেকে ডিঙি নৌকায় চড়ে তীরে নেমে কাকভেজা অবস্থায় প্ল্যাটফরমে উঠে এলেন ডেভ ম্যাকটেগারট। ইনিই সেই মানুষটি যিনি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফ্রানসের 'অ্যাটমিক টেসট এরিয়া'-তে পৌঁছেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। বয়স্ক স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, "কুড়ি বছর পরে যখন পাওয়ার প্ল্যানট এখানে পুরোদমে কাজ করবে তখন আমি হয়তো আর এ পৃথিবীতে থাকব না। কিন্তু থাকবে আমার ছেলেমেয়েরা। তাই তারা যাতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্যে আমি লড়াই করে যাব।" লড়াই শুধু টরনেসে নয়, উইনডস্কেলে নয়, লড়াই চলেছে পৃথিবী জুড়ে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে।

*

তাই পরমাণু শক্তিকে যাঁরা বিদ্যুৎশক্তি সমস্যার সমাধান ভেবে আরও নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানট গড়ে তোলার কথা ভাবছেন তাঁরা কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। গবেষণা চলেছে কিভাবে তেজস্ক্রিয় অবশেষকে নিরাপদে সরানো যায়। কিন্তু যতদিন সঠিক কোন পন্থতি বেরিয়ে আসছে না ততদিন বন্ধ থাকুক পাওয়ার প্ল্যানট তৈরির কাজ। এ কথাও বলছেন কেউ কেউ। কিন্তু পরমাণু শক্তির বিকল্প কি কেউ ভবছেন? আগামী দিনে যদি আমরা সত্যিই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটগুলিকে বন্ধ করে দিই তবে তার বিকল্প কি আমরা ভেবেছি? অফুরন্ত শক্তির উৎস পরমাণুকে বরখাস্ত করার আগে এ প্রশ্নটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন থিওডর বি টেলর। প্রিনসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এক দশক আগেও পরমাণু অস্ত্রের নানান নকশা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর নিয়েও গবেষণা করেছেন অনেক। আপাতত পুরোপুরি নজর দিয়েছেন সৌরশক্তির দিকে। "সমস্যাটা হল সূর্যের শক্তি অফুরন্ত অথচ আমরা একে ধরে রাখতে পারছি না। গবেষণা চলছে এখন কিভাবে এই সৌরশক্তিকে ধরে রাখা যায়। আর এই গবেষণার উপর দাঁড়িয়ে আমি হলফ করে বলছি আগামী দিনে সৌরশক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব আমরা শক্তি-চাহিদা মেটানোয়।" ছ' ফুট লম্বা শান্ত চোখ সুঠাম চেহারার এই মানুষটির সংগে কথা হচ্ছিল কলকাতার এক হোটেলে। গায়ে সবুজ-হলুদ স্ট্রাইপসের বুশ শারট। বাদামী ট্রাউজার। মসৃণ গাল। ছোটবেলায় স্কুল থেকে পটাশিয়াম ক্লোরেট নিয়ে এসে পটকা বানিয়ে ছুঁড়ে দিতেন রাস্তার উপরে। তখন থেকেই বোমা বানানোর শখ। কলেজ-জীবনে গরমের ছুটিতে বাড়ি বসে একদিন রেডিওতে শুনলেন হিরোশিমা শহরের উপর বোমা বর্ষণের সংবাদ। সেই প্রথম শোনা "fission" শব্দটি। এর পর একরকম নেশার ঘোরেই ঝুঁকলেন নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর দিকে। গবেষণা করলেন নিউক্লিয়ার ওয়েপনস নিয়ে। আমেরিকার ডিফেনস অ্যাটমিক সাপোরট এজেনসির ডেপুটি ডিরেকটর হলেন টেলর। এমন কি গবেষণার জন্য ১৯৬৫ সালে অ্যাটমিক এনারজি কমিশনের সম্মানজনক লরেনস মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন। আর আজ প্রায় এক দশক পরে সেই টেলরের মুখে "কোনমতেই পরমাণু শক্তি নয়।" প্রশ্ন রেখেছিলাম, অনুশোচনা হয় না আপনার? এত যে পরমাণু অস্ত্রের ডিজাইন করেছেন আপনি নিজে হাতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে

এই টেলিভিশন সেটটি পুরোপুরি চলে সৌরশক্তি দিয়ে। সোলার সেল সূর্য থেকে শক্তি টেনে নেয় এর ব্যবহারের জন্য। এটি তৈরি করেছেন নিউ জার্সির প্রিনসটনের আর সি এ ল্যাবরেটরিজ।

আপনি যে এত বড় সম্ভাব্য বিপদ তৈরি করেছেন, এর জন্য পরিতাপ হয় না? রিপারকাশন? সাদাকালো চুলে লম্বা আঙুল চালিয়ে নিয়ে থমকে দাঁড়ালেন টেলর। "হ্যাঁ, অনুশোচনা হয় যা করেছি তা নিয়ে। দীর্ঘ গবেষণার ভিত্তিতে আজ এটা উপলব্ধি করেছি পরমাণু বোমা তৈরি করা কত সহজ। কত সহজ পাওয়ার প্ল্যানট থেকে এতটুকু প্লুটোনিয়াম চুরি করে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিয়ে খেলা। হয়তো আজকের এই উপলব্ধিতে আসার জন্য এর প্রয়োজন ছিল।" যে সমস্ত পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র আজ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, সেগুলো কি ধ্বংস করার কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা আছে? "আছে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। এটা সম্ভব। সমস্ত পরমাণু বোমা থেকে ফিসাইল মেটিরিয়াল বের করে নিয়ে তাকে পাওয়ার প্ল্যানটে ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা যেতে পারে। আমার মনে হয় এটা আজ সবার উপলব্ধি করার দরকার।"

থিওডর টেলর আজ অন্য মানুষ। অভিজ্ঞতার আলোয় টেলর আজ শঙ্কিত। "তোমায় একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। সময়টা ১৯৭০। ঘটেছিল আমেরিকার অরল্যানডোতে। একদিন সকালে মেয়রের অফিসে এলো একটা ছোট্ট চিঠি। এক মিলিয়ন ডলার ছাড়ো নইলে সারা শহর হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেব। আর আশ্চর্য কি জানো তো, সংগে একটা বোমার পুরো ডিজাইন। সবাই তো ভয়ে কাঁপছে। শেষে পুলিস খুঁজে বার করল, চিঠিটা পাঠিয়েছে একজন চোদ্দ বছরের ছেলে। ব্যাপারটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। ঘটনাটা এটাই প্রমাণ করে অ্যাটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা আজ মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরমাণুবিজ্ঞানীর আওতায় নয়। এটা তৈরি করা অনেক সহজ। আর সেইজন্যই ভয় পাওয়ার প্ল্যানটগুলিকে নিয়ে। কয়েক কেজি প্লুটোনিয়াম হাইজ্যাক করে বোমা বানানো আজ আর কঠিন নয়।"

আমাদের মত দেশে সৌরশক্তির ভবিষ্যৎ কি? "তোমাদের তো ট্রপিকাল কানট্রি। সবচেয়ে বেশী উপকার পাবে তোমরাই। সূর্য এখানে মুঠো মুঠো আলো ছড়াচ্ছে প্রতি দিন, যার সবটাই নষ্ট হচ্ছে অযথা। কলকাতার কোন রাস্তায় যতটা সৌরশক্তি ঠিকরে এসে পড়ে তা স্টকহলমের কোন রাস্তার ছিটোনো সৌরশক্তির তিন গুণ। ইকোয়েটরের উপরে নীচে দু দিকের দেশগুলি এই অফুরন্ত সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবচেয়ে উন্নত দেশে পরিণত হবে একদিন।" সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে আজ চারদিকে। কেননা পরমাণু শক্তির পালটা কিছু আজ খুঁজে বের করতেই হবে। ইতিমধ্যে আমেরিকায় চল্লিশ হাজার বাড়িতে পৌঁছে গেছে সৌরশক্তি চালিত ওয়াটার হিটার বা স্পেস হিটার। আর ১৯৮৫-তে এর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে পঁচিশ লাখ। তৈরি হয়েছে সৌরশক্তি চালিত কুকার, ইরিগেশন পাম্প, গ্রীনহাউস, সোলার টেলিভিশন।

এক দিকে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে আজ আমেরিকা আর ইওরোপের দেশগুলিতে, অন্য দিকে একই গতিতে গবেষণা ছুটে চলেছে সৌরশক্তি নিয়ে। দেশে দেশে আজ এক স্লোগান: পরমাণু শক্তির বিকল্প সৌরশক্তি। "Turn off the nukes, Turn on the Sun"

আজ যখন তারাপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানট নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার ঝড় উঠেছে ইউরেনিয়াম আমদানি নিয়ে, তখন একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, তারাপুরে সর্বনাশা তেজস্ক্রিয়তা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সাংঘাতিকভাবে। লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়ে কোনরকম সতর্কতা অবলম্বন করে রেডিও অ্যাকটিভ ওয়েসট নাড়াচাড়া করা হচ্ছে এখানে তের শ' কর্মী আজ পর্যন্ত এই তারাপুরে বদলানো হয়েছে এরই মধ্যে। কেননা এঁদের সকলেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছেন। শ্বাসকষ্ট হয়ে মারা গেছেন একজন। সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে পড়েছে তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন। তাই আজ এই মুহূর্তে আমাদের ভেবে দেখা দরকার ঠিক কতটা সতর্কতা আমরা অনুসরণ করেছি তেজস্ক্রিয় অবশেষ নিয়ে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা নিয়ে। সম্ভাব্য প্লুটোনিয়াম হাইজ্যাক নিয়ে। কেননা এটা শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ঘটনা নয়। এটা আমাদের বেঁচে থাকার সমস্যা। "a matter of survival". মনে পড়ছে আলডাস হাকসলি কোথায় যেন বলেছিলেন: "Men can get on very well without atomic energy, but they cannot dispense with bread" কথাটা সত্যিই পুরোপুরি খাঁটি।

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ২১ ॥

যা হোক, এই যে চিড় খেলো তার প্রধান কারণ আমিই। অবশ্য ঘুরে-ফিরে ঐ রসায়নের কথাই বলব। কি, কমলা? হ্যাঁ, কমলাকে আমি চিনি ওর ছোট বয়স থেকেই। যখন খানিকটা বড় হল, ওকে ফের দেখলাম সেই ১৯৪৪ সালে। কলকাতায়। তখন ও ভারি সুন্দর, ফুটফুটে যুবতী। তারপর মেশাটা শুরু হল মালাদে, সেই অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময়। ঐ দিনগুলোর জন্যই অন্নপূর্ণা ভারি দুঃখ পেয়ে মাইহারে চলে গেল। এবং তারপরে কমলার সঙ্গে দেখাই হয়নি অনেক বছর। মাঝে মাঝে বোম্বেতে হয়তো ছুটখাট দেখা হত, কিন্তু সেটাকে ঠিক মেশার পর্যায়ে ফেলব না। ওর সঙ্গে শেষে ফের ভাল করে সম্পর্ক গড়ে উঠল ১৯৫৬ সালে। ততদিনে আমার আর অন্নপূর্ণার সম্পর্ক একটা খেই হারিয়ে বসেছে। ভেতরের টানটা তখন অনুপস্থিত। '৫৬ সালেও কমলার স্বামী জীবিত। কিন্তু ওরও তখন স্বামীর সঙ্গে খুবই খারাপ সম্পর্ক। প্রায় আলাদা আলাদাই থাকছিল ওরা। এর কিছু দিন পরেই ওর স্বামী ফিল্ম প্রডিউসার অমিয় চক্রবর্তী মারা গেলেন। কিছু দিনের জন্য আমি সে সময়ে আমেরিকা চলে গেলাম। এবং ফিরে এসে বেশ খোলাখুলিই মিশতে শুরু করলাম। বোম্বেতে ফের যখন অন্নপূর্ণা শুভকে নিয়ে চলে এল, আমি বাসা করলাম মালাবার হিলে। কিন্তু তখন আমার কমলার সঙ্গে সম্পর্ক বহাল। তবে সত্যি বলতে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই ওকে নিয়ে বাইরে আসতে শুরু করলাম। তার আগে দেশে থাকতে ও কিছু কিছু দিনের জন্য আমার সঙ্গে এসে থাকত। যেমন ধরো কলকাতার প্রেসিডেন্সী কোর্টের ফ্ল্যাটটায়। বিমান, অর্থাৎ বিমান ঘোষ, থাকে যেখানে এখন। একটা ঘর আমার

কমলাকে যে নিয়ম মেনে বিয়ে করিনি তার কতকগুলো কারণ আছে। কি জানি, নিজের বিয়ে দেখে, এবং অন্য অনেকের বিয়ে দেখে দেখে আমার বিয়ের ওপর থেকে সমস্ত শ্রদ্ধা চলে গেছে।

এই কমলার প্রতিও আমি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছি। আনফেথফুল হওয়া বলতে যা বোঝায়। বহুবার। কিন্তু তার জন্য আমি মিথ্যের আশ্রয় নিইনি!

ছিল ওখানে। ঐ বাড়িতে বসেই আমি ফিল্মের সুর-টুর দিতাম, বাজনার প্রোগ্রাম-টোগ্রাম করতাম। কমলা তখন ওখানে এসে এসে থাকত। তো এরকম-ভাবেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ তখন। তবে ১৯৬৭ সালে ঐ যে বিলেত চলে এলাম একসঙ্গে সেই থেকেই আমরা মোটের ওপর স্বামীস্ত্রীর মতন জীবন-যাপন করছি।

কমলাকে যে নিয়ম মেনে বিয়ে-থা করিনি তার কতকগুলো কারণ আছে। কি জানি, নিজের বিয়ে দেখে এবং অন্য অনেকের বিয়ে দেখে দেখে আমার বিয়ের ওপর থেকে সমস্ত শ্রদ্ধা চলে গেছে। তবে ভালো স্ত্রীরা বা সঙ্গিনীরা যে কোনও পুরুষকে জীবনে অনেক বড় হতে এবং সার্থক হতে অনুপ্রেরণা দেয় এবং সাহায্য করে, সেটাও আমি খুব বিশ্বাস করি। কোনও সন্দেহই নেই সে বিষয়ে। তবে সেটা নিছক বিয়ের জন্য কি না, সেটা তর্কসাপেক্ষ। ঐ সার্থক সম্পর্কও তো আসলে একটা গভীর অন্তরঙ্গতা এবং ভালবাসার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে মন্ত্র পড়ে কার বিয়ে হল, কার কি হল, সেটা বড় কথা নয়। বিয়ে না হয়েও সেটা হতে পারে। কাজেই বিয়ে বলে যে মন্ত্র পড়াপড়ির একটা অজুহাত, সেটা না দেখালেই কি নয়? আসল কথা ভালবাসা, বোঝাবুঝি, মানিয়ে চলা এবং একে অন্যকে বড় হতে দেওয়ার শুভ প্রচেষ্টা। পরস্পরকে সম্মান দিয়ে, ভালবেসে যারা থাকতে পারে তারাই সুখী, তারাই আদত বিবাহিত। এবং সেটা কমলার সঙ্গে আমার হয়েছে। তাই আমি ওকে পেয়ে সুখী।

অথচ এই কমলার প্রতিও আমি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছি। আনফেথফুল হওয়া বলতে যা বোঝায়। বহুবার। কিন্তু আনফেথফুল হওয়ার মধ্যেও একটা কথা আছে। আনফেথফুল আমি নিশ্চয়ই হয়েছি, কিন্তু আমি তার জন্য ওর কাছে মিথ্যের আশ্রয় নিইনি। আমি যা কিছু করেছি তা শুরুর থেকেই ওকে বলে এবং স্বীকার করে। আমি যে খামকা একটা পাগলের মত মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি, তা নয়। আমাদের জীবনে যা হয়, অর্থাৎ অনেক দিন একলা একলা অনেক অনেক ঘুরতে থাকলে কিছু-না-কিছু এক্সপিরিয়েন্স আপনা থেকেই হয়ে পড়ে। এবং সেটা যাঁরা অস্বীকার করেন

এই অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমি শেষ অবধি মিলে-মিশে থাকতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু ওর মাধ্যমে আমার প্রচুর ভাল হয়েছিল। ওর ঐ অত গুণ, তা ছাড়া ও যেন একটা মাধ্যমের কাজ করল আমার ভাল হওয়ার ব্যাপারে। ডাক্তার উৎস বাবাই, অন্নপূর্ণা একটা যোগাযোগের কাজ করল।

তাঁদের আমি বড় মানুষ হিসেবে মানতে বাধ্য। কিন্তু যাঁরা এসব ঘটিয়েও সব অস্বীকার করেন তাঁদেরকে আমি নিম্নস্তরের মনোবৃত্তির লোক বলেই ধরব। আমার জীবনে এরকম বহু হয়েছে, বহু হয় এবং সেটা আমি কখনও অস্বীকার করি না, তবে এ-সমস্ত করতে পারব বলেই যে কমলাকে বিয়ে করিনি, তা নয়। সে স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই যে বিয়ের ধার মাড়াইনি তা ঠিক নয়। পারতপক্ষে যা বললাম একটু আগে, সেটাই সত্যি এ ব্যাপারেও। এ ছাড়া আমি বিয়ে করতেই বা কি করে পারি? আমার তো স্ত্রীর সঙ্গে আইনগত ছাড়াছাড়ি হয়নি। সে তো আমাকে ডিভোর্স দেয়নি। দিতে চায় না। ডিভোর্স যদি অন্নপূর্ণা আমাকে দিত, তা হলে বলা যায় না, হয়তো কোনও একদিন কমলাকে বিয়ে করে ফেলতামও। জোর করে একটা কেলেঙ্কারি করে হয়তো অন্নপূর্ণার কাছ থেকে ডিভোর্স আদায় করতে পারতাম, কিন্তু সেটা আমি করিনি। তার কারণ ঐ ঘটা করে বিয়ের ব্যাপারটার ওপর থেকে মন উঠে গয়েছিল বলে। এবং কমলা যেহেতু আমাকে অবিশ্বাস করে না, আমার ওপর আস্থা আছে, আমি ওর মন ভজাবার জন্য ঐ আইনসাপেক্ষ ক্রিয়াকলাপ কিছু করি না। সেখানেও সেই কথাটা আসে।

না, কমলার আমাকে অযথা অবিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। আমার এখনও অনেক ভাল ভাল বান্ধবী আছে, সঙ্গিনী আছে। তাদের সবার সঙ্গেই আমি সুন্দরভাবে, কমলার জানতেই মিশি। তাতে আমাদের দুজনের সম্পর্কে কোনও সমস্যা দাঁড়ায় না। আমি সেটাকে সেই অর্থে অন্যায় বলেও ঠিক মনে করি না। অনেক সময়ে দুঃখ পাই, নিশ্চয়ই কমলার ওপর এই ধরনের চাপ সৃষ্টি করাটা আমি উপভোগ করি না। হাজার হোক মেয়ে তো, একটা-না-একটা কষ্ট তো হবেই আমার এসব ব্যাপারে। কিন্তু তার জন্য ও আমার ভালবাসাকে প্রশ্ন করে না। আমি দেখেছি, আমার পক্ষে দুজনকে কিংবা তিনজনকে অগাধভাবে ভালবাসাটা সম্ভব। এবং আমার এই স্খলন ও মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে বলেই না আমাদের এই সম্পর্ক এত শক্ত। তুমি এটা ওর আত্মবিশ্বাস কিংবা ওর ভালবাসার শক্তি বলে বর্ণনা করতে পারো।

নিঃসঙ্গতা? ওঃ গড্! তুমি এবার একেবারে আমার নার্ভ সেন্টার স্পর্শ করলে। আমার জন্মই হয়েছে এই ভাবনা নিয়ে। নিঃসঙ্গতা যেন আমার মনের স্থায়ী আবহাওয়া এবং ভাব। যেটা কিনা এত ভালবাসা পেয়েও কিছুতেই গেল না। শুনেছি নাকি অনেক বড় লেখক এবং শিল্পীদের এটা অবিচ্ছেদ্য স্বভাব। কিন্তু বড় শিল্পী হওয়ার জন্যই কিন্তু এসব আমি রপ্ত করিনি। এটা কিরকমভাবেই যেন আমি পেয়েছি, অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রেই বলা চলে। এবং চিরকাল সঙ্গে করে বয়ে বেড়াচ্ছি বলে নিঃসঙ্গতা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। তাই লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলি সেটাকে এড়াবার জন্য। এই সঙ্গে সুযোগ-সুবিধেও আছে। আর ভীষ্ম তো আমি নই। মহিলাদের কাছে থেকে থেকে তাই চলে যাই। তবে এই মানুষের সঙ্গ পাওয়ার নেশাটা

চেষ্টা হল না। না মদ, না [illegible] তাদের অনেকখানি চ্যানেলাইজ করে। আমি নির্ভর করি আমার ছেলে-বন্ধুদের ওপরও। যেমন বলতে পারো কলকাতার বিমান ঘোষ, লন্ডনের প্রদ্যোৎ সেন। আর একজন প্রাণের বন্ধু ছিল আমার, তাকে সখা বলতেও পারো। জগু নাম তার। মাসতুতো ভাই, পুরো নাম জগদীশ চ্যাটার্জী। এই বছরখানেক হল মারা গেছে। এই বিমান বা প্রদ্যোতের সঙ্গে আমি অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারি। তাতে কোনই হিসেব থাকে না সময়ের। কাজেই মহিলারাই যে আমার নিঃসঙ্গতা ঘোচায় তাও তো নয়। তবে একটা অমোঘ সত্যের মতন এই নিঃসঙ্গতা আমার আছে। উপরন্তু কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সমস্ত দৈহিক সম্পর্কের ওপরে বলেই তাতে আরও এক ধরনের মাদকতা এবং প্রাপ্তি আছে। কিন্তু ঠিক কিছু চাওয়া হয় না বলে তাতে অনেক কিছুই এমনিতেই পাওয়া যায়।

গুটি কয়েক মেয়ের সঙ্গে আমার এখনও একটা সম্পর্ক থেকে গেছে যা কিনা ঠিক শারীরিক ঘনিষ্ঠতার ওপরই ভিত্তি করে নেই। সেরকম কোনও কোনও বান্ধবী আমার আছে এখনও দেশে, জাপানে, কি ফ্রান্সে, কি আমেরিকায় যাদের দেখলেই এখনও মনটা ভরে ওঠে আনন্দে, ভালবাসায়। এদের সঙ্গে নিষ্কাম ভালবাসার একটা বন্ধন দিনে দিনে শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে। কোনও লুকোচুরি থাকে না সে সম্পর্কে, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। আর এই ফ্র্যাংক্‌নেস্‌টা আমার স্বভাবসিদ্ধ বলে যেখানে সেটা প্রকাশ করতে পারি তা আমাকে সুখী করে, শান্তি দেয়। কমলার সঙ্গে আমার সম্পর্কে সেই ফ্র্যাংক্‌নেস্‌টা সবচেয়ে একটা বড় ফোর্স হিসেবে থেকে গেছে। সব খুলে বলি বলে সে ধরনের কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। কষ্ট ও নিশ্চয়ই পায়। হয়তো নিজে কোনও দিন বই লিখে তা প্রকাশ করবে। কিন্তু ও সমস্তটা মানিয়ে নিয়েছে। এবং সেদিক দিয়ে ও আমাকে মুক্ত করেছে, অন্তত একটা পাপবোধ থেকে। তৎসত্ত্বেও যখনই নিজের খেয়াল-খুশির কাজ করেছি, কিছুটা কিছুটা দুঃখও আমার হয়েছে। সে দুঃখ হয়তো ওর দুঃখের চেয়ে কিছু কম না। তবে সেটাই ওর চরিত্রের আসল জোর। দুঃখ পেলেও ও সে দুঃখকে সহ্য করে আমাকে একটা পাপবোধ থেকে মুক্তি দিয়েছে। আমার সমস্ত দোষ, সমস্ত বাতিক সমেত আমাকে গ্রহণ করেছে।

আমার বান্ধবীদের আমি নাম করছি না। হয়তো নাম দিলেও তাদের কারো কারো আর সে অর্থে কোনও ক্ষতিও হবে না। কিন্তু সাধারণভাবে পুরুষরা

বহু দিন পর কমলাকে পেয়ে আমার খুঁজে বেড়ানো আনন্দটার কিছুটা পেয়েছি

যেরকম তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা লোকের সামনে রগড়ে রগড়ে আনন্দ পায়, আমি মোটেই তার পক্ষপাতী না। ফিল্ম স্টার কি শিল্পীদের নিয়ে কেচ্ছাকাণ্ডে মানুষ খুব মজা পায় ঠিকই, কিন্তু এসব কেচ্ছার অনেকখানিই পাবলিসিটির জন্য করা হয়। আর যদি পাবলিসিটির কথাই বিশ্বাস করতে হয় তা হলে তো সমস্ত ফিল্মের হিরোরাই এক একটা সুপার লাভার। যেটা কিনা নিতান্ত আজগুবী, অসম্ভব। এবং আমার এই অ্যাপ্রোচটার ওপর সবচেয়ে ঘৃণা এই কারণে যে, এই ধরনের কথাবার্তা চালচলন সংশ্লিষ্ট মহিলাদের ওপর একটা ঘোর অন্যায়। এইসব ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রচার-বিজ্ঞাপন সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করে মেয়েরাই। যাদের এসব বলে-কয়ে সুবিধে হয় তারা মূলত অপদার্থ লোক। আমার সঙ্গীত-সাধনার প্রতিষ্ঠার জন্য তা কোনও দিন প্রয়োজন হয়নি, হবেও না। মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে আমি ভালবাসা চেয়েছি, প্রচার না।

এখানে দু-চারজন যাদের কথা বলছি তাদের সঙ্গে আমার ভালবাসা খুবই সরল, সহজ এবং মধুর। দয়া করে সর্বদা ঐ শরীরের ব্যাপারটা ভেবে নিও না। এদের সঙ্গে মিশে আমিই জীবনে মানুষ কিংবা শিল্পী হিসেবে উন্নত হয়েছি। সেই সুন্দর দিনগুলোর স্মৃতিতে এইসব কথা।

প্রেমে পড়া আমার সেই ছেলেবেলা থেকেই একটা রোগের মতন। জন্মই হয়েছে বোধ হয় ঐ নিয়ে। জীবনে সর্বপ্রথম ভালবেসেছিলাম মাকে। যেটা হয়তো সবাই বেসে থাকে। সে ফ্রয়েড সাহেব যা-ই তার ব্যাখ্যা দিন। আমার জীবনের প্রথম প্রেম ঐ মায় সঙ্গেই। খুব ভালবাসতাম ওঁকে। তারপর তো দেখেছি রোজই কারো-না-কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ছি। বিশেষ করে যখন বাইরে এলাম তখন তো সেই স্কুলের থেকে নিয়ে ছোট বড় সবারই প্রেমে পড়ছি। বছর ছয়েক বয়স যখন আমার, এক মহিলার কল্যাণে প্রেমের পুরো শিক্ষা তখন থেকেই পেয়ে গেছি। সে ভদ্রমহিলা আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ছিলেন। আমাদের সেই পাড়াগাঁয়ের বাড়ির ঘটনা সেটা। তারপর যেন কিরকম ঐদিকেই নজর গেল আমার। শরীরটা আমার ছোটই ছিল, কিন্তু মনটা ততদিনে পেকে ঝানু হয়ে গেছে। দেখতে বেশ মিষ্টিও ছিলাম তখন, ছোটখাট। মেয়েরাও খুব আদর-টাদর দিত, চুমু-টুমু খেত। ওরা তো ভাবত একটা বাচ্চা ছেলেকে আদর দিচ্ছে। ওরা কি আর জানতে পারত যে, আমার ভেতরে তখনই লালসার অগ্নি একেবারে দাউদাউ করে জ্বলছে। তবে আমার প্রথম সজ্ঞান প্রেমের কাণ্ড চৌদ্দ বছর বয়সে, এক বিদেশিনীর সঙ্গে। প্রেম করা ব্যাপারটা যে কি তার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম। বছর দুয়েক একেবারে পাগল ছিলাম সেই মেয়েটার জন্য। তারপর বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকলে যা হয়, নানান আলাপ হল নতুন নতুন, আলাদা আলাদা ভাব-সাব। এবং একসময়ে উজরার সঙ্গে রসঘন আলাপ হল। কিন্তু বিয়ে হল অন্যখানে।

এই অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমি শেষ পর্যন্ত মিলে-মিশে থাকতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু ওর মাধ্যমে আমার প্রচুর ভাল হয়েছিল। ওর ঐ অত গুণ, তা ছাড়া ও যেন একটা মাধ্যমের কাজ করল আমার ভাল হওয়ার ব্যাপারে। ভালর উৎস আসলে বাবাই, অন্নপূর্ণা একটা সুন্দর যোগাযোগের কাজ করল। বাবার আওতায় থেকে অবশ্য আমি চেষ্টা করেছিলাম নিজেকে পুরো বদলে দিতে। বাবার ঐ ব্রহ্মচর্যের খাতে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলাম। পুরো শক্তিটা যাতে একটা বিশেষ খাতে বয়ে যায়। রেওয়াজ, রেওয়াজ, আর রেওয়াজ। এইভাবেই সে সময়ের সে জীবনটা চলেছিল। সেটা না করলে সংগীতে এগোতে পারা আমার পক্ষে মুশকিল ছিল; কারণ, তার আগে দাদার ট্রুপে থেকে আমি প্রায় বখে যেতে বসেছিলাম।

বিয়ে যখন টিঁকল না তখন আমি সেই ভবঘুরে হতে বসলাম। ভালবাসার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এর সঙ্গে মিশি তো তার সঙ্গে মিশি। কিন্তু সত্যিকারের একটা সম্পর্কের জন্য, একটা মিনিংফুল সম্পর্কের জন্য আমাকে ক্রমাগত খুঁজে বেড়াতে হয়েছে।

এখানে একটা কথা আছে। শুনতে হয়তো একটা বাহানা বা ক্লিশের মত শোনাবে, তবু বলছি। আমার মনের চাহিদা মনে হয় অশেষ। চেয়েই চলেছি ক্রমান্বয়ে। যেহেতু একটা মানুষের মধ্যে সব কিছু পাই না তাই অনেকের ভেতর থেকেই টুকরো টুকরো সৌন্দর্য নিয়ে আমার সেই পূর্ণ প্রতিমাটা গড়ে তুলি। নিশ্চয়ই আমার এ যুক্তি তুমি আর হাজার মানুষের মধ্যে পাবে, এবং তোমার মনেও হতে পারে এটা নিছক অজুহাত বা অছিলা; কিন্তু এটা সত্যি। বেশী চাওয়ার দণ্ডই বুঝি এই অশান্তি। এই দুর্বার চাওয়া এবং চাওয়ার বহু দিন পর কমলাকে পেয়ে আমার সেই খুঁজে বেড়ানো মানুষটার কিছুটা পেয়েছি। একটা পরিণত, স্নিগ্ধ ভালবাসার মানুষও। বুদ্ধি, রসবোধ মনকে ভরিয়ে তোলার মত সংস্কৃতি—সবই ওর আছে। এর ওপরও যেটা ওর মধ্যে পাই আমি, তা হল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে পাওয়া নানান অভিজ্ঞতার নির্যাস। নিজের জীবনে অনেক কষ্ট, দুঃখ ও বেদনা পেয়েছে কমলা। সেসব দুঃখ ওকে জীবনের প্রতি অনেক ক্ষমা এবং স্নেহ দিয়েছে। যে ক্ষমা, স্নেহ

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৪ ॥

জোড়াসাঁকোর বাড়ির সম্মুখের অলিন্দে একটি আরাম কেদারায় বসে আছেন দেবেন্দ্র। সময় প্রায় মধ্যরাত্রি, সমস্ত গৃহটি অন্ধকার। বাতাসে ধারালো শীতের ভাব, কিন্তু দেবেন্দ্র শুধু পিরানের ওপর একটা মুগার চাদর জড়িয়ে আছেন, অন্তরের চাঞ্চল্যের জন্য তাঁর এখন শীত বোধ নেই।

দেবেন্দ্র এখন ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবা পুরুষ। সবল, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, আয়তচক্ষু। কিন্তু তাঁর মুখখানিতে বিষাদের ছায়া মাখা। মাথার ওপরে নক্ষত্র খচিত নীলাকাশ, তিনি মধ্যে মধ্যে সেদিকে চোখ তুলে দেখছেন। এই রূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রায়ই প্রগাঢ় প্রশান্তি বোধ করেন, কিন্তু আজ মন কিছুতেই যেন স্ববশে আসছে না।

একটু আগেই তিনি বেলগাছিয়ার তাঁর পিতার বিলাস পুরী থেকে চলে এসেছেন। এর ফলাফল কতদূর গড়াবে কে জানে। তাঁর পিতা সিংহ বিক্রম পুরুষ, তাঁর অনুগতরা কেউ তাঁর ইচ্ছা বিরুদ্ধ কর্ম করছে, এ তিনি কিছুতেই সহ্য করেন না। কিন্তু দেবেন্দ্র আর কোনোক্রমেই থাকতে পারছিলেন না সেখানে, তাঁর অসহ্য বোধ হচ্ছিল। অতগুলি মানুষ নিছক লঘু আমোদে মত্ত। নৃত্য, গীত আর অবিরাম সুরার স্রোতে কারুর ক্লান্তি নেই। সেখানে অবস্থানের-সময় একটি কথা বার বার দেবেন্দ্রর মস্তিষ্কে ঘুরছিল। কথাটি আছে কঠোপনিষদে। "প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্বোধের নিকট পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। ইহলোকই আছে, পরলোক নাই—যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে (অর্থাৎ মৃত্যুর বশে) আসে।" চেষ্টা করেও দেবেন্দ্র কিছুতেই কথাগুলি মন থেকে বিতাড়ন করতে পারছিলেন না, ক্রমে দামামা ধ্বনির মতন এর প্রতিটি শব্দ যেন আঘাত করছিল তাঁকে। তিনি প্রায় দৌড়ে চলে এলেন সেখান থেকে।

পিতা ক্রুদ্ধ হবেন। তবু আজ দেবেন্দ্রর জীবনে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। তিনি আজ সাবালক, তবু তাঁর পিতা তাঁকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে চালিত করতে চান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ইউনিয়ন ব্যাংকে বসে টাকাকড়ি গণনা করতে করতে তাঁর চিত্ত বিকল হয়ে যায়, তবু তাঁর পিতার [illegible]

পিতা তাঁর সুপদে ও ক্ষমতায় ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন এবং তাঁর প্রিয়তম পুত্র তাঁর উত্তরাধিকার থেকে এই অভিপ্রায় সিদ্ধির সহায়তা করবে। বস্তুতান্ত্রিক পিতা একেবারেই রাখেন না পুত্রের মনের খবর। প্রৌঢ় দ্বারকানাথ জানেন না তরুণ দেবেন্দ্রর মনে জেগেছে ঐহিক সম্পদের বদলে পারত্রিক জ্ঞানের জন্য আকুলতা। কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন যেমন জানতেন না তাঁর তরুণ পুত্র যুবরাজ শাক্য সিংহের বৈরাগ্য অনুভূতির কথা।

জীবনের উদ্দেশ্য কী?

এই প্রশ্ন দেবেন্দ্রর মনে এসেছিল এমনই এক মধ্য রাত্রে, গঙ্গার তীরে। এ জগতে সবচেয়ে যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর সেই ঠাকুরমা তখন মৃত্যু-পথযাত্রিনী। এই ঠাকুরমা দেবেন্দ্রকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, শুনিয়েছেন কত রূপকথা, কত পুরান কাহিনী। ঠাকুরমাকে আনা হয়েছে অন্তর্জলী যাত্রার জন্য, শুইয়ে রাখা হয়েছে কাঁচা ঘরে। অর্ধেক শরীর তীরের ওপরে, পা দু-খানি জলমগ্ন, একদল কীর্তন গায়ক সেই মুমূর্ষুর কানে হরিনাম শোনাচ্ছে।

সেখান থেকে একটু দূরে একটা চাঁচের ওপর বসেছিলেন দেবেন্দ্র। তখন বয়েস একুশ, কী এক কার্যোপলক্ষে দ্বারকানাথ সে সময় এলাহাবাদে, দেবেন্দ্র সর্বক্ষণ রয়েছেন পিতামহীর সঙ্গে। গঙ্গার স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি, বাতাসে ভেসে আসা কীর্তনের সুর, মাথার ওপর জ্যোৎস্নাধৌত অনন্ত আকাশ—এইসব মিলেমিশে এক বিচিত্র অনুভূতি হলো তাঁর।

তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কী?

তিনি এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীর সন্তান, তাঁর অঙ্গুলি হেলনে যে-কোনো বিলাস দ্রব্য মুহূর্তে চলে আসবে তাঁর কাছে, ভোগের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়ে যেতে পারেন। কিছুদিন সব কিছুই চোখে দেখেছেন। কিন্তু এই ভোগবিলাস ও মৃত্যু, এই কি জীবনের চরম পরিণতি? পশুর জীবনের সঙ্গে এ জীবনের পার্থক্য কী? এ জীবন আর কি কোনো বৃহত্তর মহত্তর আনন্দের স্বাদ পাবার যোগ্য নয়?

শোক ও সংশয় নিয়ে বসে থাকা সেই একাকী যুবকের মনে হঠাৎ যেন একটা দিব্য আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। আকাশের জ্যোৎস্নায় যেন ধুয়ে গেল তাঁর চিত্ত। জীবনের উদ্দেশ্য কী; সে উত্তর তিনি তখুনি পেলেন না। কিন্তু এই নিশ্চিত উপলব্ধি হলো যে, এই ভোগ মত্ততাই জীবনের সব নয়। ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, অপরের ওপর প্রভুত্ব করার দাপট, এসব অতি তুচ্ছ। সামান্য যে চাঁচের ওপর তিনি বসেছিলেন সেটাই যেন তাঁর যোগ্য স্থান, গালিচা দুলিচা সব হেয় বোধ হলো।

শেষ রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু ঘুম হলো না। সারা শরীরের প্রবাহিত আনন্দে তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে আবার তিনি পিতামহীকে দেখতে এলেন শ্মশানঘাটে। বৃদ্ধার আজ শেষ সময় উপস্থিত। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে গঙ্গাগর্ভে নামিয়ে চিৎকার করছে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম"। দেবেন্দ্র জলে নেমে পাশে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখে অশ্রু নেই। তখন দ্বারকানাথের জননী, পুণ্যশীলা অলকাদেবী প্রিয়তম নাতির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটি হাত নিজের বুকে রাখলেন, অন্য হাতের একটি আঙুল উঁচু করে ওপরের দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে "হরিবোল" বলে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। দেবেন্দ্রর মনে হলো যেন ঠাকুরমা ঈশ্বর ও পরকালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের পর কল্পতরু সাজলেন দেবেন্দ্র। যে যা চায়, সবই তিনিই বিলিয়ে দেবেন। সংক্ষিপ্ত বিলাসের আমলে যত সাজ-সজ্জা অলংকার তিনি প্রিয় বোধে সংগ্রহ করেছিলেন, সে সব কিছু থেকে [illegible]

বাচ্চাকে তার একান্ত প্রয়োজনীয় সহজ স্বচ্ছন্দ আরাম এনে দেবে।

আপনি হয়তো বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে চান কিন্তু শারীরিক কারণে তা' খাওয়ানো হয়তো সম্ভব হচ্ছে না।

উৎকণ্ঠার কোনও কারণই নেই। পূপ-সী ফীডারের ওপর ভরসা করুন, দেখবেন সেটি ঠিক আপনার মতই বাচ্চার পুরোপুরি যত্ন করবে। এর নিপ্‌লটি মায়ের বুকের মতই কোমল যা' বাচ্চা খুব সহজে চুষতে পারে। আর এই পূপ-সী ফীডিং বোতলটি এমন বিশেষ ডিজাইনে গড়া, যে বাচ্চা স্বচ্ছন্দে সমানভাবে দুধ টানতে পারে এবং যার দরুন বাচ্চাকে কোনও কষ্টই করতে হয়না। এই বোতলে দুধ খেতে খেতে বাচ্চা কখনো হাঁপিয়ে ওঠে না, যার ফলে তার মেজাজও বিগড়োয় না।

বাচ্চাকে পূপ-সী ফীডারের সাহায্যে দুধ খাওয়ান। দেখবেন বাচ্চা সত্যিই সন্তুষ্ট—কারণ তার পুরোপুরি যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

আর স্বাস্থ্যবান বাড়ন্ত বাচ্চা দেখে আপনার আনন্দও শত গুণ বেড়ে যাবে, কারণ আপনি ভরসা করেছিলেন পূপ-সী'র ওপর।

পূপ-সী® ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ফীডার ও নিপ্‌ল

INNOVATION/BLD/B/11-R

... এক একজন এক একাড দ্রব্য হাতে তুলে বলছে, নেবো? তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা হেলিয়ে বলছেন, নাও। এক একজনের দু-হাতেও জিনিস ধরে না। তাঁর একজন জাঠতুতো ভাই নিয়েছে তাঁর দামী পোষাক, দেয়াল থেকে খুলে নিচ্ছে মূল্যবান সব ছবি, তবু তার লোভ যায় না। শ্বেত মর্মরের টেবিল, অমূল্য কাষ্ঠের কোচ এগুলোর দিকে চেয়েও সে জিজ্ঞেস করে, নেবো? দেবেন্দ্র ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, নাও! সে তখন মুটে ডেকে সব নিয়ে গেল।

এখানে যে তাঁর আনন্দ হয়েছিল, তা বেশীদিন স্থায়ী হলো না। আবার এক দুঃখবোধ তাঁকে ঘিরে ধরলো। তিনি নৌত পেয়েছেন, কিন্তু শান্তি পান নি। কিসে সুখ নেই, তা বুঝেছেন, কিন্তু যাতে চিরসুখ ও চিরশান্তি তা অবলম্বন করতে পারছেন না। ঈশ্বর অনন্ত সুখের আকর, কিন্তু ঈশ্বর কে? তিনি কোথায়? কী তাঁর স্বরূপ?

প্রথম বয়েসে উপনয়নের পর তিনি মন দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজো দেখতেন। তখন বোধ হতো ঐ শিলাই ঈশ্বর। দুর্গাপূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো, সরস্বতী পূজায় তিনি আর পাঁচজনের মতই মেতে উঠতেন। প্রতিদিন কলেজে যাবার পথে ভক্তিভরে প্রণাম করতেন ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে, অপরাপর বালকদের মতন তিনিও পরীক্ষার আগে দুরুদুরু বক্ষে দেবীর কাছে পাশ করার বর প্রার্থনা করতেন। তখন জানতেন যে শালগ্রাম শিলার মতনই দশভুজা দুর্গা বা চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী—সবই ঈশ্বরের প্রকাশ।

এখন বুঝতে পারছেন, এই সব কাষ্ঠ লোষ্ট্র দিয়ে গড়া মূর্তি কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ কী? নব্য বঙ্গীয় যুবকরা এই কাষ্ঠ লোষ্ট্র পূজায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকছে, আবার অনেকে খৃস্টীয় ধর্ম বরণ করে নিচ্ছে। দেশের ভালো ভালো মেধা চলে যাচ্ছে নিজের ঈশ্বরকে খুঁজে বার করতে।

এই অনুসন্ধানের যাতনা যে কী তীব্র, তা আর অন্য কে বুঝবে? বিষয় কর্মে একেবারেই মন টেঁকে না। মানুষের সংসর্গও ভালো লাগে না। এক একদিন অফিস ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান, নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে চলে আসেন শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এ স্থান অতি নির্জন। কিড সাহেবের স্মৃতি-স্তম্ভের ওপর একাকী বসে থেকে তিনি মনের বিষাদ অপনয়নের চেষ্টা করেন। কিছুতে যায় না। রোদ্দুরের রং-ও তাঁর ঘোর কালো বলে বোধহয়।

তীব্র অনুসন্ধিৎসায় তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দর্শন গ্রন্থগুলি মন্থন করতে লাগলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে হিউম ও লকের দর্শনেরা তখন খুব প্রতিপত্তি। এঁরা জড়বাদ ও সংশয়বাদের প্রবক্তা। আমিত্বেই আমি-র শেষ। আগুনের যে পোড়াবার ক্ষমতা আছে, তা চিরসত্য কে বলেছে? আমি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করি, তার দাহিকা শক্তি আমি অনুভব করি, কিন্তু যেখানে আমি নেই, সেখানেও অগ্নির দাহিকা শক্তির কথা আমি স্বীকার করবো কী করে? মানুষের মন একটা শূন্য পাতা, সেখানে শুধু অভিজ্ঞতার আঁচড় পড়ে। সমস্ত জ্ঞানই আমাদের অভিজ্ঞতা, এ ছাড়া আর কোনো জ্ঞান নেই। এই জড়বাদ দেবেন্দ্রকে তৃপ্তি দেয় না।

প্রকৃতিবাদীরা আবার অন্য কথা বলে। প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব। এ তত্ত্বে শিউরে ওঠেন দেবেন্দ্র। প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব? এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। ......এই পিশাচী প্রকৃতির হাতে তো কারুর নিস্তার নেই। এর কাছে নতশিরে বসে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তাহলে আর আশা কৈ ভরসা কৈ?

সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেও তিনি তৃপ্ত হন না। মাঝে মাঝে একটু একটু যেন আলোক দেখতে পান, আবার হারিয়ে যায়। মনের বিষাদ আর ...

এলো সেই উন্মোচনের মুহূর্তটি।

একদিন তিনি উপর মহলের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন, এমন সময় দোতলার বারান্দায় দেখলেন কোনো একটি ছিন্ন পৃষ্ঠা উড়ছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি কাগজটি তুলে নিলেন। তাতে কিছু সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে। দেবেন্দ্র মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করেছেন, কিন্তু সেই শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারলেন না।

সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনি একজন গৃহ শিক্ষক রেখেছিলেন। সেই শ্যামাচরণ পণ্ডিতকে ডেকে তিনি বললেন, দেখুন তো, এই পৃষ্ঠাটি কোথা থেকেই বা এলো এবং এতে যা মুদ্রিত রয়েছে, তার অর্থই বা কী?

পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। এই শ্লোক তাঁর কাছেও অপরিচিত, সঠিক অর্থ তাঁর কাছেও পরিষ্কার হচ্ছে না।

দেবেন্দ্র তখন বেশী দেরি করতে পারছেন না। সকাল দশটা বেজে গেছে, এখন তাঁর ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে যাবার কথা। তিনি না গেলে ক্যাশ খোলা হবে না। পণ্ডিতকে বললেন, আপনি এর অর্থ করে রাখুন, আমি বৈকালে এসে দেখবোখন।

অফিসে গিয়েও তিনি সর্বক্ষণ ছটফট করতে লাগলেন। নিদারুণ ঔৎসুক্যে তাঁর মর্মপীড়া হতে লাগলো। কোথা থেকে এলো ঐ কাগজটা, কী ওতে লেখা আছে। দ্বিপ্রহরের পর আর থাকতে পারলেন না তিনি। অন্য একজনকে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত গৃহে ফিরে এলেন।

শ্যামাচরণ পণ্ডিতের মুখখানি তখনও মলিন।

[illegible] তিনি বললেন, আপনি বরং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকাইয়া লউন। আমার মনে হয় এসব ব্রহ্মসভার কথা!

ব্রহ্মসভার নাম শুনেই দেবেন্দ্রর বুক ধক করে উঠলো। সেই ব্রহ্মসভা এখানে আছে? কে চালায়? রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ? হ্যাঁ তাও তো বটে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁরই পিতার বেতনভুক। তৎক্ষণাৎ তিনি বিদ্যাবাগীশকে ডাকতে পাঠিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

রামমোহন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একেশ্বরবাদীদের উপাসনার জন্য। হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই এতে যোগ দিতে পারবে। বিদ্যাবাগীশ শুরু আগে থেকেই রামমোহনের সঙ্গে আছেন। তাঁর ইচ্ছে এই সভার পক্ষ থেকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচার করা হোক। রামমোহন রাজি হন নি। নতুন ধর্মের প্রয়োজন নেই সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই যারা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক, তাদের মিলনই চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে সব ধর্মের লোকেরাই আসতো। সন্ধ্যেবেলা ফিরিঙ্গি ও মুসলমান বালকেরা ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় স্তব গান করে যেত। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ নামে দুই গায়ক ধরতেন গান, তাদের সঙ্গে পাখোয়াজ সংগত করতেন গোলাম আব্বাস। বালক দেবেন্দ্র রামমোহনের পাশে বসে শুনতেন।

ব্রহ্মসভার জন্য আলাদা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন রামমোহন। কিন্তু বছর দু-এক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পর তিনি পাড়ি দিলেন ইংলণ্ড। আর ফিরলেন না। রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ [illegible] পৌত্তলিকতার বিরোধী, পিতার এই [illegible]কে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হলেন না। এই সভা বন্ধই হয়ে যেত, কিন্তু এগিয়ে এলেন দ্বারকানাথ। সারা দেশ রামমোহনের বিপক্ষে ব্রহ্মসভা স্থাপনের পর থেকেই হিন্দু ধর্ম গেল গেল রব উঠেছিল, গোঁড়ার দল পাল্টা সভা স্থাপন করেছিল। সুতরাং বিবাদ এড়াবার জন্য দ্বারকানাথ রামমোহনের মত পুরো মত মেলান নি। তবে বন্ধুর একটি বাসনা বা বাতিককে তিনি সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়ে তিনি বললেন যে, ব্রহ্মসভা যদি চলে তো চলুক, তিনি এর ব্যয়ভার বহন করবেন।

দেবেন্দ্রনাথের মনে পড়লো একটি দিনের কথা: বালক বয়েসে তিনি মাণিকতলায় রামমোহন রায়ের গৃহে প্রায়ই যেতেন। একবার তিনি গিয়েছিলেন রাজাকে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ করতে। দেবেন্দ্র যেই বললেন, 'রামমণি ঠাকুরের বাড়িতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ', অমনি চমকে উঠলেন রাজা। তিনি বললেন, 'আমাকে পুজোয় নিমন্ত্রণ?' তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করছেন, তবু লোকে তাঁকে পুজোয় ডাকে? রামমোহন তাঁর বন্ধুপুত্র দেবেন্দ্রকে সম্বোধন করতেন 'বেরাদর' বলে। তিনি বললেন, বেরাদর, আমাকে নয়, আমার পুত্র রাধাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করো গে।

"আমাকে পুজোয় নিমন্ত্রণ?" সেই বিস্মিত স্বর যেন দেবেন্দ্রর কানে আবার ভেসে উঠেছিল, অথচ অনেকদিন ভুলে ছিলেন বিস্মরণে। আর একটা কথাও মনে পড়লো তাঁর। বিলাত যাত্রার কিছুক্ষণ আগে রামমোহন এসেছিলেন দ্বারকানাথের কাছে বিদায় নিতে। খানিক কথাবার্তার পর তিনি বলেছিলেন, দেবেন্দ্র কোথায়? দেবেন্দ্রকে ডাকো। তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমি যাবো না।

কিশোর দেবেন্দ্র এলে রাজা সাগ্রহে তার হাত চেপে ধরেছিলেন। সেই ব্যবহারের কোনো গূঢ় অর্থ ছিল কি? রাজা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, বেরাদর দেবেন্দ্র, আমি তোমার [illegible] বৈষয়িক লোক। কিন্তু আমার [illegible] লও!

অথচ প্রমোদে প্রমাদে সে কথা ভুলে ছিলেন দেবেন্দ্র। প্রবাসে রাজার মৃত্যুর পর দু-একবার মাত্র ব্রহ্মসভায় গিয়েছিলেন তিনি। নিছক কৌতূহল বশে। সেখানে তখন দারুণ দৈন্য দশা। প্রবল জেদে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একাই সেখানকার দীপ জেলে রেখেছেন। আর একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সেখানে উপনিষদ পাঠ করেন। কোনো কোনো দিন তিনি না এলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিজেই একমাত্র উপাসক। নিজেই উপাচার্য এবং নিজেই শ্রোতা। বৃষ্টি বাদলার দিন কিছু লোক এমনিই হঠাৎ ঢুকে পড়ে সেখানে। তাদের কারুর হাতে বাজার ভর্তি ধামা, কারুর হাতে টিয়াপাখি। উৎসাহিত হয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ শুরু করে দেন, শ্রোতারা গোল গোল চক্ষু করে শোনে এবং বৃষ্টি থামা মাত্র হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

এসব দেখে কৌতুক বোধ করেছিলেন দেবেন্দ্র। আর যান নি। মধ্যে কয়েক বৎসর তিনি ব্রহ্মসভার কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে ছিলেন।

ডাক পেয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এসে দেবেন্দ্রর সামনে আসন গ্রহণ করলেন। যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনের পর দেবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, মহাশয়, এই ছিন্ন পৃষ্ঠাটি কোন গ্রন্থের? এই শ্লোকের অর্থ আপনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতে পারেন কি?

বিদ্যাবাগীশ পৃষ্ঠাটি পরীক্ষা করে বললেন, ইহা তো ইশোপনিষদের শ্লোক। ব্রহ্মসমাজ সংকলিত

গ্রন্থ হইতে ছিন্ন হইয়াছে। এ কাগজ এ স্থানে আসিল কী প্রকারে?

দেবেন্দ্র বললেন, তাহা জানি না। আপনি শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিন।

বিদ্যাবাগীশ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

তারপর প্রথমে বললেন, আক্ষরিক অর্থ। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন করো। তিনি যাহা দান করেছেন, তাহাই উপভোগ করো।

এবার শুরু করলেন ব্যাখ্যা। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ করো...তিনি কী দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ করো। আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ করো......

দেবেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঈশ্বরকে কোথায় পাবেন? এখন শুনলেন ঈশ্বরের দ্বারাই সমুদয় জগতকে আচ্ছাদন করো। তিনি আপনাকেই দান করেছেন—এর থেকে বেশী মানুষ আর কী চাইতে পারে?

এই উড়ন্ত কাগজ যেন এক দৈববাণী বহন করে আনলো তাঁর কাছে। অভিভূতের মতন উঠে গিয়ে তিনি বিদ্যাবাগীশকে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশও ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলেন একজন অন্তশিষ্যকে। দেবেন্দ্রর মধ্যে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। এক প্রচারকের সঙ্গে মিলন হলো এক মুমুক্ষুর।

তাঁর এই নবলব্ধ জ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের জন্য দেবেন্দ্র কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্বরঞ্জিনী সভা। দ্বিতীয় বৎসর সেই সভার নাম বদলে হলো তত্ত্ববোধিনী। বাড়ির একতলার একটি অন্ধকার ঘরে বসে এর অধিবেশন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিয়মিত এখানে এসে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম বিষয়ে নানান উপদেশ দেন। দেবেন্দ্র ভেবেছিলেন এ কাজ চলবে তাঁর পিতার অজ্ঞাতসারে। কিন্তু তীক্ষ্ণধী দ্বারকানাথের কাছে কিছুই গোপন থাকে না। একদিন তিনি বেদান্তবাগীশকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, একেই তো দেবেন্দ্রর বিষয় বুদ্ধি অল্প, তার ওপর তার মাথায় ব্রহ্ম ব্রহ্ম ঢুকিয়ে যে তার সর্বনাশ করছো!

দেবেন্দ্র পিতার এই ভ্রূকুটি মান্য করলেন না। তত্ত্ববোধিনী সভার তরফ থেকে প্রকাশিত হলো পত্রিকা, স্থাপিত হলো বিদ্যালয়। বাণিজ্য-রাজ দ্বারকানাথের পুত্র হয়ে তিনি মেতে রইলেন নিছক যত অ-বাণিজ্যিক কাজে। এমন কি একবার তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে কলকাতায় তাঁদের পরিবারের যতগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে তার সমস্ত কর্মচারীদের নামে তিনি আলাদা করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ততদিন পর্যন্ত ছিল অনেকটা গুপ্ত ধরনের ব্যাপার মাত্র এক-শত দেড়শত লোকের জ্ঞাত ছিল এ খবর। কর্মচারীরা ও সভার নামই শোনে নি, এমন কি নাম শুনেও অর্থ বুঝতে পারলো না। অবশ্য মালিক-পুত্রের নিমন্ত্রণই আদেশের সমান, এসে উপস্থিত হলো সকলেই। শঙ্খ, ঘণ্টা ও শিঙা বাজিয়ে রাত্রি আটটায় দরজা খোলা হলো সভাকক্ষের। লাল রঙের বনাত গায় দিয়ে দশ জন দশ জন করে দুই সারিতে বিশ জন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমস্বরে করলেন বেদপাঠ। তারপর দেবেন্দ্র পুতুল পূজার পরিবর্তে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের তত্ত্ব ব্যাখ্যান করলেন। এরপর আরও বক্তৃতা। একের পর এক। রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ একাই লাগিয়ে দিলেন দু ঘণ্টা। রাত দুটোর পর কর্মচারীরা বিমূঢ় বিহ্বল অবস্থায় বাড়ি ফিরলো এ সব কী কাণ্ড হচ্ছে ওখানে, কিছুই তাদের মাথায় ঢুকলো না। কিন্তু তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো দেবেন্দ্রর। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাকে প্রকাশ্যে, জনসমক্ষে নিয়ে এলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দেবেন্দ্র বুঝলেন, তত্ত্ববোধিনী দুই সভারই উদ্দেশ্য যখন এক, তখন একসঙ্গে মিলে যাওয়াই ভালো। তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা হতে লাগলো ব্রহ্মসভার উপাসনার সঙ্গে মিলিয়ে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন্দ্র একটু থমকে ছিলেন। রামমোহনের ব্রহ্মসভার সঙ্গে প্রকাশ্যে একাত্মতা স্থাপনের বহু রকম প্রতিকূলতা দেখা দেবার সম্ভাবনা। শুধু হিন্দু সমাজের কাছ থেকেই নয়, নিজেদের পরিবার থেকেও। স্বয়ং পিতা কী বলবেন ঠিক নেই। দ্বারকানাথ পুত্রকে মুখে রূঢ় বাক্য বলেন না, কিন্তু সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি অবিচল।

কিন্তু দেবেন্দ্র তখনও অস্থির হয়ে আছেন। তাঁর নির্মল চিত্তে কোনোরূপ ছলনার স্থান নেই। বহু-কালাবধি প্রচলিত ধর্মীয় আচার, সংস্কার ও পূজা পার্বণ সম্পর্কে তাঁর মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে। একথা সকলকে না জানানো পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই। যে সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, সেই সত্যের স্বাদ তিনি দিতে চান অন্যকে। এই সত্য সাধনা যেন পৃথক এক ধর্ম, এর প্রচার প্রয়োজন। এবং তারও আগে প্রয়োজন এক ধর্মীয় দল স্থাপনের। দেশের মানুষকে খৃস্টানী থেকে দূরে সরিয়ে আনার জন্য এই নব ধর্মের প্রচার ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এ ব্যাপারেই দ্বিধায় দুলছিলেন তিনি। বেল-গাছিয়া ভিলা থেকে অকস্মাৎ চলে এসে বারান্দায় একলা বসে থেকে তাঁর বারংবার মনে হতে লাগলো, বৃথা সময় চলে যাচ্ছে। তাঁর পিতার বাহ্য আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিরুদ্ধে তাঁর একটা প্রতিবাদ রাখা দরকার। জীবনের উদ্দেশ্য নয় পার্থিব জগতে সবার ঊর্ধ্বে ওঠা, জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা।

জ্যোৎস্নাময় আকাশের দিকে চেয়ে তিনি প্রেরণা চাইলেন, তাঁর মনে বল এলো, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটি শপথ নিয়ে নিলেন।

৭ই পৌষ দেবেন্দ্র তাঁর কুড়িজন বন্ধুর সঙ্গে এক নতুন ধর্মে দীক্ষা নিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের যে নিভৃত কুঠুরীতে বেদ পাঠ হতো, সেই কুঠুরী ঢেকে ফেলা হলো পর্দা দিয়ে, মধ্যে একটি বেদী, তার ওপরে বসলেন বৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সেদিন বৃহস্পতিবার, দুপুর তিনটের সময় দেবেন্দ্র অফিস ছেড়ে চলে এসেছেন। বিদ্যাবাগীশকে তিনি বললেন, হে আচার্য, বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্মব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি...... যাহাতে আমরা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয় এবং পাপ মোহে অন্ধ না হই, এরূপে উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।

বিদ্যাবাগীশের চক্ষে অশ্রু এসে গেল। বহুদিন পর তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

বয়েস অনুসারে প্রথমে শ্রীধর ভট্টাচার্য, পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য এগিয়ে গিয়ে বেদীর সামনে প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তৃতীয় ব্রাহ্ম হলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারপর তাঁর ভাই গিরীন্দ্র-নাথ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ও অন্যেরা। দীক্ষান্তে নবীন ব্রাহ্মরা প্রত্যেকে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। এক সামাজিক বিপ্লব ঘটতে চলেছে যে, সেই সচেতনতা থেকে তাঁদের শরীরে রোমাঞ্চ হতে লাগলো।

দেবেন্দ্র সকলকে বললেন, পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল। এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না।

এইভাবে রামমোহনের আদর্শ থেকে কিছু বিচ্যুত হয়ে বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্র সূচনা করলেন এক পৃথক ধর্মের। রামমোহন চেয়েছিলেন সর্বধর্মের মধ্য থেকে সংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদী মানুষগুলিকে এক জায়গায় এনে জড়ো করতে, সেই জন্যই তিনি পৃথক নাম দিয়ে কোনো ধর্ম প্রচার করতে চান নি। আর দেবেন্দ্র স্থাপন করলেন, শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্র সমাজের জন্য এক বিদ্রোহী ধর্মের। অবশ্য রামমোহনের মতটি ছিল একটি তত্ত্ব মাত্র, আর দেবেন্দ্রর অধ্যক্ষতায় নব-[illegible] ধর্মটি [illegible] পথ নিজ [illegible]। (ক্রমশ)

জন্মদাত্রী সমীর রক্ষিত

লম্বা ছ' মাস বাদে অজিতের বউ ফিরল বাপের বাড়ি থেকে। এ সময় মেয়েরা একটু আহ্লাদী আহ্লাদী হয়। স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশায় বেশ খোশমেজাজে বউয়ের সঙ্গে ঘন হয়েই বসেছিল অজিত। যশোর রোডের পাশে কুমুর বাবার মিষ্টির দোকান; সেখানে এসেই অজিত চোখ সরিয়ে নিল বাঁ পাশে। তার চোখে পড়ল সূর্যাস্ত। বহু দিন সূর্যাস্ত দেখেনি সে।

একটু বাদে রিকশা মোড় ঘোরে ঘণ্টি বাজিয়ে। দূরে সাতভাই কালীতলায় প্রকাণ্ড পাকুড়গাছ আকাশ কালো করে দাঁড়িয়ে; পাতলা আঁধারে হঠাৎ গাছটা চোখে পড়তেই অজিতের বুকটা ধক করে ওঠে। সে এতক্ষণ কুমুর কথা ভাবছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে গৌরীর দিকে তাকায়। পলকে চোখাচোখি হয়। অজিত তখন উবু হয়ে তিন মাসের ছেলের মুখটা দেখে। গৌরীর বুকের কাছে, কাঁথায় পুঁটলি পাকানো; নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। গাঢ় লালাভ মুখ আই আবছায়াতেও চোখে পড়ে। কুমুর ছেলেকেও কী এমনি দেখতে হয়েছিল?

গৌরী হেসে বলে—তোমার কী হল, ছেলের মুখ থেকে যে চোখ সরছে না?

আচমকা রিকশা লাফিয়ে ওঠে। দুটো রাস্তার কুকুর ঢাকায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতখিঁচনো আর্তনাদ।

রিকশাঅলা ফুঁসে উঠে গাল দেয়—শালা বেজন্মার বাচ্চা, যেখানে সেখানে—এতে কুকুরের কৌলীন্য বিন্দুমাত্র কমল কিনা বোঝা গেল না, শুধু তাদের কাতর ধ্বনি বাতাসে ভাসতে লাগল।

অজিত বলে—এত ঘুময় কেন।

চমকে-ওঠা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে গৌরী বলে—এই বয়েসে বাচ্চারা এমনি ঘুময়। নতুন বাপ হয়েছে অজিত, এ বিষয়ে তার জ্ঞানগম্যি কম। তার ধারণা শিশু মানেই কান্না।

বোকার মতো হেসে সে বলে—আসলে ব্যাটা খুব শান্ত হয়েছে, কী বলো?

—ওহ্ উনি এর মধ্যেই ছেলেকে চিনে গেলেন। কান্না তো শোনোনি, হাড়ে হাড়ে বুঝবে।

—কাঁদুক। আবার উবু হয় অজিত, বলে—তেজী বাপের ছেলে না কাঁদলে মান থাকে?

—আদিখ্যেতা করো না। গৌরী হেসে বলে—তখন থেকে ছেলে ছেলে করছ, একবার আমাদের দিকে একটু তাকাও।

ছ' মাসে গৌরী অনেক পালটেছে। একটু মা মা ভাব হয়েছে। কিন্তু শরীর আগের চেয়ে তাজা, রসস্থ মাংসটাংস লেগেছে গায়ে। মোটাসোটা, ভরভরাট। বুকের মধ্যে শরীর-ক্ষুধা টের পায় অজিত। সহসা গৌরীর গালটা টিপে দিয়ে বলে—দেখেছি, খুব জেল্লা দিচ্ছে।

ঠোঁটে সুখের হাসি। সেই সঙ্গে রাগী বেড়ালের মতো ফোঁস করে ওঠে গৌরী, বলে—অ্যাই, ওসব চলবে না! তুমি আমাকে আরো একমাস ছোঁবে না বলে দিচ্ছি। এ জন্যই আরো কিছুদিন থাকতে চেয়েছিলাম।

—ইস্ কী আবদার। অজিত আরেকবার হাত বাড়ায় গৌরীর কাঁধটা জড়িয়ে ধরবে বলে। কিন্তু তার হাতটা সহসা শূন্যে স্থির হয়ে যায়। বিবশ লাগে। বাঁয়ে কালীতলা। ডান দিকে মোড় নিচ্ছে রিকশা। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির প্রকাণ্ড খোদলে খাঁড়া হাতে উলঙ্গ কালীমূর্তি। গোটা তিনেক একশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। কালীমূর্তি দেখে চমকে ওঠে না অজিত, সে দেখে প্রণাম সেরে কুমু উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে।

কুমু এখানে কেন? অজিত শব্দ করে একথা উচ্চারণ করল না কারণ পাশেই গৌরী। তার মনটা একথা বলে উঠল মনের মধ্যে। নিঃশব্দে।

গৌরী শুধোয়—কী হল?

অজিত বলে—কিছু না। তারপর পেছনে ফেলে আসা কালীর উদ্দেশে হাত-জোড় করে প্রণাম করে। গৌরীও ছেলেকে কোলে নিয়েই হাত জোড়া করে, মাথা নোয়ায়।

এ-তল্লাটের কে না জানে সাতভাই কালীতলার কালী ভয়ানক জাগ্রত। গৌরী এখানকার মেয়ে নয় তবু সে-ও জানে।

কুমু কালীর থানে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় অপলকে রিকশা দেখে। ইছামতীর দমকা হাওয়ায় তার বুকের আঁচল খসে পড়ে।

বনগাঁকে দুভাগ করে দিয়ে ইছামতী যেখানে কোমর মুচড়ে বাঁক নিয়েছে সেখানেই অতিকায় পাকুড় গাছটা দাঁড়িয়ে আছে বহু কাল। কতকাল কেউ জানে না। কিন্তু মুখে মুখে এই গাছের বয়েস বেড়ে যায়। যেন-বা আদিমকালের গাছ। কত গালগপ্প, কিস্সা-কথা চাউর আছে এ গাছ নিয়ে। এ-তল্লাটে এক মায়ের পেটের সাতভাই ছিল; সাতটিই খুনে ডাকাত। পাকুড় গাছের গুঁড়িতে এক মস্ত খোদল। সেখানে কালী প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই স্বপ্নাদেশ পায় এক ভাই। কালী প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বপ্নাদেশ মতো পুজো-বলিরও ব্যবস্থা হয়। শোনা যায় গভীর রাতে ডাকাতিতে বেরুবার আগে রামদা সড়কি বল্লম সামনে রেখে প্রথমে কালী-পুজো হত। তারপর হত বলি। শোনা যায় নরবলিও হত। তারপর বলির রক্তে কপালে ফোঁটা দিয়ে সাতভাই বেরুত ডাকাতিতে। রাত্তির ঘন অন্ধকারে মশাল জ্বলে উঠত ভয়ংকর, আর গ্রাম্য নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ হত সাতভাইয়ের ভয়াল হুংকারে।

এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কুমু। এই সব শোনা কথা তার মনের মধ্যে থাকে যেমন থাকে দশজনের। সে শুধু বনগাঁ এলে বাড়ি ঢোকার আগে একবার প্রণাম করে আর চলে যাবার সময় একবার।

চার বছর এ-তল্লাট ছেড়েছে কুমু। গোড়াতে ভেবেছিল আর কোনদিন ফিরবে না। এখানকার মাটি আর মাড়াবে না কোনদিন। মনে আনবে না এখানকার কথা। কিন্তু তা কী হয়? না এসে পারেনি সে। অবশ্য আসে ন' মাসে ছ'মাসে একবার মাত্র। সন্ধ্যা হলে অন্ধকারে সে বাড়ি ঢোকে, আবার দিনের আলো ফোটবার আগেই সে বেরিয়ে যায়। শেষ রাতের প্রথম ট্রেন ধরে সে; কয়লা-ইঞ্জিনের রানাঘাট লোকাল। রানাঘাট লাইনে ঘর নিয়েছে কুমু চার বছর আগে।

বহু দিন বাদে আজ অজিতদাকে দেখল কুমু, বউ বাচ্চাকে এই প্রথম। অজিতদার বিয়ের খবর সে শুনেছিল বই কি। অজিতদা বিয়ে করবে না কুমু একথা ভুল করেও ভাবেনি কখনো। কিন্তু তবু তার বিয়ের খবরে বুকের মধ্যে কলজেটা লাফাই মেরেছিল সপাটে। সেদিন খুব জোর নিজেকে সামলে নিয়েছিল কুমু। নাহলে মন ছুটে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল একবার গিয়ে অজিতদার সামনে দাঁড়াবে। কিন্তু যাওয়া আর হয়নি, ঘেন্না হয়েছিল। বাঁ পায়ে মাটিতে একটা ছোট লাথি মেরে বলে-ছিল কুমু আপন মনে—দূর্ শালা।

যতক্ষণ অজিতদার রিকশা অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে মিলিয়ে না যায় ততক্ষণ স্থির চোখে দেখে কুমু। বউয়ের কাঁধে হাত, বউয়ের কোলে বাচ্চা ভরাট রিকশার ছবিটা আগুনের মতো তার দু চোখের মণি দুটো পোড়ায়। তারপর সে আগুনে ধিকিধিকি ভেতরে ঢুকে যায়। হঠাৎ ঘুরে আবার কালীর সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করে কুমু। কেন করে সে জানে না। যখন ওঠে তখন সে কালীর লম্বা লাল-জিভটা শুধু দেখে। লাল পিঁপড়ে পা বেয়ে উঠে কামড়াতে থাকে। শরীরে বিষ-জ্বালা। আর ঠিক কাকতালীয় ঘটনার মতো নিজের হাতে গলা টিপে মারা নিজের ছেলেটার কথা মনে পড়ে কুমুর। সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে না। যত করে ফেলা নিশ্বাসের মতো ইছামতী থেকে হাওয়া ঘুরে ওঠে। আচমকা এক ঝাঁক শেয়াল ডাকে ওপারেরও অন্ধকারে।

—মা!

—কিডারে! কুমু নাকি! হেঁসেলে উনানের পাশে বসে লম্ফ বাঁ হাতে তোলে

দেখুন...
সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই ।

নিয়মিত রানীপাল লাগান...আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল** ®
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের জন্য **রানীপাল** ® -এস

Shilpi SG-2A/78 Ben

চোখে কালি পড়েছে। এমনিই হটে অবশ্য প্রতিবারই।

—দিদি এসেছে। বলে জবা কানাই মদন, কুমুর ভাইবোন সব ছুটে আসে। ছ' ভাইবোনের মধ্যে কুমু মেজ। দিদি সুধির বিয়ে হয়েছে চাঁদপাড়ায়। তার বর ভ্যানগাড়ি চালায়।

ভাইবোনে ছেঁকে ধরে, কুমু বলে—মা কেমন আছে?

কুমুর মা মাথা কাত করে। তার মানে ভাল। কিন্তু তাকে দেখে তা বিশ্বাস হয় না। চোখ ঢুকেছে গর্তে কপালটা উঁচু হয়ে উঠেছে চুল পাতলা, শরীরের হাড় গোনা যায়।

—বাবার হাঁপের টান কমিছে?

—না—আ। কমে কোথায়।

ভাইবোনদের গায়ে মাথায় হাত বুলোয় কুমু; কুনু কুচকে শুধোয়—চুনী কই?

ভাইবোনরা সব মার দিকে চায়। ভাঙাচোরা মুখে কুমুর মা বলে—নিমুনিয়া। ঘরের ভিতরে।

কুমুর দুচোখে লণ্ঠন শিখা কেঁপে যায়। ঘরে ঢুকে কাঁথায় ঢাকা প্রায়-বেহুঁশ চুনীর গালে গাল ঠেকায় কুমু। কয়লার আঁচ যেন। জবাকে ডেকে বলে—জলপট্টি দে তো জবা। জবা ছুটে যায়।

কুমু মায়ের কাছে বসে। প্লাস্টিকের ঝুড়ি-ব্যাগ থেকে একটা শাড়ি বের করে মাকে দেয়। কমদামী তাঁতের শাড়ি। ভাইবোনের জন্য ফ্রক শার্ট, বাবার জন্য একটা লুঙ্গি, সব একে একে বের করে কুমু।

কুমুর মার মুখে কোন কথা নেই। তার চোখে পলকও পড়ে না। কিন্তু ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে জমা হয় চোখের কোলে। প্রতিবারই এমনি হয়।

জামা কাপড় সামনে নিয়ে তখন কুমু থ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। বেশ্যা মেয়ের শরীর-বেচা পয়সায় কেনা এই সব সামগ্রী নিয়ে মায়ের সামনে বসে থাকে কুমু নীরবে। তার বুকটা খানিকক্ষণ খাঁ খাঁ করে।

সামনে পুজো। তখন সে আর আসতে পারবে না। জবর খাটুনি যাবে তখন তার। ছ' মাসের জমানো টাকায় তাই সে যা পেয়েছে কিনে এনেছে। পনেরটা নগদ টাকাও সে গুঁজে দেয় মায়ের হাতে।

হঠাৎ দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে শব্দ করে কেঁদে ওঠে কুমুর মা।

কুমু বাইরে চলে আসে। অন্ধকারে কুয়োতলায় সে জল তুলে চোখ মুখ ধোয়। দু আঁচলা জল মুখে ছিটোতেই তার বড় স্নান করতে সাধ যায়। সে তক্ষুনি বালতি বালতি জল তুলে পাগলের মতো ঝপ ঝপ গায়ে ঢালতে থাকে।

চারিদিকে ঘন বাঁশবন, তেঁতুল গাব মাদার গাছ। ঝোপঝাড়। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে। হুতোম প্যাঁচা ডাকে, তক্ষক। পেছনেই ইছামতী। দু-একটা জল-ঢোঁড়া সাপ চলে যায় কিলবিলিয়ে। অদূরে সাতভাই কালীতলার মস্ত পাকুড় গাছে হা হা করে হাওয়া বয়।

জিরাত আলির পোড়ো বাড়ি সুনসান পড়ে থাকে। জানলা কপাট চুরি হয়ে গেছে। খড়ের চাল হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, মাথাভাঙা দেয়াল। কোন দিন তাও পড়ে যাবে। এদিকে কেউ আসে না। শুধু আসে অজিত আর কুমু। অজিত ভালবাসে কুমুকে কুমু অজিতকে। খাঁ খাঁ দুপুরে যখন খাই খাই করে গরম হাওয়া, ধুলো ওড়ে এলোমেলো, বুকের মধ্যে অস্থির রক্ত দাপিয়ে বেড়ায়—তখন ওরা আসে। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো।

তখন কুমুর তো সদ্য সতেরো। বাড়িতে একঝাড় ভাইবোন, চেয়ামেচি। দিদিরও বিয়ে হয়নি। দেখাদেখি চলছে। আর কুমুর শরীরে ইছামতী ফুঁসে উঠছে ভরা বর্ষার মতো।

ইস্কুল ছেড়েছে কবেই। শুধু টো টো কোম্পানী।

অজিতদা যেন একটা মস্ত চুম্বক। সে একটা লোহার টুকরো। অজিতদার চোখের সংকেতে বুকে ঢেউ উথলে ওঠে, দমচাপা চোখের ইশারায় দম বন্ধ হয়ে আসে, হাতের হ্যাঁচকা টানে ভয় লাগে। কিন্তু সে-ভয়ে দারুণ সুখ। চুরি করে লোভের আচার খাবার মতো। চেটেপুটে আঙুল সুরুক্ করে নিঃশেষে খাবার মতো।

পোড়ো নির্জন জঙ্গলে বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের ছায়ায় বসে অজিতদা যখন বলে কুমু তোকে আমি ভালবাসি যখন বুকের ঢেউয়ে ডাকাতে হাত রাখে, চটচটে দুই ঠোঁট সাপটে শুষে নেয়, তখন গলা শুকিয়ে যায়। শরীরের ভেতরে এমন আগুন জ্বলে ওঠে। একদিন দুদিন কতদিন পরে একদিন অজিতদা দেখায় শরীরের সেই চরম ভেলকি; শরীরের সব সুখ কেমন করে নিঙড়ে দিতে হয়। ভয় করে, আবার শরীরের প্রতি রোমকূপে রোমাঞ্চ জাগে। একদিন দুদিন কতদিন।

তখন কী কুমু জানত তার কপাল পুড়ছে। পায়ের তলার মাটি ধসছে। সাপের মতো ফণা তুলে বিপদ ওৎ পাতছে।

যখন জানল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কুমুর কটা চোখে অনেক দিন থেকে বিপদের মেঘ জমছিল। একদিন পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল মা—ওরে হারামজাদী, মুখপুড়ি কী সর্বনাশ করেছিস!

এ সব খুব পুরনো ছকে বাঁধা ব্যাপার সবাই জানে; কিন্তু আঠারো বছরের কুমু নতুন জানল। জানল সে গেরস্থর মেয়ে আর অজিতদা ভদ্দরলোকের ছেলে। জানল ভালবাসা জারেন্তাহ্ ফেনার বুদ্বুদ—এই আছে এই নেই।

বিপদের কথা বলতেই অজিতদা আকাশ থেকে পড়ে বলে—আমি কিছু জানি না। আমি কিছু করিনি। বিয়ের কথা বলতে জাত-সাপের ল্যাজে পা পড়ে, অজিতদা ফুঁসে ওঠে, বলে—তাই হয়? তা ছাড়া জীবনে আমি বিয়ে করবই না।

এ সব পুরানো ছকে বাঁধা কথা। সবাই জানে এ রকমই হয়। কিন্তু আঠারো বছরের কুমু জানল সেই প্রথম। শুনল সেই প্রথম। শুনে সে থমকে গেল, তার কানে তালা লেগে গেল, তারপর মাথার মধ্যে আগুন দপিয়ে উঠল; চোখে অন্ধকার

[illegible] অন্ধকারে। বলতে পারল না। সে তখন কাদামাটির মতো নিথর নিস্পন্দ। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল অজিত। মাটির মূর্তির মতো ঘরের কোণে অন্ধকারের গর্তে সেঁধিয়ে রইল কুমু। বাইরের আলো চোখে সয় না। মাথা টলে যায়।

পাড়াপড়শি যারা কোনদিন উঠোন মাড়ায় না, তারাও আসে। ঘরে ঢুকে নাক সেঁটকায়। বলে—কই কুমু মা কই?

—অসুখ।

—অসুখ? কী অসুখ? এই যে দেখি ভরভরন্ত মেয়ে, পেটটা অবিশ্যি উঁচা উঁচা ঠেকে। কী উদরী?

বাপ জানতে চায়—কে? মাটির মূর্তি কী কথা বলে? কেউ চিনল না, জানল না ডাকাতটি কে। এক গভীর রাতে বাপ তাকে অগত্যা নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে। বুড়ো মানুষ কিন্তু বড় দয়ালু। আবার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—বড় দেরি হয়ে গেছে। এখন আর উপায় নেই। যে আসছে তাকে আসতে দিতে হবে।

শোনে আর দাঁতে দাঁত চাপে কুমু তার দু চোখ পাথরের গুলির মতো। এ রকম দুঃখের-অনুখ মানুষ খুন করতে পারে। কুমু ভাবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে গাছ থেকে ঝুলবে, গলায় কলসী বেঁধে ইছামতীতে ঝাঁপ দেবে। ভাবেই, কিন্তু শেষমেষ টের পায় নিজেকে মারা সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু সে একটা কিছু করবে বলে ঠিকই করে ফেলে। দাঁতে দাঁত চাপে। ভাবে। ভাবে।

আচমকা এক ঝাঁক শেয়ালের রা। অন্ধকার দাওয়ায় একলা কুমু। তবু চমকে ওঠে না। অনেক দিন সে চমকে উঠতে ভুলে গেছে। যদিও রাত গভীর। নিশুতি নিস্তব্ধ। গুমোট, ভ্যাপসা গরম। ফেলে জোৎস্না। কুমুর চোখে ঘুম নেই।

কুয়োতলায় সরসর করে কী ছুটে যায়। ঝাসঝোপ কেঁপে ওঠে। সীমানার ধারে কাঠগোলাপের গাছে প্যাঁচা ডাকে। ঐ গাছের তলায় চার বছর আগে বিয়োনো তার ছেলে এখনো শুয়ে আছে। ষষ্ঠীর রাত। কুমুর বাপ ওখানে নিজে হাতে কোদালে গর্ত খুঁড়ে তাকে শুইয়ে রেখেছে। পোড়ো বাড়ির মতো বুকের খাঁচাটাতে হা হা করে হাওয়া ঘুরে যায় কুমুর।

শরীরময় লাল পিঁপড়ে ঘুরে বেড়ায়। কামড়ায়। রক্তে বিষ ঢুকে যায়। চোখের সামনে দিয়ে একটা রিকশা ঘুরে যায়। বউয়ের কাঁধে হাত, বউয়ের কোলে বাচ্চা; সহসা কুমুর দাঁতে দাঁত চেপে বসে। সে ভাবে। ভাবে। আর তখন ফেলে জ্যোৎস্নার চোখের সামনে সে নিজের দু হাতের দশটা আঙুল দেখে। ছুঁচলো রক্তমাখা লম্বা নখ। রক্ত-লাল।

প্রণাম সেরে উঠে বসে কুমু। তার খোলা চুল সাপের জোড়া জিভের মতো হাওয়ায় ওড়ে। পা থেকে মাথা অবধি উলঙ্গ কালী দেখে কুমু। বাঁ পাশে শুয়ে

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের রঙীন পূজাবার্ষিকী

আনন্দলোক

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী
বিমল মিত্র
বুদ্ধদেব গুহ
মতি নন্দী
শেখর বসু
কণা বসুমিশ্র

বিশেষ রচনা

সত্যজিৎ রায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সেবাব্রত গুপ্ত

অন্যান্য লেখা

'পয়লা নম্বরের দখলদার কে—
অমিতাভ না বিনোদ খান্না'

'ভিলেনরা এখনও ভীষণ
ভ্যাম্‌পরা কি ভগ্নহৃদয়'
বিন্দু, আমজাদ, প্রেম চোপরা
পদ্মা খান্না, অরুণা ইরাণী—
এঁরা কি বলেন ?
ওঁদের নিয়ে আলোচনা.

বোম্বাইয়ে উত্তমকুমার
কি দেখেছেন, কি জেনেছেন ?

তারকা দর্শন :
রেখা ও পরভীন বাবী
'সান্নিধ্যে সুচিত্রা'

আগামী দিনের স্টার :
স্মিতা, মাফিসা, টিনা মুনিম

চুম্বন, ইমেজ, আউটডোর :
আরতি ভট্টাচার্য, মিঠু মুখার্জী.
সুমিত্রা মুখার্জী, সন্ধ্যা রায়—
এসব অভিনেত্রীরা কি ভাবছেন ?

এবং একটি সুদীর্ঘ রচনা :
'এই আমি উমা থেকে উমাশশী'
(পুরান দিনের অভিনেত্রী উমাশশী, এক
অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে তাঁর জীবনের অনেক
অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন)

এছাড়া বম্বে-কলকাতার বহু নামী চিত্রতারকার
ব্লো-আপ ও রঙীন ছবি
এবং আরও অনেক কৌতূহল জাগানো রচনা

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.৯০

আপনার কপির জন্যে আজই এজেন্টকে বলে
রাখুন বা আমাদের লিখুন :

সার্কুলেশন ম্যানেজার,
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড,
কলকাতা-৭০০ ০০১

হাহাকার। সিঁদুরলেপা—কালী। কুমু চোখের জলে নিজের হাতের দলাটা আবছা দেখে। দলাটা নয়। আর তখন অন্ধকার গর্তের ভেতর থেকে কুণ্ডলী ছাড়িয়ে নিয়ে একটা শঙ্খচূড় সাপ কালীর দু পায়ের ফাঁক দিয়ে গাছ থেকে নেমে আসা ঝুড়ির দিকে চলে যায়। সকাল সাতটার রোদ তার পিঠ থেকে পিছলে যায়। কুমু ছিটকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ে। পাকা রাস্তা ধরে সে হনহনিয়ে এগোয়। যে রাস্তায় কাল সন্ধ্যায় গেছে অজিতদার রিকশা। বউয়ের কাঁধে হাত, বউয়ের কোলে বাচ্চা। আশ্বিনের রোদ। গনগনে। কুকুরের পাল উদোম রাস্তায় জাপটাজাপটি করে। কোনো দিকে চেয়ে দেখে না কুমু। কিন্তু আর সবাই কী তাকে দেখছে? দোকানী? পথের ধারকে যাওয়া মানুষ? ফিসফাস করছে কী? কানাকানি?

কে জানে। হয়তো করছে হয়তো করছে না। মানুষের বড় ভুলো মন। মানুষ সব ভুলে যায়। আর সে নিজে কী আর আগের কুমু আছে, দেখলেই চিনবে?

যদি চেনেই চিনুক। ফিসফিস করে তো করুক। পুরুষ মানুষের চকচকে চোখ আর ধারালো দাঁত, লোমশ শরীরের ছিনিমিনি খেলা কী সে কম দেখল? এখন কী আর এ সব গায়ে মাখলে চলে? খারাপ লাগলে চলে? অথচ লাগত। ছেলে বিয়োনোর পরে রাস্তাঘাটে বেরুতে পারত না কুমু। ফিসফাস হত। হাসাহাসি। কানে বিঁধত। চামড়া ফুঁড়ে যেত। থু থু উঠত মুখে যখন কেউ কেউ গায়ে পড়ে বলত—বাঁশবনে যাবি? টাকা দেব।

অথচ ঠিক থাকে না। শরীর যায় শুকিয়ে, চোখের তলায় কালি গাঢ় হয়। বাড়িতে বাপ-মা কান্নাকাটি করে। এরকম অবস্থায় সব সময় একজন ঠিক এসে যায়, যে বাঁচায়। তাকেও একদিন ধলামাসী বাঁচিয়ে দিল। গোপনে বলল—তোর কী ভাবনা কুমু? আমার সাথে চল। নিজে উপায় করবি, তোরটা কে খায়?

এখন আর খুব জোরে হাঁটে না কুমু; যেন সে বহুদিন বাদে বিদেশ থেকে এলো, ধীরে সুস্থে এগোয় সে দেখতে দেখতে। কত কী পালটে গেছে। ঝোপ-ঝাড় বেড়েছে। ঘরবাড়ি যেন ছোট হয়ে গেছে।

সে হাতে ঝুমঝুমি বাজায় খেলাচ্ছলে। চুনীর জন্য আনা ঝুমঝুমিটা সে নিয়ে এসেছে। ওকে আরেকটা কিনে দিলেই হবে। কিন্তু অজিতদার বাচ্চাকে দেখতে যাচ্ছে সে, খালি হাতে কী যাওয়া যায়?

আমার বড় ভয় করছে বাপু, ডাক্তারবাবুকে একবার সঙ্গে করে নিয়েই এসো। ঘরের ভেতর থেকে গৌরী হেঁকে বলে। তাকে দেখা যায় না।

—ঠিক আছে না হয় আনব, অত ভাবছ কেন? অজিতের গলাটা উঁচু থেকে সহসা খাদে নেমে যায়। কুমু দেখে অজিতদার মুখটা নিমেষে ছাই হয়ে গেল। প্যাডেলে পা থমকে গেছে, স্থির-দৃষ্টি কুমুর দিকে।

কুমু হাসিমুখে এগিয়ে যায়। খুশি উপচে পড়ে তার মুখে। আহা, কতকাল বাদে তার ভালবাসার মানুষের সঙ্গে দেখা। মুখোমুখি। বলে—কেমন আছ অজিতদা? কুমুর গলায় কোন আড়ষ্টতা নেই।

চোয়ালের হাড় পেশী নাড়িয়ে দেয়—ভয়ে না ঘেন্নায়? চাপা ফ্যাসফ্যাসে গলায় অজিত বলে—তুই বাড়ি ঢুকবি না কুমু, চলে যা।

দমকা হাসি হাসতে পারত কুমু, হাসে না। মিষ্টিমুখে উঁচু গলায় বলে—কেন গো অজিতদা, ভয় পাচ্ছ নাকি? তোমার বউকে দেখিনি বাচ্চাকে দেখিনি দেখব না একটু? আহা বউদি বলে কথা!

—ছেনালি করিস না রেন্ডীমাগী। এ কথা অজিতের জিভের ডগায় এসেও শুকিয়ে যায়। সে চওড়া হয়ে গেট আটকে বলে—বাজে বকিস না কুমু, তোকে কিছুতেই আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না।

—ওরে আমার পিরীতের ঠাকুর! কী আবদার! কুমু খাঁ করে হাত বাড়িয়ে অজিতের থুতনি নেড়ে দেয়, তার বুক-খসা আঁচল সাপের মতো পিছলে পড়ে। অজিতের ডানায় নিজের ভারী বুকটা প্রায় ঘষটে দিয়ে কুমু সবলে ঢুকে পড়ে।

হঠাৎ জানলায় মুখ বাড়িয়ে গৌরী বলে—কী গো তোমার আক্কেল, এখনো যাওনি?

—এই যাচ্ছি। বলে নিরুপায় অজিত চোঁ করে সাইকেলে পালিয়ে যায়।

—কী গো বউদি, দ্যাখ কে এসেছে? চেঁচিয়ে ঘাসেভরা উঠোন পেরোয় কুমু দ্রুত।

—কে গো? গৌরী ঘর থেকেই সাড়া দেয়।

খচ্ করে ভাঙা বোতলের কাচ ঢুকে যায় কুমুর গোড়ালিতে ইঞ্চিখানেক। তার হাওয়াই চপ্পলের গোড়ালি বহুদিন ক্ষয়ে গেছে। আঁক্ করে টেনে তোলে নিজের হাতেই, ছুঁড়ে ফেলে। পায়ের রক্ত তার হাতের আঙুলে—তোমার ননদ গো বউদি। ঘোষপাড়ার কুমু। কুমু চটি খুলে ঘরে ঢোকে। মেঝেতে রক্তের ছোপ লাগে।

অবাক চোখে চেয়ে দেখে গৌরী, বুকে তার বাচ্চা। আঁচলে ঢাকা। স্তনে মুখ। ছেলেটির মৃদু কঁকানির শব্দ। হেসে গৌরী বলে—তোমায় আগে কোনদিন দেখিনি তো। বসো।

কুমু মজা করে হেসে বলে—কী করে দেখবে বলো, তোমার নন্দাই বড় সেয়ানা মানুষ ছাড়তে চায় না। কালীর থানে পাথরে পাথরে গোলা সিঁদুর, সেখান থেকে সিঁদুর তুলে সিঁথিতে লাগিয়েছে কুমু।

গৌরী সে সিঁদুর দেখে বলে—তোমার শ্বশুরবাড়ি বুঝি অনেক দূর?

—নাগো। এই তো রানাঘাটে। কিন্তু হলে হবে কী তোমার নন্দাইয়ের কাছিমের মুখ; সেই যে বিয়ের রাতে কামড়ে ধরেছে আর ছাড়ার নাম নেই। বলে খুব মজা পায় কুমু, গুবগুব করে হাসে।

গৌরীর বুকের বাচ্চা চমকে ওঠে, কঁকিয়ে ওঠে; গৌরী শরীর দোলায়; হেসে বলে—বেশ তো, দারুণ ভালবাসে বলছ।

কথা শুনে গৌরীর কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে; তবু শুনতে মন্দও লাগে না। সে বলে—বাবা! ওরই নাম তো ভালবাসা। তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায় বাপু, তুমি খুব স্বামীসোহাগী।

ভীষণ জোরে হাসতে গিয়ে নিমেষেই থমকে যায় কুমু। মুহূর্তে তার শরীর থেকে... উন্মত্ত হাভাতে শরীরগুলো, তাদের হা-হা নিঃশ্বাসের শব্দগুলো স্পষ্ট হয়েই মিলিয়ে যায়। মুখ ভার করে সে টেবিলের ওপর অজিতদা আর বউয়ের জোড়া ছবি দেখে আনমনে। অজিতদার বাঁপাশে বুকের কাছে বউ। দুজনের মুখেই চাপা হাসি। যেন ভেতরের খুশীর ওটুকু ছোট্ট আত্মসমার। দুজনে মিলে খুব মাখোমাখো ভঙ্গি।

কুমু অজিতদাকে প্রায়ই দুজনের একসঙ্গে একটা ছবি তোলার কথা বলত। অজিতদা বলত—বনগাঁ ছোট জায়গা, ছবি তুলতে গেলে ধরা পড়ে যাব।

একদিন অজিতদা তাকে কলকাতায় গঙ্গার পাড়ে নিয়ে যায়। সেদিন কিন্তু চেপে ধরে কুমু। তারা শেয়ালদার কাছে এক দোকানে ঢোকে। ছবি তোলা হয়। অনেকটা এরকমের ভঙ্গিতে। অ্যাডভান্স নিয়েছিল দোকানী, তিন দিন বাদে দেবে কথা ছিল। সে ছবি আর পায়নি কুমু। তখন তার পেটে বাচ্চা। সে ছবিটা এখনো কী সেই দোকানেই পড়ে আছে ভৌলভারী নেবার অপেক্ষায়?

সহসা মৃদু মলিন গলায় কুমু শুধোয়—তোমাকেও অজিতদা খুব ভালবাসে না বউদি?

ছেলেকে বুকে চেপে ধরে ঠোঁট টিপে হাসে গৌরী, বলে—তোমার কী মনে হয়

খুব আস্তে কুমু বলে—বাসে—খুব।

গৌরী শব্দ করে হেসে বলে—তবে তাই।

—অজিতদারও খুব খাই আছে। কুমু বলে। গৌরীর ভুরু কুঁচকে যায়। ক... চোখে কুমুকে দেখে। কুমুর স্থির শীতল দৃষ্টি দেখে কেমন অস্বস্তি হয় তার বলে—কী করে জানলে?

কুমুর মুখের ভেতরে জিভটা ছটফট করে ওঠে, বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা পড়ে। এক্ষুনি সব ফাঁস করে দিতে পারে কুমু। কুমু নিথর চোখে তাকায়। ছেলেটি কঁকিয়ে ওঠে এ সময়। কুমু বলে—মনে হয়।

গৌরী হাঁফ ছেড়ে বলে—তোমার বাচ্চা ক'টি?

এই জিজ্ঞাসায় বোঝাই যায় কোন ইঙ্গিত নেই, তবু কুমু কেন যে চমকে ওঠে। তার বুকটা বড় শূন্য লাগে। হুহু শূন্য। বলে—একটাই।

—ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে। কুমু এসময় তৃষ্ণার্ত চোখে গৌরীর বুকে জড়ানো ছেলেকে দেখে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলে—সে আবার বড় বাপভক্ত। সঙ্গে আসে না, এদিকে আমার যে কী রকম মন পোড়ে—

—আহা! কত বয়েস হল?

—চার বছরের। মনে মনে হিসেব করেই বলে কুমু। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদে... বাড়ির সীমানায় দাঁড়ানো কাঠগোপাল গাছের তলাটা চোখে ভেসে ওঠে তার। ঘ... আগাছা ঝোপে ছেয়ে গেছে।

ছেলেটা আবার ক্ষীণ গলায় গুঙিয়ে ওঠে। কুমু বলে—তোমারও ছেলে ক' মাস হল?

গৌরী বলে—তিন মাস।

কুমু ঝুমঝুমিটা এগিয়ে ধরে বলে—তোমার ছেলের মুখটা দেখাও বউদি একবার; এত কষ্ট করে এলাম।

গৌরী আঁচল সরায়। স্তনের বোঁটা থেকে মুখ ফসকে যেতেই ভীষণ কেঁ... ওঠে ছেলেটা।

কুমু দেখে তার কান্নাবিকৃত মুখ। সব শিশুই কী এরকম দেখতে হয়? কুমু... মনে পড়ে টর্চের আলোয় রক্তাক্ত তার ছেলের মুখটা। তখনো চোখ ফোটেনি... দু হাতের মুঠি বন্ধ, এমনি চিল-চিৎকার মুখে। এতদিন বাদে ছুঁচের মতো সেই ছবি বুকে বিঁধে যায়।

—কী যে হয়েছে ছেলেটার। গৌরীর শঙ্কাভরা মুখ। ছেলের মুখে সে... স্তন গুঁজে দেয়। কিন্তু ছেলে তা গ্রহণ করে না। চেঁচায়। বিপন্নমুখে গৌ... বলে—ভোর থেকে এই করছে। খানিক চুপ থাকছে আরপরই ভীষণ কান্না। পেট... কামড়াচ্ছে নাকি—

গৌরী খাট থেকে নেমে হাঁটে আর দোলা দেয়, মুখ নামিয়ে চুম্বন করে, আদু... গলায় বলে—কাঁদে না বাবা লক্ষ্মী। এই তো বাবা গেছে ওষুধ আনতে। এক... ধৈর্য ধরো, এলো বলে—

কুমু আনমনা। আত্মবিস্মৃত। চোখে তার বিষাদের ঘন ছায়া। ছেলের ... ছুটে গেছে অজিতদা। আহা! হাজার হলেও নিজের রক্তের সন্তান তো! ... ছেলে বড় হবে, তাকে বাবা বলে ডাকবে। টলোমলো পায়ে হেঁটে গি... বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কত সুখ। আর এই তার মা, যে ছেলেকে পেটে ধরেছে... কী ভয় মমতা তার চোখে! আহা তাকে কী কম কষ্ট করতে হয়েছে! শরীরে... ছাব্বিশ নাড়ীর পাকে জড়িয়ে ধরে, তিল তিল করে তাকে বড় করে, কত ... থেকে খুইয়ে তবে না এই ছেলে এসেছে? তার ছেলেটাও কী এমনিভাবে আসেনি... কুমু ভাবে। আর সহসাই সে হাতের ঝুমঝুমিটা পাগলের মতো বাজাতে থা... ছেলেটির সামনে। ঝুমঝুমিতে রক্তের দাগ। কুমুর বুকের ভেতরে এখন আ... একটা ট্রেন ছুটতে শুরু করে দেয়। ভীষণ দ্রুত, ভীষণ সশব্দ। রানাঘাট লাই... কালার ইঞ্জিন যেন বুক চিরে হুইসল মারে—কু-উ-উ—ছেলেটি আরো চেঁচি... ওঠে। গৌরীর কান্না কান্না মুখ—কী হবে বলতো ঠাকুরঝি!

গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয় কুমু। ...

—খাওয়াব বলছ? গৌরীর অসহায় মুখ।

ফুক-জ্বালা সাপিনের মতো সজল ফিসফিস করে কুমু বলে—তুমি বাও বটীর দুধটুকু গরম করে নিয়ে এসো। আমি ধরছি—বলে লম্বা হাতিসার দুটো শীর্ণ হাত সামনে এগিয়ে ধরে কুমু।

গৌরীর তবু কিসের দ্বিধা? সে বলে—দুধ খেলে চুপ করে যাবে, না?

কুমু যেন চাপা ধমক দিয়ে ওঠে—যাবে। তুমি যাও—

ছেলেকে কুমুর প্রসারিত দু হাতে তুলে দেয় গৌরী। তারপর চৌকাঠ থেকে দুধ নিয়ে উঠোন পেরিয়ে ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে

কোথায় যেন একটা তক্ষক ডেকে ওঠে। আর কুমুর ভেতরে তীর এঞ্জিনটা ছুটে যায়—কু-উ-উ।

সহসা বাঁ হাতের হ্যাচকা টানে ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলে কুমু, তারপর ব্রেসিয়ার। ব্রেসিয়ার খুলে পড়তেই তার দুটি স্তন বেরিয়ে পড়ে। ত্রস্ত ব্যগ্র কাঁপা হাতে সে তার বাঁ স্তন ছেলেটির মুখে চেপে ধরে ফিসফিস করে বলে—খা খারে ছেলে—

একটু যেন চুকচুক করে স্তনের বৃন্ত চুষতে শুরু করে ছেলেটি। আহ্—কুমুর সমস্ত শরীর যেন শিউরে ওঠে। পা থেকে মাথা অবধি শরীরের সব রোমকূপ যেন খাড়া হয়ে ওঠে।

রান্নাঘর থেকে খুশী গলায় গৌরী যেন কী বলে ওঠে। কিন্তু তার কিছু শুনতে পায় না। শরীরের ভীষণ সুখে কুমু তখন পাগল হয়ে যায়। তার স্তনে চার বছর আগে যে দুধ জমেছিল তা কী এখনো তার বুকে জমাট বেঁধে আছে? ভাবে কুমু। ভাবে আর তার দুটি বিস্ফারিত চোখে পড়ে মেঝের রক্তের ছাপ। তারই পায়ের রক্তে ভেজা ছাপ শুকিয়ে গেছে। ক্রমে এই শুকনো ছাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে কুমুর চোখে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় রক্তের ঢলের মধ্যে শুয়ে আছে সে। পাশে টেমি জ্বলছে। লাল শিখা দাউ দাউ জ্বলছে। কালো ধোঁয়া উগরে দিচ্ছে। মা তাকে দু হাতে চেপে ধরে আছে। বাইরে অঝোর বৃষ্টি। যন্ত্রণায় মুচড়ে যাওয়া তার শরীরটা সহসা এক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বেঁকে উঠেই অকস্মাৎ ভীষণ হালকা হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চিল-চিৎকার। ভয়ে কী আতঙ্কে, জেনে কী অজ্ঞানে সে জানে না, কুমু ঝটকা মেরে উঠে বসে; দাঁতে দাঁত চেপে যায় তার। সে সঠিক কিছুই বোঝে না, শুধু টের পায় তার ডান হাতের পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে যাচ্ছে, পঞ্জাটা এগুতে এগুতে ছালছাড়ানো মুরগীর বাচ্চার মতো রক্তাক্ত এক মাংসপিণ্ডের গলায় গিয়ে সাঁড়াশির মতো আটকে গেল। চিল-চিৎকার স্তব্ধ। চিরকালের মতো। মা তাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—কী করলি কুমু? নিজের ছেলেকে নিজের হাতে গলা টিপে মারার পরে একনাগাড়ে দুদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কুমু। এ সময় ছেলেটা স্তন থেকে মুখ ছাড়িয়ে ফের ভীষণ চীৎকার করে ওঠে। হঠাৎ কুমুর ব্রহ্মতালু ভেদ করে ইঞ্জিন ছুটে যায়—কু-উ-উ। পিচকারির মতো রক্ত ছুটে যায় কলজের এ খোপ থেকে ও খোপে।

সঙ্গে সঙ্গে কুমু ছেলেটির মুখ সবলে চেপে ধরে ফের স্তনে; তার চীৎকারের শব্দ চাপা পড়ে যায় দুরন্ত চাপে। কুমুর হাতের জোর বাড়ে ক্রমে—আরো—আরো—আরো জোরে চেপে ধরে কুমু তার মুখ স্তনের মধ্যে। ঠেলে ঠেলে নিজের বুকের পাঁজর ভেঙেচুরে ছেলেটিকে কুমুর শূন্য বুকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। প্রবলতর অন্তিম জোরে চেপে ধরে সে পাগলের মতো বিড়বিড় করতে থাকে—খা খা খুব খা, আমার সবটা খেয়ে ফেলরে ছেলে—

কয়েকটি চঞ্চল মুহূর্ত; ছেলেটির দুটি পা মাথা ভীষণ ছটফট করতে করতে এক সময় স্থির নিশ্চল হয়ে যায়। ছেলেটি দু হাতে কুমুর স্তন খিমচে ধরেছিল, এতক্ষণে সে দুটি হাতের মুঠিও অসাড়, আলগা হয়ে যায়। কুমু তবু বলে—খা খা খারে ছেলে—

গৌরীর মড়াকান্নায় লোকজন ছুটে আসে। ততক্ষণে অজিতও এসে পড়ে ওষুধ হাতে। সে চৌকাঠে দাঁড়ায়। বিমূঢ় বজ্রাহত। গৌরীর উথালপাথাল কান্না। মেঝের ওপরে তার ছেলে—তার শরীর নিস্পন্দ বিস্ফারিত স্থির দু চোখ, নিথর হা-মুখ; প্রাণহীন। অজিত উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। এক পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কুমু। সহসা গৌরীর কাছে গিয়ে দু হাতে তাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে অজিত চেঁচিয়ে শুধায়—এ সর্বনাশ কী করে হল?

—জানি না। বলে কান্নায় ফের ভেঙে পড়ে গৌরী, মৃত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে. একবার শুধু তার একটি হাত কুমুর দিকে বাড়িয়ে দেয়।

অজিত পাগলের মতো কুমুর মুখের দিকে তাকায়। সে মুখ স্পন্দনহীন। তার চোখের দৃষ্টি ভীষণ স্থির। তার বুকের ছেঁড়া ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার ঝুলছে, আঁচল খসে পড়েছে, খোলা চুল জমাট অন্ধকারের মতো। তার সারা শরীর সাড়হীন। সহসা বুকভাঙা দীর্ঘ একটা আর্তনাদের শব্দে সকলে ভয়ানক চমকে ওঠে। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে অজিত কুমুকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—রাক্ষসী, তুই?

সহসা এই দুরন্ত চীৎকারে কী যেন ঘটে যায়। কুমু যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে সহসা, চারিদিকে তাকায়। যেন সে সম্বিৎ ফিরে পায় এতক্ষণে, যেন টের পায় কী ঘটে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা শেকড় ওপড়ানো গাছের মতো সে অকস্মাৎ উপুড় হয়ে পড়ে, আঁকশির মতো দু হাতে ক্রন্দনরত গৌরীকে বুকের মধ্যে ভয়ানক আঁকড়ে ধরে সে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার সেই মর্মভেদী শোকার্ত কান্নায় সকলের চোখ ছলছল করে ওঠে। কুমুর চোখের অবিরল জল দেখতে দেখতে তার করুণ বিলাপ শুনতে শুনতে এক সময় গৌরীও মূক হয়ে যায়।

ছবি অনুপ রায়

...কুণ্ঠিত, সংশয়।
আর মানুষের স্পর্শ মানেই তো বন্য-প্রাণীর অবলুপ্তি।

প্রায় নয় কিলোমিটারের মত দূরত্ব। অবশেষে সেই জংগলা পথ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল। এর পর বালির পাড় বেয়ে পায়ে হেঁটে মিনিট পাঁচেক এগিয়ে যেতেই ইয়েল জলপ্রপাত।

আমরা সরাসরি গিয়ে দাঁড়ালাম রিভারবেডের ওপর। বেড মানে ধূসর-কালো গ্র্যানাইট পাথরের ভূমি।

সিকি মাইল দূরে বাঁ পাশ থেকে এসে হাজির হয়েছে একটি শাখা নদী। নাম কিয়রকর। কিয়রকর এসে মিশেছে কাঁপলির সঙ্গে। তারপর বন্ধুর গ্র্যানাইট পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে কাকচক্ষু কাঁপলির জল সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রায় ষাট ফুট নিচে গিরি-গহ্বরের মধ্যে। এই হল ইয়েল জলপ্রপাত।

রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাতের সুখ্যাতি করেন অনেকে। ইয়েল তুলনায় তার চেয়ে বড়। ইয়েলের জলের পরিমাণ আরও বেশি। আরও রোমাঞ্চকর। জলের তোড়ে কঠিন পাথর কেটে তৈরি হয়েছে গহ্বর। আশপাশে কুয়োর মত গর্তও চোখে পড়ল অনেক। কী মসৃণ, কী নিখুঁত বৃত্তাকার। কোন কোন কুয়ো ত্রিশ ফুটের মত গভীর। প্রকৃতি যে কত বড় দক্ষ কারিগর এই কুয়োগুলিই তার প্রমাণ।

সুকান্তবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম কে কাটলো এই কুয়ো?

কেন? কাঁপলি। আমার কথায় হেসে জবাব দিলেন সুকান্তবাবু। এক-একটা কঠিন পাথরের চাঁই রিভারবেডের ওপর আটকে যায়। তার ওপর দিয়ে বয়ে চলে প্রচণ্ড জলধারা। তার তোড়ে সেই পাথর রিভারবেডের কঠিন স্তরের ওপর ঘুরতে থাকে। চলতে থাকে ঘর্ষণ। আর এইভাবে চলতে চলতেই এক সময় তৈরি হয় এমনি এক-একটি কুয়ো। এসব হাজার বছরের কীর্তি।

প্রবাদ, এ অঞ্চলটি এক সময়ে ছিল জয়ন্তিয়া রাজার খাসমহল। তখন অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্যে এই জলপ্রপাতের ধারে নিয়ে আসা হতো। তার পর ঘটা করে প্রচুর দর্শকের সামনে তাকে নিক্ষেপ করা হত এই জলপ্রপাতে। জলের প্রচণ্ড তোড়ে সে যে কোথায় ভেসে যেতো, কেউ তার হদিশই পেত না।

প্রবাদ, স্থানীয় এক ট্রাইব বহুদিন আগে এই জলপ্রপাতটি আবিষ্কার করে। তার ছিল এক সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি এই জলপ্রপাতে পড়ে মারা যায়। মেয়েটির নাম ছিল ইয়েল। মেয়ের স্মৃতি স্মরণ করে সেই বাবাই এর নাম রেখেছিল ইয়েল জলপ্রপাত।

অপূর্ব। ইয়েলের বুকে সূর্যের আলো প্রতিমুহূর্তে যে রামধনু রচনা করছিল কোন দিন সে দৃশ্য কি ভুলতে পারবো?

মশাই, আর নয়। এবার ফিরতে হবে। পেছন থেকে সুজিতবাবুর হাঁক।

ঠিক কথা। ফিরতেই তো হবে। আজ সারাদিনই তো পথ চলা।

গবমপানি ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাদের দুটি জিনিস দেখার ছিল। এক, 'সিংক হোল'। দুই, উমরং নদীর ওপর যেখানে বাঁধের কাজ চলছিল, সেই জায়গাটা।

'সিংক হোল' দেখেছি। সত্যিই ভয়াবহ ব্যাপার। উমরং বাঁধের কিছু দূরেই দেখলাম। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। গভীর বনের মধ্যে পাহাড়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন গহ্বর। সেই গহ্বরের মধ্যে ঢুকে হাঁটতে শুরু করলাম। মনে হলো ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছি। ভেতরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। টানেলের মত এগিয়ে গেছে। কোথাও বেশ উঁচু, স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাওয়া যায়। কোথাও চলতে হয় মাথা হেঁট করে। এক জায়গায় দেখলাম, আর একটি টানেল আর এক পাশ থেকে এসে যে টানেলটি ধরে এগোচ্ছিলাম তার সঙ্গে এসে মিশেছে। অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এলো। প্রায় আশি ফুটের মত এগিয়ে গেছি যখন, ও'রা এগোতে বারণ করলেন। সঙ্গে যদিও টর্চ ছিল, ভরসা পেলাম না। কী জানি বাবা, কোন জন্তু জানোয়ার ঘাপটি মেরে যদি বসে থাকে কোথাও? অনেক সময় এ ধরনের সিংকের মধ্যে ভালুক, চিতা, এমন অনেক জানোয়ারই আশ্রয় নেয়। বড় বড় সাপও দেখা গেছে কখনও কখনও। কথাটা ভাবতেও গা সির সির করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক্ মার্চ।

ড্যাম তৈরির ব্যাপারে 'সিংক হোল' যে কী মারাত্মক প্রতিবন্ধক এই অভিজ্ঞতাটুকু না পেলে হয়ত বুঝতে পারতাম না। জিওলজিক্যাল সার্ভে এদের খুঁজে বের করার জন্যে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে উমরং ড্যামের কাজ চলছে। সরু নালার মত এই নদীর পাড়ের উচ্চতা প্রায় উনিশ শ' ফুট। তবে বাঁধের উচ্চতা অত হবে না। হবে পঁচাত্তর ফুটের মত। আমাদের জীপ তার চৌহদ্দির কাছে যেতেই কানে এল সাইরেনের শব্দ। দেখলাম একটি লোক লাল নিশান উড়িয়ে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

আমার পাশে বসে ছিলেন সুজিত-বাবু। ড্রাইভার সেই লিনডো। লিনডোকে তিনি ইশারা করে গাড়ি থামাতে বললেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটিও আমাদের সামনে এসে পড়েছে।

কী ব্যাপার? প্রশ্ন করলেন সুজিত-বাবু।

আর যাবেন না সাহেব। ওদিকে ফায়ার হচ্ছে।

ফায়ার মানে ডিনামাইটের চার্জ হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে আমরা কিছুটা পেছনে সরে এলাম।

পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। আর

সবংশে মিথুন—অরুণাচল।

ছবি : অরুণাচল সরকার

হিমালয়ের পাণ্ডা।
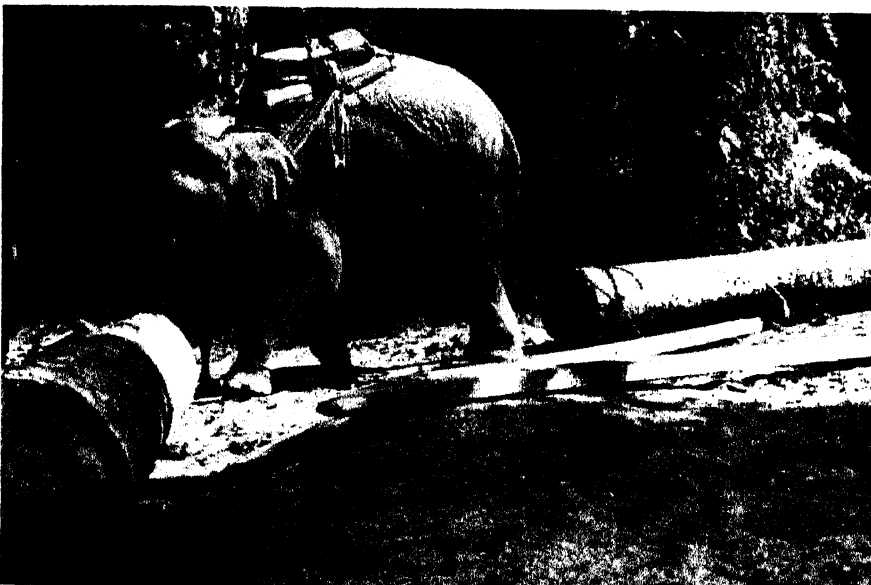
ছবি : অরুণাচল সরকার

মিশি সম্প্রদায়ের পুরুষ—অরুণাচল। ছবি : শম্ভু সেন

গর্জনের কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম, বড় বড় পাথরের টুকরো আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার! এ সময়টা খুবই বিপজ্জনক। অনেকে অসাবধানতা-বশত পাথরের ঘায়ে ঘায়েলও হয়ে থাকে।

এখানকার পাড় অনেক শক্ত। দু-ধারেই পাহাড় বলে। একমাত্র 'সিংক হোল'ই যা ফ্যাসাদ। নইলে ড্যামের ব্যাপারে এ জায়গাটা অনেক বেশি আদর্শস্থানীয়।

এবার বিদায়ের পালা। অমরবাবু, সুকান্তবাবু এবং অপূর্ববাবু এখান থেকে ফিরে যাবেন। আমরা মিলিটারি কায়দায় পরস্পরকে উইশ করে ছাড়াছাড়ি হলাম। আমরা মানে সুজিতবাবু, সমরজিৎ চক্রবর্তী, অজিতবাবু এবং আমি। তিনটি জীপ এবং একটি ট্রেইলর। উমরং থেকে কাজিরাঙ্গা।

সুজিতবাবু হাতঘড়ি দেখে বললেন অনেকটা পথ, মিঃ কর। এখন প্রায় সাড়ে বারোটা। মনে হচ্ছে রাত আটটার আগে আমরা পৌঁছতে পারব না। সো লেট আস মুভ।

আসলে কাজিরাঙ্গা যাওয়াটা একটা বোনাস বলা যেতে পারে। আমাদের সত্যিকারের গন্তব্যস্থল তেজপুর। মাঝ-পথে এই চান্সটুকু করে দিয়েছেন শম্ভু সেন। অতএব এটুকু আমাদের সারতে হলো 'হারিকেন ট্যুরের মত।

উমরং থেকে রওনা হয়ে আমরা গেলাম লঙ্কায়। দূরত্ব প্রায় আশি কিলোমিটার। জঘন্য রাস্তা। বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলে পথ তৈরি হচ্ছে। তার ওপর দিয়ে জীপ নিয়ে চলা মানে শরীরের হাড়গোড় নড়বড়ে হওয়ার মত অবস্থা। এ দিকটা পড়ে মিকির হিলস এলাকার মধ্যে। স্থানীয় অধিবাসীরা মিকির। এরা বেশির ভাগই হিন্দু। এবং

[illegible] স্টীমারের অপেক্ষায়

আসামের উর্বর শস্যক্ষেত্র। আম, কাঁঠাল এবং সুপারির বন। ছয়চালা, আটচাল টিনের বাড়ি। বড় বড় গ্রাম। লঙ্কা ব্যবসা-ক্ষেত্র। লংকা থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে নওগাঁ। সমৃদ্ধ এবং আসামের অন্যতম সংস্কৃতির পীঠস্থান এই শহরটি পেরিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম জাকলাবান্দায়। জোরহাট রাস্তা ধরে। জাকলাবন্দায় যেতে যেতে রাত প্রায় আটটা বেজে গেল। এখানে রাতের খাওয়া শেষ করতে হলো আমাদের। কারণ আমাদের আশংকা, বেশি রাতে কাজিরাঙ্গা গিয়ে কোন খাবারই হয়ত জুটবে না।

জাকলাবান্দা থেকে আর মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পথ। রাত দশটা নাগাদ গিয়ে পেঁছিলাম বাগুরি বন-বিভাগের ডাকবাংলোয়। আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল বলে অসুবিধে কিছু হয়নি।

আমরা গিয়েই জানতে পারলাম, ঘর ঠিক আছে। তিনটে হাতিও ভাড়া করা হয়েছে। তবে আমাদের উঠতে হবে ভোর চারটের মধ্যে। বেশি দেরি হলে কাজিরাঙ্গার বন্য-জীবন দেখায় হয়ত অসুবিধে হতে পারে।

বলতে বাধা নেই, সে রাতটা খুব উত্তেজনার মধ্যে দিয়েই কাটিয়েছি।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, ভোরের আলো ... বাবু এক ঘরেই শুয়েছিলাম। আমার ডাকে তিনিও উঠে পড়লেন; সুজিতবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তীও প্রস্তুত। ঘড়িতে যখন চার, মাহুত এসে জানালো হাতি প্রস্তুত সাহেব। অজিতবাবু তাঁর মুভি এবং স্টিল ক্যামেরা ভাল করে দেখে নিলেন শেষবারের মত। এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে গিয়ে পেঁছিলাম।

মাহুত সাবধান করে দিল, স্যার, একদম শব্দ করবেন না। তা হলে ওরা সরে যাবে।

এক চিলতে খাল পেরিয়েই জঙ্গল। প্রকৃতির উন্মুক্ত আঙ্গিনায় আমরা সবাই তখন রুদ্ধশ্বাস!

বড় বড় ঘাসের বন। ছয় থেকে সাত হাত লম্বা। যতদূর চোখ যায় শুধু সেই ঘাস আর ঘাস। ঘাসের বন ঠেলে আমাদের হাতি এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ, মিনিট দুয়েক পরই—কী বলব, সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আর সেখানে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ একটি গন্ডার। এক-শিংওয়ালা গন্ডার। গন্ডার আর আমাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র একশ ফুট। গন্ডারটি থমকে দাঁড়িয়ে পিট পিট করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

অরুণাচলের অরণ্যে। ছবি : অরুণাচল সরকার

তারপর এক পাশে দুলে বনের মধ্যে হাওয়া।

একটা নয় গন্ডারের দলও দেখলাম। সপরিবার। মাঝে মাঝে চিতল হরিণের লুকোচুরি। এক জায়গায় দেখলাম গোটা পঞ্চাশ হরিণ ভোরের রোদে পিঠ ছড়িয়ে বসে জাবর কাটছে। বন্য শুয়োর; পাশে খালের জলে একটি পেলিকানকেও ভেসে থাকতে দেখলাম। দেখলাম ঈগল। উঁচু এক গাছের ডালে বসে রয়েছে।

এক জায়গায় এসে মাহুত আমাদের হাতি আবার থামিয়ে দিল। অদূরে নিঃসঙ্গ একটি বন্য হাতি। বলল, দাঁড়ান স্যার, ভাল করে দেখে নিই। হাতি একলা থাকলেই ভয়। সাধারণত পাগলা হাতিরাই একা একা থাকে। দারুণ হিংস্র হয় তখন তারা।

না। পাগলা নয়। ভাল হাতিই। প্রচুর বুনো মোষও দেখলাম এখানে। সুজিতবাবুকে বললাম, মশাই, ভেবেছিলাম বুনো মোষ মানে, সাংঘাতিক কিছু হবে। কিন্তু এতো দেখছি আমাদের কলকাতার খাটালের মোষের মতই চেহারা। অজিতবাবুকে বললাম মশাই, এদের ছবি ভাল না উঠলে ক্ষতি নেই। কলকাতার খাটাল থেকে মোষ ধরে ঝোপ-ঝাড়ের পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে বলে দেবেন এই হলো কাজিরাঙ্গার বুনো মোষ।

মাহুত আমার কথায় হেসে উঠল। বলল, একেবারে আস্ত শয়তান সাহেব। দেখতে এই রকম। কিন্তু দারুণ রাগী। সামনে গিয়ে দাঁড়ান দেখবেন হিংস্র কাকে বলে।

মাহুতের মুখে শুনলাম, এখানে গন্ডারের সংখ্যা বেড়েছে।

ঘণ্টা দুয়েক ঘোরার পর ফিরে এলাম আমরা। তারপর হাতি পিছু তিরিশ টাকা ভাড়া এবং মাহুতদের কিছু বখশিস করে রওনা হলাম শিলঘাটের পথে। পথে আসতে আসতে সুজিতবাবু বললেন, অনেকে কাজিরাংগা থেকে জংগল দেখতে যায়। কিন্তু সেখান থেকে জঙ্গলে ঢুকে এত গন্ডারই তারা দেখতে পায় না। বরং বাগুরি থেকেই জঙ্গলে যাওয়া ভাল দেখছি।

এক ঘন্টার মধ্যেই শিলঘাট পেঁৗছে গেলাম। এই শিলঘাট থেকে ব্রহ্মপুত্রের ওপর নতুন সেতু তৈরির কথা হচ্ছে। এখানে দাঁড়ালে এই এপ্রিলেও বুক কাঁপে। নদীর এত ভয়ংকর চেহারা!

প্রচুর যাত্রীর ভিড়। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। কাছেই বিরাট চর। যেন একটি দ্বীপ। মাঝ নদীতে দেখলাম স্টিমার আসছে। ওই স্টিমারে চড়েই জীপ শুদ্ধ পার হয়ে আমরা ওপারে ভোমরাঘাটে যাব। সেখান থেকে যাব তেজপুর।

সুজিতবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই একই মিলিটারি কায়দায়। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন গৌহাটি এয়ার পোর্টে প্রথম দেখা হওয়ার সময়।

বললেন, এবার আমার ছুটি। আমার সার্কেলে আপনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এবার আপনি অরুণাচল সার্কেলে যাচ্ছেন। গুড বাই।

এখান থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন। এখন যাবেন শিলং।

হঠাৎ এই বিচ্ছেদে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো, শুধু কূটতাত্ত্বিক হিসেবেও নয়, মানুষ হিসেবেও এমন বিচক্ষণ একজন আজকাল খুব কমই চোখে পড়ে।

দেখতে দেখতে স্টিমার ভিড়ল ঘাটে। এবার তেজপুর। আর সেখান থেকে অরুণাচল।

টু-টোন "সুন্দরীর" মনের গোপন কথা

"আমি একবার প্রলোভনে পড়ে দিক-ভ্রান্ত হয়ে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম টু-টোন'ই হ'ল আমার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গি।"

ওঁর এত সন্তুষ্টির কারণ: টু-টোন চুলের গভীরে চমৎকার মিলিয়ে গিয়ে চুলের স্বাভাবিক চিকণ কালো রূপ ফুটিয়ে তোলে।

টু-টোন
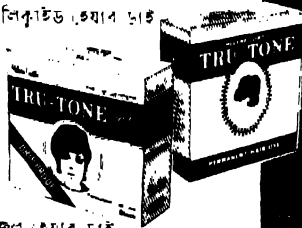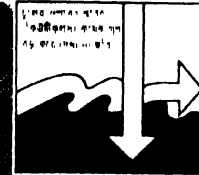
গ্যারাণ্টী দিচ্ছেন হেলীন কার্টিস্- গত ৫০ বছর ধরে যাঁরা চুলের যত্নের ব্যাপারে জগতে সবার অগ্রণী

উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ ১০ ॥

দাদুর সঙ্গে চলে আসার পর আর স্বর্গছেঁড়ায় যায় নি অনিমেষ। মহীতোষ এর মধ্যে অনেকবার এসেছেন জলপাইগুড়িতে। প্রত্যেকবারই স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, রাত্রে থাকেননি কখনো, বেলাবেলায় চলে গিয়েছেন।

হেমলতা বলেছিলেন, 'মা না বলতে পারিস তুই, নতুন মা বলে ডাকিস, অনি। আমিও তাই বলতাম। হাজার হোক মা তো।' ও'রা এলে ধারে কাছে থাকত না অনি। প্রথম দিকে কেমন একটা অস্বস্তি পরে লজ্জা লজ্জা করত। অথচ ও'রা আসবেন ছুটির দিন দেখে যখন অনিকে বাড়িতে থাকতেই হয়। মহীতোষ বাড়ি এসে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাবার সঙ্গেই গল্প করেন, চা বাগানের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে হেমলতার পাশে গিয়ে বসে থাকে। মেয়েটির বয়স অল্প এবং হেমলতা প্রথম আলাপেই বুঝে গিয়েছেন একদম আরপ্যাঁচ নেই মেয়েটার মধ্যে। এই একটা ব্যাপারে সরিৎশেখর সত্যি কথা বলেছিলেন, মেয়েটির স্বভাবের সঙ্গে মাধুরীর যথেষ্ট মিল আছে। চিবুকের আদলটায় তো মাধুরী বসানো, সেই রকমই স্বভাব। তবে মাধুরী একটু ফরসা ছিল এই যা। প্রথম কদিন তো একদম কথাই বলেনি। হেমলতা তিনবার জিজ্ঞাসা করলে একবার উত্তর পান। সে সময় কি কারণে মহীতোষ এদিকে এসেছিলেন, হেমলতা তাঁকে ডেকে বললেন, 'ও মহী, তোর বউ-এর বোধহয় আমাকে পছন্দ হয়নি, আমার সঙ্গে একদম কথা বলে না।' মহীতোষ উত্তর দেননি কিছু, চুপচাপ চলে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। তাঁর চলে যাওয়া বুঝতে পেরে খুব আস্তে অথচ দ্রুত নতুন বউ বলে উঠেছিল, 'আমার ভয় করে।'

'ভয়! ভয় কেন?' অবাক হয়েছিলেন হেমলতা।

মাথা নিচু করে নতুন বউ বলেছিল, 'আমি যদি দিদির মত না হই!' ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেলেন হেমলতা। মহীতোষের বিয়ে কর্তাটা উনি একদম পছন্দ করেন নি সেটা সবাই জানে। নতুন বউ এলে একটা দূরত্ব রেখে গেছেন এই কয়দিন, কখনো অনিকে বলেন নি বেশী কাছে আসতে। এক, সেই প্রথমদিন ওঁরা যখন জোড়ে এলেন, বউ এসে তাঁকে প্রণাম করল, কানের দুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন যখন তখন সরিৎশেখর অনিকে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলেটা আগাগোড়া মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের প্রণাম করে চলে গেল। শ্বশুরের সামনে তখন নতুন বউ এক মাথা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন এই মেয়েটার কথা শুনে বুকটা কেমন করে উঠল হেমলতার। মাধুরীর মুখটা ভাবতে গিয়ে কাঁপুনি এল শরীরে। কোন রকমে নিজেকে সামলে বললেন, 'তোমার নামটা আমার একদম ভাল লাগে না বাপু, আমি তোমাকে কিন্তু মাধুরী বলে ডাকব।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ও'র দিকে তাকিয়েছিল নতুন বউ। হেমলতা দেখেছিলেন দুটো বড় বড় চোখ ও'র দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হেমলতা দেখলেন একটু একটু করে জল গড়িয়ে এসে চোখের কোণায় জমা হচ্ছে। খুব বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছেন বুঝতে পেরে গেছেন ততক্ষণে। সরিৎশেখর চিরকাল তাঁকে বকাবকি করেছেন পেট আলগা বলে, মনে যা আসে মুখে তা না বললে স্বস্তি পান না হেমলতা। এই মেয়েটাকে মাধুরী বলে ডাকলে মনটা শান্ত হবে ভেবেই কথাটা বলেছিলেন।

খপ করে নতুন বউ-এর হাতটা ধরলেন হেমলতা, 'রাগ করলি তুই, আমি তোকে, সত্যি বলছি, দুঃখ দিতে চাইনি।' নতুন বউ-এর তখন গলা ধরে গেছে, 'আপনি আমাকে যা খুশি ডাকুন।'

হেমলতা বললেন, 'দেখি তোর একটা পরীক্ষা নিই। কাল রাত্রে পায়েস করেছিলাম। অনির জন্য একবাটি সরপাতা হয়ে আছে। ওটা নিয়ে ছেলেটাকে খাইয়ে আয় দেখি। বেলা হয়ে গেল।'

কথায় নেশায় হেমলতা কখন টপ করে যে তুইতে নেমে এসেছেন নিজেই বুঝতে পারেননি। বয়সে ছোট কাউকে যদি ভাল লেগে যায় তাহলে তাকে তুই না বললে একদম সুখ হয় না তাঁর।

ঘরের কোণায় মিটসেফের ভিতর পায়েসের বাটিগুলো চাপা দেওয়া আছে। আগের সন্ধেবেলায় রাঁধা পায়েস এক একটা বাটিতে ঢেলে রেখে দেন হেমলতা। নাড়াচাড়া না হওয়ায় বাটিগুলোতে পায়েস জমে গিয়ে পুরু সর পড়ে যায়। সরিৎশেখরের ভালবাসার জিনিসের মধ্যে এখন এই একটা জিনিস টিকটিক করে বেঁচে রয়েছে। ভাল দুধ পাওয়া যায় না এখানে, স্বর্গছেঁড়ায় যখন পায়েস রান্না হত সাত বাড়ির লোক টের পেত। কালনোনিয়া চালের গন্ধে চারধার ম ম করত। সরিৎশেখর নিজেই এক জামবাটি পায়েস দু বেলা খেতেন। দাদুর এই সখটা পেয়েছে নাতি, পায়েস খেতে বড় ভালবাসে ছেলেটা।

আজ মহীতোষরা আসবেন বলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাটিতে পায়েস রেঁধে রেখেছেন হেমলতা। সকালে দেখেছেন সেগুলো জমে গিয়েছে বেশ। বিভিন্ন সাইজের বাটি আছে মিটসেফে। নতুন বউ উঠে দাঁড়ালে তিনি মিটসেফটা ওকে দেখিয়ে দিলেন। বুক সমান মিটসেফের দরজা খুলে নতুন বউ সেদিকে তাকাতেই হেমলতা আড়চোখে দেখতে লাগলেন। অনির মন অল্পে ভরে না, ছোট বাটিতে পায়েস দিলে চেঁচামেচি করবেই। নতুন বউ কোন বাটিটা তোলে দেখছিলেন তিনি, মন বোঝা যাবে। দেওয়ার হাতটা টের পাওয়া যাবে। মেয়েটার বুদ্ধি আছে, মনে মনে খুশি হলেন হেমলতা। বড় তিনটে বাটির একটাকে বের করে আনল নতুন বউ, ছোট দুটোতে হাত ছোঁয়াল না। যাক, অনিটার কখনো কষ্ট হবে না। চামচটাও মনে করে নিল।

হেমলতা বললেন, 'বড় বাড়িতে রয়েছে ও, তুই গিয়ে ভাল করে আলাপ করে পায়েস খাইয়ে আয়।' এক পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন বউ। কিছু একটা বলব বলব করে যেন বলতে পারছিল না। সেটা বুঝতে পেরেই যেন হেমলতা বললেন, 'কি হল, আরে বাবা নিজের ছেলের কাছে যাচ্ছিস লজ্জা কিসের! অনি বড় ভাল ছেলে মনটা খুব নরম। নে যা, আমি আর বকবক করতে পারছি না, উনুন কামাই যাচ্ছে।'
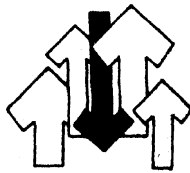
ভিতরের বারান্দায় সরিৎশেখর মহীতোষের সঙ্গে বসেছিলেন। বেতের চেয়ার থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নতুন বউকে দেখলেন সরিৎশেখর। একমাথা ঘোমটা, আঁচলের তলায় কিছু একটা ঢেকে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে আসছে। ওকে দেখলেই চট করে মাধুরীর

অন্তত পর। সে মেয়েকে পছন্দ করে এনেছিলেন তিনি, তাঁর পছন্দের জিনিস বেশীদিন টেঁকে না। ছেলের দিকে তাকালেন, মহীতোষও বউকে দেখছে। একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, মেয়েটাকে ওর বাপের কাছে নিয়ে যাও না কেন? প্রত্যেকবারই দেখতে পাই এখানে এসেই ফিরে যাচ্ছ।' হঠাৎ এ ধরনের কথার জন্য তৈরি ছিলেন না মহীতোষ। কিছু একটা নিয়ে স্ত্রীকে ওদিকে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি। এই প্রথম এ বাড়িতে ওকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছে দিদি। কিন্তু কার কাছে যাচ্ছে? ওখানে তো অনি থাকে। ছেলের সঙ্গে এখন ভাল করে কথা হয় না তাঁর, কেমন অস্বস্তি হয়। স্ত্রীকে অনির কাছে যেতে দেখে হঠাৎ খুব আরাম বোধ হচ্ছিল। এই সময় বাবার প্রশ্নটা কানে যেতে কি বলবেন বুঝতে না পেরে কান চুলকে বললেন, 'যেতে চায় না ও।' ভ্রূ কুঁচকালেন সরিৎশেখর, 'সেকি! ' না না এ ঠিক কথা নয়। তোমারই উদযোগী হওয়া উচিত, এক শহরে বাড়ি, তার মা বাবা কি ভাবছেন বলতে!' সরিৎশেখর নিজে কখনো ছেলের শ্বশুরবাড়িতে যান না, অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও যেতে পারেন না। মহীর বিয়ের রাত্রে বাড়ি ফিরে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে কথা কাউকে বলা হয়নি, এমনকি হেমলতাকেও নয়। বাড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

নতুন বউ এদিকটায় কখনো আসেনি। বিরাট বারান্দা পেরিয়ে সার দেওয়া ঘরগুলোর কোনটায় অনিমেষ আছে বুঝে উঠতে সময় লাগল তার। দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ তার মনে হল শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, হাতে কোন সাড় নেই। এ বাড়িতে যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিনও এ রকম মনে হয়নি। এতবড় একটা ছেলে আছে যাঁর তাকে বিয়ে করতে কখনই ইচ্ছে হয়নি তার তবু বিয়েটা হয়ে গেল। আর বিয়ের পর ইস্তক অহরহ যার নাম শুনেছে ও সে হল ছেলের মন জয় করতে মহীতোষ স্ত্রীকে যেন পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেটা কি করে হয়! আজ অবধি জেনেশুনে কোন মন জয় করার চেষ্টা ওকে করতে হয়নি। সেটা কি করে করতে হয় মহীতোষ তাকে শিখিয়ে দেয়নি কিন্তু। ভেজানো দরজাটা ঠেলল নতুন বউ।

বাবা এবং নতুন মা এসেছেন জানতে পেরে অনি চুপচাপ ঘরে বসেছিল। পিসীমার নির্দেশমত ও মনে মনে নতুন মা শব্দটাকে অনেকখানি রপ্ত করে নিয়েছে কিন্তু ব্যবহার করেনি। দূরে থেকে কয়েকবার নতুন মাকে ও দেখেছে। এর আগে ও'রা যখন এসেছেন তখন দুপুরের খাওয়ার সময় বাবা আর দাদুর পাশে বসে খেতে খেতে মাথা নিচু করে আড়চোখে দেখেছে একটা রঙিন শাড়ি রান্নাঘরের দরজার অনেকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাওয়ার সময় বসে থাকাটা অত্যন্ত খারাপ লাগে অনির। বাবা যেন না বললে নয় এ রকম দুএকটা প্রশ্ন করেন। কত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে পারবে সেই চেষ্টা চালিয়ে যায় অনি। পিসীমা পরিবেশন করেন বলে স্বস্তি পায় ও। এতদিন যা মনে হয়নি আজ ও'রা যখন রিকশা থেকে নামলেন তখন অনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাথরুমে টিনের বালতিতে ওর জামাকাপড় জলে ভিজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে আসছিল পড়তে এমন সময় রিকশাটা বাড়ির সামনে এসে থামে। মহীতোষ রিকশাওয়ালাকে পয়সা দিচ্ছিলেন যখন তখন নতুন মা রিকশা থেকে নেমে ঘোমটা ঠিক করে বাড়ির দিকে তাকাল। আর তাকানোর ভঙ্গীটা অনিকে কেমন চমকে দিল। ওর মনে যেটুকু আছে, মাধুরী এই রকমভাবে তাকাতেন। এক ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল অনি কেউ ওকে লক্ষ করেনি।

কালকের পড়া হয়ে গিয়েছিল। খুব একটা আটকে না গেলে ও পড়া বুঝতে সরিৎশেখরের কাছে যায় না। এমনিতে দাদু খুব ভাল কিন্তু পড়াতে গেলেই চট করে এমন রেগে যান যে অনিকে অবশ্যই চড়-চাপড় খেতে হয়। সে সময় ও'র চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। একটা সাধারণ ইংরেজী শব্দ অনি কেন বুঝতে পারছে না এই সমস্যাটা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সেটা সমাধান করতে প্রহার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সামনের বছর থেকে মাস্টার রাখবেন মহীতোষ, সরিৎশেখরকে এ রকম বলতে শুনেছে ও। পিসীমাকে অনি বলেছে যদি মাস্টার রাখতেই হয় তাহলে নতুন স্যারকে যেন রাখা হয়।

অনি দেখল দরজাটা খুলে গেল, এক হাতে বাটি নিয়ে নতুন মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মুখ নিচু করল অনি। এ ঘরে কেন এসেছে নতুন মা? ও তো কাউকে বিরক্ত করতে যায়নি। যেন কিছুই দ্যাখেনি এই রকম ভঙ্গী করে অনি সামনে খুলে রাখা একটা বই-এর দিকে চেয়ে থাকল।

'পায়েসটা খেয়ে নাও।' বড়দের মতন নয়, একদম ওদের মত গলায় কথাটা শুনতে পেল অনি। অবাক হয়ে তাকাল ও। পায়েস খেতে ওর খুব ভাল লাগে। কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি রান্নাঘরের বাইরে ভাতের সকড়ি এ বাড়িতে কাউকে আনতে দ্যাখেনি। পিসীমা এ ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। জামা-কাপড় না ছেড়ে পায়খানায় গেলে চিৎকার করে পাড়া মাত করে দেন। পায়েস শোবার ঘরে বসে খেতে দেবেন, এ একেবারেই অবিশ্বাস্য। হয় পিসীমা জানেন না, নতুন মা না বলে নিয়ে এসেছে। উলটো ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না অনিমেষের। খুব আস্তে ও বলল, 'আমি শোবার ঘরে পায়েস খাই না।'

থতমত হয়ে গেল নতুন বউ। কথাটা ওর একদম খেয়াল হয়নি, আসার সময় দিদিও বলে দেয়নি। এইটুকুনি ছেলে যে এতটা বিজ্ঞের মত কথা বলতে পারে ভাবতে পারেনি সে, শুনে লজ্জা এবং অস্বস্তি হল। মাথায় বেশ লম্বা ছেলেটা গড়নটা অবিকল

...তোষের বউ। ... এমন একটা ভাজ আছে যে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। এই ছেলে, এত বড় ছেলের মা হতে হবে বরং দিদি হতে পারলে ও সবচেয়ে খুশি হত।

চেষ্টা করে হাসল নতুন বউ তারপর ঘরটা দেখতে দেখতে অনির পাশে এসে দাঁড়াল, 'ঠিক বলেছ, আমার ছাই মাথার ঠিক নেই। যেই শুনলাম তুমি পায়েস খেতে ভালবাস নিয়ে চলে এলাম। একবারও মনে হল না যে এটা রান্নাঘর না এখানে সকড়ি চলে না। তা এনেছি যখন তখন এককাজ করা যাক, আমি হাতে ধরে থাকি তুমি চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাও।' পায়েসে গাঁথা চামচ শুদ্ধ বাটিটা অনির সামনে ধরল নতুন বউ। সেদিকে তাকিয়ে অনির জিভে প্রায় জল এসে গেল, কি সুন্দর গন্ধ ছাড়ছে। কিন্তু কেউ বাটি ধরে থাকবে আর তা থেকে ও খাবে এ রকম কোনদিন হয়নি। হঠাৎ ও নতুন বউ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা বাঙাল না?'

হকচকিয়ে গেল নতুন বউ, 'মানে?'

পায়েসের দিকে তাকিয়ে অনি বলল, 'পিসীমা বলেন, বাঙালরা সকড়ি-টকড়ি মানে না।'

খিলখিল করে হেসে ফেলল নতুন বউ। হাসির দমকে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। এই বাড়িতে আসার পর এই প্রথম সে বিয়ের আগের মত হাসতে পারছে। অনির খুব মজা লাগছিল। নতুন মা একদম ছোটপিসীর মত করছে। কোন রকমে হাসির দমক সামলে নতুন বউ বলল, 'ঘটি ঘটি ঘটি, বাঙাল বললে চটি।' তারপরেই হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ না?'

মাথা নিচু করল অনি। সেই রাত্রে বাড়িতে ফিরে বারান্দায় দাঁড়ানো সরিৎশেখরকে সে রেগে রেগে যেসব কথা বলেছিল তা কি বাবা জানেন? বাবা জানলেই নতুন বউ জানবে। পিসীমা তো কোনদিন অনির সঙ্গে ও ব্যাপারে কথা বলেননি; কিন্তু অনি জানে পিসীমা সব শুনেছিলেন। বাবার বউ-এর দিকে ও পূর্ণচোখে তাকাল। শরীর দেখে খুব বড় বলে একদম মনে হয় না। একটুও ভারিক্কি দেখাচ্ছে না কিন্তু এখন যেভাবে ঠোঁট টিপে হাসছে চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। অনি বলল, 'আমি তোমাকে চিনি না, খামোখা রাগ করতে যাব কেন?'

এক হাতে পায়েসের বাটিটা তখনও ধরা অন্য হাত অনির চেয়ারের পিছনে রাখল নতুন বউ 'আমাকে তুমি কি বলে ডাকবে?'

একটু ভেবে অনি বলল, 'তুমি বল?'

'তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?'

'হুঁ বলেছে। পিসীমা বলেছে নতুন মা বলতে।'

খুব ফিসফিস করে শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনল অনি।

'তোমার নতুন মা বলে ডাকতে ভাল লাগবে তো?'

অনির কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। কথাবার্তাগুলো এমনভাবে হচ্ছে যে, অন্য একটা অনুভূতির অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল সে।

'অনি, আমাকে তুমি ছোট মা বলে ডাকবে? আমি তো চিরকাল নতুন থাকতে পারব না।'

ঘাড় নাড়ল অনি। নতুন মার চেয়ে ছোট মা অনেক ভাল। মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যেই যেন ছোট মা বলা।

'তাহলে এই পায়েসটা খেয়ে ফেল।' চামচটা এগিয়ে দিল ছোট মা। হেসে ফেলল অনিমেষ, 'দিদি না কই।'

কপট নিঃশ্বাস ফেলল ছোট মা, 'কি আর করা যাবে। ভাবব আমার কপাল এই রকম। তোমাকে তো আর বকতে পারব না।'

'কেন? মায়েরা তো বকে।'

'হুঁ ঠিকই তো। আগে তোমাকে খুউব ভালবাসি না হলে খবর্ড বকব কি করে! এখন থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু হলাম, ঠিক তো।'

ঘাড় নাড়ল অনি, ওর খুব মজা লাগছিল।

'বন্ধু হলে কিন্তু সব কথা শুনতে হয় বিশ্বাস করতে হয়। আমার আজ অবধি একটাও বন্ধু ছিল না। তুমি আমার বন্ধু হলে।'

শুনতে পেল যেন বলছে আর কোনও ... হাত বাড়িয়ে চামচটা ধরল সে, পুরু সরের স্তর কেটে এক চামচ পায়েস তুলে মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খেয়েছ?' একগাল হেসে ছোটমা বলল, 'কেন?'

'পিসীমা দারুণ পায়েস রাঁধে খেয়ে দেখো।' নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বলল অনি, 'মাও এত ভাল পারত না।'
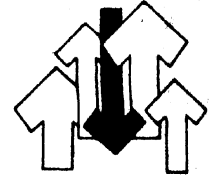
নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাব হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে মহীতোষ সবচেয়ে খুশি হলেন। হেমলতার মনটা ব্যবহারে বোঝা যায়, নতুন বউ-এর ওপর তাঁর টান বেড়ে গেছে। সরিৎশেখরকে চট করে বোঝা মুশকিল। হেমলতা দুপুরে খাওয়ার সময় পাখার হাওয়া করতে করতে অনেকবার নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাবের কথা তুলেছেন। সরিৎশেখর হাঁ না করেন নি। চিরকালই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর একটা আড়াল রাখা সম্পর্ক আছে, মনে কি হচ্ছে বোঝা যায় না। মহীতোষের বিয়ের রাত থেকে এ ব্যাপারে একটা কথা তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি।

এবার মহীতোষরা ফিরে যাবার পর বেশ কিছুদিন আসতে পারলেন না। চা পাতা তোলা হচ্ছে। এখন ফ্যাক্টরীতে দিন রাত মেশিন চলছে। রবিবারেও সময় অসময়ে ডাক পড়ে। এখন স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর অনির স্কুল এখন ছুটি। কিন্তু নতুন স্যার ওদের প্রত্যেকদিন স্কুলে যেতে বলেছেন। রোজ দুটো থেকে স্কুলের মাঠে মহড়া হচ্ছে। ছাব্বিশে জানুয়ারি আসছে। নতুন স্যার বলেছেন আমরা জন্মেছি পনেরই আগস্ট আর আমাদের অন্নপ্রাশন হবে ছাব্বিশে জানুয়ারি।

ঠিক এই সময় এক দুপুরে অনি সেজেগুজে বেরুচ্ছে ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। শীতের এই দুপুরে পশ্চিমে সূর্য চলে গেলে সরিৎশেখর পিছন-বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে থাকেন রোদে গা ডুবিয়ে। ডাকপিয়ন ওঁর হাতে চিঠিটা দিয়ে গেল। খামের ওপর ঠিকানা পড়ে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'দাদুভাই, তোমার চিঠি।'

ভিতরের কলতলায় বাসন মাজছিলেন হেমলতা। এখনও স্নান হয়নি তাঁর জল লেগে পায়ের হাজা জ্বলছে, বাবার চিৎকার শুনে হাত থামিয়ে বললেন, 'ওমা, অনিকে আবার কে চিঠি দিল!

ঘর থেকে বেরিয়ে চিৎকারটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অনিমেষ। আজ অবধি তাকে কেউ চিঠি দেয়নি। চিঠি দেবার মত বন্ধু তার কেউ নেই।

অবশ্য ওর ঠিকানা স্কুলের অনেকের কাছে আছে। স্কুল বন্ধ হবার সময় যারা বাইরে যায় তারা পছন্দমত ছেলের ঠিকানা নিয়ে যায়। কিন্তু কোনবার চিঠি দেয় নি কেউ তাকে। বিশু আর বাপী যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। বিশু এখন কুচবিহারে পড়ছে, ওরা কোনদিন তাকে চিঠি দেয়নি। বেশ একটা উত্তেজনা বুকের ভিতর নিয়ে অনিমেষ পিছন বারান্দায় দাদুর কাছে গেল। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন সরিৎশেখর, এক হাত ওপর দিকে তোলা তাতে একটা মোটা নীল খাম ধরা। খামটা নিয়ে একছুটে ... এল ও, এদিক ওদিক চেয়ে সোজা বাগানে নেমে গেল। সুপুরিগাছে বসে একজোড়া ঘুঘু সমানে ডেকে যাচ্ছে। পেয়ারাতলায় এসে খামটা তুলতেই মিষ্টি একটা গন্ধ পেল সে। চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ওর। মার শরীর থেকে ঠিক এরকম গন্ধ বেরুত। মার একটা খুব বড় সেন্টের শিশি ছিল। এই চিঠি যে লিখেছে সেও কি সেই সেন্ট মাখে। খামের ওপর

তার নাম জেনা কলুর কোয়ার অবে। নীল অকাশের মধ্যে নীল খামটা সন্তর্পণে খুলতেই ভাঁজ করা কাগজ হাতে উঠে এল। চিঠির বুক ছিঁড়ে চারটে ভাঁজের রেখা চারদিকে চলে গিয়েছে। চিঠির তলায় চোখ রাখল অনি, 'আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।' উত্তেজনাটা হঠাৎ কমে এল অনির। জানা হয়ে গেলে কোন কিছু নতুন থাকে না। উত্তেজনার জায়গায় কৌতূহল এসে জুড়ে বসল। চিঠিটা পড়ল সে, 'স্নেহের অনি। এই পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই খুব অবাক হইয়াছ। এখানে আসিয়া শুধু তোমার কথা মনে পড়িতেছে। তুমি নিশ্চয়ই জান এই সময় তোমার পিতার চাকরিতে ছুটি থাকে না তাই আমাদের জলপাইগুড়ি যাওয়া হইতেছে না। তাই বলি কি, তোমার যখন পাসের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তখন আমার নিকট চলিয়া আসিও। এখন তো আমরা বন্ধু, বন্ধুর নিকট বন্ধু আসিবে না?

'তোমাকে লইয়া আমি নদীর ধারে বেড়াইব, শুনিতেছি নদী বন্ধ হইবে উহা কি জিনিস আমি জানি না। ফুলগাছে প্রচুর ফুল ধরিয়াছে। তুমি জানিয়া খুশি হইবে কালীগাই-এর একটি নাতনী হইয়াছে। উহার সাদা বলিয়া নাম রাখিয়াছি ধবলী। বাড়িতে এখন এত দুধ হইতেছে যে খাইবার লোক নাই। তুমি আসিলে আমি তোমাকে যত ইচ্ছা পায়েস খাওয়াইব। জানি দিদির মত ভাল হইবে না।

'গতকাল এখানকার স্কুলের ভবানী মাস্টার আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন, তোমাদের স্কুল এই বৎসর হইতে নতুন বাড়িতে উঠিয়া যাইতেছে। ভবানী মাস্টারের ইচ্ছা তুমি অবশ্যই আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারি এখানে থাক। কারণ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রথম পতাকা তুমি উত্তোলন করিয়াছিলে ছাব্বিশে জানুয়ারিতেও সেই কাজটি তোমাকে দিয়ে তিনি করাইতে চান। ... কোন অবস্থায় লইয়া দেখে চাহিয়া রহিয়াছেন।

'তোমার পিতা পরে পত্র দিতেছেন, দিদিকে বলিও। গুরুজনদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম। তুমি আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।

'পুনশ্চ ॥ এ জীবনে আমি কাহাকেও দুঃখ দিই নাই। অনি, তুমি কি আমাকে দুঃখ দিবে?

চিঠিটা পড়ে অনিমেষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন সেই ঘুঘু দুটোই শুধু নয় একরাশ পাখি সমস্ত বাগান জুড়ে তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করেছে। চোখের সামনে স্বর্গছেঁড়ার গরুপালা মাঠ নদী যেন একছুটে চলে এল। সেই কাঁঠাল গাছের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লাল চিংড়িগুলো কিংবা সবুজ গালিচের মত বিছানো চা গাছের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসা কুয়াসার দঙ্গল একটা নিঃশ্বাস হয়ে অনিমেষের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ভবানী মাস্টার চলে যাবেন! 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোন দুঃখই দুঃখ থাকে না।' একটা ঘাম জড়ানো নস্যির গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে এল। স্বর্গছেঁড়ায় বাবার যে ইচ্ছেটা মাধুরী চলে যাওয়ার পর একদম চলে গিয়েছিল সেটা হঠাৎ ঝুপঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মায়ের কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা শীতল ছোঁয়া লাগল অনির। স্বর্গছেঁড়ায় গেলে সবাইকে দেখতে পাবে ও শুধু মা নেই। তাঁর জায়গায় ছোট মা সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ের পর পর হেমলতা রাগ করে বলেছিলেন, 'দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? মা হল মা, সৎমা সৎমাই।' আচ্ছা সৎমা বলে কেন? সৎ মানে তো ভাল, ভাল মা-রা আবার খারাপ হবে কি করে! কিন্তু ছোট মাকে তো মায়ের মত মনেই হয় না, বরং দিদির মত নিজের মনে হয়। সৎমায়েরা নাকি খুব অত্যাচার করে। ছোটমাকে দেখে, এই চিঠি পড়ে, কেউ সে কথা বললে অনি তাকে মিথ্যুক বলবে। এখানে ছোট মাকে তার ভাল লেগেছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ায় গেলে মাকে মনে পড়বেই, তখন ছোট মাকে—। অনির মনে হল বাবাকে যদি সে জিজ্ঞাসা করতে পারত মাকে ভুলে গেছে কি না? কিন্তু তবু স্বর্গছেঁড়ায় যাবার জন্য বুকের মধ্যে যে ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে সেটা যাচ্ছে না। নতুন স্যার বলেছিলেন, 'মা নেই কে বলল? জন্মভূমিই তো আমাদের মা। বন্দে মাতরম।' শব্দটা উচ্চারণ করলেই শরীর গরম হয়ে ওঠে। তখন আর কারো মুখ মনে পড়ে না ওর। পেয়ারা গাছের তলায় পায়চারী করতে করতে ও নিচু গলায় আবৃত্তি করতে লাগল, 'আমরা অন্য মা জানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই—আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। একদৃষ্টে ও মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পেয়ারা গাছের তলায় ছোট ছোট ঘাসের ফাঁকে কালো মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই মাটিটাকে চেনা যাচ্ছে না আর। সেই স্বর্গছেঁড়া থেকে চলে আসার দিন ও লুকিয়ে করে লুকিয়ে একমুঠো মাটি এনে পেয়ারা গাছের ঠিক তলায় রেখে দিয়েছিল। যখনই মন খারাপ করত তখনই এসে মাটিটাকে দেখত, মাটিটা দেখা মানে স্বর্গছেঁড়াকে দেখা। তারপর এক সময় ভুলে গিয়েছিল সেই মাটিটার কথা। এতদিন ধরে কত বৃষ্টি গেল, প্রতি বছরের বন্যা গেল এখন আর কাউকে আলাদা করে চেনা যাবে না। মাটিদের চেহারা কেমন এক হয়ে যায়। আমাদের মা নাই বাপ নাই, আমাদের জন্মভূমি আছে। চিঠিটা পকেটে রাখতে রাখতে অনি ঠিক করল, এখন ও স্বর্গছেঁড়ায় যাবে না। (ক্রমশ)

স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

এইবার একটি লম্বা বক্তৃতামালা। বুদ্ধদেবকে পর পর বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। কোনো কারণে কয়েকদিন ছুটি পড়েছিলো, তার সংগে শনি রবি অব ডে মিলিয়ে আরো কয়েকদিন বাড়িয়ে সব সুদ্ধ দিন দশেক পাওয়া গেল। আগে থেকেই সাজানো ছিল সময়টা, এই সময়টার জন্য আমি আগ্রহভরে তাকিয়েছিলাম। এই ছুটিতেই আমাদের এভানস্টোনে যাবার কথা। স্ত্রী কন্যা নিয়ে কবি নরেশ গুহ আছে সেখানে। এদেশে এসেছি থেকেই ওদের সংগে মিলিত হবার জন্য আমরা এবং আমাদের সংগে মিলিত হবার জন্য ওরা দু পক্ষই সমান ব্যাকুল হয়ে আছি। সুযোগ সুবিধা আর হয়ে উঠেছিলো না। ট্রাংককলে যতোবার কথা হয়েছে উভয়পক্ষের দুজন মেয়ের গলাই সমান আবেগে কম্পিত হয়েছে, দুজন পুরুষের গলাই উত্তেজনায় অধীর। ট্রাংককলের বিল ভারি হয়ে উঠেছে, কথা ফুরোয়নি।

নরেশ তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে রীডার ছিলো, (বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান) এসেছিলো ডক্টরেট করতে। এই লম্বা ছুটিটা আমি পুরোপুরিই ওদের কাছে কাটাবো, বুদ্ধদেব যেখানে যেখানে যাবার এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করেই যাবেন এবং ফিরে আসবেন।

সেই বাঞ্ছিত দিনটি সমাগত। কিন্তু সকাল থেকে আবার ছিঁচকে বৃষ্টি। এখানকার এই বৃষ্টি অসহ্য। না এদিক না ওদিক। এর চেয়ে খুব জোর কয়েক পশলা যদি হয়ে যায়, সহজে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা হবে না। এখানে পশলা বৃষ্টি ঐ একদিনই দেখেছি। নামলে এই ধরনেরই নামে। সারাটা দিন রোদ ওঠে না, হু হু হাওয়া বইতে থাকে, আবার শীতের কাঁপুনি শুরু হয়।

স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হলে এই রকম আবহাওয়া যে কী বিশ্রি বলা যায় না। দিব্যি ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আবার কি কোট, ছাতা বর্ষাতি ওভার শু ভালো লাগে? মনটাই খারাপ হয়ে যায়।

আর এয়ারপোর্ট তো এখানকার রাস্তা নয়। চল্লিশ মাইল পাড়ি দিলে তবে গিয়ে পৌঁছানো যাবে। পৌঁছেই কি শান্তি আছে? মালবাহী হয়ে এক মাইল চত্বর পাড়ি দিলে তবে প্লেন। ততোক্ষণে শীতে কেঁপে বৃষ্টিতে ভিজে দেহের যা অবস্থা দাঁড়ায়, তা আর কহতব্য নয়।

বিরক্ত বিরক্ত ভাব নিয়েই রান্নাবান্না খাওয়া ইত্যাদি সেরে রওনা হওয়া গেল। সিটি আপিসে এসে গাড়িও ধরা গেল। যাত্রীরা দেখলাম সকলেই ছাতা বর্ষাতি ওভার শুতে আবৃত হয়ে ভীষণ উত্ত্যক্ত। যাদের সংগে বেশী মাল আছে বা বাচ্চা আছে তাদের মুখে তো পৃথিবীর অভিযোগ। এই তো মাত্রই কয়েকটা সপ্তাহ একটু শান্তি তার মধ্যে এই বৃষ্টি বাদল এমন বাদ সাধে কেন?

এয়ারপোর্টে যেতে যেতে বৃষ্টি আরো বাড়লো, সারা আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে, হাওয়া প্রায় ঝড়ের মূর্তি ধারণ করলো। তারপর গিয়ে দেখি প্রায় এক ঘণ্টা আগে এসে পৌঁচেছি। দুর্দৈব আর কাকে বলে! কী আর করা, সংগের জিনিসপত্র অপেক্ষা গৃহে রেখে একটা রেস্তোরাঁতে গিয়ে বসলাম। যা ঠান্ডা, গরম গরম চা কফির ধোঁয়া দেখেও সুখ হয়। কাচের ঘরের উত্তাপ আরাম ছড়িয়ে দিল দেহে। কাচের বাইরে চলন্ত জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিলো নাটক দেখছি, সময়ের জ্ঞান ছিলো না।

সময় বড়ো অদ্ভুত জিনিস। কখনো এক মিনিট সময়ও কী-দীর্ঘ মনে হয়, কখনো একটা দিনকেও এক মিনিটের মতো লাগে। ঝড়বৃষ্টির জন্য প্লেনের অনেক দেরী আছে শুনেই তিক্ত মনে এসে যেন হতাশায় ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু রেস্তোরাঁর আরামে গরমে বসে চা খেতে খেতে এবং কালপ্রবাহ দর্শন করতে করতে কখন যে এক ঘণ্টা কেটে গেছে টেরও পাইনি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলাম, তাড়াতাড়ি অপেক্ষা গৃহে এসে দুজনে দুটি স্যুটকেস তুলে নিয়ে প্রায় ছুটলাম। দেখলাম অন্যান্য যাত্রীরা আমাদের অনেক আগেই রওনা হয়ে গেছে।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে কম্পিত বক্ষে ভাবছিলাম কী করে এর মধ্য দিয়ে প্রায় মাইলখানেক রাস্তা আকাশের তলায় পার হবো। স্যুটকেসের ভারে এমনিতেই বেঁকে আছি, পিছল চত্বরে পড়ে যেতে বাধা কী এবং সেটাই সম্ভব। একটা মস্ত লম্বা ঝুলন্ত সেতু দিয়ে যাচ্ছিলাম, মাথায় ছাদ আছে, দুধারে মোটা প্লাস্টিকের দেয়াল। সেই প্লাস্টিক কাচের মতোই স্বচ্ছ, ঝড়বৃষ্টির জন্য দাপট বেশ বোঝা যাচ্ছে তার ভিতর দিয়ে। সামনে তাকিয়ে আন্দাজ করতে পারছিলাম না এই সেতুপথ কোথায় কতোদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এদের এয়ারপোর্টের বৈচিত্র্যও একটা দেখবার বিষয়, জানবার বিষয়। যেতে যেতে এতোগুলো মানুষ হঠাৎ একটা সুড়ংগের মধ্যে ঢুকে গেল, সংগে সংগে আমরাও। আর ঢুকেই অবাক হয়ে দেখি সেই সুড়ংগটাই আমাদের প্লেনের অভ্যন্তর। উজ্জ্বল আলোকিত গহ্বরে সব সাজানো আসন অপেক্ষা করে আছে যাত্রীদের উপবেশনের জন্য।

এটা কী হলো? কেমন করে হলো? বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে শোনা গেল, যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশাল জাহাজটিই ঢুকে এসেছে। এই ঝোলানো সেতুর মুখের মধ্যে। জাহাজের প্রবেশ পথে আর এই সেতুর প্রান্তদেশের মুখে কী কৌশলে যে সংযোগ

একটা কান্ডকারখানাই বটে। নম্বর মিলিয়ে আসনে বসেও বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না।

আইডেল ওয়াইল্ড এয়ারপোর্ট থেকে (এখন কেনেডি এয়ারপোর্ট কেনেডির মৃত্যুর পরেই এই নামকরণ হয়েছে) ওহেয়ার এয়ারপোর্ট অর্থাৎ আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানকার দূরত্ব মাত্রই দু ঘণ্টার রাস্তা। একটি জেট প্লেনের পক্ষে এই পথ বড়ো ছোটো। উঠবার প্রস্তুতি শেষ হতে না হতেই নামবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তার উপরে সেদিন বায়ুর চাপ অত্যন্ত বেশী ছিলো, আকাশ গাঢ় মেঘে আবৃত ছিলো, ঐটুকু উঠতেই যথেষ্ট সময় লেগে গেল। আর যতোক্ষণে মেঘলোক ছাড়িয়ে অন্য এক উজ্জ্বল আকাশের আলোর প্রভায় চোখ ধাঁধালো, তারও ঊর্ধ্বে, মাটি থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল উপরে এসে অদ্ভুত এক নিষ্কলুষ রুক্ষ আকাশের বিস্তারে ঝিম ধরলো ততোক্ষণে দেখা গেল গন্তব্যে পৌঁছতে আর মাত্র চল্লিশ মিনিট অবশিষ্ট আছে। অতএব নামো, নামো, নামো। অতএব আবার সেই দোলানি। আবার পড়তে পড়তে ওঠা আর উঠতে উঠতে পড়া। অতক্ষুদ্রো বায়ুযান মনে হয় সমুদ্রের বুকে নৌকোর মতো দোদুল্যমান। শূন্যতাও যেন এক অনন্ত সাগর।

কথা ছিলো, নরেশ এবং চিনু (নরেশ গুহর স্ত্রী, যার পোশাকি নাম অর্চনা গুহ, বি টি কলেজের অধ্যাপিকা) এয়ারপোর্টে আসবে। নরেশকে সংগে নিয়ে সেখান থেকেই বুদ্ধদেব উইসকনসিন এবং ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে চলে যাবেন, ফিরবেন পরের দিন। আমি চিনুর সংগে ওদের এভানস্টোনের বাড়িতে চলে আসবো।

জাহাজ থেকে নেমে আর ওদের পাই না। এদিকে বুদ্ধদেব অন্য যে প্লেন ধরে চলে যাবেন তার সময় হয়ে গেছে, অথচ আমাকে একা ফেলে যেতেও পারছেন না। কী মুশকিল। এরকম হওয়া তো স্বাভাবিক নয়। প্রায় বিপন্নই বোধ করছিলাম। এমন সময় দেখি নরেশ একটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। ভুল জায়গায়। খুঁজতে খুঁজতে বেচারার ফরসা রং লাল টকটকে। অনতিদূরে প্রণবেন্দুর হাত ধরে (কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের রীডার) নরেশের ফুটফুটে বালিকা কন্যা মণি দাঁড়িয়ে। চিনু খোঁজা শেষ করে কোথা থেকে দৌড়ে এলো।

বিশাল বিমানবন্দরে সবাই সকলকে হারিয়ে আমরা যতো শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, নিমেষে জুড়িয়ে গেল সব। উপরি পাওনা প্রণবেন্দু। তাকে দেখে আর খুশিতে বাঁচেন না তার মাস্টারমশাই। আরেঃ তুমি! তুমি এলে কোথা থেকে কবে এলে?

গুরুপত্নী হিসেবে আমার স্নেহও এদের প্রতি কম অদম্য নয়। প্রায়

পুরাকালের পুরুষপুরুদের মতোই। [illegible]

প্রণবেন্দুর কথা আমরা এসে থেকেই ভাবছিলাম। চিঠিপত্রে লেখালেখি হচ্ছিলো কীভাবে যোগাযোগ করা যায়। নিউইয়র্ক যাওয়া যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ এবং বহু দূরের পথ। তার উপর ছুটির প্রশ্ন আছে। নরেশের কাছে খবর পেয়ে কাছাকাছি শহর এখানেই ছুটে এসেছে।

ঈশ্‌! জানলে তোমাকেও নিয়ে যেতাম।' এটা বুদ্ধদেবের খেদোক্তি।

প্রণবেন্দু এই দুবছর বিদেশবাসেই বেশ পরিণত যুবকে পরিণত হয়েছে। রীতিমতো একজন পরিশিক্ষিত ভদ্রলোক। অবশ্য পরিশীলিত চিরকালই, তারই মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে আরো সংস্কৃত। বললো, 'আপনি তো কালই ফিরে আসছেন, আবার তো যাবেন, আমি তখন সঙ্গে যাবো।'

'খুব ভালো, খুব ভালো।'

সময় ছিলো না কথা বলবার। নরেশকে নিয়ে নির্দিষ্ট ফ্লাইটের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি ওদের সংগে বাইরে এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম। এতোক্ষণে নরেশের তিনবছরের কন্যাটির মুখে বোল ফুটলো, আমার গলা জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে বললো, 'আমি আমার পুরোনো জুতোটা রং করে তোমাকে দিয়ে দেব।'

আমি তাকিয়ে দেখি তার নিজের পায়ে একজোড়া নতুন চকচকে জুতো। হাসতে হাসতে বললাম, কেন? পুরোনোটা কেন? নতুনটা বুঝি নয়?'

ওর মা বললো, দেখেছেন কী পাজী? এখন থেকেই কেমন সেয়ানা?'

সে ঘোরতর প্রতিবাদ করে বললো, 'এ জুতোতাতো তুমি কালকেই কিনে দিলে, দিদানিকে তো শুধু চুমুই খেতে বলেছো—'

আমি বললাম, ঠিক কথা। মা শুধু চুমু খেতে বলেছে তুমি তার উপরে পুরোনো জুতোটাও দিতে চাইছো। তাও আবার রং করে। কতো ভালো মেয়ে।'

তখন সে গায়ে ঢলে পড়ে বললো, 'আমি দিদানিকে ভালোবাসি।'

অচেনা দিদানিকে যে সে কখন ভালোবাসলো কে জানে। মা বাবার তালিম আর কি। তবে ভাব হয়ে গেল তক্ষুনি। দিদানির আঁচল ধরতে তার দেরি হলো না।

চিনু বললো, 'কতোক্ষণ থেকে যে খুঁজছি।'

প্রণবেন্দু বললো, 'চিনুদি তো কেঁদেই অস্থির। আর নরেশদার কী অবস্থা—'

'আর তোমার? তোমার বুঝি কিছু না?' চিনু ভ্রূকুটি করলো।

গাড়ি চলতে লাগলো দ্রুতগতিতে। কথার পৃষ্ঠে কথা চলতে লাগলো তার চেয়ে দ্রুত। আমি ভাবলাম পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসার গাঢ়তা যাচাই করতে হলে এই রকম তৃতীয় স্থানেই সমবেত হতে হয়।

পথে পথে গাড়ি থামিয়ে চিনু কেবলি প্রণবেন্দুকে নিয়ে নেমে গিয়ে নানা ধরনের খাদ্য সম্ভার কিনে নিয়ে আসছিলো। কেবলি বলছিলো, 'এভানস্টোনে কিছুই ভালো পাওয়া যায় না। এই দেখুন না এই আপেলগুলো কেমন ভালো। আপনি আপেল ভালোবাসেন না?'

অথবা 'দেখেছেন এখানকার অ্যাসপারেগাসগুলো কেমন টাটকা, ওখানকারগুলো বিশ্রী।'

অথবা 'এসো প্রণবেন্দু এই দোকান থেকে ভালো কেক কিনি।'

অথবা 'ফ্রজন চিংড়ি মাছ'

অথবা 'অমুক অথবা তমুক।'

বাড়ি এসে দেখি এইসব কেনার আগে আরো যা সব কিনে রেখেছে তার পরিমাণ পর্বততুল্য। 'ঈশ্‌। কতো ক্লান্ত হয়েছেন। একটু কিছু খেয়ে নিন' বলে চায়ের সংগে সে স্বাদে সুগন্ধে উৎকর্ষে যে সব ভোজ্যবস্তু এনে উপস্থিত করলো তা ওজনে, উৎকর্ষে এবং রকমারিতায় সমান অতুলনীয়। তবু 'কিছুই নয়' নামক একটি অভিজ্ঞান চিনুর মুখে ফুটে থাকতে দেখে আমি হেসে ফেললাম।

আসলে কী দিয়ে যে কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলো না, অস্থির খুশিতে কেবল এটা করছিলো ওটা করছিলো, অকারণে এঘর ওঘর হাঁটছিলো উত্তেজিতভাবে।

সময় যে তারপর কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যেতে লাগলো জানি না। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া লাল হলো, লাল ছায়া বেগুনি হয়ে সন্ধ্যা ঘন হলো, ঘন সন্ধ্যা রাত্রির মিলনে নিবিড় হয়ে উঠলো। কথা বলতে বলতে এক-সময়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কখন যেন সেই রাত ভোর চারটেতে এসে পৌঁছে গেছে।

না, এইসব সুখ আর কোনোদিন ফিরবে না জীবনে। এমন নির্মল আনন্দ কখনো আর আন্দোলিত করবে না হৃদয়কে।

পরের দিন সকালে চায়ের পর্ব সমাপ্ত করে ঘুরে ঘুরে বাড়িটি দেখছিলাম। ভারি সুন্দর বাড়ি। ঝকঝকে রোদ্দুরে ভরা উজ্জ্বল দিন। শীত নেই। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বারান্দা থেকে রেলিং দেওয়া সাত আট সিঁড়ি নেমে সামনে খানিকটা সবুজ ঘাসের জমি। চারদিকে আমাদের যেমন রাঙচিতার বেড়া থাকে এখানে তেমনিই নীল রংয়ের ছোটো ছোটো ফুলওলা গাছের বেড়া। কিন্তু বাড়িটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন বলেই চেহারা এবং চাল দুই-ই খুব গম্ভীর। উঁচু প্লীনথ, উঁচু সিলিং, উঁচু প্রশস্ত বারান্দা, মস্ত মস্ত ঘর সবই সেকালের সাক্ষী।

এই তৈরি করা আধুনিক শহরে এমন বাড়ি যেন ইতিহাসের নজির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটি একটি দোতলা বাংলো। চিনুরা থাকে একতলায়।

প্রশস্ত ঘরে বসবার এবং খাবার ব্যবস্থা, সংলগ্ন শোবার ঘর। সেই ঘরের জানালা মেঝে থেকে দরজার মতো দরাজ, জানলার পাটে রঙিন কাচ। সেই কাচে ওপিঠ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলে ছবি ফুটে ওঠে, সেই সব ছবি পৌরাণিক গল্প সম্বলিত। তার চেয়েও যা উপভোগ্য শোবার ঘরের একটি জানালা দিয়ে দূরে মিশিগান হ্রদ চোখে পড়ে। এই অতল জলরাশির না; যে কেন হ্রদ কে জানে। এর যে শুধু কূল তল খুঁজে পাওয়া যায় না তাই নয়, এর ঢেউও সাগরের ঢেউয়ের প্রতিযোগী হবার স্পর্ধা রাখে।

এখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়ায় এই হ্রদ একেবারে উত্তরোল। ছেলে-বেলায় ভূগোল পাঠে যখন এই মিশিগান হ্রদ নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে তখন মনের চোখে সব হ্রদের মতোই এটিও আর একটি নিস্তরঙ্গ সীমাবদ্ধ জল, এই সংজ্ঞা ছাড়া আর কোনো ছবি মনে ছিলো না। মধ্যবয়সে পৌঁছে জগতের বহু বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে অনেক ধারণা পাল্টে গেছে, অনেক কিছুই অন্য রকম হয়ে ধরা দিয়েছে চোখে, কিন্তু এই হ্রদ দেখে একে কেন সমুদ্র আখ্যা না দিয়ে হ্রদ বলা হয় সেটাই আমি ভেবে পাই না। এর আরো গুণ আছে, আগ্রাসী হয়ে প্রবল তরঙ্গ তীরও ভাঙে। সেইজন্য মস্ত মস্ত উপল খণ্ড দিয়ে বাঁধ দিয়েছে। সেটা এড়িয়ে আর ভেঙেচুরে শহরের রাস্তায় উঠতে পারে না।

আমরা যখন নরেশের ওখানে গিয়েছিলাম, এই হ্রদের উদ্দামতা তখন তুঙ্গে। শিকাগো শহরে প্রবেশ করবার পথে এই হ্রদ কিছুটা দূরে দিয়ে মাইলের পর মাইলব্যাপী ঘুরে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে চলে, কোনো দিগন্তরেখার সঙ্গে এই জলের কোনো সম্বন্ধ আছে বলে প্রত্যয় হয় না। সমুদ্রের মতোই এর বিস্তার। বসন্তকালের সেই তুঙ্গ অবস্থাতেই আমি সেই হ্রদ প্রথম দেখি। কিন্তু দ্বিতীয় বার দেখি শীতকালে। শিকাগোতেই আসছিলাম, হ্রদ কোথায়? বদলে এক জলহীন প্রান্তর, তার উপরে নাটমঞ্চ, কাঠের ছোটো ছোটো বাড়ি, রেস্তোরাঁ সার্কাস। কতো কিছু। অবাক হয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল। জল এখন বহুদূর পর্যন্ত শক্ত বরফে পরিণত। সেই বরফের উপরেই এখন ছ'মাস সিনেমা থিয়েটার সার্কাস স্কেটিং ইত্যাদির নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা। আর কী ভিড়। অবাধে পা ফেলে ফেলে কতোদূর পর্যন্ত হ্রদের বুকের মধ্যে চলে যাচ্ছে মানুষ। আবার ফিরে আসছে। একদিন ঋতুর পার্থক্যে আবার এই বরফ গলে জল হবে, সেই জল অথৈ হয়ে ভীষণ আকৃতি ধারণ করবে, তরঙ্গের আঘাতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব। প্রকৃতির কী তাজ্জব খেলা।

চিনু বললো বাড়িটা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েরই সম্পত্তি। হয়তো তাই এই আধুনিকতার মধ্যেও এই বৃদ্ধ চেহারা নিয়ে টিঁকে আছে এখনো। নিউ-ইয়র্কে চেলসী হোটেলের জানালা দিয়ে আমি সব সময়েই বাড়ি ভাঙার দৃশ্য দেখি। বড়ো বড়ো সব পুরোনো বাড়ি হুশহাশ ভেঙে দেয় যন্ত্র দিয়ে, তারপরেই আবার দেখতে দেখতে গজিয়ে ওঠে আকাশছোঁয়া নতুন খেলাঘর।

পুরোনোকে ওরা আর রাখতেই চাইছে না। ভাঙে আর গড়ে। একমাত্র গ্রীনিচ ভিলেজ আর উকিল পাড়া ছাড়া মাত্রই একটি পুরোনো গ্রাম দৈবাৎ আমার চোখে পড়েছিলো নিউইয়র্ক শহরে। সেটি নিগ্রো অধ্যুষিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অবশ্য সেই অঞ্চলটি দেখার সৌভাগ্য আমাকে যথেষ্ট বিড়ম্বিত করেছিলো। আসলে আমি একদিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

বুদ্ধদেব তখন ব্রুকলীন কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন। আমার পক্ষে সে জায়গাটা একেবারেই নতুন। ওয়াশিংটন স্কোয়ারে থাকতে ওখানকার সব আমি চিনে ফেলেছিলাম। বিশেষত চোদ্দো স্ট্রীট, তার তো কথাই নেই। একটা রুমাল কিনতে হলেও আমি তেইশ স্ট্রীট থেকে চোদ্দো স্ট্রীটে চলে যেতাম। চোদ্দো স্ট্রীট যে আমার কী প্রিয় ছিলো বলতে পারি না। ওখানকার গরীব পর্টুরিকানরা, দেখতে যারা দেবতার মতো সুন্দর, গায়ের রং যাদের অতসী ফুলের মতো, যারা ফুটপাতের তাৎক্ষণিক দোকানের দোকানদার, প্রায় সকলের মুখই আমার চেনা হয়ে গিয়েছিলো। যারা বড়ো দোকানের মালিক, তাদেরও আমি পরিচিত ছিলাম। এতো বছর বাদে এখনো চোখ বুজে চিন্তা করলে কতো মুখ যে ভেসে ওঠে চোখে। আমাকে দেখলে তারা সাদর আহ্বান জানাতো। হাত বাড়িয়ে দিয়ে নানান রকম সুললিত বাক্যে সম্ভাষণ করতো। ভারি ভালো লাগতো আমার।

ব্রুকলীনে এসে চোদ্দো স্ট্রীটের বিরহে বেশ কিছুকাল কাতর থাকার পরে আবার চিনে নিলাম মাটির তলার পথ। আমাদের হোটেল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দু পা গেলেই সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, প্রথম স্তরের স্টেশনটিতে নামলেই দক্ষিণমুখী চোদ্দো স্ট্রীটের ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে। মনের সুখে উঠে বসলেই হলো, চোখ বুজে চলে যাবো চল্লিশ মিনিটের মধ্যে।

সেই রকমই একদিন গিয়েছিলাম। কিন্তু ফেরবার পথে ভুল ট্রেনে উঠে বসলাম। তারপর ট্রেন চলেছে তো চলেছেই, আমার স্টেশন আর আসে না। ঘড়ি দেখছি আর চঞ্চল হয়ে উঠছি। যেতে যেতে একটা সময় এমন হলো যে সংগীরা সবাই প্রায় নেমে গেল, সহসা নিজেকে একটা ফাঁকা ট্রেনে বসে থাকতে দেখে আমিও নেমে যাই। ভেবে সভয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং ইতস্তত করে যতোক্ষণে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছুলাম, ততোক্ষণে দুপদাপ করে সবেগে একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন নিগ্রো ছেলেমেয়ে ঢুকে এলো কামরায়, ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে গেল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝপ করে।

কামরায় তখন আর একজনও শ্বেতাঙ্গ ছিলো না। ট্রেন ভর্তি সব নিগ্রো নারী-পুরুষ আর তাদের তুলনায় একটা ছোটো পোকার মতো শাড়ি পরা আমি এক বাঙালী মেয়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুত ...

পাশে উপবিষ্ট মধ্যবয়সী রমণীটি তাকিয়ে [illegible], [illegible] কোথায় যাচ্ছ?'

আমি কম্পিত স্বরে বললাম, 'এই ট্রেন কোথায় যাচ্ছে?'

'এয়ারপোর্টের কাছাকাছি যাবে।'

'এয়ারপোর্ট' সে তো বহুদূরে।'

'এখন আর বহুদূরে নেই। আসছো কোথা থেকে?'

'চোদ্দো স্ট্রীট থেকে।'

'সে কী! কোথায় যাবে বলে উঠেছিলে?'

'ব্রুকলীন যাবো, বোরোহলে নামবার কথা।'

'বোরোহল?' মোটা গলায় হেসে উঠলো।

'তুমি এখন সেখান থেকে কতো দূরে তা কি জানো?'

আমি ঘামছিলাম, আমার মুখে আর কথা সরছিলো না।

সে ফিসফিস করলো, 'শোনো, যেখানে এসেছ, জায়গাটা ভাল নয়। তুমি সামনের স্টেশনেই নেমে যাও।'

'তারপর?'

তারপর সে অনেক কিছুই বললো যার অর্ধেক কথাই আমি বুঝতে পারলাম না। ওদের কথা বোঝা খুব কঠিন। উচ্চারণ অনেক অন্যরকম। তার উপরে অদ্ভুত একটা টান আছে আর নাকি তো বটেই।

ট্রেন হঠাৎ মাটির তলা ছাড়িয়ে হুশ্‌সে করে আকাশের তলায় উঠে এলো। জায়গাটা যেমন নোংরা, তেমন দুর্গন্ধযুক্ত। একটু পরেই থামলো। থামতেই স্ত্রীলোকটি আমাকে হাতে ধরে উঠিয়ে দরজার কাছে নিয়ে এসে খুব মৃদু এবং দ্রুতস্বরে বললো, 'যাও, যাও শীগ্গির নেমে যাও, সোজা ঢুকে যাও শেডের মধ্যে। একটু হাঁটলেই এসকেলেটর পাবে, গুণে গুণে একেবারে নিচে তিনতলায় স্টেশনে নামবে, মনে রেখো না জেনে খুব খারাপ জায়গায় এসে পড়েছ। যে যাই বলুক কারো কথা শুনবে না, কারো সংগে যাবে না, তিনতলা নেমে ডানদিকে গিয়ে ডানদিকের ট্রেনেই উঠবে, বাঁয়ে নয়। শীগ্গির চলে যাও, সন্ধ্যে হয়ে এলো।

নেমে পড়লাম সেখানে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবারও অবকাশ হলো না, ছেড়ে দিল ট্রেন, তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি কয়েক সেকেন্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। জায়গাটা শুধু সম্পূর্ণ একটা অচেনা জায়গাই নয়। সম্পূর্ণ অচেনা চেহারাও। এ যে কোন মান্ধাতার আমলের আমেরিকা কে জানে। রেললাইনের সীমানার বাইরেই শহরের সড়ক, ধারে ধারে সব পুরাকালের সরু সরু ইঁটের ঘিঞ্জি বাড়ি, প্রত্যেক বাড়িরই ধসে পড়ার মতো চেহারা। কোনো বাড়িতেই রং বা প্লাস্টারের চিহ্ন নেই। হঠাৎ বহুদূর-ব্যাপী এমন একটি প্রাচীন পল্লী দেখে অন্য দেশ বলে ভ্রম হচ্ছিলো। বাড়িগুলো বস্তিবাড়ি নয়, বড়ো বড়ো দোতলা তেতলা। নিশ্চয়ই প্রথম যুগের কোনো সমৃদ্ধ জনপদ এখন নিগ্রোদের উপনিবেশ হয়েছে। সেখানে নিগ্রো ছাড়া একটিও সাদা চামড়ার মানুষ দেখা যাচ্ছিলো না। অদূরের সড়কটি কালো পাথরের মতো ভারি ভারি প্রকান্ড চেহারার মানুষে মানুষে ভর্তি।

বেলা পড়ে এসেছে, কোন বাড়ির পিছনে ডুবে আছে সূর্য, ছাই ছাই রঙ বিকেলের সংগে এই মানুষেরাও যেন ছায়া। মনে হয় কাজকর্ম থেকে ঘরে ফিরছে সবাই। আমি তাড়াতাড়ি কোথায় শেড সেই আশায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে হাঁটতে লাগলাম। স্ত্রীলোকটি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, ভয় ধরলে আর কি ছাড়ানো যায়?

পাওয়া গেল শেড। ঢুকে পড়লাম। এসকেলেটরও পাওয়া গেল। তিন স্তর নেমে আবার ডাইনে কিছু দূর এগিয়ে ট্রেনও পেলাম। এই ট্রেন [illegible] আমাকে নিয়ে আবার কোথায় পৌঁছে দেবে কী করবে, কিছু না জেনেই [illegible] বসলাম। এতোক্ষণে দু-চারজন শ্বেতাংগ স্ত্রী-পুরুষের মুখ দেখা গেল। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনেক আসন খালি ছিলো তবু গিয়ে একজন সুসজ্জিত বৃদ্ধা মহিলার পাশে বসলাম, ট্রেন ছেড়ে দিল।

মহিলাটিকে বললাম, 'আমি পথ ভুল করে এখানে এদিকে এসে পড়েছিলাম, এই ট্রেন এখন কোথায় যাবে?'

মহিলা বললেন, 'এখানে পথ ভুল করে চলে এসেছ? সর্বনাশ। যাবে কোথায়?'

'ব্রুকলীনে থাকি। বোরোহলে নামবো।'

'বোরোহলে যেতে এখানে এসেছ?'

বিপন্ন মুখে চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলা পিঠে হাত দিয়ে আশ্বাস দিলেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আসল ট্রেনে উঠিয়ে দেব।

তা দিলেন। পুরো এক ঘন্টা চলার পরে যে স্টেশন এলো, সেখান থেকে নেমে নম্বর দেখে আমাকে অন্য ট্রেনে চাপিয়ে নিজের ট্রেনে উঠলেন।

বাড়ি ফিরতে রাত আটটা। ভাগ্যিস সেদিন বুদ্ধদেবের রাত্তিরের ক্লাস ছিলো। খেয়ে-দেয়ে তো এক সংগেই বেরিয়েছিলাম। উনি এক ট্রেনে চেপে কলেজে গেলেন, আমি অন্য ট্রেনে চোদ্দো স্ট্রীট। আমার তো ছটার মধ্যেই ফিরে আসার কথা, মাঝখানে কতো কান্ড হয়ে গেল। সেদিন আমি সত্যি খুব ভয় পেয়েছিলাম। পুরোনো আমেরিকা দেখার সাধ্ব জন্মের মতো ঘুচে গিয়েছিলো। বুদ্ধদেব ফিরলেন রাত ন'টায়। আগে ফিরলে ততোক্ষণে বোধ হয় পুলিসে খবর চলে যেতো।

পুরাতন বাংলা গান

রাজ্যেশ্বর মিত্র

যে যুগে বাঙালী গাইয়েরা ধ্রুপদ গানে মুখর সে যুগে বাংলা গান যে ধারায় চলেছে তার গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তার কায়দা, রূপায়ণ, গায়নভঙ্গী এবং আবেদন একেবারেই অন্যরকম। যে ওস্তাদ প্রচণ্ড দাপটে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গাইলেন, তিনিই যখন বাংলা গান গাইতে বসলেন তখন তাঁর ধরনটা পালটে গেল, কণ্ঠ মসৃণ হয়ে গেল, ফুটে উঠতে লাগল টপ্পার দানাদার ফুলকি, একটা ভাবাবেশ যেন তাঁকে মন্ত্রবলে সমাহিত, ধ্যানস্থ করে গেল। অবশ্য, সব সময়েই যে এটা হত তা নয়, এই বছর কুড়ি আগেও এক বাঙালী ধ্রুপদীর মুখে শুনেছিলাম "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে"। এমন মনোহর টপ্পাকেও তিনি যেন দুলে, বাঁটের কররুলোয় ফেলে একেবারে লড়াই করতে লেগে গেলেন। প্রতিবার সমের মুখে এসে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে যেভাবে মেঝের ওপর খোঁচা দিচ্ছিলেন তাতে সিমেন্ট না হয়ে মাটি হলে তাঁর চারপাশ গর্তে গর্তে ছেয়ে যেত নিশ্চয়। তিরিশের দশকে এরকম কয়েকজন গাইয়ে ছিলেন কলকাতায়, যাঁরা প্রচুর পুরাতন বাংলা গান জানতেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও তবলার সঙ্গে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁদের আদর্শ। আসর পণ্ড করবার দরকার হলে লোকে এঁদের ডেকে আনত। কিন্তু, এটা নিতান্তই ব্যতিক্রম। যাঁরা যথার্থ ভাল গাইয়ে ছিলেন, বা বাংলা গান সৃষ্টি করে গেছেন তাঁরা কখনই এভাবে গাইতেন না, কারণ তাহলে উদ্দেশ্য-টাই বিফল হয়ে যেত।

এই উদ্দেশ্যটা যে কী—সেটা বহুদিন ধরে চিন্তা করে এসেছি। হিন্দুস্থানী গান, দরবারী গান—তার গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে সেই ওজনের দৃঢ়তা চাই, স্থৈর্য চাই ; কিন্তু বাংলা গান ঘরোয়া গান—তাকে সমস্ত স্নেহ মমতা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে—এই মনোভাবই হয়তো এই দুই ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। তথাপি বড় বড় আসরে গাইতে বসেও অনেক ওস্তাদ, কেবলমাত্র ধ্রুপদ ধামার গেয়েই ক্ষান্ত হতেন না, দু-চারটে বাংলা টপ্পা বা রঙীন গান শুনিয়ে একটা সুগভীর আত্মতৃপ্তি নিয়ে তাঁদের অনুষ্ঠান শেষ করতেন। গায়কীর এই বেশ খানিকটা প্রভেদে শ্রোতারাও খুশি হতেন, চমৎকৃত হতেন।

হিন্দুস্থানী গানের পাশাপাশি বাংলা গান এইভাবে দুই শতাব্দী ধরে নানা রূপে, রসে, নানান ধারায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় বাংলা গান একটা বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। যদিচ বাংলা গানের ভিত্তি ধ্রুপদ নয়, তথাপি রাগসঙ্গীতের এ যে একটি মনোরম লীলাভূমি সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারা একে এত উৎকৃষ্টভাবে রূপায়িত করলেন এবং এত মনোরম করে তুললেন ? এর উত্তরে বলতে হয় তাঁরাই বাংলা গানকে রমণীয় করবার ভার নিয়েছিলেন, হিন্দুস্থানী গানে যাঁদের পারদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। নিধুবাবু ওস্তাদ হয়ে বাংলা গান রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কালী মীর্জা তো নামকরা ওস্তাদ ছিলেন। রাধামোহন সেন গান গাইতেন না, কিন্তু তাঁর গান যাঁরা গাইতেন তাঁরা রাগসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। শ্রীধর কথক কি রকম গাইতেন, আমরা জানি না, হয়তো তেমন ওস্তাদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গান-গুলিতে রাগসঙ্গীতের নানারকম স্টাইল দেখা যায় যা অপর অনেকের রচনায় দুর্লভ। এটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব যোগ্যতম বাঙালী গায়কেরা যোগ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে যে বাংলা গান রচনা করেছেন তা প্রথম থেকেই পরিণত বা "ম্যাচিওর" রচনা ;—তা গোড়া থেকেই এর [illegible]

এসব গান গাইবার পারদর্শিতা আর কারুর থাকবার কথা নয়। পরিচিত থেকে অপরিচিত বহু রাগরাগিণী বাংলা গানে প্রবেশ করেছে ; তালের [illegible] তাই,—একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, যৎ—এসব তো আছেই, তাছাড়া আছে আড়াঠেকা, যা আজকাল প্রায় অজানা বললে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তখন ছিল প্রায়শই প্রচলিত। আজকাল হলে অধিকাংশ শিল্পী তাল ছাড়াই এ সব গান গাইতেন (অন্তত বেতারে তো বটেই), কিন্তু সেকালে তবলা ছাড়া গাইয়ে একান্ত উপহাসের পাত্র ছিলেন এবং এসব গানই তাঁদের বেশ দক্ষতার সঙ্গে তালে গাইতে হত। আর এ সব গান তালে মজা করে গাইলে সে যে কী অপূর্ব শোনায় তা যাঁরা এসব গান সেভাবে শুনেছেন একমাত্র তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন। পুরাতন বাংলা গানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম। প্রতিটি গানের বাঁধুনি এত নিটোল যে গান যখনই এসে সমে পৌঁছোচ্ছে তখনই মনে হচ্ছে ঠিক এখানে এভাবে শেষ না হলে গানের রসহানি ঘটত। আর, সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে কথা বা কাব্যের দ্যোতনার সঙ্গেই এ সমের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল; সমে পৌঁছোলেই মনে হত কাব্যের অনুপম আবেদন যেন ঠিক তার স্বাভাবিক আকৃতিকে নিয়ে সব চেয়ে অনুকূল সময়ে এসে মর্মে তার আঘাত হেনে গেল। যাঁরা লালচাঁদ বড়ালের "ধিন তা ধিনা পাকা নোনা" জাতীয় গান শুনে বাংলার পুরাতন বাংলা গান সম্বন্ধে ধারণা করেছেন তাঁরা হয়তো ঠিক আন্দাজ করতে পারেননি, কেননা এসব গান পুরাতন বাংলা গানের আদৌ প্রতিনিধিত্ব করে না : কিন্তু তথাপি তান বৈচিত্র্যে তাঁরা মুগ্ধ হবেন নিশ্চয়। লালচাঁদ গানের সেন্টিমেন্টকে সবক্ষেত্রে তেমনভাবে রাখতেন না, কিন্তু তান এবং গিট-কারিতে তিনি অতুলনীয়। তবে, তিনি দ্রুত তানেই বেশী অভ্যস্ত ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যখন "সোহাগে মৃণাল ভুজে" গাইতেন তখন ফুটে উঠত বাংলার চাল, বাংলার সেন্টিমেন্টকে তিনি বহুল পরিমাণে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তাঁর অপূর্ব গানরশৈলীতে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক যিনি পুরাতন বাংলা রাগসঙ্গীতের সুষমাকে বহুধারূপে ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর গানে। তাঁর তানকর্তব ছিল খেয়াল অঙ্গের কিন্তু বিস্তার, লালিত্য, নানারকম টেকনিক ছিল বাংলা গানের। দুই-এর একটা বিচিত্র সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছিলেন তাঁর গানগুলিতে। কয়েক বৎসর পূর্বে কালীপদ পাঠক প্রয়াত হয়েছেন ঠিক আশী বৎসর বয়সে। তাঁর গানের স্টাইল ছিল অত্যন্ত অন্তর্গূঢ়। প্রত্যেকটি বিস্তার তিনি মনো-বিশ্লেষণ করে করতেন, —এই কারণে গানের ভাব-মূর্তি তাঁর গানে যেন রূপ ধরে ফুটে উঠত। করুণ শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস—এ দুটিতেই তাঁর বৈদগ্ধ্য ছিল অসাধারণ। তাঁর সুললিত বিস্তার কখনও গানের ভারসাম্যকে অতিক্রম করত না। যাকে অ্যাকাডেমিকভাবে শেখা বলে তিনি তেমনি-ভাবেই বাংলা গান শিখেছেন—যার যাত্রা, পাঁচালী পর্যন্ত। তালে ছিলেন অসাধারণ পাকা। যে কোনও তালে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে গানের সমস্ত ফর্ম ও বাংলার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে গেয়ে যেতেন। বহু গায়কের তথা গায়িকার গান তিনি শুনেছেন, বহু ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জীবনের একেবারে বাল্যকাল থেকে আশী বৎসর পর্যন্ত অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে কেবল বাংলা গানের আলো-চনা, শিক্ষা ও বিশ্লেষণ নিয়ে কাটিয়ে গেলেন। সঙ্গীতের দিক থেকে এতবড় দেশপ্রেমিক কজন মেলে ?

বাংলার রাগসঙ্গীত যা আমরা ইতিহাসের পট-ভূমিকায় পাচ্ছি তা রামপ্রসাদের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামপ্রসাদ যে কেবল প্রসাদী সুরের স্রষ্টা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন তাই নয়, তিনি রাগসঙ্গীতেও দক্ষ ছিলেন বলে মনে হয়। [illegible]

আসেনি, তাদের চাল সম্পূর্ণ আলাদা। "[illegible] হবে তারা" গানটি এখনও অনেকেই [illegible] পুরাতন সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থাদিতে [illegible] "সিন্ধু" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখনও এটি সিন্ধু কাফিতেই গাওয়া হয়। টপ্পা গাইয়েরা এ-গানটি টপ্পার চালেই গেয়ে আসছেন। এই সিন্ধু-কাফি সুরটি সেকালকার বাংলার একটি অতীব জনপ্রিয় সুর। কত গান যে এই সুরে আছে তা বলা যায় না। এ সব সুরের একটা প্রকৃতিই হয়ে গিয়েছিল যা বাংলার নিজস্ব। অনেকে নিয়মবহির্ভূত শুদ্ধ গান্ধার লাগিয়ে অপূর্ব রসসৃষ্টি করতেন। শ্রীধর কথকের প্রসিদ্ধ গান "যে যাতনা যতনে" কিংবা কালী মীর্জার "আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি", এই দুটিতে শুধু শুদ্ধ গান্ধারই নয়, শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগও বেশ বলিষ্ঠভাবেই দেখা যায়। সব মিলিয়ে চমৎকার ফুটে উঠত সিন্ধু কাফির। কমলাকান্তের "মজিল মন ভ্রমরা" (অধিকাংশ শিল্পী—মজল আমার মন ভ্রমরা গেয়ে থাকেন) এই গানটিও একটি প্রসিদ্ধ সিন্ধু কাফি। এতেও একই স্টাইল দেখা যায়। এ সব গানই বাংলার সুপরিচিত শৈলীতে গাইতে হয়। হিন্দুস্থানী ঢঙে গাইতে গেলেই এর সব রস মাটি হয়ে যাবে। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখি,—অন্যান্য গানের ক্ষেত্রেও এটি খাটে। পুরাতন বাংলা গান সকলে যে সবগুলি একই সুরে গান এমন নয়, অনেক গানে অনেকে সুর পালটে নিজেদের পছন্দমত সুর বসিয়ে গান, কিন্তু কতকগুলি গান আছে, যাদের সুর পালটালে সেটা ঐতিহ্যের প্রতি অবমাননা বলে পরিগণিত হবে; এই প্রচেষ্টা না করাই যুক্তিযুক্ত। ধরা যাক, "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" গানটি যদি কেউ চিরপ্রচলিত খাম্বাজে না গেয়ে বাগেশ্রীতে গান করেন, তাহলে সেটি মেনে নেওয়া কঠিন হবে, এমনটা করাই সঙ্গত নয়। কিন্তু, এমন কোনো কোনো গান আছে, যাতে সুরান্তর আছে; তবে তার গাইবার স্টাইল কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যকেই মেনে চলে। যদি কেউ খাম্বাজে না গেয়ে কোনও গান বেহাগে গান, তাহলে সেই বেহাগও তার পুরাতন ট্র্যাডিশনকেই মেনে চলে, অর্থাৎ পুরাতন বাংলা বেহাগের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করে না। আবার দু-একটি সিন্ধু কাফির উল্লেখ করি যেগুলির কিছু ইতিহাস আছে বা অপর বৈশিষ্ট্য আছে। নিধুবাবুর নামে একটি গান প্রচলিত আছে, সেটি সিন্ধু কাফিতে গাওয়া হয়, যদিও খুব কম শিল্পীই অধুনা এই গানের সঙ্গে পরিচিত। গানটি হচ্ছে :—

> শ্রীমতীর মন মানেতে মগন
> ওখানে এখনো যেওনা
> বিষাদের বাতি জেলেছেন শ্রীমতী
> তাহাতে আহুতি দিওনা।
> নিবেদন করি ফিরে যাও হরি
> দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকোনা
> কত নারীর সঙ্গ, করেছ কি রঙ্গ
> শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁয়োনা।

এমন মধুর সিন্ধু কাফি বেশী শোনা যায় না। কথিত আছে নিধুবাবুর প্রণয়িনী শ্রীমতী বহুদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ফিরলেন বেশ কিছুদিন কাটিয়ে। অথবা, কোনো কারণে শ্রীমতী নিজেকে খণ্ডিতা মনে করেছিলেন। এই রকম কোনো একটি ঘটনায় শ্রীমতীর অভিমানকে উপলক্ষ করে এই গানটি রচিত হয়েছিল। এই রকম আর একটি নিধু-বাবুর গান আছে—"ভাবিতেছিলাম যারে সেই আমি প্রকাশিল" (ঝিঁঝিট খাম্বাজ)। এটিও শ্রীমতীর অভিমানকে অবলম্বন করে রচিত বলে শোনা যায়। কিন্তু "শ্রীমতীর মন মানেতে মগন" গানটি এই লেখকের কাছে নিধুবাবুর রচনা বলে মনে হয় না, কারণ নিধুবাবু ঠিক রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ করে গান লেখেননি। এই গানটি অপর কারুর রচনা বলেই মনে হয়। এই অংশটি রামু-নৃসিংহের পালায় একটি বড় বাঁনিসম্ভাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে একটি দুটি

সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে সত্য উক্তি করা কঠিন ব্যাপার। দাশু রায়ের পাঁচালিতে একটি গান আছে—"ওগো সজনি রাই অপা মায়ার দিয়ে কি ভুবন?"। এর সুরও মোটামুটি সিন্ধু কাফি, কিন্তু "ওগো সজনি" এই অংশটুকু দোলায়িত টপ্পার কোমল ধৈবত ছুঁয়ে যায়। হঠাৎ যেন পিলুতে ঠুংরির আমেজ ফুটে উঠেছে। বরাবরই এই গানটিতে একটু কোমল ধৈবতের স্পর্শ লেগে একে মনোহারিত্ব প্রদান করেছে। তবে পাঁচালি গান হওয়াতে গানটিতে বেশ একটু অতি-নয়ের ঢঙ আছে। সেইটি বজায় রেখেও ক্লাসিক্যাল স্টাইলে এই গানটি বেশ ভাল করেই গাওয়া যায়। ঠুংরির উল্লেখে একটি কথা মনে পড়ে গেল। কোনও কোনও প্রাচীন গায়ককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম টপ্পা-ঠুংরির মিশ্রণে বাংলায় কোনও গান রচিত হয়েছিল কিনা। তাঁরা কেউ-ই এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেননি, যেমন টপ্পার 'সরগম' করার প্রস্তাবে তাঁদের উৎসাহ দেখিনি;—তবে একটি গান শুনেছিলুম যাকে টপ-ঠুংরি বলা যায়। গানটির কথা আমার মনে নেই, প্রথম লাইন—"আমি ভিক্ষেকের তরে তারে দেখেছি সজনি।" অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এই গানটি চমৎকার গাইতেন। এটি তাঁর একটি প্রিয় গান ছিল। গানটি বোধ হয় তেমন প্রাচীন নয়, কারণ গ্রামোফোনে রেকর্ড ছিল। এমন কত গানই আছে। বিনোদিনীর গাওয়া "ধীরে ধীরে কর পার" (বেহাগ-খাম্বাজ) এই রকম একটি চমৎকার গান। এ সব গানের স্টাইল পুরোনো দিনের—এই হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য।

সিন্ধু-খাম্বাজও পুরাতন বাংলা গানে অপ্রচলিত নয়। কিন্তু, এই রাগনির্দেশ নিয়ে অনেক মতভেদ হয়। অধিকাংশ গান টপ্পা হওয়াতে সুরগুলি এমন-ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে তা মিশ্ররাগে আইনকানুনও অনেক সময় মানেনি। যেমন ভৈরবীর ক্ষেত্রে বলা যায়। বাংলায় ভৈরবীতে প্রায়শই শুদ্ধ 'রে' লাগানো হয়েছে, এমনকি শুদ্ধ 'নি'-ও যে বাদ গেছে তা নয়, তথাপি সব মিলিয়ে ভৈরবীর রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। বাংলার পূরবীতে শুদ্ধ ধৈবত লাগানো একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল না বরং সেটাই ছিল স্বাভাবিক; শুদ্ধ মধ্যমও উত্তমভাবে লেগেছে স্থানে স্থানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি পূরবী। গোঁড়া-রীতি শুদ্ধতার দিকে তেমন মনোযোগী হয়নি, কিন্তু আদলটা বজায় রেখে গেছে। সিন্ধু ভৈরবী বলে চিহ্নিত বহু গান প্রচলিত আছে, কিন্তু এর ঠাট সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন ব্যাপার, কেননা অনেক সময় এতে পিলুর আমেজ আসে, আবার অন্তরার দিকে কোন কোনও গানে কালাংড়ার আভাস পাওয়া যায়। এ সব রাগ সম্পর্কে এক একজন এক এক রকম মত পোষণ করেন। বহু গানই কাফি বা সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানাভাবে গাওয়া হয়ে এসেছে যথা, কি করে কলঙ্কে যদি (শ্রীধর কথক), পোড়া লোকে তারে বলে পর (শ্রীধর কথক) দেগো বুন্দে আমায় দে নারী সাজায়ে (রসিক রায়); অন্নদার দ্বারে আমি (দাশুবাবু) ইত্যাদি। শেষের গানটি অর্থাৎ "অন্নদার দ্বারে আমি পাতকী পেতেছে পাত" গানটিকে সিন্ধু কাফি বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। এটি ঝাঁপ-তালে নিবদ্ধ। সুদক্ষ গাইয়েরা এ গানটি গাইবার সময় ঝাঁপতালেও ছোট ছোট বোলতান করতেন। লয় রেখে এই সব গান গাওয়া কঠিন ব্যাপার এবং সঙ্গীতে মুনশীয়ানা না থাকলে এই সব গাইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তবে, আবার বলি, সঙ্গীত গেয়ে দেখাবার বিষয়, বলে বোঝাবার নয় এবং পুরোনো বাংলা গানে বহুক্ষেত্রেই সুরান্তর বর্তমান। দাশুবাবুর যে গানটির উল্লেখ করলুম সেটি হয়তো অনেকে ঝাঁপতালে গান না, এমনকি সিন্ধু কাফিতেও না শিখে থাকতে পারেন—এই লেখক যেভাবে এ সব গান শুনেছেন তিনি কেবল সেইভাবে বিবৃতি দিতে পারেন। কিন্তু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে পুরাতন বাংলা গানে ঝাঁপতাল যথেষ্ট প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই তালে গাইবারও কতকগুলি আর্ট ছিল যা প্রধানত বাংলা গানে দেখা যায়।

খাম্বাজের মত এত জনপ্রিয় রাগ বোধ হয় বাংলার কোনটি ছিল না। একজন প্রবীণ গায়ক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে সারা জীবন খাম্বাজ গেয়েও তিনি এই রাগের কত বৈচিত্র্য আছে তা নির্ধারণ করতে পারেননি। সেকালে যাঁরা বাংলা গান শিখেছেন তাঁরা তিনটি গান অবশ্যই জানতেন—একটি—ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে, দ্বিতীয়—তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এবং তৃতীয়—নন্দিনী বোলো নগরে। তিনটি গানের গাইবার কায়দা একই রকম এবং তিনটিই টপ্পা। সাধারণত খাম্বাজের যে "সরগম" পরিচিত বা বাজনার গৎ-এ যে রীতি দেখা যায়, টপ্পার রীতি সে রকমের নয়। বাংলা টপ্পার সাধারণত খাম্বাজ গান্ধার থেকে আরম্ভ করা হয়, তার পর কিছু টপ্পার কাজ হয়ে সমের ঝোঁকটা পড়ে পঞ্চমে। অতঃপরে ধৈবতে আরোহণ ঘটে এবং কোমল নিষাদকে কেন্দ্র করে টপ্পার দানাগুলি লীলায়িত হয়ে মধ্যম পর্যন্ত নেমে আবার চড়ায় "সা"-র আরোহণ করে খাম্বাজের কায়দায় নামতে থাকে এবং পুনরায় গান্ধারে এসে কিছু জমজমার পর খাদের সা-তে প্রত্যাবর্তন ঘটে। এটি স্থানীয় বিশেষত্ব। অন্তরায় নিষাদ অত্যন্ত তীব্র এবং নিষাদ থেকে সা-তে আরোহণে অনেক কায়দাকানুন দেখা যায়। অনেকে নি-তে একটা সাসপেন্স তৈরি করেন যাতে শ্রোতা সা-তে পৌঁছোবার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করেন। তারপর কোমল নি লাগে তারি সুন্দরভাবে এবং সেটি লাগে বক্রভাবে। খাম্বাজের টপ্পার ধৈবতও বেশ তীব্রভাবেই লাগে কিন্তু অব্যবহিত পরের কোমল নিষাদ ভারি মধুর এবং মোলায়েমভাবে লাগানো হয়। বাংলা টপ্পা আজকাল এত অপ্রচলিত যে তরুণ-সমাজের অনেকে হয়তো এই রীতির সঙ্গে আদৌ পরিচিতই নন। বহুসংখ্যক টপ্পার মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গান মনে পড়ছে—যার বেশ কয়েকটিতে কিছু বিশেষত্ব বর্তমান, যথা—পুজিব পীরিতি প্রেম (নিধুবাবু বা শ্রীধর কথক), বিঁধি দিলে যদি বিরহ

বাতনা (নিধুবাবু বা শ্রীধর); সেই কালোরূপ সদা পড়ে মনে (শ্রীধর কথক), সে কেন রে করে অপ্রণয় (শ্রীধর কথক); আর মালা গাঁথি কি কারণ (গোবিন্দ অধিকারী); ইত্যাদি। এই গানগুলির মধ্যে শ্রীধর রচিত "সেই কালো রূপ সদা পড়ে মনে" গানটির মধ্যে একটি চমৎকার বিশেষত্বের সন্ধান পেয়েছিলুম। সেটি হচ্ছে এই গানে একটি সঞ্চারীর অস্তিত্ব। বাংলা টপ্পায় সঞ্চারীর সন্ধান কদাচিৎ মেলে—যদিচ একাধিক অন্তরার অস্তিত্ব প্রায়ই দেখা যায়। এই সঞ্চারীটিতে ঝিঁঝিটের অংশ প্রবল, অর্থাৎ এক কথায় এই গানটিকে ঝিঁঝিট খাম্বাজ বলা চলে। ঝিঁঝিটের এমন মনোহর প্রয়োগ পুরাতন বাংলা গানের বিরাট ভান্ডারেও দুর্লভ। ঝিঁঝিট বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় রাগ ছিল, প্রায়ই এর নানাবিধ প্রয়োগ দেখা যেত। নিধু-বাবুর "ভাবিতেছিলাম রাত্রে সেই আসি প্রকাশিল", শ্রীধর কথকের "নয়নেরে দোষ কেন", "প্রেম গেলে হাসবে লোকে" ইত্যাদি গানে ঝিঁঝিটের প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের প্রচলিত সপ্তকে গাইতে গেলে খাদের অংশে ঝিঁঝিটের কাজগুলি ভাল করে ফোটানো যায় না বলে অনেকে মধ্যম-কে "সা" করে গাইতেন। এতে অনেক সময় অন্য একটি ধরনের আভাস পাওয়া যেত, কিন্তু ভাল করে শুনলে ঝিঁঝিটের বিশেষ লক্ষণটি সহজেই প্রতিভাত হত—বিশেষ করে খাদের "সানি-ধাপা" বা কেবল মাত্র "পাধাসা" অংশে। বলা বাহুল্য, এই নিষাদটি কোমলনিষাদ। দু-একটি হোলির গান আছে যেগুলিতে খাম্বাজের সঙ্গে ঈষৎ পিলুর ছোঁয়া লেগেছে। উদাহরণস্বরূপ "হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি" (মহারাজ মহতাবচন্দ) গানটির উল্লেখ করা যায়। এক এক সময় এই গানটিকে ঠুংরি অঙ্গের বলে মনে হয়; অন্তত ঠুংরির বেশ কিছু কাজ করার অবকাশ এ গানটিতে আছে; তথাপি এটি টপ্পা বলেই চিহ্নিত। এই গীতিকারেরই আর একটি এই ধরনের গান—"শ্রীহরি খেলিব হোরি আমরা গোপী সকলে।" এই সব চালই আর নেই, তার সঙ্গে নৃত্যছন্দে সেই তালের প্রয়োগও অবলুপ্ত হয়েছে। আরও একটি গান মনে পড়ছে, এঁরই লেখা —"চল সবে বৃন্দাবনে যাই।" এটি সিন্ধুড়ায় গাওয়া হত। একদা এই রাগটির প্রচলন বাংলা দেশে যথেষ্ট ছিল, এখন আর শোনাই যায় না। এর বক্রগতিতে চলন এবং মধ্য-সপ্তক থেকে তারস তকে সংক্রমণ গানে একটা চমৎকার মেজাজ এনে দেয়। এই গানটিতে একটা খেয়ালের ভঙ্গিমা পাওয়া যায় এবং গায়ক ইচ্ছা করলে ঐ ধরনের গানকে খেয়াল করেও গাইতে পারেন। নিছক খাম্বাজের রীতিতেও যে কম পুরোনো বাংলা গান আছে এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ দয়ালচাঁদ মিত্রের রচনা "কি কর কি কর শ্যাম নটবর" গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। *একতালে মধ্যলয়ে অথবা দ্রুত-লয়ে পুরোপুরি খাম্বাজের ঢঙে এই গানটি গাওয়া* যেতে পারে।

প্রধান রাগগুলির মধ্যে একটি রীতিতে খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম, এটি গৌড়মল্লারকে অবলম্বন করে রচিত। এর তালও এমনভাবে বাঁধা যে তাতেও রাগটি যেন বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে। তালটি সাধারণ ত্রিতাল। কিন্তু আড়িতে চলেছে, যার ফলে একটা বিচিত্র দোলনভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য গৌড়মল্লার বলা হলেও মতভেদের অবকাশ আছে, কিন্তু এতে উক্ত রাগের আভাস যে বহুল পরিমাণে পরিস্ফুট এটি অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই রীতির কয়েকটি গান হচ্ছে—'কত ভালবাসি তারে' (শ্রীধর কথক); 'মিলন না হতে সই' (শ্রীধর কথক)। 'কে তোমারে শিখায়েছে এ প্রেম ছলনা' (শ্রীধর কথক)। এক রচয়িতার রচনা অথবা এক গায়কীতে প্রতিফলিত বলেই বোধ হয় তিনটি গানের চলনই এক রকমের। এই গানগুলিও হয়তো অনেকে অন্যান্য রাগে শিখে থাকবেন কিন্তু গৌড়-মল্লারের এই যে ধরনটির কথা বলা হল, এটি বাংলার একটি বিশেষ শ্রেণী বলেই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের কতকগুলি আবেদন আছে যা মল্লার অঙ্গের গানে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তাই প্রতি-সব অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করেছে।

পুরাতন বাংলার একটি জনপ্রিয় রাগ হচ্ছে সুরট-মল্লার। এর সুর একেবারে ফরমুলায় ফেলা, তবে কেউ কেউ দেশ রাগের আভাস একটু বেশী পরিমাণে আনতেন মাধুর্য বাড়াবার জন্য। নীলকণ্ঠ মুখো-পাধ্যায়ের "দে গো মোহন চূড়া বেঁধে" বা "কতদিনে হবে এ প্রেম সঞ্চার" গানগুলি এক সময় খুবই জন-প্রিয় ছিল। কেউ কেউ এ সব গান খুব সাধারণভাবে গেয়ে যেতেন, আবার কেউ কেউ খুব মিষ্টি করেও গাইতেন পারতেন;—তবে এ সব গানে তেমন তান বিস্তার করতে প্রায়ই দেখা যেত না। যাত্রা, পাঁচালির গানে সুরটমল্লার একটু বেশী দেখা যেত। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে একটি বিশেষত্বসম্পন্ন সুরটমল্লার ছিল—"বল দেখি রে শুকশারী তোরা তো কুঞ্জেতে ছিলি"—গানটি ঝাঁপতালে একটি কাতর আবেদন ফুটিয়ে তুলত। এই ধরনের গানের গায়কী অন্য রকম। একটা অভিনয়ের ভাব থাকার জন্য ঠিক রাগসঙ্গীতের ভঙ্গিতে এ সব গান গাওয়া হত না, কিন্তু রাগের রূপ বা রস তাতে যে ব্যাহত হত এমন নয়। পুরোনো বাংলা গানে রাগসঙ্গীতে প্রায়ই এ রকম নাটকীয় ভঙ্গী দেখা যায়, যাতে সাবজেকটিভের চেয়ে অবজেকটিভ প্রকাশই অধিক পরিমাণে ঘটেছে। দাশু রায়ের পাঁচালিরই একটি বিখ্যাত গান—"ঐ দেখ আসছে আয়ান বংশীবয়ান কুঞ্জ মাঝে"; গানটির মূল সুর কালেংড়া, কিন্তু গানটি যখন শ্রোতারা শোনেন তখন কালেংড়া অথবা অন্য কোন সুরের মিশ্রণ হয়েছে সেটি জানতে ইচ্ছে করে না, কেবল গানের ভঙ্গীটি উপভোগ করতে ইচ্ছে করে। গোপাল উড়ের যাত্রার বহুবিধ কালেংড়া সম্পর্কেও একটা কথা বলা যায়।

বাংলার পুরোনো গানে পিলু এবং পিলু বারোঁয়া বেশ কিছু পাওয়া যায়। এই সুরটি প্রধানত সেকালে সানাইওয়ালারা বাজাতো বেশ মিষ্টি করে। এই ধরনের একটি সুন্দর গান শুনেছিলাম—"স্বপনে তাঁহার মনে হইল মিলন"। এটিকে পিলুখাম্বাজ বলাই বোধ হয় উচিত হবে। গানটি লিখেছিলেন সাতুবাবু (আশুতোষ দেব)। এঁর কয়েকটি রচনা শিল্পীমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সব গানে বেশ খানিকটা ঠুংরির ছায়াপাত ঘটেছে। অতুল-প্রসাদ সেনের বিখ্যাত গান "কে আবার বাজায় বাঁশী" বা "ওগো আমার নবীন শাখি" কিছু সংখ্যক পুরাতন বাংলা গানের সুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের প্রধান কবি-সুরকারদের মধ্যে অতুলপ্রসাদের রচনায় পুরাতন বাংলা গানের অনেক স্টাইল পাওয়া যায়। ঠিক এমনটি আর কারুর গানে দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর "যাব না যাব না যাব না ঘরে"—*এই গানের ধরনও আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতে দুর্লভ নয়।* একবার প্রখ্যাত টপ্পা-গায়ক কালীপদ পাঠক এই লেখককে বলেছিলেন যে তিনি লখনউয়ে সেন মহাশয়কে কিছু প্রাচীন বাংলা গান শুনিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন তিনি ওই সব ধরনের পুরোনো বাংলা গান এর আগে আর শোনেননি। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, বহুশ্রুত না হলে বাংলা গানের কতিপয় পুরাতন শৈলী তাঁর গানে এল কি করে? তবে কি এক সময় বাংলা গানে উত্তর ভারতীয় পূর্বী ঢঙের বিচিত্র রীতিনীতির প্রভাব পড়েছিল? হয়তো হয়ে থাকবে কিন্তু কিভাবে তা সম্পাদিত হয়েছিল তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। যাই হোক অতুলপ্রসাদের বহু গানের সঙ্গে পুরাতন বাংলা গানের বেশ কিছু টেকনিকের মিল আছে—এমনকি সে ক্ষেত্রে "সফিস্টিকেশন" পর্যন্ত আছে বলে মনে হয় না। তিনি পুরোনো বাংলা গানের সঙ্গে গভীরভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে যে পরি-চিত ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই মনে হয়।

বাংলায় ব্যবহৃত বহু রাগের মধ্যে বেহাগের প্রয়োগ অতুলনীয়। বাংলার বেহাগে কোমল নি প্রায় সব গানেই লাগতে দেখা যায় এবং খাদের দিকে

… … … … পাচ্ছে এর ব্যতিক্রম হয়নি। একদা এই গানটি গায়ক-মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্য কেউ যদি গোঁড়া নিয়মে এ সব গান গেয়ে থাকেন তাহলে বলবার কিছু নেই, কিন্তু আগের রীতিটি ছিল সাধারণ চলন। কালী মীর্জা রচিত "এমন নয়নবাণ কে তোমায় করেছে দান" গানটি খেয়ালের রীতিতে বেহাগে গাইতে শুনেছি। এতে কোমল নি-র প্রয়োগ ছিল না। অধুনা প্রচলিত বেহাগের ঢঙেই এই গানটি গাওয়া হত। একাধিক সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থে এই গানটির সুর "সিন্ধু ভৈরবী" দেওয়া আছে। হয়তো এর সুরান্তরও ছিল। বাংলায় পুরোনো বেহাগে দুই মধ্যমের ব্যবহারই দেখেছি কেবল মাত্র শুদ্ধ মধ্যম প্রয়োগে গাইতে বড় একটা শুনিনি। শ্রীধর কথকের দুটি বিখ্যাত বেহাগ আছে, একটি "সখি আমায় ধর ধর" অপরটি "করি কি উপায়"। প্রথমোক্ত গানটি মেলডির দিক থেকে চমৎকার। এতে সঞ্চারী বর্তমান। দ্বিতীয়টি এমনভাবে গাওয়া হয়েছে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কথকতার মধ্যে একটি বিশেষ ভাব ফোটাবার জন্য এটিতে সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। এর সঞ্চারী অংশটিও খুব মধুর লাগে। এ সব গানই কিন্তু পুরোপুরি কাব্যসংগীত, এগুলিতে রাগ সংগীতের রীতিতে তানকর্তবের একটু বেশী পরিমাণে করলে রসহানি ঘটবার সম্ভাবনা। সাতুবাবুর রচিত "হেরিব না কালো বরণ" গানটির মত মনোহর বেহাগ পুরাতন বাংলা গানে খুব কমই আছে। এতে দুটি অন্তরা বর্তমান, সঞ্চারী নেই, কিন্তু ভাল করে গাইতে পারলে এতে এত অপূর্ব করুণ রসের সঞ্চার করা যায় যে শ্রোতার চোখ অশ্রুতে বিগলিত হয়ে ওঠে। বেহাগ খাম্বাজের নিদর্শনও কম নেই এবং এই মিশ্র রাগটিও শিল্পীদের খুব প্রিয় ছিল।

ভূপালীতে কালী মীর্জার একটি বিখ্যাত গান শোনা যেত—"বিপিনে বাজে বাঁশরি"। কোনো কোনো বইতে এর সুর দেওয়া আছে ভৈরোঁ; কিন্তু এই সুরে এই গানটি কাউকে গাইতে শুনিনি। এটিও খেয়ালের ঢঙে বাঁধা এবং বাংলা খেয়ালের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে এ গানটি শোনবার সময় এই লেখকের মনে হয়েছে এটিতে যেন বিভাসের রূপটিই বেশী করে প্রতিভাত হয়েছে। বিভাস বলে পরিচিত করলেও হয়তো এর রসহানির সম্ভাবনা নেই। বাংলার বিভাস একটি বিচিত্র রূপ। এর আরোহণ অবরোহণ অনেক সময় ঠিক ভূপালীর মতই; আবার অবরোহণে নিখাদ লাগাবার রীতিও যথেষ্ট প্রচলিত। এর একটা গায়ন-ভঙ্গী আছে যাতে একটা লোকসঙ্গীতের আভাস ফুটে ওঠে, যেমন নীলকণ্ঠ রচিত—"তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে" গানটি। বহু আগমনীর গান বিভাসে গাওয়া হত। বাঙালী শিল্পীরা এই রাগটি এমনভাবে রূপায়িত করতেন যাতে কল্যাণ অঙ্গের ভূপালীর প্রভাব এর ওপর লক্ষিত হত না এবং সান্ধ্য আভাসের বদলে একটা রোদে ঝলমল প্রভাতের আভাসই ফুটে উঠত। এই রাগের গায়কী আজ আর বাঙালী গায়কদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না বললে অত্যুক্তি হয় না। এটুকু লিখেই মনে পড়ল যাত্রাওয়ালা বদন অধিকারীর গান—"শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কেন দাওনা"। এ গানটি যখন বিভাসে গাইতে শুনি তখন অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এর একটি অনুপম সঞ্চারীও ছিল। যাত্রার প্রয়োজনেই গানটি রচিত হয়েছিল বোঝা যায়, কিন্তু সুরকার যে বিভাসেরও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এতে রেখে গেছেন তা হয়তো তিনি নিজেও ততটা বোঝেননি। আজ এ যুগে যখন এই সব প্রাচীন সুর বা গায়কীর বিশ্লেষণ করা যায় তখন বোঝা যায় কত মানবিক আবেদনে পূর্ণ ছিল এই সব অতিনরে প্রযুক্ত গান। এ গানেরও সুরান্তর আছে বলে শুনেছি, কিন্তু সেটি কারুর কাছে শুনিনি।

ভৈরবীর কথা বোধ করি বিশেষভাবে বলাই বাহুল্য। তাবৎ গীতিকারই বোধ হয় ভৈরবীতে কিছু না কিছু গান রচনা করে গেছেন। কিন্তু বাংলায় ভৈরবী একেবারেই গোঁড়াভাবে চলে না, বিশেষ … … … … … লেগেছে শুদ্ধ রে-র প্রয়োগ তো যত্রতত্র দেখা গেছে। সাতুবাবুর রচিত "নয়নে আমার বিঁধি" গানটি ভৈরবীতে শুনেছি: যাঁর কাছে শুনেছি তিনি খাদের দিকে একটি চমৎকার অলংকার সহযোগে শুদ্ধ রে-র প্রয়োগ করতেন। বাংলায় এটি একটি বিশিষ্ট গায়কী। রবীন্দ্রনাথ ভৈরবী সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কত গানে কত রকমে তিনি ভৈরবীর চমকপ্রদ নিদর্শন রেখে গেছেন। যখন নিজে গাইতেন তখন ছোট ছোট টপ্পার দানায় ভৈরবীর অপূর্ব কাজগুলি ফুটিয়ে তুলতেন।—বিশেষ করে, তাঁর মধ্যম এবং কোমল গান্ধারের আন্দোলনের সঙ্গে কোমল রেখাব ছুঁয়ে সা-তে আসা—শুনলে রোমাঞ্চ জেগে উঠত। ভৈরবী ছাড়া জৌনপুরী, আশাবরী—এই দুটি রাগেও বেশ কিছু গান এক সময় রচিত হয়েছে। নিধুবাবুর একটি গান আছে—"আমার নয়ন মানে না—মন বুঝালে কি হবে সই।" এ গান একাধিক সুরে গাওয়া হয়েছে। এই লেখক যাঁর কাছে শুনেছেন তিনি এ গানটিতে জৌনপুরীকে প্রধান রেখে ভৈরবী মিশিয়েছেন। এই মিশ্রণটি একটি অপূর্ব জৌন-পুরী-ভৈরবীর নিদর্শন। গানটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল টপ্পার সঙ্গে কয়েকটি অসামান্য মীড়ের কাজ। টপ্পার তান এবং মীড় ঠিক হাত ধরাধরি করে চলে না কিন্তু এ গানে তার একটা সার্থক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই সব বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বাংলা গানের বিচিত্র টাইপ। ভৈরোঁ রাগে কমলা-কান্তের—"জাননা রে মন পরম কারণ" একটি চমকপ্রদ সৃষ্টি। প্রায় ধ্রুপদের মত গম্ভীর চালে গানটি চলেছে তার অপূর্ব প্রশান্তি নিয়ে। এতে কোমল নি-র প্রয়োগ আছে। ভৈরোঁতে কোমল নি অনেকেই একটু আধটু লাগিয়ে থাকেন তার আবেদনটি অক্ষুণ্ণ রেখে। ঠিক এই গানের মত আর একটি রচনা পুরাতন বাংলা গানে খুব অল্পই মেলে। পরবর্তীকালে কালী-কীর্তনে ধ্রুপদাঙ্গ অথবা বেশ গম্ভীর চালের গান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি বাংলার শিল্পী-মহলে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

পুরাতন বাংলার আর একটি বিশিষ্ট রাগ হচ্ছে ভীমপলশ্রী যাকে অনেক বইতে মুলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রসিক রায় রচিত "আর মা সাধন সময়ে" বা 'কি হবে কি হবে ভবরাণী ভবে' আজও অনেকে গেয়ে থাকেন। রাধামোহন সেন একটি গান লিখেছিলেন—"কেন ভুরু ধনু টানো হানিবে কি বাণ?"—এটিকে ভীমপলশ্রী রাগে মধ্যলয়ে খেয়ালের ঢঙে গাইতে শুনেছি, রীতিনীতি প্রায় আজকালকার মতই, তবে গায়কীতে একটু প্রাচীনত্বের ছাপ ছিল এই যা। এই ধরনের গানগুলি কিন্তু আজও যাঁরা রাগপ্রধান গান করেন, তাঁরা অনায়াসে করতে পারেন।

আমাদের সংগীতে আজকে যেমন গানের রূপায়ণ সম্বন্ধে সচেতনতা এসেছে, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তা ছিল না; শিল্পীরা অনেক সময় প্রচলিত সুরের পরিবর্তন করেছেন এবং গায়কীতেও পরিবর্তন এনেছেন। এর ফলে বিকৃতি কম ঘটেনি। একাধিক গ্রন্থে প্রচুর পরিশ্রম সহকারে এইরকম সঙ্কলনের প্রয়াস দেখা যায়। এ সম্পর্কেও অনেকের অভিযোগ—এই সব সংগ্রহ গ্রন্থে অনেক সময় সম্পাদনার ভ্রম বা ছাপার ভুলে বহু গোলমাল থেকে গেছে। অনেক সময়, এক গানের সুর, তাল, আর এক গানের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু গানের মূল রচয়িতা কে, এ নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়ে এসেছে। যদি আমাদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতশিক্ষার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হত তাহলে কেউ কেউ হয়ত প্রাচীন বাংলা গানের বিশিষ্ট রীতিনীতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমাদের সংগীতের ক্লাসিকাল যুগ যাতে অবহেলিত না হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কার্যধারা অবলম্বন করতেন। সেক্ষেত্রেই হয়ত পুরাতন গানে সেই পুরোনো স্টাইলকে আমরা কতকাংশে পেতুম, যাকে তালগারিটি আবিল করেনি এবং যার একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বর্তমান।

কষ্টকল্পিত
অতুল্য ঘোষ

॥ ৬৬ ॥

১৯৪৭এর ১৫ অগাস্ট দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের সামনে দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা বিরাট হয়ে দেখা দেয়। এক দিকে ভারতবর্ষ ভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যা, তার উপরে আবার কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণ। আরও পরে নিজাম হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে স্বাধীন করার হুমকি দিয়েছিলেন। অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে নেহরু সরকার দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হন। ছায়া ক্যাবিনেট গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য একটি দপ্তর হয়। ভারতবর্ষের অবস্থা খুব জটিল। ভৌগোলিক ভারতবর্ষের প্রায় ৬০০টি অঞ্চল প্রশাসনিক ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত নয়। দেশীয় রাজ্য দপ্তরের ভার নেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি ১৯৪৭-এর ৩ জুলাই এক বিবৃতি দেন:

'It is the lesson of history that it was owing to her political fragmented condition and our inability to make a united stand that India succumbed to successive waves of invaders. Our mutual conflicts, and internecine quarrels and jealousies have in the past been the cause of our downfall and our falling victims to foreign domination a number of times. We cannot afford to fall into those errors or traps again. We are on the threshold of independence. It is true that we have not been able to preserve the unity of the country entirely unimpaired in the final stage. To the bitter disappointment and sorrow of many of us some parts have chosen to go out of India and to set up their own government. But there can be no question that despite this separation a fundamental homogeneity of culture and sentiment reinforced by the compulsive logic of mutual interests would continue to govern us. Much more would this be the case with that vast majority of states which owing to their geographical contiguity and indissoluble ties, economic, cultural and political, must continue to maintain relations of mutual friendship and co-operation with the rest of India. The safety and preservation of these states as well as of India demand unity and mutual cooperation between its different parts.

'When the British established their rule in India they evolved the doctrine of paramountcy which established the supremacy of British interests. That doctrine has remained undefined to this day, but in its exercise there has undoubtedly been more sub-ordination than co-operation. Outside the field of paramountcy there has been a very wide scope in which relations between British India and the states have been regulated by enlightened mutual interests. Now that British rule is ending, the demand has been made that the states should regain their independence. In so far as paramountcy embodied the submission of states to foreign will, I have every sympathy with this demand, but I do not think it can be their desire to utilise this freedom from domination in a manner which is injurious to the common interests of India or which initiates against the ultimate paramountcy of popular interests and welfare or which might result in the abandonment of that mutually useful relationship that has developed between British India and Indian states during the last century. This has been amply demonstrated by the fact that a great majority of Indian states have already come into the constituent Assembly. To those who have not done so, I appeal that they should join now.'

[White paper on Indian states.—1950, Page—157, 158].

সর্দারের পরিষ্কার, প্রাঞ্জল বিবৃতি: কোনও গোঁজামিল নেই। ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে ভারতবর্ষ টুকরো-টুকরোভাবে ছিল বলে বারবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত ও পদানত হয়েছে। আমাদের নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা আমাদের পতন ঘটিয়েছে এবং বিদেশীর অধীন করেছে। সেই ভুল আর আমরা করতে পারি না। দেশীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও সান্নিধ্য এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তাদের বহু শত বৎসরের যে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে, তা আমাদের বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এইসব দেশীয় রাজ্যের নিরাপত্তা ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সর্দারের বক্তৃতা কেবলমাত্র একজন মন্ত্রীর বক্তৃতা নয়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক সীমানা আবার যাতে টুকরো টুকরো না হয়, সেই দিকে দেশীয় রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বক্তৃতা। সর্দারের এ বক্তৃতায় কাজ হয়। সুখের বিষয় যে, রাজন্যবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা হয়তো মনোভাব ভাল করে প্রকাশ করতে পারতেন না, যদি সে সময়ে সর্দারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সাহায্য না পেতেন।

সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কময় স্বীকৃতিতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ হল। সেখানে ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা অসহায়ের মতন। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার আর দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার বিরুদ্ধে সঙ্কল্পবদ্ধ। দু'ভাবে বাধা দেওয়া যায়; এক বুঝিয়ে, পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে; আর এক সামরিক শক্তিতে। বিসমার্ক সামরিক শক্তির সুযোগ পেয়েছিলেন। সর্দার সেদিক দিয়ে যান নি। জোর করে রাজন্যবর্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টায় সাফল্য হয়তো হত: কিন্তু যে রক্তক্ষয় ও অশান্তি হত, তার মূল্য ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন ধরে দিতে হত। যদিও কোনও কোনও বৃহৎ দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার কবরার প্রবৃত্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেরই মত পাওয়া যায়। ১৯৪৭এর ১৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সর্দার একটি বিবৃতি দেন। তার মধ্যে আছে:

'In the world of today where distances are fast shrinking and masses are being gradually brought into touch with latest administrative amenities it is impossible to postpone for a day longer than necessary the introduction of measures which would make the people realise that their progress is also proceeding at least on the lines of their neighbouring areas. Delays inevitably lead to discontent, which in its turn results in lawlessness; the use of force may for a time check the popular urge for reform, but it can never succeed in eradicating it altogether. Indeed, in many of states with which I had to hold discussions during the last two days large-scale unrest had already gripped the people; in others the rumblings of the storm were being heard. In such circumstances, after careful and anxious thought, I came to the conclusion that for smaller states of this type placed in circumstances which I have described above, there was no alternative to integration and democratisation.'

[White papers on Indian state, 1950. Page—175].

সর্দারের এ বক্তৃতার ফলে কাজ অনেক দূর এগুলো। এখন যাকে রাজস্থান বলা হয়, আগে তাকে বলা হত 'রাজপুতানা'। দক্ষিণ-পূর্ব রাজপুতানার বাঁশোয়ারা, বুন্দি, ডোঙ্গারপুর, ঝালাওয়ার, কিষেণগড়, কোটা, প্রতাপগড়, শাহাপুরা এবং টঙ্ক নিয়ে প্রথম রাজস্থান Union গঠিত হয় ১৯৪৮এর ২৫ মার্চ ...

মেবারও যুক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ১৮ এপ্রিল ১৯৪৮এ বর্ধিত রাজস্থান Union-এর উদ্বোধন করেন। তারপরে গোটা রাজস্থান নিয়ে ৩০ মার্চ, ১৯৪৯ সালে বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজ্যও ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হতে আরম্ভ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যভাতা ও দেশীয় রাজাদের বিভিন্ন সুবিধাদানের ব্যবস্থাও হয়। যখন রাজন্যভাতা এবং সুবিধার (privileges) জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে রাজন্যবর্গের চুক্তি হয়, তখন এই চুক্তির নৈতিক দিক সম্বন্ধে ভারত সরকার সচেতন ছিলেন। এই বিষয় সম্বন্ধে 'moral aspects of treaties' শিরোনামায় White paper on Indian state, 1950' ১০৪ পৃষ্ঠার ২৪৯ পরিচ্ছেদে আছে :

'It is a recognised principle of International law that the treaties for the duration of whose obligations no special period is fixed, are not to be understood as binding the contracting powers in the event of some material change in the conditions with reference to which they were concluded. An essential change of conditions—the term includes not only material but also moral facts—necessarily involves the obsolescence of treaty obligations.'

Coupland has admirably summed up the position as follows :

'The law can only take account of usage and sufferance, but there is also a moral proviso which is insusceptible of legal definition. No undertaking can be rightly interpreted without weighing the effect of lapse of time and change of circumstance. It is not only a question of material factors : it is also a question of morals. No compact can endure when, owing to the evolution of ideas, it has ceased to square with *general conceptions* of right and wrong. In this sense "rebus sic stantibus" is the implicit condition of every treaty. And certainly things no longer *stand in India* as they stood when most of the treaties were made.'

Coupland has further emphasised that 'no compact can endure when, owing to the evolution of ideas, it has ceased to square with general conceptions right and wrong'.

সবসুদ্ধ মোট ২৮১টি রাজ্য privy purse ও privileges-এর অধিকারী হয়। মোট টাকার পরিমাণ ছিল ৫,৫৪১৩,১৯১। সবচেয়ে বেশী পেতেন হায়দ্রাবাদের নিজাম—৫০ লক্ষ টাকা ; আর সবচেয়ে কম গুজরাটের Katodia নামক রাজা—বছরে ১৯২ টাকা। নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি ১০ লক্ষ অথবা তার বেশী ভাতা পেতেন।

১। হায়দ্রাবাদ—৫০ লক্ষ
২। বরোদা—২৬ লক্ষ ৫০ হাজার
৩। মহীশুর—২৬ লক্ষ
৪। গোয়ালিয়র—২৫ লক্ষ
৫। জয়পুর—১৮ লক্ষ
৬। ত্রিবাঙ্কুর—১৮ লক্ষ
৭। যোধপুর—১৭ লক্ষ ৫০ হাজার
৮। বিকানীর—১৭ লক্ষ
৯। পাতিয়ালা—১৭ লক্ষ
১০। ইন্দোর—১৬ লক্ষ
১১। ভূপাল—১১ লক্ষ
১২। মেবার—১০ লক্ষ
১৩। নবনগর—১০ লক্ষ
১৪। ভবনগর—১০ লক্ষ
১৫। রেওয়া—১০ লক্ষ
১৬। কোলাপুর—১০ লক্ষ

আর ৫ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ পেতেন ৮৬ জন। ১ লাখের নীচে ১৭৯ জন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কুচবিহার পেতেন সাড়ে আট লক্ষ টাকা। আর যেসব privileges ছিল তার উল্লেখ না করাই ভাল ; যার Electric Tax, Water Tax এসবও ছিল।

বর্তমানে রাজন্যভাতা ও privileges অতীত ইতিহাসের একটা অধ্যায়। কিন্তু যে অবস্থায় এইসব প্রবর্তিত হয়েছিল, সে অবস্থার কথা বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে সর্দারের মানসিক দৃঢ়তা ও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ভারতবর্ষ আবার টুকরো টুকরো হয়ে অশান্তিতে ডুবে যায় নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষের প্রশাসনে সর্দারের অবদানের এখনও সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। সর্দার, যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের ৪৭ শতাংশ (দেশীয় রাজ্য) বিনা রক্তপাতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। পৃথিবীর আর কোনও রাষ্ট্রনায়ক আজ অবধি এ কাজ করতে সক্ষম হননি।

কমনওয়েলথ গেমস ও ভারত

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা অত্যন্ত প্রকট বলেই সম্ভবত এডমণ্টন কমনওয়েলথ গেমসে পনেরোটি পদক প্রাপ্তিকে অভিনন্দিত করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ধাম্মা সিং গালসান। এই সাফল্যে সামগ্রিকভাবে খুশিরও হয়তো কারণ আছে। কিন্তু চার বছর আগে ক্রাইস্টচার্চ কমনওয়েলথ গেমস থেকে ভারতের কুড়িজন প্রতিযোগী যখন পনেরোটি পদক নিয়ে এসেছিল তখন এডমণ্টন থেকে ৪৪ জন প্রতিযোগীর ভারত দলের পনেরোটি পদক লাভ কি উন্নতির পরিচয়? সংখ্যানুপাতে বেশি পদক পাওয়াই উচিত ছিল। পনেরোটি পদকের নয়টিই কুস্তিতে। ভারতের দশজন কুস্তিগীর পেয়েছে নয়টি পদক। ক্রাইস্টচার্চে দশজনই দশটি পদক গলায় ঝুলিয়েছিল। পদক তালিকায় ভারতের কুড়িজনের দল ক্রাইস্টচার্চে ছিল ষষ্ঠ স্থানে। এবার ৪৪ জনের দলও আছে ষষ্ঠ স্থানে।

তবে একটু আশার কথা, এতকাল কমনওয়েলথ গেমস থেকে আহরিত মোট ১৪টি সোনার মধ্যে ১৩টিই সংগ্রহ করেছিল কুস্তিগীররা, একটি মাত্র পেয়েছিলেন অ্যাথলীট মিলখা সিং, ১৯৫৮র কার্ডিফে। এবার কুস্তিগীরদের তিনটি সোনা ছাড়া দুটি এসেছে ভারোত্তোলন ও ব্যাডমিণ্টন থেকে। ভারোত্তোলন বা ব্যাডমিণ্টনে ভারত আগে সোনা জেতেনি। ভারতের কোন্ প্রতিযোগী কোন্ ইভেণ্টে, কোন্ পদক পেয়েছে নীচে সেই তালিকাটি দেওয়া হল।

ব্যাডমিণ্টন	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
প্রকাশ পাড়ুকোন	১	×	×
অমি ঘিয়া ও কানোয়ালঠাকুর সিং	×	×	১
ভারোত্তোলন			
ই করুণাকরণ (ফ্লাই)	১	×	×
তামিল সেলভান (ব্যাণ্টাম)	×	১	×
অ্যাথলেটিক			
সুরেশবাবু (লং জাম্প)	×	×	১
বক্সিং			
বীরেন্দ্রসিং থাপা (লাইট ফ্লাই)	×	×	১
কুস্তি			
অশোককুমার (লাইট ফ্লাই)	১	×	×
সৎবীর সিং (ব্যাণ্টাম)	১	×	×
রাজিন্দার সিং (ওয়েল্টার)	১	×	×
সুদেশ কুমার (ফ্লাই)	×	১	×
জাগমিন্দার সিং (ফেদার)	×	১	×
সৎপাল সিং (হেভি)	×	১	×
জগদীশ কুমার (লাইট)	×	×	১
করতার সিং (লাইট হেভি)	×	×	১
ঈশ্বর সিং (সুপার হেভি)	×	×	১
মোট : সোনা ৫, রুপো ৪, ব্রোঞ্জ ৬ = ১৫			

উপরের এই তালিকায় যে বিষয়গুলিতে ভারত পদক পেয়েছে সেই বিষয় ছাড়াও অংশ নিয়েছিল শ্যুটিং, জিমন্যাস্টিকস, সাইক্লিং ও ডাইভিংয়ে। এডমণ্টনে প্রতিযোগিতা হয়েছে ১০ রকমের খেলাধুলায়। সাঁতার এবং বোলসে ভারত প্রতিযোগী পাঠায় নি। জিমন্যাস্টিকসে ভারত এবারই প্রথম প্রতিযোগী পাঠিয়েছিল। বলা হয়েছিল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জিমন্যাস্টিকদের পাঠান হচ্ছে। একই কারণে পাঠানো হচ্ছে বড় দল। কোনবারই ভারত এত বড় দল পাঠায়নি। তাই লিখেছি, সংখ্যানুপাতে ক্রাইস্টচার্চের চেয়ে এডমণ্টনে বেশি পদক পাওয়া উচিত ছিল।

কমনওয়েলথ গেমসে ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন

হয়তো পাওয়া সম্ভবও ছিল। কোচদের ভুলে আমরা তিন চারটি পদক হারিয়েছি। ভারোত্তোলন থেকেই আসতে পারত আরো তিনটি পদক, একটি সোনা সহ।

ব্যাণ্টমওয়েটে তামিল সেলভান রুপোর পদক পেয়েছে স্বর্ণজয়ী নিউজিল্যাণ্ডের প্রেসিরাজ ম্যাকেঞ্জির সংগে সমান ভার তুলে। দুজনেই মোট ভার তোলে ২২০ কিলোগ্রাম। সেলভানের দেহের ওজন মাত্র ৭০০ গ্রাম বেশি থাকায় তাকে দেওয়া হয় দ্বিতীয় স্থান। কিন্তু কোচ জে পি তেলাংগের ভুলেই তামিলনাড়ুর ২১ বছর বয়সী ভারোত্তোলক সেলভান তার জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সোনার পদক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্ন্যাচে সেলভান তোলে ১০৫ কিলোগ্রাম, ম্যাকেঞ্জি তোলে ৯৭·৫ কিলোগ্রাম—সেলভানের চেয়ে সাড়ে ৭ কিলোগ্রাম কম। জার্কে সেলভান তোলে ১১৫, ম্যাকেঞ্জি ১২২·৫ কিলোগ্রাম। সেলভানকে তখন কোচ ১২২·৫ কিলো তুলতে বলেন। কাঁধ পর্যন্ত তুলে আর মাথার উপরে তুলতে পারেনি। কিন্তু কোচ যদি এক লাফে সাড়ে ৭ কিলো ওজন না বাড়িয়ে মাত্র আড়াই কিলো ওজন বাড়াতেন তাহলে সেলভান নিশ্চয়ই তুলতে পারত এবং নিশ্চয়ই সোনা জিতত।

শুধু সেলভানের ক্ষেত্রেই নয়, কোচের একই ধরনের ভুলে ফ্লাইয়ে অনিল পাল এবং ব্যাণ্টামে অনিল মণ্ডল ব্রোঞ্জ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দুজনেই পেয়েছে চতুর্থ স্থান। উল্লেখ্য, সেলভানের মত ফ্লাইয়ে স্বর্ণজয়ী এগাথুর করুণাকরণ এবং অনিল পালেরও এই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা।

ক্রাইস্টচার্চেও কুস্তিগীর রাধেশ্যাম স্বর্ণপদক থেকে বঞ্চিত হয়েছিল কোচের দূরদৃষ্টির অভাবে। ফ্লাই ওয়েটের সেমিফাইনালে ওঠার পর রাধেশ্যাম ফাইনালে লড়তেই পারেনি দেহের ওজন মাত্র দুই গ্রাম বেশি হওয়ায়। প্রথমবার দেহের ওজন নেবার পর দেখা যায়, ফ্লাইয়ের নির্দিষ্ট ওজন থেকে রাধেশ্যামের ওজন মাত্র ১০ গ্রাম বেশি। তখন সে তাড়াতাড়ি চুল ছেঁটে ফেলে আবার ওজনের জন্য স্কেলের উপর দাঁড়ায়। এবার বেশি হয় মাত্র দুই গ্রাম। চুল ছাঁটার ফলে ৬ গ্রাম কমল। আর দুই গ্রাম কি কমানো যেত না, আগে থাকা [illegible]

ভারোত্তোলনে স্বর্ণপদক বিজয়ী এগাথুর [illegible]

কানে শুনে স্থির করুন আপনার কোনটি চাই !

এইচ এম ভি স্টিরিও ১০১০ এবং স্টিরিও পপুলার II

এইচ এম ভি-র ধ্বনি বিশেষজ্ঞরা তাঁদের স্টিরিও সম্ভার থেকে দুটি নিখুঁত স্টিরিও আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন। কাছাকাছি কোন এইচ এম ভি ডীলারের দোকানে ঢুকে স্টিরিও ১০১০ এবং স্টিরিও পপুলার II বাজিয়ে শুনে নিন—তারপরে স্থির করুন কোনটি নেবেন।

এইচ এম ভি স্টিরিও পপুলার II

স্পীকার এনক্লোজারের অপূর্ব গড়ণ, চমৎকার রোজউডের ক্যাবিনেট, নয়নাভিরাম রূপোলী ট্রিমযুক্ত, হালকা রঙের ঢাকনা এবং একেবারে হালফিল সব কনট্রোল আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। স্টিরিও পপুলার II প্লাস্টিকের খোলে মিনি-স্পীকারযুক্ত বা কোনো খেলো যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি নয়। স্টিরিও পপুলার II কিছু সস্তা খেলনা নয়—রীতিমতো আসল স্টিরিও।

৫ ওয়াট স্টিরিও পাওয়ার। ব্যালেন্স, টোন ও ভল্যুমের জন্যে পৃথক পৃথক কনট্রোল। সুবিধাজনক টেপ আউট 'ডিন' সকেট সমেত। মূল্য : ৯৫০৲ টাকা*

এইচ এম ভি স্টিরিও ১০১০

অবিশ্বাস্য কম দামে আপনার পছন্দসই ডিলাক্স স্টিরিও সিস্টেম। একটি সম্পূর্ণ ইউনিট, যাতে আছে নিখুঁত সমতাযুক্ত স্পীকার ও অ্যামপ্লিফায়ার।

১২ ওয়াট স্টিরিও পাওয়ার। ব্যালেন্স, ট্রেবল, বেস ও ভল্যুমের জন্যে পৃথক পৃথক কনট্রোল আছে। টেপ ইন/আউটের সুবিধা। চমৎকার টিকউডের ক্যাবিনেট। বিশেষ ধরনের 'অটো-স্টপ' ব্যবস্থা।
মূল্য : ১২৯৮৲ টাকা*

*উৎপাদন শুল্ক সমেত। স্থানীয় কর স্বতন্ত্র।

এইচ এম ভি সোনিক IV টিউনার

মূল্য : টা: ৪৭২.৫০
উৎপাদন শুল্ক সমেত
'সাউণ্ড সিস্টেম'কে সম্পূর্ণ করে তুলবে

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

আমরা জানি কি করে সঙ্গীতের খাঁটি আওয়াজটি ফুটিয়ে তুলতে হয়

HMV/CAS-3/78 BEN

এইচ এম ভি স্টিরিও সিস্টেম

... ১৬ ... গ্রাম ... ওজনটা হয়তো একটু বেশি কিছু খেয়েছিল। কিংবা খেয়েছিল এক কাপ দুধ বা এক কাপ চা। ১০ গ্রাম ওজন কতটুকু? এই সামান্য ওজন সম্পর্কে মাত্র ১৬ বছর বয়সী ভারত চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীরকে কি কোচের সতর্ক করা উচিত ছিল না? দুই গ্রাম বেশি ওজন অত্যান্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার বলেই কুস্তির জুরিরা ফাইনালে রাধেশ্যামকে লড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া কুস্তিগীরের ম্যানেজারের আপত্তিতে বেচারা লড়তে পারেনি। এই হচ্ছে আমাদের ভারতের কোচ ও ম্যানেজারদের ভূমিকা।

রানার শিবনাথ, দশ হাজার মিটার দৌড়ে নিজের রেকর্ড ২৮ মিনিট ৫৮·২ সেকেনড, সে এডমন্টনে ৩০ মিনিট ২৬·৭ সেকেন্ড সময় করে দ্বাদশ হয়েছে। মনট্রিয়ল অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে পেয়েছিল একাদশ স্থান। ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড়ে তার নিজের শ্রেষ্ঠ সময় ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৫৯·৪ সেকেন্ড। কিন্তু এডমন্টনে ম্যারাথনে কী করেছে শিবনাথ? ৩০ কিলো-মিটার পথ পার হবার পর দম ফুরিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাকে হাসপাতালে শয্যা নিতে হয়। তানজানিয়ার গিডেমাস শাহাংগা নামে যে ছেলেটি ম্যারাথনে প্রথম হয়েছে তার সময় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৩৯·৭৪ সেকেন্ড। অর্থাৎ শিবনাথের রেকর্ডের চেয়ে খারাপ সময়। প্রায় ৪ মিনিট বেশি নিয়েছে সে শিবনাথের চেয়ে। শিবনাথের ব্যর্থতার কারণ সম্ভবত খালি পায়ে দৌড়নো। সবাই তো আর সাবেবে বিকিলা নয়। ইথিওপীয়ার অমর অ্যাথলীট বিকিলাও খালি পায়ে ম্যারাথনে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরে অসুবিধা বুঝে রানিং শু পরে দৌড়েছে। টার্টান ট্র্যাকে খালি পায়ে কোনদিন দৌড়েছে কি শিবনাথ? অথচ এডমন্টনের টার্টানে দশ হাজার মিটার দৌড়েছে খালি পায়ে। এমন কি উপযুক্ত ব্যান্ডেজ না বেঁধে। ম্যারাথনেও খালি পায়ে। অ্যাথলীট নিজেই যদি তার ভাল-মন্দ বুঝতে পারে তবে আর কোচ ম্যানেজারের প্রয়োজন কী?

এতকাল ব্যাডমিন্টনে ভারতের সম্বল ছিল একটি ব্রোঞ্জ পদক। পেয়েছিল দীনেশ খান্না '৬৬তে কিংসটন কমনওয়েলথ গেমসে। এবার ব্যক্তিগত বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে প্রকাশ পাড়ুকোন। মেয়েদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছে আমি ঘিয়া ও কানোয়ারলঠাকুর সিং জুড়ি। ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগত ইভেন্টে মোটামুটি ভালই খেলেছে। কিন্তু দলগত প্রতিযোগিতায় ওয়েলসকে ৫—০ এবং নিউজিল্যান্ডকে ৩—২ খেলায় পরাজিত করার পর ইংলন্ডের কাছে ০—৫ খেলায় এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২—৩ খেলায় পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ইংলন্ডের কাছে পাঁচটি খেলাতেই হারতে হয়েছে ভারতের দুই চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন ও কানোয়ারলঠাকুর সিং দলে না থাকায়। তাদের বদলে সৈয়দ মোদি ও আমি ঘিয়াকে দলভুক্ত করা বিস্ময়কর ব্যাপার। ওইদিনই কিন্তু প্রকাশ পরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি খেলায় জিতেছে। সুতরাং, শারীরিক অসুস্থতার প্রশ্ন ওঠে না। ভারত যদি একটি ম্যাচ নয়, একটি গেমও বেশী জিতত তাহলেও নিউজিল্যান্ডের বদলে ভারতই খেলত শেষ পর্যায়ের পদক জয়ের প্রতিযোগিতায়। দলগত শক্তি অনুযায়ী ভারতের পক্ষে ব্যাডমিন্টনে আর একটি পদক লাভও অসম্ভব ছিল না।

তবু বলব, যেখানে কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত ৪৬টি দেশের প্রায় দু হাজার প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সেখানে ভারতের ষষ্ঠ স্থান দখল এবং ১৫টি পদক লাভ মন্দের ভাল ফল। অবশ্যই মনে রাখতে হবে কমনওয়েলথ গেমসের মান অলিম্পিকসের অনেক নীচেয়। কিন্তু কমনওয়েলথ গেমসে অন্যান্য দেশের যারা সোনা জিতেছে দু বছর পরে তাদের অনেকেই হয়তো মস্কো অলিম্পিকে সোনা জিতবে। সাঁতারে ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছরের মেয়ে ট্রেসি উইকহ্যাম, সাঁতারে ছয়টি স্বর্ণপদক বিজয়ী কানাডার কুড়ি বছর বয়সী ছাত্র গ্রাহাম স্মিথ, ডেকাথলন জয়ী ইংলন্ডের ডালে টমসন, তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজ ও তিন হাজার মিটার দৌড়ের বিজয়ী কিনিয়ার হেনরি রোনো প্রভৃতি মস্কোয় পদক না পেলে সেটা হবে বিস্ময়ের ব্যাপার। মস্কো অলিম্পিকে কিন্তু ভারতেরও পদক সম্ভাবনা আছে ভারোত্তোলন ও কুস্তিতে। কয়ুণাকরণ এবং সেলভান তো অলিম্পিকে যোগ দেবার যোগ্যতা-মান পেয়েই গেছে। চেষ্টা ও পরিকল্পনা থাকলে সাফল্য যে সহজ হতে পারে তার ছোট প্রমাণ কানাডার অসাধারণ অগ্রগতি। ক্রাইস্টচার্চে কানাডা পেয়েছিল ৬২টি পদক। তালিকায় ছিল তৃতীয় স্থান। মন্ট্রিয়ল অলিম্পিকে একটিও সোনা পায়নি। এবার ৪৫টি সোনা সহ মোট ১০৯টি পদক পেয়ে তালিকার শীর্ষ-স্থানে উঠে গেছে। নীচে প্রথম ১৫টি দেশের পদক তালিকা দেওয়া হল।

		সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
কানাডা	...	৪৫	৩১	৩৩
ইংলন্ড	...	২৭	২৮	৩৩
অস্ট্রেলিয়া	...	২৪	৩০	২৭
কিনিয়া	...	৭	৬	৫
নিউজিল্যান্ড	...	৫	৭	৯
ভারত	...	৫	৪	৬
স্কটল্যান্ড	...	৩	৬	৫
জামাইকা	...	২	২	৩
ওয়েলস	...	২	১	৫
উত্তর আয়ার্ল্যান্ড	...	২	১	১
হংকং	...	২	০	২
মালয়েশিয়া	...	১	২	১
ঘানা ও গায়ানা	...	১	১	১
তানজানিয়া	...	১	১	০
ত্রিনিদাদ টোব্যাগো		০	২	২

মুকুল

সদ্য প্রকাশিত বই সদ্য প্রকাশিত বই

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আলোকে বিপ্লবী, কবি, যোগী, দিব্যচেতনার সাধক শ্রীঅরবিন্দের নানা পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন জীবনকথা —পণ্ডিচেরী ও শ্রীমা, —অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন ইত্যাদির সংহত পর্যালোচনা—অজস্র অনুবাদ সহ।

দাম ১৮.০০

কবি-অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

বীরু চট্টোপাধ্যায়

ঘাতক সমিতি প্রাইভেট লিমিটেড

এও কি সম্ভব? এও কি বিশ্বাস্য? মানুষ খুন করবার নাকি একটি প্রতিষ্ঠান ছিল?

হ্যাঁ ছিল, মার্কীন যুক্তরাষ্ট্রে, তারই লোমহর্ষক কাহিনী পাবেন বীরু চট্টোপাধ্যায়ের ঘাতক সমিতি প্রাইভেট লিমিটেড-এ

দাম: বারো টাকা

নীল প্রতিহিংসা ৯

গোবিন্দ বর্মণ

স্নানঘর ১০

বাণিক রায় ৭

কালো গান

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাওয়ার অফ সাইলেন্স ১৫

সামুয়েল

আমার স্বর্গ আমার সুখ ৮

রত্না সেনদত্ত ৮

দর্পণে একাকী

রূপশংকর ১০

প্রথম দিনের সূর্য

বাংলা ভাষায় এই জাতীয় রহস্যময়িক বই প্রথম প্রকাশিত হল।

পৃথ্বীরাজ সেনের প্রচণ্ড চাঞ্চল্যকর বই

কেস অফ পয়জন

দাম ১২

সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কুখ্যাত জঘন্য বিষ-হত্যার গোপন ও কলঙ্কিত দলিল।

চিরঞ্জীব সেনের

হেড লাইন

দাম ১২

দুনো বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে যে সব খবর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে খবরের হেডলাইনের মর্যাদা অর্জন করেছিল তা থেকে বেছিয়ে খবরের সংকলন।

এই লেখকেরই

ইলেকট্রো যৌবনা

দাম ১০

প্রভাত চট্টোপাধ্যায়

টম সাহেবের গঞ্জ

সমরজিৎ কর

সমুদ্রের চোখ ১২

জাঁ ব্রুশ

ডেড সাইলেন্স ৮

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

টুকুনের অসুখ ১৫

অর্কপ্রভ গুপ্ত

মণামি ৫

ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

বাবু গৌরবের কলকাতা

ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে

ফাহিয়েন হো ১১

কুহকিনি কুগতী

অমরেন্দ্র দাস (সম্পাদনায় শিউলি দাস)-এর

রাজনারায়ণের কলকাতা

দাম ২৫.০০

অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম টাকা না পাঠালে ভি. পি. তে বই পাঠানো সম্ভবপর নয়।

আনন্দ রায় সম্পাদিত

বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ

দাম ১৫

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম প্রাণপুরুষ বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং সমালোচকদের লেখা নিয়ে একটি মূল্যবান দলিল। ইতিপূর্বে বুদ্ধদেব বসুর উপর এই ধরনের সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নি।

ডঃ অমরেন্দ্র গণাই-এর

বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার ও শরৎ চন্দ্র

দাম ১০

শরৎ চন্দ্রের শিল্প ব্যক্তিত্বে পূর্ববর্তী কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের উত্তরাধিকার ও প্রভাব নির্ণয় এবং শরৎ চন্দ্রের ভাষা-শিল্পের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ।

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র

বীরেন্দ্র দত্ত

দাম ১০

শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের বাসভূমি ছিল পানিত্রাস। গ্রামটির মধ্যে তাঁর ছিল রক্তের আত্মীয়তা। এই গ্রন্থে পানিত্রাসের পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত প্রত্যেকটি কাহিনী, ঘটনা, অন্যান্য প্রসঙ্গ শরৎ-অনুরাগীদের কাছে প্রথম উপস্থাপিত। পরিণত বয়স, মন ও মনন একজন শিল্পীর কাছে তাঁর এই বাসভূমির পরিবেশ ও সর্বস্তরের মানুষজন কোন কোন দিক থেকে প্রভাবিত করে তাঁর শিল্পীমনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিটিকে 'রূপ ওঠার' পথে সহায়তা করেছে, ব্যক্তি ও শিল্পী কি ভাবে একাত্ম হয়েছেন তারই পরিচয় আছে এ গ্রন্থে।

কমলকুমার সান্যাল

বাংলা নাটক সমীক্ষা

দাম ১০

বাংলার সামাজিক পট পরিবর্তনের পটভূমিকায় বাংলা নাটকের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণী পরিচয়। লেখকের অনেক দিনের গবেষণার ফল।

বণালী

বরুণ সেনের

কালো টাকা

দাম ১০

কংগ্রেস শাসনকালে কংগ্রেস শাসনে সাধারণ লোককে বঞ্চিত করে কালো টাকা বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে কিভাবে বেড়েছে! সেই বিশেষ গোষ্ঠী কারা এবং কাদের সাথে তাদের যোগসাজস ছিল।

এই লেখকের

গরিবী হটাও

দাম ১৫

ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীবের

খেলাধূলার নেপথ্যে দাম ১০

গ্রামের ছেলেমেয়েদের কিভাবে ধোঁকা দেওয়া হয়! সরকারী টাকা খেলোয়াড়দের হাতে পৌঁছবার আগেই অদৃশ্য। খেলায় দুর্নীতির অবসানের জন্য ক্ষমতা ক্রীড়া পরিষদের নেই। পাঞ্জাবে খেলাধূলা চলেছে মাঠে মাঠে। বাংলায় চলছে ধূলা জমানোর খেলা। ক্রীড়ামন্ত্রী কীম চাইলেন, পেলেন ও। অবশেষে বললেন, 'কিছু করার জো নেই।' খেলাধূলায়... সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার সাতজন ভিত্তিক ছিল দুর্নীতি জেলায় ক্রীড়া অফিসার নেই।

এই লেখকের দুটি বই

স্মরণীয় খেলা বরণীয় খেলোয়াড় দাম ৯

পদ্মা আমার মা গঙ্গা আমার মা দাম ১২

নিখিল চন্দ্র সরকারের

নদী যখন সাগরে

দাম ২০

অনেক ভুল ভুল ভ্রান্তি পেরিয়ে মানুষ কিভাবে একসময় বিরাট অথচ মহৎ এক উপলব্ধিতে পৌঁছোয়, এ উপন্যাস ঠিক তাই। লেখক গভীর মমতা আর সহানুভূতি দিয়ে সুন্দরবনের জল মাটি আর মানুষের ছবি এঁকেছেন। সার্থক কি ব্যর্থ, তার বিচার পাঠকের ওপর। তবে গ্রামজীবনের ধারায় এ যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম তা সবাই বলা যায়।

সাংবাদিক

নিশীথ দে'র

পালাবদলের নায়ক দাম ১২

কে সেই নায়ক? পশ্চিমবাংলায় চল্লিশ বছরের রাজনীতির নায়ক আজকের কর্ণধার জ্যোতি বসু। সাতাশ বছর রাজনীতির উত্থান পতনে নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন প্রফুল্ল সেন। পালাবদলের নায়ক'এর নায়ক এঁরাই।

এই লেখকেরই আরেকটি বই—

জয়প্রকাশ

দাম ৬

সম্রাট সেনের

সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত

দাম

১ম ১৮

২য় ২০

সম্রাট সেন বাংলা উপন্যাস জগতে এক অনায়াস উচ্চারিত নাম। তার লেখায় কাব্য-বোধ ও পরিমিতি বোধ সর্বোপরি চরিত্র চিত্রণ নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত। এক ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ কামনা বাসনা, লোভ হিংসা ও বিরহ-মিলনের এক অনবদ্য খতিয়ান। নবতম ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত।

এই লেখকেরই

নেপথ্যে নাটক

দাম ১১

সাংবাদিক ধ্রুব মজুমদারের

সাংবাদিকের সংবাদ

দাম ১২

যুগান্তর: সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা। একমাসে বিবাহ মদ্যপান করা ছাড়া সাংবাদিকরা আর কোনও কাজ করে—এই বই পড়ে তা মনে হবে না।

যুগান্তর: সাংবাদিকদের নিয়ে লিখিত রচনা। সাংবাদিকদের ভূমিকাকে ভুলে ইনি গিয়েছেন তোষক সাজিয়ে। সত্যি যাঁদের কাছে অপ্রিয়, এ গ্রন্থের নায়ক শান্তিপদ ওরফে ট্রেন দত্তগুপ্ত ও তাঁদের দেখে অপ্রিয় হবে ইনি পড়বে।

এই লেখকের কৈলাস মানস সরোবর ভ্রমণ কাহিনী

সো মাডাং ৯

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ। প্রবোধচন্দ্র সেন। অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

সমালোচনার রীতি ভেঙে একটু চটুল সুরে আরম্ভ করা যাক। এ বইটি পড়তে পড়তে এক সময় মনে হয়, একটি দারুণ রোমহর্ষক নাটক জমে উঠেছে। এর নায়ক 'পয়ার' বা সাধু বাংলার ছন্দ, প্রতিনায়ক বাংলার লোকছন্দ বা 'লৌকিক'। নায়িকা হল আধুনিক যুগের প্রাগ্‌বর্তী বাংলা কবিতা, সে এই দুজনের মধ্যে দোলাচলচিত্ত—এক ধরনের সিদ্ধান্তের সংকটে ভুগছে। খলনায়ক? তাও আছে। সে পুঁথির লিপিকর বা গায়েন। সে জানত শয়তান নয়, কিন্তু নিজের অজ্ঞতসারেই নায়ক ও প্রতিনায়কের লড়াইয়ে জড়িয়ে গেছে, প্রায়ই ঐ দুজনের আলাদা সত্তা বা আইডেনটিটি তার হস্তক্ষেপে গুলিয়ে যাচ্ছে। নায়ক কখনো প্রতিনায়কের মতো হয়ে উঠছে, প্রতিনায়ক নায়কের মতো। এই অবস্থায় কার গলায় মালা দেবে মধ্যযুগের বাংলা কবিতা? দেবে তাঁরই গলায় যিনি আবির্ভাবমাত্রেই নিজের ভৃত্য করে নেন ঐ নায়ক ও প্রতিনায়ককে, তাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ থামিয়ে দুজনের আলাদা অলাদা প্রকোষ্ঠ নির্দেশ করে দেন এবং নিজেকে প্রকাশ করেন ভাষা ও ছন্দের প্রভু ও নিয়ন্তা হিসেবে। ইনি ভারতচন্দ্র, মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মতো এক কবি।

প্রথমেই গুরুগম্ভীর সমালোচনায় নেমে না পড়ে এই অশোভন প্রগলভতায় এবং অসংগত রূপকের করবারে থামকা প্রবৃত্ত হতে গেলুম কেন? তার জন্য দায়ী সম্ভবত প্রবোধচন্দ্র নিজে, কিংবা দায়ী এ বইয়ে তাঁর ইতিহাস বলবার বিশিষ্ট ভঙ্গিটি। তাঁর বাংলা ছন্দগুলির বৃত্তান্ত পড়ে মনে হয় এই সব ছন্দ যেন রক্তমাংসের ব্যক্তিত্ব লাভ করে ইতিহাসে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। তার ধারাবাহিকতা এমন ছেদহীন, ছন্দগুলির পারস্পরিক টানাপোড়েন প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্তগুলি এবং স্পষ্ট ও বিশ্বাস্য, তাদের কাহিনী এমন বিচিত্র, উত্থান-পতনময় অথচ এমন একটি উদ্ভব-বিকাশ-পরিণামের মধ্যে সংহত ও সংগঠিত যে, পাঠকের রোমাঞ্চিত কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অশিথিল থাকে। শুধু দীক্ষিত পাঠকদের শরীরেই যে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, তা নয়। অদীক্ষিত পাঠকদের কাছেও এর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কম হওয়ার লক্ষণ দেখছি না। তার কারণ, এ বইয়ে প্রবোধচন্দ্র ছন্দের ব্যাকরণ রচনা করেননি। এটি মূলত ছন্দচিন্তার এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলা ছন্দের ইতিহাস। যিনি একাধারে ছান্দসিক এবং ঐতিহাসিক—এ বিষয় তো তাঁরই জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিল। তবে অন্যরা যেখানে উপকরণস্বল্পতার জন্য এগোতে ভরসা পেতেন না, সেখানে প্রবোধচন্দ্র আবিষ্কার করলেন উপকরণের প্রাচুর্য। এ কী করে সম্ভব হল? সম্ভব হল তাঁর এই সংগত অনুমান বা হাইপোথিসিসটির জন্য।

"...কবির মনে ছন্দ প্রথম দেখা দেয় অবিকশিত চিন্তা রূপে। সেই অস্ফুট চিন্তাই তাঁর রচনায় প্রকাশ পায় শিল্প-রূপে। তার পরে আসে অল্পাধিক সচেতন ছন্দচিন্তার পালা। ...মোট কথা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তা দুই-ই এগিয়ে চলে সমান্তরাল স্রোতে। ফলে ছন্দ-চিন্তার ইতিহাস ছন্দশিল্পের বিবর্তন-ক্রম-নিরপেক্ষ হতে পারে না।"

কথাটা একটু বিশদ করে বলা যাক। প্রবোধচন্দ্রের "আলোচনার কালপরিধি মোটামুটিভাবে দ্বাদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত" —অর্থাৎ প্রায় ছ' শো বছর। এই সময়ে, বাংলা ছন্দচিন্তার এই 'উন্মেষকাল'-এ প্রকাশ্য চিন্তার আকারে পরিবেষিত বাঙালীদের ছন্দোবোধের পরিমাণ কতটুকু? এক পঙ্‌ক্তিও নয়। যিনি প্রথম বাংলা ছন্দ বিষয়ে লিখলেন, তিনি একজন ইংরেজ, নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। সংস্কৃত ছন্দকে হিসেবে ধরলে অবশ্য একাধিক বাঙালীর নাম পাই—অনেক বাঙালী সংস্কৃত ছন্দের পাঠ্যবই রচনা করেছিলেন। কিন্তু সে সব বইয়ে পরিশ্রম, সুগ্রন্থন বা পাণ্ডিত্য থাকলেও মৌলিক চিন্তা বা আক্রমণের অভিনবত্ব কিছু আছে কি? গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'ই হোক আর নরহরি চক্রবর্তীর বাংলা পয়ারে লেখা 'ছন্দঃসমুদ্র'ই হোক—যখন বাঙালীরা সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র আলোচনা করেছেন তখন তাঁরা ব্যাখ্যাতা বা আবৃত্তিকর মাত্র স্রষ্টা নন। আর তাঁদের ব্যাখ্যাও কদাচিৎ অন্য কোনো আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। কাজেই বাংলা ছন্দের বিষয়ে বাঙালীর লিপিবদ্ধ চিন্তার পরিমাণ যেখানে শূন্য—সেখানে তার ইতিহাস হয় কী করে?

এইখানেই প্রবোধচন্দ্র আমাদের অবাক করে দিয়েছেন। তিনি কাব্যের প্রত্যক্ষ থেকে পৌঁছেছেন কবির ছন্দ-বোধের পরোক্ষে, অনেকটা সার-দেওয়া নিরপরাধ শব্দের শরীর থেকে ব্যঞ্জনায় পৌঁছে যাবার মতো করে। যে বোধ কবিকে দিয়ে ছন্দ রচনা করায় সেই বোধই আছে ছন্দচিন্তার নেপথ্যে —তা বিবরণ-বিশ্লেষণের চেহারা নিক বা না নিক। ছন্দাচারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ছন্দচিন্তা। কবি কেন সজ্ঞানে একটি ছন্দকে বেছে নিচ্ছেন, অন্যগুলিকে বর্জন করছেন; কেন ছন্দের নাম দিচ্ছেন 'দিগক্ষরা', 'একাবলী', 'মালঝাঁপ', 'পয়ার', 'ত্রিপদী', 'চৌপদী'; কেন মিশিয়ে ফেলছেন ভিন্ন গোত্রের ছন্দের লক্ষণ? এ সব থেকেই বেরিয়ে আসছে তাঁর বিচার কিংবা তাঁর বিচারভ্রান্তি, তাঁর সচেতন বোধ ও অচেতন দুর্বলতা, তাঁর পছন্দ ও বিতৃষ্ণা, সামর্থ্য ও অসতর্কতা। আর ছন্দের নিয়মও তাঁর সবই জানা, নইলে রচনা করবেন কী করে? আরো তিনি জানেন কোন ছন্দের কী ভূমিকা, কোন রীতির সঙ্গে কোন ছন্দের গাঁটছড়া বাঁধা। নইলে জয়দেব কেন লিখবেন তাঁর সাতাত্তরটি শ্লোকের মোট সাঁইত্রিশটিই শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে? শিল্প থেকে মনন এবং প্রয়োগ থেকে তত্ত্বকে উদ্ধার করে আনা যে এত সহজ, এত সংগত, এত স্বাভাবিক—তা প্রবোধচন্দ্র জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখিয়ে না দিলে আমরা বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

পটভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর, এ হেন ছন্দচিন্তাকে তিনি তিনটি পর্বে সাজিয়েছেন। পঞ্চদশ শতকে তার প্রথম পর্বের অবস্থান, ষোড়শ-সপ্তদশে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বের সাক্ষাৎ পাই অষ্টাদশ শতকে। তাঁর থিসিস হল, প্রধানত দুজাতের ছন্দের—বাংলা 'সাধু' ও 'লৌকিক' ছন্দের দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের মধ্যেই বাঙালী কবিদের এই ছ' শো বছরের ছন্দচিন্তা প্রকট হয়েছে। প্রসঙ্গতই এই পরিসরে এসেছে 'পয়ার', 'লাচাড়ি', 'ধামালি', 'ত্রিপদী' ইত্যাদি শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ-সংকোচনের ইতিহাস; বিজয় গুপ্ত, বড়ু চণ্ডীদাস, নারায়ণ দেব, কৃত্তিবাস, লোচনদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের ছন্দাচরণে ঐ দুই প্রধান ছন্দ এবং অন্যান্য ছন্দ-বিষয়ক বোধের সাক্ষ্য। তার উপর রয়েছে সংস্কৃত ছন্দবিশারদ নরহরি চক্রবর্তী এবং বাংলা ছন্দের প্রথম আলোচক হ্যালহেড সম্বন্ধে দুটি চমৎকার আলোচনা।

এই ইতিহাসের অনুধাবন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, ভারতচন্দ্রের প্রাক্‌কালিক বাংলা ছন্দের স্খলন ও অব্যবস্থিততার প্রধান কারণ দুটি। এক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের দুর্মর সংস্কার—যে সংস্কার বাংলা ভাষার ধ্বনিচরিত্রের সঙ্গে অসমঞ্জস; দুই, গানের বা নাচের তালের (সম্ভবত আরো বেশী করে ঢাকের বাদ্যির তালের) স্মৃতি—যা সংগীতের ছন্দের ফ্রেমে ভাষাকে আটকাতে চায়। এ দুয়ের মিলিত ক্রিয়াকর্মেই বাংলা ছন্দগুলিতে মাত্রা ও অক্ষরের (সিলেবলের) সাধারণভাবে অব্যতিরেকী সম্পর্ক দীর্ঘকাল অস্থির ও অনির্ধারিত থেকে গেছে। এক একজন সমর্থ কবি এসে কী করে আস্তে আস্তে মাত্রা ও অক্ষরের সম্পর্কগুলিকে বাঙালীর বোধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা ও অভ্যাসের চেহারা দিলেন তা প্রবোধচন্দ্র অতিশয় মনোরম করে বলেছেন। এবং এই সূত্রেই আমাদের অজস্র গৌণ সংশয়ের নিরসনও করে গেছেন তিনি : যেমন লাচাড়ি ও ত্রিপদী কিংবা লাচাড়ি ও ধামালি এক কি না; ধামালি ছন্দোরীতির নাম না কাব্যের বিষয়-বিহিত নাম, ইত্যাদি। হঠাৎ আলো-জ্বলে-ওঠা পর্যবেক্ষণেরও অভাব নেই। রামপ্রসাদের একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত)-লক্ষণ আবিষ্কারের পূর্বদৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেওয়া তারই একটি।

নতুন বিষয়, তাই তিনি বলছেন "শিথিল বাচনভঙ্গির আশ্রয় নেওয়াই বাঞ্ছনীয়"। কোথায় সে শিথিলতা? ভাষায় মাস্টারির অভাব, পাণ্ডিত্যের সন্ধ্যাভাষায় পাঠকদের দমিয়ে দেওয়াতে অনিচ্ছা—এ সবের মধ্যে যা পাই তা শিথিলতা নয়, অন্তরঙ্গতা। তথ্য, সূত্র ও নিয়মের দ্বারা বইটিকে ভারাক্রান্ত করেননি তিনি, ব্যবহার করেছেন ন্যূনতম পরিভাষা। স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতায় তিনি সব সময় পাঠককে নিজের সঙ্গী করে রেখেছেন, ঠেলে দেননি অবোধ্যতার গ্রাসে। অহংকার নেই, নেই "আমি যা বলছি তাই অন্তিম এবং চূড়ান্ত, এর পরে আর কারো কিছু বলবার থাকতে পারে না"-গোছের অহরহ ভাসমান বাক্যাবলি। কী মহার্ঘ

ছান্দসিক প্রাতিশাখ্যকদের [illegible] প্রতিবাদ করেন। কৌতূহলী পাঠককে ‘ধামালি কি কোনো ছন্দোরীতি?’ এবং ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দোরীতি’ অধ্যায় দুটি পড়তে বলি। খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ঘটেছে যখন তিনি নিজেকেই প্রতিপক্ষ খাড়া করছেন। এক জায়গায় বলছেন, অন্যান্যদের মতো ‘প্রবোধ সেন’ও ধামালি বিষয়ে “প্রমাণ-হীন অনুমানের কাঁচা ভিতের উপরে সৌধ নির্মাণ করেছেন।” (১৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)। উত্তম পুরুষকে প্রথম পুরুষে রূপান্তরিত করে দেখার মধ্যে যে মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় আছে, তার তুলনা নেই।

কদাচ তাঁকে এমন মন্তব্য করতে দেখি না যা অপ্রস্তুত কিংবা প্রমাণ-সমর্থনবর্জিত। আপ্তবাক্য তাঁর শত্রু, যেখানে প্রমাণের অভাব, সেখানে স্পষ্টই স্বীকার করেন, “এটা আমার অনুমান-মাত্র, এর পক্ষে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারব না” (৫১ পৃষ্ঠা)। তাঁর নিরলস নিশ্ছিদ্র এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবিস্তারের একটি অসামান্য উদাহরণ হল ‘পয়ার-লাচাড়ি’ দ্বন্দ্ব সমাসটির শেষে ‘পয়ার-ত্রিপদী’ হয়ে যাওয়ার অনুমান-ভিত্তিক ইতিহাস বর্ণনা (১০৯-১০ পৃষ্ঠা)।

দু-একটি সামান্য মন্তব্য বা প্রশ্ন তুলছি। লেখক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেই এ প্রশ্নগুলি তোলা চলে। তবে এও ঠিক যে, এ প্রশ্নের উত্তরের সংগে এ বইয়ের মূল্যবত্তার কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। মন্তব্য ও প্রশ্নগুলি এই:

১। ‘ধামালি’ কখনো ‘ধামালী’ মুদ্রিত হয়েছে, উদ্ধৃতির বাইরেও (৪৪ পৃষ্ঠা)।

২। সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম মেনে তিনি কি ‘বাগ্‌ধ্বনি’ লিখবেন না, ‘বাক্‌ধ্বনি’ই লিখবেন? (৩ পৃষ্ঠা)।

৩। আমার বিশ্বাস ছিল প্রবোধ-চন্দ্র ‘অক্ষরবৃত্ত’ (মিশ্রকলাবৃত্ত), ‘মাত্রা-বৃত্ত’ (কলাবৃত্ত) ইত্যাদি পরিভাষা বর্জন করেছেন। এ বইয়ের দু-এক জায়গায় (১০৫-৬, ১১৩-১৬), নাম দুটির দ্বিধাহীন ব্যবহার দেখে একটু বিস্ময় বোধ করছি। তিনি কি আবার বাংলা ছন্দের এই রীতিগুলির নাম বদলেছেন?

৪। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের ‘দল’-এর অর্থাৎ সিলেবলের ধারণা ছিল না, এই মত কি অসংশয়ে পোষণ করা চলে? এ নিয়ে আগেও প্রতিবাদ হয়েছে। আমার মনে হয়, অন্তত বৈদিক যুগে অক্ষর বলতে ‘স্বর’ এবং ‘সিলেবল’ দুই-ই বুঝিয়েছে। নইলে ‘স্বরোঽক্ষরম্’ (অথর্ব-প্রাতিশাখ্য), ‘সব্যঞ্জনঃ...অক্ষরো বাপি স্বরোঽক্ষরম্’ (ঋক্‌-প্রাতিশাখ্য) ইত্যাদি কথাগুলির অন্য কোনো মানে হয় না। বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে স্পষ্টই বলা হচ্ছে ‘স্বরোঽক্ষরম্ এ সহাদ্যৈঃ ব্যঞ্জনৈঃ, উত্তরৈশ্চাবসিতৈঃ’। উবট তাঁর টীকায় উদাহরণও দিয়েছেন ‘স্বো’, ‘স্ত্রু’, ‘বাক্‌’, ‘প্রাঙ্‌’ এই ক’টি সিলেবলের। এ অবশ্য আমার মৌলিক আবিষ্কার নয়, অ্যালেনের ‘ফোনেটিক্‌স ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া’ বইয়েই এ তথ্য আছে। কাজেই অক্ষর বলতে প্রাচীনকালে কেবল ‘স্বর’ বোঝাত (১৮ পৃষ্ঠা) এবং ‘দলের ধারণাটাই আধুনিক’ (১০৮) এ কথা বোধ হয় বলা চলে না।

‘বিকাশ পর্ব’ আমরা কবে পাব? আশা করব প্রবোধচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও আয়ু তাঁকে তাঁর সঙ্কল্পিত কাজগুলি শেষ করার সময় মঞ্জুর করবে।

পবিত্র সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সুকুমার মিত্রের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান

নজরুল খ্যাতিলাভ করেছিলেন বাংলায় গজল রচনা করে। নানান ধরনের পশ্চিমী ঢঙও তিনি বাংলায় এনেছিলেন, যা তাঁর আগে কেউ পরি-কল্পনা করেননি। এক সময় এই সব গানই কাজীর গান হিসাবে অতি জন-প্রিয় ছিল। ক্রমে সংগীত-রচয়িতারূপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি বহু কাব্য-সংগীত রচনা করতে থাকেন। প্রতি মাসেই গ্রামোফোন রেকর্ডে সে-সব গান আত্মপ্রকাশ করত। কাজীর এইসব গান হয়তো চলিত গানের ধরনে রচিত, কিন্তু সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, নিটোল, রসঘন এই গানগুলিকে গড়পড়তা গানের আদর্শে রচিত বললে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। আর্টের দিক থেকে শ্রীসম্পন্ন এবং স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল এই গানগুলি কাব্য-সংগীতকে যথার্থ সাংগীতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিযুক্ত করে তুলেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, নজরুল লোকচক্ষের অন্তরালে চলে যাবার পর থেকে তাঁর গজলগুলি তেমনভাবে গাওয়া হত না এবং আধুনিক সংগীতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে নজরুলের কাব্যসংগীতের প্রচারও বহুল পরিমাণে সংকুচিত হয়ে এসেছিল। কয়েক বৎসর হল বাংলার সংগীত-শিল্পীরা চিরায়ত সংগীতের মূল্যায়ন করে নজরুলের গানকে আবার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রচেষ্টায় নজরুলের কাব্য-সংগীতই অধিকতর প্রাধান্য পাচ্ছে, কেননা আজকের শিল্পী-সমাজ পরিশীলিত সংগীতের প্রতি সমধিক মনোযোগী, কেননা তাঁদের অধিকাংশই সুশিক্ষিত এবং মননশীল।

৩০ জুলাই রবীন্দ্র সদনে সুকুমার মিত্র নজরুলের বহু বিশিষ্ট পর্যায়ের গান গেয়ে শোনালেন আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে। সংগীতে তাঁর নৈপুণ্য কত দীর্ঘদিনের সাধনায় লব্ধ, সেটা বোঝা গেল তাঁর সুরে এবং তালে অধিকার থেকে। সুকুমারবাবু তাঁর প্রতিটি গানে কিছু বিস্তার করেছেন এবং তানও করেছেন মানানসইভাবে। শুনতে বেস কোথাও মনে হয়নি এই প্রয়োগ অনুপযুক্ত হল বা নজরুলের গানের সঙ্গে এটা সঙ্গতিবিহীন। রাগাশ্রয়ী যে দশটি গান তিনি শোনালেন, তার সব-গুলিই সুপরিচিত। শিল্পী আরম্ভ করলেন—‘অঞ্জলি লহ মোর’ (ভিলং) গানটি দিয়ে, পরে গাইলেন—‘কেন করুণ সুরে’ (দেশ) ‘শূন্য এ বুকে’ (ছায়ানট) ইত্যাদি। ‘কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া’ গানটি সংগীতে এবং সঙ্গতে এত রসোজ্জ্বল হয়েছিল যে শ্রোতারা বহুক্ষণ করতালি দিয়ে হর্ষ প্রকাশ করেন। আমাদের চিরায়ত

গায়নরত সুকুমার মিত্র। সঙ্গতে রাধাকান্ত নন্দী

সুরকারদের মধ্যে নজরুল তাঁর রচনায় যতটা শিল্পীর স্বকীয়তার সুযোগ রেখেছিলেন, এমন আর কেউ রাখেননি। সুকুমারবাবুর গান শুনে মনে হল তিনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। তাঁর কণ্ঠে নজরুল রচিত একটি টপ্পা—'আজি এ কুসুম হার সহি কেমনে' (সিন্ধুকাফি) খুব সুন্দর লাগল এবং শ্যামাসংগীতগুলিও মনোরম লেগেছে। তিনি তিনটি গজল এবং একটি কাওয়ালী গাইলেন; এগুলির মধ্যে 'উচাটন মন ঘরে রয় না' বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। এই সব গানের বৈশিষ্ট্য তিনি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গেই রক্ষা করেছিলেন। তাঁর চারটি কাব্যগীতি সংগীত। লোক-পর্যায়ে "নদীর নাম সই অঞ্জনা" অধিকাংশ রাগাশ্রয়ী বা সুরবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল গানগুলির মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট ব্যতিক্রম। তিনি অনুষ্ঠান শেষ করেন "সখি সাজায়ে রাখ লো পুষ্পবাসর" এই কীর্তন গানটি দিয়ে। মনে হল, সময়াভাবে তাঁকে দু-তিনটি গান প্রোগ্রাম থেকে বাদ দিতে হয়েছে।

শিল্পীর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন রাধাকান্ত নন্দী। কাব্য-সংগীতের সঙ্গে এমন চমৎকার সঙ্গত বহুদিন শুনিনি। এর চমৎকারিত্ব এইখানে যে এই ধরনের বাজনা গানকে শুধু ছন্দের সুষমায় উত্তীর্ণ করেই ক্ষান্ত হয় না, গানকে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা প্রদান করে। বিশেষ করে তার বাজানো একটি সাত মাত্রার "খেং" (আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে) মনে রাখার মত, কেননা আজকাল এই ছন্দে বড় একটা কেউ গান করেন না, অতএব বাজানোও হয় না। রাধাকান্তবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এটি বাজিয়েছিলেন এবং শিল্পীও সানন্দে উক্ত তালেই এটি গেয়ে গেলেন। সুকুমারবাবু যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় নিয়ে প্রতিটি গান রাধাকান্ত নন্দীর মত উপযুক্ত তবলিয়ার সঙ্গে গেয়ে নজরুল-গীতির যে আসরটি করে গেলেন, তাকে একটি অতি সার্থক অনুষ্ঠান বলতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।

ভাস্কর বসুর গ্রন্থনা এবং শংকর ঘোষের ভাষ্যপাঠ উপভোগ্য হয়েছে।

দুশো বছরের বাংলা টপ্পা

'টপ্পা' মানে কী? শোরী মিঞার টপ্পা প্রথম কে আনে বাংলা দেশে? কালী মির্জা না নিধুবাবু? নিধুবাবুর নামে যে-সব টপ্পা গান প্রচলিত, তার কয়েকটি আবার শ্রীধর কথকের নামেও পাওয়া যায়, এর রহস্য কী? অরূপ শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত 'দুশো বছরের বাংলা টপ্পা' (রবীন্দ্র-সদন—২৫ জুন) শুনতে গিয়ে এ-সব প্রশ্ন যদি কারো মনে উদিত হয়ে থাকে, তার উত্তর মেটাবারও চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রবীণ দুই সঙ্গীত-শিল্পী কৃষ্ণদাস ঘোষ ও হীরেন বসুকে দু-পাশে বসিয়ে প্রবীণ অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য এক আশ্চর্য সজীব প্রশ্নোত্তরের আসর পরিচালনা করছিলেন। অভিনেতারূপে রাধামোহনবাবুর অবদান নিশ্চিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-রসজ্ঞ মন ও আসর-পরিচালনার যে-পরিচয় ফুটে উঠল সেদিন, তাও কম বিস্ময়কর নয়। এই সরস আলোচনার পরবর্তী পর্বে পুরনো দিনের দুই বরণীয় তবলা-শিল্পী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হল। তারপর শুরু হল এ-দিনের মূল অনুষ্ঠান 'দুশো বছরের বাংলা টপ্পা।' সেই আসরের একক-শিল্পী ছিলেন চিন্ময় রায়চৌধুরী। পরেশ ভট্টাচার্য বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন।

হিমঘ্নবাবু দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন তাঁর অনুষ্ঠান। প্রথম পর্যায়ে ছিল 'প্রেম'-বিষয়ক টপ্পা গান। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল 'পূজা'। শোরী মিঞার একটি মূল টপ্পা শুনিয়ে তিনি কালী মির্জা, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, গোবিন্দ অধিকারী, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের গান পরিবেশন করলেন। বেশীর ভাগই যে নিধুবাবুর, বলা বাহুল্য। এই ধরনের গানে হিমঘ্নবাবুকে এমন এক মেজাজে পাওয়া যায়, যা বিস্ময়কর এবং দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের গান দুটি তিনি সাহানা দেবীর কাছ থেকে তুলেছেন বলে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু সুরের মূল কাঠামোয় তেমন পার্থক্য কিছু বোঝা গেল না। শুধু কাজের কম-বেশী। তবে রবীন্দ্রনাথ ও সৌম্যেন্দ্রনাথের গানেই তাঁকে বেশী ভাবাবিষ্ট ও কোমল মনে হল। অন্যত্র তিনি দারুণ দাপট দেখিয়েছেন।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ঘুমভাঙার গান

ঘুম কি ভাঙল? ন্যাশনাল ইউথ কয়ার সুপ্ত চেতনাকে জাগানোর জন্য রবীন্দ্র সদনে 'ঘুম ভাঙার গান' পরিবেশন করলেন। একথা অনস্বীকার্য। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কয়ার নামে বেশির ভাগ যা চলে, সে শুধুই পুনরাবৃত্তি, প্রায়শই কয়ার না হয়ে নিছক কোরাস গান। ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার এই প্রধানুগত্যের ব্যতিক্রম। তাঁরা অনুষ্ঠান করেন কম, কিন্তু প্রস্তুতি থাকে দীর্ঘদিনের, পরিকল্পনা শিল্পচেতনা সম্ভূত সর্বোপরি বহু প্রকার এক্সপেরিমেন্টে তাঁরা সাহসী। কিন্তু যে ঘুম ভাঙার গান নিয়ে তাঁরা ব্রতী, সেই সব গানের জন্মলগ্নে যে উদ্দাম আবেগ ছিল, আজকের শিল্পীদের কাছে সেটা শুধুই সুরের মজা, ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করার মতন। তাই আবেগ থাকে না, বলিষ্ঠ গায়নভঙ্গি হারিয়ে আর পাঁচটা আধুনিক গানের মত হয়ে দাঁড়ায়। ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার পবিত্র কর্তব্য পালনে শপথবদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যদি প্রত্যেক শিল্পী 'ইনস্পায়ার্ড' না বোধ করেন। সম্মিলক গানের মধ্যে 'ঝংকারো ঝংকারো' 'ওয়াক্ত কি আওয়াজ' বা 'হরতালের গান' 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' কিংবা 'অব কোমর বাঁধ তৈয়ার হো' (La marseillaise-র হিন্দী রূপান্তর) গানে যে দৃপ্তগায়নরীতি 'গোরী শৃঙ্গ তুলেছে শির' গানে সেই বলিষ্ঠতা একদম খুঁজে পাওয়া যায় না। 'বিশ্বের নব মানচিত্রের স্রষ্টা যে আমাদের কোটি কোটি প্রাণ' কখনই ঘোষণা মনে হয় না, ম্রিয়মাণ সম্মেলক কণ্ঠে নামতা পড়ার মত শোনায়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'এসো মুক্ত করো' গান দিয়ে বেশ দাপটেই সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই 'তোমায় বুকে মা গো' গানটি হার্মনাইজেশনের দাপটে কোন কথাই পরিষ্কার হয় না। নির্দেশক অরুণ বসু একজন দক্ষ এবং পরিশ্রমী সচেতন শিল্পী। হার্মনাইজেশনের পরীক্ষায় তিনি অক্লান্ত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অকুতোভয় না হলেও চলত। বহু জায়গায় পরিমিতির অভাবে মূল গান চাপা পড়ে যায়। 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' (সলিল চৌধুরী) যেভাবে আস্তে আস্তে সুর ঢেউয়ের মত উঠতে উঠতে লাখে লাখ করতাল, হরতাল হেঁকেছে' কথায় যে রকম অনায়াসভাবে আছড়ে পড়ে, সেটিই কয়ার গানের আদর্শ হওয়া উচিত। একক গানের মধ্যে শিশু শিল্পী সন্দীপ বসুকে সবচেয়ে আগে মনে পড়বে, সৌভাগ্যক্রমে ও প্রাপ্তবয়স্ক না, তাই গলা চাপার অভ্যাস এখনও হয়নি। পুরুষকণ্ঠের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিমল বসু। দরাজ গলা, সুস্পষ্ট উচ্চারণ, পাশাপাশি সুজিত দাসের 'পথে এবার নামো সাথী' শুধু অতুলনীয় গানের অতুলনীয় কুৎসিত পরিবেশন নয়, মূল বিষয় 'ঘুম ভাঙার গানকেই লজ্জা দেবে। মহিলাকণ্ঠের মধ্যে কৃষ্ণা রায়ের 'জাগো মোহন প্রীতম' অনবদ্য, নমিতা দাশের 'ও দরিয়ার মাঝিরে' গানটি সকলকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে। বিরতির আগে প্রেক্ষাগৃহের মধ্য দিয়ে প্রসেশন করে আসায় যে অভিনবত্ব ছিল, 'ও আলোর পথযাত্রী' দ্বৈতগানে মঞ্জু রায়ের কেসুরো গলা সম্পূর্ণ আবেশকে বিধ্বস্ত করে দিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'আলোর পথযাত্রী'তে দুরূহতম পরীক্ষা আছে (অ্যারেঞ্জার সলিল চৌধুরী) কিন্তু গানকে কখনই আড়াল করে না। এই আসরে অরুণকুমার বসু সুর সংযোজিত কিছু গান আছে। নিঃসন্দেহে তাঁর সুরে উত্তরাধিকার প্রমাণিত, কিন্তু প্রায় সব গানের কথা সলিল চৌধুরীর বা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের পাশাপাশি নাবালক প্রতিম।

ঘুম কি জাগানো যায়? গানের সঙ্গে কিছু নাচ ছিল (নৃত্য পরিকল্পনা বটু পাল) ঝংকারো ঝংকারো

আমূল—
আপনার দুধ ওয়ালা

আমূল—
আপনার চা ওয়ালা
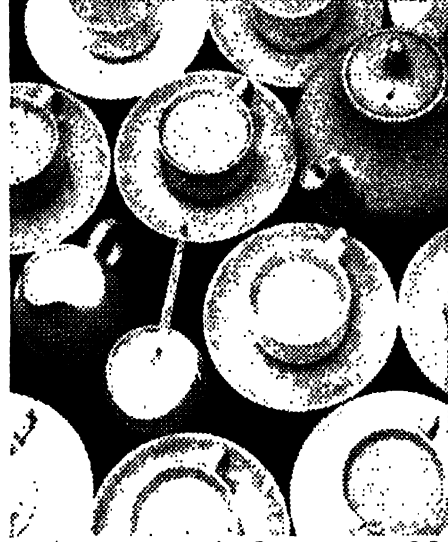
½ লিটার মাপের গেলাসে উঁচু উঁচু ২½ বড় চামচ আমূল মিল্ক পাউডার ঢালুন। একটুখানি অল্প-গরম জল মিশিয়ে লেইয়ের মত করুন। গরম জলে গেলাস ভরে নিয়ে নেড়ে নিন। আপনার বাচ্চার দুধের গেলাস তৈরী। (বিস্তারিত নির্দেশের জন্যে টিন দেখুন)। আমূল মিল্ক পাউডার চা আর কফির জন্যেও আদর্শ !

আমূল—
আপনার দই ওয়ালা
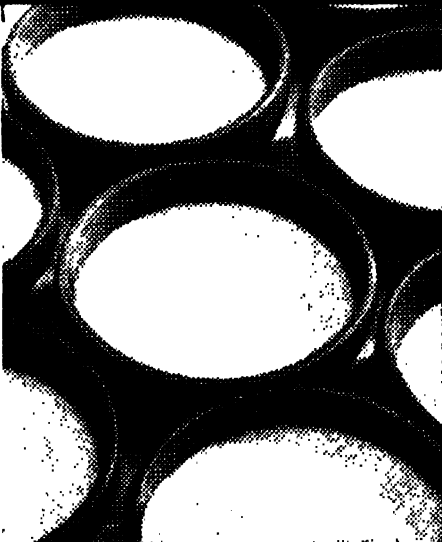
ওপরের পদ্ধতিতে দুধ তৈরী করুন। তারপর যেমন টাটকা দুধের দই বসান, তেমনি করে এই দুধ দিয়ে দই পাতুন।
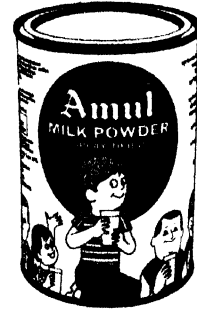
আমূল
মিল্ক পাউডার
ঘরে সবসময়ে দুধের ভাণ্ডার

বিতরণ : গুজরাট কোঅপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশান লিমিটেড, আনন্দ।

RADEUS/AMP-1

...সেজে 'ক্যাবারে' চর্চার যুগে অনাস্বাদিত। রবীন্দ্র-নৃত্য-নাট্যে যেমন একই ভাব, এখানেও অনেক সময় একই রকম বিপরীতভাব—যদিও কোন কোন মহিলা শিল্পী, বিক্ষোভের মাঝে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য সখীদের মত স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে ফেলেন। 'গাঁয়ের বধূ' ব্যালেতে তিন চারটি গান মিলিয়ে যে পরিকল্পনা সেটা দানা বাঁধতে পারেনি পরিস্থিতির অভাবে। সবকিছুই দেখতে গিয়ে মূল বিষয়ে কেন্দ্রচ্যুত হয়, ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানো যায় না এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় গান দিয়েও গভীরে পৌঁছোন যায় না। সাইক্লোরামার পিছনে মাঝে মাঝেই বিভ্রান্ত ছুটোছুটি, বিশৃংখলতাকে আরো প্রকট করে তোলে। অনুরূপ দুর্ভাগ্য আর একটি ব্যংগাত্মক গানের 'ও ভাইরে ভাই'। নাচের মধ্যে অপরিমিত অভিনয় (যদিও নাচটি সুন্দর), গানের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন অসহায়ত্ব ব্যংগকে সুতীব্র হতে দেয় না।

ঘুম ভাংগায় গানকে সব সময় সজীব রেখেছেন, যন্ত্রী সম্প্রদায়—অলোকনাথ দে, ওয়াই এস মুলকী সমীর খাসনবীস, স্বপন সেন, রবীন গাংগুলী, সমীরণ মুখার্জী, স্বপন মিত্র, সমর মুখার্জী—প্রত্যেকেই সেদিনের অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত রাখায় আন্তরিক ছিলেন। মাইক্রোফোনের অসহযোগিতা সত্ত্বেও ভাষ্যকার নীরোদ নন্দীর ভরাট কণ্ঠস্বর চাপা থাকেনি, চাপা থাকেনি অনেক অবাঞ্ছিত যতি ও ছেদ। আলোক শিল্পী মাঃ কচি সর্বক্ষণ একটাই পথ অবলম্বন করেছেন, প্রতি গানের বিলম্বিত ও দ্রুত ছন্দে একই ফরমূলা। মুড্ অনুযায়ী আলোক-সম্পাতের কোন বাসনাই ছিল না। ন্যাশনাল ইউথ কয়ারের পরিশ্রম, আন্তরিকতা, শিল্পচেতনা সব কিছু পরিবর্তনে প্রয়াসী, যা সর্বত্র সুলভ নয়, তাই হয়ত, ঘুম একদিন ভাঙ্গবেই।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

অতিথি

কিভাবে এক দুর্নীতিপরায়ণ ধনী তার কামনা ও লালসা চরিতার্থ করতে একটি সংসারকে দুঃস্থ ও ঋণগ্রস্ত করে তোলে, এবং কিভাবে আত্মীয় না হয়েও একটি বেপরোয়া যুবক সেই সংসারটিকে ওই ধনী দুর্বৃত্তের কবল থেকে মুক্ত করে—এই নিয়েই প্রফুল্ল রায় রচিত 'এখানে পিঞ্জর'-এর কাহিনী। 'অতিথি' সেই কাহিনীরই কিছুটা পরিবর্তিত হিন্দী চিত্ররূপ।

নায়ক আনন্দ (শশি কাপুর) ট্রেনে একটি মেয়ের দেখা পায় যাকে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। আনন্দ এসে পৌঁছয় মোহনবাবুর (ভারত ভূষণ) বাড়িতে। সেখানে সে ট্রেনে-দেখা সেই মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়। মেয়েটি মোহনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা নীলা (শাবানা আজমি)। তার দাদা নবেন্দু (শত্রুঘ্ন সিনহা) ধনী মহাজন অবিনাশের (উৎপল দত্ত) ষড়যন্ত্রে ওয়াগন ভাঙার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নবেন্দু বোম্বাই চলে যায় এবং সেখানে চুরি ও ছিনতাইয়ে লিপ্ত হয়। সেই সূত্রেই আনন্দের সংগে তার ঘনিষ্ঠতা। অচল সংসার চালাবার জন্য নীলা অবিনাশের মাদক পাচারের কারবারে যোগ দেয়। তার সংগী নবেন্দুর প্রেমিকা মীনা (বিন্দ্যা সিনহা)। মোহনবাবুর পরিবারে আর আছে তাঁর স্ত্রী (ঊর্মিলা ভাট) ছোট মেয়ে রজনী (গায়ত্রী) এবং নবেন্দুর ছোট ভাই কুন্দন (ছোট মেহমুদ)। পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন আনন্দ

শাবানা আজমি

এ পরিবারে এসে জীবনে প্রথম পিতা-মাতা-ভগিনীর স্নেহের স্বাদ পায়। নীলার অকৃত্রিম ভালবাসাও সে অর্জন করে। অবিনাশ এই পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী আনন্দকে শায়েস্তা করার উপায় উদ্ভাবনে রত হয়। ইতিমধ্যে আনন্দ 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'-এর রীতিতে অবিনাশের কবল থেকে মোহনবাবুর বাড়ির মর্টগেজ দেওয়ার দলিলটি উদ্ধার করে দেয়। ভগিনী সমা রজনীর বিবাহের ব্যবস্থা করে। সেই বিবাহের রাতেই আনন্দ নীলাকে জানায় পুলিসের গুলিতে নবেন্দুর মৃত্যুর ঘটনা। মীনাও জানতে পারে তার প্রেমিক নবেন্দুর মৃত্যুর জন্য দায়ী অবিনাশ। প্রতিশোধ নিতে মীনা অবিনাশকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করে। আনন্দ পুলিসের কাছে ধরা পড়ে এই পরিবারের সংগে পরিচিত হবার আগে বোম্বাইয়ে কৃত অপরাধের জন্য।

মধুর মিলনের বদলে বেদনাবিধুর পরিসমাপ্তি হিন্দী চিত্রামোদীদের মনঃপূত নাও হতে পারে। তবে শেষ দৃশ্যটির আবেগ মনকে স্পর্শ করবে। ঘটনার বিন্যাসে পরিচালক অরবিন্দ সেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নবেন্দুর সংগে আনন্দর প্রথম পরিচয় থেকে নবেন্দুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী ধাপে ধাপে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে উপস্থাপনে পরিচালকের কুশলী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মোহনবাবুর পরিবারের সংগে আনন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলায়ও পরিচালকের সংবেদনশীল ও সংযত বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে গান সেখানেই তিনি বেসামাল হয়ে পড়েছেন—আর পাঁচটা হিন্দী ছবির বাঁধা পথ অনুসৃত হয়েছে। যেমন ডোরায় যা রজনী ...

আসল আই. টি. সি. টিউব চিনে নিতে কোন অসুবিধাই নেই

এই ছাপ দেখে কিনুন

ITC-TATA

নির্ভরযোগ্যতার চূড়ান্ত গ্যারান্টি

প্রতিটি আই.টি.সি. টিউবের গায়ে এখন আই.টি.সি – টাটা ছাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনি বাজারের নিম্নমানের নকল থেকে সাবধান থাকতে পারেন। এই ছাপ হল নির্ভরযোগ্যতার চূড়ান্ত গ্যারান্টি, কারণ নাম দুটির একটি হল টাটা স্টীল—যারা এদেশে আধুনিক ইস্পাত শিল্পের প্রবর্তক; আর অপরটি হল আই.টি.সি —যারা টিউব তৈরির ক্ষেত্রে এদেশে পথিকৃৎ। এদের যৌথ প্রয়াসের ফলে আপনি পাচ্ছেন এমন জাতের টিউব, যা সেরা মাল দিয়ে তৈরি সেরা জিনিস।

একমাত্র আই.টি.সি – টাটা টিউবই ষোল আনা রিমিং স্টীল থেকে তৈরি হয়। এই স্টীল দিয়ে তৈরি বলে টিউবের জোড়গুলি খুব মজবুত হয় এবং জোড়ের মুখ খুলে যাবার বা লিক হবার কোনই ভয় থাকে না।

ফ্রেটস্ মুন নামে এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি বলে আই.টি.সি – টাটা টিউবের ভিতরে কোন শির থাকে না। ফলে জোড়ের জায়গায় ময়লা জমার কোন আশঙ্কা থাকে না এবং তোড়ে জল চলাচল করতে পারে।

আই.টি.সি – টাটা টিউব যাতে মরচে পড়ে ক্ষয়ে না যায় সেইজন্য তাতে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী বরাবর ঠিকমতো দস্তার কোটিং দেওয়া থাকে।

আই এস ঃ ১২৩৯ পার্ট ১ (১৯৭৩) অনুযায়ী তৈরি।

১৫ থেকে ৮০ এম. এম. এন. বি. সাইজে পাওয়া যায়।

ITC-TATA টিউব
তৈরির গুণে শক্তিমান তাই পাচ্ছেন বাড়তি জান

ITC ইণ্ডিয়ান টিউব

দি ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড

টাটা-স্টুয়ার্টস অ্যাণ্ড লয়েডস্-এর একটি উদ্যোগ

IT/CAS-14 BEN

স্কুলে বেতন দেবার সামর্থ্য নেই অথচ গৃহের আসবাব ও সজ্জায় যা মোহন-বাবুর পরিবারের সকলের সাজ-পোশাকে অতটা দারিদ্র্যের লক্ষণ পাওয়া যায় না। অখিনাশকে হত্যা করতে যাঁরা রিভলবারই বা পেল কোথেকে! এমন অসংগতি চোখে পড়বেই। অন্যথায় ছবিখানির যথেষ্ট গুণ আছে।

বড় গুণ এর অভিনয়াংশ। প্রধান প্রতিটি চরিত্রই ব্যক্তিত্বপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কল্যাণজী-আনন্দজীর দেওয়া সুরে আশা ভোঁসলে, মান্না দে, কিশোরকুমার, মহেন্দ্র কাপুর, কাঞ্চন, অনুরাধা ও ঊষা তিমূর্তির গাওয়া গান শুনতে ভাল। মার্শাল ব্রাগাঞ্জার ক্যামেরার কাজে কুশলতার পরিচয় যথেষ্ট, কিন্তু বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ট্রেনের কামরার ভিতরে ঝলমলে আলো, অথবা রৌদ্রের মত ঝকঝকে জ্যোৎস্না—দৃষ্টিতে অস্বস্তি জাগায়।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

রবীন্দ্রনাট্য রচনার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

কবি রবীন্দ্রের সতেরো বছর বয়সে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। ঐ বয়সেই তিনি তাঁর প্রথম কাব্য নাটিকা 'রুদ্রচণ্ড' রচনা সমাপ্ত করেন। সেটি ১২৮৫ সাল। সেই হিসেবে এ বছরে রবীন্দ্রনাট্য রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হল। রবীন্দ্রতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টায় সনিষ্ঠ একটি অগ্রণী সংস্থা 'গীত-বিতান'। অন্বেষা ও আন্তরিকতার বিনিয়োগে সম্প্রতি সপ্তাহব্যাপী (১৬-২২ জুলাই) রবীন্দ্রসদনে তাঁরা যে উৎসব উপস্থাপন করলেন এক কথায় তার নাম—রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা।

রবীন্দ্র-নাটকের আদর্শ ও শ্রেণী-ভাগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে উপস্থাপনার তা ভ্রান্ত হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও অভিপ্রায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখে সাত দিনের এই অনুষ্ঠানে তাঁর সমগ্র নাট্যসম্ভারকে চরিত্রগতভাবে দশটি পর্যায়ে ভাগ করে প্রতিটি পর্যায় থেকে একটি করে পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিবেশনের মধ্যেই ছিল এই আলোচ্য উৎসবের বৈশিষ্ট্য। প্রতি-দিন নাট্যাভিনয় আরম্ভের প্রাক-মুহূর্তে প্রতিটি পর্যায়ের নাট্যরচনা ও তার শ্রেণীগত চরিত্র নিয়ে ভাষ্য-প্রক্ষেপণ সংক্ষিপ্ত হলেও এই উৎসবে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর পৌরোহিত্যে অন্যান্য বিশিষ্ট জনের পাশাপাশি যখন উপস্থিত দর্শকদের পক্ষ থেকে অনেকে অংশগ্রহণ করে শতপ্রদীপ জ্বালিয়ে তুললেন তখন দেখা গেল আলোক শিখার মধ্যে সত্যি কোনো ভেদাভেদ নেই।

এরপর যে নাটকের রচনাকাল ধরে এই শতবর্ষপূর্তি সেই 'রুদ্রচণ্ড'-এর নির্বাচিত অংশের আসন্ন মঞ্চায়নে মঞ্চ তার অবগুণ্ঠন খুললো। গীতবিতানের সদিন নীহারবিন্দু সেন মঞ্চরূপ দিয়েছে।' সেদিক থেকে এর গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়। মঞ্চরূপ দিলেন 'থিয়েটার সেন্টার'। ঐতিহাসিক কারণে রুদ্রচণ্ডের কিছু অংশ মঞ্চস্থ করা ছাড়া অভিনয়ের প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটাতে পারেননি অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা। রুদ্রচণ্ড যেন রঘুপতি চরিত্রেরই পূর্বাভাষ। প্রতিহিংসার বিমোচনে কিভাবে রুদ্রচণ্ডের পিতৃহৃদয় উন্মোচিত হল তাই ছিল পরিবেশিত দৃশ্যে।

একই দিনে তরুণ রায়ের নির্দেশনায় থিয়েটার সেন্টার পরিবেশন করলেন কাব্যনাট্য পর্যায়ের বিসর্জন। এতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করে গেছেন রঘুপতির ভূমিকায় তরুণ রায়। নাটক যতই এগিয়েছে রঘুপতির প্রথাসক্ত পাষাণমূর্তি ততই মূর্ত হয়েছে শিল্পীর অভিনয়ে। অরুণ মুখার্জীর গোবিন্দমাণিক্য এবং দীপান্বিতা রায়ের গুণবতী যথযথ। তুলনায় দেবরাজ রায় পূর্বাপর তাঁর জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতি এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন যে জয়-সিংহ চরিত্রটির বিবেকের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিনয় পৌঁছতে পারেনি। অপর্ণা চরিত্র চিত্রণে অনুরাধা রায় প্রথম দিকে সাবলীল অভিনয় করেও যেখানে চরিত্রটির সপ্রতিভ হবার কথা সেই শেষটায় কেন যে তিনি অমন আড়ষ্ট নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন বোঝা গেল না।

নাট্যকাব্য 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু, শেষ শ্রুতি নির্বেদিত গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দিয়ে। ভাবাবেগের উত্থান পতনে কণ্ঠের শিল্পিক বিস্তৃতি ও নিয়ন্ত্রণে মঞ্চে অগোচর কর্ণ চরিত্রটিকে মন-মানসে প্রত্যক্ষগোচর করে তুলতে এদিন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এক কথায় সফল শিল্পী। তুলনায় কুন্তীর ভূমিকায় সুচিত্রা মিত্র কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত প্রজ্বল ছিলেন না। হয়তো তাঁর মতো শিল্পীর কাছে আমাদের প্রত্যাশাটা আগাম মুখ বাড়িয়ে ছিল বলেই তা আশানুরূপ প্রাপ্তিধন্য হয়নি।

আলোচ্য উৎসবে একটি বিশেষ শ্রুতিনন্দন, নয়নাভিরাম নিবেদন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বাল্মীকিপ্রতিভা। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এই নাটকটি প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন ('বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সংগে কানে না-শুনিলে ইহার কোনো স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবপর নহে।') তার সম্যক বৈশিষ্ট্য এদিন আরেকবার উপলব্ধি করলাম নাটকটির উপস্থাপনায়,—শিল্পীদের অভিনয় এবং গায়কী নৈপুণ্যে। অবশ্য সামান্য কিছু চ্যুতি আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল দস্যুদলের নাচ ও গানের অসঙ্গতিতে কিন্তু তা পবনবেগে ভাসিয়ে নিয়ে আমাদের রস-বোধ অক্ষত রেখেছে বাল্মীকির ভূমিকায় অশোকতরুর অনবদ্য উপস্থিতি। অন্য দিকে সরস্বতীর ভূমিকায় গৌরী ঘোষ যখন উচ্চারণ করলেন : 'আমি বীণাপাণি' তোরে শিখাতে এসেছি গান,/তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ...' তখন তাঁর সম্মার্জিত

অনুভূতি এমনই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে যে মনে হয়েছে শিল্পীর অভিনয়ের আড়ালে সত্যি রয়েছেন স্বয়ং বাগ্‌দেবী। এমন তুলনারহিত অনুভবের পেছনে সম্ভবত সেদিন তাপস সেনের আলোর মায়াও অনেকটা কাজ করেছিল।

সাধারণত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শুধু সরস্বতীর পরীক্ষাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু কেউ কেউ যে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র কথাও ভাবেন তার অপূর্ব প্রমাণ মিলল তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে। এদিন বিদ্যা-ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নিবেদন করলেন তাঁদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। আর এই পরীক্ষায় তাঁরা যে কেবল তাঁদের মান রাখলেন তাই নয়, প্রশংসনীয় মাত্রাও যোগ করলেন কিছু। শ্রীপর্ণা বসু (কল্যাণী রানী), মহুয়া কুলান্তি (ক্ষীরো); রিমলি সেনগুপ্ত (মালতী), অনিতা মুখার্জী (খিতি), মালা সিন্‌হা চৌধুরী (লক্ষ্মী) ইত্যাদির সঙ্গে সেদিন মঞ্চে উপস্থিত সকলেই এখনো ছাত্রী, তাই শিক্ষা যে তাঁদের এখনো শেষ হয়নি তা বলা বাহুল্য, কিন্তু এঁদের কাজ। এ-সবের মুখোমুখি হয়ে সনিষ্ঠ শিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাও যে কতখানি অসহায় বোধ করে, তা সেদিন সম্যক টের পাওয়া গেল। অথচ গীতা সেনের সংগীত পরিচালনায় ও অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিকল্পনায় এই ঋতুনাট্যটির পরিবেশন যে সার্থকতার কোন বেদীতে উদ্দিষ্ট ছিল তা উপস্থিত যথার্থ অনুরাগী মাত্রই উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন।

উৎসবের চতুর্থ দিন পার হল শিল্পায়নের 'বিনি পয়সার ভোজ' এবং অভিনেতৃ সংঘের 'শেষরক্ষা'য়। দুটি নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন অনুপকুমার। হাস্যরস প্রধান নাটক দুটিতে সচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, সুলতা চৌধুরী, অশোক মিত্র, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অলোকা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব নন্দী প্রমুখ। তবে অভিনেতৃ সংঘের উপস্থাপনায় তথাকথিত পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রভাব একটু প্রকট,

রুদ্রচণ্ড
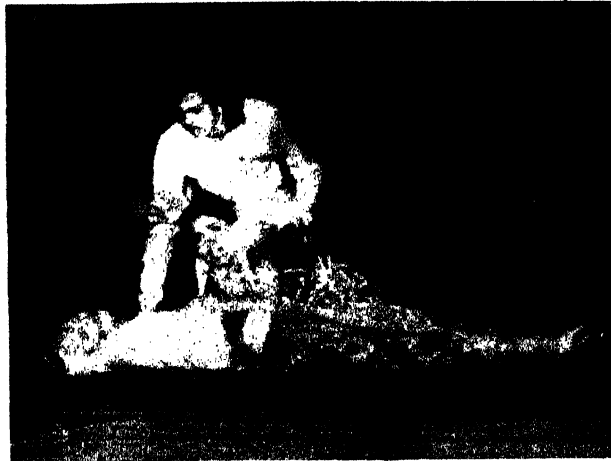
নিয়েই ভারতী দাশগুপ্তার প্রযোজনায় ও সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় যে কিশোর নাট্যটি আমরা উপভোগ করলাম তা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

এদিনই পরিবেশিত হল ঋতুনাট্য পর্যায়ের শেষবর্ষণ। এতে অংশ গ্রহণ করলেন গীতবিতানের শিল্পিবৃন্দ ও একজন 'প্রখ্যাত জনপ্রিয় শিল্পী'। কি অনুষ্ঠানলিপিতে, কি প্রাক ভাষ্যে শেষোক্ত এই শিল্পীর নাম প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু অবগুণ্ঠনমুক্ত মঞ্চের এক কোণায় টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় সেই জনপ্রিয় শিল্পীকে আবিষ্কার করে প্রেক্ষাগৃহের কিছু অতি-কৌতূহলী দর্শক তাঁদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের নিয়ে কেউ 'দেবব্রত-দেবব্রত' কেউ বা আবার একধাপ এগিয়ে 'জর্জ-জর্জ' করে এমন ফিসফিসানি শুরু করলেন যে আলোচ্য অনুষ্ঠানটির সূচনাতেই কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত আমাদের রসবোধে ঝিলিক মেরে গেল। যার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেল অনুষ্ঠান চলাকালে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের অপ্রত্যাশিত বিরূপাচরণে। অত্যুৎসাহীদের মুহুর্মুহু হাততালি রবীন্দ্রনাট্য মঞ্চায়নে যা ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়।

সাধারণ সংলাপ-নাট্যের পর্যায়ভুক্ত 'পরিত্রাণ' নিবেদন করতে পঞ্চম দিনে উপস্থিত ছিলেন 'গিরিশ নাট্য পরিষদ'। ধনঞ্জয় বৈরাগীর রূপদানে প্রভাতভূষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় নাটকটিকে ধরে রাখতে চাইলেও উপস্থাপনার শৈথিল্যে, অনেকের অভিনয়ের সংলাপ স্মরণের দৈন্যে, নৃত্যমানের অপূর্ণতায়, নেপথ্য সংগীতের সুরের অসংগতিতে পরিত্রাণ পরিণামে আমাদের মধ্যে পরিতাপের সঞ্চার করেছে।

রূপকারের 'অচলায়তন' (রূপক নাট্য) ছিল ষষ্ঠ দিনের উৎসবের আকর্ষণ। এদিন আচার্যের ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত ছিলেন অভিনয়ে ও একটি বিশেষ গানে (সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া) এক কথায় অনবদ্য। এ ব্যাপারে তিনি প্রশংসা লাভ করলেও নাট্য-প্রয়োগ-পরিচালনায় তাঁর কিছু কাজ রবীন্দ্রানুরাগীদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। দাদাঠাকুরের ভূমিকাটি তিনি

তা অন্তরায় হয়েছে। অবশ্য যেটুকু সুযোগ ছিল তাকে কাজে লাগাতে না পারার জন্য আলোচ্য ভূমিকাভিনেতাও (সুধাংশু মুখোপাধ্যায়) দায়ী। অন্যদিকে উপাধ্যায়রূপী মধুসূদন দত্ত চরিত্র-সৃষ্টির দিকে মন না দিয়ে গিমিকের ব্যাপারে এত মনোযোগী ছিলেন যে, তা হ্যাবলামোরই নামান্তর। অচলায়তনের সচল চরিত্র পঞ্চক (গৌতা দত্ত) গানে অনেকাংশেই অচল।

শেষদিন শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনাধীনে সুরঙ্গমার শিল্পিবৃন্দ পরিবেশিত নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি। ঐদিন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল অবশ্য 'নটীর পূজা'র শেষ দৃশ্যটি উপস্থাপনে। এর কারণ হিসেবে সেদিনকার তাতে জানানো হয়েছে 'নটীর পূজা' সাধারণ সংলাপ—নাট্যের পর্যায়ভুক্ত কিন্তু এতে রাজনটী শ্রীমতীর চরম নৃত্য থেকেই কবির নৃত্যনাট্য রচনার সূচনা। সে কারণেই তা এদিন মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মঞ্চায়নে ছিলেন ভারতী মিত্রের পরিচালনায় 'নব-নালন্দা'র ছাত্রীবৃন্দ। শ্রীমতী রূপদানে ছিলেন জাম্বতী মিত্র।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে সংগীতের তুলনায় নৃত্যের প্রাধান্যই বেশি। এই নৃত্য শুধুমাত্র সংগীতের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে মঞ্চে এসে দায়সারা অঙ্গবিক্ষেপ নয়, গানকে প্রকাশ করার দায় থাকে দেহে। একথা হয়তো অনেকেই জানেন, কিন্তু প্রকাশের দৈন্যে তা স্পষ্ট রূপ পায় না। এদিন অর্জুনের ভূমিকায় শিবশংকরণ তাঁর দেহ-গানে আকাঙ্ক্ষিত বাঙ্ময়তা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যান্য শিল্পীরাও তাঁরই অনুরূপ। এছাড়া নৃত্যের তালে তালে সংগীত প্রয়োগে সময়-চেতনারও কিছু ত্রুটি ছিল। কিন্তু এইসব ছাপিয়ে দর্শকদের আবিষ্ট ক'রে রেখেছেন পূর্ণিমা ঘোষ চিত্রাঙ্গদার রূপদানে। আত্মদ্বৈতের বিরহ-ব্যথা যেমন তাঁর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ লাভ করেছে তেমনি নৃত্যে শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোবন্ধ সংগীতিসিদ্ধ ব্যঞ্জনায় এই দিন তিনি সত্যি হয়ে উঠেছিলেন এক জয়শ্রী শিল্পী।

আলোচনার শেষ পর্বে আবার একবার 'গীতবিতান'কে এমন একটি উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে।

রাজা দাস

গঙ্গা তুমি বইছ কেন

সুদূর উত্তরবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারগুলিও যে নাটক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, তার পরিচয় মিলল 'কোরাস'-এর অভিনয়ে। শিলিগুড়ির দল 'কোরাস'। সম্প্রতি দিশারী তাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ দল, অভিনেতা, অভিনেত্রী (নাটক, চলচ্চিত্র, যাত্রা), প্রযোজক, নাট্যকার সাংবাদিকদের পুরস্কার দিলেন রবীন্দ্রসদনে। ওই আসরেই কোরাস অভিনয় করলেন রবীন্দ্র নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষ করে মঞ্চের সমস্যা এই সব দলের কাছে নাটক প্রযোজনার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু নিষ্ঠা থাকলে যে অনেক বাধা দূর করা যায়, তার প্রমাণ কোরাসের অভিনয়।

নাট্য-কাহিনীর কোন অভিনবত্ব নেই। 'গঙ্গা তুমি বইছ কেন' নাটকে নাট্যকার যা বলতে চেয়েছেন, তা এর আগেও বহুবার বলা হয়েছে। নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্যও তাঁর অন্য নাটকে এই একই কথা বলেছেন। মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদ ও শেষ পর্যন্ত মহাজনের মৃত্যু—এ যেন অধিকাংশ নাটকের একটা ছকবাঁধা বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যদিও হাজার বার বলা বিষয়কেও নাট্যকার নতুনভাবে উপস্থিত করতে পারেন। কিন্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও সমস্ত ভাবনা যেন এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের কোন যুবতী মেয়ের প্রতি মহাজনের লোভ, ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষ, পুলিসের অত্যাচার, মহাজনের মৃত্যু—এই পর্যন্ত যেন একটা সীমারেখা। তবুও সংলাপ ও ফর্মের কিছু পরিবর্তনের জন্য এ নাটকে কিছু নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়।

নাট্য-কাহিনীর দুর্বলতা ছাড়া কোরাসের প্রযোজনা এক কথায় ত্রুটিহীন। নাটকের শুরু থেকেই দর্শকরা কোরাসের কাছ থেকে এক প্রতিশ্রুতি পেয়ে যান। সাপুড়ে আর সাপুড়ের মেয়ের 'সাপ খেলাবে গো' বলে ডাক আর পশ্চাৎপটে প্রবহমান গঙ্গা সব মিলিয়ে ভাল নাটক দেখার আশ্বাস মেলে প্রথম থেকেই। দলগত অভিনয় যে কোন প্রযোজনাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে। বিচারের দৃশ্যটিতে পরিচালক অনুপ সরকারের বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা—এই নেপথ্য সংগীতটির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎপটে টুইসট [illegible] যুবকের অশ্লীল নাচের ছায়াচিত্রের ব্যবহারটি সুপ্রযোজ্য। নগেন গোঁসাই-এর চরিত্রটিকে পরিচালক অন্যভাবে উপস্থিত করতে পারতেন। চরিত্রটির মুলে পরিচালক প্রবেশ করতে চাননি ফলে চরিত্রটি নাটকীয় রিলিফ সৃষ্টির কাজে একমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। [illegible] কোন সময় ভাঁড়ের মত মনে হয়েছে চরিত্রটিকে।

বেউলার চরিত্রে অরুন্ধতি চ্যাটার্জির অভিনয় কিছুটা আনডার অ্যাকটিং মনে হতে পারে। কিন্তু নাটক দেখার পর মনে হয় অন্যভাবে অভিনয় করলে হয়তো চরিত্রটি যথাযথ প্রকাশিত হত না। সাপুড়ের মেয়ের ভূমিকায় অরুন্ধতী চ্যাটার্জি আগাগোড়াই চরিত্রটির সঙ্গে এক হতে পেরেছেন। প্রেমিক [illegible] চরিত্রে বারীন সরকারের অভিনয় [illegible] সংযম লক্ষ করার মত। মহাজন [illegible] তীর্থংকর গুহ কোন কোন সময় [illegible] নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

কোরাসের সর্বাপেক্ষা সার্থকতা তাঁরা আঙ্গিকের প্রতি অতিরিক্ত [illegible] দিয়ে চমক সৃষ্টি করতে চাননি। অভিনয়কেই যে তাঁরা প্রধান [illegible] করেছেন, সে প্রমাণ মিলেছে তাঁদের প্রযোজনায়।

কণ্টককল্পিত

'দেশ' পত্রিকার ১৩ মে'র সংখ্যায় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁর 'কণ্টকল্পিত' স্মৃতিচারণে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে কল্যাণী কংগ্রেস অধিবেশন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন যে, অধিবেশন মণ্ডপে ভিড়ের মধ্যে সভাপতি জওহরলাল নেহরুর স্মারকচিহ্নটি খসে পড়ে যায়। অতুল্যবাবু স্মারকচিহ্নটি খোয়া যাওয়ার বিষয়টি মাইকে ঘোষণা করার কিছুক্ষণ বাদে 'একজন কৃষক ব্যাজটি এনে দিলেন।'

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সভাপতির (নেহরু ওই কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন) প্রতীক যে ব্যাজটি (একটি ক্ষুদ্রাকৃতির সুবর্ণ পদ্ম) খোয়া গিয়েছিল তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন উড়িষ্যার একজন কংগ্রেস প্রতিনিধি। সভামঞ্চের ওপর উঠে তিনি ওই প্রতীকটি পণ্ডিত নেহরুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নেহরু প্রতীকটি পেয়ে স্মিতহাস্যে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। সেই প্রতিনিধি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি কথাও বলেছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম নেহরুর মত একজন বিশ্ব-বিশ্রুত ব্যক্তির করস্পর্শলাভ করে ওই কংগ্রেস কর্মীর চোখে-মুখে কী প্রশান্তির ছাপ!

বৃষ্টি ও জনতার ভিড়ে লণ্ডভণ্ড কল্যাণী কংগ্রেস অধিবেশনকে সফল করার ব্যাপারে অতুল্যবাবু কয়েকজন কংগ্রেস নেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভবও নয়। কিন্তু শীতকালের বৃষ্টি ও জলধারার মধ্যে তৎকালীন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী (উপ) ডঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এবং রান্নাঘরের তত্ত্বাবধায়ক তুলসীরাম সারোগীর (মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি) প্রাণ ঢালা কাজের কথা ভোলার নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৪ সালের ২৩ জানুয়ারির অপরাহ্ণে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের কক্ষ জনতার অস্বাভাবিক চাপে নির্দিষ্ট সময়ের দেড় ঘণ্টা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' প্রতিবেদকরূপে আমি ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। সে দিন সভামঞ্চের এক জায়গায় আমার আসন গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি জনতার প্রচণ্ড চাপে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। বীরেশ সেন, আনন্দগোপাল মুখার্জি এবং আরও বিশিষ্ট কয়েকজন কংগ্রেস বন্ধু সভামঞ্চে এক নিরাপদ জায়গায় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সভামঞ্চ থেকে সেই অস্বাভাবিক ভিড় এবং নেহরুর অসামান্য জনপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। পর দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'শ্রীনেহরুর গণসংযোগ' নাম দিয়ে ওই অধিবেশনের বিবরণটি বের হয়েছিল। দেখেছি, জনতা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম স্বেচ্ছা-সেবকদের 'অপদার্থ স্বেচ্ছাসেবকদল' পশ্চিমবঙ্গের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন নিজেই জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে। নেহরুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুজন পদস্থ অফিসার তাঁর পিছনে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নেহরু তাঁদের জনতার মধ্যে বসিয়ে দিলেন। সভামণ্ডপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। আশ্চর্য, কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশৃঙ্খল জনতা শান্ত হলো মন্ত্রমুগ্ধের মত—নেহরুর অঙ্গুলি নির্দেশে। সভামঞ্চে ফিরে এসে নেহরু পরীক্ষার ফল ঘোষণা করে বলেন, জনতা ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৫ নম্বর পেয়েছে।

প্রশান্ত জনতার হাস্যরোলে সে সময় সভামণ্ডপ মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

মধুসূদন চক্রবর্তী
কলকাতা-১৪

বৌদ্ধ মহাসম্মেলন

২০ শে মে তারিখের 'দেশ'-এ শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের 'কণ্টকল্পিত' নিবন্ধে বৌদ্ধ মহাসম্মেলন সম্বন্ধে কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি সংশোধনকল্পে আমার যে পত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৭ জুনের 'দেশ'-এ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষরঞ্জন বড়ুয়া তার কিঞ্চিৎ সমর্থন—কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এতে বিষয়টির নিষ্পত্তি তো হলই না! বরং ব্যাপারটি সতর্ক পাঠকদের কাছে আরও জটিল ও বিভ্রান্তিজনক বোধ হতে পারে।

আমি বৌদ্ধ মহাসম্মেলনগুলির যে সন-তারিখ উল্লেখ করেছিলাম তা সবই যে নিরঙ্কুশ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এমন নয়। বরং তা বেশীমাত্রায় অনুমানভিত্তিক। তাই 'সম্ভবত' শব্দটি আমি অর্থপূর্ণভাবেই ব্যবহার করেছিলাম। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া মহাশয়ও আরও কয়েকটি সন-তারিখ পরিবেশন করেছেন এবং বলেছেন 'সম্ভবত'। সুতরাং যে নিরীক্ষায় সম্ভাব্যতাকে প্রশ্রয় দিতে হয় বেশী সেখানে ইতিহাস-ভিত্তিক বিতর্কের অবকাশ সংকীর্ণ। জানি জ্যোতিষরঞ্জন বাবুর অনুমানের ভিত্তি নিঃসন্দেহে কয়েকটি শক্ত সমর্থ যুক্তি—যেমন আমার অনুমানের ভিত্তিও নিছকই কল্পনা-বিলাস বা প্রথাসিদ্ধির আশ্রয় নয়। কিন্তু সে সব যুক্তির অবতারণা করার স্থান এটা নয়; তাতে আমার প্রবৃত্তিও অল্প। তবে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া মহাশয় কণিষ্কের সময়কার বৌদ্ধ মহাসম্মেলনকে যেভাবে 'এক হিসেবে প্রথম' বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তা একাধিক কারণে অসমর্থনীয়।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া মহাশয়ের যুক্তি : 'কেননা এটাই ছিল মহাযানীদের প্রথম মহাসম্মেলন।' এর উত্তরে আমি 'মহাসম্মেলন' শব্দটির অর্থ-ব্যঞ্জনার প্রতি জ্যোতিষরঞ্জনবাবুকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করবো। শব্দটির সামান্যতম অনুধ্যানেই উপলব্ধি হয় যে এতে

বস্তুত মহাসম্মেলনগুলি আহ্বান করা হত বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রকার শাখা-প্রশাখার সমর্থক ও নেতৃবর্গকে নিয়ে। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বা পরেই বৌদ্ধধর্মের প্রামাণিকতা নিয়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। আর সেই কারণেই এই মহাসম্মেলন বা সংগীতি সংগঠিত হত। এক একটি বৌদ্ধগোষ্ঠী নিজেদের কৌলিন্য ও উৎকর্ষতা দাবি করতে থাকে। যাতে বৌদ্ধধর্মের অখণ্ডতা ও পবিত্রতা রক্ষিত হয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলনগুলিতে সেই প্রচেষ্টাই হত। এই 'সংগীতি'র বিবৃতি বা ব্যাখ্যাই সকল গোষ্ঠী মেনে নিতেন।

কিন্তু এই মতানৈক্যকে একেবারে নির্মূল করা যায়নি। প্রতিটি মহাসম্মেলনেই মতদ্বন্দ্ব প্রকটিত হতে থাকে। এই মতান্তর চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে মনান্তরে পরিণত হল; বৌদ্ধগোষ্ঠী দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল। তাই বৃহত্তর ঐতিহাসিকতার এটাই শেষ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন। ব্রহ্মরাজ মিনডন বা উ নু-র শাসনকালে যে বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় তা বিশেষ একটি গোষ্ঠীর—মহাযানীদের। তাই তা 'মহাসম্মেলন' এই পদবীতে উঠতে পারে না।

অধিকতর আধুনিক ঐতিহাসিকদের সাম্প্রতিক একটি শ্রেণী তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলনকেও 'মহাসম্মেলন' তৃতীয় মহাসম্মেলন নাকে [illegible] থেরবাদীদের বৈঠক—আর তাঁদের মতামতই এখানে গ্রাহ্য হয়। অন্য গোষ্ঠীর কোন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না! তবুও আমরা একে আজও তৃতীয় 'মহাসম্মেলন'ই বলছি; কারণ তখনও পর্যন্ত মহাযানী ও হীনযানীদের মতানৈক্যজনিত বিচ্ছেদ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। একমাত্র কণিষ্কের আমলের বৌদ্ধ মহাসংগীতিতেই এই বিচ্ছেদ বৌদ্ধরা ব্যবহারিক অর্থে মেনে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্থক্য দাবি করলেন।

পরিশেষে, কণিষ্কের সময়ের এই মহাসম্মেলন যেহেতু মহাযানীদের সংখ্যাধিক্য বা তাঁরাই এটা ডেকেছিলেন তাই একে মহাযানীদের 'প্রথম' সম্মেলন বলতে পারা যায়—জ্যোতিষরঞ্জনবাবুর এই যুক্তির ক্ষেত্রে সারবত্তা নেই। কারণ সেই একই হিসেবে তো তৃতীয় মহাসম্মেলনকেও হীনযানীদের প্রথম মহাসম্মেলন বলা যায়—কারণ ঐ সম্মেলন হীনযানীদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আহূত হয়েছিল। কিংবা আজ যদি হীনযানীরা বা থেরবাদীরা কোন সম্মেলন ডাকেন জ্যোতিষরঞ্জনবাবু সেই সম্মেলনকে কত নম্বর সম্মেলন বলবেন?

অরবিন্দ সামন্ত
নরেন্দ্রপুর।

'অত্যাচার বোল খেলার' (দেশ, ৩০ জুন ১৯৭৮) চিঠিতে আমাকে অজ্ঞান হয়েছে। পদবীর উল্লেখ আছে, কিন্তু আমার তিন অক্ষরের নামটির স্থলে 'অনেক' হয়েছি। পত্র লেখকের সৌজন্য বোধকে ধন্যবাদ।

(ডঃ) সুধীর চক্রবর্তী 'ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা' (দেশ, ২৯ এপ্রিল ১৯৭৮) নামক প্রবন্ধটিতে মেলার যথার্থ চিত্রটি ফুটিয়েছেন। প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করবার জন্য ওই মেলার একটি নমুনো-সমীক্ষার অংশ বিশেষ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত উৎসাহে কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে আমার কয়েক বছরের ক্ষেত্র-অনুসন্ধানের সজীব ফসল ওই সমীক্ষাটি। তা ১৯৭৬'র মে-তে 'বাংলার মুখ : মেলার রূপ' নামে প্রথম প্রকাশ হয়। পরে 'কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্যায়)' নামক সংকলন গ্রন্থে সংযোজিত হয়। মেলাটির প্রথম সমীক্ষা বলে গুণীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পত্র লেখক ডঃ চক্রবর্তীর 'উদ্ধৃতি'কে অর্থাৎ সমীক্ষায় বর্ণিত সংখ্যাকে "নির্ভরযোগ্য নয়" বলে রায় দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর রায়ের সমর্থনে কোন তথ্য নেই। তথ্য দিয়েই তথ্যকে খণ্ডন করতে হয়। এক্ষেত্রে আমি সবিনয়ে উল্লেখ করতে পারি বর্ণিত সংখ্যার সমর্থনে ঠিকানা-সহ প্রতিটি নাম পত্রলেখক দেখতে চাইলে তাঁকেই দেখাতে পারি। উদ্ধৃতির বিবরণে 'বরাতি'দের মধ্যে (দর্শনার্থী নয়) নারীর সংখ্যাধিক্যে পত্র-লেখকের হয়তো আপত্তি আছে। এতে নারীর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

'বরাতি'দের মধ্যে নারীর সংখ্যাধিক্যের সুবিশাল পটভূমিতে ইতিহাস জেগে আছে, সুদূর অতীতের নীরব সমাজচিত্র রয়েছে। পিতৃ-তান্ত্রিকতার ছিদ্রহীন প্রাধান্যে, আধা-সামন্ততান্ত্রিক বাংলার কৃষিনির্ভর পশ্চাদপদ সমাজে নর-বন্দী নারী জীবন সর্বাধিক শোষিত, বঞ্চিত এবং অবহেলিত ছিল। নারীজীবনকে পরনির্ভর করে তোলা হয়েছিল। ওই জীবনের অবর্ণনীয় প্রতিবিম্ব ঘোষপাড়ার মেলার 'বরাতি'দেরও সমাগমে ফুটে ওঠে। এর মনচিত্রাংশ মূল সমীক্ষায় কিছু আছে।

পত্র লেখক "যে সমীক্ষার উদ্ধৃতি (ডঃ চক্রবর্তী) দিয়েছেন তা বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী নয়" বলে উল্লেখ করেছেন। সংখ্যা বা তথ্য নিজগুণেই বিজ্ঞান। "উদ্ধৃতি", না "সমীক্ষা" কোনটি "বৈজ্ঞানিক রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী নয়" তা ওই বাক্য বিন্যাসে বোঝা দুষ্কর। জানা না থাকলেও জানান যেতে পারে যে তথ্যের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হয়, কোন বাঁধা ছক নেই। প্রকাশের রীতি প্রকাশক বা লেখকের নিজস্ব। তথ্যকে সহজভাবে পাঠকের কাছে উপস্থিত করাটাই বড় প্রকাশ-বিজ্ঞান। মূল সমীক্ষা এবং তার অংশবিশেষের 'উদ্ধৃতি'তে তাই-ই হয়েছে। যা পাওয়া গেছে তাতে ভাবের রং না চড়িয়ে মনগড়া পূর্ব সিদ্ধান্তের পেছনে সংখ্যাকে হাজির না করে, [illegible]হয়। 'কর্তাভজা' উপাসকদের "দশটি বিধি বা আইনে" "খাজনা" পত্রলেখকের ভাষায় "প্রণামী" দেওয়া এবং নেওয়ার কোন "আইন" নেই। "আইন" নেই, অথচ নেওয়া-দেওয়া চালু আছে। "খাজনা"র কে প্রবর্তক, তা অনুসন্ধানের বিষয়। "আইনে" যা নেই, কেন তা চালু আছে তার কারণ অবশ্য অজ্ঞাত নয়। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে ধর্মের নামে অর্থ গ্রহণ, দেবতার নামে সম্পত্তি যে এক ধরনের সামন্তযুগীয় শোষণের উপায় আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানে তা স্বীকৃত।

শতাধিক বৎসরের অর্থপ্রাপ্তির মোট সংখ্যাটি জানবার কৌতূহল হয়। প্রাপ্ত অর্থের কী পরিমাণ সাধারণ শিষ্য-শিষ্যাদের বৈষয়িক কল্যাণে ব্যয়িত হয়েছে তা জানবার আগ্রহ আছে। সমীক্ষার সময় বৎসরের মোট অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ জানতে গিয়ে বিরাগভাজন হয়েছিলাম। ধর্মমতে অভিন্ন, কিন্তু 'খাজনা' গ্রহণের একাধিক 'গদির' অবস্থিতির ভিন্ন হবার কারণ জানতে গিয়ে আমাদের দেশের শরিকী বিবাদের চিত্র কেন জানি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে বৃহত্তর লোভ রিপুটি সেখানে, অথচ বলতে দ্বিধা নেই, 'কর্তাভজা' ধর্মমতে সর্ববিধ লোভ পরিত্যক্ত।

সরকারী রেকর্ডে সরস্বতী ট্রাস্টের কর্তৃত্বাধীন ৬·২৯ একর জমি আছে। কিন্তু মেলা বসে অনেক জমি জুড়ে। এখানে "কল্যাণী উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ" ও "জে-এল-আর-ও (চাকদা)"র জমিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। তাতে ভাড়া দিয়ে দোকানপাটও বসে। এ ভাড়া কে ঠিক করে, কারা ভাড়া নেয়, তা জানতে পারলে প্রকারান্তরে অপরের প্রাপ্য (ধন) হরণ হচ্ছে কিনা তা জানা যেত। বলা দরকার, ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা প্রতি বৎসর মেলা থেকে সংগৃহীত হয়।

'বরাতি'দের দিক থেকে শতাধিক বৎসরের সংগৃহীত 'খাজনা' এবং ভাড়ার প্রাপ্য টাকা দিয়ে যদি ঘোষপাড়ায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়, একটি অবৈতনিক চিকিৎসালয়, অসহায় 'বরাতি'দের জন্য শেষ বয়সের একটি আশ্রম এবং 'দশটি বিধান' অনুসারে মানুষকে উন্নত করবার জন্য একটি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠত, মানব জাতির সেবাধর্মে তা সমুজ্জ্বল হত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এ কাজ করে আসছেন।

পত্রলেখক বলেছেন, "যে-কোন ধর্মস্থানেই প্রণামদান একটি ধর্মীয় প্রথা।" 'খাজনা' (পত্রলেখকের ভাষায় 'প্রণামী') দানে "যে-কোন ধর্মস্থানের" মতো যে "ঘোষপাড়া", তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, এর জন্য অভিনন্দন জানাই। অন্য ধর্মমতের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে অমিল থাকলেও অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে (যে নামেই হোক) "ঘোষ পাড়াও তার ব্যতিক্রম নেই" এই সত্য প্রকাশে খুশী হয়েছি। অর্থ গ্রহণের "ধর্মীয় প্রথা" ধর্মের মহৎ প্রাণের প্রবক্তারা সৃষ্টি

দেরই লালন-পালন করেছে।

পত্রলেখক নতুন সংবাদ দিয়েছেন—ওই মেলায় নাকি "বাংলা দেশ থেকে কমপক্ষে পাঁচ ছয় হাজার মুসলমান মহাশয়' বা 'বরাতিরা' আসেন।" 'কর্তাভজার' "মুসলমান" 'বরাতি' একটি স্ববিরোধী শব্দ। 'কর্তাভজার' তাত্ত্বিক ভাষ্যে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান ইত্যাদিতে কোন ভেদাভেদ নেই, সকলেই 'কর্তার' সন্তান। পত্রলেখক "মুসলমান" শব্দটি প্রয়োগ করে ভেদাভেদের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। আসলে ভাষ্যে ভেদাভেদ না থাকলেও কার্যক্ষেত্রে আছে। এটা যে প্রচলিত সমাজের একটি ঐতিহাসিক ব্যাধি। আমার প্রশ্ন, বিদেশী নাগরিকদের আগমনের ওই সংখ্যার সমর্থিত ভাষ্য ভিসা বা পাসপোর্ট দপ্তরে কী পাওয়া যাবে?

মানিক সরকার
বারাকপুর

ঘোষপাড়ার সতীমা-র মেলা: লেখকের উত্তর

'দেশ' পত্রিকায় ২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত (১৫ বৈশাখ ১৩৮৫) আমার নিবন্ধ সম্পর্কে শ্রীরতনকুমার নন্দী ও শ্রীবসন্তকুমার ঘোষের লেখা দুটি চিঠি (৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত) পড়লাম। রতনবাবুর ১নং ও ২নং সংশোধনের জন্য ধন্যবাদ। দুটো ভুলই অসতর্কতা-জনিত, অজ্ঞতাজাত নয়। অন্যান্য ত্রুটি-নির্দেশ আমার গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি; প্রসঙ্গত, পত্রলেখকদের সবিনয়ে জানাই, আমার রচনাটি প্রতিবেদনধর্মী (সে কথা আমি লিখেছি), গবেষণামূলক (বসন্তবাবু আমার অ-গবেষকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করেছেন) নয়। গত ছ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সতী মা-র মেলায় আমি যা চাক্ষুষ দেখেছি ও জেনেছি তা-ই লিখেছি। বসন্তবাবু আমাকে সমঝিয়ে দিয়েছেন: 'ছ' মাস কেন বিশবারেও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য মেলা ঘুরে ঘোষপাড়ার মূলতত্ত্ব ও তথ্য উদ্ধার করা কোন একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।' মুশকিল যে, আমি ঘোষপাড়ার মূলতত্ত্ব (সেটা কি বস্তু?) লিখতে বসিনি। আর একটি মেলা যদি বিশবার দেখেও তথ্য সংগ্রহ না করা যায় তবে আমাদের কলম গুটিয়ে নিতে হয়। তাতে রাজি নই।

উভয় পত্রলেখকই আমার রচনায় উল্লিখিত মেলার নামকরণ, মন্দির জমির পরিমাণ ইত্যাদি নানা তথ্যঘটিত ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। এই সব তথ্যনির্দেশের ব্যাপারে আমি উদার হস্তে সাহায্য নিয়েছি শ্রীমানিক সরকারকৃত সমীক্ষার মুদ্রিতরূপ (বাংলার মুখ: মেলার রূপ' সপ্তাহ, মে ১৯৭৬ কলিকাতা এবং শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত 'কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস'—দ্বিতীয় পর্যায় মার্চ ১৯৭৭) থেকে। যেহেতু পত্রলেখকরা আমার সংগৃহীত ভুল তথ্যের সংশোধনে প্রকৃত তথ্য দেননি তাই আমার ও দেশ পত্রিকার অগণিত পাঠকের অজ্ঞানতা থেকে গেল। ভরসা আমাদের অজ্ঞানতা মোচন করবেন এবং শ্রীসরকারের লিখিত তথ্যকে সংশোধন করে দেবেন। অবশ্য তখনই আমরা শ্রীসরকারের আত্মপক্ষ জানতে পারবো।

আমার নিবন্ধে উল্লিখিত ৩৮১ জনের 'স্যাম্পেল সার্ভে' (এটিও শ্রীসরকারকৃত ও মুদ্রিত) সম্পর্কে তাচ্ছিল্য করে বসন্তবাবু লিখেছেন, মেলায় মেয়েদের অধিক সংখ্যায় যোগদানের যে তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন এবং জনৈক শ্রীসরকারের যে সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা নির্ভরযোগ্য নয় বা বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী নয়।' এখানে তাহলে আমি অপরাধী নই। সমীক্ষাটি আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে তাই ব্যবহার করেছি। আর জনৈক শ্রীসরকার' (এই অসূয়াসূচক ভঙ্গিটি ভাল লাগেনি) বস্তুত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও পরিচিত লোক-সংস্কৃতিবিদ বলেই স্বীকৃত। প্রসঙ্গত বসন্তবাবু লিখেছেন 'বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে' যে পাঁচ ছয় হাজার মুসলমান মহাশয় ও বরাতিরা আসেন' (বৈধ পথে পাসপোর্ট করে আসেন তো? আমার তো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পাঁচ ছয় হাজার সংখ্যাটার নূনে মেশাতে ইচ্ছা করছে) তাদের মধ্যে শতকরা একজনও মহিলা নেই'। আমাদের প্রশ্ন কি করে থাকবে? বাংলাদেশ থেকে মহিলাদের সঙ্গে আনা খুব কি সহজ ও স্বাভাবিক?

ঘোষপাড়ার মেলার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূলে অনেকগুলি কারণ আমার নিবন্ধে উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে ধনকুবের বিড়লার আর্থিক আনুকূল্যের কথা এসেছে। আমি বলিনি (এবং এখনও বলছি না) যে, বিড়লার সাহায্যে মেলার প্রসার ঘটেছে। তবে মূলে সতী মা-র মন্দিরটাই তো বিড়লার অনুদানে নির্মিত হয়েছে এবং সে কথা শ্বেতপাথরে পরিষ্কার কালো অক্ষরে লেখা আছে। অতএব বিড়লার কৃপাদৃষ্টির কথা অসত্য ও অবাস্তব নয়। প্রাসঙ্গিকভাবে আমি অন্যান্য ভক্তদের আনুকূল্য ও 'সতীমাতা সেবক সঙ্ঘের' সাংগঠনিক কৃতিত্বের কথাও উল্লেখ করেছি।

রতনবাবু ডালিমতলায় ভক্তসমাবেশ আলোকচিত্রটি বিভ্রান্তিকর বলেছেন এবং অনুমান করেছেন, এটি কোন অবস্থার চিত্র হওয়া সম্ভব'। তাঁর ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলে দুঃখিত। এই প্রসঙ্গে আলোকচিত্রকরের বক্তব্য স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া গেল।

এক শ্রেণীর ভক্ত ঘোষপাড়ায় বোবাদের মুখে কথা ফোটাবার চেষ্টায় যে অমানবিক অত্যাচার করে আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। বসন্তবাবু জানতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রোগমুক্তি বা মনস্কামনাপূর্ণ বা বোবার কথা বলার যে সব ঘটনা সত্যই ঘটেছে তা আমি কেন লিখিনি। এর জবাব উত্তর প্রথমত, আমি রোগমুক্তি ও মনস্কামনাপূর্ণের কথা নিবন্ধে লিখিনি, লিখেছি ঐ কামনায় বহু লোক মানসিক করে ও দণ্ডী খাটে (তার ছবিও দিয়েছি) এবং দ্বিতীয়ত বোবার কথা বলার কোন ঘটনা আমি দেখিনি বা শুনিনি। অনুক্ত না।

পরিশেষে পত্রলেখক দুজনকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ক্ষুদ্র নিবন্ধটি সম্পর্কে দৃষ্টি দিয়েছেন বলে। প্রসঙ্গক্রমে ঘোষপাড়ার যোগদানকারী সকল দর্শনার্থী ও ভক্তদের জানাচ্ছি এই মেলা ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। এই মেলার উদ্যোক্তাদের প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই। তবু আমার নিবন্ধে অজ্ঞাতসারে কাউকে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তবে এই সুযোগে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

সুধীর চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর

(এ প্রসঙ্গে আর কোনো চিঠি প্রকাশিত হবে না)

জয়পুর

শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি (দেশ: ১৭ জুন) পড়ে এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। তাঁর 'জয়পুরের জন্মদিনে' (দেশ: ৮ এপ্রিল) পড়ে হতাশ হয়েছিলুম, তাঁর দীর্ঘ লেখার অগণিত ভুলভ্রান্তি ও অন্যের লেখা থেকে বিনা স্বীকৃতিতে হুবহু ভাষান্তর করার অসৌজন্যতা দেখে (দেশ ২০ মে)। এখন দেখছি চোখে আঙুল দিয়ে ভুলগুলি ধরিয়ে দেওয়ার মৌলিকত্বের বহিরাবরণ খসে পড়ার মুখে 'খুশি উদ্বুদ্ধ ও কৃতজ্ঞ' হয়েছেন বললেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উল্টোপাল্টা যুক্তি দিয়ে অশালীন ভাষায় ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করেছেন যদি তাতে আত্মরক্ষা করতে পারেন এই ভেবে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে আমার চিঠি লেখা খুবই অন্যায় হয়েছে। কে এক অখ্যাত 'ছোকরা' বিদ্যাধর পনের বছর ধরে খুঁকতে খুঁকতে জয়পুরের মত একটা বৈচিত্র্যহীন সমীকরণের শহর তৈরী করতে করতে 'ভগ্নস্বাস্থ্য প্রৌঢ়' হয়ে গেলেন ইত্যাদি পড়ার পর আমাদের বলা উচিত ছিল, 'উফ্ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কী দারুণ রোমান্টিক কল্পনা দিয়ে নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসকে।' তা না বলে যেহেতু বলেছি, বিদ্যাধর তো মাত্র তিন বছরের মধ্যে নগর পরিকল্পনা ও স্থপতির এক বিস্ময়কর নিদর্শন সৃষ্টি করে তাঁর জীবনকালেই বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, পয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি জয় সিং-এর উত্তরাধিকারী ঈশ্বরী সিং-এর 'দেশ-দেওয়ানের' গুরুদায়িত্ব পালন করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবধি করেছিলেন।

কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এমন সব কথা বলেছেন, স্থূলে ইঙ্গিত করছেন যা রীতিমত আপত্তিকর। আমি চেষ্টিত যুক্তির অনিশ্চিত ভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই কিংবা অকারণ ক্রোধ আমার যুক্তিবাদী সত্তাকে আদপেই আড়াল করে দেয়নি। সৌজন্যতাবোধের সামান্যতম অভাব আমার চিঠির একটি ছত্রেও প্রকাশিত হয়নি। তিনি প্রমাণ করতে অক্ষম হয়েছেন যে আমার চিঠির কোন যুক্তি বা

তাঁকে হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে সেটি লেখা।

যে তিন-চারটি পয়েন্ট শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে তার উত্তরে অতি সংক্ষেপে আবার জানাই—বাজার কথাটি জয়পুর শহরের আসল স্পিরিট নয়, তার সত্তা বহুধাবিভক্ত। জয়পুরের সংক্রামক গোলাপী রং অবশ্যই তাঁর চোখে পীড়াদায়ক লাগতে পারে—এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রশ্ন—কিন্তু পিঙ্ক সিটি দেখতে এসে এই গোলাপী রং কি প্রত্যাশিত নয়? রাস্তার মাপজোক দেননি বলে পকেটে টেপ না নিয়ে আসা ইত্যাদি বক্রোক্তি দুঃখজনক ও অশোভন। সংখ্যা পরিমাপ দেওয়ার উদ্দেশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিদ্রান্বেষণ নয়, বিদ্যাধরের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঠিক পরিচয়জ্ঞাপন। মোটর গাড়ি আবিষ্কারের দেড় শ' বছরেরও অনেক আগে ১০৮ ফুট চওড়া, বাঁধানো, সোজা সমান্তরাল রাজপথ দিয়ে সারা শহরটিকে প্রায় সমমাপের কয়েকটি আয়তক্ষেত্রে ভাগ করে বিভিন্ন নাগরিক প্রয়োজনে নির্দিষ্ট করার পরিকল্পনা যে কি রকম অভিনবত্বের ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক সাধারণ পাঠকবর্গকে তা জানানোর প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়েছিল। আগেও লিখেছি জয়পুরের মুখ্য রাজপথগুলি সব জটিল ঘূর্ণনের (?) শেষে' কনট সার্কাস বা পার্ক সার্কাসের মত কোন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে একত্র' হয় না সেগুলি সম্মিলিত হয় একাধিক 'চৌপড়ে' যেগুলির পারস্পরিক দূরত্ব অনেকখানি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মন চায় বা নাই চায় সওয়াই জয়সিং জগন্নাথ সম্রাটের ভিত্তি পুজোর সময় উপস্থিত ছিলেন এরকম কল্পনার সুযোগ কম। আমার যতদূর জানা, তাতে মনে হয় ঠিক ওই সময়—তিনি দিল্লীর জয়সিংপুরায় সদ্য-নির্মিত যন্তর মন্তরে জ্যোতিষ চর্চায় ও দিল্লীশ্বর মুহম্মদ শাহ রঙ্গিলার সঙ্গে আলোচনায় মশগুল ছিলেন। তাঁর জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহের কারণ ও পটভূমি এতই পরিচিত যে কোন অনামী সুন্দরী আমদানি করা নিরর্থক। অবশ্য এ কাহিনী তাঁর কল্পিত নয়— পূর্ব-প্রচলিত। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়, তবে যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তাতে এটি যে বেশ বাস্তব ঘটনা ঐতিহাসিক তথ্য নয় কিংবদন্তী তা বোঝা যায় না। ঘুড়ি মাঞ্জার গল্পটি ভাসিয়ে দেবার কথা আমি বলিনি শুধু বলেছি যে কাহিনীর নায়ক জয়পুরের নির্মাতা জয়সিং নয় দ্বিতীয় সওয়াই রাম সিং এবং ঘটনাকাল অন্তত এক শ' বছর পরেকার। এই তথ্যটি নীরস বলে কি অপ্রয়োজনীয়?

নাম ছুঁড়ে ফেলার অভ্যাস বড়ই বদভ্যাস। ইতিহাস ও রম্যরচনা এক নয় ঠিকই। যেখানে ইতিহাস নীরব, তথ্য অনুপস্থিত, যুক্তি অকাট্য নয় সেখানে কিছু কল্পনার আশ্রয় অনেকেই নেয়। কিন্তু যে অতীত সুদূর নয়, যেখানে বিশ্বাসযোগ্য মালমশলার অভাব নেই সেখানে অহেতুক রোমান্টিক কল্পনার ছল করে বিকৃত তথ্য পরি-

বেদন করা আমার কাছে অন্যায় ও অনভিপ্রেত মনে হয়েছে।

অশোককুমার দাস
জয়পুর

এ-সম্পর্কে আর কোনো চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ভারতের শেষ ভূখণ্ড

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় "ভারতের শেষ ভূখণ্ড" সম্বন্ধে হালকাভাবে লিখতে লিখতে হঠাৎ Wegner-এর Continental Drift Theory-র মত রাশভারী বিতর্কিত তত্ত্বের সূত্রপাত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বেসামাল হয়ে হাস্যরসের উদ্রেক করেছেন।

তিনি লিখেছেন "ভারত, আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ ও অস্ট্রেলিয়া একসঙ্গে একটি মহাদেশ—গণ্ডোয়ানা উত্তরে টেথিস সমুদ্র, আরও উত্তরে এশিয়া।" কিন্তু দঃ আমেরিকা গেল কোথায়? ব্রহ্মদেশই বা তখন এল কোথা থেকে? তিনি আরও লিখেছেন, "আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ভেসে গেল দূরে পশ্চিমে।" প্রশ্ন হল আফ্রিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকা নামে কি দুই ভিন্ন মহাদেশ ছিল? আর আফ্রিকা পশ্চিম দিকে ভেসে গিয়েছিল এ তথ্য শ্রীচট্টোপাধ্যায় পেলেন কোথায়? Wegner-এর পরবর্তী-কালের বিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে বর্তমান আটলান্টিক মহাসাগর … স্থানে দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা খাপে খাপে মিলিত (Jigsaw fit) অবস্থায় ছিল। তা ছাড়া আফ্রিকার পূর্বে ভারত, দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু অঞ্চল, উত্তরে উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে অস্ট্রেলিয়া আনুমানিক ২০০ মিলিয়ন বছর আগে সংলগ্ন অবস্থায় ছিল। Wegner এর নাম দিয়েছিলেন Pangaea। এর ২০ মিলিয়ন বছর পরে দঃ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে গঠিত ভূখণ্ড যা গণ্ডোয়ানা নামে পরিচিত এবং উত্তর আমেরিকা ও এশিয়া নিয়ে গঠিত ভূখণ্ড যা লরেশিয়া নামে পরিচিত, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে—দক্ষিণ আমেরিকা যায় উত্তর-পশ্চিমে, আফ্রিকা উত্তর-পূর্বে, ভারত প্রথমে উত্তর পূর্ব দিকে পরে উত্তরে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রায় ১৪০ মিলিয়ন বৎসর ধরে এই টানা-পোড়েন চলে এবং আজ থেকে ৪০ মিলিয়ন বছর আগে মহাদেশগুলি মোটামুটিভাবে বর্তমান অবস্থায় আসে। অবশ্য এ গতির বিরাম নেই—তাই এখনও মাঝে মাঝে আপনারা শুনে থাকবেন এশিয়া নাকি এখনও উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে।

এই Continental Drift-এর সূত্র ধরেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন সেটিই সব থেকে মারাত্মক অলীক কল্পনাপ্রসূত লিখেছেন Continental Drift-এর ফলে ভারত আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর দিকে সরতে সরতে একদিন এশিয়াকে ধাক্কা মারল। তারপর সেই বিশেষ দিনে (?) রাত্রিবেলা (?) প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে জলটল ছিটিয়ে, সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে (প্রসব বেদনা?) গিরিরাজের জন্ম হল।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি. হিমালয়ের জন্ম বৃত্তান্ত তো আর Wegner-এর Continental Drift-এর মত কল্পনা মেশানো তত্ত্ব নয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ তথ্য বহুদিন আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে—মূলত টেথিস সমুদ্রে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত পদার্থ থেকে গঠিত শিলারাশিই আজ থেকে আনুমানিক ৩৮ মিলিয়ন বছর আগে গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের চাপে সমুদ্র-তল থেকে উঠতে শুরু করে এবং আজ থেকে আনুমানিক ১৫ লক্ষ বছর আগে মোটামুটি ভাবে বর্তমান হিমালয়ের আকার ধারণ করে। সুতরাং এ তো আর এক রাত্তিরের ব্যাপার নয়—কয়েক কোটি বছরের ঘটনা।

তারপর যে মানচিত্রটি তিনি লেখার সাথে দিয়েছেন সেটিও অসম্পূর্ণ এবং ভুলে ভরা। তাছাড়া সেই সময় মহাদেশ-গুলির আকৃতি ঠিক কেমন ছিল সে কথা কেউ না জানলেও মানচিত্রে তিনি যেমন দেখিয়েছেন তেমনটি যে একেবারেই ছিল না সে ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। কেন না ছবিটিতে মহাদেশ-গুলির বর্তমান রূপটিই ধরা পড়েছে। ১০০-২০০ মিলিয়ন বছর আগে মহাদেশগুলি যে একই রকম ছিল না সে বিষয় আমরা নিশ্চিত। ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর চেহারা বিজ্ঞানী-দের ধারণায় কেমন ছিল তার একটা স্কেচ ম্যাপ এই সাথে নমুনা হিসাবে দিলাম।

ত্রিদিবকুমার বসু
বাটানগর

॥ ২ ॥

'ভারতের শেষ ভূখণ্ড' লেখাটি পড়তে পড়তে আন্দামান ও নিকোবরের বহু তথ্য জানবার সৌভাগ্য নিতান্ত কম নয়। এর জন্য লেখক শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীকে তারিফ না করে থাকতে পারছি না। তবে তাঁর বিভিন্ন তথ্য ও বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে কিছু প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কাছে কিছু তথ্য এবং বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ জানবার জন্য বিশেষ ভাবে আগ্রহী। দীর্ঘদিন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের (tribals) মধ্যে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

১. ২০শে মে সংখ্যায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আন্দামানের লবণাক্ত প্রস্তর যুগে সভ্য মানুষকে ঢুকতে হলে...।' আন্দামানের 'প্রস্তর যুগ' কাদের নিয়ে উনি বলতে চাইছেন? তিনি কি আন্দামানের আদিবাসী যথা আন্দামানিজ, ওঙ্গি, জারোয়া এবং সেণ্টিন্যালিজদের এখনও 'প্রস্তর যুগের' মধ্যে গণ্ডিভুক্ত করে রাখতে চাইছেন? যতদূর জানা যায়, এঁরা কেউই বর্তমানে প্রস্তরের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করে না। 'প্রস্তর যুগ' বলতে, বাস্তবিক সাপেক্ষ।

২. ঐ সংখ্যারই শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় (৩৫ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'সেই সব দ্বীপে সময় ১৮৪৪ সালের পর একটুকুও এগোয় নি। সেই শমপেন, সেই জারোয়া, সেই সেণ্টিন্যালিজরা এখনো আছে। বিবস্ত্র মানব। আগুনের ব্যবহার জানে না।'

সেণ্টিন্যালিজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে না পারলেও শমপেন্ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে, এরা আগুনের ব্যবহার খুব ভালভাবেই জানে। দু-টুকরো কাঠের ঘর্ষণে উদ্ভূত আগুন এরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজে ব্যবহার করে। অপর দিকে জারোয়ারাও আগুনের ব্যবহার জানে এবং ১৯৬৮ সালে ধৃত জারোয়াদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছিল।

৩. ২৭শে মে সংখ্যায় ৩৬ পৃষ্ঠার ছবির ক্যাপশন্ 'হাজার হাজার বছরের বিশাল বিশাল গাছ কিছু আদিম মানব আন্দামানের ভূমিকা'। আমার প্রশ্ন শ্রীচট্টোপাধ্যায় নিকোবরীয় পটভূমিকে কিভাবে আন্দামানের ভূমিকা বলে পরিচয় করাচ্ছেন যেখানে স্পষ্টতই নিকোবরীয়দের দেখা যাচ্ছে তাদের বিশেষ ঢঙে তৈরি কুটিরগুলোর সামনে। আর 'হাজার হাজার বছরের বিশাল বিশাল গাছ' বলতে তিনি শুধু নারিকেলের বন দেখিয়েছেন যাদের বয়স গড়ে মাত্র ৬০ বছর।

৪ ঐ সংখ্যারই ৩৭ পৃষ্ঠায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'দূর থেকে দেখবো গাছের তলায় জারোয়ারা সারা গায়ে সাদা মাটি মেখে, তীর-ধনুক পাশে এলিয়ে রেখে, প্রেসার কুকারে মানুষের হাড়ি কাবাব বানাচ্ছে......আছে আছে, স্টোন এজ প্রেসার কুকার। অ্যানথ্রো-পলজিক্যাল মিউজিয়ামে দেখেন নি। ডোঙ্গার মত বিশাল আর পুরু গাছের ছাল। আস্ত একটা মানুষ মুড়ে ফেলা যায়...।'

জানি না, শ্রীচট্টোপাধ্যায় উপরে উদ্ধৃত অংশগুলিতে কি বোঝাতে চাইছেন। তবে তিনি যে গাছের ছালের প্রেসার কুকারের বর্ণনা দিয়েছেন, তা মোটেই জারোয়াদের নমুনা নয়। গ্রেট নিকোবরের আদিবাসী শমপেনরা অই গাছের ছালের তৈরী বৃহৎ পাত্রে Pandanus নামে একপ্রকার ফল আগুনে সিদ্ধ করে তা হতে নির্গত pulp প্রিয় খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ঐ নমুনাটি ১৯৬৬ সালে গ্রেট নিকোবর হতে শমপেনদের কাছ হতে সংগ্রহ করার পর ঐ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় শমপেনরা আগুনের ব্যবহার জানে। 'প্রেসার কুকারে মানুষের হাড়ি কাবাব বানাচ্ছে'—এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? যেখানে কোনোভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে জারোয়ারা 'নর-খাদক।'

৫, ৩রা জুন সংখ্যায় ৩৩ পৃষ্ঠায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন "দীর্ঘপথের দুপাশে যেন গাছের সারি ফাঁকে ফাঁকে জারোয়াদের উৎসুক সন্দিগ্ধ চোখ। সভ্যতার নিষ্ঠুর করছে।" এই শেষোক্ত লাইনটি তা
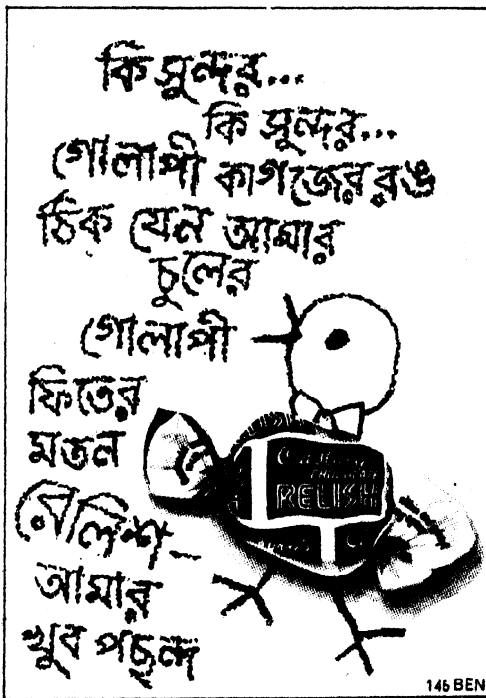
হয়েছে। ছবিটি এবং ক্যাপশানটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। প্রথমত, ছবিটি নিঃসন্দেহে জারোয়াদের নয়, কারণ এ ধরনের ভঙ্গিতে শুধুমাত্র লিটল আন্দামানের আদিবাসী ওঙ্গিদের দেখা গেছে। কারণ দুর্ধর্ষ জারোয়াদের মাত্র একটি দলের সঙ্গে ক্ষণিকের যোগাযোগ সম্ভবপর হয়েছিল ১৯৭৪ সালে যার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে National Geography নামক ম্যাগাজিনে এবং তাতে এ ধরনের ছবি পাওয়া যায় নি। জারোয়াদের প্রচণ্ডতম হিংস্রতা ও দুর্ধর্ষতার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সুদূর কল্পনাপ্রসূত।

কাজেই জারোয়াদের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে ওঙ্গিদের ছবি দেখাবার যৌক্তিকতা কোথায়। দ্বিতীয়ত, "সভ্যতার নিকুচি করেছে"—এটাও আপত্তিজনক, নয়কি? দুজন ওঙ্গি তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ অনুসারে পরস্পরকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভিবাদন জানাচ্ছে এবং এটাই তাদের সমাজে "সভ্য" রীতিনীতি।

৬ ঐ সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে তথ্যের অবতারণা করেছেন, তার কিছু ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে তিনি এড়াতে পারেননি। "বেঁচে রইল কেবল তারা যারা তীর-ধনুক নিয়ে সভ্যতার মোকাবিলা করেছিল ও করছে, সেই জারোয়া, ওঙ্গি আর নর্থ সেণ্টিনাল আইল্যান্ডের ওঙ্গিজারোয়া, সেণ্টিন্যালিজরা।' উক্ত পরিবেশিত তথ্যগুলো বিশদভাবে পরিব্যক্ত হয়নি, যার অভাবে বাক্যটির মধ্যে কিছুটা সত্যতার উপর ভিত্তি করে মূল তথ্য লুক্কায়িত অবস্থায় রয়েছে; বিশেষ করে 'নর্থ সেণ্টিন্যাল আইল্যান্ডের "ওঙ্গিজারোয়া, সেণ্টিন্যালিজরা।" ওঙ্গিদের বাসস্থান লিটল আন্দামানে, যেখানে জারোয়ারা দক্ষিণ ও মধ্য আন্দামানের পশ্চিম উপকূলভাগে গভীর জঙ্গলে বসবাস করে। সেণ্টিন্যালিজরা ওঙ্গিদের মত সম্পূর্ণ পৃথক দ্বীপ "নর্থ-সেণ্টিন্যাল"এ বসবাস করছে এবং এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃতিগত, ভাষাগত বৈষম্য থাকলেও আকৃতিগত সাদৃশ্য বহুলাংশে রয়েছে।

প্রণবজ্যোতি দে

শিলং—৪

॥ ৩ ॥

গত ২৪শে মে জুনের 'দেশ' পত্রিকায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 'ভারতের শেষ ভূখণ্ড' প্রবন্ধে একটা ভুল তথ্য দিয়েছেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে আট হাজার সৈন্য ছিল বলে তিনি লিখেছেন। এটা ঠিক না। আসলে নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে মোট ষাট হাজার সৈন্য ছিল। এর মধ্যে সাতাশ হাজার ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে, বাকী তেত্রিশ হাজার ছিল বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য যারা জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধ বন্দী হয়। বলতে বাধা নেই ইংরেজরা জাপানীদের কাছে হেরে ... আর এই ভারতীয়দের জন্য কোন চিন্তাই করে নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অজানা-অচেনা জায়গায় বিভিন্ন রোগে এবং না খেতে পেয়ে এদের অনেকেই মারা যায়। বাকী যারা ছিল সেই তেত্রিশ হাজার নিয়েই গঠিত হয় আজাদ হিন্দ বাহিনী।

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা-৫৬

নাটক থেকে ফিল্মে

গত ১৭ই জুন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রবি ঘোষ মহাশয়ের 'নাটক থেকে ফিল্মে' লেখাটি পড়ে কিছু কথা স্বভাবতই মনে এল। কেননা বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার থেকে বেশ কিছু অভিনেতা ফিল্মে অভিনয় করতে আসছেন।

নাট্য অভিনেতাদের ফিল্মে নেওয়ায় তিনটে কাজ সহজ হচ্ছে। এক, অল্প পরিশ্রম ও ঝুঁকিতে ভাল অভিনয় পাওয়া যাচ্ছে। দুই নাটকে অভিনয় করে এদের যা খ্যাতি হয়েছে ফিল্মের প্রচারে এই খ্যাতি কাজে লাগছে। তিন কম পয়সায় ভাল অভিনেতা সহজলভ্য হচ্ছে। অ.ব অভিনেতাদের দিক দিয়ে দুটো দিক থাকছে। এক, অপেশাদার অভিনয়ে পকেট খালি হয় ফিল্মের দৌলতে হাতে পয়সা আসে। দুই, ফিল্মের প্রসার ও প্রচার নাটকের চেয়ে অনেক বেশি বলে ফিল্মে এলে জনপ্রিয়তা বহুদূরগামী হয়। তিন. এই জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে তাদের নাট্যাভিনয়ে ভিড় বাড়ানো যায়। এতো গেল গতানুগতিক প্রথা। অন্যদিকে ফিল্মের দুনিয়ায় যারা চিন্তাশীল, প্রগতিবাদী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমর্পিত তাঁরাও এই অভিনেতাদের গ্রহণ করেন দুটো কারণে মুখ্যত। এক, মনোমত অভিনয় এদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। দুই, ফিল্মের স্টার-সিস্টেমের প্রচলিত প্রথাকে অস্বীকার করা চলে। তাছাড়া এই ধরনের পরিচালকদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে এই অভিনেতাদের মানসিকতার সাজুয্য থাকে। মাধ্যম তাই এখানে খুব একটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

তাই দেখি, নানা কারণেই গ্রুপথিয়েটারের অভিনেতা ফিল্মের পর্দায় হাজির হচ্ছেন কিংবা সাদরে গৃহীত হচ্ছেন। এবং অনেকেই অচিরে এই নতুন মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন।

কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠা কিভাবে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাঁড় বা ভিলেনের চরিত্রাভিনেতারূপে। এবং ভিলেন কিংবা কমিক চরিত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফিল্মের বৃহত্তর দর্শকের কাছে সেই স্বরূপের অভিনেতারূপেই জনপ্রিয়তা লাভ করছেন। থিয়েটারে এই অভিনেতাদের বিভিন্নমুখী ও দুরূহ চরিত্র অভিনয়ের দক্ষতা থিয়েটার রসিক দর্শকের অবিদিত নেই। অথচ বৃহৎ বাঙলার এদের থিয়েটার দেখে না এমন যে দর্শক, যাদের সংখ্যা প্রথমোক্তদের অনুপাতে বেশ, তাদের কাছে এদের স্বরূপে অগোচরে থেকে গিয়ে এরা ভাঁড় কিংবা খল চরিত্রাভিনেতারূপে পরিচিত হয়ে যাচ্ছেন। মানুষের অধিকার কি ময়নাতদন্ত কি টিনের তলোয়ারের উৎপল সেখানে অনুপস্থিত। দেব আফগান কি মজুরী আমের মজুরী কি তিন পয়সার পালায় অজিতেশ সেখানে অজানা। কল্লোল কি জন্মভূমির শেখর সেখানে অজ্ঞাত। অঙ্গার কিংবা ঠগ নাটকের রবি ঘোষ কোথায়? নবান্ন কিংবা দেবীগর্জনের বিজন ভট্টাচার্য অচিন্তনীয়। উৎপল ফিল্মে সিরিও-কমিক কিংবা ভিলেন। অজিতেশ শেখর তো মূর্তিমান ভিলেন। রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় তো ফিল্মের ভানুজহরের স্থান দখল করে নিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিংবা দক্ষ কিছু পরিচালক এদের নিয়ে সীরিয়াস চরিত্র যে করিয়ে নেননি তাও নয়। এরা ফিল্মেও তাঁদের নিজস্ব চরিত্রেও অসামান্য হতে পারেন। কিন্তু প্রচলিত ফিল্মের কৌশলে এঁরা এখন এই দুইরূপেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু এঁরা কি বুঝছেন না যে, ফিল্ম তার ব্যবসা ও এসটাবলিশমেণ্টের চাতুর্যে এই ক্ষমতাবান অভিনেতাদের কাজে লাগিয়ে নিচ্ছেন এবং নিজেদের ফসল ঘরে তুলে নিচ্ছেন। আর গ্রুপ থিয়েটারের প্রগতিবাদী দক্ষ অভিনেতারা প্রকারান্তরে এই এসটাবলিশমেণ্টের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছেন এবং সেই খপ্পরে মাথা গলিয়ে ক্রমশ স্বরূপ হারিয়ে ফেলে বৃহত্তর জনগণের কাছে নিজেদের ভিলেন কিংবা ভাঁড়ে পরিণত করে চলেছেন। 'বিশ শতকের শেয়ালের' গর্তে সবাই হয়তো জেনেবুঝে পা গলাচ্ছেন না, কিন্তু যে করেই হোক গলাচ্ছেন আর তাতে নিজেদের প্রতিদিনের পরিশ্রম ও সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের এবং গ্রুপ থিয়েটারের ঐকান্তিক সাধনার সমূহ সর্বনাশ করছেন। থিয়েটারের জগতে এঁরাই তো শত অসুবিধে ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নিজস্ব পথে এগিয়ে চলতে চাইছেন। অথচ তাঁরাই সেলুলয়েডের বুকে এত সহজে নিজেদের হারিয়ে ফেলছেন কেন?

দর্শন চৌধুরী

কোন্নগর

মেঘদূতের ওপর চীনা প্রভাব

শ্রীপ্রভাততপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩রা জুনের 'দেশে' প্রমাণ করতে চেয়েছেন —অবশ্য প্রখ্যাত পণ্ডিতের মতবাদ উল্লেখ করে যে, কালিদাসের 'মেঘদূতের' কল্পনায় ছিল চীনা প্রভাব। প্রাচীন চীনা কবি চু-যু-আন ও লি-সাও নাকি মেঘকে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে বার্তাবহরূপে কল্পনা করেছিলেন অনেক আগেই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিতে আছে (এটা আচার্য সুনীতিকুমারের উক্তি না তিনি অপরের কোনও রচনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঠিক বোঝা গেল না):—

"it seems to me that in the story frame-work of Megh-Duta, there is also Chinese influence....a pretty or a great idea easily passes from writer to writer."

হতে পারে, প্রাচীন কোনও চীনা কবির কল্পনার সাথে 'মেঘদূতের' কিছুটা মিল আছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে যখনই কোনও সাদৃশ্যের লক্ষণ দেখা যাবে, তখনই একজন কবি অপর কবির কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই লিখেছিলেন বা তাঁর 'আইডিয়া' আত্মসাৎ করেছিলেন, এরকম মনে করবার কি সত্যিই কোনও যুক্তিসংগত কারণ আছে? একটা উদাহরণ দিচ্ছি:

ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত ভট্টিকাব্যে শরৎকাল বর্ণনায় আছে:

'ন তজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজং
নপঙ্কজং তদ্ যদলীন ষট্‌পদম্।
ন ষট্‌পদোহ সৌন কলং জুগুঞ্জ যঃ
কলং ন গুঞ্জতি তম জহার যন্ন
নঃ॥'

[অর্থাৎ, এমন কোনও জলাশয় নেই যেখানে সুন্দর পদ্ম ফোটেনি, এমন কোনও পদ্ম নেই যাতে ভ্রমর বসেনি, এমন কোনও ভ্রমর নেই যে গুঞ্জন করছে না, এমন কোনও গুঞ্জন নেই যা মন হরণ করে না।]

এর সঙ্গে পড়ুন, ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ কবি Edmund Spenser রচিত Faerle Queene-এর একটি কাব্যাংশ যাতে আছে বসন্ত বর্ণনা:—

"No tree whose branches
didnot bravely spring;
No branch whereon a lovely
bird did not sit,
No bird but did her shrill
notes sweetly sing,
No song but did not contain
a lovely ditt."

দুই imagery-র এবং বর্ণনা বিন্যাসের কী আশ্চর্য মিল! কিন্তু Spenser সংস্কৃত জানতেন বা কেউ তাঁকে ভট্টিকাব্য ইংরেজী অনুবাদ করে শুনিয়েছিল এমন কথা কি কোনও গবেষক বলেছেন? না, কোনও ইংরেজ পণ্ডিত তা স্বীকার করবেন?

শশাঙ্কভূষণ মৈত্র

ব্যারাকপুর

চিত্র প্রদর্শনী

গত ২রা আষাঢ় ১৩৮৫ তারিখের দেশ পত্রিকায় আমার চিত্র-প্রদর্শনীর সমালোচনার প্রসঙ্গে দুটি কথা আছে।

(ক) আমার চিত্রমালার নাম "আঁধারে এ বসুধা" শ্রীযুক্ত কমলকুমার মজুমদারের দেওয়া নয়, এ নাম শিল্পীর নিজের দেওয়া।

(খ) সমালোচক বলেছেন, আমি "শিল্প আন্দোলন থেকে দূরে রেখেছি নিজেকে।" আমাদের দেশে শিল্প-আন্দোলন কি নির্দিষ্ট কোনো রূপ নিয়েছে? তার স্বরূপ কি? প্রবক্তাই বা কারা?

(গ) সমালোচক বলেছেন—"যুদ্ধোত্তর বা একেবারে সাম্প্রতিক ছবি সম্বন্ধে আর একটু ভাবলে ভাল হয়।" কথাটা বোঝা গেল না। উনি কি আমাদের দেশের ছবির কথা বলছেন, না কি পাশ্চাত্ত্যের ছবি সম্বন্ধে?

সলিল ভট্টাচার্য

প্রকাশিত হল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

হইচই-তোলা কিশোর উপন্যাস

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

দাম ৬·০০

কাউকে যদি বলতে শোনা যায়, 'তাতিরাতাচি গামা হুম্বুরাস', এবং এর মানে জিগ্যেস করলে সে যদি জবাবে বলে, 'গিমি গড়গড়ি কেরোসিন বোম' অথবা 'গমোসি গদাধর ভাগভাস ফুংকাসুন', তাহলে তাকে অন্যে কে কী ভাববেন জানি না, কিন্তু বেশ কিছু পাঠক অন্তত তক্ষুনি তাঁকে ঠিকঠিক চিনে ফেলবেন।

কেননা এ-ভাষায় কথা বলেন পৃথিবীতে একমাত্র রাজা গোবিন্দনারায়ণ। রাজা গোবিন্দনারায়ণ কেন এমন আশ্চর্য ভাষায় কথা বলেন, মনোজদের অদ্ভুত বাড়িটা ঠিক কোনখানে, সে-বাড়িতে যে-অচেনা ছেলেটির ছবি রয়েছে সে-ছবিটাই বা কার, গোয়েন্দা বরদাচরণের হারানো পিস্তল কীভাবে ভজবাবুর হাতে পৌঁছে গেল, কীভাবেই বা নিখোঁজ এক যুবরাজ হয়ে গেলেন ডাকাত-

দলের মেজ-সর্দার—এ-সব প্রশ্নের সদুত্তর পেতে গেলে পড়তেই হবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হইচই-তোলা কিশোর-উপন্যাস 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। হাসির সঙ্গে মজা, মজার সঙ্গে রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চের সঙ্গে উৎকণ্ঠার মিশেল ঘটিয়ে এক নতুন স্বাদের আশ্চর্য কিশোর-উপন্যাস উপহার দিয়েছেন এ-কালের শক্তিমান লেখক শীর্ষেন্দু।

দীপালি দত্ত রায়ের

চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

লাল হলুদ সবুজ আলো নেই

দাম ৬·০০

সাহেবিয়ানায় মোড়া সম্প্রতি গজিয়ে-ওঠা শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের নিয়ন্ত্রণনীতিহীন জীবনের এক অত্যন্ত আন্তরিক এবং দক্ষ চিত্রায়ণ এ উপন্যাস ॥

অরুণ বাগচীর

অভিনব উপন্যাস

আশাবরী দাম ৬·০০

উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগৎ নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস। সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তা, শিল্পী, সমালোচক, শ্রোতা—সবাইকে নিয়ে এক অভিনব অভিজ্ঞতার জমাট কাহিনী ॥

শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঝাঁজালো উপন্যাস

সমুদ্রস্নান দাম ৫·০০

রগরগে ঝালে ভরা মনো-বিকলনগ্রস্ত গুটি কয় মানুষের এক দারুণ উত্তেজক কাহিনীর উপন্যাস। লেখক নতুন, তাই স্বাদও নতুন—ঝাঁজও চড়া ॥

অভ্র রায়ের

সাড়া-জাগানো উপন্যাস

হৃদয়ের শব্দ

দাম ৭·০০

ফ্লাইং ক্লাবের নাটকীয় জীবন নিয়ে রচিত এই উপন্যাসটি বক্তব্যের অভিনবত্বে যে-কোনও পাঠকের অভিজ্ঞতায় এক স্বতন্ত্র স্বাদের সূচনা করবে ॥

সমরজিৎ করের

কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী

একটি সংকেতের জন্যে দাম ৬·০০

একটি আন্তঃনাক্ষত্রিক রোমহর্ষক ষড়যন্ত্রের অত্যাশ্চর্য কল্পকথা প্রখ্যাত বিজ্ঞান-সাংবাদিক সমরজিৎ করের এই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী 'একটি সংকেতের জন্যে' ॥

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

অনন্য স্বাদের উপন্যাস

ফটিকচাঁদ দাম ৮·০০

ফেলুদার রহস্যকাহিনী নয়, নয় প্রোফেসার শঙ্কুর কল্প-বিজ্ঞান উপাখ্যান, 'ফটিকচাঁদ' সত্যজিৎ রায়ের এক অনন্য সৃষ্টি। বারো বছরের একটি ছেলের স্মৃতি ফিরে পাওয়া নিয়ে এক দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী

সপ্তম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

অসাধারণ গল্প-সংকলন

আরো এক ডজন

দাম ১০·০০
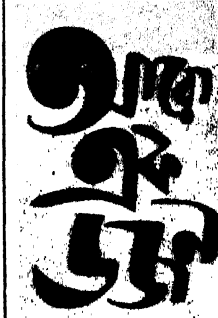
ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, অলৌকিক কাহিনী এবং নানা রসের নানা স্বাদের বারোটি গল্পের এক অসাধারণ সংকলন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন কবিতা-সংকলন

হঠাৎ নীরার জন্য

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

সুরজিৎ দাশগুপ্তের

চমকপ্রদ উপন্যাস

বিদ্ধ করো

দাম ১০·০০

আগামী দিনের এক পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের নিজেকে জানার, নিজেকে বিদ্ধ করার আজীবন-প্রয়াসের এক তরঙ্গিত সূচনাপর্বের চিরন্তন মানসিক আবেদনময় চমকপ্রদ কাহিনী ॥

সমরেশ মজুমদারের

চমক-লাগানো উপন্যাস

দৌড় দাম ৬·০০

ঘোড়দৌড়ের মাঠ, অ্যাংলো গণিকার পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট, বয়স্ক অফিসারের স-স্বামী-সন্তান রক্ষিতা পোষণ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ভাঙা-চটা সমাজের এক দারুণ অত্যাধুনিক কাহিনী ॥

শেখর বসুর

অন্যরকম উপন্যাস

অন্যরকম দাম ৬·০০

'অন্যরকম'-এ সব কিছু অন্য চোখে দেখা। অন্যরকম এর রচনাভঙ্গি। অন্যরকম এই উপন্যাসের নায়িকা প্রতিমা। এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকের বুকে এবং মাথায় স্থান পাবেই ॥

সুধাংশু ঘোষের

নতুন স্বাদের উপন্যাস

কে বাজায় দাম ৬·০০

উত্তরতিরিশ এক যুবার নিত্য-মরণের যন্ত্রণা এক দরদী গাইয়ের কণ্ঠে বিশুদ্ধ মার্গ-সংগীতের বিষণ্ণ আলাপের মতো ঝরে ঝরে পড়েছে এ উপন্যাসে ॥

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের

ভিন্ন চরিত্রের উপন্যাস

এই আমি একা অন্য দাম ৪·০০

কিছু স্মৃতি ও অনুভবের মাধ্যমে একজন মানুষের অসহায় একাকিত্বের উন্মোচন এ রচনায় যেভাবে ঘটেছে, বাংলা উপন্যাসে তা একে-বারেই অভিনব ॥

প্রকাশিত হল

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

অদ্বিতীয় ঘনাদার কাহিনী

ঘনাদার ফুঁ দাম ৬·০০

মুখ্যত বড়োদের জন্য লেখেন, অথচ কিশোরসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকার মতো মৌলিক রচনা উপহার দিয়েছেন, এমন সর্বত্রগামী সার্থক লেখক খুব বেশী নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেদিক থেকে এক বিরল প্রতিভাধর সাহিত্য-স্রষ্টা। তাঁর কবিতা ও ছোটগল্পের মতো একইরকম বিস্ময়কর সৃষ্টি তাঁর কিশোর-সাহিত্য। বিশেষত, যে-সৃষ্টির সঙ্গে মিশে আছে অদ্বিতীয় ঘনাদার নাম। ঘনাদার চরিত্রটি বাংলাসাহিত্যের অ্যালবামে যে এক দুর্লভ সংযোজন, এতে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। শুধু ঘনাদা কেন, ঘনাদা যেখানে থাকেন সেই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের বিচিত্র মেসবাড়ি, আর তার শিশির-শিবু-গৌর-রামভুজ-বনোয়ারী প্রমুখ বাসিন্দারা পর্যন্ত সেই অ্যালবামে দারুণ জ্বলজ্বলে চেহারায় চিরকালের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। আরেকটি বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ঘনাদার মধ্যে কোনও পুনরুক্তি নেই। নিত্য নতুন হয়ে দেখা দেন ঘনাদা প্রতিটি কাহিনীতে। তাঁর কীর্তি-কাহিনী শুধু বিচিত্রই নয়, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটিও অনিঃশেষ। এ-হেন ঘনাদার অফুরন্ত অভিজ্ঞতার সাম্প্রতিকতম কয়েকটি কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন এই বই—'ঘনাদার ফুঁ'।

দেশ ৪৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা
৬ শ্রাবণ ১৩৮৫

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : গরমপানিতে (আসাম) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ
আলোকচিত্র : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

পরবর্তী আকর্ষণ

সুমন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
কাহিনীকার : হাইনরিখ্ বোল্
কল্যাণ সেনের গল্প
জীবন যখন
বিজয় পালের গল্প
গন্ধ
সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা
কৃষিশিক্ষার বর্তমান সমস্যা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদ্মাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

বনমহোৎসবের আনুষ্ঠানিক রূপ

শুধু কবির পক্ষে নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষেও তার চোখের সামনের একটি শ্যাম বনভূমির দীর্ঘোন্নত গাছগুলিকে সূর্যরশ্মি পান করাবার সুখে প্রহৃষ্ট মৌনী ঋষিদের একটি সমাবেশ বলে কল্পনা করবার শক্তি ও রুচির অভাব নেই। বসন্ত ঋতুর ফাল্গুন অথবা চৈত্রের কোন জ্যোৎস্না-প্লুত রাত্রিতে এই সূর্যরশ্মিপায়ী ঋষিপ্রায় চেহারার গাছগুলিকেই আবার অন্য রূপে মূর্ত হতে দেখা যায়, তারা যেন রূপকথার কোন দেশের আলো-ছায়ার মত রহস্যের বার্তাবহ দূত। উতলা ঝড় হোক, কিংবা মৃদু সমীরের সঞ্চার হোক, এই বার্তারই ভাষা যেন তাদের লক্ষ-কোটি পাতার মর্মরধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ফুল ফোটে ও প্রজাপতির আনাগোনার সমারোহ জাগে, গাছের ও বনের ভোরবেলার জীবনও একটি রূপাভিরাম দৃশ্য। যে মানুষজাতি হাজার-হাজার বছর ধরে কঠোর এক স্বার্থের কাঠুরিয়া হয়ে বনের গাছ কেটে-কেটে বসতির আয়তন বিস্তারিত করেছে, সেই মানুষজাতির চোখে কল্পনায় ও অনুভবে এই গাছই আবার নানা রূপের মায়াময় আস্পদ। অতীতের বিপুল এবং যথেচ্ছ কাঠুরিয়া-কীর্তির রূঢ়তায় যেন অনুতপ্ত হয়ে তাই আধুনিক কালের বিজ্ঞানশীল মানুষের প্রিয় ইকোলজি শাস্ত্রের বাণীতে এই ভর্ৎসনা প্রচারিত হয়ে চলেছে যে, সাধু সাবধান, এই ধরণীর দেহটিকে আর বৃক্ষহীন করে তুলবে না।

ভারতে সরকারী বিধানের নির্দেশ অনুসারে উদ্‌যাপিত বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান বৃক্ষের সম্পর্কে অতীতের সেই মূঢ় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক একটি কর্তব্যের অনুষ্ঠান বলে মনে করা চলে। দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে অনুষ্ঠান যেন একটা প্রতীকের মতো রূপে ও প্রকারে সম্পন্ন করা হয়। অবান্তর উৎসবের প্রগল্‌ভ সমারোহ এখন আর দেখা যায় না, কিন্তু কর্তব্যের সমারোহও খুব প্রকট নয়। জেলা ও মহকুমার সদর সহরের এক্‌টি-দুটি মাটির মস্ত আঙিনাতে কিছুসংখ্যক গাছের চারা রোপণ করাই কর্তব্যের প্রধান ব্যাপার। এ ছাড়া, বনবিভাগের প্রত্যক্ষ কর্তব্যের বিধি হিসাবে বনপত্তনের ও বিশেষ স্থানে বৃক্ষ রোপণের অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়ে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে সমালোচকের পক্ষে ক্ষুব্ধ হবার মতো আরও একটি অভিযোগের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের চেহারা যেন সম্যক্ রকমের একটা দায়সারা ব্যাপার। সরকারের একটা বিভাগীয় বাৎসরিক পরবের মতো চেহারা নিয়ে যে 'বনমহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রকৃতির মধ্যে কোন মহোৎসব নেই। এক্ষেত্রে সরকারের আচরণের ঐতিহ্যকেই দায়ী করতে হয়। সরকার দেশের জনসাধারণের আগ্রহ উদ্দীপনার সম্বল নিয়ে বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত করবার নীতি কিংবা রীতি অনুসরণ করেননি, আজও করেন না। মহোৎসব কথাটির ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হতো, যদি বৃক্ষ রোপণের বিরাট অনুষ্ঠান বিশেষ প্রযত্ন ও আন্তরিকতা দিয়ে সম্পন্ন করবার একটি নতুন ঐতিহ্য জাতির জীবনে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ক্রিয়ান্বিত হতো। বাস্তবতা ও প্রকৃত তথ্যের হিসাব অনুযায়ী বলা চলে, তা হয়নি।

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর'—কবির উক্তিকে এক শ্রেণীর সমালোচকের কৌতুকপ্রবণ অভিযোগের লক্ষ্য হতে দেখা গিয়েছিল। অভিযোগ এই যে, কবির উক্তি 'প্রতিক্রিয়াশীল' বুদ্ধি-বিচারের একটি করুণ দৃষ্টান্ত। প্রগতিতত্ত্বের বস্তুবাদী বিনির্ণয়ের কাছে এহেন উক্তি অভ্রান্ত বলে সম্মানিত হতে পারে না ; ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক যৌক্তিক ও তাথ্যিক মুখরতা কবির বাণীর ভুল অন্বেষণ করেছিল। কিন্তু আজ অনেকে সেই সমালোচনাকেই একটা কৌতুকপ্রবণ মনোবৃত্তির জঞ্জাল বলে বোধ করেন। লন্ডনের একটি বিশেষ রকমের পৌর গর্ব এই যে, শহরের গা ঘেঁষে অরণ্যের অবস্থান বিস্তারিত হয়ে রয়েছে। রবিন হুডের বিচিত্র দস্যুতার নানাকাহিনীর স্মৃতিময় আবেশ নিয়ে শেরউড ফরেস্ট আজও লন্ডনের সীমাসংলগ্ন একটি ক্ষেত্র। ইংরাজ জাতির কান্ডজ্ঞান ও বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয় যে, তারা রবীন্দ্রনাথের ওই উক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন ধারণার সম্পর্কে না এসেও ওই উক্তির অন্তর্নিহিত সত্যটিকে উপলব্ধি করেছে। জার্মানীর বার্লিন সহরও এই ...ত্বের দাবি করবে যে, বার্লিন সহর অরণ্যের মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ভুল ...নি। বার্লিন সহরের মাঝখানেই একটি আরণ্য আয়তন আছে। ইঁট-পাথরের কঠিন সম্বল নিয়ে সহরের যে স্থাপত্য সংগঠিত, তাকেই এখন দেখা যায় যে, গাছের নিবিড় ছায়ার কোমল সান্নিধ্য লাভ করবার জন্য তার চেষ্টার অন্ত নেই। গাছ না থাকলে আধুনিক সহরের স্থাপত্য যেন তার শ্রী হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। পার্ক ও অ্যাভিনিউ, অর্থাৎ উদ্যান ও তরুবীথিকায় শোভিত পথ ছাড়া সহরের পক্ষে যথার্থ সুন্দর হওয়া সম্ভব নয়। বৃক্ষহীন পরিবেশ মানুষের প্রাণ ও স্বাস্থ্যের অভিশাপ। দিল্লীর বাদশাহী মোগলেরা বৃক্ষের সেই গুণ ও গৌরবের বিশেষ সমঝদার ছিলেন। যে-জন্য বৃক্ষের সমাবেশ মানুষের জীবনের নান্দনিক প্রয়োজনের একটি অঙ্গীকার হয়ে শিল্পীর অনুভবের কাছে উপস্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু মোগল আকবর কি তাঁর শখের ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্য-শোভা নির্মাণ করবার প্রয়োজনে গাছের গুরুত্ব ও গৌরবের সত্যটি বিস্মৃত হয়েছিলেন? ঐতিহাসিক গবেষকের প্রশ্ন—ফতেপুর সিক্রীর চমৎকার স্থাপত্যময় পরিবেশ থাকতেও সহরটি কেন পরিত্যক্ত হবার অগৌরবে আপতিত হলো? গবেষকেরা যে-সব কারণ আবিষ্কার করেন, সেগুলির কম বেশি সার্থকতার জন্য অস্বীকার না করেই বলা যায় যে, বৃক্ষ-বিরল হবার দুর্ভাগ্য ফতেপুর সিক্রীকে জনহীন হবার দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হয়েছে। মানবীয় অভিজ্ঞতার চরম শিক্ষা এই যে [illegible]

জনতা দল

কণ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ
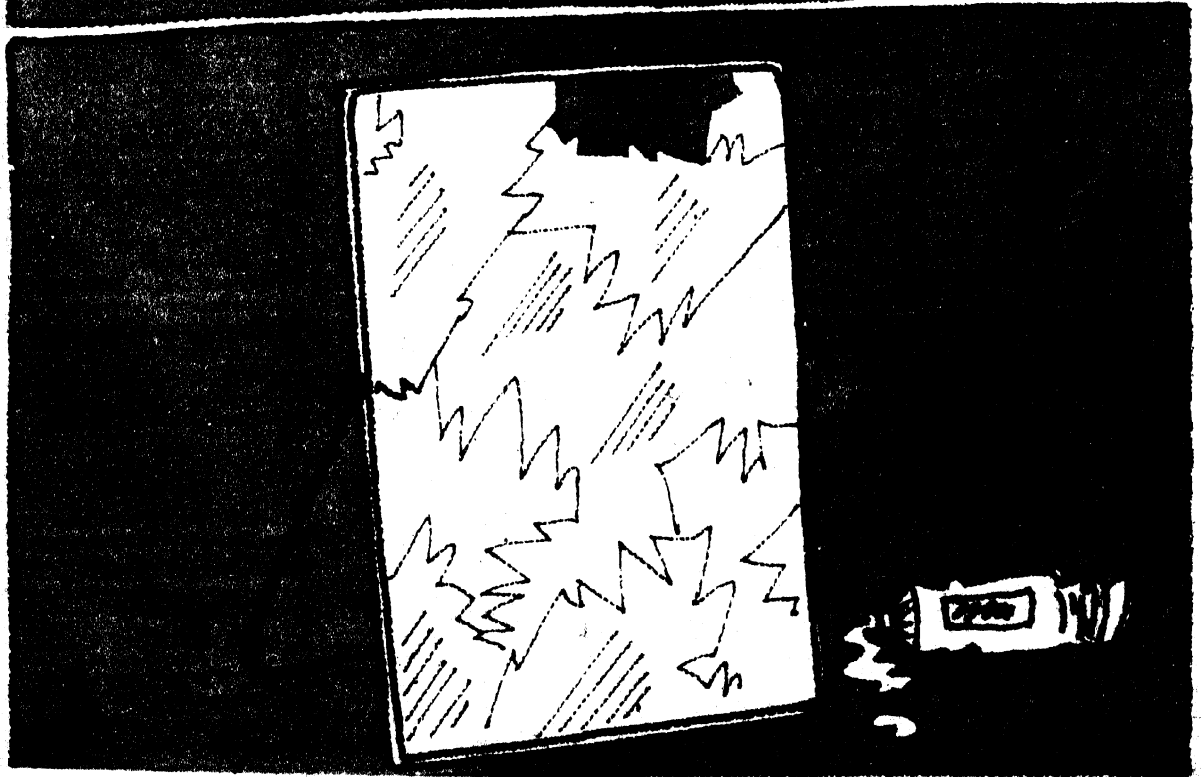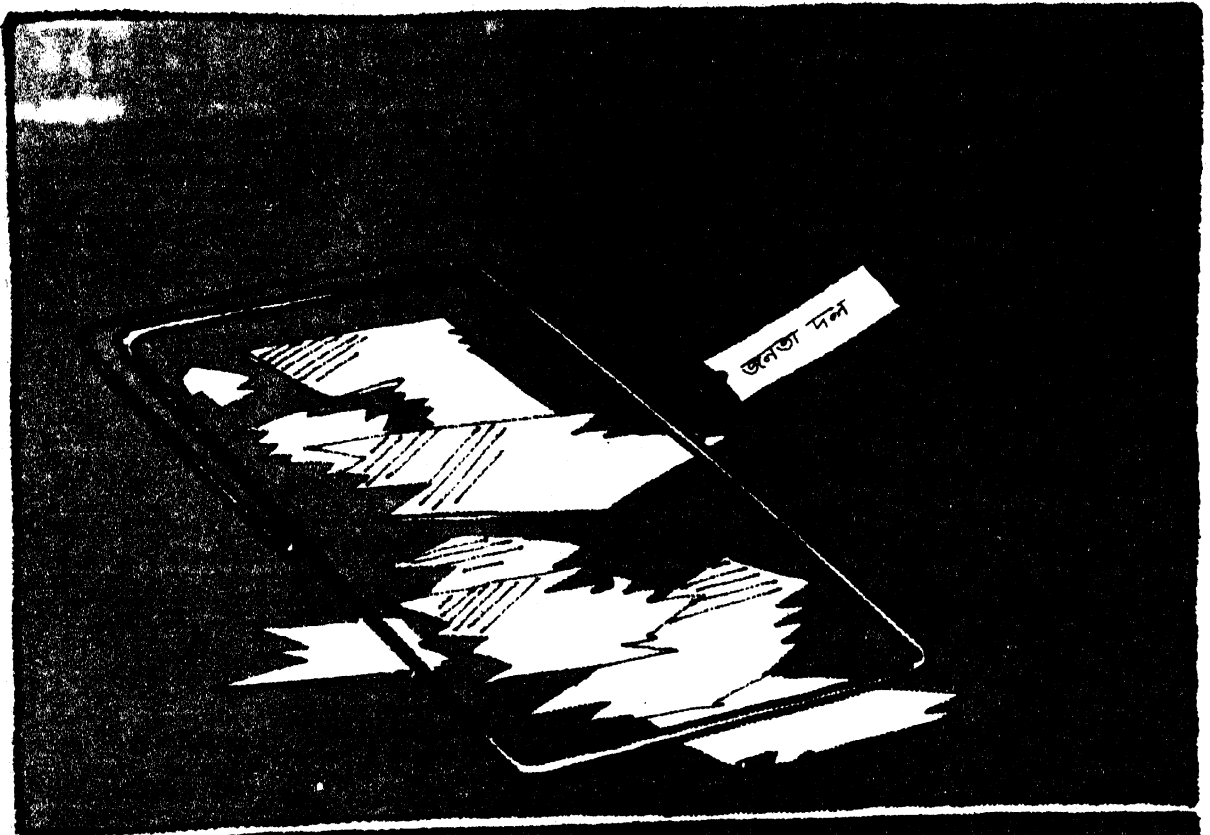
॥ ৬০ ॥

১৯৬৪-৬৫ সালে হুগলী জেলার তারাপুরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন। তৎকালীন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়) সম্মেলনের সভাপতি। কংগ্রেস সভাপতি কামরাজও উপস্থিত ছিলেন। তারাপুর সম্মেলনে প্রধানত একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

ভূমি সংক্রান্ত নীতি নিয়ে প্রস্তাব।

(১) ভূমির মালিকানা স্বত্ব।

(২) কারা মালিক হবার অধিকারী।

(৩) Law of inheritance বদলানো।

(৪) Crop insurance এবং ক্ষতিপূরণ।

১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সিলিং প্রথা চালু আছে তা ঊর্ধ্বতম। ঐ সংগে নিম্নতম সিলিং প্রথা চালু করতে হবে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞরা পাঁচজনের একটি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যত বিঘা জমির প্রয়োজন বলে ঠিক করবেন, তার চেয়ে কম জমি কাউকে দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ যদি পনরো বিঘা জমি ঠিক হয়, তা হলে পনরো বিঘার কম জমি কাউকে দেওয়া অন্যায় হবে। বর্তমান সিলিং-এর ফলে যেসব উদ্বৃত্ত হচ্ছে বর্তমানে তা থেকে এক বিঘে, দু বিঘে, দশ কাঠা করে জমি ভূমিহীনদের দেওয়া হয়। এতে কাঙালীবিদায়ের পুণ্য অর্জন করা সম্ভব; কিন্তু ভূমিহীনকে ভূমি দান করা হচ্ছে বলে যে ব্যাখ্যা করা হয় তা অর্থহীন।

ভূমিবন্টন ব্যবস্থা এমন করতে হবে যাতে পাঁচজনের একটি পরিবারে সেই ভূমিই উপজীবিকা হয়। সংগে সংগে এই যে বছরে বছরে ভূমি বিলির ব্যবস্থা তা রদ করতে হবে। এই ভূমিবণ্টন ব্যবস্থায় ভূমিহীনদের কোনও সমস্যার সমাধান হয় না, বরঞ্চ তাদের অমর্যাদাই করা হয়। যাদের কখনও এক কাঠা জমিও ছিল না, তাদের দশ কাঠা এক বিঘে জমি পেলে সাময়িক উল্লাস আসা সম্ভব, কিন্তু তার ফলে তাদের পাকাপাকিভাবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। এটা রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে, কিন্তু এটা গভীর কলঙ্কজনক। এবং যাদের জমি দেওয়া হবে, তাদের যেন সেই জমির অধিকারী থাকবার জন্য প্রতি বছর বি ডি ও অফিসে গিয়ে হয়রান না হতে হয়। পুরোপুরি স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব দিতে হবে, এর মধ্যে কোনও গোঁজামিল রাখা চলবে না।

যাঁরা জমি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল একমাত্র তাঁদেরই চাষের জমি থাকবে। যাঁরা অন্য বৃত্তিতে আছেন—যেমন উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, বৃত্তিভোগী—অর্থাৎ যাঁদের অন্য উপায়ে জীবিকানির্বাহের সংস্থান আছে, তাঁদের চাষের জমি দেওয়া অসংগত ও অন্যায় হবে। মনে রাখতে হবে যে, চাষও একটা পেশা। অধিকারী। যেমন নির্দিষ্ট গুণ না থাকলে ডাক্তারি করা যায় না, শিক্ষক হওয়া যায় না, ওকালতি করা যায় না, সেইরকম কৃষিকার্যও একটা নির্দিষ্ট গুণ। এই গুণের অধিকারীরাই চাষের জমি পাবার যোগ্য। বর্তমানে যা প্রচলিত রীতি, তাতে যে-কোনও বৃত্তিধারী চাষের জমির মালিক হতে পারেন। এই অবস্থার অবসান ঘটা উচিত। এই সংগে হোমস্টেড এবং অর্চার্ডের কথাও আসে। সিলিং-এর বাইরে কোনও ব্যক্তির হোমস্টেড বা অর্চার্ড সংলগ্ন জমির মালিকানা থাকতে পারে না। যদি একজনের দশ কাঠা জমির ওপর বাড়ি থাকতে পারে, তা হলে অন্য জনের ষাট বিঘা জমির উপর প্রাসাদ থাকা উচিত নয়। নিয়মকানুনের স্বাতন্ত্র্য হয়তো করতে হবে। অর্চার্ড কাউকে লিজ দিলে যদি সুফল পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই তা করতে হবে; কিন্তু মালিকানা স্বত্ব থাকতে পারে না।

Law of inheritance না বদলালে স্থিতিশীল ব্যবস্থা হবে না। যাদের উপজীবিকার জন্য পনরো বিঘা জমি ধার্য হল, তাদের আবার যদি উত্তরাধিকারী বেশী থাকার জন্য জমি ভাগ হয়, তা হলে পূর্বতন অবস্থাই ফিরে আসবে। সেইজন্য, একটি ছেলে বা মেয়েকেই উত্তরাধিকার দিতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, বাকী ছেলেমেয়েদের কি হবে। এ প্রশ্ন ন্যায্য ও সংগত। বর্তমানে গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর কেন্দ্রীয় সরকার খুব জোর দিয়েছেন। এই নীতি কেবলমাত্র যদি আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, যদি কার্যকরী হয়, তা হলে এ সমস্যা সমাধান করা শক্ত হবে না। ভূমিব্যবস্থার সংগে সংগে এই গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবর্তন করতে হবে। উত্তরাধিকার থেকে যারা বঞ্চিত হবে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এইসব শিল্পে নিযুক্ত হবে। গ্রামগুলোকে উজাড় করে দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পনগরী সৃষ্টি করার কোনও মানে হয় না। বৃহৎ শিল্প নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু সেই বৃহৎ শিল্পকে অবলম্বন করে আশেপাশে যে ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা হয়েছে, সেগুলি অনায়াসে গ্রামগুলে হতে পারে। এখন দেখতেও কিরকম কিম্ভুত লাগে। চতুর্দিকে জনহীন, দারিদ্র্যে জর্জরিত সব গ্রাম আর মাঝে মাঝে এক-একটা সহাসমৃদ্ধ ঝলমল আর আলোকমালায় সুসজ্জিত বড় বড় শিল্প নগরী। এই পার্থক্য বজায় রেখে কোনও দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে না। সেইজন্যেই গ্রামগুলোকে শুকিয়ে বড় বড় শিল্পনগরী না করে গ্রামগুলোকে সজীব রেখে অনায়াসে দেশকে সমৃদ্ধ করা যায়। স্বাধীন হয়ে অবধি আমরা যে কাজ করেছি, যেভাবে প্ল্যান করা হয়েছে, তাতে সেই বিখ্যাত কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে যায়—

'পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।'

এর জন্য কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী বা প্ল্যানিং কমিশনকে দোষ দিলে হবে না। ছোট বড় সব উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল উচ্ছ্বাস বোঝা যায়। তখন মনোভাব ছিল যে, আমরা তাড়াতাড়ি স্বাবলম্বী হবো। সেই মনোভাব থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে, বৃহৎ শিল্প সৃষ্টির বাইরে আর চিন্তা করবার অবকাশ হয়নি। ফলে, তিরিশ বছর ধরে দেশে সর্বসাধারণের জীবন ধারনের মান উন্নত করবার প্রকৃত চেষ্টা হয়নি। ইঞ্জিন তৈরি, ইস্পাত তৈরি, জাহাজ তৈরি—এসবের কারখানা নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু এইসব করবার জন্য যে সব ছোটখাট যন্ত্রপাতির দরকার হয়, সেগুলো আশেপাশের গ্রামে করা সম্ভব ছিল। তা করতে পারলে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পনগরী সৃষ্টি না হয়ে গ্রামগুলো নিয়ে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি হত। এবং তাতে গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থানের কোনও অসুবিধা হত না। মনে রাখতে হবে যে, প্রতি উন্নয়নমূলক কাজের সংগে গ্রামের বেকারের সংখ্যা অনেক বাড়ছে। আমাদের নজর শিক্ষিত বেকারদের উপর। কিন্তু গ্রামে গ্রামে পিচের রাস্তা হওয়ার জন্য যে কত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ চিন্তা করবার আমাদের অবকাশ নেই। পিচের রাস্তায় লরী চলে; একটা লরী পঞ্চাশটা গরুর গাড়ির মাল বহন করতে পারে। ফলে, গরুর গাড়ি যারা তৈরি করে এবং যারা চালায় তারা বেকার হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, পিচের রাস্তা হবে না। পিচের রাস্তা করতে হবে, লরীও চালাতে হবে; সংগে সংগে এমন প্ল্যানিংও করতে হবে—যারা গরুর গাড়ি চালায়, তারা যাতে বেকার না হয়। ব্রিজ একটা হলে আর নৌকার প্রয়োজন হয় না এবং নৌকায় যারা মাল তুলতো, নামাতো, তারাও বেকার হয়। সংগে সংগে নৌকা তৈরি করবার কাজও বন্ধ। ব্রিজ নিশ্চয়ই করতে হবে; কিন্তু যারা বেকার হবে, তাদের কি ব্যবস্থা! যে প্ল্যানিং-এ এই সব বেকারত্ব ঘোচাবার ব্যবস্থা হয় তাকেই তো সামগ্রিক প্ল্যানিং বলে।

তিরিশ বছর ধরে কি বামপন্থী, কি দক্ষিণপন্থী—সকলেই আমরা এ বিষয়টিকে অবহেলা করে এসেছি। প্রকৃতপক্ষে, বামপন্থী কথাটার মানে এখনও আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়। যদি বামপন্থীর মানে হয় প্রোগ্রেসিভ, তা হলে অনেক বামপন্থী আছেন যাঁরা বিয়েতে পণ নেন, যাঁরা অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করেন না, যাঁরা বিধবা-বিবাহ মেনে নেন না, যাঁরা এখনও বহু সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার মেনে চলেন তাঁদের কী করে প্রোগ্রেসিভ বলা যাবে? 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বললেও বামপন্থী হওয়া যায় না; আবার 'লাঙল যার, জমি তার' বলেও নিজেদের জমি ভাগে চাষ করিয়ে বামপন্থী হওয়া যায় না। সমাজ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, ব্যক্তিগত আচরণেরও কোনও পরিবর্তন হবে না—তবুও বামপন্থী। 'বামপন্থী' কথাটা যদি নামবাচক বিশেষ্য হয় তা হলে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এ যদি গুণবাচক হয়, তা হলে ভারতবর্ষে যাঁরা বামপন্থী বলে অভিহিত তাঁরা 'বামপন্থী'র

কায়েমেসে প্রস্তাব নিলেই যদি বামপন্থী হওয়া যায়, তা হলে কংগ্রেসই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় বামপন্থী দল। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সঙ্গে জাতপাত তোড়ক সম্মেলন হয়েছিল। লোকে বলতো যে, ভটচাযি্য মশাই-য়ের পাতের দই আমার পাতে গড়িয়ে এসেছে, আর আমার পাতের দই ভটচাযি্য মশাইয়ের পাতে গড়িয়ে গেছে। ব্যস, সমাজ থেকে জাতি-ভেদ প্রথা উঠে গেল। এতে আত্মতুষ্টি হয় বটে, কিন্তু সমাজের কোনও পরিবর্তন হয় না। কর্মের দিক থেকে আজ অবধি লেফ্‌ট-রাইটের কোনও পরিচয় ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায়নি। রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী করে সি পি আই 'লেফ্‌ট' ; রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন না রেখে সি পি আই (এম) 'লেফ্‌ট'। নির্বাচনে জেতবার জন্য বামপন্থীরা যখন ধনী লোকে-দের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন সেটা হয় লেফ্‌টিজম ; আর কংগ্রেস যখন সে কাজ করতো, সেটা ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কাজ। (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। তাঁরা কেবলমাত্র কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের ধুয়া না তুলে ভূমি সংস্কার আইনের মারফত নতুন ধারার প্রবর্তন করতে পারেন।)

মায়াপুর সম্মেলনের চতুর্থ অনুচ্ছেদে ছিল Crop insurance ও ক্ষতি পূরণের কথা। কলকারখানা ইনসিওর করা যায় ; প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক কারণে বিপর্যয় হলে সেখানে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। অথচ ভূমিকম্প অথবা অনাবৃষ্টি, অথবা প্লাবন— এতে যদি ফসল নষ্ট হয়, তাতে ক্ষতিপূরণ পাবার কোনও ব্যবস্থা নেই। কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্যা অল্প, তাই তারা সংঘবদ্ধ। তাদের নিম্নতম মজুরি স্থির হয়েছে, চালু হয়েছে ও কার্যকরী হয়েছে। কৃষিকার্যে যেসব শ্রমিক আছে, তাদের নিম্নতম মজুরির কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু তা কার্যকরী হবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। বিস্ময় লাগে যে, একটা প্রগতিশীল দেশ কি করে ভূমিকম্প, প্লাবন ও অনাবৃষ্টির জন্য শস্য নষ্টের ক্ষতি-পূরণের এখনও ব্যবস্থা করেনি। যেহেতু কৃষির উপর নির্ভরশীলরা সংঘবদ্ধ নয়, সেইজন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। কংগ্রেস সংগঠক লাল-বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বোম্বে এ আই সি সি-তে Crop insurance-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। লালবাহাদুরের মৃত্যু হলে, পরবর্তী কংগ্রেস সরকার ১৯৭৬-এর মধ্যে সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন মনে করেননি। বিনা বিলম্বে এটা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। যে শস্য কৃষক নিজে খরচ করে উৎপাদন করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি তা নষ্ট হয়, তার জন্য কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবে না কোন নীতিতে? এর কি এখনও বিচার-বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে?

এই লেখাটি সম্পর্কে আমার গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকারা, যাঁরা ছাপবার আগে লেখাটি পড়েন, তাঁরা একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই মায়াপুর প্রস্তাব আমি রচনা করেছিলাম। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও অধিকাংশ কংগ্রেস-কর্মী তাঁদের মন থেকে এ প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিতে পারেননি। এই মায়াপুর সম্মেলনের পর থেকেই আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে অধিকাংশ কর্মীর যে মনোভাব তার সঙ্গে আমি চলতে সক্ষম হব কিনা। কারণ, ভারতবর্ষে মুখে আমরা লেফ্‌ট রাইট সবই বলতে পারি, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সব রাজনৈতিক দলেরই অধিকাংশ কর্মী হলো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। তাদের মধ্যে অনেকেই জমির উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক কালে সি পি আই (এম)-এর কর্মীদের যে সমাবেশ হয়েছিল তাতে সি পি আই (এম)-এর দপ্তর হিসেব নিয়ে দেখেছেন শতকরা মাত্র পাঁচজন নিম্ন মধ্যবিত্ত বা ভূমিহীন।

মায়াপুর সম্মেলনের প্রস্তাবে কংগ্রেস-কর্মীদের অনেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন ; কারণ, তাঁরা অনেকেই ছিলেন জমির উপর নির্ভর-শীল। মায়াপুর সম্মেলনে প্রস্তাব রচনা আমার জীবনের একটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা। সেইজন্যে, 'কষ্টকল্পিত'র অন্যান্য লেখার সঙ্গে মিল না থাকলেও এটা লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অবসরের গান : বোলান

সুমন চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

'পাড়াগাঁর পথে ক্লান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান'

বাংলার গ্রামমেলা ও লৌকিক উৎসবগুলির সঙ্গে চৈতালি ফসলকাটার সময়ের যোগ রয়েছে। ফসল সম্ভারের বিপুল সংগ্রহ, তার রূপগন্ধ স্পর্শের প্রাণীন সংরাগ ও সাময়িক আর্থিক স্বচ্ছলতা গ্রামীণ কৃষি নির্ভর মানুষের কণ্ঠে আনে গান। তাদের অবসর জীবন ভরে ওঠে অবসরের আস্বাদন ও বিনোদনে। শ্রমকিণাঙ্ক হাতে তারা তুলে নেয় বাদ্যযন্ত্র। নাচের ছন্দ রক্তের ভেতর থেকে আদিম স্মৃতি নিয়ে জেগে ওঠে। অন্তিম চৈত্রের ফাল্গুনী আসর পশ্চিমবাংলার বিশেষ কয়েকটি সংলগ্ন ভূখণ্ডে যে বিশেষ গীতরূপের ভঙ্গীতে রূপ নেয় তার চলতি নাম বোলান বা বুলান গান। বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব রাঢ়ের কয়েকটি অঞ্চল চৈত্র মাসের শেষ কটা দিন বোলান গান ও নাচে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলগুলি হল বর্ধমানের কাটোয়া-কেতুগ্রাম-কুড়মুন, মুর্শিদাবাদের কান্দী অংশ, নদীয়ার দেবগ্রাম-পাগলাচণ্ডী-সাহেব নগর এবং মুর্শিদাবাদ সন্নিহিত বীরভূমের কিছু অংশ। অর্থাৎ ৪টি জেলার সীমান্ত অঞ্চলের পরস্পর সংলগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রাম অংশ নেয় এই লোক উৎসবে। বোলান গান সাংবৎসরিক গাজন উৎসবের অনুষঙ্গী অনুষ্ঠান। গ্রামবাংলায় সহজিয়া মানসে শিবঠাকুর, ধর্মঠাকুর ও বুদ্ধ একত্র হয়ে এক মিশ্র দেবতার রূপ নিয়েছে বহুদিন ধরে: চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বুদ্ধপূর্ণিমা পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের লোকোৎসবগুলির নিগূঢ় সমীক্ষায় এই সত্য ধরা পড়ে। তাই গাজন ও বোলান পরস্পর পরিপূরক অনুষ্ঠান। গাজন হল ধর্মীয় রিচুয়াল, বোলান তারই সাংস্কৃতিক স্ফুরণ। সেই জন্যই বোলান গান সারা বছর অনুষ্ঠিত হয় না। লোকগীত বা লোকনাট্যের অনেকগুলি শাখার মত বোলান নির্বিশেষ নয়। এ গান নিতান্ত উপলক্ষিক, ঋতুকেন্দ্রিক ও সাময়িক। পুরো চৈত্র মাস ধরে এই সব অঞ্চলে শৈব আবহ তৈরী হয়। নীলপুজো, গাজন ও চড়ক এই তিন ধর্মীয় কৃত্যের পূর্বালাপ হিসাবে উপবাস, 'বৃত' করা ও নিরামিষ-ভোজনের সংযমে 'ভক্ত'-র দল ও সাধারণ মানুষ মেতে ওঠে কৃষিদেবতা শিবের ভজনে। এই উপলক্ষকে লোকায়ত জীবনের সহজ বিনোদনের ছাঁচে ঢালাই করে বোলান গান ও বোলান যাত্রা বানানো হয়। অর্থাৎ শুধু গান নয়, যাত্রাও। কাহিনী ধর্মী, আতিশয্যিক, গীতময় ও নৃত্যছন্দে চপল। বোলান গান প্রযোজনের প্রাকৃতিক পটভূমিও চমৎকার। বসন্ত দিনান্তের পুষ্পবিকশিত লাবণ্য আর গ্রামীণ অনাহত হাওয়ার পথে উন্মত্ত বোলান গানের সুরে সারাদিন রাত উদ্দীপনাকে। বোলান গানের 'গাহক' ও শ্রোতা উভয়পক্ষই এই সময়টায় থাকে স্বভাবী ও মেজাজী। গ্রামীণ অর্থনীতি বছরের এই সময় একটু স্বপ্ন দেখে। যুবক ও কিশোররা বোলানের দল বাঁধে। গান গাইতে গাইতে পার হয়ে যায় নিজের জেলার চৌহদ্দি। সারাদিন গান গায় মোরপে মোরপে, সারারাত গান গায় সম্পন্ন গৃহস্থের উঠানে উঠোনে; রক্তনের তবু অক্লান্ত। জাগর ও সদাচঞ্চল। তবে সে চাঞ্চল্য অকারণে নয়। সমস্ত দেহ বেপথু ও ছন্দিত হয়ে ওঠে দিশি মদের অন্তস্পন্দে।

কেতুগ্রামের বোলান মিছিল

বোলান পার্টি গ্রামের পথে

'বোলান' শব্দটি বেশ পুরানো। এই জাতীয় গানের উল্লেখ রয়েছে প্রাচীন বাংলা কাব্যে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'শিবের গাজন-উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরিয়া যে তর্জা ছড়া বলিত তাহার বিশিষ্ট নাম বোলান। ভ্রমণ অর্থে বুলা ধাতু হইতে।' ভাষাতাত্ত্বিকের ইঙ্গিতটুকু লক্ষণীয়। বোলানের দল চলমান ও ভ্রামণিক। গান গাইতে গাইতে এরা গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যায়, পার হয় নদী ও জেলার সীমানা। সব গ্রামেই তাদের জন্য অপেক্ষাতুর রয়ে যায় মরমী শ্রোতৃমণ্ডলী। অপরিচয়ের সাময়িক দূরেত্ব ভেঙে গ্রামে গ্রামে এই সাংস্কৃতিক দূতিয়ালী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনই মানবিক। খাটো নীল গেঞ্জি আর খাটো হাফ প্যান্ট পরে, মাথায় ফেটি বেঁধে লাঠি হাতে হই হই করে ছুটে আসছে 'সাঁওতেলে' বোলানের দল। [illegible] হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ ফ্লুট সহ চলে এল জন পঁচিশেকের এক বোলান যাত্রার দল। গ্রামের মাতব্বরের দাওয়ায় আসতেই তিনি হাঁক পাড়লেন, 'বলি, কুথাকার দল তুমাদের?' সলজ্জ হেসে বোলান দলের 'মাস্টার' পরিচয় দেন, 'পলাশীপাড়ার দল আজ্ঞে'। তা বেশ বেশ। এখন গাওনা হোক। আরম্ভ হল গান। প্রথমে বন্দনা :

প্রণামি গণরায় আমারে দেয় অভয়
তোমারি করুণায় বেদনা দূরে যায়।
দয়াময়ী দীনতারিণী সেজো না আর পাষাণী
ভবানী ভৈরবী তুমি পাষাণের নন্দিনী।

এর পরে হবে 'পালাবন্দী' অর্থাৎ হরিশচন্দ্র, দাতাকর্ণ, অভিমন্যুবধ, নৌকাবিলাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল জাতীয় ঘণ্টাখানেকের পালাগান। সবশেষে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে বাঁধা গান 'রংপাঁচালী' গেয়ে গানের আসর ভাঙবে। এতক্ষণ যে গ্রাম্য অভিনেতা স্ত্রী-ভূমিকায় নাকি সুরে রাধিকার অভিনয় করছিল সে হঠাৎ রংপাঁচালী গেয়ে উঠবে:

কলির পুরুষ ভাই এখন চেনা বড় দায়
ঘাড়ের নিচে রাখছে চুল লাজে মরে যাই।
ছাপা ছিটের জামা পরে
তাদের পুরুষ বলা চলে না॥

যারা এ যুগের মেয়ে তাদের রয়েছে গায়ে
মাজা কাটা ব্লাউজ ভাই সবই বেরিয়ে॥

হই হই পড়ে যায় আসরে। আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রাম্য জনতা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। অন্তঃপুরচারী গ্রাম্য বউ ঘোমটার আড়ালে চোখের বিদ্যুৎ হেনে পাশের বউকে চিমটি কাটে। গান শেষ হলে মাতব্বর হয়ত বোলান দলকে খেতে দিলেন দই চিঁড়ে অথবা নগদে দিলেন পাঁচ টাকা। তাতেই খুশী হয়ে এবার বোলান পার্টির সানন্দ অভিযান শুরু হল আরেক গ্রামের মেঠো আলপথে।

চৈত্র মাসে শিবের গাজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও অনেক গ্রাম্যগীতির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন অষ্টক, বালাকিগান ও সাবুলে বা সাবুলে গান। কোন কোন অঞ্চলে গাজনের সন্ন্যাসীদের বলা হয় 'বালা'। তাদের গাওয়া গানকে বলে 'বালাকি'। 'সাবুলে' গানও চৈত্র মাস জুড়ে ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে গাওয়া হয়। বোলান গানের সঙ্গে এ সব গীতরীতির মিল নেই। ১৩১২ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য তাঁর

প্রচলিত আছে। এই অষ্টক গীতের অধিনায়ক অধিকারী হয়ত একজন নমঃশূদ্র, কিংবা জালিয়া, ধোপা বা মালো, উর্ধ্বসংখ্যা একজন কৈবর্ত। যখন অষ্টকের দল প্রস্তুত হয়, তখন ৪।৫টি বালক সংগ্রহ করিয়া নিজে যৎসামান্য বেহালা কি ঢোলক বাজাইয়া গীত শিক্ষা দেয়।...এই অষ্টকের দলে উর্ধ্বসংখ্যা ৬।৭টি লোক থাকে। দুইজন বাদক, একজন জুড়িদার আর ৩।৪টি বালক।' এই বর্ণনা থেকে বোলান দলের একটা পূর্বসূত্র মিলছে।

বোলান নিশ্চয়ই প্রাচীন কিন্তু তার বর্তমান প্রচলিত রূপটি নতুন। ডঃ অমলেন্দু মিত্র উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন : 'রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে যে, পুরুদত্ত বারুইয়ের মানসিক ব্রত গাজনে যখন রামাই পন্ডিত "বোলান বুলিতে গেল ময়না বসতি" তখনই রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কথা প্রথম শুনলেন।' এই উদাহরণ বোলানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য কিন্তু আমি খুব অনুসন্ধান করেও শতাধিক বছরের পুরনো বোলান পাইনি। এখানে উল্লেখযোগ্য, বোলান গান শুধু শ্রুতি বা স্মৃতিনির্ভর নয়, এর লিখিত রূপও পাওয়া যায়। নদীয়া জেলার শিবনিবাস অঞ্চল থেকে গবেষক শ্রীহারাধন দত্ত পুরানো বোলানের যে খাতা পেয়েছেন তার শতবর্ষপূর্তি হয়নি। তার ভাষাও খুব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। যেমন :

এসো গো সরস্বতী বস গো মা রথে।
বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে॥
যে বুলান বলিবা মাগো তাই বলিব আমি।
দশের মাঝে ভাঙলে বুলান লজ্জা পাবে তুমি॥

১৩৬২ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় শিবরতন মিত্র সংগৃহীত যে বোলানের নমুনা পাওয়া যায় (নির্মলচন্দ্র মাঝি ও হরিপদ রক্ষিত রচিত) তা পঞ্চাশ বছর আগে শোনা :

এলাম মনের আশে চৈত্র মাসে গাইতে বোলান গান।
পেটের তরে বেড়াই দৌড়ে জল বেগরে মরছে ধান॥
যতগুলি বোলান বললাম গো আরও বলতে পারি।
ওস্তাদের নাম হরিপদ দাস কৈবড়াতে বাড়ি॥

ভনিতা ও বাসস্থান সম্বলিত এই পরিচয়জ্ঞাপক রচনারীতি খাঁটি বোলানের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার সংগে দারিদ্র্য ও চলমানতার ইঙ্গিতটুকুও লক্ষণীয়।

মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি গবেষক শ্রীপুলকেন্দু সিংহের অনুমান, 'বোল্' মানে বাক্য, কথা, বুলি আর 'বোলানো' মানে ডাকা বা কথা বলানো। এই 'বোল্' বা 'বোলানো' থেকে বোলান শব্দের উৎপত্তি। এই অনুমানের সহায়ক তথ্য মিলছে নদীয়ার গবেষক শ্রীদিলীপ বাগচীর ভাষ্যে। তিনি দেখিয়েছেন রাঢ় অঞ্চলে 'পোড়ো' বোলানে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি যাদু বিশ্বাস কাজ করে। সেই মৃতকে 'বোলানো' অর্থাৎ ডাকা বা কথা বলানো বিশেষ একটি রিচুয়াল। প্রসংগত শ্রীবাগচী লিখেছেন এক রোমাঞ্চকর তথ্য : 'পোড়ো বা শ্মশানের দলের লোকেরা গাজনের অনেক আগে থেকে মৃত শিশু বা সদ্যোমৃতের অক্ষত মুন্ড বা সংকার হয়নি এমন নরকপাল সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহের জন্য তাদেরকে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। মৃত শিশুর পেট কেটে অন্ত্রাদি বাদ দিয়ে নানাবিধ ওষধিমিশ্রিত তেল মাখিয়ে সেটিকে জারিত করে রাখা হয়। তাকে নিয়মিত যত্ন করে কাজল পরানো হয় ও ধুপের ধোঁয়া মাখানো হয়। সদ্যোমৃতের অক্ষত মুন্ডকেও একই পদ্ধতিতে বুলানের দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত করা হয়। নরকপালকে তেল সিঁদুর মাখিয়ে গ্রামের বাইরে কোন শ্যাওড়া বা বট গাছের মাথায় রেখে দেওয়া হয়। কাঁচা ছেলে (সদ্যোমৃত শিশু) বা কাঁচা মাথা (সদ্যোমৃতের মুন্ড) নিয়ে যে দল নাচাতে পারবে 'পয়' কৃতিত্ব খ্যাতি তাদেরই বেশি। কাঁচা ছেলে সংগ্রহের জন্য ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতা নিজের শিশুপুত্রকে হত্যা করেছে এমন ঘটনার কথাও শুনেছি বিরাহিমপুর গ্রামে। ২৭শে চৈত্রের দুপুরে গাজনের সন্ন্যাসী বা ভক্তবৃন্দ ঢাকের বাজনার সাথে গান গেয়ে, ধুপ ধুনা, ফুল গঙ্গাজল ইত্যাদি দিয়ে গাছে রাখা সেই মৃতকে 'জাগাবে'। গানের সুরে ও ভাষায় উদ্দেশ্য করে সমস্ত অঞ্চলের সব গাজনে একই গান (ভাষার তারতম্য সামান্য) গায়। নমুনা হিসাবে দু-একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি, ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণকে অবিকৃত রেখে :

(ও সাঁই রে) তু কেরে, তুকে কে আনলে ইখানে
তুর পিতা, মাতা, গুরু সবাই কানছে সিথানে।

• • •

(ও সাঁই রে) তুর মা মলো, বাপ মলো, মৌলিন্দির ঐ বাঁকে
শেয়াল কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে দেখগা তাকে।

• • •

(ও সাঁইরে) কাল বাছা খেয়েছিল টুকুই ভরা মুড়ি
আজ বাছার মুন্ডু যেছে ধুলোয় গড়াগড়ি॥

ব্যক্তির শোককে সমাজের শোকে পরিণত করে তাকে

রণ-পা বোলান

অনন্তে মিশিয়ে দেবার এই পদ্ধতি ও উৎসব তুলনাহীন (গ্রাম বাংলা, কৃষ্ণনগর, কার্তিক '৮৩) অবশ্য দিলী বাগচী মনে করেন, 'বোলানো' অর্থে নয়, 'বুল্' ধা থেকে অর্থাৎ ঘুরে বেড়ানো বোঝাতে বোলান (নদীয়া স্বরসংগীততে বুলান) কথার উদ্ভব। কথাটি বিবেচন যোগ্য। কেননা, বোলান দল সদাপরিক্রমণশীল এ গানের আসরে তারা কোন নির্দি জায়গায় দাঁড়ি গায় না, গোটা আসর ঘুরে ঘু বৃত্তাকারে নাচে গা নাম অথবা নামের ব্যুৎপত্তি যাই হোক, বোলান গ বর্ধমান-নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত ভূখন্ডের এ সজীব ও পরিবর্তমান লোকনাট্য। গ্রামবাংল সুপ্রচারিত অন্যান্য লোকনাট্য ও লোককাহিনী যেমন : আলকাপ, কৃষ্ণযাত্রা, জারিনাবিবি, রূপস প্রভৃতির মত বোলানও জনপ্রিয়তা ও নতুন চিত্তস্পন্দী। একে লোকনাট্য বলার প্রধান কারণ বিষয় ও আঙ্গিক লৌকিকজীবনবৃত্ত আশ্রয়ী। রূপকার ও শ্রোতা গ্রামীণ লোকজীবনের শরি এ গানের রূপায়ন হয়, নাগরিক সংস্কৃতির আওত বাইরে অর্থাৎ গ্রামীণ বাতাবরণে। এর রচনাশৈলী গঠনের প্রচলিত অভিজাত নাট্যরীতিকে বর্জন ব হয়। এ গানের অন্তস্তলে রয়ে গেছে পুনরাবৃত্তিধ Refrain লৌকিক গানের স্বভাব ও লোকনৃ অকৃত্রিম দেশজ বলিষ্ঠতা। বিষয়বস্তুতে রয়ে ধর্মমূলকতা, সরল ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাস্যকৌতুক। লো নাট্যের স্বভাবধর্ম অনুসারে মুখে মুখে এ গান জী পড়ে গ্রামে গ্রামে।

বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বোলান গা নানা নাম ও রূপভেদ দেখা যায়। সাধারণভাবে বোলা চারটি আঙ্গিক দেখা যায় : পোড়ো, ডাক বো সাঁওতেলে ও পালাবন্দী। বর্ধমানের কাটোয়া অ প্রধানত ডাক ও পালাবন্দী বোলান বেশি চালু। নদী

নামান্তর। পোড়ো বোলানে গাজনের অংশ বেশি। সাঙভেলে বোলান আসলে এক ধরনের উদ্দীপক নাচ। ডাক বোলানে গায়করা দলবদ্ধ হয়ে খুব উঁচুগলায় গান করে তাই এই নাম। ছল বোলান নামান্তরে আরেক প্রচলিত বোলানে দোহারকির দল থাকে তবে ডাক বোলানের চেয়ে সংখ্যায় কম। এরা মৃদু নম্র মধুর কণ্ঠে গায়। বর্ধমানের উদ্ধারণপুরের ঘাট সকল গাজন ও বোলান দলের সংগমতীর্থ। এই অঞ্চলের সংলগ্ন সমস্ত জাগ্রত শিবঠাকুরকে দোলায় চড়িয়ে গ্রামের ভক্তরা সারাপথ বোলানের নৃত্যগীত করতে করতে এসে এখানে জড়ো হয়। মুখে রং মেখে (মুখোশের বিকল্প?) ঢাক বাজিয়ে, উদ্দাম নেচে ভক্তারা ভয়াবহ শ্মশানের পরিবেশ বানায়। কান্দী ও কেতুগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের এই দুটি অঞ্চল বোলানের দলে সমৃদ্ধ। নদীয়ার সাহেবনগর, ছোট নলদা, পাগলাচণ্ডী, দেবগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের সর্বাঙ্গপুর বোলান যাত্রার অজস্র দলে সমৃদ্ধ। যুবক ও কিশোররা মাসখানেক মহড়া দিয়ে বাঁধা পালা অভিনয় করে নৃত্যগীত সহযোগে। চড়া মেকাপ, চোখে গগ্‌ল্‌স্‌ ও প্রমোদপরায়ণ এই গ্রাম্য নাট্যবাহিনী চৈত্রের শেষ তিনদিন আশপাশের সমস্ত গ্রাম চষে ফেলে পায়ে হেঁটে। আশ্চর্য তাদের প্রাণশক্তি. দুর্বার তাদের আবেগ।

॥ ২ ॥
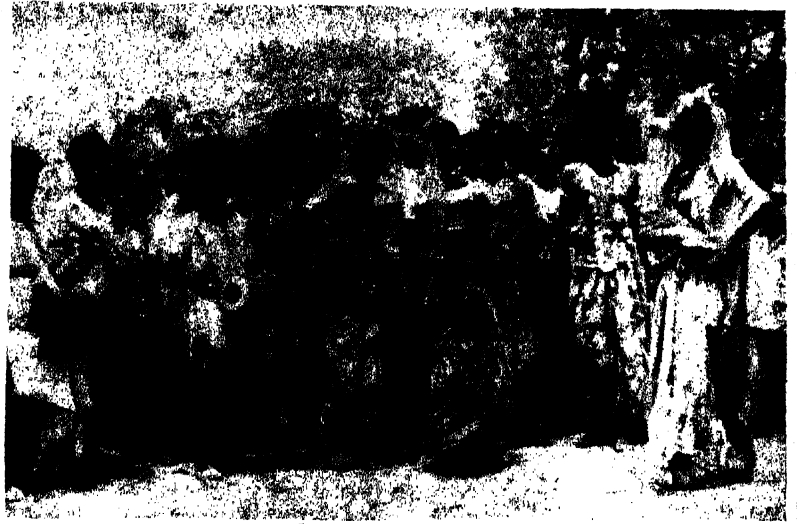
'অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়ের
মতন'

পালা বোলান বা বোলান যাত্রায় দশ পনেরোজন অংশ নেয়। ছেলেরা মেয়ে সাজে। আসরে বৃত্তাকারে সবাই দাঁড়ায়। মাঝখানে খাতা হাতে একজন প্রম্পটার মূল গায়ককে গানের পংক্তি বাতলে দেয়। গায়ক তখন গেয়ে ওঠে :

তখন রাম বলে 'ভাইরে লক্ষ্মণ চলেছ কোথায়?' পরবর্তী গায়কদল সম্মেলককণ্ঠে গেয়ে ওঠে ঐ একই পংক্তি। একই গান তিনবার রূপায়িত হয়। প্রথমে মূল গায়ক তারপরে আগদল, সবশেষে সমবেত কণ্ঠে। একক চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ নেই। রামের গান সবাই গায়, লক্ষ্মণের জবাবও সবাই গায়। এই হল বোলানের নিজস্ব গীতরীতি। উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক কিন্তু সমবেত-ভাবে গেয়। সঙ্গে থাকে নাচ। সে নাচ কিন্তু নাট্যানুগ বা চরিত্রানুগ নয়। তবে মেকাপ চরিত্র অনুযায়ী ভিন্ন। সস্তা পাউডার, লাল রং, লিপস্টিক উগ্র বক্ষবন্ধনী

নারীবেশী গ্রামযুবা : বোলান নৃত্য

এবং অবশ্যই চোখে গগল্‌স্‌ ও হাতে রুমাল। সিনথেটিক শাড়ির নিচে অধোবাস হয়ত ফুলপ্যান্ট এবং তা প্রকাশ্য। তাতে কিছু আসে যায় না। শিব-পুজোর উপলক্ষে বোলান গান হয় অথচ পালার উপজীব্য কখনই শিবমাহিমাবিষয়ক নয়। নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ নিয়ে পালা বাঁধা হয়। যিনি বাঁধেন সেই 'কবেল', 'ছড়াদার' বা 'বইদার' গ্রামের একজন মান্য ও পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি। বাঁধা পালা যিনি সুর দেন তাকে বলে 'মাস্টার'।

বাদ্যকরসহ পুরো বোলান পার্টি

আর যিনি দল গঠন, পরিচালন ও বায়না নেওয়া ইত্যাদি ঝুঁকি নেন তিনি 'ম্যানেজার'। গ্রামের 'মোরপে' মাস-খানেক অধিক রাত পর্যন্ত মহড়া চলে। অবশেষে ২৭।২৮ চৈত্র নাগাদ বোলান দল বেরিয়ে পড়ে। ড্রেস মেক-আপ নিজেদের। ফ্লুটবাদককে হয়ত ভাড়া নেওয়া হয়। ম্যানেজারের খাতায় অনুপুঙ্খ আয়ব্যয়ের হিসেব থাকে। যেমন :

জমা : মাটি কাটা ২১৲, যতীন নগদ ৪৲ ধর্ম ১৲, কমল ১৲, বলাই ১৲, আদায় ২৲ অর্থাৎ মাটি কেটে মজুরী মিলেছে একুশ টাকা, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত চাঁদা যোগ হয়ে বোলান পার্টির মূলধন। আর খরচের বিবরণ নিম্নরূপ :

হার্মোনিয়ম ভাড়া ১৮৲, খেলাখরচ ১, পান-বিড়ি ১, খাবার ২, হ্যাজাক ৫, মেণ্টল ১॥ ইত্যাদি। স্বভাবত সামাজিক হিসাবে প্রশ্ন জাগে এরা কারা? মূলত কৃষিজীবী ও অন্ত্যজ প্রায় অশিক্ষিত এই কিশোর যুবাবাহিনী বয়ে নিয়ে চলেছে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে ও প্রযত্নে লোকঐতিহ্যের এক স্পন্দমান ধারা। আসরে গান গেয়ে ৫ থেকে ১০ টাকা জোটে বড়জোর। ড্রেস, পেণ্ট, মেকআপ ও খাইখরচ ছাড়াও বাজনদারদের মজুরী ও খাঁই মিটিয়ে বোলান ম্যানেজারের অতিপরিকল্পিত বাজেট অনগ্রসর দেশের অর্থদপ্তরের মত কেবলই টাল খায়। চৈত্র শেষে সুনিশ্চিত লোকসানের ভবিষ্যৎ জেনেও তবু কেন এই বোলান দল বাঁধা? রবীন্দ্রনাথ একেই বোধ হয় বলেছেন জীবনের উদ্বৃত্ত আনন্দশক্তি, যা দরিদ্র হতশ্রী ও ম্লানায়মান পল্লীজীবনে এখনও মাথা উঁচু করে যুযুধান।

সাধারণত পালা বোলানে বন্দনা অংশে গাইবার পর দলের পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন :

মোদের বোলান গানের করি সমাধান।
সাহেবনগর বাড়ি মোদের সবার বাসস্থান॥
গৌর হয় দলপতি শুনুন গো ভারতী
জলধর করে গো ম্যানেজারি তাহার বাতিক ভারী।
সুশীল দলে করে মাস্টারি, প্রদীপ চণ্ডী নাচে
কায়দা করি।

কার্তিকচন্দ্র রচিল এ গান
সর্বাঙ্গপুর তাহার বাসস্থান।

অর্থাৎ, এই বোলান দলের 'কবেল' হলেন কার্তিকচন্দ্র, নিবাস সর্বাঙ্গপুরে। সুশীল হলেন সুরকার, জলধর ম্যানেজার, গৌর দলপতি বা মূল গায়েন, প্রদীপ ও চণ্ডী নর্তক। সমগ্র দলের ঠিকানা সাহেবনগর গ্রাম।

কদাচিৎ গানের মধ্যে বোলান দলের রিহার্সালের প্রতিবেদন মিলে যায় :

শঙ্কর চিত্ত দুইজনে কারো কথা নাহি শোনে
তাদের পড়ার ক্ষতি হয় তবু বোলান গাইতে যায়।
দ্যাখো বই-বাঁধার সময় সারারাত্রি জেগে রয়।

নিপুণ শব্দচিত্রে পাওয়া গেল গ্রাম্যসমাজের শঙ্কর ও চিত্ত নামক দুই কিশোরের জীবনে বোলান গানের আকর্ষণ ও উন্মাদনার অপ্রতিরোধ্য বিবরণ। পড়ার ক্ষতি করেও তারা বোলান গায় ও সারারাত জাগে মহড়া দিতে।

পালা বোলান এখন আর নিছক পৌরাণিক বিষয়নিষ্ঠ থাকছে না, কোথাও কোথাও সামাজিক বিষয়কে আশ্রয় করছে। প্রায় যাত্রার মত কুশীলব সহযোগে গদ্য সংলাপ যুক্ত হয়ে রূপায়িত হচ্ছে। নদীয়ার রানীনগরের ধাওয়াপাড়ার বছর দুই আগে তারাশঙ্করের চাঁপাডাঙ্গার বৌ বোলান পালায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এ সবই দুর্লক্ষণ। বোলানের নিজস্ব সুরে-তালেও কৃত্রিমতা ও আধুনিকতায় স্পর্শ লেগেছে। আগেকার বৈঠকী ও খাঁটি লৌকিক সুরের জায়গায় জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি ফিল্মের গানের সুর নেওয়া হচ্ছে। আস্থা, ধৈ, সুর-ঝাকার বদলে তীব্র তাল ও দ্রুত লয়ের দিকে বোলান শিল্পীর নজর বেশি। এ ব্যাপারে 'মাস্টার' অর্থাৎ সুরকাররা অসহায়। গ্রামের লম্বা চুল নব্য যুবকদের চাহিদা না মানলে তাদের সাংবৎসরিক সুরচর্চা ও সামাজিক সম্মানে আঘাত পড়বে। তাই লৌকিক বোলানে শোনা গেল 'শোলে' কিংবা 'বাবা তারকনাথে'র হিট গানের সুর। এর মধ্যে যে কোন মনস্ক সামাজিক গ্রামীণ অবক্ষয় ও স্ববিরোধিতার আভাস পাবেন। কেননা বোলানের ভবভিত্তিতে রয়েছে সামগ্রিক গ্রামজীবনের ধর্মকেন্দ্রিক উৎসবমুখর উল্লাস ও কৃষিজীবীদের অবসরের গান অথচ তার সুরে অতি-পরিকল্পিত উচ্চসমাজের তীব্র সংঘাতময় সিনেমা সংগীত আরোপিত হচ্ছে। এমন কেন হল?

॥ ৩ ॥

'এখানে নাহিকো কাজ—উৎসাহের ব্যথা নাই,
উদ্যমের নাহিক ভাবনা;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা

জীবনানন্দ কথিত গ্রামের এই নিরুত্তেজ প্রশান্তি নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম কর্মহীনতা আজকের গ্রাম বাংলায় কোথায়? এখনকার গ্রামে ডিপ টিউবওয়েলের আওয়াজ আর গমকলের আর্তনাদ শোনা যায়, ট্রানজিস্টরে সান্ধ্য রাজনৈতিক সংবাদ শোনেন সকল গ্রামবাসী। অধিক ফলন, সুফলা ইউরিয়া, কর্মনিয়োগ পঞ্চায়েত নির্বাচন, জনতা রাজ, ইন্দিরা গান্ধী এ স

বোলান গানের 'রং পাঁচালী' অংশে গ্রাম্য কবি আশ্চর্য সমাজ সচেতন ও রাজনীতি মনস্কতার পরিচয় রাখেন। সমাজবিজ্ঞানী ও জীবনরসিকদের চিন্তাভাবনার অনেক খোরাক এসব গানে মেলে। এখনকার ছেলে-মেয়েদের পোশাকের অভব্যতা, অবিবাহিতা মেয়ের দুঃখ, পণপ্রথার করুণ শোষণ, ভ্যাসেকটোমি, জমিতে সার প্রয়োগে ফসলের স্বাদহীনতা, লোডশেডিং ও অকেজো টেলিফোন, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব—এত সব বিভিন্ন ও বিচিত্ররসের প্রসঙ্গ 'রং পাঁচালী'তে এসে যায়। কোথাও তার ব্যঙ্গের চাবুক, কোথাও অসহায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস। মেয়ের বিয়েতে গহনা পণ দিতে না পেরে অসহায় পিতা বলেন :

> আমি অত গয়না কোথায় পাব?
> মাটির নয় যে গড়িয়ে দেব।

আবার নবযুবকদের পারিবারিক দারিদ্র্য অথচ পোশাক-বিলাসিতার বিরোধী মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করে বোলান দল গায় :

> বাংলা দেশের ছেলেগুলো
> কি যে তারা বুঝলো
> চোঙা প্যান্টে পোশু ভয়ে
> আধাসাহেব সাজলো।
> বাবা থাকে টেনা পরে
> মা খেতে পায়না,
> তার বেটারা করছে এখন
> টেরিকটের বায়না

(চতুষ্কোণ, শারদীয় ১৩৮৪)

অতিপ্রজ বাংলাগ্রামে যাত্রার বিবেকের মত বোলান শিল্পী গায় :

> গিন্নি বলিছে এখন তুমি কর 'অপারেশন'।
> সরকার থেকে দিচ্ছে 'নিরোধ' শুনুন সর্বজন॥

এই 'অপারেশন' বা নাশবন্দী সম্পর্কে পল্লীবাসীর অভিজ্ঞতা কতদূর মর্মান্তিক ও বেদনাবহ হয়েছে সে সম্পর্কে বোলানের প্রতিবেদন হল :

> যারা করল অপারেশন তাদের দুঃখে যায় জীবন।
> গিন্নী তাদের কয়না কথা সয় কত বেদন।
> উঠতে বসতে ঝাটা মারে, দেখুন বাবু
> পিঠখানা।

শেষ উক্তিটুকু বড় মর্মান্তিক। 'দেখুন বাবু পিঠখানা' এই উচ্চারণ ও আভিনয়িক কৌশলে

আত্মহারা অকালের গান

বোলান শিল্পী প্রজননবহুল বাংলা পল্লীসমাজের ব্যাধির প্রতি আঙুল দেখায়। বোলান গান পায় নতুন মাত্রা। সূচনায় যা ছিল গাজনের সাংস্কৃতিক স্ফুরণ, পরিবর্তনের ঝড়ো হাওয়ায় সেই বোলান হয়ে ওঠে সমাজসংযোগে সমস্যাকণ্টকিত।

মনে রাখতে হবে, এখনকার পশ্চিমবাংলার গ্রামে ঘরে ঘরে রয়েছে শিক্ষিত বেকার যুবক এবং তাদের নৈরাশ্য ও দ্বিধাগ্রস্ত রাজনৈতিক চিন্তা গ্রাম সমাজে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। বোলান গানের রংপাঁচালীতে যে এদের চিন্তার স্পর্শ ও বিদ্রূপ মুখরতা ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করছে তা অনুধাবন করতে হবে। ১৯৭৬ সালে ছোট নলদা গ্রামে এক গ্রাম্যযুবক আমার টেপ-রেকর্ডারে একটা গান জোর ক'রে বাণীবদ্ধ করে দিয়েছিল। গানটি হল :

> মানুষ কাটা কল এসেছে রে
> তোরা কে দামড়া হবি আর।

আবার এ বছর শালন্যচণ্ডী গ্রামে এক মধ্যবয়সী রাজনীতিচেতন ব্যক্তি স্বরচিত রংপাঁচালী শোনালেন :

> ইলেকট্রিকে আলো নেই
> ডার্ক ইণ্ডিয়া
> টেলিফোনে লাইন নেই
> বোবা মাই ডিয়ার
> ট্রাংককলেতে যতই করি
> হ্যালো হ্যালো হ্যালো
> দু ঘণ্টা পর এল রিপ্লাই
> কি হোলো কি হোলো?

এইভাবেই বোলান গানের সরল ভাবুকতায় মিশছে নাগরিকতার গরল। গ্রামবাসী যে নিতন্ত কৌতুকে

শিব নিয়ে ভক্ত্যাদের পরিক্রমা

এসব প্রসঙ্গ উপভোগ করছে সে কথাও সত্য। অবশ্য শুধু দেশকাল ও রাজনীতি সম্পর্কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নয়; ভাবনা চিন্তা মনন কর্মের কিছু কিছু অভিনব নজির অনেকসময়ে রংপাঁচালীতে পাওয়া যায়। যেমন এই তাত্ত্বিক গানে :

> এ কালের মুখে ছাই সত্যের সম্বন্ধ নাই
> মিথ্যা পথে চলে সদা সত্যে দিয়ে জলাঞ্জলি।
> পাচ্ছে তার প্রতিফল বৃক্ষে আর ধরে না ফল
> দুগ্ধবতী গাভীসকল হচ্ছে দুগ্ধহীন।
> অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হচ্ছে নানা কীটের সৃষ্টি
> শস্যাবহীন ক্ষেত্র তাই হচ্ছে দিন দিন।
> শাকসব্জী ফলমূল বিস্বাদে সব সমতুল
> তার মধ্যে আছে যত বিদেশী সারের গুণ॥

গ্রাম্য 'কবেল' অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন, যেসব বস্তুতে বিদেশী সার মেশানো হয়নি সেসব বস্তু আজও স্বাদু আছে, যেমন নুন। তিনি নিগূঢ় তর্কচিন্তায় এও বোঝেন,

> খাদ্যাভাবে দিন দিন কলির মানুষ হচ্ছে ক্ষীণ
> তার কারণ আয় চেয়ে ব্যয় বেশি।

এবং

> নরনারী সমান ছিল এখন মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গেল
> ফলে হ'ল ছেলের বাজার অতি চড়।

গ্রাম্য কবির এই সরল সিদ্ধান্ত সমাজ সমীক্ষক ও পরিসংখ্যানবিদদের মনঃপূত নাও হতে পারে তবে জনবিস্ফোরণ ও খাদ্য সমস্যার মূল খোঁজবার সচেতন চিন্তাটুকু তারিফ করবার মত।

সমস্যাকে নিস্পৃহভাবে দেখা শুধু রংপাঁচালীর কাজ নয়। অনেক সময় বিদ্রোহ ও বিরোধিতায় রুখে দাঁড়াতেও চায়। যেমন ভূতনাথ দাসের রচনায় :

> শতচ্ছিন্ন মলিন বসন জঠর জ্বালায় অকাল মরণ
> কেন হঠিব, গরীব মোরা, প্রাণ আছে যতক্ষণ।

(চতুষ্কোণ, শারদীয় ১৩৮৪)

এই রকম বিচিত্র ভাবনা ও সংকল্পে বোলান গানের চৈত্রান্ত আসর শেষ হয়। কণ্ঠবাদন ক্লান্ত, নৃত্যবিক্ষেপে মন্থর শ্লথ চরণ, বোলান শিল্পীর দল ফিরে যায় নিজের নিজের গ্রামে ও জীবিকায়। রয়ে যায় কয়েকটি দিনরাতের জাগর, মধুর গীতময় স্মৃতি। আবার শুরু হয় পৌনঃপুনিক অর্ধাশন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট অস্তিত্ব ও জীবন সংগ্রামের ক্লান্ত তবু ক্লান্তিহীন মোহ। সামনে মেলা থাকে সামনের চৈত্রের ভরা ফসলের মত প্রমত্ত বোলানের সম্ভাবনার স্বপ্ন। বোলান নামে পরিক্রমণ নয়, মৃতের পুনর্জাগরণ নয়—বোলান থেকে মৃত ম্লান মূক মুখে নতুন বাণীর উজ্জীবন।

রাগ-অনুরাগ

রবিশঙ্কর

॥ ১৫ ॥

এখানে—ভাই শংকর—একটা কথা উঠছে, খুব ডেলিকেট। তবু বলছি। আমি যখন থেকে, এই ধর ১৯৩৯-৪০ সাল থেকে, গান-বাজনার লাইনে নামলাম তখনই দেখলাম যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের ক্ষেত্রে—এক কাশী এবং মহারাষ্ট্র অঞ্চল বাদ দিয়ে—একেবারে মুসলমান শিল্পীদের প্রাধান্য। তাঁদের এবং তাঁদের ভক্তবর্গকে নিয়ে এমন একটা জোট ছিল চারিদিকে যে, তার মধ্যে দিয়ে গলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো খুব মুশকিলের ব্যাপার ছিল কোনও হিন্দু শিল্পীর পক্ষে। বিষ্ণু দিগম্বরজীর তিনজন শিষ্যের প্রতিষ্ঠা খুবই ছিল। ওংকারনাথ, পট্টবর্ধন এবং নারায়ণরাও ব্যাস। এদিকে ওদিকে কিছু নামী হিন্দু গায়িকাও ছিলেন। আর কাশীর কণ্ঠে মহারাজ, আনোখেলাল এবং সারেঙ্গিয়া গোপাল মিশ্র প্রমুখের খুব খ্যাতি ছিল। আমি খুব খুঁটিয়ে বলতে চাই না ভাই, তবে আমাকে যে কি বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে হয়েছে সে কি বলব! প্রায় ১৯৫০ সাল অবধি। একমাত্র ওংকারনাথজী ছিলেন এক দোর্দণ্ডপ্রতাপী, নির্ভীক মরদ যিনি সমস্ত খাঁ সাহেবদের মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন, এবং জোর করে আদায় করেছিলেন তাঁর সেই উচ্চ সম্মান এবং সেই বড় দক্ষিণা—হাইয়েস্ট ফীজ গান-বাজনার আর্টিস্টদের মধ্যে! একটু আগে যে কথা বলছিলাম—কিষেণের মধ্যেও এরকম একটা জেদ বা তেজ ছিল। খাঁ

আল্লা রাখার যেটা আছে তা হল হাতের আওয়াজের মনোহারিত্ব, আকর্ষণ—পাঞ্জাব ইস্কুলের ভাল ভাল গুণের যা সম্পদ, যে চেকনাই। এখন ও তো আমার ভাইয়ের মতনই

আল্লা রাখার ছেলে জাকির হুসেন, বয়সে নবীন, খুবই ট্যালেনটেড

সাহেবদের মত এঁরাও দরকার হলে কথা বলে, বক্তৃতা দিয়ে, আস্ফালন করে নিজেদের সম্মান আদায় করতে পারতেন। পিছনে যে যাই বলুক, সব গাইয়ে-বাজিয়েরাই এঁদের সমীহ করে চলতেন, ঘাঁটাতে সাহস পেতেন না। আমি কোনও দিনই এঁদের মত বোলচালে রপ্ত হইনি, কাজ দিয়ে আস্তে আস্তে এবং যাত্রাপথে কিছু নামী তবলিয়াদের জলসায় ঘায়েল (অবশ্যই বাজনার মাধ্যমে) করে নিজের জায়গায় পৌঁছেছি। তবে ঐ যে আগে বললাম ভাই, অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়েছি। এই ওস্তাদ গাইয়ে-বাজিয়ে আর তাঁদের ভক্তদের কাছ থেকে। আমাদের এই বাঙালীদেরই ধরো না। এখনও অনেকের মনে সেঁধিয়ে আছে সেই ধারণাটা যে, মুসলমান শিল্পী না হলে, বা নামের পেছনে একটা খাঁ না থাকলে তাঁর গান-বাজনায় সে জৌলুস বা রঙ্ আসতেই পারে না। এখন ভাবলে হাসি পায় যে, অনেক দিন আগে এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে রাগে দুঃখে ভেবেছিলাম, রবিশঙ্কর নাম পালটে রব্বন খাঁ নাম ধারণ করব! অনেককে তো টিপ্পনী কাটতে শুনেছি, 'পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ না থাকলে আর গান হল কি করে!' খানিকটা টেক্‌নিক্যালি দেখতে গেলে এটা ঠিকই যে, কিছু দিন আগে অবধি প্রায় শতকরা পঁচাত্তর-আশিজন গাইয়ে-বাজিয়েই মুসলমান ছিলেন কিন্তু তুমিই বল, এটা কেন হল? বিশ্লেষণ করে দেখ। এটা তো আমরা সবাই জানি যে, আমরা কোনও আরবী বা ফারসী সংগীতের চর্চা করি না। এ সংগীত এ-দেশেরই এক আদি অকৃত্রিম সম্পত্তি। অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ প্রভাব, রঙ ইত্যাদি এসেছে বইকি পারস্য, ইরাক থেকে। কিন্তু সেও তো ঐতিহাসিকের গবেষণার বস্তু। কে কার কাছ থেকে কতখানি নিল, কবে নিল, সে গভীর আলোচনায় না গিয়েই বলছি, আমাদের তানসেনের সময় থেকেই ধরো না, একনাগাড়ে কত হিন্দু গাইয়ে-বাজিয়ের ধর্মান্তর হল। আমি ধাড়ি কাওয়ালদের কথা বলি।

না; আমি বলছি তানসেন, মিসির সিংহ এবং এ'দেরই স্তরের কত বিরাট বিরাট গুণীদের সম্পর্কে। *এ'দের বহুজনকেই ধর্মান্তরিত করা হয়। এমন কি, দেড় শ' দু শ' বছর আগেও এইসব হয়েছে। বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের* ক'পুরুষ আগের প্রপিতামহরা হিন্দু ছিলেন। অনেক গাইয়ে-বাজিয়ে এখনও *আছেন—আমি বিলায়েত খাঁকেও এ'দের মধ্যে ধরতে পারি—যাঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। যা হোক, তুমি আরও দেখতে পাবে যে, মুসলমান হবার পর এইসব শিল্পীরা আরও বেশী কট্টর হয়ে একমাত্র নিজের ছেলেপুলে এবং বংশের* সন্তানদের মধ্যেই গান-বাজনাকে সীমায়িত করে রাখলেন। এবং এই করে সংগীতের যে আলাদা আলাদা ঘর গড়ে উঠল এই হল তার সূচনা। যতই মেধাবী হোক না কেন, কোনও হিন্দু শিল্পীর পক্ষে এইসব ঘরানায় ভর্তি হয়ে শিক্ষা পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ধর্মের কারণেই হোক বা খাদ্যবস্তুর গুণেই হোক, ওঁদের ভেতর এমন প্রচন্ড জেদ এবং জেহাদী মনোভাব আছে যে, যে বিষয়েই ওঁরা হাত লাগান তাতেই অতি উত্তম ফল ওঁরা পেয়েছেন। সে কার্পেট বোনাতেই হোক, কি মোরাদাবাদী সূক্ষ্ম কাজেই হোক, পালোয়ানি, ক্রিকেট খেলা বা গান-বাজনার ক্ষেত্রেই হোক। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা প্রায়ই এ কথা শুনি, যেটা সত্যিও বটে যে, মুসলমান শিল্পীদের মধ্যে চিল্লা নেওয়া বলে একটা রীতি ছিল। গাইয়ে বা যন্ত্রী হয়তো একটা বিশেষ তান নিয়ে, তবলিয়া হয়তো একটা মাত্র কায়দা নিয়ে ন' দিন, একুশ দিন বা চল্লিশ দিনের চিল্লা নিল। অর্থাৎ একটা ছোট্ট ঘরে বসে চতুর্দিক বন্ধ করে শুধু ঐ একটি জিনিস নিয়েই সমানে রগড়ানো। খাবার সময় আত্মীয়স্বজনের কেউ খাবার ও জল দিয়ে গেল। প্রকৃতির ডাকে নেহাত কিছু-ক্ষণের জন্য বাইরে বার হল। গলা বা হাত আর চলছে না। শরীর অবসন্ন, চোখ বুজে এল, ঘুম ছেয়ে গেল পুরো মস্তিষ্কে, আবার ধড়মড়িয়ে উঠে শুরু করল সেই কাজের পুনরাবৃত্তি। ভাবতে পারো তুমি, এটা করতে হলে কতখানি জেদের প্রয়োজন? আর এটা করলে কেনই বা সে বড় হবে না? সেই বিশেষ চর্চার ওপর তার নিজস্ব দাপট এবং অধিকার তো জন্মাবেই! কথা হচ্ছে যে, মেহনত যে করবে সে ফল পাবেই। আবার সেই কথা—সংগীত 'কর্তব' বিদ্যা; করো, তবে পাবে। কাশীর হিন্দু সংগীতজ্ঞদের মধ্যেও এই চিল্লা নেওয়ার প্রথা ছিল। এবং সেখানেও দারুণ রেওয়াজী এবং গুণী লোক হয়েছে সময়ে সময়ে। আনোখেলালকেই ধরো না। আমার মনে আছে, চল্লিশ কি একচল্লিশ সালে মাইহারে যখন থাকতাম, কাশীতে গিয়েছিলাম একবার একটা বিশেষ কাজে। ভীষণ ইচ্ছে হল আনোখেলালের সঙ্গে দেখা করি। ওর এক আত্মীয়ের কাছে শুনলাম যে, পরদিনই আটটার ট্রেনে ও বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি আন্দাজ করে আমার মাসতুতো ভাই জগুর সঙ্গে ওর বাড়িতে পৌঁছলাম ভোর ছ'টা নাগাদ। ওর রামাপুরার বাড়িতে। বৈঠকখানায় ওর এক আত্মীয় খাতির করে বসাল। বসেই শুনলাম পাশের ঘর থেকে চাপা তবলার আওয়াজ। অর্থাৎ তবলার ওপর কাপড় রেখে কে যেন রেওয়াজ করছে। ভাবলাম বুঝি কোনও শাগরেদ-টাগরেদ হবে। পরে আত্মীয়ের কাছে যা শুনলাম তাতে সত্যিই ভড়কে গেলাম। জানলাম যে, আনোখেলাল সারা রাত কোন্ এক জলসায় বাজিয়ে ভোর চারটে নাগাদ ফিরেছে। এবং বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ভোরের রেওয়াজ যাতে খালি না যায় তাই রেওয়াজে বসেছে। তবে একটু পরে ফের ট্রেন ধরতে হবে তো, তাই উঠল বলে। ভাবতে পারো? তার একটু পরেই উঠে এসে লোকটা আমায় দেখে তো খুব খুশী, আমিও এই বিরাট সাধককে সামনে পেয়ে উচ্ছ্বাসের বশে জড়িয়েই ধরলাম। এখন বুঝছ তো, এখানে হিন্দু হওয়া বা মুসলমান হওয়া নিয়ে কোনও কথাই উঠছে না। আমরা যদি মার খেয়ে থাকি তা একমাত্র রেওয়াজ, জেদ এবং কঠোর সাধনার অভাবে। তবে যে এই মেহনতটুকু করেছে এবং করছে, সে ফল পেয়েছে এবং পাবে। এই সঙ্গে এর উলটো কথাটাও শোনো।

দক্ষিণ ভারতের সংগীতের ক্ষেত্রে আবার ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। শুধু হিন্দু হলেই চলে না, গুটি কয়েক পিল্লে বা নাইডুকে বাদ দিয়ে যাকেই দেখবে সে হবে আইয়ার, আয়েংগার বা শাস্ত্রী। সেখানেও সেই একই কারণ। ওঁরা সীমায়িত রেখেছিলেন সংগীতের সমস্ত তত্ত্ব এবং তথ্য নিজেদের বংশ বা ব্রাহ্মণ ছাত্রকুলের মধ্যে। ওখানেও কিছু লোক তাই বলে, সৎ ব্রাহ্মণ না হলে বা তাঞ্জোরের কাবেরী নদীর জল না খেলে গান-বাজনা হয় না। আরে বাবা, এ কথা তো বাঙালীরাও বলতে পারে। সেই শুরুর থেকেই দেখো না—সেই বিষ্ণুপুর ঘরানার রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপর ধরো রাধিকা গোসাঁই, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি আরো কত! আবার এ যুগে দেখ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ী, প্রসূন এবং মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজিয়েদের মধ্যে দেখ বীরেন্দ্রকিশোর, রাধিকা মিত্র, এই অধম রবিশংকর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়—আর কত বলব? আর তুমিই বল শংকরলাল ভট্টাচার্য, লেখক হিসেবে সেই বঙ্কিম চাটুজ্যে, রবীন্দ্রনাথ (ওঁরাও তো এককালীন ব্রাহ্মণ), শরৎ চাটুজ্যে, মানিক বাঁড়ুজ্যে, তারাশংকর বাঁড়ুজ্যে, বিভূতি বাঁড়ুজ্যে। এখন এই নিয়ে কি বলা চলে, ব্রাহ্মণ না হলে বড় গাইয়ে-বাজিয়ে বা লেখক হওয়া যায় না? এটা কি একটা কথা হল!

হিন্দুদের তবে একটা বড় দোষের কথাও বলব এখানে। সেই মোগল যুগ থেকেই পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই হোক, আর নিজেদের মধ্যে অগাধ দলাদলির জন্যই হোক, আর কোনও রেওয়াজের ব্যাপারে একটা গা-ছাড়া ভাবের জন্যই হোক, এই হিন্দুরা গান-বাজনায় মার খেয়েছে যুগ যুগ ধরে। গান-বাজনায় গতর না নড়িয়ে তো আর উন্নতির উপায় নেই। কিন্তু ধর্মের কারণেই হোক বা সমাজব্যবস্থার প্রভাবেই হোক, হিন্দুদের মধ্যে এই কট্টর অনুশাসন কোথাও ছিল না। যেখানে ছিল সেই কাশীতে, মহারাষ্ট্রে এবং দক্ষিণদেশে দেখ কি ব্যুৎপত্তি এদের সংগীতে! অথচ উত্তর ভারতে এদের কি হল, কে জানে! আর এসব আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কি পরিমাণ যে আমায় লড়তে হয়েছে না এই মুসলমান গোষ্ঠীর বিরোধিতার মুখে, সে আর বলে বোঝাতে পারব না। আর কম কসরত করতে হয়নি ভাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এবং এ-সমস্ত ঝঞ্ঝাট প্রধানত ছিল আমি হিন্দু বলে। অত্যন্ত সুখের কথা ভাই যে, আজকাল এই মিউজিক্যাল পলিটিক্স, দঙ্গলবাজি, আর রেষারেষি কমে গেছে সংগীতের জগৎ থেকে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত একেবারে যায়নি। তবুও ঈশ্বর ও আল্লাকে ধন্যবাদ জানাই। আর একটা জিনিস বিশেষ লক্ষণীয়। শুধু গাইয়ে-বাজিয়েরাই নয়, মুসলমান মাত্রকেই দেখবে তারা অদ্ভুত সুন্দর কথা বলতে পারে। সে গরিব বা অশিক্ষিতই হোক, বা লেখাপড়া-জানা রইস হোক না কেন, দেখবে তার ভেতর একটা 'তমিজ' বা 'আদব' থাকবেই। সেটার দ্বারা তার বক্তব্যকে এমন সুন্দর গুছিয়ে পেশ করবে! এটা হয়তো উর্দু ভাষার এবং মোগলদের কেতাদুরস্ত ম্যানার্স ইত্যাদির প্রভাব। গাইয়ে-বাজিয়েদের ভেতর তো বিশেষ করে এটা দেখা যায়। একটা বন্দিশ বা তান অথবা ফিরৎ শোনাবার সময় সঙ্গে সঙ্গেই মুখে বলে, এই বন্দিশ কত পুরনো, এই ফিরৎ দেখুন, এই তান দেখুন, কি মুশকিল তান (সঙ্গে ঢিমা লয়ে সেটারই সরগম করে

আমি খুব খুঁটিয়ে কিছু বলতে চাই না ভাই, তবে আমাকে যে কি বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে হয়েছে সে কি বলব!

আমি আশিক আলি খাঁ সাহেব, উমিদ আলি খাঁ এবং আজকের দিনে সলামৎ আলি খাঁকে প্রচুর শুনেছি ধামার, সুলফাক্তা, সওয়ারি ইত্যাদি ধ্রুপদাঙ্গের তা খেয়াল গাইতে। ওপরের ছবিতে সলামৎ আলি ওঁর ছেলে শরাফৎ আলির সঙ্গে লনডনের এক ঘরোয়া আসরে গান গাইছে

দেখাবে)! এইসব বলে শ্রোতাকে এমন কনভিনসড্ করে দেয়! এদের গান-বাজনার সঙ্গে সঙ্গে এই সেলসম্যানশিপটাও খুব আছে।

ঠিক এখন তো আমার প্রিয় তবলিয়া বলতে আল্লা রাখা ভাই আর কিষেণ মহারাজ। খুব ভাল বোঝাপড়া হয় এদের সঙ্গে। আর এই কিষেণ এমন একটা লোক যার লয়ের ওপর কনট্রোল অসামান্য। যে-কোনও তাল ও সমান দক্ষতায়, সেই দুর্ধর্ষ লয়কারীর কাজ-টাজ দিয়ে পেশ করতে পারে। এটা আল্লা রাখা-জীরও আছে। সেই সঙ্গে আল্লা রাখার যেটা আছে তা হল হাতের আওয়াজের মনোহারিত্ব, আকর্ষণ—পাঞ্জাব ইস্কুলের ভাল ভাল গুণের যা সম্পদ, যে চেকনাই। এবং এখন ও তো আমার ভাইয়ের মতনই। একই সঙ্গে বাজাই আমরা সর্বদা, সর্বত্র। আর দুজনের বাজনা দুজনের বাজনার সঙ্গে যেন মিশে গেছে। তার এফেক্টটাও দারুণ সুন্দর হয়। আবার মার্বেল প্যালেসে যখন বাজিয়েছিলাম কিষেণের সঙ্গে তখন আর একটা সুন্দর ব্যাপার দেখলাম। He brings out a different side of my musical character!

আল্লা রাখা ভাই বোম্বে এ আই আর-এ স্টাফ আর্টিস্ট ছিল যখন ১৯৩৯ সালে সেখানে আমার সঙ্গে রেডিওতে এক অধিবেশনে সংগত করল। সেই সময় থেকেই ওর সঙ্গে একটা মিত্রতা গড়ে ওঠে। রেডিও প্রোগ্রামে ওকে তার আগে বেশ কয়বার শুনেছিলাম। যেটা ওর বাজনায় আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল সেটা হল—পাঞ্জাবী ঘরানার বিশেষত্ব খুব টেরা-বাঁকা ও কঠিন চলন। ত্রিতাল ছাড়া ও অন্যান্য তালও অবলীলাক্রমে বাজাত। ওর ওস্তাদ মিঞা কাদের বক্স এবং তাঁর পিতা ফকির বক্স আসলে লালা ভবানীদাস নামের এক বিরাট পাখোয়াজীর শিষ্যবংশ। পাখোয়াজের প্রভাব—তালাধ্যায়ের এবং অন্যান্য তাল বাজানোর ওপর বিশেষ করে—খুব দেখা যায়। এখনও পাঞ্জাবে, বিশেষ করে পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলে, দেখা যায় তবলার সঙ্গে যে বাঁয়া বাজে সেটা কাঠের তৈরী এবং তাকে দুক্কড় অথবা ধামা বলা হয়। এবং পাখোয়াজের মতই তাতে আঠা লাগিয়ে বাজানো হয়।

বেনারসেও তবলার যে বাজ তাতে পাখোয়াজের প্রভাব খুব বেশী। কণ্ঠে মহারাজের বাজনায় এবং এখন কিষেণ ভায়ার বাজনাতে তা সকলেই দেখেছে। বিশেষ করে পরন, পড়াল, টুকরা অঙ্গতে তা বেশী দর্শনীয়। পাঞ্জাব [illegible]নার তবলাতেও সেইরকম পাখোয়াজের মত খোলা হাতের প্রয়োগ প্রচুর হত। আ[illegible] রাখা ভাইয়েরও শুনেছি প্রথমের দিকে ধামার, সওয়ারি ইত্যাদি বড় তা[illegible] পাখোয়াজ অঙ্গে কিছুটা খোলা হাতের ব্যবহার, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ও এবং [illegible] সমসাময়িক পাঞ্জাবি ঘরের বাদকরা—যথা, আল্লাদিত্তা—সেটা কম করে দি[illegible] প্রায় সমস্তটাই তবলার অঙ্গে বাজায়। শুধু তাই নয়, একটা আশ্চর্য জিনি[illegible] দেখা যায় এদের ঘরে—যেটা বেনারস বা লখনৌ বা কোনও পুরব বাজে দে[illegible] যায় না, যেখানে কিনা পাখোয়াজের প্রভাব আছে—সেটা হচ্ছে যে, এরা ধাম[illegible] সুলফাক্তা, সওয়ারি ইত্যাদি ধ্রুপদাঙ্গের তালগুলো একেবারে পুরোপুরি তব[illegible] মত করে বাজায়; মোটেই পাখোয়াজের ঢঙে নয়! আর একটা আশ্চর্য ব্যাপা[illegible] গাইয়েরাও এইসব তালে যে গায় তা ধ্রুপদের ঢঙে নয়, তান-ফান মেরে একেব[illegible] তাতে খেয়ালের ট্রিটমেন্ট করা হয়। আমি আশিক আলি খাঁ সাহেব, উ[illegible] আলি খাঁ এবং অধুনা সলামৎ আলিকে প্রচুর শুনেছি এইসব তালে খে[illegible] গাইতে। হ্যাঁ, উদাহরণ দিই। তবলাতে যে ধামার এরা বাজায় তাতে হাতে [illegible] দেবার পদ্ধতি যদিও একই, কিন্তু ঠেকা একেবারে আলাদা। সেই চির[illegible] ক ধে টে ধে টে ধা—গ দিন দিন তা; ক পরিবর্তে এরা বাজায় তা ধিন—ক্র[illegible] ধিন। ধাগে তিটকিট ধাগিনা তা-ক্। তা তিটকিট তা তিটকিট। সুলফ[illegible] এরা বেশির ভাগ মধ্য এবং দ্রুত লয়েই বাজায়। এই তার ঠেকা: ধিন [illegible] কিট। ধিনা ধিন ধিন। না ধিন। ধিন না।

যা হোক, আল্লা রাখার কথায় ফিরে আসি। পাঞ্জাব ঘরের তো সম[illegible] পেয়েছে, সেই সঙ্গে মিশিয়েছে ওর অদ্ভুত মাথা এবং হিসেব করার ক্ষম[illegible] নিজের প্রতিভার জোরে একটা নিজস্ব স্টাইল দাঁড় করিয়েছে ও। এখন [illegible] প্রভাব অনেক নবীন তবলিয়ার ওপর দেখা যায়। ওর ছেলে জাকির হুসে[illegible] খুবই ট্যালেনটেড। এই অল্প বয়সেই খুব নাম করেছে, চাহিদাও প্র[illegible] সুন্দর দেখতে, দারুণ বাজাচ্ছে। আল্লা রাখার বিশেষত্ব যেসব কঠিন বা[illegible] সেসব কি সুন্দর আয়েশের সঙ্গে বাজায় ছেলেটা। টোন প্রোডাক[illegible] চমৎকার। ভারত এবং পাকিস্তান দুই জায়গাতেই ভাল্প কদর ওর। অ[illegible] সঙ্গে বিদেশে বাজিয়েছে। খুব সুনাম কিনেছে তাতে। এই সেদিন [illegible] সোহাগ দিয়ে বাজালো আমার কলকাতার [illegible]

রসুনে প্রকৃতিদত্ত যত আরোগ্যের গুণ আছে, তার সব গুণগুলিই এখন

৩০টির জন্য
৬·৮০ টাকা
১০০টির জন্য
১৯·৬০ টাকা

GARLIC PEARLS

র‍্যানব্যাক্সি'র গার্লিক পার্লস্-এ

সর্বাত্মক স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃতই কার্য্যকর এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পন্থা হিসাবে বহুকাল থেকে কাঁচা রসুন স্বীকৃতি লাভ ক'রে এসেছে।

"রসুনের তেলের ক্যাপসুল . . . রোগ নির্মূলকারক রসুনের কোয়ার সমস্ত উপাদান এর মধ্যে রয়েছে . . . রক্তকে সতেজ করে, রক্ত শোধন করে, হজমশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে . . . ফুসফুসের রোগ . . . সবরকম অন্ত্রীয় গোলযোগ, ক্ষুদামান্দ্য প্রভৃতির জন্য সুপারিশ করা হয় . . ." ডাঃ কে. এম. নাদকার্ণির ইণ্ডিয়ান মেটিরিয়া মেডিকা।

রন্ধনের সময় রসুনের কয়েকটি অনবদ্য গুণ নষ্ট হয়ে যায়। র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্ল্স্-এ রয়েছে কাঁচা রসুনের বিশুদ্ধ আরক এবং রসুনের প্রকৃতিদত্ত সবক'টি গুণ।

- কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সুসংহত রাখে এবং উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া দমন করে।
- পেটের বায়ু নিরোধ করে এবং হজমশক্তি বাড়ায় ও লিভারের কার্য্যক্ষমতার উন্নতি করে।
- পুরোনো কাশি, সর্দ্দি ও ফ্লু-কে নিরাময় করে।
- রক্তের অশুদ্ধতা দূর করে, ব্রণ, কালসিটে ও কালোদাগ পরিষ্কার ক'রে, ত্বককে সুস্থ ও মসৃণ রাখে।

গার্লিক পার্লস্—গন্ধ বাদে রসুনের সব গুণ। খাবার আগে, ১টি কিম্বা ২টি মুক্তদানা (পার্লস্) খেলে, আপনি বহুদিক থেকে উপকার পাবেন প্রাকৃতিক উপায়ে।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্—
সর্বাত্মক স্বাস্থ্য লাভের প্রাকৃতিক উপায়।

Okhla, New Delhi-110020

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৮ ॥

শহরটি প্রায় স্পষ্ট দু'ভাগে ভাগ করা হুগলী নদীর ধার ঘেঁষে যেখানে পুরোনো কেল্লা ছিল, সেই অঞ্চলেই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের ঘন-বসতি। গ্রেট ট্যাংক বা লাল দীঘির দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে সাহেবদের সুন্দর সুন্দর বসত বাড়ি। এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কোর্ট হাউস স্ট্রিট নামে একটি প্রশস্ত রাস্তা। আর একটু দক্ষিণে গাছপালা ঘেরা চৌরঙ্গি এবং বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের পাশে পাশেও কয়েকটি বাগানবাড়ি রয়েছে ধনী সাহেবদের। নতুন কেল্লা তৈরি হয়েছে গভীর জঙ্গল সাফ করে এবং লড়াইয়ের সুবিধের জন্য রাখা হয়েছে অনেকখানি ফাঁকা ময়দান। তার নাম এসপ্লানেড। এই এসপ্লানেড শব্দটির মানেই হচ্ছে দুর্গ এবং নগরীর অট্টালিকা শ্রেণীর মাঝখানের জায়গা।

আদিবাসীদের পল্লী মোটামুটি শহরের উত্তরাঞ্চল জুড়ে। পাদ্রী, শিক্ষক ও কিছু কিছু দোকানদার ছাড়া অন্য সাহেবরা এই নেটিভপাড়ায় বেশী আসে না। অবশ্য ধনী নেটিভবাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রণে সাহেবরা আসে মাঝে মাঝে। বেলগাছিয়ায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের রূপকথা তুল্য প্রমোদ ভবনে নেমন্তন্ন পাবার জন্য রাজপুরুষেরা পর্যন্ত লালায়িত হয়ে থাকে। নেটিভদেরও সাহেবপাড়ায় যাবার বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নেই যদিও, কিন্তু বিনা কাজে কেউ চট করে ওদিকে যেতে ভয় পায়। সন্ধের পর মাঠের মাঠে মাতাল গোরারা দিশী লোকদের মেরে হাতের সুখ করে নেয়। এমন জনশ্রুতি আছে। কলকাতা থেকে যারা কালীঘাটে তীর্থ করতে যায় তারাও অন্ধকার নামবার আগেই বেলাবেলি ফিরে আসে।

বউবাজার পার হয়ে লালবাজার দিয়ে সাহেব-পাড়ায় ঢুকতে গেলেই প্রথমে চোখে পড়ে সুপ্রিম কোর্ট ভবনটির সুউচ্চ চূড়া। উপনিবেশ স্থাপনের শুরু সঙ্গেই আদালতের প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজ চমকে দিয়েছে ভারতবাসীকে। ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য ইংরেজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং একথা ইংরেজ সগর্বে প্রচার করে। দিশী লোকদেরও ধারণা হয়ে গেছে যে ইংরেজ রাজত্বে সুবিচার পাওয়া যায়।

থেকে মুছে গেছে। সেও তো প্রায় ষাট সত্তর বছর আগেকার ঘটনা।

ইংরেজ দেশটা শাসন করলেও এখনো পর্যন্ত পাকাপাকি সনদ নিয়ে এদেশের রাজা হয়ে বসেনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি ভারতবর্ষটা ইজারা নিয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপের জন্য মাঝে মাঝে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এদেশেও তাদের ব্যবহার অতি সতর্ক। নেটিভদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ইংরেজ চট করে কোনো সামাজিক নীতি বদল করে না। প্রথম দিকে জোব্বাকার, ঝাড়ুদার, খানসামা, দালাল ও ফড়ে শ্রেণীর কিছু কিছু লোক সাহেবদের সংস্পর্শে এসে দু'চারটি ইংরেজি শব্দ শিখতে শুরু করে। সাহেবরা তাদের দিয়েই কাজ চালাতো। এখন সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন ঘরের লোকেরাও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তাদের মাধ্যমে সাহেবরাও জানতে পারছে যে এ দেশটা শুধু কুৎসিত, কদর্য চেহারার নির্বোধ মানুষেই ভরা নয়, এদেশে আছে সুদীর্ঘকালের জ্ঞানসম্পদ এবং আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এদেশের কোনো কোনো অতি দরিদ্র মানুষও বিনা কারণে অহংকারী হতে পারে। আরও একটি ব্যাপার জানতে পেরে সাহেবদের আত্মশ্লাঘায় খানিকটা গোপন ঘা লেগেছে। অনেক সাহেব যেমন নেটিভদের স্পর্শ করতে ঘৃণা করে, তেমনি অনেক নেটিভও ঘৃণায় সাহেবদের ছোঁয় না কিংবা দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেললেও গঙ্গায় স্নান করে আসে। আমি যাকে পায়ের তলায় রাখতে চাই এবং রাখতে পারি, সে কাতরভাবে আমার কাছে দয়া ভিক্ষা করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে যদি বিনা প্রতিবাদে পায়ের তলায় শুয়ে থাকে এবং মনে মনে আমাকেও তার পায়ের তলায় রাখে, তাহলে সুখটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না।

যাই হোক, ভয় বা ঘৃণার চেয়ে ইংরেজদের সম্পর্কে এখন ভক্তি ভাবটাই অবশ্য বেশী প্রবল। কয়েক শতাব্দীর অরাজকতায় জনসাধারণ একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল। নবাবী আমল উচ্ছন্নে গেছে বলে কারুর মনে কোনো খেদ নেই। তখনকার জঘন্য অত্যাচারের স্মৃতি এখনো মানুষের মনে সজাগ। সিরাজ-উদ্দৌল্লা, মীরকাশীম, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি নামগুলি ভবিষ্যতের নাট্যকারদের হাতে গৌরবান্বিত হবার অপেক্ষায় আপাতত ইতিহাসের অবহেলিত অন্ধকার কক্ষের দলিল দস্তাবেজে নিহিত। এখন লোকের চোখে ওরা নারী লোলুপ, রক্তশোষণকারী এবং দস্যু। লম্পট এবং দস্যুরা যে এখনো নেই তা নয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এখন নালিশ করা যায়। এবং সুবিচারও দুর্লভ নয়। ক্ষেত্রমণি নাম্নী একটি নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে সুবিখ্যাত বসাক পরিবারের সন্তান হরগোবিন্দর সম্প্রতি কারাদণ্ড হয়েছে। এমন কথা কয়েকশো বছরের মধ্যে কেউ শোনে নি। যার পিতার লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় সম্পত্তি আছে, সে কি না সামান্য একটি দরিদ্র বালিকার কারণে জেল খাটে। মাত্র কিছুদিন আগেও তো বিশ তঙ্কায় ওরকম একটি ক্রীতদাসী পাওয়া যেত।

ইংরেজের এই ন্যায়বিচারের প্রতীক ঐ সুপ্রিম কোর্টের চূড়া। লোকে এই পথ দিয়ে যাবার সময় ভক্তিভরে সেদিকে তাকায়। এখনো কেউ জানে না যে বিচার ব্যবস্থার এই আড়ম্বর ইংরেজ জাতির একটি বিলাসিতা মাত্র। প্রয়োজনের সময় এসব বিলাসিতা ছেঁটে ফেলতে তারা একটুও দ্বিধা করে না।

কোনো এক পর্ব উপলক্ষে আজ আদালতের ছুটি। সুপ্রিম কোর্ট ভবনের সিঁড়িতে একজন মধ্য-বয়স্ক গ্রাম্য মানুষ তার স্ত্রী ও দুটি শিশুপুত্র কন্যা নিয়ে বসে আছে। তারা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত এবং বিভ্রান্ত। পাঁচদিন পাঁচ রাত তারা হেঁটেছে, তারপর নৌকোয় হুগলী নদী পার হয়ে আজই দুপুরে পৌঁছেছে আর্মেনিয়ান ঘাটে। ওপরে উঠে কলকাতা শহরের রূপ দেখে তারা হতভম্ব হয়ে কখনো দেখেনি, দেখেনি এত বিচিত্র রকমের পোশাক পরা মানুষজন। এমনকি এর আগে স্বচক্ষে কোনো গোরা সাহেব দেখার সৌভাগ্যও হয়নি তাদের।

লোকটির নাম ত্রিলোচন দাস, স্ত্রীর নাম থাকোমণি, ছেলেটি ও মেয়েটির নাম দুলালচন্দ্র ও গোলাপী। ওরা এসেছে কুষ্টিয়ার ভিনকুড়ি গ্রাম থেকে। ত্রিলোচন বংশানুক্রমে রায়ত, চাষবাস ছাড়া কিছুই জানে না। পর পর দু বছরের আকালে সে বড়ই বিপাকে পড়েছিল। কয়েকদিন আগে তার বসতবাড়ি পুড়ে যাওয়ায় সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এই পরিবারটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাম্প্রতিক-তম অবদান।

ত্রিলোচন দাস জানতেই পারেনি কবে তার জমিদার বদল হয়ে গেছে। সে জানে আকাশে কোন্ জাতের মেঘ উড়লে বৃষ্টি হয়, কখন ধানে পোকা লাগে, নদীতে কখন ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসে। সে আকাশ, মাটি, রোদ, বৃষ্টি নদী ও গাছপালার খবর রাখে, সে জানে না দেশ কাকে বলে, সে জানে না জমিদাররা কী ভাবে বদলায়। তবে, সে এইটুকুও জানে যে জমিদারকে খাজনা না দেওয়াটাই বড়ই পাপের কথা। মুখের রক্ত তুলেও জমিদারের খাজনা মিটিয়ে দিতে হয়। পরপর দু বছর আকাল হলে কেঁদে পড়ে জমিদারের হাতে পায়ে ধরতে হয়। পাইক-বরকন্দাজদের কাছ থেকে সে সময় কিছু উত্তম মধ্যম জোটে বটে, কিন্তু কিছু একটা ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

এবার সে দেখলো নতুন একজন নায়েবকে এবং সঙ্গে নতুন পাইক বরকন্দাজদের। এবং সে শুনলো যে তাকে তিনগুণ খাজনা দিতে হবে। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না। তাদের গ্রামে দু-পাঁচঘর বামুন কায়েত ছাড়া আর সবাই চাষী। সব চাষীরই এক অবস্থা। কেউ কিছুই বুঝলো না। খাজনা না পেলে পাইক বরকন্দাজরা জোর জুলুম করে লোকের ঘর থেকে ঘটিবাটি কেড়ে নিতে লাগলো। ত্রিলোচন দাসের ঘরে সেরকম বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না বলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো তার বাড়িতে। সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়েই নায়েব মশাই তামাক টানতে লাগলেন। ত্রিলোচন তার পা ছুঁতে গেল, তিনি পা ছাটা দিয়ে বললেন, আরে ছুঁসনি, ছুঁসনি। ব্যাটা ভগবানকে ডাক গিয়ে। ভগবান ছাড়া কেউ তোদের বাঁচাতে পারবে না।

আগে জমিদার অত্যাচারী, অর্থপিশাচ হলেও প্রজারা জানতে পারতো সেই মানুষটা কেমন। সেই সব জমিদার নিজেদের স্বার্থেই আকালের বছর চাষীকে ধান দাদন দিত। কারণ, চাষীকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে না রাখলে পরের বছর সে চাষ করবেই বা কী করে আর জমিদারের ঋণই বা শোধ হবে কী ভাবে। মরা মানুষের কাছ থেকে তো খাজনা আদায় করা যায় না। কিন্তু এখন অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেছে। চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে না পারলে জমিদারেরাও ঠিক সময়ে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে পারতো না ইংরেজ কোম্পানির ভাঁড়ারে। তার ফলে লর্ড কর্নওয়ালিশ করে দিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদাররা যে-ভাবে হোক, যত ইচ্ছে হোক খাজনা আদায় করুক, বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে হবে কোম্পানিকে। বারবার জমিদারি হস্তান্তরে কোম্পানির ক্ষতি হয়। কোম্পানি নির্দিষ্ট টাকা পেলে আর জমিদারদের ব্যাপারে মাথা গলাবে না।

ফলে জমিদারির প্রতি আকৃষ্ট হলো নতুন ধনীরা। নুন, কাপড় এমনকি বোতলের ছিপির কারবার করে যারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল, তারাও টপাটপ মহলের পর মহাল কিনে জমিদার হয়ে বসলো। খাজনা বাড়াবার অধিকার তাদের, যেমন করে হোক খাজনা আদায়ের অধিকারও তাদের। এই সব নতুন জমিদাররা বসে রইলো কলকাতায়, প্রজাদের সঙ্গে তাদের চাক্ষুষ দর্শনও হলো না,

নতুন জমিদাররা হর্ম্যমালা নির্মাণ করতে লাগলো শহরে এবং ডুবে রইলো বিলাসিতায়। আধুনিকতম বিলাসিতা হলো সংস্কৃতি চর্চা। প্রজা নিপীড়নের টাকায় সংগীত, শিল্প এবং ধর্ম সংস্কারের খুব হুজুগ দেখা দিল। এদিকে কর্মচারীরা খাজনা আদায় করতে না পারলে ছোট চাষীদের উচ্ছেদ করে সেই জমি খাস করে দিতে লাগলো বড় চাষীদের। বাংলায় শুরু হলো ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব। তাদের মধ্যে অনেকে আবার জীবিকার সন্ধানে আসতে লাগলো শহরে। কলকাতার দিকে প্রবাহিত হতে লাগলো অবিরাম এক জনস্রোত। আমাদের এই ত্রিলোচন দাস সেই প্রথম যুগের ভূমিহীনদের একজন।

ইদানীং প্রজা-নিগ্রহের নানারকম কাহিনী বৃটিশ শাসকদের কানে পৌঁছবে, এমনকি খোদ বিলেতেও সে খবর গেছে। তাই প্রজাদের তত্ত্ব তল্লাশ করার জন্য জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট। জমিদাররাও নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপন করেছে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি। অ্যাসোসিয়েশান, সোসাইটি, সভা, সংবাদপত্র ইত্যাদি ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোকপ্রাপ্ত নেটিভরাও সত্বর ব্যবহার করতে শিখে নিয়েছে।

ত্রিলোচন দাস কোনোদিন ভগবানকে দেখেনি, সাধারণ মানুষে কখনো তাঁর দেখাও পায় না। কিন্তু তার ধারণা ছিল, খুব চেষ্টা করলে কোনোক্রমে জমিদারের দেখা পাওয়া যেতেও পারে। এই বংশানুক্রমিক বিশ্বাস তার মধ্যে বদ্ধমূল ছিল যে পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়তে পারলে জমিদারের দয়া হবেই। লাথি মারুন আর কয়েদ বেড়ি করেই রাখুন, নিজের প্রজাকে তিনি শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারবেন না। কর্মচারীদের শরীরে দয়া মায়া থাকে না, কিন্তু হাজার হোক জমিদার একজন মানী লোক।

ত্রিলোচন দাসের ক্ষুদ্র কল্পনা শক্তিতে জমিদার বাড়ির একটাই ছবি ফুটে ওঠে। ছোট ছোট অনেক বাড়ির মধ্যে একটি বিশাল প্রাসাদ, সেখানে লোহার ফটক আর সেই ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে মাথায় পাগড়ি বাঁধা শান্ত্রী। কলকাতা শহরটিকেও সে সেইরকমই কল্পনা করে রেখেছিল। গিয়েই জমিদার বাড়ি দেখতে পাবে।

কিন্তু এখানে যে সারে সারে জমিদারবাড়ি। এখানে রাস্তায় বহু লোকের মাথায় পাগড়ি। এখানে কেউ কারুকে চেনে না। এবং ত্রিলোচন দাস তার জমিদারের নামও জানে না। সে মাত্র শুনেছিল যে তার জমিদার প্রভু থাকেন কলকাতায়।

ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে গিয়ে ত্রিলোচন তার স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়েছে। যেখানেই একটু বসতে গেছে, অমনি লোকের তাড়া খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে এখানে। ছুটির জন্য আদালত পাড়া ফাঁকা।

সুপ্রিম কোর্ট ভবনটিকেও ত্রিলোচন দাসের জমিদার বাড়ি বলেই মনে হয়, কিন্তু ভেতরে জন মনিষ্যি নেই। ত্রিলোচন এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি দেবারও সাহস পায়নি। সন্ধে হয়ে এসেছে, এই নিরালাতেই তারা রাতটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছে। কাল কী হবে, তার কিছুই জানে না। বাচ্চা দুটো ঘ্যান ঘ্যান করছে অনেকক্ষণ থেকে, খাকোমনি এক গলা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে, বোঝা যায় না।

একটু অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মশা তো নয় যেন চড়ুই পাখির বাচ্চা। ত্রিলোচন দাস ঝপাঝপ করে চড় চাপড় চালাচ্ছে নিজের গায়ে। খাকোমনির এতেও হুঁশ বোধ নেই। পুঁটুলিটাতে মাথা দিয়ে ত্রিলোচন দাস শুয়ে পড়লো।

বাবা মা দুজনকেই চুপচাপ হয়ে যেতে বাচ্চা দুটো কান্না আরও বাড়িয়ে দিল। ছেলেটির থেকে মেয়েটির গলার জোর আরও বেশী। বিরক্ত হয়ে ত্রিলোচন দাস দু-জনের পিঠে কয়েকখানা বিরাশী সিক্কার কিল বসিয়ে দিল। এইবার নড়ে উঠলো খাকোমনি। হাত দিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটিকে আড়াল করে সে ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো, মেয়োনি। মেয়োনি বলচি। ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই!

ত্রিলোচন দাস বললো, চিঁড়ে গেলে না কেন? চিড়ে গিলতে বলো। ফের কাঁদলে আমি ঠেঙিয়ে শেষ করবো।

খাকোমনি বললো, আমাদের ক্যান নে এলে হেথায়? আমাদের ভিনকুড়ি ফিরে দে এসো।

গ্রাম ছেড়ে আসবার জন্য ত্রিলোচন দাস নিজেও এখন মনে মনে আফসোস করছে বটে, কিন্তু সেকথা স্বীকার করবে কেন। সে মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, ভিটে মাটি চাঁচি হয়ে গিয়েচে, সেথায় থাকবে কি গাছতলায়?

এর উত্তরে খাকোমনি জানতে চায় যে এখানেই বা কোন প্রাজবাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আর উত্তর না দিয়ে ত্রিলোচন দাস রাগে গরগর করে। সে নিরীহ চাষী, নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারুর ওপর সে রাগ দেখাবার সুযোগ পায়নি কখনো।

দুটি বড় পুঁটুলির মধ্যে রয়েছে তাদের যথা সর্বস্ব। বেশ কিছু চিঁড়ে আর পাটালি গুড়ও এনেছে সঙ্গে করে। ক-দিন ধরে ক্রমাগত শুকনো চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে ছেলে-মেয়ে দুটির গাল ছিঁড়ে গেছে। তারা আর চিঁড়ে খেতে চায় না, ভাত চায়। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে ত্রিলোচন দাস ভাত জোটাবে কোথা থেকে।

একটু পরে ছেলে-মেয়েরা খিদের জ্বালায় সেই চিড়ে গুড়ই খেয়ে নিলো খানিকটা। ছেলেটা সিঁড়ির ক-ধাপ নেমে গিয়ে ছড়ছড় করে পেচ্ছাপ করে দিল

সুপ্রিম কোর্টের দেয়ালের গায়। ফিরে এসেই বললো, জল খাবো।

ত্রিলোচন দাস বললো, হারামজাদ!

ছেলেটা তবু নাকি নাকি গলায় বলতে লাগলো, জ'ল খাবো। জ'ল খাবো।

মেয়েটা হে'চকি তুললো একবার।

থাকোমনি বললো, আমারও তেষ্টা লেগেছে। সারা রাত কি গলা শুকিয়ে থাকবো।

ত্রিলোচন দাস তিতি বিরক্ত হয়ে উঠলো। আবার একথাও বুঝলো যে এর পর থেকে ওরা অনবরত তাকে জল জল করে জ্বালিয়ে খাবে।

চি'ড়ে আর গুড় আনা হয়েছে দুটো মাটির হাঁড়িতে। একটা বোঁচকা খুলে একটা কাঁথার ওপর চিঁড়েগুলো সব ঢেলে, হাঁড়িটা খালি করে নিয়ে ত্রিলোচন দাস উঠে দাঁড়ালো। আসবার সময় কাছেই সে একটা বড় দীঘি দেখে এসেছে।

থাকোমনি বললো, দুলালকে সাথে নে যাও!

কিন্তু ছেলেকে সংগে নিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে না ত্রিলোচন দাসের। সে আর কিছুই না বলে হন হন করে হাঁটতে লাগলো।

শুক্লপক্ষ, তাই আকাশের আলো আছে, পথ-ঘাট খুব অন্ধকার নয়। কিন্তু একটুখানি এসেই থমকে গেল ত্রিলোচন দাস। যদি পথ ভুল হয়ে যায়? পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে সে সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো, প্রতিটি পদক্ষেপ গুণে গুণে। গ্রাম দেশে মাঠের মধ্যে আলেয়া দেখে পথ হারিয়ে ফেললে এই রকম পা গুনে গুনে হাঁটতে হয়।

দীঘিটার এক পারে বসে কয়েকটা শিয়াল মন দিয়ে ডাকছে তারস্বরে। আর একটা কী যেন বড় জানোয়ার খানিকটা দূরে খুব জোরে জোরে ভর-র ভস ভর-র ভস করে নিশ্বাস নিচ্ছে। কয়েকটা বগি গাড়ির ঘোড়া ঘাস খেতে এসেছে ওখানে, কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দূর থেকে ত্রিলোচন দাস সে-গুলোকে চিনতে পারলো না। তার গা ছমছম করতে লাগলো। রাশি রাশি জোনাকি বাতাসের ঝাপটায় কখনো আলো কখনো অন্ধকারের ঢেউ হয়ে দুলছে।

পুকুরে নেমে প্রথমেই জল থাবড়ে পানা সরানো অভ্যেস ত্রিলোচন দাসের। এ দীঘির জল স্বচ্ছ টলটলে, ইংরেজদের খুব সাধের গ্রেট ট্যাঙ্ক বা "লাল ডিগি", তারা এর জল পান করে না বটে কিন্তু ছুটির দুপুরে ছিপ ফেলে বসে অথবা সন্তরণ প্রতিযোগিতার নামে। হঠাৎ কোথাও আগুন লাগলে এই জল ব্যবহার করা হবে বলে দীঘিটি সংরক্ষিত। নেটিভদের এখানে আসা নিষেধ।

হাঁটু পর্যন্ত নেমে জল থাবড়ে ত্রিলোচন দাস প্রথমে মুখ ধুয়ে ভালো করে কুলকুচো করলো খানিকক্ষণ। নিজে জল পান করলো পেট ভরে। তারপর হাঁড়ি ভরে জল নিয়ে যেই উঠতে গেছে, অমনি রে রে করে তেড়ে এলো দুই যমদূত।

ইংরেজ রাজত্বের পাহারাওয়ালা হলেও তাদের চেহারা ও পোশাক অনেকটা নবাবী আমলের সেপাই-দের মতন। মোচ আর জুলফি এক সংগে জোড়া। গাঁজার নেশায় চোখ টকটকে লাল। নিশুতি রাতে সাহেব পাড়ার মধ্যে এই দীঘিতে একজন হাবিজাবি চেহারার লোককে নামতে দেখে তারা যত না ক্রুদ্ধ তার চেয়ে বেশী অবাক। দু-জনে মিলে ত্রিলোচন দাসের ঘাড় চেপে ধরে এমন হল্লা শুরু করে যে ত্রিলোচন দাস কিছুই বুঝতে পারে না। তারপর পিঠের ওপর দুম দাম শুরু হলে সে ভাবে এই বুঝি জমিদারের পেয়াদা এসেছে। তাতে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় এবং এই গোলমালের মধ্যে মাটির হাঁড়িটা তার হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়।

মাতাল ধরার জন্য পাহারাওয়ালারা এখন সঙ্গে ডুলির মতন একটা জিনিস রাখে। কোনো মাতাল বেশী বেগড়বাই করলে সেই ডুলির মধ্যে ভরে প্রায় বোঁচকার মতন বেঁধে ফেলে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। ত্রিলোচন দাসের পা সোজা আছে দেখে তারা ওকে ডুলিতে না ভরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চললো।

ত্রিলোচন এবার কেঁদে কঁকিয়ে বলে উঠলো, ওগো আমার বউ ছেলে মেয়ে সংগে আছে, তাদের নিয়ে আসি। ওগো—

কে শোনে কার কথা। ততক্ষণে পাহারা-ওয়ালাদ্বয় ত্রিলোচন দাসের ট্যাঁক হাতড়ে দেখে নিয়েছে যে সেখানে কিছু নেই, সুতরাং তারা আরও নির্দয় হয়ে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কোতোয়ালির দিকে। ত্রিলোচন দাস যত চিৎকার করে তারা তাকে তত বেশী প্রহার করে।

এদিকে থাকোমনি পক্ষীমাতার মতন দুই ডানায় ছেলে মেয়েকে আগলে বসে রইলো ঠায়। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল, তার স্বামী এলো না। সে আর কী করবে, শুধু প্রতীক্ষা করা ছাড়া? শেয়ালগুলো ডাকতে ডাকতে তাদের কাছে চলে আসছে। এক সময় দূরে দু-তিন বার গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হলো। কিসের যেন একটা শোরগোল উঠলো। এ সব কিছুতে থাকোমনির সর্বাংগে ভয়ের কাঁটা দেয়। সাহেবদের বাড়ির বাগানে শেয়াল ঢুকে পড়লে সাহেবরা জানলা দিয়ে বন্দুক চালায়। দু-একটা শেয়াল মরলে উল্লাসের ধুম পড়ে যায়।

জল জল করে ছেলে-মেয়ে দুটো বেশ কিছু-ক্ষণ কাৎরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লো আর মেয়েটা হে'চকি তুলতে লাগলো। তারপর গীর্জার গম্বুজের আড়ালে চাঁদ ঢলে পড়লে মেয়েটি কয়েকবার ওয়াক তুলে শুরু করলো বমি। থাকোমনি তাড়াতাড়ি মেয়ের মুখ চাপা দিল নিজের হাতে। কিন্তু ওতে তেদ বমি থামে না। এর নাম ওলাওঠা।

শহরে এমন কোনো বাড়ি নেই যে বাড়িতে অন্তত একজন না একজন ওলাওঠায় মরে নি। তবু গ্রামের তুলনায় শহর নিরাপদ। শহরে বিলিতি দাওয়াই পাওয়া যায় এবং পয়সা দিলে চিকিৎসক

বাড়িতে আসে। সে চিকিৎসকদের মুখ চোখ দেখলেই খানিকটা ভক্তি হয়। গ্রামে একবার ওলাবিবির নজর লাগলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। ওলাওঠার ভয়ে বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। গ্রাম থেকে যখন ভোর হতে লোকে পালায়, তখনও বারবার ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখে, ওলাবিবি তাড়া করে আসছে কিনা। এই ওলাবিবিই পরে এসিয়াটিক কলেরা নামে চিহ্নিত হয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মানব-ধ্বংসকারীর ভূমিকা নিয়েছে।

বমির ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটি জল জল বলে গোঙাতে লাগলো। তার ভাই দুলালচন্দ্র জেগে উঠেছে এবং বাবা বাবা বলে ডুকরে উঠলো কয়েক-বার। তার বাবা সে ডাক শুনতে পেল না কিন্তু লাঠি ঠকঠকিয়ে এলো আর দু-জন পাহারাওয়ালা। এ রকম জায়গায় একজন স্ত্রীলোককে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বসে থাকতে দেখে তারাও অবাক হলো কম নয়। তারা পথের পাহারাওয়ালা, আদালত ভবন পাহারা দেওয়া তাদের দায়িত্ব নয়। এর জন্য দু-জন আলাদা সেপাই থাকে। কিন্তু সারাদিন তাদের পাত্তা নেই।

একজন পাহারাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলো, হুকুমদার!

সেই বাজখাই গলা শুনে দুলালচন্দ্র আরও জোরে ও বাবা, বাবাগো বলে কেঁদে উঠলো। থাকোমনি বললো, ওগো, আমাদের ঘরের লোক কোথায় গেল। মেয়েটা কেমন কেমন করতিছে।

অচেনা স্ত্রীলোকের গলা শুনলে প্রথমে যে বিষয়ে কৌতূহল জাগে সেটি যাচাই করার জন্য পাহারাওয়ালা দু-জন উঠে এলো সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ। হাতের জাহাজী লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরলো থাকোমনির মুখের কাছে। থাকোমনিকে যুবতী এবং স্বাস্থ্যবতী দেখে তারা পরস্পর চোখাচোখি করলো এবং এই বিষয়ে মত হলো যে, তাহলে একে কোতোয়ালিতে নিয়ে যাবার নাম করে ধরা যায়।

একজন হুংকার দিয়ে উঠলো, উঠা। উঠা। ওঠাকে আ। রেণ্ডি কাঁহিকা।

থাকোমনি আরও সিঁটিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। তখন একজন পাহারাওয়ালা তার শাড়ীর আঁচল ধরে টানলো, অন্যজন ধরতে গেল তার কোমর।

থাকোমনি বললো, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার মেয়েটারে বাঁচাও।

এবার পাহারাওয়ালাদের আলো পড়লো মেয়েটির ওপরে। মেয়েটি তক্ষুণি ওয়াক তুলে হুড় হুড় করে বমি করলো অনেকখানি। এই বমি পাহারাওয়ালারা চেনে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তাদের চোখ উঠলো কপালে।

আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করে তারা পেছন ফিরে দৌড় লাগালো। তাদের সেই দৌড়োবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন অকিকস দুটি ল্যাজ তোলা বলিবর্দ।

খানিকটা পরে মেয়েটির কণ্ঠস্বর অনেক ক্ষীণ হয়ে এলো, তখনো বলতে লাগলো, জল, জল।

ছোট বোনের কষ্ট দেখে ছ বছরের শিশু দুলালচন্দ্র বললো, মা, আমি জল নে আসবো?

দ্বিতীয় হাঁড়িটা খালি করে নিয়ে সে এগিয়ে গেল খানিকটা। কোন দিকে সে দীঘিটা দেখেছিল, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। তার ভয় করছে। তার ক্ষুদ্র বুকটিতে দারুণ অভিমান জন্মেছে বাবার ওপরে। কেন বাবা ফিরে এলো না। সে আবার প্রাণপণে ডাকলো, বাবা, বাবা।

সেই রিনরিনে শিশু কণ্ঠের ধ্বনি ঠিকরে ফিরে এলো শহরের কঠিন বাড়িগুলির দেয়াল থেকে। কেউ সাড়া দিল না। একটা বলগা ছাড়া একলা ঘোড়া এদিকে কপকপিয়ে ছুটে আসতেই সে ভয় পেয়ে দৌড়ে ফিরে এলো মায়ের কাছে। তার মা বললো, থাক, তোকে আর যেতে হবে না।

কথায় বলে, মাঝ রাতের ভেদ বমি রাত শেষ হবার আগেই থেমে যায়। হলোও তাই। খানিক পরে মেয়েটি একেবারে নেতিয়ে গেল। সে ঘুমিয়েছে ভেবে একটু নিশ্চিন্ত হলো তার মা।

চাঁদ হেলে গেছে। আকাশে এখন খেলা করছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। এতক্ষণ অসহ্য গরমের পর শেষ রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। এখন পৃথিবী কী শান্ত, সুন্দর। ভোগী, চোর এবং সাধু, যারা রাত জাগে, তারাও এই শেষ প্রহরে ঘুমকে আলিঙ্গনে জড়ায়। থেমে গেছে নর্তকীর পায়ের নূপুর। মাতালরাও এতক্ষণে গড়াগড়ি দিয়েছে। ঘুমন্ত নগরীর ওপর বিছিয়ে রয়েছে এক অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের ওড়না।

থাকোমনি আর দুলালচন্দ্রও ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়। দিনের আলো ফুটে গেলেও ঘুম ভাঙলো না।

ক্রমে পথে লোক চলাচল শুরু হলো। সাহেবরা এ দেশে এসে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। আগে জেগে ওঠে তাদের নফর, বেহারা, খানসামা, দুধ-ওয়ালা, ভিস্তিওয়ালার দল। যাতায়াতের পথে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পবিত্র ধর্মাধিকরণের সিঁড়িতে ছড়ানো রয়েছে চিঁড়ে, গুড়, ছেঁড়া কাঁথা। তার মধ্যেই শুয়ে আছে এক গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও বালক। আর পাশেই বছর পাঁচেকের একটি বালিকা পুরীষ ও বমিতে মাখামাখি হয়ে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তার মুখের ওপর নীল ডুমো ডুমো মাছি ভন ভন করছে।

ধুড়ুম করে বিরাট শব্দে সাঁতটার তোপ পড়তেই থাকোমনি ধড়ফড় করে উঠে বসলো। সামনেই কিছু লোককে সারবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল তার মৃত কন্যাকে। (ক্রমশ)

মহাপুরুষ

শিশির লাহিড়ী

আমাদের ছেলেবেলায় মামাবাড়িতে একটা কথা খুব চালু ছিল। কথাটা এই যে, এ বংশে এমন এক মহাপুরুষ জন্মাবেন, মৃত্যু যাঁর ইচ্ছার অধীন হবে। প্রমাতামহের আদর-যত্ন, সেবা-শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে, এক গিরিগুহাবাসী সন্ন্যাসী নাকি এই বরদান করেছিলেন।

আমার সেজমামা একসময়ে শখের নাটক করতেন। তিনি যখন চোখ বড়বড় করে, বুক চিতিয়ে, কাঁপা কাঁপা গলায় বলতেন,—বেটা তুমহারা বংশমে আয়সান এক কুলতিলক্ পয়দা হোগা,—জোও মৃত্যুকো আপনি মুঠ্‌ঠিপর লেকর ফিরেগা। যব দিল চাহে, তব ঔও ইস পৃথিবী ছোড়কর জায়েগা—তখন সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। মনে হত, সেজমামা নয়, সামনেই এক জটা-জুটধারী নাদাপেট সন্ন্যাসী। তাঁর কপালে রক্ততিলক, গলায় রুদ্রাক্ষ, এক হাতে কমণ্ডলু, অন্য হাতে ত্রিশূল। সেই ত্রিশূল উঁচিয়ে, বুকের দম গলায় টেনে নিয়ে, তিনি যেন সেই অনাগত মহাপুরুষের আগমনবার্তা ঘোষণা করছেন।

এটা ছেলেবেলার কথা। সময়ের ফেরে মানুষের বিস্ময়বোধ মরে আসে। এই সাতাশ বছরের শরীরে বাল্য-কৈশোরের সে রোমাঞ্চ চাইলে অন্যায় হবে। তাছাড়া, মামার বাড়ির রঙচটা কাঠ-খড়ের যে কাঠামো দিন দিন চোখের সামনে ফুটে উঠছে, তাতে মনে হয় এ কথা স্রেফ ভুড়কি, বানানো। লোকে বলে, আমার দিদিমার শাশুড়ি নাকি জাঁদরেল মহিলা ছিলেন। স্বামী নামক দেবতাটিকে তিনি ট্যাঁকে গুঁজতেন; সে ভদ্রলোকের বিন্দুমাত্র টাঁ-ফোঁও করার জো ছিল না। সুতরাং লজ্জার লম্বা হাত থেকে বাঁচতে, তিনি সাধুর গলায় এই সুবচনী আওড়ে, তাঁর পিতৃ-গোষ্ঠীর পৌরুষ অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন।

আমার মাতামহ তাঁর সে গৌরব কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। তিনি আর এক অর্থে মহাপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য ছিল, সেই সংগে ছিল অসীম জীবনীশক্তি। যৌবনেই তিনি রক্ষিতা রেখেছিলেন এবং প্রৌঢ় বয়সেও তিনি নুটুমণি নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের ঘরে প্রত্যহ যেতেন।

বেহিসাবী আলাপের মতন এই পূর্ব কথন সামান্য দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। অবশ্য চিনুমামার চিঠি না এলে, এবং পরপর যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল, সেগুলি সংঘটিত না হলে, ধান ভানতে শিবের গান গাইবার দরকার হত না। সিঁড়ি-ভাঙ্গা অঙ্কের নির্গলিতার্থ বার করতে হলে, উপর থেকে নিচে নামতে হয়। প্রমাতামহকে দিয়ে যে কাহিনীর শুরু, চিনুমামাতে এসে সে কাহিনী যে চির-কালের জন্যে ইতি টানবে কে জানতো।

যাক, চিঠিতে ফিরে আসি। 'ছায়াদিদি, আমার শেষ সময় উপস্থিত। কমাস ধরেই যমরাজকে ডাণ্ডা উঁচিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখছি। তোরা যদি শেষ দেখা দেখতে চাস, তাহলে চলে আয়। আগামী পূর্ণিমা তিথি, বুধবার, দেহরক্ষা করব। সম্ভব হলে, মাকে একটা খবর দিস। ইতি চিনু।'

ছায়াদি মার ডাক নাম। মা ডাক নামটা অনেককাল ভুলে গিয়েছিল। চিঠিটা হাতে নিয়ে মা বোকার মতন বসে রইল, তারপর কাঁদতে শুরু করল। পুরানো স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক, না স্মৃতি সতত সুখের! মার চোখে জল দেখে বাবা অতিষ্ঠ গলায় বলল,—উঁহু! হল কি! আবার কাঁদছ কেন? বলতে পংগু মার ফুলো দু হাটুর দিকে চেয়ে, বাবা বোধ হয় ক্ষোভের একটা দীর্ঘ-শ্বাস চাপল।

চিঠি এগিয়ে দিয়ে, মা গলায় সুর তোলে।—তাই বলি, সে সাধুর কথা কি মিথ্যে হবার! এতকাল ধরে যা শুনছি, তা আজ অক্ষরে অক্ষরে.... কথাটা শেষ হবার সুযোগ পেল না। তার আগেই, খোলা তারে বিজলী-কামড় খাওয়া মানুষের গলায়, বাবা আর্তনাদ করে উঠল।—চুপ কর! ও হারামজাদা বংশে মহাপুরুষ জন্মাতে বয়ে গেছে। ওখানে জন্মাবে ই—য়ে!

'ইয়ে' শব্দটা এমন ভংগিতে বাবা উচ্চারণ করল, যার সরল অর্থ কাঁচকলা। সংগে সংগে মা রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইলেকট্রিক তারে বসা দুটো কাক সভয়ে কা কা করে ডেকে উঠল।

আমার মেজাজ খচে আসছিল। দুটি বয়স্ক মানুষ সামান্য কারণে খামচা-খামচি করছে দেখলে, হাসির বদলে রাগ হয়। অথচ বয়স্ক মানুষদের ধারাই এই। তখন পুরুষদের অসহিষ্ণুতা মাত্রা ছাড়ায়; মেয়েদের জিব খরসান, ধার বাড়ে। আমি হঠাৎ রাগের গলায় চিৎকার করে উঠি,—তোমরা থামবে।

আমার আওয়াজে মা এবং বাবা দুজনেই থতমত খেল। মা গোঁৎ খেয়ে, চোখে আঁচল তুলে বলল,—কত পাপ করে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি। এক জনের ধমক খেতে খেতে সারা জীবন গেল, এখন বুড়ো বয়সে ছেলের হাতে শাসন-টুকু বাকি। বাবা ভোঁতা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—ইউ ডোণ্ট নো টিংকু, দ্যাট চিনুমামা অব ইওর্স ইজ এ ডাউনরাইট স্কাউণ্ড্রেল অ্যান্ড এ রোগ্।

বাবা থমকে গেলে ভাল ইংরিজি বলে, অন্য সময় তোতলায়। কিন্তু আমার এখন ইংরিজি শোনবার মন নেই। চিনুমামার নামটা উচ্চারণ মাত্রেই আমার কান-দুটোকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। আমি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিই।

পড়তে শুরু করি। না, ঠিক পড়া নয়, কেমন যেন চোখ বোলাই। আমার মন শৈশবে ফিরে যাচ্ছে। ....পার্থকা, আমি, চিনুমামা।.....গংগার ধার।....আগে আগে সে জায়গায় একটা ইঁটভাটা ছিল, এখন পরিত্যক্ত, নির্জন। গংগার সংগে যোগ আছে। জোয়ারে জল আসে, ভাটায় সরে যায়। এক লাফে উপর থেকে নিচের জলে লাফিয়ে পড়ল চিনুমামা। কম করে বিশ হাত নিচু সে জল। জলের তোড় ছিটকে ফুলঝুরি হয়ে উড়ে এল। আমি সভয়ে চোখ বুজলাম। পার্থদা শক্ত হাতে আমাকে ধরে বলল—ভয় পাসনে। ফুলকা ওইরকম। সেদিন এক ডুবে গংগা এপার ওপার করে ছাড়ল।

পার্থদা আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। ওর কথায় অবিশ্বাস করতে পারি না। তবু কিরকম এক বিশ্বাস-অবিশ্বাস মেশানো গলায় বললাম,—সত্যি! একবারও মুখ তুলল না।

পার্থদা ঘাড় নাড়ল। —ফুলকা কি বলে জানিস, পার্থদা আবার বলল। ফুলকা বলে, বুঝলি পার্থ, একদিন আমি তোদের ছেড়েছুড়ে লোটা কম্বল নিয়ে ভেগে পড়ব।—ডংকা মেরে চলে যাব।

অতশত বোঝবার বয়স আমার নয়। কিন্তু ঐ 'ডংকা' শব্দটা অনেক দিন মনের কোণে লেগেছিল। কেমন অদ্ভুত শব্দটা, নিটোল গোল, বারবার উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয়।

আমি ঠিকানাটা উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। কাছেই। দীঘা এমন কিছু দূরে নয়। বিশ বছরের ওপর গরঠিকানা মানুষ, শেষ সময়ে যে সঠিক ঠিকানায় এত্তেলা পাঠাবে, এমন কথা চিন্তায় আসে না। কিংবা এমনও হতে পারে, সংসারের সব মায়ামোহ কখন কাটাতে চাইলেও, কাটানো যায় না। কিছু কিছু পাত্রস্থ তলানি থাকে, যা এক সময়ে না এক সময়ে গেঁজিয়ে ওঠে। তখন পরিচিত মুখ দেখতে চায় মানুষ; রক্ত সম্পর্কের সান্নিধ্য প্রার্থনা করে। অথবা এমনও—, আর এক সম্ভাবনা, আমার মাথায় ঝিলিক খেল। চলে যাবার আগে, বুজরুকি করে সকলকে বোকা বানাতে চাইছে চিনুমামা। শেষ হাসি হাসবার এমন এক সুযোগ, হাতছাড়া করা চিনুমামার মতন মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

তবু আমি দুর্বলতা বোধ করি। মার মুখের দিকে তাকিয়ে বলি,—তুমি যাবে। মার কথার জবাব বাবা দিল।—এ অবস্থায় ও যাবে কেমন করে। যাবার ইচ্ছে হয়, তুমি যাও। বাট আই ওয়ার্ন ইউ, ইউ উইল বি টোটালি ডিসইল্যুশনড।

আমি বাবার দিকে কঠোর চোখে তাকালাম। বাবাকে কেমন যেন ছোট মনে হচ্ছিল।

দীঘার বাসস্ট্যাণ্ডে দুপুরের মধ্যেই এসে পড়া গেল। সকালে সরকারী বাসে চেপেছি। রাস্তায় একটা চাকা মেরামত করবার দরকার না হলে, আরও আগেভাগে আসতে পারতাম। ন মামীমা আর তুলিকে একটা রিকশায় তুলে দিয়ে ব্যারিস্টার কলোনির বাড়িটা বুঝিয়ে দিলাম। বাড়িটা চেনা।

নিজের জন্যে দু প্যাকেট সিগারেট চাই। একটা দেশলাই। গুরুজনদের সামনে নাসচে আড়াল দিয়ে নেশা করায় আরাম হয় না। আমাদের দেশে, কবে যে এসব সংস্কার সহজ হবে।

তুলি বলল,—মিল বুক করে আসিস টিংকুদা। আর মামীমার জন্যে একটু মিষ্টিটিষ্টি নিয়ে নিস।

কথাটা মন্দ বলেনি তুলি। রোগীর বাড়ি। বাড়িতে পৌঁছেই খাই খাই করলে ভাল দেখায় না। তাছাড়া এখানকার অবস্থাও জানা নেই। কে আছে

কান্না আছে এবং কেমন আছে সব। না মামীমার সাদা সিঁথির মুখটা দীর্ঘ দেখাল।

—আমার জন্যে ব্যস্ত হসনে বাবা, আমার তেমন খেতে ইচ্ছে নেই।

আমি মামীমার মুখের দিকে তাকাই। ওঁর খাবার ইচ্ছে না থাকাই স্বাভাবিক। মুখের চুল আঙুলে আঙুলে মাথায় ফিরিয়ে দিয়ে তুলি বলল,—এতক্ষণ বাস জার্নি করে উপোস দাও, তারপর পেটে কলিক উঠুক, তাহলে নাটক মন্দ জমবে না।

ওয়াটার বটলটা কাঁধ ফিরি করে নিলাম। সিগারেটে টান দিতে দিতে অলস পায়ে হাঁটাই। শীত চলে গেছে, গ্রীষ্মও তেমন কিছু পড়েনি। এটাকে বোধ হয় বসন্তকাল বলে। বসন্ত হলেও, শেষ বসন্ত। দুপুরের রোদ তপ্ত। বাতাসে বালি। কানে সমুদ্র-গর্জন, নাকে লবণাক্ত ঘ্রাণ।

আমি অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছি। বড়মামা বলল,—হ্যাঁ, ওরকম একটা চিঠি আমরা পেয়েছি। আমার এ শরীর নিয়ে নড়াচড়া সম্ভব নয়। তোর মামীও সংসার ফেলে যেতে পারবে না। বাবার মধ্যে এক পার্থ। সে কি পারবে,—পরের গোলাম। একটু থামল বড়মামা, উদাস গলায় বলল,—যা চুকেবুকে গিয়েছে, তা নিয়ে কেঁচে গণ্ডূষ করার কোন মানে নেই। সারাটা জীবন নিজেও শান্তি পেল না, কাউকে দিল না।

বড়মামার বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসটার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে পড়লাম। কি পেয়েছে [illegible]র কি পায়নি, সে হিসাব মিলানোর সময় এখন নয়। যদি কেউ সঙ্গে যেতে চাও ভাল, না হয় একলা চল রে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমি পোস্ট-অফিসে এ[illegible]ম। মেজমামা দূরে অন্ত, এখন সোদপুরে গিয়ে দেখা করার মানসিকতা মরে গেছে। আমি ফোন তুলি। সেজমামার অফিস নাম্বার ডায়াল করি। অপারেটরের হাত ঘুরে সেজমামার কাছে ফোন পৌঁছতেই, সেজমামা নাটকীয় সুরে বলে উঠল, —হ্যালো!

আমি টিংকু বলছি।

ওহ্! বল। —তোর মা ভাল আছে?

ও প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। বললাম,—তুমি চিনু-মামার একটা চিঠি পেয়েছ?

কে? — কে! বললি। তারপর দরাজ গলায় হেসে উঠল সেজমামা। —শ্রীশ্রীচিন্ময়ানন্দ স্বামী। বুঝলি টিংকু, আমাদের বংশের সেই ভবিষ্যদবাণী আর যেই ফুলাফল করুক, চিনে সে ব্যক্তি নয়। —ওটা বুজরুক, হামবাগ। তুই ন'মামীর সেই কেসটা জানিস? একটু থামল সেজমামা, তারপর বলল,—থাক সেসব নোংরা কথা জেনে দরকার নেই। বুঝলি, ও যদি আমার ছেলে হত, ওকে আমি জ্যান্ত কব—র দিতাম।

উইন্ড পাইপের সব দম ঠেলে নিয়ে সেজমামা ফোনে কথাগুলো ঝাড়ল। এটা সরকারী অফিস, না নাট্যশালা। আমি হতাশ হচ্ছিলাম। হতাশ হয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। যাক, বাঁচা গেল। এ দুষ্কৃতির হাত থেকে এখনকার মত উদ্ধার।

বিকেলের দিকে ছোটমাসীকে নিয়ে তুলি এল। তুলি বলল,—তুই যাচ্ছিস টিংকুদা। তুলি কেমন একটা উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। —আমিও যাচ্ছি। এ রকম একটা রোমান্টিক ক্যারেকটার দেখবার লোভ সামলাতে পারছি না। —নিজের ভেথ নিজে অ্যানাউন্স করা, এ আমি লাইফে শুনিনি। একটু থামল তুলি, হাসল। মা খুব ঘ্যানঘ্যান করছিল, আমি থাবাড়ি দিয়ে রেখেছি। বোনে বোনে যা রোগ, খালি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবে। সব ম[illegible]টাই মার্ডার।

আমি চোখ বড় বড় করে তুলিকে দেখছিলাম। এক[illegible]ময় আমি ওকে হাতে হাতে বড় করেছি। এখন ও লেডি হয়ে গেছে। ছোটমাসী বলল,—কিন্তু ছোড়দার সঙ্গে তো যোগাযোগ করা হল না, সে কি করছে, কে জানে।

—কে বিনু! মা হাঁটুতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, —ওর জন্যে ভাবিসনে ছুটকি। দেখ আজকেই হয়ত ওকে আনতে বৃন্দাবন ছুটে গিয়েছে।

ন'বউদি। —ছোটমাসী হঠাৎ জিব কাটল।

আমি চার চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখে গূঢ় চাহনি, রহস্যময় এক বিচিত্র হাসি। সে হাসি, সে চাহনির অর্থ উদ্ধার করতে হলে, অনেক মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। আমি ক্রমশ অপ্রস্তুত হচ্ছিলাম।

সিগারেট ফেলে আর একটা সিগারেট ধরাই। আমার আধবোজা চোখের সামনে চিনুমামার সেই জলে ভেজা চেহারাটা ফুটে উঠল। কান্না সামলাতে সামলাতে মামা বলছে,—টিংকে, একশালা খুব বড় কচ্ছপ ধরেছিরে। আজ গুছিয়ে মাংস হবে। এমন মাংস তুই বাপের জন্মে খাসনি। কথাটা বলেই হা-হা করে চিনুমামা হেসে উঠল।

এই দুপুরের ঝাউবনে আমি সে হাসি শুনতে পাচ্ছিলাম। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল শৈশবে দাঁড়িয়ে, আমি আবার প্রাত্যহিকতায় ফিরে আসছি। আমি নিজেকে ধন্যবাদ জানালাম। ন'মামীমার সঙ্গে আমার উপস্থিতি কাম্য ছিল না। বিশ বছর পরে, এ দুটি মানুষের সাক্ষাৎ-দর্শন, যে কোন কারণেই বজ্রগর্ভ হয়ে উঠতে পারে। সেজমামার নাটকীয় ডায়লগে অসামাজিক গন্ধ। মা ও মাসীর গোপন হাসি, বাবার উষ্মা অবাঞ্ছিত কোন স্মৃতির সৃষ্টি। চিনুমামা ও ন'মামী একদা নিস্তরঙ্গ সংসারের জলে থান ইঁট মেরেছিল। সে ঢেউ আজও কাটছে।

আমি মুখের সিগারেট ফেলে দিলাম। আমার সামনে কয়েকটা সিঁড়ি। সিঁড়ির ঊর্ধ্বপ্রান্তে বাড়িটা রৌদ্রস্নাত। ওয়াটার বটলটা ভার লাগছে। আমি বোতলের ছিপি খুললাম। জল ফেলে দিতে দিতে এক ঢোক খাই। জল তেতে
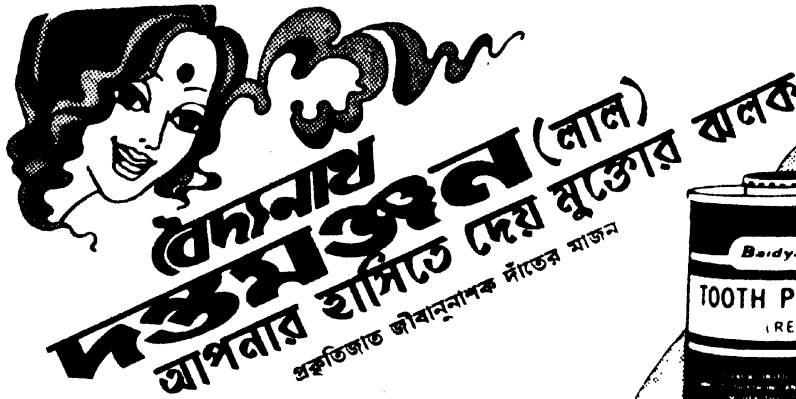
তুলছে। আমি, আমার মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির এক নাঙ্গা বণিক, মরূদ্যান খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলেছি। সমুদ্র সম্মুখে। হাত বাড়ালেই জল। কিন্তু সে জল লবণাক্ত, পানের অযোগ্য।

সামনের বারান্দায় তুলি দাঁড়িয়ে। স্নান সারা। অলস হাতে চুলে চিরুনি দিচ্ছে। সবুজ রঙ বেতের চেয়ারে এক অপরিচিত বৃদ্ধ। গৌরবর্ণ। ছোটখাটো মানুষ। মাথা জোড়া জটা, দীর্ঘ দাড়ি। সাদাকালো পশমি বোনা, সে দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। কপালে, নাকে, মুখে অজস্র বলিরেখা, সময়ের চিহ্ন। অথচ আশ্চর্য দুটি আয়ত চোখ। সে চোখে বেদনা, উল্লাস; কৌতুক, ক্লান্তি একসঙ্গে জট পাকিয়ে জড়িয়ে আছে। আমি নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেলাম। চিনুমামা বলল,—টিংকে!

তুলি হাসি মুখে বলল,—ওর নাম সুদীপ্ত।

চিনুমামা দরাজ গলায় হো হো করে হেসে উঠল। —অ্যাঁ! বাপের চেয়ে জোর বেশি হয়ে গেল যে।

আজ সোমবার। আগামীকাল বাদে পরশু বুধ। বুধবার সেই আশ্চর্য দিন; যেদিন চিনুমামা ধরাধাম থেকে বিদায় নেবে। কথাটা বলা যত সহজ, কাজে করা বোধ হয় তেমন সহজ নয়। অবশ্য দিনক্ষণ সময় মিলিয়ে মহাপুরুষের শেষযাত্রা হলে, সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অন্তত বলবার মতন কিছু থাকে।

কাল আমি চটে গিয়েছিলাম। প্রথম অভ্যর্থনার বহর দেখে চটাই স্বাভাবিক। সব চেয়ে রাগ হচ্ছিল তুলির ওপর। ইংরিজি স্কুলে পড়ে ওর সহবত জ্ঞানটুকুর লোপ পেয়েছে। এ সব কথায় হাসতে নেই, হাসি পেলেও গিলে ফেলতে হয়, সেটুকু মানে না। ও বেলেল্লার মতন হাসতে হাসতে বলল, —মামু, তোমার ল্যাঙ্গোয়েজ দারুণ অফেনসিভ।

মামু চোখ মটকাল। বলল,—বুঝলি বেটি, সহজ কথা সহজভাবে বলাই ভাল। সারাটা জীবন ঘাটেমাঠে ঘুরেফিরে দেখেছি মনের কথা আর মুখের কথা আলাদা করতে গিয়ে, মানুষ কি নাকানি-চোবানিই না খাচ্ছে। আর বাপের-ভাষাটারও বারোটা বেজে যাচ্ছে। বুঝলি, এই নষ্টদুষ্টুর গোড়ায় পুরুত হচ্ছে, আমার নদেরচাঁদ জামাইবাবুর মত ইংরেজিঅলা ভদ্রলোক। বামুনের ঘরের বিধবার মত ওরা ছুঁচিবেয়ে। কথাটা কানে চটাস করে লাগলেই, ওরা ফটাস করে চান করে ফেলে।

নদেরচাঁদ বাবার ডাক নাম। আমি রাগতে পারতাম। রেগে কটু কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু কে যেন আমার কানে কানে বলল,—সুদীপ্ত, এদের ক্ষমা কর। এরা অজ্ঞান। সারাজীবন এরা যাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরেছে, তাদের সঙ্গে তোমার লৌকিক পরিচয় নেই। এদের রুচি, এদের শিক্ষা, তোমার স্তরের নয়। তাছাড়া, তুমি এখানে শেষ দেখা দেখতে এসেছ। অভিরুচি হয় সেবা করবে, না হয় নীরব দর্শক হয়ে থাকবে।

শেষ বিকেলে মামার শরীর হঠাৎ খারাপ হল। বুকের ব্যথাটা নিয়ে মামা বিছানায় গিয়ে পড়ল। ন'মামীমা কেমন একটা হতাশ চোখমুখ করে বলল,—টিংকু কি হবে?

আমি হাসলাম। বললাম, —আজ পূর্ণিমা তিথিও নয়, বুধবারও নয়। তুমি ভাবছ কেন?

তুই ওই কথা বিশ্বাস করে বসে আছিস বুঝি। একটু থামল ন'মামীমা, জোরে জোরে দম নিল। ও মরেই আছেরে, কেবল মার আশায় আশায় প্রাণটুকু এখনও বেরোচ্ছে না।

তবে দিদিমা না এলে মরবে না। ভয় কিসের।

তুলি বলল, —যাঃ! ইয়ারকি ছাড়। একটা ডাক্তার ডাক।

—মামু তো নিজের ভরসায় এখানে আসেনি, যাদের ভরসায় এসেছে, তারা নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করেছে। এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

ন'মামীমা আমার মুখের দিকে তাকাল। সে মুখ বড় নির্জন, করুণ। ন'মামী বলল, —থাকবার মধ্যে তো ওই একটা ভৈরবী, আর একটা চাকর। ওরা কি বন্দোবস্ত করবে বল।

আমার জিদ চাপছিল। —আশ্রমটাশ্রম ছেড়ে এখানে যখন এসে পৌঁছেছে, তখন নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোন মাতব্বর আছে। তা না হলে, এ বাড়িতে আশ্রয় নিশ্চয়ই জুটত না। আমাদের দেশ সাধু-সন্তের স্বর্গক্ষেত্র। চিনুমামার কি শিষ্যটিষ্য চেলাচামুণ্ডা নেই!

সিঁড়ির নিচে সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। ছোকরা চাকর ছুটে নেমে গেল। তুলি, আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঘরের মধ্যে মামীমা মামার শিয়রে বসে। দুঃখের সময়ে ওরা একা থাকুক।

বুড়ো ডাক্তার। সিঁড়ি ভাঙতে বেশ কষ্ট হয়। ওপরে উঠে পরপর কয়েকটা দম ফেলে ডাক্তার ধাতস্থ হলেন। তারপর আমাদের পরিচয় পেয়ে বললেন, —যাক, বাঁচা গেল। আমি তো ভেবেছিলাম সৎকারের দায়টাও আমার ঘাড়ে চাপবে। তেমন তেমন হলে বাড়িতে যাবেন। ডেথ-সার্টিফিকেট লেখাই আছে, ডেট দিয়ে সই মেরে দেব।

ঘরে ঢুকে পরপর কয়েক বার শ্বাস নিলেন ডাক্তার।

—কি সাধুবাবা!! আজও চিলিম চড়িয়েছ। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ভৈরবীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—এই হারামজাদী মাগী যত নষ্টের গোড়া। যত বলি নেশাভাঙ করতে দিসনে, তত দেখি মাত্রা চড়ছে।

চিনুমামা পাশ ফিরে শুল। চোখ তাকিয়ে পাতলা হাসল।

—ডাক্তার, ওকে বকে কি হবে। গাঁজার দম না চড়লে কোন সাধু সাধু-

পরপর তিনবার কাউন্সিল পুরস্কার আনবার পর
K P W LTD
K P W LTD
K P W LTD
EXPORT 1973-74
EXPORT 1974-75
EXPORT 1975-76
খোদিয়ার এবার প্রথমবার নিয়ে আসছে
বিশেষ রপ্তানী পুরস্কার
স্যানিট্যারীওয়্যার শিল্পের জন্য।
এই হচ্ছে প্রথমবার যখন বিশেষ পুরস্কার শ্রেণী থেকে স্যানিট্যারীওয়্যার শিল্পকে একটি পুরস্কার দেওয়া হ'লো। আর যার প্রথম গ্রাহক খোদিয়ার যে আরম্ভেই জয় করেছিন অনুপম 'ক্যাপিল্প-ইল' স্বাতন্ত্র্য।
ভারতীয় স্যানিট্যারীওয়্যার শিল্পে তুবার প্রথম হবার বাঞ্ছনা এবং বিশেষ পুরস্কার অর্জন করা এ সবই খোদিয়ার স্যানিট্যারীওয়্যার- এর রীতি ও আকৃতির কথা বলে, যা বিকশিত হয়েছে ফ্রান্সের পোরচার-এর সহযোগিতায়।
খোদিয়ার যে বিশেষ সম্মান নিয়ে এসেছে তা শুধু স্মরণীয় দৃষ্টান্তই নয় ভারতীয় স্যানিট্যারীওয়্যার রপ্তানীর ক্ষেত্রে একটি গর্বিত নতুন নিদর্শন।
উৎকর্ষের উপহার
Khodiyar
খোদিয়ার
খোদিয়ার পটারি ওয়ার্কস্ লিমিটেড। সিহোর (গুজরাত) ৩৬৪২৪০, ইন্ডিয়া। টেলিফোন: ৩ টেলিগ্রাম: 'পটারি'।
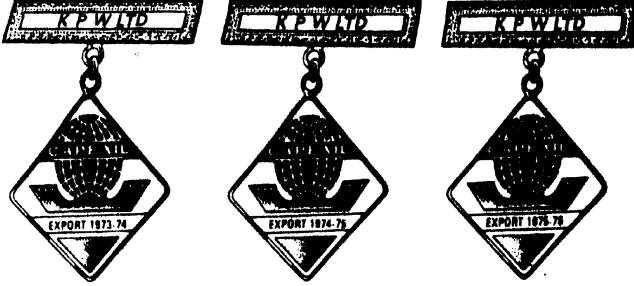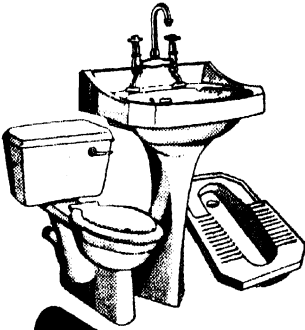
।গায় কয়েছে শুধু।

—যাঃ! এই বেশ খোল ফুটেছে। তবে আর বেশি দিন নয়।

বুধবার। চিনুমামা বলল, —বুধবারের পর আর তোমার কষ্ট দেব না ডাক্তার।

—ও সবাই বলে। বলে যদি সবাই মরত, তাহলে আর আমাদের করে খেতে হত না। ডাক্তার সিরিঞ্জ বার করলেন। কি একটু ইনজেকশানের অ্যাম্পুল ভেঙে ওষুধ নিয়ে সুঁই দিলেন। —এখন একটু ঘুমোও। কাল বিকেলে আবার দেখা হচ্ছে।

ডাক্তার চলে গেলে তুলি আর আমি বের হলাম। রাতের খাবারটা বলতে হবে। মামীমার জন্যে কিছু কেনা দরকার। সারাদিন দাঁতে কুটো কাটেননি মামীমা। মেয়েরা যে কি করে এ রকম উপোস দিতে পারে বুঝতে পারি না। আমি হলে এতক্ষণ বিছানা থেকে উঠতে পারতাম না।

আমরা চা খেলাম। সমুদ্রের ধারে ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। নতুন বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো পাড়ের ওপর সমুদ্রের আছড়ানি দেখতে ভিড় জমেছে। বিজলী বাতি রোশনাই ছড়াচ্ছে। গাদা গাদা লোক,—ভিড়। কাজুবাদাম চিবোতে চিবোতে কারা যেন মালটাসের গল্প করছিল। ঝাউবনের ধারে ধারে কিছু পেয়ার। ভিজে পাড়ে, কোথাও কোন একটি মেয়ে বসেছিল, তার পিছনে চালচিত্র। জল কেলি জল তুলি করে হাঁটছে সে। বাতাসে আঁশটে গন্ধ। মরা জেলিফিস। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলাম। বালিয়াড়ির এদিকটা এখনো বাঁধানো হয়নি। বালির ওপর আমি পা ছড়িয়ে বসে পড়ি। তুলি আমার কোলে মাথা রেখে শুল। আমি বাদাম চিবোতে চিবোতে ওর মুখে দু-একটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কারা যেন কিছু বলল।

—তুই একটা ওয়াইন বটল্স এনেছিস ?

আমি চোখ তুললাম। —তুই জানলি কি করে ?

আমি জানি না। মামু বলছিল। বলল,—ঘরে বিলিতী গন্ধ কেন রে বেটী ?

যে বোতলের ছিপি খোলা হয়নি সে বোতলের গন্ধ কোথা থেকে আসবে। আমি অবাক গলায় বললাম,—যাঃ! আন্দাজে মেরেছে।

তুলি ঘাড় নেড়ে উঠে বসল। —নারে সত্যি! মামু বলল,—একটা ছোট চ্যাপ্টা বোতল। আমি সব দেখতে পাই তো। আমি উঠে তোর ভি আই পি সার্চ করলাম। দেখলাম, ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছে।

আমার আশ্চর্য লাগছিল। হটযোগীদের কিছু কিছু ক্ষমতা থাকে। চিনুমামারও হয়ত তেমন কিছু সিদ্ধাই আছে। অত্যন্ত সাধারণ নিম্নস্তরের সাধু-সন্ন্যাসীরা, সে সব ভাঙিয়ে গৃহস্থকে চঞ্চল করে। আমি বললাম,—তাতে কি হল ?

মামু আজ রাত্তিরে একটু মাল প্রসাদ করে দেবে বলেছে। বলেছে, সে খেলে নাকি, গড অলমাইটির কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়।

আমি হেসে উঠে পড়লাম। —অনেক দাম দিয়ে কিনেছি রে। মিছিমিছি নষ্ট করতে পারব না।

তুলি আচমকা রেগে উঠল, —মরবার সময় লোকে মুখে গঙ্গাজল দেয়, তুই আর একটু স্কচ সার্ভ করতে পারবি না।

খাওয়াদাওয়া সেরে আসতে আসতে দশটা বেজে গেল। আকাশে চাঁদ। সমুদ্র ফুঁসছে। তুলির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, —মাইরি, আমার এখন প্রেম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খাই।

তুলি হাসতে হাসতে গায়ে গড়িয়ে পড়ল। গালে খাস, ঠোঁটে খাস না ভাই। তোর মুখে এখনও চিকেন লেগের গন্ধ। মরে যাব।

আমি ড্যাম্প মেরে গেলাম। মুরগীর ঠ্যাঙগুলো চুরচুর করে চিবিয়েছে তুলি। আমি কি-ই বা খেয়েছি। অথচ আমার ঘাড়ে নির্বিবাদে দোষ চাপাল। মেয়েরা সব পারে। এই জন্যে শাস্ত্রে মেয়েদের পাষাণী বলেছে।

বারান্দায় এসে দেখি চিনুমামা ডেক-চেয়ারে বসে। যে মানুষটা শেষ বিকালে মরণাপন্ন হয়েছিল, সে এখন কি করে এই বারান্দায় উঠে আসতে পারে, তা আমার বুদ্ধির অগোচর। বাচ্চা চাকরটা বসে বসে ঢুলছে। আমাদের দেখে মামু কিছু বলল। সে উঠে গেল।

বাড়ি নিস্তব্ধ। মামীমা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভৈরবীর আওয়াজ নেই। অনিলও চলে গেল। আমরা চেয়ার টেনে বসলাম চিনুমামা চুপ করে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে বসল।—যে রাত্তিরে বাড়ি ছেড়েছিলাম, সে রাতে বড় অন্ধকার ছিল। আর আলোয় আলো।

আমরা চুপ করে বসে। এ সময়ে যদি কিছু কথায় পায়, পাক। মনটা হালকা করে নিতে পারবে। নিশ্চয়ই কোন অপরাধবোধ, গ্লানি মামার মনের কোণে জড়ো হয়ে আছে। আর সে সব কবুল করে ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করবে মামা।

তুলি মামার হাত হাতে তুলে নিল। ধীরে ধীরে হাত বোলাতে শুরু করল। —তুমি কেন বাড়ি ছেড়েছিলে মামু!

মামার কৌতুকোজ্জ্বল চোখ দুটোয় হাসি ঠিকরে উঠল। পরক্ষণেই বিষণ্ণ ম্লান হয়ে এল। —সে অনেক কথা বেটী। একটু থামল মামা, অল্প পরে বলল, —মরবার আগে দোষ স্বীকার করা ভাল। তোদের ওই সাহেবদের গির্জায় পাপীতাপীদের মন খুলে কথা বলা আমার বেশ লাগে। ওরা অনেক হালকা হয়ে মরতে পায়।

তুলি মুখে চুক চুক শব্দ করল। —মরবার কথা ভাবছ কেন ?

চিনুমামা চোখ তুলে হাসল। [illegible] চাঁদের জোৎস্না।

কে বহন করে চলেছে এই রক্ষাকারী তরবারি ?
Dettol
ডেটল
৪০ বছরের ওপর ধরে ডাক্তাররা
নির্ভর করে চলেছেন এই একমাত্র
অ্যান্টিসেপ্টিকের ওপর–
কারণ, এ সব রকমের ক্ষতিকর
রোগ জীবাণু বিনষ্ট করে।
Dettol
একশটির বেশী দেশে ডেটলের তরবারি
হল রোগজীবাণু আর সংক্রমণের বিরুদ্ধে
মানুষের লড়াইয়ের বিশ্বস্ত অস্ত্র।
ডেটলে আছে বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে
কার্যকরী অ্যান্টিসেপ্টিক, যা সবরকমের
ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট করতে পারে
বলে প্রমাণিত হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তা
আর স্বাস্থ্যরক্ষার মান বজায় রাখা হয়
এমন হাসপাতাল আর অপারেশন
থিয়েটারে অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে
ডেটলই নির্বাচিত হয়।
লিনটাস-DTL. 15-2415 BG
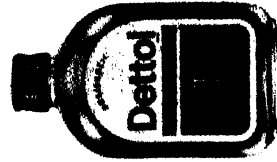
—না আর ভাবব না। আজ বাদে কাল যাকে মরতে হবে, সে মিছিমিছি
। সব চিন্তা করে কি করবে।

এত কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে। হোক বেঠিক। তবু আমরা মানা করব
।। অঘটন ঘটলে, ঘটবে। চিনুমামা দূরের দৃষ্টি কাছে টেনে আনল।
চাখ বুজে বলল,—তোদের ন'মামী পাগলী ছিল। আমরা দুজন সমবয়সী।
। আমাকে বড় ভালবাসত। ন'দা হঠরাগী। এ সব পছন্দ করত না। যখন তখন
কত। আমার কাছ ছাড়া ওর কোন কাঁদবার জায়গা ছিল না। সেই কান্নার
ায়গাটা ওর কাল হল।

চেয়ারের হাতলে আমার হাত শক্ত হয়ে আসছিল। তুলি ঘুমভাঙা গাঢ়-
ব্বরে বলল,—তারপর!

চিনুমামা হাসল। হেসে বলল,—তোর কাছে কাঁইচি আছে?

কাঁইচি!

—ও ওসব বুঝি খাসনে। তবে যা আছে তাই দে। মাথার ভেতর কেমন
একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

ডাক্তারের মানা আছে, মামু।

ডাক্তারের কথা ছাড়। ও বললেও আমি বুধবার অবধি বাঁচব, না বললেও
বাঁচব।

সিগারেট বের করে আমি ধরিয়ে দিলাম। —তুমি এত সিওর হচ্ছ কি
করে?

চিনুমামা হাসল। —আমি জানি। এটা আমার নিয়তি। একটু থামল
মামা, হাসল। আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি ফিরে বেড়াচ্ছে। তা না হলে, সেদিন
অমন কান্ড করব কেন? আর যাই হোক, ওকে তো আমি দাগা দিতে চাইনি।
ওকে, আমি ভালবাসতাম। বুঝলি, তারপর থেকে না ঘরকা না ঘাটকা। আমার
ঠিকানা কেয়ার অব শ্মশান হয়ে গেল। বাঁচবার জন্যে কি না করেছি। কিন্তু
পাঁচার মতন বাঁচা হল কই। গেরুয়া, জটাদাড়ি আর নেশাভাঙের ভেকটা, কবে
যে সত্যি হয়ে উঠল। ঘরে আর ফেরা হল না। ত্রিশঙ্কুরা কোনদিন ফেরে না।
ফেরে না।

আকাশটা উদাস হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় মানুষগুলোও। তুলি চুপ করে
থাকতে থাকতে এক সময় বলল,—তোমার কোন মেনটাল স্ট্রেংথ ছিল না।
থাকলে তুমি সিচুয়েশন ফেস করতে। অন্তত মামীমার মুখোমুখি না করে
খুব ভুল করেছ।

হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে চিনুমামা তুলির দিকে চেয়ে রইল। —কিছু
বলব বলব করল। অল্পক্ষণ পরে নিশ্বাসের মতন ফিসফিস করে বলে
উঠল, সেই ভুলটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেখি, শোধন করা যায় কিনা।

সবটাই কেমন নাটকীয়। আমার শৈশব স্মৃতি মনে পড়ছিল। আমি
হাসি চাপলাম। ডংকা মেরে চলে যাব বললেই কি আর যাওয়া যায়। অথচ কি
আশ্চর্য, এই শব্দটা কি নিটোল গোল! জিবের জড়তা ভেঙে বারবার, কতবার
উচ্চারণ করেছি শব্দটা। সেই বিশুদ্ধ অপব্যয়ের জন্য এখন আমার দুঃখ
হচ্ছিল।

আজ বুধবার। সেই বহু প্রতীক্ষিত পূর্ণিমা তিথি। আজ চিনুমামা
দেহত্যাগ করে স্বর্গধামে চলে যাবে। মামীমার মুখ দেখে মায়া লাগছে।
ন'মামার মৃত্যু সময়ে এ বদনের সুরৎ কি রকম ছিল, দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।
তুলির মর্ডান মেয়েও চঞ্চল। সকাল থেকে ভাল করে একটা কথাও বলল না।
একটা চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছে। হায়! রমণী! কি নির্মল কোমল প্রাণ!
তোমাদের দেখলেও এ ধরাধামে বেঁচে থাকবার বাসনা জাগে।

আজ দিদিমা আসছে। গতকাল টেলিগ্রাম এসেছে। ডোন্ট ওরি স্টপ
কামিং ওয়েনসডে আফটারনুন স্টপ ছোটমামা। টেলিটা আসবার পর থেকেই
চিনুমামা খুব ভাল ছিল। আমাকে মা বাবার কথা জিজ্ঞেস করল, মামা মামী-
দের খবর জানতে চাইল। বিকেলের দিকে তুলির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিল।
ভৈরবীকে দেখিয়ে দেখিয়ে তন্ত্রসাধনার গূঢ় রহস্য বোঝাচ্ছিল। তুলি কখনও
লাল হয়ে আসছিল, কখনও দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়ছিল।

কাল শেষ রাত থেকেই মামার শরীরটা আরও যেন খারাপ হল। আজ
সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। ডাক্তারবাবু নাড়ি টিপে থমকালেন।
—স্ট্রেঞ্জ। শেষ অবধি কথা ফলিয়ে দেবে নাকি সাধুবাবা। তারপর আমাদের
দিকে ফিরে বললেন,—আশা নেই। একটা ইনজেকশন দিচ্ছি, দরকার হলে—
আবার দেব, কিন্তু টিঁকবে বলে বোধ হচ্ছে না।

ডাক্তারকে ছেড়ে দিয়ে আমি বোকার মতন হাঁটছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই
রহস্যময়, কেমন যেন কাকতালীয়। ইচ্ছামৃত্যু ঘটতে পারে এ কথা ভাবাই যায়
না। অথচ নিয়তির ফেরে পাকেচক্রে তাই ঘটে যাচ্ছে। 'নিয়তি' শব্দটা আমার
জিবে আটকে এল। আমিও তাহলে অদৃষ্টবাদী হয়ে যাচ্ছি।

আমার লজ্জা করছিল। মুখরক্ষা করার মতন মনের আড়াল পাচ্ছি না।
চুপিসারে আমি ঘরে এলাম, মামার দিকে চাইলাম। মামা নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কেমন
একটা ঘোরের মধ্যে বিড়বিড় করে কি সব বলছে।

তুলি এসে বলল, —মামীমা আজও উপবাস দিচ্ছে। পূর্ণিমার উপোস।

আমার হঠাৎ রাগ এসে গেল। মামীমার দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে
বললাম, —কি ভেবেছ কি! তুমিও কি সহমরণে যাবে।

দুপুরটা খানিক ঘুমিয়েছি। রোগী আগের চেয়ে সামান্য ভাল। ডাক্তার
এসে আর একটা সূঁই দিয়ে গেল। আমি ঘুমোতে ঘুমোতে সেজমামাকে স্বপ্ন
দেখলাম। সেজমামা গাজনের শিবের সঙ্ সেজে নেচে নেচে বলছে,—বেটা তুম-
হারা বংশমে অ্যায়সান এক—

উঠে দাঁড়ালাম। দিদিমা এসে গেছে। নিশ্চয়ই। বারান্দায় ছোটমামা। তুলি ছোটমামার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। দিদিমা চিনুমামার ঘরে। আমি ঘরে এসে দাঁড়ালাম। দিদিমাকে অনেক রোগা দেখাল। সেই ফর্সা রঙ মজে মরে এসেছে। মাথায় কদম ছাঁট, দিদিমার গলায় কণ্ঠি। নাকের রসকলি শুকিয়ে ঝরে পড়েছে, এখন শুধু চন্দনের ছাপ। হাতের মালাটা ঘুরঘুর ঘুরছে।

দিদিমা স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে, একবারও চোখের পলক পড়ল না। মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা যায় না। অথচ দৃষ্টি ক্রমশ কোমল হয়ে আসছে। এক সময় চোখের কোলে হাত ছোঁয়াল দিদিমা, তারপর নরম গলায় বলল, —ন'বউ এই রাস্তার ছোঁয়ালাগা কাপড়ে আর ছোঁব না। একটা ডুব দিয়ে আসি। ও ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। দেখ, সেই ছেলেবেলার মতন কেমন কাপড়ের খুঁটটুকু হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে। হতভাগা এমনি করে আমায় আটকে রাখত।

আমার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। দিদিমা চিবুক ধরে চুমু খেল। বুকের ওপর হাতের মুড় টেনে বলল, —কত বড় হয়ে গেছিস সব। তারপর বলল, —চল হারামজাদা, আমাকে একটা ডুব দিয়ে আনবি চল।

আমাদের ঘাটমে যেতে দেখে তুলিও তোয়ালে টেনে লাফিয়ে এল। —দিদু আমি যাব। দিদু!

দিদিমা দাঁড়িয়ে হাসির চোখ তুলল। —একলাফে লংকা পেরিয়ে এলি, তোর পায়ে ঘোড়া বাঁধা আছে নাকি।

এরোপ্লেন। তুলি হাসল।

ও সব পেলেনফেলেন যাই থাক, বর এলে দেখব।

তুলি লজ্জায় লাল হয়ে হাউমাউ করে উঠল। আমি দিদিমাকে দুহাতে জড়িয়ে, বুকের কাছে মুখ এনে বললাম, —একটু খাব।

এখন কি ভাই আমাদের রুচবে। দিদিমা যেন দুষ্টু হাসিতে গলে যাচ্ছিল। —অথচ এক সময় এই হারামজাদের জন্য, বোঁটায় খয়ের মাখিয়ে রাখতে হত।

আমি জোরে জোরে হাসলাম। শব্দ করে, সশব্দে। তুলি ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিদিমা পাড়ে বসে মাথায় থাবা থাবা জল দিচ্ছে। আমার কেন জানি মনে হল, —আমরা সবাই নিষ্কৃতি চাইছি। এই দমফাটা, অন্ধ অন্ধকার থেকে নিষ্কৃতি চাইছি। এই হাসি, এই উল্লাস, কান্নার আর এক মুখ। আমরা কান্নাটাকে চাপা দিয়ে, হাসি কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। রাতের গভীরে, যে নাটক হবে, তার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে চাই।

ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতে পারে। নাও পারে।

চিনুমামা স্থির হয়ে শুয়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ বাড়ছে। ঘড়ঘড় শব্দ। ছোটমামা বারান্দায়, একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছে। ন'মামী তুলি দাঁড়িয়ে। আমি অস্থির পায়ে ঘর-বার করছিলাম।

দিদিমা আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। মামার বুকের ওপর হাত রাখল। ন'মামীর দিকে চেয়ে বলল, —বউমা, তুমি চিনুর মাথা কোলে তুলে নিয়ে বস। তোমার জন্যে আজ আমি কোলের বাছাকে কোলে পেলাম।

ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস পড়লে শোনা যায়। বাইরে বেহায়া চাঁদ, ধূপের গন্ধ। দিদিমা মামার বুকে হাত বোলাচ্ছে তো বোলাচ্ছে। ন'মামীর চোখ *বেয়ে টপটপ জল পড়ছে। চিনুমামার কপাল ভিজছে।* মামা কেমন যেন নড়েচড়ে উঠল। যন্ত্রণার শব্দ। জ্ঞান ফিরছে। শেষ অভিজ্ঞান।

—মা! ঘোলাটে চোখ দুটো ঘুরতে ঘুরতে অনন্তকাল পরে যেন স্থির হল।

দিদিমা ঝুঁকে পড়ল। —এই যে বাবা! এই যে।

—বড় কষ্ট!! বড় কষ্ট মা!

—আর হবে না বাবা। সব সেরে যাবে।

মাথাটা সামান্য তোলবার চেষ্টা করল মামা। গলায় ঘড়ঘড় বাড়ছে। হিক্কা উঠছে।

—তোমাদের, তোমাদের বড় দুঃখ—দুঃখ দিয়ে গেলাম। —মা!

দিদিমা কেমন যেন হয়ে গেল। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলে চলল, —কিসের দুঃখ বাবা! কিসের দুঃখ। আজ মহা দিন।

আমি আর তুলি বোকার মতন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মহা দিন! মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে এল। পিঠ ধনুকের মতন বেঁকে গেল।

দিদিমার গলায় কান্না। অথচ স্বর ভাঙল না। —আমরা কেউ কাকেও পুরো দেখতে পাই না চিনু। অথচ আমি পেলাম। আমি কত ভাগ্যবতী। আমি তোর জন্ম দেখেছি। মৃত্যু দেখলাম। সুখে পেলাম, দুঃখে পেলাম। হাসিতে পেলাম, কান্নায় পেলাম। —তুই আমার মহাপুরুষ ছেলে বাবা। তুই শান্তিতে যা। সুখে যা। বল, —ওঁ! গয়া-গঙ্গা-হরি! ওঁ।

কান্নাটা ফেটে পড়বার আগে তুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল। আমিও ছুটে এলাম। বাড়িঘর, বারান্দা, সিঁড়ি পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে তুলি। বালিয়াড়িতে পা রাখল। আর একটু, আর একটু আগেই রাতের সমুদ্র।

—তুলি! এই তুলি!

তুলি টালমাটাল পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন করে বলল, টিংকুদা এই পাবলিকটা কেরে! মহাপুরুষের বাবা! —তোর হিপপকেটে সেই বটলটা আছে।

আমি ঘাড় নাড়লাম।

—দে। তুলি হাত বাড়াল। আজ শালা মাল খেয়ে বেহেড হব।

মানুষ পাথর

সমরজিৎ কর

॥ ১ ॥

মানুষ মানুষের রক্তে স্নান করিয়ে সাপের পুজো করে। দেখবেন খাসিয়া পাহাড়ের সেই রিয়াংডে বাজার। যার আধ কিলোমিটার দূরে নগস্টেন। গভীর অরণ্যে চলতে গিয়ে যেখানে সভ্য মানুষ আজও পথ হারায়। এই নগস্টেনের নির্জন পাহাড়ে গেলে আজও দেখা যাবে তিনটি গুহা। না। গুহা না বলে বরং বলি তিনটি টানেল। কবে কে তাদের তৈরি করেছিল সেকথা কেউ বলতে পারে না। এদেরই একটির মধ্যে ঢুকে ১৯২৪ সালে আসামের স্টিল ব্রাদার্স কোম্পানির বেশ কয়েকজন কর্মী বেমালুম লোপাট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কেউ তাদের হদিশ দিতে পারেনি। এ ঘটনার সাক্ষী স্বয়ং সেখানকার সিয়াম। খাসিয়াদের রাজা।

অথবা নাগাল্যান্ডের পুকপুর। হাজার দুই ফুট উঁচু পাহাড়ে গ্রাম। যেখান থেকে দক্ষিণে চাইলে চোখে পড়বে সারামাটি গিরিশৃঙ্গ। প্রায় হাজার তেরো ফুট উঁচু। যার ওপারে বর্মা। এ পারে ভারত। এই পুকপুরেই জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া সন্ধান পেয়েছে মূল্যবান ধাতুর। ওদের ভাষায় যাদের বলা হয় আলট্রা বেসিক মিনারেলস। এই গ্রামে লবণ উপহার দিয়ে বন্ধুত্ব করতে হয় নাগাদের সঙ্গে। সেও যেন আর এক কাহিনী।

শিলং থেকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল শাখার ডেপুটি ডাইরেকটার জেনারেল শ্রীশম্ভু সেন চিঠি লিখেছিলেন : এদিকে আসুন। দেখে যান আসাম, মেঘালয় অরুণাচল এবং নাগাল্যান্ড। কুমারী কন্যার মত অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এখানকার বন্য সম্পদ, কঠিন পাথরের বুকে লুকিয়ে থাকা খনিজ সামগ্রী, বেগবতী নদীর সহস্র ধারা, যাদের মুখে বাঁধ বসিয়ে পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাতকে দিনের সূর্যে ভাসিয়ে দেয়া যায়।

"দেশ" সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ বললেন, ঘুরে এসো। আমরা অনেকেই চাঁদের খবর রাখি, কিন্তু প্রতিবেশীর খবর রাখি না।

অতএব।

১২ এপ্রিল। কলকাতা থেকেই সঙ্গী জুটে গেল। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার স্টাফ ফটোগ্রাফার শ্রীঅজিত ব্যানার্জি। শম্ভুবাবু আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। কলকাতাতেই মিঃ ব্যানার্জি আপনাকে সব বাতলে দেবেন। গোহাটি পৌঁছলেই দেখবেন, সমস্ত ব্যবস্থা পাকা।

দমদম বিমান বন্দরে কথাটা বলতেই অজিতবাবু বললেন, ঠিক। পাকা বলতে একেবারেই পাকা। তবে আপনার যা প্রোগ্রাম দেখছি, ধকল সামলাতে পারলেই হয়।

ভদ্রলোক যে রসিক ব্যক্তি, প্রথম পরিচয়েই বোঝা গেল। এবং সতর্কও। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার বেশ কয়েকটি এক্সপিডিশনে তিনি ফটোগ্রাফার হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছেন। হিমালয়ের দুর্গম হিমবাহ অঞ্চল থেকেও ঘুরে এসেছেন কিছু দিন আগে। ছবি তোলার ব্যাপারে প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে।

বললেন, ফিল্ম, সাজ-সরঞ্জাম সবই তো নিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব না পণ্ডশ্রম হয়।

কেন বলুন তো ? আমার প্রশ্ন।

মানে মাসটা এপ্রিল কি-না। তাই ভাবছি। এ সময়ে আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়ে বর্ষা নামে। আর ওদিকের বর্ষা মানেই সব ভণ্ডুল। ছবি তোলার দফা রফা। ঝির ঝির বৃষ্টি। বৃষ্টির যেন শেষ নেই। অজিতবাবুর উত্তর।

অজিতবাবুর কথা শুনে দমে গেলাম। সত্যিই যদি বর্ষার মুখে পড়ি ছবি তোলা তো দূরের কথা, ঘরের বাইরে বেরোনোই তো শক্ত হবে। বিশেষ করে মেঘালয় এবং অরুণাচলে। বর্ষা মানেই ওই সব অঞ্চলে বন্যা। তখন পথে ঘাটে পায়ে জলাই শত্রু। গাড়ি তো কোন ছার।

ভাগ্য ভাল। দমদম থেকে যখন প্লেন ছাড়ল, ঘড়িতে তখন সকাল দশটা বেজে দশ। বোয়িং ৭৩৭। নন স্টপ ফ্লাইট। দমদম থেকে গোহাটি। চৈত্রের শেষ। নববর্ষের তখন আর মাত্র দুদিন বাকি। এ সময়ে সারা আসাম আনন্দে মেতে ওঠে। তখন উৎসব। বিহু উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে যেমন দুর্গোৎসব। আসামের প্রতিটি মানুষের কাছে বিহুও ঠিক তেমনি। নতুন কাপড় পরা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানান, নাচ, গান। চলে কয়েকদিন। প্লেন যাত্রীতে ঠাসা।

মিনিট পঞ্চাশের ফ্লাইট। গোহাটি গিয়ে যখন পৌঁছলাম ঘড়িতে তখন এগারোটা। বিমান বন্দরের লাউঞ্জে হাজির হতেই দেখা হল অমর মজুমদারের সঙ্গে। অমরবাবু জিওলজিস্ট। আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল।

এসেছিলেন ডঃ সুব্রত মজুমদার, ডঃ সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন।

অমরবাবু সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঁরাও জিওলজিস্ট।

অমরবাবু বললেন, আমরা আজ ভোরেই শিলং থেকে রওনা হয়ে আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি। আপনার প্রোগ্রামটি নিশ্চয় আপনি দেখে নিয়েছেন ?

বললাম, দেখেছি। শম্ভুবাবু আগেই আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

বড় প্রোগ্রাম। বেশির ভাগ জায়গার পথঘাটই খারাপ। জানি না, সামলাতে পারবেন কী না।

খানিকটা স্মার্টের মতই বললাম, দেখাই যাক না।

সুজিতবাবু বললেন, আমরাও চাই, আমাদের সঙ্গে আপনিও একটু কষ্ট করুন। কী নিদারুণ অবস্থার মধ্যে জিওলজিস্টদের কাজ করতে হয় তাহলে বুঝতে পারবেন।

শিলং সারকেল দেখানর দায়িত্ব সুজিতবাবুর ওপর।

রীতিমত মিলিটারি ব্যবস্থা। চারটে জীপ, একটি ট্রেইলর। ট্রেইলারে নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত পেট্রল। নেওয়া হয়েছে বিছানাপত্র, শুকনো খাবার, মায় জ্যান্ত মুর্গি পর্যন্ত।

জ্যান্ত মুর্গি কেন ? এবার আমি রীতিমত অবাক।

ব্যাপারটা বিশদ করলেন সুজিতবাবু। —পাথর সাহেবদের সঙ্গে শুধু ঘুরলেই তো চলবে না, পেটে কিছু দিতেও তো হবে ? আজকের মত রাতে যেখানে আস্তানা নেব, সেখানে কী জুটবে, সে তো আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। এসব অভিজ্ঞতায় আমরা পাথর সাহেবরা কিন্তু ওস্তাদ। নো চান্স, মশাই। খাবার আর আস্তানাটা আমরা সঙ্গেই রাখি।

কানের ওপর দু-দুবার যেন হাতুড়ি পড়ল। পাথর সাহেব মানে ?

আমার প্রশ্নে হেসে উঠলেন সুব্রতবাবু। —সে কি ? সাধারণ লোকের কাছে আমাদের পরিচয় কী, জানেন না ? পাথর সাহেব। মশায়, স্রেফ পাথর সাহব। জিওলজিস্ট মানেই তো হাতুড়ি। আর হাতুড়ি মানেই পাথর। পাহাড় পর্বতে যাই। চোখ আমাদের শুধু পাথরের ওপর। তেমন কিছু পেলেই পাহাড়ের গায়ে আমরা হাতুড়ির ঘা বসাই। সংগ্রহ করি টুকরো। পাথর। একটুকরো পাথর আমাদের কাছে কোটি কোটি বছরের ইতিহাস। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস। সেই ইতিহাসকেই আমরা খুঁজি। তারই সন্ধান করতে গিয়ে আমরা কোথাও পাই লোহা, কোথাও তামা অথবা চুনো পাথরের খনি। আশপাশের যারা দর্শক সেই গ্রাম্য মানুষ— এসব তারা বোঝে না। তারা শুধু দেখে আমরা হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙি। তারা এর ভেতর কোন মানেই খুঁজে পায় না। তাদের কাছে আমাদের পরিচয়—আমরা হাতুড়ি হাতে এক একজন পাথর সাহেব। শুনবেন শুনবেন। সব শুনবেন মশায়। অনেক কিছু চোখেও পড়ে যেতে পারে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়-পর্বতের গঠন এবং ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করে চলেছেন সুব্রতবাবু। দীর্ঘদিন। পাথর তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর ডাকে বলেই মাঝে কলকাতায় বদলী নিয়েও আবার তিনি ফিরে এসেছেন শিলং-এ। প্রাচীন বরফ যুগে এ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক কায়দা কানুনটি কেমন ছিল এই নিয়ে এখন তাঁর মাথা ব্যথা।

ব্যাপারটা সত্যিকারে কী ঘটছে

পাহাড়। তার সামনে খাসি গ্রাম। খাসি মেয়েরা [illegible]

তারপর আবিষ্কার করলাম, কোন বিশ্রাম নয়, অলস তত্ত্ব আওড়ানোও নয়। গৌহাটিতে পা দেয়া মানেই প্রোগ্রাম শুরু। বলছিলাম মিলিটারি ব্যবস্থা। ঘটলও তাই।

প্রথম পরিচয়ের পাট চুকতে মিনিট দশেক গেল। বিমান বন্দর থেকে মালপত্র ছাড় করতে গেল আরও মিনিট পনের সময়। ঘড়িতে যখন বারোটা, আবিষ্কার করলাম একটি জীপের সিটে আমি বসে। আমার পাশে সুজিতবাবু। আমাদের জীপ সামনে এগোল। পেছনে আরও তিনটে জীপ।

কোনরকম ভূমিকা না করেই সুজিতবাবু বললেন, গৌহাটি বিমান বন্দর থেকে যাত্রা করে আমরা যাব পলাশবাড়ি। সেখানে আগে ব্রহ্মপুত্রের চরটা দেখুন। আসামের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র একাত্ম।

একাত্ম। হয়ত তাই। এ একাত্মের ভেতর অন্তরঙ্গতা হয়ত আছে। কিন্তু বিভীষিকাও কি নেই? ইদানীং পৃথিবী জুড়ে রব উঠেছে, গেল, গেল। সভ্যমানুষ কল-কারখানা তৈরি করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। বনজঙ্গল কেটে সাফ করে করে ঘটাচ্ছে ভূতাত্ত্বিক অবক্ষয়। কিন্তু এই ভাঙ্গার খেলায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের তুলনা করা চলে কি? কখনও কখনও প্রকৃতি নিজেই তার পরিবেশকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়। এমনভাবে ধ্বংস করে মানুষ যা কল্পনাও করতে পারে না। ব্রহ্মপুত্র তার উদাহরণ।

ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন যেন একটি ত্রিকোণ ফলকের মত। তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র। তার দু-পাশে অসংখ্য শাখা নদী। উপনদী। এদের মধ্যে প্রধান উপনদী সিয়াং। সিয়াং মানস সরোবর থেকে বের হয়ে হিমালয়ের গহন অঞ্চল ধরে প্রায় এক হাজার মাইল এগিয়ে গেছে সোজা পুব দিকে। পূর্বাঞ্চলে এসে এরই নাম হয়েছে ডিহং। পূর্ববাহিনী নদী এই ডিহং অরুণাচলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ মোড় নিয়েছে দক্ষিণ বরাবর। তারপর অরুণাচলেরই পাসিঘাটে এর সঙ্গে মিলিত হল আর একটি নদী। লোহিত। ডিহং আর লোহিত মিলিত হয়ে তৈরি করল ব্রহ্মপুত্র।

১৯৫১ সাল থেকে ডিব্রুগড়ের কাছাকাছি হঠাৎই দেখা গেল ব্রহ্মপুত্র কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ডিব্রুগড় শহর এবং তার আশেপাশে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড অবক্ষয়। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড় বরাবর। ১৯৫০-এ এই অঞ্চলে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় সেই ভূমিকম্পই এর জন্যে দায়ী। ব্রহ্মপুত্রের তারপর থেকেই যেন এক নতুন চেহারা। তার আগ্রাসী থাবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ডিব্রুগড় শহরের দিকে বিস্তৃত হতে শুরু করে।

এল সেপটেম্বর ১৯৫৪। ১৯৫০ এর সেই ব্যাপক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর এবার ধ্বংসের উন্মত্ততায় মেতে উঠল ব্রহ্মপুত্র। এর কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড বর্ষা। ছোট বড় শত শত শাখা-প্রশাখা নদী ব্রহ্মপুত্রকে তুলস ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। মুহুর্মুহু চলল পাড় ভাঙ্গার লীলা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন জহরলাল নেহরু। একদিন নিজের চোখে পরিস্থিতিটা দেখার জন্যে তিনি হেলিকপটার চড়ে ডিব্রুগড়ের আকাশে পরিক্রমা শুরু করলেন। আর তখনই। আকাশ থেকে তাঁর চোখের সামনেই ঘটল সেই ঘটনা। শহরের পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিসকে নিয়ে শহরের এক অংশ সমাহিত হল নদী গর্ভে। পুরনো সেই শহর এখন ব্রহ্মপুত্রের কবলিত।

এরপর তৎপর হয়ে উঠলেন ভারত সরকার। যে করে হোক ব্রহ্মপুত্রকে রুখতেই হবে। এলেন বড় বড় ইনজিনিয়ার। এলেন হাইড্রোলজিস্ট এবং ভূতাত্ত্বিক। ১৯৫৫-৫৬ সালে ডিব্রুগড় শহরকে বাঁচানোর জন্যে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপাড় বরাবর তৈরি করা হল ছয় মাইল লম্বা বাঁধ।

বাঁধ তো হল। কিন্তু ভয় গেল না। এ-পাড় থেকে ওপাড় পর্যন্ত নদী-স্রোতের মুখোমুখি বসান হল "স্পার"। হাইড্রোলজিস্টরা ভাবলেন এইভাবে নদীর ধারাকে ভেঙ্গে তার প্রবাহকে এদিক সেদিক ছড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এত করেও খুব যে একটা লাভ হয়েছে বলা চলে না। ১৯৫৬ সালের পর বাঁধটিকে আরও উঁচু করা হয়েছে। যতটা সম্ভব মজবুত করারও চেষ্টা হয়েছে। তবু, প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্রে ঢল নামে। বাঁধের কাছে জল যেন উপচে পড়ার মত হয়ে দাঁড়ায়। তখন ধুক ধুক করে বুক কাঁপে ডিব্রুগড় শহরের প্রতিটি মানুষের। গেল। এই বুঝি আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কিছু। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, ডিব্রুগড়ের কাছে ব্রহ্মপুত্রের [illegible] ভূস্তর ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে। প্রতি বছর বন্যার সময় সেখানে জমে উঠছে পলি এবং বালি। যা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে আরও বড় রকম বন্যার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। খেয়ালী ব্রহ্মপুত্রের কোপে ১৯৫০ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যেই ওকল্যান্ড চা-বাগিচার প্রায় ছয়শো থেকে সাতশো একর জমি পুরোপুরি নদীগর্ভে চলে গেছে। নাগাঘুলি এবং মাথুলা চা-বাগিচার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে আটশো থেকে নয়শো এবং বোলোশো থেকে সতেরশো একর।

গৌহাটি গোয়ালপাড়া হাইওয়ে দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। পথের দুধারে গাছপালা। এক পাশে মাঠ। আর এক পাশে উঁচু নিচু জমি। ওদিকে ব্রহ্মপুত্র। প্রায় পনের কিলোমিটার এগোতেই সুজিতবাবু বললেন আমরা পলাশবাড়ি এসে গেছি।

এখন যেখানে হাইওয়ে সেটা নতুন জায়গা। এক সময় গোয়ালপাড়া যাওয়ার রাজপথ ছিল আরও দক্ষিণে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে আগ্রাসী নদী এক সময়ে পুরনো সেই রাস্তাটি গ্রাস করেও নিল। ফলে, বাধ্য হয়ে রাস্তাটাকেও দূরে সরিয়ে আনতে হল। পলাশবাড়ির কাছে বরাবর নদী তার পাড় কাটার কাজ অব্যাহত রেখেছে। সামনে বাঁ পাশে পাহাড়ের সারি, নদীর মাঝ বরাবর দ্বীপের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটি পাহাড়। ও-পারে চড়া। নদীর খাড়া পাড়ের গা বরাবর স্তরে স্তরে সাজানো পুরু বালির স্তর। একটি স্তর লালচে। তার ওপর ধূসর মাটির সজ্জা। ভূতাত্ত্বিকরা এই লাল এবং ধূসর স্তর পরীক্ষা করে এই অঞ্চলের পাললিক গঠন সম্পর্কে বিশদ তথ্য [illegible]। এই স্তর জানা শুধু ভূতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাই নয়, বাস্তব প্রয়োজনেও তাদের মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মপুত্রের দু-পাশে রয়েছে ছোট বড় শহর এবং গ্রাম। কীভাবে তাদের বিপদের হাত থেকে মুক্ত রাখা যেতে পারে ভূতাত্ত্বিকদের এই অনুসন্ধান সে ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এছাড়া নতুন শহর এবং সেতুর স্থান নির্বাচনের সময় যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা অপরিহার্য।

গৌহাটি গোয়ালপাড়া হাইওয়ে ধরে বিজয়নগর, ছয়গ্রাম, কুকুরমারা হয়ে পৌঁছলাম বোকো। ঘড়িতে তখন প্রায় দুটো।

সুজিতবাবু বললেন, দুপুরের খাওয়া এখানেই সেরে নিতে হবে আমাদের। এর পর আর কোন খাবার জায়গা পাবেন না। আমার এক বন্ধু দ্বিজেন দাস। এখানকার জে এ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। এখানকার হোটেলে খাবার ব্যবস্থা করার জন্যে তাঁকে চিঠি লিখেছি।

নির্দিষ্ট হোটেলের সামনে যখন জীপ এসে থামল পেটের মধ্যে তখন নেকড়ের খিদে। অকারণে বলব না। কলকাতায় সকালের খাওয়া খেয়েছিলাম আটটা নাগাদ। প্লেনে এক কাপ চা এবং এক টুকরো বিস্কুট। পেটের আর কি দোষ বলুন।

দ্বিজেনবাবু হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। প্রথম পরিচয়ের পাট চুকাতে গেল মিনিট পাঁচেক সময়। তারপর বললেন, ভাত, মাছ প্রস্তুত। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে বসে যেতে পারেন।

মুখে বললাম, ধন্যবাদ। আর মনে মনে বললাম, সে আর আপনাকে বলতে হবে না। আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি।

এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়। [illegible]

হাতিদের খাবার পরিবেশন

কাঠের খুঁটির ওপর টিনের চালা। ছোট বড় কয়েকটি ঘর। কাঠের চেয়ার আর টেবিল। সবই বিবর্ণ। হোটেলের মালিক বিহারী। এক সময়ে বাড়ি ছিল ভাগলপুর। কম বয়েসে আসামের এই অঞ্চলে ভাগ্য অন্বেষণে আসেন। তারপর হোটেলের ব্যবসা।

খুবই সাধারণ ব্যবস্থা। তবে প্রয়োজনের কোন কথাই হয়ত ভোলেন নি তিনি। হোটেলের পেছনে একটি উঠোন। সেখানে স্নান করার জায়গা আছে। দরকার হলে স্নান করুন। চাইলে গামছাও পেতে পারেন। তারপর আয়াস করে একটি টেবিলের সামনে বসে যান। ভাত, ডাল, একটি তরকারি এবং মাছ। এই হল মধ্যাহ্ন ভোজন। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। সঙ্গে এক টুকরো লেবু এবং লঙ্কাও পাবেন। খাবার পাতে লেবু এবং লংকা। যা আসামের বৈশিষ্ট্য। ভিড় লেগেই আছে সব সময়। কারণ বোকো তো শুধু একটি শহর নয়, এ যে গঞ্জও। দেশ বিদেশের মানুষের এখানে আনাগোনা। অদূরে জংগল। সেই জংগলের কাঠ এখান থেকে রপ্তানি হয়। এখান থেকে বাসে যাওয়া যায় শিলং, গৌহাটি, নওগাঁ। সেই বাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে দাঁতাল হাতিরা বাস করতো। তাদের মূর্তি গড়ে রেখেছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞা

[illegible] অল্প টৈরির কাজ। শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ওড়িষার মানুষ। আবহমান কাল ধরে এ রকমই চলে আস

চলার পথে বোকোতে এসে বিশ্রাম নেয় তাদের যাত্রী। দু দণ্ড কথা বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, যাঁরা ব্যবসার জন্যে ঘুরে বেড়ান আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

পানের দোকানে যান। মিষ্টি হেসে তাম্বুল এগিয়ে দেবে পান বিক্রেতা। দাম পাঁচ পয়সা। আধখানা পান, একটু চুন, আধখানা সুপুরি।

দ্বিজেনবাবু বললেন, তাম্বুল খাওয়া অভ্যেস আছে তো ? না থাকলে কিন্তু গা গুলোবে। ঠিক আছে খান। তবে চুনটা কম খাবেন। চুন কাঁচা সুপুরির সঙ্গে রি-অ্যাকশন করে কি-না। শরীরটা গরম হয়ে যায়।

দারুণ ভাল লাগল। অদ্ভুত মানুষ এখানকার। আস্তে কথা বলে। যথেষ্ট কর্মঠ। আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ অনেকেরই মুখে।

দ্বিজেনবাবু বললেন, এখানে কোন বেকার নেই। কোথাও কাজ না পেলে বনে যান। কাঠ কাটার কাজ চলছে সেখানে। একটা কাজ সেখানে পাবেন।

জনৈক সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের সঙ্গে কথা হল। ভদ্রলোক কোন

এক সময় খাসিয়া অঞ্চল কলস বৃক্ষে (পিচার প্ল্যান্ট) ছেয়ে থাকত

জিওলজিস্টরা ম্যাপিং-এর জন্যে সার্ভে করছেন

একটি বিখ্যাত বিস্কুটের কোম্পানির হয়ে কাজ করছেন। তিনি বললেন, শুধু আসাম কেন, গোটা পূর্বাঞ্চলটাই ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য। মুশকিল কি জানেন, বেশির ভাগ ব্যবসাই কিন্তু অন্য দেশের মানুষেরা দখল করে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, গুজরাটের মানুষই বেশী। সিন্ধিও কিছু আছে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসী ? সংখ্যায় নগণ্য। খাসিয়া, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচলে যান—দেখবেন সংখ্যায় তারা আরও নগণ্য।

বোকো থেকে মাইল তিনেক এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে পথ। ডানদিকে চলে গেল গোয়ালপাড়া হাইওয়ে। আর বাঁ দিকের রাস্তা মেঘালয়ের সীমানা বরাবর।

অদ্ভুত। সত্যিই অপূর্ব। দু-পাশে শালবন। শালবনের ভেতর দিয়ে কয়েক মাইল গেলেই হঠাৎ ভেসে উঠবে মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। খাসি হিলস।

খাসি হিলসে ওঠার আগে আধ ঘণ্টার মত বিশ্রাম। জায়গাটার নাম হাহিম।

এবার মনে হল, আমরা যেন এক অপরিচিত জগতে এসে হাজির হয়েছি। অদূরে পর্বতশৃঙ্গ। অপরাহ্ণের আলোয় কখনও ভুল হয় পাহাড়, না ঘন কালো মেঘ ? আর হাহিম এক স্নিগ্ধ উপত্যকা-শহর। এখানে পুলিস স্টেশন আছে। আছে সেণ্ট্রাল পি ডব্লু ডি-র অফিস। পাহাড় কেটে পথ তৈরির কাজ চলছে। চাই, আরও পথ চাই। কারণ পথই তো সভ্যতায় স্রোতস্বিনী এনে দেয় ! পথ মানেই তো চলা ! আর যেখানেই চলা, সেখানেই তো জীবনের মুক্তি !

এই হাহিমেই পরিচয় হল ডাঃ মারাকের সঙ্গে। বয়েস ষাটের দশকের মাঝামাঝি। জাতিতে খাসি। এক সময়ে ছিলেন সরকারী ডাক্তার। এখন অবসর নিয়ে হাহিমেই প্র্যাকটিস করছেন। ওঁর এক ছেলে জিওলজিকেল সার্ভে অভ ইনডিয়ায় জিওলজিস্টের কাজ করছেন। আছেন শিলং-এ।

পরিচয় হতেই ডাঃ মারাক বললে আসুন না। আমার কুটিয়ে বসে একটু চা খেয়ে যান।

উদাত্ত আহ্বান। তবু ইতস্তত করেছিলাম একবার। এখনও অনেকট পথ যেতে হবে। সেই সোনা পাহাড় পুরো পথই পার্বত্য, বন্ধুর। বেশি রাত হলে, বিশেষ করে পথে যদি বৃষ্টি নামে অসুবিধে হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু বৃদ্ধ ডাঃ মারাকে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারি নি শে পর্যন্ত। আর পরে মনে হয়েছে উপেক্ষা করলে ভুলই করতাম। জনৈ বন্ধু বলেছিলেন, খাসি হিলসের গহ অঞ্চলে যারা বাস করে, তারা এ একটি পাথর। মানুষ পাথর। কিন্ ডাঃ মারাক খাসি হলেও তাঁর মা যা পেলাম, কই, তা তো পাথর নয় ?

সোনাপাহাড়ের গল্প তাঁর মুখে প্রথম শুনলাম। ডাঃ মারাক যখ ছিলেন বালক, ইংরেজ সাহেবরা এ পথ দিয়েই যেত সোনাপাহাড়ে তাঁদের আনাগোনা তাঁর কাছে কো রহস্যজনক লাগত তখন। [ক্রমশঃ

সামনে ঘোড়সওয়ার

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এই করতে-করতে
এই করতে-করতে
তারপর,
কখন এক সময়
দুম দুম করে দামামা বেজে উঠবে।

এখন,
মেলায় মজে আছ তাই,
খেলায় জমে আছ তাই,
দোলনায় দোল খাচ্ছ তাই;
ভাবছঃ
ও কিছু নয়।

কিছু হয়,
তাক বুঝে তখন
ঠিক পাখা মেলে দেব।

আরে,
আকাশ হা-হা করে হাসে,
তাকিয়ে দেখ।
বাতাস খা-খা করে কাশে,
কান পেতে শোনো।
উঠোনের নটে-গাছটাও বিলকুল মুড়োনো
এই চৈত্র মাসে।
দিকে দিকে শুকনো পাতা উড়ছে,
রগরগে ধুলো মাথা খুঁড়ছে।
ভাঙা মৌচাক,
ডাকে কাক
আর অনবরত ঢাকের কাঠি ঘুরছেঃ
গুরু-গুরু, গুরু-গুরু।

এই করতে-করতে
এই করতে-করতে,
এমনি ছোঁয়াতে-ছোঁয়াতে
ধোঁয়াতে-ধোঁয়াতে,
ধরতে-ধরতে, নিভতে-নিভতে

তারপর,

কখন এক সময়,
দপ ক'রে জ্বলে উঠবে—
দাবানল।

পা বাড়াবে,
সামনে ঘোড়সওয়ার।

সম্মুখে স্নিগ্ধ স্তব্ধ

সুধেন্দু মল্লিক

যদি গাছ থেকে ঝরে যায় সব পাতা
মেঘ সরে গিয়ে জ্বলন্ত আঘাতে যদি দু'ভাগ
হয়ে যাই! আজন্ম ভয়ের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে
ধরে থাকি এক কাঁটাওলা বিষপোকা
যেন টোকা দিলে উড়ে যাবে এক বিহ্বল প্রজাপতি।

যে মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সহসা একদিন
ছুটে এসেছিলাম নগ্ন অসহায়, তুমি কি বলতে
পারো সে কেমন মা! তুমি কি বলতে পারো
আজো তার কোলে আমার ছোট্ট কাঁথার আচ্ছন্ন
বিছানা তেমনি মেলা আছে কিনা!

কি অদ্ভুত আনমনা ছেলে তুমি! হাত ভরে
যা দিলাম—তোমার অসাবধান মুঠির ফাঁক
হতে সব পড়ে গেল, কিছু নিয়ে গেল
ঝড়ের হাওয়া।
আজ আমি সম্পূর্ণ নিরভিমান।
তোমার পদ্ম কুঁড়ির পায়ে রেখে যাই
আমার চুম্বন আমার নিশ্বাসের বাষ্প।
দ্যাখো কি ভারমুক্ত প্রসারিত আকাশে
ছড়িয়ে পড়ছে আমার হাত, আমার দৃষ্টি
আমার চেতনা।

সম্মুখে স্নিগ্ধ স্তব্ধ। ভালোবাসার
প্রখর আলোগুলি নিভিয়ে দাও। শুধু
রাখো রাখো সেই মৌন প্রদীপ যা কবে জ্বলেছিলো
আমার আপন মায়ের চোখে।

"কল্পধারা"—(৮৬×৮৬ সি এম তেলচিত্র)—শুভপ্রসন্নের আঁকা। জন্ম ১৯৪৭। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৬৯)। সেণ্ট পলস স্কুলের চিত্রশিক্ষক। দেশে বিদেশে প্রদর্শনী করেছেন। আইফেকস পুরস্কারপ্রাপ্ত। নীচে মৃৎপাত্রে রাখা গাছের পাতা। চেয়ারে স্তূপীকৃত কাপড়। দেওয়ালের ছবিতে সুন্দরী বুকে রাখা নির্জন হাত। বাস্তব কল্পনায় সূক্ষ্ম রেখা রঙের অবকাশ।

গোষ্ঠীপতিরা সবাই এসে গেছেন...
লঙ্গোর লিয়োন্টো... ওয়াম্বেসির ওয়াম্বাটো
... মোরির মুগাট্টো... উংগানের ওবিজু...

পাহাড় দেশের রাজারাও এসেছেন...
টিরানা... কোমুর... মোলান্ডা...

মজ-বুড়ো ঘোষণা করছে, কে কে এলেন.....
রাজকুমার লোথার,
মিঃ ম্যানড্রেক,
কর্নেল ওরুবু...

..ডঃ অ্যাক্সেল...
ভয় পেও না, হিজ...
হিজ্জ্
ওরেব্বাবা! এ আবার কে?

দয়া করে আপনারা বসুন... এখুনি অনুষ্ঠান শুরু হবে।
12/4

গুরন, বড্ড নার্ভাস লাগছে যে!
অরণ্যদেব, বিয়ের নামে দেখছি সেরা বীরপুরুষেরও ভয় ধরে যায়।

বামন সর্দার গুরন ওই বরকে নিয়ে আসছেন।

কনেকে নিয়ে আসছেন মিস টোগামা
... কনে এসেছেন সমুদ্রের ওপার থেকে...
আগামী সপ্তাহে বিবাহ
১৭

শোকগৃহ

অমল আচার্য

ছত্রিশের গাঁট ছাড়াতেনা মাত্র শৈলেশ্বরের ছিপছিপে চেহারা এমন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে যে, সাধ্যমত দৌড়ঝাঁপ করেও সে বাসের নাগাল পেল না। বাস ছেড়ে দিল। পরের বাস আসতে আধঘন্টা। অথচ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বলেই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছে সে। বাড়িতে অসুখ।

মাসের শেষ, ট্যাক্সিতে অনেক খরচ। এ রুটে মিনি বা ডি-লাক্স নেই যে তাড়াতাড়ি করা যাবে। সুতরাং পরের বাস ছাড়া উপায় নেই কোনো। শৈলেশ্বর সিগারেট ধরালো একটা।

তেমন শীত না পড়লেও, শীতের সন্ধে। শীতের অন্ধকার একটু ভারিই হয়ে থাকে। কলকাতার নিয়নও তাকে ধুয়ে ফেলতে পারে না পুরো। কেমন যেন আবছা লাগে লোকজন, গাড়িঘোড়া, দোকানপাট। হঠাৎ হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস পৃথিবীর শরীর থেকে উঠে এসে মন-মেজাজ তছনছ করে দেয় বিষণ্ণতায়। শৈলেশ্বরের তখন বড় একলা মনে হয়। হু হু করে ওঠে ভেতরটা।

শৈলেশ্বর, বাস-স্টপে পায়চারি করছিল অন্যমনস্ক। হাতের সিগারেট ধাঁক ধাঁক করে পুড়ে যাচ্ছিল দ্রুত টানে। এমন সময় কিন্নর এসে বলল, চলুন।

কিন্নরকে দেখা মাত্র শৈলেশ্বর দোকলা হয়ে গেল। খুশি হয়ে উঠল খানিক। বলল, কোথায় ?

—রতনদের বাড়ি। কিন্নর সিগারেট চাইল একটা।

কিন্নরের হাতে সিগারেট তুলে দিয়ে শৈলেশ্বর বলল, বাড়ি যাব। ভাল্লাগছে না—।

কিন্নর বিপুল বিস্ময়ে শৈলেশ্বরকে দেখল খানিকক্ষণ। এত সকাল সকাল একটা সুস্থ মানুষ বাড়ি ফেরে কি করে, সম্ভবত খতিয়ে দেখছিল সে। কিন্নরের বয়েস চাব্বিশ কামড়েছে সবে। অনেক টালবাহানার পর বি-এ পাশ করেছে এবার। কাজকাজ নেই কিছু। চেষ্টা-চরিত্তিরও নেই তেমন। সাহিত্য করে বেড়ায়, বস্তুত সর্বক্ষণ। গোঁফে কাঁচা রঙ থাকলেও জটিল সাবালকত্বে সেয়ানা কিন্নর। তার সংগে মালটাল খায় শৈলেশ্বর, নিতান্তই শখে পড়ে। শৈলেশ্বরও ইদানীং সাহিত্যটাহিত্য করে থাকে।

—রাজা ওয়াদিপাউস। রুণা লায়লার গান। দারুণ জমবে, দেখবেন। কিন্নর টোপ দিল। শৈলেশ্বরের গলায় আটকে গেল বঁড়শি। বঁড়শিতে শৈলেশ্বরকে নিপুণ টানে গেঁথে নিয়ে কিন্নর এগিয়ে চলল, সামনেই রতনের বাড়ি।

রতনও শৈলেশ্বরের অসম বয়েসী বন্ধু, কিন্নরের মারফত। বার দুয়েক রতনের বাড়ি গিয়েছে শৈলেশ্বর, কি কারণে মনে নেই। তবে স্বাচ্ছন্দ্য পায়নি মনে আছে স্পষ্ট। কেমন যেন এক ছন্নছাড়া গোছের ব্যাপার মনে হয়েছে তার।

দোরগোড়ায় এসে কিন্নর বলল, রতনের বাবা মারা গেছে, জানেন তো ?

—সেকি ? শৈলেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুখে নিষ্পাপ হাসি ফুটিয়ে বলল কিন্নর, মানুষ কি মরে না ?

সদর দরজা পেরোলেই ডানদিকে একটা বড় ঘর। সবকটা জানলা খোলা। সাবেকি আমলের ডবল-বেড খাট। খাটে মাঝবয়েসী কিছু মহিলা, জাঁকিয়ে গল্প চালাচ্ছে। রতনের মা বাজুতে পিঠ রেখে বসে আছেন। কাঁচাপাকা চুল চিরে চওড়া সিঁথি সদ্য সিঁদুরহীন। শুকনো মুখ। চোখের নিচে জমাট ক্লান্তি। হাসছিলেন তিনি।

পাশের বাড়ির বড় খুকীর মা নাতির গল্প শোনাচ্ছিলেন। নাতির শখ দিদাকে বিয়ে করা। রোজই দশবার করে বিয়ের হুজুগ তোলে। বাধ্য হয়ে দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে, আসছে রোববার। ওইদিন নাতির জন্মদিন।

দাসগিন্নীর মেয়ের বিয়ে সামনের মাসে। ছেলে ব্যাংকে কাজ করে, এম কম। বাপের একই ছেলে। কলকাতায় তিনতলা বাড়ি। অমিতাভ বচ্চনের মত দেখতে ছেলেকে (দাসগিন্নী অমিতাভ বচ্চনের ফ্যান)। ফ্রীজ, টেলিভিশন, স্টীরিও, বিশ ভরি সোনা, আর নগদ হাজার পাঁচেক রফা হয়েছে। এছাড়া অন্য দানসামগ্রী তো আছেই। কর্তা তাতেই রাজি। ভাল ছেলের জন্যে এটুকু করতেই হয় (দাসবাবুর লোহালক্কড়ের ব্যবসা)। দাসগিন্নী কথাগুলো বলে থামলেন একটু। তাঁর চোখ দুটো ঝকঝক করছিল ব্যাঙের চোখের মত। ঘরের অন্য সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল।

শুধু রতনের মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আচমকা। তাঁর ছোট মেয়ের বয়েস সবে তের। কর্তা চলে গেলেন।

এমন সময় রীণা ট্রে করে চা নিয়ে এলো। রীণা তাঁর বড় মেয়ে। বছরখানেক হল বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছে এক যুবককে, ভালোবাসা-বাসির ব্যাপার। রতনের বাবা মেনে নিতে পারেননি। তাই এ-বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল এতকাল। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছে। রীণা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সব।

রীণা লাল শাড়ি পরেছে, লাল ব্লাউজ। কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ। শ্যাম্পু করা চুলের খাঁজে সিঁদুরের চওড়া টান। ঠোঁটে আলতো লিপস্টিক।

রীণার শরীরে লকলক করছিল চব্বিশের আগুন।

দাসগিন্নী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন : জামাই যেন কোথায় কাজ করে বাছা ?

—ব্যাংকে। রীণা চা দিয়ে চলে গেল অন্য ঘরে।

দাসগিন্নীর ঝকঝকে চোখে কাল-বাদলার ছায়া পড়ল।

টুকটুকির মা চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ তিনি চুপচাপ ছিলেন, একটাও কথা বলেননি। বললেন, চলি ভাই। ও'র অফিস থেকে ফেরার সময় হল। বাড়ি ফিরে না দেখতে পেলে রক্ষে থাকবে না। বড়খুকীর মা, দার্সাগন্নী একসঙ্গে কচি মেয়েদের মত হেসে উঠলেন। রতনের মাও। হো হো হাসি শুনে তের বছরের সুমি পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো। মা হাসছে ঠিক তার মত। সেদিন চড়াইভাতি করতে গিয়ে সে বন্ধুদের সঙ্গে ওরকমই হাসাহাসি করেছিল। তখন কি জানত সুমি, বাবা হঠাৎ করে মরে যাবে? টেবিলে বাবার ছবিটায় মালা পরিয়েছে সুমি। ধূপদানিতে একগোছা ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল অনেকক্ষণ আগে। বাবার প্রিয় ধূপ। সেগুলো পুড়ে ছাই।

সুমির চোখের কোণে আলপিন ঢুকিয়ে দিল কেউ।

শৈলেশ্বরকে দেখে রতনের ছোটভাই যতন চেঁচিয়ে উঠল। শৈলেশ্বর হকচকিয়ে গেল। শৈলেশ্বর জানে যতন উড়ো খৈ। রতনের মুখে শুনেছে। কিছুদিন আগে পাড়ায় এক মেয়েঘটিত মারামারিতে ফেঁসে গিয়ে হাজতবাস হয়েছিল একমাস। রতনের বাবা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ সব ব্যাপারে তাঁর করার কিছু নেই। কোর্ট-কাছারি তিনি পারবেন না। রতনের বড় দু'ভাই ব্যাপারটায় উদাসীন থেকে গেছে পুরো। অনেক খরচা, হুজ্জোত—সময় নেই তাদের। বাড়াবাড়ির উচিত শিক্ষা হয়েছে, ভালই হয়েছে। শেষবেশ রতনকে প্যালা সামলাতে হয়েছে গায়ে-গতরে, টাকা পয়সা খরচ হয়েছে আর গোপন তহবিল থেকে। হাজত ফেরতা যতন, বাড়িতে থেকেও অন্য সকলের সঙ্গে সম্পর্কহীন—রতন, সুমি, মা ছাড়া।

যতন এগিয়ে এলো শৈলেশ্বরের দিকে। অনেক দিন বাদে এলেন। হাসল যতন।

যতনের বন্ধুরা হিহি হাহা হাসছিল কোনো প্রসঙ্গে। সিগারেট ফুঁকছিল আর কথা বলছিল। একজন টুইস্ট দিচ্ছিল বিশেষ ভঙ্গীতে।

শৈলেশ্বর একটা ছোটো দ্বীপে কিছু মানুষ দেখেছিল একবার। বাঙলাদেশের উদ্বাস্তু মানুষ। অর্ধউলঙ্গ, অর্ধভুক্ত। বাঁচার আশায় তারা ঘর বেঁধেছিল দ্বীপে। একে অপরকে টেনে রেখেছিল গভীর মায়ায়। প্রকৃতির ঝুঁকি সহ্য হল না। সমুদ্র একদিন হেঁচকাটানে তাদের সকলকে নিজের পেটে পুরে নিল।

শৈলেশ্বরের মনে হল যতনের বন্ধুরা বুঝি কোনো অলৌকিক দ্বীপবাসী। তবে তারা সামাজিক পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কের ফিতে কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছে স্বেচ্ছায়। গভীর মায়ায় তারা একে অপরকে টানে না। স্বার্থপরের মত নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চায় শুধু।

যতনের কাঁধে চাপ দিয়ে শৈলেশ্বর এগিয়ে গেল। কথা বলল না।

সুমি যতনের সামনে এসে দাঁড়াল। তার নজর গিয়ে পড়ল, খোকা, নাটু, বাচ্চুর ওপর। যতনের বন্ধুরা। সুমির চোখে শীতের গাঢ় সন্ধ্যে কাজল লেপে দিল। ঠোঁট কাঁপল সুমির। তাকাল যতনের দিকে। যতন সুমিকে কাছে টেনে নিল।

আদর করে বলল, খেলতে যাসনি?

শৈলেশ্বর কিন্নরকে জিজ্ঞেস করল, রতন আছে তো?

—থাকবে।

—আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না।

—কেন?

—এ রকম অবস্থায় অস্বস্তি লাগে।

—আপনি বেশি ভাবছেন।

—রতনদের বাড়িটা বেশ বড়। অনেক ঘর।

—ওর বাবার পৈতৃক বাড়ি। বাড়াননি কিছু, দু'একবার প্লাসটার বা রঙ করা ছাড়া।

—রতনের বাবা খুব খেয়ালী মানুষ ছিলেন, তাই না?

কিন্নর থমকে দাঁড়াল। কেন, বলুন তো?

অতনুর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কালো হুলো বেড়ালটা গোঁত্তা মেরে দরজা ফাঁক করে ঢুকে গেল ঘরে। রতনের বাবার শেষ জীবনের সঙ্গী ছিল বেড়ালটা। বাজার থেকে রোজ পঞ্চাশ গ্রাম মাছ আসত তার জন্যে। নিজের ভাগের দুধটুকুও খাওয়াতেন তাকে। রাতে রতনের বাবা-মার মাঝখানে বেড়ালটার ঘুমনোর জায়গা পাকাপাকিভাবে বরাদ্দ হয়ে গিয়েছিল এক সময়।

বেড়ালটা রতনের বড়দা অতনুর দিকে তাকিয়ে ডাকল, ম্যাও—।

অতনুর বউ বলল, আপদ।

বেড়ালটা গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সুমি তাকে কোলে করে চলে গেল ছোট্ট বাগানটার দিকে। তার বাবার তৈরি। ফুল আজও ফোটেনি একটাও। সুমির বড় দুঃখ।

অতনু চুপ করে বসে ছিল। কথা বলছিল তার বউ, সাধনা। গোলগাল ভারি চেহারা সাধনার। কথা বলার সময় হাত নাড়ে প্রচন্ড। অভ্যেস। সাধনা বলছিল, তোমার মেজভাই-এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলো।

—কি হবে বলে?

—বা, তার দায়দায়িত্ব নেই? তার কি বাবা না?

—তাহলেও আমাকে বেশিটা করতে হবে।

—তা কেন? সেও তো চাকরি করে?

—আমি তো বড়!

—এই করে নিজের বুঝটা এখনো শিখলে না। বুবুল বড় হচ্ছে খেয়াল

আসলেই অতনুর দাড়ি হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাঁচাপাকার মিশেল! সব সময় কুটকুট করে গাল। চুলকোয় ভীষণ। অতনুর রোজ দাড়ি কামানোর অভ্যেস। দাড়ি চুলকোচ্ছিল অতনু আর ভাবছিল, বাবার মৃত্যুতে সংসারের একটা আয় কমে গেল। পেনসান পেতেন বাবা। টাকাটা সংসারে লক্ষী হত। এখন থেকে আর হবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের মোটা অংশ বাবা জীবৎকালেই সংসারের পেছনে ফোঁত করে দিয়েছিলেন, প্রমাণ আছে। সামান্য যা কিছু আছে মার নামে ফিকসড। সুমি আছে। রীণা যা হোক...।

সাধনার তপ্তকণ্ঠ, তোমার ধর্মের ষাঁড় ভাইদুটো বাপের হোটেলে খেত, এখন ?

সাধনার কথায় অতনুর রাগ হল। ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো।

সাধনার গোলগাল চেহারা দোচকে উঠল। বলল, আঁতে ঘা লেগেছে যে—।

সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। বেড়ালটা কেন যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে সুমির কোল থেকে পালিয়ে গেল।

সুমি ডাকতে লাগল, আয়, আয়—।

রতনের মেজদা বচন চিঠি লিখছিল বউকে। তার বউ রাঁচি বেড়াতে গেছে পাঁচ ছ'দিন আগে, তার বাবা-মার সংগে। থাকবে কিছুদিন। বচন লিখছিল :

দীপা,

তিনদিন হল বাবা মারা গেছেন হঠাৎ। যেদিন সকালে মারা গেছেন, সেদিনই আমার রাঁচি একসপ্রেস ধরার কথা। ফ্যাকটরিতে ছুটি মঞ্জুর করিয়েছিলাম, টিকিট কাটাও হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, হঠাৎ গিয়ে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব। কিন্তু তার আগে বাবাই সারপ্রাইজ দিলেন। ছকে রেখেছিলাম তোমাকে সংগে করে হুড্রু ফলস যাব, টেগোর হিলস-এর চুড়োয় উঠব, নেতারহাটে দু'রাত কাটাব। রাজগীর গিয়ে হট-স্প্রিং-এ চান করব দুজনে। টাটার জুবিলি পার্ক দেখব। সব ভেস্তে গেল। বাবার বয়েস হয়েছিল, মরতেন। কিন্তু কয়েক-দিন পরে মরলে কি এমন ক্ষতি হত তাঁর, বুঝতে পারছি না।

বাবার স্ট্রোক হয়েছিল। তবে ঘাবড়িও না। এখানে ঝুটঝামেলার পাট চুকিয়েই রওনা হচ্ছি।

এমন সময় সুমি এসে বলল, বড়দা ডাকছে তোমাকে।

—কেন ? বিরক্ত হল বচন।

—জানি না।

—বলগে, পরে যাচ্ছি।

সুমি দাঁড়িয়ে রইল।

—কিরে, গেলি না ?

—তুমি মেজবউদিকে চিঠি লিখছ, মেজদা ? সুমির চোখ মেজদা-মেজবউদির ছবিতে আটকে থাকল।

মুখে তাজা হাসি ফুটিয়ে রতন বলল, আরে শৈলদা যে, আসুন আসুন—। শৈলেশ্বর দেখল রতন একটুও বদলায়নি। ও দাড়িগোঁফ কোনো-কালেই ছাঁটে না, চুলে তেল দেয় না, মাথায় চিরুনি দিলে বড়জোর দু'বার। সুতরাং ওদিকটা ঠিক আছে। চশমার নিচে উজ্জ্বল চোখ দুটো কবিতায় ভরা। ধরা-চুড়া পড়ে থাকার দরুণ যা-কিছু হেরফের রতনের চেহারায়।

শৈলেশ্বর সহজ হতে পারছিল না। মৃত্যু-টৃত্যু ঘটে গেলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সমবেদনা জানাতে আসে, রেওয়াজ। তার ভাষাই আলাদা। অনেকে এ সব ব্যাপারে এমনি রপ্ত যে, সুন্দর ম্যানেজ দেয়। শৈলেশ্বর একদম আনাড়ি। একমাত্র পিসী মারা গেলেও পিসীর বাড়ির ছায়া মাড়ায়নি শৈলেশ্বর বহুদিন। কিন্তু পিসীর জন্যে কষ্ট হয়েছে তার। চোখের পাতা ভিজেছে বারবার।

শৈলেশ্বর খাটের কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। এক গেলাস জল পেলে ভাল হত। জল চাইতে পারল না শৈলেশ্বর। বিপন্ন বাড়ির যে কেউ তার জন্যে বিব্রত হোক সামান্যতম, শৈলেশ্বর ভাবতে পারে না।

রতন চেঁচিয়ে ডাকল রীণা, রীণা—দেখে যা, কে এসেছে—।

রীণার কণ্ঠ উড়ে এলো, যাচ্ছি, একটু দেরি হবে। মাসীমা এলেন।

রীণার সংগে শৈলেশ্বরের প্রথম আলাপ কোনো এক সন্ধ্যায়, এক স্কুল বাড়িতে। রীণা সেদিন টেরিফিক মুড। ড্রিংক করেছিল ও আর প্রণবেশ, এখন রীণার স্বামী।

শৈলেশ্বর সিগারেট ধরাল।

কিন্নর জিজ্ঞেস করল : অবেলায় ঘুমোচ্ছিলে কেন, তুমি ?

—রাতে জাগব বলে। রতন হাসল।

—কেন ?

—কাল থেকে পরীক্ষা, একটু দেখে নিতে হবে না ?

—কি পরীক্ষা ? শৈলেশ্বর জানতে চাইল।

—পার্ট টু, অনার্সের ব্যাক পেপার।

শৈলেশ্বরের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। আজকাল প্রায়ই হয়। লো প্রেসার। ডাক্তার দিয়ে চেক করিয়েছে।

—লায়লার রেকর্ড চালাও। শৈলদা শোনেনি, কিন্নর।

—খুব ভাল লাগবে আপনার। রতন রেকর্ড চালিয়ে দিল।

শৈলেশ্বর অবাক হচ্ছিল কাণ্ডকারখানা দেখে। মৃত্যুর গন্ধ যে-বাড়ির বাতাসে লেগে রয়েছে তখনো, সেখানে গান ? কুঁকড়ে যাচ্ছিল শৈলেশ্বর। তার তো বয়েস হয়েছে ? বাড়ির লোকজন ভাববে কি ? মাথা ব্যথাটা তার নয়, তবু তার যেন। অথচ কিছু বলতেও পারছিল না শৈলেশ্বর। কিছু বলতে গেলেই হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চিত, কিন্নর রতন বিদ্রূপ করবে তাকে। প্রায়ই করে থাকে তারা। তাদের হিসেবে ভুল থেকে যায়, শৈলেশ্বর ছাব্বিশ টপকেছে আর তারা বড়জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। মাঝখানের সাঁকোটা ধসে গেছে যে।

রীণা ডাকল, কিন্নরদা, শোনো—।

রতন বলল, এই রীণা, ডাকছি না তোকে ?

—চা নিয়ে আসছি একেবারে।

—তিনটে। আমারটা ভাঁড়ে কিন্তু—।

—আচ্ছা।

কিন্নর উঠে গেল। রেকর্ড পাল্টে দিল রতন।

রীণা চা করছিল রান্নাঘরে। কিন্নর কাছে গিয়ে বসল। এবাড়িতে কিন্নরের কোনোকিছুতে বাধানিষেধ নেই। থাকলেও গ্রাহ্য করে না।

কিন্নর বলল, ডাকছিলে কেন ?

রীণা বিশাল চোখ তুলে তাকাল কিন্নরের দিকে। ওই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে এক সময় ভালবাসত কিন্নর। কিন্নর যখন জেলে ছিল, হ্যাঁ কিন্নর এক সময় রাজনীতি করত। দেশ তখন এক জটিল রাজনীতিতে ভাসছে। ক্রমপন্থী রাজনীতি তখন হতচ্ছাড়া। বিভুল স্বপ্ন, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। একটা বাহু ভূমি ছেড়ে চরম দিকে ছুটছে, শেষ পর্যায়ে লক্ষ্যহীন হলেও, যেন মূল ধরে টান দিচ্ছিল। কেঁপে উঠেছিল সব কিছু। যেন ভিসুভিয়াস বহু-কাল পর জেগে উঠেছে আবার। সেইকালে কিন্নরের মত দেদার ছেলে কমিটেড রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়ে, কিন্নরও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল সব। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল, অনেক ত্যাগ, অনেক জীবন, অনেক সময় অপহৃত হল, মুক্তির দশক আতঙ্ক হয়ে ঝুলে রইল ইতিহাসে। কিন্নর অবশ্য এখনো বিশ্বাস রেখেছে, কোনোকিছুই বিফলে যায় না। একটা না একটা অর্থ থেকেই যায়। সব কিছুরই প্রয়োজন থাকে সংসারে।

কিন্নর যখন জেলে ছিল, মাঝে মধ্যেই সে খুঁজত রীণার চোখ। তার যেন কি একটা মানে ছিল তখন। সময় দাঁড়িয়ে থাকে না, জীবনও থাকে না, তলে তলে বদলে যায় ভীষণ। রীণা বদলে গেল, বদলে গেল কিন্নর। তবু কি যেন থেকে গেল, থেকেই যায় বুঝি, অন্তত রীণার উৎসুক বিশাল চোখের দিকে তাকিয়ে, যে চোখের দিকে তাকিয়ে কিন্নর সময় হারিয়েছে জীবনযাপনের দাঁড়ির কাঁটায়, একদা বিস্তর সুখ-কল্পনা—কিন্নরের নিশ্চিতভাবে মনে হল এখন।

—কেমন আছ, কিন্নরদা ? অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে।

রীণা যেন কিন্নরের গভীর গোপনে হাত দিল নিষ্ঠুরভাবে। রীণার সরু আঙুলের অধিকতর সরু নখ কিন্নরের হৃদপিন্ড, হৃদপিন্ডের আশপাশ কোমল জায়গায়, সূক্ষ্ম শির-উপশিরার পিচ্ছিল শরীরে বিঁধে গেল খানিক। চিন্-চিনে ব্যথা সমস্ত শরীরে বয়ে নিয়ে গেল রক্ত, আবার তুলে আনল হৃদপিন্ডে। এ সব ঘটে গেল নিঃশব্দে।

কিন্নর সিগারেটের মশলা ফেলে দিয়ে গাঁজা ঢোকাচ্ছিল তাতে। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভরাট করছিল সিগারেট।

বলল, প্রণবেশ আসেনি ?

—অফিস থেকে ট্রেনিং-এ পাঠিয়েছে, এলাহাবাদ।

কিন্নর দু'নম্বরী সিগারেট ধরাল।

—গাঁজা ছাড়নি ?

—না।

—মদ ?

—এই জন্যে ডেকেছ ?

—রীণা ম্লান হাসল। চা-পাতা ভিজিয়ে বলল, লেখালেখি করছ তো ?

—ইচ্ছে হলে লিখি একটু আধটু।

—পত্রিকা বার করছ না ?

—না।

—কেন ?

—পয়সা নেই।

—আগে করতে কি করে ?

—বন্ধুরা চাঁদা দিত।

—এখন ?

—কত কাল দেবে ? ওরাও তো বেকার!

—তুমি চাকরি-বাকরি দেখছ না ?

—রেডিমেড জামাকাপড়ের ব্যবসা করব ঠিক করেছি। আসামে। কলকাতা থেকে মাল নিয়ে যাব। সাপ্লাই বিজনেস। আড়াইশো টাকা দিয়ে মালপত্র করে নিলেই হল।

রীণা হেসে উঠল ফুমুল। হাসি থামিয়ে বলল, ভালই তো।

কিন্নর [illegible]

—ওমা উঠছ নাকি ? ...

—যাই, শৈলদা বসে আছে।

রীণা কাপ গোছাতে গোছাতে বলল, আমার ঘর-সংসার দেখতে যাবে না একদিন ?

—ও সব বুঝি না আমি।

—লোকে বেড়াতেও তো যায় ?

হাসল কিন্নর। সময় কই ?

—কি আমার কাজের লোক! কটাক্ষ করল রীণা। সারাদিন টইটই করা তো কাজ। আর, আজ এখেনে কাল সেখেনে, এই তো করে বেড়াচ্ছ! সব খবর রাখি মশাই!

রীণা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রতনের ঘরের দিকে যেতে যেতে কিন্নরের মনে হল, রীণার চোখে জলও ছিল বোধ হয়।

শৈলেশ্বর গানে বুঁদ হয়ে ছিল। রেকর্ড থেমে গেছে। রতন ইচ্ছে করেই শৈলেশ্বরকে ডাকে নি। সে জানলার পর্দা সরিয়ে আকাশ দেখছিল, হয়ত নক্ষত্র গুণছিল। কিন্নর দুজনকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে বলে উঠল : মুণার এফেক্ট! হতেই হবে। বুঝলেন শৈলদা, এই মুণা না—, ওফ্, ওকে খুন করে ফেলব। আমার হাতে ওর মৃত্যু!

শৈলেশ্বর ফিরে এলো শৈলেশ্বরে।

—এই রতন, অয়দিপাউস কি হল ? কিন্নর জিজ্ঞাসা করে।

—ব্যাটারি কাজ করছে না।

শৈলেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল কিন্নর, আপনার কপাল খারাপ।

শৈলেশ্বর ফাঁকা হাসি হাসল।

—ও রকম গুম মেরে আছেন কেন, কথা বলুন ? খাটে আধশোয়া হয়ে গুনগুন করে গান ধরল কিন্নর। শৈলেশ্বর খবরের কাগজ টেনে নিল। পড়ছিল না ঠিক, হেডলাইনগুলো দেখে যাচ্ছিল।

—ভাল আছেন ? শৈলেশ্বরের দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করে হাসল রীণা। চা এনেছে।

শৈলেশ্বরের পাশে বসে রীণা কথা বলতে লাগল। কিন্নর ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল, আর চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। রতন তিনবারের চেষ্টায় সিগারেট ধরাতে পারল একটা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল রতন, একটা গান করবি রীণা ?

—তুমিও গলা মেলাবে, বল ?

সুমি দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

সুমি দরজায় মাথা রেখে দাঁতের ফাঁকে বুড়ো আঙুল কামড়াচ্ছিল। কিন্নর ইশারায় কাছে ডাকল। সুমি না, চলে গেল।

রতনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় শৈলেশ্বরের সঙ্গে প্রথম দেখা হল অতনুর। রতন আলাপ করিয়ে দিল।

অতনু বলল, রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। বাবার কাশি কানে আসে। রাতে কাশি হত বাবার।

বচনের সঙ্গে আলাপ হতে বলল, রোজ ভোর পাঁচটায় ফুলের বাগানে কাজ করতেন বাবা। বাগানের পাশের ঘরটাই আমার। ঘুম ভেঙে যেত। রাগ হত খুব। কিন্তু ঠিক সময় ফ্যাক্টরিতে পৌঁছতে পারতাম। এখন আর ঘুম ভাঙে না—

বচনের কথা শেষ না হতেই লোড-শেডিং নামক জন্তুটা ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল রতনদের পাড়ায়। রতনদের বাড়িটা গলির মধ্যে, চারদিক থেকে অন্ধকার ছুটে এসে ঘিরে ফেলল বাড়িটা, চাপা পড়ে গেল অন্ধকারে। নিত্যকার ব্যাপার গা-সওয়া হয়ে গেছে লোকের। অন্ধকারেও দিব্যি হাঁটাচলা, লেখাপোনা, কথা-বার্তা হয়ে যায়, ভ্রূক্ষেপ থাকে না কোনো।

রতনের মা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধূপের গন্ধ ঘরের বাতাসে মিশে আছে তখনো। নাকে এসে ঢুকছিল ক্ষীণভাবে। শৈলেশ্বরকে বললেন, খুব একা মনে হচ্ছে নিজেকে।

শৈলেশ্বর তাঁর মুখ ভাল দেখতে পেল না। ভারি নিশ্বাসটা শুনতে পেল শুধু।

সামনে রতন, পেছনে শৈলেশ্বর, কিন্নর রীণা তার পেছনে পর পর। ওরা সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। রতন চুপ করে আছে, শৈলেশ্বরও। শৈলেশ্বরের মাথাটা অসম্ভব ভার হয়ে উঠেছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তার। এ বাড়িটা থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার তাড়নায়, খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে এক বুক নিশ্বাস টানার আকাঙ্ক্ষায় তার মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল অস্থিরতা।

রীণা বলল, তুমি খুব বদলে যাচ্ছ, কিন্নরদা........

রীণার কথায় কিন্নর থেমে পড়েছিল এক মুহূর্ত।

রতনের পিঠে হাত রেখে শৈলেশ্বর বলল, চলি রতন—।

শৈলেশ্বরের হাত দুহাতে চেপে ধরে রতন বলল, বেশি রাত করে আড্ডা মারা যাবে না বাইরে। দরজা খুলে দেবে কে ? বাবা তো নেই—।

রতন কি যথার্থই হাসল অন্ধকারে ? ভাবতে গিয়ে ভয়ে ছ্যাঁক করে উঠল শৈলেশ্বরের বুক। পাঁচিলের ওপর কামিনীফুলের ডালের নিচে দুটো চোখ। ওঁত পেতে বসে আছে গভীরতর অন্ধকারে, গ্রাস করে নেবে। বিমূঢ় শৈলেশ্বর দাঁড়িয়ে থাকল কণকাল।

মোমবাতি হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সুমি। পথ দেখাল শৈলেশ্বরকে। মানুষের মধ্যে মিশে যেতে যেতে শৈলেশ্বর দেখল, সদর দরজায় ...

॥ ৭ ॥

অবসর জীবন কিভাবে কাটাবেন সরিৎশেখর কোনদিন চিন্তা করেন নি। সেই কোন ছেলেবেলায় চা বাগানে ঢুকে পড়ার পর এতটা কাল হু হু করে কেটে গেল, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাননি। চাকুরির মেয়াদ ফুরিয়ে আসার মুখে ভেবেছিলেন কর্মহীন অবস্থায় এই তল্লাটে আর থাকবেনই না। আজ ডুয়ার্সের সব লোক তাকে এক ডাকে চেনে যে জন্যে সেটা ক্ষয়ে যাবে বেকার ক্ষমতাহীন হয়ে বসে থাকলে। তার চেয়ে কলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে বাড়ি নিলে বেশ হয়, এ রকমটা ভাবতে শুরু করেছিলেন। হেম বলেছিল যদি এ দেশ ছেড়ে যেতেই হয় তো দেশে চলুন। দেশ বলতে সরিৎশেখর অবাক হয়েছিলেন। আজ প্রায় কুড়ি বছর তিনি নদীয়ার সেই গণ্ডগ্রামে পা বাড়ান নি, পিতা ষষ্ঠীচরণ দের রাখার পর সে ভিটেতে খুড়তুতো ভাইরা ধুঁকছে। নিজের একটা দেশ আছে এই বোধটা কবেই চলে গেছে। বোধ হয় বড়বৌ চলে যাবার পর থেকেই দেশ সম্পর্কে মায়া মমতা তাঁর নেই। তাছাড়া এতটা কাল সাহেব-সুবোদের সঙ্গে কাটিয়ে এখন ঐ গ্রামের জীবন তাঁর পোষাবে না। দেশ শব্দটা তাই তাঁর মনেই পড়ে না। অথচ হেমলতা কি সহজে দেশ বলল আবেগ আবেগ গলায়। বেচারা তো কখনো সে গ্রাম চোখেই দ্যাখেনি। বাবার ইচ্ছের কথা শুনে মহীতোষ বেঁকে বসল। আমাদের ছেড়ে আপনি আগে অতো দূরে চলে যাবেন—এ হয় না। আপনি যখন রিটায়ার করে আমার সঙ্গে থাকবেনই না তাহলে অন্তত কাছাকাছি থাকুন। সাপ্লায়ারদের বললে জলপাইগুড়িতে একটা জমির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিপদে আপদে আমরা যেতে পারবো। কিন্তু কোলকাতায় আপনি তিষ্ঠোতে পারবেন না। আর কিছু একটা হয়ে গেলে আমরা আফসোসে মরে যাব। কথাগুলোকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিলেন না সরিৎশেখর। শেষ পর্যন্ত বউমা বললেন, বাবা আপনি চলে গেলে অনির কি হবে? ও কার কাছে পড়াশুনা করবে?'

ক্লাস হয়ে গেল। সরিৎশেখর জলপাইগুড়ি শহরে জমি কিনলেন। মাত্র দু-হাজার টাকায় শহরের ওপরে এক বিঘের ওপর জমিসমেত দুটো কাঠাল গাছ, একটা আম আর অজস্র সুপুরি। এছাড়া একটা টিনের চালওয়ালা দু-ঘরের মাথা গোঁজার আস্তানা, যেটায় দিব্যি থাকা যায় কিছুদিন।

জমিটা রেজিস্ট্রী হয়ে গেলেই তিনি বড় ছেলে পরিতোষকে পাঠিয়ে দিলেন। এই ছেলে তাঁর রাতের ঘুম দিনের স্বস্তি কেড়ে নিতে যথেষ্ট। অনেক ঘাট ঘুরে সরিৎশেখরের অনেক পয়সা কাজে লাগাতে চাইলেন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল বাড়ির। দোতলার ভিৎ হবে. পাঁচটা শোবার ঘর, একটা হল, বসার ঘর, কিচেন, দুটো বাথরুম, একটু ডাইনিং স্পেস, মেয়েদের গল্প করার জন্য বেশ বড় ঠাকুরঘর। ম্যাকফার্সন সাহেবের সঙ্গে বসে বাড়ির প্ল্যান করা হল। ঘুপচি ঘর নয়, দক্ষিণের বাতাস যেন চিরুনির মত সমস্ত বাড়িটায় মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে এরকমভাবে জানলা দরজা বানানো হবে। পরিতোষ শহরে এসে বাড়ির তদারকি করবে দাঁড়িয়ে থেকে। কণ্ট্রাকটরকে বিশ্বাস নেই সরিৎশেখরের। ওদের কাজকর্ম তো চা বাগানের বিভিন্ন ব্যাপারে অষ্টপ্রহর দেখছেন। কাজ যদি সঠিক হতো তাহলে পুজো বা ক্রীসমাসে এত ভেট দিতে হতো না। সরিৎশেখর নিজের বাড়ি তৈরী করতে দিয়ে কণ্ট্রাকটরের কাছে ভেট চান না।

বাড়ি করার আগে সরিৎশেখর পরিতোষকে নিয়ে এক সকালে শহরে এলেন। পরিতোষের ইচ্ছা সে নিজেই মিস্ত্রি জোগাড় করে প্ল্যানমাফিক বাড়ি বানাবে—সরিৎশেখর একেবারে গৃহপ্রবেশ করবেন। কিন্তু ছেলের কথায় তাঁর আজকাল খুব ভরসা নেই। শহরে সরিৎশেখরের দেশের গাঁয়ের একজন আছেন যাকে তিনি বন্ধুর মত বিশ্বাস করেন—সেই সাধুচরণ হালদারের বাড়িতে পরিতোষ প্রথমটা আসতে চায়নি। কিন্তু সরিৎশেখর যখন সেখানে যাবেনই পরিতোষকে বাধ্য হয়ে সঙ্গী হতে হল।

রায়কতপাড়ায় ঢুকতেই সাধুচরণের কাঠ-সিমেনট মেশানো দোতলা বাড়ি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নদীয়া জেলার যেসব মানুষ পাকাপাকি বসবাস করছেন তাঁদের নাড়িনক্ষত্র সাধুচরণের জানা। দেশের খবরাখবর এবং ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য তাঁরা সাধুচরণের শরণাপন্ন হন। কদমতলায় ওঁর বিরাট স্টেশনারি দোকান এককালে রমরম করত। স্যার আশুতোষের মত গোঁফ তখনো কুচকুচে কালো, সরিৎশেখর শহরে এলেই দোকানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতেন। তা এখন বয়স হয়েছে সাধুচরণের, দুই ছেলে দোকানে বসে। বাড়ি বসে বন্ধকী কারবার করেন তিনি? সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো!

পরিতোষের এ বাড়িতে আসতে না চাওয়ার পেছনে যে কারণটা সেটা সরিৎশেখর জানেন। সাধুচরণের স্ত্রী এবং কন্যা উন্মাদ। স্ত্রী যতটা কন্যা তার দ্বিগুণ। বিবস্ত্র হয়ে যাতে না থাকে সে জন্যে পা অবধি ঝুল এবং তলায় বোতাম আঁটা এক ধরনের অর্ডারী সেমিজ মেয়েকে পরিয়ে রাখেন সাধুচরণ। মেয়েটি চিৎকার চেঁচামেচি করে না, কামড়ায় না। শুধু অঙ্গভঙ্গী করে এবং শব্দ না করে হাসে। পরিতোষ এর আগে দেখেছে সাধুচরণ মেয়েটাকে বারান্দায় এক কোণে চেয়ারে বসিয়ে তার খানিক তফাতে নিজে বসে অতিথির সঙ্গে কথা বলেন। সাধুকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার চোখ মেয়েটার দিকে যেতে সে শিউরে উঠেছিল। অত কুৎসিৎ করে কোন মেয়ে নিঃশব্দে হাসতে পারে সে জানতো না। আর তার ঐ প্রতিক্রিয়া দেখে সাধুচরণ খুব মজা পাচ্ছেন—যেটা পরিতোষ বেশ টের পাচ্ছিল। বোধ হয় মেয়েকে সামনে বসিয়ে অতিথিদের নার্ভের ওপরে একটা প্রেসার সৃষ্টি করে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে খেলা করেন। সেদিন সাধুচরণের স্ত্রী এসে তাকে চা দিয়েছিল। নিশ্চিত, ভদ্রমহিলা সেদিন কিছুটা সুস্থ ছিলেন। তবে তাঁর চোখ মুখ অসম্ভব লাল দেখাচ্ছিল। পরিতোষ শুনেছে ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, তখন তাকে ঘরবন্দী করে রাখা হয়—আবার টপ করে সুস্থও হয়ে যান। পরিতোষ এও শুনেছে এক জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছে বিয়ে দিলে মেয়ের এই পাগলামি সেরে যাবে। কিন্তু সাধুচরণ নদীয়া জেলায় সে ধরনের পাত্র ...

হল। রিক্শায় চড়া সরিৎশেখর একদম পছন্দ করেন না লাঠি হাতে লম্বা শরীরটা নিয়ে যখন হন হন করে হেঁটে যান, তখন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল তাছাড়া বাবার সঙ্গে হাঁটতে পরিতোষের ভীষণ অস্বস্তি হয়—ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে এমনভাবে সে হাঁটে যেন সরিৎশেখর তার কেউ না।

সাধুচরণ হালদার বাড়িতেই ছিলেন। সরিৎশেখরের গলা শুনে হাত জোড় করে হাসতে হাসতে অভ্যর্থনা জানালেন। চেয়ারে বসতে বসতে সরিৎশেখরের প্রথম কথা হল, 'বসো হে সাধু, তোমার সঙ্গে কথা আছে আর হ্যাঁ, মেয়েটাকে আজ বাইরে আনার দরকার নেই।' সাধুচরণ ঘাড় নাড়লেন, 'না না আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন, তাকে বাইরে আনার দরকার হবে না।'

পরিতোষ বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকালো। সরিৎশেখর খানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, আসতে হবে না কেন?'

'আজ্ঞে, ডাক্তার বলেছে ও আর বেশী দিন বাঁচবে না। আজন্ম শুনে এলাম পাগলরা দীর্ঘজীবী হয়—কিন্তু এ মেয়ে নাকি বড়জোর মাসখানেক। কথা তো কোনকালেই বলে না—এখন মুখে গ্যাঁজলা উঠছে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। যাক বাবা, যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল। কি বলেন?'

সরিৎশেখর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'তবু তো তোমার মেয়ে হে।' মাথা নাড়লেন সাধুচরণ, 'না, না বাপ তো মেয়েকে সৎপাত্রে দান করতে পারলে বেঁচে যায়—তাই না? তা ওর ক্ষেত্রে মৃত্যু হল সৎপাত্র। এ ব্যাপারে আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হবেন না। এখন বলুন আগমনের উদ্দেশ্যটা কি?' সরিৎশেখর বাড়ি বানাবার কথা বললেন। যেহেতু তিনি শহরে থাকতে পারছেন না তাই সাধুবাবুর সাহায্য নিতে চান। ভাল রাজমিস্ত্রি জোগাড় করে দেওয়া তো সাধুবাবুর কাছে কোন সমস্যা নয়। ইঁট-ভাটায় খবর দিলে গরুর গাড়ি করে ইঁট আসবে—সিমেন্টের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর ঐ এলাহী কাজ কর্ম ঠিক হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পরিতোষ থাকল। সাধুবাবুকে দেখতে হবে পরিতোষ ঠিকমত কাজকর্ম দেখাশোনা করছে কিনা। সরিৎশেখর মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।

সাধুচরণ চুপচাপ শুনলেন তারপর বললেন, 'আপনি শহরে এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, দুবেলা দেখা পাব—এতো আমাদের সৌভাগ্য। সব ব্যবস্থা করে দেব। রহমৎ মিয়া আছে—খুব গুণী মিস্ত্রী—ওর ওপর ভার দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারেন। সে-সব কিছুতেই আটকাবে না। আমি ভাবছি আপনার পুত্র আহারাদি করবে কোথায়?'

পরিতোষ চমকে উঠে কিছু বলতে চাইলে সরিৎশেখর হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'কোন হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিতেই হবে। কিন্তু সাহেবের ঘাটে এখন তো অনেক পাইস-হোটেল হয়েছে।'

সাধুচরণ বললেন, 'দুদিনেই পেটের বারোটা বেজে যাবে। তার চেয়ে ও আমার এখানেই থাকা-খাওয়া করে কাজকর্ম দেখতে পারে। আমার সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ হবে।'

কিন্তু পরিতোষ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রায় বিদ্রোহ করে বসল। সাধুচরণের বাড়িতে সে মরে গেলেও থাকবে না। দু-দুটো পাগলকে দিনরাত দেখার মত নার্ভ তার নাকি নেই। সাধুচরণের বউকে যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু মেয়েকে অসম্ভব। তার চেয়ে সে নিজে হাত পুড়িয়ে ভাতে ভাত রেঁধে খাবে। বাবার দিক থেকে উল্টোমুখো হয়ে সে বলল, 'আপনি এ ব্যাপারে একদম চিন্তা করবেন না বাবা।'

সরিৎশেখরেরও সাধুচরণের কথাটা ভাল লাগেনি হয়তো সে খোলামনেই বলেছে। তবু একটা সোমত্ত মেয়ে রয়েছে বাড়িতে, হোক না পাগল, সোমত্ত তো সেখানে পরিতোষের মত দুর্নামযুক্ত একটা ছেলেকে বাড়িতে রাখার প্রস্তাব—কেমন যেন মনে সন্দেহ এনে দেয়। ঠিক হল, পরিতোষ নিজেই খাবার ব্যবস্থা করবে টিনের ছাউনিতে ...

সরিৎশেখর সপ্তাহে একদিন এসে টাকা পয়সা দিয়ে যাবেন পুত্রকে। কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিতোষ সাধুচরণের পরামর্শ নেবে। খুব ঠেকায় না পড়লে যেন টাকা পয়সা না নেয়।

ভিৎ খোঁড়া হল। প্ল্যানমাফিক কাজ এগোতে লাগল। ভিৎ পুজোটুজোর ব্যাপার করলেন না সরিৎশেখর। প্রথম দিকে তরতর করে কাজ চলতে লাগল। সরিৎশেখর সন্তুষ্ট, ছেলের পরিবর্তন হয়েছে দেখে খুশী হলেন। সাধুচরণও পরিতোষের প্রশংসা করেন। সারাদিন রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থেকে মজুরদের কাজ করায়। ক্রমশ সরিৎশেখর ছেলের ওপর বিশ্বাস করতে লাগলেন। লোক মারফৎ টাকা পাঠান, চা-বাগানের কাজ ফাঁকি দিয়ে ঘন ঘন শহরে আসা সম্ভবও হয় না। যেভাবে কাজ চলছে পুরো বাড়ি শেষ হতে মাস দুয়েক লাগার কথা নয়। এখনও রিটায়ার করতে দেরী আছে তবে সরিৎশেখর ঠিক করলেন ভাড়াটাড়া দেবেন না।

এমন সময় সাধুচরণের একটা চিঠি পেলেন সরিৎশেখর। শনিবার সন্ধ্যে নাগাদ চলে আসুন, দিনমানে অবশ্যই নয়। আমার গৃহে তো থাকবেন না তাই রবি বোর্ডিং-এ আপনার ব্যবস্থা করতে পারি। আসা আপনার প্রয়োজন কারণ আপনার পুত্রের সঙ্গে আপনার ভবিষ্যৎ এক্ষেত্রে জড়িত হয়ে পড়েছে।

মাথায় রক্ত উঠে গেল সরিৎশেখরের। অতীতের অনেক অপকর্মের নায়ক নিজের ছেলেকে তিনি জানেন। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। বিকেলের ডাকে চিঠি পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে বলে একটা গাড়ি যোগাড় করে শহরে রওনা হলেন। যাবার সময় মহীতোষকেও কিছু বললেন না। শহরে এসে প্রথমে ভাবলেন সাধুচরণের কাছে যাবেন কিনা। তারপর ঠিক করলেন নিজেই ব্যাপারটা দেখবেন আগে। সাধুচরণের চিঠির ভাষা খুবই সন্দেহজনক—সরিৎশেখর একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছেন তাতে—আর তাই সাক্ষী রাখা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। তিস্তা নদীর গায়ে যে মাটির রাস্তা সেনপাড়ার দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে গাড়ি রেখে ড্রাইভারকে চুপচাপ বসে থাকতে বললেন। গাড়ি থেকে নেমে ওঁর খেয়াল হল উত্তেজনায় আসবার সময় কাশ্মীরী লাঠিটা সঙ্গে আনতে ভুলে গেছেন। সামনে অনেকটা খোলা মাঠ অন্ধকারে ঢাকা—অনেক দূরে টিনের ঘরের সামনে হ্যারিকেন জ্বলছে টিমটিম করে। কি মনে করে সরিৎশেখর গাড়ির হ্যান্ডেলটা লাঠির মত বাগিয়ে মাঠ ভাঙতে লাগলেন।

জাল তারের বেড়া দিয়ে সমস্ত জমিটা ঘিরে রাখা হয়েছিল। এদিকটা দিয়ে বাড়ির মালমশলা আনবার জন্য একটা ছোট টিনের গেট করা আছে। সরিৎশেখর গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

ঢুকতেই তিনি বড় ছেলের গলা শুনতে পেলেন। এলোমেলো গলায় সায়গলের গান গাইছে। গানের গলাটা তো বেশ ভাল! ছেলের গান কোনদিন শোনেননি তিনি। হঠাৎ মনে হল ওকে যদি গান শেখানো যেত, তাহলে নাম করতে পারতো। কিন্তু গলাটা স্থির থাকছে না কেন! কয়েক পা এগোতেই নতুন বাঁধাই কুয়োটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভিৎ খোঁড়ার পর এই কুয়োটা হয়েছে। খাবার জল নয়—বাড়ির কাজে জল দরকার বলেই এটা খোঁড়া। অগভীর। অন্ধকার হালকা করে অনেক তারা উঠে এল আকাশটায়। সরিৎশেখর কুয়োর দিকে তাকাতে অবাক হলেন। বেশ কিছুটা নিচে অন্ধকারেও যেন কিছু চিক-চিক করছে। জল নয় অবশ্যই। হাতের লোহার হ্যান্ডেলটা নিচে নামিয়ে দিতেই ঠক্ করে শব্দ হল। জোরে চাপ দিতে মচ্ করে ভেঙে গেল। সরিৎশেখর বুঝলেন ওটা কাচ। এত কাচে কুয়ো ভর্তি হবে কেন! নাকি এ কুয়োয় জল পায় না বলে ওরা অন্য কুয়ো খুঁড়ছে। বোধ হয় এটাতে আবর্জনা ফেলে আজকাল।

কিছুক্ষণ বাদেই গান শেষ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে সরিৎশেখর শুনলেন দুটি স্ত্রী-কণ্ঠে প্রবল উল্লাসের ঝড় উঠল। একটি কণ্ঠ একজন মাতাল গলায়, 'তুমি মাইরি নাগর ভালই গাও, এসো তোমার গলায় একটা চুমু খাই।' বলে খিলখিল করে উঠল।

সরিৎশেখর আর [illegible] শেষ পর্যন্ত বারান্দায় উঠে এসে লোহার হ্যান্ডেলটা দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলেন। ভেজানো ছিল দরজাটা, হাট করে খুলে গেল। দুটো ঘরের মধ্যে এটাই একটু বড়। ঘরের মাঝখানে একটা জলচৌকির ওপর দুটো বড় মোটা মোমবাতি জ্বলছে। দরজাটা খুলল বলে মোমবাতির শিখা দুটো থর থর করে কাঁপছে এখন। সরিৎশেখর দেখলেন পরিতোষ একটা বালিশ পেটের নিচে নিয়ে একটি কদাকার মেয়ের কোলে মুখ রেখে শুয়ে আছে। মেয়েটি হাতের গেলাস থেকে মাঝে মাঝে নিজে আবার পরিতোষকে মদ খাওয়াচ্ছে। আর একটি বয়স্কা মোটা মেয়েছেলে পরিতোষের পায়ের কাছে বসে ওর গোড়ালি টিপছে।

দরজাটা খুলে যেতেই বয়স্কা মেয়েছেলেটি প্রথম ওঁকে দেখতে পেল, তারপর গলা দুলিয়ে বলল, কে এলে গো, নতুন নাগর?'

সরিৎশেখর প্রথমে উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলেন না। থর থর করে ওঁর দেহ কাঁপছিল। কোনরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলেন, 'পরিতোষ!' বাবার গলা শুনে নেশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পরিতোষ তড়াক করে উঠে বসল। অন্ধকার মোমবাতির আলোয় পুরোটা দেখা যায় না, তাই দরজায় দাঁড়ানো সরিৎশেখরকে মোমবাতির মাথা ডিঙিয়ে অস্পষ্ট ছায় ছায়া দেখল সে।

সরিৎশেখর তখন এক-পা এগিয়েছেন, হারামজাদা, বদমাস, কুলাঙ্গার,'—কথা বলতে বলতে হাতের হ্যান্ডেলটা শূন্যে আস্ফালন করে সজোরে পুত্রের দিকে ঘোরালেন তিনি। পলকে মোমবাতি দুটো শূন্যে উঠে নিবে গেল। পরিতোষ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। মেয়ে দুটো তাদের বাবু বিপদে পড়েছে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় এসে সরিৎশেখরের দুই পা জড়িয়ে ধরল। সরিৎশেখর একটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেও মোটা মেয়েছেলেটিকে পারলেন না। সে সমানে ককিয়ে যাচ্ছে, 'বাবুসাহেব আর আসব না, মাইরি বলছি, ট্যাকা দিলেও রাজী হব না ভদ্দরপাড়ায় আসতে। আমাদের বেগুনটুলিই ভাল ছিল গো—ও—ও।'

আর এই সুযোগে এক হাতে মাথার একটা পাশ ধরে তীরের মত দরজা দিয়ে পরিতোষ ছুটে বেরিয়ে গেল। পা আটক থাকায় সরিৎশেখর পুত্রকে আর একবার বেদম প্রহার করার চেষ্টা করেও বিফল হলেন।

মেয়েছেলে দুটোকে দূর করে দেবার সময় আবার ঝামেলায় পড়তে হল। টাকা ছাড়া তারা যাবে না। জানতে পারলেন পরিতোষ প্রায়ই তাদের নিয়ে আসে, ফূর্তি করে যাবার সময় টাকা দেয়। চিৎকার চেঁচামেচি করে ওরা সরিৎশেখরের কাছ থেকে টাকা আদায় করল। ভাগ্যিস এখনও এদিকে তেমন লোকবসাত হয়নি এবং সময়টা সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তাই কেউ জানল না। সরিৎশেখর সব কটা দরজায় তালা লাগিয়ে পেছনে আসতে হাঁ হয়ে গেলেন। এতদিনে তাঁর বাড়ির অর্ধেকটা কাজ হয়ে যাবার কথা। জানলা দরজার ফ্রেম লেগে যাবে শুনেছিলেন। কিন্তু এই অস্পষ্ট অন্ধকারে উনি দেখতে পেলেন ভিৎ-এর গাঁথুনির পর আর এক ইঞ্চি দেয়ালও ওঠেনি।

নিজের সারা জীবনের সঞ্চয়ের একটা অংশের এই পরিণতি দেখতে দেখতে সরিৎশেখর শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মাথা উঁচু করে অন্ধকারের মাঠ ভেঙে গাড়িতে ফিরে এলেন। একবার ভাবলেন এখনি রায়কতপাড়ায় গিয়ে সাধুচরণের সঙ্গে দেখা করবেন। কেন তাঁকে এতদিন পর তিনি জানালেন পুত্রের কথা! কেন সময় থাকতে সাবধান করে খবর দেননি? বন্ধু হিসেবে সরিৎশেখর তো সাধুচরণের ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। সাধুচরণ অনেকদিন আগে তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'আপনার এই পুত্রটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দেখছি অবধি নেই। আমাদের জাতের কেউ জেনে শুনে ওকে কন্যা দেবে না। আমারও কন্যাটিকে নিয়ে ভাবনার শেষ হয় না। এই দুটিকে একসঙ্গে জুটিয়ে দিলে কেমন হয়?'

সরিৎশেখর অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কি যা তা

করছ?' সাধুচরণ বলেছিলেন, 'তা অবশ্য। আপনার পুত্র আগে খুব আসতো, এখন আসতে চায় না।'

গাড়ি আর ঘোরালেন না তিনি। সোজা কিং সাহেবের ঘাটে চলে এলেন। তিস্তার এই ঘাটটা এখন জমজমাট। অজস্র খড়ের চালের দোকান হয়েছে চা-খাবারের। সন্ধ্যের পর ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, অনেক কষ্টে বেশী বকশিশের লোভ দেখিয়ে সরিৎশেখর একটা জোড়া-নৌকা যোগাড় করে গাড়ি তুললেন তাতে।

সেদিন গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে তিনি কিছুক্ষণ নিজের খাটের ওপর গুম হয়ে বসে রইলেন। সবাই আন্দাজ করছে কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কেউ আগ-বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত নিজেই ডাকলেন তিনি হেম, মহীতোষ আর প্রিয়তোষকে। ওঁরা শুনলেন ওঁদের বাবা ওঁদের বড়-দাদাকে আজ থেকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলেন। খাটের একপাশে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা অনিমেষ কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল। দাদু আসার পরই ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল সেটা টের পেতে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র শব্দটার মানে কি?
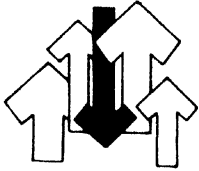
রহমৎ মিঞার হাতে বাড়ি তরতর করে উঠতে লাগল। ছাতি মাথায় সরিৎশেখর সারাদিন মিস্ত্রীদের পিছনে লেগে রইলেন। ট্রাকে করে ইঁট-বালি আসছে। ভারা বেঁধে মিস্ত্রীরা কাজ করছে। বাউন্ডারির মধ্যে একটা একচালা করে মজুররা সেখানে আস্তানা করে নিয়েছে। সন্ধ্যের সময় ইঁটের উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকতে সেঁকতে রামলীলা গায় ওরা তারস্বরে। অনি ঘুরে ঘুরে দেখে সারাদিন। সরিৎশেখর ঠিক করেছেন সামনের বছর ওকে জেলা স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। যেহেতু এটা প্রায় বছরের শেষ, ভর্তি হওয়া চলবে না। ফলে অনির আর বই নিয়ে বসতে হয় না। ওদের বাড়ির কাছে বড় রাস্তা নেই। দাদুর সঙ্গে বাজারে যাবার সময় ও দেখতে পায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা লাইন করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। জেলা স্কুলে ভর্তি হতে অনিকে যে আরো কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হবে। সরিৎশেখর ওকে খবরের কাগজ পড়া শেখাচ্ছেন। রোজ বিকেলে যখন কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে যায়, তখন প্রথম পাতা জুড়ে মহাত্মা গান্ধী আর জহরলাল নেহরুর ছবি দেখতে পায় অনি।

এখানে শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এই রকম—বড় ঘরটায় সরিৎশেখরের বিরাট খাটটা পাতা আছে। দামী মেহগনি কাঠের খাট। খাটের গায়ে চীনে-লণ্ঠন রাখার একটা স্ট্যান্ড। অনি দাদুর সঙ্গে ঐ খাটে শোয়। সারাদিন মিস্ত্রীদের পিছনে খেটে সরিৎশেখর সন্ধ্যে পেরুলেই খাওয়া-দাওয়া সেরে অনিকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। অন্ধকার ঘরে দাদুর নাক ডাকা শুনতে শুনতে অনির কিছুতেই ঘুম আসে না। রাত হয়ে গেলে মজুররা আর গান গায় না, শুধু একলা একটা ঢোলক তালে তালে বেজে যায়। সেই বাজনা শুনতে শুনতে অনির মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আর তখনি বুক কেমন করে ওর কান্না আসে। এখানে ওর একটাও বন্ধু নেই, ওর সমবয়সী কোন ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ নেই। পাশের ঘরে শোন হেমলতা। ঘরের এক কোণে রান্নার জিনিসপত্র, অন্য কোণে ঠাকুরের আসন। এই-ভাবে থাকা ওঁর কোনদিন অভ্যেস নেই। প্রথম দিন ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'ওমা, এইরকমভাবে থাকব কি করে?' সরিৎশেখর কোন জবাব দেননি। তবে বাড়ি তৈরী না হওয়া অবধি কষ্ট করতে হবেই—উপায় কি—এইরকম একটা ভঙ্গী তাঁর আচরণে ছিল। কিন্তু হেমলতা চমৎকার মানিয়ে নিলেন। এখানকার সংসার, তা যত কষ্টকর হোক, তার নিজের। চিরকাল ভাই ভাই-বউদের সঙ্গে থেকে এরকম একটা মজা তিনি পাননি কোনদিন। নিজের সংসার তো কোনকালে করা হল না, বাবা আর ভাইপোকে নিয়ে নতুন সংসারে অদ্ভুতভাবে মজে গেলেন হেমলতা।

খুব ভোরে সরিৎশেখর অনিকে ঘুম থেকে তোলেন। এই সময় প্রায়ই ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়। সরিৎশেখর তা গ্রাহ্য করেন না। বৃষ্টি হলে গামবুট আর ছাতি নিয়ে দাদুর সঙ্গে অনিকে বেরুতে হয়। দাদুরও একই পোশাক। ঘুমে চোখের পাতা এঁটে থাকে, জল ছিটিয়ে চোখ ধুয়ে বেরুতে হয়। বেরুবার সময় সরিৎশেখর হেমলতার ঘুম ভাঙিয়ে যান নইলে দরজা খোলা থাকবে যে। মাঠ পেরিয়ে নাতির হাত ধরে হনহন করে তিনি তিস্তার পারে চলে আসেন। এখন তিস্তা পোয়াতি মেয়ের লাবণ্যে টলটলে। বৃষ্টি না হলে অন্ধকার পাতলা সরের মত পৃথিবীময় জুড়ে থাকে। টুপটাপ তারাগুলো নিভছে। কখনো সাদা চাড়ের মত চাঁদ আকাশের এক কোণে ঝুলে থাকে। সারা রাত বিশ্রাম পেয়ে পৃথিবীর বুকের ভিতর থেকে উঠে আসা নিঃশ্বাসের মত এক রাশ ঠাণ্ডা বাতাস নদীর জলে খেলা করতে করতে অনিদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় মণ্ডলঘাটের দিকে। নদীর বুকে অদ্ভুত এক অন্ধকার লুকোচুরি খেলা করে জলের সঙ্গে। হাটতে শুরু করেন সরিৎশেখর কাঁচা রাস্তা ধরে। এক পাশে নদী, অন্যপাশে ঘুমন্ত শহর। দাদুর দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে অনিকে হাঁপাতে হয়। চলার সময় কোন কথা বলেন না সরিৎশেখর। কিং সাহেবের ঘাট ছাড়াবার পর হঠাৎই পুবের আকাশটা রং বদলায়। অনি দেখেছে, যে মুহূর্তে ওরা কিং সাহেবের ঘাট পেরিয়ে পিলখানার রাস্তায় পা বাড়ায়, ঠিক তখনি অন্ধকার মাটি থেকে হুস করে উঠে গিয়ে গাছের মাথায় মাথায় জমে। আর সংগে সংগে সমস্ত চরাচর ঠাকুরঘরের মত পবিত্র হয়ে যায়। এমনকি মাটির ওপর ধুলোগুলো কেমন শান্ত হয়ে এলিয়ে থাকে শিশির মেখে। অনি দ্যাখে নদীর গায়ে কোথাও অন্ধকার নেই। অদ্ভুত সারল্য নিয়ে জলেরা বয়ে যায়। দু-একটা তারা ডুবে যাবার আগে, যেন কেউ তাদের কথা দিয়ে নিয়ে যায়নি এইরকম আফসোস-মুখে চেয়ে থাকে তখনো। পুবের আকাশটায় হোলি খেলা শুরু হয়ে যায় হঠাৎ। তখনি দাদু দাঁড়িয়ে পড়েন সেদিকে হাত জোড় করে। সংগে সংগে শুরু হয়ে যায় খোলা গলায় সূর্য প্রণাম—ওঁ জবাকুসুম শংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥ কবিতার সুরে সুরে অদ্ভুত এক মায়াময় জগৎ তৈরী হয়ে যায় তখন, প্রতিটি শব্দ যেন সামনের আকাশে অঞ্জলির মত রঙ হয়ে জড়িয়ে যায়। এক সময় দিগন্ত রেখায় যেখানে তিস্তার বুকে অসম্ভব লালচে রঙের আকাশ মুখ ডুবিয়েছে সেখানটা কাঁপতে থাকে থর থর করে। সেই কাঁপুনি গায়ে মেখে টুক করে সূর্যটা উঠে পড়ে জল থেকে আর সংগে সঙ্গে সমস্ত আকাশে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। এক সময় যখন সুন্দর সোনার টিপটা থেকে ঝলক ঝলক আগুন বেরোতে থাকে, তখন সরিৎশেখর বাড়ির পথ ধরেন। অনির তখন মনটা কেমন করে ওঠে। যে কোন ভাল জিনিস দেখলেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। এই মুহূর্তে ওর দাদুকে খুব ভাল লাগে—ঘুম ভাঙিয়ে তোলার জন্য কোন আফসোস থাকে না।

বাড়ি ফিরে জল খেয়ে বাড়ির কাজে লেগে যান সরিৎশেখর। সারাদিনের প্রতিটি মুহূর্ত মিস্ত্রীদের চিৎকার আর বিভিন্ন রকমের শব্দে বাড়িটা ভরে থাকে। হেমলতা নিজের মনে সংসারের কাজ করে যান। এখানে এসে প্রথমে চাকরবাকর পাওয়া যায়নি। এখন চাকর রাখলেই যেন হেমলতার অসুবিধে হবে বেশী। কোন কাজ নিজের হাতে না করলে তাঁর স্বস্তি হয় না। বাবার খাওয়া-দাওয়ার দিকে তাঁর কড়া নজর। ঠিক সময়ে সরবৎ পাঠিয়ে দেন অনির হাত দিয়ে পাথরের

সরিৎশেখর। অনি তখন সঙ্গী হয়। দাদুর সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তায় কত রকমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের বেশীর ভাগই দাদুকে নমস্কার করে কথা বলে, নানা রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অনি বুঝতে পারে ইংরেজরা চলে যাওয়ায় আমাদের অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেছে। দাদুর বন্ধুদের কেউ বলেন, যারা ইংরেজদের চাকর ছিল সেই অফিসাররা কি করে দেশ শাসন করবে? আবার একজন বুড়ো বললেন,, জিনিস-পত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, এর চেয়ে ইংরেজ-আমল বরং ভাল ছিল। লোকটা কথা বলার সময় চারপাশে চোরের মত তাকাচ্ছিল। অনির ওকে ভাল লাগছিল না। এ-সব কথাবার্তার সবটা অনি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল ও বড় হচ্ছে, একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

বাড়ির একদিকে চুড়ো করে বালি রাখা ছিল: খাওয়া-দাওয়ার পর অনি একা একা সেখানটায় সুড়ঙ্গ তৈরীর খেলা খেলত। অনেকটা দূর ওপরের বালি না ভেঙে গর্ত করে চুপচাপ ভেতরে ঢুকে বসে থাকা যায়। এদিকটায় নতুন তৈরী বাড়ির ছায়া পড়ে থাকায় বেশ ঠাণ্ডা। দরজা জানলার ফ্রেম বসে গেছে। কয়েক-দিন আগে ঢালাই শেষ হয়ে গিয়েছে। ছাদ পেটানোর কাজ চলছে। রহমৎ মিঞা কম পয়সায় বেশী কাজ পাওয়া যায় বলে একগাদা কামিন নিয়ে এসেছে। তারা সকালে দল বেঁধে আসে, সন্ধ্যের সময় দল বেঁধে চলে যায়। সরিৎশেখর মজুরদের দিয়ে বাড়ির ভিতরের খোলা জায়গায় অজস্র গাছপালা লাগিয়ে নিয়েছেন। তারা শিকড়ে জোর পেয়ে গেছে। অনি ভালবাসে বলে তিনটে পেয়ারা এবং বাউন্ডারীর ধার ঘেঁষে সার দিয়ে কলাগাছ লাগানো হয়েছে।

সেদিন দুপুরে অনি বালির পাহাড়ের তলায় সুড়ঙ্গ করে একদম ওপাশে প্রায় চলে এল। সারা গায়ে বালি মেখে অনি বেরুতে যাচ্ছে হঠাৎ চাপা গলা শুনতে পেল। ওর মনে হল কোন কারণে দাদু আজ এদিকটায় চলে এসেছেন। আজ এই বালিমাখা অবস্থায় তিনি যদি অনিকে দ্যাখেন, তাহলে নির্ঘাৎ শাস্তি পেতে হবে। এর আগে বালি নষ্ট করার জন্য ওকে ধমক খেতে হয়েছে। চোরের মত উল্টোদিকে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতে যেতে অনি আবার গলাটা শুনতে পেল। না, এ গলা তো দাদুর নয়। হিন্দীতে কথা বলছে। ছেলেটা কি যেন বলছে খুব চাপা গলায় আর মেয়েটা না না বলছে সমানে। অনি ফিরল না আর। ওরা কারা দেখার কৌতূহলে ও এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। একদম শেষ প্রান্তে গুহার মুখটা বড় হয়নি, একটা বড় ছিদ্র হয়ে রয়েছে, অনি সেখানে চোখ রাখল। ও দেখতে পেল একটা মাঝবয়সী মজুর, যার দাড়ি আছে অনেকটা আর রাত্রে রামলীলা গায়, নতুন আসা একটা লম্বা কামিনের হাত ধরে কথা বলছে। কামিনটা বার বার ঘাড় নাড়ছে আর ভয় ভয় চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে কেউ দেখে ফেলল কি না। কিন্তু মজুরটা যেন কোন কথা শুনতে রাজী নয়। হঠাৎ সে দু-হাতে কামিনটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে চাপতে লাগল। কামিনটা প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে দুমদাম করে মজুরটার বুকে ঘুষি মারতে লাগল। মজুরটা ভীষণ অন্যায় করেছে এটা বুঝতে পারছিল অনি। ওর মনে হল কামিনটাকে বাঁচানো দরকার। চিৎকার করবে কিনা অনি যখন ভাবছে, ঠিক তখনি মজুরটা কামিনটাকে টপ করে চুমু খেয়ে ফেলল। অনি অবাক হয়ে দেখল চুমু খেতেই কামিনটা কেমন হয়ে গেল। হাত পা ছুঁড়ছে না, প্রতিবাদ করছে না, বরং দু-হাতে মজুরটাকে জড়িয়ে ধরেছে ও। আর মজুরটা ওর সমস্ত শরীরে আদর করার মত করে হাত বোলাতে লাগল। এখন চিৎকার করার কোন মানে হয় না, কারণ মেয়েটা তো সাহায্য চাইছে না—এটুকু অনি বুঝতে পারল। এক সময় লোকটা কামিনের ওপরের কালো জামাটা খুলে ফেলল। অনি কামিনটার পিঠ দেখতে পাচ্ছে। কালো শরীরের ওপর একটা ফ্যাকাশে সাদা দাগ। অনেকদিন চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মত রঙ। মজুরটার এখন সব আগ্রহ কামিনের বুকের ওপর—যেটা অনির দিক থেকে আও[illegible] এল। কে যেন কাউকে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে এল কামিনটা এদিকে আর মজুরটা সাড়া দিতে দিতে দৌড়ে চলে গেল কামিনটাকে কি যেন বলে। মাটিতে পড়ে থাকা জামাটা দ্রুত তুলে নিয়ে এপাশে ফিরে হাঁটু গেড়ে বসে সে পরতে লাগল। অনি দেখল মেয়েটির তামাটে রঙের বড় বড় বুকের ওপর লালচে লালচে দাঁতের দাগ। এভাবে কোনদিন এইরকম বুক দ্যাখেনি অনি। মেয়েটি জামা পরতে পরতে কি মমতায় একবার দাগগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল। তারপর অনির পাশে বালির ওপর পিচ করে থুতু ফেলে হেলতে দুলতে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পর অসাড় হয়ে অনি শুয়ে থাকল বালির ভেতর। ওর মাথা ঘুরছিল ও বুঝতে পারছিল ওরা খুব খারাপ কিছু করছিল যেটা সবার সামনে করা যায় না। মেয়েটা তাহলে প্রথমে অত ছটফট করছিল কেন? কেন লোকটাকে ঘুষি মারছিল? আবার পরে লোকটা যখন ওর বুকে অমন করে দাঁত বসিয়ে দিল তখন ও কেন যন্ত্রণা পায়নি? কেন তখনো ও মজুরটাকে আদর করছিল? হঠাৎ ওর মাল-বাবুর ছোট মেয়ে সীতার কথা মনে পড়ে গেল। সীতা ওর চেয়ে এক বছরের ছোট। বাড়ি থেকে খুব কম বের হয়। কিন্তু ওর হাত একটু শক্ত করে ধরলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। সীতাও কি বুকে ওরকম করে কামড়ে দিলে কাঁদবে না? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল সীতার বুক তো ওদের মত একদম সমান। তাহলে বড় হলে সীতার বুক নিশ্চয়ই এই কামিনটার মত হয়ে যাবে। আর বুক বড় হলে মেয়েদের নিশ্চয়ই ব্যথা লাগে না। সমস্যাটার এই রকম একটা সমাধান করতে পেরে অনি অন্যমনস্ক হয়ে নড়তেই চাপ লেগে বালির দেওয়াল ধসে পড়ল। অনি দেখল ওপরের বালি হুড়মুড়িয়ে তাকে চাপা দিতে আসছে। কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে ও বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এল।

(ক্রমশ)

ভারতের শেষ ভূখণ্ড

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

॥ ১০ ॥

গরম ক্রমশই বাড়ছে। ওংগিজরা তবু মাটি মেখে ঘুরছে। আমরা মরছি জামাকাপড় পরে ঘেমে। সুধার ব্লাউজ ঘামে ভিজে গেছে। একটু হাওয়া নেই। সমুদ্রের হাওয়া বড় বড় গাছ ভেদ করে ঢুকতেই পারছে না। স্কুলের হল ঘরে এসে বসেছি। এখানে সবই কাঠের। ছাদটা খালি টিনের। প্রশস্ত ঘর। বেশ বড় একটা স্থায়ী মঞ্চ। ছোটো ছোটো বেন্চি, টেবিল। কয়েকটা বড় চেয়ার সামনের সারিতে। এখানে পরিচয় হল আর এক তরুণীর সঙ্গে। ডক্টর গোপাল সিঙের মেয়ে। এই স্কুলের শিক্ষিকা। ব্ল্যাক বোর্ডে দেখলুম সংখ্যা লেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। টেবিলে এক একজন ছাত্রের জন্যে একসেট করে বই, স্লেট, পেনসিল, শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই হিন্দি। হিন্দি সর্বভারতীয় ভাষা। হিন্দি ছাড়া আগামী ভারতে আর কোন্ ভাষা থাকবে। ডাঃ সিংএর মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হল। মেয়েটি পোশাকে ইওরোপীয়, ব্যবহারে ভারতীয়। বেশ একটু লাজুক। এঁর কাছে কেই বা পড়ে। কিই বা পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি আর আই কিউ নিয়ে কথা হল। হতে পারে আদিমানব, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে কিন্তু বুদ্ধির মাপে এরা আমাদের চে কম যায় না। এক একজন প্রকৃতই বুদ্ধিমান। হয়ত কোনো জিনিস ধরতে বা বুঝতে একটু দেরি হয় তবে নিরেট নয়। শ্রীমতী সিং সংখ্যা লিখতে শিখিয়েছেন অক্ষর পরিচয় শুরু করেছেন। কোনো কোনো স্লেটে নিজেদের জীবনের ছবি—শিকার, মাছধরা, পশু, মানুষ, আমাদের শিশুদের চেয়েও ভাল এঁকেছে। একটা স্লেটে বেশ বড় বড় গোঁফওলা একজন কাউকে আঁকার চেষ্টা হয়েছে। পড়া-শোনার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। ইচ্ছে হল পড়। না হল যা খুশি কর। কটাই বা শিশু। তবু চেষ্টা করে দেখা। বছর দশেক পরে হঠাৎ যদি বলতে পারে—আবে পটাক দে।

এই ডাক্তার দম্পতি, এঁরা মনে হয় কণ্ব মুনির আশ্রমে ছিলেন। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। দুজনে বীণা নিয়ে বসেছেন মঞ্চে। শ্রোতা আমরা, শ্রোতা ওংগিজরা। মহিলারা আসেনি। এসেছে শুধু পুরুষরা। এই ভীষণ অরণ্যে, চারপাশে উত্তাল সমুদ্র, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর গাছের প্রহরা, গাছ কাটার শব্দ, কিছু মানুষের আদিম চিৎকার চিরো, চিরো, তার মাঝে দুই শিল্পীর নিপুণ দ্বৈত বাজনা—শ্রী, মল্লার, দেশ, টোড়ী, খাম্বাজ..একটু দক্ষিণী ঢঙে। প্রকৃত শিল্পী। তা না হলে এই ধরনের শ্রোতাদের সামনে কেউ এত তন্ময় হয়ে বীণার মত দুরূহ একটি বাদ্যযন্ত্র এমন সুন্দর করে বাজাতে পারে না।

বাজনার পর নাচের প্রোগ্রাম। বেন্চি সরিয়ে 'ড্যানসিং ফ্লোর' তৈরি হল। এবারের শিল্পী ওংগিজরা। জহোরার সিং বললেন—যান আপনারাও ওদের সঙ্গে নাচুন। আমাদের দলে এসব ব্যাপারে অগ্রণী লালাজী। লালাজী এগিয়ে গেলেন, গেলেন বরাক্সুন্দর, গেলেন ডাঃ কুমার। এ নাচ মোটেই সহজ নয়। শরীরে তাকত থাকা চাই। হার্টের টিউনিং-এ কোনো গোলমাল থাকলেও চলবে না। তারপর থাকা চাই ট্রেনিং। কাঁধ ধরাধরি করে লাফিয়ে লাফিয়ে গোল হয়ে ঘোরা। বার কতক হুপ হাপ করে লাফিয়েই আমাদের হয়ে গেল। প্রাণ যায়। আসরে নামলেন জহোরার সিং: সেই বিখ্যাত নর্তক যিনি ইতিমধ্যেই জারোয়াদের সঙ্গে জেথ ডানস করে রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছেন। তবে কিনা সব শিল্পীই বয়সের ভারে প্রতিভা হারিয়ে ফেলেন। সিংজী হুপ করে একবার লাফিয়েই বুঝে গেলেন—দিন শেষ। ভুঁড়িটা ধড়াস করে চিবুক পর্যন্ত লাফিয়ে উঠেই শান্ত আর হতে চায় না, থলথল টলমল। ঢেউ দিল, ঢেউ দিস রে।

নাচ শেষ। শুরু হল নোনতা বিস্কুট বিতরণ। জহোরারজী দু টিন বিস্কুট এনেছেন। আনারস এনেছেন। আরো সব নানা জিনিস এনেছেন। হাতে হাতে

বড় একটিন শেষ। আর একটিন মজুত রইল। তোমরা পরে খাবে। এখন আর খাই খাই কোরো না। তাম্বোলেটা একটু হ্যাংলা হয়েছে ইদানীং।

তাম্বোলে যে সে মানুষ নয়। চিফ কমিশনারের উপদেষ্টা কমিটির একজন সভ্য। পোর্ট ব্লেয়ারে মিটিং করতে যায়, বাঘা বাঘা অফিসারের সঙ্গে। চেঁচা-মেচি করে। দাবি দাওয়া সম্পর্কে সচেতন। বেশ ভাটও আছে। আমার হাত থেকে ফাইবার টিপ কলমটা কেড়ে নিয়ে, খসখস করে এক ছত্র কবিতা লিখে ফেলল। কী লিখল সেই জানে। আর জানেন ভাষাবিদ্‌রা।

ডাক্তার সন্তোষকুমার এদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলেন। 'এ' ভিটামিনের ঘাটতিতে সকলেই ভুগছে। নিয়মিত ইঞ্জেকসান চলছে। ওয়ার্মসের জন্যে অ্যানিমিয়া। টি বি আছে। চারজনকে পোর্ট ব্লেয়ারে চিকিৎসার জন্যে পাঠান হয়েছে। এই হাসপাতালে এক্সরে প্ল্যান্ট দু-এক মাসের মধ্যেই বসবে। কিছু ভি ডি ছিল। এখন নেই। হাসপাতালে ডাক্তার ছাড়া, একজন স্টাফ নার্স আছেন. ওয়ার্ডবয়, অ্যাটেনড্যান্ট একজন সিনিয়ার মেল নার্স ও হেল্পার আছেন। সকলেই আন্দামান আদিম জনজাতি বিকাশ সমিতির কর্মী। আউট-ডোরে গড়ে রোজ দশজনের চিকিৎসা হয়। প্রধান রোগ ম্যালেরিয়া, শরীরের ব্যথা, পেটের ব্যথা।

ওঙ্গিজদের মধ্যে পুরুষ আর মহিলার সংখ্যা প্রায় সমান সমান—৩৮ জন পুরুষ, ৩৬ জন মহিলা। মহিলা নিয়ে কাজিয়া ভাজিয়ার সম্ভাবনা নেই। রাজা হল ওই তাম্বোলে, রাজা তাম্বোলে। দ্বিতীয় রাজা, দু নম্বর রাজা-নাকি কুট্টি। তাম্বোলে বেশ পয়সা চিনেছে। পয়সার ব্যবহার জানে। শিখে গেছে, ফেল কড়ি মাখো তেল।

যে পথে এসেছিলুম সেই পথেই ফিরে চলেছি। বিপুলবাবু সুন্দর একটা গাছের ডাল উপহার দিলেন। বকর সাহেব বললেন, প্যাডক প্যাডক করে মাথা খারাপ করে দিয়েছিলেন, ওই নিন প্যাডক। কলকাতায় গিয়ে একটা হাতল লাগিয়ে পালিশ করিয়ে নেবেন। সুধা বললেন, সাবধান। ওই কাঠের টুকরো একটু ভিজে গেলেই অ্যায়সা রঙ ছড়াতে আরম্ভ করবে, জামাকাপড় সব লাল হয়ে, লালবাবাজী হয়ে যাবেন। তবু তো তোমায় ছাড়ব না। তুমি যে আমার সেই প্যাডক।

ডক্টর গোপাল সিংয়ের বাড়িতে এসে হাজির হলুম। সমুদ্রের তীরে। আয়তনে ফলাও। চৌকো বসার ঘর, একদিকে প্যানাট্রি অন্যদিকে শোবার ঘর। সংসারে বোধ হয় দুটি প্রাণী—পিতা আর কন্যা। এইবার হবে চা-পর্ব। বিপুল-বাবু এইখানে এক তাড়া নোট পেলেন। গুনে গুনে পকেটে পুরলেন। এটা কিসের পাওনা মশাই। হাসলেন। মুখ খুললেন না। ট্রেড সিক্রেট ফাঁস হল না। বেশী কৌতূহল ঠিক নয়। এখানকার জঙ্গলে দামী দামী কাঠের ছড়াছড়ি। বাদাম, আটশো থেকে হাজার টাকা কিউবিক মিটার প্যাডক, মার্বেল দু হাজার টাকা কিউবিক মিটার। সেইসব জঙ্গল কী ইজারা দেওয়া হয়েছে।

মাছ পেয়েছি: মাছ—ওঙ্গি যুবক
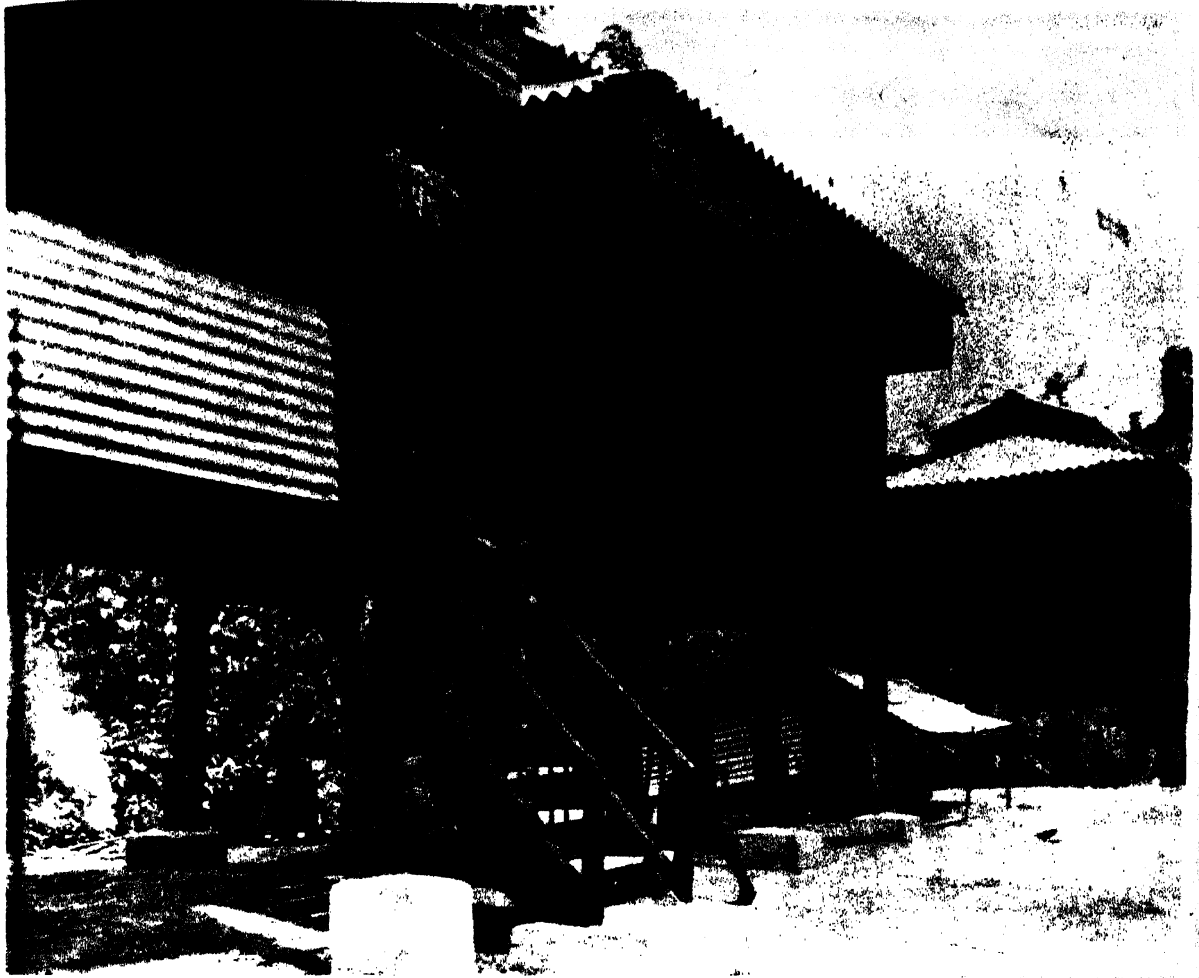
ওংগিজদের সরকারের করে দেওয়া ঘর

প্যারিশিয়া গাছের সংগে দেশলাইয়ের সম্পর্ক। পোর্ট ব্লেয়ারে উইমকোর বড় কারখানা। সেই প্যারিশিয়া জংগলের ইজারায় টাকা নাকি।

সকলেই প্রাণ ভরে জল খাচ্ছেন। জল সম্পর্কে আমার আতঙ্কটা প্রকাশ করতেই হল। ডক্টর সিং বললেন কোনো ভয় নেই। এখানে এত পেটের অসুখ, আমরা জলে ক্লোরিন মেশাতে শুরু করেছি, নির্ভয়ে খান। বকরসাহেবকে অনেকক্ষণ দেখছিলুম না। ঘর্মাক্ত হয়ে এলেন। কোথায় ছিলেন ভাই। রহস্যের হাসি হাসলেন। ব্যাপার কি। পুরো ব্যাপারটাই কি রহস্য উপন্যাস হয়ে গেল নাকি! বকরসাহেব রহস্য উন্মোচন করলেন। গিয়েছিলুম চাল যোগাড় করতে। কোথায়! অরণ্যের উল্টোপিঠে কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে নাকি। কোনো ঝকঝকে শহর, ধুলো ধোঁয়া, মটর?

না, তা নেই। এখানেই আছে, ওংগিজ মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। সেইখান থেকেই সংগৃহীত, দশ পনের কিলো চাল। চাল রহস্যের পেছনে আর এক রহস্য। আগের বারে যিনি, আমাদের মধ্য আন্দামান ঘোরাবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, এবারে তিনি আমাদের দলে নেই; কিন্তু কথা ছিল পোর্ট থেকে জাহাজ ছাড়ার আগে রসদটা তিনি বোঝাই করে দেবেন। দিয়েছেনও, তবে আমাদের গো, গাবৌ গাব ভেবে চাল যা দিয়েছেন, তা খেতে হলে প্রকৃতই হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে হবে।' আমাদের বাঁচাতে বকর সাহেবের এই শাস্তি।

সমুদ্রের তীরে এসে চক্ষু স্থির। জোয়ার এসেছে। সাইনবোর্ডের তলা অবধি জলে জলাকার। থই থই। আমার ভেতরের শিশুটা ভীষণ উৎফুল্ল। কী মজা! জল হয়তো আরো উঠবে, আরো উঠবে ওপরে। সাইনবোর্ডের তলা দিয়ে ফুঁসে ফুঁসে চলে আসবে। ফিরে যাবার সময় বালি সরে সরে যাবে, ঝিনুক, প্রবাল, কড়ি ছটফট করতে থাকবে। কী আনন্দ, ছাপা বুশ শার্ট পরা ওংগিজ যুবকটির। মাছ ধরেছে একগাদা। দু হাত মেলে দেখাচ্ছে, খলখল করে হাসছে। তীর মেরে মাছ শিকার দেখা হল না।

ছটফটে খোটটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে; ডিগবাজি খেয়ে প্রায় মাছের মতই

হাওয়ায় কাঁপছে, এগিয়ে আসা সমুদ্রের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে কেউ যদি এখানে আমাকে অন্তর্জলীর জন্যে ফেলে দিয়ে যেত। চোখে নেমে আসছে মৃত্যুর ঘোর। মাথার কাছে যমরাজের প্রহরীর মত বিশাল বিশাল গাছ। পায়ের দিক থেকে সরীসৃপের মত একটু একটু করে উঠে আসছে মৃত্যু সাগর।

কে কোন দিকে গেছে জানি না, সুধা আমার সংগী। বেলাভূমির অবস্থা কাপড়ের সরু পাড়ের মত। সমুদ্র ভরাট হয়ে উঠছে, পূর্ণতা আসছে। কোন-রকমে জল বাঁচিয়ে, শিকড়ের খোচা বাঁচিয়ে সমুদ্রের পাশে পাশে সুধার পেছনে পেছনে হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝে অবাক অবাক জিনিস পড়ে থাকতে দেখছি— অস্থি। চুনের মত সাদা নরকপাল, পশুর ওপরের পাটির দাঁত, লম্বা চুলের গুচ্ছ। রবারের চটি। পলিথিন কারবয়। সত্যিই, আমরা কি মৃত্যুর সীমানা দিয়ে হাঁটছি। ছায়ার খুব আনন্দ। দশ বার সের ঝিনুক কুড়িয়েছেন, আমার ঝুমালটা ধার দিতে হল।

২০০০ নারকেল গাছ লাগান হয়েছে। ৫০০ পেঁপে। ৫০টা কমলালেবু। ৪১০টা কলাগাছ। ১০টা কাঁঠাল। আখ লেগেছে; আনারস, লবংগ উঠছে। ওংগিজরা চাষ করে কিনা জানি না। কেন করবে? জীবনধারণের সবই তো বিনা পরিশ্রমে আসছে। ওরা তো সুসভ্য, মধ্যবিত্ত বাঙালী নয়, ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে ডিসপেপটিক হয়ে যাবে। কিংবা স্ত্রীর সংগে চুলোচুলি করবে। যা করার কৃষি বিভাগের কর্মীরাই হয়তো করেছেন।

ডক্টোয়ার সিং এবার প্রায় ধমকেই উঠলেন। আর দেরি করলে, সমুদ্রের য অবস্থা জাহাজে ফেরা যাবে না। তোমরা সমুদ্রকে চেন না, জেন্টেলমেন। তখন কিন্তু বুঝবে ঠেলা। সুধা তখন কলাকের গল্প বললেন: স্বামী স্ত্রী দুজনে সমুদ্রের তীর ধরে ডায়াসকোরিয়ার খোঁজে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন। অনেকটা নেশার নেশায়। আরও একটু এগিয়ে দেখি, আরও একটু এগিয়ে দেখি। যখন খেয়াল হল ফিরতে হবে, তখন বেলাভূমি মুছে গেছে। জল ক্রমশই বাড়ছে একদিকে অরণ্য গভীর অন্যদিকে স্ফীত সমুদ্র। পাতাজল, হাঁটুজল, বুকজল।

ঘাড় মাথা নেড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে বলতে ইচ্ছে করে—উঃ কী জীবন।

জত্তোয়ার সিংএর বকুনি খেয়ে আমরা সকলে লক্ষ্মী ছেলের মত সেই টলটলে বোটে, ঢলঢলে যৌবন নিয়ে ল্যটপটে প্যান্ট জলে ভিজিয়ে, জুতোয় সেরখানেক বালি ঢুকিয়ে আর একটু ওজনদার হয়ে উঠে পড়লুম। আর, কি আশ্চর্য। সুধাও আমাদের সঙ্গে চলেছেন জাহাজে। আমাদের পার্টিতে এখন তিনজন মহিলা। অলোক সমুদ্রের জলে ভেসে আসা একটা ধনুক পেয়েছে।

সমুদ্র আরো ভয়ঙ্কর। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ভরাডুবি হল বুঝি। মাঝে মাঝে ঢেউ এমন লাফিয়ে উঠছে, জামা, চুল, চশমা সব ভিজে যাচ্ছে। প্রদ্যোতবাবু বিপদে পড়েছেন দুটো দামী ক্যামেরা নিয়ে। নোনা জল ঢুকে গেলেই হয়ে গেল। দোল খেতে খেতে, জল খেতে খেতে, প্রায় মরতে মরতে জাহাজে এসে উঠলুম। সবচেয়ে বড় শাস্তি বোধ হয়, জাহাজে ওঠা, জাহাজ থেকে বোটে নামা, বোট থেকে তীরে নামা, তীর থেকে বোটে ওঠা, বোট থেকে জাহাজে চড়া। বেশি না, মাসখানেক, কাউকে অনবরতই যদি এই রকম করানো হয়, হয় সে খুনী হয়ে যাবে, না হয় সাধু।

জাহাজে উঠতেই বকর সাহেব বললেন, একদম সময় নেই, পনের মিনিটের মধ্যে খাওয়া সেরে নিন। জাহাজ ছাড়বে। জাহাজ চলতে শুরু করলে, আর খেতে পারবেন না। কোনো রকমে খাওয়া শেষ হল। খাওয়ার তেমন জুত নেই। আর কত খাওয়াবেন আন্দামান সরকার।

তিন মহিলার মজলিস বসেছে। সেই মজলিসে আমি প্রধান অতিথি। আলোচনার বিষয় দর্শন আর কাব্য। ড্যাঙ্গায় থাকার সময়েই কিভাবে যেন জন্মান্তরের কথা উঠেছিল। তারই জের চলেছে। আজকালকার মহিলাদের সঙ্গে কঠিন কঠিন বিষয়ের আলোচনা করে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। যেমন ভাল শ্রোতা, তেমনি ভাল বক্তা। তর্কের জালও বেশ ভাল বুনতে পারেন। মনে হয় আর কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারলে, খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী এঁরা সব আবার জন্মাবেন। পিঠে বালিশ লাগিয়ে একদিকে ছায়া, আর একদিকে সুধা। তৃতীয় মহিলা অন্য একটি বিছানায় সম্পূর্ণ শুয়ে। মাঝে একটি চেয়ারে আমি।

সুধা যোগে বিশ্বাসী। ধ্যানের কথা হচ্ছে। কিভাবে মনটাকে ভাইটাল থেকে চেতনার স্তরে কনসাসনেসের স্তরে তোলা যায়। কিভাবে মনটাকে সম্পূর্ণ শূন্য করে ফেলা যায়। বাইরের চেতনা আর ভেতরের সত্তার মাঝখানের পর্দাটা কিভাবে ছিঁড়ে ফেলা যায়।

সুধা আমাদের সঙ্গে হাটবে অবধি যাবেন। হাটবেতে সুধার ভাই একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার। হাটবে ঘণ্টা তিনেকের পথ। সমুদ্র ভীষণ অশান্ত, কিন্তু এই প্রথম সেই মজার মাছ দেখলুম—ফ্লাইং ফিশ। হঠাৎ জল থেকে লাফিয়ে উঠেই একেবারে নিখুঁত একটি পাখির মত, তা প্রায় হাত তিনেক উঁচু দিয়ে উড়তে উড়তে অনেক দূর গিয়ে আবার জলে ঢুকে যাচ্ছে। উত্তর সমুদ্রে ফ্লাইং ফিশ দেখিনি, যত দক্ষিণে এগোচ্ছি সমুদ্র ততই নতুন খেলা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুটো মাছে প্রতিযোগিতা। কে কত দূরে যেতে পারে।

দুপুর তিনটে নাগাদ হাটবের বিশাল জেটিতে জাহাজ লাগল। এখানেও সেই একই সমস্যা। অবতরণের বিপজ্জনক পদ্ধতি। নিচের ডেক থেকে রেলিং

ম্যাশহর

টপকে হাত পাঁচেক নিচের একটা শালের বিমে পা রেখে তারপর খোদ জেটিতে উঠতে হবে। দু তিনজন লস্কর জাহাজটাকে টেনে ধরে রেখেছেন। রাখলে কি হবে! যেই পা বাড়াতে যাচ্ছি, হেরেবেরে, মাঝের ফাঁকটা বেড়ে যাচ্ছে। একপা ডেকে, একপা শূন্যে। জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ধরে গেল। এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না, জলে পড়ে, জাহাজ আর জেটির মাঝখানে স্যাণ্ডউইচ হয়ে যাওয়াই ভাল!

এখানে সমুদ্রটাকে মানুষ বেশ কাবু করে ফেলেছে। সাত বছর ধরে চেষ্টা করে ৫ কোটি টাকা খরচ করে একটা দুর্ধর্ষ ব্রেকার তৈরি করা হয়েছে। সমুদ্রকে এইভাবে ভাঙার ফলেই হাটবের জেটিটা দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ ভিড়তে পারছে। তা না হলে ঢেউ, চাবকে শেষ করে দিত।

হাটবে একটা বিশাল জায়গা। অর্থনীতির স্বর্ণভূমি। লোকসংখ্যায়, কৃষি উৎপাদনে, ভূমি উর্বরতায়, অরণ্য সম্পদে এই অংশ সমস্ত প্রকার দৃষ্টি ও সুযোগ সুবিধের দাবি জানাতে পারে। ৫ কোটি টাকা খরচ করে এই ব্রেকারের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। তীরভূমি, ব্রেকার, জেটি একটি অসম্পূর্ণ চতুষ্কোণ তৈরি করেছে। সারি সারি গাড়ি ব্রেকারের ওপর দিয়ে একেবারে শেষ বিন্দুতে গিয়ে থামল। বিশাল একটা ক্রেন খোলা সমুদ্রের দিকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বলতে চাইছে, তুমিও আছ, আমিও আছি। দেখি ভাঙচোরার খেলা কেমন জমে।

কোনদিন পয়সা হলে, এই হাটবে, এই ব্রেকারকে লোকেসান করে একটা বিয়োগান্ত ছায়াছবি তুলবো। পান্থপাদপের মত দুদিকে দুসার আলোকস্তম্ভ। মাথার ওপর বড় বড় কাচের ডোম পরানো। পৃথিবীর যত পাথর ছিল সাদা, কালো, যত সিমেণ্ট ছিল, সব এনে ফেলা হয়েছে চপল সমুদ্রকে একটু শান্ত করার জন্যে। দুপাশে সারি সারি সাজানো কিম্ভুত একধরনের চতুষ্পদ বিরাটাকার গোল গোল বস্তু। এর নাম নাকি টেট্রাপড। জলের ধাক্কা সামলাবার জন্যে এই ব্যবস্থা। অজস্র টেট্রাপড নিচে থেকে, থাকে থাকে ওপরে উঠে এসে, দুপাশে সংগীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল—সালভাদর ডালির জগতে বাস করছি। মারাত্মক লোকেসান। কি না করা যায় এখানে ; প্রেম, আত্মহত্যা, খুন, সোর্ড ফাইট।

সবুজ অ্যালগী গুঁড়ি গুঁড়ি মিশে আছে জলে। মাছ খেলছে টেট্রাপডের ফাঁকে ফাঁকে। হাওয়া হয়তো উড়িয়ে নিয়ে যাবে। হয়েছে, উড়িয়ে নিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে। বর্ষা যখন আসে, জল বয়ে যায় ব্রেকারের ওপর দিয়ে। দুঃসাহসী কেউ ওই মরসুমেএই ব্রেকারে দাঁড়ালেই কুঁচো কাগজের মতো উড়ে যাবে। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, টেট্রাপডের হাতে পায়ে ভর রেখে, ছাগলের মত, একেবারে জলের কিনারায় নেমে যাই। নেমে যাবার অদ্ভুত একটা আকর্ষণ। ডকটর পণ্ডিত বললেন, নামতে হয়তো পারবেন, তবে শেষ অবতরণ। উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না।

সকলেই জাহাজে ফিরে গেলেন। আমরা কয়েকজন গেলুম ভেতরে, দ্বীপের জঠরে। বিপুলবাবু আছেন। নতুন পরিচয় শ্রীভড়। এখানকার পি ডব্লু ডির কর্মী। তিনি [illegible] এসেছেন। ড্রাইভারের পাশে অঢেল জায়গা। আমরা দুজনে পাশাপাশি বসেছি। সতের বছর চাকরি হল। জীবন কী আন্দামানেই কেটে যাবে! সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসন অন্যান্য প্রদেশের সরকারের কাছ থেকে লোক ধার করে আর কাজ চালাবেন না। নিজেরাই সব করবেন। ভড় হলেন ওড়িষা সরকারের কর্মচারী! হয়তো যাবার দিন আসন্ন।

টিম্বারের জন্যেই হাটবের এত খাতির! পোর্টমেডো, হাটবে, এলফিন্‌-স্টোন, মায়াবন্দর, পোর্ট কর্নওয়ালিস হ্যাভলক—এদের দরজা গলে কাঠ বেরোয়। যাবে মাদ্রাজ, যাবে কলকাতা। মনমরা পিচের রাস্তা ধরে, কখন সোজা, কখন ঘোরা পথে, চলেছি তো, চলেইছি। এখানে সাজানোটা একটু উল্টে গেছে। সামনে অরণ্য, পশ্চাৎপটে জনপদ। নেতাজীনগর, বিবেকানন্দনগর। মহাপুরুষদের নামে চিহ্নিত, বাঙালী অঞ্চল।

গাড়ি থামল পথের ধারে। একটা শ্রীহীন বাড়ি, অর্ধ উলঙ্গ কিছু শ্রীহীন মানুষ। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বেশ অবাক হতে হল—ছাদহীন ঘরে, একটি খাট, বিছানা, খাটিয়া। কেউ কোথাও নেই। ঘর আছে, দরজা নেই। একটা শীর্ণ কুকুর রাজার মত এঘর থেকে ওঘরে চলে গেল। ঘরের মালিকদের পেলুম—পেছনের চসা জঙ্গলে। দুটি সবল প্রাণী। হাতে কোদাল। দেখে মনে হয়েছিল, দুজন ভন কুইক্সোট চাষ করতে নেমেছে। পায়ের কাছে কোদাল রেখে, দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। খেটে ধুতি। বহুদিন যেন স্নান নেই। দূরে দূরে কিছু গাছপালা। প্রথম নমুনাই দুঃখজনক!

দু ভাই একমুখ হেসে এমনভাবে তাকাল, যেন ছাদহীন ঘরের মত এতবড় তামাসা আর কিছু হয় না।

—চাষবাসের অবস্থা কী?

দুজনেই প্রবল মাথা নাড়াল। যেন, কোনো পাপকর্মের স্বীকারোক্তি চেয়েছি।

—চাষবাস হয়! ধান হয়। ফসল হয়। আমার প্রশ্ন।

খুব জোরে জোরে বললুম। জোরে বললে যদি উত্তর পাই। দু ভাই কোদালটার দিকে তাকিয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নয়, আজারের জেরার উত্তরে কুলবধূর লজ্জা মেশানো গলায় বললে—একটু একটু হয়।

সংগে সংগে বড় ভাই ছোট ভাইকে বললে—ভীষণ পোকা।

তারপর দু ভাই নিজেরাই নিবিষ্ট আলোচনায় মেতে গেল। আমরা যেন নেই। দুজনে নিজেদের আলোচনায় মাতোয়ারা।

—জল! জল পাবে কোথায়! জল কে দেবে দাদা!

—আরে জল না হয় আকাশ দেবে, পোকা মারবে কে, এ কি উকুন পেয়েছিস।

—পোকা বেশি শত্রু, না জল বেশি শত্রু!

দুজনেই চুপ। প্রশ্নটা খুব কূট-কচালে। দুজনেই তখন আবার আমাদের দিকে আগের মত উদাস মুখে তাকিয়ে রইল।

চলে আসতে আসতে বিপুলবাবু বললেন—প্রশ্ন করে কিছু পাবেন না মশাই।

—এই যে বললেন 'হাটবে'তে খুব ভাল ধান হয়, কলা হয়, ফসল হয়।

—হয়ই তো!

—এরা তো কেমন হয়ে গেছে। অন্য কথা বলছে।

—আপনি নিজে ঘুরেই দেখুন না। কী ধারণা হয়, পরে আলোচনা করা যাবে।

বাঁপাশে উঁচু একটা টিলার মত জায়গায়, না তাল, না খেজুর গোছের অদ্ভুত এক ধরনের গাছে থোকা থোকা লাল ফল। আলুবখরার মত কিংবা বড় বড় লাল সুপুরির মত দেখতে। একেই বলে রেড অয়েল পাম। পাট কিংবা আখের মতই অর্থকরী ফসল। পাম অয়েল এখন আদরের জিনিস। ভোজ্য তেল। বনস্পতি তৈরিতে লাগে। হাটবেতে ক্রমশই রেড অয়েল পামের চাষ বাড়ছে। বাড়ালেই ভাল। চাষবাস ছাড়া এখানে দ্বিতীয় কী তৃতীয় কোনও জীবিকার কথা ভাবা যায় না। যাঁকেই প্রশ্ন করেছি সকলেরই এককথা—ধান আর তেমন ভাল হচ্ছে না। জমির উর্বরতা ক্রমান্বয়ে চাষবাসের ফলে মরে আসছে। সারের ব্যবহার নেই। সেচ, মানুষের হাতে নেই ঈশ্বরের হাতে।

এইখানেই দেখলুম বীভৎস চর্মরোগ। হাতে পায়ে দগদগে একজিমা। বিদঘুটে একটা চিন্তা মাথায় এল চর্মরোগ কেউ ইচ্ছে করে শরীরে এনে বসায় না। যেভাবেই হোক এসেছে। একজিমা সহজে সারতেও চায় না। এইসব শক্ত সমর্থ মানুষদের বিবাহিত জীবনও নিশ্চই শেষ হয়ে যায়নি। এ'দের স্ত্রীদের কী ভীষণ শাস্তি!

সমগ্র লিটল আন্দামান একদিনে ঘোরা সম্ভব নয়। তবে ম্যাপ খুলে সহজেই এক চক্কর ঘুরে আসা যায়। একেবারে উত্তরে, সমুদ্র ঢুকে এসে তৈরি করেছে বোমিলা ক্রীক। তার একটু তলায় সমুদ্র দিয়েছে ডুগং ক্রীক। ১৯৬১ সালেও এই বিশাল দ্বীপে বসবাস করত মাত্র ১৯২ জন ওঙ্গি। তারা এখন উঠে এসেছে এই ডুগং ক্রীকের কলোনীতে। উত্তর পশ্চিমে আর একটি খাঁড়ি—জ্যাকসন ক্রীক। পূর্ব দক্ষিণ থেকে পূর্ব উত্তরের সমগ্র এলাকায় গড়ে উঠেছে—বাঙালী কলোনী আর শ্রীলঙ্কার কিছু অধিবাসীদের কলোনী।

তিনটি গ্রাম পড়ে আছে ট্রাঙ্ক রোডের পাশে পাশে। ৮ কিলোমিটারের মাথায় নেতাজীনগর, ১৭ কিলোমিটারে রামকৃষ্ণপুর, ২২ কিলোমিটারে বিবেকানন্দপুরম। ২০ কিলোমিটারের মাথায় চতুর্থ আর একটি গ্রামের পত্তন করা হয়েছে। ৩৮৬টি পরিবার এইসব গ্রামে স্থান পেয়েছে। শ্রীলঙ্কার ২৮ জনকে এখানে বসাবার জন্যে জমি উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাকটরের সাহায্যে জমি চৌরস করার ফলে কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। খুব সাবধানে সমস্ত পরিকল্পনাটি রূপায়িত হচ্ছে। এ যে দ্বীপ! যে কোনো রকম হটকারিতার মূল্য গুঁড়ো গুঁড়ো, টুকরো টুকরো হয়ে দ্বীপখণ্ডটি জলে ধুয়ে যাবে।

৭৭ সালের খরিফ মরসুমে ১৫১৫ একর জমিতে চাষ হয়েছে। ১০৪৪ একর গেছে উচ্চফলনশীল ধানের চাষে। ১১৯০ মেট্রিক টনের মত ধান ফলবে। একরপ্রতি ফলন ১০৯০ কেজি। আখের চাষ সফল হয়েছে। আদা, হলুদ, ডাল, তেলবীজ সবই ফলছে, আরো বেশি ফলতে পারে। মশলার চাষও ভাল হবে। চেষ্টা চলছে।

দুপুরের আকাশ আজ কিছু মেঘলা। সারাটা ট্রাঙ্ক রোডের দুধারেই মাঝে মাঝে দৈত্য "গর্জন", বহু উঁচু থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে যেন দেখছে—মানুষ কি করছে। গর্জনের মত বিশাল ব্যক্তিত্বের সংগে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হয়, তবে কাঁধে তো হাত রাখতে পারবো না! পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু করে সুখ দুঃখের কথা ছুঁড়ে দেওয়া চলে; কিন্তু সন্দেহ হয়, হৃদয় আছে তো।

একটা ভাঙা আটচালায় বসে, বিপুলবাবুকে বললুম—খবরে যদি এই লিখি—ম্যালেরিয়ায় লিটল আন্দামান উজাড় হয়ে গেল। ধান ছাড়া হয়ত অন্য সব

বিজ্ঞান

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রসঙ্গে

ধরুন, দুর্ঘটনা অথবা রোগের দরুন কারো হৃৎপিণ্ডটি নষ্ট হয়ে গেল। তেমন ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, নিখুঁত এবং দীর্ঘকাল কাজ চালিয়ে যেতে পারে এমন একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড পাওয়ার জন্যে মানুষকে আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

'বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ সে ধরনের হৃৎপিণ্ড হয়ত আমরা তৈরি করে ফেলতে পারব।' বলেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভ্যালেরি শুমাকফ্। অধ্যাপক শুমাকফ্ সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অব মেডিক্যাল সায়ানসেস এর ইন্সটিটিউট অব অরগ্যান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যানটেশনের ডিরেকটর।

প্রশ্ন : সদ্য মৃত কোন মানুষের হৃৎপিণ্ড কারো দেহে বসিয়ে দিয়েও তো কাজ চালান যায়। তা যদি হয়, আপনারা কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরির কথা ভাবছেন কেন?

উত্তর : সঙ্গত কারণেই সে কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে। আপনাদের হয়ত মনে আছে, ১৯৬৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক ডঃ ক্রিশ্চিয়ান বারনার্ড সর্বপ্রথম একজনের হৃৎপিণ্ড আর একজনের দেহে প্রতিস্থাপিত করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তারপর এক শ'রও বেশী মানুষের দেহে এ ধরনের হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। (লনডন থেকে রয়টারের সংবাদ, ১৮ অকটোবর ১৯৭৭ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মোট ৩৩৮ জনের দেহে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়।) এই সংখ্যা প্রতি বছর এখন কমে যাচ্ছে। এখন বছরে মোট পনর থেকে কুড়ি জনের দেহেও এ ধরনের হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয় কি না সন্দেহ। এ পর্যন্ত যেসব রোগীর দেহে মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভাগ্যবান শুধু একজন। তাঁর নাম ইমানুয়েল ভিত্রিয়া। প্রায় নয় বছর আগে তাঁর হৃৎপিণ্ডটি অকেজো হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে জনৈক তরুণ এক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার হৃৎপিণ্ডটি সংগ্রহ করে ইমানুয়েলের দেহে প্রতিস্থাপিত করা হয়। তারপর থেকে এই দীর্ঘ নয় বছর বেশ বহাল তবিয়তেই তিনি বেঁচে রয়েছেন। আমরা বলব, এটা বড় রকমের একটা ব্যতিক্রম। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এ পর্যন্ত পাঁচ শ' জনের বেশী রোগী হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের সাহায্য নেন। প্রতিস্থাপনের পর তাঁদের বেশির ভাগই পাঁচ বছরের বেশি বাঁচেননি। একথা ভেবেই আমরা কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছি।

প্রশ্ন : একজনের হৃৎপিণ্ড অপরের শরীরে প্রতিস্থাপন করার ব্যাপারে বাধাটা কোথায়?

উত্তর : বাধা অনেক। যেমন ধরুন, কারো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যে মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার দেহে প্রতিস্থাপনের কাজটি সারতে হবে। এখন প্রতিস্থাপনের উপযোগী একটি হৃৎপিণ্ড তখন যে আপনি পাবেনই, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তারপর দেখতে হবে, এ কাজে যাঁর হৃৎপিণ্ডটি আপনি ব্যবহার করবেন, তিনি নীরোগ কি না। তিনি যদি ক্যানসার, সংক্রামক অথবা দূষিত রক্তজনিত রোগে ভুগে থাকেন, তাঁর হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন কাজে আসবে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দরকার একজন সুস্থদেহী মানুষ, যাঁর শরীরে কোন রোগ নেই। এমন একজনের হৃৎপিণ্ড তখনই সংগ্রহ করা সম্ভব, যদি তিনি আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় মারা যান। এবং কনডিশনটি হবে এইরকম : কোন একজনের দেহে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের যখন দরকার হল, ঠিক ওই সময়ে সুস্থদেহী কোন মানুষ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সবল হৃৎপিণ্ডটি সংগ্রহ করে চিকিৎসক প্রতিস্থাপনের কাজটি সেরে ফেললেন। বেশী দেরি হলে ওই হৃৎপিণ্ডে কোন কাজ হবে না। অতএব বুঝতেই পারছেন অসুবিধাটা কোথায়। এর পর আরও একটি বড় সমস্যা আছে। ধরুন, যথাসময়ে উপযুক্ত হৃৎপিণ্ডও পাওয়া গেল এবং শল্য-চিকিৎসক নিখুঁতভাবে প্রতিস্থাপনের কাজটিও সারলেন। কিন্তু তারপরই গোলমাল। প্রাণী-কোষের মধ্যে সব সময়ে একটা প্রতিরোধ-ক্ষমতা কাজ করে। আর কাজ করে বলেই রোগের আক্রমণ আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারি। শরীরের কোষ যদি তা অনুরূপ বা পছন্দসই কোন কোষের সান্নিধ্য না পায়, তাহলে সেই কোষকে সে সরিয়ে দেবে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'রিজেকশন'। এখন ধরুন, কারো দেহে আর একজনের হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দিলেন ঠিকই, কিন্তু এই হৃৎপিণ্ডের কোষকে তার দেহ-কোষের পছন্দ হল না। অতএব অল্প দিনের মধ্যেই হৃৎপিণ্ডটি রিজেকটেড হয়ে যাবে। হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এটাও একটা বড় রকমের সমস্যা।

বসে রয়েছেন অধ্যাপক ভ্যলেরি শুমাকফ্। তাঁর বাঁ-পাশে শল্য-চিকিৎসক ডঃ গ্রেগরি ইর্তকিন এবং ডানপাশে ডঃ ওলেগ ইয়েগোরফ্। ইনি বেশ কয়েকটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি করেছেন।

প্রশ্ন : কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি করার ব্যাপারে আপনাদের মূল লক্ষ্য কী রকম?

উত্তর : আমাদের সামনে লক্ষ্য এখন দুটি। এক, আমরা এমন হৃৎপিণ্ড তৈরি করতে চাই, যা পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করবে; যাকে প্রতিস্থাপন করা যাবে এবং যা দীর্ঘদিন ধরে স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের মতই নিজের ভূমিকাটি পালন করবে। আশা করা যায় বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাত এ ধরনের যন্ত্র আমরা তৈরি করতে পারব। দুই, তার আগে আমরা এমন এক ধরনের কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি করতে চাই, সাময়িকভাবে যার সাহায্যে আমরা কাজ চালিয়ে নিতে পারব। যেমন ধরুন, কোন রোগীর হৃৎপিণ্ড এখনই কেটে বাদ দিতে হবে। তখন এ ধরনের কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড দিয়ে এক দিন, এক সপ্তাহ অথবা এক মাস আমরা কাজ চালিয়ে নেব। চিকিৎসকদের তড়িঘড়ি করে হাতের কাছে যে হৃৎপিণ্ড পেলেন সেটিকে বসিয়ে দেবার দরকার হবে না। বরং দীর্ঘ সময় হাতে পাওয়ায় মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত হৃৎপিণ্ড তাঁরা খতিয়ে পরীক্ষা করতে পারবেন। দেখে নিতে পারবেন, ঠিক কী ধরনের হৃৎপিণ্ড ব্যবহার করলে 'রিজেকশনের' সম্ভাবনা থাকবে না।

অধ্যাপক শুমাকফ্ মনে করেন, আগামী চার পাঁচ বছরের মধ্যেই এই শেষোক্ত কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তাঁরা তৈরি করতে পারবেন।

মসকোয় 'ইনসটিটিউট অভ্ ট্রানসপ্ল্যানটেশন অভ্ অরগানস অ্যান্ড টিস্যুজ'-এর এই গবেষণাগারে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড নিয়ে গবেষণা চলছে। বাঁপাশের আধারগুলির মধ্যে রক্ত।

যে গাছ প্রচুর প্রোটিন দিতে পারবে

শুঁটি জাতীয় গাছ। নাম 'উইংগড বীন'। গাছটি জন্মায় পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে। খাবার হিসেবে এই গাছের শুঁটি যে উপাদেয় হতে পারে, তা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাননি। পাপুয়া নিউগিনি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অঞ্চল এবং শ্রীলংকার গরীব মানুষ তাদের বাড়ির সংলগ্ন জমিতে আবহমান কাল ধরে এই শুঁটিগাছটির চাষ করে আসছিল।

হঠাৎ বিজ্ঞানীদের চোখ গিয়ে পড়ল এই গাছটির ওপর। তাঁরা এর শুঁটির খাদ্যগুণ পরীক্ষা করতে গিয়ে তো অবাক! দেখা গেল এই শুঁটির শতকরা তিরিশ থেকে সাঁইত্রিশ ভাগই প্রোটিন।

বোটানিক গার্ডেনস-এর বিজ্ঞানীরা। পাপুয়া নিউগিনি থেকে ওই দুটি গাছের কিছু বীজ সংগ্রহ করে উত্তর ভারতের মরুভূমি অঞ্চলের কিছু জমিতে তার পরীক্ষামূলক চাষ শুরু করে দিলেন তাঁরা। প্রথম দিকে সন্দেহ ছিল। ভেবেছিলেন, এ দেশের মাটিতে ওই গাছে তেমন ফলনই হয়ত হবে না।

কিন্তু সন্দেহ ভুল প্রতিপন্ন হল। কাদামাটি, বেলেমাটি, প্রায় সবরকম মাটিতেই মৌসুমী বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'উইংগেড বীনের' বীজ বুনে খুব ভাল ফল পাওয়া গেল।

এই শুঁটির এক একটি লম্বায় ছয় থেকে ছাব্বিশ সেনটিমিটার। যে-কোন বীনের মতই এদের রান্না করা চলে। ছাল রসাল এবং পুরু হওয়ার স্যালাড হিসেবেই এদের খাওয়া যায়। এবং বীন ছাড়াও গাছের অন্যান্য অংশও শাক ও ডাঁটার মত রান্না করা চলে।

সম্প্রতি ন্যাশনাল বোটানিক গার্ডেনের (লখনৌ) ডাইরেকটর ডঃ টি এন খুসু উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি ব্লকে এক হাজার প্যাকেট 'উইংগেড বীনের' বীজ বিতরণ করেছেন। প্রতিটি প্যাকেটে ছিল এক শ' গ্রাম বীজ। বিভিন্ন চাষী তাদের নিজেদের জমিতে এই বীজ বপন করবেন। প্রতিটি প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি করে পুস্তিকা। কীভাবে এই বীজ চাষ করতে হয়, রোগের আক্রমণ থেকে বীনের গাছ কীভাবে বাঁচাতে হবে এবং খাবার হিসেবে এই বীন কতটা পুষ্টিকর এমন অনেক তথ্য এই পুস্তিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডঃ খুসু মনে করেন, ব্যাপক চল হলে উইংগেড বীন দেশের প্রোটিন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

শিশুদের আলসার

শিশুদের যতটা সম্ভব হাসিখুশি রাখুন। তাদের মাথায় বড়োদের দুশ্চিন্তার বোঝা আর নাই বা চাপালেন।

হ্যাঁ। আক্ষেপের সুরেই কথাগুলি বলেছেন জাপানের আসাহিকাওয়া মেডিক্যাল কলেজের শিশু-রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাসাইওশি নামিকি। গত পনের বছর ধরে তিনি শিশুদের পাকস্থলী এবং গ্রহণীর (ডিউওডেনাল) আলসারের ওপর পরিসংখ্যান নিয়ে আসছেন।

তাঁর মনে প্রথম খটকা লাগে ১৯৬২ সালে। ওই বছর তিনটে প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভার পড়েছিল তাঁর ওপর। আর এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি তো অবাক! দেখলেন, বেশ কয়েকটি শিশু পাকস্থলীর আলসারে ভুগছে। অদ্ভুত ব্যাপার! অতিরিক্ত মানসিক চাপের দরুন বয়স্করা অনেক সময় পেটের আলসারে আক্রান্ত হয় ঠিকই, তাই বলে শিশুদের এ অবস্থা কেন?

এনডোস্কোপ নামে এক ধরনের যন্ত্রের সাহায্য নিলেন তিনি। এ যন্ত্রে পাকস্থলীর ভেতরটা সরাসরি দেখা যায়। যন্ত্রটির সাহায্যে ৪৪৬টি শিশুকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, তাদের মধ্যে ৯৭ জনই পাকস্থলী অথবা গ্রহণীর আলসারে ভুগছে। কেউ পাকস্থলীর ব্যথায় প্রায়শই অজ্ঞান হয়, কারো বমির সঙ্গে পড়ে রক্ত।

অধ্যাপক নামিকি বলেছেন, প্রথম দিকে এ ধরনের রোগী পেতাম শতকরা দুই কি তিনটি। ১৯৭৬ সালে পেলাম শতকরা কুড়িটি। আর ১৯৭৭ সালের প্রথম সাত মাসেই এই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল উনিশ-এ। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, জাপানে শিশুদের মধ্যে পাকস্থলী এবং গ্রহণীর আলসার রোগী বাড়ছে। এসব রোগীর সর্বোচ্চ বয়স ১৪ বছর।

কেন এমন হচ্ছে?

অধ্যাপক নামিকির উত্তর : পরীক্ষার ভয়। শিশুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। সবারই এক কথা, পরীক্ষার ফল খারাপ হলে বাবা-মা ভীষণ বকে। শাস্তি পেতে হয়। বাবা-মায়াও পড়াশুনোর ব্যাপারে সব সময়ে তাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে রাখেন।

জাপানে একটা ভাল স্কুলে ভরতি হওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এর জন্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় একাধিক টিউটোরিয়াল ক্লাসে গিয়ে সময় কাটাতে হয়। টিউটোরিয়াল মানে ব্যক্তিগত ব্যবসা। ও দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'জুকু'।

অধ্যাপক নামিকি বলেছেন, একবার নয় বছরের একটি ছোট্ট বাচ্চাকে দেখলাম। ইস্কুলের পর বেচারাকে তার বাবা-মা তিনটে 'জুকু'তে যেতে বাধ্য করেছে। তারপর আবার ইংরেজী কথা বলার ক্লাস। এসব করতে গিয়ে একদিন পথেই সে রক্তবমি করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। শিশুদের মানসিক চাপ সৃষ্টির মূলে অনেক সময় কাজ করে শিক্ষক-শিক্ষিকার দুর্ব্যবহার, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া অথবা পারিবারিক অশান্তি।

অধ্যাপক নামিকির মন্তব্য : পেটে আলসার হলে শিশুরা যেমন একটুতেই কাহিল হয়ে পড়ে, আবার দেখা যায়, তাদের ওপর থেকে মানসিক চাপ সরিয়ে নিলে এ রোগ তাড়াতাড়ি সেরেও যায়। সামাজিক প্রতিযোগিতা এখনকার দিনে একটা বড় রকমের সমস্যা ঠিকই, তাই বলে খুব কম বয়েস থেকে এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্যে তাদের ছুঁড়ে দিয়ে তাদের শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম করাটা কতটা লাভের হবে সেটা বাবা-মার ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

সমরজিৎ কর

নাট্যাভিনয়ে রূপসজ্জার ভূমিকা

শক্তি সেন

নাট্যাভিনয় ও তার রূপসজ্জা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে ও বিদেশে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ শিল্পীর অভিজ্ঞতা পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। আমি বিদেশী গবেষকদের কিছু কিছু বই পড়েছি। তা থেকে রূপসজ্জার টেকনিক কি করে আয়ত্ত করা যায় সে সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও অর্জন করেছি। কিন্তু তা থেকে রূপসজ্জা শিল্পের গভীরতা অনুভব করা যায় না। রূপসজ্জা নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার জন্য আমার এই আলোচনা।

কেন আমি অন্য অনেক শিল্পকলা থাকা সত্ত্বেও এই "নাট্যকলায়" উৎসাহী হলাম? আর কেনই বা এই রূপসজ্জা শিল্পের জন্য নিজের সাধনাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলাম?

আমি খুব ছোটবেলা থেকেই নাটক দেখতে ভালবাসতাম। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রাভিনয়, নৃত্য-নাট্য, এমন কি হিন্দুস্থানীদের "রাম-লীলা"ও আমায় আকৃষ্ট করতো। নাটক' আমার ভীষণ ভাল লাগতো। আর ভাল লাগতো ছবি আঁকতে। এ দুটোই আমার প্রাণমাতানো নেশা ছিল। এরই জন্য লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পারিনি। কোনরকমে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়েই ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম, ফাইন আর্টস নিয়ে। সেই আর্ট স্কুলেও প্রত্যেক বছর স্কুলের জন্মদিন উপলক্ষে নাট্যোৎসব হত। ছাত্র ও শিক্ষকরা এক সঙ্গেই নাটক করতেন। আমিও ভীষণ উৎসাহী হয়ে প্রতি বছর নাটকে অংশগ্রহণ করে স্কুলে বেশ ভাল অভিনেতা হিসেবে নাম করে ফেলেছিলাম। আর সেই সময় থেকেই অভিনয় করার নেশা আমাকে আরো বেশী করে পেয়ে বসেছিল। তাই আমি সেই সময় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে "নাট্যভারতী" নামে একটা ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। বর্তমানে ঐ থিয়েটারবাড়ি "গ্রেস সিনেমা" নামে পরিচিত। ঐ থিয়েটারে সেই সময় যেসব বিখ্যাত অভিনেতারা অভিনয় করতেন তাঁরা হলেন—'দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগেশ চৌধুরী 'রবি রায় 'ছবি বিশ্বাস, 'জহর গাঙ্গুলী, 'প্রভা দেবী ও সেইসময়কার সাবিত্রী দেবী নামে একজন অভিনেত্রী ও আরো অনেকে। এই সব দিকপাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে থেকে, তাঁদের আশীর্বাদ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। একদিন "দুই পুরুষ" নাটকের একটা কোর্ট সিনে একজন জুরী সাজার চান্স পেলাম। পোশাক পরে মেক-আপ ঘরে এলাম রূপ-সজ্জার জন্য। তখনকার দিনে থিয়েটারে কোন মাইনে করা রূপশিল্পী থাকত না। যার ফলে অভিনয়-শিল্পীরা নিজেরাই যে যার মেক-আপ করে নিত। আমি একজন পুরোনো "অ্যাপ্রেনটিস্ট অ্যাক্টর"কে বলেছিলাম, "দাদা, আমার মুখে একটা গোঁফ এঁকে দেবেন?" সেই অ্যাক্টর, জবাবে আমায় বলেছিলেন, 'দাদা, এখানে কেউ কাউকে মেক-আপ করে দেয় না নিজেদেরই করে নিতে হয়।" সুতরাং সেদিন থেকেই আমি আমার নিজের রূপসজ্জা নিজেই করতে শুরু করে দিলাম। আমার ছবি আঁকার অভ্যাস থাকার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই অন্য সকলের চেয়ে আমার মেক-আপ ভালো হতে শুরু করল যার ফলে তখন অনেকেই আমার কাছে মেক-আপ নিতে আসতে শুরু করলেন আমারও মেক-আপ করতে বেশ ভালই লাগত। আমি কাউকে নিরাশ না করে সবাইকেই মেক-আপ করে দিতে লাগলাম। ফলে, আমারও বেশ প্র্যাকটিস হতে লাগল। সেই থেকেই আমার রূপ-সজ্জা শেখার ভীষণ আগ্রহ জন্মেছিল। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কিছু বিদেশী রূপসজ্জার বই সংগ্রহ করে থিয়েটারের বাইরে তার চর্চা করা শুরু করে দিয়েছিলাম এবং প্র্যাকটিস করতে গিয়ে বুঝেছিলাম রূপসজ্জা-সম্পূর্ণ ফাইন আর্টস-এর মধ্যেই পড়ে। কারণ, ছবি আঁকার দখল না থাকলে, মানুষের মুখে শুধুমাত্র রূপসজ্জার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতেও মানুষের মুখ বদলে দেয়া যায় না। যেমন, একজন যুবককে বৃদ্ধে পরিণত করা যায় না; আবার একজন বৃদ্ধকে একজন যুবকে পরিণত করা যায় না। দিনের পর দিন রূপসজ্জা নিয়ে যত ভাবতে আরম্ভ করলাম, ততই অবাক হয়ে যেতে থাকলাম। নাটকের সঙ্গে রূপসজ্জার যে কী গভীর সম্পর্ক ক্রমশই তা আমার চোখে পরিষ্কার হতে থাকল। সেই থেকে রূপসজ্জার সাধনায় ক্রমশ এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। তার সঙ্গে চলতে থাকলো আর্ট স্কুল ও নাট্যভারতীতে অভিনয় শিক্ষা। সে সময় প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ঐ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শরৎ-চন্দ্রের "দেবদাস" উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনি করে-ছিলেন। আমি বেশ কিছুদিন নাট্যভারতীর সঙ্গে যুক্ত থেকে—'দেবদাস', 'দুইপুরুষ', 'চরিত্রহীন' 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটকে ছোট ছোট চরিত্রে, আবার আবার কখনো শুধুই ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছি। এখন বুঝি কেন মঞ্চে শুধু ঐটুকু পাওয়ার মধ্যেই এতো আনন্দ পেয়েছিলাম সেদিন। যা আমার পরবর্তীকালে অন্য সব কিছুর প্রলোভন মুক্ত করে নাট্যরসের গভীরে পৌঁছে দিয়েছিল। তখন যদি আমি, আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সকল প্রচেষ্টা উপেক্ষা করে নাটকের আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না পারতাম তাহলে এ জীবনে আমার এই স্বপ্ন সার্থক হত না। আমি একজন নাট্যলোকের শিল্পী হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম না; আর তা না পারলে এ শিল্পের অসীম গভীরতা ও তার বিচিত্র রূপ কোন-দিনই অনুভব করতে পারতাম না। তবে একথাও ঠিক যে, আমার হিতৈষীদের অমতে এ পথে যদি তখন না আসতাম, তাহলে আজ হয়তো এতো অর্থকষ্টে ও সহায় সম্বলহীন হয়ে জীবনযাপন করতে হত না। আজ দীর্ঘকাল এই শিল্পের সাধনার পর আমার মনে হয়, কোন শিল্পকলাকে সীমারেখার বন্ধনে বাঁধা যায় না। সব শিল্পকলাই অসীমে বিলীন। আমরা তার কতটুকু সন্ধান করতে পেরেছি? শুধু যেটুকু পেরেছি, তা হচ্ছে সেখানে পৌঁছবার পথের সন্ধান খুঁজে বার করা—এ পথে চলতে চলতে আমার বহুদিন বছরের কর্ম ও সাধনার মধ্য দিয়ে যা করতে পেরেছি ও অনুভব করেছি। বহুকাল পূর্বে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে শহরের লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ আহার জোটাতে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অসংখ্য দুঃস্থ নারীপুরুষ তাদের শিশু-সন্তানদের নিয়ে শহরে ছুটে এসেছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি, —কত শত মানুষ রাস্তার ধারে না খেতে পেয়ে মরে পড়ে রয়েছে। শহরবাসীর দ্বারে দ্বারে কত শত অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায় শিশু ও নরনারী একটু ফ্যান চেয়ে চেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাদের সেই অসহায় ক্ষুধাকাতর মুখগুলি আজও আমার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানুষ দুঃখে, কষ্টে ও অনাহারে থাকলে চোখে মুখে তা যে কী ভীষণভাবে রেখাপাত করে, তা আমি সেই সময় থেকেই দেখতে শুরু করেছিলাম। পরবর্তীকালে "গণনাট্য সংঘের নাটকে তার হুবহু রূপসজ্জা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। দ্বিতীয় উপকরণ অনুভব করেছি, —ফাইন আর্টস-এ অতি অবশ্যই দখল থাকার প্রয়োজন। ছবি আঁকায় পারদর্শী না হলে, মানুষের মুখে অঙ্কনবিদ্যা প্রয়োগ করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

তৃতীয় উপকরণ অনুভব করেছি, —হিউম্যান সাইকোলজি—মানে মানুষের মনের খবর; যা না জানতে পারলে মানুষ চেনা যায় না ও তার মনের ভাবভঙ্গি ও চিন্তাধারার হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না; আর তা পাওয়া না গেলে, নানা শ্রেণী ও নানা জাতের মানুষের স্বরূপ বোঝা যায় না; তা না বুঝতে পারলে, সুস্থ শরীর ও মনের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মুখে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমস্যাজড়িত মুখের সেই রূপ রূপসজ্জায় ফুটিয়ে তোলা যায় না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই অবস্থার কিছুকাল পরেই আবার কল-কাতায় জাপানীদের বোমা নিক্ষেপণ শুরু হল; ফলে শহরবাসীরা অনেকেই যে যেদিকে পারল, শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। তখন আমাদের আর্ট স্কুল ও নাট্যভারতী থিয়েটার সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। আমিও তখন একটা কিছু করা প্রয়োজন মনে করেই 'এয়ার রেড ফার্স্ট এড পোস্ট'-এ ভর্তি হয়ে গেলাম। সাইরেন বাজলে (জাপানী আক্রমণের সংকেত ধ্বনি) আমাকে তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হত পথচারীদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেবার কথা বলতে।

এভাবে কিছুকাল চলার পর যখন দেশের অবস্থা একটু শান্ত হল। তখন এক আশ্চর্য ধরনের নাটক পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় প্রগতিশীল নাট্যকার-'বিজন ভট্টাচার্য। তিনি একাধারে সংগীতজ্ঞ, পরি-চালক ও অসাধারণ অভিনেতাও ছিলেন। যে নাটকটি রচনা করে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, তার নাম 'নবান্ন'। এই নাটকের বিষয়বস্তু ছিল, ঐ অকাল বিধ্বস্ত গ্রামের কৃষক-সমাজ ও খেতমজুর—যারা শহরে এসে না খেতে পেয়ে পথেঘাটে মৃত্যু বরণ করেছিল। যারা বেঁচেছিল, তারা সব একত্রিত হয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে কেমনভাবে চাষবাস করে নতুন ফসল তুলে নবান্ন উৎসবে মেতে উঠেছিল।

এই নাটকে তখন অভিনয় করেছিলেন—'বিজনদা নিজে ও শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, সজল রায়-চৌধুরী, তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি। এছাড়া অনেক প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই সর্বপ্রথম দেখলাম,—নিঃস্ব ও শোষিত মানুষের ব্যথা ও বেদনার কাহিনী অবলম্বন করে এক মহৎ নাট্যপ্রয়োগ। যা চিরদিন প্রকৃত শিল্প মাধুর্যে ইতিহাস হয়ে থাকবে আমাদের দেশে। এই নাটক দেখে আমার মনে এক ...

আরোগ্য নিকেতন নাটকে শশী কম্পাউন্ডারের ভূমিকায় রবি ব্যানার্জী

করে গিয়েছিল তখন। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি এঁদের সঙ্গে থেকে নাটক না করতে পারি তা হলে জীবনই বৃথা। তাই অনেক চেষ্টা করে বেশ কিছুদিন পরে বন্ধুবর কবি সুকান্ত-র চেষ্টায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘে স্থান করে নিতে পেরেছিলাম। সেই সময় গণনাট্য সংঘের আরেকজন অন্যতম স্রষ্টা ও সংগীতশিল্পী ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিনয় রায়। তখন তিনি সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন দেশে বহুবিধ শিল্পী সমন্বয়ে নাট্যসংস্থা, সংগীত-সংস্থা ও নৃত্য-সংস্থাও গড়ে চলেছেন। কলকাতা শহরে এই তিনটি সংস্থা তখন ভীষণভাবে কাজ করে করে চলেছে। সেই সময়ে নৃত্যবিভাগে তৈরি হয়েছিল 'শহীদের ডাক' নামে একটি নৃত্যনাট্য। এক বিচিত্র ধরনের "শ্যাডো প্লে"। আমি ছবি আঁকার শিল্পী হিসাবে তাতে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার কাজ ছিল দৃশ্যসজ্জা ও লাইটিং এফেক্টে সাহায্য করা। শহীদের ডাক সে সময় সারা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে, এক নূতন ধরনের নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে সকল মানুষের মন জয় করেছিল। এই ব্যালে গ্রুপের সঙ্গে সমানে তাল রেখে নাট্যবিভাগ একটার পর একটা, শোষিত মানুষের কল্যাণে ও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছিল। ঠিক সে সময় বর্তমানের স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক এই নাট্যবিভাগে উৎসাহী হয়ে যোগ দিয়েছিলেন ও কিছুদিনের মধ্যেই ঋত্বিক নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতারূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত অনেক নাটকের মধ্যে—জ্বালা, ভাঙা বন্দর, দলিল, সাঁকো ইত্যাদি সব নাটকই খণ্ডিত পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী নিয়েই তৈরি করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে 'দলিল' নাটকটি খুবই মানুষের মনে রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীকালে আরও কিছু নাটক পরিচালনা করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' স্মরণীয়। গণনাট্যের বাইরে তিনি একটি 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। সেখানেও রবীন্দ্রনাথের "স্ত্রীর পত্র" গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ও তাঁরই পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। সে সময় মঞ্চে নাটক নিয়ে ঋত্বিকের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম ও তাঁর সব নাটকের রূপসজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করে, নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। গণনাট্যে যোগ দেবার কিছুকাল পরেই ঋত্বিক চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যোগ দিয়েছিলেন।

গণনাট্যে এক সঙ্গে কাজ করার সময় কত ছোট ছোট ঘটনার কথা আজ মাঝে মাঝে মনে পড়ে যেমন—ঋত্বিকের সঙ্গে কাজ করার সময় আমার সঙ্গে তাঁর একবার মনোমালিন্য হয়েছিল রিহার্সাল রুমে। কি কারণে যে হয়েছিল সেকথা আজ ভুলেই গিয়েছি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হওয়ার ফলে আমি রাগ করে চলে গিয়েছিলাম, আর কখনো ওঁর সঙ্গে কাজ করব না মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম। তার কিছুদিন পরেই "রবীন্দ্র জন্মোৎসব" উপলক্ষে গণনাট্য থেকে টালিগঞ্জ এলাকায় "টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে" বিসর্জন নাটক অভিনীত হওয়ার কথা। এই নাটকের রূপসজ্জা খুবই কঠিন ছিল। বিশেষ করে "রঘুপতির" রূপসজ্জা রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়েছিল। আর ঋত্বিক নিজে করতেন রঘুপতির অভিনয়। ঋত্বিকও রাগ করে বসেছিলেন, আমার কাছে কিছুতেই নতিস্বীকার করবেন না। আমিও কিছুতেই কাজ করবো না পণ করে বসে আছি। এ অবস্থায় মমতাজ আমেদ গণনাট্যের একজন দায়িত্বশীল সভ্য হিসেবে অনেক চেষ্টা করেও আমাদের একসঙ্গে কাজ করাবার জন্য রাজী করাতে না পেরে, নাটকে অংশগ্রহণকারী আর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমায় অভিনয়ের দিন ঋত্বিক নিজে আমার কাছে তার ভুল স্বীকার করে নেন, তাহলেই আমি যেন রূপসজ্জার কাজ শুরু করি এই কথাই ঠিক হল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন, জয়সিংহ—কালী ব্যানার্জি, গোবিন্দমানিক্য— উৎপল দত্ত, নক্ষত্র—মমতাজ আমেদ, গুণবতী—শোভা সেন প্রভৃতি। নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—নাট্য পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। আবহসংগীতে সলিল চৌধুরী। মঞ্চসজ্জায় রবি চ্যাটার্জি। আলোয় তাপস সেন। রূপসজ্জা ছিল আমার। সে সময় বিসর্জন নাটক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। অভিনয়ে, সংগীত, মঞ্চসজ্জা, আলো ও রূপসজ্জার অসাধারণ কৃতিত্বে বিসর্জন নাটক ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। মধ্যে আর একদিন বাকি বিসর্জন অভিনীত হওয়ার। সকলেরই মন খারাপ, আমি অভিনয়ের দিন হাজির হব কিনা সেই সন্দেহই সকলের মনে। কারণ আমি ভীষণ একগুঁয়ে ছিলাম। কিন্তু আমিও মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম যদি ঋত্বিক আমার কাছে না আসেন? ঋত্বিক আমায় যেমন ভালবাসতেন আর আমার কাজের প্রতি তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল, ঠিক আমারও ঋত্বিকের কাজের প্রতি তেমনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। আমিও ওঁকে ভীষণ ভালবাসতাম। কাজেই অভিনয়ের দিন তিন ঘণ্টা আগেই আমি টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু মেকআপ রুমের বাহিরে গাছের তলায় বসে থাকলাম ঋত্বিকের অপেক্ষায়। মঞ্চসজ্জা দেখার জন্য ঋত্বিক অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। দুজনেই দুজনকে কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু কেউই কারো কাছে যেতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে কি যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল সে সময় তা বলে বোঝানো যাবে না। একটা ঘণ্টা একটা মাসের প্রতীক্ষার মত মনে হয়েছিল। যাই হোক ঋত্বিক এক সময় আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে একটা বিড়ি ধরালেন, আর একটা বিড়ি হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি হাত বাড়িয়ে বিড়ি নেবার জন্য ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, দিনের পর দিন নাটকের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ওঁর চোখ-মুখ বসে গেছে। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেমন অসহায় চেহারা। দেখেই আমার মন ওঁর জন্য মমতায় ভরে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো জলে। ঋত্বিক কিন্তু নির্বিকার, ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরে বললেন 'খুব হইছে নে বিড়ি ধরা।' আমি বিড়ি ধরালাম। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'মেকআপ আরম্ভ কর দে আর বেশী সময় নেই আমি দাড়িটা কামিয়ে এখুনি আসছি।' আমি সেই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারলাম না।

আমার বেশ মনে আছে সেদিন বিসর্জনের রূপসজ্জার কাজ অন্য সমস্ত দিনের চেয়ে ভাল হয়েছিল।

অভিনয় শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি যাওয়ার আগে ঋত্বিক আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'কাল থেকে রিহার্সাল রুমে আসিস কিন্তু।'

একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ঋত্বিকের সঙ্গে এ রকম কত ঘটনা, কত মনোমালিন্য হয়েছে, কিন্তু কাজের তাগিদে আবার মিটেও গেছে।

আজ ঋত্বিক অনেক জ্বালা, অনেক অভিমান, সহ্য করে আমাদের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন জীবনের পরপারে। জানি আজ আর ওঁর জন্য অভিমানভরে অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। কিন্তু আমার সঙ্গে জড়িত ওঁর জীবনের সেই সব ছোট ছোট ঘটনাগুলি আজও যে আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়, আমাকে জাগিয়ে তোলে, তাই আমার কাছে এ ভাবনাগুলির মৃত্যু হবে না কোন দিন।

আরেকটা মজার ঘটনা ঘটেছিল শিয়ালদাহ রেলওয়ে মঞ্চে "নীলদর্পণ" নাটক অভিনয় করতে গিয়ে। পরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন বিজন [illegible] নীলদর্পণ নিষিদ্ধ ছিল সে সময়ে। কিন্তু পুলিশের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই সেদিন নাটক অভিনীত হচ্ছিল। প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ অবস্থায় নাটক শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পুলিশ এসে হানা দিল গ্রীনরুমের দরজায়। বিজনদা আধা মেকআপ অবস্থাতেই বাইরে বেরিয়ে এসে পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করেছিলেন, কি চাই? 'তোরাবের' রূপসজ্জায় বিজনদাকে দেখে পুলিশ অফিসার খানিকটা নার্ভাস হয়ে গিয়ে বলেছিল এ নাটক অভিনয় করা চলবে না। আমরা লালবাজার থেকে এসেছি, নাট্যকারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিজনদা ও আমরা সবাই পুলিশ অফিসারের কথা শুনে সেদিন হাসতে হাসতে অজ্ঞান হবার দশা হয়েছিল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বিজনদা পুলিশকে বলেছিলেন, আপনারা লালবাজারে চলে যান মশায়, নাটক হইব। আর নাট্যকারের লগে যদি দেখা করতে চান তবে প্রাণটা দিতে হইব এইখানে, নইলে তো দেখা পাইবেন না তাঁর। কিন্তু অফিসারটি কিছুতেই নাটক করতে দিতে পারে না, এ বিষয়ে নাট্যকারের সঙ্গে সে কথা বলতে চায়। অগত্যা নিরুপায় হয়ে বিজনদা ভিতরে চলে এলেন। স্টেজের পর্দা সরিয়ে দর্শকদের কাছে পুলিশের নাটক বন্ধ করা ও নাট্যকার 'দীনবন্ধুবাবু'র সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার কথা সব বললেন। বিজনদার এই কথা শুনে এক হাজার দর্শক প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। ধীরে ধীরে সেই হাসি বিক্ষোভে পরিণত হলো। একদল যুবক-দর্শক চিৎকার করে বলে উঠল—চলুন আমরা সবাই মিলে পুলিশদের 'দীনবন্ধুবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আসি। বলার সঙ্গে সঙ্গে হই-হই করে প্রায় সমস্ত দর্শক বাইরে বেরুতে শুরু করলো। প্রচণ্ড গণ্ডগোল ও চিৎকার শুনে পুলিশ তখন সে যাত্রায় পালিয়ে বেঁচেছিল। তারপর নির্বিঘ্নে সেদিনকার অভিনয় সমাধা হয়েছিল। পুলিশ আর 'দীনবন্ধুবাবুর খোঁজ করতে দ্বিতীয়বার আসেনি।

গণনাট্যের শুরু থেকে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল সেই সব নাটকগুলি যথাক্রমে—বাংলাদেশ ভাগ হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "বাস্তুভিটা", ভানু চট্টোপাধ্যায় রচিত "আজকাল", বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত 'ঢেউ', নাটক নয়, ও রাহুমুক্ত যাত্রাভিনয়। এবং 'নীলদর্পণ', নৌকাডুবি ২০শে জুন ইস্পাত ও আরো অনেক নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই সব নাটক এবং ঋত্বিক ঘটকের সমস্ত নাটক ও ব্যালে গ্রুপের শহীদের ডাক, এক পয়সার ভেঁপু, অহল্যা, কল অব ড্রাম, হোলি, সোর্ড ডান্স প্রভৃতি থেকে শুরু করে শম্ভু ভট্টাচার্যের একক নৃত্য "রানার" পর্যন্ত—সব কিছুর রূপসজ্জার দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হয়েছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সকল নাটক ও নৃত্যনাট্যের রূপসজ্জা, শহর ও গ্রামের শ্রেণীবহুল জনজীবন থেকে অনুসন্ধান করে তার হুবহু রূপ এই সব চরিত্রে রূপায়িত করার চেষ্টা সব সময়ই করেছি। আর তারই ফলস্বরূপ এইসব চরিত্রগুলি যে মঞ্চে জীবন্ত হয়ে কী সার্থকতা লাভ করেছিল, তা আমি খুব ভাল করেই বুঝেছিলাম তখন। এ সম্পর্কে আমার মনে হয়,—নাট্যকার যখন নাটক লেখেন, তখন তিনি তাঁর নাটকের চরিত্রের রূপ কি হওয়া দরকার, তার বর্ণনাও লিখে থাকেন। যে রূপশিল্পী সে সব চরিত্রের রূপসজ্জা দেবেন, তিনি যদি আদৌ নাটক না বোঝেন বা নিজে শিল্পী না হন, অর্থাৎ যদি তাঁর ললিতকলায় দখল না থাকে, তা হলে তাঁর সাধ্য কি-যে, তিনি নাটকের প্রয়োজনীয় চরিত্রানুগ রূপসজ্জা ফুটিয়ে তুলবেন? নাটকের চরিত্রে বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলা ভীষণ কঠিন বলেই আমার মনে হয়। আর সে কাজ করতে প্রথমেই যে সাধনা দরকার তা হচ্ছে জীবনদর্শনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা ও তার সাথে নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং ফাইন আর্টস শেখা। এই সব বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই রূপশিল্পের কিছু কিছু কাজ করা সম্ভব। তাছাড়াও রূপশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও

থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা—চাকভাঙা মধু

সৃষ্টিধর্মী অনেক কাজ আছে। যথা—যে-কোন চরিত্রের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা, বা কোন চরিত্রকে নাটকের শুরু থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটক চলাকালীন, রূপসজ্জার ডিটেল টাচের সাহায্যে শেষ পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া। সে কাজ করতে না পারলে, শুধুমাত্র অভিনয়, মিউজিক, আলো বা স্টেজ ক্রাফটের অন্য সব চেষ্টা দিয়েও নাটকের শেষ সার্থকতায় পৌঁছনো যায় না। যেমন—ধরা যাক যে-কোন একটি নাটকের অবস্থাপন্ন পরিবারের সুখী চরিত্রগুলি, প্রথম অঙ্ক পর্যন্ত বেশ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় দেখা যাবে। দ্বিতীয় অঙ্কে সেই চরিত্রগুলি, কোন কারণে একেবারে নিঃস্ব ও সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়বে। তৃতীয় অঙ্কে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় নাটকের সম্পূর্ণ সার্থকতা নির্ভর করছে কিন্তু সেই রূপসজ্জার ক্রিয়েটিভ ও ডিটেল টাচিংয়ের দ্বারা সেই সুন্দর ও সুখী মানুষগুলির চোখে-মুখে যখন না খেতে-পাওয়ার চিহ্ন ফুটে উঠবে। যেন দেখলেই মনে হয়—শোকে-দুঃখে জর্জরিত ক্ষুধাকাতর মানুষগুলির কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে। তবেই তা সার্থক হয়ে দর্শকের মনে রেখাপাত করবে। অন্যথায় সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। চরিত্রের এরূপ ভাবান্তর ঘটানো প্রথমে রূপসজ্জা ও পরে অভিনয় কৃতিত্বের দ্বারাই তা সম্ভব, চরিত্রের এই ভাবান্তরকে রূপসজ্জা ছাড়া কোন কিছু দিয়েই পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কাজেই এই ধরনের নাটকে রূপসজ্জার কাজ যদি সৃষ্টিধর্মী না হয়, তবে তার শেষ পরিণতি খুবই হাস্যকর হয়ে উঠবে। এছাড়া বিশেষ ধরনের [illegible] নেতাও সেই চরিত্রের রূপ কেমন টাইপ চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক বড় দরের হবে তা কল্পনা করতে পারেন যার ফলে তাঁরা অভিনয়ে সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু, যদি ঠিক চরিত্রানুগ রূপ তার চোখের সামনে রূপসজ্জা দিয়ে তুলে ধরা যায়, তা হলে অভিনেতাও সেই চরিত্রটির রূপ অবলম্বন করে অভিনয়ে কৃতকার্য হতে পারেন। এই ধরনের বহু নজির আমার কর্মজীবনে একাধিকবার ঘটেছে। আবার কোন একটি যুবক-চরিত্রকে যদি নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নব্বুই বছরের বৃদ্ধে পরিণত করতে হয়, তাহলে সেই ইয়াং শিল্পীর মুখে বয়সের রূপসজ্জা একটু একটু করে নব্বুই বছরের বৃদ্ধে রূপান্তরিত করাও দুঃসাধ্য কাজ। এ ক্ষেত্রেও ললিতকলায় দখল না থাকলে এ ধরনের কাজ নিখুঁতভাবে করা সম্ভব নয়। এই সব বিশেষ-ধরনের কাজের জন্য হিউম্যান ফেসিয়াল অ্যানাটমি জানা দরকার। একমাত্র ফাইন আর্টের লাইফ স্টাডিতেই তা শেখানো হয়ে থাকে। এছাড়া বহু ধরনের কঠিন কঠিন রূপসজ্জা নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে, যেমন—আগুনে পুড়ে যাওয়ার এফেক্ট, ব্লাড ক্যান্সারের, রক্তশূন্যতার, নানা ধরনের রোগের ও তার পরের এফেক্ট। বিভিন্ন রকমের পাগলের রূপসজ্জা ইত্যাদি। সমগ্র মানবজাতির জীবনে যত রকমের বিপর্যয় ঘটতে পারে তার সব কিছুই নাটকে প্রয়োজনবোধে ফুটিয়ে তোলার একমাত্র উপায় হল রূপসজ্জা। অন্য কোন কিছু দিয়েই তা পূরণ করা সম্ভব নয়, এছাড়াও আছে পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকের কত বিচিত্র ধরনের চরিত্র। পৃথিবীর নানা দেশের নানা বর্ণের মানুষ, যেমন—চীন ও জাপানীদের মধ্যে যে পার্থক্য তা খুঁজে বার করা। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ ও দেশের, সমস্ত জাতির মধ্যে যত রকম মানুষ আছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ভিন্ন ধরনের রূপের পৃথক রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষ করা। প্রত্যেক দেশের আদিবাসী ও উপজাতিদের রূপের পার্থক্যও লক্ষণীয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের সাঁওতাল, কোল, ভীল, ওঁরাও ইত্যাদি এবং আমাদের প্রত্যেক প্রভিন্সের সঙ্গে প্রত্যেকের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চুল-দাড়ি রাখার ভিন্ন ভিন্ন ধরন খুব ভালভাবে লক্ষ করে রূপসজ্জায় ধরতে না পারলে, বিভিন্ন দেশের মানুষকে মুখে তাদের ভাষায় কথা বলানো দিয়ে মঞ্চে দর্শক সমক্ষে উপস্থিত করলে, দর্শকের বোঝার পক্ষে খুবই অসুবিধার কারণ ঘটতে পারে। আবার শহরের হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিক-শ্রেণীর চেহারার রকমফের ও গ্রামের হিন্দু-মুসলমান চাষীর সারল্য ও দাড়ি-গোঁফের ভিন্ন ধরনের ব্যবহার প্রভৃতিও লক্ষণীয়। কত সহস্র ধরনের যে স্টাডি করার আছে এই রূপসজ্জা শিল্পের জন্য, তা লিখে শেষ করা যায় না। তারপর আরো কিছুকাল পরে চলচ্চিত্র ও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমাকে কর্মসূত্রে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছিল। কাজেই গণনাট্যের সঙ্গে ক্রমশই কাজের সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন অনেকেই গণনাট্যের বাইরে এসে গ্রুপ থিয়েটার তৈরি করে থিয়েটারে নানান এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করেছিল। স্বভাবতই

গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলে, আমার আলোচ্য বিষয় শেষ করব।

গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভুদাই সর্বপ্রথম থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করেন—যার নাম "বহুরূপী"। গণনাট্যে থাকাকালীন শম্ভুদা আমায় খুবই স্নেহ করতেন। আমিও শম্ভুদাকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। আমাদের সেই সম্পর্ক আজও রয়েছে। আজো মাঝে মধ্যে বন্ধুস্থানীয় কুমার রায়ের অনুরোধে দশচক্র, রাজা অয়োদিপাউস, ঘরে বাইরে, রাজা ইত্যাদি নাটকে রূপসজ্জায় অংশগ্রহণ করে থাকি। বহুরূপী যখন নিউ এম্পায়ারে সর্বপ্রথম তাঁদের নাট্যোৎসব শুরু করে তখন শম্ভুদা আমায় তাঁর তিনটি নাটকের রূপসজ্জার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। নাটক তিনটি যথাক্রমে ছেঁড়া তার, পথিক, উলুখাগরা। আমিও তখন খুব উৎসাহের সঙ্গে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে মাসাধিক-কাল ধরে সেই কাজ সমাধা করেছিলাম। তারপর থেকে বহুকাল ধরে শম্ভুদার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটে উঠতে পারিনি। কারণ তখন অর্থের প্রয়োজন ভীষণ জরুরী হয়ে পড়ার দরুণ, চলচ্চিত্রের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয়েছে। সেই সময় সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিশির ভাদুড়ি মহাশয় তাঁর "শ্রীরঙ্গম" থিয়েটার মঞ্চটি অর্থাভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিশিরবাবুর পর যাঁরা এই থিয়েটার নিলেন ও শ্রীরঙ্গম নাম পালটে "বিশ্বরূপা" করলেন, তাঁরা আজ সকলেরই পরিচিত। দক্ষিণেশ্বর সরকার ও রাসবিহারী সরকার। এই বিশ্বরূপার প্রথম শুরু থেকেই আমি দশ বছর একটানা বহু নাটকে কাজ করেছি। শিল্পী কালী ব্যানারজির অনুরোধে আমাকে বিশ্বরূপায় যোগ দিতে হয়েছিল। শেষের দিকে কর্তৃপক্ষের অভদ্র আচরণের জন্য বিশ্বরূপা ছাড়তে হয়েছিল। বিশ্বরূপায় কাজ করার কোন এক সময়ে 'নান্দীকারে'র অজিতেশ ব্যানারজির সাথে আমায় আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন কালী ব্যানারজি। নান্দীকার তখন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নাটকটি সবে মাত্র মঞ্চস্থ করেছে। অজিতেশবাবু খুবই আগ্রহের সঙ্গে ও'দের সাথে রূপসজ্জার কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমিও তখন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নাটকটির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সুতরাং অজিতেশবাবুর সেই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছিলাম।

তারপর এঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি সভ্যের আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধানত ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আর দীর্ঘদিন ধরে ওঁদের সঙ্গে নানান সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, শের আফগান, তিনপয়সার পালা, হে সময় উত্তাল সময়, শাহী সংবাদ, নটী বিনোদিনী, ভালমানুষ, আন্তিগোনে ফুটবল, খড়ির গণ্ডী ও তিনটি একাঙ্ক নাটকের রূপসজ্জায় কোন প্রকার অবহেলা না করে যেখানে যেমনটি হওয়া দরকার, ঠিক সেই রকম ভাবনাচিন্তা করেই রূপসজ্জা করে গেছি। তাই আজো নান্দীকার আমার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। এক সময় নান্দীকার থেকে কিছু সভ্য বেরিয়ে গিয়ে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাম দিয়ে আর একটি থিয়েটার গ্রুপ তৈরী করে। তাদের মধ্যে চিন্ময় রায়, বিভাস চক্রবর্তী, সঞ্জয় গাংগুলী, মায়া ঘোষ ও সত্যেন মিত্র প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। এঁরা সবাই নান্দীকারে থাকাকালীন, আমার সঙ্গে সকলেরই খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। কাজেই এঁদের নাটকের রূপসজ্জার দায়িত্বও আমাকেই নিতে হয়েছিল। প্রথমেই 'চাক ভাঙা'? নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ। তারপর যথাক্রমে—অমর ভিয়েৎনাম, চাকভাঙা মধু, রাজরক্ত, অশ্বত্থামা, নরক-গুলজার প্রভৃতি নাটকের সঙ্গে যুক্ত থেকে রূপসজ্জার কাজ করে যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু জীবিকার জন্য আমায় কমার্শিয়াল থিয়েটারের সঙ্গে সমানে কাজ করতে হয়। সেখানে চরিত্রানুগ ব্যস্ত। দুঃখের বিষয়, গ্ল্যামার শব্দের অর্থ নট ও নটীর জীবনে যে কি তা নিশ্চয়ই এই সব নট-নটীরা জানেন না। আমার মনে হয় চরিত্রানুগ রূপসজ্জা ও পোশাক পরিধান করে, সেই চরিত্রকে অভিনয় দিয়ে মঞ্চে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই নট ও নটী জীবনে সেইটাই হবে দর্শক-মানসে তাদের সত্যিকারের গ্ল্যামার। আর তা না করতে পারলে ইতিহাস তো দূরের কথা, দর্শক সমাজই যে বিরক্ত হয়ে তাঁদের মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, একথা তাঁরা কিছুতেই বোঝার চেষ্টা করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকের চরিত্রগুলি বিসর্জন দেওয়া হয় কুৎসিত ধরনের সাজসজ্জায়। ইদানীং কালের থিয়েটার কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে নীরব থাকেন। কি করে পয়সা রোজগার করা যায় সেইটাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তাঁদের নাকি সব সময় প্রচুর ভাবতে হয়।

নিন্দুক লোকেরা নাকি সব সময় জ্ঞান দেবার চেষ্টা করেই থাকে। তাতে অবশ্য তাঁদের কিছু যায় আসে না। আজকাল থিয়েটারের মালিকরা চলচ্চিত্রের শিল্পীদের নিয়ে আসেন অনেক বেশী টাকা মাইনে দিয়ে। তাঁরা মঞ্চে অভিনয় করতে সক্ষম না হলেও কিছু যায় আসে না। কারণ তাঁদের ধারণা, দর্শক নাকি চলচ্চিত্রের শিল্পীদের শুধু দেখার জন্যই থিয়েটারে ভিড় জমায়। নাটক দেখে আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়। ফলে ঐসব শিল্পীরাও বলতে শুরু করেছে, দর্শক তাঁদের দেখার জন্যই পাগল। নাটক বা তার চরিত্র ওসব কিছুই না। তাছাড়া কমার্শিয়াল থিয়েটারে আজকাল ভালো অভিজ্ঞ পরিচালকেরও প্রয়োজন হচ্ছে না। মালিকরাই পরিচালনা করতে শুরু করেছেন। কাজেই সবচেয়ে বিপদে পড়তে হয়েছে, দীর্ঘদিনের মঞ্চের পুরোনো অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের। তাঁরা মঞ্চের এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছেন না। পুরোনো দিনের নিয়ম কিন্তু এরকম ছিল না। তখন থিয়েটারেই একমাত্র অভিনয় শিক্ষার চর্চা হতো। আর থিয়েটার থেকেই শিল্পী-দের চলচ্চিত্রের জন্য নেওয়া হতো। এর ফলে থিয়েটার ও চলচ্চিত্র উভয় ক্ষেত্রেই অভিনয় ভাল হতো। এই ব্যবস্থা উলটে যাওয়ার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই অভিনয়ের ব্যর্থতা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। ষোল বছর আগে আমি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় "আরোগ্য নিকেতন" ও "ক্ষুধা" নাটকের রূপসজ্জা করে ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলাম। ইদানীংকালে কোন কমার্শিয়াল থিয়েটারে তা পেয়ে থাকি না: তার একমাত্র কারণ কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অব্যবস্থা। পরিচালক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী। তাই বহুরূপী, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রভৃতি প্রগতিশীল নাট্যগ্রুপের সঙ্গে কাজ করতে ভীষণ ভাল লাগে। কারণ এঁদের ভাবনা-চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে নাটক পরিবেশন করা, আমার ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে অনেকাংশে মিল খুঁজে পাই। তাই এঁদের নাটকে রূপসজ্জার পরীক্ষা নিরীক্ষারও সুযোগ পেয়ে থাকি। আর একথাও ঠিক যে, চরিত্রানুগ স্বাভাবিক রূপসজ্জার জন্য অনেকাংশেই নাটকগুলিও সার্থকতা লাভ করে। আমার বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সত্য আমি অনুভব করেছি। নাট্যকার সমাজ-জীবনের নানাবিধ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটক লিখে থাকেন। আবার পুরাণ ও ইতিহাসের নানান বিষয়-বস্তু নিয়েও নাটক লিখে থাকেন।

কিন্তু নাটকের আসল ও প্রধান বস্তুই তো নাটকের চরিত্রগুলি ?

সেই চরিত্ররাই তো মঞ্চে সবাক হয়ে প্রাণের সঞ্চার করবে। অনেকেই অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে— অভিনেতারাই নাকি মঞ্চে নাটককে সার্থক করে তোলেন তাঁদের অভিনয় দিয়ে। ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, নাটকের চরিত্রানুগ যথাযথ নাট্যোল্লিখিত চরিত্রে, নিজস্ব স্বরূপ বদলাতে পারবে না! যতক্ষণ না স্বাভাবিক চরিত্রানুগ রূপসজ্জায়, অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী অভিনেতাদের হুবহু নাটকের চরিত্রে বদলে দেওয়া যায়। সুতরাং নাট্য-শিল্পের প্রধান কাজ যেমন নাটক রচনা, তেমনি দ্বিতীয় প্রধান কাজ হচ্ছে, যথাযথ রূপসজ্জায় নাটকের চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা। তৃতীয় প্রধান কাজ হচ্ছে অভিনেতার অভিনয় দক্ষতা দিয়ে, রূপসজ্জাকৃত চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাওয়া। তাহলেই একমাত্র নাটক জীবন্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তা না হলে স্টেজ ক্রাফটের অন্য সব কিছু দিয়েও নাটককে জীবন্ত করে তোলা যায় না।

স্বাভাবিক ও সার্থক রূপসজ্জা দর্শকের চোখে পড়ার কথা নয়। কিন্তু তার প্রয়োগ নৈপুণ্যের উপরেই নাটকের সমস্ত উত্থান-পতন নির্ভর করে থাকে। এ বিষয়ে নাটকের সঙ্গে জড়িত সবারই—ও বোদ্ধা দর্শক আর নাট্য সমলোচকদের সকলেরই বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কেউ এ ব্যাপারে বোঝার চেষ্টা করেন না; কয়েকজন নাট্যকার, কিছু পরিচালক আর মুষ্টিমেয় অভিনেতা ছাড়া, এ বিষয়ে সবাই যেন কেমন উদাসীন। যেমন উদাসীন থাকেন কর্মকর্তারা। প্রচার পত্রে, প্রযোজক, পরিচালক ও নট-নটীদের প্রচারই শুধু থাকে। মাঝে মাঝে আলোকসম্পাত সুরকার ও নাট্যকারের নাম নেহাতই দয়া করে প্রচার হয়ে থাকে। আর সব নেপথ্য শিল্পীরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে। তাঁদের কর্মকাণ্ড যেন পুতুল খেলা। অথচ নাটকের সফলতা নির্ভর করছে কিন্তু এইসব কৃতী নেপথ্য শিল্পীদের সুষ্ঠু কর্মকাণ্ডের উপরই। আশ্চর্য লাগে, যাঁরা মঞ্চের আড়াল থেকে নাটককে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়ে দর্শক সমক্ষে তুলে ধরেন, তাঁদের স্বীকৃতিদানে কর্মকর্তা-দের এই কৃপণতা কেন ? দুঃখের বিষয় এতো বড় একটা শিল্পকলার সত্যিকারের মূল্যায়ন আমাদের দেশে আজো হলো না। কলাকুশলীদের প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করা হয় না। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের জন্য প্রতি বছর সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে যেসব প্রাইজ ও সম্মানপত্র দেওয়া হয়, অধিকাংশ সময়ই তার থেকে রূপসজ্জা, আলো, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বাদ পড়ে যায়। এর অর্থ আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হয়। আবার আশ্চর্য হয়ে যাই একথা ভেবে যে—আমাদের দেশের অসংখ্য মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের কলাকুশলী, যারা তাদের কর্মক্ষেত্রে কোন প্রকার সিকিউরিটি না পেয়ে ও বছরের [illegible] ছয় মাস বেকার থেকে, কোন প্রকারে আধপেটা খেয়ে, কেমন করে এই নাট্যভারতীর সাধনায় রত রয়েছে। আর কেমন করেই বা দেশের নাট্য সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেরা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এইভাবে আর বেশীদিন চলতে থাকলে, অদূরভবিষ্যতে আমাদের দেশের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের শক্তিমান স্রষ্টারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর তার সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে, জনগণের কল্যাণে সুস্থ নাটক ও চলচ্চিত্র-নির্মাণ কার্য। দেশের এই কষ্টার্জিত সংস্কৃতির স্তম্ভ অচিরেই ভেঙে পড়বে। গড়ে উঠবে সেখানে অপসংস্কৃতির দুর্গ। নাটকই হচ্ছে সমাজজীবনের দর্পণ, কাজেই সেই ভালো নাটক ও ভালো চলচ্চিত্র, ভালো শিল্পী ও ভালো কলাকুশলী ব্যতিরেকে তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এঁদের এই শিল্প-কলার মধ্যেই মর্যাদা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আজ এই দুঃসাধ্য কাজ একমাত্র এদেশের সরকার ও প্রযোজকরাই সমাধা করতে পারেন।

দর্শক-সমাজেরও নির্বিকার থাকলে চলবে না। তাদেরও বুঝতে হবে ভালো-মন্দের পার্থক্য। কুরুচিপূর্ণ সব কিছুকে বর্জন করে নির্মল ও সুন্দর শিল্পসৃষ্টিকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের [illegible] দর্শকদের এটা

খেলা

বিশ্বজয়ী ফুটবল দলের কোচ মিনত্তি

গত দু বছর ধরে আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে বিরক্ত ও বিতর্কিত মানুষ ছিলেন ফুটবল দলের কোচ সিজার লুই মিনত্তি। বিরক্ত হওয়ার কারণ, ফুটবল সমস্যা নিয়ে এবং আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিততে পারবে কিনা এই প্রশ্নে মিনত্তিকে বারবার দিশি-বিদেশী সাংবাদিকদের নানা ধরনের প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই। বিতর্কের কারণ, সাংবাদিকরা তখন চেপে ধরেছেন। তাঁকে ভুল বুঝে মিনত্তি হয়তো সব সময় এক কথা বলেননি। সমালোচনা করেছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের প্রধান প্রতিবেদক এরিক উইল "ওয়ার্লড সকার" পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় লিখেছেন—"খোলা মনের মানুষ মিনত্তির কিন্তু কোন দোষ নেই। কোনদিনই তিনি কোন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেননি। বড় বড় কথাও বলেননি। বরং নিজের সীমায়িত শক্তি এবং সমস্যার কথাই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তবে বার বার একই কথার জবাব দিতে তাঁর পক্ষে বিরক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবস্থার পরিবর্তনের সংগে মত বদলও স্বাভাবিক ব্যাপার।"

প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে মিনত্তি জাতীয় দলের ভার ধরার পর থেকে এই বছর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ৩২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। জিতেছে ১৮টি ম্যাচে। ড্র হয়েছে সাতটি ম্যাচ। হেরেছে সাতটিতে। স্বপক্ষে গোল ছিল ৬৪, বিরুদ্ধে ৩৩। আন্তর্জাতিক ফুটবলের কঠিন সংগ্রামে যে কোন দেশের পক্ষে এই ফল মোটামুটি খুশির কারণ হত। কিন্তু আর্জেন্টিনার মানুষ মোটামুটিতে খুশি ছিল না। দেশের আড়াই কোটি মানুষের কাছেই ফুটবল ধর্মের মত। তারা চাইত আর্জেন্টিনা সব খেলায় জিতুক। বিশ্বকাপে বিজয়ী হোক। তাই মিনত্তির সমালোচকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল।

স্বল্পবাক মিনত্তি দুঃখ করে বলেছিলেন—সমালোচকদের স্মরণে রাখা উচিত কোচের ক্ষমতা কতখানি। এই যে আর পাঁচ মাস পরে বিশ্বকাপের খেলা। আমি এখনো দলের ২২ জন খেলোয়াড় হাতে পাইনি। পেয়েছি মাত্র ১৫ জন। যদিও খেলবে ১১ জন। কিন্তু চোট আঘাত আছে। বদলের প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, শুধু দল গড়ার ব্যাপারে এখনো আমার ৬০ ভাগ কাজই অসমাপ্ত রয়েছে। যতক্ষণ না দলের মধ্যে সংহতি আনতে পারছি, আমি যে আক্রমণাত্মক ফুটবল চাই সেই মানসিকতায় খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করতে পারছি ততক্ষণ আমি ফল সম্পর্কে নিশ্চিত নই। তারপর ধরে নিলাম চূড়ান্ত-ভাবেই দলটি গড়া হল। একজন খেলোয়াড়েরও অদল বদলের প্রয়োজন নেই। টেকনিক-ট্যাকটিকস এবং প্র্যাকটিসেও পুরো তালিম নেওয়া হয়েছে। তখন কত ভাগ কাজ শেষ হল? মাত্র ২০ ভাগ। সাফল্যের বাকি ৭৫ ভাগ নির্ভর করবে খেলার সময় খেলোয়াড়দের উপর। মাত্র ৫ ভাগ নির্ভর করবে কোচের উপর খেলার সময় প্রয়োজনীয় রদ-বদল এবং পরামর্শকে ঘিরে। এর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব কোচের নেই। যে কোচরা সাফল্যের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দাবী করে থাকেন তাঁরা একটু বেশিই দাবী করেন। ঠিক সত্যি কথাও বলেন না।

সাংবাদিক এরিক উইল লিখেছেন, ১৯৭৪ সালের ১২ অক্টোবর স্পেনের সংগে আন্তর্জাতিক খেলায় যেদিন মিনত্তি আর্জেন্টিনা দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বলতে গেলে সেইদিন থেকে ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে তিনি দেখা করেছেন এবং ও'র আন্তরিকতা ও মানসিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন। বরাবরই বলেছেন, আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিততে পারে, যদি ভাল অ্যাটাকিং ফুটবল খেলে।

আর্জেন্টিনা অ্যাটাকিং ফুটবলই খেলেছে। বিশ্বকাপও জিতেছে। বলা যেতে পারে মিনত্তিই

বিশ্বকাপ জয়ের পাঁচ মাস আগে কোচ মিনত্তি বলছেন— আর্জেন্টিনা ...

খেলিয়েছেন এবং আর্জেন্টিনা দলকে জিতিয়েছেন। ফুটবলে বিশ্বজয়ের পরও মানুষটির মধ্যে কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। মুখে বড় কথা নেই। "দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলই বিশ্বশ্রেষ্ঠ"—ফুটবলের রাজা পেলের এই মতের সঙ্গেও সায় দেননি। বলেছেন, কীভাবে এটা প্রমাণ হল? আমরা তো অনেক দলের সঙ্গেই খেলিনি। তবে এটা অবশ্যই প্রমাণ হয়েছে, আমরা লড়তে জানি।

দক্ষিণ আমেরিকারই আর এক কোচের সঙ্গে মিনত্তির মনোভঙ্গিরই বা কত পার্থক্য। অপরাজিত থেকে ব্রাজিল তৃতীয় স্থান দখল করায় ব্রাজিলের কোচ ক্লডিও কুটিনহো বলেছিলেন, ব্রাজিলই ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপের নৈতিক চ্যাম্পিয়ন। ওই সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললে মিনত্তি রসিকতা করে বলেন—"নিশ্চয়ই, কুটিনহোকে তাঁর নৈতিক চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করব, আর্জেন্টিনা বাস্তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তিনিও আমাকে অভিনন্দন জানাবেন।"

ফুটবলে পেলে পৃথিবীর গর্ব হলেও দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা স্বাভাবিক। ওই পেলেই কিন্তু প্রথমদিকে ব্রাজিলের নেতিমূলক খেলা দেখে মন্তব্য করেছিলেন—তাঁর প্রিয় ব্রাজিল ফুটবল উপহার দেয়নি, দিয়েছে অশ্রুর উপাদান। পরে বলেছেন, দল হিসাবে ব্রাজিলের তৃতীয় স্থান দখল প্রাপ্যের বেশি পাওনা। সেই পেলে যখন দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন তখন বোধ হয় মিনত্তি তাঁর প্রাক্তন সতীর্থের মন্তব্যে খুশি হতে পারেননি। বলেছেন, আনন্দ উল্লাসের মধ্যেও মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। হ্যাঁ, মিনত্তি ১৯৬৮তে পেলের পাশেই খেলেছেন ব্রাজিলের স্যান্টোস ক্লাবে। তার আগে আর্জেন্টিনার তিনটি ক্লাবে খেলে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭০এ ফুটবল থেকে বিদায় নেবার পর শুরু করেন কোচিং। প্রথম কৃতিত্ব হুরাকান ক্লাবকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন করা।

জাতীয় কোচ হিসাবে প্রচুর সমস্যা ছিল মিনত্তির। স্বীকার করেছেন, দীর্ঘ তিন বছর ধরে তাঁকে জাতীয় দলের পেছনে যে শ্রম দিতে হয়েছে সেই শ্রমে চার মাসের মধ্যে একটি ক্লাবকে বেশ ভাল দলে পরিণত করা যায়। তার কারণ, আর্জেন্টিনার ফুটবল মরসুম যথেষ্ট দীর্ঘ। কোচিংয়ের জন্য খেলোয়াড়দের সব সময় পাওয়া যায় না। সবাই এক ধাঁচে খেলে না। যেমন, তিনি যে ক্লাবের কোচ ছিলেন সেই হুরাকান হেমন... হুরাকানের ক্লাব এবার রেলিগেশন ফাইট করেছে। হুরাকানের চারজন খেলোয়াড় ছিল জাতীয় দলে—গোলকিপার ব্যালে, ডিফেন্ডার ক্যারাসকোসা ও আর্ডিলিস এবং ফরোয়ার্ড হাউসম্যান। রেলিগেশন ফাইটের জন্য ওদের খেলার ধারা ছিল ডিফেন্সিভ। তাদের মধ্যে আক্রমণ-মুখী মেজাজ আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। আর্জেন্টিনার অনেক নামী খেলোয়াড় ছিলেন বিদেশের নানা দলে। স্পেনেই তো ছিলেন তিনজন। রিয়েল মাদ্রিদে এর্নারিথ উলফ, সেন্ট এটিয়েনে অসওয়াল্ডো পিয়াজ্জা এবং ভ্যালেন্সিয়ায় মেরিও কেম্পেস। ওদের পাওয়া যাবে কিনা এবং ওরা কী ফর্মে আছেন তা জানার জন্য বিদেশে ছুটতে হয়েছে। ইউরোপের নানা দেশ সফর করতে হয়েছে সেখানকার খেলার মান সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণার জন্য। তারপর সমস্যা আরও দানা বেঁধে উঠল মাস তিনেক আগে! জাতীয় দলের অধিনায়ক ও লেফ্ট ব্যাক জোর্গে ক্যারাসকোসা জানিয়ে দিলেন খেলবেন না। এক নম্বর গোলকিপার হুগো গত্তিকে বাদ দিতে হল প্র্যাক্টিসে না আসায়। মিডফিল্ডার রিকার্ডো ভিলাও বাদ পড়লেন পাঁচ লক্ষ পাউন্ড দাম পেয়ে টেকসাসে চলে যাবার মতলব করায়। মিনত্তি কোন কিছুতেই বিচলিত হলেন না। তরুণদের উপর জোর দিয়ে দল গড়ে পরিকল্পনা আঁটতে লাগলেন আর পোড়াতে লাগলেন প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট। ৩৯ বছর বয়সী দীর্ঘদেহী সুপুরুষ কোচ একজন চেন স্মোকার। সিগারেটের আগুন কখনো নেভে না। কাগজেই খবর বেরিয়েছে বিশ্বকাপের খেলার সময়ও পুড়িয়েছেন প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট।

নিয়ম নিষ্ঠার দিকেও মিনত্তি যথেষ্ট সচেতন। কোচিং ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন আশ্রমের পবিত্রতায়। খেলোয়াড়দের খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম দিয়েছেন রুটিন বেঁধে। তার চেয়েও বড় কথা, দলটিকে এক মন এক প্রাণ একতার সুরে উদ্বুদ্ধ করে তার মধ্যে আক্রমণাত্মক ফুটবলের মেজাজ এনেছেন।

আজ প্রেসিডেন্ট জোরাগ ভিডেলার মত তিনি আর্জেন্টিনার সম্মানিত পুরুষ। ঘরে ঘরে তাঁর বন্দনা, তাঁর নাম। তবু কিন্তু আবার জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে তাঁর প্রবল দ্বিধা। আগেই বলেছিলেন, বিশ্বকাপের খেলার পরই দায়িত্ব ত্যাগ করবেন। সে মত এখনো বদলাননি।

মিনত্তি ভাল করেই জানেন, রাজনীতির নেতাদের মতই উত্থান পতন নিয়ে ফুটবল কোচদের জীবন। আজ রাজা, কাল ফকির। আজ মাথায় যশের মুকুট, কাল গলায় কাঁটার মালা।

বিশ্বকাপ জয়ের সুবাদেই ইংলণ্ডের কোচ আলফ র‍্যামসে স্যার খেতাব পেয়েছিলেন। আবার স্যার আলফের চাকরিও গেল ইংলণ্ডের ব্যর্থতায়। ১৯৬৬তে ব্রাজিলের ব্যর্থতায় কিছু ফুটবলপ্রেমিক তো রিও ডি জেনিরোতে কোচ ফিওলার জন্য ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছিল। এবারেও পোড়ানো হয়েছে কোচ কুটিনহোর কুশপুত্তলিকা। ভদ্রলোকের হাত থেকে ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর চাকরিটি গেছে, ব্রাজিল অপরাজিত থেকে তৃতীয় স্থান দখল করা সত্ত্বেও।

সিজার লুই মিনত্তি এ সব ভাল করেই জানেন বলে বোধ হয় আর দায়িত্ব নিতে চান না এবং দেশের ফুটবলের প্রতি অসাধারণ দরদ আছে বলেই ফুটবলের উন্নতি, প্রসার এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য ১৯৭৯ সালের পরিকল্পনা পেশ করে রেখেছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের কাছে। কোচ হিসাবে এমন চরিত্র মেলা ভার।
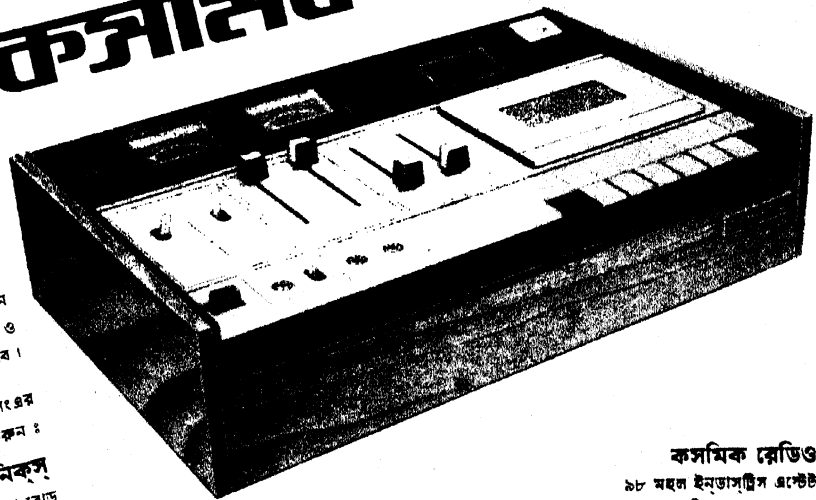
মুকুল

লীগের এক-তৃতীয়াংশ খেলার পর

পুষ্পেন সরকার

কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ এখন পরিণতির দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। অর্থাৎ লীগ খেলার উপরের এবং নীচের দিকের অবস্থা খানিকটা আঁচ করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দলগুলির এক-তৃতীয়াংশ খেলাও হয়ে গেছে।

প্রথম ডিভিসন লীগে উপরের এবং নীচের দিকের অবস্থান নিয়েই মাথা ঘামায় দলগুলি। উপরের দিকের অবস্থান মানে চ্যাম্পিয়নের সম্মান। এটা অবশ্য মোরসীপাট্টা হয়ে পড়েছে দুটি দলের মধ্যে। তৃতীয় কোন দলের এবারও সেই অধিকারে ভাগ বসানোর সম্ভাবনা নেই। এই দল দুটি চ্যাম্পিয়ন ছাড়া রানার্সের সম্মানের জন্য কিন্তু মাথা ঘামায় না।

নীচের দিকের অবস্থাকে বলা যায় বাঁচার লড়াই যেখানে আছে এক দুষ্ট ব্যাধি। প্রথম ডিভিসনে টিকে থাকার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা গড়াপেটার খেলা। যোগ্যতা না থাকলেও খুঁটির জোরে কৌলীন্য বজায় রাখা। বাংলার ফুটবলের উন্নতির পথে এই রোগ এক বড় বাধা।

মোহনবাগানের নয়টি খেলা দেখে বলা যায়, এইভাবে এগিয়ে গেলে তাদের চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কোন খেলায় হারেনি। ড্র করে নষ্ট করেনি কোন পয়েন্ট। সর্বাধিক ৩৬টি গোল করেছে। এবং একটি মাত্র গোল খেয়েছে। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি খেলায় ভবিষ্যতে তাদের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে।

সব দলগুলির মধ্যে মোহনবাগান ভাল খেলছে। দলগত বোঝাপড়ায় এবং খেলার বিন্যাসে অধিকাংশ খেলাগুলিতে তারা সাফল্য দেখিয়েছে। গোল করার দক্ষতা নিয়ে নিন্দা করার বিশেষ কিছু নেই। এ বছর মোহনবাগানের নিয়মিত গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জি আস্থা নিয়ে খেলছে। খিদিরপুরের অমিত বাগচীর গোলটির জন্য তাকে বিশেষ দায়ী করা যায় না।

ডিপ ডিফেন্সও মোহনবাগানের সব থেকে ভাল। দুই সাইড ব্যাক শ্যামল ও দিলীপ নির্ভরশীল। সুযোগমত এগিয়ে এসে আক্রমণ সক্রিয় করার চেষ্টা করে। স্টপার হিসাবে সুব্রতর জুড়ি এ বছর কলকাতা মাঠে নেই। অনেক পরিণত। মেজাজ গরম করে খেলার দুর্নাম অনেক কাটিয়ে উঠেছে। আমি সব থেকে খুশি হয়েছি চন্দ্র মেমোরিয়ালের বিরুদ্ধে তার খেলা দেখে। সেদিন চন্দ্রের খেলার ট্যাকটিকস ছিল মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের মাথা গরম করে দেওয়া। পরিকল্পনায় তারা সফল হয়েছিল। মোহনবাগান মরসুমে সব থেকে খারাপ খেলেছিল সেদিন। ব্যতিক্রম ছিল সুব্রত। অহেতুক ফাউল, গা-জোয়ারী খেলা, প্রভৃতি নিয়ে অন্য সকলে নিজেদের স্বাভাবিক খেলা ত্যাগ করলেও সুব্রত কোন সময়েই নিজের দায়িত্ব ভোলেনি।

লিংকম্যান হিসাবে গৌতম ও প্রসূনকে ভারতের সেরা জুড়ি ধরা হয়। গৌতম সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় খেলছে না। ফলে হাবিবকে দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা হচ্ছে। প্রসূন প্রথম দিকে দু-তিনটি ম্যাচ আশানুরূপ খেলতে পারেনি। পরের খেলাগুলি ভাল খেলেছে। হাবিব লিংকম্যানের দায়িত্ব ছাড়া আক্রমণ পরিকল্পনায় পুরোধা। অধিকাংশ খেলাতে হাবিবকে দেখেছি বুদ্ধি ও কুশলতা দিয়ে আক্রমণ সজীব ও কার্যকরী করে রাখার চেষ্টা করতে। দুই লিংকম্যান দু রকমের দায়িত্ব পালন করছে। প্রসূনের ভূমিকা বেশীটাই রক্ষণাত্মক। হাবিবের আক্রমণাত্মক। হাবিব মাঠে থাকলে দল অনেকটা নিশ্চিন্তে খেলতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল—ক্যালকাটা জিমখানা

গতি। অধিকাংশ খেলাতেই সে বিপক্ষের রক্ষণভাগকে ভেঙেছে গতির মূলধনে। তবে প্রথম সুযোগেই যদি সে সহ-খেলোয়াড়কে বল যোগাতে চেষ্টা করে তা হলে আক্রমণ আরও ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা। সুভাষ প্রথম দিকে দু-তিনটি ম্যাচ খুব ভাল খেলেছিল। পুরোনো সুভাষকে দেখেছিলাম। তিন-চারটি ম্যাচ পরে আবার ম্লান হয়ে পড়ে। তবে ভারি মাঠে আবার তার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। শ্যাম এবং আকবর দুজনেই প্রায় প্রতিটি খেলায় গোল করেছে। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর শ্যাম কিছুটা মন্থর। খেলার শেষ দিকে ক্লান্তির ছায়া ফুটে ওঠে। মানস নিয়মিত সুযোগ পেলে আরও ভাল খেলবে আমার ধারণা। বিদেশের থেকেও তার খেলায় বুদ্ধির ছাপ বেশী। মোটামুটি বলা যায় মোহনবাগানের আক্রমণভাগ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বাটার বিরুদ্ধে আট গোল ওই সময় পর্যন্ত এ বছরের রেকর্ড।

মোহনবাগানের দুর্বল জায়গায় সুব্রত ছাড়া দ্বিতীয় স্টপারের স্থান। প্রদীপ বা কম্পটন কেউই আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারছে না।

গতবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের সূচনা হয়েছিল শুভ সাত সংখ্যা দিয়ে। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে উঠে আসা পুলিস যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু অধিনায়ক সুরজিত-বিহীন ইস্টবেঙ্গলের প্রথম দিনের খেলা দেখে মনে হয়েছিল এবারের লীগ মরসুমের মধ্যপথে বাধা সৃষ্টি করা যে কোন দলের পক্ষে কষ্টকর হবে।

কিন্তু স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরের খেলাতেই কোনক্রমে ২—১ গোলে জয় ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক ও সদস্য মনে অনিশ্চয়তার দোলা লাগায়। তৃতীয় খেলায় উয়াড়ির কাছে পরাজয়। চতুর্থ খেলায় পোর্টের সঙ্গে ড্র। সমর্থকদের বুকভরা আশা ভেঙে চুরমার করে দেয়। লীগে একটি পয়েন্ট হারালেই দুর্ভাবনা হয়। তবে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল এ অবস্থায় পড়লে সব সময়েই আশা করে যে মর্যাদার লড়াইতে তারা এই ঘাটতি পূরণ করে নেবে। এ ছাড়া বাইশটি খেলায় যে কোনদিন আপসেট হবে না এ কথাই বা কে বলতে পারে? কিন্তু শুরুতেই তিন পয়েন্টের ব্যবধান চ্যাম্পিয়ন হবার পথে দুস্তর বাধা। সেই বাধা ইস্টবেঙ্গল পার হতে পারবে, এমন সম্ভাবনা কম।

এই প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের দুই কট্টর সমর্থকের কথা উল্লেখ করলেই অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিন পয়েন্ট হারানোতে দলের প্রতি দুজনই বিরক্ত। আবার এত ভালবাসেন দলকে যে খেলার মাঠে না এসেও পারেন না। দু-জনেই খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করতে করতে মাঠের পথে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন আর একজনকে বললেন, "দ্যাখ আমাদের লীগ পাওয়ার আশা কি রকম জানিস? ওগের পোলা ফেল করুক। আর আমাগের পোলা ডবল প্রমোসন পাক।" যুক্তির দিক থেকে মন্তব্যটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সকলের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটূক্তি উপেক্ষা করে ইস্টবেঙ্গল পরের খেলাগুলি খারাপ খেলেনি। বিশেষ করে মরসুমের প্রথম প্রদর্শনী খেলায় শক্তিশালী মহামেডানের বিরুদ্ধে তারা সমস্ত দুর্বলতা

ক্ষেত্রে ফেলে যে বড় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ রেখেছে। ভবিষ্যতের খেলাগুলিতেও তারা দলীর সুনাম বজায় রাখতে চেষ্টা করবে আশা করা যায়।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে ইস্টবেঙ্গল গত বছরের মত খেলতে পারছে না। গোলরক্ষক ভাস্করের বিরুদ্ধে দুটি গোলের ক্ষেত্রে একটি আত্ম-ঘাতী অপরটি মনোরঞ্জনের ভুল পাশের পরিণাম। সাময়িক ভেঙে পড়লেও ভাস্কর আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। ডিপ ডিফেন্স নিয়ে সমস্যা আছে। চিন্ময় আহত হওয়ায় কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেনি। সাইড ব্যাক হিসেবে চিন্ময়কে ভারতশ্রেষ্ঠ বলা হয়। চিন্ময়ের অনুপস্থিত ডিপ ডিফেন্সকে দুর্বল করেছে সন্দেহ নেই। অপর সাইড ব্যাক সত্যজিৎ বা বরীনের মধ্যে সত্যজিৎ ভাল। চিন্ময়ের শূন্য স্থানে সমীর ক্রমেই উন্নতি দেখিয়েছে। চিন্ময় ফিরে এলেও লেফ্‌ট ব্যাক সম্বন্ধে কিছুটা দুর্ভাবনা থাকবে।

দুই স্টপারের মধ্যে মনোরঞ্জন মাঝে মাঝে ভুলভ্রান্তি করলেও পরিশ্রমী এবং সব থেকে সক্রিয়। সুন্দর স্বাস্থ্য এবং অফুরন্ত দম নিয়ে মনোরঞ্জন সাহসের সংগে আক্রমণ মোকাবিলা করছে এবং ফাঁকা জমি ভরাট করার দিকে লক্ষ আছে। মহমেডানের বিরুদ্ধে এ বছর সেরা ম্যাচ খেলেছে সে। শ্যামল অনেক মন্থর। জায়গা ছেড়ে এগিয়ে গেলে ফিরে আসতে দেরী হয়। সেটা যে তার পক্ষে সম্ভব নয় এ বিষয়ে সচেতন। ফলে কদাচিৎ আক্রমণ জোরদার করতে এগিয়ে আসে।

লিংকম্যানের জায়গাতেও সমস্যা। এখনও সেই সমরেশই প্রধান ভরসা। কিন্তু পাঁচ বছর বা তিনবছর আগের সমরেশ আর আজকের সমরেশের কর্ম-ক্ষমতা যে একই রকম থাকা সম্ভব নয় এটা সকলেরই বোঝা উচিত। আবার লিংকম্যান হিসাবে প্রশান্ত বা প্রশান্তের পরিবর্ত কোন খেলোয়াড় দলকে তেমন কিছু সাহায্য করতে পারেনি। মহমেডানের বিরুদ্ধে প্রশান্ত যেমন খেলেছে পরের খেলাগুলিতে যদি সে অনুরূপ সাফল্য দেখাতে পারে তাহলে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগ শক্তিশালী হবে।

ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের প্রধান শক্তি অধিনায়ক সুরজিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ উইং-ফরোয়ার্ড হিসাবে তার স্বীকৃতি। কিন্তু গতবারের সুরজিতকে এবারে প্রতিটি খেলায় দেখতে পাইনি। কিন্তু সময়ের জন্য হয়তো সে জ্বলে উঠেছে। পায়ের সূক্ষ্ম কাজে উঁচু দরের শিল্পীর স্বাক্ষর রেখেছে। গোল করার দক্ষতা দেখিয়েছে। তবুও বলব সুরজিত এ বছর সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হয়নি। সুরজিত ফিরে আসছে তার প্রমাণ পাচ্ছি। ফিরে এলেই যে-কোন দলের কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

ফরোয়ার্ডদের মধ্যে ভাল খেলছে উলগা ও মিহির। উলগার গতি এবং অভিজ্ঞতা এবং মিহিরের পরিশ্রম কার্যকরী হচ্ছে। দু-তিনটি ভাল গোল করেছে মিহির। সুরজিত, উলগা এবং মিহিরের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাফল্যের উপর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ধার বাড়া-কমা নির্ভর করছে। অপর স্টাইকার হিসাবে তপন বা রঞ্জিত অপরিহার্যতার পরিচয় দিতে পারেনি। তবে তপনের উন্নতি দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, দুর্বলতা কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। এইভাবে এগিয়ে যেতে পারলে মোহনবাগানের সংগে মর্যাদার লড়াইটিও জমবে। সর্বশেষে একটি কথা বলব সেটা হল ভাগ্য। এই ভাগ্য খেলার অনেক ফল উলটে-পালটে দেয়। এ বছর ইস্টবেঙ্গল সেই ভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

উয়াড়ির কাছে পরাজয় বা পোর্টের বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট হারানোর মধ্যে ভাগ্যের পরিহাস বিশেষ করে লক্ষ করেছি। এরপর মহমেডান স্পোর্টিং-এর কথা। ইস্টবেঙ্গলের মত তারাও তিন পয়েন্ট হারায় আটটি খেলায়। সালকিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম খেলাতেই বোঝা গিয়েছিল এ বছর চ্যাম্পিয়ন হবার জোরদার [illegible] প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। ইস্টার্ন কম্যাণ্ড, কালীঘাট এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোনক্রমে ১—০ গোলে জয়লাভ সেই বিশ্বাস আরও জোরদার করে। এরপর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ খেলাটিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। দুই-এর পরিবর্তে চার বা ছয় গোলে হারলেও তাদের কৈফিয়ত দেবার কিছু থাকত না।

মহমেডানের এই মরসুমের এ অবস্থার জন্য প্রায় সব বিভাগ কম বেশী দায়ী। গোলরক্ষক নাসির আমেদ মোটামুটি খারাপ নয়। চার ব্যাকের মধ্যে শ্যাম কর্মকার এবং অশোক চক্রবর্তী প্রধান ভরসা। আনোয়ার বা অধিনায়ক হাবিব খাঁ ভাল খেলছে না। দলের হাফব্যাক হিসাবে নবাগত অমলরাজ মন্দ নয়। আজিজের পরিশ্রম করার ক্ষমতা কম। গতিও মন্থর।

মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সাজ্জাদের গোল করার চেষ্টা ব্যর্থ করছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ব্যাক

ফরোয়ারডদের মধ্যে গত কয়েক বছর লতিফুদ্দিনই ছিল ক্ষুরধার অস্ত্র। এবার প্রায় প্রতিটি খেলাতেই সে সব থেকে নিরাশ করেছে। এমন কি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে তার ব্যর্থতা দেখে কোচ রহমন লতিফুদ্দিনকে বসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুকিম, নাসিম আলি বা সুরীন্দরকুমার কেউই মহমেডানের শক্তি ভরাল করে তুলতে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম সাজ্জাদ। দলের আক্রমণ এবং গোল করা দুটি বিষয়েই সেই প্রধান ভরসা। বাটার বিরুদ্ধে মরসুমে প্রথম হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্বও সাজ্জাতের।

খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের পর আশা করা গিয়েছিল এই মরসুমে এরিয়ান ও জর্জ টেলিগ্রাফ ভাল খেলবে। গত বছর তিন প্রধানের পর স্থান ছিল এই দল দুটির। কিন্তু সেই প্রত্যাশা রাখতে পারেনি। এরিয়ানের এগারটি খেলার মধ্যে জয় তিন। হার তিন। ড্র-এর সংখ্যা পাঁচ। এরিয়ানের খেলা দেখে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা করতে পারছি না।

জর্জ টেলিগ্রাফের অবস্থাও অনুরূপ। উয়াড়ি, পোর্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয়। দুই রেলের সংগে গোলশূন্য খেলা। ভবিষ্যতের খেলার মধ্যে মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং রয়েছে। অবশিষ্ট খেলাগুলিতে যে জর্জ ভাল খেলবে তার ইংগিত নেই।

অন্য দলগুলির মধ্যে এ বছর ভাল খেলছে উয়াড়ি। গতবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে হারানো বড় কৃতিত্ব। জর্জকে হারানোর মধ্যেও শক্তির সমন্বয় দেখিয়েছে। এ পর্যন্ত একমাত্র বি এন আর-এর কাছে হেরেছে। অবশ্য সাতটি খেলায় ড্র না করলে উয়াড়ি লীগ তালিকায় অনেক উপরে উঠে আসতে পারত। স্ট্রাইকার উত্তম বিপজ্জনক। পুলিশের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয়ের গোলটিও তার। মোটা-মুটি দলটি সাফল্য দেখাচ্ছে।

খিদিরপুর, পোরট এবং দুই রেল খুব খারাপ খেলছে না। প্রথম সাত-আটটি দলের মধ্যে জায়গা করে নেবে আশা করা যায়। বড় দলগুলিকেও এদের বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট নিতে বেশ পরিশ্রম করতে হবে।

তবে, 'পাড়াপেটার খেলা' শুরু হয়ে গেছে। খেলা চলছে মাঠের বাইরে। চলবেও। দয়া-দাক্ষিণ্যর পয়েণ্টে মুক্তি এবং মোক্ষলাভের চেষ্টা করবে দু-তিনটি দল।

কলকাতার ফুটবল লীগ নিয়ে হুজুগের অভাব নেই। ক্রমেই বাড়ছে। তিন প্রধানের খেলার দিন ময়দান গম গম করে। ওদের কাছে দলের জয় ছাড়া দর্শনীয় বা কাম্য কিছু নেই। যেন তেন প্রকারেণ দুটি পয়েন্ট। না হলেই বিবাদ। মারদাংগা। এই আবহাওয়ায় ফুটবল মরসুমের সমাপ্তি সুষ্ঠু-ভাবে এবং শান্তিতে ঘটবে এমন জোরদার আশা এই মুহূর্তে করতে পারছি না।

ফটো: দেবীপ্রসাদ সিংহ

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

 বই

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রবন্ধ। নবনীতা দেব সেন। আশা প্রকাশনী ॥ দশ টাকা ॥

নবনীতা দেব সেন তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধের ("বিবাগী ফুলের গন্ধ") মুখবন্ধে লিখেছেন "মন্দলোকে বলে যে বাংলায় নাকি সমালোচনা সাহিত্য নেই"। আমি সেই "মন্দলোকদের" একজন। আমিও বিশ্বাস করি যে কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের প্রতি-তুলনায় বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারাটি খুবই দুর্বল, ক্ষীণস্রোত, এবং সততই আবর্জনাময়। চার-পাঁচজন উজ্জ্বল সমালোচক আছেন অবশ্য তাঁদের দলে আরেকটি নবীন নাম সংযুক্ত হলো : নবনীতা দেব সেন। বুদ্ধিমনস্কতা, বৈজ্ঞানিকতা তথ্য ও তত্ত্বের সামঞ্জস্যবোধ, এবং সর্বোপরি সাবলীল ভাষা-সার্থক সমালোচনার যে যে অপরিহার্য গুণ, তার সবগুলিই উপস্থিত আছে এই গ্রন্থে। এবং এদের সংগে যুক্ত হয়েছে এক ধরনের হার্দ্য নিমগ্নতা—বুদ্ধি ও হৃদয়ের পারস্পরিক নির্ভরতা, যার ফলে গ্রন্থটির অধিকাংশ প্রবন্ধই খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে আমার কাছে।

গ্রন্থভুক্ত দশটি নিবন্ধের মধ্যে তিনটিই ('প্রবাসী জন্মান্তর' 'বিবাগী ফুলের গন্ধ' 'বজ্রগর্ভ কুসুম : রাজা থেকে রক্তকরবী') রবীন্দ্র-কেন্দ্রিক। 'প্রবাসী জন্মান্তর' প্রবন্ধটিতে শ্রীমতী দেবসেন পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের জনপ্রিয়তার অভাবের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, যে-রবীন্দ্রসাহিত্য (অন্তত তার অংশবিশেষ) একদা প্রতীচ্যের কোনো কোনো কবি ও মনীষীকে সর্বাংশেই মুগ্ধ করেছিলো। প্রথম কারণটি তিনি যে দর্শিয়েছেন—অনুবাদের ভাষাগত দুর্বলতা—সে-বিষয়ে আমি সর্বাংশে একমত, এবং লেখিকার নিজের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ "জন্মের মতো অপূরণীয় ক্ষতি করে দেবে তাঁর সুনামের"। একদা রবীন্দ্র-মুগ্ধ ইয়েটসও সরোষে জানিয়েছিলেন : Let Tagore cast off English। অন্যদের অনুবাদও তেমন সুবিধের হয় নি ("জলচৌকি কোথাও কোথাও water হয়ে গেছে")। দ্বিতীয় কারণ, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য-হীনতা অর্থাৎ অনূদিত রবীন্দ্রকাব্য ও নাটকের বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্যের অভাব, যা অনেক বিদেশী পাঠককে প্রায়শই ক্লান্ত করে। শুধু বিদেশী পাঠক কেন, আমার যতোদূর মনে পড়ছে—প্রখ্যাত শিল্পী অমৃতা শেরগীলও রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে স্বীকার করেন নি, শুধু চিত্রশিল্পী হিসেবেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তৃতীয় কারণ, পাশ্চাত্য ভূখণ্ড আমাদের কবিকে শুধুমাত্র 'মিস্টিক কবি' এবং আলখাল্লা-পরা সন্ত হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলো, এবং তাঁর বহুবিচ্ছুরিত কবি-ব্যক্তিত্বের কোনো খবর রাখেনি। প্রবন্ধটির কোনো এক অংশে শ্রীমতী দেব সেন [illegible] পাশ্চাত্যের, অন্যান্য পাণ্ড ও প্রথম যুগের নেরুদার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিলো। হিমেনেথের ওপর পড়তে পারে, কিন্তু পাণ্ড ও নেরুদার ওপর রবীন্দ্রপ্রভাব পড়েছিলো বলে আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বিবাগী ফুলের গন্ধ'-এ নবনীতা শঙ্খ ঘোষ-কৃত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বা বিজয়ার সানইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ'-এর অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শঙ্খ ঘোষ সেই বিরল কবিদের মধ্যে একজন, যিনি শুধু ভালো কবিতাই লেখেন না, সমানুপাতিকভাবে ভালো গদ্যও রচনা করেন। শ্রীমতী দেব সেনের ভাষায় "ভিক্টোরিয়া নিজে কবি। তাঁর শিল্পীমনের সূক্ষ্মচেতনা, অনুভূতি-প্রবণ গতিটি শঙ্খ ঘোষের স্বচ্ছ প্রকাশ-নৈপুণ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।" লেখার কাটাকুটি থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রেরণা এবং সে-বিষয়ে ভিক্টোরিয়ার অবদান বিষয়ে শ্রীমতী দেবসেন আলোকপাত করেছেন, এবং আলোচনা করেছেন দুজনের হার্দ্য অন্তরঙ্গতা বিষয়ে ("শিল্প কি শেষ-পর্যন্ত চরম আশ্রয় দেয় না? তাহলে শিল্পীরও চাই সেই সনাতন অভিনব হৃদয়-উত্তাপ, সেই মানবিক প্রেম?")

"বজ্রগর্ভ কুসুম : রাজা থেকে রক্তকরবী" প্রবন্ধে নবনীতা ঠিকই দেখিয়েছেন যে গীতাঞ্জলি-পর্বের কবিতার সংগে 'রাজা' ও অন্যান্য প্রতীকী নাটকের ধর্মগত সাদৃশ্য আছে। 'রক্তকরবী' প্রসংগে তিনি একটি জরুরি কথা জানিয়েছেন যে "সেই লাল ফুলটির নাম হলো রক্তকরবী, যার কোমল পাপড়ির মর্মে লুকোনো আছে অগ্নি', এবং সেই সূত্রে 'রাজা' নাটকের রাজার সংগে তুলনার সূত্রপাত করেছেন। কিন্তু 'রাজা'র রাজা কি ঈশ্বরেরও প্রতীক নন?

'শতেক বরষ পরে' এবং 'নারীর মূল্য ও শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে শ্রীমতী দেবসেন শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে-সব সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন, তা সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশেই মান্য। শরৎচন্দ্র বিষয়ে কিছু উন্নাসিক কুসংস্কারকে তিনি স্বচ্ছন্দেই নাকচ করতে পেরেছেন, এবং শুধু তাই নয়, তিনি ঠিকই জানিয়েছেন যে শরৎচন্দ্র লেখকের লেখক নন, 'পাঠকের লেখক, এবং সেভাবেই তাঁর বিচার হওয়া বিধেয়। 'অমৃতেরে করি নমস্কার' নিবন্ধে নবনীতা সুধীন্দ্র-নাথের প্রতিতুলনায় বুদ্ধদেব বসুকে সার্থকতর অনুবাদক হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এবং সে-বিষয়ে সফলও হয়েছেন, কেননা সুধীন্দ্রনাথ মালার্মে অনুবাদ করতে গিয়ে মূল থেকে অনেক দূরে সরে যান, কিন্তু বুদ্ধদেব বাংলাভাষায় বদলেয়ারকে প্রায় অবিকৃত রেখেছেন। শুধু তাই নয়, বদলেয়ারের কবিতার প্রেরণায় কিভাবে বুদ্ধদেবের 'যে-আঁধার আলোর অধিক' রচিত হলো সে-বিষয়েও সংগত ইঙ্গিত করেছেন লেখিকা। 'Angoisse—উৎকণ্ঠা— Anguish' নিবন্ধে নবনীতা মালার্মে'র রজার ফ্রাই-কৃত

বাদের তুলনা করে দেখিয়েছেন যে অনুবাদক হিসেবে তেমন মনোযোগী নন সুধীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর সিদ্ধান্ত হলো যে "মালার্মের মূল কথা ছিলো ক্লার্তে clarity, স্বচ্ছতা। সুধীন্দ্রনাথ তো সেই মতের অনুগামী ছিলেন না" ঠিকই, কিন্তু "স্বচ্ছতা" সত্ত্বেও মালার্মের কবিতা কি দুরূহ নয়? এ-বিষয়ে শ্রীমতী দেবসেন তেমন আলোচনা করেন নি।

গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রবন্ধ হলো "ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : শশী ও রিউ"। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশীর সঙ্গে কাম্যুর প্লেগের রিউ-র তুলনা। এরা দুজন যে শুধু ডাক্তারই ছিলো তা নয় "রিউ ও শশী এই দুজনেরই মূল সমস্যা হলো মৃত্যুশাসিত জীবনের অসম্পূর্ণতা মোচনে ব্যক্তিমানসের প্রয়াসের অর্থহীনতা"। লেখিকা "অস্তিবাদী" ("অস্তিত্ববাদীতাই") দর্শনের পটভূমিকা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এই সূত্রে, এবং মানুষ যে আজকের পৃথিবীতে স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে তা-ও জানিয়েছেন। এই বিষয়টি অবশ্য দেশ-বিদেশের অনেক মনীষীই দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন আমাদের, যেমন স্পেনের অর্তেগা ই গ্যাসেট। কিন্তু তুলনামূলক সাহিত্যের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে নবনীতার এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত জরুরি ও মূল্যবান বলে আমার মনে হলো। "ভার্জিলের ঈনীড" এবং 'ইংরিজি ভাষায় গীতগোবিন্দ' প্রবন্ধ দুটিও সরাসরিভাবে তুলনাত্মক সমালোচনার অন্তর্গত। প্রথমটিতে তিনি দেখিয়েছেন, ফাদার রবের আঁতোয়ান ও শ্রীহৃষীকেশ বসু কিভাবে মূল লাতিন থেকে ভার্জিলের মহা-কাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও তথ্যসমৃদ্ধ।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সমাজ মন। মানসী দাশগুপ্ত। ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড। কলিকাতা। বারো টাকা।

গত কয়েক দশকে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুত এবং অধিক অগ্রগতি ঘটেছে মনোবিদ্যার চর্চা, বিশেষ করে সমাজ মনোবিদ্যার চর্চায়। এর সমস্যাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্ব-ব্যাপী। সামাজিক জগতের সঙ্গে মানুষের লেনদেন—যে সামাজিক জগতে তার জন্ম, যে জগৎ তাকে ব্যক্তি হিসেবে রূপ দেয় এবং যে সামাজিক জগতে আমৃত্যু সে বাস করে—মানব জীবনের মূল উপাদানস্বরূপ। কোন মানবিক ব্যবহারের সম্যক ব্যাখ্যা করা সম্ভবই নয় যদি তা অন্তরঙ্গ এবং জটিল সামাজিক তন্তুজালকে বাদ দিয়ে বলার চেষ্টা করা হয়। সামাজিক মনোবিদ্যা তাই পশ্চিম দেশসমূহে আজ বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। তার কিছু কিছু ছোঁয়াচ এ দেশেও লেগেছে।

এ দেশে বর্তমানে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নতুন নতুন যা কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে—সমাজতত্ত্বের আলোচনা-গবেষণা তার মধ্যে একটি। যদিও এ বিষয়ে বলে আমাদের জানা নেই। আর যেটুকু হচ্ছে, তাও বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন বিদ্যায়তনের গণ্ডীর মধ্যেই এবং অনিবার্যভাবেই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। হায়! বাংলাভাষার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা এখনও শিক্ষিত সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েই রইলো। অথচ, এই বাংলাভাষা নিয়ে আমাদের নাকি গর্বের সীমা নেই।

সামাজিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে বাংলা ভাষায় ইদানীং কোনো প্রামাণ্য আলোচনা নজরে পড়েছে বলে মনে হয় না। ইংরেজীতে কিছু কিছু আলোচনা সংকলন অবিশ্যি বেরিয়েছে। সেগুলির পাঠক অবশ্যই এক বিশেষ শ্রেণীর লোক। সাধারণ শিক্ষিতজনেরা এবিষয় নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী হতে পারতেন, যদি মাতৃভাষায় এই দুরূহ অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিয়ে সরল সহজ প্রাঞ্জল আলোচনা হতো।

অধ্যাপিকা মানসী দাশগুপ্ত সেই প্রশংসনীয় কাজটি করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর কথাতে বলি : "বাংলা ভাষায় সামাজিক রীতি চরিত্রের প্রাঞ্জল মৌলিক আলোচনা আমরা আজ পর্যন্ত যতটুকু পেয়েছি, তা দিয়ে গেছেন ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষী তথা সাহিত্যিকেরাই। এর বাইরে যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক রচনা বাংলায় পাওয়া গেছে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, নির্মলকুমার বসু ও অন্যান্য কারো কারো কাছে, কিন্তু সে সব পরবর্তীকালে। সাহিত্যের জগতে শুধু প্রবন্ধ নয়, সৎ সাহিত্যের অন্যান্য যে মাধ্যম যথা নাটক, উপন্যাস, কাহিনী এসবের ভিতরেও সামাজিক মনস্তত্ত্ব এবং সমাজ স্তর-বিন্যাসের কথা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ ধরনের সৃষ্টি-ধর্মী রচনায় কোনো বৈজ্ঞানিক সামান্য-সূত্র-সন্ধানের চেষ্টা থাকে না। তীক্ষ্ণ ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের গুণে সামান্য সূত্র যদি কিছু মিলে যায়, তার পরিমাণ অল্প, এবং সে সব সূত্র অনেকক্ষেত্রে অন্তর্বিরোধী সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাক প্রাচীন ছড়া বা লৌকিক প্রবচনগুলির একটি জুটি :

(ক) অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। (একাধিক মানুষ মিললে কাজ ভণ্ডুল।)

(খ) দশে মিলি করি কাজ হারিজিতি নাই লাজ। (কাজের সার্থকতা একাধিকের মিলনেই।)'

এই (ক) আর (খ) সামাজিক চিন্তার দুটি বিপরীত ধারার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখন আমাদের জানতে ইচ্ছা করতে পারে কিসের ভিত্তিতে এই চিন্তা এলো। এদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কী মাপ-কাঠিতে তা করা হলো? ছড়া, প্রবচন অথবা সাহিত্য এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে না। এসব প্রশ্নই সেখানে অবান্তর। কিন্তু সমাজ মনের আলোচনায় এই সমস্ত প্রশ্ন এবং এদের উত্তর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে সামাজিক মনস্তত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্বিরোধহীন সামান্য সূত্রানুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে অনেকে পর্যবেক্ষণকে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল উত্তাপ-নির্ভর করে তুলেছেন যে সাধারণ পাঠক সামাজিক মনস্তত্ত্বের এড়িয়ে যাওয়াই উচিত বলে সাব্যস্ত করেন। পাঠকের সঙ্গে সামাজিক মনস্তত্ত্ব বিষয়টির এরকম সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় নয়। 'সমাজ মন' বইটির ছোট ছোট আলোচনা লেখার সময়ে আমি এ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করেছি, আর মনে রেখেছি আমাদের দেশের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের মোট কথাটা। ...ছাত্র-ছাত্রীদের যুথবদ্ধ মানুষের মনের ব্যাপার বোঝাতে গিয়ে দেখেছিলাম পাঠ্যপুস্তকে দেশী পরিপ্রেক্ষিতের অভাব কী ভয়ানক। সে সময়েই যৌথ ব্যবহারের রীতি-প্রকৃতি, সমাজে পর-স্পরের সম্পর্কের প্রকাশ এসব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছোটবড় বাংলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। বর্তমান প্রবন্ধ-গুলির সূত্রপাত সেইভাবে।"

দশটি প্রবন্ধের সংকলন এ বই। প্রবন্ধগুলির নামকরণে বিষয়বস্তুর আভাস মেলে—জাতক জগত : যৌথ'; 'দেখা'; 'অনুকরণ ও অঙ্গীকার'; 'সংসার ধর্ম'; 'নেতৃত্ব'; 'হলদে-সবুজ-সাদা-কালো'; 'যুযুৎসু'; 'মাতৃ-রূপেণ'; 'সপ্তম রিপু'; 'হাসাহাসি'। আলোচনাগুলি বলাবাহুল্য সংক্ষেপ; কিন্তু চিন্তার স্বচ্ছতা, ভাষার সরলতা এবং দেশী পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখে প্রতিটি আলোচনাই দারুণ আকর্ষণীয়। 'হলদে-সবুজ-সাদা কালো' প্রবন্ধে ঐতিহ্য ও 'আধুনিকতা' নিয়ে বিশেষ করে আজকের দিনের 'আধুনিকতা' নিয়ে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। 'সপ্তম রিপু' বলতে লেখিকা 'সমর্থন'কে বোঝাচ্ছেন যে সমর্থন মানুষের একটি প্রধান কাম্য। পরিভাষা ব্যবহারেও লেখিকা সংযম ও সহজ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রণব মজুমদার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

কথোপকথন

সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দার, আবার কত দিন পরে আপনার ছবি দেখলেন সবাই? আকাদমী অব ফাইন আর্টসের এই প্রদর্শনী কক্ষ। এতদিন [illegible] ছিলেন বলুন তো মশাই! আপনার জন্ম ১৯২৯। সরকারী কারু আর চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক হলেন। গোপাল সান্যাল, গণেশ হালুই এঁরা বোধহয় আপনার সহপাঠী। প্রথম শ্রেণীর স্নাতক হলেন। আধুনিক চিত্র-কলায় স্বর্ণপদক পেলেন। তখন কলেজে দারুণ সব মাস্টার মশাই—গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, প্রয়াত বসন্ত গাঙ্গুলী এবং কিশোরী রায়। আপনাদের সময় সত্যেন্দ্র ঘোষাল মাস্টারমশাই আর্ট কলেজে যোগদান করলেন।

কলেজে থাকতে আপনি গোপাল সান্যাল আর কে যেন মিলে 'প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট গ্রুপ' করলেন। তলোয়ার খেলা দেখিয়ে তারপর স্রেফ ডুব। আমরাও ভাবলাম এমন তো কত হয়। আর্ট কলেজ থেকে পাস করার পর জন-জঙ্গলে অজ্ঞাতবাস করে শিল্পী, তারপর হারিয়ে যায় চিরকালের জন্যে। লোক-মুখে শুনেছিলাম আপনি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে আর্ট টীচার হিসাবে আছেন।

ইতিমধ্যে আপনি প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পাশ করলেন। শিল্পকলা এবং স্থাপত্য ছিল আপনার স্পেশাল পেপার। আপনি তাহলে দেখছি রীতিমত শিক্ষিত আর্টিস্ট! তারপর আবার বি এড পাশ করেছেন! না, সত্যেনবাবু, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

মে মাসের এই দারুণ গরমে আপনার ছবি দেখে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে 'যুদ্ধ বা সন্ধিতে গেলো দীর্ঘবেলা।' তবু মনে হয় সত্যেনবাবু, 'জৈব জীবনের ঊর্ধ্বে সুষমা সৃষ্টির স্বপ্ন, স্বর্গের নন্দন বনে ভ্রমণ বা দেবভোগ্য অমৃত পানের সাধনা রয়েছে, আপনার মধ্যে। আর নয় এবার অর্থ-সম্মান এসব সম্বন্ধে চিন্তা ছাড়ুন! পশ্চিম পাহাড়ে সূর্য ঢলে পড়ে অবসন্ন এক বার্ধক্য-জর্জর সম্রাটের মতো।' বয়স তো হলো, এবার ছবি আঁকার দিকে মন দিন।

ছবি আঁকা ধরুন। আপনার সব ছবি আমার ভাল লাগেনি। কিছুটা অনভ্যাস আপনার কয়েকটি ছবিকে ক্ষুন্ন করেছে। কিন্তু আপনার তুলিতে যাদু আছে সেটা আমি দেখে নিয়েছি। নরম রঙে আপনি স্বপ্নসম্ভব পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেন। একটা রোমান্টিক মনকে আপনি দুঃখকষ্টের মধ্যেও পুষে গেছেন। আপনার আঙ্গিকগত নৈপুণ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। যদিও কখনো কখনো আপনার জীবন দর্শন আমার কাছে ছেলেমানুষী মনে হয়েছে। 'মানুষ ভোলে, প্রকৃতি বাঁচায়'—ফুলে ঢাকা গোরস্থান। প্রকৃতি তাকে সাজিয়েছে। শুনেছি, চোররা পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও স্মৃতিফলক, শ্বেতপাথর উপড়ে নিয়ে যায়, আগাছার জঙ্গলে ভরে যায় কবর। কিংবা পার্ক স্ট্রীটের পুরনো গোরস্থানের স্মৃতিস্তম্ভের নীচে বসে থাকা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেমিক প্রেমিকা আর স্তম্ভের ওপর জোড়া পায়রা ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে বন্দী হবার দৃশ্যটি এমনিতে চমৎকার! নীল পটে নরম বেগুনী ফুলে ভরা গাছের মরমী ছায়া—সমস্ত পরিবেশটা দারুণ জমজমাট। কিন্তু পায়রা আর মানুষের প্রেমঘন দৃশ্য পুরনো বাঙলা বইয়ের রোমান্টিক দৃশ্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তেমনি আত্মার দেহান্তরে বাসা বদল করার দৃশ্যটির ছায়াপথ পরিবেশ সত্ত্বেও মনকে নাড়া দিতে পারেনি। সর্বধর্ম সমন্বয় করার স্থান ক্যাম্বিসের পট সে-বিষয় আমার কিঞ্চিত সন্দেহ থেকে গেল কিন্তু!

সে-তুলনায় 'কাল বোশেখীর' মাতনে বেঁকে যাওয়া গাছগুলো, মেঘের কষ বেয়ে চুঁইয়ে পড়া আলো, হলুদের মধ্যে জমেছে। হাওয়ার দুরন্তপনা ধুলোর ঝড় গায়ে লাগে। তেমনি 'ঝড় এসে গেল' ছবিটায় দিগন্ত জোড়া মাঠের মধ্যে কালো ঘন মেঘ করে আসা আকাশের নীচে দিদির সঙ্গে ছোট ভাই। এই ছবিটা অপু দুর্গার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া প্যাস্টেলে করা 'নীল মেয়ে' বা রাস্তায় 'পাগল' সারলার জন্যে নাড়া দেয়। নন্দনকাননে 'ইভ' বা 'স্বপনমোহে' চিৎ সাঁতার কাটছে পুকুরে যে মেয়েটি আর স্বপ্ন দেখছে রাজপুত্র আসার—এগুলি নরম উজ্জ্বল বর্ণের জন্যে মনকে টানে। আবার বলছি আপনার তুলিতে যাদু আছে। কিন্তু আপনি স্থিতু হয়ে বসে ছবি ভাবেননি। পাঁচমিশালি নানা দৃশ্য। চিন্তার বিচিত্র স্ববৈপরীত্য আপনার পটে। তবু 'পাখির খাঁচা'র মতো ছবিতে সবুজ মানুষটিতো আপনার হাতে আঁকা। দারুণ ছবি—দেখেছি মুগ্ধ হয়ে।

ক্ষমা করবেন সত্যেনবাবু এসব কঠিন কথা বললাম। আমি জানি আপনি ধ্যানে বসলে আপনার হাত থেকে যথার্থ ভাল ছবি বেরুবে। এ প্রদর্শনীতে তার কিছু উদাহরণ ছিল।

ফুল ঝরে যায়
শুধু হৃদের ভেতরে

পাঁচুগোপাল দত্ত আর বিশ্বরূপ দত্তের ছবি দেখতে দেখতে প্রভাত চৌধুরীর এই পঙক্তি মাথার ভেতরে ঘোরে। এঁরা দুজনই পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মে মাসের শেষে আকাদমী অব ফাইন আর্টসে এঁদের প্রদর্শনী হলো।

পাঁচুগোপাল দত্তের হাত ভাল। পরিচ্ছন্ন কিন্তু এবার ঠিক যেন জমাতে পারেন নি। কিছু ছবি আবার সচিত্রকরণের কথা মনে করিয়েছে। কাজ কখনও অলঙ্কার-প্রধান, কখন মণ্ডন-ধর্মী। চিত্রের নির্মিতি, রঙের খেলা কম। পাঁচুবাবু যামিনী রায়-নন্দলালের জগতের বাসিন্দা। ভাড়াটে তিনি। এখনও ঘর হলো না তাঁর। কিন্তু তথাপি যেখানে ঘরের স্বপ্ন দেখেছেন সেখানে কিছু কিছু সার্থকতা অবশ্যই এসেছে। আমার মনে হয় পুরুলিয়ার মানুষ-জন, বৃক্ষ, মাটি যদি তিনি আধুনিক চিত্রের দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তাহলে ভাল করবেন। 'মহাজাগতিক নৃত্য' মহাকালীর প্রাচীন পটের মত নাড়া দেয় না—তার কারণ বোধহয়

বিশ্বরূপ দত্ত

আধুনিক মানুষ এভাবে আর ধ্যান করতে পারে না। তারপর মাদী কুকুরের বাঁটে মুখ দেওয়া ছানাপোনাগুলো বাস্তবসম্মত আর কুকুরটা রূপারোপিত—পেছনের নীলচে সবুজ পটে সাঁটা মনে হয়। দ্বিমাত্রিকতার মধ্যে ত্রিমাত্রিক ভ্রম সম্বন্ধে তিনি ভাবেননি। আসলে জীবনের মধ্যে শিকড় চালিয়ে রস নিতে হবে।

বিশ্বরূপ দত্ত প্রচুর চিত্রকল্প এনে জড়ো করেন। আঁকার মেহনত এড়াবার জন্যে ম্যাগাজিন কেটেছেন কখনো। পটের জ্যামিতি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ভাবনা আছে। চিত্রলেখ রেখার খেলা। রঙ সম্বন্ধে সচেতনতা। অতিরিক্ত কঠিন রেখা, অতিরিক্ত বালি দিয়ে টেকসচার বোতাম সেঁটে দেওয়া সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। ছবি বড় বেশি অতিরঞ্জিত।

সহজাত ক্ষমতার পরিধির সামনে গণ্ডী টেনে দিয়েছে কে যেন। এর বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে।

সন্দীপ সরকার

পাঁচুগোপাল দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

মুনওয়ার আলী সংবর্ধিত

পাটিয়ালা ঘরানার প্রধান প্রতিনিধি ওস্তাদ মুনওয়ার আলী খাঁ গত ২৯শে জুন ইওরোপ সফরে রওনা হন। এই সফরের মুখে শিল্পীকে সংবর্ধনা জানান ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড গ্রান্ড হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে (২৫শে জুন)। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানের শিল্পী ওস্তাদ সফদর হুসেন খাঁর ঠুংরী, দাদরা ও গজল দিয়ে আসরটি শুরু হয়। এঁর গান সোরভের অনুষ্ঠানে যত ভাল হয়েছিল এখানে তত ভাল হয়নি। তবে প্রথম ঠুংরীটি ও শেষের গজলটি অন্যান্য গানগুলির চেয়ে ভাল হয়েছিল। ফিলিপসের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি রেকর্ডপ্লেয়ার উপহার দেওয়া হয়।

ওস্তাদ মুনওয়ার আলী খাঁ মালকোষ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল এবং একটি তারানা গেয়ে তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করেন। স্বরের উপর দীর্ঘ অধিষ্ঠানের ফলে তাঁর বিস্তারের কাজ একটি শান্তিপূর্ণ ও গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি

ওস্তাদ মুনওয়ার আলী খাঁ

মূহ সপ্তকের স্বর বিচক্ষণতার সঙ্গে জোড়া হয়েছিল। দ্রুত খেয়াল ও তারানাটিতে তানের কাজ অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং শিল্পীর পুত্র রাজা আলি

সফদর হুসেন খাঁ

খাঁ ও শিষ্য অজয় চক্রবর্তী তানকর্তবে যোগদান করেছিলেন নিপুণভাবে।

তব আসরের শ্রেষ্ঠ অংশ ছিল আড়ানা রাগে দ্রুত তিনতাল ও একতালে নিবদ্ধ খেয়াল ও তারানাটি। তানের ওজন, গতি ও বৈচিত্র্য ছিল শান্তিপূর্ণ ও গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি দর্শনীয়। এই স্তরের তানকর্তব ও দ্রুত খেয়াল শৈলী কলকাতায় অনেকদিন

গেছে শিল্পী। তার অনুভাল ... করেন।

ইউনুস খাঁর গান

সাঙ্গীতিকের জুলাই মাসের বৈঠকে শোনা গেল ইউনুস হুসেন খাঁর গান। ইনি আগ্রার স্বর্গীয় ওস্তাদ বিলায়েৎ হুসেনের পুত্র এবং আগ্রা গায়কীর সঙ্গে আজাদিয়া খাঁর গায়কীর খানিকটা মিশ্রণ ঘটানোর জন্য খ্যাত (আজাদিয়া খাঁ ছিলেন তাঁর মাতামহ)। এদিনের গানে কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত গায়কীর বিশেষ কোন ছাপ দেখা যায় নি।

তাঁর প্রথম বিলম্বিত খেয়ালটির রাগ তিনি এক প্রকার ধনাশ্রী (ধানেশ্রী) বলে ঘোষণা করেন। রাগটির ঠাট মূলতঃ বিলাবল যদিও মাঝে-সাঝে কোমল নিষাদ ব্যবহার হয় ধ্ ণ্ র স ও ণ্ র স পদের মাধ্যমে। এই প্রকার ধানেশ্রীর উল্লেখ সঙ্গীত শাস্ত্রে বা আধুনিক সঙ্গীত গ্রন্থে নেই। সাধারণত এই অপ্রচলিত রাগটি কাফি ঠাটেই পাওয়া যায়—কাঠামো ভীমপলশ্রীর মত, কিন্তু মধ্যম দুর্বল বিশেষ সংগতি প=জ্ঞ ও জ্ঞ=প এবং গ্রহ গান্ধার, ন্যাস পঞ্চম ও অংশ স্বর জ্ঞ প ণ। অহোবল বর্ণিত ধানেশ্রীর (ঔড়ব=সম্পূর্ণ) রূপ এখনকার ভীমপলশ্রীর মত এবং বলা বাহুল্য এরও ঠাট কাফি। সেনী ঘরানায় পূরবী ঠাটের ধানেশ্রী স্বীকৃত এবং এটিও

... ঔড়ব=সম্পূর্ণতা এবং প=প ও প=গ সংগতি বজায় আছে, খালি ঠাট পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে বিলাবল ঠাটের (অর্থাৎ সেনী) পটদীপ রাগের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে নি। কোমল নিষাদ ব্যবহার করে খানিকটা পার্থক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা অবশ্য হয়েছে, কিন্তু এই স্বরটি চলনের ভিতর দৃঢ়ভাবে বসানো না হওয়ায় রাগের কাঠামো আরো ঢিলে হয়ে পড়েছে। ছোট করে গাওয়া বিলম্বিত খেয়ালটি অবশ্য খাজি স্বরবিস্তার কণ্ঠ ও অলংকরণ শৈলীর দিক থেকে দেখলে মন্দ হয়নি। আরো ছোট করে গাওয়া দ্রুত খেয়ালটির দুনি তান ও সরগমের বিষয়েও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

এর পর শোনা গেল এক প্রকার রায়েসা কানাড়া যাতে ধৈবতের (শুদ্ধ) প্রয়োগ ও র জ্ঞ ম পদের ব্যবহার দেখা গেল। পূর্বাঙ্গে সুঘরই কানাড়ার এবং উত্তরাঙ্গে হুসেনি কানাড়ার প্রবল ছাপ পড়ার ফলে এটিকে একটি স্বতন্ত্র রাগ হিসেবে উপভোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিস্তার ও তানের কাজে আগের খেয়াল দুটির গুণগুলি এটিতেও ছিল। পরের সাহানা খেয়ালটি খুব ছোট হলেও উপভোগ্য হয়েছিল।

বিরতির পরে শোনা যায় শিল্পীর নিজের তৈরী রাগ সুজানি মল্লার (আগ্রা ঘরানার আদি পর্যায়ের গায়ক হাজি সুজান খাঁর প্রতি উৎসর্গীত)। রাগটি শুনে মনে হল গায়ক প্রচলিত ঔড়ব=মেঘ রূপায়ণ করতে করতে খেয়ালখুশি মত জায়গায় জায়গায় গোরখ কল্যাণের ণ ধ ম র জুড়ে দিচ্ছেন। কাজেই এটিকে রাগ আখ্যা দেওয়া অসম্ভব। এই রাগে বিলম্বিত খেয়ালটির পর আগ্রার এক বিখ্যাত সুরদাসী মল্লার দ্রুত খেয়াল শোনা যায় এবং সংক্ষিপ্ত হলেও এটির রাগ=রূপায়ণ ও গমকের কাজ এটিকে সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ নিবেদন করে তুলেছিল। শেষে শোনা যায় ললিতা=সোহিনী বলে একটি রাগ যা কাঠামো ও স্বতন্ত্রতার দিক থেকে আগের অপ্রচলিত রাগগুলির চেয়ে অনেক ভাল।

ভ্রম সংশোধন : "রাধিকামোহন মৈত্রের সরোদ" শীর্ষক রচনাটিতে (১৭ জুন, ১৯৭৮). কল্যাণ অংশের কাজের স্বরলিপিতে কয়েকটি ছাপার ভুল হয়েছে। প্রথম কাজটি হওয়া উচিত প্ ধ্ প্ স। চতুর্থটি (ধ্=প্=জ্ঞ=ম্ স) হওয়া উচিত ধ্=প্=জ্ঞ্=প্ স।

নীলাক্ষ গুপ্ত

'প্রেম'-পর্যায়ের দুটি আসর

রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে এবারে প্রেম-পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর বসেছিল দু-দিন। প্রথমটি ১৮ মে সন্ধ্যায়, দ্বিতীয়টি ১১ জুন সকালে।

'আমারের' সম্মেলক সঙ্গীত দিয়ে আসরের শুভ সূচনা হল প্রথম দিন।

লেন। তাঁর গাইবার ধরন একেবারেই অরাবীন্দ্রিক। দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন অভিরূপ গুহঠাকুরতা। তাঁর কণ্ঠটি দারুণ সমৃদ্ধ। পরিবেশনে অবশ্য পরিপূর্ণতা আসেনি এখনো। তবে কালক্রমে যে আসবে, তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল। আসর প্রায় জমে উঠেছিল, কিন্তু নন্দিনী মুখোপাধ্যায় আবার বাদ সাধলেন। বয়সে নবীন এই শিল্পীর বড়ো আসরে গাইবার যোগ্যতা এখনো হয় নি। গীতা মাইতির গান প্রথম শুনলাম। মন্দ গান করেন না। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'ভালোবাসি' শুনে মনে হল, গানটি তাঁর গলায় বসে নি ভালো করে। পরের গান—'আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে' তাঁর গাইবার ধরনে স্বগতোক্তির পক্ষে সার্থক বাক্য মনে হচ্ছিল। বুলবুল সেনগুপ্তকে বহুকাল বাদে আসরে দেখা গেল। তাঁর পরিণত পরিবেশনভঙ্গিতে দুটি গানই উত্তীর্ণ নিবেদন। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় দুখানি গানেই প্রেমের রোমান্টিক মেজাজ এনেছিলেন। এই ধরনের আসরে তাঁর সংযত ভঙ্গির পরিবেশনও প্রশংসনীয়। উজ্জয়িনী রায়ের কণ্ঠটি চমৎকার। গানও করেন বেশ সুষ্ঠু ভঙ্গিতে। ধীরেন বসু যে এখন রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে তেমন মনোযোগী নন বোঝা গেল। 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' গানটিতে তিনি অকুণ্ঠভাবে গাইলেন 'মিলনোন্মালায় যুগলোগলায় রইবে গাঁথা'। স্বরলিপির নির্দেশ—মিলন্ মালায় যুগল্ গলায়্'। স্বরান্ত

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্চারণে বেশী 'রাবীন্দ্রিক' হওয়ার এই অপচেষ্টা অমনোযোগেরই নামান্তর। স্নিগ্ধা ঘোষের কণ্ঠ তেমন স্নিগ্ধ নয়, কিন্তু সবল তাঁর গায়কীও পরিণত এবং রাবীন্দ্রিক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় পুরনো লাবণ্যময় ঐতিহ্য এখন হঠাৎ এক ঝলক সুবাতাসের মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। অন্যত্র তাঁকে বেশ ক্লান্ত ও জীর্ণ লাগে। কমলা বসুর কণ্ঠে 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' বয়স-ভোলানো সজীব নিবেদন। অদিতি সেনগুপ্ত চেষ্টা করেন এই ধরনের আসরে স্বল্পপ্রচলিত গান শোনাতে। তাঁর কণ্ঠেও নিজস্বতার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর দুটি গানই ভালো লেগেছে। গোরা সর্বাধিকারী এখন অনেক বেশী গ্রহণীয় হয়ে উঠেছেন। এ-দিনের চূড়ান্ত শিল্পী ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসরও তাই শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছিল এক চূড়ান্ত রসের শিখরে। অসামান্য

পুরুষের মতো দুর্লভ এবং মহার্ঘ্য উপহার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা প্রেক্ষাগৃহে। তিনি যখন গাইছিলেন 'কিছুই তো হল না' তখন সেই হাহাকার ধ্বনি, সেই অশ্রুবারিধারা আর সেই হৃদয়-বেদনা যেন শরীরী হয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর কানের শ্রবণ ভেদ করে হাত রেখেছিল প্রাণের শ্রবণে।

দ্বিতীয় দিনের আসরের উদ্বোধন সংগীতের ভার যাঁদের উপর ছিল, সেই গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী কলাকুশলী সম্মেলন' প্রেমের আসরের শুরুতে শোনালেন, 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি।' পরের গান ছিল—'নয় নয় এ মধুর খেলা।' খুবই বিস্ময়কর নির্বাচন সন্দেহ নেই। একক আসর শুরু করলেন শুভ্রা সান্যাল। নার্ভাস মনে হল তাঁকে। পরবর্তী শিল্পী কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি নার্ভাস ছিলেন মনে হয় নি, কিন্তু গলা তাঁরও কাঁপছিল। ইলা দাস সুন্দরভাবে গেয়েছেন 'ওলো সই' গানটি। সুনীল মল্লিকের কণ্ঠটি বেশ সবল। গানও ভালো গেয়েছেন। বুলবুল ভট্টাচার্যের গলা সুন্দর সুরেলা। 'আমি তোমার প্রেমে' গানটির কোমল মাধুর্য তাঁর নিবেদনের ভঙ্গির সঙ্গে মানিয়েছিলও সুন্দর। প্রশান্ত ভট্টাচার্য পুরনো দিনের চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ভঙ্গিতে গান করেন, যে-ভঙ্গিতে চিন্ময়বাবুর জনপ্রিয়তা ও বদনাম দুই-ই ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। প্রশান্তবাবু কোন্‌টি চাইছেন জানি না, কিন্তু অন্যের গলায় গান শ্রোতারা নিশ্চিত চান না। এনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এই আসরে প্রথম গাইলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ পরিণত ও পরিপূর্ণ তাঁর কণ্ঠ, পরিবেশন-ভঙ্গিও অনবদ্য। তাঁর কণ্ঠের 'আজি যে রজনী যায়' এদিনের শ্রেষ্ঠ পরিবেশন। শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দুটি উতরে গিয়েছে মাত্র—এটুকু বলা যায়। কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ'—টপ্পার সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের এক অভিনব মিশ্রণের ফসল। অথচ এই শিল্পীর কণ্ঠটি আশ্চর্য সমৃদ্ধ এতে সন্দেহ নেই। শিখা বসুর কণ্ঠে 'জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার' চমৎকার শুনিয়েছে। সুপর্ণা চৌধুরী দরাজ গলায় শুনিয়েছেন দুটি গান। তাঁর 'বড়ো বেদনার মতো'তে পূর্ণ মেজাজ পাওয়া গিয়েছিল। মঞ্জরী লালের 'যদি বারণ কর' সতেজ ও স্ফূর্তিময় কণ্ঠের উপহার। স্বপ্না ঘোষালের কণ্ঠে সব গানই সুষ্ঠু ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়। নিখুঁত তাঁর পরিবেশনদক্ষতা। এদিনের দুটি গানেও সেই দক্ষতা সুপরিস্ফুট। শ্রীলা সেনের কণ্ঠে 'মুখ পানে চেয়ে দেখি' বেশী সপ্রাণ লেগেছে। সুমিত্রা সেন এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আসরের শেষ দুই শিল্পী। সুমিত্রা সেনের কণ্ঠে 'ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে' এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'বলি ও আমার গোলাপবালা' স্মরণীয় নিবেদন।

নতুন তাল, নতুন ছন্দ

এই রবীন্দ্রসদন মঞ্চেই কয়েকমাস আগে একটি প্রভাতী আসর বসেছিল। সেই আসরের উদ্যোক্তা ছিলেন মধুচক্র পরিষদ' শীর্ষক সঙ্গীত-গবেষণা শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন দিবসে তাঁরা যে-অনুষ্ঠানটি উপহার দিয়েছিলেন তার বিষয় ছিল—রবীন্দ্রনাথের গানে কবি প্রবর্তিত নতুন তাল ও ছন্দের বৈচিত্র্য। আলোচনা-সহযোগে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সেই আসরের কথাই মনে পড়িয়ে দিলেন গান্ধর্ব সংস্থা বিগত ৫ জুন রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র- জন্মোৎসবের সন্ধ্যা-আসরে গান্ধর্বী নিবেদিত অনুষ্ঠানেরও বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও ছন্দ বৈচিত্র্য।'

বিষয় এক, কিন্তু পরিবেশনের পার্থক্য প্রচুর। শুধু তথ্য ও গান দিয়ে নিবেদিত হয়েছিল পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান। গান্ধর্বী অন্যতম বৈচিত্র্য এনেছিলেন নৃত্যের আয়োজন করে। চক্ষু ও কর্ণকে একই সঙ্গে তৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তার থেকেও বড়ো কথা, পরিচালক সুবিনয় রায় 'তত্ত্ব-উপলব্ধি' এবং 'গান শোনা' যাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারে সে-জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। নিবেদিত গানের তাল ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু ঠিক অব্যবহিত পূর্ব-মুহূর্তে তুলে ধরেছিলেন তিনি। আগের অনুষ্ঠানে এই আলোচনাংশ অনুসরণ করে গানের ছন্দ ও তালের বৈচিত্র্যের রস আস্বাদন করা বেশ দুরূহ কাজ হয়ে উঠেছিল; তার কারণ, সেবারে দীর্ঘ ভূমিকার সবটুকুই আগে বলে নিয়ে তারপর অবিচ্ছিন্নভাবে গান শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে, রসজ্ঞ শ্রোতার অসুবিধে না হলেও সাধারণ শ্রোতার পক্ষে যথাযথরূপে রস-গ্রহণ করা যে দুষ্কর ব্যাপার ছিল, এতে সংশয়ের অবকাশ নেই। সুবিনয় রায় সে-কথা মনে রেখেছিলেন নিশ্চিত কেননা সেদিন তিনি শুধু গানই শোনাননি, আলোচনা-অংশে মুখ্য নিবেদক সলিলচন্দ্র ঘোষের সহযোগী 'ভূমিকা'ও রচনা করেছিলেন তিনি। ফলে, গান্ধর্বীর এই অনুষ্ঠানটিকে পরিবেশনের দিক থেকে আরও নিখুঁত ও মনোজ্ঞ করে তোলা তাঁর পক্ষে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সহজতর হয়েছে। আবার, দুটি নিবেদনের মধ্যে স্বাভাবিক ভিন্নতা রক্ষার জন্য পরিবেশিত গানের ক্ষেত্রেও নির্বাচনের হেরফের ঘটিয়েছেন অতি সুচারু ও সচেতনভাবে। তবে উদাহরণ যেখানে অদ্বিতীয়, সে-রকম ক্ষেত্রে গান যে পাল্টানো যায়নি, সে-কথা না বললেও চলে। যেমন একাদশী তালের একমাত্র গান—'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' অথবা নবপঞ্চ তালের (২|৪|৪|৪|৪ ছন্দে) অনন্য উদাহরণ—'জননী তোমার করুণ চরণখানি' কিংবা ৫।৫ ছন্দে পঞ্চ মল্লার তালের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল' গানগুলি।

এই জাতীয় অনুষ্ঠানে গানের ব্যাকরণগত দিকটিকে ছাপিয়ে উঠে শিল্পীর খেয়াল-খুশী বা স্বাধীনতা প্রয়োগের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। গান্ধর্বীর এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনার ভার যাঁর হাতে তিনি অবশ্য কোনও অনুষ্ঠানেই সেই স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেন কণ্ঠসম্পদ যেহেতু অন্যতম মাধ্যম তাই ব্যতিক্রমেরে কিছু ইতরবিশেষও ঘটেছে। তবু ভাল-মন্দ মিলিয়ে সকালি এই অনুষ্ঠানটি যে উত্তীর্ণ পরিবেশন তাতে সন্দেহ নেই।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

মন্থন

এমন ছবি যার বিরুদ্ধে সমালোচনা তার ধারালো অস্ত্রগুলি নামিয়ে রাখে। কিছু শিথিল গ্রন্থি, কয়েকটি নষ্ট সম্ভাবনা খুঁজলে চোখে পড়ে না, এমন নয়। কিন্তু সেই খুঁতখুঁতে গোয়েন্দাগিরি বিফল হয়ে যায় মন্থনের অভিঘাতে, আমরা একাধিকবার ছবিটি দেখতে চাই মণিমুক্তোগুলিকে ছেঁকে তোলবার জন্যে। মন্থনের পরিচালক শ্যাম বেনেগেল—এটুকু বললেই অনেকের কাছে অনেকটা পৌঁছবে, প্রত্যাশা বিভিন্ন পথে নতুন নতুন বাঁক নেবে। কেউ আশা করবে, পাঁকাল মাছের ধুরন্ধর পিচ্ছিলতা নয়, সরাসরি কমিটমেন্ট-এর। কেউ দৃষ্টি দেবেন বক্তব্যের অভিনবত্বের দিকে, কেউ চাইবেন নিশ্ছিদ্র, আঁটসাঁট বাঁধুনি, আর কেউ চাইবেন সেই ছিমছাম এক-মুখী স্রোত যা শ্যামের সব ছবিতে পাওয়া যায়। মন্থনে এসব তো আছেই—কিন্তু সব চেয়ে বড় করে আছে এক আপাত-সামান্য কাহিনীর আশ্চর্য শৈল্পিক শান্তায়ন বা সাবলিমেশন।

মন্থন ছবিটির অন্তরের জোরটা এসেছে স্ক্রিপ্ট থেকে। সমস্ত ছবিটি

ভিশুয়ালি ভাবা হয়েছে। অর্থাৎ মূল মিডিয়াম এখানে ছবি—কথা শুধু নেপথ্য থেকে ছবিকে আরো একটু পুষ্টি দিচ্ছে মাত্র। কোনো-কোনো দৃশ্যে, বা সিকোয়েনস-এ কথা প্রায় নেই বললেই চলে, যেমন স্মিতা পাতিলের পা ধোয়ার দৃশ্যে। এক টুকরো ঘটনা, ছবির মূল ঘটনার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এমনও নয়। কিন্তু এ ছবির ক্রমশ ঘনিয়ে আসা সেকস-থিমকে কী সাবলীলভাবে সাহায্য করে স্মিতার উরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়া চিকন জল। গিরিশ কারনাড সেই দিকে অডিয়েন্স-এর সঙ্গে সেই শটকেও থেকে স্মিতার উন্মুক্ত মসৃণ পায়ের ওপর নিবদ্ধ থাকে। এতে অডিয়েন্স-এর ইনভলভমেন্টটা ক্রমশ বাড়ে, শুধু ক্যামেরা অ্যাংগেল এবং ছবির মাধ্যমে।

এক গুজরাটি গ্রামে দুধ সরবরাহ ও মিলক ডেয়ারির সমস্যা মন্থনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এই বিষয় নিয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর ডকুমেন্টারি হতে পারতো। শ্যাম এই অভিনব বিষয় নিয়ে এমন একটি চূড়ান্ত মাপের ফিচার ফিলম করলেন যার মধ্যে ডকুমেন্টেশন-এর অবিরল এবং স্বাস্থ্যকর মিশ্রণ আমাদের অবাক করে দেয়। ডকুমেন্টারি এবং ফিচার—এই দুইয়ের মধ্যে মন্থন আশ্চর্যভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। ডকুমেন্টেশন-এর প্রয়োজন হয়েছে তথ্যগতভাবে ছবিটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে, কিন্তু শ্যাম যেভাবে ডকুমেন্টারি ও ফিচার ফিলম-এর স্টাইলকে মিশিয়ে একটি সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন সেখানেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়।

মন্থন-এর সবচেয়ে জোরের দিকটা হলো লোকেশন শুটিং। গুজরাটি গ্রামের সব অনুপুঙ্খ নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। হে হিন্দি ছবির পরিচালকেরা। একবার ফিরে দেখুন আউটডোর শুটিং বলতে আধুনিক সিনেমা কি বোঝে। এবং টালিগঞ্জ, তুমিও দেখো, ক্যামেরার চোখ দিয়ে কিভাবে একটি গ্রামীণ আবহাওয়া তৈরি করতে হয়। কিছুই এখানে অভিনীত, সাজানো, চেষ্টিত নয়—একটি আসল গুজরাটি গ্রাম তার স্বাভাবিক চরিত্র নিয়ে এ ছবিতে আগাগোড়া হাজির। কি তৎপর ক্যামেরায় কিছু কিছু ট্র্যাকিং শট নেয়া হয়েছে।

বাংলা ছবির সমালোচনায় আমি প্রায়ই অযথা গান ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠি। মন্থন ছবিতে শ্যাম একটি গুজরাটি গানের ব্যবহার করেছেন। এ গান যে ছবিটির পক্ষে কতোটা অনিবার্য এবং ছবির অভিঘাত যে কতখানি বাড়িয়ে দেয়, সেটা ছবিটি না দেখলে বোঝা যায় না। বাংলা ছবিতে গানের ব্যবহারে কবে আমরা এমনি সংযমী ও নির্ভুল হতে পারবো?

মন্থনে অভিনয় প্রসঙ্গে ছোট্ট করে একটি কথা বলার আছে। কেউই এখানে অভিনয় করেন নি। প্রত্যেকে এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন মাত্র। এর চেয়ে কম হলে শ্যাম বেনেগেল খুশি হতেন না।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ পরদেশ

সাধারণ হিন্দী ছবি অথবা দেব আনন্দের পূর্ববর্তী প্রযোজনাগুলির মতো আবোল-তাবোল নয়। কিভাবে এক কুচক্রীদল চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এদেশ থেকে জাল পাসপোর্ট এবং চোরা-পথে লোককে ব্রিটেনে নিয়ে যায় এবং তাদের বেতনের অর্ধাংশ কমিশন হিসেবে দিতে বাধ্য করায় যে বৃত্তান্ত এ কাহিনীতে (রচয়িতা দেব আনন্দ ও সুরজ সানিম)

দেব আনন্দ ও বিন্দু

অনেক তার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু মিল পাওয়া যায়। কাহিনী ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে। সমীর (প্রাণ) লণ্ডনে বসবাস করে। সেখানে একটা পানশালা কেনার প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ধার্য মূল্যের বাটা তার সামর্থ্যে না-থাকায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কুচক্রী-দের পাণ্ডা গুরুনাম (অজিত)। গুরুনাম এই পানশালার পুরো মালিক হবার বাসনায় স্ত্রী সিলভিয়া (বিন্দু) এবং সহকারি বুটা সিং-এর (আমজাদ খান) সহযোগীতায় সমীরকে হত্যা করে গুম করে। দেশে সমীরের নিখোঁজ হওয়ার খবর পৌঁছয়। সমীরের লেখা একখানি চিঠির খামে রক্তের ছাপ দেখে তার ভাই বলবীরের (দেব আনন্দ) মনে সন্দেহ জাগতে সে লণ্ডন রওয়ানা হয়। বিমানে সহযাত্রিনী গোরীর (তিন) সঙ্গে আলাপ হতে জানতে পারে তার দাদা গুরুনামের অনুচর ... বশ করে গুরুনামের ... (প্রেম চোপরা) তাকে বধূ সাজিয়ে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলবীর তখনই তার কার্যধারা স্থির করে নেয়। লণ্ডনে পৌঁছে মিথ্যা পরিচয়ে সে নিজে এবং গৌরী গুরুনামের পানশালায় চাকরি লাভ করে। এবং শেষ পর্যন্ত বলবীর তার দাদার খুনের কিনারা করে গুরু-নামসহ কুচক্রীদলকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয় তার পুরনো বন্ধু আনোয়ারের (মেহমুদ) সহায়তায়।

চলতি হিন্দী ছবির ফরমূলার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন হিন্দী ছবির যা একটি প্রধান উপজীব্য—মাঠে-ঘাটে-উদ্যানে-পর্বতে ঘুরে ঘুরে নেচে-গেয়ে নায়ক-নায়িকার চলাচলি প্রেম—তা অবশ্য এ-ছবিতে নেই। তবে মারদাঙ্গা এবং নায়কের একাই একশো হয়ে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতায় প্রতিপক্ষকে কায়েদা করার স্তম্ভিত হবার মত ব্যাপার (সম্ভবত হিন্দী ছবির দর্শকদের মনোরঞ্জনের কথা মনে রেখে) পরিহার করতে প্রযোজক-পরিচালক দেব আনন্দ সাহস করেন নি। অথচ কাহিনীতে প্রেমকে বাদ দেওয়ায় তাঁর সাহসের অভাব ঘটেনি। প্রায় দশো পঞ্চাশ মিনিট দীর্ঘ ছবির খুব বেশী হলে মিনিট দশেক কাহিনীর পটভূমি দেশ, বাকিটা পরদেশ অর্থাৎ লণ্ডন। ছবি তোলাও হয়েছে লণ্ডনেই। কিন্তু অবাক হতে হয় দেখে যে লণ্ডনের সাহেব-মেমরা ধুরো ধরনেও ... অজান্তে। এই ধরনের বহুবিধ উদ্ভট ও অসংগতি সত্ত্বেও পরিচালনা বিষয়ে দেব আনন্দ শুরু থেকেই দর্শক-কৌতূহল উদগ্র রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও দুরাত্মা দমনে পদে পদে অবিশ্বাস্য ক্রিয়াকার্যের উদ্ভাবন দেখা যায়।

ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় চেতা বলবীরের চরিত্রে দেব আনন্দকে দীর্ঘকাল পর একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ নাট-কীয় চরিত্রে পাওয়া যায়—যে-অভিনয় দর্শকমনকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে ধরে রাখে। অন্যান্য সকলের অভিনয়ও চরিত্রানুগ। নবাগতা তিনা প্রতিশ্রুতি-সম্পন্না। লং-প্লেয়িং রেকর্ডের মাপে ছটি সুদীর্ঘ গান আছে। রাজেশ রোশনের দেওয়া সুর ভাল। লতা, কিশোরকুমার, মনোহর ও অনুরাধা পাউদওয়ালের গাওয়া ভাল। শুনতেও মন্দ লাগে না, কিন্তু অতগুলি গানের ব্যবহার অনিবার্য ছিল কি-না প্রশ্ন জাগতে পারে।

অঞ্জন দত্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

অমিতাক্ষর

এ বছর ফুটবল মরসুমের শুরু ইন্দ্রপতন দিয়ে। ইন্দ্রপতনে সমর্থক নিশ্চয়ই হতাশ্বাস কিন্তু যে সব দ্বিতীয় সারির দল এই ইন্দ্রপতন ঘটিয়েছে তাদের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাতে হয় নির্দ্বিধায়। কলকাতার থিয়েটারে যখন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য আশ্রয়ী গোষ্ঠীগুলি পুনরাবৃত্তি অথবা প্রত্যাবর্তনেই সন্তুষ্ট, নাট্যরচনায় স্বাব-লম্বী না হয়ে অবলম্বনেই বৈদগ্ধের কাচের স্বর্গে বাস করছেন ঠিক তখনই সদ্যপ্রসূত একটি গোষ্ঠী স্বাবলম্বী সাবালকত্ব ঘোষণা করেছে। দলের নাম শূদ্রক, প্রযোজনার নাম 'অমিতাক্ষর।'

সংগ্রাম এবং স্বার্থ দুটি শব্দ অনেক দূরের অথচ গাটছড়া বাঁধা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কত ত্যাগ, সংগ্রাম ভোরের আলোর জন্য কত তামস তপস্যা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর শুধু স্বার্থরক্ষার জন্য, দলবাজি, অন্যায়কে প্রশ্রয় গদী আঁকড়ে থাকার জন্য কত না লোভী শর্ত কত না প্রবঞ্চনা! বাংলা নাটকের ফরমূলা ভেঙে দেবাশিস মজুমদার যে নাটক রচনা করেছেন সেখানে মানুষের মন আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে প্রতিরোধে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এতই সজীব, যখন সচেতন মানুষ বারমাস্যায় উৎপীড়িত মানুষ লোভের কাছে আত্মসমর্পণ না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এই যুগে উঁচু মাথা মানুষের বড় অভাব। পৃথি-বীটা বামন মানুষে ভরে গেছে। তাই উন্নতশির দেখাটা স্বপ্ন মনে হয়। শূদ্রক সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে আমাদের আত্মবোধন ঘটিয়েছেন।

শিশির মঞ্চে শূদ্রক প্রযোজিত অমিতাক্ষর সাজা বিপ্লবীকে ধীরে ধীরে বিপ্লব বোধে উজ্জীবিত করে দেন এবং তার জন্যে কোন লাল আলো, সংগ্রামী অথবা প্রতিরোধী মিছিল, ধর্ষণ—জমিদার বা জোতদারের অত্যাচার, কিংবা পুলিশ বা বিচারকের ভাঁড়ামি ... জীবনে যেখানে বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা, সেখানে সেই ছোট গণ্ডীর মধ্যেও মুখোশ সরে গিয়ে বলিষ্ঠ মুখ দেখা যায়—যে মুখ নাটকের শুরুতে ছিল ভীরু, নাটকের পরিণতিতে সেই মুখ দৃপ্ত—প্রত্যয়নিষ্ঠ।

সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে, ঘরোয়া আটপৌরে অভিনয়ে, দর্শকমন একাত্ম হয়, সমব্যথী হয়, সহমর্মী হয়, সহ-যোদ্ধা হয়। নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার যেমন কোন আতিশয্যকে পরিহার করেছেন, নির্দেশক দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক তেমনি সর্বতোভাবে থিয়েটারিকে বর্জন করেছেন। প্রতিটি চরিত্র রক্ত-মাংসের, তাদের নীচতা, সততা সব কিছু নিয়ে। নায়ক *তিষাম্পতি (দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন মিটিং-এর কথা* মনে করেন, *আয়োজনের আপ্যায়নসূত্রে* অথবা মনটাকে সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলেন, কোথাও এতটুকু অভিনয়ের ভাষায় 'জার্ক' লাগে না। ইন্দ্রাণী মৈত্রের নীহার আমাদের খুব চেনা—পবিত্র শাঁখা সিঁদুর কখন যে ফাঁস হয়ে শ্বাসরোধ করে, কখন যে সানাইয়ের মিঠে সুর উধাও হয়ে যায় বাসন মাজার নৈমিত্তিক কর্কশ শব্দে, সে নিজেই জানে না। ইন্দ্রাণী মৈত্রকে অনেক সময় একঘেয়ে মনে হতে পরে বাচনভঙ্গীতে—ওই এক-ঘেয়েমি চরিত্রে প্রাণসঞ্চারী। আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রায়ণ গৌরী চৌধুরীর। অসম্ভব ভাল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন চন্দন সেনগুপ্ত। চন্দ্রকান্ত চরিত্র বোধ হয় এই নাটকের, এই সমাজের, এই সময়ের নির্ভুল প্রতিচ্ছবি। চন্দন সেন-

দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রাণী মৈত্র

গুপ্ত তাঁর অভিনয়ে এই অসহায় আত্ম-সমর্পণকে বিশ্বস্ত করে তুলেছেন। তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়নি বাসুদেব মজুমদারের অভিনয়ে। টুপুর ঘোষ যেমন স্বাভাবিক, পাশাপাশি প্রবুদ্ধ মিত্র অনেকখানি ম্রিয়মাণ। সলিল সরকার বা গৌতম চৌধুরী যে যুব সম্প্রদায়কে ফোটাতে চেয়েছেন, সেটা সাম্প্রতিক থিয়েটারের কমার্শিয়াল প্যাচ নয়—তবুও এই এক জায়গায় সামান্য 'থিয়েটারি' প্রশ্রয় পায়।

এই প্রযোজনায় মনোরঞ্জন ঘোষের আলো নাটকের মেজাজ সম্পূর্ণ রক্ষা করেছে। আবহ-ধ্বনি প্রক্ষেপণ (শ্রীপতি দাস) এই নাটকের সম্পদ। শুধু দুই জায়গায়, এক জায়গায় সংলাপের পরে দু' লাইন গান 'যেমনি নয়ন মেলি/যেন মাতার স্তন্য সুধা হেন/নবীন জীবন দেয় লোপুরে' খুব ঝাঁঝালো মনে হয়। সবশেষে ঢাক না বাজলেও চলত। ঐ একটি সংগীত প্রয়োগ ফরমূলার আওতায় নিয়ে যায়—

াছে ঢাক বাজানো কথা নয়।

দেবাশিস মজুমদার নাটক লিখছেন কয়েকদিন আগে থেকেই। ইতি-ধাই নাট্য-রচনায় তাঁর দক্ষতা সম্পেছে প্রমাণিত। এর আগে একটি খ্যাত গল্পের অবলম্বন ছিল এবং পূর্ণ একক সৃষ্টি। দেবাশিস মুমদার নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দেন না টোই বোধহয় তাঁর স্বভাব। কিন্তু তকগুলি প্রবণতা তাঁর নাটককে সামান্য ভারাক্রান্ত করে। শ্রীমজুমদার লোপে প্রায়শই উপমা রূপক, প্রবাদ, বচন ব্যবহার করেন। এই সব লংকার অনেক সময় শোভা না। মন এই নাটকে 'লেখাপড়া হোক য়ে গরুর ল্যাজ, মশামাছি গা থেকে াড়ানো চলে, কিন্তু খাবার জোটাতে ংবা বাটে দুধ আনতে ঐ ল্যাজের ান কাজ নেই' কিংবা 'ও-সব ককেয়ীর ঝাড়, একবার ক্ষমতা পেলে াদ্দ বছর ছোবল মারবে' অবধ র্য়োগ। কিন্তু পাশাপাশি নীহার যখন লে, 'শরীর। বাঁজা মেয়ে ষষ্ঠীর পোস করলেও কি ধম্ম নড়ে!' তার-রেই ত্রিষাস্পতির উত্তর 'আঁধার াশমানেই চাঁদের শোভন। আবার কেবারে শেষে ত্রিষাস্পতির ঘোষণা অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, াধকের সেখানেই সিদ্ধিলাভ ঘটে'— মাঘ সংলাপ। হিন্দী সিনেমার মত কাহিয়ে নাম নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়—কন্তু নায়কের আশ্চর্য নামকরণ ত্রিষাস্পতি' মনে রাখাই দুষ্কর। দবাশিস মজুমদার মাঝে মাঝে একটি তীকী নাট্যমুহূর্ত রচনা করেন। দানসাগরে' একটি অলৌকিক বৃদ্ধা বেশ করে অনেককে দ্বিধায় ফেলে-ছল। এই নাটকে পাগল তিলক (স্বপন ন্দ্যোপাধ্যায়) বিরতির আগে জানলায় খোশ পরে দাঁড়ায়—নিঃশব্দে পর্দা ারে—সাইলেন্স ইজ বেস্ট ইলো-কায়েন্স। পরে নায়কের মন পরি-র্তনের পর সে মুখোশ খুলে দাঁড়ায়—অপূর্ব প্রয়োগ। যদিও ঘটনাস্থল, চরিত্রের ভাষা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু। তবুও এই নাটকের সঙ্গে 'সওদাগরের নৌকা' অ নে ক খা নি স ম ধ র্মী। বভ্রান্তিতে ফেলে মঞ্চ (দেবাশিস মজুমদার)। ঘরের রং ধূসর, নাটকের মেজাজ অনুযায়ী কিন্তু উপরের কাঠ-গুলি নৌকার আভাস আনে। পাশে দরজার ফ্রেমটি অধিকন্তু। বাইরের রাস্তায় বা বিসর্জনের প্রসেসনের আলো ও শব্দ আরো একটু দেখান যেত জানালা দিয়ে।

অভ্যাস অনুযায়ী অনেকে নাটকের শেষে আরও জোরদার কিছু আশা করেন। কিন্তু রোজকার এই পালাবদল, পদত্যাগ ও অভিষেকের হাস্যকর স্বার্থ-সন্ধানের অন্তরালে যদি সাধারণ মানুষ কোন লোভের হাতছানিতে প্রলুব্ধ না হয়ে নিজের বিশ্বাসে অচল থাকে, তবে শহীদের আত্মদান সার্থক হবেই; নচেৎ শুধুই অপচয়। বাইরে যদি বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে অশ্লীল নাচ চলে চলুক—সচেতন মানুষের অন্তরে যদি বোধনের বাজনা বাজে—তবে দিন বদলাবেই—শুভক প্রযোজনা এইভাবেই মহিমান্বিত।

নতুন সরকার কলকাতা ইনফর-মেশন সেন্টারে শিশির মঞ্চ নামে একটি আধুনিকতম প্রেক্ষাগৃহ গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য সুবিধা-জনক শর্তে খুলে দিলেন। একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

শিশির মঞ্চের শব্দসাম্য (অ্যাকাউস্টিকস) ব্যবস্থা খুব ভাল। থিয়েটার এর-এর প্রযোজনা দ্রৌপদী দেখতে গিয়ে এটা অনুভূত হল। মহাশ্বেতা দেবীর একটি সুন্দর গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন শশধর নস্কর। পরিচালকও তিনি। নাট্যরূপ দিতে গিয়ে তিনি শুধু ঘটনা দেখানোতে তুষ্ট থাকেন নি মাঝে মাঝে সূত্রধারের ভাষ্য যোগ করেছেন। এই সূত্রধার (দুলাল মণ্ডল) যা বিবৃত করেন সেটা আগেই ঘটে গেছে অথবা পরে চোখের সামনে ঘটে যায়—ফলে শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়ায়। আর বোঝা হল পুরো নাটকের প্রোডাকশন। নাটকে কিছু কিছু সংলাপ যোজনায় বোঝা যায় শশধর নস্করের আন্ত-রিকতা। সূত্রধার ভাষ্যের সাহিত্যিক শ্লেষ কখনই অভিনেতার বাচনভঙ্গিতে নিবিড় হয় না। আর আগেই বলেছি, শব্দসাম্য ব্যবস্থা যথেষ্ট ভাল হওয়ার জন্য খুব চাপা স্বরে প্রমপ্টও মাঝে মাঝে দর্শকের কানে গিয়ে পৌঁছয়। শব্দসাম্য ভাল হলেও যান্ত্রিক শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বোধ হয় সুষম নয়। 'বোধহয়' বলার অর্থ, শব্দনিয়ন্ত্রণ রেকর্ডিং ত্রুটিও হতে পারে। অভিনয়ে ব্যবহৃত আবহ বা সংলাপ সময়ে সময়ে ভাল ফল দিলেও যুদ্ধের সময় একেবারেই নাবালক চেহারা নেয়। (আবহ রবিলোচন মুর্মু, দেবপ্রসাদ ..., শব্দ—মুকুল নস্কর)।

শিশির মঞ্চের মিড কার্টেনটির ত্রুটি আছে। প্রায়শই মাঝ পথে আটকে যায়। অথচ এই প্রযোজনায় মঞ্চসজ্জায় মিড কার্টেনের ব্যবহার খুব জরুরী ছিল। অবশ্য এই সুন্দর মঞ্চের পর্দা আটকানোর মত একটি সুন্দর গল্পের প্রযোজনা মাঝে মাঝে ঠেকে যাচ্ছিল অনভিজ্ঞতায় কি-না বলতে পারব না। প্রথমেই সূর্যসাহু এবং তাঁর ছেলের ভূমিকায় যে সূত্রপাত করলেন তাতে সন্দেহ ছিল সম্ভাবনায় অপমৃত্যুর। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বটকৃষ্ণ রায় সাফই ভাস্কর নস্কর, পরাশর সরকার, গোবিন্দ নস্কর, বীণা মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন ভূমিকার প্রতি আন্তরিক ছিলেন যার জন্য নাটকটি কিছুটা আকর্ষণ রাখতে পারে। বিশেষ করে নাম-ভূমিকায় কল্যাণী মণ্ডল চরিত্রের মর্যাদা রক্ষায় ছিলেন সযত্ন। আশ্চর্য এই যে সাঁওতালি ডায়ালেক্টে যাঁরা কথা বললেন তাঁরা মোটামুটি সফল, কিন্তু শহরের শিক্ষিত বিপ্লবী যুবক শশধর নস্কর, বিপুল সরকার, দুলাল মণ্ডল সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। অবশ্য এর জন্য পরিচালনাই দায়ী। বিপ্লবী যুবকরা সভা করে, কথা বলে এক লাইনে বসে বা দাঁড়িয়ে, যান্ত্রিক ভঙ্গিতে। সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট হয়, সিদ্ধান্ত হয়, রেডিওর নাটকের মত,

অর্থাৎ দৃশ্যমান করানোর কথাটাই অজানা। অথচ নাটক কখনই সংবাদ সমীক্ষা নয়। মাঝে মাঝে সামান্য একটা চমক, সেটা যুদ্ধের দৃশ্যে দিলীপ মিত্রের আলোর মত। একই মাপা জায়গায় লাল আলো পড়ে, এবং একটি স্পট একটি চরিত্রের পেছনে জ্বলা নেবা করে সম্পূর্ণ পরিবেশকে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলা করে দেয়। হ্যারিকেন নিয়ে ঢোকার সময় দিনের মত আলো।

একটি সুন্দর গল্পের নাট্যরূপে মাঝে মাঝে চমক আছে, কিন্তু সমস্ত প্রযোজনার পিছনে একটা আলগা সাধুনি। নাম-ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয়ে মাঝে মাঝে নাট্য মুহূর্ত গড়ে উঠলেও পরবর্তী মুহূর্তে সব ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। এক এক জনের হাতে রিভলবার তুলে দেওয়ার জন্য শশধর নস্কর সময় নেন কুড়ি সেকেন্ড অথচ কথা বলেন ঝড়ের গতিতে যার জন্য অনেক সংলাপ অগম্য থেকে যায়। এই অযথা কালক্ষেপ ঘটেছে যত্রতত্র। ফলে মোটামুটি একটা সক্ষম টিমওয়ার্ক সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, কারণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শিশির মঞ্চের আসনগুলি বড়ই আরামপ্রদ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

নাজি '৭৪

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রশাসন যদি স্বৈরাচারী হয় সমাজের অমঙ্গল ঘটে। —'বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শংকার'।—সর্বসাধারণের জন্য রচিত আইন শৃংখলা তখন একশ্রেণীর অন্ধ কায়েমী স্বার্থে দুষ্ট নায়েবী কুকর্ম-কলাপের আত্মপ্রকাশ ঘটায়।

মোটামুটি ভাবে এই প্রতিপন্ন বিষয় নিয়ে 'শৌভনিক'-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'নাজি '৭৪'। যা দর্শকচেতনায় উপলব্ধিঘন করে তুলতে চেয়ে উদাহরণে উদাহরণে বিস্তৃত। কিন্তু উদাহরণ, উপমানেই খণ্ডিত, উপমেয়র সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান হয়নি। ফলত, সেদিন মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে নাটকীয় প্রাচুর্য দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত নাটক রক্ষা হয়নি।

এই নাটক রচনায় অসিত ঘোষ স্বদেশী উপকরণ যা গ্রহণ করেছেন তুলনায় বৈদেশিক ঘটনাপ্রবাহ দৃশ্যে সংক্ষিপ্ত হলেও, অন্তত অর্থবহ ব্যাপ্তির প্রশ্নে অনেক বেশি। কিন্তু এই অর্থ শেষ পর্যন্ত নাট্যকারের বক্তব্যের সঙ্গে তালে তাল দেয়নি। মুনশীয়ানায় নাটকের ফর্মটা একটু নেড়ে দেখলেই এর বে-তাল-রূপটা অনায়াসেই আমাদের চোখে পড়ে।

নাট্যকাহিনীর স্থান-কাল মূলত

[illegible]
[illegible]
পরিবেশ। পাছে বিদেশী হয়ে পড়েন, কিংবা নাটক উপস্থাপনায় ... ইত্যাদি কারণেই কিনা, জানি না, নাট্যকার একটি জন-দৃশ্য ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও কোনো কিছুর প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন নি। অন্যদিকে, মস্তানী কার্যকলাপকে খোলতাই করে দেখাবার জন্য যা যা প্রয়োজন—অর্থাৎ, শিক্ষিত সম্মানযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অসম্মান-অত্যাচার; মেয়ের বিয়ের জন্য সারা-জীবনের উপার্জিত টাকা লুণ্ঠন; এবং অন্যান্য আরো কিছুর সঙ্গে অবশ্য-ম্ভাবী নারী নির্যাতন,—অসিতবাবুর কি সৌভাগ্য একই দিনে একই সময়ে গুরুত্বহীন-অনাদৃত সর্বার্থেই মফঃস্বলীর সিগন্যাল ওয়েব একটি রেলস্টেশনে পেয়ে গেলেন! (যেখানে হাসপাতাল, জেলখানা সবই আছে, অথচ নব-দম্পতিকে দ্বিরাগমন সেরে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়!) এই না হলে নাটক! অতএব নয় এ বাহ্য। কিন্তু সব চাইতে যা আমাকে অবাক করেছে—'সরকার পালটালেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না'—যে নাটকে এমন একটি বুদ্ধি-দীপ্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য সংলাপ গ্রথিত হয়েছে, সেই নাটকেরই উপস্থাপিত বিষয়ের উপর শৌভনিকের পক্ষে নাট্যকার তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রাখলেন, দুটি মস্তান নিধনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের গৌরবকে সূচিত করে, এবং তা পরিবেশিত হল কি না একটি ধর্মীয় ভাবাবেগের মোড়কে! বাহ্য কি এও?

দর্শককে সরাসরি 'সোহাগ' জানাতে আপত্তি কোথায় আমি বুঝি না। কারণ, মানবীয় বোধবুদ্ধি এবং সহজাত ভাবব্যঞ্জনা সম্পন্ন যে-কোনো দর্শকের পক্ষেই তা কাম্য। আইডেন্টিফিকেশনের জন্যও সে নাটক দেখতে যায়। কিন্তু রাজ-নৈতিক সচেতনতার নামে পরোক্ষে ব্যভিচারী-সুড়সুড়ি দেবার প্রবণতা,—সত্যি পীড়াদায়ক।

'নাজি '৭৪'-এ সঙ্গীত নির্বাচন ও প্রয়োগে (দেবাশিস দাশগুপ্ত) যে

নিমু ভৌমিক ও বুলবুল চৌধুরী

সম্ভাবনা ছিল, তাও মার খেয়েছে নাট্য ঘটনার অসংগতিতে, বিস্তারের বৈসুদ্যে। প্রসঙ্গটির একটু ব্যাখ্যা করা যাক। নাটকের শুরু থেকে রবীন্দ্র সংগীতের 'স্বদেশ' পর্যায় থেকে 'সার্থক জনম আমার' গানটি প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে একাধিক খেপে আমাদের শোনানো হয়েছে। মঞ্চদৃশ্যের সঙ্গে সেই গান প্রথম দিকে অনেকের কাছেই বিদ্রূপ বা আক্ষেপজনিত 'উচ্চারণ' বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরে বোঝা গেল, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে

সবখানে জয়ের যে দেশ তার মহিমা সম্প্রচারেই এর উদ্দেশ্য। তখন প্রশ্ন জাগে, এমন একটি দেশের শিক্ষিত আদর্শবাদী একজন শিক্ষককে প্রতিবাদ-সচেতন করে তুলতে কেন নাটকে নাটকীয়ভাবে ইতিহাস থেকে ব্রুটাসের আবির্ভাব? বস্তুত, এই নাটকের অন্তিমকালের মূল বক্তব্য এবং আলোচ্য গানের প্রয়োগ-ব্যঞ্জনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে ব্রুটাসের উপস্থিতি কিন্তু সত্যি অনিবার্য বোধ হয় না। বরং এক্ষেত্রে ব্যাপারটা 'নাটকীয় ধোঁকা' বলেই মনে করা যেতে পারে।

'তুলনায় 'পূজা' পর্বের অন্য রবীন্দ্র সঙ্গীতটির ব্যবহার (পিনাকেতে লাগে টংকার) অনেক বেশি সুপ্রযুক্ত, সার্থক। অবশ্য আলোচ্য দুটি গানের ক্ষেত্রেই নেপথ্য কণ্ঠে যথাক্রমে মঞ্জু দাশগুপ্তা ও দেবাশিস দাশগুপ্তের কাজ রবীন্দ্র অভিব্যক্তির প্রশ্নে যথার্থ। বিশেষ করে মঞ্জু দাশগুপ্তা প্রথম গানটি গেয়েছেন বড় দরদ দিয়ে। সেকারণেই দর্শকদের শুনতে ভালো লেগেছে।

অভিনয়ে রেলপুলিশের রূপদানে গোপাল মুখার্জী, ব্রুটাস ও প্রোফেসর তাকিও'র চরিত্রস্রষ্টা অমল মুখার্জী এবং মা'-র ভূমিকায় কাজল মুখার্জী স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজেদের দক্ষতার কোনো ত্রুটি রাখেন নি। শিক্ষকরূপী প্রদীপ ভট্টাচার্য কিন্তু তুলনায় সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত নন। তাঁর পুত্রশোকের অভিব্যক্তিটি অযাচিত ভাবাবেগ দ্বারা আক্রান্ত। তাঁর হাত থেকে বইগুলো প'ড়ে যায় নি, তিনি নিজেই ফেলে দিলেন। কণ্ঠস্বরের জড়তার প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলে প্রদীপবাবুর পরবর্তী অভিব্যক্তিগুলো যথার্থই ঠেকেছে। বুলবুল চৌধুরী ও শিল্পী বোসের কাজও মন্দ লাগেনি। আলোচিত চরিত্রগুলোর উপযুক্ত সাজসজ্জার জন চিনু দাস প্রশংসিত হতে পারেন।

নাটকে মস্তানী কার্যকলাপ আরো সুসম্পাদনার প্রয়োজন। অতটা সময় আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যয় করাটাও নির্দেশকের (বিমলেন্দু মজুমদার) ঠিক হয়নি। যে দর্শকদের সংক্ষিপ্ত কয়েকটি দৃশ্যের সাহায্যে যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্যাসিবাদ প্রকোপিত সমাজ-চিত্রের অবস্থা বোধিত করা যেতে পারে, সেখানে স্বৈরাচারের স্বরূপ জানাতে মস্তানী কার্যকলাপকে কেন এত দীর্ঘায়িত করা হল,—এমন প্রশ্ন জাগলে, উত্তর একটাই—অন্যথায় মস্তানের ভূমিকায় শোভনিকের দুজন অভিনেতা নিমু ভৌমিক (তাজা) ও কাশীনাথ হালদার (পণ্ডা) খিস্তি-খেউড়ে, লম্ফ ঝম্ফ, মস্তানী হাসির প্রাচুর্যে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য লেফালুফিতে যে কতটা পারঙ্গম তা দর্শকদের বোঝানো যেত না! আর এই 'বোঝা'টাই ভেঙে তছনছ করেছে আলোচ্য নাটকের অন্যান্য কর্মীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের সুপ্রয়াসকে।

স্বর্গের সিঁড়ি

স্বর্গের সিঁড়িটা শেষ পর্যন্ত নির্মাণ হয় নি। তবে তার জন্য অনেক পরিকল্পনা ফেঁদেছিলেন রাবণ রাজা। ঠিক তেমনি, একটি নাটক দর্শকদের কাছে দাঁড় করাতে নেমে 'থিয়েটার ক্ল্যান' তার আয়োজনের কোনোরকম ঘাটতি

বিবরণ দেয়া যাক—(ক) 'যারা ইতিহাস' এমন কিছু চরিত্রের পাশাপাশি মঞ্চে আসা-যাওয়া করলেন 'যারা ইতিহাস নয়' এমন কিছু চরিত্র; (খ) বিদ্রূপ আর বক্তব্যের সঙ্গে আছে নাচ গান কৌতুক; (গ) ম্যাক্স ফ্রিশের অনুপ্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেশটীয় রীতি।

এত কিছুর পরও অনুষ্ঠানান্তে প্রেক্ষাগৃহের আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে নাটকে ব্যবহৃত একটি গানের কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল—'আমরা পেলাম কি?'

আমরা যা পেলাম তার নাম, 'চমক'। বর্ণে, রঙে, ঢঙে। কিন্তু যাবতীয় চমক শেষ পর্যন্ত কি আবেগে, কি বুদ্ধিতে দর্শকদের যে কোনো বিশেষ রূপেই আসেচন করে তুললো না, তার কারণ, একই নাটকে প্রশ্রয় পেলেও চমকগুলো আসলে পরস্পর শুধু যে সংসর্গহীন তাই নয়, ক্ষণপ্রভাও বটে। অবশ্য, চমক মাত্রই তাই। কিন্তু যেহেতু এই নাটক মূলত চমকের সমাহার, তাই তারও একটা এফেক্ট আছে। এবং তার ব্যাখ্যায় অনিবার্যভাবেই সুকুমার রায়কে স্মরণ করতে হয়। ঋণ স্বীকার করতে হয়

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর একটি রচনার কাছে। কারণ, পরস্পর বিজাতীয় স্ফূর্তিতে যে 'বকচ্ছপ' মূর্তির আত্মপ্রকাশ, আমার ব্যাখ্যায় উদ্দিষ্ট বিষয় তারই সমার্থক।

আলোচ্য নাটকে স্ফূর্তি সত্যি সত্যি আছে। রাবণরাজার স্বর্গের সিঁড়ির যেদিন ভিত্তি স্থাপন হবে, তার পূর্ব সন্ধ্যায় সেই উপলক্ষেই তিনি একটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন। তার এই সভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, হিউ-এন-সাং, কর্ণ, আওরঙজেব, লায়লা-মজনু এবং দীনবন্ধু মিত্র'র "সধবার একাদশী" থেকে ঘটীরাম ডেপুটি। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার, নির্দেশক (পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়) স্বয়ং এই দশকের একজন বুদ্ধিজীবী, —'যারা ইতিহাস নয়' বিভাগীয় একটি চরিত্রে অংশগ্রহণ করে এটি যে আসলে একটি 'প্রহসন' সে কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। একটি রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী রাজার প্রতি তাঁর প্রজাদের প্রতিবাদহীন আনুগত্য—এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চেয়েই এত কাণ্ড, উপকাণ্ড নাটকে জড় করা হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাবণ যখন শেষ পর্যন্ত স্বর্গের সিঁড়িটি নির্মাণ করতে পারেন নি, এবং সেটা এই মর্তবাসীদের পক্ষে মঙ্গলই হয়েছে, (কারণ, তাদের দ্রুত স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেনি) ঠিক তেমনি, মূলত চমক সৃষ্টির পরিকল্পনায় আলোচ্য নাটকের নাট্যকার-নির্দেশকের

মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের বোধবুদ্ধি স্বর্গপ্রাপ্তির সত্যি কোনো কারণ ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, নাটকে প্রাগুক্ত বুদ্ধিজীবী চরিত্রটির উপস্থিতি এবং তার অভিনয়ের কার্যকলাপে ইলিউশন-ব্রেকের ছড়াছড়ি ব্রেশটের রীতিকে ব্রেক ফেল করে তবে ছেড়েছে।

শেষ দৃশ্য, কম্পোজিশনের প্রশ্নে সত্যি ভালো। তবে এত কিছুর পর সন্দিগ্ধ আমাদের মন বলে, মায়ের (নাটকের একটি চরিত্র) ইচ্ছায় তার বোবা সন্তানের মুখে স্বর ফোটানো, এবং তার হাত দিয়ে অস্ত্র প্রয়োগের ব্যাপারটি নাটকে সংযুক্ত হয়েছে আবেগ-সঞ্চারী একটি 'ফ্রিজ' পরিবেশন করার লোভ সামলাতে না পেরেই। সেহেতু বলতে কি, আয়োজনের চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়'র পর সেটা দর্শকদের কাছে 'মুখশুদ্ধি'র মত বোধ হয়েছে।

আলোচ্য নাটকটির একমাত্র যা চড়া সুরে প্রশংসা করা যায় তা অভিনয়। বেশ ভালো। বিশেষ করে ঘটীরাম ডেপুটির ভূমিকায় প্রখরকিরণ মুখোপাধ্যায়ের টাইপ চরিত্রাভিনয়-দক্ষতা সত্যি প্রখর। একই কারণে উল্লেখ করতে হয় মিলন বসুর নাম (হিউ-এন-সাঙ)। এছাড়া, ছিমছাম অভিনয় করে দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছেন চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লতিকা বসু।

বাস্তবিক, থিয়েটার ক্ল্যানের শিল্পীদের অভিনয় গুণের প্রতি লক্ষ রেখে আমার এই ধারণা হয়েছে, এ'রা ইচ্ছা করলে সিঁড়ি ভেঙে সার্থক নাটক নামাতে পারেন। সে কারণেই এ'দের কাছে উল্লেখ করবার আগ্রহ বোধ করছি, আলোচ্য 'প্রহসন'টি শেষপর্যন্ত প্রহৃত হয়েছে ফর্মের প্রহরণে। হরণ হয়েছে তাই এর 'রস'। ফলে, হাস্যরসাত্মক নাটক আমাদের কাছে অন্তিমে কেবলই 'হাস্যাত্মক' বোধ হয়েছে, এই যা।

'প্রসব' ও 'খামারের গপ্পো'

সম্প্রতি শিশির মঞ্চে অপরূপ (নর্থ) নিবেদন করলে তাঁদের প্রযোজিত দু'টি একাংক—'প্রসব' ও 'খামারের গপ্পো' (নির্দেশনা, অসীম চক্রবর্তী)। একাংক দু'টির মূল প্লট ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পারিপার্শ্বিকে, অন্বিত হলেও, লক্ষ্য করলাম, সেদিন শিশির-মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের দৃষ্টির গভে—মানসানুভূতিতে এর আবেদন পরম্পরা একটি বিশেষ তাৎপর্য ও মর্যাদায় স্বীকৃত হয়েছে।

'প্রসব—স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' ও 'প্রসব' অবলম্বনে,—নগরকেন্দ্রিক; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এক যুবকের গ্রামে গিয়ে রাজনীতি করার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব—সর্বোপরি, অস্পষ্ট চেতনার—ক্রমানুসারে সংঘাতলব্ধ অভিজ্ঞতায়—অভিজ্ঞ উত্তরণে উদ্দিষ্ট। অন্যদিকে, 'খামারের গপ্পো'—চাও শু শিয়েন কৃত 'দি টু ওয়ে অভ থিঙ্কিং অ্যাট ইট' অবলম্বনে, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমি (অনুবাদ, ইন্দ্রজিৎ সেন ও দিলীপ বসু)—আলোচ্য উপস্থাপনায় যা সময়োচিত আবেদনে পরিবেশিত হয়েছে।

আপাত অন্তঃসত্ত্বা আসলে ছদ্মবেশী এক নারী, যে কিনা সন্তান সম্ভবা বলেই প্রতিবিপ্লবীদের কাছে 'ইনোসেন্ট' বোধে মুক্তি পায়, সে-ই বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে, তাদের হাতে তুলে দেয় লুকিয়ে আনা প্রচারপত্র, রিভলবার ইত্যাদি। অর্থাৎ এখানে আলোচ্য এই নারীচরিত্রটিকে উদ্দিষ্ট করা হয়েছে সর্বহারার যূথবদ্ধতা এবং বিপ্লবীদের মধ্যে বিশ্বাস সঞ্জীবনী প্রেরণার জন্মদাত্রী হিসেবে। সেদিক থেকে প্রথম একাঙ্কটির নামকরণ যথার্থ। কিন্তু এই নামকরণের যথার্থতা সমগ্রতার বিচারে নাটকটিকে যে আশান্বিত সার্থক ক'রে তুলতে পারেনি তার কারণ হিসেবে আমার মনে হয়েছে দু'টি কাহিনীর ('গ্রামে চলো' ও প্রসব) একত্রীকরণে যে নাট্যরূপ (ইন্দ্রজিৎ সেন) তা বিশেষ ক'রে সংলাপ গাঁথুনি ও প্রতিপাদ্য ঘটনাশৃংখলায় আরো বেশি সম্বিত, সুসমঞ্জস হবার প্রয়োজন ছিল। নামকরণের যথার্থতায় পুটু চরিত্রটি (ছদ্মবেশী নারী) দর্শকদের মন কেড়ে নিলে, রঘু চরিত্রটি (শিক্ষিত, নগরকেন্দ্রিক যুবক, যে গ্রামে গিয়ে রাজনীতি করছে) কিছুটা ম্লান হয়, অথচ এই চরিত্রটির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আলোচ্য নাটকের বিশেষ প্রতিপাদ্য-সম্পদ, এটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এইসব কারণেই প্রসবের উপস্থাপনা আমাদের কাছে কিছুটা বিশৃংখল বোধ হয়েছে। অথচ এই নাটকে অনেকেই বেশ ভালো কাজ করেছেন। রঘু চরিত্রের দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণার দিকটি সমীন্দ্র দেবের অভিনয়ে স্বচ্ছন্দে ধরা পড়েছে। সূর্যের ভূমিকায় অসীম চক্রবর্তী সংলাপ উচ্চারণে একবার হোঁচট খেলেও, শিল্পীর কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতি আমাদের ভালো লেগেছে। পুটু চরিত্রে মণিদীপা রায়কেও চমৎকার মানিয়েছে, অভিনয়ে তিনিও দর্শকদের তৃপ্ত করেছেন। সত্যবান ও কালা শবরের ভূমিকায় যথাক্রমে সুবল থান ও অলোক চট্টোপাধ্যায় এবং সুজয় চরিত্রে সুদীপ দে [illegible]। এ'দের সংলাপ উচ্চারণ আরো স্পষ্ট ও সাবলীল হওয়ার দরকার ছিল। ফু-দান বাবার চরিত্র স্রষ্টা তাপস ভট্টাচার্য তাঁর অভিনয়ে 'রিলিফে'র তুলনায় চরিত্র সৃজনে আরো বেশি মনোযোগী হ'লে ভালো করতেন।

'আমি'র চিন্তাকে তুচ্ছ করে 'আমরা'র স্বার্থকে বড় ক'রে দেখানোর জন্য এর মূল গল্প ফাঁদা হয়েছে,—আলোচ্য নাটকে 'জনৈক ভট্টাচার্য' চরিত্রটি এই গল্পেরই ব্যাখ্যা-কর্তা, প্রাককথনে তাই তার (তাপস ভট্টাচার্য) উপস্থিতি। যদিও তাপসবাবুর অভিব্যক্তি অতি-প্রগলভ, কিন্তু এই ত্রুটি দর্শকচেতনায় অতিদ্রুত অপসৃত হয়েছে অবশিষ্ট দু'জন অভিনেতা, অসীম চক্রবর্তী ও সমর কুণ্ডুর অভিনয় গুণে। বাস্তবিক এ'দের সৃষ্ট যথাক্রমে জেন ও পিয়েন চরিত্র দু'টির কথা, আমার বিশ্বাস, সেদিন শিশির মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকগণ অনেকদিন মনে রাখবেন।

রানা দাস

অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য
মনোহর, রেশম কোমল, স্নিগ্ধ সুন্দর

লাক্স সুপ্রীম আপনার রূপ-লাবণ্য করে তুলবে এই রকম অপরূপ অতুলনীয়। এতে আছে অপূর্ব সুরভির আবেশ। এর ক্রীমে ভরপুর রাশি রাশি ফেনা আপনার ত্বকে রেখে যায় রেশম চিকন পরশ। লাক্স সুপ্রীমের বিউটি ক্রীম আপনার রূপ-লাবণ্যকে ক'রে তোলে রেশম কোমল, স্নিগ্ধ সুন্দর।

এর পর আপনার
আর কিছুই পছন্দ হবে না।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

HLL-1059

রাগ-অনুরাগ

যখন দেশ পত্রিকায় প্রথম খবর প্রকাশ করা হল যে বিশ্ববিখ্যাত সেতার-বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর ধারাবাহিক-ভাবে সংগীত সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখবেন, তখন সবিশেষ আশান্বিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে বহু দিন পরে একজন সত্যিকারের সংগীত শিল্পীর কাছ থেকে কিছু শুনতে পাব যার মধ্যে হয়তো থাকবে অনেক নতুন কথা, অজানা তত্ত্ব এবং তথ্য। কিন্তু আমি নিতান্ত দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমি সত্যই হতাশ হয়েছি তাঁর লেখা পড়ে।

এই আশাভঙ্গের কারণ হল এই যে নানা অসঙ্গতিপূর্ণ, অর্ধ সত্য এবং ভুল ভ্রান্তিতে ভরা এই ধরনের একটি সাধারণ মামুলী রচনা ইদানীং কালে আমার নজরে পড়েনি। "রাগ"-এর প্রতি তাঁর "অনুরাগ" কতটুকু তা আমার জানা নেই, কিন্তু কিছু সংগীত শিল্পীর প্রতি তাঁর যে বীতরাগ আছে তার ইংগিত প্রচ্ছন্ন হলেও রীতিমত প্রকট। বিশেষ করে যাঁরা সংগীত জগতের বিভিন্ন রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন এবং অবহিত তাঁদের বাক্যজাল বিস্তার করে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা।

আমি সে সমস্ত বিষয়ের যতটা সম্ভব বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করবো এই প্রতিবাদ লিপির মাধ্যমে। সে জন্য হয়তো আমাকে ২।৩টি কিস্তিতে আমার বক্তব্য পেশ করতে হবে, যদি অবশ্য দেশ পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় আমাকে তাঁর সুবিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দিতে অস্বীকার না করেন।

যেহেতু আমি স্বেচ্ছায় সংগীত জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছি, সেই হেতু আমি এই ধরনের বাদানুবাদের মধ্যে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-ছিলাম। কিন্তু সত্যের খাতিরে এবং সংগীত জগতের মঙ্গলের জন্য আমাকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে। রবিবাবু আমার বিশেষ বন্ধু স্থানীয় শিল্পী এবং আমি তাঁর একজন গুণমুগ্ধ শ্রোতা। বহু সংগীত জলসায় একত্রে সংগীত পরিবেশন করার সুযোগও আমার হয়েছে। তাই আমি আশা করি যে আমার সমালোচনা যেন তিনি খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতি আমার অসম্মান করার কোনও বাসনা নেই, কিন্তু তবুও যদি তিনি মনে আঘাত পান, আমার লেখা পড়ে, তবে যেন তিনি তা নিজ-গুণে ক্ষমা করে নেন।

তাঁর লেখা পড়লে সাধারণ মানুষের মনে হবে যেন এটা তাঁর নিজের কথা অর্থাৎ আত্মজীবনী। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সংগীতের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন যেখানে তিনিই একমাত্র বক্তা এবং অন্যান্য সকলে শ্রোতা। সংগীতের প্রকৃত মূল্যায়ন নির্ধারণ করার বিষয়েও তিনি একমাত্র বিচারক এবং চূড়ান্ত রায় দেবার মালিক। অর্থাৎ এক কথায় এ যেন অনেকটা—

"শাস্ত্রীয় সংগীত কথামৃত সমান তাতেও কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু অভিনবত্ব কোথায়? এবার তাহলে দেখি গলদ কোথায়।

আমি দফাওয়ারী সমালোচনা আপাতত করছি না। যে পর্যন্ত পড়েছি, তার একটা সার্বিক আলো-চনার মধ্যেই আমার বক্তব্য নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই ধরা যাক সংগীতের সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি (পৃ—১৭, নবম সর্গ)। তিনি লিখেছেন—"রঞ্জয়তে ইতি রাগঃ।" "রঞ্জয়তে" নয় "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ।" মনে হয় তিনি ঐ বাক্যটি না পড়ে শুধু কানে শুনে উদ্ধৃত করেছেন।

তার পরে তিনি রাগ-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছেন তার মধ্যে কোনও নতুন কথা নেই, যা আছে তা সাংগীতিক উপাধির জন্য নির্ধারিত পাঠসূচীর ব্যাখ্যা করে বাজারে যে সমস্ত সস্তা দামের বই পাওয়া যায় তারই পুনরুক্তি মাত্র। রবিবাবুর কাছে সেই মামুলী কথা আমরা আশা করিনি।

ঐ নবম সর্গেরই শেষের দিকে তিনি আরও একটি সাধারণ অথচ মারাত্মক ভুল করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে—"শাস্ত্রচর্চা আরও কমে গেল, কারণ শিল্পীরা লেখাপড়ার ধারই মাড়ালো না। আর সময়ই বা পাবেন কোত্থেকে? সমস্ত জাগ্রত অবস্থাটাই তো চলে গেল রেওয়াজ, রেওয়াজ আর রেওয়াজে"। কথাটা "রেওয়াজ" নয়, "রিয়াজ"। "রেওয়াজ" মানে প্রচলন, যেমন এ জিনিসের আর রেওয়াজ নেই। কিন্তু "রিয়াজ" মানে সাধনা, অভ্যাস ইত্যাদি। তিনি সংগীত জগতের একজন শিরোমণি হয়ে যে এ-রকম একটি সাধারণ ভুল শব্দ ব্যবহার করবেন তা সত্যই কল্পনাতীত।

এবারে আলোচনা করা যাক তাঁর লেখা একটি ঐতিহাসিক ভুল। রাগ-অনুরাগের দ্বিতীয় পর্বের ১৭ পৃষ্ঠায় একস্থানে সেতারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে—"আর এক দল বলেন যে, পারস্যের এক যন্ত্রের আইডিয়া নিয়ে আমির খুসরো দ্বাদশ শতাব্দীতে এর আবিষ্কার করেছিলেন।" আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমির খুসরো দ্বাদশ শতাব্দীর লোক নন, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কারণ তিনি ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর সভাসদ যাঁর রাজত্বকাল ছিল ১২৯৬ খৃঃ থেকে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তা ছাড়াও আমার মনে হয় তিনি আর একজন আমির খুসরো-এর সাথে আলাউদ্দিন খিলজীর সভাসদের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। বিশিষ্ট অনেক গবেষকেরা মনে করেন যে কবি এবং সংগীতজ্ঞ আমির খুসরো-এর সমসাময়িক আর একজন সেতার বাদক আমির খুসরো ছিলেন যাঁর বাড়ি ছিল উত্তরপ্রদেশের বাদায়ূন কাছে। যিনিই প্রকৃতপক্ষে সেতারের উন্নতিসাধন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সম্রাটের সভাসদ আমীর খুসরো-এর মত অতো নামী লোক ছিলেন না, সে জন্য তিনি জনসমাজের অগোচরেই

[illegible] বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। অধ্যাপক ধ্রুবতারা জোশী তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন বলে আশা করি।

রবিবাবুর লেখা প্রবন্ধাবলীর তৃতীয় সর্গের ১৯ নং পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ সাহেব কর্তৃক আয়োজিত ডঃ যতন সরকারের বাড়িতে তিনি এক জলসায় পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে ঝাঁপ তালে গৎ বাজিয়ে কলকাতায় সংগীত সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম অন্য তালে গৎ বাজিয়ে কৃতিত্ব লাভের দাবি করেছেন। সেই সূত্রে সে আসরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে আমার নামও তিনি করেছেন। কিন্তু আমি সরবে অস্বীকার করছি যে সে আসরে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কেননা সে সময় আমি রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসাবে আমার পূর্বতন দেশেই অবস্থান করছিলাম। তিনি সম্ভবত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রবীন্দ্রমোহন মৈত্রের সাথে যে কোনো কারণেই হোক আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

সে যাই হোক, অন্য তালে গৎ বাজাবার প্রথম কৃতিত্বের দাবি তিনি কিছুতেই করতে পারেন না। তার একাধিক প্রমাণ আমি দাখিল করছি।

প্রথমত সংগীত জগতে তাঁর আবির্ভাব আমাদের মত বহু শিল্পীর অনেক পরে এবং হয়তো অনেকের বাজনা শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। যাঁরা রবিবাবুর অনেক পূর্বে বিভিন্ন তালে গৎ বাজিয়েছেন তাঁদের নাম আমি একে একে করছি।

প্রথমেই ধরা যাক, তাঁর ওস্তাদ স্বর্গত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কথা। তিনি কলকাতায় অনেক বার বিভিন্ন তালে বাজিয়েছেন। তা ছাড়া ওস্তাদ কেরামতুল্লা-কোকুভ খাঁ সাহেবদের ঘরানার শিষ্য বাংলার প্রখ্যাত সরোদ বাদক প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ ভোঁস (বসু) মহাশয়কে আমি পাখোয়াজের সাথে চৌতাল এবং ধামারে গৎ বাজাতে স্বকর্ণে শুনেছি। এ ছাড়াও ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ কলকাতায় ১৯৩৮-৩৯ সন থেকে প্রায় দেড় দু বছর এক নাগাড়ে কাটিয়ে ছিলেন। সে সময়েও তাঁকেও বিভিন্ন তালে গৎ বাজাতে শুনেছি। আর আমার নিজের কথা নিজের মুখে নাই বা বললাম। যাঁরা আমার কথা জানতে চান তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে বন্ধুবর শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং বিশ্বভারতীর সংগীতের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীধ্রুবতারা জোশী মহোদয়গণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

আজ এই পর্যন্ত বলেই আমার বক্তব্য আপাতত শেষ করছি। সামনের বার সুযোগ পেলে পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এবং অন্যান্য যন্ত্রীদের সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

রাধিকামোহন মৈত্র কলকাতা-৩২

কৃষিশিক্ষার সমস্যা

১২ আগস্টে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় … আরও কিছু প্রসঙ্গ যোগ করার চেষ্টা করছি।

আমাদের রাজ্যের কৃষিশিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নেই। এর ফলে শিক্ষক এবং ছাত্র কেউই বুঝতে পারেন না কতটা শিক্ষা দিতে হবে বা কতটা শিক্ষা পেতে হবে। নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যপুস্তকও নেই। তাছাড়াও রয়ে গেছে স্নাতক স্তরে পুঁথিগত শিক্ষার সংগে ব্যবহারিক শিক্ষার বিরাট ফারাক। যে শিক্ষা ক্লাসে দেওয়া হয় তার সামান্য অংশই ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কৃষি ছাত্রকে কৃষি মনোভাবাপন্ন করতে হলে প্রথম থেকেই 'ফিল্ড ওরিয়েন্টেড' শিক্ষা দিতে হবে। ক্লাসের বেশীরভাগ সময়ই থাকবে ফার্মের সংগে জড়িত। ল্যাবরেটরীতে বেশী সময় নষ্ট না করিয়ে প্রতিটি ফসল সম্বন্ধে প্রতিটি ছাত্রকে হাতে ধরে ধরে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে প্রতিটি ফসলের বীজ বপন থেকে আরম্ভ করে ফসল ওঠা পর্যন্ত সমস্ত ধাপগুলি নখদর্পণে থাকবে। প্রতিটি ছাত্র নিজে থেকেই হিসাব করে দেখবে কোন ফসলের কেমন লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে। ফসল ফার্মে থাকাকালীন জানাতে হবে কোন মাটিতে কোন ফসল ভাল হয়, কখন কোন পোকার বা রোগের আক্রমণ হয়, তাদের প্রতিকারের উপায় প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যগুলি।

পশ্চিমবংগের কৃষিশিক্ষার সংগে কতকগুলি সাধারণ সমস্যাও জড়িত রয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর বিভাগে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ওখানে যে সকল ছাত্ররা ভর্তি হন তাদের খুব সামান্য ভাগই চার বছরের কৃষি স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে আসেন। বেশীর ভাগই আসেন ৩ বছরের বিজ্ঞানের স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে। এরা কিন্তু কৃষি শব্দের ঠিকমত অর্থটাই বোঝেন না। দুঃখের বিষয় এঁরাও কৃষি প্রযুক্তিবিদ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। সরকারের উচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও স্নাতক স্তরে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা নইলে [illegible]বারেই তুলে দেওয়া। এই আধাশিক্ষিত কৃষিবিদরা সমাজের কোন উপকারেই আসতে পারে না।

শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে কৃষি-মহাবিদ্যালয় খোলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু কথা হচ্ছে আগে থেকেই কর্মসংস্থানের ঠিকমত পরিকল্পনা না করে আর কৃষি-মহাবিদ্যালয় খোলা উচিত কি? বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষির গুরুত্ব বুঝে বিভিন্ন জেলাতে একটু ভিন্ন ধরনের কৃষিশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। উত্তরবংগে টী টেকনোলজী বা মেদিনীপুরে জুট টেকনোলজীর কোরস চালু হলে সাধারণ চাষী উপকৃত হবেন বলেই বিশ্বাস।

কেননা একজন কৃষিস্নাতক তৈরি করাতে সরকারের খরচ হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা, আবার অভিভাবকদের প্রায় ১০ হাজার টাকার মত। মোট এই ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে যে কৃষিস্নাতক তৈরি হয়, তাকে দেশের বা সমাজের কাজে কতখানি লাগানো হয়! তাছাড়া কৃষিস্নাতকরা প্রযুক্তিবিদের আখ্যা

দীপঙ্কর সাহা কলকাতা-৬৭

নাট্যাভিনয়ের রূপসজ্জার ভূমিকা

গত ২২শে জুলাই, ১৯৭৮ সংখ্যার একটি ভুল আমরা সংশোধন করতে চাই। শম্ভু সেন আমাদের বন্ধুমানুষ। তবে স্মৃতি তো বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকেই। তাই ভ্রমসংশোধন করা কর্তব্য মনে করলাম। উনি লিখেছেন, "পরবর্তীকালে আরও কিছু নাটক পরিচালনা করেছিলেন তিনি (ঋত্বিক ঘটক)। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' স্মরণীয়।"

এই দুটি নাটক ঋত্বিক ঘটক পরিচালনা করেননি। তার কিছুদিন আগে শ্রীউৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর প্রথম পরিচালনায় 'ম্যাকবেথ'-এর প্রথম অঙ্ক (শেক্সপীয়রের জন্মদিবস উপলক্ষে) অভিনীত হয়। তারপর উপরিউক্ত দুটি নাটক তিনি পরিচালনা করেন। 'বিসর্জন' নাটকে ঋত্বিক 'রঘুপতি'র চরিত্রে অভিনয় করতেন। অন্য অন্যটি 'অফিসার' নামে অভিনীত হয়েছিল। ঋত্বিক এ নাটকটি বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন কিন্তু পরিচালনা করেননি।

এ নাটকে অফিসার অর্থাৎ ইন্সপেক্টর জেনারেল পার্টটি তাঁকে করতে হয়েছিল দায়ে পড়ে। শ্রীকালী ব্যানার্জি মনোনীত হয়েছিলেন। দিনকয়েক মহড়াও দিয়েছিলেন। মনে পড়ে মহড়া হত গোবাগানের বাড়িতে। শো-এর দু'দিন আগে উস্কো-খুস্কো চুল নিয়ে কালী ব্যানার্জি উপস্থিত। এবং দুঃখের সঙ্গে জানালেন তিনি প্রথম অভিনয় রজনীতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না কারণ ঐদিনই তিনি বিয়ে করছেন। আমাদের অবস্থা তখন কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। বিনামেঘে বজ্রাঘাত আর কি! তখন অগতির গতি পতিতপাবনরূপে ঋত্বিক এসে উদ্ধার করলেন এই সংকট থেকে। অর্থাৎ নাটকেও তিনি একজন মুখ্য অভিনেতা হয়েছিলেন। গণনাট্য সংঘের ইতিহাস অনেক বিকৃত হচ্ছে। আমরা দুজনেই তার সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িত ছিলাম বলে ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করতে চাইছি। এরপর বোধহয় আর কেউ থাকবে না এসব সংশোধন করার জন্যে। তাই বিশেষ অনুরোধ যে যখন লিখবেন চেষ্টা করবেন অন্যদের কাছ থেকে তথ্যগুলো যাচিয়ে নিতে। শুনেছি ঋত্বিকের সহধর্মিণী শ্রীমতী সুরমা ঘটকও তাঁর ঋত্বিক জীবনস্মৃতিতে ঐ একই ভুল করেছেন। তাঁকেও সংশোধন করতে অনুরোধ করছি।

শোভা সেন
গীতা সেন
তাপস সেন

মানুষ পাথর

"মানুষ পাথর" লেখাটির জন্য প্রথমেই সমরজিৎবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমার কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে। প্রশ্ন করার আগে ২২শে জুলাই সংখ্যার করেছেন আমি সেইদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন—আমি ভূতত্ত্বের ছাত্র নই; তাই শ্রীকর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিকোণ ফলকের মত ভূতাত্ত্বিক গঠন বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন সেকথা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন ভাল হত।

দ্বিতীয়ত—তিনি লিখেছেন ভারতের এই অংশে ব্রহ্মপুত্রের অসংখ্য শাখা নদী উপনদী আছে। শাখা নদী বলতে অমরা বুঝি "কোন নদী হইতে উৎপন্ন নদী" (সংসদ বাংলা অভিধান) আর উপনদী বলতে বুঝি "যে নদী অন্য নদীতে যাইয়া পতিত হয়—tributary" (সংসদ)। আমার প্রশ্ন আলোচ্য অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের সত্যিই কোনও শাখা নদী আছে কিনা অথবা থাকা সম্ভব কিনা? আমার তো মনে হয় শ্রীকর যেগুলির কথা বলতে চাইছেন সেগুলি সবই উপনদী।

তৃতীয়ত—"এদের মধ্যে প্রধান উপনদী সিয়াং"-এ তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন, জানতে ইচ্ছা করছে। আমরা তো জানি এই নদীর নাম "সাংপো"।

চতুর্থত—সেই প্রধান উপনদী (সিয়াং নয়, সাংপো) মানস সরোবর থেকে বের হয়ে এসেছে এ তথ্যও আমাকে অবাক করেছে। সমরজিৎবাবু যদি একটু খোঁজ নিতেন তবে দেখতে পেতেন কৈলাস পর্বতমালায় ৫১৫০ মিটার উচ্চতায় এক বিরাট হিমবাহই ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থল। আমি ঠিক বললাম কি?

পঞ্চমত—সেই নদী (সাংপো) হিমালয়ের গহন অঞ্চল ধরে প্রায় এক হাজার মাইল এগিয়ে গেছে এ তথ্য মেনে নিতে পারছি না। কেননা সাংপো যে অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তাকে আমরা তিব্বতের মালভূমি বলেই জানি।

এই সাংপো নদী নামচা বারওয়া শৃঙ্গের কাছে দক্ষিণমুখী হয়ে প্রথমে সিয়াং পরে ডিহং নাম নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং শ্রীকরের মত অনুযায়ী এই ডিহং নদী "পূর্ববাহিনী" হতে পারে না।

ব্রহ্মপুত্র তৈরি হয়েছে ডিহং আর লোহিতের মিলনে ঠিকই তবে তার সঙ্গে ডিবং-এর নামও যুক্ত করা উচিত বলে মনে করি। কিন্তু তারা পাসিঘাটে মিলিত হয়েছে না বলে প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণে সাদিয়ার সামান্য পশ্চিমে অথবা ঠিক করে বললে কোব্বোতে মিলিত হয়েছে বলা ভাল—তাই নয় কি?

আমি ২৯শে জুলাই সংখ্যার আলোচিত একটি বিষয় "লাল মাটির পুরু স্তর" (ল্যাটেরাইট)-এর উপর একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। শ্রীকর লিখেছেন "সিংগ্রা নদীর পর থেকে চড়াই। প্রথমে ছোট ছোট পাহাড়। লাল মাটির পুরু স্তরে ঢাকা। এসব অঞ্চল এক সময় সমুদ্রের নীচে ছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অক্সিজেন এবং মাটির সঙ্গে মিশে থাকা লোহার কণাজারিত হয়ে তৈরি হয়েছে আয়রন অকসাইড। এর জন্যেই ওই মাটির রঙ লাল। মাটির স্তরে ছোট ছোট নুড়ি পাথর।......" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর থেকে এই মনে হয় যে

ল্যাটেরাইট অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আমার ধারণা একটু অন্য রকম। ল্যাটেরাইট নানা ধরনের পাথর থেকেই হতে পারে। সেই পাথরের ওপর অবশ্য আয়রন এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থাকতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ এবং টিটানিয়াম অক্সাইডও থাকে। ল্যাটেরাইট গঠনের সঙ্গে উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। সেই কারণে ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে ভারতের মৌসুমী অঞ্চলের মত বৃষ্টি বহুল স্থানের সঙ্গে ল্যাটেরাইটের অবস্থানের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে পাথরের সিলিকা জাতীয় পদার্থ ধুয়ে যায় এবং আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি পদার্থের জারণের ফলে ল্যাটেরাইট গঠন সম্ভব হয়। এই কারণেই পূর্ব এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বিভিন্ন বৃষ্টিবহুল অংশে আমরা ল্যাটেরাইট দেখতে পাই। মেঘালয়ও বৃষ্টিপাতের জন্য শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীবিখ্যাত। তাই সমুদ্রের জলের তলায় থাকার ফলে মেঘালয়ে ল্যাটেরাইটের সৃষ্টি হয়েছে এই তথ্য ঠিক কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি। সন্দেহ আরও প্রবল এই কারণে যে, আমরা জানি, হিমালয় সমুদ্রের তলা থেকে উঠলেও মেঘালয় মালভূমি সমুদ্রতল থেকে ওঠেনি এবং এটি পৃথিবীর অন্যতম আদি ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানারই এক বিচ্ছিন্ন অংশে মাত্র।

আমার সর্বশেষ প্রশ্ন—ল্যাটেরাইট নুড়ির সাথে পুরু বরফের স্তর এবং হিমবাহের (প্রসঙ্গত বলে রাখি এ দুটির অর্থ এক নয়—অন্তত শ্রীকরের লেখা পড়ে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক—আসলে প্রথমটি স্থির, ইংরেজীতে বলে ice sheet, অপরটি glacier, কোন কোনও ক্ষেত্রে আপাতস্থির মনে হলেও বহমান, সাদা বাংলায় বরফের নদী) যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে "শেষ হিম-যুগের অধীন" এই অঞ্চল কোনও কালে ছিল কিনা। আমি এখনও পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানীর লেখায় এ তথ্য পাইনি। সমরজিৎবাবু যদি এর সমর্থনে কিছু তথ্য আমাদের দিতে পারেন তবে বাধিত থাকব। দ্বিতীয়ত হিম-যুগের অধীন এই অঞ্চল থাকলেও ল্যাটেরাইট নুড়ির জন্মের কারণ হিসাবে এই পুরু বরফের স্তর অথবা হিমবাহকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই বা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তাও ভেবে দেখতে হবে। বিখ্যাত মৃত্তিকাবিজ্ঞানী জন্মের এস পি রায়চৌধুরীর মতে ভারতে দুই রকমের ল্যাটেরাইট দেখা যায়:—(১) ল্যাটেরাইট murrum এবং (২) ল্যাটেরাইট rock। শ্রীকর বোধ হয় এই murrumকেই নুড়ি বলতে চাইছেন। মেঘালয়ে যে ধরনের ল্যাটেরাইটের কথা সমরজিৎবাবু বলেছেন, আমার ধারণা, তার উৎপত্তির কারণ হল উপরের স্তরের ল্যাটেরাইটের ক্ষয়। তারপর সেই ক্ষয়ীভূত সামগ্রী মূলত বৃষ্টির জলের স্রোতে বাহিত হয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করে এবং নুড়ির জন্ম দেয়। নীচের স্তরেও হাইড্রো-অক্সাইডের প্রভাবে এরা কাজ—এই সিদ্ধান্তে আসতে আমার আপত্তি আছে। আমার এই ধারণা ভুল না ঠিক তা জানার জন্যে শ্রীকরের কাছ থেকে এ বিষয়ে একটু বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রইলাম।

ত্রিদিবকুমার বসু
কাঁটাপুকুর

॥ ২ ॥

গত ১২ই আগস্টের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমরজিৎ করের "মানুষ পাথর" লেখায় একই ধরনের ভুল চোখে পড়ল। এবারের ছবিটা ডালিমের ফুল (Flower of Punica), এই ছবিটার নীচে লেখা হয়েছে—"রডোডেনড্রন গুচ্ছ", এটা আদৌ রডোডেনড্রনের ফুল নয়। লেখক ২৯শে জুলাই-এর অর্কিডের ছবির পরিবর্তে আইরিসের ছবি আর ১২ই আগস্টের রোডডেনড্রনের পরিবর্তে ডালিমের ছবি দুটো সংশোধন করে নেবেন।

বিমলা কিঙ্কর জানা শিলং

॥ ৩ ॥

মানুষ পাথর'-এর প্রথম দুই কিস্তিতে তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। প্রচলিত ভূগোল দেখলেই শ্রীকর জানতেন যে, মানস সরোবর-এর কাছে তিনটি হিমবাহ থেকে যে নদী উৎপন্ন হয়ে অরুণাচলে ডিবং ও লোহিতের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নাম নিয়েছে তার নাম 'সাংপো'—সিয়াং নয়। ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী নেই বললেই চলে। যে সব নদীর জলে ব্রহ্মপুত্র পুষ্ট সে নদীগুলি উপনদী। মানুষ পাথরের দ্বিতীয় কিস্তিতে শ্রীকর গারো ও খাসি উপজাতির কোন তফাত রাখেননি। শ্রীমারাক গারো কিন্তু তার পরিচয় দিয়েছেন খাসি বলে। দুটো সমাজই মাতৃতান্ত্রিক কিন্তু রীতিনীতিতে প্রভেদ প্রচুর। খাসি উপজাতির ভাষা ও গারো ভাষার মধ্যে কোন মিল নেই।

শচীন পাল শিলং-৩

॥ ৪ ॥

গত ২২ ও ২৯ জুলাই 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসমরজিৎ কর-এর 'মানুষ পাথর' লেখাটি পড়লাম শিলং-প্রবাসী হিসেবে, লেখাটা পড়তে ভালোই লাগছে। তবে কয়েকটা ত্রুটি চোখে পড়লো।

শ্রীকর লিখেছেন যে, ডাঃ মারাক জাতিতে খাসি। কথাটি ঠিক নয়। উনি জাতিতে গারো। 'মারাক' বা 'সাংমা' পদবীধারী ব্যক্তি জাতিতে খাসি হতে পারেন না। ঠিক তেমনই 'খারকোনিয়াং' বা 'রিনজা' পদবী গারো উপজাতির মধ্যে নেই।

আরেক জায়গায় শ্রীকর লিখেছেন, "খাসিদের সম্পত্তির মালিক মা। —আর সম্পত্তি পায় তার বড় মেয়ে, ছেলে নয়" এ কথাটাও ঠিক নয়। কারণ, সম্পত্তি পায় ছোট মেয়ে অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। এটাই তাঁদের মাতৃতান্ত্রিক—সমাজ ব্যবস্থার মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। তবে '৭২ সালে মেঘালয় রাজ্যের জন্মের পর এই নিয়ম বেশ কিছুটা শিথিল হয়েছে। বর্তমানে ছোট মেয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হলেও, মা-এর ইচ্ছা অনুসারে অন্যান্য মেয়েরাও সম্পত্তির ভাগ পায়।

... ... বলেছেন, তা একমাত্র হিন্দু খাসিদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এ'দের সংখ্যা খুবই কম। কারণ, অধিকাংশ খাসিই খৃস্টান। আর সাপ পুজোর মানুষের রক্ত লাগে ঠিকই। কিন্তু তাঁদের শাস্ত্র মতে তা অবশ্যই কোন শিশু হতে হবে। শিশুর নিষ্পাপ রক্তেই সাপ-দেবতার স্নান হয়। তাই কোন 'লোককে' নিয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনলে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

কৃষ্ণা পাল
লাইথুমুখরা
শিলং

॥ ৫ ॥

সমরজিৎ কর মহাশয় লিখিত "মানুষ পাথর" নামক যে প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কিন্তু করমহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় বোকো এবং হাহিম সম্বন্ধে বর্ণিত কিছু সংখ্যক তথ্য ভুল ছিল, যাহা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

চাকুরির প্রয়োজনে আমি কয়েক বছর যাবৎ বোকোতে অবস্থান করিতেছি। তাই বোকো এবং তাহার পূর্ববর্তী অঞ্চল সম্পর্কে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। উল্লেখিত এই দুই স্থান সম্পর্কে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ভুল তথ্যগুলি নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

১। লেখক মহাশয়ের বন্ধু, বোকোর (ইতিহাসের) অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন দাস বর্তমান পত্র লেখকেরও বিশেষ বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু উনি যে লেখক মহাশয়কে "এখানে কোন বেকার নাই" বলিয়া তথ্যটি দিয়াছেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। উনি যদি কেবল এখানকার নিরক্ষর কৃষক ও পার্বত্য উপজাতিদের কথা বুঝাইয়া থাকেন তবে তথ্যটি আংশিক সত্য, কিন্তু শিক্ষিত বেকারের হার এখানে আসামের মোট শতকরা বেকার হারের অনুপাতে কোন অংশে কম নয়।

২। বোকো হইতে বাসে শিলং, গৌহাটী যাওয়া গেলেও এখান হইতে সরাসরি নওগাঁ যাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই নাই।

৩। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদেশী ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া লেখক মহাশয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে গুজরাটী সম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এদিকে গুজরাটী ব্যবসায়ী প্রায় নাই বলিলেই চলে। অপরপক্ষে তিনি এই অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়ী মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখই করেন নাই।

৪। বোকো হইতে মাইল তিনেক উত্তীর্ণ হইয়া বামদিকে সামান্য অগ্রসর হইলে যে সৌন্দর্যময় বিশাল পর্বতরাশি নজরে পড়ে তাহা "খাসি হিলস" নয়, "গারো হিলস"। খাসি হিলস তাহার পশ্চাতে।

৫। ডাক্তার মারাক জাতিতে "খাসি" নন তিনি "গারো"।

রামকৃষ্ণ পাল
বোকো

ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সংস্থার কাজ সম্বন্ধে সমরজিৎ কর মহাশয়ের লেখা আমাদের খুবই উপকার করেছে; কারণ, পত্রিকাতে নাম বার হলে এমনকি বাড়িতেও কয়েক দিন থাকিতে পাওয়া যায়।

সমরজিত কর মহাশয়ের লেখায় কিছু কিছু তথ্য লোকাচার সম্বন্ধে দেওয়া আছে, বিশেষত ২নং ক্রমিক রচনাটিতে। এর প্রধান source হল বিভিন্ন কর্মচারীর সঙ্গে লেখকের আলোচনা; তবে আমরা পাথরের হিসাব ঠিকমত দিতে পারলেও লোকাচার সম্বন্ধে আমাদের সব কথাই যে নির্ভুল তা নয়, অবশ্য আমরাই সবার চেয়ে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে পরিচিত। সাধারণ বাঙালী পাঠক সমাজে ২নং লেখাটিতে বিবৃত কয়েকটি তথ্য খাসিয়া সমাজ সম্বন্ধে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে; হয়তো আমাদের জানানোর দোষেই কর মহাশয় সেগুলো সেইভাবেই রেখেছেন কিন্তু সেগুলোর সংশোধন প্রয়োজন।

(১) Syiemরা কদাচ মুসলমান নন। আমার যতদূর জানা আছে, Syiemরা এখনও pre-Christian (? Hindu) ধর্মাবলম্বী। খাসিয়াদের ভিতরে বোধ হয় (ব্যতিক্রম বাদ দিলে) একজনও মুসলমান নেই।

(২) খাসিয়াদের মধ্যে Singh উপাধি প্রচলিত থাকায় এবং সনাতন ধর্মাচারী খাসিয়াদের মাথায় পাগড়ী থাকায় কোন কোন লোক অনুমান করেন মুসলমান সম্রাটের তাড়ায় কোন কোন পশ্চিম ভারতীয় গোষ্ঠী খাসিয়া পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই আগন্তুকেরা মুসলমান ছিলেন না নিশ্চয়ই। তবে এ সম্বন্ধে কোন লিখিত সাক্ষ্য জোগাড় করতে পারিনি। ট্রাইব্যাল স্মৃতি এ বিষয়ে নীরব। ব্রিটিশ অভিযানের আগে খাসিয়া ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না। তাই সবই লোককাহিনী।

ব্রিটিশ অফিসারেরা উত্তর-পূর্ব ভারতে বহির্ভারতের মানুষের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন; ছোটনাগপুর, আসাম, নগা রাজ্য, বর্মা, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশের আদিবাসী মানুষের কিছু কিছু সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত আশ্চর্য সাদৃশ্য তাঁদের নজর এড়ায়নি। ১৮৯৬-এর Journal of the Asiatic Society-তে এ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, কৌতূহলী পাঠক খোঁজ করতে পারেন।

(৩) আহুষ্ঠানিক খাসিয়া সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বড় মেয়ে নন, ছোট মেয়ে। যে লিংডো প্রাইভরের কথা কর মহাশয় লিখেছেন সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান; কিন্তু মায়ের সম্পত্তি কার কাছে যাবে তার বিচার করবেন সমাজের বড়রা—অভিভাবক হিসেবে বিশিষ্ট স্থান বাবার নয়, মামাদের (মায়ের ভাই মামা)।

(৪) সাপপুজার শিকারদের শরীরের যে কোন স্থান থেকে রক্ত নেওয়া হয় না, নাকের মাঝখানের septumটি থেকে নেওয়া হয় বলে শুনেছি।

সুজিত কুমার মজুমদার
শিলং

প্রকাশিত হল

ননীগোপাল চক্রবর্তীর

কৌতূহলকর কিশোর-গ্রন্থ

যাদুঘরে চল যাই

দাম ৬·০০

রূপকথার গল্পে যে-ঘুমন্ত রাজপুরীর কথা শোনা যায়, আধুনিক যুগে তারই নাম যেন যাদুঘর বা মিউজিয়াম। প্রাচীন কালের জীবনযাত্রাকে যেন অবিকল-ভাবে কেউ যাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে এই সংরক্ষণশালায়। ভারতবর্ষে যত যাদুঘর রয়েছে, তার মধ্যে আবার সব-থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ যাদুঘর হল কলকাতার যাদুঘর। নানা রকম খনিজ পদার্থ, কৃষিজাত দ্রব্য, মৃত পশুপাখি ও জীবজন্তুর নমুনা, প্রাচীন যুগের শিল্প-সম্ভার, মিশরের মমি, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া হাজার-হাজার বছর আগেকার বিস্ময়কর জিনিসপত্র, অশোকস্তম্ভের চূড়া, পুরনো মুদ্রা, শিলালিপি, ঢাকাই মসলিন, পৃথিবীর বুক থেকে মুছে-যাওয়া প্রাণীর কঙ্কাল—এমন নানা কৌতূহলকর নিদর্শনে ভর্তি কলকাতার যাদুঘর। ননীগোপাল চক্রবর্তীর এই বইটি এক দিক থেকে কলকাতা যাদুঘরের গাইড-বুক বলা যায়। কোন্ ঘরে কী রয়েছে, তার বিস্তারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর বর্ণনার ভঙ্গি এমনই সজীব এবং সুন্দর যে, গল্পের বই বলে ভুল হয়। ক্লান্তি আসে না। কেবলই কৌতূহলকে উসকে দেন তিনি। মনে হয়, আরো শুনি। প্রচুর ইলাসট্রেশন ও ফোটো যুক্ত হওয়ায় বইটির আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কিছু ভালো বই

বিমল করের

বালিকা বধূ

দাম ৭·০০

গ্রহণ

দাম ৪·০০

সমরেশ বসুর

সঙ্কট

দাম ৬·০০

প্রাচীর

দাম ৭·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সরল সত্য

দাম ৫·০০

তুমি কে ?

দাম ৪·০০

দিব্যেন্দু পালিতের

সন্ধিক্ষণ

দাম ৪·০০

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের

যাদের কথা কেউ ভাবে না

দাম ১০·০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের

কথা ছিল

দাম ৮·০০

বরুণ সেনগুপ্তের

সব চরিত্র কাল্পনিক

দাম ৮·০০

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিশীথ ফেরী

দাম ৫·০০

মতি নন্দীর

স্ট্রাইকার

দাম ৬·০০

বুদ্ধদেব বসুর

কালসন্ধ্যা

দাম ৩·০০

পুনর্মিলন

দাম ৪·০০

নেহরুর বিশেষ সহকারী

এম. ও. মাথাই-এর

আলোড়ন-তোলা গ্রন্থ

নেহেরুর সঙ্গে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর রচনাসংগ্রহ

শরদিন্দু অমনিবাস

॥ আট খণ্ডে প্রকাশিত ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—এই নামটি সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠকের কাছে আজ এক আশ্চর্য প্রিয় নাম। জীবন এবং শিল্প এক হয়ে মিশে গিয়েছে তাঁর অমর রচনাবলীতে। একটি বিশেষ রস নয়, সব-রকম রসেরই বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার তাঁর সাহিত্যকীর্তি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সৃষ্টিসম্ভার কয়েক খণ্ড অমনিবাসে প্রকাশিত হচ্ছে। এ-যাবৎকাল বেরিয়েছে আটটি খণ্ড। প্রথম দুটি খণ্ডে ব্যোমকেশের যাবতীয় গোয়েন্দাকাহিনী, তৃতীয় খণ্ডে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস, চতুর্থ খণ্ডে সমুদয় কিশোর-সাহিত্য, পঞ্চম থেকে সপ্তম খণ্ডে সমস্ত ছোটগল্প এবং অষ্টম খণ্ডে 'বিষের ধোঁয়া' নামক আলোড়ন-তোলা উপন্যাসসহ কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রনাট্য, কৌতুকনাট্য ও 'ছায়াপথিক' উপন্যাস সংগ্রথিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহকে মূল্যবান করে তুলবে এই অসামান্য রচনাসংগ্রহ।

দাম : প্রথম খণ্ড (নবম মুদ্রণ) ২৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড (সপ্তম মুদ্রণ) ৩০·০০ তৃতীয় খণ্ড (ষষ্ঠ মুদ্রণ) ৩০·০০ চতুর্থ খণ্ড (চতুর্থ মুদ্রণ) ২০·০০ পঞ্চম খণ্ড (চতুর্থ মুদ্রণ) ২৫·০০ ষষ্ঠ খণ্ড (চতুর্থ মুদ্রণ) ২৫·০০ সপ্তম খণ্ড (তৃতীয় মুদ্রণ) ৩০·০০ এবং অষ্টম খণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২৫·০০

কিছু ভালো বই

রূপদর্শীর

আমাকে বলতে দাও

দাম ৭·০০

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য

দাম ৮·০০

বিমল মিত্রের

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

দাম ১০·০০

নিশিপালন

দাম ৬·০০

রানী চন্দের

পথে ঘাটে

দাম ১৫·০০

উর্মিলা হাকসার-এর

নিজেকে নিয়ে

দাম ১০·০০

পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের

মাধুরীলতার চিঠি

দাম ৫·০০

যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপল-ব্যথিত গতি

দাম ৫·০০

সুদেব রায়চৌধুরীর

মা টেরেসা

দাম ১০·০০

সমরেশ বসুর

পরম রতন

দাম ৫·০০

বিশ্বাস

দাম ৭·০০

বিমল করের

একা একা

দাম ৫·০০

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

দাম ৪·৫০

বুদ্ধদেব গুহের

একটু উষ্ণতার জন্যে

দাম ১০·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা

দাম ১৫·০০

প্রকাশিত হল

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের

চাঞ্চল্যকর নেপথ্যকাহিনী

মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র

দাম ৮·০০

বাংলাদেশের ফৌজী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ গ্রন্থ

তাঁর এই নতুন গ্রন্থে সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঘটে-যাওয়া এক নৃশংস নাটকের দারুণ চাঞ্চল্যকর নেপথ্যকাহিনী। কেন খুন হলেন মুজিব? কারা লিপ্ত ছিল এই চক্রান্তে? তিনি নিজেও কি কিছুটা দায়ী এই চূড়ান্ত পরিস্থিতির জন্য? নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন খোন্দকার মোস্তাক আহমদ ষড়যন্ত্র করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরুদ্ধে? কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল কীভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে গোপন যোগাযোগে? ১৯৭১ সালে যিনি ছিলেন ...কিস্তানের সামরিক গোয়েন্দাবিভাগের এক নগণ্য মেজর, কীভাবেই বা স্থান পেলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর মসনদে? জিয়ার পায়ের তলার মাটিও কি টলোমলো? প্রতিশোধের অঙ্গীকার কি আবার ধ্বনিত হচ্ছে বাংলাদেশের বাতাসে? এমন বহু প্রশ্নের সদুত্তর এই বই। একদিকে হত্যার পশ্চাৎপট ও ঘাতকদের সনাক্তকরণ, অন্যদিকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি—সমস্ত কিছুই সাংবাদিক-লেখকের নিখুঁত বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। এমন বহু চমকপ্রদ তথ্য রয়েছে—যা এই প্রথম জানা গেল।

এই লেখকের আরেকটি বই :

সিদ্ধার্থশংকর : সিদ্ধি ও নির্বাণ ৬·০০

কোনারক ও তাজমহল

কোনারক ও তাজমহল, স্থাপত্যের দুই সুমহিম নিদর্শনের ভাল-মন্দ অবস্থার যে-কোন সংবাদ ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের ভাল-মন্দ সংবাদ বলে বিবেচিত হবে। কিছুদিন থেকে একটা দুশ্চিন্তার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সরব প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যদিও সেটা বাগুদেশের কোন কোলাহল হয়ে ওঠেনি। মথুরাতে তেলের রিফাইনারি তথা শোধনাগার স্থাপিত হবার ফলে স্থানীয় পরিবেশের প্রকৃতিতে হানিকর কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হবে কি হবে না, এই প্রশ্ন। মথুরার স্থানীয় পরিবেশ বলতে যে পরিধিভুক্ত ক্ষেত্রায়তন বোঝায়, তার মধ্যে আগ্রা শহরের অবস্থিতি লক্ষ্য করে পর্যবেক্ষকের মনে এই চিন্তা স্বাভাবিক ক্রমে এসে পড়ে যে, মথুরার রিফাইনারি ও আগ্রার তাজমহল একই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত দুই কৃতিত্বের স্থাপত্য —একটি ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক নিদর্শন, অপরটি আধুনিক-বৈষয়িক নিদর্শন। শোধনাগারের যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের অপরিহার্য একটি আঙ্গিক এই যে, প্রত্যহ অজস্র পরিমাণের ধোঁয়ার নিঃসরণ প্রাকৃতিক পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত অথবা সন্নিহিত বায়ুমন্ডলে যে দোষ ও বিকার নিক্ষেপ করবে, তার সংস্পর্শে তাজমহলের সাদা মর্মর পাথরের সৌধসজ্জা ক্রমেই জীর্ণ হতে থাকবে। একদিন এর পরিণাম কি হবে, সেটা কল্পনা করা যায়। সাড়ে তিনশত বৎসর ধরে অবিকার সৌষ্ঠবের সম্বল নিয়ে যে তাজমহল বিশ্বেরই চোখে স্থাপত্যের একটি বিস্ময় হয়ে বেঁচে থাকবার গৌরব লাভ করেছে, সে-তাজমহল তার রূপ আর সৌষ্ঠব দুই-ই হারিয়ে জীর্ণ-পুরাতনের একটি রিক্ত-করুণ নিদর্শনে পরিণত হবার দুর্ভাগ্য লাভ করবে। সুতরাং তাজমহলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনমতের সব ক্ষেত্রে একটা আশঙ্কার ভাব ঘনীভূত হবে, এটা স্বাভাবিক। সরকার এ বিষয়ে যথোচিত ও যথার্থ তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে সরকার একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীবহুগুণা তাঁর এক বিবৃতিতে বলেছেন, না, মথুরার শোধনাগার আগ্রার তাজমহলের সৌষ্ঠব ও স্থায়িত্ব বিপন্ন করবার মতো কোন ক্রিয়া অথবা স্বভাব বহন করে না। কিন্তু পূর্বতন অভিজ্ঞতার শিক্ষা এই যে সরকারী বিবৃতির এধরনের ঘোষণায় সান্ত্বনা লাভ করা ও নিশ্চিন্ত হওয়ায়ও একপ্রকারের অসতর্কতা।

কোনারকের সূর্যমন্দির ভারতীয় রীতি ও অভিরুচির ঐতিহ্যে লালিত স্থাপত্যের একটি বিশাল গরিমার রূপায়িত সৃষ্টি। তের শতকের এই সূর্যমন্দির অবশ্য তার বক্ষ প্রকোষ্ঠের বিগ্রহ ও দীপারতির আলোক কবেই হারিয়ে ফেলেছে। অনেকে মনে করেন যে ধার্মিক বিশ্বাসীর মন্ত্রধ্বনিতে অভিনন্দিত হবার সুযোগ এই মন্দিরের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কোন ক্ষণেই সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ নির্মাণ সম্পূর্ণ হবার আগেই দুর্ভাগ্যের আঘাতে স্তব্ধ ও পরিত্যক্ত হয়েছিল এই মন্দির। কোনারকের সূর্যমন্দিরের বর্তমান রূপ বস্তুত তার প্রাক্তন সৌষ্ঠবের একটি খন্ডিত অংশের রূপ। প্রধান মন্দিরটি সম্পূর্ণ রূপে ও প্রকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। স্থাপত্যের যে অংশের স্থিতি ও অস্তিত্ব এখন মন্দির বলে বিবেচিত হয়ে পর্যটকের কৌতূহল আকর্ষণ করছে সেটা বস্তুত প্রধান মন্দিরের সংলগ্ন জগমোহন। সাম্প্রতিক সংবাদ এই যে, কোনারক মন্দিরের এই জগমোহনের গাত্রে যে চমৎকার আলংকারিক দক্ষতার কীর্তিস্বরূপ অজস্র চিত্রার্ধের পটশোভা উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে, তারই এক জায়গার একটি বড় চাপড়া স্খলিত হয়ে ভূশায়িত হয়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার কর্মী ও অফিসারের পক্ষে যেমন বিশেষজ্ঞ গবেষকের পক্ষেও তেমন দুরূহ একটি কর্তব্যের দায় দেখা দিয়েছে। চিত্রার্ধের এই স্খলিত পটের অংশটিকে তুলে নিয়ে আবার যথাস্থানে সংলগ্ন করে পূর্বতন শোভার রূপ উজ্জীবিত করতে হবে।

কোন সন্দেহ নেই, দুরূহ হলেও এক্ষেত্রে সংস্কার ও সৌষ্ঠবের পুনর্বিন্যাসের কাজটি আধুনিক ভারতীয় কর্মীর পক্ষে খুব দুঃসাধ্য কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু একটি অভিযোগের দায় থেকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে থাকা সম্ভব নয় বলে মনে হয়। কোনারকের স্থাপত্য সম্বন্ধে যথার্থ সজাগ পর্যবেক্ষণ অক্ষুণ্ণ প্রকারে আচরিত হয় না বলেই সন্দেহ করবার যুক্তি এসে পড়ে। চিত্রার্ধযুক্ত বৃহৎ পটখণ্ড একেবারে স্খলিত হবার আগে কি কোন ফাটল ও চিড়ের চিহ্ন সেখানে রেখায়িত হয়ে ওঠেনি? পর্যবেক্ষণ বোধ হয় বেশীর ভাগ সময় আলস্যের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। তাই চিত্রার্ধের ওই পটের স্খলনের সম্ভাবনার সঙ্কেত চোখে পড়েনি। পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্যের অদৃষ্টে এই সমস্যা লেগেই আছে। যথোচিত সতর্কতাযুক্ত পর্যবেক্ষণ নেই, সজাগ পাহারা নেই, প্রগলভ্ চরিত্রের টুরিস্ট এবং পেশাদার তস্কর, উভয়েরই আচরণে প্রাচীন স্থাপত্য-দেহের কারুশোভার অজস্র অংশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও উৎপাটিত করবার এক বর্বরতন্ত্রের প্রকোপ যেন ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যের, মূর্তি ও মন্দিরের শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তার অভিশাপ হয়ে উঠেছে। ঠিক কথা, ধর্মবিদ্বেষীর অনেক আঘাতে ভারতের প্রাচীন মন্দির ও মূর্তির অনেক ধ্বংস সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয়-ইসলামীয় স্থাপত্যের, যথা তাজমহলের সৌভাগ্য এই যে এই স্থাপত্যের পক্ষে কোন ধর্মবিদ্বেষের আঘাতে উৎপীড়িত ও বিধ্বস্ত হবার দুঃখ সহ্য করতে হয়নি। লর্ড বেন্টিঙ্ক অবশ্য তাজমহলকে টুকরো-টুকরো করে সব মার্বেল পাথর নীলামে বিক্রী করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বেন্টিঙ্কের এই ভয়ানক মনোবৃত্তির মূলে অবশ্য ধর্মবিদ্বেষ ছিল না। ছিল, বৈষয়িক ব্যবসায়িক লোভ।

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

কেতকী কুশারী ডাইসনের প্রবন্ধ
সলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গে : নিকোলাস জার্নভের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা
আলোচনা যখন সমতা হারায়
আশিস ঘোষের গল্প
যন্ত্রলেখা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা।
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা।

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

"নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন কর"

হাটাও। সব হাটাও। দুটো মুটে এনে ওই ফাইলপত্তর সব স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরে দিয়ে এস। আমার দ্বারা আর সম্ভব হস না। তোমার হাতে ওটা আবার কি।

এটা সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ফাইলটা স্যার। পুলিস আউটপোস্টে একটা চায়ের দোকান করার প্রস্তাব এসেছে। আপনি প্রোপোজালটা আর একবার দেখবেন বলেছিলেন, বলেছিলেন চা আগে, না পুলিস আগে, আমাদের ভাবতে হবে। এক কাপ চা পেটে পড়লে কাজ বেশি হয়, না পেটে পুলিসের রুলের গুঁতো পড়লে কাজ বেশি হয়, না ধান্যেশ্বরী পড়লে হয়, একসপার্ট ওপিনিয়ান নিয়ে দেখবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলুম। ওটাও স্বাস্থ্যদপ্তরে দিয়ে এস। ওসব সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আমার জ্ঞানগম্যির বাইরে। আমি ডাক্তার নই, ইঞ্জিনিয়ারও নই, ওসবের আমি বুঝি কি। এই কমাস ইয়ারকি করতে গিয়ে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে বল তো? অ্যাঁ কি সাংঘাতিক অবস্থা? এই আছে এই নেই। আমার নিজেরই কিরকম আতঙ্ক ধরে গেছে। ফাইলপত্তর দেখব কি? কেবলই মনে হচ্ছে এই গেল, এই গেল। আর যাওয়াটা কিরকম? একেবারে ফচাত করে ঘুড়ি উপড়ে যাবার মত। ছেলেবেলায় ঘুড়ি উড়িয়েছো।

ঘুড়ির কথায় একটা আইডিয়া আমার মাথায় এল স্যার। বলব।

বলে ফেল, বলে ফেল, নিমজ্জমান কাঁত একটি তৃণখণ্ড দেখলেও আঁকড়ে ধরতে যায়। বল, বল।

ব্যাপারটা হল, ঘুড়ি দিয়েই তো প্রথম বিদ্যুৎ ধরা হয়েছিল। মনে পড়ছে আপনার ঘটনাটা। সেই কে এক সায়েব মেঘলা দিনে তারের সুতো দিয়ে ঢাউস একটা ঘুড়ি উড়িয়েছিস।

ঠিক ঠিক মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কি আইডিয়া। তুমি এখনি স্পেস্যাল ক্যাবিনেট মিটিং কল কর তিনতলায়। বল পনের মিনিটের মধ্যে, মুখ্যমন্ত্রী সো ডিজায়ার্স। কোনও ধানাইপানাই না, কোনও পার্টিগত কোন্দল নয়। বল 'সেভ ওয়েস্ট বেঙ্গল' পর্যায়ে এস ও এস মিটিং। তোমাদের ওই সার্কুলারে বানানটা ঠিক করে দিয়েছো প্রফুল?

কোনটা স্যার।

জ্বলে যাও তুমি। সেভ বানানটা। বানানটা করে...। ছি ছি, এস এইচ এ ভি ই, শেভ মানে ত কামান, ওয়েস্ট বেঙ্গলকে কামিয়ে ছেড়ে দাও। আমি কি বলেছিলুম—পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাও না কামাও। আমি এনকোয়ারি কমিশন বসাব। দেখি, ধরত লাইনটা, জাস্টিস দ্বারকানাথ....

তিনি ত বহুকাল মারা গেছেন স্যার?

তিনি মারা গেলেও তাঁর নামে একটা রাস্তা আছে স্যার, সেই রাস্তায় আমার এক বন্ধু রিটায়ার্ড জজ সায়েব আছেন। পুরোটা না শুনেই তোমরা হই চই কর। চোখ-কান খোলা রেখেই ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বাঁচাতে গিয়ে কামিয়ে ছেড়ে দাও। দেখি ডিরেক্ট লাইনে ধরি।

হ্যালো? হ্যালো? কে সোনামণি? ডার্লিং বাপী কোথায়? বারান্দায় বসে হাতপাখার হাওয়া খেতে খেতে আমাকে গালাগাল দিচ্ছেন। যাক পরমায়ু বাড়ছে আমার। শোন, লাইনটা একবার দাও না লক্ষ্মীটি।

হ্যালো জজ সাহেব? হ্যাঁ খুব গরম। গরম গরম থাকাই ত ভাল। শরীরের রক্ত চলাচল বাড়বে। মোটাদের আবার গরম একটু বেশি। মোটা হবার আগে পাওয়ার পজিশানের কথা ভাবা উচিত ছিল। না না লোড শেডিং চলছে চলবে। চলছে চলবেটাই আমাদের ইটার্নাল স্লোগান। শুনুন, শুনুন, নো রাগারাগি—আমি কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। ইয়েস, আলাদার এনকোয়ারী কমিশন। না না জেনারেটর ভাঙাভাঙি নয়। এবার অন্যধরনের এস এ ভি ই-সেভকে কারা স্যাবোতাজ করে এস এইচ এ ভি ই-শেভ করেছে তদন্ত করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচানটা কামান হয়ে গেছে। আরে ভেতরে বিভীষণ, বাইরে ভীষণ, আমাদের ভাবমূর্তি পাংচার করে দিলে। কখন আসবে? কি কখন আসবে? পাওয়ার। ওঃ, কলা দাও মুলো দাও ভবী ভোলার নয়। জানি না পাওয়ারের ব্যাপার আমি জানি না। আমি ও মাল হেলথ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিচ্ছি। ও আপনি বুঝবেন না। স্বাস্থ্য দপ্তরই এখন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেবে। সন্তান উৎপাদন আর বিদ্যুৎ উৎপাদন—ইয়েস ইয়েস, সেম কপুলেশান থিউরী—হ্যাঁ হ্যাঁ নেগেটিভ পজেটিভের খেলা।

যাঃ লাইনটা কেটে গেল যে রে শালা! পার্টিবাজী করে করে দেশটার বারটা বাজিয়ে দিলে মাইরি। চল প্রফুল ক্যাবিনেটটা সেরে আসি। মন্ত্রীরা সব আছেন?—আছেন স্যার। —বল কি? —এখন ত থাকবেনই স্যার! মক্কেলদের ত চেনেন। এই একমাত্র জায়গা যেখানে লোডশেডিং হয় না। পাখার লোভে সব চেম্বারে চেম্বারে বাপটি মেরে হাওয়ার লোভে বসে আছেন। একজন ত স্যার হোল ফ্যামিলিটাকে ঘরে এনে পুরেছেন।

—সে কি?

—হ্যাঁ স্যার। ওনার ফ্যামিলি গরম সহ্য করতে পারেন না। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হচ্ছে। তোলা উনুন এসেছে। দেখে এলুম বেগুনপোড়া হচ্ছে।

—সে কি হে সেক্রেটারিয়েটে বেগুনপোড়া!

—আজ্ঞে হ্যাঁ মন্ত্রীদের সাতখুন মাফ।

। দৃশ্যান্তর।

বন্ধুগণ, এই জরুরী অধিবেশন ডাকার কারণটা আপনাদের বলি, কাল রাত্তিরবেলা আমার গৃহিণী আমাকে বাড়ি থেকে অপদার্থ বলে দূর করে দিয়েছেন। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান আমার দ্বারা হল না। আমি দেশবাসীকে বলেছি—এটা আমার একার পিতার শ্রাদ্ধ হতে পারে না। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর আমার এমন পোড়াকপাল সকলের মাথার ওপর পাখা ঘোরাবো, নাকের ডগায় আলো জ্বালাবো। মন্ত্রী বলে কি আমি মানুষ নই! আমি সাফ বলে দিয়েছি—নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন কর। আমার বাড়ি নাকি। ওয়ার্ক এডুকেশান চালু হয়ে গেছে, নিজেদের বুদ্ধিতে না কুলোলে নিজের ছেলেকে জিজ্ঞেস কর। স্কুলের দিদিমণিদের কাছে শিখে নাও। কিছু বলার আছে?

[illegible] হল।

হ্যাঁ। [illegible]

তিনশো বার জন শ্রমিক বেকার হয়ে বসে আছে।

কোথায় বসে আছে?

রকে, গাছতলায়, নদীর ধারে, রাস্তার পাশে, পাড়ার চায়ের দোকানে।

তাদের সাকার করে দিন। শিল্প তো আপনার হাতে।

মালেক, পাওয়ারটা যে আপনার হাতে। বিদ্যুতের অভাবে শিল্পে যে লালবাতি জ্বলছে। উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, দেশ হড়কে যাচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে।

তাই নাকি মশাই। অত সব কাণ্ড হচ্ছে। আমি ভেবেছিলুম মানুষ শুধু খেয়ে যাচ্ছে। গর্তে পড়ে যাচ্ছে। আপনি কী এতদিন নাকে সরষের তেল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন।

আজ্ঞে না। সে গুড়ে বালি। যেখানে যে ক' সপ্তাহ রেশনে তেল দেওয়া হয়েছিল সেই সময় দু-এক দিন নাকে, নাইকুণ্ডুসে, ব্রহ্মতালুতে, বুড়ো আঙুলের মাথায় দিয়েছিলুম। বাজারের সরষের তেলে আমার বিশ্বাস নেই। সব ভেজাল। আমাদের ব্যবসাদারদের আমি বিশ্বাস করি না। সব চুর, সুয়র, সুয়র!

ও এখন সব সুয়র হয়ে গেল! ইলেকসানের সময় মনে ছিল না, যা দিচ্ছে সব পরে উশুল করে নেবে!

মুখ সামলে!

মুখ থাকলে তো সামলাবো! আমার মুখের কিছু রেখেছেন আপনারা!

এই রে কেন্দ্রের হাওয়া লেগেছে রে!

কে বললেন এই অশ্লীল কথাটা?

আমি বলেছি। কেন, বলেছি তো কি হয়েছে?

বলবেন না।

বেশ করব বলব।

আমি জানি যেখানে মেয়েছেলে সেইখানেই অশান্তি। বৌ ঢুকলেই যৌথ পরিবার ভাঙবে।

তুমি কী স্বপ্ন দেখছ? এখানে আবার নারী পেলে কোথায়? আমরা সব কটাই ত পুরুষ।

আছে ভাই আছে। তিনি নেপথ্যে বসে কল-কাঠি নাড়ছেন।

বাস বাস নো মোর সাইড টকস। কাজের কথা হোক। কোন্দল বড় ছোঁয়াচে জিনিস রে ভাই।

আপনার ওই দু লক্ষ বেকারকে আমি এখনি সাকার করে দিচ্ছি। শিল্পমন্ত্রী বসে বসে নিজের কতস্থান না চেটে কাজে নেমে পড়ুন। বন্ধুগণ, আমি সরকার পরিচালিত একটি বোমা লাটাই প্রতিষ্ঠান চালু করার প্রস্তাব রাখছি। উত্তেজিত হবেন না। এটা আমার পি-এর মস্তিষ্ক ঢেউ। প্রফুল পরিষ্কার কর।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সমবেত মন্ত্রীমণ্ডলী এবং অদৃশ্য দেশবাসীগণ, আমাদের সামনে আজ সুপরিকল্পিত অন্ধকার। যত বার আলো জ্বালাতে

জয় [illegible]...

চাই দিবে যায় যারে বারে। রাজনীতির কুলকারে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনমন্ত্রীর আরও ঘনঘোর ষড়যন্ত্র চলেছে। তাঁর খন্দকার বাহিনী সারা শহর আর শহরতলিতে বড় বড় পিল, গাবব্‌ বানিয়ে চলেছে মনের আনন্দে। তিনি কাল্পনিক কোনও যুদ্ধের কথা ভেবেই হয়ত এই পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছেন।

কি বললে ছোকরা! পেপারওয়েট ছুঁড়ে মাথা ভেঙে দোবো। কেউ আটকাতে পারবে না। কোনও পার্টির সাধ্য হবে না তোমাকে বাঁচায়। আমার কাজ আমি করছি। আমি যদি না খুঁড়ি, কে খুঁড়বে! আমার মেসোমশাই! জানো শাস্ত্রে কি বলেছে—যতই খুঁড়িবে তাই তত পাবে ধন। আমি খুঁড়তে বলি তাই কন্ট্র্যাক্টাররা পয়সা পায়, সেই পয়সা লেবারের পকেটে যায়, তারপর কিপিং এদিক সেদিক হয়। খননেই লক্ষ্মীলাভ। অত হিংসে কেন হে তোমার। আমি যতই খুঁড়ব আমার স্বায়ত্বশাসনের শিকড় ততই নামবে। তোমার অত চোখ টাটাচ্ছে কেন হে!

না, চোখ টাটাবে কেন? তবে লোকে বড় বিরক্ত হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই ডুব জল, তার ওপর অন্ধকার।

লোক না পোক। যাও শালা লোক না পোক। ছ লাখ মরলেও অনেক ভোটার থাকবে। লোকের আর কি? তারা আমার পথ্য দেবে। যে আমার পথ্য দেবে তাকেই আমি খুঁড়তে দোবো যাও আমার সাফ কথা।

কী রকম অ্যাডামান্ট অ্যাটিচ্যুড দেখেছেন স্যার। এভাবে মিনিস্ট্রী চলে।

তুমি তোমার পরিকল্পনা বলে যাও। কদিন আর খুঁড়বে। সেদিনের আর বেশী দেরি নেই যে বাপ, ভড় ভড় করে সব গর্তে ঢুকে যাবে। জয়াতু বি আমাদের ললাটলিপি।

তা আজ সকালে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে এক সায়েবকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখলুম। তাঁমার সরু তারে চাউস ঘুড়ি। সেই ঘুড়ি দিয়ে সির সির করে বিদ্যুৎ নেমে এল।

প্রত্তুল, প্রত্তুল এবার আমাকে বলতে দাও। বন্ধুগণ, স্টেট বোমাসাটাই অ্যান্ড ঘুড়ি করপোরেশান স্মল স্কেল সেক্টারে থাকবে। এককোটি টাকা ইনিসিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। আমরা লক্ষ লক্ষ বোমাসাটাই আর ঘুড়ি তৈরি করে দেশবাসীকে দুগ্ধ বিপণন কেন্দ্র মারফৎ বিতরণ করব। সমস্ত ঘুড়ির গায়ে আমাদের পার্টির সিম্বল থাকবে। প্রত্যেককে ঘুড়ি ওড়াতে হবে, ছেলে বুড়ো জোয়ান মদ্দ। সারা আকাশ ছেয়ে যাবে ঘুড়িতে। কেবল মনে রাখতে হবে—প্যাঁচ খেলা চলবে না। নো প্যাঁচ। নো ভোম-মারা বলে চিৎকার।

অবজেকসান।

কি হল আবার।

ঘুড়িতে শুধু আপনার পার্টির সিম্বল থাকবে কেন? মামার বাড়ি নাকি। সব পার্টির সিম্বল থাকবে। নির্বাচনে যে পার্সেন্টেজে সিট ভাগ হয়েছিল, সেই ভাগে সিম্বলঅলা ঘুড়ি তৈরি হবে।

না, তা কেন! ইন দি মিনটাইম আমাদের পার্টির স্ট্রেংথ অনেক বেড়ে গেছে। সেদিনের র‍্যালিই তার প্রমাণ। ফর্টি পার্সেন্ট ঘুড়িতে আমাদের পার্টির সিম্বল বসাতে হবে।

আস্তে আস্তে। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। মুখ্যমন্ত্রী তো ঘুড়ি ওড়াবেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর জ্ঞান নিয়ে বিদ্যুৎ আনবে কিভাবে একটু ব্যাখ্যা করবেন কি!

প্রত্তুল ব্যাখ্যা বানাও।

স্যার, ফাঁস গেলা। আই মিন ফেঁসে গেছি। ঘুড়িটা বিদ্যুতের প্রমাণ মাত্র। শুধু তাই নয় ঘুড়ি দিয়ে বিদ্যুৎ ধরার জন্যে ঝড়বৃষ্টি চাই, বজ্রপাত চাই। ঘুড়ি পরিকল্পনা বাতিল স্যার।

বাতিল কেন? অত সহজে হেরে যাবে কেন? রোজই কত বৃষ্টি হচ্ছে আর বজ্রপাতের রেকর্ড তো

মেঘ পরীক্ষার জন্য আকাশে অফিস

কতক কুপোকাত হয়ে গেল। প্রয়োজন হলে আমরা আর একটা লেজুড় পরিকল্পনা নিতে পারি। ভুলে যেওনা এটা বিজ্ঞানের যুগ। আমরা যদি বঙ্গোপ-সাগরে অনবরতই একটা নিম্নচাপ তৈরি করে রাখতে পারি তাহলেই তো মার দিয়া কেল্লা।

তা হলেও স্যার ওই বাঁটাত বিদ্যুৎ কিভাবে কাজে লাগাবেন। বই লিখছে, সাহেব শক খেয়ে মাটিতে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর উঠেই ধেই ধেই করে নৃত্য করতে লাগলেন।

তা হলে আমার আর একটা পরিকল্পনা আছে। সেটা করতে পারলে—ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। বন্ধুগণ, আপনারা জোনাকি দেখেছেন?

আপনি কি জোনাকির চাষ করতে বলছেন, তাহলে গোবরের প্রোডাকসান কিন্তু বাড়াতে হবে।

পুরোটা শুনুন তারপর ক্যাচর ক্যাচর করবেন। যত থার্ড ক্লাস এম এ আর এম এল এ-তে দেশটার বারটা বাজিয়ে দিলে।

অবজেকসান!

নো অবজেকসান। আমার মুখ খুলে গেলে কারুর তোয়াক্কা করি না। হ্যাঁ জোনাকি, সেই জোনাকি? আমার বেসিক প্রশ্ন হল, জোনাকি যা পারে মানুষ চেষ্টা করলে তা পারবে না কেন?

মানে পেছনে আলো, মানে পেছন দিয়ে আলো বের করা!

এগজ্যাকটলি সো। জোনাকিকে ভাল করে অবজার্ভ করতে হবে। দেখতে হবে তার ফুড হ্যাবিট। বন্ধুগণ, প্রয়োজন হলে আমরা সমস্ত লোককে ধরে ধরে ফসফরাস খাইয়ে দোবো। খুব সোজা কাজ। দেশলাইকাঠিতে ফসফরাস আছে। রোজ লোকে ভিটামিন ক্যাপসুল খেতে পারে, নিজে-দের স্বার্থে এক বাকস দেশলাই খেতে পারবে না! খুব পারবে। এটাই হল আমার নিজের বিদ্যুৎ নিজেই উৎপাদন করার পরিকল্পনা। হেলথ, আপনারা চ্যারিটেবল হাসপাতালে এটা পরীক্ষা করে দেখুন ত।

কিন্তু স্যার পেছনে আলো বের করে লাভ কি। মানুষ ত মটরগাড়ি নয় যে ন্যাজে পিকপিক করে লাল আলো জ্বললে সুবিধে হবে! ওই আলোটাকে কোনও ক্রমে সামনে আনা যায় না।

খামোশ! আপনার পেছনটা যদি আমার সামনে থাকে তা হলেই ত আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের টেবল ল্যাম্প! নয় কি। হ্যা হ্যা বাবা, দিস ইজ অ্যাবসেনস!

আমার কাছে আর একটা পরিকল্পনা আছে স্যার!

বলে ফেলুন।

আমরা কিছু ড্রাগন ইমপোর্ট করি। একটাকে চৌরঙ্গির মোড়ে চিৎ করে ফেলি। মুখটা আকাশের দিকে। লোহার স্ট্র্যাপ আর বল্টু দিয়ে রাস্তার [illegible]

ডিউটি ফেলে দিন। অনবরত ন্যাজে পাম্প, মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে আগুন। উঃ আলোর আলো।

আর একটাকে ফেলি শ্যামবাজারের মোড়ে। ইমপর্ট্যান্ট মোড়ে মোড়ে একটা করে ড্রাগন।

হবে না, হবে না। ড্রাগন যে দেশের জন্তু সে দেশের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল নেই। ড্রাগন আমরা আনতে পারব না। বাতিল, বাতিল।

কেন বাতিল! আমরা কি কেবল একটা দেশের কাছেই মাথা বিকিয়ে থাকব। নো নেভার। সব সব দেশই আমাদের কামিয়ে যাক।

আই সি। ইউ আর দ্যা কালপ্রিট। আপনিই সেই বিভীষণ, যে এস এ ভি ই কে এস এইচ এ ভিই করে দিয়েছেন। এর নাম কৃতজ্ঞতা! তাই না।

একি, একি? কার কুকুর! কুকুরই তো। ক্যাবি-নেট মিটিঙে কুকুর? স্ট্রেঞ্জ!

আমার কুকুর! আয় আয় লুসী, লুসী। কেন কি হয়েছে! যুধিষ্ঠির কুকুর নিয়ে স্বর্গে যেতে পারে আর আমি আমার লুসীকে নিয়ে দপ্তরে আসতে পারি না! কী বলে রে লুসী! আমার এই কুকুর গরম একদম সহ্য করতে পারে না। সাইবেরিয়ার মেয়ে। তাই ত আমার কুলার লাগান ঘরে থাকে। মাই ফেথফুল ডগ। কুকুরের ভোটাধিকার থাকলে আমাদের গণতন্ত্রের চেহারাটাই পালটে যেত। প্রতি ইলেকসানের সময় আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বসতে হত না। লুসী, লুউসী।

শেষ প্রস্তাব! মুখ্যমন্ত্রী! আমি হুগলীর লোক। আমার জেলাতেই মহাপীঠ তারকেশ্বর। শ্রাবণ চলে গেল, তা হলেও, চলুন আমরা সকলে বাঁক ঘাড়ে করে কলকাতা থেকে হাঁটাপথে ব্যোম, ব্যোম করতে করতে বাবার কাছে একবার যাই। গিয়ে ধড়াস করে বডি ফেলে দি। কত লোকের গোদ সারল, কার্বাঙ্কল চুপসে গেল, বন্ধ্যা, মৃতবৎসার সন্তান লাভ হল, আমরা কি এমন পাপ করেছি যে বাবা আমাদের উদ্ধার করবেন না! কিছুই তো তেমন চাইছি না, চাইছি কয়েক শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

ড্রাগনের ন্যাজে পাম্প করে মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে... আলোর আলো!

বাবার শক্তিই বাবার কাছে ধার চাইছি। বাওয়া সব থেকেও আমাদের কেন এই কাঙালের অবস্থা। তাই সব একবার হেঁকে বলুন—ভোলেবাবা পার করেগা, ভোলে বোম, তারক বোম, বোম, বোম তারক বোম। কি হল! সব চুপ!

মোস্ট থার্ড ক্লাস সাজেসান? এরপর বলবে তন্ত্রসাধনা কর ভৈরবী নিয়ে। মিটিং শেষ। আমাদের ওই এক শ্লোগানই চলুক নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন কর।

সম্প্রতি এই রকম একটি ক্যাবিনেট মিটিং হয়েছিল কী?

সুরেশ কুমার
কেলেঙ্কারি
বিরাট
বিস্ফোরণ

কংগ্রেসকাহিনী
অতুল্য ঘোষ

॥ ৬৮ ॥
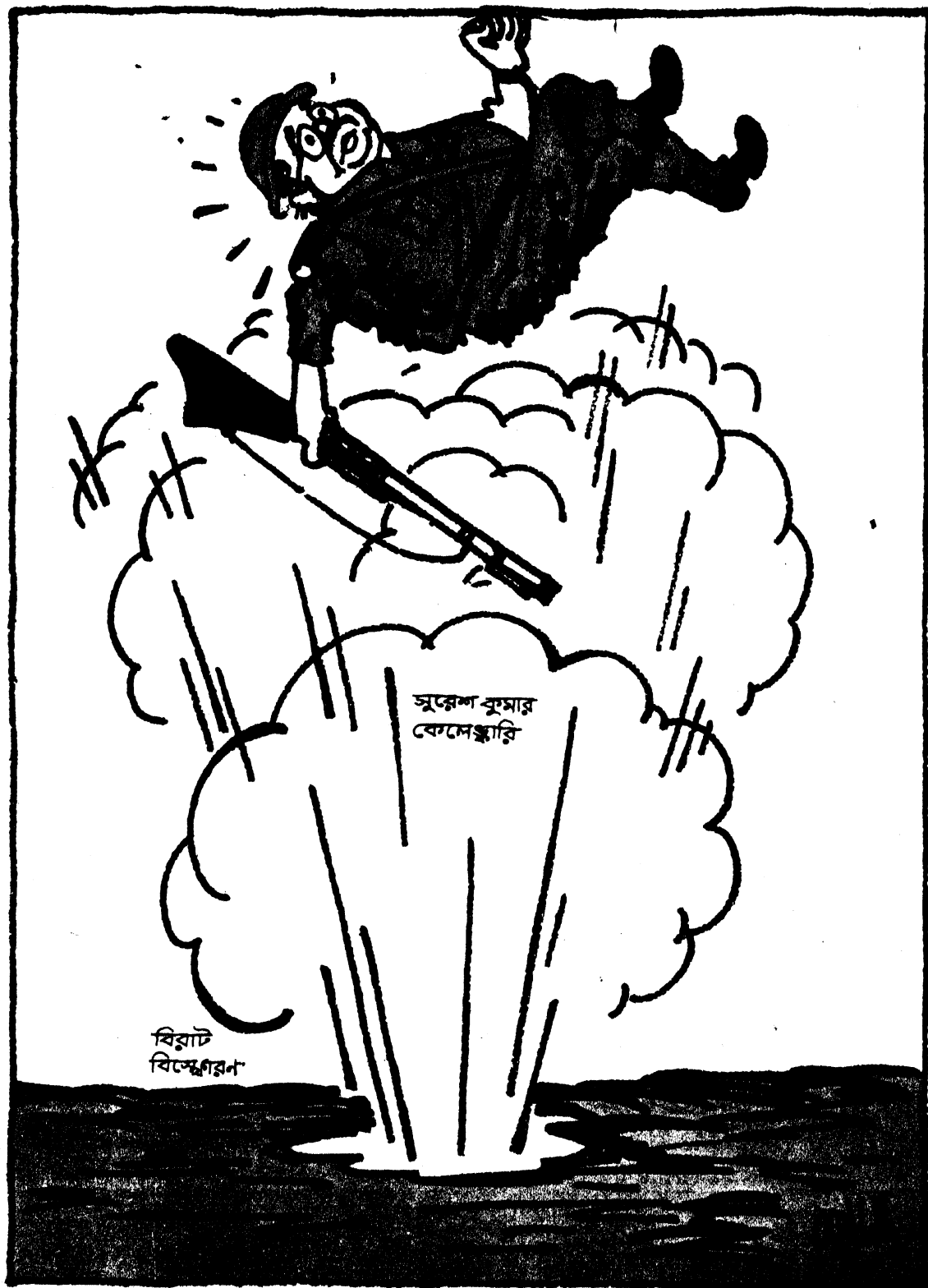
১৯২৮-২৯ সালে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় হুগলী জেলার অনেকগুলি গ্রাম পায়ে হেঁটে ঘোরেন। তাঁর সঙ্গে কিছু স্কুল-কলেজের ছাত্রও ছিল। সব ব্যবস্থা করে হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটি। প্রতি গ্রামে পৌঁছবার পর সেখানে কংগ্রেস পতাকা তোলা হত। সেই পতাকার কাছে দাঁড়িয়ে ওই ছাত্রদের মধ্যে যারা বক্তা ছিল তারা দু-চার কথা বলত আর সতীশবাবু বসে চরকা কাটতেন। সারা দিন সেই গ্রামের তথ্য সংগ্রহ হত। সন্ধ্যার পর সতীশবাবু কিছু বলতেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানারকম আলোচনা হত এবং সেই গ্রামেই রাত্রিবাস। সতীশবাবু মসলা-দেওয়া তরকারি খেতেন না, তাই ওঁর সঙ্গে থাকত একটি ইকমিক কুকার। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা গ্রামের একটি বাড়িতে বা কয়েকটি বাড়িতে দু বেলাই খেতেন। মাঝে মাঝে বেশ মজাও হত। যদি কোনও কর্মীর গলায় পইতে থাকত তা হলে গ্রামবাসীরা কিছুতেই রান্না করে খাওয়াত না। তাকে নিজেকে রান্না করে খেতে হত। সে এক বিপদ। যে জীবনে কখনও রান্না করেনি, তার প্রায় হত অগ্নি-পরীক্ষা। সাধারণত এঁরা পাঁচ-ছয় মাইল করে যেতেন। একবার হয়েছে কি, রাত্রে ওঁরা যে গ্রামে ছিলেন তার পরদিন অন্য গ্রামে যাবার সময়ে পথের মাঝে দুটি ছেলে তাদের পইতে ফেলে দেয়, পাছে রান্না করে খেতে হয়। তারা যখন খেতে বসেছে, তখন যে গ্রামে আগের রাত্রে ছিল সেই গ্রামের একজন লোক গিয়ে উপস্থিত। সেই লোকটি যে দু'জন পইতে ফেলে দিয়েছিল তাদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'সে কি! কাল তোমরা ছিলে ব্রাহ্মণ, আর আজ এদের হাতের রান্না খাচ্ছ!' হুলস্থুল ব্যাপার—যাদের বাড়ি খাওয়া হচ্ছিল তারা মর্মাহত। সতীশবাবুর চেষ্টায় অতি কষ্টে সকলে শান্ত হয় এবং ওই দু'জন ছেলেকে সাময়িকভাবে সতীশবাবু বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

সতীশবাবুর এই পায়ে হেঁটে ঘোরাটা খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। খুঁটিয়ে সব তথ্য সংগ্রহ করা হত :

(১) গাঁয়ে কতগুলি পুকুর আছে। তার কতগুলি সেচযোগ্য এবং কতগুলিতে কেবল-মাত্র মাছ আবাদ হয়।

(২) পুকুরের অধিকারীর অবস্থা কিরকম। মাসে তার আনুমানিক আয় কত।

(৩) গ্রামে কতগুলি পরিবারের

ক) ২০ বিঘের উপর জমি আছে।

খ) ১০ বিঘে বা তার চেয়ে বেশী জমি আছে।

গ) ৫ বিঘে থেকে ১০ বিঘের মধ্যে কতজনের জমি আছে।

ঘ) ৩ বিঘে থেকে ৫ বিঘে জমি ক'জনের।

ঙ) ১ বিঘে থেকে ৩ বিঘে কতজনের।

চ) ১ বিঘের নীচে আছে কতজনের।

(৪) গ্রামে নাপিত, কুমোর, কামার, স্যাকরা, গোয়ালা, মালাকার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার কতগুলি পরিবার।

(৫) কত ঘর যজন-যাজন করে এমন পুরোহিত।

(৬) কত গৃহস্থের বাড়িতে চাকুরিজীবী আছে এবং কি ধরনের চাকরি।

(৭) ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি পেশার লোক গ্রামে আছে কিনা, থাকলে কতজন।

(৮) ক'খানি দোকান এবং কিসের দোকান।

(৯) পরিবারের যে জমি আছে তার কতটা ধান-জমি, কতটা আলু ও পাটের জমি এবং কতটা তরিতরকারি ও অন্যান্য ফসলের জমি।

(১০) ক'দিন অন্তর গ্রামে হাট হয়।

(১১) গ্রামে কতজন নিজের জমি চাষ করে।

(১২) কতজন ভাগীদার।

(১৩) কতজন কৃষিমজুর।

(১৪) গ্রামে তাঁতের সংখ্যা এবং তাঁত থাকলে কত ঘর তন্তুবায়।

(১৫) নাপিত, কামার প্রভৃতি বৃত্তিধারী-দের তাদের নিজেদের বৃত্তিতে জীবিকানির্বাহ হয় কিনা।

(১৬) গ্রামে পাঠশালা এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিনা।

(১৭) গ্রাম থেকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কত দূরে।

(১৮) ম্যাট্রিকুলেশন পাস কতজন, কলেজে শিক্ষিত কতজন, ম্যাট্রিকুলেশন পাস নয় অথচ শিক্ষিত কতজন, নিরক্ষর কতজন।

(১৯) গ্রামের জমিদারের নাম এবং খাজনার হার।

(২০) গ্রাম থেকে হাসপাতাল কত দূরে।

(২১) নিকটস্থ পুলিস থানা কত দূরে।

(২২) যাতায়াতের পথ।

(২৩) নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশন কত দূরে।

বিশদভাবে এ-সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হত। সতীশবাবু সঠিক তথ্য সংগ্রহের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে-সমস্ত ছাত্র গিয়েছিল তারা খুব উৎসাহভরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব তথ্য সংগ্রহ করত। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হয়েছিল। সঠিক তথ্য পাওয়া খুব শক্ত হত। বেশ কিছু গ্রামে রটে গিয়েছিল যে, বোধ হয় আবার নতুন ট্যাক্স বসবে, সেই-জন্য এসব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অবশ্য সতীশবাবু এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় সে সন্দেহ দূর হয়। সতীশবাবু যখন প্রথম যান তখন আমাদের ধারণা হয়নি যে এত বিশদভাবে সব তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কিছু দিন কাজ করবার পর আমাদের সামনে একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছিল। তারপর ১৯৩০এর আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন এ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩০-৩২এর আন্দোলনের পর জেল থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩৭, '৩৮, '৩৯ সালে আমরা আরও ব্যাপক-ভাবে এ কাজ আরম্ভ করি। তখন নাম দেওয়া হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম বছর পাঠানো হয় প্রায় এক শত জন ছাত্র। সেটা ক্রমশ পাঁচ শততে ওঠে। গ্রামে যাবার সময়ে তারা কিছু প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, ধারাপাত, সোজা অঙ্কের বই এবং স্লেট-পেন্সিল নিয়ে যেত। ছেলেরা সব বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত এবং কুড়ি দিন গ্রামে

গ্রাম পরিক্রমায় গান্ধীজীর সঙ্গে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

বাস করার পর কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে ফিরে আসত। এবং সকলের কাছে যে ডায়েরী বই থাকত, সে বইগুলি জমা দিত। এই ডায়েরী-গুলিতেই সব তথ্য লেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। আর যেসব গ্রামে যেত সেসব গ্রামবাসী সমাদর করে এদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দিত। রাজনীতির বিশেষ আলোচনা হত না। তবে সকালে কংগ্রেস পতাকা তুলে তা অভিবাদন করা হত। কোনও কোনও গ্রামে পতাকা তোলবার সময়ে ভাল জনসমাগম হত। আবার কোনও কোনও গ্রামে দু-চারজন লোক মাত্র উপস্থিত থাকত। প্রতি গ্রামেই সন্ধ্যার পর গ্রামের সাধারণ জায়গায়, হয় আটচালায়, নয় কারও বাড়ির উঠনে একটা বৈঠক হত। সেখানে নানাবিধ আলোচনা হত ও কখনও কখনও গ্রামবাসীরা প্রশ্নও করত। যেসব প্রশ্ন ছেলেরা উত্তর দিতে পারত, দিত। যেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেগুলি লেখা হত নিজ নিজ ডায়েরীতে। অত ছেলে গ্রামে যেত, কিন্তু তাদের বিশেষ অসুবিধা কোনও দিন ভোগ করতে হয়নি। ছেলেরা তো স্ফূর্তিতেই ছিল, গ্রামবাসীরাও আনন্দ পেত। কোনও গ্রামে থাকত পাঁচজন, কোনও গ্রামে তিনজন। কিন্তু কোথাও দু-জনের কম থাকেনি। অসুখবিসুখ হলে গ্রামবাসীরা সাধ্যমত সেবাযত্ন করত। সামান্য অসুখের অবশ্য চিকিৎসা হত, না হলে তারা বাড়ি ফিরে আসত। যেসব ছেলে যেত তারা অধিকাংশই শহরাঞ্চলের ছেলে। সেইজন্য খানিকটা অসুবিধা হতই। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে দু-চারজন ছাড়া কেউ নির্দিষ্ট সময়ের আগে বাড়ি ফিরে আসেনি। ১৯৪০-এর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ থেকে ১৯৪৫ অবধি এ কাজ বন্ধ ছিল। আবার নতুন করে আরম্ভ হয় ১৯৪৬এ।

১৯৪৬এ আবার যখন গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে ছেলেদের গ্রামে পাঠানো আরম্ভ হল তখন তা ছিল আরও সুনিয়ন্ত্রিত। ভার নিয়েছিল অপরেশ (ভট্টাচার্য), অনিল (গাঙ্গুলী), নির্মল (সরকার) এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপক। অপরেশ এখন স্কটিশ চার্চ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, অনিল ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার-এর একজন উচ্চ মানের গবেষক, আর নির্মল আছে এখন অধ্যাপকরূপে কানাডায়। এরা ব্যবস্থা করে যে, প্রতি গ্রামে দুজন করে কর্মী থাকবে এবং তারা একটি নৈশ বিদ্যালয় আরম্ভ করে দেবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা চলে আসবার পর গ্রামের লোকেরাই সেই নৈশ বিদ্যালয়ের ভার নয়। এইরকমভাবে প্রতি পাঁচটি কেন্দ্রের উপর পরিদর্শক থাকত। যে অঞ্চলে এইসব গ্রাম সেইসব অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেখানে থাকত আঞ্চলিক কার্যালয়। সমস্ত এলাকাকে কয়েকটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ভাগ করা হত। এই আঞ্চলিক কার্যালয়ে থাকতেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সাধারণত ... শিক্ষক। আঞ্চলিক কার্যালয়ের
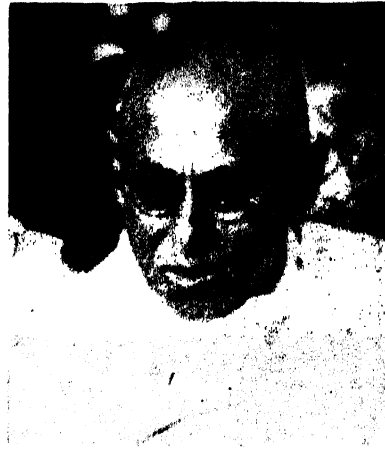
যোগাযোগ রাখা এবং সম্ভব হলে নৈশ বিদ্যালয়কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া। ওইসব অঞ্চলে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল, যার কয়েকটি এখনও টিঁকে আছে। কয়েকটি আরও উন্নত হয়েছে। কর্মকাল শেষ হলে অর্থাৎ কুড়ি দিন বাদে সব কর্মী এসে একটি প্রধান শিবিরে তিন দিন বাস করত। সেই শিবিরে তাদের সংগৃহীত তথ্য এবং তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা হত। সতীশবাবু যেসব তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছিলেন মোটামুটি সেইসব তথ্যই সংগ্রহ করা হত। আবার তথ্যভুক্ত নয় এমন কোনও কাজ কোনও গ্রামে থাকলে তাও ছেলেরা খাতায় লিখে নিত। এই তিন দিনের শিবিরের শেষ দিনে যাদের ডায়েরী ভাল বলে বিবেচিত হত তাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের কতকগুলি বই উপহার দেওয়া হত। অবশ্য ১৯৪৮ সালের পর এ কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এই তথ্য সংগ্রহ করে একটা জিনিস বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, সাধারণত শিক্ষিত বলতে যাদের বোঝায় গ্রামের সেইসব পরিবার এই কাজে বিশেষ আমল দিতেন না। যাঁরা নিজেরা জমিতে চাষ করতেন বা গ্রামের মধ্যে ছোটখাট দোকান রাখতেন তাঁরাই বরাবর পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের সাহায্য পাওয়া যেত না, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবার—তাঁরাই এগিয়ে আসতেন। আর একটা জিনিসও বেশ বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, ভূমিহীন কথার সংজ্ঞা নতুন করে নিরূপণ করা প্রয়োজন। গ্রামে এমন অনেক পরিবারই ছিলেন যাঁদের জমি আছে অথচ তাতে পাঁচজনের একটি ছোট পরিবারও প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রায় সকলেরই জমি আছে ; কিন্তু পরিমাণ পাঁচ কাঠা, দশ কাঠা, কি এক বিঘে, দেড় বিঘে, দু' বিঘে ; অর্থাৎ দু-তিন মাসের খোরাকিও তার থেকে হত না। আবার অনেকের বেশী জমি থাকলেও হয় সে জমি বন্যায় ডুবে থাকত, নয় সেচের জলের অভাবে ফসল শুকিয়ে যেত। আর বৃত্তিধারী যারা—কামার, কুমোর, নাপিত, ছুতোর, গোয়ালা, ময়রা—এদের উপার্জন বন্ধ হয়ে

বাসী বাঁশের ভাল কাজ করত—চুপড়ি, পেতে, ধুচুনি। প্রায়ই সবই বন্ধ। অনেক গ্রামে গরুর গাড়ির চাকা ও গরুর গাড়ি তৈরী হত। পাকা রাস্তা হওয়ার ফলে সেও বন্ধ প্রায়। অর্থাৎ সকলেই জমির উপর নির্ভরশীল। যাদের কোনও দিন জমি ছিল না, কেবল বৃত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের অবস্থা দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। জমিদার এবং মহাজনের অত্যাচারে গ্রাম তো জর্জরিত, তারপর আবার ওইসব বৃত্তিধারী-দের শিল্পসৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় সব গ্রামেরই অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। যাঁরা গ্রামের বাইরে থেকে ওকালতি বা চাকরি করে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন, তাঁরাই ছিলেন গ্রামের মাতব্বর। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামে আসতেন ভাগের ফসল আদায়ের জন্য। গ্রামের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। আর এই সম্প্রদায়ের যাঁরা গ্রামে বাস করতেন তাঁদের গ্রাম থেকে আয়ের বিভিন্ন পন্থা ছিল। যেমন ধান ধার দেওয়া। এক মন ধানের দেনা ফসল উঠলে দেড় মন দিলে তবে শোধ হবে। আর দাদন প্রথা, সে তো ভয়াবহ। দুধের দাম ছয় আনা সের। মহাজন দাদন দিয়েছেন বলে তাকে দু আনা সেরে বেচতে হবে। আলু-চাষেও তাই। বড় হাট বা গঞ্জ থেকে খোল ও বীজ চাষের সময় পাওয়া যেত ; পরিবর্তে আলু হবার পর বাজার থেকে অর্ধেক দামে আলু পৌঁছে দিতে হত। পাটবীজেও তাই। চাষের এমন কোনও জিনিস নেই যাতে কৃষক-দের এইরকম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত না। এ একটা দুঃসহ অবস্থা।

পাশ্চাত্ত্য দেশে যাদের প্রোলেটারিয়েট বলে তারা বাস্তবিকপক্ষে ভূমিহীন। প্রোলেটারিয়েট কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যাদের সন্তান ছাড়া কোনও সম্পত্তি নেই—বাসস্থানের ভিটের মাটিটুকুও তাদের নিজেদের নয়। যখন যেখানে তারা কাজ করে তখন সেটাই তাদের বাড়ি। আমাদের এদিকে অতি গরীবেরও মাথা গোঁজবার জায়গা আছে আর সামান্য জমিও হয়তো আছে। কিন্তু তাতে দু বেলা পেট পুরে খাওয়া দূরের কথা, একবারও খাওয়া জুটতো না।

গ্রামে গ্রামে এইসব তথ্য সংগ্রহ করে অন্তত একটা সত্য উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, বইয়ে যেসব কথা লেখা আছে তার সঙ্গে রূঢ় বাস্তব সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন ; কিন্তু এক বেলাও পুরো আহার যাদের জোটে না, তাদের কাছে কোনও বড় বড় কথা বলা উপহাসেরই নামান্তর। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর অনেক বছর কেটে গেছে। গ্রামের চেহারা অনেক বদলেছে। এখন টেলারিং হয়েছে, জুতোর দোকান হয়েছে ; বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা—এসবও হয়েছে। মানুষ হয়তো এক বেলা পেট ভরে খেতেও পাচ্ছে ; কিন্তু সংগতিশালী ও সংগতিহীনের মধ্যে যে পার্থক্য তা যেন

[illegible]

সাধনা মুখোপাধ্যায়

শূন্য বেদী দেখে বড় ভয় করে মনে
আর যদি কোনদিন পূর্ণ না হয়
কার্জন আমহার্স্ট পঞ্চম জর্জ,
তোমাদের সোনার সময়
শেষ হয়ে গেছে তাই
উত্তোলন যন্ত্র দিয়ে বেদী থেকে আমরা নামাই
ওই অর্ধবিস্মৃত পাথরের মৃত মূর্তিগুলো
কোন যাদুঘরে গিয়ে অন্ধকারে তারা
ম্লান হোক্ পড়ে পড়ে সময়ের ধুলো।

আজকের এ বেদীতে আমাদের মানস মূর্তিরা
রূপ নিয়ে বসবেন ; মৃত্তিকার সেই সব রাজা ও রানীরা
নতুন আলোর যাঁরা প্রথম পথিক ;
দুঃখিনী মায়ের ছেলে, তবুও রক্ত রাজসিক
মাটির নাড়িতে কাঁপে আমাদের উর্বরতা হয়ে,
মনের শীর্ণ ধারা স্ফীত হল আশৈশব
যাঁদের পুণ্য জল বয়ে,
যাঁদের শ্রমের শস্যে
পুষ্ট কৃষ্টি গাভীদের স্তন—প্রথম প্রত্যুষে
হয়েছে দোহন
তাঁরা এসে দাঁড়াবেন মাইকেল বঙ্কিম
শ্রীরামমোহন
উৎখাত বেদিকায় সমুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়
শঙ্কা তবু থেকে যায়
আসন কি স্থায়ী হবে চির?

কোন উত্তোলন-যন্ত্রে
অন্য কোন সময়ের স্রোত
মূর্তিগুলো তুলে নেয় যদি
সূর্যকে ভেবে খদ্যোত,
নদীর পাড়ের মতো
বারবার ভেঙে যায়
বারবার গড়ে ওঠে
নতুন নতুন মূল্যবোধ—।

শূন্য বেদী দেখে তাই ভয় করে মনে
অস্থির সময় ঘিরে আমাদের মানস মূর্তিরা
প্রস্তর শরীর নিয়ে যদি যাতায়াত
করে যান চিরদিন, কারণ ঘৃণিত আজ
কাল ছিল যে হৃদয়-হীরা।

যাদুঘর

রঞ্জিতকুমার সরকার

হৃৎপিণ্ড ধুয়ে দেয় অলৌকিক বাতাসের স্বর
বাতাস, না তোমার জিগীষা?
রক্তের মিছিলে শুধু পরিশ্রুত ভালোবাসা
নীল পাটাতনে জাগে শব্দের জলাংকার হয়ে,
ক্রমশ মলিন করে গ্রাম-গেরস্থালি-কাটাতার—
পিছল অস্তিত্বে একা অনির্বাণ বাতাসের মতো
তোমারি সাজানো যাদুঘর।

একটি পারিবারিক দুঃখ

তারাপদ রায়

আমরা বনের ধারে একটি নদীর নাম দিয়েছিলাম বনতোষিণী,
শীতশেষের এক সন্ধ্যাবেলা পাহাড়তলীতে ট্রেন থেকে নেমে,
পশ্চিমে দিগন্ত অন্ধকার করা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে
আমরা বলেছিলাম বসন্ত শর্বরী।

কাছাকাছি জিনিস-পত্রের মধ্যে
মাইল তিরিশেক দূরে একটা ভাঙা বাসা ছিলো আমাদের,
আমরা তার নাম রেখেছিলাম শ্রীনিবাস,
শ্রীনিবাসের উঠোনে একটা পাতাভরা কাঁঠালগাছ ছিলো
সেই গাছের নাম দিয়েছিলাম ছায়াচ্ছন্ন,
আমাদের দুটি কুকুরের নামকরণ হয়েছিলো বলবান্ ও সদাজাগ্রত,
আমাদের সাদা বেড়াল শ্বেতকরবীকেও অনেকে দেখেছে,
অবশেষে, সে'ও অনেকদিন হয়ে গেলো,
আমরা আমাদের ছেলের নাম রেখেছিলাম কৃত্তিবাস।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, দুর্ভাগ্য আমাদের,
কৃত্তিবাস এক লাইন পদ্য লিখতে চায় না।

"সার্কাস" (৩০″×২৪″)—পরিমল দত্তরায়ের তৈলচিত্র। জন্ম—১৯৪২। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৬৫)। জীবনসংগ্রাম যেন এক সার্কাস। অংশগ্রহণ করলে প্রাণান্ত, না করলে কাগতাড়ুয়া। পরিমল শিক্ষকতা করেন। ক্যানভাস আর্টিস্ট সারকেলের সদস্য।

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ২৩ ॥

কিছু লোকের সম্বন্ধে তো বলেছি আগেই—যেমন গিরিজা চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—আহা, বেচারী সেদিন মারা গেলেন! ওঁর শেষ জীবন বড় কষ্টে গেল! এবার বলি আরও কিছু বাঙ্গালী সংগীতজ্ঞের সম্বন্ধে। '৩৩-'৩৪ সালের দিকে আমার মনে আছে গোপালবাবুর—যাঁকে কুটে গোপাল বলা হত—এবং অমর ভট্টাচার্যর গান শুনেছিলাম। এঁরা চমৎকার ধ্রুপদ গাইতেন। সঙ্গে পাখোয়াজ সংগত করতে কয়েকজনকে শুনেছিলাম। তার মধ্যে আমার বিশেষ করে মনে আছে দুর্লভ ভট্টাচার্য মশাইকে। দক্ষিণ ভারতে কিছু ব্রাহ্মণ গাইয়ে-বাজিয়েকে অবশ্য দেখেছি খালি গায়ে বসে প্রোগ্রাম করতে। কিন্তু উত্তরে একমাত্র ওই দুর্লভবাবু বা দুলিবাবুকেই দেখেছি ওই ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়সে, দাড়িগোঁফবিহীন খালি গায়ে, গলায় পইতে, নধরকান্তি, বসে পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। ভারি সুন্দর লাগত।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই গুণী ধ্রুপদ-গায়ক ছিলেন। আহা, বিষ্ণুপুরে কি অদ্ভুত বাঙ্গালীর সংগীত ঘরানা ছিল! কি সব গুণী লোকই না হয়েছেন! গোপেশ্বরবাবুকে নায়ক বলা হত। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী—সবই জানতেন। যন্ত্রসংগীতেও খুব দখল ছিল। উনি প্রায় ভাতখণ্ডেজীর সময়েতেই বা অল্প কিছু পরেই কি চমৎকার বই লিখে বার করেছিলেন! নামটা মনে আসছে না। সংগীত লহরী বা ওইরকম কিছু যেন। ভাল ভাল পুরনো গানের বন্দিশ স্বরলিপির সঙ্গে।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ভারতের স্বাধীনতা অবধি বাংলার জমিদাররা—বিশেষ করে ময়মনসিংহের জমিদাররা—সংগীতের চর্চা ও সেবা খুব করে গেছেন। হেন গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন না—সে মুসলমান হোন, চাই হিন্দু—যিনি কিনা এঁদের আশ্রয়ে কিছু দিন না থেকেছেন, এঁদের শিক্ষা না দিয়েছেন। প্রথম দেখি গৌরীপুরের কুমারবাহাদুর বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে ১৯৩৫ সালে, সেই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে। সেনেট হলে। ফরসা নাদুস-নুদুস চেহারা। সুরশৃঙ্গার বাজিয়েছিলেন। ভারি সুন্দর লেগেছিল। ওঁকে সবাই ডাকত খোকাবাবু বলে। সত্যি, লাগতও সেইরকম। বহু লোকের কাছ থেকে উনি তালিম নিয়েছিলেন। অদ্ভুত সংগ্রহ ছিল ওঁর ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ইত্যাদি গানের। অনেক পরে, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪এর পর থেকে ওঁদের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। যখনই কলকাতা আসতাম। সেই ওঁদের ৫৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বাড়িতে। ওঁকে আমার ভারি ভাল লাগত। তখন ওঁর কি দারুণ ভাল অবস্থা ছিল—কি সম্মান, পোজিশন! পূর্ববঙ্গে যাঁদের জমিদারি ছিল তাঁদের সবাইয়ের মত এঁদেরও সব কিছু চলে গেল '৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা এবং বাংলার বিভাগের পর। শেষের দিকে উনি আমাদের গুরুবংশীয় শেষ রত্ন অর্থাৎ ওয়াজির খাঁ সাহেবের নাতি দবীর খাঁয়ের কাছ থেকেই শিখতেন। কি শিশুর মত সরল ও ভাল মানুষ। বীণ, সুরশৃঙ্গার, সুররবাব বাজনা যদিও ওঁর শৌখীন স্ট্যানডার্ডের ছিল, কিন্তু সত্যিই উনি গুণী ছিলেন। অনেক জানতেন। ওঁর কাছ থেকে আমিও কিছু গান সংগ্রহ করেছি। বাংলা ভাষায় ওঁর এক বড় দান ওঁর বই 'হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান'। প্রত্যেক সংগীত-রসিক ও সংগীতের ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য।

সত্যিই গুণী ছিলেন গৌরীপুরের কুমারবাহাদুর বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মশাই। অনেক জানতেন। ওঁর কাছ থেকে আমিও কিছু গান সংগ্রহ করেছি। বাংলা ভাষায় ওঁর এক বড় দান 'হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান'।

ওঁর মেয়ে রানু ও ছেলে বেণুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। ওদের আড্ডাতেই আমার আলাপ হল ওদের সম্পর্কে ভাই হন যিনি সেই কচিবাবুর সঙ্গে। অর্থাৎ বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী মশাই। খুব versatile লোক। সেতার, জ্যোতিষ, ম্যাজিক—বাবাঃ! ওঁরও একটি monumental work হল গিয়ে 'ভারতীয় সংগীত কোষ'। আমি তো এত ভাল ভারতীয় সংগীতের তথ্যপূর্ণ বই এখন অবধি দেখিনি।

হীরুবাবু, হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীও কি চমৎকার লোক! এই সেদিন বাজালাম ওঁর সঙ্গে এক ঘরোয়া জলসায়, পঞ্চম সওয়ারি তালে। কলকাতার ভাল সংগীত-রসিকরা ছিলেন। খুব জমেছিল। ওঁকেও দেখছি শুনছি '৩৪-'৩৫ সাল থেকে। লখনৌয়ের খলিফা আবেদ হুসেন খাঁর শিষ্য। তবলায় দারুণ দাপট ওঁর হাতে। অনেক কনফারেন্সে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, বা বাবার সঙ্গে ওঁর তবলা সংগত শুনেছি। এমনি খুবই বিনয়ী—কিন্তু বাজাবার সময়ে দেখেছি বড় বড় বাঘেদের সঙ্গে উনিও বাঘ হয়ে যেতেন। এখন অবশ্য তবলার স্ট্যানডার্ড কোথায় উঠে গেছে। কিন্তু তখনকার দিনে হীরুবাবুই প্রথম লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক, রক্ষিণ ঘরের ছেলে, যিনি কিনা তবলা বাজনাকে সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। সাধনা করে নাম করেছিলেন।

সরোদের কথায় মনে আসে রাধুবাবুর কথা। রাধিকামোহন মৈত্র। আমার মতে, আজ অবধি ওঁর মত উচ্চ স্তরের সরোদিয়া বাঙালীর ভেতর হয়নি। সারা ভারতেও ওঁর স্থান খুব উঁচুতে। খুব গুণী লোক।

রাইচাঁদ বড়াল আর একজন লোক। খুব নামডাক ছিল, বড় ঘরের ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি আশিকী মেজাজ। তবলায় খুব মিষ্টি হাত ছিল।

নিজের মুখের কথাতেই, তবলা ওঁর নেশা। পেশা নয়। পেশা হচ্ছে ওঁর ওকালতি। বয়স ওঁর কত হবে? ৬৫-৬৬। কিন্তু ওঁকে সেই শুরু থেকেই দেখে এসেছি বেশ ভারিক্কি গোছের। ওঁর অল্প বয়সেও ওঁর বাবার ছাত্ররা, যাঁরা ওঁর থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন, তাঁরাও ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। ওঁর খুড়তুতো ভাই শ্যামবাবু চমৎকার সরোদ বাজান। বোধ হয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় দিকে বাবার শাগরেদ হয়েছিলেন।

সরোদের কথায় মনে আসছে রাধুবাবুর কথা। রাধিকামোহন মৈত্র। ওঁরও তো শুনেছিলাম সেই ১৯৩৫ সালে, সেনেট হাউসের কনফারেন্সে। বাজিয়েছিলেন নট কেদারা। তখন বড় জোর ২০-২১ বছর বয়স। সুন্দর চেহারা। আমির খাঁ সরোদিয়ার শাগরেদ ছিলেন। বাবার কাছ থেকে তালিম না নিলেও

কানন দেবী। একসময়ে সিনেমার জাঁদরেল নায়িকাও ছিলেন, আর এখন দেখো একেবারে দেবীরূপে অধিষ্ঠিতা। যারা সংগ্রাম করে ছোট থেকে বড় হয়ে তারাই আসল জীবনের মর্যাদা কি জানবেন কি।

গরদ-পরা ফরসা সুডোল শরীর, মিষ্টি, লাজুক, নম্র উমাশশীকে সামনে দেখে এবং ফিল্মের রাধীর কথা ভাবতে ভাবতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

খুব সম্মান করতেন। বাবার প্রভাব কিছুটা ওঁর বাজনায় এসে পড়েছিল। আমার মতে, আজ অবধি ওঁর মত উচ্চস্তরের সরোদিয়া বাঙালীর ভেতর হয়নি। সারা ভারতেও ওঁর স্থান খুব উঁচুতে। খুব গুণী লোক। তা ছাড়া পরে তো উনি দবীর খাঁর শাগরেদও হলেন। 'ঝংকার' বলে চমৎকার মিউজিক সার্কেল চালু করেছিলেন। আমি বার কয়েক বাজিয়েছি তাতে। সেই থেকে খুব আলাপ হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। ওঁর খুব বড় ধরনের intelligent approach to music, জ্ঞানের পরিধি এবং সংগীতচিন্তা। ওঁর বাজনার অনেকখানি ওঁর ছাত্র বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মধ্যে পাওয়া যায়। কি চমৎকার সরোদ বাজায় বুদ্ধদেব! আহা! কি মিষ্টি আর স্পষ্ট হাত!

হ্যাঁ, রাইচাঁদ বড়াল আর একজন লোক। খুব নামডাক ছিল, বড় ঘরের ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি আশিকী মেজাজ। তবলায় খুব মিষ্টি হাত ছিল। সব বড় ওস্তাদ, বাঈজীরা, গুণিজন ওঁকে ঘিরে থাকতেন। হাফিজ আলি খাঁ সাহেব ও এনায়েৎ খাঁ সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই বাজাতেন। নিউ থিয়েটার্সে ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবেও খুব নাম ছিল তখন ওঁর।

মজার একটা কথা মনে পড়ল, জানো শংকর। ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি। আমরা তখন এলগিন রোডে থাকতাম দুটো বাড়ি নিয়ে। আমার মা তখন কাশী থেকে এসে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিমিরদাও তখন নিউ থিয়েটার্সে মিউজিক ডিরেক্টর সবেমাত্র হয়েছেন। উনি আমাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি, ভোম্বল আর ওর মাসতুতো ভাই ঝণ্টু এবং মা গিয়েছিলাম নিউ থিয়েটার্সে শ্যুটিং দেখতে। ওরে বাবা, কি এক্সাইটমেণ্ট তখন! মনে আছে ছোটাই মিত্তির তখন স্টুডিওর একজন কেউকেটা ছিলেন। ক্দর দুটো আলাদা স্টুডিও দেখারই চমৎকার ব্যবস্থা করে দিলেন। মলিনা দেবীকে সেই প্রথম দেখি। তখন উনিও নতুন। তাঁর অপূর্ব অভিনয়শক্তি তখন মোটেই প্রকাশ পায়নি। মনে আছে আমি আর ভোম্বল কিছুক্ষণের জন্য স্টুডিও বিল্ডিং এর বাইরে এসে একটা ফলসা কিংবা জাম গাছের তলায় গিয়ে ফল পেড়ে খাবার ধান্দা করছিলাম। দেখি, একটি মেয়ে। মনে হল ১৯-২০ বছর বয়স। মলিনা সেই গাছেরই এক ডাল ধরে তার থেকে ফল পেড়ে খাচ্ছে। আমাদের দেখে খুব মিউজিক্যাল স্বরে বলল, পাকলে বেশ লাগে, না? টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি? ওরে বাপ রে! আমার তো বুক কিরকম শুকিয়ে গেল, মুখও লাল হয়ে গেল। কি যেন অসম্ভবরকম একটা কাজের জিনিস ভুলে এসেছি এই ভাব দেখিয়ে 'এই যাঃ!' বলে একেবারে অ্যাবাউট টার্ন নিলুম। ভোম্বলও পেছনে পেছনে ছুটল।

[illegible]

সেখানে একটা বড় পুকুরের পাড়ে কি যেন শ্যুটিং হচ্ছিল। মাকে আর আমাদের খুব খাতির করে বসানো হলো সেই পুকুরের এক দিকে—যেখানে ক্যামেরা ইত্যাদি প্লেসিং করা ছিল। চা, স্যান্ডুইচ, মিষ্টি এলো আমাদের জন্য। সেদিন জানি না কোন ফিল্মের শ্যুটিং চলছিল, তবে উমাশশী গরদের লালপেড়ে শাড়ি পরে কপালে বড় সিঁদুরের টিপ দিয়ে তৈরী ছিলেন। তিনি এসে প্রথমে তো গলায় আঁচল দিয়ে মাকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর চা ঢেলে মিষ্টি দিয়ে মাকে ও আমাদের খুব আপ্যায়ন করলেন। আমি চা বা খাবার কি খাব—হাঁ করে উমাশশীকেই গিলছিলাম। তার কয়েক মাস আগেই দেখেছিলাম 'চণ্ডীদাস'। রামীর পার্ট করেছিলেন উমাশশী আর চণ্ডীদাস সেজেছিলেন সে যুগের অপরূপ সুন্দর ও বড় অভিনেতা দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্যে। কি বলব শংকর, . তারও অনেক আগে শিশু বয়সে কাশীতে নির্বাক ছবি দেখেছিলাম 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'। তাতে দুর্গাদাসবাবুকে যা মানিয়েছিল, যা দেখাচ্ছিল, জীবনে ভুলব না। হ্যাঁ, তো সেইদিন বিকেলবেলা উমাশশীকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম ফিল্মের রামীকে। সেই ডায়ালগ, 'চণ্ডী ঠাকুর, এ কি সত্যি?' এই পুকুরপাড়েই তোলা বোধ হয় ঐ ফিল্মের শটগুলি—রামীর পুকুরে স্নান, তারপর ভিজে গায়ে কাপড় সেঁটে থাকা অবস্থায় জলের বাইরে বেরুলেন। গরদ-পরা ফরসা সুডোল শরীর, মিষ্টি, লাজুক, নম্র উমাশশীকে সামনে দেখে এবং রামীকে ভাবতে ভাবতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম মনে আছে। আরও মনে পড়ে, মাকে আবার গড় করে প্রণাম করল উমাশশী, আমার পিঠে নরম হাত রেখে বলল, আবার এসো ভাই। গাড়িতে চড়ে প্রথমেই মা বললেন, আহা রে! এমন একটা যদি বউ পেতাম!

এই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে সেই সময়ের একটা অদ্ভুত মজার ছবি 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। তাতে ছিলেন কানন দেবী। আজকের কানন দেবী নয়, সেদিনের কাননবালা। পাগলা হয়ে গিয়েছিলাম ওঁকে দেখে সেদিন। সে ছবিতে জহর গাঙ্গুলীও ছিলেন। পরে খুব আলাপ হয়েছিল এই জহরবাবুর সঙ্গেও। কি সংগীতপাগল লোক রে বাবা! ওঁর ভেতরে একটা অদ্ভুত উদ্যম ছিল। জীবনের শেষ অবধি। সেই পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ফাংশন করা, জলসা করা—কত কি কাণ্ড ওঁর! যা হোক, কাননবালার কথাতেই ফিরে যাচ্ছি। যেমন ভাল আভিনেত্রী, ওর গানগুলোও চমৎকার লাগত সে সময়ে। খুব জনপ্রিয় হত ওঁর প্রত্যেকটি গান। খুব চোখা, সুরের গলা। রাইবাবুর দেওয়া সুরে ওঁর কয়েকটা গান দারুণ জমেছিল। ওঁর সঙ্গে আলাপ কিন্তু আমার অনেক পরে। এই সেদিন। আমার বাজনায় এসেছিলেন, পরে রিজেণ্টস পার্কের ওঁর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। ভারি ভাল লাগল ওঁর বাড়িতে গিয়ে। মানুষের জন্য ওঁর যে কি ভালবাসা, কি বলব! মনটা যেন ভেসে যাচ্ছে ভালবাসায়, অনুরাগে। অথচ সেই সঙ্গে কতখানি ডিগ্নিটি! এবার ভাবো, মহিলা সমাজের কোন দুঃস্থ পর্যায় থেকে উঠে এসেছেন। একসময়ে সিনেমার লাস্যময়ী নায়িকা ছিলেন, আর এখন দেখো একেবারে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা। এই হয়, জানো শংকর। যারা সংগ্রাম করে ছোট থেকে বড় হয় তারাই জানে, জীবনের মর্যাদা কি, মূল্যবোধ কি। আর একজন এরকম দেখেছিলাম—চন্দুলাল শাহের জীবনসঙ্গিনী গহর। গহরজান না, কেবল মিস্ গহর। ঐ নীচের তলা থেকে উঠে আসা মানুষ। পরে কি হয়ে গেল—মহীয়সী একেবারে! তাই বলছিলাম, কানন দেবী সত্যিই একটা দৃষ্টান্ত। কাননবালা থেকে কানন দেবী—একটা spiritual journey বলতে পারো।

আবার এর উলটোটাও দেখো। খুব বড় ঘরের মেয়ে, তাঁরা যখন আল্ট্রা মডার্ন হন বা বেপথে নামেন তখন কোথায়-না-কোথায় তলিয়ে যান! তখন কোথায় যায় তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, কোথায় তাঁর বাড়ির কালচার, কোথায়ই বা তাঁর অন্য সমস্ত ঐতিহ্যের ব্যাপার! তিনি নামলেন তো নামলেনই। একেবারে পাঁকের অতলে। সেই নতুন মুসলমানের গরু খাওয়ার মতন। দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে। যেন ওটার জন্যই ওঁর যত কিছু। এরকম অনেক উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু মিছিমিছি নাম করে আর কি লাভ!

আজকালের তুলনায় সে যুগের নায়িকারা—ধরো না যেমন উমাশশী, কানন-বালা, মলিনা—এ'রা কেউ glamorous heroine এর পর্যায়ে পড়েন না। কি চেহারা, কি ফিগার—সেসব দিক দিয়ে এ'রা এমন কিছু ডানা-কাটা পরী না। কিন্তু এ'দের ভেতর যেটা ছিল—sincerity, dedication, অগাধ পরিশ্রম এবং অভিনয়ের চাপা শক্তি। সেসব কি যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়? এ'দের স্ট্যাচারে একমাত্র তুমি পাবে—আমার মতে—এ যুগের সুচিত্রা সেন। আমি ওঁর ভীষণ অনুরাগী। কি উঁচু দরের অভিনেত্রী! (ক্রমশ)

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৬ ॥

এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই বিবাহের লগ্ন। সোমে গঙ্গানারায়ণের আর বৃহস্পতিতে সুহাসিনীর। বিধুশেখর অনেক ভাবনা চিন্তা করেই এমন দিন ফেলেছেন। দুটি বিবাহেরই সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করতে হবে বিধুশেখরকেই, কেননা রামকমল সিংহ ইদানীং সংসার থেকে প্রায় পুরোপুরি বিযুক্ত হয়ে পড়েছেন, সান্ধ্যকালীন ভোগ আহ্লাদ ছাড়া আর কোনো দিকেই মন নেই। বিধুশেখর অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুকে ফেরাতে পারলেন না। কঠিন ভর্ৎসনা করলেও রামকমল মৃদু মৃদু হেসে বলেন, তুই তো এ রসে মজলি না বিধু, তুই এর মর্ম বুঝবি কি? কখনো মাঝ নদীতে স্রোতের মুখে গা ছেড়ে দিয়ে দেখিচিস, কী আরাম?

ব্যয় সঙ্কোচের অবশ্য কোনো প্রশ্নই নেই। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে দু'খানি করে শাল, দুটি সোনা বাঁধানো লোহা, এক জোড়া ঢাকাই কাপড় ও দু' শিশি গুলাবী আতর। সিংহ বাড়ি ও মুখুজ্যে বাড়িতে সার বেঁধে বসে গেছে দর্জি ও ওস্তাগাররা, ভৃত্য ও দ্বারবানেরা পাবে দু' প্রস্থ করে লাল বনাতের তকমা ও উর্দি। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্যরা একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়িতে গিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। নহবতের সানাই ও ঢুলী, বাজনাদাররা মাত করে দিয়েছে পাড়া। ভিয়েনের ধোঁয়ায় আকাশে মেঘ জমে যাচ্ছে, বাতাস একেবারে ম ম। হাতে একটি সোনা বাঁধানো ছড়ি নিয়ে শক্ত কঠিন চেহারার বিধুশেখর পরিদর্শন করছেন সব কিছু। তিনি যে কোথায় কখন উপস্থিত হবেন, তার কোনো ঠিক নেই।

রামকমল সিংহের ওপর কোনো দায়িত্ব না দিলেও তাঁকে বিধুশেখর অনুরোধ করেছেন যে উৎসবের ক'টি দিন তাঁকে থাকতে হবে বাড়িতে। কন্যাপক্ষের বাড়িতেও তাঁকে বেসামাল হলে চলবে না। গঙ্গানারায়ণকে বিবাহ আসরে নিয়ে যাবার আগে কন্যা কর্তা যখন অনুমতি চাইতে আসবেন, তখন সে অনুমতি তো বিধুশেখর দেবেন না, রামকমল সিংহকেই দিতে হবে। আর একটি শর্ত, বিবাহ উপলক্ষে বাড়িতে বাই নাচের ব্যবস্থা না হয় হোক, কারণ সেটাই বড় মানুষদের প্রথা, কিন্তু কমলাসুন্দরীকে বাড়িতে আনা চলবে না।

বাগবাজারের বসু বাড়ির কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করে নির্বিঘ্নে স্বগৃহে ফিরে এলো গঙ্গানারায়ণ। লীলাবতীর বয়েস এখন আট বছর পাঁচ মাস। লাল বেনারসী চেলী ও ফুলের মালায় ওকে তাকে যেন আর দেখাই যায় না। মনে হয় একটি চলন্ত পুঁটুলি। দাস দাসী, পাইক বরকন্দাজদের বিরাট মিছিল নিয়ে গঙ্গানারায়ণ থামলো বাড়ির সিংহ দ্বারের সামনে। সেখানে একটি বিশাল উনুনের ওপর এক কড়া দুধ ফুটছে।

গঙ্গানারায়ণের জননী বিম্ববতী আত্মীয় আশ্রিত মহিলাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। গঙ্গানারায়ণ বিম্ববতীর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলো। সেই দেখাদেখি লীলাবতীও ঢিপ করে মাথা ঠেকালো তাঁর পায়ের ওপর।

প্রথা অনুযায়ী বিম্ববতী পুত্রকে প্রশ্ন করলেন, এ কাকে এনিচিস রে গঙ্গা?

গঙ্গানারায়ণ লজ্জারুণ মুখখানি নীচু করে বললো, মা, তোমার জন্য দাসী এনেছি।

অমনি সমবেত মহিলারা উলু দিয়ে উঠলেন, ছোট ছোট ছোঁড়ারা হাততালি দিল আর ঢাক ঢোলের শব্দে কর্ণপটাহ ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলো।

এবার বিম্ববতী দুধের কড়াইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে নববধূকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, কী দেখচো?

পিত্রালয় থেকে সহস্রবার শিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এর উত্তর ভুলে গেছে লীলাবতী। অথবা লজ্জায় তার মুখ খুলছে না। চতুর্দিকের নানান শব্দে কান পাতা দায়।

বিম্ববতী আবার বললেন প্রশ্নটি। সাড়ে আট বছরের মেয়েটির মাথা নুইতে নুইতে যেন মাটির সঙ্গে ঠেকে যাবে। তখন একজন এয়ো স্ত্রী এগিয়ে এসে লীলাবতীর পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ওর মুখটি তুলে ধরে বললেন, বল্ মা বল, আমার সংসার উথলে পড়চে দেকচি।

দু' তিনবারের চেষ্টায় লীলাবতী কোনোক্রমে মুনিয়া পাখির মতন সরু গলায় কথাগুলি উচ্চারণ করতেই আবার উলু, উল্লাসধ্বনি ও বাদ্যরবে ছেয়ে গেল অঙ্গন। বিম্ববতী পুত্রবধূকে কোলে টেনে নিলেন।

গাঁট ছড়া খুলে এতক্ষণ পরে মুক্ত হলো গঙ্গানারায়ণ। ভৃত্যরা জল ঢেলে দিতে এলো, নামমাত্র ধুয়ে পা ধুয়ে বাড়ির মধ্যে চলে এসে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ওঃ, বিবাহ না যেন এক কঠিন পরীক্ষা। কয়েকদিন ধরে নানা রকম আচার অনুষ্ঠানে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাগবাজারের শ্বশুরালয়ে তো তাকে সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছে, নানা রকম রঙ্গ রসিকতায় ওকে নাস্তানাবুদ করার জন্য সকলের কী চেষ্টা।

বাসরঘরে তো এক কাণ্ডই হয়েছিল। সেখানে গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের প্রবেশ অধিকার ছিল না, শুধু যত রাজ্যের অচেনা মহিলা সেখানে উপস্থিত। বন্ধুদের ছেড়ে আরও অসহায় বোধ করছিল গঙ্গানারায়ণ। একটি রত্নখচিত সিংহাসনে আসীন সে একমাত্র পুরুষ, নববধূ পাশে নেই, প্রায় দুশো জন নারী তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

হঠাৎ একজন যুবতী তার সামনে এসে থুতনিতে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেছিল এই যে, আমাদের কালেজে পড়া বর মশাই, তোমার বউটি গেল কোথায়? আমাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমার বউ খুঁজে বার করো তো।

গঙ্গানারায়ণ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন! নানান বয়েসী স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত, তাদের মধ্যে কোনটি তার পত্নী তা খুঁজে বার করা সত্যিই খুব দুষ্কর। শুভদৃষ্টির সময় একবার মাত্র সে লীলাবতীকে দেখেছে, তাও ভালো করে দেখার সুযোগ পায়নি কিংবা সে চেষ্টাও সে করেনি। এদের মধ্যে কোন্‌জন সে? বিবাহ উৎসবে নারীরা জমকালো সাজ-পোশাক করে আসে, অনেককেই সে কারণে এক রকম দেখায়।

গঙ্গানারায়ণ উদভ্রান্তের মতন সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। বাসর কক্ষে অন্যান্য নারীদের প্রগলভতা হতে কোনো বাধা নেই। কারুর দিকে চোখ পড়তেই সে হেসে [illegible]

ও, আমায় বুঝি মনে ধরেচে? আহা, সে কথা আগে বলতে হয়!

গঙ্গানারায়ণকে ওরা কিছুতেই নিরুত্তর থাকতে দেবে না। সে যতই দিশাহারা হয়, ততই নারীরা অধিক কৌতুক পেয়ে কেউ তাকে ঠোনা মারে, কেউ কান দুলে দেয়। কেউ বলে, ওমা, বিয়ে করে এসে বউ হারিয়ে ফেললে? কাল মায়ের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? কেউ বলে, ভুল বাড়িতে এয়েচো নাকি গো? শেষ কালে কী, গোঁসাই পাড়ায় বর এলো গো কায়েৎ বাড়িতে, টোপর খুলে মুখ নুকোলো কালো হাঁড়িতে!' আর অমনি শত শত কাচের বাসন ভাঙার মতন হাসির শব্দে ঘর ভরে যায়।

এক এক সময় অতি নিরীহ ব্যক্তিও যেমন হঠাৎ খুন করে বসে, সেই রকমই অত্যন্ত লাজুক গঙ্গানারায়ণও এক সময় মরীয়া হয়ে তুখোড় হয়ে উঠলো। নানা রত্নালঙ্কারে সজ্জিতা ষোলো সতেরো বৎসরের এক সুন্দরী বিবাহিতা যুবতী, যে মাঝে মাঝেই এসে গঙ্গানারায়ণের কান মুলে দিয়ে যাচ্ছিল, গঙ্গানারায়ণ হঠাৎ খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো, এই তো পেয়েছি! এই তো আমার বউ!

অমনি সারা কক্ষে আবার হাসির হুল্লোড়। সেই যুবতীটি ত্রস্তে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই গঙ্গানারায়ণ বললো, আর হারাচ্চি না, একবার পেয়ে গেচি, আর ছাড়চি না!

কৌতুকের বন্যায় সেই যুবতীটিই শেষ পর্যন্ত কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো। গঙ্গানারায়ণ জোর করে তার হাত চেপে ধরে আছে। দূর থেকে একজন বললো, ও গো, নতুন বর, আমাদের ঐ কনকলতার বর কুস্তি করে, এখুনি এসে তোমায় ঠ্যাঙাবে। ওকে ছাড়ো!

গঙ্গানারায়ণ চোখ পাকিয়ে বলেছিল, না!

তখন আড়াল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল লীলাবতীকে। একজন তাকে সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, দেকিস লো, সাবধান! তোর বর এখুনি তো সতীন আনতে চায়!

আজ বাড়ি ফেরার পর গঙ্গানারায়ণের ছুটি। আজ আর তার করণীয় কিছু নেই, এই রাত্তকে বলে কালরাত্রি, এখন সন্ধে থেকে কাল প্রভাত পর্যন্ত নববধূর মুখ দেখা তার নিষেধ। এখন অন্দরমহলে মহিলারা নববধূকে নিয়ে মেতে থাকবে, ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কর্তাবাবুরা এখন সুরাপানের আসরে বসে বাই নাচ দেখবেন, ঢাকী-ঢুলী বাজনাদাররা থেমে গড়াবে, আর ভট্টাচার্যির দল আর চাকর বাকররা লুচি মণ্ডা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। সেই এক কড়াই গরম দুধে মাটির ভাঁড় ডুবিয়ে ডুবিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন শেষ করে দিয়েছে।

বরবেশ ছেড়ে একটা সাদা কামিজের ওপর একখানা কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে গঙ্গানারায়ণ আবার নেমে এলো নীচে। ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গেছে, তবু বেশ শীত শীত ভাব। গঙ্গানারায়ণ তার সহপাঠী বন্ধুদের এই সময় আসতে বলেছিল।

কর্তারা বাগানে বসেছেন, তাই বৈঠকখানা ঘরটি এখন খালি। গঙ্গানারায়ণ সেখানেই বন্ধুদের নিয়ে এলো। গৌরদাস, ভূদেব, রাজনারায়ণ, গিরীশ, বঙ্কু বেণী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। গতকালের বিবাহ বাসরের নানান ঘটনার উল্লেখ করে ওরা খুব আমোদ করতে লাগলো।

গঙ্গানারায়ণ সুরা পান করে না। সেই জন্য বন্ধুদের জন্য সে সুরার কোনো বন্দোবস্ত রাখেনি। কিন্তু রাজনারায়ণ ছটফট করছে। ইদানীং রাজনারায়ণ প্রায় মধুরই মতন অতি সুরাপায়ী হয়ে উঠেছে। সে আগেই খানিকটা পান করে এসেছে, তাই বারবার বলছে, গেলাস কোতায়? ব্র্যাণ্ডি কোতায়? শুধু মুখে কি গপ্পো হয়? তোমরাও ব্যাবন! এই গঙ্গা, তোর বাপের ভাঁড়ার থেকে দু' পাঁচ বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আয় না!

কথা ঘোরাবার জন্য গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করলো, হ্যাঁ রে, মধু কোথায় রে। সে এলো না? সে কালও আসেনি।

রাজনারায়ণ ঠোঁট উল্টে বললো, 'মধু তোমাদের পেয়েছে! কেন বাপু, মধু আসেনি বলে কি আমাদের

গঙ্গানারায়ণ অন্দরের দিকে ফিরে তীব্র ক্ষুব্ধ স্বরে বললো, মধুকে এত করে আমি বলে এইছিলাম, তবু সে এলো না?

বেণী বললো, মধুর কথা এখন আর নাই বা শুনলি! শুভ কাজের মধ্যে আবার অশুভ জিনিস টেনে আনা কেন?

গঙ্গানারায়ণ ক্ষুণ্ণ হলো। নানা রকম বরাটেপনা করলেও দুরন্ত স্বভাবের মধুকে সে ভালোবাসে। মধু যে কবি, সে বায়রন-মিল্টনের সমগোত্রীয়, সেই জন্য অনেক কিছুই তাকে মানায়। বেণী মধুকে পছন্দ করে না, সব সময় টক্কর লড়তে চায়, তা গঙ্গানারায়ণ জানে।

মধুর নাম উঠতেই অন্যরা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে মনে হলো। আবার নতুন কী কাণ্ড করেছে মধু? একমাত্র গৌরদাসকে প্রশ্ন করলেই সঠিক জানা যাবে, গৌরদাস মধুর প্রাণের দোসর এবং সে অযথা মিথ্যে ভাষণ করে না।

—গৌর, মধুর কী হয়েছে রে?

গৌরের ফর্সা মুখখানিতে ম্লান ছায়া। সে অন্যমনস্ক। খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে সে বললো, তোকে কাল ইচ্ছে করেই খবরটা দিইনি, গঙ্গা! মধু বাড়ি থেকে পালিয়েছে। মধু খৃষ্টান হবার জন্য পাদ্রীদের কাছে গিয়ে লুকিয়েছে!

রাজনারায়ণ জড়িত কণ্ঠে বললো, যে সে পাদ্রী নয় বাবা! একেবারে লাট পাদ্রী। লর্ড বিশপ যাকে বলে। তিনি আবার মধুকে ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে ঠুসে রেখেছেন। আর কেল্লার কর্তা ব্রিগেডিয়ারের পোলিন নিজে পাহারা দিচ্ছেন মধুকে। এবার মধু গেল, তাকে আর পাবি না কোনোদিন।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কেল্লার মধ্যে? বলিস কী?

বঙ্কু বললো, মধুর বাবা লাঠিয়াল পাইক আনিয়েছেন যে। পুলিসের হাত থেকে মধুকে তিনি কেড়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেল্লার গোরাদের সঙ্গে তো আর তিনি লড়াই দিতে পারবেন না। স্বয়ং সেনাপতির তাঁবে রয়েছে সে। মধু নিজেই এই ফন্দী এঁটে বাপের ওপর এক হাত নিয়েছে!

—মধুকে জোর করে সেখানে ধরে রাখেনি তো?

ভূদেব গম্ভীর স্বরে বললো, না, আমি আর গৌর দেখা করতে গেসলাম মধুর সঙ্গে।

—তারপর?

—আমার সঙ্গে অবশ্য সে দেখা করে নাই। সে নিজেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল না পাদ্রীরাই আমাদের ভাগিয়ে দিল, তা জানি না। পরে গৌর একবার একা গেসলো, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ গৌরের দিকে তাকালো। গৌর নিশ্চয় মধুর সমস্ত গোপন কথা জানে। মধু গৌরের সঙ্গে দেখা করবে না, এ কখনো হতেই পারে না। ভূদেব সঙ্গে গিয়েছিল বলেই বোধ হয় মধু আগের দিন ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে দেখা করেনি। গোঁড়া নীতিবাগিশ ভূদেবকে বন্ধুরা অনেকেই ডরায়।

গৌর বললো, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু আমাকে সে বিশেষ কথা বলতেই দেয়নি। নিজের উচ্ছ্বাসেই সে ডগোমগো। আমি একবার শুধু কইলাম, মধু, তুই বাপ মায়ের মনে এমন দুঃখও দিতে পারলি? তোর মা যে মূর্ছিতা হয়ে রয়েছেন, অন্ন-জল ত্যাগ করেছেন, তাতে মধু আমার ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে বললে, চুপ, চুপ, ওসব কথা কোস না এখন! আমার মন অ্যাখন পরমপিতার পায়ে আশ্রয় নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এই উপলক্ষে আমি একটা হিম রচেচি সেটা বরং তোকে শোনাই। তোকে না শোনানো পর্যন্ত আমার তৃপ্তি নেই। ভাই, তারপর মধু যে পদ্যটা পড়ে শোনালো, মধুর লেখা অত খারাপ ইংরেজি পদ্য আমি কখনো পড়িনি বা শুনিনি! সে একেবারে ভক্তিতে জ্যাবজেবে আর আমাদের ধম্মো যে কত খারাপ, সেই কথা!

গঙ্গানারায়ণ বললো, কিন্তু মধুর মুখে এমন খৃষ্টভক্তির কথা তো আগে কখনো শুনিনি! বরং থিয়োডোর পার্কারের বই পড়ার পর তার মধ্যে একটু নাস্তিক নাস্তিক ভাবই দেখেছিলুম।

বেণী বললো, আরে মধু কেরেস্তান হয়েছে কি আর শুধু ভক্তিতে? এর মধ্যে আর [illegible] ও তো এক পা বিলেতের দিকে বাড়িয়েই ছিল, এবার পাদ্রীরা ওকে বিলেতে পাঠাবে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, মধুকে বাড়ি থেকে পালাবার এই বুদ্ধি দিল কে? কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুজ্যেই নিশ্চয়ই ওর কানে মন্তোর দিয়েছেন।

বঙ্কু বললো, এই ক্যাটি কেষ্টো বাঁড়ুজ্যের আর পার গেল না। নিজে তো জাত খুইয়েছেই, আবার কচি কচি ছেলেদের ধরে ধরে কেরেস্তান করাচ্ছে! সাহেবদের পা-চাটা নচ্ছার কোথাকার!

ভূদেব বললো, শুধু শুধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দোষ দিও না। তিনি নিজ বিশ্বাস মতে আছেন। মধুর বাবা তেনাকে চেপে ধরায় তিনি তো সাফ বলে দিয়েছেন, আপনার পুত্র তো দুধের বাছাটি নয়! রীতিমতন লেকাপড়া শিখে সাবালক হয়েছে, তার কি নিজের কোনো বুদ্ধি ভাব নেই? আপনার ক্ষমতা থাকে তাকে ঠেকান! ...আমার কী মনে হয় জানো, মধুদের পাড়ার যে নবীন মিত্তির বলে একটা ছোঁড়া আছে না? সেই ছোঁড়াই মধুকে ফুসলেছে! ছোঁড়া তো অনেক আগেই খৃষ্টান হয়েছে। আমি অনেকবার শুনিচি, সেই ছোঁড়া মধুকে বলচে, খৃষ্টান হলেই বিলেত যেতে পারবে।

রাজনারায়ণ বললো, আরে না, ওসব কিছু না! মধু খেষ্টান হয়েছে হিঁদু বে করবে না বলে! হিঁদুর মেয়েগুলো লেকাপড়া শেখে না। তেমন মেয়েকে মধু কিছুতেই বউ করবে না। ওর বাপ জোর করে বে দিতে গেসলো, তাই মধু পাখি হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল!

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এইখানেই মধুর জয়। সে তো কিছুতেই পারলো না। এই বিবাহে তার তীব্র অসম্মতি ছিল তবু সে মেনে নিতে হলো তাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র পুলক বোধ করেনি বরং মনের মধ্যে বিরক্তি স্তূপীকৃত হয়েছে। নববধূর দিকে তার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইতেও ইচ্ছে করে না।

বন্ধুরা চলে যাবার পর রাত্রে একা শুয়ে শুয়ে গঙ্গানারায়ণ অনেকক্ষণ মধুর কথা চিন্তা করলো। তাহলে কি আর কোনোদিন মধুর সঙ্গে দেখা হবে না? খৃষ্টান হবার পর কি মধু এ শহরে টিঁকতে পারবে? তার দোর্দণ্ড প্রতাপ পিতা সহ্য করতে পারবেন এই অপমান?

এক সময় গঙ্গানারায়ণ টের পেল, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অনেকক্ষণ ধরেই তার স্ত্রী লীলাবতীর কথাও ভাবছে। হঠাৎ গঙ্গানারায়ণ শয্যার উপরে উঠে বসলো। না, সে অন্যায় করছিল। মধুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মধু মধুই, গঙ্গানারায়ণ কোনোদিন মধুর মতন হবে না। নিজ অভিলাষ সিদ্ধির জন্য গঙ্গানারায়ণ কখনো ধর্মত্যাগ করতে পারবে না, মা এবং পিতার মনে সে দুঃখও দিতে পারবে না। বিবাহ যখন করেছেই, তখন আর স্ত্রীর প্রতি বিরূপতা পোষণ করা অন্যায়। ধর্ম সাক্ষী করে সে একটি সরলা বালিকাকে নিজের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বরণ করেছে, এখন সর্বপ্রকারে এ বালিকাকে সুখী করার চেষ্টায় তার যত্নবান হওয়া উচিত। সে কোনোদিন লীলাবতীর প্রতি অনাগ্রহ বা অনাদর দেখাবে না।

বৃহস্পতিবার বিধুশেখরের গৃহে সুহাসিনীর বিবাহ অনুষ্ঠানে গঙ্গানারায়ণের ওপর অতিথিদের সাদর সম্ভাষণের ভার পড়েছে। নিজ বিবাহের দিনের অভ্যাগতদের সকলকে ঠিক মতন দেখার সুযোগ হয়নি তার, আজ সে স্বয়ং দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান। বিধুশেখরের পুত্র নেই, গঙ্গানারায়ণই তাঁর পুত্রবৎ। একে একে উপস্থিত হতে লাগলেন শহরের অভিজাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বহুরকম শকটের ভিড়ে পথ একেবারে পরিপূর্ণ। সরকারী সেপাইরা মহামান্য ব্যক্তিদের অশ্বযানের পথ পরিষ্কার করে দেবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বিধুশেখর এ শহরের বিশেষ প্রতিপত্তি-

স্বাস্থ্যকর শক্তিতে ভরপুর পুষ্টিদায়ক

Horlicks

BRITANNIA

Horlicks

HORLICKS

একান্তভাবে আপনার বাড়ন্ত সন্তানের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ব্রিটানিয়া হরলিক্স্ বিস্কুট। পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যে ভরপুর মুচমুচে তাজা। আপনার সন্তান একে লুফে নেবে।

হরলিকস বিস্কুট

ব্রিটানিয়া ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিন্টাস-BBC. HOR. 1-2415 BG

মহারাজ[illegible]চাঁদ বাহাদুর। তারপরই এলেন রাজা নরসিংহ-চন্দ্র রায় বাহাদুর, ইনি পোস্তার সুবিখ্যাত রাজা সুখময় রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। সপারিষদ এসে উপস্থিত হলেন শোভাবাজারের রাজা বর্তমান হিন্দু সমাজের শিরোমণি রাধাকান্ত দেব। একটু পরেই এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ভ্রাতাগণ। এত রাজা-রাজড়াদের মধ্যে দেবেন্দ্র-নাথের পোশাকই সবচেয়ে অনাড়ম্বর, যদিও একটি সাদা শাল জড়ানো থাকায় তাঁর গৌরবর্ণ আরও বেশী গৌর দেখাচ্ছে। তাঁর ঠিক পরেই এলেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামকমল সেন। তিনি সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছরের দৌহিত্র কেশবকে নিয়ে এসেছেন। পিতৃবন্ধু রামকমল সেনকে দেখে দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণেক দাঁড়িয়ে দু' চারটি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং শিশু কেশবের থুতনি ছুঁয়ে আদর জানালেন একটু। তখুনি ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল এসে পড়ায় ওঁরা কথা বলতে বলতে চলে গেলেন ভিতরে।

একসঙ্গে দল বেঁধে এলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণাচরণ মুখো-পাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী। এঁরা এক সময়ে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল নামে কথিত ডিরোজিও-শিষ্য বিদ্রোহী যুবাবৃন্দ, এখন পরিণত বয়েসে সংসারী হয়ে বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি হয়েছেন।

বিধুশেখর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার জন্য জামাতাকে ধনী পরিবার থেকে আনেন নি। পাত্রটি দরিদ্র হলেও সংস্কৃত কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র ছিল, এখন আইন অধ্যয়ন করে জজ পণ্ডিত হবার অপেক্ষায় আছে। বরের নাম পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে এসেছে তার সহপাঠী এবং আত্মীয়দের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার, মহেশচন্দ্র শাস্ত্রী, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

গঙ্গানারায়ণের নিজের বন্ধুরা এলো কিঞ্চিৎ দেরি করে। গণ্যমান্য অতিথিদের আপ্যায়ণ করার কাজে ব্যাপৃত থাকলেও সে তার বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল।

ওরা এসে উপস্থিত হতেই গঙ্গানারায়ণ দ্বারের কাছ থেকে একটু সরে এসে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলো, খবর কী, বল! হয়ে গ্যাচে?

গৌর বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

—তুই গিইছিলিস?

—হাঁ, কিন্তু কথা কিছু হলো না। এক ঝলক শুধু চোখের দেখা দেখিচি।

ভূদেব বললো, কোনোক্রমে কাছে ঘেঁষবার তো উপায় রাখে নাই। মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চ তো সশস্ত্র সৈনিক দিয়ে একেবারে ঘিরে রেখেচিল। এত সেপাই শাস্ত্রী নিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপার, আগে কেউ বাপের জন্মে দেকেচে! ইংরেজের যে-টুকু চক্ষু-লজ্জা ছিল, তাও আর নাই! এদেশে আর কেউ হিন্দু থাকবে না, দেশটা ম্লেচ্ছে ভরে যাবে!

—মধুকে কেমন দেকলি?

—দেকলুম আর কোথায়! কেল্লা থেকে ঢাকা গাড়ি করে বাঘা-বাঘা সাহেবরা মধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। যেন কোনো ডিউক বা লার্ডের বিবি, পাছে কেউ কেড়ে নেয়, তাই এত সাবধানতা। আর কোনো নেটিভকে ওরা আগে কখনো আদর দেখিয়ে কোলে বসিয়ে আনেনি। গাড়ি থেকে নেমে গীর্জায় ঢোকার সময় আমরা মধুকে দূর থেকে দেকলুম এক ঝলক। মধু অবশ্য একবারও ফিরেও তাকায় নি।

—সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গ্যালো। সব সাহেব মেম গিজগিজ করচে, শুধু দুজন নেটিভ রইলো ভেতরে। এক মধু, আর আমাদের কালোমানিক কেষ্ট-মোহন। সেই তো রাজসাক্ষী হয়েছে গো! ঐ যে দেকচিস রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ীরা দাঁড়িয়ে আচে, ওদেরই তো বন্ধু ঐ ক্যাটিকেষ্ট। ওরা বন্ধুকে সামলাতে পারে না? নইলে আমরাই ওকে একদিন দোবো দুম্বা!

ভিতর থেকে ডাক আসায় গঙ্গানারায়ণকে চলে যেতে হলো, বন্ধুদের সঙ্গে আর কথা বলার অবকাশ পেল না।

এক সময়, অতিথিরা যখন আহারে বসেছে, বিবাহ-বাসরে সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ শুরু হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ গঙ্গানারায়ণের একটা কথা মনে পড়লো। ক্য়দিনে সে এবাড়ির সমস্ত মহল চষে বেড়িয়েছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু একবারও তো সে বিন্দুবাসিনীকে দেখেনি। এত উৎসবের মধ্যে বিন্দুবাসিনী কোথায়?

কথাটা মনে পড়া মাত্র গঙ্গানারায়ণের হৃদয় কম্পিত হতে লাগলো। এ জগতে যেন সে এক চরম ঘৃণ্য অপরাধী। শুধু আজ কেন, সপ্তাহব্যাপী দুই বাড়িতে যে এত সমারোহ, তার মধ্যে কোনো এক সময়েও তো বিন্দুবাসিনীর দেখা মেলেনি। এবং একথা একবারের জন্যও গঙ্গানারায়ণের মনে আসেনি পর্যন্ত। গত কয়েক মাস ধরেই সে বিন্দুবাসিনীর কথা কখনো নিজ চিন্তায় স্থান দেয়নি। বিন্দুবাসিনী তার বাল্য সখী, তাকে সে বিস্মৃত হয়েছে।

নহবৎখানায় সানাইয়ের স্বরও গঙ্গানারায়ণের কাছে নিরানন্দ মনে হলো। চতুর্দিকে এত মানুষ, অথচ এক-জনের অভাবেই মনে হলো সব কিছু শূন্য।

সারা বাড়ি আর একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজে গঙ্গানারায়ণ ত্রিতলে পূজার কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো। আর সব জায়গায় এত আলো, এত রঙের বাহার কিন্তু এখানে শুধু একটি রেড়ির তেলের বাতি জ্বলছে। সেই ম্লান আলোয় চতুর্দিকে ছড়ানো অজস্র বাসি ফুলের মধ্যে বসে আছে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা এক যুবতী। সে আজ প্রকৃতই একা, কেননা এ কক্ষে আজ জনার্দনমূর্তিও নেই, পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী সেই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিবাহ বাসরে।

গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, বিন্দুবাসিনী যেন এক তপঃকৃশা ব্রতচারিণী। পিঠের ওপর খোলা চুল, তার শ্বেত বসনও যেন রেড়ির তেলের আলোয় গেরুয়া-মতন দেখায়। বিন্দুবাসিনীর চক্ষু দুটি মুদিত, সেই অবস্থায় বসে থেকে সে যেন একটু একটু দুলছে।

—বিন্দু!

বিন্দুবাসিনী চমকালো না। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে বললো, কে? গঙ্গা? তুই কেমন বউ আনলি? একদিন তোর বউ দেখতে যাবো!

অভিমান মিশ্রিত গলায় গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই কেন আমার বিবাহে যাসনি? আমি নিজে এসে তোকে নেমন্তন্ন করিনি বলে? সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু আজ সুহাসিনীর বে, তুই সেজে গুজে আহ্লাদ না করে এখানে এমন করে বসে রয়িচিস কেন? তোর বড় দেমাক, তাই না?

সেইরকম হাস্যমুখেই ছদ্মভর্ৎসনা করে বিন্দু-বাসিনী বললো, যাঃ! অমন কথা বলতে আচে? তুই এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেলি! আমি কাঁচা বয়েসের রাঁড়, কোনো শুভকাজের সময় আমার মুখ দেখাতে নেই, তুই জানিস না?

গঙ্গানারায়ণ কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রস্তরমূর্তির মতন স্থির হয়ে রইলো। কী উত্তর দেবে সে জানে না।

পরক্ষণেই যেন এক প্রবল জোয়ারে সে প্লাবিত হয়ে গেল সহসা। আর সব কিছুই মিথ্যা বলে বোধ হলো। চোখের সম্মুখে এ কাকে সে দেখছে? এ যে বিন্দু, তার শৈশব কৈশোরের সমস্ত স্বপ্নের সঙ্গী। একে ঘিরেই তো সে এক স্বর্গ রচনা করতে পারতো, তার বদলে কোন মহত্তর ভুলে সে জড়িয়ে পড়লো? বিন্দুকে বাদ দিয়ে তার জীবন শূন্য, ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণবাড়ির পূজার কক্ষে গঙ্গানারায়ণ প্রবেশ করে না। কিন্তু আজ এঘরে দেবতা নেই। গঙ্গানারায়ণ দ্রুত সেখানে ঢুকে সবলে বিন্দুকে আঁকড়ে ধরে আবেগ-মথিত কণ্ঠে বললো, বিন্দু, বিন্দু, তুই আমার! এতকাল বুঝিনি! তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই সুখ পাবো না!

বিন্দু গঙ্গানারায়ণকে মৃদু অথচ কঠিনভাবে ঠেলে দিয়ে বললো, ছিঃ গঙ্গা, এসব কথা উচ্চারণ করতে নেই! আমি তোর কেউ না। তুই সুখে থাক, তাহলেই আমি সুখী হবো।

(ক্রমশ)

চাকা

সমীরণ দাশগুপ্ত

ঘটনাটা ঘটে যাবার কত সময় পরে হুঁশ হল জ্যোতি ভাল মনে করতে পারল না। ভেবে দেখতে গিয়ে বোঝে মিনিট পনের-বিশের কম হবে না সে এভাবে নালার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সোজা হেঁটে গেলে অবশ্য কিছু বোঝার উপায় নেই। একমাত্র কেউ রাস্তার কিনারে এসে কৌতূহলী হয়ে আড়াই-তিন ফুট গভীর হাইস্কেন নামে কাঁচা নর্দমার গর্তে উঁকি দিলে টের পেতো কে একটা মানুষ নালার মুখোমুখ আর কাঁটানটের জংগলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অন্ধকারে সেভাবে দেখার যে কেউ ছিল না তা সে ভাল করেই জানে। জায়গাটা যদিও রেলস্টেশন থেকে কলোনিতে ঢোকার বড় সড়কের ওপরে, তা সত্ত্বেও চারপাশে ঘন আমের বাগান বলে বসতি এলাকা শুরু হয়েছে আরো আধ মাইলটাক পার হয়ে। স্টেশন দূরে বলে কলোনিতে যাতায়াতের জন্য লোকে গংগার ধার-ঘেঁষা এর অর্ধেক দূরত্বের বাসরাস্তাটা বেশী পছন্দ করে। রেলে কিছু ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছাড়া, সারাদিনে এই রাস্তায় লোক চলাচল, এমনিতেই কম। দিনের বেলা চোখ পড়ে আমবাগানের জটলার মাথায় শিবমন্দিরের চূড়া আকাশে উঠে গেছে—এখন সেদিকে তাকিয়ে জ্যোতি অন্ধকারের ঘনত্ব কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিল। ত্রিশূল সমেত মন্দিরের নকশা একেবারে মুছে গেছে। তার বদলে নিচে ঝোপঝাড়ে খই ফোটার মত জোনাকি জ্বলছে। আচ্ছন্নের মত চোখ তুলে তাকাতে দেখে বাগানের জটলা আরো স্ফীত হয়ে ঘন কালো মেঘের মত চারদিক ঠেসে ধরেছে। দেখে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে তার।

সোজা হয়ে উঠে বসে জ্যোতি এবার টের পায় চোয়ালের হাড় আর ঘাড়ের পেছন দিকটা অসহ্য টনটন করছে। সে যে নালার মধ্যে একা পড়ে আছে আর তার মাথার ওপরে ঠাসবুনোট মেঘের মত আম-বাগানের অন্ধ জটলা খালি এতটুকু লক্ষ করে শরীরের লুকনো বাথাগুলি যেন নড়েচড়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে তার মধ্যে। সে বোঝে না জায়গাগুলো খালি থেঁতলেছে না চামড়া ফেটে রক্ত পাতও হয়েছে। এ সময় সহসা সাইকেলের কথা খেয়াল হতে আবার মনে মনে একটা গুরুতর ধাক্কা খায়। জিনিসটা আছে না নেই সংশয় নিয়ে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে কিছু দূরে নালার একপাশে ঘাসের মধ্যে আটকে থাকা হ্যান্ডেল চকচক করে উঠলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এক মিনিট আগে অবধি ধারণা ছিল খালি ঐ জিনিসটার জন্যে তার যত কিছু লাঞ্ছনা। স্রেফ ওটা হাতাবার মতলবে লোকগুলো অমন দল বেঁধে তার ওপরে হামলা চালায়। এখন ওটা খোয়া যায়নি দেখে সে যত না অবাক হয় তার চেয়ে বেশী ধাঁধায় মধ্যে পড়ে যায়। বোঝে না তবে কিসের জন্য এমন আচমকা আক্রমণ!

হ্যাণ্ডেল ধরে এবার জ্যোতি সাইকেলটা টেনে তোলে। খাড়াই পাড় বেয়ে সোজা ওঠা যায় না, আড়াআড়ি এগোতে হয়। একে গড়ানে থেকে সমতলে ওঠা কষ্টকর, তার আবার সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়া। এতক্ষণে মগজের মধ্যে কুর-কুরে একটু রাগ বুঝি চুরি করে ঢুকে পড়ে। জ্যাট সে সেধে নেয়নি, ভাল-বেসে ঘাড়ে এসে ভর করেছে। ওটা বাস্তবিক চোট হয়ে গেলে কি বিড়ম্বনা হত ভাবা যায়। তাহলে এই রাতের বেলা এখন ফাঁড়িতে ছুটতে হত—তাও পাক্কা দু মাইলের কম নয়। এসব খুচরো জিনিস একবার বেহাত হয়ে আবার ফিরে পাওয়া গেছে এমন একটা বড় না শোনা থাকলেও অরূপের মনে কোনো রকম সন্দেহের খিঁচ থেকে যেতে পারে চিন্তা করে বাধ্য হয়েই যেতে হত। ফাঁড়ির সেজো কি ন' বাবুর তিন মিনিট বিস্তৃত সরস বাঁকা হাসি আর ভুরু নাচানোর ফাঁকে হুলের বিষ ঢোকানো বুলি শ্ব, তাই বলেন, গাড়ীটা আপনার নিজের নয়—তাই অমন মুকের কতায় হেনতাই হয়ে গেল? তা বেশ হয়েছে হেনতাই হয়েছে, পাঞ্জাবিটা ফাঁসাতে গেলেন কোন দুঃখে? ওটা তো নিজের, নাকি আঁ?' টেবিলের তলায় জোড়া পা নাচাতে নাচাতে ফের, 'তা রাদার, বিনা নম্বরে তো ডায়রি নেবার নিয়ম নেই। মন, দ্যাখেন যদি একটা নম্বর টম্বর জোগাড় করে আনতে পারেন—' এতদূর অবধি শোনার আগে ঊর্ধ্বশ্বাস দু মাইল অন্ধকার পেরিয়ে অরূপের বাড়ি। সে না থাক তার মা বোন কারো কাছ থেকে যে করে পারা যায় নম্বরটা উদ্ধার করতেই হত।

সন্ধে থেকে লোডশেডিং চলছে বলে স্টেশান রোড ধরে সাইকেলে বাড়ি ফেরার তার আদৌ কোনো ইচ্ছে ছিল না। তাছাড়া অরূপের সাইকেলে বাতি নেই জানত। সেই মুহূর্তে বাড়ি ফেরার বিশেষ তাড়াও ছিল না। সাড়ে আটটায় লোকাসে দেবকীদের বাড়ি থেকে টুইশানি সেরে ফিরছে। দেবকীর মা—সংসারের সব মা-ই বোধ হয় এক রক্ত মাংসের—একবার মুখের দিকে তাকিয়ে টের পেয়ে যান কোনটা সত্যিকার খিদের কাতরতা, কোনটা তা কষ্ট করে চাপা দেবার সলজ্জ ভান।' হাজার না না-তে কিছুতে ছাড়লেন না। 'কোনদিন খাওয়াতে পারি না, আজ না খাইয়ে ছাড়লে তো—'বলে জবরদস্তি এক পেট রুটি আলু-চচ্চড়ি খাইয়ে তবে উঠতে দিলেন। সেই খাওয়া, তারপর রাত দশটা অবধি ক্লাবের টোকো চা আর বিড়ির ধোঁয়ায় দিব্যি ভুলে থাকা যেতো। সুহাসের কাল একটা ব্যাঙ্কের ইনটারভিউ ছিল। ট্রেন থেকে নেমে ক্লাব ঘরের জানলায় উঁকি মেরে দেখে লণ্ঠন ডিম করা, খেজুর চাটাই বিছিয়ে তাসের প্যাকেট অবধি নেমে গেছে। অথচ দরজা বাইরে থেকে শেকল তোলা। কোথায় গেল সব ভাবতে গিয়ে বিশেষ সুহাসের কথা মনে হল। আড্ডার চেয়েও জরুরি সাহসের খবর জানা। বলেছিল, এই চান্সটা খুব ফেয়ার। মন্দ কি যদি লেগেই যায়। আড্ডা ভেঙে যাবে—তা যেতেই পারে। এটা কোনো আপসোস করার কারণ হতে পারে না। টালির খাপরার নিচে এই নকড়া-ছকড়ার জীবন কে-ই বা চিরকাল আশা করে। নেহাত করার কিছু নেই বলে না—। মাস তিনেক আগে বিভূতি বেরিয়ে গেল তো। বিশ্বটাও কোন মেসোর সুপারিশ নিয়ে মাঝে মাঝে এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে গিয়ে ধরনা মেরে আসছে। কপাল খুললে ধরেই পোস্টিং হবে নাকি বম্বের হেড অফিসে। বাকি থাকে অরূপ যে একেবারে আলাদা এক কারণে আপাতত হাত গুটিয়ে বসে। তার এক দাদার পলিটিকাল কেরিয়ার নাকি তার চাকরির বাধা। তার সেই দাদা আজ চার পাঁচ বছর বাড়ি-ছাড়া। লুকিয়ে চুরিয়ে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছে এরকম রটনাও তার নামে শোনা যায় নি। ফলে অরূপের একটা চাকরি খুব দরকার—একেবারে জল বাতাসের মত। সে যতটুকু বুঝতে পেরেছে—অরূপের দাদার ঘর-ছাড়া হবার মোদ্দা কারণ একটাই—সেই গোষ্ঠী বিরোধের নোংরা বিষাক্ত পরিণাম—তার কিশোর বয়সে অত্যন্ত কঠিন আর নির্মমভাবে টের পাওয়া সাম্প্রদায়িক কলহের চেয়ে ভয়াবহতায় যে কোনো অংশে এতটুকু কম বলে তার বিশ্বাস হয় না। দিনদিন অরূপ কেমন সিনিক হয়ে পড়ছে। কি কথায় একদিন সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'কলোনি মানে তো রাজ্যের হাড়হাভাতের আড্ডা—এখানে কোনো ভদ্রলোক বাস করতে পারে? জানি শালা, আজ নয়তো কাল চাকা ঘুরে যাবে। তখন সবার আগে আমি পালাব। কলকাতায় চাকরি করব, থাকতে হয় সেখানে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকব। এখানে আছে কী যে চিরকাল আহাম্মকের মত পড়ে থাকতে হবে?'

কি আছে সেটা ঠিক এতটা চেঁচিয়ে না বললেও ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার মত সত্যি। আজ অবধি নেই-এর পাল্লাটাই বেজায় রকম ভারী। ভাল রাস্তা নেই, শহরের সংগে দ্রুত আর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ব্যবস্থাটা আধ খেঁচড়া হয়ে ঝুলে আছে কবে থেকে। ভাবা যায় একদিকে যখন মাথার ওপরে এশিয়াড মুক্তি-সূর্য দপদপ করছে তখন কিনা বাঁশবনের আড়ালে নিটোল ইয়ারকির মত মিট-মিট করছে কেরোসিনের আলো। এখনো মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পেটের ভাত জোগানো মানুষ বর্ষার দিনে বাঁশবন আর কচুর জংগল হাঁটকাতে গিয়ে সাপের ছোবল খেলে লোকজন পাঁচ মাইল দূরে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেয়ে ঘরের পাশের ওঝা ডেকে আনা বেশী পছন্দ করে। তার জাগ্রত [illegible]

—এখনো ও কলোনীর তো জোয়ানদের জন্য তাদেরই মিটে যায়। যা মেটে না—এমন কি মনে হয় মিটিয়ে মিটতে বোধহয় আরো একটা কি দুটো জেনারেশান পার হয়ে যাবে—তা হল এক হাত জমির লোভ। এ লোকগুলো এক সময় ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছিল বলেই কি জমির প্রতি এমন অদম্য লালসা—এক কোঁটাও দখল কাউকে সহজে ছেড়ে দিতে নারাজ। জমিদার হাইয়ের টালির চালার নিচে বসে কতদিন জ্যোতির মনে হয়েছে আর পারা যাচ্ছে না—বুকে পাথর চাপার মত দম আটকে আসছে। তার কী দায়। মানুষের কিসে ভাল আর কিসে মন্দ তার কতটুকুই বা সে জানতে পেরেছে। তবু যে সবার মত সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে পারছে না তার জন্য তার সত্তর বছরের অর্থ যা যত না তার চেয়ে বেশী দায়ী বোধহয় সে নিজে। সত্তর বছরের ঐ অজর মহিলা যেমন কিছুতে ভুলতে পারেনি ফেলে-আসা আমগাছ কাঁঠাল-গাছের স্মৃতি, তেমনি তার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিরুপদ্রবে শিকড় ছড়িয়ে দাঁড়াবার আলসেপনা গজিয়ে গেছে। যখনই টালমাটাল লাগে তখনি সে নিজেকে শুনিয়ে দেয়, একবার তো শিকড়-ছেঁড়া হলে কত, আরো কতবার কত অজুহাতে ঘুরে ঘুরে পালিয়ে বেড়াবে। এ যদি চলতেই থাকে তবে তো সারা জীবন কোথাও পা রাখার জায়গা খুঁজে পাবে না।

তিলকলালের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বিশ্ব কয়েক জনের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে চা খাচ্ছিল। ডোবার পাশে পাকুড় গাছের নিচে গুমটি মত দোকান। কেরোসিন ডিবির লাল আলোয় তিলকের খালি গা আর গোল তালপাতার পাখা মুখের একপাশ খালি দেখা যায়। বেঞ্চিতে বসা কার সঙ্গে গালে হাত দিয়ে হেসে হেসে খুব কথা বলছে। বিশ্ব না ডাকলে বুঝতেই পারত না সে ওখানে আছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বিশ্ব একবার চোখ তুলে দেখল কি দেখলও না। গম্ভীর গলায় বলল, চা খাবি তো নাকি ?'

সে কিছুটা অবাক হয়ে বেঞ্চিতে বসা মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুই একা ? আর সব কোথায় ?'

তিলকের হাতের ভাঁড় এগিয়ে দিয়ে বিশ্ব গজগজ করতে লাগল। 'কেউ এসেছে নাকি ? শালা ঝাড়া একঘন্টা মশার কামড় খেয়ে মরে যাচ্ছি। যার দরকার খুঁজে নেবে।'

'কেন, সুহাস আসেনি ?' কেউ আসেনি, এমন কি সুহাসও না—এতক্ষণে ব্যাপারটা তাকে ভাবায়। ইনটারভিউ মানেই তো চাকরি হওয়া নয়। তবে কি ধীরে ধীরে মায়া কাটানোর অভ্যেস করছে। তা পারে ভাল কথা।

অন্ধকারে বিশ্ব হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার পায়ের নিচে বুঝি তিলকের বিস্কুটে পোষ মানানো সোহাগী নেড়ি কুত্তাটার লেজ চাপা পড়েছে। কেঁউ কেঁউ আর্ত চিৎকারে ছিটকে সরে গিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে বিশ্ব বলে, 'তবে আর শুনলে কি বাবা ? তুমি সবাইকে নিয়ে যত ভাব তোমায় নিয়ে কেউ তার এক কড়াও ভাবে না। এখন বাড়ি যাও, আমিও ঘরে তালা দিয়ে চলে যাচ্ছি।'

পিছিয়ে বড় রাস্তায় উঠে জ্যোতি বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে দেখে ক্লাবঘরের জানলা বন্ধ করে শেকলে তালা ঝুলিয়ে বিশ্ব ঘাড় নিচু করে চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ তাকে দেখা যায় কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। সত্যি কাউকে নিয়ে কিছু আবার ভাবে নাকি সে। এমন কিছু চিন্তা করতেও তো তার লজ্জা হয়। এমন কি তার ক্ষমতা সবার কথা ভাবতে পারে। আসলে এ তো মিথ্যে নয়, কতগুলো স্বার্থপর হিসেবী হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে কি করে দাঁত-কামড়ে টিকে থাকা যায় এই চিন্তাতে তার বেশীর ভাগ সময় চলে যায় এখন। নিজের হাজারো অক্ষমতা আর পাওয়া না পাওয়ার কথা বাদ দিয়ে অপরের কথা ভাববার সময় কিংবা সুযোগ কোথায় তার।

খানিক দূর চলে যেতে একজন সাইকেলে ঘন্টি বাজিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায়। অন্ধকার সত্ত্বেও জ্যোতি চিনতে পারে। দলে একমাত্র অরূপের সাইকেল আছে। ওটা আসলে ওর দাদার। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর ও-ই তার দখল নিয়েছে। নইলে পাশের কলোনি থেকে রোজ দেড়-দু মাইল হেঁটে তার এখানে আসা হয়ত সম্ভব ছিল না।

মাটিতে পা না দিয়ে অরূপ অবাক হবার ভান করে বলে, 'কিরে এরি মধ্যে চলে যাচ্ছিস ? ঘর খোলেনি ?'

'খুলেছিল। কেউ আসেনি দেখে বিশ্ব চলে গেল।'

অরূপ আর কথা বাড়ায় না। ঘর খোলা থাকলেও সে আজ আড্ডায় বসত কিনা সন্দেহ আছে। মাস দুয়েক হল সে অ্যাসেমব্লি ইলেকশান নিয়ে খুব মেতে আছে। এমন কি ইতিমধ্যে সে তার হয়ে তিন কিস্তি ঘর খোলার কাজও করে দিয়েছে।

'এত রাত করে কোথায় গিয়েছিলি ?'

পকেট থেকে রুমাল বের করে অরূপ ঝটপট ঘাড়-গলা মোছে। চকিত সতর্ক চোখে পেছন দেখে নিয়ে কেমন একটু গলা নামিয়ে বলে, 'খাইনি, যাব বলে বেরিয়েছি। একটা জরুরী খবর একজনের কাছে পৌঁছে না দিলেই চলবে না। আসতে আসতে ভাবছিলাম সাইকেলটা কাকে দিয়ে পাঠানো যায়। যাক, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল।'

জ্যোতি বলল, 'তা তো বুঝলাম। তুই তাহলে ফিরবি কি করে ?'

অরূপ হ্যাণ্ডেলটা এক রকম ঠেসে তার মুঠোর মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ ফেরা হবে কিনা বলতে পারি না। সে জন্যে ভাবিস না। কাল তোর ওখানে তো যাচ্ছি।'

এক সুকোমল সাথী
কোমল আর মোলায়েম
স্যানিটারী টাওয়েল

সত্যি বলতে কি, কামফিট স্যানিটারী টাওয়েল সারা দুনিয়াতে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারণ, এই স্যানিটারী টাওয়েল খুবই মোলায়েম আর এটির ভালভাবে শুষে নেওয়ার ক্ষমতাও অনেক বেশী। আর সেইসঙ্গে এটি এতই চাপা যে এটি পরে আপনি বিলকুল টেরই পাবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, হল এই যে, কামফিট সব প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধিসম্মত পরিবেশে বানানো হয়, আর তাতে এটি আপনার সম্পূর্ণ [illegible] ও স্বাস্থ্য অনুকূল। কারণ এগুলি বানাতে এক অত্যাধুনিক এবং অটোমেটিক প্ল্যান্টে বানানো হয়, যার সাথে আছে [illegible] পূর্ণ সহযোগিতা।
কামফিটকে আপনার মনপছন্দ সঙ্গী করুন।
সুকোমল সুরক্ষার জন্য—
কামফিট [illegible]

আপনার স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে সুরক্ষা।

[illegible] সেলুনের আলোয়া কিছু বসতবাড়ি পেছনে ফেলে সে ক্রমেই আরো বেশী ফাঁকায় চলে আসতে থাকে। দুধারে ফাঁকা মাঠ ছোট ঝোপঝাড় ডোবাপুকুর একগলা কালোয় ডুবে আছে। কবে আর এ সব জায়গা বাবোয়েসে অব্যবস্থার হাত ছাড়িয়ে নেবে সেকথা বোধ হয় কেউই বলতে পারে না। তবু এভাবে চিন্তা করতে ভালো লাগে। চারপাশে কেবলি অন্ধের ঝিঁঝির নেই, এরি মধ্যে দু-একজন নিদারুণ কটাক্ষে অপচয়গুলো ঠিক দাগ মেরে মেরে চলে যাচ্ছে। তার মাথায় দু-পাশ দিয়ে চৈত্রের তাতানো বাতাস গাছের পাতা থেমে থেমে বাজিয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাতাস একেবারে পড়ে গেলেও চলন্ত সাইকেলে থাকার ফলে কিছুটা কর্কশ অথচ অনুগত টান সে নিজের জন্যে তৈরি করে নিতে সমর্থ হয়। বাজারের একচালাগুলো ফাঁকা। খালি একটা দো-চালায় নিচে জনাকয় ব্যাপারী মানুষ হ্যারিকেন জেলে হন্যে হয়ে তাস পেটাচ্ছে। কিন্তু যাবে, সুহাসও হয়ত থাকবে না শেষ পর্যন্ত। তার আর বোধ হয় এ জীবনে কোথাও যাবার উপায় রইল না। সমস্ত চাহিদা ছাঁটতে ছাঁটতে এতটুকু করে এনে অনড় গাছের মত চারপাশের এই ঘেমো গন্ধ মানুষজনের মধ্যেই সে থেকে যাবে চিরকাল। এও তো এক রকমের বাঁচাই হল। ভোরের ট্রেনে কাঁচা সবজি নিয়ে ফিরবে বলে বিশাল মৌচাক সাইজের ঝুড়ি হাতে দুজন চলে গেল পাশ দিয়ে। চায়ের দোকানের লোকটা উনুনের গোড়ায় উবু হয়ে বসে ঠুকঠুক করে পোড়া কয়লা বেছে রাখছে। দেখতে দেখতে বাজার পেছনে ফেলে বাঁ দিকে ঘুরে যায়। সামনে কালভার্ট পেরোলে আমবাগান। সহসা রাস্তার দিকে নজর পড়তে আপনা থেকে ব্রেকে হাত চলে যায়। হাত তিন-চার দূরে আবছা মত দু-তিনটি মূর্তি দাঁড়িয়ে। সময় মত ব্রেক সামলাতে না পারলে নির্ঘাৎ ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হত। অথচ দু-তিন বার বেল বাজাতেও মূর্তিগুলো নড়বার নাম করে না। তখন সে প্যাডল থেকে এক পা নামিয়ে এক মুহূর্ত কি করা যায় তাই ভাবে। শেষে মরিয়া হয়ে বাঁধা ফেড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় প্যাডলে পা তুলে এক মোচড় ঘোরানো মাত্র অনুভব করে একখানা হাত বাঁদিকের হ্যান্ডেল চেপে ধরে তাকে পুরোপুরি কব্জা করে নিয়েছে। এবার প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মত একপায়ে ফের মাটি ছুঁয়ে কি ঘটে তার জন্য সে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে। পলকে ঘাড়ের কাছে উঠে আসে একখানা হাত—চকিত খড়্গের মত। ফরফর শব্দে কলাপাতা চেরার মত পাঞ্জাবি ছিঁড়ে মিনিটখানেক শূন্যে ঝুলে থাকার পর পায়ের নিচে ফের মাটি ফিরে পায়। পর মুহূর্তে সবটুকু আক্রোশ ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে তার ঘাড়ে থুতনিতে আর চোয়ালে। কাতর শব্দ করে নালার মধ্যে পড়ে যেতে যেতে উঁচু থেকে ফুঁসে ওঠা গলা-কানে আসে জ্যোতির : 'শালা হারামির বাচ্চা, ইনফরমার—এই যা শিক্ষা দিলাম, মনে রাখিস—'

সাইকেলের চাকায় তখন থেকে ক্রমাগত ঘষটা আওয়াজ হয়ে চলেছে। ফলে ওটা না চেপে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। পুকুর বাঁ ধারে রেখে রাস্তা এবার ডানদিকে ঘুরে বসতি এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এতক্ষণে দু-একটি অস্পষ্ট গলার স্বর তার কানে আসে। কলাবাগানে চৌকি সেরে বুড়ো মতো একজন মানুষ গলাখাকারি দিয়ে লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে আর্গল ঠেলে পাশের বাড়িতে ঢুকে যায়। এত সময় ফরসা ফরসা লাগছে কলাঝাড়ের মাথার ওপরে আকাশ। সবুজ নোয়ানো পাতায় হালকা রুপোলি তেলের মত গড়িয়ে নামছে। মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদ উঠে যাবে।

সাইকেলের চেনে অনেক নিচু করে ঝোলানো হ্যাজাকের তলায় হরিশ একটা চাকা খুলে লণ্ডভণ্ড করে বসে আছে। জ্যোতি ভাবতে ভাবতে আসছিল দোকান খোলা থাকলে ওটা এই রাতের মধ্যে সারিয়ে নিয়ে যাবে যাতে কাল অরূপ এসে না টের পায় কোথাও কোনো গোলমাল ঘটেছিল। সে নিঃশব্দে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

তার গোঁট-বাঁধা পাঞ্জাবি উড়োখুড়ো চেহারা দেখে হরিশের ছোকরা কর্মচারী ছেলেটা হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ও কাকা, দ্যাখেন চেয়ে মাস্টার-দাদার যেন কি হয়েছে।'

টাল-ভাঙা মেশিন থেকে চোখ তুলে হরিশ অন্ধকারে তাকায়। জ্যোতি বুঝতে পারে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে অত দূরে সহজে লোকটার নজর আসবে না। লোকটা দিনের বেলাও ভালো চোখে দেখে না। সাইকেল মেরামতের দোকানটা হয়ত এখনো অভ্যাসবশে চালিয়ে যেতে পারছে।

হরিশ ইশারা করতে ছেলেটা ঝাঁপের নিচে টিনের চেয়ারখানা পেতে দেয়। সাইকেলটা ঝাঁপের বাঁশে হেলান দিয়ে জ্যোতি মাথা নাড়ে। 'না, বসব না। শিবমন্দিরের কাছটা এত অন্ধকার আর ঠিক ঐখানটায় এসে ব্রেকটাও গেল বিগড়ে। কিছুতে সামলাতে পারলাম না।'

হ্যাজাকের আলো পড়েছে গায়ে। হরিশের প্রায়-অন্ধ চোখে সব কি [illegible] করে অক্ষমশক্তির ছোঁড়া। নিজেই বাঁচে না, তলে তলে কাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে মাস্টার। খুঁটির আড়ালে জ্যোতি একটু ঘুরে বসে। তাদের মাঝখানে ছোকরাটার নির্বোধ মাথায় তুম্বো ছায়া হেলে আছে।

কবে থেকে শুনছি ইলেকট্রিক আসছে। এখন আবার শুনি ভোটে জিতলে নাকি আসবে। আর যদি হেরে যায় তবে কি হবে?'

কান্তি দত্ত আরো কে কে বছর খানেক ধরে বাতির অফিসে হাঁটাহাটি করে কাজ বুঝি কিছুটা এগিয়ে এনেছিল। একবার যেন কিছু শালবল্লাও নেমেছিল। এখন সেগুলোর গায়ে ঘুঁটে চাপড়ানো হয়। মাঝখান থেকে দত্তর নামে বদনাম রটে গেল সে নাকি বাতির নাম করে লোকের পয়সা খেয়েছে। আড়াল আবডালে হতে হতে কথাটা ঠিক দত্তর কানে চলে যায়। একদিন সে দুর্গামণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে দিল। 'বীর পুত্তলো কে আর নোলায় জল ঝরে কাদের। আন্দেক কাজ হয়ে গেছে কিনা এখন এ-শালা তো চোর-জোচ্চোর হবেই—এতো সংসারেরই নিয়ম। বেশ, আমিও দেখবো ক'বছরে এ ভাগাড়ে বাতি ঢোকে......।' লোকটা সত্যি করে কিছু কলকাঠি নেড়ে এলো কিনা কে জানে। পরে অরূপেরা কিছুদিন হাঁটাহাটি করল। কাজের কাজ কিছু হল না।

বাতি আসা নতুন করে ভোটের ইস্যু হয়েছে এই প্রথম শুনল বসে জ্যোতি ভালমন্দ কিছু বলল না। হরিশের মনোযোগ সাইকেলের দিকে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'দেখুন তো, কোথায় কি গোলমাল হল—কিছুতে চেপে আসতে পারলাম না।'

'সাইকেলটা কার?' হরিশ শুধোয়।

'আমার এক বন্ধুর। কাল সকালে নিতে আসার কথা। দেখুন যদি বসে থাকতে সারিয়ে দেওয়া যায়।'

সাইকেলের সামনে উবু হয়ে বসে খুঁটিনাটি কি সব দেখে নিয়ে হরিশ উঠে দাঁড়ায়। মাথা নেড়ে বলে, 'সামনের চাকায় টাল আছে, দুটো স্পোকও ভেঙেছে দেখলাম। এতো আপনার বসে থেকে হবে না।'

জ্যোতি হতাশ বোধ করে মনে মনে। রাতে যদি নাও ফেরে কাল সকালের মধ্যে অরূপ নিশ্চয় ফিরে আসবে। এসে যদি শোনে সাইকেল দোকানে দেওয়া আছে তাহলে খুব স্বাভাবিক কারণে নানা সন্দেহ করতে পারে। যতই অন্ধকার থাক, সাইকেল সুদ্ধো নালায় পড়ে যাওয়ার কথা তাকে বিশ্বাস করানো শক্ত হবে। তাছাড়া সে চায় না যা ঘটে গেছে তা নিয়ে কারো কাছে কোনো রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

'কাল সকালেও পাব না?' জ্যোতি কিছুটা বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করে।

ইশারায় ছেলেটার দিকে তাকায় হরিশ। 'কিরে, রাতের বেলা পারবি ধরতে?'

ছেলেটা মাথা নেড়ে হাসে। 'ধরতেই হবে, মাস্টার দাদার সাইকেল যখন।'

জ্যোতি যেতে যেতে দেখে গুমোট আকাশের নিচে দু-তিন দল খেলার মাঠে গোল হয়ে শুয়ে বসে আছে। মাথার কাছে নিচু টিউনে হিন্দী গানের মহব্বতের কলি বাজছে। মেঠো জোছনায় আম জাম জামরুলের পাতা নিথর। সে নিঃশব্দে তাদের শিয়র ছুঁয়ে চলে যায়। নিজেকে সাবধানে সরিয়ে নেয় রাস্তার অন্য পাশে। দুর্গামণ্ডপের কাছে আসতে লক্ষ করে দুজন লোকের সঙ্গে কান্তি দত্ত মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসছে। লোক দুটি বেশ উত্তেজিত। [illegible] নেড়ে দত্তকে কি বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে। দত্ত বিশেষ কোনো সাড়া [illegible] করছে না। কেবল একবার তাকে সায় দিয়ে বলতে শোনা গেল, 'না, সে [illegible] পারলে খুবই ভালো। এখন তোমরা যদি দায়িত্ব নাও তবে না—' দত্তর পাশের লোকটি এবার একটু জোরের সঙ্গে বললে, 'আলবাত দায়িত্ব নিতে হবে, এ কি ইয়ার্কি নাকি? তবে আপনি দত্তদা, কথাটা বলছি বলে যেন আবার রাগ করবেন না—কেমন একটু যাকে বলে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। এরকম হলে কিন্তু অর্গানিজেশান চোট খেয়ে যাবে।' দত্ত দুবার খুশ খুশ করে কেশে গলা সাফ করে নিয়ে চাপা ধমক দিল, 'তুমি থামো তো বঙ্কু, এ বয়সে আমায় আর উত্তেজিত করে লাভ নেই। আমার তো দিন চলেই গেছে একরকম করে। এখন তোমরা শক্ত থাকো, তবেই হবে।'

জ্যোতি ভেবেছিল পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারবে। তাড়াতাড়ি হেঁটে ওদের ছাড়িয়ে কয়েক পা চলেও গিয়েছিল। চিনতে পেরে কান্তি দত্ত পেছন থেকে ডাকেন, 'জ্যোতি ফিরলে নাকি?'

সেই এক ভয় জ্যোতির মনে। যদি চেহারা দেখে ফেলে, যদি জানতে চায় কি ঘটেছে তাহলে সে ভারী বিপদে পড়ে যাবে। এক রকম মিথ্যে বলতে গিয়ে এবার হয়ত গলা আটকে যাবে। বুকের মধ্যে এখনো সেই শব্দের কাঁটা খচখচ করছে। সে কি কারো চর—কার হয়ে সে কবে কোথায় গোয়েন্দাগিরি করল। সে যে কারো সামনাসামনি হতে চায় না তা তো খালি কেবল অরূপকে বাঁচানোর জন্যে নয়—সেই সঙ্গে সে নিজেও কি বেঁচে যাচ্ছে না অন্তত বড় অবিশ্বাস আর সংশয়ের হাত থেকে।

যতটা দূরে থাকলে দত্ত আভাস পান ততটা দূরত্ব বজায় রেখে সে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে চলতে চলতে জ্যোতি বলে, 'সুহাস ফিরেছে কাকাবাবু?'

দত্ত মুখ না ঘুরিয়ে বলেন, 'সন্ধে অবধি ফেরেনি তো জানি। ইনটার-ভিউ দিয়ে একবার বেহালায় তার মাসীর বাড়ি যাবার কথা।'

কিছুদূর যাবার পর বঙ্কু আর তার সঙ্গী লোকটি চলে যেতে দত্ত

দিকে ঝুঁকে গেছেন—এটা আজই প্রথম জ্যোতি খেয়াল করে। এখন … পারে যৌবন টেররিস্ট মুভমেন্টে দীর্ঘ অনিশ্চিত জীবন, তারপর স্বাধীনতা—ক্ষমতার লোভে সম্ভব যত রকম অপেখলেপনার বিনিময়ে কিছু মানুষের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত হওয়া—সব কিছু এই পরিণত বয়সে গভীর হতাশার চেহারা নিয়ে তাঁর সামনে খাড়া হয়ে পড়েছে।

দত্ত এবার গলা নামিয়ে বলেন, 'আসলে তাকে আমিই এখন চট করে ফিরে আসতে মানা করেছি। কি জানি কখন কী হয়?'

'কি হয় মানে?'

দত্ত ফিস ফিস করে বলেন, 'কেন, দেখনি দেয়ালে পোস্টার? ঘুষখোর কান্তি দত্তের বিচার চাই।'

জ্যোতি লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে।

'যার বিচার হোক তাতে ভয় পাই না। কিন্তু ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে এ কেমন জুলুম বলতে পার!'

হ্যারিকেনের আলোয় জ্যোতি যখন গায়ে ময়লা গেঞ্জি রেখে জামাটা খুলে চিনুর হাতে দিয়ে বলে, 'কাল এসে যেন রিফু করা পাই। এখন থাকে তো সুহাসের একটা জামা দাও, পরে যাবো—' তখন হেঁয়ালির মত মুখ করে চিনু পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, 'মারামারি করলে কার সঙ্গে?' জ্যোতি দেখে চিনুর ভয়ার্ত চোখ। মা মেয়ে দুজন দরজায় খিল দিয়ে বসেছিল। নাম ধরে চিনুকে ডাকা যায় না। ডাকল, 'সুহাস আছিস—'। দরজা সামান্য ফাঁক করে সুহাসের মা বললেন, 'নেই তো।' সে তাড়াতাড়ি ভয়ে মহিলাটিকে ছাড়িয়ে হুড়মুড় করে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে। চিনুর ভয়ার্ত চোখে কাঁটার মত আক্ষেপ বিঁধে যায়। 'দাদা কেন বেহালা গেছে জান? কী করে জানবে—কাক-পক্ষীতেও যা জানে না। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কোনদিন এসে দেখবে নেই—' জ্যোতি হাত বাড়িয়ে সুহাসের জামাটা তুলে নেয়। ছোট হবে, না বড়—নাকি সমান-সমান ফিট করে যাবে। 'যাবার আগে আমার জামা রিফু হবে তো?' চিনু ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা কোলে তুলে নিয়ে বসে আছে, দশাটা দেখে নিয়ে সে অন্ধকারে পা বাড়ায়।

মার হাতের তিনটে আমের কলমে এবারই প্রথম মুকুল এসেছে। সকাল না হতে দু-তিনটে ছোটো ছেলে গাছের কুশি কুশি আমের পেছনে সমানে লেগে আছে। হরিশ ছেলেটাকে দিয়ে সাইকেল পাঠিয়ে দিয়েছে আটটা বাজার আগেই। জ্যোতি ছেলেটাকে টাকা বের করে দিতে দিতে মার গলা শুনতে পায়, 'যত চোরের বংশ জুটেছে এসে এক জায়গায়। থাকবে নাকি—কিছু থাকবে না। বচ্ছরকার নামে দুটো আম এসেছে গাছে, তা কি আর নোলায় সয় কারো'—জ্যোতি পা টিপে টিপে করমচা গাছের তলা দিয়ে … মেরে গিয়ে খপ করে একটা ছেলের চুলের ঝুঁটি টেনে ধরে। 'কাঁচা আমগুলো পাড়ছিস কেন—ঘরে খেতে পাস না?' আস্তে দুটো ঝাঁকানি দিয়ে ছেড়ে দেয়। কোনদিক দিয়ে নামল এলো, কাঁচা আমের মতই রসালো সকাল বেলাটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ছেলেটা সীমানায় করমচা গাছটার নিশ্ছিদ্র কাঁটার সঙিনের দিকে থমকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে পালাবার ভান করলেও হাত পাঁচেক দূরে গিয়ে ফের ঘুরে তাকায় জ্যোতির দিকে। বলে, 'খেতে পাই কি না তুমি জান? কাঁচা আম খাব না তো পাকলে নিজেরাই খাবে—তখন কি আমাদের ডাকতে যাবে? হু হু বাবা, জানা আছে সব।' কী ঘৃণার চোখ, কী অবজ্ঞা। জ্যোতি গাছতলা থেকে ফিরবে বলে ঘুরে তাকাতে অরূপকে দেখতে পায়। 'কী করছিস জংগলের মধ্যে?' অরূপ একটা চারা কলাগাছের নিচু পাতা হাত দিয়ে সরিয়ে বলে, 'ঘরে আয়, দারুণ খবর আছে।'

ঘরে এসে অরূপ একরকম বিনা উত্তেজনায় বলে, 'আমরা জিতছি, হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর খবর। আসলে কাল তোকে খবরটা বলিনি। আমি কাল দাদার কাছে গিয়েছিলাম। দাদা ফিরছে দু একদিনের মধ্যে।'

জ্যোতি কোন কথা বলে না। জিতছি মানে কী। জিতলে কি ঐ ছোট ছেলেটার চোখের ঘৃণা দূর হবে। অবজ্ঞা মুছে যাবে। তার বদলে দেখে রাতের অন্ধকারে বাঁশবনের আড়ালে আড়ালে কান্তি দত্ত তার স্ত্রী আর চিনু নিঃশব্দে কলোনি ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। জ্যোতি আক্রমের মত নিজের মনে বিড় বিড় করে: অরূপ, তুই বল কাল রাতের বেলা যা ঘটেছে তুই তার কিছুই জানতিস না। একথা না জেনে আমার কিছুতে স্বস্তি হচ্ছে না তোর লাঞ্ছনার ভার তুই জেনে বুঝে আমার ওপরে চাপাতে চাসনি।

অরূপ উঠোন পেরিয়ে ধাঁ করে সাইকেলে ওঠে। তার চটির ফটফটানি লেগে বড় অকারণ বাতাসে খানিক শুকনো ধুলো ওড়ে।

মানুষ পাখির

সমরজিৎ কর

॥ ৮ ॥

ওকে। হ্যাভ এ গুড টাইম। বলেই বিদায় নিলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

তিনি চলে গেলে আমি হাসতে হাসতে সমরজিৎ চক্রবর্তীকে বললাম, আর গুড্ টাইম! একি কলকাতা, না দিল্লি, যে রাতের দিকে একটু হই-চই করে ঘুরে বেড়াবো? এসব ছোট শহরে সন্ধ্যে নামার সংগে সংগেই মানুষ ঘরমুখী হয়। বেড়াবোটা কোথায়?

অজিতবাবু এতক্ষণ নিজের ঘরের মধ্যেই সাজগোজ করায় ব্যস্ত ছিলেন। মাঝে ডঃ ত্রিপাঠী যে এসেছিলেন টেরই পাননি। এতক্ষণে গালের পাশে অতিরিক্ত লেগে থাকা পাউডার রুমাল দিয়ে ঘষতে ঘষতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, সে কি, মশায়? চললেন কোথায় সেজেগুজে?

সলজ্জ হাসি হেসে অজিতবাবু বললেন, কী যে বলেন? সাজগোজ দেখলেন কোথায়? চান করার পর খুব ঘুম ধরছিল, তাই একটু পাউডার ডলে নিয়েছি। ডঃ ত্রিপাঠীর গলা পেলাম যেন?

যেন কেন? ডঃ চক্রবর্তীর পাল্টা প্রশ্ন।—তিনিই এসেছিলেন। আবার চলে গেলেন। তা আপনি এখন চলেছেন কোথায়?

জলসা শুনব।

জলসা মানে?

জলসা মানে আবার কি? জলসা। আপনারা যখন ঘুমোচ্ছিলেন, আমি বেরিয়েছিলাম একটু। এখান থেকে মাত্র কোয়ার্টার মাইল দূরে বিরাট প্যান্ডেল পড়েছে, মশাই। বিহুর জের তো এখনও চলছে। আজ নাকি জের জলসা। ভূপেন হাজারিকা গান গাইবেন আজ। শুনে এলাম।

বাঃ বাঃ! এর মধ্যে একা একা বেড়িয়েও এলেন?

বেড়ানো ঠিক নয়। ফিলিম কিনতে গিয়েছিলাম, সেই পথেই দেখলাম জলসার প্যান্ডেল।

বললাম, খুব ভাল কথা। এখন ছটা। আমরাও চট করে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। আধ ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। তারপর কোথাও একটু খাওয়া দাওয়া সেরে চলুন বরং জলসার আসরে গিয়ে বসি। আসামে এলাম অথচ এ পর্যন্ত এখানকার একটা কালচারাল প্রোগ্রাম দেখলাম না!

এরপর আর দেরি নয়। আধঘন্টার মধ্যেই চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

ততক্ষণ অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তার ধারে জ্বলে উঠেছে ইলেকট্রিক আলো। গেস্ট হাউস থেকে পায়ে হেঁটে কিছুটা এগোতেই একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম আমরা। রাস্তায় পড়তেই পেছন থেকে ভেসে এল মাইকের শব্দ।

গেস্ট হাউসে আসার সময় অন্য-পথ ধরে এসেছি। তাই ওদিকটা চোখে পড়েনি। এখন দেখলাম, এখানেও একটি জলসায় প্যান্ডেল বসেছে। অজিতবাবু বললেন, এখানটায় নয়, আমি যে প্যান্ডেলটা দেখে এসেছি, ভূপেনবাবু গাইবেন সেখানে। তাড়াতাড়ি চলুন। হাতে মাত্র এক ঘন্টা সময়। খেয়ে দেয়ে আটটার মধ্যে জায়গা না নিলে কিছুই দেখতে পাবেন না।

ঠিক আটটার মধ্যেই জলসায় গিয়েছিলাম। দেখলাম, এরই মধ্যে প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। ভিড়ের পেছনে খাবারদাবারের দোকান। পান বিড়ি সিগারেটও আছে। ওদিকে চলছে প্রোগ্রাম। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভ্যারাইটি শো। লোকনৃত্য, লোকগীত। দারুণ ভাল লাগল।

ভাল লাগল একটি কারণে। ভূপেন হাজারিকা এবং তাঁর দু-এক জন সঙ্গী ছাড়া এই আসরে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা সবাই স্থায়ী অধিবাসী। স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়ে। আর তাঁদের অনুষ্ঠানের মধ্যে ফুটে উঠেছিল আসামের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাটি। যে গান স্টেজে দাঁড়িয়ে তাঁরা গাইলেন, তা আসামের গ্রামে, হাটে মানুষের গলায় ঘুরে বেড়ায়। তাঁদের নৃত্য আসামের সনাতন জীবনের সংগে সম্পর্কিত। সেখানে হলিউড বা বোম্বের কোন স্পর্শই ছিল না। আমার মনে হলো, কলকাতায় তো কত সাংস্কৃতিক উৎসব হয়। কিন্তু বিহুর মত কলকাতায় নববর্ষে, দোলে অথবা দুর্গাপুজোয় কটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চোখে পড়ে, যার শেকড়ের সংগে আমাদের মননশীলতার সত্যিকারের কোন যোগ আছে!

বড় তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলাম অনুষ্ঠান থেকে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাংগল। তারপর তাড়াতাড়ি আবার প্যাকিং। ডঃ ত্রিপাঠী তাঁর নিজের জীপ নিয়ে এলেন। তার কিছুক্ষণ পরই এল আমাদের জীপ দুটি। অর্থাৎ শিলং থেকে যারা আমাদের বাহক হয়ে আসছে। রুটিন মাফিক আমরা ঠিক সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই যাত্রা করলাম।

তেজপুর থেকে প্রথমে উত্তর লখীমপুর। দূরত্ব প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার। তবে রাস্তা ভাল। এটা হাইওয়ে। প্রথমে বেশ কিছুটা পথ আসাম উপত্যকার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। পুরোপুরি সমভূমি। মাঝে মাঝে অজস্র সুপারি গাছের বাগানে ঘেরা এক একটি গ্রাম। যেখানে গ্রাম নেই, সেখানে দুপাশে আছে দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। পথ কখনও এগিয়ে চলেছে রঙ্গিয়ার দিকে যে রেল-পথটি এগিয়ে গেছে তার পাশ বরাবর। ছোট বড় অজস্র নদী। একের পর একটি চা বাগান। পথে পড়ল চারিয়ালি দারং, বেগমারী চা বাগিচা; বহুপুকেরির ইম্পিরিয়্যাল টি এসটেট। বড়গাং নদী পেরিয়ে আরও কয়েকটি চা বাগান।

উত্তর লখীমপুরে পৌঁছতে বাজল দুপুর দেড়টা। বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র এই শহরটি। অজিতবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী এখান থেকে আরও কিছু ফিলম কিনে নিলেন।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, পথে অরুণাচলের এক চিলতে জমি আমরা স্পর্শ করে এসেছি, লক্ষ করেছেন হয়ত, মিঃ কর। ওই যে, একটা পাহাড়ের কোলে এসে আমরা গাড়ির তেল নিলাম, সেখান থেকে অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটার হবে। আমরা আগামী কাল ফেরার সময় ইটানগর যাব। এখন দেখবেন চলুন, সুবনসিরি কাকে বলে। প্রকৃতির সংগে কী প্রচণ্ড যুদ্ধ করেই না জিওলজিস্টদের কাজ করতে হয়।

উত্তর লখীমপুর যাওয়া মানে খানিকটা উজিয়ে যাওয়া। সেখানকার কেনাকাটা সেরে আবার মিনিট দশেক ভাটিয়ে আসতে হলো আমাদের। পথে রাংগা নদী। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে আসা তার জল সব সময়ই স্রোতস্বিনী।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, সাংঘাতিক নদী, মশায়। এখন এপ্রিল তো? এখন কিছু বুঝবেন না। আর কয়েকটা দিন যাক। বর্ষা আসুক। এর সেতুর ওপর দিয়ে যেতেই তখন আমাদের বুক কাঁপে।

রাংগা নদী অধ্যুষিত এই এলাকার নামই রাংগা উপত্যকা। পথ। সোজাসে মিনিট তিন এগিয়ে বাঁ পাশে সরু পথ। কিমিন যাওয়ার সড়ক। এই সড়ক ধরে প্রায় চার কিলোমিটার এগোতেই পড়ল আবার চা বাগান। চা বাগান শেষ হতেই পাহাড়ী রাস্তা। আমরা উপরে উঠতে লাগলাম।

আকাশে মেঘ জমেছে। মাঝে মাঝে ঘন কুয়াশার মত মেঘ উঁচু উঁচু গাছের ফাঁকে ঢুকে পড়ে চারপাশের পরিবেশ আরও রহস্যঘন করে তুলছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন ডঃ ত্রিপাঠী, মিঃ কর, দেখুন, দেখুন! কী বাহারে গরু একবার দেখে নিন! সঙ্কর জাতের গরু। এ ধরনের গরু এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ট্রাইবদের মধ্যেই শুধু দেখতে পাবেন। আমরা এখন ট্রাইবদের পল্লীর মধ্য দিয়ে চলেছি।

অদ্ভুত। গরু না অন্য কিছু? বিশ্বাস করুন বনের মধ্যে অমন প্রাণী দেখে আমি চমকেই উঠেছিলাম। একটি নয়। বেশ কয়েকটি। দেখতে না মোষ, না গরু। মসৃণ গা। যেন তেল চকচক করছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর তাদের গায়ের রঙ।

দেখলাম কারোর রঙ পুরোপুরি হলদে। দেখলে মনে হয়, কে যেন সাদা গরুর গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে। কারোর গায়ের রং কালো। মাঝে মাঝে গোলাপী রঙের বড় বড় ছোপ।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, ট্রাইবরা এদের বলে মিথুন। ওদের কাছে মিথুন একটা বড় রকমের সম্পত্তি, মিঃ কর। আমাদের টাকা পয়সার মত। বিয়ের সময় কনের যৌতুকস্বরূপ কনের বাবাকে ওরা মিথুন উপহার দিয়ে থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানেও মিথুন লেন দেন হয়।

এক একটা মিথুনের অপূর্ব স্বাস্থ্য। বললাম, তা হলে চাষ-আবাদের ব্যাপারে তো এদের কোন অসুবিধে নেই?

হাসলেন ডঃ ত্রিপাঠী। বললেন, চাষ-আবাদের মানে? আপনি কি ভেবেছেন, গরু দিয়ে এরা লাংগল টানে? তাহলেই হয়েছে। মশায়, এদিকের কোন ট্রাইবই লাংগলের ব্যবহার জানে না। ছোট ছোট এক ধরনের খন্তা দিয়ে চাষের মাটি তৈরি করে এরা। এমন কি মিথুনের দুধ অব্দি খায় না এরা। এরা মনে করে মায়ের দুধ তো তার বাচ্চার জন্যে। অন্যে কেন খাবে? তবে হ্যাঁ, পাল-পার্বণে মিথুনের মাংস এরা খায়।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রাম মানে বড় বড় কাঠের গুঁড়ির ওপর ঘর। কোন কোন ঘরের বেড়া কাঠের। ছাদ কাঠের। মেঝে কাঠের। আবার কারোর কারোর ঘরের মেঝেই শুধু কাঠের। দেওয়াল এবং ছাদ খড়ে ছাওয়া। মানুষগুলি বেঁটে, খানিকটা স্থূল গঠন। কিন্তু প্রচণ্ড কর্মঠ সবাই। জীপের শব্দে কেউ কেউ ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাচ্চারা হাত নাচিয়ে কতকটা অভিনন্দনের ভংগীতে চেঁচা-মেচি শুরু করেছিল।

উত্তর লখীমপুর থেকে কিমিনের দূরত্ব প্রায় আঠারো কিলোমিটার। চারদিকে পাহাড়। তার মাঝে উপত্যকার

লোহিতে খামতি নাচ

লোহিত উপত্যকার নয় হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য এলাকায় রডোডেনডন

কোলে শিশু। এখানে আছে মিলিটারি ছাউনি। ঝকঝকে তকতকে পরিবেশ। ব্যারাক, অফিসার্স কোয়ার্টার্স, অফিসার্স ক্লাব, ফুলের বাগান।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, আমরা এখন হিমালয়ান ফুট হিলসের ওপর দিয়ে চলেছি। আর একটু এগিয়ে চলুন, ওই যে বাঁকটা দেখছেন? বাঁকের পর একটা গেট। ওটা চেক পোস্ট। ওখানে ইনার লাইন পাস দেখাতে হবে আমাদের।

রীতিমত কড়া ব্যবস্থা। সরকারী গাড়ি দেখে যে গার্ডরা ছেড়ে দেবে, তার জো নেই। গাড়ি থামিয়ে ওরা পাসগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিল। তারপর প্রত্যেকটি গাড়ির কাছে এসে দেখে নিল সত্যিকারের ক' জন যাত্রী সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিমিন সমুদ্রতল থেকে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু। এর পর খাড়াই।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, আর কিছু দূর চলুন, আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো। দেখবেন, পাশাপাশি দুই পাথরের স্তর। একটি স্তরের সঙ্গে আর একটি স্তরের বয়েসের পার্থক্য লক্ষ লক্ষ বছর। আর একটি কথা। এখান থেকে একচল্লিশ কিলোমিটার দূরে আমাদের ড্রিলিং ক্যাম্প। তবে সেখানে পৌঁছনোর আগেই দুটি মারাত্মক জিনিস সম্পর্কে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। একটি হলো জোঁক। আর একটি হলো ডিমডিম।

জোঁক না হয় বুঝলাম। কিন্তু ডিম ডিম মানে! ডঃ ত্রিপাঠীর কথায় চমকে উঠলাম আমি।

এক ধরনের খুদে মাছি। কালো রঙ। অনেক সময় বুঝতেও পারবেন না, কখন গায়ে এসে বসেছে। আর বসা মানেই সাংঘাতিক ব্যাপার। যে জায়গায় বসবে সেখানটা জ্বালা করবে। ফুলেও যেতে পারে। তারপর ঘা হয়ে কষ্ট দেবে। দারুণ পাজী-মাছি, মশায়। এখানে কাজ করতে গিয়ে আমাদের জিওলজিস্টদের লাইফ হেল হয়ে যাচ্ছে।

ডিমডিমের দংশন থেকে আমি রেহাই পাইনি। যেন বৈদ্যুতিক শক! সে অভিজ্ঞতা পরে বলছি। তবে তার চেয়েও অবাক করেছিল সেই উড়ন্ত বেড়ালটি। জীপের আলোয় চোখ ঝলসে নিশাচর সেই বেড়াল চলন্ত জীপে ধাক্কা খেয়ে সেই যে পড়ে গেল, আর উঠল না। সারা অরুণাচলে এই প্রাণীটি এখন বিরলের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

এক সময় আসামের হিমালয় অধ্যুষিত এলাকায় এক এক অঞ্চলের পরিচয় ছিল এক এক নামে। আকা হিলস্, ডাফলা হিলস, মিরি হিলস, মিশমি হিলস্, ইত্যাদি। এদের নিয়েই তৈরি এখনকার অরুণাচল প্রদেশ।

পশ্চিমে ভুটান। ভুটানের পূবে দিকে অরুণাচল। গিরিরাজ হিমালয় এখানে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে গেছে কামেং, সুবনসিরি এবং সিয়াং জেলার মধ্য দিয়ে। তারপর আরও খানিকটা পূবে দিকে গিয়ে সিয়াং নদীর গিরিসঙ্কটের ওপারে বাঁক নিয়েছে দক্ষিণ বরাবর। বরং বলি, দক্ষিণ-পূর্বে লোহিত জেলায়। এবং তার কিছুটা অংশ ঢুকে পড়েছে তিরাপ জেলার পূবে দিক বরাবর। এই তিরাপেই নাগা পর্বতমালার সঙ্গে তার মিলন। পর্বতবহুল অরুণাচলের কোথাও গড় উচ্চতা ১৭০০ মিটার, কোথাও ৩৫০০ মিটার, কিংবা ৪৫০০ মিটারের চেয়েও বেশী। এই অঞ্চলের গ্রেটার হিমালয়ের দিকে যান। যেখানে গোরিচেনের মত শৃঙ্গও দেখতে পাবেন। যার উচ্চতা ৬৫৩৮ মিটার। অথবা কংতু গিরিশৃঙ্গ। উচ্চতা ৭০৯০ মিটার। ভূতাত্ত্বিকদের কাছেও এ সব অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম।

দুর্গম। তবু ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ থেমে থাকেনি। ১৮২৫ সালে লোহিত সীমান্তে এ কাজে প্রথম পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন উইলকক্স। তারপর এলেন রাওলেট এবং গডউইন অস্টিন (১৮৭৫), লা তাউচে [illegible] ম্যাক ল্যারেন (১৯০৪) এবং কগিন ব্রাউন (১৯১১)। ওঁদের চেষ্টায় অরুণাচলের কিছু কিছু অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক তথ্য জানা গেল। বর্তমান শতকের চারের দশক পর্যন্ত ওঁদের অনুকরণে অভিযান চালিয়ে সন্ধান পাওয়া গেল আপার টারসিয়ারি, লোয়ার গণ্ডোয়ানা এবং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তিত শিলা। পাওয়া গেল কয়লার অস্তিত্ব সুবনসিরি জেলায়।

ছয়ের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একাধিক ভূতাত্ত্বিক অরুণাচলের বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালান। ওঁদের মধ্যে ছিলেন এ কে দে এবং জি সি চ্যাটার্জি। ওঁরা অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন লোহিত জেলায়। টি ব্যানার্জি এবং এম এস বালসুন্দরম উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেন কামেং জেলা থেকে। জি লস্কর এবং তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় অনেক কিছু জানা গেল সুবনসিরি এবং সিয়াং জেলার ভূতাত্ত্বিক রহস্য সম্পর্কে। দুর্গম উপত্যকা এবং গহন অরণ্য অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে না ছিল পায়ে চলার মতও পথ, না ছিল এতটুকু আশ্রয়। বন্য প্রাণী, অপরিচিত আদিবাসীর ভয়, কখনও বা অনাহারে ভূতাত্ত্বিকেরা অভিযান চালিয়েছেন। এই সব অভিযানের পরই জানা গেল, গংগা উপত্যকায় সালফাইডঘটিত ভূস্তর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আছে নিকেল। কামলা উপত্যকায় সন্ধান মিলল পিরাইট এবং লোহার আকর, আপাতানি মালভূমির জিরো উপত্যকায় কয়লার স্তর। কামেং, সুবনসিরি এবং সিয়াং জেলায় পাওয়া গেল গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা। পরে ওই সব অঞ্চলে চুণা পাথরও আবিষ্কৃত হয়।

কিমিন থেকে রওনা হওয়ার পর ক্রমাগত খাড়াই। আর সেই সঙ্গে মনে হল চারদিকের বনও ক্রমে গভীর হয়ে আসছে।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, যে কোন ভূতাত্ত্বিকের কাছেই সুবনসিরির এই অঞ্চলটি দারুণ ইন্টারেস্টিং, মিঃ কর।

লোহিত উপত্যকার ঘন অরণ্যে

অ্যানথ্রেসাইট কয়লা দেখাব।

ডঃ ত্রিপাঠীর কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম আমি। বললাম, বলেন কি? একেবারে অ্যানথ্রেসাইট? রানীগঞ্জ, ঝরিয়া থেকে শুরু করে আমাদের দেশে যে ধরনের কয়লা পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই বিটুমিনাস। কার্বনের পরিমাণ কম। আসামের চেরাপুঞ্জিতে কয়লা দেখে এলাম। তাতে আবার গন্ধকের মাত্রা বেশী। আর অ্যানথ্রেসাইট? সে তো সোনা। এতে কার্বনের ভাগ শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ। কয়লার মধ্যে এটাই উৎকৃষ্টতম জ্বালানি।

ঠিক তাই। মন্তব্য করলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

গাড়ি এগোচ্ছিল। আর দু' পাশের পাথর-স্তর এবং গাছপালার দিকে চাইতে চাইতে ভাবছিলাম, এই তা হলে সুবনসিরি?

সুবনসিরি নদীর নাম। আর সেই নদীর নামে জেলারও নাম সুবনসিরি। এর পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সমভূমির কিঞ্চিৎ স্পর্শ। উত্তরে গ্রেট হিমালয় এবং দক্ষিণে আসাম সমভূমির কিঞ্চিৎ স্পর্শ। উত্তর সীমান্তের ওপারে চীন। ভূতাত্ত্বিক চরিত্রের দিক দিয়ে এই জেলাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষিণে আসাম সমতল পেরলেই প্রথমে পড়বে শিবালিক অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের মত প্রশস্ত। গড় উচ্চতা ১৬০০ থেকে ১৭০০ মিটার। তারপর নিম্ন হিমালয় এবং অবশেষে গ্রেটার হিমালয়। অজস্র জলধারা থাকলেও এ

লোহিতের মিশমি ললনা

অঞ্চলে প্রধান নদী বলতে দুটি। সুবনসিরি এবং কমলা।

এখানকার ভূতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে পাবেন পাললিক এবং পরিবর্তিত শিলা। যার মধ্যে নিহিত আছে পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সাম্প্রতিকতম ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের সাক্ষ্য। উঁচুমানের পরিবর্তিত শিলার মধ্যে পাবেন বাইওটাইট-গারনেট-সিলিমেনাইট। লামডাক এবং ডাপোরিজোয় যান। সেখানে দেখবেন গ্র্যাফাইট। আর রাঙ্গা উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে সালফাইড হিসেবে কোবল্ট, নিকেল এবং তামা। কিমিন থেকে জিরোর পথে পড়ে ইয়াচালি। এখানে পাওয়া গেছে সাদা রঙের মূল্যবান বেরাইলের কেলাস। রাঙ্গা উপত্যকার পোতিন-এ তিন কিলোমিটার লম্বা এবং তিনশ থেকে আটশ' মিটার চওড়া একটা ভূস্তরের সন্ধান পেয়েছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার কর্মীরা। সেখানে চলছে ড্রিল করে নমুনা সংগ্রহের কাজ। এ পর্যন্ত সংগৃহীত নমুনার কিছু কিছু পরীক্ষা করে তাঁরা মনে করছেন এ অঞ্চলে কোবলট্, নিকেল, তামা এবং দস্তাও পাওয়া যাবে। লে-তে যান। দেখবেন, মাটির ওপর থেকে প্রায় তিরিশ মিটার গভীর পর্যন্ত নেমে গেছে খণ্ড খণ্ড গ্র্যাফাইটের স্তর। অনুমান ২১৮৬৬ টন গ্র্যাফাইট পাওয়া যাবে এখান থেকে। যার শতকরা বারো ভাগ গ্র্যাফাইট কার্বন। আর লামডাকে যে গ্র্যাফাইট আছে, তার পরিমাণ তেত্রিশ লক্ষ মিলিয়ন টন। ভাল মানের গ্রাফাইট। ...

পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসাই নদী

শতাংশ। ডাপোরিজো থেকে তালি যাওয়ার পথে পাওয়া গেছে এক হাজা মিটার ডলোমাইটের স্তর। তারি এ হুরি এলাকায়। এই ডলোমাইটের আ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশই ক্যাল সিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

শুধু আকরিক অনুসন্ধানই ন চাই বিদ্যুৎ শক্তি। বিদ্যুৎ না হলে ও আকরিক কোন কাজেই লাগান যা না। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আস অজস্র জলধারা। তার মধ্যে সুবনসি তো আছেই। পরিকল্পনা নেও হয়েছে, ডিরপাতি চা বাগানের উত্ত সুবনসিরি গিরিসংকটে বসানো হ সুবনসিরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বাঁধ দি তৈরি হবে ২৮৩৬ মিলিয়ন ঘনমিট পরিমাণ জল সঞ্চয়ের আধার। যে জ নব্বই মেগাওয়াটের মত বিদ্যু উৎপাদনের কাজে সক্ষম হবে। এই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপযুক্ত জায় নির্বাচনের দায়িত্বও ছিল জিওলজিক্যা সার্ভে অভ ইনডিয়ার ভূতাত্ত্বিকদে ওপর। জীবন হাতে করে সে কা তাঁরা শেষও করেছেন। এছাড়া জিরো কাছে ৩.৫ মেগাওয়াটের একটি ছো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে এই প্রকল্পটিরও স্থান নির্বাচনে তাঁদে সাহায্য অপরিহার্য ছিল। নতুন রাজ তৈরি হলো। তার তো একটা বে সাজানো গোছানো রাজধানী চাই। ে জায়গাটা হবে মনোরম এবং ভূতাত্ত্বি দিক দিয়ে নিরাপদ। ডাক পড় জিওলজিকাল সার্ভের। তাঁদের ব হলো, ইটা দুর্গ থেকে কাছে এ রাজধানীর বর্তমান স্থান নগর লাগু থেকে দশ কিলোমিটার পশ্চিমে একা জায়গার সন্ধান মিলেছে। দেখু এখানে শহর তৈরি করলে সে শহ নিরাপদ হবে কী, না। ভাল ক দেখুন সেখানকার ভূস্তর কতটা জমাট জায়গাটি পরীক্ষা করে ভূতাত্ত্বিক জানালেন, ঠিক আছে। এখানে রাজ ধানী বসান। স্থায়ী রাজধানী। কো বিপদ নেই। আর তারপরই তো গ উঠল অরুণাচলের স্থায়ী রাজধান ইটানগর।

আছে। শুধু সুবনসিরিই বা কে আছে কামেং, তিরাপ, সিয়াং এ লোহিত জেলার অরণ্য সম্পদ। সেখা আছে দুর্লভ পান্ডা, বুনো মোষ, বিচি সব পাখির সমাবেশ। আর আ ভূতাত্ত্বিক ভান্ডার। বলবো। স বলবো। ফিঃ কর। ইয়াজালি পৌ আগে। সেখানে বসেই কথা হবে, এ-স নিয়ে। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

শিলং-এ পরিচয় হয়েছিল শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণ বরদোইল-এর সঙ্গে। উত্ত পূর্বাঞ্চলের খনিজ সম্পদ অনু সন্ধানের জন্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে যে দলটি কাজ করে যাচ্ছেন, সে দলেরই প্রধান উদ্ধববাবু। পঞ্চাশে কাছাকাছি বয়েস। প্রচন্ড চটপটে এ আমুদে।

শিলং-এ দেখা হলেও অরুণাচলে পার্বত্য এলাকায় প্রথমে তাঁকে আ চিনতেই পারি নি। গায়ে চামড় জ্যাকেট। মাথায় চামড়ার টুপি। ত জীপটি তখন আমাদের জীপের পা এসে ভিড়ল এবং তার ভেতর থে

মিঃ কর, আমিও এসে গেছি—বলতে কি, প্রথমটায় ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলাম। মুখে আমার নাম অথচ মুখটি চিনতে পারছি না কেন?

আমার মুখের দিকে চেয়ে হয়ত ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। তারপর স্বভাবসুলভ হাসি ছড়িয়ে বললেন, বরদোইল মশায়, বরদোইল। শিলং।

জানি, জানি। চিনতে পেরেছি। নিজের অজ্ঞতা মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললাম, আপনাকে আর পরিচয় দিতে হবে না। চিনতে পেরেছি। অর্থাৎ মুহূর্তের জন্যে আমাকে হিপোক্রাট বনতে হলো।

বললাম, গোড়ায় একটু ভুল হচ্ছিল। মানে—

হচ্ছিল বুঝি? অসম্ভব নয়। টুপিটা খুলে ফেলি, তা হলে আর ভুল হবে না। বলেই মাথার ক্যাপটি খুলে নিলেন বরদোইল সাহেব।

অ্যাঁ, হ্যাঁ। এইবার কারেক্ট। সার, টুপি বড় বিপজ্জনক জিনিস। পরিচিত জনকে চিনতে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আমার পাশে বসেছিলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোড়ন কাটলেন: সে টুপি যদি আবার 'সত্যমেব জয়তে' হয়।

তার মানে? আমার জিজ্ঞাসা।

মানে আর কি? দেখছেন না পুরো পোশাকটাই 'সত্যমেব জয়তে'? পায়ে হান্টিং বুট, গায়ে জ্যাকেট, মাথায় টুপি। সব কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান মশায়। আমরা বলি 'সত্যমেব জয়তে'র কৃপা।

উদ্ধববাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, শিলং থেকে কখন এলেন আপনি?

গতকাল বিকেলের দিকে। উদ্ধববাবুর উত্তর।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আরও দুটি জীপ এসে হাজির। তাদের ভেতর থেকে মিলিটারি কায়দায় নেমে এলেন কয়েকজন অফিসার। সবাই বয়সে তরুণ। শুরু হলো রীতিমত হইচই কাণ্ড।

এঁদের মধ্যে একজন চিৎকার করে হেঁকে উঠলেন, আমরা ভেবেছিলাম আপনারা বুঝি সকালে আসবেন। ভগবান বাঁচিয়েছেন। সকালে এলে খুবই দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

ডঃ ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করলেন কী ব্যাপার, মিঃ হোসেন? এনিথিং রং অন দ্য রোড?

মিঃ হোসেন, অর্থাৎ সেই ভদ্রলোক বললেন, কাল রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেল স্যার। বৃষ্টির দরুন আমাদের একচল্লিশ নম্বর ক্যাম্পের কাছ বরাবর বিরাট একটা ধ্বস নেমেছে। রাত থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত তো রাস্তা বন্ধই ছিল। কী বড় বড় পাথরের চাঁই। একটা বুলডোজারে সে কি সরানো যায়? মাত্র কিছুক্ষণ আগে রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। সকালে এলে এতক্ষণ আপনাদের পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

উদ্ধববাবু তাঁর কথা লুফে নিয়ে বললেন, ডঃ ত্রিপাঠী, মাত্র কিছুক্ষণ আগে আপনারা কতদূর এলেন দেখার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়েছি। সকাল থেকে সারাক্ষণ সন্দীপনায় কেটেছে।

তারপর আগন্তুকদের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন। —ইনি মিঃ হোসেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ড্রিলিং। ইনি মিঃ কে ভি মোহন। ইনিও ড্রিলিং-এর সঙ্গে জড়িত। মিঃ এম কে অগ্রবাল, *জিওলজিকিস্ট*। এবং মিঃ এম কে সাইকিয়া, ভূ-পদার্থবিজ্ঞানী।

সবাই মিলে একটা পুরো রেজিমেণ্ট। আর এই রেজিমেণ্ট নিয়ে জীপের কনভয় ইয়াজালির দিকে এগিয়ে চলল।

আগেই বলেছি, কিমিন থেকে রওনা হওয়ার পর পথের ঢাল ক্রমেই খাড়াই হতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও সত্তর ডিগ্রির মত খাড়াই।

কনভয়ের সামনের জীপটিতে বসে ডঃ ত্রিপাঠী এবং আমি। ডঃ ত্রিপাঠী পথের দুপাশের পাথর-স্তরের বৈচিত্র্য নিয়ে নাগাড়ে কথা বলছিলেন। বলছিলেন, এই যে দেখছেন, এটা শিবালিক অঞ্চল। এখানকার মাটি এবং পাথরের রঙটা লক্ষ করছেন, মিঃ কর। কেমন হলুদপানা রঙ। শিবালিকের এই পাথরের স্তরে আমরা নানা রকম জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছি। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখবেন, হঠাৎ এক জায়গায় এই হলদে রঙের ভূস্তর শেষ হয়ে গেছে। আর তার গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এশিয়াটিক রক। যার রঙ লালচে। অথবা কালো, লাল এবং হলুদ মিশিয়ে একটা অদ্ভুত তালগোল পাকানো রঙ।

আমাদের জীপ চলছিল, আবার ডঃ ত্রিপাঠীর নির্দেশে মাঝে মাঝে থেমে পড়ছিল। থামার পর সবাই নেমে পড়ছিলেন গাড়ি থেকে। তারপর প্রত্যেকে হাতুড়ি ঠুকে পাহাড়ের টুকরো সংগ্রহ করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পরীক্ষা করে পাথরের নমুনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা তখন যেন অদ্ভুত মানুষ। জীবনের তথাকথিত চিন্তা-ভাবনা ভুলে গিয়ে ওই পাথরখণ্ডেরই যেন অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন তাঁরা।

ইউরেকা! খাড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে উঠলেন ডাঃ ত্রিপাঠী। জীপ থামিয়ে আমাকে হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গিয়ে পাঁচিলের মত খাড়া এক শিলাস্তরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

লেট মি শো ইউ দ্য বেস্ট কাইণ্ড অভ্ কোল, মিঃ কর। কখনও আপনি অ্যানথ্রেসাইট কয়লা দেখেছেন? আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে দেখিয়ে দিই। বলেই পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে থেকে হাতুড়ির ডগা দিয়ে এক টুকরো কালো বস্তু বের করে আনলেন তিনি।

এই হলো অ্যানথ্রেসাইট। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

হালকা। সাধারণ কয়লার মত অত চকচকে কালো নয়। কতকটা কাঠকয়লার মত খসখসে। তবে অতটা সছিদ্রও নয়, বরং 'কমপ্যাক্ট'।

জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের কয়লা কী পরিমাণ এদিকে আছে বলে মনে করছেন আপনারা?

আমরা তারই তো সন্ধান করছি, মিঃ কর। পেয়েছি। কিছুটা পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ বছর আগের গাছপালা ভূস্তরের মধ্যে চাপা পড়ে শেষ পর্যন্ত [illegible] হয় সে তো আপনারা জানেন। ধরুন, কোথাও হয়ত দু-একটি গাছ চাপা পড়ল। তারপর ভূতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সেই গাছই রূপান্তরিত হলো কয়লায়। সে ক্ষেত্রে তো বেশী কয়লা পাবেন না। যৎসামান্য অ্যানথ্রেসাইট এদিকের অনেক জায়গাতেই পাওয়া গেছে। আমাদের লক্ষ্য, কিছু বড় ডিপোজিট পাওয়া যায় কী না, তার জন্যেই অনুসন্ধান চালানো।

ভালো। কিন্তু এই দুর্গম পরিবেশে সেই অনুসন্ধান চালানো কি খুব সহজ কাজ হবে?

আমার প্রশ্নে হেসে উঠলেন ডঃ ত্রিপাঠী। হঠাৎ শক্ত মুঠোয় আমার করমর্দন করে বসলেন তিনি। বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ!

আমি সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম, কী হলো? এমন দুম করে আমাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়ার কারণ কী?

কারণ, আপনি বুঝতে পেরেছেন, ভূতাত্ত্বিকদের কী পরিবেশে কাজ করতে হয়।

চমকে চেয়েছিলাম ডঃ ত্রিপাঠীর মুখের দিকে। এ প্রশ্ন কি কোন যন্ত্রণার প্রতিফলন? শুধু ডঃ ত্রিপাঠীই নন। ঠিক একই ধরনের অভিব্যক্তি আরও অনেকের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রচণ্ড কর্মঠ, প্রাণচঞ্চল এবং সহিষ্ণু এই ভূতাত্ত্বিকরা এবং সেই সঙ্গে জিওলজিক্যাল সার্ভের আর সব কর্মী, যাঁদের সঙ্গেই কথা বলেছি তাঁদের বেশির ভাগের মধ্যেই নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটা গর্বের, একটা সন্তুষ্টির মনোভাবও যেমন লক্ষ করেছি, তার পাশাপাশি অনুভব করেছি একটা যেন যন্ত্রণা। তাঁদের ধারণা, তাঁরা অবহেলিত। তাঁদের এত যে দুঃখ কষ্ট, সে খবর কেউ রাখে না। এমন কি, ন্যূনতম সহানুভূতি থেকেও কখনও কখনও তাঁরা বঞ্চিত হন।

ইয়াজালির পথে আমরা এগোচ্ছিলাম এবং মাঝে মাঝে থামছিলাম।

মিঃ হোসেন বললেন, আপনারা বরং ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে আসুন। সেই ফাঁকে আমরা একচল্লিশ নম্বর ক্যাম্পে গিয়ে কিছু ব্যবস্থাপত্র করে রাখি। আজই ড্রিল করে কিছু বেস মেটালের নমুনা সংগ্রহ করেছি আমরা। দেখে আনন্দ হবে আপনাদের।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, সেই ভালো। আপনারা এগোন। আমরা পিছে পিছে আসছি।

মিঃ হোসেন সদলবলে চলে গেলেন।

আমরা এগোচ্ছি। কিমিন থেকে ইয়াজালির দূরত্ব একাত্ম কিলোমিটার। আর একচল্লিশ নম্বর ড্রিলিং ক্যাম্পের দূরত্ব একচল্লিশ কিলোমিটার। এ অঞ্চলে অনেক জায়গার কোন নাম নেই। থাকলেও সে নাম হয়ত শুধু ট্রাইব বা খণ্ডজাতিদের মুখে মুখেই ঘোরে। অথচ কোন জায়গায় আস্তানা পড়ল তার তো একটা পরিচয় থাকা চাই। এই পরিচয় দেওয়ার জন্যেই একটি সহজ পদ্ধতি মেনে চলেন ভূতাত্ত্বিকরা। যেখানে ওঁরা ক্যাম্প বসান, দেখে নেন কাছাকাছি সুপরিচিত কোন জায়গা থেকে সেই ক্যাম্পের দূরত্ব কতটা। তারপর সেই দূরত্বের সংখ্যাটিই হয়ে পড়ে সেই জায়গার পরিচয়। যেমন এই ক্যাম্প নম্বর একচল্লিশ।

[illegible] প্রত্যন্ত জায়গাটিরও নাম আছে। আবদুল নালা।

নামটি শুনে প্রথমে কৌতূহলী হয়েছিলাম। কারণ এতটা পথ অতিক্রম করা সত্ত্বেও কিমিনের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন লোকালয় চোখে পড়ে নি। তারপর এই মুসলমানী নাম। ইয়াজালিতে জনৈক বনবিভাগের কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের এদিকে দেখছি প্রচুর মুসলমানী নাম। যেমন এই আবদুল নালা, এই ইয়াজালি—

দুটি নয়। এমন নাম আপনি অনেক পাবেন এদিকে। বললেন তিনি। —আসলে ব্যাপার কি জানেন, আমরা নিজেরাও যে খুব জানি, তা বলব না। তবে ওই যে মোগল যুগে—এদিকে কেউ কেউ বলে থাকেন ওই সময় দিল্লির বাদশার ভয়ে অনেক মুসলমান যোদ্ধা এবং জমিদার অরুণাচলের এই সব দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে তাদের অনেকেই এদিকের খণ্ডজাতির সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে মিশে যায়। তারাই এসব জায়গায় অমন মুসলমানী নাম রাখে।

প্রায় হাজার দুই ফুট উপরে উঠে এসেছি আমরা। বন আরও গম্ভীর হয়ে আসছে। দেখলাম এদিকেও প্রচুর কলাগাছ। আর কী লম্বাই না এক একটি কলাগাছ। অন্তত পঁচিশ তিরিশ ফুট তো হবেই। আছে নানা রকম লতাপাতা, বিশাল বিটপী।

কিছুটা এগোতেই একটা ঝোলানো সেতু। সেতুর সামনে এসে ডঃ ত্রিপাঠী চালককে জীপটি দাঁড় করাতে বললেন। আমাদের সামনে যাচ্ছিল সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং অজিত ব্যানার্জির জীপ।

ডঃ ত্রিপাঠী চালককে বললেন, ও'দের জীপটি আগে ব্রীজটি পার হয়ে যাক, তারপর আমরা এগবো। বলেই আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন তিনি।—বুঝলেন কী না, মিঃ কর। কতকগুলি নিয়ম যদি সব সময় আমরা মাথার মধ্যে রেখে দিই এবং কঠোরভাবে তাদের যদি মেনে চলি, তাতে অনেক দুর্ঘটনাই কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। এই যে ব্রিজটা দেখছেন, এতে বেশী বোঝা তোলা বারণ। অতএব যাক না আগের জীপটা। আমরা না হয় একটু দেরি করেই যাব। তা ছাড়া এসব ব্রীজে দুটি গাড়ি এক সঙ্গে চললে রেজোনেনস্ এফেক্টের জন্যে ব্রীজটি কোলপস্ও করতে পারে। রেজোনেন্স্ বোঝেন তো?

জানি। মানে আপনি বলতে চান, দুটি গাড়ি ব্রীজের ওপর চলার সময় একই তালে ব্রীজটি কাঁপাতে শুরু করল। গাড়ি চলার দরুন যে কম্পন, সেই কম্পন যখন গোটা ব্রীজটির কম্পনের মত হয়ে দাঁড়াল, তখনই বিপদ। তখন প্রচণ্ড কম্পনের দরুন গোটা ব্রীজটিই ভেঙে পড়তে পারে। বললাম আমি।

কতকটা সেই রকমই বটে। ডঃ ত্রিপাঠীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মুহূর্তের জন্যে কিছুটা যেন অন্যমনস্ক হলেন তিনি। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস। বললেন, সামান্য সতর্কতার অভাবে কিছুদিন আগে কয়েকটি

আলো জ্বলে উঠছে, যে বলছে তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। উঁকি মেরে প্রায় রোমাঞ্চ হলো। সবই যেন ভৌতিক। আসলে আলোটাও যেমন নিজেই জ্বলে জ্বলে উঠছিলো, কথাগুলোও তেমনি কোনো অস্তিত্ববিহীন ভাবে নিজে নিজেই ভাসছিলো ঘরের মধ্যে। নির্দিষ্ট সুইচ আছে টিপে দিলেই যা যা যা জানতে চাও সেই সেই বক্তৃতা শুরু হয়ে যাবে। আবার একজনের বক্তৃতার বিষয় যদি অপরে শুনতে না চায়, তবে হেডফোন আছে, অন্য সুইচ টিপে সেটা লাগিয়ে নাও কানে, তোমারটা শুধু তুমিই শুনবে।

যাদের রেড-ইন্ডিয়ান বলা হয়, যাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমূলে উচ্ছিন্ন করে এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন, তাদের ছবিতে আলো জ্বলছিলো তখন। আমার কী রকম খারাপ লাগছিলো। সেই ইতিহাস শুনতে।

এই আদিবাসীদের আমি একবার দেখেছিলাম। প্রায় নেই বললেই চলে। নমুনা হিসেবে মিউজিয়ামপিসের মতো কিছু বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা গোষ্ঠী কলোরাডোতে আছে। বুদ্ধদেব একবার সেখানে সামার ক্লাস পড়াতে গিয়েছিলেন, বড়ো সুন্দর দেশ। দার্জিলিংয়ের মতো চারদিকেই পাহাড় ঘেরা। আমরা ছিলাম বোল্ডারে, সেখান থেকেই রকি পর্বতের শুরু। কলেজ ক্যাম্পাসের একটি অতি উৎকৃষ্ট বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলো আমাদের। দুটি শোবার ঘরের একটির সমস্তটা পুব জুড়ে কাচের জানলা ছিলো, সূর্য উঠলে কি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তার আভা ছড়িয়ে পড়তো দেখতাম। একটু পরে সেই আভাই আবার দপ করে শত সহস্র হীরকখণ্ডের দ্যুতিতে ঝলসে দিত চোখ। অন্য শোবার ঘরটিতে আবার সমস্ত পশ্চিম জুড়ে জানালা ছিলো, বিকেল পড়তেই পাহাড়ের মাথায় অন্য আলোর ঐশ্বরিক বিভা হরণ করতো হৃদয় মন।

সেই সব পাহাড়ে একটি তৃণও জন্মাতো না, লোহারঙা লালচে পর্বত যেন আকাশের ঢেউ খেলানো রঙিন পর্দা।

বেশী উঁচুর সবগুলো চূড়াকেই এক এক ধরনের মূর্তি বলে ভ্রম হতো। বিছানায় শুয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তাকিয়ে তাকিয়ে আমি তাদের ঈশ্বরের দূত বলেই কল্পনা করতাম। প্রায় ভয়াবহ ছিলো সেই সৌন্দর্য। আমরা থাকতাম দোতলায়, চারদিক ঘিরেই সব একতলা বা দোতলা বাড়ি, মাঝখানে চৌকো সবুজ লন। লনের চারপাশে নানা রঙের চিনেমাটির টালিপাতা চওড়া নিচু বারান্দা, সবুজ ঘাসের চারপাশ ঘিরে অজস্র ফুল। বাগানে সারারাত আলো জ্বলতো, শুধু চাঁদনি রাতে নিবিয়ে দিত সেই আলো। জ্যোৎস্নার ছিটকে পড়া জালগুলোকে মনে হতো পরীর শরীর।

অনেকের সঙ্গেই সেখানে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিলো আমার। বুদ্ধদেবের একজন বয়স্ক ছাত্রের স্ত্রী, প্রায়ই গাড়ি চালিয়ে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতো। অবশ্য এই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যাপারে প্রতিদিনই যে দম্পতির সঙ্গে আমাদের দেখা হতো তারা ছিলো বাঙালী। ঐ সুদূর বোল্ডার শহরে গিয়ে এই রকম কোনো বাঙালী পরিবারের দেখা পাবো তা ভাবতে পারিনি। আর সত্যি বলতে সেই স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের ক্ষণিক বসবাসের দিনগুলো বড়ো ভালো কেটেছিলো। ভদ্রলোক ছিলেন বৈজ্ঞানিক, ডক্টর ভদ্র, আর তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী অতি কর্মিৎকর্মা এক চমৎকার মেয়ে। লক্ষ্মী একদিন না এলেই আমি ছটফট করতাম, ওরও সময় কাটতো না। কতো যে খাইয়েছে ওরা, কতো যে যত্ন করেছে তার ঠিক নেই। ডক্টর ভদ্রের মতো একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি সর্বত্রই দুর্লভ। আর কী সুন্দর রান্না করতেন। ওঁর সেই রান্নার কাজে ওঁদের ছোট্ট মেয়ে শম্পাই ছিলো আসল সাহায্যকারিণী। এইটুকু টুকু হাতে কী মিষ্টি করে যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চপ গড়তো, দেখার মতো।

ওদের দেশে ওদের ধারণায় কোনো কিছু শিক্ষারই কোনো বয়স নেই। বুদ্ধদেবের সামার ক্লাসে একাধিক বয়স্ক ব্যক্তি ভর্তি হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের বয়েস সত্তর ছিলো। তিনি নিজেও একজন অধ্যাপক, ছুটিতে ভর্তি হয়েছেন এই ক্লাসে। বুদ্ধদেবের পড়াবার বিষয় ছিলো, ইন্দো-ইয়োরোপীয় এপিক। অবশ্যই তুলনামূলকভাবে। একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্য দিকে মহাভারত ও রামায়ণ। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিষয়ে ক্লাস ছিলো। এই ক্লাস নিয়ে বুদ্ধদেব যত সুখী হতেন, মনে হয় সেই সুখ বা উত্তেজনা তাঁর অন্য কোনো ক্লাসে হতো না। ছাত্র-ছাত্রীও সেখানে কম মগ্ন হয়ে পড়তো না। তারা নানা দেশের লোক ছিলো, জার্মান, গ্রীক, ইহুদী —এবং অল্প বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বসে অনেক কৃতবিদ্য প্রৌঢ় ব্যক্তিও শুনতেন সেই ক্লাস, নোট নিতেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। বাড়ি এসে বলতে বলতে বুদ্ধদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। আস্তে আস্তে তিনি নিজেও একজন ছাত্র হয়ে গেলেন।

সে বিষয়ে যেখানে যতো বই পান সব এনে জড়ো করেন টেবিলে, তারপর সারাদিন ধরে সেই পুঁথিপত্র নিয়ে ব্যাকুল হয়ে থাকা। কতো তথ্য, কতো সংকেত, কতো প্রতিসাম্য খুঁদে খুঁদে অক্ষরে নোটে বইয়ের পৃষ্ঠা ভরে ওঠে দেখতে দেখতে। বিস্মান বিদুষী বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর ভিন্ন ভিন্ন অভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কতো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কতো চিন্তার উদ্ভাব খেলে যায় মনের মধ্যে।

একদা কোনো দীর্ঘ অসুস্থতার অবকাশে আমি অতি অল্প বয়সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের চারখণ্ড মহাভারত পড়ে ফেলেছিলাম, সেই মহাকাব্য আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। সেই বই পড়ার পরে আমার এই বোধ জন্মেছিলো যে, ভালো মন্দ বিবেক বুদ্ধি সভ্যতা সভ্যতা জড়তা

কোনো কিছুই কোনো মাপে নেই যদি না তা সমাজরক্ষার প্রয়োজনে লাগে। একমাত্র অনুতাপন এবং অতি লোভ বিষয়েই পরিপূর্ণ নিষেধ ছাড়া সবই সিদ্ধ। সুতরাং আমিও ওঁর এই আগ্রহে মেতে উঠেছিলাম, আমারও অনেক বলবার কথা ছিলো, মানবার ছিলো, বুঝবার ছিলো। কৃষ্ণ বিষয়ে মতামত নিয়ে আমাদের খুব তর্ক হতো। অর্জুনের নায়কত্ব বিষয়েও আমি খুব সমর্থক ছিলাম না। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ যে পায় তাকে ঠেকায় কে?

কলোরাডোতেও যখন সেই বিষয়েই ক্লাস নেবেন জানিয়েছিলেন, নোটিশ দেখে সামার ক্লাসে পণ্ডিত বিদ্বান এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদেরও ভিড় জমলো অনেক। তাঁদের একজনের স্ত্রীর সঙ্গেই আমার ভাব হয়েছিলো।

একদিন মহিলাটি বললেন, 'মিসেস বোস, আমার দিদি কোনোদিন কোনো ভারতীয় মহিলা দেখেননি। তাঁর খুব শখ আপনাদের একবার তাঁর জঙ্গলে যেতে বলেন। যাবেন?'

'জঙ্গল।'

'শহর ছাড়িয়ে প্রায় চোদ্দো মাইল দূরে, সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উপরে একটি পর্বতের মাথায় তিনি একটি বহু ক্রোশ বিস্তৃত জঙ্গল কিনেছেন, আজ প্রায় দশ বছর যাবৎ সেখানেই বসবাস করছেন। কখনোই লোকালয়ে আসেন না, দিনের পর দিন পশুপ্রাণী পাখি ছাড়া কোনো মানুষের মুখ দেখেন না। কেন না ওঁর অধিকৃত জঙ্গলের মধ্যে কোনো মনুষ্যের প্রবেশ নিষেধ।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'আপনারও প্রবেশ নিষেধ?'

'আমার একটা ব্যাপার আছে। দিদির আপনজন জগতে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমার ভগ্নিপতির সঙ্গে দিদির বিচ্ছেদ হবার পর থেকে আমি দিদির সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতাম। কেননা আমারও তো দিদি ছাড়া কেউ নেই। দিদি দশ বছর আগে যখন এই নির্বাসনে এলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন অত্যন্ত প্রয়োজন বা বাধ্য না হলে আমৃত্যু কোনোদিন কোনো মানুষের মুখ দেখবেন না, সেই শুনে আমি খুব কেঁদেছিলাম। তখন দিদি ঐ জঙ্গলের মধ্যেই এককোণে আমাকে একটি ঘর তোলবার অনুমতি দেন। যখন খুশি তখন এসে থাকার অনুমতিও আছে। কিন্তু আমার স্বামী এবং সন্তান ছাড়া আর কারোকে নিয়েই ফটক দিয়ে ঢোকা নির্বন্ধ। আর গেলেই যে দিদির সঙ্গে দেখা হয় তা নয়। একই পাহাড়ের মাথার উপরে সামান্য উঁচু-নিচুতে বাড়ি হলেও দূরত্ব যথেষ্ট। দূরত্ব অতিক্রম করলেও নির্দিষ্ট দিন ছাড়া তিনি দেখা করেন না।'

'এভাবে সম্পূর্ণ একা দশ বছর যাবৎ আছেন?'

'আর একজন বৃদ্ধা ব্যারিস্টার মহিলাও আছেন সঙ্গে, তিনিও ডিভোর্সড। তিনিও মনুষ্য সংস্রব বর্জিত হয়ে, দিদির সঙ্গে থাকেন।'

'কী খান?'

'এখন তো বলা যায় প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। জঙ্গলেই চষে ফেলেছেন গম করেছেন, ভার্সির ক্ষেত করেছেন, তারপর শাকসবজি তরকারি এ সবের ফলনও বেশ ভালো।'

'এ সব করতে লোক লাগে না?'

'না না, লোক কোথায়? সব নিজেরা। জঙ্গলটা কেনার পরে মাস ছয়েক প্রস্তুতিতে কাটে, ঐটুকুই। দুটি ঘোড়া আছে, তাদের পিঠে সওয়ার হয়েই বেড়ান সেই জোহদ্দিতে, তবে পায়ে হেঁটেই বেশী। একটি পুরোনো গাড়িও আছে অবশ্য, সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা সেই গাড়ি নিয়ে এসে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ঘোড়ার দানা নিয়ে যান, মাংসও নেন।'

'কে দেয়? কী করে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সব পান?'

'ওটা বন্দোবস্ত আছে দোকানের সঙ্গে। চিঠি লিখে দিলেই তারা জায়গা মতো রেখে যায়। না পারলে লিখে জানায়।'

'তা হলেও তো মানুষের সংস্রব দরকার। খাম পোস্টকার্ড কিনতে হবে। চিঠি এলে তা আনতে হবে—'

'তারও বন্দোবস্ত আছে। একটা ডাকগাড়ি সপ্তাহে একদিন এই পথে যায়, এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে এসটস পার্কের দিকে। সেখানে একটি মালভূমি আছে সেই মালভূমির উপরে সরকার একটা টুরিস্ট সেন্টার করেছে, উঠতে উঠতে সত্যি বড়ো স্বর্গোদ্যান পড়ে পথে। সেই বাগান যে কী সুন্দর সাজানো, কতো যে ফুল, কতো যে পাখি তার ঠিক নেই। বছরের যে কোনোদিন গেলেই তেমনি সজীব বাগান, তেমনি পাখির গান। কোনোদিন গাছের পাতা হলুদ হয় না। কিন্তু সেটা কোনো মনুষ্য নির্মিত নয়, প্রকৃতিরই সাজানো বাগান। আমাদের অনেক সংস্কার আছে, কোনো মালি কখনো সেই বাগানে হাত দেয় না। সেই ডাকগাড়িই দিদির কোনো চিঠি থাকলে দিয়ে যায় নিয়ে যায়। ফটকের ধারে একটা লম্বা গাছ আছে, তার গায়ে ডাকবাক্স বাঁধা। লাল নিশেন আছে, সেটা নামানো থাকে, চিঠি দিয়ে গেলে পিয়ন সেটাকে, দড়ি টেনে গাছের মাথায় উঠিয়ে দেয়, দিদি ঘর থেকেই দেখতে পান জানালা দিয়ে। তখন এসে চিঠি নিয়ে যান, আর যদি চিঠি রেখে যান বাক্সে তবে নামিয়ে রেখে যান সেই নিশেন। ডাকগাড়ি যেদিন যায়, নামানো দেখলে থামে, বোঝে যে ডাকে দেবার চিঠি আছে। তখন নিয়ে যায়।'

ভালো ফ্যাশনের
অন্তরালে থাকে গবেষণা...
উৎকৃষ্টতা...
অরবিন্দ
...অনুসন্ধান জাত

পকসম্ভই। তোমাদের আমি সব দেখাবো, এসটেস পার্ক, সোনার খনি—জান তো এই বোল্ডার শহর সোনার খনির জন্য বিখ্যাত? এই একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে কতোগুলো খনি ছিলো, এমন নজির নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তা হলে দিনের ওখানে যাবার কথাটা পাকা করি আগে, কী বলো?'

'খুব ভালো।'

এরপরে বন্ধুদেবের সঙ্গে সময় মিলিয়ে পাকা হলো কথা। আর সেই দিনই আমরা রেড ইন্ডিয়ান দেখলাম। মিসেস ম্যাকলিন অনেকটা আগে এলেন, বললেন, 'যদি প্রস্তুত থাকো, চলো এখুনি বেরিয়ে পড়ি পথে তোমাদের আর একটা জায়গাও দেখিয়ে নিয়ে যাই। একটা হিলটপ আছে মাইল তিনেক গেলে, তারি সুন্দর পাহাড় ঘেরা রেড ইন্ডিয়ান বাচ্চাদের স্যানাটোরিয়াম সেখানে। বাচ্চাগুলো এতো মিষ্টি, আমরা প্রায় যাই।'

তখুনি রওনা হলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেই হিলটপে। যতো দুর্গম স্থানই হোক, অরণ্য যতো নিবিড়ই হোক, প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে তার সব গহন সৌন্দর্য খুঁজে নিয়ে এরা নিবাস বানিয়েছে। রেড ইন্ডিয়ান বাচ্চাদের জন্য এই নিবাসটি যেন কল্পনার স্বপ্নবাস। দেবভূমি ছাড়া সত্যি জায়গাটাকে আর কিছু মনে হয় না। সামান্য উঁচু নিচু ভর্তি প্রায় সমতল পর্বতচূড়ায় ছোটো বড়ো কটেজের সারি, আঁকাবাঁকা কাঁকর ঢালা পথ, পাশে পাশে বাগান হ্রদ প্রস্রবণ গুহা খেলার মাঠ রঙিন মাছের চৌবাচ্চা—ফুরফুরে বাচ্চারা যেন তার মধ্যে সব প্রজাপতি।

নানা বয়সের নানাবিধ ধরনের টি বি রোগীর জন্য নানা রকম বাড়ি, নানা রকম ওয়ার্ড, নানা রকম ওষুধপথ্য। ঊর্ধ্বে পনেরো বছরের রোগী থেকে নিচে একটি আট মাসের বাচ্চা পর্যন্ত আছে।

'আট মাসের বাচ্চারও টি বি হয়?' আমি একেবারে অবাক।

মিসেস ম্যাকলিন সব বাচ্চাদেরই কিছু কিছু খাবার দিচ্ছিলেন। আমি জানি না, আমি নিয়ে যাইনি, আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো কিছু দিতে না পেরে। নার্সরা আমাদের যে সব ওয়ার্ডে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন, তারা সব সারবার মুখে এবং ছোঁয়াচে নয়। ছোঁয়াচে রোগী আরো একটু উপরে থাকে, পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাদের ঘর। বাচ্চারা আমার শাড়ির পোশাক দেখে আমাকে বোধ হয় মানুষ বলে চিনতে পারছিলো না। কেউ কেউ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে থমকে দাঁড়াচ্ছিলো, কেউ সভয়ে যার যার খাটে উঠে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ করছিলো. অনেক বাচ্চা তাদের নার্সকে জড়িয়ে ধরছিলো, আবার অনেক বাচ্চা কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছিলো, 'তুমি কে?'

এর মধ্যে একটা বাচ্চা হাঁটু বেয়ে কোলে উঠতে চাইল, 'কিস্ মি মামমি' বলে কান্না জুড়ে দিল। আর একটা বাচ্চা আমার কোমরে ঝুমঝুমি দেওয়া ঝোলানো চাবির ক্লিপটার জন্যে বায়না ধরলো—এই সব বাচ্চারা দু থেকে পাঁচের মধ্যে। হঠাৎ একটি বাচ্চা জেদ ধরলো আমার সঙ্গে চলে যাবে বলে। যদিও নার্স বারণ করেছিল। তবু সে আঁচল ছাড়ছিলো না। আমার খুব ইচ্ছে করছিলো ওকে সত্যি সত্যি নিয়ে আসি সঙ্গে করে, তা তো হয় না। কী ভীষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো জোর করে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময়! তখন ওদের ওষুধ খাবার সময় হয়ে গিয়েছিলো। দেখলাম একটা ঘরে লম্বা এ-মাথা ও-মাথা সিমেন্টের সরু টেবিলের উপর পুরিয়া করে নাম এবং নম্বর লিখে লিখে সাজানো আছে ওষুধ। ট্যাবলেটের গুঁড়ো। বললো এই রোগটা ওদের খুব হয়। খাটে বেশী খায় কম, আর এই উঁচু নিচু পাহাড় ভেঙে খাদ্য সংগ্রহ করতে করতেই ফুসফুসের রোগে ধরে। তারি মধ্যে বাচ্চা হয়, বাচ্চাগুলোও এ থেকে নিস্কৃতি পায় না। তবে বাচ্চা ওদের খুব কম হয়। প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে এই আদিবাসী গোষ্ঠী। সরকার তাই খুব যত্ন করছে এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আর, টি বি রোগ তো নিয়মমতো ওষুধ পথ্য পেলেই সেরে যায়, তাই বলা যায় প্রায় সেন্ট পার্সেন্টই বাঁচে। মরেও অবশ্য।

বাচ্চাগুলো সাংঘাতিক মোটাসোটা, যাকে বলে একেবারে 'রলি পলি' ঠিক তাই। রং সাহেবদের মতো ফর্সা নয়, ঘষা মাজা উজ্জ্বল শ্যাম। আমার মনে হয় মহাভারতের দ্রৌপদীর রং ঠিক এরকম ছিলো। বোধহয় অর্জুনেরও। এ দেশের খাঁটি মঙ্গোলিয়ান চেহারা, প্রত্যেকেরই গালের হাড় উঁচু, চোখ ছোটো ছোটো এবং ভাসা, ঠোঁট পাতলা, নাক কারো কারো চোখা, কারো কারো বোঁচা। চুল চোখ দুইই কালো। আর সকলের চেহারার মধ্যেই এমন একটা সারল্য মাখানো মনে হয় এখনো ওরা পাহাড়-পর্বতের মধ্যে জঙ্গলে ঘাসেই বড়ো হচ্ছে। সেই সারল্য আর পাঁচটা শিশুর সারল্যের মতো নয়, জাতির সারল্য।

ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে সেদিন ক্রমাগতই আমার মাথার মধ্যে চাঁদ তারা ধূমকেতুর সঙ্গে রেড ইন্ডিয়ানদের অত্যাচারিত জীবন মিলে-মিশে এক হয়ে যাচ্ছিলো।

ধূমকেতুটা দেখেছিলাম বেরুবার মুখে। দৈর্ঘ্যে প্রায় একতলা সমান উঁচু, প্রস্থে অন্তত কুড়ি বাই কুড়ি একটা ঘরের মতো। এটা নাকি ধূমকেতুর একটা ছোট্টো টুকরো মাত্র। সবাই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে বেয়ে উঠে মাথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলো, ছবি তুলছিলো। সমবেতভাবে বাচ্চারা হুটোপুটি করছিলো। আমি হাঁ করে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, বিশ্বচরাচরে কতো কাণ্ডই ঘটাচ্ছেন ঈশ্বর।

সুখবর !

এল.আই.সি-র
মানি ব্যাক পলিসি-র
এখন ২টি নতুন রূপ-
২০বছর এবং ২৫ বছর

এল. আই. সি- র মানি ব্যাক পলিসি এখন পাবেন ২০ এবং ২৫ বছরের মেয়াদের জন্য (আগেকার ১২ এবং ১৫ বছরের মেয়াদ ছাড়াও)

২০-বছর প্রকল্প (বীমাকৃত টাকা, ধরুন ১০,০০০ টাকা)
আপনি পাবেনঃ
৫ বছর পরে—২,০০০ টাকা
আরো ৫ বছর পরে—২,০০০ টাকা
আরো ৫ বছর পরে—২,০০০ টাকা
আরো ৫ বছর পরে—বাকি ৪,০০০ টাকা—এছাড়া ১০,০০০ টাকার ওপর ২০ বছরের লভ্যাংশ।

মেয়াদকালীন পুরো বীমাকৃত টাকাই সুরক্ষিত থাকে।

২৫-বছর প্রকল্প (বীমাকৃত টাকা, ধরুন ১০,০০০ টাকা)
আপনি পাবেনঃ
১০ বছর পরে—২,০০০ টাকা
আরো ৫ বছর পরে—২,০০০ টাকা
আরো ৫ বছর পরে—২,০০০ টাকা
আরো ৫ বছর পরে—বাকি ৪,০০০ টাকা
এছাড়া ১০,০০০ টাকার ওপর ২৫ বছরের লভ্যাংশ।

মেয়াদকালীন পুরো বীমাকৃত টাকাই সুরক্ষিত থাকে।

এখন আপনার সঞ্চয় আপনার সবরকম প্রয়োজন মেটাতে পারে—বিয়ে, লেখাপড়া, ছুটি উপভোগ, বাড়ির জন্য নগদ ইত্যাদি। আর দীর্ঘকালীন সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে থাকতেই এইসব সুবিধে ভোগ করতে পারবেন।

আপনার এজেন্টের কাছে পুরো বিবরণ জেনে নিন

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

daCunha/LIC/54 BN

উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ ১৫ ॥

সরিৎশেখর আজ সকালে শিলিগুড়ি গিয়েছেন। ওঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত পাগলঝোড়া টি এস্টেটের রিটায়ার্ড হেডক্লার্ক তেজেন বিশ্বাসের গৃহপ্রবেশ আজ। সরিৎশেখরের যাবার ইচ্ছে ছিল না বড় একটা, গেলেই খরচ। ইদানীং টাকা-পয়সার ব্যাপারে আগের মতন দরাজ হতে পারেন না তিনি। পেন্সনের টাকা, সামান্য শেয়ারের ডিভিডেন্ড আর মহীতোষের পাঠানো অনির নাম করে কিছু টাকা—এর মধ্যেই তাঁকে ম্যানেজ করতে হয়। সেটা করতে গিয়ে এখন একটা আধুলি তাঁর কাছে আটটা আনার মতই মূল্যবান। তাই তেজেন বিশ্বাস যখন এসে হাতজোড় করে যাবার জন্য অনুরোধ করল তখন সরিৎশেখর বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এখন প্রতিদিন তাঁকে হিসাব করে চলতে হয়। ব্যাঙ্কে প্রায় তলানিটুকু পড়ে আছে, বাড়িটা এবার ভাড়া না দিলেই নয়। অবশ্য হেমলতার নামে ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা তিনি একসময় রেখেছিলেন। কিন্তু সে টাকার কথা চিন্তা করতে গেলে নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়। তা তেজেন বিশ্বাসের বাড়িতে হেমলতাই জোর করে পাঠালেন বাবাকে। এই একঘেয়ে জীবনের বাইরে একটু ঘুরে আসা হবে, মনটা ভাল থাকবে। সেজেগুজে আজ সকাল নটার ট্রেনে শিলিগুড়ি চলে গেলেন সরিৎশেখর, সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে আসবেন অবশ্যই।

আজ স্কুল ছুটি। দাদু চলে যাওয়ার পর অনি পড়ছিল নিজের ঘরে। শীত চলে গেছে, স্কুলে পড়াশুনা এখন জোর কদমে চলছে। এমন সময় বাইরের দরজায় খুব জোর কড়া নড়ে উঠল। বই রেখে ঘরের বাইরে এসে অনি দেখল পিসীমা রান্নাঘরে রয়েছেন, কড়ানাড়ার শব্দ বোধ হয় কানে যায়নি। ইদানীং হেমলতা কানে একটু কম শুনছেন। কড়াটা আর একবার শব্দ করে উঠতেই অনি দৌড়ে এসে দরজা খুলল।

মাঝবয়সী একজন মহিলা, মাথায় অনেকখানি ঘোমটা দেওয়া, অথচ ঘোমটা দেওয়ার ধরন থেকে বোঝা যায় অনভ্যস্ত হাতে দেওয়া, একটি বছর দুয়েকের বাচ্চার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। অনিকে দেখা মাত্র মহিলা হাসলেন তারপর বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অনি, না?' অনি দেখল হাসবার সময় মহিলার কালো মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। কেমন একটা বিচ্ছিরি সেন্ট না পাউডারের গন্ধ ওঁর শরীর থেকে আসছে। অনি ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বাচ্চাটাকে বললেন, 'প্রণাম করো, প্রণাম করো, তোমার দাদা হয়।' বলামাত্র দম দেওয়া পুতুলের মত বাচ্চাটা হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের মাটি ছুঁয়ে মাথায় বোলাল। অনি চমকে উঠে সরে দাঁড়াতে গিয়েও সুযোগ পেল না। আজ অবধি কেউ তাকে প্রণাম করেনি, এতকাল ওই সবাইকে প্রণাম করে এসেছে। ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল। এই সময় বাচ্চাটা আধো আধো গলায় বলে উঠল, 'জল খাবো।'

'তোমাকে জল খাওয়াবে, দুধ খাওয়াবে, সন্দেশ খাওয়াবে, তাই না?'

অনি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'আমি?' মহিলা আবার হাসবার চেষ্টা করলেন, 'চিনতে পারছ না তো! আচ্ছা আগে বল বাড়িতে এখন কে কে আছেন?'

'আমি আর পিসীমা।'

'দাদু কোথায় গেছেন, বাজারে?'

'না। দাদু আজ শিলিগুড়িতে গিয়েছেন।'

'ও তাই নাকি!' বলে মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন গেটের দিকে। সেখানে কেউ নেই কিন্তু মহিলা গলা তুলে ডাকলেন, 'চলে এস, তোমার বাবা বাড়িতে নেই।' অনি অবাক হয়ে দেখল গেটের একপাশে ইলেকট্রিক পোস্টের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এদিকে আসছে। তার মুখ চোখ কেমন বসা বসা, গায়ের শার্ট খুব ময়লা আর পাজামার নিচের দিকটার অনেকটা ফাটা। কাছাকাছি হতে অনির মনে হল এঁকে সে চেনে, খুবতানির কাছে অতখানি দাড়ি থাকলা সত্ত্বেও ভীষণ পরিচিত মনে হচ্ছে। ও চকিতে মহিলার দিকে তাকাল। এতক্ষণ যেটা লক্ষ করেনি সেটা দেখতে পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মহিলার শাড়িটা বোধহয় ঠিক আস্ত নেই আর বাচ্চাটার জুতোর ডগা ফেটে পায়ের আঙুল বেরিয়ে এসেছে। ঠিক এইসময় লোকটি কাছাকাছি হয়ে মোটা গলায় বলল, 'আমাদের অনির দেখি স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছে।' কথাটা শোনামাত্র অনি আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না। কয়েক লাফে সমস্ত বাড়িটা ডিঙিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। হেমলতা তখন মাটিতে বঁটি নিয়ে বসে তরকারি কুটছিলেন। ছেলেটাকে হনুমানের মত দুপদাপ করে আসতে দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই অনি তাঁর কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, 'জ্যাঠামশাই এসেছে।'

অল্পের জন্য বঁটিতে আঙুলটা দুটুকরো হল না, হেমলতা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এসেছে?'

'জ্যাঠামশাই, সঙ্গে একজন বউ আর এইটুকুনি একটা বাচ্চা ছেলে।' কথাটা বলতে বলতে অনি দেখল পিসীমা সোজা হয়ে বসে বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এমন গলায় হেমলতা বললেন, 'পরিতোষ এসেছে? তুই চিনতে পারলি? কিন্তু ও তো বিয়ে থা করেনি—যাঃ, তুই ভুল দেখেছিস।' হেমলতা উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় হাঁকটা ভেসে এল রান্নাঘরে, 'ও দিদি, কোথায় গেলে! দ্যাখো, কাদের এনেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বজ্রাহতের মত বললেন, 'পরিই তো। কিন্তু এখন আমি কি করবো, গুরুদেব আমি কি করবো এখন?'

'আরে তোমাকে ডাকতে ডাকতে গলা ধরে এল আর তুমি এখানে বসে আছ, বাইরে এস, প্রণাম করি।' অনি দেখল জ্যাঠামশাই রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।
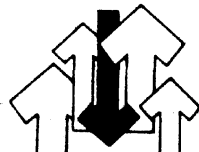
হেমলতা ভাইয়ের দিকে তাকালেন। এত বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে যে চট করে চেনা মুশকিল। এই ভাই তাঁর বড় ভাই, এককালে সেই ছেলেবেলায় ওঁর কত আদরের ছিল—হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন নড়ে চড়ে উঠতেই কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলেন হেমলতা। বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এবাড়িতে ওর প্রবেশাধিকার নেই। এতদিন পর কোথা থেকে উদয় হল?

যেন হেমলতা কি চিন্তা করছেন টের পেয়ে গেল পরিতোষ, 'কিছু চিন্তা করো না, তোমাদের বাবার ফেরার আগেই কেটে পড়ব।'

এতক্ষণে হেমলতা যেন সাড় পেলেন, শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এলি?'

'তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল, তাছাড়া—' একটু থেমে অনির দিকে তাকাল পরিতোষ, 'অনেকদিন বউ বাচ্চাটা পেট ভরে খায়নি। অবশ্য তোমাদের বাবার বাড়ি থাকলে আমি ঢুকতাম না। বউটা শালা কিছুতেই শুনতে চায় না, একবার শ্বশুরবাড়ি আসবেই, বাঙাল তো, গোঁ ভীষণ।'

'বাঙাল? বাঙালের মেয়ে বিয়ে করেছিস তুই?'

'বিয়ে করিনি। করতে বাধ্য হয়েছি। আমার একটা বাচ্চা ছেলে আছে, তাকে তুমি দেখবে না?'

হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন। বাবাকে তিনি চেনেন। আজ অবধি ভুলেও একবার বড়ছেলের নাম করেননি কখনো। বরং প্রিয়তোষের খোঁজ খবর গোপনে গোপনে নেবার চেষ্টা করছেন তিনি—হেমলতা সেটা বুঝতে পারেন। পরিতোষ তাঁর কাছে মৃত। এই অবস্থায় হেমলতার কি করা উচিত? ভাইকে থাকতে বলা মানে বাবাকে অসম্মান করা নয়? আর সন্ধ্যের মধ্যেই তো তিনি ফিরবেন, তখন? অবশ্য সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী আছে। হেমলতা দরজার সামনে এলে পরিতোষ ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি চমকে পিছিয়ে দাঁড়ালেন, 'রাস্তার ময়লা কাপড়ে ছুঁয়ে দিয়ো না, আমার স্নান হয়ে গেছে।'

পরিতোষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমার তো আর জামা কাপড় নেই।'

হেমলতা বললেন, 'তাহলে সরে দাঁড়াও, প্রণাম করার প্রয়োজন নেই।'

পরিতোষ দিদির কাছ থেকে এই ধরনের কথা আশা করেনি, স্খলিত গলায় সে উচ্চারণ করল, 'তুমি মাইরি বাবারই মতই নিষ্ঠুর।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নিজে যেন সাধুপুরুষ! এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই যার সে আবার অন্যকে নিষ্ঠুর বলে।' কথাটা শুনেই পরিতোষ গর্জে উঠল, 'অ্যাই, চুপ!'

'চুপ করবো কেন? অনেক চুপ করেছি আর নয়।'

কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা উঠোনের দিকে তাকাতেই দেখলেন বারান্দার সিঁড়িতে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে একটি রোগাটে বউ বসে আছে। বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলেন হেমলতা, 'এরা কারা?'

যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় পরিতোষ বলল, 'ওই তো, তোমার ভাইবৌ আর ভাইপো। দিদিকে আবার প্রণাম করতে যেও না, রাস্তার কাপড়ে আছ।'

'এমন ভান করে যেন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।' মুখ নেড়ে পরিতোষকে কথাটা বলল মহিলা, তারপর হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল তার। বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে হেমলতার দিকে এগিয়ে এসে প্রায় কেঁদে ফেলল, 'মুখে বড় বড় কথা বলত লোকটা, তাই শুনে ভুল গেলাম। বিয়ের পর একদিনও পেট ভরে খেতে পাইনি, বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ার পর একে আর দুধ দিতে পারিনি। দিদি, আমি ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, আপনিও তো মেয়ে, আমাকে ক্ষমা করবেন না?'

হেমলতার পেছন পেছন অনি বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ পরিতোষ যেন তাকে আবিষ্কার করে বলে উঠল, 'এই ছেলেটা, তুমি এখানে কি করছ? যাও, বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই।' তারপর চাপা গলায় বলল, 'বাবারের পেয়ারের নাতি তো, এলেই সব রিপোর্ট করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন হেমলতা, 'পরি, তুই—তুই একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিস। ছি ছি ছি। সারাটা জীবন বাবাকে জ্বালিয়ে এলি, নিজের এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই আবার এই মেয়েটাকে বিয়ে করে কষ্ট দিচ্ছিস, ছি!'

হাসল পরিতোষ, 'বিয়ে আমি করিনি, আমাকে করেছে।'

মহিলা এইসময় ডুকরে কেঁদে উঠতে হেমলতা বিচলিত হয়ে উঠোনে নেমে এলেন। জ্যাঠামশাইয়ের ধমক খেয়ে অনি কি করবে বুঝতে পারছিল না। লোকটা খারাপ, খুবই খারাপ, তাদের বাড়িতে কেউ এভাবে কথা বলে না। ও দেখতে পেল বাচ্চাটা টলতে টলতে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে বকফুলের গাছের দিকে চলে যাচ্ছে—সেদিকে কারো নজর নেই। জ্যাঠামশাইয়ের

গেল। বেচারা এত নির্জীব যে সামান্য হেঁটে আর দাঁড়াতে পারছিল না, অনিকে পেয়ে ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরল। পরিতোষ সেটা লক্ষ করে বলল, 'বাঃ, দুই ভাইয়ে দেখছি বেশ ভাব হয়েছে।'
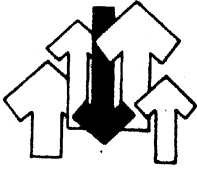
মহিলা তখনও কাঁদছিল। হেমলতা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বয়েস বেশী নয় কিন্তু অসম্ভব পোড় খাওয়া—দেখলেই বোঝা যায়। ভাল খেতে না পেয়ে শরীর ঝরাটে হয়ে গেছে। এ বাড়ির বউ হবার কোন গুণ চেহারায় নেই। মাধুরী বা নতুন বউয়ের চেহারা দেখলে মনটা যে স্নিগ্ধতায় ভরে যায় এই মেয়েটির মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই।

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?'

যেন বেরিয়ে আসা কান্নাটা গিলছে এমন গলায় উত্তর এল, 'সাবিত্রী'।

'তোমার বাবা কি বিয়ে দেবার আগে খোঁজ খবর নেননি?' কাটাকাটাভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন হেমলতা। উঠোনের এক কোণে বাচ্চাটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে অনি অন্যদিকে তাকিয়ে পিসীমার কথা শুনছিল। এতদিনের দেখা পিসীমার সঙ্গে এই পিসীমাকে ও কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। হঠাৎ ওর মনে হল পিসীমার গলা দিয়ে যেন দাদু কথা বলছেন।

'আমার বাবা নেই, যশোরে দাঙ্গার সময় মারা যায়। বিয়ের পর আমরা জানতে পারলাম উনি ত্যাজ্যপুত্র।' সাবিত্রী বলল।

'বাঃ, বিয়ের আগে ছেলের বাড়িঘর আত্মীয়-স্বজন কেউ? চমৎকার!' হেমলতা হিসেব মেলাতে পারছিলেন না।

পরিতোষ হাসল, 'তখন আর উপায় ছিল না যে। আমাকেও কেটে পড়তে দিল না, যাতায়াতি জোর করে বিয়ে দিয়ে দিল। নইলে আমাদের বংশে—'

'চুপ কর! তোর মুখে বংশ কথাটা একদম মানায় না। যাক, বাচ্চাটাকে নিয়ে যখন এসেছ তখন এমনি চলে যেতে বলছি না। তবে সন্ধেবেলায় বাবা আসার আগেই বিদায় হয়ো। আর তাঁর অনুমতি না পেলে এই বাড়িতে কখনই এসো না—মনে থাকে যেন।' হন হন করে আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন হেমলতা।

পিসীমা চোখের আড়াল হওয়ামাত্র অনি জ্যাঠামশাইকে মাথার ওপর দুহাত তুলে একটা নাচের ভঙ্গী করতে দেখল। জেঠিমার কান্না চট করে থেমে গিয়ে কালো কালো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। বড় বড় পা ফেলে জ্যাঠামশাই জেঠিমার কাছে নেমে এসে চাপা গলায় বললেন, 'দারুণ হয়েছে। তুমি মাইরি জব্বর অ্যাক্টিং করলে সাবু। বড়দি একদম আউট।'

জেঠিমা বললেন, 'ঝগড়াটা না বাধালে তোমার দিদি আমার কথা শুনতোই না।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি তো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম তুমি অরিজিনাল ছাড়ছ কিনা!'

জেঠিমা বললেন, 'পাগল। একটা কথা তো সত্যি বলেছ।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কি?'

'এই বাড়িটার কথা। এতবড় বাড়ি যার তাকে কি বকা যায়?' এমনভাবে হাসলেন জেঠিমা যে অনির খুব খারাপ লাগল।

এটা আমার বাবার বাড়ি—আমার নয়। তা ছাড়া আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে—নো রাইট এই বাড়িতে।' জ্যাঠামশাই উদাস গলায় বললেন। ও'র চোখ সমস্ত বাড়িটায় ঘুরছিল।

'দেখো না, আস্তে আস্তে সব জল হয়ে যাবে। একটা সত্যি কথা বলবে, ... বলে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল না অন্য কারণ ছিল?' জেঠিমার চাপা গলার স্বর কেমন হিসহিসে।

পরিতোষ খুব অস্বস্তির মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কাইটিং করো না, একটু লটঘট করেছিলাম। প্রথম যৌবন তো।'

কি বললে? বুড়ো ভাম, পাঁচ বছর আগে প্রথম যৌবন ছিল তোমার—' ফুঁসে ওঠা সাবিত্রীকে হাত জোড় করে থামিয়ে দিল পরিতোষ, 'নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে শেষ পর্যন্ত লক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে চাও, আরে পুরুষমানুষের ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে, তা নিয়ে কেউ মাথা খারাপ করে না। তাছাড়া দুজনের ধান্দাই তো এক।'

সাবিত্রী নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেও বোঝাই যায় হজম করতে পারছে না ব্যাপারটা। হঠাৎ ও এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে দেখল সে অনির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সে, 'খুব তো চেঁচিয়ে ভেতরের কথা বলছ ওদিকে ছোঁড়াটা হাঁ করে সব গিলচে।' কথাটা শোনামাত্র পরিতোষ ঘাড় ঘুরিয়ে অনিকে দেখতে পেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সাবিত্রী চাপা গলায় তাকে বাধা দিল, 'খবরদার বকাবকি করবে না। মিষ্টি কথায় ওকে হাত করে নিতে হবে।'

অনি দেখল জেঠিমা ওর দিকে আসছে। বাচ্চাটা তখন থেকে ঠায় ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অনি বুঝতে পারছিল ছেড়ে দিলেই এ পড়ে যাবে। জেঠিমা বললেন, 'কি সুন্দর দেখতে তোমাকে অনি। আহা। মার জন্য খুব কষ্ট হয়, না? সৎমা মারে?'

অনি জেঠিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল না কি জবাব দেবে। আজ অবধি এধরনের প্রশ্ন তাকে কেউ করেনি। এরা এবাড়িতে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করছে এটা ও বুঝতে পারছিল। ত্যাজ্যপুত্র হলেও জ্যাঠামশাই এবাড়ির সব খবর রাখে।

বাচ্চাটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে অনি বলল, 'একে ধরুন।' সাবিত্রী অবাক হয়ে বাচ্চাটাকে টেনে নিতে নিতে দেখল অনি গট গট করে উঠোন পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। রাগে গা জ্বলে গেল সাবিত্রীর। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পরিতোষের কাছে এসে বলল, 'দেখলে, ছেলেটার তেজ দেখলে? কথাটার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না!'

পরিতোষ মুখ বেঁকাল, 'কাদায়ের সব কটা বয়স্ত ভাইসেস ও পেয়েছে। আচ্ছা করে অড়ং ধোলাই দিতে হয়!'

চোখের আড়াল হতেই অনি পা টিপে টিপে বাগানের মধ্যে দিয়ে ফিরে এল। গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ও রান্নাঘরের ওপর নজর রাখতে লাগল।

'বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে জামা খুলতে খুলতে পরিতোষকে বলতে শুনল অনি, 'ও বড়দি, আজ তোমার হাতের রান্না খাবো।'

হেমলতা কোন উত্তর দিলেন না। পরিতোষ কান পেতে উত্তরটা শোনার চেষ্টা করে না পেয়ে যেন খুশী হল। অনি দেখল জ্যাঠামশাই জেঠিমার দিকে একটা চোখ কুঁচকে হাসলেন। জামাটা খুলতেই অনির চোখ বড় হয়ে গেল। জ্যাঠামশাইয়ের গেঞ্জিটা ছিঁড়ে ফেটে একাকার। দু'এক জায়গায় সেলাই করে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। পিসীমা বলেন গেঞ্জি সেলাই করে পরলে লক্ষ্মী চলে যায়। জ্যাঠামশাই কি করে ওঠা পরেন?

জ্যাঠামশাই পায়ের ওপর পা দিয়ে বললেন, 'দিদির রান্না কোনদিন খাওনি তো, আহা, মাইরি তোমরা রাঁধতে জানো না।'

জেঠিমা খিঁচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'রান্না করার মত জিনিস কোনদিন এনেছ যে রাঁধবো? শুনলে গা জ্বলে যায়।'

হঠাৎ জ্যাঠামশাই উঠে বসলেন, 'যাও না, দিদিকে একটু সাহায্য করো। একা একা রাঁধছেন, দুই একটা পদ তৈরি করে নিজের এলেম দেখাও!'

জেঠিমা হতচকিত হয়ে বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন এমন সময় পিসীমার গলা ভেসে এল, 'কাউকে আসতে হবে না। রাস্তার কাপড়ে এ বাড়িতে কেউ রান্নাঘরে ঢোকে না। বাথরুমে জল আছে, বাচ্চাটাকে একেবারে স্নান করিয়ে দিতে বল। ভদ্রলোকের মতন দেখতে হোক।'

কথাটা শুনে জেঠিমার মুখ বেঁকে যেতে দেখল অনি। জ্যাঠামশাই চট করে উঠে দাঁড়ালেন, 'সেই ভাল, যাও মন দিয়ে সাবান মেখে স্নান করে নাও। আমি বরং ছোঁড়াটার কাছ থেকে লেটেস্ট খবর নিই গে।'

জ্যাঠামশাইকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে অনি চট করে বাগানের ভিতরে চলে গেল। ইদানীং ঝোপঝাড় বেশী হয়ে গেছে বলে সরিৎশেখর লোক লাগিয়ে বাগান সাফ করার কথা বলেন। লোক পাওয়া আজকাল মুশকিল বলেই এখনও পরিষ্কার হয়নি। অনি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাল। জ্যাঠামশাই-য়ের মুখোমুখি হতে ওর একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। লোকটাকে অত্যন্ত বদ মনে হচ্ছে ওর।

খেতে বসে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনি। একটা লোক এত ভাত খেতে পারে? এক সঙ্গে খেতে চায় নি ও, পিসীমা তাগাদা দিয়ে স্নান করিয়ে বসিয়েছেন। বাচ্চাটার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাকে বড় ঘরের মেঝেতে বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে আসা হয়েছে। পরিতোষ স্নান করে সরিৎশেখরের একখানা ধুতি লুঙ্গির মতন জড়িয়েছে। হেমলতা ওতক্ষণ সেটা লক্ষ করেননি। অনির বারংবার তাকানো দেখে বুঝতে পারলেন, 'তুই বাবার ধুতি পরেছিস?'

পরিতোষ খেতে খেতে বলল, 'সিম্পল রান্না অথচ কি টেস্ট, আহা। হ্যাঁ, কি বললে? ধুতি? আমার পাজামার চেহারা দেখেছ? তুমি কোনদিন ও রকম পাজামা আমাকে পরতে দেখেছ? ফিল ইজ লাইক। বুঝলে।'

খেয়ে উঠে ধুতি ছেড়ে রাখবি। একেই তোদের যদি এ সব জানতে পারে—' কথাটা শেষ করলেন না হেমলতা। পরিতোষ দিদির দিকে তাকাল, 'মাইরি দিদি, এটা কি মুসলমানদের তালাক যে জামাপুত্র বললাম আর সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল? তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতো ছেলেবেলার আমার কথা মনে পড়লে কষ্ট হয় না।'

হেমলতা একবার অনির দিকে তাকিয়ে বলব কি বলব না ভাবতে ভাবতে বলে ফেললেন, 'কিন্তু বাবা বলেন যে দুষ্ট ক্ষত হাতে হলে সেটা বাড়তে না দিয়ে যদি হাতটা কেটে ফেলতে হয় তাই ভাল, শরীরটা বাঁচে।' অদ্ভুতভাবে হাসল পরিতোষ। তারপর বলল, 'আর একটু ভাত দেবে? কম পড়বে না তো!'

হেমলতা ভেতর থেকে ভাত এনে দিতে পরিতোষ বলল, 'ব্যাপারটা কি জানো, তোমরা চিরকাল হাতটা কেটে ফেলার কথাই ভেবেছ, ওষুধ দিয়ে হাতটা সারিয়ে তোলার কোন চেষ্টাই করোনি। তুমি কি ভেবেছ আমি পাষাণ? আমার মনের মধ্যে তোমাদের কথা আসে না? আমরা সব ভুলে যেতে পারি কিন্তু ছেলেবেলার কথা ভুলে যেতে পারি?'

হেমলতা বললেন, 'এ সব কথা এখন থাক।'

জ্যাঠামশাই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, জেঠিমা বলে উঠলেন, 'দিদি যখন বলছেন তখন আর কথা বাড়াচ্ছ কেন?' জেঠিমা স্নান করেছেন কিন্তু সেই আগের কাপড়ই তাঁর পরনে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন মেনে নিলেন জ্যাঠামশাই, 'ঠিক আছে, থাক। আমাকে আর একটু আমড়ার টক দাও।'

খাওয়া দাওয়ার পর অনি নিজের ঘরে চলে এল। এখন জ্যাঠামশাইকে, অনেকটা জানা হয়ে গেছে। মুখ ধোওয়ার সময় জ্যাঠামশাই বলেছিলেন যে ওরা হলদিবাড়িতে আছেন এখন। দাদু যে ট্রেনে শিলিগুড়ি থেকে আসবেন তাতেই ওঁদের উঠতে হবে যদি যেতে হয়। না হলে কাল সকালে ট্রেন আছে —রাতটা থেকে যেতে হয়। পিসীমা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, সে চিন্তা যেন ঘুণাক্ষরে মাথায় না আসে, বিকেলের অনেক আগেই ওদের চলে যেতে হবে।

কথাটা শোনার পর থেকে অনি ভাবছিল স্টেশনে যদি মুখোমুখি দেখা হয় তাহলে দাদু ওঁদের চিনতে পারবেন কি না। জ্যাঠামশায়ের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, দাড়ি রেখেছেন তবু দাদু ঠিক চিনে ফেলবেন। কিন্তু তারপর কি হবে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনি যখন এইসব ভাবছে তখন দরজা খুলে পরিতোষ মাথা বাড়াল, 'বাঃ, বেশ ঘরটা তো।' অনি তড়াক করে উঠে দাঁড়াতেই পরিতোষ ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল, 'পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?' কোন রকমে অনি বলল, 'ভাল।'

'খারাপ হবার কথা নয়। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে বাবা—আমার ছেলেটাকে দেখেছ? পেট পুরে খাবার দিতেই পারি না তো পড়াশুনা করাবো —সৎমা কেমন চীজ? শহরের মেয়ে তো?' অনির একটা পেনসিল টেবিল থেকে তুলে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে জ্যাঠামশাই এমনভাবে কথা বলে যাচ্ছিল যে অনি ঠিক তাল রাখতে পারছিল না।

শেষের কথাটা না ধরে অনি বলল, 'সৎমা?'

জ্যাঠামশাই বলল, 'আরে তোমার বাবা আবার বিয়ে করেনি? আমি শালা চিন্তাই করতে পারি না, এত বড় ছেলে যার সে কি করে বিয়ে করে—তা বাবার এই বউ তোমার সৎমা হল না? তুমি কি বলে ডাক?'

'ছোটমা।' কথাগুলো শুনতে অনির খুব খারাপ লাগছিল।

'ওই হল, বাচ্চা কাঁঠালের আর এক নাম এঁচোড়। দেখতে শুনতে কেমন?'

'ভাল?'

'তোমার জেঠিমার চেয়ে ভাল?'

কোন রকমে অনি বলল, 'জানি না।'

'কি ফরসা ছিল এককালে, দেখলে মনে হত বেনারসী জর্দা খাচ্ছি। এখন অবশ্য না খেয়ে না খেয়ে আমাদের ... ...

করেন না। ছোটকা মানে পরিতোষ এটা বুঝতে পারল অনি, না।'

শালা এক নম্বরের বুদ্ধু। বাঙালী হয়ে পলিটিক্স বোঝে না। আরে আখের গোছাতে হবে বলেই যদি দল করবি তবে কংগ্রেস কর। আমার কাছে গিয়েছিল একদিন। তোমার কাছে টাকা পয়সা আছে ?' জ্যাঠামশাই ওর দিকে ফিরে চাইলেন। অনি প্রথমে কথাটা ধরতে পারেনি, শেষে দ্রুত ঘাড় নাড়ল, না। ছোটকাকু এখন কোথায় ?'

জানি না। তোমার জেঠিমার হাতের তেল-মুড়ি খেয়ে হাওয়া হয়ে গেল। বেশীক্ষণ রাখা রিস্কি —কে দেখে ফেলবে—ফাদারের কাছ থেকে টাকা নেয় না ? এখন তো সব কম্যুনিস্টরা দেখি ঝান্ডা নিয়ে মিছিল করে, পুলিস কিছু বলে না. ও শালা তাহলে অন্য কারণে পালিয়েছে, তাই না ?' কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাঠামশাই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুবার আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'অম্বর খাওয়া হয়ে গেছে আজ। অনেক প্রাইভেট কথা বললাম. কাউকে বলিস না ভাই।' উনি ঘর থেকে চলে যাবার পর অনির খেয়াল হল জ্যাঠামশাই ওকে ভাই বললেন। ও হেসে ফেলল, লোকটা যেন কি রকম। আচ্ছা, আখের গোছাতে কি লোকে কংগ্রেস করে ? আখের গোছানো মানে তো বড়লোক হওয়া। নতুন স্যার তো মোটেই বড়লোক নয়। তবে ?

যাবার সময় হেমলতা প্রায় তাড়িয়ে ছাড়লেন। সাবিত্রীর যেন যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না। বারবার বলছিল, 'দিদি আমি না হয় খোকাকে নিয়ে থেকে যাই। উনি দেখবেন, খোকাকে ফেলতে পারবেন না।' হেমলতা কান দেননি সেকথায়। বলেছেন সরিৎশেখর বাড়িতে থাকাকালীন ওরা আসুক উনি কিছু বলবেন না কিন্তু ওঁর অনুপস্থিতিতে এদের থাকা চলবে না। অনি দেখছিল যাওয়ার সময় অনেকগুলো পোঁটলা হয়ে গিয়েছে। এগুলো পিসীমা দিয়েছেন না ওরা জোর করে নিয়েছেন বুঝতে পারছিল না। প্রায় দরজার কাছে গিয়ে পরিতোষ বলল, 'বাঃ, এক পেটি চা দাও !'

হেমলতা ইতস্তত করে বললেন, 'মহী এখনও চা পাঠায়নি।'

'এমন গুল মারো না!' আমি দেখলাম খাটের তলায় দুটো পেটি পড়ে আছে। একটা নিচ্ছি।' বলে সটান ভিতরে গিয়ে একটা পাঁচ পাউন্ডের পেটি বের করে আনল।'

হেমলতা বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এবার—।'

পোঁটলাগুলো গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে ওরা হেমলতাকে প্রণাম করল। সকালে ওঁদের প্রণাম করা হয়নি, অনি এবার চট করে প্রণামটা সেরে নিল। জ্যাঠামশাইকে করার সময় তিনি হঠাৎ একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন. 'মাইরি দিদি, আমি শালা এক নম্বরের হারামী।'

হেমলতা বললেন, 'মুখ খারাপ না করে এবার এসো।'

'আসতে বলছ ?' অনিকে ছেড়ে দিল পরিতোষ। 'না। আর হ্যাঁ, এই টাকাটা তোমার ছেলেকে মিষ্টি খেতে দিলাম। জন্মাবার পর ওকে প্রথম দেখলাম তো।' হঠাৎ হাতের মুঠো থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সাবিত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই সে সেটাকে হেমলতার বোঝার আগেই নিয়ে ব্লাউজের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলল।

'মাইরি দিদি, তুমি নমস্য। জন্মাবার পর অনিকে ফাদার আংটি দিয়েছিল আর তুমি আমার ছেলেকে দশ টাকা দিলে। অবশ্য তাই বা কে দেয়।' কথাটা শেষ করে পরিতোষ পুটলি নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। সাবিত্রী তার পিছনে বাচ্চাকে নিয়ে হাঁটছিল। অনি পিসীমার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখছিল। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গেটের বাইরে গিয়ে সাবিত্রী বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল। অনি দূরে থেকে একবার বাচ্চাটাকে দিয়ে জেঠিমা বলাতে পারল, 'টা—টা।'

হঠাৎ হেমলতা বললেন, 'অনিবাবা, দাদু এলে এদের আসার কথা তুমি বলে ফেলো না, বুঝলে ?'

অবাক হয়ে অনি বলল, 'কেন ?'

হেমলতা একটু অস্বস্তিতে বললেন, 'সারাদিন পরিশ্রমের পর একথা শুনলে ওঁর শরীর খারাপ হবে। যা বলার আমি বলব।'

'কিন্তু দাদু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ?'

'হাসলেন হেমলতা, না করবেন না।'

কিন্তু সেই রাত্রে, সরিৎশেখর আসার অনেক পরে, অনি যখন ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে বসে আছে তখন দাদুর চিৎকার শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে দাদুর শোওয়ার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। সরিৎশেখর বলছিলেন, 'তুমি ভীষণ অন্যায় করেছ। কেন তাকে ঢুকতে দিলে ?' পিসীমা চাপা গলায় কি যেন বললেন। 'তুমি জানো সে চারধারে বলে বেড়াচ্ছে ব্যাঙ্কে আমার নামে লাখ টাকা আছে। আমি নাকি চামার।' সরিৎশেখর আক্ষেপের গলায় বললেন। পিসীমার গলা শুনতে পেল অনি, 'আমি বলে দিয়েছি যেন এ বাড়িতে সে আর কোনদিন না আসে। আপনি এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না।'

'তুমি ভীষণ অন্যায় করেছ ঐ অপদার্থটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়ে, আঃ। আমার রাত্রে ঘুম হবে না।' কিছুক্ষণ চুপচাপ। অনি চলে আসবে ভাবছে এমন সময় শুনতে পেল দাদু জিজ্ঞাসা করছেন, 'বাচ্চাটা কার মত দেখতে হয়েছে ?' মায়ের আদল আসে।' পিসীমা বললেন, 'মা-মুখো বাচ্চারা সুখী হয়।' সরিৎশেখরের গলার আওয়াজটা অন্য রকম ঠেকল অনির কাছে। (ক্রমশ)

ধ্যানমগ্ন হিমালয় : ধ্যানাসন মায়াবতী

মধুসূদন চক্রবর্তী

স্বামীজীর কল্পনায় ছিল—হিমালয়। অপার প্রশান্তির মাঝে বসে অদ্বৈত সাধনা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাব বিনিময়

আলমোড়া থেকে কুমায়ূন মোটর-অপারেটেড পরিবহণ সংস্থার বাসখানি যখন মায়াবতীর পথে লোহাঘাট যাত্রা করলো তখন কনকনে ঠাণ্ডা। ঝিরঝিরে বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস বইছে—যে বাসের মাঝামাঝি, কলকাতায় তখন প্রচণ্ড গরম। আগের রাতে প্রায় সারা রাতেই ছিল ঝড়ো হাওয়া, সে সঙ্গে এক পশলা শিলাবৃষ্টিও হয়। অবিরাম সোঁ সোঁ শব্দ, তাতে নিশিদ্র অন্ধকার, নিস্তব্ধ পাহাড়পুরীর কী এক ভয়ংকর রূপ। ভোরে উঠে বাস ধরতে হবে এই দুর্ভাবনায় চোখেও ঘুম ছিল না। শেষ রাত্রির দিকে অবশ্য কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক নেই। ভোর পাঁচটায় হুড়মুড় করে জেগে গেলাম দরজায় করাঘাতের শব্দে। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী কৃষ্ণানন্দজী (পূর্ণ মহারাজ) আমাদের জাগাতে এসেছেন, হাতে দু'খানা ছাতা, কাঁধে চা ভর্তি একটি ফ্লাস্ক। নিজে শীতে কাঁপছেন। চার পাঁচ শ' ফুট নীচে আশ্রমের বাড়ি থেকে শেষ রাতে চা তৈরি করে উঠে এলেন—কী হৃদয়বান সাধু। আগের রাতে সবকিছু গোছগাছ করাই ছিল, আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে অতিথি ভবনের ওপরে বড় রাস্তায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকি বাসের অপেক্ষায়। আলমোড়ার যে প্রান্তটিতে আমরা থাকতুম, সেখান থেকে বাস স্টেশন প্রায় দেড় মাইল। আগের দিন বাস স্ট্যাণ্ড-এ গিয়ে নির্দিষ্ট বাসের কণ্ডাক্টরের হাতে দশটি টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছিলাম, শর্ত আমাদের বাসস্থান থেকে তুলে নেবে। এত ভোরে কুলি পাওয়া যায় না—আগাম কুলির বন্দোবস্ত করলেও তার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে না। তার ওপর গত ক'দিন আবহাওয়া তেমন ভালো যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে এই অঞ্চলের পাহাড়ী রাস্তাগুলি ঝড় জল হলে ধ্বস নেমে বন্ধ হয়ে যায়। একদিন, দু'দিন তো বটেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও বেশী বাস চলাচল বন্ধ থাকে। নির্ভর তখন পদযুগল। গাইড ছাড়া পথ চলার উপায় নেই। তাই আগের দিন বাস স্ট্যাণ্ড-এ খোঁজখবর নিয়ে, অগ্রিম টিকিট কিনে, কণ্ডাক্টরের সঙ্গে স-দক্ষিণ ভাব জমিয়ে এসে তবে নিশ্চিন্ত হলুম।

মায়াবতী—এই নামের সঙ্গে যেন এক মোহিনী যাদু আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল হিমালয়ের কোনো নিভৃত স্থানে, শান্ত, শীতল, সুন্দর ও শ্যামল পরিবেশের মধ্যে এমন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হবে যেখানে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদি বিরহিত শুদ্ধ অদ্বৈত সাধনা চলবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরস্পরের সঙ্গে এখানে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হবেন এবং উভয় ভূখণ্ডের ভাবধারার আদান-প্রদানের অবকাশ পাবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ১৮৯৯ সালের ১৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি দিবসে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্থানটি এখন পিথোরাগড় জেলার অন্তর্গত—আগে ছিল আলমোড়া জেলায়। মহকুমা শহর লোহাঘাট; আশ্রম থেকে ছয় মাইল দূরে।

বাস আসার কথা ছিল সকাল ছটায়—এলো পঁচিশ মিনিট বিলম্বে। উঠে পড়লাম। বাস স্ট্যাণ্ড-এ গিয়ে আবার দেরি। বেলা সাতটার কিছু পর বাস ছাড়লো। আলমোড়া শহরের সীমানা যখন ছাড়িয়ে গেলাম তখনো জানালা দিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি 'নন্দাদেবী' মন্দিরের চূড়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আগের রাত্রে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির দরুন টেলিগ্রাফের তার বা গাছের ডালপালা পড়ে রাস্তা বন্ধ। সেই সাত সকালে ডাক তার বা পি ডবলিউ ডি (রোডস)-এর লোকজন সেগুলি অপসারণে ব্যস্ত। রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে, নীচে ওপরে ছবির মত ঘরবাড়ি—ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামগুলি তখনো যেন ঘুমিয়ে আছে। কোনো কোনো বাড়ি থেকে ধুঁয়ো উঠছে—সম্ভবত ধুনো জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার জন্য চিরন্তন সেই ব্যবস্থা। বেশ কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের চূড়া ভেদ করে সূর্যদেব দেখা দিলেন। সোনার বরণ রোদে চারদিক ঝলমল করে উঠলো। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পায়ে হাঁটার রাস্তায় শুরু হয়েছে লোকের আনাগোনা। কাঠ বা কাঠকয়লা অথবা শাক শবজির বোঝা পিঠে করে এরা চলেছে শহরে বা কোনো চটিতে।

বেলা নটা নাগাদ বাস গিয়ে থামল দানিয়ায়। ওখান থেকে ঘাট শুরু—এক মুখো রাস্তা। গেট খুলতে তখনো বাকি, আধ ঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করে আবার 'মোদের যাত্রা হল শুরু'। দানিয়ায় অনেকগুলি চা ও খাবারের দোকান। ওখানেই যাত্রীদের সাধারণত চা ও প্রাতরাশ চলে—দুপুরের আহারের ব্যবস্থাও আছে। আমাদের সঙ্গী ছিলেন জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ মিশনের বীরেশ মহারাজ। সুকণ্ঠ গায়ক—মার্গ সঙ্গীতে পারদর্শী। মৃদুকণ্ঠে ভজন গাইতে লাগলেন অতি মধুর সুরে। বাসে প্রচণ্ড ভিড়—বেসরকারী বাস, অতএব যাত্রীর সীমা সংখ্যা নেই। আমাদের আসন ছিল অবশ্য নির্দিষ্ট—তবুও ভিড়ের বাস, ভয়ও আছে। বাস চলছে, ঘণ্টায় দশ থেকে ষোল কিলোমিটার গতিতে। এক দিকে সু-উচ্চ পাহাড়, আর নীচে—বহু নীচে খাদ, নদী বা ঝরনাধারা। দূরে মাইলের পর মাইল পাহাড়ের মালা। মনে হচ্ছে এর আদি নেই, অন্ত নেই। রৌদ্রস্নাত ঝরনা জল গড়িয়ে পড়ছে নীচে সশব্দে। রূপোগলা জল চিকচিক করছে। ড্রাইভার মোহন সিং বললো, হরিণদের অবাধ বিচরণের স্থান কুমায়ুনের ওই অঞ্চল, সে তো দিনের বেলায়ও কত হরিণ দেখতে পেয়েছে, দু' এক জায়গায় বাসের গতি মন্থর করে আমাদেরও হরিণ দেখার সুযোগ করে দিলো। দুর্ভাগ্য, আমরা দেখতে পাইনি। ভালুকের সামনাসামনিও সে হয়েছে, তবে পাহাড়ী লোক—বন্যপ্রাণীর গতিবিধি এবং তাদের আচরণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। অতএব রক্ষা পেয়েছে। হ্যাঁ, শের'ও দেখেছে সে। তবে তা এই পথে নয় পিথোরাগড়ের দিকে। তাদের বাড়ির গরুছাগল বাঘের পেটে গেছে। সে প্রায় ১০/১২ বছর আগেকার কথা। মোহন সিং-এর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বাঁদিকে [illegible]

পাহাড়ে বাস-ট্রাক চালাচ্ছে। নদী, পাহাড়, জঙ্গল ও ঝরনার অপরূপে শোভা অবাক বিস্ময়ে দেখতে-দেখতে লোহাঘাটের কাছাকাছি যখন এলাম, তখন আবার আকাশে মেঘের ঘনঘটা। আধ ঘণ্টা আকাশ পরিষ্কার ছিল, ঝলমলে রোদও। আকাশে মেঘ দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামলো। হিমালয় অঞ্চলে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা চলে। এই রোদ, কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, তারপরই বৃষ্টি। আবহাওয়ার ওপর কোনো বিশ্বাস নেই। দেখলাম, নদীর এপারে মেঘ ও বৃষ্টি আর ওপারে আকাশ ঘন নীল, প্রসন্ন রোদে ছেয়ে আছে বনরাজিনীলা। গো-মহিষ ও ভেড়াগুলি পরম নিশ্চিন্তে পাহাড়ের গা বেয়ে বিচরণ করছে। রাখাল বালক হাতের লাঠিটির ওপর ভর করে তাকিয়ে আছে চলমান বাস এবং যাত্রীদের দিকে। হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে—মুখে তৃপ্তির হাসি।

লোহাঘাটে এসে বাস যখন থামলো তখন বেলা সাড়ে তিনটা। বেশ বৃষ্টি পড়ছে। বাস থেকে নামা মাত্রই এক ব্যক্তি ছুটে এলেন, স্মিতহাস্যে নমস্কার জানিয়ে জানালেন মায়াবতী আশ্রম থেকে তিনি এসেছেন। মাথার ওপর ছাতা ধরলেন, কুলি নিয়ে, মালপত্র নামিয়ে আমাদের একে-একে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী একটি চায়ের দোকানে। দোকানের মালিক পরমানন্দ যোশী, মিষ্টভাষী, বিনয়ী। বেশ ঠাণ্ডা। এক গ্লাস করে গরম চা দিলেন আমাদের। চা পরিবেশনের মধ্যেও যেন অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা মেশান। অদ্বৈত আশ্রমের অতিথি আগেই জেনেছেন। তাঁর কাছে অতিথি নারায়ণ। অতিথির নিকট থেকে চায়ের দাম নিতে নারাজ। আমরা অনেক বুঝিয়ে চায়ের পয়সা হাতে গুঁজে দিলুম। মাথায় ঠেকিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তা গ্রহণ করলেন, কিন্তু কিসের যেন একটা সংকোচ।

পরমানন্দ গরীব লোক—কাছেই বাড়ি। ছেলেকে নিয়ে চায়ের দোকানটি চালায়। অল্প-স্বল্প আয়—এতেই সংসার চলে। ছেলেটি স্থানীয় স্কুলে পড়ে, অবসর সময় দোকানে বসে। 'অল্প লইয়া থাকি'র আনন্দে দিন চলে যায়। পরমানন্দের মনে কোনো খেদ নেই। দেখলুম, লোহাঘাটে ছাত্র অধ্যাপক শিক্ষক অনেকেই তাঁর পৃষ্ঠপোষক। ধর্মভীরু সহজ সরল এই মানুষটিকে দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। মায়াবতী থেকে যে কর্মীটি এসেছেন, তাঁর নাম প্রহ্লাদ সিং। রাজপুতনা থেকে কবে তাঁর পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছেন, তিনি তা জানেন না। আশ্রমে ফল ও ফুল বাগিচা দেখাশোনার সঙ্গে অতিথিদের ওপর লক্ষ রাখা তাঁর কাজ—যাতে তাঁদের কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি। বালককাল থেকে আশ্রমে আছেন। ত্রিশ মাইল দূরে এক গ্রামে বাড়ি। চাষের জমি আছে, গরু আছে, কিছু ফলের গাছও আছে। এর মধ্যে বৃষ্টি কিছুটা থেমেছে—আকাশও পরিষ্কার হয়ে আসছে। আশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ (স্বামী সংপ্রভানন্দ) আমাদের সঙ্গে দেখা করে, অপেক্ষা করতে বলে কি একটা কাজে চলে গেলেন। বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামলে আমরা মায়াবতী রওনা হবো ঠিক হলো। কারণ রাস্তা বেশ পিচ্ছিল, ট্রাক নিয়ে যাবেন—ধর্মসিং কন্ট্রাক্টরের ট্রাক, সঙ্গে সিমেণ্ট ও অন্যান্য মালপত্র। এই ট্রাকেই আমাদেরও যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। হেঁটে গেলে চার মাইল, সাড়ে চার মাইল। কিন্তু বৃষ্টিতে চড়াই উৎরাই করা কষ্টকর। জিপ ও ট্রাকের রাস্তাটি ঘুরে ঘুরে আশ্রমের ফটক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। দূরত্ব প্রায় ছ' মাইল। কৃষ্ণমূর্তি মহারাজের দক্ষিণ ভারতের শরীর। কিন্তু বাংলা বলেন চমৎকার, হাস্য পরিহাসে [illegible]

দোহাবাট পার হয়ে উঁচু রাস্তা ধরে যাত্রী-বাহী আমাদের জীপ যখন আশ্রমে পৌঁছল, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। সারা দিনের পথশ্রান্তিতে দেহ অবসন্ন। আলমোড়া থেকে ৫০/৫২ মাইল বিপদসঙ্কুল এই পাহাড়ী রাস্তায় আমরা প্রাণটা যেন হাতে করে এসেছি। উত্তরপ্রদেশ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা এবং পুলিশ প্রশাসনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমাদের বাস যখন একমুখো রাস্তায় অন্য একটি বাস, জিপ অথবা ট্রাকের মুখোমুখি দাঁড়াল, তখন মনে সংশয় জাগলো এই রাজ্যে বিধিনিষেধ বা আইনকানুন বলে কিছু আছে কিনা। হনেক রে বালাই নেই, কঠিন কঠোর সরু পাহাড়ী পথে মারাত্মক বাঁকের সামনা সামনি বাস দাঁড়িয়ে গেল, বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের সামনে। 'লাইন ক্লিয়ার'-এর জন্য অপেক্ষা না করে দু'দিকের বাসই যাতায়াত করে। সারাটা পথেই চলে এই বিধি-নিয়ম লঙ্ঘনের পালা। মাঝে মাঝে পুলিস চৌকি আছে, বাস থামিয়ে কিছু আদান-প্রদান চলে। তারপরই জীবন ও যাত্রী নিয়ে চলে এই মারাত্মক খেলা। অন্তত তিন চার জায়গায় এমন অবস্থা হয়েছে যে ডাইনে বা বাঁয়ে কয়েক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে নির্ঘাত মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাস্তা থেকে নীচের দিকে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। সব সাদা মেঘে ঢাকা। এতটুকু অসাবধানতায় দেড়-দু হাজার ফুট নীচে কোনো নদীতে বা খাদে গিয়ে হয়তো বাসটি হুমড়ি খেয়ে পড়তো—যাত্রীদের জীবনের চিহ্নই থাকতো না। শুনেছি এই ধরনের দুর্ঘটনা ওই অঞ্চলে বিরল নয়, বিশেষ করে বর্ষায়। তবে মোহর সিং ওস্তাদ ড্রাইভার। আমরা বেঁচে গেলাম।

সারা দিনের ক্লান্তির অবসান ঘটলো আশ্রমে পদার্পণ করে। বৃষ্টি নেই। আকাশ পরিষ্কার। দূরের পাহাড়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো। মায়াবতী এবং তার চারদিকের রূপ দেখে আমরা নির্বাক। আশ্রমে এক প্রশান্ত নীরবতা—অথচ কাজকর্ম চলছে যথারীতি। বাগানে তখনো গোলাপের সমারোহ। ধ্যানমৌন গিরিরাজ যেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণপ্রিয় এই আশ্রমটিকে স্নেহে, সমাদরে ও ভালোবাসায় ঘিরে রেখেছেন। আশ্রমের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট স্বামী বন্দনানন্দ এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্বামী তদ্রূপানন্দজী আমাদের স্বাগত জানালেন সন্ন্যাসী-সুলভ বিনয় ও ভালোবাসা দিয়ে। একটু পরেই ডাক পড়লো। খাবারঘরে নিয়ে গেলেন কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ। সুগন্ধ চা এবং 'উকুম' পরিবেশন করলেন, তিনি স্বয়ং। মায়ের স্নেহে কাছে বসে খাওয়াচ্ছেন, এর মধ্যে নানা খবর জিজ্ঞেস করছেন। চা-পর্বের পর আমরা ঘুরে দেখছি আশ্রম, গ্রন্থাগার, ফুলের বাগান। মনে হচ্ছিল এক নন্দনকাননে বিচরণ করছি—যেখানে বহুজনহিতায় কাজের সঙ্গে মিশে আছে শান্তি ও অনাবিল প্রেম। সদাপ্রসন্ন প্রহ্লাদ সিং আমাদের নিয়ে গেলেন আশ্রম ভবনের অদূরে অতিথিশালায়। ঘরদোর গুছিয়ে বিছানা-পত্র পেতে রেখেছেন আগেই।

এখানে মায়াবতী আশ্রমের গোড়াপত্তনের কথা বলি। বলা বাহুল্য, হিমালয়ের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের চিরন্তন আকর্ষণ ছিল। তিনি হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গগুলি দেখে শুধু বিমোহিতই হতেন না, ত্যাগ ও পবিত্রতার প্রতীকরূপে হিমালয়কে তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর মতে হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায় তবে তার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকবে। তিনি বলেছেন, 'এই হিমালয় পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান, আর মানবজাতিকে এই ত্যাগ অপেক্ষা আর কিছু উন্নততর ও মহত্তর শিক্ষা দিবার আমাদের নাই।' ১৮৯৬ সালে বসন্তকালে লণ্ডনে একদিন স্বামীজী 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন মধ্যবয়সী এক ইংরেজ দম্পতি—ক্যাপটেন জে এইচ সেভিয়ার, মিসেস চারলট এলিজাবেথ সেভিয়ার এবং তাঁদের এক বন্ধু মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড। অদ্বৈত বেদান্তের মর্মবাণী স্বামীজীর কাছে শুনতে পেয়ে তাঁরা খুবই আকৃষ্ট হন। তাঁরা তাঁকে আদর্শ ব্যক্তিরূপে মনে করেন। স্বামীজীও ভারতের সনাতন ভাবধারা এবং পরাবিদ্যার প্রতি এদের আগ্রহ লক্ষ করে মুগ্ধ হন। তাঁরা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সে বছরই স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতিকে নিয়ে ইউরোপ সফর করেন এবং আলপস পর্বতমালা দেখে মনে অসীম আনন্দ লাভ করেন। আলপস পর্বত এলাকায় বেশ কিছুদিন তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই সময় স্বামীজী এক পত্রে লেখেন :

'The mountains and snow have a beautifully quietting influence on me'. আলপস পর্বতমালা দেখে তাঁর মনে তাঁর অতি প্রিয় হিমালয়ের রূপটি ভেসে ওঠে। স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতির নিকট হিমালয়ে নির্জন স্থানে একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন :

O, I long for such a monastery where I can retire from the labours of my life and pass the rest of my days in meditation. It will be a centre for work and meditation where my Indian and Western disciples can live together and then I shall train as workers; the former to go out as preachers of Vedanta to the West and latter will devote their lives to good of India."

কথাগুলি সেভিয়ার দম্পতির মনে লাগে। স্বামীজীর মনোবাসনা পূরণের জন্য তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করার আশ্বাসও তাঁকে দেন। ক্যাপটেন সেভিয়ার বলেন : 'How nice it would be, Swamiji, if this could be done. We must have a monastery.'

১৮৯৬ সালে ৫ই আগস্ট, স্বামীজী সুইজারল্যাণ্ড থেকে আলমোড়ায় বা তার কাছে একটি মঠ স্থাপনের জন্য জায়গা খুঁজে দিতে লিখলেন আলমোড়ায় তাঁর বন্ধু লালা বদ্রী শাহকে। 'বাগ বাগিচা সহ একটি ছোট পাহাড় আশ্রমের আয়ত্তে' থাকলে সেটিই তাঁর মনোমত হবে বলে বন্ধুকে জানালেন। ইতিমধ্যে ... আলমোড়ার পাঠানোর সিদ্ধান্ত করেন। বসবাসের

স্বামী বিবেকানন্দ সেভিয়ার দম্পতির নিকট হিমালয়ের নির্জন স্থানে যে আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন—তারই নাম মায়াবতী

পক্ষে আলমোড়াই তাঁদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান—তা ছাড়া আশ্রমের জন্য জমি সংগ্রহ করাও সহজ হবে এই মনে করেই স্বামীজী এই সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে পর পর দুখানি চিঠিতে পুনরায় এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। লিখলেন : একটি সমগ্র পাহাড় আমাদের জন্য চাই, যেখান থেকে হিমালয়ের তুষারশ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। যতদিন না আশ্রম তৈরি হয়, ততদিন সেভিয়ার দম্পতির জন্য আলমোড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করে দেওয়ার জন্য বদ্রী শাহকে অনুরোধ জানান (২১শে নভেম্বর, ১৮৯৬)। স্বামীজীর ইচ্ছা হিমালয়ের বুকে আশ্রম-স্থানটির উচ্চতা হবে সাত হাজার ফুট বা তার কাছাকাছি। গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা থাকবে এবং সারা বছর ওখানে পানীয় এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায় এমন জায়গার সন্ধান চলতে লাগলো। কিন্তু পছন্দমত জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। এইভাবে এসে গেল ১৮৯৮ সাল। সেভিয়ার দম্পতি তখন গ্রীষ্মকালে আলমোড়ায়: স্বামীজীও সেখানে। তাঁরা বদ্রী শাহর 'টম্‌সন হাউস' নামক এক বাড়িতে ছিলেন। এমন সময় স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্য রাজম আয়ারের মৃত্যু-সংবাদ পান। মাদরাজে তিনি পরলোকগমন করেছেন। ১৮৯৬ সাল থেকে রাজম স্বামীজীর প্রেরণায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাটি প্রকাশ করছিলেন। রাজমের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী শোকাভিভূত হলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর তো শোকে অভিভূত হলে চলে না! তিনি পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের সংকল্প নিলেন। ক্যাপটেন সেভিয়ারকে কাছে ডেকে পত্রিকাখানি পুনঃপ্রকাশের ভার অর্পণ করলেন। দু' মাস বন্ধ থাকার পর আলমোড়া থেকে পত্রিকাখানি পুনরায় প্রকাশিত হতে লাগলো স্বামীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনায়। এদিকে আলমোড়ায় এবার অবস্থানকালে হিমালয়ের প্রতি স্বামীজীর আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে তিনি ধ্যানমৌন হয়ে যান। উল্লেখ থাকে যে, ১৮৯০ সাল থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে স্বামীজী তিনবার আলমোড়া পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলে তো ঘুরেছেনই। ক্যাপটেন সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দের ওপর 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর দায়িত্বভার দিয়ে স্বামীজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

স্বামী স্বরূপানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭১ সালের ৮ই জুলাই ভবানীপুরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। আশৈশব বিদ্যানুরাগী। পল্লীর যুবকদের একত্রিত করে নৈতিক জীবন গঠনে এবং নানা সদনুষ্ঠান পরিচালনা করতে তিনি অগ্রণী ছিলেন। এই কাজে তাঁর বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে 'ডন সোসাইটি'র মাধ্যমে যাঁর মনীষা ও দেশহিতৈষণা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত অজয়হরি 'ডন' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৮ সালের ২৯শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে দীক্ষা দেন। সন্ন্যাসদানের পর স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের নিকট বলেছিলেন : আজ আমরা একটি রত্নলাভ করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এরই চার দিন পূর্বে স্বামীজী কুমারী মারগারেট নবেল্‌-কে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিয়ে নামকরণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর নির্দেশে স্বরূপানন্দ নিবেদিতাকে বাংলা শেখান। ভগিনী নিবেদিতার অধ্যাত্মজীবনে অদ্বৈতবাদী সুপণ্ডিত ও স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী স্বরূপানন্দের প্রভাব অনেকটা পড়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীজীর কল্পনায় ছিল হিমালয়ের প্রশান্ত ও নির্জন স্থানে আশ্রম স্থাপন করে অদ্বৈত সাধনার সঙ্গে চলবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলন ও উভয় ভূখণ্ডের ভাবধারার আদানপ্রদান। এবার ঠিক হলো ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির বার্তাবহ 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদনা ও প্রকাশ চলবে ওই প্রস্তাবিত আশ্রম থেকেই। ক্যাপটেন সেভিয়ার [illegible]

স্বরূপানন্দ সম্পাদক। আলমোড়ার স্বল্পপরিসর বাড়িটি এত বড় কাজের পক্ষে প্রশস্ত নয়। অতএব নবীন উদ্যমে তাঁরা জমি খুঁজতে লাগলেন। ইতিপূর্বে আশ্রমের পক্ষে অনুকূল ভূমি সংগ্রহের জন্য হিমালয় অঞ্চলে ধরমশালা, মরী, কাশ্মীর, দেরাদুন, মুসৌরি ও আলমোড়ায় জায়গা খোঁজা হয়, পছন্দ হয়নি। কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজীকে আশ্রম স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিতে সম্মত হলেও ইংরেজ রেসিডেন্ট স্যার অ্যাডালবার্ট ট্যালবটের প্রতিবন্ধকতায় জমি পাওয়া সম্ভব হয়নি। মহারাজার মন্ত্রণা পরিষদের বৈঠকে আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লিখিত জমিদানের বিষয়টি দু'দুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু রেসিডেন্ট স্বামীজীকে 'বিপ্লবী' বলে সন্দেহ করে 'ভেটো' প্রয়োগ করেন। ফলে আলোচ্য বিষয়ের তালিকা থেকে সেটি কাটা যায়। শেষ পর্যন্ত সেভিয়ার দম্পতির চেষ্টায় ও উৎসাহে এবং স্বামী স্বরূপানন্দের নিরলস শ্রম ও সহযোগিতায় স্বামীজীর বহু দিনের স্বপ্ন সার্থক হলো। আলমোড়া থেকে ৫০ মাইল দূরে ৬৪০০ ফুট উঁচু এক নির্জন পাহাড়ের সন্ধান পেয়ে সেভিয়ার দম্পতিসহ স্বামী স্বরূপানন্দ সেখানে যান ১৮৯৯ সালের গোড়ার দিকে। দেখে জায়গাটি তাঁদের খুব পছন্দ হয়। তখন ওখানে ছিল এক চা বাগিচা। মালিক ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যাকগ্রেগর। চা বাগিচার চতুর্দিকে হিমালয়ের গহন অরণ্য—পাহাড়ের ওপর জমি সমান করে তৈরি হয়েছিল চা শুকোবার জন্য বাড়ি, সাহেবের বাসগৃহ এবং অফিস। বাড়িটি সুন্দর হলেও জীর্ণদশা ছিল। সাহেব বাগান বিক্রি করে দেশে চলে যাবেন তাই ঘরদোর কিছুই মেরামত হচ্ছিল না। তা হলেই বা কি—দৃশ্যটি মনোরম। সেভিয়ার দম্পতি তুষারমৌলী হিমালয়ের শোভা দেখে তো বাকহারা। গুরু যে জায়গার কল্পনা করেছিলেন এতো ঠিক সেই জায়গা! সামনে যত দূর দৃষ্টি যায়—তুষারময় পর্বতশ্রেণী। দুইশত মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ। ঘর বাড়ি ও জমি সমেত চা বাগিচার সমুদয় সম্পত্তি কিনে ফেললেন ক্যাপটেন সেভিয়ার। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রধান কেন্দ্র হলো মায়াবতী।

মায়াবতী নামটি সম্ভবত স্বামী স্বরূপানন্দই দিয়েছেন। ওই অঞ্চলটির নাম ছিল মাইপীঠ। চা বাগিচার কয়েকশ ফুট নীচ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে গেছে—নদীটি শীর্ণা হলেও বর্ষায় বেশ জলধারা থাকে। আসলে এটি একটি ঝরনাধারা। মাইপীঠ অর্থাৎ মায়ের পীঠস্থান। পীঠস্থানের কোনো চিহ্ন অবশ্য নেই—তবুও স্থানীয় অধিবাসীরা ওই অঞ্চলটিকে দেবীভূমি বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। মাইপীঠ থেকে মায়াবতী—আজ যার নাম ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে—সত্যানুসন্ধানী মানুষের কাছে। এই ভূখণ্ড ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলমোড়া থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হলো মায়াবতীতে। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জন্য একটি ছাপাখানাও স্থাপিত হলো। মুদ্রাযন্ত্রটি কিনে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়। কম্পোজিং, ছাপা, বাঁধাই সবই মায়াবতীতে। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলে। তার আগে শুধু 'প্রবুদ্ধ ভারত' নয়, স্বামীজীর জীবনীসহ নানা গ্রন্থের প্রকাশ ও সম্পাদনাও মায়াবতী থেকেই হয়। বর্তমানে শুধু সম্পাদকীয় দফতরটি মায়াবতীতে, স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় এবং গ্রন্থাদির প্রকাশ-সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রণ ও বিক্রয়াদির ব্যবস্থাও অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা অফিস থেকে হচ্ছে। ১৯০৬ সালে স্বামী স্বরূপানন্দ পরলোকগমন করেন; আশ্রম এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামীজীর অপর মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিরজানন্দ (কালীকৃষ্ণ মহারাজ) —যিনি পরে বেলুড় মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। গুরুভাই স্বরূপানন্দের মৃত্যুর পর শক্ত করে তিনি আশ্রমের হাল ধরেন; সাত বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করে এর কর্মপরিধি বিস্তৃত করে দেন।

শুধু প্রবুদ্ধ ভারতের প্রকাশনা নিয়েই স্বামী স্বরূপানন্দ ও অন্যান্য কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকেননি। দুর্ভিক্ষ বা ভূমিকম্প অথবা যেখানে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে, আর্তত্রাণের কার্যে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ।' এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই তো স্বামীজী স্থাপন করেছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়া অবস্থানকালে একদিন স্বরূপানন্দকে বলেছিলেন : 'খুব সহজ পন্থা আমাদের। এক কথায় বলা চলে জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবন। ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই দুই ধারাকে ঠিক রেখো।' প্রকৃতপক্ষে শিষ্য গুরুর নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। চতুষ্পার্শের পাহাড়ী অধিবাসীদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা স্বামী স্বরূপানন্দকে নিদারুণ ব্যথিত করেছিল। তাঁদের পেটে অন্ন নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, রোগের চিকিৎসা নেই। তিনি মায়াবতীর আশে-পাশে দরিদ্র জনগণকে কৃষি শিক্ষাদানের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। মিঃ ম্যাকোনেল নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সহযোগিতায় পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিবিদ্যা প্রচারের জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। পাহাড়ী শিশুদের জন্য জঙ্গলাকীর্ণ মায়াবতীর কাছে লোহাঘাটে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। স্বামী স্বরূপানন্দের চেষ্টায়ই মায়াবতী আশ্রমে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। প্রথমে আশ্রম ভবনের নীচের ঘরে একটি আলমারিতে কিছু ওষুধপত্র থাকত। স্বামীজীরাই রোগীদের অবস্থা শুনে ওষুধপত্র দিতেন, রোগও নিরাময় হতো। তখন শ্বাপদসঙ্কুল এই পাহাড় অঞ্চলে পাশকরা ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর ছিল।

ক্যাপটেন সেভিয়ার ১৯০০ সালের ২৮শে অক্টোবর মায়াবতীতে পরলোকগমন করেন। ত্রিশ মাইল দূর থেকে তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক আনা হয়—তাও তিনি পাশ করা ডাক্তার নন—একজন কম্পাউণ্ডার। সেভিয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী নদীতীরে হিন্দুমতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেখানে কোনো স্মৃতিস্তম্ভ যাতে নির্মিত না হয়, সে সম্পর্কেও নির্দেশ করে গিয়েছিলেন। [illegible]

[illegible] মায়াবতী গেছেন। [illegible]
১৯০০ সালের ডিসেম্বরে বিদেশ থেকে বেলুড় মঠে ফিরে এসে তিনি সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ পান। ২৯শে ডিসেম্বর সকালে কাঠগুদামে নেমে ওরা জানুয়ারি (১৯০১) দুপুরে মায়াবতী পৌঁছেন। এক পক্ষকাল তিনি আশ্রমে ছিলেন। সেবার মায়াবতীতে প্রচণ্ড ঠান্ডা—বরফে আশ্রম পথঘাট। আশ্রমে গিয়ে স্বামীজী অনেক আনন্দে কাটিয়ে গেছেন। কখনো গল্প করে, গান গেয়ে, খেলাধুলা করে এর মধ্যেও আশ্রমিকদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রাণখোলা হাসি এবং সরস আলোচনায় মায়াবতীর নির্জন আশ্রম মুখর হয়ে উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার লিখেছেন : হিমালয়ক্রোড়ে জনকোলাহলশূন্য শান্তরসাস্পদ আশ্রম ভবনে স্বামীজী আনন্দে দিনগুলি কাটাতে লাগলেন। মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে যখন তিনি আলাপ করতেন, মনে হতো যেন একটি শিশু তার জননীর সঙ্গে কথা বলছে। সত্য সত্যই মিসেস সেভিয়ার ছিলেন আশ্রমে মাতৃসমা। স্বামীজীকে তিনি পুত্রজ্ঞানে স্নেহ করতেন। স্বামীজী এবং তৎকালীন আশ্রমিকরা সকলেই তাঁকে 'মাদার' (মা) বলে সম্বোধন করতেন। পাহাড়ী গ্রামবাসীদের নিকট তিনি ছিলেন 'দেবী'। ক্যাপটেন সেভিয়ার জীবিতাবস্থায় 'পিতাজী' নামে সকলের নিকট সমাদৃত ছিলেন।

অদ্বৈত আশ্রমের মর্মবাণীটি (প্রসপেকটাস) স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ইংরেজিতে হাতে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে। পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি দিবস ১৯শে মার্চ (১৮৯৯) তারিখে আশ্রম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মর্মবাণীর অংশ বিশেষের অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো। 'অদ্বৈতই এক মাত্র মতবাদ, যা মানুষকে তার স্বাধিকার প্রদান করে, এবং তার সমস্ত পরাধীনতা, তৎসংশ্লিষ্ট সকল কুসংস্কার দূর করে আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা, কাজ করার ক্ষমতা ও সাহস প্রদান করে; পরিশেষে উহাই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম করে।' আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে মায়াবতী আশ্রমে একটি ঠাকুরঘর ছিল। এই ব্যবস্থাটি স্বামীজীর মনঃপূত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেটি উঠে যায়। স্বামীজী চেয়েছিলেন অদ্বৈত আশ্রম শুধু অদ্বৈতভাবেই পূর্ণ থাকবে। সেখানে দ্বৈতভাবের নামগন্ধও থাকবে না। মায়াবতী পরিদর্শনে গিয়ে স্বামীজী আশ্রমিকদের অদ্বৈতবাদের মর্মকথা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। মায়াবতী থেকে মঠে ফিরে গিয়ে অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘরের অস্তিত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্বামীজী তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় বলেছিলেন 'আমি ভেবেছিলাম অন্তত একটা কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজারি বন্ধ থাকবে। কিন্তু হায়, হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো সেখানেও জেঁকে বসেছেন।' ঠাকুরঘরটি প্রকাশ্যে উঠে গেলেও আশ্রমিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা নিজ নিজ ঘরে বসে ঠাকুর-মায়ের ছোট প্রতিকৃতি রেখে জপধ্যান করতে পারেন। মায়াবতীতে কিছুকাল কর্মী ছিলেন এমন একজন সন্ন্যাসী অতি সম্প্রতি আমাকে এ কথা জানিয়েছেন।

এক পক্ষকাল মায়াবতী অবস্থানকালে স্বামীজী আশ্রম থেকে মাইল দুই দূরে আরও প্রায় এক হাজার ফুট উঁচুতে ধর্মঘর নামে একটি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ধ্যানে বসে যান। সেখান থেকে তুষার-দৃশ্য অতি মনোহর। ধর্মঘর গিয়ে স্বামীজীর ইচ্ছা হয়েছিল সেখানে একটি আশ্রম স্থাপন করে নির্জনে ধ্যানভজন করবেন। মিসেস সেভিয়ারকে বলেছিলেন : জীবনের শেষ ভাগে সমস্ত জনহিতকর কাজ ত্যাগ করে এখানে আসব এবং গ্রন্থ রচনা ও সঙ্গীতালাপ করে দিন কাটিয়ে দেব। আশ্রমের অদূরে লেক গারডেন-এর পারে বেড়াতে বেড়াতেও স্বামীজী অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজীর মনোবাসনা পূর্ণ হলো না। এর প্রায় দেড় বছর পর ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রচুর বরফ পড়েছিল সেবার মায়াবতীতে। কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) তাঁকে একদিন বরফ দিয়ে আইসক্রিম করে খাওয়ালেন। আইসক্রিম হাতে নিয়ে তাঁর শিশুর মত উল্লাস। প্রথমে আশ্রম বাড়ির দোতলায় একখানি ঘরে স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সেখানে ঘর গরম রাখার ভালো ব্যবস্থা ছিল না—নীচে 'ফায়ারপ্লেস' (অগ্নিকুণ্ড)-এর কাছেই তাঁকে বিছানা করে দেওয়া হয়। এখনও প্রতি রাতে আহারাদির পর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সেই স্থানটিতে বসে ধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ অথবা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করেন। মায়াবতীতে আমাদেরও সেই পাঠ ও আলোচনা শোনার সুযোগ হয়েছে। পাঠ শুনতে শুনতে এক অব্যক্ত আনন্দে আমাদের মন ভরে গিয়েছিল। স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতিজড়িত স্থান। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল তাঁর সেই দিব্যশ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডল।

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কথা শুনেছি প্রথম ১৯৩৫ সালে। তখন আমার কিশোর বয়স। পূর্ববঙ্গের একটি মহকুমা শহরের জনৈক বিদ্যোৎসাহী এবং স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর একখানি বিশেষ সংখ্যা আমাকে পড়তে দেন। প্রচ্ছদপটের ছবিটি ছিল হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের (এখনও ওই ধরনের সুদৃশ্য প্রচ্ছদ)। প্রবন্ধাবলী পড়ে বোঝার বিদ্যা অ.মার ছিল না, কিন্তু মায়াবতী থেকে হিমালয়ের দৃশ্যাবলীর চিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এতকাল পর তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা সফল হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করলাম। কৌসানী গান্ধী আশ্রমের সরলা.ম দাস কুলেতি আমাকে মায়াবতীর কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, হিমালয়ের শান্ত পরিবেশ ও নির্জনতার মধ্যে যে ভগবৎ অনুভূতি উপলব্ধি করা যায় এক মায়াবতী আশ্রম পরিদর্শনে গিয়ে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন। কৌসানীর হিমালয়ের দৃশ্যাবলীও একদিন মহাত্মা গান্ধীর চিত্তকে অপূর্ব নাড়া দিয়েছিল—এক ঈশ্বরীয় অনুভূতি তাঁকে অনাসক্তি প্রেম ও করুণার পথে ঠেলে দিয়েছিল। সেটা ছিল ১৯২৯ সালের মার্চ মাস। গান্ধীজী কৌসানীতে এসে দশ দিন ছিলেন। এখানে ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে লিখেছিলেন গুজরাটি ভাষায় লিখিত ভগবদ্গীতার ভাষ্যটি। স্বাধীনতার পর ওই স্থানটির নাম গান্ধী আশ্রম বা অনাসক্তি আশ্রম

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম যে পর্বতশ্রেণীর ওপর থেকে দুই শত মাইলব্যাপী হিমালয়ের তুষার পর্বতমালার রূপ বর্ণনাতীত। আশ্রম থেকে শৃঙ্গগুলির দূরত্ব মোটামুটি ৭০ মাইল। পশ্চিমে বদ্রীনারায়ণ এবং পূর্বে পঞ্চচুল্লি বা পাঁচোলি। মাঝখানে ত্রিশূল এবং নন্দাদেবী (২৫,৬৬১ ফুট)। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় পাহাড়ের চূড়ায় চলে বিচিত্র রং-এর খেলা। আমরা মাত্র দু' দিন এই অপরূপ শোভা দেখার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এই দৃশ্য তুলনাহীন। আশ্রমের সন্ন্যাসীদের নিকট শুনতে পেলাম জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে গিরিশৃঙ্গগুলির রূপবর্ণনা। নিঃশব্দ জ্যোৎস্নাধারায় সিঞ্চিত তুষার শৃঙ্গগুলি দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।'

গত আদমসুমারি অনুযায়ী মায়াবতী গ্রামের লোক সংখ্যা নয়। এরা আশ্রমের স্থায়ী বাসিন্দা—সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী। আশেপাশে গ্রামেও বসতি কম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—হিন্দুদের ওই চার শাখাই এই অঞ্চলে বসবাস করে। কুমায়ুন বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা কম—বিশেষ করে পাহাড়ী গ্রামাঞ্চলে। জীবিকা প্রধানত কৃষি কাজ এবং সেনা বিভাগে চাকুরি। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রতি পরিবারে একাধিক ব্যক্তি সেনা বিভাগে কাজ করেন। কুমায়ুন রেজিমেন্ট-এ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বেশী, বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সাধারণত ফল ও সবজি। চাষবাসের কাজ করে, মেয়েরাও বসে থাকে না। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কায়িক শ্রম করে। আজকাল সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী বা পুলিস বাহিনীতে এরা কাজের সুযোগ পায়। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ যোশী ও পন্থ সম্প্রদায়, অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষই মোগলদের তাড়া খেয়ে মহারাষ্ট্র থেকে চলে এসেছিল কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলে। ব্রাহ্মণরা যে কোন শ্রমের কাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, মালপত্র ও দূরে দুর্গম অঞ্চলে মালবহনের কাজও করেন। এক সঙ্গে এরা কাজ করেন বটে কিন্তু এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খাবেন না। ছুৎমার্গের প্রাধান্য বেশী। খাওয়া-দাওয়ার তেমন বাছবিচার নেই। সকলেই মাছ মাংস খায়। মায়াবতী থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে চম্পাওয়াত বা চম্পাবতী। কয়েকটি প্রাচীন মন্দির—দুর্গাদেবী এবং শিবের মন্দিরগুলির স্থাপত্য খুবই সুন্দর। শক্তি ও শিবের পূজার্চনা হিমালয়ের সর্বত্র। এখানেও তাই।

মায়াবতী গ্রামটি ছোট হলেও এই গ্রামের ওপর কুমায়ুন অঞ্চলের আলমোড়া ও পিথোরাগড়—এই দুটি জেলার পার্বত্য অধিবাসীদের শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিবদ্ধ—সে সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও। আশ্রমের দাতব্য হাসপাতালটিকে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে মনে করে। ১৯০৩ সালে একটি মাত্র আলমারি এবং কিছু ওষুধপত্র নিয়ে দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৯১৪ সালে সেটি দাতব্য হাসপাতালের রূপ নেয়, ছয়টি মাত্র শয্যা নিয়ে। এখন শয্যা সংখ্যা ২৩, অনেক সময় অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করতে হয়। ৫০।৬০ মাইল কি তারও বেশী দূর থেকে ডুলিতে বা ঘোড়ার পিঠে শক্ত করে খাটিয়ায় শুইয়ে বেঁধে রোগীদের এনে ভর্তি করা হয় ইনডোর-এ। দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে, জঙ্গলাকীর্ণ পাকদণ্ডীর পথ ধরে সন্তর্পণে ডুলিতে করে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন রোগীর আত্মীয় বা নিকটজনের মনে পরম তৃপ্তি এবং স্বস্তির ছাপ ফুটে ওঠে। ১১২টি ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে একটি পট্টি—এরূপ ১৩টি পট্টির ১৪০০ গ্রামের অধিবাসীদের রোগের যন্ত্রণা উপশমের ভার মায়াবতী হাসপাতালের। ১৯৭৬-৭৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বারো মাসে ইনডোর বিভাগে ৪৬১ রোগী এবং আউটডোর-এ ১১৯৯১ জনের চিকিৎসা হয়। হাসপাতালের তত্ত্বাবধানের ভার একজন সন্ন্যাসীর ওপর। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং পাস করা কম্পাউণ্ডার একাধিক। স্বামী শ্রীবৎসানন্দের (গৌর মহারাজ) দৃষ্টি শুধু রোগীদের ওপরই নয়, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার দিকেও। ঘরগুলি ঝকঝকে তকতকে।

হাসপাতালের জন্য এক সময় দারুণ অর্থাভাব দেখা দেয়। মোরভি নামে কাথিয়াবাড়ের একটি দেশীয় রাজ্যের মহারাজার লক্ষাধিক টাকা দানে অর্থাভাব দূর করে এর সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছিল। সে সময় মায়াবতীর পাশ দিয়ে মহারাজা সদলবলে কৈলাস তীর্থে যাচ্ছিলেন। দলের একজন সাংঘাতিক পীড়িত হয়ে পড়েন। তাঁকে মায়াবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়—চিকিৎসায় তাঁর জীবন রক্ষা পায়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপে মহারাজা রাজ্যে ফিরে গিয়ে হাসপাতাল বাবদ আশ্রমাধ্যক্ষের নামে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দেন। আর একবার 'প্রবুদ্ধ ভারত' হাসপাতালে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। সেবারেও নানা প্রান্ত থেকে ছোট বড় দান পাওয়া যায়। বর্তমানে ওষুধপত্রের দাম বেড়েছে, হাসপাতাল পরিচালন-ব্যবস্থার ব্যয় বেড়েছে। স্থায়ী আমানতের সুদ বা সাময়িক দান বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায়, তাতে ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। আশ্রম কর্তৃপক্ষ চিন্তাকুল। তাই তাঁরা দেশবাসীর নিকট হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশের গরীব রোগীদের চিকিৎসার জন্য অকৃপণ সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন। একটি শয্যা সৃষ্টির জন্য পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তদরূপানন্দ জানান, হাসপাতালের জন্য দান আয়কর বহির্ভূত।

আগে চা বাগিচা ছিল বলে এখনও তার চিহ্ন বর্তমান। এখনও আশ্রম ভবনের নীচে, অতিথিশালার কাছাকাছি জঙ্গলে চায়ের ঝোপ দেখা যায়। নীচের নদী পর্যন্ত চায়ের ঝোপ ইতস্তত রয়েছে। গ্রাম্য রমণী ও রাখাল বালকেরা বেছে বেছে চা পাতা তুলে নেয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে চা থেকে আশ্রমের কিছু আয় হতো। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু বিক্রিও হতো। তখন রোদে চা শুকানো হতো। ফল-ফুলের গাছ মায়াবতী আশ্রমে প্রচুর। অনেক বিদেশী ফল-ফুলের গাছ আছে। [illegible] যুগে চা বাগানের সাহেব মালিক পরবর্তী যুগে সেভিয়ার দম্পতি [illegible] আপেল, নাশপাতি, খোবানি, আখরোট [illegible] বিলাতি [illegible]

শুনলাম, আপেলের মরসুমে মাদার সেভিয়ার ডেকে-ডেকে পথচারীদের আপেল খাওয়াতেন। হাতে গুঁজে দিতেন বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। এমনকি গরু-বাছুরদেরও আপেল খাওয়াতেন বলে প্রবীণ সন্ন্যাসীরা তাঁদের স্মৃতিচারণে লিখে গেছেন। মরসুমে আশ্রমের প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে জ্যাম, জেলি তৈরি করে রেখে দেওয়া হয় সারা বছরের জন্য। এত আপেল যে, ডালে ও তরকারিতেও আপেল দেওয়া হয়। আপেল দিয়ে ডাল শুনলেও আশ্চর্য লাগে। সাধারণত কাঁচা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত টক আপেল ডালে ছেড়ে দেওয়া হয়। পায়েসে আপেলের টুকরো, খেতে নাকি অপূর্ব। সবজি হয় প্রচুর—আলু, পেঁয়াজ, রসুন, কপি, বিট, গাজর। প্রচুর পরিমাণে টমাটো হয়—বেশ রসাল এবং বিলাতী। ফুলের তো কথাই নেই। পদ্ম ফুলের আকারের বড় বড় গোলাপ মায়াবতীর বাগানে—নাম 'পিস' (শান্তি) এ ছাড়া আছে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কসমস, প্যান্সিওয়ালাস, অ্যান্টিরিনাম, টাইগার লিলি, জুঁই ও জিনিয়া। আশ্রমের সর্বত্র রডোডেনড্রন। কুমায়ুনের এই অঞ্চলে অফুরন্ত রডোডেনড্রন পুষ্পের রক্তিমচ্ছটা জঙ্গলের শোভা বাড়িয়ে তোলে। মায়াবতী পাহাড়ে লতান গোলাপ ও নাম-না-জানা বনফুলের শেষ নেই। গ্রীষ্মে কুমায়ুন পাহাড়ে অম্লমধুর এক রকমের ছোট ছোট ফল পাওয়া যায়। পাকলে গাঢ় লাল ও বেগুনি রং হয়। রাস্তার ধারে ডাল কাঁধে ওইগুলি বিক্রি হয়—নাম কাফল।

শহরাঞ্চলে এখন কাফলের সমাদর বেড়েছে। পর্যটকদের হাতেও দেখা যায় পাতার ঠোঙায় কাফল—টপাটপ খাচ্ছেন। আমাদের বাংলাদেশে 'বউ কথা কও' পাখির ডাক সকলেই শুনে থাকবেন—ওই পাখি কুমায়ুনেও আছে। অনুরূপ সুরে ওরা ডাকে 'কাফল পাকো।' লোকে নাম দিয়েছে 'কাফল পাকো' পাখি। মায়াবতীতে বহু বিচিত্র ধরনের পাখির সন্ধান পাওয়া যায়। হিমালয় এলাকায় নানা পাখির বাসভূমি। ফল-ফুলের গাছে বাগানে জঙ্গলে কত না পাখির কাকলী। খুব ভোরে সূর্যোদয়ের আগে এবং সন্ধ্যার এক রকমের পাখির ডাক খুবই মধুর শোনা যায়। স্থানীয় নাম কস্তুরা পাখি— পক্ষী ও ফুল বিশারদ এক নবীন সন্ন্যাসীর মতে কালো রঙ-এর এই পাখির সুমিষ্ট ডাকের নাকি তুলনা নেই। খুবই লাজুক পাখি। গাছের ডালের আড়ালে বসে ডাকে—যেন সুরেলা কণ্ঠের গান। পাখির গানে এক মোহিনী মায়া। 'স্কপস আওল'—প্যাঁচাজাতীয় এক ধরনের পাখির ডাক টং...টং আওয়াজ। ঘণ্টা বাজার শব্দ। প্রচলিত নাম হচ্ছে 'বেল বার্ড।' 'আলতাপরী' পাখি খুব সুন্দর, মেয়ে ও পুরুষের রূপ ও রঙ আলাদা।

আশ্রমাধ্যক্ষ একদিন সকালে প্রাতরাশের পর বাগানে নেমে আমাদের হাতে শক্তিশালী একটি বাইনোকুলার দিয়ে পাহাড়ের শোভা দেখতে বলেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, স্বামীজী শুধু একজন বেদান্তবাদী ত্যাগী সন্ন্যাসীই ছিলেন না, সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ পূজারীও ছিলেন। বাইনোকুলারের সাহায্যে দূরের পর্বতমালা যেন আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেলো। মহারাজ আমাদের পর্বতগুলির নাম, উচ্চতা, দূরত্ব—আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় নাম সব একে-একে বলে দিচ্ছিলেন। দেখলাম দুই শত মাইলব্যাপী ওই সুবিস্তীর্ণ তুষার পর্বতমালার অপরূপ দৃশ্য। এই রূপরাশির মোহে দেশ-বিদেশ থেকে কত বড় বড় পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও সমাজ-সংস্কারক সাধুসন্ত ছুটে এসেছেন তার তুলনা নেই। দূর দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম করে কেউ পায়ে হেঁটে, ডাণ্ডিতে, ডুলিতে বা ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা এসেছেন। রাস্তাঘাট ছিল না, যানবাহনের সুবিধা নাই—শৈলশহরের আধুনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নেই—অথচ কিসের টানে যে এঁরা ছুটে আসতেন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। বিপদসঙ্কুল পথে দিনের পর দিন তাঁদের হাঁটতে হয়েছে, তীর্থ দর্শনের দুর্বার বাসনা পথশ্রম তাঁদের ক্লান্ত করেনি। পুণ্যভূমি মায়াবতী যে তাঁদের দিয়েছে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আনন্দমোহন বসু, সপরিবারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইলিয়ট ক্লার্ক, সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টাইন, সরলা দেবী চৌধুরানী এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মায়াবতী গিয়েছেন বহু কষ্ট করে। জগদীশ বসু চার-পাঁচবার গিয়েছেন। তিনি যে রাস্তায় বেড়াতেন তার নাম এখনও 'বোসেস ওয়াক' নামে পরিচিত। নিবেদিতার তো প্রিয় স্থান ছিল মায়াবতী। শেষবার মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও গ্রীষ্মে জগদীশ বসুর সঙ্গে গিয়ে নিবেদিতা এক মাস মায়াবতীতে ছিলেন। উভয়ে নির্জন পরিবেশে বসে বিজ্ঞানের বই লেখার কাজ করেন।

বিজ্ঞানী জগদীশ বসুর বিজ্ঞান প্রতিভা দেশে-বিদেশে বিস্তার লাভ করুক এবং ভারতের কীর্তি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই ছিল নিবেদিতার অন্তরের অভিলাষ। এই ব্যাপারে তিনি বিজ্ঞানীকে নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও ভগিনী নিবেদিতার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া বিদেশে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি এত বিকাশের সুযোগ হতো কিনা সন্দেহ। মৃত্যুর ক'দিন আগে, নিবেদিতা তাঁর বন্ধু স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা বিদুষী মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন : ডঃ বসুর কাজের মূল্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ভারতে আরও যে সব মহান ব্যক্তি আছেন, ভারতের সেবার দ্বারাই তাঁরা মহান; সীমাবদ্ধ এক গোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁরা কাজ করেন। কিন্তু ধর্মে বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞানে বসু পৃথিবীর জন্য দান করেছেন। নিবেদিতার মাধ্যমেই মাদাম সেভিয়ারের সঙ্গে জগদীশ বসুর অন্তরঙ্গতা। নিবেদিতার মৃত্যুর পর ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মে জগদীশ বসুর দুই মাসাধিক অবস্থানকালে 'গাছ গাছড়ার জীবন রহস্য' সম্বন্ধে এক বক্তৃতার আয়োজন হয়। মাদাম সেভিয়ার ছিলেন [illegible] শ্রোতা [illegible]

সহায়তা করেন বিজ্ঞানী বসুর এক [illegible] পরবর্তী-কালে আলমোড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের নামে পাহাড় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের ব্যাপারে গবেষণার জন্য একটি সংস্থা স্থাপন করেন। বর্তমানে এই সংস্থাটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি গবেষণা দফতর। বশী সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একবার আলমোড়ায় গিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন ১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মকালে। এ যাত্রায় আলমোড়ায় বশী সেনের স্থাপিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এবং তাঁর বাড়িটি দেখে এসেছি। বিজ্ঞান ও কৃষিক্ষেত্রে স্বামীজীর স্বপ্ন রূপায়ণে বশীবাবু দেহ মন সঁপে দিয়েছিলেন। স্বামীজীর স্মৃতিকে কুমায়ুনবাসীর অন্তরে চিরজাগ্রত রাখার জন্য তাঁরই চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছে শহরপ্রান্তে একটি স্মৃতিবেদী—তাতে উৎকীর্ণ হয়েছে বিবেকানন্দের বাণী। স্ত্রী এমার্সন সেন আমেরিকান মহিলা। তাঁর লেখা অরেঞ্জলেস ইণ্ডিয়া দেশ-বিদেশে সমাদর লাভ করেছে। অসাধারণ বিদুষী—স্বামীর গর্বে গর্বিত।

জগদীশ বসু মায়াবতী যেতেন প্রধানত গ্রীষ্মকালে। তিনি একদিন বলেন: মায়াবতীতে যখন থাকি তখন নানা কল্পনা আমার মনের মধ্যে চাড়া দেয়, কলকাতা গেলে যেন সব ডুবে যায়।

যাঁর অর্থানুকূল্যে মায়াবতী আশ্রমের পত্তন সেই মহাপ্রাণ ইংরেজ ক্যাপটেন সেভিয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী মাদাম সেভিয়ারই ছিলেন আশ্রমে প্রাণশক্তির উৎস। তাঁর তত্ত্বাবধানে, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের নিরলস শ্রম ও সাধনায় আশ্রমের কার্যকলাপ দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল। পত্রিকার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, দর্শন ও জীবনী গ্রন্থাদি প্রকাশ হতে থাকে। দেশ-বিদেশের ধর্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আশ্রমের প্রতি।

স্বামী বিরজানন্দের নিকট থেকে ১৯১৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ নেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ—পূর্বাশ্রমের নাম দেবব্রত বসু। দেবব্রত ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রথম সারির কর্মী। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলিপুর বোমার মামলায় তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। দীর্ঘাকৃতি, তেজোমণ্ডিত চেহারা, শান্ত সৌম্য প্রকৃতি। তেমনই গভীর চিন্তাশীল মন। রাজ-নৈতিক জীবন ছেড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবার আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। মায়াবতী যাওয়ার আগে বছরখানেক 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে নতুন কর্মী হয়ে গেলেন ব্রহ্মচারী ভরত (স্বামী অভয়ানন্দ—বর্তমানে ভরত মহারাজ নামেই খ্যাত) এবং সীতাপতি মহারাজ (স্বামী রাঘবানন্দ)। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাজা মহারাজ) কর্মভারে ক্লান্ত স্বামী বিরজানন্দকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের মায়াবতী পাঠান। রাজা মহারাজ তখন কাশীতে। তাই মায়াবতী যাওয়ার পথে তাঁরা কাশীতে নেমে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁদের আশীর্বাদ করে বলেন যে তাঁদের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁদের মায়াবতী পাঠাচ্ছেন। স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) ইচ্ছা ছিল না ভরত মহারাজকে বেলুড় মঠ থেকে ছাড়েন। ভরত মহারাজ সে সময় বন্যাত্রাণের কাজ করছিলেন। মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর অঞ্চলে। ১৯০৯ সালে অতি অল্প বয়সে ভরত মহারাজ বেলুড় মঠে যোগ দেন, চার বছরের মধ্যে মায়াবতী আশ্রমের কাজে নিযুক্ত হন। মায়াবতীতে তিনি প্রায় বিশ বছর ছিলেন।

অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেদিন মঠে কত ঘটনার কথাই না ভরত মহারাজ বললেন। তাঁর চোখের সামনে যেন ভেসে উঠেছিল তাঁর প্রথম জীবনের মায়াবতী। হিমালয়ের জনবিরল পাহাড়ী অঞ্চলে ছোট্ট একটি আশ্রম ক্রমে কিভাবে আজ ভুবনজোড়া খ্যাতি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের [illegible] সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের মর্মবাণী প্রচার করে চলেছে পরম আনন্দে ও গর্বে তা তিনি বলছিলেন আমার কাছে।

১৯১৫ সালের কথা। সি আর দাশ তখনো দেশবন্ধু হননি—একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, দেশপ্রেমিক এবং রাজনৈতিক নেতা। মায়াবতী আশ্রমের প্রেসিডেন্টরূপে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁকে আশ্রমে আমন্ত্রণ জানালেন। ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জন জগদীশ বসু ও নিবেদিতার কাছে মায়াবতী আশ্রমের কথা শুনেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সন্ন্যাসীর সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে জানা-শোনা অনেক আগে থেকেই—যখন তিনি সন্ন্যাসী সঙ্ঘে যোগ দেননি। গণেন ব্রহ্মচারীর মারফত আশ্রমাধ্যক্ষের আমন্ত্রণ পেয়ে চিত্তরঞ্জন তা সানন্দে গ্রহণ করেন। সেবার পুজোর ছুটিতে কাঠগুদাম হয়ে যাত্রা করেন মায়াবতী। এক মাস কাল সপরিবারে তিনি মায়াবতী ছিলেন। দলে ছিলেন ১৪ জন। চিত্তরঞ্জন, বাসন্তী দেবী, কন্যাদ্বয় অপর্ণা ও কল্যাণী ও পুত্র চিররঞ্জন (ভোম্বল), চিত্তরঞ্জনের ল' ক্লার্ক এবং আত্মীয় ললিতমোহন সেন, বাসন্তী দেবীর এক সম্পর্কিত ভ্রাতা টগর, আর ছিলেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আত্মীয় পরিজন ছাড়া আরও ছয়জন—একজন আয়া, আর পাচক ভৃত্য মিলে পাঁচজন। আট জনের প্রত্যেকের জন্য ছিল একটি করে ডাণ্ডি। চারজন পাহাড়ী এক-একটি ডাণ্ডি বহন করে।

ভরত মহারাজ বলেন: সে এক এলাহি ব্যাপার। প্রায় শ' খানেক লোক, প্রচুর মালপত্রের বোঝা নিয়ে হাজির হলেন দাশ সাহেব। বাবুর্চি, খানসামা, বামুন—দেশী রান্না বিদেশী রান্না সব কিছুর আয়োজন ছিল। দাশ সাহেব থাকতেন 'সাদারন বাংলোতে।' (সেভিয়ার দম্পতি নিজেদের থাকার জন্য যে গৃহটি তৈরি করেছিলেন) সকালে আড্ডা বসতো 'গেস্ট হাউস'-এ। উপেনবাবু গান গাইতেন, কবিতা লিখতেন। গড়গড়া টানতে-টানতে চিত্তরঞ্জন নিবিষ্ট মনে শুনতেন। আশ্রমের বাগানে ছিল প্রচুর তরিতরকারি। বাসন্তী দেবী নিজে নিরামিষ শাক-সবজি রান্না করতেন। সেগুলি

… দাশ সাহেব আলোচনা করতেন। কী বিরাট পুরুষ ছিলেন চিত্তরঞ্জন, সে সময় বুঝতে পেরেছিলাম। দেশের জন্য কতটা যে তিনি ভাবতেন, তার কোনো পরিমাপ নেই। দেশের মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা তাঁর সে সময়ের কথাবার্তার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।'

চিত্তরঞ্জনের মায়াবতী যাওয়ার বছর তিন পরের কথা। মঠে শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব। দাশ সাহেব উৎসবের আগের দিন মঠে এলেন। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) চিত্তরঞ্জনের দেখাশোনার ভার দিলেন ভরত মহারাজের ওপর। ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল মায়াবতীতে। ভরত মহারাজ বলেন: 'এখন যেখানে মন্দির, সে জায়গাটায় মস্ত বড় সামিয়ানা টাঙান হয়েছে, গোবর দিয়ে লেপা হয়েছে। ঠাকুরের উৎসবে পঙ্‌ক্তি ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। চিত্তরঞ্জন ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। তাঁর জন্য আলাদা প্রসাদ নেওয়ার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। ভোগ ওঠার পর প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ চিত্তরঞ্জনকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে বললেন আমাকে। প্রসাদ প্রস্তুত। কিন্তু দাশ সাহেব একান্তে ঘরে বসে প্রসাদ নেবেন না—পঙ্‌ক্তিতে বসে সকলের সঙ্গে প্রসাদ নেবেন।' তিনি বললেন: 'না, যিনি সকলকে এক করতে এসেছিলেন, যাঁর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না, তাঁর জন্মদিনে আমি আলাদা বসে খাব এ-ও কি হয়। এ যে পাপ হবে মহারাজ।' এ কথা বলেই দাশ সাহেব ওই পঙ্‌ক্তি ভোজের জায়গায় বসে পড়লেন। দাশ সাহেবের সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী, বাবুরাম মহারাজও বসে পড়লেন ওখানে। খিচুড়ি আর আলুর তরকারি পরম তৃপ্তিতে সকলের সঙ্গে বসে খেলেন। এদিকে তাঁর খানসামার তো চক্ষুস্থির। সাহেব মাটিতে বসে খাচ্ছেন? কিন্তু দাশ সাহেব যে ছিলেন মাটির মানুষ।

মায়াবতীতে কিভাবে একবার এক বাঘের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা বলতে গিয়ে ভরত মহারাজ বললেন: সম্ভবত সেটা ১৯২১ কি ২২ সালের শীতকাল। বরফ পড়ছে প্রচণ্ড শীত—প্যাচপ্যাচে রাস্তা। বেড়াতে যাবো। কিন্তু সঙ্গী নেই। কেউ ঘরের বার হতে চায় না। শীতে তারা জবুথবু। অগত্যা একটা একনলা বন্দুক নিয়ে তিনি একাই বেড়িয়ে পড়লেন। বেশ কিছুটা গিয়ে ফেরার সময় শর্ট-কার্ট রাস্তায় নামলেন। একটু এগুতেই দেখতে পেলেন ডোরাকাটা একটা মস্ত বড় বাঘ—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। চুপচাপ বসে আছে, আমি যে পথে যাচ্ছি তার একটু নীচে—কয়েক ফুট দূরে। কী গ্রেসফুল চেহারা! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাঘের দিকে। হঠাৎ একটি গাছের ডাল পড়লো ওপর থেকে ঠিক তাঁর এবং বসে থাকা বাঘটার মাঝখানটায়। এ যেন দৈব ঘটনা। ডাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি উঠে আরও নীচের দিকে চলে গেল। 'বাঘের মুখে পড়েও এতটুকু বুক ধড়ফড় করেনি, ভয় পাইনি সে কথা আজও বেশ মনে আছে,' বললেন স্বামী অভয়ানন্দ।

মায়াবতী অবস্থানকালে এক গাড়োয়ালী মহিলা—সরস্বতী দেবীকে তিনি দেখেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের শিষ্যা। এক নেপালী সামরিক অফিসারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের কাল। তাঁর চারটি ছেলের মধ্যে তিনটিকেই যেতে হয় যুদ্ধে। ফ্রান্স-এ এক ছেলে যুদ্ধে মারা যায়। আর এক ছেলেরও কোনো সন্ধান নেই। রটে গেলো তার মৃত্যু হয়েছে—ওই মর্মে তারবার্তাও এলো মা বাবার কাছে। স্বামী ও এক পুত্রকে নিয়ে সরস্বতী দেবী তখন থাকেন পিথোরাগড়ে। প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর নির্দেশে আশ্রমের ঘোড়াটি নিয়ে ভরত মহারাজ ছুটে গেলেন তাঁদের বাড়িতে—শোকাতুর দম্পতিকে সান্ত্বনা দিতে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দেখেন, সরস্বতী দেবী তখন রামায়ণের ক্লাস নিচ্ছেন। এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, অপর পুত্রেরও মৃত্যু ঘটেছে বলে সন্দেহ; তারবার্তাও পেয়েছেন। অথচ সে দিকে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কাবুল যুদ্ধে স্বামীর একটি হাত জখম হয়, পরে কেটে বাদ দেওয়া হয়। পুত্রশোকে তিনি খুবই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবী? শেষ রাত্রে সরস্বতী দেবীর কণ্ঠরব শুনে ভরত মহারাজের ঘুম ভাঙলো। স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলছিলেন: যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্রের মৃত্যু হয়েছে এতো ক্ষত্রিয়ের কাছে স্বর্গতুল্য। এ যে বীরের মৃত্যু। কিসের জন্য দুঃখ করছ? সরস্বতী দেবী স্বামীকে পদ্মাসন করে বসে ভগবানের নাম করার জন্য বলছিলেন। এ যেন গুরু নির্দেশ দিচ্ছেন শিষ্যকে। সরস্বতী দেবীর কথাগুলি এই পরিণত বয়সেও ভরত মহারাজ ভুলতে পারেননি—ভুলতে পারেননি তাঁর তেজ ও ভক্তিময়ীরূপ। পরে কয়েক দিন বাদে নিখোঁজ ছেলেটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে সে বন্দী শিবিরে আটক থাকে। যুদ্ধাবসানে মুক্তি পায়। মায়াবতীতে সরস্বতী দেবী প্রায়ই যেতেন। স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি তাঁর তেজস্বিতায় বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করে সরস্বতী দেবীর এক ছেলে উদাসী হয়ে যান। সমাজ-সংসারের ওপর তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে। সর্বক্ষণ হাতে মালা জপ করতেন। কিছুকাল পর তাঁর মৃত্যু হয় বলে সংবাদ পাওয়া যায়।

মায়াবতীতে এককালে ভালুক ও হরিণের অন্ত ছিল না। আশ্রমের গরু বাছুর বাঘের শিকার হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আশ্রমের বাগানে বিকালের দিকে ঘাস কাটতে এসে 'বাচ্চিয়া' নামে এক গ্রামবাসী বাঘের কবলে মারা গিয়েছে ভরত মহারাজ তার সাক্ষী। হিংস্র বনপ্রাণী—বাঘ ভালুক প্রভৃতির আক্রমণ থেকে গরু বাছুর ছাগল রক্ষা করার জন্য মায়াবতীতে কুকুর পোষা হয়। বলিষ্ঠ ও তেজী কুকুর সারা রাত আশ্রমে বাগ-বাগিচা পাহারা দিয়ে আসছে আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে। লালু, ভুতাই, ভুতী—এই তিনটি কুকুরের দাপটে চোর কেন বাঘ ভালুকও আশ্রমের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না। হনুমানের উৎপাতও থাকে খুব বেশী—এই ত্রয়ীকে দেখতে পেলে তাদের পলায়ন ছাড়া পথ থাকে না।

মায়াবতী আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যমণ্ডলী—ওপরে: স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বরূপানন্দ, সচ্চিদানন্দ (বাঁ থেকে ডানে)। নীচে: শ্রীমতী সেভিয়ার, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, বিরজানন্দ, বিমলানন্দ, ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ

মায়াবতী অঞ্চলের মধু চমৎকার। হাসপাতালের ডাক্তারকে দলবল নিয়ে ছুটির সময়ে চাকসহ মধু সংগ্রহ করতে দেখেছি। পাহাড়ের ওপরে মধু সংগ্রহ অভিযান পাহাড়ী বালকদের একটা আনন্দের বস্তু। কুমায়ুন পাহাড়ের মধু যেমন বিশুদ্ধ তেমনি প্রচুর ক্যালোরিযুক্ত। শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রম তো ফুল ও মধুর জন্য বিখ্যাত। মাদাম সেভিয়ার মায়াবতী আশ্রম থেকে মাঝে মাঝে ইংলণ্ডে যেতেন। কিন্তু 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং আশ্রমটি ছিল তাঁর প্রাণপ্রিয়। প্রতিটি গাছ-পালা এবং জীবজন্তু সম্বন্ধে তিনি খুঁটিয়ে লিখতেন আশ্রমিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী-দের নিকট। মাদামের একটি ভুটিয়া কুকুর ছিল, নাম 'লামা'। বার্ধক্যহেতু লামার মৃত্যু হলে মাদাম খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন শোকে। সেদিন তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেননি—ঘর বন্ধ করে বসে ছিলেন। ১৯১৬ সালে মাদাম স্থায়িভাবে চলে যান ইংলণ্ডে। তার অনেক আগেই—স্বামীজীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই তিনি অদ্বৈত আশ্রমের জন্য একটি ট্রাস্ট ডিড করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মনোবাসনা—অদ্বৈতভাবের সাধনা এবং বহুজনহিতায় কাজ—এই আদর্শ অনুযায়ী যাতে আশ্রমের কার্য পরিচালনা হয়, সেভাবে ট্রাস্ট ডিডটি রচিত হয়। ১৯৩০ সালের ২০শে অক্টোবর ৮৩ বছর বয়সে এই মহীয়সী মহিলা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। শেষের দিকে আশ্রমে লিখিত চিঠিপত্রে 'ওল্ড মাদার' বলে লিখতেন। মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহও স্বামী ক্যাপ্টেন সেভিয়রের মত হিন্দুমতে সৎকার করা হয় এবং ভস্মরাশি আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এটিই ছিল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ১৯৪২ সালের জুন মাসে মায়াবতী পরিদর্শনে যান। আলমোড়া থেকে হেঁটে গিয়েছিলেন দীর্ঘ পথ। ফিরেছেন টনকপুর হয়ে। মায়াবতীতে তখন বৃষ্টি। তা হলেও মায়াবতী থেকে হিমগিরির সৌন্দর্য ভোগ করেছেন প্রাণভরে। আশ্রমিকরা ভেবেছিলেন এত বড় একজন শিল্পী নিশ্চয়ই ওখানে বসে তিনি কিছু ছবি আঁকবেন। কিন্তু একটি ছবিও তিনি আঁকেননি। কেন? নন্দলাল বলেন: 'আমার এখানে ছবি আঁকার মন আসছে না। আমি এখানকার অপরূপ পরিবেশটি অন্তরের শ্রদ্ধা ও অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। এটাই হবে আমার মস্ত লাভ। আমি মায়াবতী থেকে ফিরে যাবো অসীম প্রেরণা নিয়ে—এই প্রেরণাই ফিরে গিয়ে আমাকে কাজ করার শক্তি দেবে।' মায়াবতী দাতব্য হাসপাতালটি দেখে এটিকে 'হিমালয়ের বুকে প্রেম ও করুণার স্রোতস্বিনী' রূপে আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি।

মায়াবতী থাকাকালে নন্দলাল ছবি না আঁকলেও আলমোড়ায় তিনি কয়েকটি ছবি এঁকেছিলেন। তার মধ্যে রঙিন ছবিও ছিল। আলমোড়ায় আঁকা তাঁর 'জ্বলন্ত পাইন' ছবিটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে বিবেচিত হয়েছিল। নিত্যভ্রমণ ছিল নন্দলালের কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ। আলমোড়া থেকে মায়াবতীর দিকে যে রাস্তাটি গেছে, একদিন সঙ্গীদল নিয়ে তিনি সেই রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন। পাহাড়ী রাস্তা—স্বাভাবিক কারণেই নির্জন। একদিন দেখতে পেলেন ওই রাস্তার পাশে একটি পাইন গাছ জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন গাছের গায়ে কিছুটা অংশ চেরা, সেখানটা ধীরে ধীরে পুড়ছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আবিষ্কার করা হলো কোনো কৌতূহলী পথচারী হয়তো বৃক্ষক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা আঠার মত কষ—যাকে 'কৌজন' বলা হয়—তার ওপর জ্বলন্ত সিগারেট রাখেন, তাতেই আগুন ধরে যায় এবং এই আগুন ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে। (প্রসঙ্গত বলা যায় ওই কষ থেকে তৈরি হয় তারপিন তেল। কুমায়ুন অঞ্চলে প্রতিটি পাইন গাছের গোড়ায় দেখা যাবে একটি করে পাত্র গাঁথা রয়েছে। গাছের গা কয়েক ইঞ্চি কেটে পাত্রটি বেঁধে রাখা হয়—ওখানে কষ চুঁইয়ে পড়ে।) এই দৃশ্য দেখার জন্য বহু লোক ওখানে যেতেন। নির্জন পাহাড়ে একটি সু-উচ্চ পাইন গাছকে অসহায়ভাবে নীরবে জ্বলতে দেখে শিল্পিমন ব্যথিত হয়। তিনি তুলির আঁচড়ে 'জ্বলন্ত পাইন'-এর দৃশ্যটি ধরে রাখলেন।

এই প্রসঙ্গে মায়াবতীতে কথাচ্ছলে ...
হিন্দুঘরে জন্মে হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ করে দেবদেবীর ছবিই এ'কেছি। এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধারণ জীবনের ছবিও এ'কে থাকি; উভয়েতেই সমান আনন্দ পাই। দেবতার রূপ কল্পনাই উঁচু দরের জিনিস, আশপাশের সাধারণ জিনিসের রূপ তুচ্ছ—এই ধারণা পূর্বে ছিল। মনের পরিণতির সঙ্গে রূপকেই আর প্রধান করে দেখিনে, তাদের প্রত্যেকটিকে একই সত্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ হিসাবে দেখি। সমুদয় জগৎ, অন্তরে বাহিরে সকল রূপ, যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান সত্তার সেই প্রাণ-ছন্দকেই খুঁজি সমস্ত রূপে—কী সাধারণ আর কী অসাধারণ। অর্থাৎ, পূর্বে দেবতা দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে পাই—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।' উল্লেখ থাকে যে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের এককালীন অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু) নন্দলালের আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দেবব্রত যখন বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন তিনি প্রায়ই নন্দলালের কলকাতার বাসাবাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। দেশের দুরবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হতো। পরাধীনতার বন্ধন বেদনা নন্দলালকে পীড়িত ও ব্যথিত করেছিল। তিনি তখন তরুণ-যুবা। সে সময় বাঙলার বিপ্লবীদের প্রতি নন্দলালের সহানুভূতি ও সমর্থন অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে শ্রীশ্রী ঠাকুরের মানস সন্তানদের মধ্যে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভূতানন্দ (লাটু মহারাজ), স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ মায়াবতী পরিদর্শন করে তৃপ্তি লাভ করেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ—যিনি মায়াবতীতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কর্মী হিসাবে নিয়োগ করে তাঁদের এটি 'প্রাইজ পোস্ট' দেওয়া হলো বলে মন্তব্য করলেন, তাঁর সেখানে যাওয়া হয়নি। একবার যাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়েও শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করা হয়। আশ্রমের প্রশান্ত স্নিগ্ধতা এবং নির্জনতার মধ্যে ভগবৎ সাধনার জন্য এখনো মঠ মিশনের সন্ন্যাসীদের সমাবেশ হয় সারা বছর ধরেই। বেলুড় মঠ ও মিশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দ দীর্ঘকাল মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে তিনি এবং ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দ) মায়াবতী গিয়েছিলেন। কৈলাস আসা-যাওয়ার পথে সাধু-সন্তরা আশ্রমে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। সে সময়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম দর্শন ছিল কৈলাসতীর্থ যাত্রীদের অবশ্যকর্তব্য: কৈলাসের পথের নানা কাহিনী তাঁরা শোনাতেন। চম্পাওয়াত হয়ে কৈলাসগামী পথের চিহ্ন আশ্রম থেকে এখনো চোখে পড়ে। এই পথ এখন বন্ধ। বন্ধ কৈলাসযাত্রাও।

সরলা দেবী চৌধুরানী বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে মায়াবতী আশ্রমে গিয়েছিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ তখন জীবিত। 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে তিনি মায়াবতী পরিদর্শনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : "আমি গিয়েছিলুম তখন হিমালয়ের উপর স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে। সেখানে দেখলুম সেই 'অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল' ভারতবর্ষকে আমার; সেই 'শুভ্র তুষার কিরীটিনী' মাকে আমার। আহা কি সুন্দরী! চোখের সামনে ঝকঝক করছে কেদার ও বদ্রীনারায়ণের শৃঙ্গ। এই তুষার প্রাচীরের ওপারে অন্যান্য বর্ষ অন্যান্য সভ্যতা; এপারে চিরসনাতন ভারতবর্ষ ও ভারত সভ্যতা; যা বেদমন্ত্রে মুখরিত হয়ে ভারতের গগন আচ্ছন্ন করেছিল। এই পর্বতমালার কন্দরে কন্দরে আজও কি তার প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে না! ঐ উপত্যকা ক্রোড়োত্থিত মেঘপুঞ্জ চিরজীব ঋষিদের হোমাগ্নিধূমে কি আজও ধূমায়িত নয়? ...এখানে দেখলুম আশ্রমাধ্যক্ষ, স্বামী স্বরূপানন্দ, যাঁর সঙ্গে বেলুড়ে প্রথম সাক্ষাৎ হয়—'প্রবুদ্ধ ভারত' নামীয় অতি উচ্চাঙ্গের একখানি পত্রিকা সম্পাদন করছেন, ব্রহ্মচারীদের জন্য বেদান্তক্লাসে নিয়মিত অধ্যাপকতা করছেন। আবার তিনিই অন্য সময়ে অতিথি অভ্যাগতদের সৎকারে ত্রুটি না হয়—এ জন্য আশ্রমের ভাণ্ডারগৃহ থেকে চাল ডাল আটা কিসমিস পেস্তা বাদাম প্রভৃতি বের করে রোদ্রে শুখতে দিচ্ছেন, নিজের হাতে পোকা বেছে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার ভাণ্ডারে তুলছেন। কোনো কর্মই তাঁদের পক্ষে অবহেয় নয়। ধীরে ধীরে আমার মনে অনুপ্রবেশ করল যে এই হল জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়; এ'দের এই গৃহস্থতুল্য কর্মের মধ্যে গৃহস্থের স্বার্থপরতা নেই, শুধু কর্তব্যের ওপর সেবার অনুপ্রেরণা রয়েছে।"

এতকাল পরেও মায়াবতী আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কর্মের সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। আশ্চর্য আমরাও দেখলাম সাধু ব্রহ্মচারী নিজেরাই গম, ডাল প্রভৃতি শুকোতে দিচ্ছেন রোদে, সাধারণ শ্রমিক ও মিস্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের দরজা জানালায় রং বুলুচ্ছেন। আবার এ'রাই প্রত্যুষে সুর করে বেদমন্ত্র পাঠ করছেন, অথবা নিবিষ্ট মনে বসে বিদেশী কোনো পণ্ডিতের লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে টকাটক টাইপ করছেন 'প্রবুদ্ধ ভারতের' জন্য প্রবন্ধ।

মায়াবতী যাতায়াত এখন আগেকার তুলনায় সহজ হয়েছে। লোহাঘাট থেকে রাস্তা গিয়েছে আশ্রম পর্যন্ত—পাকা না হলেও যানবাহন চলাচল করতে পারে। আশ্রমে বিজলী আলোও হয়েছে, পানীয় জলের অভাব ঘুচেছে। রাস্তাটি পাকা না হওয়ায় যানবাহনের পক্ষে অনেক সময় অসুবিধা হয়। বর্ষায়-বৃষ্টিতে মাঝে মাঝে ধস নেমে যাতায়াত বন্ধ থাকে। একদিকে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সুবিধা আছে, আবার অন্য দিকে অসুবিধাও। আশ্রমের নির্জনতা ও প্রশান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন। হিমালয়ের আর দু-চারটি দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে মায়াবতীকে এক সারিতে গণ্য করলে ভুল করা হবে। মায়াবতী ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' ভগবৎপ্রেমিক মানুষের পিপাসিত চিত্তে অমৃত সুধা সিঞ্চন করে তাকে রসসিক্ত ও সঞ্জীবিত করবে এই হোক আমাদের একমাত্র কামনা। মায়াবতী অনন্তকাল ধরে হয়ে থাক প্রবুদ্ধ ভারতের প্রাণকেন্দ্র—যেখানে পাওয়া যাবে আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ, অন্তর জ্যোতির সন্ধান।

খেলা

কারপভ দেখালেন তিনি কত প্রতিভাধর

এই লেখাটি যখন তৈরি করছি তখন বিশ্ব দাবার খেতাবী খেলায় চ্যালেঞ্জার ভিক্টর করশনয়ের বিরুদ্ধে আনাতলী কারপভ ৪—১ জয়ে এগিয়ে আছেন। লেখাটা ছাপা হয়ে পাঠকদের হাতে পৌঁছবার মধ্যেই হয়তো কারপভ আর দুটি গেম জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের সম্মান পাবেন। হবেন অবিসংবাদী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ১৯৭৫এ তিনি প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ওয়াক ওভার পেয়ে, তখনকার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ববি ফিশার খেতাবী ম্যাচে না খেলায়। তাই অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল কারপভই দাবা খেলায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ কিনা। দাবা-বিশ্বের বিরল প্রতিভা ববি ফিশার অবশ্য এবার ক্যান্ডিডেট প্রতিযোগিতাতেও খেলেননি। তবু প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী কারপভের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে যে মানসিক চাপের মধ্যে শীর্ণকায় সাতাশ বছর বয়সী চ্যাম্পিয়ন চ্যালেঞ্জার করশনয়কে পর্যুদস্ত করেছেন তাতে প্রমাণ হয়েছে তিনি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া পৃথিবীর দারুণ প্রতিভাধর দাবাড়ু।

দাবার গুরুত্বপূর্ণ খেলায় জয়ের ট্যাকটিক্স হিসাবে কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বির মনের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দাবা বিশেষজ্ঞ হিমানীশ গোস্বামী তার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ১৯৭২ সালে ফিশারও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন চ্যালেঞ্জার বরিস স্প্যাস্কির মনের উপর। স্প্যাস্কি সে চাপ সহ্য করতে না পেরেই এগিয়ে যেয়েও শেষ পর্যন্ত হেরে যান। কারপভ কিন্তু সমস্ত চাপ, সমস্ত অভিযোগ উপেক্ষা করে অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। আর খেলার মধ্যে দেখিয়েছেন সূক্ষ্ম বুদ্ধি, নতুন পরিকল্পনা। দিয়েছেন। মস্তিষ্কপ্রসূত নতুন চাল।

এবারে পঞ্চম গেমটির কথা বলা যাক। তখনো কেউ একটি গেমও জেতেননি। করশনয় সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলছেন। বারবার কাবু করে ফেলছেন কারপভকে। কারপভ নড়াচড়ার বেশী জায়গা পাচ্ছেন না চৌষট্টি ঘরের ছকের মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা বললেন, এ গেমে কারপভের হার এড়ানো খুবই শক্ত এবং এই চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় যিনি প্রথম গেমটি জিতবেন মনের দিক দিয়ে সতেজ থেকে তিনি চাপ সৃষ্টি করে যাবেন প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে। আর্জেন্টিনার গ্র্যান্ড-মাস্টার মিগুয়েল নজডর্ফ, আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার রবার্ট বার্ন, যুগোস্লাভিয়ার চেস-মাস্টার নিয়োস্লাভ বাডাকিক সবাই বললেন, কারপভ হেরে যাচ্ছেন। এমন কি, কারপভের পরামর্শদাতা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মিখাইল তালও চালের গবেষণা করে হদিস পেলেন না, কিভাবে কারপভ হার এড়াতে পারেন। প্রথম দিনের খেলা মুলতবির সময় কারপভের ৪২ চালটি 'সিল' করা ছিল। ওই চালটি কি হতে পারে তা জানার জন্য গ্র্যান্ডমাস্টাররা উদ্গ্রীব হয়ে ছিলেন। বহু মাথা এক হয়ে গবেষণা করে সম্ভাব্য একটি চালের হদিস পেয়েছিলেন, যে চালে কারপভ হয়তো হার এড়াতেও পারেন। কিন্তু পরের দিন 'সিল' খোলার পর দেখা গেল কারপভ যে চাল দিয়েছেন কারো মাথায় তা আসেনি। তাঁর মস্তিষ্ক-প্রসূত একেবারে নতুন ধরনের চাল। ওই চালে তিনি সংগ্রাম করার জায়গা পেলেন বটে কিন্তু করশনয় সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে কারপভকে কাবু করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। গেমটি চলল তিন দিন। দীর্ঘ বার ঘন্টা পনর মিনিট সংগ্রামের পর ১২৪ চালে ড্র-র প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলেন করশনয়। দাবা ইতিহাসের এক অভাবনীয় সংগ্রাম।

আনাতলী কারপভ

করশনয় তো সাধারণ ধরনের খেলোয়াড় নন, মস্ত মাপের বিশ্বখ্যাত দাবাড়ু। এই সাতচল্লিশ বছর বয়সেও ক্যান্ডিডেট প্রতিযোগিতায় যেভাবে তিনি তিন অসাধারণ খেলোয়াড় পলুগেভস্কি, পেত্রোসিয়ান ও স্প্যাস্কিকে হারিয়ে খেতাবী খেলায় চ্যালেঞ্জার হন তাতে অনেকেরই ধারণা ছিল দাবায় বেশী বয়সী খেলোয়াড়ের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভে নতুন ইতিহাস রচনা হতে পারে। কিন্তু করশনয়ের পাকা বুদ্ধিকে কাঁচা করে দিয়ে কারপভ প্রমাণ করলেন তিনি আরও অসাধারণ।

করশনয় কিভাবে কারপভের স্নায়ুর উপর প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করে গেছেন খতিয়ে দেখা যাক। আমরা জানি, দুজনই সোভিয়েট রাশিয়ার খেলোয়াড়। করশনয় দেশত্যাগী। এবং দেশত্যাগ করেন মুখ্যত কারপভের কারণে। ১৯৭৪-এর ক্যান্ডিডেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ফিশারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য সোভিয়েট দাবা ফেডারেশন নাকি তখনকার ২৪ বছর বয়সী কারপভকে যোগ্য মনে করে করশনয়কে হেরে যেতে বলেছিলেন কার-পভের কাছে। তারপর নাকি আন্তর্জাতিক দাবার নানা সুযোগ-সুবিধা থেকেও করশনয়কে বঞ্চিত করা হয়। তাই দু বছর আগে দেশত্যাগ করে করশনয় আশ্রয় নেন সুইজারল্যান্ডে। স্বাভাবিক কারণেই রাশিয়ার প্রতি তাঁর দারুণ বিদ্বেষ। বিদ্বেষ কারপভের বিরুদ্ধেও। তাঁর জন্যই তো তিনি দেশ-ছাড়া। তার উপর আবার স্বদেশে থাকতে দুই দাবাড়ুর ৩৪ বার খেলার মধ্যে কারপভের জয় ছয় বার, করশনয়ের পাঁচবার। তাই বোধ হয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়ে কারপভকে হারানোই ছিল তাঁর বেশী কাম্য। সেইভাবেই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। সাহায্য পেয়েছিলেন পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের। তাঁর প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন ইংলন্ডের মাইকেল স্টিন। ডেলিগেশনের নেত্রী ছিলেন নেদারল্যান্ডসের পেত্রা লিউয়েরিক। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই ভদ্রমহিলারও দারুণ বিদ্বেষ। ১৯৪৮-এ অধিকৃত অস্ট্রিয়ায় রুশীদের হাতে বন্দী হয়ে দশ বছর ছিলেন সোভিয়েট কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

তাই ফিলিপিনসের বাগুইওসিটির শৈলাবাসে ৪৪ লক্ষ টাকা পুরস্কার অর্থের খেতাবী খেলা আরম্ভ হবার আগে থেকেই অভিযোগ উঠতে আরম্ভ করল। করশনয় প্রথম অভিযোগ করলেন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে আসতে দিচ্ছেন না। তারপর সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের কাছে খোলা চিঠি লিখে স্ত্রী ও পুত্রকে পাঠিয়ে দেবার দাবি জানালেন। ম্যানিলায় পৌঁছে বললেন, আমি যদি জিতি তবে আমাকে খুন করা হবে। রাশিয়ার ডেলিগেশনে যে চোদ্দজন আছে তার মধ্যে দুজন আছে গুপ্ত পুলিস কে জি বি-র লোক। তারপর বললেন, অদৃশ্য রশ্মির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি দেহের সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্র রাখবেন। পতাকা ব্যবহার নিয়ে জোর বিতন্ডা হল। খেলার সময় আয়না-চশমা পরে খেললেন কারপভের নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে থাকতে। দ্বিতীয় গেমে অভিযোগ তুললেন, খেলার মধ্যে কারপভকে ইউগোর্ট (টক দই) সরবরাহ করার সময় সাংকেতিক বার্তা পাঠানো হয়েছে। অষ্টম গেমে প্রথম পরাজয় স্বীকারের পর অভিযোগ তুললেন, তাঁকে সম্মোহন করা হচ্ছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ ভ্লাডিমির জুকার দর্শক আসনের দ্বিতীয় সারিতে বসে তাঁকে সম্মোহন করছেন। সব অভিযোগ অবশ্য করশনয়ের নিজের মুখ থেকে করা হয়নি। করা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। দলনেত্রী পেত্রা লিউয়েরিক এও বললেন, সম্মোহনশক্তিকে কাটান দেবার জন্য তিনিও এক মনস্তত্ত্ববিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খেলা আরম্ভ করার আগে করমর্দন করা নিয়ে গোলমাল হল। বলা হল করশনয় আর সরাসরি ড্র-র প্রস্তাব দেবেন না, দেবেন মধ্যস্থ মারফত।

এইভাবে প্রায় প্রতি দিনই কারপভের স্নায়ুর উপর অসাধারণ চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু হিটলারের বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে যে নীতি অবলম্বন করে নির্বাক স্তালিন পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ জয় করেছিলেন, সেই নীতি অবলম্বন করেই দাবার বিশ্বযুদ্ধে করশনয়কে কাত করলেন রাশিয়ার আনাতলী কারপভ।

১৯৭৫এ কারপভ প্রথম বিশ্বখেতাব পাবার পর এই 'দেশ'-এর পাতায় এক প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। সেটা তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে।

১৯৭৫এ বিশ্বখেতাব পাবার পর ভূমিকাটা খতিয়ে দেখা যাক। করশনয়ের সঙ্গে খেতাবী খেলার আগে পর্যন্ত খেলেছেন দু শো কুড়িটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার গেম। তার মধ্যে পরাজয় মাত্র ছয়টি গেমে। ১৯৭৫এ অ্যান্ডার্সনের কাছে, ১৯৭৬-এ টোরে ও জেলারের কাছে, ১৯৭৭-এ তাইমানভ, বেলিভস্কি এবং টিম্যানের কাছে। মর্যাদা-পূর্ণ প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে ৭৬-এ কোপেনহেগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পনের পয়েন্টের মধ্যে সাড়ে বারো পয়েন্ট পেয়ে এবং নজন গ্রান্ডমাস্টারের উপরে থেকে। '৭৭এ ব্যাডকিস্টারার্সের প্রতিযোগিতায় ষোলজন প্রতিযোগীর মধ্যে বারজনই ছিলেন গ্রান্ড-মাস্টার। বারো পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন কারপভ। লাসপালমাস '৭৭ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন পনের পয়েন্টের মধ্যে বারো পয়েন্ট সংগ্রহ করে। বিখ্যাত লারসেন এগার পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। টিলবার্গে' অফ গ্র্যান্ডমাস্টার্স' চ্যাম্পিয়নশিপেও কারপভ শীর্ষস্থান দখল করেন। শুধু বিওগ্রাড প্রতিযোগিতায় যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন হন বরিস স্প্যাসকির সঙ্গে।

রেকর্ডের দিক দিয়ে কিউবার ক্যাপাব্লাঙ্কাকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছেন কারপভ। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ক্যাপাব্লাঙ্কা মোট ৫৯৫টি আন্তর্জাতিক গেমের মধ্যে হেরেছিলেন ৩১টি গেমে। আনাতলী কারপভ হেরেছেন মাত্র সাতাশটি গেমে মোট ৬৫০টি গেমের মধ্যে। গেমের সংখ্যা ৫৫ বেশি, হারের সংখ্যা বারো কম। সুতরাং রেকর্ডের দিক দিয়েও কারপভ এখন বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

আলি কি আবার আমীর হবেন

পরেশ নন্দী

আমীর থেকে ফকির, ফকির থেকে আমীর এবং আবার আমীর থেকে ফকির। মহা-মুষ্টিক মহম্মদ আলির জীবনে আমীরী এবং ফকিরী যেন আলো-ছায়ার জাল বুনে চলেছে।

লুইসভিলের দরিদ্র নিগ্রো কেসিয়াস ক্লে দীর্ঘ নিরলস সাধনার পর করেছিলেন সিদ্ধিলাভ। প্রায় ১৭ বছর আগে আর্চি মুরের ঘুষিতে নাক ভাঙার পর দীর্ঘ ও কঠিন পথ অতিক্রম করে ক্লে করতলগত করলেন বিশ্ব হেভিওয়েট খেতাব। সেই প্রথম আমীর হয়ে বসলেন মুষ্টিযুদ্ধের তখ্‌ত তাউসে; নূতন নামকরণ করে তিনি হলেন মহম্মদ আলি।

এই ছিদ্র পথেই প্রথম বার শনি প্রবেশ করেছিল তাঁর জীবনে। ধর্মে 'ব্ল্যাক মুসলিম' আলি নীতিগত কারণে যুদ্ধের বিরোধিতা করে মার্কিন সরকারের বিরাগ-ভাজন হলেন। জেল খাটলেন এবং পরে মামলা করে সরকারের বিরুদ্ধে বিজয়ীও হলেন। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেল। কেড়ে নেওয়া হল তাঁর বিশ্ব-খেতাব। আলি শীঘ্রই আবার ফিরে এলেন মুষ্টিযুদ্ধের আসরে। যে সমস্ত এরণ্ডরা ইতিমধ্যে বৃক্ষের অভাবে 'দ্রুমায়তে' হচ্ছিলেন তাদের উচ্ছেদ ও উৎখাত করে মহম্মদ আলি দ্বিতীয় বার বিশ্ব খেতাবের মুকুট তুলে নিলেন নিজ মাথায়। আবার আমীর হলেন।

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এ এক অনন্য-সাধারণ কীর্তি। এখানে একবার কেউ সরে গেলে আর তিনি ফিরে আসতে পারেন না। নজির আছে চারটি—জেমস জেফারিস, জেনি টোনি, জো লুই এবং রকি মার্সিয়ানো। এ চারজনই অপরাজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের গৌরব নিয়ে অবসর নিয়েছিলেন। এর মধ্যে জেফারিস ও জো লুই আবার আসরে নেমেছিলেন এবং পরাজয়ের গ্লানিতে মসীলিপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মহম্মদ আলির কিন্তু কোন তুলনা নেই। হৃত খেতাব পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ফিরে এলেন এবং আবার মুকুট মাথাতে তুলে নিলেন।

বহাল তবিয়তে দীর্ঘ কাল চালিয়ে গেলেন রেকর্ড। এ সময়ে রজব আলি নামে এক বক্সিং প্রেমিক মহম্মদ আলির উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ২৫শে মার্চের 'দেশ'-এ। পুনরুক্তি হবে তবু সে চিঠি থেকে একটু সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বলেছিলেন রজব আলি, "তোমার অবসর নেবার সময় পার হয়ে গেছে। আর দেরী করা উচিত নয়।...তুমি যেমন বার বার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছ, তেমনই ডলারের ডালিতে পূর্ণ করেছ তোমার কোষাগার। তবু তোমার চাহিদার শেষ নাই। তাই বার বার অবসর নেবার কথা বলে আবার লড়াইয়ে ফিরে আসছ।...অন্তহীন প্রলোভন হয়ত অচিরে তোমারও পতন ডেকে আনবে।"

রজব আলি সাধারণ সাবধানী লোক। তাঁর এবং মহম্মদ আলির জীবন-দর্শন কখনো এক হতে পারে না। একদিন ভরাডুবি হবে এ ভয়ে দুনিয়ার মহম্মদ আলিরা ভীত নয়। পরাজয়ের ভয়ে মাঝ পথে থেমে যাবার মত দুর্বল চিত্ত লোক নন মহম্মদ আলি। সফল হল রজব আলির সাবধান বাণী। গত ১৫ই এপ্রিল লাস ভেগাসে ইন্দ্রপতন হল।

সত্যই পরাজিত হয়েছেন মহম্মদ আলি। কিন্তু ঐ পরাজয় কি ইন্দ্রের পতন না মূর্ছা। পিটার বনডেনটার বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের অন্যতম নামী সমালোচক। "লাস ভেগাস" পত্রিকাতে যে মন্তব্য করেছেন তার অনুবাদ করলে বলা যেতে পারে যে এ পরাজয় রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের পতনের মত। তিনি রেখে ঢেকে যা বলেছেন তার অর্থ, মহম্মদ আলি এমনভাবে ফুরিয়ে যাবেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

তাঁর এ অনুমান অসংগত বলে মনে হয় না। মুষ্টিযুদ্ধের চতুষ্কোণ মঞ্চে এমনভাবে মার খেয়ে খেয়ে পড়বে মহম্মদ আলি? বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের পরাজয় ইতিপূর্বেও ঘটেছে এবং পরেও ঘটবে। কিন্তু সেদিন যা ঘটল এবং যেভাবে ঘটল তার নজির খুঁজতে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে পঞ্চাশ বছরেরও বেশী। ১৯৩৫ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাক্স বেয়ারকে পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়েছিল জিম ব্র্যাডকক। আর ১৯৭৮ সালে 'রকি' স্পিংকস পয়েন্টে হারালেন মহম্মদ আলিকে। ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন অঘটন আর ঘটেনি। ইতিমধ্যে আর কোন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পয়েন্টে হেরে খেতাব খোয়াতে বাধ্য হননি। বনডেনটার বলতে চাইছেন যে, মহম্মদ আলির অপমৃত্যু নয়, বীরেরা থেমে থাকেন না।

পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে আলিকে লড়তে হয়েছে মোট ৫৮ বার এবং খেতাব রক্ষার সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন ২০ বার। রজব আলি বুঝতে পারেননি যে, এ দুনিয়ার মহম্মদ আলিরা না থামালে থেমে যাবেন না।

এ জীবন-দর্শনের সংগে সংগতি রেখেই স্পিংকসের বিরুদ্ধে পরাজয়ের অল্প পরেই 'লাস ভেগাস'-এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিশাল এক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মহম্মদ আলি স্বগতোক্তি করেছিলেন, "আমি জয়লাভ করলে পৃথিবী হয় বিস্মিত; আমি হারলে পৃথিবী হয় স্তম্ভিত। কিন্তু কোন না কোন সময়ে সকলকেই একবারের জন্য হলেও হারতে হয়। তবু মানুষ চলে এগিয়ে। আমিও এগোব। আমি হবো তৃতীয়বার খেতাব-হারানো এবং খেতাব-বিজয়ী মুষ্টি-যোদ্ধা—আমি হব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।"

এ একান্ত উক্তি থেকে মনে হতে পারে যে, আলি হয়তো স্পিংকসকে বিজয়ীর প্রাপ্য সম্মান দেননি। এ রকম মনে করলে আলির প্রতি অবিচার করা হবে। ফলাফল ঘোষণার পরই আলি অভিনন্দন জানিয়ে স্পিংকসকে বলেছিলেন, 'তুমি আজ দুনিয়াকে উলটে দিয়েছ।' হাসি মুখে জবাব দিয়েছিলেন স্পিংকস, 'ধন্যবাদ! একদিন তুমিও ঠিক এমনি করতে।'

এ প্রাথমিক ভদ্রতা বিনিময়ের পরই শ্রান্ত-দেহে, ক্ষত-বিক্ষত মুখ নিয়ে আলি এলিয়ে পড়েছিলেন একটি চেয়ারে। পাশে হাঁটু গেড়ে স্বামীর হাতে হাত রেখে বসেছিলেন স্ত্রী ভেরোনিকা। এমন সময় ভীড় ঠেলে কাছে এলেন ভাই রহমান আলি। উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "জানি এ লড়াইয়ের জন্য তোমার উপযুক্ত শারীরিক প্রস্তুতি ছিল না। তবু আমি বলব, তোমাকে জোচ্চুরি করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

বিজয়ী বীরের অসম্মান সহ্য হল না আলির। গর্জে উঠলেন তিনি, "চুপ কর! হারলেই তুমি মাথা গরম কর। তোমার নির্লজ্জ উক্তি শুনে আমি বিব্রত বোধ করছি। সত্য কথা হল, আমি জিততে পারিনি। অজুহাত দেখিয়ে আমাকে আর ছোট করো না।" সংগে সংগে স্পিংকসের সৌজন্যেরও একটি মনোরম চিত্র প্রকাশ করেছেন 'লাস ভেগাস'। এ সংবাদপত্র বলেছেন যে, জয়লাভের পর স্পিংকস আত্মগতভাবেই বার বার বলে চলেছিলেন, "আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন!" এমন সময় একজন বলে উঠলেন, "তুমি শুধু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নও; তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টি-যোদ্ধাও বটে।" কথাটি কানে যাওয়া মাত্র তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়ালেন স্পিংকস। বললেন, "আমি জিতেছি বটে, কিন্তু আমি সর্বশ্রেষ্ঠ নই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন একমাত্র মহম্মদ আলি।"

এতদিন পর সে ঐতিহাসিক মুষ্টিযুদ্ধের ময়না-তদন্তের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবু "লাস ভেগাস"-এর বিশেষজ্ঞের বিবরণ থেকে ছোট একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "পনেরো রাউন্ড প্রতিযোগিতার দশম রাউন্ডের শেষে" বলছেন 'লাস ভেগাস' "সকলেরই মনে হয়েছিল যে, আলির জয় অবশ্যম্ভাবী। তারপরই ঘটল অঘটন। ইতিপূর্বে কেন নর্টন, জিমি ইয়ং এবং আর্নি সেভার্স যা করতে পারেননি তাই করলেন অনভিজ্ঞ এই স্পিংকস। আলির মার হজম করে আরম্ভ করলেন উলটো মার দিতে। এখন আর মুষ্টিযুদ্ধ নয়; হাতাহাতি দ্বন্দ্ব চালালেন স্পিংকস।

"এসে গেল শেষ রাউন্ড। আলিকে তাঁর ট্রেনার এঞ্জেলো ডান্ডি বললেন, যা করবার শেষ তিন মিনিটেই [illegible]

কাজে তা হল না। মার খেয়েও স্পিংকস মার দিয়ে চললেন। শেষ ঘণ্টা যখন বাজল, স্পিংকস বিজয়ী বলে ঘোষিত হলেন। নিজের কোণে চেয়ারে বসে আলি তা শুনলেন।"

এ উদ্ধৃতির সমস্ত গুরুত্বই হচ্ছে স্পিংকস এবং মহম্মদ আলির মধ্যে ফিরতি লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনে কোন বীর কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন তার কিছু হদিশ পাওয়া যাচ্ছে এ উদ্ধৃতির মধ্যে। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ নিয়ে মুষ্টি-যুদ্ধ প্রশাসনের দুই সংস্থার মধ্যে ঘটে মতবিরোধ। শুধু মতের পার্থক্য বললে হয়তো কিছুই বলা হল না। এ যেন রীতিমত দুই সতীনের কোন্দল। চুল ধরে টানাটানি না হলেও খেতাব নিয়ে টানাটানি তো বটেই।

বড় সতীন ওয়ার্ল্ড বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন: তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে স্বীকৃতি দিলেন স্পিংকসকে। ছোট সতীন ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিলকেও শুকনো হাসি হেসে স্বীকৃতি দিতে হল নূতন চ্যাম্পিয়নকে। কিন্তু অল্প পরই একটি ছুতো পেয়ে ছোট সতীন গোল বাধালেন। খেতাবের লড়াইয়ের আগে নাকি স্পিংকস বলেছিলেন যে, আলির বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তিনি প্রথম লড়বেন নর্টনের সংগে। জয়লাভের পর মত পালটালেন স্পিংকস। বললেন যে, নর্টন এখন কিছুদিন পথ চেয়ে বসে থাকুক। তিনি পরাজিত মহম্মদ আলির সংগেই আগে লড়বেন।

ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল গর্জে উঠলেন—আবদার! ছিনিয়ে নিলেন স্পিংকসের মাথার মুকুট। ১৮ই মার্চ ঘোষণা করলেন যে তাঁদের চোখে স্পিংকস আর চ্যাম্পিয়ন নয়। সংগে সংগেই কেন নর্টনের মাথায় দিলেন বিশ্ব খেতাবের কাগুজে টুপি পরিয়ে। না লড়েই চ্যাম্পিয়ন।

গত ১৫ জুন লাস ভেগাসে অখ্যাত ল্যারি হোমসের কাছে সেই পড়ে পাওয়া খেতাবটি হারিয়েছেন কেন নর্টন। স্পিংকসের ইচ্ছা অনুসারে মহম্মদ আলির সংগেই তার দ্বিতীয় বার লড়াইয়ের আয়োজন পাকা হয়েছে। সে লড়াই এই সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নিউ অর্লিয়েন্সে।

লিওন (রকি) স্পিংকসের তেমন খ্যাতি ছিল না, ১৯৭৬ সালের মন্ট্রিয়ল অলিম্পিকে লাইট-হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে স্বর্ণপদক বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু আলির সম্মুখীন হবার পূর্বে পেশাদার হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র সাতটি প্রতিযোগিতাতে। তিনি এক টেলিভিশন প্রমোটারের হাতের পুতুল হয়ে লড়তে রাজী হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে! কিসের প্রলোভনে? আলির বিরুদ্ধে হারলে অগৌরব নেই। জিতলে অসীম গৌরব। আর আছে অঢেল টাকা।

জয়লাভের পর জানাচ্ছেন বেনডেনটার, "বন্ধু-বেষ্টিত হয়ে এবং সুরা সংবাহিনী সখী পত্নী নোভার কটি বেষ্টন করে স্পিংকস ডুবে গেলেন শ্যাম্পেনের সুধা সাগরে। চোখে ঘুম নেই, মুখে কথার বিরাম নেই। শোনাচ্ছেন নিজের বাবার কথা, যিনি বলতেন আমার জীবনে কিছু হবে না। আমার প্রথম সফল স্বপ্ন ছিল অলিম্পিক স্বর্ণপদক। আর এখন আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ছয়টি ভাই বোন এবং মাকে রেখে তিনি পালিয়েছিলেন। সেই বাবার কথা আর কত ঠিক হবে?

"কিন্তু আমার মা? দেড় গণ্ডা ভাইবোনকে পেট ভরে সব সময় খাওয়াতে পারতেন না। পেটে আগুন জ্বলত, মা বাইবেল পড়ে শোনাতেন। কিন্তু এরই মধ্যে আমার যে বক্সিং শিক্ষার জন্য আমাকে ও মাইকেলকে (ছোট ভাই) পয়সা জোগাতেন। আমি আমার মার মুখরক্ষা করেছি। কিন্তু আমার মাও মহম্মদ আলির সংগে লড়াইয়ের নামে ভয় পেয়েছিলেন। সোজা বলেছিলেন আমার মাথা খারাপ হয়েছে। সবধান করে বলেছিলেন আলি তোকে আরশোলার মত পিষে মারবে। ভয় আমি পাইনি; তাই আমি চ্যাম্পিয়ন।"

সেপ্টেম্বরে স্পিংকস এবং আলির মধ্যে ফিরতি লড়াইয়ের ফল কি হবে? পণ্ডিতেরা সব বেড়ার উপর

স্বচ্ছ লাল
ক্লোজ-আপ
একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

এমন নিবিড় মুহূর্তের জন্যে আপনার প্রয়োজন নতুন ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর শক্তিশালী মাউথওয়াশ আপনার নিঃশ্বাসকে করবে ক্লোজ-আপ-তাজা, এর বিশেষ দুটি উপাদান আপনার দাঁতকে করবে ক্লোজ-আপ-সাদা।

কোলকাতায় এবং মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, গোয়া, পশ্চিম বঙ্গ, তামিল নাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের বাছাই করা শহরে পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-CX.14-2415 BG

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

স্বাধীনতার সন্ধানে : মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিশোর ট্রাস্ট। ৬ মিশন রো, কলি-১। পৃষ্ঠা ৪৪৮ + ১৫। দাম ২০ টাকা।

স্মৃতিকথা জাতীয় বই হাতে এলে তা খুলতে একটু আতঙ্ক হয়। স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে 'আমি'-র প্রাধান্য একটু বেশী থাকা স্বাভাবিক। সেটা পাঠককুল মেনে নেবার জন্য মনে মনে তৈরীও থাকেন; তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই 'আমি' ন্যক্কারজনকভাবে সারা বই জুড়ে থাকে বলে পাঠকদের মনে এই আতঙ্ক। মনে হয়, পলাট ওলটালেই ভেতরটা ফার্স্ট পারসন, সিংগুলার নাম্বার, নমিনেটিভ কেস, ইণ্ডিকেটিভ মুড, অ্যাকটিভ ভয়েসের গন্ধে বুঝি বা ম-ম করছে।

আলোচ্য বইটির ক্ষেত্রে সে আশংকা অমূলক বলে প্রমাণিত হল। লেখক নিজে একজন প্রথিতযশা বিপ্লবী। আনুমানিক তিরিশ বছর (১৯১৬—৪৭) ধরে দেশের বিপ্লব-আন্দোলনের সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেজন্য এখানে ঘটনার বৈচিত্র্যের কোন ঘাটতি নেই; পাঠক আপনা থেকেই এই বইয়ের মধ্যে ডুবে যাবেন। বিপ্লবীরা কিভাবে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে দেশসেবা করে গেছেন তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আছে বইয়ের সর্বত্র।

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৫) দেশের সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক সাড়া-জাগানো নাম। অতীতের ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট নেতা। পরবর্তী কালে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে উত্তরপ্রদেশে (তৎকালীন যুক্তপ্রদেশে) চলে যান (১৯২৩)।

মৃত্যুর বছর দুই পূর্বে তাঁর স্মৃতিকথা 'ইন সার্চ অব ফ্রীডম' ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণটি সেই পুস্তকের অনুবাদ। লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন 'যুগজ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবীরেশচন্দ্র মজুমদার।

লেখক নিজে একজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী বলেই যে তাঁর স্মৃতিকথা 'স্বাধীনতার সন্ধানে' উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে তাই নয়। আমাদের দেশের সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য তা মৌলিক উপাদান হিসেবে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে।

লেখক তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ২৪।২৫ বছর কাল কাটিয়েছেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার করেন অনশন ধর্মঘট। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ১৪২ দিন (১১ জুলাই থেকে ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪) এবং এটি হল লেখকের স্মৃতিকথা লেখাকালীন অনশন ধর্মঘটের বিশ্ব রেকর্ড (পৃঃ ৬৯ এবং পৃঃ ৪০৪)।

এই স্মৃতিকথা লেখক যুগ

কয়েক জায়গায় বিপদে ফেলেছে। বিশেষত সন-তারিখের ক্ষেত্রে। এ প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শহীদ শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা —যাঁর নামে লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন। শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'শৈলেশ চ্যাটার্জী ছিল আমার মাসতুতো ভাই এবং ১৯১৬ সালে আমি জেলে আসিবার সময় তাহার বয়স দুই বৎসরের বেশী ছিল না।' (পৃঃ ৩৬৬) বইয়ের গোড়াতে উৎসর্গ-পৃষ্ঠার সামনে শহীদ শৈলেশের ছবি ছাপানো আছে। সেখানে তাঁর জন্ম-সাল হিসেবে উল্লেখ করা আছে ১৯১১। এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
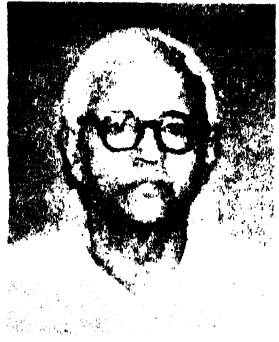
'হুজ হু অব ইণ্ডিয়ান মারটারস' (১ম খণ্ড)-এ শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-সাল বলে উল্লিখিত আছে ১৯১২। এ ছাড়াও, আরও সন-তারিখ উল্লেখের ক্ষেত্রে ভুল চোখে পড়ে। যেমন ১। বিপ্লবী রাজগুরু, সনডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর (১৫ই ডিসেম্বর নয়। পৃঃ ৩৪৯), ২। যতীন দাস তের্ষট্টি দিন অনশন ধর্মঘটের ফলে দেহত্যাগ করেন ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ (১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ নয়, পৃঃ ৩৫৪); ৩। লাহোর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে (১৯৩০ নয়, পৃঃ ৪৭১) ইত্যাদি। এই চারটি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ বলেই উল্লেখ করলাম।

'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' লেখকের জীবনের অন্যতম ঘটনা এবং খুব স্বাভাবিকভাবে তিনি এই ক্ষেত্রে খুব বিশদভাবে সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ২১৬ থেকে ৩০০ পৃষ্ঠায় কাকোরী মামলা সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা এবং তাঁদের বিষয়ে দায়রা আদালতের নির্দেশ বিষয়ে এক সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন, উদ্দেশ্য— 'সবটাই যেন একসংগে পরিষ্কার মতন চোখে পড়ে।' এখানে, রয়েছে আপাত-দৃষ্টে অনেক ত্রুটি। [স্মর্তব্য : এই মামলা শুরু হয় ১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি এবং রায় বের হয় ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল।] এই অংশে লেখকের [জন্ম : ১৮৯৫] বয়স হিসেবে উল্লেখ আছে একুশ বছর (পৃঃ ২১৭)। পূর্ববর্তী এক জায়গায় লিখিত আছে যে ১৯১৭

(পৃঃ ৫৬-৫৭)। এই অংশে পাঠকের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এরকম আরও একটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে। যাঁরা বিচার শুরু হবার আগেই খালাস পেয়েছিলেন তার এক তালিকা ২১৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। সেখানে দেখা যায় পনরজনের নাম। অথচ ২৫২ পৃষ্ঠায় এই একই প্রসংগে বারোজনের মাত্র নামোল্লেখ করেছেন!

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্মৃতিচারণ করতে বসে ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ হয়ে পড়াটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। পুরনো দিনের কথা স্মরণে এলে যুক্তির প্রাধান্য ক্ষীণ হয়ে আসে—মানুষ ভাবালু হয়ে পড়ে। লেখকের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলা যায়, এই বইয়ের গোড়ার দিকে (পৃঃ ১০—১৩) যুগান্তর পার্টি এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি লিখেছেন সেখানে প্রথমোক্ত দলের মূল্যায়ন কি ইতিহাসসম্মত? সত্যিই কি 'যতীন মুখার্জীর আত্মদানের পর যুগান্তর দল টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল'? ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' এবং উমা মুখোপাধ্যায়ের 'টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেভোলিউশনারিজ' কিন্তু অন্য কথা বলে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছিল। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সেই সব গ্রুপ এক হয়। মিলনের পর এই বৃহৎ দলটি অনুশীলন সমিতির মুখপত্র 'যুগান্তর'-এর নামানুযায়ী কালক্রমে যুগান্তর পার্টি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি আসলে একই দল। লেখক পুস্তকের বহু স্থানে ঢাকা অনুশীলন সমিতি উল্লেখ করতে গিয়ে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' এবং শুধু 'অনুশীলন সমিতি' —দুইই ব্যবহার করেছেন। এতে পাঠকের মনে শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয়।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির কথা বলতে গিয়ে লেখক খুব উচ্ছ্বাসভরে বলেছেন, 'নিয়মানুবর্তিতা ও মন্ত্রগুপ্তি কঠোরভাবে পালন করা হইত এবং সেইজন্য পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও সমিতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার সম্পর্কে তাহার কোন সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারে না।..... অনুশীলন সমিতি উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণকারী ব্যক্তিদের একটি সংগঠন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার সদস্যদের খ্যাতির দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। তাহারা শুধু দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া যাইত।' (পৃঃ ১৩) কিন্তু পরেই এক স্থানে (পৃঃ ৬১) লেখক আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'আমি তখন নিশ্চিত বুঝিলাম যে, আমাদের সংগঠনের মধ্যে মারাত্মক অনাচার চলিতেছে........। ....আমি আর কোন মতেই আমার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলাম না।' এই প্রসংগে তাঁর দলের নেতা নরেন সেনের মন্তব্য যা তিনি তাঁর বইয়ে

বলিয়াছিলেন যে, এতগুলি বাজে লোক লইয়া গঠিত আমাদের সংগঠন বেশী দিন টিঁকিবে না। ভবিষ্যৎ দেখিবার তাঁহার সত্যি এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।' সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী উক্তি।

বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে এত বিশদ করে বলবার উদ্দেশ্য একটিই। প্রকাশকদের উচিত ছিল বাংলা সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে ভাল করে সম্পাদনা করে নেওয়া। ভবিষ্যতে এই বাংলা সংস্করণের নতুন মুদ্রণকালে যেন তা করে নেওয়া হয়। তা হলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নির্ভর-যোগ্যতা আরও বেড়ে যাবে। লেখকের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

অশোক দাস

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

পোলানডের মেডালিয়ান প্রদর্শনী

বই পড়ে কিছু জানা আর প্রত্যক্ষ দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশেষত দৃশ্যকলার ক্ষেত্রে 'দর্শন' মানে 'অভিজ্ঞতা'। এ বিষয়ে অবশ্য আঁদ্রে মালরো তাঁর 'মৌনতার কণ্ঠস্বর' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কেমন করে 'দেওয়ালহীন যাদুঘর' (অর্থাৎ রঙীন প্রতিচিত্র দেওয়া শিল্পকলার গ্রন্থ) আমাদের সচেতনতার দিগন্ত বাড়িয়েছে। রঙীন মুদ্রণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব দেশের আদিম, প্রাগৈতিহাসিক, ঐতি-হাসিক এবং সমকালীন চিত্রকলার রত্নরাজি আমাদের ব্যক্তিগত বইয়ের শেলফে হাজির হয়েছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে কিন্তু কেবল বহন-যোগ্য শিল্পবস্তুই গেছে। অণুচিত্র গেছে আকছার। অজন্তা বা কোনারকের গন্ধমাদন কে নিয়ে যাবে? সুতরাং ম্যুজিয়ামে শুধু তুলনায় ছোটখাটো জিনিস আছে। অন্যদিকে মালরো দেখিয়েছেন যে ১৯শ শতকে যাঁরা সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় শিল্পকলা দেখেছিলেন তাঁদের সংখ্যা অণুবীক্ষণমেয়। শিল্প-কলা সম্বন্ধে যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি আজও আমাদের বিমুগ্ধ করে সেই সব মহান পূর্বসূরীদের অনেকেই শুধু যাদুঘরে 'পোর্টবেল' আলেখ্য দর্শন করেছিলেন। "গতিয়ে' উনচল্লিশ বছর বয়সে ইটালী দেখেছিলেন (কিন্তু রোম নয়)। এডমনদ দ্য গঁকুর যখন তিনি তেত্রিশ। হুগো শৈশবে। বদলেয়ার আর ভারলেন কখনই নয়।"

এখন নানা দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুসারে এক দেশের শিল্পকলা অন্য দেশে যাচ্ছে। সেদিক দিয়ে আমাদের সৌভাগ্য প্রচুর। কিন্তু হায়রে! কলকাতা হচ্ছে এইচ জি ওয়েলসের 'অন্ধদের রাজ্য'। পোলাণ্ড থেকে মেডালিয়ানের এমন একটা প্রদর্শনী এল তা দেখতে ভীড় হল না। বিদেশী ছায়াবলম্বনে নাটক, সিনেমার মতো অর্বাচীন শিল্প, যাত্রা—অধুনা বাঙালী এর চেয়ে বেশী কিছু বোঝে না। আমার বিলাপ, আমার খেদোক্তি বাঙালী চরিত্রের পরিবর্তন

ঘটাবে বলে তো মনে হয় না। একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই একটি জাতির সংস্কৃতি তা সাহিত্য, নাটক বা বায়োস্কোপ দিয়ে যতটা না বিচার হয়, তার চেয়ে বেশ বিচার হয় সংগীত শিল্পকলা দিয়ে কারণ এই দুই ক্ষেত্রে অনুবাদের প্রয়োজন পড়ে না। অনুবাদে রবীন্দ্র নাথ পড়ে যে বিদেশীকে নির্বাক দেখেছি, সে-ই রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

দু দিন প্রদর্শনীটি দেখলাম তবু মনে হলো বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। সব দেশেই মুদ্রা এবং সীলের ওপর আধা রিলিফ ভাস্কর্য করা হয় এজন্যে কলকাতায় টেঁকসালে যেমন ধরুন আছেন ভাস্কর দেবব্রত চক্রবর্তী। ব্যাপারটা খুবই প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সীলের কথা ভাবুন 'মেডালিয়ান' শব্দটা এসেছে মেডেল থেকে। অর্থ হলো ছোট্ট একখণ্ড সমতল ধাতু যার ওপর অঙ্কিত অলঙ্করণ বা লেখা মুদ্রিত বা খোদাই করা হয়েছে কোনো ঘটনার স্মারক হিসাবে। কাজ বা গুণের পুরস্কার হিসাবে যা মানুষকে দেওয়া হয়। ব চার্চ কর্তৃক মন্ত্রপূত এমন পদক যা মধ্যে ধর্মীয় প্রতীক আছে এগুলি আবার সংস্কারাচ্ছন্ন লোকে অঙ্গে ধারণ করে। মেডালিয়ান কথাটি এসেছে এই মেডেল থেকে। এর অর্থ ১। বড় মেডেল। ২। গোল বা ডিম্ব কৃতি নকশা, প্রতিকৃতি বা রিলিফ খোদাই করা চাকতি। দেখতে মেডেলের মতো এবং স্থাপত্য ও বস্ত্র অলঙ্করণে কাজে লাগানো হয়।

আকাদমী অব ফাইন আর্টসে ১৯ ও ২০শ শতাব্দীর ৩০০ মেডালিয়া প্রদর্শিত হয়। পোলাণ্ডের ছকল-এ পদক যাদুঘর থেকে এসেছে। রূপায়িত সূক্ষ্ম নান্দনিক স্পর্শবোধ শিল্পকলা দেখতে দেখতে মানুষে
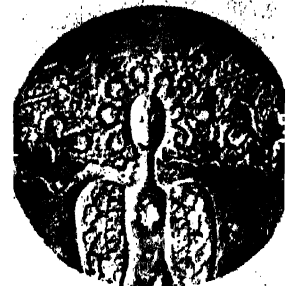
দুঃস্বপ্ন, কারুকাজ, বোধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। পোলাণ্ডের গ্রাফিকস এবং পোস্টারেরও কোনো তুলনা হয় না। দৃশ্যশিল্পের একটা দিক হল তার যাদুকরী গুণ। এমন চাক্ষুষ বিভ্রম যে মনে হয় দৃশ্যের সারবস্তুর অভিজ্ঞতা। যেমন ধরা যাক লেসেক ক্রাইসোয়াস্কির (জন্ম ১৯৩৫) 'চন্দ্রবিজয়ী' নামক মেডালিয়ান (গোল ৮৮ সি এম)। পদকের উপরের দিকটা একটু ফুইয়ে আনা হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠের আভাস। এক জায়গায় ছোট্ট একটা পায়ের ছাপ। কী নিখুঁত। একটা কবিতা।

একটা চৌকো মেডালিয়ান ছিল খেলাধুলার টুকরো দৃশ্যের কোলাজ— বন্ধুবর মতি নন্দী এটা দেখলে কেমন উত্তেজিত হতেন সেটা ভাবতে পারছি। পোলাণ্ডের সাংস্কৃতিক চেতনা, দৈনন্দিন জীবন, জার্মান অধিকারের স্মৃতি, রোমান ক্যাথলিক ধর্মভীরু পোলাণ্ড, পৃথিবীর নানা মানুষ আর ঘটনার প্রতিফলন কখনো এসেছে পরিমিত সাংকেতিক ভাষ্যে, কখনো প্রতিকৃতি-রূপে। পোলাণ্ডের দুজন মানুষ এসেছেন বারবার—কোপারনিকস এবং প্যান। তেমনি যীশু, মেরী, গান্ধী, তিন পাবলো—পিকাসো, নেরুদা, ক্যাসাল আছেন। আছেন বীঠফেন, সেকসপীয়র, মিকালেঞ্জেলো, দান্তে, আইনস্টাইন, লোরকা। ১৯শ শতকের রূপদী রীতি, রোমাণ্টিক পর্যায় পেরিয়ে শেষে সমকালীন ইঙ্গিতময়তা অঙ্গীকার করলেন শিল্পীরা এটা স্পষ্ট। একবারও মনে হয় না দুর্বোধ্য। যুদ্ধের বর্বরতা থেকে মানুষের মহত্ত্ব মহাকাব্যের মতো করে ধরেছেন। প্রত্যেক শিল্পীর সৃজনক্রিয়ার চরম নান্দনিক সার্থকতা দেখে ঘোর লাগে। আচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সুরেশ সঙ্গীত সংসদের অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের মত সুরেশ সংগীত সংসদ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন গত ১৪ই অগস্ট। এবারের অনুষ্ঠান হয় মহাজাতি সদনে এবং দুই প্রধান শিল্পী ছিলেন কণ্ঠশিল্পী গিরিজা দেবী ও সরোদ বাদক ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ। অনুষ্ঠানের আরম্ভে রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং সংগৃহীত অর্ঘ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষের হাতে তুলে দেন। এর পরেই শোনা যায় সবিতাব্রত দত্তের স্বদেশী গান। শিল্পীর বলিষ্ঠ কণ্ঠ বৈদ্যুতিক গোলযোগ সত্ত্বেও শ্রোতার কানে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছেছিল। এই মাইক্রোফোন ভয়েসের যুগে এটি নিশ্চয় এক স্মরণীয় ঘটনা।

গিরিজা দেবীর শুদ্ধকল্যাণ রাগে বিলম্বিত খেয়ালটিতে সুর ও পরিচ্ছন্নতার কোনো অভাব না থাকলেও জায়গায় জায়গায় ভূপালির ভাব এসে গিয়েছিল। আরোহী ...

আমজাদ আলী খাঁ

শিল্পী বেশী জোর দিয়েছিলেন এবং কিছু প-গ বিন্যাসে তীব্র মধ্যমের ছোঁয়া লা গা ন নি—ভূপালীর আবির্ভাবের কারণ এই দুইটিই ছিল বলে মনে হয়। অবশ্য মধ্যলয় অংশের ও দ্রুত খেয়ালটির তানকারি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। শেষের কাজরিটিও অতি সুখশ্রাব্য হয়েছিল।

আমজাদ আলী খাঁর প্রধান নিবেদনটি ছিল কর্ণাটক মেলাকর্তা রাগ লতাঙ্গীর স্বরসমষ্টি নির্মিত। শিল্পী জানান যে তিনি রাগটির নামকরণের ব্যাপারে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। লতাঙ্গীর আরোহণ ও অবরোহণ সম্পূর্ণ এবং স্বরসমষ্টি —স র গ ক্ষ প দ ন। আমজাদ আলীর রাগটি আরোহণে ষড়ব, তা ছাড়া ইমনের কায়দায় আরোহণে ষড়জবর্জিত। অর্থাৎ এটির আরোহণ-অবরোহণ ন্ র গ ক্ষ প ন র্স, র্স ন দ প ক্ষ গ র স। ইমনের কায়দায় র ক্ষ গ ও ক্ষ র গ সংগতিরও প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়। বাদি, সমবাদি ন্যাশ, অপন্যাশ, গ্রহ ও অংশ ইমনেরই মতন।

রাগের কাঠামো দেখেই বোঝা যায় যে এটিতে অতি বিলম্বিত বা দু-তিন স্বরকেন্দ্রিক আলাপচারি অসম্ভব—সেভাবে এগোলেই মনে হবে হয় ইমন নয় কিরবানি গোছের কিছু বাজছে। প্রত্যেকটি অংশে কমপক্ষে গোটা ছয়েক স্বর কাজে লাগাতে হবে—ভিন্নধর্মী পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গকে সব সময় এক সঙ্গে গেঁথে রাখতে হবে। ঠিক এই জিনিসই করতে সক্ষম হয়েছিলেন আমজাদ আলী খাঁ এবং এই জন্যই তাঁর আলাপ ও গৎ দুটিই উপভোগ্য হয়েছিল। বিলম্বিত তিনতাল, দ্রুত একতাল ও অতি দ্রুত তিনতাল গৎগুলিতে তান-তোড়া, গমক, সাথ-সংগত ও ঝালার কাজও ছিল দক্ষ, সুপরিকল্পিত ও চিত্তাকর্ষক।

শিল্পীর দ্বিতীয় নিবেদনটিও কর্ণাটক সংগীতভিত্তিক ছিল। এটি ছিল ষড়ব রাগ জনসম্মোধনীর স্বর নির্মিত—স র গ প ধ ণ। এই অংশে শোনা যায় কিছু মনোরম স্বরের নকশা এবং মন্দ্র সপ্তকের একহারা তান। পিলুতে আওচার ও গৎ দুটিও আনন্দদায়ক হয়েছিল। এরপরে শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে শিল্পী দেশ রাগে একটি সংক্ষিপ্ত সিতারখানি গৎ বাজিয়ে শোনান এবং স্বরচিত 'ভাটিয়ালি' ...

শুধু পেলাম না।
নীলাক্ষ দত্ত

শর্মিলা বসুর একক আসর

'বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্তে' যে দেবী, তাঁর বীণা এবং পুস্তক দুইয়েরই দাক্ষিণ্য সমানভাবে একই আধারে প্রসারিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বড়ো-একটা দেখা যায় না। শর্মিলা বসু তাই সেদিক থেকে বিরল উদাহরণই বলতে হয়। ১৯৭৬ সালের মাধ্যমিকে সাতটি বিষয়ে লেটার পেয়ে সেকেন্ড হওয়া শর্মিলা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী, ছুটি কাটাতে কলকাতায় এসেছিলেন। আর সেই অবকাশে গত ছয় আগস্ট ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক প্রেক্ষাগৃহে একক সঙ্গীতের এক আসরে তাঁর সাঙ্গীতিক নৈপুণ্যের চূড়ান্ত কিছু নমুনা নিবেদন করে গেলেন। শর্মিলা অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গানের তালিম নিয়েছেন শ্রীমতী

শর্মিলা বসু

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন গীতবিতানে। গত বছর গীতবিতানের শেষ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম। এ-দিনের একক আসরে তিনি অবশ্য রবীন্দ্রসংগীত শোনান নি। তিন পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল অতুলপ্রসাদের দশটি গান। অতঃপর দশ মিনিটের বিরতি। বিরতির পর চারটি দ্বিজেন্দ্রগীতি ও চারখানি রজনীকান্তের গান। সব শেষে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'শুধু দু-দিনেরই খেলা' গানটিকে বেছে নিয়েছিলেন শর্মিলা। অন্তত একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতও যদি রাখতেন তিনি, নিশ্চিত তাঁর অর্ঘ্যের অঞ্জলি হয়ে উঠত পরিপূর্ণতম।

শর্মিলা বসুর কণ্ঠটি চমৎকার। যেমন দরাজ, তেমনই সুরেলা। কাজ পরিষ্কার। সুরের ওঠা-নামা স্বচ্ছন্দ। কাউকে অনুকরণ না করে এবং গানের নিহিত ব্যঞ্জনা যথার্থভাবে অনুসরণ করে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে গান শোনান, এটা আরও বড়ো গুণ। আরেকটি বিস্ময়কর উপাদান, তাঁর প্রখর আত্মবিশ্বাস। দ্বিতীয় গানটি যখন গাইছেন, আলো চলে গেল। লোড শেডিং উপেক্ষা করে, মাইকের অনুপস্থিতি অগ্রাহ্য করে, তিনি অবশ্য আলো ফিরে এসেছিল আবার। কিন্তু এই তাঁর প্রথম একক অনুষ্ঠান, এ কথা মনে রাখলে, তাঁর এই কুণ্ঠাহীন দ্বিধাহীন জড়তাহীন সাহসিক ভঙ্গি দ্বিগুণ প্রশংসার ব্যাপার হয়ে ওঠে। এই আত্মবিশ্বাস গানের ক্ষেত্রেও তাঁকে নিশ্চিত ভিতর থেকে প্রভাবিত করেছে। কেননা, যে সজীব দক্ষতায় তিনি অতুলপ্রসাদের 'শ্রাবণ ঝুলাতে' বা 'বলো গো সজনি', দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা এমনি এসে', 'সে কেন দেখা দিল', 'এসো প্রাণসখা', ও 'শুধু দু-দিনের খেলা' এবং রজনীকান্তের 'জাগাও পথিকে' আর 'কেন বঞ্চিত হবো চরণে' শোনালেন প্রবীণতর বহু নামী-দামী শিল্পীও সচরাচর সে-ধরনের দক্ষতা নিয়ে প্রকাশিত হন না।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **রেকর্ড**

নীরব কেন কবি ?

নজরুল জন্মদিনে এইচ এম ভি যে সওগাত সাজিয়েছেন, সেটি সংখ্যায় স্বল্প হলেও সুরের ক্ষমতায় দীর্ঘস্থায়ী হবে, এ বিশ্বাস রাখা যায় অনায়াসে। একটা প্রবণতা ইদানীং প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। যাঁরাই রাগসংগীতে পারঙ্গম, বাংলা গানের মধ্যে নজরুল-গীতি তাঁদের দিলপসন্দ। এর ফলে একদিকে যেমন অসাধারণ সুরনৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে—অন্যদিকে চলতি রাগপ্রধান গানের মত তান বিস্তারের প্রাবল্যে কাব্য-মাধুর্যের অপমৃত্যু আমাদের বিমূঢ় করে। সাম্প্রতিক নিয়ম অনুযায়ী, রাধা, বাঁশি, যমুনা ছাড়াও যে কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে রাগপ্রধান হতে পারে, নজরুল-গীতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে কাব্যরস বেহস্তকে অনুভবে আনতে পারত, ওস্তাদীর মারপ্যাঁচে তা বরবাদ হয়ে যায়।

আরতি মুখোপাধ্যায় তাঁর কণ্ঠের পুরো সুযোগ পেয়েছেন নজরুল-গীতিতে। দেশী টোড়ীতে 'না মিটিতে আশা' বহুশ্রুত একটি গান আবার সকলের মনে স্থান করে নেবে। প্রসঙ্গত মনে আসে বহুদিন আগে শান্তা আপ্তের রেকর্ড করা এই গান—অনেক সহজ সরলভাবে গাওয়া কিন্তু এতদিন পরেও মনে এল। সিরাজদ্দৌলা নাটকের 'পথহারা পাখি' গানটি সম্পূর্ণ গান হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত, নাটকীয়তার জন্য নয়। অন্য দুটি গান বসন্ত মুখারিতে "বসন্ত মুখর আজি" "কার বাঁশরী বাজে মুলতানী সুরে" আরো অনেক নজরুল-গীতি শোনবার জন্য মন আকৃষ্ট করে। অনুপ ঘোষালের কণ্ঠ নিশ্চিতভাবেই দক্ষ। কিন্তু সমস্ত গানের মধ্যেই একটি নিষ্প্রাণ আবেগ তাঁর বৃহত্তর মর্যাদা লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটি সুপার সেভেন রেকর্ডে তাঁর ছয়টি গানের মধ্যে রাগ-মাধুর্যে সাবন্ত সারঙ্গে 'মেঘবিহীন খর বৈশাখে', 'গুঞ্জমালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা।' অথবা 'শ্মশান কালীর নাম' গান-

'আবেগ জোয়ার এলো ফিরে' বা 'তুমি শুনিতে চেও না আমার মনের কথা' গান অনেক আবেগহীন মনে হয়। তাঁর মত শিল্পী এই গানে কামাল করে দিতে পারতেন—খুবই দুর্ভাগ্য। একটি ই-পি রেকর্ডে দুটি করে গান গেয়েছেন মীরা দত্তরায় ও নীতিশ দত্তরায়। মীরা দত্তরায়ের "তোমার বিনা তারের গীতি" এবং "পালিয়ে তুমি বেড়াবে" দুইটি গানেই শিল্পীর আগামী দিনগুলির সম্ভাবনা [illegible] নীতিশ দত্তরায়ের 'মহাকালের কোলে এসে' পরিচ্ছন্ন পরিবেশন। আবার মনে পড়ে যায় 'মৃণালকান্তি ঘোষের গাওয়া এই গান। দুটি গান পর পর শুনলেই গায়কীর ধরন কিভাবে যুগে যুগে বদলায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, যে বদল স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষিত। বড় হংস সারং রাগে নীতিশ দত্তরায়ের "হংস মিথুন ওগো" গানে মন্দ্র সপ্তক সুস্পষ্ট নয়।

একটি মিনি লং প্লেইং রেকর্ডে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন আটটি ভক্তিগীতি। একদিকে চারটি শ্যামা-সংগীত, অপরদিকে চারটি কৃষ্ণ-বিষয়ক। নজরুল বিরচিত ভক্তিগীতি শুধুমাত্র অসহায় আত্মসমর্পণ নয়, ভক্তিগীতির মধ্যে অদ্ভুত কাব্য-কল্পনা এবং রূপকের প্রয়োগ অন্যতর আভাস আনে। বাংলা ভক্তিগীতির ইতিহাসে নজরুল একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্তমানকালের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এবং সেই প্রতিষ্ঠা
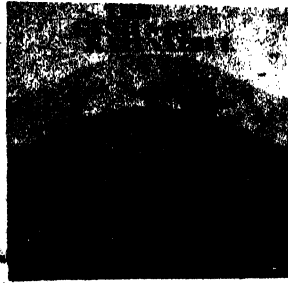
কণ্ঠের জোরে লব্ধ নয়, গায়কী নৈপুণ্যে তিনি প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেছেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠের উপর আশ্চর্য দখল, তাঁকে প্রলুব্ধ করে অনেক অযাচিত বাহাদুরিতে যাতে নজরুলগীতির কাব্য অন্তরাল হয়ে থাকে—সুরের মারপ্যাচে শ্রোতাকে বিস্মিত করে, পাশাপাশি কাব্যের ওজস্বিতা কখনই বিমুগ্ধ করে না। যেমন বাগেশ্রী রাগে 'চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় মা' গানে সে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন/অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ/মন্দিরে দুর্গে রহে না সে বন্দী/সেই দুর্গারে দেশ তায়/...... এই পূজা বিলাস সংহার কর (মা)/ যদি পুত্র শক্তি নাহি পায়' ভক্তিরসের আড়ালে যে আত্মবোধনের আহ্বান, সেই আহ্বান এই গানে অশ্রুত থেকে যায়। কিংবা 'বিজয়া' নাটকের গান 'যাসনে মা ফিরে' গানে 'আজো মরেনি অসুর মরেনি দানব/ধরণীর বুকে নাচে কেন ত্রাস [illegible]' আবার '[illegible] বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা' গানে 'কৃষ্ণা তিথির তিমিরহারী/শ্রীকৃষ্ণ এস, এস মুরারী/ঘরে ঘরে আজ 'পুতনা-ভীতি হানিছে কালা' গানে তান প্রাবল্যে মূল কথাই চাপা পড়ে যায়। সবচেয়ে ভাল লেগেছে পরিচ্ছন্নতার গুণে 'আমার আর কোন গুণ নেই মা' এই গানটি। শুনলে বোঝা যায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কতখানি পারেন।

একটি লংপ্লেইং রেকর্ডে ফিরোজা বেগম, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চারটি করে গান পুনঃ সংকলিত। নতুন করে ভাল লাগে। 'হাসিমুখে বাসি ফুল' (ফিরোজা বেগম), 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর' (পাহাড়ী), এবং গজল 'বাগিচায় বুলবুলি মোর' (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়), অনুপ ঘোষালের 'বসিয়া বিজনে' এবং 'চাঁদ হেরিয়ছে চাঁদ'। তিলং রাগে 'কে নিবি ফুল' গানটি একটি নাটকের গান। কয়েক বছর আগে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে 'নাটকের গান' অনুষ্ঠানে এক প্রবীণা শিল্পী গানটি পরিবেশন করেছিলেন, যাতে গানটির মাধুর্য নতুনভাবে বিস্ময়াবিষ্ট করে। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ থিয়েটারী অনুষঙ্গ গানটির পুরোন রূপ মনে করিয়ে দিলেন। তাঁর গাওয়া 'ফুলের জলসায়' পুনরায় স্মৃতিকে বিড়ম্বিত করে। এইচ এম ভি নিবেদিত রেকর্ডগুচ্ছে [illegible] আবৃত্তি করেছেন। কবিতাগুলি বিষ[illegible] বস্তুর দিক দিয়ে সমগোত্রীয় ও সম্পূর্ণ রেকর্ড শুনলে নজরু[illegible] স্বদেশ-চেতনা আভাসিত হ[illegible] বিশেষত কাজী সব্যসাচী আবৃ[illegible] শিল্পের সেই নিপুণ রূপকার, যি[illegible] স্বাভাবিকভাবে কোন নাটকীয়তা [illegible] এনেও রস সঞ্চারে সক্ষম। বিষয়বস্[illegible] দিক থেকে সমগোত্রীয় হলেও অন্য বি[illegible] কবিতা নির্বাচন উচিত ছিল, কা[illegible] ছন্দের দিক থেকে প্রায় সব কবি[illegible] একইভাবে উচ্চারিত। যেখানেই রক[illegible] ফের আছে সেখানেই শ্রোতারা উৎব[illegible] হবেন, নচেৎ ক্লান্তিতে আক্রান্ত হওয়[illegible] সম্ভাবনা। নজরুল-গীতির চ[illegible] সাম্প্রতিককালে ব্যাপকতর হচ্ছে। [illegible] সময়ে সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন [illegible] করলে, মূল কাব্য এবং সুর বহু[illegible] বিভক্ত হবার আশংকা আছে—ত[illegible] নীরব থাকা উচিত নয়।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **চলচ্চিত্র**

স্ট্রাইকার

এক চিলতে নতুন আকাশের দে[illegible] পাওয়া গেল, নিঃসন্দেহে। নতুনের প্রী[illegible] ও ঝুঁকি নেওয়ার এই প্রবণতায় প[illegible] চালক অর্চন চক্রবর্তী প্রশংসার দা[illegible] রাখেন। বাংলা ছবির ভাবনাহ[illegible] গড্ডলিকায় এই যে একজন অন্[illegible] ছিটকে পড়ার উৎসাহে স্টিয়ারিং[illegible]

চেয়েছে, সেটা প্রমাণিত হল। শুধু ফুটবলকে অবলম্বন করে এর আগে কোন রঙিন বাংলা ছবি হয়নি; ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রেও এ-ধরনের বিষয় ও ট্রিটমেন্ট যতদূর জানি, অভিনব। মোহনবাগানের মেয়ে ছবিটিতে ফুটবল এসেছিল একটি অপ্রয়োজনীয়, দুর্বল তথাকথিত কমিক ইণ্টারলিউড হিসেবে। স্ট্রাইকার-এর ফুটবল সেই অতি-প্রয়োজনীয় ভূমি, যেখানে ছবিটির শিকড় গাঁথা।

আমাদের দেশে এ-ধরনের গল্প নিয়ে ছবি তৈরির একাধিক অসুবিধে। প্রথমত, বিষয়ের নতুনত্ব প্রযোজক (এ-ক্ষেত্রে সমিত ভঞ্জ) ও পরিচালকের ওপর একটা দারুণ ঝুঁকির চাপ সৃষ্টি করে, এবং বাণিজ্যের দিকে তাকিয়ে এঁদের একাধিকভাবে সস্তায় বাজিমাত করার প্রলোভনে পড়তে হয়। স্ট্রাইকার-এর ক্ষেত্রে খুব বেশী বাণিজ্যিক কম্প্রোমাইজ চোখে পড়লো না। যেভাবে কাহিনীটিকে পর্দায় আনা হয়েছে, তাতে বাংলা ছবির চলতি ধারা অনুসারে একটি সেনটিমেনট-এ চুপ-চুপে প্রেম-কাহিনীর সুযোগ ছিল। কিন্তু আরতি ভট্টাচার্য ও সমিত ভঞ্জের

সমিত ভঞ্জ

আদান-প্রদান খুব হালকা রঙে আভাসিত হয়েছে বলে ভালো লাগলো। এখানে টিকিটঘরের দাবিতে সাড়া দিলে একই ঢিলে ছবি ও বাণিজ্য দুই-ই নষ্ট হতো। একটা কথা, আরতি ও সমিতকে নায়ক-নায়িকা হিসেবে কষ্ট-কল্পিত মনে হয়। কিন্তু কিছু-কিছু খুব ফিকে রঙের রোমানটিক দৃশ্যে আরতি বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

স্ট্রাইকার-এর মতো ছবি করার পথে আর একটি সাংঘাতিক বাধা হলো টালিগঞ্জের পুরনো যন্ত্রপাতি এবং স্বল্পবিত্ত। প্রথমত, ফুটবল খেলার দৃশ্যগুলি একাধিক ক্যামেরায় অভিনব অ্যাংগেল থেকে আরো অনেক বেশী নাটকীয়ভাবে তুলে খেলার টেনশানকে বাড়ানো যেত। পুরো মাঠের দু-একটি এরিয়েল বা হ্যালিকপটার থেকে নেওয়া শট থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিলো। খুব ভালো জাতের কোনো খেলোয়াড়ের দ্রুতগামী পায়ের ক্লোজআপ হ্যানড-হেলড ক্যামেরায় নিয়ে সমস্ত পর্দা জুড়ে দেখাতে পারলে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরা খেলার মধ্যে আরো সহজে ঢুকতে পারতেন। স্ট্রাইকার-এ কিন্তু দুর্বল। সবচেয়ে দুর্বল অজয় বসুর ধারা-বিবরণীর শটগুলি। তাঁর চোখের সামনে যে কিছুই ঘটছে না, তিনি শুধু মুখস্থ বলে যাচ্ছেন, এটা তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এবং বার-বার তাঁকে শুধুমাত্র ডান পাশ থেকে দেখানো হয়—ভীষণ সাজানো ও ঠান্ডাভাবে।

খেলার দৃশ্যের যেটুকু টেনশান এলোমেলো বল মারা পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় তা সম্ভব হয়েছে মূলত দুটি কারণে—রমেশ যোশীর এডিটিং এবং প্রবীর মুখার্জির সংগীত-সংযোজন। খেলার সিকোয়েনসগুলির টেনশান ও দ্রুতি বাড়ানো হয়েছে এডিটিং-এর চালাকির সাহায্যে। সমিত ভঞ্জ কোনোভাবেই জাত প্লেয়ার নন এবং এডিটিং-এর হাজার প্রচেষ্টাতেও সে-অভাব পূর্ণ হয় না। কিন্তু রমেশ যোশী অনেক ফাঁকিকেই বিশ্বস্ত করে তোলেন।

এ-ছবির একটি দুর্বল দিক হলো মেক-আপ—যা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কালার-ফটোগ্রাফির বিরুদ্ধতা করেছে। রঙের ব্যবহার মার্জিত—কিন্তু একাধিক দৃশ্যে ফিল্ম-এর বিশ্বাসঘাতকতা দুঃখজনক।

নতুনদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ে আনোয়ারের ভূমিকায় রমেন রায়-চৌধুরীকে। অভিনয়-করছি, অভিনয়-করছি ভাবটা তাঁর নেই। ক্যামেরার সামনে তিনি বেশ সহজ। সন্তু মুখোপাধ্যায়ের সুঠাম অভিনয়ও হৃদয়স্পর্শী। কিন্তু চুনী গোস্বামী ও শ্যাম থাপার উপস্থিতি একেবারে বাণিজ্যিক স্টান্ট—ছবির সংগে তাঁরা কাহিনীর প্রয়োজনে যুক্ত নন।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সিংহদুয়ার

মাঝে মাঝে কৌতুকের ছিটে দিয়ে ভাবাবেগকে নাড়া দিয়ে দিয়ে কিভাবে দর্শকদের অশ্রুসিক্ত করে তোলা যায়, সুখেন্দু দাস সে-কৌশল আয়ত্ত করেছেন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য তাঁর নিজেরই রচনা। এতে আমরা দেখি বংশের আভিজাত্য রক্ষায় জমিদার বিজয়নারায়ণ এমনই অন্ধ যে তাঁর অতিপ্রিয় দুই কন্যা সন্তান প্রমীলা ও শর্মিলা তাদের নিজেদের নির্বাচিত দুজন দরিদ্র পাত্র শিবনাথ ও বিশ্বনাথের গলায় মালা দিয়ে গৃহত্যাগিণী হলেও তিনি বজ্রাদপি কঠোর। পরিশিষ্টে কুসুমাদপি কোমল অবশ্য হন, কিন্তু তা ঘটে মাঝে অনেক জল গড়িয়ে যাবার পর। এই মধ্যবর্তী অংশে আছে বিজয়নারায়ণের পুত্র সন্তান না থাকায় তার গৃহে আশ্রিতা দূর সম্পর্কের এক বোন ও নিজের পুত্র বেচাকে সম্পত্তির অধিকারী করার মানসে তার কুটিলপনা। আর আছে অশিক্ষিত স্বামী শিবনাথকে শুধু শিক্ষিতই নয়, একেবারে উকিল করে তোলায় প্রমীলার পণ এবং সাফল্য। গৃহত্যাগের পর এক বাউলের আশ্রয়ে থেকে শর্মিলা ও শিবনাথের অসহ দুঃখকষ্ট। পরিশেষে বিজয়নারায়ণ, বেচা ও তার মায়ের অনুতাপের পালা এবং পুনর্মিলন। ঘটনা ও চরিত্রাবলীর সংগে শরৎচন্দ্রের

েন্দু ও সমীজা

দু রচনা, শৈলজানন্দের তৈরি ছবি 'স্বয়ংসিদ্ধা'-র আদল চোখে পড়লে হবে না।
ছবিখানির প্রধান গুণ অভিনয়াংশ ঘটনা প্রবাহে নানা অসংগতি গোঁজামিল উঁকি দিলেও সেগুলিকে ভোগাতায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেনি। অভিনয় অবশ্য একটু উচ্চগ্রামে যা প্রায় মঞ্চাভিনয়ের কাছ ঘেঁষে। তবু কয়েকজনের অভিনয় ছবিকে অভিভূত করে তোলায় গেলাম। আত্মভোলা, সংকীর্ণচিত্ত ও ভাই-অন্ত-প্রাণ শিবনাথ চরিত্রে শুভেন্দু পাধ্যায় শুরু থেকেই দর্শকমন কেড়ে ধরে রাখেন। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের বিজয়নারায়ণ কঠোর ও মমতার দ্বন্দ্বে অস্থির একটি মনোজ্ঞ রূপায়ণ। সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রমীলা চরিত্রে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়ে দৃষ্টিকে ধরে রাখেন। সুখেন্দু দাস বেচারা চরিত্রটি অতি নাটকীয়তা সত্ত্বেও তাকে গ্রহণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন মজুমদার রূপায়িত উদাসকেও ভাল লাগবে। ছায়া দেবী, সীতা রায় ও বিকাশ রায় যথাক্রমে শিবনাথ-বিশ্বনাথের মা, জমিদার গৃহিণী এবং কামুক এক প্রৌঢ়ের ভূমিকাতে নিজেদের ব্যক্তিত্বের জোরেই উতরিয়ে গিয়েছেন। বিশ্বনাথ ও উর্মিলার চরিত্রে আছেন নবাগত রাজকুমার ও শিপ্রা বসু।
অজয় দাসের সুরে মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় ও নমিতা রায়ের গাওয়া গান সুশ্রাব্য। কলাকৌশলের কাজ মোটামুটি।
পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

নটসেনার তিনটি একাঙ্ক

'সূর্য নেই স্বপ্ন আছে'—একটা একাঙ্ক নাটকের নাম। মফস্বলের নাটকের দলগুলো সম্বন্ধেও বোধহয় এই নামটা প্রযোজ্য। এই নামটাই একটু পরিবর্তন করে বলা যায় সংগতি নেই, নিষ্ঠা ও স্বপ্ন আছে। সম্প্রতি রবীন্দ্রভবনে ঠাকুরপুকুরের নটসেনা নাট্যসংস্থা তিনটি একাঙ্ক মঞ্চস্থ করলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম নাটক ছিল কমল চক্রবর্তীর রচিত 'ব্যূহ'। একদিন সপ্তরথীর আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন অভিমন্যু। আজও অভিমন্যু নিহত হচ্ছে। তবে সপ্তরথীদের রূপ আর পোশাক পালটেছে। এই জাতীয় কাহিনী যদিও অনেক নাটকেরই বর্তমান বিষয়বস্তু, কিন্তু এ নাটকের যেটা লক্ষ্য করবার সেটা হল উত্তরার ভূমিকা। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর উত্তরা মঞ্চের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে এক নবজাতককে। এই অংশের প্রয়োগ-পরিকল্পনাটির ...

করেছে নবজাতককে। মৃত্যুর গভীর ট্র্যাজেডির উত্তরণ ঘটেছে নবজাতকের জন্মের মধ্যে। সাধারণ নাটকে যেটা একটা শোকদৃশ্যে পরিণত হয় পরিচালক সরোজ রায় সেই দৃশ্যকেই রূপান্তরিত করেছেন আগামী দিনের স্বপ্নে। উত্তরার ভূমিকায় শিপ্রা চক্রবর্তীর অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্য নাটককে উদ্ভাসিত করেছে। তাঁর মাইমের ব্যবহার তারোমানুষের কেয়া চক্রবর্তীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

নটসেনার দ্বিতীয় নাটক ছিল রাধারমণ ঘোষের 'ভজ গৌরাঙ্গ কথা'। দুর্বল লঘু কাহিনীকে শুধুমাত্র অভিনয় দিয়ে যতটা আকর্ষণীয় করা যায় সে চেষ্টা করেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। হাসির নাটক বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি 'ভজ গৌরাঙ্গ কথা' সেই জাতীয় নাটক। নটসেনার নাটকের তালিকায় এ নাটকটি যেন বড় বেশী বেমানান। হয়ত দুটি সিরিয়াস একাঙ্কের মধ্যে একটু রিলিফ দেবার মধ্যে সেদিনের অনুষ্ঠানে এই একাঙ্কটি নির্বাচন করা হয়েছিল। তবু লক্ষ করার মত শংকর পালুই ও অঞ্জনা পালের অভিনয়।

শেষ নাটক ছিল 'সূর্য নেই স্বপ্ন আছে'। নটসেনার এই নাটকটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কৃত। রাধারমণ ঘোষ রচিত চারটি চরিত্রের এই

ভজ গৌরাঙ্গ কথা

নাটকটির বক্তব্য ইতিপূর্বে অনেক নাটকেই নানাভাবে বলা হয়েছে। শোষণ মুক্তির কথাই নাটকের কাহিনী। কিন্তু অনেক শোনা কথাও বলার গুণে পরিবেশনের কৌশলে নতুন মনে হয়। সরোজ রায়ের নির্দেশনা এ নাটকে লক্ষ্য করার মত। অভিনয় এ নাটকের সম্পদ। সমবেত সংলাপ, যা অনেক ক্ষেত্রেই বিরক্তির উৎপাদন করে আলোচ্য নাটকের ক্ষেত্রে এক অন্য এফেক্টের সৃষ্টি করেছে। তিনজন ক্লান্ত মানুষ, যারা সূর্যকে হারিয়ে ফেলেছে, যাদের পরিচয় শুধুমাত্র সংখ্যায়; এমন তিনজন মানুষের ক্লান্তি, ক্ষুধা, ভয়, অবসন্ন পথ চলা পর্যন্ত সুব্রত নন্দী, অমিত বসুরায় ও নিত্যগোপাল চক্রবর্তীর অভিনয়ে ধরা পড়েছে। মহাশূন্যের ভূমিকায় সরোজ রায় কোন কোন সময় কৃত্রিম মনে হলেও মুহূর্তের মধ্যে চরিত্র-বদল তার অভিনয়ের উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়। দলগত অভিনয় এত নিখুঁত যে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে অভিনেতাদের প্রতিটি চলাফেরা যেন যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সব মিলিয়ে সূর্য নেই স্বপ্ন আছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।
অরুণোদয় ভট্টাচার্য

সকাল সব সময়ে সঠিকভাবে সমস্ত দিনের আভাস দেয় না। সন্দীপন প্রযোজিত 'এইভাবেই কাটিয়ে যাব হা হা' নাটকের সূচনায় যে সম্ভাবনা ছিল সে শুধু অঙ্কুর মাত্র, যার বিনাশ তৃতীয় দৃশ্যেই ঘটে যায়। নাট্যকার-পরিচালক কাজল চক্রবর্তী তাঁর নাটকের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন চমকপ্রদভাবে। এই গতানুগতিকতামুক্ত নাটকের আভাস পেয়ে মুক্ত অঙ্গনে সকলেই আশান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু কিছু সময় পরে যখন রাজনৈতিক মস্তান একইভাবে

নাটককে আক্রমণ করে, তখন বিপর্যস্ত নাটক দেখে দর্শকও আশাহত। প্রথম দিকের চমকপ্রদ সংলাপ মিলিয়ে আস্তে আস্তে ব্যবহারজীর্ণ নাটকীয়তার সংগে সংলাপও ক্লিশে হয়ে আসে।

অভিনয়-ক্ষমতা এই গোষ্ঠীর আছে। যে সুরে অমিত রায় ও গৌতম চক্রবর্তী কথা বলেন, সেই ধরনে অভিনবত্ব আছে। বিচারের দৃশ্যে টাইপ অভিনয়ে উৎপল ভট্টাচার্য, তপন নাথ, কানু মজুমদার, মুকুল চাটার্জী নাটককে জমিয়ে তোলেন, পাশাপাশি তপন মুখার্জীর সংলাপ বা খোঁড়ানো শুধুই পুনরাবৃত্তি। আর একজনের অনবদ্য অভিনয় মনে থাকবে, তাঁর নাম সুমিত চ্যাটার্জী (পুরোহিত)। এই স্টাইলাইজেশন যেমন নাটক জমাতে সাহায্য করে, পুলিস অফিসার চরিত্রে কাজল চক্রবর্তীর স্টাইল কোন কাজেই লাগে না। মস্তান বা আদর্শবাদী যেরকম হয়ে থাকে তাই হয়েছে। বৃহন্নলাপ্রতিম কবিকে ব্যঙ্গ করা হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে কবির চরিত্রে নারায়ণ শ্রীবাস্তব যে আধো-উচ্চারণ করেন, পাশাপাশি বিপ্লবী যুবক সত্যব্রত দাশ বা ভাস্কর সেনগুপ্তও একইভাবে সফিস্টিকেটেড উচ্চারণ করেন। আর নায়িকা আইভি ঘোষ গান করেন আধো-উচ্চারণে, সংলাপ উচ্চারণ করেন ফ্ল্যাটে। যদিও মুখস্থ থাকাটাই তার একমাত্র গুণ। এই নাটকের আলো (চিত্ত সরকার) অনেক জায়গায় নাট্য-মুহূর্তকে অলংকৃত করেছে, কিন্তু যেখানে নাটকের গঠন সিনেমার কাটশটের মতন, সেখানে কালক্ষেপ অন্যায়। গানের সুর সহজেই ব্যঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করে, গাওয়াও ভাল, কিন্তু আবহ বহু জায়গাই ফাঁকা রেখে যায়।

সাম্প্রতিক কালে কিছু নাটক দেখে মনে হয়, সমকালীন তরুণ নাট্যকারদের হাতে ব্যঙ্গ বা চটুল সংলাপ আসে ভালো, কিন্তু গভীরতার কথা বলতে গিয়ে শুধুই সস্তা কথার জাবর কাটা হয় এবং মাঝে কবিতার অংশ দিয়ে মানরক্ষার চেষ্টা হয়। যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নাটক সেই আদর্শ যদি শুধুই মামুলী হয় তবে সন্দেহ জাগে, এ কি আদর্শে বিশ্বাস, না আদর্শ-বিলাস?

চাণক্য সেন রাজনীতির অন্দরমহলের অনেক কাহিনী আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেই সব কাহিনী গোয়েন্দা-গল্পকে হার মানায়। আসলে সত্যের থেকে রোমাঞ্চকর কিছুই হতে পারে না। নাম 'অরাজনৈতিক' হলেও রাজনীতির দাবার চাল সেখানে অদৃশ্য নয়। চাণক্য সেনের বেশির ভাগ কাহিনীর আকর্ষণ হল অতি নাটকীয়তা। কোমল গান্ধার প্রযোজিত 'অরাজনৈতিক' কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন অনিল দে। নাটকীয় কাহিনীকে একালের নাট্যকর্মী অনিল দে চেষ্টা করেছেন নৈপুণ্যের সঙ্গে নাট্যরূপ দিতে। কারণ, কাহিনীর অতি নাটকীয়তাকে কোমল গান্ধার নাট্য প্রযোজনায় আরও সরলীকৃত করে নিয়েছেন। মানুষের জীবনের জটিলতা, বিশেষত কালো টাকা বা অরাজনৈতিক টাকার জটিলতা বাজার-চলতি গোয়েন্দা-কাহিনীর রূপ নেয়। কিছু আবেগ, কিছু সংঘাত, কিছু আদর্শের টানাপোড়েন, সর্বোপরি সেক্স। অভিনয়াংশে অসিত মুখোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল সেনগুপ্তের যে স্বাভাবিকতা অন্য সকলের অভিনয় সেখানে শেখানো মনে হয়, শুধুই নিপুণভাবে পার্ট বলা। রবীন মিত্রের বনোয়ারীলাল সুন্দর চরিত্রচিত্রণ, তাঁর সংলাপ যথেষ্টই মজাদার, তার সঙ্গে প্রকৃতির বেগ বারবার মেশিয়ে সুন্দর চরিত্রচিত্রণকেও মোটা দাগে চিহ্নিত করে দেয়। মিত্রের ভূমিকায় শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব মনে হয় আরোপিত। অথচ তাঁর দায়িত্ব পালনে তিনি কম আন্তরিক ছিলেন না। কিন্তু সর্বতোভাবে ভিলেন বানাতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে।

পরী বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্নিগ্ধা মজুমদার সুন্দর অভিনয় করেছেন। কিন্তু দুজনের চরিত্রই ফরমুলায় বাঁধা। যে ফরমুলা শরৎচন্দ্রের যুগের। বইয়ের পাত্রপাত্রী কেউ বাঙ্গালী নয়—সংলাপ যথার্থভাবেই বাংলা—(এটাই হওয়া উচিত) কিন্তু আচার-আচরণ কোনভাবেই বাঙালীয়ানাকে ত্যাগ করতে পারে না—মনে হয় বাংলা থেকেই বাংলায় রূপান্তরিত নাটক দেখলাম।

কোমল গান্ধার একটি নিষ্ঠাবান গোষ্ঠী। অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও নির্দেশক অসিত মুখোপাধ্যায় নাটককে জমিয়ে দিয়েছেন কয়েকটি সুন্দর নাট্যমুহূর্ত এবং তাঁর নিজের অননুকরণীয় অভিনয়ে। এই নাটকে মিনু চৌধুরীর আলো মুড প্রকাশে সহায়তা করলেও, দৃশ্যান্তরে সময় নিয়েছে বেশী যার জন্য নাটকীয় গতি অনেক সময়েই ব্যাহত। সংগীত নির্দেশক ভাস্কর মিত্র অনেক শ্রুতিনন্দন আবহ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু শব্দসংকেতে নাটকীয় তাৎপর্য আরও অনেক ব্যাপক হতে পারত। ঘুমপাড়ানী গান হিসেবে সলিল চৌধুরী 'কে যাবি আয়' একই সঙ্গে নিছক বাঙ্গালীয়ানাকেই প্রকট করে, সে বাঙ্গালীয়ানা স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ করে। কোন বাঙ্গালী মা জলসায়, ঘরোয়া বৈঠকে ওই গান গাইলেও বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর সময় স্বাভাবিকভাবেই 'কে যাবি আয়' গাইবেন না।
দেবাশিস দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

কে, এস, কুলকার্নি (১৯২১—)

অধ্যাপক কুলকার্নি বর্তমানে কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত এবং শিল্পকলা বিভাগের ডীন। উত্তরপ্রদেশের প্রাদেশিক ললিতকলা আকাদমীর চেয়ারম্যান। কিছু দিন আগে নয়াদিল্লির জাতীয় ললিতকলা আকাদমীর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

বোম্বাইয়ের জে জে আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৪০)। কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পর দুটো বৃত্তি পেলেন। দেয়াল মণ্ডনকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য সরকারী দাক্ষিণ্যলাভ (১৯৪০-৪২)। টাটা ট্রাস্টের ভারতীয় চিত্রকলার গবেষণার বৃত্তিও পেলেন প্রায় একই সঙ্গে (১৯৪১-৪৩)। ডি সি এম-এ বস্ত্র-নকশাবিদ হিসাবে যুক্ত ছিলেন (১৯৪৪-৪৫)। দিল্লি পলিটেকনিকের কলাবিভাগে অধ্যাপক ছিলেন (১৯৪৫-৫২ এবং ৫৮-৬১)। দিল্লি শিল্পীচক্রের শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৮) এবং সভাপতি (১৯৪৮-৬২)। দিল্লির অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস সোসাইটির (সংক্ষেপে আইফ্যাকসের) পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য (১৯৪৭-৪৮)। অল ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব ফাইন আর্টসের সেক্রেটারী (১৯৪৮-৫২)। দিল্লির ত্রিবেণী কলাসংগমের মতো সংগীতনৃত্য এবং ললিতকলা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং ডিরেকটার ছিলেন (১৯৫০-১৯৬৭)। শংকরস উইকলি পরিচালিত বিশ্ব শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার সঙ্গে ষোল বছর জড়িত ছিলেন (১৯৫০-৬৬)। এই সূত্রেই চিলড্রেনস বুক ট্রাস্টের জন্য বইয়ের সচিত্রকরণ এবং মলাট আঁকার বিষয়ে দুটি কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেন। এই পাঠক্রমে দু বছরে প্রশিক্ষিত হন চল্লিশ জন ছাত্র। এশিয়াড ১৯৫৬-র জন্য স্টুবেন গ্লাসের নকশা করেন। আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি মিশর, জাপান, সুইৎসারল্যাণ্ড, মেকসিকো এবং মার্কিন মুলুকে চিত্রপ্রদর্শনী করেন (১৯৫৮-৫৯)। ১৯৬১-৬৩ সালে স্কুল ফর প্ল্যানিং অ্যাণ্ড আর্কিটেকচারে শিক্ষকতা করেন। প্রতিরক্ষা, শ্রম, প্রাদেশিক, শিক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য ও বেতার, খাদ্য এবং কৃষি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের জন্যে প্রতিকৃতি এবং ভিত্তিচিত্র এঁকেছেন প্রচুর। তিনটি কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপাদি মণ্ডন এবং সচিত্রণ করেন। ১৯৫০ সালে রেলপথের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের প্রদর্শনীর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এবং ভিত্তিচিত্র অঙ্কন তাঁরই। ১৯৫৮-র গ্রামীণ কুটির এবং খাদি প্রদর্শনী ও আন্তর্জাতিক বাসস্থান প্রদর্শনীর ভিত্তিচিত্র এবং মূর্তি করেন। ভারতীয় যন্ত্রশিল্প এবং বিশ্ব কৃষি উৎসবের ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করেন (১৯৫৯-৬১)।

কুলকার্নি পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন—মার্কিন মুলুক সোভিয়েত রুশিয়া, জাপান, পূর্ব এবং [illegible] পশ্চিম, এবং যাদুঘর এবং শিল্পকলা [illegible] দেখে এসেছেন।

একক প্রদর্শনী নয়াদিল্লি (১৯৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯), কলকাতা (১৯৬১, ৬৩), বোম্বাই (১৯৬১, ৬৬), হায়দ্রাবাদ (১৯৬৪), নিউ ইয়র্ক (১৯৫১, ৭০, ৭২-তে দুটো), কায়রো (১৯৫৮), ওয়াশিংটন (১৯৫৮, ৭১), সানফ্রানসিসকো (১৯৫৮) ছাড়া হনলুলু প্রভৃতি নানা জায়গায় একক প্রদর্শনী হয়েছে। নানা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ইণ্টারন্যাশনাল আর্ট শো, লণ্ডন (১৯৪৮), ইণ্টারন্যাশনাল একজিবিশন, দিল্লি (১৯৫৪), ইণ্টারন্যাশনাল শো, ইন্সটিট্যুট অব আর্কিটেক্টস নিউ ইয়র্ক (১৯৫১), মার্কিন মুলুকের ফেডারেশন অব আর্টস এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির দ্বিবার্ষিক, ব্রেজিল (১৯৫৭), ভারতীয় চিত্রকরদের পূর্ব ইউরোপে প্রেরিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ (১৯৫৯)। এ ছাড়াও অনেক আছে।

ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তিনবার (১৯৫৫, ৬২, ৬৫)।

কুলকার্নির ছবিতে ভারতীয় এবং ইউরোপের ধারার সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা

যায়। তাঁর [illegible] দিকের [illegible] অন্তর্গত আকারগুলি [illegible] শৈলীর মধ্যে কাব্যগুণ [illegible] বাস্তব দৃশ্যকে বিমূর্তকরণ [illegible] এবং কোমল রঙের ঐক্যে [illegible] রচনাসৌকর্যের বাঁধনে। [illegible] মোটা রেখার জোরে। ভারতীয় [illegible] কলাকারদের ছন্দিত ভংগী [illegible] প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। [illegible] নারী এবং গৃহপালিত জন্তু [illegible] ছবিতে এসেছে। পটভূমি [illegible] রূপ ও রঙের অসাযুজ্য [illegible] সহাবস্থান সম্বন্ধে নানা রকম [illegible] ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। [illegible] এবং নিরাবয়বী কাজের মাধ্যমে [illegible] ভারতীয় দেওয়ালচিত্রের মণ্ডনের [illegible] আধুনিক নন্দনতত্ত্বের যোগ ঘটেছে [illegible] ভিত্তিচিত্রে।

প্রচ্ছদে মুদ্রিত "মুখোশ" ([illegible] ৪০" তৈলচিত্র, ১৯৬৫) [illegible] এবং কোমল বর্ণের মধ্যে [illegible] মায়ার জগৎ তৈরি করেছে। [illegible] জোলুস এবং রূপের ঐশ্বর্যের [illegible] তাঁর লক্ষ্য।

Shingar
DELUXE
KAJAL

বাড়িয়ে তুলুন সৌন্দর্য্য, রূপ ও রঙ্গ
অথচ দামে এতই কম যে, আপনি
অবাক হয়ে যাবেন।
নন্দন শাড়ী...

Nandan

নন্দন টেক্সটাইলস (প্রাঃ) লিমিটেড, বম্বে

Grant.10 BN

রাগ-অনুরাগ : বিরাগ

রবিশঙ্করের রাগ-অনুরাগ সত্যিই তাঁর বাজনার মতই অনবদ্য। জ্ঞানগর্ভ আবার সুখপাঠ্যও। তবে দু-একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিশেষ করে এ জন্য যে, উনি যদি এটা পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন তা হলে স্থায়ী-ভাবে এই সামান্য ত্রুটি বা বিচ্যুতিগুলি যাতে স্থান না পায় তার জন্য তাঁর দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ থাকবে।

গুলাম আলি সম্পর্কে রবিশঙ্কর খুবই শ্রদ্ধাবান। ও'র গানকে উনি 'মহত্বের নিজস্ব এলাকা'য় 'নিয়ম-কানুনের বাইরে' স্থান দিয়েছেন। ঠুংরিসহ ও'র গানকে 'একটা দিক, স্বতন্ত্র শৈলী' বলে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, 'বারোটা সুরই যেন ও'র পোষা পাখি ছিল।'

কিন্তু আবার এও বলেছেন, বড়ে গুলাম আলি 'বড় বড় রাগ' গাইবার সময় 'মনে হত নিজেও ততখানি আনন্দ পাচ্ছেন না। যার জন্য অনেকেই চির-কালই সমালোচনা করেছেন ও'র।' '...একটা চাঞ্চল্য ভাব থেকে যেত তাতে। তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতেন, বেশীক্ষণ গাইতেই চাইতেন না।' ঠুংরি অঙ্গের গানেই ও'র পুরো সত্তা জেগে উঠতো।

পুত্র মুনওয়ার আলি খাঁ যাকে 'অন্যায় ও অসত্য' বলেছেন আমি ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে একথা নিশ্চয়ই বলব বড়ে গুলাম তো মালকোষ, বাগেশ্রী, কেদার, ইমন, মুলতান, জয়জয়ন্তী, হাম্বীর, টোড়ি, গুণকেলি, দরবারি কানাড়া এই রাগ গুলোই বেশী গাইতেন। সবই তো বড় রাগ। গারা‌তি, আড়ানা, বাহার, বসন্ত, পরজ, দেশ ইত্যাদি গাইতেন দ্বিতীয় গানের রাগ হিসাবে। খুব আনন্দ করেই তো গাইতেন। আর শ্রোতারা আনন্দ পেতেনই। এমন কি কট্টর শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা ও'র গানকে একটু হালকা চালের মনে করতেন তাঁরাও বলতেন লোকটার রাগরূপায়ণে কিন্তু কোনও খুঁত নেই। স্বরের ওপর দখল তো অবিসম্বাদী। নিজস্ব ঢঙে পুরো রস আদায় করেই গান জমাতেন। তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতেন কথাটা এখানে প্রযোজ্য কি? যে আমীর খাঁর উনি এত গুণগান করেছেন তিনি পূর্বে খুবই ধীরগতিতে বাড়্হত করতেন কিন্তু পরে তা সংক্ষেপ করেন এবং তাতে পুনরাবৃত্তি কমে যায়। গান আরও দানা বাঁধে। তবে খেয়াল গানে আমীর ছিলেন সত্যিই একজন সার্থক ক্লাসিক্যালধর্মী শিল্পী। আর মেজাজে গুলাম ছিলেন রোমানটিক। ক্লাসিক্যাল গানের শিল্পী হয়েও ধ্যানগম্ভীর পথে না এগিয়ে স্বরগুলোকে তুলির রঙের মত ব্যবহার করে উনি দু-এক আঁচড়েই রাগের স্বপ্নলোকে পৌঁছে দিতেন শ্রোতাকে। তারপর দমবন্ধ করা তানের চমক, তাক লাগানো নানা অলংকরণের মনোহারিত্বে বিংশ শতকের এক সেরা বিস্ময়কর খেয়াল-গায়কের মর্যাদাই পেয়েছেন উনি। আর ঠুংরি গানে ও'র সত্তা জেগে ওঠার প্রশ্নটি ভারি মজার। সংগীতের ভিয়েনে। আসলে ঠুংরি জিনিসটাই অনেক বেশী পারসো-ন্যালাইজড। আগ্রা ঘরানার গায়ক হলেও ফৈয়াজ খাঁর গানে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ছিল অমোঘ। কিন্তু সেই রাসভারি খেয়াল-গায়কও যখন ঠুংরি-দাদরা শুরু করতেন তখন একটি মজাদার লোক যেন ও'র গান থেকে বেরিয়ে এসে শ্রোতাদের সংগে আলাপচারি জুড়ে দিতেন—আরে, তুমি কোথায় ছিলে, আমি কোথায় ছিলাম, অজ্ঞ এই মাইফেলে এসে যাই হোক, মিলে গেলাম। আমাদের এই মিলন 'হাজার বরষ সলামৎ রহে' ইত্যাদি। মৌজুদ্দিনের গানেও নাকি ছিল এটা। আসলে খেয়ালের ফরমের কাছে শিল্পী খানিকটা আত্মসমর্পণ করে চলতে বাধ্য হন। ঠুংরিতে তা নিষ্প্রয়োজন। গুলাম আলির খেয়ালেও ছিল রঙ, রস, মজা, গতিময়, বর্ণাঢ্য সুরের কারুকার্য যা কখনও গভীর, গম্ভীর কখনও বিষাদ, মধুর, কখনও চপল, চঞ্চল। কিন্তু একে শুধু 'চাঞ্চল্য' বলা কি ঠিক?

রবিশংকর অল্প কথায় তুলে ধরেছেন আলাউদ্দিন খাঁর সরল, নিরহংকারী দেহাতী রূপটি। ছবি নিগ্রহের প্রসংগটিও নিষ্ঠুর সত্য, মর্মস্পর্শী। তবে এই প্রসংগে লিখেছেন 'উনি জীবনে কখনও চান্সই পাননি যে, লোককে দেখাবেন ও'র ভিতরে কি আছে। অনেক পরেও দেখা গেছে, সেই কলকাতায় এলেই ও'কে হয় হীরুবাবুর সংগে বসাবে, নয় কণ্ঠে মহারাজের সংগে বসাবে। আমি তো দেখেছি, সেই একটা লয়ের মারপিট। আলাউদ্দিন খাঁ মানেই সেই পেটাপিটি।'

এ কথাগুলিও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 'ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও'কে পুরোপুরি চিনে ছিলেন বলেই গৌরীপুরে ও'কে রেখেছিলেন বিশেষ মর্যাদার সংগে। সেতারী এনায়েৎ খাঁ এবং আরও অনেক ওস্তাদই ছিলেন সেখানে। চট্টগ্রামে উনি যান এবং বহু ধরনের যন্ত্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়ে এবং ধ্রুপদ গেয়ে, শিখিয়ে ক'দিনে আর্য সংগীত সমিতির শিক্ষক ছাত্র ও অনুরাগীদের এমন আপনজন হয়ে ওঠেন যে ওখান থেকে উনি চলে আসার সময় সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন, উনি তো বটেই।

মানুষ হিসাবে, সংগীতজ্ঞ হিসাবে, ও'র স্থান অনেকের মনেই একজন সফল শিল্পীর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। বিংশ শতাব্দীতে যার নজির দুর্লভ নয়, নেই। তাই বাঙালী মাত্রেরই ও'র জন্য একটা গর্ববোধ আছে। রবিশংকর ও'র সুরের সেই জগৎটাকে বিস্তারিত-ভাবে তুলে ধরুন না। সকলেই শ্রদ্ধার সংগে তা পাঠ করে সাধুবাদ দেবেন।

'পেটাপেটি' যন্ত্রীরা প্রয়োজনে স্থান বিশেষে করে থাকেন কিন্তু ওটা যে পূর্বোক্ত দুজন তবলিয়ার একচেটিয়া অধিকার নয় সেই প্রসংগেরও উল্লেখ প্রয়োজন। রবিশংকর নিজেই বলেছেন '...যাত্রাপথে কিছু নাড়ী তবলিয়াদের জলসায় ঘায়েল (অবশ্য বাজনার মাধ্যমে) করে নিজের জায়গায় পৌঁছেছি।' সে যাই হোক, কণ্ঠে

ছেন, '...আমার অন্তরের প্রিয় যোগ ছিলেন তিনি কণ্ঠে মহারাজ।...লয় তাল ছন্দের তো রাজা ছিলেন উনি। শুধু সমঝদারই নয়, যারা কম বুঝত তাদেরও নাচিয়ে দেবার ক্ষমতা ওঁ'র ছিল।' —তাই ওঁদের প্রসঙ্গটিও উত্থাপন না করে বলি হীরুবাবু যা হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর সঙ্গত সম্পর্কে 'পেটাপেটি'-ই একমাত্র পরিচয় নয়। হীরুবাবুর বাজনা খুব মিষ্টি হাতের সুরেলা ঠেকা—এরূপ কিছু প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং যথেষ্ট বাজালেও, লয়দারী করলেও উপভোগ্য সঙ্গীত সৃষ্টি যে হয়, এমন কি হীরুবাবুর ব্যাপারেই, তার একাধিক দৃষ্টান্তের একটিই তুলে ধরছি এখানে। বিশেষত দৃষ্টান্তটি যখন আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁরই সঙ্গতের।

১৯৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ পড়ুন : "আগের দিনের অধিবেশনে রবিশঙ্কর যে মেজাজটি আসরে ধরাইয়া দিয়া যান এই দিন, তাঁহার গুরু, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ দুঘণ্টাব্যাপী সরোদ ও বেহালা বাজানোর মধ্য দিয়া তাঁহার নিজের খুশীর মেজাজকে বাতাসে বাতাসে অনুরণিত করিয়া এক অভূতপূর্ব সঙ্গীতলোক রচনা করিয়াছেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া যাঁহারা খাঁ সাহেবের বাজনা শুনিয়া আসিতেছেন তাঁহারা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে এমন বাজনা কলিকাতার কোন আসরে আর শোনা যায় নাই। সেই অপূর্ব সুধামাধুর্য, আর দর্শকদের পুলকানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত সে প্রকাশকে ভাষায় বিবৃত করা দুরূহ ব্যাপার। তাহার তুলনাও পাওয়া যায় না। সঙ্গে তেমনি অপূর্ব তবলা সংগত করেন হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। খাঁ সাহেব পর্যন্ত তবলায় এতটা মুগ্ধ হন যে তিনি বারবার হীরেন্দ্রকুমারকে উচ্ছসিত হইয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিতে থাকেন। খাঁ সাহেবের সে-কী উদ্দীপনাময় বাজনা—

'শুনিতে শুনিতে জগতের কোন খেয়ালই থাকে না। সে রাতের শ্রোতৃমণ্ডলের কাছে এই পরম অভিজ্ঞতা আজীবনের সঞ্চয় হইয়া থাকিবে। সরোদের পর...শিল্পী বেহালা বাজাইয়া শোনান প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরিয়া, সঙ্গত করেন কেরামত খাঁ।'

তা হলে দেখা যাচ্ছে এমন অভূতপূর্ব সরোদ বাদনের সঙ্গতকার ছিলেন হীরুবাবুই। 'পেটাপিটি' করে তিনি এই 'সুধামাধুর্য'-কে মল্লযুদ্ধে পরিণত করেননি। কেরামতের মত মিষ্টি হাতের শিল্পী উপস্থিত থাকতেও হীরুবাবুকেই (আলাউদ্দিন বলতেন, হীরাবাবা) বেছে নিয়ে ছিলেন আলাউদ্দিন মূল বাজনাটির জন্য। কেউ 'বসিয়ে' দেয়নি হীরুবাবুকে। বরং হীরুবাবুকে অনুষ্ঠানের পর আনন্দাশ্রুতে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন। অনুষ্ঠানকালে বারবারই তারিফ করছিলেন তাঁর লয়দার সঙ্গতকারীর।

ওই তারিখেই মুদ্রিত ওই সরোদ বাদনের হ্যাণ্ডবিল পরিচিতিটিও উল্লেখ্য। —"নিখিল ভারত খ্যাতনামা সঙ্গীত [illegible] নিমগ্ন সাধক শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (মধ্যে) এবং তাঁহার সঙ্গীত সঙ্গতকার হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (তবলা) ও রবীন্দ্রশঙ্কর (তম্বুরা)।"

তাহলে মঞ্চে রবিশঙ্কর নিজেই যখন তম্বুরাহস্তে উপস্থিত ছিলেন তখন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রকাশের কারণ শুধু হীরুবাবুর প্রতি সুবিচারই নয়, সমালোচকদের সম্পর্কে রবিশঙ্করের চাপাও বিরাগ-ভাবের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণও বটে। সমালোচকদের সম্পর্কে রবিশঙ্করের অনেকগুলি দৃষ্টান্তই সঙ্গতভাবেই তাঁর বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করে। তবুও বলি, উপরের এই লেখাটির মত অনেক লেখাই তো রবিশঙ্করের মত অনেককে খ্যাতির চূড়ায় যেতে সাহায্যও করেছে। তাই নিন্দা প্রসঙ্গে তাঁকে এতটা মুখর দেখে মনে হয়, প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হলেও কোনও লেখাতেই বলার মত কি কিছুই পাননি তিনি? তা ছাড়া, সমালোচকদেরও তো নানা সমস্যা থাকে। যেমন, খাম্বাজে শুদ্ধ নিখাদ দিয়ে নামলে তাকে 'সৌন্দর্যের বিকাশ-মাত্র' বলা যায় কি? রবিশঙ্করের এ কথাও ঠিক যে, দীর্ঘ সময়ের বাজনায় ওরকম দুএকটি প্রয়োগ রাগের বিচ্যুতি ঘটায় না, সৌন্দর্য বাড়াতেও পারে। কিন্তু তার একটি স্বীকৃত রীতিও যে আছে। গুলাম আলি এইভাবেই মালকোষে পঞ্চম লাগিয়ে শ্রোতাদের হাততালি কুড়োতেন। কিন্তু সেটা করতেন বলে-কয়ে। কেউ যদি না বলে-কয়ে তা করেন তবে সেটা লেখায় ধরে দেওয়া কি সমালোচকের অপরাধ? সেতারী বিলায়েৎ খাঁ এক প্রভাতী আসরে (সুরেশ সংগীত সংসদ। ১৯৭২, কলামন্দির) বিলাসখানি টোড়িতে কড়ি মধ্যম লাগিয়েছিলেন দু ঘণ্টার বাজনায় তিনবার এবং তাও তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। আমি বলব, প্রথমটা ভুলেই লেগেছিল। বাকি দুটি ওটাকে সমর্থন করার জন্য। তা নইলে উনি আরো অ[illegible]বারই লাগাতেন কড়ি মধ্যম আগে বা পরে। তা ছাড়া, যে সুস্থ ধারায় এটি লাগতে পারে তা লাগাতে হলে শুদ্ধ নিখাদও লাগাতে হবে—টোড়ি থেকে এসেছে বলে। এই ধারা খুব বেশী দিন চলে নি। এরূপ ক্ষেত্রে রবিশঙ্করকেই আমার জিজ্ঞাস্য, বেচারা সমালোচকের কর্তব্য কি?

সব শেষে জানাই, কৃতজ্ঞতা, রাগ-অনুরাগ লেখার জন্য। রবিশঙ্কর শিল্পী, লেখক নন। তবু বলব তাঁর বাজনার মতই তার লেখাও তাঁকে অমর করে রাখবে।

বিজয় চক্রবর্তী
কলকাতা-৬

শ্রীজগন্নাথ ও মানবিক সমন্বয়

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধের দু একটি বক্তব্যের সম্বন্ধে দু একটি বক্তব্য আছে।

১। প্রবন্ধকার বলেছেন যে,

...নাগর রীতি ও দাক্ষিণ ভারতীয় 'গোপুরম' রীতির সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু 'গোপুরম' কোন স্থাপত্যরীতি নয়। দ্রাবিড় স্থাপত্য-রীতির অর্বাচীন কালে নির্মিত মন্দিরসৌধ Complex-এর অংশ বিশেষের নাম। সুপ্রাচীন দ্রাবিড়-স্থাপত্যে, যথা মল্লপুরম-এ, গোপুরম নেই, মহীশূরের বেলুড়-এ বা হয়সল স্থাপত্যেও নেই। কেবল তামিলনাদেই গোপুরম দেখা যায়। যেমন মদুরার মীনাক্ষী মন্দিরে (সপ্তদশ শতাব্দী) বা চিদাম্বরমে। কিন্তু তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে (দশম শতাব্দী) অনুপস্থিত। দ্রাবিড় স্থাপত্যে এই মন্দিরটি অনন্য—বিশালত্ব ও মহিমার রূপায়ণের দিক থেকে। যদিও পরবর্তীকালে দ্রাবিড় স্থাপত্যচিন্তা গোপুরমকে এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে মূল মন্দির অন্তরালে পড়ে গিয়েছে। স্থাপত্য-শিল্পের ভাষায় গোপুরম বৌদ্ধ তোরণের functional descendant। গোপুরম একটি "tower like entrance gateway". মন্দিরের spire নয়।

২। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত মন্দির স্থাপত্যরীতিকে 'নাগর'শৈলী বলা হয়—যদিও তার প্রচুর আঞ্চলিক রূপভেদ আছে। যেমন বুদ্ধগয়ার মন্দির। খজুরাহোর মন্দির, পুরী-ভুবনেশ্বরের মন্দির—সবই নাগররীতির অন্তর্গত। উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্য নাগরশৈলীর এক মৌলিক আঞ্চলিক রীতি। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অনুশীলিত রীতিকে 'দ্রাবিড়' শৈলী বলা হয়। এই দুই রীতির মিলন কোথাও যে হয়নি তা নয়। যেমন মহীশূরে, এমন কি ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলে (৬০০-৬২৫ খৃষ্টাব্দে); কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দিরে কদাপি নয়। উড়িষ্যার আঞ্চলিক রীতি অনুসারে মন্দির স্থাপত্য 'রেখ-শিখর' ও 'পীঢ়া-দেউল'—এই দুই মুখ্য অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশকে বিমান ও দ্বিতীয়াংশকে জগমোহন নামে অভিহিত করা হয়। কোথাও কোথাও অবশ্য বিমান ও জগমোহন ছাড়া নাটমন্দির এবং ভোগ-মণ্ডপ দেখা যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরে যে জগমোহন অনুরূপ স্থাপত্য ভুবনেশ্বরের লিংগরাজ মন্দিরেও বর্তমান। আর কোনারকের যে তথাকথিত সূর্যমন্দির তা প্রকৃত পক্ষে লুপ্ত বিমানের জগমোহন মাত্র।

অন্যত্র অনুসৃত নাগরশৈলীর মন্দির স্থাপত্যে জগমোহন বা পীঢ়া-দেউল দেখা যায় না। মহানদীর দ্বীপস্থ সিংহনাথের ছোট মন্দিরটি আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত ... উড়িষ্যার নাগরশৈলীর আঞ্চলিক রীতির পূর্বরূপ বলা যায়। ভুবনেশ্বরের রাজারাণী (দশম শতাব্দী), ব্রহ্মেশ্বর (আনুমানিক ১০৫০ খৃষ্টাব্দ) ও সুবিখ্যাত লিংগরাজ (১১০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়) মন্দিরগুলি উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোপুরম-যুক্ত দক্ষিণ ভারতের মন্দির-পরবর্তীকালের। তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির ও ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দির সমসাময়িক। প্রথমোক্তটি গোপুরম ভূষিত নয়। দ্বিতীয়োক্তটি বিমান ও জগমোহনের আকারগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ শিল্পশ্রীমণ্ডিত।

৩। প্রবন্ধকার তাঁর অন্বিষ্ট সমন্বয় প্রদর্শনার্থ জগন্নাথ মাহাত্ম্যসূচক একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করেছেন। তদনুসারে জগন্নাথদেব বেদান্ত-প্রতিপাদ্য-ব্রহ্মমূর্তি, আবার জৈন ও বৌদ্ধ সিদ্ধান্তসার-রূপী। জৈন বা বৌদ্ধরা এ-কথা মানেন কিনা সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে উত্থাপন না করলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগে উপরোক্ত দুই দার্শনিক মতের ও ধর্মেতিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ অনুধাবন করা যেতে পারে। জৈন শ্রমণ পরম্পরা কেবল যে প্রাগার্য তাই নয়, অনার্যও বটে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে আদি তীর্থংকর ঋষভদেব বিষ্ণুর দশাবতারের পূর্ববর্তী কল্পের অবতাররূপে কথিত। জৈন সাহিত্যেও তার সমর্থন আছে। দ্বাবিংশতিতম তীর্থংকর অরিষ্টনেমি মহাভারতখ্যাত শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাতপুত্র। জৈনরা অরিষ্টনেমিকে নেমিনাথ নামে উল্লেখ করেন। আবার তিনজন তীর্থংকরের নাম, যথা ঋষভ, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমি, যজুর্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু জৈন সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্য মানে না, তদুপরি নিরীশ্বরবাদী।

কলিংগরাজ খারবেল খৃষ্টপূর্ব ১৬১ অব্দে মগধ থেকে ঋষভনাথের সেই মূর্তিটি নিয়ে আসেন যেটি তিনশ বছর পূর্বে কলিংগ থেকে মগধ সম্রাট প্রথম নন্দ নিয়ে গিয়েছিলেন। পণ্ডিত মহলে একথাও চলে যে, বর্তমান লিংগরাজের মন্দিরের স্থানে খারবেল-নির্মিত একটি জৈন মন্দির ছিল।

এই সমস্ত তথ্য সত্ত্বেও পুরী জৈন-তীর্থ নয়, জগন্নাথদেবও জৈনদের উপাস্য নন।

৪। হিন্দুমতে বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার। কেবল জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে নয়, অন্যত্রও। দেবী ভাগবতে (১০-৫-১৪), ভাগবত পুরাণে (৬-৮-১৭) বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকৃত। তদুপরি সাত্বতসংহিতায় তাঁর নাম 'শান্তাত্মন্', অগ্নিপুরাণে 'শান্তাত্মা'। পদ্মপুরাণের বুদ্ধস্তুতিও উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র এবং শিশুপালবধে কবি মাঘ হরিতে বুদ্ধত্ব আরোপ করেছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে বুদ্ধস্তব আছে। অষ্টম শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্তির মূর্ধায় ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায় (Annual Report of the Dacca Museum for 1939-40)। মহাচীনাচারতন্ত্রে 'বুদ্ধরূপী জনার্দন' অথবা 'বিষ্ণুণা বুদ্ধরূপিণা' ইত্যাদি ব্রহ্মার্ষ্য রামচন্দ্র কবিভারতীর (১৩শ শতক) রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙালী বর্ণহিন্দু বুদ্ধমূর্তি ঘরে রাখেন না। তাঁদের ধারণা যে ঘরে বুদ্ধমূর্তি থাকলে অমংগল হয়।

৫। বাঁকুড়ার দশাবতার তাস-এ নবম অবতারের স্থানে বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথদেবকে চিত্রিত করা হয়। বর্ধমান বীরভূম প্রভৃতি জেলার মন্দিরের পোড়া-

জগন্নাথদেবের আত্মজ বোধক? গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরটি বুদ্ধপদ মন্দির বলেই ঐতিহাসিকদের ধারণা (P. C. Roy-Choudhuri, Temples and Legends of Bihar, Bombay. p. 186)। ভারতে কোথাওই বিষ্ণুপদ পূজিত হয় না (শ্রাদ্ধ শান্তিতে হিন্দুরা 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্' স্মরণ করেন অবশ্যই)। বলা হয়েছে যে, বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করার পূর্বে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করে আসবে। অবাঙালীরা বুদ্ধগয়া মন্দিরে পিণ্ডদানও করেন গয়া-মাহাত্ম্যের বিধি অনুসারে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরটি যে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির সেই বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও Cunningham নিঃসন্দেহ ছিলেন। সাঁচীতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ-জ্ঞাপক যন্ত্রের সঙ্গে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের অবয়বগত সাদৃশ্য বিস্ময়কর। বৌদ্ধশিল্পে ও তন্ত্রে ধর্ম স্ত্রীরূপে কল্পিত হয়। বুদ্ধের পদচিহ্ন-জ্ঞাপক শিল্পাকৃতিতে চক্রচিহ্ন থাকে। পুরীর শ্রীমন্দিরস্থ সুদর্শনকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বুদ্ধচক্র বলেই মনে করেছেন (The Antiquities of Orissa. Vol. II)।

৬। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাজ্য, কিন্তু অন্য কোন বৈষ্ণবতীর্থে তা নেই কেন? বুদ্ধ তাঁর চারিত্র্যমাহাত্ম্যে অনিবার্যভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন—কিন্তু বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত—তার অনাত্মবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ ও দুঃখের সর্বাত্মিকতা ব্রাহ্মণ্য দর্শনে গৃহীত হয়নি। শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বৌদ্ধ ও জৈন মত অপর আস্তিক মতগুলির সঙ্গেই খণ্ডন করেছিলেন। রামানুজ তাঁর ভাষ্যে সাংখ্যাদি আস্তিক মতের আংশিক যাথার্থ্য স্বীকার করলেও বৌদ্ধ ও জৈন সিদ্ধান্ত বিষয়ে শংকরেরই অনুসারী। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে শংকর 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ', হয়ত তাই; তাঁর প্রগুরু গৌড়পাদ সম্ভবত বৌদ্ধ ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় একদিকে বিষ্ণুর নবমাবতারকে স্মরণ করেছেন জয়দেবের গানে, অপর দিকে তাঁদের সাম্প্রদায়িক রচনাবলীতে প্রকাশ করেছেন চরমবৌদ্ধ বিদ্বেষ। চৈতন্যচরিতামৃত-র মধ্যলীলা পড়লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

৭। যে-সমন্বয়ের কথা জগন্নাথ-দেবকে কেন্দ্র করে গ্রন্থের প্রবন্ধকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী তা বাস্তবে কদাপি সম্ভব হয়নি।

সমন্বয়ের কথা প্রায়ই হতাশ করে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের বিখ্যাত সূত্র: 'তৎ তু সমন্বয়াৎ'। কিন্তু কোন সমন্বয়? কোনও ভাষ্যকারই তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সমন্বয় অভীষ্ট নয়। বিভিন্ন ঔপনিষদিক পদসমূহের সমন্বয়ই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য—যা বেদান্তের মূল গ্রন্থ। আর 'মানবিক' সমন্বয় যদি জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে সাধিত হয়েই থাকবে তাহলে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই কেন? গান্ধী যে-কারণে পুরী গিয়ে জগন্নাথ দর্শনে যাননি। 'মানবিক' বলতে শুধু বর্ণহিন্দুকে বুঝব কেন—খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি ভারতবাসী কি 'মানব'-সংজ্ঞা বহির্ভূত? যবন হরিদাসকে

তার প্রবক্তা রামমোহন, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ বিনিই হন না কেন রেনেসাঁস পরবর্তী ইওরোপে positivism ও humanism-এ দান। তা হিন্দু ঐতিহ্যগত নয়।

পবিত্রকুমার রায়
বিশ্বভারতী

অবসরের গান : বোলান

শ্রীসুধীর চক্রবর্তী বোলান সমৃ অঞ্চলগুলোর একটা তালিকা (অংশি কিনা তার স্পষ্ট কোন আভা নেই) বর্ণনা করতে গিয়ে নদীয় বোলান পীঠস্থান কালীগঞ্জ গ্রাম এ তৎসংলগ্ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা (কুলবেড়িয়া, বাদরীডাঙ্গা, নারায় পুর, এড়িয়াডাঙ্গা) নদীয়ার বোল সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে বেমালুম ব দিয়েছেন। জানি না কোনদিক থে বিচার করে তিনি এমন সিদ্ধা নিলেন তবে গুণগত উৎকৃষ্টতা এ প্রাচীনত্ব যদি বোলান সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রধান পরিচয় হয় তাহলে কালী অঞ্চল লেখক বর্ণিত অঞ্চলসমূহে টেক্কা দেবার একমাত্র অহংকারী দাব দার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দেবগ্র অঞ্চল যদিও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্ভু তবুও বোলান চর্চায় কাসে তমুণ

এছাড়া, পশ্চিম বাংলার ভৌগোলি অবস্থানের দিক থেকেও কালী গ্রামকে নদীয়া জেলার বোলান চচ প্রাণকেন্দ্র বলার একটা গুরুত্বপূ ভূমিকা আছে। কালীগঞ্জ গ্রাে মধ্য দিয়ে যে বিখ্যাত জগৎখ বাঁক এঁকেবেঁকে বর্ধমান এ নদীয়ার সীমারেখা টেনে দিে তা এই দুই জেলার গ্রাম সাংস্কৃতিকতাসম্পন্ন মানুষগুে মনকে এক সূত্রে বেঁধেছে এবং দ ভিন্ন জেলার লোকোৎসবগুে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক চিন্তার ফস গুলোকে পরস্পর আন্তরিক বিনিময়ে একে অপরকে বিভিন্ন দি থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই এখে বর্ধমানের রাঢ় অঞ্চলের বোে উৎসবের জোয়ার কালীগঞ্জকে বোে পীঠস্থান করতে প্রভূত সাহ করেছে।

শ্রীচক্রবর্তী বোলান গানের গু কীর্তন করতে গিয়ে এক জায় লিখেছেন, "......কান্ত বসন্তের প বিকশিত লাবণ্য আর গ্রা অনাহত হাওয়ার পথে উন্মত্ত বো গানের সুর সারাদিনরাত উচ্ছ্রিত জাগিয়ে রাখে গ্রামীণ মানুষের ম উদ্দীপনাকে—স্বীকার করি দি "…. বোলান গানের 'গ্রাহক' শ্রোতা উভয় পক্ষই এ সময়টার প্রভাবী ও মেজাজী" এই ধা প্রকৃত অর্থটাকে মেনে নিতে কেমন কুণ্ঠা বোধ হয়। যদিও গ্রা অর্থনীতি প্রাবন্ধিকের মতে এ স স্বচ্ছল থাকে (সব সময় স্বচ্ছল থা কি?) তবুও যদি প্রভাবী ও মেজ থাকার সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনী

জেনেছেন একমাত্র যুবক ও কিশোরেরা বোলানের দল বাঁধে এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও শাস্ত্র-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পালা রচনা করে থাকেন ভুক্তায়। বোলান দলে যুবক ও কিশোরের প্রাধান্য অনস্বীকার্য কিন্তু বৃদ্ধরা যে পুরো-পুরি অজ্ঞাত থাকে তা আমি এই প্রথম জানলাম। কারণ দীর্ঘদিন বিভিন্ন বোলান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যে রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে করে বৃদ্ধদের উৎসাহ, উদ্দীপনা কোন অংশে যুবক এবং কিশোরের চেয়ে কমতি নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলি, গত বছর এক ৬৫ বছরের ছোনকেশী বৃদ্ধ তাঁর ছেলের সঙ্গে যে রঙ পাঁচালি গাইল তা কানে আঙুল দিয়ে শুনতে হলেও সমবেত শ্রোতামহলে এক বিশেষ আনন্দের সৃষ্টি করেছিল। তার কয়েকটা কলি এখানে তুলে দিলাম :

শালী ॥ জামাইবাবু গো, আমার ফোঁটা ফুল তো রাখা গেল না/কাছে এসো, পাশে বসো মিলন করি দু জনা।

জামাই ॥ শোন বলি, ওহে শালী, এতো যে বেড়ো না/তুমি এখন অনেক ছোট উতলা হয়ো না / সে আসবে বাড়ি, তাড়াতাড়ি চিন্তা করো না।

শালী ॥ চাঁদে মধু গলগল করে তুমি হে দেখো না / মোম ফেটে মধু পড়ে সইতে পারি না, / এসো ঘরে গলা ধরে, খেলা কর না। [ছড়াদার : শ্রীত্রিফল হাজরা]

ঘটনাটি ব্যতিক্রম ধরে নিলে মারাত্মক ভুল হবে কারণ এখনও গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায় পাড়ায় ভুরি ভুরি প্রবীণ ব্যক্তি যুবক ও কিশোরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বুক উঁচিয়ে গেয়ে যায় রাজা হরিশ্চন্দ্র, সতী বেহুলার মত করুণ পালা কিংবা ফোকলা দাঁতে ঢোলকের তালে তাল মিসিয়ে রসাত্মক ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে '......যদি মধুর ভাণ্ড চাও/ তবে মথুরাতে যাও/'

এমন নির্ভেজাল আন্তরিকতাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই, তাই ব্যাপারটা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখবার অনুরোধ করি। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়ে, বোলান গান শুধু মাত্র প্রবীণ এবং শাস্ত্র-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই আজকাল লেখেন না—বাইশ বছরের পাঠশালা ফেরত যুবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী তরুণরাও এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। তাই লেখকের এ প্রসঙ্গের মতামতটা মেনে নিতে নারাজ।

প্রাবন্ধিক বিভিন্ন গুণিজনের বিভিন্ন মতামত তাঁদের স্ব স্ব নামেই উল্লেখ করেছেন এমন কি চতুষ্কোণ (শারদীয়া, ১৩৮৪) এবং কৃষ্ণনগরের গ্রামবাংলা (কার্তিক, ১৩৮৩) লেখকের সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে মুছে যায়নি—কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সমস্ত অজ্ঞ, সহজ, সরল মানুষগুলো এই দুর্মূল্যের বাজারে কুপীর কেরোসিন পুড়িয়ে ছড়া বাঁধল—তাদের কথা, তাদের নাম একটু লিখলে খুব একটা মহাভারত অশুদ্ধ হত কি? সমস্ত পাড়ার, লাল রঙ, লিপস্টিক মুখে মেখে উগ্র বক্ষবন্ধনীতে পরিপাটি করে মেয়ে কিংবা সখী সাজে। আলোচ্য প্রবন্ধের বেশ কয়েক ছত্রে তার স্থির আভাস (অবশ্য ছবিগুলোও কমতি নয়!) আমি পেয়েছি। কিন্তু লেখকের কাছে আমার জিজ্ঞাসা তিনি কি কোন দিন বোলান গানের তথ্যানুসন্ধানে কালীগঞ্জ থানার কুলবেড়িয়া গ্রামে গিয়েছেন? যদি কোনদিন যান তবে শুনতে পাবেন আজ থেকে প্রায় ছয়/সাত বছর আগে ওখানকার স্থানীয় ধাওড়া-পাড়ার গ্রাম্য রমণীরা পুরুষদের মুখে মেয়েদের টিট করা কথা শুনে ঘোমটার আড়ালে চোখের বিদ্যুৎ হেনে পাশের বউকে চিমটি কাটেনি বরং নিজেরাই সৎসাহস নিয়ে সদর্পে দল গঠন করে গ্রামের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেয়ে গেয়ে ফিরেছে শিবঠাকুরের পালা।

অনিল ঘড়াই
কালীগঞ্জ, নদীয়া

আদিশূর

'সেই সময়' উপন্যাসে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আদিশূর সম্পর্কে যা বলেছেন, সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে অক্ষয়কুমার মৈত্রের গৌড়রাজমালা গ্রন্থে আদিশূরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেও শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদিত গ্রন্থের টীকায় আদি-শূরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং মোটামুটি একাদশ খৃষ্টাব্দে যে আদিশূর গৌড় শাসন করতেন সে বিষয়ে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। পাল রাজবংশের পর গৌড়ে সেনবংশের উত্থান ঘটে। ওই গ্রন্থেই আদিশূরকে বল্লাল সেনের মাতামহ বংশ বলেও দাবি করা হয়েছে।

সুনীলবাবু লিখেছেন তৎকালে গৌড়ে অনার্যরা বাস করত। তৎকালে অর্থাৎ আদিশূরের সময়ে। একাদশ শতাব্দীতে অনার্যদের বিবর্তিত বংশ-ধারা হয়তো থাকতে পারে—কিন্তু অনার্য বলতে যা বোঝায়, তা গৌড়ে কেন,. ভারতবর্ষের কোথায়ও আর ছিল না। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও তারপর পরস্পরের বৈদিক ও তন্ত্রের চিন্তাধারায় আদান প্রদানের ফলে ভারতে সনাতন হিন্দু ধর্মের গোড়া-পত্তন হয়ে গেছে আদিশূরের অনেক আগেই। দ্বিতীয়ত সেই প্রাগৈতিহাসিক গৌড়ে (তখন গৌড় নয়) অনার্য ছিল না। অনার্য সম্প্রদায় যারা ছিল, তাদের বলা হত 'চোয়াড়', 'শবর' ইত্যাদি। সুনীলবাবু প্রখর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের বংশাবলী অনুসন্ধান করতে গিয়ে আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি যদি অবহেলা করেন, তাহলে ইতিহাস বিকৃত হয়ে যাবে।

বিমল ঘোষ
শিলিগুড়ি

এম.ও. মাথাই-এর

অনন্য তথ্য-সংবলিত অন্তরঙ্গ ইতিহাস

নেহরুর সঙ্গে

দাম ১৫.০০

১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত এম, ও, মাথাই ছিলেন নেহরুর বিশেষ সহকারী। বস্তুত তিনি তখন নেহরুর দ্বিতীয় সত্তা হয়ে উঠেছিলেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। লোকে তখন বলত যে, প্রধানমন্ত্রীর পরে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। ক্ষমতার সেই বৃত্তের মধ্যে মাথাই-ই ছিলেন একমাত্র লোক, নেহরু সম্পর্কে প্রতিটি খুঁটিনাটি খবর যিনি জানতেন। রাজনীতি, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, আমলা-তন্ত্র, অর্থ, নারী, যৌনজীবন, সুরা ইত্যাদি নানা বিষয়ে নেহরুর নানা ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার কথাও তাঁর অজানা ছিল না।

যা তিনি জানতেন, গ্রন্থকার তার সবই এখানে খোলাখুলি ও অকপটভাবে জানিয়েছেন। ফলত, নেহরুর জীবনশৈলী, কৃষ্ণ মেননের ব্যক্তিগত নানা অভ্যাস ও আচরণ, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের অমিতব্যয়িতা, ফিরোজ গান্ধীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, উপাধিখেতাব ইত্যাদি ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনের দুর্বলতা এবং আরও নানা বিষয়ে সর্বতোভাবে নূতন এমন অনেক খবর আমরা এখানে পাচ্ছি, যা এর আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। সেই সঙ্গে, শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, প্যাটেল, কিদোয়াই, টি. টি. কে., মৌলানা আজাদ, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ, চার্চিল, শ ও লেডি মাউন্টব্যাটেনের উপরে এখানে নূতন করে আবার আলো পড়েছে। বিস্তর ফোটো ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিলিপি এ-বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ।

উপহার হোক ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়ের

ফটিকচাঁদ

দাম ৮.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদার ফুঁ

দাম ৬.০০

শৈলেন ঘোষের

আমার নাম টায়রা

দাম ৫.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভূমিকম্পের পটভূমি

দাম ৪.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

পাথরের চোখ

দাম ৬.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সমগ্র কিশোর-সাহিত্য ১ম

দাম ২০.০০

ইন্দ্রমিত্রের

শরৎ কথামালা

দাম ১০.০০

শিশির করের

গঙ্গায় বাঘ

দাম ৪.০০

রেবন্ত গোস্বামীর

অরুমিতুদের কথা

দাম ৪.০০

মঞ্জিল সেনের

ডাকাবুকো

দাম ৫.০০

বিমল মিত্রের

রাজা হওয়ার ঝকমারি

দাম ৭.০০

অন্নদাশংকর রায়ের

ছড়ার বই

হৈ রে বাবুই হৈ

দাম ৫.০০

'তেলের শিশি ভাঙলো বলে/ খুকুর 'পরে রাগ করো/ তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ ভারত ভেঙে ভাগ করো'—আধুনিক কালের এই বিখ্যাত ছড়ার রচয়িতা কে, অনেকেই হয়তো চট করে তা মনে করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো/বর্গি এলো দেশে' কিংবা 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে'র মতো প্রাচীন ছড়াগুলির সঙ্গে এটিও তাদের সকলের মুখে মুখে ফেরে।

স্রষ্টার নাম যখন গৌণ হয়ে গিয়ে কোনও ছড়া আবালবৃদ্ধ সকলের মুখে স্থান পায় তখনই ছড়া হিসেবে সেটি সার্থক—বোঝা যায়। এমন সার্থক ছড়া লেখেন বা লিখতে পারেন একালে মাত্র একজনই। তিনি অন্নদাশংকর রায়। লোকের মুখে-মুখে ফেরার মতো তাঁর আরও অনেক ছড়া—'আধমণ চাল তার/এক থালা ভাত/ কে খায় ?/কে খায় ?/ কৈলাসনাথ' 'ক'রে, তোরা ক[illegible] ?/সুধান তিনি, বর্ণমালায় ক'টা আছে স[illegible] ?' 'মুনু মুনু মুনিয়া/ শিকারী নয়গো ওরা/ওই সব খুনিয়া'; 'খেলবো না তো গোলামচোর/ সবাই তোরা চালাক ঘোর'; 'বিজলীর ধারা এই/এই আছে এই নেই' প্রভৃতি নিয়ে বেরোলো এই নতুন ছড়ার বই 'হৈ রে বাবুই হৈ'। প্রতিটি ছড়ার সঙ্গে আছে এক বা একাধিক মন-ভোলানো রঙিন ছবি—নাম-করা আঁকিয়ে অহিভূষণ মালিকের আঁকা॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

উপহার হোক ছোটদের বই

সুবোধ ঘোষের

সেই অদ্ভুত অভ্রখনি

দাম ৫.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

দাম ৬.০০

মনোজ বসুর

ওস্তাদ নটবর

দাম ৬.০০

বিমল করের

কাপালিকরা এখনও আছে

দাম ৭.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সবুজ দ্বীপের রাজা

দাম ৫.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

ম্যাজিকের মজা

দাম ৫.০০

বুদ্ধদেব গুহের

মউলির রাত

দাম ৫.০০

সুকুমার রায়ের

জীবজন্তু

দাম ৮.০০

সমরেশ বসুর

মোক্তারদাদুর কেতুবধ

দাম ৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

রাজকুমারের পোশাকে

দাম ৪.০০

[illegible] চক্রবর্তীর

কৌতূহলকর কিশোর-গ্রন্থ

যাদুঘরে চল যাই

দাম ৬.০০

রূপকথার গল্পে যে-ঘুমন্ত রাজপুরীর কথা শোনা যায়, আধুনিক যুগে তারই নাম যেন যাদুঘর বা মিউজিয়াম। প্রাচীন কালের জীবনযাত্রাকে যেন অবিকল ভাবে কেউ যাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে এই সংরক্ষণশালায়। ভারতবর্ষে যত যাদুঘর রয়েছে, তার মধ্যে আবার সব-থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ যাদুঘর হল কলকাতার যাদুঘর। নানা রকম খনিজ পদার্থ, কৃষিজাত দ্রব্য, মৃত পশুপাখি ও জীবজন্তুর নমুনা, প্রাচীন যুগের শিল্পসম্ভার, মিশরের মমি, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া হাজার-হাজার বছর আগেকার বিস্ময়কর জিনিসপত্র, অশোকস্তম্ভের চূড়া, পুরনো মুদ্রা, শিলালিপি, ঢাকাই মসলিন, পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাওয়া প্রাণীর কঙ্কাল এমন নানা কৌতূহলকর নিদর্শনে ভর্তি কলকাতার যাদুঘর। [illegible]গোপাল চক্রবর্তীর এই বইটি এক দিক থেকে কলকাতা যাদুঘরের গাইড-বুক বলা যায়। কোন ঘরে কী রয়েছে, তার বিস্তারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর বর্ণনার ভঙ্গি এমনই সজীব এবং সুন্দর যে, গল্পের বই বলে ভুল হয়। ক্লান্তি আসে না। কেবলই কৌতূহলকে উসকে দেন তিনি। মনে হয়, আরো শুনি। প্রচুর ইলাসট্রেশন ও ফোটো যুক্ত হওয়ায় বইটির আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশ ৪৫ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা
৬ আশ্বিন ১৩৮৫

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অরুণ বসু
প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতি শেষ পৃষ্ঠায়

পরবর্তী আকর্ষণ

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
আলোচনা যখন সমতা হারায়
বুদ্ধদেব গুহর গল্প
লতল পালা
সুধীর করণের রচনা
লোকবিশ্বাসে 'সাপ'
প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথা
স্মৃতি সততই সুখের
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রম্য রচনা
কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা

সম্পাদকীয়

টলস্টয়ের দেড়শততম জন্মদিবস

টলস্টয়ের চিন্তা এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরে বিশ্বমানবীয় জীবনে বিচার, বুদ্ধি ও বিবেক প্রভাবিত করবার সুযোগ পেয়েছে। দিল্লিতে মনস্বী টলস্টয়ের দেড়শততম জন্মদিবসের উদ্‌যাপন বস্তুত সেকালের টলস্টয়ের প্রতি আধুনিককালের শ্রদ্ধান্বিত স্বীকৃতির এবং উদার অভ্যর্থনার একটি নিবেদন। বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, টলস্টয় আধুনিককালের পক্ষে একটি নির্বাপিত দীপ নন, তিনি জাগ্রত দীপ। যদিও এই অপ্রিয় সত্যটিতে স্বীকার করতে হয় যে বিজ্ঞ বুদ্ধিবাদীর রূঢ় অমান্যতার প্রকোপে বেশ কিছুকাল ধরে তাঁর প্রতিভা ও উপলব্ধির নিকষ জ্যোতিঃশিখার উপর ধোঁয়ার আবরণ নিক্ষেপ করবার অনেক চেষ্টা হয়ে এসেছে। লক্ষ্য করতে হয় যে শুধু অর্থনীতিঘটিত নানা তত্ত্ববাদের মুখরতা নয়, নিতান্ত নৈতিক তত্ত্ববাদের মুখরতাও টলস্টয়কে পছন্দ করতে পারেনি। খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের নানা মতের চার্চ, এবং অর্থনৈতিক মত ও ধারণা নিয়ে প্রভাবিত মার্ক্সীয় বস্তুবাদ উভয়ের কেউই টলস্টয়কে উদাত্ত আগ্রহে সম্মানিত করতে পারেনি।

ভারতের একাধিক স্থানের শিক্ষিত জনের সমাবেশে, বিশেষ করে রাজধানী দিল্লির অনুষ্ঠানে বক্তাদের যে-সব বক্তব্যের বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তার দ্বারা বৃহৎ লক্ষণযুক্ত এই সত্যেরই পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে যে, টলস্টয় বিশ্বমানবীয় চিন্তার এবং হৃদয়বৃত্তির অন্তঃস্তকে বিশাল এক দীপ্ত পরিবেশের মধ্যে আশ্রিত হয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রতিভার ও চিন্তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্বের দু'চারটে রূঢ় ঘটনার আঘাতে বিচলিত হতে পারে না। রাজধানী দিল্লির অনুষ্ঠান যুক্তভাবে গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশন এবং সোভিয়েট ল্যাণ্ড পত্রিকার উদ্যোগে রূপায়িত তথা কার্যায়িত হয়েছে। ভারতীয় ব্যক্তির কাছে দৃশ্যটি একটি অভিনব সত্যের সংকেত। সোভিয়েট ল্যাণ্ড পত্রিকা টলস্টয়ের দেড়শততম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত করতে উদ্বোধিত হয়েছে, এর মধ্যে অবশ্যই সোভিয়েট রাশিয়ার আধুনিক জনমতেরই একটি রূপের এই আভাস পাওয়া যায় যে টলস্টয় আজ আর সোভিয়েটের সংস্কৃতির চিন্তার ঘর থেকে বিতাড়িত কোন বুর্জোয়া অপচ্ছায়া নয়। অবশ্য একথা সত্য যে সোভিয়েট রাশিয়ায় এখনও টলস্টয়কে 'মোদের গর্ব মোদের আশা' বলে মান্য করে সোভিয়েট জনচিত্তের আন্তরিক অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়নি তবু দেখে মনে হয় যে, মনের গ্রন্থি বোধ হয় অনেকখানি টুটেছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅ আর দিবাকর টলস্টয়ের চিন্তার যে মহত্ত্বময় গুরুত্বের পরিচয় নিবেদিত করেছেন, সেটা ভারতীয় জনসংস্কৃতির একটি স্বভাবজ্ঞ উপলব্ধির পরিচয়। কোন সন্দেহ নেই সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তির পক্ষে মনস্বী টলস্টয়কে একজন শ্রদ্ধেয় সন্ত বলে মান্য করতে কোন অসুবিধা নেই। টলস্টয়ের বাণীর মধ্যে ভারতীয় সন্তদের বাণীর অনুরূপ বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ভারতীয় চিন্তার কাছে একটি চমৎকার বিস্ময়ের সত্য এই যে, ভারতের মহাত্মা গান্ধী চিন্তা টলস্টয়ের চিন্তা ও উপলব্ধির বাঙ্ময় ঐশ্বর্যের বিরাট দান এবং প্রভাব নিয়ে বিং শতাব্দীর বিশ্বজীবনের কাছে যে মুক্তির অঙ্গীকার সংঘটিত করেছে, তার মধ্যে মানবধর্মে চিরায়ত এক মহিমার সন্ধান দিব্যসত্যের জ্যোতির্লেখার মতো উদ্ভাসিত হয়েছে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মনস্বী টলস্টয় তাঁর স্বকৃত কোন আন্দোলন অথবা বিপুল প্রকারের কো অধ্যাবসায়ের সূচনা ও জাগৃতি সম্পন্ন করে তাঁরই উপলব্ধিজাত সত্যের পরীক্ষা সম্প করেননি; কিন্তু ভারতের গান্ধীই তাঁর ভাবময় প্রেরণার ঐতিহাসিক দান। দক্ষিণ আফ্রিকা 'টলস্টয় আশ্রম' স্থাপিত করে গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মের একটি অধ্যায় উদ্‌যাপিত হয়েছিল টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর পত্রযোগে চিন্তা-বিনিময় হয়েছিল।

টলস্টয়ের সাহিত্যকীর্তি এবং রম্যকলা সম্বন্ধে তাঁর নৈতিক-দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি আধুনিককালের নতুন হাওয়ার আঘাতে বিচলিত হয়েছে, চারিদিক দৃষ্টিপাত করলে কথা এইরকমই অভিরুচীর ক্রিয়া লক্ষ্য করতে হয়। মনে হতে পারে, রম্যকলার ক্ষেত্রে মৌল সত্য চিরকালীন সত্য বলে কিছু নেই। উপন্যাসে ও অনন্য কাহিনীতে টলস্টয় যে মানবধর্মের শাশ্ব পরিচয় বিবৃত করেছেন, সে সম্পর্কেও আধুনিককালের নানা অভিনবতার নানা স্বরে না বিরুদ্ধবাণীর নিনাদ শোনা যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে বিশ্বজনের জিজ্ঞাসা এখনও ঘটনার অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে জয়াখ্য গৌরব উপার্জিত করতে পারেনি। সাহিত্য ও সাংস্কৃতি জীবনে কে যে স্থায়িরকমের মূল্যশীল হতে পেরেছে এবং কে যে পারেনি, এই বিচার চর রূপে নিষ্পন্ন হয়নি। টলস্টয়ের জন্মের পর দেড়শত বৎসরও ঐতিহাসিক বিচার ও পরীক্ষ পক্ষে যথোচিত কালসীমা নয়। টলস্টয়কে স্মরণ করে আধুনিককালের জীবন একটি বু বিশ্বাসের সমর্থন লাভ করতে পারে যে, সনাতন সত্য ও চিরায়ত সত্য আছে, যাদের উপর সমস্যার আঘাত বর্ষিত হলেও তাদের প্রতিষ্ঠা বিচলিত হয় না। বিশ্বজীবনের ইতিহাসে কি একশত বৎসর ধরে এমনতর চিন্তার প্রভাব চমকিত হয়েছে, যার সঙ্গে টলস্টয়ের চিন্তার যে সাদৃশ্য নেই। বরং বলা চলে, টলস্টয়ের প্রস্তাবিত নৈতিক প্রকর্ষের জীবন বস্তুবাদী বি তাত্ত্বিকের অনেক ভর্ৎসনার কারণে বেশীর ভাগ সময় নীরব ও বিষণ্ণ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে নানা প্রকার অভ্যুদয় দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, এর ফলে মানবীয় অদৃষ্টের সুখ বেড়েছে? না বাড়েনি।

ব্যঙ্গচিত্র

ডেমোক্রিসের খড়্গ

সলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গেঃ নিকোলাস জার্নভের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

কেতকী কুশারী ডাইসন

॥ ১ ॥

আলেক্সান্দার ইসায়েভিচ্ সল্ঝেনিৎসিন (জন্ম ১৯১৮) এ যুগের একটি বিশ্বখ্যাত নাম। বহু-বিতর্কিত এই মানুষটির লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু অনুবাদের মাধ্যমেই, কারণ রুশ ভাষা আমার জানা নেই, কিন্তু ইংরেজী অনুবাদের দর্পণে যে প্রতিমূর্তি পাই তা থেকে অন্তত এটুকু বুঝতে পারি যে তাঁকে নিয়ে ইডিওলজির বিভিন্ন পন্থাবলম্বীদের মধ্যে তর্কের ঝড় যতই চলুক না কেন—এবং তা চলবে, চলতে বাধ্য,—সাহিত্যের বিচারে তিনি একজন শক্তিশালী পুরুষ। সম্প্রতি আমার হাতে এলো তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'প্রুস্কিয়ে নচি' বা 'প্রুশ রজনী'-র রবার্ট কন্‌কোয়েস্ট-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, যেটি মাত্র গত বছর বেরিয়েছে। মনোরম দ্বিভাষিক সংস্করণ : একদিকে রুশ, অন্য দিকে ইংরেজী, অনুবাদটিকে যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে।১ মূল কবিতাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৭৪ সালে, প্যারিসে। কিন্তু কবিতাটি রচিত হয় তার চব্বিশ বছর আগে, ১৯৫০ সালে, যখন সলঝেনিৎসিন স্তালিনের আমলের শ্রমশিবিরে রাজনৈতিক বন্দী অবস্থায় আটক ছিলেন। ঐ সময়ে কবিতাটি মনে মনে রচনা করে স্মৃতিস্থ করেছিলেন তিনি।

'মক্-হীরোয়িক' বা শ্লেষাত্মক বীররসাশ্রয়ী শৈলীতে রচিত এই কবিতাটি কবির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জাত। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব প্রুশিয়াকে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে যে বিজয়ী সোভিয়েত বাহিনী সলঝেনিৎসিন ছিলেন তারই অন্তর্গত একজন গোলন্দাজী অফিসার, এবং এই এলাকাতেই ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের আজ্ঞানুসারে তিনি গ্রেপ্তার হন। কবিতাটিতে মিলিত হয়েছে দু' ধরনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, কবির ব্যক্তিগত জীবনের এবং সাধারণভাবে রুশ জাতির। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৪ সালে, ঐ একই অঞ্চলে সেনাধ্যক্ষ সাম্‌সনভের নেতৃত্বে এক রুশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে, যে ঘটনাকে আশ্রয় করে সলঝেনিৎসিন লিখেছেন তাঁর উপন্যাস 'অগাস্ট, ১৯১৪'। প্রথম মহাযুদ্ধে রুশ জাতির ভূমিকা সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন সলঝেনিৎসিন। তার কারণ পরিষ্কার : প্রথম মহাযুদ্ধ, তার অব্যবহিত পরেই রুশ বিপ্লব, এই দুই বিশাল ঘটনার উত্তরাধিকারী যে রুশ প্রজন্ম তিনি তারই অন্তর্গত। ঐ উত্তাল সময়ের জাতক তিনি, এবং তাঁর বাবা প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যদিও যুদ্ধে প্রাণ হারান নি। তৎসত্ত্বেও জন্মমুহূর্ত থেকেই পিতৃবঞ্চিত সলঝেনিৎসিন, কারণ তিনি ভূমিষ্ঠ হবার ছ' মাস আগে তাঁর বাবা দুর্ঘটনায় মারা যান, এবং তাঁর বিধবা মা অনেক কৃচ্ছ্রসাধনায় তাঁকে মানুষ করেন।২ ঠিক যেসব প্রশ্নের জবাব ছোট ছেলেরা সাধারণত পায় তাদের বাবাদের কাছ থেকে সেগুলির উত্তর বালক সলঝেনিৎসিনকে খুঁজতে হয়েছিলো বইয়ের পাতায়। পিতৃবঞ্চিত নিজের তথা রুশ বিপ্লবের অভিঘাতে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর সমকালীন গোটা প্রজন্মটির উৎসকে জানবার তাগিদে ঐ যুগটি সম্পর্কে তাঁর তীব্র অনুসন্ধিৎসা জন্মায়। ১৯১৪ সালে যে পথ দিয়ে সাম্‌সনভ গিয়েছিলেন পরাজয়ের অভিমুখে, ১৯৪৫ সালে সে পথই হলো সোভিয়েত ফৌজের জয়যাত্রার পথ, এবং তরুণ সলঝেনিৎসিন তাতে অংশও নিলেন; কিন্তু ঠিক যখনই তিনি আর তাঁর সহযোদ্ধারা বিজয়োল্লসিত, ঠিক তখনই ঘটলো তাঁর জীবনের দিক-বদল : তিনি হলেন বন্দী, শত্রুর হাতে নয়, তাঁরই নিজের সরকারের হাতে, যার তরফে তিনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ভাগ্যের এই বিস্ময়কর ওঠা-নামার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন কালের মৌখিক রীতির কবিতার মত কাগজ-কলমের সহায়তা ছাড়া মনে মনে রচিত হয় বন্দীর উক্তি 'প্রুশ রজনী'। বন্দী অবস্থায় কবিতাটিকে তিনি কাগজে লিপিবদ্ধ করেন নি এই কারণে যে তাহলে সেটি তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হতো।

অনুবাদের মাধ্যমেই কবিতাটি আমাকে নাড়া দেয়, এবং রুশভাষাভাষী কোনো পাঠকের সঙ্গে বইটি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা জাগে। অতঃপর যোগাযোগ স্থাপন করি আমার ছাত্রজীবনের পরিচিত ও বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিকোলাস জার্নভের সঙ্গে। ডঃ নিকোলাস জার্নভ অক্সফোর্ডের রুশ সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, একাধারে বিদ্বান, সাহিত্যরসিক ও মরমিয়া সাধক। ১৮৯৮ সালে মস্কোতে তাঁর জন্ম হয়। ১৯২১ সালে ছাত্রাবস্থায় খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র ভালো করে অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে—যার সুযোগ তাঁর স্বদেশে তখন আর ছিলো না—যুগোস্লাভিয়ায় যান; সেখানে বেলগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯২৬ সালে ফ্রান্সে আসেন, এবং দেশান্তরিত রুশ ছাত্রদের খ্রীষ্টীয় আন্দোলনের কর্ম-সচিব হন। এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলো প্যারিস, যদিও ক্রিয়াকলাপ ছিলো গোটা পশ্চিম ইয়োরোপে ব্যাপ্ত। বিশের দশকের প্যারিস ছিলো, বলাই বাহুল্য, দেশান্তরিত রুশ সম্প্রদায়ের জীবনের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ। দিয়াগিলেফ-এর ব্যালে-দল, ইগর স্ত্রাভিন্‌স্কির মত সংগীতরচয়িতা তখন প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টীয় চার্চের ইতিহাস-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণার জন্য ১৯৩২ সালে নিকোলাস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের বিভিন্ন থিওলজিক্যাল কলেজে ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লাভনিক বিদ্যা বিভাগেও অধ্যাপনা করেন, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত Fellowship of St Alban and St Sergius নামক সমিতির কর্মসচিব হন। ১৯৪৭ সালে তিনি ডক্টর অফ ডিভিনিটি ডিগ্রি লাভ করেন এবং প্রাচ্য খ্রীষ্টানদের সংস্কৃতি বিষয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত স্পল্‌ডিং লেকচারশিপ-এর প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে অবসরগ্রহণ করা পর্যন্ত এই পদটি তাঁর ছিলো। এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। ভারতেও তিনি এক বছর কাটিয়ে গেছেন : ১৯৫২-৩ সালে তিনি তদানীন্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত পথনমথিত্তার ক্যাথলিকেট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। রুশ ধর্ম, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি একজন পণ্ডিত মানুষ এবং একাধিক গ্রন্থের লেখক। ষাটের দশকে দু'বার সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করেছেন।

১৯৬২ সাল থেকেই আমি তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী মিলিৎসা-র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সেণ্ট গ্রেগরিজ হাউস নামক ছাত্রাবাসে আমার ছাত্রজীবনের একটি সুখী বছর অতিবাহিত হয়, যার খানিকটা আভাস দিয়েছিলাম 'দেশ' পত্রিকায় বহু বছর আগে প্রকাশিত 'নারী, নগরী' নামক একটি লেখাতে। নিকোলাসের পূবে-পশ্চিমে মেলানো, রসিক, কৌতুকস্নিগ্ধ, মরমী রূপটি আমাকে বরাবর টেনেছে। একজন প্রকৃত মানবপ্রেমিকের স্বাদ তাঁর ব্যক্তিত্বে লভ্য। আমার যখন মাত্র বাইশ বছর বয়স তখন থেকেই তিনি আমাকে অধিকার দিয়েছিলেন তাঁকে 'বন্ধু' বলে বিবেচনা করতে—গুরুর ভূমিকা নিতে রাজী হতেন না—এবং আমি লজ্জায় মরে যেতাম যখন তিনি তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমার পরিচয় দিতেন 'একজন ভারতীয় মিস্টিক' হিসেবে, এবং আমাকে ব্যবহার করতেন ভারত ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে একটি সচল অভিধান হিসেবে।

'প্রুশ রজনী'-র ব্যাপারে যখন তাঁকে টেলিফোন করলাম তখন তিনি জানালেন যে ঐ বইটিই তাঁর এখনও পড়া হয়নি, যদিও সলঝেনিৎসিনের প্রায় যাবতী প্রকাশিত রচনাই তিনি পড়েছেন। তখন আমার নিজের বইটি তাঁকে দিয়ে আসি তাঁর দৃষ্টিশক্তি এখন একেবারে ক্ষীণ; তাঁর স্ত্রী তাঁকে কবিতাটি মূল রুশে পড়ে শোনান। কিছুদিন পরে আমি আমার ক্যাসেট টেপ রেকর্ডারটি নিয়ে তাঁদের বাসায় হাজির হই, এবং অশীতিপর পিতৃব্যতুল্য এই বৃদ্ধ নবীনদের হার-মানিয়ে-দেওয়া উৎসাহ সহকারে এক ঘণ্টাব্যাপী টানা আলোচনা চালালেন, 'প্রুশ রজনী' র উপলক্ষমাত্র, প্রকৃত পরীক্ষা সলঝেনিৎসিনের সামগ্রিক মূল্যায়ন। মিলিৎসা জোগালেন চা-জলখাবার, এবং তারই মধ্যে কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও। পাছে নিকোলাসের বক্তব্যের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটে তাই কাটছাঁট করার চেষ্টা না করে শুধু নামমাত্র সম্পাদনা করে সেই চিত্তাকর্ষক আলোচনাটিকে এখানে বাংলা অনুবাদে পেশ করছি। বক্তাদের প্রথম নামের আদ্য অক্ষর দ্বারা সূচিত। সব শেষে জুড়ে উপসংহারস্বরূপ আমার নিজের কিছু ভাবনা।

কে ॥ আপনার মত একজন রুশ-ভাষী মানুষের কাছে সলঝেনিৎসিনের মত একজন লেখক ও মনীষীর তাৎপর্য কী?

নি ॥ তিনি এক ক্ষণজন্মা পুরুষ, যাঁর জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা গন্তব্য আছে। রুশ সাহিত্যের মহৎ লেখকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, আমাদের জাতীয় জীবনে যাঁদের তাৎপর্য তাঁদের সাহিত্যিক মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। রুশ সমাজে এঁদের চিরকাল লোকশিক্ষক এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হিসেবে দেখা হয়েছে। এমন মানুষ ছিলেন তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি, এবং সলঝেনিৎসিনও তাঁদেরই দলে। তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব এবং রুশ সমাজের কাছে তাঁর বক্তব্য, এ দুটোকে আলাদা করে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। উপরন্তু, তাঁর বক্তব্য ও আঙ্গিক দুটোই এত মৌলিক ও আধুনিক যে তাঁকে নিয়ে বিতর্কও স্বাভাবিক; তাঁকে চট করে কোনো পরিচিত সাম্প্রতিক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে পুরে ফেলা যায় না।

কে ॥ 'প্রুশ রজনী' কবিতাটির প্রকরণ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? আমি এই রেকর্ডারটি চালাবার আগে আপনি বলছিলেন যে রুশে বীররসাত্মক দীর্ঘ কবিতার একটি ধারা আছে। ঠিক কোন ধারার অন্তর্গত এই কবিতাটি?

নি ॥ 'প্রুশ রজনী' হচ্ছে সামরিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত সোভিয়েত কাব্য-ধারার অন্তর্গত। ঠিক এই ধরনের কবিতা বিপ্লবের আগে ছিলো না। কবিতাটিকে কবি পেশ করেছেন একজন তরুণ সামরিক অফিসারের উক্তি হিসেবে, যে সাধারণ মানুষ, বিদগ্ধ নয়। তাই এতে কোনো সূক্ষ্ম, পরিশীলিত অলংকরণ নেই। লাল ফৌজ যখন জার্মান এলাকায় প্রবেশ করলো তখন তার যে বিজয়োল্লাস, শত্রুর পরাজয়ে তার যে মত্ততা—সেই মেজাজের একটি শক্তিশালী প্রকাশ এই কবিতাটি। উপরের স্তরে কবিতাটি একজন তরুণ সামরিক অফিসারের জয়োক্তি, যে এক বিরাট গণ-অভিযানের অন্তর্গত। তার সঙ্গে আছে বহু সহযোদ্ধা। প্রচণ্ড বেগে এবং দুর্দম জেদের বশে তারা শত্রুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে; তাদের গতিপথে যা-ই পড়ছে তা-ই তারা ধ্বংস করে ফেলছে, সবাইকে হত্যা করছে, সব কিছুতে আগুন লাগাচ্ছে। কিন্তু একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে এই কবিতাটির রচয়িতা একজন অসাধারণ মানুষ। দুটি কারণে। প্রথমত, তিনি স্কুলজীবন থেকেই ১৯১৪ সালের রুশ পরাজয় বিষয়ে খুঁটিয়ে পড়াশোনা করেছেন,—যে পরাজয় ঘটেছিলো ঠিক ঐ অঞ্চলে, যেখানে ১৯৪৫ সালে তিনি লাল ফৌজের সঙ্গে বিজয়গর্বে প্রবিষ্ট। ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক শহর-গ্রামের নামধাম তাঁর পূর্বপরিচিত,—সেটা যেন তাঁর চেনা দেশ। এটা একটা আসাধারণ ঘটনা। দ্বিতীয়ত, তিনি এমন একজন মানুষ যিনি ধ্বংসের তাণ্ডবে পুরোপুরি মেতে উঠতে পারছেন না,—কতগুলি নৈতিক প্রশ্ন তাঁকে বিক্ষুব্ধ করছে। তিনি বুঝতে পারছেন ১৯৪৫ সালের লাল ফৌজ ১৯১৪ সালের রুশ ফৌজের থেকে কতখানি আলাদা। ১৯১৪ সালের সৈন্যরা ছিলো একটি খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী জাতির প্রতিনিধি : উদাহরণস্বরূপ, তারা এটা মেনে নিতো যে একজন বন্দী হচ্ছে একটি অসহায় মানুষ, যাকে শ্রদ্ধা দেখানো উচিত; যে যুদ্ধ একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার, তাকে যতটা সম্ভব সংযত করে রাখা দরকার; যে নারীরা আর শিশুরা লড়াইয়ের বাইরে; যে অসহায় মানুষকে হত্যা করা যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ১৯৪৫ সালের সোভিয়েত ফৌজ প্রতিহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত : তাদের শেখানো হয়েছে যে প্রতিশোধস্পৃহাই জীবনের মূল চালক-শক্তি। তাই এই কবিতাটিতে একের পর এক আসছে ভয়ংকর দৃশ্য; অর্থহীন ধ্বংসের লীলা; নারী, শিশু আর বন্দীদের হত্যা। দুই বাহিনীর মেজাজের এই পার্থক্য বিষয়ে সলঝেনিৎসিন সম্পূর্ণ সচেতন। কোনো খ্রীষ্টীয় পটভূমিকার রুশ পাঠক যখন কবিতাটি পড়েন, তখন রুশ সৈনিকদের এই আত্মিক পরিবর্তন তাঁর মনে গভীর-ভাবে রেখাপাত করে। এই কবিতার সৈনিকরাও রুশ, কিন্তু ১৯১৪ সালের রুশ সৈনিকদের থেকে ভিন্ন ধরনের মানুষ। 'অগাস্ট, ১৯১৪' নামক তাঁর উপন্যাসটিতে সলঝেনিৎসিন দেখিয়েছেন যে সে যুগের রুশ সৈনিকদের একটা নৈতিক মর্যাদা ছিলো। 'প্রুশ রজনী'-র সৈনিকরা সেটা হারিয়েছে। দুই যুগের রুশ বাহিনীর মধ্যে এই যে তফাত, এটা বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য পাঠক ঠিক বোঝেন না, ধরতে পারেন না; কিন্তু রুশ পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট।

কে ॥ অর্থাৎ সলঝেনিৎসিন বলতে চাইছেন যে একটা নৈতিক অবনতি ঘটেছে?

নি ॥ নৈতিক মানদণ্ড, মূল্যবোধ—সব বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

কে ॥ এটা শুধু যুদ্ধকালীন অনিবার্য দুর্নীতির ব্যাপার নয়,—তার চেয়ে বেশি গুরুতর ব্যাপার?

নি ॥ ঠিক, তার চাইতে বেশি গুরুতর ব্যাপার। সব যুদ্ধই নিষ্ঠুর, লড়াই মানেই মানুষ খুন করা, প্রত্যেক লড়াইয়েই কিছু নিরপরাধ মানুষকে বলি দেওয়া হয়। কিন্তু 'প্রুশ রজনী'-তে কবি দেখাচ্ছেন যে রুশ সৈনিকের পক্ষে নারীধর্ষণও আর নিন্দিত নয়। অতীতেও হয়তো এ কাজ করা হয়েছে, কিন্তু সে যুগে এটা গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচিত হতো।

কে ॥ এটা সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আচ্ছা, কবিতাটির ছন্দ, মিল, অলংকার ইত্যাদিতে এই জঙ্গী উত্তেজনার ভাবটা কতখানি ফুটে উঠেছে? হিংসার উন্মাদনা আঙ্গিকে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে?

নি ॥ সার্থকভাবে। একটা বিরাট বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। কোনোরকম নৈতিক দায়িত্ব নেই এই সৈনিকদের—তারা বন্যার মত ছড়িয়ে পড়ছে। আর এ কাজে তাদের সাহায্য করছে আধুনিক যানবাহন। আগেকার দিনের সৈনিকদের মত এরা নয় পদাতিক বা অশ্বারোহী—প্রত্যেকে কোনো না কোনো মোটরচালিত গাড়িতে চেপে চলেছে—

কে ॥ হ্যাঁ, সলঝেনিৎসিন এ ব্যাপারটার উপর জোর দিয়েছেন—

নি ॥ কারণ, এই যন্ত্রচালিত দুরন্ত গতিবেগ তাদের ব্যক্তিগত নৈতিক দায়িত্ব কমিয়ে দিচ্ছে।

কে ॥ কোনো রকম সৌকুমার্যের স্থান নেই এ কবিতাটিতে, যেমন থাকে প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি কবিকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে হয়েছিলো। জন্য পুনরাবৃত্তি অবশ্যই আছে।

কে ॥ সেটা তো এপিক ঐতিহ্যের কাব্যেও থাকে, মৌখিক রীতির কবিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যই এটা। লেখনীর সহায়তা ছাড়া রচিত কাব্যে পুনরাবৃ প্রত্যাশিত।

নি ॥ কিন্তু এই আঙ্গিকের মাধ্যমে একটি যন্ত্রচালিত অপ্রতিরোধ্য গতি আশ্চর্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।

কে ॥ আচ্ছা, তা হলে তাঁদের আপনি কী জবাব দেবেন যাঁরা অভিযোগ ক যে সলঝেনিৎসিন আদৌ সুলেখক নন, যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন রাজনৈ কারণে নয়, তিনি নাকি বাজে লেখক, সে জন্যে? লক্ষ করেছি যে কেউ এমন মত পোষণ করেন।

নি ॥ কেউ কেউ বলেন যে সলঝেনিৎসিন সাহিত্যিক নন, শুধুমাত্র সাংবা শুধু রিপোর্টার। আমি মনে করি যে হ্যাঁ, এক অর্থে এখানেই তো তাঁর সা কারের অবদান। কারণ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যই হলো রুশ দেশে যা ঘটে গেছে আসল কাহিনীটা বলা। কাজেই তিনি স্বভাবতই কিছু বানিয়ে বলতে চান কাহিনীটা এমনিতেই এত ভয়ানক যে কিছু বানানো ব্যাপার তাতে জুড়তে এফেক্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আবার আরেক অর্থে বলতে হয় : না, তাঁর লেখা সাংবাদিকতা নয়, শিল্পীর সৃষ্টিও বটে; কারণ অন্যান্য শিল্পীদের মত তি শুধু বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত নন, বাস্তবের ব্যাখ্যাতেও ব্যস্ত বটে। আর তিনি একজন বড় লেখক তার একটা চিহ্ন বা প্রমাণ অন্তত আমার কাছে এই যে তাঁর কোনো বই একবার পড়লে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

কে ॥ আমার নিজের প্রতিক্রিয়াও তাই। আমার পরিচিত এক চেক দম্পতি যাঁরা কম্যুনিস্ট নন, অন্তত কম্যুনিস্ট চেকোস্লোভাকিয়া ছেড়ে এখন ব্রি বসবাস করছেন,—তাঁদের মতে, এবং তাঁরা বলেন যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের কারও কারও মতেও বটে, সলঝেনিৎসিনকে নাকি উঁচু দরের শিল্পী স্বীকার করা যায় না। শুনে আমি তো অবাক। আমি তাঁর বেশ কিছু পড়েছি—'ইভান দেনিসোভিচের জীবনে একটি দিন', 'ক্যানসার ওয়ার্ড', বৃত্ত', 'অগাস্ট, ১৯১৪', 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ'-এর প্রথম খণ্ড, 'জুরিখে লে তা ছাড়া তাঁর কিছু ছোট গল্প ও গদ্যকবিতা; তাঁর নাটকের চিত্ররূপও দে এবং আপনার মত আমারও প্রতিক্রিয়া এই যে তিনি এমন জাতের লেখক নন একবার পড়ে নিয়ে তার পর স্রেফ ভুলে ফেলা যায়। 'ক্যানসার ওয়ার্ড' বা বৃত্ত'-এর স্রষ্টাকে উঁচু দরের শিল্পী ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? অন আকারেও এই উপন্যাসগুলির মহত্ত্ব প্রতিভাত হয়। 'মাত্রিয়োনার বাড়ি'-র মত গল্প স্পষ্টতই দীপ্ত শিল্প। বা শুকনো কাঠে অঙ্কুরোদ্গমের উপর তাঁর কবিতাটিও একবার পড়লে ভোলা যায় না। অতএব কারও কারও এই বিপ উলটো প্রতিক্রিয়ার কারণটা কী আপনার মতে? কারণটা কি মূলত রাজনৈ

মিলিৎসা ॥ এখানে আমি একটা কথা বলতে পারি?

কে ॥ বলুন না কিছু।

মি ॥ কোনো কোনো সমালোচক তাঁর স্টাইলটা পছন্দ করেন না, তলস্ত দস্তয়েভস্কির সঙ্গে তুলনা করে তাঁর রচনাশৈলীকে হীনপ্রভ মনে করেন। তাঁর লেখার ধরনই আলাদা—একেবারে নতুন, সমসাময়িক, যুগোচিত, এবং স্ব

কে ॥ ও'র স্টাইল যে আধুনিক সে তো অনুবাদেও বোঝা যায়। অথচ বৃত্ত'-র মত উপন্যাসকে রুশ ঐতিহ্যেরই যোগ্য জাতক বলতে হবে। সেই পটভূমি, সেই জটিলতা, সেই জীবন বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি। আর শুধুমাত্র আ দিকে তাকালেও দেখা যাবে কি নিখুঁত এর গঠনপদ্ধতি

নি ॥ হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে যাঁরা ও'র সাহিত্যমূল্য স্বীকার করেন না মনের অন্তস্তলে কোনো রাজনৈতিক ঝোঁকই কাজ করছে। আরও একটা আছে। উনি পাঠককে গভীরভাবে বিচলিত করেন। দস্তয়েভস্কির বি কখনও কখনও একই অভিযোগ আনা হয়। যে কারণে নাবোকভ বা বুনিনে নামজাদা রুশ লেখকরাও দস্তয়েভস্কিকে বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরা তোলেন : এটা আমাদের বড্ড বেশি বিচলিত করছে, অতএব এটা সাহিত্য অথচ স্বীকার করতেই হবে যে উঁচু দরের শিল্পীরাই পাঠকচিত্তকে বিচলিত পারেন, যে-কেউ সে ক্ষমতার অধিকারী নন।

কে ॥ সুতরাং ঐ ধরনের আপত্তি দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিচলি দেওয়া উচিত নয়!

নি ॥ এ'রা তলস্তয়কে পছন্দ করেন কারণ তিনি শান্ত, ধীরস্থির মোলায়েম। দস্তয়েভস্কি উত্তাল। তা ছাড়া দস্তয়েভস্কি আর সলঝেনিৎ জনেই ঘটনাকে সীমায়িত স্থানকালের মধ্যে অত্যন্ত ঘন করে সন্নিবিষ্ট পারেন। 'প্রথম বৃত্ত' যেমন। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু হচ্ছে।

কে ॥ সেই ধ্রুপদী ঐক্যত্রয়ের ব্যাপার।

নি ॥ ঠিক। ঐক্যত্রয়ের ব্যাপার। তিন দিনের মধ্যে—পাশ্চাত্ত্য ক্যাথ ক্রিসমাসের সময়—যেটা তাৎপর্যপূর্ণ—

মিলিৎসা ॥ প্রতীকী।

নি ॥ আর 'ক্যানসার ওয়ার্ড'-এর দৃঢ় গঠনও লক্ষণীয়।

কে ॥ আঙ্গিকের দিক দিয়ে এ উপন্যাস দুটি সত্যিই ভাস্বর, তা অ বোঝা যায়। তা হলে আপনি বলছেন যে এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচকেরা যোগ্য নন?

নি ॥ নির্ভরযোগ্য নন।

মি ॥ আরেকটা ব্যাপার এই যে উনি নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে জানে [illegible] করেন। অবশ্যই এই নতুন ভাষার কিছুটা চালু হবে,

কে ॥ নতুন ভাষার সৃষ্টি তো প্রতিভাধর শিল্পীর স্বাক্ষরই বহন করে।
মি ॥ কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে উনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছেন,

কে ॥ তবে উত্তাল তরঙ্গময় কতগুলো অভিজ্ঞতাকে যদি রূপ দিতে হয়, একটা জরুরী খবর দিতে হবে এমন কোনো চেতনা যদি তাঁর থাকে, যেমন আপনারা বলছেন, তা হলে নতুন শব্দ সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভব করাটাই স্বাভাবিক।

নি ॥ ও'র শব্দব্যবহার সম্পর্কে একটা বই বেরিয়ে গেছে এর মধ্যেই! বেশ লম্বা একটা বই।

কে ॥ ও'র সাহিত্যিক আর রাজনৈতিক দিককে কি তা হলে আলাদা করে দেখতে হবে, না পরস্পরসম্পৃক্ত হিসেবে? ও'র মহত্ত্ব কি ঐ অন্যোন্যসম্পর্কের উপরেই নির্ভরশীল?

নি ॥ একেবারেই। দুটো দিক মিলিয়ে দেখতে হবে। পৃথিবীর কাছে তাঁর একটা জরুরী বক্তব্য রয়েছে।

মি ॥ তাঁর শিল্পের সাহায্যে তিনি সেই বক্তব্যকে পেশ করছেন।

নি ॥ ঠিক তাই।

কে ॥ তা হলে নীতিশিক্ষক শিল্পী তিনি।

নি ॥ নিশ্চয়, কিন্তু এটাও রুশ ঐতিহ্যেরই অংশ। ব্রিটিশ ঐতিহ্য না হতে পারে—এখানে ঔপন্যাসিকদের ভূমিকা লোকরঞ্জকের—কিন্তু রুশ ঐতিহ্যে একজন উঁচু দরের ঔপন্যাসিককে লোকশিক্ষক হতে হবে।

কে ॥ মধ্যযুগের ব্রিটেনেও শিল্পের এই আদর্শই ছিলো। চসর বা ল্যাংল্যান্ড-এর যুগে। মনে করি যে ভারতবাসীদের এ ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হবে না, কারণ ভারতেও খুব বড় কোনো শিল্পীকে গুরুর আসন দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের কথা আপনি জানেন।

নি ॥ জানি বই কি!

কে ॥ তা হলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের উদ্দেশ্যেও সলঝেনিৎসিনের একটা বক্তব্য আছে?

নি ॥ হ্যাঁ, পৃথিবীর ঐক্য হচ্ছে ঐ বার্তার মর্ম। পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকেরা স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করবে, অন্য আরেক প্রান্তে ঐ স্বাধীনতা-গুলো রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা একেবারে পদদলিত হবে, আর এই দুই বিপরীত প্রকৃতির সমাজব্যবস্থা সুখে সহাবস্থান করবে, কখনও পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না,—এটা কখনও চিরকাল চলতে পারে না। বস্তুত, একদলতন্ত্র গণতান্ত্রিক জগতে সর্বদাই হস্তক্ষেপ করছে, কিন্তু তা যদি না-ও করতো, তা হলেও তাঁর বার্তাটি শ্রবণযোগ্য হতো। তিনি বলছেন যে মানবসমাজ একটি দেহ; এই দেহের এক অংশে কিছু হলে অন্য অংশেও তার প্রতিক্রিয়া হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে সমগ্র মানব-জাতির পক্ষেই একদলতন্ত্র একটি অন্তর্নিহিত বিপদ।

মি ॥ তিনি বলছেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নাও, একই গর্তে পড়ে যেও না।

নি ॥ এই সাবধান বাণীর ভাবগত ভিত্তি এই বিশ্বাস যে মানুষ নিছক দ্বিমাত্রিক জীব নয়, তার সত্তায় একটা তৃতীয়, লোকোত্তর মাত্রা আছে। যখন এটাকে চাপা দেওয়া হয় তখন সে তার আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে।

কে ॥ এবারে সলঝেনিৎসিনের ধর্মীয় মাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলুন, প্রাসঙ্গিক হবে।

নি ॥ এ ব্যাপারে তিনি বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অধিকাংশ যুবকদের মত তিনিও জীবন শুরু করেছিলেন নাস্তিক হিসেবে। আদর্শবাদের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন কম্যুনিস্ট, বিশ্বাস করতেন যে কম্যুনিস্ট আদর্শে পৌঁছনো দরকার। তাঁর বন্দী দশায় তিনি ক্রমশ তলস্তয়ের শিক্ষার অনুরূপ একটা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন, যা ছিলো মুখ্যত মানবতা-বাদী, ধর্মীয়-মাত্রা-বর্জিত। তার পরে ধীরে ধীরে তিনি খৃষ্ট ধর্মকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন, তার প্রাচীন প্রাচ্য আকারে। বর্তমানে তিনি রুশ অর্থডক্স চার্চের সভ্য। তাঁর স্রষ্টার সঙ্গে ভাববিনিময়ের প্রকৃত এবং গভীর অভিজ্ঞতা আছে এমনই এক মানুষ তিনি। তাঁর একটি প্রিয় প্রার্থনাবাণী আমাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, যা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করে। যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে, অনুভব করেছিলাম যে বিশ্বাসে এবং আচরণে তিনি একজন প্রকৃত খৃষ্টান।

কে ॥ তাঁর শিল্পের উপরে এর প্রভাব কী?

নি ॥ তাঁর শিল্প এ থেকে নতুন মাত্রা পেয়েছে। 'অগাস্ট, ১৯১৪'তে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার একাধিক মহৎ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্য বিধৃত হয়েছে। তাঁর আগেকার উপন্যাসগুলিতে ঠিক এরকমটি নেই। কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রার্থনার বাস্তবতাকে বর্ণনায় মূর্ত করা খুবই কঠিন, কারণ ভাষায় কুলাতে চায় না......

কে ॥ কারণ সেটা একটা অত্যন্ত নিবিড় এবং ভিতরকার অভিজ্ঞতা।

নি ॥ ঠিক তাই। তবু 'অগাস্ট, ১৯১৪'-তে তিনি সেই শোচনীয় লড়াইয়ের আগে সেনাধ্যক্ষ সামসনভের প্রার্থনাটিকে সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন। নিশ্চয় তাঁর নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতারই ফল এই সাফল্য। প্রার্থনার যে বাস্তবধর্মী, অকৃত্রিম,

ডঃ নিকোলাস জের্নভ

প্রত্যয়জনক রূপায়ণ তিনি ঐ দৃশ্যটিতে পরিবেশন করেছেন তার তুলনা গোট সাহিত্যে আর কোথাও খুঁজে পাই না।

কে ॥ অবশ্য রুশ সাহিত্যিক ঐতিহ্য এমনিতেই অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক নয় কি? মোটের উপর তাতে একটি ধর্মীয় মাত্রা উপস্থিত, অনুপস্থিত তাই বলবেন তো?

নি ॥ হ্যাঁ, আমি বলবো যে পুশকিন থেকে যার অভ্যুদয়, এবং লের্ গোগল, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রুশ সাহিত্যের যে ধারাটি প্রবাহিত, সেটি প্রগাঢ়ভাবে ধর্মীয়। ধর্ম এ সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে অব অপরপক্ষে, কম্যুনিস্ট আমলে রুশ সাহিত্যের যে ধারাটি প্রচারিত ও খ্যা হয়েছে তাতে এ স্বাদ নেই, এবং তার সাহিত্যমূল্যও অপেক্ষাকৃত কম।

কে ॥ সোভিয়েত রাশিয়াতে এখন কি এমন কোনো লেখকবৃন্দ নেই, প্রাচীন ধর্মীয় মূল্যবোধগুলিকে তাঁদের লেখায় প্রতিবিম্বিত করছেন?

নি ॥ সে জাতীয় কোনো লেখা তো সোভিয়েত রাশিয়াতে প্রকা অসম্ভব।

কে ॥ কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেসে, 'সামিজদাত্'-এ, লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু প্রচারিত হচ্ছে?

নি ॥ হচ্ছে বই কি। অবশ্য 'ডঃ জিভাগো'-র কথা মনে রাখতে হবে, জাতের আরেকটি মহৎ রুশ উপন্যাস। তা ছাড়া আছে মাইকেল বুল 'মহাপ্রভু ও মার্গারিটা', আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যাতে ধর্মীয় প্রচুর। আধুনিক রুশ কবিতাতেও, যেমন আন্না আখ্মাতোভার ধর্মের বলিষ্ঠ প্রকাশ মেলে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রকাশিত সাহিত্যে কোনো সুস্পষ্ট ধর্মীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় না। আমি যে সোভিয়েত রাশিয়ার লেখকদের লেখায় গূঢ় ধর্মীয় উপাদান ক্রমশই বাড় সেগুলিকে সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতে হয়।

কে ॥ সোজাসুজি আত্মপ্রকাশ করার স্বাধীনতাটুকু নেই?

নি ॥ আজকের সোভিয়েত রাশিয়ায় ছাপা অক্ষরে কোনো অপরোক্ষ আত্মপ্রকাশ অসম্ভব।

মিলিৎসা ॥ একটা স্থায়ী লড়াই চলছে, বলতে পারো।

কে ॥ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লে অবাঞ্ছিত য যেতে হয়?

নি ॥ একটা ছোট্ট অনুপুঙ্খ দিচ্ছি তোমাকে, যা থেকে আবহাওয়াট তা আন্দাজ করতে পারবে। সোভিয়েত রাশিয়াতে মুদ্রিত কোনো বইয়ে ঈ

---

১ Solzhenitsyn, *Prussian Nights*, translated by Robert Conquest, Collins and Harvill Press, London, 1977; দাম ৩ পাউন্ড ৭৫ পেনি।

২ দ্রষ্টব্য David Burg and George Feifer, *Solzhenitsyn, A Biography*, Hodder and Stoughton. London 1972

পন্থী সাহিত্যের পুনর্মুদ্রণে বা সম্পূর্ণ বিদেশী কোনো সাহিত্যের মুদ্রণের াতেও এ নিয়ম মানতে হবে।

কে ॥ এবারে সলঝেনিৎসিনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কিছু ুন। কবে এবং কোথায় দেখা হয়েছিলো?

নি ॥ ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় জুরিখে, উনি ইয়োরোপ ছেড়ে আমেরিকা য যাবার একটু আগে। উনি লেখার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছেন; র মনে লেখার যে পরিকল্পনাটা রয়েছে সেটাকে কার্যে পরিণত করতে নিতান্ত । আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আরও পঞ্চাশ বছর ধরে লিখবার মত াদান আমার হাতে রয়েছে, কিন্তু এখনই যখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছি, তখন আর াশ বছর সময় তো হাতে পাবো না, তাই আমার এ জীবনের কাজ শেষ করে তে পারবো না।' তাই ওঁর প্রতিটি অবসর মুহূর্ত উনি রাখেন ওঁর কাজের জন্য। ন ওঁকে টেলিফোন করলাম, তখন উনি বললেন যে উনি আমাকে মাত্র কয়েক নিট সময় দিতে পারেন। কিন্তু যখন আলাপ হলো তখন দু' ঘণ্টা কথা বলে- লাম আমরা। দুটো জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিলো। প্রথমত, ওঁর সাধারণ হাসিটুকু। মানুষের হাসির ভঙ্গি তার ব্যক্তিত্বকে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ র। ওঁর তো খুব গম্ভীর, রাশভারী চেহারা; কিন্তু যখন হাসেন,—এবং প্রায়ই সেন উনি—তখন ওঁর মুখে একটা নিষ্পাপ বালসরল উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে, রিক্তি ভবটা একেবারে বদলে যায়। ওঁর অন্তঃস্থ সত্তাটিকে বুঝতে এটা খুবই হায্য করে। অনেকের হাসি এত অপ্রীতিকর হয়! হয়তো প্রীতিকর মানুষই তাঁরা, ন্তু যেই হাসতে শুরু করেন অমনি একটা নিষ্ঠুর বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভাব ঠিকরে রোয়। সলঝেনিৎসিনের বেলায় হয় উলটোটা : তাঁর অন্তঃস্থিত আলোকটি জ্জ্বলিত হয়। অন্য যে জিনিসটি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে তা হলো যিনি ঁর সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর প্রতি ওঁর নিবিড় মনোযোগ। বিখ্যাত মানুষেরা প্রায়ই াতা পেলেই বক্তৃতা দিতে উন্মুখ, কিন্তু উনি কথা শুনতে উৎসুক। এমন কি, খন আমরা কথা বলছিলাম, তখন ওঁর হাতে একটা নোটবই পর্যন্ত ছিলো, এবং মাদের আলোচনার সময় কোনো কথা ওঁর মনে রেখাপাত করলেই উনি সেটা কে নিচ্ছিলেন। ওঁর বিস্ময়কর সততা এবং সচেতনতার চিহ্ন এটা। নতুন জিনিস খতে এত তীব্র ওঁর আগ্রহ যে জ্ঞান আহরণের কোনো সুযোগ উনি ছাড়েন না।

কে ॥ আপনার এই সাক্ষ্য সত্যিই চিত্তাকর্ষক। কোনো কোনো বিবরণে উলটো বি পেয়েছি—যে উনি নাকি খুব কঠোর প্রকৃতির।

নি ॥ নাকি যা খুশি তা-ই বলে বেড়ান তাঁর পারিপার্শ্বের দিকে কোনো নোযোগ না দিয়ে, ইত্যাদি।

কে ॥ আচ্ছা, ওঁর জীবনের ব্রত সম্পর্কে ওঁর এই যে অসাধারণ সচেতনতা, -কেউ কেউ বলেন যে এটা প্রায় অন্ধ, বাতিকগ্রস্ত একদেশদর্শিতায় পরিণত য়েছে। এ অভিযোগ কি খণ্ডনীয়?

নি ॥ এ বিষয়ে ওঁর একটা দৃঢ় প্রত্যয় আছে, কিন্তু আমার অর্থে ওঁকে কদেশদর্শী বা বাতিকগ্রস্ত বলা চলে না এই কারণে যে উনি অন্যের কথা শোনেন, নতে চান। ওসব বিশেষণ আমি তাঁকেই দিই যিনি শ্রোতার প্রতিক্রিয়ার দিকে ন্দুমাত্র নজর না দিয়ে সমানে বকবক করে যান। সলঝেনিৎসিন করেন এর লটোটা : তিনি তন্ময় হয়ে কথা শোনেন। অন্য কারও কারও কাছে শুনেছি যে নি আলাপ না করে স্বগতভাষণ করেন, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা তো একেবারে আলাদা। হয়তো বিরূপ সমালোচকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ওঁর আচরণ ন্য রকম হয়—কে জানে। আমার কিন্তু ওঁকে মনে হয়েছিলো খুব আপন জন, ব কাছাকাছি। বিদায়মুহূর্তে আমরা যখন পরস্পরকে রুশ প্রথায় আলিঙ্গন রেছিলাম, তখন আমার সত্যিই প্রতীতি হয়েছিলো যে একজন বন্ধুকে আবিষ্কার রেছি।

কে ॥ সলঝেনিৎসিনের 'জুরিখে লেনিন' বইটি বিষয়ে আপনার কিছু বলবার াছে কি, নিকোলাস?

নি ॥ আমার মতে ঐ ভীতিপ্রদ মানুষটির চরিত্রের একটি সফল অর্থোদ্ধার বইটি। তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর একজন মানুষকে ভিতর থেকে দেখতে ারার এই ক্ষমতা লেখকের প্রতিভারই পরিচায়ক। লেনিনের যে চিত্রটা পাচ্ছি টা বিকৃত ব্যঙ্গচিত্র নয়; লেনিনের নিজস্ব কণ্ঠস্বরই শুনতে পাওয়া যাবে ইটিতে। একটি আইডিয়ার প্রতি লেনিনের সম্পূর্ণ অভিনিবেশকে ফুটিয়ে তোলা য়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সলঝেনিৎসিন সম্প্রতি একটি রুশ পত্রিকায়— লা বাহুল্য, সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে—তুলনীয় একটি লেখা বার করেছেন, ষ রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস সম্পর্কে। এটাও একই রীতির শক্তিশালী রচনা খ্যাত জারের ডায়েরি ব্যবহার করে লেখা; মানুষটির মানসিক অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি ভতর থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই দুই চরিত্রের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তা সাংঘাতিক। ষ রুশ জারের ছিলো অনেক মহৎ ইচ্ছা, সদভিপ্রায়; কিন্তু উনি মন স্থির করে কানো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। কী কর্তব্য ঠিক করতে পারতেন না, দ্বধাগ্রস্ত হতেন। আর তাঁর প্রতিপক্ষ লেনিন ছিলেন এর উলটো, কখনও দ্বিধা রতেন না, যে কোনো অবস্থাতেই পরবর্তী কর্তব্য বিষয়ে তাঁর মন একেবারে স্থিরীকৃত থাকতো। যখন এ হেন দু' পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধে তখন জয় হয় তারই যে নজের মনকে জানে। তাঁর সমস্ত আদর্শবাদ ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও জার সম্পূর্ণ হেরে গেলেন, কারণ উনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম ছিলেন। ব্যবহারিক সমস্যাগুলো অগণিত য়ে ওঁর চোখের সামনে ভিড় করতো। আর লেনিন কোনো সমস্যাই দেখতে পতেন না।

— … নীতিবিরুদ্ধ কিছু করতে লেনিন কুণ্ঠিত

পেয়ে বসেছিলো। একটা চূড়ান্ত আত্মাভিমান তাঁকে গ্রাস করেছিলো। সলঝেনিৎসিন আর লেনিন দুজনেই তাঁদের জীবনব্রতে উৎসর্গিত,—এখানে দুজনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে—কিন্তু সলঝেনিৎসিনের ব্রত হচ্ছে বিপদ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা, আর লেনিন ভাবতেন যে তাঁর জীবনের কাজ হচ্ছে মানবজাতির পরিত্রাণ-সাধন। নিজেকে একজন ত্রাতা হিসেবে দেখতেন বলেই যীশুর প্রতি তাঁর ছিলো এক প্রবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। তাঁর চোখে খৃষ্ট ছিলেন একজন প্রবঞ্চক। তাঁর ধারণা ছিলো যে মানবজাতিকে কিভাবে বাঁচাতে হবে তা তিনিই জানেন।

কে ॥ দাম্ভিক ছিলেন?

নি ॥ একটামাত্র আইডিয়ার ভূতে পেলে মানুষের যা দশা হয়। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো না, টাকাকড়ির প্রতি লোভ ছিলো না। অবশ্য টাকা-পয়সা তিনি সাবধানেই খরচ করতেন, কিন্তু অর্থ তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না। নিজের মানবত্রাতার ভূমিকাটাই তাঁকে মোহাবিষ্ট করেছিলো। পুরোনো দুনিয়াটাকে ভেঙেচুরে মানুষকে বাঁচাতে হবে এই ছিলো তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। এখন, ভাঙবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো অসীম, কিন্তু গঠনমূলক চিন্তাধারা ছিলো না। তাই সেই পুরোনো জগতের ধ্বংসাবশেষের উপরে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা তাঁর প্রতিশ্রুত ভবিষ্যতের চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আশা দিয়েছিলেন যে মানবজাতির রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণবর্জিত ঐক্য আসবে, সেনাবাহিনী আর থাকবে না। আর সোভিয়েত দুনিয়ায় এখন পৃথিবীর বৃহত্তম ফৌজ, কঠোরতম পুলিসী নিয়ন্ত্রণ। লেনিন বলেছিলেন এগুলো লুপ্ত হয়ে যাবে। কোথায়, হলো না তো? বরং এগুলো দৃঢ়তর হয়েছে।

কে ॥ বস্তুত একদলীয় শাসনতন্ত্রে হিংসা একটি বড় রকমের শক্তি হয়ে পড়ে। আপনি কি বলবেন যে সলঝেনিৎসিনের প্রবণতা অহিংসার দিকে?

নি ॥ আমি বলবো যে মন্দের দ্বারা যে মন্দকে পরাভূত করা যায় না তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। জগতের উদ্দেশ্যে এটাই তাঁর বাণী।

কে ॥ যেটা ধর্মেরও বাণী।

নি ॥ এবং যেটা—আমি বিশ্বাস করি দেখানো যেতে পারে—পরিণত বুদ্ধির বাণীর সঙ্গে একাত্ম। মানুষ যত হিংসা ব্যবহার করে তত তার ইষ্টসিদ্ধি বিঘ্নিত হয়।

কে ॥ হিংসার জালে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে।

নি ॥ আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। বস্তুত, এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা, কিন্তু ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাধারণ বুদ্ধিকে পূর্ণ তাৎপর্য দেয়—যখন বিশ্বাস করা যায় যে মানুষের চেয়ে বড় এমন কোনো সার্বভৌম শক্তি আছে যা শুভানুধ্যায়ী।

কে ॥ ধর্মবিশ্বাস একটা বিরাট চালক-শক্তি জোগায়—

নি ॥ এবং আত্মবিশ্বাস। প্রত্যয় জোগায় যে অশুভ শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারবে না, কারণ মহাজাগতিক জীবনের পিছনে আরেকটি শক্তি—শুভশক্তি—আছে।

কে ॥ সলঝেনিৎসিনকে তাঁর স্বদেশে কি আবার গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং বৃহৎ রুশ ঐতিহ্যে তাঁর মর্যাদা কি আবার প্রতিষ্ঠিত হবে? এখন থেকে সর্বদাই কি রুশ সাহিত্যের দুটি ঐতিহ্য থাকবে, একটি দেশের ভিতরে, একটি বাইরে? সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিবাদপন্থী গোষ্ঠীগুলিতে সলঝেনিৎসিনের খ্যাতির অবস্থা এখন কিরকম?

নি ॥ আজকের রাশিয়ায় দুটো ঐতিহ্য নেই—রুশ ঐতিহ্য একটিই। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম সাহিত্যের ধারা প্রবর্তিত করেছে, যে ধারার লেখকদের অধিকাংশকেই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা বলতে হয়। আজকের রাশিয়ার পক্ষে সলঝেনিৎসিন বিপুলভাবে তাৎপর্যময়, কারণ তিনি এমন অনেককে মুখ খুলে কথা বলতে সাহস দিয়েছেন যাদের আগে সে সাহস ছিলো না, ভয়ে যারা আড়ষ্ট হয়েছিলো। তাঁর প্রভাবে অনেকে তাঁদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা কইতে শুরু করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ গালিচ্ নামে একজন কবি, যিনি এই সম্প্রতি নির্বাসনে মারা গেলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার খুব জনপ্রিয় কবি ছিলেন, ওঁর নাটক অভিনীত হতো, ইত্যাদি। নিজের কণ্ঠস্বরে কথা কইতেন না। তারপর সলঝেনিৎসিনের প্রভাবে স্বকীয় কণ্ঠস্বরে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর হঠাৎ একজন নতুন, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠলেন। আর তার পরই সোভিয়েত রাশিয়া থেকে হলেন নির্বাসিত। একটি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন বেচারী,—বয়স তেমন কিছু হয়নি, মাত্র ষাটের কোঠায়। সলঝেনিৎসিনের অনুপ্রেরণায় হারানো প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছেন এমন মানুষ আরও আছেন। আর সে জন্যই তো সলঝেনিৎসিনকে এতটা ভয় পান সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ, সে জন্যই তাঁর বই এত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যদি তাঁর কোনো প্রভাব না থাকতো, তা হলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে এতটা ভয়ের চোখে দেখতেন না।

কে ॥ উপেক্ষা করতেন।

নি ॥ ঠিক তাই।

কে ॥ তা হলে সলঝেনিৎসিনের খ্যাতির পুনর্বাসন ঘটবে?

নি ॥ আজকের সোভিয়েত রাশিয়ায় উনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি।

কে ॥ কী অর্থে, নিকোলাস?

নি ॥ ওঁর নির্ভীকতাকে প্রত্যেকে তারিফ করে। সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যার লেখক এখনও সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরেই আছেন। লেখকের নাম আলেক্সান্দার জিনোভিয়েভ। ভারী সরস, কৌতূহলোদ্দীপক বইটি, আর সলঝেনিৎসিনের কথায় ঠাসা। ওঁর কথা বারে বারেই উল্লেখ করেছেন লেখক। বইটি বার হবার পরে লেখককে সোভিয়েত সরকারের অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে। তাঁর সমস্ত পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তিনি। অ্যাকাডেমির সভ্য ছিলেন, সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। এমন … সরকার কেড়ে নিয়েছেন।

নি ॥ সুযোগ পেলেই পড়ে। অবশ্য খুব বিপজ্জনক কাজ সেটা। তা সত্ত্বেও তিনি পাঠকমনসে অনুপ্রবিষ্ট।

কে ॥ তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি গোপনে প্রচারিত হয়?

নি ॥ হয় বই কি। এই তো প্যারিসে একটি বই বার হয়েছে—'অগাস্ট, ১৯১৪'-র উপর ভাষ্যাবলী—লিখেছেন সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরকার লোকেরাই। অবশ্যই তাঁদের নাম প্রকাশিত হয়নি।

কে ॥ তা হলে ও ধরনের পাণ্ডুলিপি ক্রমাগত চোরা-গোপ্তা উপায়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে আনা হচ্ছে?

নি ॥ সর্বদা।

কে ॥ আর প্যারিসের রুশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মস্কোর ক্রমাগত আদানপ্রদান চলছে?

নি ॥ বর্তমানে খুব জোর আদানপ্রদান চলছে।

কে ॥ প্যারিস কি এখনও দেশান্তরিত রুশদের কেন্দ্রস্থল?

নি ॥ হ্যাঁ, এক অর্থে যদিও অনেকেই চলে গেছেন আমেরিকায়।

কে ॥ আমেরিকায় সলঝেনিৎসিনের ভূমিকা কী? উনি কি ওখানে দেশান্তরিত রুশদের সমবেত করছেন?

নি ॥ না না, সেরকম কিছু করার কোনো চেষ্টা উনি করছেন না। উনি নির্জন জীবন যাপন করেন, লেখার কাজে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। ও'র মতে ও'র ভূমিকা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, লেখক হিসেবে।

কে ॥ ও'র প্রথম স্ত্রী বলেছেন যে সলঝেনিৎসিন নাকি সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি সুবিচার করেন নি, ইত্যাদি। এ বিষয়ে আপনার কি মত? এটা কি তিক্ততা?

নি ॥ হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। ভদ্রমহিলা বইটা লিখেছিলেন 'কে-জি-বি' বা গুপ্ত পুলিসের চাপে পড়ে। ওরা ও'কে বইটা লিখতে আদেশ করে। কাজেই লেখাটা ও'র স্বাধীন আত্মপ্রকাশ নয়। হয়তো সলঝেনিৎসিনের বিরুদ্ধে ও'র ব্যক্তিগত অসন্তোষের জন্যই উনি বইটা লিখতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, উনিও সলঝেনিৎসিনকে খুব একটা আক্রমণ করতে পারেন নি। উনি অভিযোগ করেছেন যে, সলঝেনিৎসিন স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, তাঁর জীবনব্রতে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট। অবশ্যই উনি ও'র জীবনব্রতে সমর্পিত! ভদ্রমহিলা ইঙ্গিত করেছেন যে, স্তালিনের আমলে সলঝেনিৎসিন যখন গ্রেপ্তার হন, তখন উনি নাকি ও'র বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এটা ভিত্তিহীন অপবাদ, কারণ ও'র বন্ধুরা কেউ গ্রেপ্তার হন নি, আর স্তালিনের আমলে কেউ যদি বন্ধুদের ধরিয়ে দিত তবে তারা নির্ঘাৎ গ্রেপ্তার হতো।

কে ॥ সলঝেনিৎসিনের হার্ভার্ডে দেওয়া বক্তৃতাটি পড়ে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হলো?

নি ॥ একদলতন্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে পশ্চিমের উদ্দেশে তাঁর সাবধান-বাণীরই একটি পরিণততর রূপ বক্তৃতাটি। মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঐক্য সম্বন্ধে চেতনাও বর্ধিত করতে চেয়েছেন।

কে ॥ বামপন্থীদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে সলঝেনিৎসিনকে পশ্চিমের চাটুকার হিসেবে দেখা।

নি ॥ যা তিনি আদপেই নন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, উনি প্রায় গান্ধীর মত সহজতর সরলতর জীবনে ফিরে যেতে চান, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার একেবারে বিরুদ্ধে—এটাও ও'র দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক বিশ্লেষণ নয়।

কে ॥ তাহ'লে উনি পৃথিবীকে একটি সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন? প্রাদেশিক নন, আন্তর্জাতিক?

নি ॥ খুবই আন্তর্জাতিক। পশ্চিমকে অবহিত করতে হবে এটা উনি তীব্রভাবে অনুভব করেন।

কে ॥ একদলতন্ত্রের বিপদের বিরুদ্ধে?

নি ॥ ঠিক তাই। পশ্চিম যদি তার মূল্যবোধ হারায়, তাহলে একদলতন্ত্রের করতলগত হয়ে পড়বে। মানুষ যখন তার ঐহিক ভোগসুখে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, নতুন গাড়ি বা রেফ্রিজারেটার ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারে না, তখন সে সহজেই একদলতন্ত্রের শিকার হয়, দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার অনেকে মনে করেন যে, এ জাতীয় দুর্ঘটনা নাকি পশ্চিমে হতে পারে না, কারণ 'প্রাচ্য দুনিয়ার মানুষ একনায়কত্ব, স্বৈরাচার, দারিদ্র্য প্রভৃতিতে অভ্যস্ত; তাদের ভাগ্যই তাই; কিন্তু আমরা অন্য জাতের মানুষ, উন্নততর জীব', ইত্যাদি। কিন্তু এটা নির্জলা আত্মপ্রতারণা।

কে ॥ এই মনোবৃত্তি অনেক দিনের ইউরোপ-কেন্দ্রিক দম্ভের জাতক।

নি ॥ রাশিয়ার মানুষ নাকি শ্রমশিবির পছন্দ করে! তারা নাকি দাসবৃত্তি উপভোগ করে!

কে ॥ এশিয়ার মানুষ সম্পর্কেও এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। তারাও নাকি দাসবৃত্তি পছন্দ করে! রাশিয়ার মানুষ আর এশিয়ার মানুষ উভয় দলই নাকি বর্বর! 'ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজম্'-এর থিওরি অনেক দিনের পুরোনো।'

নি ॥ রাশিয়ার মানুষকে নাকি মার না দিয়ে শাসন করা যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কে ॥ আচ্ছা, এবারে থামা যাক। অনেক ধন্যবাদ, নিকোলাস। আপনি আমাদের প্রচুর মালমশলা দিয়েছেন।

নি ॥ বিস্তৃত আলোচনা হলো। খুবই উপভোগ করলাম। ধন্যবাদ, বিশেষ বন্ধু!

তর্কের অবসান ঘটানো বা শেষ কথা বলা, উদ্দেশ্য খানিকটা খবর দেওয়া আর খানিকটা চিন্তার উদ্দীপন। সলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গে নিকোলাস জার্নেভের মত একজন মানুষের ভাবনা-বেদনাকে এ কারণে মূল্যবান মনে করি যে, নিকোলাস শুধু যে একজন রুশভাষী বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক তাই নন, উপরন্তু সেই প্রাচ্য-খ্রিস্টীয় রুশ ঐতিহ্যের সন্তান, যা রুশ দুনিয়ার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার, যার সঙ্গে সলঝেনিৎসিন নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন, এবং যার সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিজেদের মেলানো বারণ। সলঝেনিৎসিন তাঁর স্বজাতীয় ঐতিহ্যের নিহিতমূলে, বিভিন্ন অবধারার সারগ্রাহী একজন চিন্তাশীল লেখক। তাঁর বিবর্তন ভালো করে বুঝতে হলে উনিশ শতকের রাশিয়ার বৌদ্ধিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে গবেষণা চলছে এবং অনেক দিন ধরে চলবে; আপাতত বক্তব্য যে তাঁর বিবর্তন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও অনুধাবনযোগ্য, এবং তাঁর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য।

এটা মনে রাখতে হবে যে, মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সলঝেনিৎসিন সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিতরেই ছিলেন। তথাকথিত লৌহযবনিকার অন্তরাল থেকে বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য খবরাখবর কতটা পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। হয়তো সে কারণে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বাইরে যে দুনিয়া সে সম্পর্কে তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যে বিরোধাভাস প্রাপ্তব্য। আমাদের মনে হতে পারে যে, উনি উলটো-পালটা, স্ববিরোধী কথা বলছেন; গৌণ ব্যাপারে বেশি ঝোঁক দিচ্ছেন; গুরু-লঘুর তফাত করছেন না। যেমন কেউ কেউ অভিযোগ করেন, 'উনি বাঁ দিকের একদলতন্ত্রকে সমানে সমালোচনা করে যাচ্ছেন, ডান দিকের একদলতন্ত্রও যে কতখানি খারাপ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করছেন না কেন?' তার কারণ নিশ্চয় এই যে, উনি দক্ষিণপন্থী একদলতন্ত্রে মানুষ হননি, সে সম্বন্ধে কোনো খাঁটি, তাজা খবর তাঁর দেবার নেই, বামপন্থী একদলতন্ত্র সম্বন্ধেই অনেক খবর দেবার আছে, আর প্রথম ধরনের একদলতন্ত্রের অবাঞ্ছিত দিকগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধিজীবীদের নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন কম, সে সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত।

হয়তো এটা ঠিক যে, অপর জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবার মত মানসিক পরিণতি কোনো জাতিরই নেই, প্রত্যেক জাতিকেই উত্তীর্ণ হতে হবে নিজস্ব অগ্নিপরীক্ষায়। তবুও বলতে হয় যে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় বড়-হয়ে-ওঠা এই মানুষটি জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ, স্তালিনের শ্রমশিবিরে অবরোধ, কঠিন কর্কটরোগের সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ, সোভিয়েত রাশিয়াতে তাঁর লেখা প্রকাশের জন্য সংগ্রাম, স্বদেশ থেকে নির্বাসন, ইত্যাদি; এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এমন একজন মানুষের সাক্ষ্য এবং সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর পৃথিবীর উদ্দেশে তাঁর সাবধান-বাণী সযত্ন শুনানি দাবি করে। কম্যুনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত, চিন্তাশীল, বিজ্ঞানলালিত একটি সোভিয়েত যুবক—গণিত ও পদার্থবিদ্যার স্নাতক তিনি—কেন, কিভাবে তাঁর দেশের প্রতিষ্ঠিত সার্বিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার প্রখর সমালোচক হয়ে উঠলেন, ধর্মবিশ্বাসে ফিরে গেলেন, এবং কী সেই অন্তঃস্থ দীপ্ত প্রত্যয় যা তাঁকে দিয়ে একের পর এক উল্লেখযোগ্য বই লিখিয়ে নিচ্ছে: এই প্রশ্নগুলি নিশ্চয় ভেবে দেখবার মত। সোভিয়েত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে আঁকা হয় একজন উৎকট কালাপাহাড় হিসেবে। কিন্তু তিনি নন নিষ্ঠুর বা বিকট, বরং একজন গভীর প্রেমিক, এবং তাঁর যে নিরন্তর সংগ্রাম তা একদলতান্ত্রিক সমাজের অপ্রেম, অসত্য, অসহিষ্ণুতা, দমননীতি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, প্রাতিষ্ঠানিক জুগুপ্সা, ইতিহাসের প্রণালীবদ্ধ বিকৃতি, ইত্যাদির বিরুদ্ধে। তিনি কালাপাহাড় শুধু এই অর্থে যে, তিনি তাঁর সমাজের একজন মৌলিক সমালোচক, তার প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী, এবং প্রত্যেক সমাজেই মৌলিক প্রতিবাদের প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাসে বারে বারেই দেখি যে আজকে যাকে মনে হয় 'heresy' বা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধতা তা কয়েক শতাব্দী পরে মর্যাদা পায়; সলঝেনিৎসিনের চিন্তাধারার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি লেনিনের সমালোচনা করেছেন বলে বামপন্থীরা ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু এ দুনিয়ার কেউই নন সমালোচনার ঊর্ধ্বে স্থিত জ্যোতির্ময় গুরুদেব, বিশেষত এমন কেউ রাজনীতি যাঁর চারণভূমি, এবং যিনি বিশ্বাস করেন যে, লক্ষ্যের সাধুতা ভ্রষ্ট পন্থার দোষমোচন করে। তা ছাড়া, 'জুরিখে লেনিন' বইটিতে লেনিনকে দোষে-গুণে মেলানো মানবিক মাত্রাতেই আঁকা হয়েছে। যেমন দেখানো হয়েছে একটু আইডিয়ার ঘোরে মোহাবিষ্ট একটি মানুষকে, তেমন দেখানো হয়েছে প্রেমিক লেনিনকে। অন্যত্র যিনি প্রবল প্রতাপশালী দলীয় নেতা, ইনেস আর্মান্ড-এর কাছে তিনিই দুর্বল, ছেলেমানুষ।

যাঁরা মনে করেন যে, সলঝেনিৎসিন পশ্চিমের মোসাহেব তাঁরা তাঁর ৮ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে হার্ভার্ড স্কোয়ারে প্রদত্ত ভাষণটি পড়ে দেখবেন। ঐ বৃষ্টি-ঝরা দিনে পনেরো হাজার মানুষ ছাতা মাথায় দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে সমবেত হন, কিন্তু পশ্চিমের প্রশংসা শোনার সৌভাগ্য তাঁদের হয় নি। ২৬শে জুলাই, ১৯৭৮ তারিখের লণ্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'টাইম্স্' পত্রিকায় ভাষণটির ইংরেজী অনুবাদ পড়লাম। ঠিক যেভাবে তিনি সোভিয়েত সমাজের সমালোচনা করে থাকেন সেভাবেই তাঁর গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতারও মৌলিক, কঠোর সমালোচনা করেছেন, যা শুনে মধ্যে রবীন্দ্রনাথকৃত পশ্চিমের সমালোচনাকে মনে করায়। পশ্চিমের জড়বাদ, ভোগবাদ, স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা, আইনসর্বস্ব সঙ্কীর্ণতা, এশিয়া-আফ্রিকার প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে

চিন্তাশীল পর্যবেক্ষককেই সূচিত করে। তিনি জানেন যে, যদিও সোভিয়েত সরকার স্বৈরাচারী এবং সোভিয়েত সমাজ বিত্তসম্ভারে পশ্চিমের চেয়ে দরিদ্রতর, তবুও আইনশাসিত ও সচ্ছলতর পশ্চিমে সোভিয়েত সমাজের চেয়ে অপরাধের হার ঢের বেশি। 'যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে, আজকের পশ্চিমকে আমি আমার দেশবাসীর কাছে মডেল হিসেবে নির্দিষ্ট করবো কি না, তাহলে আমার উত্তর হবে স্পষ্টত নঞর্থক', পরিষ্কার বলেছেন তিনি। এর পরে তাঁকে আর যা-ই বলা যাক, পশ্চিমের তোষামোদকারী বলা চলে না। তিনি জানেন যে তথাকথিত 'প্রথম' এবং 'দ্বিতীয়' উভয় দুনিয়াই রেনেসাঁস-পরবর্তী ইউরোপীয় সভ্যতার দুই সন্তান, কারণ মার্ক্সবাদ উইরোপীয় মানবতাবাদেরই জাতক, এবং এই দুই দুনিয়াতেই প্রেমহীন, হৃদয়হীন, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধশূন্য মানবতাবাদের ধারাটির অন্তিম ব্যর্থতা তিনি ধরতে পেরেছেন। তাই তিনি বলতে পারেন যে, 'মহাকাশবিজয় সূক্ষ্ম যন্ত্রবিদ্যার যাবতীয় কীর্তিত প্রগতি বিশ শতকের সেই নৈতিক দীনতার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না, যে দীনতার কথা মাত্র উনিশ শতকেও কেউ কল্পনা করতে পারে নি'।

এই দুই দুনিয়ার সভ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে রহস্যাক্রান্ত সৃষ্টির সম্মুখে প্রয়োজনীয় বিনয়, যে মাত্রাটুকু ছাড়া প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব আসে না, মর্তে স্বর্গ রচিত হয় না, কীর্তি পর্যবসিত হয় অসার অহমিকায়। কেউ যদি প্রমাণ করতে বসেন যে সলঝেনিৎসিন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী তা হবে নিছক বাতুলতা; তিনি বিরোধী সেই উদ্ধত ভণ্ডামি-র বা অবধারিত মতের, যা ঐ আদর্শকে কিভাবে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে সে বিষয়ে একক পন্থা স্থির করে ফেলেছে এবং সর্বদাই ঘোষণা করছে যে নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে; যা বিশ্বাস করে যে ঐ আদর্শে পৌঁছনোর পথে বেশ খানিকটা নীতিভ্রষ্ট হলেও কিছু এসে যাবে না, আদর্শের খাতিরে শুধু দু'একটি নিষ্ঠুর কাজ নয় শত শত সহস্র সহস্র মানুষের প্রতি বর্বরতাও বৈধ হবে; যা দু'চারজন মানুষের লেখাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে অন্য সবাইকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেচনাকে ভ্রান্ত বলে নামাঙ্কিত করে; যা সমালোচনা সহ্য করতে পারে না; যা পৃথিবীকে সর্বদা শত্রুশিবির ও মিত্রশিবিরে বিভক্ত করে দেখে। সলঝেনিৎসিন বোঝেন যে, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যেমন পারিবারিক শান্তি আসে না, তেমনই শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমেও মৈত্রী আসতে পারে না। সংগ্রামের মাধ্যমে বড় জোর সম্ভব এক গোষ্ঠীর হাতে আরেক গোষ্ঠীর পরাজয়, কিন্তু তা নয় প্রকৃত শান্তিতে উত্তরণের সঙ্গে সমার্থক, যেটা বিজয়ী পাণ্ডবদের বুঝতে হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের শেষে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ বংশজাত খ্যাতনামা লেখক এবং বর্ণবিভাগপ্রথার নামজাদা বিরোধী লরেন্স ভ্যান্ ডের্ পোস্ট-এর একটি উক্তি। ইনি ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিশেছেন। বি-বি-সি টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে তিনি পাশ্চাত্য জগৎ, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত রাষ্ট্র, প্রতিটি দুনিয়াতেই একটি দলের হাতে আরেকটি দলের নিপীড়নকে ইউরোপীয় ক্যাল্ভিনিজ্‌ম্ (Calvinism)-এর জাতকরূপে চিহ্নিত করেছেন। ইহুদীবিদ্বেষ, কৃষ্ণবিদ্বেষ, সোভিয়েত সমাজে প্রতিবাদীদের দমন, প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি দেখেন ক্যালভিনীয় আত্মগরিমা এবং তার অবধারিত উলটো পিঠ, পরবিদ্বেষ। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্যাল্ভিনিজ্‌ম্ হিসেবে। 'যারা আমার সপক্ষে নয় তারা আমার বিপক্ষে।' স্মরণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানসিকতার বিশ্লেষণেও এই সূত্রটি সাহায্য করতে পারে, কারণ সেখানেও প্রটেস্টান্ট-ক্যালভিনীয় মনোবৃত্তি শ্বেতসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ক্যালভিনিজ্‌ম্ সূচিত করে দ্বিখণ্ডিত চেতনাকে। নৈতিক আত্মশ্লাঘার অনিবার্য পরিণাম আমাদের অভ্যন্তরীণ কোমল, শিশুসুলভ প্রাকৃত, বন্য বা সংরক্ত প্রবৃত্তিগুলির দমন; প্রেম, ক্ষমা ও অন্যান্য নারীসুলভ বৃত্তিগুলির অবমাননা ও কঠোর পৌরুষের জয়জয়কার; সংক্ষেপে, এক ধরনের আত্মলাঞ্ছনা। আত্মলাঞ্ছনার মুকুর, মনস্তত্ত্ব বলে, পরলাঞ্ছনা। যে নিজের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে চেপে রাখে সে অপরেরও টুঁটি টিপে রাখে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াতেই পাশ্চাত্য যুবসমাজ ছোটে উন্দামতার বা হিপি-তন্ত্রের বিপরীত মেরুতে; তার প্রতিক্রিয়ায় আবার আসে রক্ষণশীল কঠোরতা: এভাবে চলতে থাকে দ্বিধাবিভক্ত সভ্যতার দোলাচল পেন্ডুলম, যে অস্থিরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন অনেক শিল্পী, মানুষকে পূর্ণ ও অবিভক্ত করার প্রয়াসে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তপস্বীর অহংকার, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের দমন, পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু সমাজে নারীর নিপীড়ন, ইসলামপন্থীর কাফেরবিদ্বেষ ইত্যাদি ক্যালভিনীয় মনোবৃত্তির সমগোত্রীয়।

এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা যায়, আমাদের সময়ের আরেক বিশ্বখ্যাত দরদী শিল্পীর উক্তি। বেহালাবাদক, সংগীতরসিক, ভারতপ্রেমিক রবিশঙ্করের অনুরাগী বন্ধু য়েহুদি মেনুহিনও মানুষের অবিভাজ্য পূর্ণতার সন্ধানী এবং আক্রান্ত মূল্যবোধগুলির একজন স্পষ্টবাদী আরক্ষক। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর 'ইজ্‌ম্'-গুলিকে এক একটি দল দখল করে বসে, অপর কোনো দলকে অপরাধীর কাঠগড়ায় খাড়া করে তাকে হারিয়ে দিয়ে নিজেদের দলকে জেতানোর চেষ্টায় মগ্ন হয়। তাই ঐ 'ইজ্‌ম্'-গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আদর্শবাদগুলি তেতো হয়ে যায়। সোভিয়েত সাম্যবাদকে তিনিও চিহ্নিত করেন ইহুদী-খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয় সভ্যতার একটি নতুন শাখারূপে, যেখানে আগেকার ইউরোপীয় দাম্ভিকতা ও অসহিষ্ণুতা নতুন মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। 'এই ঐতিহ্যের একটি প্রধান ভাববস্তু হলো যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্বের উপরে প্রভুত্ব করবার জন্য। শুধু মানুষেরই আত্মা আছে। এই ভ্রান্ত, একমাত্রিক, আদিম, পৃথিবী-একটি-সমতলক্ষেত্র জাতের ধারণা এখনও এই খ্রীষ্টীয় তরুর সাম্প্রতিকতম শাখাটির বৈশিষ্ট্য।'৩

সলঝেনিৎসিনের ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য তাহলে কী? এই ঘটনাটি বুঝতে হবে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। মার্ক্সবাদ যে ইউরোপীয় মানবতাবাদের জাতক এ পর্যন্ত সলঝেনিৎসিন পরিষ্কার বুঝেছেন। ইউরোপীয় মানবতাবাদ যে আবার ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্মেরই জাতক সেটা তিনি কতটা ধরতে পেরেছেন তা বলা কঠিন। কারণ তিনি প্রাচ্য-খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের মানুষ। রুশ অর্থডক্স চার্চ বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র, ভিন্ন পথের যাত্রী। প্রাচ্য-খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে ক্যালভিনিজমের কঠোরতার চেয়ে ধ্যান, মরমিয়া সাধনা, শান্ত ভক্তিরসের স্বাদটিই গাঢ়তর। এটা বিস্ময়কর নয় যে, পশ্চিম ইউরোপের ধর্ম ও মানবতাবাদের অন্তর্বর্তী সংযোগসূত্রটি সলঝেনিৎসিনের কাছে ততটা স্পষ্ট নয়। তাঁর জীবনের সুকঠিন সংগ্রামগুলি মার্ক্সবাদের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে ঠেলেছে লোকোত্তর নির্ভরের সন্ধানে, আর যেটা তাঁর পক্ষে নিকটতম, পরিচিততম আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তিনি স্বভাবতই ফিরে গেছেন তার দ্বারে, আহত শিশু যেমন যায় তার মায়ের কোলে। যাঁদের জীবনে কোনো প্রত্যক্ষ কঠিন অত্যাচার সইতে হয় নি তাঁরা যতটা স্বনির্ভর হতে পারেন অত্যাচারিতেরা ঠিক ততটা স্বনির্ভর হতে পারেন না। বিক্ষত মানুষের লাগে একটু বাড়তি স্নেহ, বিশেষ ভরসা, ছায়াময় আশ্রয়। সেই আশ্রয়, ভরসা ও প্রেমের সন্ধান সলঝেনিৎসিন পেয়েছেন তাঁর দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে। দুঃখের সাধনায় যে নির্ভর তাঁকে বাঁচতে সাহায্য করেছে তার সম্মুখে আমাদের বিনয় ব্যতীত কোনো ভঙ্গিই শোভন নয়।

নিকোলাস জার্নড এবং তাঁর মত সুধীরা বলেন যে, পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার জাতক মার্ক্সবাদ, যাকে লেনিন রাশিয়ার মাটিতে প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন, রাশিয়ার স্বকীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূলত বিদেশী। তা রাশিয়াতে কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করলেও তার বিরুদ্ধে প্রাচ্য-খ্রীষ্টীয় প্রতিক্রিয়া ও রুশ আধ্যাত্মিকতার নবজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। আপাতত এটুকু স্পষ্ট যে, আমাদের থেকে কোটি কোটি গুণ বৃহত্তর সৃষ্টির অভ্যন্তরে থেকে সুস্থ বিবর্তনের জন্য প্রত্যেক সভ্যতারই প্রয়োজন তার পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিগুলির সঙ্গে যোগাযোগের লাইন খোলা রাখা।

নেহরু পুরস্কার গ্রহণের সময় তাঁর প্রদত্ত ভাষণে য়েহুদি মেনুহিন বলেছিলেন 'I am a Communist with Jesus,' 'আমি যীশুর সঙ্গে সাম্যবাদী'।৪ হয়তো সলঝেনিৎসিনও বলতে পারতেন ঐ কথা। এটুকু পরিষ্কার যে, হিংসা আর প্রতিহিংসার, দমন আর প্রতিদমনের আবর্তিত চক্র থেকে যে সাম্যবাদ মুক্ত নয়, যে সাম্যবাদে প্রেমের স্থান নেই, তাতে তাঁর অন্তর সায় দেয় না।

৩ দ্রষ্টব্য তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ: Yehudi Menuhin, *Theme and Variations*. Heinemann. London. 1972.

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ২৪ ॥

অনেক সিনেমার গল্প করে বসলাম। এবার একটু সিনেমা আর গান-বাজনার মধ্যে সেতু তৈরি করি। পঙ্কজ মল্লিকের কথা তো আগেই বলেছি। এবার পাহাড়ীদার কথা বলি। পাহাড়ী সান্যাল মশাই। লখ্নৌয়ের ছেলে, চোস্ত উর্দু বলতেন, ঠুংরী-গজলের ব্যাকগ্রাউণ্ডটাও ভাল ছিল, লখ্নৌয়ে অতুলপ্রসাদবাবুর কাছে অতুলপ্রসাদীর তালিমও পেয়েছিলেন। কি চমৎকার গাইতেন অতুলবাবুর গানগুলো! ওঁকে প্রথম বোধ হয় দেখেছিলাম প্রমথেশ বড়ুয়ার 'অধিকার' ছবিতে। ওঁর হীরো হিসেবে প্রথম ছবি দেখলাম 'বিদ্যাপতি'। মুখটা অপরূপ সুন্দর ছিল। নিখুঁত নাক, মুগ্ধ-করা চোখ, কোঁকড়া চুল, সাক্ষাৎ বিদ্যাপতি যেন। তবে ওঁর অভিনয়ের সত্যিকারের পরিচয় পেলাম 'বড়দিদি' ছবিতে সুরেনের ভূমিকায়। আহা! কি সুন্দর অভিনয়! সেই আত্মভোলা, পড়ুয়া সুরেন। বড়দিদির রোলে মলিনার কাজও দারুণ লেগেছিল। পরে তো পাহাড়ীদার বাংলা বম্বে উভয় প্রদেশেই বিরাট নামডাক হলো অভিনেতা হিসেবে। এবং সিনেমার রোল নিতে নিতে ওঁর গানের কাজটা পিছিয়ে পড়ল। দুটো আর সমান তালে চলল না। অনেকের যদিও আশা এবং ধারণা ছিল যে, উনি সায়গলের মত সিনেমায় অভিনয় এবং গান দুটোকেই বজায় রাখবেন; সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। তবে পাহাড়ীদার যেটা একটা বড় আকর্ষণ হিসেবে রয়ে গেল তা হল ওঁর মজলিসী চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব। একসময়ে গান-বাজনার লোক ছিলেন বলে ওঁর স্বভাবের মধ্যে এবং আচার-ব্যবহারে একটা মজলিসী ঢঙ এসে গিয়েছিল। শংকর, তুমি জানো কি, উনি বেশ ভাল তবলা বাজাতেন? লখ্নৌতে শিখেছিলেন। গান-বাজনা উনি সত্যিই ভালবাসতেন, যখনই সুযোগ হত ঘরোয়া জলসা বা মিউজিক কন্ফারেন্সে আমরা ওঁকে পেতাম। যদিও জলসায় বসে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলতেন 'আহা, সুভান আল্লা', 'বাঃ, বাঃ', 'কিয়া কহ্নে' ইত্যাদি সোচ্চার তারিফে; তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, উনি সংগীতের এবং গুণীদের একজন বিরাট অনুরাগী ছিলেন। ওঁর পড়াশুনোও খুব ভাল ছিল। প্রায়ই বই পড়তেন, অনেক বই পড়তেন। শেষ বয়সে আলেয়াঁস ফ্রাসেজে ফরাসী শিখলেন। আমাকে জলসাতে দেখলেই ফরাসীতে কথা বলে উঠতেন। Comment allez vous', comme a ca va' ইত্যাদি বলে ফরাসীতে কথাবার্তা শুরু করতেন।

পাহাড়ীদার কথায় মনে পড়ে আর একজনকে। উনিও লখ্নৌতে থাকতেন, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক ছিলেন—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নিজে গাইতেন না, তবে দারুণ মজলিসী লোক ছিলেন। বই এবং প্রবন্ধ লিখেছিলেন বেশ কিছু সংগীত সম্বন্ধে। ভাল ভাল লোকদের অনেক শুনে-ছিলেন। আমাকে স্নেহ করতেন খুব। তবে ওঁর একটা patronizing attitude বেশ ছিল। 'সেই অমুক সালে কালে খাঁর আশাবরির ধৈবত বা আলাবন্দের টোড়ির গান্ধার যা শুনেছিলাম, আজকাল তা আর দেখি না কারো ইত্যাদি ভাব।

অমিয় সান্যাল মশাইকেও বার দুয়েক দেখেছি। অদ্ভুত ইন্টেলিজেন্ট লোক। রসজ্ঞান ওঁর খুব ছিল, তবে সেই সঙ্গে বেশ সিনিক্ও ছিলেন। কবে কোন্ সালে কোন্ সময়ে বাবা বা হাফিজ আলি খাঁ অথবা কানাই ঢেঁড়ি কোন্ রাগে কোন্ গৎ বাজিয়েছিলেন, বা ফৈয়াজ খাঁ, বড়ি মোতিবাঈ কোন্ আস্থায়ী অন্তরা গেয়েছিলেন, এবং কোন্ জলসায়, তা সব উনি নোটেশন করে টুকে রেখেছেন। সংগীতে ওঁর চিন্তাধারা নিয়ে ইংরাজীতে একটা গভীর বইও আছে। তবে জানি না কেন রিটায়ার করে কৃষ্ণনগরে চলে গেলেন। ওঁর কাছ থেকে জানবার শেখবার প্রচুর জিনিস ছিল।

আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে। কি গুণী-জ্ঞানী অথচ অমায়িক মিষ্টি লোক! চুপচাপ ভদ্রলোক অথচ কি পরিশ্রম করে কতগুলো অদ্ভুত তথ্যপূর্ণ সংগীত বিষয়ক বই লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। ওঁর ওপর অগাধ আশীর্বাদ আছে ওঁর গুরু স্বামী অভেদানন্দজীর।

সুরেশবাবু, মানে সুরেশ চক্রবর্তী ছিলেন আর একজন বিরাট সংগীতবিদ লোক। শাস্ত্র তো গুলে খেয়েছিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের বর্তমান ধারার বিশ্লেষণ করার কি দারুণ ক্ষমতা ছিল! এ কথা বিশেষ করে তাঁরাই জানেন যাঁরা ওঁর রাগ-রাগিণীর উপর গবেষণা শুনেছেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কয়েক বছর ধরে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাছে ওঁকে প্রথম দেখি। পরে খুব ভাব হয়ে গেল।

এবার বলি একজনের বিষয়ে, যাঁকে আমি আমার অন্তর থেকে যেমন ভালবাসি তেমনি শ্রদ্ধা করি। তিনি হলেন জ্ঞানদা—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

পাহাড়ীদার যেটা একটা বড় আকর্ষণ হিসেবে রয়ে গেল তা হল ওঁর মজলিসী চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব। একসময়ে গান-বাজনার লোক ছিলেন বলে ওঁর স্বভাবের মধ্যে এবং আচার-ব্যবহারে একটা মজলিসী ঢঙ এসে গিয়েছিল।

আমি আমার জীবনে তিনটে প্রধান সংগীতের আড্ডা দেখেছি। সেই ছোট-বেলায় বড়বাজারে শিব ঠাকুর লেনের গলিতে তিমিরদার বাড়িতে। বোম্বেতে Opera House-এর কাছে বি. আর. দেওধরের বাড়ি আর দেওধর হলে, আর শেয়ালদার কাছে ডিক্সন লেনে জ্ঞানদাদের নিজের বাড়িতে। জ্ঞানদাকে আমি প্রথম শুনি ১৯৩৯ সালে আলি আকবর ভাইয়ের সঙ্গে তবলা সংগত করতে। নগেনদা (নগেন দে) দাদার ট্রুপে বাঁশি বাজাতেন। ওঁর দাদা খগেন দে ম্যাণ্ডোলিন বাজাতেন। ওঁদের দুজনের অর্থাৎ খগেন দে ও নগেন দে-র ম্যাণ্ডোলিন ও বাঁশি খুবই পপুলার ছিল সেই সময়ে হিন্দুস্তান কোম্পানির রেকর্ডে। তাঁদেরই বাড়িতে ছোট বৈঠকখানায় একটা ঘরোয়া বাজনা হয়েছিল এক সকালে। হীরুবাবুকে তো আগেই শুনেছিলাম—খোলা হাতের পুরব বাজ এবং ওঁর একটা নিজস্ব ঢঙ। কিন্তু সেই দিন জ্ঞানদাকে শুনে আমার এত ভাল লাগল! তৈরী স্পষ্ট হাত। কি টেরাবাঁকা চলন! আর একেবারে খাঁ সাহেবী ঢঙের বাজনা! এর আগে আর একজনের বাজনা খুব শুনেছিলাম এবং যা খুব ভালও লাগত তা হল শিশিরদার। শিশিরশোভন ভট্টাচার্য—তিমিরদার ছোট ভাই। খুব মিষ্টি হাত—যন্ত্রের সঙ্গে খুব ভাল মিলে-মিশে সংগত করতেন। উনিও নগেনদার সঙ্গে দাদার ট্রুপে ১৯৩৪ থেকে প্রায় ১৯৪৮ সাল অবধি ছিলেন। যা হোক, সেই দিন জ্ঞানদার তবলা শুনে মনে হয়েছিল, এবং সেই মত আমি এখনও পোষণ করি যে, কোনও বাঙালী ঐ standard-এর তবলা-বাদক এখনও হয়নি। তখনই জানতে পারলাম যে, উনি ডোয়ার্কিনের ঘোষেদের বাড়ির ছেলে। Radio Supply Store-এর অংশীদার, বিরাট বড়লোক—সাথী

ছেন দারুণ ঠুংরী গান। আবার উনি আমাদের বীণকার ঘরানার খলিফা সগীর খাঁ সাহেবেরও শাগরেদ। প্রচুর ধ্রুপদ-ধামারের বন্দিশও শিখেছেন। তবলায় ওঁর প্রধান গুরু কেরামত ভাইয়ের বাবা মসীদ খাঁ সাহেব। তা ছাড়া পাঞ্জাবের এক খুব গুণী তবলিয়া ফিরোজ খাঁ নিশিওয়ালের কাছ থেকেও প্রচুর শিখেছেন। ওঁর বাড়িতে নাকি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সব গুণী গাইয়ে-বাজিয়েরা ওঠা-বসা করেন—বাদল খাঁ, মেহেদি হুসেন, আতা হুসেন, মুস্তাক হুসেন, আজীম খাঁ, জয়লাল, আরও যত সেই সময়কার লোক যাঁরা কলকাতায় থাকতেন বা যাওয়া-আসা করতেন। ওঁর ওপর আমার তখন থেকেই শ্রদ্ধা আর টান কিরকম যেন হয়ে গেল। তার বেশ ক'বছর পর ওঁর সঙ্গে একটু একটু করে ভাব হয়ে গেল। তা ক্রমে এক গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হল। যদিও বয়সে উনি আমার চেয়ে বছর আট-নয়ের বড়। আমাদের ভেতর এই যে প্রীতি এবং ভালবাসার সম্পর্ক সেটা যেন ক্রমান্বয়ে আরও দানা বেঁধে গেছে। ১৯৪৮ সাল থেকে জ্ঞানদার ডিক্সন লেনের বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা খুব বেড়ে যায়। এমন কি, সেই থেকে বছর কয়েক যখনই কলকাতায় কোনও প্রোগ্রামে বাজাতে যেতাম তখন জ্ঞানদার ঐখানেই উঠতাম। কখনই ভুলব না আমি সেই কয়েকটা দিন ওঁর সঙ্গে কি হইহই করে কাটত। গানে, বাজনায়, গল্পে, ঠাট্টায়, হাসিতে আমোদে আমাদের আড্ডা যেন শেষ হতে চায় না। আমি একেবারে ওঁর বাড়ির মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। ও'র মা-বোন-ভাইরা, বাড়ির ছেলেপিলেরা—সবাই কি স্নেহটাই না আমাকে করত! রোজ সকাল-বিকেলে কেউ-না-কেউ আসতেনই। বড়ে গুলাম আলি, আমির খাঁ, মসীদ খাঁ, দবীর খাঁ, জয়লাল ইত্যাদি আরও কত গুণী লোক। নীচের বৈঠকখানায় আড্ডা জমত কখনও কখনও। informally এ'রা inspired হয়ে ভাল ভাল বন্দিশ শোনাতে শুরু করে দিতেন। আমিও দু-একবার এই পরিস্থিতিতে বাজিয়েছি। এ ছাড়া জন দশ-পনর জ্ঞানদার তবলার ও গানের ছাত্র সর্বদাই থাকত। এ কানন, ভি জি যোগও আসত। রাধিকামোহন মৈত্র আসতেন। কাননের সঙ্গে আগে থেকেই আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। গান তো ওর ভাল লাগতই, তা ছাড়া ভাল লাগত ওর স্বভাবটা। গাইয়ে-বাজিয়ের মত মোটেই নয়—more of a sportsman। এই যেন টেনিস খেলে এল বা ব্যাডমিণ্টন খেলতে যাচ্ছে—এইরকম ভাব। সবচেয়ে মিষ্টি লাগে এই মাদ্রাজের মুদালিয়র-নন্দন যখন বাঙলা বলে। 'সোব টিক ওয়ে যাবে' (সব ঠিক হয়ে যাবে), 'তুমি কোতায় চিলে ?', 'ইয়েই ওয়াটেলে কুজলাম, ওয়ই ওয়াটেলে কুজলাম, কোতাও পেলাম না' গোছের।

বেচারা একটা গানের ফিল্মের টেকে বেশ জব্দ হয়েছিল। ভাই আলি আকবরের নির্দেশনায় গানের টেক হচ্ছিল। গান আর এক মাদ্রাজ-নন্দিনীর

কানন গান তো ভালই গায়, ভাল লাগে আমার, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর স্বভাবটাও বড় ভাল লাগে। গাইয়ে-বাজিয়েদের মত মোটেই না—more of a sportsman। ছবিতে কাননের পাশে বসে গান গাইছে ওর স্ত্রী মালবিকা।
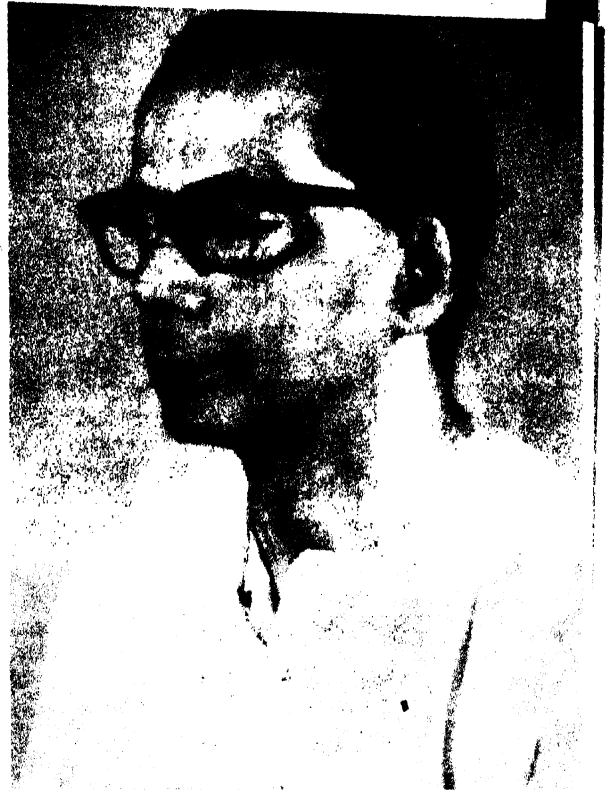
প্রথমবার জ্ঞানদাকে শুনেই যে আমার কি ভাল লেগেছিল! তৈরী স্পষ্ট হাত। কি টেরা-বাঁকা চলন! আর একেবারে খাঁ সাহেবী ঢঙের বাজনা। জ্ঞানদাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি শ্রদ্ধা করি। যেমন দরদার লোক, তেমন সুরেলা।

সঙ্গে—আমার বউদি লক্ষ্মীশঙ্কর। কোন্ ফিল্মের জন্যে মনে নেই। তবে দেশী তোড়ী রাগে গানের মুখটা ছিল 'বঁধু, এই মধুমাসে'। তাতে একটা লাইন ছিল—'বল কিছু কথা, ভাঙো নীরবতা'। কানন তাতে ফেঁসে গেল, 'বোলে কিছু কতা—বাঙো নিরবতা' হয়ে যাচ্ছিল। এই নিয়ে কি হাসির হল্লা উঠত স্টুডিওর ভেতর! অন্য কেউ হলে অপমানিত বোধ করত। চটে যেত। কিন্তু ধন্য কানন! কি স্পোর্টিং স্বভাব আর খুশদিল মেজাজ লোকটার! একেবারে unperturbed হয়ে অনেকক্ষণ খেটে গাইল কিন্তু [illegible]। ওকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আর কলকাতায় কি যে পপুলার ওর গান! এবং স্বভাবের জন্য সবাই ওকে কি ভালই না বাসে!

ওর স্ত্রী মালবিকাকেও অনেক দিন থেকে চিনি। ওর গানও আমার ভাল লাগে। ওরা দুজনেই আমার তৈরী কিছু রাগ ও বন্দিশ গায়। যোগকে আমি চিনি সেই লখনৌ থেকে, যখন যেতাম রেডিওর প্রোগ্রাম করতে '৪০-এর গোড়ায়। ও তখন চিদানন্দ নগরকর, এস সি আর ভাটপিনডে, দিনকর কাইকিনি —এদের সঙ্গে ম্যারিস কলেজে শ্রীকৃষ্ণ রতনজংকরজীর কাছে শিখছিল। তখন থেকেই যোগের সঙ্গে আমার খুব ভাব। ফরসা, লাল টুকটুকে গোল মুখে পান খেয়ে হেসে হেসে যখন বেহালা বাজাত, ভারি মিষ্টি লাগত। পরে ও বেশ জনপ্রিয় শিল্পী হয়ে উঠল। বাবার কাছেও তালিম নিয়েছে। মাইহারে আমি থাকতে দু-একবার এসেছিল। ভীষণ রগুড়ে। কতরকম গল্প, anecdo[te] না ছাড়ে গাইয়ে-বাজিয়েদের সম্বন্ধে! হাসিয়ে মেরে ফেলে। রাধুবাবুর সঙ্গেও এই সময়ে খুব ভাব হল। আমার, জ্ঞানদার ও রাধুবাবুর দেদার আড্ডা জমত। তাতে আদিরসাত্মক আলোচনা ও কিছুটা খিস্তি-খেউড়ও হত। ঠাট্টা হাসির মাঝ থেকে কিছু ক্রিয়েটিভ কাজও দাঁড়িয়ে যেত। ক'টা উদাহরণ দিই শুরু করি। জ্ঞানদার অনেক ছাত্রছাত্রী আসত, তার মধ্যে অনেকেই বেশ নাম করেছে। ললিতা তো জ্ঞানদার জীবনসঙ্গিনীই হয়ে গেছেন। একটি ছেলে আসত বেশ [illegible]। একটু [illegible]। সে একেবারে [illegible]

... ডিসকারেজ করেন ততই তার রোখ চেপে যায়। সে তবলা নিয়ে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে বসবেই আর আবোলতাবোল বাজাবেই। এক দিন, বোধ হয় '৪৬-এর কথা, তখন এদিকে-ওদিকে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা চলছে। এদিকে তবলার তালিম চলছে, হঠাৎ ছেলেটি ওর সেই ঝোল-টানা ও তোতলানো ঢঙে বলে উঠল, 'ওরে বাবা, সে কি রায়ট হচ্ছে আমাদের ঊদিকে! নেড়ে ধরে মেড়োকে কাটছে আর মেড়ো ধরে নেড়েকে কাটছে, নাক কাটছে, কান কাটছে।' ঠিক সেই সময়টা জ্ঞানদা কিছু নতুন শিক্ষার্থীকে বিলম্বিত লয়ে রেলা অভ্যাস করাচ্ছিলেন—ধেরে ধেরে কেটে তাক, নাগ ধেরে কেটে তাক। সেই ছেলেটিও বসে চেষ্টা করছিল তা বাজাতে। বাজাতে বাজাতে ওর এই অদ্ভুত কথা বলাতে সবাই হেসে উঠল। জ্ঞানদা কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে তাকে বললেন, আচ্ছা, এই যে বাজাচ্ছ এখন তুমি, এটা হচ্ছে riot-এর বোল। এই বলে বলে বাজাও—'নেড়ে ধরে কেটে রাখ, মেড়ো ধরে কেটে রাখ, কান ধরে কেটে রাখ, নাক ধরে কেটে রাখ।' বাকী সবাইয়ের তো তখন হাসি চাপতে অবস্থা কাহিল, কিন্তু সেই ছোকরা সিরিয়াসলি শুরু করল ওই রায়টের বোল দিয়ে তবলা বাজাতে। বিশ্বাস কর শংকর, আমি পরে দু-একবার জ্ঞানদার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি ও একলা বসে একটা ছোট ঘরে 'আপ্রাণ তবলা সাধনা' করছে সেই রায়টের বোল 'নেড়ে ধরে কেটে রাখ' দিয়ে। সেই থেকে আমি আর জ্ঞানদা শুরু করলাম কবিতা তৈরি করতে, শুধুমাত্র সেই শব্দ বা অক্ষর নিয়ে, যা নাকি তবলায় বা পাখোয়াজে ব্যবহার হয়। প্রথম আমি করলাম তিন তালে সম থেকে চক্রধার তেহাইয়ের হিসেবে। 'খেটেখুটে নিধু মদ টেনে কাদা ঘেঁটে গড়াগড়ি নর্দমায় কি ঘেন্না কি ঘেন্না কি ঘেন্না'; তিনবারে সমে আসবে। এর পর জ্ঞানদা তৈরি করলেন তিন তালে চক্রধার—'নগেনের গিন্নীর দাঁত কনকন মাড়ি টনটন মাথা ঘোরে ঘন ঘন কর্তাকে ঠোকে—খাঁদা-নেকো মর্কট গন্ডা গন্ডা খোকাখুকু, ধেনো তাড়ি টেনে ঢুকুঢুকু, দিনরাত নাক ডাকা ট্যাঁকে টাকাকড়ি নেই ডাক্তার ডাকা নেই মরি খেটে খেটে দূর দুত্তোর। ধেড়ে মন্দর গর্দান ধরে গোটা দু-তিন ধাঁই ধাঁই দে। ধেড়ে মন্দর গর্দান ধরে গোটা দু-তিন ধাঁই ধাঁই দে। ধেড়ে মন্দর গর্দান ধরে গোটা দু-তিন ধাঁই ধাঁই দে'। এইসব হত। তারপর ছাত্রদের শেখাবার জন্য এক হাতে চারটে আঘাত ঊরুর ওপর আর ঠিক সেই time value তে অন্য হাতে তিনটে আঘাত দেওয়া। অর্থাৎ একসঙ্গেই এক হাতে তিন মাত্রা ও অন্য হাতে চার মাত্রা দেখানো। শিক্ষার্থীদের সুবিধের জন্য মুখে তাদের বলাতেন, 'ঘর থেকে বাইরে যা'।

আমি তার হিন্দী সংস্করণ করলাম 'নাগপুরী সন্তরা'। আমার একটা রচনা জ্ঞানদা ও রাধুবাবু quiz বা ধাঁধা হিসেবে তাঁদের ছাত্রদের এখনও শেখান। 'একটি গোলাপগাছে ফুটিয়াছে দুটি ফুল। তার মাঝে কুঁড়ি এক, হায়, কি বাহার কি বাহার কি বাহার!' অর্থাৎ তিন তালের সম থেকে শুরু করতে হবে, আর শেষ বাহারের 'হা'-টা যেন সমেতে পড়ে।

তারপর কি কি জলসাই না হয়েছে ঐ বাড়ির উঠনে, মাথার ওপর তেরপল টাঙিয়ে! 'ঝংকার' মিউজিক সারকেলের জন্য বার দুয়েক তো আমিই বাজিয়েছি। তারপর বড়ে গুলাম আলি, আমির খাঁ, বিলায়েত খাঁ, আলি আকবর খাঁ—সবাইয়েরই কত ভাল ভাল প্রোগ্রাম শোনা গেছে সেখানে। একটা উল্লেখযোগ্য জলসা সারা রাত্রিব্যাপী হয়েছিল, কখনও ভুলব না। শুধুমাত্র তবলার আসর। কণ্ঠে মহারাজ, আহমেদ জান থিরকোয়া, আনোখেলাল, কেরামত খাঁ, আল্লা রাখা, শামতা প্রসাদ—কেউ বাদ যায়নি। পর পর সকলেই বাজিয়েছিলেন। কাজেই, বুঝলে—জ্ঞানদার বাড়িতেই কলকাতায় শেষ এইরকম আখড়া দেখা গেছে। গান-বাজনায় আর ভবিষ্যতে কোথাও এমনটা হবে বলে মনে হয় না। ওঁর creative side টাও কি অদ্ভুত লয়দার এবং সুরেলা। এরকম তো দেখাই যায় না। তবলায় ওঁর কত যে উঁচুদরের রচনা আছে তা শুধু তবলিয়ারাই বুঝবে। তা ছাড়া হিন্দীতে অফুরন্ত ভাল ভাল খেয়াল, ঠুংরী, গীত ও ভজন ওঁর আছে। আর বাংলা গান? আহা, কি চমৎকার সব কম্পোজিশন! ফিল্মেও ভাল ভাল সুর দিয়েছেন। কত যে versatile! কিন্তু ভাবি, এক-একজনের ভাগ্য বা stars কেন যে কাজ করে না! বাংলায় বা ভারতে জ্ঞানদার দাম কেউ দিলে না। ওঁর ন্যায্য নামযশ উনি পাননি। শুধুমাত্র কিছু গুণী ও জ্ঞানীই ওঁর গুণমুগ্ধ। অবশ্য কানাই দত্ত, শংকর ঘোষ প্রমুখ ওঁর কিছু ছাত্র তবলায় খুব নাম করেছে। বাংলায় তবলার উৎকর্ষের পেছনে জ্ঞানদার দান সবচেয়ে বেশী। এইরকম লয়দার লোক কলকাতায় বাঙালীর ভেতর অন্তত আমি দেখিনি। তেমনি ওঁর সংগ্রহ ও জ্ঞান। সুরেলা লোক তো প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে বাংলায়—যেখানে শ্রোতারা সুরের পাগল। কিন্তু এই কিছু দিন আগে অবধি, সত্যি বলতে কি, খুবই কম দেখেছি যাঁরা কিনা সত্যিকার তালাধ্যায়ের, বিশেষ করে লয়ের সূক্ষ্মতা ও চুলচেরা ভাগ-বিভাগ বোঝেন, তার অসম্ভব বৈজ্ঞানিক বা আঙ্গিক দিকটা এবং তার ভেতরের যে ছন্দের দোলা তার রসগ্রহণ করতে পারেন। (ক্রমশ)

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৭ ॥

রাজনারায়ণ দত্তের শয্যাকণ্টকী হয়েছে। একটুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকলেই তাঁর সর্ব শরীরে জ্বালা ধরে, তৎক্ষণাৎ উঠে ছটফটিয়ে বেড়ান। সমস্তক্ষণ শরীরে এতটা অস্থিরতা, বসে থাকলে মনে হয় পায়চারি করলে ভালো লাগবে, আবার তাতেও একটু পরেই ক্লান্তি বোধ হয়, তখন ইচ্ছা হয় বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে। কিন্তু তারও উপায় নেই।

রাতের পর রাত ঘুম নেই। রাজনারায়ণ দত্তের বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, তাঁর অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্রোধ। এত অপমানিত তিনি জীবনে আর কখনো হননি।

আজ বৈকালেই রাধুটিয়ার জমিদার স্বয়ং এসেছিলেন তাঁর গৃহে। সেই মানুষটি মাত্র এই কয়েকদিনেই একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গেছেন। শত অনুরোধেও তিনি বৈঠকখানায় এসে আসন গ্রহণ করলেন না। ল্যান্ডো থেকে নেমে এসে তিনি রুপোর মোড়া ছড়িখানিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বারের কাছে। রাজনারায়ণ দত্ত অতি বিনীত ভাবে তাঁকে বলেছিলেন, যা হবার তা তো হয়ে গ্যাচেই, আসুন আপনার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আমি একটু জুড়োই।

সেই শীর্ণকায় বৃদ্ধ বিকৃত-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, না, আপনাকে শুধু একটা কথা শুধোতে এলুম। দত্তজা, আপনি জেনে শুনে আমার এ সর্বনাশ করলেন কেন?

রাজনারায়ণ দত্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। 'জেনে শুনে'? রাজনারায়ণ দত্ত জেনে শুনে কথার খেলাপ করবেন? তিনি একজন সাধারণ ফড়ে-দালালের মতন মিথ্যাবাদী?

তিনি সেই বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে যেন সোজা তাকাতে পারছেন না। কোনোক্রমে বললেন, মহাশয়, আপনার সর্বনাশ হয়েচে, আমার হয়নি? আমার আর পুত্র নেই, যদি থাকতো, তবে আপনার সম্মান বাঁচাবার জন্য....

রাধুটিয়ারাজ পুরো কথা শুনলেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেছন ফিরে ধীরে ধীরে গিয়ে আবার ল্যান্ডোতে চড়ে বসলেন। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে বিদায় জানাতে পর্যন্ত পারলেন না, রাধুটিয়ারাজ [illegible]

করছেন প্রাণপণে।

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ি বয়ে এসে কেউ এমনভাবে কখনো অপমান করে যাবার সাহস পায়নি। অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর মস্তক ঘূর্ণিত হতে লাগলো। তিনি যেন জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে যাবেন।

রাধুটিয়ার জমিদারের সর্বনাশের জন্য রাজনারায়ণ দত্ত দায়ী তো বটেই। ওঁর কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে রাজনারায়ণ নিজের পুত্র মধুর বিবাহ ঠিক করেছিলেন। পাটীপত্র হয়ে গেছে, বিবাহের দিনও ধার্য হয়েছে। আর মাত্র বাইশ দিন বাকি। কন্যাপক্ষ নিমন্ত্রণ পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিবাহ ভেঙে যাওয়ায় সেই কন্যার নামে কলঙ্ক রটে গেল। আর ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হবে? এই অনাপূর্বা পাত্রীর জন্য আর কোনো সদ্বংশজাত পাত্র পাওয়া যাবে না।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে রাজনারায়ণ দত্ত মধ্যে মধ্যে আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন। যেন তাঁর সর্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন হচ্ছে। এ সময় তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই। পত্নী জাহ্নবী তো ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন। তাঁকে আর বাঁচানো যাবে কিনা কে জানে! এত স্নেহ, ভালোবাসা, প্রশ্রয় দিয়েছিলেন মধুকে, অথচ সে তার পিতার মান-সম্মান সব ধুলোয় লুটিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করলো না?

রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন মধুর খোঁজে চতুর্দিকে ছুটোছুটি করছে কয়েকদিন ধরে। তিন দিন আগে মধু খৃস্টান হয়ে গেছে, তা আর কিছুতেই রোধ করা যায়নি। প্যারীমোহন তবুও চেষ্টা করছে যদি মধুকে এখনো বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যায়।

সকালবেলা সে এসে উঁকি মারলো রাজনারায়ণ দত্তের কক্ষে। সারা রাত্রি চোখের পাতা জোড়েনি, বিধ্বস্ত চেহারায় একটি কৌচে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে আছেন তিনি।

প্যারীমোহন মৃদুকণ্ঠে বললো, বড়খুড়ো, একটা কথা কইবো? একবার কৃষ্ণমোহনবাবুকে ডাকি? উনি আসতে রাজি হয়েছেন।

রাজনারায়ণ দত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, কৃষ্ণমোহন? ঐ কোলে ক্রেস্তানটা? ও আমার বাড়ির দিকে এলে আমি পাইক লেলিয়ে ওর হাড় গুঁড়ো করে দেবো!

প্যারীমোহন বললো, আজ্ঞে, এখন আর মিছা-মিছি রাগ করে কী হবে। যা হবার তো হয়েইচে। এখন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের সাহায্য নিলে মধুর খোঁজটা অন্তত পাওয়া যায়।

—রেভারেন্ড? ছোঃ! ও ব্যাটা বামুনের ঘরের চাঁড়াল। পয়সার লোভে জাত খুইয়েচে।

—তবু ওনার কথা সাহেবরা মানে-গোনে!

—ওর নাম আমার সামনে আর কখনো উচ্চারণ করিস না, প্যারী! আমার আর মাথা গরম করিয়ে দিসনি!

—যত দূর সন্ধান পেয়েচি, মধু অ্যাখুন পাদ্রী ডিয়ালট্রি সাহেবের বাড়িতে রয়েচে। আমি যদি পারি, একবার তাকে বাড়িতে নিয়ে আসবো?

—না।

—বড়খুড়ো, একবার মধুর জননীর কথা ভেবে দেখুন। তিনি যে দিনরাত হা মধু, কোথায় মধু কচ্চেন আর মুচ্ছো যাচ্ছেন! ওনাকে বাঁচাবার কথাটি একবার ভাববেন না?

—তুই ছেলেমানুষ, প্যারী। তুই সব বুঝিস না, সে আসবে না? তুই কেন উপযাচক হয়ে মান খোয়াতে যাবি? তুই জানিস না, কেল্লার মধ্যে সে যখন সাহেবদের কোলে বসেছেস, তখন আমি আমার বন্ধু ভূকৈলাশের রাজা সত্যসরণ ঘোষালকে পাঠিয়ে-ছেলুম। এমন বেয়াদপ ছেলে যে তাঁর সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলে না। অতবড় একটা মানী লোক মুখ চুন করে ফিরে এলেন!

—মধু আমাকে ফেরালে তো আর আমার মান

মারধোর করবেন না বলুন? আপনি কথা দিন।

—তুই পারবি নি। কেন মিছিমিছি হয়রাণ হবি।

—সে দায়িত্ব আমার। চেষ্টা তো করতে হবে এর মধ্যে মধু কবে ফস করে বিলেত পালিয়ে যায় তার ঠিক আচে কি? কৃষ্ণমোহনবাবুর বাড়িতে আর দু-তিন জন ভদ্দরলোক বসে ছেলেন। বলাবলি করছেলেন যে মধুর তো তেমন খৃস্টান হবার আগ্রহ ছেল না। বিলেত যাবার দিকেই ওর ঝোঁক পাদ্রীরা ওকে বিলেত পাঠাবে বলেই....

রাজনারায়ণ দত্ত এবার গর্জে উঠলেন। সামান্য স্বার্থের জন্য কেউ বংশানুক্রমিক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারে, এই চিন্তাই তাঁকে বেশী পীড়া দেয়।

—পাদ্রীরা ওকে বিলেত পাঠাবে? কেন, আমার পয়সা নেই? আমি ওকে সাতবার বিলেত ঘুরিয়ে আনতে পারি, সে ক্ষমতা আমার আছে। কেন পাঠাইনি জানিস? সে তার মাকে একদিন কী বলে-ছেল তুই শুনিস নি? বাঙালী মেয়েদের চেয়ে নাকি ইংরেজ মেয়েদের রূপ-গুণ একশো গুণ বেশী! দিনের পর দিন স্নান করে না। গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, সেই নাক লাগা ইংরেজ মাগী-গুলো আমাদের বাঙালী মেয়েদের চে ভালো? হিন্দু মেয়েরা নেকাপড়া শেকে না। মাথায় ঘোমটা দেয়। পায়ে জুতো ইস্টাকিন দিয়ে বিবি সেজে পথে পথে ধেই ধেই করে বেড়ায় না বলে মধু তাদের যে কয়েকে না বলেছেল। এই অবস্থায় ওকে বিলেত পাঠালে আর রক্ষে ছেল? ও সেখানেই এক বেড়ালমুখীকে বে করে ফেলতো না? তাহলেও তো সেই জাত খোয়ানোই হতো। সেই জন্যই আমি ভেবে রেখে-ছিলুম, আগে জোর করে ওর বেটা দি, হিন্দু কলেজেও এক বছর পড়া বাকি আছে, সেটা সেরে নিক, তারপর না হয় বিলেত পাঠানো যাবে! তার আগেই ছেলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত করলে!

প্যারীমোহন বললো, মধুর ঐ তো দোষ, বড় চঞ্চল। আমি যেমন ভাবে পারি বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক আনবো। খৃস্টান হয়েছে বলে কি ওকে বাড়ি ছাড়া করতে হবে? হাজার হোক, ও তো আমাদেরই মধু। প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার মধুকে স্বজাতে নিয়ে আসবো। আপনি যেন অমত করবেন না। অন্তত খুড়ীমার মুখ চেয়ে—।

এদিকে মধু আর্চবিশপ ডিয়ালট্রির বাড়িতে মহা আনন্দেই রয়েছে। এখন শহরের যাবতীয় মানুষ শুধু তার কথা নিয়ে মেতে আছে, এতেই মধুর রক্তে এত উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সমস্ত সংবাদপত্রে তার খবর। খৃস্টান তো আরও অনেকেই হয়েছে। কিন্তু সোসাইটি ও সাহেব মহলে এতখানি হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করতে পেরেছে আর কে, সে, মধুসূদন দত্ত ছাড়া?

'কবিতার জন্য পিতামাতাকেও পরিত্যাগ করতে হয়', কবি পোপের এই বাণী সে তার জীবনে সার্থক করে তুলেছে। তার বন্ধুরা ভেবেছিল সে পারবে না। পারবে না? ওরা মধুকে এখনো চেনে না। রাজনারায়ণ দত্ত ভেবেছিলেন জোর করে তার বিয়ে দেবেন। রাজনারায়ণ দত্ত ছেলেকে এখনো চেনেন নি।

তবু বন্ধুদের জন্যই মধুর একটু একটু মন কেমন করে। বিশেষত গৌরের জন্য। গৌরকে একদিনও সে চোখের দেখা না দেখে থাকতে পারতো না। গৌরের সঙ্গে তার অনেক গল্প বাকি আছে। গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হয়ে গেল এর মধ্যে, নিশ্চয়ই সেই উপলক্ষে বন্ধুরা দারুণ মজা করেছে।

গৌরকে সে আসতে বলেছিল, তবু সে আসে না কেন? গৌর কি তার উপরে এখনো ক্রুদ্ধ হয়ে আছে? না, না, বাকি পৃথিবীর যে যাই বলুক, তাতে মধুর কিছু আসে যায় না। কিন্তু গৌর যদি তাকে ভুলে যায়, তাহলে সে আঘাত মধু সইতে পারবে না।

কাগজ-কলম নিয়ে মধু গৌরকে একটা চিঠি লিখতে বসলো।

৩ মাসের, পর শুধু দুধই যথেষ্ট নয়

ফ্যারেক্স®

আপনার শিশুর আদর্শ শক্ত আহার

ডাক্তাররা ফ্যারেক্স খাওয়াতে বলেন ! কেন ?

কারণ এটি এক নিখুঁত সুষম আহার,— আপনার বাচ্চা শক্ত আহার শুরু করতেই ওর যা যা দরকার এটি তা যোগায়, আর কচি বাচ্চার কোমল হজম শক্তির পক্ষেও এটি খুব ভাল।

বাচ্চার চাহিদা মেটাবার পক্ষে ফ্যারেক্স চমৎকারভাবে সুষম কেন ?

আপনার বাচ্চার মস্তিষ্ক আর শরীরের বিকাশের জন্য প্রোটিন দরকার : ফ্যারেক্স সঠিক আর সহজে হজম করার প্রোটিন যোগায়। আপনার বাচ্চার শক্তি দরকার : ফ্যারেক্স যে কার্বোহাইড্রেট যোগায় তা থেকে আপনার বাচ্চা অবিরত শক্তি সংগ্রহ করবে।

জন্মের সময় আপনি ওকে আয়রণ যুগিয়েছিলেন, যা ও ৩ মাসের মধ্যেই নিঃশেষ ক'রে ফেলবে। আপনার বাচ্চার চাহিদা পূরণ করার জন্য আর ওর রক্ত সুস্থ রাখার জন্য ফ্যারেক্সে আছে পর্য্যাপ্ত আয়রণ। এ ছাড়াও ফ্যারেক্সে আছে পর্য্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফোরাস আর ভিটামিন ডি যা'র দৌলতে আপনার বাচ্চার গ'ড়ে ওঠে মজবুত হাড় আর শক্ত দাঁত।

৩ মাস থেকেই কেন ?

৩ মাসে পড়তেই আপনার বাচ্চার চিবিয়ে খাওয়া শেখা দরকার, নয়ত পরে আপনি ওকে যে শক্ত আহার দেবেন ও হয়ত তা গিলে খেতে শুরু করবে। এতে ওর পেটে ব্যথা হবে এবং শরীরের বিকাশও ভাল হবে না। ফ্যারেক্স আপনার বাচ্চাকে চিবিয়ে খাওয়া শিখতে সাহায্য করবে আর খাবার ঠিকমত সে হজমও করতে পারবে।

তাছাড়া, ৩ মাসে ওর হজমশক্তি এখনও কোমল। আর তার জন্যই আপনার বাচ্চার দরকার বিশেষভাবে তৈরী শিশুদের শক্ত আহার— এমন আহার যা ও **সহজে** হজম করতে পারবে। তাছাড়া, গতানুগতিক খাবার সব সময় বিজ্ঞানসম্মতভাবে সে রকম সুষম হয় না যা থেকে আপনার বাচ্চা ওর সবচেয়ে জরুরী চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে : যেমন, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফোরাস, ভিটামিন ডি এবং বিশেষ ক'রে সঠিক পরিমাণ আয়রণ।

কখন থেকে ওকে 'বড়দের' খাবার খাওয়াতে শুরু করব ?

যখন প্রথম হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করবে। এ সময় থেকেই ও 'বড়দের' খাবার গ্রহণ করতে শুরু করবে, আর এসময় থেকেই ওকে ফ্যারেক্স দিন মল্ট নির্য্যাসের সঙ্গে। একটু কল্পনার সাহায্যে আর আপনার স্নেহ উজাড় ক'রে ওর সমস্ত খাবারের সঙ্গেই ফ্যারেক্স মেশা...।

এখন সেই একই গুণেভরা ফ...রেক্স আপনি পাবেন নতুন ২০০ গ্রাঃ কার্টন প্যাকেও। এতে সাশ্রয় অনেক...এতে গুণও অনেক !

শিশুদের প্রথম শক্ত আহার—সব দিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য

লিনটাস-GLF.60-2415 BG

[illegible] না। অতএব বাংলা অক্ষরও লিখবে না সে। এখন সে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ইংরাজদের সমতুল্য হয়েছে, এখন তো আর ঐ নেটিভদের সামান্য ভাষা ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

'ও গৌর, দু-চার দিনেতেই এত!!!' এই বাক্যটি সে প্রথমে লিখলো রোমান হরফে। তারপর ইংরেজিতে চিঠি শুরু করলো, "তুই যদি সত্যিই আমায় দেখতে চাস, তাহলে এখানে, এই ওলড চার্চ মিশান রো-তে চলে আয়। তুই নিশ্চয় জানিস, তোর গাড়িভাড়া নেই। ঠিক আছে, একটা পাল্কি ভাড়া করে সোজা চলেই আয় না, আমি ভাড়া মিটিয়ে দেবো। আমার কাছে এখানে ঢের ঢের টাকা রয়েছে। মিঃ কার-এর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আয়....।"

বাই, ব্রাইটেস্ট গৌর দাস, ওল আ হায়ার্ড পাল্কি

অ্যান্ড সি দাই অ্যাংকশাস ফ্রেন্ড, এম এস ডি

সে চিঠি পেয়েও গৌর এলো না। মধুর মন খারাপ ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হতে লাগলো। এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছে সে, এত উৎসাহ উদ্দীপনা, এ সব কথা কি গৌরকে না জানালে চলে?

সে আবার একটি চিঠি লিখলো :

প্রিয় বন্ধু আমার, এক কবি তাঁর প্রেয়সীকে বলেছিলেন, "ক্যান আই সীয় টু লাভ দী! নো।" সেই কথাই আমি বলছি, আমার এক প্রিয়তর জনকে, এক বন্ধু, খাঁটি, (কী দুর্লভ এ জিনিস); খাঁটি বন্ধুকে। ....তুই কেমন আছিস? কখনো ভাবিস না যে আমি তোকে ভুলে যাবো—তুইও যেন আমায় ভুলিস না। ....কবিতা লিকচি........কোথায় ছাপা হবে জানিস খোদ লন্ডনে। ভাবতে পারিস? বেণীর সঙ্গে দেখা হয়? কী আশ্চর্য ব্যাপার, বেণীকে আমি পছন্দ করি না, বেণীও আমায় দেখতে পারে না, অথচ কদিন ধরে বেণীর কথা বার বার মনে পড়চে। অন্য বন্ধুদের কথাও প্রায়ই ভাবি....... ভূদেব মেডেলটা পেয়েচে? ....তুই আসচিস নি কেন একবার। আয়, গৌর আয়, পাল্কি ভাড়া করে আসিস। আমি তো বলিচিই....

গৌরদাস এরপর এলো বটে, কিন্তু সঙ্গে প্যারীমোহনকে নিয়ে। প্যারীমোহন এর আগেও দু একবার এসেছে মধুর কাছে কিন্তু তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। প্যারী খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল, গৌরদাসের কথাতেই মধু বশীভূত হতে পারে। সেইজন্য সে গৌরদাসের সঙ্গে এসেছে।

মধু ছুটে গিয়ে গৌরকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও পশ্চাতে প্যারীমোহনকে দেখে থমকে গেল। ক্রুদ্ধ কোপের সঙ্গে বললো, প্যারীদাদা, তুমি ফের এয়েচো? আমি তো বলেই দিয়িচি, তোমাদের ও প্রস্তাব আমি মানবো না, মানবো না, মানবো না! তোমাদের কথা মতন আমি বিলেত যাওয়া এখন স্থগিত রেখিচি, তোমরা আর কী চাও?

প্যারীমোহন বললো, মধু, তুই একবারটি অন্তত বাড়ি চ।

মধু বললো, এ বাড়িতে আমায় মধু মধু বলে ডেকো না। এখন আমার নাম মাইকেল।

বলেই সে হা হা করে উচ্চশব্দে হেসে উঠলো। দুরন্ত শিশুর মতন হাসি। যেন সে কোনো অভিনব ফন্দীতে গুরুজনদের জব্দ করেছে।

গৌর বললো, মধু, তোর মাকে আমি কথা দিয়িচি, তোকে একবার নিয়ে যাবো।

মধু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, গৌর, তুই অন্য যা কিছু অনুরোধ কর, শুধু ও কথা বলিস নি।

—কেন, এটা কি অন্যায় অনুরোধ?

—এ সব তুই বুঝবিনি।

প্যারীমোহন বললো, খুড়ী ঠাকুরানীর কষ্ট যে আমরা চোখে দেখতে পারি নে আর। শোকে দুঃখে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গ্যাচেন। মধু, তোর একবারও ইচ্ছে করে না অমন স্নেহময়ী জননীকে দেখে আসতে?

মধু উত্তর দিল, প্যারীদাদা, তুমি প্রতিদিন

গৌর বললো, মিস্তার মাইকেল এম এস ডাট, তুমি যদি আর আমার কথা না শোনো, তবে আমায় এখানে আসবার জন্য পেড়াপীড়ি করো কেন? আমি আর আসবো না।

মধু গৌরের হাত চেপে ধরে বললো, তুই মিথ্যেই রাগ করচিস গৌর। তুই সব জানিস না। মাকে দেখতে আমার সাধ হবে না কেন? আমিও তো মায়ের হাতের পাখার বাতাস খাবার জন্য ছটফট করচি। এই বসন্ত ঋতুতেই কেমন ঘাম ছুটচে দেকচিস তো। পাঙ্খা পুলার যতই হাওয়া করুক কিন্তু আমার মায়ের হাতপাখার বাতাস যেমন ঠান্ডা, তেমন আর কিছুই না। কিন্তু আমি বাড়ি গেলেই বাবা পাইক প্যায়দা দিয়ে আমায় আটকে দেবেন।

প্যারীমোহন সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, ঠাকুরখুড়ো নিজে আমায় কথা দিয়েচেন। কেউ তোকে আটকাবে না।

গৌর বললো, আমি দায়িক রইলুম, তুই আবার ইচ্ছে মতন ফিরে আসবি।

মধু বললো, তুই ভেবেছিলি, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (?) ডিয়ালট্রি সাহেব এদেশে এয়েচিলেন বলেই আমি খৃষ্টান হয়েচি। তোর এ ধারণা ভুল। তোরা জানিস, আমার উপর জোর করে কিছু করিয়ে নেবার সাধ্যি কারুর নেই। পরম পিতা যীশুর পাদপদ্মে আমি নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছি স্বেচ্ছায়। আমি কারুর জোর-জবরদস্তি মানি না।

—বেশ মানলুম। তুই তা হলে মাকে দেখতে যাবি কি না?

—যাবো।

প্যারী তৎক্ষণাৎ ওঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের পাল্কিওয়ালাটা চলে গ্যাচে বোধ হয়। আর একটা পাল্কি ডেকে আনি?

মধু বললো, রও, রও, প্যারীদাদা, অমন হটমট করচো কেন? যাবো বলে কি এখুনি যাবো? আজ চর্চে একটা মেমোরিয়াল সার্ভিস রয়েছে, সেটা অ্যাটেন্ড করতেই হবে। তারপর, কাল, না, কালও হবে না। ক্যাপটেন রিচার্ডসন কাল এখানে ডিনার খেতে আসচেন। পরশু যেতে পারি। ধরো, পরশু, সকাল এগারোটায়।

গৌর বললো, তুই বুঝি তোর মায়ের সঙ্গেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে যেতে চাস?

—অফ কোর্স? হোয়াই নট?

—চার্চে মেমোরিয়াল সার্ভিস তো সন্ধ্যাকালে। এখন এই সকালবেলা, তোর যেতে আপত্তি কী? তুই এখন যেতে চাস তো বল, নইলে তোর যা খুশী করিস!

মধু কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর আপন মনে বলে উঠলো, বিকজ আই লাভ, রেসপেক্ট অ্যান্ড অনার দী, অ্যান্ড থিংক ইউ আর আ ম্যান অফ অনেস্টি? ঠিক আছে, চল!

কেউ একটুও অতিরঞ্জিত করে বলেনি, জাহ্নবী দেবী তখনও নিজ কক্ষের ভূমির ওপর বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। খোলা চুল লুটোচ্ছে পাশে। তাঁর একটি হাত যেন শক্ত সিমেন্টের মেঝেকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

জুতো না খুলেই মধু দ্রুত এসে কাছে বসে পড়ে ডাকলো, মা!

সেই ডাকে যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলো। যেন প্রবল একটি আঘাতে জাহ্নবী তড়াক করে উঠে পড়ে ভয়ার্ত গলায় বললেন, কে?

পর মুহূর্তেই ঘোর কেটে গেল। তিনি পুত্রকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদিনীর মতন বলতে লাগলেন, মধু, মধু, মধু, মধু। মধুও সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো, মা, মা, মা, মা।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর জাহ্নবী তাঁর হৃদয়ের নিধির দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ম্লান গলায় বললেন, বাছা, তুই আমার এমন দাগা দিলি? দিতে পারলি?

মধু বললো, মা, দ্যাখো, আমি তো তোমার সেই মধুই রয়িচি। আমার চোখ, মুখ, কান, হাত পা কিছুই কি বদলেচে? আমি কি অন্য রকম কথা

[illegible]। কিন্তু তোমার ছেলে তো তোমারই রয়েছে, মা!

—ওরে, কত মানুষের ছেলেদের যমে কেড়ে নিয়ে যায়। তোকে সাহেবরা কেড়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে।

—আমায় কেউ কেড়ে নেয়নি। এই দ্যাখো না, আমি নিজের ইচ্ছেতে এসেছি তোমার কাছে।

—তুই আবার চলে যাবি?

প্যারীমোহন গিয়ে খবর দিয়েছিল রাজনারায়ণ দত্তকে। প্রথমে তিনি আসতে চাননি, ছেলে এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তবে তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন। প্যারী প্রায় হাতে পায়ে ধরে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁকে একবার নিয়ে এলো। কেন না, প্যারীর ভয় ছিল, মধু শুধু তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছে, হয়তো শুধু মাকে দেখেই চলে যাবে। তাতে রাজনারায়ণ দত্ত আরও অপমানিত হবেন।

দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ালেন রাজনারায়ণ দত্ত। তাঁর ছায়া এসে পড়লো মধুর শরীরে। রাজনারায়ণের মুখে উৎকট গাম্ভীর্য মাখানো। যেন সেই গাম্ভীর্য দিয়েই তিনি তাঁর আহত অহংকার ঢাকতে চান। মধুও ঘাড় শক্ত করে রইলো।

মাত্র বৎসরকাল আগেও পিতা ও পুত্র ছিল দুই বন্ধুর মতন। আর এখন যেন মুখোমুখি দুই যুযুধান।

রাজনারায়ণ রুক্ষ স্বরে বললেন, আমি পুরুত বামুনদের সঙ্গে কথা কয়েছি। প্রায়শ্চিত্ত করাবার কোনো অসুবিধে হবে না। তারা নিদেন খুঁজে বার করেছে। দু-পাঁচ শো বামুনকে শাল-দোশালা দিয়ে একদিন পেট পুরে খাইয়ে দিলেই হবে। আর তোকে এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পঞ্চগব্য খেয়ে দুটো চারটে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। শুভস্য শীঘ্রং, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি, এ হপ্তার মধ্যেই সব হয়ে যাবে।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে বলে উঠলো, বাবা, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন, যদি আকাশে চন্দ্র সূর্য না ওঠে, যদি পুবের বদলে পশ্চিমে সূর্যের উদয় হয়, তা হলেও আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো না। আমি নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মতে খৃস্টান হয়েছি। আমি বর্বর হিন্দু সমাজ ছেড়ে সুসভ্য ইংরাজদের সমকক্ষ হয়েছি।

ক্রোধে রাজনারায়ণের শরীর কম্পিত হতে লাগলো। তিনি বললেন, দূর হয়ে যা। আর কোনোদিন যেন তোর মুখ আমায় দেখতে না হয়!

লম্বা অলিন্দ ধরে হাঁটতে লাগলেন রাজনারায়ণ। বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, ও আমার ছেলে নয়! ও আমার কেউ নয়। বিধর্মী, ও কাল-সর্প। ওকে তিনি মন থেকে মুছে ফেলবেন। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে রাজনারায়ণ আবার ভাবলেন, আমার পুত্র নেই। আমি মলে আমার মুখাগ্নি করার কেউ রইলো না। আমাকে পুন্নাম নরকে যেতে হবে।

মুখমণ্ডল কঠিন করে তিনি সেইক্ষণেই শপথ নিলেন, তিনি আবার বিবাহ করবেন। আর একটি পুত্র সন্তান তাঁর চাই-ই চাই।

মধুর বেশ সুবিধেই হয়ে গেল। পিতার এবম্বিধ কঠিন ব্যবহার গৌর প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং এ রকম একজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী থাকার ফলে অন্যান্য বন্ধু ও শুভার্থীদের কাছে মধু এর পর থেকে অনায়াসেই বলতে পারে, পিতা চান না, সে বাড়ি ফিরবে কী করে? মাঝে মাঝে গৌর লুকিয়ে চুরিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং মুঠো মুঠো টাকা পকেট ভরে নিয়ে যায়। বিলাসিতা তার অহংকারের আশ্রয়। প্রচুর অর্থ না থাকলে তার স্বস্তি হয় না।

প্রথম কিছুদিন তার অসুবিধে হলো পড়া-শুনোর ব্যাপারে। শিক্ষা অর্জনে তার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু হিন্দু কলেজে তার প্রবেশ অধিকার নেই। হিন্দু ছাড়া আর কোনো ছাত্র সেখানে পড়তে পারে না। বেশ কয়েক মাস মধু বিভিন্ন পাদ্রীদের গৃহে লাগলো। এই যুবকটির মেধা ও আগ্রহ দেখে বহু সাহেবই মুগ্ধ ও বিস্মিত। তাঁরাই পরামর্শ দিলেন মধুকে বিশপস কলেজে ভর্তি হবার জন্য।

বিশপস কলেজে আবাসিক ছাত্র হওয়া রীতি-মতন ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রতি মাসে ষাট টাকা করে লাগে। মায়ের কাছ থেকে নিয়মিত এত টাকা পাবার সম্ভাবনা নেই, তাই মায়ের মারফৎ কথাটা সে তার পিতার কানে তোলালো। রাজনারায়ণ দত্ত নিজের পুত্রকে অস্বীকার করলেও লোকে এখনো মধুকে বলে, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে। এর পরেও মধু যদি পাদ্রীদের কাছে ভিক্ষাজীবী হয়, তাতে রাজনারায়ণেরই মান ক্ষুন্ন হবে। পত্নীর হাত দিয়েই তিনি পুত্রের জন্য মাসিক একশো টাকা বরাদ্দ করে দিলেন।

বিশপস কলেজে মধু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাত্র। সেখানে খাঁটি ইওরোপীয় যুবকেরা পড়ে, আর রয়েছে কিছু দেশীয় খৃস্টান। নিঃসন্দেহে এদের সকলের মধ্যে মধু সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। ক্ল্যাসিকাল ল্যাঙ্গোয়েজ বিভাগে মধু গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু এবং সংস্কৃত শিক্ষা করতে লাগলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে। ভাষা শিক্ষায় তার দ্রুত কৃতিত্বে শিক্ষকরা মুগ্ধ। আবার এই মধুই এক একদিন ক্লাসে অসম্ভব দৌরাত্ম্য করে। কলেজের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রায়ই। সন্ধ্যাকালে সে বিলাসী পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে প্রমোদ সন্ধানে যায়, যখন ফেরে, তখন তার মস্তক ও পদদ্বয় টালমাটাল।

কলেজে ভর্তি হবার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই মধু একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুললো। সে দেখলো যে, ইওরোপীয় ছাত্র ও দেশী খৃস্টান ছাত্রদের দু রকম পোশাক। সে ভেবেছিল, খৃস্টান ধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই, মানুষে মানুষে সব ভ্রাতৃত্বই এই ধর্মের সার কথা। তবে দু রকমের পোশাক কেন?

মধু ইওরোপীয় ছাত্রদের মতন কালো ক্যাসক, কোমরবন্ধ ও চতুষ্কোণ টুপী পরিধান করে ক্লাসে এলো একদিন। সব ইওরোপীয় ছাত্ররা আড়চোখে দেখতে লাগলো তাকে। শিক্ষক মহাশয় পড়ানো বন্ধ করলেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছুটে এলেন। তিনি মধুকে বললেন, প্রিয় বৎস, যদি ক্যাসক পরিধান করিতেই চাও তো সাদা রঙের পরিধান করিও।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না, মহাশয়। হয় ইওরোপীয় পোশাক পরিধান করিব, নয় তো আমার পছন্দ মতন দেশীয় পোশাক।

অধ্যক্ষ বললেন, বেশ, দেশীয় পোশাকেই আসিও।

মধু মুচকি হেসে তখুনি মনে মনে মতলোব ভেঁজে নিল। এবং পরদিন ক্লাসে সে বাধিয়ে দিল আরও এক হুলস্থূল কাণ্ড। এবং পরদিন লেখাপড়া সব মাথায় উঠলো, সমস্ত কলেজের ছাত্ররা ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখতে লাগল মধুকে। সেদিন মধু পরেছে সাদা সিল্কের জাব্বা, গলায় বহু রঙের কাজ করা শালের স্কার্ফ এবং মাথায় উকিলদের মতন বিরাট রঙীন পাগড়ি। মধু যেন সেদিন কোনো গো অ্যাজ ইউ লাইক প্রদর্শনীর নায়ক। আবার ছুটে এলেন অধ্যক্ষ।

এমন ছেলেকে একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ে রাখা নিরাপদ নয়। অধ্যক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুকে নিয়ে একটি সভায় বসলেন। সেদিনই মধুর নাম কাটা যেত, কিন্তু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শ দিলেন, মধুর ওপর যদি এমন কঠোর নীতি প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এর পর আর সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের খৃস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা সুদূর পরাহত হবে। অনেক বিচার বিবেচনা করে কর্তৃ-পক্ষ কৃষ্ণমোহনের পরামর্শই মেনে নিলেন। মধু ইওরোপীয় ছাত্রদের মতনই পোশাক পরবার অনুমতি পেল।

এরপর মাইকেল এম এস ডাট পাক্কা সাহেব। ক্লাস করবার সময় তার পাদ্রীদের মতন পোশাক আর তার সায়ংকালীন প্রমোদযাত্রায় ইংলিশ কোট ও মাথায় বাঁকার হ্যাট।

আবার একদিন অধ্যক্ষ নিজ কক্ষে ডেকে পাঠালেন মধুকে। ঈষদুষ্ণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন হেসেছিলে কেন?

মধু বললো, আমাদের মাননীয় পাদ্রী বাংলা-ভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন কিনা!

অধ্যক্ষ ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি নিজে বঙ্গ বাসী, তবু বঙ্গ ভাষা শুনিলে তোমার হাস্য উদ্রেক হয়? ছিঃ!

বাংলা ভাষাকে মধু নিজের জীবন থেকে ত্যাগ করেছিল। সে এখন খৃস্টান, সে ইংরেজদের স্বজাতি, সে ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে অমর হবে। বাংলা ভাষা দিয়ে তার প্রয়োজন কী? কিন্তু গীর্জার উপাসনায় অকস্মাৎ বাংলা ভাষার ব্যবহার তার বিস্ময় উদ্রেক করে।

অধ্যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, মহাশয়, উপাসনার সময় আমাদের মাননীয় পাদ্রী কী ধরনের বাংলা বলিতেছিলেন আপনি জানেন কি? তিনি বলিতেছিলেন, "আমরা তাম্বু ফেলিলাম, কলা উঠাইয়া লইলাম, এবং অন্য স্থানে তাম্বু গাড়িলাম।" এই কি বাংলা? বাংলা ভাষা এত যাহা তাহা নহে। এই ধরনের বিজাতি বাংলা শুনিলে হাসাই আসে, ইহার পরিবর্তে ইংরাজি বলাই শ্রেয়।

এর পরে ঘটনাটি অবশ্য আরও অনেক গুরুতর। সেটি ঘটেছিল ডাইনিং হলে।

সন্ধ্যার সময় ছাত্রেরা ইচ্ছে মতন বাইরে ঘুরে আসে। কে কোথায় যায়, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তবে নৈশভোজের ঘণ্টাধ্বনির সময় সব ছাত্রের ডাইনিং হলে এসে উপস্থিত হবার কথা। মধু অবশ্য দু একদিন অধিক রাত্ত করে ফেলে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার সম্পর্কে নিয়ম কানুন একটু শিথিল। সে যতই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করুক, অধ্যয়নের ব্যাপারে সে যে এই কলেজের গৌরব। কোনো কোনো ছুটির দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মধু শুধু দুবেলা আহারের সময় ছাড়া আর একবারও নিজের ঘর থেকে নির্গত হয় না। অনবরত শুধু বই পড়ে যায়।

সেরকমই একটি দিনে মধু নৈশভোজের ঘণ্টা-ধ্বনি শুনে ডাইনিং হলে উপস্থিত হয়েছে। সারা-দিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। তবু আহার সেরেই সে আবার বই নিয়ে বসবে। ইদানীং সে এতই ব্যস্ত যে গৌরদাস বসাকের চিঠির উত্তর দেবারও সময় পায় না। মূল ভাষায় সে ভার্জিল ও হোমার পড়তে শুরু করেছে।

ইউরোপীয় প্রথা অনুযায়ী আহারের পূর্বে দু' এক পেগ হাল্কা সুরা পরিবেশন করা হয়। সারাদিন মধু কিছু পান করে নি, তাই সে ঐটুকু সুরার জন্যই উন্মুখ হয়েছিল। হঠাৎ সে দেখলো, পরিচারক শুধু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদেরই সুরা পরিবেশন করে গেল, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের গেলাস শূন্যই পড়ে রইলো।

ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে গেল মধুর মুখ। এই ক্রোধ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, প্রথমে সে জিভের তলায় আঙুল দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিল। তারপর ডান হাতের তর্জনী হেলন করে ডাকলো, স্টুয়ার্ড, কাম হিদার!

পরিচারকটি এগিয়ে আসার পর মধু নিজের শূন্য গেলাসটির দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এটি পূর্ণ করো নি কেন?

পরিচারক বললো, আজ আমাদের ভাণ্ডারে সুরা কিছু কম আছে, তাই সকলকে দেওয়া যায় নি।

মধু বললো, তাহলে সব ইউরোপীয় ছাত্ররা পেল কী করে? একজনও দেশীয় ছাত্র পায় নি কেন? তোমার যদি অল্প সুরা থাকে, তবে প্রথম থেকে শুরু করে যে-কজন পাবে তো পাবে। এটাই নিয়ম সঙ্গত নয় কি?

পরিচারকটি কাঁচুমাচু হয়ে বললো, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, প্রথমে শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের, তারপর অন্যদের....

মধু উঠে দাঁড়িয়ে সিংহ গর্জনে বললো, ইউ বী ড্যামড্। দোজ ইনসট্রাকশানস বী ড্যামড!

সঙ্গে সঙ্গে মধু নিজের শূন্য গেলাসটা ছুঁড়ে মারলো মাটিতে। শুধু নিজেরটা নয়, আশপাশের কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রের গেলাস তুলে নিয়ে সে

অতুল্য ঘোষ

॥ ৬৯ ॥
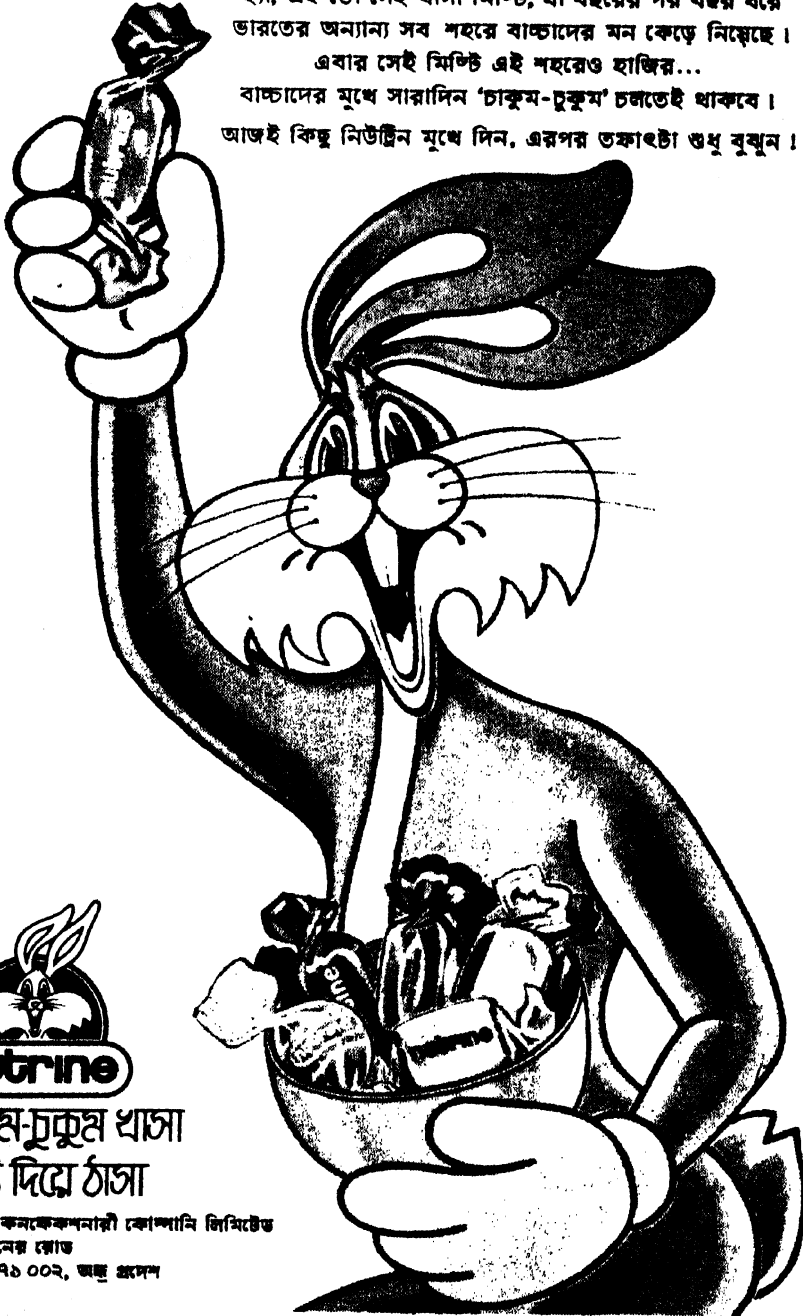
যত দূর মনে হচ্ছে ১৯৬৯-৭০ সালে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মূর্তি ভাঙ্গা অভিযান শুরু হয়। প্রথম শিকার হয় ডাঃ রায়ের মূর্তি—তাঁরই সৃষ্ট দুর্গাপুরে। একদিন সকালে দেখা গেল মূর্তির গলাটি স্কন্ধচ্যুত হয়ে পড়ে আছে। বিশেষ হইচই যে হল, তা নয়। তবে প্রফুল্লদা এবং আরও কয়েকজন এ কাজের কঠোর ভাষায় নিন্দা করলেন। তারপর অবশ্য আরও মূর্তি ভাঙ্গা হয়। চৌরঙ্গীর গান্ধী-মূর্তিও ভাঙ্গার চেষ্টা হয়েছিল, বোধ হয় উচ্চতার জন্য সম্ভব হয়নি। তখনই মনে হয়েছিল, এই নিষ্ফল অভিযান কেন? প্রতি-ক্রিয়াপন্থী বলে জীবিত মানুষকে হত্যা করার কথা শোনা গেছে; কিন্তু মূর্তি ভাঙ্গলে কোন বিপ্লব সফল হবে, এ সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। অবশ্য অর্থহীন পাগলামিতে কেউ কেউ এ কাজ করতে পারে। এবারকার মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে প্রফুল্লদা এ কথা বলেছেন। আর একটা দিক আছে, যার মানে খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের, তা তিনি জীবিতই হন বা মৃতই হন, তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে দেশে শ্রদ্ধাহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া। বিপ্লবের নাকি এটা একটা বড় অঙ্গ।

১৯৬৯-৭০এ মূর্তি ভাঙ্গার দোষ নকশালদের উপর দেওয়া হয়েছিল। এবারে কারা ভাঙছে, এখনও ঠিক পরিষ্কার হয়নি। সংবাদপত্রে নানারকম বেরিয়েছে। আমরা যদি কয়েক বছর পেছিয়ে যাই, তা হলে অবশ্য দেশে শ্রদ্ধাহীনতা ছড়াবার কোন রাজনৈতিক দল প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন, সে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। কেবলমাত্র মূর্তি ভাঙ্গলেই তো শ্রদ্ধাহীনতা হয় না, আরও নানারকমে শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করা যায়। যেমন, পরম শ্রদ্ধেয় বলে পরিগণিত মানুষের প্রতি জুতো ছোঁড়া, জাতীয় পতাকা পোড়ানো, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের গাধা ও কুকুরের রূপ দিয়ে প্রচার, স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা—আরও নানাভাবে দেশের লোকের মন স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিক থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা।

মূর্তি ভাঙ্গা উপলক্ষ করে লেফ্‌ট্‌ ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের দলীয় চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এরকম মন্তব্য এঁরা আগে কখনও করেননি। বাস্তবিকপক্ষে, অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের সৃষ্টি থেকে জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে যতরকম অপপ্রচার করা যায়, করে এসেছেন। সেইজন্যে যাঁরা বর্তমানে পঃ বঙ্গ সরকার চালাচ্ছেন, সেই দলের নেতার মুখে মূর্তি ভাঙ্গার কঠোরতম প্রতিবাদ দেখে আশ্বস্ত হয়েছি।

কম্যুনিস্ট পার্টি বোধ হয় ১৯২৬ সালে ভারতের মাটিতে প্রকাশ পায়। তারপর থেকে এই রাজনৈতিক দলটি দলবদ্ধভাবে জাতীয়

সায় দিয়ে এসেছেন।

(১) সোভিয়েত রাশিয়া যখন তাঁদের বিশ্বকোষে গান্ধীজীকে সাম্রাজ্যবাদের চর ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে লেখেন, ভারতীয় কম্যুনিস্টরা আপত্তি করেননি।

(২) ১৯৩০এর দশকে কম্যুনিস্ট পার্টির একজন কর্মী (তিনি মৃত বলে তাঁর নাম প্রকাশ করলুম না) যখন গান্ধীজীর দিকে জুতো ছোঁড়েন, তখন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি তার নিন্দা করেননি।

(৩) যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যদিও ভারতবর্ষ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে, এবং নাৎসীদের নীতি অত্যন্ত গর্হিত, তা সত্ত্বেও যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করেনি, সেহেতু দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ তাকে সাহায্য করবে না—পয়সা দিয়েও নয়, মানুষ দিয়েও নয়। বিশ্বযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন রাশিয়া-জার্মানিতে চুক্তি হয়েছিল। সেইজন্য ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি যুদ্ধের নিষ্ক্রিয় সমর্থক ছিলেন। যখন জার্মানি রুশ দেশ আক্রমণ করে, তখন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন এবং যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে থাকেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী দল বা ভারতের মাটির প্রতি কম্যুনিস্ট পার্টি কোনও শ্রদ্ধা দেখাননি। রুশ দেশের সিদ্ধান্তকে তাঁরা কার্যকরী করেন।

(৪) নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ 'প্রবাসী'র সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অনেক দুঃখে 'প্রবাসী'তে মন্তব্য করেছিলেন:

'চাঁদি কে চন্দ্‌ টুকরে পর দেশকে বেচনেওয়ালে'—এই মন্তব্যে তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী শ্রী পি সি যোশীর যে চুক্তি হয়, তা প্রকাশ করেন। চুক্তিতে লেখা ছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের জেল থেকে ছেড়ে দিলে তাঁরা 'Quit India'—'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করবেন। রামানন্দবাবুর পর এ ব্যাপারে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

(৫) নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আই এন এ ফৌজ গঠন করেন এবং ভারত অভিযানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন কম্যুনিস্টদের 'People's War' কাগজে ১৯-৭-৪২ তারিখে একটা কার্টুনে নেতাজীকে গাধারূপে দেখানো হয়। এবং গাধারূপে নেতাজীর পিঠে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো বসে আছেন। ১৩-৯-৪২ তারিখে ঐ 'People's War' কাগজে একটি কার্টুনে নেতাজীকে কুকুররূপে দেখানো হয়েছে এবং হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস বাঁ হাতে ঐ কুকুরের ঝুঁটি ধরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ কাগজেরই ২১-১১-৪২ তারিখে আর একটি ব্যংগচিত্র ছাপা হয়। একটি প্রকাণ্ড বোমাকে আঁকড়ে ধরে নেতাজী আকাশপথে

(৬) বোম্বাই এ আই সি সি-তে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে আসেন জওহরলাল—সমর্থন করেন সর্দার। বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে জওহরলাল বলেন, 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের বিপক্ষে বারোজন ভোট দিয়েছেন। তার মধ্যে এগারো জন কম্যুনিস্ট, আর একজনের ছেলে কম্যুনিস্ট।

এখন অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা ৯ আগস্ট দিবস পালন করেন।

(৭) ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই ইংরাজ সরকার এক প্রেস নোটে প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশদের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করার শর্তে কম্যুনিস্টদের ছাড়া হয়েছে।

(৮) স্বাধীনতার পর কম্যুনিস্টরা স্লোগান তোলেন, 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'। এবং ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ 'ক্ষমতা দখলের জন্য' প্রবন্ধে লেখেন:

(ক) ক্রমাগত কংগ্রেস দলকে দুর্বল করিয়া ফেলা। (খ) ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণে বাধা দেওয়া।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কার্যপন্থা উপর্যুক্তভাবে স্থির হয়। 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' স্লোগানে সারা ভারতের আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সর্বরকমে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে।

(৯) ভারতবর্ষের সর্বত্র কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক জাতীয় পতাকার বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ করা হয়।

সংবিধানে স্বীকৃত জাতীয় পতাকার বহ্ন্যুৎসবে চরম শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করা হয়েছে।

তালিকা আর দীর্ঘ করতে চাই না। সাম্প্রতিক কালের লেফট ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পঃ বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যসচিব পূর্বাপর প্রথানুযায়ী ২০ অক্টোবর গান্ধীঘাটে গিয়ে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র প্রকাশ করেন। এ ঘটনা ১৯৭৭এর ২ অক্টোবর ঘটেছে। আমার যত দূর স্মরণ হচ্ছে মুখ্যসচিবের এ চিঠি প্রত্যাহৃত হয়; কারণ সি পি আই (এম) দলভুক্ত মন্ত্রীরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য গান্ধীঘাটে যাওয়া ব্যবস্থাটা পছন্দ করেননি।

স্বাধীন হবার পর তেলেঙ্গানা, বড়া, কমলা-পুর প্রভৃতি স্থানে বহু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তা সুবিদিত।

বর্তমানে সি পি আই (এম) দল তাঁদের পথ বদলেছেন। পঃ বঙ্গের নাগরিক হিসেবে এতে আমি আনন্দিত হয়েছি। ২৩ জানুয়ারী নেতাজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে তাঁরা পূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। বহু দিন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি এবং বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টিরা জাতীয় ভাবধারার মূল উৎস থেকে সরে ছিলেন। বর্তমানে সি পি আই (এম) দল মূল উৎসের

দেখিয়েছেন। এখনও মাঝে মাঝে অসঙ্গত কথা বলা হয়। এই কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতার একটি বাংলা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে, লেফ্‌ট্‌ ফ্রন্ট পার্টির নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, আদালতের রায় যাই হোক, বর্গাদারদের লড়াই চলবে। যদি এ খবর সত্য হয়, তা হলে এ বিবৃতি অত্যন্ত নিন্দার্হ। যাঁরা সরকার পরিচালনা করছেন, তাঁদের নেতা যদি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে যাবার জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করেন, তবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য। আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা শুধু যে অপরাধ তাই নয়, দণ্ড পাবার মত অপরাধ। যদি লেফট ফ্রন্ট সরকারের নেতা এ কথা না বলে থাকেন, তবে যে সংবাদপত্রে এ কথা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের দণ্ড পাওয়া উচিত।

আমি শুরু করেছিলুম শ্রদ্ধাহীনতা দিয়ে। জাতীয় ভাবধারা এবং জাতির মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি অসম্মান ও দেশকে যে আঘাত করে, তার পরিণাম সুদূরপ্রসারী। এ কাজ যে দল বা যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে করে এসেছেন তাঁদের আজ বিচার, বিশ্লেষণ, বিবেচনা করা উচিত যে, কেন এসব মূর্তি ভাংগা হচ্ছে। কেবলমাত্র করেকটি নকশালের উপর দোষ চাপিয়ে দায়িত্বের অবসান হয় না। মূর্তিগুলির সামনে পুলিস বসিয়েও কর্তব্য সম্পাদিত হয় না। শ্রদ্ধাহীনতার যে বিষাক্ত আবহাওয়া অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি দীর্ঘকাল ধরে জন্য সক্রিয় পন্থা নেওয়া প্রয়োজন। এর সর্বোত্তম পথ হল জনসাধারণের কাছে অকপটে স্বীকার করা যে, জাতীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে শ্রদ্ধাহীনতা প্রচার করে বিপ্লব আসে না, জনকল্যাণও হয় না।

বিদ্যাসাগর বা যতীন্দ্রনাথ বা দেশবন্ধু —এঁদের মূর্তি ভেঙ্গে এঁরা যে আসনে বসে আছেন, সেখান থেকে তাঁদের টলানো যাবে না। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, স্ত্রীশিক্ষা থাকবে, মেয়েদের প্রতি অযথা অত্যাচার অন্যায় বলে স্বীকৃত হবে, ততদিন বিদ্যাসাগরের নাম, বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট থাকবে। শত মূর্তি ভেঙ্গেও তাঁকে তাঁর শ্রদ্ধার আসন থেকে কেউ সরাতে পারবে না। এ তো হল ভাবপ্রবণতার কথা। বাস্তব সত্য হল শ্রদ্ধাহীনতার পথ থেকে দেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, তার জন্য প্রচেষ্টা। সমালোচনা ও শ্রদ্ধাহীনতা এক নয়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে প্রত্যেক নাগরিকেরই সমালোচনা করার অধিকার আছে। কিন্তু সে সমালোচনা যদি শ্রদ্ধাহীনতার প্রসার ঘটায়, তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ। সংবিধানসম্মত উপায়ে যাঁরা সরকারে এসেছেন, আইনসভার মধ্যে তাঁরা সে সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন; কিন্তু জনসভার সে চেষ্টা শ্রদ্ধাহীনতার নামান্তর। এ পূর্বেও লিখেছি। সেই কথারই পুনরুক্তি করছি যে, নকশাল বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি। এঁদের পার্টির এবং পরে সি পি আই (এম)-এর সদস্য। কেন দেশের এইসব সুসন্তান—এঁদের অনেককেই সুসন্তান বলে আমি জানতুম—সর্বনাশা ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার আলোচনা ও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র নকশালদের কাজ বলে উড়িয়ে দিলে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হবে না।

১৯৬২তে যখন চীন ভারতবর্ষে হানা দেয়, তখন দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পোস্টার পড়ে যে, মাও সে তুং মুক্তি-ফৌজ নিয়ে ভারতবর্ষে আসছেন। মাও সে তুং চীনের লোক চীনের সেনা নিয়ে আসছিলেন। আর নেতাজী ভারতবর্ষের লোক, ভারতবর্ষের মাটিতে, ভারতবর্ষের সৈন্য নিয়ে গঠিত আই এন এ নিয়ে আসছিলেন। তাঁকে 'কুইসলিং' বলা হয়েছিল। কিন্তু এই মুক্তি-ফৌজ নিয়ে মাও সে তুং আসছেন—এর কোনও প্রতিবাদ কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে করা হয়নি। দার্জিলিং জেলার বহু ইউনিয়নে লাল রসিদ দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয় মুক্তি-ফৌজকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। কিন্তু কোনও দিন কোনও কম্যুনিস্ট ইউনিয়ন থেকে এর প্রতিবাদ শোনা যায়নি। এসব ঘটনা একটুও অতিরঞ্জিত করে বলছি না। কম্যুনিস্ট পার্টি এখন বিভক্ত। সেজন্য সি পি আই (এম) নেতাদের কাছে অনুরোধ যেন নতুন করে তাঁরা জাতীয়তাবাদের মূল্যায়ন করেন।

যুবসমাজ

সুমন চট্টোপাধ্যায়

নাচঘর মেতে ওঠে যৌবনের গন্ধে

বাঙলার নগরজীবনে এক প্রতিমা-বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ছাড়া নাচের কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই বললেই চলে। বিসর্জনের সেই ধেইনৃত্যেও আবার ললনাদের কোনো স্থান নেই। কিছু কিছু ধর্মসভায় ভক্তবৃন্দ দশাপ্রাপ্ত হয়ে নৃত্য করেন এবং সেই নৃত্যে মহিলারাও কখনও সখনও যোগ দেন বটে, তবে সে নাচও মূলত দশানৃত্য, সামাজিক নাচ নয়। ইউরোপীয়দের আদব কায়দা, চালচলন ও সামাজিক ব্যাপার স্যাপার অনুসরণ করতে যাঁরা বদ্ধপরিকর, তাঁরা অবশ্য বাঙলার নগর—থুড়ি মহানগরজীবনে "সামাজিক নাচের" প্রবর্তন করেছেন। সে নাচে নারী পুরুষের ভূমিকা সমান—এও সত্যি। কিন্তু সেই দোহা-দুহু-নৃত্য হল পশ্চিমী দুনিয়ার এমন এক প্রসাদ, যা দেশের ও দশের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতিতে সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি।

পশ্চিমের নগরজীবনে কিন্তু সামাজিক নাচ গত ক' শতাব্দী ধরে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এককালে তা গুরুগম্ভীরও ছিল। রাজারাজড়াদের রমরমার যুগে ইউরোপের তথাকথিত ভদ্রমহলে সামাজিক নাচ-শেখা ছিল এমনকি সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ। সমাজে যাঁরা ছিলেন উচ্চবর্গ তাঁদের জীবনে নাচের আসর ছিল অপরিহার্য। সামাজিক নাচই ছিল সম্মিলিত সাহেব-বিবিদের সামাজিকতার উপলক্ষ। বিবাহযোগ্যা পাত্রীদের সঙ্গে বিবাহযোগ্য পাত্রদের প্রত্যক্ষ আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাত হত সেই আসরে। সেখানেই ফুটতো প্রেমের কলি। ঝরতোও।

কালে কালে সবই বদলায়। সামাজিক নাচ ও তার আসরের প্রকৃতিও বদলেছে। ইতিহাস যতই সমকাল ছুঁয়ে হাত বাড়াচ্ছে আগামীর দিকে, পরিবর্তনের দ্রুতিও যাচ্ছে ততই বেড়ে। পশ্চিমের সামাজিক নাচে লেগেছে তার ছন্দ, লয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামাজিকতার রূপ যা ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজে সে রূপ আর নেই। শোভন আচরণের বাধ্যবাধকতা মিলিয়ে গেছে আরোও খোলামেলা আচরণের শৈথিল্যে। এই পালাবদল গত দু শতাব্দীর সামাজিক নাচের বিবর্তনেও চোখে পড়ে। ধরাবাঁধা নিয়ম যাচ্ছে ভেঙে। দ্রুতি যাচ্ছে বেড়ে। ভাবের প্রকাশ হচ্ছে মুক্ততর।

এ তো গেলো নাচের কথা। আর নাচের আসর? তারও আকৃতি প্রকৃতি গেছে সাধারণভাবে বেবাক পালটে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয়, বয়ে-শেখা খানদানি সামাজিকতা বৃহত্তর সমাজে তলিয়ে গেছে। এককালে যা ছিল অল্প কিছু মানুষের, আজ তা অনেকের। অল্প থেকে অনেক-এ যাবার পথ কেটেছে ব্যবসা। নাচের আসর থেকে "নাচঘর" বানিয়ে বাণিজ্য এনেছে "ডিসকোথেকের" যুগ। ঝাড়লণ্ঠনের জায়গায় এসেছে রকমারি মায় সংঘাতিক সাংঘাতিক (বলা বাহুল্য, চপলা ও অ্যানাসিন-অ্যাসপ্রোর প্রেক্ষিতে) আলো। জমকালো পোশাক ঠেকেছে এসে জীনস্‌-এ। চোখ-ধাঁধানো পোশাক-পরিহিত ও অলংকারভূষিত "কংস-রাজের বংশধররা" ছিলেন এককালে নাচের আসরের কুশীলব। আজকের "ডিসকোথেক" বা নাচঘরের পৃষ্ঠপোষক হল আটপৌরে জীনস্‌-পরা কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর দল। সামন্ততান্ত্রিক পশ্চিমী দুনিয়ায় নাচের আসর ম ম করতো মূল্যবান সুরভিতে। ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দুনিয়ায় নাচঘর মেতে ওঠে যৌবনের গন্ধে।

পশ্চিম জার্মানীর যুবসমাজে নাচঘরের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। শুধু পশ্চিম জার্মানী কেন, পশ্চিম ইউরোপের সব দেশ সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়। তবে আমার বর্তমান বাস যেহেতু পশ্চিম জার্মানীতে সেই হেতু এ দেশের সমাজজীবনের সঙ্গেই আমি সবচেয়ে বেশী জড়িত। এ দেশের যুবসমাজকেই সরাসরি চোখের সামনে দেখতে পাই। দেখি, পনেরো থেকে তিরিশের মধ্যে যাদের বয়েস, তাদের জীবনে নাচঘরের ভূমিকা কি জোরদার।

ডিসকোথেক্ বা নাচঘরে যৌবনের সয়লাব। প্রবেশমূল্য বেশী নয়। তা হবেই বা কি করে। ছেলে-মেয়েরা তাদের হাত খরচ থেকেই যে প্রবেশপত্র কেনে। এবং সাধারণত তারা প্রতি সপ্তাহান্তেই নাচতে যায়। প্রতিদিনের খদ্দেরও সংখ্যায় নেহাত কম নয়। বাঙালী যুবক-যুবতীদের যেমন আড্ডার নেশা, এদের তেমনি নাচঘরের নেশা। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চেয়ে এ দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা বেশী। তাই সন্ধ্যেবেলা নাচঘরে ঢুকে রাত এগারোটা-বারোটার আগে সে ঠাঁই ছেড়ে নড়ার কথা এরা বড় একটা ভাবে না। আইনত অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের রাত দশটার পর অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া ঐ ধরনের কোনো জায়গায় থাকার কথা না। কিন্তু নাচঘরের আলো-আঁধারি, দারুণ ভিড় আর জমে-থাকা সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে কে দেখতে যাচ্ছে কার বয়েস কত! সরকারীভাবে তা দেখার দায়িত্ব যাঁদের, সেই পুলিস কর্মচারীরা মাঝে-মধ্যে রাত দশটা নাগাদ হানা দেন। সন্দেহ হলে পরিচয়-পত্র দেখতে চান। তাতে জন্ম সাল লেখা থাকে। কচিকাঁচাদের তখন বাধ্য হয়ে বিদায় নিতে হয়। প্রাপ্ত-বয়স্ক যুবক-যুবতীদের জন্য বেশির ভাগ নাচঘর এমনিতে মোটামুটি রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত আর সপ্তাহান্তে ভোর চারটে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ছোট বড় সব শহরেই অসংখ্য নাচঘর রয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে যেমনই হোক, ভেতরে কিন্তু তাদের চেহারা মোটামুটি একই ধরনের। পরিসরে নাচঘরগুলো তেমন একটা বড় নয়। কতকগুলো তো দস্তুরমত ছোট। আলো যৎসামান্য। নাচ হয় যে জায়গাটায় (সারা নাচঘরে জুড়েই যে নাচ হয় তা নয়) সেখানে আবার নানা রঙের আলো থাকে। অবশ্যই জোরালো নয়। কিছু কিছু নাচঘরে আবার বিভিন্ন জায়গা থেকে হরেকরকম আলো জ্বলে আর নেবে। ফলে, ঐসব জায়গায় খানিকক্ষণ থাকলে যে-কোনো সুস্থ মানুষেরই সর্ষে সমেত আরোও নানান ফুল দেখতে পাওয়ার কথা। নাচঘরে পেল্লায় পেল্লায় লাউড-স্পীকার থেকে গাঁক্ গাঁক্ করে সংগীত ঢালা হয়। ছন্দোময় সেই সংগীত এমনই তেজী যে, নাচঘরে সাধারণত কাউকে কোনো কথা বলতে গেলে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তারস্বরে চেঁচানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ব্যতিক্রম বড়ই দুর্লভ। এই ধরনের হট্টগোল যেখানে সারা সন্ধ্যে চলে, সেখানে জানলা থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। থাকলেও, তা বন্ধ করে রাখতে হয়। ফলে, সিগারেটের ধোঁয়া, যা প্রায় সকলের মুখ থেকেই সমানে নির্গত হতে থাকে, বেরোবার পথ পায় না। নাচঘরে যাবতীয় পানীয় পাওয়া সম্ভব। তবে সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয় বিয়ার আর কোকাকোলা। কারণ, এই দুটি পানীয় সস্তা। নাচঘরের বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, অল্প খরচে প্রবেশপত্র কিনে, একটি বা দুটি গেলাসের জন্য পয়সা খরচ করেই ঘণ্টা চার পাঁচ দিব্যি নেচেকুঁদে কাটিয়ে দেওয়া যায়। হোটেল-রেস্তোরাঁয় তা সম্ভব না। নিছক

নাচঘরে বারের সামনে জটলা

বাড়ন্ত বয়সের আর এক নাম–

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®

এখন পাওয়া যাচ্ছে এক অসাধারণ প্যাকে যার জন্যে কোন ও বাড়তি খরচ লাগবে না।

মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠার সময় থেকেই সন্তানের হাড় ও দাঁত গড়ে ওঠা শুরু হয়ে যায়। শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের পক্ষে অপরিহার্য।

বাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তার বাড় থেমে যাবে। তখন গাদাগাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যাবে না।

সুতরাং আজ থেকেই তাকে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ খাওয়াতে শুরু করুন।

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে, বিশেষতঃ তার দাঁত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে। ভিটামিন সি, ডি ও বি ১২ সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেটে ভ্যানিলার গন্ধ দেওয়া এমন এক লোভনীয় স্বাদ আছে, যা' বাচ্চাদের দারুণ ভালো লাগে।

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ— সুইজারল্যাণ্ডের স্যাণ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত দুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম।

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®

শক্ত দাঁত ও সুস্থ সবল হাড়ের জন্যে

daCunha/CS/26 BEN

নাচঘরে বিদেশীরা অনেক সময় কোণঠাসা হয়ে পড়ে

আর্থিক কারণেও ছেলেমেয়েদের কাছে নাচঘরের আকর্ষণ নেহাত কম নয়।

নাচঘরে নাচঘরে ঘুরে ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে, সেখানে তারা কয়েকটি কারণে আসে। অন্যান্য অনেক সমবয়সীদের মধ্যে অল্প খরচে সময় কাটানো। কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্তত অন্য সব ভাবনাচিন্তা ভুলে বিনা বাধায় ও নিঃসংকোচে হইচই করা। নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। জনপ্রিয় রেকর্ডগুলো শোনা। এবং তা ছাড়াও, নাচা।

নাচঘরে শুধু নাচতেই যায় এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম। নাচটা সেখানে উপলক্ষ মাত্র। এ ব্যাপারে সাবেকী নাচের আসরের সঙ্গে আজকের নাচঘরের সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো। যে সব ছেলেরা তাদের বান্ধবীদের নিয়ে আসে তাদের এবং তাদের বান্ধবীদের আর নাচের পার্টনার খুঁজতে হয় না। একা আসে যারা এবং যারা নাচতে চায় তাদের উদ্দেশ্য হয়, সাধারণভাবে দেখতে গেলে, পার্টনার পাকড়ানো। এ এক দারুণ মজাদার ব্যাপার। নারীমুক্তির এই যুগেও কোনো মেয়ে কোনো ছেলেকে তার সঙ্গে নাচতে অনুরোধ করছে এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। তবে কোনো ছেলেকে যদি কোনো মেয়ের মনে ধরে তাহলে মেয়েটি ছেলেটির দিকে বারবার তাকিয়ে এবং দৃষ্টিকে যথাসম্ভব আহ্বান করে তুলে তার অন্তরের প্রস্তুতি জানায়। এখানে একটা বিপত্তি আছে। এমন কোনো মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। সেক্ষেত্রে, সে আপ্রাণ চেষ্টা করে সেই অন্য ছেলেটিকে বাগাতে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারেও আবার প্রথম মেয়েটির কপালে যা ঘটেছে, ছেলেটির কপালেও তা ঘটাতে পারে। ছেলে বুদ্ধিমান হলে, যে মেয়েটি তার সঙ্গে আলাপ করতে ও নাচতে ইচ্ছুক তাকে তার অন্তত হাতে রাখা উচিত। তবে লাঠি না ভেঙে সাপ মারার চিন্তা উঠতি বয়েসে আর ক'জনের মাথায় আসে। ফলে দক্ষতার অভাবে একটি সন্ধ্যার জন্য অন্তত অনেক ছেলেরই কপাল পোড়ে। তারা তখন অন্য যে সব ছেলেদের পার্টনার জুটছে না তাদের সঙ্গে মিলে "কাফের" সামনে দাঁড়ায়, জটলা করে। কেউ কেউ এক আরোপিত ঔদাসীন্যের ভাব দেখায়। কেউ বা যায় চটে। দাগা পেয়ে অন্য নাচঘরে চলে যেতে চায় এমন ছেলেও আছে। মেয়েও। তবে সাধারণত আর্থিক কারণেই ছেলেমেয়েরা এক সন্ধ্যা একই নাচঘরে কাটানোর পক্ষপাতী।

যা বলেছি, নাচের অনুরোধ ছেলেদের পক্ষ থেকেই আসে। নাচঘরের চালাও বৈশিষ্ট্য হল, যে কোনো পরিচয়ের প্রথম কদমফুল "তুমি" করে ফোটে। "আপনি" করে নয়। পশ্চিম জার্মানীর যুব-সমাজে এই সামাজিক আন্তরিকতা লক্ষ করার মতো। নাচঘরে সাধারণত আপনি-আজ্ঞে অচল। তবে এমন নাচঘরও আছে যেখানে প্রবেশমূল্য ও পানীয়ের দাম বেশী বলে শুধু চাকুরে যুবক-যুবতীরাই যা যাবার হক রাখেন। সেখানে আদব-কায়দা পৃথক। যাই হোক, কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলের আমন্ত্রণে সাড়া দেয় তাহলে তারা দুজন "ফ্লোরে" গিয়ে নাচতে শুরু করে।

আজকালকার নাচঘরে চোদ্দ আনা সময়ে যে নাচ হয় তা হল এক মুক্ত, উদ্দাম নৃত্য। সে নাচে নারী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক সংসর্গ নেই। জনপ্রিয় এই নাচ শেখারও দরকার পড়ে না। যে-কোনো ওয়াকিবহাল বাঙালী লক্ষ করলে দেখবেন, এ হল আমাদের ভক্ত

দারুণ উপভোগ্য ও পরিশ্রম সাপেক্ষ সংযোজন। নাচঘরে নাচ দেখতে দেখতে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে যে, এ নাচ সত্যিই আন্তর্জাতিক। কলকাতায় মোহনবাগান জিতলে সে দলের সমর্থকদের মধ্যে ও হারলে ইস্ট বেঙ্গলের সমর্থকদের মধ্যে আমি এ নাচের কিছু কিছু মুদ্রা দেখেছি বোধ হয়।

এই উদ্দাম নাচ একটানা অনেকক্ষণ চলার পর "ডিস্ক-জকি" সাহেব (যিনি 'ফ্লোর' সংলগ্ন একটি খুপরিতে বসে বসে রেকর্ড বাজান এবং মাঝেমধ্যে নাচিয়েদের উৎসাহ দেন ও সেই সংগে টিপ্পনি কাটেন) ছেলেমেয়েদের মেজাজ বুঝে মন্থরগতি "ব্লুজের" একটি রেকর্ড চালিয়ে দেন। "ফ্লোরের" আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। পরিবেশ হয়ে ওঠে ঘন, রহস্যময়—পাত্রপাত্রীর মনোভাব মুতসই, হল মায়াময়। মেয়েরা তাদের সদ্যচেনা নৃত্যসংগীদের গলা স্বচ্ছন্দে জড়িয়ে ধরে। ছেলেরা এমনিতেই ডানপিটে। তারা জড়িয়ে নেয় সঙ্গিনীর কোমর।

এই "ব্লুজ" নাচ হল যে-কোনো নাচঘরে একটি সন্ধ্যার ক্রান্তিক্ষণ। ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ নাচের ও তার পরবর্তী সময়টুকুর দারুণ তাৎপর্য। এই নাচ নাচার মধ্যে ঐ সন্ধ্যেটির জন্যে অন্তত কোথায় যেন উভয়পক্ষের একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি আছে। সব মেয়েই যে সব ছেলের সংগে এ নাচ নাচবে এমন কথা নেই। কেউ কেউ আবার "ব্লুজ" শুরু হলে "ফ্লোর" ত্যাগ করে। যারা থেকে যায় তাদের আচরণ ক্রমশই নীলাভ থেকে নীলাভতর হয়ে ওঠে। নাচঘরের ঐ চার-দেওয়ালের মধ্যে, প্রায়-অন্ধকারে, কোনো নিগ্রো কণ্ঠ-শিল্পীর উষ্ণ কণ্ঠে গাওয়া বা রাশিরাশি বাজনার চালচিত্রে একটিমাত্র স্যাক্সোফোন অথবা ট্রাম্পেটে বাজানো "ব্লুজের" সুর, তার প্রায়লুপ্ত ছন্দ লয় হাতকে করে তোলে করতল, "তাকে" করে তোলে "আপনার" আর সন্ধ্যেকে করে তোলে রাত।

এ নাচের শেষ স্বপ্নভঙ্গের মতো। অনেকেই তখন ফিরে আসে "বারে" বা বসার জায়গায়। সাধারণত জোড়ায় জোড়ায়। আধোপরিচিতির পাট চুকিয়ে এবার পরিচিতির পালা। আলাপ শুরু হয়। প্রথমে একটু নৈর্ব্যক্তিক—যদিও অতিকষ্টে। তারপর "আলাপ" মিলতে চায় "জোড়ে"। এই দুই পর্যায়ের মাঝে ছোট্ট একটু ফাঁক আছে। সেই ফাঁকটুকু অস্বস্তিতে ভরা। ফলে দুজনকেই বারবার সিগারেট খেতে হয়। হয়তো দুজনেই চায় পরস্পরকে আরোও ভালো করে, আরোও ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে। পাত্ররা প্রকৃতির হাতযশেই প্রথম থেকে রাজী। পাত্রীরা সেই একই কারণে এক চোটে ধরা দিতে নারাজ। "জোড়ের" পালা সাঙ্গ করে এক ছন্দোময়, মনোরম 'গৎ' ধরার মেজাজ যদি তাদের থাকে, তাহলে তখনই চুম্বন নয়তো অন্য কোন দিন একই নাচঘরে বা অন্য কোথাও সাক্ষাতের অঙ্গীকার। নাচঘরে যৌবনের সম্পর্ক দানা বাঁধে।

সব ছেলেই যে নাচার সুযোগ পায় এমন না। কেউ কেউ আবার আদৌ নাচার উদ্দেশ্য নিয়ে নাচঘরে আসে না। আসে গল্পগুজব করতে, বিয়ার খেতে। এদের ঠেক "বারের" সামনে। এরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সেখানে ছড়িয়ে থাকে। রাত যত বাড়ে বিয়ারও তত বেশী খাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যে অনেকেই ঠিক সুস্থ থাকে না। মনে রাখা দরকার, এ দেশে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপানের ঘটা আশংকা-জনক রকম বেড়ে চলেছে। নাচঘর তাতে ইন্ধন যোগায়। যাই হোক, ছেলেরা, দেখা যায়, নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তাতে মেয়েরাও যোগ দেয়। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ঐ ভাব সচরাচর দেখা যায় না। তাদের নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণই এক প্রচ্ছন্ন, মাঝেমধ্যে প্রকট প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ করার মতো। নাচঘরে মেয়েরা যে, সাধারণভাবে, একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না এ কথা, এই লেখা উপলক্ষে মেয়েদের প্রশ্ন করায় তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে।

পশ্চিম জার্মানীতে বিদেশীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। বহু বিদেশী ছেলেমেয়ে এ দেশে পড়াশুনো করছে। স্বভাবতই এরাও নাচঘরে আসে। কিন্তু যে সব নাচঘরে জার্মান ছেলেমেয়েদের আনাগোনাই বেশী, স্বীকৃত হয় না। ... একটি শ্রেণীর মধ্যে আজকাল বর্ণবিদ্বেষ যে দুর্ভাগ্য-বশত মাথা চাড়া দিচ্ছে, নাচঘরে মাঝে মাঝে তার পরিচয় মেলে। তার মানে এই নয় যে, বিদেশী ছেলে-মেয়েদের পেছনে লাগা হয় বা তাদের প্রকাশ্যে হেয় করা হয়। নাচঘরে বিদেশীরা অনেক সময় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এ প্রসংগে খোদ নাচঘরে বসে অনেক জার্মান ছেলেমেয়েকে প্রশ্ন করে দেখেছি, এই ভয়াবহ যুগবৈশিষ্ট্যের কথা তারা অনেকেই স্বীকার করে। কেউ কেউ এড়িয়ে যায়।

ঠিক এর উলটোটা দেখা যায় কোলোনের এক আফ্রিকান নাচঘরে। সেখানে কোলোনের কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে ছেলেদের আড্ডা। এই নাচঘরে আবার এমন অনেক শ্বেতাঙ্গিনী যান, যাঁরা কেবলমাত্র কৃষ্ণকায় পুরুষদের সংগে ছাড়া নাচবেন না। শ্বেতাঙ্গ ছেলেরা সেখানে করুণ মুখে ফেউ ফেউ করে ঘোরে।

কতকগুলো নাচঘর আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনাই বেশী। এই সব জায়গায় বর্ণবিদ্বেষ ততটা প্রকট নয়, যতটা প্রকট তা একটু বেশী পয়সার নাচঘরে। এখানে প্রবেশমূল্য বেশী বলে চাকুরে যুবক-যুবতীরাই বেশী আসেন। এঁদের সাজপোশাকও আরো পরিপাটি। দুঃখের বিষয়, এই সব নাচঘরে এমন অনেক নারী-পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, এক সন্ধ্যার মজা লোটাই যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে, ঘনিষ্ঠ-নাচ প্রায়ই গায়ে-পড়ে অশোভন আচরণের অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় বলা যায়, এই সব নাচঘরে দেহের চাহিদাটাই মুখ্য, বাকি সব কিছু নেহাতই গৌণ।

গুপ্ত সমাজে নাচঘর এমন একটা ব্যাপার যা বিবিধ অপশক্তির, কুপ্রভাবের শিকার হতে পারে। বয়স্কদের মনোরঞ্জনের জন্য এমন এমন সব "প্রাইভেট ডিস্কোথেক" এ দেশে আছে, যেখানে নাচার পূর্ব শর্ত হল, দুজনকেই নগ্ন হতে হবে। ধনতান্ত্রিক দেশে যে সব সামাজিক ব্যাধি দেখা যায়, নাচঘরগুলোকে তারা আগে সংক্রামিত করে।

পশ্চিম জার্মানীর বাবা-মা'রা সাধারণত চান না যে, ছেলেমেয়েরা নাচঘরে যাক। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি যে, ছেলেমেয়ে ও বাবা-মা'র মধ্যে "নাচঘর" নিয়ে ঝগড়াঝাটি এ দেশের সংসারে প্রায় নিত্যকার ব্যাপার। অনেক ছেলেমেয়ে বাবা-মা'র ওপর এক হাত নেওয়ার জন্য আরোও বেশী করে নাচতে যায়। যা দেখা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে নাচঘর অতীতের নাচের আসর থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে। সাবেককালের নাচের আসরে যুবক-যুবতীদের বাবা-মা'রা স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। নাচ দেখতেন। মাঝেমধ্যে অংশ গ্রহণও করতেন তাঁরা। আজকের নাচঘরে উত্তরযৌবন/যৌবনাদের স্থান নেই।

সব কথার শেষে একটি প্রশ্ন থেকে যেতে পারে। এই যে নাচঘর এ দেশের যুবক-যুবতীদের এত টানে, এই যে ছেলেমেয়েরা চুম্বকাকৃষ্ট লোহার টুকরোর মত ছোটে নাচঘরে, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সন্ধ্যার পর সন্ধ্যে কাটায়, পরবর্তী জীবনে কি এ সবের কোনো ভূমিকা থাকে? নাচঘর-সংস্কৃতি কি কোনো গঠনমূলক ব্যাপার? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় : না। এ সবই বয়সের উত্তরোল। একটা বিশেষ বয়সের পর যা মিলিয়ে যেতে চায়। তার প্রধান কারণ হল, নাচঘরে আর সব কিছুরই স্থান আছে, কেবল ভাবনার কোনো ঠাঁই নেই। তাই বাঙলায় যুবসমাজে আড্ডার যে ভূমিকা, এ দেশের যুবসমাজে "নাচঘর" সে ভূমিকা নিতে পারে না। তবে এক কথায় দেওয়া উত্তরগুলো চিরদিনই বড় সন্দেহজনক। পশ্চিমী দুনিয়ার এই নাচঘর-সংস্কৃতি গঠনমূলক কিনা, তা কাজের কিনা এ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা যায়, জগতে যৌবনের প্রকাশ ও আস্ফালনের জন্য এমন কয়েকটি অকাজের ব্যাপার না হয় থাকলোই। শুধু, অকাজের কাজ করে মানুষ, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা দল যে আনন্দ পায় সে আনন্দের হাসিটুকু নাচঘরে যদি একটু বেশী দেখতে পেতাম, তাহলে "অকাজের" যুক্তিটা যেন আরোও দাঁড়াতো।

এইচ এম ভি ফিয়েস্টা পপুলার
ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ার

ফিয়েস্টা পপুলার বাজারে চালু করার সময়ে আমাদের আশা ছিল যে এতে আমরা অনেক বেশি শ্রোতাদের কাছে সংগীতের আনন্দধারা পৌঁছে দিতে পারবো। এই ভেবে আমরা ফিয়েস্টা পপুলারে সেই সব বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছিলাম যা সংগীত প্রেমিক মাত্রেই একটি ছিমছাম এবং মজবুত সেটে আশা করেন। তার প্রথম প্রমাণ হলো এর সুলভ দাম, এসি অথবা ব্যাটারী মডেল উভয়েরই। শুধু এই নয়, এতে আছে শক্তিশালী ও বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সি রেন্‌জ-এর অ্যাম্প্লিফায়ার এবং ঢাকনায় লাগানো চমৎকার মানানসই স্পীকার যেটিকে আপনি যেখানে খুশি রেখে গান-বাজনা শুনতে পারেন। ধ্বনির গভীরতা ইচ্ছেমত ভারী অথবা হাল্‌কা করার জন্য আছে একটি টোন-কণ্ট্রোল। আর আছে সব রকম রেকর্ড বাজাবার জন্য ৩-স্পীডের টার্ন-টেবল॥

এসবের উদ্দেশ্য একটি—যাতে ফিয়েস্টা পপুলারের মাধ্যমে অনেক বেশি লোক গান-বাজনা শোনার আনন্দ পান। আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে অনেক আগেই ফিয়েস্টা পপুলার ভারতের সব চেয়ে বেশি বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ারে পরিণত হয়েছে।

আজ সারা ভারতে ২,৫০,০০০ ফিয়েস্টা পরিবার আছেন। আপনি নিশ্চিত জানবেন—ঠিক এই মুহূর্তে কোথাও না কোথাও এইচ এম ভি ফিয়েস্টা নিশ্চয়ই বাজছে।

৪৫৫ টাকা০
স্থানীয় কর আলাদা

আপনি কি রেডিও অথবা অ্যাম্প্লিফায়ারের মাধ্যমে বাজানো যায় এমন একটি রেকর্ড প্লেয়ার খুঁজছেন? তাহলে আপনি অবশ্যই কিনুন এইচ এম ভি ক্যালিপ্সো পপুলার—আপনার আরেকটি 'পপুলার' সঙ্গী।

GC 9846

সমরজিৎ কর

॥ নয় ॥

শিলং ছাড়ার সময় শম্ভু সেন বলে-ছিলেন, অরুণাচলে তো যাচ্ছেন। গেলেই দেখবেন, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল কাকে বলে। পদে পদে বিপদ, মশায়, পদে পদে বিপদ। এই প্রদেশটির মোট আয়তন ৮৩,৫৭৮ বর্গকিলোমিটার। তার ৭০,০০০ বর্গ-কিলোমিটারই দখল করে রয়েছে গিরিরাজ হিমালয়। আর সেই অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ চালানো কি সহজ কথা! এ পর্যন্ত সারা প্রদেশের মাত্র পনেরো শতাংশ জায়গায় আমরা অনুসন্ধান চালাতে পেরেছি। গাড়ি তো দূরের কথা, বহু জায়গায় আপনি পায়ে হেঁটেই যেতে পারবেন না। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে ছবির ওপর। মানে, যাকে আমরা বলে থাকি ফটো-জিওলজি। প্লেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এখানকার বিস্তৃত এলাকার ছবি তোলা হয়েছে। সেই সব ছবি বিশ্লেষণ করে বহু এলাকার মোটামুটি একটা বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ ব্যাপারে মার্কিন দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ আমাদের সাহায্য করেছে। বলতে বাধা নেই, কিছুদিন আগে আমরা লোহিতের বরফ ঢাকা উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে একটি অভিযান চালিয়ে-ছিলাম। কোন পথ দিয়ে আমাদের যেতে হবে, কোথায় আমাদের তাঁবু বসাতে হবে সে ব্যাপারে অনেক তথ্য ওই সব ছবি থেকেই আমরা জানতে পেরে-ছিলাম।

শম্ভুবাবু বললেন, নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল আমাদের সাহায্য করেছেন। সাহায্য করেছেন হায়দ্রাবাদের এন জি আর আই। ওঁদের সহায়তায় এ অঞ্চলে আকাশ থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিভাগ ১৯৭৭-৭৮ সালে ৭৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করেছেন, যার স্কেল ১ : ৫০,০০০। কামেং এবং সুবনসিরি জেলায় কম করেও আধ ডজনের মত বেস মেটালের ডিপোজিট আমরা খুঁজে পেয়েছি। অনেক কিছু নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। তবে আপনার এই ভ্রমণে একটা জিনিস দেখতে পাবেন না—সেই জায়গাটা যেখানে ডিহং প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে। পৃথিবীর এটা অন্যতম বৃহত্তম বাঁধ প্রকল্প। প্রস্তাব, সিয়াং জেলার রোটাং-এ তৈরি করা হবে ২১৪ মিটার উঁচু বাঁধ। যার জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা দাঁড়াবে এক কোটি নব্বই লক্ষ একর ফুট। এই প্রকল্প ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তৃত এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগবে। এছাড়া এই প্রকল্প থেকে ৭৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথাও ভাবা হচ্ছে। বিরাট কাজ, মশায়। বড় দায়িত্ব। জিওলজি-ক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া এখানকার জিওটেকনিক্যাল অর্থাৎ ভূ-প্রযুক্তিগত দিকটি এখন খতিয়ে দেখছে। প্রস্তাব করা হয়েছে ২১৪ মিটার নয়, বাঁধটি

গাঁওবুড়া—ইদু মিশমি, অরুণাচল

উঁচু করা হবে ২৬০ মিটার পর্যন্ত। তা যদি হয়, ভাবুন আমাদের দায়িত্বটা। ওই এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি অনুসন্ধান করতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে কোথায় এবং কীভাবে অত ভারি এবং অত বড় একটি বাঁধ বসালে সেই বাঁধ না বসে যায়। পুরো প্রকল্পটাই না পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। আমরা আনন্দিত। অরুণাচল সর-কারও নানাভাবে আমাদের সাহায্য দিয়ে আসছেন। অনেক সময় এমন হয়, কোন দুর্গম জায়গায় আমাদের কর্মীরা হয়ত আটকে পড়ল, অথবা দুর্ঘটনায় কেউ আহত হলো। আকাশ থেকে তখন তাদের খাবার জুগিয়ে অথবা চিকিৎসার সাহায্য দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে ওঁরা সহজ করতে এগিয়ে আসেন।

ইয়াজালির সরকারী আবাসে পৌঁছে এ-সব কথাই মনে পড়ছিল আমার।

সমুদ্রতল থেকে এখানকার উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট। উত্তর লখীমপুর থেকে আসার পথে ভ্যাপসা গরম ছিল। এখানে সেটা নেই। পৌষের শীতের মত হিমেল স্পর্শ। রাতের অন্ধকারে ঠিক কি ধরনের পরিবেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, অনুমান করাও শক্ত। তবে সর-কারী কৃপায় এখানেও বিদ্যুতের আলো এসেছে। সেই আলোয় শুধু এটুকু বোঝা গেল, দুর্গম হলেও পথক্লান্ত আশ্রয়প্রার্থীর জন্যে মোটামুটি যতটা সুযোগ সুবিধে দরকার সবই আছে এখানকার সরকারী আবাসে। বাংলোর শেষ প্রান্তে যে ঘরটি আমার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম পার্বত্য জলধারার কলকল ধ্বনি। বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে মেঘমুক্ত আকাশে লক্ষ তারার আবির্ভাব। ঘন অরণ্য। তার ভেতর থেকে অত রাতেও কানে ভেসে এলো পাখির ডাক।

বাংলোর জনৈক কর্মী বললেন, এই আপনাদের মত লোকজন যখন কেউ আসেন, তখন তবু মানুষের শব্দ শুনি। তাছাড়া আছে কিছু ওখানে? শুধু লকড়ি, আর জানোয়ার। তা স্যার, আমার দেখতে দেখতে এখানে প্রায় বছর পাঁচ কেটে গেল। প্রথম যখন আসি, কী বলব আপনাকে, কলজেটা যেন শুকিয়ে যায়। বিশেষ করে রাতে। এখন আর কী দেখছেন? কয়েক বছর আগেও এখানে আর ক'জন লোক যাতায়াত করত? লোক বলতে তখন তো ওই জঙ্গলবাবুরা। মানে ফরেস্ট ডিপার্ট-মেন্টের লোক। তা ওনাদের কথা ছেড়ে দিন। ওনাদের চালচলন দেখলে মনে হয় বন-জঙ্গলে বাঁচার জন্যেই যেন ওনারা জন্মেছেন। কিন্তু আমার কথা একবার ভাবুন, স্যার। কোথায় চব্বিশ পরগনা, আর কোথায় অরুণাচলের এই ইয়াজালি। একেবারে রামের বনবাস। প্রথম যখন এখানে আসি, সারা রাত কি ঘুম হয়। কিম্ভুত সব পাখি আর জানোয়ারের ডাকে জেগেই কাটাতে হতো তখন। এখন তো বলতে পারেন স্বর্গ-রাজ্য। আগের চেয়ে এখন লোক বেড়েছে। এই পাথরবাবুরা আসছেন, আসছেন সি পি ডব্লু ডি-র লোক। চীনের যুদ্ধের পর তোড়জোড় করে শুরু হলো পথ তৈরির কাজ! মিলিটারিরা আসছে। কাল সকালেই দেখবেন, কিছু নেপালী শ্রমিকরা এসেও এখানে বসতি বানিয়েছে।

হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হতেই চা এবং যৎসামান্য খাবার এল। আমরা সবাই গিয়ে ডাইনিং হলে বসলাম। তা ছোটখাটো একটা পার্টি বলতে পারেন।

এম কে অগ্রবাল বললেন, আজকের ডিনার এখানে। কাল লাঞ্চ আমার ক্যাম্পে। কাল দুপুরের দিকে আপনাকে দেখাবো কী ধরনের ভূতাত্ত্বিক নমুনা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি।

শুরু হলো। আলাপ আলোচনা। ডঃ ত্রিপাঠী সবার কাছ থেকে এ অঞ্চলে এখন কোথায় কী ধরনের কাজ চলছে তার হিসেব নিতে লাগলেন। তার এক ফাঁকে পকেট থেকে আমি বের করলাম কয়েকটি চিরকুট। ওঁরা কথা বলতে লাগলেন, আর এক একটি চিরকুটে আমি এক একটি করে পয়েন্ট লিখে যেতে লাগলাম। তারপর চায়ের আসর যখন শেষ হলো, আমি এক একটি চিরকুট সবার হাতে ধরিয়ে দিলাম।

কী ব্যাপার, মিঃ কর? ডঃ ত্রিপাঠীর প্রশ্ন।

কিছুটা কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, বুঝতে পেরেছি, রথ দেখা এবং কলা বেচা দুই-ই চলছে। আমার তাতে লাভই হচ্ছে বরং। আপনারা করছেন ভূতত্ত্ব। আর আমি করছি ভূতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সফর। এতক্ষণ আপনাদের আলো-ত্রিপাঠী। এ-সব তো আমরা কিছু জানি না। যা বললেন এতক্ষ আপনারা, আমার মনেও থাকবে না। ত এক একটা চিরকুটে আমার এক এক প্রশ্ন লিখে দিয়েছি। আমার জ একটু হোমওয়ার্ক করতে হ আপনাদের। ওই প্রশ্নের উত্তরগু লিখে দিতে হবে। বেশি না। সংক্ষে লিখলেই চলবে।

জেনজারাস। ইউ মিন উই হ্যাভ টু সাম হোমওয়ার্ক ফর ইউ?

দ্যাটস একজ্যাক্টলি হোয়াট অ মিন। আপনারা একটু না লিখে দি আমি সব ভুলে যাব। তাছাড়া আমা মগজটাও একটু নরম। সব কথা সেখা ঠিক জমে বসতে চায় না।

আমার মন্তব্যে হো হো করে হে উঠলেন সবাই।

শ্রীসাইকিয়া বললেন, হবে, হবে, মশায়। ফেরার পথে আম লেখাটা আপনি পেয়ে যাবেন। জি ফিজিক্যালের পার্টটা।

বলতে কি, সে রাতে আমিও ঘুম পারি নি। সরকারী আবাসে সবাই য ঘুমে অচেতন, নিজের বিছানায় শু সারা রাত আমি শুধু এ-পাশ ও-পা করে কাটালাম। কখনও দূরে থে ভেসে আসছিল ফেউ-এর মত একটা ডাক। মাঝে মাঝে পাখির বিকট শব্দ জলের সেই একটানা কলতান যে আরও স্পষ্ট। আরও ব্যক্ত। শেষ রা শুনতে পেলাম, খুব কাছেই খুব উ কণ্ঠে একটি পাখি ডেকে চলে ডাকছে। থামছে। আর থামছে যখ অনুরূপ শব্দ ভেসে আসছে দূর কোন জায়গা থেকে। মনে হচ্ছিল, এ জন ডাকছে, অপরজন সেই ডাকে সা দিয়ে চলছে নিরন্তর। মনে হচ্ছি সেই ডাকের যেন একটি ভাষা আ সেই সঙ্গে একটি সঙ্গীত আছে। ভা ছিলাম, পাখিও কি তা হলে নিজে মধ্যে কথা বলে?

যখন ঘুম ভাঙল, ঘড়িতে ত চারটে বেজে গেছে। আকাশ পরিষ্কা অমার পাশের খাটে শুয়ে ছিলে অজিতবাবু। তখনও ঘুমচ্ছেন তিনি তাঁকে ডেকে তুললাম।

হঠাৎ আচমকা ঘুম ভাঙাতে ভ লোক একটু বিরক্তই হলেন আম ওপর। বললেন, এখন তো মাত্র চারটে আর একটু ঘুমবো না? কেউ ে ওঠেন নি এখনও।

ছাড়ুন মশায় চারটে। আপনাদে কলকাতায় চারটে মানে ভোর রা কিন্তু এটা অরুণাচল মশায়, এ অরুণাচল। অরুণের আগমন এখা ঘটে অনেক আগে। এখানে এসে ত সেই আগমন মুহূর্তটাই যদি দেখলেন, তবে দেখলেন কী?

বুঝতে পেরেছি। আমার ঘু দফারফা। তবে মনে রাখবেন, সারা দি আজ পথেই কাটাতে হবে। হয়ত গো রাতটাও। তখন শেষ পর্যন্ত না শরীর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

অজিতবাবুর কথায় হেসে উঠল আমি। বুঝলাম, বেচারা আর এক ঘুমোতে চান। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। পাহাড়ে দেশে এ পাহাড়ী মানুষের দিন কীভাবে শ

কাপড়-ভারতের

যে খাচাতে থেকে যাবে অনেক।

তবু ঘাটতি কিছুটা থেকেই গেল। যথেষ্ট তাড়াহুড়ো সত্ত্বেও সরকারী আবাস থেকে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম, বুঝলাম বেশ কিছুটা দেরি করে ফেলেছি। পথে দু এক জন লোক। লোক মানে মহিলা। সুন্দর পিচ ঢালা রাস্তা। বাংলোর সামনে দুটি খাড়াই পর্বতচূড়া। তাদের ফাঁকে গিরিখাত। জঙ্গলাকীর্ণ। পথ থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে আর একটি গভীর গিরি-খাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সুবর্নসিরি নদী। বাংলোর এক পাশে কাঠের মেঝে এবং পাঁচিল ঘেরা নতুন নতুন ঘর উঠেছে। টিনের চাল। বসতি। নেপালী বসতি। বনের কাঠ সংগ্রহ এবং তার বেচা-কেনাই এদের পেশা। সামনে একটি ছোট্ট দোকান। অত ভোরেও দোকানটি খোলা রয়েছে, দেখলাম। একজন তরুণী নেপালী সেখানে পসরা নিয়ে বসে রয়েছে। পসরা বলতে সিগারেট, ম্যাচ, চাল, ডাল, নুন, ইত্যাদি। দেখলাম মহুরির মত দেখতে সবুজ রঙের এক ধরনের ফল। শুনলাম বন থেকেই এগুলি সংগ্রহ করা হয়। এক পয়সা দুই পয়সার বিনিময়ে স্কুলের বাচ্চারা এদের কেনে। আমাদের বাচ্চারা যেমন হজমীগুলি কেনে, কতকটা সেই রকম।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতে তো হেসেই অস্থির। বলল, নিন না। পয়সা দিতে হবে না।

বললাম, সে কি হয়? ভোরে দোকান খুলে বসেছ। বউনি বলে একটা কথা আছে তো। বেশ, ওই ফলের জন্যে পয়সা না নাও, এক প্যাকেট সিগারেট দাও বরং? এক প্যাকেট উইলস ফ্লেক।

উইলস ফ্লেক নেই। ক্যাপস্টান আছে। আর আছে চারমিনার।

তা হলে ক্যাপস্টানই দাও বরং। কত দেব?

এক টাকা।

সে কী? এত সস্তা? চমকে প্রশ্ন করলাম আমি।

কেন? এক টাকাই তো দাম। মেয়েটি আমার কথায় যেন অবাক হলো।

না, মানে, আনতে তো খরচ পড়ে। আমার উত্তর।

না। ওই এক টাকাই দাম।

অদ্ভুত মেয়েটি। কত আর বয়েস? বছর আঠারো। সুন্দরী তো নিশ্চয়। কিন্তু সৌন্দর্যই কি শুধু? সারা মুখে তার সমুদ্রের মত সারল্য। হিমালয়ের মতই হয়ত আত্মবিশ্বাস। অন্তত ওই পরিবেশে একটি কথাই মনে হলো, এ মেয়ের মধ্যে প্রত্যয় আছে। শহরের চুনকালি মাখা মুখে মেয়েদের রূপ তো কবরস্থ হয়। আর এ মেয়ে—কোন পুরুষের সাহস আছে এর সামনে দাঁড়িয়ে খারাপ কিছু ভাবে? যেন দেব-কন্যার মতই সরল। আর এই সারল্যের বনিয়াদ সততা। যেখানে মাথা এমনিতেই নুইয়ে আসে।

ঠিক একটা টাকাই হাতে গুনে দিয়ে মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

মেয়েটি বলল, আবার আসবেন। ভাষা হিন্দী।

বলল। কিন্তু ও জানে, আমরা

ছবি : এস কে চক্রবর্তী

১২০০০ ফুট উঁচু পার্বত্য এলাকায় ছুতারিকরা তাঁবু বসাচ্ছেন

মোহিনী পোশাকে মিশমি তরুণী

পরদেশী। হয়ত কোন দিনই ওর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে না। তবু বলল। খদ্দেরকে ওই কথাই বলতে হয় যে সব সময়।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অজিত বাবু বললেন, একটা ছবি নিলে ভাল হতো।

দাঁড়ান, মশায়। ছবি-টবির কথা ছাড়ুন। ওর অনেস্টির কথা ভাবুন দেখি? কোথায় ইয়াজালি। এমন গহন জায়গায় দোকান করে বসেছে। অথচ এতটুকু নাফার লোভ নেই। আমি বলছি, এই দোকান যদি কোন অন্য জাতের হতো, এক প্যাকেট ক্যাপস্টানের দাম নির্ঘাৎ সে পাঁচ সিকে আদায় করে ছাড়তো। প্লেনের মানুষেরা, মশায়, মুনাফাবাজিতে ওস্তাদ। এ ব্যাপারে তাদের লাজলজ্জা ভয়, এতটুকু নয়।

যা বলেছেন। আমার কথায় সমর্থন জানালেন অজিতবাবু।

সামনেই ছোট্ট একটি নালা। দূরের কোন ঝর্নার জলে সম্পৃক্ত। কোথাও হয়ত বৃষ্টি হয়েছে। ফলে নালাটির স্রোতও গেছে বেড়ে। নালার পর থেকেই শুরু হয়েছে খন্ড জাতির গ্রাম। ছোট ছোট ঘর। এগিয়ে গেছে সামনের পাহা-ড়ের ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে। এক একটি ঘরের সামনে ছোট্ট বাগান।

ছবি : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

সেখানে একটি পরিবার নিয়েও একটি গ্রাম তৈরি হয়

বাগানে ভুট্টার চাষ করেছে ওরা। বড়দের চোখে পড়ল না। বড়দের মধ্যে যারা মেয়ে, তারা চাষবাস করতে দূরের কোন পাহাড়ের মাথায় ব্যস্ত। ঝুম চাষ। পুরুষরা কেউ রাস্তার কাজে নেমেছে। কেউ জিওলজিক্যাল সার্ভে অদূরে যে ড্রিলিং চালাচ্ছে, সেখানে কাজ করতে গেছে। গ্রামের অধিবাসী বলতে, অন্তত এই সকালে—এক দঙ্গল বাচ্চা। বড় বড় ছেলে মেয়েরা তাদের ছোট ভাই বোনদের দেখা শুনা করছে। তদের নিয়ে খেলছে।

শুনলাম ছোট্ট একটি প্রাইমারি স্কুল আছে এখানে। লেখা পড়া থেকে শুরু করে সেখানে তারা হাতের কাজ শেখে।

পাশ দিয়ে দুটি মেয়ে হেঁটে গেল। কালো পোশাক।

অজিতবাবু বললেন, এরা নিশি। এদের ড্রেস সব সময় কালো।

চারদিকটা ঘুরে বাংলোয় ফিরলাম সাতটা নাগাদ। এতক্ষণ সবাই উঠে পড়েছেন। আমরা যেতেই ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, আসুন, আসুন, উই আর গেটিং ডিলেড্। চা জলপান সেরে এখনই বেরিয়ে না পড়লে হাফোলি থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।

সব সেরে আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পথে ড্রিলিং ক্যাম্প। বেস মেটালের সন্ধানে এখানে কাজ করছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্মীরা। পথ এবার খাড়াই। আশপাশে গ্রামের চিহ্ন নেই। প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পড়ল ইয়াচালি। এটি একটি শহর। শুনলাম, নতুন ধরনের চায়ের চাষ করার ব্যাপারে এখানে সরকার থেকে গবেষণা চলছে। ভূতাত্ত্বিকরা এখানে মূল্যবান পাথর বেরাইলের সন্ধান পেয়েছেন। জহরৎ হিসেবে যা যথেষ্ট মূল্যবান।

আছে। অফুরন্ত ভূতাত্ত্বিক সম্ভার লুকিয়ে আছে সুবনসিরির এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মিঃ কর। ওদের সন্ধান পেলে এই অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একেবারে সোনা হয়ে দাঁড়াবে। মন্তব্য করলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

শুধু কি ভূতাত্ত্বিক সম্পদ? এ দিকের অরণ্য সম্পদও কি কম কিছু? সারা অরুণাচল জুড়ে বাঁশের বন। কলা। আছে বার্চ, ফার, নীল পাইন, আরও নানা রকম পাইন গাছ, সুপা। আরও নানা রকম মূল্যবান উদ্ভিদ সম্পদ। সারা অরুণাচল থেকে বছরে এখন সংগ্রহ করা হচ্ছে এক কোটি ষাট লক্ষ ঘন ফুটের মত কাঠ। সংগ্রহের পরিমান আরও বাড়ানর চেষ্টা চলছে।

মুশকিল এই, নষ্টও হচ্ছে প্রচুর গাছপালা। বললেন জনৈক কর্মী। জ্বালানির জন্যে বনকে বন উজাড় করে দিচ্ছে খণ্ডজাতিরা। বাইরে থেকেও লোক আসে। এক দল চুরি করেও সাবাড় করে দিচ্ছে মূল্যবান গাছপালা। তারপর ঝুম চাষ তো আছেই। বন সম্পদ রক্ষার জন্যে আরও লোকজন দরকার। তা ছাড়া, এ ব্যাপারে খণ্ড জাতিদের মধ্যেও একটা মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আমরা চলেছি কিমিন থেকে জিরো যাওয়ার পথ ধরে। ইয়াচালির পর কয়েক কিলোমিটার দূরে এক একটি পাহাড়ের মাথায় সাজান গ্রাম। নিশি সম্প্রদায়ের গ্রাম। একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম [illegible] কাঠের পাটাতনের ওপর ঘরগুলো দাঁড়িয়ে। গাড়ির শব্দে বাচ্চারা এসে পথের ধারে ভিড় করেছে।

অজিতবাবু বললেন, সুন্দর স্পট। এখান থেকে ছবি তুলব।

আমরা থামলাম।

আমাদের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল একজন নিশি রমণী। কালো বেশে অপূর্ব দেখাচ্ছিল তাকে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এল। উদ্ধব বরদোলৈ ছিলেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। তাঁকে বললাম, ইচ্ছে করছে, ওই মেয়েটির অন্দর মহল একবার দেখে নিই। কোন অসুবিধা আছে?

আমার প্রস্তাব শুনে উদ্ধববাবু মৃদু হাসলেন। তারপর যে বাড়িটির সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে দিকে চাইলেন একবার।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

অসুবিধে নেই। বললেন উদ্ধববাবু। —ভূতাত্ত্বিকদের কথা এরা জানে। তাই আমাদের এরা ভয় পায় না। বেশ, চলুন। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

উদ্ধববাবুর পেছন পেছন আমি এবং আরও কয়েকজন গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম।

মাচার ওপর গুদামের মত ঘর। কাঠের সিঁড়ি। উদ্ধববাবু সেই সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসমীয়া ভাষায় এবং মোলায়েম স্বরে ডাকলেন, কে আছ গো ভেতরে। আমরা কাছেরই লোকজন। ভয় নেই। এই তোমাদের ঘর বাড়ি দেখতে এলাম।

উদ্ধববাবু বললেন, সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ, খণ্ডজাতিও, অসমীয়া ভাষা কিছুটা বুঝতে পারে।

দরজার কাছে সসংকোচে এবং সলজ্জ ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়াল একজন প্রবীণা রমণী।

উদ্ধববাবু তাকে নমস্কার করে বললেন, এই আমরা গো। সঙ্গে ভিন দেশী মানুষ আছে, বুঝলে? তোমাদের ঘর সংসার দেখতে চায় সে। বলেই আমাকে দেখিয়ে দিলেন তিনি।

আমিও মহিলাটিকে নমস্কার জানালাম।

এবার আমাদের সে ভেতরে আসতে বলল।

আমরা ভেতরে গেলাম।

নিরাড়ম্বর পরিবেশ। প্রায় ফুট তিরিশেক লম্বা ঘর। এক পাশে কয়েকটি মাটির হাঁড়ি। ঘরের মাঝখানে একটি ধুনি জ্বলছে। ধুনিতে কাঠ এগিয়ে দিচ্ছে সেই মেয়েটি। প্রথমে যাকে দেখেছিলাম। তার সুন্দর মুখের ওপর আগুনের আভা পড়েছে ঠিকরে। সেই আভা তাকে যেন আরও রমণীয় করে তুলেছিল। আমাদের দেখেই সে মাথা নত করে এক মনে কাজ করতে লাগল। বছর পঁচিশ বয়স।

প্রবীণা মহিলাটি বলল, আমার ছেলের বৌ।

উদ্ধববাবু বললেন, আমাদের সব দেখাও গো, তোমাদের সংসার।

এক এক জন মানুষ আছেন, যাঁরা অনায়াসে অপরের সঙ্গে কত সহজেই না অন্তরঙ্গ হতে পারেন। তাঁদের সান্নিধ্যে মুহূর্তে আপন পরের ব্যবধান ঘুচে যায়। সম্পর্ক অনায়াস হয়। উদ্ধববাবু তেমনই এক জন মানুষ।

হয়ত তাই। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যতজন পাহাড়ী মানুষকে দেখেছি, মনে হয়েছে, বাইরের আচরণে তারা সমতলভূমির মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শান্ত। সংযত।

প্রৌঢ়া মহিলাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

কোন উচ্ছ্বাস নয়। তার কথায় অনবদ্য শান্ত সুর। একে একে নিজের সংসারটি ঘুরে ফিরে দেখাতে লাগল সে।

আগুনের ধুনির পাশে পড়েছিল এক গাদা পাতা। আর তার পাশে বাঁশের তৈরি চাটাই-এর ওপর কতকটা কালো সরষের মত দেখতে কী যেন।

উদ্ধববাবু জেনে নিলেন ওটা কী। তারপর আমাকে বুঝিয়ে বললেন, ওই দানাগুলি হলো কোদো ফল। আর ওই পাতাগুলিকে বলে ওকো পাতা।

কোদো ফল দিয়ে কি কর তোমরা গো? প্রশ্ন করলেন উদ্ধববাবু।

প্রৌঢ়া বলল, রুটি বানাই। আর আপং।

হ্যাঁ, এই হল ওদের খাবার। রাই পাতা, ওকো পাতার সেদ্ধ। তার সঙ্গে যদি কোদো ফলের রুটি জোটে তো চমৎকার। কোদোর দানার সঙ্গে ঈস্ট মিশিয়ে ওরা তৈরি করে এক ধরনের মদ। এই মদ তাদের কাছে পানীয় বলতে পারেন। আবার খাদ্যও বলতে পারেন। প্রচুর প্রোটিন থাকে এতে। কখনও কখনও বন্য পশু শিকার করে ওরা। তখন মাংস জোটে। তবে ইদানীং তাতেও ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

স্ত্রী-পুত্র কন্যা। একই ঘরে সবার বাস। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই সমর্থ পুরুষ এবং মেয়েরা দূরের কোন পাহাড়ে চলে যায় চাষ করতে। সেখানে সারা দিন আপাং পান এবং চাষ করা। আর ঘরে থাকে যারা, সারা দিন তারা ব্যস্ত থাকে গৃহস্থালির কাজে। ঘরবাড়ি মেরামত, রুটি তৈরি, আপাং তৈরি অথবা সেলাই। চিরাচরিত এই জীবন ধারার সেখানে আজও যেন ছেদ নেই।

তবে পরিবর্তন আসছে। বললেন উদ্ধববাবু।—বাইরের লোকের আনা-গোনা বাড়ছে। এক সময় নিজের গ্রাম ছেড়ে এরা বাইরে যেতো না। এখন কিছু কিছু তাও যাচ্ছে। পেছনে ইয়াচালি। সামনে এগোলেই হাফোলি। সেখানে দোকান বসেছে। শহর বসেছে। তাদের স্পর্শে এদের জীবনেও আসছে পরিবর্তন।

আসুক পরিবর্তন। কিন্তু নিশি পরিবারের সান্নিধ্যে জীবনের যে শান্ত দিকটা দেখে এলাম আধুনিক শহর মানুষকে কোন দিন কি তা দিতে পারবে?

নাগাল্যাণ্ডের পুকপুরে গিয়েও এই একই কথা আমার মনে হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা পরে বলব।

নিশি পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে হাফোলী যেতে আমাদের আরও প্রায় এক ঘন্টার মত লেগে গেল। মাঝে পড়ল জোরাম। কিমিন-জিরো পথের এটাই উচ্চতম অঞ্চল। উচ্চতা ৫৭৫৪ ফুট। জোরামের পর ডান দিকে বাঁক নিয়ে কিছুদূরে এগোতেই হাফোলির সীমানা। এই পথে আমাদের জীপ বেশ কিছুটা পথ নিচে নেমে এল। নেমে এল পাহাড়ের কোল থেকে দেখা গেল এক পাশে বিরাট উপত্যকায় ধানের ক্ষেত। ক্ষেতে ধান ছিল না তখন। ধান বোনার জন্যে জমি তৈরি করা হচ্ছে। এখানে পথের ধারে অদ্ভুত এক ধরনের বাঁশ গাছ দেখলাম। শরু শরু পাতা। বাঁশগুলি লম্বায় খুব বড় নয়। ব্যাস দুই ইঞ্চির মত। সারিবদ্ধ কুঞ্জের মত পথের যে দিকটায় উপত্যকা সে দিকে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, ঘরের বেড়া দেওয়ার জন্যেই এই বাঁশ প্রধানত কাজে লাগান হয়।

আধুনিক ঘড়বাড়ি। হাউসিং এস্টেট। ছোট ছোট শিল্প কেন্দ্র। এক পাশে পুলিস লাইন। কোর্ট কাছারি। আর এক পাশে দোকান পাট। পাহাড়ের সম্পূর্ণ আদিম পরিবেশ থেকে এ যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জগৎ। কে বলবে, আমি পৃথিবীর আধুনিকতম একটি শহরে দাঁড়িয়ে নেই?

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, কেমন মালুম হচ্ছে বলুন? হাফোলি হচ্ছে সুবনসিরির ডিস্ট্রিক্ট হেড্ কোয়ার্টাস্।

অপূর্ব! এত কাছে এমন যে একটি মনোরম জায়গা থাকতে পারে, যেন ভাবাই যায় না। একেবারে টিপ টপ। পথের দু ধারে দোকান। সব কিছুই পাবেন সেখানে। জামা কাপড় থেকে ট্রানজিস্টার। ভাল স্কুল আছে। ছেলে মেয়েরা সাজসজ্জায় পাকা শহুরে।

একটি চায়ের দোকানে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। দারুণ স্মার্ট। মিশনারি ইস্কুলে পড়ে। আপাতানি ট্রাইব। বলল, বাবা তাকে বলেছে, স্কুল পাস করার পর সে কলকাতায় গিয়ে পড়বে।

পথে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছে মেয়েরা। বেশির ভাগই বিদেশী পোশাক। চেহারায় অপূর্ব কমনীয়তা। শুধু নাকের দু পাশে কালো গহনার মত উল্কি। অনেকের থুতনিও ওই ভাবে গহনা করা হয়েছে।

জনৈক আপাতানি বলল, আগে উল্কি মাখিয়ে মেয়েদের মুখের রূপ নষ্ট করে দেয়া হতো। সবটাই যে ডেকরেশন, তা নয়। দূরে থেকে অনেকে আমাদের মেয়ে নিতে আসত তো তাই এই ব্যবস্থা। এখন এই প্রথাটি আমরা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। বন্ধ হয়েওছে অনেকটা।

পথ দিয়ে আসছিলেন জনৈকা মহিলা। বললাম, আপনার ছবি তুলব।

দারুন স্মার্ট! আমার কথায় মুচকি হেসে তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজিতবাবুর ক্যামেরায় ক্লিক।

ছবি তোলার পর দু চারটি কথাও বললাম তাঁর সঙ্গে। ইংরেজি জানেন। তাই অসুবিধা হলো না। বললেন, বেড়াতে এসেছেন? থেকে যান কয়েক দিন। জায়গাটা আপনার ভাল লাগবে।

কথায় কোন জটিলতা নেই। কোন জড়তা নেই। মনে হলো, এমন অদ্ভুত সাবলীলতা যাঁদের, জীবন সংগ্রামে তাঁরা তো অনেকটা পথই এগিয়ে গেছেন। আধুনিকতা মানে যে চিরায়ত মানবিক গুণগুলি হারিয়ে ফেলা নয়, ওঁদের সঙ্গে কথা না বললে, ওঁদের ব্যবহারিক জীবন না দেখলে, সেটা বুঝে ওঠা শক্ত। [ক্রমশ]

পূর্ণেন্দু পত্রী

মাথায় মুকুটটা পরিয়ে দিতেই রাজা হয়ে গেলেন তিনি।
আর সিংহাসনে পাছা রেখেই হাঁক পাড়লেন
—হালুম।
অমনি মন্ত্রীরা ছুটলো ঘুরঘুট্টি বনে হরিণের মাংস সেঁকতে
সেনাপতিরা ছুটলো থলথলে সমুদ্রে ফিস-ফ্রাইয়ের খোঁজে
কোতোয়ালরা ছুটলো হাটে-বাজারে যেখান থেকে যা আনা যায় উপড়ে
বরকন্দাজেরা ক্ষেত-খামার লণ্ড-ভণ্ড করে বানালো ফ্রুট-স্যালাড
রাজা সারলেন ব্রেক-ফাস্ট।
তারপরেই সিং-দুয়ারে বেজে উঠলো সাতমন সোনার ঘণ্টা। —
এবার রাজদরবার।
আসমুদ্র-হিমাচলের ন্যাংটো, আধ-ন্যাংটো জন্তু-জানোয়ারের ঝাঁক
পিলপিলিয়ে জড়ো হলো রাজ-চত্বরে
মন্ত্রী জানালো, প্রভু!
জনতা হাজির। ওরা প্রসাদ পেতে চায় আপনার অমৃত ভাষণের।
অমনি উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে, ঈশানে, নৈর্ঋতে
গাছে, পাতায়, শিশিরে, শ্মশানে, ধুলোয়, ধোঁয়ায়, কুয়াশায়
আকাশে, বাতাসে, হাড়ে, মাসে, পেটে, পাঁজরে
গর্জন করে উঠলো সাড়ে সাতশো অ্যাম্প্লিফায়ার
—হালুম।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

পায়ের নিচের মাটি চেনা, প্রতিষ্ঠিত।
আকাশই অচেনা, উপমার নিস্তব্ধ আঁধারে
একা যা জ্বলতে পারে
নাভির আগুনে,
সেই নক্ষত্রজ্যোতির দিকে
অর্জুনতীরের মতো এখনো সহসা
অসমসাহসীভাষা একা উঠে যায়;
যেন দিগন্তের শেষ দিক শিখে
যতিচিহ্নের আগ্রহ এড়িয়ে
তীর বিদ্ধ হবে কোনো স্পষ্ট অলৌকিকে
আর কাছে, তুলসীতলার শান্ত বাঙালী প্রতীকে
পুনর্বার ব্যাপ্ত হবে কুলবধূ আলো
যা ওই নক্ষত্রেরই একমাত্র স্থায়ী অনুবাদ!

আয়তি, কত দীর্ঘদিন পরে
বাতাসপুরের মাঠে সন্ধ্যার কালো হাহাকারে
তোমাকে দেখলাম!
দেখলাম
কিশোরীর সদ্য বেশে
অথবা কি ছদ্মবেশে
বর্ষাবিষণ্ণ মাঠে দেবতার দীপ্ত একাকী জ্বালাতে এসে
অকস্মাৎ নিজে উঠলে জ্বলে?
আর চেনা মাটির ওপরে
অচেনা দৃশ্যের মতো ক্রমশই হয়ে এলে
মানুষ কবির না লেখা শব্দের অভিমান।

এক শর্তে

সলিল চক্রবর্তী

এক শর্তে শান্ত হ'তে পারি—
আমাকে দেখাবে তুমি মুগ্ধবৃষ্টি, ধ্যানমগ্ন রোদ।
ক্ষমা নয়। ক্ষমা চাই না আমি। তবে, ভুল কিছু চাই—
যে ভুলে শিখতে পারি গাঢ় সম্মোহন।

এক শর্তে চুপ থাকতে পারি—
আমাকে ভেজাবে তুমি, অপরূপ মেঘের ঝালরে।
আলো দিয়ে ঢেকে দেবে অসীম শূন্যতা।

ঘুম নেই, চেয়ে দেখো—কতোদিন ঘুমোইনি আমি
শান্তি নেই, চেয়ে দেখো কতোদিন, বসিনি নিজের কাছে, শুধু
আছে, বনস্থলী জুড়ে বর্ণহীন মোহময় খিদে।

দুপুর গড়িয়ে রোদ চ'লে গেলো ছায়ার ভিতরে...
ওই শর্তে নিতে পারি কাছে।

বিষ্ণু দাস (জন্ম ১৯৪৬)—সরকারী চারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৭১)। "ক্যানভাস আর্টিস্টস সার্কেলের" প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। হাভানার বিশ্ব যুব উৎসবে অন্যতম প্রতিনিধি (১৯৭৮)। সিটি কলিজিয়েট স্কুলের চিত্রশিক্ষক। টেম্পেরায় (২৪"×১২") আঁকা ছবিতে নাগরিক বাঙালী ভদ্রলোককে তাঁর পরিবেশের মধ্যে দেখি।

আগামী সপ্তাহে নতুন অ্যাডভেঞ্চার

॥ ১৬ ॥

আজ ইন্টারস্কুল ক্রিকেট ফাইন্যালে জিলা স্কুল নয় রানে এফ ডি আইকে হারিয়েছে। স্কুলের উপর ক্লাসের ছেলেরা বিজয়-উল্লাস চলার সময় হেডমাস্টার মশাইকে ধরেছিল যাতে আগামীকাল স্কুল ছুটি থাকে। সেটা পাওয়া গেল কিনা এখনও জানা যায়নি। তাই স্কুলের সামনে বেশ কিছু ছাত্রের জটলা রয়েছে। মাঠের একপাশে গোলপোস্টের গা ঘেঁষে নতুন স্যারের সঙ্গে অনিরা বসেছিল। এমন সময় এফ ডি আই স্কুলের নবীনবাবু ওদের কাছে এলেন। নবীনবাবুকে এর আগে দেখেছে অনি। ভীষণ নস্যি নেন আর কংগ্রেসী করেন। ছাব্বিশে জানুয়ারীতে কংগ্রেসের প্রসেশনে নবীনবাবুর হাতে পতাকা ছিল। এফ ডি আই-এর ছেলেরা পোশাক পালটে চুপচাপই চলে গেল। ইন্টারস্কুলের যত খেলা হয় প্রতিটিতেই প্রায় ওরা জিলাস্কুলকে হারায় শুধু এই ক্রিকেটটা বাদে। আজকে জিলাস্কুলের অরুণ ব্যানার্জী দারুণ খেলেছে, সামনেবার ও থাকছে না, তখন দেখা যাবে —যাবে এইসব বলতে বলতে ওরা চুপচাপই চলে গেল

নবীনবাবু রুমালে নাক মুছতে মুছতে নতুন স্যারকে বললেন, 'নিশীথ, তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল'। নবীনবাবুকে দেখে অনির খুব হাসি পাচ্ছিল। খেলা চলার সময় কোন বল বাউণ্ডারী পেরিয়ে গেলে নিজের স্কুলের ছেলেদের গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছিলেন। অনিদের স্কুলের বড়রা সেই গালাগালিগুলো আওড়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে।

নতুন স্যার বললেন, 'আরে বসুন না এখানে এখন আর ঠাণ্ডা নেই।'

নবীনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন 'ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে তো, হিমটিম লাগলে—তাছাড়া-- বলে ওদের দিকে তাকালেন নবীনবাবু।

নতুন স্যার বললেন, 'খুব ব্যক্তিগত কথা ?'

নবীনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'রাজনীতিক ব্যাপার।'

নতুন স্যার হাসলেন, 'ও, তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। এরা আমার খুব অনুগত ছাত্র। তেমন গুরুতর ব্যাপার নয় আশা করি ?'

নবীনবাবু এবার ধুতি সামলে ঘাসের ওপর বসলেন, 'এবারও আমরা তোমাদের কাছে হেরে গেলাম। ফুটবলে দেখে নেব।'

নতুন স্যার হাসলেন। অনির খুব ইচ্ছে করছিল ফুটবল নিয়ে কথা হোক। ওঁদের স্কুলে দুজন ছেলে আজ আটবছর ধরে নাকি ফুটবল খেলার জন্য পাস করতে পারছে না। নবীনস্যার বললেন, 'ছাব্বিশে জানুয়ারীর পর একদম হইচই হল না, কেমন যেন আলুনি আলুনি লাগছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'হইচই করার মত লোক করেননি।'

নবীনবাবু বললেন, 'কিন্তু ওদের পার্টির সভ্যদের ধরে পুলিস প্যাঁদালো, এতো সবাই চোখের ওপর দেখেছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'ওরা পার্টির সভ্য নয় নিশ্চয়ই। কোন পার্টি এই ধরনের হঠকারী কাজ করবে না। আমরা তো জানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পরও ওরা এখন অগোছালো।'

নবীনবাবু বললেন, 'তাহলে এ কাজ করল কে ?'

নতুনস্যার বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু মাথাগরম ছেলে। পুলিস নাকি বলেছে সবাই শহরের নয়। এসব নিয়ে ভাববেন না।'

নবীনবাবু বললেন, 'আমি ভাবতে পারি না নিশীথ, এত কষ্ট করে এত রক্ত দিয়ে কংগ্রেস স্বাধীনতা আনলো আর সেদিনের কয়েকটা পুঁচকে ছোঁড়া তাকে অপবিত্র করে দিল। এই প্রতিদান ?'

হঠাৎ নতুন স্যারের গলার স্বর পালটে গেল, 'এ কথাই তো দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে। গান্ধীজীকে হত্যা করতে এ দেশের মানুষের হাত তো কাঁপেনি। কিন্তু সেটা কজনের হাত ? যীশু-খ্রীষ্ট নিহত না হলে পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষের চোখ খুলত না। আমরা সে কথাই সবাইকে বোঝাব।'

নবীনবাবু সামনে ঝুঁকে যেন অনিরা শুনতে না পায় এমন গলায় বললেন, 'কাল শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ঐ ঘটনাটাকে কাজে লাগিয়ে লাল-পার্টির বারোটা বাজাতে প্ল্যান হচ্ছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'সে কি। এটা তো ওদের কাজ নয়, আমরা জানি।'

নবীনবাবু বললেন, 'জানাটা আর জানানোটা এক নয়। শশধরবাবু বললেন এই সুযোগে ওদের মুখে কালি বোলালে ইলেকশনে ওরা মাথা তুলতে পারবে না। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন ওয়ার।'

নতুন স্যার বললেন, 'ইলেকশন। কবে ?'

নবীনবাবু কৌটো খুলে আবার নস্যি তুললেন, 'তা জানি না তবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নির্বাচন তো অবশ্যম্ভাবী।'

হঠাৎ নতুন স্যার বললেন, 'যারা সেদিন কাজটা করল তাদের একজনকে আমি চিনি। খুব ভাল কবিতা লিখত। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ও যে কোন রাজনীতিতে বিশ্বাস করে আমি কোনদিন টের পাইনি।'

নবীনবাবু রুমালে নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'শশধরবাবু আজ তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।'

নতুন স্যার বললেন, 'বাড়িতে থাকবেন ?'

নবীনবাবু বললেন, 'না-না। তোমাদের পাড়ার বিরাম করের বাড়িতে আজ সন্ধ্যেবেলায় উনি আসবেন, সেখানেই যেতে বলেছে। বিরামবাবুকে চেন ?'

'সামান্য। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবশ্য আলাপ আছে।'

'খুব সুন্দরী মহিলা, না ?' নবীনবাবু প্রশ্নটা করতে অনি দেখল নতুন স্যার চট করে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর একটু অস্বস্তি-মাখানো গলায় বললেন, 'ওই মহিলারা যেরকম হন আর কি।'

নবীনবাবু হাসলেন, 'একটু হাতে রেখ, হচ্ছেন। ইনাকসাব স্যাঙাতদের কে হচ্ছে জানো ?'

নতুন স্যার অনামনস্ক হয়ে ঘাড় নাড়লে কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ ফস ক বলে বসল, 'আচ্ছা, ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে কি

সবাই ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতে নং স্যার বললেন, 'হঠাৎ তোমার মাথায় এই প্রশ্নটা এ কেন অনি ?'

অনি আস্তে আস্তে বলল, 'দেশমাত শব্দটার মানে তো আমরা জানি কিন্তু ইনকিল জিন্দাবাদ মানে তো জানি না। আচ্ছা, এখন থ আমি পরে জিজ্ঞাসা করব।'

কথা বলার ধরন দেখে সবাই হো হো ক হেসে উঠতে অনি মাথা নিচু করল। হঠাৎ হঠাৎ ম থেকে নিজের অজান্তে কথা বেরিয়ে যায়। নতুন স্য বললেন, 'পরে কেন ? আচ্ছা তোমরা যে সব হাত তোমাদের কেউ মানেটা বল দেখি ?' অনি চোখ তুল দেখল ওরা কেউ কথা বলছে না, প্রশ্নটা শু নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। হঠাৎ নবীনবা ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'আমাকে জিজ্ঞা করো না। আমি চলি।' নতুন স্যার কিছু বল আগেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'আরে আপনি যাচ্ছেন কোথায় ? একসঙ্গে শশধরবাবুর কাছে যাব ভেবেছিলাম।' নতুন স্যা বলে উঠলেন।

'শশধরবাবু ? বিরাম করের বাড়িতে যাবেন তা হলে অবশ্য—।' একটু যেন খুশী হলে নবীনবাবু, 'আমার সঙ্গে আলাপ নেই, এই সুযোগে আলাপ হয়ে যাবে; চল।'

নতুন স্যার বললেন, 'আরে এখনও তো সন্ধে হয়নি।'

নবীনবাবু বললেন, 'বয়স অল্প তো, ঠাও পাও না। এই সন্ধ্যে হয়নি মনে হওয়া সময়টা খু ডেঞ্জারাস। চোরা হিম কখন মাথার ভিতর ঢুকে গিয়ে চেপে বসবে টের পাবে না। আমার আবা সাইনাসের ট্রাবল আছে। সাইনাস কি কশগা রোগ ?'

নতুন স্যার উঠতে উঠতে বললেন, 'জানি না তাহলে আপনার পক্ষে নস্যি নেওয়া তো উচিত হচ্ছে না।' ওঁকে উঠতে দেখে অনিরাও উঠে পড়ল। এখন সন্ধ্যে হয়নি বটে কিন্তু পশ্চিমের আকাশটার লাল আভাটা কেটে গেছে। স্কুলের বিশাল মাঠটা জুড়ে অদ্ভুত শান্ত এক ছায়া ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

নতুন স্যার বললেন, 'চল হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।'

নবীনবাবুর কথাটা মনঃপুত হল না, আ না ওরা আবার হাঁটবে কেন, ছাত্রদের পড়ার সময় হয়ে গেছে। এখন তোমাদের কর্তব্য মন দিয়ে পড়াশুনা করা, রাজনৈতিক আলোচনা করার জন্য পরে অনেক সময় আছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে এখন বাবারা দৌড়ে বাড়ি চলে যাও।'

নতুন স্যার হেসে অনির কাঁধে হাত রাখলেন 'বাড়ি যেতে হলে ওদের বড় রাস্তা অবধি একসঙ্গে যেতে হবে তো। চল তোমরা। হ্যাঁ যে কথ জিজ্ঞাসা করছিলে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে হ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

নবীনবাবু বললেন, 'তাই বলো। আমার তে ধ্বনিটা শুনলে কেমন ধমক ধমক মনে হয়। ত তাই বিপ্লবটা

আসল ফরাসী
সৌরভের
মত অনুপম
Lakme

গোরা রঙ...
তরতাজা ভাব..
নিদাগ, নিখুঁত !

ল্যাকমে
ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্ক
একেবারে আসল ফরাসী
ল্যাভেণ্ডারের মত.এর
মন মাতানো সুরভি আপনাকে
সারাক্ষণ আবেশে বিভোর
করে রাখবে -যে সুরভির রেশ
কখনো ফুরোয় না।
ল্যাকমে-
সৌন্দর্য সাধনায় যারা সবার সেরা
ল্যাকমে

ল্যাকমে
ভ্যানিশিং ক্রীম
কত কোমল
কত স্বাভাবিক —মেক-আপের
মূল বুনিয়াদের এক আদর্শ
উপাদান। ল্যাকমে
ভ্যানিশিং ক্রীম।
Lakmé
VANISHING CREAM
ল্যাকমে-
ত্বকের পরিচর্যায় যারা সবার সেরা
ল্যাকমে

তাকেই কম্যুনিস্টরা বিপ্লব বলে থাকে। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে একজন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ এক হয়ে যে সংগ্রাম করেছিল তার ফলে সেই দেশে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যায়। সেই সংগ্রামের সম্মানে পৃথিবীর সর্বত্র শোষিত মানুষের বুকে উৎসাহ আনতে কম্যুনিস্টরা বলে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

অনি বলে ফেলল, 'এখন তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, ইংরেজরা চলে গেছে, শোষকরা তো আর নেই। তাহলে কেন ওরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে সেদিন অমন মার খেল ?'

নবীনবাবু চমকিত হয়ে বললেন, 'এ ছেলে তো খুব তৈরী। গুড, গুড। তবে জেনে রেখো খোকা, নেতারা যা বলেন তাই মেনে নেবে, কোন প্রশ্ন করতে নেই। প্রশ্ন করলে কোন শৃঙ্খলা থাকে না।'

নতুন স্যার বললেন, 'ওতো এখনও বালক কৌতূহল না থাকলে ওকে মানায় না। ওরা বলে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা নাকি ইংরেজরা দয়া করে দিয়ে গেছে। কেউ কি দয়া করে ক্ষমতা দেয় যদি বাধ্য না হয় ? ওরা বলে দেশে স্বাধীনতার পর কোন পরিবর্তন হয়নি। অবস্থা একই আছে। আমরাই যেন এখন শোষক। নিশ্চয়ই কেউ একথা ভাবতে পারে তার স্বাধীনতা আছে ভাবার। আমরা রাশিয়ার মত কারো ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইনি। কিন্তু আমাদের ভুল দেশের লোকের কাছে ধরিয়ে দিতে ওরা বিদেশ থেকে আদর্শ আমদানি করল কেন ? এমন একটা ধ্বনি ওরা বেছে নিল যার অর্থ দেশের সাধারণ মানুষ জানে না। দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পুজো করার কি প্রবণতা। সুভাষ বোস কংগ্রেসের আদর্শ মেনে না নিতে পেরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেননি, তিনি বলেছিলেন, 'জয় হিন্দ'। আসলে নিজেদের কথা নিজেদের মত পাওয়া যাবে না।'

নবীনবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। এই দেশে আগামী একশ বছরেও কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আসবে না।'

নতুন স্যার ম্লান হাসলেন, 'দুঃখ হয়, কয়েকটি তাজা তরুণ ছেলে কি ভ্রান্ত হয়ে বিপথে চলে গেল। আচ্ছা, এবার তোমরা যাও।'

ওরা দাঁড়িয়ে দেখল নতুন স্যার আর নবীনবাবু বিরাম কর মশাইয়ের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। অনির বন্ধুরা ডানদিকে সেনপাড়ার দিকে চলে গেলে ও একা একা হাঁটতে লাগল। নতুন স্যারের সব কথা ও বুঝতে পারেনি। কিন্তু বন্দেমাতরম শব্দটা উচ্চারণ করলে বুকের মধ্যে যে রকম চনমন করে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বললে তা করে না। সেদিন ঐ ধ্বনিটা শোনার পর বাড়িতে একা একা ও আবৃত্তি করেছে। খুব জোরালো মিলিটারী মিলিটারী বলে মনে হয়। ওর হঠাৎ মনে হল, নতুন স্যার হয়তো ঠিক কথা বলেননি। এই ছেলেগুলো কি এতই বোকা যে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতে বলতে মার খাবে! কোথাও একটা ব্যাপার আছে যা হয়তো নতুন স্যার জানেন না। অনির ছোটকাকার কথা মনে পড়ল। ছোটকাকা কোথায় এখন ? ছোটকাকা তো বন্দেমাতরম শুনলে মুখটা কেমন করতো! কিসের জন্য ছোটকাকা এখনও বাড়ি আসে না ? ছোটকাকা তো সব বুঝতো। এসব কথা ভাবতে গিয়েই অনির মনে পড়ে গেল তপুপিসী এখন জলপাইগুড়িতে। তিস্তা গার্লস স্কুলে দিদিমণি হয়ে গেছে তপুপিসী। পিসীমা সেদিন দাদুকে বলছিলেন কথাটা। বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে এই চাকরিটা নিয়ে স্কুলের হোস্টেলে আছে। অনির ভীষণ মনে হতে লাগল, তপুপিসী নিশ্চয়ই ছোটকাকার খবর জানে। কেন মনে হল অনি জানে না, কিন্তু ও ঠিক করল তপুপিসীর সঙ্গে দেখা করবে।

স্কুলের সামনে এসে দাঁড়াল। আর কদিন বাদেই দোল। জলপাইগুড়িতে দোলটা বেশ বাড়াবাড়ি রকম হয়ে থাকে। তিস্তা গার্লস স্কুলের পথে আসতে আসতে অনি বিহারী মজুরদের চিৎকার করে ঢোলক বাজিয়ে হোলির গান গাইতে দেখেছে। স্কুলের মেইন গেট বন্ধ তবে গেটের একপাশে ছোট একটা দরজা কেটে বের করা হয়েছে। অনি দেখল বয়স্ক পুরুষ মহিলারা সেই ছোট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। সাহস করে অনি ওঁদের পিছু পিছু চলে এল। গেটের এপাশে বিরাট মাঠ, অনেক গাছপালা, তারপর ইংরেজী 'ই' অক্ষরের মতো স্কুল বিল্ডিং। কোথায় তপুপিসীর হোস্টেল বুঝতে না পেরে অনি এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ভাবল এভাবে আসাটা ঠিক হয়নি। তপুপিসীর ভাল নাম ওর জানা নেই। মাঠের দিকে তাকাল ও, মেয়েরা হাডুডু খেলছে। এত বড় মেয়েদের হাডুডু খেলতে ও কখনো দ্যাখেনি। কয়েকটা শাড়ি পরা মেয়ে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ফিক করে হেসে গেল। মুহূর্তে অনির নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগল। ঠিক সেই সময় একটা দারোয়ানগোছের লোক ওকে জিজ্ঞাসা করল সে কাকে চায় ?

অনি বলল, 'নতুন দিদিমণি।'

দারোয়ান বলল, 'কোনসা দিদিমণি ? নাম ক্যা ?'

অনি বলল, 'তপুদিদিমণি! স্বর্গছেঁড়া থেকে এসেছে।'

'ক্যা বোলতা ? পুরা নাম কহ ?' দারোয়ান খিঁচিয়ে উঠল।

'পুরো নাম জানি না।' অনি বলল।

'তব ভাগো। দো মিনিট নেহি তো আর মতলবে ঘুস গিয়া। যা ভাগ। লিডিস স্কুলমে ঘুসনেমে বহুত মজা—হ্যাঁ ?' লোকটা অনির হাত ধরে টানতে টানতে গেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। অনি বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।' ওর খুব

"টিয়ারা এগ আমার মাথার মণি"

আমার মাথার চুলের আগাগুলো চিরে গিয়ে চুল ক্রমেই খসখসে শুকনো হয়ে যাচ্ছিল। তখন মার উপদেশমত মাথায় টিয়ারা এগ শ্যাম্পু ব্যবহার শুরু করলাম। এর পুষ্টিকর ভিটামিন এ ও ডি'র গুণে চুল হয়ে উঠলো চিকণ, ঝলমলে। টিয়ারা এগকে আপনারও মাথার মণি করুন।

সবরকম চুলের যত্নের জন্যে টিয়ারা, সবার সেরা।

- **টিয়ারা বিউটি শ্যাম্পু**
  রাশি রাশি ফেনায় ভরপুর।
- **টিয়ারা ল্যানোলিন শ্যাম্পু**
  শুকনো চুল করে তোলে চিকণ, ঝলমলে।
- **টিয়ারা শিকাকাই শ্যাম্পু**
  এতে মেশানো আছে আমলা ও ব্রাহ্মী যা' একচাল লম্বা চুলের যত্ন নেয়।
- **টিয়ারা লেমন শ্যাম্পু**
  তেলতেলা চুলের যত্ন নেয়।
- এছাড়া **টিয়ারা হেয়ার কণ্ডিশনার'ও** পাওয়া যায়।

- **টিয়ারা ব্যান + ড্যান ক্রীম শ্যাম্পু**
  খুসকি নির্মূল করে চুল করে তোলে পরিষ্কার।

টিয়ারা শ্যাম্পু

HELENE CURTIS

হেলীন কার্টিস্‌-চুলের যত্নের ব্যাপারে যাঁরা জগতে সবার অগ্রণী

everest/78/JKH/40-bn

ওদের দিকে দারোয়ানকে ডাকতে ডাকতে এল। ডাক শুনে দারোয়ান ওকে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর শক্ত লোহার মত আঙুলের চাপে অনির হাত ভেঙে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে বলল, 'দারোয়ান, দিদি ওকে ছেড়ে দিতে বলল।'

'কোন দিদি?' দারোয়ান বোধ হয় এটা আশা করেনি।

'ডেপুটি দিদি।' মেয়েটি কথাটা বলতেই দারোয়ান ওর হাত ছেড়ে দিল। অনির মনে হল ওর হাতটা কবজির কাছে ভেঙে গেছে। একটুও সাড় পাচ্ছে না। অন্য হাতটা দিয়ে ও অবশ জায়গাটায় মালিশ করতে গিয়ে শুনল মেয়েটি তাকে বলছে, 'তোমাকে দিদিমণি ডাকছেন?'

খুব অবাক হয়ে অনি ওর মুখের দিকে তাকাল। ফ্রক পরা এই মেয়েটি মাথায় তারই মত লম্বা, দৌড়ে এসেছে বলে মুখটা একটু লালচে। ও বলল 'আমাকে?' মেয়েটি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কে?' অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না।

'ডেপুটি দিদি।'

'আমি তো!' অনি ভয় পেল হয়তো তার এই প্রবেশের জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ ওকে শাস্তি দেবেন, শুধু দারোয়ানের আঙুলের চাপই যথেষ্ট নয়। অনি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এখানে তপু দিদিমণি কোথায় আছেন? স্বর্গছেঁড়ায় থাকতেন।' মেয়েটিকে তুমি বলতে কেমন বাধলো অনির।

'উনিই তো আমাদের ডেপুটি। উনিই তোমাকে ডাকছেন।' অনির বোকামি দেখে মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসল।

তপুপিসী কি ধরনের কাজ করে যাতে তাকে ডেপুটি বলা যায় তার কোন ধারণা ছিল না অনির। ও মেয়েটির পেছন পেছন অনেকটা পথ হেঁটে এল। এর আগে কোন গার্লস স্কুলের ভেতরে ও ঢোকেনি, এখন এতগুলো মেয়ের মধ্যে তাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে হাঁটতে গিয়ে অনির খুব অস্বস্তি হতে লাগল। অদ্ভুত এক আড়ষ্টতা এবং পুরুষালী সপ্রতিভতা ওকে পেয়ে বসল।
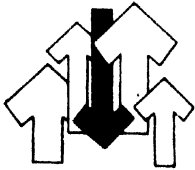
মাঠের শেষে চেয়ারে গা এলিয়ে তপুপিসী বসেছিল। অনিদের দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল। অনি খানিকটা দূরে থেকে তপুপিসীকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে তপুপিসী। মুখ চোখ যেন কেমন কেমন, রাগী রাগী মনে হয়।

মেয়েটি বলল, 'দিদি, ওকে এনেছি।' কথাটা শেষ হতেই তপুপিসী ওকে হাত ধরে কাছে টেনেছেন, 'ওমা, আমাদের অনি, তুই কত বড় হয়ে গেছিস। দূর থেকে দেখে আমি একদম অবাক। একবার ভাবি অনি কিনা, তারপর হাঁটা দেখে বুঝলাম, এ নির্ঘাত তুই। খুব লম্বা হয়েছিস যাহোক, সোজা হয়ে দাঁড়া দেখি, ওমা, আমি কোথায় যাব—তুই যে একদম আমার মাথায় মাথায় হয়ে গেছিস।' গালে হাত দিতেই তপুপিসীর মুখের গাম্ভীর্য কোথায় পালিয়ে গেল। এই ধরনের কথা শুনে অনির খুব ভাল লাগছিল। এইভাবে নিজের লোকের মত কথা কেউ বলে না আজকাল। ও দেখল মেয়েটি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে তপুপিসীকে দেখছে। বোধ হয় ওদের কাছে তপুপিসীর এই চেহারাটা অজানা। তপুপিসী

নরম হয়ে গেল তার, 'মায়ের জন্য খুব কষ্ট হয় না রে?' তপুপিসীর হাতটা ওর কাঁধের ওপর ছিল। অনি মাথা নিচু করল। ও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছে, ইদানীং মায়ের কথাবার্তা কেউ বললে ও বেশ সহ্য করতে পারে, আগেকার মত দম বন্ধ হয়ে কান্না পায় না।

'তোর নতুন মা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। আচ্ছা, তুই কার কাছে এসেছিস এখানে? কেউ পরিচিত আছে এখানে?' তপুপিসী যেন হঠাৎই বাস্তবে ফিরে এলেন। হাসল অনি, 'তোমার কাছে এসেছিলাম।'

'আমার কাছে? সত্যি? তাহলে ফিরে যাচ্ছিলি কেন?

'দারোয়ান তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তোমার পুরো নাম বলতে পারিনি।'

কথাটা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন তপুপিসী, 'সেকি! তুই আমার নাম জানিস না?'

নিজেকে সামলাতে অনি বলল, 'কি করে জানব তুমি ডেপুটি ফেপুটি হয়েছ!'

'ওমা, আরে আমি তো এই হোস্টেলে থাকি আর মেয়েদের খুব যে শাসন করি তাই আমার কাছে ভাড়া নেয় না স্কুল, তার বদলে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট করে দিয়েছে।' তপুপিসী বোঝালেন, 'তা হাঁরে, কার কাছে শুনলি আমি এখানে আছি।'

অনি বলল, 'শুনলাম, পিসীমা বলছিল।'

তপুপিসী বলল, 'বড়দি, মেশোমশাই ভাল আছেন?' অনি ঘাড় নাড়ল।

'কেউ তোকে পাঠিয়েছে আমার কাছে?' তপুপিসী চোখ বড় বড় করল।

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

এই প্রথম অনির মনে হল ও যেজন্য তপুপিসীর কাছে এসেছে সেটা বলতে ওর কেমন সংকোচ হচ্ছে। ছোটকাকুর কোন খবর তপুপিসীর কাছে পেতে হলে যে সম্পর্কটা থাকা দরকার সেটা আছে কি? অনির মনে পড়ল সেই চিঠিটার কথা, যার অর্থ তখন সে বুঝতে পারেনি কিন্তু তপুপিসীর জন্য কষ্ট হয়েছিল। এখন তো সে অনেক কিছু বুঝতে পারে। এই তো তপুপিসী বাড়ি-ঘর ছেড়ে একা একা এখানে আছেন, কেন, কি জানে? তপুপিসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এসেছিস, বলনা রে?' এবার অনি ঠিক করল ও বলেই ফেলবে। মাথা নিচু করে ও বলল, 'আমি একটা কথার মানে বুঝতে পারি না। ছোটকাকু থাকলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম। তুমি জানো কোথায় ছোটকাকু আছে?'

'আমি জানবো এই ধারণা তোর কি করে হল?' যেন একটা গভীর কুয়োর ভিতর থেকে কথা বলছে তপুপিসী। অনি সত্যি কথা বলে ফেলল, 'আমি তোমার চিঠিটা পড়েছিলাম, পুলিস সেটা পায়নি। ছোটকাকু চলে যাবার পর পুলিস এসে ওটা পেলে তোমাকেও ধরত। দাদুর আলমারিতে চিঠিটা রয়েছে, তুমি যদি চাও এনে দিতে পারি।'

তপুপিসী বলল, 'কি কথার মানে তুই বুঝতে পারিস না অনি?'

'বন্দেমাতরম আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ছোটকাকু কেন দ্বিতীয়টাকে বেছে নিল? কোনটা বড়?' অনি বলল। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তপুপিসী বলল, 'তুই এত ছোট ছেলে, তোর এ সবে কি দরকার! এ বড় শক্ত জিনিস, ভীষণ নেশা। মদের চেয়েও খারাপ নেশা। এ নেশা সব খায়। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের এই নেশা থেকে অনেক দূরে থাকা উচিত।'

ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে ভিজিটরদের যাবার নির্দেশ বাজল। অনি দেখল গার্জেনরা সব গেটের দিকে চলে যাচ্ছেন। তপুপিসী হঠাৎ কেমন কেমন গলায় বলে উঠলেন, 'অনি, তার খবর কখনও যদি পাস আমাকে বলে যাবি? আমার

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

সাধারণতঃ রঙ ময়লা হয় কি করে

বছরের পর বছর সাধারণতঃ আপনার রঙ একটু একটু করে ময়লা হতে থাকে। আর তাহয় দুভাবেঃ ভেতরের ও বাইরের প্রক্রিয়ায়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে একটি শরীর রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু লোকের শরীরে অন্যদের তুলনায় বেশী ছড়িয়ে পড়ে। আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, রঙ তত ময়লা দেখায়। তাছাড়া, আপনি যতবার বাড়ীর বাইরে যান সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে, ফলে মেল্যানিন বেশী করে ছড়াতে থাকে আর আপনার রঙও হতে থাকে আরো বেশী ময়লা।

রঙ ফর্সা করার প্রচলিত উপায়

শত শত বছর ধরে ত্বকের রঙরূপের উন্নতির জন্যে মহিলারা রকমারি উপায় অবলম্বন করে এসেছেন। বেসন, দুধের সর, পাতিলেবু আর গ্লিসারিন, এমনকি শশার রস পর্য্যন্ত! এগুলি সম্ভবতঃ আপনার ত্বকের উন্নতি করে—ত্বক নরম করে, কিন্তু এসব দিয়ে কি সত্যিই রঙ ফর্সা হয়?

অপর পক্ষে আছে—ব্লীচ করার উপাদান। এগুলি যে ত্বকের কত ক্ষতি করে তা আপনাকে বলে দিতে হবে না। আচ্ছা, কোনো দামী আর নরম কাপড় কি আপনি ব্লীচ করবেন? আপনার ত্বকও তো কম দামী আর কোমল নয়!

আবিষ্কার! ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর রঙ ফর্সা করার প্রণালী—প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার—যা পৃথিবীতে এই প্রথম, প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে! আপনার ত্বকের ভেতরে কাজ করে এর 'ভিটামিন ক্রিয়া'। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীতে একটি ভিটামিন আছে, যা ক্রীম মাখবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বকে প্রবেশ করে। মেল্যানিনের বিস্তার রোধ করবার জন্যে এই ভিটামিন স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে, ফলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হয়ে ওঠে, যা নজরে পড়ে! এই ভিটামিনটির ক্রিয়া আর ফর্সা-ত্বক ওয়ালা লোকের ত্বকের ভেতরের মেল্যানিন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে প্রকৃতির যে ক্রিয়া তা বলতে গেলে একই রকমের। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ছেঁকে বাদ দেয়। এইভাবে আপনার ত্বক রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, অথচ সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে।

৬ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মাখুন, তারপর দেখুন কি তফাৎ!

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল নিজে চোখে দেখা। ছ'সপ্তাহ নিয়মিত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী ব্যবহার করুন। তফাৎ নিশ্চয়ই নজরে পড়বে আপনার! অন্যদেরও! হাজার হোক, এটি প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে। আর সেইজন্যেই তো আপনার ত্বকে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কাজ এত সহজে হয়!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী রঙ ফর্সা করার ক্রীম তো বটেই...আরো কিছু

আপনি উপভোগ করবেন ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কোমল স্পর্শ আর মনোরম সুগন্ধ! দিনে অন্ততঃ একবার ব্যবহার করুন, সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে দুবার! নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হবে, যা নজরে পড়বে, আর প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে ঐ রকমই থাকবে!

ফর্সা হবার এক কোমল উপায়

লিনটাস-FALOV.8-2415 BG (R)

মাওৎসু আণ্ডারগ্রাউণ্ড

অসীম রায়

তুলি থেকে মোকোকচঙের পথে উংলের। পাথরের মতো পেটা নগ্ন গা, কতগুলো ধুলোধুসর মোষ নিয়ে হাটছে কতগুলো লোক। কুড়ি পঁচিশ দিন ধরে কনিয়াক ট্রাইবের এই লোকগুলো চলেছে তাদের বাসস্থান বর্মাবর্ডারে। তাদের চলার গতি খুব ধীর, বৃষ্টিভেজা পাহাড়ের গা বেয়ে মোষ মানুষ পাথরের মতোই গড়াতে গড়াতে চলেছে। তাদের কিংবদন্তীর পাথর যেখান থেকে তাদের উৎপত্তি সেই পাথরের প্রভাব তাদের মুখে চোখে। চলন্ত গাড়ির দিকে এমনকি মোষগুলোও ফিরে তাকায় না। আর গাড়ির ভেতর থেকে একজোড়া দৃষ্টি বৃষ্টিতে ভেজা মানুষগুলোর খালি পিঠের দিকে চেয়ে কী খোঁজে?

'ওদিকে হাঁ করে কী দেখছো?' সহযাত্রী মিস্টার আও প্রশ্ন করে।

'দেখছি অটোমেটিক রাইফেল কোথাও লুকানো আছে কি না।'

'রাইফেল?'

'হ্যাঁ, যা দিয়ে তোমরা ইণ্ডিয়ান মিলিটারী ঠেকাতে।'

ফোঁচকে হেসে ওঠে আও। 'ওসব কথা ভুলে যাও। এখন সব শান্তি। আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান।'

মিহি গলায় রতন মুখার্জি বললে, 'এ সব ঠাট্টা আমাকে দিও না।'

'বিশ্বেস করো, একদম খাঁটি সত্যি কথা।' তারপর ছোকরা বললে, 'সিন্স দেন উই হ্যাভ টার্নড ওভার এ নিউ লিফ।'

এই সব বাঁধা গৎ শুনলেই রতন চিড়বিড়িয়ে ওঠে। কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ভাবে লোকটার সঙ্গে ঝগড়া করলে চলবে না। একমাত্র সেই তার নাগা কনটাক্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করাবে। লোকটাকে চটালে চলবে না।

'এখন শান্তি নিশ্চয়।' রতন বললে, 'কিন্তু এ শান্তি কি টিঁকবে? আমার তো মনে হয় আণ্ডারগ্রাউণ্ড এখনও অ্যাকটিভ। গ্রামের লোকেরা তোমাদের বিশ্বেস করে? তোমরা যারা শহরের লোক বড় বড় কথা বলছো তাদের?'

আও সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। গাড়িটা এই মুহূর্তে প্রচণ্ড বাঁক নেয়। হঠাৎ বৃষ্টির পর হঠাৎ রোদ উঠে চারদিক ঝকমক করছে। ঝকমক করছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে রুপোলী টিন। ঘন মোটা বাঁশঝাড় আর ধাপে ধাপে বুনো কলাগাছের সারি জল লেগে ঝলমল করছে। মন্দ জলে কাঁপা মেলাক নদী জলপ্রপাতের মতো শব্দ করতে করতে বয়ে চলেছে রাস্তার নীচ দিয়ে।

'আর কতক্ষণ?'

'আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ।'

'আজকে, তুমি যেরকম বলেছিলে, দেখা হবে?'

'আজ তো [illegible]।'

'হ্যাঁ, মানে বীজবপনের উৎসব। ওই দ্যাখো, পাহাড়ের গা [illegible] কাল্টিভেশান শুরু হচ্ছে। এই সময় সারা বছরে একবার এই উৎসব, গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সবাই আসবে।'

'তুমি যদি আগে বলতে তাহলে গেস্ট হাউসে আজকের দিনটা কাটিয়ে কাল প্লেন ধরতাম। এই সব কালচারাল ব্যাপার...'

রতন মনে মনে গজরায়। তৈরি করা সাজানো কাগজের ফুলে তার বরাবর অরুচি। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখেছে যে সব বাঙালী সাহেব খালি পায়ে ঘরের মধ্যেও এক পা নড়তে পারে না তারাও জুতো খুলে লাল কাঁকরে হাঁটছে। এখানে নাগাল্যাণ্ডে এসে নাগা কালচার স্টাডি করার বাসনা তার বিন্দুমাত্র নেই। তাদের পোশাক মাথার পালক দেখে লাভ কী? যারা খবরের কাগজের পাতায় নৃতত্ত্ব আঁচড়ায়, সচিত্র ফিচার লেখে তাদের জন্যে ওসব। রতন ফ্যাক্টের পূজারী আর নাগাল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ফ্যাক্ট নাগা আণ্ডারগ্রাউণ্ড।

'যাই হোক, তুমি বলেছো তো? তারাও তো এ উৎসবে আসবে?'

আও আড়চোখে দেখে এই অসহিষ্ণু মানুষটিকে। সিগারেটে টান দিতে দিতে বলে, 'আমিও নাগা।...তবে কোনো জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয় না। দশ বছর আগে যা ঘটে গেছে দশ বছর পরেও তাই ঘটবে?'

এইবার বাঁকে রাস্তা মেরামতের কাজ চলেছে। আর ঠিক তার সামনে ফুলন্ত বোগেনভিলিয়া আঁটা সাদা একতলা কাঠের বাড়িটার গায়ে নীচে থাদের কাছে দাঁড়িয়ে নাগা তরুণতরুণী। তরুণটির ধারালো চেহারা, মেয়েটির মাথায় একরাশ চুল, টকটকে লাল পুরু লুঙ্গির ওপর সাদা ধবধবে সামনে বোতাম আঁটা শার্ট।

'বাঃ বেশ চমৎকার জায়গাটা। এক মিনিট। পা বড্ড ধরে গেছে।' তারা দুজনেই নামে। রতন মুখার্জি এগিয়ে যায় তরুণ-তরুণীটির দিকে। চেহারা দেখে মনে হয়, তারা আওয়ের মতই ইংরেজী জানে।

'গুড মর্নিং, এখানে চা পাওয়া যায়?'

মেয়েটা খিল খিল করে হেসে ওঠে। রতন এই সুযোগ খুঁজছিল। 'হ্যাভ ইউ এভার হার্ড অব ফিজো?'

মেয়েটার হাসি বন্ধ হয়ে যায়। অবাক হয়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেটির মাথায় কালো খেলোয়াড়ী ক্যাপ, ছুঁচলো মুখে অল্প অল্প ছাগল দাড়ি। ধীরে ধীরে বলে, 'ইয়েস, উই অল রেসপেক্ট হিম।'

'হ্যাজ হি এনি ফলোয়াস হিয়ার?'

'ডোণ্ট নো', ছেলেটি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েটি তার সঙ্গে যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকায়।

আও গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। বললে, 'চলো চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।'

গাড়ি যত পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে ওঠে তত ঠাণ্ডা লাগে। তবে খুব চমৎকার আরামের ঠাণ্ডা। কলকাতার মাঝ-ডিসেম্বর। এই প্রবল বৈশাখেও নাগাল্যাণ্ডে মিঠে শীত।

'উই ডোণ্ট হ্যাভ সামার ইন নাগাল্যাণ্ড', আও বললে।

উঙ্গের গাঁয়ের সামনে তিনখানা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে লাগে। এর পর হাঁটা পথে খাড়াই। বৃষ্টিতে ভেজা সোনালী কাদা পাথর রোদ্দুরে চকচক করে। গাড়ি থেকে যারা নামে তারা বেশীর ভাগই বহিরাগত—বঙ্গসন্তান, পাঞ্জাবী, বিহারী অসমীয়া। কেউ কাগজকলের পেপার টেকনলজিস্ট, কেউ প্রেস রিপোর্টার, সারা গায়ে ক্যামেরা ঝোলানো এক ফটোগ্রাফার। খাড়াইয়ের দুদিক দিয়ে কাঠের বাঁশের বাড়ি। বাড়ির সামনেই কাঠের চৌকো নীচু চৌবাচ্চা, সেখানে মুখ ডুবিয়ে পুরুষ্টু শুয়োর আর একপাল সাদা গোলাপী বাচ্চা। মাঝে মাঝে তিনচারতলা উঁচু ঘন মোটা বাঁশঝাড়। বাড়ির পাশে বৃষ্টির জল ধরার জন্যে বড় বড় ড্রাম। আর প্রতি বাড়ির পেছনেই বাঁশের মাচায় বাড়ির আঙিনা। সেখানে কাপড় কাচার জন্যে কাপড় জড়ো করা আছে। কিন্তু বাড়িগুলো সব খালি, লোক নেই। মাঝে মাঝে এক একটা চকিত মুরগি খাড়াই ধরে ওঠা-নামা করে।

হঠাৎ চমকায় রতন। এক ধাক্কায় মনে হলো বয়েসটা বিশ বছর কমে গেল। চারদিকে রঙ, রঙের বন্যা। খাড়াইয়ের গা জুড়ে তিন চার থাক নাগা তরুণী। লাল ডগডগে লুঙ্গির ওপর সাদা, কারো কারো ঘন নীল লুঙ্গি। লাল নীল সাদা, লাল নীল সাদা—পরতে পরতে থাকে থাকে। ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে পড়ে রতন মুখার্জি। সমতলে এ ধাক্কা লাগত না কারণ সমতলে ছত্রাকার জনতায় রঙের বৈশিষ্ট্য তলিয়ে যায়। কিন্তু এখানে তিন চার থাক বাঁশের বাড়ির সামনে তিন চার থাক ডগডগে লাল লুঙ্গি, সাদা শার্ট, সার সার পুরুষের গায়ে লাল পুরু উলের শাল, পেছনে আশেপাশে নতুন কচি পাতায় ছাওয়া উঁচু নীচু গাছের নানারকম জ্যামিতি, কোনো দীর্ঘ শিমুল সমকোণে, কোনো সতেজ বাঁশঝাড় স্থূল-কোণ, ঝাড়ালো পাতার বৃত্ত যেন গোলাকার চালচিত্র। খানিকটা ভ্যাবাচাকার মত রতন মুখুজ্জে আগন্তুকদলের সঙ্গে অগ্রসর হয়। হঠাৎ খেয়াল হয় মাথার ঠিক ওপরেই পাতায় মোড়া তোরণ। সাদাকালোর ওপর একসার সজীব ঠাসা চুল আঁটা ব্রাউন মুখ, চকচকে চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। এক একজনের হাতে থালায় বুনো পলাশ কুচি বোগেনভিলিয়ার মালা। মেয়েরা এসে এক একজন আগন্তুকের গলায় মালা পরায়। তারপর মাথায় পালক-আঁটা, সাদা কালো ঢাল আর দুমুখো বর্শা হাতে নাগা নর্তকরা পা তুলে তুলে তাদের দিকে থমকে থমকে এগোয়। তাদের সেই ঠাণ্ডা শিকারী চোখের চেয়ে কারুর কারুর বুকটা সিরসির করে। রতন মুখার্জির মনে হয়, সে চোখে আণ্ডারগ্রাউণ্ড আছে। এই অদ্ভুত আত্মীয়তা ছেদ পড়ে এক কমিক দৃশ্যে। বর্শাউদ্যত হাতে পালক আঁটা যোদ্ধারা যত এগিয়ে আসতে থাকে তত ফটাফট ছবি তুলতে থাকে ফটোগ্রাফেরাটি। চারদিকে বনের মাথার ওপর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে রতন

নবাবৃত্তি ?

এর পর মাওৎসদ্ শুরু হয়। দুদিকের বনের মাঝখান দিয়ে একটা ঢালে খাড়াই ক্রমশ ঢালে নেমে এসে সবুজ ঘাসে ঢাকা মস্ত মাঠে মিশে গেছে। তারই কদিকে সামিয়ানা আঁটা দোতলা এক বাঁশের ঢিবি, দর্শকদের অস্থায়ী মঞ্চ। বনের মাঝখান দিয়ে খাড়াই ধরে সাদা কালো পোশাকে ঢাল-বল্লম হাতে পালক-আঁটা গা যোদ্ধারা নাচতে নাচতে নামে। স্তব্ধতা প্লাবিত করে শিঙা বেজে ওঠে। তারা গোল হয়ে মাঠের মাঝখানে নাচতে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটায় এমন এক ধরনের ভয়ংকর সৌন্দর্য আছে যা সাধারণ লোকনৃত্য থেকে একেবারে আলাদা। তারপর একদল প্রজাপতির মতো মেয়েরা নাচতে থাকে। মাঝে মাঝে কিছু তরুণেরা ভাঙা ইংরেজীতে উৎসবের মর্ম ব্যাখ্যা করে। একটা লম্বা বাঁশ আর দা হাতে একটি তরুণ এগিয়ে আসে, পেছনে দুটি মেয়ে তাদের হাতে মোটা কলসিদানিতে কমলা লেবুর রস। দা দিয়ে তরুণটি ছোট ছোট বাঁশদানি তৈরি করে আর মেয়ে দুটি তাতে কমলা লেবুর রস ঢালে আগন্তুকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। কয়েকজন বৃদ্ধাও এগিয়ে আসে। রতন বোকার মতো দু হাত জোড় করে নমস্কার জানাবার চেষ্টা করে, কিন্তু নমস্কারের কেতা এখানে নেই। তারা সবাই হাত বাড়ায় করমর্দনের জন্যে।

হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামে। নাগা তরুণটি বলে ওয়ঃ তার মানে সারা বছর ভালো কাটবে। আজ এই উৎসবে বৃষ্টি যদি না হয় তার মানেই অমঙ্গল। সন্ধেবেলা যখন আশপাশের গ্রাম উজাড় করে লোক আসবে এই মাঠে আর খাওয়া-দাওয়া করে ফিরে যাবে তখনও এমনি বৃষ্টি হবে। বলতে কি, সারাদিনই বৃষ্টি। যে ভাষায় তরুণটি এবং তার দুতিনজন সঙ্গী কথা বলে সেটা এক আশ্চর্য ভাষা, তার নামটাও আশ্চর্য—নাগামিজ। তার মধ্যে ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া সব রকম শব্দ। মানুষের কাছে পৌঁছবার যখন এত বাধা তখন যেন সব কিছু দিয়ে তার কাছে পৌঁছতে হবে।

এর পর মুরগি কেটে তার একটা নাড়ি থেকে অপদেবতা দূর করে অসুস্থ তাড়ানোর উৎসব। এমনি আরও উৎসব চলে সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে। মাথার পালকগুলো কাগজের ওপর কালো রং করা, জলে ভিজে সেগুলো এখন বিবিন্যস্ত। কিন্তু উৎসবের বিরাম নেই। এই পাহাড় জঙ্গলের গায়ে বৃষ্টিতে ভেজা উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে রতন মুখার্জির মনে হতে থাকে এর সবটাই ঠিক স্টেজ-ম্যানেজ বোধ হয় নয়। মানুষগুলোর মুখে চোখে হাসিতে এমন এক ধরনের উষ্ণতা যা এতগুলো মানুষের রিহার্সাল দেওয়া এত বড় অভিনয় হতে পারে না। বেশ স্পষ্ট, এখনও নাগাল্যান্ডে গ্রাম আছে, এখনও এখানকার মানুষগুলো হ্যাংলা ভিখিরী হয়ে যায় নি। আর তাদের জীবনের আনন্দের খানিকটা অন্তত একদিনের জন্যেও ভাগ করে নিতে তারা ডাক দিচ্ছে। আন্ডারগ্রাউন্ড যদি রীয়াল হয়, মাওৎসুও রীয়াল।

একটি নাগা তরুণ বাঁশ কাটা নাগা দা বা মাথাভোঁতা লম্বা চপারখানা হাতে তুলে নাচাতে নাচাতে বলে ঃ আগে আমরা ছিলাম হেড হান্টার। কে কটা হেড নিতে পারে তার চিহ্ন থাকত আমাদের গায়ে, আমাদের গলার মালায়। তারপর ক্রিশ্চানিটি এল। তার মানে পিস এল।

'ফিজো?' রতন মুখার্জি দমবার পাত্র নয়।

তরুণটি তার দিকে তেরছাভাবে চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে বলে, 'উই অল রেসপেক্ট হিম।' একটুক্ষণ থেমে জিজ্ঞাসু গলায় বলে, 'বাট হোয়াই?'

চারপাশের ভেজা উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর দিকে চেয়ে রতন হঠাৎ চুপ করে যায়। সত্যিই বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না—ক্রমাগত একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকেই কেবল অক্ষয় অব্যয় ভাবা। আরও একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, অন্তত সেই রকমই মনে হচ্ছে।

এবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। নীচে পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘ জমে থাকে। চারপাশের নীচের খাদগুলো মেঘে ঢেকে যায়। এক এক করে ভেজা চুপচুপে নর্তক-নর্তকীরা মাঠ ভেঙে আবার খাড়াই ধরে ফিরে যেতে থাকে। শিঙা বাজে। উৎসব এখনকার মতো শেষ। বুনো 'পামের' মস্ত গোলাকার পাতা কেটে ছাতা বানানো হয়। সারি সারি সবুজ ঝলমলে ছাতা খাড়াই ধরে গ্রামের দিকে মিলিয়ে যেতে থাকে। যে মেয়েটি তাকে মালা পরিয়েছিল (অন্তত রতনের সেই রকম মনে হয়) সে একটা পামের পাতা এগিয়ে দেয়। মেয়েদের ব্যবহারে যেমন সামান্য আড়ষ্টতা নেই তেমনি অকারণ ঢলানি নেই। তারা সবাই পুরুষদের মতো, কিংবা পুরুষদের থেকেও বোধহয় কিছুটা বেশী, অফুরন্ত এনার্জির আকর। তার মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চেয়ে একজন পেপার টেকনলজিস্ট বললে, 'মেয়েদের নিয়ে উল্টোপাল্টা করলে কী করে জানেন? ওদের প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকতেই গোল উনুন পাতা। তার চারদিকে বসে তারা খায়দায় গল্প করে। সেখানে তাকে চপারের ভোঁতা দিকটা দিয়ে পেটায়।'

'আপনি দেখেছেন?'

'আমার নাগা বন্ধুরা বলেছে।'

রতন বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটবে না।'

তরুণ টেকনলজিস্ট হেসে বললে, 'ভীষণ লাইভলি, তাই না?'

'ভীষণ লাইভলি, দেখলে বয়েস কমে যায়।'

এবার তারা পামের ছাতা মাথায় ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে হলদে পিছল খাড়াই ধরে উঠতে থাকে। খাড়াইয়ের গায়ে গায়ে থাকে থাকে বাঁশের বাড়ি। তবে এ বাঁশের চেহারা অনেক মজবুত, ঘরের মেঝেতে ভারী কাঠের তক্তা। কোনো কোনো কাঠের বারান্দায় বেতের চেয়ার টেবিল।

আগন্তুকদের লাঞ্চের ব্যবস্থা ভি. আই. পি.-র বাড়ি। ...

... অথবা সংস্কৃতের চেয়েও অনেক বেশী কথা বাংলা হিন্দী অসমীয়া ভাষা। একেবারে আলাদা হয়ে রকম, একেবারে নিজস্ব—তার মধ্যে যেরকম একটা জোর আছে তেমনি আবার পরাজিতের মরিয়া ভাবও আছে। রতন মুখার্জির মনে পড়ে, তার এক ফোক-লোর পাগল বন্ধুর কথা। সারাটা জীবন সে বাংলাদেশের জেলায় মন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই জ্বলজ্বলে বাংলার দুর্গা ঠাকুরের মুখ তার কাছে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। সে মুখ ভেঙে গিয়ে এখন বাংলার প্রতিমাতে ফিল্মস্টারদের মুখ এসে গেছে বলে কি তার আত্মিক যন্ত্রণা। নাগাদেরও বোধ হয় সেই রকম একটা আত্মিক যন্ত্রণা আছে। ক্রিশ্চানিটি এসেছে, শতকরা নব্বই ভাগের বেশী লোকই খ্রীস্টের পূজারী। কিন্তু খ্রীস্ট তাদের আলতোভাবে ছুঁয়েছে। খ্রীস্টের পরব থেকেও মাওৎসু পরব তাই বোধ হয় তাদের কাছে আরো জীবন্ত।

বারান্দা দিয়ে ঢুকেই লম্বা কাঠ আর বাঁশের আয়তক্ষেত্র। আর বাঁশের দেওয়াল জুড়ে নীচু হাতলছাড়া বেঞ্চ। মাঝখানে গোল মস্ত উনুন। তার মাথায় উনুনের তাত-লাগা চৌকো কালচে কাঠের তিন থাক। নীচের থাকে আঁকশির সঙ্গে ঝুলছে বিফ আর পর্কের চৌকো চৌকো ঝলসানো মাংস।

বাড়ির গৃহিণী করমর্দন করে তাদের বসতে আহ্বান করে। ঝমঝমিয়ে আবার বৃষ্টি আসে। জানলায় সুন্দর কাচের পাল্লা। জানলার গায়েই হাওয়ায় দোলে কুচি কুচি সবজে ফলে ঠাসা নাসপাতি গাছ। আর মাসখানেকের মধ্যেই গাছভর্তি তৈরী নাসপাতি।

এবার জি-বি দাঁড়িয়ে ওঠে। শক্ত তামাটে মুখখানা টকটকে লাল শালের মাঝখানে ভাবান্তরশূন্য। একটানা গানের মতো বলে চলে। মিস্টার আও দাঁড়িয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরেজী তর্জমা করে যায়। 'আমাদের পূর্ব-পুরুষরা জন্মেছিল ছটা পাথর থেকে। আমরা থাকতাম যে জায়গায় তার নাম চুংলিমুতি। তারপর আমরা কুয়ো খুঁড়লাম আর বিয়ে করতে শুরু করলাম। এইভাবে আমাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তারপর আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করলাম। তার নাম পুটু। সেই পুটুই সর্বেসর্বা। সেই পুটুই ঠিক করবে কার মাথা নিতে হবে, কার সঙ্গে হবে বন্ধুত্ব। চুংলিমুতিতে থাকতে থাকতেই যাকে তোমরা বলো হেড হান্টিং তাই শুরু হলো আর আমাদের দল ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। আমরা তখন অনেক দেবতা পুজো করতাম। এই সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, এই গাছ পাথর। ওষুধ আমরা জানতাম না। অসুখে পড়লে দেবতাদের ডাকতাম। আর আমাদের স্বাস্থ্য ছিল অপর্যাপ্ত।

'আমাদের এই উৎসবে তোমরা এসেছো। তোমাদের আমরা অভিবাদন করি। এখন ইণ্ডিয়া তো একটাই দেশ, এখানে তোমরাও যা আমরাও তাই। তাহলে আমাদের মাঝখানে এত বিভেদ কেন?'

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়তে থাকে। পাহাড়ের গায়ে কোথাও বাজ পড়ে। জানলার পাশে নাসপাতি গাছটা হাওয়ায় ঝলমলিয়ে দোল খায়। 'ইণ্ডিয়া তো একটাই দেশ ...তাহলে আমাদের মাঝখানে এত বিভেদ কেন?'

এটা কি স্টেজ ম্যানেজ? সেই কঠিন তামাটে মুখ, কদম ছাঁট চুল, বাঘনখের মালার দিকে চেয়ে চেয়ে সমস্ত অবচেতন ঠেলে রতনের সেই প্রশ্নটা আর্তনাদ করে ওঠে। অথবা এটা সাম্প্রতিক ইণ্ডিয়ান মিলিটারীর যে 'ব্যাটল অফ উইনিং হার্টস ইন নাগাল্যাণ্ড'—তারই একটা ছবি? কিন্তু জি-বির কথা কেউ প্রম্পট করে বলে নি। প্রম্পট করে বলার লোকজন এরা নয়। সত্যিই এত বিচিত্র আর এত আলাদা বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠী। এক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ বলেছিলেন না, আমরা সবাই মোহানার মুখে এক একটা বদ্বীপের মতো। কোনদিন কি মূল এক ভূখণ্ডে এই সব বদ্বীপ মিলে যাবে যে ভূখণ্ডকে ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখেছিল, কখনও কখনও এক আধটা কবিতার গানে যা ঝলকে ওঠে আর যে ভূখণ্ডের নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ঐক্য মাইকের সামনে দাঁড়ানো রাজনৈতিক নেতার কণ্ঠে কিংবা তুখোড় সাংবাদিকের কলমে রোজ জানান দেয়? অন্তত সামান্য একদিনের অভিজ্ঞতায় নাগাদের সম্পর্কে ভেরিয়ার এলুইনের কথাটার সত্যতা মর্মে মর্মে টের পাওয়া যায়। সেই তামাটে মুখখানার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে এলুইন পুনরাবৃত্তি করে রতন, 'এ ফাইন পিপল, এ ফাইন পিপল!'

'কী বিড়বিড় করছো? নিশ্চয় খুব তেষ্টা পেয়েছে তোমার?' পেপার টেকনলজিস্ট ছোকরা বললে।

বাঁশের গেলাসে নাগা তরুণ-তরুণীরা রাইস বীয়ার নিয়ে আসে। দুধের মতো ধবধবে সাদা, অনেকটা ঘোলের চেহারা। কিন্তু সামান্য গন্ধ নেই। বীয়ারের পর কাঁচ বাঁশের সঙ্গে পর্ক আর লাল চপড়া ভাত পাতলা বাঁশের দোনায়। জীবনটা কি অপর্যাপ্তভাবে সুন্দর।

'তোমার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি এইখানেই থেকে যাবে।' পেপার টেকনলজিস্টটি বললে।

'যদি সম্ভব হতো থাকতাম।'

বাইরে ঝিমঝিম বৃষ্টি যেন শুধু বাইরেই না, সমস্ত শরীর জুড়ে বাজতে থাকে। আরও কেউ কেউ কী কী বলে। আগন্তুকদের মোকুকচঙে একটা মারকেটিং প্রোগ্রাম ছিল। শাল লুংগি তাদের মিসেসদের জন্যে—যেমন খাপি যেমন সুদৃশ্য তেমনি সস্তা। গুলি মারো! ছেলেবেলায় তার এক দিদি এই মেজাজটার একটা নাম দিয়েছিল—খাপুংখুপুং। অর্থাৎ খামচে খামচে যেখানকার ভালো জিনিস তুলে নাও, প্রকারান্তরে আত্মসাৎ করো। সব জায়গায়, বয়স্ক মানুষগুলোরও এই খাপুংখুপুং মেজাজ। যেখানে যাচ্ছিস ভালো জিনিস চোখ ভরে দ্যাখ, তোর ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে সেগুলো ধুলোভর্তি আবর্জনায় পরিণত করার কী দরকার?

বিকেল হয়ে আসছে। মোকুকচঙ যাওয়া হবে কি হবে না তা নিয়ে আগন্তুকদের মধ্যে একটা চাপা বিতণ্ডা চলে। ...

আপনার ছেলেমেয়েদের
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়,
তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে...
কোকোর স্বাদে ভরা বোর্নভিটা !
বোর্নভিটাতে এখন পাবেন আরও বেশী কোকো, ফলে আরও বেশী স্বাদ আর পুষ্টিগুণ।
শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।
এক কাপ গরম দুধে দু' চামচ বোর্নভিটা দিয়ে এক সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় তৈরী করুন।
আপনার ছেলেমেয়েদের রোজই বোর্নভিটা খাওয়ান দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত দেহে মূল্যবান পুষ্টিগুণ দরকার, বোর্নভিটা তা যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার... ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।
ক্যাডবেরিস
বোর্নভিটা
Cadbury's
Bournvita
500 g net
With More Cocoa
tastier healthier
৭৫ পয়সা বাঁচান
৫০০ গ্রামের কম খরচের রিফিল প্যাক কিনলে।
জরুরী কথা : বোর্নভিটা টাটকা রাখতে—রিফিল প্যাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার একটি সাধারণ টিনে ঢেলে রাখুন।
OBM 8376 BEN

'মোকুকচঙে সঙ সাজতে আমি যাব না', রতন চেঁচিয়ে ওঠে। তার কথায় আগন্তুকদের একজন হইহই করে হেসে উঠল।

বাইরে বাঁশের বারান্দায় এসে তারা দাঁড়ায়। বিকেল হয়ে আসছে। নীচে আলিতে সাদা পেঁজা পেঁজা মেঘ। বৃষ্টি ধরে গেছে। চারদিকে শান্ত নীলাভ সবুজ সৌন্দর্য। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে না কি? রতন মুখার্জি সেদিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলে। জি-বির বেদনা হয়তো বৃদ্ধের বেদনা। সে বৃদ্ধ অনেক দেখেছে, সে দেখেছে বিদ্রোহী নাগাদের মাথাকুটে মরার ইতিহাস। জি-বি হয়তো হাঁপিয়ে গেছে। বিশ্রাম চাইছে। যেমনভাবে বাংলাদেশে ১৯৪৮-এ তেলেঙ্গানায় কাকদ্বীপে আর তারও পরে উনিশশো সত্তর সালে তরুণেরা চমৎকার এক অসংলগ্ন কবিতার স্বপ্ন দেখেছিল, আর পথে পথে নিজেদের রক্ত ঢেলেছিল তেমনি দশ-পনেরো বছর আগে এক সার্বভৌম ক্রিশ্চান স্টেট, এক অসংলগ্ন কাব্যের বিজয়-পতাকা তুলে ধরেছিল নাগারা। তারপর নিষ্ঠুর নির্যাতনে সে স্বপ্ন বিলীয়মান, কিন্তু একেবারে কি অপসৃত? জি-বির কণ্ঠস্বরই কি নাগাল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব-মূলক কণ্ঠস্বর, না সেই কণ্ঠস্বর আজও শুনতে পাওয়া যাবে খাদে জংগলে? দুদিন সে নাগাল্যান্ডে আছে। গতকাল মোকুকচঙের কাছে ওখায় আর্মি ক্যান্টনমেন্টের পাশে এক বাগানে সে এক পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ দেখে চমকেছিল। চোদ্দজন মৃতের সম্পর্কে উৎকীর্ণ কয়েকটা কথা : 'তারা আত্মদান করেছে শান্তির জন্যে।' তেরো চোদ্দ বছর আগে এরা চলেছিল বৈরী নাগা ক্যাম্প ধ্বংসের অভিযানে।

সবই সত্যি। এখন দু'তিন বছর আগে শিলং এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে। শান্তি ফিরেছে। কিন্তু এইটাই কি সব? এখনও কি জংগলে বনে বাদাড়ে কেউ নেই?

সেই মেয়েটি এগিয়ে আসে। তার হাতে একটা গরম বাঁশের গেলাস গুঁজে দিয়ে হেসে চলে যায়। হালকা রুটি খেতে খেতে রতনের চিন্তাশক্তি আরও খেলতে থাকে। মিস্টার আও একটু দূরে মেয়েদের দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে পাখি তাড়ানোর ভংগি করতে করতে কী বলছিল আর মেয়েরা হাসছিল, ফটোগ্রাফারটি ক্রমাগত ছবি তোলে। পেপার টেকনলজিস্ট ভদ্রলোকটি একজন স্থানীয় গ্রামবাসীর পিঠে কোলানো থলের দর করে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে মিস্টার আওকে রতন বলে, 'তোমাকে যে বলেছিলাম, কী হলো?'

'এই ডান দিকে—লাস্ট হাট। দেখা হতে পারে।'

বৃষ্টি ধরে গেছে। সবাই নিজের মনে আলাপে ব্যস্ত। রতন খাড়াই ধরে এগোতে থাকে। সামনে কাঠের চাড়িতে মুখ ডুবিয়ে শুয়োরছানারা পরম শান্তিতে খেয়ে চলেছে। ডোলে ছরছর করে পড়ছে বৃষ্টির জল, ছাত থেকে। খাড়াইয়ের মুখে একটি বয়স্কা মহিলা তাকে এক নজরে দেখতে থাকে। এবং কোনো নোটিশ না দিয়ে আবার চড়বড় করে বৃষ্টি নামে। শেষ কাঠের বাড়িটা আর একটু আগে। রতন দৌড়ে এগিয়ে আসে। বন্ধ বাঁশের ঝাঁপ আলগা করে খুলে বলে, 'মে আই কাম ইন?'

'কান ইন, কাম ইন', বেশ চাঁছা গলায় ভেতর থেকে জবাব আসে।

ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। প্রথমে ঢুকে রতন হকচকিয়ে যায়। তারপর বেতের চেয়ারে বসে থাকা দুটি মূর্তি আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে। তরুণীটি ঝাঁপ তুলে ভেতরের ঘরে চলে যায়। তরুণটি আহ্বান জানায় সামনে কাঠের বেঞ্চির দিকে হাত বাড়িয়ে।

ঘরের মধ্যে একটা লম্ফ জ্বলছে। টেবিলে কি সব লেখালেখি চলছিল, কাগজপত্তর ছত্রাকার।

'তোমরা আজ গাঁ দেখতে এসেছো? সত্যিকার নাগাল্যান্ড—না?'

বেশ মাজা ইংরেজী উচ্চারণ। হাতকাটা সান্ডো গেঞ্জি পরনে, ছোকরাটির একমাথা চুল, মুখটা হাসিতে ভরপুর, সে হাসি খুশি না বিদ্রূপের বোঝা যায় না।

'তোমাদের এখানে এরকম সত্যিকার নাগাল্যান্ড দেখতে আগেও লোক এসেছে?'

তরুণটি এবার হেসে উঠে বলে, 'না না, আমি সেরকম কিছু বলছি না। নাগাল্যান্ড মানেই তো, গ্রাম, জংগল পাহাড়।'

'এই জংগলে পাহাড়ে এখনও তো তোমাদের মতো অনেকে লুকিয়ে আছে।'

তরুণটি বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসে। সিগারেট প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলে, 'স্মোক?'

রতন সিগারেট ধরাবার পর তার দিকে একনজর চেয়ে নাগা তরুণটি বললে, 'তুমি কি খবরের কাগজের লোক?'

রতন মাথা নাড়াতে, হেসে বলে, 'আই সি, আই সি। স্টোরি। বেশ একটা রিপোর্ট লিখবে— একজন আন্ডারগ্রাউন্ড নেতার সংগে কয়েক ঘণ্টা।'

'তার মানে তুমি আমার সংগে কথা বলতে চাও না?'

'না না, কথা বলব না কেন? কিন্তু তুমি কেন এসব কথা জিজ্ঞেস করছো? তোমাকে কি আমাদের গাঁয়ের লোকে ভালো করে আদর যত্ন করে নি?'

'ঠিক উল্টো, ঠিক উল্টো। এত যত্ন করেছে যে মনে হচ্ছে...' রতন চুপ করে যায়।

'তুমি সন্দেহ করছো। ভাবছো, এটা আসল নাগাল্যান্ড না, আসল নাগাল্যান্ড ঐ খাদে ঝোপে জংগলে। এই তো?'

'হ্যাঁ। ঠিক এই কথাটাই ভাবছি।'

'তোমরা কখনোও ভেবেছো ঐ জংগলে ঠান্ডায় বর্ষায় কী অবস্থা? কখনোও কল্পনা করতে পারো, বছরের পর বছর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো...'

'সেই জন্যেই তো। সেই জন্যেই তো...' উৎসাহের সংগে রতন বলতে গিয়েছিল।

'তাহলে তুমি টুয়েনসাংয়ে যাও, বার্মা বর্ডারে যাও। এখানে কেন?'

কাগজে ফলাও করে ছাপাবে। কিন্তু কেন? আমাদের কি সত্যিই তোমরা ভালো চাও?'

রতন জ্যাবলার মতো বসে থাকে। তরুণটির বক্তব্যে যথেষ্ট সার আছে। তার দিদি ছেলেবেলায় যা বলতো ঠিক সেই ব্যাপারই তো ঘটছে। খাপ্‌ছাড়া থাপ্‌ছাড়া করে খামচে খাবলে সত্যের চেহারা ধরা যায় না।

'টুয়েনসাঙের দিকে এখনও রেবেল অ্যাকটিভিটি আছে?'

'সে তো কাগজেই দেখতে পাচ্ছো।'

দুজনেই চুপ করে থাকে। দুজনের মাঝখানেই নৈস্তব্ধ্য নেমে আসে।

'তুমি কখনও ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছো? চার পাঁচ দিন খাওয়াদাওয়া হয় নি। কোথাও জংগলে বৃষ্টিতে বসে ভিজেছি, খিদেতে পেট কথা করছে এমন সময় খবর এল সেই সবুজ ইউনিফর্মপরা নেকড়েগুলো তেড়ে আসছে। আবার ছোট, আবার ছোট। বছরের পর বছর। তুমি যখন বছরের পর বছর ছুটে বেড়াচ্ছো তখন তোমার বাবা মা মারা গেল। তোমার বউ কোথায় আছে তুমি জানো না। এ কথাগুলো তোমার রিপোর্টে লিখতে পারবে?'

তরুণীটি ঘরে ঢোকে। হাতে বাঁশের গেলাসে র-টি। দুজনে নিঃশব্দে চা পান করে।

এমন সময় মোটরের হর্ন বাজে। তরুণীটি ঝাঁপ খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। রতনের ডাক পড়েছে।

বাইরে বৃষ্টি এখন ধরে গিয়েছে। জংগলের আর পাহাড়ের ওপর নীলচে বিকেলের আলো। খাড়াইয়ের শেষে খোলা জায়গাটায় আগন্তুকদের জন কয়েক রতনকে লক্ষ করে হাত নাড়ায়।

'তুমি এখন কী করছো?'

রতনের প্রশ্নে নাগা তরুণটি হাসে। ধারাল অথচ মোলায়েম মুখশ্রী। হাত বাড়িয়ে সামনে পাহাড়ের মোড়টা দেখিয়ে বলে, 'তোমাদের গাড়ি যখন বাঁক নেবে তখন ঠিক নীচে ভ্যালির দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখো। পেপার মিল বসেছে। আমি ঐ মিলে কন্‌ট্রাক্টরের কাজ করি। গুড বাই।'

খাড়াই দিয়ে নামতে নামতে রতন লক্ষ করলে একদৃষ্টিতে সেই মহিলাটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমার জন্যে আমরা বসে আছি। তুমি কী করছিলে এতক্ষণ? কোনো নাগা মেয়ের প্রেমেট্রেমে পড়লে নাকি? খুব সাবধান।' তার পরিচিত সঙ্গীটি রসিকতা করে।

আগন্তুকরা এবার এক সুদৃশ্য বাঁশের আটচালায় গিয়ে ওঠে। সেখানে প্‌টুর তরফ থেকে তাদের বিদায় সম্বর্ধনা। সবার আগে ছাই রঙের টেরিকটের স্যুটপরা একটি তরুণ দাঁড়িয়ে ওঠে। জি-বি পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি হলেন পাস্টর। ছোকরা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এক হাত শূন্যে তুলে চোখ বন্ধ করে আও ভাষায় কিছুক্ষণ বলে যায়। শেষে 'আমেন' উচ্চারিত হবার সংগে সংগে সেই লাল শালপরা খালি পা তামাটে লোকগুলোর গলায় আমেন প্রতিধ্বনিত হয়। আবার জি-বি উঠে বলতে থাকে তাদের জন্ম বৃত্তান্তের কথা। তাদের সেই শৌর্যবীর্যে ভরা অতীত কাহিনী। রতনের মনে হতে থাকে, দুটো কাহিনীই পাশাপাশি চলেছে : মাওৎসে আর আন্ডারগ্রাউন্ড, দুটোই নাগাজীবন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে রেখেছে। এই প্‌টুর সমাবেশও যেমন প্রচণ্ডভাবে বাস্তব তেমনি প্রচণ্ডভাবে বাস্তব অদূরে অন্ধকার ঘরে বসে থাকা প্রাক্তন বৈরী নাগা। বস্তুবের চেহারা কি সব সময়ই এই রকম গরল অমৃতে মাখামাখি?

রতনের ওপর ভার পড়ে আগন্তুকদের তরফ থেকে কিছু বলতে? কিন্তু কী বলবে সে? সে কি বলবে, তোমরা তোমাদের চমৎকার প্রাণদায়িনী ঐশ্বর্যময় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখো, এই বুশ শার্টপরা সর্বভারতীয় যান্ত্রিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ো না। বাঁচিয়ে রাখো তোমাদের খাওয়াদাওয়া বেশভূষা, তোমাদের বর্শা, তোমাদের দা, তোমাদের ভয়ংকর সজীব সৌন্দর্য। যা বলতে চেয়েছিল ঠিক তার উল্টো বলে। ইংরেজী ভাষায় যে সব মামুলী ধন্যবাদ দেওয়ার কেতা আছে, ভি-আই-পি-রা যত্রতত্র যেভাবে বলে যাচ্ছে সেইভাবে সে একটা প্রাণহীন বক্তৃতা করে। মিস্টার আও তার পাশে দাঁড়িয়ে তর্জমা করে যায়।

এবার ইংরেজীতে 'বুক অব গড' থেকে একটি অংশ পাঠ করে এক বর্ষীয়ান নাগা : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। কখনও ঝঞ্ঝা, কখনও জল, কখনও বজ্রবিদ্যুৎ। ঝড়ে কত লোকের মৃত্যু হয়, কত পশুপাখির প্রাণহানি ঘটে। ঈশ্বর, তুমি দেখো, আমাদের বন্ধুরা যেন নিরাপদে বাড়ি পৌঁছয়। তাদের প্রিয়জনরা বসে আছে দরজা ধরে, তারা যেন ফিরে গিয়ে তাদের প্রিয়জনের হাতে হাত রাখে।

প্রবল উষ্ণতায় ঝিম মেরে বসে থাকে রতন। আস্তে আস্তে প্‌টুর সভা ভাঙে। নীচে গাড়ির ড্রাইভাররা তাড়া লাগায়। অনেকটা পথ, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে যে মেয়েটি তাকে মালা পরিয়েছিল সেও দাঁড়িয়ে। রতন তার দিকে চেয়ে হাত নাড়ায়। সংগে সংগে কয়েকটা তরুণ-তরুণীর হাত নড়তে থাকে।

খাড়াই দিয়ে নামবার সময় বাইবেল পাঠকটি তার সংগে সঙ্গে এগিয়ে আসে। 'এবার যখন নাগাল্যাণ্ডে আসবে তখন সংগে একটা রেনকোট এনো।'

রতন একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখটির দিকে। ঘণ্টার মতো জি-বি'র কথাগুলো তার মনের মধ্যে বাজতে থাকে : আমরা তো একই দেশের লোক, তাহলে এত বিভেদ কেন?

'সিগারেট নাও', গাড়িতে উঠবার আগে মিস্টার আও প্যাকেট এগিয়ে দেয়। রতন সিগারেট ধরায়।

আপ্পারাও চলে গেলেন

আর একজন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় ইহলোক থেকে চলে গেলেন। ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া পড়েছে। মাত্র পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে মারা গেলেন ৮ জন খেলোয়াড়—টেস্ট ক্রিকেটার গোলাম গার্ড ও জে এম ঘোড়পাদের পর হকি খেলোয়াড় দিগ্বিজয় সিং বাবু ও রবার্ট ক্লডিয়াস, ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সুরেশ গোয়েলের পরে ফুটবল খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশ, আবার টেস্ট ক্রিকেটার ভিনু মানকড়ের পর ফুটবলার আপ্পারাও।

ভেঙ্কটেশ মারা যান ১লা জুন কলকাতায়, আপ্পারাও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আগস্টের ৩০ তারিখে, তাঁর নিজের বাড়ি অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাদের আনাপার্তিতে। কলকাতার ফুটবলে চমক সৃষ্টিকারী দক্ষিণ ভারতীয় এই দুই ফুটবলারের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল ১৬ বছর। ভেঙ্কটেশ মারা গেছেন ৫১ বছরে, আপ্পারাও ৬৭তে। জন্মেছিলেন ১৯১১ সালের ১১ মার্চ তারিখে। দুজন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পাশাপাশি খেলেছেন সাত-আট বছর, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আপ্পারাও অবশ্য খেলা শুরু করেন ১৯৪১এ। ১৯৪৮এ যখন ভেঙ্কটেশ এলেন তখন বয়স কত? মাত্র ২১ বছর। আর আপ্পারাওয়ের ৩৭। কিন্তু খেলার মধ্যে বয়সের এই পার্থক্য ধরা পড়েনি।

বয়সে ১৬ বছরের বড় আপ্পারাওয়ের খেলা সম্পর্কে ভেঙ্কটেশের উক্তি আজ মনে পড়ছে। আপ্পারাও কতবড় খেলোয়াড় ছিলেন কারো অজানা নেই। তবে কোনো খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-দক্ষতা বাইরের মানুষ যতটা বুঝতে পারে তার চেয়ে বেশী ভাল বুঝতে পারে যারা বিপক্ষে বা স্বপক্ষে খেলে। ভেঙ্কটেশের পক্ষে বোঝা আরও সহজ ছিল এই কারণে যে, ভেঙ্কটেশ খেলতেন রাইট আউটে আপ্পারাও রাইট ইনে। আমেদ খাঁর মত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় দলে থাকা সত্ত্বেও সেই ভেঙ্কটেশ তাঁর ক্রীড়া জীবনের মধ্যাহ্ন লগ্নে বলেছিলেন—"কলকাতা মাঠে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে আপ্পারাওয়ের খেলা। আপ্পারাওই আমার জীবনে একমাত্র খেলোয়াড়, যে আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে আছে। তাছাড়া আপ্পারাওয়ের ব্যক্তিত্ব এত অসাধারণ এবং খেলার ক্ষমতা এমন যা অন্য কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমি পাইনি। আমাদের মাঝে আপ্পারাওকে পেলেই আমরা শান্তি পাই।" (১৯৫১ সালে প্রকাশিত ফুটবল খেলা ও খেলোয়াড় পুস্তক : ৮৪ পৃষ্ঠা)

আপ্পারাওয়ের পাশের আর এক খেলোয়াড়, ওই সময়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড ধনরাজের মন্তব্যও উল্লেখ করার মত। ধনরাজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল খেলার মাঠে কাকে তোমার বেশী পছন্দ? এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন ধনরাজ—"ফেমাস আপ্পারাওকে"।

মৃত্যু সংবাদ শোনার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক এবং ক্লাবের গৌরব অধ্যায়ের রূপকার জ্যোতিষ গুহকে ফোন করেছিলাম। জ্যোতিষবাবু তখনো আপ্পারাওয়ের মৃত্যু সংবাদ পাননি। হয়তো জ্যোতিষবাবু অসুস্থ বলেই তাঁকে তাঁর প্রিয় খেলোয়াড়ের মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়নি। তিনিই কালিঘাট ক্লাব থেকে আপ্পারাওকে নিয়ে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। আপ্পারাওয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন—"কেন? মারা গেছে?" বললাম—সেই রকমই তো খবর শুনছি। যেন একটা বড় আঘাত পেলেন। কিছুক্ষণ টেলিফোন ধরে চুপ করে রইলেন। বললাম—"আপনি কি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন?' বেশ ধরা গলায় বললেন—"কি আর বলব? শুধু এইটুকু বলব, আমি যত খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এনেছি তাদের মধ্যে আপ্পারাও ছিল তুলনাবিহীন—মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরেও।"

আপ্পারাও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন দীর্ঘ ১৫ বছর, ৪১ থেকে ৫৫ পর্যন্ত। তার মধ্যে ক্লাবের

১৯৪০-এ ইস্টবেঙ্গলের প্রথম শীল্ড বিজয়ী দল : বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে— জয়োকিরাজ, সোমানা, অমিতাভ মুখার্জী, রাখাল মজুমদার, অজিত নন্দী, গোপীনাথ দাস (ফুটবল সম্পাদক), এন তালুকদার, আপ্পারাও, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ডি সেন, সুশীল চ্যাটার্জী। বাঁ দিক থেকে বসে— ফটিক সিংহ, সুনীল ঘোষ, পরিতোষ চক্রবর্তী ও নগেন রায়

প্রথম রোভার্স, প্রথম ডুরাণ্ড জয়ের সম্মান তো বটেই—একই বছরে লীগ ও শীল্ড জয়ের দ্বৈত সম্মান, টানা তিনবছর শীল্ডের উপর নাম খোদাই, একই বছরে লীগ শীল্ড ও রোভার্স জয়ে তথাকথিত ট্রিপল ক্রাউন লাভ—সব কিছুর মূলে আপ্পারাওয়ের অবদান অনেকখানি। ১৯৪৬ সালে তাঁরই অধিনায়কত্বে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তৃতীয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শীল্ডের খেলা শেষ মুখে বন্ধ না হলে হয়তো শীল্ডও জয় করতে পারতেন। অথচ অধিনায়ক আপ্পারাওকে ওই বছর বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। নামী গোলকীপার কে দত্ত ও হাফব্যাক মহাবীর দল ছেড়ে গিয়েছিলেন। সেন্টার ফরোয়ার্ড সোমানা আর কলকাতায় আসেন নি। অপর সেন্টার ফরোয়ার্ড পাগসলীকেও পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় হাফব্যাকের খেলোয়াড় নায়ারকে সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলিয়ে বাজি মাৎ করেছিলেন। ওই বছরের লীগে নায়ারের ৩৫টি গোল করার রেকর্ড আজও অম্লান।

৪০এ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম শীল্ডজয়ে, ফাইনালে পুলিসের বিরুদ্ধে তিনটি গোলের প্রথমটি আপ্পারাওই করেছিলেন। ৮ বার শীল্ড ফাইনাল খেলে ৫ বার তাঁর জয়ের রেকর্ড। গোল করেছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলায়। জাতীয় ফুটবলে কয়েকবার বাংলা দলে খেলেছেন। খেলেছেন তখনকার তথাকথিত ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচে। ১৯৫৩ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে ইউরোপ ও রাশিয়া সফর করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় একজন খেলোয়াড়কে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসাবে ১৯৫৫ সালে কাবুল সফরে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছাড়া অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সম্ভবত বয়সের কথা বিবেচনা করে। কিন্তু আপ্পারাওয়ের বৈশিষ্ট্য, যতই তাঁর বয়স বেড়েছে ততই ফুটবল প্রজ্ঞার পরিমার্জন ঘটেছে। ততই যেন যৌবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক খেলোয়াড়রা তো কত আগেই খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের অলিম্পিকের পর ৪৯এ বিখ্যাত আমেদ এবং ধনরাজ যখন ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন তখন

তখনও দলের অপরিহার্য—ফরোয়ার্ডের পঞ্চরত্নের এক উজ্জ্বল রত্ন। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই সময়ে ইস্টবেঙ্গলের পাঁচ ফরোয়ার্ড ভেঙ্কটেশ-আপ্পারাও-ধনরাজ-আমেদ-সালের মধ্যে যে কম্বিনেশন গড়ে উঠেছিল কলকাতার ফুটবলে তেমন কম্বিনেশন আর দেখা যায়নি। ব্যক্তিগতভাবেও পাঁচজনই ছিলেন ক্রীড়াদক্ষতায় দীপ্যমান। নাম হয়ে গিয়েছিল পঞ্চপাণ্ডব। পাঁচজনের নামের আদ্যাক্ষরকে এক সঙ্গে যুক্ত করে অনেকে বলত—'প্যাডাস' (*PADAS*)। অর্থাৎ পুরুষোত্তম (ভেঙ্কটেশের নাম), আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ, ও সালে।

আপ্পারাও অবশ্যই আমেদের মত অসাধারণ ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় ছিলেন না। পায়েও ছিল না জোরালো শট। আমেদ, চুনী, বলরামের মত বল কন্ট্রোলও দেখিনি। কিন্তু দেখেছি তাঁর অবিশ্বাস্য স্কিমিং। অতি পরিচ্ছন্ন ছিল তাঁর খেলা। ঠিক সময় ঠিক লোকের উদ্দেশে এবং সঠিক জায়গায় বল পাস করায় তাঁর জুড়ি ছিল না। কল্পনাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। দেহটি ছিল ছোটখাটো। পাঁচফুট তিন ইঞ্চির মত। ফুটবলারের অবয়ব পাননি।

আপ্পারাও মাঝে মাঝে হাঁপানী রোগে কষ্ট পেতেন। কিন্তু নিতান্ত অপারগ না হলে 'খেলব না' বলতেন না কখনো। ফুটবল ও ক্লাবের প্রতি তাঁর ভালবাসা কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ১৯৪৯ সালের কথা। মোহনবাগানের সঙ্গে শীল্ড ফাইনালের আগের রাতে তিনি হাঁপানীর টানে সারা রাতের মধ্যে দু চোখ বুজতে পারেননি। তবু কিন্তু খেলেছিলেন, ইনজেকশন নিয়ে এবং খেলার আগে ও বিরতিতে তাঁবুর মধ্যে অক্সিজেন নিয়ে। তাঁবুর মধ্যেই অক্সিজেন সিলিণ্ডার রাখা হয়েছিল। এবং আপ্পারাও খেলেছিলেন আপ্পারাওয়েরই মত। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল। এইসব কারণেই ১৯৫৬ সালে ক্লাব থেকে আপ্পারাওয়ের বিদায় অভিনন্দনকালে একটি টাকার তোড়া ওই মহা খেলোয়াড়টির হাতে তুলে দিয়ে ক্লাব সম্পাদক জ্যোতিষ গুহ বলেছিলেন—ক্লাব প্রাঙ্গণে আপ্পারাওয়ের একটি সোনার মূর্তি স্থাপন করলে তাঁর প্রতি যোগ্য

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

Perspectives In Social Sciences Historical Dimensions. Edited by Barun De, Published for "Centre for Studies in Social Sciences", Oxford University Press. Rs. 40.00.

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় আমরা যে কতোটা পিছিয়ে আছি পশ্চিম দেশগুলোর দিকে তাকালে তা বুঝতে পারা যায়। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, কতো নতুন তথ্যের উদ্ঘাটন ও তত্ত্বের বিকাশ হচ্ছে, এবং কতো নতুন আলোকপাত হচ্ছে নানাবিধ বিষয়ের ওপরে। আমাদের দেশে ছিটেফোঁটা কাজ যে না হচ্ছে, তা নয়। প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই। তবু, কিছু না হওয়ার চেয়ে ছিটেফোঁটা হওয়াও ভালো।

১৯৭৩ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস'। অধ্যাপক বরুণ দে এবং অপর কয়েকজন বুদ্ধিজীবী এর প্রাণস্বরূপ। এঁরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ 'কাজ' করেছেন। সেই কাজের ফল-শ্রুতি আলোচ্য পুস্তক—কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন যা কেন্দ্রের স্কলারদের গবেষণার ফল। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লেখা হলেও গবেষণা ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এঁরা নিয়েছেন সেই পথ যাকে বলা হয়েছে Interdisciplinary Approach অর্থাৎ একবেণী বিদ্যার পথ নয়, বিভিন্ন বিদ্যার জিজ্ঞাসার সমবায়ে গঠিত পথ যাতে কেন্দ্রের অপরাপর বিদ্যার গবেষকরাও সাহায্য করেছেন। সমস্ত রচনাগুলির মধ্যেই ঐতিহাসিক বিকাশের চেতনা উপস্থিত, যদিও লেখকেরা তাঁদের নিজের নিজের বিষয়ের আসল লক্ষ্য থেকে এতোটুকু বিচ্যুত হননি।

'পারসপেকটিভ ইন সোস্যাল সায়েন্সের' (সমাজ বিজ্ঞানসমূহের পরিপ্রেক্ষিত) এই সিরিজে কেন্দ্র অনেক গবেষণা প্রকাশ করায় আগ্রহী। এই খণ্ডের নামকরণে Historical Dimensions উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে আজকের দিনে কোনো সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনাই বোধ হয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত করা সম্ভব নয়।

২২৭ পাতার এই বইতে পাঁচটি প্রবন্ধ সংকলিত। 'ফ্রম ব্যালান্স অব ... টু ইম্পেরিয়ালিজম : অ্যানালিসিস অব এ সিসটেম চেঞ্জ ইন ... ন্যাশনাল পলিটিকস' (লেখক ... পার্থ চট্টোপাধ্যায়); অ্যা প্রি-...নমিক ফরমেশন ইন ইণ্ডিয়া ... এইটিনথ সেনচুরি : টিপু ... এবং ... হাইদ্রাবাদ' (লেখক-গবেষক—... নাইনটিনথ সেনচুরি : অ্যা স্টাডি ইন সোস্যাল রেসপনসেস টু টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন' (লেখক-গবেষক—হিতেশরঞ্জন সান্যাল); 'অ্যা হিসটোরিওগ্র্যাফিক্যাল ক্রিটিক অব রেনেসা অ্যানালগস ফর নাইনটিনথ সেনচুরি ইণ্ডিয়া' (লেখক-গবেষক—বরুণ দে); ডোয়ার্ফড গ্রোথ এক্সপিরিয়েন্স অব অ্যা...ওয়েস্ট বেঙ্গল রুর‍্যাল টাউন—বোলপুর (সমালোচনা প্রবন্ধ—দীপেশ চক্রবর্তী)।

প্রবন্ধগুলির বিস্তৃত আলোচনা স্বল্প পরিসরে একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গবেষকেরা প্রত্যেকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন এবং তাঁদের স্কলারশিপে কোনো ফাঁকি নেই। স্বভাবতই অনেক নতুন কথা তাঁদের প্রবন্ধে শোনা যাচ্ছে, নতুন তত্ত্ব গবেষণায় ধরা পড়ছে। প্রবন্ধগুলি যে কোন দেশের প্রথম সারির গবেষকদের রচনার মতো।

কেন্দ্রের কর্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক বরুণ দে-র লেখা ষাট পাতার ভূমিকাটি অতি মূল্যবান। এর মধ্যে তিনি বিবৃত করেছেন 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস' কী, কেন এবং কী জন্য এবং এই 'পারসপেকটিভস' সিরিজের তথ্য কেন্দ্রের অপরাপর কাজের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা কোনখানে।

আমাদের দেশে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধাবলী এক বিশেষ অবদান।

প্রণব মজুমদার

রাবণের সিঁড়ি। রবীন সুর। অরণি প্রকাশন, ১২, মুখার্জীপাড়া লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা।। পাঁচ টাকা।

তাম্রবাতাসী। উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। পত্রমিতা, ৫৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। এক টাকা।

নিঃশব্দের আর্তনাদ। ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। দেউটি প্রকাশনী, পোঃ হিজলপুকুর, ২৪ পরগনা। পাঁচ টাকা।

রবীন সুর তাঁর কাব্যচর্চা নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখেছেন আজ বেশ কিছু কাল ধরে। 'রাবণের সিঁড়ি' তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, প্রচুর কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যার অধিকাংশ মানবিক এবং সামাজিক চেতনায় পুষ্ট হলেও, শিল্পিক চৈতন্যের প্রশ্নে বলা যায়, আলোচ্য কবির কাছে আমাদের আরো বেশি পরিণতির প্রত্যাশা ছিল। 'রাবণের সিঁড়ি'র বিভিন্ন ধাপে ছড়ানো-ছিটনো অনেক দুর্লভ বোধ, ব্যাখ্যা হঠাৎ হঠাৎ আমাদের বিহ্বল করে তুলে পরমুহূর্তেই বিরস বিধুর করেছে, আপাত আধুনিক কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার কবির উত্তরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ রচনা পাঠককে প্রশংসা পাবার প্রাক মুহূর্তে নাজেহাল হয়ে পড়েছে কবির অতিকথনে। এই ধরনের রচনাবলীর ভারে হেলে না-পড়ে যে পাঠক ভজু প্রবেশ করতে পারবেন রচয়িতার বিক্ষিপ্ত বোধের প্রাঙ্গণে, মন-চোখ খোলা রাখলে তিনি সত্যিই এমন কিছু পেয়ে যাবেন, যা ...
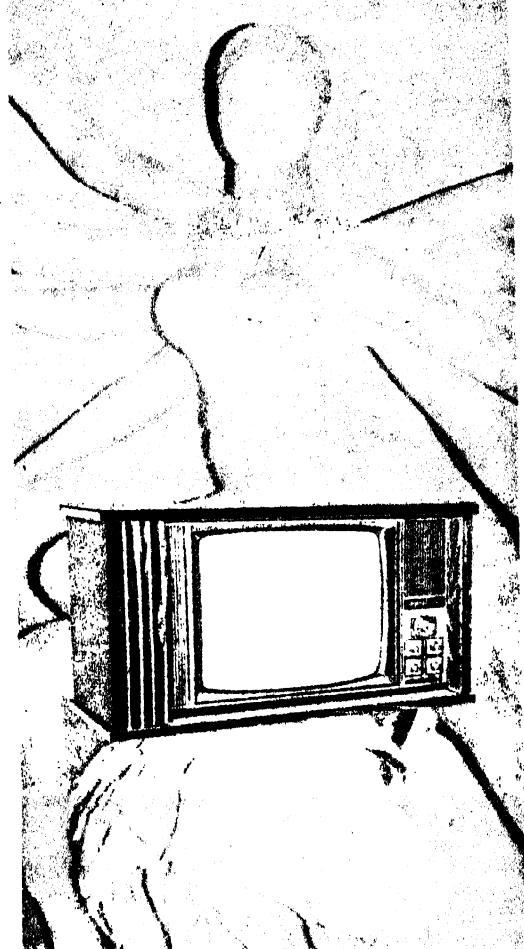
রোজ ভেঙে যাচ্ছে তেলে তিমো প্রকৃত নিয়মে/শিশুর দুধেলি দাঁত, হাহা হাওয়া সমুদ্রের মতো বিলাপ./রাষ্ট্রের উত্থান ধ্বংস, প্রযুক্তি প্রয়োগ, অন্তর্দেশ বাণিজ্যের / যাতায়াত, মেরুশীতে এস্কিমোর জবুথবু, ঠোঁটে/শব্দ রোজ পাল্টে যাচ্ছে যে-রকম আস্ত হিমলয়/ টেথিস ঘনিয়ে তোলে, উবে যায় কলরেডোর শিলা।' (পৃঃ ৬৩)

কালের গতি প্রবাহের দিকে তেমন মন না-দিয়েও কেউ কেউ তাঁর আন্তরিক প্রেরণা বা তাড়নায় শিল্প রচনা করেন। যে কোনো শিল্প মাধ্যমে এমন ঘটনা আগেও যেমন ছিল, আজো আছে। সেদিক থেকে 'তালবাতাসী'র কবি উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় অন্তত বাংলা কাব্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম না হলেও বিমিশ্র পাঠকের কাছে তিনি তাঁর বেশ কটি 'আনন্দপ্রদ' কবিতা উপহার দিয়েছেন যেগুলো পড়তে সত্যি মন্দ লাগে না। 'ফুলেরাও কথা বলে, খই ফোটে মুখে।/যথার্থ সময় এলে টেল পড়ে গালে।'

ছোট্ট, সুমুদ্রিত এই কাব্য গ্রন্থটির 'সূচীপত্র' সংযুক্তির বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না, আলোচ্য ক্ষেত্রে 'সূচী' বরং কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান দশকের অনেক কবিকেই আমরা জানি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের কবিতা পাঠে, তাঁদের অনেকের কাব্যগ্রন্থ এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি। অন্য দিকে হঠাৎ-ই এমন কারো কাব্যগ্রন্থ পেয়ে যাই, যার নাম আমাদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণই নতুন ঠেকে। 'নিঃশব্দের আর্তনাদ' কাব্যগ্রন্থের কবি ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় তেমনই একজন। নির্বাচনের ব্যাপারে অসংযমী হবার ফলে আলোচ্য গ্রন্থে অনেক দুর্বল রচনা স্থান পেয়েছে ঠিক কিন্তু একজন নবীন কবির কাব্যগ্রন্থে এটা খুব একটা অমার্জনীয় নয়। তবু প্রসঙ্গটির উল্লেখ করলাম, মানের বিপরীতমুখী দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে বড় বেশি সোচ্চার। 'একটি নারীকে কেন্দ্র করে যে কোন পুরুষ বিকেলের বর্ণাঢ্য রূপ নিতে পারে'— এমন পঙ্‌ক্তির জনক যিনি, বুঝি না তিনিই কি করে তরল ভাষায় অনায়াসে 'স্বীকারোক্তি' করেন—'যদি দু ফোঁটা চোখের জল সে সময় পড়ে প্রিয়া/ আমার অধরে/আমি মারা যেতে রাজী আছি।'

জালা দাস

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

এক তাঁবু : অনেক শিল্পী

ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে স্বনামধন্য শিল্পী সুনীল দাসের পরিচালনায় ৮ই আগস্ট থেকে ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত বারো দিন পঁচিশজন শিল্পী এক ছাউনির নিচে, গানবাজনা ও চা-সিগারেটের ফাঁকে ফাঁকে চিত্রচর্চা করেছিলেন "ম্যাক্সমুলারের" প্রাঙ্গণে।

শিল্পী : সুনীল দাস

তাঁদের চিত্রকর্মের ফসল পরে প্রদর্শনী হিসেবে টাঙানো হয়েছিলো ম্যাক্সমুলার ভবনের ভেতরের ঘরে। পরিচালক এবং উদ্যোক্তাদের কাছে জেনেছি, এই "ওয়ার্ক-শপে"র উদ্দেশ্য ছিলো জনতা ও শিল্পীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বা যোগাযোগের সেতুবন্ধন। এই উদ্দেশ্য কত দূর সফল হয়েছে আমি সঠিক জানি না। অংশত নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার কথঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। ছবি বিক্রি হয়েছে কিনা তা-ও আমি জানি না। বোম্বাই ও দিল্লির তুলনায় কলকাতায় আধুনিক চিত্রকরদের ছবি তেমন বিক্রি হয় না কেন, সে বিষয়েও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তা হলেও কলকাতা শহরের কলহ-কুটিল শিল্প-সাহিত্যের রাজ্যে এ ধরনের শিল্প-মেলা বা শিল্প-ছাউনির সাংস্কৃতিক মূল্যই শুধু অনস্বীকার্য নয়, শিল্পীদের মধ্যে প্রীতিপ্রসারের প্রচেষ্টা হিসেবেও তা অভিনন্দনযোগ্য।

এবার ছবির প্রসঙ্গে আসি। সুনীল দাস, রবীন মণ্ডল, এবং অনীতা রায়চৌধুরী ছাড়া বাকি বাইশ জন শিল্পীকেই "তরুণতর" বলা যেতে পারে। বয়সের দিক থেকে না হলেও (যেমন—প্রবীর দাশগুপ্ত নিশ্চয় সুনীল দাসের চেয়ে নবীনতর নন) প্রতিষ্ঠার দিক থেকে। এমন কি প্রতিষ্ঠার দিক থেকে না হলেও শিল্পচর্চা শুরু করবার সময়ের দিক থেকে। অনীতা রায়চৌধুরীর অর্ধ-বিমূর্ত রেখানির্ভর "সার্চ" সুন্দর, কিন্তু দশ বছর আগেও তিনি একই ধরনের ছবি আঁকতেন। এখন তাঁর ছবিতে বিবর্তন আশা করা কি অন্যায়? সুনীল দাসের ছবিতে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা ও দক্ষতার ছাপ পরিস্ফুট—ক্যানভাসের ভেতরে জ্যামিতিক চতুষ্কোণকে ঘিরে গাঢ় বর্ণপুঞ্জের আভাস। রবীন মণ্ডলের "কিং অ্যান্ড কুইন" সুন্দর—ক্যানভাসে সমতলস্থ ঈষদুন্নত রঙিন রেখা ভেঙে ফেলেছে তাঁর ছবিতে, কিন্তু তাঁর এই ধরনের ছবি আমরা আগে দেখেছি।

রামলাল ধরের "স্প্রিং" গীতিময় আলেখ্যর মতো সুন্দর ডিজাইন। শিবপ্রসাদ করচৌধুরীর ছবিটিতে বিশাল হলুদ প্রজাপতিটির আভাস বা ব্যঞ্জনা খুব সবলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রেবন্ত গোস্বামীর ফানুস এবং

নকে ভুলতে পারছেন না, অথচ ছবি আঁকবার হাত যে পাকা সে য় সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ । গীতা ভট্টাচার্যের "সানসেট ও গানি" খুবই আকর্ষণীয় ছবি, কিন্তু য়ত সূর্যটিকে তিনি কালো রঙে আঁকলেই পারতেন। দিলীপ কুণ্ডুর কশা-পুলার" প্রদর্শনীর অন্যতম ঠ ছবি বলে আমার মনে হলো। গাঢ় নী রঙের ঘেরাটোপের মধ্যে শাচালকের শিল্পিত (stylized) প্রকাশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না পারে না। অশোক ভৌমিক যেমন কেন, তেমনই এঁকেছেন। পতঙ্গ-শ মানুষের রূপক চিত্র। ঈষৎ ব্যঙ্গের গ মেলানো ঈষৎ অসম্ভাব্যতা। লক মণ্ডল প্রতিশ্রুতিময় শিল্পী, তু তাঁর "অন স্টেজ" কেমন সাদামাঠা হলো আমার কাছে। ছবিটির ম্পোজিশনে তল-বিভাগের রীতিটিও ম ঠিক ধরতে পারিনি। অজিতবিক্রম র ছবিটিতে মানুষের ভিড়ের মধ্যে টি শূকরসন্তানের উপস্থিতি কের মতো আমাদের অনুভূতির রে কাজ করে। প্রবীর দাশগুপ্তের ্যাডোলেসেন্স" ছবির কম্পোজিশন ব সুন্দর, বড়ো বড়ো চোখের ঃসন্ধির কিশোরটির জন্যে আমাদের ত্যই করুণা হয়, কিন্তু ছবিটির বর্ণ বহার সমানুপাতিকভাবে সার্থক না দিকে স্বপ্নেন্দু ভৌমিকের ... বটিতে রঙের ব্যবহার ... নাই কর্মকারের ... স্বতীর "সলিচিউড" শ্যামলী ট্টাচার্যের "আনটু ট্রুথ" এবং দীপক াসের পুষ্পিত ডিজাইনসদৃশ "... ট" মোটামুটি ভালো ছবি। শংকর হর "টাচ" ছবিটি প্রদর্শনীর র একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। ানভাসের তিন চতুর্থাংশ গাঢ় বাদামী ও আস্তীর্ণ ... একটি রুষ-হাত রমণী-শরীর স্পর্শ করে ছে। বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব কিছু ই, কিন্তু ছবিটি আঁকা হয়েছে তান্ত দক্ষতার সঙ্গে। মহী পালের রিয়ালিস্টিক চেয়ার ও ফুলের বিটিও সুন্দর। অলোক ভট্টাচার্য, মঙ্গ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত নিয়োগী, নোজকুমার দত্ত, এবং কমল সেনের বি আমার ভালো লাগেনি। প্রদর্শনীর তিটি ছবিই তেলরঙে আঁকা।

ক্যানভাস থেকে শুরু করে ব... লি সমস্তই উপহার দিয়েছেন ম্যাক্স লার ভবন, সুতরাং এই প্রতিষ্ঠান ... কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

রণবেন্দ্র দাশগুপ্ত

রেখার লেখা

২১শে অগস্ট—বিড়লা অকাদমী সমীর দত্তগুপ্তের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী। জন্ম ১৯৩... দিল্লি আর্ট কলেজের স্নাতক। সম্প্রতি কলকাতার বাসিন্দা। একঘেয়ে ছবি দেখতে দেখতে সমালোচকেরও অরুচি হয়। তখন নতুন স্বাদের ছবি দেখলে চোখটা ধাতস্থ হয়।

সমীর দত্তগুপ্তের পঁয়ত্রিশটা ছবি ছিল। কিন্তু কিছু ছবিতে আঁকার ... নানা ধরনের ছবি আঁকা নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন। আর্ট কলেজের ছাত্রের মতো কিছু অস্থিরতা রয়েছে। সেইটুকু প্রদর্শনীর দুর্বলতা।

তবু আমার ভাল লেগেছে তাঁর রেখাচিত্রগুলি। বড় বড় কালো সাদা বা রঙীন অংকনে তাঁর রেখা যে রীতিমতো জোরালো তা বোঝা গেছে। তিনি পুস্তক অলংকরণ বা সচিত্রকরণ করলে দারুণ করবেন। কিন্তু তাঁর রেখাবহুল অংকনগুলির মধ্যে একাধিক রীতি দেখা গেছে।

এক ধরনের ছবি তিনি দুগ্ধ-ফেননিভ থারমোকোলের ওপরে করেছেন। হয়তো স্পেচুলা বা শিল্পীর ছুরি দিয়ে দাগ কেটে পুরো মেয়েটির আভাস দিয়েছেন। তারপর সবুজ, বেগুনী, কচিকলাপাতা রঙ দিয়ে এঁকেছেন। মাটিঘেঁষা অথচ মায়াময়। তরুলতার মতো সর্পিল মেয়েটি উঠে গেছে। হয়তো তার নির্জন কনক চাঁপা হাতের আভাস। এখানে সাবলীল গড়িয়ে যাওয়া রেখার জোর আছে। কাব্যময় মাতিসীয় রেখা। বঙ্কিমগতি। আর এক ধরনের রেখা আছে, যা এঁকে বেঁকে গেলেও তার চলার মধ্যে ঋজুতারই প্রাধান্য। "ফুটপাতের বাসিন্দা" চিত্রটির মধ্যে মানুষগুলোকে এই রকম কঠিন রেখা দিয়ে বন্দী করা হয়েছে। তার ওপর অসংখ্য গিরিগিরি রেখার নানা কারিকুরি। তবুও তাঁর ... অংকন খুবই উচ্চমানের। বোঝা যায়, তাঁর পিতা প্রাতঃস্মরণীয় মাখন দত্তগুপ্তের কাছ থেকে তিনি অংকন খুবই যত্নের সঙ্গে শিখেছেন। ভবিষ্যতে এমন পুত্রের কাছে পরাজিত হয়েও দারুণ সুখ পাবেন মাখনবাবু।

সমীর দত্তগুপ্তের আলেখ্য কিন্তু খুবই কাঁচা। একটা ছবিই অন্য ধরনের। "অজানা দ্বীপ" ছোট্ট ছবিতে আদিম এক ... মা তার কিশোর ছেলে এবং ... বুনো কুকুর। সব মিলিয়ে খয়েরী রঙ জমেছে। কিন্তু বড় বড় পটে মোটে রঙ জল দিয়ে গুলে যে রূপবন্ধ ... ছবিগুলো এঁকেছেন তা ছদ্ম-আধুনিক। কারণ তাতে না আছে জলরঙের স্বচ্ছতা। না অস্বচ্ছ জলরঙের ... ছবিগুলো ... ছবি শেষ হবার পর রঙের তলানি দিয়ে আঁকা অপরিচ্ছন্ন। যেমন "জলজ" (অ্যাকুয়াটিক) বা "হাওয়া" (ব্রীজ)—এখানে ... বা নৌকার দলামোচড়ানো রূপবন্ধ রঙের অভাবে জমেনি। আলেখ্যে তিনি কি করবেন তা স্থির নয় বলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

রবিতীর্থের অনুষ্ঠান

১৮ আগস্ট রবিতীর্থের বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনটি নির্দিষ্ট ছিল সুচিত্রা মিত্রের একক গানের জন্য। সেদিন তিনি গাইলেন রবীন্দ্রনাথের 'পূজার গান'. অনুষ্ঠানসূচীর পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথকৃত বিষয় বিন্যাস ...

দুহ অধে জোন্দাত করে মোচ আলোপাত গান।

অনুষ্ঠানের মূল সুরটি ছিল নিবেদনের আর তা যথার্থ সার্থক হয়ে উঠেছিল গান নির্বাচনের পরিকল্পনা-বৈচিত্র্যে এবং গায়নভঙ্গির অনন্যতায়। প্রথমার্ধের গান শুরু করলেন 'তোমার নয়ন আমায় বারে বারে' গানটি দিয়ে। তারপর 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে', 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি', 'নীরবে আছ কেন বাহির দুয়ারে' 'জাগিতে হবে রে', 'তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী', 'এবার নীরব করে', 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' প্রভৃতি গানগুলি যখন একে একে স্নিগ্ধ শান্ত স্বরে গেয়ে চললেন তখন তা গভীর পুলকে আমাদের হৃদয়ে স্পন্দিত হতে থাকল। বহু ব্যবহৃত শব্দ যখন তাঁর কণ্ঠে মন্ত্রসম মন্দ্রিত হয়ে নতুন অর্থবাহী হয়, তখনই বুঝি রবীন্দ্রনাথের গান সে কেবলই সুর কেবলই বাণী নয়। তাঁর স্বরক্ষেপণ, উচ্চারণ, অলংকরণ ও নাট্যরসের সুশৃংখল সংযত প্রয়োগ এবং সবশেষে বলিষ্ঠতা বিচিত্র রসের গানগুলিকে তাই অনায়াসে রসোত্তীর্ণ করে।

দ্বিতীয়ার্ধের গান শুরু করেন 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে' গানটি দিয়ে। তার পরে 'নিভৃত প্রাণের দেবতা', 'হৃদিমন্দিরদ্বারে', 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'পথে চলে যেতে যেতে', 'আঁধার রাতে একলা পাগল' ইত্যাদি। তাঁর কণ্ঠস্বর সেদিন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকায় এবং সঠিক লয়ে গানগুলি গাওয়ায় তা সমস্ত শ্রোতাকে ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত করেছে। আর সর্বোপরি তাঁর উপলব্ধি, যা তিনিই সঞ্চারিত করতে পারেন শ্রোতার হৃদয়ে। তাঁর শিল্পীসত্তার প্রকাশ পূর্ণ বিভাসিত হতে দেখি যখন আমাদের সমস্ত চেতনাকে কাঁপিয়ে দিয়ে তিনি 'আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর' গানটি গেয়ে সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের যন্ত্রানুষংগে যথাযোগ্য সহযোগিতা করেছেন চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর রায় ও গৌর বসাক।

১৯ আগস্ট দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হল নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। সনিষ্ঠ প্রযোজনায় নাচ, গান, মঞ্চসজ্জা, পোশাক, আলোকসম্পাত, আবহসংগীত সর্ববিষয়েই সযত্ন চিন্তা ও অনুশীলনের ছাপ যা থেকে সাধারণ ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানগুলির সংগে পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তবু এখানেও সব ছাপিয়ে উঠেছে গান। এ যাবৎ আমি কোন নৃত্যশিল্পী দেখি নি, যিনি 'ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া, তার নাই ভয় নাই লজ্জা' বা '...বুকের জ্বালা দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানির' সার্থক নৃত্যরূপ দিতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে মাত্র দুএকটি গানের কথাই উল্লেখ করলাম। এমন অজস্র গান চণ্ডালিকায় আছে যার সঠিক নৃত্যরূপ দেওয়া কেবলমাত্র গভীর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কোন নৃত্য-পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব। আর এই

সুচিত্রা মিত্র

বিশ্বাস আমার আরো দৃঢ় হয় যখনই সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে প্রকৃতির গানগুলি শুনি। তাঁর অনুভূতির প্রকাশ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ বিস্মিত করে। মায়ের গানগুলি স্বপ্না মতিলাল ভালোই গেয়েছেন কিন্তু যখনই পাশাপাশি দৃপ্ত কণ্ঠে 'আমি ভয় করিনে মা' 'লজ্জা ছি ছি লজ্জা' অথবা 'আমি চাই তারে' বা 'ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া' গেয়ে ওঠেন সুচিত্রা মিত্র তখনই সব বদল হয়ে যায়। কী জাদু ওই গানে। মায়ের চরিত্রে রেখা মৈত্রের নৃত্যরূপ বিশেষ প্রশংসনীয়। সমবেত নৃত্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

সুভাষ চৌধুরী

বাদল-বাউল

কালিদাস বর্ষাকে দেখেছিলেন রাজবেশে, ক্ষত্রিয় রূপে। রবীন্দ্রনাথ আরেক রূপে দেখেছিলেন তাকে। দেখেছিলেন বাউলের চেহারায়। কিন্তু কালিদাসের বর্ষাও তিনি ভোলেন নি। বহু যুগের ওপার থেকে সেই কবির ছন্দ ঝরঝর বরিষণে ধরা পড়েছে তাঁর কানে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার তাই দুই রূপ। কখনো বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা সেই ক্ষত্রিয়রাজের মালা, কখনো সেই বাদল-বাউলের হাতে একতারা—দুই রূপেই বর্ষা স্থান পেয়েছে তাঁর গানে। এই ভাবনাকে অবলম্বন করে সেই গানের ডালি সাজিয়ে একটি [illegible] ভাষ্য রচনা করেছিলেন ভাস্কর [illegible]। সুরঝর্নার উদ্যোগে রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি সেই ভাষ্য নিবেদিত হল, 'বাদল-বাউল' নামে।

পার্থ ঘোষের গ্রন্থনায় একটি বিশিষ্ট মেজাজ ফুটে উঠেছিল। মেজাজ ছিল পূর্বা দাম, অর্ঘ্য সেনের অসামান্য কয়েকটি গানে। সাগর সেন, সুমিত্র সেনও ভালো গান করেছেন সেদিন নবীনদের মধ্যে প্রভাত ভজের গান আলাদাভাবে নাম করার মতো। অ্যরেব নবীন শিল্পী রুনু বসু অবিকল সুমিত্রা সেনের কণ্ঠ চুরি করে অবাক করেছিলেন। রুমা সিংহও চলনসই ছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নৃত্য-পরিকল্পনা ছিল ভীষণ ক্লান্তিকর। প্রায় একই মুদ্রা, একই ভঙ্গি ঘুরে-ফিরে দেখা গেল। তাছাড়া, গানের অন্তর্নিহিত ভাবের উলটো পরিবেশ ফুটে উঠেছিল বারবার। অর্ঘ্য সেনের অম[illegible] সবল পুরুষকণ্ঠের অনবদ্য গান—'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে।' মঞ্চে দেখা গেল একটি মেয়ে

পীবকার মাহনিও যে ভেসে এলে হলার খুশি হন, তাও এই প্রথম না গেল। রামগোপাল ভট্টাচার্য এবং ধা মৈত্র আলাদাভাবে অবশ্য দুটি নে খুবই সুন্দর নেচেছেন।

াজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে

মঞ্চের একপাশে ছিল জগন্নাথের কটি মূর্তি। সেই মূর্তির গলায় ছিল লা। দিনটি যেহেতু ছিল উল্টোরথের ১৫ জুলাই) হঠাৎ কারো মনে হতে াকত, বুঝি রবীন্দ্রসদনের মঞ্চে ল্টোরথ-উৎসবের আয়োজন। কিন্তু না। এক বিচিত্র যোগাযোগ। রানী কর্ণার ড়িশি নৃত্য ছিল সেদিন, সেই সূত্রেই ঞ্চ জগন্নাথদেবের আসন পাতা হয়েছল। জগন্নাথের উদ্দেশেই প্রণাম নালেন রানী কর্ণা তাঁর প্রথম নৃত্যে। মঙ্গলাচরণ। তারপর শৃঙ্গার নৃত্য। তৎপর অভিসারিকা নায়িকা—জয়দেবর কবিতার সূত্রে। সব শেষে দেখালেন দাবতার নৃত্যে দশটি অসাধারণ ঙ্গি। চমৎকার দেখতে রানী কর্ণাকে, চ আরও অনেক বেশী আকর্ষণীয়। ড়িশার ঐতিহ্যপূর্ণ নৃত্য-পদ্ধতি ওড়িশিকে এক বিরল লাবণ্যে পরিবেশন করলেন তিনি। রানী কর্ণার নৃত্য রিবেশন দেখা নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় ভিজ্ঞতা।

বিরতি ছিল রানী কর্ণার নাচের ক পরেই। কিন্তু কতক্ষণের বিরতি দোভারা জানান নি। প্রেক্ষাগৃহের ালো জ্বলে উঠেছিল। আর তখুনি বিশিখার সেদিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় র্ব শুরু হল মঞ্চে। শিখা বসু, গোতম ত্র ও কুমকুম চট্টোপাধ্যায়—এই তিনন নবীন শিল্পীকে রবিশিখার পক্ষ কে 'পঙ্কজ মল্লিক স্মৃতি পুরস্কার' ওয়া হল।

এরপর সত্যি বিরতি। তৃতীয় পর্বে বেদিত হল 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে'। বীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও রচনাংশ য়ে নৃত্যনাট্য। এখানেও নাচ মানে ই একই রকম ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা। -দিন আগে এই একই মঞ্চে 'বাদলউলে'র নাচ যাদের দেখা, তাঁরা

নী কর্ণা

পরিচয় ছিল না। এদিনও সেই একই গ্রুপ নেচেছেন। এবং রেখা মৈত্র একমাত্র সব ছাপিয়ে মনে গেঁথে যান।

'নৃত্যনাট্য' বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য সংকলনের মধ্য দিয়ে একেবারেই ফুটে ওঠে নি। নাট্য কথাটির অপব্যবহার ঘটেছে সন্দেহ নেই। গানেও বহু দুবলতা ছিল। বিশেষ করে গোতম মিত্র ও সুস্মিত মুখোপাধ্যায় একেবারেই ব্যর্থ। সুস্মিত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ সুরেলা নয়, গোতম মিত্র অসহ্য আধুনিক করে তোলেন রবীন্দ্রসংগীতকে। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ও বড়ো দুর্বল ভঙ্গিতে গান করেন। সবল কণ্ঠ ছিল একমাত্র অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সুস্মিতা সেন, বনানী ঘোষ এবং কুমকুম চট্টোপাধ্যায়—কেউই পূর্ণ মেজাজে গান শোনাতে পারেন নি। ব্যতিক্রম বরং শিখা বসু। 'শ্রাবণ আকাশে ওই' গানটি শিখা বসুর কণ্ঠে শোনা সেদিনের এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। তাঁর কণ্ঠের লাবণ্য পূর্ণ দলে বিকশিত হয়েছিল গানটিতে।

আবৃত্তিতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে) একমাত্র স্মরণীয় উপহার তুলে দিয়েছিলেন সেদিন।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

মাহাতোদের গান

তিস্তার এবারের অনুষ্ঠানে (আশুতোষ শতবার্ষিকী ভবন—৫ আগস্ট) সুবর্ণরেখার পারের মাহাতোদের লোকগীতিতে ভরা ছিল। মাহাতোদের গানে পরিস্ফুট এক সংগ্রামী মনোভাব। তাদের গানে বারবার ফুটে উঠেছে এক আশাবাদের সুর। হাজারো সমস্যার জীবন, কঠিন রুক্ষ মাটি, আকাশের দিকে চাতকের মত তাকিয়ে থাকা, প্রচণ্ড খরা—এসবই সত্য তাদের জীবনে। কিন্তু এসবের চেয়ে বড় কথা, একদিন সুদিন আসবে। এই আশা মাহাতোদের গানের প্রধান সুর।

অনুষ্ঠানের শিল্পীরা এসেছিলেন পুরুলিয়া থেকে। দু ধরনের গান ছিল সেদিনের সূচিতে। এক—প্রেম বিষয়ক গান। যদিও প্রেমের গানগুলি অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে। তবু এই গানগুলির আড়াল থেকে বারবার উঁকি মেরেছে আদিবাসী সমাজের প্রেমিক-প্রেমিকার অনুভূতির ভাষা। 'হইল বসন্তে অবশ রাধা' ও 'যখন ফুল কলি ছিল' গান দুটি যেন ভরা যৌবনের উত্তাপে উষ্ণ। গানের সুর ও ভাষার সে উষ্ণতার ছোঁয়া দর্শকদেরও স্পর্শ করেছিল। প্রবীণ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ মাহাতোর গাওয়া 'বারবার মনে দাগা দেলা হরি আর না দেখিব মুখ বংশীধারী' গানটির আকুল আবেদন অনেকক্ষণ গুনগুন করে ফেরে।

সেদিনের অনুষ্ঠানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন বীণাপাণি মাহাতো ও পশুপতি মাহাতো। বীণাপাণির গান বিরহপ্রধান। তাঁর কণ্ঠস্বরের সম্পদ মাহাতোদের গানের প্রকৃত রূপটিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। পশুপতি মাহাতোর গান জন-মজুরদের

আপনি যেমনটি চান ঠিক তেমনটি আরামপ্রদ স্যানিটারী ন্যাপকিন

সুন্দর ডিজাইনে লুপগুলি এমনভাবে লাগানো যা' আপনাকে পুরোপুরি সুরক্ষা প্রদান করে।

রেশমের মত মোলায়েম আবরণ সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় যা' ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

দু'ই প্রান্তভাগ এমন সুন্দর ডিজাইনে বানানো যে, এটি পরেছেন কিনা টের পাবেন না।

'ময়েশ্চার ফিব'-- বিশেষ-প্রক্রিয়ায় বানানো ফাইবার, যারফলে ভেতরে কিছু প্রবেশ করতে পারে না।

চট করে শুষে নেওয়া মোলায়েম 'টিস্যু' যা' আপনার শরীরের পক্ষে নিরাপদ আর খুশিমত বদলাতে পারেন।

APEX

- চালাক চটপটে মহিলারা জানেন কিভাবে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিতে হয়। মাসের কয়েকটি অস্বস্তিকর দিনে তাঁদের অবশ্যই দরকার— ক্লিন স্যানিটারী ন্যাপকিন।
- 'ময়েশ্চার ফিব'—এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় বানানো ফাইবার যা' খুবই মোলায়েম এবং যেটি থাকার ফলে ভেতরে কিছু প্রবেশ করতে পারে না। এটি কেমিক্যালে বানানো কাপড়ের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।
- রেশমের মত মোলায়েম আবরণ যাতে বাড়তি কাপড় আছে।
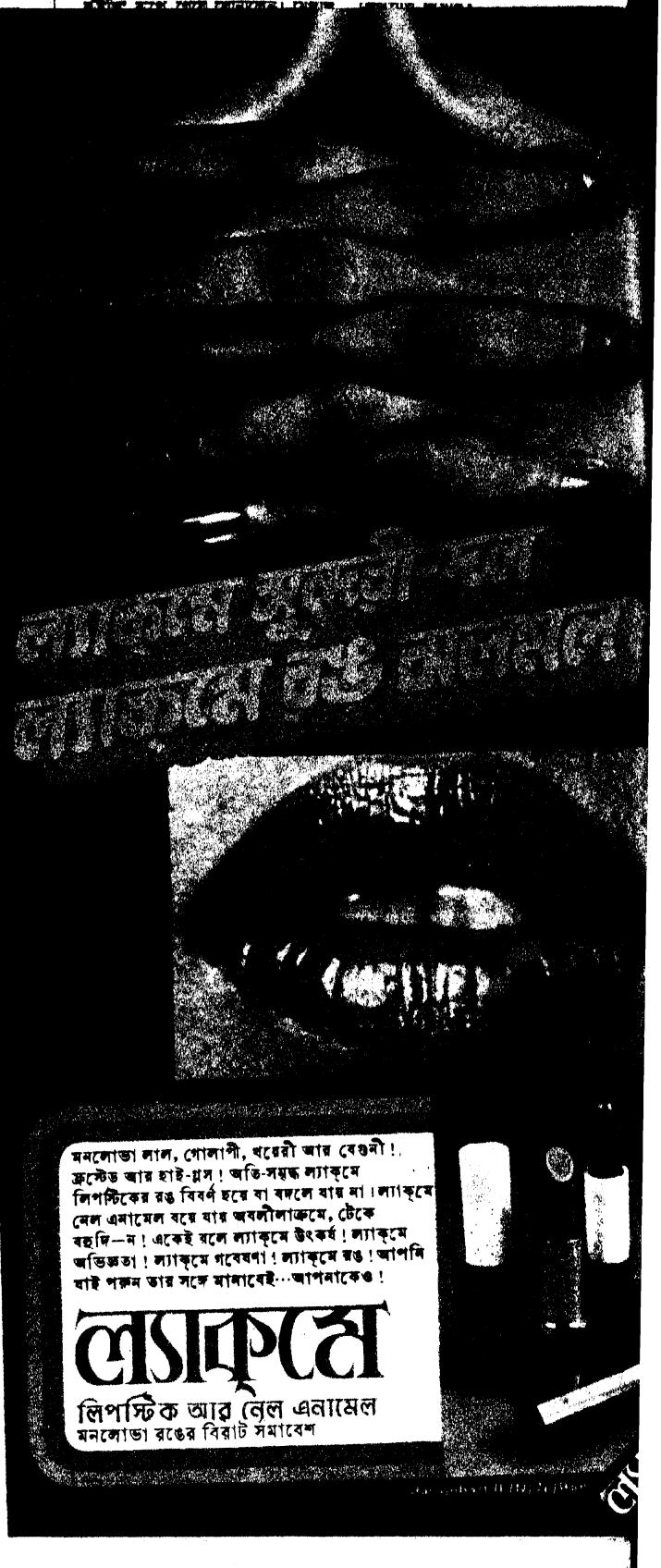
শুষে নেওয়া ক্ষমতা সম্পন্ন 'টিস্যু' যা' আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়।

- আরও কি, ক্লিন শরীরের পক্ষে নিরাপদ এবং সহজেই বদলানো যায়। যেখানে অন্যান্য ন্যাপকিন লাগে দু'টি সেখানে একটি ক্লিন ন্যাপকিনেই কাজ হয়ে যায়।

১৯৪০ সাল থেকে দেশে ও বিদেশে সুবিখ্যাত।

Klin

ক্লিন ইণ্ডাস্ট্রীজ্
(অমরনাথ) প্রাইভেট লিমিটেড,
মোরভি (গুজরাট) ৩৬৩৬৪১

ক্লিন যেমনই আরামকর তেমনই সাশ্রয়কর

জন্‌। 'এ মানুষকে মেলে না
'নিহদ্বিক্ত নিহদ্বিক্ত জান্ডা ট্রটি'
: বারবার শোনার মত। তবে
ট আর একট্ দীর্ঘ হলে ভাল
সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যের
হলে কম।
া ভট্টাচার্য

...নির গান

ও সুরের সার্থক মেলবন্ধনে
শল্পীদের হাতেই ললিতকলার
শ্রেষ্ঠ কলা সংগীত বিশেষ তাৎ-
ত হয়ে ওঠে। পায় নূতনতর
আধুনিক বাঙলা গানে এই
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাতিক।
যাঁরা গানের কথাবস্তু রচনা
তাঁরা অনেকেই তাঁদের রচনায়
করার ক্ষমতা রাখেন না,
যাঁরা সুরশিল্পী তাঁদের
হাতেই গানের কলম অচল।
আধুনিক গানের সার্থক রূপ-
এভাবে এ'দের হাতে বারবার
য়েছে। যাঁরা কথা ও সুরকে
পেরেছেন, এবং শুধু
ই নয়, ওই দুইয়ের সংগতি-
বরল ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাঁরাই
শিল্পী হিসেবে সিদ্ধি ও
অর্জন করেছেন। বাঙলা গানের
এদিক থেকে একটি বিশিষ্ট
সলিল চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ,
দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল,
ান্ত বাঙলা গানকে যে বিশেষ
সমৃদ্ধ করেছেন, যে বাঙলা
হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য,
রেন্দ্র মৈত্র প্রমুখ শিল্পীরা
ন নতুন আয়তন, সেই বাঙলা
যোগ্য উত্তরসূরী সলিল
। তাঁর লেখা গান যেমন
ী, তেমনই তার গীতিগত
অসাধারণ। শিল্পী হিসেবে
তাঁর সাংগীতিক রচনাগুলিতে
িত্ত ও দূরকল্পনার পরিচয়
ন। কথা ও সুরের মাধুর্য এবং
দিয়ে এই শিল্পী যত সহজে
র হৃদয় জয় করতে পারেন,
আধুনিক শিল্পীর পক্ষে তার
ৎ সাফল্যও অকল্পনীয়।
সম্প্রতি প্রতিধ্বনি সংস্থা দু
ও বেশী গান পরিবেশন করলেন
ন্দির প্রেক্ষাগৃহে। সলিল
ীর নিজের লেখা গান যেমন
শুনিয়েছেন তেমনই আবার বেছে
লেন শিল্পীর অভিজ্ঞতাপ্রয়
সেইসব গান যা আসলে কবি
নাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও
ন্দ্র ঘোষের কবিতার গীতিরূপ।
একসময় সংগীত বলতে নৃত্য,
ও বাদ্য বোঝানো হ'ত। প্রতি-
তরুণ শিল্পীরা সংগীতের
র মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে সলিল
ীর গানের উপযোগী কিছু কিছু
পরিবেশন করেছিলেন। শিল্পীর
'অডিও ভিস্যুয়াল' রূপটি
দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে এক
অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল। সলিল
ীর গানে দেশী ও বিদেশী সুর
আগাগোড়াই কিছু না কিছু
া করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর
বিদেশী সংগীতের অপায়ন নয়,
আয়োজন থেকে ধীরে ধীরে তিনি
পৌঁছেছেন সংশ্লেষণের অপূর্ব এক
জগতে যেখানে শিল্পী হিসাবে তিনি
যথেষ্ট দায়িত্ববান। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি
বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অধিবক্তা হলেও
গানের সাংগীতিক শর্তই তাঁর শপথপত্র,
প্রচারের ঢক্কানিনাদে আদৌ তিনি
মনোযোগী নন। প্রতিধ্বনি সংস্থার
শিল্পীদের গানের আসরে এটা বিশেষ-
ভাবে টের পেলাম। তাঁরা সলিল
চৌধুরীর পুরনো দিনের গানের পাশা-
পাশি নতুন গানও গেয়েছিলেন। এভাবে
সলিল চৌধুরীর ফিল্মের গান বাদ
দিয়ে তাঁর অন্যান্য গানের মোটামুটি
একটি অখণ্ড পরিচয় আমরা পেয়েছি
তাঁদের অনুষ্ঠানে।

সব দিক থেকে বিশ্বস্ত
থেকেই গানগুলি পরিবেশিত হয়েছিল।
সলিল চৌধুরী যে সব সহযোগী
বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন সেগুলিও
প্রতিধ্বনির শিল্পীরা ব্যবহার
করেছিলেন। তাই সোনোবক্স, অ্যাকো-
র্ডিয়ান, লীড ও বেস্ গীটার,
ঢোল, মন্দিরা, তবলা সেতার প্রভৃতি
সহযোগে যে সব গান সেদিন গাওয়া
হয়েছিল তা প্রেক্ষাগৃহের বাইরে থেকে
শুনলে মনে হত যেন রেকর্ড বাজানো
হচ্ছে। পার্থ সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশ-
গুপ্ত, নন্দন দাশগুপ্ত, রঞ্জিত মুখার্জি,
বিমল সিংহ, কবিতা নন্দী, মধুশ্রী দত্ত,
মধুরিতা দত্ত, অমৃত্র দত্ত, কবিতা
ঘোষ, নন্দিনী দেব, পর্ণা ঘোষ, অশোক
দত্ত প্রমুখ শিল্পীরা এই সুন্দর
'ইলিউশন' সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।
নৃত্যে হাসি মুখার্জি, সীমা সরকার,
ভারতী ঘোষ, শর্মিলা ব্যানার্জি,
বিপাশা ব্যানার্জি, সুলগ্না বাগচী,
আদিত্য মিত্র ও সুনীত বোসের ওপর
যে কাজ ন্যস্ত হয়েছিল তা তাঁরা
ভালোভাবেই সম্পন্ন করেন। মেক-
আপের গুণে বা যে কোন কারণেই
হোক গাঁয়ের বধূকে আমরা অবশ্য
গাঁয়ের বধূ হিসাবে মেনে নিতে
পারিনি।

প্রতিধ্বনির তরুণ শিল্পীদের
ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় আমরা
পেয়েছি। তাঁদের একটা কথা বলতে
চাই। তাঁরা নিজেরা গান লিখে বা
উপযুক্ত কবিতা নির্বাচন করে নিজেরাই
সুর দিচ্ছেন না কেন? তাহলে হয়তো
বাংলা গান তাঁদের কাছে কিছু পেতে
পারে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

বান্ধবী

অভাবের দরজায় প্রলোভন কড়া
নাড়ে বার বার। তবু প্রলোভনের মুখে
দাঁড়িয়েও শিশুর মত টাল খেতে খেতে
দাঁড়িয়ে পড়ে কোন কোন মানুষ। শেষ
পর্যন্ত পথের দিশা মেলে। এমনই এক
পথ খুঁজে পাওয়ার গল্প 'বান্ধবী'।

মিনার্ভা মঞ্চে বান্ধবীর অভিনয়
দেখতে গিয়ে প্রথম ক'টি দৃশ্য দেখে
বিরক্তই হয়েছি। কোথাও কোথাও বাড়া-
বাড়ি মনে হয়েছে, কোথাও কোথাও
সেক্সের প্রাবল্য মনে হয়েছে। কিন্তু
নাটক শেষ হওয়ার পরে দেখেছি, প্রথম

অংশ বাদ দিলে নাটকের রসভঙ্গ হত।

রিটায়ার বাবা। সংসারের সর্বত্রই অভাব। এমনই এক সংসারের মেয়ে অনামিকা। যার টিউশ্যানির টাকাই এই সংসারের একমাত্র সম্বল। অনামিকা স্বপ্ন দেখে সুদিনের, স্বপ্ন দেখে অলককে নিয়ে ঘর বাঁধার। অভাব আর স্বপ্নের পথ বেয়েই আসে প্রলোভন। বার বার হারতে হারতে জিতে যাওয়ার কাহিনী নিয়েই বান্ধবী। কাহিনীকার ও নির্দেশক সুনীত দাসের গল্প বলার ভঙ্গীটির মধ্যে আকর্ষণ আছে। দৃশ্য সাজানোর পরিকল্পনার জন্যে নাটকের স্বাচ্ছন্দ গতি কখনও ব্যাহত হয়নি।

সুনীত দাস ও গীতশ্রী

কাহিনী অবশ্যই কিছুটা অবাস্তব। তবু উপস্থাপনার গুণে দিব্যেন্দু চৌধুরীর হৃদয় পরিবর্তনের ঘটনা বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

নাটকের শেষ দৃশ্যটির পরিকল্পনায় পরিচালকের দক্ষতার ছাপ পরিস্ফুট। এক বিরাট মাকড়শার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে অনামিকা আর অলক। বেরিয়ে আসছে দিব্যেন্দু। প্রফেসনাল থিয়েটারেও যে গ্রুপ থিয়েটারের প্রভাব পড়ছে, বা দর্শকদের খুশি করার জন্যে ক্যাবারে ছাড়াও যে অন্য পথ আছে তার প্রমাণ মিলছে ইদানীং। যদিও এ নাটকেও পরিচালক মিস জের একটি নাচ রাখতে ভোলেননি।

যাযাবর নর্থ পরিবেশিত এ নাটকের অভিনয়েও নিষ্ঠার প্রমাণ আছে। একদিকে প্রেম অপর দিকে সংসার এ দুয়ের দ্বন্দ্বকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অনামিকার চরিত্রে সোমা গাংগুলী। সোমা গাংগুলী কোন কোন সময় অভিনয় ও বাস্তবের সীমারেখাকে মুছে দিয়েছেন। এক দেহপসারিণীর চরিত্রে গীতশ্রী দেবী তাঁর অভিনয় ক্ষমতাকে নতুনভাবে প্রমাণ করলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজলক্ষ্মী দেবীর অভিনয় তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। দিব্যেন্দু চৌধুরীর ভূমিকায় সুনীত দাসের শেষ দৃশ্যের অভিনয় একটু ওভার মনে হয়েছে। এ ছাড়া চরিত্রটিকে তিনি যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাটকে ব্যবহৃত 'পুতুলের' গাওয়া গানটি ছাড়া অন্য গানগুলি নাটকের প্রয়োজন ... গেল না। এডিটিং-এর কাজে আর একটু নজর দিলে নাটকের বক্তব্য বিষয় আরও স্মার্ট হতে পারে।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

যুদ্ধজাহাজ

১৯০৪ সালের রাশিয়া। ভ্লাডিভস্টক বন্দরে নোঙর করা রয়েছে একটি যুদ্ধ জাহাজ—'নিকোলাই টু'। জাহাজের ক্যাপ্টেন যুদ্ধপাগল। 'দেশ আজ বিপন্ন'—মুহুর্মুহু এ কথার দোহাই পেড়ে ভৌগোলিক ও জাতীয়তার স্বার্থান্ধ এই ক্যাপ্টেন যুদ্ধের জন্য অস্থির। তার এই অস্থিরতায় আসলে যা বিপন্ন তার নাম মানবতা, মানুষের সহজাত হৃদয়বৃত্তি-সুষমা। তাই যুদ্ধ জাহাজের চিমনি পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত এক জারজ ('জা... থেকে যা জাত'—নাটকে এমন ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে।) সন্তান—যে তার শিশু সুলভ উজ্জ্বলতায় সকল মানুষকেই পেতে চায় প্রেমে, পাপে নয়—চিমনির অন্ধকার থেকে তার যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে জাহাজের প্রায় সকল সৈনিক যখন বিচলিত, ইঞ্জিনিয়ার জুকভ যখন আপ্লুত অপত্যস্নেহে—তখনও ক্যাপ্টেন দয়ামায়াহীন শয়তানের এক সাকার মাত্র—তাই বয়লারে আগুন দিয়ে নিরীহ নিষ্পাপ মানবশিশুকে অনায়াসে পুড়িয়ে ফেলার বীভৎস উল্লাসের মধ্যেই হয় তার যুদ্ধযাত্রার সূচনা।

'ভৌগোলিক ও জাতীয়তার দেবতার কাছে বহু নরবলি চাই'—ক্ষোভের সঙ্গে এই কথা উচ্চারণ করে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে একবার এক প্রতিবেদনে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন যে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের তুলনায় অনেক বেশী আহত ব্যথিত। প্রসংগত তিনি শেলী, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, রোমা রোলাঁ, বারট্রান্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীর নাম করে বলেন—এঁদের পেছনে আরও কত অজ্ঞাত অখ্যাত লোক রয়েছেন যাঁরা আজ ভবঘুরের (Vagabond) মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটি নাটক সম্পর্কে আলোচনা লিখতে বসে একটু ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলো চলে এল। কারণ 'যুদ্ধজাহাজ'-এর দুটি চরিত্র দিমিত্রি ও জুকভ সেই অজ্ঞাত অখ্যাত লোক যারা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জারতন্ত্র এক ক্যাপ্টেনের যুদ্ধজাহাজে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে যুদ্ধ ব্যপনয়নে দাঁড়িয়েছিল। হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে জাগ্রত করেছিল বাকি সৈনিকদেরও। ফলত, 'যুদ্ধজাহাজ'-এর মূল যুদ্ধটা আসলে যুদ্ধের বিরুদ্ধেই। কাহিনী বিস্তারে, সংকলিত চরিত্রের অভিনেয় বেদন-প্রতিবেদনে এই বিরুদ্ধতা ক্রমশ ঘনীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হালফিলের কোলকাতার চলতি নাট্যপ্রবাহে তাই বক্তব্যের প্রশ্নে বলা যায়, একটা নতুন সুর সংযোজিত হল ইউ টি জি প্রযোজিত 'যুদ্ধজাহাজ' (অরুণ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত) মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে। বিমিশ্র নাট্যমোদীদের বুদ্ধি বিবেক বা হৃৎচেতনায়

ই সুর কোনোরকম আবেদন রাখলে
র জন্য নিশ্চিত ধন্যবাদার্হ নাট্যকার
মল মজুমদার, যিনি একটি রুশ
ল্পের (বরিস্ ল্যাভরেনিয়ভ-কৃত)
য়ায় এই নাটকটি রচনা করেছেন।

কিন্তু আফসোসের কথা, এমন
ব্য বিষয় নিয়ে সেদিন শিশির মঞ্চে
। উপস্থাপনায় সর্বতোভদ্র নৈপুণ্যের
বীতে ইউ টি জি'র নাট্যকর্মীরা কিন্তু
থেষ্ট সাড়া দিতে পারেন নি। বিশেষ
রে তাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রায় সারা
টকে এতই স্পষ্ট ছিল যে আহত রস-
াধের সমস্ত যন্ত্রণা উপস্থিত দর্শক-
র ধরে রাখতে হয়েছিল তাদের
ৌজন্যবোধের দৃঢ়তায়। ফলে, বিরক্তি ও
াস্তির মুখোমুখি তাদের হতেই হল।
কানো কোনো দৃশ্যে নাট্যঘটনা যে
ংকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে দর্শকচেতনায়
া বাহ্য করাবার মতো অভিনয়-দক্ষতা
শল্পীদের ছিল না। কণ্ঠস্বরের বিস্তৃ-
তির উপর যত্ন না-নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে
ংলাপকে সকলের জন্য শ্রুতি-স্পষ্ট
রা যায় না। তাই বিস্তৃতিহীন কণ্ঠে
চন্টাকৃত লাউড-অ্যাকটিং-ও পরিবেশ
ষ্ট করেছে। কিছু ব্যতিক্রম ছিলেন
মবশ্য জুকেভ চরিত্রস্রষ্টা শ্যামল দাশ
ও দিমিত্রির ভূমিকায় হেলেন দাসশর্মা।

শুভাপ্রসন্ন'র পরিকল্পনায় মঞ্চসজ্জা
গোপাল দা ও অবশেষ দা) এই নাট-
কের কিছু বাড়তি আকর্ষণ। শব্দগ্রহণ
হিমাদ্রি ভট্টাচার্য) ও শব্দ প্রক্ষেপণের
হিমাংশু পাল) কাজ যথাযথ। কিন্তু
মনু চৌধুরীর আলো অনেকাংশেই
বিশৃঙ্খল।

আবার বলছি, 'যুদ্ধজাহাজ' নাটকটি
বক্তব্যের প্রশ্নে বেশ সম্ভাবনাময়। কিন্তু
পরবর্তী মঞ্চায়নে অভিনয় মানের প্রতি
ইউ টি জি'র নাট্যকর্মীরা কতখানি
যত্নবান হবেন তার উপরেই নির্ভর করছে
তাঁদের সাফল্য।

স্মৃতি থেকে

স্মৃতি থেকে' মৌলিক নাটক নয়;
আরউইন শ কৃত 'বেরী দ্য ডেড' অব-
লম্বনে ভাবানুবাদ।

মনুষ্য সমাজের কল্যাণে কতিপয়
মানবের আত্মত্যাগ, সেই আত্মত্যাগকে
ভিত্তি করে কিছু স্বার্থান্ধ মানুষের
সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠা বা বহাল ও
[illegible]
কোনো অভিনবত্ব হয়তো দাবি করতে
পারে না; কিন্তু এর মূল গল্প-কাহিনীর
মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পরি-
লক্ষিত—এখানে মিথ্যার জগতে সত্য
আত্মপ্রকাশ করেছে ঘটনা বিস্তারের এক
অভিনবত্বে, যা অসম্ভব বা অলৌকিক
হলেও আমাদের ঠিক 'বিশ্বাস' নয়,
'মেনে' নিতে অসুবিধা হয় না, কারণ
সেটা শিল্প রচনার খাতিরে অনুপ্রবেশ
ক'রে নাট্য বক্তব্যকে আমাদের চেতনায়
ক্রমশ বাস্তবিক করে তুলেছে। কাহিনীর
এই অসম্ভব বা অলৌকিক ঘটনাটি হল,
অতীতের তিনজন শহীদ আচমকা তাদের
স্মৃতিস্তম্ভ থেকে জেগে উঠেছে।
মূল্যায়ন করেছে তাদের সুন্দর স্বপ্নের
বিকৃত রূপায়ণকে।

মূল রচনা বৈদেশিক হলেও কুমার
রায় তাকে যথেষ্ট নৈপুণ্যে স্বদেশী
আবহাওয়ায় আসেচন করে তুলেছেন।

অধুনা উপস্থাপনায় নাটকের ফর্ম
নিয়ে যে মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতি চলেছে
তার তুলনায় রূপচক্র নিবেদিত 'স্মৃতি
থেকে'-র মঞ্চায়নে (রংগনায়) কিছু
সংযমের পরিচয় পাওয়া গেল। পরি-
চালনার কাজেও গৌরকৃষ্ণ ভদ্র বেশ ছিম-
ছাম. নাটকের শুরু থেকেই তা লক্ষ
করা গেছে। কিন্তু বিভিন্ন চরিত্র
সৃষ্টিতে শিল্পীদের যে অভিনয় বৈশিষ্ট্য
নাটকটির উত্তরণের পথ সুগম করে
দিতে পারতো, তার অভাব শেষ পর্যন্ত
রয়েই গেল। অভিনয়-দক্ষতা কারো
কারো মধ্যে অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে,
কিন্তু তা গতানুগতিক। ফর্মুলা
বহির্ভূত অভিনয়-বৈশিষ্ট্যের প্রতি যে
স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে, তেমন
কোনো আকর্ষণে অভিজ্ঞ নাট্য-দর্শকদের
বাঁধতে পারেন নি তাঁরা। কোনো কোনো
ক্ষেত্রে সংলাপ উচ্চারণের দোলা, বিস্তৃতি
যেমন অভিব্যক্ত দৃশ্যকে দান করেছে
প্রশংসনীয় সমাকৃতি, তেমনি কোনো
কোনো ক্ষেত্রে আবার সংলাপের টানহীন
উচ্চারণ ও তার দীর্ঘসূত্রিতায় বিপন্ন
হয়েছে দৃশ্যাভিব্যক্তি। এরই মধ্যে বিভিন্ন
চরিত্রাভিনয়ে আলোচ্য নাটকে যাঁরা
সম্পদস্বরূপ অভিনয় করেছেন তাঁরা
হলেন নিশিকান্ত ঘোষ (মুখ্যমন্ত্রী),
গৌরকৃষ্ণ ভদ্র (বিজয় দা), প্রভাত বসু
(কমিশনার)। এছাড়া তিনজন শহীদের
চরিত্র চিত্রণে সুজিত বসু, প্রণব বড়াল,
তারক কুণ্ডুও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যদের
উপস্থিতি এক রকম মেনে নেয়া গেলেও
একমাত্র নারী চরিত্র ইন্দুর ভূমিকাভি-
নেত্রী রত্না সিদ্ধান্ত কিন্তু আলোচ্য
নাটকের মেজাজের সঙ্গে নিজেকে একে-
বারেই খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি।

আবহ ও শব্দ (শ্রীপতি দাস)
অনেকাংশেই যথাযথ, তবে কয়েকটি
ক্ষেত্রে টিউন এত চড়া যে বিরক্তির সৃষ্টি
করেছে। আলোক সম্পাতে ভানু বিশ্বাস
প্রশংসনীয়। সবশেষে বলি, কিছু দৃশ্য
এবং সংলাপের রদ-বদল ঘটিয়ে আরো
কিছুদিন অভিনয়কে রিহার্সালের আও-
তায় ফেলে রাখার পর আলোচ্য নাটকটি
দর্শকদের কাছে নিবেদন করলে রূপচক্র
গোষ্ঠী সমাদৃত হতে পারেন। কারণ
নাটকটি সে সম্ভাবনাপূর্ণ।

রানা দাস

অরুণ বসু (১৯৩৪—)

প্রায় দশ বছর হলো অরুণ বসু রকফেলার থার্ড ফান্ড ফেলোশিপ পেয়ে ন্যু ইয়র্কে চলে গেছেন। আগে স্বল্পকাল ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ (১৯৫৬-৬২) এবং গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে (১৯৬৫-৬৮) অধ্যাপনা করেছেন।

সমকালীন ভারতীয় ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। ১৯৫৫-তে সরকারী চারুকলা মহা-বিদ্যালয়ের স্নাতক। ফরাসী সরকারের বৃত্তিলাভ করে পারীতে গিয়ে এস ডব্লু হেটারের "আটেলিয়ার ১৭"তে ছাপাই ছবির কাজ শেখেন। আর ফ্রেসকোর কাজ শেখেন একোল নেশনেল সুপিরিয়ের দ্য বোজার্তে (১৯৬২-৬৪)। দেশে ফিরে আসার পর এক স্পেনীয় সুন্দরী এ দেশে এসে তাঁর গলায় বরমাল্য দেন।

বস্তুত "ইন্তাল্পিও" পদ্ধতিতে ছাপাই ছবি কলকাতায় তাঁর জন্য জনপ্রিয় হয়। আজকের অনেকেই ছাপাই ছবির কাজ পারী-ফেরত অরুণের কাছে শেখেন। মস্তিষ্ক চালানোর যুগ না হলে তিনি কলকাতায় থাকতেন। ১৯৭০-৭৭ সালে ছিলেন ন্যু ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ছাপাই ছবির স্নাতক পর্যায়ের উচ্চ শ্রেণীতে 'সহকারী অধ্যাপক। ১৯৭০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি সিটি ইউনিভার্সিটি অব ন্যু ইয়র্কের হার্বার্ট এইচ লেমান কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার (টেনিয়র্‌ড)।

নানা সময় পুরস্কৃত হয়েছেন। 'আইফেকস' পুরস্কার (১৯৫৯)। দিল্লির ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার (১৯৬১, ১৯৬২)। চতুর্থ আন্তর্জাতিক অনুচিত্রাকার ছাপাই ছবির প্রদর্শনী, ন্যু ইয়র্ক (১৯৭১)। একক প্রদর্শনী —নয়াদিল্লি (১৯৫৬)। কলকাতা (১৯৬২)। পারী, ব্রাসেলস (১৯৬৪)। কলকাতা (১৯৬৭)। ডেনেভার, কলোরডো (১৯৬৯)। পিটসবার্গ ইউনিভার্সিটি (১৯৭০)। এলসওয়ার্থ, মেইন (১৯৭১)। ডেনভার কলোরডো (১৯৭২)। আর্ট অ্যালিয়ান্স, ফিলাডেল-ফিয়া ওয়েনস্টাব গ্যালারী, ম্যাডিসান অ্যাভিন্যু, ন্যু ইয়র্ক এবং স্টকটন কলেজ, ন্যু জার্সি (১৯৭৩)। ন্যাশন্যাল আর্ট ক্লাব, ন্যু ইয়র্ক (১৯৭৫)।

এ ছাড়া তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। কমনওয়েলথ প্রদর্শনী লণ্ডন (১৯৬২)। পারী বিয়ানাল (১৯৬৩)। লা গ্রেড, মুসি ম্যর্দান আর্ত, পারী (১৯৬৪)। বিদেশী শিল্পীদের প্রদর্শনী, পারী (১৯৬৩-৬৪)। আন্তর্জাতিক ছাপাই ছবির প্রদর্শনী, লুগানো, সুইৎসারল্যাণ্ড (১৯৬৬)। টোকিও বিয়ানাল (১৯৬৭)। টোকিও প্রিণ্ট বিয়ানাল (১৯৬৮)। সাও পাওলো বিয়ানাল (১৯৬৮)। প্র্যাট গ্রাফিকস সেণ্টারের সাহায্যার্থে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, ন্যু ইয়র্ক (১৯৬৯)। সারা বিশ্বের তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনী, ইউনিয়ান কার্বাইড বিলডিং, ন্যু ইয়র্ক সিরেনসের ২০তম জয়ন্তী (১৯৭০)। মডার্ন আসটিয়স অব দ্য ওরিয়েণ্ট, ইণ্ডিয়ানাপোলিস (১৯৭০)। ভারতীয় কবিতা এবং ছাপাই ছবি, থর গ্যালারী লুইসভিল, কেনটাকী (১৯৭০)। প্রিণ্টমেকিং ওয়ার্কশপ, ন্যু ইয়র্ক (১৯৬৯-৭০)। চারজন ভারতীয় শিল্পী, মুজিয়াম অব আর্ট, পিটস-ফিলড, ম্যাসেচুসেটস (১৯৭০)। ৪র্থ আন্তর্জাতিক অনুছাপাই ছবির প্রদর্শনী, ন্যু ইয়র্ক (১৯৭১)। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন আয়োজিত ভারতীয় ছাপাই ছবির প্রদর্শনী, পোলাণ্ড (১৯৭১), পূর্ব জার্মানী (১৯৭২)। প্রিণ্টমেকিং ওয়ার্কশপ ন্যু ইয়র্ক (১৯৭২)। ১৯৭২-৭৫-এর মধ্যে নানা দেশে প্রচুর যৌথ প্রদর্শনী করেছেন। এর প্রধান-গুলি হলো, আন্তর্জাতিক গ্রাফিকস বার্ষিকী, ন্যু হ্যামশেয়ার এবং ৪র্থ আর্ট ফেয়ার, বাসাল, সুইৎসারল্যাণ্ড,

ডুসেলডর্ফ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (১৯৭৩)। "মডার্ন প্রিণ্টমেকার্স", ন্যু ইয়র্ক; প্রিণ্ট বিয়ানাল, ব্রাডফোর্ড ইংলণ্ড, ন্যু ইয়র্ক গ্রাফিকস বার্ষিকী, ২য় আন্তর্জাতিক ছাপাই বার্ষিকী, ন্যু হ্যামশায়ার, ডুসেলডর্ফ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী; সানঅ্যাণ্টোনিও, টেকসাস (১৯৭৪)। ৩য় ত্রিবার্ষিকাল নয়াদিল্লি, ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, সুইৎসারল্যাণ্ড; আর্ট ফেয়ার কলোন (১৯৭৫)। ভ্রাম্যমাণ অনুছাপাই ছবির জন্য মার্কিন মুলুকে ১৯৭১-এ ৫টি পুরস্কার পান —নর্থ লেকসটন; নকসভিল টেনিসী; জনসন সিটি, টেনেসী; টেকসাস; উটা। ইণ্টারন্যাশনাল আর্ট ফেয়ার, বেসাল; ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক প্রিণ্ট বিয়ানাল, মেলবোর্ন; ইণ্টারন্যাশনাল গ্রাফিকস বিয়ানাল, লিউব্লিয়ানা, স্লোভেনিয়া, ইউগোশ্লাভিয়া (১৯৭৭)।

"কালসর্প" (এনগ্রেভিং ২২"× ৩০")—তিনি মূলত অবয়বী অংকন করেন। একটি চিত্রকল্পকে মূর্ত করার পক্ষপাতী। যদিও বিমূর্ত কাজও করেছেন। দক্ষ কারুকার তিনি। রেখা সুনিয়ন্ত্রিত। অঘটনের স্থান নেই। নিখুঁত অথচ নান্দনিক। সাপ এখানে কোনো পৌরাণিক প্রতীক, কিংবা হয়তো নিছক সাপ। কিন্তু শিল্পকর্ম হিসাবে সার্থক।

ক্ষণে ক্ষণে প্রতি ক্ষণে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

utterly butterly delicious
Amul
Amul
PASTEURISED
BUTTER

কেয়ারফ্রী* সুরক্ষা

এর মানে হ'ল সম্পূর্ণ সুরক্ষা। আপনি এর জন্যে যে মূল্য দেন উপকৃত হন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী।

মাসের ওই পাঁচটা দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্য বিশেষ ধরণের সুরক্ষার প্রয়োজন হয়, যাঁর ওপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন: এটি হ'ল কেয়ারফ্রী সুরক্ষা। স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে জগদ্বিখ্যাত জনসন এণ্ড জনসন তৈরী করেছেন এই কেয়ারফ্রী, যেটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য স্ত্রীলোকেরা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

বিশেষ ওয়াণ্ডারর‍্যাপ কভার

এর জন্য কেয়ারফ্রী অবিকৃত অবস্থায় থাকে··· সাধারণ ন্যাপকিনের মত কুঁচকে যায় না। তাছাড়া এটি সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় বলে, আপনার ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে এবং কোন অস্বস্তি বোধ হয় না।

নীলরঙা প্ল্যাস্টি-শীল্ড রক্ষাকবচ

কেয়ারফ্রী-র তলা আর অন্য পাশ রক্ষাপ্রদ পলিথিন দিয়ে ঘেরা—যার ফলে ছিটিয়ে পড়ার বা কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।

বাড়তি শুষে নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন জিনিষ

ভালভাবে শুষে নেয়, নিশ্চিন্তভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে।

প্রান্তে টুকরো কাপড় যাতে খাপ খাইয়ে পরা যায়

একমাত্র কেয়ারফ্রী বিন্যাসযোগ্য দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়, যাতে আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। প্রত্যেক প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যের একটি কেয়ারফ্রী বেল্ট।

সহজে ফেলে দেওয়া যায়

কেয়ারফ্রী ন্যাপকিন নিরাপদে সহজেই ফেলে দিতে পারা যায়, কেননা ফ্লাশ করলেই জলের মধ্যে সব অদৃশ্য···তাই আপনি যখন ঘরের বাইরে থাকেন, কিম্বা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন এটি প্রকৃত সহায়।

কেয়ারফ্রী সুরক্ষা: যে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার কথা ভাবেন, তাঁদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

১৮টি ন্যাপকিনের সাশ্রয়মূলক ইকনমি প্যাক কিনুন

Carefree SANITARY NAPKINS WITH 3-WAY PROTECTIVE PLASTI-SHIELD

© J&J 76

কেয়ারফ্রী: যুগপৎ সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা

Johnson & Johnson*

কণ্টকল্পিত

"কণ্টকল্পিত" সম্বন্ধে মিহিরবাবু অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের উত্তর তথ্য-ভিত্তিক নয়। যথা—

১। সুভাষবাবুর দ্বিতীয়বার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট (১৯৩৮) হবার পর গান্ধীজী যে চিত্তচাঞ্চল্যকারী বিবৃতি দেন "Pattavi's defeat is my defeat" তারই শেষ লাইন ছিল "After all Subhas Babu is not an enemy of the country" এটি প্রশংসা বাণী নয়, মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত বিরক্তিভাবের অভিব্যক্তি। সুভাষবাবুর মহানিষ্ক্রমণের পরে মহাত্মাজী কোনও কথা বলেননি বা বিবৃতি দেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর সংবাদের পরে "হরিজন" কাগজে সুভাষবাবু সম্বন্ধে লিখেছিলেন "He was prince among patriots" ইত্যাদি।

২। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে বড় ব্যবসায়ীর স্বার্থের ব্যাঘাত হয়। অতুল্যবাবু প্রমুখ কংগ্রেসের কর্ণধারগণ উদ্যোগী হয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসাবার চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য হন। সেই সময়ের একটি ঘটনা ছোট হলেও মারাত্মক হয়েছিল। ডঃ ঘোষ বলেন যে, মহাত্মাজী তাঁকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন যে একজন মারোয়াড়ী সম্প্রদায় থেকে যেন মন্ত্রী গ্রহণ করা হয়। অতুল্যবাবু এটির তীব্র প্রতিবাদ করে প্রকারান্তরে ডঃ ঘোষকে অলীকবাদী বলে বিবৃতি দেন। ডঃ ঘোষ তার উত্তরে মহাত্মাজীর লেখা চিঠিটি সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দেন।

৩। রাজাজী ও গান্ধীজী দুই বেয়াই। দুজনেই সুভাষ-বিরোধী ছিলেন। যে উপমাটির উল্লেখ পত্রে করা হয়েছে তা হল রাজাজীর উক্তি—গান্ধীজী হচ্ছেন শক্ত নৌকার পোক্ত মাঝি, আর সুভাষবাবুর ফুটো নৌকা (leaky boat)।

৪। ডাঃ বিধান রায় বাংলা বিহার একীভূত (merger) করার যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাতে ভুল নেই। তীব্র প্রতিবাদ ও মতভেদের কাছে মোকাবেলা না করতে পেরে একটি একক ইলেকসনে কংগ্রেস প্রার্থীর হার হওয়াতে তারই ভিত্তিতে তিনি নিবৃত্ত হন।

অতুল্যবাবুর "কণ্টকল্পিত" একটি সযত্ন স্মৃতিচারণ। এতো আর ইতিহাস নয়, ইতিকথা মাত্র।

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
কলকাতা-২৬

শিক্ষা ব্যবস্থা

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের 'নাভিমূলে ফিরে গিয়ে' পড়ে একটি বিশ্লেষণ পুরোপুরি মানা গেল না। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ধনিক-সম্প্রদায়ের মুনাফা লাভের সম্ভাবনা নেই বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে বায় বৃদ্ধির প্রতি এই ঔদাসীন্য। তাঁর ভাষায়—"শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে ধনীর আরো ধনী হওয়ার পথ বন্ধ। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে অর্থনীতির কারণ। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়। কোন দেশে কোনকালেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যয়-বরাদ্দ বাড়িয়ে ধনীদের মুনাফা লোটার পথ সুগম হয় না। তা হলে কি ধরে নেব যে, সব দেশে সব কালেই এই কারণে অন্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বা উন্নয়নে বিঘ্ন থাকে?

আসলে তাৎক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারের আরও একটি উদ্দেশ্য থাকে: আর সেইটাই তার আসল উদ্দেশ্য। এই দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার এমন হাল কেন—সে প্রশ্নের উত্তরের জন্যও মনে হয় এই অন্যতর কারণটির একটু অনুসন্ধান প্রয়োজন।

কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হয়—সে শিক্ষা কার কোন কাজে লাগে? যিনি শিক্ষিত হন তাঁর উপকার হয় এই যে, তিনি তাঁর নিজের (এবং নিজ পরিবার-পরিজনবর্গের) জন্য রুটি-মাখন নিদেনপক্ষে ডাল-ভাত, জোগাড়ে সমর্থ হন। (এটিই শিক্ষার bread and butter aim নামে নিন্দিত একমাত্র লক্ষ্য।) কিন্তু আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা দের, আমাদের শিক্ষাদাতা—এই অর্থে যে তাঁরাই ব্যবস্থাটা করে দেন—ধনিক-গোষ্ঠীর কি লাভ হয়? সহজ উত্তর হল এই যে, ঐ 'শিক্ষিত' মানুষটি ধনিক-গোষ্ঠীর মুনাফা-সঞ্চয়ের হাতিয়ার হন। যে ছেলেটি কয়েক বছর ঘষে-মেজে এঞ্জিনীয়র হয়ে বেরুলো, সে কোন কাজে লাগে? নিঃসন্দেহে কোন না কোন রাঘব-বোয়ালের কারখানায় গতর ও মগজ খাটিয়ে তার 'শিক্ষা'র সাহায্যে মালিকের মুনাফা-বৃদ্ধির কাজে লাগে।

তা হলে এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, যতদিন পর্যন্ত এই ধরনের শিক্ষিত লোক ধনিক-গোষ্ঠীর প্রয়োজন থাকে ততদিন তারা নিজের স্বার্থেই 'শিক্ষা' ব্যবস্থার প্রতি, অর্থাৎ এই বিশেষ ধরনের মুনাফার—হাতিয়ার সৃষ্টির-ব্যবস্থাটার প্রতি দরদ দেখিয়ে থাকে। বর্তমান ভারতবর্ষের আর্থিক-দুনিয়ার হালচালের কিছু খোঁজখবর যিনিই রাখেন তিনিই জানেন যে, এই বিশেষ প্রয়োজনটি কিভাবে ভারতবর্ষের ধনিক-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কমে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে যদি এই মুহূর্তে কয়েক হাজার কলকারখানা তৈরি শুরু হয়, তাহলে কি ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কর্ণধারদের কোন নজর পড়বে না সেই সব কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রবিদ ও কলাকুশলী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী সৃষ্টির দিকে? এবং সেক্ষেত্রে কি স্বভাবতই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে না শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার?

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা দিক মাত্র। বৃত্তিগত ও কারিগরী শিক্ষা, এমন কি বিজ্ঞান-শিক্ষাকেও বাদ দিলেও বিশুদ্ধ কলা ও শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে কি বলা হবে? সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, কলা বা শিল্প কোন কিছুই উদ্দেশ্যহীনভাবে উপযোগিতাহীনভাবে চর্চা হতে পারে না। তাছাড়া, শিল্প-সাহিত্যচর্চার জন্য কিছু খরচপত্র করা তখনই সম্ভব হয়

[illegible] ভিতরেও কিছু সমস্যা অজ্ঞাত থাকে। এ কথা একটি পরিবারের ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, দেশ ও জাতির পক্ষেও তেমনই সত্য।

অতএব, সমস্যাটি সত্যই 'নাভিমূলে'; যেখানে গিয়ে এই হতভাগ্য দেশের সব সমস্যাই মিলে যায় একটি বিন্দুতে। এ ক্ষেত্রেও সমস্যাটা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধনিক-গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষভাবে মুনাফা আদায়ের সমস্যা নয়, অথবা বলা চলে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু। যে মানুষটিকে পয়সা-কড়ি খরচ করে 'শিক্ষা' দেওয়া হল, (বলা বাহুল্য, এ ধরনের প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষের জন্যই রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয় করতে হয়) তাকে দিয়ে কতখানি কয়লা উঠবে, অথবা আদৌ কিছু তোলা যাবে কিনা—সেটাই সমস্যা। বেকার ছেলে পুষতে বাপ-মা যেমন ভালবাসেন না, তেমনই দেশ ও জাতির কর্ণধারও সেটা চান না। সেটা একদিকে অপচয়, অন্য দিকে বিপজ্জনক।

রঞ্জিত ঘোষ
হাবড়া, ২৪ পরগনা।

মানুষ-পাথর

'দেশ'-এর ১৯ আগস্ট সংখ্যায় সমরজিৎবাবুর উত্তর-পর্ব ভারত সফরের অন্তরঙ্গ ও ঘরোয়া ভঙ্গিতে লেখা বিবরণ 'মানুষ পাথর' পড়লাম।

যে উদ্দেশ্যে সমরবাবুর সফর তা প্রশংসনীয়; যে সংস্থা তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। তবে আমার মনে হয় এর জন্যে বিশেষ এক পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গি দরকার যা সত্যনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক। নইলে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা (Geological Survey of India, সংক্ষেপে G S I) যেভাবে উদ্যোগী হয়ে সমরবাবুকে তাঁদের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন তা প্রশংসনীয় ও অন্যান্য সংস্থারও অনুকরণযোগ্য।

আমি যে সংস্থার কর্মী তা হল পারমাণবিক খনিজ বিভাগ (Atomic Minerals Division, সংক্ষেপে A M D)। এটা পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (Deptt of Atomic Energy) অন্তর্গত। বিশেষ বিশেষ কতকগুলো খনিজ যা থেকে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, বেরিলিয়াম, নায়োবিয়াম, ট্যান্টালাম ইত্যাদি পাওয়া যায়—এগুলোর জন্যে অন্বেষণ, খনন, উত্তোলন, পরিশুদ্ধি-করণ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই পারমাণবিক শক্তি সংস্থার একমাত্র দায়িত্ব। অন্য কোন সংস্থা তা করে না বা করতে পারে না। সমরবাবু হয়তো এটা নাও জানতে পারেন। G S I বা অন্য কোন সংস্থাই ভারতে এগুলোর জন্যে অনুসন্ধান চালাচ্ছে না। তবে ভারত বা প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা আছে। যেমন G S I এর ছেদক যন্ত্র কাজ শেষ করলে আমরা সেখানকার গহ্বরে কেবল বা তারের সাহায্যে ভারী, লম্বাকৃতি ধাতবখণ্ডের মধ্যে বিশেষ এক যন্ত্র পাঠাই যা গামা-রশ্মি বিকিরণকে ধরতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে গামা রশ্মির [illegible] ধাতুর জন্যে ছিদ্র [illegible] করে পাথরের নমুনা সংগ্রহ করার সঙ্গে তেজস্ক্রিয় ধাতুরও উপস্থিতি জানা যায়। এটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মত। সব জায়গাতেই আমরা ঐ সহযোগিতা পেয়ে আসছি। এত গেল অন্য সংস্থার কর ছিদ্রের সদ্ব্যবহার। আমাদের ভূ-তাত্ত্বিকরাও সম্ভাব্য নানা স্থানে অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছেন ও প্রাথমিক স্তরের কাজ আশাপ্রদ হলে পরের পর্যায়ের জন্যে ছেদকযন্ত্র ও অন্যান্য আরও অনেক ধরনের অনুসন্ধান চালাচ্ছেন (যেমন ভূ-রাসায়নিক, ভূপদার্থিক ইত্যাদি)।

৩৮ পাতায় আছে…"এই সেই জায়গা। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে।…এ তথ্য যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে একটা বড় রকম কাজ করেছেন।" এখানে ঐ আগের কথাটা আবার বলি—এটা জিওলজিক্যাল সার্ভের কাজ নয়; তাই কৃতিত্ব বা ব্যর্থতা কোনটাই তাদের প্রাপ্য নয়। আর ৬৫০ মিটার লম্বা, ১৫০-২৫০ মিটার চওড়া পাথরে প্রতি ১০ লক্ষে ৫০ ভাগ ইউরেনিয়াম পাওয়া নিয়ে এত উৎসাহ—নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। এটা উল্লেখ না করলেই বরং ভালো ছিল।

ব্যাপারটা তাহলে একটু বুঝিয়ে বলা যাক। যে জায়গার কথা উনি উল্লেখ করেছেন তাকে বলা হয় সুংগ উপত্যকা (Sung Valley)। ওখানে G S I-এর drilling-এর কাজ চলছে অন্যান্য ধাতুর জন্যে আর AMD-র কাজ চলছে নায়োবিয়াম, ট্যান্টালাম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম—এই সবের জন্যে। সমরবাবু বর্ণিত 'কারবনেটাইট' যে নিঃসন্দেহে 'কারবনেটাইট' তা আমাদের কর্মীরাই প্রমাণ করেছে ও ইতিমধ্যে প্রবন্ধও বেরিয়েছে। এটা ঠিক, কাজ ও'রা আগে থেকেই করছিলেন, কিন্তু পাথরটা যে 'কারবনেটাইট' তা ও'রা স্থির করতে পারেননি। এটা খুবই অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রথম এর সন্ধান পান ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক শ্রীপ্রমথনাথ বসু (যাঁর আবিষ্কৃত আকরিক লোহার জন্যে টাটা স্টীল কারখানা এখনও চলছে)। আজ থেকে কিছু কম একশো বছর আগে নর্মদা উপত্যকায়। কিন্তু তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও কেউ এ নিয়ে আলোচনা করেনি বা নামকরণও হয়নি। বর্তমানের ভারতীয় 'কারবনেটাইট' বিশেষজ্ঞ ডঃ জি আর উদাসই (যিনি আমাদের বিভাগের ডাইরেক্টার) এটার প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কারবনেটাইটের ওপর আমাদের গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের 'বিরল মৌল' পাওয়া যায়। নায়োবিয়াম, ট্যান্টালাম হল পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু। থোরিয়াম, ইউরেনিয়মও কিছু কিছু পাওয়া যায়; তবে সব জায়গাতেই যে সবগুলো থাকবে, তা নয়। আমাদের কর্মীরা ঐ সুংগ উপত্যকাতেই কম করে দু ডজনের চেয়েও বেশী সংখ্যায় ছোটখাটো জায়গায় কারবনেটাইট খুঁজে পেয়েছেন।

পাওয়া গেছে—কিনা অনুসন্ধান চলছে ভূকম্প যন্ত্র ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

সমরঞ্জনবাবুর লেখা 'স্ট্রাইক' কথাটা বুঝলাম না। ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় strike বা 'স্ট্রাইক' কথা আছে যেমন আছে dip বা নতি। কোন স্তরের বিন্যাস ও ব্যাপ্তি বোঝাবার জন্যে এগুলোর ব্যবহার হয়। কাল্পনিক আনুভৌমিক পরিসরের (horizontal plane) সঙ্গে সেই স্তর যে কোণ উৎপন্ন করে তা হল 'dip' আর ঐ স্তরের বিস্তারকে আনুভৌমিক পরিসরে অভিক্ষেপ (project) করলে যা পাওয়া যায় তা হল 'strike'।

প্রসঙ্গত বলি, পারমাণবিক শক্তি সংস্থা গত ক' বছর ধরেই উত্তর-পূর্ব ভারতে অনুসন্ধান কাজে খুব জোর দিয়েছে। নতুন একটা 'উত্তর-পূর্ব চক্র' গড়া হয়েছে যার সদর দফতর শিলঙে। পারমাণবিক শক্তি সংস্থার মন্ত্রগুপ্তির জন্যেই আমাদের কার্যকলাপের সঙ্গে জনসাধারণ ততটা পরিচিত নন। এটা দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থেই। তাই অনেক সময় 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজ' ধরনের তথ্য বিকৃতি ঘটে। তবে বিজ্ঞানীসুলভ শৃঙ্খলা আর সততা রক্ষা করতে পারলে এটা হয় না।

দেবেন্দ্রবিজয় গুপ্ত
শিলং ৩

রাগী সমালোচক ঃ
লেখকের জবাব

সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরীর অসত্য অভিযোগে পূর্ণ চিঠিটি পাঠ করে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। তিনি দেবীপদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধর সঙ্গে আমার প্রবন্ধের "হুবহু" মিল দেখেছেন।

কি সে মিল? দেবীপদবাবুর বইটি এনে পড়ে দেখলাম। কিন্তু বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিকোণে প্রবন্ধ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বলেই স্থির বিশ্বাস হলো আমার।

(১) দীনবন্ধুর অমর নাটক (প্রহসন) 'সধবার একাদশী'কে কেন্দ্র করে লালবিহারী ও দীনবন্ধুর মধ্যে বিরোধ এবং এই বিরোধের মূলে কারণ যে উভয়ের মানসিকতায় আকাশ পাতাল পার্থক্য—এই বিষয়বস্তু নিয়েই লেখা হয়েছে আমার প্রবন্ধ "রাগী সমালোচক বনাম শান্ত লেখক।" কিন্তু দেবীপদবাবুর প্রবন্ধে এই বিষয়ে আদৌ একটি কথা কিংবা তথ্যেরও তো উল্লেখ নেই। তিনি লিখেছেন অন্য প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত বলে রাখি খোলাখুলি কুখ্যাত বেশ্যাপল্লী সোনাগাছির উল্লেখ করে তিক্ত সমালোচনার ঐ বিরোধ এবং দুই লেখকের মানসিকতার প্রভেদের ইংগিত দিয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে। দেবীপদবাবু নন।

(২) আমি আমার প্রবন্ধে মোট ২৩টি তথ্যের উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে ৬টি তথ্যের সঙ্গে দেবীপদবাবুর ব্যবহৃত তথ্যের মিল আছে। যেমন (ক) দীনবন্ধু রচিত 'সুরধুনী' কাব্যের দুর্বলতা নিয়ে লালবিহারীর কঠোর সমালোচনা, (খ) ... অনুবাদ বাংলা হওয়া উচিত, মাতৃভাষাতেই প্রকৃত সুখ—একথা স্বীকার করে নিয়েও লালবিহারী অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, উচ্চতর, মহৎ ভাবপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাবার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকেই গ্রহণ করা উচিত, বাঙলা ভাষা কিছুতেই নয়। ইত্যাদি।

কিন্তু এসব তো সাধারণ সিদ্ধান্ত। এবং এগুলি একমাত্র দেবীবাবুরই আবিষ্কৃত তথ্য, তা মেনে নেওয়া যায় কিভাবে? লালবিহারীকে, দীনবন্ধু মিত্র ও সমসাময়িক লেখকদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিগত যুগের বহু লেখক বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী সাময়িক পত্রে দেবীবাবুর বহু আগে নানা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেমন, সুরধুনী কাব্যের কঠোর সমালোচনা এবং তোতারাম ভাট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, আজ থেকে প্রায় ৯২ বছর আগে। বাংলা-ইংরেজী ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে লালবিহারীর বিচিত্র মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন রেভারেন্ড আলেকস টমোরি আজ থেকে ৭৬ বছর আগে, এবং কাকিরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৬ বছর আগে।

(৩) মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও লালবিহারীর সঙ্গে তাঁর মূল প্রভেদ যে পাঠক নগেন্দ্রনাথ সোম কিংবা যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা মাইকেল জীবনী পড়েছেন, তাঁর কাছেই অতি স্পষ্ট। মাইকেল যে বড়োলোকের ছেলে, প্রচুর আদরে মানুষ, বন্ধুভাগ্য তাঁর বরাবরই ভালো, কালোর ওপর খুব সুন্দর চেহারা, ন্যায়নীতি জ্ঞান বেশ শিথিল, পুরো দিলখোলা প্রকৃতি, দু হাতে টাকা ওড়াতে ভালো বাসেন, ধর্মটর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না তেমন, স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত উড়নচণ্ডে—এ তথ্যগুলি তো সর্বজনপরিচিত। তথ্যগুলি আমি দেবীপদবাবুর প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করতে যাবো কোন দুঃখে? পত্রলেখক সুনীতিরঞ্জনবাবু কি সত্যিই মনে করেন উপরিউক্ত তথ্যগুলি দেবীপদবাবুরই "আবিষ্কৃত তথ্য"?

(৪) পত্রলেখক মন্তব্য করেছেন, 'অরুণোদয়' পত্রিকা সুজিতবাবু চোখে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। দেবীপদবাবু এটি ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে আনিয়েছেন। ইত্যাদি।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই, অরুণোদয় কেমন পত্রিকা ছিলো, কে কে লিখতেন, তার স্ট্যান্ডার্ড বা ভালো-মন্দ কেমন ছিলো, বৈশিষ্ট্যই বা কি, সে সম্বন্ধে কোনো অযাচিত মন্তব্য আমি করিই নি আদৌ। কারণ, সত্যিই অরুণোদয় পত্রিকা আমি চোখে দেখিনি, এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্যকর তথ্য আমি "নিজের আবিষ্কৃত" দাবি করে পাঠকের ঘাড়ে চাপাইনি, তাই, আমার তিন লাইনের মন্তব্যটি ছিলো এই—"কোনো কোনো গবেষক লালবিহারী দেকে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' নামক একটি বাংলা উপন্যাসের লেখক বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি ও প্রমাণ পরম্পরা দেখে ঐ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত মনে হয়।" স্পষ্টতই আমি নিজে কিছু আবিষ্কার

আপনার ভালোবাসার সঙ্গে

ক্লিয়ারটোন

আজ সারা দেশের ঘরে ঘরে ক্লিয়ারটোন নাম এক এমন গ্যারান্টী, যার শেষ নেই। আপনার প্রত্যেক চাহিদা মেটাতে ঘরের কাজের রকমারি সরঞ্জাম, আর এক হাজারেরও বেশী ডীলারের সাহায্যে বিক্রীর পরের চটপট সুদক্ষ সার্ভিস দিয়ে আমরা গত ২৫ বছরেরও ওপর ধরে নির্ভরযোগ্যতার সুনাম গড়ে তুলেছি।

ক্লিয়ারটোন ঘরের কাজের সরঞ্জাম

রান্নাঘরের সাথী···
ক্লিয়ারটোন মিক্সার যেন একজোড়া বাড়তি হাত···কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লান্তিকর কাজের ঝামেলা মিটিয়ে ফ্যালে। ১ লিটার ও ৩/৪ লিটার মডেল—দুটিই ISI-এর নির্ধারিত মান অনুসারে তৈরী। এর শক্তসমর্থ মোটরের রেটিং নিশ্চিতভাবে অনেক বেশী–৩০ মিনিট ও ১০ মিনিট। যাতে লীক না করে তার জন্যে, মিক্সিং জারটি নিখুঁতভাবে সুসমঞ্জস এবং এগুলি স্যান প্লাস্টিকে পাওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়াম ও স্টেনলেস স্টীল জারও বাড়তি অংশ হিসেবে কিনতে পাওয়া যায়।

না আছে উপদ্রব! না আছে ঝঞ্ঝাট!
ক্লিয়ারটোন প্রেশার কুকার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুস্বাদু খাবার রান্না করে, আর আপনার জ্বালানী খরচও কমিয়ে দেয়। বাড়তি নিরাপত্তার জন্যে ঢাকনাটি পাঁজরকাটা বলে আরও মজবুত। এর গাস্কেট উৎকৃষ্ট জাতের রবার দিয়ে তৈরী হওয়ার দরুন ক্ষয়ে যায় না।

Kleertone

cu 3856 Ben.

সরেছি মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। ়, "অন্নপোষণ"কে বিশ্লেষণ করার ্রমাত্র প্রয়োজনও আমার ছিলো না, শ আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু লবিহারী ও দীনবন্ধুর মধ্যের ্রাত্তটি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত া।

(৫) দীনবন্ধু মিত্র-র একটি ্বতা আমি আমার প্রবন্ধের শেষে ্ছার করেছি দেখে পত্রলেখক ্নীতিরঞ্জনবাবু বিশেষ ক্ষুব্ধ।

কিন্তু আমি মনে করি, নিজের ্ত্য প্রকাশের সুবিধের জন্য কোনো ্ন্ধ-লেখক—যে-কোনো কবিতা— ্বর নাম উল্লেখ করে এবং যথাযথ ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে, নিজের প্রবন্ধের ্গে মধ্যে শেষে, যে-কোনো জায়গায় ্ছার করার অধিকার রাখেন। ্শেষত আমার প্রবন্ধে—যেখানে ্মনে ইতিপূর্বে একবারও রাগ না ্া দীনবন্ধু ক্ষণিকের জন্য আত্ম- ্স্মৃত হয়ে লালবিহারীর ওপর রেগে ্—এবং কিছু পরেই সহৎ প্রকৃতির ্নবন্ধু মন থেকে রাগ মুছে ফেলে ্ন—সেই ঐতিহাসিক সত্যটি ্ঠকের সামনে রাখতে ঐ কবিতাটির ্রাগ আমার পক্ষে অনিবার্য ছিলো।

দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধের ্যে দীনবন্ধুর লেখা কবিতা ব্যবহার ্রছেন, সুতরাং ঐ কবিতা, আর কেউ ্খনো অন্য কোনো প্রবন্ধে ব্যবহার ্রতে পারবেন না—তা হলেই সেটা ্র হয়ে যাবে—এমন একচ্ছত্র মালিকানা ইজারাদারী প্রথা পত্রলেখক সুনীতি- ্ন রায়চৌধুরী কি অতঃপর বাংলা ্হিত্যে চালু করতে চান? দীনবন্ধুর ্থাবলীর অন্তর্গত ঐ কবিতা তো যে ্উই ব্যবহার করতে পারেন। তাই ্ কি?

্জিতকুমার সেনগুপ্ত
্লকাতা-৭

[এ সম্পর্কে আর কোনো আলো- ্া প্রকাশ করা সম্ভব নয়]

্মালোচনার এথিক্স্

২য়া সেপ্টেম্বর সংখ্যায় দেশ ্ত্রিকায় উপরিউক্ত বিষয়ে শ্রীমধুকর ্র্মার পত্র পড়বার পর ১৭ই জুন ্খ্যায় শ্রীনীলাক্ষ গুপ্তের আলোচনা ্বং মধুকর বাবুর পত্র দুটিই আবার ্ড়লাম। মধুকরবাবু লিখেছেন এই ্নুষ্ঠানে 'আপনিও যেতে পারেননি ্মিও না, যেহেতু এই আয়োজন ্ছল সম্পূর্ণ ঘরোয়া'। এখানে আপনি' বলতে নিশ্চয়ই দেশ ্সম্পাদক মহাশয়। তা, আমার ত ্নে হয় 'আপনি' ব্যক্তিগতভাবে ্উপস্থিত না থাকলেও 'আপনাদের ্নজস্ব সমালোচক'-এর উপস্থিতি আপনার' প্রতিনিধিত্ব-ই সূচিত করে। ্ক্ষেত্রে 'আপনাকে' দলে টেনে এনে ্লজরী করার চেষ্টাটাও বোধ হয় এথিক্যাস' নয়।

যাই হোক, অনুষ্ঠানটি ্ঘরোয়া-ই ছিল। যদিও কয়েকটি ্বশিষ্ট সংবাদপত্রে এর বিজ্ঞপ্তি ছিল ্এবং আনন্দবাজারে বিজ্ঞপ্তি দেখেই ্আমিও ঐ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে-

সৌভাগ্য বলতে গেলে হয়ই না। প্রসঙ্গত, সমালোচক কিন্তু রাধু- বাবুর প্রফেশন্যাল' বাজনা থেকে অবসর গ্রহণের কোনও উল্লেখ করেন নি, করেছেন পত্রলেখক নিজেই। এবং এটা সঠিক খবর-ই। তবে রাধুবাবু এখনও কেবল 'ভালই' বাজাচ্ছেন তাই নয়,—রীতিমতো ভাল বাজাচ্ছেন এবং তাঁর বাজনার মাধুর্য ও নৈপুণ্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি।

পত্রলেখক রাধুবাবুদের বাজনার আলোচনায় আর একজন বিশ্ববন্দিত সেতারীকে টেনে আনার প্রতিবাদেই প্রধানত পত্রটি লিখেছেন। হয়ত এ আলোচনায় আর একজনকে না টানলেও চলত। যাই হোক এটি সমালোচকের ব্যক্তিগত অভিমত। তার যৌক্তিকতা বা ঔচিত্য সম্বন্ধে কোনও আলো- চনায় আমি যাচ্ছি না। তবে কোন প্রসঙ্গে কথাটা এসেছে সেটাও দেখা উচিত। সমালোচনা থেকেই উদ্ধৃতি দিই।—'এই দক্ষ রাগজারি ও বিদগ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল দীর্ঘ মীড়-আঁশের কাজ যা ছাড়া কোনো আলাপ দাঁড়াতে পারে না—যে কারণে বীণকার ঘরানার তালিম সত্ত্বেও এক বিশ্ববন্দিত সেতারীর আলাপ জমে না।' নাম উল্লেখ না থাকলেও মনে হয় এটা সম্ভবত রবিশংকরকেই বলা হয়েছে। পত্রলেখক আগের অংশ ও 'যে কারণে' কথাটা বাদ দিয়ে শুধু পরের মন্তব্য- টুকু পড়ে রাগান্বিত হয়েছেন। রবি- শংকরও নিশ্চয়ই দক্ষ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী। সমালোচক মনে হয় এখানে পূর্বোল্লিখিত দক্ষরাগজারির সঙ্গে দীর্ঘ মীড়-আঁশের কাজের সং- মিশ্রণে সূক্ষ্ম মাধুর্যের প্রকাশের কথাই বলতে চেয়েছেন,—সমালোচকের মতে যেটার অভাবে বিশ্ববন্দিত সেতারীর আলাপ ততটা জমে না। এক্ষেত্রে রবিবাবুর আর্টের বিস্তৃত আলোচনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

পত্রলেখক আরও বলেছেন, সমালোচক পরোক্ষে মন্তব্য করেছেন যে রবিবাবু খাম্বাজ রাগের অব- রোহণে ভুল করে শুদ্ধ নি ব্যবহার করেন, এবং এই ব্যবহারের সমর্থনে পত্রলেখক অনেক কথার অবতারণা ও রবিশংকরের লেখা থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। নীলাক্ষবাবুর সমালোচনাটি বারবার পড়েও কিন্তু তার মধ্যে এ কথাটি খুঁজে বার করতে পারলাম না। সমালোচক বলেছেন, "তিনি (রাধুবাবু) কোথাও 'এই রাগের অবরোহণে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহার করেন নি—আলী আকবর সাহেবও যেমন করেন না, যখন তিনি ঠুংরী অঙ্গ বাজাচ্ছেন তখনও না' ইত্যাদি। এর মধ্যে রবিবাবুকে টেনে এনে এত কথা কেন?

পরিশেষে লিখি, সমালোচক নাড়া বাঁধা অনুষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তীর উল্লেখ করেছিলেন, পত্রলেখক সেখানে সরোদ শিক্ষার হাতেখড়ির সুবর্ণজয়ন্তী বলেছেন। নাড়া বাঁধা আর হাতেখড়ি কি একই?

গুরুদাস সিংহ কলকাতা-২৯

চীপত্র

রবর্তী আকর্ষণ

শোক রুদ্রের প্রবন্ধ
াধ ও শাপ
ন্দীপ সরকারের রচনা
চক্রের চোখ : হাভানায় যুব উৎসব
দলীপ ঘোষের গল্প
বহমান

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
াপ্লাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

বন্যাপ্লাবিত ভারত একটি অতি-করুণ দুঃখের মূর্তি বলে অভিহিত হতে পারে। ইতিহাসের গবেষক বলতে পারেন, এই দুঃখের মূর্তি ভারতীয় জীবনের পক্ষে নিতান্ত অভিনব কোন আবির্ভাব নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের বৃত্তান্ত এক্ষেত্রে মানবীয় জীবনের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সামান্য সাধারণ রকমের উল্লেখ ছাড়া অতীতের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে ঘটনার তেমন-কোন বিশদ ও বিস্তারিত উল্লেখ দেখা যায় না, যার গতি-প্রকৃতি ও রূপ বিচার করে মানুষের জীবনধারার পতন-অভ্যুদয়ের তত্ত্ব বিচার করা সম্ভব হয়। অনুমান করা ভুল হবে না যে, বন্যার আঘাতজনিত দুঃখ জয় করতে না পারার দুঃখে মানুষের সাংস্কৃতিক শক্তি সৌষ্ঠব ও যোগ্যতাকে পরাভূত হতে হয়েছে। ইতিহাসের অতি-অতীতের একাধিক সভ্য জনপদের বর্তমান ধ্বংসীভূত অবস্থার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা যে সত্যের পরিচয় পেয়েছেন সেটা মানব সভ্যতার বিকৃতিজনিত কোন ঘটনা অথবা ব্যাপার নয়: সেটা একটি বড় রকমের প্রাকৃতিক আঘাত, যার নাম বন্যা। সাম্প্রতিক ভারতীয় বন্যার সম্পর্কে এ ধরনের স্মৃতির মন্থন অবশ্য খুব প্রয়োজনীয় কোন সত্য নয়। এর মধ্যে শুধু এইটুকু শিক্ষণীয় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, ঐতিহাসিক বয়ঃক্রমের বিচারে বন্যা মানুষের জীবনের একটি আদিম দুঃখ বলে প্রতীত হলেও মানুষের ঐতিহাসিক চিন্তায় এ বিষয়ে সতর্কতা ও চেতনার অভাবই বেশী প্রকট হতে দেখা গিয়েছে। বন্যাকে জয় করবার কোন সার্থক উপায় আবিষ্কার না করতে পারার দুঃখে, বন্যার ইচ্ছার কাছে ভাগ্য সঁপে দেবার স্বভাব মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

এইসব তাত্ত্বিক অভিযোগও বর্তমানের দুঃখাভিভূত সমস্যার পক্ষে বিচারণীয় বিষয় নয়। ভারতের জাতীয় আচরণ ও সংকল্পের পক্ষে এই ভর্ৎসনা যথোচিত প্রাপ্য বলে বিবেচিত হবে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বন্যার রূপ ও প্রকৃতির রীতি-নীতি লক্ষ্য করেও ভারতীয় জনজীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কোন শিক্ষা সঞ্চারিত হয়নি। যদি হতো তবে ঐতিহাসিক প্রথা ও প্রক্রিয়া হয়ে এই দৃশ্য দেখা যেত যে, ভারতে জনপদের প্রতিষ্ঠা ও স্থাপনা বিশেষ একটি রীতি অনুসরণ করে চলেছে। নদী সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা ও রক্ষাবিধি অনুসরণ করবার রীতি। বলা বাহুল্য যে, মানবীয় জীবনের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নদীর দ্বারা খুবই প্রভাবিত। নদীকে সভ্যতার জীবন বলে প্রশস্তি করা হয়ে থাকে। সুতরাং নদী সম্পর্কে মানসিক প্রভাবে অনুরাগের এবং বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদে নদীর বিশ্বাসঘাতক চরিত্রবৃত্তির সত্যটি সর্বদা স্মরণে রাখবার কর্তব্য মানুষের চিন্তাতে প্রতিপালিত হয়নি। সুতরাং দুঃখের মূর্তির ভয়ালতা লক্ষ্য করে এই সত্যই মুক্তকণ্ঠে অভিব্যক্ত করতে হয় যে, উত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি নদী যেন বিশেষ একটি সময় বুঝে ভারতীয় জীবনের হিত স্বার্থ ও স্বস্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকের আচরণ একসঙ্গে প্রকট করেছে। নদীকে পবিত্র বলে ধারণাও করেও নদীর এই খল চরিত্রের অপবিত্রতা স্বীকার করতে হয়।

ঐতিহাসিক তথ্যের মানচিত্রে আরও দুটি দুঃখের নদীকে দেখতে পাওয়া যায়, ইয়াংসি-কিয়াং ও মেকং নদী যারা যুগ যুগ ধরে দুই তটের মানুষের উপনিবেশ ডুবিয়ে ভাসিয়ে ও প্লাবিত করে আর্তনাদের রাজত্ব রচনা করেছিল। এই দুই নদী আজও তাদের স্বভাব বর্জন করেছে বলে মনে হয় না, যদিও মানুষের সতর্কবুদ্ধির শাসনে যথোচিত সংযম মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতীয় অতীতকালীন জীবনে জনপদের সংখ্যা বিশেষ প্রকারে সীমায়িত ছিল। অখণ্ড ভারতের আট লাখ গ্রামেই ছিল ত্রিশ কোটি অধিবাসীর পঁচিশ কোটির বসতির ভূমি। সুতরাং বন্যার প্রকোপ ছিল প্রধানত গ্রামবাসীদেরই উপর প্রবাহিত দুঃখের প্লাবন। ইংরাজ আমলের রেলপথের ও বহু নতুন সড়কের বে-হিসাব নির্মাণ সাধারণ বন্যাজলের প্রবাহ ব্যাপক প্রকারে অবরুদ্ধ করে দেবার প্রথম প্রধান অভিশাপ বলে বিবেচিত হতে পারে। এর পর প্রশাসনিক কারণে নতুন শহরের প্রতিষ্ঠা এবং যান্ত্রিক উৎপাদনের কারখানা ও খনির পরিচালনার প্রয়োজনে নতুন শহরের প্রতিষ্ঠা যত্রতত্র প্রসারিত হবার ফলে বন্যার পক্ষে বেশী বিনাশক হবার বৃহৎ হেতু সৃষ্টি করেছে।

সরকার বলেছেন, নতুন করে এক বন্যা-কমিশন নিয়োগ করা হবে। সরকারী ইচ্ছা ও প্রস্তাবকে বর্তমান অবস্থায় এবং অতীতের অভিজ্ঞতার শিক্ষায় এক প্রকারের প্রগলভতার বলে মনে করা চলে। কমিশনবাজি তো অনেক হয়েছে। ওর মধ্যে প্রকৃত কোন সহায়ক পদ্ধতির প্রতিশ্রুতি নেই। সমস্যাটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক বিনাশক্রিয়ার নিরোধক একটি পূর্তবৃত্তির অভ্যুদিত করবার কর্তব্য বলে বিবেচনা করতে হবে। বন্যার বাৎসরিক সম্ভাবনার মুখের কাছে নতুন কোন বৈষয়িক প্রয়োজনের আধার নির্মাণ করবার মূঢ়তাময় রীতি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। নদীকে তার বন্যার খলজলের প্রবাহ স্বচ্ছন্দে বিস্তারিত করবার খোলাপথ দিতে হবে। খোলাপথে যতটা সম্ভব মুক্ত প্রান্তর কৃষিক্ষেত্র ছাড়া কোন জনপদের স্থাপনা থাকবে না। প্রস্তাবটা কোন-কোন বিজ্ঞতার কাছে খেয়ালের খেলার প্রস্তাব বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু আধুনিক ইকোলজির আধুনিকতম দাবি এই যে, বন্যাকে বাঁধ বেঁধে শান্ত করে রাখার চেয়ে, বাঁধ না বেঁধে স্বচ্ছন্দ প্রবাহক্ষেত্র অবারিত করে রাখাই শ্রেয়। চিরস্থায়ী বাঁধের নির্মাণ সম্ভব কি-না, এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন অভিজ্ঞ পূর্তবিদ্। অবস্থার স্বাভাবিক সত্যের একটি কঠিন বিদ্রূপ এই যে, যে-বাঁধকে আজ চিরস্থায়ী বলে মনে করা হচ্ছে, সে বাঁধ হয়তো কালই নিদারুণ এক অস্থায়িতার আবর্তে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

গাছতলার কিছু লোক

গোটা পঞ্চাশ লোক হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে ওই গাছতলাটার দাঁড়িয়ে আছে কেন হে?

ও তো রোজই থাকে স্যার। স্বাধীনতার পর থেকেই আছে। চেহারাটাই যা কেবল পাল্টাচ্ছে। গাছের ডালে থাকে পাখি আর তলায় থাকে বাকি।

তোমার কাছে কবিতা শুনতে চাইনি, কারণ জানতে চেয়েছি। কেন ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে
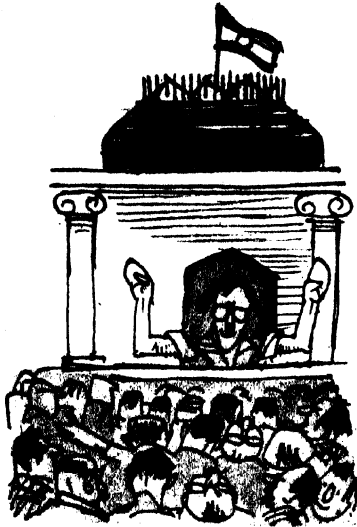
মন্ত্রীদের প্রথম বছর পোপের ভঙ্গীতে দর্শনদান

ওইভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে? এটা কি চিড়িয়াখানা!

না স্যার চিড়িয়াখানা কেন হবে। সে তো আলিপুরে। এটা হল মন্ত্রীখানা—সিট অফ পাওয়ার, না, না সিটাডেল অফ পাওয়ার। পাওয়ারপ্ল্যান্ট স্যার। পাওয়ার প্ল্যান্ট।

তোমার কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। গাছের তলায় ক্লান্ত মানুষ আমি বুঝি, কিন্তু হোয়াট ইজ দিস? বিয়েবাড়ির বাইরে কাঙালের মত রোজ রোজ এক গাদা লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেন থাকবে, কি জন্যে থাকবে? আমরা কি ফিল্মস্টার না পওহারী-বাবা। হেমা মালিনীর মত এক ঝলক নেচে যাবো, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দুবার হাত নেড়ে দোবো! মোস্ট অস্বস্তিকর। যতবার বাথরুমে আসছি যাচ্ছি, একবার করে চোখ পড়ে যাচ্ছে—ফ্যালফ্যালে একসার মুখ রোগা, লম্বা, মোটা, হোঁতকা নানা ডিজাইনের মানুষ।

ভুলে যান না ওদের কথা। সন্ধ্যে হলেই চলে যাবে। আপনার কাজ আপনি করে যান।

তোমরা সব ব্যাপারটাকেই বড় সহজ করে নাও। সবসময় তোমার দিকে যদি জোড়া জোড়া চোখ তাকিয়ে থাকে, একটা অস্বস্তি লাগে না? পারফেক্টেড ঘরে কেউ বসবাস করতে পারে! পারফোরেটেড মশারিতে কোনওদিন শুয়ে দেখেছো!

যদি রাগ না করেন তো একটা কথা বলি।

বলতে আর বাকি রেখেছো কি। তুমি বলছ, কাগজ বলছে, রাম বলছে, শ্যাম বলছে, গরু বলছে, ভেড়া বলছে, স্বজন বলছে, দুর্জন বলছে, চীন বলছে, জাপান বলছে...।

নিজেকে স্যার ক্যাবারে ড্যানসার ভেবে চুপচাপ বসে থাকুন। জোড়া জোড়া চোখ অবলোকন করে চলেছে, এতটুকু কপনি, ইঞ্চেতে এইটুকু কাপড়, থির্কিং কী উপদেশই দিলে? কোথায় মন্ত্রী, কোথায় ক্যাবারে ড্যানসার! অর্ধোওলঙ্গ নর্তকী নেচে চলেছে লাস্যলেখী, কামমর্দিত, নেশা চুলুচুল, চোখের সামনে ইন্দ্রিয়কে উসকে দেবার জন্যে। হোয়ার অ্যাজ মন্ত্রী! মন্ত্রীর ব্যাংসান কী! দেশকে সুন্দরভাবে শাসন করা। মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা। দেশকে ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে প্রগতির শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া! বাবারে! পড়ে বাবার মত হাঁফিল। চেয়ারটার স্প্রিংটা একটু কমজোর হয়ে গেছে। অবার বোধহয় ওয়েট গেন করছি হে। মন্ত্রী হলেই দেখবে ওজন বাড়ন্ত থাকবে। এরকম একটা স্লাইট প্রোসেস তুমি দ্বিতীয় আর পাবে না। ফ্যাটলেস, লো-কোলেস্টেরাল মন্ত্রী কোথায় পাওয়া যায় বল তো!

রোগা মন্ত্রী খুব কম দেখা যায় স্যার! বিদেশী মন্ত্রীদের যেসব ছবিটবি দেখি, গাল ভাঙা, কণ্ঠা বেরোনো মন্ত্রী বড় একটা দেখা যায় না। আসলে মন্ত্রীত্বটাকে হজম করতে পারলে মোটা হবার ভয় থাকে না। আপনার স্যার বদহজম হচ্ছে। অ্যাসিড হয়ে যাচ্ছে।

যাঃ আমি কী নতুন মন্ত্রী হয়েছি নাকি! আমার রক্তে মন্ত্রী, মর্মে মন্ত্রী, মন্ত্রীর "জিন্স" আমার দেহকাণ্ডের কোষে কোষে। তুমি বলছ—বদ হজম?

হ্যাঁ বদহজম। অ না হলে গাছতলার কটা লোক দেখে আপনার এমন চিত্তবিকার হত না। জাত মন্ত্রী হবে জাতসাপের মত। নিজের খেয়ালে এঁকেবেঁকে চলবে। লোকে ভয় পেয়ে লাফিয়ে পালাবে। মাঝেমধ্যে ফ্যাসফোঁস করে দু একটা ছোবলটোবল মারবে। তা না দেশ দেশ করে হেদিয়ে পড়লেন। দেশটা কি আপনার পিতার সম্পত্তি!

পিতার কেন হবে? আমার পার্টির সম্পত্তি। আপাতত আমার পার্টির সম্পত্তি। ইজারা সিসটেম। দেশ কত পবিত্র জিনিস! দেবালয়ের মত। মন্দিরের মত। জানো তো বড় বড় মন্দিরে সেবায়েতদের ঘর ভাগ করা থাকে। এ তরফ একবার সেবার ভার পায় তো, ও তরফ আর একবার পায়। দু তরফে লাঠালাঠি হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসে যায়। তখন নেপোয় মারে দই।

সেই ভাবেই সেবা করুন। কলাটা মুলোটা, ফলটা ফুলুরিটা যা দিয়ে যাবে তিনের চার ভাগ মেরে দিয়ে সিকি ভাগ সিঁদুর মাখিয়ে ছোপ ছোপ লাল করে একটা জবা দিয়ে ফেলে দিন—উড়ো খই গোবিন্দায় নম।

সেই খই ধরার জন্যে একগাদা গোবিন্দ যদি সত্যি সত্যি রোজ এসে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে কেমন লাগে! বল কেমন লাগে! আজ আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। আমি জানতে চাই, দেখতে

মন্ত্রীদের তৃতীয় বছর কুমকুমেওয়ালাদের আপ্যায়ন

চাই, কী করলে ওই গাছতলাটা ফাঁকা করা যায়। থাকবে, ডালে ডালে পাখি থাকবে, তলায় একটা দ
পাগল কি ভ্যাগাবণ্ড থাকবে থাকুক, কিন্তু
খালাসির মত চেহারার লোকগুলো থাকবে না।
একটা স্পেসিমেনকে ওপরে তুলে আন। দেখে
আনবে। যেভাবে মাছ কেনে সেই কায়দায় আনবে
বেশি কাঁটা থাকবে না, বেশি তেল যেন না থা
খাতে সয় এমন জিনিস আনবে। একেবারে টাটকা
আনবে না, ধ্যাড়ধেড়ে বুড়োও আনবে না। বেশ হ
গোবা মাঝবয়সী পোড়া পোড়া রোস্টেড ধরনের, ও
বেকড একটা জিনিস তুলে আন। সে আমাকে দেখ
আমি তাকে দেখি। দেখাদেখি করে দেখি দে
কোথায় আছে! ওপরে, নিচে, মাঝে না কি রসাতলে

॥ দৃশ্যান্তর ॥

এই যে স্যার বঙ্কুবাবুকে তুলে এনেছি।
যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি। স্পেসিমেনে স্পেসি
মিলিয়ে। এই দেখুন ওষ্ঠে তাম্বুল রেখা, গ
ঘর্মবিন্দু, প্যান্টের পাশ পকেটে টিফিনের মোড়
শরীরের মধ্যদেশে আলস্যে অর্জিত বদহজমে ল
চর্বি।

হয়েছে। হয়েছে। আর শুনতে চাই না। তুমি য
বসুন আপনি।

কতদূরে বসব স্যার। সারি সারি চেয়ার। বে
সারিতে বসব বলেন।

স্কুল কলেজে কোন্ সারিতে বসতেন?

একেবারে লাস্টে স্যার।

হুঁ। কী করেন আপনি?

সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরি।

হুঁ, তার মানে বড়কর্তাদের ঘরে ঢুকলে ব
বলে না দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়।

রাইট স্যার। দাঁড় করিয়ে রেখে টেলিফোনে অন
কথা বলে যেতে থাকে। একটা ফোন নামিয়ে
একটা ফোন তোলে। কখনও বাথরুমে চলে য
কখনও ফাইফরমাশ খাটায়—অ্যাই ডাইরেক্টারিটা আ
তো, এই কাগজটা মিত্তিরকে দিয়ে আসুন।
প্রশান্তকে ডাকুন তো, যত সব অপদার্থ বে
ইডিয়েট!

হুঁ, নুন, সুন, কুন বলে না সো, কো
বলে, ভাল করে অবজার্ভ করেছেন কি? এই
আমি বেশ জোরের সঙ্গেই এন বললাম। ইচ্ছে
তবু বললুম। সম্মান দেখাবার জন্যে নয় কি
জাস্ট ভদ্রতা। এমপ্লয়ার হল প্রভু, এমপ্লয়ী
দাস। দাস ব্যবসায় খাতিরখাতির নেই। আ
সাইকোলজিক্যালি কিছু লোককে ওইভাবে
এর নাম ল

সকেন্ড ল, থার্ড ল আছে?

ওসব আমি পড়িনি ভাই, বলতে পারবো না। আপনি তৃতীয় সারির তিন নম্বর চেয়ারে বসুন। তার আগে এদিকে আসুন, দেখি, জিভ দেখি। হুঁ। দাঁত? হুঁ। চোখের সাদা অংশটা টেনে দেখি। হুঁ। এবার বসুন।

কী দেখলেন স্যার? কেমন আছি?

মধ্যবিত্তের যেমন থাকা উচিত। জিভে কোটিং, দাঁতে কেভিটস, চোখের কোণে কালি, সামান্য অ্যানিমিয়া। পেটটা বড়। দেখলে মনে হবে নাদুসনুদুস বাবুটি, ভেতরটা ফোঁপরা। ইন ফ্যাক্ট আমরা এই ধরনের কিছু ভোটারও চাই।

কেন স্যার? আমরা কিরকম ভোটার?

আর্মপিট ভোটার।

সে আবার কি!

যে ভোটারদের বগলে চেপে রাখা যায়। ময়দানে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের আগে শুধু একবার হেঁকে ডেকে বলব—বন্ধুগণ শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। যাঁরা এখন ক্ষমতায় আছেন তাঁদের ঠেলে ফেলে দেবার শক্তি আমাদের হাতে দিন। মধ্যবিত্ত বাঙালীরা একটু অভিমানী হন। সেই অভিমানটাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় আমরা জানি। একে বলে দোল খাল নাগরদোলা সেন্টিমেন্ট। গণেশ শুধু উল্টে দাও। ও ব্যাটরা ক্ষমতায় আছে, ও খুব আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, ছিলে রকে বসে আমার বৌকে বৌদি বৌদি করতে, চা-চানাচুর ওড়াতে, হঠাৎ এম এল এ হয়ে আর চিনতেই পার না স্যাপলা! আই সি! অমুক মন্ত্রী হয়ে তমুককে রাজা করে দিয়েছে! তখনই মনুমেন্টের তলায় কণ্ঠস্বর—বন্ধুগণ, এই দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুণ ধরা প্রশাসনকে পাংচার করে দিন, ফাকচার করে দিন। চলবে না, চলবে হে হে না। জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! ব্যাস ফন্দায় অনন্দে ফেলে দাও। নামিয়ে দে, নামিয়ে দে। যেই যার গদীতে সেই হয় সম্বন্ধী।

এটা স্যার কি ধরনের রাজনীতি!

একে বলে—মেরি গো রাউন্ড পলিটিকস। আজ রামের দল ওপরে, কাল শামুর দল ওপরে। সেই নাগরদোলাটা ঘোরাবার জন্যে আপনাদের প্রয়োজন। আপনাদের মনটাকেও তো সেইভাবে তৈরি করতে হবে—আই মিন করে দিতে হবে—পরশ্রীকাতর, হীনমনা, মনুদার, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ভীরু, বারফট্টাই সবসময় একটা আনহেলদি লুক, হয় ড্যাপসা, না হয় প্যাঁকাটি, হয় লো প্রেসার না হয় হাই প্রেসার, হয় মনমিনে, না হয় খিনখিনে, কলতলার শ্যাওলার মত।

আমরা আর কদিন আছি স্যার!

ক'বছর হল? প'দুয়েক বছর হল তো! এগজ্যাক্ট

মন্ত্রীত্বের পঞ্চম বছরে কেবল ভিক্ষিনেন্ডর স্বাপন (আসন্ন নির্বাচন আসন্ন)
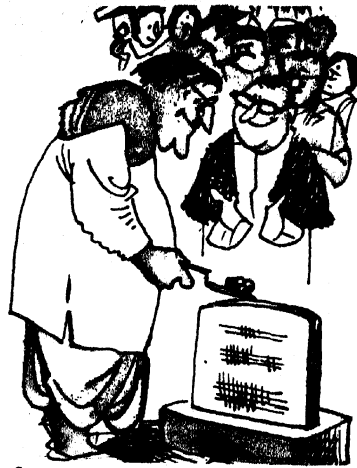
বলতে পারছি না, শুনেছি ছারপোকা বাঁচে অনেকদিন। তাহলে আসি স্যার! যাই গাছতলায় গে দাঁড়াই! আমাদের অনেক কষ্ট স্যার। সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন না টাকের ওপর পাখিতে কতবার হোয়াইটওয়াশ করে দিয়েছে!

তা গাছতলায় দাঁড়ালে দুঃখু চলে যাবে! আন্দোলন ছাড়া কিছু হয়! আন্দোলন করুন।

নেতা নেই স্যার। যেমন তেমন একটা নেতা চাই তো। আমরা অনেক কথা বলতে আসি। পুলিস বলে চুপ করে গাছতলেমে খাড়া হো যাও। আমরা দাঁড়াতে দাঁড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের তখন নিজেদের ওপর রাগ হতে থাকে। প্রথমে বলি—ধুশ শালা। তারপর বলি ধ্যাত্ত শালা। তারপর বলি—শালা বাঙালী। তারপর বলি—জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। তারপর আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন ফিসফিস করে বলে ওঠে—একটা রেভোলিউসান না হলে কিছু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ হেসে ওঠে—এদেশে বিপ্লব ভ্যাঃ। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে ওঠেন—অশিক্ষিতদের দেশে ডেমক্রেসী চলে? একজন ডিকটেটার চাই, একজন ডিকটেটার, সব চাবকে ঠিক করে দেবে। তখন কেউ না কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আর ডিকটেটার, ভ্যাঃ শালা ডিকটেটার। কোথায় পাবে ডিকটেটার? এ কি জার্মানী, না ইতালি, না ইউ এ আর। তারপর আমরা একে একে যে যার জায়গায় চলে যেতে থাকি। তেমন তো যাবার জায়গা নেই, বেশ মনের মত জায়গা। তেমন মালু পার্টিফার্টি পেলে সেইসব জায়গায় যাওয়া যায়। আর তা না হলে সেই গৃহগণ্ডী! সেই গৃহিণীর তিরস্কার সারা জীবনের পুরস্কার।

মন্ত্রী ক্যাঁক ক্যাঁক করে বেল বাজালেন। পি এ ঘরে এলেন।

শোনো, স্পেসিমেনটা তুমি ভালই তুলে এনেছো হে। মনে হয় পঁচিশ থেকে তিরিশের প্রোডাক্ট।

কত সালে নেমেছেন?

নেমেছেন মানে?

ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

আঠান সালে।

তার মানে বুঝেছো আদর্শ মধ্যবিত্ত। ওই ওদের বিপ্লবটিপ্লব কিছু দেখেছে। বাড়ীর দেয়ালে ছেলেবেলায় গান্ধী, বিবেকানন্দ, নেতাজী প্রভৃতির ছবি দেখেছে। মা কালীর ছবি দেখেছে। চক্রধারী নারায়ণ দেখেছে। কী দেখেননি?

আজ্ঞে হ্যাঁ তিন কিসিমের কালী দেখেছি। কালীঘাটের কালী, বন্দুরে কালী, তার তলায় আবার লেখা আছে—যশোর নগর ধাম, মহারাজ প্রতাপাদিত্য নাম। মা দুর্গা আছেন, পোকায় বিঁধ বিঁধ কুটো করে দিয়েছে, আর একটা গণেশ আছে। হ্যাঁ রাম, লক্ষ্মণ, সীতার গ্রুপ ফটো আছে। যখন ওঁরা দণ্ডকারণ্যে

তোলা নয় আঁকা। রামের আমলে ক্যামেরা ছিল না। সরষের তেল মেখে চান করেন?

হ্যাঁ স্যার!

দেখো তো পি এ জামার কলারটা।

তেলের দাগ, ঘামের দাগ, সাদা সাদা খুশকি।

দেশ কোথায় ছিল? এপারে, না ওপারে?

এপারেই ছিল। বিবাহ ওপারে।

তার মানে ডবল মজা। মধ্যবিত্তের বিয়ে, তার ওপর কালচারে মেলেনি। আপনার তো অভিযোগ থাকবেই। তবু শোনা যাক। পি এ তুমিও বস। আজ এক হাত হয়ে যাক। ধুতি পরেন না কেন?

খরচে কুলোতেও পারবো না, সামলাতেও পারবো না।

বাড়ীতে কি পরা হয়, লুঙ্গি?

হ্যাঁ স্যার!

টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত। ইস্যু কটা?

তিন স্যার। দু মেয়ে, এক ছেলে।

পিতার কটি ছিল?

সাতটি স্যার।

বুঝেছো পি এ, বেপরোয়া ভাবটা কেটে এসেছে, এখন সব বাঁশের ইয়েছে। হিসেবটিসেব করে সংসার করবে। কত হিসেব করবে মানিক! তোমাদের কাছাকোঁচা খুলে ছাড়বো। দালাল কো হালাল করো।

আমরা দালাল স্যার? দালাল বললেন?

অফকোর্স! কেন মারবেন নাকি?

না মারবো কেন? বড় দুঃখ হল। শব্দটা তো তেমন ভাল নয়।

হা হা হা, বুঝলে পি এ সেই মধ্যবিত্তের মানসম্মান বোধ! পিকুলিয়ার। আপনার বাবা বলতেন না, খাই না খাই, মাথা উঁচু করে থাকতে চাই। কেউ

পরবর্তী পাঁচ বছর 'রিলিফ' 'রিলিফ' চিৎকার

দুটো ছোটোবড় কথা বলে যাবে এ আমি টলারেট করব না।

ঠিক বলেছেন স্যার। শেষ দিন পর্যন্ত ওই এক কথা ছিল—কারুর কাছে মাথা নিচু করিনি, তোমরাও করবে না। তেমনি নিষ্ঠাবানও ছিলেন। দুবেলা সন্ধ্যাহ্নিক।

কী করতেন?

রেলে চাকরি।

বুঝলে পি এ সেই কেস। অফিসে বড় সাহেবের লাথি। হ্যাঁ স্যার ইয়েস স্যার নো স্যার। বাঁধা মাসমাইনে। এদিকটা টানে তো ওদিকটা খুলে যায়। মাথাই নেই তো মাথা উঁচু! যত অসহায় ভাবটা বাড়ছে, ততই সন্তান সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ততই জপতপ, হ্যানা ত্যানা। হাবুডুবু লোকের ভেসে থাকার চেষ্টা। সাপ্পর স্যার করছেন কেন তখন থেকে? কে বলেছে স্যার বলতে?

ভয়ে বলেছি স্যার!

কিসের ভয়! চাকরি চলে যাবার ভয়! একে বলে মধ্যবিত্তের ভয়। আমরা তো আপনাদের ভয়েই রাখতে চাই। ভয়ে ভয়ে সবসময় আধমরা হয়ে থাকবেন আপনারা। তা না হলে ফাংসানাল ডেমক্রেসী চলবে কি করে। ভয়টা রক্তের সঙ্গে মিশে থাকবে হেমগ্লোবিনের মত। আচ্ছা আসুন মধ্যবিত্তের ভয়ের একটা লিস্টি করা যাক।

কার্টুন : চণ্ডী লাহিড়ী

কষ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৭০ ॥

৬৯ অবধি কষ্টকল্পিত লিখে একটু থমকে দাঁড়িয়েছি। আমি যদিও প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখেছিলুম যে, আমি কোনও ডায়েরী রাখি না, সবই আমার মন থেকে লেখা, সেজন্য তথ্যগত ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আর এটা জীবনীও নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমি দর্শক। কতগুলি জায়গা ও কতগুলি মানুষ সম্পর্কে আমার যা মনে হয়েছে, লিখেছি। এর কোনও ধারাবাহিকতা নেই। বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে অনেক গল্পও দিয়েছি। তার যে সবই বানিয়ে লেখা, তা নয় ; তবে লিখতে লিখতে কিছু কিছু বানানো ব্যাপারও এসে গেছে। আমি পরিষ্কার করে বললেও পাঠকদের মধ্যে অনেকেই আমার কথা বিশ্বাস করেননি। তাঁদের অনেকের ধারণা, লেখক যখন অনেক দিন রাজনীতি করেছে, তখন কখনই সত্যি কথা বলতে পারে না। আমি নিরুপায়। অনেকে আবার ধরে নিয়েছেন, যেহেতু আমার লেখার মধ্যে গান্ধীজী, জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডাঃ রায় এসে পড়েছেন, অতএব তাঁদের সব কাজের কৈফিয়ত আমারই দেওয়া উচিত। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এ'দের কাজের দোষগুণের বিচার ইতিহাস করেছে এবং করবে। আমার যা মনে হয়েছে এ'দের সম্পর্কে, তাই লিখেছি। সেটা যদি কোনও কোনও পাঠকের মনঃপূত না হয়, তার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি নাচার। সারা জীবনে অনেক কাজই করেছি, যা অনেকের মনঃপূত হয়নি। সকলের মনঃপূত কাজ ও কথা যদি করতে পারতুম ও লিখতে পারতুম, তা হলে খুবই খুশী হতুম। কিন্তু এই জীবন-সায়াহ্নে এসে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করা কোনও মতেই সম্ভব হচ্ছে না।

আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, যাঁরা সত্যিই অনুগৃহীত করেছেন। তথ্যগত ভুল যা আছে, সংশোধন করেছেন। এই পাঠকদের সহৃদয়তা বুঝতে পারি ; কিন্তু গান্ধীজী কেন ভেজালদারদের পক্ষে ছিলেন—এ কথার উত্তর দেওয়া তো আমার পক্ষে অসম্ভব। আগে কোনও দিন শুনিনি, এখনও আমার জানা নেই। তবে তথ্যগত প্রমাণ দিয়ে যদি কেউ এ বিষয়ে লেখেন, তা হলে গান্ধীজীর জীবন নিয়ে যাঁরা বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করছেন, তাঁদের কাছে আর একটা দিক খুলে যাবে। বহু দেশের বহু লোক ও পণ্ডিত গান্ধীজীর জীবনী নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের কাছে একটা নতুন দিক খুলে যাবে। যদি কেউ তথ্য-প্রমাণ সহযোগে দেখাতে পারেন। আবার আর এক রকমও আছে। আমি হেমন্তদার (বসু) কথা বারবার উল্লেখ করেছি। একজন চিঠিতে লিখেছেন যে, আমি ভুল বলছি, হেমন্ত বসু হবে না, হেমন্ত সরকার হবে। হেমন্ত সরকার নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং একসময়ে তাঁর খুব নামও ছিল। কিন্তু তার দ্বারা তো এটা প্রমাণ করা যাবে না যে, হেমন্ত বসু বলে কেউ ছিলেন না।

... ভুল না, তা সব সময়েই ভুল। সে আমার মত লোকই লিখুক, বা কোনও বড় পণ্ডিতই লিখুন। কিন্তু কেবলমাত্র ভুল বললেই তো ভুল প্রমাণ করা যায় না ; কি ভুল, কোথায় ভুল এবং কিভাবে জানা গেল যে এটা ভুল—এ না জানালে তো ভুল প্রমাণিত হয় না। সহৃদয় পাঠকবর্গ যাঁরা এই সব ব্যাপারে অনুগ্রহ করে লেখেন, তাঁরা যদি কারণ ও তথ্য দিয়ে ভুল দেখিয়ে দেন, তা হলে আমাকে তো সাহায্য করা হবেই, অন্যান্য পাঠকদেরও অনেক সুবিধা হবে।

ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কত বৈচিত্র্য। সামাজিক ব্যবস্থায় কত পার্থক্য। পশ্চিম বাংলায় হিন্দুদের বিবাহ-পদ্ধতির সঙ্গে অন্ধ্রের হিন্দুদের বিবাহপদ্ধতি ও পাত্রী মনোনয়নে সম্পূর্ণ তফাত। তবুও আমরা এক দেশেরই লোক এবং এক ধর্মাবলম্বী। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সুর এবং সূত্র, যা সারা ভারতবর্ষকে বেঁধে রেখেছে, তার খানিকটাও যদি ধরতে পারা যায়, তা হলে জীবন সার্থক হয়। সকলেই তো পথিক—নির্দিষ্ট জায়গায় যাবার জন্য বেরিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে একাত্মবোধ কি করে বিকাশ লাভ করেছে, এটাই তো ভারতবাসীর জীবনের বড় কথা। কত সাধু, তাপস, পরিব্রাজক অজানা-অচেনা ভারতবর্ষের অন্দর-কন্দরে ঘুরে এসেছেন। এ শক্তি তাঁরা পেয়েছিলেন কোথায় ? আবার সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন, গ্রীকদের ভারতবর্ষের মাটি থেকে হটিয়ে দিলেন, আর যেমনি পঞ্চাশ বছর বয়স হল, সঙ্গে সঙ্গে বিহার থেকে হেঁটে কর্ণাটকে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর শৌর্য, বীর্য সাম্রাজ্য—সব পড়ে রইল ; কেউ তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না। মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে কর্ণাটকের শ্রাবণবেলগোলায় গিয়ে বারো বছর সাধনা করে দেহত্যাগ করলেন। এ'রা হলেন ভারত-পথিক। কেন করেছিলেন, কি অনুভূতি তাঁদের মনের মধ্যে তখন ছিল—তার কিছুই আমরা জানি না। তবে এটুকু জানি যে, এ কাজ তিনি করেছিলেন। এর মধ্যে কোনও বিশ্লেষণ নেই। একটা মহত্তোমহীয়ান আচরণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন। এর মানে এই নয় যে, পৃথিবীর অন্য দেশে এরকম সাধক বা পথিক নেই। তাঁদের আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের মহাসৌভাগ্য যে, আমাদের যাঁরা পথিক ও পথদ্রষ্টা তাঁদের আমরা চিনতে পেরেছি, জানতে পেরেছি এবং গ্রহণ করেছি। এতে কতটা বিশ্লেষণ আছে এবং কতটা অনুভূতি আছে—এর ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বিশ্লেষণই হোক, আর অনুভূতিই হোক, আমার কাছে যে এ'দের কাজ পরিস্ফুট হয়েছে—এটাই আমার কাছে বড় কথা। সত্য তো সবই। কেউ যদি আধ গেলাস জলকে বলে গেলাসটা অর্ধেক ভরতি, আবার কেউ যদি বলেন যে গেলাসটা অর্ধেক খালি—দুটোই সত্যি। তা হলে কি আমরা দুটো সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে কোনটা সত্য, তা নিয়ে সময় কাটাব, না কোনও একটাকে গ্রহণ করব—নিজের জীবনকে সার্থক করবার পথে এগিয়ে যাব ? দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে—সবই ঠিক।

বিশ্লেষণও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার আবর্তে জীবনকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে কখনই পথের নিশানা পাওয়া যাবে না।

কেউ কেউ বলেন যে, ইতিহাস ভুল করে না ; আবার কেউ কেউ বলেন যে, ইতিহাসের সবই ভুল। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে 'গ্রেট' বলা হয় (আমরা বলি সেকেন্দার শাহ)। পণ্ডিতপ্রবর এইচ জি ওয়েলস তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসের বইতে বলেছেন যে, আলেকজাণ্ডার যেভাবে দেশ জয় করেছেন তার পিছনে কোনও কারণ ছিল না ; নেহাত খামখেয়াল। এইচ জি ওয়েলস আলেকজাণ্ডারের যাত্রাপথ একটি ম্যাপে দেখিয়ে লিখেছেন 'Wild goose chase'. 'Wild goose chase' যিনি করেছিলেন তাঁকে অনেকে 'গ্রেট' বলেছেন। তবে কোনটা সত্যি ? ফরাসী বিপ্লবের এক বড় নেতাকে সাড়ম্বরে কবরস্থ করা হয়। আবার কিছু দিন পরে কবর খুঁড়ে তাঁকে বার করে এনে ফাঁসিকাঠে লটকানো হয়। রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা বুখারিন-এর 'হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম'-এর বই শ্রদ্ধাসহকারে পড়ত এবং অনেকে সেই বই পড়ে কম্যুনিস্ট হয়েছেন। রুশ বিপ্লব সফল হবার পর বুখারিন-এর সহকর্মীরা তাঁর বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেন—তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। আমাদের দেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে যুবকরা টেনে নিয়ে যেত। আবার পরে তাঁর প্রতি সে শ্রদ্ধার প্রকাশ আর দেখতে পাওয়া যায়নি। ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে এমন বহু নজির আছে। কিন্তু জীবন তো খালি ইতিহাস পড়ে গড়ে ওঠে না। সেইজন্য কতগুলি লেখা হয় সুখপাঠ্য, কতগুলি অপাঠ্য, কতগুলি পাঠ্য।

১৯৬৯-৭০ এখানে মূর্তি ভাঙ্গা আরম্ভ হয়। সাম্প্রতিক কালেও কিছু হয়েছে। অনেকেই এর কোনও মানে খুঁজে পান না। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এর কোনও মানেও হয় না। কারণ, বিদ্যাসাগর তো প্রস্তরমূর্তির মধ্যে বেঁচে নেই ; তিনি বেঁচে আছেন তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু চেষ্টা করলে এর মানে বার করা যায়। আধুনিক সমাজ যার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে সেই শ্রদ্ধার নিদর্শনকে ভেঙ্গে দেশের মাঝে শ্রদ্ধাহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া। কিছু লোক মনে করেন যে, অরাজকতা ও শ্রদ্ধাহীনতা যত ছড়াবে বিপ্লব তত ত্বরান্বিত হবে। প্রথম যখন মূর্তি ভাঙ্গা আরম্ভ হয় তখন তাকে বলা হত নকশাল-পন্থীদের কাজ। আমি জানি না কারা মূর্তি ভাঙ্গেন ; তবে নকশালরা যদি ভেঙ্গে থাকেন তা হলে এই মূর্তি ভাঙ্গার পিছনে কম্যুনিজমের কোনও সম্পর্ক নেই—এ কথা বলা যায়। পৃথিবীর যে দুটি বড় দেশে এখন কম্যুনিজম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সেই রাশিয়া ও চীন দেশে বিপ্লবের পূর্বে স্থাপিত মূর্তি এখনও সগৌরবে বিরাজ করছে। রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট এবং চীন দেশে চেংগিস খাঁয়ের। পিটার দি গ্রেট সম্বন্ধে ইতিহাসে নানা কথা পাওয়া যায় ; কিন্তু চেংগিস খাঁ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুব

অন্য। আমাদের ধারণা অনুযায়ী। সে সময়ে

চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর অধিনায়কত্বে কম্যুনিজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে এবং যা এখনও অব্যাহত আছে সেখানে চেংগিস খাঁয়ের মূর্তি এখনও কি করে সগৌরবে বিরাজ করে তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। ভেবে পাওয়া মুশকিল হলেও এ ঘটনাটি বাস্তব এবং সত্য। সেইজন্যই সব সময়ে সব কাজের মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গান্ধীজীর 'স্বরাজ'কে অনেকে 'ইউটোপিয়া' বলে। মার্কসের বইয়ে যা লেখা আছে দেখা যাচ্ছে রুশ দেশ বা চীন দেশ কম্যুনিজম অনুশীলনে তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এর মধ্যে হয়তো অনেকে অসংগতি খুঁজে পাবেন; কিন্তু যাঁরা কম্যুনিজমের প্রচার করছেন তাঁদের কাছে এই অসংগতি এখনও ধরা পড়েনি। ধরা পড়েনি বলে এর পিছনে যে সত্য, তা একটুও ম্লান হয়নি। সেইজন্য কোনও লেখার মধ্যে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া সব সময়ে সংগতিপূর্ণ হয় না। আমি 'কষ্টকল্পিত'তে যা লিখেছি তা সাময়িকভাবেও যদি কোনও পাঠককে তৃপ্তি দিয়ে থাকে, সেটা আমার পুরস্কার। বাকি সবটাই আমার কাছে সাময়িক।

শংকরাচার্য সুদূর কালাডি গ্রাম থেকে বেরিয়ে ভারতবর্ষের চার দিকে চারটি ধর্ম-সংস্থা স্থাপন করেন। তিনি হয়তো করেছিলেন হিন্দুধর্মের প্রসারতা বৃদ্ধির পথঘাটও ছিল না এবং ভারতবর্ষ যে অখণ্ড—এ ধারণাও ছিল না। আমরা এখন শংকরাচার্যের কাজকে উল্লেখ করে বলি যে, এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ ছিল। ঐতিহাসিকরা শংকরাচার্যের প্রব্রজ্যার যে মানেই করুন, এটা সত্য যে, শংকরাচার্য উত্তরে বদরিকাশ্রম, পূর্বে নীলাচল, পশ্চিমে দ্বারকা এবং দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেছিলেন। করেছিলেন এটা সত্য। কিন্তু তাঁর মনে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল তা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। গান্ধার, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানের শিল্প ও স্থাপত্য নিয়ে আমরা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করি। কিন্তু ১৯৭৮ সালে দাঁড়িয়ে এ কথা প্রমাণ করা শক্ত হবে যে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করতেন। সেইজন্যই আমি মনে করি যে, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ইতিহাসের সূত্র খোঁজার চেষ্টা না করে যদি লেখাটি পাঠ্য অথবা অপাঠ্য এই বিচার করা হয় তা হলে লেখকের প্রতি যথোচিত মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব। আর ইতিহাস সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা তো শক্ত। রাজাদের বংশানুক্রমিক তালিকা যেমন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত সেই-রকম তৎকালীন সমাজের রীতিপদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক অনুষ্ঠান, অর্থশাস্ত্র

তৎকালীন সাহিত্য—এসবই ইতিহাসের একটা বড় অঙ্গ। সেইজন্য চলতি কথায় যে বলা হয় অমুকের লেখার মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপাদান আছে তা অনেক সময়ে অতিশয়োক্তি। কারণ, ইতিহাস লেখার প্রচলন অনেক দিনের হলেও অনেকেই এখনও ইতিহাসের সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক উপাদানের উপর তত জোর দেন না, যত জোর দেন সাল ও তারিখের উপর। এ বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত The Cultural Heritage of India-তে খুব ভাল কথা লেখা আছে 'The stories, epilogues and parables continued in them. Were not put together for the purpose of furnishing a chronologically accurate history. Recent researches have demonstrated that the Itihasas and the Puranas are more accurate historically, geographically, and chronologically than was at one time supposed.' (The Cultural Heritage of India. Vol. II—Page XXII)

'কষ্টকল্পিত' আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে লেখা। আমি নিজে এতে ইতিহাসের উপাদান দেবার চেষ্টা করিনি। পূর্বেও বলেছি, পুনরায় বলছি। কতকগুলো বিষয় নিয়ে আমার মনে যা হয়েছে সেইগুলি দেবার চেষ্টা করেছি। যদি এ লেখার মধ্যে কেউ কোনও উপাদান খুঁজে পান, সেটা পাঠকের নিজের গুণে। সেরকম কোনও ইচ্ছা বা অভিরুচি আমার মনে নেই।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তৎপরতা কেমন, বুঝি দেখেছিলাম দশ বছর আগে
দিল্লী থেকে একটু দূরে গ্রাম
ফরিদাবাদ নাম।
সেখানে আজ চাকরি আছে, চাহিদা আছে অনেক
যোগ্য লোক কম।

এলোরা যেতে এই সেদিনও ঘণ্টাখানেক
থেমেছি ঔরঙ্গাবাদ হাটে
পাথরমেশা রুক্ষ মাটি, নোংরা, ধুলো, খাঁখাঁ।
তৎপরতা তাকেও করে দিয়েছে সুন্দরী
সেখানে আজ অনেক কাজ, শ্বেতফলক, শিল্পনগরী।

কথা ছিল কি, আমরা চাই পুরুলিয়ায় হলদিয়ায় কিছু ?
পেলাম না কি তৎপরতা বিনা ?
মানতে বুঝি বাধে।
কাজ কোথায়, কাজ কোথায় ? দেখে যাচ্ছি, চার্মিনার হাতে
বেকার ফেউ বাঙালী যুবকেরা।
তাদের দিকে এগিয়ে দেয় পতাকা কেউ কেউ
তাদের মুখে পরিয়ে দেয় অপরিণত বিপ্লবের গান,
অথচ প্রতিদিন
পুরুলিয়ায় পড়ছে ধুলো, হলদিয়ায় পলি,
বিমানে বসে কর্তা দেখে যান।

বিবর্ণ মুখ চোখে পড়লে ইচ্ছে করে বলি,
আরো তিরিশ বছর তোরা থাকবি মরা যৌথ পরিবারে ?

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

কউবা ভাবে ইন্দ্রধনু ফাঁকি!
স্মৃতির জরিবুটি খোঁজে বেদে,
শিকড় যার ফোটায় ফুল—পাখি
ডালে বসে কেন যে ফেরে কেঁদে!

সে কি খোঁজে ব্যাকুল বসন্তকে ?
নাকি ধনী শরৎ ইঙ্গিতেই
চমকে দিল কাজল-পুরু চোখে ?
কোথায়, কখন অসম্ভবের থেই ?

মধ্যদিনে গানের কলি ক্ষীণ,—
অন্তক্ষণের লগ্ন রুগ্ন, দূরে;
মাথায় ফোটে বিশুষ্ক আলপিন
যখন কাঁপি ছায়ানটের সুরে।

দূরের দেশে সাগর পারের মদে
লরেল, ওক, টিউলিপের ছায়া
ভেসে বেড়ায়, অসংগত রোদে
হয়তো যদি-র প্রত্যাশিত কান্না

ঘুরে, ফেরে কাচের ঘরে দ্রুত!
কে বা চেনে সূক্ষ্ম ঘড়ির চাবি ?
রঙ চড়েছে দেহের পরিস্রুত
রক্তকোষে—জীবনমরণ দাবি ॥

অলোক ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৪২)—সরকারী চারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৬৭)। "ক্যানভাস আর্টিস্টস সার্কেলের" প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ তৈলচিত্রকর। স্টেটসম্যানের আর্ট ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। পটে চতুষ্কোণ ঘর কেটেছেন। গ্লাস হাতে একটি লোকের দেহের নানা অংশ ছোট বা বড় করেছেন। তৈলচিত্রের সামগ্রিক রচনাকে জমিয়েছেন এইভাবে।

জানা হয়ে গেলে

অবিনাশ রায়

জানা হয়ে গেলে শুধু মনে হয় এতই সহজ ছিল যদি
আগে তো ভাবিনি।
এরই জন্যে অন্বেষণ সমস্ত বুকের রাজধানী, অলিগলি
সমস্ত গহন গ্রন্থ কীটের মতন বুকে হেঁটে
খুঁজে বেড়িয়েছি সেই প্রাণ ভোমরা শব্দটিকেঃ হাওয়ার ভেতরে
সবটুকু সঞ্জীবনী, সবটুকু আয়ু খরচা করে
খুঁজেছি রক্তের মধ্যে কতখানি অ্যালকোহল থাকে।

আমি এই পৃথিবীতে কতকাল অর্কিডের মত
বেঁচে আছি, সুপ্রাচীন মুদ্রা যেন বহু হাত-বদলানো সময়
হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে যায়। চতুর্দিকে জনস্রোত তুলে আছে
কেমন নির্ভুল লক্ষ্যে অদৃশ্য তর্জনী;
বারংবার ফিরে আসে একই নারী, একই সহবাস
স্থান কাল পাত্রী শুধু বদলে যায়
মন্ত্র ঘোরে, দৃশ্যপট সরে।
জানা হয়ে গেলে তাই মনে হয় এতই সহজ ছিল যদি
আগে তো ভাবিনি ॥

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ২৫ ॥

অনেককে বলতে শুনেছি সংগীতে সুরটা হৃদয়কে ছোঁয়, অর্থাৎ সেটা ইমোশন্যাল: আর লয় নাকি শুধু মাথা বা বুদ্ধিকে ছোঁয়, অর্থাৎ সেটা ইণ্টেলেকচুয়াল! এটা বড়ই তর্ক এবং গবেষণার বস্তু বলে আমি মনে করি। আমার নিজের মত খানিকটা প্রকাশ করছি এখানে। সুর বলতে অনেক কিছু বোঝায়, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়। একটা সাংগীতিক স্বর স র গ ম-কেও আমরা 'সুর' বলি, আবার কোনও একটা মেলডিকেও সুর বলি। তুমি যে জিনিস অর্থাৎ যে ধরনের সুর বা গান জানো, জন্ম থেকে শুনে এসেছ, তারই মাঝে বড় হয়েছ এবং পরে হয়তো কিছুটা নিজেও চর্চা করেছ, তা সে পল্লীগীতি হোক, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদী হোক বা রাগসংগীত হোক, সেটা যখনই ভালভাবে পেশ করছ বা অন্য কারো কাছে শুনছ, তোমার মনে সেটা প্রবেশ করবেই। অবশ্য রাগসংগীতে সুরের এফেক্ট বেশী হলেও অন্য ধরনের গানগুলোতে কথার এফেক্ট বেশী, অর্থাৎ শতকরা ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ পর্যন্তও হতে পারে। একেবারে জড় বা আওরংগজেব যদি না হয় তা হলে সাধারণ মানুষ মাত্রেরই দূরে বাজছে মেঠো বাঁশি বা সানাই বা কেউ ভাটিয়ালির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যাচ্ছে শুনে তো সেটা ভাল লাগবেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখ, বিয়ের ব্যাণ্ড বাজছে, ছেলেপিলেরা কিরকম তার পিছু নেয়। দুর্গা পুজোয় জয়ঢাক, ঢোল বাজছে, কিরকম তাতে লোক উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সাঁওতালদের মাদলের আঘাতেই হোক বা উত্তরপ্রদেশী বা বিহারীদের ঢোলক-করতাল-মঞ্জিরার সমন্বয়েই হোক, লয় লোকের মনে কিরকম একটা
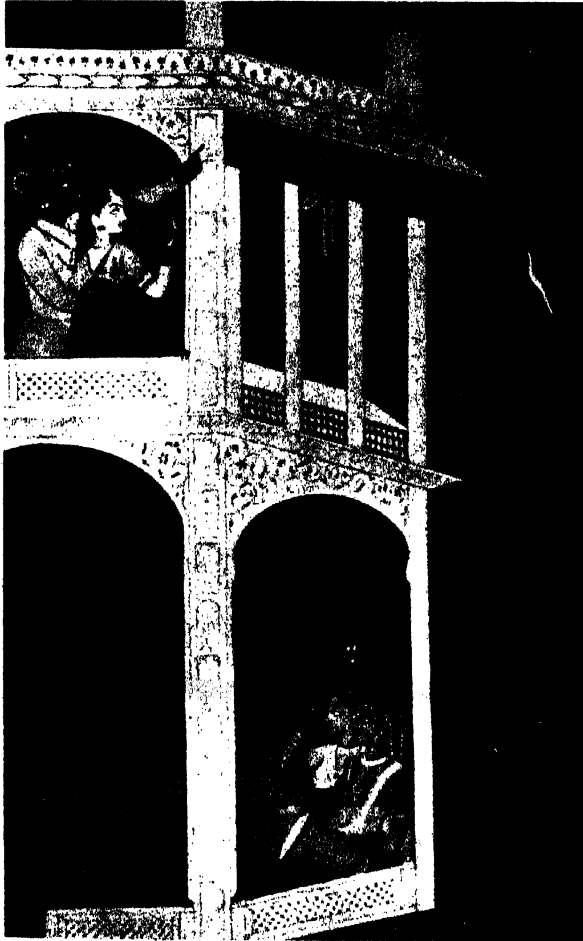
উন্মাদনা এনে দেয়। লয়ের এই ধাক্কা সবাই টের পেয়েছে কোনও-না-কোনও দিন। সে-ই দোল দিয়ে লোককে নাচিয়ে দেয়। পৃথিবীর সব দেশের বুনো জাতরাই এই লয়ের আঘাত খায়। Beat-এর ওপর গড়ে তুলেছে তাদের সুখ-দুঃখ-পুজো-পার্বণের ঘটনা এবং তার ভেতর দিয়েই বেরোয় তাদের সমস্ত এনার্জি, ভালবাসা আর উচ্ছ্বাস। আদি জ্যাজেও তাই দেখবে, রক এন রোল বা পপ মিউজিকেও দেখবে সেই লয়ের আঘাত বা বিটের প্রাধান্য। একবার প্রকৃতির দিকেই চেয়ে দেখ না, সৌর জগতের কোটি কোটি গ্রহতারকার চলা-ফেরা, পৃথিবীর আহ্নিক গতি—এ-সমস্তই তো একেবারে লয়বদ্ধ ব্যাপার। তার এতটুকু বিচ্যুতি হলেই প্রলয়। তোমার বুকের ধুকধুকুনি বা নাড়ির গতি—সবই তো প্রকৃতির লয়ের খেলা। আমাদের সমস্ত শাস্ত্র, মন্ত্র, কবিতা ছন্দে বসানো। সেও তো মাত্রা, লয়ের ওপর। আর একটা ব্যাপারই ধরো, প্রতিটি ভাষার সাহিত্যে কবিতাই আগে এসেছে—কেননা ওখানে ছন্দের, লয়ের গোছানো ব্যাপার। আর সংগীতে তো হবেই। সুরটা কি? সুরটা বিশ্লেষণ করো, পণ্ডিতরা তো আগেই বলে গেছেন, সুর হল গিয়ে 'আহত নাদ'। অনাহত নাদের কথা ছেড়ে দাও, সে তো কেবল যোগী-ঋষি-মুনিরাই পারেন নিজের ভেতরে শুনতে। বিশ্লেষণে বলে যে, একটা সুর মানে অসংখ্য একত্রিত ভাইব্রেশন। যেমন ধরো, যে সুর বা স্বরকে পাশ্চাত্য মতে ' বলে ধরা হয় সেটায় প্রকম্পন হল ৪৪০ না কত। এরকম সব স্বরেরই একটা সাংখ্যিক পরিচয় আছে। অর্থাৎ সব স্বরই একটা বিশেষ স্তরে অসংখ্য প্রকম্পনের প্রকাশ। এবং এই প্রকম্পন বা ভাইব্রেশন কি? পরিষ্কার কথায়—আঘাত। প্রচ্ছন্নভাবে সুরের ভেতর তাই লয় আছে। ওতপ্রোতভাবে মিলে আছে। তবে দেখ, সেই সোজা সোজা ধুন গান, পল্লীগীতি, ভজন, কাওয়ালি এবং প্রান্তিক গান, যা সবাই

স্ফুর্তি দিয়ে গড়া, স্বাদে রসে ভরা...
এমন মজার স্বাদের মিষ্টি
নিউট্রিন-এরই সৃষ্টি
nutrine
মল্ট, মধু, ক্রীম, মাখন,
দুধ আর ফলের গন্ধ—
দুনিয়ার যা কিছু খাসা,
সব মিশেল দিয়ে তৈরি এই
মজাদার মিষ্টি। অর্থাৎ ঠিক
যেমনটি হলে জিভে জল
আসবে, মনটা হবে স্ফুর্তিতে
ভরপুর—ঠিক তেমনটি।
ল্যাক্টো বনবন, কোকোনাট
বনবন, অরেঞ্জ ক্যান্ডি, মিল্ক
ক্যারামেল, ডাচ টফি, কার্ডামম
ক্রীম টফি, পাইনঅ্যাপেল টফি,
মুঘল টফি, কফি টফি ও
ল্যাকটো নভেলটি।
nutrine
চাকুম-চুকুম খাসা
মিষ্টি দিয়ে ঠাসা
নিউট্রিন কনফেকশনারী
কোম্পানি লিমিটেড
প্যালামানের রোড
চিত্তুর ৫১৭ ০০২ অঃপ্র
CAS NC 21A78BEN
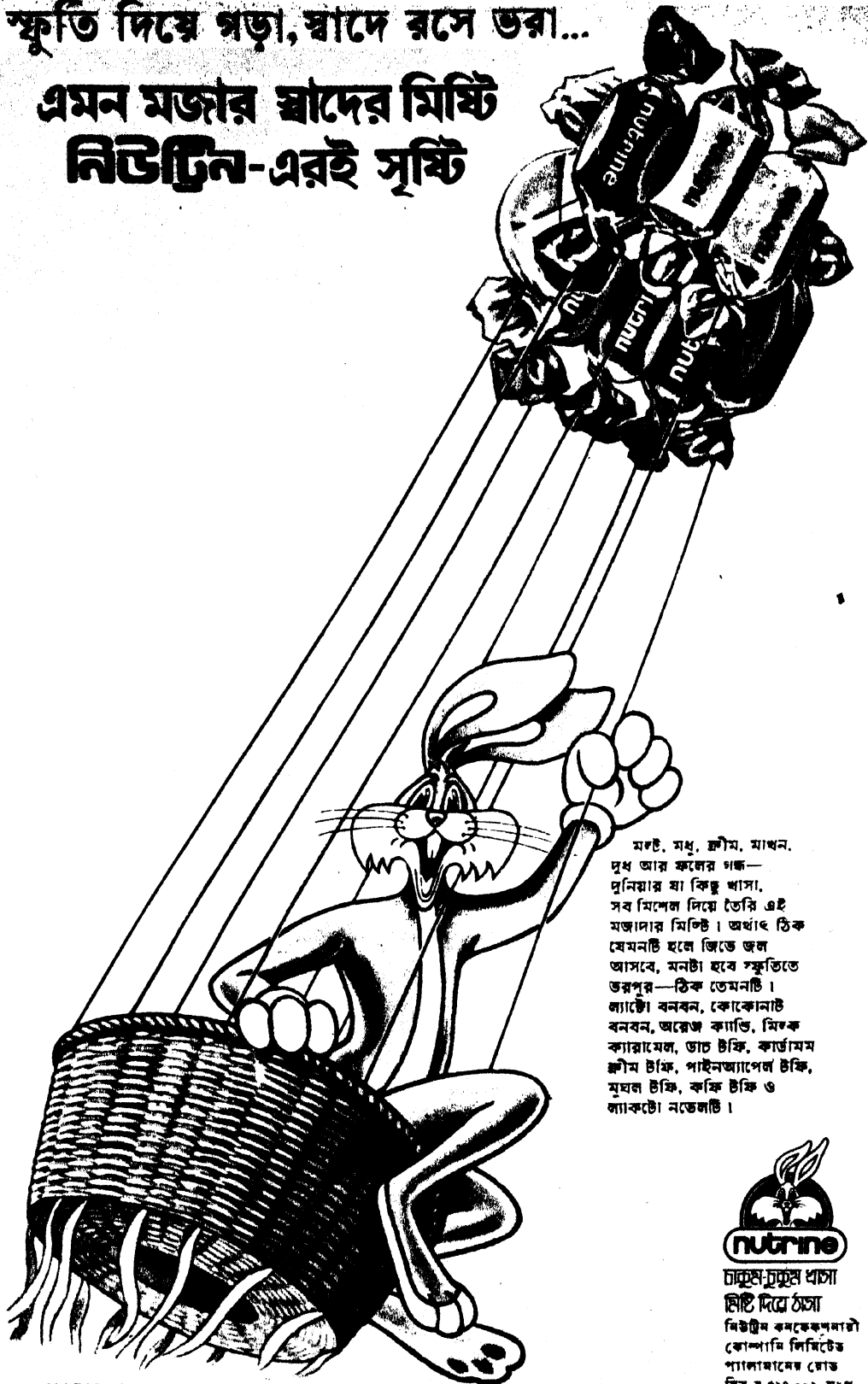
গাইতে পারে, এক দিকে তার সুরের, কথার এবং ছন্দের মজা সাধারণ মানুষ মাত্রেই পেতে পারে। কোনও প্রয়োজন নেই বিশেষ সংস্কার, শিক্ষা বা চেষ্টার এসব বোঝার জন্য। কিন্তু রাগসংগীতের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে সে-ই, যার ছোটবেলা থেকে এই জিনিসের চর্চা আছে, বা কিছু শিখেছে। অথবা প্রচুর শুনে শুনে বোঝবার চেষ্টা করে নিজের রুচির উন্নতি সাধন করেছে। রাগ-সংগীতে সুর ঠিক লাগছে কি বেসুরো লাগছে তার প্রধান সাক্ষী হল গিয়ে তানপুরা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হারমোনিয়ম। ওই যে তানপুরা সমানে বেজে যাচ্ছে ষড়জ পঞ্চম স্বরডালাগুলি কায়েম হয়ে শ্রোতার কানে বাজছে, সেখানে যদি গাইয়ে বা তার সংগত করতে গিয়ে সারেংগী কোথাও বেসুরো হয়ে যান তা হল মরমী শ্রোতা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবেন। ঠিক সেইরকমই তাঁরা বুঝবেন যদি গাইয়ে বা যন্ত্রী, এমন কি তবলচি, সমে এসে ঠিক একসঙ্গে না ভেড়েন। লয়ের এই যে মূল বিচার, এটা প্রায় বেশ কিছু শ্রোতাই করতে পারেন। কিন্তু গাইয়ে বা যন্ত্রী এবং বিশেষ করে তবলিয়া যখন খুব সূক্ষ্ম আংকক কারসাজি দেখান, সেটা খুব কম শ্রোতাই ধরতে পারেন, নেহাত মুষ্টিমেয় কিছু গাইয়ে-বাজিয়ে ছাড়া। আরও বলি শোন। কার্ফা, দাদরা যখন বাজে তখন জলসায় প্রায় সবারই মাথা দোলে দেখেছি। দ্রুত তিন তালে বা এক তালেও তাই; কিন্তু বিলম্বিত তিন তাল থেকে তা কমতে থাকে; রূপকে আরও কম। আর ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭ মাত্রার কোনও গৎ বাজালে দেখি এক কিছু গাইয়ে-বাজিয়ে বা সংগীতের ছাত্র ছাড়া প্রায় সবাই চুপ। আমার তো মনে হয় আমাদের হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগসংগীত যাঁরা শেখান, সে স্কুলে-কলেজেই হোক বা ট্যুশনি করেই হোক, তাঁদের উচিত স্বরসাধনার সঙ্গে সঙ্গে লয়সাধনার নানাবিধ অংগ ছাত্রদের শেখানো। যেমনটা আর কি কর্ণাটকী পদ্ধতিতে আমরা পাই। কি মাদ্রাজে, কি বোম্বেতে, দিল্লীতে বা কলকাতাতে, যেখানেই যাও, যে-কোনও দক্ষিণীদের সংগীত আসরে, যেখানে কর্ণাটকী পদ্ধতির কোনও ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ের জলসা বসেছে; দেখবে যে, প্রায় প্রত্যেক শ্রোতাই গান শুনছে হাতে তাল দিয়ে ও কর গুনে। সে বাচ্চাই হোক বা বুড়ো বুড়ী হোক, ছেলেমেয়ে সবাই। তারা প্রায় সকলেই ছোটবেলা থেকে রাগ ও তালের বন্দেজগুলো শিখে নেয়। প্রথমে শুরু করে এরা 'সরলী' দিয়ে, যেটা আমাদের পালটা অলংকারের মতই। প্রথমে সোজা সোজা, তারপর একটু শক্ত গোছের। কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিস গোড়া থেকেই হাতে তাল দিয়ে, কর গুনে গাইতে হয়। এর পর শেখা হয় জনডই—এও পালটার অন্তর্গত, ত[illegible] আরও বেশী কঠিন। এবং এক-একটা ভেরিয়েশন এক-এক তালে নিবদ্ধ হয় হাতে সেই তালের তাল দিয়ে গাইতে হয়। প্রধানত আদি তালেই (৮ মাত্রা ৪+২+২=৮) এই চর্চাগুলো চলে অর্ধেক লয়ে। বরাবর দু গুণ, চৌ গু[illegible] আট গুণ লয়ে এইগুলো কিছু দিন অভ্যাস করলে কি উপকার হয় দেখ[illegible] 'স্বরম'-এর উপর অধিকার জন্মায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্বরের 'পহেচান' চেনার শক্তি, তাল দেওয়া ও কর গোনার অভ্যাস, এবং লয়ের চেতনা—সব এ[illegible] সঙ্গেই গড়ে ওঠে। এর পর শেখা হয় 'গীতম', অর্থাৎ বিবিধ রাগে বাঁ[illegible] সংস্কৃত ও তেলুগু গান, যা কিনা আলাদা আলাদা তালে নিবদ্ধ। যথা, আ[illegible] তাল, রূপকম (৬ মাত্রা। ২+৪=৬), মিশ্র চাপু (৭ মাত্রা। ৩+২+২=৭) বা জম্প (১০ মাত্রা। ৭+৩=১০) ইত্যাদি। নিয়ম হল গানের কথাগুলো গাইবার আ[illegible] প্রথমে স্বরগুলো গাইতে হয়। উপরের জিনিসগুলো ছেলেবেলায় প্রায় সকলে[illegible] শিখে অভ্যাস করে থাকে। ফলে, যেমন আগেই বলেছি, পরের বয়সে আম[illegible] দেখি যে, এদের ভেতর স্বরবোধ, লয়বোধ এবং মোটামুটি সংগীতবোধ আমাদে[illegible] তুলনায় অনেক বেশী পরিণত। এত সব শিখে নেবার পর যারা সংগীতের ক্ষে[illegible] আরও গভীরভাবে প্রবেশ করতে চায় তারা শুরু করে 'বর্ণম' শিখতে। বিভি[illegible] রাগে ও তালে নিবদ্ধ অদ্ভুত সুন্দর ও কঠিন বন্দিশ এইসব 'বর্ণম'। এ[illegible] কয়েকটি বিভাগ—যথা, 'স্বরম', 'চিট্টেই স্বরম' এবং তারপর 'সাহিত্যম'—[illegible] 'পল্লবি', 'অনুপল্লবি' ও 'চরণম'—এই তিনটে ভাগে। অনেকখানি লম্বা ঠা[illegible] বুনুনিতে ভরা হয় এই এক-একটা বর্ণম। হাতে তাল দিয়ে গাইতে হয়। এ[illegible] এর বিশেষত্ব এই যে, হাতে তাল ওই চলবে কিন্তু সেই সঙ্গে তিন বিভি[illegible] কালে গাইতে হবে; অর্থাৎ ঠায় দু গুণ এবং চৌ গুণ গতিতে। আগে এ[illegible] জায়গায় বলেছি যে, যন্ত্রীদেরও এইসব শিখতে হয়। ওরা গানের সম্পূ[illegible] তালিমই পায় এবং যন্ত্রের উপর সেসবটাই বাজায়। এই যন্ত্রীদের অনে[illegible] বিশেষ করে বাঁশিতে বা বেহালাতে পাঁচ কালেও এইসব বর্ণম বাজিয়ে দেখান[illegible] অত্যন্ত কঠিন এ কাজ! খুব কম লোকেই পারে। বুঝে দেখ, আট গুণ [illegible] ষোল গুণে এক-একটি বর্ণম বাজানো কি দুষ্কর! এই বর্ণমই হচ্ছে সংগীতে[illegible] ভাল শিক্ষার্থী এবং বড় শিল্পীর এক সন্ধির ক্ষেত্র। অর্থাৎ জলসায় বসে [illegible] গাইয়েরাও 'বর্ণম' পেশ করে থাকেন। আর এক ভিন্ন প্রকারের বর্ণম দে[illegible] যায় শুধুমাত্র ভরতনাট্যম নৃত্যে।

(ক্রমশ[illegible]

২ অকটোবর থেকে ৭ অকটোবর পর্যন্ত সমস্ত ক্রেতাকে **২০%** কমিশন।
সীমিত সংখ্যায় সদস্য নেওয়া হচ্ছে। ১০ টাকা জমা দিয়ে যাঁরা নাম তালিকাভুক্ত করবেন, তাঁরা সারা বছর যত বই কিনবেন তাতে **২৫%** ছাড় পাবেন।
সদস্যপদ ত্যাগের সময় জমা ফেরত দেওয়া হবে।
চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হলো ১০টি নতুন বই।

প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য রচনা ১২·০০

সুবিমল রায়

ভূমিকা : লীলা মজুমদার

ছবি : সুকুমার রায়

সত্যজিৎ রায়

সুবিমল রায়ের আশ্চর্য-অদ্ভুত'আজগুবি ভাবনা' নিয়ে গল্প, পদ্য এবং অন্য সব লেখা এতদিন 'সন্দেশ'-এর পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। এই প্রথম তাঁর লেখার সংকলন প্রকাশিত হলো। পাঠক, লেখকের পরিচয় না জানলেও চিনতে পারবেন কে এই সুবিমল রায়? লীলা মজুমদারের কথায়, 'এই বইখানি আমার নানুকুদার আজগুবি ভাবনার বই। নানুকুদার আসল নাম সুবিমল রায়।...আমার মেজ জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে নানুকুদা।...নানুকুদার সব ভাবনাই আজগুবি ছিল না, গভীর গম্ভীর দিক-ও একটা ছিল। এই বইতে তারো নমুনা আছে।' উপেন্দ্রকিশোর, সারদারঞ্জন, সুকুমার রায় প্রসঙ্গে সুবিমল রায়ের তিনটি রচনাও এই বই-এর অন্তর্গত হয়েছে।

• দুটি স্বতন্ত্র মেজাজের আত্মজীবনী •

বাবু বৃত্তান্ত ১০·০০

সমর সেন

সমর সেনের প্রথম গদ্যগ্রন্থ তাঁর আত্মজীবনী সহ সত্তরের দশকে লেখা প্রবন্ধের সংকলন।
ঝকঝকে ধারালো গদ্যে, ব্যঙ্গ-শ্লেষে উজ্জ্বল এই আত্মজীবনী অনেককেই হয়তো ক্রুদ্ধ করবে, কাউকে-বা করবে হতাশ। কিন্তু ভান-ভণিতাহীন এই আত্মজীবনী ও প্রবন্ধ সংগ্রহ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

জিন্দাবাহার লেন

পরিতোষ সেন ১৪·০০

সম্পূর্ণ নতুন এক আঙ্গিকে আত্মজীবনী এঁকেছেন একালের বিশিষ্ট শিল্পী পরিতোষ সেন। তাঁর কলম তুলি হয়ে উঠেছে, তুলে ধরেছে 'শিল্পী' হয়ে ওঠার ইতিহাসকে। অবনীন্দ্রনাথের পর পরিতোষ সেনই সম্ভবত একমাত্র শিল্পী যাঁর সমান অধিকার তুলি আর কলমের উপর। আর্ট প্লেটে ছাপা ষোলটি স্কেচ-এর অ্যালবাম এই সঙ্গে অতিরিক্ত আকর্ষণ।

পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়

ডক্টর জয়ন্ত বসু ১০·০০

পদার্থের বিচিত্র ধর্ম ও বিপরীত পদার্থ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের নতুন নতুন ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমন অন্যদিকে বলা হয়েছে টেলিভিশন, কমপিউটার, রেডার, লেসার, ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্র, মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা চিকিৎসায় ইলেকট্রনিকস প্রভৃতির কাহিনী। এই বইটি বাংলায় পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ।

ধাঁধা দিচ্ছেন মৃগাঙ্ক দে

সম্পাদক/বিশ্বনাথ বসু ৫·০০

গণিতের নানা ধাঁধা ও জটিল সব বিষয়ের সমাধান যে কত সহজ তা জানতে হলে বইটি পড়তেই হবে।

বিজ্ঞানের পাগলামো ৪·০০

সত্যেন সান্যাল

Vanish বানান কী 'C' দিয়ে না 'V' দিয়ে? ঋতুভেদে গাড়ির গতিবেগের তারতম্য হয় কী? বিবর্তনবাদ থেকে ব্রীজ, রেল, প্লেন আবিষ্কার নিয়ে ছোটদের জন্যে আদর্শ বই।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য

৭·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্পী অন্নদাশঙ্করের এমারজেন্সির সময়ে লেখা নির্ভীক প্রবন্ধসমূহের সংকলন। এই লেখাগুলি তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা নিয়ে নয়, ভবিষ্যতেও এই লেখাগুলি মূল্যবান বলেই চিহ্নিত হবে।

বাক্যের সৃষ্টি ঃ রবীন্দ্রনাথ ১২·০০

অশ্রুকুমার সিকদার

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাস, অতিপ্রাকৃত গল্প, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে লেখা বইটি রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী এবং আধুনিক সাহিত্যের পাঠকের অবশ্য পাঠ্য।

মনীষী জীবন ও বিচিত্র প্রসঙ্গ ৭·০০

শৈলেনকুমার দত্ত

বাঙালী মনীষীদের ঘরোয়া জীবনের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত।

রম্য গণিত ৬·০০

অরূপরতন ভট্টাচার্য

তাস, ব্লাক-ট্রাই, জুয়া খেলা, লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ এরকম সব বিষয় নিয়ে বাংলায় প্রথম বই।

আশার আরো বই

কাব্যতত্ত্ব ঃ আরিস্টটল
শিশিরকুমার দাশ অনূদিত ১০·০০/১৪·০০

বাংলার কীটপতঙ্গ (তৃতীয় সংস্করণ)
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ২০·০০

ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ ১৮·০০
বিষ্ণু প্রভাকর
অনুবাদ দেবলীনা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল

কাদম্বরী দেবী ১০·০০
[illegible]

যামিনী রায় ১৫·০০
বিষ্ণু দে

ঋত্বিক ১৮·০০
সুরমা ঘটক

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ১২·০০
নবনীতা দেবসেন

ঈশ্বর কোটির রঙ্গ কৌতুক ১০·০০
কমলকুমার মজুমদার

নিঃশব্দের তর্জনী ৭·০০
শঙ্খ ঘোষ

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়েরি ৮·০০

আকাশ চেনো ১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য

হর্ষবর্ধনের জয়ধ্বনি ৫·৫০
শিবরাম চক্রবর্তী

আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৮ ॥

মানিকগঞ্জের জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায় যাবেন কলকাতা দর্শনে। বাঙাল দেশের লোক, আগে কখনো পদ্মা পার হননি, রাজধানী কলকাতা সম্পর্কে মনের মধ্যে কিছুটা ভয় ভয় ভাব আছে। কিন্তু দেশ গাঁয়ে আমোদ ফুর্তির মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই, একটু বিদেশ ঘুরে আসার জন্য মন ঘুর ঘুর করে। তা ছাড়া একটি মাতৃদায়ও রয়েছে। পরপর দু বৎসর উত্তম ফসল হওয়ায়ও আদায়-তহশিলও ভালো, সারা বাড়িতে টাকার থলিগুলি ঝমর ঝমর করে নাচে। তাই বাবু পূর্ণচন্দ্র বর্ষার পরই ঘুরে আসা মনস্থ করলেন।

পূর্ণচন্দ্রের পিতা গত হয়েছেন অনেকদিন আগেই। তাঁর মা অনঙ্গমোহিনী ছিলেন অতি জাঁদরেল নারী, নাবালক পুত্রের হয়ে তিনিই জমিদারী শাসন করতেন অতি দক্ষতার সঙ্গে। এমনকি পূর্ণ-চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও অনঙ্গমোহিনী একটুও রাশ আলগা করেন নি.. পুত্র তখন নামে মাত্র জমিদার হলেও সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল তাঁর হাতে। বৎসর দেড়েক আগে সেই অনঙ্গমোহিনীও স্বর্গারোহণ করেছেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি পুত্রকে বলেছিলেন, বাবা পূর্ণ, মা কালীর কাছে আমার একটা মানত আছে, তুই কালীঘাটে মায়ের পুজা দিয়া আসিস, নইলে আমার আত্মা স্বর্গে গিয়াও তৃপ্তি পাবে না।

মানতটি অবশ্য পূর্ণচন্দ্র সম্পর্কেই, মায়ের মৃত্যুকালে পূর্ণচন্দ্রের বয়স উনত্রিশ কিন্তু তখনও বংশে নতুন উত্তরাধিকারী আসে নি। নাতির মুখ দেখার জেদে অনঙ্গমোহিনী আট বৎসরের মধ্যে পাঁচবার পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন। সেই পাঁচটি বধূই এ বাড়িতে থাকে কিন্তু তারা কেউই স্বামীকে একটিও সন্তান উপহার দিতে পারে নি। কালাশৌচ কেটে যাবার পর ইয়ার বন্ধুরা পূর্ণচন্দ্রকে আর একবার দার পরিগ্রহ করার পরামর্শ দিচ্ছিল, তার আগে পূর্ণচন্দ্র ঠিক করলেন একবার কালী-ঘাটটা ঘুরে আসা যাক।

পাশের পরগণার জমিদার ইব্রাহিম শেখের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের দোস্তি আছে। ইব্রাহিম শেখ বহুদর্শী লোক, ইতিমধ্যে তিনি দুবার ঘুরে এসেছেন কলকাতা থেকে। সুতরাং পূর্ণচন্দ্র গেলেন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে।

[illegible]

দিলেন এবং কলকাতার এমন একটি চিত্র আঁকলেন যাতে পূর্ণচন্দ্র একেবারে তাজ্জব। জল নাকি জমে শক্ত হয়ে যায় এবং তা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায় কলকাতার মানুষ। আরও কতক মানুষ নাকি দিনের বেলা ঘুমোয় ও রাতের বেলা জেগে থাকে। মুসলমান মেয়ে মানুষের বাড়িতে হিন্দু বাবুরা যায় এবং কসবীর আম্মাকে মা বলে ডাকে।

পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, ভাইডি, একটা কথা কও তো। শুনেছি, কইলকাতায় গ্যালেই সাহেবরা নাকি সকলডিরে ধইরা ধইরা খৃষ্টান কইরা দেয় ? তোমারে ধরতে আসে নাই ?

ইব্রাহিম শেখ অহংকারী পুরুষ, মুসলমান জাতির পূর্ব গৌরব সম্পর্কে সদা সজাগ। তিনি বললেন, আমারে খৃষ্টান করতে আইব কুন পুঙ্গির পুত ? হ্যারে তার মায় এখনো জন্ম দেন নাই।

পূর্ণচন্দ্র বললো, ভাই তোমাগো মুসলমানগো সাহেবরা এখনো ডরায়। কিন্তু হিন্দুগুলার উপর নাকি খুব অইত্যাচার করে ?

ইব্রাহিম শেখ বললো, দোস্ত, আমি কইলকাতা থিকা অইন্যা খবর শুইন্যা আইছি। তোমাগো হিন্দগো সর্বনাশ করতে আছে হিন্দুরাই। হিন্দু ধর্ম আর বুঝি রইল না। ইংরাজি ল্যাখাপড়া শিখ্যা এক দলের মাথা বিগড়াইয়া গ্যাছে, তারা হিন্দুদের জবরদস্তি কইরা বেহ্মজ্ঞানি কইরা দিতাছে।

—কী কইরা দিতাছে ?

—বেহ্মজ্ঞানি ! হেডা কী বস্তু তা তোমরাই ভালো বোঝবা। আমি দ্যাখলাম, সিঁদুরিয়াপট্টিতে একদল বাবুরে দেইখ্যা রাস্তার লোকেরা বেহ্মজ্ঞানি বেহ্মজ্ঞানি কইরা তরাসে চিল্লাইতে চিল্লাইতে আগল বাগল দৌড়াইয়া পলাইয়া গ্যালো।

ইংরাজি শিক্ষার ঢেউ পূর্ব বাংলার এতদূর অভ্যন্তরে পৌঁছোয় নি। পূর্ণচন্দ্র অতি অল্প কিছুদিন এক মুন্সীর কাছে সামান্য ফার্সী পড়ে-ছিলেন এবং বাংলায় নাম সই করতে পারেন মাত্র। বেহ্মজ্ঞানি কথাটার অর্থ তিনি কিছুই বুঝলেন না। তিনি বেহ্মদৈত্যের নাম শুনেছেন, সেরকমই একটা কিছু বলে মনে হলো।

ভয়ে বিবর্ণ মুখে তিনি বললেন, তাইলে আর কইলকাতায় গিয়া কাম নেই। জাত খোয়াইতে পারমু না। স্বর্গ থিকা মায় আমারে অভিশাপ দেবে।

ইব্রাহিম শেখ তখন আশ্বাস দিয়ে বললেন, দুই চাইরজন পাইক লাঠিয়াল নিয়া যাও সঙ্গে। কইলকাতার মানুষ দুইডা জিনিসরে বড় মাইন্য করে। পেয়াদা আর পয়সা। পেয়াদার লাঠি দ্যাখলেই ভয়ে পলায় আর পয়সা ছড়াইলেই পায়ের উপর আইস্যা পড়ে। পয়সা ছড়াও আর লাথথি মারো, কইলকাতায় এই একটা বড় সুখ।

শুভক্ষণ দেখে পূর্ণচন্দ্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে বজরায় ভেসে পড়লেন। দিন সাতেক পর লালগোলার কাছে চড়ায় আটকে গেল সেই বজরা। সে আর কিছুতেই নড়ানো যায় না। এখান থেকে স্থলপথে তিনি পালকিতে যেতে পারেন বটে কিন্তু ইব্রাহিম শেখ বারবার বলে দিয়েছেন, নিজস্ব বজরা না নিয়ে গেলে খাতির পাওয়া যায় না কলকাতা শহরে। সুতরাং পুরোনো বজরা সেখানেই ফেলে রেখে লোক লাগিয়ে দেখে শুনে আর একটি বজরা কিনে ফেললেন এবং ভগবানগোলা থেকে সেই বজরায় আবার যাত্রা শুরু করলেন। যথা সময়ে বাগবাজারের ঘাটে এসে ভিড়লো তাঁর সেই নতুন বজরা।

এই সব ঘাটে মোসাহেব ও দালালরা সদা-প্রত্যহ ছোঁক ছোঁক করে। [illegible]

পাকড়াতে হয়। তাজ্জ্বমানের (?) পাণ্ডাদের মতন দালাল মোসাহেবরা কে আগে কোন্ বাবুকে পাকড়াবে তা নিয়ে রীতিমতন প্রতিযোগিতা ও ধুন্ধুমার কাণ্ড চলে। বিশেষত বাঙাল দেশের বড়মানুষ দেখলে তাদের আমোদ আর ধরে না। বাঙাল দেশের বড় মানুষরা প্রত্যেকেই এক একটি যেন নধর পাঁঠা।

পূর্ণচন্দ্র যে দুই দালালের এক্তিয়ারে পড়লেন তাদের নিজস্ব নাম যা-ই থাক, লোকে তাদের নন্দী ও ভৃঙ্গী বলে ডাকে। সেই নন্দী ও ভৃঙ্গী পূর্ণচন্দ্রের বজরায় উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো।

কলকাতা যতই এগিয়ে আসছিল, তত পূর্ণচন্দ্রের বক্ষের ধুকপুকানি বাড়ছিল। কোন অজব জায়গা দেখবেন কে জানে ! পাইক লাঠিয়াল দের প্রস্তুত থাকতে বলে তিনি উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সুরাপান শুরু করে দিলেন, বাগবাজারে এসে যখন পৌঁছোলেন তখন তাঁর টপভুজঙ্গ দশা। এ সময় তাঁর ভীরুতা, দুর্বলতা একেবারে উবে যায়, সুরাপান করলেই তিনি শের। মা জীবিত থাকতে তিনি কখনো ও জিনিস স্পর্শ করতেও সাহস পান নি, মাত্র এই দেড় বৎসরেই পূর্বেকার সব ক্ষুধা মিটিয়ে নিয়েছেন।

রক্তাক্ত চক্ষে কামরার বাইরে এসে তিনি গর্জন করে বললেন, তোমরা কেডা ? আমার বজরায় আইছ কার হুকুমে ?

নন্দী ও ভৃঙ্গী হাত জোড় করে বললো, হুজুর, আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনার সেবা করবার জন্য আমরা হাজির হইচি।

দোস্ত ইব্রাহিম শেখের পরামর্শ মনে রেখে পূর্ণচন্দ্র তাঁর রেশমী কুর্তার পকেট থেকে দু মুঠো টাকা বার করে ছুঁড়ে দিলেন ওদের দুজনের সামনে। ওরা সাগ্রহে সেই টাকা কুড়িয়ে নেবার পর পূর্ণচন্দ্র দুজনের পশ্চাৎদেশে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দুটি লাথি কষালেন।

মারের আকস্মিকতায় ঈষৎ চমকে উঠলেও নন্দী ও ভৃঙ্গী বিগলিত হাসিমুখ করে রইলো। দুধেল গোরু তো মাঝে মাঝে চাঁট মারবেই।

পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগলো ?

নন্দী ভৃঙ্গী একসঙ্গে বলে উঠলো, আহা, কী কোমল আপনার পা, যেন পদ্মফুল দিয়ে গড়া। যেন শ্রীহরি:কণ্টর (?) পদাঘাত, আমরা হুজুর গো রাখিকে (?) আর একবার মারুন।

পূর্ণচন্দ্র হৃষ্ট হয়ে বললেন, বাঃ বেশ !

তারপর নিজের লোকজনদের দিকে ফিরে বললেন, দেখলি ? কেমন সোন্দর কথা কয় কইলকাতা শহরের সহবৎই আলাদা।

নন্দী ভৃঙ্গী কাজে নিযুক্ত হয়ে গেল। একটি বাসা ভাড়া করা হলো রামবাগানে। তারপর মচ্ছব চলতে লাগলো কয়েকদিন ধরে। বাঙাল পূর্ণচন্দ্রকে শহুরে বাবু করে তোলার জন্য নন্দী ভৃঙ্গী উঠে পড়ে লাগলো। পূর্ণচন্দ্রের পোশাক আশাক ও মাথার চুল দেখলেই বাঙাল বলে চেনা যায়, কথা বললে তো আর রক্ষে নেই। রাস্তা দিয়ে দশ বারো জন পারিষদ পরিবৃত হয়ে পূর্ণচন্দ্র যখন চলেন অমনি ফচকে ছোঁড়া, কুঠীওয়ালা ও গেঁজেল গুলিখোররা চেঁচিয়ে ওঠে, বাঙাল ভিড়েছে বাঙালের মরণ ! মাথাখানা দ্যাখ, যেন কাতলা মাছ।

এসব কথায় পূর্ণচন্দ্রের মনে বড় ব্যথা লাগে তাই নাপিত ডেকে তার চুল ছাঁটিয়ে দেওয়া হলো। নন্দী ভৃঙ্গী বোঝালো যে ঘাড়ের কাছের চুল সব ছেঁটে ফেললে ঘাড়ে বাতাস লাগে, বুদ্ধি খোলে হয়, সেই জন্যই কলকাতার সব বড় বড় বাবুদের ঘাড় ছাঁটা। বেশী চুল রাখতে হয় মাথার সামনের দিকে সেটা হলো গিয়ে শোভা, যেমন মোরগের মাথায় ঝুঁটি। পূর্ণচন্দ্রবাবুর পোশাক ছিল ফিনফিনে আটহাতি নতকলকা ধুতি, তার ওপর নবাবি আমলের খাজাঞ্চিদের মতন রেশমী বেনিয়ান আর পায়ে শুঁড়ওয়ালা নাগরা। এসব ছাড়িয়ে তাঁকে পরানো হলো দো-নলা প্যান্টালুন, জালদার

[illegible] পকেটে ওয়াচপাড সংযোজিত ঘাড়, হাতে হীরের আংটি এবং সর্বদা সঙ্গে রাখেন ফুকো-শিশি ভরা আতর। এই রূপে পূর্ণচন্দ্র ভব্য হলেন।

বাবুর জন্য সকলরকম কেনাকাটার কাজেই দালালরা দু'দফা দস্তুরি পায়। কিন্তু সব চেয়ে বেশী দস্তুরি মেয়েমানুষে। এই বাসা বাড়ির খুব কাছেই অবিদ্যাদের আশ্রয় স্থল। অবশ্য এ শহরের কোথাই বা তারা নেই, সর্বত্রই তাদের অধিষ্ঠান। পূর্ণচন্দ্র এক জোড়া বড় সাদা ঘোড়া সমেত একটি ফেটিং গাড়ি কিনেছেন, সেই গাড়ি এক এক রাত্রে থামতে লাগলো এক এক বারবনিতার বাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সুকুমারী নাম্নী এক অল্প বয়েসী বারবনিতার প্রতি তাঁর মন মজে গেল।

সুকুমারীর বয়েস উনিশ। চিকন পাতলা গড়ন, মেম-পারা গায়ের রং, মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সুকুমারীরা তিন পুরুষের বেশ্যা, তার মা চুনীবালা (ডাক নাম পেঁটো চুন্নি) সদ্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িউলি মাসি হয়েছে। সুকুমারীরও খুব পছন্দ হয়ে গেল পূর্ণচন্দ্রকে। মানুষটি বেশ আলা-ভোলা, যখন মদ খায় না তখন মিনমিন করে আর একটু মদ পেটে পড়লেই অন্য চেহারা। সন্ধে হতে থাকে সুকুমারীর ঘরে। নন্দী আর ভৃঙ্গী চো-চো করে মদ গিলতে পারে এবং সহজে তারা বেহুঁশ হয় না, তারা নানারকম মজের গল্প বলে পূর্ণচন্দ্রের মন খুশী রাখে। ওদের খেইচি, পিইচি ধরনের কথায় সব অর্থ বুঝতে পারেন না পূর্ণচন্দ্র, তবু শুধু কথা শুনেই হেসে গড়াগড়ি যান। নেশা বেশ খানিকটা জমে উঠলে পূর্ণচন্দ্র অধিকতর মজার জন্য পকেট থেকে পাঁচ দশ টাকা বার করে হুকুম দেন, নন্দী!

নন্দী অমনি বুঝতে পারে, টাকাগুলো হাত পেতে নিয়ে সুবোধ বালকের মতন পশ্চাদ্দেশটি ঘুরিয়ে বসে আর পূর্ণচন্দ্র সজোরে সেখানে লাথি কষান। তারপর ভৃঙ্গীর পালা। সত্যি, কী শুলুকই দিয়েছে ইব্রাহিম শেখ, এমন মজা আর হয় না।

সুকুমারীও এতে দারুণ আমোদ পায়। সে বলে, ওগো, আমায় ট্যাকা দাও, আমায় টাকা দাও, আমিও মারবো!

ইঁদুরমুখো তবলা বাজনদারটি হাঁ করে চেয়ে থাকে। একদিন সে বলেই ফেললো, হ্যাঁ মশাই, আপনাদের দেশে বুঝি লাথি মারবার লোক নেই? সবাই সেখানে জমিদার?

পূর্ণচন্দ্র বলেন, থাকবে না ক্যান? কিন্তু নিজের দ্যাশে লাথথি মারার সুখ নাই। আমার প্রজাগো আমি যারে খুশী লাথথি মারতে পারি, বাঁশ দিয়ে ডলাইতে পারি, পোন্দায় হুড়কা দিতে পারি, কিন্তু হ্যারা হইল আমার প্রজা, হ্যারা তো টু শব্দও করবে না!

তবলা বাজনদারটি বলে, বুইচি, দৈনিক দু'-চারটি লাথি না মেরে আপনারা জলখাবার খান না। আমরা এখেনে অনেক বাবু দেকিচি, কিন্তু এসব লাথি-মারা বাবু আগে দেখি নি।

নন্দী বললো, এমন লাথি লাথি করছো কেন [illegible] এ হলো। সে হুজুরের স্নেহাশাবাদ।

ভৃঙ্গী বললো, তোর বুঝি হিংসের বু[illegible] জ্বলচে? চুপ মেরে থাক। তবলা চাঁটানো কা[illegible] ভ[illegible]লা চাঁটা।

সুকুমারী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা বাব[illegible] তোমাদের দেশে তো শুনিচি চারদিকে শুধু জল তোমরা এ বাড়ি ও বাড়ি কী করে যাও? সাঁতরে[illegible]

নন্দী বললো, বাবু কত বড় বজরা এনেচে[illegible] জানিস? এই অ্যাত্তবড়, দু'খানা বাড়ির সমান বাবুর দেশে কত নৌকো, কত বজরা, বাবু সাঁতে[illegible] যাবেন কোন দুঃখে?

ভৃঙ্গী বললো, চাদ্দিকে জল হলে কী হবে[illegible] তার মধ্যে বাবুর রাজপ্রাসাদখানি যেন ইন্দ্রে[illegible] ঐরাবত!

পূর্ণচন্দ্র বললেন, ঐরাবত না তোমার মাথা আমার বাড়ি থিকা সাত মাইল দূরে মাঘনা নদ[illegible] তা ছাড়া সব দিক শুকনা। আমি জমিদারি দ্যাখতে ঘুরায় চইড়া যাই।

সুকুমারী জিজ্ঞেস করলো, ঘুরায়?

পূর্ণচন্দ্র বললেন, হ্যা হ্যা, ঘুরা। ছুট ছু[illegible] ঘুরা। কিন্তু ছুট হইলে কী হয়, তাগৎ খুব। ঠি[illegible] যেন পংখীরাজ!

ছুট ছুট ঘুরা, ছুট ছুট ঘুরা, এই ক[illegible] বলতে বলতে সুকুমারী হাসতে হাসতে গড়াগ[illegible] দেয়।

সুকুমারীর মা পেঁটোচুন্নি বসে থাকে পাশে[illegible] ঘরে। মেয়ের ঘরে যখন বাবু থাকবে, তখন [illegible] কক্ষনো সে ঘরে ঢুকবে না, এটাই নিয়ম মোসাহেবরা মাঝে মাঝে মদের গেলাস ভরে হা[illegible] বাড়িয়ে পেঁটোচুন্নির দিকে এগিয়ে দেয়।

পেঁটোচুন্নি পাশের ঘর থেকে ফিসফিস ক[illegible]

করে আমাদের ঘুরিয়ে আনতে। কতদিন বাজরায় বসে হাওয়া খাওয়া হয় নি!

পূর্ণচন্দ্র শুনতে পেয়ে বললেন, কাইলই চলেন। মা, আপনে যখন কইতে আছেন, তখন হ্যায় আর কথা কী! কাইল ক্যান, আইজ রাইতেই চলেন!

ইব্রাহিম শেখ বলে দিয়েছিল কশবীর মাকে মা বলে ডাকতে হয়, সেটাই কলকাতার প্রথা, পূর্ণচন্দ্র তা ভুলে যায় নি। কিন্তু ঐ মা ডাক শুনে পেঁটাচুন্নি পাশের ঘরে বসে আধ হাত জিভ কাটে।

বাইরে কোনো একটা গোলমাল হতেই পূর্ণচন্দ্র সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে, কেডা আইল, কেডা আইল? বেহ্মজ্ঞানি নাকি? অ্যাঁ?

কলকাতায় এ পর্যন্ত ব্রেহ্মজ্ঞানিদের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে এখনো। সঙ্গের দুজন লাঠিয়ালকে দাঁড় করানো আছে সুকুমারীর বাড়ির সদরে।

এর পর তিন চারদিন গেল বজরা সফরে। আমোদ-হুল্লোড় ঠিক যেমন হয়—তেমনই হলো পুরোপুরি, শুধু ছোট একটুখানি বৈচিত্র্য ঘটেছিল।

বজরার ছাদে বসে ব্র্যান্ডির নেশায় চুরচুর হয়ে হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রের আবার লাথি মারার শখ জেগে ওঠায় যথারীতি নন্দী ও ভৃঙ্গী তৈরি হয়েছিল পেছন ঘুরিয়ে। কিন্তু ভৃঙ্গীর বেলায় লাথিটা এমনই জোরে হয়ে যায় যে সে ছিটকে পড়ে গেল ভরা গঙ্গায়। কলকাতার লোক অনেকেই সাঁতার জানে না, ভৃঙ্গী বেচারা প্রাণেই মারা যেত, শেষ পর্যন্ত বজরার দুজন দাঁড়ি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচায়।

দিনের মনে দিন কাটতে লাগলো। পূর্ণচন্দ্রের যে টাকা কড়ি ফুরিয়ে আসছে, তার খেয়াল নেই। বৃদ্ধ নায়েব সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে আনলে ফুর্তির বাধা হবে বলে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। মূর্খ পূর্ণচন্দ্র টাকা কড়ির হিসেবও বোঝে না। সুকুমারীর নেশায় সে উন্মত্ত, দেশ থেকে টাকা কড়ি আনাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে বজরাটি বেচে দেওয়া হলো।

পেঁটাচুন্নি আবার একদিন মেয়ের মারফত অনুরোধ জানালো, তার খুব কালীঘাট দর্শন করবার ইচ্ছে। বাবু দয়া করলেই তাদের কালীঘাট যাওয়া হয়।

পূর্ণচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললো, বিলক্ষণ! কাইল সকালেই যামু। নন্দী, ভৃঙ্গী সব ব্যবস্থা পাক্কা কইরা ন্যাও।

সুকুমারীদের পাড়ায় একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কালীঘাট ভ্রমণের সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। সুকুমারী পূর্ণচন্দ্রের কাছে আবদার ধরে বললো, কালীঘাটে শুধু আমরা যাবো, আমার সই, মিত্তিন, গঙ্গাজল, মকর, চোকের বালি, মনের কাঙ্গি, নয়নতারা এরা যাবে না?

পূর্ণচন্দ্র বললেন, ক্যান যাবে না? হক্কলডিই যাবে!

সুকুমারী পূর্ণচন্দ্রের গাল টিপে আদর করে বললো, ওরে আমার হক্কলডিরে! ওরে আমার ক্যান রে! এই জন্যই তোমায় আমার এত ভালো লাগে।

দেখা গেল, সব মিলিয়ে যাবার মানুষ আটচল্লিশ জন। নন্দী বললো, হুজুর, এটা আপনার একটা যোগ্য কাজ হয়েচে। তিত্থি স্থানে বড় দঙ্গল না নিয়ে গেলে পাণ্ডারা বড় হ্যাটা করে।

ভৃঙ্গী বললো, বাবুর মন এত বড়, তিনি ছোট দঙ্গল নিয়ে যেতে পারেন কখনো? আমাদের বাবু কোনো কিছুতেই পেচপাও নন।

পনেরখানি ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে আনা হলো। যার যত ভালো ভালো শাড়ি গয়না ছিল, তাতে সেজেগুজে ছুঁড়ি ও বুড়ি বেশ্যারা পিলপিল করে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। নিজের ফিটনখানা পূর্ণচন্দ্র আগের দিনই বেচে দিয়েছেন, সুতরাং নিজেও একটি ভাড়া গাড়িতে সুকুমারী আর তার চোখের বালি ও গঙ্গাজলকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন।

কালীঘাট যেতে হলে নানাবিধ সরঞ্জাম লাগে। নন্দী আগেই একলা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে, সেখানে গিয়ে একটি বাড়ি ভাড়া করে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। ভৃঙ্গী এদিককার বাজার করে নিয়ে যাবে। রাধাবাজার থেকে কিনতে হবে মদের বোতল, বড়বাজার থেকে চাল ডাল, মেছোবাজার থেকে সাজিয়ে নিতে হবে গোলাপী ও ছাঁচী পানের খিলি, মোগলের দোকানের অম্বুরি তামাক।

যথা সময়ে শহর ছাড়িয়ে ওরা কালীঘাটের গ্রামে এসে পৌঁছোলেন। গাড়ি থেকে নেমেই সুকুমারী খোঁজ করলো, মা কোতা? মায়ের গাড়ি এয়েচে? পূর্ণচন্দ্রও শশব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যা, হ্যা, মায়ের গাড়ি ঠিকঠাক আইছে তো? মায়ের কষ্ট হয় নাই তো?

পেঁটাচুন্নি পাখা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে সদ্য ভাড়া করা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললো, এই তো আমি। এসো বাছা, প্রথমে বসে একটু জিরোম নাও।

অনেক দূরের পথ, গাড়িতে বসে বসে আসায় বেশ পরিশ্রম হয়েছে। সুকুমারী বিবি রুমালে মুখ রগড়ে রগড়ে মুখ একেবারে লাল করে ফেললে। নন্দী একটা গেলাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে তাতে সোডা ওয়াটার মিশিয়ে সুকুমারীর মুখের কাছে ধরলে। বিবি অমনি চটে উঠে বললো, তোমরা সহবত শেকো নি গা? মিত্তিন, মকর, গঙ্গাজল এরা সব রয়েচে, তাদের না দিয়ে তুমি প্রথমেই আমাকে দিলে? নিজেরা আগে টেনে বসে আচো, বাবুর যে গলা শুকোচ্চে, সে খেয়াল নেই?

কালীঘাটে এসে এক দণ্ড বাইরে তিষ্ঠোবার উপায় নেই। পাল পাল কাঙালী এসে ছেঁকে ধরে। এ ছাড়া পুজুরি বামুন, রাঁধুনি বামুন আরও হাজার রকমের উমেদার। কেউ খ্যাংরা-গুঁপো, কেউ গামছা কাঁধে, কেউ ধামা-মাথায়। চতুর্দিকে একেবারে চিলুবিলু অবস্থা। বড়বাজারের দোকানে পাকানো পৈতে বিক্রি শুরু হবার পর শহরে বামুন খুব বেড়ে গেছে, কালীঘাটে এখন কাঙালী বেশী না বামুন বেশী, তা বোঝা ভার।

দোতলায় কার্পেট বিছানো ঘরে এসে বসে পূর্ণচন্দ্র একটু জিরোতে লাগলেন। সুকুমারীর সইয়েরা তাঁকে বাতাস করতে লাগলো। নন্দী ভৃঙ্গী এসে সুরার গ্লাস তুলে দিল হাতে। পেঁটাচুন্নি দরজার আড়াল থেকে মৃদু ভর্ৎসনা দিয়ে বললো, অ সুকু, এসেই তোরা টানতে বসে গিলি? পুজো আচ্চার ব্যবস্থা করতে হবে না!

নন্দী বললো, পুজো তো ওবলা? এখন কী? এবলা আগে খাওয়া দাওয়া হোক। পাঁচজন রান্নার ঠাকুর পাঁচটা উনুন ধরিয়েচে।

পেঁটাচুন্নি বললো, ওমা, সে কি কতা! মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে পাচ্চি, আর ও পোড়ারমুখো বলে কি-না পুজো ওবলা? কালীঘাটে এসে আগে পুজো দিতে হয়, তার পর অন্য কিছু।

ভৃঙ্গী বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুজোর ব্যবস্থা করচি। আমি বামুন পাণ্ডা ধরে আনচি।

ভৃঙ্গী বাইরে থেকে কোরাথান পরা, পৈতের গোছা গলায়, মাথায় মস্ত টিকি, খড়ম পায়ে একজন বেশ বিশ্বাসযোগ্য চেহারার বামুনকে ডেকে আনলো। পেঁটাচুন্নি বললো, ওমা, কী হবে! আসবার সময় আমি যে তাড়াতাড়িতে সিন্দুক খুলেও টাকা বার করতে ভুলে গ্যাচি। আমি যে পুজো মানত করেছিলুম, কী করে পুজো দোবো?

পূর্ণচন্দ্র বললেন, একথা বলে বড় লজ্জা এই ন্যান, কত লাগবে?

পকেট থেকে কুড়ি পঁচিশ টাকা যা ওঠে তা দিয়ে দিলেন পূর্ণচন্দ্র নন্দীর হাতে। নন্দী তা থেকে পাঁচ টাকা সরিয়ে বাকিটা দিল পেঁটাচুন্নিকে। পেঁটাচুন্নি আবার তার থেকে বেশ কিছু সরি মোট সাতটি টাকা দিল বামুনকে। তাই পেয়ে বামুনের এক গাল হাসি। দুটো ছোট গোটা পাঁঠা, দু সরাতে আধসেরটাক চিনি, একছ মন্দির বেড়া জবাফুলের মালা, কুনকেটাক আতপ চাল, গোটা দশেক কাঁঠালি কলা, একটু ঘি, এক সিঁদুর—সব মিলিয়ে মোট আড়াই টাকার জিনি কিনে মন্দিরে গিয়ে পুজো চড়িয়ে এলো।

এদিকে ভাড়া বাড়ির একতলায় বড় বড় উনুনে খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে, আর দোতলায় বোতলের পর বোতল উড়ছে। বোতল শুধু ওড়ে না, একসময় গড়ায়, তখন মানুষগুলোও গড়ায়। একজন গড়ায়, অন্যজন তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করে, তারপর সেও গড়িয়ে যায়। কালীঘাটে এসে এতটা বাড়াবাড়ি পেঁটাচুন্নির পছন্দ হচ্ছে না; তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে মতি হয়েছে। সে এসে মাঝে মাঝে বকুনি দিয়ে যাচ্ছে ওদের। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সুকুমারীর সইরা সব এক একজন মোসাহেবের পাশে বসে গলা জড়াজড়ি করছে। নন্দী আর ভৃঙ্গী মাঝে মাঝে বলে উঠছে, ওফ্, এত ফুর্তি বহুত দিন হয় নি। ধন্য আমাদের পূর্ণচন্দ্রবাবু!

রান্না শেষ, নীচতলার চাতালে জল ছিটিয়ে পাত পাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু কে খেতে যাবে ওপরের বাবু বিবিদের খাওয়ার কথায় হুঁস নেই কেউ ডাকতে এলেও তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। চাকর-নফর, পাইক আর অন্যরা গাণ্ডে পিণ্ডে গিলতে লাগলো গরম গরম খিচুড়ি, রুই মাছের কালিয়া, পাঁঠার পোলাও, আলুর দম, হাঁসের ডিম তাসা বাঁশের চোঙায় জমিয়ে দোকা। বেলা গড়িয়ে বিকেল পড়ে এলো।

মদের বোতল সব শূন্য, তবু পূর্ণচন্দ্রের তৃষ্ণা মেটেনি। এসানো অবস্থায় সে বললো, কই বাপ নন্দী, কই বাপ ভৃঙ্গী, গেলাস যে খালি! শ্যাম্পেন কার্ক খোলার ফটাফট মধুর আওয়াজও বন্ধ। কী হইলো তোমাগো?

নন্দী বললো, হুজুর টাকা দিন!

পূর্ণচন্দ্র বললেন, টাকা চাই? কত টাকা?

এবার পেঁটাচুন্নি সত্যিকারের রেগে গিয়ে বললো, হ্যাঁ গা, কী আক্কেল তোমাদের? কাঁড়ি-কাঁড়ি রান্না হলো, কিছু খেলে না। গঙ্গায় নাইলে না, মায়ের দর্শন করলে না, এ কেমন ধরা ব্যাভার? সন্ধে হয়ে এলো। আগে দুটি খেয়ে নাও!

পূর্ণচন্দ্র বীরবিক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না খামু না! মায়ের দর্শন করতে যামু। আগে মায়ের দর্শন, তারপর অইন্য কথা! চলো, সুকুমারী!

সুকুমারী দু পা চলতে গিয়েই লুটিয়ে পড়ে গেল। একেবারে জ্ঞানহারা। তাকে একটুক্ষণ টানাটানি করেও কোনো সুবিধে হলো না। পেঁটাচুন্নি বললো, থাক, ওকে ছাড়ো, ওর আর ক্ষামতা নেই। পূর্ণচন্দ্রের মনে একটা আঘাত লাগলো। এত দূর এসেও সুকুমারী তার সঙ্গে মন্দিরে যাবে না? এত খরচাপাতি করে মেয়েমানুষ রেখে তাহলে লাভ কী হল? পূর্ণচন্দ্রের মস্তিষ্কের নেশাগ্রস্ত যুক্তিতে মনে হলো যে সুকুমারী যেন ইচ্ছে করেই ভিরমি

ষ্টা করলো, কিন্তু সুকুমারীর মুখ দিয়ে গ্যাজলা বেরুচ্ছে।

তখন পূর্ণচন্দ্র বললেন, আমি একলাই যাবো।

সিঁড়ি দিয়ে দুপ দাপ করে তিনি নেমে এলেন। নন্দী, ভৃঙ্গী এলো সঙ্গে সঙ্গে। নীচতলার লোকগুলো নেশা করেনি বটে কিন্তু প্রচণ্ড রকম চিংড়ি মিসুড়ি খেয়ে পেট মোটা করে শুয়ে আছে। লাঠিয়াল দুজন ঘুমন্ত। পূর্ণচন্দ্র ওদের আর ডাকলেন না। রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন ভিড় ঠেলে। পা দুটি টলমল করলেও তাঁর শরীরে যেন মত্ত মাতঙ্গের শক্তি। নন্দী, ভৃঙ্গী কাঙালীদের তাড়াতে লাগলো।

পূর্ণচন্দ্র মন্দিরে এসে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মনটা বিষাদে ভরে গেছে। মনে পড়েছে স্বর্গগতা জননীর কথা। মায়ের মৃত্যুশয্যার অনুরোধেই কালীঘাট দর্শনের জন্য কলকাতায় আসা। অথচ এতদিনে কালীঘাট দর্শনের কথা মনেও পড়েনি। সেই কালীঘাটে আসতে হলো কিনা সুকুমারীর কথায়। আর সে বেশ্যামাগীও এমন নিমকহারাম, শেষ পর্যন্ত সঙ্গে এলো না।

পূর্ণচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠলেন, মা, মা, আমি তোমার কুপুত্র। আমি মহাপাতকী।

মন্দিরের পুরুতরা চেহারা ও বেশবাসের জাঁকজমক দেখে পূর্ণচন্দ্রকে একজন বেশ বড় গোছের বাবু ঠাউরে অন্য লোকজনদের সরিয়ে সাগ্রহে বলতে লাগলো, আসুন, আসুন, আপনি সামনে আসুন। আপনার গোত্র কী?

পূর্ণচন্দ্র এগোতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। আর অমনি মুখ দিয়ে হড়হড়িয়ে বমি বেরিয়ে এলো। তাতে অসহ্য দুর্গন্ধ। পুরোহিতরা চেঁচিয়ে উঠলো, দিলে দিলে সব কিছু নষ্ট করে দিলে। কী আপদ! এ মাতালকে সরাও!

নন্দী, ভৃঙ্গী হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো পূর্ণচন্দ্রকে। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বিড়-বিড় করে বারবার বলছেন, আমি মহাপাতকী, মহাপাতকী। ওগো, আমার মা কী যেন মানত কইরছিল, তোমাগো মনে আছে?

নন্দী ভৃঙ্গী বললো, হুজুর, আপনার মায়ের মানত আমরা জানাবো কী করে।

পূর্ণচন্দ্রের দারুণ কষ্ট হচ্ছে, কিছুতেই একটা কথাও মনে আসছে না।

পুরুতরা বললো, দক্ষিণা যা দেবার দিয়ে একে একবার এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও না।

দক্ষিণার কথা শুনে পূর্ণচন্দ্র পকেটে হাত দিলেন। পকেট শূন্য। অসহায়ভাবে ঘোলাটে চোখে নন্দী আর ভৃঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, টাকা? আমার টাকা নাই? তোমরা আমারে টাকা দেবা? আমি মায়ের দক্ষিণা দিতে পারমু না?

নন্দী, ভৃঙ্গী বললো, হুজুর, আমরা টাকা পাবো কোথায়? আমাদের কি টাকা থাকে!

হাত থেকে হীরের আংটিটা খুলে প্রণামীর থালার ওপর ছুঁড়ে দিলেন পূর্ণচন্দ্র। তারপর ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। নন্দী, ভৃঙ্গী ওঁকে ধরাধরি করে চত্বরে নিয়ে এলো।

একটু সামলে পূর্ণচন্দ্র বললো, আমি আর ঐ মাগীগো কাছে যামু না। আমি বাড়ি যামু। আমার দাদার কাছে যামু। আমারে গঙ্গার ঘাটে লইয়া চলো, আমি গঙ্গা স্নান কইরা শুদ্ধ হমু।

সন্ধে হয়ে গেছে, এখন আর স্নানটান করানোর ঝামেলায় নন্দী, ভৃঙ্গী যেতে চায় না। তারা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু অতি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পূর্ণচন্দ্র বোধশক্তিহীন গোঁয়ার হয়ে গেছেন। তিনি যাবেনই স্নান করতে।

অগত্যা নন্দী আর ভৃঙ্গী ওঁকে নিয়ে চললো টানতে টানতে। পূর্ণচন্দ্রের আর চলার শক্তি নেই, চেতনাও আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার একেবারে কাছাকাছি এসে আর পারলেন না, একেবারে পাথর হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। আর গঙ্গার ঢালু পাড়ে তাঁর মাথাটা নীচের দিকে ঝুলে রইলো।

নন্দী ভৃঙ্গীকে বললো, থাক, এখানেই পড়ে থাক। এ ব্যাটা ছিবড়ে হয়ে গেছে।

ভৃঙ্গী বললো, দ্যাখ না, ট্যাঁকে কিছু লুকোনো আছে কিনা।

দুজনে হাঁটু গেড়ে বসে ভালো করে পূর্ণচন্দ্রের ট্যাঁক ও পকেট পরীক্ষা করে দেখলো। না, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এর জন্য আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না ভেবে চলে যেতে গিয়েও দুজনে আবার থমকে দাঁড়ালো। দুজনের মনে একই কথা এসেছে। ব্যাটার জামা-কাপড়গুলোও তো দামী, সেগুলিই বা বাদ থাকে কেন? কাছে ফিরে এসে ওরা পূর্ণচন্দ্রের সমস্ত পোশাক খুলে নিল। পায়ের জুতো জোড়া পর্যন্ত। সব কিছু নিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধে উঠে দাঁড়ালো দুজনে।

আবার ওরা চোখাচোখি করলো। ঠিক একই কথা আবার দুজনের মনে এসেছে। দুজনে দুপাশে সরে গিয়ে পূর্ণচন্দ্রের নগ্ন নিতম্বে সপাটে লাথি কষালো কয়েকবার। (ক্রমশ)

... সুখের

প্রতিভা বসু

আসলে নরেশদের এই পুরোনো আবাসটি একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস। ছাত্ররা দোতলায় থাকবে, নিচে থাকবে তাদের কেয়ারটেকার এই হচ্ছে নিয়ম। ছাত্রদের দেখাশুনো করা। তাড়া আদায় ইত্যাদি নানান দায়-দায়িত্ব সবই কেয়ার-টেকারের উপরেই ন্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে এক ধরনের অভিভাবকত্ব।

বাড়িটা ভেঙে ফেলাই কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ছিল, সেই অনুযায়ী তারা এগিয়েও ছিলো কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল এতোগুলো ছেলেমেয়েকে থাকতে দেবার মতো বাড়ি আর হাতে নেই তাদের। ছেলেমেয়েরা বললো, তবে, এই সেমেস্টারের মাঝখানে আমরা কোথায় যাবো? অতএব তখনকার মতো স্থগিত থাকলো কাজ। এক আমেরিকান দম্পতি এখন অভিভাবকত্ব করতে। আগে যাঁরা ছিলেন বাড়ি ভাঙা হবে শুনে অন্য বাসস্থানে চলে গিয়ে-ছিলেন। এই দম্পতি এসে থেকেই খুঁতখুঁত করছিলেন পুরোনো বাড়ি বলে। তার মধ্যে কোনো এক রাত্রে একটি অঘটন ঘটলো। মহিলাটি বাথরুমে যাবার পথে একটি আরশুলার বাচ্চা দেখে মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা যেতে যেতে মেমসাহেবী সরু গলা আকাশে তুলে পিতা মাতা স্বামী প্রভু সকলকে এমন পরিত্রাহী রবে ডেকে বাঁচাবার আবেদন জানাতে লাগলেন যে দোতলা থেকে সব ছাত্রছাত্রী নেমে এলো দৌড়ে। জল পাখা দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় মূর্ছা ভাঙালো। ভাঙালে কী হবে? মহিলা কি আর সেখানে থাকেন। একটু সুস্থ হয়েই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে বন্ধুর বাড়ি পালালেন।

স্ত্রী পালালে স্বামী আর থাকেন কী করে? তিনিও নোটিস দিলেন। তখন ছেলেমেয়েরা দিকবিদিক খুঁজে নিয়ে এলো নরেশকে। আবার যে কোনা মানুষ হলেই তো হবে না।। বিবাহিত হওয়া চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হওয়া চাই, আরো কী সব নিয়ম কানুনের অন্তর্গত হওয়া চাই—সব দিক থেকেই যোগ্য নরেশকে পেয়ে তারা ধন্য হলো।

নরেশের পক্ষেও এই বাসস্থান খুবই সুখের হলো। সামনে এমন সুন্দর কম্পাউন্ড—যদিও সেই ঘাস জমিতে কেউ সযত্নে ফুল ফোটায়নি তবু প্রকৃতিদত্ত কতো রঙের ফুলই না ফুটে আছে! যদিও জমির ঘাস কেউ ছাঁটে না তবু শীতের পরে বসন্তের ছোঁয়ায় কী সুন্দর সতেজ। যদিও পুরোনো বাড়ি বলে কোনোখানেই কোন আদর নেই তবু প্লাস্টার খসা দেয়ালে কী সুন্দর হলদেটে শ্যাওলা—বরং এই চেহারার জন্যই বোধ হয় নরেশের কবিপ্রাণ বেশী উৎফুল্ল হলো, একটু মিল পেলো স্বদেশের। স্বজনবিরহিত প্রান্তরে কতো কাল বাদে কয়েকটি আরশুলার বাচ্চা দেখে ও নিশ্চয়ই হৃদয় জুড়োলো!

এমন হাত পা ছড়ানো সুন্দর মনোমতো বাড়ি পেয়েই যে শুধু সুখী হলো তা-ই নয়, ছাত্রছাত্রীদের সাহচর্যও তাদের কম আনন্দের কারণ হলো না।

নিচেরতলার যে দুখানা ঘর আর একখানা বারান্দা নিয়ে চিনুর সংসার, সে ঘর দুখানা নামেই দুখানা, আসলে প্রায় তিনখানার সমান। গলি পেরিয়ে রান্নাঘর। রান্নাঘরটিই দেখবার। যেন এক যজ্ঞশালা। চারদিকে চারটি চার মুখওলা গ্যাসের উনুন, পাশে পাশে সিংক, ফ্রিজ ইত্যাদির সমাবেশ। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বারো, সবাই আলাদা আলাদা রান্না করে খায়। প্রত্যেকের বাজার থাকে ফ্রিজগুলোর মধ্যে ভাগ ভাগ করা। সকলের বাসনও আলাদা। খেয়ে-দেয়ে রান্না করে যার যারটা নিজেরাই মেজেঘষে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখে। চিনুরাও ওখানেই রান্না করে।

শুধু স্যারকেই না, স্যারের স্ত্রী চিনুকে পেয়েও ওরা মহা খুশি। এমন মমতাময়ী মধুভাষিণী নম্র মধুর বঙ্গমহিলা বঙ্গদেশেই যেখানে বিরল সেখানে ঐ আত্মকেন্দ্রিক রাজত্বে তো একটা স্বপ্ন। চিনুর প্রশ্রয়ে ছেলেগুলো কিন্তু বেশ অলস হয়ে উঠেছিলো। বারোটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দশজনই ছিলো ছেলে। মাত্র দুজন মেয়ে। দেখলাম আন্তর্জাতিক বলতে যা বোঝায় এদের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে তা সত্য। চীনে, জাপানী, আফগানী, কেনেডিয়ান, আমেরিকান আফ্রিকান, ভারতীয়—সকলে মিলে এক বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন।

যেহেতু যার যার রান্না তার তার, সকালের দিকে ঘরটার মধ্যে একটা ভিড় লেগে যেতো। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ মিলিয়ে ব্রাঞ্চ তৈরি করে খেয়ে দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলে তবে সব ঠান্ডা। তারপরে আসে চিনু। এসেই বলে, দেখেছেন কী কাণ্ড! এমন হয়েছে ওরা—'

কী ব্যাপার?'

'দেখুন না, নিজেরা বাসন মাজবে না, আমার মাজা বাসনগুলো নিয়ে খেয়ে-দেয়ে পালিয়ে গেছে।'

চিনুর মুখে অবশ্য এ নিয়ে কোনো অসন্তোষ দেখা যেতো না। বরং বেশ স্নেহের সঙ্গে সঙ্গেই বলতো, 'ছেলেগুলোর সত্যিই বড়ো কষ্ট হয় বাসন মাজতে।'

মধ্যে মধ্যে মাজা বাসন চুরি করতে গিয়ে অবশ্য ধরাও পড়তো। চিনু হেই হেই করে উঠলেই সহাস্যে নিজেদের বাসন তো মাজতই একেবারে বশংবদ হয়ে চিনুর বাদবাকি না মাজা বাসন পড়ে থাকলেও মেজে দিত ঘস ঘস করে।

ভালো ফ্যাশনের
অন্তরালে থাকে গবেষণা...
অরবিন্দ-
এ বহুবছরের দক্ষতা আধুনিক কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে সৃষ্টি করেছে
এমন ডিজাইন ও বুননির- যা দৃষ্টিকে করে তৃপ্ত স্পর্শে আনে আনন্দ।
সুতীবস্ত্র, পলিয়েষ্টার আর ব্লেণ্ডস সংগে আছে ফ্যাশনের বুনুনি বুট্টা।
অরবিন্দের দ্রব্যমান-এ এই যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ এর মূলে আছে গবেষণা।
উৎকৃষ্টতা...
অরবিন্দ
...অনুসন্ধান জাত

কোনো পাকিস্তানী যুবককে ওখানেই আমি প্রথম দেখি। ছেলেটির নাম ছিলো হারুণিল্ল। আমি ওকে সাহেবই ভেবেছিলাম। শেতাঙ্গ মানেই আমাদের কাছে সাহেব। কিন্তু আলাপ হতে ভালো করে তাকিয়েই কোথাকার জলবায়ুতে এমন বসরাই গোলাপের মতো রঙ তিলফুল নাসা, কাজল কালো চোখ আয়তলোচন সম্ভব সেটা বোঝা গেল।

ঐ ছেলেটিকে দেখার পরে আর একটি ছেলের সংগেও আলাপ হয়েছিলো। চল্লিশোত্তর একজন পরিণত যুবক। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। যখন চলে আসি বিদায় দিতে গিয়ে হাসিমুখে হাত ঝাঁকাতে এসে সহসা বাহিন বাজ কেঁদে ফেললেন।

আমরা ইংরেজ আমলেই বড়ো হয়ে উঠেছি। এদের এখনো ভারতীয় ছাড়া ভাবতে দ্বিধা হয়। ভিতরের টানটাও দেখলাম হৃদয়ের তারে কম্পন তুলতে যথেষ্ট সক্ষম।

ভারতবর্ষে বসে কিন্তু আমরা ভারতীয়দের এমন ভালোবাসার সংগে দেখি না। প্রদেশে প্রদেশে যেমন অমিলও প্রকট, ঈর্ষা দ্বেষ বিতৃষ্ণাও ততোধিক। পোশাক পরিচ্ছদ ভাষা প্রাত্যহিক জীবনযাপন খাওয়া দাওয়া সব কিছু নিয়েই একে অপরের ছিদ্রান্বেষী।

নরেশদের ওখানে আর একটি দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে দেখকে দেখেও এই একাত্মবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিলো: অথচ এই কলকাতা শহরে কতো অসংখ্য দক্ষিণ ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ বাস করে, পাশাপাশি বাড়িতে থেকেও জীবনে আলাপ করি না। কোনো আগ্রহই হয় না।

একদিন বাদেই ফিরে এলো নরেশরা। আড্ডা আরো জমজমাট হলো। তবে অধিক রাত্রির আড্ডাটা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। আমার আর চিনুর এই পরবাসে এসে নির্জনে অনেক কিছু বলার ছিলো দেখলাম।

সেই সময়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব জাঁকজমক সহকারে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিলো। যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ডক্টর এডোয়ার্ড ডিমক, এশিয়া স্টাডির ডিরেকটার, ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান স্টাডিজরও অধি-কর্তা। কলকাতার বিদগ্ধ বাঙালী সমাজের অনেকেই ডিমককে জানেন। সেই সংগে এ-ও জানেন, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ (খন্ড বাংলায় যার নাম দুর্ভাগ্য-বশত পশ্চিমবাংলা)। এবং বাঙালী তাঁর প্রাণ। কলকাতা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি।

প্রথম অতি অল্প বয়সে যখন একবার এসেছিলেন এদেশে, সম্ভবত পুরোনো বাংলা ভাষার গবেষণা করতেই এসেছিলেন। আমার সঠিক মনে নেই। আমাদের সংগে ঘনিষ্ঠতা সেই সময় থেকেই। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মস্থান। সেই স্থানকে তিনি তাঁর বাংলা এবং বাঙালীপ্রীতির নিদর্শনে অনেকভাবে অলংকৃত করে রেখেছেন। তার মধ্যে সব চেয়ে যা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে একটি বাংলা বিভাগ এবং চমৎকার একটি বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী।

নিজেও কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের সফল অনুবাদক, যেমন 'বিদ্যাসুন্দর' 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'মংগলকাব্য' ইত্যাদি।

এ হেন মানুষ যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন অতি সম্মানের সংগে করবেন অতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বস্তুত আমরা সেই আমন্ত্রণে এসেই নরেশের এখানে উঠেছি। এভানস্টোন শিকাগোর একটি উপকণ্ঠ শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না এতোটাই কাছে।

উৎসব তিনদিন ধরে পালিত হবে, মার্কিন মুলুকের নগর বন্দর থেকে বেশ কয়েকজন জ্ঞানীগুণী সমাবিষ্ট হয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তী তো আছেনই। নরেশও পেপার পড়বে। সেখানে গিয়ে কবি গলওয়ে কিনেলের এক বান্ধবীর সংগেও আলাপ হলো। ছিপছিপে হাসিখুশি লাবণ্যময়ী মহিলা, বলা যায় চোখে পড়ার মতো চেহারা। লাল টুকটুকে পোশাকে পালকের টুপিতে রানীর মতো দেখাচ্ছিলো। নাম শার্লি ক্লাই। সভার শেষে আলাপ করলো এসে। বললো, 'গলওয়ে চিঠি লিখেছে তোমাদের সংগে দেখা করতে।' সেই রাত্রেই দলবল সহ আমাদের ধরে নিয়ে গেল তার অ্যাপার্টমেন্টে, খাদ্য মদ্য চা কফির এলাহি বন্দোবস্ত। মস্ত ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মিশিগান হ্রদ। দুটি ছেলে একটি মেয়ে আর একটি বুক সমান উঁচু কুকুর নিয়ে সংসার। অসম্ভব ফুর্তিবাজ, অসম্ভব ছটফটে। ছেলে দুটি আর মা গলায় গলায় বন্ধু, মেয়ে সকলের ছোটো, বয়েস চোদ্দো, সে কিছুটা গম্ভীর এবং একা থাকতে ভালোবাসে। এক ঝলক দেখা দিয়েই নিজের ঘরে চলে গেল।

দলে আমরা কম ভারি ছিলুম না, আমি চিনু, চিনুর মেয়ে মনি, নরেশ প্রণবেন্দু, বুদ্ধদেব—সকলের মনই সেদিন খুব সুরে বাঁধা ছিলো। বুদ্ধদেব বারে বারেই বলছিলেন, নরেশ, তোমার পেপার সব চেয়ে ভালো হয়েছে সব চেয়ে ভালো।'

প্রণবেন্দুও ঐ আসরে কোনো তর্ক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে মঞ্চে উঠে

অকল্পনীয় জগতের দ্বার খুলে দিল!
নানান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙের, নানান বৈচিত্র্যের নয়নাভিরাম
বিশাল মেলা। বিনী পলিয়েস্টার মেশানো বস্ত্র।
স্যুটিং, শার্টিং, ড্রেস মেটিরিয়াল। হাল-ফ্যাশনের
নানান কাপড় যা' পরেও স্বচ্ছন্দ আরাম আর ব্যবহার
করা সহজ। আপনার জন্যে এক লোভনীয় সম্ভার।
বিনী
পলিয়েস্টার মেশানো বস্ত্র
Interpub/BB/1/78 BN
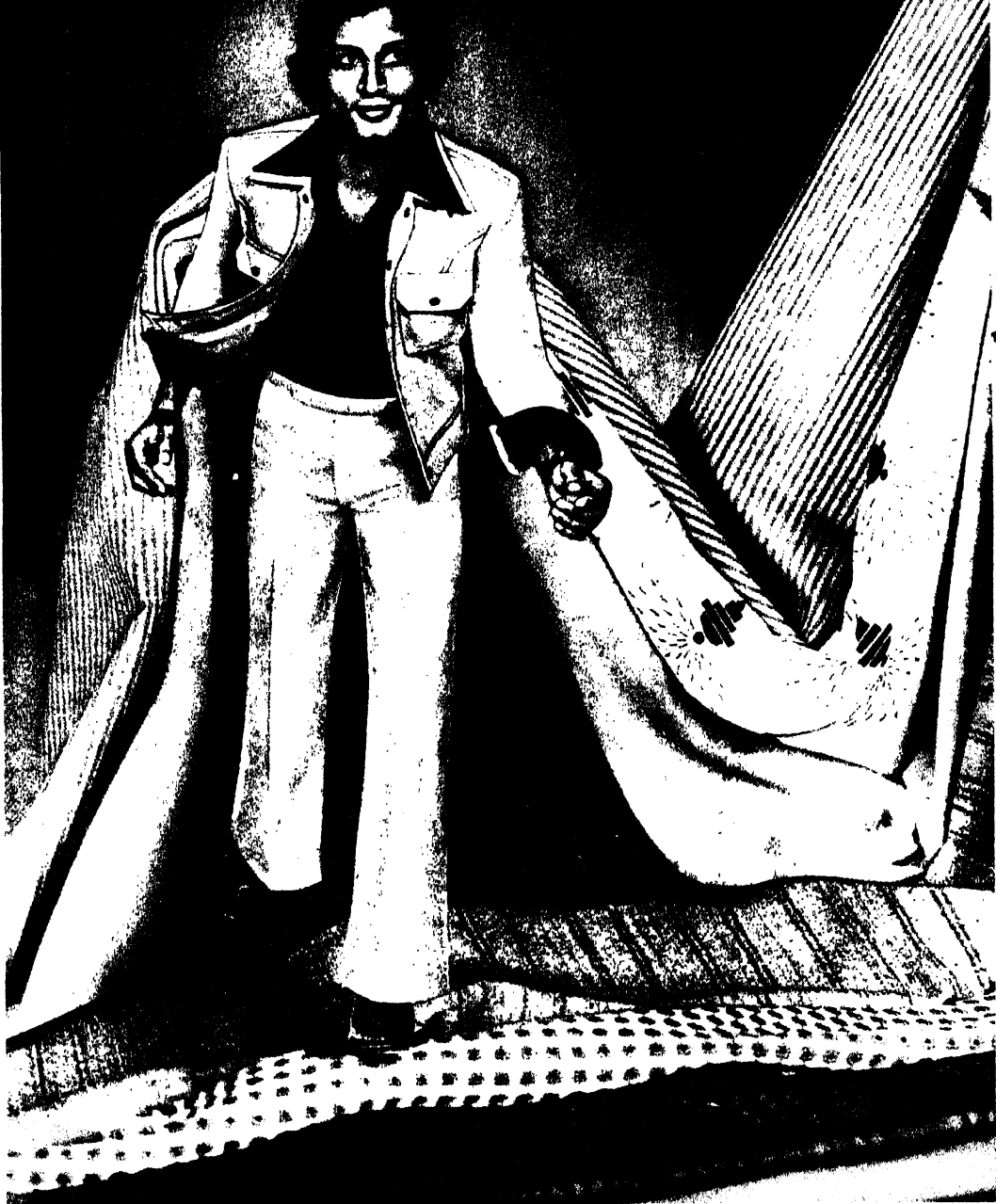
শেষ বক্তব্য মাফ অসম্ভব সারবান ছিলো। অতএব সফলতার সুখ সকলের মুখেই প্রতিফলিত।

নরেশের বাড়িতে আমরা দশদিন ছিলাম, সে বাড়িকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে বুদ্ধদেব আরো কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে এলেন, সঙ্গে সর্বদাই নরেশ। প্লেনে করে যাচ্ছেন আর ফিরে আসছেন, কতোটুকু আর সময় লাগে। যেদিনই কিছু থাকছে না, নরেশ একটা না একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ভরে রেখেছে দিন। এক সন্ধ্যায় মস্ত এক পার্টির আয়োজন করলো। গলওয়ের বান্ধবী শার্লির সঙ্গে মাত্রই কয়েক ঘন্টার আলাপে সকলেরই এতো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো যে সেই সন্ধ্যার আসরে নরেশ তাকেও নিমন্ত্রণ করলো।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীও ছিলেন, আর একজন যিনে ছিলেন তাঁর নাম ডক্টর প্রফুল্ল মুখার্জি। নিউইয়র্কের বাসিন্দা। বহু বছর যাবৎ এদেশে আছেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী নিয়ে তিনিও কম উত্তেজিত নন। টেগোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, শীঘ্রই সেই সংস্থা থেকে তিনি রাজা নাটক মঞ্চস্থ করছেন। এডোয়ার্ডের নিমন্ত্রণে এখানে এসেছেন।

এর নাম আমি বুদ্ধদেবের কাছে আগেই শুনেছিলাম। যেবার একা পিটসবার্গ কলেজে পড়াতে এসেছিলেন, তখন ডক্টর প্রফুল্ল মুখার্জিও পিটস-বার্গে ছিলেন। ইংরেজ আমলের আদি বিপ্লবী।

এই সব লোকেদের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা। বিপ্লববাদী বলে নয়, আদর্শবাদী বলে। আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ বলে। ইতিহাসের উৎকৃষ্ট অংশ বলে। ডক্টর ডেকারের বাড়িতে কনডেনস্‌সিকে দেখেও আমি সেই কারণেই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার প্রতিও কম কৃতজ্ঞ হইনি। পৃথিবীর এই সব মূল্যবান সন্তানকে এরাই তো সর্বদা মাতা হয়ে আশ্রয় দিয়েছে!

প্রফুল্ল মুখার্জির সঙ্গে বুদ্ধদেব আমাকে ইংরিজিতেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, বুদ্ধদেবের ধারণা ছিলো ইনি বাংলা ভুলে গেছেন। ভোলা অসম্ভব নয়, অন্তত অনভ্যস্ত তো বটেই। কথাবার্তা সর্বদাই ইংরিজিতে চলছিলো। সেইভাবেই আলাপ করিয়ে দেবার পরেও একজন সম্মানিত পিতার বয়সী বাঙালীকে পাশ্চাত্য প্রথায় সম্ভাষণ করতে আমি সংকোচ বোধ করে নিজের দেশীয় পদ্ধতিতে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি পরম সংকোচে 'না না সেকি!' বলে পিছিয়ে গেলেন, তারপরেই এগিয়ে এসে মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' মানুষটি লাজুক সজ্জা লজ্জা ভঙ্গিতেই আবার বলেন, 'তা ভালো, তা ভালো—মানে এটাই তো আমাদের রীতি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।' ভারি চশমা পরা চোখে প্রসন্ন হাসি টল টল করতে লাগলো। বাংলাতেই কথাগুলো বললেন। সেই সন্ধ্যায় আসরে তিনি কোনো বাঙালীর সঙ্গেই আর ইংরিজিতে কথা বললেন না। পার্টিটা সেদিন অবশ্য প্রধানত বাঙালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু এ রকম অবিরত বাংলায় কথা বলতে প্রফুল্ল মুখার্জি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন।

দেশ ছেড়েছিলেন উনিশশো ছয় সালে, তার মানে একষট্টি সালে ঐ দেশের বসবাসে তাঁর জীবনের পঞ্চান্নটা বছর কেটে গেছে। বিবাহও করেছেন একটি আমেরিকান দুহিতাকে। বাংলা বলার আর সুযোগ কোথায়? ইচ্ছে করলেও উপায় কী? ভুলতে না চাইলেও ভুলে যেতে হয়।

পরে বলেছিলেন, কন্যাপ্রতিম একটি বাঙালী মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামই তাঁকে সেদিন মাতৃভাষায় কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। সম্ভবত সেই প্রণামই আমার জন্য তাঁর হৃদয় সত্যি সত্যি পিতৃস্নেহের আবেগ সঞ্চার করেছিলো। ভদ্রলোক নিঃসন্তান।

প্রফুল্ল মুখার্জিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম একষট্টি সালে, শেষ দেখি পঁয়ষট্টি সালে। তখন তাঁর বয়েস একাশি। কিন্তু বার্ধক্য কোথাও ছিলো না। সতেজ সটান এক বয়স্ক মানুষ, যার মাথার চুল পর্যন্ত সব পাকেনি।

সেবার নানান কার্যকারণে আমাকে একা দেশে ফিরতে হয়েছিলো। ব্লুমিংটন থেকে নিউইয়র্ক আসবো, নিউইয়র্কে এসে ভারতগামী উড়োজাহাজ ধরবো। কথাটা বলতে সহজ কিন্তু কাজটা ততো সহজ নয়, যদি না কোনো সহায়ক পাওয়া যায়। ব্লুমিংটন থেকে তুলে দেবার লোকের অভাব ছিলো না, কিন্তু নিউইয়র্ক বন্দরে এসে যা করবার আমাকে একাই করতে হবে। আমি খুব নার্ভাস ছিলাম।

আইডেলওয়াইল্ড বিমানবন্দরে যাঁরাই একটু ঘোরাফেরা করেছেন তাঁরাই জানেন সেই বন্দরটির বিশালত্ব প্রায় গোলকধাঁধা। রাতদিন কতো চত্বর থেকে যে কতো বিমান ওড়ে তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কার বিমান কোন লাইনের অন্তর্গত তা হাজার মুখস্থ রেখেও তেমন তেমন ভ্রমণকারীরও ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ যায়। একটা

জন্য হাতে কাঁধে যে কতো মাল থাকে তার তো ...

বেলা বারোটার সময় যখন নিউইয়র্কে গিয়ে নামিয়ে দিল প্লেন, চারদিকে তাকিয়ে আমার বক্ষস্পন্দন অতি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। সঙ্গে যে সব যাত্রীরা এসেছিলেন, তাঁদের যাত্রা এই শহরেই শেষ। সুতরাং, তাদের সঙ্গ ধরেও যে পিছে পিছে চলবো এমন কাউকে পাওয়া গেল না। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই বলে 'এনকোয়ারিতে খোঁজ করো।'

'এনকোয়ারির অপিস কোথায় ?'

'বোধ হয় অমুক জায়গায়। অমুক জায়গায়ও হতে পারে।'

শঙ্কিত হৃদয়ে চত্বর পার হয়ে ব্রীজের উপর উঠলাম—সবাই উঠলো বলেই উঠলাম, কিন্তু পথ ঐ একটাই নয়, দিকে দিকে প্রসারিত। সব পথেই হুস্‌হাস পাখা মেলে মেলে যন্ত্রযান এসে দাঁড়াচ্ছে, কাকে কোথায় উগরে দিচ্ছে ঠিক নেই। আমার মতো অপরিচিত একজন যাত্রীর পক্ষে একেবারে বিহ্বল হয়ে যাবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ।

ব্রীজ পেরুতে প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল, নামবার মুখেই প্রথম গেটেই দেখি সেই একাশি বছরের বৃদ্ধ সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে যেন আলো জ্বলে উঠলো মুখে। কাছে যেতেই হাত থেকে অ্যাটাচি, থলি ইত্যাদি সব টেনে নিলেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'হঠাৎ এখানে ?' কেউ এসেছেন ? কেউ আসবে ?' সেই রকম লজ্জা লজ্জা মুখে বললেন, 'তুমি —মানে তুমি আসবে বলেই এসেছি। একা একা হয় তো অসুবিধে হবে, তাই ভাবলাম—'

'তা সেই জন্যে আপনি এই চাল্লিশ মাইল দূরে এয়ারপোর্টে এসেছেন ? কী আশ্চর্য ! কেমন করে এলেন ? সিটি আপিস থেকে ওদের গাড়িতে ?'

হাসলেন, 'না না, ওদের গাড়ি আমাকে দেবে কেন, আমি তো যাত্রী নই ? এই প্রবেশ দ্বারে আসতেই আমাকে অনেক কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। অনেক বোঝাতে হয়েছে। তুমি একা একজন ভারতীয় মেয়ে আসছো শুনে শেষ পর্যন্ত রাজী করানো গেল। আমি এমনি বাসেই এসেছি।'

'আমি তো জানতাম না আপনি আসবেন, তা হলে আমি খুব আপত্তি করতাম। কক্ষনো এতো দূরে আসতে দিতাম না। কতো কষ্ট হয়েছে—'

'এসো। দাঁড়িয়ে থাকলে অন্য যাত্রীদের চলতে অসুবিধে হয়। এগুতে এগুতে বললেন, 'তুমি কাল রাত্রে যখন আমাকে ফোন করে বললে, আজ চলে যাচ্ছো, তখনই মনে হচ্ছিলো, আর একবার দেখা হলে বড়ো ভালো হতো। যখন শুনলাম একা যাচ্ছো—'

পৌঁছে গেলাম শেষ গেটে। দেখলাম, সাদা পোশাক পরিহিতা একটি সুন্দরী যুবতী আমার দিকে হাত নেড়ে হাসলো, আমিও হাসলাম। এদেশে এভাবে চোখে চোখে হাসির সম্ভাষণ বড়ো সুন্দর।

কিন্তু শুধুই তা নয়, কাছে আসতেই বললো, 'নিশ্চয়ই একথা বললে ভুল হবে না যে, তুমিই মিসেস বোস, এয়ার ইন্ডিয়ায় ভারতবর্ষে যাচ্ছো' বুকের ব্যাজ দেখালো, পরিচয়পত্র দেখালো, 'আমি নিতে এসেছি তোমাকে।'

শাড়ি পরা মহিলা দেখেই চিনতে পেরেছিলো। এয়ার ইন্ডিয়ার এই সুচিন্তিত সুবন্দোবস্ত দেখে যুগপৎ আমি এবং ডক্টর প্রফুল্ল মুখার্জি একযোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। সে আমাদের নিয়ে মাইলখানেক হেঁটে বাইরে রাস্তার ধারে আকাশের তলায় এলো। যার যার লাইনের যাত্রীর জন্য তার তার অসংখ্য বাস দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর প্রফুল্ল মুখার্জিও উঠলাম। সেই বাস প্রায় দশ মিনিট চলবার পরে তবে পৌঁছুলাম এসে আসল স্টেশনে। ভিতরে ঢুকে তেমনিই এলাহি কাণ্ড। আমাদের এনে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে দিয়ে মহিলাটি ঘড়ি দেখে বললো, 'একটা পাঁচ, তোমার প্লেন সন্ধ্যা সাতটায়।'

অর্থাৎ এই অপেক্ষাগৃহে এখন ছ ঘন্টার অবস্থান। অবশ্য এই অবস্থানের কথা আমি জানতাম। আমার একা আসার পক্ষে ঐ ছ ঘন্টাই ভরসা ছিলো। ভেবেছিলাম, ছ ঘন্টার চেষ্টায় নিশ্চয়ই নিজের প্লেনটা খুঁজে নিতে পারবো।'

অপেক্ষাগৃহটি আরামের প্রাচুর্যে ভরপুর। শোয়া বসা হাত পা ছড়ানোর জন্য কিছুরই অভাব নেই। এমন কি বাথরুমের ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধন দ্রব্যও সাজানো আছে।

প্রফুল্ল মুখার্জি বললেন, 'বোসো, কিছু খাবার নিয়ে আসি।' আমার বাধা মানলেন না। ফিরে এসে বললেন, 'ভারতবর্ষ দেখছি আমাদের মাথা বেশ উঁচুতে তুলে দিয়েছে এমন সুন্দর ব্যবস্থায়। আমারই ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে চলে যাই। একবার গিয়ে দেখে আসি সব। আমি ভাবতেই পারিনি তোমাকে কেউ আনতে যাবে। না গেলে ভেবে দেখো, এতো দূরে আসতে কতো হাঙ্গামা আর কতো পরিশ্রম হতো।'

বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে অতি দুর্মূল্য একটি খাবারের প্যাকেট নিয়ে এসে এগিয়ে দিলেন আমার হাতে। সঙ্গে বড়ো পাতার চকোলেট। হেসে বললাম, 'আমি কি ছেলেমানুষ ?' তিনি বললেন, 'আমার কাছে তাই।'
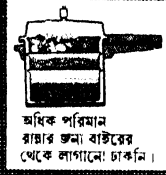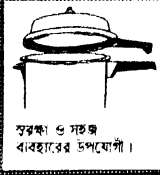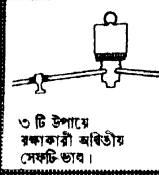
সমরজিৎ কর

॥ দশ ॥

হাফোলিতে এক চায়ের দোকানে পরিচয় হয়েছিল এনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বছর পঞ্চাশ বয়েস। বাড়ি কলকাতায়। আত্মীয় পরিজন সব কলকাতাতেই থাকেন। কম বয়েসে ঘর ছেড়ে চলে আসেন। প্রথমে আসামে। মানে খোদ গৌহাটি, তারপর নর্থ লখীমপুর। বিয়ে থা করেননি। কাপড়ের হোল সেলার।

ভদ্রলোক বললেন, মশায়, এই যে হাপোলি দেখছেন না, একেবারে যাকে বলে স্বর্গ। ব্যবসা করুন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাবেন। আবার ফূর্তি করতে চান, একেবারে শরিফ জায়গা।

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, জায়গাটার সত্যিকারের নাম কী, বলুন তো? হাফোলি, না হাপোলি?

হঠাৎ নাম নিয়ে অত মাথা ব্যথা কেন, বলুন তো? এসব পাহাড়ী অঞ্চলে নামে কী আসে যায়! কেউ বলে হাফোলি আবার কেউ বলে হাপোলি। কেউ কেউ হ্যাপি ভ্যালিও বলে। মশায়, করি কাপড়ের কারবার। লখীমপুরে গদি আছে। দেশের সেরা সেরা কাপড় এনে সেখানে জমাই। তারপর নিয়ে আসি এই হাপোলিতে। নিয়ে যাই আলং, দলাই, কাবু, তিরোপের নার্মাচক, নামফুক, নামসাং, কামেং-এর ডেডজা, রূপা, টেংগায়, অবথা লোহিতের লালপানি, তেজু। মশায় এদিকে বিজনেস ভাল। ওই যে আপাতানি মেয়েটা দেখলেন না, ছবি তুললেন যার—তার সাজ পোশাক দেখলেন তো। বাইরে থেকে কিছু বুঝবেন না। থাকে হয়ত ওই দূরে পাহাড়ী গ্রামে। খড়ো ঘর। সাদামাটা চালচলন। কিন্তু শহরে আসবে যখন, একেবারে মেমসাহেব। আর ছোকরাগুলো? একেবারে পাক্কা আমেরিকান। ওদের পা থেকে মাথা অব্দি সব ইমপোরটেড। আর ব্যবসাও কম বোঝে না ওরা। ওই যে আপাতানি ছোকরাগুলি দেখছেন না, চায়ের টেবিলে গোল হয়ে বসে কেমন আড্ডা দিচ্ছে? আড্ডা নয়, মশায়। সব ব্যবসার কথা। সুবনসিরির এই আপাতানিরা খুব চালাক। মিশনারিদের কৃপায় লেখা পড়াও শিখেছে। কেতাদুরস্ত মিজোদের সঙ্গে ওদের অনেকটা মিল।

তা না হয় হলো। কিন্তু আপনি ওই যে ব্যবসার কথা বললেন, মার্কেট তো ওই উপজাতিদের নিয়ে তাই তো? তা যদি হয়, অত পয়সা আসে ওদের কোত্থেকে?

জানি না, মশায়। কপাল ঠুকে বছর পনের আগে প্রথম যখন এদিকে আসি, আমার মনেও ওই একই প্রশ্ন জেগেছিল তখন। সেই চীনের যুদ্ধের পর আর কি। কেউ বলে, মিশনারিরা ওদের তখন নাকি টাকা পয়সা, কাপড় চোপড় দিয়ে সাহায্য করত। চীন থেকেও প্রচুর রসদ আসত ওদের জন্যে। এখনও আসে। তিব্বতের থেকে বোঝার জো আছে? প্লেইনের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে এরা দারুন রিজারভড। শহরের দিকে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যান, দেখবেন, রাজত্ব কাকে বলে। সব নিজের নিজের আইনে চলেছে। বিয়ে থা থেকে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা, অসামাজিক কাজ, সব কিছু।

ভদ্রলোক বললেন, শহরে খুব একটা ঝামেলা নেই। তবে শহরের বাইরে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। বাইরের লোককে ওরা বিশ্বাসই করে না। বিশেষ করে মিলিটারি উর্দিপরা কেউ হলে। তবে আমাদের এখন আর কোন অসুবিধে হয় না। ওদের চালচলন বুঝি। আর সব চাইতে মজা, একবার যদি ওদের বিশ্বাসভাজন হতে পারেন তো সব মিটে গেল। আপনি তখন ওদের নিজের মানুষ। ওদের সঙ্গে আপং খান। ফূর্তি করুন।

তা হলে তো বেশ ভালই আছেন। আমার মন্তব্য।

তা ভাল আছি। আপনাদের কলকাতা থেকে অনেক ভাল আছি বলতে পারেন। নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা না করে এখানে অনেক ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা যায়। আপনাকে আমি বলছি, মশায়, পাসটাচ্ছে। অনেক দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে এখানকার জীবনযাত্রা। সেই ... পঞ্চাশ থেকে যে সব স্কিম নেওয়া হয়েছে, যদি ঠিক মত তারা চলে, আপনাকে আমি বলে দিতে পারি, আগামী দশ বছরের মধ্যে এরা আপনাদেরও টেক্কা দিতে পারবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তো বটেই। শিক্ষাতেও। এদের মস্ত বড় একটা গুণ, এরা ভিক্ষা করতে জানে না। এমন একটা গুণ যাদের সুযোগ পেলে তারা না দাঁড়িয়ে পারে?

ভদ্রলোকের কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস!

মিজি মেয়ে (অরুণাচল)

কিন্তু সমস্যাও কি বড় কম? অরুণাচলের পার্বত্য এলাকায় কত রকম উপজাতিরই না বাস। কামেং সীমান্ত অঞ্চলে আছে মোনপা, সেরডুকপেন, খাওয়া, মিজু এবং আকা। সুবনসিরিতে আছে ডাফলা এবং আপাতানি। আবোর পার্বত্য অঞ্চলে পদম, মিনইয়ং, গালোং, বোকার, বোরি, পালিলিবো, টাগিং এবং মোনপা। আর তিরাপে গেলে দেখতে পাবেন মিজু দিগারু, পদম, খামতি, সিংফো, কাচিন, টাংসা ওয়ানচো, হাওয়া এবং লোকতে। এক একটি ট্রাইবের আছে নিজস্ব লোকাচার, সামাজিকতা এবং জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ। আছে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মিশনারিদের কৃপায় যথেষ্ট খ্রীশ্চান। কতকাল আগে ... গহন অরণ্যে তারা বসতি স্থাপন করেছিল সে প্রশ্নের উত্তর নৃবিজ্ঞানীরাই দিতে পারেন। সেটা তাঁদের গবেষণার ব্যাপার। আর লোককথা যা সেটা বিশ্বাস। ট্রাইবদের মধ্যে সেই বিশ্বাসে এখনও চিড় ধরেনি।

আমাদের কিছু দূরে এক পাশে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল একজন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। রঙীন পোশাক। মাথায় টুপি। কোমরে দায়ের মত একটি অস্ত্র। তার তামাটে মুখ দেখে কত তার বয়েস বলা কঠিন। কপালে গভীর বলি রেখা। সারা মুখে পাথরের প্রশান্তি! আর কী সাংঘাতিক দুটি চোখ! মনে হলো, সে চোখ মনের গভীরতম অঞ্চল মুহূর্তে নিরিখ করে নিতে পারে।

ব্যবসায়ী সেই ভদ্রলোকটি বললেন, পদম। কোন গ্রামের মোড়ল হবে মনে হয়। কেমন শক্ত চেহারা দেখেছেন? কত বয়েস বলুন দেখি?

বললাম, এর আগে অনেক ঠকেছি, মশায়। মুখ দেখে এই পাহাড়ীদের বয়েস বলা শক্ত। কত বয়েস হতে পারে আপনিই বলুন না?

কম করেও আশি।

বলেন কী? আশি মানে তো খুনখুনে বুড়ো? কিন্তু এর যা চেহারা দেখছি—

না, না। চেহারা দেখে ধরতে পারবেন না। আমাদের মত চট্ করে এদের মনটা বুড়িয়ে যায় না কিনা, তাই যৌবন এদের ছাড়তে চায় না। আসুন, এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

বলেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে লোকটির চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে মাথা নত করে নমস্কার করলেন, তারপর আদি ভাষায় কী যেন বললেন তাকে।

লোকটি আমার দিকে চাইল। যেন পাথরের দৃষ্টি। এমন ভাবলেশহীন দৃষ্টি আমি জীবনে কখনও দেখিনি। একবার ঘাড় নোওয়ালো। তারপর শেষ চুমুক দিয়ে হাতের কাপটি টেবিলের এক কোণে সরিয়ে রাখলো।

ভদ্রলোক বললেন, বসুন।

আমি সন্তর্পণে তাঁর পাশের চেয়ারটিতে বসলাম।

আর এক কাপ করে চা হোক। খানিকটা সম্মতি আদায়ের জন্যেই তিনি চাইলেন লোকটির দিকে।

লোকটি ইঙ্গিতে সম্মতি জানালো।

তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ভদ্রলোক আদি ভাষায় কথাবার্তা শুরু করলেন তার সঙ্গে। বুঝলাম, আমার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি।

তার পাথরের ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসির রেখা। কি যেন বলল সে ভদ্রলোককে। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, পদম বলছে, এভাবে তো দেশ দেখা হয় না। বরং আমার সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে চলুন। দিন দুই কাটিয়ে যান সেখানে। তবে তো সব মালুম হবে।

প্রথম পরিচয়েই একেবারে

বিশ্বাস, বুঝলেন কী না, বিশ্বাস। আগন্তুককে প্রথম দিকে এরা সন্দেহের চোখেই দেখে। কিন্তু ওই যে, একবার যদি বিশ্বাসভাজন হতে পারেন এরা জান দিতে প্রস্তুত আপনার জন্যে। বুঝছি, আপনাকে ভাল লেগেছে ওর। একবার যান ওর সঙ্গে, দেখবেন আতিথেয়তার জ্বালায় কেমন প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। বললেন সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক।

বিব্রত বোধ করলাম আমি। বললাম, এ যাত্রায় সে সৌভাগ্য আর হলো কই? ওকে বুঝিয়ে বলুন আমার অবস্থাটা।

জানি, জানি। সেটা সম্ভব নয়। আর হুট করে যাওয়া বললেই কি যাওয়া যায়। বাড়ি যেখানে বলছে, সে তো দুই দিনের পথ। মানে জিরো পেরিয়ে ডাপারিজো। সেটুকু তবু গাড়িতে যাওয়া চলে। তারপর বনের মধ্যে চড়াই উৎড়াই ধরে হাঁটুন।

ভদ্রলোক আদি ভাষায় আমার পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললেন তাকে। তার কথা শুনে লোকটি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল।

দারুন টাচি, মশায়, দারুন টাচি। এরা যা মনে করে, সেটা না হলে মুহূর্তে বড় স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। একেবারে ছেলেমানুষের মত স্পর্শ-কাতর। দেখলেন, মুখখানা কেমন গোমড়া করে ফেলল?

না। বেশি কথা হয়নি। সমতল-ভূমি মানুষের সঙ্গে এমনিতেই এরা কথা বলে কম। নিমন্ত্রণ যখন রাখতে পারলাম না, তখন এক্ষেত্রে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে হ্যাঁ, আমাদের ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটিকে বাহাদুর বলতে হবে। আদিদের কী করে মানভঞ্জন করতে হয় সে সব কায়দা কানুন তিনি জানেন। আমাকে কী করতে হবে এখন, কানের কাছে ফিস ফিস করে সে কথাও জানিয়ে দিলেন তিনি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। কিছু দূরেই ছিল সিগারেটের দোকান। তড়িঘড়ি সেখান থেকে প্যাকেট পাঁচেক চারমিনার কিনে নিয়ে এসে হাজির হলাম চায়ের দোকানে।

ভদ্রলোক ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে চারমিনারের প্যাকেটগুলি নিয়ে পদমটির দিকে এগিয়ে দিলেন। এবং বিনয়ের হাসি হেসে আমাকে দেখিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমার বন্ধুটি দারুণ খুশী। তোমার জন্যে এই যৎসামান্য উপহার।

সিগারেটের প্যাকেটগুলি পেয়ে প্রচণ্ড খুশী হয়ে উঠল সে। কঠিন পাথরের মধ্যে থেকে যেন বেরিয়ে এল একটি সজীব সত্তা। সবাক।

চা এল। চায়ের সঙ্গে শুরু হলো এবার গল্প। গল্প মানে তার গ্রামের কথা। কোন কালে তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল তিব্বতে। সেখানে ঝগড়া বাধল নিজেদের মধ্যে। তারপর নিরাপত্তার জন্যে সিয়াং নদীর পাড় বেয়ে একদিন তারা চলে এলো অরুণাচলের পার্বত্য আশ্রয়ে। গল্প মানে তাদের জীবনের কথা। চাষ-

ইয়াজালিতে (অরুণাচল)

হাকোলিতে আপাতানি মহিলা

উপত্যকার ওপাড়ে হাপোলি

আদি রমণী তাঁতে কাপড় বুনছে (অরুণাচল)

আবাদ। মিথুন। ভূত প্রেত কী করে সায়েস্তা করতে হয়, মৃত্যুর করাল স্পর্শ থেকে গ্রামবাসীকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়—অনেক—অনেক অলীক কাহিনী। অলীক! আমাদের কাছে। ওদের কাছে এসব বিশ্বাস। ওদের কাছে জীবন মানেই তো এইসব। হাফোলি থেকে ইয়াজালি ফেরার পথে সেই বৃদ্ধ পদমটির কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কী সরলভাবেই না সিগারেটের প্যাকেটগুলি তুলে নিয়েছিল সে। যখন নিজের কথা বলছিল, অথবা তার গ্রামবাসীর কথা, কই, একবারের জন্যেও তো সে বলল না, তার জীবনে কোন বঞ্চনা আছে? অথবা কোন সমস্যা? অথচ তার প্রতিটি কথায় আত্মপ্রত্যয়। যেন, যা পেয়েছি, তার ওপর আবার কী চাই? মনে হলো, শহরের ইঁট পাথরের মধ্যে থেকে আমাদের যে মনটির জন্ম, তা দিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি ওই মানব শিশুদের মূল্যায়ণ করা কোন দিনই সম্ভব নয়। কিছু স্থূল সমস্যা ওদের অবশ্য আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার এবং আশ্রয়ের সমস্যা। এ সব সমস্যার সমাধানের জন্যে সরকারও অবশ্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জীবন মানে তো টাকা পয়সা শুধু নয়। বাহারি জামাকাপড় বা তথাকথিত বৈভবও নয়। পরিস্তৃত জীবনের জন্যে যে মূল্যবোধের প্রয়োজন, সেটা বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে বেঁচে থাকা বলে কি?

পথ চলতে চলতে এই প্রসঙ্গ নিয়েই কথা বলছিলাম ডঃ ত্রিপাঠীর সঙ্গে।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, কর মশায়: একটি পদম দেখেই আপনার এই কথা। আর আমরা তো বছরের পর বছর দেখে আসছি শ'য়ে শ'য়ে পদম, মিশমি, মিজু, মোনপা, আরও কত রকম ট্রাইব। আমরা ওদের ভয় পাই না। এই তো সেবার সিয়াং-এ গিয়ে আমাদের জিওলজিস্টরা ওদের মোশুপ-এ বাস করে এলো। জানেন বোধ হয়, ট্রাইবদের মধ্যে দু রকম ডরমিটারি আছে। মোশুপ এবং রাশেং। বিরাট চালাঘর সব। প্রথমটি আইবুড়ো ছেলেদের জন্যে। দ্বিতীয়টিতে বাস করে গ্রামের আইবুড়ো মেয়েরা। এই ডরমিটারিতে একত্রে বাস করার সময় ছেলে মেয়েরা সংসারের সব হাল পত্তর শিখে নেয়। একবার যদি গ্রামবাসীদের আপনি আপন হতে পারেন, আর কোন ভয় নেই, বলুন, ওদের সাহায্য না পেলে অরুণাচলের এসব দুর্গম এলাকায় কোন দিন জিওলজি হতো, মশায়?

জানি না, হতো কী না। হলেও সে কাজ যে সহজসাধ্য হত না, সে কথা না বললেও চলে।

সুবনসিরির কথা আগে বলেছি। তারপর ধরুন সিয়াং অঞ্চল। সিয়াং নদীর নামে যার নাম। পাশিঘাট এক সময় যার হেডকোয়ার্টার্স ছিল। এখন আলং। পশ্চিমে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর শিবালিক পর্বতমালার সানুদেশ। অবশেষে পাহাড় যার সমতলে পরিণত হয়েছে সিয়াং নদীর পূব দিকে এসে। সিয়ম নদীর দক্ষিণে দেখতে পাবেন হিমালয়ের

সিয়াং জেলার মিনিয়ং শিকারী

আলং উপত্যকায় এবং সিয়াং উপত্যকার ওপরের অংশে। আছে অজস্র পার্বত্য নদী। সমতল থেকে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান। তাপমাত্রা কমবে। শীত। ক্রমে আরও শীত।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, সিয়াং জেলার দক্ষিণ দিক বরাবর যান। দেখবেন পাললিক শিলা। মানে বেলে পাথর, শেল, ক্লে, এই সব। মাঝে মাঝে গনডোয়ানা এবং টারসিয়ারি যুগের কয়লাও চোখে পড়বে আপনার। গনডোয়ানা মানে পনের থেকে ত্রিশ কোটি বছর পুরনো। আর টারশিয়ারি মানে এক কোটি থেকে সত্তর লক্ষ বছরের মধ্যে।

পাওয়া গেছে। অনেক কিছুই পাওয়া গেছে এই সিয়াং জেলায়। বামে থেকে সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দূরে তাই গ্রাম। এখানে সন্ধান মিলেছে গ্র্যাফাইটের। আলং থেকে পাং সিং যাওয়ার পথে তারক থেকে পাং সিং-এর মধ্যে পাবেন ডোলোমাইট। সিয়ম উপত্যকার ওপর দিকে ডাপু, লিপুসি এবং মেচুকায় জিওলজিক্যাল সার্ভে খুঁজে পেয়েছেন ভাল মার্বেল পাথর। দলাই এবং কাবুতে পাওয়া গেছে প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি টনের মত চুনা পাথর। সন্ধান মিলেছে তামা, দস্তা, লোহার।

অরুণাচল হলো জিওলজিস্টদের মক্কা। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডঃ ত্রিপাঠী। —এখানকার অনেক কিছু এখনও পর্যন্ত তো জানতেই পারিনি আমরা। পথের দু পাশে বন জঙ্গল দেখছেন তো? রাস্তা কোথায় যে, পাথর খুঁজতে যাবেন? ট্রাইব আমাদের কাছে কোন সমস্যা নয়, মিঃ কর। সমস্যা হলো পথঘাট। কম্যুনিকেশন। এখানে এমন জায়গা আছে, যেখানে গেলে তো আপনি বেপাত্তা। যতক্ষণ না ফিরে আসছেন, আমরা বলতেই পারব না, আপনি আছেন, কি গেছেন।

আপার আসামের সমভূমি। তার দক্ষিণে পাহাড়ী রাজত্ব। উত্তর-পূর্ব বরাবর এগিয়ে গিয়ে মিশেছে নাগা পর্বতমালার সঙ্গে। উত্তর-পূর্বে লোহিত পর্বতমালা। উত্তরের পাহাড় সব চেয়ে উঁচু। দুই হাজার মিটার পর্যন্ত। আর এই নিয়ে তৈরি তিরাপ জেলা। তিরাপের পূর্বাঞ্চল থেকে নেমে এসে উত্তর-পশ্চিম বরাবর বয়ে চলেছে তিরাপ, নামচিক এবং নামফুক বা বুড়িডিহং নদী। আর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে ডিরাক, লামসাং এবং তিসা। এখানে তিন শ' ষাট কোটি বছর পুরনো পরিবর্তিত শিলাও যেমন দেখতে পাবেন, সেই সঙ্গে দেখতে পাবেন সাত কোটি বছরের পুরনো পাললিক স্তর। নামচিক-নামফুক এবং মাইওবুমে আছে অঢেল কয়লা। পাটকই পর্বতমালায় তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, ভোগাপানি এবং খোলসায় পিরাইট এবং পাইরোটাইট। বুড়িডিহং-এর বালিতে সোনা পাওয়ার প্রবাদও প্রচলিত কাহিনী। তবে ভূতাত্ত্বিকদের যা অবাক করেছে, তা হলো, বড়দুরিয়া, খোলসা এবং নামসাং-এর চারপাশের অজস্র প্রস্রবণ এবং কুয়ো। যাদের জল অত্যন্ত লবণাক্ত। এই জল বাষ্পীভূত করেই ওই সব ধরে নুন তৈরি করে আসছে। এক সময় এই অঞ্চলটি হয়ত সমুদ্র অধ্যুষিত ছিল।

চলুন লোহিতে। অরুণাচলের এটাই বৃহত্তম জেলা। এর দক্ষিণে তিরাপ, পশ্চিমে সিয়াং এবং উত্তর ও পূবে চীন। জেলা শহর তেজু। হিমালয়ের একটি বড় অংশ এই অঞ্চলে অবস্থিত। ৫৫০০ মিটার উঁচু পাহাড়ের চূড়াও আপনি দেখতে পাবেন এখানে। দেখতে পাবেন লোহিত এবং ডিবং নদী। নেমে আসছে হিমালয়ের ওপর থেকে। এছাড়া দেখবেন, হিমালয়ের ডাফাভুম পর্বতমালা থেকে নেমে আসছে কামলাং এবং নোয়া ডিহিং। প্রায় তিন হাজার মিটার ওপরে দেখবেন শতখানেক হ্রদও।

লোহিতে পাওয়া গেছে অ্যাসবেসটস। তেজু-হায়ানলিয়াং পথের ওপর। এবং ডিবং উপত্যকার উত্তরে রোয়িং-হুনলি পথের পাশে পাওয়া গেছে গ্র্যাফাইট। তেজু থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে লালপানিতে। তেজু থেকে পয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে টিডিংএ পাওয়া গেছে সিমেন্ট তৈরি করার মত প্রচুর চূণাপাথর। মার্বেল পাথর, ম্যাগনেশিয়া, ইত্যাদি।

তুলনায় কামেং জেলার ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস অনেকটা জানা। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বর্তমান শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত অরুণাচলের পশ্চিম প্রান্তের এই জেলাটির বেশির ভাগ জায়গায় ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সংস্থা ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। এখানে সন্ধান মিলেছে তিন শ' কোটি বছর পুরনো পরিবর্তিত শিলার অস্তিত্ব। সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ বছর পুরনো গনডোয়ানা ভূস্তর, অথবা সত্তর লক্ষ বছর পুরনো টারশিয়ারি যুগের শিলাস্তূপ। পাওয়া গেছে কয়লা, তামা, সিসে, কোয়ার্টজাইট, ডোলোমাইট, মারবেল এবং চূণা পাথর।

শম্ভু সেন বলেছিলেন, দারুণ, মশায়। দারুণ ব্যাপার। জিরো পয়েন্ট থেকে যে জিরো-সেপ্পা রোড গেছে সে পথের ৮৮ কিলোমিটার স্টোনের কাছে গেলেই দেখতে পাবেন ব্যাপারটা। একেবারে তামা। আমরা এখনও অনুসন্ধান চালাচ্ছি। আমাদের ধারণা বেশ ভাল রকম তামাই পাওয়া যাবে এখান থেকে। সে তামার দামটা একবার ভাবুন।

আশার কথা সন্দেহ নেই। ভাবছিলাম, এই সব প্রাকৃতির সম্পদ যেদিন উন্মীলিত হবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অরুণাচলের মানুষ অনেক সমৃদ্ধ হবে হয়ত। কিন্তু কবে আসবে সেদিন? অরুণাচলের মানুষ কি জানেন প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে কত বেশি সমৃদ্ধ তাঁরা? আমি জানি বেশির ভাগ মানুষই এসব খবর রাখেন না। রাজনীতির নামে স্বাধীনতার পর থেকে গুটিকয় মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, দলীয় দ্বন্দ্ব যে ভাবে চলছে, এ ধরনের সংগঠনশীল ভাবনাচিন্তা জনসাধারণের মনে প্রোথিত করা তাতে করে কখনই সম্ভব হয় না। আর সম্ভব যদি না হয়, জনকল্যাণ তো ফানুস!

বিকেল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আকাশও বেশ থমথমে হয়ে এসেছে।

আমরা হাজির হতেই ক্যাম্প থেকে হই হই করে বেরিয়ে এলেন এম কে অগ্রবাল, মিঃ হোসেন এবং কে ভি মোহন। অগ্রবালের পেছনে পেছনে এলেন তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলাও ভূতত্ত্বের ছাত্রী। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বয়েস কম।

বরদোলৈ সাহেব ছিলেন আমার পাশেই। তাঁর কানে ফিস ফিস করে বললাম, পথের ক্লান্তি দূর হলো এতক্ষণে।

কেন বলুন তো! বরদোলৈ সাহেবের কণ্ঠে বিস্ময়।

বুঝলেন না, সুন্দর মুখ। এতক্ষণ পাথর আর বন জঙ্গল দেখে দেখে লাইফ হেল।—

আমার কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন উর্ধ্বকক্ষ বরদোলৈ। একেবারে প্রাণখোলা, উদাত্ত হাসির সবাইকে শুনিয়ে আমার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন।

আর এক চোট হাসির দমক।

এবার কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমি বললাম, হাসুন, আপত্তি নেই। তবে আমি একটি সত্যি কথা বলেছি। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে একটি রমণী-মুখ কত প্রশান্তির অগ্রবাল সাহেব নিশ্চয় তা বুঝতে পারছেন। তবে এ কয় দিনে বুঝেছি, এমন সৌভাগ্য কমজনের কপালেই লেখা থাকে।

রাইট্! পেছন থেকে শব্দ এলো। কথা বললেন মোহন।

মোহনের দিকে চোখ পড়তে ম্লান হাসি হাসলেন তিনি। বললেন, কেন 'রাইট' বললাম সে কথা আপনাকে পরে বলব, মিঃ কর।

মিসেস অগ্রবাল দেখলাম দারুণ স্মার্ট। আসামের মেয়ে। ভাল বাংলাও জানেন। বললেন, আমার তো জিওলজি ছিলো। তাই অসুবিধে হয় না। ও নানা রকম নমুনা আনে। আমি দেখি। দেখে আনন্দই পাই। কখনও কখনও লেখার ব্যাপারে ওকে সাহায্যও করি আমি।

শুধু জিওলজিই নয়। সংসারও যে গুছিয়ে করতে পারেন, তাঁর ক্যাম্পে তারও নমুনা দেখলাম। বন থেকে সংগ্রহ করেছেন মোটা বাঁশ, নানা রকম গাছের বাঁকা-তোবড়া ডাল। এ সব দিয়ে ভেতরটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। ছোট ছোট ভূতাত্ত্বিক নমুনা দিয়ে তৈরি করেছেন কিউরিও।

ডঃ ত্রিপাঠী তাগাদা দিলেন, মিসেস অগ্রবাল, এবার আপনি তা হলে অতিথিদের পেটের ব্যবস্থা করুন। আমরা বরং একটু প্রোফেশনাল কাজটি সেরে নিই। বলেই চাইলেন মিঃ অগ্রবালের দিকে।

অগ্রবাল বললেন, সব রেডি আছে। স্যাম্পেলগুলি আমি আনিয়ে রেখেছি।

অগ্রবালের সঙ্গে আমরা ক্যাম্পের বাইরে এলাম। সেখানে দেখি একটি টেবিল। টেবিলের ওপর পর পর সাজানো রয়েছে একচাল্লিশ কিলোমিটার ক্যাম্পের কাছে যে ড্রিলিং চলছে তার নমুনা। বেশির ভাগই বেস মেটাল। তামা, কোবল্ট, নিকেল, ইত্যাদি।

দেখলেন ডঃ ত্রিপাঠী। মন্তব্য করলেন— আত্মগতভাবেই—লুক্স গুড্।

তৃপ্তি? হয়ত তাই। ভূতাত্ত্বিকদের জীবনে কষ্ট আছে অনেক। কিন্তু সে সব কষ্ট মুহূর্তে তাঁরা ভুলে যান। অনুসন্ধানের সাফল্য ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে যেন ছাপিয়ে যায় সব সময়।

ইয়াজালির বেস ক্যাম্প থেকে কিমিন রোডের সেই একচাল্লিশ কিলোমিটার ড্রিলিং ক্যাম্পেও সেই একই ব্যাপার। রাস্তা থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে সুবনসিরি নদী। তার ওপর বেতের সেতু। এ বস্তুটি যে কী ভয়াবহ আমরা কল্পনাই করতে পারব না। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দুলতে থাকে। এক সঙ্গে দুই তিন জনের বেশি পার হওয়ার নিয়মও নেই।

নিশিদের বাড়ি (সুবর্ণসিরি)

সেতুর মাঝখানে এলে দুলুনি বাড়ে। তখন প্রায় পাঁচশ' ফুট নিচে নদীর দিকে চাইলে মনে হয়, মৃত্যু যেন পায়ের সামনে। এই সেতুর ওপর দিয়েই জিওলজিস্টরা সন্তর্পণে পারাপার করেন। ওপারে আবার খাড়াই পাহাড়। এবার পায়ে হেঁটে ওঠো দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ডগায়। সেখানে বসেছে ড্রিল। ড্রিল চলে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। বেস মেটালের নমুনা সংগ্রহ চলে ততক্ষণ। দিনের শেষে আবার ফেরার পালা। হাতে তখন একটি করে থলে। থলে ভর্তি নমুনা। আর বেতের সেতুর নিচে মরণ ফাঁদ।

এই ক্যাম্পেই দেখা হলো জিও-ফিজিসিস্ট বিনয়চন্দ্র সাইকিয়া এবং তাঁর দুই সহকারী কল্যাণ সাহা এবং সুরেশ সিং-এর সঙ্গে।

বিনয়বাবু বয়েসে কিছুটা প্রবীণ। বললেন, এই দেখুন না। এই যে দেখছেন সছিদ্র পাত্র। এর মধ্যে আছে দ্রবণে ডোবানো আছে একটি করে তামার দণ্ড। একে আমরা বলি নন-পোলারাইজিং ইলেকট্রোড। এক সঙ্গে দুটি করে পাত্র নিই আমরা। তারপর পাত্র দুটি কোন জায়গার ভূস্তরের দুটি স্থানে বসিয়ে ওই দুই জায়গার তড়িৎ বিভব মেপে চলি আমরা। এই তড়িৎ বিভব দেখে আমরা অনুমান করতে পারি কী ধরনের ধাতু সেখানে থাকতে পারে। কখনও কখনও কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দুটি ইস্পাতের দণ্ড পুঁতে দণ্ড দুটি তার দিয়ে জুড়ে দিই এবং সেই তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করি। এতে ওই তারে কতটা রোধ বা রেজিস্ট্যান্স ধরা পড়ল তা দেখেও ভূস্তরের ধাতু বা অধাতুর অস্তিত্ব ধরতে পারি আমরা। আরও নানারকম পদ্ধতিও এ ব্যাপারে আমরা কাজে লাগাচ্ছি।

প্রচণ্ড উৎসাহ ভদ্রলোকের। ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে এই বয়েসেও তিনি যে ধরনের কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছেন তার যেন তুলনাই হয় না।

মোহন ঘুরে ঘুরে করছিল আমার পাশেই।

বললাম কিছু বলবেন, মিঃ মোহন?

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেন চ্যাঙ দোলা করেই একান্তে সরিয়ে আনলেন মোহন। তারপর বললেন, আই অ্যাম ভেরি ভেরি হোম সিক্, মিঃ কর। আই লাভ মাই ওয়াইফ্।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। তা হলে, এই হলো মোহনের সেই টপ্ সিক্রেট কথা?

অন্ধ্রের ছেলে। তা হোসেনও তো আলিগড় থেকে এসেছেন এখানে কাজ করতে। তাঁকে তো এতটা করুণ মনে হয়নি?

কথাটার উল্লেখ করতেই মোহন

ওয়াইফ, জাস্ট লাইক মিঃ আগরওয়াল।

তা আপনিও তো বউকে এখানে নিয়ে আসতে পারেন? আমার প্রশ্ন।

কী করে আনবো? আমার ছেলে আছে না? দশ বছরের ছেলে। শিলং-এ তার মায়ের কাছে থেকে স্কুলে পড়ছে। তার মাকে নিয়ে এলে সে সেখানে থাকবে কী করে?

তা অনেকেই তো এইভাবে চাকরী করে, মিঃ মোহন। একবার কল্পনা করুন। আপনি তবু আছেন মাটির ওপর। এখান থেকে শিলং এমন কোন দূরের পথ নয়। ইচ্ছে করলেই আপনি বউ ছেলেকে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। অথচ ধরুন তাদের কথা— জাহাজে যারা কাজ করে। বন্দর থেকে জাহাজ নোঙর তুলল তো, মাটি দূর অস্ত্। মাসের পর মাস শুধু জল আর জল। ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় ফেরার পথ থাকে না। জলের ওপর প্রাণ হাতে করে জীবন কাটানো শুধু। তাদের চেয়ে আপনি কি ভাল নেই? যাঁরা সেনা বিভাগে কাজ করেন, তাঁদের কথা ভাবুন।

বললাম বটে। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কথাগুলি তাঁর কাছে উপদেশের মতই শোনালো হয়ত। কিন্তু এছাড়া কীই বা আমি বলতে পারি?

ক্যাম্প নাম্বার একচাল্লিশ ছেড়ে যাত্রা করতে হয়েছিল সেই রাতেই। একেবারে সোজা তেজপুরে।

ওঁরা চাইছিলেন, সে রাতটা আমরা ইয়াজালিতেই থেকে যাই।

বাধ সাধলেন সমর চক্রবর্তী। বললেন, সেটা ঠিক হবে না। কারণ আগামী কাল সন্ধ্যের মধ্যে যে করে হোক আমাদের ডিমাপুরে পৌঁছতেই হবে। ফেরিতে ব্রহ্মপুত্র পার হতে হবে আবার। জীপের জন্যে অ্যাডভান্স বুকিংও করে রাখা হয়েছে।

আমি বললাম, তার মানে আবার প্রায় তিনশ' কিলোমিটার ড্রাইভ। এবং রাতে। কখন তেজপুরে পৌঁছবো মনে করেন, ডঃ চক্রবর্তী?

তা রাত তিনটে তো হবেই। একেবারে দার্শনিকের মত উত্তর।

কিন্তু ড্রাইভারদের কথা একবার ভেবে দেখেছেন? সেই সকাল থেকেই তো ওরা স্টিয়ারিং-এর ওপর বসে?

সমর চক্রবর্তীর উত্তর দেবার আগেই কথা বলল জনৈক ড্রাইভার। ঠিক আছে, স্যার। আমরা আজ রাতেই যাবো। তেজপুরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলেই চলবে।

ড্রাইভার ভদ্রলোকের কথায় অবাক হয়েছি। এত পরিশ্রমও মানুষ করতে পারে?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চও অনুভব করলাম।

নাগাল্যাণ্ড! এবার যাচ্ছিফিজোর দেশে, নাগাল্যাণ্ডে। শুনেছি, যেখানে পথের পাশে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বিদ্রোহী নাগারা প্রহরা গোনে। তাদের আচার বিচিত্র। যাদের কাছে সমতলের মানুষ মানেই ইনডিয়ান। আর ইনডিয়ান মানেই বিদেশী।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

[ক্রমশ]

অরণ্যদেব

কাহিনীর চুম্বক...
মধুচন্দ্রিমা যাপনের সময় অরণ্যদেব ও ডায়ানাকে ডাকাতরা আক্রমণ করেছিল.....

পরে সেই তিন দস্যু নদীর দিকে পালায়.....,
নৌকোটা চাই!
কেড়ে নিলেই হয়!

অরণ্যদেব ও ডায়ানার মধ্যে এখন আট হাজার মাইলের ব্যবধান...
আঃ, কী সুন্দর ছিল সেই সোনা-বেলা!

সবটাই যেন স্বপ্নের মতন লাগছে!
...দুটি মন.....কিন্তু একই চিন্তা.....

রাইফেল তো খুঁজে পেয়েছিলুম...কিন্তু দস্যুরা ইতিমধ্যে পালায়...
তারা নদীর দিকে যায়...

জেলেকে জখম করে তার নৌকো নিয়ে সরে পড়ে...
লোকটা মরে যেতে পারত!
দস্যুরা শয়তান!
2/12

তোমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলব। ভয় পেও না!
ভয় পাব কেন? আপনি তো গরিবদের বন্ধু!

ম্যাক, তোমার চোয়ালে কিসের চিহ্ন?
এখানে?
আরে, তোমার মুখেও দাগ দেখছি!
লোকটা ওখানেই ঘুষি মেরেছিল!
খুলি-চিহ্ন! অরণ্যদেব!
চলবে

দুর্গাপুরের ডি ভি সি ব্যারাজ জল ছেড়েছে জোর আজ সকাল থেকে। কাল বিকেলে লাল ফ্ল্যাগ তুলে দিয়েছিল টাওয়ার-এর উপরে। তোড়ে নেমেছে ফেনা ভোলা জল দামোদরের বুক বেয়ে। দ্বিজপদ ও কেদার নীলরঙা নাইলনের বাঁধ-জালটা চরের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে শুকুবার জন্যে। আজ বুঝি আর জাল ফেলা যাবে না। রোজগারপাতি হবে না কিছুই।

অ্যানিকাটের সামনে একটা চোরা ঘূর্ণী আছে। গত বছর ওপারের বেলোয়া গাঁ থেকে দুটো ছেলে ধান নিয়ে আসছিল চাকতেতুলের ধানভাঙা কলে ভাঙবে বলে। হঠাৎ এই ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে নৌকোসুদ্ধ তলিয়ে যায়। তারপর থেকে ঐ জায়গাটা বাঁচিয়ে চলে জেলেরা।

গামছা পরা উদলা গায়ের ছোঁড়াগুলো পোলো আর খেপলা জাল নিয়ে অ্যানিকাটের ঠিক নীচে যেখানে কংক্রীটের বেঁটে বেঁটে থামগুলো আছে জলের তোড় রোখার জন্য সেখানে অন্যান্য দিন ঝাঁপাঝাঁপি করে বেড়ায়। কখনও সোনাট্যাংরা, চিংড়ি বা বাটা পেলেও পায়। কিন্তু আজ নদীর চেহারা দেখে তারাও আর এমুখো হয়নি; রোণ্ডিয়ার মোরাম ঢালা পথে মেহগিনী গাছগুলোর নীচে দল বেঁধে ডাংগুলী খেলছে।

পরেশ গুপ্তর দেশ ছিলো উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে। গোলাপজলের নামী জায়গা। হলে কী হয়, গত তিরিশ বছর সে বাংলাদেশে। এই পানাগড়-বর্ধমান রোণ্ডিয়ার আশেপাশেই। খড়ে-ছাওয়া ঘর বানিয়েছে একটা কানালের বাঁধের পাশে। চা-সিগারেট বিক্রি করে। মাছ কেনে জেলেদের কাছ থেকে—কিছু লাভ করে ছেড়ে দেয় শহর থেকে গাড়ি চড়ে আসা বাবুদের কাছে। ভাল দামেই বিকোয় মাছ। শহরের দামেই প্রায় বলতে গেলে। যেহেতু আড়, চিতল, কালবাউশগুলো নড়াচড়া করে, বাবুরা চেপে জান। বলেন, টাটকা ত! শহরে যে মাছ পাই তা তো বরফচাপা।

আজকাল টাটকা মাছেও গন্ধ হয়। কোক্ ওভেনের জল মেশে দামোদরে। নদীর জলে গন্ধ; মাছে গন্ধ। কত সব কলকারখানা হয়ে গেছে নদীর উত্তরে। জলে হরজাই বিষ পড়ে। গরমের সময় বা শেষ শীতে জল কমে গেলে মাছ সব বিষে মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। বড় বড় রুপোলী চিতল—লেজে হলুদ-কালো বুটি দেওয়া। দেখলেও, চোখে জল আসে। রোদ পোয়াতে পোয়াতে নদীর বুক বেয়ে, ফুলে-ওঠা মরা গাছগুলো তখন ভেসে যায় দক্ষিণের চরের শেয়ালদের খোরাক হয়ে। শালা শেয়ালদের খাটা-খাটনী নেই। দিব্যি আছে। মাছ খাচ্ছে, গান গাইছে; বাচ্চা বিয়োচ্ছে।

পরেশ বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। দোকানে খরিদ্দার নেই। একটু আগে রোণ্ডিয়ার বাংলো থেকে মাছ কিনতে এসে মাছ না পেয়ে এক বাবু কিছুক্ষণ বসেছিলেন। চা চেয়েছিলেন। সংগে দুটো লেড়ো বিস্কুট। বলেছিলেন, ছেলে-বেলায় লংকার গুঁড়ো-মাখা লাল লাল ঝাল লেড়ো পাওয়া যেত। এখন ছেলেবেলারই মত ছেলেবেলার সব ভালোলাগার জিনিসগুলোও হারিয়ে গেছে একেবারে।

পরেশ বলেছিল, সত্যি কথা। সব কিছু ভাল জিনিসই হারিয়ে গেছে দুনিয়া থেকে। তারপর দূরের টিপ্‌কলের জল এনে চা করে দিয়েছিল বাবুকে। নদীর জলেও গন্ধ। মড়ার কোক্ ওভেন এদের সকলকে মেরে তবে ছাড়বে।

চা খেয়ে, বাবু চারধারের ছিনিক-বিউটির তারিফ করে চলে গেছে।

পরেশের কালো-ভুটিয়া কুকুরী লক্ষ্মী খড়ের চালার বাইরে ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল নদীর হাওয়ায়। ক'দিন থেকে রোদ নেই। মেঘ করে আছে সব সময়। কখনও বাড়ে, কখনও কমে, বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে। বেশ হিমহিম ভাব। নদীর হুহু হাওয়ায় ঘুম আসে। লক্ষ্মী আরামে ঘুমোয় মেঘের ছাতার নীচে।

হঠাৎ ভুক্-ভুক্ করে ওঠে লক্ষ্মী। পরেশ চোখ তুলে তাকায়। বিড়িটাতে শেষ টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। সনাতন আসছে। সনাতন আঁকুড়া।

ছেলেটাকে এড়িয়ে চলতে চায় পরেশ, কিন্তু ভালোবাসার ভান করে।

সনাতন প্রায় ছ' ফিটের মতন লম্বা। কালবাউশের মত গায়ের রঙ কিন্তু তাতে পানকৌড়ীর জেল্লা। চ্যাটালো বুক। বুকে কোনো ভাঁজ নেই। অথচ চওড়া বিরাট। কাঁধ থেকে মাথাকে তফাত করেছে একটা লম্বা গলা। শীতের নদীতে আসা বিদেশী হাঁসের গলার মত। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবি।

পার্টি করে সনাতন। এবারে এদিকে পঞ্চায়েত ইলেকশনে কম্যুনিস্টরাই ছিট নিয়েছে সবচেয়ে বেশী।

পরেশ ভাবে, সনাতন ছেলে ভাল। রাগী একটু বটেক—তবে সোজা। পরেশ ওকে ভয় পায়, কারণ পরেশ ব্যবসাদার। মুনাফা উঠিয়ে ও খায়। যদিও ও ভোট দেয় বাবুদের। তাতে সনাতনের খুশী হওয়ারই কথা। পার্টি-করা ছোঁড়ারা অনেকেই নিজের নিজের ধান্দায় সকলকে চোখ রাঙিয়ে বেড়ায়। এর টুপি ওকে পরায়। কিন্তু সনাতন অন্যরকম। এরকম ছেলে যে দলই পাবে, সে দলের মান-প্রতিপত্তি বাড়বে বলেই পরেশের বিশ্বেস।

এখন সনাতন মাছেরই কেনা-বেচা করে একটু আধটু। এর আগে ও পানাগড়ের মিলিটারী ক্যাম্পে একজন এম ই এস-এর ঠিকাদারের কাছে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। তখন পেতো দিনে আট টাকা। ওখানে টিকে থাকলে আরও বেশীই পেতো আজকে। সেই বাবু একদিন মাছ কিনতে এসে বলে গেলো, এখন মিস্ত্রীরা নাকি দিনে চোদ্দ টাকা পাচ্ছে।

সনাতনের লোভ নেই টাকায়। পেট চললেই হল কোনোক্রমে। টাকা

কেয়ো-কার্পিন আপনার সুন্দর কেশরাশি
আরও সুন্দর আরও মসৃণ ক'রে তুলবে

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেলের
তৈরী

O:KB-6/78

স্বজনহীন সনাতন অনেক কিছুই ভাবে। সব অন্য রকম ভাবনা।

সনাতন পরেশের দোকানে ঢুকল। ঢুকে, মাচায় বসল।

কেউ কোনো কথা বলল না। মাচা থেকে খাতাটা তুলে নিল সনাতন। খাতায় মাছের হিসেব দেখল। তারপর খাতাটা নামিয়ে রাখল।

পরেশ বলল, চা হবে নাকি?

সনাতন বলল, তুমি খাবে ত হোক।

আমি ত এই-ই খেছু।

তালে থাক্।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। বাইরে লক্ষ্মী খচ্‌খচ্ করে নখ দিয়ে গা চুলকাচ্ছে তার শব্দ কানে এল। মেছো চিলের তীক্ষ্ম স্বর জলের উপর দুবার কেঁপে স্থির হয়ে গেল।

পরেশ বলল, পালা এগোল কদ্দুর?

সনাতন খুশী হল। হেসে ফেলল।

বলল, দূ—র্। সবে ভূমিকাটা হল। এখুনি কী। ঈ সব তাড়ার কাজ লয় গো।

ভূমিকে হল কেমন? পরেশ একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে শুধালো। যেন পালা-টালাতে পরেশের বড়ই উৎসাহ।

সনাতন বলল, ভূমিকার আর ভালোমন্দর কী? আসল পালাতে আসি আগে। অনেক সময় লাগবে। এমন পালা আগে লেখা হয় নাই। কেউ লেখে নাই।

পরেশ সনাতনকে খুশী করার জন্যে বলল, তা ত বটেই। পালা লেখা কী ইয়ার্কি-কথা। ত তাড়াতাড়ি শেষ করলে এখানে সামনের পুজোয়, কি কাহেবা-মানায় বেহুলা-লখীন্দরের মেলায় মাঘ মাসে, নয় ত নিদেন চাক-তেঁতুলের গাজনের সময় পাবলিক্‌কে শুনিয়ে দেওয়া যাবেক্। তুমি তড়িঘড়ি লিখে ফেলো না— তারপর পালা যাতে হয় তা আমরা দেখবু।

সনাতন বলল, এ পালা শুধু এ গ্রামের জন্যে লয় গো পরেশদাদা। আগে ছাপাব ঐটাকে—তারপর গ্রামে গ্রামে সকলে করবে এ পালা। খেলা লয় এ। নতুন পালা।

ছাপাবে? বলে পরেশ গুম্ভ নড়ে চড়ে বসল।

তারপর বলল, ছাপাবার খরচ জোগাড় হবে কুথেকে?

সনাতন হাসল। বলল, মাছের কেনা-বেচা করছি কেন তালে?

পরেশ কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, তা করবে।

কিন্তু কান চুলকোতে চুলকোতেই পরেশের সন্দেহ হল যে, সনাতন পালা লিখলেও ছাপাবার টাকার জোগাড় করতে পারবে না।

আসলে সনাতন ত বেশী পড়াশুনা করেনি! বারাজের উপর যে পাথরের ফলকটা আছে ইংরিজীতে, সেই ফলকটাকে একদিন পরেশ পড়তে পেরেছিল।' জোরে জোরে। "রোগুীয়া উয়ার। ওপেনড বাই স্যার জন অ্যান্ডরসন গভর্নর অফ বেংগল, সেকেন্ড সেপ্টেম্বর, নাইনটিন্ থার্টি থ্রী। পড়ে শুনিয়েছিল সনাতনকে।

সনাতন ইংরিজী জানে না, বাংলাও তথৈবচ। পরেশ জানে, ইংরিজী না জানলি না বিদ্বেন হওয়া যায়, নেতাও লয়।

পরেশ গাজীপুরের স্কুলে পড়েছিল ফাইভ ক্লাস অবধি আর সনাতন পড়াশুনা করেছিল গাঁয়ের পাঠশালে; সামান্যই!

সনাতন বলল, কে কত পড়া-লেখা করল সেইটাই বড় লয় গো পরেশদা, বুঝলে? কে মানুষ কেমন, কার বলার কী আছে সেইটি হতিছে আসল কথা। পড়াশুনা করেও মানুষ অমানুষ হয়।

পরেশ ও সনাতন অদ্ভুত বাংলা বলে। গাজীপুরী উর্দুমিশ্রিত হিন্দীর সংগে রাঢ় বাংলার ভাষাকে আতপ চাল আর সোনামুগের ডালের খিচুড়ীর মত মিশিয়ে ফেলেছিল পরেশ।

সনাতনেরও বহু জায়গায় থাকতে থাকতে ভাষাটা মিশ্র হয়ে গেছে।

পরেশ বলল, কথাটা ঠিকেই বলছু তুমি। আসল হচ্ছে গিয়ে ভালোবাসা; লভ্। যদি দিশকে তুমি ভালোবাসো, তবে সেই দিশের পালা তুমার দিশের দশের কাছে উতরোবেক্‌ই গো উতরোবেক্। ভিতরে মাল লাগে গো, বিদ্যে ধুয়ে কী হয়?

সনাতন উত্তর দিলো না। চুপ করে বসে নদীর দিকে চেয়ে রইল। ওর বুকের মধ্যে রক্ত বর্ষার দামোদরের জলের মত চলাক্ চলাক্ করে ঘুরপাক্ খেতে লাগল। মনে মনে সনাতন বলল, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক পরেশদা।

আজ যেহেতু কোনো জেলেই জাল ফেললো না, মাছের আশা আর নেই। মাছ না উঠলে পাইকার, খুচরো খরিদ্দার, ফোতোপুর, কাহেবা-মানা, ওপারের বেলোমা, দূর দূর গ্রামের কোনো জায়গা থেকেই লোক আসবে না মাছের খোঁজে। সুতরাং পরেশের দোকানে চা-সিগারেট যে আজ আর বিক্রী হবে সে আশা কম। ঝাঁপ বন্ধ করল পরেশ। বলল, ঘর্‌কে যাব্। তু কুথাকে যাবি রে সনাতন?

সনাতন বলল, এই একটু ঘুরে-ঘারেই ফিরে যাবো।

ঝাঁপ বন্ধ করল পরেশ। তালাটা লাগাল। তারপর রোগুীয়ার দিকে পা চালাল। ওর কালো কুকুর, লক্ষ্মী পিছন পিছন চলতে লাগল মোরামের উপর খচ্ খচ্ আওয়াজ তুলে। বাঁধের কাছে এসে যেখানে বড় বড় কালো পাথরগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে অশত্থ আর সেগুনের চারা গজিয়ে উঠেছে সেখানটাতে একটু ভাল করে দেখে নিলো পরেশ।

ক্ষতি করে না কখনও সাপগুলো। কিন্তু গরম আর বর্ষার দিনে মাঝে মাঝে পথ জুড়ে শুয়ে থাকে। বড় বড় সাপ। চন্দ্রবোড়া, শংখচূড় গোখরো।

সনাতন পরেশের ঝাঁপ-বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। বাঁদিকে চলে গেছে কানালের পাশের বাঁধের পাড়ে পাড়ে মোরাম-ঢালা পথটা বর্ধমানের দিকে। এপথে যায়নি কখনও সে বর্ধমানে। কানালের ওপাশে দূ—রে কেয়ারী করা বাগান ঘেরা বাংলোটা। পানাগড়ের মিলিটারী সাহেবরা মাঝে-মাঝে পিক্‌নিকে আসেন। মাথার উপর লাল আলো জ্বালিয়ে ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল সাহেবদের গাড়িগুলো ভীড় করে মাঝে মাঝে।

কানালের পাশেই বাউড়িদের খড়ের ঘরগুলো। ওরা থাকতো চাকতেঁতুলে। দু'বছর আগে বাউড়িপাড়ায় এক নাম-না-জানা পোকার উপদ্রবে মারা যায় অনেক লোক। সে পোকা চোখে দেখেনি কেউ। কামড়াল, রে কামড়াল বলতে বলতেই যাকে কামড়াল সে মৃত্যুর গায়ে ঢলে পড়ে। ওরা তাই গাঁ ছেড়ে এসে কানালের ধারে নিজেদের ঘর বানিয়ে নিয়েছে। চাকতেঁতুলে মা-মনসা আর কালী মায়ের থান আছে। বাউড়িরা নাকি গরু কেটেছিল সেই থানে। সেই দোষে মায়েরা পোকা পাঠিয়ে ওদের শাস্তি দেন।

নদী থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। সনাতনের ঘাড় সমান বড় বড় চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সনাতন নদীর চরের দিকে এগোয়। ও বুঝতে পারে যে, আসলে ও কবি, লেখক। টাকা-পয়সা, মাছ-পাইকার এমনকি পার্টিও বুঝি ওর আসল ঠাঁই নয়। ওর বুকের ভিতর অন্য একটা মানুষ বাস করে। জনগণের কত দুঃখ দুর্দশা—কত কষ্ট মানুষের—দেশে নতুন দিন আনতে হবে—পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নতুন কথা শোনাতে হবে মানুষগুলোকে।

চরে নেমে এল সনাতন। বাঁয়ে পবনসাধুর পোড়ো আশ্রমটা। নিম তেঁতুল, আমলকী, বেলের ভীড় মাঝখানে। চারপাশে দু' মানুষ সমান করবীর বেড়া। পবন সাধু মরে গেছে। মায়ের মন্দির ছিল মাটির; তাও পড়ে গেছে। তবু এখনও গাঁয়ের লোকে মায়ের থানের দিকে পা দেয় না,—অন্য দিক দিয়ে পবন সাধুর আশ্রমে ঢোকে।

এখন জমজমাট আশ্রম বেলোমাতে। নদী পাড়ে। উত্তরপ্রদেশ থেকে সাধুরা এসে সিখানে আশ্রম বানিয়েছে। খেয়া পারাপার করে, মেয়েপুরুষে যায়। জেলেরাও ঘুরে আসে সময় পেলে।

সনাতন নিজেই নিজেকে বলে, আচ্ছা ভগমান নাকী নাই? পঞ্চায়েত ইলেক্‌শানে একজন বড় পার্টি-লিডার বক্তিমে দিতে এসে সনাতনকে বলেছিলেন কমোনিস্টোরা ভগমান মানে না। মানুষই হল গিয়ে ভগবান। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

কিন্তুক এই গাঁ-গঞ্জের লোকগুলোন যে ভগমান ভগমান করে পাগল। এদের ভাল করে বুঝাতে হবেক। বুঝাতে হবেক যে, ভগমানে আর কমোনিস্টোদের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। এসব বুঝাবে সনাতন ওর পালাতে। পালার মত একটো পালা লিখবে সে বটেক।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। লাল পাল তুলে বেলোমার দিকে খেয়া নৌকো সাবধানে নদী পার হয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ-মেঘালীর খেলা। ঘোমটা পরা, ঘোমটা খোলা। খেয়া নৌকোয় হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁস-মুরগী, মাটির জালা নিয়ে বেলোমার মেয়ে-মরদরা হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে। আজ হাট ছিল।

সনাতনের এই হাটের কথায় মনে পড়ল কথাটা। এই হাটটা আগে ছিল রোন্ডীয়াতে। কিছুদিন হল প্রতি হাটের দিন কতগুলো লোক এসে মদ খেয়ে হামলা করত। কখনও মেয়েদের হালকা বেইজ্জতীও করত—ঝুটঝামেলা। এই গা-গঞ্জের মানুষগুলো বড়ই থাড্‌কেলাশ শান্তিপ্রিয়—। কোথায় ঝামেলাবাজদের টাইট করবে তা নয়—ওখানে হাটই বসাবে না ঠিক করল সকলে মিলে। কী শান্তি, কী শান্তি। শেষে হাট গিয়ে বসল অন্য জায়গায় যেখানে ধান-ভানা কল, আটা-ভাঙ্গা চাকী—একেবারে হাটের মাঝখানেই ওদের কল হল। রথ দেখা কলা-বেচা ফিট্। ফোর-পাইস্ রোজগার হল গিয়ে। আর সেদিন থেকে সেই হামলা-করা মানুষগুলোও কুথায় জানি মেজিকের মতই অদৃশ্য হয়ে গেল। এসকলই বড়লোক-দের চক্কান্ত।

হঠাৎ একটা ঘুঘু ডেকে উঠল। ভিজে ঘুঘু বড় কড়া করুণ ডাকে। চারধারে বালি, বালিয়াড়ি সোঁতা। শরবন, আর কাশিয়া, নরম কালচে সবুজ—কী দিন টান—বৃষ্টিভেজা ঘুঘুর ডাক না, সনাতনের বুকের মধ্যে কে যেন ছুরি বসিয়ে দিল একটা—হ্যান্ডেল অবদি।

হঠাৎ হঠাৎই সোনামণির কথা মনে পড়ে গেল সনাতনের। চাকতেঁতুলের সোনামণি। বড় মন্দ মধুর মেয়ে সে। আজই না সকালে দেখা হল হাটে। হলোই ত মানিক। একবার দেখায় কী ভরে মন? না কী মন ভরায়? গাছ কোমর করে শাড়ি পরে হাটের মাঝে তার ভাইয়ের পাশে মাটিতে বসেছিল বুকের কাছে পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে দু হাত দিয়ে চার পা জড়িয়ে। আশপাশ সার সার নিমগাছ, আঁশফল গাছ, তালের সারি—একপাশে পুকুর। মধ্যে সোনামণি। কত লোকজন হই হই, শাক সবজি, বেলোয়াড়ি চুড়ি, রিবন ফিতে, তরল আলতা সোহাগী সিঁদুর, তার মাঝে সনাতনের সোনামণি।

হাটে কতরকম গন্ধ। গুড়ের গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, চালের গন্ধ, হাঁস মুরগীর গন্ধ, মানুষের ঘামের গন্ধ—কালো কালো চকচকে সব মানুষ যারা খেটে খায়—রোদে পোড়ে। বৃষ্টিতে ভেজে; যারা সনাতনের আসল বাঙলাদেশ তাদের সকলের সব গন্ধ মিলে নেশা ধরিয়ে দেয় সনাতনক। তার মধ্যে সোনামণি।

সনাতন চরের মধ্যে কাশিয়ার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাওয়ায় মুখ রেখে বলে, সোনামণি রে, সোনামণি, তোর বুকের খাঁজে কেমন গন্ধ রে মেয়ে!

তারপর হাত নেড়ে বলে, একদিন তুই আমার হবি, হবি, হবিই। সেদিন তোর সব গন্ধ নিবো দু নাক ভরে। তোকে এমন আদর করব না, তুই দেখিস

বেক নাই। আমি পালাকার, একদিন আমি পার্টির লিডার হব। আমার কথা নেবে, শুনবে দশ-বিশটা গাঁয়ের লোক—সেদিন তুই আমার পাশে থাকলি পৃথিবীটাকে আমি আমার হাতে নিব, হাঁ। দেখিস্ তুই।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা বহুদিন থেকে এসে চরে খড়ের ঘর করে রয়েছে। ক্ষেত লাগিয়েছে ওরা। তরমুজ করে, খেরো বোনে। চরে যা যা হয়, সব। জল বেড়ে বাড়লে কখনও কখনও আগে থাকতে বাড়ি ঘর তুলে নিয়ে বাঁধে গিয়ে থাকে কিছুদিন। আবার জল নামলে নেমে আসে।

ডানদিকে নদীটা চলে গেছে। ধু ধু বালির চর। সোনামণির অদেখা উরুও বোধহয় এই সোনালী বালির মতই হবে। ভাবে সনাতন। একমুঠো বালি তুলে নিয়ে গালে ঘষে। মুখে ঢুকে যায় কিছু। বলে থুঃ থুঃ।

তারপরই বলে, তোকে বলিনি কখনও সোনামণি। তুই আমার সোনামণি। তারপর নিজের মনেই বলে, ভালোবাসার বড় দুঃখ রে।

নদীটা কোথায় গেছে? এই চরের মধ্যে হু-হু হাওয়ায় দাঁড়িয়ে একথা প্রায়ই ভাবে সনাতন। শুনেছে, ভাগীরথীতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু কোথায়? কত দূরে! দুজনে কী মিলে এক হয়ে গেছে! দামোদর ত' নদ, আর ভাগীরথী নদী। নদ আর নদী মিললে কী এক হয়ে যায়?

মনে মনে জিগেস করে সনাতন, কী রে সোনা? জানিস তুই? নদ-নদীর মতন?

কতদিন ইচ্ছে করেছে একটা ডিঙিং নৌকো নে দাঁড় বেয়ে একা একা চলে যায় দক্ষিণে।—নদী যতদূর যায়—ততদূর। দু পাশের চর, গ্রাম, গাছ-গাছালি, দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে। সনাতনের যে পালা লিখতে হবে। দেশের জন্যে. গরীবদের জন্যে পালা। পালাকারের কী মিথ্যে সাজিয়ে চলে? অর পেত্যেক কথাটি সত্যি হওয়া চাই, তার কাছের মেয়ে পুরুষের মনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তাদের বুঝে, তাদের সঙ্গে কেঁদে, হেসে, মার খেয়ে অপমান সয়ে, তবেই না তাদের বাঁচার পথের হদিস্ দিবে সনাতন!

সনাতন ভাবে, ও লিখবেই। এদেশে এমন পালা আর কেউ লেখেনি কখনও। বুর্জো বাবুদের প্রেম ভালোবাসা জয় পরাজয় নিয়ে নয়—জনগণের পালা লিখবে সনাতন আঁকুড়া।

এবার চর ভেঙে বাঁধের পাশের পথে উঠে এল সনাতন। এদিকে অনেক লালভেরাণ্ডার গাছ। কী সুন্দর লাগে ছোট ছোট গাছগুলোকে। পাতাবাহারের মত। কী চিকণ উজ্জ্বল লাল আর কালো আর ফলসা রঙা পাতাগুলো।

সোনামণির বুকের রঙ ফলসা। একদিন হাটে সনাতন দেখেছিল। সোনামণি বসে হাঁসের ডিম বিক্রী করছিল—সনাতন দাঁড়িয়ে দর করতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছিল হলুদ ছিটের ঢিলে ব্লাউজের ফাঁকে।

সনাতন একটা লাল-ভেরাণ্ডার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দেখে বুলাল। বাঁধে উঠে এল সনাতন। ওপাশে বাউড়িদের বস্তি। ছোট ছোট স্বপ্নের মত খড়ের ঘরগুলো। কানালপারে একটাই সাঁই-বাবলা গাছ। তার পাশে খালি গায়ে, লাল শাড়ি পেঁচিয়ে কাঠের কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে বাউড়ি বউ শেষ বিকেলে। কী দারুণ একটা ছবি হয়েছে।

থমকে গেল কবি সনাতন।

সামনে দামোদরের বর্ষার লাল ঘোলা জল বয়ে চলেছে কানাল দিয়ে। তার পাশে বাঁধ। বেওয়ারিশ বেসামাল বাতাসে বারিষ-ভেজা মেছো বকের ডানার বাস। চারপাশে চুপচাপ্ চাপচাপ ফিকে সবুজ। কালো মেয়ের কোমর সমান চুল উড়ছে হাওয়ায়। উড়ছে সাঁই-বাবলার পাতা। বাউড়ি বউ-এর লাল শাড়ির আঁচল উড়ছে পত্‌পত্ করে।

চমকে গেল সনাতন। আদিগন্ত আকাশের পটভূমিতে সেই দুঃখী, দিন-কামিন বাউড়ি মেয়ের চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্ত ভঙ্গীটা আর হাওয়ায়-ওড়া অর উদ্ধত গর্বিত লাল আঁচল সনাতনকে যেন কোন্ অনাগত দিনের স্পষ্ট আভাস দিল।

সনাতন নিরুচ্চারে বলল, দিদি, আর কিছুদিন কষ্ট করো তুমরা—তারপর দেখো। আমরা সবাই বড়লোক হব। ভাল খাব, ভাল থাকব, ভাল পরব। বাউড়ি দিদি; তুমি দেখো। নতুন পালা লিখছি আমি। আমার নাম সনাতন। শুনে নাও গো তোমরা সকলে। সনাতন আঁকুড়া আমার নাম।

॥ ২ ॥

আকাশ মেঘে ঢাকা। একবার চাঁদ বেরুলো। বেরিয়েই ডুবে গেল পাতলা মেঘের আড়ালে। বড়জোর জল চলেছে আজ বিকেল থেকে। সনাতন ছেলেবেলা থেকে এমনটি দেখেনি। দূরে দামোদরের জল, চর; কাশিয়া আর শরবনের ভীড় এখন আর আলাদা করা যায় না। মেঘের পর্দা ভেদ করে ফিকে একটা রুপোলী অস্পষ্ট আভা রোন্ডীয়ার রাতের প্রকৃতিকে মুড়ে রেখেছে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত অ্যানিকাটের জলের আওয়াজ ঘুমন্ত গ্রামের খড়ের ঘরগুলোতে হামলে পড়ছে।

সনাতন তক্তপোশের উপর সোজা হয়ে বসল। লণ্ঠনটা সামনে করে। তারপর খাতাটা আর একবার বের করল বের করেই পাতা উলটোল।

জনগণের পালা

লেখক : শ্রীযুক্ত সনাতন আঁকুড়া

ভূমিকা

যে দেশে গরিব চিরজিবন অর্ত্যাচারীত, মানুষ মানুষের সম্মান পেল না সেই দেশেরই কবি আমি! বড়লোকেরা গরিবকে কাজে ব্যবহার করার পর যে দেশে লাথ মারে যে দেশে ট্যাকা [illegible] গাজনের মেলার তরে নয়, নয় এ লখীন্দর-বেহুলার উত্সবের জন্যেও। এ পালা নিরবধী কালের পালা।

সনাতন আঁকুড়া চীরদিন বাঁচবে না হয়ত, হয়ত সে নিচিহ্ন হবে টাকাওয়ালা মানুষের চক্রান্তে কোনোদিন, কিন্তুক শত শত সনাতন জনম নিবে এই নদিতিরে, এই রোন্ডীয়ায়।

সনাতন চিরদিন থাকবে না। নাই বা থাকল সে। অর পালা, তার গান গায়ে গায়ে, রোন্ডীয়ায়, চাকতেঁতুলে, ফোতোপুরে, কাহেবা-মানায় আর বেলেমায়ও সকলেরই মুখে মুখে ঘুরবে নিশ্চয়। আকাশ-প্রদীপ দিবে মা বোনেরা সনাতন আঁকুড়ার নামে—সেদিন এক সনাতন-এর ঠেঙে হাজার সনাতন জনম নিবে। জনম নিবে নিরবধী।

এইই প্রাথনা করে নিবেদক জনগণ সেবক সনাতন আঁকুড়া।

—ইতি উনত্রিশে ভাদ্র, তেরোশ পঁচাশী সন,
মোকাম, রোন্ডীয়া, জিলা বর্ধমান

ভূমিকার ওজস্বী ভাষাতে সনাতন নিজে পরম প্রীত হল। যে-কোনো কাজ ভাল করে করার পর, তা সমাপ্তির পর যেমন যে তা করে তার বড় ভাল লাগে, সনাতনেরও তেমনই ভাল লাগল। অনেকক্ষণ সনাতন খড়ের দেওয়ালকাটা জানালা দিয়ে বাইরের দূরের প্রায়ান্ধকার নদীর দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথা মনে এল আবার সনাতনের।

আজই সকালে নদীর চরে কেদার আর নিত্যপদদের মাছ ধরার নীল রঙা নাইলনের জালটা শুকোতে দেওয়া ছিল দেখেছে। জালটা বাধ-জাল। দাম নেছিল চার হাজার নশ টাকা। কিন্তু আগের সপ্তাহে ঐ জালটে দিয়ে এক বাধেই আঠারশো টাকার মাছ ধরেছিল ওরা।

কেদাররা সমবায় করেছে একটা। এ শালার দেশে এত কামড়া-কামড়ি খেউ-খেই যে নিজেরা নিজেদের ভালটা বোঝে কই? তাই-ই যদি বুঝত তবে কী আর এমন হত!

লোকগুলো সব কুঁড়েও বড়। একবেলা পেলে, তাই-ই ভাল, পেট মাদিয়ে খেয়ে নিয়ে নদীর হাওয়ায় গুঁড়িসুঁড়ি ঘুম লাগাবে। আর পচেষ্টা ছাড়া, মেহনত ছাড়া কোনো দিশ কী বড় হয়? চিনে কী হল? রাশিয়ায় কী হল? তারা কী এমনি এমনিই সব নায়েক হয়ে গেল নাকি? না খাটুনি কিছু হয়? কুঁড়ের জাতের খালি ঘুম আর যার যার মেয়েছেলের উপর হামড়ে পড়ে বাচ্চা বিয়োনো। শালারা যেন শুয়োর। মান নাই, সম্মান নাই, এক মুঠো ভাতের জন্যি নিজেরে বিকিয়ে দিয়ে দিব্বি পরমানন্দে পাঁকের মধ্যে, ময়লার মধ্যে বড়লোকগুলার পা চেটে দিন গুজরাচ্ছে। নিজেরা বড়লোক হবে যে সেসব

পয়লাটি লেখা। বাঁধ পরিবর্তন হয়। আসে।

শিল্পপতিরা সমবায়ের টাকা দিয়ে নাইলনের জাল, ফাৎনা এটা সেটা কেনে। ঐটেই আসল কথা। ক্যাপিটল। যার ক্যাপিটল-নাই তার নাইলন জালও নাই। আর এই ক্যাপিটল, বে-পরিশ্রমে বসে বসেই ডিম পাড়ে। সুদ, খাতির, প্রতি-পত্তি, ক্ষমতা, আরও টাকা। আরও ক্ষমতা।

হঠাৎ পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর শব্দে রাতের গায়ের আকাশ ভরে ওঠে। পানাগড়ের পথের দিক থেকে আসে আওয়াজটা। সনাতন ভাবে যে, এত রাতে কি মণ্ডলদের ট্যারেকটর চলছে? দিশা পায় না আওয়াজটা কিসের?

মণ্ডলরা বড়লোক। পাকা দালান, আটাকল, তাঁতাকল, পুকুর, ধান জমি আবার ট্যারেকটর। ঘন্টা প্রতি চল্লিশ টাকা ভাড়া খাটায়। এক সনের ভাড়ায় মেশিনটার পুরো দামই উঠিয়ে লেওয়ার মতলব লয় কী? সেই একই কথা—গোড়ার কথা—ক্যাপিটল। যার আছে সে রাজা ঃ যার নাই সে ফকির। বেশীর বড়লোকেরই ত ক্যাপিটল। গরীব ঠকায়। ন্যায্য গুণে, লোক না-ঠকায়ে, কটা লোকে ক্যাপিটল বানায় হে?

এই ফণী মণ্ডলের, লাটসাহেব ছেলেটার সঙ্গে একদিন লেগে যাবে সনাতনের। যদিও ওর বিবেক ওকে বলে মাথা ঠান্ডা রাখতে, বলে, মাথা গরম করলে লোকে সম্মান করেনা সনাতন। দেশের দশের কাজ করতি হলি অনেক অপমান অসম্মান সয়। সিটা তোমার নিজের অপমান বলে ভাবছ কেন? সেটা জাতির অপমান, গরীবের অপমান। সেই অপমানের আগুনেই ত খাঁটি ওয়ার্কার জ্বলে পুড়ে সোনা হয়। খাঁটি সোনা, গিলটি নয় হে।

মাথা গরম করে না সনাতন, কিন্তু একদিন করে ফেলেছিল। হাটের মধ্যেই থাবড়া কষিয়েছিল সজনে গাছের তলায় ফণী মণ্ডলের একমাত্র ছেলের গালে। সবজি বিক্রি করতে এসেছিল হারু দাস কাহেবা থেকে—ঢেড়স-এর দাম না কী বেশী বলেছিল তাই সটান লাথি চালিয়ে দিল ক্যাপিটল, গরীবের পেটে। সনাতন চিতাবাঘের মত পড়ল গিয়ে তার ঘাড়ে। জনতার প্রতিভূ সে। থাবড়ায় থাবড়ায় বাছার নরম তুলতুল গাল দামোদরের জলের মত লাল করি ছাড়ল। তখন তার চোখমুখের ভাবখানা কী, যেন গিলে খায়। ওদের যতেক কর্মচারী—তারা সনাতনেরই ভাই-বেরাদর চিনা-জানা সব শালা ক্যাপিটলের চাকর-দালাল শালারা। তেড়ে এসে ঘিরে ধরল সনাতনরে। কিন্তু বুড়ো ফণী মণ্ডল, বিড়েল-তপসী গলায় কণ্ঠী, মুখ-সুখ চেহারা, যার একমাত্র ভগমান টাকা, সে কী না এসে সকলের সামনে তার ছেলেকে বকল। বলল এ কী অন্যায়। লাথ মারো কেন বাপ তুমি, তুমি কী দেশের রাজা হলে চাঁদ? এ কী বেবহার? মানুষকে মানুষ জ্ঞান নাই?

তারপর সনাতনকে আদর করে গাল টিপে পিঠে নে হাত দে বলল, যা রে সনাতন বাপ, মাথা গরম করিস না।

সোনামণিও সেদিন হাটে ছিল। দূর থেকে সে সনাতনের দিকে আর পাঁচটা গাঁয়ের চাষাভূষা দিনমজুরের সংগে চেয়ে ছিল মুগ্ধ বিস্ময়ে; সম্মানের চোখে।

সকলে বলেছিল, হ্যাঃ, সাহস রাখে বটেক ছোকরা। হাটের মাঝে মণ্ডলের পোকে থাবড়া কষানো চারটি কথা না হে।

হাটের মালিকও দৌড়ে এসে বিবেদ মিটিয়ে দেছিল। তার হাটে কোনো ঝুট-ঝামেলা। পছন্দ লয় তার। ঝামেলি হলে হাট যদি আবার অন্যত্র চলে যায়? সকলেরই চিন্তা স্বার্থ,—সেই গোড়ার কথা—ক্যাপিটল।

শব্দটা আরো জোর হচ্ছে—পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর শব্দটা যেন গ্রামময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। দামোদরের জলের শব্দের সংগে ঐ শব্দটা যেন পাকায়ে যাতিছে।

সনাতন দরজা খুলে বাইরে এলো। আকাশ মেঘে ঢাকা। আলো নাই—ফ্যাকাশে অন্ধকার। দুর্গাপুর থেকে কি আবারও জল ছাড়ল নাকি ওরা? চর বাঁকি পুরো ডুবে যায়। বিষ্টি খুব হতিছে উত্তুরে—খবর পেয়েছে ওরা। চরে আছে মহিম ভাই আর নেতাই কর্মকার—পেশাতি ছেল কর্মকার আর এখন চাষ করতিছে খেরোর আর পাটের—শালার পেট এমনই জিনিস।

সনাতন ভাবল, ওদের একবার দেখে আসবে। লাল সিগন্যাল যদি না দেখে থাকে ত' ছাগল মুরগী বউ মেয়ে নিয়ে সব যে রাতারাতি ভেসে যাবেক গো ওরা।

হাতে লণ্ঠনটা নিয়ে নিল সনাতন। আঁধার রাত, এখন মা-মনসার পুজারীরা সব বেরুবে। সনাতন জানে, ওরা কিছু করবে না সনাতনকে। পতি-বছর কাহেবা-মানার বেহুলা-লখীন্দরের মেলায় গান বাঁধে সনাতন। সাপের ভয় করে না সে।

হুহু করি হাওয়া আসতিছে নদী থেকে। লণ্ঠনের আলোটা কাঁপে খালি। বাঁধের উপর দিয়ে চলল সনাতন—বাঁধ থেকে চরে নামবে সেই লাল-ভেরাণ্ডার জঙ্গলের মধ্যি দিয়ে, ভুবুরির পাশে পাশে পবন সাধুর আশ্রম পেরিয়ে নেতাই আর মহিমকে দেখতে।

ওমাঃ জল যে বাঁধের গায়ে গায়ে! ছল্ ছল্ করে, খল্বল্ করে লক্ষ লক্ষ সাপের মত যায়।

আবার শুনতি পেল সেই পুটুর্ পুটুর্ পুটুর্ পুটুর্ শব্দটা।

ব্যাপারটা কি?

সনাতন দাঁড়িয়ে পড়ে চারধারে দেখে। আবার যেন শুনতি পায় শব্দটা পুটুর্—পুটুর্—পুটুর্—। কোথাও কোনো আলো নাই, অন্য আওয়াজ নাই—। বাউড়ি পাড়ার মেয়ে মরদ ঘুমে বেহুঁশ। দূ-রে চাকতে'তুলেও আলো নাই। শুধু মেঘে ঢাকা আকাশ আর জলের গর্জন। নদীর—কানালের। আর হাওয়ার শাসানি।

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড-ফর্ম্মুলা যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত্তের সৃষ্টি হবে।

সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।

সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

... সাহেবাদগের বাঁধ এ, মেপ্টে কাদা মেশাতাম তখন পাব্লিকের কাজে। ফাঁকি দে সারতে পারত না উ। এখন ত চুরি; খালি চুরি।

হঠাৎ সনাতন আবিষ্কার করে বাঁধের তলা থেকেও যেন মাটি সরি যাতিছে। াতন ভয় পায়। সনাতন পিছন ফিরে দৌড়ে যায়। জীবনে এই পেরথম্ সনাতন ় পায়।

আবার শব্দটা ফিরে আসে—পুটুর্ পুটুর্ পুটুর্ পুটুর্। পবন সাধুর গ্রমে কী দৈত্য-দানো এসে ভীড় জমালো? জলের ভয়ে কিছু ভাবারও সময় ই সনাতনের—এদিকে নদী, ওদিকে কানাল। ভেসে গেলে সনাতন মিলবে গিয়ে ই ভাগীরথীতে—মিলন হবেক নদ, নদী আর পালাকারের।

প্রায় বাঁধটা পেরিয়ে এসেছে সনাতন। আবার শুনল, পুটুর্ পুটুর্—এবার ন কাছেই—নদীর শব্দে আর হাওয়ার গুমরানিতে কী শোনায় জো আছে কিছু?

আসানসোল থেকে আসা ভাড়া-করা লোক দুটো, বাঁধের পাশে ভাব্রি আর ল ভেরাণ্ডার ঝোপের আড়ালে মোটর বাইকটাকে শুইয়ে রেখে ওৎ পেতে রইল।

সনাতন যখন একেবারে বাঁধের মুখে তখন দুজনেই একসংগে তার উপর াঁপিয়ে পড়ল। সনাতন বাধা দেওয়ার আগেই, একজন পেটে আর একজন বুকে ভলবার দিয়ে গুলি করল সনাতনকে।

গুলির শব্দ জলের গুম্গুমানিতে মিলে গেল।

জানলো না কেউ।

সনাতন মা রে বলে পড়ে গেল। অস্ফুটে বলল, ভগমান। লণ্ঠনটা উলটে পড়ে বে গেল।

তার মা মরেছিল এক বছর বয়সে। মানুষ তবু ব্যথা লাগলে মাকেই ডাকে। গমানকেও। কমোনিস্টোরাও ডাকে।

সনাতনের টানটান শরীরটা লাল হয়ে গেল তাজা রক্তে—তার সোনামণির কের রঙের মত ফল্সা-রঙা আর লালচে তার ভালোবাসার লাল-ভেরাণ্ডার াপে পড়ে রইল উত্তপ্ত কিন্তু মৃত সনাতন।

লোক দুটো ফিরে যাচ্ছিল মোটরবাইকের দিকে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় ফিরে সে দুজনে মিলে লাথি মেরে সনাতনের মৃত শরীরটাকে নদীর জলে ফেলে ল। এত শব্দের মধ্যে সনাতনের জলে পড়ার শব্দটা শুনতেও পেল না ওরা।

তারপরই দৌড়ে ফিরে গিয়ে মোটরবাইক স্টার্ট করে চলে গেল।

পুটুর্-পুটুর্-পুটুর্ আওয়াজটা হাওয়ার সংগে উড়তে লাগল। নতুন লা লেখা হলো না সনাতনের। শেষের যাত্রায় ভেসে চলল সে তার সাধের দী বেয়ে। এ নদীর ধারের যে গাঁ-গঞ্জ গাছ-গাছালী দেখা হয় নাই কখনও বার সব দেখে নিবে সে।

সূর্য ওঠার অনেক আগেই তিন গাঁয়ের লোক এসে নদীর পারে পেঁছিল—। খে খুশী হল যে, জল নেমে গেছে। এতদিনের বাঁধ—চিরদিন তাদের বিশ্বাসের ম দিয়েছে। ওরা জানে, এ বাঁধ কখনও ভাঙবে না।

কাল রাতে নাকি ইরিগেশান ডিপার্টের দুজন লোক এসেছিল মোটর-াইকেলে বাঁধের অবস্থা দেখতে—। কাদের মুখ থেকে বা কার মুখ থেকে থাটা রটল কেউ জানলো না। তবে পুটুর্ পুটুর্ শব্দটা কেউ কেউ শুনেছিল। াই সকলেই কথাটা বিশ্বাস করল।

সনাতন তখনও চিৎ হয়ে ভেসে যাচ্ছিল ভাগীরথীর দিকে।

তার বড় বড় চুল, সুন্দর টান-টান ফরসা শরীর—যেন সুন্দর চিতল মাছ কটা—কোক্ ওভেনের বিষে মরে ভেসে চলেছে।

সূর্য তখনও ওঠেনি। সোনামণি তার মায়ের পাশে মাটির ঘরে উপুড় হয়ে ুমোচ্ছিল। দুটো হাত জোড়া করে কোমরের কাছে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ুমোচ্ছিল সোনামণি। তার খোলা চুল পিঠময় ছড়িয়ে ছিল।

একটা ভাসা-কাঠের সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লাগায় চিৎ হয়ে ভেসে যাওয়া সনাতনের বটা উলটে গেল। তখন উপুড় হয়ে ভেসে চলল টান টান।

ঘুমের মধ্যে কী যেন বিড় বিড় করতে করতে সোনামণি হঠাৎ চিৎ হয়ে ুলো। তারপর ঘুমের মধ্যেই মাথার বালিশটাকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। পে ধরলো জোরে। তারপর ঘুমের মধ্যে এক সুন্দর সলজ্জ স্বপ্নে ভেসে চলল।

যখন সূর্য উঠলো নদীর উপরে—লাল টক্টকে একটা সূর্য—তখন পালাকার নাতন দেখতেও পেলো না যে, সমস্ত ভোরের নদী কেমন লাল হয়ে গেছে তুল সূর্যের উষ্ণ লাল আলোয়।

॥ ৩ ॥

ফণী মন্ডল পাকা বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে হুঁকো খাচ্ছিল দূরের দীর দিকে চেয়ে।

তার নাদুস-নুদুস আতু-আতু ছেলেটা দৌড়ে এসে বলল, জানো বাবা, নাতন হারিয়ে গেছে, বলছে সকলে। বলছে না কী তারে নদীতে নেছে। ভগবান ী নেই? এত সাহস? আমাকে থাপ্পড় মারা!

ফণী মন্ডলের রক্ত হঠাৎ মাথায় চড়ে গেল। সে তার বৌমার সামনেই ছেলের পটে এক লাথি মারলো কোঁত্ করে।

মুখে বলল, শালা, কুকুরের বাচ্চা। ভাগ্।

পিতৃ-অন্ন, লালিত-পালিত, দামড়া, পরানর্ভর, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ছেলেটা ী কারণে লাথি খেল বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচাকা মেরে আড়ালে গিয়ে বৌএর াছে কেঁদে পড়ল।

বলল, শালার বাপ্কে দেখাবো।—দেখো, ঠিক আমি কমোনিস্টো হয়ে যাবো —একদিন। শালা, মজাটা বুঝবেক তখন।
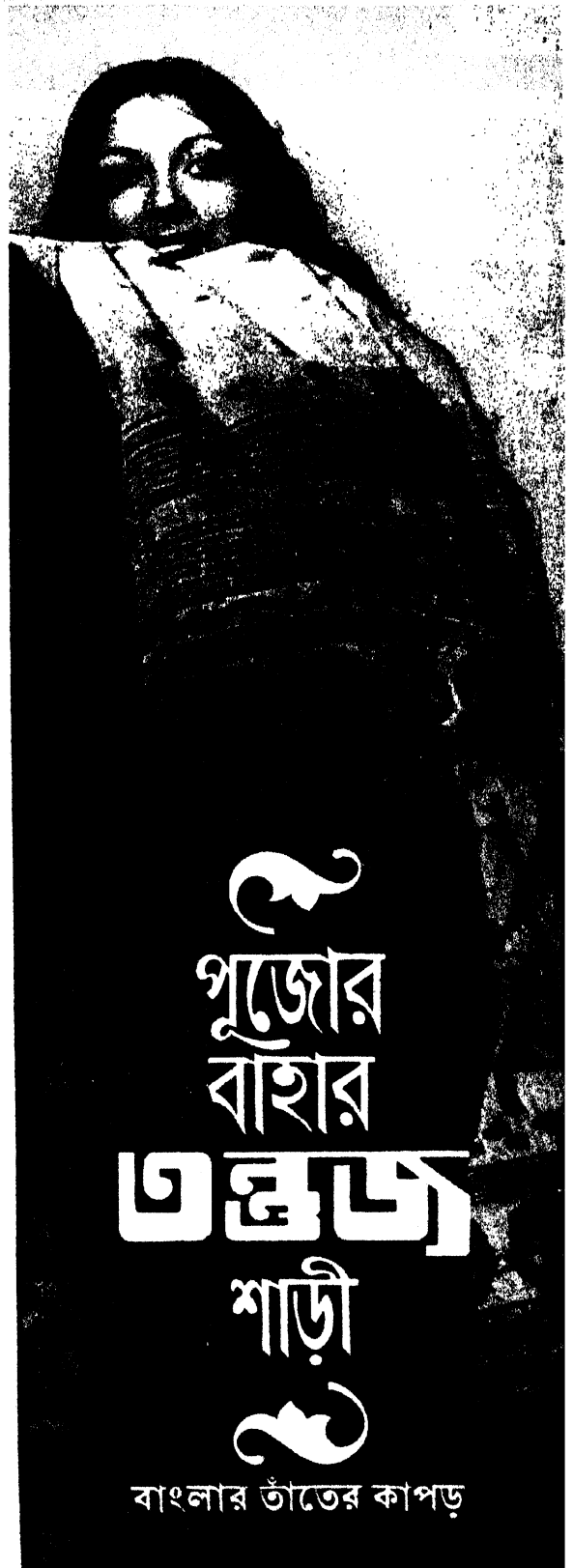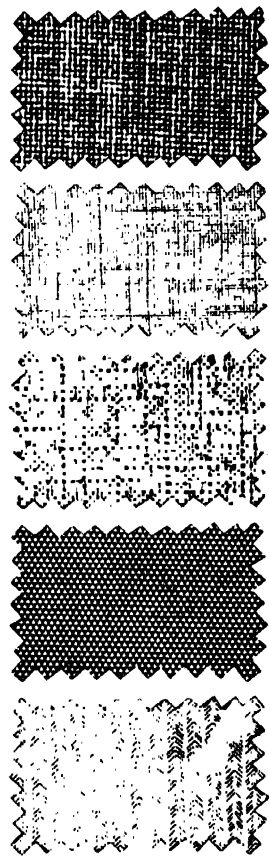
উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ ১৭ ॥

কে যেন এসে খবর দিয়ে গেল মহীতোষ খুব
…স্থ, বিকেলের দিকে রোজই জ্বর আসছে।
…পাইগুড়ি থেকে স্বর্গছেঁড়ায় সরিৎশেখর পোস্ট
…ফস মারফত চিঠিপত্র খুব একটা পাঠাতেন না।
… ঘন্টার পথ কোন কোন সময় সারাদিন নিয়ে নিত
…কবিভাগ। খেয়েদেয়ে দুপুর নাগাদ কিঙ সাহেবের
…টে গিয়ে দাঁড়ালেই হল, প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়া,
…পাড়া, বানারহাটে যাচ্ছে। তাদেরই কারো হাতে
…ঠি দিয়ে দিতেন তিনি, মহীতোষ সন্ধ্যে নাগাদ
…য়ে যেত। যাঁরা স্বর্গছেঁড়ার লোক নন অথচ
…তোষকে চেনেন তাঁরা যাবার সময় স্বর্গছেঁড়ার
…মাথার পেট্রল-পাম্পে চিঠি রেখে যেতেন। চিঠি
…বার না থাকলেও সরিৎশেখর দুপুরে কিংসাহেবের
…টে যেতেন। ওখানে গেলে পুরো ডুয়ার্সের
…সফিল খবর পাওয়া যায়। কোর্টকাছারি করতে
…জ্র মানুষ আসছেন ওদিকে মালবাজার-
…গরাকাটা আর এদিকে ফালাকাটা-হাসিমারা থেকে।
…নেকেই সরিৎশেখরকে চেনেন, দেখা হলে নমস্কার
…র খবরাখবর নেন। তাছাড়া টিম্বার মার্চেন্টরা তো
…ছেনই, ওঁদের জলপাইগুড়িতে না এসে উপায়
…ই। তা আজ বিকেলে ফেরার সময় এই খবরটা
…লেন। মহীতোষ যে অসুস্থ একথা আগে কেউ
…লনি, কেউ চিঠি লেখেনি। বিকেলের দিকে জ্বর
…সছে এটা ভাল কথা নয়। তিস্তার পাশ ঘেঁষে
… কাঁচা পথটা দিয়ে রোজ হাঁটাচলা করতেন সেটার
…পর মাটি পড়ছে। পি ডবলু ডি অফিসের সামনে
…য়ে ঘুরে আসতে হল।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন সরিৎশেখর।
…জকাল লাঠি আর পা কেমন মিলেমিশে পথ মেপে
…য়। লাস্ট বাস্ বার্নিশ থেকে ছাড়ে বিকেল ছটায়।
…খনও ঘন্টা দেড়েক সময় আছে, অনিকে নিয়ে
…না হলে রাত নটার মধ্যে স্বর্গছেঁড়ায় পৌঁছে
…ওয়া যায়। তেমন বোধ করলে মহীতোষকে এখানে
…য়ে এসে চিকিৎসা করাতে হবে। হঠাৎ তাঁর মনে
…ল আজ অবধি তাঁকে শুধুই দায়িত্ব পালন করে
…তে হচ্ছে। চাকরীতে যখন ছিলেন তখন তো
…টই, আজ নিঃসঙ্গ অর্থহীন অবসর জীবনেও
…ইসব সাংসারিক চিন্তা তাঁকে ভাবতে বাধ্য করে।
… ছেড়েছুড়ে একা একা বেঁচে থাকার সুখ পাওয়া
…র হল না। অথচ হেম আজকাল প্রায়ই বলে থাকে
… তিনি নাকি অত্যন্ত নির্দয়, পাষাণ। তাঁর কথা-
…র্তা অত্যন্ত ঠোঁটকাটা এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া
… ভেবে বলা। হেম এসব কথা আগে বলতে সাহস
…ত না, ইদানীং বলে থাকে। সরিৎশেখরের মাঝে
…ঝে মনে হয় মেয়ের মাথাটায় কিছু গোলমাল
…য়েছে। কারণ রাতারাতি তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা
…কলের ছিল সেটা হেম খোয়ালো কি করে। মাঝে
…ঝে এমন উপদেশ দেয় যে বন্ধুর মত মনে হয়,

…কে তখন আবার বাবার সংসারে পড়ে থেকে
জীবনটা নষ্ট হল বলে যখন আক্ষেপ করে তখন চট
করে বড় বউ-এর কথা মনে পড়ে যায়। এ এক
অদ্ভুত খেলা মেয়ের সঙ্গে, হেমলতাও মোক্ষ হয়ে
খেলে যায়। অনির সঙ্গে কথাবার্তা কম হয়। পড়া-
শুনা খারাপ করছে না, করলে রেজাল্ট ভাল হতো
না। তাঁর কড়া নির্দেশ আছে যেখানেই থাকো
সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। সকালে অঙ্কের
মাস্টার পড়িয়ে যায় অনিকে মহীতোষ তার টাকা
দিচ্ছে। কিন্তু বাজারদর যেভাবে বাড়ছে সংসারের
খরচ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ছে তাঁর। ফলে
হেমলতার জমা-টাকায় হাত দিতে হয়। মনে মনে
ভীষণ কুন্ঠার মধ্যে আছেন তিনি

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্বর্গছেঁড়ায় ফিরে যাবেন
না আর। জীবনের সব প্রতিজ্ঞাই কি রাখতে পারা
যায়? দ্রুত পা চালালেন সরিৎশেখর। হাসপাতাল
পাড়া থেকে দুটো সাইকেল রিকশা রেস দিয়ে
আসছিল কোর্টের দিকে। মোড় ঘোরার সময় এ
ওকে ডিঙিয়ে যেতে যেতে পরস্পরকে ছুঁয়ে
ফেলতেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। সরিৎশেখর দেখলেন
রিকশাটা দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু
বোঝার আগেই হাঁটুর ওপর প্রচন্ড একটা আঘাত
তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। প্রায় মুখ থুবড়ে
পড়ে গেলেন সরিৎশেখর। হই হই করে লোকজন
ছুটে এল চারধার থেকে। রিকশা রাস্তার একপাশে
কাত হয়ে উলটে আছে। রিকশাওয়ালা লোকটা
মাটিতে শুয়ে। ওরা যখন সরিৎশেখরকে তুলে ধরল
মাটি থেকে তখন তাঁর চোখে অন্ধকার, চশমা নেই,
লাঠিটা ছিটকে গেছে হাত থেকে। মাজাভাঙা
লাউডগার মত হিলহিল করছে শরীর, ছেড়ে দিলেই
ধুপ করে পড়ে যাবেন, বাঁ পাটা যেন তাঁর শরীরে
নেই। আর তারপরেই বেদনাটা অনুভব করলেন
তিনি, কেন একটা ধারালো করাত দিয়ে কেউ
তাঁর পা কেটে যাচ্ছে। ছেলেরা অনেকেই সরিৎ-
শেখরকে চিনতো, দাঁড়িয়ে থাকা অন্য রিকশাটায় ওরা
এঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ধাক্কা লাগার পর
সেটার কিছু হয়নি, এমনকি রিকশাওয়ালারাও
চুপচাপ ভদ্রলোকের মত দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনি বাড়ি ফিরে
আসতো। সূর্য ডুবে গেলে যে ছায়াটা চারধার জুড়ে
থাকে সেটা মন কেমন করায়। কারণ একটু আগেই
দৌড়তে হবে, পিসীমা ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যে দিয়ে
বেরিয়ে আসার আগেই কলতলায় পৌঁছে যেতে
হবে। এই একটি ব্যাপারে সরিৎশেখর দারুণ কড়া।
রাত হয়ে গেলে কি হবে অনি অনুমান করতে
পারে।

আজ অবশ্য সেরকম কোন সমস্যা তার নেই।
ছুটির পর বাড়ি এসে বেরুতে যাবে এমন সময়
শচীন আর তপন এসে হাজির হল। শচীন ওদের
ক্লাসের গোলগাল মার্কা ভাল ছেলে, ওর বাবার
দুটো চা-বাগানের শেয়ার আছে। শচীন তপনকে
নিয়ে এসেছে অনিকে নেমন্তন্ন করতে। স্কুলে বললে
হবে না বলে বাড়ি বয়ে এসেছে, তার দিদির বিয়ে।

ভেতরের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল, সেখানে
ওদের বসিয়ে অনি পিসীমাকে ডেকে আনল। দাদু
বাড়িতে নেই, নিশ্চয়ই কিংসাহেবের ঘাটে
গিয়েছেন। অনির বন্ধুরা খুব কমই বাড়িতে আসে,
পিসীমা তাড়াতাড়ি দেখতে এলেন। আজকাল পিসীমা
বাড়িতে শেমিজ পরেন না, কেমন যেন হয়ে গেছেন।
কিছুতেই খেয়াল থাকে না।

হেমলতাকে দেখে অনির বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল।
ফুটফুটে দুটো ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
হেমলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বসো বসো, দাঁড়াতে
হবে না, তোমরা তো সব অনির বন্ধু? তা আমাদের
বাড়িতে আসো না কেন? কি নাম তোমাদের?'
অনির খুব মজা লাগছিল, পিসীমা যখন কথা বলেন
তখন কেন থামতে চান না। ওর বন্ধুরা বেশ হক-
চকিয়ে গেছে, কোন উত্তরটা দেবে বুঝতে পারছে না।

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা বেদনা, ঠাণ্ডা লাগা ও মচকানির জন্য একটি বহুমুখী ঘরোয়া দাওয়াই

আপনার ব্যথাস্থানে, ঠাণ্ডা-লাগা ও মচকানো জায়গায় সামান্য পরিমাণ আরামদায়ক অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে মালিশ করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এর দশটি ভেষজের কার্যকারিতা অনুভব করবেন এবং আপনি অনেক আরাম বোধ করবেন।

অমৃতাঞ্জন — জার, শিশি ও ছিমছাম কমদামী টিনের কৌটোয় পাওয়া যায়।

অমৃতাঞ্জন —
৮০ বছরেরও বেশি
সময় ধরে বিশ্বস্ত ঘরোয়া
রোগ প্রতিষেধক

AM 1912

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

তপন এবার চটপট বলল, 'গীত।' বলে এগিয়ে এসে হেমলতাকে প্রণাম করল। হেমলতা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক, বাবা। মিত্তির না কুলীন কায়েত।'

অনি বলল, 'আর এ হচ্ছে আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয়। ওর দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছে।'

হেমলতা বললেন,' কি নাম তোমার, বাবা ?'

'আমার নাম শচীন রায়।' শচীন এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। কিন্তু বেচারা নিচু হতে না হতেই হেমলতা ধড়মড় করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন, 'না, না, থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না।' শচীন তা বটেই অনিও খুব অবাক হয়ে গেল পিসীমার এ রকম ব্যবহারে। একটু সামলে নিয়ে হেমলতা বললেন, 'বামুনের ছেলে তুমি—।'

কথা শেষ করার আগেই অবাক গলায় শচীন বলল, 'না, না, আমরা বৈদ্য।'

হেমলতা তাই শুনে দোনমনা হয়ে বললেন, একই হল। বদ্যিরাও তো এক ধরনের বামুন। তোমরা সব বসে গল্প কর।' হেমলতা আর দাঁড়ালেন না। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে আর একবার ওদের দেখে গেলেন।

শচীন বলল, তোর পিসীমা খুব সেকেলে, না রে ?'

অনি বলল, 'কই না তো ?'

তপন বলল, 'যাঃ। আমি প্রণাম করলাম কিছু হল না। ও প্রণাম করতেই বামুন টামুন বের করে ফেললেন।'

শচীন বলল, 'মিত্তররা তো কায়েত সবাই জানে। আগেকার লোকেরা বামুনদের শুধু সম্মান দিত। তোর পিসীমার কথা বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে।'

তপন গম্ভীর গলায় বলল, 'স্বাধীনতা এলেও আমরা যে কত পরাধীন তা তোর পিসীমাকে দেখলে বোঝা যায় অনি।'

এসব কথা শুনতে অনির একদম ভাল লাগছিল না। পিসীমা এমন কাণ্ড করবে ও ভাবতে পারেনি। যদি না বামুন না জেনেই প্রণাম নিলেন না, বন্ধুদের কাছে এই খবরটা ওরা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে দেবে। খুব খারাপ লাগছিল ওর। এমন সময় রান্নাঘর থেকে হেমলতা চাপা গলায় তাকে ডাকলেন। হেমলতা এইভাবে তাকে ডাকেন না, অন্য সময় তার চিৎকার শুনে সরিৎশেখর অবধি বিরক্ত হয়ে ধমক দেন, 'কি কাকের মত চেঁচাচ্ছ।'

চটপট হেমলতা জবাব দিতেন, 'কি করব জন্মাবার সময় তো কেউ মধু দেয়নি।' তা এখন এই যে হেমলতা ওকে ডাকছেন মোটেই কর্কশ মনে হচ্ছে না। অনি উঠে রান্নাঘরে এল।

হেমলতা প্লেট সাজিয়ে বসেছিলেন। তিলের নাড়ু, নারকোলের নাড়ু আর মোটা পাকা কলা। হেমলতা বললেন, হ্যাঁরে, ও আবার এসব খাবে টাবে তো। নাহলে বল দুটো লুচি ভেজে দিই।'

অনি বলল, কে খাবে না, কার কথা বলছ ?'

হেমলতা বললেন, 'ঐ যে, ফরসা মতন—।'

অনি বলল, 'দুজনেই তো ফরসা। তপন— ?'

হেমলতা দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'না না। যে প্রণাম করতে আসছিল—।'

'ও শচীনের কথা বলছ! তুমি কিন্তু ওকে প্রণাম না করতে দিয়ে খুব অন্যায় করেছ। আমার বন্ধুরা শুনলে ক্ষ্যাপাবে।' অনি সোজাসুজি বলে ফেলল। হেমলতা বলে উঠলেন, 'না বাবা, প্রণাম করতে হবে না। তা ও কি খাবে এসব ?'

'খাবে না কেন ?' অনি দুটো প্লেট হাতে নিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'একটাতে বেশী দিয়েছ কেন অত ?'

হেমলতা হাসলেন, 'বেশী কোথায়? ওটা ওকে দিবি।'

অনি বলল, 'কেন'? দুজনকেই সমান দাও। তপন কি দোষ করল? একেই প্রণাম নেবার সময় অমন করলে, খাবার দেবার সময় যদি তপনকে কম দাও তো ও ছেড়ে কথা বলবে?

[illegible] না রে ?'

'কোন ছেলেটা ? অনির হঠাৎ মনে হল পিসীমাকে যেন অন্য রকম লাগছে। এমন ভঙ্গীতে পিসীমাকে কথা বলতে ও কোনদিন দ্যাখেনি।

'ওই যে, বদ্যিব্রাহ্মণ—।'

'ওঃ', অনি প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'তুমি বারবার ওই যে ওই যে করছ কেন? শচীন নামটা বলতে পারছ না ?'

হেমলতা কিছু বললেন না। অনি খাবার নিয়ে চলে গেলে একা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কোন ছবি নেই, মুখ মনে নেই, এই শরীরে কোন চিহ্ন সে এঁকে যেতে পারেনি কারণ শরীরটা তখন তৈরি হয়নি। সে শুধু বেঁচে আছে হেমলতার কাছে একটা নাম হয়ে, বুকের মধ্যে একটা নাম জপের মন্ত্রের মত অবিরত ঘুরে ফিরে আসে। সে মানুষকে তিনি মনে করতে পারেন না, শুনেছেন বড় সুন্দর ছিল লোকটা, খুব ফরসা। তারপর এতদিন ধরে নামটাকে সম্বল করে কল্পনায় চেহারাটাকে তৈরি করে নিজের সঙ্গে খেলে খেলে যাওয়া। আজ এতদিন বাদে সেই নামের একটি মানুষকে তিনি প্রথম দেখলেন। ফর্সা সুন্দর চেহারার একটি কিশোর। হোক কিশোর নামটা শুনে বুকের মধ্যে লোহার মুঠোর কে দম টিপে ধরেছিল! এ নামের মানুষের কাছে কি করে তিনি প্রণাম নেবেন?

হেমলতা চুপচাপ একা একা কাঁদতে লাগলেন। যৌবনের শুরুতে যে মানুষটা তাঁকে কুমারী রেখে চলে গিয়েছিল স্বার্থপরের মত আজ এতদিন পরে তার নামটার সঙ্গে মিলিয়ে একটা ছবি পেয়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সরিৎশেখরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তপন আর শচীন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, অনি যেন অবশ্যই যায়, ওর দাদুকে যেন অনি বলে যে ওরা এতক্ষণ বসেছিল। জলপাইগুড়িতে তখন একটা অদ্ভুত নিয়ম চালু ছিল। কোন বিবাহ-অনুষ্ঠানে পত্র দিয়ে অথবা মুখে নিমন্ত্রণ করলেই চলবে না, অনুষ্ঠানের দিন ঘনিষ্ঠদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসতে হবে। এ রকম অনেকবার হয়েছে, এই সামান্য ত্রুটির জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠান ফাঁকা গেছে, বাড়িতে গিয়ে বলা হয়নি বলে অনেকেই আসেননি।

শচীনরা চলে গেলে অনি চুপচাপ গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। এখন খেলার মাঠে গিয়ে কোন লাভ নেই। পিসীমা আজ ওরকম করছিল কেন? শচীনকে নাম ধরে ডাকছিল না পর্যন্ত। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পিসীমার বরের নাম ছিল শচীন। দাদু একদিন সে সব গল্প বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনি ঘুরে দাঁড়াল। এখন ও বুঝতে পেরে গেছে কেন শচীনকে উনি প্রণাম করতে দেননি। ইদানীং ও পিসীমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে, বয়স হয়ে যাবার জন্যে বোধ হয় পিসীমা ওকে প্রশ্রয় দেন। এরকম একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে অনি এই নিয়ে একটু মজা করবে বলে হাঁটতে যেতেই পেছন থেকে একজন তাকে ডেকে উঠল। অনি ফিরে দেখল, ওদের পাড়ার একটি বড় ছেলে ওকে ডাকছে, 'এই খোকা, তোমার নাম অনি তো?'

অনি ঘাড় নাড়ল।

'তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবর দাও, তোমার দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ছেলেটি গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? অনি হতভম্বের মত তাকাল। কি করতে হবে কি বলতে হবে বুঝতে পারছিল না। ছেলেটি আবার বলল, 'দাঁড়িয়ে থেক না, যাও। খুব খারাপ কিছু না, পায়ে চোট লেগেছে বোধ হয়, ভয়ের কিছু নেই।'

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে অথচ ভয়ের কিছু নেই— এ কথা লোকে চট করে বিশ্বাস করতে চায় না। তা ছাড়া, প্রিয়জনের দুর্ঘটনা মানেই একটা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যায়। অনি যখন ছুটে গিয়ে হেমলতাকে চেঁচিয়ে এই খবরটা দিল তখনও হেমলতা তার স্বামীর ঘোরে আছেন, চোখে জল। খবরটা শুনেই [illegible]

আগে সুস্থ শরীরে বেড়াতে গেল সে লোকটা এখন হাসপাতালে—এ কথা ভাবলেই বুকটা কেমন করে ওঠে। এই দীর্ঘ জীবনটা তাঁর বাবার সঙ্গে কেটেছে, বাবা ছাড়া তিনি কিছু ভাবতেই পারেন না। ফলে এই খবরটা ওর শরীর নিঙড়ে একটা ভয়ের কান্না বের করে আনল। স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে যে কান্নাটা বুকে ঘোরাফেরা করছিল এতক্ষণ, আশ্চর্যভাবে সেটা চেহারা পালটে ফেলল এখন। সেই কান্নাটা এখন হেমলতাকে যেন সাহায্য করল।

হাসপাতালে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ির ঘর-দোর বন্ধ করে তালা দিতে গিয়ে হেমলতা আবিষ্কার করলেন বাড়িটা একদম খোলা পড়ে থাকছে। এত বড় বাড়িতে তালা দিয়ে এর আগে সবাই মিলে কোথাও যাওয়া হয়নি। হেমলতা দেখলেন, বাগানের ভিতর দিয়ে কেউ এসে তালা ভেঙে যদি সব বের করে নিয়ে যায় তবে পাড়ার লোকে কেউ টের পাবে না। কিন্তু একটা বড় আতংক ছোট ভয়ের সম্ভাবনাকে চাপা দিতে পারে, হেমলতা ইষ্টনাম জপ করতে করতে অনিকে নিয়ে বের হলেন।

অনি দেখল, পিসীমা থান-সেমিজের ওপর একটা সুতীর চাদর জড়িয়েছেন। এর আগে কখনও সে পিসীমার সঙ্গে রাস্তায় বের হয়নি। এখানে আসার পর পিসীমা কখনো বাড়ি থেকে বেরিয়েছে কিনা মনে পড়ে না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। টাউন ক্লাব মাঠের পাশ দিয়ে যেতেই ওরা রিকশা পেয়ে গেল। হেমলতা তখন থেকে শুধু নাম জপ করে যাচ্ছেন। দাদুর পায়ে চোট লেগেছে, ভয়ের কিছু নেই, শোনার পরও কিন্তু অনি সহজ হতে পারছিল না। খারাপ খবর নাকি লোকে টপ করে দেয় না, সইয়ে সইয়ে দেয়। দাদু যদি মরে গিয়ে থাকে এতক্ষণে তাহলে ও কি করবে?

হাসপাতালে প্রথম ঢুকল অনি। পিসীমা পেছন পেছন। রিকশা থেকে নেমেই অনি দেখল পিসীমা মাথায় ঘোমটা দিয়েছেন। এ রকম বেশে ওঁকে দেখে অনির খুব হাসি পেলেও কিছু বলল না। তাড়াহুড়োয় পয়সাকড়ি আনা হয়নি বলে রিকশাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফিরে গিয়ে একেবারে ডবল পাবে। কড়া ওষুধের গন্ধ নাকে ধক করে আসতেই অনির মনে হল, হাসপাতালে থাকতে খুব কষ্ট হয়। অনুসন্ধান লেখা কাউন্টারটায় কেউ নেই। একটা শুটকো মত বেয়ারাগোছের লোক মেঝেতে বসেছিল, অনিদের বোকার মত চাইতে দেখে বলল, 'কি খুঁজছ, বাবা?'

অনি বলবে কি বলবে না ভেবে বলে ফেলল, 'আমার দাদু কোথায় তাই জানতে এসেছি।'

লোকটা কেমন অথর্বের মত তাকাল, 'জানতে চাইলেই জানতে পারবে না। ছ'টার পর বাবুদের ডিউটি খতম।' হাত দিয়ে ফাঁকা চেয়ার দেখাল সে, 'কি কেস?'

অনি ঠিক বুঝতে পারল না প্রথমটা, 'মানে?'

'বাঁচবে না কষ্ট পাবে?' লোকটা উদাস গলায় জিজ্ঞাসা করল। অনিকে ঘুরে পিসীমার দিকে চাইতে দেখে লোকটা বুঝিয়ে দিল, 'ঢুকে গেলেই বেঁচে যাওয়া যায়, এখানে থাকলেই তো ভোগান্তি, কষ্ট। কিন্তু চাইলেই কি যাওয়া যায়? এই যে দ্যাখো, আমি একেবারে খোদ যাবার দরজা—এই হাসপাতালে কাজ করছি আর প্রতিদিন চলে যাবার জন্য চেষ্টা করছি তবু সে শালা কি আমাকে টিকিট দেবে? তা কখন ভর্তি হয়েছে?'

'বিকেলে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পায়ে।' অনি বলল।

'ও সেই রিকশা কেস? বাঁচার কোন আশা নেই, সে শালা দয়া করবে না, অনেক ভোগান্তি আছে। তা তিনি আছেন ওই সামনের হলুদ বাড়িতে। এসে অবধি ডাক্তার নার্সদের ধমকে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। যাও, রিকশা কেস বললেই যে কেউ এখন বলে দিতে পারবে।' লোকটা একফোঁটা নড়ল না।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে অনি বলল, 'বাঁচার আশা নেই বলল, না?'

হেমলতা বললেন, 'তার মানে ভগবান নিয়ে যাবে না ওর কাছে মরে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া। যত হাসপাতালের [illegible] রাজ্যের মানুষের ছোঁয়া লেগে বাতাসে তাঁর হাঁটাটা শ্লথ হচ্ছিল। দুবার তাগাদা দিয়ে অনি এগিয়ে গিয়েছিল হলুদ বাড়ির দরজায়। এখন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে মানুষজন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজায় একজন দারোয়ানগোছের লোক ওদের আটকালেন। অনি ব্যাপারটা তাকে বললেও সে যেতে দিতে নারাজ, সময় চলে গেছে।

ততক্ষণে হেমলতা এসে পড়েছেন, শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমরা কি জেনে বসে আছি যে, কখন ওঁর অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর আমাদের সে খবর পেয়ে আসতে তোমাদের সময় চলে যাবে?'

দারোয়ান বলল, 'কখন অ্যাডমিট হয়েছে আপনার স্বামী?'

হেমলতা সব ভুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুখ-পোড়া বলে কি! ওরে উনি আমার বাবা, স্বামীকে অনেক দিন আগে খেয়েছি।' অনির চট করে মনে পড়ে গেল দাদু বলেন পিসীমার নাকি রাক্ষস গণ।

দারোয়ানটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি হয়েছিল?'

এবার অনি চটপট বলল, 'রিকশার লেগেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ানের চেহারা বদলে গেল, 'আরে বাপ, যান যান, বাঁ দিকে ঘুরে তিন নম্বর বেড।'

লোকটা এরকম ভয় পেল কেন বুঝতে পারল না অনি। পিসীমা তখনও গজগজ করছেন, 'এদের এখানে চাকরি দেয় কেন? মেয়ে বউ বুঝতে পারে না। যত বদ লোক।'

সরিৎশেখর বিছানার ওপর হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর একটা পা মোটা ব্যান্ডেজ জড়ানো, টান টান করে রাখা। ওদের দেখে তিনিই কাছে ডাকলেন, 'এই যে, এদিকে এস। দ্যাখো কিভাবে এরা সব আছেন। এটা কি হাসপাতাল না শুয়োরের খাঁচা! ঘরময় নোংরা ছিল, আমি বলে করে সরিয়েছি, নইলে তোমরা ঢুকতে পারতে না।'

হেমলতা বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে গলা তুললেন সরিৎশেখর, 'স্বাধীন হয়ে সব উচ্ছন্নে গেছেন। আমি এখানে এসে এক ঘণ্টা পড়ে আছি একটা ডাক্তার নেই যে এসে দেখবে! নাকি তার ডিউটি ওভার, নতুন লোক আসেনি। ভাবতে পার? ইংরেজ আমলে এ সব জিনিস হলে হ্যাঙ্ আনটিল ডেথ হয়ে যেত। আমি কালই জহরলাল নেহেরুকে লিখব।'

সরিৎশেখরের পাশের বেডে শুয়ে থাকা একজন রুগী চিনচিনে গলায় বলে উঠলেন 'আমাদের খাবার থেকে চুরি করে ওরা, কি জঘন্য [illegible]!'

সরিৎশেখর হেমলতাকে বললেন, 'শুনলে? চুরি করা আমি বের করছি। আমি এখানকার দেখনবাহার নাইটিঙ্গেলদের বলেছি খাবারের চার্ট দেখাতে, একটা কিছু বিহিত করতে হবে। ওই যে আট নম্বরের বাচ্চাটা, চল্লিশ মিনিট চেঁচিয়েও বেডপ্যান পায়নি, আমি এলে তবে দিল। হ্যাঁ মশাই সিভিল সার্জেন কখন আসেন হাসপাতালে?'

পাশের লোকটি বলল, 'সকালে।'

হেমলতা এবার প্রায় অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'আপনার পায়ের অবস্থা কি রকম?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে, খুব।' এতক্ষণে মুখ বিকৃত করলেন সরিৎশেখর, 'কাল সকালে বোধ হয় প্লাস্টার করবে। দুপুর নাগাদ বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।'

'পারবেন?' হেমলতা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'পারব না কেন? আমার একটা পা তো ঠিক আছে।' হঠাৎ যেন তাঁর কথাটা মনে পড়ে যেতেই তিনি অনিকে কাছে ডাকলেন, 'শোন, তুমি কাল সকালের ফার্স্ট বাসে স্বর্গছেঁড়ায় চলে যাবে।'

অনি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? আমার স্কুল যে খোলা!'

সরিৎশেখর বললেন, 'সারা জীবনে অনেক স্কুল খোলা পাবে। আমি যেতে পারছি না, তুমি অবশ্যই [illegible]।'

(ক্রমশ)

সহজ জয়

ইংলন্ডের ক্রিকেট অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ার্লির সময়টা এখন খুবই ভাল যাচ্ছে। যে তেরটি টেস্টে তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন তার একটি টেস্টেও হার স্বীকার করেননি, জিতেছেন আটটি টেস্টে। দেশের মাঠে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে তাঁর জয়জয়কার। পাকিস্তান প্রথম দুটি টেস্টে শোচনীয়ভাবে ইনিংসে হারে। তৃতীয় টেস্টেও হয়তো হারত বৃষ্টিতে খেলা পন্ড না হলে। নিউজিল্যান্ড হেরেছে তিনটিতেই। এবং শোচনীয়ভাবেও। তারপরই ৭৮-৭৯ মরসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ব্রিয়ার্লি আবার ইংলন্ডে দলের অধিনায়ক হয়েছেন।

অবশ্যই অধিনায়কের প্রশ্নে ব্রিয়ার্লির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইংলন্ডের একনম্বর ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট, অধিনায়কত্ব সম্মান না পাওয়ায় যিনি দু বছরেরও বেশি টেস্ট খেলা থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন এবং পাকিস্তানে ব্রিয়ার্লির চোট লাগার পর শেষ টেস্টে অধিনায়ক হয়ে নিউজিল্যান্ড সফরও ইংলন্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বয়কটের এমনই দুর্ভাগ্য যে, প্রায় পঞ্চাশ বছরে সতেরটি সিরিজের সাতচল্লিশটি টেস্টের মধ্যে যে নিউজিল্যান্ড একটি টেস্টেও ইংলন্ডকে হারাতে পারেনি, সেই নিউজিল্যান্ড আটচল্লিশতম টেস্টে হারিয়ে দিল বয়কটের ইংলন্ড দলকে। শুধু প্রথম পরাজয়ই নয়, তৃতীয় টেস্ট ড্রয়দিনের হওয়া সত্ত্বেও বয়কট সিরিজ জিততে পারেননি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র এবং পরে নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মাইক ব্রিয়ার্লি তখন কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করেননি। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ইংলন্ডের অধিনায়কত্ব চান। বয়কটও অধিনায়ক পদের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্র ব্রিয়ার্লিরই অনুকূলে গেল। অভিমানক্ষুব্ধ বয়কট নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট মাঠের বাইরে থেকে দেখে দ্বিতীয় টেস্টে দলে ফিরে এলেন এবং ইনিংসের সূচনা করে একটি অনবদ্য সেঞ্চুরি উপহার দিলেন ইংলন্ডকে। তাঁর ষোলতম টেস্ট সেঞ্চুরি। তবু অস্ট্রেলিয়া সফরে বয়কট অধিনায়ক হতে পারলেন না, ক্রিকেট জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও। তবে অভিমান করে আর দূরে সরে থাকেননি। অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংলন্ডের ষোলজনের মধ্যে বয়কটও আছেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে নিজেদের দেশে ওয়েলিংটন টেস্টে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে প্রথম জয় ও সিরিজ ড্র করার ফলে নিউজিল্যান্ডের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। আশা ছিল ইংলন্ডের মাঠে প্রথম অন্তত একটি টেস্ট জিতে আর এক ইতিহাস রচনা করবে। অবস্থাও ছিল অনুকূল। নিউজিল্যান্ডের রাইট, হাওয়ার্থ, পার্কার প্রভৃতি ইংলন্ডের কাউন্টি টিমের খেলোয়াড়। অভিজ্ঞতা প্রচুর। তারপর তাদের একজন খেলোয়াড়ও কেরী প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়নি, যদিও শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান গ্লেন টার্নার সিরিজে খেলেননি। ইংলন্ডের উরস্টার কাউন্টিতে খেলে প্রচুর রান করছিলেন। সফরের সূচনাও ছিল শুভ। দুটি কাউন্টি টিম মিডলসেক্স ও ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ড জিতেছিল ইনিংসে। কিন্তু টেস্টের আগে কয়েকজন খেলোয়াড়ের চোট আঘাতের ফলে একদিনের দুটি আন্তর্জাতিক খেলাতেই হেরে গেল এবং ওভালে প্রথম টেস্টে হারল সাত উইকেটে।

ওভাল টেস্ট (২৭ জুলাই—১ আগস্ট)

ওভালে প্রথম টেস্টে অবশ্য অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মার্ক বার্জেস টসে জিতে ভারি আবহাওয়ায় প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। তবু ইংল্যান্ড বোলাররা প্রথম দিকে খুব সুবিধা করতে পারেননি। এক উইকেটেই নিউজিল্যান্ড তুলেছিল ১৩০ রান, ওপেনার জন রাইট ও জিওফ হাওয়ার্থের ব্যাটিং কৃতিত্বে। হাওয়ার্থের পাকিস্তান এবং টেস্টে পর পর তিন ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরি করার মুখে বিমুখ হয়েছেন। অকল্যান্ডে আগের টেস্টে তিনি করেছিলেন ১২২ ও ১০২ রান। রাইট এবং হাওয়ার্থের পর আর দুই অঙ্কের রান বার্জেসের ৩৪ এবং মিঃ এডগার ১১। বাকি ৮ জনের কেউই ৬-এর বেশি রান করতে পারেননি। তবু নিউজিল্যান্ডের ২০৪ রানের উত্তরে ইংলন্ডের ২৭৯ রান খেলায় আধিপত্য বিস্তারের মত কিছু নয়। ওই ২৭৯ রানের মধ্যেও এক তরুণ, একুশ বছর বয়সী বাঁ-হাতী ব্যাটসম্যান ডেভিড গাওয়ারের ১১১ এবং এক বর্ষীয়ান, ৩৩ বছরের ক্লাইভ র‍্যাডলের ৪৯ রানই মুখ্য। ইংলন্ডের পাঁচজন দুই অঙ্কের রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলন্ড বোলারদের সাফল্য এবং নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার ফলেই ইংলন্ডের সাত উইকেটে সহজ জয়। বৃষ্টির জন্য চতুর্থ দিনের খেলা বন্ধ ছিল এবং পঞ্চম দিন একটু আগেই জয় করায়ত্ত হওয়ায় ইংলন্ডের গ্রাহাম গুচকে ৯১ রানে নটআউট থাকতে হয়। সেঞ্চুরির সুযোগ পান না।

নিউজিল্যান্ডের দুজনের টেস্ট অভিষেক হয় ওভালে—ব্রেনডন ব্রেসওয়েল ও ব্রুস এডগারের। প্রথম ইনিংসে মাত্র সাত রানের মধ্যে পেস বোলার ব্রেসওয়েল দুই নামী খেলোয়াড় ব্রিয়ার্লি ও গুচকে

ইংলন্ড অধিনায়ক ব্রিয়ার্লি

ফিরিয়ে দিয়ে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস—২০৪ (জন রাইট ৬২, জিওফ হাওয়ার্থ ৯৪, মার্ক বার্জেস ৩৪. বব উইলিস ৫—৪২; জিওফ মিলার ২—৩১)

ইংলন্ড—প্রথম ইনিংস—২৭৯ (ডেভিড গাওয়ার ১১১, ক্লাইভ র‍্যাডলে ৪৯ ফিল এডমন্ডস ২৮: রিচার্ড হ্যাডলি ২—৪৩; ব্রুস ব্রেসওয়েল ২—৪৬; স্টিফেন বুক ২—৬১; কেয়ারনস ২—৬৫)

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—১৮২ (ব্রুস এডগার ৩৮, বিভান কংডন ৩৬; ইয়ান বথাম ৩—৪৬: ফিল এডমন্ডস ৪—২০; মিলার ২—৩৫)

ইংলন্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইকেটে) ১৩৮ (গ্রাহাম গুচ নটআউট ৯১)

[ইংলন্ড ৭ উইকেটে জয়ী]

ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্ট (১০—১৪ আগস্ট)

টসে জিতে প্রথম ইনিংসে ইংলন্ডের ৪২৯ রানের বড় ইনিংস এবং দুই ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং বিপর্যয়ই দ্বিতীয় টেস্টে ইংলন্ডের ইনিংস ভিক্টরীর কারণ। ওপেনার বয়কটের ষোলতম টেস্ট সেঞ্চুরির কথা আগেই বলেছি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এটি ছিল তাঁর ১০৮তম সেঞ্চুরি। তাঁর চিরকালের অভ্যাস মত এ টেস্টেও ১৩১ রান করেন দীর্ঘ সাত ঘন্টায়। ইংলন্ডের বড় ইনিংসেও রিচার্ড হ্যাডলি কিন্তু চমৎকার বল করেছিলেন। তবে বল বাহাদুরি দেখিয়েছেন ইংলন্ডের ইয়ান বথাম, যিনি মাত্র পাঁচ-ছয় মাস আগে নিউজিল্যান্ডে তিনটি টেস্টে পেয়েছিলেন সতেরটি উইকেট। ট্রেন্ট ব্রিজে পান দুই ইনিংসে দুই ইনিংসে এগারটি উইকেট।

মধ্যত এই বথামের বিভিন্ন পেস বোলিংয়ের জন্যই কোন ইনিংসে নিউজিল্যান্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাট করতে পারেনি। তবে তাদের সংগ্রামের সুযোগ শেষ করে দেন খেলায় দুই আম্পায়ার ডেভিড কনস্ট্যান্ট ও টম স্পেন্সার।

তৃতীয় দিন বৃষ্টির আশংকা এবং অবনত মন্দ আলোর মধ্যে আম্পায়ারেরা ব্যাট করতে ডাকেন নিউজিল্যান্ডকে। কিন্তু মাত্র দুটি বল হবার পরই বৃষ্টির জন্য ব্যাটসম্যানদের প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয়। এর ফলে পরে ভিজে পিচে আবার ব্যাট করতে হয় নিউজিল্যান্ডকে। কারণ পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী একবার খেলা আরম্ভ হলে আর পিচ ঢেকে রাখার উপায় ছিল না। আকাশের অবস্থা দেখে আম্পায়ারেরা যদি দুটি বলের জন্য নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে না ডাকতেন তবে পিচ ঢাকা থাকত এবং এত খারাপ পিচে নিউজিল্যান্ডকে হয়তো ব্যাট করতে হত না। অন্তত কিছুটা সংগ্রাম করতে পারত। প্রথম ইনিংসে ৩০৯ রান পিছিয়ে পড়ে ফলোঅন করলেও সে সংগ্রামের কিছুটা আভাস দিয়েছিল কুড়ি বছর বয়সী ওপেনার ব্রুস এডগার, দ্বিতীয় ইনিংসে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট রান করে। পর পর দুটি টেস্টে জয়ের ফলে ইংলন্ড রাবার পায় এবং তৃতীয় টেস্টের আকর্ষণ কমে যায়। সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ইংলন্ড—প্রথম ইনিংস—৪২৯ (জিওফ বয়কট ১৩১, ক্লাইভ র‍্যাডলে ৫৯, গ্রাহাম গুচ ৫৫, মাইক ব্রিয়ার্লি ৫০, ডেভিড গাওয়ার ৪৬; রিচার্ড হ্যাডলি ৪—৯৪, ব্রুস ব্রেসওয়েল ৩—১১০, স্টিফেন বুক ২—২৯)

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস— ১২০ (জিওফ হাওয়ার্থ নট আউট ৩১, বিভান কংডন ২৭; বথাম ৬—৩৪; এডমন্ডস ২—২১)

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—১৯০ (এডগার ৬০, পার্কার ৩৮, হাওয়ার্থ ৩৪; এডমন্ডস ৪—৪৪, বথাম ৩—৫৯)

[ইংল্যান্ড ইনিংস ও ১১৯ রানে জয়ী।]

লর্ডস টেস্ট (২৪—২৮ আগস্ট)

লর্ডসের তৃতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ড কিন্তু প্রথম ইনিংসে পঞ্চাশ রানে এগিয়ে থাকার কৃতিত্ব দেখায়, জিওফ হাওয়ার্থের সেঞ্চুরি এবং বার্জেসের আটষট্টি রান সংগ্রহের ফলে। রিচার্ড হ্যাডলির বোলিংয়ের জন্যও বটে। কিন্তু প্রথম ইনিংসে এত ভাল ব্যাট করার পর মাত্র সাতষট্টি রানে নিউজিল্যান্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়া রীতিমত অপ্রত্যাশিত।

বথামের বলের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর সঙ্গেই মারাত্মক হয়ে ওঠেন বব উইলিস। মাত্র ষোল রানে পান চারটি উইকেট। এ টেস্টে এগারটি উইকেট নিয়ে ইয়ান বথাম মাত্র এগারটি টেস্টে পেয়েছেন উনষাটটি উইকেট। স্বাভাবিকভাবেই ইংলন্ড আশা করেছে টনি গ্রেগের শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিয়েছেন বথাম। গ্রেগ আটান্নটি টেস্টে ছয় বার পাঁচটির বেশী উইকেট পেয়েছেন। বথাম এগারটি টেস্টেই পেয়েছেন ছয় বার। লর্ডস টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর :

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস — ৩৩৯ (জিওফ হাওয়ার্থ ১২৩, মার্ক বার্জেস ৬৮, বি এডগার ৩৯: ইয়ান বথাম ৬—১০১, এম্বুরে ২—৩৯)

ইংলন্ড—প্রথম ইনিংস—২৮৯ (ক্লাইভ র‍্যাডলে ৭৭, ডেভিড গাওয়ার ৭১, মাইক ব্রিয়ার্লি ৩৩; রিচার্ড হ্যাডলি ৫—৮৪, রিচার্ড কলিঞ্জ ২—৫৮, বি ব্রেসওয়েল ২—৬৮)

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৬৭ (মার্ক বার্জেস ১৪, জিওফ হাওয়ার্থ নট আউট ১৪; ইয়ান বথাম ৫—৩৯, বব উইলিস ৪—১৬)

ইংলন্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—(৩ উইকেটে) ১১৮ (ডেভিড গাওয়ার ৪৬, গ্রাহাম গুচ নট আউট ৪২; রিচার্ড হ্যাডলি ২—৩১)

[ইংলন্ড সাত উইকেটে জয়ী।]

মুকুল

আই এফ এ শীল্ড এবং প্রথম বছরের খেলা

পরেশ নন্দী

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার এখন সম্মান এবং সমারোহের শেষ নেই। দীর্ঘ দিন ধরে নানা প্রকার উত্থান পতনের বৈচিত্র্যে গড়ে উঠেছে অতুলনীয় ঐতিহ্য। ফুটবল-ভক্তদের নিকট আই এফ এ শীল্ডের ইজ্জতই আলাদা। ফুটবল খেলার মরসুম এলেই সাড়া জাগে দিকে দিকে। প্রস্তুতি চলে কলকাতাতে; প্রস্তুতি চলে কলকাতার বাইরে।

বহু বছর ধরে চলেছে শীল্ড প্রতিযোগিতা। ৮৫ বছর পূর্ণ হয়ে এবার ৮৬ বছরে পড়ল। তবু কেমন করে এ শীল্ড প্রতিযোগিতার আরম্ভ হল সে কথাই একটু সংক্ষেপে বলব। যে সময়ের কথা তখন ফুটবল সবে কলকাতাতে আসর জমাতে শুরু করেছে। তখনও বিদেশী এ খেলাতে সাহেবদেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং সে শ্রেষ্ঠত্বও কুক্ষিগত করেছে সামরিক দলগুলি। বিশেষ করে কিছুদিন পূর্বেই—১৮৮৮ সালে কেবল সৈনিকদের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছিল ডুরান্ড প্রতিযোগিতা। সে খেলা হত তখন সিমলাতে। সৈনিক দলগুলি ভীড় করত সেখানেই।

প্রধানত ঐ সব সৈনিক দলের একটি অংশকে কলকাতাতে টেনে আনার উদ্দেশ্য নিয়েই হল আই এফ এ শীল্ডের সূচনা। কাজ বড় সহজ ছিল না। সে সময়ে ডুরান্ড ছিল সৈনিকদের নিজস্ব প্রতিযোগিতা। সামরিক দলগুলির স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব ছিল ঐ প্রতিযোগিতার উপর। কলকাতা ফুটবলের তদানীন্তন পালকেরা ঐ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা হিসাবে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করলেন। সামরিক এবং বে-সামরিক সব দলই খেলবে নূতন প্রতিযোগিতায়। সুতরাং ঐ প্রতিযোগিতাতে বিজয়ীর সম্মান লাভই হবে ভারতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

এমন একটি বৃহৎ ও ব্যাপক সর্বভারতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করতে সময় লাগল অনেক। প্রাথমিক ঘরোয়া কথাবার্তা শুরু হল ১৮৯২ সালে। কিন্তু নূতন প্রতিযোগিতার সূচনা হল আরো এক বছর পরে—১৮৯৩ সালে। কলকাতা ফুটবলের জনপ্রিয়তা বর্ধনের সংকল্প নিয়ে প্রথম এগিয়ে এল ডালহৌসি ক্লাব। ১৮৮৯ সালে কলকাতার সর্বপ্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে ট্রেডস কাপ প্রবর্তনের কালে ডালহৌসি ক্লাবই ছিল অগ্রণী। তখন চেয়েও তারা ক্যালকাটা ক্লাবের সহযোগিতা পায়নি। ক্যালকাটা ক্লাব তখন সম্পূর্ণই মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

কিন্তু ট্রেডস কাপ নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। নূতন প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা সর্বভারতীয়। কাজেই ক্যালকাটা ক্লাবের সহযোগিতা ও সমর্থন এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সহায়তা লাভের জন্য সক্রিয় হলেন ডালহৌসি ক্লাবের সেক্রেটারী সি এ বি ব্রাউন এবং সে দলেরই প্রতিষ্ঠাবান খেলোয়াড় সি বি লিন্ডসে। তাঁদের সঙ্গে এসে কাঁধ মেলালেন শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। প্রধানত ঐ স্মরণীয় ত্রয়ীর জন্যই ক্যালকাটা ক্লাবের মিঃ ওয়াটসনেরও সমর্থন পাওয়া গেল।

১৮৯২ সালের কথা। এই চার ব্যক্তি পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার উপযুক্ত একটি ট্রফির বন্দোবস্ত করতে হবে সর্বপ্রথম। প্রথমে কথা হল ডুরান্ড কাপের অনুরূপ, অথচ তার চেয়ে বড় একটি কাপই হবে নূতন প্রতিযোগিতাতে বিজয়ীর পুরস্কার। কিন্তু নগেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, পুরস্কার হিসাবে একটি শীল্ড ঘোষণা করলে নূতনত্ব হবে এবং নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতার আকর্ষণও অনেক বৃদ্ধি পাবে। নগেন্দ্রপ্রসাদের অভিমত সকলেই সমর্থন করলেন। তখন প্রধান সমস্যা হল শীল্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ। প্রতিযোগিতার লাগসই নামকরণ হল তাঁদের দ্বিতীয় সমস্যা।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, ১৮৯২ সালেও কর্মকর্তারা বাঁধাধরা পথে প্রতিযোগিতাকে কোন রাজপুরুষের নামাঙ্কিত করার কথা চিন্তা করেননি। অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলের আইন অনুসারে এ প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে। তাই তাঁরা স্থির করলেন, প্রতিযোগিতার নাম হবে ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন শীল্ড। (Indian Football Association Shield) আর প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবে যে কমিটি তার নাম হবে—ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। শীল্ডের নাম থেকেই পরিচালনা কমিটির নাম হল আই এফ এ। এ হল আই এফ এর জন্মের ছোট ইতিহাস।

নাম স্থির হলে আরম্ভ হল শীল্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ। টাকা দিলেন কুচবিহারের মহরাজা, পাতিয়ালার মহারাজা এবং ধনকুবের মিঃ আপকার ও মিঃ সাদারল্যাণ্ড। তখন কলকাতার মেসার্স ওয়ালটার লক এণ্ড কোম্পানির মাধ্যমে লণ্ডনের মেসার্স এলকিংটন এণ্ড কোম্পানির সঙ্গে শীল্ড তৈরীর জন্য চুক্তি হল। ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শীল্ডের অর্ডার দেওয়া হল। কথা হল, ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসেই লণ্ডনের কোম্পানি শীল্ড কলকাতাতে পৌঁছে দেবে। কথা হল বটে, কিন্তু কাজে তা হল না। সময়মত শীল্ড এসে পৌঁছুল না। বর্তমান পাঠকেরা জেনে হয়ত অবাক হবেন যে, শিবহীন যজ্ঞের মত প্রথম বছরের

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শীল্ড ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৯৩ সালের জুন মাসেই কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে মিঃ ব্রাউনের স্বাক্ষরে শীল্ড প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। উদ্যোক্তারা ভাল করেই জানতেন যে, প্রথম বৎসরে ডুরাংড ফেলে কোন সৈনিক দলই শীল্ডের টানে কলকাতাতে আসবে না। তাই বিজ্ঞাপনে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, উদ্বোধনী বৎসরে এ প্রতিযোগিতা আঞ্চলিক ভিত্তিতেই খেলা হবে। লখনৌ তখন মস্ত বড়-ক্যানটনমেন্ট শহর; সেখানে মোতায়েন আছে বহু গোরা সৈনিক দল। তাই স্থির হল, কলকাতা এবং লখনৌ এ দু অঞ্চলে শীল্ড প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাগুলি হবে। দুই আঞ্চলিক বিজয়ী দলের মধ্যে ফাইন্যাল খেলা হবে কলকাতায়।

স্টেটসম্যান ১৩ই জুলাই সংবাদ দিলেন, 'শীল্ড প্রতিযোগিতায় নাম দেবার শেষ দিন ছিল আজ। কিন্তু মেয়াদ তিনদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন [illegible] (শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিল নয়টি স্থানীয় দল; এর মধ্যে আছে ভারতীয় দল শোভাবাজার।' শীল্ড সম্বন্ধে ঐ সংবাদপত্র জানালেন, "ডালহৌসী ক্লাব এক সহস্র টাকা ব্যয়ে এ শীল্ডটি তৈরী করিয়েছে।" কোন দল একাদিক্রমে তিনবার এ প্রতিযোগিতাতে বিজয়ী হলে শীল্ডটি তাদের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে।"

যথাসময়ে দলের নাম নেওয়া বন্ধ হল এবং আই এফ এ শীল্ডের উদ্বোধনী আসরের ক্রীড়া-তালিকা প্রস্তুত হল। স্টেটসম্যান ২২শে জুলাই জানালেন যে, প্রথম বছরের খেলায় যোগ দিয়েছে নয়টি স্থানীয় দল এবং বহিরাঞ্চলে যোগ দিয়েছে রয়াল আইরিশ রাইফলস্, অকসফোর্ডশায়ার, ইস্ট ল্যাঙ্কাশায়ার ও আর্গাইল এণ্ড সাদারল্যাণ্ড প্রমুখ চারটি সৈনিক দল। ঐ সংবাদপত্রেই ক্রীড়া-তালিকাটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হল :

প্রথম পর্যায় : ডালহৌসি বনাম রয়াল সাসেক্স; **দ্বিতীয় পর্যায় :** (১) শোভাবাজার বনাম ৫ম রয়াল আর্টিলারি, (২) ইউনাইটেড ক্লাব, হাওড়া বনাম প্রথম পর্যায়ের বিজয়ী; (৩) রাইফেল ব্রিগেড বনাম ক্যালকাটা ও (৪) ২১ রয়াল আর্টিলারি বনাম নেভাল ভলানটিয়ার্স; **তৃতীয় পর্যায়** (২- খেলার বিজয়ী বনাম (৪) খেলার বিজয়ী (১) খেলার বিজয়ী বনাম (৩) খেলার বিজয়ী ফাইন্যাল : তৃতীয় পর্যায়ের বিজয়ী বনাম বহিরাঞ্চলের বিজয়ী।

প্রথম বছরের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হল ৬ই আগস্ট। প্রথম দিন ছিল দুটি খেলা। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ক্যালকাটা মাঠে ২১ রয়াল আর্টিলারি দল অতি সহজেই ৩—০ গোলে বিজয়ী হল নেভাল ভলানটিয়ার্স দলের বিরুদ্ধে। গোল করেছিল এডামস ও রোজার্স (২)। দ্বিতীয় খেলাতে ডালহৌসি নিজ মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল রয়াল সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে। সৈনিক দল প্রথমার্ধে ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে লিন্ডসের সাহায্যে একটি গোল করে ডালহৌসি খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ করে। সেদিন অতিরিক্ত সময় খেলা হল না। কিন্তু ৯ই আগস্ট ডালসিক্ত মাঠে অতিরিক্ত সময় খেলা হওয়া সত্ত্বেও খেলাটি রইল ১—১ গোলে অমীমাংসিত। তারপর রোজই একটি দুটি করে খেলা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেছে প্রতিযোগিতার অগ্রগতি। ক্যালকাটা দলের প্রথম খেলা ছিল ১১ই আগস্ট। খেলার একমাত্র গোলটি করেছিল এমটন।

শোভাবাজারকে কেন্দ্র করে সেদিনের ভারতীয় ফুটবল রসপিপাসুদের বিশেষ কোন আশা নিশ্চয়ই ছিল না। তবু ঘরের ছেলেরা খেলছে শীল্ডে এবং খেলছে একটি সৈনিক দলের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মদত জোগাতে মাঠে এসেছিল বেশ কিছু লোক। "নেভাল ভলানটিয়ার্স (বর্তমান রেঞ্জার্স) মাঠে শোভাবাজার এবং ৫ম রয়াল আর্টিলারি দলের মধ্যে খেলাটি দেখতে"—বললেন স্টেটসম্যান "এসেছিল একটি ক্ষুদ্র জনতা। তবে যেমন আশা করা গিয়েছিল ঐ খেলাতে সৈনিক দল অনায়াসেই ৩—০ গোলে বিজয়ী হল। আর্টিলারি দল সূচনা থেকেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু গোলরক্ষক চৌধুরীর কৃতিত্বে সৈনিক দল তখন বিফল হল। তারপর স্মিথের একটি চমৎকার শটে তিনি পরাজিত হলেন। এক গোলে পশ্চাৎবর্তী হবার পর বাবুদের খেলাতে একটু উন্নতি দেখা যায় কিন্তু মুখার্জি তখন একটি সুযোগের অপচয় করেন। ম্যাকডোনাল্ড অতঃপর আর একটি গোল করলে সৈনিক দল প্রথমার্ধে ২—০ গোলে অগ্রগামী হয়। বিরতির পর লোমাস তৃতীয় ও শেষ গোলটি করে।

এদিন শোভাবাজার দলে খেলেছিলেন, বি চৌধুরী, মতিলাল ও বি সর্বাধিকারী, এম দাস, বে মিত্র (অধিনায়ক) ও এ পাল, ইউ ব্যানার্জি, বি

দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শেষ ... না। ডালহৌসি এবং রয়াল আর্সের দলের খেলা মীমাংসিত হল তৃতীয় সাক্ষাতে। ১—০ গোলে জিতল ডালহৌসি। কিন্তু প্রতিযোগিতায় তারা আর এগোতে পারল না। পরবর্তী খেলাতে হাওড়া ইউনাইটেড ২—০ গোলে হারিয়ে দিল ডালহৌসিকে। ঐ পরিস্থিতিতে স্থানীয় অঞ্চলের শেষ চারটি দল নিম্নলিখিতভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হল : ক্যালকাটা বনাম ৫ম রয়াল আর্টিলারি, ইউনাইটেড হাওড়া বনাম ২১ আর্টিলারি।

স্থানীয় অঞ্চলের তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম খেলাটি হল ২১শে আগস্ট কিন্তু ২৯শে আগস্ট পর্যন্ত ০—০, ০—০, ০—০ গোলে অমীমাংসিত রইল। পরের খেলাতে ক্যালকাটা পরাজিত হল ০—১ গোলে। সেমিফাইন্যালে উঠল গোড়াবাজার বিজয়ী ৫ম রয়াল আর্টিলারি। ইউনাইটেড হাওড়া দলও দুদিন অমীমাংসিত খেলার পর (১—১,১—১) তৃতীয় সংঘর্ষে বিজয়ী হল ১—০ গোলে। কলকাতার একটি সামরিক ও একটি বে-সামরিক দলের মধ্যে শীল্ডের প্রথম সেমিফাইন্যাল খেলাটি হল ২রা সেপ্টেম্বর এবং সে খেলাতে লোমাস একটি গোল করে বিজয়ী করলেন ৫ম রয়েল আর্টিলারি দলকে।

সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার কলকাতা অঞ্চলের খেলা শেষ হল। এখন শীল্ড জয়ের পরম সম্মানের জন্য চরম সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে বাহিরাঞ্চলের বিজয়ী দল। কিন্তু সে কোন্ দল? জানা গেল ২৫শে আগস্ট। সেদিন ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ সংবাদ দিলেন, "রয়াল আইরিশ ৫—০ গোলে ইস্ট ল্যাঙ্কাশায়ার দলকে হারিয়ে লখনউ অঞ্চলের বিজয়ী হয়েছে এবং তারাই এখন ৫ম রয়াল আর্টিলারি দলের বিরুদ্ধে ফাইন্যালে খেলবে।

উদ্বোধনী বৎসরের শীল্ড ফাইন্যাল—সর্বপ্রথম এবং সর্ব নূতন।

এল সে দিন। সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা এবং তার সর্বপ্রথম ফাইন্যাল। খেলা হল ২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার। খেলাটি অনুষ্ঠিত হল। ক্যালকাটা মাঠে নয়। ডালহৌসি মাঠে।

আলোচ্য ফাইন্যালটিকে নিয়ে কলকাতার তদানীন্তন দর্শকদের কি মনোভাব হয়েছিল এবং একে উপলক্ষ করে তারা কেমন মেতে উঠেছিল তা আজ অনুধাবনের উপায় নেই। কিন্তু বর্তমানের চোখ নিয়ে অতীতের সে দিনটির দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। প্রথম—দর্শকদের উৎসাহ কি সেদিন মাত্রাহীন হয়েছিল? আজকের নিরিখে হয়ত তা হয়নি। লোক হয়েছিল মাঠে দশ হাজার এবং প্রায় সবই সাহেব এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। দেশী লোকও কিছু ছিল বটে। কিন্তু তারা নাকি খেলার টানে আসেনি। তারা এসেছিল খেলার মাঠে বাজি খেলে পয়সা কামাতে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—দর্শকেরা কি স্থানীয় দল হিসাবে ৫ম রয়াল আর্টিলারি দলকে সমর্থন জানিয়েছিল? এ সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। তবে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখেছিলেন, "১০০—৯০ দরেও রয়াল আর্টিলারি দলের উপর বহু লোক টাকা লাগিয়েছিল। আইরিশ রাইফেল-এর দর ছিল ৩—১।"

লোক হয়েছিল মাত্র দশ হাজার। কিন্তু ১৮৯৩ সালে ফুটবল মাঠে তাই ছিল প্রচণ্ড ভিড়। ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ বলেছিলেন, "বিকাল সাড়ে চারটাতেই চার আনা মূল্যের আসনগুলি সব ভর্তি হয়ে গেল। পাঁচটার সময় মাঠের দড়ির পাশে দাঁড়াবার আর কোন জায়গাই নেই। জায়গা নেই, তবু লোক আসছে। শেষ পর্যন্ত চার-পাঁচ পংক্তি গভীর হয়ে লোক দাঁড়াল দড়ির পাশে—ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি।"

যা হোক, সর্বপ্রথম শীল্ড ফাইন্যালের দিন বরুণদেব কিন্তু সত্যই বড় অকরুণ হলেন। চার ঘন্টা একটানা বৃষ্টি হল দুপুর পর্যন্ত। স্টেটসম্যান মন্তব্য করলেন, "জুপিটার প্লুভিয়াসের ভ্রূকুটিতে ... খেলাটির সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে না। পিচ্ছিল ডালহৌসী মাঠে খেলাটি হল নিতান্তই শ্লথগতি।"

টসে জিতল রয়াল আইরিশ দল। রেড রোডের দিক থেকে খেলার সূচনা করল আর্টিলারি। খেলার বিবরণ দিতে গিয়ে স্টেটসম্যান লিখলেন, "খেলার সূচনা করল আর্টিলারি, কিন্তু আইরিশ দলের শক্তির পরিচয় শীঘ্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আর্টিলারি দলের হাফব্যাকদের খেলাতে মোটেই দৃঢ়তা ছিল না। এই সুযোগে আইরিশ দল কয়েক বার আক্রমণ করলেও তাদের অগ্রগতি প্রতিহত হল ব্যাক স্পিন্ডলির দক্ষতায়।" তারপর খেলা কিছুক্ষণ মাঝ মাঠেই আটকে রইল। অল্প পরেই একটু চাঞ্চল্য হল। সে সময়ের খেলা সম্বন্ধে স্টেটসম্যান লিখেছিলেন, "এখন আইরিশ দলের আক্রমণ দুর্বার হয়ে উঠল। কয়েক বারই তারা প্রতিপক্ষের উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করল এবং শেষ পর্যন্ত আদায় করল একটি কর্নার। সুন্দর কর্নার কিক থেকে বার্ক হেড করে খেলার প্রথম গোলটি করল। আইরিশ রাইফেলস অগ্রগামী হল গোলে।"

বিরতির পর রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠল আইরিশ দল। তারা কয়েক মিনিট অনবরত আর্টিলারি দলের গোল সীমানাতে হানা দিল। "লোমাস একক নৈপুণ্যেই খেলার গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। এভাবে দশ বারো মিনিট খেলার পর লোমাসই তার দলকে রক্ষা করলেন। তিনিই একটি মাপা পাশে সুন্দর একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন এবং টমলিনসন কোনাকুনি শটে বলটিকে জালের মধ্যে পাঠালেন ১—১।

উভয় দলই এখন সমান সমান, খেলাও চলছে সমান তালে। এমন সময় আইরিশ দলের লেফট ইন সেলডন একটি বল নিয়ে দৌড়ুতে গিয়ে ভিজে মাঠে বেমক্কা পড়ে গেল। ভেঙে গেল তার পায়ের হাড়। খেলার মাঠে একটু নিরানন্দের সৃষ্টি হল। আইরিশ দল এখন দশ জনে খেলছে। আর্টিলারি এখন গোটা দুই সুযোগ পেল, কিন্তু কোন প্রকৃত সুবিধা আদায় করতে পারল না। খেলাটি এদিন শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবেই শেষ হল।

৫ম রয়াল আর্টিলারি : হকসওয়েল, ব্রাউন ও স্পিন্ডলি, মার্টিন, হাসলাম ও ম্যাকডিটি, প্রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড, লোমাস, টমলিনসন ও এণ্ডারসন।

রয়াল আইরিশ রাইফেলস : ফিলিপস, বেরেসফোর্ড ও বার্ফি, সিমন্ড, ও ও'কনর ও ডানভাস, ওয়েবস্টার, ওয়াইল্ডম্যান, লেম, সেলডন ও বার্ক।

রেফারী : মিঃ ব্রাউন।

প্রথম দিনের অমীমাংসিত খেলার পর কলকাতায় সাইক্লোনের ভাব দেখা দিল। ... ৬ই সেপ্টেম্বর খেলাটি আবার অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। এদিন কিন্তু আবহাওয়া হল সুন্দর। ডালহৌসি মাঠ হল মনোরম। আগের দিনের চেয়ে খেলায় বোধ হয় ভিড় একটু বেশীই হয়েছিল। রাস্তার উপর ঘোড়ার গাড়ির ছাদে বসে কিছু লোক খেলা দেখেছিল। আর্টিলারি দলে এদিন কোন পরিবর্তন ছিল না, কিন্তু আইরিশ দলে আহত সেলডনের পরিবর্তে খেলেছিলেন ফ্লাহার এবং খেলার একমাত্র গোলটি করেছিলেন তিনিই।

এ গোলটি হল কিন্তু অদ্ভুত ভাবে। স্টেটসম্যান গোলটির বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন, "প্রথমার্ধের মাঝামাঝি একটি সেন্টার করলে স্পিন্ডলি তা আটকাতে অসমর্থ হলেন। গোল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন হক্সওয়েল কিন্তু বিপদ কাটাতে গিয়ে তার হল পদস্খলন। পড়ে গিয়ে তাকে গড়াগড়ি দিতে হল। ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ালেন হকসওয়েল এবং শূন্য গোল লক্ষ করে দিলেন ছুট। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে বল ধরে ফ্লাহার ফাঁকা গোলে শট করলেন। গোল হয়ে গেল এবং সেই এক গোলেই সর্বপ্রথম শীল্ড ফাইন্যালে বিজয়ী হল রয়াল আইরিশ দল।"

যবনিকাপাত হল প্রথম বছরের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার উপর।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

Sanskrit and Modern Medical Vocabulary. Asoke Kumar Bagchi. Riddhi India, 28 Beniatola Lane, Calcutta-9. Price Rs. 40.

ইউরোপীয় পণ্ডিতবৃন্দের কাছে ভাষারহস্যের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণবিধি জানার পর থেকে। উইলিয়ম জোনস সংস্কৃত ভাষাকে সর্বাপেক্ষা সুগঠিত বলেছিলেন। তিনি এবং স্লেগেল সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত ভাষার সাদৃশ্যও লক্ষ করেছিলেন। স্লেগেল এই সাদৃশ্য লক্ষ করেই ইউরোপীয় ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার মূল যে একই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। এর পর থেকে ভাষা আলোচনায় নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল। ভাষাতত্ত্ব বিচার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বেশী দেরী হয়নি। যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন সে গোষ্ঠীর ভাষার পরিবর্তন, ব্যাকরণবিধি ডঃ বাগচীকে কৌতূহলী করেছে। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার আশ্রয়ে চিকিৎসাবিদ্যার শব্দভাণ্ডারের গতিপ্রকৃতি নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শব্দভাণ্ডার যে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের কাছে নানা দিক দিয়ে ঋণী বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে লেখক সে বিষয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সাধারণত লাতিন, গ্রীক, ফরাসী ইত্যাদির শব্দাবলী চিকিৎসাবিদ্যার শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে—এরকমই সকলের মত। কিন্তু ডঃ বাগচী মনে করেন সংস্কৃতের সঙ্গেই আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শব্দভাণ্ডারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

ডঃ বাগচী তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্য পূর্বাচার্যদের ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সার সংগ্রহ করেছেন কয়েকটি অধ্যায়ে। তিনি এই আলোচনা কালে সংস্কৃত শব্দাবলীর সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার শব্দাবলীর যে সাদৃশ্য আছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ডঃ বাগচী সাইবেরিয়ার ওব নদী নামটি গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত অপ এবং পারসিক অব-এর সঙ্গে শব্দটির সাদৃশ্য আছে। তুর্কী দুটি নদী—বৃহৎ জ-অব ও ক্ষুদ্র জ-অব এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমু দরিয়া নদী নামটির গ্রীক প্রতিশব্দ অক্সাস। অক্সাস সংস্কৃত অক্ষি অথবা চক্ষুর সমতুল্য (ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে)। অম অর্থ ভীষণ। সংস্কৃত আমুর অর্থ ধ্বংসকারী। দরিয়ার বুৎপত্তি দর অথবা ধারা। আবার আমু দরিয়া নদীটির স্থানীয় নাম বক্ষর-অব। ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে বক্ষ, অক্ষি ও চক্ষু প্রায় সমজাতীয়। বক্ষ (উক্ত—মনিয়ের উইলিয়মস) অর্থ বহতা অর্থেও প্রযুক্ত। এরকম এন্সা (নদীর নাম) শব্দটি সংস্কৃত অম্বুর কাছাকাছি। দিনা (সং দীনা), ভোলগা (সং ভেলা) ইত্যাদি শব্দভাণ্ডারে এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এই রকমভাবে বহু উদাহরণ দিয়ে ডঃ বাগচী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, মনিয়ের উইলিয়মস তাঁর অভিধানে সংস্কৃত শব্দাবলীর সঙ্গে লাতিন, গ্রীক, জার্মানিক, কেলটিক ইত্যাদি শব্দাবলীর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। ডঃ বাগচী এরপর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ কোনো একসময়ে ভারত থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সেকথা বলেছেন। গ্রিম, বেরনের ইত্যাদির সূত্র অবলম্বনে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার যে পরিবর্তন (বিশেষত চিকিৎসাবিদ্যার শব্দভাণ্ডারে) হয়েছিল তার উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। এখানেও তিনি প্রথমে সংস্কৃত শব্দটি দিয়ে পর পর অন্যান্য ভাষার পরিবর্তন দেখিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষার এই গুরুত্ব নিরূপণ করে তিনি আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে সংস্কৃত এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার শব্দভাণ্ডারের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার এবং আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শব্দভাণ্ডারের উদাহরণ নিই। যেমন, টোনালিটি (সং তান), টোনিয়া (সং স্থূণ), এক্সালিটা, এক্সাইটমেণ্ট (সং সক্র), সার্ভো মেকানিজম (সং সেবক), লোশিও আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (সং রজতভস্ম) প্যান্দন (সং পন্থ), রোটারি (সং রথ), অর্থপেডিক (সং পদ), নার্ভ, নার্ভাস সিস্টেম (সং নাড়ী), নেভাল (সং নাভি), মেলাঙ্কলিয়া (সং ম্লান), মাসক, ম্যাসকুলাইন, ইমানকুলেশন (সং মুষ্ক), ম্যানিয়া, ক্লেপ্টোম্যানিয়া (সং মন), লোকোমটোর অ্যাটেক্সিয়া (সং লোক), এন্টেরিক (সং অন্ত্র) ইত্যাদি। ডঃ বাগচীর তালিকা দীর্ঘ। কৌতূহলী পাঠকের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরিভাষা রচনার দিক থেকেও এসব উদাহরণ বিশেষভাবে বিবেচ্য।

ডঃ বাগচীর কিছু কিছু সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভাষাবিদ্‌গণ নিশ্চয়ই একমত হবেন না। বিশেষত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীর আদি বাসস্থান সম্বন্ধে ডঃ বাগচীর অনুমান নিছক অনুমানই। উৎপত্তির দিক দিয়ে লেখা যে-সব সিদ্ধান্ত করেছেন সেগুলি সম্বন্ধেও ভিন্নমতের অবকাশ থেকেই যাবে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার শব্দাবলী, ব্যাকরণবিধির মধ্যে সাদৃশ্য থাকবেই। সে সাদৃশ্য আবিষ্কারে ডঃ বাগচীর উদ্যম প্রশংসনীয়। ডঃ বাগচী যে বিতর্কের সৃষ্টি করলেন ভাষাতত্ত্ব আলোচনার কৌতূহলী গবেষকবৃন্দ সে বিতর্কে যোগ দেবেন এইটি আশা করব।

বিজিতকুমার দত্ত

শ্বেতপাথরের টেবিল। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আনন্দ পাবলিশার্স, মূল্য ৬.০০

আজকাল বাংলা সাহিত্যে সরসতার আকাল পড়েছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় অতর্কিতে উদিত হয়েছেন মরুবিজয়ের কেতন উড়িয়ে, উদয় না বলে অভ্যুদয় বলাই ভালো—এবং আশ্চর্য [illegible] ধারায় আমাদের বুক ভরিয়ে দিয়েছেন।

মাত্র গল্পটির উৎকর্ষ নিয়ে মুখ খুললে আর থামা যাবে না। সঞ্জীবের ভাষার সহজ কৌতুকপ্রবণতা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের প্রাণচাঞ্চল্য, আর তাঁর দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য প্রথম নজরেই পাঠকের মন কেড়ে নেয়। গুরুকে লঘু করে দেখার জাদু তাঁর চোখে আছে, তাই মানুষের মানসিক দুর্বলতা, বিচ্যুতিগুলিই ক্রোধের পরিবর্তে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায় সঞ্জীবের কলমে। বিরোধবিক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে উদ্ভটরসের স্বাদ খুঁজে নেওয়ার, সর্ব অবস্থার মধ্যে মজা পাবার দুর্লভ শক্তি, যা যৌবনেরই একচেটিয়া ঐশ্বর্য, এবং এক ধরনের স্মার্ট আন্ডার-ইয়ার্কির বাক্‌ভঙ্গি, যা একান্তই বুদবুদেও, এই দুটি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনার মেরুদণ্ড। এ ছাড়া শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতেও সঞ্জীব ওস্তাদ ('তাঁর আধখানা মাথায় কলপ লাগানো কড়কড়ে চুল, তেরালেপরা জ্যাঠামশাইকে পাঠকরা স্বচক্ষে দেখেছেন')। আরো একটি অসামান্য গুণ আছে তাঁর, গল্প বলবার একটা নিজস্ব ধাঁচ, নিদারুণ টেনে রাখেন তিনি পাঠকদের। সবচেয়ে নজর কাড়ে কিন্তু তাঁর দুঃসাহস, প্রথা-ভাঙবার সাবলীল আত্মবিশ্বাস। এই বাঙালী মধ্যবিত্ত হাস্য পরিহাসের পর্দাটানা ঘরে তিনি অনায়াসে নিষিদ্ধ রসের আমদানি করেন (risque)—অ্যাবসলুটলি নো ইজ্যাকুয়েশন!" এবং তার পরেই অবিস্মরণীয়—"একটু প্যাক-প্যাক?" পরশুরামের সেই—"স্বাঃ মানেই হ্যাঁ!"-এর মতো চিরন্তন হয়ে রইল।

এ ছাড়া ওই একই দুঃসাহসে সঞ্জীব বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি চিরাচরিত 'ইমেজ' ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন বাবা-জ্যাঠা-শ্বশুরের সাহিত্যিক চরিত্র। সেইসঙ্গে নববধূর ইমেজও।

কে না জানে, বাঙালীর ছেলে বাল্যে পিতার, যৌবনে পত্নীর, এবং বার্ধক্যে পুত্রবধূর শাসনে জীবনধারণ করেন? পিতৃ-শাসিত বখাটে পুত্র ও পত্নী-শাসিত বশংবদ পতি, এই দুই জাতীয় বাঙালীর ক্লোজআপ ছবি 'বঙ্কিম'। আমাদের খুব চেনা, একবার বুকের ভিতর দৃষ্টিপাত করলেই তাকে দেখা যাবে। কিন্তু ঐতিহ্য ভাঙা বিদ্রোহী চরিত্র হলেন শ্বশুরমশায়। বাংলা সাহিত্যে পিতার চরিত্র হয় গম্ভীর, গভীর, সৎ, স্নেহপ্রবণ কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংযত, কর্তব্যপরায়ণ। সেই বহুগুণান্বিত মহাপুরুষের পরিবর্তে সঞ্জীব এনেছেন অবুঝ, বয়সী, চতুর, গোঁয়ার, পুত্রস্নেহান্ধ, দাম্ভিক আশ্চর্য এক বাবাকে—যার প্রায় পুরোটাই ত্রুটি দিয়ে তৈরি। এবং এই ত্রুটিপ্রাচুর্যই তাঁর প্রতি আমাদের মমতা গড়ে দেয়, আমোদের উৎসও সেই দোষবাহুল্য। পুত্রবধূর লাইফ মিজারেবল করার দায়িত্বটি বাংলা সাহিত্যে শ্বশ্রূমাতার জন্যই সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত—সঞ্জীব সেই মহান কর্তব্য এখানে শ্বশুরে অর্পণ করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই পালটে গেছে শ্বশুরের গতানুগতিক ইমেজ, এবং পুত্রবধূরও। ঘরের মধ্যে কেডিও খুলে নতুন বউয়ের টুইস্ট নাচন, অর্থাৎ পয়লা রাতেই শ্বশুর শাসন—আবার সাইকেলের পিঠে চড়িয়ে সেই শ্বশুরের জন্যেই লাঠি আর টর্চ নিয়ে বাস স্টপ থেকে স্বামী গ্রেপ্তার করার নিয়মিত কর্তব্য পালন এ জিনিস বাংলা সাহিত্যে শাশ্বত হয়ে গেল, 'রসময়ীর রসিকতার' মতো। বর্মি বাক্সের পাশাপাশি, বা কাশীবাসী ছোটঠাকুরদার মতো এই বউ-বাবা-জ্যাঠাও বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের পারিবারিক বৃত্তের অমর-সংসদে ঠাঁই পাবেন। যেমন পাগলা দাশু, কি লালিম পাল (পুং), যেমন হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন, যেমন টেনিদা। সঞ্জীব কিন্তু এঁদের কারুর মতোই নন। তিনি তাঁর নিজের মতো। মাঝে মাঝে, জেরোম কে জেরোম, কি পি জি ওডহাউসকে মনে পড়িয়ে দিলেও, সঞ্জীবের চরিত্রটা বিদেশী আমদানি নয়, খাঁটি বাঙালী। ভলতেয়ার বলতেন ট্র্যাজিডি সর্বকালীন, সর্বজনীন। কিন্তু কমেডি দেশ, কাল, সংস্কৃতি ও ভাষার অধীন। ভাষা ও দেশাচার ভাল করে না বুঝলে রসিকতাপূর্ণ মর্মোদ্ধার সম্ভব হয় না। সঞ্জীবের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। তাঁর হাসিও একান্তই বঙ্গসংস্কৃতি নির্ভর—নিরীহ বাঙালী পতি ভিন্ন কে আর বুঝবেন যে প্রত্যেকটি ললিত লবঙ্গলতা বঙ্গবধূই ভিতরে ভিতরে জবরদস্ত কর্নেলের মেয়ে, কাবলি জেনানা? প্রত্যেকেরই নিঠোর পাকা লাঠি, আর দৃষ্টিতে হাইপাওয়ারের টর্চ আছে—একমাত্র স্বামীটি ছাড়া আর কেউ তা চর্মচক্ষে দেখতে পান না, এই যা!

বাংলাসাহিত্যের ভাঁড়ারে নির্মল পরিহাসের রসদ খুব বেশি নয়—বেশির ভাগই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ। সমাজ সংস্কারের মন নিয়ে যা লেখা হয় তাতে মধুর চেয়ে কষায় স্বাদই বেশি, সে হাসি খেলা হাসি না, বক্রহাস্য। ইদানীং সেটাই বেড়ে উঠেছে, হঠাৎ, হঠাৎই একটা দুটো 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ী', কি 'ঝাঁকিদর্শনে'র মতো লেখা বেরিয়ে পড়ে। আজকের প্রণয় পরিশ্রান্ত, বিচ্ছিন্নতা বিমূঢ়, এবং বিপ্লব-প্লাবিত বাংলাসাহিত্যের স্বেদসক্ত মাথা শরীরে অনেকদিন পরে সঞ্জীব দক্ষিণের বাতাস এনে দিয়েছেন। আজগুবি কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে, খাঁটি বাস্তবের পরিধির মধ্যে থেকেই সঞ্জীব জীবনের আজগুবি দিকটি আবিষ্কার করেন, যেমন শ্বেতপাথরের টেবিল, যেমন শ্বশুর বাড়ির শাল'। কিন্তু সঞ্জীব শুধুই "হাসির লেখক" নন। কখনও মানুষের মনের সূক্ষ্মতম খেলাগুলি তাঁর গল্পকে তীব্র মমতারসে উজ্জীবিত করে রাখে—যেমন 'দুই পিতা', কি 'তৃতীয় পুরুষ'। এখানেই পাঠকের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের গ্রন্থিবন্ধন। বাস্তব, মানবিক অনুভূতিগুলির সততা নষ্ট না করেই হাস্যরস সৃষ্টি করেন তিনি—অতিপরিচিত প্রাত্যহিকতার মধ্যেই গড়ে দেন কয়েকটি অমর মুহূর্ত। যেমন ভোরের আলোআঁধারে মর্নিং ওয়াকে বেরুলে খিজি অভিজেলা কলকাতাকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। "শ্বেতপাথরের টেবিল" পড়বার পরে তেমনি অতি-ঘনিষ্ঠ, মধ্যবিত্ত সংসারের পরিবেশকেও মায়া করতে ইচ্ছে হয়, মনের স্বাস্থ্য উদ্ধার হয়। নতুন মমতার আরো কিছুদিন বাঁচতে সাধ জাগে।

দাশগুপ্ত; ঈশান, ৭৯/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, দাম পাঁচ টাকা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর কবিতায় শব্দ ও ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোত সহজ মাধুরী (নুয়ান্সেস) ধরতে পেরেছেন সক্ষমভাবে। তিনি প্রতিদিনের যৎসামান্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। অপাংক্তেয় অনুভব প্রণবেন্দুর হাতে পড়ে প্রাণ পেয়েছে—হয়েছে মূল্যবান; যেমন শিল্পীর হাতে পড়ে মাটির তাল প্রতিমা হয়ে যায়। অথচ প্রণবেন্দুর কোনো ভান নেই, কৃপণতা নেই—কবিতা করার জন্যে কোনো চাতুরী নেই। সবই যেন স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে এসেছে একেবারে হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু থেকে। চারদিকের নিতান্তই সাদামাটা ব্যাপারগুলি কবিতা হয়ে উঠেছে প্রণবেন্দুর প্রচণ্ড দৃষ্টিশক্তিরই জন্য। সেই দৃষ্টি প্রসঙ্গে কবির নিজেরই বক্তব্য—'এত গাঢ় অন্ধকার, প্রথমে কিছুই চোখে পড়ে না সহজে।/কিন্তু যদি দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ করা যায়,/শরীরে সমস্ত রক্ত এক জায়গায় জড়ো হয়,/তাহলে বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বাইরে চলে আসা,/বিদ্যুৎ-চমকে দেখা যায়—অন্তত অর্ধেক লোক মরে আছে আমার স্বদেশে।' প্রণবেন্দু দেখতে জানেন, তিনি তাকিয়ে থাকেন না। এখানেই তাঁর নিবিড় গভীর সার্থকতা। তিনি যা বুঝতে পারেন না তা নিয়ে একটি কথাও বলতে চান না—বলেন না। আসলে তিনি ছড়িয়ে পড়েন না—গভীরে যান। এটুকু সততা, এটুকু নিষ্ঠা প্রতিটি কবির কাছেই কাম্য। প্রণবেন্দু জীবনানুগ; তাই বলতে পারেন,—'আমার ধর্ম নেই, রাজনীতি নেই,/তবু আমার পা বাঁধা আছে জীবনে,/সেখান থেকে আমি বেরোতে চাই না'।

একই সঙ্গে এই সময়ের জটিলতা বিষয়েও প্রণবেন্দু কত সচেতন। তাই 'টান পড়ছে' কবিতায় লেখা হল—'টান পড়ছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পাই,/সমস্ত শরীর মনে টান পড়ছে একূল ওকূল। সোনা বালি, সমুদ্রের হাওয়া,/নর্তকীর মতো ঠিক পাক খেয়ে উঠছে উপরে—'। কবির 'সর্বস্ব নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা করছে সমুদ্রের হাওয়া' এই সময়। প্রণবেন্দু এই সময়ের কবি, এই মুহূর্তের কবি। সময় সচেতনতায় তাই তিনি লেখেন—'সরতে সরতে সরতে/তুমি আর কোথায় সরবে?/এবার ঘুরে দাঁড়াও।/ছোট্ট একটা ভুক করে বাইরেটা পালটে দাও—/...নইলে সরতে সরতে সরতে/তুমি বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাবে।/এখন ঘুরে দাঁড়াও।'

প্রণবেন্দুর কবিতা চিত্রময়। ইতস্তত ছড়ানো উজ্জ্বল চিত্রল অজস্র পঙ্ক্তি। যেমন,—'নিঃশব্দ বাজার স্তূপ স্তনের মতন উঠে গেছে—/মসৃণ নিতম্ব, নাভি ঝিকমিক করে ওঠে এখানে ওখানে।/আস্তাবলে, আহত ঘোড়ার মত ডাঙা নৌকো বাঁধা আছে/, গাছের গুঁড়িতে,/চাঁদ ডাক দিলে, হয়তো চিৎকার করে দৌড়ে চলে যাবে।' আবার, আমরা অনেক কবিতায় সাক্ষাৎ পাই যার সবটা মিলেই পুরো একটা ইমেজ। যেমন 'কতক্ষণ সেলাই কল' 'ধর্মপদের হাতি' 'পাপ' এবং এরকম আরো অনেক কবিতা।

... এই কার্পণ্য তাঁর নৈপুণ্যের প্রকাশ। কোথাও তিনি একটিও অপ্রয়োজনীয় শব্দ অহেতুক ব্যবহার করেননি। কারণ, তিনি শব্দ ভেঙে শব্দের ভেতরে চলে যেতে জানেন এবং পারেনও সহজে। শব্দের ভেতরের ব্যঞ্জনা তিনি আমাদের শোনাতে পারেন কারণ তিনি এ ব্যাপারে সংগতভাবে মিতব্যয়ী।

সব মিলিয়ে প্রণবেন্দু এই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি বলে আমার মনে হয়েছে।

অনুপম দাশগুপ্ত

চরিত্র। দিব্যেন্দু পালিত। ছ-টাকা।

বিনিদ্র। দিব্যেন্দু পালিত। ছ-টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।

'চরিত্র'-র পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৭, বিনিদ্র-র ১০১; ঔপন্যাসিক একটু চাপ দিলেই উপন্যাস দুটির আয়তন চার গুণ বেড়ে যেতে পারত। কারণ, এখানে বেশ কিছু ছেড়ে-দেওয়া ঘটনা আছে, সমাধান একটিও নেই, আর সমস্যা সূচীমুখ থেকে গেছে দুটি উপন্যাসের শেষেই।

দিব্যেন্দুবাবু পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়াননি. বাড়াননি যখন ধরে নিতে হবে ওই দুটি জায়গাতেই উপন্যাসদুটি শেষ করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। পাঠকরা জানতে পারলেন না—আহামরি এবং ব্রতীনের সম্পর্ক এবার কী ধরনের বাঁক নেবে, কিংবা কী করবে দীপ্ত এবার! যাঁরা প্রচলিত পদ্ধতিতে আরও জানতে চান তাঁরা হয়ত এই পরিণতিতে একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। কিন্তু যাঁরা জানেন—জানতে জানতে জানতে, আরও জানতে জানতে জানতে, জানার শেষ থাকে না—এই সমাপ্তি তাঁদের ভাল লাগবে।

জীবন বিচিত্র এবং রহস্যময়, মৃত্যুতেও এ রহস্যের শেষ হয় না, সুতরাং নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে চরিত্ররা কী করে সব রহস্যের সমাধান দিয়ে যাবে! আজকের লেখকরা এই কথাগুলো জানেন, জানেন বলেই মিথ্যে কথা বলে পাঠকের সমস্ত কৌতূহল মেটাবার দায়িত্ব তাঁরা নেন না। দায়িত্বশীল আধুনিক পাঠকেরাও আবার এইসব লেখকের দিকে সম্ভ্রমের চোখে তাকান।

আগেই বলেছি, উপন্যাসদুটির আয়তন হয়ত বাড়ানো যেতে পারত। শুধু এই দুটি উপন্যাসই নয়, এই ধরনের যে-কোন উপন্যাসই সামান্য চেষ্টায় আরও কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। বাড়ানো সম্ভব, কিন্তু কমানো যাবে না একেবারেই। আধুনিক গঠনভঙ্গির উপন্যাসের সাফল্য এখানেই। দিব্যেন্দু পালিতের এই দুটি উপন্যাসের গা থেকে সামান্য কিছুও সরিয়ে নেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে এক শ্রেণীর বিশাল চেহারার সার্কেল চালের উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। এই শ্রেণীর উপন্যাসের পরিচ্ছেদের বেশ কিছু অংশ এবং দু-চারটি উপকাহিনী ছেঁটে দিলেও উপন্যাসের কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। কেননা এখনও অনেকে মনে করেন, উপন্যাস মানে বিশাল আয়তন মিশ্র পারস্পরিক সম্পর্কহীন বিস্তর কাহিনী আর উপকাহিনী বলে যাওয়া। তবে আনন্দের কথা যে, আজকের বেশ কয়েকজন লেখক জেনে গেছেন যে, সুগ্রথিত কাহিনীর আভাস নিয়েও ভাল উপন্যাস লেখা সম্ভব। গঠনবৈশিষ্ট্যের বিচারে 'চরিত্র' এবং 'বিনিদ্র' ত্রুটিহীন।

'চরিত্র' উপন্যাসটির মূল চরিত্র অধ্যাপক ব্রতীন, স্ত্রী আহামরির গোপন প্রেমিক নৃসিংহকে কেন্দ্র করে তার চরিত্রের মূল সংকট তীব্রতর হয়ে উঠেছে। 'বিনিদ্র'-র প্রধান চরিত্র দীপ্ত, একটি বেসরকারি সংস্থার বড় মাপের একজিকিউটিভ। এই চরিত্রটির প্রধান সমস্যা দানা বেঁধেছে চাকরিজীবনের উত্থানকে কেন্দ্র করে, সঙ্গে আছে তার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-অসুখ।

'বিনিদ্র'-তে বিজ্ঞাপন জগতের নানা গোপন ও চিত্তাকর্ষক তথ্য আছে, কিন্তু এই তথ্য কোথাও বোঝা হয়নি' আজকাল তথ্যভিত্তিক উপন্যাস বলে যে বিচিত্র এক শ্রেণীর উপন্যাসের চল হয়েছে—তার সঙ্গেও এই উপন্যাসটির কোনো সাদৃশ্য নেই।

উপন্যাসদুটি প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দু' মাসের ব্যবধানে, মনে হয় এই গ্রন্থ দুটির রচনা কালও কাছাকাছি। অথচ 'চরিত্র' ও 'বিনিদ্র'-র ঘটনা, চরিত্র ও বিবরণে সামান্য অসতর্ক মিলও চোখে পড়ে না। এটা এবং প্রাসঙ্গিক আরও অনেককিছু জানার পরে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, দিব্যেন্দু পালিত একজন সচেতন লেখক।

দিব্যেন্দুবাবুর গদ্য আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো। মনে হয়, যে-কথা তিনি যেমনভাবে বলতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনভাবেই বলতে পেরেছেন। তাঁর গদ্য পরিশীলিত, উজ্জ্বল এবং ধারালো। তবে কোথাও কোথাও একটু বেশি উজ্জ্বল, মাত্রাতিরিক্ত ধারালো, হয়ত বা অকারণে বক্র।

শেখর বসু

হিলারীর সঙ্গে সমুদ্র থেকে আকাশ। তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। মনোমোহন প্রকাশনী, কলকাতা বারো। মূল্য দশ টাকা।

ছলনাময়ী প্রকৃতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ আছে বলেই নানা আবিষ্কারে পৃথিবী ধন্য। এই চ্যালেঞ্জের জন্যই প্রকৃতির অনেকটাই আমাদের করায়ত্ত। স্যার এডমণ্ড হিলারী তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের উদ্যোগ করেছিলেন কতকটা চ্যালেঞ্জের বশেই। তাঁর 'সমুদ্র থেকে আকাশ' অভিযানের সাক্ষী ছিলেন সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায়।

হিলারী জেট বোটের সাহায্যে হলদিয়া থেকে গঙ্গার উৎসে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। প্রথম পর্বে সমুদ্র থেকে নবদ্বীপ হয়ে মুর্শিদাবাদ, ফারাক্কা, পাটনা, এলাহাবাদ, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ। দ্বিতীয় পর্বে অলকানন্দার অববাহিকা ধরে রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ হয়ে উৎসে পৌঁছনো। তারপর যাত্রা পরিত্যক্ত। এরই মধ্যে সুন্দরবন ঘুরে বেড়ানোও হিলারীর কর্মসূচীতে ছিল। তিনটি বোট-ই নিউজিল্যান্ডে নির্মিত। এই বোটগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। হলদিয়া বন্দর থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত বোটগুলিকে চালিয়ে পরীক্ষা করা হল। হিলারী নিশ্চিন্ত হলেন। সুন্দরবনে তাঁর ছোট বড়ো মাঝারি নদীগুলি অনায়াসে অতিক্রম করলেন। সুন্দরবনের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখলেন। পাখি দেখে মুগ্ধ হলেন। ভাগ্যক্রমে রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরও সাক্ষাৎ মিলল। তারপর একদিন আসল অভিযান শুরু হল। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হিলারী বদ্ধপরিকর। এভারেস্ট-বিজয়ী বীর দেবপ্রয়াগ থেকে হিংস্র, ভয়াল অলকানন্দার সঙ্গে যুদ্ধ করে নন্দপ্রয়াগে গিয়ে এবারের মত যাত্রা শেষ করলেন। প্রকৃতির ছলনা হিলারীকে পরাস্ত করল।

তাপসবাবু গ্রন্থটি শুরু করেছেন নৌযাত্রা পরিত্যক্ত হবার ঘটনা দিয়ে। এক একবার মনে হচ্ছিল শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এই সংবাদটি পাঠাবার জন্যই বেশ কয়েকদিন প্রতীক্ষা করেছিলেন। সাংবাদিক কৌতূকের সঙ্গে হিলারী এবং তাঁর সঙ্গীদের এই অভিযান লক্ষ করছিলেন। কিন্তু কৌতুক সত্ত্বেও উত্তেজনা এবং উত্তাপ নিশ্চয়ই ছিল। তাপসবাবুর বর্ণনায় সেই উত্তাপ ও উত্তেজনা পরিস্ফুট। হিলারীর লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য মরণপণ সংগ্রাম পাঠককে অভিভূত করে। এ অসম্ভব যে সম্ভব নয় একথা হিলারী অভিজ্ঞতা দিয়েও যেন কিছুটা বুঝতে চেয়েছিলেন। এই যাত্রার পূর্বে হিলারী এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নেপালের কোশী নদী অভিযানে বেরিয়েছিলেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনায় সে অভিযানের ভয়ংকরতা এবং মানুষের দুঃসাহসিকতা প্রত্যক্ষবৎ উপস্থাপিত। প্রতিপদে রোমাঞ্চকরতা, তিলার্ধ ভুলে চরম সর্বনাশের উদ্বেগ ব্যাকুলতা এবং শেষ পর্যন্ত সে অভিযানের পরিণামরমণীয়তা হিলারীকে আশার ছলনায় ভুলিয়েছিল নিশ্চয়ই।

সংগত কারণেই তাপসবাবু গ্রন্থটিকে হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনীতে রূপান্তরিত করেননি। সে কাহিনীর বিশ্বস্ত রূপরেখা বাংলা সাহিত্যে অনেকের গ্রন্থেই লভ্য। লেখক হিলারীর বাল্যজীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলেছেন, হিলারীর চিত্তে অভিযানের নেশা কি করে দৃঢ়মূল হল সে প্রসঙ্গও বিস্তৃত করেছেন। আইসেনহাওয়ারের সম্বন্ধে হিলারীর করুণ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে লেখক একটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় 'সমুদ্র থেকে আকাশ' যাত্রার দিনলিপি দিয়েছেন। তাতে এ অভিযানের প্রতিটি পর্ব পাঠকের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারত সরকারের আচরণ সম্বন্ধে লেখক কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করেছেন। ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানির এ বিরাট অভিযানের জন্য বিনা ব্যয়ে তৈল প্রদান, কর্তাব্যক্তিদের অহেতুক ব্যস্ততা লেখকের জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছে। সরকার যেন দেশে-বিদেশে বিজ্ঞাপন প্রচারের কর্তাব্যক্তি মিঃ জার্মার সুন্দরবনে অত্যন্ত গোপন মানচিত্রের আদানে আন্দায়-কে লেখক ভালো চো[খে] দেখেন নি। সরকারী কর্মচারী[দের] নির্বুদ্ধিতার (?) নানা দৃষ্টান্ত আ[ছে]। তাপসবাবু আর একটি যুক্ত করলে[ন]। তাপসবাবু লক্ষ করেছেন এ অভিযা[নে] গৌণ বস্তুর উপর অধিক গুরু[ত্ব] দেওয়া হয়েছিল। মুখ্য ক[থা] অভিযানের সাফল্য। কিন্তু দেখা গে[ল] ফিল্ম তোলার জন্য হুড়োহুড়ি এবং সে ফিল্মের স্বত্বে ভারতে[র] কোনো অধিকার নেই। কি[ন্তু] গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহ, টি[ভি] সিনেমার জন্য ছবি সংগ্রহ করাই যে অভিযানের উদ্দেশ্য। তাপসবাবু[র] এ সব উক্তি সরকার ও জনগণের ভে[বে] দেখা উচিত। আরও একটি প্রশ্ন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় তুলেছেন। যে বো[ট]গুলি এ অভিযানের জন্য নির্মি[ত] সেই বোট-নির্মাতা মাইক ও ... নিজেদের বৃহত্তর ব্যবসায়িক স্বার্থে[র] জন্য এ অভিযানে নামেন নি তো? অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে বোটগুলির আন্তর্জাতিক বাজার মূ[ল্য] খুবই বেড়ে যাবে। আর পেটেন্ট কিনে নিয়ে নিউজিল্যান্ডে তাদে[র] কোম্পানি বোটের চাহিদা দ্বিগু[ণ] যাবে। তাহলে এ অভিযানের ভিন্নতর কোনো উদ্দেশ্য ছিল? রথ দেখা ও কলা বেচা দুই উদ্দেশ্য ছিল? 'সমুদ্র থেকে আকাশ' গ্রন্থ পাঠককে এই সব প্রশ্নে খানিক উদ্দীপ্ত করে।

সাংবাদিক তাপসবাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্তব্যবোধ, বন্ধু সাংবাদিকদের সঙ্গে শত্রুমিত্রবৎ আচরণ আমাকে চমৎকৃত করে। আমি হিলারী[র] অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে তাপসবাবু[র] 'অভিযান'কেও লক্ষ করে আন[ন্দ] পেয়েছি। এই বইটির সংবাদ-সাহি[ত্য] গুণ নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি হৃদ্য এ[বং] মনোহর।

বিজিতকুমার দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

মানুষের অক্ষিপুটে কিছু আড়াল থাকে না

লাইনটি বোধ হয় অজয় নাগ না[মে] কোনো তরুণ কবির। বিড়লা অকাদমী[তে] শ্যামসুন্দর সরকারের ছবি দেখ[তে] দেখতে মনে এল। এঁর ছবি প্রথম দে[খি] বছর দুয়েক আগে। "শিল্পটন ও রে[ম্ব্রান্ট] হতে পারেন" এমন কোনো তত্ত্ব প্রচ[ার] বা প্রমাণ করার ইচ্ছা শ্যামসুন্দরে[র] আছে কী না জানি না। মনে হয় নে[ই]। কারণ, তাঁর ছবিতে প্রতিশ্রুতি আছে। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যাল[য়ে] ইলেকট্রনিক এবং টেলিকমিউনিকেশন[এর] তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ন্যাশন[াল] ট্যালেন্ট স্কলারশিপ স্কীমে এ ... মডেলটি ফিজিক্যাল সায়েন্স গ্রু[পে] শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে।

তৈলরঙ খড়ি, তেলরঙ, কা[লি], সাদা অঙ্কন নানা মাধ্যমে শ্যামসুন্দরে[র] কাজ ছিল। ...

যদিও নিখিল বিশ্বাস থেকে অন্যান্য বিষয়সচেতন শিল্পীর প্রভাব তাঁর কাজে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বর্শা হাতে "ক্রুদ্ধ সাঁওতাল", কোলে বাচ্চা "গ্রাম্য মাতা" থেকে "কৃষক" এবং "ক্ষুধার্ত"রা তাদের রক্তমাংসের দেহের আর্তি নিয়ে দৃশ্যমান। জোরালো রেখা, কালো সাদার বিভাজন, বর্ণের বণ্টনের কারিকুরি সব মিলিয়ে অপরিণত হলেও ভীষণ আন্তরিক। কিছু ঘোড়াও আছে। শক্তি আর যন্ত্রণার প্রতীক হিসাবে। ছবিতে একটা রাগী রাগী ভঙ্গী কিন্তু তাঁর নিজস্ব। আইনস্টাইন বেহালা বাজাতেন, ভালই বাজাতেন। হোমি ভাবা ছিলেন সৌখীন ছবি আঁকিয়ে। শ্যামসুন্দর যদি কালক্রমে বৈজ্ঞানিক হয়ে ভাল ছবি আঁকেন, কিংবা নেহাত মন্দ নয় এমন ছবি আঁকেন, তাহলে সেটা সুখেরই হবে। বিজ্ঞানী এবং শিল্পীদের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজটা করলেও আমরা তাঁকে সাধুবাদ দেবো।

সরকার। [illegible] বেরিয়েছেন। এখনও কাজে ছাত্রসুলভ ছটফটানি আছে। এবার অবশ্য বড় বড় চারটে ক্যানভাস ছিল (৪'×৮')। এখনও ক্যানভাসের বড় পটভূমিতে তুলি চালাবার মতো অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি। যেখানে বিষয়বস্তু সাধারণ তুষারাচ্ছাদিত পাহাড় আর পাহাড়ীদের গ্রাম আর পাইন গাছ সেখানে রচনা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আরেকটি ছবিও মন্দ নয়। চারিদিকে কাটা মাটির পাহাড়, গর্ত, রাস্তা, ক্রেন আর মানুষজন। সব কিছু দ্রুত বদলের দৃশ্য। এখানে তুলি চালনায় আবেগ রঙে রঙে স্পষ্ট। অন্য একটি কাজে মাটির ভেতর একটা গর্তের মধ্য থেকে ক্রেনকে নির্দেশ দিচ্ছে একটি লোক। কিন্তু ৪৮"×১৬" আকারের ক্যানভাসের পুরো জমিটা ঠিকমতো কাজে লাগানো হয়নি। ফলত রচনার কোনো কেন্দ্রবিন্দু না থাকায় চোখ স্বচ্ছন্দে চারপাশ ঘোরার সুযোগ পায় না। অঙ্কনও খুব দুর্বল। ফলে সুইমিং পুলের ছবিটা বিকিনি পরা সুন্দরীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও জমেনি।

ক্ষুদিবাবুর প্রত্যাবর্তন

ক্ষুদিরাম পাত্র আকাদমী অব ফাইন আর্টসে তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী করলেন (জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ)। এত ঘন ঘন প্রদর্শনী করার জন্যে ক্ষুদিবাবুর ওপর বিরক্ত রথীন মৈত্র মশাই আপত্তি তুললেন বলে আমাকে সমালোচনা

ক্ষুদিরাম পাত্রের সব কাজেই অনুশীলনের ছাপ। পরিণত চিন্তা বা বোধ ন থাকায় পাচমিশালী নানা কায়দা দেখাবার লোভ। দেওয়াল খালি পেয়ে ছাত্রজীবনের কিছু প্যাস্টেলে আঁকা প্রতিকৃতি চালিয়ে দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে সাদা স্লেট দেওয়া একটা বইও তিনি বার করেছেন ইংরেজীতে। চটপট নাম কেনার প্রবণতা। নগদ বিদায়ের লোভ। এসব ছেড়ে যদি ক্ষুদিরামবাবু ছবি আঁকেন তাহলে শিল্পী হিসাবে সফল হবেন মনে হয়।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সদারঙ্গের অনুষ্ঠানে রবিশঙ্কর

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কলামন্দিরে আয়োজিত এক দুদিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের (অগাস্ট ৩১, সেপ্টেম্বর ১) প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বিখ্যাত সেতার-বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তিনি দ্বিতীয় দিনে বাজিয়ে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সেতারে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর শিষ্য দীপক চৌধুরী।

সে দুদিনের অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে সুর মেলানোর জন্য শিল্পী বেছে নিয়েছিলেন মিয়াঁকি-মল্লার এবং বৈঠকের প্রথম অংশে শোনা যায় এই রাগে আলাপ, জোড়, ধামার গৎ ও তিনটি দ্রুত তিনতাল গৎ।

মিয়াঁকি-মল্লারের মত বক্রগতি রাগে অভিনব স্বরপ্রগতি অসম্ভব এবং দুই নিষাদের খেলা ও তীব্র কোমল গান্ধারের আবেদন ফোটানোই আসল কথা। পণ্ডিত রবিশঙ্করের আলাপের ব্যর্থতা ছিল এখানেই। বাঁ হাতের কাজে রেশের অভাব থাকায় দুই নিষাদ ও এ দুটির মধ্যবর্তী ধৈবৎ নিয়ে মহৎ যন্ত্রীরা যেসব স্মরণীয় মীড়ের কাজ করেন তার একটিও শোনা গেল না। রেশের অভাবে উত্তরাঙ্গের প্রধান প ণ ধ ন বিন্যাসটিও এক টোকায় বাজেনি। শিল্পী বেশির ভাগ সময় এটিকে দুই টোকায়, অর্থাৎ (১) প ণ—(২) ধ ন—এইভাবে বাজিয়েছেন। তাতে খালি এই বিন্যাসটির রূপ নষ্ট হয়নি রাগের মেজাজও নষ্ট হয়েছে। খাদের তারে কিন্তু এই

খাদের তারে কোমল গান্ধারের কাজ যতখানি ফলোৎপাদক হওয়া উচিত ততখানি হয়নি। কারণ প-জ্ঞ মীড়ে রেশের যে ঘন সংযোগ থাকার কথা তা ছিল না—শিল্পী এই তারে বেশির ভাগ সময়ই এই কাজটিকে ভেঙে প, ম-জ্ঞ, ম-জ্ঞ এইভাবে বাজিয়েছেন। ফলত তীব্র কোমল গান্ধার লেগেছে নিশ্চয় কিন্তু তা ঠিক মিয়াঁকি-মল্লারের বলিষ্ঠ গান্ধার হয়নি। মন্দ্রসপ্তকে গান্ধারের প্রয়োগ এর চেয়ে ভাল হলেও পুরোপুরি ফলোৎপাদক হয়নি কারণ শিল্পী সাধারণত র প-জ্ঞ পদটি বড় বেশী চঞ্চলতার সঙ্গে এবং বড় তাড়াহুড়ো করে লাগিয়েছেন।

এই রাগে পঞ্চম থেকে ষড়জে যাওয়া একমাত্র প্রথা প ণ ধ ন স। কিন্তু শিল্পী চার পাঁচবার প ধ ন স ব্যবহার করেছেন আলাপে এবং তাঁর ধামারের মুখড়াটি সমে আসছিল এই ভাবেই। প ধ ন স ধ ণ প খাম্বাজ ঠাটের গৌড়-মল্লারের দ্যোতক।

এছাড়া সুরের কমবেশি বেশ কয়েকবার দেখা গেছে এবং মন্দ্র সপ্তকের মধ্যম ও ঋষভ যে মাঝে মাঝে বেসুরো লেগেছিল তা এখনও পরিষ্কার মনে আছে।

প ণ-ধ বাজানোর সময়ে প্রায়ই নিষাদটি চড়ে গিয়ে শুদ্ধ নিষাদের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে—অর্থাৎ, শুনিয়েছে প, ন-ধ, যা মিয়াঁকি-মল্লারে হওয়া উচিত নয়। ধ ণ প মীড় রেশের অভাবে প্রায়ই ধ প শুনিয়েছে। এই শেষ দুটি ত্রুটি দেখা যায় দ্রুত জোড়ে ও গৎকারিতে।

বিলম্বিত জোড়টি যখনই নায়কি তারে বেজেছে তখনই রেশ ও ঘন লপেটের অভাবে মলিন হয়েছে কিন্তু যখনই খাদের তারে নেমেছে তখনই অনেক উন্নত হয়েছে কারণ এই তারগুলিতে রেশ ছিল অনেক বেশী। মধ্যলয়, মধ্যদ্রুত ও দ্রুত জোড় তুলনামূলকভাবে খানিকটা ভাল হয়েছিল। জোড়ের শেষে ঝালা ছিল না।

ধামার গৎটিতে রবিশঙ্করের সেই চিরাচরিতের চক্রদার তেহাই দিয়ে শেষ

হওয়া লয়কারি ছিল এবং তবলা-বাদক শংকর ঘোষ তেহাইগুলির যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু লয়কারির চেয়ে তেহাইগুলিতেই মজা বেশী ছিল। দ্রুত তিনতাল অংশে ছিল তিনটি স্পন্দন, কিছু ছন্দের কাজ, বাঁট এবং মাঝে মাঝে একটু আধটু সাথসংগত। কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য তান-তোড়া পেলাম না। গৎকারির কাঠামোও ছিল বড় খাপছাড়া। ঝালা অংশে দীপক চৌধুরী কিছু পরিষ্কার চার টোকার কাজ শোনান।

বিরতির পরে শোনা গেল বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতালে পঞ্চমসে গারা ধুন। যেহেতু এই ধরনের ধুনে শিল্পীর কল্পনা ও ক্রিয়াশক্তির উপর কোনো বাঁধন থাকে না রবিশংকরের স্তরের শিল্পীদের কাছ থেকে এইসব ধুনে আমরা কিছু অসাধারণ সুরের কাজের বা স্বরসমষ্টি আশা করি। দুঃখের বিষয় বিলম্বিত গৎটিতে সেরকম কিছু পাওয়া গেল না—শিল্পী যা বাজালেন তা বড় মামুলি লাগলো। দ্রুত গৎটিতে রবিশংকরের বোল অঙ্গের তান-তোড়া যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি, জায়গায় জায়গায় সুরও কম লেগেছে। অবশ্য দীপক চৌধুরী যখন তাঁর গুরুর অনুকরণ করে এগুলিই বাজাচ্ছিলেন তখন তান-তোড়া যথেষ্ট পরিষ্কার ও সুরেলা হচ্ছিল। ধুনটির শেষে কোন ঝালা ছিল না।

পুষ্পেন সেনের পুরিয়া-কল্যাণ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল এবং কাফি ঠুংরী দিয়ে দ্বিতীয় দিনের আসর শুরু হয়। মাইক্রোফোনের গোলযোগের জন্য এঁর গান জমে উঠতে পারেনি। অনিবার্য কারণে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুনতে যেতে পারিনি।

নীলাক্ষ গুপ্ত

মালঞ্চের শেষবর্ষণ

শেষ বর্ষণের শেষ সংলাপে রাজকবি বলেছিলেন, 'আরও অনেক উত্তম হতে পারত।' কিন্তু আমরা তা বলব না। 'মালঞ্চ' নিবেদিত 'শেষ বর্ষণ' (রবীন্দ্রসদন, ৪ আগস্ট) যখন শেষ হল, তখন বরং রাজার সঙ্গেই কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল—'উত্তম হয়েছে।' কেননা, মধুর যেমন অশেষ, 'আরও অনেক উত্তম হওয়া'র মানও তেমনই কূলহীন এক সমুদ্র। তার পার দেখা যায় না।

তা বলে কি ছোটখাট গোলমাল ছিল না? নিশ্চিত ছিল। নটরাজ যখন বললেন—'ওই শুনুন মহারাজ মেঘ-মল্লার', তখন শোনা গেল কাশির আওয়াজ। গায়িকা গলা পরিষ্কার করে নিলেন। যদিবা গান ধরলেন, ক্ষীণবল মাইক্রোফোনের কল্যাণে 'কখন শুনি কখন শুনি না যে,' হয়ে ভেসে এল 'কোথা যে উধাও হল'র মেঘমল্লার। কিংবা মাইক্রোফোনের সীমানা থেকে একটু সরে গিয়ে নটরাজ যখন বলছিলেন, 'ইশারায় বুঝিয়ে দেব', তখন সত্যি-সত্যি ইশারাতেই সব কথা বুঝতে হবে—এমন মনে হচ্ছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী 'লাউডার লাউডার' আওয়াজে তক্ষুনি অবশ্য বুঝিয়ে দিলেন। নটরাজও ইশারা বুঝে মাইকের দিকে মুখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু এ সবই উপেক্ষাযোগ্য ত্রুটি। কেননা, সব মিলিয়ে উপভোগ্য ছিল সেই সন্ধ্যার প্রয়াস। সমবেত গানগুলি যেমন সবল ছিল, তেমনই বহুশ্রুত-নাম-না-জানা শিল্পীর কণ্ঠের একক গানের ডালিও ছিল আকর্ষণীয়। যেমন, মিত্র দস্তিদার, বিশাখা চৌধুরী, নন্দন দাশ-গুপ্ত, জয়শ্রী দাশগুপ্ত ও প্রভাত ভঞ্জ—প্রত্যেকেই দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুপ্রিয় রায়ও ভবিষ্যতে ভালো গাইবেন—এ ছাপ রেখেছেন। একারে বোধ করি কিঞ্চিত নার্ভাস ছিলেন। খ্যাতনামাদের মধ্যে অর্ঘ্য সেন একাই জমিয়ে রেখে-ছিলেন। সংগীত পরিচালিকা জয়শ্রী রায়ের কণ্ঠে 'দেখ দেখ শুকতারা' গানটি বেশী ভালো লেগেছে। সুপূর্ণা চৌধুরীর গানে মন ভরে নি সেদিন।

শেষ বর্ষণের গানের পাল্লার সঙ্গে সমানভাবে ওজনদার ছিল নাচ। সুনীতি বসুর নৃত্য-পরিকল্পনায় নিজস্ব এবং চোখ-ভরানো কল্পনা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। একবার দুবার নয়, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। বিশেষ করে 'ওলো শেফালী' গানের ক্ষেত্রে অনির্বাণ চৌধুরীকে মাঝখানে রেখে বালিকাদের সম্মেলক নৃত্যের ছবিটি এখনো মনে গেঁথে রয়েছে। 'ওই আসে ওই অতি' এবং 'শেফালী বনের মনের কামনা'ও সম্মেলক নৃত্যে জমে উঠেছিল দারুণ-ভাবে। শুধু 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা'র ক্ষেত্রে দ্বৈত নৃত্য-পরিকল্পনাটি একটু বিষম ছন্দের মনে হয়েছে। পুব-হাওয়ার দোলা যদি হয় এমন উত্তাল, যৌবনের দোলা তাহলে কী হতে পারে—এই ভাবনাটা পীড়া দিচ্ছিল সারাক্ষণ। সুনন্দা চৌধুরীর 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে'র অভিব্যক্তি অনবদ্য।

আরম্ভের একটা আরম্ভ ছিল। সেই পর্বে সুচিত্রা মিত্র শুনিয়েছিলেন তাঁর একক কণ্ঠের সতেজ সমৃদ্ধ আটটি গান।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

নজরুল স্মরণ সন্ধ্যা

সঞ্চিতা শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত নজরুল স্মরণ সন্ধ্যায় প্রধান আকর্ষণ ছিল ধীরেন বসুর একক সংগীত। ধীরেন বসুর গান আগেও শুনেছি। কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পীর কণ্ঠে নির্বাচিত নজরুলগীতিগুলি ছিল প্রাণসম্পদে পূর্ণ। 'যেদিন লব বিদায়' 'ছাড়িতে পরান নাহি চায়', 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' প্রভৃতি গান-গুলি অনেকবার শোনার পরেও সেদিন নতুন মনে হয়েছে। বালিগঞ্জ ইনসটি-টিউটের এই অনুষ্ঠানে কবিপুত্র কাজি সব্যসাচী কবি প্রসঙ্গে নানা কথা বলেন। কবিপুত্রের কাছ থেকে কবির বিষয়ে শোনাও সেদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা আবৃত্তি করেন। একটি সুন্দর সংহত পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানের জন্যে সঞ্চিতা শিল্পীগোষ্ঠী অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন।

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

আরাধনা

ছি-ছি ছিনেমা খেলার টালিউড-নির্মিত ছবিদের অনেকেই ফার্স্ট হতে পারে। সেই খেলায় এবার একদা হিন্দি ছবিগুলি বাংলা কপচাতে-কপচাতে যোগ দিচ্ছে। এতে খেলা আরো জমেছে ভালো। রং-ঢং ঝাঁকজমক এমন পরিমাপে এই বাংলা-কপচানো হিন্দি ছবিতে এসে জড় হয়েছে যা টালিগঞ্জের আয়ত্তের বাইরে। এই চলাকির খেলায় শক্তি সামন্তের জুড়ি নেই। আমরা হিন্দি-বাংলা অমানুষ দেখেছি। এবার বাংলা আরাধনা—সেই পুরনো হিট সিনেম্যা-টিক অপকীর্তি'র বাংলা তর্জমা। ছবিটি না দেখলে বোঝা যায় না সিনেমার প্রতি কতটা অশ্রদ্ধা নিয়ে একটি পুরোপুরি বাণিজ্যিক ছবি তৈরি হতে পারে। সেই পুরনো হিন্দি ছবিটাকে বাংলায় 'ডাব' করানো হয়েছে মাত্র। এবং টাইটেল সিকোয়েনস ছাড়া প্রায় কিছুই নতুন নেই।

ফলে রাজেশ খান্নার সংলাপগুলি তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরে সমস্ত ছবিতে কখনই শোনা যায় না। যেহেতু রাজেশকে দিয়ে বাংলা বলানো সম্ভব হয়নি, তাঁর হিন্দি সংলাপের ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে জোর করে ভিন্ন কণ্ঠের বাংলা সংলাপ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই কণ্ঠস্বর উচ্চারণে, বিন্যাসে,

শর্মিলা ঠাকুর

প্রক্ষেপণে ও অভিঘাতে এতটাই ভিন্ন যে দর্শকের মধ্যে, বিশেষ করে রাজেশ-ভক্তদের মধ্যে, একটা অভাব-বোধ ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাজেশের অভিনয় স্টাইলের সঙ্গে এই অপরিচিত কণ্ঠের ওঠানামা ও বিশেষ ভঙ্গিটি একেবারেই খাপ খায় না। এটা বড় মারাত্মক ফাঁকি এবং ঐভাবে বাংলা ফিল্মের জগতে সহজে বাজিমাত করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টাটা ঠিক এথিকাল বলে মনে হয় না।

এ-ছবিতে এক বিখ্যাত বাঙালী অভিনেতার প্রতি নিদারুণ অবিচার করা হয়েছে বলে তীব্র প্রতিবাদ জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি। নাম পাহাড়ী সান্যাল। ডাবিং-এ এই প্রয়াত অভিনেতার সেই অনন্য কণ্ঠের কতখানি যে তাঁর কণ্ঠের ওঠানামা উচ্চারণের ভঙ্গি প্রভৃতির ওপর নির্ভর থাকতো শক্তি সামন্ত কি তা ভুলে গেলেন? একজন অত উঁচুদরের বিখ্যাত অভিনেতার সংলাপগুলি অন্য কারো কণ্ঠে বলানোর আগে দু-বার ভাবা উচিত ছিলো যে ব্যাপারটা আদৌ এথিকাল হবে কি না। এব কথায় সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কদর্য মনে হয়েছে।

যেহেতু সমস্ত ছবিটাই হিন্দি থেকে বাংলায় 'ডাব' করা হয়েছে, 'প্রশ্ন উঠবে, ডাবিং-এর মান কোন পর্যায়ের। লং শটে বিশেষ কিছু ধরা পড়ে না। কিন্তু মিড বা ক্লোজ-এ হিন্দি সংলাপের ঠোঁট নাড়ার ওপর বাংলা সংলাপকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা বহু জায়গাতেই ধরা পড়ে। তবু বলবো ডাবিং-এর মান বেশ ভালো। এবং এছাড়া আরা-ধনায় প্রশংসা করার মতো আর প্রায় কিছুই নেই। হিন্দি আরাধনার একদা হিট-গানগুলি বঙ্গানুবাদে গাওয়া হয়েছে। এবং যাঁরা সিনেমা হলে শিস ও তালে-তালে জুতো বাজাতে ভালোবাসেন তাঁদের এইসব ব্যায়ামের জন্য প্রচুর সুযোগ গানগুলির মধ্যে আছে সন্দেহ নেই।

আরাধনা ছবিটির চরিত্রের সঙ্গে ফটোগ্রাফি একেবারে মিলে যায় ঝকঝকে, রংচঙে ছবি—বাচ্চাদের ছবির বইতে যেমন থাকে। শর্মিলার প্রায় সবকটি ক্লোজ আপ (প্রথমার্ধে) মেক আপের বিজ্ঞাপন বলে মনে হয়। শুধু দুটি সিকোয়েনস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এক, যেখানে শর্মিলা আর পাহাড়ী সান্যাল রাজেশের কাকার বাড়িতে গেছেন। এই দৃশ্যে হঠাৎ ছবির রং পরিবর্তন হয়ে রঙের কনটিনিউইটি নষ্ট হয়ে যায়। দুই যুদ্ধ-দৃশ্যগুলি রঙের ট্রিটমেন্ট-এ খাপছাড়াভাবে ভিন্ন, এবং বিদেশী ফিল্ম থেকে একেবারে কেটে জুড়ে দেওয়া।

বাংলা আরাধনার মধ্যে আমি একটি বিপদ-সংকেত শুনতে পাচ্ছি একদা হিট হিন্দি ছবিগুলি যদি এইভাবে ক্রমাগত বাংলায় ডাবড্ হয়ে মুক্তি পেতে থাকে তাহলে টালিগঞ্জের গলায় ফাঁস আরো একটু টাইট হবে নিঃসন্দেহে। দেখছি টালিগঞ্জের এক মাত্র বাঁচার উপায় প্রত্যুত্তরে ইংরেজি হিট ছবিগুলিকে একের পর এক বাংলায় ডাব করে ফেলা—বন্দেবা মোকাবিলা করতে। চার্লটন হেসটন রিচারড বারটন, পিটার ওটুল, রবার্ট রেডফোর্ড—এঁদের কণ্ঠে যে-কোনো বাঙালী ভদ্রলোকের সংলাপ চলতে পারে—ভাবনার কিসসু নেই।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

রবীন্দ্র জন্মোৎসব : নাটক

রবীন্দ্রনাথ এখন শুধু উৎসবের উপচার। অন্য কাজে জন্মোৎসবে এ ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজানো বাহু ন

প্রেমের ... জন্য ...
...র বহরেই তাই রবীন্দ্রচর্চা অনেক সময় করা হয় কমার্শিয়াল প্রসপেক্ট ভেবে, (বিশেষত শেষ বৈশাখে দীর্ঘ জন্মোৎসব মঞ্চে) জীবনে উপলব্ধি করে না।

সমস্ত বছর ধরেই রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য, গান, কবিতার আসরের নানা রকম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তুলনায় নিয়মিত রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় প্রায় হয় না বললেই চলে। অথচ কে না জানে আজকের সংস্কৃতি জগতে নাটকের দলগুলি সব চেয়ে সক্রিয় মননে ও পরিশ্রমে আন্তরিক। রবীন্দ্রনাথ এই তৎপর নাট্যজগতেও নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হয়ে রইলেন। অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাটকই একমাত্র ভারতীয় নাটক যার নিবিষ্ট চর্চা হয়ত অন্য পথ দেখাতে পারত।

রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রথম থেকেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে। কয়েক বার যে চেষ্টা হয়েছিল তার মধ্যে বোধ হয় 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা'র মত কমেডি ছাড়া আসর জমাতে পারেনি। লোকরুচি অদ্ভুত! কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক যে যে বছর প্রকাশিত হয় ঠিক সেই সেই বছরে প্রকাশিত বাজার গরম করা নাটক দেখলেই বোঝা যাবে দুই মেরুর মধ্যে কি দুস্তর ব্যবধান। ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' প্রকাশিত। পাশাপাশি আছে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'টিকে ভুল', গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মসনদ'। ১৯১২ সাল রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'মালিনী', 'অচলায়তন'-এর প্রকাশকাল। অন্য নাটকের মধ্যে আছে অমৃতলালের 'খাসদখল', দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে', গিরিশচন্দ্রের 'গৃহলক্ষ্মী,' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'মিডিয়া'। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' প্রকাশিত। ঐ বছরের নাটক অপরেশচন্দ্রের 'সুদামা', নিশিকান্ত বসুর 'বঙ্গে বর্গী'। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বহুরূপী 'চার অধ্যায়' প্রযোজনা করেন ১৯৫১ সালে এবং 'রক্তকরবী' ১৯৫৪ সালে। তখনও পাশাপাশি চলছে 'চাঁদবিবি', 'দেবলা দেবী', 'মিশরকুমারী', 'প্রফুল্ল', 'শ্যামলী' এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে গণনাট্য সঙ্ঘ এবং অন্যান্য সংস্থার কয়েকটি উজ্জ্বল নাটক। বলবার কথা—বহুরূপীর প্রযোজনা চলেছে দীর্ঘকাল—এখনও। জন-সমাদর এতখানি বোধ হয় আগে কোন রবীন্দ্র-নাটক পায়নি—এতটা পরিশ্রমী প্রযোজনাও বোধ হয় আগে হয়নি। এর আগে যা হয়েছে সে শুধু রবীন্দ্রনাথের নাম করে এক ধরনের সুরেলা গদগদ বাচালক নৈপুণ্য অথবা পুরস্কার বিতরণী সভার মত উপরে উপরে ছুঁয়ে যাওয়া, বাৎসরিক উৎসবে 'সাজাহান' বা 'টিপু সুলতান' না করে হঠাৎই একবার 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা' করে ফেলা। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি রবীন্দ্র-নাট্যচর্চায় প্রথমেই সকলে চেষ্টা করেন, 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ('চিরকুমার সভায় আবার গানের ঝামেলা আছে')। বাচ্চাদের ব্যাপার হলে 'ডাকঘর', 'মুকুট' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ফার্স্ট ক্লাস।

শেষের কবিতা

ডাকঘর

একটা সময় ছিল, যখন নিয়মিত রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় প্রযোজনায় অনেকেই সাহসী হয়েছিলেন, বহুরূপী ছাড়াও শৌভনিক, রূপকার, লিটল থিয়েটার গ্রুপ এবং আরো অনেকের প্রযোজনাই উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু গত দুই তিন বছরের মধ্যে নিয়মিত রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় তালিকায় নাম মনে পড়ছে, 'ঘরে বাইরে' (বহুরূপী), 'দৃষ্টিদান' (কোমল গান্ধার), 'বদনাম' (গন্ধর্ব) 'হৈমন্তী' (গান্ধার)। লক্ষণীয় বিষয় তিনটিই নাট্যরূপ অর্থাৎ কিছুটা সুবিধে মত করে নেওয়া। রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ প্রতি বছরই দীর্ঘ জন্মোৎসব আয়োজন করে থাকেন। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত কলকাতায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হত চার পাঁচ জায়গায়—কারো বা পক্ষকালব্যাপী কারোবা সপ্তাহব্যাপী। এখন শুধু রবীন্দ্রসদন আয়োজিত অনুষ্ঠানই একমাত্র দীর্ঘ উৎসব। রবীন্দ্র-নাট্যচর্চায় জন্য রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ যে সুযোগ করে দেন সেই সুযোগ কাজে লাগানো হয় কয়েকভাবে। (১) পেশাদার কিছু শিল্পী একত্র হয়ে রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করেন—উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের নাম এবং নিজেদের গ্ল্যামার মূলধন করে কিছু 'ক্যাশ শো'-এর বাসনা' এবং এর জন্য কোন মহলা না দিলেও চলে। (২) কিছু কিছু সংস্থা রবীন্দ্রনাথের একটা নাটক উৎসবে উপস্থিত করেন, প্রযোজনা তালিকায় একটি মর্যাদা যুক্ত করার জন্য, প্রচারের সুযোগ এবং শুনতে খারাপ লাগলেও টিকিট বিক্রি থেকে আদায়ের শতকরা ৫০% পাওয়ার জন্য—যদি হঠাৎ শিকে ছেঁড়ে। এই নাটক একবারই মঞ্চস্থ হয়—রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোন নিবিড় অনুরাগ থেকে এই প্রযোজনা হয় না। (৩) বিভিন্ন স্কুল, বা ক্লাব (গ্রুপ নয়—গ্রুপ বলতে একটা শৃংখলা থাকেই—ক্লাব শুধুই আড্ডার জায়গা। তাস, পাশা খেলার অবসরে রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনা)। রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ কোন নিয়মের ভিত্তিতে সবাইকে সুযোগ দেন জানা নেই। মোটামুটিভাবে এই তিন ভাগই রবীন্দ্রনাটক বছরে একবারের জন্য করে থাকে। ফলে রবীন্দ্রনাট্যচর্চা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম হয়েই থাকে—মঞ্চে পরীক্ষিত হয় না। এ দেশে বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ হয় (কারণ, এটা ইজ্জতের ব্যাপার)। পুরোনো বাংলা নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাটক করা হয় নাচ গান বা প্রহসনের নামে ভাঁড়ামির কথা ভেবে—কিন্তু 'জনা' হয় না। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকও মঞ্চস্থ হয় কিছু সম্ভাবনা মাথায় রেখে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' হয়—

...বিদ্রোহের ভাবে ... নাটক হয় জনচেতনা উদ্বোধনের জন্য—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হয় না। 'মুক্তধারা' 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন' কেন হয় না জানি না—সম্ভবত ছকে মেলানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাটক দিন বদল বা পালা বদলের নাটক নয়—কালান্তরের নাটক।

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত নাট্যোৎসবে নাটকগুলির প্রযোজনার উদ্দেশ্য আগেই বলা হয়েছে। গিরিশ নাট্য পরিষদ প্রযোজনা করেছেন, 'পরিত্রাণ'। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস লেখেন, পরে তাকে 'নাট্যীকৃত' করেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে সন ১৯০৯। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরিবর্তিত নাট্যরূপ 'পরিত্রাণ'-এর মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী আরও একবার দেখা দিয়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ অন্যরূপে। সময় যত এগিয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথ ততই বদলাচ্ছেন, নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছেন। গিরিশ নাট্য পরিষদ-এর ১৯৭৮-এর প্রযোজনা দেখলে মনে হবে তিরিশ দশকের কোন পাড়ায় দুর্গোৎসবের প্যাণ্ডেলে অভিনয় দেখছি। যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের রুচিহীনতার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের বিরোধ, পুরোনো যুগের সেই সস্তা মারপ্যাঁচ এখানে ব্যবহৃত হয়, বসন্ত রায়কে যথাযথ মনে হলেও রমাই ভাঁড়কে জঘন্যতম যাত্রার আসরের কমেডিয়ান হিসাবেও মানতে রুচিতে বাধবে (বিমল দে)। নৃত্য গীত সব পুরোনো আমলের থিয়েটারে পরিত্যাজ্য ঢংয়ের মত। উদয়াদিত্যের (বাবুল দাশ-গুপ্ত) প রি শী লি ত রাবীন্দ্রিক সংলাপের পাশাপাশি প্রতাপাদিত্য (রাজা মুখোপাধ্যায়) সম্পূর্ণ মেলোড্রামা করেন। রবীন্দ্রনাথের রাজপুরুষের পোশাক যে টিপু সুলতান বা মশিয়ে লালির মত নয় সেটাও কারো বোধে আসে না। পূর্বসারথির 'কাবুলিওয়ালা' নাটকে মিনির বিয়ের আসরে যে ভাঁড়ামির অবতারণা—সেই সব ফরমুলা এখন তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ছবি থেকেও নির্বাসিত হতে চলেছে। প্রসাদনী সংস্থা প্রযোজনা করেছেন 'উদ্ধার'। নিজেদের পরিচিতিতে তাঁরা বলেছেন, তাঁরা নাটক বাছাই করেন ফর্ম বা

শেষরক্ষা

প্রযোজনা থেকে আমাদের সন্দেহ জাগে এঁরা প্রকৃতই গ্রুপ থিয়েটার কি না? অর্থাৎ যে শৃংখলা, নিয়মনিষ্ঠা আজকের গ্রুপ থিয়েটারের প্রাথমিক শর্ত সেগুলি তাঁরা পালন করেন কি না? এই বিভ্রান্তি থেকে 'উদ্ধার' করবে কে? কণিকা মজুমদার, সৈকত পাকড়াশী, সমরকুমার প্রভৃতি নাম শিল্পী তালিকার শোভা বর্ধন করলেও প্রযোজনাকে পঙ্গু করেছেন অক্লেশে। ঋত্বিক গোষ্ঠীর 'দালিয়া' একটি সুপ্রযোজিত নাটক। শিল্পীরা মোটামুটি আন্তরিকতার সংগে কাজ করেছেন, প্রম্পট না শুনেই। (এটাও একটা সংবাদ—এই উৎসবে নাটক অভিনয়ে বেশীর ভাগ গ্রুপ প্রম্পট ভরসা করে নেমেছেন—অর্থাৎ প্রায় সকলেরই অপ্রস্তুতি প্রযোজনা)। বিরতির পর নাটকের সহজ সুন্দর গতি কমে যায়—আর সবচেয়ে বিপদে ফেলেছে শেষ যবনিকা। পর্দা তোলা ও পর্দা ফেলা যে একটা আর্ট এবং কঠিন দায়িত্ব এটা অনেকেই ভুলে যান। রবীন্দ্রসদন কর্মচারিবৃন্দ প্রযোজনা করেছেন 'শেষ রক্ষা'; কোন নিয়মিত গ্রুপ নয়, নামী দামী শিল্পী সমাবেশও নয়, সমস্ত বছর নৈমিত্তিক কাজের পর, নাটকের মহলা যথেষ্ট আন্তরিক। অনিয়মিত চর্চা হিসেবে যথেষ্ট ভাল। বিভিন্ন ভূমিকায় অমরেশ দাশ, অনিল দে, বরুণ চট্টোপাধ্যায় বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। সবচেয়ে ভাল লাগে গদাইয়ের ভূমিকায় চন্দন রায়কে, যিনি বাড়াবাড়ি করেননি আবার রাবীন্দ্রিক হতে গিয়ে নিষ্প্রাণ হননি। বিনোদের ভূমিকায় গোপাল চক্রবর্তী প্রথম দিকে 'স'-এর উচ্চারণ সম্পূর্ণ নাটককেই আহত করেছিল। রবীন্দ্রসদন মঞ্চে এখনকার সমস্ত দিকপাল অভিনেতা ও উজ্জ্বল প্রযোজনা দেখাবার সুযোগ পান, অথচ তাদের প্রযোজনায় কেন রিভলবিং স্টেজ-এর সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সেট দেখাতে হয়, অন্তর্বর্তী সময়ে এলোমেলো বাজনা বাজে (সংগীত—সৌরীন দাশগুপ্ত) এটা বোঝা দুষ্কর। মহিলা চরিত্র শুভ্রা বসু ও বিজয়লক্ষ্মী বর্মণের অভিনয় রবীন্দ্রনাথের সংলাপের মর্যাদা রক্ষা করেছে কিন্তু ইন্দুমতীর ভূমিকায় গীতা ভট্টাচার্যের যে অভিনয় সেটা রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' না হয়ে অন্য কোন চপলা নারীর ভূমিকাও হতে পারত—কমেডি হয়েও রবীন্দ্রনাথের কমেডির জাত ও স্বাদ আলাদা। তাই অসকার ওয়াইল্ডের 'ইমপর্টান্স অব বিইং আর্নেস্ট' নাটকের অনেক রূপান্তর সাধিত হলেও 'শেষরক্ষা'র মাধুর্য অন্যতর। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকলে শেষরক্ষা হওয়া মুশকিল। কোমল গান্ধার প্রযোজিত 'ল্যাবরেটরি' রবীন্দ্রনাথকে অনেক কাছে এনে দিয়েছে। এই দুরূহ গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন সুধাংশু দাশগুপ্ত। নির্দেশক অসিত মুখোপাধ্যায় কোন অকারণ প্রয়োগ চাতুর্য ব্যবহার করেননি, যার জন্য সংলাপনির্ভর এই নাটক সহজেই দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। প্রত্যেক শিল্পীর টেনশন ছিল কিন্তু সেই টেনশন রূপাপভোগে বাধা ঘটায়নি।

নষ্টনীড়

সোহিনী চরিত্রে রূপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও রত্না সিং-এর ভূমিকায় শুভেন্দু চক্রবর্তী চমৎকার মানিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত হলেও স্নিগ্ধা মজুমদার ভালই করেছেন। প্রথম অভিনয় হলেও কোমল গান্ধারের সাহসী প্রযোজনাকে কখনই স্পর্ধা মনে হয়নি। গ্রুপ থিয়েটারের অমনোযোগী প্রযোজনার পাশাপাশি, এবার পেশাদার মঞ্চের শিল্পীদের প্রযোজনার অভিজ্ঞতা বিপরীত। সাধারণত বিগত যুগের কম্বিনেশন নাইটের মত এই সব শিল্পীরা নিজেদের গ্ল্যামার ভরসা করে অবতীর্ণ হন, মহলা বা অন্য কিছুর অপেক্ষা করেন না। এবার প্রত্যেকটি শিল্পী আন্তরিক তাঁদের দায়িত্বে, তাই কয়েকটি প্রযোজনা মনে দাগ কাটে। বিশেষত অভিনয় যাদের পেশা, তাঁরা মহতী চিন্তায় ব্রতী হলে অনেক কিছুই সৃষ্টি হতে পারেন। আর্ট থিয়েটার ক্যালকাটা প্রযোজনা করেছেন 'যোগাযোগ' (নাট্যরূপ নির্দেশনা—পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়)। নাট্যরূপের কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও সব ভুলিয়ে দিয়েছেন সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুমুদিনী অনেক সময় হয়তো রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী নয় কিন্তু সমস্ত নাটক তিনিই ধরে রাখেন। স্বরূপ দত্তের মধুসূদনও আশানুরূপ নয়। নাটকের আলো (কনিষ্ক সেন) সংগীত (পূর্ণেন্দু রায়) ও মঞ্চ (রবি চট্টোপাধ্যায়) নাটকের মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পি বি প্রোডাকশন প্রযোজনা করেছেন 'নষ্ট নীড়' (নাট্যরূপ—সন্তু বসু), নাট্যরূপটি বেতার নাটকের মত। চারুলতার নিঃসঙ্গতা বোঝানোর জন্য বাইরের জগতের কোন ছায়াপাত ঘটেনি। পাত্র-পাত্রীরা শুধু সংলাপ বলে যান একই জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে। প্রবেশ-প্রস্থানের কোন সুনির্দিষ্ট বিধি ছিল না। তবু নাটকটি জমে যায় অভিনয়ের গুণে। এই নাটকে অভিজ্ঞতার দাম কতখানি প্রমাণিত হল। অসম্ভব ভাল অভিনয় করেছেন সুলতা চৌধুরী। তাঁর বাচনভঙ্গি, চলাফেরা সব কিছুতেই তিনি দাপটের সংগে অভিনয় করেছেন। দিলীপ রায়ের 'উমাপদর' ভূমিকা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি। একটু সংযমের অভাবেই চরিত্রটি হাপ-মারা 'ভিলেন' হতে পারত, কিন্তু হয় নি। ভূপতি চরিত্রে শৈলেন মুখোপাধ্যায় এখন 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' পর্যায়ভুক্ত: তিনি মঞ্চে চরিত্রের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। পাশাপাশি গৌতম চক্রবর্তী অনেক আন্তরিক কিন্তু ম্লান। তাঁর ক্ষেত্রে বিপদ অন্যতর—তিনি সব সময় হয়তো ভেবেছেন, প্রাণ খুলে অভিনয় করতে গেলে রাবীন্দ্রিক আবহাওয়া দূষিত হবে। খব কয়ণ অভিনয় চারুলতার ভূমিকায় নন্দিনী মালিয়ার। স্বরক্ষেপণ এত মৃদু যে, পঞ্চম সারি থেকে শোনা দুষ্কর হয়ে ওঠে। 'মৃদু-ভাষিণী' বিশেষণ অনেক সময়েই কমপ্লিমেন্ট নয়। অনেক সময় নাটকীয়তা প্রশ্রয় পেয়ে মূল গল্পের মেজাজকে নষ্ট করেছে। যেমন ভূপতি উমাপদর বিশ্বাসভঙ্গের পর বেরিয়ে যায়। অথবা বিরতির আগে চারুলতা যখন অমলের উদ্দেশে স্বগতোক্তি করে সেটা স্পষ্টতই নাটকীয়, এর সংগে 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে' গানের প্রয়োগ নাটকীয়তাকে আণ্ডার লাইন করে দেয়।

সাম্প্রতিককালের একটি স্মরণীয় ঘটনা কথক নিবেদিত 'শেষের কবিতা'। শেষের কবিতা নাটক নয়—শুধু আবৃত্তি ও পাঠের মাধ্যমে সম্পূর্ণ উপন্যাস অনবদ্য রসসঞ্চার করেছে (নির্দেশনা—বিমল রায়)। শেষের কবিতার বর্ণনার অংশ পাঠ করেছেন—বিকাশ রায়, পার্থ

ল্যাবরেটরি

সংলাপ পাঠ করেছেন। —সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, লিলি চক্রবর্তী, শ্রাবন্তী মজুমদার, ঊর্মিমালা বসু, গৌতম চক্রবর্তী, ধীমান চক্রবর্তী। ধারাভাষ্যে বিকাশ রায়, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ কোন সময় একঘেয়ে হতে দেন নি। কোন নাটক নয়, গান নয়, অথচ গানের মেজাজে দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা। পিছনে সামান্য একটা সাজেশনে প্রাকৃতিক পটভূমি তার সংগে অসামান্য আলোক-সম্পাত তাপস সেনের। শুধু কাহিনীর মেজাজ অনুযায়ী আলো বদলে যায় অথচ জার্ক লাগে না কোথাও। সংগে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আবহ অনেক জায়গায়ই একঘেয়ে, যদিও বাঁশির প্রয়োগ মাঝে মাঝেই মন কেড়ে নেয়। সংলাপ অংশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অমিত' প্রমাণ করল, তিনি কতখানি নিপুণ শিল্পী। বিশেষত শেষ আবৃত্তি বহু দিন মনে থাকবে। লিলি চক্রবর্তীর লাবণ্য যথেষ্ট আন্তরিক, যদিও অমিতের তুলনায় কিছু ম্লান। শ্রাবন্তী মজুমদারের 'কেটি' প্রথাগত। অনেক জায়গায় সম্পাদনা আরও নির্মম হতে পারত, যেমন ঊর্মিমালা বসুর হাসির পর— সিসি হেসে উঠল বলা অর্থহীন। বিকাশ রায় যেভাবে গদ্য পড়েন, পার্থ ঘোষ বা গৌরী ঘোষ অনেক জায়গায় নিছক আটপৌরে কথাকেও কাব্য করে ফেলেন। তবু এই ধরনের রবীন্দ্রচর্চা বা একসপেরিমেন্টের জন্য আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ উৎসবের আয়োজন করে যে চর্চার সুযোগ করে দেন, সেই সুযোগ যদি আমরা কাজে না লাগাতে পারি, তবে দোষ সম্পূর্ণ আমাদের। রবীন্দ্রনাথের নাটক করতে যে অনুশীলন করা দরকার, একসপেরিমেন্ট করতে হলেও যে কৃতজ্ঞ সাহসিকতা থাকা দরকার সেই সব দায়িত্ব যদি আমাদের না থাকে তবে আর যাই হোক, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাবালকত্ব অসহনীয়। ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজানো সব সময়েই কাম্য। কিন্তু বুঝোৎসর্গেই আপত্তি।

অনুষ্ঠিত নাটক:

পরিত্রাণ (গিরিশ নাট্য পরিষদ), ডাকঘর (নটরাজ), শেষরক্ষা (রবীন্দ্র সদন), বিসর্জন (কলাকার)।

অনুষ্ঠিত নাট্যরূপ:

উদ্ধার (প্রসাদনী), দালিয়া (ঋত্বিক), যোগাযোগ (আর্ট থিয়েটার ক্যালকাটা), ল্যাবরেটরি (কোমল গান্ধার), নষ্টনীড় (পি বি প্রোডাকশন), কাবুলিওয়ালা (পূর্বসারথি)।

কাহিনী পাঠ:

শেষের কবিতা (কথক)।

ছদ্মবেশী

কমেডি জীর্ণ হয় কম। তাই ট্রাজেডির তুলনায় কমেডি পুনঃ-প্রযোজিত হয় বেশী। বিশেষত শক্তিশালী অভিনয় শিল্পী যদি গোষ্ঠী-ভুক্ত থাকে তবে নগদবিদায় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'ছদ্মবেশী' চলচ্চিত্রে জনপ্রিয়তা পেয়েছে অনেক

বেণী—গত কয়েক দশকের মধ্যে চলচ্চিত্রে কয়েকবার রূপায়িত। সুতরাং, সেই কাহিনী যেমন নাটকাকারে রঙ্গমহলে উপস্থিত তখন আগে থেকেই জমি তৈরি রয়েছে এবং রবি ঘোষের নির্দেশনায় নিপুণ অভিনয় শিল্পীরা ফসল তুলছেন অনায়াসে।

বলতে বাধা নেই রঙ্গমহলে হাসির নাটকের একটা ঐতিহ্য আছে, এই ঐতিহ্য বদনামের। হাসির নামে ভাঁড়ামি, অশোভন বাড়াবাড়িটাই রেওয়াজ ছিল। রবি ঘোষ সেই অসংযমকে শক্ত হাতে বেঁধেছেন। এই সংযমের জন্য নাট্যরূপও অনেকাংশে দায়ী (নাটক : অশোক মিত্র) গায়ক অভিনেতা গোষ্ঠীভুক্ত থাকা সত্ত্বেও যত্রতত্র গান ব্যবহৃত হয়নি—যত দূর জানি, সন্তু মুখার্জি ভালই গান করেন, কিন্তু নায়ক এখানে ঘুরে ফিরে গান গেয়ে প্রেম নিবেদন করেনি—সুলেখা অবনীশ পালিয়ে যাবার পর কর্মচারীর বা চাকরের মুখে যে গান অবধারিত ছিল, তাও দেওয়া হয়নি এবং সর্বশেষে সুবিমল যে অবনীশ নয় সেটা জানবার পর বসুধা নাচতে পারত কিন্তু নাচেনি। তিন চারবার ট্রেনের শব্দ আছে কিন্তু মঞ্চমায়ার প্রলোভনে দক্ষ কণিষ্ক সেন ট্রেন যাওয়া দেখাননি। (অবশ্য ট্রেন যাওয়াটা এখানে কোন ক্লাইম্যাক্স পয়েন্ট নয়) এই সব লোকরঞ্জনী প্রক্রিয়ার লোভ পেশাদারী মঞ্চে সামলানো প্রায় ব্রহ্মচর্য রক্ষার মত কঠিন কাজ। চলচ্চিত্র বা উপন্যাসের অনেক অবান্তর অংশ নাটকে পরিত্যক্ত। এবং এই 'অর্ধং ত্যজতি' নীতি পণ্ডিতদের মতই কাজ হয়েছে—গল্পটি নিপুণভাবে বলা গেছে।

প্রায় সকলেই দাপটে অভিনয় করে গেছেন। একটি নাটকের মেরুদণ্ড যে অভিনয় সেটা আবার প্রমাণিত হল, এবং অভিনয়ের ধারাও যে নানাভাবে পাল্টানো দরকার সেটাও প্রতিষ্ঠিত। প্রথমেই মনে আসে সুলেখার ভূমিকায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের নাম। গলাকে নানাভাবে খেলিয়ে হাস্যরসকে আরও কত তীক্ষ্ণ করা যায় তা তিনি দেখিয়েছেন। আবারও সিদ্ধান্তে আসলেন, এই দেশে যোগ্য সমাদরের কতখানি অভাব। রবি ঘোষ সেই জাতের শিল্পী যিনি চলচ্চিত্র নাটক সবকটি মাধ্যমেই অনন্য। ছদ্মবেশী নাটকে তাঁর বাচনভঙ্গী ওই নাটক জমিয়ে রেখেছেন—কোনখানে কাছাখোলা বা ডিগবাজি খাওয়ার দরকার হয়নি। জাল অবনীশ আসার পর তার জবাবদিহি অথবা বন্ধুটি সুবিমল প্রসঙ্গ তীরেন-চন্দর সময় তাঁর অভিব্যক্তি কমেডি অভিনয়ের শিক্ষণীয় বিষয়। পেশাদারী মঞ্চ সন্তু মুখার্জী সম্ভবত এই প্রথম নায়ক চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন এবং এতখানি গুরুদায়িত্ব বোধহয় তিনি প্রথম পেলেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় দায়িত্ব পালনে তিনি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছেন। লাবণ্য চরিত্রে অলকা গাঙ্গুলী তাঁর চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্য সকলের হাসির অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি গম্ভীর, যে দু এক জায়গায় তিনি সুযোগ পেয়েছেন, তিনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন। এই একই কথা বলা যায় বীথি গাঙ্গুলী সম্পর্কে। বসুধা চরিত্রে সোমা মুখোপাধ্যায় কিন্তু যথেষ্ট সাবলীল নন। অনেক জায়গায় তাঁকে আড়ষ্ট মনে হয়েছে। উজ্জ্বল সেনগুপ্ত সুবিমলের ভূমিকায় প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন, যদিও কয়েক জায়গায় তাঁর মুভমেন্ট্ বা বাচনভঙ্গি প্রশ্নসিদ্ধ। সন্তোষ দত্তের অভিনয় সকলকে হাসিয়েছে অনেকখানি, সংলাপ তাঁকে সাহায্য করেছে [illegible] বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় নয়। হরিপদর ভূমিকায় তেজা দত্ত সুযোগ পেয়েছেন দুবার, এবং সেই সুযোগ সদ্ব্যবহৃত। আর একটি ছোট ভূমিকায় সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অভিনয়কৃতিত্বের ছাপ রাখেন। অলোক বাগচী একটি বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ। অভিনয় ক্ষমতা তাঁর আছে, বর্তমান নাট্যজগতে নায়ক অভিনেতার সংখ্যা খুব কম—অলোক বাগচী মনে হয় অনেক শূন্যতা পূর্ণ করতে পারবেন। একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে বোঝাই যায়নি, কারণ অজিত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অনুষঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে—এখানে সেই মাত্রাজ্ঞানহীনতা একদম নেই—এই ব্যতিক্রমই ছদ্মবেশী'কে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

নির্দেশক রবি ঘোষ অনেক কিছুই সংযত হয়ে করতে চেয়েছেন, তা সত্ত্বেও বহু জায়গায় তিনি মাঝে মাঝেই পুরোনো লোকোক্ত পা রেখেছেন। প্রথমে অবনীশের মুখ দিয়ে একবার বলা হলেও, আইন ব্যাঙের সুযোগ দেওয়া

মাঝে দর্শকদের সম্বোধন করে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করা হ'ক না কেন। কমেডিজ লাইসেন্স নেওয়া সত্ত্বেও একবার গোরহরির পা মুড়ে হেঁটে যাওয়া এবং সকলের মার্চ করে বেরোনো চোখে লাগে। কয়েক জায়গায় সংলাপ খুব ছেলেমানুষী মনে হয়। গুরুদেবের দৃশ্য দেখানোর, জন্য মিড্‌কার্টেন ফেলে গোরহরির ডিগিং মারা, এবং মথুরের ঘুষ নেওয়া নেহাতই হাসির জন্য, সময়ের জন্য অকারণ রঙমহলে ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি। বহু জায়গায় মিড্‌কার্টেন ফেলে সামান্য আসবাবপত্রে নাটকের পুরো মেজাজ রাখা গেছে, এমনকি দু'টি জোনে ভাগ করে বিনয় ও তার স্ত্রী, প্রশান্ত লাবণ্য এবং একই সঙ্গে সুবিমল বসুধাকে দেখিয়ে সম্পূর্ণ পেশাদারী প্রথাকে অগ্রাহ্য করে গেছে। কিন্তু প্রশান্ত বা বিনয়ের ব্যক্তি, ফিল্মের সেটের মত—ওটা রাজভবনও হতে পারে, ব্যারিস্টারের বাড়িও হতে পারে। আবার এলাহাবাদ জংশনে যে স্টেশনের সেট (আর এম এস আরও কিছু সত্ত্বেও) সেটা জয়নগর বা মধ্যমগ্রাম হলে বিশ্বস্ত হত—স্টেশনে পিলারগুলি আঁকা। এলাহাবাদ জংশনে কুলি অবশ্য বিহারী দেহাতী গান গাইতেই পারে। অভিনয়ে অবনীশ ও জাল অবনীশ প্রায়শই মিশে যায়। ভোলা দত্ত একবার 'চোপ, চোপ' করে দুজনকে সামলান, আর একবার একইভাবে 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে দুই পক্ষের সামাল দেন।—অভিনয় ভালো হলেও পুনরাবৃত্তি অনাকাঙ্ক্ষিত। এছাড়া মাঝে মাঝেই সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় আতিশয্যের আশ্রয় নিয়েছেন, যেটা এ নাটকে মানিয়ে গেছে, তবে আরো বেড়ে গেলে হয়ত ফল ভালো হবে না।

রবি ঘোষ আর এক জায়গায় গ্রুপ থিয়েটারের নীতি গ্রহণ করেছেন। বাংলা থিয়েটার অনেক সময় বিজ্ঞাপনের ফরমুলা গ্রহণ করে। কস্‌মেটিক্‌স বিজ্ঞাপনে সব সময় মহিলাদের ছবি—যেন পুরুষরা দাঁত মাজেন, অথবা ক্রীম-পাউডার-সাবান মাখেন না। অপর পক্ষে দাদ, হাজা, চর্মরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্যের বিজ্ঞাপনে সব সময় পুরুষদের ছবি—যেন মহিলারা কেউ জীবনে ঐ রোগের মুখোমুখি হননি। বাংলা নাটকে মহিলারা প্রতিটি আবির্ভাবে পোশাক পরিবর্তন করেন, পুরুষরা অনন্তকালব্যাপী নাট্য-ঘটনা চললেও পোশাক পরিবর্তন করেন না। ছদ্মবেশী নাটকে একবার ড্রেসিং-গাউন, কোর্ট থেকে ফেরবার পর প্যান্ট শার্ট ছাড়া রবি ঘোষ ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর একটি লখনৌ কাজ করা পাঞ্জাবি পরে কাটিয়েছেন, এবং সবাই একই পথে চলেন, বিনয়, সুবিমল, পোশাক পালটায় একদম শেষ আশীর্বাদ দৃশ্যে, মথুর একবার একটি কোট পরে। নাটকে রজনীকান্তের 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়' গানটি ব্যবহার করা হয়েছে—গাওয়া হয়েছে ভাল। কিন্তু আবহ রচনায় কোন পরিকল্পনা নেই, স্বদেশী-বিদেশী কোন বাছবিচার নেই। অবনীশের দৈশ অভিসারের পিছনে যে সাসপেন্স ব্যবহৃত, সেটা বাংলা ছিলমে ভৈরব বন্যাকার হঠাৎ শোরগোল ব্যান্ড বেজে ওঠে—একদম আচমকা। (সঙ্গীত: অলোক বাগচী)

'ছদ্মবেশী' নাটকটি ভালভাবে দেখবার জন্য আমি দু'বার দেখতে বাধ্য হয়েছি। প্রথমবার দেখার অভিজ্ঞতার জন্য আমি রঙমহল কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আগে থেকে ব্যবস্থা সত্ত্বেও রবিবার যখন বিক্রী ভাল হয়—সেই সময় একজন কমপ্লিমেন্টারী চিহ্নিত সাংবাদিক বড়ই বিপদে ফেলে। সন্ধ্যে ৬টার সময় গিয়ে পরিচয় দেওয়ার পর সত্যিই নগদ পাওনার মাঝখানে একটি আসন ব্যবস্থা করতে ওঁরা বিপাকে পড়েন। নিমন্ত্রণ বাড়িতে বরযাত্রীর দাবি আগে—সানাই-ওয়ালার সবচেয়ে পরে একথা আমার মনে রাখা উচিত ছিল তাই ক্ষমাপ্রার্থী। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তাঁরা আমাকে নস্টালজিক অভিজ্ঞতায় স্নিগ্ধ করেছেন। মাঝে মাঝেই একজন হাঁক দিচ্ছিলেন 'দেশ পত্রিকা থেকে কে লোক এ-ছে ?' বাল্যকালে মা-ঠাকুমার কোলে বসে যখন সিনেমা বা থিয়েটার দেখতাম, তখন দোতলায় মহিলারা বসতেন, একতলায় পুরুষ—শো শেষ হওয়ার পর ঝি এসে হাঁক দিত—'শ্যামপুকুরের দত্তবাড়ির লোক এসেছে'। সম্পূর্ণ নতুন প্রযোজনা প্রচেষ্টার মধ্যেও আমি পুরোন দিনের আস্বাদ পেলাম। প্রায় তৃতীয় সিন পড়বার সময় একজন বিনয় সহকারে এসে আমার 'বক্সে' বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তাকে একটি প্রোগ্রাম দিতে বলায় তিনি আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন। বিরতির পরেও দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেল প্রোগ্রাম এল না। রঙমহল কর্তৃপক্ষকে আবার ধন্যবাদ, তাঁরা আমায় আর একবার শিক্ষা দিলেন। আসলে আমরা প্রত্যেকে আয়েশী, হুকুম করতে অভ্যস্ত—নিজ দায়িত্বের জন্য খাটতে প্রচণ্ড অনীহা। বাইরে বেরোলাম—'প্রোগ্রাম পাওয়া যাবে' ? অধোমুখে একজন বললেন "সে কি আর আছে। দেখুন তো গলির মধ্যে পান্না বসে একজন আছে তার কাছে পাওয়া যায় কিনা"। পান্নাকে খুঁজে বের করে প্রোগ্রাম সংগ্রহ করা গেল। 'বক্স' কথাটির মধ্যে আভিজাত্য আছে। কিন্তু যে বক্সে আমি বসেছিলাম সেখান থেকে স্টেজের এক-চতুর্থাংশ দেখা যায় না (ভাগ্যিস ক্যাবারে নাচ ছিল না।) রবি ঘোষের নির্দেশনায় শিল্পীদের নৈপুণ্যে তিন-চতুর্থাংশই আমাকে বিমুগ্ধ করে দিচ্ছিল—তবে আমার কাছে অন্ধকারাবৃত মঞ্চে অভিনয় দেখে দর্শক যখন সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন, তখন আমি শুধুমাত্র আন্দাজ করে বোকার মত হাসছিলাম—এইটুকুই যা হরিষে বিষাদ।

খড়িমাটীর গণ্ডি

এই মুহূর্তে নাটনগরী কলকাতায় ব্রেশটের 'ককেশিয়ান চক সার্কেল' অবলম্বনে তিনটি প্রযোজনা একই সঙ্গে চলছে। ১৯৪৪ সালে লেখা নাটক প্রায় চার দশক বাদে তিনজন প্রযোজককে যুগে যুগে জরুরী হয়ে পড়ে।

দুইজন ক্ষমতাবান প্রযোজক ব্রেশট নাটকের রূপান্তর মঞ্চস্থ করলেও, থিয়েটার ক্রণ্ট প্রযোজনা করেছেন 'ককেসিয়ান চক সার্কেল'-এর ভাষান্তর। এই অনুবাদ প্রযোজনায় সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। দেশজ পটভূমিতে অনেক অযৌক্তিক নাট্য-মুহূর্ত অনুপ্রবেশ করে, মূলানুগত্যের থেকে সরে এলেই ব্যাখ্যা নিয়ে মত-বিরোধ হয়—সে ক্ষেত্রে অনুবাদ অনেক দায় বাঁচায়। আবার সরাসরি অনুবাদ নাট্যকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে, পরিবেশ, সজ্জা সব কিছু অটুট রাখতে যে পরিশ্রম ও আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়, এই অকালমৃত্যুর দেশে সেটাই বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। থিয়েটার ক্রণ্ট সুবিধা যেমন নিয়েছেন তেমনি অসুবিধের মুখোমুখি হয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে (অনুবাদ ও নির্দেশনা—সুব্রত নন্দী)।

পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে জমকালো বিরাট সেট দেখা যায়, তাতে ভাবা গিয়েছিল থিয়েটার ক্রণ্ট প্রথম বাধাটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন (মঞ্চ—সমরেশ মুখোপাধ্যায়)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ সেট কোন সময়ে শুধুই চমকদার অন্য সময়ে অকারণে জঞ্জাল হয়েছে মাত্র। প্রথম পর্বে অভিনয়, গান,
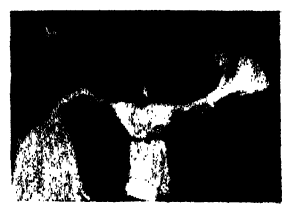
আলগা নাট্য গাঁথুনি সব কিছু খাপ-ছাড়াভাবে এগোতে থাকে। বিশাল সেট পরিবেশ রচনায় সহায়তা করলেও, কম লোকজন নিয়ে কাজ করায় অনেক সময় সম্পূর্ণ ঘটনার আভাস দিতে পারে—বিশ্বস্ত করে তুলতে পারে না। পোশাকে কেউ মোজা পরেন, কারো পা খালি। আজদক শার্টদের শুধুই পোশাক যা ইউনিফর্ম নয়। কেউ অতি অভিনয় করেন, কেউ বা বাস্তবিক, কেউ স্টাইলাইজড কেউবা শুধু পার্টটা বলেন (অর্থাৎ মুখস্থ থাকাটাই যার একমাত্র গুণ)। গান অনেক সময় শুধুই বিরক্তিকর কালক্ষেপ (সঙ্গীত—কালী দাশগুপ্ত)। তাপস সেনের আলো প্রায়শই অন্ধকারেই রাখে—পিছনে গৃহযুদ্ধের সময় কিছু বিক্ষিপ্ত আলো; আর জোনাল লাইটের ইতস্তত পরিক্রমার পর কল্পনার দৃশ্যে ব্রহ্মাস্ত্রটি নিক্ষেপ করলেন। ব্রেশটীয় রীতি নিয়ে অনেক গবেষণা, অনেক বিতর্ক। প্রযোজনায় বিভিন্ন স্তর অভিনয়ের সঙ্গে মিশে বিলীন হবে, নচেৎ গান নাটককে ভারাক্রান্ত করবে। সঙ্গীত-নির্দেশক কালী দাশগুপ্ত একজন স্বনির্ভর শিল্পী—কিন্তু তিনি যে সুর করেন, আলাদাভাবে সেই সুর মর্মগ্রাহী হলেও থিয়েটারের গান হয়ে ওঠে না। এই দায়িত্ব শুধু তাঁর নয়, প্রযোজনার স্বাদুও এর জন্য দায়ী। অথচ আলাদাভাবে দেখতে গেলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে আভার গান সুন্দরভাবে গাওয়া (যা থিয়েটারে প্রায়শই দুর্লভ)—কিছু গান মঞ্চে কিছু গান টেপেই বা কেন রাখা হল? প্রীতিলি পাল, মল্লিকা সিং, তপন দত্ত, বাসুদেব দে, তাপস ঠাকুর প্রত্যেকেই গান গেয়েছেন ভালো—কিন্তু তা কাজে লাগেনি। গানগুলি পড়তে ভালো লাগলেও যখন গাওয়া হয় 'এবার শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করো ওহে মূর্খ শস্যপাণি/চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি'—তখন কতটুকু দর্শকদের স্পর্শ করতে পারে?

গ্রুশা চরিত্রে পম্পপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় আটপৌরে ঘরোয়া চেহারা, ১৯৫৬ সালে প্যারীর নাট্যোৎসবে ব্রেশট প্রযোজনারও এই রকম চটকবিহীন নির্বাচন ছিল, যাতে সহজলভ্য মমতা আদায় না হয়। অর্থাৎ ব্রেশটীয় রীতি অনুযায়ী অনেক আবেগ, সম্মোহনী প্রক্রিয়াকে বর্জন করা হল। শম্পা নন্দী, তাপস ঠাকুর, সবিতা দেবী, রঞ্জা গুপ্ত প্রত্যেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদনে কিন্তু প্রযোজনা-শৈথিল্যে কিছুই উত্তরোয়নি। আর নীতি কথা? থিয়েটার শুধুমাত্র নৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, এ বিষয়ে ব্রেশট স্মার্ট মত পোষণ করতেন—সব তত্ত্বের উপরে অভিনয়—যা সমান দাপটে না চললে সব কিছু অগোছাল হয়ে যায়। যার সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল দ্বিতীয় পর্বে, যার মূল নায়ক আজদাক। এই চরিত্রে সুব্রত নন্দী আদ্যোপান্ত দাপটে অভিনয় ও একটি গান গেয়ে, আমাদের দুঃখই বাড়িয়ে দিয়েছেন—কারণ, দ্বিতীয় পর্বে আমরা উপলব্ধি করলাম থিয়েটার ফ্রণ্টের প্রযোজনায় কতখানি সম্ভাবনা ছিল।

আসলে মনে হয়, সুব্রত নন্দী তত্ত্ব ও তথ্য অনেকের থেকেই বেশী জানেন, সেই আহরিত জ্ঞানের প্রতি নানাভাবে আনুগত্য রাখতে গিয়ে অনেক স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ফাঁস

মহাশয়/মহাশয়া

অনেকদিন আপনারা 'কলরব'-এর কোলাহল শোনেন নি। তাই সাদরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী সোমবার ২৮শে, শ্রাবণ ১৩৮৫ (ইং ১৪ আগস্ট ১৯৭৮) সন্ধ্যা ৬টায় 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে সেই কোলাহলের সাক্ষী হতে।"...

ভরসা রাখি এ পর্যন্ত পড়েই কেউ বিশ্বরূপায় ছুটে যাবেন না। খেয়াল করুন, আলোচ্য অনুষ্ঠানের তারিখটা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। তবু আলোচনার প্রমুখে সেদিনকার আমন্ত্রণ পত্র থেকে এই উল্লেখ, বিশ্বাস করুন, তা আপনাদের সঙ্গে কোনো রসিকতায় উদ্দিষ্ট নয়, এটা নির্দিষ্ট, আলোচ্য সংস্থার অভাবনীয় এক দূরদর্শিতার পরিচয়ে।

চূড়ান্ত ঘণ্টি বাজিয়ে ঘোষণা করা হল : নাটক শুরু হচ্ছে। কিন্তু কোথায় নাটক। মঞ্চে নয়, অন্য কোনোখানে?

মেচি। হোঁচট খেয়ে পড়া, বিশ্ব বলে কে যে ডাকে, বোঝা যায় না তারই নাম ঘৃণা কি না! অন্ধকারে উচ্চারিত নামগুলো ভেসে যায় এপাশ থেকে ওপাশে। নাটক দেখতে এ তুমি কোথায় এলে হে প্রতিবেদক—মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করি—প্রেক্ষাগৃহে, না বাজার সংলগ্ন কোনো মেলায়?

যাই হোক বললে যাই হোক। এক সময় মঞ্চে শৈলেশ গুহনিয়োগী রচিত 'ফাঁস'-এর অভিনয় শুরু হল। বহু অভিনীত (বিশেষ করে তথাকথিত অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবগুলোর দৌলতে) আলোচ্য নাটকটি যেহেতু সকলেই জানেন 'কৌতুক নাটক' সে কারণেই কি না জানি না, দর্শকদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপিত হাসির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। মাঝ পথে এসবেরই পরিণতিতে (হয়তো বা অন্য আরো কিছুর জন্যে) হঠাৎ অভিনেতারা তাঁদের 'কৌতুক' সৃষ্টিতে ক্ষান্ত দিয়ে হাত জোড় করে বাস্তবে ফিরে এলেন: 'আপনারা শান্ত হয়ে না-বসলে আমরা আমাদের অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অভিনয় বন্ধ হয়নি, তবে প্রেক্ষাগৃহের সব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হল কতিপয় দর্শককে বাইরে ঠেলে দিয়ে।

তো, এ সবেরই মধ্যে বসে আমাদের অনুধাবন করতে হল 'কলরব' নিবেদিত বাদল মৈত্র নির্দেশিত 'ফাঁস'কে।

যে তাৎক্ষণিক আনন্দদান ও গ্রহণের জন্যে এই নাটক আজকের দিনে তার ধার ও সূক্ষ্মতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠতেই পারে তবে অভিনয়ে প্রায় সকল শিল্পীই যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন, এই যা। তাই অশান্তির মধ্যেও তাঁদের অভিনয়ের প্রতি মন দিয়ে আমাদের যা কিছু শান্তিলাভ। বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন শ্রীরূপ মিত্র, বাদল মৈত্র, ব্রততী সেনগুপ্ত, সমীর চক্রবর্তী সলিল মজুমদার, চন্দন রায় দেবিকা মিত্র প্রমুখ। তবে শিল্পীদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই কখনো বাচিক অংশে কখনো আঙ্গিক অংশে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।

মৌচোর

যে পথে হামেশাই মৃত্যুভয়, সে পথে চোর হোক কি সাধু হোক, মধু সংগ্রহ করা খুব সহজ কথা নয়। এর জন্যে চাই যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। পরিশ্রম-বিমুখ-সাহস দুঃসাহসেরই নামান্তর, যার পরিণামে অপেক্ষা করে থাকে ব্যর্থতা। আবার শুধু পরিশ্রমী হলেই চলে না, চাই কিছু দূরদর্শিতা, চাকে মধু কখন জমে সেটাও জানা চাই, অপরিণত চাক ভাঙলে ব্যর্থতা এবং অকালমৃত্যু একই সঙ্গে ঘটতে পারে।

'কথাকলি' নাট্যগোষ্ঠী অকালে লোকান্তরিত হোক, বালাই ষাট, এমন কথা আমি বলি না; কিন্তু অগাস্টের শেষে মুক্ত অঙ্গনে 'মৌচোর'-এর প্রযোজনায় নাটক করার নামে তাঁরা যে

'মৌচোর'-এর কাহিনীকার (গোকুল দেব) যেমন তাঁর গল্প কাঁদতে গিয়ে একটি প্রচলিত ছাঁচকেই গ্রহণ করেছেন, ঠিক তেমনি প্রয়োগকর্তাও (দুলাল সাহা) বেছে নিয়েছেন এমন একটি মঞ্চাভিনয়-রীতি একালে যা অচল; তাতে আরোপিত 'আধুনিকতা' তাঁর দৈন্যকে চাপা দেবার তুলনায় খোলসাই করেছে বেশী।

আলোচ্য নাটকে 'মুখরক্ষা'র এক প্রার্থনা ছিল বংশী বাউরীর মুখে। কাহিনীর ছাঁচকে (অগত্যা) মেনে নিয়ে বলা যায়, শেষ পর্যন্ত তার মুখ রক্ষা হয়েছিল, কারণ সমাজতন্ত্রের বুকে সে বিদ্ধ করতে পেরেছিল তার হাতের ধারালো অস্ত্রটি। কিন্তু কোনো অনন্য-তন্ত্রেই 'কথাকলি' আলোচ্য প্রযোজনায় তার মুখ রক্ষা করতে পারেনি যেহেতু তার কর্মীরা ছিলেন নাটকীয় গুণের প্রায় সর্বক্ষেত্রে একেবারেই নিরস্ত্র ভূমিকায়।

'মা'

সন্তানকে জন্ম দেন মা। আর মাকে মহিমান্বিত করেন সন্তান। সকলেই এমন সন্তান নয়, কেউ কেউ। যেমন, আলেক্সেই মাক্সিমভিচ পেশকভ—যিনি আমাদের কাছে 'মাক্সিম গোর্কি', নামেই সুপরিচিত। ১৯০৬ সালে গোর্কি রচিত 'মা' সম্পর্কে পরবর্তীকালে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত গোর্কিবিদ বরিস বিয়ালিক আমাদের জানান : " 'মা' উপন্যাসে গোর্কির নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তার প্রধান চরিত্র নিলভ্নার মূর্তিতে।... আমরা পাঠকেরা আমাদের চারিপাশের দুনিয়াটাকে দেখি এই মায়ের চোখ দিয়ে, ঘটনার মূল্যায়ন করি তারই মূল্যবোধ নিয়ে।...নিলভ্নার সঙ্গে সম্পর্কেই তার চারিপাশের বিপ্লবীরা, পাভেলের কমরেডরা অনুভব করে তাদের আত্মিক ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।"

দীপালি চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'ভিরেটোরিনা'কৃত 'মা' নাটকের (দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়) মঞ্চায়ন দেখে ফিরে তার আলোচনা করতে বসে সমালোচনার ব্যাপনরূনে প্রাগুক্ত কথাগুলো চলে আসার কারণ, সেদিন রবীন্দ্রসদনে এই নাটক মঞ্চায়নের পরিকল্পনাটি ছিল একটি বিশেষ তাৎপর্যে নিহিত। এই নাটক দেখতে গিয়ে দর্শকেরা যে অর্থ দিয়েছেন তা ব্যয় হবে কুষ্ঠ রোগীদের সেবায়। যে কোনো সেবাই পূর্ণতা পায়, সার্থক হয়ে ওঠে যখন মানুষ একে অপরকে বাঁধে তার আত্মিক ভ্রাতৃত্ব বোধে।

কোনো ধর্ম বা রাজনীতি ধারী হিসেবে না থাকলেও মহকুমা কুষ্ঠ নিবারণী সমিতি সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মীয়তা স্থাপনের কথাই প্রচার করেছেন তাঁদের মুখপত্রে : 'যেহেতু কুষ্ঠও একটি রোগ, এই রোগী আপনার সহানুভূতির দাবি রাখে। সমাজে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন এবং সামাজিক স্বীকৃতি দিন। অহেতুক ভয়

অর্থাৎ প্রয়োজন সেই ভ্রাতৃত্ব বোধ। 'থিয়েটারিনা'র নাট্যকর্মিগণ নিশ্চিত ধন্যবাদার্হ এমন একটি অনুষ্ঠানকে 'অর্থবহ' করে তুলতে তাঁরা 'মা' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন।

বিপ্লব তো শুধু রাজনৈতিক চিন্তার নয়, আমাদের মানবীয় সম্পর্কের নীতিতেও তা প্রকাশলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

'সমস্যাপূরণে'র নামে 'সমস্যাস্ফুরণ'

সাত্যি-মিথ্যে জানি না, কিছুকাল আগে দুটি অত্যাশ্চর্য কথা হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে আমাদের কর্ণকুহরে ঢুকে পড়েছিল। কথা দুটি এই: (১) কোনো এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'অধুনাতন' করার জন্যে রবীন্দ্রগানে নাকি তিনি নিজে সুর দেবার কথা ভাবছেন। (২) একালের সঙ্গীত রচয়িতাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে আরেকজন নাকি বলেই বসেছিলেন, 'এঁরা যে কি সব গান লেখেন! কেন, নতুন নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না!'

তা কথা দুটি শুনেছি মাত্র। তেমন কোনো অত্যুৎসাহীর রবীন্দ্রগানের নব্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে এখনো আমাদের অভিজ্ঞতায় অনুস্যূত হয়নি। এটা আমাদের সৌভাগ্য কি না জানি না! যদি হয়, সম্প্রতি সেই সৌভাগ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হতেই হল, রবীন্দ্রসদনে একটি রবীন্দ্রগল্পের স্বেচ্ছাচারী আধুনিকীকরণ এবং নাট্যরূপে তা মঞ্চায়নে।

রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যাপূরণ' গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়েছেন নিরঞ্জন দেওয়ান।

কমল ঘোষ দস্তিদার পরিচালিত কার্টুন থিয়েটার প্রযোজিত আলোচ্য নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের দুর্ভাগ্যই বলতে হয়, যেহেতু নির্বেদনের নির্মাল্য আশানুরূপ নির্মল ছিল না, সে কারণেই তাঁদের অভিনয়-দক্ষতার প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি পরিণামে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে অভিনেয় বিষয়ের প্রতি অসমর্থনে।

সার্থক যে কোনো ছোট গল্পের নাম কবিতার নামের মতোই একটু বেশী স্পর্শকাতর, অর্থবহ। উপযুক্ত নামকরণের অভাবে একটি উৎকৃষ্ট গল্প অনায়াসেই আমাদের মনে অতৃপ্তি জাগাতে পারে। আবার এমনও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাশি রাশি শব্দে ভরা একটি গল্পের বক্তব্য-জটিলতা অনায়াসে তার ছোট্ট একটি নামকরণের মধ্যে মুক্তিলাভ করে আমাদের উপলব্ধিতে স্পষ্ট বোধিত হয়েছে।

কথাগুলো এল এই কারণে, একটি ছোট গল্পকে নাট্যরূপ দানের সময় নাট্যকারকে ইত্যাদিও ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। বিশেষ করে গল্পকার ও নাট্যকার যদি ভিন্ন ব্যক্তি হন সেক্ষেত্রে এর অন্যথাচারণে মূল স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিরুদ্ধাচারণই ঘটে।

সে দিনের অনুষ্ঠান-লিপিতে প্রকাশিত নাট্যকার তাঁর 'কৈফিয়ত'-এ বলেছেন এখানে তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি জানিয়েছেন:

(১) 'সমস্যাপূরণ'-এর মত একটি অখ্যাত গল্পের নাট্যরূপ আমি কেন দিলাম এর জবাবে এক কথায় বলা চলে, আমার ভাল লাগল তাই।

(২) কাহিনীর শেষ পরিণতিকে আরো ধারালো করার চেষ্টা করেছি। মূল কাহিনী যখন পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন আমার সৃষ্ট চরিত্র পীতম সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের শিকার হয়ে প্রাণ হারায়।

(৩) যাঁরা 'সমস্যাপূরণ' গল্প পড়েছেন, বা যাঁরা পড়েন নি, পড়ে দেখবেন মূল কাহিনী নাটকে পরিপূর্ণভাবে বজায় আছে। কবিগুরুর কাহিনীকে বিকৃত করার বাসনা বা দুঃসাহস আমার নেই।

নাট্যকারের এইসব কৈফিয়ত এবং তাঁর কৃতকর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমাদের কথা হচ্ছে:

এক। আজ থেকে প্রায় পঁচাশি বছর আগে লেখা একটি গল্প (রচনাকাল ১৮৯৩ সাল) যা যথেষ্ট ধারাল বা শক্তিশালী নয় বলে নাট্যকারের মনে হয়েছে তেমন একটি গল্প তাঁর ভাল লাগল কেন? এই ভাল লাগার অর্থই বা কি?

দুই। নাট্যকার যে তুলনামূলকভাবে এমন একটি ভোঁতা, দুর্বল গল্প বেছে নিলেন তা কি গল্পটির উপর তাঁর নিজের 'ধার' ও 'শক্তি' আরোপের জন্যই? সেক্ষেত্রে নিজস্ব ধার ও শক্তিটুকুকে তিনি কেন একটি মৌলিক নাটক রচনার কাজে লাগালেন না?

তিন। নাট্যকার কৃত নাট্যরূপে আমরা যেমন দেখলাম গল্পকারের বিপিনবিহারী কি সত্যি কোনো 'খল' চরিত্র? নাট্যরূপের প্রয়োজনে কাহিনী-বিস্তারের কিছু পরিবর্তন হয়তো নিন্দনীয় নয়, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের শিকার হয়ে নাট্যকারের সৃষ্ট যে চরিত্রটি (পিতম) প্রাণ হারায় তার জন্যে কি গল্পকারের সৃষ্ট চরিত্র বিপিনবিহারীকে দায়ী করা চলে?

সাথী

সম্প্রতি একটি মানী পাড়ার দামী প্রেক্ষাগৃহে 'ন্যাশন্যাল ইয়ুথ ড্রামাটিক গ্রুপ' মঞ্চস্থ করলেন 'সাথী' (রচনা/নির্দেশনা: সুভাষ ঘোষ দস্তিদার)। যার বিস্তৃত কাহিনী কল্পিত হয়েছে নির্যাতন ও শোষণের চিত্ররেখায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটি গ্রামের বর্গাদার চাষীদের উপর জমিদারী স্বেচ্ছাচার প্রতিভাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুটা অনুকরণাসক্ত হলেও নাট্যকারের প্রয়াস একেবারে মন্দ নয়। কিন্তু এই প্রয়াসে উদ্দিষ্ট নাট্য-বক্তব্য (নির্বিরোধী মানুষদের সংগ্রামী চেতনার স্ফুরণ ও সম্মিলন) শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, কারণ, তা প্রতিষ্ঠা করার মতো বাস্তবিক বলিষ্ঠ কোনো চরিত্র নাটকে ছিল না। বিক্ষিপ্ত কিছু দৃশ্যে কোনো কোনো শিল্পীর অভিনয়-দক্ষতা উঁকি দিলেও, কাহিনীর কাঠামোতে পড়ে সব কিছুই কেমন সম্প্রতিভ করার তুলনায় নিষ্প্রভই করেছে বেশী। অন্যদিকে অভিনেয় নাট্য-কাহিনী পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামন্দিরে (হিন্দি হাইস্কুল অডিটোরিয়াম) উপস্থিত দর্শকদের তুষ্টি প্রদান প্রকল্পে আনুষঙ্গিক আয়োজনেরও (আলো আবহসঙ্গীত ইত্যাদি) কোনো ঘাটতি ছিল না সত্যি, কিন্তু প্রয়োগে প্রয়োজনের মাত্রাতিক্রমণ করায় নাট্যোৎকর্ষের পক্ষে তাও আত্মঘাতী বোধ হয়েছে। এই সব ত্রুটিগুলো সম্পর্কে আলোচ্য সংস্থার নাট্যকর্মীরা সচেতন হবেন কি না জানি না, হলে ভালো। কারণ, সব অন্ধকারেই তো আর স্বপ্ন থাকে না, এক্ষেত্রে ধারণা হয়, আছে। নইলে, নাটক চলাকালে লোডশেডিং-এর পরেও তাঁরা অমন প্রাঞ্জল রইলেন কি করে।

'দেশ দোস্তি আউর দেবতা' ও 'ছায়াঘন বসন্ত'

যেখানে পরিশ্রম, নিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে প্রতুল গুণের অধিকারী হয়েও বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার তাদের পাবলিক শো-এর টিকিট পাঁচ টাকার বেশি ধার্য করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন, সেখানে কোনো 'রদ্দী-মাল' (দর্শকদের মন্তব্য থেকে সংকলিত) পরিবেশন করতে যখন কোনো নাট্যসঙ্ঘ দশ টাকা পর্যন্ত অনায়াস হাত বাড়ান তখন বেশ তাক লাগে! আরো তাক লাগে, যেখানে বিভিন্ন খেলাধুলো বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের ধৈর্য-চ্যুতি এবং তার পরিণামে গণ্ডগোলের কাহিনী প্রায় শোনা যায়, সেখানে প্রচুর স্থৈর্যশক্তিসম্পন্ন কিছু দর্শকের পরিচয় লাভ করে, যাঁরা বার কয়েক মুদ্রা কাড়লেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কোনো প্রতিবাদ করেন না। নিয়তিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা নিশ্চিত বলবেন, এমন কাণ্ড কোনো গ্রুপের ভাগ্যে বৃহস্পতির অবস্থান না-ঘটলেই নয়। হয়তো বা। কিন্তু আমি মোটামুটিভাবে বুঝেছি, এটা দর্শকদের তরফ থেকে এক দুর্লভ ক্ষমা, ট্যাঁকের পয়সা সহযোগে এ ক্ষমা বিরল নয় শুধু সত্যি তুলনারহিত।

'দেশ দোস্তি আউর দেবতা' একটি হিন্দী নাটক, 'ছায়াঘন বসন্ত' বাংলা। এই দুটি নাটকের লেখক ও নির্দেশক রণিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোটা দাগের কৃতকর্ম নিবেদন করেছেন লাবণি নাট্য সংঘ।

অভিনয় মানেই যে মুহুর্মুহু চোখ সংকোচন বা মুখের রেখা কুঞ্চন করা নয়, মঞ্চে অপ্রস্তুত ও অর্বাচীনের মত দাঁড়িয়ে থেকে বিকৃত উচ্চারণে সংলাপ পাঠ নয়—এসব বোধ করি দু-একজন বাদে আলোচ্য সংঘের নাট্যকর্মীদের জানতে বিস্তর বাকি। অথচ অনুষ্ঠানে সার্ত্র, কাম্যুর সঙ্গে সঙ্গে একজিসটেনসিয়ালিজমের দোহাই পেড়ে তাঁরা কত না মজাই উপহার দিলেন দর্শকদের! যেকারণে গাজিবিদ্ধ বিপ্লবীদের সীরিয়াস (?) অভিব্যক্তির প্রকাশেও উপস্থিত দর্শকগণ না-হেসে পারেন না। বোঝা গেল, আমাদের বসন্ত সত্যি ছায়াঘন! কিন্তু এ কিসের ছায়া?

সংস্থাদের প্রথম পাতকাচ দুষেছ উল্লেখ করেছি, হিন্দী নাটক। অভিব্যক্তির দাবীতে অভিনয় গুণের অভাব এই নাটকেও পর্যাপ্ত। প্রায় সারা নাটকটিই নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ, কথাসর্বস্ব, তবু সেটা হিন্দী হবার ফলে বাঙালী শ্রোতারা তা মন দিয়ে শোনা ও বোঝার দিকেই ঝুঁকেছেন বেশি। কিন্তু তাঁদের এই সহৃদয়তার যথার্থ মূল্য তাঁরা পাননি।

মোটকথা, লাবণি নাট্য সঙ্ঘের কর্মীদের অভিনয় যা দেখলাম তাতে স্কুল-কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত অনেক অনভিজ্ঞ আনকোরা অনুষ্ঠানও তুলনায় গৌরব বোধ করতে পারে। আর নাটক দুটির সাহিত্য গুণ যদি ঈষৎ স্বীকার করা হয়, সেক্ষেত্রে 'বটতলায়' যাঁদের স্থান তাঁদেরও কৌলীন্য দাবী-না করার কোনো কারণ থাকে না!

সর্বাঙ্গে পঙ্গু, সর্বার্থেই বিবর্ণ,—গ্রুপ থিয়েটারের নামে এই ধরনের অনুষ্ঠান নিবেদন করে নাট্য দর্শক ও পর্যালোচকদের মতামত চাওয়া হলে সংক্ষেপে সেই একটি কথাতেই তা জানানো যেতে পারে: সর্ব অঙ্গে ঘা, মলম লাগাই কোথা!

রানা দাস

হাওড়া ড্রামা কলেজের 'শেষকথা'

আমন্ত্রণপত্রে হাওড়া ড্রামা কলেজের প্রযোজনা দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম। ড্রামা কলেজ, স্বাভাবিকভাবেই নাটকের প্রয়োগ কৌশল, মঞ্চস্থাপত্য, মেকআপ ও মঞ্চকে ব্যবহার করার রীতিনীতি এক্ষেত্রে অনেক বেশী নিখুঁত হবে। আরও আকর্ষণ ছিল মূল নাটকটাই। নাটক রবীন্দ্রনাথের 'শেষকথা'। দুর্ভাগ্যের বিষয় হাওড়া ড্রামা কলেজের 'শেষকথা' একটি অক্ষম প্রযোজনা।

প্রথমত বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ অত্যন্ত দুর্বল। গল্প বা উপন্যাস যেভাবে চলে, নাটক নিশ্চয় সে-ভাবে চলে না। নাটকের একটা আলাদা ছন্দ আছে। নাট্যরূপের ক্ষেত্র লেখকের অবশ্যই কিছু স্বাধীনতা থাকে। মাধ্যম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা ভোগ করবার অধিকার লেখকের রয়েছেই। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর নাট্যরূপের ক্ষেত্রে লেখকের কলমের জোর আশা করা অন্যায় নয়। বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে সে ক্ষমতার আভাস মেলেনি। নাট্যরূপের দুর্বলতা গোটা প্রযোজনাকেই ক্ষুণ্ণ করেছে।

মেকআপ-এর ক্ষেত্রও চোখে পড়ার মত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি। মাথায় ফুল গুঁজে দিলেই সাঁওতাল হয়ে যায়, ড্রামা কলেজের কাছে এটা আশা করা যায় না।

মঞ্চ স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও আনাড়ি কাঁচা হাতের ছোঁয়া। দলগত অভিনয় এবং [illegible]

উৎপাদন করে। নির্দেশক বিজয় চট্টোপাধ্যায় কয়েকজনকে দিয়ে কিছু সংলাপ বলানোকেই যদি নির্দেশকের দায়িত্ব বলে মনে করেন তাহলে বলার কিছু নেই। শম্ভু চক্রবর্তী ও রথীন দে'র অভিনয়ে অতিনাটকীয়তা যাত্রাকেও হার মানায়। এ নাটকে একমাত্র অভিনয় করেছেন অচিরার ভূমিকায় শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী। কিন্তু সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দুর্বল অভিনয়ের সঙ্গে কতক্ষণ ভাল অভিনয় করা যায়। তৎসত্ত্বেও কোন কোন দৃশ্যে তার অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের অচিরার সন্ধান মিলেছে।

অনুপেন্দ্র ভট্টাচার্য

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **রেকর্ড**

বিদ্রোহ চারিদিকে

ইনরেকো রেকর্ড কোম্পানী সুকান্ত জয়ন্তী উপলক্ষে একটি রেকর্ড প্রকাশ করেছেন। একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনা। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় সুরারোপ করেছেন অনল চট্টোপাধ্যায়, গেয়েছেন চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। সুকান্ত ভট্টাচার্য কিছু গান লিখেছিলেন, (গানগুলি গীতিগুচ্ছ নামে প্রকাশিত) সেই গানগুলিতে সুর খুব কম করা হয়েছে (যদিও গানগুলি সুকান্তর কাব্যের পাশাপাশি খুবই সাধারণ এবং বিপরীতধর্মী)। অথচ সুকান্তর অনেক কবিতার সুরারোপ প্রায় কিংবদন্তীর মত লোকের মুখে মুখে ফিরেছে, যা কবিতায় সুরারোপের আদর্শ হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত। সুরকার আলোচ্য গান দুটিতে সেই আদর্শের মহাজন পন্থা অনুসরণ করেছেন। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় গান দুটি ভাল গেয়েছেন—সম্মেলক হার্মনাইজেশন অনেক জায়গায় বাধা সৃষ্টি করে। 'কারা যেন আজ দু' হাতে খুলেছে ভেঙেছে খিল।' (আমরা এসেছি) গানটিতে সুরের পরিবর্তন অনেক বেশী—যার জন্য কায়দাটা চমক লাগায়—স্থায়ী হয় না। তুলনায় "বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে" (পুরনো ধাঁধা) গানটি অনেকের কণ্ঠে স্থান পাবে। সবশেষে একটি কথা—দুটি গানেই পঞ্চাশের দশকের কয়েকটি গানের ছাপ বিশেষভাবে পড়েছে——এবার আত্ম-সমালোচনার পালা—আমরা এগোচ্ছি না পিছোচ্ছি? অবশ্য সকলেই জানেন খামখেয়ালী অগ্রগতির থেকে পিছন ফিরে দেখলে অনেক শান্তি এবং স্বস্তি।

যাটানী রেকর্ডস কোম্পানী একটি লং প্লেইং রেকর্ডে তরুণ অপেরার 'লেনিন' যাত্রা নাটকটি প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিককালে নির্দেশক-

অভিনেতা শান্তিগোপাল জীবনী নাট্যে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। পর পর তিনি জীবনী নাট্য পরিবেশনায় খ্যাতকীর্তি। ঘুরিয়ে বলা যায় জীবনী নাট্যে তাঁর কমার্শিয়াল সাকসেস। তাই তাঁর নির্দেশনায় হিটলার হয় আবার লেনিনও হয়। বিরাট যাত্রার পালাকে একটি লং প্লেইং-এর পরিসরে খাপ খাওয়ানো খুবই শ্রমসাধ্য—কিন্তু দীপেন মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড নাট্যরূপ ও সম্পাদনা নাটকটিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করতে পেরেছে। ... নিশ্চয়ই যাত্রার জগতে পালাবদলের কাজ করেছে—কিন্তু পাশাপাশি, পুরোন যাত্রার অতিকৃত সংলাপ উচ্চারণ, কিংবা স্টেম্পকীর ভিলেনী, (নরেন দে) কেরনেস্কির (অমর ভট্টাচার্যের) স্বরণভাব সব কিছুই পুরোন রীতিকে ফিরিয়ে আনে।

তুলনায় ভাল লাগে বুৎশেভের ভূমিকায় শিব ভট্টাচার্যের অভিনয়। একটি দৃশ্যে লেনিন ও ভেরা (ইন্দিরা দে) নাটককে যে মহিমা দেন—পরবর্তী পর্যায়ে প্রথাসিদ্ধ অভিনয় (যাত্রার ভাষায় থাকে বলে সেট নেওয়া) আবার পুরোন জায়গায় ফিরিয়ে দেয়। কয়েকজন অভিনেতা 'নগিন'কে "নগেন" সম্বোধন করেন। শব্দ সংযোজনা ভালই তবে কোলাহলগুলো সাজান বলে মনে হয়। পালার মধ্যে নতুন পুরোন যত কিছুর সংমিশ্রণ ঘটুক না কেন—গানগুলি কিন্তু সদর্থে আধুনিক (সুর প্রশান্ত ভট্টাচার্য) এবং নাটকীয়। সবশেষে জীবনী নাট্য ফরমূলা মতন ভিলেনি, আবেগ, উত্তেজনা প্রভৃতি মশলায় ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার জমাটি মিশ্রণের জন্য পালা রচয়িতা শম্ভু বাগকে তারিফ জানাতেই হয়।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

মীনা বন্ধুকে সাহায্য করলো!

গুণ্ডাছেলে মন্টু মীনাকে জ্বালিয়ে মারছে।

নিউট্রামুলের ওপর মীনার মায়ের খুব ভরসা!

মন্টু এবার মীনার ছোট্ট বন্ধুর পেছনে লাগলো।

ঠিক হয়েছে!

!

উফ্!
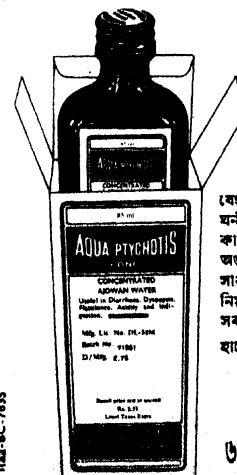
দিনে-দুবার নিউট্রামুল খাওয়া অভ্যেস করলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্মেই দেশের হাজার হাজার লোক সব ছেড়ে এখন আমূলের তৈরী শক্তিবর্ধক পানীয় নিউট্রামূল ধরেছেন।

আমূল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে — আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্ত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের

৫০০ গ্রা. টিন মাত্র ১২ টাকা ২১ পয়সা স্থানীয় কর, সেন্টাল সেলস্ ট্যাক্স ও মাসুল আলাদা।

মীনা এবং আরো অনেকে নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে!

daCunha/N/2o/Ben/R-1

Nestlé
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে
NESCAFÉ
শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি

লী উত্তরায়ণ রবীন্দ্রনাথ

দেশ ২০ শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীদেবী- চট্টোপাধ্যায়ের 'শান্তিনিকেতন : ংশের উদ্যান' লেখাটির সংগে সুন্দর ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত ছে। উদ্যানে বৈকালিক ভ্রমণে দ্রনাথ—এই ছবির মত পরিষ্কার ক্যানডিড ফোটো কম আছে। কিন্তু ছবির ক্যাপশানে এবং ক্রেডিট নে ভুল আছে। এই ছবি যখন লা হয়েছিল উত্তরায়ণের উদ্যান নও তৈরি হয়নি। ছবি তুলেছিলেন নাকীন ত্রিবেদী। ছাত্রাবস্থায় প্রথমে কেতনে এবং পরে শান্তিনিকেতনে কাল রবীন্দ্রনাথের খুবই কাছে বার সুযোগ তাঁর ঘটেছে, অত ছবি তিনি তুলেছেন এবং সেও ক। শুধু শান্তিনিকেতনে নয় রে তোলা তাঁর অনেক ফোটোগ্রাফ লী সংগ্রহে রক্ষিত আছে। অভিনয়ে লের দলের সংগে যখন তিনি বাইরে য়েছেন অনেক সুযোগ তিনি য়েছেন। বিচিত্র সে সব ছবি। ড়াসাঁকোতে তাঁরই গৃহীত একটি ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য মনে র : দলে পরিবৃত, খুশির খেয়ালে ন্দ্রনাথ গণৎকারের কাছে হাত খাচ্ছেন।

দেশ পত্রিকায় ছাপা বৈকালিক মণে রবীন্দ্রনাথ ছবিটি নেওয়া য়েছিল আম্রকুঞ্জের মন্দির-দেহলি য়ে চলা পথে। বসন্তোৎসব যেখানে নুষ্ঠিত হয় তার অনতিদূরে। দুর্বল রীরে বা অসুখে শেষ বয়েস পর্যন্ত বীন্দ্রনাথ কখনও লাঠিতে ভর করেন । ছবিটি যে সময়ে তোলা সে সময়ে ত কয়েক সপ্তাহের জন্য তাঁকে লাঠি বহার করতে হয়েছিল। মোটা খাটো ই লাঠি হাতে আরও দু-একটি বীন্দ্রনাথের ছবি আছে। সে কয়টি ই সময়েই তোলা।

একই সংখ্যা দেশে প্রকাশিত য়েছে শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের ্যামলী : কবির শেষবেলাকার খানি'। শ্যামলী গৃহের দেওয়াল— বির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ছবির ানোটিই টেরাকোটা নয়। মূর্তি সবই চা মাটির। শ্যামলীর দেওয়ালের টির সংগে এক।

বিলেতে পুত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি অমিত্রসূদন উদ্ধৃত করেছেন : ন্দলালের দল দেওয়ালে মূর্তি করবার ন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম রেছে—রাত্রে আলো জ্বালিয়েও কাজ লেছিল।' শ্যামলী বাড়ি সম্পূর্ণ য়েছে এ সুখবর রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বেন, দিয়েওছেন। সংবাদে বিশেষ রে রবীন্দ্রনাথের আরও একটু ভাল াগবে তা কবি বোধ হয় জানতেন। -জানার কথা নয়।

আচার্য নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ খবর য়েছিলেন, হুগলী জেলায় আশ্চর্য কটি মন্দির সম্প্রতি তিনি দেখে সেছেন। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরটি ত দিন টিঁকে থাকবে বলা শক্ত। সেটা ৩৪ সালের শেষ দিকের কথা। ঠিক য় গেল ১৯৩৪-৩৫ সালের কলাভবন ।নন্দলালকে নিয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামকিঙ্কর, শ্রীবিশ্বরূপ বসু। শ্রীমতী ইন্দিরা (তখন নেহরু) কলেজের ছাত্রী হলেও কনিষ্ঠদের মধ্যে একজন।

জঙ্গলে ঘেরা এই মন্দিরের চত্বরে রাত্রি ১২টায় একস্‌কারশনের নববর্ষও উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

এই বাঁশবেড়ে বাসুদেব মন্দিরের টেরাকোটা থেকে স্কেচ এবং ছাপ এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে হয়েছিল। দ্রুত কাজ করতে হয়েছে, একেবারে ভোর থেকে সন্ধ্যা।

শ্যামলী এবং প্রায় একই সময়ে (১৯৩৫) করা কলাভবনের মাটির ছাত্রাবাসের দেওয়ালের মূর্তি প্রধানত এই টেরাকোটা থেকে নেওয়া। সব কাজই যৌথ প্রচেষ্টায় করা। যে দলের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন তা এই একসকারশন দল থেকেই গঠিত। হুগলীতে যাননি এমন শিল্পীরও কাজ শ্যামলীর দেওয়ালে আছে।

দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া বাসুদেব মন্দির গাত্রে সাধারণ ঘরোয়া জীবনের অনেক আলেখ্য আছে। একসকারশনের দল, তাঁদের কাজ এবং মন্দিরের টেরাকোটার আলোকচিত্র নষ্ট হয়নি।

ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন কলকাতা-২৬

সুর ও ছন্দ

১৯ অগাস্ট সংখ্যার 'দেশ'-এ 'সুর ও ছন্দ' শীর্ষক একটি চিঠিতে শ্রীঅনিল দাশগুপ্ত 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা' গানের তাল সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তুলেছেন। গানটি নাকি সাহানা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে সপ্তমাত্রিক ছন্দে নিবন্ধ, কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় রেকর্ডে এই অতুলপ্রসাদী গানকে চতুর্মাত্রিক ছন্দে পরিবেশন করেছেন। প্রশ্নটি সংগত, কিন্তু বড়ো বিলম্বিত। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ডটি কমপক্ষে দশ বছর আগে শুনেছি এবং উপভোগ করেছি। আমার বিশ্বাস, 'সাহানা দেবী-কৃত স্বরলিপি থেকে কণ্ঠে' তুলে নেবার পূর্ব পর্যন্ত অনিলবাবুরও এ গানের রসোপভোগে কোনো বাধা ছিল না।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের সঠিক উৎস শিল্পী নিজেই হয়তো বলতে পারবেন। তবে অতুলপ্রসাদের গানে তাঁর শিক্ষা যে খাঁটি, এটা সাধারণ শ্রোতা হয়েও আমি জানি। তাঁর পিতা হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো অতুলপ্রসাদের গানের ভাণ্ডারী আর কে আছেন? এই বিশেষ গানটি অবশ্য তাঁরই কাছ থেকে তিনি শিখেছেন কিনা, অথবা অন্য কোনো সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন, সে তথ্য আমার জানা নেই।

কিন্তু এত সব তথ্যে আমার প্রয়োজন কি? আলোচ্য গানের এই ছন্দোবিভাগে অন্তর্নিহিত ভাবের বা রসের ব্যাখ্যায় কোনো ত্রুটি হয়েছে, স্বরলিপি-সংক্রান্ত অনিলবাবু প্রদত্ত তথ্য জানবার পরেও তা একবারও আমার মনে হচ্ছে না। কেননা রসের বিচারে মননকে মনের ওপর ঠাঁই দিয়ে আমি ঠকতে চাই না। একটি বিরহী হৃদয়ের আকুতি কত সহজে, কত স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত হয়েছে এই

মেজাজের একটি বিরাট ত্রৈমাত্রিক ছন্দের রবীন্দ্রসংগীত আমার মনে পড়ছে, সেখানেও আড়িকর ছন্দে প্রেমিক-হৃদয়ের অতৃপ্তির চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে : দুজনে দেখা হল মধু-যামিনীরে। অথচ সপ্তমাত্রিক ছন্দে রূপক বা তেওড়ায়, যে রূপদী গাম্ভীর্য আছে, তাকেই যেন এমন সহজ রোমান্টিক ভাবের পক্ষে একটু ভারী মনে হয়।

সবশেষে বলি, স্বরলিপির প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁদের পক্ষে তো বটেই। কিন্তু স্বরলিপিতেই কি সব সময় গানের সঠিক চেহারাটি ধরা পড়ে? রবীন্দ্রসংগীতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত কি নেই, যেখানে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর গাওয়া গানের সঙ্গে স্বরলিপির বেশ তফাত? এই প্রসঙ্গে এ-ও স্মরণীয়, রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড যেমন বিশ্ব-ভারতীর অনুমোদনসাপেক্ষ, অতুল-প্রসাদের গানেরও তেমন একটি সংস্থা আছে যাঁদের অনুমোদন ছাড়া রেকর্ড প্রকাশিত হয় না। সুতরাং আলোচ্য গানের সুর ও ছন্দ যে অননুমোদিত নয় প্রচলিত রেকর্ডটিই গত দশ বছর ধরে তার প্রমাণ দিচ্ছে।

কালিদাস সেনগুপ্ত কলকাতা-১৯

স্মৃতি সততই সুখের

'স্মৃতি সততই সুখের' এই অনবদ্য ও স্বাদু ভ্রমণপঞ্জীর এক স্থানে (দেশ : ১২ অগাস্ট) প্রতিভা বসু তাঁর দেখা 'বিখ্যাত ভাস্কর' আলেকসান্দর আর্চিপেঙ্কোকে অগাস্ত রদ্যা (১৮৪০—১৯১৭)-র সমসাময়িক বলে পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তা কি সঠিক? রদ্যার সময় উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সেক্ষেত্রে আর্চিপেঙ্কো জন্মেছেন উনিশ শতকের শেষ দিকে (১৮৮৭), ১৯০৮ সালে প্যারিসে গিয়ে কিউবিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। মারা গেছেন তিনি এই সেদিন, ১৯৬৪ সালে। তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলিতেই রদ্যা একজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর যিনি ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করে নিয়েছেন নিজস্ব ছন্দ। (রদ্যার ক্ষেত্রে 'প্রতিষ্ঠা' শব্দটা অবশ্যই বিতর্ক বাধাতে পারে।) সুতরাং দু সময়ের দুই শিল্পীকে কি সমসাময়িক ভাবা ঠিক? অবশ্য বড় শিল্পীরা, সর্বকালের এবং এই উদার ধারণায় তাঁরা প্রত্যেকে অপরের সমসাময়িক।

দীপায়ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গা

মানুষ পাথর

'দেশ' পত্রিকার ২৯-এ জুলাই ও ৫ই অগাস্টের সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসমরজিৎ করের 'মানুষ পাথর' ভ্রমণ কাহিনীতে কয়েকটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল।

"মা-র সম্পত্তি পায় তার বড় মেয়ে", লেখকের সংগ্রহ করা এই তথ্যটি দারুণ ভুল। সম্পত্তি পায় পরিবারের সবচেয়ে ছোটো মেয়ে। খাসিয়া ভাষায় ছোটো মেয়েকে বলে 'খাড়ডো'। খাসিয়াদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ও ... [illegible] ... তাই। এমন সমাজ ব্যবস্থা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যই তাদের সমাজে মেয়েদের প্রাধান্য বেশি এবং পুত্র-কন্যা মায়ের পদবী ধারণ করে। বিশেষ করে খাসিয়াদের মধ্যে মামা-মাসীর সম্পর্ক জ্যাঠামশাই-পিসীর চেয়ে ঘনিষ্ঠ। তাদের পরিবারে সব সম্পত্তির মালিক মা। এমন কি পিতার অর্জন করা সম্পত্তিরও। পরিবারে যদি একটিও মেয়ে না জন্মায়, তবে মা-র সম্পত্তি পাবে মা-র ছোটো বোন। মা-র ছোটো বোনের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হবে ছোটো বোনের ছোটো মেয়ে। এমনও হতে পারে যে সম্পত্তির মালিকের মেয়ে নেই আর বোনও নেই। সে অবস্থায় সম্পত্তির মালিক হবে মা-র ছোটো মাসী। তার অবর্তমানে ছোটো-মাসীর ছোটো মেয়ে। জয়ন্তিয়াদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগের ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। পিতার অর্জিত সম্পত্তির মালিক মা হয় না, হয় পিতার ছোটো বোন। মা-র নিজস্ব সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মালিক, খাসিয়াদের মতই, ছোটো মেয়ে হয়।

এ ধরনের ব্যবস্থার মূল কারণ হলো সমস্ত সম্পত্তি গুষ্ঠির মধ্যে আবদ্ধ রাখা। গুষ্ঠি (clan)র বাহিরে যেন না যায়। মেয়েরাই সম্পত্তির মালিক, তাদের স্বামীরা যে কোনো জাতির বা ধর্মের লোক হোক না কেন, ইংরেজ, জার্মান, বাঙ্গালী, অসমীয়া, বিহারী, পাঠান, পারসী, মোগল বা খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান। তাতে ক্ষতি নেই। এমনও দেখা যায় যে এক-ই মায়ের ৫টি সন্তানের মধ্যে একটির পিতা ইংরেজ একটির পাঠান আর বাকী তিনটির খাসিয়া। এর জন্য তাদের সমাজে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না যেহেতু ছেলে-মেয়েদের পরিচয় তাদের মা-র পদবীতে। পিতৃকুলের সামাজিক কোনো পরিচয়ই তাদের থাকে না।

খাসিয়াদের রাজা—সিয়েম—সম্পর্কে কর মহাশয় লিখেছেন (৩৬ পৃষ্ঠায়), তাকে যে খাসিই হতে হবে এর কোন কারণ নেই। এরা কেউ কেউ খাসি। আবার শুনলাম কেউ মুসলমান। মাতৃ-তান্ত্রিক খাসিয়া সমাজে হিন্দু, মুসলমান, জৈন পারসী, খ্রীষ্টান পিতার কোনো পরিচয় নেই। সিয়েমের মাতৃকুল খাসিয়া হওয়া আবশ্যক, নতুবা সিয়েম হওয়া সম্ভব নয়। যে ভদ্রলোক কর মহাশয়কে 'মুসলমান' সিয়েমের খবর দিয়েছিলেন, তিনি মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া সমাজের যথার্থ খবর রাখেন না।

২৯ জুলাইর সংখ্যার ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় রঙ্গীন ছবির Mesembryan-themum বা Livingstone Daisyকে লেখক বন্যফুল বলে পরিচয় দিয়েছেন। ওগুলো শীতকালের মরসুমী ফুল।

'বন্যফুল' ছবির তলার ছবিতে লোকটিকে লেখক অরুণাচলের 'নিশি' সম্প্রদায়ের মানুষ বলে ভুল পরিচয় দিয়েছেন। লোকটির মুখ ভাল করে লক্ষ করলে তার থুতনিতে উল্কির দাগ ... [illegible]

থাকে, পনিশিদের নয়। ছবির ঐ লোকটি 'আপাতানী' সম্প্রদায়ের, বেলা গ্রামের 'কালং' পাড়ার লোক।

"নিশি সম্প্রদায়ের মানুষ কখনও কখনও খাসি পার্বত্য অঞ্চলেও এখন কাজের খোঁজে আসে", লেখক ঐ ছবির নীচে লিখেছেন। ঐ সম্প্রদায়েরও পদ্ধতি এবং ধাতুর তৈরী গহনা খাসি মেয়েরা কখনোই পরে না। আমার যতদূর মনে হয় অল্প কালের ভ্রমণে অরুণাচল এবং খাসি পাহাড়ের মানুষের মধ্যে যে পৃথক পৃথক জাতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা লক্ষ করার মত লেখকের সময় হয়ে ওঠেনি। যার ফলে সম্ভবত অরুণাচলের গালং সম্প্রদায়ের মেয়েলোকের সুতো-কাটার ছবিটি খাসি মেয়ের ছবি বলে পরিচয় দিয়েছেন খাসি মেয়েরা কখনোই সুতো কাটে না এবং কাপড়ও তৈরী করে না। তাদের মধ্যে তাঁতশিল্প নেই বললেই চলে। দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড় সব-ই মিলের তৈরী করা। এণ্ডি-মুগার চাষ কিছু গ্রামে দেখা যায়, তবে ঐ জাতের গুটিপোকার তৈরী করা রেশমের সুতো কাটে না। 'ককুন'-গুলি বিক্রি করে দেয়। মুগা সিল্কের দামী কাপড় ব্যবহার করে। ঐগুলি মেঘালয়ের বাইরে থেকে তৈরী হয়ে আসে।

হাফলং আসামের উত্তর কাছাড় জেলার সদর। নংগস্টইন থেকে শিলং যেতে হলে ময়রাবাংগ ও মওংগাপ হয়ে যেতে হয়। হাফলং বহু দূরে এবং ঐ রাস্তায় পড়ে না। এমন কি মফলং হয়ে যাবারও প্রয়োজন নেই। নংগস্টইন থেকে হাফলং যেতে হলে, শিলং, জোয়াই আর গরমপানী হয়ে যেতে হবে। মনে হয় ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় মফলং ছাপতে হাফলং ছাপা হয়েছে।

বাসন্তী মুখোপাধ্যায়
শিলং-৩ : মেঘালয়

॥ ২ ॥

শ্রীসময়জিৎ করের "মানুষ পাথর" প্রবন্ধটির ১২ আগস্টের সংখ্যায় আছে —"শুনেছিলাম সার্থক শিল্প সব সময়ই নাকি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কথাটা যে কতখানি সত্যি তার পরিচয় পেয়েছিলাম একবার প্যারিসের লাভর মিউজিয়ামে। মনে পড়ে, বিরাট ঘর। তার দেয়াল জুড়ে ঐতিহাসিক ছবি: লাস্ট সাপার।" লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির এই বিখ্যাত ছবিটি পারিসের লুভ্র মিউজিয়ামে নয়—উত্তর ইতালীর শহর মিলানের সান্টা মারিয়া দেল গ্রাৎসির কনভেন্টের একটি দেওয়ালে আঁকা হয় এবং এখনো সেখানেই আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই কনভেন্টের অন্যান্য দেওয়ালগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সৌভাগ্যবশত এই দেওয়ালটির কিছু হয়নি।

ঐ একই সংখ্যায় "ইয়ারো ভিজিটেড" কবিতা প্রসংগে উদ্ধৃত প্রথম লাইন দুটির শুদ্ধরূপ হচ্ছে—"অ্যান্ড ইস দিস—ইয়ারো? —দিস দি স্ট্রীম/ অব হুইচ মাই ফ্যানসি চেরিশ্‌ড্।" এবং কবিতাটি ভূয়োথি নয়, তাঁর বিখ্যাত ভাই উইলিয়াম ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের লেখা।

সবিতা দাশগুপ্ত
নয়াদিল্লি

"কাহিনীকার হাইনরিখ বোল" শিরোনামে আমার যে লেখাটি ২৯শে জুলাই তারিখের 'দেশে' প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে পড়ল।

যেমন, ফ্রীডরিখ "অ্যাংগেলসে"র জায়গায় 'এংগেলস' হবে। বোলের প্রথম গল্প সংকলনটির নামের প্রথম শব্দটি হল: "WANDERER"। হিটলারের বইটির নাম: "MEIN KAMPF"। "ভাইটুং" এর জায়গায় হবে "ট্‌সাইটুং"। বের্টোল্ট্ ব্রেখটের উদ্ধৃতিটি হল: "সত্য বহু উপায়ে চাপা যায় এবং বহু উপায়ে বলা যায়।" তার পরবর্তী কথাগুলো ব্রেখ্ট লেখেননি।

প্রসংগত বলি, জার্মান 'Ch'-এর সঠিক উচ্চারণ বাংলায় লেখা সম্ভব না। কিছু কিছু আঞ্চলিক টানে "Ch" কে 'শ'-এর মতো করে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু "উচ্চ জার্মানে" 'Ch'-এর উচ্চারণ এক গভীরতর "খ" এর অনুরূপ। এজন্য আমি Heinrich, Brecht ইত্যাদি নাম বাংলা হরফে "হাইনরিখ" ও 'ব্রেখট' লিখেছি।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

ভারতের শেষ ভূখণ্ড

"ভারতের শেষ ভূখণ্ড"-এর লেখক শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর শেষ কিস্তিতে নিকোবর সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রশংসা করতে গিয়ে তার প্রশংসা কিছুটা অপাত্রে বর্ষণ করেছেন। এ-সম্বন্ধে একজন স্কুল ছাত্র হিসেবে কিছু মন্তব্য করতে চাই।

লেখকের ভাষায়,—'সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি পত্রিকা—'প্রয়াস' উপহার পেয়েছিলুম। এখন যত পাতা ওল্টাচ্ছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা অবাক করে দেবার মত কবিতা লিখেছে (পৃঃ ৫৫)।" কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র-গ্যাব্রিয়েল স্টিফেন যা লিখেছে তা নিশ্চয়ই অবাক করে দেবার কবিতা (!) নয়। গ্যাব্রিয়েল স্টিফেন লিখেছে—'দিস ন্যাটিভ ল্যান্ড অব মাইন।' কিন্তু এই কবিতাটি (!) টমাস ডেভিসের মাই ল্যান্ড কবিতার (!) হুবহু নকল! কারণ, গ্যাব্রিয়েল প্রথম লাইনেই লিখেছে—"ও! সি ইজ এ ফ্রেস এন্ড ফেয়ার ল্যান্ড।" এই লাইনটি ডেভিসের 'মাই ল্যান্ডের' তৃতীয় স্তবকের প্রথম লাইন। আবার; গ্যাব্রিয়েলের—"সি ইজ নট এ ডাল এন্ড কোল্ড ল্যান্ড/নো! সি ইজ এ ওয়ার্ম অ্যান্ড বোল্ড ল্যান্ড/ ও সি ইজ এ ট্রু এন্ড ওল্ড ল্যান্ড/দিস নেটিভ ল্যান্ড অব মাইন (পৃঃ ৫৫)।" এই লাইনগুলি তো ডেভিসের 'মাই-ল্যান্ডের' দ্বিতীয় স্তবকের লাইন-বাই-লাইন নকল। (এই কি অবাক করা কবিতা?) তবুও শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় গ্যাব্রিয়েল সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন—"এক চুলও বাড়িয়ে লেখেনি।" আমার প্রশ্ন, নকল কি আর বাড়িয়ে লেখা যায়?

জনৈক ছাত্র
কালিয়াগঞ্জ, পঃ দিনাজপুর।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

শিবরাম চক্রবর্তীর

হাসির গল্পের সংকলন

দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন

দাম ৬·০০

ওড্‌হাউসের যেমন জীভ্‌স, শিবরাম চক্রবর্তীর তেমনই হর্ষবর্ধন। মজার-মজার আর অকল্পনীয় যত সব কৌতুককর ঘটনাসৃষ্টিকারী এমন সর্বজনপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর নেই। এহেন হর্ষবর্ধনকে যিনি আমদানী করেছেন, বাংলাসাহিত্যের সেই লেখকটি নিজেও তুলনারহিত। তাঁর সর্বজন-পরিচিতি ও সর্বজনপ্রিয়তার মূলে অসংখ্য হাসির গল্প। শুধু হর্ষবর্ধনের কাণ্ড-কারখানাকেই নয়, যে-কোনো বিষয়কেই অনাবিল হাসির অফুরন্ত উৎস করে তুলেছেন শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর দুর্ধর্ষ গল্পাবলীতে। তাঁর যে-কোনো গল্পই হাসির অ্যাটম বোমা। 'দ্বিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন' গল্প-গ্রন্থে তাই হর্ষবর্ধন-গোবর্ধনের গল্প ছাড়াও আরও কয়েকটি বাছাই গল্প যুক্ত হয়েছে। যেমন, 'মামারও মামা থাকে আবার', 'বিড়ম্বিত লয়', 'রেডিয়ো সর্বদাই রেডি', 'খেলোয়াড়ি দুর্যোগ', 'রঙের তুরুপ'—এমন অনেক-অনেক গল্প। যাঁদের এসব গল্প পড়া, তাঁরা নিশ্চিত নাম শুনেই হাসতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে। কেননা শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প হাতে নিলেই অজান্তে হাসি শুরু হয়ে যায়, আর শেষ করার বহু পরেও সেই হাসির রেশ সহজে ফুরোতে চায় না।

পুজোয় আনন্দ-উপহার হোক ছোটদের বই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ভয়ের মুখোশ

দাম ৫·০০

রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত

পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া

দাম ৫·০০

সত্যজিৎ রায়ের

সোনার কেল্লা

দাম ৬·০০

শৈলেন ঘোষের

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা

দাম ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভয়ংকর সুন্দর

দাম ৫·০০

সত্যজিৎ রায়ের

বাক্স-রহস্য

দাম ৫·০০

শৈলেন ঘোষের

মিতুল নামে পুতুলটি

দাম ৪·০০

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদা এণ্ড কোং

দাম ৮·০০

সুকুমার রায়ের

সমগ্র শিশুসাহিত্য

দাম ১০·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা

দাম ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদা-সিরিজের প্রথম বই

বাদশাহী আংটি

দাম ৫·০০

'গোয়েন্দা ফেলুদা'—এই নামটির সঙ্গে পাঠকদের প্রথম পরিচয় ঘটেছে এক আংটি-রহস্যের সমাধানের মধ্য দিয়ে। সেই আংটি চুরির রহস্য-ভেদ করতে এসে ফেলুদা চিরকালের জন্য থেকে গেলেন বাংলাসাহিত্যে।

ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

চলচ্চিত্রে নির্মীয়মান কাহিনী

জয় বাবা ফেলুনাথ

দাম ৬·০০

ফেলুদার জীবনের সবচেয়ে ধুরন্ধর ও সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের ঘটনা 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। ফেলুদার নিজেরই কথায়—''এইরকম একজন লোকের জন্যই অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপসে। এসব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে বেশ একটা টনিকের কাজ দেয়।'' সেই লড়ে জেতার শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনীই এই উপন্যাস। সিনেমায় আসছে।

আনন্দ উপহার হোক ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়ের

গ্যাংটকে গণ্ডগোল

দাম ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সত্যি রাজপুত্র

দাম ৫·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

পাঁচ মুণ্ডির আসর

দাম ৬·০০

শৈলেন ঘোষের

বাজনা

দাম ৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

যাঁর নাম ঘনাদা

দাম ৫·০০

সত্যজিৎ রায়ের

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

দাম ৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং

দাম ৬·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তীর

যাদুঘরে চল যাই

দাম ৬·০০

শৈলেন ঘোষের

অরুণ বরুণ কিরণমালা

দাম ৩·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক

দাম ৪·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

তিন নম্বর চোখ

দাম ৫·০০

শৈলেন ঘোষের

ছোটদের রূপকথা

আমার নাম টায়রা

দাম ৫·০০

ছোট্ট মেয়ে টায়রা—ভারী মিষ্টি মেয়ে। থাকে টুংরি নদীর ধারে। এক বর্ষায় টুংরির বান এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই ছোট্ট সোনা টায়রাকে। আছড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল গভীর এক বনে। টায়রার প্রাণ নিল না টুংরি, কথা নিল। বোবা হয়ে গেল টায়রা।

হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট টায়রা—পথ চেনে না, ঘাট চেনে না—একলা ; সঙ্গে কেউ নেই—বাবা না, মা না, কেউ না! কথা বলতে পারে না। শুধু ভয়-ভয় চোখে কেঁদে সারা হয়। সেই অন্ধকার বিজন বনের মধ্যে কত ধরনের বিপত্তি, কত শত ভয়ঙ্কর ব্যাপারস্যাপার। সেই ভয়ানক ব্যাপারস্যাপারেই জড়িয়ে পড়ল টায়রা। দেখা হল এক [illegible]ঘের সঙ্গে, দেখা হল এক খুনে ডাকাতের সঙ্গে। কী বিপদেই না পড়ল টায়রা। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

টায়রা কি পারবে এই বিপদ কাটিয়ে মা-বাবার কাছে কোনোদিন আর ফিরে আসতে? সে কি বোবা হয়েই থাকবে সারাজীবন?

এ-কালের রূপকথার জাদুকর শৈলেন ঘোষ ছোট্ট মেয়ে মিষ্টি মেয়ে টায়রার মুখেই শুনিয়েছেন তার অপরূপ কথা, সে নিজেই বলেছে তার আশ্চর্য অভিজ্ঞতার গল্প 'আমার নাম টায়রা'তে। সঙ্গে রয়েছে অজস্র চোখ-ভরানো সব ছবি।

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অশোক রুদ্রের প্রবন্ধ
ক্রোধ ও শাপ
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র রচনা
মন্দির টেরাকোটায় দুর্গা
দিলীপ ঘোষের গল্প প্রবহমান
প্রতিভা বসুর ভ্রমণ কথা
স্মৃতি সততই সুখের
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ রচনা
কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদল দিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

দুই ধর্ম মহাসম্মেলন

ভারতীয় রাজধানীতে একটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন উদযাপিত হয়েছে। ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রতিনিধি হয়ে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। দলাই লামা এবং শ্রীলঙ্কার শিক্ষামন্ত্রী, দুজনের কেউই ভিক্ষু নন, তবু তাঁদের উপস্থিতি তিব্বতীয় বৌদ্ধ এবং শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ জীবনের দুই প্রতিভূর উপস্থিতি বলে অভিহিত হতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, যিনি ধর্মমতে বৌদ্ধ নন, যিনি হিন্দু ধর্মমতে বিশ্বাসী, তিনিই এই আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। শ্রীদেশাই উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন যে, যে বুদ্ধবাণী একদা বিশ্বজীবনের শান্তির বাণী বলে প্রথম সঞ্চার লাভ করেছিল, সেই বুদ্ধ-বাণী বিশ্বের শান্তিকে পুনরায় রূপায়িত করার প্রয়োজনে সার্থক হবে। কোন সন্দেহ নেই, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে বুদ্ধবাণীর যে মহত্ত্বের সত্য অভিব্যক্ত হয়েছে, সেটা সমস্ত ভারতের অবৌদ্ধ হিন্দু জনসাধারণের কাছে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতিপালিত একটি সত্য। হিন্দুর চিন্তা মনোভাব ও বিশ্বাসের এই সহজ বৈশিষ্ট্য কিন্তু অন্য কোন ধর্মীয় সংহতির অনুগত জনসাধারণের কাছে একটি বিস্ময়। বৌদ্ধ ধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জনজীবনে খুবই সীমায়িত। ধর্মমতে বৌদ্ধ, ভারতের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এহেন ভারতীয়ের সংখ্যাও সামান্য। ঐতিহাসিক মহাশয়দের বিচার ও সিদ্ধান্তের একটি গম্ভীর কথা এই যে, বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় জীবন থেকে 'বিতাড়িত' এবং অপসারিত হয়েছে। এই গম্ভীর কথার রূঢ়তা অপসারিত করে আর-এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের যে অভিমত প্রচারিত হয়ে থাকে, তার সার মর্মকথা এই যে বৌদ্ধ ধর্মের বাণী আনুষ্ঠানিকভাবে না হোক, ভাবরূপে ভারতীয় হিন্দুর ধর্মজীবনেরই মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতির প্রমাণ সন্ধান না করেও নিতান্ত সহজ বুদ্ধিতে একথা বলা চলে যে, তথাগত বুদ্ধ ভারতীয় হিন্দুর চিন্তা ও বিশ্বাসের কাছে নিতান্ত আপনজন।

আর একটি ধর্ম সম্মেলনের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এটা হলো, দ্বিতীয় বিশ্ব হিন্দুধর্ম সম্মেলন। এই বিশ্ব হিন্দুধর্ম সম্মেলন আগামী জানুয়ারী মাসে প্রয়াগে তথা এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের প্রায় আশিটি বিভিন্ন দেশ থেকে পঞ্চাশ হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠন সেক্রেটারী বলেছেন, বাংলাদেশের হিন্দু অধিবাসীর দুরবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মনোযোগ ও বিবেচনা জাগ্রত করবার জন্য আলোচনা হবে। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী সার শিবসাগর রামগোলাম, নেপালের মহা-রাজাধিরাজ বীরেন্দ্র, দলাই লামা এবং শ্রীমোরারজী দেশাই এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। আশা করা যাচ্ছে, তাইল্যান্ডের নৃপতিও সম্মেলনে যোগদান করবেন। পরিষদের সংগঠন সেক্রেটারী প্রসঙ্গত আরও যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, সেটা সম্মেলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অবশ্যই সাহায্য করবে। বিশ্বের তেইশটি দেশে পরিষদের প্রায় তিন হাজার শাখা-প্রতিষ্ঠান আছে। এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা হলো তিন কোটি।

বলা বাহুল্য, এটা ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশের ভারতীয়দের জনসংখ্যার হিসাব নয়, যেটা নিতান্ত রাজনীতিক বিষয়ের তথ্য বলে বিবেচিত হবে। এবং স্বাধীন ভারতের একত্রিশ বছরের সরকারী চিন্তারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর হিসাব করলে দেখা যাবে যে, বহির্ভারতের এই তিন কোটি হিন্দুর হিন্দু-পরিচয়ের বিপদ-আপদ সম্পর্কে সরকার কোন কৌতূহল প্রকাশ করবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

বিশ্ব হিন্দুধর্ম সম্মেলনের প্রসঙ্গে কোন নতুন কথা বলবার আগে একটি পুরনো কথা স্মরণ করতে হয়। হিন্দুধর্ম বলতে ঠিক কী বোঝায়, এই প্রশ্নের কোন সমগ্র-সার্থক তাত্ত্বিক সদুত্তর হতে পারে না। বহু-বিচিত্রতা হিন্দুর ধর্মসংস্কারের একটি বৈশিষ্ট্য। অতীতের ভারতীয় হিন্দু মহাসভা হিন্দুধর্মের পরিচায়ক যে সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ ছিল যে, ভারতে উদ্ভূত হয়েছে এরকম যে-কোন ধর্মই (জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য সমাজ, বৌদ্ধ) হলো হিন্দুধর্ম। একদা হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ভিক্ষু উত্তম, বর্মাবাসী বৌদ্ধ। ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ শাসকের রাজনীতিক অভিসন্ধির সহযোগী হয়ে ভারতের বহু জননেতা হিন্দুধর্মের এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলিত করেছিলেন। সেই ব্রিটিশের চোখে হিন্দু-ঐক্য এবং হিন্দু-ধর্মের উদারমাত্রিক পরিচয়, দুই-ই ছিল দুই প্রবল বিদ্বেষের আস্পদ। ভারতে অনুষ্ঠিত এই দুই ধর্ম-সম্মেলনকে জনজীবনের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক সৌষ্ঠবের অপঘাত বলে ধারণা করবার কোন অর্থ হয় না। বলা বাহুল্য, বিশ্ব হিন্দুধর্ম সম্মেলনে অন্য কোন ধর্মের (যার উদ্ভব ভিন্ন দেশে) নিন্দাবাদ নিনাদিত হবে না। বৌদ্ধ সম্মেলনও হিন্দুধর্মের প্রতি কোন ভ্রূকুটি প্রদর্শিত করবার সম্মেলনে পরিণত হবে না। ভারতীয় সংবিধানের 'কম্পোজিট' সংস্কৃতির নির্দেশ অনুযায়ী উভয় ধর্ম জনজীবনের সকলেরই শ্রদ্ধার আস্পদ। আম্বেদকারী বৌদ্ধগণ বুদ্ধবাণীকে মনে-প্রাণে ভালবাসুন, কিন্তু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পঙ্ক নিক্ষেপ করবেন না, এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের কাম্য। কয়েক বছর আগে বর্মার প্রধান বিচারপতি এই আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন যে, সমগ্র ভারতীয় জাতিকে বৌদ্ধে পরিণত করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের আদর্শের ঘোষণা ধর্মে-ধর্মে এবং দেশে-দেশে অপ্রীতির একটি প্রধান প্ররোচনা।

সোভিয়েট
রাশিয়া
চীন

অরবিন্দের
ধুতির বৈশিষ্ট্য
স্নিগ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিমল লাবণ্য
সূতীবস্ত্র ও পলিয়েস্টার,
এর সংগে মানানসই অরবিন্দ
লন-এর তৈরী কুর্ত্তা—
সুশোভন মহিমা।
উৎকৃষ্টতা...
অরবিন্দ
...অনুসন্ধান জাত

॥ ৭১ ॥

১৯৭৮-এর বন্যা নিয়ে সকলেই যেন একটু বিভ্রান্ত হয়েছেন। এর আগেও বিধ্বংসী বন্যা, প্লাবন কয়েকবারই হয়েছে। কিন্তু তখন সরকার এত দিশাহারা হননি আর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও এমন নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়নি। ১৯৬৮-তে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রলয় ঘটেছিল। পাহাড়ে ধস নামা, বিভিন্ন পাহাড়ে নদীতে প্লাবন ও বন্যা ভীষণ ক্ষতি করেছিল। অবশ্য তখন রাজ্যপালের শাসন। ১৯৫৯-এ প্রবল বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলা বিধ্বস্ত হয়। তখন ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা। এর কোনবারই প্রশাসন এবারের মত নিশ্চল হয়নি। একটা কারণ অবশ্য আছে। সেটা এবারের বন্যার আকস্মিকতা। তা হলেও নিষ্ক্রিয়তার কোনও মানে হয় না। কারণ, যেসব জায়গা বন্যাবিধ্বস্ত হয়েছে তার অধিকাংশ জায়গাই পূর্বে বন্যার তান্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছে।

যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে গঙ্গায় জলোচ্ছ্বাস হলেই মালদার কিছু গ্রাম বন্যাগ্রস্ত হয়। আর গঙ্গায় বানের জন্য যদি বিহার বিপর্যস্ত হয়, তাহলে তার ভারতের ছাব খুব ভয়াবহ। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি জেলার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। উপর থেকে যত জল নামবে তা যখন মেঘনা, পদ্মা দিয়ে নিকাশি পাবে না তখন সেই জলস্রোত প্রথম ধাক্কা দেবে মালদা জেলায় ও মুর্শিদাবাদের খানিকটা অঞ্চলে। তারপর একমাত্র নিকাশি ভাগীরথী। বর্ষায় ভাগীরথী ভরাতি। আর ভাগীরথীতে এখন গভীরতাও নেই। এবং হুগলী জেলার ওপরে কলকাতা থেকে নৌকো করে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে যাওয়াও যায় না। ভাগীরথী আয়তনে চওড়া হয়েছে বটে কিন্তু এর গভীরতা একেবারেই নেই। সেইজন্যই গঙ্গার ঐ বিপুল জলস্রোত যখন ভাগীরথীর উপর এসে পড়ে তখন বিপর্যয় দেখা দেয়। বোজা ভাগীরথী ঐ জল ধারণ করতে পারে না। ফলে ভাগীরথী যে কূলে সুবিধে পায়, বন্যার জল সেদিকে গড়িয়ে গিয়ে গ্রাম, জনপদ সব বিধ্বস্ত করে। মনে রাখতে হবে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের লোকেরা গ্রীষ্মকালে হেঁটে ভাগীরথী পারাপার করেন। উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর জল নিয়ে স্ফীতকায় হয়ে গঙ্গা দৌড়ে আসে, আবার বিহারে এসেও অনেক নদীর জল পায়। ফলে নিম্ন অঞ্চলের অধিবাসীদেরই দুর্দশার অন্ত থাকে না।

মুর্শিদাবাদে বহু খাল, বিল ছিল। সেই সব খালবিলের অধিকাংশই এখন মজা। নাব্যতা তো নেই-ই, অধিকাংশ জায়গাতেই খালবিলগুলো চাষের জমি হয়ে গেছে। কোন এক সুদূর অতীতে কতগুলি দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার যেখানে গঙ্গার জল ভাগীরথী দিয়ে নিকাশ হচ্ছে সেইখানকার ভাগীরথীর দুই ধার কুড়ি মাইল অবধি তামার পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দুই ধারের মাটির অবক্ষয় বিশেষ ঘটতে পারতো না। প্রথম মহা বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তামার পাত খুলে নেওয়া হয়। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—এই ১৯৭৮ সালে বন্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছে ধূলিয়ান নদীগর্ভে। আমাদের কোনও পরিকল্পনাই সার্থকভাবে রূপায়িত হয় না। সেইজন্য শুরুতে যা থাকে, শেষ অবধি দেখা যায় তার অনেক কাজ বাকী আছে। গঙ্গায় জল বাড়লেই মালদার খানিকটা অঞ্চল বিপন্ন হয়। এ ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত স্বাধীন ভারতবর্ষে এর কোনও সুরাহা এখনও হয়নি। ১৯৭৮ সালে এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা অনুভব করছি। প্রত্যেকবার বান আসবার সময়েই শোনা যায়—যাতে ভবিষ্যতে আর জনসাধারণ এইভাবে বন্যা-ক্লিষ্ট না হন, তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বন্যা
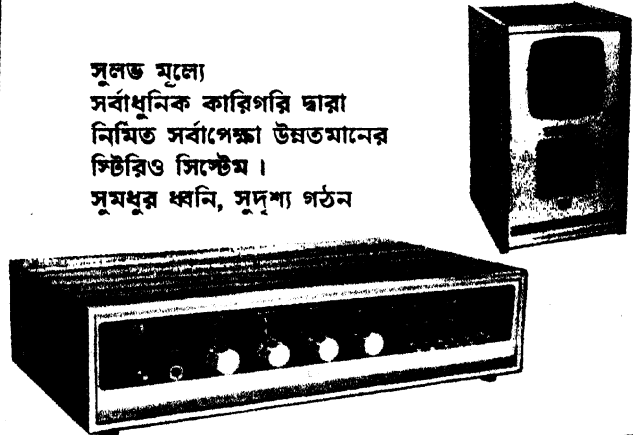
যে, বন্যার একটা সুফলও আছে, অনেক পলি পড়ে। কথাটা ঠিকই। পলি পড়ে যেমন অনেক জমির উন্নতি হয়, তেমনি বালি পড়ে অনেক জমি পতিত হয়। মাপজোক করলে দেখা যাবে যে, বালি পড়ে পতিত জমির অনুপাত পলি-পড়া জমির চেয়ে ঢের বশী। এর আরও একটা দিক আছে। সেটা মানবিক। স্বাধীন দেশের শাসনক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁদের মানবিক দিক উপেক্ষা করা চলে না। বন্যার তান্ডবে যদি ঘর-বাড়ি গরু-লাঙল তৈজসপত্র সবই ধ্বংস হয়, তা হলে পলি-পড়া জমির সদ্ব্যবহার কে করবে? মনে রাখতে হবে যে, বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলের মানুষ সত্যিই সর্বস্বান্ত হয়। নতুন করে প্রত্যেক পরিবারকেই আবার জীবন আরম্ভ করতে হয়। ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনার সঙ্গে ভাগীরথীর নাব্যতা একান্তভাবে যুক্ত। অর্থাৎ ভাগীরথী যদি আর খানিকটা গভীর হয়, তা হলে গঙ্গার যে পরিমাণ জল ভাগীরথী এখন গ্রহণ করতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশী জল ধারণ করার ক্ষমতা তার হবে। মালদা জেলার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থার পরিকল্পনা আছে। গঙ্গা দিয়ে বানের জল এলেই মানিকচক থানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ভালুকা দিয়ে জলস্রোত এসে হরিশচন্দ্রপুরকেও বিপর্যস্ত করে। আমি কিছু নতুন পুনরাবৃত্তি ঘটছে—এই আমার প্রশ্ন।

গঙ্গা এবং ভাগীরথীর কথা এতক্ষণ বলেছি। এবার দামোদর ও সংশ্লিষ্ট নদীগুলি বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরে কি বিপর্যয় টেনে আনে সে কথা বলবো অনেক বছর ধরেই দামোদরের ধ্বংসলীলা চলে এসেছে। বর্ধমান জেলা দিয়ে এসে দামোদর যেখানে হুগলী জেলায় প্রবেশ করছে, তার কিছু আগে বর্ধমান জেলাতেই এক 'হানা' পড়ে। নদী যেখানে বাঁধ ভেঙে দিয়ে নতুন পথ করে নেয়, তাকেই 'হানা' বলে। হানাটির নাম 'বেগোর হানা' এই বেগোর হানা দিয়ে জল এসে বেশোর খালে পড়ে। বেশোর খালই পরে মুন্ডেশ্বরী ও হুড়হুড়ে-র খাল বলে অভিহিত হয়। কালে দামোদরের আসল জলস্রোত সবই এই বেশোর খাল, মুন্ডেশ্বরী, হুড়হুড়ে হয়ে হুগলী জেলার খানাকুল থানার নতীবপুর ও শাবলসিংপুরের মধ্য দিয়ে এক বিশাল জলরাশিতে পরিণত হয়। এই মুন্ডেশ্বরী প্রবাহিত হয় আরামবাগ থানা ও পুড়শুড়ো থানার মধ্য দিয়ে। আরামবাগ থানার আর এক দিক দিয়ে দ্বারকেশ্বর আসে—যার ওপর আরামবাগ শহর। খানাকুল থানার ঠাকুরণচক গ্রামে এই দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মেলে ঝুমঝুমি নামে একটি মাঠের জলনিকাশী নদী। এই যুক্ত শিলাবতী। এই শিলাবতীর উপরেই ঘাটা শহর। এই রূপনারায়ণে মুন্ডেশ্বরী হুড়হুড়ের জল অর্থাৎ দামোদরের প্রধান জল রাশি এসে মিলিত হয়। ফলে বরাব জায়গাটা বর্ষাকালে সমুদ্রের মত মনে হত। এ বিশাল জলরাশি নিকাশের একমাত্র পথ ছি রূপনারায়ণের মধ্য দিয়ে। এবং সেই জল প্র বাধা পেত আগেকার বি এন আর-এর বাঁধে এখন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের বাঁধ। এখ আরও দুটি ব্রীজ হয়েছে। বোম্বে রোডে ব্রীজ এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের আর একটি ব্রীজ। অর্থাৎ ব্রীজের এই স্বল্প পরিস নিকাশি দিয়ে এই বিশাল জলরাশি বেরোতে পারতো না। তার ফলে হাওড়া জেলার আমত প্রভৃতি অঞ্চল, মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুম এবং হুগলী জেলার গোঘাটা থানা বাদ দিয়ে সমগ্র আরামবাগ মহকুমা বছরে চার থেকে পাঁচ মাস জলবন্দী অবস্থায় থাকত। ঘাটাল শহরটি দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, এক একটি বাড়ি যেন এক-একটি দ্বীপ। বর্ষাকালে সবটাই জলে ভরতি হয়ে থাকত ঠিক অনুরূপ অবস্থা ছিল হুগলী জেলার খানাকুল থানা, পুড়শুড়ো থানা এবং আরামবাগ থানার অধিকাংশ জায়গা। পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সে

...রে তিন-চার মাস নৌকো ছাড়া যাওয়া যেত ... এইটি মনে রাখা দরকার, চাঁপাডাঙ্গা বা ...নানে যে দামোদর আমরা দেখি সে দামোদর ...রা দেখি 'বেগোর হানা' হবার আগেকার ...মাদর। বর্তমানে এই দামোদরের সঙ্গে মূল ...মোদরের জলস্রোতের কোনও সম্পর্ক নেই। ... জলস্রোত মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতিতে গিয়ে ...নারায়ণের জলরাশিকে বাড়ায়। মেদিনী-...রে আর এক দিক দিয়ে বিপদ আসে—...াবতী নদী মারফত। যখন কংসাবতী ...রেজ হয়, তখন ঠিক ছিল কংসাবতী, কুমারী ...শিলাবতী এই তিনটে নিয়ে হবে কংসাবতী ...রিকল্পনা। এ পরিকল্পনাকেও পূর্ণ রূপ ...ওয়া হয় নি। ফলে কংসাবতীও শিলাবতীর ... মাঝে মাঝে আশপাশের গ্রাম ও জনপদ-...লি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। অবশ্য চাপ ...টা আসে দামোদর ও দ্বারকেশ্বরের জল-...শির মাধ্যমে, এরা ততটা ধ্বংসলীলা সাধন ...তে পারে না।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা যখন হয় ...খন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি:

(১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

(২) চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা। এবং ...র্গাপুর ব্যারেজ থেকে যে খাল বেরিয়ে ...সেছে, তার ভাগীরথী অবধি নাব্যতা।

কোনার ও অন্যান্য যেসব ছোটখাটো ছোট-নাগপুরের পার্বত্য নদী আছে, যা দামোদরের মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলা চালায়, তার জলরাশিকে আটটা ড্যামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথম পর্যায়ে ছিল চারটি ড্যাম। কোনার, তিলায়া, মাইথন ও পাঁচেট। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল বলপাহাড়ী প্রভৃতি আরও চারটি ড্যাম। প্রথম চারটি ড্যাম হয়েছে। তার বন্যানিয়ন্ত্রণজনিত আংশিক সুফলও পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুরের যেসব অঞ্চল বন্যার জলে ডুবে থাকত সেসব জায়গায় এখন চাষ হয় এবং সাধারণত বন্যা কবলমুক্ত বলা যায়। বিপদ হয় যখন ছোটনাগপুর অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে দামোদর দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। তখন আর ঐ চারটি ড্যাম দামোদর প্রভৃতি নদীর জলরাশি ধারণ করতে পারে না। ফলে দুর্গাপুরে ব্যারেজের জল সময়ে এবং অসময়ে ছেড়ে দিতে হয় ব্যারেজকে রক্ষা করবার জন্য। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে যেসব জায়গা reclaimed হয়েছে, সেসব জায়গা আবার বানে ডুবে যায়। জলরাশিকে তো পথ দিতেই হবে। যখন বন্যার বিশাল জলস্রোত নির্দিষ্ট পথ দিয়ে নিকাশ হতে পারে না, তখন সে নিজের পথ নিজে করে নেয়। ঠাকুরবাড়ি,

নিয়ে যায়। যখনই দামোদরে বন্যা হয়, তখনই দামোদরের যে চারটি বাঁধ এখনও তৈরি হয়নি সেগুলির কথা ওঠে, তারপরই আবার সব চুপচাপ। এই হলো মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের বন্যার মৌলিক কাহিনী। বর্তমানে অ্যাসেম্বলীতে ঘোরতর বাগযুদ্ধ হচ্ছে। সরকার পক্ষের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের উপর দায়িত্ব এবং কর্তব্য ন্যস্ত আছে। কেবলমাত্র বাগাড়ম্বরে সে দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় খুব উদ্বিগ্ন। পনরো হাজার লোক মরেছে—এ কথা কে বলেছে এবং কেন? তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। অস্বাভাবিক-ভাবে যদি পাঁচজন অথবা পঁচিশজন মরে, তাঁর দায়িত্ব একটুও কমে না। সাধারণ নাগরিকের কাছে সংখ্যার দায়িত্ব বেশী; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সাধারণ নাগরিকের থেকে বেশী। যতদিন দামোদর পরিকল্পনা পূর্ণ রূপায়িত না হবে অর্থাৎ যতদিন না ঐ আটটি বাঁধ সম্পূর্ণ তৈরী হবে ততদিন পশ্চিমবঙ্গের বন্যাজনিত সমস্যার সমাধান হবে না। মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া—তার কাহিনী অন্য। তারও বিশদ আলোচনা ও সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এ সমস্যা গঙ্গার অববাহিকার সমস্যা।

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ২৬ ॥

দাদার কথা ? দাদার কথা তো গত বছর সবিস্তারে আনন্দবাজারে লিখেছি। এবং অনেকেই হয়তো সেটা পড়েছেন। তবুও অল্প কথায় দাদার আসল ব্যাপারগুলো বলার চেষ্টা করছি। এই বাংলা দেশে অবশ্য দাদার মাহাত্ম্যের গুণগান না করলেও চলে। কে না জানে ওঁকে, ওঁর কাজ ! কিন্তু যত্ন এবং সংরক্ষণের অভাবে বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মানুষ কতখানিই বা জানছে, চর্চা করছে দাদার কাজ ? এটা বড়ই দুঃখের কথা। ভারতীয় নাচে ব্যালের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে উনি যে কত বড় একজন পথপ্রদর্শকের কাজ করে গেছেন তা বোঝানোই মুশকিল। কিন্তু তার তো কোনও হিসেবনিকেশ হল না। সেটাই এখন দরকার আমাদের।

প্রথমেই বলি আমি নিজে তাঁর কাছে কত ঋণী। ওঁকে আমি গুরু বলে চিরদিন স্বীকার করে এসেছি। জীবন, ভালবাসা এবং শিল্প—এই তিনটে বিষয়কে সাধনা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এক সুরে বাঁধার ঢঙটা আমি ওঁর থেকেই শিখেছি। ওঁর জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়টায় মনে হত যেন ঈশ্বর সব কিছু ওঁকে উজাড় করে দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে তখন ওঁর ভক্ত এবং অনুরাগীরা ওঁকে এক দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছিল। তখনও এবং চিরদিনই কিন্তু ওঁকে দেখেছি মাটির সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা অটুট রেখেছেন। উন্নাসিকের দল যে যাই বলুক, একটা কথা তো মানতেই হয় যে, ভারতের নানান ধরনের আঞ্চলিক কৃষ্টি থেকে আহরণ করে উদয়শঙ্কর তাতে তাঁর নিজস্ব জিনিয়াসের ছোঁয়া দিয়ে এক অসামান্য রসের নাচ সৃষ্টি করে গেছেন। যেমন একটা উদাহরণ দিই—ইলোরার একটা ভঙ্গী। সেই এক-একটা ভঙ্গী থেকেই দাদা এক-একটা সম্পূর্ণ মুভমেণ্ট রচনা করলেন। যেসব মুভমেণ্ট অন্য পাঁচটা লোকের সুদূর কল্পনাতেও আসতে পারে না।

অনেকের আবার একটা ভুল ধারণা আছে যে, উনি আনা পাভলোভার কাছে নাচ শিখেছিলেন, এবং তাঁর প্রভাবে ওঁর নিজের নাচেও পাশ্চাত্যের প্রভাব এসেছে। এটা খুবই ভুল কথা। আসল কথা কি জানো ! উনি যেটা নিয়েছিলেন সেটা হলো পাশ্চাত্য ব্যালের পরিবেষণা এবং শোম্যানশিপ। কতখানি দেওয়া উচিত, এবং কিভাবে—এই পরিমিতিবোধ ওঁর পাশ্চাত্যের কাছ থেকে পাওয়া। এ ছাড়া আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বিষয়গুলোতেও বাইরে থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। এসব কিন্তু ওঁর আগে আমাদের নাচে ছিল না। তবে নিছক নাচের কথা যদি বল, আমি এক শ'বার বলব যে, উদয়শঙ্কর ষোল আনা ভারতীয়।

সংগীতের ক্ষেত্রেও আমি বলব, উদয়শঙ্কর এক ধরনের পথপ্রদর্শক। একটা অদ্ভুত গান-বাজনার বোধশক্তি তো ওঁর ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল এক ধরনের 'গোঁড়ামি'ও ! কেন বলছি, শোনো। কোনও একটা বিদেশী যন্ত্র উনি জীবনের শেষ অবধি ওঁর কাজে ব্যবহার করতে দেননি। সারা ভারত ঘুরে উনি যোগাড় করেছিলেন কতরকম classical এবং folk instruments। উপরন্তু ওঁর একটা বড় সংগ্রহ ছিল জাভা এবং বালির গ্যামেলং এবং গং বাদ্যের। ব্রহ্মদেশেরও অনেক যন্ত্র উনি আনিয়েছিলেন। উনি এগুলোকে বিদেশী যন্ত্র বলে মনে করতেন না। ওঁর থিওরি ছিল যে, বহু যুগ আগে এসব দেশের নৃত্য এবং সংগীত ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কাজেই বুঝতে পারছ যে, উনি সেতার, বাঁশি, সরোদ, এস্রাজ, সারেঙ্গা, একতারা, খমক, খঞ্জনি, তানপুরা এবং বিভিন্ন গ্যামেলং, গং এবং নানান ধাঁচের ড্রাম দিয়ে একটা একান্ত নিজস্ব শব্দঝংকার সৃষ্টি করেছিলেন। এই ঝংকার, এই শব্দ, এই আওয়াজ ওঁর একে-

পাশ্চাত্যের নৃত্যশিল্প থেকে উদয়শঙ্কর পেয়েছিলেন তাঁর পরিমিতিজ্ঞান। তবে নিছক নাচের কথা যদি তোলা হয় তো আমি এক শ'বার বলব যে, উদয়শঙ্কর ষোল আনা ভারতীয়। ওপরের ছবিতে দাদাকে দেখা যাচ্ছে ওঁর ট্রুপের সঙ্গে বিলেতে। দাদার এক পাশে বাচ্চা আমি দাঁড়িয়ে আছি। আর এক পাশে সিমকি।

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

সাধারণতঃ রঙ ময়লা হয় কি করে

বছরের পর বছর সাধারণতঃ আপনার রঙ একটু একটু করে ময়লা হতে থাকে। আর তাহয় দুভাবে: ভেতরের ও বাইরের প্রক্রিয়ায়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেল্যানিন নামে একটি শরীর রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু লোকের শরীরে অন্যদের তুলনায় বেশী ছড়িয়ে পড়ে। আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, রঙ তত ময়লা দেখায়। তাছাড়া, আপনি যতবার বাড়ীর বাইরে যান সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে, ফলে মেল্যানিন বেশী করে ছড়াতে থাকে আর আপনার রঙও হতে থাকে আরো বেশী ময়লা।

রঙ ফর্সা করার প্রচলিত উপায়

শত শত বছর ধরে ত্বকের রঙরূপের উন্নতির জন্যে মহিলারা রকমারি উপায় অবলম্বন করে এসেছেন। বেসন, দুধের সর, পাতিলেবু আর গ্লিসারিন, এমনকি শশার রস পর্য্যন্ত! এগুলি সম্ভবতঃ আপনার ত্বকের উন্নতি করে—ত্বক নরম করে, কিন্তু এসব দিয়ে কি সত্যিই রঙ ফর্সা হয়?

অপর পক্ষে আছে—ব্লীচ করার উপাদান। এগুলি যে ত্বকের কত ক্ষতি করে তা আপনাকে বলে দিতে হবে না। আচ্ছা, কোনো দামী আর নরম কাপড় কি আপনি ব্লীচ করবেন? আপনার ত্বকও তো কম দামী আর কোমল নয়!

আবিষ্কার! ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর রঙ ফর্সা করার প্রণালী—প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার—যা পৃথিবীতে এই প্রথম, প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে! আপনার ত্বকের ভেতরে কাজ করে এর 'ভিটামিন ক্রিয়া'। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীতে একটি ভিটামিন আছে, যা ক্রীম মাখবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বকে প্রবেশ করে। মেল্যানিনের বিস্তার রোধ করবার জন্যে এই ভিটামিন স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে, ফলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হয়ে ওঠে, যা নজরে পড়ে! এই ভিটামিনটির ক্রিয়া আর ফর্সা-ত্বক ওয়ালা লোকের ত্বকের ভেতরের মেল্যানিন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে প্রকৃতির যে [illegible] গেলে একই রকমের। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ছেঁকে বাদ দেয়। এইভাবে আপনার ত্বক রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, অথচ সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে।

৬ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মাখুন, তারপর দেখুন কি তফাৎ!

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল নিজে চোখে দেখা। ছ'সপ্তাহ নিয়মিত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী ব্যবহার করুন। তফাৎ নিশ্চয়ই নজরে পড়বে আপনার! অন্যদেরও! হাজার হোক, এটি প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে। আর সেইজন্যেই তো আপনার ত্বকে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কাজ এত সহজে হয়!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী রঙ ফর্সা করার ক্রীম তো বটেই...আরো কিছু

আপনি উপভোগ করবেন ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কোমল স্পর্শ আর মনোরম সুগন্ধ! দিনে অন্ততঃ একবার ব্যবহার করুন, সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে দুবার! নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হবে, যা নজরে পড়বে, আর প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে ঐ রকমই থাকবে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী
ফর্সা হবার এক কোমল উপায়

লিনটাস-FALOV.8-2418 BG (R)

দেখেছেন, তাঁরা কি কখনও ভুলতে পারবেন উদয়শঙ্করের 'ইন্দ্রনৃত্য', 'গন্ধর্ব', 'সাপুড়ে',—তারপর সিমকির সঙ্গে 'রাধাকৃষ্ণ নৃত্য', 'তলোয়ার নৃত্য' এবং ব্যালে হিসেবে 'শিবপার্বতী', 'লেবার অ্যান্ড মেশিনারী', 'রিদম অব লাইফ' ইত্যাদি ?

আলমোড়া কালচার সেন্টার দুর্ভাগ্যবশত আর্থিক কারণে টিঁকল না। তুমি ভাবতে পারবে না শংকর, কি একখানা জিনিস উনি গড়ে তুলেছিলেন ! পাহাড়ের একটা উপত্যকা জুড়ে এই সেন্টার ছিল। সেখানে ওঁকে ছাড়াও ছিল বাঘা বাঘা চারজন গুরু। কথাকলির জন্য গুরু শঙ্করন নামবুদরি, ভরতনাট্যমের জন্য কন্দপ্পন পিল্লেই (বালাসরস্বতীর গুরু), মণিপুরীর জন্য গুরু অমোবি সিংহ এবং সংগীতের জন্য বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। ভাবো দেখি কি চূড়ামণি-যোগ ! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এটা বছর চারেকের বেশী চলল না। চললে হয়তো এতদিনে ভারতবর্ষের নাচগানে একটা নতুন দিক খুলে যেত।

এর পর দাদার বিরাট দান হল গিয়ে শ্যাডো প্লে। সাদা পর্দার ওপর ওঁর নিজস্ব টেকনিকে একটা নতুন আলোছায়ার ধারার সৃষ্টি করে গেলেন। কিন্তু যেটুকু জিনিস হয়তো থেকে যাবে ভবিষ্যতের জন্য এবং যার মাধ্যমে লোকে ওঁর মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানতে পারবে তা হল ওঁর চলচ্চিত্র 'কল্পনা'। তুমি এখনও দেখবে নাচগান কি সিনেমা মহলে অনেকেই দাদার বিভিন্ন সৃষ্টির দ্বারা প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবান্বিত। তাঁদের মধ্যে আমি নিজে একজন।

এবার একটু অন্য কথায় যাচ্ছি, কেমন ! ১৯৫৬ সাল থেকে যখন আমি ইউরোপ ও আমেরিকায় যাওয়া শুরু করলাম তখন লক্ষ করলাম কি দারুণ আগ্রহ সেখানে আমাদের সংগীতের ব্যাপারে। অবশ্য ছেলেবেলায় দাদার ট্রুপে থাকতেও এই জিনিসটা দেখেছিলাম। কিন্তু তখন যে দর্শক এবং শ্রোতা ছিল তারা আসত প্রধানত নাচ দেখতে, সংগীতটা ছিল সেকেনডারি। '৬৫ সাল অবধি প্রায় ১০ বছর ধরে ক্রমাগত বাইরে ট্যুর করে ও বাজিয়ে দারুণ নামযশ হল আমার—ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতিনিধি হিসেবে। লনডন, প্যারিস, বার্লিন, শিকাগো, সিডনি—প্রায় সমস্ত বড় বড় জায়গাতেই আমার আসর বসছে তখন। নামও ছড়াচ্ছিল ভালমতনই। লোকেরা বিদেশে মেনে নিচ্ছিল আমাকে এ-দেশের সংগীতের মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে। আমার বাজনা হচ্ছিল সেইসব হলেই, যেখানে বাজিয়েছেন ইহুদি মেনুহিন, 'ডেভিড অয়েস্ট্রাখ, কি যশস্বী আন্দ্রে সেগোভিয়া। বেহালাবাদক হিসেবে মেনুহিন কি অয়েস্ট্রাখ কিংবা স্প্যানিশ গীটারে সেগোভিয়ার তুলনা কোথায় পাবে ? এবং এই সময়েই মেনুহিনের সঙ্গে আমার বহু দিনের পুরনো বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়ে গেল। কয়েকটা রাগাশ্রয়ী রচনাও করলাম মেনুহিনের বেহালার জন্য। পরে ইউরোপের কয়েকটা নামজাদা ফেস্টিভ্যালে আমরা বাজালাম একসঙ্গে। আমাদের প্রথম রেকর্ড—'ওয়েস্ট

জর্জ হ্যারিসন আমার শিষ্য হওয়ায় একই সঙ্গে আমার ভাল এবং খারাপ দুটোই হল। ভাল হল এই যে, আমার জগৎজোড়া খ্যাতি হল, সারা দুনিয়ার যুবসমাজের কাছে আমি রাতারাতি পৌঁছে গেলাম। খারাপটা হল যে, অনেকের ধারণা হল, বিশেষ করে এই দেশে যে, আমিও বুঝি বীটলদের একজন হয়ে গেছি। আমি যেন হিপি এবং ড্রাগ কালচারের মাধ্যমে নিজের সংগীত এবং সত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিলেতের এক আসরে আল্লা রাখা, আলি আকবর, বিসমিল্লা এবং আমার সঙ্গে জর্জ হ্যারিসন।

উন্নাসিকের দল যে যাই বলুক, একটা কথা তো মানতেই হয় যে, ভারতের নানান ধরনের আঞ্চলিক কৃষ্টি থেকে আহরণ করে উদয়শঙ্কর তাতে তাঁর নিজস্ব জিনিয়াসের ছোঁয়া দিয়ে এক অসামান্য রসের নাচ সৃষ্টি করে গেছেন। উপরের ছবিতে বৃদ্ধ দাদার এক পাশে আমি, আর এক পাশে কমলা।

মিট্‌স্‌ ইস্ট'-এর প্রথম ভল্যুমটা তো গ্র্যামি পুরস্কারই পেয়ে গেল। যে পুরস্কার হল গিয়ে রেকর্ডের দুনিয়ায় সিনেমার অস্কার পুরস্কারের সমতুল্য। এর পর আমরা 'ওয়েস্ট মিট্‌স্‌ ইস্ট'-এর আরও দুটো ভল্যুম করেছিলাম। প্রথম দিকের এই রেকর্ডগুলো শুনে আমাদের এখানে অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন যে, মেনুহিনের বাজনাতে দিশী রাগ বাজাবার ভাবটা পুরো ফুটে ওঠে না। কিন্তু তারা একটা জিনিস খেয়ালই করলেন না যে, ওঁদের বেহালা বাজাবার

আসল ফরাসী
সৌরভের
মত অনুপম
Lakme
তরতাজা ভাব..
নিদাগ, নিখুঁত !
ল্যাক্‌মে
ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্ক
Lakme
ল্যাক্‌মে
ল্যাক্‌মে
ভ্যানিশিং ক্রীম
L
Lakmé
ল্যাক্‌মে
daCunha/L-VC/LT/3 h Ben.

দাদা উদয়শঙ্করের সঙ্গে আমরা আরও তিন ভাই। বাঁ দিক থেকে দাদা, আমি, রাজেন্দ্র এবং দেবেন্দ্র। ছবিটা ১৯৪৮ কি '৪৯ সালের।

কায়দাটাই পুরো আলাদা। আমাদের শ্রুতি, আন্দোলন, মিড়, গমক ইত্যাদির ব্যবহার ওঁদের সংগীতে তো নেই। কাজেই ওঁর পক্ষে রাগের ভেতরে এইগুলো ফুটিয়ে তোলা দুরূহ ছিল। কিন্তু বলিহারি ওঁর শেখবার শখ, এবং আমাদের গান-বাজনার ওপর ভালবাসা। তুমি দেখবে যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভল্যুমে উনি এধার দিয়ে কতখানি এগিয়ে গেছেন। এই ব্যাপারে আমার মনে এল উনি যখন প্রথম মাদরাজে এম এস গোপালকৃষ্ণকে শুনলেন তখন বেহালাবাদনের, পাশ্চাত্ত্যের বেহালাযন্ত্র বাজাবার একটা ভারতীয় টেক্‌নিক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে ওঁকে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, খাঁটি বিলিতী ঢঙের বেহালা ধরার যে upright position, দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে, সেটা পালন না করে ভারতীয়রা যেভাবে মাটিতে বসে বেহালার মাথাটা পায়ে ঠেকিয়ে বাজায়, সেটা কি ঠিক? তার উত্তরে উনি বলেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য সংগীতে বেহালা বাজাবার যে টেক্‌নিক তার জন্য ঐ upright positionই সম্যক। কিন্তু ভারতীয় সংগীতে যেখানে নাকি খাড়া খাড়া সুরের ব্যবহার নেই, যেখানে এত মিড় এবং গমকের প্রয়োগ, সেখানে বসে ঐ প্রথায় বাজানোই একমাত্র পথ।

তারপর '৬৬ সাল থেকে শুরু হল আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। দুম্ করে হঠাৎ সুপারস্টারডম পেয়ে গেলাম। সারা দুনিয়ার যুবসমাজের কাছে একটা 'গুরু' বনে গেলাম রাতারাতি। এবং সেটা ঘটে গেল যেহেতু অন্যতম বীটল জর্জ হ্যারিসন আমার শিষ্য হয়ে বসল। এতে আমার ভাল তো হয়েই-ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু খারাপও হল। অনেকের ধারণা হল, বিশেষ করে এই দেশে যে, আমিও বুঝি বীটলদেরই একজন হয়ে গেলাম। আমি যেন হিপি এবং ড্রাগ কালচারের মাধ্যমে নিজের সংগীত এবং সত্তাকে জলাঞ্জলি দিলাম। কিন্তু কি জানো শঙ্কর, হয়েছিল ঠিক এর উলটোটাই। ভাবতে পারবে না ক'টা বছর আমি কি জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়েছি! এক দিকে রাগদারীরা যেমন আমাকে হেয় চোখে দেখেছে, তেমনি অপর দিকে আমাকে সমানে যুঝতে হয়েছে আমার জগৎজোড়া যুব ভক্তদের সঙ্গে। তারা তাদের এক দেবতা জর্জ হ্যারিসনের গুরু বলে আমার কাছে ভালবাসা নিয়ে ছুটে এসেছিল। কিন্তু ওদের অপরিণত চিন্তাধারায় ওরা ধরেই নিয়েছিল যে, ভারতীয় সংগীত শুনতে গেলেও রক অ্যান্ড রোল কি পপের মনোভাব নিয়ে গেলেই চলে। অর্থাৎ এল-এস-ডি, গাঁজা, হাসিস, মারুয়ানা—এইসব নেশা করে, একটা তুরীয় অবস্থায় পৌঁছে নাকি ভারতীয় সংগীত শোনা উচিত। আর সেটা তো ছিল হিপিদের, ফ্লাওয়ার চিলড্রেনদের আন্দোলনের গোড়ার দিক। আর এই মনোভাবের খোরাক যুগিয়েছিলেন টিমথি লিয়ারি, অ্যালান ওয়াট্‌স্ এবং অ্যালান গিন্‌স্‌বার্গ। তাঁরা এই কচি কচি ছেলেমেয়েদের শিখিয়েছিলেন যে, ভারতে নাকি সবাই গাঁজা খায়। এবং এই গাঁজা, এল-এস-ডি ইত্যাদির প্রভাবে না পড়লে নাকি অন্তর্দৃষ্টি খোলে না, এবং সংগীত, যোগসাধনা, ধ্যান,—এমন কি প্রেম করাও ভালভাবে সম্ভব হয় না। কাজেই বুঝতে পারছ বছরের পর বছর ধরে সবখানেই কিভাবে মেহনত করেছি আমি স্রেফ এদের বোঝাতে যে, তাদের এইসব ধারণা এবং বদঅভ্যাস কতখানি ভুল। তবে এখন বছর কয়েক ধরে এসব শুধরে গেছে। এই হুজুগে পড়ে আগে যারা আসত তারা সরে গেছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এইভাবে কেটে পড়েছে। কিন্তু এখনও যারা টিঁকে আছে তারা যথার্থই ভালবাসে আমাদের কৃষ্টি এবং গান-বাজনা। এদের কাছে গাঁজা-ভাঙটা কোনও ব্যাপার না, এরা সত্যিকারের বোঝদার এবং সংগীতপ্রেমী। এতে আমার ভারি আনন্দ। কারণ, আমি আবার ফিরে পেয়েছি আমার সেই আসন এবং সম্মান। যেটা একজন ধ্রুপদী শিল্পীর মূল চাওয়া।

এবার জর্জের কথায় ফিরে যাচ্ছি। জর্জ নিজেও কতকগুলো সময়ের স্তরের ভেতর দিয়ে চলে এসেছে। এখন সে অনেক পরিণত মনের ছেলে। ও আমাকে ভীষণই শ্রদ্ধা করে। ছেলেটি তো অত্যন্ত ভাল। কি চমৎকার মন! এবং ওর প্রতি আমার অসীম স্নেহ। তবে গান-বাজনার ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার একে-বারেই কোনও যোগাযোগ নেই। (ক্রমশ)

হরলিক্‌স

Horlicks

THE IDEAL FOOD DRINK

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যা আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুখাদ্য উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিক্‌স পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিক্‌স ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্‌স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্‌স একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১১ ॥

পাঁচ বৎসর বয়েসে, সরস্বতী পুজোর দিনে নবীনকুমারের হাতেখড়ি হলো। এই উপলক্ষে বেশ ধুমধাম হলো সিংহ সদনে।

বিম্ববতীর পিত্রালয়ের কারুর শিক্ষার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর শ্বশুর স্বামীও বিদ্যাচর্চা না করেও প্রভূত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু বিম্ববতীর দত্তকপুত্র গঙ্গানারায়ণ প্রধানত স্বীয় যত্নে আজ কৃতবিদ্য এবং এই বিদ্যার গুণে সে বিনয়ী, সুশীল ও ধীরস্থির। গঙ্গানারায়ণকে প্রীতি করে না, এমন কেউ নেই। বিম্ববতী পুত্র-গর্বে গর্বিত এবং গঙ্গানারায়ণের চরিত্রের ক্রম পরিণতি দেখেই তিনি বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছেন।

হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে গঙ্গানারায়ণ এখন বিধুশেখরের নির্দেশ মতন পারিবারিক ব্যবসায় ও জমিদারের কাজে শিক্ষিত হচ্ছে। রামকমল সিংহ তো সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, কমলাসুন্দরীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন উত্তরভারত পরিভ্রমণে, গত পাঁচ মাস তাঁর কোনো সংবাদই নেই। যত দূর জানা যায়, তিনি বারানসীতে এক বিশাল প্রাসাদ ভাড়া নিয়ে নৃত্যগীতের আসরে মত্ত হয়ে আছেন।

বিম্ববতী দেখেছেন, কর্তাদের ধারা কিছুই বর্তায়নি গঙ্গানারায়ণের ওপরে। সে সুরা পান করে না। সন্ধ্যার পর জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে গৃহ থেকে নির্গত হয়ে ভোররাত্রে বাড়ি ফেরার যে রীতি গঙ্গানারায়ণ তেমনটি করেনি একদিনও। যথা সময়ে অফিস দেখতে যায় এবং সন্ধ্যার পর বিদ্বান বন্ধুদের সঙ্গে নানা প্রকার তর্কে মেতে থাকে। এ গৃহের মজলিশকক্ষে এখন আর নূপুরের নিক্কন কিংবা বোতল-গেলাসের ঠনৎকার শোনা যায় না, বরং গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা সেখানে নানা রকম কেতাব থেকে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে পরস্পরকে শোনায়।

বিধুভূষণও গঙ্গানারায়ণের ওপরে খুব সন্তুষ্ট। হিন্দু কলেজে পাঠ নিয়েও সে ফিরিঙ্গি বনে যায়নি কিংবা দেবেন্দ্র ঠাকুরের হুজুগে-দলে গিয়ে জোটেনি। তাছাড়া ইতিমধ্যেই দুবার জমিদারী মহল পরিদর্শন করতে গিয়ে সে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং সুবন্দোবস্ত করে এসেছে।

গেছেন, তাতে এদের সাত পুরুষ বিনা পরিশ্রমে চালিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং বিষয় না দেখে যদি শুধু বিদ্যাচর্চা কিংবা ধর্মানুশীলনেও মেতে থাকে তাতে অন্তত সংসারের শান্তি আসবে। দুই ভ্রাতায় খুব ভাব। নবীনকুমারের জন্মের পর যে শঙ্কা বিম্ববতী ও তাঁর স্বামীর মনে জেগেছিল, তা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। গঙ্গানারায়ণ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় ভালোবাসে। আর নবীনকুমারও যতই দুরন্তপনা করুক, সে গঙ্গানারায়ণের খুবই বশবর্তী এবং এক একদিন সে গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের তর্কসভায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকে।

নবীনকুমারের শিক্ষা সম্পর্কে বিম্ববতী বিধুশেখরের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এ গৃহে বিধুশেখর নিত্য আসেন এবং পরপুরুষদের মধ্যে একমাত্র সরাসরি বিধুশেখরের সঙ্গেই কথা বলেন বিম্ববতী। যখন অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা, সেই সময় নববধূ হয়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন বিম্ববতী, আর তাঁর বত্রিশ বৎসর বয়েস, এই সুদীর্ঘকাল কত সুখ দুঃখের কথা হয়েছে বিধুশেখরের সঙ্গে। গত কয়েক বৎসর তো স্বামীর সঙ্গে বিম্ববতীর প্রায় দেখাই হয় না। তা নিয়ে অবশ্য কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন না বিম্ববতী, কারণ, যে-টুকু সময় রামকমল সিংহ গৃহে থাকেন, তখন তিনি যেন বিম্ববতীর দাসানুদাস। গদগদ কণ্ঠে বলেন, বিম্ব, তুমি আমার লক্ষ্মী, তুমিই আমার জগদ্ধাত্রী, তোমার জন্যই আমার এত সব হয়েছে। তুমি যদি রাগ করো তো বলো, আমি বাড়ির বাইরে এক পা যাবো না। তবে, আমায় আর বিষয় দেখতে বলো না! আর যে কটা দিন বেঁচে আছি ......। সঙ্গে সঙ্গে বিম্ববতী বলেন, ওগো, না, না, তোমার যা মন চায় তাই তুমি করবে ......।

বিধুশেখরের মত এই যে নবীনকুমার গৃহেই বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে বিদ্যাভ্যাস করুক। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরাজীও শিখবে বইকি, কিন্তু সে জন্যে তাকে সাহেব শিক্ষকদের স্কুলে পাঠাবার দরকার নেই। আজকাল ভদ্র ঘরের অনেক যুবকও ইংরাজী শিখেছে, গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের মধ্যেও তো দু-একজন গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র আছে, তাদেরই কারুর ওপর ভার দেওয়া যেতে পারে। বিম্ববতীর তাতে কোনো আপত্তি নেই।

হাতেখড়ির দিন দীক্ষাচার্য হিসেবে বিধুশেখর তিনজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনাবার ব্যবস্থা করলেন। আজকাল অবশ্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া ভার। পয়সার লোভে অনেক ব্রাহ্মণই বিবেক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ধনীদের খোসামোদ করে।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্ত বিধুশেখরের বন্ধুস্থানীয়। বাঙালী বা ভারতীয়দের মধ্যে বোধ হয় তিনিই সর্বোচ্চ সরকারি কর্মে নিযুক্ত, তাঁর বেতন নব্বুই টাকা। সাহেবদের কাছে রসময় দত্তের খুব প্রতিপত্তি। কিন্তু রসময় দত্ত ব্রাহ্মণ নন, তাঁকে আচার্য করা যায় না। সুতরাং ঐ কলেজেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বৃদ্ধ রামমাণিক্য বিদ্যালংকারকে একজন আচার্য হিসেবে মনোনয়ন করলেন বিধুশেখর। রসময় দত্তই বললেন, আর একজনের কথা তাঁর নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মানুষটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিধুশেখর মুগ্ধ হলেন। দুর্গাচরণ সত্যিই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ, ইংরাজী ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই বিশেষ দক্ষতা আছে, এক সময় হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, তারপর হঠাৎ শিক্ষকতা ছেড়ে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন। চিকিৎসাবিদ্যা উত্তম রূপে শিক্ষা করার পর তিনি দুঃস্থ-আতুর মানুষদের চিকিৎসায় সাহায্য দেন। আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার হিসাবেও নিযুক্ত। ইংরাজদের শিক্ষা-বিজ্ঞান আহরণ করেও এঁর চাল-চলন খাঁটি দেশীয়দের মতন, এই প্রকার মানুষই বিধুশেখরের পছন্দ। এই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হলো। আর একজনের কথা। এঁকেই তিনি তৃতীয় আচার্য হিসেবে মনোনীত করে ফেললেন। ইনি মেদিনীপুরী ব্রাহ্মণ, বয়সে যুবক এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুকাল আগে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর পদবী পেয়েছেন, ইদানীং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করেন। যুবকটির চেহারা কদাকার। কিন্তু মুখমণ্ডলে আত্মাভিমানের ছাপ প্রকট।

বিধুশেখরের সঙ্গে পরিচয় হতেই। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মহাশয়কে আমি বিলক্ষণ চিনি। আপনার স্মরণ নাই কিন্তু আপনার বাড়িতে গিয়ে একদিন এমন ভুরিভোজ খেতে হয়েছিল যে আজও সেকথা মনে এলে আতঙ্ক হয়। সে আপনার এক কন্যার বিবাহের সময়, আমাদেরই এক সতীর্থ আপনার জামাতা। বরযাত্রীদের খাওয়াইয়ে খাওয়াইয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাই বুঝি আপনাদিগের রীতি?

বিধুশেখর উচ্চহাস করে উঠেছিলেন।

কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর বিধুশেখর অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর, এই বাগদেবীর পূজায় যদি আমার বন্ধু রামকমল সিংহের গৃহে পদধূলি দেন, তবে আমি ধন্য হই! বন্ধুর একটি পঞ্চম বর্ষীয় সুলক্ষণ পুত্র আছে, সে আমারও পুত্রবৎ, আপনারা সেইদিন তাহাকে আশীর্বাদ করিলে সে জ্ঞান পথের পথিক হইতে পারে।

দুর্গাচরণ বললেন, সেদিনও ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকবে তো?

ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধুকে বললেন, ঔদরিক! অমনি বুঝি নোলা শক শক করে উঠলো?

দুর্গাচরণ বললেন, ভাই, বামুনের ছেলে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখলে চাঞ্চল্য ঘটবে না, এ কি একটা কথা হলো? বংশের অবমাননা হবে যে!

ঈশ্বরচন্দ্র বিধুশেখরকে বললেন, এই উপলক্ষে বামুন পণ্ডিত ডাকছেন যখন, তখন শাল দোশালা বিদায় দেবেন নিশ্চয়?

বিধুশেখর বললেন, আজ্ঞে, সে তো আমাদের প্রথাই রয়েছে!

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, আর সোনাদানা?

দুর্গাচরণ হাসতে হাসতে বললেন, ঈশ্বর, তুমি বোধ হয় জানো না, রামকমল সিংহী কত বড় ধনী। তেনার মনটাও খুব খোলসা দরাজ! সোনা-দানা দিয়ে তোমায় ভরিয়ে দেবেন।

বিধুশেখর বললেন, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনাদের কোনো প্রকার অসম্মান হবে না। আমার বন্ধু আপনাদের মর্যাদার যোগ্য জিনিসই দেবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, দত্ত মহাশয়, দুর্গাচরণবাবু অতিশয় পরিহাস প্রবণ। তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাড়া কথা কইতে পারেন না। সেই জন্যই আমার বিষয়টি আমি স্পষ্টাক্ষরে বলি। আপনার বন্ধুপুত্রের হাতেখড়ির সময় উপস্থিত থাকতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে। সোনা-দানা, শাল-দোশালা দূরে থাক, গুরুদক্ষিণা হিসাবেও আমাকে একটি পাইপয়সা দিতে পারবেন না। আমি পঞ্চাশ টাকা বেতন পাই, তাতেই আমার সংসার অতি উত্তম-রূপে চলে যায়। কাহারো কাছ থেকে দান গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না।

বিধুশেখর অভিভূত ভাবে নির্বাক হয়ে রইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, দুর্গামোহনবাবুকেও আমি যথেষ্ট চিনি। উনি বেতন পান আশি টাকা, উঁহারও দান গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং আমরা কিছুই লবো না, এই শর্তে যদি রাজি থাকেন, তবে আমরা যেতে পারি। এই উপলক্ষে যদি অর্থ ব্যয় করতে চান, তবে কিছু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করুন, সেটা কাজে দেবে।

বিধুশেখর বললেন, আপনাদের যা অভিপ্রায়, সেই মতই হবে।

দুর্গাচরণ বললেন, ঈশ্বর, তুমি 'আমরা' 'আমরা'

রসুনে প্রকৃতিদত্ত যত আরোগ্যের গুণ আছে, তার সব গুণগুলিই এখন

৩০টির জন্য
৬·৮০ টাকা

১০০টির জন্য
১৯·৩০ টাকা

র‍্যানব্যাক্সি'র গার্লিক পার্লস্-এ

সর্বাত্মক স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃতই কার্য্যকর এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পন্থা হিসাবে বহুকাল থেকে কাঁচা রসুন স্বীকৃতি লাভ ক'রে এসেছে।

"রসুনের তেলের ক্যাপসুল . . . রোগ নির্মূলকারক রসুনের কোয়ার সমস্ত উপাদান এর মধ্যে রয়েছে . . . রক্তকে সতেজ করে, রক্ত শোধন করে, হজমশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে . . . ফুসফুসের রোগ . . . সবরকম অন্ত্রীয় গোলযোগ, ক্ষুদামান্দ্য প্রভৃতির জন্য সুপারিশ করা হয় . . ." ডাঃ কে. এম. নাদকার্ণির ইণ্ডিয়ান মেটিরিয়া মেডিকা।

রন্ধনের সময় রসুনের কয়েকটি অনবদ্য গুণ নষ্ট হয়ে যায়। র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্ল'স্-এ রয়েছে কাঁচা রসুনের বিশুদ্ধ আরক এবং রসুনের প্রকৃতিদত্ত সবক'টি গুণ।

- কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ সুসংহত রাখে এবং উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া দমন করে।
- পেটের বায়ু নিরোধ করে এবং হজমশক্তি বাড়ায় ও লিভারের কার্য্যক্ষমতার উন্নতি করে।
- পুরোনো কাশি, সর্দ্দি ও ফ্লু-কে নিরাময় করে।
- রক্তের অশুদ্ধতা দূর করে, ব্রণ, কালসিটে ও কালোদাগ পরিষ্কার ক'রে, ত্বককে সুস্থ ও মসৃণ রাখে।

গার্লিক পার্লস্—গন্ধ বাদে রসুনের সব গুণ। খাবার আগে, ১টি কিম্বা ২টি মুক্তদানা (পার্লস্) খেলে, আপনি বহুদিক থেকে উপকার পাবেন প্রাকৃতিক উপায়ে।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্—
সর্বাত্মক স্বাস্থ্য লাভের প্রাকৃতিক উপায়।

Okhla, New Delhi-110020

[illegible] আমার চক্ষুলজ্জায় আর কিছু নিতে পারবো না! কিন্তু উনি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকেও আচার্য করেছেন, তাঁকে কেন বঞ্চিত করো, সে বড়ার যথেষ্ট লোভ আছে আমি জানি। তাছাড়া, বিদ্যালঙ্কারের মস্ত বড় সংসার, কতদিন আর চাকরি করতে পারবেন তার ঠিক নেই। তাঁর অর্থের প্রয়োজন আছে। আমি বলি কী, ইঁহারা আমাদের তিনজনকে যা দেবেন স্থির করেছিলেন, তার সবটাই বিদ্যালঙ্কারকে দিন না কেন!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এটা একটা ভারী কাজের কথা বলেছেন। তবে তেমনই করুন। কিন্তু কিছু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করার কথাও ভুলবেন না।

বিধুশেখর বুঝলেন, তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের কাছেই এসেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, আর একটি কথা। আমি দুগ্ধ জাতীয় কোনো খাদ্য খাই না। মাছ-মাংসও পরিত্যাগ করেছি। আপনার গৃহে শুধু জলাহার করবো। অধিক কিছু খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। আপনাদের মতন বড় মানুষদের গৃহে একদিন আহার করলে পেটের পীড়া সারাতে এক বৎসর লেগে যায়।

দুর্গাচরণ বিধুশেখরকে বললেন, মহাশয়, এই ব্যাপারে কিন্তু আমি ঈশ্বরের সঙ্গে একমত নই। আমি পেটুক মানুষ, লুচি মণ্ডাতে আপত্তি নেই।

মহাসমারোহে সরস্বতী পুজো সম্পন্ন হয়ে গেল। বাহির মহলের উঠানে শামিয়ানা খাটিয়ে সেখানে সব ব্যবস্থা হয়েছে। রামকমল সিংহ উত্তর ভারত থেকে এখনো ফেরেন নি, গত সপ্তাহেই তাঁর এক দূত এসে আবার একক্কাঁড়ি টাকা নিয়ে গেছে, সুতরাং সব দায়িত্ব বিধুশেখরের একার। অচেনা যে-কেউ ভাববে তিনিই এ বাড়ির কর্তা।

রেখে, স্নান করিয়ে, কোরা পট্টবস্ত্র পরিয়ে নিয়ে আসা হলো তাঁদের সামনে। প্রথমে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করে আশীর্বাদ করলেন তাকে। অধিকাংশ দাঁত নেই। মুখ একেবারে ফোকলা, তাই কোনো কথাই প্রায় বোঝা যায় না।

তারপর দুর্গাচরণও নবীনকুমারের মস্তক স্পর্শ করে কয়েকটি মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করলেন। নবীনকুমারের কোনো রূপ আড়ষ্টতা নেই। সে তার অস্বাভাবিক তীব্র চোখ মেলে দেখছে ওঁদের। দুর্গাচরণ বললেন, এ বালকের মুখে প্রতিভার জ্যোতি আছে।

আচার্যদের যে প্রণাম করতে হয়, সেটা নবীনকুমারকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। দুপাশ থেকে গঙ্গানারায়ণ আর বিধুশেখর বারংবার বলছেন, প্রণাম কর। পণ্ডিতমশাইদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর! নবীনকুমার মুখ ফিরিয়ে শুধু তাকাচ্ছে, সে যেন জানেই না প্রণাম কাকে বলে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণ তার হাত ধরে আচার্যদের পায়ে ছোঁয়ালো।

ঈশ্বরচন্দ্র কোনো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না। তিনি বললেন, আসল হাতেখড়িই তো হলো না। খড়ি কই? শ্লেট কই?

শ্লেট-পেন্সিল ও কয়েকখানি পুস্তক সরস্বতী মূর্তির পায়ের কাছে রাখা ছিল, সে সব পুষ্প-স্তবকের নীচে চাপা পড়ে গেছে। পুরোহিত সেগুলি টেনে বার করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বললেন, তোমার মুক্তার মতন হস্তাক্ষর হোক। এসো দিকি, আমরা দুজনে মিলে একটু লিখি।

বালকের হাতে পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে নিজেও তার হাতটি চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, প্রথমে

অহ? তারপর বাম দিকে তেকোণা করে [illegible] এই, এই এই! এবার কী হলো? ঘুড়ি দেখেছো তো? ছেলেরা মাঠে যে ঘুড়ি ওড়ায়? এই হলো একটা ঘুড়ির অর্ধেক, তাই না এবার ডানদিকে একটা শুঁড়, এই! এবার কী হলো এর নাম ক!

নবীনকুমার বললো, ক!

তারপর ঈশ্বরচন্দ্র তার হাত ছেড়ে দিতেই সে নিজেই শ্লেটের ওপর আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলো।

ঈশ্বরচন্দ্র দারুণ বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কী? এ বালক কি আগেই লেখা অভ্যেস করেছে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, না তো!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এ তো ক লিখতে জানে! এই যে একটা লিখেছে।

অপর দুই ব্রাহ্মণও শ্লেটের ওপর উঁকি দিলেন। সত্যিই তো, ঈশ্বরচন্দ্র যে ক লিখে দিলেন, নবীনচন্দ্র তার পাশে আর একটি ক লিখে ফেলেছে। যতই আঁকা বাঁকা রেখা হোক, তবু ক বলে চেনা যায়। প্রথম দিনেই এমন লেখা কোনো বালকের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিধুশেখরও শ্লেটখানি তুলে নিয়ে দেখলেন। চারপাশে আরও অনেকে ভিড় করে এলো। দূরে চিকের আড়ালে রয়েছেন বিম্ববতী এবং অন্য রমণীরা।

ঈশ্বরচন্দ্র শ্লেটটা ফেরৎ নিয়ে বললেন, দেখি, দেখি, আর একটা লেখো তো!

কোনো আপত্তি নেই, বালক আবার লিখে দেখালো।

ঈশ্বরচন্দ্র বাঁ হাতের চেটো দিয়ে শ্লেটটা একেবারে মুছে ফেলে বললেন, আর একবার লেখো তো! কী সুন্দর ছেলে! আর একবার লেখো!

এবারে সকলেরই একেবারে স্তম্ভিত অবস্থা।

দুর্গাচরণ প্রশ্ন করলেন, আপনারা সত্যি জানেন, এ বালক আগে লিখতে শেখেনি?

গঙ্গানারায়ণ ও বিধুশেখর দুজনেই বললেন, আজ্ঞে, না। হাতেখড়ির আগে কেউ কি লেখাপড়া শেখায়?

দুর্গাচরণ এবার নিজে শ্লেটটা নিয়ে ইংরেজি এ আর বি অক্ষর দুটি লিখলেন। তারপর নবীনকুমারকে বললেন, ঠিক এই রকম দুটি পাশে লিখে দেখাও তো!

নবীনকুমার যেন বেশ কৌতুক পেয়েছে। খুব মন দিয়ে পেন্সিল ঘষে সে এ এবং বি অক্ষর ফুটিয়ে তুললো। দুর্গাচরণ সব মুছে দিলেন, তারপরও নবীনকুমার লিখে দেখাতে পারলো।

আর কোনো সন্দেহ রাখার উপায় নেই। বাড়ির কারুর কাছ থেকে যদি বা বাংলা অক্ষর লিখতে শিখেও থাকে, ইংরেজি অক্ষর শেখাবার মতন লোক কোথায় পাওয়া যাবে?

দুর্গাচরণ বললেন, ভাই, শ্রুতিধরের কথা শুনেছি। কিন্তু এই বালক কি দৃষ্টিস্মৃতিধর?

বিধুশেখর বললেন, এ শিশু জন্মের অতি অল্পকাল পর থেকেই নানা প্রকার বিস্ময়ের কাজ করেচে। এ হাঁটতে শিখেচে, কথা কইতে শিখেচে অন্য ছেলেপুলেদের চেয়ে অনেক আগে। হ্যাঁরে গঙ্গা, ও ক মাসে কথা কইতে শিখেছিল রে?

গঙ্গানারায়ণ পিছন ফিরে মায়ের দিকে চাইলো। সেখান থেকে অন্য লোক মারফৎ উত্তর এলো, আট মাস!

দুর্গাচরণ বললেন, আমি দেখেই বুঝেছি, এ বালক ক্ষণজন্মা।

বিধুশেখর গর্বিত ভাবে বললেন, ওর কুষ্ঠিতেও আছে, ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

দুর্গাচরণ বললেন, এর দিকে নজর রাখবেন ভালো করে। স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন। দেখবেন, যেন, এ শিশু দীর্ঘজীবী হয়!

গঙ্গানারায়ণ বললো, দেড় দু বছর বয়েস থেকেই ও অনেক রকম ছড়া বলতে পারে। একলা একলা ছড়া বলে বলে দরদালানে ঘুরে বেড়ায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কই শুনি। একটা ছড়া বলো তো?

গঙ্গানারায়ণ বললেন, বল তো নবীন, একটা ছড়া বল তো।

নবীনকুমার অমনি চোখ বুজে বললো

তুমি প্রভু সৃষ্টিধর জগতের পতি
তোমা পানে সদা মোর যেন থাকে মতি!

তিন ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে বাহাবা দিয়ে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, বড় সুন্দর কণ্ঠস্বর, আর একটা বলো তো!

এবার নবীনকুমার কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললো,

এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি?

দুর্গাচরণ ও ঈশ্বরচন্দ্র হেসে উঠলেও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নাক কুঁচকোলেন। তিনি বললেন, এ আবার কোথা থেকে শিখলো!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আর একটু বলো তো. আর জানো না?

নবীনচন্দ্র আবার দুলে দুলে বলতে লাগলো

তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ
তুমি আমার তায় রতনমণি

আধো আধো বালকের কথা নয়। প্রায় সঠিক উচ্চারণ। শুনতে শুনতে একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। এমনকি বিধুশেখরও হেসে ফেললেন। একমাত্র বিদ্যালঙ্কারই অসন্তুষ্ট হলেন একটু। ঠাকুর দেবতার সামনে একি অশ্লীল কথা! তাও এক বালকের মুখে!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, চেনা চেনা যেন মনে হয়, এ গান কার রচনা?

দুর্গাচরণ বললেন, এ তো গোঁজলা গুঁই-এর

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এ শিশু এ গান শিখলে কেমন করে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, ভিকিরী, বৈষ্ণব, কীর্তনীয়ারা বাড়িতে এসে আমার ভাইটি তাদের গান খুব মন দিয়ে শোনে। সে সব শুনে শুনেই শিখেচে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তা হলে তো এ বালক শ্রুতিধরও বটে!

দুর্গাচরণ বললেন, এমন আশ্চর্য শিশু আমি আগে আর দেখিনি তো বটেই কোথাও শুনিনি পর্যন্ত! ঈশ্বর ওকে দীর্ঘজীবী করুন।

তারপর, উভয়ে মিলে নবীনকুমারকে প্রভূত আদর করতে লাগলেন। দূর থেকে দেখে বিম্ববতীর মন গর্বে ভরে গেল। পুত্রের ব্যবহার দেখে তাঁর নিজের এখনো মাঝে মাঝে খটকা লাগে, কোনো রকম অপ্রাকৃত কিছুর প্রভাব আছে কি না। কিন্তু এত বড় গুণী ব্যক্তিরা তার পুত্রের এমন সুখ্যাতি করছেন যখন, তখন আর কোনো চিন্তা নেই।

ব্রাহ্মণদের এবার জলপান করানো হবে। নবীনকুমারকেও এখন খাওয়ানো দরকার, তাই গঙ্গানারায়ণ তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভাইকে ক্রোড়ে তুলে নিল। নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আমার হাতেখড়ি হয়ে গেছে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যাঁ। তোমার খুব ভালো হাতেখড়ি হয়েছে।

তখন নবীনকুমার তীক্ষ্ণ জোরালো গলায় বললো, দাদা, দুলালের হাতেখড়ি হবে না?

বিধুশেখর বিস্মিতভাবে বললেন, দুলাল? দুলাল কে?

গঙ্গানারায়ণ নবীনকুমারের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলো, এখন খাবার খাবি। চল, চল!

নবীনকুমার কেঁদে উঠলো, না, আমি যাবো না। দুলালের হাতেখড়ি হবে। দুলালকে ডাকো। দুলালকে ডাকো।

গঙ্গানারায়ণও জানে না দুলাল কে। খানিকটা বিব্রত অবস্থায় সে নবীনকুমারকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। মায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, দুলাল কে মা? দ্যাখো, ছোটবাবু আবার কী বায়নাক ধরেছে'

বিম্ববতী বললেন, কী জানি বাবা, নীচের যে ছেলেটি ওর সঙ্গে খেলে, সেই নাকি!

নবীনকুমার তখন দুলালের নাম করে ডুকরে কাঁদতে শুরু করেছে। তখন গঙ্গানারায়ণ ও বিম্ববতী দুজনেই তাকে অনেক কষ্টে বোঝালেন যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে, হবে, দুলালেরও হাতেখড়ি হবে, পরে হবে।

ভিড়ের একেবারে পিছন দিকে থাকোমণি তার পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনিবপুত্রের মুখে দুলালের নাম উচ্চারণ সে-ও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেল, এ সব ভালো নয়। বাবুদের কোনো ব্যাপারের মধ্যেই থাকা ভালো নয়। ছেলেকে নিয়ে থাকোমণি সরে গেল তাড়াতাড়ি।

দুলালচন্দ্রকে নবীনকুমার খুঁজে পেল বিকেলবেলা। শ্লেট আর পেন্সিল সে সারাদিন আর কাছ ছাড়া করেনি। এগুলিকে সে নতুন খেলনা হিসেবে পেয়েছে।

—দুলাল, তুই হাতেখড়ি দিলি নি? তোর বিদ্যে হবে না।

দুলালচন্দ্র হাতেখড়ি মানে জানে না। সে দূর থেকে দেখেছিল। সাদা রঙের হাঁসের ওপর বসা সরস্বতী ঠাকুরের সামনে স্তূপ করা ছিল সন্দেশের পাহাড়। তার ভাগ্যে একটাও জোটেনি।

—আয়, আমি তোকে হাতেখড়ি শেখাবো। বোস, আমার সামনে বোস, হাঁটু গেড়ে বোস।

নিজে ঠিক ব্রাহ্মণ আচার্যদের ভঙ্গিতে পিঠ সোজা করে বসে সে অবিকল তাঁদের নকল করে বলতে লাগলো, লেখ, ক! ঘুঁড়ির আর্ধেক আর একটা শুন্ডি! তোকে আগে কেউ লিখতে শিখিয়েছে? লেখ এ বি!

এক সুকোমল সাথী
কোমল আর মোলায়েম
স্যানিটারী টাওয়েল

সত্যি বলতে কি, কাম্ফিট স্যানিটারী টাওয়েল সারা দুনিয়াতে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারণ, এই স্যানিটারী টাওয়েল খুবই মোলায়েম আর এটির ভালভাবে শুষে নেওয়ার ক্ষমতাও অনেক বেশী। আর সেইসঙ্গে এটি এতই হাল্কা যে এটি পরে আপনি বিলকুল টেরই পাবেন না। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, কাম্ফিট সর্বপ্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধিসম্মত পরিবেশে বানানো হয়, যার জন্যে এটি আপনার সম্পূর্ণ উপযোগী ও স্বাস্থ্য অনুকূল।
কারণ এগুলি ভারতে এক অত্যাধুনিক এবং অটোমেটিক প্লান্টে বানানো হয়, যার সাথে আছে সুইডেনের ক্রিস্টাইন ফোরেডনের পূর্ণ সহযোগিতা।
কাম্ফিটকে আপনার মনপছন্দ সাথী করুন।
সুকোমল সুরক্ষার ভার—
কাম্ফিট জিম্মাদার

আপনার স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে সুরক্ষা।

যন্ত্রলেখা

আশিস ঘোষ

একটা মেশিন বানিয়েছি। নাম রেখেছি 'যন্ত্রলেখা'। লেখার জন্যে এখন আর আমাকে ভাবতে হবে না। যা লিখতে চাই, এই যন্ত্রই সব লিখে দেবে। আমার চিন্তা-ভাবনা ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছুই যন্ত্রে ধরা পড়বে। যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত হবে। একবার বোতাম টিপে দিলে, খুব সহজেই ছাপা হয়ে যাবে।

আমি লেখক হতে চাই। খুব নামী লেখক। ছেলেবেলায় এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল,—বড় হয়ে খুব নামী লোক হব। কথাটা ফলবে কিনা জানি না, তবে আমি কিছু লিখতে চাই। নিজের কথাই লিখতে চাই। লিখতে গেলে নানা কথা এসে পড়বে। কত কিছুই তো লেখার আছে। বাড়ির কথা। বন্ধুদের কথা। এই শহর। এখানকার রাস্তা। মানুষজন। রোজ যা হচ্ছে—যাকে যেভাবে দেখছি। সব লিখতে হবে। এসবের কেন্দ্রে থাকব আমি। আমাকে নিয়েই তো সবকিছু।

কিন্তু মুশকিল কী, লেখাটা আর হয়ে ওঠে না। ঠিক মতো গোছাতে পারি না। কিভাবে শুরু করবো, কোথায় শেষ হবে, বুঝতে পারি না। বন্ধুরাও উৎসাহ দেয় না। এই তো সেদিন একজন বলে গেল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। একি চিঠি, নাকি পরীক্ষার খাতায় রচনা লেখা? লিখবো বললেই কি আর লেখা যায়? একজন বয়স্ক সাহিত্যিক বললেন,—বুঝলে হে, বেশ ঝামেলা আছে। দরকার হলে, এক একটা লেখা অনেকবার লিখতে হবে। বার বার লিখতে হবে।

এই সব শুনে শুনে আমি তো প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। লিখতে পারবো না? এটা কি এমন কঠিন কাজ? কাগজ কলম নিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই হয়। আপসে লেখা হয়ে যাবে। সত্যি বলতে কী, কয়েকদিন চেষ্টাও করেছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাদা পাতা নিয়ে বসে থেকেছি। সরু মোটা নানা রকমের দাগ কেটেছি খাতায়। কলমটা কপালে ঠেকিয়েছি। কিন্তু লেখা আর হয়নি। আসলে, কিভাবে যে শুরু করবো, তাই ঠিক করতে পারি না। কি নিয়ে লিখবো? একটা বিষয় ঠিক করি তো, আর একটা লিখতে ইচ্ছে করে। যেভাবে হোক শুরু করলেই হয়। লেখা নাকি নিজেই এগিয়ে যায়। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি, ইচ্ছে মতো শুরু করা যায় না। তা হলে? ভাবলাম বোধ হয় কলমটার দোষ। বারবার কালি ফুরিয়ে যায়। ঠিক মতো লেখা পড়ে না। দামী একটা কলম কিনলাম। প্রচুর কালি ধরে। অনেকটা লেখা যায়। কিন্তু কি বলবো, এতেও কিছু হলো না। মনমতো কিছুই লিখতে পারলাম না। নিবটাও বড্ড সরু। পাতা ফুটো হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি হাতও চলে না। কিছু লিখতে না লিখতে, আরও পাঁচ রকমের চিন্তা মনে আসে। হাতের আগেই মন ছোটে। আচ্ছা মুশকিল তো! এতো দেখি আর এক সমস্যা। লেখার কত সমস্যাই না আছে! কাউকে বললে, বিশ্বাস করবে না। ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে। সমস্যা তো আমার। অন্যে তা বুঝবে কেন?

এই সব ভাবতে ভাবতেই একটা মেসিন তৈরির ফন্দি করলাম। মেসিন যদি হিসেব করতে পারে, দাবার চাল বলে দিতে পারে, তা হলে লিখতেই বা পারবে না কেন? এই তো সেদিন টেস্ট টিউবে মানব-সন্তানের জন্ম হয়েছে। মহাশূন্যে মানুষ আজ হাঁটাচলা করছে। বিজ্ঞান যদি এত কিছু করতে পারে তো, লেখার একটা যন্ত্রও করা যেতে পারে। কেউ তো চেষ্টা করেনি। একবার দেখলে হয়!

কয়েক দিন ধরে বইটই ঘেঁটে একটা নকশা তৈরি করলাম। চোরাবাজার চাঁদনিকবাজার ঘুরে টুকিটাকি অনেক কিছুই জোগাড় করলাম। উঁচু টেবিলে প্রথমে একটা শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র বসানো হলো। যখন যা মনে আসবে মুখে বললেই, শব্দযন্ত্র টেপ করে নেবে। তারপর সময় মতো মেসিন চালিয়ে টেপ বাছাই করতে হবে। শব্দযন্ত্রের পাশে একটা অটোমেটিক টাইপরাইটার। টেপ চললেই আমার কথাগুলো সব ছাপা হয়ে যাবে। সহজ ব্যাপার। এতদিন কেন যে ভাবিনি!

আমার টেবিল জুড়ে এখন 'যন্ত্রলেখা'। সকাল দুপুর বা রাতে, যখনই সময় পাই, ঘরে ঢুকে পড়ি। দরজা-জানলা বন্ধ করে দেই। 'যন্ত্রলেখা' যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করে থাকে। নীচু একটা টুলে বসি। সুইচ টিপতেই লাল আলো জ্বলে ওঠে। শব্দ হয়। কথা বলে যাই। যন্ত্র সব টেনে নেয়। পাশেই আর একটা টেবিলে রেকর্ড-প্লেয়ার। পুরিয়া কল্যাণ রাগে সেতার বাজতে থাকে। আবছা অন্ধকার ঘরে অলৌকিক এক পরিবেশ তৈরি হয়। লেখা ব্যাপারটা তখন খুব সহজ মনে হয়। কিছুদিন এইভাবে চালিয়ে যেতে পারলে, কে রুখবে! আমার লেখা নিয়ে চারদিকে হইচই পড়ে যাবে। লেখকবন্ধুরা? ফুঃ!

কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটালাম। রাস্তায় দর্পভরে হাঁটি। খেয়াল খুশী মতো গলা ছেড়ে গান গাই। পরিচিত কাউকে দেখলে, গম্ভীর হয়ে যাই। এখন কাউকেই কিছু জানাবো না। সময় মতো ওরাই ছুটে আসবে।

মুশকিল হচ্ছে কি, 'যন্ত্রলেখা' এখনো ঠিক মতো কাজ করছে না। যা বলতে চাই, ঠিক পর পর সাজিয়ে লিখতে পারি না। কেমন যেন উলটো-পালটা হয়ে যায়। মেসিনেও তাই ছাপা হয়। কিন্তু এভাবে তো গল্প লেখা যায় না। গল্পের শুরু থাকবে। একটা শেষও থাকা চাই। এলোমেলোভাবে তো গল্প হয় না!

সেদিন একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এই সব কথাই হচ্ছিল। সমালোচক হিসেবে ওঁর খুব নামডাক। পণ্ডিত লোক। নিজে লেখেন না। অন্যের লেখার সমালোচনা

স্বচ্ছ লাল

ক্লোজ-আপ

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

Close-up

Close-up

এমন নিবিড় মুহূর্তের জন্যে আপনার প্রয়োজন নতুন ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর শক্তিশালী মাউথওয়াশ আপনার নিঃশ্বাসকে করবে ক্লোজ-আপ-তাজা, এর বিশেষ দুটি উপাদান আপনার দাঁতকে করবে ক্লোজ-আপ-সাদা।

কোলকাতায় এবং মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, গোয়া, পশ্চিম বঙ্গ, তামিল নাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের বাছাই করা শহরে পাওয়া যায়।

লিনটাস-CX.14-2415 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

... বললেন ভদ্রলোক।—'বাঃ, অনেক কিছুই তো করেছ দেখছি। লেখা কিছু হচ্ছে?'

সব কাগজপত্তর দেখালাম। দেখতে দেখতে কিন্তু ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন,—'দারুণ, দারুণ ব্যাপার করেছ!' কয়েক জায়গায় লাল কালির দাগ দিতে দিতে বলজেন,—'য়ুরোপ আমেরিকায় আজকাল এ ধরনের "অটোমেটিক" লেখা হচ্ছে।'

অধ্যাপকের কথা শুনে সেদিন কী যে খুশী হয়েছিলাম। কফি বানিয়ে খাওয়ালাম। ভাল সিগারেট দিলাম। 'যন্ত্রলেখা'র সামনে বসে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা করা হলো। চলে যাওয়ার সময় ভদ্রলোক বললেন—'ব্যাপারটা নিয়ে একটু হইচই করা দরকার।'

—কি করতে চান?

-উনি হেসে বললেন,—আর কিছু না পারি, পত্রিকায় একটা "ফিচার" তো লেখা যাবে।'

আনন্দে উত্তেজনায় সেদিন রাতে ঘুমোতে পারিনি।

'যন্ত্রলেখা'কে ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারলে, খ্যাতি আর কে আটকায়? অসুবিধে একটু হচ্ছে। বানান ভুল হয়। কিন্তু সে তো আমার দোষ। অনেক শব্দই ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারি না। ল-কে ন, ম-কে ব আর র-কে ড় এর মতো হামেশাই উচ্চারণ করি। যেখানে-সেখানে 'চন্দ্রবিন্দু' ব্যবহার করি। 'যন্ত্র-লেখা'র কি দোষ? যেমন বলি, ছাপিয়ে দেয়। আমার সব চিন্তা-ভাবনারও মাথা-মুণ্ডু নেই। গল্পের জন্য দরকার নেই, এমন অনেক কিছু ভেবে থাকি। তাই ছাপা হয়। এই এক মুশকিল! যদি এমন কিছু করা যেত,—যা শুধু লেখার জন্যে দরকার, যন্ত্র তাই ছাপাবে। ভুল ত্রুটি শুধরে দেবে। যা ভাবি বলি বা দেখি, সব কিছু নিয়েই তো আর সাহিত্য হয় না!

এবার 'যন্ত্রলেখা'কে আরও ভাল করতে হবে। সব রকমের বিদ্যে ফলাতে শুরু করলাম। মেসিনের সামনেই একটা বৈদ্যুতিক চেয়ার বসিয়ে দিলাম। এই চেয়ারটায় বসে, মাথায় লোহার টুপি পরতে হবে। টুপিতে নেগেটিভ-পজিটিভ তার লাগানো আছে। সুইচ টিপলেই টুপির মাথায় লাল আলো জ্বলে ওঠে। তামার একটা হাত এগিয়ে এসে বুক ছুঁয়ে থাকে। বাজে কথা বা চিন্তাগুলো নেগেটিভ তার দিয়ে বেরিয়ে যায়। পজিটিভ তারটা যেন চুম্বক। যেটুকু দরকার টেনে নেয়।

এবার লেখা শুরু। তামার হাতটা বুক ছুঁয়েই আছে। মেসিনে পাতার পর পাতা ছাপা হয়ে যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসে আছি 'যন্ত্রলেখা'র মাথায় লাল আলোটা দপদপ করছে।

কিন্তু ভাগে না থাকলে যা হয়! কী বলবো, যা লিখলাম গল্প হলো না একটাও। সমস্যা কী কম? হয়তো লিখেছি,—'সোনালী গমের মতো এক ফালি রোদ কাঁপছে তিরতিরিয়ে।' এখন পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে, রোদ কি সোনালী গমের মতো? আমি সোনালী দেখেছি, আরেকজন নাও দেখতে পারে। তিরতিরিয়ে কাঁপাটা কেমন? রোদ কি কাঁপে? নাকি আমারই দেখার দোষ? কোন চরিত্র লিখতে গেলেও, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যাকে নিয়ে লিখছি, সত্যিই কী তাকে ভাল করে চিনি, না জানি? যেটুকু তাকে দেখেছি, সে তো বাইরে থেকে। তা হলে?

'যন্ত্রলেখা' এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কি যে করি! এত কষ্ট করে যন্ত্রটা তৈরি করলাম। ভেবেছিলাম, এবার লেখক হয়ে যাবে। আমার সব কথা —দুঃখ কষ্ট ইচ্ছে-অনিচ্ছে—সবকিছুই লিখে জানাতে পারবো। কিন্তু পারছি কই?

পরিশ্রমে, নানা চিন্তায় শরীরটা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। একটু কাজ করলেই এখন মাথা ধরে। হাত-পা অবশ হয়ে আসে। কী যে কষ্ট হয়, কাউকে বোঝাতে পারি না।

বাড়ি থেকে একদম বেরুই না। লেখক-বন্ধুরা মাঝে মধ্যে আসে। ছুটির দিনে আড্ডা জমে ওঠে। লেখা নিয়ে আলোচনা হয়। কার ক'টা বই বেরুলো। কে কোথায় লিখছে। বাধ্য হয়েই সব শুনতে হয়। নিজের দুঃখ বাড়ে। 'যন্ত্রলেখা'-কে আলাদা একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখেছি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি, নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। বেকার চেষ্টা করেছি। ভাগ্যে না থাকলে যা হয়!

রাতের দিকে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, এক একদিন 'যন্ত্রলেখা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াই। রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিই। গায়ে হাত বুলোতে থাকি। মেসিনের মাথায় লাল আলোটা দপ দপ করতে থাকে। ভেতরে কেমন যেন শব্দ হয়। তামার সরু হাতটা কেঁপে ওঠে। বৈদ্যুতিক চেয়ার ফাঁকাই পড়ে থাকে। বসি না। অন্য একটা চেয়ার টেনে নিই। ...

পড়তে পড়তে মনে হয়, এতদিন ধরে কী লিখলাম? এতো কিছুই হয়নি। কই, এরকম তো লিখতে চাইনি! কী হবে এসব দিয়ে? পাতাগুলো টেনে টেনে ছিঁড়তে শুরু করি। সাদা কাগজের টুকরো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

কাল রাতেও ঠিক এইভাবেই বসেছিলাম। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে। বাইরের রাস্তায় হঠাৎ কোন ছুটে যাওয়া গাড়ির শব্দ। জানলার কাছের দেবদারু গাছটা হাওয়ায় কাঁপছে। মাঝে মাঝে বিকট শব্দে প্যাঁচা ডাকছে। ঘুম আসছে না কিছুতেই।

চেয়ারে বসে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করছিলাম। কী রকম যেন মনে হচ্ছিল। উঠে গিয়ে লেখার খাতাটা নিয়ে এলাম। 'যন্ত্রলেখা' পড়ে রইলো। বৈদ্যুতিক চেয়ারেও বসলাম না। লাল আলোটা নিবিয়ে দিলাম। জানলা দিয়ে সাদা জ্যোৎস্না এসে ঘরের মেঝেয় পড়েছে। তিরতিরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আবছা অন্ধকারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আস্তে আস্তে লিখতে শুরু করলাম। পাতার পর পাতা। লিখলাম, কি করে কত দিনের চেষ্টায় এই 'যন্ত্র-লেখা'কে তৈরি করেছি। কেন করেছি। একে দিয়ে কী কী করতে চেয়েছিলাম। লিখলাম, আমার ব্যর্থতার কথা। নিজের দুঃখ দুর্ভাগ্যের কথা। লেখা আর শেষ হয় না। কত কিছু লেখার আছে। হাত কিছুতেই থামতে চাইছিল না। লিখছি। আর পড়ছি। সাদা পাতায় লাল কালির অক্ষরগুলো যেন রক্ত দিয়ে লেখা।

কতক্ষণ লিখেছিলাম, খেয়াল নেই। লিখতে লিখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী একটা শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, জানলা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে গায়ে পড়েছে। বাঁ হাতটা অলতোভাবে 'যন্ত্রলেখা'র ওপর পড়ে আছে। ডান হাত নীচের দিকে ঝুলে আছে। কলমটা হাত থেকে টুপ করে খসে পড়েছে। সেই শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল।

নীচু হয়ে কলমটা তুলতে গেলাম। হাত কেঁপে উঠলো। কেমন যেন শীত শীত করছে। পড়ে গিয়েও নিবটা কিন্তু ভাঙেনি। আঙুলের ডগায়, হাতের চেটোয় লাল কালি। মাথার চুলে হাত মুছতে মুছতে 'যন্ত্রলেখা'র দিকে চাইলাম। লাল আলো জ্বলছে না। তামার হাতটাও নড়ছে না। কোন শব্দ নেই। বৈদ্যুতিক চেয়ারে কত দিনের ধুলো জমে আছে।

নীচের দিকে চেয়ে দেখি, সাদা সিমেন্টের মেঝের ফোঁটা ফোঁটা লাল কালির দাগ। রক্তের মতো।

ফণিভূষণ আচার্য্য

বুড়িমা   তোমাকে আর কেউ চায় না শীত বসন্তে
বুক-মোচড়ানো শোকের মতো তোমার এই নিঃসঙ্গতা
কেউ চায় না

কেউনা   তবু তুমি বেঁচে আছো নিষ্পাপ গাছের মতো
ছায়াহীন দিগন্তের ধারে   ঝড়ে ভাঙা ডালপালা
ভীষণ নিঃশব্দে কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছে
বুক চিরে অশ্রুবাহী নদী
অস্পষ্ট ধূপের গন্ধে ধিকিধিকি পুড়ছো
যেন সুগন্ধি বিষাদ
ঘাসের ঝুপড়িতে একা বারোমাস দীর্ঘতম শীতে নির্বাসিত

বুড়িমা   তোমার চোখে প্রতিদিন যে শিশুটি
হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে
সে তোমাকে আঁচলের গন্ধে ঠিক চিনে নেবে বুনো কুসুমের মতো
রাতের শিশির মুছে তুমি তাকে কোলে টেনে নিও

বলাই কর্মকার (জন্ম ১৯৪৪) সরকারী চারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৬৭)। "ক্যানভাস আর্টিস্টস সারকেলের" সদস্য। গ্রান্ট এডভারটাইজিং-এ আছেন। নাগরিক নৈর্ব্যক্তিক কংক্রিটের বিষণ্ণ একটি মানুষ, দুটি বিপন্ন হাত আর অজস্র রং।

রমানাথ চট্টোপাধ্যায়

বিস্ফোরিত পঙ্ক্তিগুলি টেনে ধরে ধূর্ত পরিচ্ছদ
অনর্গল ধ্রুব যায় রূপ ভেঙে করতল ভেঙে
যেমন জেলখানা ভেঙে ছুটে যায় বিপ্লবী বালক
তুমুল স্রোতের মধ্যে। স্বপ্নে পরিচ্ছদ জ্বলে যায়।

নিরুপম বীজগুলি পাষাণে প্রতিমা গড়ে তোলে
অনিন্দ্য বন্দুক থেকে ছিটকে পড়ে গোলাপের কুঁড়ি
বন্ধ্যা মাঠে ফলে ওঠে ঋষিকল্প উজ্জ্বল বাগান
আমূল স্বপ্নের মধ্যে নিয়মিত ধ্রুব ভেঙে যায়
বিপ্লবী বালক যেন ভেঙে দ্যায় নির্মম প্রবীণ
বিস্ফোরিত পঙ্ক্তিগুলি বয়ে আনে নিশ্ছিদ্র পোশাক।

নিপুণ বন্দুক থেকে ছিটকে পড়ে নিরুপম বীজ
বহুদিন বন্ধ্যা মাঠ সাজিয়ে বাগান গড়ে ওঠে ॥

ঘরে, একঘরে

কবিরুল ইসলাম

কোথায় সে জোয়ার? আমি শুধু কালেভদ্রে তোমার জ্বালুক জ্বরের ওষু
ভাটার টানের মতো, কিংবা তাও নই
নিতান্ত হাতুড়ে
স্বপ্নাদ্য তো অনেক দূরের ঘুর পথ!
শুধু প্রাত্যহিকতার তল্লাশি?
—তাও যেন ছিলো ভালো! তার বদলে
রোজকার সম্পর্ক খারাপ হয় রোজ, যেন সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক রচনা
ধারহীন, ধারাহীন, বন্ধ জলাশয়
রোজগারে টান পড়লে যে রকম আত্মসম্মানও নষ্ট ফলের তুল্য
কলকাতার রাস্তাঘাট আরও একটু ক্লিন্ন হয়
আবর্জনা জমে ওঠে প্রাগৈতিহাসিক।

যদিচ একঘরে থাকি, তবু একা, প্রায় একঘরে
হায়, উভয় সংকটে পড়ে, হে আত্মজ, হে আত্মজা
তোমরা রা[illegible]ক্ষী থেকে গেলে

রূপিণী। শত্রুনাশ দ্বারা তিনি
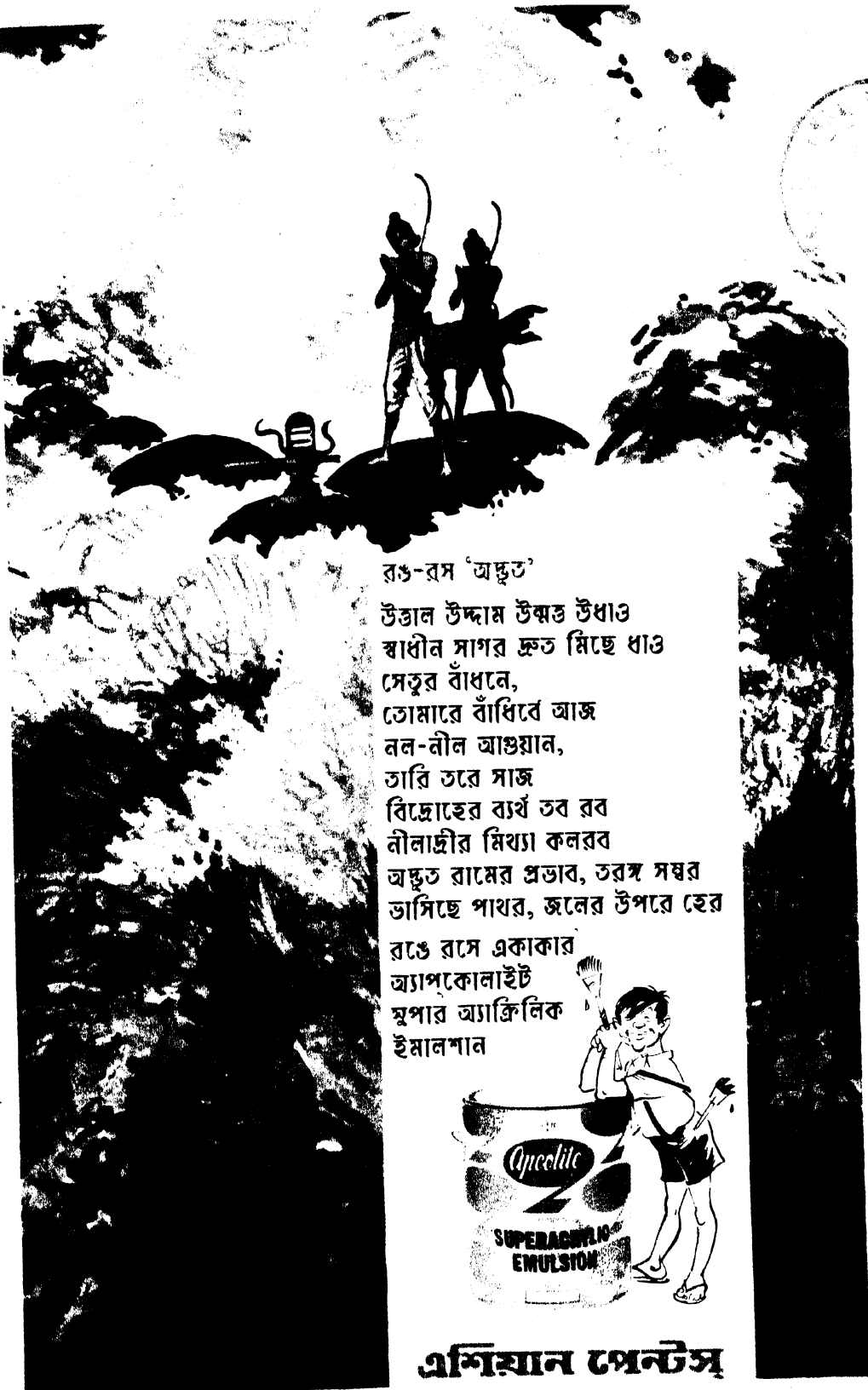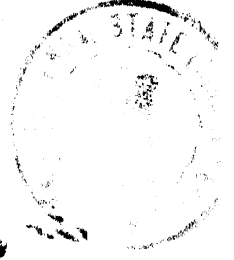
রঙ-রস 'অদ্ভুত'
উত্তাল উদ্দাম উন্মত্ত উধাও
স্বাধীন সাগর দ্রুত মিছে ধাও
সেতুর বাঁধনে,
তোমারে বাঁধিবে আজ
নল-নীল আগুয়ান,
তারি তরে সাজ
বিদ্রোহের ব্যর্থ তব রব
নীলাদ্রীর মিথ্যা কলরব
অদ্ভুত রামের প্রভাব, তরঙ্গ সম্বর
ভাসিছে পাথর, জলের উপরে হের
রঙে রসে একাকার
অ্যাপকোলাইট
সুপার অ্যাক্রিলিক
ইমালশান
Apcolite
SUPERACRYLIC
EMULSION
এশিয়ান পেন্টস্
CASAP-45-244 BEN
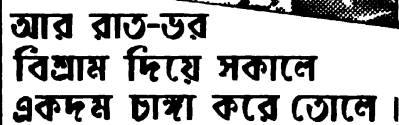
সমরাজিৎ কর

॥ এগার ॥
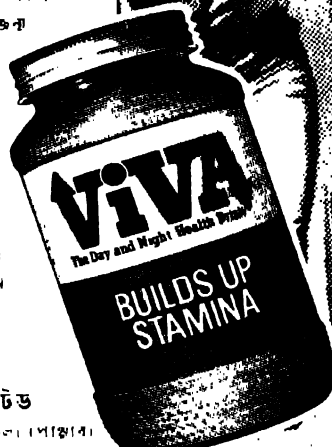
কথায় বলে, যদি কখনও আপনার মধ্যে এতটুকু গুণ প্রকাশ পায়, দেখবেন, আপনার আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে অনেক অজ্ঞাতকুলশীল প্রতিবেশী পর্যন্ত মুহূর্তে কেমন যেন বোবা হয়ে গেল। তখন আপনার নামটিও যেন দাঁতে কাটতে নেই। চলতি পথে সামনে পড়লে তাদের ভাবটা এমন, আপনি যেন নেহাতই অপরিচিত জন। অথবা, তুমি আর এমন কী হে! আপনি যে তাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, অলীক কল্পনায় ঠিক এমনই একটি ভাব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তির মধ্যে তখন তারা ডুবতে শুরু করে। বিদ্বেষ? জানি না। তবে নিজেদের মানসিক দীনতাকে ভুলে থাকায় এটাই তাদের কাছে একমাত্র অবলম্বন হয়ত।

ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, ব্যাপক অর্থেও কথাটা হয়ত সত্য।

কিমিন থেকে তেজপুরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন রাত তিনটে। পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঝড়। অরুণাচল গেস্ট হাউসে হাজির হওয়ার পর মনে হলো, আমরা বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ঝুঁকি নিয়েই পথ চলেছি। মাঝে-মাঝে দৈত্যের মত ট্রাক। তাদের তীব্র হেড লাইটে চোখ যেন ঝলসে যায়। পাশ কাটিয়ে আমাদের দুটি জীপ ছুটছিল ঘণ্টার প্রায় এক শ' কিলোমিটার বেগে।

আমাদের ড্রাইভার ছিলেন দাস। তাঁকে বললাম, এত জোরে চালাচ্ছেন। দেখবেন, এদিক-সেদিক না চলে যাই।

দাস বললেন, উপায় নেই, স্যার। আকাশের অবস্থা খুব খারাপ। মনে হচ্ছে, ঝড় আসবে জোর। আরও বেশী বাদল নামবে। তার আগে তেজপুর শহরে না পৌঁছলে আমরা পথে আটকে পড়ব। তখন কোন আশ্রয় পাবেন না আপনারা।

কিন্তু এত করে, তেজপুরে ঢোকার মুখেই আমাদের জীপের একটি টায়ার গেল ফেঁসে। মেরামত করতে লাগল ঘণ্টাখানিক সময়।

বলতে কী, সে রাতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি কেউই আমরা ঘুমতে পারি নি। পরদিন সাতটা নাগাদ তল্পি তল্পা বেঁধে এলাম ভোমরাগুরি ঘাট। তারপর আবার সেই ফেরি। আবার ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শিলঘাট হয়ে যেতে হবে ডাকলাবান্দা। সেখান থেকে ডিমাপুর।

ফেরিতে উঠে সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং অজিতবাবু জীপের মধ্যেই বসে রইলেন। বসা মানে ঘুম। অস্বাভাবিক কিছু নয়। গত রাতটা তো প্রায় জেগেই কেটেছে আমাদের। ঘুম আমারও যে পাচ্ছিল না, সে কথা বলব না। তবু ব্রহ্মপুত্রকে আর একবার দেখে নেওয়ার লোভটি সামলাতে পারলাম না। গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ফেরির পেছনে রেলিং-এর পাশ বরাবর।

উজান বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ফেরি। গত রাতের বৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের জল কিছুটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে স্রোতের বেগ। মাঝে মাঝে রাক্ষসে ঘূর্ণি দেখলে বুক যেন শুকিয়ে যায়।

আমার অদূরে দাঁড়িয়ে কারকটি ছেলে। একেবারে টকটকে ফরসা। বড় বড় জনৈক ভদ্রলোক। কাপড়ের ব্যবসায়ী। কনফেকশনারিরও ব্যবসা আছে কোহিমায়। এখন চলেছেন নওগাঁয়। ফেরিতে ওঠার মুখেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ছেলেগুলিকে লক্ষ করে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বাড়ি এদের?

আমার প্রশ্নে ভদ্রলোক ছেলেগুলিকে একবার দেখে নিয়ে কতকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই যেন বললেন, চিনতে পারলেন না? এরা মিজো।

চমৎকার চেহারা, মশায়। আমার মন্তব্য।

হ্যাঁ, চেহারায় চমৎকার বটে। তবে চরিত্রে এক-একজন একেবারে বিচ্ছু। ভদ্রলোকের উত্তর।

সে আবার কী? আমার প্রশ্ন।

মিজোরাম গেছেন কখনও?

না।

তা হলে ব্যাপারটা আপনার পক্ষে বোঝা শক্ত। মশায়, বলব কী আপনাকে।

নাগা মেয়েরা বাঁশের চোঙায় জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে

কার ব্যবসা। আমাকে প্রায়ই সেখানে যেতে হয় বলেই ওদের হালচাল আমার জানা হয়ে গেছে। আইজল যান। মিজোদের দেখবেন সব ফিট বাবু। ছেলে মেয়েদের কী সুন্দর চেহারা। বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলবে ধীরে ধীরে। এক একটা কথা যেন মিছরির টুকরো। সাজ পোশাক? মশায়, জানি না, এত টাকা ওরা পায় কোত্থেকে। তবে পাকা ব্যবসায়ী সব। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? সত্যি কথা কেউ বলবে না। নাগাড়ে একের পর এক মিথ্যে এমন ভাবে বলে যাবে, আপনি মিথ্যে বলে তাদের ধরতেই পারবেন না। এমন আর্ট মেরে বলবে, আপনার পক্ষে ধরা শক্ত। দেখে শুনে আমার কী মনে হয়েছে, জানেন? ওরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেই জন্মায়, সারা জীবন সদা মিথ্যা কথা বলিব।

আমার কথায় তাঁর মধ্যে কোন

নিজেদের মধ্যে [illegible] ছেলেদের দেখে নিলেন একবার। তারপর বললেন, 'মঃ কর, বলছি না, আমরা ব্যবসা করি? আমাদের নানা রকম লোক ঘাটতে হয়। তবু বলব, অমন মিথ্যে কথায় মন ভোলানো জাত ভারতে আর কোথাও আমি দেখিনি।

জানি না। এটা তাঁর একমাত্র নিজস্ব অভিজ্ঞতাই হয়ত। তবে সুবনসিরির এক জায়গায় জনৈক পি ডব্লু ডি কর্মীকে বলতে শুনেছি, ট্রাইবদের মধ্যে মিথ্যে কথা বলাটা নাকি একটি অভ্যেসের মত। ছল চাতুরী ওদের জীবনে কখনও কখনও আভরণ। ওরা মুখ দিয়ে শব্দ করে। শব্দ করে বনের পশুদের বিভ্রান্ত করে নিয়ে আসে নিজেদের নাগালের মধ্যে। অবশেষে হত্যা। শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার সময়ও ওরা আশ্রয় নেয় ছলনার। চাতুরীর। অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ ওদের কাছে আশংকার। চট করে তাদের কখনও ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। পথে তেমন কারোর দেখা পেলে মিথ্যে কথার ছলনায় তাকে ওরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে এনে তোলে। তারপর করে হত্যা।

হ্যাঁ। এ সব এখন অতীত কথা হয়ত। আগের তুলনায় এখন তারা অনেক সামাজিক। অনেক সভ্য। মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে দিন দিন তাদের সখ্যতা বাড়ছে। অজ্ঞাত মানুষ সম্পর্কে যে আশংকা তাও দ্রুত কমে আসছে দিন দিন।

ভদ্রলোক বললেন, মশায়, আপনি নাগাল্যাণ্ড যাচ্ছেন, বললেন না? উঃ! এই নাগারা হলো গিয়ে আর এক চিজ। দিয়ে যাও, দিয়ে যাও, আর দিয়ে যাও। আপনি শুধু দিয়েই যাবেন। আর ওরা শুধু নেবে। এমন ডিম্যাণ্ডিং জাত আমি লাইফ-এ দেখি নি। একেবারে ছেলেমানুষের মত বায়নাবাজ। তাতে অপরের যে অসুবিধে হচ্ছে সে

সাত্যি বলছি, কী না?

কী আর বলব। ভদ্রলোকের কথা বলার ধরন দেখে হাসিই পেলো। ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই হয়ত তাঁর মধ্যে এ ধরনের মনোভাব গড়ে উঠেছে। এক একটি জাতি সম্পর্কে অদ্ভুত অনাস্থা।

কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ বা জাতি সম্পর্কে এ ধরনের এক পেশে ধারণা শুধু এ দেশেই বা কেন, বিদেশেও কি নেই?

মনে পড়ে, বছর দশেক আগে। পিটস্‌বার্গের চাথাম কলেজে আমাদের তখন ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম চলছে। সেখানে এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এক মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। বয়স্ক ভদ্রলোক। বাড়ি বস্টোনে।

কথার মাঝে ভদ্রলোক হঠাৎ এক সময় আমায় জিজ্ঞেস করে বসলেন, ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম তো তোমাদের দিন সাতেকের মধ্যেই শেষ হচ্ছে। তা এর পর পড়তে যাচ্ছ কোথায়?

বললাম, টেকসাসের রাজধানী অস্টিনে। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোকের দু চোখ তো কপালে উঠল। আমার কথা যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না এমন একখানা ভাব নিয়ে তিনি বললেন, হে ভগবান! সে কী? এত জায়গা থাকতে শেষে কি না টেকসাস?

কেন বলুন তো? এবার আমার কণ্ঠেও বিস্ময়।

জানো না, টেকসানরা বড় দেমাকে জাত?

না।

তা হলে শোনো। প্রথমত ওরা গায়ে পড়ে কারোর সঙ্গে কথা বলে না। দ্বিতীয়ত কথা যদিও বা বলে, তার নমুনাটা হবে এই রকম। ধরো, কেউ তোমার সঙ্গে কথা বললো। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, মশায়, আপনাদের এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক'টা প্রদেশ? দেখবে, লোকটি তখন টেকসান সুলভ ঘাড় নাচিয়ে বলবে, কেন? উনোপঞ্চাশটি এবং একটি, সেটা হলো একক নক্ষত্রের দেশ টেকসাস। টেকসাসের নিজস্ব পতাকায় একটি নক্ষত্রই আঁকা থাকে। তার উত্তরটি শুনে তুমি হয়ত জিজ্ঞেস করলে, তা ওভাবে না বলে, বললেই তো পারতেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট পঞ্চাশটি প্রদেশ আছে? তোমার কথা শুনে এবার দেখবে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে, ও, নো। টেকসাস ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট, অলসো দ্য রিচেস্ট। উই হ্যাভ বিগ র‍্যাঞ্চ, বিগ কাউ, বিগ হর্স। এ কথার উত্তরে তুমি হয়ত বলে উঠলে, তা কেন? আমি তো শুনেছি, আয়তনে আলাস্কাই সবচেয়ে বড়। তখন সে বলবে, ফরগেট ইট। দ্যাটস অল আইস। শুনলে, টেকসানদের নমুনা? বড় টাকার গরম, ভাই, ওদের বড় টাকার গরম।

তাই ফেরিতে দাঁড়িয়ে আমার সতীর্থ যাত্রীটির মুখে মিজো এবং নাগাদের সম্পর্কে টীকাসহ নানা রকম মন্তব্য শুনছিলাম, তখন মোটেই অবাক হই নি। মানুষ একে অপরের ব্যাপারে এ রকমটি নানাভাবে ভাবে। সে

রেশমী কোমল, উজ্জ্বল কেশভার! সানসিল্ক শুধু শ্যাম্পুই নয়—আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রসাধনী। কারণ, একমাত্র সানসিল্ক শ্যাম্পুর যত্নই আপনাকে দিতে পারে সেরা সৌন্দর্য, আর সৌন্দর্য সাধনে তৃপ্ত এক অভিনব অনুভূতি!
আর এখন, 'নতুন-রূপের' সানসিল্ক শ্যাম্পুতে পাবেন আরো কিছুঃ প্রাকৃতিক উপাদান—যা চুলের জন্যে উপকারী বলে আপনার জানা আছে।
যতই সাজগোজ করুন না কেন, সানসিল্ক ব্যবহার করলে তবেই আপনার রূপ সত্যিসত্যি ফুটে উঠবে! এখনই ব্যবহার করতে শুরু করুন।
সান সিল্ক*
মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রসাধনী
'নতুন—রূপের' সানসিল্কের ভাণ্ডারে পাবেন প্রত্যেক রকমের চুলের উপযুক্ত রকমারি শ্যাম্পু।
স্বাভাবিক চুলের জন্যে আমণ্ড। তেলা চুলের জন্যে লেমন। শুকনো চুলের জন্যে আমলা। নিষ্প্রভ প্রাণহীন চুলের জন্যে প্রোটিন। নরম চুলের জন্যে শিকাকাই।
লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

অথবা অজ্ঞতা হেতু হীনমন্যতা। বিশেষ কোন মানুষ অথবা কোন জাতি সম্পর্কে অবশেষে সেই ভাবনা কখনও কখনও হুল ফোটানো প্রবাদের মত পাঁচ জনের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। আর কোন কথা যখন প্রবাদে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার সত্যাসত্য নিয়ে মাথা ঘামায় ক'জন?

আবার শিলঘাট। ফেরি শিলঘাটে গিয়ে নোঙর করল পৌনে দশটা নাগাদ। ফেরি থেকে জীপ খালাস করতে গেল আরও আধ ঘন্টার মত সময়। ফেরার পথে ভিড় ছিল আরও বেশী।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, বুঝলেন না, বিহু উৎসবের পর এখন সব যে যার বাড়ি ফিরছে কুটুমবাড়ি থেকে। অনেকে ফিরছে নিজেদের কাজের জায়গায়। তাই এত ভিড়।

বললাম, এখান থেকে কতটা পথ ডিমাপুর?

তা বেশ খানিকটা হবে। আমরা বরং একটা কাজ করি। সেই জোকলাবান্দা দিয়েই তো যেতে হচ্ছে। পথ তো দেখছেন? খানিকটা পাহাড়ী, কিছুটা অবশ্য ভালো। জোকলাবান্দায় পৌঁছতে প্রায় এগারটা বেজে যাবে। সেখানে গিয়েই আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই। লাঞ্চ সেরে যদি সাড়ে বারোটা নাগাদ রওনা দিতে পারি, আমার মনে হয় নোমালিঘাট আমরা বিকেল আড়াইটে নাগাদ পৌঁছে যাবো। সেখান থেকে ডিমাপুর ১১৬ কিলোমিটার।

চমৎকার হিসেব। কী বলব। জিওলজিস্টরা যে এমন 'সাংঘাতিক' মানুষ হয় আমার জানা ছিল না। গত কাল সারা দিনরাতের ধকল। কথা শুনে বুঝতে পারছি, আজও রাত আটটার আগে পর্যন্ত চাকার ওপর বসে থাকতে হবে। তাও আবার জীপের চাকা। বুঝুন ব্যাপারখানা। পরশুরামের সেই হাড্ডি পিলপিলানের মত অবস্থা। আর এই পাথর সাহেবদের কাছে সেটা যেন কোন সমস্যাই নয়।

বললাম, তা লাঞ্চের পর একটু ক্ষণের জন্যে ন্যাপ নিয়ে আমরা রওনা হতে পারি।

আমার কথায় যেন লাফিয়ে উঠলেন অজিতবাবু। বললেন, ভালো প্রস্তাব। একটু ন্যাপ নিলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠবে।

সমরজিৎ চক্রবর্তীর ঠোঁটের কোণে হাসি। —বেশ, তাই হবে। বুঝতে পারছি, একটু বাড়াবাড়িই হচ্ছে।

শিলঘাট থেকে জোকলাবান্দা দশ কিলোমিটারের মত পথ। আমরা সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম বেলা প্রায় এগারোটা। যাওয়ার পথে এখানে থেমেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তাই জায়গাটি তখন ভাল ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখতে পারি নি। তখন মনে হয়েছিল বড় বড় সড়কের পাশে দু চারটে দোকানপাট এবং কিছু ঘর বাড়ি নিয়ে যেমন ছোটখাটো লোকালয় গড়ে ওঠে জোকলাবান্দা তেমনই হয়ত কিছু হবে। কিন্তু এখন দেখলাম, ঠিক তা নয়। বরং শহরই বলতে পারেন এই জায়গাটিকে।

স্বাধীনতার পর এখানে প্রচুর লোকজন এসেছে। অসমীয়া যেমন

কোহিমা শহর।

নাগা যুবক।

ছবি ঃ শম্ভু সেন

নাগা অলংকার

মানুষ। বিরাট বাজার। পোস্ট অফিস, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবই আছে এখানে। গড়ে উঠেছে ঘন বসতি। দূর গ্রামাঞ্চল থেকে হাট বাজার করতে আসে গারোরা। তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসে তারা বাঁশের তৈরী নানা রকম সামগ্রী। এখানে সেগুলি তারা বিক্রি করে। বিক্রির পয়সা দিয়ে কেনে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

আছে হোটেল। হোটেল না বলে বলি খাবারের দোকান। যাদের মালিক বেশির ভাগই বিহার অথবা উত্তর ভারতের মানুষ। যাদের খরিদ্দার পথ চলতি যারা, তারা। ট্রাকের ড্রাইভার, ক্লিনার, রিপ্রেজেনটেটিভ অথবা ভিন অঞ্চলের লোকজন। ক্যামেরার ফিল্মও পাবেন এখানে। পাবেন ক্যাডবেরি, ব্রিটানিয়া অথবা মাংঘারামের বিস্কুট।

আসাম থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলের মানুষের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য—ব্যবহারে ওরা বড় বিনয়ী। বড় মধুর। ওরা কথা বলে ধীরে। চলনের মধ্যেও চাপল্য কম। পানের দোকানে যান। আপনি বলবেন, একটা পান দিন। দেখবেন, পানের দোকানীর ঠোঁটের প্রান্তে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে মধুর হাসির রেখা। ছোট্ট করে হয়ত সে বলবে, আপনারা বলেন পান। আমরা বলি তাম্বুল। তারপর ছোট্ট একটি পানের পাতা হাতে নিয়ে তাতে চুন বোলাবে। চুন বোলানো শেষ হলে বাঁ হাতের চেটোয় পানটি রেখে আস্ত একটি কাঁচা সুপুরি রাখবে তার ওপর। তারপর দু হাত বাড়িয়ে কোন দেব-দেবীকে যে ভাবে আমরা উৎসর্গ করি সেই ভাবে পানটি এগিয়ে দেবে আপনার দিকে।

দাস এসে বললেন, কয়েক দিন ধরেই তো গাড়ি চলছে, স্যার। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। গাড়ি চেক করা দরকার। একটা হেডলাইট জ্বলছে না। কারবুরেটারেও গোলমাল দেখা দিয়েছে।

দাসের কথা শুনে সমরজিৎ চক্রবর্তীর তো মাথায় হাত। বললেন, কী বলছেন, দাস? তার মানে, ঘন্টা দুই-এর ধাক্কা!

উপায় নেই, স্যার। গাড়ি এর মধ্যেই ট্রাবল দিচ্ছে। ডিমাপুর থেকে কোহিমা খাড়াই পথ। তারপর পুকপুর যেতে হবে। অনেকটা রাস্তা। পথ আরও খারাপ। বললেন দাস।

অতএব গাড়ি গ্যারেজ করতেই হলো।

এই গ্যারেজেই পরিচয় হলো গ্যারেজের মালিকের সঙ্গে। বছর বত্রিশ বয়েস। এক সময়ে বাড়ি ছিল ময়মনসিং। এখন বাংলা দেশের পাট তুলে চলে এসে জোকলাবান্দায় গ্যারেজ খুলে বসেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, মোটর মেকানিকের কাজ জানতাম, স্যার। না হলে পথে বসতে হতো। নগদ তো কিছু ছিল না। এই গায়ে খেটে যেটুকু করা।

বাঁশের চাটাই ঘেরা ঘর। সহকারী হিসেবে সঙ্গে পেয়েছেন এক শ্যালক। এই দু জনকে দিয়েই চলছে গ্যারেজ। নিজেদের পরিশ্রমকে সম্বল করে বেঁচে থাকার চেষ্টা।

হয়ে পরগাছা চরিত্র যে ও'রা পান নি, বলতে হবে এটা ও'দের ভাগ্য। নইলে দণ্ডকারণ্য সুন্দরবন করতে করতেই এতদিন হয়ত শেষ হয়ে যেত ও'দের জীবন।

জনৈক ভদ্রলোক বললেন, যান না। সারা পূর্বাঞ্চলটা দেখে নিন। শুধু শহর নয়। গ্রামে গ্রামে যান। ভারতের কোন অঞ্চলের মানুষ নেই এখানে? কে অসমীয়া, কে বাঙ্গালী অথবা পাঞ্জাবী—সাধারণ মানুষ এ সব কী বোঝে, মশায়? বোঝার দরকারই বা কী? এদের মধ্যে ওই নেতারা পড়লেই যত গোলমাল। নেতা মানে তো ভেড়ার পালে বাঘ পড়া।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কি করেন?

মাস্টারি। ভদ্রলোকের উত্তর।

তাই। এই কারণেই আপনার মনটা এখনও সাদা।

আমার মন্তব্যে হেসে ফেললেন ভদ্রলোক।

মনে মনে ভাবলাম, হাসুন। কিন্তু আপনাদের মত সাদা মনের মানুষ যে দিন দিন কমে যাচ্ছে।

জোকলাবান্দা থেকে রওনা হতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। এখান থেকে আবার সেই পুরনো পথ। জোরহাট-ডিব্রুগড় হাইওয়ে। ভয় পেয়েছিলাম, পথে হয়ত বৃষ্টি নামবে। এবং ঝড়। ভাগ্য ভাল। তা আর হয় নি। বরং কিছুক্ষণের মধ্যে পরিষ্কার আকাশ রোদের আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠল। রাস্তার বাঁ পাশে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সমভূমি। ডান দিকে বন জঙ্গল। কাছাড় পর্বতমালা। খুব একটা উঁচু বলব না। লাল বেলে পাথর। বড় বড় গাছ বলতে যা বোঝায় তাও তেমন নেই সেখানে। কিছু দূর এগিয়ে হাইওয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। তারপর আবার সেখান থেকে আমরা নেমে এসেছি। আবার সমভূমি। বাঁ পাশে শুরু কাজিরাঙ্গার বন। সেই বন অতিক্রম করে গেলে দু পাশেই সমভূমি আবার। ধানের ক্ষেত।

এই পথ দিয়ে নোমালিঘাট পেঁছিতে বিকেল চারটে বেজে গেল। এখান থেকে জোরহাট-ডিব্রুগড় হাইওয়েকে বিদেয় দিয়ে ডান দিকে ঘুরলাম। শনিবার। পথে প্রচুর ভিড়। এখানে আছে বিরাট চা বাগান। সম্প্রতি একটি কারখানাও বসেছে। এখানে ভিনদেশী মানুষের প্রাচুর্য। চা বাগানের কুলি কামিন। শনিবার হাটবার। একটা ফাঁকা জায়গায় বসেছে সাপ্তাহিক হাট। কাটা কাপড়ের দোকান। মনোহারী সামগ্রী নিয়ে বসেছে সাপ্তাহিক বিক্রেতারা। বড় বড় দোকানের মালিক বেশির ভাগই উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের। এ সব নিয়ে নোমালিঘাট এ অঞ্চলের একটি শিল্প নগরী।

নোমালিঘাট থেকে ডান দিকে এগিয়ে গেছে ডিমাপুর হাইওয়ে। বেশ কয়েক কিলোমিটার পড়ল চা বাগান। একেবারে পথ ছুঁয়ে। ছায়াশীতল সবুজ। তারপর রুক্ষ মাটি। পুরনো বাঁকা রাস্তাটি সোজা করার জন্যে চলছে কাজ। মাঝে মাঝে চলছে আরও চওড়া করার চেষ্টা। শত শত মজুর এ সব মজুরের বেশির ভাগই সাঁওতাল এবং মধ্যপ্রদেশের মানুষ। পথ চাই। আরও পথ। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নাগাল্যাণ্ডের সঙ্গে দরকার আরও বেশী সংযোগ।

নোমালিঘাট থেকে ডিমাপুরের দূরত্ব এক শ' ষোল কিলোমিটার। ডিমাপুর যখন পেঁছিলাম তখন সন্ধ্যে। ছ'টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। শহরে ঢুকতেই বিদ্যুতের আলোয় চোখ ঝলসে উঠল। প্রচুর দোকান পাট। রাস্তায় জনতা। আধুনিক বার, রেস্তোরাঁ। বাটার দোকান। সুটিং-শার্টিং-এর আলোয় দিন করা শো রুম। অসমীয়া এবং বাঙ্গালীর ভিড়। দেশ-ভাগের পর প্রচুর বাঙ্গালী এসে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এক সময় আসামেরই অংশ ছিল ডিমাপুর। এখন নাগাল্যাণ্ড। নাগা ছেলেমেয়েরা বিলেতী পোশাকে সেজে বেশ আড্ডার আমেজ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে মনে হয়, আমরা কসমোপলিটান শহরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং মিজোরামের খাস দরজা এই ডিমাপুর। এ অঞ্চলের বৃহত্তর বাণিজ্যিক কেন্দ্র। নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমা। কিন্তু তার বিমান বন্দরটি এখানে এই ডিমাপুরে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের বড় বড় দপ্তরও বসান হয়েছে এখানে।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, অনেকটা পথ এসেছি। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে। এখান থেকে কোহিমার দূরত্ব চুয়াত্তর কিলোমিটার। এবার আর সমতলভূমি নয়। খাড়াই পথ। খাড়াই পথে প্রায় চার হাজার ফুটের মত উঠতে হবে আমাদের। তা ছাড়া রাস্তাটা এত আঁকা-বাঁকা—হ্যাঁ, ভাল কথা। বড়ি চাই নাকি আপনার? আপনার তো আবার এ ধরনের জার্নিতে অভ্যেস নেই।

বড়ি। মানে গা গুলিয়ে ওঠা বন্ধ করার ওষুধ?

বলতে বাধা নেই। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়ে থাকে। আমিও বাদ যাইনি। ভোলাগঞ্জ থেকে চেরাপুঞ্জি আসার পথে জীপে কেলেংকারিই বাধিয়ে বসেছিলাম আমি। ব্যাপারটা খেয়াল করে অরুণাচল যাওয়ার সময় সমরজিৎ চক্রবর্তী তাঁর ওষুধের কলেকশনের সঙ্গে আমার জন্যে কিছু গা-গোলান বন্ধ করার ওষুধ সঙ্গে নিয়েছিলেন। অরুণাচলের সর্পিল পাহাড়ী পথে চলাফেরার সময় তার নিয়মিত সদ্ব্যবহারও করেছি। বলতে কী, তারপর থেকে পাহাড়ী পথ দেখলেই আমার কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে বড়ি গলাধঃকরণ। এবার সমরজিৎ চক্রবর্তীর কথা শুনেই বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বললাম, ঠিক কথা। ওভারস্মার্ট হয়ে কাজ নেই। দিন দু চারটে বড়ি। খেয়েই নিই।

আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন চক্রবর্তী সাহেব। ওষুধের ব্যাগ কাছেই ছিল। তা থেকে দুটি বড়ি বের করে . . . অভ্যেস কাজ হবে।

মিনিট দশেকের জন্যে একটি চায়ের দোকানে এসে বসলাম আমরা। চা পানের পর বড়ি খেয়ে বেরোতেই পথে আলাপ হলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বাড়ি সিলেটে। আমাদের পরিচয় পেতেই যেন সোচ্চার হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, এ সময় নাগাল্যাণ্ড যাচ্ছেন মশায়। আবহাওয়া বড় থমথমে।

ভদ্রলোক এমনভাবে কথাটি ছুঁড়ে দিলেন, আমরা ঘাবড়ে গেলাম।

কী ব্যাপার বলুন তো? প্রশ্ন করলাম।

আর বলবেন না। পরশু কোথায় যেন সেমা আর অঙ্গামী দু দল নাগার মধ্যে দাঙ্গা হয়ে গেছে। হাঙ্গামায় খুনও হয়েছে একজন। এই নিয়ে আবহাওয়া খুব গরম। এখন শুনছি এই হাঙ্গামার জন্যে প্লেইনের লোকদের দোষ দিচ্ছে ওরা। এই তো, আপনারা আসার কিছুক্ষণ আগেই নাগাদের একটা মিছিল বেরিয়েছিল এখানে। ওরা প্রতিশোধ চায়। আমরা—বাঙ্গালীরা তো, মশায়, ঘাবড়ে গেছি। জানেন তো, এদিকে পান থেকে চুন খসলেই ওই যত দোষ নন্দ ঘোষ। মানে বাঙ্গালী।

ভদ্রলোকের কথা শুনে হোঁচট খেতে হলো। বলেন কী উনি? না। শুধু উনিই নন। আরও দু-চারজন জুটে গিয়েছিল ততক্ষণ। সবার মুখেই এক কথা। ও'দের কথাবার্তা শুনে বেশ দমে গেলাম। দূর থেকে নাগাদের সম্পর্কে প্রচুর গল্প শুনি আমরা। ওরা নাকি দুর্ধর্ষ জাত। কল্পনার মাহাত্ম্যে সে সব গল্প অতিরঞ্জিতও হয় যথেষ্ট। তবে একেবারে খোদ নাগাল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে এমন ধরনের কথাবার্তা শুনে ভয় কার না পায়, বলুন?

আমি আড় চোখে চাইলাম সমরজিৎ চক্রবর্তীর দিকে। দেখলাম, তিনিও বেশ গম্ভীর হয়ে শুনছেন ও'দের কথাবার্তা। অজিতবাবু তো পুরোপুরি চুপ।

অবশেষে এক ফাঁকে সমরজিৎ চক্রবর্তীই বললেন, বেশ ভারিক্কির মত—খারাপ ব্যাপার সব। দেখা যাক। আচ্ছা, আমরা চলি এখন, কেমন? বলেই আমাদের নিয়ে জীপে গিয়ে উঠলেন চটপট।

জীপ যখন ছাড়ল, জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। বললেন, আপনিও যেমন? এ সব টুকরো টাকরা ঘটনা কোথায় নেই, বলুন? এদিকে মশায়, গুজবও অ্যাটম বোমা ফাটায়।

ডিমাপুরে গিয়ে আমাদের প্রথম কাজ সেখানকার জিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসে যাওয়া। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার নাগাল্যাণ্ড এবং মণিপুর সারকেলের এটাই প্রধান দপ্তর।

সেখানে পেঁছিতেই হই হই কাণ্ড। অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। জনৈক কর্মী আমাদের অপেক্ষায় তখনও সেখানে দুর্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা যেতেই নিশ্চিন্ত হলেন যেন তিনি। বললেন, বিকেল চারটে থেকে আমরা বসে আছি। এ বুঝি এলেন আপনারা। শেষ পর্যন্ত এত দেরি দেখে আমাদের ডাইরেক্টর ডঃ শ্রীবাস্তব তো রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল শম্ভু সেন কোহিমায় পেঁছে গেছেন। এরই মধ্যে দু' দুবার লাইটনিং কল করেছেন তিনি। জানতে চেয়েছেন, আপনারা পেঁছিলেন কী না। ডঃ শ্রীবাস্তব আপনাদের দেরি দেখে মিনিট দশ আগে কোহিমার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। দেরি না করে বরং এখুনি আপনারা এগিয়ে যান। হয়ত ধরে ফেলবেন তাঁদের। আমি বরং ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেলকে টেলিফোনে জানিয়ে দিই, আপনারা যাচ্ছেন।

বা-বা! একেবারে নন স্টপ মেসেজ যেন মিলিটারি ফরমানের মত বলে গেলেন ভদ্রলোক।

আর অপেক্ষা না করে আমরাও কোহিমার দিকে ছুটলাম। এবং ভদ্রলোক যা বলেছিলেন তাই হলো। ডঃ শ্রীবাস্তবের দলকে আমরা মিনিট দশেকের মধ্যেই ধরে ফেললাম। তারপর মিনিটখানিক ধরে পরিচয়ের পালা এবং আমাদের এত দেরি কেন হল সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দেবার পাট চুকিয়ে শুরু হলো আবার পথ চলা। এ পথের সাত আট কিলোমিটার সমতল। মাঝে পার্বত্য নদী। তারপর ইনার লাইনের চেক পোস্ট। ইনার লাইনের চেক পোস্টে গাড়ি থামল। গার্ডরা আমাদের গাড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর ছেড়ে দিলো। দেখলাম কিমিনের মত এখানে তেমন কড়াকড়ি নেই। সরকারী গাড়িকে এরা তেমন বাধা দেয় না।

ইনার লাইনের পর থেকেই পাহাড়। আমার পাশে এবার বসেছিলেন ডঃ নির্মল চক্রবর্তী। গাড়ি প্রচণ্ড আঁকা-বাঁকা পথ ধরে ক্রমেই উপরে উঠতে লাগল। এতক্ষণ আমাদের জামা কাপড় ছিল হালকা। এবার এক-আধটা গরম পোশাক পরে নিতে হলো।

ডঃ চক্রবর্তী বললেন, কোহিমায় চলুন, দেখবেন আরও শীত করবে।

পাশে বসে এদিকের ভূতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে লাগলেন নির্মলবাবু। প্রথমে বাটি। তারপর সেল। এ সব নতুন স্তর। অবশেষে প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ। পাললিক শিলার পর এল পরিবর্তিত শিলা। নাগাল্যাণ্ডে আছে প্রচুর কয়লা। আছে চুণা পাথর। আর জিওলজিক্যাল সার্ভে আবিষ্কার করেছে লোহা, নিকেল, কোবল্ট।

কোহিমায় পেঁছিলাম রাত প্রায় সাড়ে ন'টায়। পাহাড় হাজার আলোয় আলোকিত সেখানে। শম্ভুবাবু এবং আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ভি আই পি গেস্ট হাউসে।

সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, আজ আর রাত করা নয়। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আগামীকাল এখানকার পাওয়ার এবং জিওলজির মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার। সকালে। তারপর বিরাট ট্রিপ। ২৫৮ কিলোমিটার। সেখানে গিয়েই দেখবেন সত্যিকারের সৌন্দর্য কোথায়।

(ক্রমশঃ)

কাহিনীর চুম্বক : গুণ্ডাদের হাতে জখম জেলেকে হাসপাতালে আনা হয়েছে...
DR. AXEL'S HOSPITAL
অরণ্যদেবের পাঠানো লোক..
অরণ্যদেব বলে সত্যিই তাহলে কেউ আছে?
কেমন দেখতে তাকে?

খুলির চিহ্ন... ধুলেই উঠে যাবে... *
...দোকানে হানা দেব!
TRADER JOE'S
আরে, এই দোকানেই সাবান পাওয়া যাবে নিশ্চয়!
* না, তা উঠবে না...

ওদিকে... রাষ্ট্রপুঞ্জে.
ডায়ানা... চীফ ডাকছেন... খুবই জরুরী...
এক্ষুনি যাচ্ছি।

শুভেচ্ছা!
ডায়ানা, বিয়ের খবরটা পর্যন্ত আমাদের দিলে না!
সময় পাইনি!

কেমন দেখতে?
নাম কী?
কোথায় থাকেন?
দেখতে খুবই ভাল... নাম ওয়াকার *... আপাতত কাজের সূত্রে ঘুরতে বেরিয়েছেন...
* অরণ্যদেবের আর এক নাম।

অরণ্যদেব সত্যি কাজে বেরিয়েছেন।
কোথায় যেতে পারে গুণ্ডারা? মনে হয়, ওদের পরবর্তী লক্ষ্য হবে জোয়ের দোকান!
2/19

কী হে, তুমিই বুঝি এই দোকানের মালিক?
?
ক্যাশবাক্সের চাবিটা দাও তো!

খবরদার... আর এক পা এগোলেই...
গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব!
চলবে
২

সমরেশ মজুমদার

॥ ১৮ ॥

কিংসাহেবের ঘাটের চায়ের দোকানগুলো বোধ হয় দিনরাত খোলা থাকে। এই কাক-ভোরেও তাদের সামনে লোকের অভাব নেই। ভাতের হোটেল এখনও খোলেনি। সেগুলো ছাড়িয়ে সামান্য এগোতেই অনিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একই সঙ্গে চার-পাঁচজন ট্যাক্সিড্রাইভারের স্যাঙাত এসে ওকে যেন কোলে করেই নিজের নিজের গাড়িতে তুলতে চাইছে। অনি অসহায়ের মত এ-পাশ-ও-পাশ তাকাচ্ছিল। সামনে সার দিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। মন্টু এগুলোকে বলে মুড়ির টিন। থার্টি টু পার্টস অল আউট। পুরো গাড়িটাই নাকি ভাঙাচোরা। সবকটা অংশ কোনরকমে জোড়া তালি দিয়ে রাখা হয়েছে। হর্ন নেই, দরকারও হয় না। চলার সময় এক মাইল দূর থেকে সবাই এদের গর্জন শুনতে পায়। অনি কোনদিন এই ট্যাক্সিতে চড়েনি। স্বর্গছেঁড়া থেকে আসবার সময় লরিতে চেপে জোড়া-নৌকোয় পার হয়ে এসেছিল। অনেক দিন ওরা কিংসাহেবের ঘাটে এসে দেখেছে সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপিয়ে আগাপাশতলা যাত্রী বোঝাই করে ট্যাক্সিগুলো তিস্তার কাশবন চিরে ছুটে যায় বার্নিসের দিকে। বছরের যে কটা মাস চর শুকনো থাকে ট্যাক্সিগুলো প্রতাপ দেখিয়ে বেড়ায়। তাও পুরো চর নয়, বার্নিশের কাছে সিকি মাইল গভীর জলের ধারা আছে। সে অবধি গিয়ে আবার যাত্রী নিয়ে ফিরে আসে ট্যাক্সিগুলো। তারপর যখন বর্ষা বেশ জমে ওঠে, নদীর এপার-ওপার দেখা যায় না, ঢেউগুলো ক্ষ্যাপা গোখরোর মত ছোবল মারতে থাকে অবিরত তখন ট্যাক্সিগুলো কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়! অনি দেখল সামনের একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে গেল হঠাৎ। তারপর একজন বয়স্ক মানুষ চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'কি হচ্ছে?'

সঙ্গে সঙ্গে অনি দেখল লোকগুলো বেশ থতমত হয়ে গেল। একজন চট করে বলে উঠল, 'কেন ঝামেলা করস, বাবু তখন থিকা বইস্যা আছেন, ইনারে পাইলেই গাড়ি খুলুম—আসেন কত্তা, আমাগো পিক্ষীরাজে বসেন, আমি ডেরাইভার সাহেবকে ডাইক্যা আনি।'

লোকটা ওকে যেন পথ দেখিয়ে খানিকটা দূরে এগিয়ে এসে গাড়িটা চিনিয়ে দিল। অনি দেখল অন্যান্য গাড়ির তুলনায় এটা তবু ভদ্র চেহারার, মাথার ওপরের ত্রিপলটা আস্ত আছে। বয়স্ক ভদ্রলোক তখনও বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনি দেখেই বুঝলো ইনি নিশ্চয়ই খুব বড়লোক কারণ এঁর ফিনফিনে ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি আর ফরসা গোলগাল চেহারা থেকে একটা আভা বের হচ্ছিল।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, গাড়িতে [illegible] তাকালেন। অনি দেখল যে লোকটা ওকে গাড়ি চিনিয়েছে সে একটা পাটকাঠির মত ফিনফিনে লোককে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আসছে। অনি শুনতে পেল ভদ্রলোক তাকে ডাকছেন, 'এই খোকা, ওপারে যাবে তো? গাড়িতে উঠে বস। এবার না ছাড়লে দেখছি?' অনি গাড়িতে ওঠার আগেই ফিনফিনে লোকটি দরজা খুলে ওকে সামনে বসতে বলল। ড্রাইভারের সিটে কোন গদি নেই। গোল গোল স্প্রিং-এর ওপর মোটা বস্তা পাতা রয়েছে। খুব চওড়া ফুটবোর্ডের ওপর পা রেখে নিচু হয়ে সিটে গিয়ে বসতেই মনে হল ওর পাছায় অজস্র পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। ড্রাইভারের সঙ্গীটি তখন চেঁচাচ্ছে—'ফাস্টো টিপ—বার্নিশ, ফাস্টো টিপ—বার্নিশ।'

গাড়িতে ওঠার সময় অনি লক্ষ করেছিল গাড়িতে ভদ্রলোক একা নেই। একজন মহিলা এবং একটি ছেলেকে এক পলকে নজর করেছিল সে। এখন গাড়িতে উঠে ও দেখল ওর সামনে আয়নাটা আস্ত আছে এবং ভদ্রলোকের পাশে ভীষণ ফরসা একজন মহিলা বসে আছেন লাল কাপড় পরে। মহিলার চোখে নতুন ধরনের চশমা যা অনি কোনদিন দেখেনি, জামাটার হাতা নেই। এ রকম জামা ছোট ঠাকুমা পরত। দাদুর তোলা ছোট ঠাকুমার একটা ছবি দেখেছিল সে, ঠিক এই রকম, তবে একটু ঢোলা। অনি উঠতেই তিনি চোখ কুঁচকে তাকে একবার দেখলেন, 'রাবিশ', এত করে বললাম গাড়ি বের কর, শুনলে না এখন বোঝ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিস্তার চরে প্রাইভেট গাড়ি চালালে বারোটা বেজে যাবে।' ভদ্রমহিলা বললেন, 'উঃ, চিরটাকাল পুতুপুতু করে কাটালে!'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেলে শুনছে!'

'শুনুক। এখন তো শোনার বয়স হচ্ছে।' ভদ্রমহিলার কথা শেষ হওয়া মাত্র হুড়মুড় করে চার-পাঁচজন কাবুলিওয়ালার একটা দল এসে পড়ল। ওদের দেখে অন্যান্য ট্যাক্সি ড্রাইভাররা কিন্তু একদম চিৎকার করল না। ওরা বোধ হয় এই ট্যাক্সিতে প্যাসেঞ্জার দেখে সোজা এখানে চলে এল। ড্রাইভারের সঙ্গী চেঁচিয়ে বলল, 'এক রুপিয়া খান সাব এক আদমি কো।' একটা মোটা কাবুলিওয়ালা যার ঘাড় মাথার অর্ধেক অবধি কামানো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'পাঁচ আদমী—চার রুপেয়া।' এই নিয়ে যখন ওদের মধ্যে কথা চলছে অনি শুনল ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই গাড়িতে ওরা যাবে নাকি?' ভদ্রলোক জবাব না দিলেও অনি বুঝতে পারল তিনিও ওদের যাওয়াটা পছন্দ করছেন না। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি ড্রাইভারকে বলো ওদের না নিতে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও শুনবে কেন? আমরা তো পুরো ট্যাক্সি রিজার্ভ করিনি।'

এবার যেন মহিলা ধৈর্য রাখতে পারলেন না, 'তাই কর। আঃ। তুমি জানো না ওরা কি রকম। আজ অবধি কেউ কাবুলিয়ালার বউ দ্যাখেনি জানো?' হঠাৎ ভদ্রলোকের গলার স্বর পালটে গেল, 'তাতে তোমার কি এসে গেল, তুমি তো আমার স্ত্রী।' অনি দেখল ভদ্রমহিলার মুখ অসম্ভব লাল হয়ে গেছে। তাঁর একপাশে ওর বয়সী যে ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে তার মুখটা অসম্ভব রকমের গোবেচারা। এ রকম লালটু গোলালু মার্কা ছেলে ওদের স্কুলে একটাও নেই। হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল, 'কাবুলিয়ালারা খুব ভাল, না মা? আখরোট দেবে আমাদের?' ভদ্রমহিলা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, তুমি চুপ কর। যেমন বাপ তেমনি ছেলে।' ছেলেটি হতচকিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, মিনিকে দিত, আমি পড়েছি।'

অনি ঠিক বুঝতে পারছিল ছেলেটা কোন পড়ার কথা বলছে। তবে আন্দাজ করল ও কাবুলিদের নিয়ে কোন গল্প পড়েছে।

দর ঠিকঠাক হয়ে গেলে লোকগুলো যখন অনেকটা ঝুঁকে প্রায় তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছেন, 'তুমি আমাদের এখানে এসে বসোতো ভাই, সামনের সিটটা ওদের ছেড়ে দাও।' অনি কি করবে বুঝে না উঠতেই ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'চলে এসো পেছনে, কুইক।' ভদ্রলোক জানলা ছাড়বেন না, তাঁর কি সব দেখার আছে। গোলালু ছেলেটা প্রায় নাকে কেঁদে উঠল, সে ওপাশের জানলা থেকে সরবে না। অনি নেমে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোকরা কাবুলি ওর মাথায় আলতো করে টোকা মারল। তারপর ওরা চারজন ড্রাইভারের পাশে গিয়ে অদ্ভুত ভাষায় উঃ আঃ করতে করতে বসে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নেমে দাঁড়াতে অনি পেছনের সিটে বসতে পেল। ছোট্ট কাপড়ের ঝোলাটা কোলের ওপর রেখে মহিলার পাশে বসতেই অনির মনে হল অদ্ভুত এক ফুলের বাগানে যেন সে ঢুকে পড়েছে। এতো রকম ফুলের গন্ধ একসঙ্গে নাকে আসছে যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। মায়ের গা থেকে যে রকম গন্ধ বের হত এটা সে রকম নয়, মহিলার শরীর থেকে যে সৌরভ বের হচ্ছে তা মানুষকে যেন অবশ করে দেয়। সামনের সিটে বসে যে কেন গন্ধটা পায়নি বুঝতে পারছিল না অনি। কাবুলিরা উঠে বসেই প্রায় একই সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখল। একজন কি একটা মন্তব্য করতেই সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অনি দেখল ভদ্রমহিলা এক হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছেন, অন্য হাত তার পিঠের ওপর রাখা।

ড্রাইভারের সঙ্গী এবং অবশিষ্ট কাবুলিটি ফুটবোর্ডে উঠল। সঙ্গীটি ওঠার আগে হ্যান্ডেল নিয়ে কয়েক মিনিট প্রাণপণে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে সেটা ঘুরিয়ে সফল হয়ে এল। ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই গাড়িটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। অনির মনে হতে লাগল মন্টুর কথা সত্যি, যে কোন সময় গাড়ির সব কটা অংশ খুলে পড়ে যেতে পারে। বিকট চিৎকার করে গাড়িটা চলতে শুরু করল এবার। ভেতরে বসে কানে তালা লাগার যোগাড়। অনি দেখল পেছনের সিটের গদি এখনও সবটা উঠে যায়নি।

দুপাশে বালি আর বালি, ইতস্তত কিছু কাশগাছ, গাড়িটা যত জোরে ছুটছে তার বহু গুণ বেশী শব্দ করছে। মাঝে মাঝে মরা নদীর খাতে কিছু জল জমে রয়েছে। অবলীলায় ট্যাক্সি সেটা পেরিয়ে এল। কাবুলিগুলো খুব মজা পেয়েছে অনি শুনল ওরা চিৎকার করে গান ধরেছে। অনির বসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মহিলা তাকে প্রায় চেপে ফেলেছেন। ওর পেটের গমের মত রঙের চর্বি যত নরম হোক ওজনে দম বন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভদ্রমহিলা বোধ হয় অনির পেছন দিক দিয়ে স্বামীকে চিমটি কেটেছিলেন কারণ তিনি হঠাৎ উঃ করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মহিলা কেমন হাসি হাসি গলায় বললেন, 'কাবুলিওয়ালারাও গান গায়, শুনেছো আগে?' ভদ্রলোক বললেন, 'হুঁ! সেক্স এলে ওরা গান গায়।' প্রায় আঁতকে উঠলেন মহিলা, 'সেকি!' সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'তোমার অবশ্য ভয়ের দিন অনেক আগে চলে গেছে। আয়নায় মুখ দ্যাখোনা তো!'

অনি দেখল মহিলা হঠাৎ চুপ করে গেলেন ওর হাতটা নির্ভর হয়ে ওর পিঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ ঘুরিয়ে অনি দেখল একটু ঠোঁট চেপে ধরে তিনি ছেলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। কেন হঠাৎ এমন হল সে বুঝতে পারছিল না। সেক্স মানে কি? এই শব্দটাই সব গোলমালের কারণ? মানে জিজ্ঞাসা করলে যদি ভদ্রলোক চটে যান? ও মনে মনে কয়েকবার আওড়ে শব্দটা মুখস্থ করে ফেলল। বাড়িতে ফিরে গিয়ে ডিক্সনারীতে এর মানেটা দেখতে হবে। আর এই সময় প্রায় আর্তনাদ করে গাড়িটা থেমে গেল। অনি দেখল চারধারে এখন মাথা অবধি কাশগাছের বন একটা ডাহুক পাখি ডাকছে কোথাও। ড্রাইভারের

স্যাণ্ডাও লাফিয়ে নামল, 'হালারে টাইট নেবার লাগব।' বসে পাশ থেকে একটা কালগাছের ডাঁটা ছিঁড়ে নিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ভেতরে কোথাও গুঁজে দিতেই আবার শব্দ করে গাড়িটা ডেকে উঠল। ব্যাপারটা এতটা আকস্মিক কাবুলিগুলো পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল। ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'আমার গাড়ি হলে মেকানিক ডাকতে হত।'
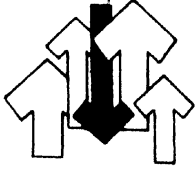
নদীর ধারে এসে ট্যাকসিটা দাঁড়াতেই কাবুলি-গুলো আগে লাফিয়ে নামল। এপারে কোন দোকান-পাট নেই। প্রায় রোজই ঘাট জায়গা বদলাচ্ছে, তাছাড়া পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই শুকনো চরে আট-দশটা মোটা ধারা গজিয়ে এক হয়ে যাবে। ওপারে বার্নিশ। বার্নেশও বলে অনেকে। লোকজন দোকানপাটে জনজমাট। এই সাতসকালে সেখানে গঞ্জের ভিড়। সমস্ত ডুয়ার্স এবং সুদূর কুচ-বিহার থেকে বাসগুলো এসে ওই বার্নিশে গুঁজে বসে থাকে। তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়িতে আসার উপায় নেই। তাই বার্নিশের রবরবা এত। বার্নিশের নিচে মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়িতে আসার সময় ওরা মণ্ডলঘাট দিয়ে এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে অনি দেখল জোড়া-নৌকো একটাও নেই, ছোট ছোট নৌকো দুটো দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ে ভিড় নেই একদম, একটা নৌকোয় গোটা আটেক লোক বসে আছে। তবে এই সিকি মাইল চওড়া তিস্তায় এখন প্রচণ্ড ঢেউ, জলের রঙ লালচে। হঠাৎ দেখলে কেমন ভয় ভয় করে। ড্রাইভারের সংগী এসে তার কাছে একটা টাকা চাইল। ও দেখল ভদ্রলোক মহিলা এবং গোলালুকে নিয়ে নৌকোর দিকে এগোচ্ছেন। টাকাটা দিয়ে ও চটপট এগোল। আসবার সময় পিসীমা তিনটে একটাকার নোট তাকে দিয়েছেন। একটাকা ট্যাকসির ভাড়া, বার আনা নৌকোর ভাড়া, পাঁচসিকা বাসভাড়া আর আট আনায় দুটো রাজভোগ। একদম হিসেব করে দেওয়া টাকা। সকালবেলায় তাড়াতাড়ি না খেয়ে বেরোন—তাই রাজভোগ বরাদ্দ।

ভদ্রলোক উঠে গেছেন নৌকোয়, উঠে ছেলেকে প্রায় কোলে করে টেনে তুলেছেন। অনিকে আসতে দেখে মহিলা বললেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব-ছিলে ভাই? তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এক সংগে এলাম তো! যাই কি করে!'

অত বড় মহিলা তাকে ভাই বলছেন, অনির কেমন অস্বস্তি হল। ও কি মাসীমা না বলে দিদি বলবে? এঁরা নিশ্চয়ই খুব আধুনিক। বড়লোক হলেই বোধ হয় আধুনিক হয়। মন্টু বলে বিলেতে আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের বন্ধু। ওদের চেয়ে আধুনিক কে আছে? মহিলা তো তাকে শুধু ভাই বললেন।

অনি দেখল ঢেউ-এর দোলায় নৌকোটা পাড়ের বালিতে ঘষা খেয়ে আবার হাত খানেক সরে যাচ্ছে। সে সময় তার ফাঁক দিয়ে লালচে জলের স্রোত দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় সেই দিকে চোখ পড়ার পর আর এগোতে পারছেন না। ওদিকে ভদ্রলোক কিন্তু উদাস চোখে বার্নিশের দিকে চেয়ে আছেন। নৌকোটা ছোট। দুধারে সরু তক্তা পাতা, যাত্রীরা সেখানে বসে আছে। মাঝখানে কাঠের বীমগুলো এখন ফাঁকা। গোলালু জুলজুল করে বাবার পাশে বসে মাকে দেখছিল। অনির একটু ভয় ভয় করছিল। সে সাবধানে নৌকোতে উঠতেই সেটা সামান্য দুলে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি এবার ব্যালান্স থাকবে না কিন্তু সেটা চট করে ফিরে এল। সোজা হয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। ও ঘুরে দেখল ভদ্রমহিলা ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, 'বেশী দুলছে না তো?' অনি ঘাড় নেড়ে হাতটা ধরতেই ভদ্রমহিলা শরীরের সব ওজন নৌকোর ওপর অনিকে ভর করে ছেড়ে দিলেন। অনির মনে হল ওর দম বন্ধ হয়ে যাবে, ও উলটে জলে পড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না, সামলে নিয়ে ভদ্রমহিলা সেখানেই কাঠের ওপর বসে পড়ে অনিকে বললেন, 'বসো।' অনি বসতে বসতে শুনতে পেল, মহিলা বলছেন, 'স্বার্থপর, জেলাস!' ঠিক বুঝতে না পেরে ওঁর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে ফেললেন, 'না না, তোমাকে নয় ভাই। এম্মা, তোমাকে কেন বলব। তুমি আমার কত উপকার করলে! কোথায় যাচ্ছ?'

'স্বর্গছেঁড়ায়।' অনি বলল।

'দারুণ রোমান্টিক নাম না? আমরা যাচ্ছি ময়নাগুড়ি। আজই ফিরে আসব। জলপাইগুড়িতে থাক?' কাঁধে হাত রেখে পা নাচালেন মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'এলে দেখা কর। আমরা থাকি বাবুপাড়ায়। বাড়ির নাম ড্রিমল্যান্ড।'

'মনে থাকবে তো?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'ও কোন স্কুলে পড়ে?'

'কে? ও, প্রিন্স! কার্শিয়াং-এ পড়ে। ছুটিতে এসেছে। আমার একটা মেয়ে আছে দারুণ সুন্দরী, আমার চেয়েও। ওর সংগেই আমার মেলে বেশী। প্রিন্স ওর বাবার মতন, স্বার্থপর। ওহো তোমার নাম কি? কোন স্কুলে পড়?' এত কথায়

সে সময় মাঝিরা এসে নৌকোয় উঠতে সেটা খুব জোরে দুলে উঠল। মহিলা এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন। সেই রকম ফুলের বাগানে ঢুকে পড়ে অনি বলল, 'আমার নাম অনিমেষ, জিলা স্কুলে পড়ি।'

নৌকোটা ছেড়ে দিল। নৌকোর মুখে একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে কয়েকজন সেটাকে টানতে লাগল পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে। সেই টানে নৌকো এগিয়ে যেতে লাগলো ওপরের দিকে। অনি শুনতে পেল ভদ্রলোক গোলাপকে বলছেন, 'একে বলে গুণ টানা।' গোলাপ বুঝল কিনা বোঝা গেল না। ও কেন জিলা স্কুলে না পড়ে কার্শিয়াং-এ পড়ে? সেখানে নিশ্চয়ই একা থাকতে হয়। ওর হঠাৎ গোলাপের জন্য কষ্ট হল। মা থেকেও ও মায় কাছে থাকতে পারছে না। ঢেউ বাঁচিয়ে নৌকোটাকে অনেক দূর নিয়ে এসে মাঝিরা লাফিয়ে তাতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছপছপ করে বৈঠা পড়তে লাগল জলে। বাঁধন খুলে যেতেই স্রোতের টানে সোঁ সোঁ করে নৌকো নদীর ভিতর ঢুকে পড়ল। বড় বড় ঢেউ দেখা যাচ্ছে মাঝ নদীতে। এক একটা এত বড় যে তার আড়ালে বার্নিশ ঘাট ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পলকের জন্য। হঠাৎ নৌকোর একধারে বসে থাকা রাজবংশীরা চিৎকার করে উঠল, 'তিস্তা বুড়িকি জয়!' সঙ্গে সঙ্গে সেটা গর্জন করে ফিরে এল। মাঝিরা প্রাণপণে নৌকো ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে ওরা। অনি দেখল বড় ঢেউয়ের কাছাকাছি নৌকো এসে যেতেই একটা দিক কেমন উঁচু হয়ে যাচ্ছে নৌকোর। গোলাপ ওর বাবাকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ভদ্রলোক দুইহাতে নৌকোর তক্তা শক্ত করে ধরে আছেন। ভদ্রমহিলা এই সকালে কুল কুল করে [illegible] একধারে। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন অনিকে জড়িয়ে ধরেছেন। ছিটকে ছিটকে জল আসছে নৌকোয়। কাবুলিগুলো পর্যন্ত নদীর চেহারা দেখে ভয়ে চুপ-চাপ হয়ে বসে গেছে। এবার ঢেউটা পার হবে নৌকো। অনি দেখল স্রোতটা এখানে গর্তের মত নিচে নেমে গিয়ে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ের মত ওপরে ফুঁসে উঠেছে। নৌকো সেই টানে নিচে নেমে যেতেই অদ্ভুত একটা ঝাঁকুনি লাগল। সেটা সামলে জলের টানে ওপরে উঠতেই একটু বেটাল হয়ে গেল আর হুড়মুড় করে একরাশ জল নৌকোয় উঠে এল। আর তখনই অনি দেখল বেটাল নৌকোর একপাশে বসে থাকা একটা লোক টুপ করে জলে পড়ে গেল চুপ-চাপ। যেন ভেতরে ভেতরে কেউ কাজ করে যায় নইলে সেই মুহূর্তে মহিলার বাঁধন খুলে অনি ঘুরে বসত না। আর বসতেই ও দেখল সেই শরীরটা ছুটন্ত জলের সঙ্গে পাক খেয়ে তার নিচ দিয়ে নৌকোর তলায় ঢুকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে অনিমেষ তার পিঠের জামা চেপে ধরল মুঠায়। জলের স্রোতে শরীরটার ওজন কমে গিয়েছে, তবু তাকে ধরে রাখা অনির পক্ষে অসম্ভব। পিঠের দিকে টান লাগায় শরীরটার নিচ দিক নৌকোর তলায় ঢুকে গেল আর লোকটা চট করে আধা উলটে গেল। অনি দেখল লোকটার সারা শরীর কাপড়ে মোড়া, বাঁচার স্বাদ পেয়ে একটা হাত ওপরে বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে কতক্ষণ সে ধরে থাকতে পারে। মহিলা না থাকলে সে নিজে জলে পড়ে যেত। মহিলা তার কোমর দুহাতে ধরে রাখায় সে ব্যালেন্স রাখতে পারছে। এতক্ষণে নৌকোটা সেই বড় ঢেউ-এর জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে। দুজন মাঝি দৌড়ে ছুটে এল অনিকে সাহায্য করতে। তারা এসে ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে ধরতেই সে হাত বাড়িয়ে নৌকোর কাঠ ধরতে গেল। নাগাল পাচ্ছে না দেখে অনি একবার পিঠ দিয়ে হাতটা ধরে সাহায্য করতে যেতেই দেখল সে কোনরকমেই মুঠো করতে পারছে না। কারণ মুঠো করার জন্য আঙুলগুলোই তার নেই। এই জলে ভেজা হাতের যেখানে সে চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা যেন কেমন কেমন লাগছে। আর এই সময় চিৎকারটা শুনতে পেল অনি। কানের কাছে মহিলা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে তার কোমর ছেড়ে দিলেন। দিয়ে আলুথালু হয়ে দৌড়ে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন। যেহেতু এখন নৌকো দুলছে না, অনি সোজা হয়ে একা দাঁড়াতে পারল। ততক্ষণে নৌকোটা পারের কাছে এসে গেছে এবং এই মাঝি দুটো লোকটাকে টেনে অনিরা যেখানে বসেছিল সেখানে টেনে তুলেছে। অনি দেখল মৃতপ্রায় একটা মানুষ নৌকোর কাঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ ভর্তি দাড়ি, দাঁত নেই, হাঁ করে বুক কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অনি দেখল লোকটার নাক নেই, কানের অর্ধেকটা খসা চুলের জায়গায় ছোপ ছোপ দাগ। পুরো মুখটা ঢেকে বসেছিল সে নৌকোয়। আর এতক্ষণ পরে অনি টের পেল ওর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা পচা গন্ধ বের হচ্ছে। কেমন একটা গা ঘিনঘিনে ভাব সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল এবার। অনি নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর ঝুঁকে তিস্তার জলে হাত ধুয়ে নিল। আর এইসময় একটা মাঝি ওকে বলে উঠল, 'পুণ্য করলেন না ভাই, আপনের পাপই হইল।' কথাটার মানে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'এ তো মানুষ না, জন্তুর অধম। মইরা গেলেই এ শান্তি পাইত, তিস্তা বুড়ির কোল থিকা ছিনাইয়া আইন্যা কি লাভ হইল।'

অনি এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওর

যদি এই দুর্নিবার আকর্ষণ
আপনাকে বিহ্বল না করে...
...বিনীর অসাধারণ কোয়ালিটির কাপড় অবশ্যই তা'

আনাকোনগড়ের অনেকটা যে জলে ভিজে গেছে টের পেল না, 'কিন্তু ও মরে যেত যে।'

মাঝিটা হাসল, 'হক কথা। কিন্তু বাইচ্যা যাইত।'

ঠিক তখন কাল সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতালের সেই লোকটার মুখ মনে পড়ল। এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া—লোকটা বলেছিল। এখন এই মাঝিও প্রায় সেই কথাই বলছে। নিজের মায়ের কথা ভাবল অনি, মা কি বেঁচে গেছে ? তাকে ফেলে রেখে মা কি শান্তিতে আছে ? মানুষের কেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না বুঝতে পারছিল না অনি। হঠাৎ ওর মনে হল হাসপাতালের সেই লোকটা অথবা খসে-যাওয়া-শরীরের লোকটা বোধ হয় একই রকমের।
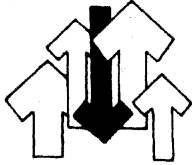
পাড়ে নৌকো এসে ভিড়তেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। সংগে সংগে একটা ভীড় জমে গেল নৌকো-টার সামনে। সবাই একে একে পয়সা দিয়ে নেমে গেলে অনি মাঝিটাকে পয়সা দিতে গেল। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, আপনের ভাড়া লাগব না।'

পাড়ে দাঁড়িয়ে দুলন্ত নৌকোয় দাঁড়ানো মাঝিকে সে বলল, 'কেন ?' মাঝি হাসল, "আপনি যা করছেন তা কজনা করে!" কিছুতেই পয়সা নিল না সে। অনেকগুলো বিস্মিত মুখের সামনে দিয়ে অনি ওপরে উঠে এল। সার সার বাস দাঁড়িয়ে। জায়গাগুলোর নাম মাথার ওপর লেখা—লঙ্কাপাড়া—আলিপুরদুয়ার— কুচবিহার— মাথুরা— ফালাকাটা। এইসব চেনা বাসগুলোকে দেখতে পেয়ে ওর খুব খিদে পেয়ে গেল। খাবারের দোকান খুঁজতে গিয়ে ও দেখল ভদ্রলোক, মহিলা আর গোলগাল একটা মিষ্টির দোকানে বসে আছেন। হাসিমুখে ওঁদের কাছে যেতেই অনি দেখল মহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। একটা চেয়ার খালি ছিল, অনি সেটা ধরতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'বসো না বসো না' খবরদার, ছোঁয়া লেগে যাবে।' হাঁ হয়ে গেল অনি। মহিলা স্বামীকে বললেন, 'ওকে এখান থেকে যেতে বলে দাও। সংক্রামক রোগ, অলরেডি ওর ভেতর এসে গিয়েছে কি না কে জানে।'

ভদ্রমহিলার দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে ওঁর স্বামী বললেন, 'তুমি বরং কার্বলিক সোপ দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিও। হিরোর ডেফিনেশন সব মানুষের কাছে সমান নয় ভাই। উইশ ইউ গুড লাক।'

ভীষণ কান্না পেয়ে গেল অনির। কোনরকমে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। খাবার ইচ্ছেটা এখন একদম চলে গেছে। এসব রোগ কি সংক্রামক ? তার ভেতরে কি চলে আসতে পারে ? এখানে কার্বলিক সোপ সে কোথায় পাবে। চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাকের কাছে হাতটা নিয়ে এল সে। না তো, কোন গন্ধ নেই। এইসময় সামনের বাসে হর্ন বেজে উঠতে সে দেখল তার ওপর আলিপুর-দুয়ার লেখা, বাসটা এখনই ছাড়বে। স্বর্গছেঁড়ার ওপর দিয়ে একে যেতে হবে।

প্রায় অন্ধের মতন সে বাসে উঠে বসল। এখান থেকে মিষ্টির দোকানটা দেখা যাচ্ছে। জানলার পাশের সিটে বসে অনি দেখল ওদের টেবিলে বড় বড় রাজভোগ এসে গিয়েছে। আজ অবধি কেউ তার সংগে এমন ব্যবহার করেনি। সে কি জানতো লোকটার খারাপ অসুখ আছে ? একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে দেখে তার বুকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হল যে সে ঠিক থাকতে পারেনি। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, মাঝিগুলো তো নির্দ্বিধায় লোকটাকে টেনে তুলেছিল। ওরা কি কার্বলিক সোপে হাত ধোবে ? ওদের মনে যদি কোন চিন্তা না এসে থাকে সে এত ভাবছে কেন ? মহিলা নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছেন অথবা তিনি মোটেই আধুনিক নন। সংস্কার না থাকার নামই নাকি আধুনিক হওয়া, আমেরিকানদের মত—মন্টু প্রায়ই বলে। ওর মনে পড়ল মাঝি ওকে বলছে আপনি যা করেছেন তা কজনে পারে ? অদ্ভুত একটা শান্তি একটু একটু করে ফিরে আসছিল অনির।

এইসময় ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল দুবার হর্ন বাজিয়ে। সামান্য লোক হয়েছে গাড়িতে। কণ্ডাক্টর দরজা বন্ধ করে চেঁচাল, 'ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, স্বর্গছেঁড়া, বীরপাড়া—আলিপুরদুয়ার।' আর বাসটা এবার নড়তেই হঠাৎ অনি লক্ষ করল কি একটা ছুটে আসছে তার দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই কালো মতন জিনিষটা চটাৎ করে এসে লাগল জানলার ওপরে। একটা কাদার তাল ঝুলে থাকল জানলায়। একটু নিচু হলেই সেটা গলে অনির মুখে এসে লাগত। বিস্মিত, হতভম্ব অনি সমস্ত শরীরে কাঁপুনি নিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটা লোক ওকে দেখে চেঁচাচ্ছে, 'কেন বাঁচালি, কেন বাঁচালি, মরতে চেয়েছিলাম তো তোর বাপের কি, শালা। কেন বাঁচালি ?' সেই আধখানা শরীরটা নৌকোর ওপর থেকে উঠে এসে ভেজা কাপড়ে হিংস্র হয়ে লাফাচ্ছে আর নাকি স্বরে অনির দিকে তাকিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। ও কি করে টের পেল যে অনি বাঁচিয়েছে ? নিশ্চয়ই কেউ বলে দিয়েছে। অনির বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল, চোখের সামনে জলের আড়াল। ও তাড়াতাড়ি কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিল। ঝাপসা হয়ে গেলে সব মানুষকে সমান দেখায়।

(ক্রমশ)

চিত্রকরের চোখে : হাভানার যুব উৎসব

সন্দীপ সরকার

এবার হাভানার বিশ্ব যুব উৎসবে গিয়েছিলেন বিষ্ণু দাস। শিল্পরসিক এবং বিদগ্ধ সমাজের বাইরে তেমন পরিচিত নন। সুতরাং বিশদ করে তাঁর বিষয় বলতে হয়।

কয়েক বছর আগের কথা। "স্টেটসম্যান"-এ "আর্টিস্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল" বলে একটা ধারাবাহিক রচনা লেখার সময় গোপাল ঘোষের সংগে দেখা করতে গেছি। কিছুদিন তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না।

বললাম, এখন কেমন বোধ করছেন গোপালদা?

উন্মীলিত চোখ হঠাৎ অর্ধনিমীলিত করলেন তিনি। শেষে বুজেই ফেললেন। বললেন, দেখো আমার জীবনটাই বিষ্ণুময়। এক বিষ্ণুর জন্য আমারই প্রায় অনন্তশয্যা নিতে হয়েছিল। ডুবে গেছিলাম। তখন আমাকে আরেক বিষ্ণু টেনে তুলল—আমার ছাত্র বিষ্ণু দাসের কথা বলছি। জান তো আমার ছেলে নেই—বিষ্ণু আমার পুত্রতুল্য। ও-ই আমায় খুব করে।

অন্য বিষ্ণু কে?

অবান্তর! এর বেশি তিনি আর বলেননি।

যামিনী রায়ের মৃত্যুর পর অধুনা পশ্চিমবঙ্গের যেসব শিল্পী সক্রিয়, তাঁদের বয়স অনুযায়ী চার দলে ভাগ করা যায়। নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র এবং ভাস্করদের মধ্যে রামকিংকর, প্রদোষ দাশগুপ্ত আর চিন্তামণি কর একটি প্রজন্ম। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের বয়স অনুসারে আবার দুই দলে ভাগ করা যায়। ঈষৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে পড়েন মীরা মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়, শানু লাহিড়ী এবং বিজন চৌধুরী। এঁদেরই অনুজ সমসাময়িক হলেন নিখিল বিশ্বাস (প্রয়াত), প্রকাশ কর্মকার, অধুনা ন্যু ইয়র্ক প্রবাসী অরুণ বসু, রবীন মণ্ডল, সনৎ কর, শ্যামল দত্তরায়, গোপাল সান্যাল এবং ভাস্কর্যে শর্বরী রায়চৌধুরী, বিপিন গোস্বামী, অজিত চক্রবর্তী, মাধব ভট্টাচার্য, ফুলচাঁদ পাইন, রঘুনাথ সিংহ, দেবব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ আরও অনেকে। গণেশ পাইন যোগেন চৌধুরী, সুনীল দাস, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, অনীতা রায়চৌধুরী থেকে অজিত-বিক্রম চৌধুরী এবং বিকাশ ভট্টাচার্য আরেক প্রজন্ম—এঁদের সকলের জন্ম ১৯৩৭-৪০-এর মধ্যে। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরা যুদ্ধের সময় থেকে স্বাধীনতার আগেপিছু দু-এক বছরে জন্মেছেন। এঁদের মধ্যে ভাস্কর্যে বিমান দাস, নিরঞ্জন প্রধান, সুধীর ধর, মানিক তালুকদার, অনিট ঘোষ, দিলীপ সাহা এবং ছবি আঁকায় শংকর গুহ, শুভাপ্রসন্ন, অলোক ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ করচৌধুরী, বিষ্ণু দাস এবং আরও কয়েক জন উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণু দাস ভাস্কর্যে স্নাতক হয়েও কিন্তু ছবি আঁকেন। টেম্পেরার ছবি। তাঁর ছবির বিষয় ভারতীয় শহর আর গ্রামের মানুষ। রূপারোপের ক্ষেত্রে দেশজ রীতি মানলেও, তাঁর রচনারীতি ছবির শূন্যস্থান ব্যবহারের বিষয় ভাবনা চিন্তা, বর্ণের মূল্যবোধ, কাঠামো সবই সমকালীন। সহজ আর আন্তরিক তাঁর কাজ। চমক নেই। তাঁর শান্ত স্থির কথা অনামনস্ক হলে শোনা যায় না।

ছবি কেমন করে ছবি হবে অথচ শুধুমাত্র বিদগ্ধদের বোধগম্য সাংকেতিক ভাষা হবে না, এ-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব সুচিন্তিত মতামত আছে। নব্য ধনীর রুচি বা বিকারের চাহিদা মেটানোই ছবির একমাত্র উপযোগ নয়, এটা তাঁর বিশ্বাস। ড্রইং রুম সাজানো, ম্যাজিকের মতো কালো টাকা সাদা করা, সংগ্রহকারীর সুরক্ষিত ভাণ্ডারে বন্দী থাকার জন্যে শিল্পকলা রচিত হয় না। ভাস্কর্য, ছবি ম্যুরাল ফ্রেস্কোকে সাধারণের সামনে আনতে হবে। অফিসে, পার্কে, কলকারখানায়, হাসপাতালে, সভাগৃহে আনতে হবে। কিন্তু তিনি জানেন, রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে শিল্পকলা তৃতীয় শ্রেণীর পোস্টার বা ওয়ালিজের পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। তাঁর আদর্শ নন্দলাল বসু। পিকাসো, সিকুরাস। এই সব গুরুস্থানীয় শিল্পীরা মানুষের সপক্ষে শিল্পকলার শর্ত মেনে যেভাবে ছবি এঁকেছিলেন তা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে।

বিষ্ণু দাস শুধু শিল্পী নন সংগঠক। শিল্পীদের তিনি ভ্রাতৃ সংঘের মতো ঐক্যবদ্ধ করতে চান। "ক্যানভাস আর্টিস্ট সার্কেল"-এর সক্রিয় সদস্য তিনি। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সংঘের প্রদর্শনীর জন্য তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন। প্রতি বছর।
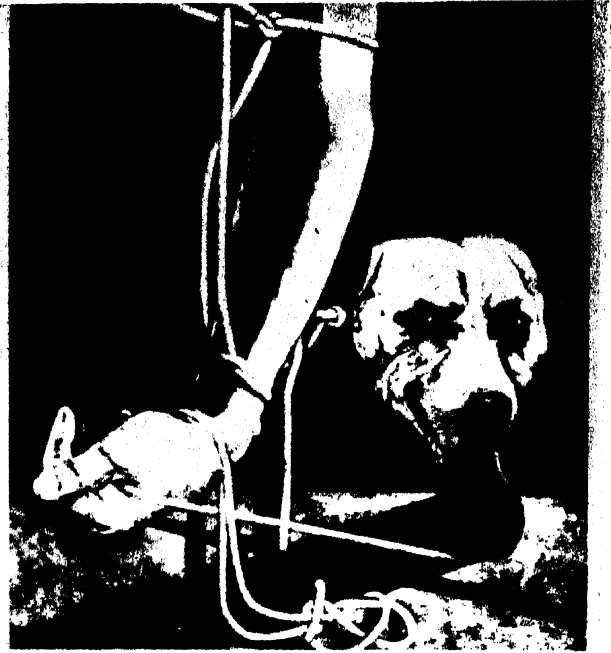
"রক্তশোষণ"—হুয়ান এন্টনীর রচনা (কলাম্বিয়া)

এবারে ২৭শে মে—৪ঠা জুন ইডেন উদ্যানে সি পি আই যে যুব উৎসব করে তার শিল্পকলার প্রদর্শনী মণ্ডপটা প্রধানত বিষ্ণু দাস সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বন্ধু অধ্যাপক বাঁধন দাসের সহযোগিতায় করেন। অবশ্য এর আগে দুটো তিনটে যুব উৎসবে এই কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। মণ্ডপটির উদ্বোধন করেন গোপাল ঘোষ। রামকিংকর, গোপাল ঘোষ এবং নিখিল বিশ্বাসের প্রচুর ছবি প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া বহু পরিচিত শিল্পীর কাজ ছিল। শিল্পকলার সংগে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটাই তিনি চান। শিল্পকলার জন্যে তাঁর নিষ্কাম কর্ম আমাকে মুগ্ধ করেছে। নিজের ক্ষতি করে তিনি এসব কাজে মেতে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের ইউথ ফেস্টিভাল প্রিপেরটারী কমিটির জন্যে—যার সভাপতি স্বয়ং সত্যজিৎ রায়—২০শে জুন বিষ্ণু দাস জানতে পারেন তিনি হাভানার বিশ্ব যুব উৎসবের জন্যে সদস্য মনোনীত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে আরও কয়েক জন নির্বাচিত হয়েছিলেন—যেমন লোকসংগীতের রুনো অংশুমান রায়। বাহাদুর খাঁর ছেলে সেতারী কিরীট খাঁ। মুকাভিনেতা অমিতাভ মজুমদার। রবীন্দ্রসংগীত গায়ক শক্তি দাস ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনের ছাত্র চন্দন মুন্সী মনোনীত হয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীত এবং বাউল গানের জন্যে। এ ছাড়া ছিলেন সি পি এম-এর আই পি টি আই-খ্যাত নারেন মুখোপাধ্যায়। এঁরা নিজস্ব দায়িত্বপালন করেছিলেন যথাযোগ্য ভাবে।

সারা দেশ থেকে একশ ত্রিশ জন তরুণ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পী মাত্র দুজন—বিষ্ণু দাস আর ভিভান সুন্দরম।

সন্দীপ : আপনি যখন খবরটা পেলেন তখন কি মনে হল? আনন্দ?

বিষ্ণু : আনন্দ নিশ্চয়। কিন্তু তার সংগে কেমন মনে হলো এত বড় দেশ, ষাট কোটি মানুষ তাদের প্রতিনিধি আমি—আমি কি তার যোগ্য? তারপর আনন্দের দমকা হাওয়ায় সব উড়ে গেল।

সন্দীপ : তারপর?

বিষ্ণু : তা ছাড়া ফিদেল কাস্ত্রোর সম্বন্ধে আমার দারুণ শ্রদ্ধা। চে গুয়েভারার মতো কিংবদন্তীর নায়ক। কিউবার ইতিহাসের কথা ভাবুন। ১৪৯২ সালে স্বয়ং ক্রিস্টোফার কলাম্বাস দেশটি আবিষ্কার করেন। স্পেন ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই জয় করে নেয়। কিউবা ১৮৯৮ পর্যন্ত স্পেনের উপনিবেশ ছিল। সেই বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিপক্ষে কিউবানদের জন্যে হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন সামরিক শাসনের অধীনে থাকে কিউবা ১৮৯৯—১৯০২ এবং আবার ১৯০৬-৯। সাধারণতন্ত্র হিসাবে কিউবা শাসিত হয় ১৯০৯—৩৩। ১৯৩৩-এ জেনারেল বাতিস্তা ক্ষমতা দখল করে নেন। ১৯৪০ বাতিস্তা নতুন সংবিধান চালু করেন। এতে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি, ৫৪ জনের সিনেট এবং ১৪০ সদস্যের জনপ্রতিনিধির সংসদের স্বীকৃতি রইল। সীমায়িত কিছু সংস্কারের

[illegible] [illegible] বিশ্ব যুব উৎসবের প্রতীক

সানট্রেক

আভরণের সেরা রত্ন...

নির্ভুল সময়ের
নিখুঁত ঘড়ি
সানট্রেক ঘড়ি
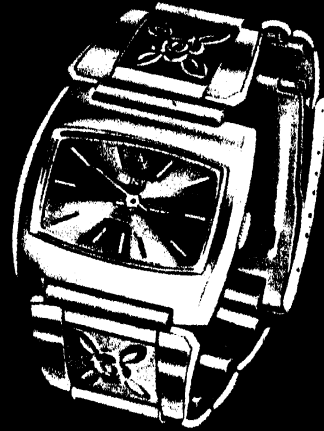
সানট্রেক ঘড়ি···সঠিক আর নিখুঁত ঘড়ি। সুবিখ্যাত সুইস কুশলী কারিগরী টেকনিকের জবাব নেই···
যে অসাধারণ টেকনিকের সাহায্যে বানানো সানট্রেক ঘড়ির স্বচ্ছন্দ মুভমেন্ট যে কোনও আবহাওয়ায়,
যে কোনও তাপমানে একদম নির্ভুল, নিখুঁত থাকে···আর এটাই তো হ'ল এর বিশেষত্ব। আর প্রতিটি
সানট্রেক ঘড়ি দেখতেও যেমন দারুণ কাজেও তেমনই দারুণ।
অটোমেটিক ও ওয়াইণ্ডিং···স্টেনলেস স্টীল, ক্রোম আর গোল্ড সব ধরনেরই।

সানট্রেক ঘড়ি —নির্ভুল সময়ের ঘড়ি—যা' সবাই চান।

সোকী ট্রেসা টাইম ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ,
আবন হাউস, ২৫/৩১ রোপওয়াক স্ট্রীট, র‍্যাম্পার্ট রো, বম্বে ৪০০ ০২৩।
বি ১০/৪, ঝিলমিল্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, শাহাদারা, দিল্লী ১১০ ০৩২।

Alka-ST-02

'পারিবারিক'—জোসে ভেন্তুরেলি (চিলি)।

সমস্যা ইত্যাদি পাল্টায়নি। অনাহারে অবিচারে সাধারণ মানুষ মৃতপ্রায়। ১৯৫৯-এ এরাই প্রতিকার করতে এগিয়ে এলেন কাস্ত্রো। ক্ষমতা হাতে নিয়েই, ভূমি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থনীতির আমূল বদলবার কাজে হাত দিলেন। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট প্রতিবিপ্লবীর আক্রমণের মহড়া নিলেন তিনি। সেইবার তিনি স্বীকার করেন তিনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী।

সন্দীপ : আমার কিন্তু কিউবার সংকটের কথাও মনে হচ্ছে। ১৯৬২-র সেও এক অকটোবার মাস। জন এফ কেনেডী ঘোষণা করলেন আকাশে তোলা ছবি থেকে তিনি জানতে পেরেছেন কিউবায় সোভিয়েত রকেট ঘাঁটি আছে। সুতরাং কিউবার অবরোধ শুরু হল যাতে আর বাইরে থেকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র না আসতে পারে। তিনি বললেন আগেকার মারণাস্ত্রকেও ফেরত নিয়ে যেতে হবে। ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ পাঠালেন কিউবা অভিমুখে। পারমাণবিক যুদ্ধে পৃথিবী শেষ হবার মুখে ২৮শে অক্টোবর ক্রুশ্চেভ গোঁয়ার কেনেডীর দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিলেন। সেই সময় কাস্ত্রোর ওপর মানসিক চাপটা কল্পনা করার চেষ্টা করেছি কখনো কখনো।

এই স্থলে বিষ্ণু দাসের একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি।

হাভানা ২৩শে জুলাই।

সন্দীপবাবু,

হঠাৎ হাভানার যুব উৎসবে যাবার সুযোগ এসে গেল। শেষ মুহূর্তে এমন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। ইতিমধ্যে 'সোডা ঝরনা'-র চত্বরে আড্ডা মারতে গিয়ে আমার খবর পেয়েছো নিশ্চয়। পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার ইউথ ফেসটিভালের ন্যাশনাল প্রিপেরটারী কমিটি করে রেখেছিল তাই রক্ষা। তাও প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কেনাকাটা ছিল। ছোটখাটো হ্যাণ্ডিক্র্যাফট কিনলাম যাতে দরকার পড়লে নতুন ইয়ার দোস্তদের উপহার দিতে পারি। আমরা দিল্লিতে ট্রেনে করে পৌঁছলাম ২১শে। ২২ তারিখ সকাল ১০টা ৩৫-এ এয়ারোফ্লোট বিমানে চেপে তাসখন্দ হয়ে সন্ধ্যায় মসকো। একশ তিরিশ জন ভারতীয় যাত্রীর বেশির ভাগ রঙীন নয়, সাদা জল খেতে অভ্যস্ত। মধ্যাহ্নে আহারের পর দু গ্লাস জলের বদলে সুরা বা শিবাম্বু-কোলা তাদের ক্ষেত্রে বিষবৎ। সুতরাং জল, পানি, ওয়াটার এবং আরও চোদ্দটা ভাষায় তৃষ্ণানিবারণী বারি চাওয়া হলো। এ ছাড়া অঘটন কিছু ঘটেনি। মসকো সামান্য ঠাণ্ডা সুন্দর আবহাওয়া। সেখানে প্লেন বদল। আগামী অলিম্পিক মসকোতে হবে। ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছে কিছু অফিসিয়াল ওলিম্পিক কেরিয়ার প্লেন। তাতে চেপে বসলাম।

আজ ভোর চারটে হাভানায় পৌঁছলাম। অন্ধকার ঘুটঘুটি। হাওয়া গরম। এয়ারপোর্টে লাতিন আমেরিকার নাচগান দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। এশিয়া দেশবাসীদের শহর ছাড়িয়ে নতুন একটি বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ছ' তলা বাড়ি। নাম "ইনস্তিতুতো সুপিরিয়ার দে লা সুকার" অর্থাৎ চিনি বিষয়ক উচ্চশিক্ষায়তন। বাসে এলাম। পুনরায় নৃত্যগীতিমুখর স্বাগতজ্ঞাপন এবং এবারে ভাষণ ছিল। নীচের তলায় দাঁড়িয়ে শুনলাম। আমাদের মালপত্তর থাক থাক করে সাজানো। দোতলায় ঢালাও বুফে প্রাতরাশের ব্যবস্থা। আপেল, কলা, পেঁপে, আর বড় বড় কিউবান আম, পাঁউরুটি, চীজ এবং মুর্গি আর বিফ। ফলগুলো সব ভারতীয় তাই চমকালাম। ট্রেতে কোলড ড্রিংকস। হায় চা অনুপস্থিত—টি বোর্ড কি করে বলুন তো? ওপরে একটা ঘরে আমাদের ২৮ জনের থাকার ব্যবস্থা। ১৪ জন নীচের বার্থে। ১৪ জন বাংকে। কিন্তু খুবই প্রশস্থ। ঘরে ঢোকার আগে অবশ্য আতিথ্য সেবার নমুনা হিসাবে ৪টে তিতো কুইনিন খাইয়ে দিল। সাদা ধবধবে বিছানা। নতুন তোয়ালে। বালিশের অড়। তা ছাড়া লাভ হল টুরিস্ট ব্যাগ, প্লাসটিকের কাভার ফাইল। কিছু বই। পেস্ট, সাবান, ফ্রুট জুসের টিন-ওপনার, সুচসুতো, টুপি, গলায় এবং মাথায় বাঁধার মজুরের প্রতীক। প্রত্যেকের খাটের পাশে ওয়ার্ডরোব। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে সুন্দর বাথরুমে কলোয়াতীতে ওস্তাদের হার মানিয়ে স্নান সারলাম। তখন ভোর হচ্ছে। কারিবিয়ান সাগরের নোনা হাওয়া। পকেটে স্পেনিশ ভাষায় কাজ চালাবার পুস্তিকা পুরে দিলাম। শব্দ ও বাক্যের পাশে ইংরেজী, ফরাসী, রুশী, জার্মান এবং আরবী মানে। পাশেই সুগার মিল। আখের ক্ষেত। আম গাছ, কলা গাছ—ভারতীয় দৃশ্য। ছোট ছোট ছিমছাম বাড়িঘর। একজন শক্তসমর্থ লোক বাড়ি ঝাড় দিচ্ছিল। আম গাছটা দেখিয়ে বললাম—ম্যাংগো। সে আমাকে ঘরে নিয়ে গেল। কোথা থেকে একা বাচ্চা এনে কোলে তুলে দিল। বললাম, ওয়াটার। জল এল। জানলাম জলের ইস্পাহানী হলো "আওয়া"। ইসারায় হাসাহাসির পর গেলাম পাশের বাড়ি। সে বাড়ির বাসিন্দা

"শহীদ"—লিওপলড মেনডেজ (মেক্সিকো)।
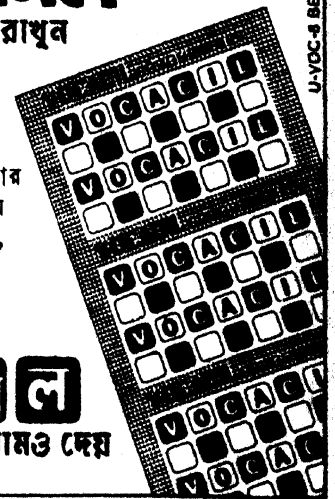
এক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা। ছুটে এল ওদের পোষা অ্যালসেসিয়ান—"বিওয়েয়ার অব ডগস"—মার্কা সারমেয় নয়, রীতিমতো প্রশিক্ষিত কুকুর, তার একটা তো ভব্যতা আছে, সুতরাং সে খুব খানিক অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা করল। কিন্তু সে কুকুর, তাই তার প্রভুকে হার মানাতে পারল না। এ'রা দুজন ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী অর্থাৎ আমার মতো বলতে পরেন। এবার খাবার মিলল। যদিও খিদে ছিল না। জবা গাছের বেড়া, নারকেল গাছ, গাঁদা, গোলাপ,—সব দিশী ফুল। টুলিপ ডেফোডিল সব কোথায় গেল? কিছুক্ষণ গল্প হল। ছোট ছোট ঘর। কিন্তু বড় খাট, খাবার টেবিল কিছু চেয়ার এবং টি ভি আর ফ্রিজ আছে। ইনস্টিট্যুটের মূল বাড়িতে ঢোকো না, বৃদ্ধ বললেন, বেশী দূরে যেও না কারণ এখনও ডেলিগেট কার্ড পাওনি। তারপর ফিরে এলাম। ৯টার সময় প্রাতরাশ আবার। এবার খেয়ে ঘুমলাম। ১২টা—৩টে লাঞ্চ। অন্যান্য দেশের লোকের সংগে করমর্দন। হাস্য-পরিহাস। বিকেলে শহরের রাস্তায় ঘুরলাম। পায়োনিয়ারদের ফুটফুটে ছেলে-মেয়েদের অটোগ্রাফ সই করলাম। পুরস্কার পেলাম সুন্দর পিকচার পোস্টকার্ড। রেস্তোরাঁয় কিউবানরা গিটার বাজিয়ে গান করছে। নাচছে। হাসছে। ওদের অঢেল প্রাণ আর আনন্দ আছে।

দশ দিনে একটা জাতির সব কি জানতে পারব—সামান্য কিছু অবশ্যই। পরিস্কার শহর। বড় বড় রাস্তাঘাট। ছিমছাম অট্টালিকা আর ছোট বাড়ি। কাস্ত্রো বৈষম্য ঘুচিয়েছেন। অনাহারী ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা লোক চোখে পড়ল না। যুব উৎসবের জন্য দশ দিন ছুটি। সুতরাং চারিদিকে আনন্দ ফুর্তির জোয়ার। এখানকার মেয়েগুলো দেখতে ভারী সুন্দর। ভাল আছেন তো? ইতি—বিষ্ণু দাস।

সন্দীপ : ডেলি রুটিন কি চিঠিতে যা লিখেছিলেন তাই ছিল?

বিষ্ণু : প্রতিদিনই কিছু অদল-বদল হতো প্রোগ্রাম অনুসারে কিন্তু মূল রুটিনটা এক। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা মাইক্রোফনে "গুড মর্নিং" ঘোষণা করে আমাদের জাগানো হতো। পরদিন থেকে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের বাকুয়ানা বীচে ব্রেকফাস্টের পর নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে স্নান পর্ব ঘণ্টা দেড়েক। বালির ওপর স্টলে ওরেঞ্জ, লেমান স্কোয়াশ—বড় পেপারগ্লাসে গ্লাস পাঁচ সেণ্টো—বীয়ার পনেরো সেণ্টো। ভেকার আছে কিন্তু খুব দুর্দান্ত নয়। নানা দেশের ছেলেমেয়ে। হাসি গল্প। আলাপ। দ্বিতীয় দিনে আমি স্কেচ খাতায় আঁকছি। এমন সময় একজন চেক ছোকরা এসে বলল—ইন্দো? ঘাড় নাড়লাম। বলল, গিভ মি কয়েন—ইণ্ডিয়ান কয়েন। পাঁচ দশ পয়সা দিলাম তাকে। একদিন আমাদের দলের একজন চাবি হারায় সমুদ্রের ধারে। পরে কে যেন খুঁজে এনে দিল। ফাঁকে ফাঁকে টুরিস্ট স্পট দেখছি। কোনো দিন এসকালেরা দো হারুকা—সুন্দর পাহাড়, সাদা পাহাড় —দেখতে যাচ্ছি। কোনদিন শহরের বাতিস্তা প্যালেস, রেভল্যুশান স্কোয়ার। —দেখলাম কাস্ত্রো যে হেলিকপটার চেপে এসেছিলেন সেইটা। বা চিড়িয়াখানা—ভারতীয় বাঘকে একটা ভারতীয় মুখ দেখিয়ে দিলাম। তা ছাড়া ইউনিভার্সিদাদ—বিশ্ববিদ্যালয়। চলছে অভ্যর্থনা, সংবর্ধনা, নাচা গানা। আমরা নাচি না বলে ওরা মাঝেসাঝে অনুযোগ করত।

মূল ঘটনা বলুন।

সন্দীপ : সাক্ষাতকারে ভ্রমণ কাহিনী কেমনভাবে ম্যানেজ করব জানি না।

বিষ্ণু : সেই সঙ্গে ওখানকার শিল্পকলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বলব। শহরে ক্যাপিটল, বিখ্যাত লাগোয়ানা দুর্গ এসব দ্রষ্টব্য দেখলাম। টোয়েণ্টি থার্ড স্ট্রীট আমার চোখে লেগে রয়েছে। এণ্টনী মার্সিও, জোসে মার্তি প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের মূর্তি আছে। প্রথাসিদ্ধ বাস্তব কাজ মার্বল পাথরে করা। চৌকো চৌকো করে করা—কিউবিস্টিক কিন্তু বিকৃতিকরণ না করে করা।

সন্দীপ : পায়োনিয়ার ক্যাম্প দেখেননি।

বিষ্ণু : ২৬শে সমুদ্রের ধারে পায়োনিয়ারদের ক্যাম্পে নিয়ে গেছিল। শহরের কাছেই। দশ থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়ে ক্যাম্পের ভেতর ট্রাফিক কনট্রোল করছে। মেয়েদের হাতকাটা ছাই রঙের জামা আর ছেলেদের ছাই রঙের সার্ট প্যাণ্ট। এখানে চে গুয়েভারার ছোট্ট আপার্টমেণ্ট। চে হাঁপানীর জন্যে এখানে এসে বিশ্রাম নিতেন। তাঁর ব্যবহৃত আসবাব, বই, ছবি আছে সেখানে। অনুবাদকের মাধ্যমে

আপনার ছেলেমেয়েদের
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়,
তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে...
কোকোর স্বাদে ভরা বোর্নভিটা !
বোর্নভিটাতে এখন পাবেন আরও বেশী কোকো, ফলে আরও বেশী স্বাদ আর পুষ্টিগুণ।
শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।
এক কাপ গরম দুধে দু' চামচ বোর্নভিটা দিয়ে এক সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় তৈরী করুন।
আপনার ছেলেমেয়েদের রোজই বোর্নভিটা খাওয়ান দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত দেহের মূল্যবান পুষ্টিগুণ দরকার, বোর্নভিটা তা যোগাতে সা" ।য্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকা… ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।
৭৫ পয়সা বাঁচান
৫০০ গ্রামের কম খরচের রিফিল প্যাক কিনলে।
জরুরী কথা: বোর্নভিটা টাটকা রাখতে—রিফিল প্যাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার একটি সাধারণ টিনে ঢেলে রাখুন।
ক্যাডবেরিজ
বোর্নভিটা
Bournvita
500 g net
OBM 8376 BEN

"...জাজক নারী"—দিয়াগো রিভিয়ারা (মেকসিকো)।

প্রচুর কথা হলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে দু মাসের ক্যাম্প। আমাদের উপহার দিল স্কার্ফ, পিকচার পোস্টকার্ড, ব্যাজ। অটোগ্রাফে সই আর কয়েন দিতে হলো। ছেলেমেয়েগুলো সপ্রতিভ, নিয়মানুবর্তী—নিজে মাস্টারী করি, তাই আমার ছাত্রদের অন্ধকারে ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনটা ছ্যাত করে উঠল।

সন্দীপ : যুব উৎসবের কথা আবার বলুন।

বিষ্ণু : বিছানায় পুরো প্রোগ্রাম, প্রয়োজনীয় তথ্য পেলাম। ২৮শে জুলাই মিছিল যাবে টোয়েন্টী থার্ড স্ট্রীট থেকে সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে। দেড় লাখ লোকের মিছিল—পনেরোটা দল। দশ হাজার করে এক একটা দল। সঙ্গে পতাকা। প্যাকেটে টফি, চকলেট, হ্যাম, পোর্ক। স্টেডিয়ামে যাবার পথে হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সবাই ভিজলাম। স্বাগতভাষণ, ভাষণ, গান, বাজনা। কাস্ত্রো ছিলেন। কিন্তু বক্তৃতা দিলেন রাউল কাস্ত্রো।

সন্দীপ : ফিদেল কাস্ত্রোর কাছাকাছি এসেছিলেন?

বিষ্ণু : একদিন ভিয়েৎনাম, কিউবা আর ভারতীয় প্রতিনিধিদের সভা হলো হাভানা ক্লাবে। সেখানে ল্যাংগুয়েজ রিসিভার লাগিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা এবং ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা আলোচনা শুনলাম। তারপর খাওয়া-দাওয়ার সময় রিসিভার খুলে পানভোজন চলছে। এমন সময় মানুষটি হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। ঘরে হঠাৎ বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এ ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে। আমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলাম। আনন্দে হাসিতে এ ওর গায়ে মদ ঢেলে দিল। বোধ হয় মিনিট পনেরো—তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। আমার সমস্ত গায়ে কে এক বোতল বীয়ার ঢেলে দিয়েছে। ঐ দশ দিনে শহরের সব বাস আমাদের জন্য অধিগ্রহণ করা হলো, পার্কে পার্কে উৎসব চলল। মানুষের সৌভ্রাতৃত্বের উষ্ণতার মধ্যে বড় ভাল কেটেছে। এসেছি কত মানুষের কাছে। নানা দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনেছি, দেখেছি। অংশুমান কিরীট আর যাঁরা গাইতে বাজাতে পারেন তাঁরা শ্রোতাদের মন মাতিয়ে দিয়েছেন। জমজমাট আসর—মন টইটম্বুর ভরে গেছে। অংশুমান জোস মার্তিনেলের ভুবনবিখ্যাত "গান্তানোমেরা" গানটা তুলে নিলেন। দারুণ মন মাতানো সুর।

সন্দীপ : বিষ্ণু আপনি কিউবান শিল্পকলা আর শিল্পীদের কথা এখনও বলেননি।

বিষ্ণু : আপনার এই প্রশ্নটার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। আমি ছবি আঁকি সুতরাং প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাণবে। কিউবার ন্যাশনাল আর্টিস্ট বলতে বোঝায় পোর্তকারেরোকে। গ্রামে হাভানায় যার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই বলেছে। খুবই সুপরিচিত নাম। মোটা করে ইমপেস্টো করে রঙ চাপিয়ে কাজ করেন। নীরদ মজুমদারের মতো বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই করছে। লোকশিল্প ভেঙে তিনি মানুষজনের কাজ করেন। মানুষের মূল প্রয়োজন মিটে গেছে—চাকরি, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান—এসব প্রত্যেকের আয়ত্তে। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বৈপ্লবিক ব্যাপার আছে। তাই শিল্পীরা সব দেশের মানুষের বিষয় ছবিতে কিছু ভাবছেন। ছবি কেনে সরকার। সাধারণ মানুষ ছাপাই ছবি কেনে। তবে সমাজতান্ত্রিক দেশ সুতরাং দামটা আগুন নয়। সব শিল্পীই শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাপার

সন্দীপ ঃ জামিয়ে কোনো শিল্পীর সংগে আড্ডা হয়নি?

বিকাদ ঃ তাও হয়েছে। ওখানে শিল্পকলার দুটো যাদুঘর—ন্যাশনাল মিউজিয়াম এবং ডেকোরেটিভ আর্ট মিউজিয়াম। লাতিন আমেরিকার সব শিল্পীদের কাজ দেখলাম মুসিও নেশিওনালে। মেক্সিকোর ওরাস্কো, দিয়াগো রিভেরা, ত্রিকুয়াস, তামাইওর ছবি চোখে দেখে গায়ে কাঁটা দিল। তা ছাড়া কিউবার শিল্পীদের কাজ দেখলাম। একদিন ইউনিভার্সিদাদে ইণ্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ডস সেণ্টারে সব দেশের শিল্পীদের ডাকা হলো। ছুটি চলছে। তাই ছাত্ররা ছিল না। ক্লাসরুম খুলে ওদের ছবি ভাস্কর্য এবং অনুশীলন আর পর্যবেক্ষণের কাজ দেখলাম। একটা দেওয়ালে কাগজ লাগিয়ে চটপট ম্যুরাল আঁকো। প্রত্যেকে পালাক্রমে। আমি ১৫″ × ২০″ কাগজে ভারতীয় নিসর্গ দৃশ্য আঁকলাম। বেশ কিছুক্ষণ সবাই দেখল। তারিফ করল। তারপর গুটিয়ে রাখল। তারপর বলল, রেখে দিতে আপত্তি আছে? বললাম, না। বলল, সই করুন। ইংরেজীতে বিকাদ দাস লিখলাম। নামের শেষে এস্-টি লিখিয়ে দিল ওরা। ফলে হয়ে গেলাম বিকাদ দা। এক তরুণী সাংবাদিকের সংগে পরিচয় হল। যুবকদের পত্রিকার জন্যে সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হলাম। বাড়িতে, নেমন্তন্ন করল। রাজী হলাম এক শর্তে—বিকেলে চা খাওয়াতে হবে। এঁর স্বামী একজন শিল্পী—নাম লিওন। সে-প্রসংগে ফিরে আসব। হায়ার ইনস্টিটিউট অব আর্টে নিয়ে যাওয়া হলো ৩০শে জুলাই। ছবি আঁকতে হবে। কাগজ, তুলি, ক্যানভাস তেলরঙ, জলরঙ, গুয়াস, টেম্পেরা কালি আর ক্রোকুইল সব মজুদ। ইচ্ছামতো জিনিস নিয়ে ইজেলে টানিয়ে আঁকো যা প্রাণে চায়। আমি ৩০″ × ২০″ বড় কাগজ নিয়ে কাঠকয়লায় প্রাথমিক অংকনটা করলাম। বারোটা থেকে দুটো মধ্যাহ্নের বিরতি। কুপন নিয়ে ক্যানটিনে খেলাম। সমুদ্রের ধারে এক জার্মান রেনাতে স্কেফারের সংগে আলাপ হয়েছিল। সে হঠাৎ এখানে হাজির। গল্প লাগাচ্ছি। সে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে। একদিন আবার আমাদের সংগে কিউবার শিল্পীদের বিশেষভাবে মোলাকাত হল। মুক্তাঙ্গন—বড় বড় পাথর গড়িয়ে এনে গাছতলায় বসার ব্যবস্থা করল কিউবার শিল্পীরা। কয়েক জন ভারতীয় প্রশ্ন করলেন—ছবি আঁকার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলতে হয় কী-না? পাল্টা প্রশ্ন—দেখে কি মনে হয়? লাতিন আমেরিকার শিল্পীরা মানুষের আত্মীয়—"তোমাদেরই লোক"। শিল্পকলা মানুষের জন্য উৎসর্গিত। জোর করে নয় কিন্তু স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। গ্রামে গ্রামে শিল্পকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘোষণা করা হয় শিল্পীরা কাজ নিয়ে আসছেন। ধরা যাক, তামাশা দেখার জন্যেই ভীড় হয়। কিন্তু আমি সচক্ষে দেখেছি ওখানে শিল্পকলা এবং শিল্পী জনপ্রিয়। গাঁয়ের লোক শহরে এলে শিল্পীর সংগে দেখা করে যায়। কিউবার শিল্পীরা শুধু নন সারা লাতিন আমেরিকার শিল্পীরা ইউরোপীয় ট্র্যাডিশানটা স্বীকার করেছেন। রসদ নিয়েছেন ভেলাসকুস, এল গ্রেকো, গোইয়া থেকে পিকাসো আর মীরো পর্যন্ত হিস্পানী শিল্পীদের কাছে। তাঁদের ছবিতে এসেছে যুদ্ধের পর লাতিন আমেরিকার সংগে ঔপনিবেশিক স্বার্থের সংঘাতের প্রাসঙ্গিকতা। অথচ বাস্তব থেকে বিমূর্ত মেজাজ মর্জি অনুসারে এই ঐতিহ্যের কাছে যা দরকার তা আদায় করেছে শিল্পীরা। মানুষের সপক্ষে, কিন্তু ছবির শর্তকে ক্ষুণ্ণ করে নয়। তারের ওপর হাঁটাচলার খেলা। রুদ্ধশ্বাস কিন্তু জমাট। অপরিচিত ক্রেতার জন্যে লক্ষ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। সোভিয়েত ছবির কোনো ছায়া ওদের কাজে নেই। ভাস্কর্য আর স্থাপত্যেও একথা সত্য।

সন্দীপ ঃ চা পান পর্বের কথা বলুন।

বিকাদ ঃ সাংবাদিক মেয়েটির স্বামী লিওন। আর্ট কলেজে পড়ায়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। চাঁচাছোলা মুখ। ঘর বাড়ি ঝকঝকে তকতকে। রেকর্ডপ্লেয়ারে গান। বেড়াল, ছোট্ট সাদা ইঁদুর এসব পোষা আছে। ঢুকতেই ডান দিকে কীচেন, ইলেকট্রিক হিটার পাতা। সেটা আবার স্টুডিও। পুরনো কাজ আছে কিছু। ইজেলের ছবিটা অসম্পূর্ণ। পরের ঘরটা বসার। টি ভি, রেকর্ডপ্লেয়ার, ফ্রিজ—বসার ঘরে আছে। আর অন্যটা শোবার ঘর। কর্মস্থল আর্ট কলেজ মাইল দুয়েক দূরে। বউয়ের নাম ইস্মাইয়া। চা পর্বের শেষে ছবি দেখলাম। আধা বিমূর্ত—নাপাম বোমার বিরুদ্ধে ছবি এঁকেছে। পাশের বাড়ি থেকে ইংরেজী জানা দোভাষী আনল ওরা চট করে। মেয়েটি দিল্লিতে ছিল। ওর বাবা ছিলেন ভারতে কিউবার রাষ্ট্রদূত ১৯৭১—৭৪-এ। ওদের প্রত্যেককে ত্রিপুরার বাঁশের তৈরী জিনিস দিলাম। রাষ্ট্রদূতের মেয়ের সংগে বাড়িতে যেতে হল। খালি বলে, বাবা খুশি হবে। ভারতীয় জিনিসে ঘর সাজানো। ওর বাবা সত্যি খুশি হয়ে আড্ডা মারলেন। ইতিমধ্যে লিওনের বন্ধু জোনা এসে হাজির। সবাই মিলে নৈশভোজের জন্য হই হই করতে করতে জোনার বাড়িতে গেলাম। জোনারও ফ্ল্যাটটা ছোট্ট। ঢুকেই একপাশে রান্নাঘর। ফ্রিজ খুলে পেয়ারা বার করল। ছুটে গিয়ে মুর্গির রোস্ট আর আলু ভাজা আনল। লিওন উজ্জ্বল রঙ পাতলা করে চাপায়। জোনা মানুষ নিয়ে বাস্তবঘেষা ছবি আঁকে মোটা রঙে। সরাসরি স্পেচুলা ব্যবহার করে। খুব স্পর্শকাতর ছবি, কিন্তু জোর আছে। দাবার ছকের মতো রঙ ছাপানো চৌকো চৌকো করে। এঁরা ওরাসকো বা রিভিয়েরাকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী করেন পিকাসোকে। নানা রকম ধারায় পরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু পথ বা খেই হারিয়ে কেউ এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে না। সংশয়, সংকট এবং মনের ভেতরে নৈরাশ্যের অন্ধকার কিন্তু এদের টলাতে পারেনি।

সন্দীপ ঃ আসার সময়—?

বিকাদ ঃ সাগরজলে সিক্ত দেশটা ছেড়ে আসতে মায়া হল। মনটা কেমন বিষন্ন হল। যাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন তাঁদের ফেলে আসতে কষ্ট হলো। শুধু বললাম, পুনর্দর্শনায় চ।

৮টি কারণে–

অধিক পরিমান
রান্নার জন্য বাইরের
থেকে লাগানো ঢাকনি।

সুরক্ষা ও সহজ
ব্যবহারের উপযোগী।

৩ টি উপায়ে
রক্ষাকারী অদ্বিতীয়
সেফটি-ভাল্‌ব।

দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য
দৃঢ় শরীর ও পুরু
তলভাগ বিশিষ্ট।

Prestige

আই এস আই
চিহ্ন দ্বারা গুণবত্তার জন্য
গ্যারান্টিযুক্ত।

খাদ্যের স্বাদ
ও পুষ্টিবজায় থাকে।
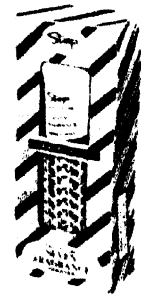
দেশের সর্বত্র
সাপ্লাই করবার সুবিধা।

৪ লি থেকে ১২ লি
পর্যন্ত বিভিন্ন সাইজ।

ভারতের প্রথম প্রেশার কুকার এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
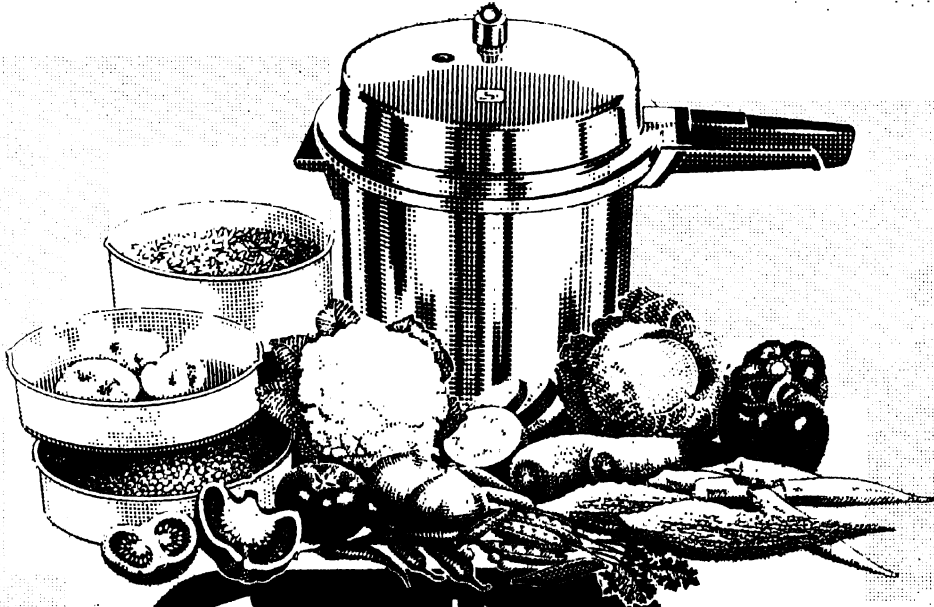
প্রেস্টিজ
টি টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড,
ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০১৬.

MCA/TT/50 Ben

গেছে আরারাত

আগেও হয়েছে, এবারও আই এফ এ শীল্ডকে পাত্রস্থ করা হল আত্মশীয়া কন্যার মত। যুগ্মভাবে জয়-মালা পরল দুটি দল—কলকাতার মোহনবাগান এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের আরারাত ক্লাব।

কলকাতা ফুটবল মরসুমের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ বছর একটু আগেই মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে, জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলকে কাশ্মীরে পাঠাবার জন্য। শীল্ড ফাইনাল অমীমাংসিত অবস্থায় একদিনেই শেষ হয়েছে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী আরারাত দলের আর একদিনও কলকাতায় অবস্থানের উপায় না থাকায়। সোভিয়েট দেশের সুপার লীগের ওই দলটি লীগ চলাকালেই কলকাতায় খেলতে এসেছিল। ব্যবস্থা ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর তাদের ফিরে যেতেই হবে। তাই আই এফ এ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, আরারাত যদি ফাইনালে ওঠে ১৫ সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলা হবেই। অন্য দল ফাইনালে উঠলে খেলা হবে ১৬ সেপ্টেম্বর। তবে যারাই ফাইনাল খেলুক একদিনেই ফয়সালা হবে। শুধু একদিনেই ফয়সালা নয়—৯০ মিনিটের খেলায় ফল নিষ্পত্তি না হলে অতিরিক্ত সময় খেলানো হবে না, টাই-ব্রেকারেও ফলের মীমাংসা করা হবে না। দুই দলকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

তাই হয়েছে। মোহনবাগান ও আরারাতের শীল্ড ফাইনাল ২—২ গোলে অমীমাংসিত থাকায় দুই দল যুগ্মবিজয়ী ঘোষিত হয়েছে। টসে জিতে প্রথম ছয়মাস শীল্ড দখলে রাখার সুযোগ পেয়েছে মোহনবাগান। আরারাত সঙ্গে করে নিয়ে গেছে শীল্ডের ছোট একটি প্রতিরূপ, যা আগেই তৈরী করা ছিল। আরারাত যদি জিতত তাহলেও আসল শীল্ডটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারত না। কারণ, নিয়ম আছে, বিদেশের কোনো দল যদি শীল্ড জেতে তারা শীল্ডটি নিয়ে যেতে পারবে না—তাদের দেওয়া হবে শীল্ডের একটি রেপ্লিকা, অর্থাৎ আসল শীল্ডের মতই ছোট একটি শীল্ড। তাই আগে থেকে ওটা তৈরী করে রাখা হয়েছিল। সে যাই হোক, শীল্ড হাতে পাওয়া বড় কথা নয়, জয় করাটাই বড় কথা—গৌরবের ব্যাপার। আমি তো জানি না যুগ্মবিজয়ী ঘোষিত হবার পর দ্বিতীয় ছয়মাস পুরস্কার অধিকারে রাখতে কোনো দল আগ্রহ দেখিয়েছে কিনা—সে ফুটবলে আই এফ এ শীল্ড, ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপই হোক, কি হকিতে বেটন কাপের খেলাই হোক। আমার প্রশ্ন—যে প্রতিযোগিতার নাম নক আউট প্রতিযোগিতা, অপর দলগুলিকে আউট করেই যার শেষ সম্মান, সে প্রতিযোগিতায় যুগ্মজয়ের ব্যবস্থা কেন? সময় যদি নাই থাকে অতিরিক্ত সময় খেলিয়ে ফল মীমাংসা করা যেতে পারে। তাতেও গোল না হলে কিংবা দুই দল সমান গোল করলে টাই ব্রেকার পেনাল্টি কিকে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হতে পারে। ওই উদ্দেশ্যেই তো টাই-ব্রেকার পেনাল্টি কিকের প্রবর্তন। নক আউট প্রতিযোগিতায় যুগ্মজয়ী ঘোষণা কেমন যেন খাপ-ছাড়া ব্যবস্থা। এবার নিয়ে তিনবার এই ব্যবস্থার মধ্যে শীল্ড খেলা শেষ হল। আগে হয়েছে ১৯৬১ ও ১৯৭৬ সালে। একই আসরে জয়ের মালা পরেছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। সুতরাং এটা নতুন ব্যবস্থা নয়। তবে জয়-সম্মানের শরিক হলেও ৮৫ বছরের ইতিহাসে আই এফ এ শীল্ড সর্বপ্রথম জয় করল বিদেশের একটি দল।

অবশ্য ভারতের ঐতিহ্যময় এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিদেশী দলের অভিযানও সাম্প্রতিক—১৯৭০ থেকে। তাহলেও ইরানের পাস ক্লাব, পশ্চিম জারমানির মীনার সাকসেন, উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং প্রভৃতি শক্তিশালী দল যা পারেনি সোভিয়েট দেশের আর্মেনিয়া রিপাবলিকের এই দলটি তা পারল। আমার ধারণা, আরারাত নিরঙ্কুশভাবেই শীল্ড জয়ীর সম্মান পেত, যদি মাঠের অবস্থা তাদের অনুকূল থাকত। কোনো দ্বিধা না রেখেই বলছি, আধুনিক ফুটবলের টেকনিক-ট্যাকটিকসে সুপটু একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শক্তিশালী দল আরারাত। খেলার মধ্যে আছে এগারো তারের একটি সিম্ফনির সুর। অবশ্যই প্রতিকূল পরিবেশে তাল কেটেছে। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সংগ্রাম করে মাত্র এক গোলে হেরে গেছে। ফাইনালে মরীয়া হয়ে আরারাতকে জিততে দেয়নি মোহনবাগান। কিন্তু খেলার ছন্দ, আক্রমণ রচনার বিন্যাস এবং কলাকৌশলে রুশীয় যে অনেক বেশি দক্ষ তার প্রমাণ মিলেছে প্রতি খেলায়। এক কথায় বলব, আরারাত যেমন ছিল শীল্ড খেলার বড় আকর্ষণ, তেমন

আই এফ এ শীল্ড সহ যুগ্মজয়ী মোহনবাগানের শিবাজী ব্যানার্জী, মানস ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জী (অধিনায়ক), সন্তোষ বসু ও সুব্রত ভট্টাচার্য।

ফটো: চিত্তরঞ্জন দাস

শীল্ড সেমিফাইনালে আরারাতের আন্দ্রেসিয়ানের শট ডাইভ দিয়ে বাঁচাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক

শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের কর্ণার কিক ধরেছেন আরারাতের গোলকিপার আব্রাহামিয়ান। ফটো: অলোক মি

ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরল—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-LR.28-2416 BG

শীল্ড ফাইনালে নিশ্চিত গোল বাঁচাচ্ছেন মোহনবাগানের সুব্রত ভট্টাচার্য — ফটো সত্যেন সেন

আরারাতের খেলার জন্যই বহুকাল পরে শীল্ডের খেলা বেশ জমে উঠেছিল।

অতীতের ফুটবলের সঙ্গে বর্তমানের ফুটবলের প্রচুর প্রভেদ। অতীতে আই এফ এ শীল্ডের রমরমার মধ্যে প্রচুর ভাল খেলা দেখেছেন এখনকার প্রবীণ দর্শকরা। ব্রিটিশ মিলিটারি টিমগুলি ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। তাদের ক্রীড়াসংগ্রাম অনেকের স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাছাড়া অতীতের একটা পৃথক মোহ আছে। অতীত সবসময়ই মধুর। অতীতের কথা অনেকের কাছে অমৃত সমান। কিন্তু যারা দুচোখ ভরে পুরনো দিনের খেলা দেখেছেন তারাও স্বীকার করবেন ফুটবলে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। এসেছে নতুন চিন্তা। ফুটবলের মধ্যে এসেছে শিল্প বিজ্ঞান, ধাপে ধাপে নতুন শিক্ষাক্রম। ফুটবল নিয়ে এখন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিস্তর গবেষণা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও এখন যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি। খেলার আঙ্গিকে এগারো জনের সর্বাত্মক প্রয়াস, যাকে বলা হয় টোটাল ফুটবল। সুতরাং মোটর যানের যুগ থেকে ফুটবল এখন জেটযুগে পৌঁছে গেছে। সেই হিসাবেই ভুললে চলবে না, এ পর্যন্ত বিদেশের যতগুলি দল ভারত সফরে এসেছে তার মধ্যে রাশিয়ার জাতীয় দলটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। সে দলটি এসেছিল ১৯৫৫ সালে। তারপর তেইশ বছর কেটে গেছে। এই তেইশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার ফুটবলও এগিয়েছে অনেক পথ। সেই রাশিয়ার সুপার লীগের দল আরারাত, ১৯৭৩ সালে যাদের জাতীয় লীগ এবং কাপ জয়ের সম্মান।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রুশ দলটি এতই যদি শক্তিশালী তাহলে কেন ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে একটি বেশি গোল করতে পারল না? কেনই বা পরাজিত করতে পারল না মোহনবাগানকে? উত্তরে ভারতীয় ক্রীড়ামোদী হিসাবে বলব, এখানেই ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের বাহাদুরি। এবং যে কারণে মোহনবাগানের ১৯১১-র শীল্ড জয় ইতিহাসের অঙ্গীভূত সেই কারণে ১৯৭৮-এর সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হতে পারত আরারাতকে হারাতে পারলে। তবে ওই শক্তিশালী দলটিকে জিততে না দিয়ে যে গৌরব করায়ত্ত হয়েছে তার মূল্যও অপরিসীম। এখন হয়তো ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না এর মূল্য। ১৯১১ সালের ক্রীড়ারসিকরা কি তখন জয়ের মূল্য ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছিলেন? যত দিন গেছে তত মাহাত্ম্য যোগ হয়েছে, মূল্যবোধ উপলব্ধি হয়েছে। ১৯৭৮-এর ঘটনাও ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল। অতীত তখন আরও মধুর হতে বাধ্য!

নিরপেক্ষ সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আগেই বলেছি, আরারাতের সুন্দর ক্রীড়াছন্দে তাল কাটার কারণ প্রতিকূল পরিবেশ এবং পিছল মাঠ। প্রথম দিন প্রি-কোয়ারটার ফাইনালে এরিয়ান ক্লাবকে তারা ২—০ গোলে হারাল তেমন গা না লাগিয়ে

... গোল করল না। সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল তাদের বিরুদ্ধে রক্ষণব্যূহ তৈরি করল আট-নয়জন খেলোয়াড় নিয়ে। ইস্টবেঙ্গল প্রতিজ্ঞা করেই মাঠে নেমেছিল—'কিছুতেই হারস্বীকার করব না।' তার মধ্যেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে খেলে শেষ মুখে জয়সূচক গোলটি করল আরারাত। আরারাতের ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানও সেই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমেছিল, যে মানসিকতায় এবং সংগ্রামী শৌর্যে গত বছর পেলে ও বিশ্বতারকাখচিত কসমস ক্লাবকে কলকাতা থেকে জিতে যেতে দেয়নি। খেলাটি ২—২ গোলে অমীমাংসিত ছিল। এবার ফাইনালেও হল সেই ফল। দেশের মর্যাদা সবুজ-মেরুন জার্সির রঙের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মোহনবাগান আগে থেকেই সজাগ ছিল। ১৯৭০-এ পাস ক্লাবকে এবং ৭৩-এ পিয়ং ইয়ংকে শীল্ড নিয়ে যেতে দেয়নি ইস্টবেঙ্গল। শীল্ড ফাইনালে বিদেশের তৃতীয় দলটির নিরঙ্কুশ জয় রুখে দিল মোহনবাগান।

আরারাতকে চারটি ম্যাচই খেলতে হয়েছে আঠালো এবং পিছল মাঠে, যে মাঠ ওদের ক্রীড়া-বিন্যাসের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। ওরা খেলে ঘাসের উপর বল রেখে সহজ ছন্দে। আঠালো মাঠে বলের গতির আন্দাজ পাওয়া শক্ত। বলের পেছনে কতটা জোর দিলে ঠিক নিশানায় বল পৌঁছবে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। পিছল মাঠে বলের গতি বেড়ে যায়, জল জমা পিছল মাঠে বল যায় আটকে। ফাইনালে তাই হয়েছে। এবং রুশ দলটির দুর্ভাগ্য, শুকনো মাঠে খেলা আরম্ভের পর প্রবল বর্ষণে মাঠ প্রায় ভেসে গেছে। একসময় মনে হয়েছিল খেলাটি বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় খেলা বন্ধ হয়নি। ক্ষতি যা হবার তা কিন্তু প্রথমার্ধেই হয়ে গিয়েছিল।

কাপ হাতে আরারাত অধিনায়ক বন্দারেঙ্কো

আরারাতের প্রায় সব খেলোয়াড়ের বল কন্ট্রোল, কাভারিং, ট্যাকল, জায়গা বদল করে আক্রমণ রচনার কৌশল চমৎকার। তার মধ্যে তিনজন—৩ নম্বর আরমেন সারকিসিয়ান, ৬ নম্বর আরকোডি আন্দ্রিয়াসিয়ান এবং ১০ নম্বর যোরেন আগানেসিয়ান ফুটবলের তিন নিপুণ শিল্পী। আন্দ্রিয়াসিয়ান ৭২-এর অলিম্পিকে রাশিয়া দলের খেলোয়াড়। সারকিসিয়ান ও আগানেসিয়ান খেলেছেন জুনিয়র ইউরোপীয় কাপ বিজয়ী রুশ দলে। ৪+২+৪ ছকে তিনজন ব্যাকের পেছনে সুইপার হিসাবে সারকিসিয়ানের ধীর স্থির এবং অচঞ্চল রক্ষণ ১৯৪৯-এ সুইডেন থেকে আসা হেলসিংবর্গ দলের অ্যাপলট ... পেয়েছেন। অসাধারণ বল কন্ট্রোল এবং চকিতে স্থান বদলের মধ্যে তিনি দেখিয়ে গেছেন লিঙ্কম্যানে খেলেও আক্রমণে কত বড় ভূমিকা নেওয়া যায়। আর আগানেসিয়ান দেখিয়ে গেছেন ছোট ছোট কাজের ছন্দ-সুখ এবং ফাইনালে উপহার দিয়ে গেছেন একটি অবিস্মরণীয় গোল। দেহটাকে একটু বাঁকিয়ে বুকের কাছাকাছি ওঠা বলটিকে সাইড থেকে ভলি মেরে তিনি গোল করেন প্রায় ১৮ গজ দূর থেকে। মোহনবাগান গোলকিপার শিবাজী ব্যানার্জী 'বল প্রতিরোধের সামান্য সুযোগও পান না। সময়জ্ঞানে, সৌন্দর্যে এবং পরিমার্জনে সত্যিই অবিস্মরণীয় গোল। বহুকাল মানুষের মনে থাকবে, বার বার ওই গোলের কথা আলোচিত হবে।

ফাইনালে মোহনবাগান অবশ্যই এক মন এক প্রাণ হয়ে সংগ্রাম করে। প্রথম গোল খাবার পর মরীয়া হয়ে আক্রমণ চালায় এবং গোলটি শোধ করে দেয় হাবিব। তারপর নিঃসন্দেহে খেলায় সাময়িক আধিপত্য বিস্তার করে মোহনবাগান এবং শুরু হয় ফুটবলের মহারণ। ওই সময় মাথার বুদ্ধি ও পায়ের কাজে মানস ভট্টাচার্য একটি পরিচ্ছন্ন গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিতেই মাঠে যে আনন্দরোল ওঠে তার রেশ এখনো যেন কানে লেগে আছে। আমি কোনদিন চল্লিশ হাজার দর্শকের অমন দীর্ঘস্থায়ী আনন্দনৃত্য দেখিনি, অমন কানফাটানো করতালিধ্বনিও শুনিনি। মাঠের সে দৃশ্য বর্ণনার অতীত। মোহনবাগান অবশ্য গোলটি ধরে রেখে নিরঙ্কুশ জয়ের সম্মান পায়নি। তবে সব মিলিয়ে ১৯৭৮-এর শীল্ডের শেষ খেলাটি স্মরণীয় করে রেখেছে। এবং ১৯৭৮-এর শীল্ডের খেলা জমিয়ে গেছে আরারাত।

মুকুল

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

বঙ্কিমসাহিত্য। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। সাহিত্যশ্রী। কলিকাতা-৯। মূল্য পনের টাকা।

ডক্টর অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বেশ কয়েকখানা বই লিখে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবৎকাল থেকেই বাঙালী পাঠকের শ্রদ্ধা এবং সমালোচনা দুই-ই পেয়ে এসেছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর অম্লান খ্যাতি দেশাত্মবোধের ঋষি হিসাবে তাঁর পরিচয়কে সুদূরপ্রসারী এবং কালাতিক্রান্ত করেছে। শুধু শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নয়, প্রতিকূল সমালোচনা দিয়েও তাঁর অচলপ্রতিষ্ঠা স্বীকৃত। ভক্তের পূজা বিশেষ গোষ্ঠীকে প্রতিফলিত করে মাত্র, কিন্তু সমালোচনা নিসংশয়িত করে গোষ্ঠীর বাইরে বৃহত্তর জনসমাজের সচেতনতাকে।

অমিত্রসূদনের সমালোচনা প্রশস্তি মাত্র নয়। বঙ্কিমের যথার্থ মহত্ত্বকে খর্ব করা কারো সাধ্য নয়, কিন্তু দেবোপম মহাপুরুষরাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকেন না—রামচন্দ্রও নন, যুধিষ্ঠিরও নন। বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচনায় অমিত্রসূদনের দৃষ্টি যে আচ্ছন্ন নয় অথচ বঙ্কিমের রচনাশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ, তাঁর বঙ্কিম-সাহিত্য পড়তে গিয়ে এটা বিশেষভাবে অনুভব করেছি। লেখক এ বইতে এক বিশেষ ধরনের সমালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আজকাল দেখা যাচ্ছে হায়ার ক্রিটিসিজমের চেয়ে হিসটরিক্যাল এবং টেকসচুয়াল ক্রিটিসিজমের দিকে ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের অমৃতমধুর রচনার শব্দভেদ পাঠভেদ কালানুক্রমিক পরিবর্তন এবং অন্যান্য তথ্য ও সংবাদমূলক উল্লেখের প্রতি আজকালকার সমালোচকদের ঝোঁক। বঙ্কিম সম্বন্ধে এই রীতির আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ যতখানি গুরুত্ব এবং ব্যাপকতা অর্জন করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তা হয়নি, সম্ভবত উপকরণের স্বল্পতার জন্য।

বস্তুত একালে অমিত্রসূদনই নিঃসপত্নভাবে এই কাজ করবার চেষ্টা করে চলেছেন। পুরনো বঙ্গদর্শন ঘেঁটে পুরনো সংস্করণ সংগ্রহ করে, বর্জিত অংশ উদ্ধার করে শুধু নয়, বঙ্কিম-রচনার পঞ্জী প্রস্তুত করে তিনি চেষ্টা করেছেন নতুন উপকরণ আমাদের হাতে তুলে দিতে। 'বঙ্কিম-সাহিত্য' বইটির শেষের পাঁচটি অধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে সমালোচিত পুস্তক ও সাময়িকপত্র' 'সাময়িকপত্রে পত্রে প্রকাশিত বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনাপঞ্জী' 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী' পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত 'রজনীর প্রথম পাঠ' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রচলিত গ্রন্থের বিবরণ' তার দৃষ্টান্ত। এই সংযোজনগুলি বিক্ষিপ্ত রচনা—গ্রন্থের মূলে অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়. এটাই এর ত্রুটি। অবশ্য 'বঙ্কিম-সাহিত্যে' আর যে কাজ তিনি করেছেন, সেটা হচ্ছে বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি সমাহৃত করে এক একটি প্রবন্ধ। যেমন 'উপন্যাসের পত্রব্যবহার : প্রকরণ ও প্রবণতা' অধ্যায়টিতে বঙ্কিম-উপন্যাসে পত্র ব্যবহারের বিভিন্ন স্থলগুলি একসঙ্গে নির্দেশ করে দেওয়ায় পাঠক অতি সহজেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৌশলের একটি বড়ো সূত্র পাবেন, 'উপন্যাসে দাম্পত্যজীবন' থেকে পাঠক যদি আশা করেন দাম্পত্যজীবন বা দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমের নৈতিক আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ধারণা লাভ করবেন তা হলে ভুল হবে। লেখক দেখিয়েছেন, বঙ্কিমে কোন কোন নায়িকা সন্তানহীনা—এর থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারি সন্তান থাকলে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের সংকট সৃষ্টি হত না। আর একটি অধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকথন : স্রষ্টার চোখে সৃষ্টি।' 'ললিতা ও মানস' থেকে রাজসিংহ পর্যন্ত বিভিন্ন উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনা

ললিতা।

পুরাকালিক গল্প।

মানস।
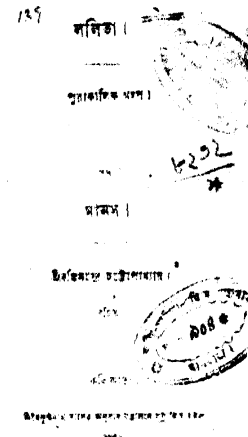
সম্বন্ধে ইতস্তত যে-সমস্ত মন্তব্য বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, অমিত্রসূদন সেগুলি সংকলন করে দিয়েছেন। ফলে যাঁরা এ ধরনের ব্যাপারে উৎসাহী তাঁরা উপন্যাসের আর্ট সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতামত জানতে পারবেন। 'নায়ক-নায়িকারা স্বল্পায়ু কেন' এই অধ্যায়টিতে লেখক দেখিয়েছেন বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকাদের স্বল্প-জীবিতা। তারা স্বল্পায়ু কেন, তার উত্তর লেখক প্রবন্ধের শেষে একটি বাক্যে দিয়েছেন—

'বঙ্কিমের ছোট মেয়ে উৎপলকুমারী তার শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল ১৮৮৭ সালের ৮ নবেমবর।'

পাঠক এই উত্তরে সন্তুষ্ট হবেন কিনা জানি না।

বঙ্কিম-সাহিত্য গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি এই শ্রেণীর সংকলনমূলক। 'দুর্গেশনন্দিনী : সমকালীনের চোখে।' 'সেকালের ছড়াছবি ও প্রহসনে বঙ্কিম-চন্দ্র, 'বঙ্গদর্শন ও সমকালীন সোম-প্রকাশ' 'কৈশোরের কবিতাবন্ধ' 'বঙ্কিম-দর্পণ কমলাকান্ত'। 'বন্দেমাতরম' রচনাটি বস্তুত অসম্পূর্ণ। এতে আরও তথ্য দেওয়া চলত ব্যাখ্যা না

'বোধ' প্রবন্ধটি একটু ভিন্ন জাতের। এতে লেখক নায়ক-নায়িকাদের বিশেষ করে কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইল অবলম্বনে মানব-প্রবৃত্তির নানা বিচিত্র অভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। রসসমালোচকেরা এ ধরনের আলোচনা ইতিপূর্বে করেছেন কিন্তু লেখক অমিত্রসূদনের আত্মনিরপেক্ষতাই বিশেষ প্রশংসনীয়। এতে লেখক বঙ্কিমের সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে নতুন কথা বলতে পেরেছেন।

মোটের উপর অমিত্রসূদনের বঙ্কিম-আলোচনা বিবলিওগ্রাফিক্যাল—সংকলন-মূলক। এ বিষয়ে বঙ্কিমের অভিপ্রেত রীতির সঙ্গেই তাঁর রীতির পার্থক্য আছে। উত্তরচরিতের সমালোচনায় বঙ্কিম বলেছিলেন সৌন্দর্য-বস্তুকে সমগ্রভাবে দেখাই যথার্থ সমালোচনা। উত্তরচরিতে কাব্যের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতিসূত্রে ঘটনাক্রম অনুসরণ করে রসবোধের অখণ্ডতায় বঙ্কিম আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। বঙ্কিম কাব্যপাঠ করে সমগ্রভাবে তার সৌন্দর্য অন্তরে গ্রহণ করে নিয়েছেন, অতঃপর ব্যাখ্যাসূত্রে খণ্ড অংশগুলি ভাবগতসূত্রে যুক্ত করে নিয়েছেন। অমিত্রসূদনের লেখা পড়ে মনে হয় প্রথম পাঠের গঠিত ধারণা থেকে মুক্ত থেকেই তিনি তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত। সমতুল্য তথ্য সংকলন করে পাঠকদের হাতেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছেন। এই পদ্ধতি প্রত্নতাত্ত্বিকের।

সমালোচকের পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক হওয়াই শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। তাকে অতিক্রম করে না যেতে পারলে সমালোচনায় ফল ফলে না। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভবভূতি সমালোচনার প্রতি সুবিচার করেননি—বিদ্যাসাগরের লেখা উদ্ধৃত করে লেখক তা দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলব লেখকও বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করেননি। অমিত্রসূদন বলছেন, 'যে রীতি বঙ্কিমের মতে প্রকৃত সমালোচনা উত্তরচরিত প্রবন্ধে তা অনুসৃত হয়নি। এই সমালোচনায় প্রথমাবধি গ্রন্থের বিভিন্ন অংকের 'সারমর্ম' উদ্ধার ও দোষগুণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে ; কিন্তু যে দৃষ্টিতে সামগ্রিক সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে তা অনুসৃত হয়নি।' বঙ্কিম ভবভূতিকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলেই মনে করতেন। ভবভূতির দাম্পত্যপ্রেমের স্মৃতি উত্তর-চরিতের সমকালীন রচনা বিষবৃক্ষের দাম্পত্যপ্রেমের বিপর্যয়ের পশ্চাৎপট ছিল। সেই ভবভূতির নাটককে যে বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতায় আলোচনা করা উচিত, তা তিনি পারেননি বলেই তাঁর আক্ষেপ। বঙ্কিমের এই অভিপ্রায়টি লেখকের কাছে সুস্পষ্ট হয়নি। বঙ্কিম 'যখন কাব্যরস পান করতে চেয়েছেন, তখন লেখকের মনে হয়েছে 'সারমর্ম উদ্ধার'।

আমাদের অনুমান অমিত্রসূদনের মতো, তথ্যনিষ্ঠ পাঠকের এরকম মনে হওয়ার কারণ মূল সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব। বস্তুত বঙ্কিম-চন্দ্র কেবল সারমর্মই উদ্ধার করেননি সেকালের অদীক্ষিত পাঠককে ভালো করে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন কাব্য ও নাটকের

অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ রেখে গিয়েছেন ভবভূতির সীতার মুখের এক একটি উক্তির গভীরতার ইঙ্গিত দিয়ে। অমিত্রসূদনের 'বঙ্কিম-সাহিত্য' বইটি যদি আমাদের কোনো দিক দিয়ে অতৃপ্ত করে থাকে, তবে তা এই যে লেখকের বিচারের পটভূমি যথোপযুক্তরূপে বিস্তৃত নয়। বঙ্কিমের উপন্যাসের largeness of design-এর উল্লেখ করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। এই বৃহত্ত্ব যেমন উপন্যাসে, তেমনি প্রবন্ধে। প্রবন্ধে বঙ্কিমের মননের ব্যাপ্তি ও যুক্তিবদ্ধতা সর্বস্বীকৃত। অমিত্রসূদনের আলোচনায় তার পূর্ণ রূপটি অনুদ্ঘাটিত থেকে গিয়েছে।

দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বাংলা গদ্য নিয়ে বঙ্কিমের সমালোচনাকে যথার্থ বুঝতে গেলে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশিত Bengali spoken and written প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতকাই সে চেষ্টা করা সঙ্গত। ওই প্রবন্ধ বাংলা গদ্যরীতি নির্মাণে মূল্যবান দিগদর্শনী হিসাবে কাজ করছে। তরুণ হরপ্রসাদকে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর চেলা'। এই অসাধারণ প্রবন্ধটি অমিত্রসূদন দেখেছেন বলে মনে হল না। বঙ্কিমের প্রথম পদ্য 'নিরলে বাস' যে একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ, সেটিও লেখক লক্ষ্য করেননি। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' সম্পাদনাকালে এই তথ্যটি সন্নিবিষ্ট করেছিলাম। এতে বালক বঙ্কিমের অধ্যয়নস্পৃহা এবং অনুবাদ-দক্ষতার পরিচয় মেলে। বঙ্কিম-প্রতিভার উন্মেষ এভাবেই হয়েছিল।

অমিত্রসূদনের সংগৃহীত তথ্যগুলি মূল্যবান। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার কাজে তাদের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করবে ?

ভবতোষ দত্ত

খাদ্য ও পথ্য। সমর রায়চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। দাম পনেরো টাকা।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। কিন্তু বড়োই কঠিন কাজ এই স্বাস্থ্যকে সুস্থ ও সুন্দর রাখা। শরীরের জন্য সঠিক খাদ্য নির্বাচন, প্রয়োজনমতো ক্যালরি গ্রহণ সকলের পক্ষে সব সময় হয়ে ওঠে না। তার প্রধান কারণ অজ্ঞানতা। ডাঃ সমর রায়চৌধুরীকে ধন্যবাদ, তিনি বাংলা ভাষায় ডায়েট এবং ডায়েটিং-এর উপর চমৎকার একটি গ্রন্থ উপহার দিলেন। শর্করা, স্নেহপদার্থ, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন বয়সে পুষ্টির চাহিদা, বিভিন্ন রোগে পথ্যের ভূমিকা, খাদ্য সংরক্ষণ, মেদবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পেট ভরলেই পুষ্টি হয় না। আবার কম খেলেই মেদ কমে না। এর জন্য চাই খাদ্যগুণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা, এর জন্য চাই সুষম খাদ্যের নিখুঁত এক তালিকা। সমরবাবু উভয় কাজই করেছেন। তাই এই বই শরীর নিয়ে চিন্তিতদেরই প্রয়োজনীয় নয়, শিশুপালন, প্রসূতি পরিচর্যার ব্যাপারে গৃহস্থেরও দরকারী এই বইটি। গ্রন্থটি বিষয়ে দুটি মাত্র আপত্তি। বইটির আকার পত্রিকার মতো বাড়িতে তাই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর দামটা পনেরো টাকা —একটু কম হলে ভালো হত।

অদৃশ্য জগৎ। সমরেন্দ্রনাথ সেন। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি। ৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। পঁচিশ টাকা।

১৯৪৫ সালে হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর আইনস্টাইনকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, আইনস্টাইন, পরমাণুর মধ্যে যে এত প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে এতকাল সেটা আবিষ্কৃত হয়নি কেন প্রশ্নটি শুনে আইনস্টাইন মন্ত করেছিলেন, এর উত্তর খুব সহজ পরমাণুর শক্তি যতক্ষণ না পরমাণু ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আস এবং আমাদের চোখে ধরা পড় ততক্ষণ তার অস্তিত্ব জানা সম কি ? যেমন ধরুন, একজন লোক। প্রচুর টাকা। আপনি দেখছেন, এ পয়সাও সে খরচ করছে না। সে আপনার পক্ষে কখনও কি বে সম্ভব লোকটি কত বেশী ধনী ?

মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য জা গিয়েও মানুষ এই ধরনের খে সামনে পড়ে থেকেছিল দীর্ঘ মাথার ওপর আকাশ। রাতের অন্ধক সেই আকাশে ফুটে ওঠে বিচিত্র নক্ষত্র। তাদের খালি চোখে আ দেখতে পাই। দেখতে পাই একটি কারণে—তাদের আলো দৃ মান। ইংরেজীতে যাকে বলা 'ভিজিবল লাইট'।

কিন্তু গত কয়েক দশকে বি এবং বিশেষ করে প্রযুক্তির অভূত উন্নতির দরুন মহাবিশ্বের না জগৎগুলি মানুষ দেখতে শুরু সম্পূর্ণ ক নতুন অভিজ্ঞ ভিত্তিতে, নতুন নতুন কৌশ আবিষ্কৃত হল, খালি চোখে ন জগতের যেটুকু আমরা দেখতে সেটাই, তার সবটুকু নয়। দৃশ আলো ছাড়াও মহাবিশ্ব আমাদের পরিমণ্ডলে নিরত নানারকম বিকিরণ বর্ষিত হ যেমন, একস-রে, গামা রশ্মি, বেগুনী এবং অবলোহিত র কিংবা বিভিন্ন কম্পাঙ্কের বে তরঙ্গ। মুশকিল এই, বিকিরণ খালি চোখে কখনও পড়ে না। আর পড়ে না বলেই উৎসগুলি অদৃশ্য অবস্থাতেই যায়।

তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং তার নির্ভর করে নানারকম পদ্ধতির ভাবলেন জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞা উদ্ভাবিত হল নানারকম প্রকৌ নানারকম যন্ত্রপাতি। এদের নিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করলেন, অথবা যেসব নক্ষত্র আমরা খালি দেখতে পাই, দৃশ্যমান আলো তারা আরও নানারকম রশ্মি বি

...আবিষ্কৃত হল, মহাবিশ্বে ...ন অজস্র নক্ষত্র বা নাক্ষত্রিক বস্তু ...রাজ করছে যাদের আমরা কখনই ...লি চোখে দেখতে পাই না। নাক্ষত্রিক ...বর্তনের মধ্যে তারা এমন কোন ...স্থায় হয়তো বিরাজ করছে, যার ফলে ...রা দৃশ্যমান আলোর বিকিরণ-...মতা হারিয়ে ফেলেছে। অথবা সেই ...মতা এত ক্ষীণ যে, দৃশ্যমান আলো ...কীর্ণ করলেও শত শত বা লক্ষ ...লোক-বছর দূরত্ব অতিক্রম করে ...থিবীর দর্শকদের চোখ পর্যন্ত সে ...কিরণ এসে আর পৌঁছতে পারে ...। আবিষ্কৃত হল, এমন অনেক নক্ষত্র ... নাক্ষত্রিক বস্তু আছে যেমন রেডিও ...ক্ষত্র, কোয়াসার, পালসার, একস-রে ...ক্ষত্র, একমাত্র অদৃশ্য বিকিরণের ...ধ্যমেই যাদের অস্তিত্ব আমরা ...নুমান করতে পারি।

'অদৃশ্য জগৎ' এসব বিষয় ...য়েই লিখিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ...টি নয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই ...ন্থে লেখক মুখ্যত যেসব বিষয় নিয়ে ...লোচনা করেছেন তাদের মধ্যে আছে ...ডিও নক্ষত্রজগৎ, কোয়াসার, পাল-...র, সুপার নোভা বা অতি নোভা, ...স-রে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহা-...শ্বের নেপথ্য বিকিরণ বা ব্যাক-...উণ্ড রেডিয়েশন। লেখক বিষয়বস্তু ...খ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ...ছুটা গণিতেরও সাহায্য নিয়েছেন। ...াকাশযানের সাহায্যে মাত্র এক ...কের কিছুটা বেশী সময়ের মধ্যে ...নুষ 'অদৃশ্য জগৎ' সম্পর্কে কত ...তুন তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে ...সবও উল্লেখ করেছেন তিনি। ...ইটির আরও একটা উল্লেখযোগ্য দিক ...ল, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লেখক কিছু ...ছু যন্ত্রপাতি, যেমন রেডিও-...টারফেরোমিটার, টেপ রেকর্ডিং ...টারফেরোমিটার প্রভৃতি অত্যন্ত ...রল ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন, যা ...ক্ষত্র বিষয়ক গবেষণাক্ষেত্রে বিজ্ঞানী-...দের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পাঠকদের ...ছুটা আভাস যোগাতে সমর্থ ...বে। বইটি লেখার জন্যে ...লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন নির্ভর-...যোগ্য রেফারেন্সেরও সাহায্য ...নিয়েছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ...র ফলে বইটির নির্ভরযোগ্যতা ...নেকটা বেড়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় ...যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে লেখেন, তাঁদের ...লেখায় এদিকটি সচরাচর অনুপস্থিতই ...থেকে যায়।

একটা কথা। মূল বিষয়ের ...পারে যাঁরা কিছুটা আগে থেকেই ...বহিত নন, বিষয়সম্বন্ধ হওয়া ...ত্ত্বেও বইটি তাঁদের কাছে কষ্ট-...ঠ্য হবে বলেই মনে হয়। লেখকের ...ন কোন বক্তব্য, যেমন ১। 'পৌনঃ-...ন্যের আপাত বৃদ্ধি ও হ্রাসের ...ন্য অর্থাৎ শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ...সবৃদ্ধির ফল এরকম হয়।' (পৃঃ ...৫)। ২। উজ্জ্বলতার প্রভাবে বিভিন্ন ...গে গতিশীল থাকবার জন্যে এইসব ...রমাণুর বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ...াড়ে ও কমে; এতে বর্ণালী রেখা ...ওড়া হয়ে যায়।' (পৃঃ ৩৬) বর্ণালী ...রেখা চওড়া বলতে লেখক কি বলতে নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টির কাজ শুরু করে দেয়।' (পৃঃ ৫৯)। গ্যাস ছাড়াও 'কসমিক ডাস্ট'ও তো থাকে? ২৫৯ পৃষ্ঠায় চাঁদের বস্তুর রূপান্তর সম্পর্কে ব্যাখ্যাটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান-পাঠকদের কাছে কতটা স্পষ্ট হবে, বলা শক্ত। মনে হয় কিছু কিছু গাণিতিক, চার্ট এবং লেখচিত্রের বাহুল্য থাকায় বইটি সার্থক জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার সুরটি কিছুটা হারিয়েছে। তবে জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানের যাঁরা 'সিরিয়াস' পাঠক, 'অদৃশ্য জগৎ' তাঁদের ভাল লাগবে।

সমরজিৎ কর

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

সমন্বয়বাদী শারীরাঙ্কন

ম্যাকস মুলার ভবনের দৌলতে গত কয়েক বছরে ছাপাই ছবি দেখেছি প্রচুর—কলাকৌশলের দিক দিয়ে উন্নত-মানের কারিগরী। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর এমন একটি প্রদর্শনী হলো (বিড়লা আকাদমী ২৯শে অগাস্ট—১০ সেপটেম্বর)। ম্যাকস মুলার ভবন এবার নয়াদিল্লির ত্রিয়ানালের ছবি কেন দেখাল না কলকাতায়? শুধুই ছাপাই ছবি। সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুসারে আজকাল এক দেশের কাজ অন্য দেশে যাচ্ছে। সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে মার্কিন মুলুকে গেছে "সিথিয়ান গোলড" অর্থাৎ শকদের ব্যবহৃত স্বর্ণের ওপর কাজ করা বাসন-কোসন। তৃতীয় বিশ্বের "অনুন্নত" জাতির জন্যে ছাপাই ছবি বা পোস্টার যথেষ্ট! ওতেই সন্তুষ্ট থাকো। ফরাসীরাই বরং আমাদের মানুষ বলে গণ্য করেছে। ছাপাই ছবির এমন প্রদর্শনী দেখতে আমার নিজেকে অপমানিত মনে হয়। এমন তুচ্ছ জিনিস যে এর বীমা খরচ সামান্য।

পশ্চিম জার্মানীর শিল্পীদের কাজ দেখতে ভালই লাগে। জীবনযাত্রার মান বাড়ার সংগে সংগে মানুষের অধ্যাত্ম দৈন্য বাড়ে। ভোগবিলাস যেন এক মেফিস্টোফিলিস যে ফাউস্টের আত্মাকে চুরি করে। গ্যেটে থেকে টমাস ম্যান পর্যন্ত কবি সাহিত্যিকরা অধ্যাত্ম সংকটের কথা বলেছিলেন, যা হাইনরিখ বোলের সাম্প্রতিকতম উপন্যাসেও পরিষ্কার। সেই একই বক্তব্যই সমান তিক্ততা তীব্রতা নিয়ে জার্মানরা চিত্রের ভাষায় বলতে পারছেন। তা ছাড়া আসউইগ বেলসান এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের জন্যে তাঁদের লজ্জা এবং অপরাধবোধ প্রচণ্ড। সুতরাং এঁরা যখন মানুষ আঁকেন তখন বামন (দ্রষ্টব্য : হর্সট এনটেসের রঙীন পাথর ছাপ) বা "দানবীয় মূর্তি" (জেরগান উইসমান ভূমিকায় "ডিমনিক ফিগার" বলেছেন) এসে পড়ে। কেন বিকলাঙ্গ, বামন, দানবসদৃশ মানুষের চরিত্রের চিত্রশালা? প্রবাসী জার্মানদের একথা বললে কিন্তু তারা আপনার মুখদর্শন করবেন না। হিটলারের উত্থান, যুদ্ধে পরাজয় এবং বিদেশী সাহায্যে ভোগ-বিলাসী হওয়ার সুযোগ তাদের জাতীয় চরিত্রকে পর্যুদস্ত করেছে। তাদের কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দেয়। এঁদের মধ্যে হ্যাপ গ্রিসাবেরের জন্ম ১৯০৯, (বাদবাকি সবাইয়ের ১৯৩৬—৪২) এবং তাঁর রঙীন কাঠখোদাই মানবিক। যুদ্ধের আগে পরে যাঁদের জন্ম তাঁদের ছবি অমানবিক। ইংরাজী 'ইনহিউম্যান' আর 'ডিহিউম্যানের' মধ্যে তফাত আছে। নৃশংস আর নারকীয়র মধ্যে যা তফাত। ছবিগুলিতে নরকবাসের যন্ত্রণার কথা আছে। যুধিষ্ঠির নরকদর্শন করে শেষে স্বর্গে যান। এখানে অনন্ত নরকবাসের কথা। মর্গে শবব্যবচ্ছেদ—কাঠখোদাই, পাথরছাপ, রেশমী পর্দাছাপ, বিকৃত বিকারগ্রস্ত যন্ত্রণার চীৎকার। দান্তে আলিগারির 'ই ন ফা র্নো' পাঠের অভিজ্ঞতা। কিন্তু নরকে তাঁর পথ-প্রদর্শক ভারজিল এবং তাঁর পেছনে অক্ষয় স্বর্গবাসিনী বিয়াত্রিচ।

আঙ্গিকগত চরম নৈপুণ্য সত্ত্বেও ছবি আমাকে তৃপ্তি দেয়নি। অথচ মানুষের অধ্যাত্ম সংকটের রূপক আমি তাঁদের মননের দৈন্যও বলতে পারছি না। এখনও যেখানে গোয়েবেলসের দিনপঞ্জি বা রমেলের বিষয়ে নতুন গবেষণা বেরুচ্ছে সেখানকার মানুষ স্বস্তিতে থাকতে পারে না। প্রত্যেক জাতির আলমারিতে কংকাল 'গুচ্ছ'. কারো বেশী কারো কম. কিন্তু ক্রমাগত যদি কংকালগুলো বেরিয়ে আসে তাহলে মুশকিল।

যাদুঘরের যাদু

যাদুঘর বহিরাগতদের যত আকর্ষণ ... তবুও যাদুঘর সাংস্কৃতিক জীবনে প্রয়োজনীয়। অধিকর্তা ডঃ সুনীল রায় এবং তাঁর সহকর্মীরা চেষ্টা করছেন যাতে নাগরিকদের সংগে যাদুঘরের সখ্য গড়ে ওঠে। যাদুঘরে ফুলচাঁদ পাইন থেকে অনিল সেন পর্যন্ত বহু শিল্পী আছেন। তাঁরাও প্রদর্শনীগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থিত করছেন। শুভ লক্ষণ। বস্তুত চৌরঙ্গী সদর স্ট্রীট দিয়ে ঢুকে ডানদিকে গেটে আশুতোষ সেন্টেনারী হল কলকাতা-বাসীমাত্রেরই চিনে নেওয়া দরকার। ১৯৭২ থেকে সংগৃহীত শিল্প সম্ভারের সুনির্বাচিত প্রদর্শনী (সেপটেম্বর ১১—১৭)। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পোড়ামাটি পাথর ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য থেকে নৃতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয় মুখোশ ইত্যাদি যেমন ছিল, তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারে এমন প্রাচীন মুদ্রা।

আলেখ্য দর্শনও ঘটল। ১৮শ ১৯শ শতাব্দীর অনুচিত্র ছিল। কাংড়া গাড়োয়ালের মোটামুটি মানের ছবি। এর মধ্যে পাটনা কলমের অভ্রর ওপর আঁকা 'নাচঘর' (১৯ শতক) ছবিটার মধ্যে শস্তা ভাবটা প্রকট। ইংরাজ আসার ফলে অনুচিত্রের দুর্দশার শুরুর চিহ্ন সুস্পষ্ট। লখনউ কলমে হাতির দাঁতের ওপর কাজটায় ইউরোপীয় কায়দায় প্রতিকৃতি আঁকার প্রভাব স্পষ্ট। এক বর্গ ইঞ্চিতে প্রতিকৃতিটি সম্ভ্রান্ত মহিলার। খিলান দেওয়া দরজায় লাল পর্দা। পর্দাটা

ফোটোগ্রাফের মতো নিখুঁত। অনুচিত্রের অবক্ষয় শুরু হয়ে গেছে।

ঐ শতাব্দীর মন্দিরে বিগ্রহের পেছনে ঝোলাবার বিরাট 'পিছাবি' দেখলাম। বল্লভচারী সম্প্রদায়ের ফ.জ। যে কোনো কারণে প্রচলিত ধারণা হলো অনুচিত্রই আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু ভিত্তিচিত্র এবং দেওয়ালচিত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়ানো। অনুচিত্রের দরবারী শৌখিন সূক্ষ্মতা ছাড়াও ভারতীয় ছবিতে ভীষণ রকম বেঁচে থাকার কাজও হয়েছে। উদয়পুরের মন্দিরের ঝোলানো দৃশ্যটি ৬´×৪´ অসাধারণ কাজ। নীচে পুকুর। পুকুরে মাছ। মাঝখানে গরুর পালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ। গোপিনীরা জল নিয়ে ফিরছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আঁচল চেপে ধরেছেন। পেছনে পাহাড়। আকাশে পুষ্পক রথ। লোকগুলির পাগড়ী এবং গোপিনীদের শাড়িতে জরির কাজ। খুঁটিনাটি, রঙের জেল্লা থেকে অংকন, গোটা রচনা ভীষণ জমাট এবং জীবনধর্মী।

এ ছাড়া ছিল নব্য ভারতীয় রীতির কাজ।

গগণেন্দ্রনাথকে অনেকে 'কিউবিস্ট' বলেন। কিন্তু ব্রাখ, পিকাসো, লেজারের কিউবিজমের সংগে তাঁর পার্থক্য মৌলিক। তিনি কিউবিস্ট ছাঁচে তাঁর কল্পচিত্র এঁকেছিলেন। এবার তাঁর দুটি দারুণ কাজ দেখলাম। একটি কাজের নাম 'আজান'। সোনালী রঙ সমতলভাবে পটে দিয়ে তারপর লাল নীল ত্রিভুজ চতুর্ভুজ সিঁড়ি উঠিয়ে সমতল ভাবটির একঘেয়েমী কমিয়েছেন। মিনারে মিশরী মূর্তির মতো একটি মানুষ আজান দিচ্ছে। রঙ এবং রচনা-সৌকর্য গুণে জমাটি কাজ। অন্য কাজটি 'কুরুক্ষেত্র'। প্রসারিত প্রান্তর অলিন্দের সম্মুখে। স্তম্ভ আর আচ্ছাদনে ত্রিভুজাদি কারুকর্ম। আর এই আলো অন্ধকারে কে এই বিষাদময়ী নারী? ইনি মাতা গান্ধারী। ছবিটির বর্ণ ও রচনার গাম্ভীর্য উজ্জ্বল করে তোলে। এত না হলেও 'মায়াকানন' এবং 'রাজা' ভাল কাজ।

অবনীন্দ্রনাথের প্যাস্টেল আর ওয়াশের ভাল কাজ ছিল। দেখা কাজ। তার মধ্যে সুবিখ্যাত 'গণেশজননী'। এর মধ্যে নীল থালি ফুলদানির ওপর প্রজাপতি। এই কাজটির মানসিকতা পরবর্তীকালের যোগেন চৌধুরীর সংগে মেলে।

নন্দলাল বসুর সুপরিচিত 'পার্থ-সারথি' এখন যাদুঘরে। তাঁর 'আমার গুরু' এই প্রথম দেখলাম। কাপড়ের ওপর কাজ। পটভূমির সাদা এবং অবনীন্দ্রনাথের জামাকাপড়ের শুভ্র শুচিতার মধ্যে বিভেদ তৈরি করার জন্যে সাদার বুনোট দারুণ। কাষ্ঠাসনের দুই থাক। প্রথম থাকের ওপর সবুজ গদি। তার ওপরের থাকটায় লাল গদি। পদ্মাসনে বরাভয় মুদ্রায় তুলিসুদ্ধ হাত তুলে বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ। হাতটার অঙ্কন দুর্বল। কিন্তু ভাল কাজ। পেছনে নীল গামলায় পদ্ম ফুল সাজানো। আর একটি কাজ অষ্টাদশী শ্যামা আগুনের মধ্যে নৃত্যরতা। উলংগিনী। ভক্তিভাবে আঁকা।

এ ছাড়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের

আকাশ এসে সমুদ্রের সংগে মিশেছে। উপকূলের বালুকারাশির মধ্যে অচৈতন্য শ্রীচৈতন্য। তাঁর বস্ত্র যেন অনন্তনাগ। বেলাভূমির সংগে সমুদ্র, সমুদ্রের সংগে আকাশ, বস্ত্রের সংগে দেহের, জীবের সংগে জড়ের, ব্রহ্মার সংগে সৃষ্টির এক অচিন্ত্য ভেদাভেদ। এখানেও অংকন দুর্বল।

এই প্রদর্শনী থেকে আমার কাছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। নব্য ভারতীয় রীতি যতটা নিন্দা করা হয় ততটা করার যথেষ্ট যুক্তি নেই। যদিও অতীত-মুখিতা তাঁদের দুর্বল করেছিল। এক ধরনের রীতি জোর করে চাপিয়ে দেবার জন্য তাঁদের অংকন কখনো কখনো দুর্বল হত। কিন্তু জীবন ও রসবোধ এবং আন্তরিকতাগুণে তাঁরা ভারতীয় চিত্রকলায় অবশ্যই স্থায়ী আসন পাবার অধিকারী।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : রবীন্দ্র সদন

রবীন্দ্রসদন সারা বছরই নানাভাবে জাতীয় কর্তব্য পালন করে থাকেন। দেড়মাসব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব, সপ্তাহব্যাপী শরৎ জন্মোৎসব, শিশু উৎসব, নাট্যোৎসব সব কিছু করার পরও কিছু দায়িত্ব বাকি থেকে যায়। রবীন্দ্রসদন তাই সপ্তাহ ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকের সৃষ্টি সুধীসমাজের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু সব অনুষ্ঠানই অন্য পাঁচটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম[illegible] ফাংশন হয়ে দাঁড়ায়—অন্যতর কোন পরিকল্পনা প্রয়াসকে সুচিহ্নিত করে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় রবীন্দ্রসদন মঞ্চেই অনেক প্রতিষ্ঠান নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হন কিন্তু রবীন্দ্রসদন উদ্যোগে যা হয় সেটা নিছক জলসা—অবশ্য আভিজাত্য রেখে।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হল বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্র স্মরণ সন্ধ্যায় সভাপতি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শম্ভু ঘোষ। এইদিনের মূল অনুষ্ঠান ছিল একটি সঙ্গীতা[illegible] (?)। 'সবারে আমি প্রণাম করে যাই' অনুষ্ঠান নিবেদন করেন রবিরশ্মি সংকলন ও গ্রন্থক—ভাস্কর বস[illegible] সংগীত পরিচালনা সাগর সেন। 'স্মর[illegible] সন্ধ্যার' সমালোচনা রীতিবিরু[illegible] কিন্তু একক কণ্ঠে বেসুরে গাও[illegible] 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার', 'আম[illegible] সকল দুখের প্রদীপ' কিংবা যেতা[illegible] 'এই কথাটা ধরে রাখিস' স্মরণ সন্ধ্যা[illegible] বিড়ম্বিত করে। আর রোমাঞ্চিত হ[illegible] হয় বাণী ঠাকুরের কণ্ঠে 'আমি জে[illegible] শুনে তবু ভুলে আছি।' প্রতিষ্ঠ[illegible] সুযোগ নিয়ে 'যেন তেন প্রকারেণ' [illegible] পরিবেশন শুধুই বঞ্চনা। তুল[illegible] সম্মেলক গান 'তোমার অসী[illegible] পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই' অ[illegible] স্বচ্ছন্দ যদিও 'পথে চলে যেতে যে[illegible] গানে আবার কণ্ঠে দৈন্য প্রকট হয়ে [illegible]

রজনী

'যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ' এবং সাগর সেনের 'পথ এখনো শেষ হল না।'

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল 'বঙ্কিম জয়ন্তী'। রবীন্দ্রসদন সহজভাবে যা করা যায় তাই করেছেন অর্থাৎ উদ্বোধন 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে (সতিব্রত দত্ত), তারপর রচনা পাঠ রাধামোহন ভট্টাচার্য, সর্বশেষে আর্ট থিয়েটার প্রযোজনা করলেন 'রজনী'। অথচ এই একটি সন্ধ্যায় সদন কর্তৃপক্ষ অনেক কিছু ভাবতে পারতেন। ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক গান আছে, যেমন 'মৃণালিনী'-তে গিরিজায়ার গান 'যে ফুল ফুটিত সখি' বিষবৃক্ষে বৈষ্ণবীর গান শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো বলে হে তাই এসেছিলাম এ গোকুলে' এবং 'কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল'। এক সময় প্রতিটি উপন্যাসের নাট্যরূপে গান সংযোজিত হত—সেই সব প্রাচীন শিল্পীদের অথবা সুর খোঁজ করে আনা যেত। নতুন করে আর একবার আবিষ্কার করা যেত, গান ও পাঠ মাধ্যমে। এসব অনেক পরিশ্রমসাধ্য প্রয়াস, তার থেকে একটি নাটক দিয়েই একদিনের অনুষ্ঠানের নিয়মরক্ষা অনেক সহজ। আর্ট থিয়েটারের 'রজনী'র নাট্যরূপ বা নির্দেশনা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একই পরিকল্পনায় 'রজনী' মঞ্চস্থ হয়েছে অন্য সংস্থার উদ্যোগে কিছুদিন আগে যার বিস্তারিত আলোচনা এই পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত। আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনার শিল্পী তালিকা স্বভাবতই পরিবর্তিত—যার মন্দের থেকে ভালর ভাগই বেশী।

তৃতীয় দিন ছিল অতুলপ্রসাদের গানের আসর। প্রথমে অতুলপ্রসাদের রচনা থেকে পাঠ করেন 'মমতা দাশগুপ্তা। কবিতা ছাড়াও গান ও আবৃত্তি তালিকাভুক্ত হয়—যে গান আসরে গাওয়াও হয়। গীতিগুঞ্জ পরিবেশিত সম্মেলক গান বেশ ভাল। 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' এখন সকলেই হার্মনাইজেশন সহযোগে গান করেন—অনেকদিন বাদে পুরনো রীতির স্বাদ পাওয়া গেল। এই আসরে সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের গান অনেকদিন মনে থাকবে। আসরে যাঁরা গান গাইলেন প্রায় সকলেই স্বীকৃত শিল্পী। এই আসরে নতুন অভিজ্ঞতা জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গান। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় নিপুণ শিল্পী। তিনি কোন 'ঢং'-কে প্রশ্রয় না দিয়ে সুরের মাধুর্যে গানকেই মর্যাদা দিয়েছেন, যেমন জৌনপুরী-তে 'তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে' গানটি আরম্ভ কিংবা 'কামিও হে শিব' গানে 'বিপদে' শব্দটিতে সুরের উচ্চারণে জোর দেওয়ায় গান জমে ওঠে সহজেই।

চতুর্থ দিন দ্বিজেন্দ্রগীতির আসর ... ... আর নেপথ্যের জন্য আবৃত্তি। দ্বিজেন্দ্রলালের বিভিন্ন রসের নাটক থেকে অভিজ্ঞ শিল্পীদের দিয়ে পাঠ করানো যেত। জলসা প্রযোজনার আরও একটি উদাহরণ। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের যে ধরনের গায়কী অনুসরণ সেই গায়কী অনেক সময় ব্যাকডেটেড্ মনে হতে পারে, কিন্তু মাধুরী মুখোপাধ্যায় এখনও অনন্য তাঁর স্বকীয়তায়। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এখন দ্বিজেন্দ্রগীতি বিশেষজ্ঞ, সেদিনের অনুষ্ঠানে 'বেলা বহে যায়' কিন্তু প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেনি। অন্য গান মোটামুটি। সর্বাণী হোম ও শিখা বসু গান থেকে 'ঢং'কেই প্রশ্রয় দেন, তাই অস্বাভাবিক, অস্পষ্ট উচ্চারণ শ্রবণকে বিড়ম্বিত করে। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি হিমাংশু রায়চৌধুরী ও চিত্রিতা দাশগুপ্তের অন্তর্ভুক্তিতে পূরণ হয়নি।

"গুণীজন সম্বর্ধনা রবীন্দ্রসদনের অন্যতম কর্তব্য"। ইতিপূর্বে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় অবদানের জন্য রবীন্দ্রসদন সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, কানন দেবী, উদয়শঙ্কর ও সুচিত্রা মিত্রকে। এবার রবীন্দ্রসদন সম্বর্ধনা জানালেন রাজ্যসভায় সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রীনেপাল মজুমদারকে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এঁরা দুজনেই রবীন্দ্রসদন কার্য নির্ধারক সমিতির সভ্য) এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল—শিল্পী ছিলেন রবীন্দ্রসদন উৎসব উপসমিতির চারজন সভ্য—সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও হাবুল দাস। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'এমনি করেই যায় যদি দিন', সুচিত্রা মিত্রের 'তব প্রেমসুধা রসে' এবং 'রইল বলে রাখলে কারে' গানগুলি ঐ সন্ধ্যাকে রমণীয় করেছিল। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় নজরুল গীতির পর নিজের লেখা ও সুরের যে দুটি গান শোনালেন, সেই গান অবসন্ন আধুনিক গানের যুগে নতুন প্রত্যাশা জাগায়। এই তিনজন শিল্পী উৎসব উপসমিতিতে সভ্য থাকায় রবীন্দ্রসদন উপকৃত হবেন অনেকখানি—পাশাপাশি হাবুল দাসের গান প্রমাণ করে, কার্য নির্ধারক সমিতির সদস্য হিসাবে তিনি যতই সক্রিয় হোন না কেন, শিল্পী হিসাবে অন্তত এইসব আসরে নিষ্ক্রিয় থাকাই শুভ হবে।
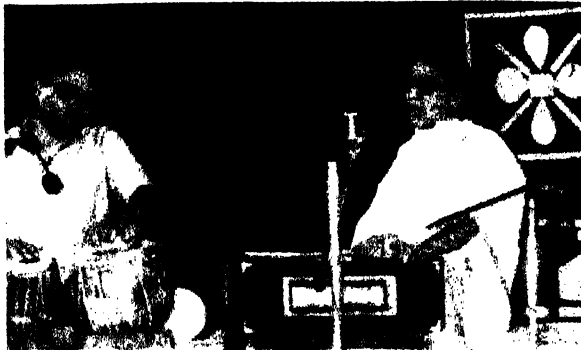
রজনীকান্তের গানের আসরে সন্ধ্যা সেনের গান অতুলনীয়। নিশিথ সাধু ও নীলা মজুমদারের গানও মনে রাখার মতন। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রজনীকান্তের গান স্বতঃস্ফূর্ত। গীতা মাইতির গান মোটামুটি। অসীমা ভট্টাচার্য এই আসরে রজনীকান্তের গান পরিবেশনে যথেষ্ট আন্তরিক ও সহজ ছিলেন যার জন্য সহজেই মনকে ছুঁয়ে যায়। ভাল লাগেনি অতনু সান্যালের গান। প্রতিদিন সঙ্গীতানুষঙ্গে বেহালায় সলিল মিত্র অতুলনীয়। রূপেন ঘোষ সঙ্গত করেন ভালই—তবে খোল বাজানোর সময় তিনি বাজনা শোনানোর থেকে দেখাতে চান বেশী। শেষ দিন ছিল সুকান্ত জয়ন্তী। রবীন্দ্রসদনে এই প্রথম সুকান্ত জয়ন্তীর অনুষ্ঠান: প্রথমে নারায়ণ চৌধুরী ও তারাপদ লাহিড়ীর ক্লাস লেকচারের মত ভাষণ ছাড়া বিভিন্ন আবৃত্তি ও গানের মধ্যে এক্সপেরিমেন্টের পরিচয় মেলে। গীতিগুচ্ছ'-এর অন্তর্গত যে রোমান্টিক সুকান্তর গান পাওয়া যায়—সেই সব গানে সুর সংযোজিত হয় খুব কম। অথচ তাঁর অনেক কবিতার গীতিরূপ এখন কিংবদন্তী, এমন কি কবিতায় সুর সংযোজনের সার্থক উদাহরণ। এই আসরে হাবুল দাস যখন ক্রান্তি শিল্পী সংঘের সভ্যদের নিয়ে কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন তখন অগোছাল সুর কাব্যকেও ক্ষুণ্ণ করে, আবার অজয় দাশ যখন সহশিল্পীদের নিয়ে সুকান্তর কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন তখন কাব্য অক্ষুণ্ণ থেকেও কবিতা গান হয়ে ওঠে। (গানের সুরে সলিল চৌধুরীর প্রভাব সুস্পষ্ট—তবুও সেটা সুলক্ষণ, কারণ মহাজন পন্থা অবলম্বন, খামখেয়ালী থেকে অনেক বেশী কাম্য)। সহশিল্পীদের মধ্যে সুজাতা গোস্বামী একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় চারটি গানেই আন্তরিক—খাদের দিকে তাঁর কণ্ঠ সেদিন তাঁর পরিবেশনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় গাইলেন 'একটি মোরগের কাহিনী'। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত শিল্পী নন। হলেও দোষের ছিল না—কারণ অনেক সীমায়িত ক্ষমতা অথচ অসীম দম্ভের শিল্পীর থেকে তিনি ভাল গান করেন। সবশেষে ক্রান্তিবীণা পরিবেশন করলেন নৃত্যনাট্য অভিযান (সুর—হাবুল দাস, নৃত্য—স্মৃতিকণা দাস)। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের সুর অবলম্বন করে এখনও কত কাজ করা যায়—এই নৃত্যনাট্য তার প্রমাণ। নৃত্যাংশে ছিলেন টিংকু দাস স্মৃতিকণা দাস, কাজলী চৌধুরী, ভক্তি সিং প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশে ইলা দাস হাবুল দাস, বীরেন ঘোষ, অমিত ঘোষ প্রভৃতি। অন্যান্য কলাকুশলীদের মধ্যে শঙ্কর দাস, শেখর দাস, অজন দাস সত্যেন ঘোষ, আবৃত্তি ও গ্রন্থনা অজয় দাস।

রবীন্দ্রসদনে সুকান্ত জয়ন্তী একটি নতুন সূচনা—আশা করব অন্য অনেক প্রয়াত কবির মূল্যায়নে সদন কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হবেন। কবিতা পাঠ কবিতায় সার্থক সুরারোপ অনেক পরীক্ষার রাস্তা খুলে দেবে। অনেক উপন্যাস বা ছোট গল্প পাঠ করা যেতে পারে। এবারে 'শেষের কবিতা' পাঠের আসর (রবীন্দ্র জন্মোৎসব) একটি সার্থক অনুষ্ঠান। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠের অনুষ্ঠানও জনপ্রিয় হয়েছে। পুরোন নাটক প্রযোজনা অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু দক্ষ অভিনেতাদের দিয়ে নাটকের বিভিন্ন অংশ পাঠের ব্যবস্থায় অনেকেই অন্যতর আস্বাদ পেতে পারেন—এবং এই সব অনুষ্ঠান একমাত্র রবীন্দ্রসদনই দায়িত্ব নিয়ে সুচারুভাবে করতে পারেন—নইলে সাধারণ জলসায় আয়োজক হিসাবে, সরকারী আনুগত্যে রবীন্দ্রসদনকে ভাবতে কষ্ট হয়। স্মারক পুস্তিকায় প্রতি কবি ও সাহিত্যিকের যে পরিচয় দেওয়া হয় সেই পরিচিতি স্কুলপাঠ্য রচনার মত, রবীন্দ্রসদনের উপযোগী রচনা নয়—সমস্ত ব্যাপারটার পিছনেই পরিকল্পনা ছাড়া এক কয়েদুলো কাজ করে চলেছে।

তিনটি সঙ্গীতানুষ্ঠান

"সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার আমাদের কাছে যেমন সুখের তেমনি একটু আশঙ্কারও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানি জনপ্রিয়তাই সংগীতের মান নির্ণয়ের একমাত্র পথ নয়—বরং এর উল্টোটাই দেখা গেছে....অপরিমিত রবিরশ্মি সর্বদা স্বাস্থ্যকর নয়।" নন্দনের পক্ষ থেকে এই সত্য ঘোষণার পর আকাদেমি মঞ্চে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন তিনজন, যাঁরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের শুচিতার দর্শক রুচি উন্নয়নে নিবেদিত। মায়া সেন মূলত বর্ষার গান নির্বাচন করেছিলেন। গলার অবস্থা সেদিন বোধ হয় খুবই খারাপ ছিল, তাই উল্টো ব্যাপারটাই ঘটে গেল সেদিনকার গানের মধ্যে ভাল লাগে 'মধু গন্ধে ভরা', 'রিমিক ঝিমিক ঝরে' অপর পক্ষে যে সব গানে মায়া সেনের স্বাতন্ত্র্য সেই 'বন্ধু রহো রহো সাথে' 'বড়ো বিস্ময় লাগে' অথবা 'এস পরানে আপন করে' গানগুলির পরিবেশ সেদিন কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি খুব গুরের রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর অন্তর্ভুক্তি বিশুদ্ধ শ্রোতায় কাছে আরও সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার প্রাপ্তি সেদিন ঘটেছে তবে পূর্ণভাবে নয় সেদিনকার গানগুলির ... ...

যা'এর আগে আপনি কখনোই ব্যবহার করেন নি।

ল্যাক্‌মে ক্যালামাইন কত কোমল, কত সহজে ত্বকের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।
একমাত্র ল্যাক্‌মে ক্যালামাইনেই পাচ্ছেন আপনার মনোমত নানান
আকর্ষণীয় শেড যা' আপনার রঙরূপে ফুটিয়ে তুলবে ঝলমলে জৌলুস।
ভেষজ মিশ্রিত একমাত্র ল্যাক্‌মে ক্যালামাইন'ই সুরভিত সুগন্ধে ভরা।
ল্যাক্‌মে ক্যালামাইন — আপনার কোমল ত্বকের,
শিশুর তুলতুলে নরম ত্বকের, এমনকি পুরুষদেরও কর্কশ ত্বকের পুরোপুরি
যত্ন নিয়ে আনবে ঝলমলে দীপ্তি।
আপনার রঙ রূপের যত্নের ভার পুরোপুরি ছেড়ে দিন —
ল্যাক্‌মে ক্যালামাইনের ওপর।

কোমল ও ঝলমলে দীপ্ত

আকর্ষণীয় তিন রকম শেড

সুরভিত সুগন্ধ

daCunha/LC/1 F BEN

সময় হল'। সব অপূর্ণতা মেটবার জন্য বোধহয় সবশেষে সুবিনয় রায়ের আসর। সুবিনয় রায় সেদিন সব ক'টি গানেই প্রমাণ করলেন, রবীন্দ্র সংগীতের শুদ্ধতা বজায় রেখেও সকলের মনোহরণ করা যেতে পারে। সব থেকে ভাল লেগেছে, 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল', 'বিরস দিন বিরল কাজ', 'কোথা যে উধাও হল।' সুবিনয় রায়ের গানের প্রতিবেদন লেখায় একটা অসুবিধা দেখা দেয়—প্রশংসা করতে হলে বিশেষণ ফুরিয়ে যায় অথবা পুনরুক্তি ঘটে—আর সমালোচনা? আদর্শের সমালোচনা স্পর্ধারই নামান্তর।

*

কলামন্দির বেসমেণ্টে মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায় একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করলেন। মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী নন—কিন্তু তাঁর শিক্ষা, পরিবেশন সব কিছুই নিপুণ যা অনেক রেকর্ড শিল্পীর এখনও অর্জন করতে হবে। একক অনুষ্ঠানের দিন ছিল বাইশে শ্রাবণ, গানগুলি সেই অনুষঙ্গে গ্রথিত। গ্রন্থনায় ছিলেন দিলীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ। মোটামুটিভাবে কিছু কবিতা বা গান পাঠ করা হয় যেগুলির রচনাকাল বিভিন্ন বছরের বাইশে শ্রাবণ। একটি আশ্চর্য যোগাযোগ রচনাগুলির যেন দিনটি পূর্বাভাষ—বেদনাসিঞ্চিত! তাই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে 'চিরদিনের সেই আমি।' মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায় নানা ধরনের গান গেয়েছেন; তার মধ্যে ভাল লেগেছে 'তোমারেই প্রাণের আশা কহিব', 'চলিয়াছি গৃহপানে' 'আমার যে আসে কাছে', 'যা হবার তা হবে'। গান সম্পর্কে একটি কথা—গানের স্কেল নির্বাচন সঠিক নয়। নীচু স্কেলের জন্য অনেক গান স্বতঃস্ফূর্ত নয়—সব সময় চেষ্টা করে গাওয়া, অথচ কণ্ঠ যথেষ্ট দরাজ এবং সমৃদ্ধ। সূক্ষ্ম কাজগুলি শুধু ছুঁয়ে যায় মাত্র, কখনই "ফুল প্লোটেড" নয়। এই অকুতোভয় না হওয়ার আর একটি প্রমাণ খাতা বা স্বরলিপি দেখে গান করা। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্মৃতিচারণ করেন শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর।

*

বাগেশ্রীর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করেন প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের গান গেয়ে রবীন্দ্র সদনের একটি সকাল তিনি পূর্ণ করে দিলেন। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গান শোনা সংগীত-শিক্ষার্থীর কাছে বিপদ ডেকে আনে। সে গান শুনে কেউ আপ্লুত হয়ে শেখবার চেষ্টা করলে, স্বরলিপি দেখে বিভ্রান্ত হবেন। অন্য রেকর্ডও তাঁর গানের সঙ্গে মিলবে না। এমন কি তাঁর সাম্প্রতিক লং প্লেইং রেকর্ডে শোনা 'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে' গানটি তালবদ্ধ কিন্তু এই আসরে অসীম দক্ষতায় তাল ছাড়া গাওয়া হল অনেক অলংকরণ সহযোগে। এই আসরে রজনীকান্তের 'জাগাও পথিকে, ঘুমে অচেতন', অতুলপ্রসাদের 'কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা' সব গানগুলি স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়ে থাকে, যে স্বাতন্ত্র্য তাঁর শোভা—অন্যে অনুকরণ করলে হয়ত 'ঢং' মনে হবে। সবশেষে তিনি গাইলেন অন্য শিল্পী সহযোগে 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা'; এই গান এমন রক্তে মিশে আছে, যেখানে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা মুশকিল এবং অপরাধও বটে। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় নির্দ্বিধায় সচেতন শিল্পী তাই সে চেষ্টা তিনি করেননি। গানের পর থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা করেন 'নরক গুলজার'।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

অতুল-রজনী-নজরুল প্রভাত

'সুরমালা' সংগীত শিক্ষায়তনের উদ্যোগে গত ৩ সেপ্টেম্বর বয়েজ ওন লাইব্রেরিতে পরিবেশিত হল অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এবং নজরুলের কিছু গান। ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহ, আয়োজনও তেমন বড়ো মাপের কিছু নয়। দুজন মাত্র শিল্পী। একজন শোনালেন অতুলপ্রসাদী ও কান্তগীতি। অন্য জন নজরুলগীতি। তবু উপাদানের বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছিল এই প্রভাতী আসরকে।

শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম শিল্পী। রজনীকান্তের আটটি ও অতুলপ্রসাদের পাঁচটি গানের নিবেদনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির স্পষ্ট পরিচয় ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর গায়কী পরিচ্ছন্ন, কণ্ঠ সমৃদ্ধ। শিক্ষাপ্রাপ্তির ছাপ সহজেই ধরা পড়ে। লয় এবং মাত্রা জ্ঞানও প্রশংসার যোগ্য। সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে প্রতিটি গানই ভালো গেয়েছেন। বিশেষভাবে মনে থেকে গিয়েছে—'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি', 'তুমি নির্মল কর', 'তুমি মধুর অঙ্গে' ও 'শ্রাবণ ঝুলাতে'। লক্ষ্মীকান্ত পাত্রের তবলা ও জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেহালা তাঁকে যথাযথ সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় শিল্পী দেবব্রত গোস্বামী নিজেই জানিয়ে দিলেন, আধুনিক গানের শিল্পী তিনি, এ-দিনই প্রথম নজরুলগীতি প্রকাশ্যে পরিবেশন করতে চলেছেন। তিনি বলে না দিলেও তাঁকে আধুনিক গানের শিল্পী বলে বোধকরি ঠিকই চেনা যেত, কেননা, নজরুলগীতিকে আধুনিক ঢঙে যাঁরা পরিবেশন করেন, মুখ্যত তাঁদেরই অনুগামী তিনি। তাঁর গলা ভালো। কিন্তু ভঙ্গি ভালো নয়। 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়' গানটিকে দ্বিধাহীন

কাহিনি' রূপে গেয়ে শোনালেন। মেজাজ ভেতরে থাকলে ভালো, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশে মাত্রা ছাড়ালেই বিষম আবহাওয়া তৈরী হয়ে যায়। দেবব্রত গোস্বামীর গান শুনে এই কথাটাই মনে হচ্ছিল সেদিন।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

বুড়োর তরবারি ও অন্যান্য

থিয়েটার শিল্পের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি মাইম আকাদেমিতে একটি যৌগিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে হয়েছিল। অনুষ্ঠান শুরু হয় গণ-সংগীত দিয়ে। প্রতিটি গানের সূচনায় ভাষা পরিকল্পনা মন্দ নয়, কিন্তু গ্রহণকারী শিল্পীরা আরো তালিম নিয়ে গানগুলো পরিবেশন করলেই তা সার্থক হত।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী উপকরণ ছিল একটি আবৃত্তি। আবৃত্তিতে যাঁরা নাটকীয়তা পছন্দ করেন তাঁদের খুশি করতে পেরেছেন মিলন রায়চৌধুরী।

আলোচ্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তুলনামূলকভাবে যা সব চাইতে ভালো লেগেছে আমাদের তা হল, ফাল্গুনী সংঘ নিবেদিত শিশু নাটক 'বুড়োর তরবারি' (রচনা ও নির্দেশনা : পরিতোষ বসু)। যদিও নাটকের সূচনায় নাট্যকারের প্রস্তাবনা প্রকল্প জরুরী-বোধ হয়নি।

মানুষের পক্ষে যা অশুভ অস্ত্র তাই দীর্ঘকাল আগলে রেখেছে অরণ্যের এক বুড়ো। পাঁচ জন শিশু খেলাচ্ছলে এক অভিযানে বেরিয়ে সেই বুড়োর মুখোমুখি হয়। বল তাদের কম, তাই ছল আর কৌশলে তারা ঐ বুড়ো ও তার রক্ষীদের নিহত করে কেড়ে নেয় সেই অশুভ অস্ত্রটি। ফ্যানটাসিধর্মী আলোচ্য নাটকটির বিষয়-বক্তব্য এই। দু-এক ক্ষেত্রে এক-জনের সংলাপ অন্যজন বলে ফেলা ছাড়া এদিন শিশু শিল্পীরা তাদের অভিনয়ে আর বিশেষ কিছু ভুল করেনি। নাটকের শেষ পর্বে সবার চাইতে ছোট শিশুটি যখন বুড়োর সিংহাসনে দাঁড়িয়ে তার পূর্ব বায়না বশত (পাখির ডিমের জন্যে) কেঁদে ফেলে, তখনই, শিশুনাটক হিসেবে আলোচ্য নিবেদনটি বিশেষ এক মাত্রায় উৎরে যায়। তবে নাটকে দুটি চোরের উপস্থিতি নাট্য-গতিতে কিছুটা বেমক্কা মনে হয়েছে, আর বুড়োর ভূমিকায় বয়স্ক অভিনেতার স্থলে কোনো শিশু শিল্পীর অভিনয় দেখতে পেলেই আমাদের ভালো লাগতো।

সবশেষে শ্যামলতনু দাশগুপ্ত রচিত 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর' নাটকটি মঞ্চায়ন করেন থিয়েটার শিল্পের শিল্পীরা। সূচনায় পর্দানের ভূমিকা-ভিনেত্রী ঝর্না মৈত্রের 'ফেন' ভিক্ষার মধ্যে আলোচ্য নাটকটি সম্পর্কে আমরা যে উৎসাহ বোধ করেছিলাম অনুকরণ সর্বস্ব কাহিনীর ফর্মুলা তা আর বহন করতে পারেনি। এ ব্যাপারে অবশ্য হাত বাড়াতে চেয়েছিল শিল্পী-দের অভিনয়, কিন্তু দক্ষতার অভাবে

লেখাপাঠ ভালো।

রঞ্জন দাস

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

আবৃত্তি আলেখ্য ও কবিতা পাঠের আসর

এই শিরোনামায় সম্প্রতি রবীন্দ্র-সদনে 'আমরা সকলে'র পরিচালনায় একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এতে বিভিন্ন স্বাদের কবিতা আবৃত্তি করেন বিভিন্ন আবৃত্তিকার, স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দুজন প্রখ্যাত কবি, এবং আবৃত্তি, ভাষ্যপাঠ ও সংগীত সহযোগে পরিবেশিত হয় দুটি আবৃত্তি আলেখ্য। যার প্রথমটি 'লেনিন ও যৌবন'।

এই আলেখ্যটির পরিকল্পনায় ছিলেন যিনি তিনি সম্প্রতি প্রয়াত সংবাদ পাঠক গৌতম বসু। লেনিনের জীবনী হয়তো অনেকেই জানেন, কিন্তু সেই জীবনের মহিমাকে গৌতম তাঁর যৌবনে যে সৃজনী-শ্রদ্ধায় বরণ করে-ছিলেন তার খবর আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না। সেদিক থেকে আলোচ্য আলেখ্যটি (পরিচালনা : শুভ্রা বসু) এই উৎসবে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

কিন্তু গৌতমের তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য-ব্যাদানে একটি প্রতিবেদন পাঠ করতে এসে তরুণ চক্রবর্তী 'শোকাহতের' যে বাচিক অভিনয় করে যান তাতে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করে ফেলার ফলে তা আমাদের শ্রুতিকে তো বটেই দৃষ্টিকেও পীড়া দিচ্ছে।

আবৃত্তি শিল্পে জনপ্রিয়দের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন কাজী সব্যসাচী, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাদ্রিশেখর বসু, গৌরী ঘোষ, কাজল চৌধুরী, শুভ্রা বসু, শাঁওলী মিত্র, পার্থ ঘোষ, জগন্নাথ বসু প্রমুখ। স্ব স্ব বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে এবং কবিতা নির্বাচনের বৈচিত্র্যে এঁরা সকলে মিলে আলোচ্য অনুষ্ঠানটিকে উপস্থিত রস-গ্রাহীদের কাছে মনোজ্ঞ করে তোলেন।

কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর একটি পরিচিত কবিতার সংগে এদিন পাঠ করে শোনান আনকোরা দুটি কবিতা। সমাজের প্রতি তাঁর তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি প্রকাশ করেন তাঁর তির্যক উচ্চারণে।

উপস্থিত শ্রোতারা আরো যে বিশেষ প্রতিভা থেকে এদিন প্রাপ্তিধন্য হন তাঁর নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে এসে তিনি 'আমার একটু দেরি হয়ে গেল' বলেই টোকা মারেন অবনীর দরজায়। যতটা অবাক হই হঠাৎ তাঁর পংক্তি ভুলে যাওয়ায় তার চাইতেও আশ্চর্য লাগে কোনো ভুলেই তাঁর ছন্দপতন হয় না। আসলে, এমনি অনির্বচনীয় তাঁর ভুলের অভিব্যক্তি ব্যঞ্জনায় যা বিশেষ মাত্রায় স্থান করে নেয় একজন কবির স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থাপনায়।

দ্বিতীয় আলেখ্য 'ফুলের সৌরভ ঝড়ের গর্জন' (পরিকল্পনা ও পরি-চালনা : অমিতাভ বাগচী) দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি।

রঞ্জন দাস

ভালো ফ্যাশনের
অন্তরালে থাকে গবেষণা...
উৎকৃষ্টতা...
অরবিন্দ
...অনুসন্ধান জাত

আপনি এখন তরুণী; তাই এখন আপনার—
এমন সুরক্ষা দরকার, যা শুধু
কেয়ারফ্রী যোগাতে পারে

শ্রেষ্ঠ লেখক : শ্রেষ্ঠ বই

আশাপূর্ণা দেবী

পলাতক সৈনিক ৭·৫০ যার যা দাম ৭৲ নয় ছয় ৬৲ প্রথম প্রতিশ্রুতি ২৮৲ সুবর্ণলতা ২৬৲ বকুল কথা ২৬৲ যে যার দর্পণে ৮৲ অগ্নিপরীক্ষা ৮৲ উড়োপাখী ৮৲ বিজয়ী বসন্ত ৬৲ দূরের জানালা ৩৲ রেললাইন ২৲ পাখীর খাঁচা ও খাঁচার পাখী ৯৲

বিমল মিত্র

আসামী হাজির (১/২) ৪৫৲ কড়ি দিয়ে কিনলাম (১/২) ৭২৲ যে অঙ্ক মেলেনি ১২৲ জন গণ মন ১৬৲ একক দশক শতক ৩০৲ সখী সমাচার ৮৲ কলকাতা থেকে বলছি ৮৲ তিন নম্বর সাক্ষী ১০৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲ বেনারসী ৮৲ কুমারীব্রত ৬৲ স্ত্রী ৮৲ নফর সংকীর্তন ৭৲ যে যেমন ৩৲ চলতে চলতে ১৬৲ ফুলফুটুক ৩৲ সাহেব বিবি গোলাম (পে. ব্যা.) ১২·৫০

প্রমথনাথ বিশী

পনেরোই আগস্ট ২৫৲ লালকেল্লা ৩৫৲ ঐ (পে:ব্যা) ১২.৫০ বঙ্গভঙ্গ ১৪৲ কেরী সাহেবের মুন্সী ২০৲ ঐ (পেঃব্যা.) ১০৲ পূর্ণাবতার ২০৲ বিপুল সুদূর তুমি যে ৭·৫০ শাহী শিরোপা ৩·৫০ হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স ২৲ বেনিফিট অব ডাউট ১০৲ সিন্ধুনদের প্রহরী ৩.৫০ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ৩৲ মাইকেল মধুসূদন ৮৲ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ১০৲ রবীন্দ্র সরণী ১৫৲ চিত্র ও চরিত্র ৬৲ বঙ্কিম সাহিত্য বিচার ১২.৫০ বঙ্কিম সরণী ১৬৲ গান্ধী জীবনভাষ্য ৭৲ কাব্য গ্রন্থাবলী (১/২/৩/৪) ৪৫৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১/২/৩/৪) ৫০৲ অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (১/২/৩) ৪৫৲ কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৲ ভাগবতী তনু রবীন্দ্রনাথ ১২·৫০ ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১০৲ ভক্ত বিবেকানন্দ ৭·৫০ মৃগমদ ৮·৫০ চল চল কাঁচা ৬·৫০ অধরা মাধুরী ৩৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পাঞ্চজন্য ১৬৲ হায়নার দাঁত ৬৲ কলকাতার কাছেই ১৮৲ ঐ (পে: ব্যা) ৬৲ উপকণ্ঠে ২ ঐ (পে: ব্যা) ১০৲ বহ্নিবন্যা ১৩৲ আকাশের সীমা নেই ৫৲ দহন ও দীপ্তি ৮৲ আবছায়া ৫৲ নারী ও নিয়তি ৩৲ প্রভাত সূর্য ৫৲ প্রেরণা ২·৭৫ মনে ছিল আশা ৪·৫০ জ্যোতিষী ৩·৫০ স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম ৩·৫০ রাত্রির তপস্যা ১২৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫·৫০ স্বর্ণমৃগ ৩৲ তবু মনে রেখো ৩৲ তারা ভৈরবী ২৲ আমি কান পেতে রই (পে: ব্যা) ১২·৫০ কথা কল্পনা কাহিনী ১৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মধুমতী থেকে ভাগীরথী ১৬৲ রজনী শেষের শেষতারা ৭৲ অজ্ঞাতবাস ৯৲ অমৃত পাত্রখানি ৮৲ ইস্কাবনের টেক্কা ১৮৲ অশান্ত ঘূর্ণি (১/২/৩) ৩১৲ তালপাতার পুঁথি ২৫৲ স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ১২৲ কোমল গান্ধার (১/২) ১৯৲ অহল্যা ঘুম ৭৲ হাসপাতাল ১৮৲ সেই মরুপ্রান্তে ১৩৲ অপারেশন ১৬৲ কালোভ্রমর (১/২) ১২·৫০ কালোভ্রমর (৩/৪) ১২·৫০ কালোহাত ১২৲ ঘুম নেই ৮৲ কন্যাকুমারী ৮৲ রাতের রজনীগন্ধ্যা ৭৲ উল্কা (উপন্যাস) ১০৲ নীলতারা ৭·৫০ নিশিপদ্ম ৭·৫০ ছিন্নপত্র ৭৲ নপুর ৬৲ লালুভুলু ৭৲ কাজললতা ৮৲ কলঙ্কিণী কঙ্কাবতী ১৮৲ রাতের গাড়ী ৩৲ কাগজের ফুল ২৲ উত্তর ফাল্গুণী ১৫৲ অস্তি ভাগীরথী তীরে ২০৲ বহ্নিশিখা ১৮৲ ঐ (নাটক) ৪৲ নিরালা প্রহর ৩৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৮৭৯১
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪-৩৪৯২

চিঠিপত্র

রাগ-অনুরাগ

প্রথম যখন গ্রন্থের শিল্পী শ্রীরবিশঙ্করের 'রাগ-অনুরাগ' পড়তে শুরু করি, এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন উঠেছিলো ভরে যে রবিশঙ্করকে অগুন্তি জলসায় দেখেছি অনেকবার, শুনেছি হৃদয় ভরে তাঁর স্বর্গীয় সুরঝংকার তাঁরই বয়ানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত পেয়েছে এক অভিনব রূপ এই রাগ-অনুরাগ রচনায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের হয়েছে সঠিক মূল্যায়ন। হঠাৎ যেন সেতারের তার গেলো ছিঁড়ে। গত কয়েক সপ্তাহের "রাগ-অনুরাগে" দেখলাম শিল্পীর জীবনের নানা দুঃখবহুল ঘটনার সমাবেশ। পারিবারিক দুঃখ ঝঞ্ঝাট হয়তো শিল্পীর সংবেদনশীল মনে তোলে ঝড়। তাই তো তাঁর বোবাকান্না রূপ নেয় শ্রোতার হৃদয়-পাগল করা সংগীতের করুণ সুরে। সেই কথা আবার ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে শ্রোতার মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করা অবান্তর।

অঞ্জনকুমার বক্সী
কলকাতা-৭০০০৩২

॥ ২ ॥

রাধিকামোহন মৈত্র একটু বেশি রকম ক্রুদ্ধ হয়েছেন বোঝা গেল। কিন্তু এত ভণিতার পর তিনি যা বলেছেন তাও তো এক্ষেত্রে বাহ্য বলে মনে হয়। "রেওয়াজ" আর "রিয়াজ" নিয়ে এত প্রচণ্ড ধমক না দিলেও চলত, যখন লেখাটা রবিশংকরের নিজের নয়, বলে যাওয়াটাই তাঁর নিজের। একজন বাঙালীর পক্ষে এরকম ভুল ভ্রান্তি হামেশাই ঘটে, যদিও সেটা উচিত নয়। আমরা মুসলমানেরাই কি আরবী, ফারসী ঠিক উচ্চারণ করি? বরঞ্চ এমন হাস্যকর ভুল করি যে অর্থবোধই কঠিন হয়ে ওঠে। রাধিকাবাবু একজন দ্বিতীয় আমীর খুসরোর কথা লিখেছেন, কিন্তু সেতারের আবিষ্কর্তা হিসাবে যাঁর নাম উল্লেখ করা হয় তিনি ইতিহাসবিশ্রুত কবি আমীর খুসরোই বটেন। এর আসল প্রবক্তা হচ্ছেন মওলানা শিবলী নোমানী। তিনিই প্রথমে তাঁর "শায়ের-উল্-আজম" নামক অতি বিখ্যাত উর্দু গ্রন্থে আমীর খুসরোর উপর এই সেতার আবিষ্কারের দায়িত্ব আরোপ করেছেন। অথচ আমীর খুসরোর নিজের রচনার কোথাও এমন কথা লেখা নেই যে তিনি সেতার নামক কোনো একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক কোনও গ্রন্থেও এমন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু গোটা জিনিসটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গোড়াতেই ভুল হয়েছে। আসলে সেতার বলে কোনও যন্ত্র ছিল না। সেকালে "যন্তর" বলে একটা বীণার প্রকারভেদ ছিল। তাতে তিনটি তার যোগ করা হয়েছিল। আইনে আকবরী ভাল করে পড়লে (অবশ্য মূল ফারসীতে) এইটিই পরিস্ফুট হয়। মূল যন্ত্রটির আখ্যা বরাবরই ছিল-বীণ এবং বীণা-সেহতার —এই রকম নাম ছিল সেকালে। ক্রমে বীণ শব্দটি আর ব্যবহার হত না, তার বদলে সেতার শব্দটিই ব্যবহৃত হত...

...আমীর খুসরো সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে। আমীর উপাধিটি একটি মস্ত বড় উপাধি, অথচ এবংবিধ উপাধিধারী দ্বিতীয় খুসরোর নাম কোনও দরবারি ইতিহাসে পাওয়া যায় না। উদুস দোসরা আমীর খুসরো আদৌ ইতিহাস সমর্থিত ব্যক্তি নন, ইনি কোনও ওস্তাদ বা বাজিয়ের পরিকল্পনার সৃষ্টি।

ফরীদুদ্দিন আত্তার
কলিকাতা-১৪

॥ ৩ ॥

"রাগ-অনুরাগ" লেখার জন্য প্রথমেই রবিশংকরবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। এইটি ধারাবাহিকভাবে বেরুনোর জন্যে সংগীত সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেল এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু জানবার আশা রাখি। রবিবাবুর লেখা ২৩নং প্রবন্ধের একটি বিষয় আমি মনে করিয়ে দিতে চাই। তিনি লিখেছেন যে গোপেশ্বরবাবু ভাতখণ্ডেজীর সময়েতেই বা অল্প কিছুকাল পরে যে চমৎকার বই লিখে বার করেছিলেন তার নাম "সংগীত-লহরী।" কিন্তু আমার মনে হয় তিনি প্রথমে "সংগীতলহরী" লিখে বার করেন নি। তিনি ঐ সময়ে তাঁর বিখ্যাত ধ্রুপদ গানের বই "সংগীত-চন্দ্রিকা" (১ম ও ২য় খণ্ড) সন ১৩২১ সালে লিখে বার করেন যা মুদ্রিত করেন বর্ধমানাধিপতি শ্রীল বিজয় চন্দ মহতাব বাহাদুর। তারপর তিনি ১৩০২ সালে তাঁর বিখ্যাত খেয়ালের বই "তানমালা" বার করেন যার প্রকাশক ডোয়ারকিন অ্যান্ড সনস। আর তিনি সংগীত লহরী লিখে বার করেন ১৩০৪ সালের শ্রাবণ মাসে, যা মুদ্রিত করেন মহামান্য শ্রীমন্মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর।

দুর্গাদাস গঙ্গোপাধ্যায়
বর্ধমান

রাগ-অনুরাগ ও রাধিকাবাবু

আমি গানবাজনার ব্যাকরণ জানি না। ভগবানের ইচ্ছায় ভাল উচ্চাংগ সংগীতের আনন্দ কিছুটা বুঝি। রবিশংকর বেশী শুনেছি, রাধিকাবাবুও বেশ কয়েকবার শুনেছি। বারবার রোমাঞ্চিত হয়েছি আনন্দে। ভেবেছি, ভগবানের অতি বিশেষ কৃপার আধার, এঁরা। তাই রাধিকাবাবুর চিঠি পড়ে বেদনাবোধ আমাকে, একজন মোটামুটি পরিচ্ছন্ন কানের শ্রোতা হিসেবে, এই চিঠি লিখতে বাধ্য করেছে। উদ্দেশ্য একটাই, রাধিকাবাবু যেন আরও অগ্রসর হয়ে সংগীত জগতের রাজনীতির অবসাদজনক রূপ আমাদের জানতে বাধ্য না করেন।

রবিশঙ্কর, রাধিকাবাবু, এঁরা মহান শিল্পী। এঁদের চরম প্রকাশ কেবল এঁদের নিজের নিজের শিল্প মাধ্যমে। এঁদের অন্য যে কোন কমিউনিকেশন মাধ্যমে বিচার করা wrong approach।

আমার মনে হয়, রাধিকাবাবু রবিশঙ্করের লেখায় শুদ্ধতা ছাড়িয়ে...

...অত্যাচারের ভূমিকা। বস্তুত আমরা দেশে যা পড়ছি তা বিশেষ ভাবে গৃহীত ঐতিহাসিক দলিল। শঙ্করবাবু বহু আয়াসে অতিক্রান্ত রবিশঙ্করের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে ছিলেন এবং টেপ করেছিলেন। সেই টেপ থেকে তিনিই লেখাটা দাঁড় করিয়েছিলেন এবং মোটামুটি মুন্সিয়ানায় সম্পাদনা করেছিলেন। আমার এমনই মনে পড়ছে। এটা কখনই গানবাজনার গবেষণামূলক সমালোচনা ধরনের লেখা বলে ঘোষণা করা হয়নি। অথচ রাধিকাবাবু প্রথম থেকেই তাই ভেবে নিয়ে কলম ধরেছেন। আমি শুধু প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সবাইকে যাঁরা এত ইমোজিনেটিভ ওয়েতে, এত প্রাণবন্ত ভাবে, নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশের আমেজে বিশাল রবিশঙ্করের একান্ত নিজের মনের বস্তুভাণ্ডার রসজ্ঞ পাঠকদের সামনে হাজির করতে পেরেছেন। এ তো প্রফেশনাল রবিশঙ্কর নন, এ তো মানুষ রবিশঙ্কর, সমুদ্র-রবিশঙ্করের প্রাণ স্পন্দনের লিপি। রবিবাবু নিজে থেকে তো চাননি এসব কথা জনসাধারণের সম্পত্তি করতে। তিনি কেবল আগ্রহী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নিতান্ত নিজের মতামত হিসেবে। এমন আর একজন সমকক্ষ মানুষকেও তো দেখি না তাঁর মত সারল্যে প্রকট হতে। 'রাগ-অনুরাগ' এবং 'কণ্টকল্পিতের' ভেতর একটা মিল আছে। দুটোই মনের নানা রংয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই সমালোচনা, বিশেষ করে, 'মুড়ং দেহি' 'সমালোচনার' ঊর্ধ্বে। তবে অবশ্যই 'আলোচনা'র বাইরে নয়। তাই বলছিলাম, সংস্কৃত শ্লোকের বিভ্রাট, ইতিহাসের বিচ্যুতি, কিংবা 'রেওয়াজ' শব্দ আসল না নকল ইত্যাদির অবস্থিতি আমাদের 'রাগ অনুরাগ'এর আসল স্পিরিট বুঝতে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। কিংবা উপরিউক্ত বিষয়ের হাজিরা রবিশঙ্করের পাণ্ডিত্য বিন্দুমাত্র খর্ব করে না। আমরা তাঁকে সেতারের সিদ্ধপুরুষ হিসেবেই জানি এবং মনে রাখব। আর সব তুচ্ছ।

তবে শঙ্করবাবুকে বলার, এমন প্রশ্ন এত বেশী না রাখলেই ভাল করতেন যাতে পারসনিফিকেশন অবধারিত ভাবে এসে পড়ে। কোনটা বেশী রকম প্রোফেশনাল কিনা। আর, 'অনুরাগ' অংশ আরও একটু কমিয়ে 'রাগ' অংশ বাড়ালে, লেখাটা আরও রসসিদ্ধ হত।

কল্হন সান্যাল
দুর্গাপুর ৯

॥ ২ ॥

গত ১৬ই জুলাই সংখ্যায় রবিশঙ্করের 'রাগ-অনুরাগ' উপলক্ষ করে শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের 'প্রতিবাদ-লিপি' পড়লাম।

লেখক তাঁর লিপিতে রবিশঙ্করকে 'বিশেষ বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর (লেখকের) প্রতিবাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সমালোচনাকে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতে বলেছেন।

অথচ কার্যক্ষেত্রে লেখক এমন সমস্ত মন্তব্য করেছেন যা কিনা মানসিক কারণেই বন্ধুর প্রতি প্রযোজ্য হওয়া...

এ থেকে—তাঁর প্রতি আর অসম্মান করার কোনও বাসনা নেই' লেখকের এই উক্তি যথেষ্ট সন্দেহজন বলে বোধ হয়।

আরও একটি কথা বলা দরকার ভুল ধরার খেলায় উন্মত্ত হয়ে তি নিজেও ভুলের শিকার হয়েছেন।

'রেওয়াজ' শব্দটি কখনই ভুল নয় কারণ এর অর্থ শুধুমাত্র 'প্রচলন' ন অভ্যাসও। এই দ্বিতীয় অর্থটি বাংলা সুপ্রচলিত এবং এর আভিধানি স্বীকৃতিও রয়েছে।

এ ছাড়া তিনি যে 'রিয়াজ' শব্দটি আশ্রয় করেছেন সেটিই বরং বেঠিক শব্দটি হওয়া উচিত 'রিয়া (অন্তস্থ-ব) বা রিওয়াজ। এটি আর শব্দ। আর সবচেয়ে বড় কথা, 'রেওয়া শব্দটি এই রিওয়াজ হতেই এসেছে।

উচ্চারণে শুদ্ধতা রাখতে হ রিয়াজ নেহাতই পরিহার যোগ লেখকের, রবিশঙ্করকে 'সঙ্গীতজগতে শিরোমণি' হিসাবে তুলে দিয়ে এই মই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা—উত্তেজন বশে তা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সমালোচক হিসাবে তিনি যে আর সচেতনতা ধারণের যোগ্য—এ কথাই ত বক্তব্য হতে প্রমাণিত হল।

বিশ্বনাথ রাহা
চক্রধরপুর

ভারতের শেষ ভূখণ্ড

আন্দামানের সবুজ সাপ প্রসঙ্গে আমার ২৪শে জুন তারিখের ('দেশ' ১৯শে আগস্ট) 'দেশ' প্রকাশিত চিঠি জবাবে 'ভারতের শেষ ভূখণ্ডের' লেখ শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ আলো চনার জন্য তাঁকে আমার আন্তরি ধন্যবাদ জানাই।

তাঁর আলোচনা পড়ে বোঝা গে তিনি R. H. Colebrook— রিপোর্ট থেকে পেয়েছেন. ......'th green snake very venomous এবং 'যোজনা' আগস্ট, ১৯৭ আন্দামান-নিকোবর সংখ্যার (Wi life) and its protection-এ লেখক S. S. Chana.

এর লেখা থেকে পেয়েছেন আন্দামা 'A varieties of lizards ar snakes including viper cobras and coral snakes... রয়েছে।

এবার শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর কল্পনা দি দুটি তথ্যের সংমিশ্রণ করে আন্দামা venomous 'সবুজ কোর স্নেকের' উপস্থিতি ঘটিয়ে দিয়েছেন

এ প্রসঙ্গে জানাই, 'যোজনা' বে বিজ্ঞান-পত্রিকা নয় এবং শ্রীচ লেখার ঐ অংশটি (অর্থাৎ আন্দামা কোরাল স্নেক পাওয়া যায়) তথ্যনির্ভর নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্বীকার করি—লেখায় ঐ অংশটি তথ্যনির্ভর কিনা তা শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানার কথা নয়। তবে যেহেতু তি এই ব্যাপারে অনেক গ্রন্থস্বীকার অনেক রিপোর্ট ও বই ঘেঁটে সেজন্য তাঁকে আন্দামানে কি কি আজ পর্যন্ত নথিভুক্ত আছে তা জান

Reptilia and Amphibia'—Vol. III by M. A. Smith (Taylor and Francis Ltd., London), 1943 বইটি পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করি। তাছাড়া Madras Snake Park Trust and Conservation Centre প্রকাশিত Newsletter 'HAMADRYAD', January 1978 (পৃঃ ৯—১৬) থেকে আন্দামানে কি কি সরীসৃপ ও উভচর পাওয়া যায় তার একটি তালিকা তিনি পেতে পারেন। আর একটি কথা ঃ আন্দামানে সবুজ কোরাল স্নেক পাওয়া যায়—এ তথ্যটি তিনি কোথায় পেয়েছেন?

এবার আন্দামানের সবুজ সাপ বিষাক্ত কিনা—এই আলোচনায় আসা যাক। এ ব্যাপারে তিনি 'Animal World Encyclopedia, 1977-এর তথ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে Lieutenant R. H. Colebrook—এর কথাটিই মেনে নিয়েছেন। আমি এ প্রসঙ্গে একজন ভারতীয় প্রখ্যাত পক্ষিবিজ্ঞানী তথা প্রাণীবিজ্ঞানী Humayun Abdulali-র নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে চাই। তিনি ১৯৬৬ সালে প্রাণী সমীক্ষার উদ্দেশ্যে নিকোবরের কয়েকটি দ্বীপ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন—

'9th March, (1966) we got to Camorta in Central Nicobars, where we had hoped to do the bulk of our collecting. The Dy. Commissioner, who was also on the boat, warned me about the large number of snakes on the island and said it was impossible to go out in the dark....I went ashore in a canoe....just outside the D.C.'s garden the guide pointed a largish 'green viper' in the middle of the path. I took the torch, put my foot on its neck and attempted to seize it behind the head. There was some miscalculation somewhere and, before I realised what was happening, I had two long gashes along the middle of my right fore-finger which bled profusely. Killing the snake with the stick, we took it to D.C.'s house, 'to be told that its bite was fatal.' A quarter of an hour had elapsed, and in absence of any local swelling or irritation, 'I was confident that there was no poison to worry about.' (Journal of the Bombay Natural History Society, 1976, Vol. 64, No. 2, pp. 144-145).

সবশেষে আসা যাক Elapidae প্রসঙ্গে। তিনি এই শব্দের origin এবং উচ্চারণ সংকেতের জন্য অনেক শ্রমস্বীকার করেছেন—এজন্য নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদার্হ। আমার চিঠিতে আমি ভারতীয় জীববিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচলিত উচ্চারণের কথাই উল্লেখ করেছি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে অভিধান ঘেঁটে এবং মাননীয় ভাষাতত্ত্ববিদদের সঙ্গে আলোচনা করে যা বুঝেছেন তা [illegible] 'এল-এ-পেডি' বা 'ইলেপেদে' না লিখে 'এলাপিডী' লিখেছেন) তখন সেক্ষেত্রে ভারতীয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ পদ্ধতিটি গ্রহণ করা কি যুক্তিযুক্ত নয়?

প্রাণিবিজ্ঞানের একজন সেবক হিসেবে প্রাণিবিজ্ঞানসম্মত কিছু তথ্য আমি তাঁর কাছে পরিবেশন করেছি। এখন তিনি কোনটা গ্রহণ করবেন এবং কোনটা বর্জন করবেন এটা সম্পূর্ণ তাঁর এক্তিয়ারে।

অশোককুমার দাস
পোর্ট-ব্লেয়ার

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর ধারাবাহিক উপন্যাস 'সেই সময়' রচনাটির গত ২রা সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় ঐ উপন্যাসের ১৪ পরিচ্ছেদে কিছু কিছু এমন ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা ভ্রান্ত বলেই মনে হয়।

প্রথমত সুনীলবাবু লিখেছেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারকানাথের বেতনভুক ছিলেন। এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য থেকেই তো জানা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারের অনেক আগে থেকে, ১৮২৭ সালের মে মাস থেকেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪০ সালে হিন্দু কলেজের সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন। এ সবেরও আগে ১৮১৫ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত দ্বারকানাথ নয়, তিনি রামমোহনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়েই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের রচিত জ্যোতিষ সংগ্রহসার ও বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান 'অভিধান' প্রকাশিত হয়। সুতরাং তাঁকে দেবেন্দ্রনাথের বেতনভুক কর্মচারী আখ্যায় ভূষিত করা কেন?

উপন্যাসটির আলোচ্য পরিচ্ছেদেই অন্যত্র বলা হয়েছে,—'রামমোহন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একেশ্বরবাদীদের উপাসনার জন্য। হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই এতে যোগ দিতে পারবে। বিদ্যাবাগীশ তার আগে থেকেই রামমোহনের সঙ্গে আছেন। তাঁর ইচ্ছে এই সভার পক্ষ থেকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মপ্রচার করা হোক। রামমোহন রাজী হননি।'—প্রকৃত তথ্য কিন্তু অন্যরকম। ১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র কমল বসুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যে অধিবেশন হয় তখন থেকেই রামমোহন নিজে সভার আচার্যের কাজ না করে পরম্পরাক্রমে যে ব্রাহ্মণেরা ধর্মোদেশনার অধিকারী তাঁদের ওপরই এই কাজ ন্যস্ত করেছিলেন। আর ব্রাহ্মসমাজের ভার অর্পণ করেছিলেন তাঁর গুরুস্থানীয় হরিহরানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর। ১লা বৈশাখ ১৭৬৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিবরণেও লেখা হয়েছিল—'রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্নদ্বারা মানিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনার জন্য ক্ষুদ্র আকারে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা সংস্থাপিতা হয় বিষয়ক ব্যাখ্যা করিতেন।' এ সবই প্রমাণ করে যে, ব্রহ্মোপাসনার জন্যই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এ-বিষয়ে রামমোহন ও রামচন্দ্রের কোন মত-বৈষম্য ছিল না।

অন্যত্র লেখক যা বলেছেন তা থেকে মনে হয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে আগে দেবেন্দ্রনাথের বেদান্ত চর্চা শুরু হয় এবং তারপরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাটি ঠাকুরবাড়ী থেকেই প্রকাশিত হত। ঠাকুরবাড়ীর একতলার একটি অন্ধকার ঘরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নিয়মিত এসে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম বিষয়ে নানান উপদেশ দিতেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিন্তু এ প্রসঙ্গে অন্য মত ব্যক্ত করেছেন,—'১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় তত্ত্ববোধিনীসভা ব্রাহ্মসমাজের ভারগ্রহণ করিল। পর বৎসর তাঁহারই আনুকূল্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল, অক্ষয়কুমার দত্ত হইলেন প্রথম সম্পাদক। হেদুয়ার নিকটবর্তী রামমোহন রায়ের পরিত্যক্ত স্কুলবাটীতে পত্রিকার যন্ত্রালয় ছিল; দ্বারকানাথ তখন জীবিত, তাঁহার বিরাগভাজন হইবার ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতে না বসিয়া তথায় গিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট বেদান্ত পাঠ করিতেন।'

অজয় নন্দী
চাকদহ কলেজ

রাজপুত চিত্রমালা ঃ লেখকের জবাব

'রাজপুত চিত্রমালা' (দেশ, ১৫ জুলাই '৭৮) প্রবন্ধটির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ই আগস্টের দেশ পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে শ্রী অশোককুমার দাসের চিঠিটি পড়লাম। সমালোচনার ভঙ্গিতে এ চিঠিতে তিনি যা লিখেছেন তাকে সুস্থ বিশ্লেষণধর্মী বলা যায় না। যুক্তিসঙ্গত তথ্যাদি বিশ্লেষণের বদলে তাঁর চিঠিটিতে শুধু মন্তব্যের আধিক্যও লক্ষণীয়—যা পাঠকদের এ বিষয়ে সঠিক আরও বেশী জানবার আশা থেকে বঞ্চিত করেছে।

(১) শ্রী দাস প্রথমেই প্রশ্ন রেখেছেন লেখককে 'রাজপুত চিত্রমালা বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন?' কিন্তু রচনাটির ৩৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তবকেই তো রয়েছে—'সাতপুরা বিন্ধ্য ঘেরা নর্মদার সীমাটুকু ছাড়ালেই মাথার ওপরে উত্তর ভারতের সুবিস্তৃত এলাকা, যার পশ্চিম দিককে ঘিরে আছে ধূসর বালুকাময় মরুরাজ্য, একটু ওপরে মৌনী হিমালয়ের অযুত শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা গিরিমালা, পঞ্চনদীর ধারা বিধৌত ভূখণ্ড।....রাজস্থানের ঊষর ভূখণ্ড অবধি এ গিরিমালার বিস্তার। এই ছবির মত দেশে রূপকথার রাজ্যের মতো সোনার গাছে মণিমুক্তোর ফল ফলে, রাজপুত আর পাহাড়ী চিত্রকলা যার নাম।' রাজপুত চিত্রমালা বলতে যে বিশেষ ধরনের শিল্পের কথা লেখায় বলা হয়েছে, তার ভৌগোলিক বিস্তার এর থেকে আমার জানা নেই, [illegible] আশ্চর্যের বিষয়, শ্রী দাসও জানাননি।

দ্বিতীয়ত তিনি মন্তব্য করেছেন যে রচনাটিতে 'রাজস্থানী চিত্রকলার কোনো বিবরণ নেই।' ৩৬ পৃষ্ঠার শেষদিকে ও ৩৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে এর প্রয়োজনীয় বিবরণ উপস্থিত। স্থানাভাবে পুনরুল্লেখ করলাম না। শ্রীদাসের অপর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে রাজস্থানের দরবার-ভিত্তিক চিত্রশিল্পকে অবশ্যই রাজপুত চিত্রশিল্পের অন্তর্গত বলে মনে করি। রচনাটিতেও একাধিক স্থানে এর উল্লেখ করেছি কিন্তু প্রবন্ধটি মূলত ক্ষুদ্রচিত্র বা মিনিয়েচারকে কেন্দ্র করে তাই স্থাপত্য ও অন্যান্য দরবারী শিল্পের বিশদ বিবরণ অনুক্ত থেকেছে। এজন্য প্রশ্ন অবান্তর। বুন্দেলখণ্ডের বা পাহাড়ী চিত্রশৈলীকে রাজপুত-শৈলী বলা অনুচিত বলে শ্রীদাস লিখেছেন। তিনি পাঠক হিসাবে লেখাটির প্রতি মনোযোগী হলেই দেখতে পেতেন যে বারংবার আমি 'রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্রকলা' বলে উল্লেখ করেছি, শুধু 'রাজপুতশৈলী' কখনই বলা হয়নি।

'বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কুমারস্বামী প্রদত্ত 'রাজপুত' সংজ্ঞার যে প্রচলনের শুরু—রাজস্থান, মধ্য-ভারত ও পাহাড়ী সমগ্র চিত্রকলাকে উপস্থাপনের জন্য, তা বর্তমান গবেষকদের অনেকেই তিনটি পৃথক শিল্পঘরানা হিসাবে দেখালেন। কিন্তু যখন তিনটি শৈলী বা ঘরানার ক্ষুদ্র চিত্রকে এক করে দেখতে চাই (এই তিন শিল্পশৈলীর মধ্যে শিল্পগত পার্থক্যের পাশাপাশি মিলও যথেষ্ট তা প্রমাণিত হয়েছে) তখন কুমারস্বামী প্রদত্ত সংজ্ঞাকে মেনে নেওয়াটাই একমাত্র পথ। শিল্পগবেষকরা এই তিন শৈলীর মিলটুকুকে কি পৃথক কোনো নামে চিহ্নিত করতে পেরেছেন?

শ্রীদাসের বক্তব্য যে 'বিগত ২৫-৩০ বছরে নামী শিল্প ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে রাজস্থানের চিত্রশিল্পপরম্পরা মুঘলদের ভারতবর্ষে আসার বহু যুগ আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত।' তিনি ইতিহাসকে নিজের মত করে বদলে নিয়েছেন। রাজস্থানে মুসলিমপূর্ব কালেও চিত্রশিল্প ছিল—বেশির ভাগই লোকশিল্প হিসাবে, সে আজও আছে। আলোচ্য দরবারী শিল্প হিসাবে মিনিয়েচার চিত্র মুঘল সমসাময়িক-কালে উদ্ভূত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'The Rajput Style' নামক অধুনারচিত প্রবন্ধে বলেছেন — 'Today, however, we know that there is no single dated or datable painting of Rajasthani origin, that can be assigned to a date before the end of 16th century at the earliest, when Mughal painting had already all but scored half-a-century of its existence. (Panorama of Indian Painting, 1971, Page No-20)। ঐ একই বইয়ের ১৬ [illegible] 'Mughal

[illegible]তে দেখতে পাই 'In Jehangir's India, painting became more widely diffused. Many Mughal grandees, the Rajput nobles and to some extent even marchants employed painters trained in the Mughal atelier.

(২) কিষণগড়শৈলীর রাধার ছবির উলটোদিকে ছাপানো হয়েছে—এ বিষয়ে লেখক ও আলোকচিত্রশিল্পী হিসাবে জানাই যে আমার গৃহীত মূল ছবিটি যথাযথভাবেই ছিল। ছাপার গোলমাল আমার দায়িত্বের বাইরে। ছবির রঙ 'বিভ্রান্তিকর' বলে চিহ্নিত করা আপত্তিকর এবং যে ছবিগুলিকে 'কপি' এবং 'নিকৃষ্টমানের' বলে বলেছেন তা সবই প্রকৃত শিল্পীদের ও তৎপরবর্তী বংশধরদেরই হাতে আঁকা, স্বাভাবিকভাবেই বয়সের ভারে অপেক্ষাকৃত জীর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট বা 'নিকৃষ্ট' শব্দগুলির ব্যবহার গবেষণাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, কিউরিও-সন্ধানী মনোভাবের পরিচায়ক।

(৩) সুখের কথা পাহাড়ী চিত্রকলার উপর মুঘল চিত্রকলার প্রভাব চিঠির গোড়াতে অস্বীকৃত হলেও চিঠির তৃতীয়াংশে শ্রীদাস নিজেই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কাল উল্লেখ করেছেন। তিনি রাজা দলীপ সিংয়ের রাজত্বকাল লিখেছেন ১৬৯৫ থেকে ১৭৪১, কিন্তু M. S. Randhawa এবং J. K. Galbraith লিখিত 'Indian painting, scene, themes and legends' নামক পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে এবং Karl Khandalvala-র 'Pahari Miniature painting' সবগুলি বইতেই রাজা দলীপ সিংয়ের রাজত্বকাল বলা হয়েছে ১৬৯৫ থেকে ১৭৪৪ অবধি। অন্যত্র লেখা রাজা ঘমন্দচাঁদের ('ঘমন্ত' নয়) রাজত্বকাল ১৭৬১-তে শুরু নয়, সঠিক কাল হলো ১৭৫১। তিনি তেগ সিংয়ের পুত্র সংসার চন্দের রাজত্বকাল ১৭৭৫ থেকে ১৮২৩ বলেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে ১৭৭৫ থেকে ১৮২৮। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রীদাসের কালনিরূপণ পাঠকদের কাছে 'বিভ্রান্তি'র সৃষ্টি করে।

(৪) শ্রীদাস প্রবন্ধে উল্লিখিত বেশ কিছু শিল্পীর নামই উল্লেখ করে বলেছেন যে ঐ নামে কোনো শিল্পী ছিলেন কিনা তা 'আমাদের জানা নেই'। 'আমাদের' বলতে শ্রীদাস নিজেকে ছাড়া আর কাকে বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। শ্রীদাসের কাছে এজন্য অনুরোধ যে নিজের বক্তব্য সমষ্টির বক্তব্য হিসাবে নাই বা প্রচার করলেন। পাহাড়ী চিত্রকলা শিল্পীদের বংশলতিকা বা Geneologyতেই এই শিল্পীদের নাম উজ্জ্বলভাবে লেখা আছে। কিষাণলালের নামের উল্লেখ পাই কাংড়ার রাজা সংসারচন্দের রাজদরবারের একজন 'সুপরিচিত ও প্রিয় শিল্পী' হিসাবে। কার্ল খাণ্ডালওয়ালার ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'Pahari miniature painting' গ্রন্থের ৩৩১ পৃষ্ঠাতে এই শিল্পীর নাম ও বিবরণ আছে।

নয়) নামে বিশিষ্ট মহিলাশিল্পীর উপস্থিতিও তিনি সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ব্যাপক আলোচনা না করে এই শিল্পীর পরিচিতি সম্বন্ধে কার্ল খাণ্ডালওয়ালার বক্তব্য সরাসরি উদ্ধৃত করছি—

'Para—a woman artist of Kangra, who died at a very advanced stage in the early years of the century. The then living Kangra artists spoke her art in terms of great respect. She is the only reputed pahari woman painter'. (Pahari miniature painting, 1958. Page No. 333).

শ্রীদাস অভিযোগ করেছেন যে আমার রচনায় যে সব শিল্পীদের নাম আছে তাঁরা 'শিল্পী হিসাবে তেমন অগ্রগণ্য নয়।' শিল্পী হিসাবে কে বা কারা অগ্রগণ্য তা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত নয়। 'নয়নসুখ' বা 'নয়না'র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তাই তিনি বেশী পরিচিত। অপরদিকে শতাধিক সমমানের ক্ষুদ্রচিত্রশিল্পীর সম্বন্ধে এ ধরনের গবেষণার প্রয়োজন আছে। 'ঠিক একই ভাবে' সংসারচাঁদের চেয়ে চিত্রকলার সমঝদার হিসাবে অপর কোনো রাজা 'গুরুত্বপূর্ণ' স্থান দখল করেন কিনা তা বিতর্কের বিষয়—আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এ ধরনের কোনো তুলনামূলক বিচারের অবতারণা করা হয়নি তাই এ ব্যাপার প্রসঙ্গাতীত।

(৫) 'কলাকাচার্যকথা' জৈন ধর্মগ্রন্থ এ বিষয়ে লেখক পরিচিত। তবে শুধু এই গ্রন্থটিকেই বৈষ্ণবধর্মী বলা হয়েছে এ তথ্য বিকৃত কারণ এর আগে বালগোপালস্তুতিরও উল্লেখ রয়েছে। এই দুটি গ্রন্থকেই বৈষ্ণব ধর্মের বলে চিহ্নিত করতে চাওয়া হয় নি, বলা হয়েছে 'বৈষ্ণবধর্মী'। 'বৈষ্ণবধর্ম' ও 'বৈষ্ণবধর্মী' কথা দুটির মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। রাজমনামা মুঘল রাজদরবারের বদান্যতায় ঐ কালে সৃষ্ট হয়েছিল তাই 'ধর্মপুস্তকের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রণের' প্রসঙ্গে মুসলিম গ্রন্থের পাশাপাশি এই নামও আসে ধর্ম হিসাবে নয়, সমকালীন চিত্রকলার বিচারে।

চিত্রকলা বা 'Visual art'কে একটি সাংস্কৃতিক ধারা (Cultural trait) হিসাবে ধরলে দেখা যায় যে রাজস্থান, মধ্যভারত ও পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা (Cultural variations) ক্ষুদ্রতর বা মাইক্রোভাবে থাকলেও সমগ্র অঞ্চলটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আদিম—লোকশিল্প—দরবারী চিত্রকলার চিরায়ত ধারাই তা বারংবার প্রমাণিত করে।

সোমনাথ চক্রবর্তী
কলকাতা-১৪

[এ সম্পর্কে আর কোনো চিঠি ছাপা সম্ভব নয়]

না মিটিতে আশা

এ রেকর্ড সম্বন্ধে [illegible] একালে 'নীরব কেন কবি?' শিরোনামে, শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্ত লিখছেন, [illegible]দেশী টোড়ীতে 'না মিটিতে আশা' বহুশ্রুত একটি গান আবার সকলের মনে স্থান করে নেবে। প্রসঙ্গত মনে আসে, বহু দিন আগে শান্তা আপ্তের রেকর্ড করা এই গান... ইত্যাদি।

এই গানটির জন্ম-ইতিহাস এইরূপঃ

এইচ এম ভি-র তৎকালীন রেকর্ডিং রিপ্রেজেনটেটিভ (স্বর্গত) হেম সোম মহাশয়, শান্তা আপ্তে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন খবর পেয়ে শান্তার দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বাংলা গান গাইতে রাজী করান। শান্তা এসেছিলেন ছবি করতে। কিছু মতভেদ হওয়ায় অভিনেত্রী শান্তা ছবি না করেই কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। হাতে সময় ছিল মাত্র দু-তিন দিন।

৩এ নলিন সরকার স্ট্রিটের এইচ এম ভি-র রিহার্স্যাল রুম-এ কাজী সাহেবের আলাদা ঘর ছিল। হেমবাবু কাজী সাহেবকে মরক্কো-বাঁধানো মোটা মোটা একসারসাইজ বুক দিয়ে রেখে দিতেন। কাজী সাহেব তাঁর মর্জি-মাফিক এক-একটি পৃষ্ঠায় এক-একটি গানের প্রথম লাইনটি আর (সাধারণত মিশ্র) রাগ-রাগিণীর নাম, তাল, মাত্রা লিখে রাখতেন পৃষ্ঠার শিরোদেশে। হেমবাবু কোনও শিল্পীর জন্য গান চাইলে সেই বিশেষ শিল্পীর কণ্ঠ-সম্পদের মান অনুযায়ী কাজী সাহেব গানটির বাকী লাইনগুলো লিখে ফেলতেন। কোলের কাছের হারমনিয়ামটি টেনে নিয়ে বার দুই অভ্যাস করে কমল দাশগুপ্তকে সুরটি তুলে দিতেন। ব্যস, কাজী সাহেবের কার্য শেষ। বাকী কাজ কমলবাবুর। তিনি শিল্পীর কণ্ঠে গান তুলে দেওয়া, অর্কেস্ট্রেশন, রেকর্ডিং করানো—বাকী সবটুকুই করতেন। রেকর্ডের লেবেল-এ সুর কমল দাশগুপ্ত লেখা থাকলেও মূল সুর কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কাজী সাহেবের। এর ব্যতিক্রম প্রায় নেই-ই।

হেমবাবু বললেন, শান্তা চলে যাচ্ছেন, কনট্রাক্ট ফুলফিল না করেই! বস্তুত ছবির কাজ শুরুই হয়নি। কাজী সাহেব এই ঘটনাটাকেই প্রথম কলি করে তক্ষুনি গান বেঁধে ফেললেনঃ না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা। এই গানটির সঞ্চারীতে একটি অদ্ভুত সুন্দর ছবি আছে।

আঁধারের এলো কেশ দু হাতে
জড়ায়ে যেতে যেতে নিশীথিনী
কাঁদে বনছায়ে—

(বুঝি দুঃখ-নিশি মোর হবে না হবে না ভোর/বাজিয়াছে বুকে যেন কার অবহেলা...)

সুশীল ঘোষ
ব্যারাকপুর ১

নজরুলের গান

১৬ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের মতামত পড়লাম। তিনি চান নজরুলের রাগাশ্রয়ী ও রাগপ্রধান [illegible] রাগপ্রধান (কেননা, কাজী নজরুলের প্রায় প্রতিটি গান রাগপ্রধান, কিছু কিছু বাদে) সেই গান সেইভাবে না গাইলে বড় শ্রুতিকটু শোনায়। ইদানীং বহু শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া গানগুলি গেয়ে রেকর্ড করছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে গান—যেমন 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে', 'শূন্য এ বুকে', 'মধুর মিনতি' যে স্টাইলে এবং যে নিপুণতার সঙ্গে তিনি গেয়ে গেছেন, সেই গান সুদক্ষ শিল্পী না হলে তাঁদের পক্ষে গাওয়া প্রায় অসম্ভব এবং গাইলেও তা বড় হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। যে 'মহাকালের কোলে এসে' মৃণালকান্তি গেয়েছেন সেই গান নতুনভাবে গাইলেও তা খুবই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, বর্তমান শিল্পীরা গান গাইছেন খ্যাতিলাভের আশায়। কিন্তু তাঁরা গানের জন্যই গান গেয়েছেন। মানবেন্দ্র একজন শিল্পী—তাঁর গাওয়া 'ভরিয়া পরান', 'কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী' ইত্যাদি চারখানা গানই সেরা, কিন্তু তাঁর অন্য গানই শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। যেসব গান জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মৃণালকান্তি ঘোষ, শচীন দেববর্মন, ইন্দুবালা গেয়ে গিয়েছেন সেসব গান নাকি বড় পুরনো।

বামনদাস ভট্টাচার্য
কলকাতা

ঋত্বিক

১৬ সেপ্টেম্বরের দেশে 'চিঠিপত্রের মধ্যে শোভা সেন, গীতা সেন, তাপস সেন-এর লেখা নাট্যাভিনয়ের রূপসজ্জার ভূমিকা নামক চিঠিটা পড়লাম। আমি এই চিঠিটার উত্তর দিচ্ছি।

নাট্যাভিনয়ের রূপসজ্জার ভূমিকা প্রবন্ধটি বিষয়ে বলতে গিয়ে শ্রীমতী শোভা সেন, শ্রীমতী গীতা সেন ও শ্রীযুক্ত তাপস সেন আমার সম্বন্ধেও একটুখানি লিখেছেন। আমি এর উত্তর দিচ্ছি। প্রথমেই বলতে চাই আমি কোনো জীবনস্মৃতি লিখিনি। আমার ক্ষুদ্র জীবনের কোনো জীবনস্মৃতি লেখার প্রশ্নই আসে না।

'ঋত্বিক' বইটির ভূমিকাতেই আমি লিখেছি 'আমার তো কিছু লিখবার প্রশ্ন আসে না। জ্ঞানীগুণীরাই লিখবেন ও বলবেন। আমি শুধু যে সমস্ত কাগজপত্র আমার কাছে আছে ও যে সমস্ত তথ্য ও ঘটনাবলী আমি জানি তারই ভিত্তিতে একটি চিন্তাধারার পরিচয় ও সামগ্রিক জীবনের পরিচয় দিতে পারি। তাই সমস্ত চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি থেকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে একটি গ্রন্থনা লেখার চেষ্টা করেছি।'

বইটি পড়লেই সেটা বুঝবেন। এবং গণনাট্য সংঘের কোনো ইতিহাস লিখবার কোনো প্রশ্নই আমার তরফ থেকে নেই। আমার লেখা 'ঋত্বিক' বইটির ষোল পৃষ্ঠা দেখতে অনুরোধ করি। 'দলিল ও বিসর্জন আমি দেখেছিলাম, ভাঙা বন্দর, অফিসার প্রভৃতি

...[illegible] বলতে পারবেন।'

'ঋত্বিক' বইটিরই শেষে পরিশিষ্টে 'একুশ বছর' প্রবন্ধটিও আছে। ১৫৮ পৃষ্ঠা দেখতে অনুরোধ করি। 'মনে পড়ে বিসর্জন নাটকটিও দেখেছিলাম। কলকাতায় তখন আই পি টি এ-র সেন্ট্রাল স্কোয়াডের খুব নাম। 'বিসর্জন' নাটকে উৎপল দত্ত, কালী ব্যানার্জী ও ঋত্বিক ঘটকের একত্র অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহের ভূমিকায় কালী ব্যানার্জীর ও রঘুপতির চরিত্রে ঋত্বিক ঘটকের অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।'

৫৪ ও ৫৫ সালে বিসর্জন নাটকটি আমার স্বামী ঋত্বিককুমার ঘটক পরিচালনা করেন। ৫৪ সালে কলকাতায় পরিচালনা সম্বন্ধে সাধনা রায় চৌধুরী ও নিবেদিতা দাস বলতে পারবেন। ৫৫ সালে বোম্বেতে পরিচালনা সম্বন্ধে সীতা মুখার্জী ও গীতা ঘটক বলতে পারবেন।

তাই অনুরোধ করছি কিছু না শুনে বইটি পড়ে দেখতে। শ্রীউৎপল দত্ত মহাশয় বিরাট অভিনেতা, নাট্যকার ও পরিচালক। তাঁর নামের জায়গায় ঋত্বিক কুমার ঘটকের নাম আমি কেন লিখবো।

সুরমা ঘটক
সাঁইথিয়া

কানের ভিতর দিয়া

দেশ পত্রিকার (১৯শে আগস্ট সংখ্যায়) জগন্নাথ বসুর—'কানের ভিতর দিয়া' লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। মঞ্চ নাটকে—দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য মঞ্চশোভা, দৃশ্যপট, অভিনেতার চাক্ষুষ উপস্থিতি—তার পোশাক, আচরণ ও অভিব্যক্তি এবং মঞ্চের আলোকসম্পাত—দর্শকের মনোহারী হয়ে ওঠে সহজে কিন্তু শ্রুতিনাট্যে একমাত্র অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়—এতে প্রযোজকের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রযোজকের তিল তিল প্রযত্ন আর আন্তরিক কুশলতায় শ্রুতিনাট্যের তিলোত্তমা মূর্ত হয়ে ওঠে। নাটক রেকর্ডিংয়ের পর সম্পাদনাকালে প্রযোজক নাটকটির মেজাজ অনুযায়ী আবহসুর, শব্দসংযোজন প্রভৃতি টেকনিক্যাল কাজগুলি এমনভাবে আরোপ করেন যাতে প্রযোজকের মুন্সীয়ানা ও শৈল্পিক ভাবনা আভাসিত হয়। লেখক বিস্তারিত আলোচনায় নাট্যপিপাসুর কৌতূহল ও সংশয় নিরসন করেছেন নিঃসন্দেহে—তবু একটা প্রশ্ন, মঞ্চনাটকে অভিনেতার দীর্ঘ স্বগতোক্তি দর্শকের মনে বিরক্তি আনে না কারণ তার মধ্যে অভিনেতার অভিব্যক্তি ও আচরণ দর্শক মনকে প্রভাবিত করে—কিন্তু শ্রুতিনাট্যে যেখানে সম্বল শুধু অভিনেতার কণ্ঠস্বর সেখানে দীর্ঘ স্বগতোক্তি কি শ্রোতৃমনে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে না? এ বিষয়ে জগন্নাথবাবু কি বলেন?

আর একটা কথা, ইলেকট্রনিক সংগীত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও আগ্রহীদের বাদ দিলে সাধারণ্যে এ যন্ত্রসংগীতের ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। এই যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে [illegible]

...কল্যাণলাভ করতে পারেন সে বিষয়ে লেখক আলোকপাত করেন নি।

রণজিৎ মিত্র
দুর্গাপুর ৪

টলস্টয়

৯ সেপ্টেম্বরের 'দেশ'-এ শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য টলস্টয় বিষয়ক রচনাটির একস্থানে লিখেছেন, '১৮৯৬ সালে লণ্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকার প্রতিনিধিকে ভারতবর্ষের আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ মহামতি টলস্টয়ের আদর্শের উল্লেখ করেন। উভয়ের আদর্শের সাদৃশ্য বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন।' বিবেকানন্দ সম্পর্কে এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে। কারণ বিবেকানন্দ বিষয়ে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর সাম্প্রতিক গবেষণাগ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় আদর্শ প্রসঙ্গে টলস্টয়ের উল্লেখ স্বামীজী আদৌ করেন নি, তা করেছিলেন সানডে টাইমস এর উক্ত সাংবাদিক। প্রাসঙ্গিক অংশের কিছুটা উদ্ধার করা যায়: '...এই আদর্শ—সর্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত দেবত্বে বিশ্বাস থেকে যার বিকাশ—কোন সর্বোচ্চ রূপ ধরতে পারে স্বামীজী তার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন।

'ভারতের সিপাহী যুদ্ধকালের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারি। চিরমৌনের ব্রত নিয়েছিলেন এক সন্ন্যাসী—বহু বর্ষ তিনি তা পালন করেছেন—তাঁকে ঐ যুদ্ধের সময় এক মুসলমান ছুরিকাঘাত করে। লোকে ঐ খুনীকে নিয়ে আসে সাধুর কাছে এবং উত্তেজিত হয়ে বলে, স্বামীজী, শুধু একবার বলুন তাহলেই লোকটাকে শেষ করে দিই। সন্ন্যাসী তাঁর বহু বছরের মৌনব্রত ভাঙলেন শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই কথাগুলি বলবার জন্য—বৎসগণ! তোমরা ভুল করছ—ঐ মানুষটিও ঈশ্বর ছাড়া কেউ নয়।

'স্বামীজীর এই সব কথা শুনবার পর সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বলেছিলেন—আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের মতো লাগছে।'

[বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ২য় খণ্ড (১ম প্রকাশ) পৃঃ ৩০]

সুতরাং, বিবেকানন্দ ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে টলস্টয়ের আদর্শের সাদৃশ্য দেখেছিলেন—এ কথা মেনে নেওয়া যায় না।

প্রসঙ্গত, আলোচ্য রচনায় শ্রী ভট্টাচার্য টলস্টয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্যগুলি সংকলন করেছেন তাতে আরও কিছু সংযোজন করা যায়। 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক প্রবন্ধে [১৬ আশ্বিন, ১৩৪৪] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "...মহাত্মাজি এমন একজন খৃষ্ট সাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃষ্টান ধর্মের অহিংসনীতি বাণী যথার্থভাবে লাভ করেছিলেন।..." [মহাত্মা গান্ধী] এ ছাড়াও টলস্টয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার কিছু ছবি মেলে রোমাঁ রোলাঁর ডায়েরি থেকে। ১৯ এপ্রিল ১৯২১ সাক্ষাৎকারের বিবরণে সেই দিনলিপিতে রোলাঁ লিখেছেন, "...জিজ্ঞাসা করলাম, ভারতবর্ষে কি বহু লোকে টলস্টয় পড়ে ও বোঝে? উত্তর করলেন, মনে হয় পড়ে ঠিকই—তবে তাঁর চিন্তার স্বরূপ হয়তো না বুঝতে পারে। গান্ধীর বিশ্বাস টলস্টয়ের কাছ থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। তবে (মনে হয়) এটা তাঁর ভুল। তাঁর অপ্রতিরোধনীতি টলস্টয়ের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু! মনে হয় ঠাকুর টলস্টয়কে বেশী পছন্দ করেন না। খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীর উৎকট বৈরাগ্য ঠাকুর অনুমোদন করেন না (বললেন, কোন হিন্দুই করবে না), ভারতের আকাশ বাতাস এর অনুকূল নয়।..." [মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ বসু]। এখানে দুটি জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথম, এখানে গান্ধীজীবনে টলস্টয়ের প্রভাব সম্পর্কে ঐ উক্তি রবীন্দ্রনাথ করে থাকলে বলতে হবে তাঁর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে অন্যরকম মত প্রকাশ করেছেন, এবং দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতোই, চরম বৈরাগ্যের আদর্শকে ভারতের মানুষের জন্য অনুপযুক্ত মনে করেছেন।

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী
জামসেদপুর ১

এনোলা গে

'দেশ' পত্রিকায় অরূপ দাসের "পরমাণুশক্তির বিরুদ্ধে : দেশে দেশে" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—" 'এনোলো গে'" এই নামের আড়ালে বিমানটি থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর বুকে সেই মারণাস্ত্রটি ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট—যার অন্য নাম রাখা হয়েছিল 'লিটল বয়'।"

কিন্তু আমরা যত দূর জানি, 'এনোলা গে' হল একটি বিমানের নাম যার পরিচালক ছিলেন কর্নেল টিবেটস এবং তার মায়ের নাম হল 'এনোলা গে'। এই নাম অনুসারেই বিমানটির নাম রাখা হয়। এনোলা গে থেকে 'লিটল বয়' নামধারী অ্যাটম বোমটি হিরোসিমার মাটি থেকে ১৮৫০ ফুট উচুতে ফাটানো হয়েছিল। বোমাটি লম্বায় চৌদ্দ ফুট আর ব্যাস পাঁচ ফুট, ওজন প্রায় সাড়ে চার টন।

আর ঠিক তিন দিন পরেই 'বকস কার' বিমান থেকে 'ফ্যাট ম্যান' নামধারী দ্বিতীয় মারণাস্ত্রটি নাগাসাকির উপর ফেলা হয়েছিল।

কালিদাস সাহা
কামাখ্যাগুড়ি

মানুষ পাথর

শ্রীসমরজিৎ কর 'মানুষ পাথর' লেখাটির ৫ আগস্ট সংখ্যায় এক জায়গায় ড্রিলিং ক্যাম্পে কর্মরত কয়েকজন কর্মীদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন 'শ্রী ভোগাল হো' একজন সাঁওতাল...' আমার মনে হয় তথ্যের দিক থেকে কিছুটা ভুল রয়েছে। শ্রী ভোগালের পদবী যদি 'হো' হয় তা হলে তিনি কোন মতেই সাঁওতাল নন। সাঁওতাল হতে পারেন না। সাঁওতালদের নামেতে চিনতে হলে তাদের পদবীই তাদের নরগোষ্ঠী-পরিচিতির অন্যতম সহজ পরিচায়ক। 'সাঁওতাল' ও 'হো' উভয়েই কোলারিয়ান নরগোষ্ঠীর বৃহত্তর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়েই টোটেম বিশ্বাসী, তবে উভয়ের মধ্যে স্বজাত্যবোধের গোষ্ঠীচেতনা প্রবহমান। সাঁওতালদের যে ১২টি গোত্র রয়েছে—সরেন, মুরমু, মান্ডি কিস্কু বেসরা হাঁসদা টুডু বাস্কে হেমরম গেন্ডওয়ার ছেড়াই ও কাউরিয়া—তাদের নামও এই সব পদবী আশ্রিত। এ ছাড়া অবশ্য অনেক মাঝি (মাজি নহে) শব্দ পদবী হিসাবে ব্যবহার করেন। কাজেই এই সব পদবী থেকে সহজই বোঝা যায় যে, কে সাঁওতাল আর কে সাঁওতাল নয়। এ ছাড়া আদি বাসস্থানও পরিচিতিকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে শ্রী ভোগালের আদি বাসভূমি যদি বিহারের সিংভূমের চাইবাসা—সারেন্ডা অঞ্চলে, তাহলে তিনি কোন মতেই সাঁওতাল নন। এবং বলতে দ্বিধা থাকবে না যে তিনি একজন 'হো'।

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়
পুরুলিয়া

কণ্টককল্পিত

দেশ পত্রিকা, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৮৫ সনের প্রকাশিত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের লেখা কণ্টককল্পিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমার দাদামশাই শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিষয়ে অনেক তথ্য বের হয়েছে। একটি ছবি বের হয়েছে, "গ্রাম্য পরিক্রমার গান্ধীজীর সাথে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত" এই নামে। ঐ ছবিটি গ্রাম্য পরিক্রমার নয়, এবং ১৯২৮-২৯ সনের নয়। ছবিটি তোলা হয় সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে ১৯৪৬ সনে, যখন বাপুজী এসেছিলেন। এবং বিকেলে প্রার্থনাসভায় যাওয়ার সময় তোলা হয়। আমাদের সোদপুরের ভেতরের রাস্তাতে।

এই ভুলটি সংশোধন করে দেবার জন্য এই চিঠির অবতারণা।

তরুণা দাশগুপ্তা
কলকাতা ৫৩

শিল্পী দুলাল মণ্ডল

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখের সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার ৪৭ পৃষ্ঠায় দিল্লির শিল্পী দুলাল মণ্ডলের 'ধরিত্রী' তৈলচিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে ছবির নীচে শিল্পী পরিচিতি প্রসঙ্গে তাকে দিল্লীর রায় সিন্‌হা স্কুলের শিক্ষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকার আরেকটি সংখ্যায় দুলালবাবুর কলকাতায় চিত্র প্রদর্শনীর সমালোচনাতেও কলা-সমালোচক ঠিক এই ভুল তথ্যই পরিবেশন করেছিলেন। মণ্ডল মোটেই রায় সিনহা স্কুলের শিক্ষক নন।

দুলালবাবু শ্যামাপ্রসাদ স্কুলে শিক্ষকতা করেন, ইস্তাম্বুল থেকে ফিরে আসার পর থেকেই।

নন্দদুলাল কুণ্ডু

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

উজ্জ্বলতম কবিতার সংকলন

ছেলে গেছে বনে

দাম ৫.০০

গত তিরিশ বছর ধরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতাকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। প্রথম আবির্ভাবেই যিনি বিস্মিত ও অভিভূত করেছিলেন পাঠকদের, তিনি কখনও এক জায়গায় থেমে থাকেন নি, প্রচণ্ড অতৃপ্তি ও অনুসন্ধিৎসায়, কবিতার শব্দ ব্যবহারে, খুঁজতে চেয়েছেন বহুকোণ হীরকের মতন নানা ধরনের আলো। সমাজ-সচেতন এই কবি তাঁর কবিতায় সমসাময়িক জীবন ও জীবিত মানুষকে সব-সময় জড়িয়ে রেখেছেন এবং প্রায় অলৌকিক ক্ষমতাবলে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে অসাধারণ কাব্যগুণ দিতে পেরেছেন। তাঁর কবিতা পাঠের যে-আনন্দ তার সঙ্গে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এক হয়ে মিলে যায়।

'ছেলে গেছে বনে' কাব্যগ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কালে স্মরণীয় একগুচ্ছ কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি অনুবাদ কবিতা যা মৌলিক কবিতার মতোই স্বাদু ও সৃজনধর্মী।

বিমল মিত্রের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

চলো কলকাতা

দাম ৫.০০

বহুদিন আগে কালীক্ষেত্রের দেবীমূর্তি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়। সেখানে কাপালিকরা কালীমূর্তির সামনে নরবলি দিত। কালক্রমে কাপালিকরা দেবীকে পাথুরিয়াঘাটা থেকে স্থানান্তরিত করে কালীঘাটে। সে কলকাতা নেই, নেই সেই কাপালিকরাও। কিন্তু অন্যদিক থেকে আবার আছেও। এখন আর কাপালিকদের গেরুয়া-বসন নেই, এখন তাদের অন্য পোশাক, অন্য আকৃতি। এখনও সেই আগেকার মতই যাত্রীরা কলকাতায় আসে, আর তাদের চোখের সামনেই কাপালিকরা নরবলি দেয়। 'চলো কলকাতা' সেই নরবলিরই রক্তাক্ত কাহিনী।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

যা ইতিহাসে নেই ১২.০০ শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন ১০.০০ পতি পরম গুরু ৩৫.০০ রাগ ভৈরব ৭.০০ রাজাবদল ৭.০০ নিশিপালন ৬.০০ প্রেম পরিণয় ইত্যাদি ৭.০০ হাতে রইলো তিন ৬.০০ বেগম মেরী বিশ্বাস ৪০.০০ নিবেদন ইতি ৮.০০ রং বদলায় ৫.০০ রাজা হওয়ার ঝকমারি (কিশোর-সাহিত্য) ৭.০০

সেরা কবি, সেরা বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

হঠাৎ নীরার জন্য

দাম ৫.০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সৌরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা

দাম ৩.০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

মানুষ বড়ো কাঁদছে

দাম ৫.০০

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল

দাম ৫.০০

ছিন্নবিচ্ছিন্ন

দাম ৩.০০

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের

এসো, হাত ধরো

দাম ৫.০০

কেতকী কুশারী ডাইসনের

বল্কল

দাম ৫.০০

তুষার রায়ের

মরুভূমির আকাশে তারা

দাম ৪.০০

সুব্রত চক্রবর্তীর

বালক জানে না

দাম ৫.০০

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্বপ্নে, উপকূলে

দাম ৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

সমরেশ বসুর

স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উপন্যাস

যার যা ভূমিকা

দাম ১০.০০

একজন জনপ্রিয় বিখ্যাত নাট্যকার, একটি নাম-করা মঞ্চের মালিক এক ধনী ব্যবসায়ী তথা নাট্যপ্রযোজক, একজন সার্থক নাট্য-পরিচালক, অভিনয় যার নেশা পেশা হাড়ে-মজ্জায় এমন একটি যুবতী অভিনেত্রী ও অবাঙালী একজন মোটর-গাড়ির ড্রাইভার—এই পাঁচটি চরিত্রের কার কী ভূমিকা তা তাঁরা নিজেরাই বিবৃত করেছেন সমরেশ বসুর এই স্বতন্ত্র স্বাদের উপন্যাসে। সন্দেহ নেই যে, বাংলা সাহিত্যের এক প্রবল শক্তিমান লেখকের এক দারুণ কৌতূহলকর উপন্যাস 'যার যা ভূমিকা'।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

মহাকালের রথের ঘোড়া ১০.০০ ম্যাকবেথ ঃ রঙ্গমঞ্চ কলকাতা ৭.০০ সংকট ৬.০০ বিজড়িত ৬.০০ প্রাচীর ৭.০০ মানুষ শক্তির উৎস ৮.০০ পরম রতন ৫.০০ অশ্লীল ৭.০০ ওদের বলতে দাও ৮.০০ ধর্ষিতা ৪.০০ একটি অস্পষ্ট স্বর ৭.০০ বিশ্বাস ৭.০০ অবচেতন ৪.০০ মানুষ ৬.০০ সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা ৪.০০ এপার ওপার ৭.০০ স্বীকারোক্তি ৮.০০ বিবর ৬.০০ ফেরাই ৩.০০ মোক্তারদাদুর কেতুবধ (কিশোর-সাহিত্য) ৫.০০

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

সরস গল্পের সংকলন

শ্বেত পাথরের টেবিল

দাম ৬.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নতুন লেখক। মাত্র বছর তিন-চার হল সাহিত্যের আসরে তিনি প্রবেশ করেছেন সরস গল্পের ডালি নিয়ে। প্রবেশমাত্রই তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে প্রশংসা আর অভিনন্দনের অজস্র কুসুম তাঁর অসীম কৌতুকবোধ এবং হাস্যরস সৃষ্টির আশ্চর্য নিপুণতার জন্য। বাংলা হাসির গল্পের ছোট্ট আসরটুকু যখন ফাঁকা হয়ে আসছিল, শুধুই প্রবীণ শিবরাম চক্রবর্তী যখন প্রায় 'একা কুম্ভের' মতো বাংলা কৌতুক গল্পের 'বুঁদির গড়'টি একক প্রয়াসে রক্ষা করে চলেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই হাস্যরসের পাঞ্চজন্য হাতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তরুণ প্রতিভাবান লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তির্যক দৃষ্টিপাত, সরস মনোভঙ্গি, সঞ্জীব রচনারীতি চারপাশে ছড়ানো জীবন থেকে তুলে নেওয়া কৌতুককর ঘটনারাজি, শ্লেষাত্মক মন্তব্য —সব কিছু, সমস্ত কিছুই নতুন স্বাদের। সেই অভিনব স্বাদের সেরা এগারোটি গল্পের এক অদ্বিতীয় সংকলন—'শ্বেত পাথরের টেবিল'।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থঃ

পায়রা (উপন্যাস) ৬.০০

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

দেবব্রত মল্লিকের গল্প
ডায়েরি
দিলীপ রায়ের প্রবন্ধ
শেষের সেদিন কি ভয়ংকর
অরুণকুমার ঘোষের রচনা
ফটোগ্রাফির শৈশব ও ভারতে স্যামুয়েল বোর্ণ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২৫ পয়সা

নিরাপদ নাগরিক জীবন

দেশে আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা জনজীবনের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে, এই ধারণা সরকারের সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক বিদ্বেষ এবং অশুভেচ্ছার সৃষ্টি নয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কোন-কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের একাধিক মন্তব্যে দেশের সংবাদপত্রের সম্পর্কে নিন্দোক্তি করেছেন যে, সংবাদপত্রের নিরতিশয় প্রচার এবং ঘটনা সম্পর্কে ভুল ও বিকৃত বিবরণের প্রকাশ জনজীবনের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্তি ঘটিয়ে থাকে। তাঁদের মতে আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা এমন ভয়ানক কোন উদ্বেগ সঞ্চারিত করবার মতো প্রহত দশা লাভ করেনি যে, উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হতে হবে। অর্থাৎ অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সেটা জনজীবনের পক্ষে নিদারুণ রকমের একটা যায়-যায় কিম্বা গেল-গেল অবস্থার সংকেত নয়। সরকারের এই ধারণামূলক মন্তব্যের সম্পর্কে সমালোচকের পক্ষে এমন বিদ্রূপ নিক্ষেপ করবার যুক্তি আছে যে, সরকার স্বয়ং বাস্তবতার ন্যূনতম সত্যটুকু স্বীকার করতে এতদিন ধরে নিতান্ত কুণ্ঠা শুধু নয়, নিতান্ত পাল্টা ভর্ৎসনার আঘাত হেনে এসেছেন। সেপ্টেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে ভারতের সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের প্রধানগণের যে সম্মেলন হয়ে গেল, সেটা অবশ্যই দেশবাসীর বিচারে এই সান্ত্বনার অঙ্গীকার বলে বিবেচিত হবে যে, দেশের আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি লক্ষ করে সরকারী অন্তঃকরণ বোধ হয় বিচলিত হয়েছে, এবং জনজীবনে সর্ববিধ নিরাপত্তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করবার জন্য সরকারের আন্তরিক সংকল্প উদ্বোধিত হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়েছে, এহেন সম্মেলনের আসরে মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং কেন্দ্রীয় প্রধানদের, যাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীই প্রধানতম বক্তা, সম্মিলিত বিচার-বিবেচনার আসরে জনজীবনের নিরাপত্তার অভাব সম্বন্ধে কোন মুক্তকণ্ঠ স্বীকৃতি ভাষিত হয়নি। ভাষিত হয়েছে বস্তুত একরকমের অদ্ভুত কুণ্ঠাগ্রস্ত স্বীকৃতি। কেউ-কেউ একেবারে সমাজতন্ত্রের মৌল জিজ্ঞাসা আলোড়িত করেছেন। কেউ বা জাতীয় ইতিহাসের অতীতকালীন ঘটনাবর্তের কথা তুলেছেন কিন্তু বিচার-বিবেচনার এরকম প্রথা এক ধরণের চিন্তালস অবস্থার প্রমাণ বলে অনেকের ধারণা হতে পারে। নিতান্ত তার্কিক ব্যায়ামের একটা পরিদৃশ্য। প্রশ্ন হলো, ইতিহাস ও সমাজতন্ত্রের এত গভীরে প্রবেশ করে সমস্যার সমাধান আকৃষ্ট করবার দরকার কি? জনজীবনকে অপরাধ ও অপরাধীর স্বেচ্ছাচারের আঘাত থেকে রক্ষা করবার প্রাথমিক কার্যবিধির উপযোগিতা বিচার করতে হলে বহুবিস্তারিত ও বিশদ প্রকারের কোন তাত্ত্বিক তথ্যের মধ্যে প্রবেশ করে কোন লাভ নেই, যদিও সেটা নিন্দনীয় কোন চিন্তার ব্যাপার নয়। ছাত্র বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, উদ্বাস্তুর বিক্ষোভ, রাজনীতিক দলীয়তার সংঘর্ষ ; ইত্যাকার সব সমস্যারই সমাধান অন্বেষণ করবার সংকল্প প্রবল হয়ে উঠলে বরং প্রকৃত চেষ্টা-চরিত্রের একটা নৈরাজ্যকর চঞ্চলতা প্রবল হয়ে উঠবে বলে মনে করবার যুক্তি আছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, দেশের সরকার প্রথমত এবং প্রধানত তাঁর কর্তব্যের সেই বিভাগীয় সংগঠনের প্রকৃতিকে একটু শুদ্ধসত্ত্ব করে তুলুন, যে বিভাগের নাম আরক্ষা তথা পুলিসী কর্তব্যের অনুগত কর্মবিভাগ। অপরাধের দমন ও প্রতিরোধ সার্থক প্রকারে সম্পন্ন করতে হলে পুলিশী সংগঠনকে কীভাবে এবং কী প্রকারে সংস্কারের দ্বারা সুস্থ ও উন্নত ও বলিষ্ঠ করে তুলতে হবে, আপাতত এবং সবার আগে এই কর্তব্য সরকারের পক্ষে প্রতিপালনীয় জাতীয় ভুক্তির আদর্শের অনুরূপ দাবি নিয়ে দেখা দিয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিসের কর্তব্য নিষ্ঠাই সবচেয়ে বড় সম্বল। এবং অপরাধের সংখ্যা তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন এই মানবিক বিবেচনাটি অপরাধীর চিন্তা ও আচরণের প্রেরণা হয়ে ওঠে যে, তার ঔদ্ধত্য দমন করবার শক্তি এবং সংকল্প-নিষ্ঠা পুলিসের আন্তরিক স্বভাব থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। শাস্তি পেতে হবে না, এবং পুলিসের কর্মশক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠা নেই, এই ধারণা প্রশস্ত হলেই অপরাধীর দুঃসাহস ও স্বেচ্ছাচার প্রশস্ত হয়ে উঠে। ঠগীদমনের কৃতিত্বে যাঁর নাম বিখ্যাত হয়েছে, কর্নেল স্লীম্যান, তাঁর রিপোর্টের মধ্যে অভিব্যক্ত একটি প্রধান অভিজ্ঞতার সত্য এই যে, পুলিসের কর্তব্যনিষ্ঠা যেমন কঠোর হবে, অপরাধের সংখ্যা তেমনই ম্রিয়মান হবে। স্বভাব-অপরাধী হোক অথবা নিছক অপরাধপ্রবণ হোক, সামাজিক শত্রু ব্যক্তিই পুলিসের কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। অলস পুলিস ও উৎকোচ-সুখী পুলিসও বস্তুত একটি সমস্যা, যার প্রকোপে ঘটনা প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতীয় প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে (সম্ভবত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়) জনজীবনের নিরাপত্তার সত্য রূপক ঘটনার কথা দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সালংকারা সুন্দরী ও একাকিনী যুবতী, দূরান্তরের স্থানে যাবার জন্য স্বগৃহ থেকে বহির্গত হবার পর নিশাকালে কোন স্থানের বৃক্ষতলে নিশ্চিত মনে নিদ্রাযাপন করবে ; এহেন নিরাপদ অবস্থার রূপ এই সত্যই প্রমাণিত করে যে, রাজা ও রাজা-শাসনের প্রকৃতি দুই-ই কর্তব্যনিষ্ঠার পুণ্যে অভিষিক্ত। নিরাপদ নাগরিক জীবন যেমন শাসন-রীতির, তেমনই জাতিরও গৌরব।

কালকাতা আছে কলিকাতাতেই

রাজাজীকা দো শিং

আসুন তা হলে ভয়ের লিস্টটা করে ফেলি। প এ তুমি একটা কাগজ নিয়ে বস। নোট নাও।

কার ভয় স্যার!

আপনার ভয়, আপনার ভয়। কতরকম ভয়ে আপনি আধমরা, জানতে চাই। বেশ ভেবে চিন্তে ধীরে ধীরে বলুন।

কত বছর বয়েস থেকে নিজেকে ধরব স্যার—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়……..

যৌবন থেকে ধরুন, ঠিক যে বয়েসে টোপর মাথায় দিয়ে ছাঁদনাতলা হয়ে বাটিতে উথলানো দুধ দেখতে দেখতে সংসার সমরাঙ্গনে টেঁপীর হাত ধরে প্রবেশ করলেন। আপনার হাতে একটি মাকু
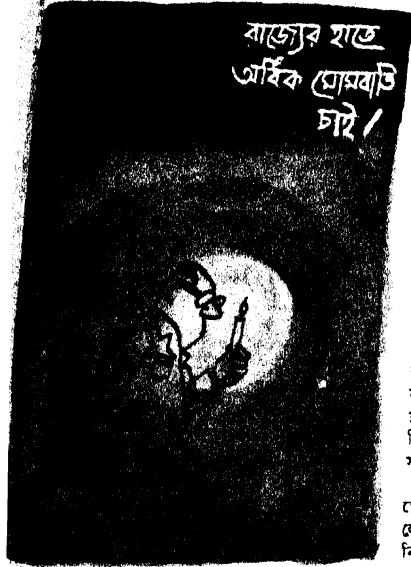
দিয়ে বলা হল—হাতে দিলাম মাকু ভ্যা করত বাপু। সেই ভ্যা করার দিন থেকে কি ভাবে ভ্যা-ভ্যা করতে করতে জীবনের এই পর্যন্ত এলেন তার ওপর একটি রচনা তৈরি করুন।

টেঁপী কে স্যার?

মধ্যবিত্তরা আমাদের চোখে সব টাঁপা আর টেঁপী।

আপনারা কে স্যার?

আমরা ছিলাম মধ্যবিত্ত। নেতা হয়ে হলাম উচ্চবিত্ত। মন্ত্রী হয়ে হলাম বিত্তের বিত্ত। আমরা আসলে 'নেপো ক্লাস'। দই পাতবে তোমরা, চেটেপুটে মেরে দোবো আমরা।

ক্যানো এমন করবেন?

কেন করব, আমাদের খুশি। আমরা পিঠ বেয়ে উঠি তারপর কাঁধের দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসি। যার শিল যার নোড়া আমরা তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া। আমরা হলুম গে ক্রিয়েশান।

কার ক্রিয়েশান?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না হরিচরণ ভাই। ভাইরা আমার, সেইটাই তো মিসট্রি। ওহে বল না রাধেশ্যাম, আমরা কী জনগণের সৃষ্টি! আমরা কী ভগবানের সৃষ্টি! দ্যাখো তো কৌটার খুঁটে কোথাকার স্ট্যাম্প! মেড ইন, ইউ এস এ! চায়না! ফ্রান্স! জার্মানী! ইতালি!

হরিচরণ তো আমার নাম নয়। আমার নাম বঙ্কুবিহারী।

ছিলো রামকৃষ্ণ। আমাদের ওরিজিন আপনাকে খুঁজতে হবে না। মাথা ঘুলিয়ে যাবে রে হয়েকেষ্ট। মানুষের ওরিজিন বাঁদর কটা লোক বুঝেছিল! একটি লোক। মাত্র একটি লোক। ডারউইন সাহেব। বাকি সব হ্যাঁ হ্যাঁ করে সায় দিয়ে প্রমাণ করে দিল—যে, বাঁদর প্যান্ট জামা পরিয়া দাড়ি গোঁফ কামাইয়া কিঞ্চিৎ ভদ্রস্থ হইয়া মানুষ বলিয়া নিজেদের দাবী করিতে পারে। স্বভাবের সহিত মিলাইয়া লইলে মানুষ আর বাঁদরে মাত্র ফুট কয়েক তফাৎ।

ফুট কয়েক কেন?

ছোট বাঁদর হলে এক মাপ, বড় হলে আর এক সেই জন্যে সঠিক মাপটা না বলে ফুট কয়েক বলে ছেড়ে দিয়েছি। দুঁদে মন্ত্রীরা ওইরকমই করে—সো অ্যান্ড সো, অ্যাবাউট অ্যাপ্রক্স, অ্যাভারেজ বলে ছেড়ে দেয়। মধ্যবিত্তের যেমন ভয়, আমাদের তেমনি সন্দেহ, ডাওট।

তার মানে স্যার?

মানে, ভেরি সিম্পল। ছোট বাঁদরের ন্যাজের মাপ বড় বাঁদরের চেয়ে ছোটো হবে। আই সি। আচ্ছা পি এ তোমার কি মনে হয়?

কিসের কি মনে হয়?

একই বয়েসের সমস্ত বাঁদরের ন্যাজের মাপ কি সমান হবে? গণিতের ভাষায় বলতে দাও—ডাজ ন্যাজ গ্রোজ ডাইরেকটলি ইন প্রোপোরশান টু দি এজ অফ ইচ অ্যান্ড এভরি বাঁদর অ্যান্ড বাঁদরী।

একটু ব্যাখ্যা করবেন স্যার! এ যেন সার্ভিস কমিশানের ইন্টারভিউয়ের বেকার মারা প্রশ্ন।

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! কেমন ছেড়েচি একখানা! কোনোদিন তোমাদের মাথায় এসেছিল?

নো স্যার।

একেই বলে মগজের সুপ্রেমেসি। ধনবানদের মাথা ধনহীনদের মাথার চেয়ে শার্প হয়। রিসার্চ বলে প্রোটিন ম্যালনিউট্রিশানের ফলে মগজ ডাল হয়ে যায়। লেট মি একসপ্লেন। ধর, রাম, শ্যাম, যদু, মধু, প্রভাত, মুকুল, ষোল বছরের ছটা বাঁদর। প্রশ্নটা হল এই ছটি যুবক বাঁদরের ন্যাজ যদি ফিতে দিয়ে মাপা হয় তাহলে ছজনের ন্যাজের মাপই কী সমান হবে?

ও ওঃ সাংঘাতিক! ভাবা যায় না স্যার। এটা তো একটা রিসার্চের সাবজেক্ট। ডকটরাল থিসীস লেখার মত বিষয়। এটা তো স্যার কখন ভেবে দেখি নি। তা ছাড়া ষোড়শ বর্ষীয় বাঁদরের ন্যাজের মাপ

কঠোর শ্রমের বিকল্প নেই।

আর ষোড়শীর ন্যাজের মাপে কোনও তফাত হবে কি?

কত কি আমরা জানি না। ফানি চ্যাপ। কিসসু জানি না অথচ কুটি কুটি লুকের ওপর আমরা লাঠি ঘুরিয়ে চলেছি।

কুটি কুটি লুক বলে বিকৃত করছেন কেন?

আই লাইক ইট দ্যাট ওয়ে স্যার। জনগণের ভাষা হবে ফোর্স-ফুল, তাতে সবরকম ডায়ালেক্ট থাকবে। দেখি তোমার পেনসিলটা দেখি। এই দ্যাখো কি রকম ফোর্স! পেনসিলটাকে কাঁচের ওপর রাখি, এইবার বলি—কুটি কুটি লুক। আ হা, লুকের তেজ দেখ ফুঁ দিয়ে আলো নেভাবার মত শব্দ হে! পেনসিলটা গড়গড়, গড়গড় করে গড়িয়ে তোমার দিকে চলে গেল। জাপান কি আবিষ্কার করেছে?

আবার প্রশ্ন স্যার?

ইয়েস প্রশ্ন। প্রশ্নে প্রশ্নে আজ জর্জরিত করে দোবো। জাপান আবিষ্কার করেছে—শব্দ তরঙ্গ দিয়ে অপারেশান। চ্যাচ্চাড় করে ফেঁড়ে ফেলছে, মানুষের পেট, পিঠ, বুক।

মনে পড়েছে স্যার। সুপারসনিক যুম।

খুব পড়েছে! আহা আমার বিস্টুরে। সে তো হল গিয়ে তোমার এরোপ্লেনের ব্যাপার। কোথাকার মাল কোথায় এনে ফেললে হে। একেই বলে পলিটিকস। আন্ডায় গন্ডা মেলানো। জেব্রা ধরে গেল।

ওই রকমই হবে স্যার। যেমন কর্তা তার তেমন কর্ম। মধ্যবিত্তের ভয় নিয়ে রিসার্চ হচ্ছিল, কি করে চলে গেলেন বাঁদরে।

তা তো বলতে পারবো না ভাই। তা যদি বলতে পারবো তাহলে রাজনীতি করতে আসব কেন?

ওইটা ঠিক ক্লিয়ার হল না স্যার।

কোন্ জিনিসটা ক্লিয়ার হয় ভাই বঙ্কুবিহারী। ধার ক্লিয়ার হয় না। ইনস্টলমেন্টে জিনিস কিনলে কিস্তি শোধ হয় না, বুকে সর্দি জমলে ক্লিয়ার হয় না, কোটি টাকা ঢেলে দিলেও কলকাতার জঞ্জাল ক্লিয়ার হয় না। কোনদিকে তাকাবে, ট্যাকস, ভাড়া, স্কুলের মাইনে, ইনসিওরেনসের প্রিমিয়াম, সব সব এক অবস্থা। যা ক্লিয়ার হবার নয় তার জন্যে দুঃখু করে লাভ কি ভাই! তবে জেনে রাখো বাঁদরের ফুটখানেক ন্যাজটি ক্লিয়ার হলেই সে মানুষ হয়ে যায়। কয়েক ফুটের

হয়ে আবার বাঁদর হয়ে যাব।

কিলিয়ার স্যার, এবার বুঝেছি।

আমরা ভুলে যাবে। ও বোকার কোনও দাম নেই রে। আমাদের দেখছো না। যুগে, যুগে যুগজার হয়েও সেই একই ভুল বারে বারে। বাঁদরের পিঠে ভাগ। তাই তো আমরা একটা স্লোগান কমিটি করেছি। পি এ ওটা কোন্ দেশ হে যেখানে পোস্টার বিপ্লব হয়েছিল।

সে একটা দেশে হয়েছিল স্যার। নাম বলব না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে চিড় ধরে যাবে।

বেশ বোলো না, কিন্তু আমাদের সেই স্লোগান কমিটির কি হল? বেশ জোরদার নতুন কিছু জিনিস বেরোলো কি? লড়াই, লড়াই, লড়াই, লড়াই। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে। লড়াই, লড়াই, লড়াই

চমৎকার হয়েছিল জিনিসটা, টেনিসনকেও আমরা হারিয়ে দিয়েছিলুম, কতগুলো ল দেখেছেন! ল-এর অ্যালিটারেশান। ভেড়ার পালের মত মুখ-গহ্বর থেকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

তা আসছে, তবে কি জানো, ওটা শাড়ির ডিজাইনের মত পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন মাল চাই।

কেন, স্যার, আমরা তো নতুন একটা বায়নাক্কা তুলেছিলুম—রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা চাই।

দ্যাটস নট এ স্লোগান, ওটা একটা দাবী। বেশ ক্যাম্পোর ক্যাম্পোর স্লোগান চাই। শব্দ, সুর, দেহভঙ্গিমা, তাল, লয় সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যাপার, অনেকটা বীর রসাত্মক কীর্তনের মত। কীর্তন মাইনাস মধুর রস। যেমন ধর—নিতাই এনেছে নাম গৌর হরি, হরি বোল, নিতাই এনেছে নাম........

চেয়ারের স্প্রিংটা স্যার কম জোর আছে অত ধড়ফড় করবেন না, এখুনি একপাশে কেতরে পড়বেন।

চেয়ারটা পাল্টাচ্ছ না কেন বলত?

স্যার যে কম্পানীর চেয়ার সেখানে লাস্ট থ্রি মান্থস লক আউট চলছে।

তাহলে টেবিলে উঠে বসি।

না না, চেয়ারে বসেই কীর্তন করুন তবে চেয়ারের অবস্থাটা মনে রেখে। চেয়ার বড় বিশ্বাস-

মানছিনা,
মানবোনা,

ঘাতক, এর আগেও আপনাকে বারকয়েক ফেলেছে।

ঠিক বলেছো। আই মাস্ট বি এ বিট কেয়ারফুল। জনগণের স্প্রিং তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ একজন মন্ত্রীর দুটো জিনিস থাকা চাই—ভার্বাল ল্যাঙ্গোয়েজ আর বডি ল্যাঙ্গোয়েজ। গফম্যান পড়েছো?

নো স্যার!

বডি ল্যাঙ্গোয়েজটা পড়ে দেখো। যা বলছিলুম, মাইনাস মধুর রস, নিতাই আমার মাতা হাতি হুঙ্কার দিয়ে বল দাঁতে দাঁত চেপে-মাতা হাতি।

আমরা একটা স্লোগান নিয়ে রিসার্চ করতে করতে মোটামুটি একটা ফাইনাল চেহারা দিতে পেরেছি।

কোনটা, কোনটা!

এবার স্যার একেবারে নতুন অ্যাপ্রোচ। ওই গানের সুরটা মনে করুন—বোম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত, দোস্ত কো সেলাম কর।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু হুঁ হুঁ করে নি—বোম্বাই সে, হাঁহাঁ বোম্বাই সে আয়া মেরা হা—বাঃ ফাইন রিদম্। তা এই দোস্তকে কি করব?

দোস্ত নয় স্যার ওখানে দালাল বসবে, সুর আর ছন্দটা কেবল মনে রাখুন, একটু তাল দিন ওই ছোটো পেপার ওয়েটটাকে ওই মোটা ফাইলটার ওপর ফ্ল্যাট করে ঠুকে। নিন ওয়ান টু, ওয়ান টু.... বোম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত....দালাল কো হালাল করোও ও ওঃ (এখানে সম) আর একবার, দালাল কো হালাল করো, ও ও ওঃ ওই যে দালাল পালায়, ওই যে দালাল পালায়ায়ায়, দালাল কো হালাল কর। গুফ গুফ গুফ দালাল কো হালাল করোওঃ। স্টপ। কেমন?

ফাইন। মালটা বাজারে ছাড়ছো কবে?

এই স্যার বন্যাটন্যাগুলো সরে যাক। রিলিফ নিয়ে ক্যাডাররা বড় ব্যস্ত। জিনিসটা রেডি। আর একটা স্লোগান—কায়েমী স্বার্থের বুর্জোয়া দালাল-দের কালো হাত ভেঙে দাও (খাদে) গুঁড়িয়ে দাও। ভেঙে দাও (খাদে) গুঁড়িয়ে দাও।

ওসব তোমাদের অর্ডিনারি মাল। বরং পপুলার হিন্দি গানের টিউনের সঙ্গে পাঞ্চ করে.... যেমন ওই একটা হিটগান আছে না—গীত গাতা দরখো।

অ্যা ই ইল।

কি হল হে?

এই বাইরের মালটার সামনে ভেতরের সব কথা ফাঁস হয়ে গেল। এ শালা বাইরে গিয়ে বলে বলে বেড়াবে—এই ভাবে মিনস্ট্রী চলছে।

রাস্তার ভয় দেখিয়ে বাইরে ছেড়ে দিয়ে এস, কিস্যু করবে না, শেষে বোবা হয়ে যাবে। বাঙালীর আর ভয়েস কোথায়! শেষ বাঙালী যার ভয়েস শোনা গিয়েছিল হি ওয়াজ বোস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। এখন তো বাঙালী মানেই প্যান্টোমাইম।

না স্যার, সেই বজ্জাত হাজামকেও তো রাজা ভয় দেখিয়েছিলেন। ফলটা কী?

সে আবার কে!

সেই যে লোকটা, রাজার চুল কাটতে এসে, রাজার মাথায় দুটো শিং দেখেছিল। কিছুতেই কথাটা পেটে রাখতে পারলে না। শেষমেষ গভীর জঙ্গলে ঢুকে একটা নিম না তুঁত গাছের সামনে দাঁড়িয়ে চেপে রাখা কথাটা বলে খোলসা হয়ে এল। আর তারপর! তারপর সেই গাছ কেটে ঢোল হল সেতার হল, আরও কি কি যন্ত্র তৈরি হল। সেই মাল গিয়ে পড়ল এক ওস্তাদের হাতে। সেই ওস্তাদ আবার দলবল নিয়ে সেই শিংঅলা রাজার আসরেই গেল মিউজিক শোনাতে। সেতারে আঙুল পড়তেই বেজে উঠল—রাজাজীকা দো শিং, দো শিং, কাঁসর বেজে উঠল, কিসে কহা, কিস্সে কহা? ঢোলে চাঁটি

বন্যাবন্ধ,
চলবেনা!
চলবেনা!!

পড়তেই মাল ফাঁস—বজ্জাত হাজাম নে কহা, বজ্জাত হাজাম নে কহা। ব্যাস, হাজামের গর্দান গেল।

ওহে বন্ধু শুনলে গপ্পটা। আমাদের শিং দেখেছো, খবরদার এ জিনিস যেন লিক না করে, কৌকে বলবে না, সেলুনে বসে কি চায়ের দোকানে বসে বলবে না, এমন কি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস না পেয়ে কিম্বা বাসের ভেতর জন-গণের ডেমোক্রেসির চাপে গলদঘর্ম হয়ে বিরক্তির চরম মুহূর্তেও বলা চলবে না—ধ্যাৎ শালা মিনিস্ট্রী, যুঝলে হয়েন, সেদিন যা দেখেছি.... এইসব যখন বলতে খুব ইচ্ছে করবে, তখন খৈনী খেয়ে যেভাবে থুতু ফেলে সেইভাবে পিচ পিচ থুতু ছিটোতে পারো কিম্বা রেগে ঘোড়া যেভাবে আস্তাবলে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠোকে সেইভাবে পা ঠুকতে পারো। থাট নট মোর দ্যান দ্যাট।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রবিশঙ্কর

॥ ২৭ ॥

শংকর, তোমার কথায় কথায় অনেক আন্তরিক প্রসঙ্গ পাড়লাম। কিভাবেই না এক কথায় আর এক কথা এসে যায়! কিভাবে শুরু করলাম কথা আর কোথায় এসে পড়লাম! এবার তোমার পূর্বের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব। গানের কথা ঠিকই, কিন্তু অনুরাগের কথাও। সেজন্যই এই পর্যায়ে এইসব কথা আসছে। যেমন ভাই আলি আকবরের কথায় যাব আমরা শীঘ্রই। ওকে বাদ দিয়ে তো আমার কথা শেষ হতে পারে না। তা ছাড়া নিখিল আমাদের ঘরের একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অন্নপূর্ণার বাজনার কথাও তুমি জিজ্ঞেস করেছ। বলব। তার আগে, হ্যাঁ, কি যেন একটা জানতে চেয়েছিলে তুমি?

দুর্গা রাগের নামটা এরকম হল কেন? তা দেখ, নামকরণ সম্পর্কে আর কি বলব বল, এটা আমার মনে হয় মিউজিকোলজিস্টদের কাজ। তবে দুর্গা রাগ, আমার সামান্য ধারণায় যা মনে হয়, ধর গিয়ে ভূপালি—বিশেষ করে ভূপালি রাগ —আর সারংগ, এই তিনটে রাগ আমার মনে হয়—বই পড়ে বলছি না, কারণ বইতে এরকম আলোচনা দেখিনি—এই রাগগুলো আমার মনে হয় আদিবাসী সংগীত থেকে এসেছে। তুমি এখনও তার প্রমাণ পেতে পারো—সে আসামে যাও, কি হিমাচল প্রদেশে যাও, কি এখানে যাও কি ওখানে যাও, সে চীনে যাও

গানের মধ্যে ভালবাসা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা খেরকুয়া খাঁ সাহেবের মধ্যে ছিল বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের মধ্যে ছিল। যেটা একটা বিচিত্র, বিরাট আকারে ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। ওপরের ছবিতে বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গে বড়ে গোলাম সাহেব বসে আছেন।

কি জাপানে যাও—ঘুরে-ফিরে তুমি সেই দুর্গা আর ভূপালি পাবে। পাবেই আর কোথাও কোথাও সারংগ। সারংগটা আমাদের সাঁওতাল-টাঁওতালদের মধ্যে খুব পাবে। কাজেই এই পাঁচ সুরের রাগগুলো, অনেকের মতে, অবশ্য সব গুলো না, এই যে ক'টা বললাম—দুর্গা, ভূপালি, সারংগ, এবং আর একটা রাগ ধানী বলে যাকে—সা গা মা পা নি সা। একমাত্র মালকোষটা ঠিক আমরা পাই না কোনও ট্রাইবাল মিউজিকে। অর্থাৎ এই রেঞ্জে। সা গা মা ধা নি সা যে খুব কমই পাওয়া যায়! একটা কথা কি জানো, আমাদের প্রচুর রাগ, বেশির ভাগ রাগই বলতে পারো উদ্ভূত হয়েছে মূর্ছনার দ্বারা। অর্থাৎ একটা রাগের পর পর স্বরস্থান বা 'সা' স্বরটা বদলে বদলে। এটাকে অনেকে স্বরভেদ বলেন। এর একটা দৃষ্টান্ত আমরা পাই এই পাঁচটি রাগে—মালকোষ, দুর্গা ধানী, ভূপালি, এবং সারংগে। প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটার ভেতরে সেঁধিয়ে আছে আমি আমার তৈরী ঈশ্বরী গোত্রের রাগগুলো এইভাবেই খুঁজে পাই। অর্থাৎ ঐ যে পরমেশ্বরী, গঙ্গেশ্বরী ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রথমে যে রাগটা মাথায় এল তা হল কামেশ্বরী। দক্ষিণে সরস্বতী বলে একটা প্রচলিত রাগ আছে তার সঙ্গে কিছুটা মেলে আমার কামেশ্বরী। তবে তফাতটা হল সরস্বতীতে আরোহী যায় প ধ স অর্থাৎ কোমল 'নি' লাগে না। লাগে শুধু অবরোহীতে তা ছাড়া সরস্বতীর প্রধান স্বরবিস্তার উত্তরাঙ্গে, অর্থাৎ চড়ার দিকে কামেশ্বরীতে আরোহীতে নিখাদ লাগে, এবং স্বরবিস্তারের বৈশিষ্ট্য হয় পূর্বাঙ্গে। এখন এই কামেশ্বরীর রেখাবকে 'স' করে আর একটা রাগ পেলাম নাম দিলাম গঙ্গেশ্বরী। গঙ্গেশ্বরীর মধ্যমকে 'স' করে যে রাগ পেলাম তা হল রঙ্গেশ্বরী। আর এই রঙ্গেশ্বরীর রেখাবকে 'স' করে পেলাম আমার অতি প্রিয় সকালের রাগ পরমেশ্বরী।

তুমি জিজ্ঞেস করেছ দক্ষিণের বিরাট শিল্পী শুভলক্ষ্মী সম্পর্কে। বলছি তা হলে। শুভলক্ষ্মী আমার মনে হয় এ যুগের একটা দৃষ্টান্তবিহীন শিল্পী। চেহারা বল, যশ বল, গানের মাহাত্ম্য বল, সব দিক থেকেই উনি খুব অদ্ভুত, খুব ভাগ্যবতী। আর বিশেষ করে আমার মনে হয় ওঁর এত নাম এবং যশের জন্য অনেকখানি ধন্যবাদ আমরা দিতে পারি ওঁর স্বামী সদাশিবনকে। সদাশিবন খুব উঁচু বংশের ব্রাহ্মণের ছেলে। আর এ তো নিশ্চয়ই জানো দক্ষিণের লোক কিরকম গোঁড়া সব। আর শুভলক্ষ্মী ছিল, যাদের আমরা বলি গায়িকা-শ্রেণী, সেরকম বংশের মেয়ে। সে যুগের দিনে যখন ওঁরা বিয়ে করলেন তখন

শুভলক্ষ্মী এ যুগের একজন দৃষ্টান্তবিহীন শিল্পী। চেহারা বল, যশ বল, গানের মাহাত্ম্য বল, সব দিক থেকেই উনি খুব অদ্ভুত। ওঁর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে ওঁদের কর্ণাটকী পদ্ধতির গানে। খুব সুরেলা, এবং ওঁর গলার আওয়াজ এত ভাল। ওঁর নিবেদনও খুব উঁচু পর্যায়ের।

...লবাসা দেওয়া এবং পাওয়ার আর একটা বিরাট দৃষ্টান্ত বিসমিল্লা। ওঁর ...জনার মধ্যেই কতখানি ভালবাসা মিশিয়ে থাকে। লোকে ভালওবাসে তো! ...বালদত্ত ঐ যে একটা ফু'—তা দিয়ে একটা অন্য স্তর সৃষ্টি করে গেল লোকটা।

ওঁর সঙ্গে থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই আরও ভাল হয়ে গেল ওঁর দিক থেকে। বংশের মর্যাদা সেটা তো পেলেনই, কারণ সদাশিবন ছিলেন প্রায় চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর পুত্রের মতন। এত ভালবাসতেন ওঁকে যে, বেশ ক'বছর ওঁর বাড়িতে ছিলেন রাজাজী। সদাশিবনের বাড়ির লোকের মত। ওঁর জন্য বিশেষ করে নীচের তলায় একটা ছোট ঘর করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া রাজাজীর 'স্বরাজ' বলে যে পত্রিকাটি সেটা মোটামুটি সদাশিবনের তত্ত্বাবধানেই ছিল। 'কল্কি' সাপ্তাহিকটা এ'দেরই। কাজে-কাজেই এইসব আওতায় এসে শুভলক্ষ্মীর খুব ভালই হল। সেই কল্কি, রাজাজী, সে যুগের যত ইন্টেলেকচুয়াল গুণী-জ্ঞানী লোক, যেমন সম্মানগুড়ি শ্রীনিবাস আইয়ার—মনে আছে সেদিন দেখা হল আমাদের সঙ্গে—এইসব চমৎকার, চমৎকার মানুষের পাশে এসে শুভলক্ষ্মীর শিক্ষা-দীক্ষা, মনের বিকাশ এত ভাল হল যে, তার ছাপ পড়ল ওঁর শিল্পী-জীবনের ওপরও। তারপর 'মীরা' বলে ছবিটা করলেন, তাতে উত্তর ভারতেও খুব নাম হল। কি আর বলব! যেমন চেহারা, তেমন গলা, তেমন পরিবেশ—আর তা ছাড়া অদ্ভুত ভালমানুষ। সত্যি বলতে কি, এমন একটা সুন্দর, ভক্তিমতী ভালমানুষ জীবনে খুব কমই দেখেছি। একটা দেবী ভাব যেন! এত সুন্দর লাগত, ক্রমশ আরও ভাল লাগতে লাগল। শিক্ষা পেয়ে পেয়ে নিজেকে কিরকম গড়ে নিয়েছেন। এবং এখন সেটা লোক মেনেও নিয়েছে। শুরুর দিকে হয়তো লোকে বলত, বাঃ! বেশ ভাল গলা, বেশ ভাল গায়! ঠিক ঐ গোছের! ব্যস! কিন্তু এই মনোভাবটা মানুষের বদলেছে। উনি যে বড় শিল্পী আর পাঁচটা গুণীর থেকেও, সেটা লোক বিশ্বাস করে এখন। কিন্তু ওঁর যেটা সবচেয়ে বড় গুণ, সেটা না বললেই নয়। সেটা অবশ্য উনি পেয়েছেন সদাশিবন এবং আরও অনেকের সঙ্গে থেকে থেকে। সেটা ওঁর দান, ওঁর ত্যাগ। ওঁকে সেভাবে গড়ে তোলাও হয়েছে। সেই পোপের সঙ্গে দেখা করা থেকে ইউনাইটেড নেশন্সে গিয়ে দাঁড়ানো—সবই। এবং সবখানে ওঁর যে কি দানের বহর তা বলেও বোঝানো সম্ভব না। সে বোধ হয় কোটি টাকার ওপরে চলে গেছে এতদিনে। কোন এক মিশনের জন্য তিন লাখ টাকা, কোন স্কুলের জন্য দু

শুভলক্ষ্মীর জীবনের সার্থকতার পিছনে অনেকখানি দান ওঁর স্বামী সদাশিবনের। খুব বড় ঘরের ছেলে সদাশিবন। ইন্টেলেকচুয়াল লোক। উনিই শুভলক্ষ্মীকে বড় বড় জায়গায়, মানুষের কাছে নিয়ে গেছেন। ওঁকে দান করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ওপরের ছবিতে স্বর্গত পোপ পলের সঙ্গে সদাশিবন এবং শুভলক্ষ্মী।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছ থেকে সম্মান-পুরস্কার গ্রহণ করছেন শুভলক্ষ্মী

লাখ টাকা, তো কোন হাসপাতালের জন্য ষাট হাজার টাকা—প্রায় চল্লিশ বছর এই ওঁরা করে এসেছেন। এখনও ওঁরা বছরে ছ'টা-আটটা এই ধরনের চ্যারিটি প্রোগ্রাম করে যাচ্ছেন—কি উত্তর ভারতে, কি দক্ষিণ ভারতে। গান গেয়ে এই-রকম অর্থ আয় করা এবং সেই অর্থ দান করার নজির পৃথিবীতে খুব কম আছে। অবশ্য এই যে টাকা দান করবার একটা পাগলামি, এটা আসলে সদাশিবনের। আমি তো ওঁর নাম রেখেছি Sada Givam। ভাবলে দুঃখ হয় যে, এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে. এখন নিজের বলতে প্রায় ওঁদের কিছুই নেই!

শুভলক্ষ্মীর গানের বিশেষ গুণ ওঁর কর্ণাটকী গানেই আছে। ভজন-টজন যা উনি গান তা তো উত্তর ভারতের শ্রোতাদের জন্যই। আর এই ভজন, আমি মনে করি না ওঁর গানের বিশেষত্ব। তার কারণ, যে ভজন উনি হিন্দুস্তানীতে গান তাতে একটু দাক্ষিণী প্রভাব এবং রেশ থাকে। তাতে কারও কারও হয়তো খুব ভাল লাগতে পারে, কিন্তু ওঁর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে ওঁদের কর্ণাটকী পদ্ধতির গানেই। খুব সুরেলা গলা সেখানে—খুবই সুরেলা, এবং ওঁর গলার আওয়াজ এত ভাল, এবং ওঁর নিবেদনও খুবই উন্নত পর্যায়ের। খুব গুণী সঙ্গে সঙ্গে। সেটা মনে রাখা দরকার। হয়তো তুমি বলবে, আরও তো কত গুণী আছেন, কেবল ওঁরই এত সুনাম হল কেন? যেমন ধরা যাক, একজন আছেন শ্রীমতী বি কে পট্টাম্মাল। একসময়ে দুজনকে খুবই তুলনা করা হত। এখন অবশ্য সেরকমটা হয় না। ওঁর বয়স এখন অনেক হয়ে গেছে। পট্টাম্মালকে লোকে বলে এসেছে ওঁর থেকেও বেশী গুণী। কিন্তু ভেবে দেখ শুভলক্ষ্মীর আজকের গানের স্ট্যাণ্ডার্ড। কি উন্নত, কি পরিশীলিত! এ ছাড়া শুভলক্ষ্মীর কপালটা তো কেউ নিতে পারে না! তাই তো আমি বললাম যে, কোনও কোনও লোককে ভগবান এমন একটা দান দিয়ে দেন—তার চেহারা, তার কপাল, তার স্বভাব—আর লোকে তাকে ভালওবাসে। এই ভালবাসা কথাটা আমি এতক্ষণ বলতে চাইছিলাম। মানে এর আগে সংগীতের ভেতরের আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই বলেছি, কিন্তু একটা জিনিস মিস্ করে গিয়েছি, যেটা সব চেয়ে বড়। সেটা হল ভালবাসা। একটা কথা আছে না? One who gives love gets love। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, সব চেয়ে বড় জিনিস গান-বাজনার ভেতর—ভালবাসা। তুমি যদি গাইতে ভালই না বাসো, তোমার বাজনার মধ্যেও যদি ভালবাসার প্রকাশ না থাকে, then .what is the use of it .all? Love is .such a secret power এবং সেটা হয়তো কেউ বুঝতেও পারবে না, কিন্তু সেটাই আসলে কাজ করছে। সেটাই আমার বিশ্বাস। এবং এটা আমার স্রেফ মত না, বিশ্বাস। সে তুমি এর কথা বল, কি তার কথা বল। এই ব্যাপারে তুমি যা খুশিই বল না কেন, সেসবেই আমার বক্তব্য হল যে, যদি গানের রূপটা ভালবাসার মধ্য দিয়ে বের করতে না পারে কোনও আর্টিস্ট, যদি প্রতিটি সুরের মধ্যে ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে না পারে সে, তবে শেষ অবধি তার সাধ-সাধনার কিছুই দাঁড়াবে না। আজকালকার গান-বাজনার আলোচনায় এই ভালবাসার ব্যাপারটাকে অনেকে বলেন life, joy; অর্থাৎ অমুকের গানে প্রাণ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ভারতে যাঁকে লোকে চিনতে পারবেন—মাহালিয়া জ্যাকসন। ভালবাসা পাওয়াটার চেয়েও গানে ভালবাসা দেওয়াটা অনেক বড়। অবশ্য যে দেয় সে তো ভালবাসা পাচ্ছেই। শুভলক্ষ্মীর কথায় কথায় মনে পড়ছে, এই ভালবাসা দেওয়া এবং পাওয়ার একটা বিরাট দৃষ্টান্ত বিসমিল্লা। দেখ, বছরের পর বছর লোকটা বাজিয়ে যাচ্ছে, কি সুন্দর, কি চমৎকার, তার মধ্যে কতখানি ভালবাসা মেশানো থাকে, লোকে ভালওবাসে তা। অনেকে হয়তো বলবে, বলেও যে, সেরকম রাগ-রাগিণীর বিরাট কিছু assembly বা আয়োজন নেই। কিন্তু ভগবানদত্ত ঐ যে একটা ফুঁ—একটা অন্য স্তর সৃষ্টি করে গেল লোকটা। কত লোকেই তো শানাই বাজিয়েছে, কিন্তু শানাই-বাজিয়ের স্থান কোথায় ছিল? সেই বিয়ের মণ্ডপে, কিংবা প্রোসেসনে। কিন্তু বিসমিল্লা সেটাকে এমন পাতে তুলে দিয়েছেন যে, লোকে শানাইকে ক্ল্যাসিকাল সংগীত হিসেবেই শুনছে, নিচ্ছে! ভাল ভাল শানাইবাদক আমি শুনেছি। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গণপত রাও, বরোদার। খুব গুণ ছিল, খুব ভাল বাজিয়ে। তাঁর বাজনায় তান-টান, গমক এত সুন্দর যেত. রাগ-রাগিণীর কাজ-কর্মও অনেক বেশী ছিল তাঁর। আর একজন ছিলেন বারাণসীর নন্দলালজী। কিন্তু বিসমিল্লা একটা অদ্ভুত প্রতিভা এ যুগে, মানে ভাবতে পারা যায় না। তা ছাড়া ঐ জিনিসটা, যেটা আমি বলতে চাই যে ভালবাসা, আছে। এবং ও জিনিসটা থেরকুয়া খাঁ সাহেবের মধ্যেও ছিল, গোলাম আলি খাঁ সাহেবের মধ্যে ছিল; যে-কোনও ভাল শিল্পীই, যিনি সত্যিকারের মহান হয়েছেন, লোক যাঁকে পেতে এবং শুনতে চায়, তাঁর মধ্যেই এটা থাকতে হবে। সেটা ঠিক কারও চেহারা, গান-বাজনা এবং ব্যবহারেই locate করা যায় না। সেটা কি বলব! একটা inexplicable something—যেটা একটা বিরাট আকারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। ওঁর তো মানে একেবারে অণুতে-পরমাণুতে ভরা ছিল। দিয়েওছেন, পেয়েওছেন। না দিলে পাওয়া যায় না। এ হল আমার স্থির সিদ্ধান্ত। একান্ত বিশ্বাস। (ক্রমশ)
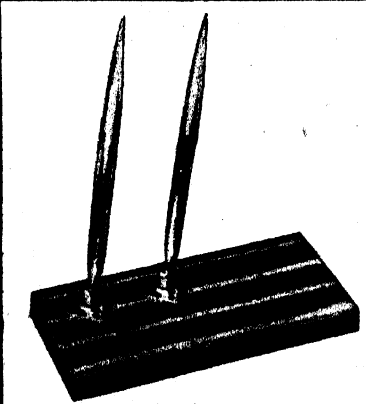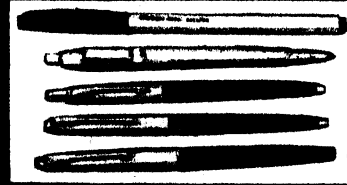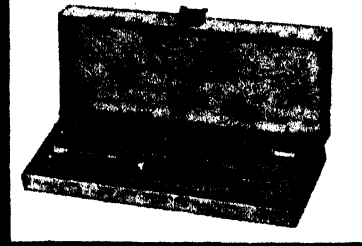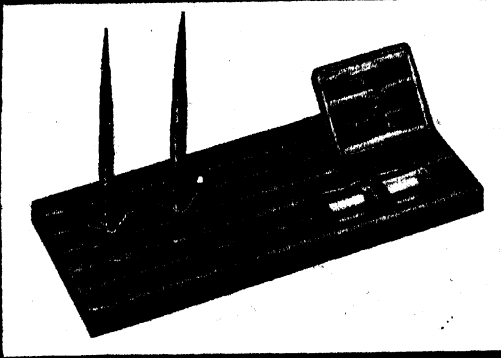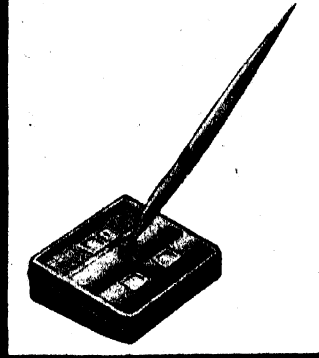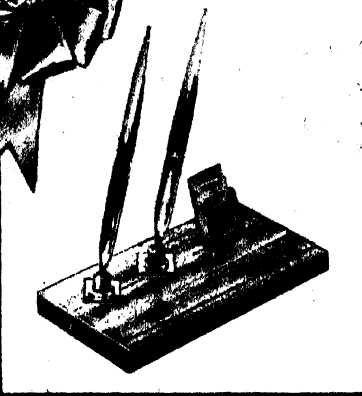
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে
অনেক দূরের সমতলে
নদীর শরীর যেন কৃশাঙ্গী সুমিত্রা হয়ে যায় ;
সুশোভনা সময়ে তখন
ভালো লাগে কটুগন্ধ কিছু বুনোফুল
এমন কি বিহ্বল বায়স যদি তীক্ষ্ম ডেকে ওঠে।
অথচ যখন তুমি খুব কাছে আছো
সিঁদুরের লালটুকু গালে লাগে হাওয়ার মতন
তখন গনগনে আঁচে পুড়ে যায়
ঘরবাড়ি, আলমারির বই
পুড়ে যায় টেরিকট শার্ট।
তুমি কাছে নেই, এখন সময়
সৌন্দর্যের হাত রাখে আমার চিবুকে
তোমার শূন্যতাটুকু ফ্যানের ব্লেডের মত
দ্রুত ঘোরে ঘরের ভিতরে
তুমি দূরে—
তোমার গালের টোল, সাদা দাঁত,
বালির পাহাড় বুক, ছোট নাভি
স্পষ্ট ধরা পড়ে—
অসহায় একা বোঝে, একা একা বোঝে।

রত্নেশ্বর হাজরা

শাদা বয়মের মধ্যে নষ্ট হয় আঙুর এখন
ফল কি কোথাও কিছু পাকে........
গ্রীষ্ম খুব কষ্টে আছে আজকাল বালিকারা—কেন
ঘুমিয়ে পড়েছে সব খেলা ভুলে এই
পরিবেশে নগ্ন হয়ে তারা
কখন এসেছে!

হয়ত এদেরই কারো চক্ষু দেখে বয়স্ক ঈগল
বাসা বেঁধেছিল—কোনো
পর্বত কন্দরে
লুকিয়ে দেখেছে গ্রীষ্ম আজ
মাঠের শরীর কাটে ছুরির ফলায়—তার তাপে
শাদা শিমুলের তুলো ঠা-ঠা রোদে ধু-ধু
মাঠের ভিতর ঘুরে মরে—

গ্রীষ্ম খুব কষ্টে আছে
নির্জন বনের মধ্যে—আর
ফল কি কোথাও কিছু পাকে!
এদিকে যে এই পরিবেশে
শাদা বয়মের মধ্যে নষ্ট হয় আঙুর আমার—

মরিচ নুন

বাসুদেব দেব

অদূরে আল্পনা থেকে ঝুলেছিল তেত্রিশ শরীর
প্লাসটিকের অভিমান মগজের নিচে ঝুলকালি
বাতিল ড্রামের মত ভাঙাচোরা সিন্দুকের পিছে
কিশোরের চোখ দুটো সিঁদুর মাখানো টাকা
জং ধরা চাবি

বিছানায় বউ ছেলে বাথরুমে তোয়ালে সাবান
তারই মধ্যে সে দেখেছে এলোমেলো মেঘের ভিতর
সারারাত ওঠে নামে সাদা এক ঝকঝকে লিফট
সিঁড়ির ঘোরালো ডাক বঁড়শির মত তাকে টানে
নাইলন মশারি শুধু বলেছিল
কোনখানে যাবি?

ইঁদুরের খুটখাট সারারাত কেটেছিল বুঝি
লেপ ও তোশক, ছিল বাসনকোসনে বড় মধুর ঝঙ্কার
ধ্বংসস্তূপ থেকে ক্রমে নড়ে ওঠে শিশুটির হাত
নিজ হাতে গড়া তার দোকান কিনেছে তাকে
তখন সকাল
মাখন মরিচ নুন মেখে তাকে ধীরে ধীরে খায়

অজিতবিক্রম দত্ত (জন্ম ১৯৪০)—ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্টসের স্নাতক। "ক্যানভাস আর্টিস্টস সারকেলের" সদস্য। অফিসে চাকরি করেন। "বোধ প্রতিকৃতি" (২৪″×৩০″) তৈলচিত্রে যন্ত্রণাজর্জর রক্তমাংসের মানুষ এবং পোষা একটি [illegible]

নিজেকে দোষী
ভাববার কোন
কারণ নেই।

পূপ-সী বাচ্চাকে
তার একান্ত প্রয়োজনীয়
সহজ স্বচ্ছন্দ
আরাম এনে দেবে।

আপনি হয়তো বাচ্চার মা যাঁকে চাকরি-বাকরি করতে হয় অথবা আপনি হয়তো আপনার ফিগার ঠিক রাখা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। হয়তো এইসব কারণে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে আপনি মন থেকে ঠিকমত সাড়া পান না।

এতে চিন্তার কোন কারণ নেই। এর একটি খুবই সহজ সুন্দর উপায় আছে— তা' হল পূপ-সী। এটি ঠিক আপনার মতই বাচ্চার পুরোপুরি যত্ন করবে পূপ-সীতে লাগানো রয়েছে এমন নিপ্‌ল যা' মায়ের বুকের মত কোমল আর যেটি বাচ্চা খুব সহজে চুষতে পারে। আর এই পূপ-সী ফীডিং বোতলটি এমন বিশেষ ডিজাইনে গড়া, যে বাচ্চা স্বচ্ছন্দে সমানভাবে দুধ টানতে পারে এবং যার দরুন বাচ্চাকে কোনও কষ্টই করতে হয় না। এই বোতলে দুধ খেতে খেতে বাচ্চা কখনো হাঁপিয়ে ওঠে না, যার ফলে তার মেজাজও বিগড়োয় না।

সুতরাং বাচ্চাকে পূপ-সী-ফিডারের সাহায্যে দুধ খাওয়ান। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার মতই এটিতে দুধ খেয়ে বাচ্চা যে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে, সেবিষয়ে আপনি সুনিশ্চিত থাকতে পারেন। আর এর চেয়ে জলজ্যান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আপনার আর কিই বা থাকতে পারে।

পূপ-সী®

ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ফীডার ও নিপ্‌ল

অতুল্য ঘোষ

॥ ৭২ ॥

লখনৌ যখন গিয়ে পৌঁছলুম, তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। চন্দ্রভানু (গুপ্তা) গাড়ি ঠিক করেই রেখেছিলেন। কিন্তু মনে হল বেরিলী পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে, সেইজন্য সে রাত্রি লখনৌতেই থেকে গেলাম। সকালে উঠে বেরিলী। বেরিলীতে আই এন টি ইউ সি-র বার্ষিক সম্মেলন। ওয়ার্কিং কমিটিতে ঝড় বয়ে গেল। আই এন টি ইউ সি-র পতাকা কি হবে তাই নিয়ে বিতণ্ডা। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হল যে, কংগ্রেসের পতাকাই হবে আই এন টি ইউ সি-র পতাকা; কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা হবে না। এ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। কংগ্রেস থেকে বারবার Resolution করা হয়েছে যে, কংগ্রেস কর্মীরা যদি শ্রমিক-সংগঠন করেন, তা আই এন টি ইউ সি-র ছত্রতলে করতে হবে। যদি আই এন টি ইউ সি-র বাইরে কেউ করেন, তা হলে তা আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অথবা ভেঙ্গে দিতে হবে। বর্ধমানের আবদুস সাত্তার আমাকে সভাপতি করে আসানসোল অঞ্চলে একটি ভাল ইউনিয়ন করেছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে ইউনিয়ন আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। ফলে জওহরলালের কাছ থেকে কড়া চিঠি আসে এবং সে ইউনিয়ন ভেঙ্গে দিতে হয়। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। স্বাভাবিক কারণেই আই এন টি ইউ সি কংগ্রেসের 'বি' টীম হতে চায়নি। অথচ কংগ্রেসকর্মীদের পুরো সাহায্য ও সহযোগিতা তার প্রয়োজন ছিল। যেসব প্রদেশে রাজ্য আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিল হত না, সেইসব রাজ্যে আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়ন কখনও শক্তিশালী হয়নি। মাদ্রাজে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ছিল। মাদ্রাজের আই এন টি ইউ সি শাখার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কোনও দিন মিল হয়নি। মাদ্রাজে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ছিল শক্তিশালী। ফলে ওখানে আই এন টি ইউ সি-র নামে শ্রমিক-সংগঠন বিশেষ গড়ে উঠতে পারেনি। আবার যেসব জায়গায় রাজ্য আই এন টি ইউ সি কংগ্রেস-বিরোধীদের হাতে ছিল, সেখানেও খুব অসুবিধা দেখা দেয়। পশ্চিম বঙ্গে সেই অবস্থা হয়।

১৯৫০-এ যখন ডঃ ঘোষ, ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেনদা (সেন) কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে 'কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি' সংগঠন করেন, তখন পশ্চিম বাংলার শ্রমিক-সংগঠন প্রধানত সুরেশদা, দেবেনদা—এঁদের হাতে। ফলে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি হয়। ফলে ইউনিয়নের সভাপতি হয়তো কংগ্রেস প্রার্থী, এবং সম্পাদক কে এম পি পি প্রার্থী। ফল যা হবার তাই হয়। একটা বিশৃঙ্খলা। কর্মীদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি এসবে মিলে সংগঠন বেশ ঘা খায়। যেসব কর্মী আবার কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে

অন্যান্য দেশের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দলের সাহায্য ও সহযোগিতায়। এবং রাজনৈতিক দলেরাও তাঁদের সাহায্যের পুরো মাসুল আদায় করে নেন। একদা ভারতবর্ষে এ আই টি ইউ সি ছিল সব দলের সম্মিলিত শ্রমিক-সংগঠন। ধীরে ধীরে সে জায়গা থেকে শ্রমিক-সংগঠন সরে যায়। বল্লভভাইয়ের সাহায্যে সুরেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) খান্ডুভাই দেশাই, ভাসোয়াড়া প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা আলাদা করে আই এন টি ইউ সি সংগঠিত করেন। অবশ্য তার আগেই কম্যুনিস্টদের সঙ্গে এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা কখনও এমনই দাঁড়ায় যে, আর মানিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না; তখনই আই এন টি ইউ সি-র সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী-প্রবর্তিত আমেদাবাদে শ্রমিক-সংগঠন খুবই মজবুত ছিল। কিন্তু তা কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি।

আমি প্রত্যক্ষভাবে অনেক ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলুম—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সভাপতিরূপে। তখন থেকেই একটা প্রশ্ন শ্রমিক-সংগঠনে আমাদের যাঁরা পুরোধা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি—কোনও দিন সদুত্তর পাইনি। আজও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। প্রশ্নটি অতি সোজা—শ্রমিক-সংগঠনে বাইরেকার লোক অর্থাৎ যে কারখানা বা সংস্থাকে নিয়ে ইউনিয়নটি গঠিত, তার ইউনিয়নে কেন সভাপতি বা সম্পাদক বা অন্য কর্মকর্তা সংস্থার বাইরের লোক হবে। বহু ইউনিয়ন এখনও আছে, যার সত্যিকারের পরিচালক বাইরেকার। অর্থাৎ যাঁরা ঐ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন না। এটা একটা বিসদৃশ ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে ইউনিয়নের সভাপতি বা কর্মকর্তা করা হয়ে থাকে। আর বড় বড় ফেডারেশনের কথা তো সম্পূর্ণ আলাদা। সেগুলো তো রাজনীতিকদেরই কুক্ষিগত। ফলে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে ইউনিয়ন, সেই সব কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার পরামর্শে চালিত হন। শ্রমিক-সংগঠনের কাজ যে রাজনীতির বাইরে এ বোধ অনেক শ্রমিক-সংগঠকের নেই। পরাধীন ভারতবর্ষে যেসব শ্রমিক-সংগঠন হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই সেইসব সংগঠনে রাজনীতি এসে পড়ে। কিন্তু স্বাধীন হবার পরও এই অবস্থা থেকে গেছে। এবং এখানে দক্ষিণ, বাম, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, পি এস পি, বর্তমানে জনতা—সব দলই সমানভাবে জড়িত। ফলে শ্রমিক-সংগঠন এখনও রাজনৈতিক দলের 'বি' টিমই হয়ে আছে। যেখানে যে শ্রমিক-সংগঠন, সেখানে সে রাজনৈতিক দলের উত্থান-পতনের সঙ্গে শ্রমিক-সংগঠনের উত্থান-পতন দেখা যায়; অর্থাৎ শ্রমিক-সংগঠনগুলি এমনভাবে পরিচালিত হয় যে ইউনিয়নের স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক দলের স্বার্থই তাদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আর এক রকমের শ্রমিক

...তায় অনেক সময়ে শ্রমিকদের স্বার্থ ব... দেন। এবং এটাও দেখা গেছে যে অনেক শ্রমি... ইউনিয়ন মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। যে... প্রাইভেট সেক্টরে যেসব কলকারখানা আ... তার মালিকানা যে সেই সব কলকারখান... শ্রমিকদেরই হওয়া উচিত—এমন প্রশ্ন খুব কম ইউনিয়ন করে থাকে... রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের যেসব শ্রমিক ইউনি... তারা এখনও এ দাবি তোলেননি। ... জেনারেল ম্যানেজার এবং শ্রমিক দুজনে... মর্যাদায় সমান। বিশেষ জ্ঞান যাঁদের আ... তাঁরা তার জন্য বিশেষ সুবিধা পাবেন। কি... সার্বিক ব্যবস্থা তো অন্যরকম দরকার। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কল-কারখানার স... রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানার পরিচালনায় কো... পার্থক্য দেখা যায় না। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জা... যে, তা হলে রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা কি কেবলমাত্র সরকারকে লাভের অংশ পাইয়ে দেবা... জন্য? রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানার শ্রমিকরা... সমান—এ বোধ তা হলে কিভাবে আসবে... সরকার পরিচালনায় যাঁরা আছেন, তাঁ... হয়তো দৃষ্টিভঙ্গী এখনও স্বচ্ছ নয়। কি... শ্রমিক-সংগঠন যাঁরা করছেন, তাঁদের ম... কোনও ধোঁয়াটে ভাব থাকা উচিত নয়। শ্রমি... কল্যাণ এক জিনিস, আর শ্রমিকদের অধিক... আর এক জিনিস। অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখে... সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ব্যক্তিগ... মালিকানাধীন টাটার শ্রমিকরা রাষ্ট্রায়... কারখানার শ্রমিকদের চেয়ে ঢের বেশী সু... সুবিধা পায়। বাস্তবিকপক্ষে এ এক প্রহেলিকা।

যতদিন বাইরেকার লোকে বিভিন্ন ক... কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নগুলি পরিচাল... করবেন, ততদিন একটা অবাস্তব অব্যবস্থা... থাকতে বাধ্য। যদি সত্যই সমাজতন্ত্রের এক... নীতি হয় তা হলে উৎপাদনের যাবতী... উপাদান রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তা... মানে যদি এই হয় যে, লভ্যাংশ সরকার... ট্রেজারিতে জমা পড়তে লাগল, আর শ্রমিক... যে মালিক এ বোধ কোন দিনই হল না, ত... হলে এই রাষ্ট্রীয়করণ উপহাসের নামান্ত... মাত্র। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অনে... শ্রমিক ইউনিয়নের পরিচালকের মাসিক আ... সে ইউনিয়নের শ্রমিকের মাসিক আয়ের চে... অনেক বেশী। সরকারী কর্মচারীদের বেতনে... হারের সঙ্গে আমরা ভারতবাসীর মাথাপিছ... গড়পড়তা আয়ের তুলনা করে কিরকম অসম... যে এখনও ভারতবর্ষে আছে, তা প্রমাণ করি... যদি শ্রমিক-সংগঠকদের আয়ের হিসাব নেওয়... যায় তা হলে দেখা যাবে, গড়পড়তা শ্রমিকদে... যে আয় তার অসমতা খুব বেশী। আবা... কোনও কোনও শ্রমিক-সংগঠক যদি ইউনিয়... সংক্রান্ত কোনও সরকারী বোর্ডের সদস্য হ... পারেন, তা হলে তো কথাই নেই। তাঁদের চালচলন, খাওয়া-দাওয়া, আহার-বিহার—সবেতে... শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পার্থক্য। বোঝা শা... এ ব্যাপার কেন ঘটবে? আর এ ব্যাপার থেকে বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী কোনও দলই বাদ পড়ে না। কয়েক বছর আগে কম্যুনিস্টরা লুম্পেন

প্রোলেটারিয়েট কথাটা খুব ব্যবহার করত। অর্থাৎ যারা প্রোলেটারিয়েটদের উপার্জনের অংশ নিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং নিজেরা খাটেন না। আজকাল এ কথা বড় বেশী শুনতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় অনেক রাজনৈতিক দল লজ্জায় এ কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, রাজনৈতিক দলেরাই তো শ্রমিক-সংগঠক পাঠান। এ একটা অসম্ভব অবস্থা। সব সময়েই যেন শ্রমিকদের নাবালক করে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। শ্রমিক-সংগঠক যদি মাসে দু হাজার টাকা পান তবে কারখানার ম্যানেজারই বা পাবেন না কেন—এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসতে পারে।

বিপ্লবী কথার সংজ্ঞা যেমন খুঁজে বার করা শক্ত সে রকম বামপন্থী, প্রগতীশীল—এসব কথার মানেও খুঁজে বার করা শক্ত। ভারতবর্ষে তো অনেক কৃষককে প্রগতিশীল বলা হয়। রেডিওতে রোজ বলে থাকে। অর্থাৎ যে কৃষক ক্ষেত বীজ সার—এসব ব্যাপারে সরকারের সাহায্যের সদ্ব্যবহার করতে পারে তারাই প্রগতিশীল। আর যাঁরা বিনা সেচের জলে কঙ্করময় জমিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় ফসল ফলাচ্ছে, তারা প্রগতিশীল আওতায় পড়ে না। ঠিক বামপন্থীর সংজ্ঞাও সেরকম খুঁজে পাওয়া শক্ত। যদি প্রস্তাব পাশ করলেই বামপন্থী হওয়া যায় তা হলে তো কংগ্রেস চাষের জমি সিলিং প্রবর্তন করেছে আর urban সিলিংএর প্রস্তাব অনেকদিন আগেই গ্রহণ করেছে। Crop [illegible] অনেকদিন আগে নেওয়া হয়েছে। কো-অপারেটিভের প্রস্তাব তো কংগ্রেসের নেওয়াই আছে। আর ধীরে ধীরে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের কল-কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে—এ প্রস্তাবও নেওয়া আছে। তা হলে প্রতিটি কংগ্রেস কর্মী বাম-পন্থী। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দেড় বিঘের বেশী জমি নেই—তিনি কোনরকমেই বামপন্থী বলে অভিহিত হতে পারবেন না : আর হরিণখালির রাজার ছেলে, যাঁদের আয় এখনও জনসাধারণের আয়ের তুলনায় বেশী, তিনি বিধানসভার নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির টিকিটে দাঁড়ালেই বামপন্থী হয়ে যান—এ অসহনীয় ব্যাপার আর কত দিন চলবে? বামপন্থীরই বা সংজ্ঞা কি আর প্রতিক্রিয়াপন্থীরই বা সংজ্ঞা কি? অভিধানগত সংজ্ঞা আমরা জানি। কিন্তু যেভাবে ভারতবর্ষে এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মানে এখনও পরিস্ফুট নয়। বর্তমানে একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে, প্রফুল্লচন্দ্র সেন জোতদারদের প্রতিনিধি। বেশ! আর যেসব জোতদার কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, তাঁরা কাদের প্রতিনিধি? পশ্চিম বাংলায় এবং অন্ধ্রে বহু কম্যুনিস্ট নেতা দেখা যাবে যাঁরা ভারতবর্ষের মান অনুযায়ী ধনী ব্যক্তি। এমনও অনেক কর্মী ও নেতা আছেন, যাঁরা নিজেরা উপার্জন করেন না, ধনী সংসারের সন্তান। এঁরা কিন্তু সকলেই প্রগতিবাদী ও বামপন্থী বলে অভিহিত। সেজন্যই জানবার ইচ্ছা হয় যে, ক্রিয়াপন্থীদের সংজ্ঞাটি বোঝা যায়। অর্থাৎ যাঁরাই বামপন্থী নন, তাঁরাই প্রতিক্রিয়াপন্থী। অনেক বামপন্থী ও প্রগতিশীল ব্যক্তি আছেন যাঁরা কোনও দিনই সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। আমার মনে হয় যাঁরা নিজেদের বামপন্থী ও প্রগতিশীল বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন যে, কতজন সমাজবিরোধী তাঁদের মধ্যে আছেন। এমনত আমরা পশ্চিমবাংলা ও কেরালায় প্রত্যক্ষ করেছি যে, বামপন্থী বলে অভিহিত দলেরা যেসব অভিযানকে প্রগতিশীল অভিযান বলে মনে করতেন, তাঁরা যখন ক্ষমতায় এসেছেন, তখনই সেইসব অভিযানকে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের অভিযান বলা হয়েছে। শ্রমিক-সংগঠনের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করি বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল—এসব ভুয়ো স্লোগান দেবার দিন চলে গেছে। কর্মের ভিত্তিতেই পরিচিতি থাকা উচিত। ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭৬-৭৬ অবধি কংগ্রেস সর্বত্রই প্রগতিশীল বলে অভিহিত হত। এবং জনসাধারণও ধীরে ধীরে তাই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। এক এমার্জেন্সির ধাক্কায় সমস্ত প্রগতিশীলতা ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এমার্জেন্সির সমর্থক সি পি আই দল এখনও বামপন্থী ও প্রগতিবাদী বলে পরিচিত।

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২০ ॥

ামমানিক্য বিদ্যালংকার অকস্মাৎ পরলোকগমন সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদটি হলো। এই পদের জন্য দাবিদার অনেক। কিন্তু রা বুঝেছে যে বৃদ্ধ পন্ডিত বা গ্রামের টুলো দের দিয়ে শিক্ষালয় পরিচালনার কাজ ভালো না। এ জন্য আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো বী ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন। ফোর্ট য়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার চন্দ্র বছর পাঁচেক ধরে বেশ যোগ্যতার সংগে কাজ সুনাম অর্জন করেছে। সেই জন্য শিক্ষা বিভাগের াারি ময়েট সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মার্শাল সাহেবকে অনুরোধ জানালেন ঈশ্বরকে দেবার জন্য। মার্শাল সাহেব রাজি হলেন সানন্দে। উভয় চাকরিরই বেতন একই, সেই পঞ্চাশ টাকা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চেয়ে সংস্কৃত কলেজে নেওয়ায় ঈশ্বরের বেশী আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। উইলিয়াম কলেজে পড়াতে হয় সাহেবদের তারা বা সংস্কৃত শেখে চাকরি রক্ষার কারণে। আর ত কলেজে পড়ানো হয় দেশীয় ছাত্রদের এবং ই প্রকৃত বিদ্যাচর্চার স্থল। মার্শাল সাহেব ঈশ্বর তের ওপর এমনই প্রীত ছিলেন যে ঈশ্বর ফোর্ট য়াম কলেজ পরিত্যাগ করার পর তাঁর ভাই দীন- কই তিনি সে জায়গায় বসালেন।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত। ইনি সংস্কৃত তেমন কিছু জানেন না কিন্তু ইংরেজি । দক্ষ এবং সাহেবদের সংগে উত্তমরূপে যোগাযোগ করতে পারেন বলে সংস্কৃত কলেজ পরিচালনার পেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র হলেন তাঁর সহকারী। বাবু দত্তের আরও পাঁচ রকম কর্ম আছে, ছাড়া তিনি ছোট আদালতের সাব জজ্, তিনি শ কলেজে থাকতে পারেন না, ঘণ্টা দু' একের এসে ব্যবস্থাদি ঠিক মতন চলছে কিনা দেখে যান। চন্দ্র নিজে কলেজের পরিচালনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ সাজাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা পাঠ শেষ করবার পর ভূষণ, বিদ্যালংকার, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি ী পায়। ঈশ্বরচন্দ্রের আগেও দু' একজন বিদ্যা- । হয়েছেন, পরেও হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজের নাম র সময় লেখেন ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ, কিন্তু লোকে বছর আগে থেকেই, সংস্কৃত কলেজে আসবার পর ঐ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন।

নতুন চাকরি নেওয়ার পর একবার পিতামাতার সংগে দেখা করার প্রয়োজন। ঈশ্বরচন্দ্র ভাই ভাইদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতার বাসা থেকে স্বগ্রাম মেদিনীপুরে পেঁাছোবার ব্যবস্থা অতি সরল, গাড়ি ঘোড়ার কোনো বালাই নেই। বউবাজার থেকে বেরিয়ে পদব্রজে হাটখোলার গঙ্গার ধারে এসে ফেরি নৌকোর পার হয়ে গিয়ে উঠলেন শালিখায়। তারপর বাঁধা রাস্তা ধরে হণ্টন। বৈশাখ মাস, যখন তখন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, সে রকম হলে গাছতলায় বিশ্রাম। মসাট গ্রাম পর্যন্ত পেঁাছে রাস্তা ছেড়ে ঈশ্বরচন্দ্র সদলবলে নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে। কোণাকুণি পশ্চিম মুখে গেলে দূরত্ব সংক্ষেপ হয়। বর্ষার সময় রাস্তা ও মাঠ প্রায় একাকার হয়ে যায়, কোথাও কোথাও হাঁটু সমান কাদা ঠেলে এগাতে হয়। এখন অবশ্য মাঠ ঘাট শুকনো। ওঁরা দিন শেষে পেঁাছোলেন রাজবলহাটে। এখানে দামোদর নদ পেরুতে হবে। সংগে চিঁড়ে গুড় মুড়ি যা ছিল, তা দিয়ে আহার সেরে নেওয়া হলো।

দামোদর অতি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর নদ। এখন গ্রীষ্মকাল, অধিকাংশ নদী নালারই তেজ মরে যায়, কিন্তু দামোদর এই সময়ও তপস্যারত যোগীর মতন কৃশকায় হলেও সমান তেজস্বী। ভরা বর্ষায় এই নদ করাল রূপ ধারণ করে, দু পার্শ্বের চার-পাঁচ ক্রোশ জলমগ্ন হয়ে যায়। প্রতি বৎসরই বন্যা।

সে রাত্রে নৌকো পাওয়া গেল না বলে ফিরে আসতে হলো রাজবল হাটে। এই গ্রামে রাত্রি যাপনের জন্য সরাইখানা আছে। ধনী ব্যক্তিরা পথিকদের জন্য মধ্যে মধ্যে এ রকম সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন পথিকরা বিনা ব্যয়ে এখানে থেকে যান।

ভোরে ওঠে দামোদর পেরিয়ে আবার পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে এসে পেঁাছোলেন পাতুল গ্রামে। এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের কিছু আত্মীয়স্বজন থাকেন, তাঁদের সংগে দেখা করে আবার বেরিয়ে পড়লেন নিজের গ্রামের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে বীরসিংহা গ্রাম মাত্র সাত ক্রোশ। দুপুর দুই ঘটিকার মধ্যেই ও'রা পেঁাছে গেলেন বাড়িতে।

আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল না, অকস্মাৎ পুত্রদের উপস্থিত হতে দেখে বাড়িতে আনন্দের সমারোহ পড়ে গেল।

ঠাকুরদাস চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখন গ্রামেই থাকেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঢেকার পরই ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় জোর করেই পিতাকে চাকরি ছাড়িয়েছেন। ঠাকুরদাস তখন মাইনে পেতেন দশ টাকা। তাঁর সমবয়েসীরা অবশ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, কাঁচা বয়েসের ছেলের কথায় এমন হুট করে কাজ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, ছেলে যদি পরে দুশ্চরিত্র হয়ে যায়, বাপ মাকে আর না দেখে, তখন ঠাকুরদাসকে আবার চাকরির খোঁজে দোরে দোরে ঘুরতে হবে। কিন্তু ঠাকুরদাস ততদিনে বুঝে গেছেন, এ ছেলে ঠাকুর দেবতাদের বিশেষ ভক্তি করে না বটে, কিন্তু পিতা মাতাই এর ঠাকুর দেবতা।

সাত ভাইয়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের জ্যেষ্ঠ। তিনি সবচেয়ে বেশী কৃতী হয়েছেন বলেই নয়, বাল্যকাল থেকেই তিনি জননীর বেশী প্রিয়। ঈশ্বর এসেছে বলে ভগবতী অত বেলাতেই আবার রান্নাবান্না নিয়ে মেতে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী দীনময়ীও রান্নাঘরে ঢুকে বসে রইলেন শাশুড়ীর সংগে। স্বামী অনেকদিন পরে বাড়ি এসেছেন বটে, কিন্তু দিনের আলোয় স্বামীর সংগে তাঁর দেখা হবে না। সে রকম নিয়ম নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র বেরুলেন পাড়া বেড়াতে। প্রথমেই গেলেন কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ইনি ঈশ্বরচন্দ্রের আদি শিক্ষক, প্রত্যেকবার বাড়ি আসবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র এঁর জন্য নতুন বস্ত্র কিনে আনেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ, তবু তিনি একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন। গৃহিণীকে ডেকে বললেন, ওগো, দেখে যাও, দেখে যাও পাগল ছেলের কাণ্ড!

অদূরের মাঠে ছেলেরা জল কাদার মধ্যে কপাটি খেলছিল, ঈশ্বরচন্দ্রও অদের মধ্যে নেমে পড়ে লাফা-লাফি করছেন। গুরুমশাই ঈশ্বরকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, ঈশ্বর দূর থেকেই উত্তর দিলেন, দাঁড়ান, খেলাটি সেরে লই!

খানিক বাদে ঈশ্বরচন্দ্র এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। গুরুমশাই বললেন, এ কি কাণ্ড দেখো! একেবারে বালকদের সংগে মিশে বালক হয়ে গেলে!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কলকেতায় তো আর খেলা-ধুলার সুযোগ হয় না! গ্রামে এলেই আমার শরীর সুস্থ থাকে। নিয়মিত কপাটি খেললে উদরাময় হয় না।

গুরুমশাই তাঁর পত্নীকে বললেন, শোনো ছেলের কথা! এ এখন কী হয়েছে জানো! সংস্কৃত কলেজের সহকারী পরিচালক, দু বেলা সাহেবদের সংগে কথা কইতে হয়, দেশের মাথা মাথা লোকেরা যেখানে ঠাঁই পায় না—

ঈশ্বরচন্দ্র হাসতে লাগলেন।

গুরু-পত্নী বললেন, আমাদের সেদিনের সেই ঈশ্বর, এই তো এইটুকুন গুটুলিমতন চেহারা ছিল, কী দুষ্টামিই করতো! সে আজ এত বড়টি হয়েছে! অ ঈশ্বর, তোর বয়েস কত হলো?

ঈশ্বরচন্দ্র হিসেব কষে বললেন, এই তো ছাব্বিশে পড়লাম।

তিনি বললেন, চেহারা দেখে কিন্তু বোঝা যায় না বাপু! সেই যেন ছোটটিই রইছিস।

গুরুমশাই বললেন, হ্যাঁরে ঈশ্বর, সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা তোকে মানে?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ফোর্ট ইউলিয়াম কালেজে আমি সাহেব ছাত্রদের শায়েস্তা করিছি, আর এই নিরীহ ডাল ভাত খাওয়া ছেলেরা আমায় মানবে না?

কথায় কথায় একটু বাদে কালীকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ক্ষীরপাই যাবি নাকি? তা হলে চল আমিও তোর সাথেই যাই। পরশু আমার সে স্থলে যেতে হবে।

ক্ষীরপাই গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্বশুরালয়। তিনি কদাচিৎ সেখানে যান। এখন তাঁর স্ত্রী এখানেই রয়েছেন, সুতরাং যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আপনার শরীর তো দেখছি ভালো না। আপনি আবার অত দূরে যাবেন কী জন্য?

কালীকান্ত বললেন, কী করি বল, আবার একটি বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে, না করলেই নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, বিবাহের সম্বন্ধ? কার? আপনার?

কালীকান্ত বললেন, আর বলিস কেন! না করলে নয়, ওরাও ছাড়ে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন গুরুর দিকে। গুরু-পত্নী পাশেই বসা, তাঁর মুখেও কোনো ভাবান্তর নেই। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভঙ্গ কুলীন, বহু বিবাহে আলস্য নেই। ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই জানেন এ কথা। বাড়িতে এই একটিই স্ত্রী।

অর্থব্যয় করতে হয় প্রত্যেকবার।

এসব জানা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র আজ যেন গুরুকে নতুনভাবে দেখলেন, তাঁর সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়ে গেল ঘৃণা, গুরু হিসেবে যাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, মানুষ হিসেবে তিনি এত অশ্রদ্ধেয়! ইদানীং ঈশ্বর অনুভব করেছেন, খাঁটি মানুষ বড় দুর্লভ। লেখাপড়া তো শিখছে অনেকেই, কিন্তু তাদের মধ্যেই বা খাঁটি মানুষ ক'জন?

এই বৃদ্ধের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো বিবাহ করার শখ? জেনেশুনে আবার একটি মেয়ের সর্বনাশ করবে?

ঈশ্বরচন্দ্রকে মূকবাক দেখে গুরুমশাই নিজেই বললেন, কী করি বল, পাঠশালাটি এখন ভালো চলে না, আমার এ পক্ষেই ছয়টি ছেলেমেয়ে, এত বড় সংসার চালানো কি সহজ কথা! পুরানো শ্বশুর-বাটিগুলান থেকেও আদায়পত্তর আজকাল আর ভালো হয় না, রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সে মেয়েটির বয়েস কত?

গুরুমশাই বললেন, নয় পার হয়ে গেছে। এত বড় বয়স্থা কন্যা, তার পিতা অতি ব্যস্ত হয়ে আমার একেবারে হাতে পায়ে ধরেছে। টাকা পয়সাও এরা দেবে ভালো।

ঈশ্বরচন্দ্র কড়া গলায় বললেন, দুদিন পর আপনি চোখ বুজলে সে মেয়েটির যে কপাল পুড়বে?

—আর তার যদি বিবাহ না হয়, সমাজে তার বাপ মা পতিত হয়ে যাবে না?

—আপনার ছেলে শ্রীনাথ...সেও তো উপযুক্ত হয়েছে, তার সঙ্গেই এই কন্যার বিবাহ দিন না কেন?

—শ্রীনাথের আমি অন্যত্র বিবাহ ঠিক করেছি। দিলেন ঈশ্বরের জন্য। কিন্তু ঈশ্বর হাত জোড় করে বললেন, মাপ করুন, এ বাড়িতে আমি জলস্পর্শ করবো না।

তারপর কালীকান্তের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, গুরুমহাশয়, আপনার সহিত এই আমার শেষ দেখা। এ বাড়িতে আর আমি কোনোদিন আসবো না।

পিছন ফিরে হন হন করে হাঁটতে লাগলেন ঈশ্বরচন্দ্র। গুরুমশাই তাঁর ক্রোধের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিতভাবে ডাকতে লাগলেন, অ ঈশ্বর শোন, কী হলো, অ ঈশ্বর

ঈশ্বর আর দাঁড়ালেনও না, উত্তরও দিলেন না।

তারপর থেকে সর্বক্ষণ ঈশ্বরের মন চঞ্চল হয়ে রইলো। যাঁরা নমস্য, যাঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁরাও এই প্রকার অন্যায় করে, তবে সাধারণ অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত ব্যক্তিরা তো এ রকম করবেই। অথচ এর প্রতিবিধান করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই, এ কথা চিন্তা করেই গায়ে যেন জ্বালা ধরে।

তাঁর মনে পড়লো, তাঁর ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে তাঁর ব্যাকরণ শিক্ষক শম্ভুনাথ বাচস্পতি পত্নী বিয়োগের পর সেই বৃদ্ধ বয়সেই আবার বিবাহ করতে উদ্যত হন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁকে বলেছিলেন, এরূপ বয়সে মহাশয়ের বিবাহ করা পরামর্শ সিদ্ধ নয়। বাচস্পতি শুনলেন না, আবার এক বালিকাকে বিয়ে করে আনলেন। সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আর যেতেন না শম্ভুনাথ বাচস্পতির গৃহে। বাচস্পতি মাঝে মাঝেই বলতেন, একটি দিনের জন্যও তোমার মাকে দেখতে গেলে না। পেড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত একদিন গেলেন তিনি, কিন্তু মেয়েটিকে দেখা মাত্রই তাঁর চোখ ফেটে জল এলো, নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারেননি তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটিকে অকূল পাথারে

মেয়েটির কথা ভেবে তাঁর কান্না এসে গেল।

জননী ভগবতীও ঈশ্বরের ব্যবহার দেখে অবা
এত যত্ন করে তিনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করলেন, ঈশ্ব
চন্দ্র তার কিছুই প্রায় খেতে চান না। জাল ফে
পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়েছে, বাড়ির গাভির দুধে
হয়েছে পায়েসান্ন, পুত্র এতবড় সুসংবাদ বহন ক
এনেছে, তারই জন্য এত আয়োজন। কিন্তু ঈশ্ব
বললেন, মা, আমি শুধু দুটি ডাল ভাত খাবো, আ
কিছু আমার মুখে রুচবে না।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা, এ কী কথা
তুই খাবিনি কেন? তোর জন্য এত করলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, এতকাল আমরা ডাল ভা
খেয়েই তো মানুষ হয়েছি, সেই ডাল ভাত খেয়েই
কত আহ্লাদ করলাম। এখন হঠাৎ বড় মানষী করা
প্রয়োজন তো দেখি না। মা, দেশে অনেক দুঃখী, তা
কথা চিন্তা করলে আমার মুখে ভালো খা
রোচে না।

ভগবতী বললেন, তুই বড় কাজ পেয়েছিস, একা
গরীব দুঃখীদেরও আমি পেট পুরে খাওয়াবো।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, তোমাদের আশীর্বাদে আ
আর দীনবন্ধু দুভায়েই উপযুক্ত কাজ পেয়েছি, এ
আমাদের অবস্থা যদি কিছু ফেরে, তবে তা দিয়ে দে
গাঁয়ের কিছু উন্নতি ঘটাতে চাই।

—সে হবেখন। একদিন শখ করে রেঁধেছি, তুই
তো এখন।

ঈশ্বর একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার
বললেন, মা, আমাদের কলকেতার বাসাবাড়ির যাও
আসার পথে আমি রোজ দেখি গোয়ালাদের
দুইতে। বাছুর গুলানকে তারা দূরে বেঁধে রাখে, ত

[illegible]

তো দুধ, তাদের আমরা বঞ্চিত করি। এইসব দেখে-শুনে দুধের প্রতি আমার অভক্তি জন্মে গেছে। মাছ মাংস খেতেও আমার রুচি হয় না।

ভগবতী রীতিমতন ভয় পেয়ে বললেন, ও মা, এমন অলক্ষুণে কথা তো কখনো শুনি নি। দুধ, মাছ, মাংস না খেলে শরীর টিঁকবে? একেই তো তোদের কত খাটুনি।

এক টুকরো ভাজা মাছ ভগবতী নিজ পাত থেকে তুলে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মুখের কাছে ধরে বললেন, খা। আমি বলছি, খা!

অন্য ভাইরা কৌতুক দেখার ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। খাদ্য বিষয়ে দাদার এই নতুন বাতিকের কথা তারা জানে। দাদা দারুণ গোঁয়ার, একবার যা বলে সে কথা আর ফেরায় না। কিন্তু জননীর সঙ্গে কি দাদা জেদ পারবে?

ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের হাত থেকে মাছ ভাজাটি নিয়ে বললেন, মা, তুমি এত করে বলছো বলে এই আমি এক টুকরো মাছ মুখে দিলাম। কিন্তু পায়েস সরিয়ে নাও। দুধের জিনিস আর আমি কিছুতেই খেতে পারবো না।

ঠাকুরদাস কাছেই দাঁড়িয়ে হুঁকো টানতে টানতে শুনছিলেন সব। এবার তিনি বললেন, ও ঘাড়-বাঁকাকে তুমি আর বেশী সিধে করতে পারবে না, গিন্নী। আর বেশী জোর করলে সব ফেলে উঠে যাবে!

কয়েকদিন গ্রামে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আবার ফিরলেন কলকাতার দিকে। এবারে তাঁর বড় মন খারাপ হয়ে আছে। সেই নয় বৎসর বয়েসে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তারপর থেকে প্রায় কলকাতাতেই থেকেছেন, মধ্যে [illegible] মাত্র। কিন্তু এবারে তাঁর মনে হলো, গ্রামের মানুষের মধ্যে দুঃখ, দারিদ্র্য, কুসংস্কার যেন দিন দিনই বাড়ছে। সামান্য স্বার্থ নিয়ে সবাই ব্যাপৃত, সামান্য কারণে দলাদলি। এ-সব দূর করার উপায় কী? একমাত্র শিক্ষা বিস্তারেই কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষের সামনে একটি দর্পণ তুলে ধরে। মানুষ তাতে নিজেকে চিনতে শেখে।

কলকাতায় ফিরেই তিনি সংস্কৃত কলেজটির আমূল সংস্কার করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সংস্কৃত কলেজটি যেন হরিঘোষের গোয়াল হয়েছে। সরকার কলেজ খুলে দিয়েছে, যার যেমন খুশী কলেজটিকে ব্যবহার করে। ছাত্রদের কোনো বেতন লাগে না, তাই পড়াশুনোর কর্মটিকেও তারা মনে করে যেন গোপাল ঠাকুরের ব্যাপার। যার যখন ইচ্ছা আসে যায়। যদিও পাকা ইস্টকের ভবনে কলেজ বসে, তবু শিক্ষকগণ যেন সেই আগেকার গাছতলার টোলের ধারাটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। কোনো শিক্ষক ক্লাসের মধ্যে চেয়ারে পা তুলে বসে তাঁর কোনো প্রিয় ছাত্রকে ডেকে বলেন, বাপু হে, একটু বাতাস করো তো, কিছুক্ষণ ঘুমায়ে লই!

কলেজে কোনো সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্দিষ্ট নেই। ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় কোনো নতুন পাঠ শুরু করতে নেই, এমন রীতি কে স্থির করেছে তার ঠিক নেই, তবু চলে আসছে।

ঈশ্বরচন্দ্র এ-সব প্রথা বন্ধ করে দিলেন। প্রত্যেক রবিবার কলেজ বন্ধ থাকবে, বাকি দিনগুলিতে যথা-নিয়মে ক্লাস চলবে। শিক্ষক বা ছাত্র সকলকেই আসতে হবে সাড়ে দশটার মধ্যে। ক্লাসে কোনো শিক্ষক ঘুমোলে তিনি নিজে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দেন, অতিশয় নিদ্রাতুর কোনো শিক্ষককে হেসে পরামর্শ দেন, এবার থেকে সঙ্গে নস্যির ডিপে রাখুন, ঘুম এলেই নাকে নস্য ঠুসে দেবেন!

কলেজ ভবনের পেছন দিকে মালির ঘরের পাশে শৌচাগার। ছাত্ররা সেখানে যাবার নাম করে দল বেঁধে এক সঙ্গে এসে নানারকম রঙ্গ-রস করে। তাদের পাঠ্য রচনার মধ্যে আদি রসাত্মক শ্লোকের ছড়াছড়ি। সেগুলির আলোচনারও এটিই উপযুক্ত জায়গা। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিয়ম করলেন, একবারে এক-জনের বেশী ছাত্র শৌচাগারে যেতে পারবে না এবং যাবার সময় কাঠের পাস নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে। শিক্ষক বা ছাত্র কেউই আবেদনপত্র না পাঠিয়ে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। মাসে এক-বার প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হবে এবং শুধু সংস্কৃত নয়, ছাত্রদের প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হবে বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক।

ছাত্রদের নিয়ে বেশী সমস্যা নেই, কিন্তু কিছু সমস্যা দেখা দিল অধ্যাপকদের নিয়ে। অধিকাংশ বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে পড়েছেন। তাঁরা তাঁর গুরুস্থানীয়। ঈশ্বরচন্দ্র এখন তাঁদের ওপরে কর্তা হয়ে বসায় তাঁরা সব নির্দেশ মানতে চান না। বিশেষত সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে কলেজে এসে

পোঁছোবার ব্যাপারটা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হয়।

গুরুস্থানীয় অধ্যাপকদের ঈশ্বরচন্দ্র মুখে কিছু বলতে পারেন না। ঠিক সাড়ে দশটায় সময় তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কলেজের গেটে, হাতে একটি ঘড়ি। যে-সব অধ্যাপক অনেক বিলম্ব করে পোঁছোন, তাঁরা দেখতে পান যে, ঈশ্বরচন্দ্র একবার তাঁদের মুখের দিকে আর একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। একজন পণ্ডিত একদিন বলেই ফেললেন, ঈশ্বর তুমি যে কিছু বলো না, টিপি টিপি হাসো, ওতেই বড় লজ্জা পাই। ঘাট মানছি বাপু, কাল থেকে ঠিক সময় আসবো।

মাঝখানে একটা ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র মহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজ সন্নিহিত ভবনে বসে। একদিন কোনো প্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গেলেন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের ঘরে। চরকায় মায়ের হাতে বোনা মোটা সুতোর ধুতি ও চাদর পরা, মাথার সামনের দিক কামানো, পিছনে সুবৃহৎ শিখা। এমন চেহারার মনুষ্যকে দেখে কার সাহেব বসতে বললেন না, বরং নিজের পা দু-খানি টেবলের ওপর তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হাঁ পণ্ডিত কী দরকার বলো? অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ফিরে এলেন সেদিন, কারুকে কিছু বললেন না। কয়েকদিন পরেই একটি সুযোগ

প্রায়ই নানা কাজে কথাবার্তা বলতে হয়। সেদিন কার সাহেব এলেন সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে। আগে থেকে খবর পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র টেবিলের ওপর তাঁর চটি পরা পা দুখানি তুলে রাখলেন, তারপর কার সাহেবকে বসবার চেয়ার না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, বলো সাহেব কী তোমার প্রয়োজন?

এই ঘটনাই নানাভাবে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। এমনকি ইংরেজ সমাজেরও কানে গেল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা এই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দুয়ো দেয়। কার সাহেব ঘটনাটিকে রসিকতা হিসেবে না নিয়ে শিক্ষা বিভাগের প্রধানের কাছে নালিশ জানালেন। তিনি বললেন, আর কোনো ইউরোপীয় হলে এই অপমান কিছুতেই সহ্য করতো না।

শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব এলেন তদন্তে। ঈশ্বরচন্দ্র নিরীহমুখে বললেন, আমি কিছু দোষ করেছি, তা তো জানতাম না। আমি তো ভেবেছিলাম, এটাই তোমাদের দেশের ভদ্রতা। কার সাহেবের মতন একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি যদি টেবিলে চর্ম নির্মিত জুতো শুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বসে থাকেন, তা হলে আমার পক্ষে টেবিল থেকে পা নামিয়ে বসা কি অভব্যতা হতো না?

ময়েট সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর রিপোর্টে লিখলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ আমি বাঙালীদের মধ্যে আর একজনও দেখি নাই।

সেবার চাকরি টিঁকে গেলেও মাত্র এক বছর তিন মাস পরেই সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

দিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন, কলেজের নানাবিধ সংস্কারের কারণে সাহেবগণ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশংসা করছেন। রসময় দত্ত মনে করলেন, সাহেবদের কাছে তাঁর নিজের সমাদর যেন কমে যাবে এতে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর অধস্তন কর্মচারী, সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র খাটবেন, কৃতিত্বটা পাবেন তিনি, এরকমই সাধারণত হয়। কিন্তু এ যে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হয়ে যাচ্ছে। এবার রসময় দত্ত শক্ত হাতে হাল ধরলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কার প্রস্তাব বাতিল করে দিতে লাগলেন একটার পর একটা। কলেজটি আমূলভাবে ঢেলে সাজাবার একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সেটি রসময় দত্ত কিছুতেই পাঠাতে রাজি হলেন না শিক্ষা বিভাগীয় বড় সাহেবদের কাছে।

বিরক্ত হয়ে ইস্তফাপত্র পেশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সে কথা শুনে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক লিখিতভাবে রসময় দত্তকে অনুরোধ করলেন, এই কলেজের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহা উপকারী, তাকে যেন যেতে না দেওয়া হয় কিছুতেই। রসময় দত্ত সে-সব গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর ধারণা, একটু চাপ দিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে নরম করা যাবে।

এক কথায় ঈশ্বরচন্দ্র চাকরি ছেড়ে চলে এলেন।

বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বাড়িতে এসে বললেন, ওহে ঈশ্বরচন্দ্র, তোমার কাণ্ড দেখে যে সকলের তাক্ লেগে গেছে। এই বাজারে কেউ এত বড় চাকরি ছাড়ে? রসময় দত্ত কী বলেছেন জানো? ছোকরা এক কথায় চাকরি ছাড়লো, এর পর খাবে কী?

ঈশ্বর হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ওঁকে জানিয়ে দিও, দরকার হয় আলু পটল বেচে খাবো, মুদির দোকান দেবো! তবু যে চাকরিতে মান থাকে না, সে চাকরি আর আমি কক্ষনো করতে যাবো না। (ক্রমশ)

প্রবহমান দিলীপ ঘোষ

বাল্যকাল থেকেই ভোর ভোর শয্যাত্যাগ সুখেন্দুবাবুর অভ্যাস। বয়স বাড়ার সংগে সংগে ঘুম অনেক কমে এসেছে, তবু ঘুম তাঁর ভাঙেই ভোরে। নিয়মমাফিক চলাফেরা এবং খাওয়া-দাওয়ার দরুন শরীর-স্বাস্থ্য তাঁর অটুট, ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ছেলেবেলায় শরীরচর্চা, খেলাধুলো করতেন, শরীরের গঠনটি তাই এখনও বেশ মজবুত। ধীর-স্থির মানুষ তিনি, হাজার সমস্যার মধ্যেও অবিচল থাকতে পারেন। তাঁর বুকের ভেতর আলাদা একটা 'বাসা' আছে, দরকার মত খিল এঁটে লুকিয়ে পড়েন, আবার দরকার বুঝে হুট করে সেই বাসাটির খিল খুলে বেরিয়ে আসেন। সংসারের নানান ঝড়-ঝাপটা তিনি কতবার যে সহজ সরলভাবে আটকে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বহির্জগতের কোন আক্রমণেই তিনি পরাস্ত হননি।

ইহজগতে তাঁকে কেন্দ্র করে এ যাবৎ যা কিছু ঘটেছে সুখেন্দুবাবু তা থেকে সর্বমংগলময়কেই প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। অন্ধভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী তিনি নন, কিন্তু প্রবল এক দৈব শক্তিকে তিনি তাঁর রক্তপ্রবাহের মধ্যে অহরহ অনুভব করেন। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তিনি কখনও সূর্যস্তোত্র আবৃত্তি করেন না, কিন্তু অসীম শূন্যতার মধ্যে দিয়ে পথ করে প্রভাতের যে সূর্য[illegible] তাঁর দেহে এসে পড়ে তা অনুভব করে তিনি বিস্মিত হন। সারা দিন ধরেই সেই কিরণরেখাগুলো তাঁর মনের মধ্যে চলাফেরা করে। যত দিন যায় তিনি ধীরে ধীরে আরও ধীর স্থির হতে থাকেন।

তাঁর স্ত্রী অনুপমা দেবী অবশ্য অন্য কথা বলেন। —লোকটা অত্যন্ত চাপা, একগুঁয়ে, স্বার্থপর—এসব মানুষ নিয়ে ঘর করার যে কী জ্বালা, তা যে ঘর করে সেই বোঝে।

সুখেন্দুবাবুর বিয়ে হয়েছিল তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে। এখন তাঁর বয়স সাতান্ন। বত্রিশ বছর ধরে অনুপমা দেবী ঘর করছেন স্বামীর সংগে, তবু তাঁর মনের তল পাননি আজও। মাঝে-মধ্যে মানুষটার কথা ভাবলে অবাকই লাগে অনুপমা দেবীর।

এক-আধ দিন ভোর বেলা ব্রাহ্ম মুহূর্তে খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন স্বামীর পেছনে। ভেবেছেন উনিও বোধ হয় চান সূর্য হতে। উনি থাকবেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনেক দূরে, আর ওঁর কিরণ পড়বে সর্বত্র। যৌবন পার হয়ে কলকাতার বাড়িতে প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন সুখেন্দুবাবু—এমন হলে বেশ হয়, তোমাদের মোটামুটি গুছিয়ে দিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে থাকি। আমি সংসারের মধ্যে থাকলে তোমাদের গায়ে আমার উত্তাপ লাগবে, তা ভাল নয়। দূরে গেলে আলো পাবে, সেই আলোতে পথ দেখা যায়।

দূরে যাওয়া হয়নি তাঁর, বরং ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছেন সংসারে। আর যতই জড়িয়ে পড়েছেন, 'জট' খোলার আনন্দে ততই মেতেছেন নিজের মধ্যে। হৃদয়টিকে বার বার আঘাত থেকে বাঁচিয়েছেন। যতবারই জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, ততবারই সেই দৈবশক্তিকে স্মরণ করে ভেবেছেন—আমার জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, তা একান্তভাবে মংগলের জন্যই।

জীবনে সুখেন্দুবাবু অর্থোপার্জন তেমন করতে পারেননি, কিন্তু আশাতিরিক্ত সঞ্চয় করেছেন। অবশ্য তিনি একথা জানেন এই সঞ্চয়টুকুর পেছনে তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়ের অবদান অনেকখানি। এরা সকলে উড়োনচণ্ডী মার্কা হলে তিনি একা কী করতে পারতেন! যদিও এইটাই তাঁর ভাবনা, তবু বিশ্বাস তাঁর অন্য ধরনের—তাঁর সন্তান এবং স্ত্রী উড়োনচণ্ডীমার্কা হতেই পারে না।

সাত বছর আগে কলকাতার বাসাতেই সুখেন্দুবাবু বিয়ে দিয়েছেন বড় মেয়ে সুমিতার অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে। দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন অনুপমা দেবী। সুমিতারও তখন জীবন-মরণ সমস্যা। একদিকে স্ত্রী অন্য দিকে মেয়ে—দু'জনাকে আগলেছেন দু' হাতে। এখন ভাবলে কেমন যেন অবাক লাগে। অন্ধকারের মধ্যে দূরের একটি আলোকবিন্দুর মত সমস্যাটাকে আগে-ভাগেই দেখতে পেয়ে সজাগ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে। সংগে সংগে এই বিশ্বাসটাও আরও বদ্ধমূল হয়ে তাঁর মধ্যে বসে যাচ্ছিল—জীবনে যা কিছু ঘটুক না কেন, তা নিশ্চয়ই মংগলের জন্যেই।

সুমিতা এম এ পাশ করে বসে আছে তখন। অন্যান্য মেয়েদের থেকে তার তফাতটা এক নজরেই ধরা পড়ে। বাপের মত শান্তশিষ্ট কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন প্রচণ্ড অহংকারী। সুখেন্দুবাবুর যত ভয় ওই অহংকারকেই। অহংকারই সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় মানুষকে। তিনি বুঝতে পারছিলেন সুমিতা অহংকারের বশেই সাপের ফণার সামনে বুক মেলে ধরেছে এই বিশ্বাসে—আমি বুক না পাতলে দংশনের আনন্দ বিষধর পাবে কী করে!

অনুপমা দেবী, তাঁর বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে, সাবধান করে দিয়েছিলেন স্বামীকে। —ছেলেমেয়েদের তুমি কিছু বল না, আশকারা পেতে পেতে শেখে না কোন দিন—

হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেছিলেন সুখেন্দুবাবু—কেন কি হল?

—সব কথা তুমি উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু আমি পারি না। জান, সুমি আজকাল কত রাত করে বাড়ি ফেরে?

—জানি। আর শুধু জানিই না, আমার কাছে সব লেখা আছে।
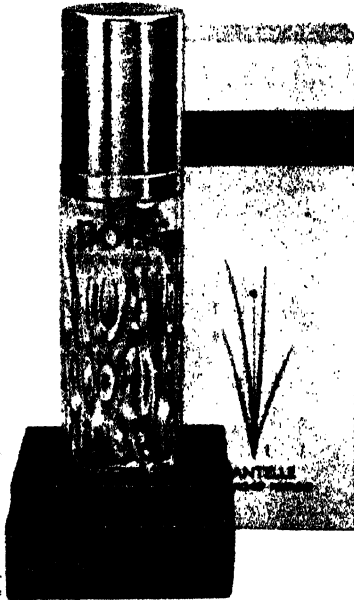
শোন, গত মাসের তিন তারিখে রাত এগারোটা দশ। চোদ্দ তারিখে দশটা পঁচিশ, পনের তারিখে সাড়ে এগারোটা।

একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বললেন—ও মাসে একটা দিনই বড্ড দেরী করেছিল সুমি। সাড়ে বারটার পর ফিরেছে। সাতাশ তারিখে।

কোনও কথা বলতে পারলেন না অনুপমা দেবী। এই প্রথম না হলেও আজ যেন তিনি বিশেষভাবে স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন—তাঁর স্বামী সকলের অজান্তে সংসারের সব কিছু দেখে রাখেন, অথচ মুখে কিছু বলেন না। একটু সরে গিয়ে স্বামীর খুব কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলেন অনুপমা দেবী—ও খাতায় আমার নামে কি লিখে রেখেছ শুনি?

আলমারীতে 'ডায়রী'টা রাখতে রাখতে বললেন—তোমার সম্বন্ধে কি আর লিখব বল, অনু! তোমাকে তো আমি বুঝতে পারি, কিন্তু সুমি—দীপু—শুনুকে আমি ঠিক ধরতে পারি না। আসলে কি জান, আমার-তোমার মত করে যদি এদের বুঝতে চাই তাহলে বড় ভুল করা হয়। এদের মত করে এদের চিনে নিতে হবে, তা না হলেই গণ্ডগোল। দেখছ না, দিনকাল কত তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছে!

স্বামীর দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আশংকিত হয়ে অনুপমা দেবী জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তাহলে ছেলেটাকেও দেখেছ নিশ্চই। জানলার ফাঁকটুকু দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন সুখেন্দুবাবু। —হ্যাঁ, তা দেখেছি। —কেমন দেখতে? আলাপ করেছো?

—না। একটু থামলেন। —মুখ দেখলে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

স্বামীর মুখের ওপর যন্ত্রণার ছায়া দেখে পিছিয়ে এলেন অনুপমা দেবী। ভীত হয়েও ভীত হননি—এই রকম একটা ভাব নিয়ে অনুযোগ করলেন—এখন বোঝ। আরও আশকারা দাও না ছেলেমেয়েদের। কতদিন বলেছি তোমায়, আমাকে তো মানুষ বলেই গণ্য কর না, এখন সামলাও। মুখ দেখাতে পারব না কারুর কাছে, আমি গলায় দড়ি দেব।

উত্তেজিত হয়ে পড়া আদৌ পছন্দ করেন না সুখেন্দুবাবু। তবু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন অনুপমা দেবী। স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে থামলেন। এগিয়ে এলেন, মনে মনে স্বামীকে বুঝে নিয়ে বললেন—একটা ভাল সম্বন্ধ দেখে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর। দু দিন বাদে ভুল বুঝতে পারবে, চুকে-বুকে যাবে সব।

সুখেন্দুবাবু কোনও কথা বললেন না প্রথমে। স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে, ছোট্ট ছেলেমেয়েদের যেমন মানুষ বোঝায় তেমন করে, বললেন—তুমি রাগ করো না, অনু। সুমি যা করবে, ভেবে-চিন্তেই করবে। ও তো বড় হয়েছে। তুমি ওর ভালর জন্যে যেমন চিন্তা করছ, ও-ও তেমনি আমাদের কথাও ভাবছে।

অনুপমা দেবী কেঁদে ফেললেন। পাঞ্জাবি দিয়ে স্ত্রীর চোখ মুছে দিলেন সুখেন্দুবাবু। কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অনুপমা দেবী। দাঁড়িয়ে রইলেন চুপটি করে সুখেন্দুবাবু। তাঁর যেন মনে হল সুমিই বুঝি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নানানভাবে পরবর্তী ঘটনাগুলো নিজের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে সুখেন্দুবাবু প্রস্তুত হয়েছিলেন সুমির জন্যে। সমস্যা যেমন ভাবে যে দিক থেকেই আসুক না কেন তিনি তার সমাধান করবেন স্থিরভাবে—এই রকম একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে রইল তাঁর মধ্যে। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আবার আপিস যেতে লাগলেন, পড়া-শুনোয় মন দিলেন এবং বন্ধুদের সংগে তাস খেলতে শুরু করে দিলেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পূব-মুখো দাঁড়িয়ে সূর্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমনভাবে হয়, সেইভাবেই, আত্মীয়স্বজনদের ফিসফিসানি এবং সুমিতা ও তার মার কত কান্নাকাটির মধ্যে দিয়ে সুমির বিয়ে হয়ে গেল সেই ছেলেটার সংগে। পুরোহিতের সংগে উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করে সুখেন্দুবাবু কন্যা-সম্প্রদান করলেন। কাকপক্ষীও জানতে পারল না—এই বিয়েতে সুখেন্দুবাবু আনন্দিত না দুঃখিত। শুধু সুমিই হাড়ে হাড়ে টের পেল এই ঘটনার চাকা তার বাবার মনের ওপর চিরস্থায়ী কী গভীর দাগ কেটে দিল!

জানি না সুমির এই বিয়ের ঘটনা থেকে তিনি কোন মংগলকে প্রত্যক্ষ করলেন। তবে এ কথা ঠিক তিনি আর একটু সাবধান হতে শিখলেন। যেমনভাবে এতদিন তিনি পা ফেলে আসছিলেন, ঠিক তেমন আর নয়, একটু অন্য রকম করে তাঁকে এবার পা ফেলতে হবে—এইটা ঠিক করে নিয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন—কলকাতার একটু দূরে আশপাশে একটা বাড়ি কিনলে কেমন হয়? এ কথায় অনুপমা দেবী এটাই অনুমান করলেন—মেয়ে তাঁকে যে দুঃখ দিয়েছে, সেই যন্ত্রণা ভোলবার জন্য তিনি অধিকতর শান্ত পরিবেশে আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি হ্যাঁও বললেন না, নাও বললেন না তবে ভুল বুঝলেন। সুখেন্দুবাবু ভবিষ্যতের অন্য একটি সমস্যার ছবি যে আবছা দেখতে পাচ্ছেন—তা বুঝতে পারলেন না অনুপমা দেবী।

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সংগে পরামর্শ না করেই সঞ্চিত অর্থে কলকাতা থেকে একটু দূরে মধ্যমগ্রামে ছোট একটি বাড়ি কিনলেন। আজ থেকে ন' বছর আগে দীপুর বয়স তখন আঠারো, শুনুর ষোল। ওরা দুজন কলকাতায় যেমন পড়ছিল তেমনি পড়তে লাগল। দীপু কলেজে, শুনু স্কুলে। বুড়ো বয়সে একটু বেশ চলাফেরা করলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে—অনুপমা দেবীকে এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি আপিস করতে লাগলেন এখান থেকে একটু বেশী কষ্ট করেই।

সুমি যাকে বিয়ে করেছে, সেই ছেলেটিকে প্রথম দিন দেখেই সুখেন্দুবাবু আশংকিত হয়েছিলেন এই ভেবে নয় যে এই রকম একটা ছেলে যে তাঁর মনের মত নয়, তাকেই জামাই বলে মেনে নিতে হবে। এই ছেলেটাকে দেখে তিনি প্রথ...

... দীপু শুনু যখন আরও ব...

দশের ছেলেমেয়েদের চেহারা, চালচলন, ভাবনা-চিন্তা কী রকম হবে। সুখেন্দুবাবু এই রকমটাকে মেনে নিতে পারেন না। তিনি জানেন এই মুহূর্তের চেহারার সঙ্গে পর-মুহূর্তের চেহারার কোন মিল নেই। সময়কে আঁকড়ে ধরে রাখা যায় না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলতে হয়, পরিবর্তনকে মেনে নিতে হয় নতুবা এ ভীষণ খেলায় জীবন হারিয়ে দেয় মানুষকে। কিন্তু পরিবর্তনটা এতই দ্রুত ঘটছে, তিনি যেন আর তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না, বার বার পিছিয়ে পড়ছেন। সময় তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তিনি স্বীকার করে নিচ্ছিলেন—এটা তাঁর ত্রুটি এবং বুঝতে পারছিলেন—সংশোধনের আশু প্রয়োজন।

সুখেন্দুবাবু জানেন জীবন সমুদ্রের মত, ঢেউয়ের মত সময়। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসবে নিয়মমাফিক আটকানো যাবে না। দুটি বিন্দু জলকণার মত দীপু-শুনুকে করতলে রেখে আজীবন বাঁচাতে পারবেন না তিনি। বাঁচতে হবে তাদের নিজেদেরই। তিনি একান্তভাবে চাইছিলেন ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকুক তাঁর সন্তান। কিন্তু যে সময়টাকে তিনি কল্পনা করছিলেন, বুঝতে পারছিলেন, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হলে বড় দাপটের সঙ্গে সাঁতার দিতে হবে। তাই তিনি আরও একটু সময় পেতে চাইছিলেন যাতে ওরা আরও খানিকটা সময় পায় নিজেদের তৈরি করে নিতে। জল বাদ দিয়ে সাঁতার শেখা যায়—অবুঝের মত এ কথা তিনি কখনও ভাবেননি।

সেই ভেবে তিনি কলকাতা ছেড়েছেন, যাতে দীপু-শুনু প্রত্যক্ষ করতে পারে একই সময়ে কলকাতার চলন এবং এই একটু দূরে মধ্যমগ্রাম বা আরও দূরের অন্য কোন স্থানের চলন ঠিক এক কায়দার নয়। তফাতটা যেন ওরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারে। কলকাতার ঢেউ এখানে এসে পৌঁছোতে একটু তো সময় নেবে, আর সেই সময়টুকুর মধ্যে ওরা প্রস্তুত হয়ে নিক—এমনটাই চেয়েছিলেন সুখেন্দুবাবু।

সময় পালটাতে লাগল। অতি দ্রুত। দীপু-শুনুর চেহারাও পালটাতে লাগল। সময়ের তালে তালে। সুখেন্দুবাবু ভীত হলেন না, কারণ তিনি যেমন ভেবেছিলেন সেইভাবেই ঘটনা ঘটতে লাগল। তিনি তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত! ব্যাপারটা ঠিক এই রকমই দাঁড়াল—উত্তাল ঢেউয়ের মুখোমুখি দীপু-শুনু সাঁতরাচ্ছে আর তাদের রক্ষাগুরু সুখেন্দুবাবু, তাদের বাবা, হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে তা দেখছেন। তাঁর ভাবটা যেন এই—ওদের মারে কে? যা শিখিয়েছি এবং যা শিখেছে তাতে মরে গেলেও ওরা ডুববে না। আর এদিকে তীরের ওপর শুধুমাত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনুপমা দেবী—ওদের মা। যেন কিছুই দেখছেন না তিনি, অথবা সবই দেখছেন, বুঝতে পারছেন না কিছুই।

ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল হিমালয়ের সেই পাদদেশ থেকে সুদূর বিহার পর্যন্ত। উদ্দাম ভীষণ জলপ্রবাহ থেকে কিছুতেই দুটি বিন্দুকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলেন না সুখেন্দুবাবু। ইচ্ছেও তাঁর তেমন ছিল না।

স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি সব প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানান জনের মুখে মুখে মৃত্যুর খবর আসতে লাগল। সন্ধ্যে হতে না হতেই মানুষজন যে যার আস্তানায় প্রাণ বাঁচাতে ফিরে আসা শুরু করল। তাতেও বাঁচল না প্রাণ! মার চোখের সামনে ছেলের পেটে, স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীর বুকে চু-কিৎ-কিৎ খেলার মত ছুরি বিঁধল। রাস্তাঘাটে আলো জ্বলে না। দিন দুপুরে এদিক সেদিক বিকট আতস বাজির শব্দ ফেটে পড়ে। মানুষের হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে। ভীত-সন্ত্রস্ত পথচারী প্রাণের ভয়ে এদিক থেকে সেদিক ছুটে পালায়। কেউ কেউ বুক-পেট চেপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রক্তের দাগ মুছে যায় মুহূর্তে। মৃতদেহের সামনে নিথর দাঁড়িয়ে বাবা-মা তাদের সন্তানের মরা-মুখ না-চেনার ভান করে। চিনলেই সর্বনাশ। কাঁদলেই সর্বনাশ। অন্ধকারের নিস্তব্ধতা চিরে গোঁ গোঁ করে পুলিসের গাড়ি ছোটে!

অনুপমা দেবী রাস্তার দিকের বারান্দায় বসে বসে চোখের জল ফেলেন। সুখেন্দুবাবু অন্ধকারে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। বড় রাস্তা, রেল লাইনের আশ-পাশ, পাড়ার ছেলেদের ক্লাব ঘুরে বুঝে-সুঝে দু'-একজনকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন বাড়িতে। ডুকরে কেঁদে ওঠেন অনুপমা দেবী। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করেন সুখেন্দুবাবু। কিন্তু তিনি নিজে বিচলিত হন না। দ্রুত পালটে যাওয়া সময়টাকে তিনি শুধু বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। দীপু-শুনুই শুধু নয় দেশের আরও কত কত ছেলে মরণপণ করে দল-বেঁধে দাঁড়িয়েছে আজ একত্রে নিশ্চয়ই কোন না কোন মঙ্গলের জন্য। সুখেন্দুবাবু বুঝতে পারছেন না তাদের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথটা ঠিক না ভুল, অথবা এর মধ্যে রাজনীতির কোন গভীর চাল আছে কি না। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার তো কোন উপায় নেই যে সময় বড় দ্রুত পালটাচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন কোন ঘটনাই ফেলনা নয়। প্রত্যেক ঘটনা থেকে একটা না একটা মঙ্গল বেরিয়ে আসে। তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে—এত যে রক্তের দাগ পড়ছে ধরিত্রীর বুকের ওপর সে কি মিছিমিছিই? নিশ্চয়ই কোন না কোন একটা মঙ্গল লুকিয়ে আছে এর মধ্যে। কি সেটা? তিনি খুঁজতে থাকেন।

সে দিন রাত তখন দুটো, কি একটু বেশী। সুখেন্দুবাবুর দরজার কড়া নড়ে উঠল। স্বামী-স্ত্রী চমকে উঠলেন। নির্ভয়ে দরজা খুললেন সুখেন্দুবাবু। তাঁর সামনে দীপুর বয়সী একটি ছেলে। তার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটি দীপু-শুনুর খবর দিতে এসেছে, ভাল-মন্দ যে কোন খবর। তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন—এস ভেতরে এস। কি নাম তোমার?

—না, ভেতরে যাব না। আমার নাম পবিত্র সরকার।

সুখেন্দুবাবুর বড় ভাল লাগল ছেলেটির মৃদু অথচ স্থির কণ্ঠস্বরটি। ঠিক দীপুর মত।

—দীপু-শুনু কেমন আছে? কেঁদে ফেললেন অনুপমা দেবী।

—কাঁদবেন না মাসীমা। ওরা ভাল আছে। আজই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে দীপুর। ও এখন লুকিয়ে আছে। পুলিস খুঁজছে ওকে। শুনুকে কলকাতার বাইরে পাঠানো হয়েছে।

অনুপমা দেবী অধীর হয়ে উঠলেন। —কোথায়, কোথায় শুনু? কোথায় দীপু?

—তা আপনাকে বলব না, মাসীমা। আচ্ছা আমি যাই।

ছেলেটিকে দেখে সুখেন্দুবাবুর মনে হল অনেকদিন ভাল করে খেতে পায়নি ও। শুকিয়ে যাওয়া বিষণ্ণ মুখ। জিজ্ঞেস করলেন—কিছু খেয়ে নেবে?

—না। সময় নেই। আমি যে এখানে এসেছিলুম কেউ যেন তা জানতে না পারে। পুলিস এলে বুঝে সুঝে কথা বলবেন।

ছেলেটি আর দাঁড়ায় নি। অন্ধকারে মিশে গিয়েছিল।

পরের দিন সকালে বড় রাস্তার পুর দিকে লিচুবাগানে পবিত্র সরকারের লাশ পাওয়া গেল। সুখেন্দুবাবু খবরটা শুনলেন বাজার যাবার সময়। ছেলেটার কাছে নাকি দুটো পিস্তল ছিল। কেউ বলল—পুলিশ মেরেছে, কেউ কেউ আবার রাজ-নৈতিক দু-একটা দলের নাম করতে লাগল। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বোঝা মুশকিল। খবরটা শুনে সুখেন্দুবাবুর বড় ইচ্ছে করছিল ছেলেটাকে একবার শেষ-দেখা দেখে আসতে। তখনও তাঁর কানে ছেলেটির মৃদু অথচ স্থির কণ্ঠস্বরটি বাজছিল। ঝামেলার ভয়ে বড় রাস্তার পুবমুখো হবার সাহস পেলেন না তিনি।

দীপু-শুনুর খবরে তাঁর হালকা মনটা ঘণ্টা পাঁচেক পরে আবার ভারী হয়ে উঠল। দ্রুত পালটে যাওয়া সময়টাকে তিনি যেন কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। তিনি তাঁর শক্ত মনটাকে আরও কঠিন করে বেঁধে নিলেন।

ইতিমধ্যে মধ্যমগ্রামের সকলে জেনে গেছে—দীপু-শুনু নকশাল হয়ে গেছে। তারা বাড়িতে আসে না। আর এই সুখেন্দু দত্ত তাদের বাবা। চলতে ফিরতে কিছু ফিসফিসানী কথা তাঁর কানেও আসে, তিনি আমল দেন না। সারা দিনরাত তিনি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলাফেরা করেন, স্ত্রীকে এটা-সেটা বোঝান। শুধুমাত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্যের কিরণ তাঁর দেহে এসে পড়লে তিনি যেন একটু শান্ত হন।

মনে আছে সুখেন্দুবাবুর, সেদিন মঙ্গলবার। আপিস যাবেন, বাসের জন্যে

অপেক্ষা করছেন বড় রাস্তার ধারে। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল তুতু, নবীন পল্লীর মনোজ রায়ের মেয়ে, মাঠ ভেঙে ছুটে আসছে রাস্তার দিকে। মেয়েটা রাস্তা পার হয়ে সুখেন্দুবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বুকটা কেঁপে উঠল সুখেন্দুবাবুর। তিনি যে পরিষ্কার দেখতে পেলেন ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে দীপু-শুনু একেবারে ডুবে গেল। তিনি এগিয়ে গিয়ে তুতুর মাথায় হাত রাখলেন।

—কি হয়েছে রে?

তুতু শুনুর থেকে বছর কয়েকের ছোট। অল্প বয়স, গুছিয়ে কিছু বলতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলল তাদের বাড়ির সামনে রেল লাইনের ধারে দীপুদা পড়ে রয়েছে।

জীবনে এই প্রথম সুখেন্দুবাবুর পা কাঁপল। চোখ দুটো ঝাপসা মনে হল তাঁর। হাতের ছাতাটার ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। অনুপমা দেবীর মুখটা মনে পড়ল একবার। তুতুকে জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের বাড়ি গিয়েছিলি? কথা বলতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে পড়েছে, কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছে। তুতু মাথা নেড়ে জানালো, সে মাসীমাকে খবর দেয় নি।

তুতুর একটা হাত টেনে নিলেন তিনি। আর এক হাতে ছাতায় ভর দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এবড়ো-খেবড়ো নাবাল জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন রেল লাইনের দিকে। পেছন থেকে রোদ এসে তাঁর পিঠ তাতিয়ে দিচ্ছিল। তিনি হয় ছাতা খুলতে ভুলে গেলেন, নয় নিজের পায়ের ওপর ভরসা করতে পারছিলেন না।

দীপুর কথা তিনি ভাবছেন না এখন। দীপুর মুখটাও সঠিক মনে পড়ছে না। মনে মনে শুনুকেই তিনি আশপাশে খুঁজতে লাগলেন। স্বামীর কথাও তাঁর মনে পড়ল। মেয়েটাকে তিনি কাছে পেতে চাইছিলেন।

হাত তুলে দেখালো—মাঠের মধ্যে আধা-তৈরী একটা কোঠা বাড়ির সামনে অনেক মানুষজন। তিনি এগিয়ে গিয়ে দীপুর কাছটায় দাঁড়ালেন। যে সূর্যের স্নিগ্ধ কিরণ তাঁর দেহে এসে পড়ে প্রতিদিন ভোরবেলা সেই সূর্যের তেজী রোদ দীপুর সারা গায়ের ওপর এসে পড়ছে আজ। দীপু শুয়ে আছে। সন্তানের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তে যে মাটি ভিজে উঠেছে তার ওপর পা রেখে জন্মদাতা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না। সরে এলেন সুখেন্দুবাবু। তারপর আর কিছু মনে নেই তাঁর।

কারা কারা এল, কে কি বলল, কি কি হল—এসব তিনি আর স্পষ্ট মনে করতে পারেন না এখন, আজ থেকে চার বছর আগেকার ঘটনা। শুধু মনে আছে সেই ছাতাটা মাঠের কোথায় যেন ভুলে ফেলে এসেছিলেন। বার বছর ছাতাটা ব্যবহার করেছেন একটানা। ছাতাটা কখন তাঁর হাতছাড়া হয়েছিল মনে পড়ে না তাঁর।

গত বছর রিটায়ার করেছেন সুখেন্দুবাবু। তার আগের বছর একদিন মর্যাঁর রাত্রে অনুপমা দেবী মারা গেছেন। সে কথাও তাঁর ভাল মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে আছে অনুপমা মারা যাবার পরের দিন তুতুর মা এসেছিলেন ঠাকুরের প্রসাদী ফুল নিয়ে অনুপমার মাথায় ছোঁয়াতে।

তাঁর এখনও বিশ্বাস জগতের কোন ঘটনাই ফেলনা নয়। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে কোন না কোন একটা মঙ্গল লুকিয়ে আছে।

গত দু বছর সংসারে তিনি একা। সুমি চেয়েছিল তার বাবাকে তার সংসারে নিয়ে যেতে, তিনি রাজি হননি। দু বেলা দু মুঠো নিজের হাতে সেদ্ধ করে তিনি দিন চালাচ্ছেন। প্রাত্যহিক অভ্যাসগুলো বরাবরের মত এখনও আছে। বই পড়া, ডায়রী লেখা, ব্রাহ্মমুহূর্তে ছাদে গিয়ে সূর্যের জন্য অপেক্ষা করা, বিকেল বেলা বেড়ানো, পরিচিত কারুর সংগে দেখা হলে হেসে একটু কথা বলা— সবই।

গতকাল বিকেলে বেড়িয়ে এসে তিনি দেখতে পেলেন লেটার বক্সে একটা চিঠি পড়ে আছে। সুমি ইদানীং ঘন ঘন চিঠি লেখে, ভাবলেন সুমির চিঠি। চিঠিটা বার করে বিকেলের অল্প আলোতে পড়লেন—'শ্রীচরণকমলেষু বাবা, আমি ভাল আছি। শুক্রবার বাড়ি পেঁছোবো। তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি শুনু।'

দু হাত কেঁপে উঠল, কাঁপা হাতে ঘাম জমতে শুরু করল। ঘরে ঢুকে আলো জেলে আবার পড়লেন চিঠিটা। শুনুর কলেজের খাতা খুলে ভাল করে মিলিয়ে নিলেন হাতের লেখাটা। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন—আজ বৃহস্পতিবার। ঠিক করতে পারলেন না কাল শুক্রবার না পরের শুক্রবার। 'ডেট' দেয়নি কেন? তাঁর মনে হল, তিনি হলে শুক্রবারের পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে তারিখ লিখতে ভুল করতেন না।

গতকাল রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। বার বার ঘুম ভাঙছিল, শেষের দিকে ঘুম আর এলই না। প্রতিদিনের মত অন্ধকারে আজ হয়তো একটু আগেই, স্নান সেরে ছাদে উঠে পুব-মুখ করে দাঁড়ালেন তিনি। বুঝতে পারলেন আজ তাঁকে সূর্যোদয়ের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। পায়চারী করলেন ক'বার, আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। সারা পুব আকাশে যে দিকেই তিনি দৃষ্টি ফেরান, শুনুর মুখটা দেখতে পান। অনুপমা দেবী পাশে এসে দাঁড়ান, সুমির কান্না শুনতে পান, নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে তিনি স্পষ্ট শুনতে পান দীপুর গোঙানির আওয়াজ। বার বার এই রকম হতেই তিনি অধীর হয়ে সূর্যোদয়ের আগেই নিচে নেমে আলমারি খুললেন। হিসেব করে দীপুর একটা পাজামা, একটা শার্ট একটা গেঞ্জি বার করে খাটের ওপর সাজিয়ে রাখলেন। তখন সূর্য উঠেছে। রান্নাঘরে গেলেন, বাজারের থলিটা বারান্দায় হাতের কাছে রাখলেন।

সুখেন্দুবাবু বুঝতে পারছিলেন, তিনি চঞ্চল, অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। নিজের মত একটু চা করে মুড়ির বাটি আর চায়ের কাপটা নিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় বসলেন।

রাস্তা থেকে তিনি কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছেন না। চা খেয়ে মুড়ির বাটি, কাপ-প্লেট ভেতরে রেখে এসে, আবার ইজিচেয়ারে বসলেন। গয়লা এল। প্রতিদিন তিনি এক পোয়া করে দুধ রাখেন, আর এক সের রাখলেন। তারপর ঝি এল।

ঘর-দোর পরিষ্কার করে বাসন-পত্তর মেজে যখন সে চলে যাচ্ছে তখন জিজ্ঞেস করলেন—তুমি একটা কাজ করে দিতে পারবে? বাজার থেকে একটু মাছ এনে দিতে পারবে? টাকা আর থলি হাতে দিয়ে বললেন—যদি পাও মাগুর মাছ নিও, একটা কাঁচকলা নিও আর যা হয় পাও নিও।

নিজেই তিনি বাজার যান দু-একদিন অন্তর। আজ বাড়ি ছাড়তে কিছুতেই তাঁর মন চাইছে না। এদিক-সেদিক তিনি বাথরুমে গেলেন। বেরিয়ে এসে আবার ইজিচেয়ারে বসলেন। আবার উঠলেন রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এলেন দুধটুকু ঢাকা দিয়েছেন কিনা।

ঝি বাজার রেখে চলে গেল। কী এনেছে তা দেখতে তিনি ভুলে গেলেন। বাইরের বারান্দায় এসে দেখলেন কাগজ দিয়ে গেছে। কাগজটা পড়তে গেলেন, চোখ রাখতে পারলেন না। কাগজ ফেলে উনুন ধরালেন।

রান্নাঘর থেকে থলিটা এনে বাজারটা ঢালতেই রকের ওপর আড়াআড়ি বড় একটা ছায়া চোখে পড়ল তাঁর। মুখ তুলে দেখেন, শুনু উঠোনে দাঁড়িয়ে। কথা বলতে পারলেন না। কয়েকটা আলু গড়িয়ে গেল এদিক-ওদিক। দুটো মাগুর মাছ লাফিয়ে উঠোনে পড়ল। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রকে উঠে এসে শুনু তার বাবাকে প্রণাম করল। ওঁর মনে হল শুনু যেন মাথায় একটু লম্বা হয়েছে, স্বাস্থ্যও যেন আগের চেয়ে ভাল তবে গায়ের রঙটা যেন আগের চেয়ে একটু ময়লা হয়েছে।

আলুগুলো কুড়োতে কুড়োতে জিজ্ঞেস করলেন—চা খাবি? মুড়ি আছে।
[illegible] আমি চা

জলের সাথ, [illegible]
এসে বললেন—দেখ তো দীপুর পাজামা-শার্ট তোর হয় কিনা। ওগুলো ছেড়ে ফেল, বড্ড ময়লা হয়েছে।

শুনু আড় চোখে একবার বাবার দিকে তাকালো। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। সুখেন্দুবাবু পাজামা-শার্টটা বারান্দায় দড়ির ওপর রেখে আবার শোবার ঘরে ঢুকলেন।

চায়ে চুমুক দিতেই শুনু জিজ্ঞেস করল—ঠিক আছে?

—ঠিকই আছে, তবে তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম চিনি আজকাল খুব কম খাই। তারপর একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যারে, তুই যে এলি, তোকে কেউ দেখতে পেয়েছে? শুনুর যেন কথাটা তেমন পছন্দ হল না। বিরক্ত হয়ে বলল—দেখলেই বা। আমার কি? ও সব তুমি ভেবো না।

চা খেয়ে সুখেন্দুবাবু রান্নাঘরের দিকে এগুতেই শুনু বলল—তুমি রেঁধো না, আজ আমি রাঁধব। আমি অনেক রান্না শিখেছি।

কোন কথা না বলে সুখেন্দুবাবু কাগজটা নিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন। শুনুকে অনেক কথাই তাঁর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। সে কোথায় কোথায় কেমন ছিল, কি কি করল এতদিন। তাঁর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে দীপুর কথা, অনুপমার কথা। কিন্তু মুখে কোন প্রশ্নই আনতে পারছেন না। কিছুতেই তিনি বুঝতে পারছেন না শুনুকে। আন্দাজ করতে পারছেন না—কেমন প্রশ্ন করা উচিত বা কি প্রশ্ন করলে কি উত্তর আসবে শুনুর মুখে। নিজের সন্তান অথচ মনে হচ্ছে নাগালের কত বাইরে।

শুনুর হাতের রান্না খেয়ে আজ বড় তৃপ্ত হলেন। বললেন—তুই একটু রেস্ট নে। আজ বেরোস নি কোথাও।

মনটা তাঁর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। কোন চিন্তাই সুস্থির হয়ে মাথায় দাঁড়াচ্ছে না। দুপুর বেলা কখনও শোন না, আজ বাধ্য হয়েই যেন শুতে গেলেন।

তন্দ্রামত এসেছিল। শুনুর কথা মনে হতেই ধড়ফড় করে উঠে ও ঘরে মুখ বাড়ালেন। শুনু নেই। চিন্তিত হয়ে একবার ডাকতে গেলেন, অন্য কেউ যদি শুনতে পায়—এই ভয়ে ডাকলেন না। ওপরে উঠে ছাদের ঘরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেন শুনু ঘুমোচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত হলেন।

নিচে নামছেন, মুখোমুখি পড়ল তুতু। তার হাতে কি যেন একটা রয়েছে, বোঝা গেল না। লজ্জায় অবনত হয়ে বলল—মা পাঠিয়ে দিল, ঠাকুরের প্রসাদ।

সুখেন্দুবাবু বুঝলেন শুনু আসার সময় তুতুদের বাড়ি হয়ে এসেছে। বললেন—ওপরে যা, বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

তুতু তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে, ডাকলেন তাকে। —শোন তুতু, আমি একটু বেরুচ্ছি। আমি না ফেরা পর্যন্ত তুই যাস না। আর ও যদি বেরোতে চায় বলিস, আমি এলে তবে যেন যায়। আর শোন যদি খেতে চায় একটু চা করে দিস, চা-চিনি সব এক জায়গায় করা আছে রান্নাঘরে।

তুতু ওপরে উঠে গেল। জামাকাপড় পালটে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন তিনি। রাস্তায় যতবারই পরিচিত কারুর মুখোমুখি হন, ততবারই আশংকিত হন—এই বুঝি বলে বসে, শুনলুম শুনু নাকি বাড়ি ফিরেছে। এ এলাকায় অনেকেরই যে ধারণা—শুনু বেঁচে নেই, দীপুর মত সেও আঘাটায় মরেছে—এমন আলাপ-আলোচনা অনেকবার তাঁর কানে এসেছে। তিনি বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই করেন নি। শুধু অপেক্ষা করছিলেন।

আজ যেন তিনি দেহে অনেকটা শক্তি ফিরে পেয়েছেন। দ্রুত মাঠ পার হয়ে তিনি রেল লাইনে উঠে ওপারে নামলেন। চেয়ে দেখলেন মাঠের মধ্যে আধা-তৈরী সেই বাড়িটা এখনও তেমনি আছে। চারিদিকে ছোট [illegible] আগাছা জমেছে কত। তিনি এগিয়ে গেলেন বাড়িটার কাছে। দীপুকে যেখানে তিনি পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, সেই আগাছা-ভর্তি জমিটুকুর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তখন সূর্য অস্ত যাবার সময় হয়ে এসেছে। চোখ দুটো তাঁর কর কর করে উঠল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। দীপুর যে কোন বয়সের একটা মুখ মনে করার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অনুপমা দেবীর মুখখানা সংগে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন

কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন চায়ের জিনিস-পত্তর যেমন সাজানো ছিল, তেমনি রয়েছে। তিনি এক পা এক পা করে ওপরে উঠলেন ছাদের ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে নজর যেতেই চোখ সরিয়ে তিনি আড়ালে দাঁড়ালেন।

তুতুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে শুনু। তুতুর এক পাশে ওর মা পাঠানো ঠাকুরের প্রসাদ।

তুতুর একটা হাত শুনুর একরাশ চুলের ভেতর। শুনলেন সুখেন্দুবাবু শুনু বলছে—তুমি দেখে নিও, আমি এর প্রতিশোধ নেব। দাদাকে, পবিত্রদাকে কা[illegible] মেরেছে আমি জানি। যেখানে দাদাকে পড়ে থাকতে তুমি দেখেছিলে ঠিক সেইখা[illegible] আমি ওদের দশটা লাশ ফেলব। এই দেখ—আমি আর ভয় পাই না দুনিয়ায় কাউকে সুখেন্দুবাবু দু কদম পিছিয়ে এসে দেখলেন শুনু হাত উঁচু করে তুতুকে [illegible] যেন একটা দেখাচ্ছে। এই কি পিস্তল? না কি রিভলবার? বুঝতে পারলেন ন[illegible]

তিনি আর দাঁড়ালেন না। পায়ে পায়ে নিচে নামতে লাগলেন। অনেক দি[illegible] পরে আবার আজ তাঁর মনে হল দিনকাল দ্রুত পালটে যাচ্ছে। তিনি পশ্চিমমুখে একটা সিঁড়িতে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। পশ্চি[illegible] আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্য ডুবে গেছে, লাল আভাটুকু ছড়িয়ে আ[illegible] খানিকটা জায়গায়। তিনি বড় বড় চোখ করে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝ[illegible] পারলেন যে রক্ত ছড়িয়ে সন্ধ্যায় সূর্যের অস্তযাত্রা সেই একই রক্ত ছড়িয়ে সূর্যে[illegible] উদয় হয় ভোরের ব্রাহ্ম মুহূর্তে। আজকের এই ক্ষণ সন্ধ্যেবেলা তিনি এ[illegible]

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একই টালিতে উৎকীর্ণ প্রাচীন রীতির সপরিবারে দুর্গা : বাসুদেব-মন্দির : বাঁশবেড়িয়া (হুগলী)

দুই বাংলায় পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত মন্দির-মসজিদের কোনো আদমশুমার কখনো হয়নি। সেজন্য তাদের সঠিক সংখ্যা কত তা বলা যায় না। তবে, গত কুড়ি বছর ধরে, এদের সন্ধানে আমি পশ্চিমবঙ্গের সব কটি জেলায় ছড়ানো প্রায় আড়াই হাজার গ্রামে গিয়েছি বলে, এ-সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করতে পারি। প্রথমত, এই বিশেষ সজ্জায় ভূষিত মসজিদ, সংখ্যার হিসাবে, মন্দিরের তুলনায় অনেক অনেক কম। দ্বিতীয়ত, আজকের বাংলাদেশ-এলাকা থেকে এ-সম্পদের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে রাঢ়-অঞ্চলে, বহুগুণে বেশী। (প্রসঙ্গত, সাবেক পূর্ববঙ্গ তুলনায় এ-বিষয়ে দীন হলেও, উভয় বাংলার শ্রেষ্ঠ 'টেরাকোটা'-দেবালয়টি কিন্তু দিনাজপুর শহরের মাইল বারো উত্তরে কান্তনগর গ্রামে অবস্থিত।) তৃতীয়ত, 'টেরাকোটা'-মন্দিরের সংখ্যা বাঁকুড়া জেলাতেই বুঝি সর্বাধিক - এই প্রচলিত ধারণাটি ভ্রান্ত। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় ও কেষ্টরায় (সাধারণে 'জোড়বাংলা'-মন্দির নামে পরিচিত) মন্দির দুটি যে পশ্চিমবাংলায় এ শ্রেণীর ইমারতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিছক সংখ্যার দিক থেকে, টেরাকোটা-মন্দিরের জেলাওয়ারি হিসাবে বাঁকুড়া অনেক পিছনে প্রথম মেদিনীপুর, দ্বিতীয় বর্ধমান, তৃতীয় হুগলী, চতুর্থ বীরভূম, পঞ্চম বাঁকুড়া। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলি এদের পরে। উত্তরবঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরে পোড়ামাটির সজ্জায় মণ্ডিত দু-চারটি মন্দির ছাড়া অন্য জেলাগুলিতে এ জাতীয় পুরাকীর্তি প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু মুসলমানী 'টেরাকোটা'-ইমারতের ক্ষেত্রে, গৌড়, পাণ্ডুয়া ও আদিনার দৌলতে, গোটা পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার স্থান শীর্ষে।

ধর্মীয় হর্ম্যের দেওয়াল ভূষিত করবার এই বিশেষ প্রকরণটি বাঙালী মনীষার এক অতুলনীয় কীর্তি। প্রাচীন ভারতের কয়েকটি কেন্দ্রে এ-শিল্পরীতিটির চর্চা হয়ে থাকলেও, তা বর্তমান শতক অবধি প্রায় একাদিক্রমে অনুশীলিত হয়ে আসবার দৃষ্টান্ত, বঙ্গদেশ ও উত্তর-পূর্ব ওড়িশার কিছু সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্যত্র বা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। সে কর্মকাণ্ডে দু-তিন শতাব্দীর সাময়িক একটু ছেদ পড়েছিল, মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের শুরুতে সে-রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বকালীন কিছু কিছু ইটের মন্দির অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষা পেয়ে বর্তমানের তীর অবধি ভেসে এসেছে, যাদের অঙ্গসজ্জায় পোড়ামাটির অলংকরণের ব্যবহার দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাঁকুড়ার বহুলাড়া ও সোনাতপল এবং পুরুলিয়ার দেউলঘাট-বড়ামের ইটের দেউলগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলিতে মূর্তি-ভাস্কর্য নেই বললেই চলে ; কিন্তু তাদের (বহুলাড়ারটি ছাড়া অন্যগুলি এখন পরিত্যক্ত) শিখর-দেশে ইটের নানাবিধ নকাশি-সজ্জার সমারোহ। আদিতে সেগুলি পঙ্খের পলস্তারায় আবৃত ছিল। কালক্রমে সে-আবরণ অনেকাংশে নষ্ট হওয়ায় নীচের 'টেরাকোটা'-অলংকরণ এখন স্পষ্ট দেখা যায়। এ-মন্দিরগুলির কয়েক শতক আগে নির্মিত পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ময়নামতী প্রভৃতি স্থানের ধর্মীয় সৌধে ব্যবহৃত পোড়ামাটির বহু মূর্তিফলক, পশুপক্ষীর অনুকৃতি ফুলকারি নকশা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি এই শিল্পকলার সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু বঙ্গদেশে মুসলিম-আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বের উল্লিখিত দেউলগুলি কেন যে মূর্তি-ভাস্কর্যরিক্ত তা অনুসন্ধানের বিষয়। সন্দেহ নেই, এ-জাতীয় পুরাকীর্তি সেকালে বহুসংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল। এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গসজ্জায় নকাশি-টালি ছাড়াও মূর্তি-ভাস্কর্যও হয়ত রূপায়িত হয়ে থাকবে। কিন্তু বাংলার আর্দ্র আবহাওয়ায়, সহজে বিনাশশীল ইটের উপকরণে প্রস্তুত হবার দরুন, মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাড়া সে পুরাকীর্তিগুলির আর সবই কালস্রোতে ভেসে গেছে। মূর্তি-ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মত যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে না থাকলেও একথা অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, পাহাড়পুরের কাল (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক) থেকে তেরো শতকের প্রারম্ভ অবধি ধর্মীয় সৌধে কোন-না-কোন রূপে পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যবহারের রীতিটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অনুসৃত হয়ে এসেছিল। পাহাড়পুরের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যগুলিতে যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, অতি দীর্ঘকালের পুরুষানুক্রমিক চর্চা ছাড়া তা একেবারেই অসম্ভব। সেজন্য বঙ্গদেশের এই একান্ত নিজস্ব কারুকলাটির উদ্ভব ও প্রথম প্রয়োগের সময় আরও দু-এক শতাব্দী পিছিয়ে দিলে ভ্রমের সম্ভাবনা কম।

সুদীর্ঘকাল অনুশীলিত এ অনুপম ভাস্কর্যপদ্ধতিটি মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পরবর্তী বেশ কিছুকাল প্রথমে থমকে দাঁড়াল, তারপর কার্যত অন্তর্হিত হল সাময়িকভাবে। বিধর্মী শাসককুলের অনুপ্রেরণায় মসজিদে বা মোসলেম স্মৃতিসৌধে পোড়ামাটির সজ্জা নিবদ্ধ করার একটা রেওয়াজ চালু হল সে-সময়ে। সংশ্লিষ্ট কারিগররা যে বিজেতাদের সঙ্গে তুর্কীস্তান থেকে আসেননি সেকথা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় হিন্দু 'টেরাকোটা'-শিল্পীরা (তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ইতিমধ্যে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকবেন) যে এ-কাজে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এটা অনুমান নয়,, এর একাধিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনা মসজিদ (১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ আরম্ভ) ও একলাখী সমাধিভবনে (নির্মাণকাল আনুমানিক ১৪৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) এবং গৌড়ের কদম্ রসুল স্মৃতিসৌধে (১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যবহৃত 'টেরাকোটা'-অলংকরণে কোনো মূর্তি-ভাস্কর্য নেই বটে, কেননা ইসলামে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু [illegible] ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশায় পূর্বতন হিন্দু-শৈলীর ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

বিভিন্ন আসনে স্থাপিত দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ : পরিত্যক্ত জোড়বাংলা-মন্দির : [illegible] (হুগলী)

আবার, পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহরের আট মাইল উত্তরে বিন্দোল গ্রামের জীর্ণ ভৈরবী-মন্দিরের (আনুমানিক ১৬ শতক) বাইরের ও ভিতরের দেওয়ালে যেসব পোড়ামাটির সজ্জা উৎকীর্ণ আছে, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সমকালীন মোসলেম ইমারতে, বিশেষ করে 'একলাখী' স্মৃতিসৌধে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা'-অলংকরণের, সাদৃশ্য বিস্ময়কর। যেসব কারিগর বংশানুক্রমিকভাবে এই শিল্পটিকে অবলম্বন করে বেঁচেছিলেন, মুসলমান-বিজয়ের পর তাঁরা—ধর্মান্তরিত হয়ে থাকুন বা না থাকুন—সেটিকেই আঁকড়ে রইলেন। কেননা, বিকল্প কোনো জীবিকা তাঁদের জানা ছিল না। ধর্মান্তরকারীরাও নতুন ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে তাঁদের জন্য নতুন কোনো জীবিকার ব্যবস্থা একেবারেই করেননি। মনিব পরিবর্তনের কারণে তাঁদের শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হল সত্য, কিন্তু আঙ্গিক বা স্টাইলের বদল হুকুমমাফিক রাতারাতি হয় না, এক্ষেত্রেও হয়ও নি। মোটামুটি এহেন 'না-ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থাটা চলল শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) কাল অবধি। সে সময়ে হিন্দু 'টেরাকোটা'-মন্দির যে একেবারেই নির্মিত হয়নি এমন নয়। অল্পস্বল্প হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে একই কারিগর-গোষ্ঠীর হিন্দু শিল্পীরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজে নিযুক্ত হয়েছেন এবং মূর্তি-ভাস্কর্য রচনায় তাঁদের বংশগত নৈপুণ্যের কিছু চর্চা করবারও অবকাশ পেয়েছেন। পক্ষান্তরে, ধর্মান্তরিত মুসলমান ভাস্কররা যে হিন্দু-মন্দিরনির্মাতাদের অধীনে কখনো কাজ পাননি এমন নয়। এরকম দৃষ্টান্ত বিরল হলেও একটির কথা জানি। জয়রামবাটির অদূরে, বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত জিবটা গ্রামে, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত রায়-পরিবারের দুর্গা-দালানের প্রতিষ্ঠালিপিটি হুবহু নিম্নরূপ : "এই দালান জগন্নাথ রায়ের যত্নে প্রস্তুত হইল। সমাপ্ত ১২৯৭ সাল। মিস্ত্রি শ্রীপানাউল্লা কাজি দিং। সাং তাজপুর।" এই উদ্ধৃতির শেষাংশের অর্থ—মিস্ত্রী তাজপুরনিবাসী শ্রীপানাউল্লা কাজী ও তাঁর দলবল।

মন্দির 'টেরাকোটা'-শিল্পের ধারাবাহিকতা ও সংশ্লিষ্ট কারিগরদের ধর্ম-বিপর্যয় প্রভৃতি নিয়ে একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করলাম এইজন্য, পরবর্তীকালের অজস্র 'টেরাকোটা'-মন্দিরে ফুলকারি (অল্প ক্ষেত্রে জ্যামিতিক) নকশার প্রাচুর্যের প্রধান কারণ—মুসলমান আমলের প্রথম কয়েক শতক শিল্পীদের বিমূর্ত নকশার বাধ্যতামূলক অনুশীলন। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়নামতীতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে নকাশি-অলংকরণ পরিমাণে অনেক কম, উৎকর্ষেও হীন। পশ্চিমবঙ্গে এখন যেসব মূর্তিসজ্জিত 'টেরাকোটা'-মন্দির বিদ্যমান, দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, তাদের সবই খৃষ্টীয় ষোলো শতক বা তার পরে নির্মিত। সেগুলিতে, বহু ক্ষেত্রে,

একই প্যানেলে নিবদ্ধ পত্রকলাসমেত মহিষাসুরমর্দিনী : রাধাগোবিন্দজীউ-মন্দির : আঁটপুর (হুগলী)

নিছক আয়তনের পরিমাপে, অন্যান্য যে কোনো বিষয়বস্তুর ভাস্কর্য থেকে বিমূর্ত নকাশি-অলংকরণই বেশী স্থান আচ্ছাদিত করেছে দেখা যায়। মন্দির-'টেরাকোটা'-শিল্পীরা যদি অন্তর্বর্তীকালীন মুসলিম-সংস্পর্শে না আসতেন, তাহলে পোড়ামাটি-সজ্জার এই বিশেষ বিভাগে তাঁদের রুচি ও দক্ষতা কোনোটাই এতদূর স্ফূর্তিলাভ করত না। বর্তমান নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় মন্দির-'টেরাকোটা'য় দুর্গা হলেও, পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখব ফুলকারি বা নকাশি-অলংকরণের চর্চাপ্রসূত সূক্ষ্মতা ও পরিমিতিবোধ দুর্গা-মূর্তি রচনাকেও কীভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশার কাল ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ অবধি। দুই বাংলায় অধুনা-বিদ্যমান ও পোড়ামাটির মূর্তি-ভাস্কর্যসমন্বিত যাবতীয় মন্দিরই তাঁর দেহাবসানের পরে নির্মিত। [শুধু ঘাটাল শহরে অবস্থিত সিংহবাহিনী-মন্দিরটি (১৪৯০ খৃঃ) সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম।] শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী একক মূর্তির আরাধনা যে বঙ্গদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল তার 'পাথুরে প্রমাণ' পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে 'চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক রাজা চন্দ্রবর্মার খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের এক গুহালিপি থেকে। কিন্তু চৈতন্যদেব যে-বিষ্ণুর (নামান্তরে, কৃষ্ণের) উপাসনা প্রবর্তিত করলেন, তাতে তিনি আর একক রইলেন না ; তাঁর হ্লাদিনী শক্তিরূপে শ্রীরাধিকা এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। নব পর্যায়ে এই বিষ্ণু-উপাসনার স্রোতে যখন "শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়"ই শুধু নয়, গোটা বঙ্গদেশ এমন কি ওড়িশাও, ভেসে গেল, তখন সেই প্রেমভক্তিধর্মের নবীন উন্মাদনায় মন্দির - টেরাকোটা - শিল্পীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। অব্যবহিত পূর্বের মোসলেম-পদ্ধতিগত জ্যামিতিক ও নকাশি-অলংকরণে হাত পাকাবার পরই কৃষ্ণলীলার বিপুল ভাণ্ডার তাঁদের কাছে উন্মুক্ত হল। রামায়ণ-মহাভারতের কালজয়ী ঐশ্বর্য এবং অগণিত পৌরাণিক কাহিনীর অজস্র চিত্ররূপ তো ইতিপূর্বেই তাঁদের কাছে অবারিত ছিল ; এখন, অনুকূল পরিবেশে, অসংখ্য মন্দির আচ্ছাদিত হতে লাগল এই নতুন বিষয়বস্তুর রূপায়ণে। 'অনুকূল পরিবেশ' বলতে শুধু এক নবীন ধর্মপ্রেরণার কথাই বলছি না, সমকালীন হোসেন শাহী সুলতানদের আমলে (১৪৯৪-১৫৩৮ খৃঃ) ও পরবর্তী মুঘল শাসনকালে (১৫৭৬-১৭১৭ খৃঃ) রাজশক্তির আপেক্ষিক উদার মনোভাবের কথাও বোঝাতে চাইছি। শেষোক্ত সময়ে, শাসন-কেন্দ্র দিল্লীতে থাকার দরুণও বহুদূরবর্তী বাংলায় ধর্মীয় হস্তক্ষেপ অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। বস্তুত, মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকের তীব্র ধর্মীয় বিদ্বেষ যদি শেষের দিকেও একই মাত্রায় অব্যাহত থাকত, তা হলে এত অসংখ্য 'টেরাকোটা'-মন্দির বঙ্গদেশে নির্মিত বা রক্ষিত হতে পারত কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, রামায়ণ-মহাভারতজাত, না পৌরাণিক, না কৃষ্ণলীলাবিষয়ক না ফুলকারি বা নকাশি-সজ্জা—কোন জাতীয় অলংকরণ 'টেরাকোটা'-মন্দিরে প্রাধান্য পেয়েছে, সে-প্রশ্নের এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব শ্রেণীর বিষয়বস্তুরই মিশ্র ব্যবহার হয়েছে, যদিও পৌরাণিক চিত্রকল্পের অজস্রতার জন্য বহু মন্দিরে তাদের সংখ্যাধিক্য কিংবা অগ্রাধিকার দেখা যায়।

... দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী এক প্রধান

স্বর্গ অধিকার করলে, দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। কেন না, ব্রহ্মা ইতি-পূর্বেই তাকে বর দিয়েছিলেন—কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু হবে না। বিষ্ণুর পরামর্শে, সমস্ত দেবতার দেহনিঃসৃত মহাশক্তিশালী তেজোরাশির সমন্বয়ে যে-দেবী আবির্ভূতা হলেন, তিনিই দেবগণের দুর্গতিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। শরৎকালে তাঁর সাড়ম্বর উপাসনাই বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকেই এ-অনুষ্ঠান যে বাঙালী সমাজে সুপ্রচলিত তার প্রমাণ সমকালীন শাস্ত্রকার জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' গ্রন্থে সে-বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখ। তাঁর পরবর্তী, শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি, বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রমুখের গ্রন্থেও এই পূজার সবিশেষ বিবরণ দেখা যায়। দেবীর শাস্ত্রোক্ত মূর্তির সঙ্গে, কালক্রমে, বহু লৌকিক ভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছে। মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীরা একান্তভাবেই লোক-শিল্পী ছিলেন বলে দুর্গার জনপ্রিয় মূর্তিই তাঁরা রূপায়িত করেছেন দেবালয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে। এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক স্বর্গত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' পুস্তকটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন—"দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাধারণতঃ মাটির প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয়। মূর্তিগুলিকে স্বাভাবিক ও জনসাধারণের চিত্তা-কর্ষক করিবার আগ্রহ ইহাদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। নানারূপ অপৌরাণিক নূতন নূতন ভাব ফুটাইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ....প্রচলিত ধ্যান অনুসারে দেবী জটাজুটসমাযুক্তা, তাঁহার মস্তকে অর্ধচন্দ্র, তাঁহার আনন পূর্ণচন্দ্রতুল্য ও ত্রিনয়নবিশিষ্ট ; তাঁহার বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় (মতান্তরে, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়)। তিনি নবযৌবনসম্পন্না, সুচারুদর্শনা, সর্বাভরণভূষিতা, ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানা, পীনোন্নতপয়োধরা মহিষাসুরমর্দিনী। তাঁহার মৃণাল-কোমল দশ বাহুতে দশ প্রহরণ শোভমান। ..দেবীর নিম্নদেশে খণ্ডিতমস্তক মহিষ এবং তাহার শিরশ্ছেদে উৎপন্ন, দেবীর শূলবিদ্ধ, নাগপাশে বেষ্টিত, খড়্গহস্ত দানব....। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা চণ্ড নায়িকা চণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডরূপা অতিচণ্ডিকা এই অষ্ট শক্তির দ্বারা দেবী পরিবেষ্টিতা। ....রঘুনন্দন, গোবিন্দানন্দ, বেণীনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন মনীষীর লেখা দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই ধ্যানেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রতিমা এই ধ্যান অনুসারেই রচিত হওয়া উচিত। লক্ষ্য করিবার বিষয়—উল্লিখিত ধ্যানে লক্ষ্মী সরস্বতী ও কার্তিক গণেশের কোনও প্রসঙ্গ নাই। অথচ ইহাদের প্রতিমা দেবীর প্রতিমার সহিত সর্বত্র যুক্ত হইয়া থাকে। কতদিন হইতে এইরূপ হইতেছে বলা যায় না। ইহাদের অবস্থান সর্বত্র একরূপ নহে। পশ্চিমবঙ্গে দেবীর দক্ষিণে গণেশ বামে কার্তিক—পূর্ববঙ্গে ইহার বিপরীত, আবার লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থানে জয়া বিজয়া বা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। 'কালীবিলাস' তন্ত্রে কার্তিক গণেশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে সত্য, তবে এই তন্ত্রের রচনাকাল অজ্ঞাত। ইহা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না—অন্যত্র অনুল্লিখিত কার্তিক গণেশাদির পূজাকে শাস্ত্রসংগত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। লৌকিকভাবও এই পরিকল্পনার রূপায়ণে সাহায্য করিয়াছে। দেবী বৎসরান্তে পিতৃগৃহে আসিবার সময় পুত্রকন্যাদের সঙ্গে নিয়া আসিবেন—(লোককল্পনায়) ইহাই স্বাভাবিক। আগমনী গানের মধ্যে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (পৃঃ ১২০-২৪)।

আগমনী গানের উল্লেখ এখানে যথোচিত ও বিশেষ অর্থবহ। সকলেই জানেন, এই বিশেষ শ্রেণীর সংগীত গ্রাম-বাংলার এক বিশিষ্ট সম্পদ। এগুলির

লঙ্কা-রণক্ষেত্রে দেবীর অকালবোধন : মণ্ডল-পরিবারের মন্দির : হদল-নারায়ণপুর (বাঁকুড়া)
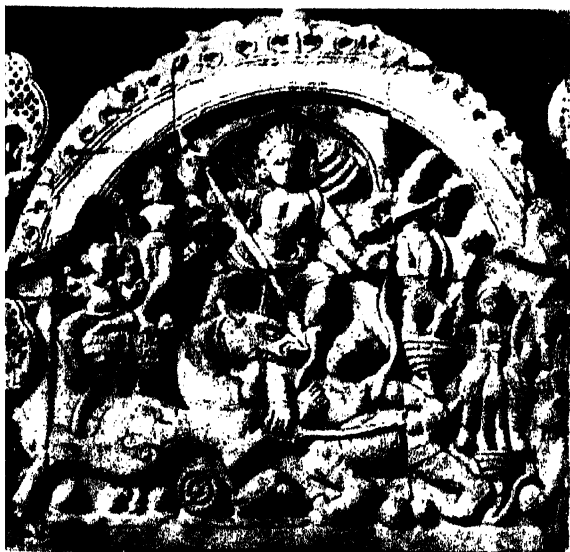
রচয়িতা, সুরকার, গায়ক সকলেই পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। শাস্ত্রে-পুরাণে দুর্গার যে-বর্ণনাই থাকুক না কেন, তাঁদের ও তাবৎ বাঙালীর কাছে তিনি স্নেহের দুলালী উমা বা গৌরী। বছরে মাত্র তিনটি দিনের জন্য পুত্রকন্যাসমেত তাঁর পিতৃগৃহে আগমনের পথ চেয়ে বাঙালী আকুল আগ্রহে দিন গোনে। হিমালয়ের অগম্য শিখরে তাঁর পতিগৃহের অবস্থান বাঙালীর কাছে এক অলীক কাহিনীমাত্র। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায়—"সেই সকল কাব্যে....গৃহস্থালির বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই ; তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা-পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম-বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে বাংলা গ্রামের মধ্যে তাহাদের স্থান হইত না। ....একান্ন পরিবারে আমরা দূর নিকট, এমন-কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই—কেবল কন্যাকে ফেলিয়া দিতে হয়। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্ন পরিবারের সেই বেদনার কথা। শরৎ-সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি-ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল আসে।" ('লোকসাহিত্য' : গ্রাম্যসাহিত্য)

বাঙালীর দুর্গা যে আমাদের গ্রামীণ লোকমানসের এক স্নেহবাৎসল্যসিক্ত অনুপম সৃষ্টি তা এর থেকে বেশী ব্যঞ্জনাময় ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করা যেত কিনা সন্দেহ। মন্দির-টেরাকোটার কারিগরেরা একান্তভাবে লোকশিল্পী হওয়ার দরুন, এই সর্বজনীন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা সানন্দে ও মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের রচিত দুর্গা-প্যানেলগুলিতে কেন্দ্রীয় দেবীমূর্তির দুপাশে তাঁর পুত্রকন্যারা প্রায় সর্বদাই উপস্থিত। পুরাণোক্ত একক মহিষ-মর্দিনী তাঁরা কদাচিৎ রূপায়িত করেছেন। তবে, পুত্রকন্যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই টালিতে উৎকীর্ণ হলেও কোথাও কোথাও খোদিত হয়েছে সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত বিভিন্ন কুলুঙ্গিতে।

পুত্রকন্যাবিহীন অল্প কিছু 'টেরাকোটা'-দুর্গারও দেখা মেলে যেগুলি একই লৌকিক কল্পনাপ্রসূত। পুরাণ-নির্দিষ্ট নয়। আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস অবধি দেবতাদের শয়নকাল বলে, আশ্বিন-কার্তিকে আমাদের দুর্গাপূজা অকালবোধন নামে পরিচিত। পুরাণের মতে, রামের তরফে এই বোধন করেন স্বয়ং ব্রহ্মা, রামচন্দ্র নন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে, লঙ্কার শেষ যুদ্ধের আগে রাম নিজেই দেবীর বোধন ও আরাধনা করেছিলেন। বাংলার গ্রামাঞ্চলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে শাস্ত্র-পুরাণতন্ত্র থেকে বহুগুণ বেশী জনপ্রিয় ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। এই শ্রেণীর ভাস্কর্যে মন্দির 'টেরাকোটা'-শিল্পীরা সেজন্য কৃত্তিবাসী চিত্রকল্পই রূপায়িত করেছেন, পুরাণগত তন্ত্র-পুরাণের ধার ধারেননি। এসব প্যানেলে কেন্দ্রীয় মহিষমর্দিনী মূর্তির এক পাশে পূজারত (অথবা যুদ্ধরত) রাম ও তাঁর বানর-সৈন্যদল ও অন্য পাশে সংগ্রামরত রাবণ

দুশ্চরিত রাম রাবণের যুদ্ধাবর্তিনী দুর্গা : প্রতাপেশ্বর-শিবমন্দির : কালনা (বর্ধমান)

'টেরাকোটা'-মন্দিরের ত্রিখিলান-প্রবেশপথের মধ্যবর্তী দুটি পূর্ণস্তম্ভের সামনের গায়ে এ-জাতীয় ভাস্কর্য সাধারণত নিবন্ধ হত। ব্যতিক্রমও অনেক আছে ; যেমন, বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের (১৬৪৩ খ্রীঃ) একাধিক দেওয়ালে ও সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের (১৮৪৫ খ্রীঃ) পাশের দেওয়ালে এবং হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জের পরিত্যক্ত জোড়বাংলা মন্দিরের (আনুমানিক ১৯ শতক) সামনের বাঁকানো কার্নিসের নীচে এক সমান্তরাল সারিতে। দৃষ্টান্ত আরও আছে : এগুলি কয়েকটি নমুনা মাত্র।

পশ্চিম বাংলার এত অসংখ্য মন্দিরে দুর্গামূর্তি রূপায়িত হয়েছে যে তাদের সামগ্রিক বিবরণ তো দূরের কথা, বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি পূর্ণ তালিকাও পেশ করা সম্ভব নয়। তবে, আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তিনটি দেবালয় ছাড়া আরও অল্প কয়েকটির উল্লেখ করছি। যথা—হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় বাসুদেব মন্দির (১৬৭৯ খ্রীঃ), পুরুলিয়ার চেলিয়ামায় রাধা-বিনোদ মন্দির (১৬৯৭ খ্রীঃ), মেদিনীপুরের মালঞ্চে দক্ষিণা-কালীর মন্দির (১৭১২ খ্রীঃ), মুর্শিদাবাদের বড়নগরে চার-বাংলা মন্দির (১৭৬০ খ্রীঃ), হুগলীর আঁটপুরে রাধাগোবিন্দজীউ মন্দির (১৭৭৩ খ্রীঃ), বর্ধমান শহরের সর্বমঙ্গলা মন্দির (আনুমানিক ১৯ শতকের প্রথম দিক), কালনার প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির (১৮৪৯ খ্রীঃ), বাঁকুড়ার হদল-নারায়ণপুরে মণ্ডল-পরিবারের মন্দির (আনুমানিক ১৯ শতক) প্রভৃতি।

অন্য যে-কোনো লোকশিল্পের মত মন্দির-'টেরাকোটা'-শিল্পও যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে। এ-প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলি যেসব দেবালয় থেকে আহৃত তাদের প্রতিষ্ঠা-বৎসরের ক্রম অনুসারে পাঠক যদি তুলনামূলকভাবে সেগুলির দিকে মনোনিবেশ করেন তাহলে দেখবেন—কারিগরির মান ক্রমশই নিম্নমুখী হয়েছে, আলংকারিক সূক্ষ্মতা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে এবং বাস্তব-মুখিতা ধীরে ধীরে বেড়েছে। মুসলমান আমলে নকাশি-সজ্জার শিক্ষানবীশিতে শিল্পীরা যে পরিচ্ছন্ন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগরি আয়ত্ত করেছিলেন, প্রাচীন-তর শিল্পকর্মে তা যতটা উপস্থিত পরবর্তীকালে সেরকম নয়। অর্বাচীন ভাস্কর্যগুলিতে আগেকার সে-ঋজুতা বা মনোহারিত্ব নেই, সবই যেন কেমন গোলগাল পুতুল-পুতুল গড়নের।

তবে বাঙালী-মনীষার অনুপম সৃষ্টি মন্দির-'টেরাকোটা'-শিল্পের এই ক্রমাবনতি নিয়ে খেদ প্রকাশ আর সমাধিফলকে ব্যবহারের জন্য স্মৃতিগাথা রচনা আজ একই রকম শোকাবহ। কেননা, যেসব গ্রামীণ শিল্পী মন্দির-'টেরাকোটা'য় শুধু দুর্গামূর্তিই নয় আরও অজস্র অলংকরণ একদা রচনা করতেন, তাঁরা প্রধানত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছেন হয়ত চিরকালের মত। তাঁদের সুমহান স্মৃতি বহন করে যেসব জীর্ণ 'টেরাকোটা'-মন্দির এখনও টিকে আছে দুই বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে, সরকারী ও বেসরকারী উদাসীনতায়, অল্প কিছু সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ছাড়া, তারাও বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে অমোঘ গতিতে।

(আলোকচিত্র—লেখক কর্তৃক গৃহীত ও পরিস্ফুটিত)

CHAITRA-SBI-309 BEN

ক্ষণে ক্ষণে প্রতি ক্ষণে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য
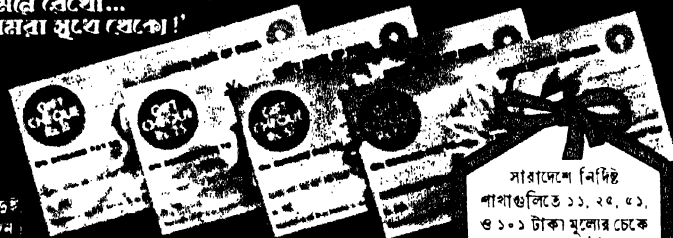
দিন শুরু করুন বেশ মচমচে আর তাজা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। স্বাদেভরা এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। দাদু থেকে নাতি—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

ব্রিটানিয়া
দেয় ভাল বিস্কুট –
৫০ বছরের অভিজ্ঞতায়

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিনটাস-BBC.AR.3-140 BG

সমরজিৎ কর

॥ তেরো ॥

কোহিমা। ৫৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই পার্বত্য শহর আধুনিক নাগাল্যান্ডের এখন প্রাণকেন্দ্র। না। শুধু কি তাই? এ শহর নাগাদের কাছে এখন গর্বও বটে।

এদের আত্ম-অভিমান বড় বেশী। এরা প্রচণ্ড স্পর্শকাতর। মন্তব্য করলেন রবিকুমার। জিওলজিক্যাল সার্ভের তরুণ জিওলজিস্ট।

কী রকম? আমার প্রশ্ন।

সে আপনাকে বোঝাতে পারবো না। যাচ্ছেন তো পুকপুর। সেখানে গেলেই আমার কথার মর্মটি বুঝতে পারবেন।

জানি না, কী বলতে চাইলেন রবিকুমার। কিন্তু মনে মনে কেমন যেন শিহরণ অনুভব করলাম।

এক সময় এই অঞ্চলটিকে লোকে বলতো, নাগা পাহাড়ের দেশ। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, দক্ষিণে মণিপুর। পশ্চিমে যান, পাবেন ধনশ্রী উপত্যকা। পূবে ব্রহ্মদেশ। স্বাধীনতার আগে পশ্চিমের বেশ বড় রকম একটি অঞ্চল বৃটিশ রাজের অধীনে ছিল। নাগাদের তখন মোটামুটি সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যারা দক্ষিণ-পশ্চিমে বাস করতো, তাদের বলা হতো কাচা নাগা। মণিপুরের উত্তরে যারা বাস করে তাদের বলা হয় আঙ্গামী। আঙ্গামীরা চেহারায় যেমন লম্বা চওড়া, মানুষ হিসেবেও এরা বড় বেশি স্বাধীনচেতা। আঙ্গামীদের উত্তর-পশ্চিমে বাস করে রেঙ্গমা। রেঙ্গমাদের উত্তরে লোটা এবং পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে সেমা নাগাদের বাস। আরও উত্তরে গেলে দেখতে পাবেন আর একশ্রেণীর নাগা। যাদের বলা হয় আউ। এগিয়ে যান আরও উত্তরে। বরং বলি উত্তর-পূর্বে। সেখানে চোখে পড়বে চাংগো নাগাদের। চাংগো শব্দটির অর্থ উলঙ্গ। ব্রিটিশরা আর একশ্রেণীর নাগার কথা উল্লেখ করেছেন। যাদের ওঁরা বলতেন স্বাধীন নাগা।

বাট দিস ইজ এ ব্রড ডিভিশন। ইফ ইউ ইনক্লুড সাব-ট্রাইবস, দা নাম্বার উইল বি মোর দ্যান ফরটি। মন্তব্য করেছিলেন তরুণ নাগা ডাক্তার মেরেন সাংতাম। তুয়েংসাং জেলার পুংরোয় ওঁর বাসস্থান। মেডিকেল অফিসার। ওঁর সঙ্গে দেখা পুকপুরে,

কিঃ কর? ঘুম ভাঙলো?

বিছানায় শুয়ে তখনও আড়ামোড়া ভাঙছি। তন্দ্রায় চোখের পাতা তখনও ভারী। হঠাৎ শম্ভু সেনের গলার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখি, তিনি দাড়ি কামানোর সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করছেন।

শব্দ শুনছেন? শম্ভুবাবুর প্রশ্ন।

কিসের শব্দ? আমার জিজ্ঞাসা।

একটু কান খাড়া করুন, শুনতে পাবেন।

তাইতো। একটানা গুরুগম্ভীর হুঁ—উম। মনে হলো সে শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। যে শব্দে বুক কাঁপে অনভ্যস্ত মানুষের।

শম্ভুবাবু বললেন, বাইরে গিয়ে দেখুন না, এ শব্দ কারা করছে?

তাঁর কথায় 'সেবক' গেস্ট হাউসের বাইরে বেরুতেই এক ঝলক উজ্জ্বল রোদ গায়ে এসে পড়ল। আর সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে বুকটা উঠল কেঁপে।

নাগা। গেস্ট হাউসের নিচের পথ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছে একদল নাগা যুবক। সুগৌর রঙ। খালি পা। পরণে হাফ প্যান্ট। কারোর গায়ে শুধু গেঞ্জি। কেউ গেঞ্জির ওপর জড়িয়ে নিয়েছে কালো রঙের চাদর। চাদরে লাল রঙের কাজ। প্রত্যেকের হাতে বেশ বড় একখণ্ড কাঠ। এক একটি খণ্ড লম্বায় প্রায় সাত-আট ফুট। ওজনও তিরিশ চল্লিশ কিলোর কম হবে না। বলিষ্ঠ তাদের চলন। একের পেছনে আর একজনের অনু-

পুকপুরের পথে

গমন। তা কম করেও দুশ জন তো হবেই। মুখে একটানা ধ্বনি। হুঁ—হুঁ—উম! হুঁ—হুঁ—উম।

দেখলেন তো, মিঃ কর? এদেশে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে কত কষ্ট করতে হয়?

পেছনে চাইতেই দেখি অজিতবাবু।

এরা কারা? যা গলার আওয়াজ মশায়, ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যা বলেছেন। মৃদু হাসলেন অজিতবাবু। —ভোর রাতে উঠে এরা সব কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। জানেন তো, নাগাল্যান্ডের মানুষদের গৃহস্থালীর জ্বালানির জন্যে কাঠের ওপরই নির্ভর করতে হয় বেশী।

যাই বলুন, শক্তি আছে, মশায়। অমন বড় বড় কাঠ কেমন বেমালুম বয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে।

তা শক্তি ওরা ধরে। দারুণ কর্মঠ জাত, মশায়। আর ওই যে গান শুনছেন, গলা মিলিয়ে কোরাস? ওই গান ওদের কর্মশক্তি আরও বাড়িয়ে দেয়।

[illegible] গান? এ গান শুনলে আমাদের মরা মানুষেরও পিলে চমকাবে।

এদের চমকায় না। বরং প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর হয়।

ওরা চলে গেল। আর স্তম্ভিতের মত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এরাই তা হলে নাগা? শুনেছিলাম, নাগারা নাকি দুর্ধর্ষ হয়। সমভূমির যারা মানুষ, তাদের কাছে নাগা মানেই যেন আতঙ্ক। কিন্তু এদের দেখে তেমন তো কিছু মনে হলো না?

গেস্ট হাউসের ঘরে ফিরতেই শম্ভুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন?

অপূর্ব।

জেসামি চলুন, দেখবেন আরও ভালো লাগবে। সেখানে বাস করে চেকাসাং নাগা। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। নির্মল চক্রবর্তী, অসিত ভৌমিক, রবিকুমার ওরা সার্কিট হাউসে আছে। টেলিফোনে এইমাত্র তাদের তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললাম। নটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। সাড়ে নটায় নাগাল্যান্ডের শক্তি, ভূতত্ত্ব, খনি এবং সীমানা সমস্যা বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ লেংগা ল্যাঙ্গ-এর সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এখানকার জিওলজি এবং মাইনিং ডাইরেকটরেটের ডাইরেকটার আর এন কাকের-এর সঙ্গে গতকাল আপনারা এখানে আসার আগেই মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মিটিং-এর ব্যাপারটা কনফরম করে নিয়েছি। অসুবিধের কারণ নেই। সাড়ে দশটার মধ্যে মিটিংটা যদি শেষ করতে পারি, আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই কিফিরে গিয়ে পৌঁছতে পারবো। দুর্গম পথ। কোহিমা থেকে দূরত্ব ২৫৮ কিলোমিটার।

রীতিমত ফরমান।

তাতে অসুবিধে অবশ্য কিছু নেই। কারণ কোহিমার আকাশে সূর্যের আলো ঝরতে শুরু করে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে। পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো ঘরবাড়ি জেগে ওঠে তখন। এ শহরের প্রতিটি মানুষ তখন থেকেই শ্রমিক।

ছটা বাজতেই গেস্ট হাউসের পরিচালক এসে জানিয়ে দিলেন, গরম জল প্রস্তুত। আপনারা স্নান সেরে নিন।

স্নান সেরে প্রস্তুত হতেই অসিত ভৌমিক, রবিকুমার এবং আর সবাই এসে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল মিলিটারি কায়দায় মিটিং।

শম্ভুবাবু বললেন, আমার মনে হচ্ছে, এখান থেকেই দুটি দল তৈরি করে ফেলা দরকার। ভৌমিক, ইউ বি দ্য কমান্ডার অভ দ্য অ্যাডভান্স পার্টি। আপনি, রবিকুমার এবং আরও কয়েকজন ব্রেকফাস্টের পর দুটি জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

ডঃ শ্রীবাস্তব পাশ থেকে মন্তব্য করলেন, কিফিরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিসট্রিকট কমিশনার মিঃ এস শিমা আয়ার-এর সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি। পুকপুরে জাংগার গ্রামে তিনি আমাদের জন্যে একটি কালচারাল শোর ব্যবস্থা করেছেন। তাদের জন্যে তো সঙ্গে কিছু নিতে হয়।

ইউ মিন গিফট? ঠিক। ভৌমিক আপনারা এক কাজ করুন। এই কোহিমা থেকেই সওদাগুলি নিয়ে নিন। ছয় বস্তা নুন, কয়েক প্যাকেট টফি এবং চারমিনার সিগারেট। ভারি খুশী হবে ওরা। বললেন শম্ভু সেন।

নুন দিয়ে নাগাদের সঙ্গে সখ্যতা করাটা কি রীতির মধ্যে পড়ে-? আমার প্রশ্ন।

রীতিনীতি বুঝি না, মিঃ কর। যেখানে যাচ্ছেন, দেখবেন কী দুর্গম জায়গা সেটা। নুন সেখানে একটা দুর্লভ সামগ্রী। শম্ভুবাবুর উত্তর।

শম্ভুবাবুর প্ল্যান অনুযায়ী অসিত ভৌমিকের নেতৃত্বে কিফিরের দিকে চলে গেলো ব্রেকফাস্টের পর। ঠিক হলো, তাঁরা সেখানে পৌঁছে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক আছে কী না, দেখে নেবেন। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করবেন বিভিন্ন রসদপত্রের। পুকপুর যাওয়ার প্ল্যান। শুনলাম, এ ধরনের কাজে অসিতবাবু দারুণ পোক্ত। ১৯৭৭ সালের লোহিত এক্সপিডিশনেও তিনি ছিলেন অ্যাডভান্স পার্টির কম্যান্ডার।

তাঁরা চলে যাওয়ার পর বসলো আর একদফা মিটিং। শম্ভুবাবু এবং ডঃ শ্রীবাস্তব ঠিক করে নিলেন মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করার সময় কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দেবেন তাঁরা। তাঁকে বোঝাতে হবে, ভূতাত্ত্বিক সম্পদের দিক দিয়ে নাগাল্যান্ড যথেষ্ট ধনী। এই সম্পদ যদি যথাযথ কাজে লাগানো যায়, নাগাল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া এ অঞ্চলে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার কাজকর্মের জন্যে প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা তাঁদের দরকার মন্ত্রীর কাছে সে কথাও তুলে ধরতে হবে।

শম্ভুবাবুর পরিষ্কার কথা। হতে পারে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর কিন্তু যা কিছু কাজকর্ম তাঁরা করে থাকেন তার সবই তো হয় কোন না কোন প্রদেশ সরকারের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যেই। কখনও কখনও কোন কোন প্রদেশ
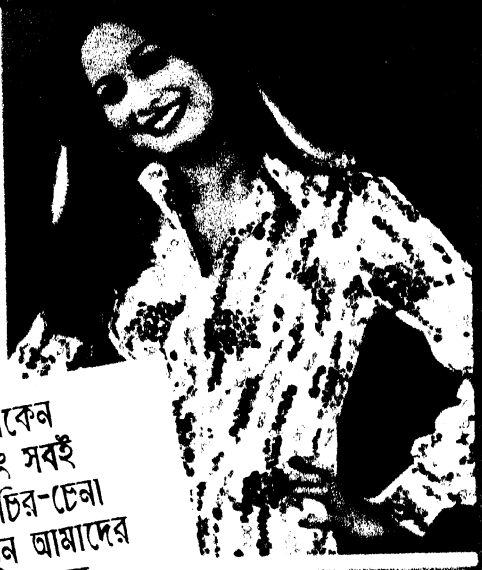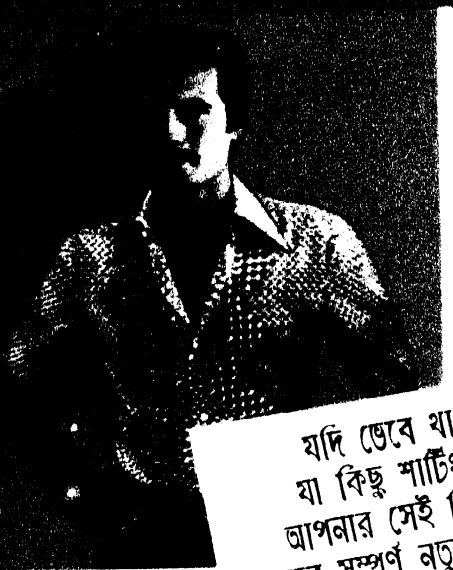
যদি ভেবে থাকেন
যা কিছু শার্টিং সবই
আপনার সেই চির-চেনা
তবে সম্পূর্ণ নতুন আমাদের
এই বিশাল রাজ্যে
আপনাকে স্বাগত জানাই।
এমন নকশা, রং আর বুনন আপনি
আগে কখনো দেখেননি।
আপনার সামনে সেরা জিনিষ তুলে ধরতে
আমরা আগাগোড়া নতুন ধারার
শার্টিং-এর পরিকল্পনা করেছি।
অভিনব নকশা, বুনন আর রঙের
ক্রীজ নিরোধক কাপড়—এমনটি
এর আগে কখনো দেখেননি।
মনোমুগ্ধ ভঙ্গীতে চলুন।
নিজস্ব ভঙ্গীতে।
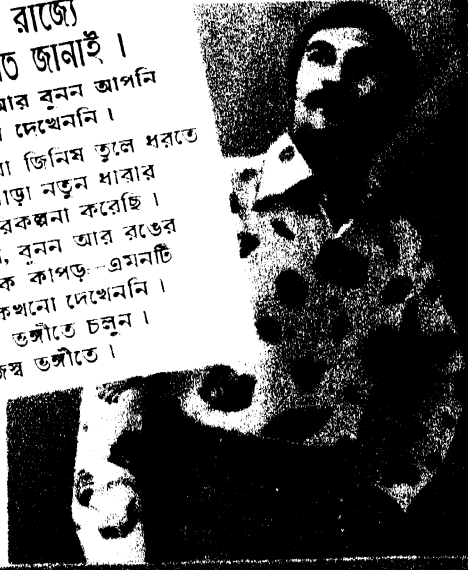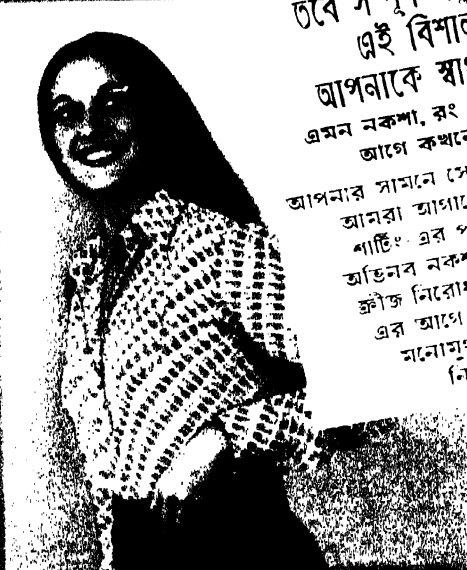
অথচ পদব্যাপার লোক।বলার জন্যে যুগপৎ কাজ করতে এগিয়ে আসে। যেমন ধরুন এই নাগাল্যান্ড। নাগাল্যান্ড সরকারের নিজস্ব ভূতাত্ত্বিক দপ্তর আছে। এই দপ্তরটিরও কাজ এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং কোথাও ব্যবহার-যোগ্য কোন সম্পদ পেলে তাকে কাজে লাগানো। অথচ জিওলজিক্যাল সার্ভেরও দায়িত্ব ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। এখন দেখা দরকার, প্রাদেশিক দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় উদ্যোগ এমন কিছু কাজ করছে কী না, যেটা ডুপ্লিকেশনের পর্যায়ে পড়ে। পড়লে সেক্ষেত্রে সেটা হবে অপচয়। এ বিষয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। আছে আরও সমস্যা। সমস্যা স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে। এখানে অনেক গ্রাম আছে যেখানে বাইরের লোকদের পক্ষে চলা-ফেরা করাটা যথেষ্ট বিপজ্জনক। বাইরের লোকদের তারা বিশ্বাসই করতে চায় না। তবে অন্তত জিওলজিস্টদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আগের তুলনায় এখন অনেক কম। ওদের মনে একবার যদি বিশ্বাস জন্মানো যায়, জিওলজিস্টরা যা কিছু করছেন তাতে ওদেরই মঙ্গল, তাহলে সমস্যা যেটুকুও এখন আছে তা দূর করতে বেগ পেতে হবে না। এর জন্যে দরকার নাগাল্যান্ড সরকারের শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতা।

শম্ভুবাবুর কথাবার্তায় বুঝলাম নানা রকম পরিকল্পনা মাথায় রেখেই তিনি মন্ত্রী মিঃ লেপ্পা ল্যাং-এর সঙ্গে কথা বলতে চলেছেন।

দরকার। এ ধরনের আলোচনাই তো এখন দরকার সব চেয়ে বেশী। কারণ ভূতাত্ত্বিকদের কাছে নাগাল্যান্ড তো এখনও কুমারী রমণী। ভারতের এই পার্বত্যসঙ্কুল অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কতটুকু জানতে পেরেছেন তাঁরা? আগে কিছু কিছু ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যে এখানে হয়নি, সে কথা বলব না। কিন্তু জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওন খোলার পর নাগাল্যান্ডে যে ধরনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে তাও যেন এক অভূত-পূর্ব ঘটনা।

ডিমাপুর থেকে কোহিমার চড়াই পথে ওঠার সময় ডঃ নির্মল চট্টো-পাধ্যায় বলছিলেন, মিঃ কর, নাগাল্যান্ড মানেই তো শুধু পাহাড়। আরাকান ইয়োমা পর্বতমালা এগিয়ে এসেছে উত্তর দিকে। সেই উত্তরেই নাগা-ল্যান্ডের অবস্থান। এখানকার ঢেউ খেলানো পাহাড়গুলি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে। ভূতাত্ত্বিকের ভাষায় বলবো, ক্রিটেসিয়াম এবং টারসিয়ারি যুগে। ক্রিটেসিয়াম যুগকেই বলা হয় খড়িমাটি তৈরির যুগ। এই সেদিনও, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত, বলতে পারেন, কতটুকু ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয়েছিল এখানে? দুর্গম এই অঞ্চলে যেখানে শুধু চলাচল করা সম্ভব ছিল, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ একমাত্র সেখানেই যৎসামান্য যাতায়াত করত। যাঁরা ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণ নয়, কোথাও কিছু খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় কী না, তারই সন্ধান করা।

নাগাল্যান্ডের নাজিরা কয়লাখনি এলাকা সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল এফ আর ম্যালেটের স্মৃতিকথায়। সেটা ১৮৭৬। এর পর ১৯১০ সালে নাগাল্যান্ডের একাধিক কয়লাখনি এলাকার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় এইচ এইচ হয়ডেনের রচনায়। হয়ডেন লিখে-ছেন, ডিখু উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যতই এগোন যায়, দেখা যাবে কয়লার স্তর ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। আরও পশ্চিমে এগিয়ে যান, কয়লার বদলে তখন চোখে পড়বে কার্বনঘটিত শেল। পি ইভানস এবং এল পি মাথুর ১৯৪৬ সালের স্কুপেন বেল্টের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে সুন্দর একটি ছবি তুলে ধরেছিলেন। ১৯৬৭ এবং '৬৮ সালে চাংসিকং-জাপুকং এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করেন এম ডি লিমায়ে এবং বি দেবাধিকারী। তাঁরা ওই সব অঞ্চলের কয়লা এবং চুনা-পাথরেরও সন্ধান দেন। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে এন ডি মিত্র এবং এ চৌধুরী নাগাল্যান্ডের বোরজাং— চাংগিকং কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশদ মানচিত্র তৈরি করেন। ১৯৭৩ সালে এন ভৌমিক, এম মজুমদার এবং এস এ আমেদের অনুসন্ধানে ধরা পড়ে নাগাল্যান্ডের তুয়েংসাং জেলার পুকপুর গ্রামের কাছাকাছি অঞ্চলে রয়েছে ম্যাগনেটাইট, নিকেল এবং কোবল্ট।

শম্ভু সেন বললেন, ব্যাপার কি জানেন? নাগাল্যান্ডকে আমরা বলি, 'একফালি সরু পার্বত্য অঞ্চল। শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব থেকে। এগিয়ে গেছে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর। এর উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে আসামের সমভূমি; আর এই যে পার্বত্য অঞ্চলের কথা বললাম তার জন্ম টার-সিয়ারি ক্রিটেসিয়াম যুগে। অর্থাৎ এদিকের ভূ-স্তরের বয়েস প্রায় সাত

কোহিমার মিউজিয়ামে নাগা প্রতিমূর্তি

কোটি বছর। এখানকার ভূ-স্তর বয়েসে নবীন। এবং সচল। সচল বলেই এই অঞ্চলটি ভূমিকম্পের অন্যতম কেন্দ্র। এছাড়া ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে নাগাল্যান্ড আরও একটি ব্যাপারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সবটাই 'জিওসিনক্লিনাল'। চারদিকে পাহাড়। মাঝখানে গামলার মত খাপ। কোহিমা শহরের বাইরে গেলেই বুঝতে পারবেন, কী বলছি আমি। দেখবেন, আপনি ভাঁজল পর্বত বা ফোল্ড মাউনটেইনস-এর ওপর দিয়ে চলেছেন।

নাচের পোশাকে চেকাসাং নাগা

ভাঁজে ভাঁজে ভূ-স্তর। যেন একের পর এক পাথরের ঢেউ। আর ঢেউ-গুলির মাঝখানে গভীর গামলা। পর্বতচূড়া থেকে যাদের গভীরতা কোথাও এক হাজার ফুট। কোথাও তার চেয়েও বেশী। এদেরই আমরা বলি 'জিওসিনক্লিনাল ফেসিজ'। এ সব অঞ্চল খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে নাগাল্যান্ডকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ডিসাং গ্রুপ, বারেইল গ্রুপ, সুরমা এবং তিপম গ্রুপ, নামসাংবেড এবং ডিহিং গ্রুপ। ধূসর রঙের শেল এবং বেলে-পাথর ডিসাং গ্রুপের বৈশিষ্ট্য। ডিসাং ভূ-স্তরের গভীরতা প্রায় তিন হাজার মিটার। তুলনায় বারেইল স্তর আরও বেশি পুরু। চার থেকে ছয় হাজার মিটার। এই ভূ-স্তরের প্রধান উপাদান বেলেপাথর। সুরমা গ্রুপের ভূ-স্তরে দেখতে পাবেন শেল এবং বেলেপাথর। ডিহিং গ্রুপে আছে বালি, মাটি এবং নুড়িপাথর।

গত কয়েক বছর ধরে এখানকার বিস্তৃত পার্বত্য ...

চালিয়েছেন নাগাল্যান্ড সরকারের ভূতাত্ত্বিক দপ্তর এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ভূতাত্ত্বিকরা। এই সব অনুসন্ধানের ফলে নেইয়াং, এবং তাপে নদীর অন্তর্বর্তী তুজু উপত্যকার পানচিমি এবং কুরানিতে পাওয়া গেছে অ্যাসবেসটস। নাগাল্যান্ড সরকারের ভূতত্ত্ব দপ্তর সন্ধান দিয়েছেন মূল্যবান আকরিক নিকেল এবং ক্রোমাইটের। এই সব মূল্যবান ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে তুয়েনসাং জেলার পাং নামক একটি গ্রামে। পাওয়া গেছে পাং এবং থোনোসিংইয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, পুকপুর এবং থোলোসিংইয়ার মাঝামাঝি আর একটি জায়গায়।

এক সময় বলা হতো নাজিরা কয়লাখনি এলাকা। এখন বলা হয় ডিখু উপত্যকা কয়লাখনি অঞ্চল। নাগাল্যান্ডের এটাই বৃহত্তম এবং উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি অধ্যুষিত এলাকা। কয়লা পাওয়া গেছে আরও অনেক জায়গায়। পাওয়া গেছে চাম্পাকি —চোনাঙ্গমসেন-এ, ওয়ারোমাং— মোংগচেন এবং লাকুনিমিরিনপো-তে। অবশ্য এ পর্যন্ত যতটা কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে তার মান যে খুব ভাল, তা নয়। গন্ধকের মাত্রা বেশী। ওই সব কয়লার ছাই-এর পরিমাণও কম নয়।

তুয়েংসাং জেলার পুংরো সারকেলে যে চুনাপাথর পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট উন্নত মানের। আছে নিকেল, জুনাকিতে সন্ধান মিলেছে পিরাই-টিসের। দস্তা পাওয়ার সম্ভাবনার কথাও সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে। এছাড়া প্রচুর
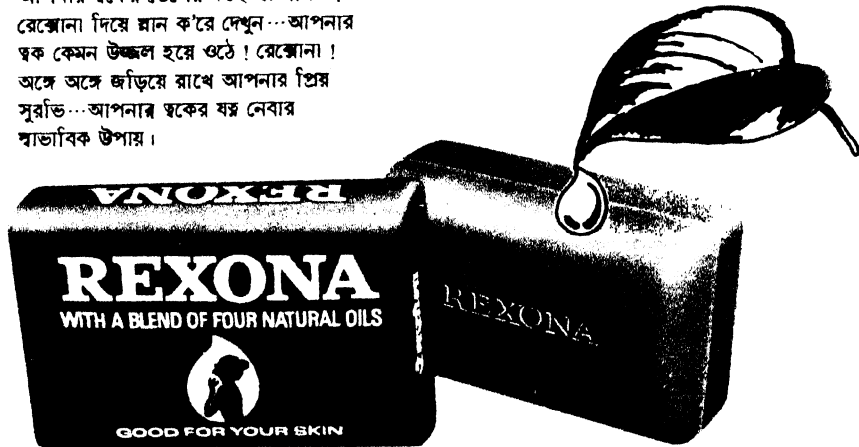
... প্রস্রবণ। এই সব প্রস্রবণের জলে প্রচুর নুন পাওয়া যায়। ডিসাং অঞ্চলে গেলে এ ধরনের প্রচুর প্রস্রবণ আপনার চোখে পড়বে। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের জল বাষ্পীভূত করে খাবার নুন সংগ্রহ করে থাকে।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, মিঃ কর, কিফ্রেতে চলুন, কিছুটা সময় সেখানে আমরা তো পাবোই। নাগাল্যান্ডের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে তখন অনেক কথা শোনাবো আপনাকে। সোনা, মশাই, সোনা। 'দ্য ল্যান্ড ইজ ভেরি মাচ রিচ ইন মিনারেলস।' মুশকিল হয়েছে শুধু ওই পথঘাট নিয়ে। এখানে এক মাইল দূরত্ব যেতে আপনাকে পাহাড়ের গায়ে পাক খেতে হবে মাইলের পর মাইল। আর নাগাদের কথা বলছেন? দে আর কোয়ায়েট ফ্রেনডলি। আমার সার-ভেসে কাজ করতে গিয়ে ওদের তরফ থেকে খুব একটা বাধা পাইনি।

নটা বাজল। অসিত ভৌমিকের অ্যাডভান্স পার্টি কিফ্রের পথে রওনা হলেন আর সংগে সংগে আমাদের জেনারেল শম্ভু সেন ঘোষণা করলেন, জেন্টলমেন, উই হ্যাভ টু প্যাক আপ নাও। এখন নটা। মন্ত্রীর সংগে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাড়ে নটায়।

শীতের সময় কোহিমার তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি নেমে যায়। এপ্রিলে সেখানে বসন্তের আবহাওয়া। রাতের দিকে বেশ শীত শীত করছিল। আমাদের দিকে মাঘ মাসের গোড়ায় যেমনটি হয়ে থাকে, তেমন। তবে তখন, এপ্রিলের এই সকালে মৃদু শীত এবং তার সংগে উজ্জ্বল রোদ বড় মিষ্টি বলেই মনে হচ্ছিল আমার। একটা ফুলস্লিভ শার্টই যথেষ্ট।

এখানকার পাহাড়ে ঝোপঝাড় আছে যথেষ্ট। কিন্তু ঘন অরণ্য বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নেই। কোহিমায় পাখি দেখেছি কম। এমন কি কাকও। 'সেবক' গেস্ট হাউসের পেছনে উপত্যকা। শহরের পরিধি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সারা শহরে তৈরি হয়েছে সুপ্রশস্ত পথ। আছে অভিজাত হোটেল, বড় বড় অট্টালিকা। কোহিমা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এখন আধুনিক শহর। সমৃদ্ধ শহর।

গোছগাছ সেরে বেরোতে গেলো আরও দশ মিনিট। শুরু হলো আবার কনভয়। সামনের গাড়িতে শম্ভুবাবু, ডঃ শ্রীবাস্তব এবং আমি। পেছনে দুখানা জিপে অজিত ব্যানার্জি এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী। খাড়াই-উৎড়াই পথে মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে যখন আমরা পৌঁছলাম, ঘড়িতে তখন নটা বেজে পঁচিশ।

দপ্তরে গাড়ি গিয়ে থামতেই ডঃ শ্রীবাস্তব নেমে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আপনারা একটু বসুন। আমি মিঃ কাকেরের সংগে আগে কথা বলে নিই।

তারপর মিনিট তিনেক বিরতি। মিঃ কাকেরকে নিয়ে ফিরে এলেন ডঃ শ্রীবাস্তব। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি মিঃ কাকের। নাগাল্যান্ড সরকারের ভূতত্ত্ব দপ্তরের ডাইরেকটার। করতেন।

ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। সেই সংগে যথেষ্ট বিনয়ী। বললেন, আপনারা আসাতে খুবই খুশি হয়েছি আমরা। মিঃ সেন, আমাদের মন্ত্রী মিঃ ল্যাংগকে আপনার কথা বলেছি। আপনি দেখা করতে আসছেন জেনে তিনিও খুব খুশি। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন মিঃ ল্যাংগকে আমি একটু খবর দিয়ে আসি আপনারা এসে গেছেন। বলেই তিনি চলে গেলেন।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, মিঃ ল্যাংগ প্রবীণ আই সি এস অফিসার। অবসর নেওয়ার পর এখন মন্ত্রী হয়েছেন। শুনেছি খুব সিরিয়াস মানুষ। জিওলজির ব্যাপারে ওঁর প্রচন্ড আগ্রহ।

শুধু কি আগ্রহ? মিঃ লেংগা ল্যাংগ-এর সংগে প্রথম পরিচয়েই বুঝলাম, শুধু বয়েসেই তিনি প্রবীণ নয়, তাঁর মত বিচক্ষণ মন্ত্রী খুবই কমই চোখে পড়ে।

মিনিটখানিক পর মিঃ কাকের ফিরে এসে জানালেন, মন্ত্রী আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনারা আসুন।

অসাধারণ ব্যক্তিসম্পন্ন পুরুষ মিঃ ল্যাংগ। শান্ত সৌম্য চেহারা; মুখের ওপর পাথরের প্রশান্তি। তাঁর বসা, পোশাক এবং কথা বলায় প্রচণ্ড আভিজাত্যের ছাপ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমার ধারণা ছিলো, রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁরা কথা বলেন বেশী। শ্রোতার চেয়ে বক্তার ভূমিকাই তাঁদের প্রধান। কিন্তু দেখলাম মিঃ ল্যাংগ তার বড় রকমের এক ব্যতিক্রম।

ঘরে ছিলেন মিঃ ল্যাংগ এবং নাগাল্যান্ড সরকারের শক্তি এবং ভূতত্ত্ব দপ্তরের সেক্রেটারি মিঃ জাকালু। ইনিও নাগা। বেঁটে খাটো মানুষ। আটপৌরে চেহারা। হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না ওই আটপৌরে চেহারার আড়ালে এমন একজন মানুষ থাকতে পারে যিনি শুধু প্রাজ্ঞই নন, রসিক ব্যক্তিও বটে।

পরিচয়ের পর আলোচনার সূত্রপাত করলেন শম্ভু সেন। মিঃ ল্যাংগের টেবিলের ওপর নাগাল্যান্ডের বিরাট একটি মানচিত্র বিছিয়ে বলে যেতে লাগলেন নাগাল্যান্ডের কোন জায়গায় কী ধরনের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ রয়েছে এবং অনুসন্ধান চালালে আরও কতটা সম্পদ পাওয়া যেতে পারে?

দেখলাম শম্ভুবাবু যতক্ষণ কথা বলে গেলেন, তিনি বসে রইলেন নির্বাক। যেন পাথরের মূর্তি। তিনি তাঁর কথা শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে মানচিত্রের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন।

শম্ভুবাবুর কথা বলা শেষ হওয়ার পর মুখ খুললেন মিঃ ল্যাংগ। তাঁর কথার সুরে কোন চপলতা নেই, কোন উত্তেজনাও ছিল না। ছিল গম্ভীর বিচক্ষণতা এবং নাগা অধিবাসীদের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ।

মিঃ ল্যাংগ বললেন মিঃ সেন, আমাদের সমস্যাটা অন্যরকম। এখানে উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে চাই কতকগুলি ঢালাও নীতি আছে, ঠিকই। আমি তার সমালোচনা করতে চাই না। আমি শুধু একথাই বলব, নাগাল্যান্ড শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ এ স্পেশাল কেস। আমাদের মানুষ কম শিক্ষিত। তাদের তেমন প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। তাদের জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ। যাতে করে এখানে যা সম্পদ আছে, তাকে নিজেদের স্বার্থে তারা কাজে লাগাতে পারে। দরকার টেকনিক্যাল এডুকেশন। দরকার টেকনো-

মিঃ লেংগা ল্যাংগা

লজির প্রসার। এর জন্যে প্রয়োজন বিদ্যুৎ শক্তি। আমরা আসাম সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁরা নিয়মিত পাঁচ মেগাওয়াটের মত শক্তি আমাদের সরবরাহ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিজু এবং জুনাকি নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছি আমরা। এর জন্যে সিকেমরো জলপ্রপাতও কাজে লাগানো যেতে পারে। ওখা জেলায় ডিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে কাজ চলছে। কিন্তু সেটাও তো শেষ হতে সাত আট বছর। অতদিন আমরা তো বসে থাকতে পারি না।

আমাদের প্রচুর কয়লা আছে। ডিয়াং-এ চারকোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন কয়লার অস্তিত্ব আমরা প্রমাণ করেছি। তা দিয়ে তাপবিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। বোরজান-এ সন্ধান পাওয়া গেছে ৫৫ মিলিয়ন টনের মত কয়লা। যে কয়লার তাপ দেবার ক্ষমতা যথেষ্ট বেশী। ৭০০০ ব্রিটিশ থার্মাল এককের মত। কোনিয়াতেও প্রচুর কয়লা আছে বলে আমরা জেনেছি। ঠিক কতটা কয়লা আছে, সে কয়লার গুণগত উৎকর্ষ কতটা সেটা আপনারা আমাদের জানিয়ে দিন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছে এবং করছেও। এখন তৈরি হয়েছে কোল ইনডিয়া। কোনিয়ার কয়লা সম্বন্ধে ওদের সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে বরং আপনারাই এ কাজটা করুন না। তাতে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে।

শম্ভুবাবু পুকপুরের প্রসংগ তুললেন।

মিঃ ল্যাংগ বললেন, জানি। 'পুকপুর ইজ এ ডিফিকাল্ট এরিয়া'। খবর পেয়েছি, স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা আপনারা সেখানেও পাচ্ছেন। —নাগাল্যান্ডের মানুষ এতদিন ঘুমিয়ে ছিলো, মিঃ সেন। এখন তাদের চোখ খুলেছে। বিদ্যুৎ এবং পথ—এ দুটিই এখন আমাদের কাছে বড় রকমের সমস্যা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ দুটি সমস্যার সমাধান চাই। চাই 'টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস'। আমরা সময় নষ্ট করতে পারবো না। আপনারা বলে দিন কোথায় কী সম্পদ আছে। কুইক। বলে দিন কী ভাবে তাদের কাজে লাগানো যায়। আমরা কাজে নেমে পড়ি। সেদিন দিল্লিতেও আমি বলে এসেছি গড়িমসি না করে নাগাল্যান্ডকে আপনারা সাহায্য করুন, নাগাল্যান্ডও আপনাদের সাহায্য করবে।

জিওলজির প্রসংগ উঠল। আমি বললাম, মিঃ ল্যাংগ, নাগাল্যান্ড অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল। একটা কাজ করা যায় না? এখানে তো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। যদি তাঁদের বলা হয়, আপনারা গ্রামবাসীদের পাথর চেনান। যে যে অঞ্চলে তারা বাস করে, সেখানকার পাথরের নমুনা দেখে তারা অনুমান করুক, ওই পাথরের মধ্যে এমন কোন সম্পদ আছে কী না, যা বাস্তব প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। সে রকম বুঝলে ওই নমুনা, ধরুন, জিওলজিক্যাল সার্ভেতে তারা পাঠিয়ে দিলো। এই ভাবে জিওলজিক্যাল সার্ভেরও যথেষ্ট সাহায্য হবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কাজ যারা করবে, তাদের আর্থিক সাহায্যও করা যেতে পারে।

মিঃ ল্যাংগ বললেন, আপনার আইডিয়া ভাল। বলেই চাইলেন শম্ভুবাবুর দিকে।

শম্ভুবাবু বললেন, কোন অসুবিধে নেই। আমরা জিওলজিক্যাল কিটস তৈরি করেছি। তার মধ্যে আছে নানা রকম পাথরের নমুনা। জনশিক্ষার জন্যেই এসব করা। মাননীয় মন্ত্রী চাইলে সে ধরনের প্রোগ্রামও আমরা নাগাল্যান্ডে নিতে পারি। তাতে আমাদের কাজ আরও সহজ হবে। আমরা বেশি করে স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা চাই।

মিঃ ল্যাংগ আমাকে বললেন, আপনার পরিকল্পনাটা ভালো। আসলে এ ধরনের জনশিক্ষাই আমাদের দরকার। কলকাতায় ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে আমাকে বিশদ জানালে খুশি হবো।

আমি বললাম, অবশ্যই আপনাকে জানাবো।

আমাদের মিটিং শেষ হলো এগারোটায়। আর তারপরই আবার পথ চলা। ২৫৮ কিলোমিটার পার্বত্য পথ। শুনলাম, সে পথের ধারে তথাকথিত অনেক হোস্টাইল নাগাদের গ্রামও পড়বে। (ক্রমশ)

গল্পের চুম্বক...
আরে দিদিমণি, বন্দুকটা দাও তো!
বাঃ!
উঃ...!
দোকানী জোয়ের বউয়ের বন্দুকটা কেড়ে নিয়েছে গুণ্ডারা!

সব লুট করে... দোকানে আগুন লাগিয়ে তারা সরে পড়ল...
একী! আমরা পুড়ে মরব যে!
তা তো মরবেই! হাঃ! হাঃ!

তিন খুনী...
ম্যাক, আগুন লাগালি কেন?
বেশ করেছি! সাক্ষী রাখতে চাই না!
DER JOE'S

এবারে কী করব?
টাকা আছে, বন্দুক আছে, এবারে আরও কয়েকটা ডাকাতি করে বাড়ি ফিরব!

বাঁচাও ..... বাঁচাও...
কে শুনবে তোমার কথা? বাঁচবার শেষ চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে.....
2/26

বাঁচাও... বাঁচাও!
দেখা যাক...

অরণ্যদেব কিন্তু শুনতে পেয়েছেন।
বাঁচাও... বাঁচাও!
!

আসছি!
চলবে
৩

স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

প্রফুল্ল মুখার্জির আদি বাড়ি পূর্ব বাংলায়। বাল্যকালে আসাম প্রবাসী ছিলেন। সেখানেই রাজনীতির হাতেখড়ি। অপেক্ষাগৃহে বসেই কফি খেতে খেতে বলছিলেন : জানো, আমরা যখন ছোটো ছিলাম, সাহেবদের ভয়ে সব সময়েই জুজু। বিশেষত চা-বাগানের সাহেবরা যে কী অত্যাচারী ছিলো! কুলীদের তো জন্তুজানোয়ার ছাড়া ভাবতোই না, আমরাও তথৈবচ। ওদের সব আলাদা, ইস্কুল আলাদা, ক্লাব আলাদা, প্লে-গ্রাউন্ড আলাদা— আসাম তো যাওনি, বড়ো সুন্দর দেশ, ধুবড়ি শহরের সব সুন্দর অংশ নিয়েই তাদের এলাকা। ওই কয়েকটি মুষ্টিমের সাহেব-মেমদের হেলাফেলার অংশগুলোতে আমরা—যারা নিজগৃহে পরবাসী। ওদের ছেলেদের ইস্কুলের খেলার মাঠটাই আমাদের খুব আকর্ষণ করতো। আমাদের তো ওরকম কোনো মাঠ ছিলো না! বেড়াতে হলে, খেলতে হলে ওই ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর। একদিন সেখানে যেতেও তারা বাধা দিল। ওখান থেকেই সাহেবদের এলাকা শুরু কিনা! কাছেই টেনিস লন, তাদের পছন্দ হলো না আমরা কালো আদমিরা কিলবিল করে সেখানে ঘুরে বেড়াই। সেই আমাদের প্রথম বিদ্রোহ। আদেশ মানলাম না। নালিশ এলো ইস্কুলে হেডমাস্টারের কাছে, ছেলেদের শাসন করো।'

হেডমাস্টার ছিলেন ঢাকার মানুষ, দারুণ স্পিরিটেড, বললেন, 'আমার ছেলেদের তো তোমাদের মতো মাঠ নেই, নদীর ধার ছাড়া। বেড়াবে কোথায়? অতোবড়ো নদীর তীর বন্ধ করে দিলে চলবে কেন?'

বস্, আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো। পেয়াদারা তাড়া করলো, তা-ও, আমরা বেড়াতেই থাকলাম। তখন টেনিস লন থেকে বড়ো সাহেব বেরিয়ে এসে হান্টার দিয়ে আমাদের শায়েস্তা করলো। ওখানে আমরা ছোটো ছেলেরাই বেড়াতাম। এই ঘটনার পরে বড়ো ছেলেরা ক্ষেপে গিয়ে বললো, 'আর নয়, আর আমরা সহ্য করবো না। তোরা কে আসবি সঙ্গে আয়, আজ রাতেই এর শোধ নেবো।'

আমি তখন ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্র, তৎক্ষণাৎ মিলে গেলাম তাদের সঙ্গে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ছেলে বেরিয়ে পড়লাম লাঠি নিয়ে। গর্ত গর্ত জায়গা আর ঝোপঝাড়ে নিঃশব্দে বসে থাকলাম ওত পেতে। রাত্রিবেলা ক্লাব থেকে যেই ফুর্তিটুর্তি করে একটু মত্ত অবস্থায় সব বেরুলো, অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লাম বাঘের মতো। মেরে এক-একটাকে একেবারে লাশ বানিয়ে দিলাম। বড়ো বড়ো সাহেবগুলোকে ধরে নর্দমায় চুবিয়ে দিলাম। দারুণ চ্যাঁচামেচি, হইহট্টগোল আমরা ততোক্ষণে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেলাম।

পালালে কী হবে, পরের দিন স্কুলে এসে যা তাণ্ডব করলো বলা যায় না। লাথি মেরে ভেঙে দিল দরজা, অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলো। কিন্তু হেডমাস্টারমশায় রজনীকান্ত বসু, ভয় পাওয়া বা অ্যাপোলোজাইস করা তো দূরের কথা, সমানে সাপোর্ট করতে লাগলেন আমাদের। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বললেন, 'যা করেছো করেছো আর নয়। এবার শান্ত হয়ে থাকবি, জুতোর খাপ পাওয়া গেছে, ট্রেসপাস হবে। দেখি উকিলরা কী বলে।'

উকিলরা বলবার আগেই যা হলো সারা শহর তোলপাড়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অকারণে মেরেধরে সার্চ করে নাস্তানাবুদ করে তুললো গৃহস্থদের। শেষে প্রমাণের অভাবে থামতে বাধ্য হলো।

আঠারশো সাতানব্বুই সাল সেটা। মানে আটষট্টি বছর আগে। আমার জন্ম আঠারোশো চুরাশি সালে, জীবনের ধারা ওই সাতানব্বুই সালেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অপমানকে অপমান ছাড়া আর কিছুই ভাবিনি তারপর।

'তখন তো আপনি বালক মাত্র।'

'তাতো বটেই। হিসেব মতো বয়েস তখন তেরো।'

'বাবা-মা নিশ্চয়ই ছিলেন—'

'বাবা ওখানকারই প্রাইমারী ইস্কুলের হেডমাস্টার। ওই সামান্য আয়ে আমাদের চার ভাইবোনকে নিয়ে মা সব সময়েই বিপর্যস্ত। তবু কোনোদিন বলেননি, এ সব অপমান গায়ে মাখলে চলবে না, সংসারের ভাবনা ভাবো। কিন্তু আমি নিজেই সংসারের ভাবনা ভেবে, তাঁদের সুখের জন্য নিজেকে তৈরি করতে চেয়েছি, যোগ্য হতে চেয়েছি। ধুবড়ি থেকেই ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা সিটি কলেজে পড়তে এলাম। তারপরেই ভেসে গেলাম জোয়ারে। আমার বাবাও তো পূর্ব বাংলারই মানুষ, তিনিও যথেষ্ট তেজী ছিলেন।'

প্রায় ষাট বছর বিদেশে আছেন, আবাল্য আসামে থেকে বড়ো হয়েছেন তবু, কবে পূর্ব বাংলার মানুষ ছিলেন সেই টান আর ছাড়তে পারেন না।

বললেন, 'ভারি দেশে যেতে ইচ্ছে করে। যদি সম্ভব হয় যাবো।'

আমার হাতে খাবারের প্যাকেটটি তেমনই ধরা ছিলো, খুলে দিলেন, 'খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' উঠে দরজা ঠেলে বাইরে গেলেন, আবার ফিরে এলেন তক্ষুনি। নিজের জন্য আর এক মগ কফি, আর আমার জন্য একগ্লাস কোকাকোলা।

প্লেন সন্ধ্যে সাতটায়, তখন মাত্র বেলা দুটো। আমি বললাম, 'আপনি কতো কষ্ট করে এতোদূরে এসেছেন, ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগছে কিন্তু আপনাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কতো যে ভালো লেগেছিলো, কতো যে আশ্বস্ত বোধ করছিলাম! এখন আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে যে কতো গৌরব বোধ করছি বলতে পারি না। দেশে গেলে আমাকে কিন্তু নিশ্চয়ই আগে জানাবেন—আবার দেখা হবে—'

'আবার দেখা হবে?' থেমে থেমে সামান্য হেসে বললেন, 'আর কি হবে? তেমন হবে না?'

[illegible]

[illegible]

জানালার কাচে তাকিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করলেন; জানো, আমি তখন হ্যারিসন রোডের একটা মেসে থাকি। সেই সময়েই বুয়োর ওয়ার শেষ হলো উনিশশো দুই কি তিন। লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন, 'বাংলা বিভাগ হবে। লীডার সুরেন ব্যানার্জি, ভূপেন বোস, অম্বিকা মজুমদার, এ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিপিন পাল এঁরা একেবারে রুখে দাঁড়ালেন। অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) তখন যুবক, বরোদা কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, ছেড়ে দিলেন চাকরি, আমরাও অনেকে কলেজ ছেড়ে ঢুকে পড়লাম নিরমিত কাজের মধ্যে। সারা ভারতময় আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সেটাই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন। মস্ত মিটিং হলো টাউন হলে, রবিবাবু (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেখানে তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, গানও বেঁধে দিয়েছিলেন একটা, 'হে ভারত আজি তোমারি সভায় শোন এ কবির গান।' অজিত চক্রবর্তী ছিলো আমার সহপাঠী, আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে গানের দল নিয়ে এলো, কী উত্তেজনা! দেশটা যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। রবিবাবু বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। টেবিলে চাপড় মেরে যখন বললেন, 'আমরা সরকারকে ছেড়ে নিজেরাই নিজেদের নির্ভর হবো,' সবাই একেবারে উৎসাহে ফেটে পড়লো। তারপরেই তৈরি হলো সাবানের ফ্যাক্টরি, জুতোর কারখানা—জানো তো, কংগ্রেসের প্রবর্তন হয়েছিলো আঠারো শো পঁচাশি সনে. প্রথম প্রবর্তক ছিলেন আনন্দমোহন বসু, দাদাভাই নৌরোজি, সুরেন ব্যানার্জি, রমেশ দত্ত। প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডব্লিউ সি ব্যানার্জি। প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসের পত্তন হয় বরিশালে। নেতারা গিয়ে সবাই উপস্থিত সেখানে ব্যারিস্টার আবদুল রসুল হলেন সেসনের প্রেসিডেন্ট অশ্বিনী দত্ত হলেন 'চেয়ারম্যান অব রিসেপসন কমিটি', শুরু হলো মিটিং। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের নোটিস এলো, 'সভা বন্ধ করো।' পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেল চারদিক। ভেবে দ্যাখো, কী কাণ্ড। তখন সুরেন ব্যানার্জি বললেন, মিটিং বন্ধ কোরো না, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে আসছি।

গেলেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে, বসলেন মুখোমুখি চেয়ারে, ভুরু কুঁচকে ম্যাজিস্ট্রেট বললো, 'আমি তো আপনাকে বসতে বলিনি।'

সুরেন ব্যানার্জি অসম্মানে অপমানে রাগে লাল হয়ে বেরিয়ে এলেন। অতোবড়ো একজন লীডার, কতো উঁচুদরের একজন মানুষ, কোনো দ্বিধা নেই অভদ্রতা করতে! এরা আবার সভ্য জাত। ছি। আর এদিকে মিটিং বন্ধ না করার দরুন পুলিশ লাঠিচার্জ করলো। মারের চোটে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল সেখানে। কারো মাথা ফাটলো, কারো হাত ভাঙলো, কারো পা ভাঙলো—'

প্রফুল্ল মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন, এতোকাল বাদেও তাঁর চোখের তারা পাওয়ারফুল টর্চের মতো জ্বলতে লাগলো। পিছনে হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন। এই-সব অত্যাচারের নমুনা আমার নিজেরও কিছু জানা ছিলো। আমারও মনে পড়লো সে সব কথা। একবার আমাদের পাশের বাড়িতে অধিক রাত্তিরে হানা দিয়েছিলো পুলিশ। একটি পলাতক ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তারা। কোনো দুপুরে ধরেও ফেলেছিলো প্রায়, পিছন দিকের দেয়াল টপকে আমাদের বাড়ির ভিতর দিয়ে জলপাই বাগান পার হয়ে পালিয়ে যায়। সেদিন রাত্রে সেই ছেলে, যার বয়েস আঠারো, তার অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছিলো লুকিয়ে। সে নিজেও বহু দিনের অনিশ্চিত জীবনে কম ক্লান্ত ছিলো না। সেটা তার মামার বাড়ি। ছেলেটির মা বিধবা ছিলেন। মামারা বললেন, 'আজ থেকে যা। আপত্তি না করে সে-ও রয়ে গেল।' কিন্তু গোয়েন্দার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। মধ্যরাত্রে হুলুস্থুল। আমার খাটের সমান সমান জানালা, শুয়ে শুয়েই সব দেখতে পাচ্ছিলাম। ছেলেটির এক মামী সন্তানসম্ভবা ছিলেন, হুড়মুড় করে প্রায় আটজন-দশজন মিলে শোবার ঘরে ঢুকে ঢুকে হানা দিচ্ছিলো, মশারির ভিতর থেকে টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছিলো সব ঘুমন্ত বাচ্চাদের, ওই মহিলাকেও এক ধাক্কায় ফেলে দিল মাটিতে, তিনি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন, তাঁর স্বামী রুখে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুটের লাথি।

ধরলো হরিদাসকে। ছেলেটির নাম হরিদাস ছিলো। তারপর যে তাকে মারতে শুরু করলো, অকথ্য। অজ্ঞান হয়ে গেলো সে, সেইভাবেই ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুললো। সারা বাড়ির আর্তনাদে পাড়ার প্রতিটি অধিবাসী জেগে উঠে অক্ষম অসহায় রোষে ফুঁসতে লাগলো নিঃশব্দে। পরের দিন বেলা বারোটার মধ্যে ছ' মাস গর্ভবতী মামী অকালে একটি মৃত শিশু প্রসব করে যুদ্ধ করতে লাগলেন যমের সঙ্গে।

তারই কিছুদিন বাদে আর একটি দৃশ্য। ঢাকা ওয়ারির হেয়ার স্ট্রীটে থাকতাম আমরা। খুব ধরপাকড় চলছে কয়েকদিন যাবত, একসঙ্গে তিনজনের বেশী চলা বা দাঁড়ানো নিষেধ। সারাদিন টহল দিচ্ছে পুলিশ, হঠাৎ হঠাৎ কোনো বাড়িতে ঢুকে সার্চ করার নামে তাণ্ডব করছে, মুসলমানের আক্রমণ হলে আত্মরক্ষার সমস্ত উপায়, এমন কি কয়লা ভাঙা হাতুড়ি বা খাটের বাজু পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাচ্ছে, আর যাবার পরেই পাঁচ-সাতশো মুসলমান একসঙ্গে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে কেটে খুন করে আগুন লাগিয়ে সারা পাড়া শ্মশান করে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লাগিয়ে হিন্দুনিধন করছে ইংরেজরা। বাঁচতে তো হবে? সবাই মিলে জোট না পাকালে সঙ্ঘবদ্ধ না হলে শত্রু রুখবে কী করে? বাধ্য হয়েই ছেলেরা তক্কে তক্কে থেকে একসঙ্গে হয়ে পড়ছে বারে বারে। বিকেল তখন চারটে হবে আমি সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসেছিলাম, ছোটো বাগান পেরিয়ে কাঠের গেটটি খোলা রাস্তা দেখা যাচ্ছে সোজা হঠাৎ একটা গোলমাল উঠলো। আমরা সকলেই তখন ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করতাম। আমাদের তো কোনো নিরাপত্তা ছিলো না? চকিতে উঠে দাঁড়ালাম এবং চকিতেই দেখতে পেলাম এক জাঁদরেল সাহেবের এক লাথিতে একটি যুবক ছিটকে এসে আমাদের গেটের ভিতরে মুখ থুবড়ে পড়লো। যুবকটিকে আমি চেহারায় চিনি পাড়ার দলের একজন। এদের আপ্রাণ [illegible]

সাহেবটি হচ্ছেন ঢাকার কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট হাডসন, যার অত্যাচারের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না, হৃদয়হীনতায় যে লোক হিংস্রতম জানোয়ারেরও অধম।

ছেলেটি উঠলো. আমি দৌড়ে কোনো সাহায্যের জন্য কাছে যেতে না যেতেই দাঁতে দাঁত পিষে বেরিয়ে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যেই হাডসনকে গুলি করে পালালো বিনয়। বিনয়-বাদল-দীনেশের বিনয়। যে ছেলেটিকে তিনজন ছেলের সঙ্গে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে তাড়া করে এ পর্যন্ত এসে লাথি মারতে পেরেছিলো তার নাম আমি জানি না। তবেও পারে এই তিনজনেরই একজন। আমি দীনেশকে ছাড়া আর কাউকেই চিনতাম না।

প্রফুল্ল মুখার্জির কাছে বিগতদিনের ইতিহাস শুনতে শুনতে আমি আমার বিগতদিনের ইতিহাসে ফিরে যাচ্ছিলাম। রাজনীতির সঙ্গে নানা কারণে প্রত্যক্ষ-ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কেমন একটা যোগাযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। এ বিষয়ে আমার স্পষ্ট মতামত আছে, বলবার কথা আছে, উৎসাহ আছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা আছে। একজন প্রকৃত সংগ্রামীর মুখে এই লিপি পাঠ করতে করতে আমি অন্য এক জগতে চলে যাচ্ছিলাম। প্রফুল্ল মুখার্জিও কথা থামাতে পারছিলেন না, বিষয় বদলাতে পারছিলেন না. সেই সময়কার দেশ কাল পাত্র স্মৃতি বয়েস—সব তাঁর মনের অন্ধকার থেকে উঠে আসছিলো উপরতলায়, আমার মতো মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসছিলো সব।

বললেন, 'সুরেন ব্যানার্জি ছিলেন বেঙ্গলীর এডিটর, শিয়ালদা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে কলুটোলা বেঙ্গলী আপিসে এসে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন, উই ডিমান্ড ন্যাশানাল এডুকেশন।' বক্তৃতা হলো কলেজ স্কোয়ারে, সেনেট হলে, ঐ সেনেট হলের শেষ গানটা কি জানো? 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' ঐ এক গানেই সব মাত্। হাজার হাজার কণ্ঠ গেয়ে উঠতো 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই গান গেয়ে আমরা কতো চাঁদা তুলেছি, ট্রেজারার ছিলেন পশুপতি বোস, মস্ত জমিদার, সঙ্গীত সমাজ ছিলো ওঁদের বসবার বৈঠকখানা। রাত্রিবেলা গিয়ে সবাই চাঁদা জমা দিয়ে আসতাম। এক বছরে এক লাখ টাকা উঠলো তার উপরে রাজা সুবোধ মল্লিক একলাই দিলেন এক লাখ, টি পালিতও দিলেন, মস্ত ফান্ড হলো। ঐ ফান্ড থেকেই খোলা হলো যাদবপুর কলেজ। 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', কী কথা। রাখী বন্ধনের জন্যই রবিবাবু লিখে দিয়েছিলেন সেই গান। রাখী পরিয়ে ঐ গান গাইলে কি আর কেউ থাকতে পেরেছে? আমাদের ভিক্ষার ঝুলি তখুনি ভরে গিয়েছে তাদের দানে। বিপিনবাবু বলতেন, 'নুন চিনির স্বদেশী চাই না হে. আসল স্বদেশী চাই।' নরেন গোস্বামী, খুদিরাম, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত কতো সব বন্ধু কোথায় চলে গেল। আর কি দেখা হলো তাদের সঙ্গে? আরো কতো মানুষ ছিলো জীবনে, মা বাবা ভাই বোন—কতো কতো—সব কোথায় আজ?'

চুপ করে রইলেন। অন্যমনস্ক ভাবে আবার বললেন, 'কাণ্ড তো কম করিনি। বড়োবাজারে সেই স্বদেশী স্টোর, হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্কোয়ারে যার প্রধান ঘাঁটি—যেদিন স্টোর আরম্ভ হলো, চার পাঁচজন মিলে বড়োবাজারে তো বস্তা ভর্তি কাপড় কিনেছি, কেনা হয়ে যাবার পরে খেয়াল হলো, কারো পকেটেই তো একটা পয়সা নেই, নিজেরা তো হেঁটে যাবো, এই বোঝাগুলো নেবো কেমন করে? আমাদের সঙ্গে রমাকান্ত বলে একটি ছেলে ছিলো, সদ্য জাপান থেকে এসেছে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় পাগড়ি, একেবারে ডায়নামিক পার্সন, গেয়ে উঠলো 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' গেয়েই এক হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল এক গাঁঠরি। ব্যস, সব সমস্যার সমাধান। প্রত্যেকের ঘাড়েই তখন উঠে গেল এক একটি বোঁচকা।

এর মধ্যেই একজন কৃষ্ণনগর অথবা মুর্শিদাবাদের হাকিমকে বোমা মেরে বসলো, হাকিম মরলো না, মরলো তার স্ত্রী। তারপরেই উল্লাস প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ইংরেজ অধ্যাপককে জুতো মারলো। দুটো ঘটনা নিয়েই সাংঘাতিক তোলপাড়। বোমা মারার জন্যে পিউনিটিভ পুলিস বসে গেলো, বেধড়ক ধর পাকড়ে দোষী-নির্দোষীর আর কোনো ভেদাভেদ থাকলো না। আর এদিকে জুতো মারার জন্য চাপ পড়লো সব প্রিন্সিপ্যালের উপরেই। প্রিন্সিপাল ছিলেন পি কে রায়, তিনি তো কিছুই জানেন না, দল পাকিয়েই জুতো মারা হয়েছিলো, কাজেই কে মেরে ছিলো কী করে বলবেন? যারা জানে তারা তো বলবেই না। অথচ খুঁজে বার করতেই হবে। ই এম ফস্টার তখন বঙ্গবাসীতে। তিনি বললেন, যদি বার করতে না-ই পারো, সব্বাইকে রাসটিকেট করে দাও এক বছরের জন্য। তাই ঠিক হলো আবার হুকুম এলো, 'না, তাতে হবে না, সমস্ত সেকেন্ড ইয়ারটাই তুলে দাও।'

এটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। পি কে রায় তখন নিরুপায় হয়ে ছুটলেন আশুতোষ মুখার্জির কাছে, আশুতোষ মুখার্জি সারদারঞ্জন রায়কে ডাকলেন পরামর্শ করে শেষে ই এম ফস্টারকেও ডাকা হলো। বোঝানো হলো এসব ইমো-শনাল ছেলেদের আরো ক্ষেপিয়ে লাভ নেই, আগুন আরো জ্বলবে, বরং শাস্তি উগ্রতা কমালে শান্ত হতে পারে। এ প্রস্তাব সমীচীন মনে হলো তাদের, মাত্র এক সপ্তাহের শাস্তি নির্ধারণ করেই নিষ্পত্তি হলো সে ঘটনার।

কিন্তু উল্লাস কলেজ ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঢেলে দিল দলের কাজে। পুলিস তো নিষ্ক্রিয় ছিলো না, নেতাদের মনে হলো জালে করে জেলেদের মাছ তোলার মতো এবার ওরা একসঙ্গে আমাদের সব্বাইকে টান দেবে। সেই ভয়ে অনেকটা আবার কিছুটা বাইরের জগতে আমাদের অবস্থাটা জানাবার জন্যে কয়েকজন ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া স্থির করলেন তাঁরা।

আমরা চারজন—আমি, হেরম্বলাল গুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, আর ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এলাম এদেশে, তারকনাথ দাস, রাসবিহারী ঘোষ আর ফণি ব্যানার্জি গেলে জাপান।'

আমরা গ্রেফতার করেছিলাম।'

প্রফুল্ল মুখার্জির কণ্ঠস্বর বহুকাল বিদেশে বাস করার জন্যই কিনা জানি না র নিচু. আস্তে কথা বলা অভ্যাস, তারই মধ্যে কিছুটা গলা তুলে বললেন, 'বার ল বাঙালীরা অলস, অপদার্থ, তাদের আমার বলতে ইচ্ছে করে ছাতু আর জল য়ে লোটা কম্বল সম্বল করে করে দাওয়ায় পড়ে থেকে বাঙালীরা বড়ো ব্যবসার ায় মূলধন সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখে না বটে, তবে শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাধীনতার ব্যক্তিক স্বপ্ন তারা দেখতে জানে। এই স্বাধীনতার যজ্ঞে বাঙালীর মূলধন বড়ো ম ছিলো না।' থেমে বললেন, 'এই যে আমরা এতোগুলো আঠারো কুড়ি বাইশ য়ের ছেলে ইংরেজের তাড়া খেয়ে স্বদেশ স্বজন ছেড়ে বিদেশের অজ্ঞাত অনিশ্চিত মিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, মেহনত না করে তো বেঁচে থাকিনি? সম্বল ী ছিলো? শীতের দেশ, কত্তো জামা জুতো লাগে, তাই কি আমাদের ছিলো?

'কী করলেন তবে?'

'প্রথম যে চারজন আমরা এসেছিলাম, লন্ডন থেকে রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী র্মানন্দ আমাদের পরিচয় দিয়ে নিউ ইয়র্কের একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ারের ছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠি পড়ে তিনিই একটা থাকার জায়গা ঠিক য়ে দিলেন, একটা কারখানার ম্যানেজারের কাছেও পাঠিয়ে দিলেন। ম্যানেজার ললেন, কী কাজ চাও? আমরা বললাম, যা দেবে তাই শিখে নেবো। হয়ে গেল করি। এক সঙ্গেই চার জনের হলো।'

'বাঃ বেশ তো।'

'আমাদের তো কোনো চয়েস ছিলো না, চাহিদাও ছিলো না। সারাদিন ভূতের টুনি। এক বছর ছিলাম সেখানে। অতি কষ্টে থেকে সামান্য টাকা জমিয়ে ফেলে- লাম, সেই টাকাতেই আমি গেলাম ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে. খানকার টিউসন ফী খুব কম। একটা ফ্যাক্টরিতে টুকটাক কাজ করে সামান্য পার্জনও হতো, এক বছর পড়লাম সেখানে।'

'আর ওঁরা।'

'ধীরেন গুপ্ত গেল হার্ভার্ডে, ধীরেন সেন টি কোম্পানীতে কাজ নিল।'

'তারপর?'

'এক বছরের বেশী সেখানেও থাকতে পারলাম না। পড়াশুনো করে যতোটুকু মর পেতাম, তাতে মাত্রই দু তিন ডলার উপার্জন হতো, খরচ চলতো না। খবরা- খর করে সামারে চলে এলাম পিটসবার্গে, স্টীল প্ল্যান্টে কাজ যোগাড় করে লাম একটা। সেখানেও এক বছর। আবার হাতে কিছু জমলো, সেখানেই বিশ্ব- দ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। রেস্টোরেন্টে হাউসে টেবিল সাফ করতাম, খাওয়াট ী, একটা স্টোরে গিয়ে দাঁড়াতাম. তাতেও পেতাম কিছু, হাত খরচটা চলে যেতো। ই করে করে তিন বছরে ডিগ্রীটা হয়ে গেল। কিন্তু সে সব শুনে আর কী রবে?'

হেসে বললাম, 'আমি আর কী করবো, কোনো উদ্যোগী ছেলে হয়তো অনু- াণিত হতে পারে। তাছাড়া স্বাধীনতার জন্য একজন উৎসর্গীকৃত মানুষের জীবন ত্তান্ত তাঁরই মুখে শোনাটাও তো কম মূল্যবান নয়?'

'আরো অনেক ছেলে এসেছিলো তারপরে। শৈলেনও এলো, তুখোড় ছাত্র. টট স্কলারশিপ পেয়েছিলো, নেয়নি। বোমার কেসে পড়েছিলো তো? পালাতে রেছিলো। ব্রিটিশ সরকারের দক্ষ নজর এড়িয়ে পালানো সহজ নয়। ওয়াকেট হলো। কীভাবে জাহাজের স্টোর কীপার হয়ে যে চলে এলো কে জানে? আমরা কন্তু ততোদিন বসে ছিলাম না। এখানে এসে কষ্ট করে শুধু নিজেদের বিদ্যা- ৃদ্ধি বয়েস বাড়িয়েই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করাই আমাদের উদ্দেশ্য হলো না। সেটা আসল কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো। তারক চলে এসেছে জাপান থেকে, সুধীন বোস আছেন, তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রফেসর এদেশে। ছিলেন য়োয়া সিটিতে, শিকাগোতে আছেন কুমারস্বামী। আদান-প্রদানে সমস্ত কাজ সুগতিতে চলছে, মিমিওগ্রাফ করে ফ্রী হিন্দুস্থান নামে কাগজ বার করেছি, াইরীশরা আমাদের পক্ষ সমর্থন করে লিখছে সেই কাগজে। টলস্টয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তিনিও চিঠি দিয়েছেন, কুমারস্বামীও লিখছেন। সমিতিও লো একটা, নাম হলো 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন', সুধীন প্রেসিডেন্ট ামি ভাইস প্রেসিডেন্ট. রফিউদ্দীন আমেদ সেক্রেটারি। দেখতে দেখতে কতো ব্রাঞ্চ খোলা হয়ে গেল। নিউ ইয়র্ক শিকাগো উইসকনসিন মিশিগান বার্কলি ইলিনয় ঠাহা—সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো কর্মীরা. সেনেটরদের সঙ্গে দেখাশুনো করে শুধু পাওয়া গেল অনেক, ওয়াশিংটনের সেনেটররা সত্যি খুব সাহায্য করেছিলেন। ামদের ফ্রেন্ডস ফর ফ্রিডাম ফর ইন্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে অনেক আমেরিকান ্র হলো, আইরীশরা তো ছিলোই। লালা লাজপৎ রায় এলেন, আমিই সমস্ত বন্দোবস্ত করে তাঁকে নিয়ে এলাম আইরীশদের মিটিংয়ে। জন ডিভয় ছিলেন াইরিশ-কাগজের লীডার। লাজপৎ রায় এসে বললেন, 'আমরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস ই।' একথা শুনে আমাদের তো লজ্জায় মাথা হেঁট। খুব ঝগড়া হয়ে গেল ামার সঙ্গে। পিটসবার্গে আমার সঙ্গেই ছিলেন তিনি। যাই হোক, আমেরিকাতে মরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এমন একটা ফিলিং, তৈরি করতে পেরেছিলাম যে, াটিশকে যথেষ্ট দোষারোপ করে লেখালেখি করতে লাগলো ওরা। মিস এন্ড লে এক মহিলা ওপিয়াম ট্রেইড ইন ইন্ডিয়া বলে একটা বইও লিখলেন ওদের পক্ষে। তাতে লেখা থাকলো কী ভাবে ইংরেজরা খোলাবাজারে আফিম বিক্রী করে াককে 'করাপ্ট' করে, নিস্তেজ করে দেয়। চীনে জাতটাকে তো প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে—ভারতবর্ষে সেটাই শুরু করেছে এখন। পাটের আপিসে যেসব মেয়েরা াজে আসে, তাদের ছেলেমেয়েদের ওরা আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। এই বর ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে। বেশ একটা ঘৃণা তৈরি হলো সকলের মধ্যে। দেখলো সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকা বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তৎক্ষণাৎ প্রচার করলো আমরা সব বিদ্রোহী, সব শ্বেতাঙ্গদেরই শত্রু, সুতরাং সাবধান। আমাদের উপরও কড়া নজর রাখলো। তখন অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বাধা হয়ে গেল আমাদের জীবন।

পিটসবার্গে এসে শৈলেন আমার ভাই পরিচয় দিয়ে আমার কাছেই ছিলো। সুভাষবাবু চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন ওকে রাখবার জন্য। নির্দিষ্ট পদ্ধতিও ঠিক করা ছিলো কাজকর্মের। সেই মতো নিউ ইয়র্কে এসে যেখানে সব লেবার আপিস সেখানেই একটা ছোটো ঘর নিয়ে আমাদের আপিস খোলা হলো। কিন্তু টাকার তো দরকার? আমি তখন গ্র্যাজুয়েট করে 'ইউনাইটেড স্টেটস স্টীল কর্পোরেশনে' কাজ করি। শৈলেনও আইরীশদের 'ক্যাথলিক' চার্চে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ভালোই উপার্জন করতে লাগলো। শৈলেন নিজেদের দৈন্য দুর্দশার কথা খুব সুন্দর করে বলতে পারতো। লোকেদের মন ভিজে যেত ভারতবর্ষের জন্য। তারপর চাটগাঁয়ের যে সব নাবিকরা নেমে আর জাহাজ ধরতে না পেরে বাধ্য হয়েই থেকে গেছে এদেশে, খুঁজে খুঁজে বার করা হলো তাদের। তারা ঘুরে ঘুরে বোতাম বিক্রী করে আমাদের টাকা তুলে দিত। ফ্ল্যাগও বিক্রী করতো। ন্যাশানাল ফ্ল্যাগ, লেখা থাকতো ফ্রী-ইন্ডিয়া। ছোটো বড়োর দু রকম দাম ছিলো, পঁচিশ সেন্ট আর পঞ্চাশ সেন্ট। তা-ও কম বিক্রী হতো না। সব ভারতীয় হৃদয়ের সঙ্গে তখন আমাদের যোগাযোগ, প্রায় আড়াই শো তিনশো ছেলে ছড়িয়ে আছে বিদেশে, তারা সবাই যুক্ত হলো এই একই প্রচারে। তার মধ্যেই যুদ্ধ লাগলো। উনিশ শো চোদ্দো সাল সেটা, ইংল্যান্ড জার্মানী ফ্রান্স। আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন এলো। আমরা তখন ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম তোমরা যদি ডেমোক্রেটিকই হও, তবে এদের কী করে সাহায্য করবে? এতবড়ো একটা দেশকে যারা ওরকম করে রেখেছে?' থেমে প্রফুল্ল মুখার্জি তাঁর নিবে যাওয়া চুরুটটাকে ধরাবার জন্য লাইটার জ্বালাতে চেষ্টা করলেন। তখনই দরজায় টোকা পড়লো, এয়ার ইন্ডিয়ার সহাস্য সুন্দরী অভ্যর্থনা- কারিণী মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি, প্লেন এসে গেছে।' ঘড়িতে দেখলাম সাতটা বাজতে কয়েক সেকেন্ড বাকী।

চমকিত হয়ে প্রফুল্ল মুখার্জি বললেন 'তা হলে—'

আমি প্রণাম করে বললাম, 'আবার দেখা হবে দেশে।'

তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমা খুলে মুখ মুছলেন, জবাব দিলেন না। তারপর যতোদূর দেখা গেল উড়তে লাগলো সেই রুমাল। এক সময় সেই সুতোটুকুও যখন হারিয়ে গেল। আমি ঝাপসা চোখে আকাশে উঠতে উঠতে বুঝতে পারলাম সেই সুতো আর জোড়া লাগবে না কোনোদিন। এই শেষ।

সত্যিই আর আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য
মনোহর. রেশম কোমল. স্নিগ্ধ সুন্দর

লাক্স সুপ্রীম আপনার রূপ-লাবণ্য করে তুলবে এই রকম অপরূপ অতুলনীয়। এতে আছে অপূর্ব সুরভির আবেশ। এর ক্রীমে ভরপুর রাশি রাশি ফেনা আপনার ত্বকে রেখে যায় রেশম চিকন পরশ। লাক্স সুপ্রীমের বিউটি ক্রীম আপনার রূপ-লাবণ্যকে ক'রে তোলে রেশম কোমল, স্নিগ্ধ সুন্দর।

এর পর আপনার
আর কিছুই পছন্দ হবে না

HLL:.1060

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আলোচনা যখন সমতা হারায়

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

আলোচনা যখন সমতা হারায়, তখন সেই বস্তুটি আর যাই হয়ে উঠুক না কেন, অন্তত সমালোচনা হয় না। হয় সেটি কটূক্তি, নতুবা হয়ে দাঁড়ায় প্রশস্তি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রথমোক্ত শ্রেণীর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ হয়ে দাঁড়ায় কটূক্তি।

আমাদের সমালোচনার সাহিত্য খুব একটা বয়স্ক নয়। তবে একবারে কিশোর বালকটিও নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই এই শিশুটি গুটি গুটি হাঁটতে শিখেছিল। একদা 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম যা লিখতেন সেই ছাঁদেই গড়ে ওঠে এ সাহিত্য। মহৎ সাহিত্যকে স্বাগত জানাতে বঙ্কিম যেমন উদার-হৃদয় ছিলেন তেমনি ততোধিক নিষ্ঠুর ছিলেন সাহিত্যের আঙিনা থেকে কুসাহিত্যের বিদায়ের ব্যাপারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর ফলে একশ্রেণীর লেখকদের কাছে তিনি দ্রুত বিরাগভাজন হলেন। ওঁরা হয়ে উঠলেন বঙ্কিম-বিরোধী। আর কেবল বঙ্কিম কেন, ওঁদের হাতে সেকালের বড়ো বড়ো অনেক সাহিত্যিকই হলেন আক্রান্ত। হুতোম দীনবন্ধু থেকে রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ কোনো সাহিত্য-সাধকই রেহাই পেলেন না। এঁদের আক্রমণের ভাষা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি জোরালো। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, আজকের দিনে সেভাষা পড়তে বেশ মজা পাওয়া যায়। উপভোগও করা যায়। কেননা তাদের অক্ষমতা বড়োই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে নিষ্ফল আক্রোশ।

বারো শ একাশি সালের 'মাঘ' সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা হল, 'আজি কালি বাঙলা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে উভয়ের অপত্যবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারেন না। আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহাসকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন লেখকদের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। 'বৃত্রসংহার' বা 'কল্পতরু' বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।'

এই লেখার শেষে গ্রন্থ-সমালোচনার বিষয়ে তিতি-বিরক্ত হয়ে লেখক লিখেছেন, 'আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয়, এমত চেষ্টা করিব।'

ভিমরুলের চাকে ঢিল মারলে যা হয়, এর পরের অবস্থা প্রায় অনুরূপ হয়ে দাঁড়াল।

ঐ একাশি সালের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে-সব গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার দরুন একদল লেখক আগে থেকেই চটে ছিলেন। এখন ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পাঠের পর আরো অনেকে আরো বেশি রকম চটে উঠলেন। এবং এঁদের বক্তব্য ছিল এই রকম : 'বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ অবধি এ পর্যন্ত কত গ্রন্থকার যে ইহার নিকট অভ্যর্থ্যাচিত তিরস্কার লাভ করিয়াছেন তাহা বঙ্গদর্শনের পাঠকমাত্রেই জানেন। তথাপি কি সাহস, কি বিবেচনায় তাহারা বঙ্গদর্শনে সমালোচনার জন্য আপন আপন পুস্তক পাঠান, আমরা বুঝিয়া উঠিতে

আসে যায় না। তবে গ্রন্থাকারদিগের এ রোগ কেন ?

কারকটা গ্রন্থের ব্যাপারে সোজাসুজি অভিযোগও উদ্যত হল। সে অভিযোগ এই রকম : '..... অপাত্রের সঙ্গে সৎপাত্রকেও সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবু তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন; দৃষ্টান্ত স্বপ্ন প্রয়াণ কাব্য। আমরা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠে স্বপ্ন প্রয়াণের নাম দেখিয়া মনে করিলাম, বুঝি ভিতরে ইহার সমালোচনা আছে। কিন্তু বই খুলিয়া দেখি কয়েকটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ কি ? অর্থ যিনি যাহা মনে করুন, আমরা বুঝিলাম যে স্বপ্ন প্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শনের সমালোচনার যোগ্য নহে; কেননা ইহাতে কামমুগ্ধ যুবক-যুবতীর প্রেম ঢলাঢলি নাই। তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু একজন বড়লোক তাঁহার কাব্যকে একেবারে উল্লেখ না করা সহজ নহে। অতএব ভাল-মন্দ কিছু না বলিয়া বঙ্গদর্শনে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করা গেল, পাঠকগণ ভাল-মন্দ বাছিয়া লউক।'

অভিযোগ আরো আছে। অজ্ঞাত ও অপরিচিত মধুসূদন সরকারের গ্রন্থ সম্পর্কে এই অভিযোগকারীদের বক্তব্য হল, 'ইহার জন্য দেড় পৃষ্ঠা জুড়িয়া সমালোচনচ্ছলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল : শেষ লেখা হইয়াছে, "মধুসূদন সরকারস্য পৃষ্ঠদেশ বঙ্গদর্শনের বেত্রাঘাতের যোগ্য নহে"...... বাঙলা সাহিত্যে মিথ্যা কথা, পুরুষ হইয়া রমণীর সাজা প্রভৃতি অনেক জুতাজুতি হইয়াছে। বঙ্গদর্শন তাহার কি পথ দেখাইলেন ?'

অবশ্য প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এই যে বঙ্গদর্শন' বিরোধী মনোভাব, এই ভাবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন 'সোমপ্রকাশের লেখক গোষ্ঠী।' বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হবার বছর বারো আগে প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা। আঠারো শ আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের পনেরোই নভেম্বর এ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। শহর কলকাতার চাঁপাতলা থেকে এটি বের হল। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন সম্পাদকতার। এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর দেওয়া তথ্য হল : 'শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদাপ্রসাদ নামে তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রব প্রথম প্রকাশিত হইল। দ্বারকানাথ সম্পাদকতা ও তাঁহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কণের বায়ভার গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক শ্রেণী গণ্য হইলেন। কার্যকালে সারদাপ্র আসিলেন না, অপরাপর লেখকগণও অদৃশ্য হইলেন ; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে দ্বারকা বিদ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়া গেল। তি অধ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসরকাল পাইতে তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করি লাগিলেন।

অধ্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকাটির জন দ্বারকানাথ যে পরিশ্রম করতেন, তা ছিল চো পড়বার মতন। না, পত্রিকার ব্যাপারে তাঁর কো ফাঁকি ছিল না। এ সম্পর্কেও শিবনাথ শাস্ত্র সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। শাস্ত্রীমশাই ত মাতুলের কথায় লিখেছেন, 'তিনি যখন সংস্ক কলেজের পুস্তকালয়ে পাঠে মগ্ন থাকিতেন, ত দেখিলে বোধ হইত না যে অধ্যাপকতা কার্য সুচার রূপে নিষ্পন্ন করা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে কোন কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকা জন্য রাশিকৃত বিলাতি সংবাদপত্র, গবর্ণমেন্টের রিপো ও গ্রন্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দি ঘন্টার পর ঘন্টা যাইত তাহার জ্ঞান থাকিত রাত্রি এগারটার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূ দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন, রাত্রি চার সময় উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছে আমার বয়সের মধ্যে তাঁহাকে কখনও ঘুমাই দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না।'

অঠারো শ ছিয়াশি খ্রীষ্টাব্দের তেইশে আগ তারিখে বিদ্যাভূষণ মশাই পরলোকে গমণ করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে য ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও যে এ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, তাও দেখা গেছে। সুতে এই দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকাটিকে অবলম্বন করে এক লেখকগোষ্ঠী এবং একটি সাহিত্যাদর্শ যে গড়ে উঠে ছিল, তাতে আর সংশয় কী! ভূদেব মুখোপাধ্যা এই সত্যটির ওপর আলোকপাত করেছেন। তি লিখেছেন, 'বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গালা সংবাদপ প্রথম শিক্ষা গুরু। তাঁহা হইতেই বাঙ্গালা সংবাদপ উন্নতি হয়। পূর্বে ভাস্কর প্রভাকর সমাচারচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল ছিল বটে, কি সংবাদপত্রের উপযুক্ত বিষয়সমূহ সেই সকল প লিখিত হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সুপন্ধতি বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের প্রকৃত পথ পরিদর্শ করেন।'

তবে সংবাদপত্র পরিচালনার সুদীর্ঘ সময়ে ভেতর দ্বারকানাথের মাঝে মাঝে একটু বিরতি ছিল এবং কেবল বিরতির সময় নয়, পরেও কিছু কি দায়িত্ব অন্যদের ওপর অর্পিত হত। —'১৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্মবাহুল্যের দর দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশের' সম্পাদক ভার মোহনল বিদ্যাবাগীশের হস্তে দিয়া কিছুদিনের জন্য অব গ্রহণ করেন।' —১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকুলার প্রে অ্যাক্ট জারি হলে 'রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকে এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া' যায়। এর পর পত্রিকাটি নব কলেবর ধারণ করিয়া.......কালিকা মুজাপুর দপ্তরি পাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হই প্রতি সোমবার প্রকাশিত' হতে থাকল। তবে, 'ইহ অল্পদিন পরেই "সোমপ্রকাশ" হস্তান্তরিত হইয় ছিল।' মোট কথা, এই পত্রিকাটির ধারাবাহি ইতিহাসের ভেতর দ্বারকানাথের প্রভাব থাক সর্বত্র তা অপ্রতিহত ছিল না। কিন্তু তাই ব তাঁর মতামতের বাইরে কিছু হত, এ অনুমা যথার্থ নয়। —অন্তত বঙ্কিম বিরোধিতার ব্যাপ দ্বারকানাথের যে সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

আবার শিবনাথের স্মরণ নেওয়া যাক। শিব এদিনের স্মৃতিকথায় লিখেছেন 'বঙ্কিম

এবারের শীতে কারা কটসউল পরবে বলুন তো?
বুদ্ধিমতী মেয়েরা—যারা কটসউল
প্রিন্ট ও প্লেন—মিলিয়ে-মিশিয়ে,
মানানসই ক'রে পরতে ভালবাসে।
কেতাদুরস্ত পুরুষগণ—
রঙদার পোশাক যাঁরা
ভালবাসেন। যাঁরা গাঢ় রঙের
শীতের স্যুটের নিচে গরম কটসউলের
ঝলমলে চেকের পোশাক চান।
ফ্যাশনদুরস্ত মহিলাগণ—
যাঁরা নরম ও উষ্ণ কটসউল
শালের আরাম সদ্য-সদ্য
অনুভব করেছেন।
এবং, ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা—
যারা চিরটাকাল কটসউল পরে
আসছে। হালকা নানা রঙা ও
ঝলমলে এক রঙা, ফুলকাটা প্রিন্ট
ও ঝকমকে ডোরাকাটা পোশাক
যারা ভালবাসে। যাদের অঙ্গে শোভা
পায় শীতের ডিজাইনের রকমারি বাহার!
OBM 4316
DS
বিনামূল্যে!
একটি ২০ পৃষ্ঠার কটসউল ক্যাটালগ
পাবেন—"ডিজাইন ফর এ ওয়ার্ম, ব্রাইট
উইন্টার।" কুপনটি আপনি ডাকযোগে
এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন:
বিন্নী লিমিটেড
পোস্ট বক্স নং ২৩০১ বাঙ্গালোর-৫৬০ ০২৩
নাম
ঠিকানা
বিনি
কটসউল
রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক
পশমের উষ্ণতা আর
সূতীর কোমলতার মিশ্রণ

লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা এক দিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষরী ভাষা ও অপর দিকে আলালী ভাষার ব্যাখ্যা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকারীদিগের নাম "শব-পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে, যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে, কেহই "শবপোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে "শবপোড়া মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্যের চানা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।'

বিরোধ কীভাবে বেধে গেল, তার একটি সুস্পষ্ট ছবি আমরা পেলাম। বিদ্যাভূষণের সঙ্গে বঙ্কিমের যে বিরোধ, তার সূচনা যে ভাষাদর্শ থেকে একথা খুবই সহজে শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এ বিরোধ কী শুধুই ভাষাদর্শ নিয়ে। সাহিত্যাদর্শ নিয়ে নয়?—এছাড়া বঙ্কিমের পুস্তক পর্যালোচনার কঠোর মন্তব্যগুলিও কী এই বিরোধীদের মনের গভীরে অঙ্কুশ হয়ে ছিল না? 'সোমপ্রকাশে' যে সব চিঠি ছাপা হত, সেগুলির ভাষা এবং আক্রমণের ভঙ্গী কী যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিল? কেবল চিঠি কেন. ঐ পত্রিকার যাঁরা লেখক, তাঁরাও কী সর্বত্র শালীনতা বাখতে পেরেছেন? —'সোমপ্রকাশের' চোদ্দ বছর পরে বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। এবং আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' যেভাবে বাঙালীর মন জয় করে নেয়, তা অনেক পত্রিকা-পরিচালকের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমাদের জিজ্ঞাসা, 'সোমপ্রকাশের' মনের গভীরের এই ঈর্ষাই শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম-বিরোধিতার উৎস হয়ে দেখা দেয়নি তো?

'সোমপ্রকাশে'র কোনো কোনো বিশেষ লেখার ওপর সম্পাদক মশায়ের প্রশ্রয় ও প্রচ্ছন্ন অনুমোদন যে ছিল, তা একটু খুঁজলেই বের করে দেওয়া যায়। এমন কী একথাও মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই সব লেখার ভেতর যে অশালীন ভঙ্গীটুকু রয়েছে, তাও যেন পরিকল্পিত। বারো শ পঁচাশির মাঘ সংখ্যায় 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা' নামে একটি আলোচনা প্রকাশিত হল। এই আলোচনা লিখিত হবার উপলক্ষ ছিল একটি সভা। জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনে মাঘ মাসের সাত তারিখে এই সভা হয়। রামমোহনের স্মরণ সভা। এখানে যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ। ছিলেন রামমোহনের জীবনী প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বয়ং রাজনারায়ণ বসুও ছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এঁরা সকলেই মাননীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। শুধু সেকালের নয়, সর্বকালের। এঁদের ভেতর আবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সভার আহ্বায়ক। 'আমার বাটীতে সভা হইবে' একথা তিনি আগেভাগেই বিজ্ঞাপিত করেছিলেন নিমন্ত্রণপত্রে। এই সভার বিবরণ বিবৃত করতে গিয়ে 'সোমপ্রকাশে'র আলোচক যেভাবে ওঁদের এক হাত করে নিয়েছেন, তা পড়তে পড়তে আজকের দিনের সাধারণ পাঠকরাও রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়তে পারেন।

প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছেন বেচারি দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'দেবেন্দ্রবাবু এখনও জীবিত আছেন, সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন্ আইন ও কোন শিষ্টাচারানুসারে বিজ্ঞাপনে "আমার বাটীতে সভা হইবে" লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেবল ইহা নহে, তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন. তাহার

লেন? আমি ও আমার পরিবর্তে আমাদের ও আমরা বলিলে কি অপমান হইত?' নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে এঁদের অভিযোগ ছিল বক্তৃতার সময় 'বড় শীঘ্র শীঘ্র "নোট পেপার" দেখিয়াছিলেন'। রাজনারায়ণ বসুকে এখানে চিত্রিত করা হয়েছে বিদূষক হিসাবে। —'ইনি মাথামুণ্ডু কি যে বলিয়াছিলেন, কেন যে বলিতে উঠিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন।' আমরা তাহা জানিনা। কোথায় সকলে রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইবে, দুঃখ করিবে, রোদন করিবে, না কোথায় সকলে ইঁহার কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।' শুধু এইখানেই শেষ নয়। উপসংহারে রাজনারায়ণ বসুর জন্য দুঃখ করে বলা হয়েছে. 'ইঁহার ন্যায় লোকের এরূপ কুরুচি দেখিলে যথার্থই মনে বড় কষ্ট হইয়া থাকে।'

না আলোচনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'সোমপ্রকাশের লেখক-

পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে দি[...] হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পত্রপ্রেরকতা দে[...] ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষের বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটিও ললিত ও সর্বজ[...] হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই। তাহা হউক, যদি কেহ তুলা[...] মানে দুর্গেশনন্দিনীর গুণদোষের পরিমাণ করে[ন] গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই।'

বেশি নয়, মাত্র সাত আট বছরের ব্যবধা[নে] বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এঁদের ধারণাটি আমূল পরি[ব]র্তিত হয়ে গেল। তখন গুণদোষের বিচা[রে] গুণের থেকে গুরুভার হল দোষ। তবে মজা[র] ব্যাপার এই, এই দোষকে সোজাসুজি দোষ ব[লে] চিহ্নিত করা হল না। প্রথমে একটু ভালো ব[লে] নেওয়ার একটি ছল রইল, পরে আক্ষেপে দেখা[নো] হল, আহা! এমন ভালো যে, সে গেল খারা[প] হয়ে! কিংবা ঘুরিয়ে বলা হল, হ্যাঁ, সর্বনাশ [...] করবার, তা করেছেন, তবে ও'র একটু গু[ণ]

কলেজ রিইউনিয়ন "আজ্ঞে আজ্ঞা হোক, মহাশয় ভালো আছেন?"

গোষ্ঠী যে আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করতেন, তার ভেতর ছিল একটি কালাপাহাড়ী ও অনমনীয় মনোভাব। নিজেদের এঁরা মনে করতেন অভ্রান্ত। ফলে, সমালোচনার ভেতর যে শ্রদ্ধাবোধ ও সভ্যতা থাকলে তা যথার্থ হয়ে উঠতে পারে, এ লেখাগুলি তা হতে ব্যর্থ হল। এঁদের আক্রমণ তাই ধার হারাল, শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না সংযমও। সুতরাং সমালোচনা পরিণত হল কটু-আলোচনায়। আর সব থেকে বেশী যিনি আক্রান্ত হলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। এবং ততোধিক বেশী সমালোচিত হল তাঁর পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কীভাবে ধাপে ধাপে আক্রমণ করা হল, তার পর্যায়টি একটু একটু করে খতিয়ে দেখা যেতে পারে। আঠারোশ পঁয়ষট্টিতে যখন 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশিত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নিতান্তই একজন লেখকমাত্র। লেখার জগতে তখন তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। তাই 'সোমপ্রকাশে'র ভাষায় তিনি মোটা-মুটি প্রশংসাই পেলেন। তবে এ প্রশংসা উচ্ছ্বাসে ভরা নয়। —'দুর্গেশনন্দিনী' যে একটি অসাধারণ গ্রন্থ— না, সমালোচক তা ধরতে পারেন নি। এমন কী এটি অভিনব বলেও চিহ্নিত হয়নি। নিতান্ত সাদা-মাটা ভাষায় এর দোষ-গুণের খতিয়ান করা হয়েছে। উপসংহারে লিখিত হয়েছে, 'এদেশের লোকের এক

ছিল।— উদাহরণ হিসাবে একটি চিঠির অং[শ] উদ্ধার করা গেল, 'যদিও বঙ্কিমবাবুর আদির[স] প্রবাহিণী "মেয়েলী" ভাষাতে অনেক নির্বোধ যুবক-যুবতীর সর্বনাশ হইয়াছে, বঙ্গীয় অর্ধশিক্ষি[ত] নবেল-প্রিয় যুবক-যুবতীর মধ্যে কুরুচি [ও] কুনীতির প্রশ্রয় দিন দিন বাড়িতেছে, তথাপি বঙ্কিমবাবুর একটি গুণ ছিল; —তিনি অতি কদর্য জিনিসকেও সুন্দর করিতে পারিতেন। এই জন্যই তিনি নবেলরূপে যে সব নরকের সৃষ্টি করিয়া-ছেন, তাহার মনোজ্ঞ আবরণে ভুলিয়া অসার হৃদয় যুবক-যুবতী তাহাতে ডুবিতেছে।' —এখানে বঙ্কিমকে যেভাবে নিন্দা করা হল, তা রীতিমত চমকপ্রদ। ভয়ঙ্কর কদর্যতায় আকর্ষণ করিয়া তোলাই যে বঙ্কিমের প্রধান গুণ, এরকম ব্যাখ্যা অবশ্যই অভিনব, তবে তার লোকও চোখে পড়া মতন হল এঁদের বাচন-রীতি। এভাবে একজন সাহিত্যিককে যে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়, তা যে কোনো সমালোচকের পক্ষেই একটি অচিন্তনী[য়] ব্যাপার।

কিন্তু 'সোমপ্রকাশ'-এর কাছে এটাই ছি[ল] রীতি। এভাবেই তাঁরা সমালোচনা করতেন[,] করেছেনও।

এবার বঙ্কিম-বিরোধিতার কিছু কিছু নমুনা

'সোমপ্রকাশে'। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' যখন ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছে, তখন উপন্যাসটির নানা দোষ দেখিয়ে মন্তব্য করা হচ্ছে, 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের এ দোষ মার্জনীয় নহে।' —'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল'-এর উল্লেখ করে বলা হল, এ 'বিষয় বঙ্গদর্শনে শোভা পায় না।' —'জন স্টুয়ার্ট মিল' প্রবন্ধটির ওপর মন্তব্য করা হল, 'প্রস্তাবটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলের জীবনী সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই জন্মে না। এরূপ অবাপ্তি নিতান্তই দোষবহ সন্দেহ নাই।' —'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়েছে, 'বঙ্কিমবাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ "অপাঠ্য" বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহার বিষবৃক্ষও সেইরূপ "অপাঠ্য" হইয়াছে সন্দেহ নাই।' 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শৈবলিনী সম্পর্কে এঁরা লিখলেন, 'এই শৈবলিনী চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিমবাবু এরূপ জঘন্য ভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থ বাঙ্গালী কাহিনীতে দৃষ্ট হয় না।'

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'গর্দ্দভ স্তোত্র'টি সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা যে সবরকম শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না, 'বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য!!! গর্দ্দভ স্তোত্রটি তাহার অনুরূপ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। গর্দ্দভ বুদ্ধি যখন যাহার ঘাড়ে চাপে, সে সময়ে তিনি যে গর্দ্দভবৎ ব্যবহার করেন, তাহা আশ্চর্যের নহে।' —অথচ একথা কে না জানে যে বঙ্কিমচন্দ্রের এ রচনাটি ব্যঙ্গ রচনা হিসাবে সর্ব্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারত কলঙ্ক' লেখাটির ভাষা নিয়ে নানান কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। এবং উপসংহারে কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।'

এইভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কেবল বঙ্কিম কেন, তাঁর যিনি সর্বাধিক কাছের মানুষ, সেই দীনবন্ধু মিত্রও অনুরূপ ভাষায় এবং অনুরূপভাবে হয়েছেন লাঞ্ছিত। দীনবন্ধুর 'সুরধুনী কাব্য' এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও, তাঁর 'দ্বাদশ কবিতা' তা পারল না। বরং এই গ্রন্থটিকে উপলক্ষ করে বেশ এক প্রস্থ গালাগাল দিয়ে নেওয়া গেল। এই নিন্দার কিছু কিছু ভাষা এই রকম : 'বাবু দীনবন্ধু এ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থ লিখিলেন ; কিন্তু নীলদর্পণের নামটি ব্যতীত (ইহাও সাহিত্য নহে, রাজনীতি সম্বন্ধে) আর একখানিও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের হস্তে যাইবে না। এটি মঙ্গলের বিষয় ; কিন্তু আপাতত তিনি একটি অনিষ্ট করিতেছেন। একদল কুরুচি বিশিষ্ট লোকে তাঁহাকে কবি বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ কেহ তাঁহার বক্র কবিতা অশ্লীলতা ও গ্রাম্যরসিকতার অনুকরণ করিতেছেন। কৃতবিদ্যমণ্ডলী অবশ্যই জামাইবারিকের ন্যায় অসম্ভব ও অশ্লীল গল্প পাঠে ঘৃণা করেন, কিন্তু যে দল অদ্যাপিও তাঁহাকে কবি মনে করেন, তাঁহাদিগের ভ্রম দূর করা কর্তব্য হইতেছে।'

মজার ব্যাপার এই, দীনবন্ধু সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশে'র এই মনোভাব এই লেখাটির বছরখানেক আগেও ছিল না। দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্যের প্রথম ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বরং প্রশংসা করা হয়েছিল কবিকে। বলা হয়েছিল, তাঁর 'কবিতাগুলি মিষ্ট সরস ও কোমল হইয়াছে।' গ্রন্থকার সম্পর্কে এবং তাঁর লেখা কবিতা ও নাটকগুলি সম্পর্কেও ছিল সহৃদয় মন্তব্য। লেখা হয়েছিল, 'বহু বিষয়ের একত্র সমাবেশ দ্বারা গ্রন্থকার স্বীয় বহুদর্শিতা কবিত্বশক্তি লিপিনৈপুণ্য ও করিয়াছেন। দীনবন্ধুবাবুর এই সকল অপ্রসিদ্ধ নয়। তাঁহার কৃত নীলদর্পণ, লীলাব সধবার একাদশী প্রভৃতি ইহার প্রমাণ।'

দুঃখের ব্যাপার, মাত্র এক বছরের ব্যবধ দীনবন্ধুর প্রতিভা এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে প্র মনোভাব 'সোমপ্রকাশে'র দপ্তর থেকে লোপ পে গেল। পরিবর্তে লিখিত হল, 'যথার্থ কবির লেখ হইতে জলের ন্যায় কবিতা বহির্গত হয় ; কি দীনবন্ধুবাবুর কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয় তি দশ দিস্তা কাগজ নষ্ট না করিয়া আর দশ লিখিতে পারেন না।'

'সোমপ্রকাশ'-এর ওপর আস্থা রেখে এবং এ সপক্ষে অবশ্য একটি কথা বলা যেতে পারে। যি গ্রন্থ-সমালোচক, তিনি হয়ত বিরূপ মনোভাব ন নিয়েই ঐ সমালোচনা করেছেন। সত্যি সত্যিই য 'দ্বাদশ কবিতা' সেকালের কোনো সমালোচকে কাছে ভালো না লাগে, তিনি কী তাঁর মনের ক অকপটে ব্যক্ত করবেন না? —অবশ্যই করবেন। ত তাঁর ভাষা নিশ্চয় শালীনতার সীমা অতিক্রম কর না, এটাই হবে আমাদের কাম্য। আর দীনব সম্পর্কে আগে থেকে বিরূপ ধারণা নিয়েই লিখতে বসেছেন সমালোচক, তার প্রমাণও আছে আলোচনার শেষে। এখানে আলোচক প্রায় বেরি এসেছেন লগুড় হাতে। লিখছেন, 'দীনবন্ধুবা ছেবলা লেখক, ছেবলাদিগকে সন্তুষ্ট করা তাঁহা অভিপ্রেত। ....ইউরোপের ন্যায় এখানে সাহিত্যি দলের ক্ষমতা থাকিলে দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় মুড় কবি সধবার একাদশীর ন্যায় ঘৃণাকর গ্রন্থ লিখিবা পর আর লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইতেন না বঙ্গদেশ বলিয়াই এখনও তিনি লিখিতেছেন —অর্থাৎ আলোচক মশায়ের ক্ষমতা থাকলে 'মুড় কবি' দীনবন্ধুকে যে তিনি স্তব্ধ করে দিতেন, এম

এতদসত্ত্বেও দীনবন্ধু কিন্তু প্ররোচিত হননি : ঐ-রকম অশালীন ভাষা তাঁর ওপর প্রয়োগ করা হলেও তিনি কিন্তু তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে'র দ্বিতীয় ভাগে দ্বারকানাথ ও 'সোমপ্রকাশ' সম্পর্কে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে লিখেছিলেন :

বিদ্যাবিশারদ বিদ্যাভূষণ গম্ভীর।
সোমবন্ত্র সুধা ক্ষরে যায় লেখনীর॥

না, সোমপ্রকাশে'র সুধা যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সহযোগী লেখকদের জন্য ছিল না, একথা সেদিন প্রায় সোজাসুজিই 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক-গোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে খুব খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এঁদের বিদ্বেষের প্রকৃত লক্ষ্য বঙ্কিম বা দীনবন্ধু নন, এঁদের লক্ষ্য ছিল ওঁদের সাহিত্যাদর্শ। অর্থাৎ আরো সরাসরি এবং আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, এঁদের বিরোধিতা ছিল 'বঙ্গদর্শনে'র সঙ্গে। এই পত্রিকা-টিকে সোমপ্রকাশে'র লেখকগোষ্ঠী কোনোরকমেই সহ্য করতে পারতেন না। দেখতে পারতেন না এদের রমরমা। সুতরাং নানারকম খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়েই এঁরা বিরোধ জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। 'বঙ্গ-দর্শন'-এর ভাষা এবং বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত লেখাগুলি নিয়ে এঁরা সমালোচনা করতেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায়। আর প্রায়ই এঁরা যে কথা বলতেন, তা হল, 'বঙ্গদর্শন'-এর অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে ভাষার উন্নতি সুদূরে পরাহত।'

ভাষার ব্যাপারে এঁদের যে সমীক্ষা, তার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য যখন একটি সাহিত্যিক রূপ পেতে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে কয়েকজন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত সেই ভাষা নিয়ে কী ধরনের মন্তব্য করে চলেছেন, তা অবশ্যই কৌতূহলপ্রদ। এ মতের কতটা গ্রহণযোগ্য এবং কতটাই বা বর্জনীয়, সে বিষয়ও আমরা নিজেরাই একটি ধারণা করে নিতে পারি। তাই ওঁদের আলোচনার বেশ খানিকটা অংশ উদ্ধার করা গেল :

'বঙ্গদর্শনের স্থানে স্থানে যেরূপ ভাষা ব্যব-হৃত হইয়াছে, সাধারণ লোকেও তাহা প্রয়োগ করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। 'বিবরিত' প্রভৃতি কতক-গুলি ণ্যান্ত ক্রিয়ার প্রাদ্ধ করা হইয়াছে। এগুলি বাঙ্গালায় প্রচারযুক্ত নহে। এই ণ্যান্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিলেও শ্রুতিমধুর হয় না। 'বিবরিত' স্থলে 'বিবৃত' প্রয়োগ করাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ। 'সাবধানী', 'একেবারে', 'কেবলমাত্র' পদগুলি দুষ্ট। এই গুলির পরিবর্তে 'সাবধান', 'একবারে', 'কেবল' অথবা 'মাত্র' প্রয়োগ করা বিধেয়। 'কেবলমাত্র' এই দুটি কথা একবারে প্রয়োগ করা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে :

'বিষবৃক্ষ' আখ্যায়িকার স্থলে 'গুরুস হেবী' বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হাসিতেছে, ছুটিতেছে, নাচিতেছে, ঠেঙ্গান হইতেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি একস্থলে এরূপ অনুচিতরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে পাঠ করিলে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। এই আখ্যায়িকার লেখক অনেকস্থলে ব্যাকরণ ও ভাষার মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাহা মনে আসিয়াছে, মুদ্রিত নয়নে তাহাই লিখিয়াছেন। 'সরলতা চমৎকারা' কিরূপ বাঙ্গালা তাহা আমরা বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দশম বর্ষীয় বালকও এইরূপ বাঙ্গালা ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। লেখক ব্যাকরণ বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই মুণ্ডু নিপাত করিয়াছেন। 'পদ্মপলাশ নয়নী' কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে ? এইরূপ গুরু-দুষ্ট ব্যাকরণের আঘাতে ক্ষীণাঙ্গী বাঙ্গালা ভাষাকে প্রহার করিলে আর রক্ষা নাই। 'শ্যামাঙ্গনী' পদটিও দুষ্ট। বহুক্ষণ ব্যাকরণের আরাধনা করিলে, এই পদটি সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বাঙ্গালা কি সংস্কৃতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। 'শ্যামাঙ্গনা' পদের উল্লেখ করিয়াছেন।'

ব্যাকরণের কচকচি আরো আছে। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। যেটুকু তোলা হয়েছে, তার ভেতর থেকে একটা কথা খুবই স্পষ্ট যে, এ আলোচনা যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের ব্যাকরণ-জ্ঞানের কোনো অভাব নেই। আর সে ব্যাকরণ, সংস্কৃত-ব্যাকরণ। এঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের নির্দেশ বাংলা ভাষাতেও চালাতে দৃঢ়চিত্ত। বাংলা যে নিজের মত হয়ে উঠতে পারে, তাঁরা তা ভাবতেই পারতেন না। সুতরাং তা সমর্থন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। —বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে নতুন গদ্যরীতি। সে লেখায় সবটাই যে ব্যাকরণের নির্দেশ

The Bull and The Frog.

বুড়াবেং "এত গরল গায়ে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোলনা, যেন আমি ফুলে ওর সমান হোচ্ছি। দেখ দেখি ওর মতন হইনি।"
দলস্থ খুদে খুদে বেংচর "বাহবা বাহবা আর একটু ফুলিলেই হবে।"

মেনে চলবে। তা অসম্ভব। সুতরাং বিরোধও বাড়তে থাকল।

'বঙ্গদর্শন' সম্পর্কে এঁদের আরো যে অভিযোগটি ছিল, তা হল 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'র ব্যাপারে। এই একটি খোঁচা সেদিন বহু লেখককে ও সাহিত্যযশপ্রার্থী বহু মানুষকে দিয়েছিল মর্মান্তিক পীড়া। বঙ্গদর্শনের এই ঔদ্ধত্য সেদিন তাঁরা যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না। ওঁদের বক্তব্য ছিল, 'বঙ্গদর্শন প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় নিতান্ত চপলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ (দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ব্যতীত) প্রচা-রিত হয়, তৎসমুদয়ই অপদার্থ। কোনো গ্রন্থকারকে বারম্বার অভিযোগ করিবার ভয় দেখান, কোন গ্রন্থ-কারের গ্রন্থ অকর্মণ্য ও অপাঠ্য বলেন। এরূপ

কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না।'

এর পরে 'বঙ্গদর্শনে'র বিরুদ্ধে আর অভিযোগ উদাত্ত ছিল, বলার অপেক্ষা রাখে সেটি হল তার লোকপ্রিয়তা। এত আঘাত সত্ত্বেও ঐ পত্রিকা এবং তার লেখকগোষ্ঠীকে কিছুতেই দমানো যাচ্ছিল না, এটি ওঁদের ক হয়েছিল বড়োই পীড়াদায়ক। এই লোকপ্রিয় উৎস তাঁরা যা আবিষ্কার করেছিলেন, তা 'উপন্যাস'। 'একটি উপন্যাস শেষ হইলেই আ আর একটির জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ —তাই শেষবেশ ঐ বঙ্কিমবিরোধী লেখকগোষ্ঠী সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুলেন যে 'অপদার্থ উপন প্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব সুতরাং এটিকে যম ভয়ে গালিগালাজ দেওয়া যে পারে।

না, এসব ব্যাপারে বঙ্কিম কিন্তু সোজাসু প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সো এর জবাব দিলেন একটু ঘুরিয়ে। এই সব নিন্দ বাদের কথায় তিনি 'লোকরহস্যে'র বিজ্ঞাপনে লিখলেন, 'বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইর সংস্কার আছে যে রহস্যমাত্র গালাগালি, গালি ব্যঙ্গ্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠ দিগের নিকট নিবেদন যে তাঁহাদের জন্য এ লিখিত হয় নাই—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।'

যা লিখেছিলেন, সেই লেখাটিকে এই প্রসঙ্গে আরেকবার উদ্ধার করা যেতে পারে। ওখানে তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন, 'আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দুষ্কর্ম করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয়, এমত চেষ্টা করিব।'

এহ বাহ্য। বঙ্কিমের এসব কথায় কান দেয় কে? দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মত প্রশ্নের ব্যক্তি যখন তাঁর 'সোমপ্রকাশ'কে উৎসর্গ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দায়, তখন যারা একান্তই নিন্দিত ও অক্ষম লেখক, তাঁরাই বা বাদ থাকেন কেন? তাঁরাও বেছে নিলেন নানান উপকরণ বঙ্কিম-নিন্দার প্রয়োজনে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ অগ্রজকে। প্রায় দশ বছর পরে সে কথা তুলে একজন লেখক লিখলেন, 'দেখুন, সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অশ্লীল গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই।'

ঐ লেখকই আরেক জায়গায় লিখলেন, 'উক্ত লেখকের একটি গুণ আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তিনি আপনার গ্রন্থ সন্নিবেশিত ঘটনাবলী এতদূর মনোরম করিতে পারেন, যে তাহা পিতামহী দেবীর উপকথার ন্যায়, শুনেন্দ্রিয় নির্বোধের নিদ্রাকর্ষণ করিতে পারে।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে যাঁরা আঘাত দিতে চান, তাঁরা সূক্ষ্ম আঘাত দিয়ে ঠিক খুশি হতে পারলেন না। আরো স্পষ্ট এবং আরো মোটা অস্ত্র তাঁরা বেছে নিলেন সেদিন বঙ্কিমকে আঘাত করবার জন্য। প্যারীমোহন কবিরত্নের ব্যঙ্গ কবিতায় সেই মোটা আঘাতের ব্যাপারটি ফুটে উঠল :

> বঙ্গদর্শনের দর্শন শক্তি চমৎকার,
> এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার?
> অন্ধ যে জন নাইকো লোচন
> সমালোচন কেন তার?
> পদে পদে দেখতে পাই,
> কর্তা কর্ম বোধ নাই,
> ভাবরসের মা-গোসাঞি
> কেন লেখার হাল ধরে,
> রাধা কৃষ্ণ বলতে শিখে,
> দুই একটা পদ্য লিখে,
> ধরাকে শরা সম জ্ঞান করে—

কেবল কবিতা কেন, সাহিত্যের নানা শাখায় বঙ্কিমচন্দ্রকে চলল আক্রমণের উদ্যোগ। আঠারো শ চুয়াত্তরে অর্থাৎ বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হবার বছর দুই পরে বের হল একটি নাটক। এই নাটকটির নাম 'বিধবার দাঁতে মিশি'। নাটক না বলে এটিকে প্রহসন বলাই ভালো। নাট্যকারের নাম, গোপাল মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিম-বিরোধিতার উৎসাহে ও আতিশয্যে তাঁর প্রহসনের একটি চরিত্রই তিনি এঁকে ফেললেন বঙ্কিমচন্দ্রের ছাঁদে। নামের উপাধিটি পর্যন্ত রাখলেন 'চট্টোপাধ্যায়'। নাম দিলেন, উড়ুম্বর। মুখে উপযুক্ত সংলাপও হল সংযোজিত। এবং অংশবিশেষ এই রকম :

> উড়ুম্বর। গুড নাইট বরদাবাবু।
> গোরা। আইরে ইণ্ডিয়ান সার ওয়াণ্টার স্কট।
> উড়ুম্বর। আর কেন জ্বালাও বাবা।

তবে এসবও তুচ্ছ হয়ে গেল। সবাইকে টেক্কা দিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। যে বছর 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হল, তার বছর চারেক আগে ভবানীপুরে ওঁর জন্ম। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের ঠিক চার বছর পরে কালীপ্রসন্ন পাস করলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা। এফ এ পড়তে ঢুকলেন কলেজে। কলেজে পড়তে পড়তে কলেজীয় শিক্ষায় হলেন বীতরাগ। ঠিক সেই সময়ে 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক দ্বারকানাথের সঙ্গে হয়ে গেল যোগাযোগ। এই তরুণ কালীপ্রসন্ন সেই সময় বিদ্যাভূষণের নিকট কাব্য-ব্যাকরণাদি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি বিদ্যা-

করেন।'

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার বছর আট পরে 'শ্রীফকির দাস বাবাজী' এই ছদ্ম নাম নিয়ে ইনি 'বঙ্গীয় সমালোচক' এই নামে একটি কাব্য লেখেন। এই কাব্যগ্রন্থটিতে অত্যন্ত অসভ্যভাবে বঙ্কিমকে আক্রমণ করেন কবি। বইয়ের প্রথমেই আঁকা হয় একটি ছবি। সেই ছবিতে দেখানো হয়েছে—একটি কাঁঠাল গাছ, তার তলায় একটি বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ হয়ে। হাতে বঙ্গদর্শন। নীচে কবিতা—'হে বঙ্গ দর্শন কর বঙ্কিম বানর'—।

আলোচনা যখন সমতা হারায়, সমালোচনা যখন পরিণত হয় গালিগালাজ এবং ঈর্ষা যখন উত্তাপ হয়ে ওঠে, তখন ঠিক কী অবস্থা হয়, আমাদের কাব্যবিশারদের ঐ কাব্য তারই উদাহরণ। আমাদের সাহিত্যে এমন পঙ্কিল পরিবেশ মাঝে মাঝেই তৈরি হয়েছে। তবে ভরসা এই, সেটা কখনো স্থায়ী হয়নি এবং কখনোই তা সাহিত্যের মহৎ উদ্যোগকে গ্রাস করতে পারেনি। বঙ্কিমবিরোধীরা তাঁদের তূণ থেকেই সব অস্ত্রই প্রয়োগ করেছিলেন বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমকে বিনাশ করতে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তাঁদের সব অস্ত্রই হয়েছে ব্যর্থ। বঙ্কিম যথা সময়ে বিকশিত হয়েছেন স্বমহিমায়।

গালিগালাজ নয়, ঐ কটু সমালোচনাও নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সেদিনের প্রকৃত ভূমিকাটি ঠিক কী ছিল, তা জানতে হলে আমাদের শরণ নিতে হবে রবীন্দ্রনাথের। একজন তরুণ লেখকের মনকে 'বঙ্গদর্শন' কীভাবে মাতিয়ে তুলেছিল, তার উষ্ণতা অনুভব করা যায় ওঁর লেখায়। রবীন্দ্রনাথ খুব অকপটেই কবুল করেছেন, 'পূর্বে কী ছিল, এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।—কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।'

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে সেদিন যে ভূমিকায় অব[illegible] হয়েছিলেন, সেটি যে যথার্থ ভূমিকা ছিল, মহাকাল তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। পরের যুগের প্রধান সাহিত্যরথীরা তা একবাক্যে স্বীকারও করে নিয়েছেন।—'সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।'

দুঃখ এই, এত বড়ো দায়িত্ব যিনি পালন করে গেলেন, তাঁর বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা যেসব মন্তব্য তাঁর দিকে ছুঁড়েছিলাম, যে ভাষায় তাঁকে অভিষেক করলাম, তা বড়োই পীড়াদায়ক।—আলোচনা যখন সমতা হারায়, তখন সে বস্তুটি যে কী ভীষণ বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তারই পরাকাষ্ঠা যেন বঙ্কিমবিরোধীরা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।—তবে এই বিরোধিতার ভেতরেও ছিল একটি লজ্জাজনক ইতিহাস। আলোচনা কেন সমতা হারায় এখানেই আছে তার গোপন রহস্য—'সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে লেখক সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।'

রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত উক্তিটির ওপর, আশা করি, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সমরেশ মজুমদার

॥ ১১ ॥

বাবার অসুখের খবর পেয়ে জোর করে দাদু তাকে পাঠালেন কিন্তু ধূপগুড়ি না পেরোন পর্যন্ত সে কথা খুব একটা মনে পড়েনি অনির। ডুডুয়া নদী ছাড়িয়ে রাস্তাটা বাঁক নিতে যেই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের গাছগুলো চোখে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। কদ্দিন বাদে সে আবার এইসব গাছগাছালি, ডানদিকের মদেশিয়া কুলিদের ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে একটাও পরিচিত মুখ দেখল না ও। যদিও স্বর্গছেঁড়া বাজার এখান থেকে মাইল দুয়েক তবু কেউ কেউ তো এদিকে আসতেও পারে। তারপর যেই বিরাট শালের মাঝখানে কাজকরা ফুলের মত চা-বাগানের মধ্যিখানে মাথা তোলা ফ্যাক্টরী-বাড়িটা চোখে পড়ল তক্ষুনি ওর বুকটা কেঁপে উঠল, বাবার খুব অসুখ, ওই ফ্যাক্টরীতে বাবা নিশ্চয়ই কাজ করতে যেতে পারছেন না। চা-বাগানের শেষ হতে বাঁ দিকে বাবুদের কোয়ার্টার, দুদুটো চাঁপা গাছ বুকে নিয়ে বিরাট খেলার মাঠ চুপচাপ পড়ে আছে। অনি চিৎকার করে বাস থামাল।

মাটিতে নামতেই ইউক্যালিপটাস গাছের শরীর ছোঁয়া বাতাসটাকে নাক ভরে টেনে নিয়ে ও চারপাশে তাকাল। কোয়ার্টারগুলোর দরজা বন্ধ। রাস্তার এপাশে মারোয়াড়ীদের দোকানের সামনে একজন পশ্চিমাগোছের লোক উবু হয়ে বসে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হতে সে দাঁত বের করে হাসল, অনি তাকে চিনতে পারল না। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের যে সার দেওয়া গাছগুলো ছিল সেগুলো যেন শুকিয়ে এসেছে। ক্লাবঘরের তালা বন্ধ, অনি বারান্দায় উঠে এসে দরজার কড়া নাড়ল।

ডানদিকের খিড়কি দরজা খুলে বাগান দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ এই সদরের বন্ধ দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনটা কেমন হয়ে গেল। এখন এ বাড়িতে মা নেই। এই বারান্দা, এ বাড়ির ঘর উঠোন যে কোন জায়গায় ও মাকে কল্পনা করতে পারে। মা মারা গেছেন জেনেও ও মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে খেলা করে ভাবত মা স্বর্গছেঁড়ায় আছেন, গেলেই দেখা হবে। এখন এই দরজাটার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল ওর। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে বাবাকে মনে পড়ে যেতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল অনি। বাবার কি হয়েছে? দাদু কেন জোর করে ওকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন। হঠাৎ অনি কুঁই কুঁই শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল একটা কালো রঙের ঘেয়ো নেড়ি কুকুর চার পা মুড়ে মাটিতে বসে ওর দিকে কেমন আদুরে চোখে তাকিয়ে শব্দ করছে। কুকুরটাকে চিনতে পারল ও, মা এঁটো ভাত দিতেন, কালু কালু ডাকতেন, আর একদম পছন্দ করতেন না

... চিনতে পারল! আর একবার কড়া নাড়তেই ভেতরে খিল খোলার শব্দ হল। দরজার কপাট খুলে যেতে অনি দেখল ছোটমা দাঁড়িয়ে আছে।

'ওমা, তুমি! কি চমকে দিয়েছ, আমি ভাবলাম কে না কে?' সত্যিই অবাক হয়ে গেছে ছোটমা, হাত বাড়িয়ে অনির ব্যাগটা নিয়ে কাছাকাছি হতেই আবার বলল, 'আরে, তুমি যে দেখছি আমাকে ছাড়িয়ে গেছ মাথায়!'

অনি এখন চট করে কথা বলতে পারছিল না। অনেকদিন ছোটমা জলপাইগুড়ি যায় নি। মহীতোষ একা গেছেন মাস কয়েক আগে। কিন্তু একটা মানুষের চেহারা যে এই সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে এত খারাপ হতে পারে ছোটমাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। কি রোগা হয়ে গেছে শরীরটা! দেখে মনে হয় ছোটমারই খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। কিন্তু গালের ওপর অতখানি কাটা দাগ কেন? অনি সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি পড়ে গিয়েছিলে?'

'না তো!' বলেই ছোটমা প্রশ্নটা বুঝতে পারল, 'ও হ্যাঁ, খোঁচা লেগেছিল একবার। তা তুমি হঠাৎ চলে এলে যে, স্কুল কি ছুটি?'

'না ছুটি না। দাদু জোর করে পাঠালেন, বাবার নাকি খুব অসুখ, কি হয়েছে?' অনি ছোটমার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওদের বাইরের ঘরটা সেইরকমই রয়ে গেছে। এমন কি দু দুটো সোফার ওপরে যে কভার ছিল সেগুলো অবধি একই রকম আছে, ছিঁড়ে যায় নি। ছোটমা বলল, 'অসুখ মানে, এই পেটের যন্ত্রণা হয় খুব। বাবাকে কে খবর দিল?' ছোটমা ঘুরে ওর দিকে তাকাল।

'জানি না। কাল বোধ হয় কেউ দাদুকে বলেছে। কিন্তু বাড়ি আসার সময় একটা রিকশার সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টে দাদুর পা ভেঙে গেছে, আজ প্লাস্টার করে হাসপাতাল থেকে আসবে।' অনি খবরটা দিল।

'ও মা! কি করে হল? এখন কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'কিন্তু ওঁর এই অবস্থায় তুমি চলে এলে কেন?'

'কি করব! দাদু যে জোর করে আমাকে পাঠাল, কোন কথা শুনতে চাইল না। বাবা কোন্ ঘরে? এখন কেমন আছেন?'

খুব আস্তে ছোটমা বললেন, 'এখন ভাল আছেন, ফ্যাক্টরীতে গিয়েছেন।'

অবাক হয়ে গেল অনি, 'সে কি! তাহলে কাল যে দাদু খবর পেলেন বাবা খুব অসুস্থ! দাদু লোকের কথায় চট করে বিশ্বাস করেন।' অনির মনে হল ছোটমা খুব কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করলেন।

মাঝের ঘরে এসে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। কোন জানলা খোলা নেই, যাওয়া আসার দরজায় ভারী পর্দা ঝোলান। প্রায়ান্ধকার ঘরের এক কোণায় টেবিলের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপের আলোয় অনি দেখতে পেল মাধুরী খুব গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন। একটা বেশ বড় ফ্রেমের চৌহদ্দিতে মাধুরীর একটা অচেনা ছবি এনলার্জড করে ধরে রাখা হয়েছে। যেহেতু ঘরের ভেতর আলো আসার রাস্তা নেই তাই ছবির ওপর পড়া প্রদীপের আলোটা অদ্ভুতভাবে চোখ কেড়ে নেয়। অনির মনে হল মাকে যেন দেব-দেবীর মত লাগছে, এ-বাড়ির সবাই এখানে এসে পুজো করে যায়। কিন্তু এই বন্ধ ঘরে কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। একটা চাপা অস্বস্তি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মুখ ঘুরিয়ে ছোটমার দিকে তাকাতেই দেখল ছোটমা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব দ্রুত অনি বলল, 'জানলা বন্ধ করে রেখেছ কেন, খুলে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা চমকে উঠল, 'না, না। এ ঘরের জানলা খোলা বারণ। চল, ভেতরে যাই।' ছোটমা আর দাঁড়ালেন না। অনি দেখল ঘরের ...

... সামনে একটা খাট পাতা। ঘরটা ... বেরিয়ে যেতে যেতে ছবিটার দিকে আর একবার তাকিয়ে ওর মনে হল মা যখন খুব গম্ভীর হয়ে যেতেন অথবা কোন কারণে যখন মায়ের মন ... হয়ে যেত তখন এইরকম দেখাত।

ভেতরের ঘরে যেখানে অনিরা শুতো সেখানে একটা ছোট খাট আর তার চারপাশের কাপড় চোপড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে এটা ছোটমার ঘর, ছোটমা একাই শোন এখানে।

ছোটমা বলল, 'আগে একটু জিরিয়ে নাও, আমি তোমার জন্য খাবার করি।'

অনি বলল, 'ঝাড়ি কাকু কোথায়?'

ছোটমা যেন সামান্য ভ্রূকুটি করল, 'তুমি জান না?'

অনি ঘাড় নাড়ল। ছোটমা মুখ নিচু করে বলল, 'তোমার বাবার সঙ্গে তর্ক করেছিল বলে উনি ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তা আমার অসুবিধে হচ্ছে না কিছু, একা মানুষ সারাদিন বসে থাকতাম, এখন কাজ করতে করতে বেশ দিনটা কেটে যায়।' ছোটমা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে অনির মনে হল ও যেন একদম অচেনা কোন পরিবেশে চলে এসেছে।

জুতো খুলে খালি পায়ে অনি উঠানে এসে দাঁড়াল। ঝাড়ি কাকুকে বাবা ছাড়িয়ে দিয়েছেন? পিসীমা বলতেন, ঝাড়িকাকু এ বাড়িতে এসে বাবাকে কোলে পিঠে করেছেন, কাকুকে তো মানুষ করেছেন বলা যায়। ইদানীং অনির মনে হত ও সবকিছু বুঝতে পারে, ও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন এই কাঁঠালগাছ আর তালগাছের দিকে তাকিয়ে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না যে বাবা কি করে ঝাড়ি কাকুকে ছাড়িয়ে দেন।
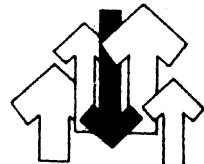
বাড়ির ভেতর যে বাগানটা ছিল সেটা অপরিষ্কার হয়ে আছে। অনি তারের দরজা ঠেলে পেছনে এল। গোয়ালঘরের আশেপাশে বেশ জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। সেদিকে এগোতেই খুব দ্রুত হাম্বা হাম্বা ডাক শুনতে পেল অনি। গলাটা ধরা ধরা, কিন্তু অনি চিনতে পারল। কাছাকাছি হতে ও একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। গোয়ালঘরের কাছে বিচুলির স্তূপের পাশে কালীগাইকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অনিকে দেখে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এখন ওর অনেক বয়স, শরীর হাড়জিরজিরে হয়ে গেছে, ফলে বেচারার গলায় দড়ির চাপ লাগায় চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। অনি দৌড়ে ওর পাশে যেতে গরুটা একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর খুব অভিমানী মেয়ের মত মাথা নিচু করে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগল। অনি ঘাড়ে হাত রাখতেই কালী ওর লম্বা গলাটা চট করে তুলে যেন অনিকে জড়িয়ে ধরতে কোমরের কাছে ঘষতে লাগল। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা সমানে চলছে। অনি শব্দটার মানে বুঝতে পারছিল। বেচারার প্রচুর বয়স হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই আর দুধ দেয় না। মা ওকে এইটুকুনি কিনে এনেছিল। তারপর ওর নাতি পুতি বিরাট বংশে গোয়ালঘর ভর্তি হয়ে গেল। হঠাৎ অনির খেয়াল হল আর কোন গরুকে দেখতে পাচ্ছে না তো! কালীর আদরের চোটে যখন অস্থির তখন অনি ছোটমার গলা শুনতে পেল, 'তোমাকে দেখে ওর খুব আনন্দ হয়েছে না?'

অনি দেখল ছোটমা তারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কালী ওকে সরতে দিচ্ছে না, ওর গলায় হাত বোলাতে বোলাতে অনি বলল, 'আর গরুগুলো কোথায়?'

অনি অবাক হয়ে বলল, 'দিদা কী করে দিতেন ?'

ছোটমা হাসলো, 'দিদি খুব বড় করত, আমি পারি না তাই। বাড়ি থাকতে ওই করত সব। তা যেদিন সকালুলোকে নিয়ে হাটে চলে যাবে সেদিন এই গরুটার কি কান্না! ঠিক বুঝতে পেরেছিল এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এখন তো আর দুধ দেয় না বেচারা, গায়ে জোরও নেই যে চাষ করবে. বোধহয় কেটেই ফেলত ওকে। এমনভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে তাকাল যে আমি পারলাম না। তোমার বাবাকে অনেক বলে করে ওকে রেখে দিলাম। বেশী দিন আর বাঁচবে না।'

হঠাৎ অনি আবিষ্কার করল কালীগাই-এর গলায় আদর করতে করতে কখন ওর দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। ছোটমা এই সময় ডাকল, 'এসো, হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নাও। সেই কোন সাতসকালে বেরিয়েছে।'

ছোটমার হাতের রান্না ভাল, তরকারিটা খেতে খেতে অনির মনে হল। একটু ঝাল ঝাল, কিন্তু বেশ সুস্বাদু। লুচি ওর খুব প্রিয় জিনিস, ফুলকো হলে কথাই নেই। ঠিক এই সময় অনি শুনতে পেল বাইরের ঘরের দরজায় কে যেন খুব জোরে জোরে শব্দ করছে। খেতে খেতে ও উঠতে যাবে ছোটমা রান্নাঘর থেকে ছুটে এল, 'তুমি খাও, আমি দেখছি।'

ভেতরের বারান্দায় জলখাবার খাবার চল এ বাড়িতে এখনও আছে। টুলমোড়াগুলো পাল্টায়নি। খেতে খেতে অনি পিসীমার ঘরটার দিকে তাকাল, দরজা খোলা, ওটা বোধহয় গুদাম ঘর করা হয়েছে। ঘরটার ওপরে পেয়ারা গাছটা তার সব ডালপালা যেন নামিয়ে দিয়েছে, বেশ ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা হয়েছে গাছটায়। এই সময় বাইরের ঘরে বেশ জোরে একটা ধমক শুনতে পেল অনি, 'কোথায় আড্ডা মারা হচ্ছিস, অ্যাঁ ? আধঘন্টা ধরে ডাকছি, দরজা খোলার নাম নেই ?' ছোটমা বোধহয় কিছু বলতেই চিৎকারটা জোরদার হল, 'কেন, চুপ করব কেন ? বিয়ের সময় তোমার বাপ তো বলে দেয়নি যে তোমার কান খারাপ।'

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, অনি উঠে দাঁড়াল। গলাটা নিচে নেমে আসতে ও স্পষ্ট চিনতে পারল। আর চিনতে পেরেই হতভম্ব হয়ে গেল। মহীতোষকে এ গলায় কোনদিন কথা বলতে শোনেনি অনি। আজ অবধি বাবাকে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে দ্যাখেনি পর্যন্ত। মায়ের সঙ্গে যখন ঠাট্টা করতেন তখন বাবার গজদাঁত দেখা যেত। ও কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। এমন কি বাবা যখন জলপাই-গুড়িতে যান তখনও তো এ ধরনের কথা বলেন না। মেয়েদের এই বাড়িতে কেউ বকেছে, এমন গলায়, মনে করতে পারে না অনি। তা ছাড়া, ওর যে জন্ম আসা, বাবার এই গলা শুনে কিছুতেই মনে হচ্ছে না যে তাঁর কোন অসুখ করেছে।

'ধূপ জ্বলছে না কেন, ধূপ ?' আবার চিৎকারটা ভেসে এল, এবার কাছে। বোধহয় বাবা এখন মায়ের ঘরে চলে এসেছেন। তবে স্বরটা কেমন কাঁপা কাঁপা, সুস্থ নয়। ছোটমার গলা শুনতে পেল ও, 'নিবে গেছে।'

'অ্যাই!' গর্জনটা অদ্ভুতভাবে গোঙাল যেন. 'সারাদিন খাটিন মারছ, একটা কাজ বললে পাওয়া যাবে না, না ?'

'আঃ। আস্তে কথা বল।' ছোটমা যেন এবার ধমকে উঠলেন।

'ও বাবা! আমার গলায় তেজ হয়েছে দেখছি। ঝেড়ে বিষ নামিয়ে দেব ?'

জবাবে ছোটমা বলল, অনিমেষ এসেছে।'

প্রথমে বোধ হয় বুঝতে পারেননি বাবা, 'কে এসেছে ? আবার কে জুটল ?'

ছোটমা বলল, 'অনিমেষ—অনি।'

এবার চটপট বাবার কেমন হয়ে যাওয়া গলাটা

'তুমি আনালে ?'

'না, বাবা পাঠিয়েছেন, তোমাকে দেখতে। অসুখের খবর পেয়েছেন কার মুখে। কাল বাবার পা ভেঙেছে।'

'সে কি! কি করে ?'

রিকশায় ধাক্কা লেগে। আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। তবু ছেলেকে পাঠিয়েছেন তোমাকে দেখতে, আর তুমি—।' কেমন ধরা ধরা লাগ ছোটমার গলা।

'অ্যাই, আগে বলোনি কেন যে ও এসেছে ছেলেকে দ্যাখাতে চাও, না ? প্রতিশোধ নিতে চা না ?'

'তুমি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দাও রোজ রোজ তুমি যা কর আমি আর পারি না—এবার যেন কেঁদে ফেলল ছোটমা। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আই, চুপ! খবরদার এ ঘরে দাঁড়িয়ে তুমি কাঁদবে না! ছেলেকে শোনাচ্ছ বুঝতে পারি খবরদার, কোন নালিশ করবে না!'

ছোটমা বলল, 'চমৎকার! তোমার নামে অ ঐটুকুনি ছেলের কাছে নালিশ করব ? গলায় জোটে না তার চেয়ে।'

বাবা বললেন, 'গুড, গুড। তা সে কোথায় অনেকদিন পর এল, না ?'

অনির খুব লজ্জা করছিল। বাবার গলা আসার খবর পেয়ে অদ্ভুতভাবে যে পাল্টে গেল টের পেয়ে লজ্জাটা যেন আরো বেড়ে গেল। বেঁচে থাকতে বাবা কি কখনও এরকম ভাবে বলতে পারত ? বাবার গলা ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসছে। ওর ইচ্ছে করছিল দৌড়ে এখান থেকে যায়, বাবার সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা না হলে যেন ভাল হয়।
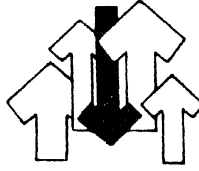
মহীতোষ এলেন। খুব শব্দ করে। মশমশিয়ে। বারান্দায় পা দিয়ে ছেলের মুখের তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এই কয় মাস লাউডগার মত চড় চড় করে গেছে শরীরটা, মাথায় মহীতোষকে ধরতে আর দেরী নেই। নিজের ছেলেকে এখন হঠাৎ লোক-বলে মনে হল মহীতোষের। চোখাচোখি হতেই ঝাড়লেন মহীতোষ, 'কখন এলে ?' অনি কয়েক এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করল। প্রণাম উঠতে উঠতে ওর খেয়াল হল ছোটমাকে করেনি। এখন চারপাশে ছোটমাকে দেখতে পেল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'একটু অ বাবার চেহারাটা এরকম হয়ে গেল কি করে ? রোগা রোগা, চোখের তলায় কালি, গাল মাথায় চুল লালচে লালচে—মাঝে মাঝে চি করছে। অসুখটা কি ? মহীতোষ বললেন, কথা ?'

'না। অসুখের খবর শুনে দাদু জোর পাঠালেন।'

'অসুখ ? কার অসুখ ? আরে না, এসব বাজে কথা রটায়। আমি ভাল আছি। যখন খোলা তখন তোমার আসা উচিত হয় তোমার মা থাকলে রাগ করতেন! তোমার কার্স্ট ডিউটি অধ্যয়ন। তোমার মায়ের গিয়েছ ?' মহীতোষ চোখ বড় বড় করে তাকা

অনির হঠাৎ মনে হল বাবা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছেন না। কথাগুলো যেন অ এবং সেটা তিনি নিজেও টের পাচ্ছেন না। ঝর মানে ? যে ঘরে মায়ের ছবি আছে সেই ঘর

ঝলমল করে উঠল। ওর মনে পড়ল ছোটমা খবর দেওয়া সত্ত্বেও বাবা দাদুর অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছেন না কিছু। ও ঠিক করল না বললে সেও কিছু জানাবে না। কারণ ওর মনে হল বাবার মাথায় এখন অন্য কোন চিন্তা রয়েছে, ছোটমার কথাটা একদম ভুলে গিয়েছেন।

ছোটমাকে রান্নাঘর থেকে জলখাবার নিয়ে ঘর হতে দেখে বাবা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে আজকের দিনটা থাক অনি। স্কুল কামাই করা ঠিক কথা নয়। দাদুর ওখানে তোমাকে রেখেছি—হ্যাঁ, দাদুর নাকি পা ভেঙে গেছে, রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'কাল বিকেলে হয়েছে, হাসপাতালে ছিলেন। আজ প্লাস্টার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

এবার যেন মহীতোষের কানে শোনা চেহারাটাকেই সামনাসামনি দেখতে পেল অনি, 'অ্যাঁ ? দাদুকে হাসপাতালে রেখে তুমি চলে এসেছ ? আশ্চর্য অকৃতজ্ঞ ছেলে। লেখাপড়া শিখে তুমি বাঁদর তৈরি হচ্ছ ? যে তোমাকে বুকে আগলে রেখেছে তার প্রতি কর্তব্য বলে কিছু নেই ? ছি ছি ছি।'

জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে এসব শব্দ দিয়ে তৈরী করা বাক্য শোনাল। অনি বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীরে একটা আলোড়ন অনুভব করল। তারপর কোনরকমে বলল, 'আমি আসতে চাই নি, দাদু জোর করে পাঠালেন।' এখন অনির আর কান্না পাচ্ছিল না, এত শক্ত কথা শুনেও ওর ভেতরে কোন অভিমান হচ্ছিল না। বরং ও খুব শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়াল।

'তুমি আসতে চাওনি, গুড গুড। তা এই প্রথম বাপ মায়ের কথা মনে পড়ল ? গিয়েছ তো অনেকদিন, আমরা এখানে কেমন আছি খোঁজ রেখেছ। "আমি আসতে চাইনি—" তা তো বলবেই। মহীতোষ কেমন ঠাট্টা অথচ রাগ রাগ গলায় বললেন।' এর জবাব কি দেবে অনি ? মা থাকতে বাবা তাকে আনতে চান নি। এখন এলেও দোষ না এলেও দোষ। অনি কোন কথা বলছে না দেখে মহীতোষ ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর দু'পা এগিয়ে অনির কাঁধে হাত রাখলেন, 'রাগ করো' না, একটু বুঝতে শেখ। তোমার মা তো তোমার জন্যই মারা গেলেন!'

চমকে উঠল অনি, 'আমার জন্য ?'

ঘাড় নাড়লেন মহীতোষ, 'হ্যাঁ। তোমার জেলে যাবার ভবিষ্যৎ বাণীটা শোনার পর থেকেই ছটফট করছিল। না হলে বৃষ্টির মধ্যে কেউ ঐ অবস্থায় ছাদে আসে। আমিও দোষী, বুঝলি অনি, আমি যদি তখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতাম—। ওর চলে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই দায়ী।'

হঠাৎ ছোটমার গলা মহীতোষকে যেন বাধা দিল, 'অনেক হয়েছে, ছেলেটা এল আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে পড়লে। ওকে ছেড়ে দাও।' লুচির থালাটা টেবিলের ওপর রাখল ছোটমা। মহীতোষ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মা আমার সঙ্গে এভাবে কোনদিন কথা বলেনি।'

অনি কোন উত্তর দিল না। বাবার দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে এল। এই মুহূর্তে ও বাবাকে যেন সহ্য করতে পারছিল না।

বাইরের খোলা মাঠে একরাশ ছাগল গলায় ঘণ্টি বেঁধে টুং টাং শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনি আচ্ছন্নের মত সেখানে এসে দাঁড়াল। এখন মনে হচ্ছে এই বাড়িতে ওর কোন জোর নেই। নিজের বাড়ি বলে ও আর ভাবতে পারছে না। এখন যদি জলপাইগুড়িতে চলে যেতে পারত, ও ঠিক করল বিকেলের বাসে ফিরে যাবে। বাবা কি করে এত বদলে গেলেন ? বাবার এই চেহারাটা জলপাইগুড়িতে ওরা কেউ টের পায় নি।

...পাচ্ছে। ... কোয়াটারগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মাথার ওপর ঠা-ঠা রোদ এখন। বিশু বা বাপীরা এখন নিশ্চয়ই স্কুলে। সীতাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে অনি শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। ও দেখল ওদের বাড়ির জানলায় সীতার ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে তাকাতে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন। ঠাকুমাকে দেখে অনির খুব ভাল লাগল। অনি যখন এখানে থাকত তখন ঠাকুমা রোজ বিকেলে ওদের বাড়িতে পিসীমার কাছে বেড়াতে আসতেন। ঠাকুমার কাছে ওরা কত মজার গল্প শুনেছে।

গেট খুলে বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল অনি। সীতাদের কোয়ার্টারটা একই রকম আছে, চোখ বন্ধ করে ও ঘোরাফেরা করতে পারে। বাঁ দিকের ঘরে ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে দেখেই ফোকলা দাঁতে বলে উঠলেন, 'আয় দাদু, কাছে এসে বস, কখন এলি ?'

ঠাকুমার চেহারা একই রকম আছে। বিছানার ওপর ছড়ানো পা দুটো দেখল অনি, বেশ ফোলা ফোলা। 'চোখে বড় কম দেখি আজকাল, তাই ভাবলাম সত্যি দেখছি তো! কি লম্বা হয়ে গেছিস দাদু, আয় কাছে এসে বস।' হাত বাড়িয়ে বিছানার একটা ধার দেখিয়ে দিতে অনি সেখানে বসল, 'কেমন আছ ঠাকুমা।'

'ওমা, গলার স্বর দ্যাখ, একদম ব্যাটাছেলে ব্যাটাছেলে লাগছে। তা হ্যাঁ দাদু, এখান থেকে চলে গিয়ে আমাদের এমন করে ভুলে যেতে হয় ? ঠাকুমা তাঁর শির বের করা হাত অনির গায়ে বোলাতে লাগলেন।

মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছিল অনির, আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি একইরকম আছ।'

'সেকি! দুরকম হতে যাবো কেন ? কিন্তু আজকাল একদম হাঁটতে পারিনা রে, বাতে পেড়ে ফেলেছে, পা দুটো দ্যাখ, কলাগাছ। -কবে যে ছাই যমের রুচি হবে! সে বেটি তো স্বার্থপরের মত কলা দেখিয়ে চলে গেল!' ঠাকুমার শেষ কথাটা শুনে অনি ওঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি কেঁদে ফেললেন, 'গৃহপ্রবেশে যাবার আগে আমায় বলে গেল তোমার ওপর সব দায়িত্ব, এবার দিদি নেই। তা আমি বসে বসে আটখানা কাঁথা সেলাই করে রেখেছিলাম, মাধুর বড় ইচ্ছে ছিল মেয়ে হোক এবার।' ফুকরে ওঠা কান্নাটাকে কোনরকমে সামলে আবার বললেন, 'তা সেসব কাঁথা আমার কাছে পড়েই রইল। মহীকে এত করে জিজ্ঞাসা করলাম, বাঁচাতে পারলি না কেন ? জবাব দেয় না।'

মায়ের কথা ঠাকুমা এভাবে বলবেন আন্দাজ করতে পারেনি অনি। এসব কথা শুনেও ওর কান্না পাচ্ছে না কেন আজ ? হঠাৎ ঠাকুমা গলা নামিয়ে যেন কোন গোপন কথা বলছেন এই ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর সৎমা বড় ভাল মেয়ে রে। এত লোককে দেখলাম, মেয়ে দেখলে আমি চিনতে পারব না ? বেশ মেয়ে, কিন্তু বড় দুঃখী। তুই ওকে কষ্ট দিস না ভাই।'

হাসতে চেষ্টা করল অনি, 'কি যা-তা বলছ! আমি কষ্ট দিতে যাব কেন ?'

ঠাকুমা যেন কি বলতে গিয়ে বললেন না। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'তোর দাদু কেমন আছে রে ?।

অনি দাদুর খবরটা দিতেই মাথা নাড়তে লাগলেন বুড়ী, 'এই বয়সে পা ভাঙলে কি আর জোড়া লাগে! দেখেশুনে তো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়। তা হ্যাঁ দাদু, তেনার পা সেরে গেলে শিগ্‌গীর একবার নিয়ে আসতে পারবি ?'

'কেন ?'

'দরকার আছে ভাই। নইলে যে সব ভেসে যাবে। আমি তো বিছানা থেকে উঠতে পারি না, আমার কথা কে শোনে। কিন্তু আমার কানে তো সব

কিন্তু মনে করে তেমনকে ...

ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট অথচ কিছু একটার ইঙ্গিত পাচ্ছে অনি। ও জানে ঠাকুমাকে এ বিষয়ে বেশী প্রশ্ন করে লাভ হবে না।

ঠাকুমা হঠাৎ চিৎকার শুরু করলেন, 'ও বউমা, দ্যাখ কে এসেছে। তোমার বন্ধুর ছেলে গো!' সাধারণত চা বাগানের এইসব কোয়ার্টারের রান্নাঘর একটু দূরে, সম্ভবত উঠোন পেরিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখান থেকে মহিলাকণ্ঠে সাড়া এল। অনি বলল, 'সীতা কোথায় ? স্কুলে ?'

'সে মুখপুড়ি গলা ফুলিয়ে বিছানায় কাৎ হয়ে আছে। যা না, পাশের ঘরে গিয়ে দ্যাখ না, দুদিনের জ্বরে কি চেহারা হয়েছে!'

অনি উঠে পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়েই ও সীতাকে দেখতে পেল। একটা বড় খাটের ঠিক মধ্যিখানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মুখটা ঘামে ভর্তি। চোখ দুটো বোজা—অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শব্দ না করে পাশে এসে দাঁড়াল অনি। বোধ হয় জ্বর ছাড়ছে ওর, বালিশ অবধি ঘামে ভিজে গেছে। সীতার দিকে তাকিয়ে অনির বেশ মজা লাগল। ঘুমোলে মানুষের মুখ কেমন আদুরে আদুরে হয়ে যায়।

ডাকতে মায়া হল অনির, ফিরে যাবে বলে ঘুরতেই ও সীতার মাকে দেখতে পেল। রান্না করতে করতে বোধ হয় ছুটে এসেছেন, 'ও মা, অনি কখন এলি ?' দেখেছেন মা, কি লম্বা হয়ে গেছে।'

ঠাকুমা বললেন, 'ওদের গুষ্টির ধাত লম্বা হওয়া।'

'এই তো আজ সকালে।' অনি হাসল।

'তোর নাকি এত পড়ার চাপ যে আসবার সময়ই পাস না ?' সীতার মা বললেন। অনি বলল, 'কে বলল ?'

'তোর নতুন মা!' কথাটা বলেই ভদ্রমহিলা চট করে শাশুড়ির দিকে তাকালেন। তারপর বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বস। আজকে নাড়ু বানিয়েছি, খেয়ে যা। ছেলেবেলায় ও নাড়ু খেতে কি ভালবাসত, না মা ?'

ঠাকুমা হাসলেন, 'একবার হেমের ঠাকুরঘরের নাড়ু চুরি করে খেয়েছিল বলে দশবার ওঠবোস করেছিল।'

অনি বলল, 'আজ থাক ঠাকুমা। আমি এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

ঠাকুমা বললেন, 'থাক মানে ? এ বাড়ি থেকে না খেয়ে যাবি ? বড় হয়ে গেছিস বুঝি। আর ও মেয়েটা যদি ঘুম থেকে উঠে শোনে যে তুই এসে না কথা বলে চলে গেছিস তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে ?'

সীতার মা বললেন, 'তুমি ওকে ডেকে তোল, অবেলায় ঘুমোচ্ছে! আমি তোমার নাড়ু নিয়ে আসছি।' রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি।

অনি আবার সীতার দিকে ফিরে তাকাল। ঠোঁটটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকায় সাদা দাঁত চিকচিক করছে। মুক্তোর মত ঘামের ফোঁটা কপালময়, গলায় ছড়ানো। রুক্ষ একরাশ চুল ফেঁপে ফুলে বালিশ-টাকে অন্ধকার করে রেখেছে। হঠাৎ অনির খুব অস্বস্তি হতে আরম্ভ করল। ও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঠাকুমা পাশের ঘরের খাটে খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখছেন। চোখাচোখি হতে হেসে বললেন, 'কি হল, চেঁচিয়ে ডাক। মেয়েটা একটু কালা আছে।'

হঠাৎ অনির মনে পড়ল ছেলেবেলায় সীতা কানে একটু কম শুনতো। ও এবার ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'সীতা, সীতা!'

আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে যে অস্বাচ্ছন্দ্য থাকে সেটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল সীতার। মুখের সামনে একটি অনভ্যস্ত মুখ দেখতে পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। (ক্রমশ)

SAA/AM/1905,BN

মানন্দ বাগচী

শরৎ সমিতির ৭-৯-৭৮ তারিখে ছাপানো যে নিমন্ত্রণ পত্রটি নিয়ে গত ৩১শে
দ্র শরৎচন্দ্রের বাসভবন ২৪ অশ্বিনী দত্ত রোডে হাজির হয়েছিলাম তাতে কোন
ভাস ছিল না, আমি নিজেও কোন খবর জানতাম না যে বিভূতিভূষণ মুখো-
ধ্যায় গুরুতর অসুস্থ, জানতাম না যে পুরস্কার নিতে তিনি আসছেন না। দীর্ঘ
বছর পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এই আনন্দে ছুটে গিয়েছিলাম। যেতে
তে মনের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন ঘষামাজা করছিলাম বারবার। তাঁর মত
রলবাক, রাশভারি মানুষকে, অন্তত ওই আনুষ্ঠানিক পরিবেশে, কথা বলানো
ত শক্ত হবে তা আমার জানা ছিল, হ্যাঁ কিংবা না দিয়েই তিনি কাজ সারেন
শির ভাগ সময়ে, তাই চিন্তাও ছিল। কিন্তু গিয়ে হতাশ হলাম। আমার মত
রও অনেকে যাঁরা তাঁকে চোখে দেখতে এবং কানে শুনতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও।
রৎচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তৈলচিত্রের সামনে ঘরোয়া ধরনের ছোট্ট আসর, আড়ম্বরহীন,
খানেক লোকের বসবার আয়োজন ছিল। যদিচ বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি,
ক্তার অধ্যাপক আইনজীবী সম্পাদক প্রকাশক ও কবি-লেখক উপস্থিত ছিলেন,
সেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। একমাত্র অমিয় মজুমদার ভিন্ন
র যাঁরাই বক্তৃতা দিলেন সকলেই প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্চে আমন্ত্রিত। অনুষ্ঠান
রিচালনায় কিছুটা দায়সারা ভাব লক্ষ করলাম।

অনুষ্ঠান শুরু হল নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা বিলম্বে এবং তার কিছু
রেই লোডশেডিং-এর রসিকতা, আলো-অন্ধকারের লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হল।
র্তৃপক্ষ কোন রকম বিকল্প আলোর ব্যবস্থা রাখেননি, ফলে মোমবাতি নিয়ে
ছোটাছুটি চলল। মানপত্রটি তো পাঠ করা হল কেবল একটি টর্চের আলো সম্বল
রে।

চাক্ষুষ না হলেও, বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় দুই যুগ আগে,
ই কিশোর বয়সে। তাঁর 'নীলাঙ্গুরীয়' পড়ে দু-তিন দিন ঘুমোতে পারিনি,
বং সেই বয়সেই কেন জানি না মনে হয়েছিল এটা বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক
পন্যাস। পরবর্তী কালে যখন মুখোমুখি তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ হয়েছিল
খন জেনেছি, না। এর মধ্যে তাঁর আত্মজীবনের কিছু নেই। কিন্তু কথাটা এখনও
ন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কেবল ঘটনাগত মিলই বড় কথা নয়, লেখকের
রিত্রগত, স্বভাবগত মিলও কি জীবনের অংশ নয়? কোনো সৃজনকর্মই ডিটাচ্‌ড
্যাপার হতে পারে না, নিজেকে মেশাতেই হয়। ঘটনার দিকে পিঠ ফেরালেও,
রিণতিকে নিজের চাওয়া-পাওয়ার বাইরে টেনে নিয়ে গেলেও এবং নির্মম হলেও
লখকের রেহাই নেই। কারণ সৃষ্টি মানেই সত্যে উত্তরণ, আর কোন সত্যের হাত
থেকেই আমাদের শেষ পর্যন্ত মুক্তি নেই। বিভূতিবাবুর সম্পর্কে বলা হয় তিনি
নরাসক্ত লেখক। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাবই নিরাসক্তি নয়, ভাল লাগাও আসক্তি,
া আবেগশূন্য হলেও। তাই 'নীলাঙ্গুরীয়'-র নায়ক শৈলেনকে বিভূতিবাবুর
স্তিত্ব থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলতে পারি না।

যাই হোক, 'নীলাঙ্গুরীয়' তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত জনপ্রিয় উপন্যাস। এবং এক
বিচিত্র প্রেমের উপন্যাস। হাসির গল্প লেখকের হাতে এই সংযতবাক, মনস্তত্ত্ব
বশ্লেষণ অভাবনীয়। বিভূতিবাবু নিজে তাঁর এই উপন্যাস সম্বন্ধে এক রকম
নর্বাক, তাঁর নিজের দুর্বলতা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' গ্রন্থটির প্রতি। তাঁর সামগ্রিক
ীবন দর্শন এর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এটি যে তাঁর শ্রেষ্ঠ
পন্যাস আমার নিজেরও তাই মনে হয়েছে। বিভূতিবাবুর সাহিত্যজীবন সুদীর্ঘ
লেও গ্রন্থসংখ্যা এখনো পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যায়নি। এবং এর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা
বেশী নয়। সবচেয়ে বেশী লিখেছেন তিনি গল্প এবং বেশির ভাগই হাসির গল্প।
ন্য রসের গল্পেও তাঁর কৃতিত্ব নগণ্য নয়।

হাসির লেখা ইদানীং বাংলা সাহিত্যে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে। ফুরিয়ে
আসছে তার অনাবিল প্রাণের ফোয়ারা। শিবরাম চক্রবর্তী ফেরত জার্নালধর্মী
হাসির লেখা—সুনন্দর, রূপদর্শীর—কিছুদিন আলো জ্বালিয়েছিল, সে রংমশাল
নিবে গেছে। আজকের আপ-টু-ডেট হাসি মুখ পালটেছে, ঠোঁটের কায়দায় রঙ
য়েছে, কথার কেরদানী-কসরতে প্রায় হাঁপাচ্ছে। এক কথায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে
নজেই। খাঁটি বাংলা হাসির ঘরানায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী যদি
কেউ ছিলেন এবং আছেন তবে তিনি এই বিভূতিভূষণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা
হাসির গল্পের এক বিরাট প্রজন্মের ওপরে পূর্ণচ্ছেদ নেমে আসবে। কিন্তু তাঁর
রচনা এবং রচিত চরিত্র বাংলা সাহিত্যে চিরদিন সরস বৈঠক চালিয়ে যাবে। তাঁর
বরযাত্রীরা চিরদিনের বরমাল্য পেয়ে গেছে বাঙালী পাঠকের কাছে। তাঁর ঘোঁতনা,
গণশা, কে গুপ্ত, তাঁর পোনু, রাণু, বাদল-রা যে যার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গেছে।

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় কীর্তি বাৎসল্য রসে মজানো কাহিনীগুলি। 'রাণুর
প্রথম ভাগ' দিয়ে যার বর্ণপরিচয়। এইটিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত (১৯৪৪) তাঁর
প্রথম গ্রন্থ। বাঙালীর চোখ-মন চমৎকৃত হয়ে উঠেছে যার পৃষ্ঠা খুলে। তারপর
রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, কথামালা। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ল এই আশ্বিনেই
মিত্র ও ঘোষ পেপারব্যাকে 'রাণু' প্রকাশ করেছেন। একের মধ্যেই চার অর্থাৎ প্রথম
ভাগ থেকে কথামালা পর্যন্ত। কেবল বাৎসল্যই নয়, পারিবারিক জীবনের তুচ্ছাতি-
তুচ্ছ অসঙ্গতি, কলহ-কোন্দল নিয়ে বাঙালীর যে চালচিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন
তাঁর সরস গল্পগুলির মধ্যে তাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ নেই, আছে উচ্চাঙ্গের

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অনাবিল কৌতুক। আছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ।
মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে, ছাপোষা সংসারে ছোট গল্পের উপাদান নেই, এ দুঃখ
তিনি ঘুচিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রবাসী বাঙালী লেখকের অবদান সামান্য নয়। তাঁদের কেউ
স্থায়ী, কেউ অস্থায়ী প্রবাসী। শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, দিলীপ রায়,
বলাইচাঁদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, জগদীশ গুপ্ত থেকে শরদিন্দু-সতীনাথ ভাদুড়ী ইস্তক
সকলেই কমবেশী প্রবাসী। প্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও—তবে ঘরে বাইরে,
অর্থাৎ শারীরিক মানসিক উভয় অর্থেই। দূরত্বে এবং দুর্ভেদ্যতায়। দ্বারভাঙ্গাবাসী,
নির্জলীয় নিশ্চুপ এই মানুষটি, প্রায় রসকষহীন মুখোভঙ্গি; অমিশুক-অমজলিশী,
বাইরের খোলসটি ঝুনো নারকেলের মত শক্ত। রাশভারি, চাপা স্বভাবের জন্যে
লোকে খুব বেশী দূর এগোতে পারে না। লোককে অফুরন্ত হাসান, কথায় নয়
লেখায়, অথচ নিজে হাসেন না। অনেকে ভুল বোঝেন। এক সময় দিন-তিনেক
ওঁর সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলাম। তখন মনে হয়েছে ওঁর চাপা ঠোঁটে, চিবুকের
রেখায়, ভ্রূকুঞ্চনের মধ্যে স্মিত হাসির ঝিলিক লুকিয়ে আছে। আধ বোজা চোখে
ক্যামেরার মত নির্ভুল চাউনি। এমন নরম মনের মানুষ, অপরের সুবিধে অসুবিধের

হ তুলনা চলে না। চেহারায় মনুষ্যত্বের শুষ্কতা, কিন্তু হাঁড়ি বাঁধতে জানলে র প্রস্রবণ নামে. তবে অলক্ষ্যে এবং ফোঁটায় ফোঁটায়। এই হচ্ছেন বিভূতিভূষণ খোপাধ্যায়. সংক্ষেপে ব-ভূ-ম, অকৃতদার মানুষ, সংসারের ভেতরে থেকেও যেন রে, নিকটে থেকেও দূরে। উদাসী অনাসক্ত মানুষ কিন্তু চক্ষুষ্মান, তাঁর ীক্ষণের মধ্যে পর্যবেক্ষণ আছে, পরীক্ষণ আছে, কিছুই নজর এড়িয়ে যায় না।

বাংলা সাহিত্যে মুখুজ্জে বাঁড়ুজ্জে দুই বিভূতিভূষণ আছেন দুজন দুই কোটির খক। কিন্তু এক জায়গায় এই দুই প্রখ্যাতকীর্তি লেখকই এক, সেটি সরলভাব েশ। দুজনের লেখার মধ্যেই কোনো মারপ্যাঁচ নেই, কায়দা নেই, চমক নেই। বনের সমস্ত তুচ্ছতাকে দুজনেই তুলে ধরেছেন দুর্লভ মূল্যে। বাংলা প্রকৃতির ং বাঙালী জীবনের অবিকৃত অনাহত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের নায়। ভ্রমণের নেশা দুজনকেই পথে বের করেছে। এবং সে ভ্রমণ 'বহু ব্যয় করে ; দেশ ঘুরে' নয়, ঘর থেকে শুধু দু পা বাড়ালেই যে সব জায়গা, অখ্যাত এবং জ্ঞাত, এক কথায় মজা বাংলা তার সৌন্দর্যেই দুজনে মজে ছিলেন। মুখো-ধ্যায়ের 'দুয়োর হতে অদূরে' আর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযাত্রিক' প্রভৃতি গ্রন্থ সেই রুণে অতুলনীয়। কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠের রম্য ভ্রমণকাহিনী 'দুয়ার হতে দূরে'। তিন পুরুষের মিথিলা প্রবাসী হয়েও বিভূতি মুখোপাধ্যায় খাঁটি বাঙালী। শবে, যৌবনে তিনি যথাক্রমে দুই দুই চার বছর এই বাংলা দেশে যে দিনগুলি তগুলি কাটিয়ে গিয়েছেন একদা, পরবর্তী কালের দেখার সঙ্গে তার রং মিশে লা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে উঠেছে ওই গ্রন্থটি। জীবনদর্শন সিঞ্চিত আর কটি দুর্লভ গ্রন্থ 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'। কুশী নদীর পথ ও শাখা পথের হুর্মুহু পাশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার ভৌগোলিক রূপান্তর, লোক-বিনের ভাঙাগড়া, প্রবাসী বাঙালী সমাজের বিবর্তন, বহু স্মৃতি বহু অবসানের াপাশি শ্রম-ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান এর উপজীব্য। আরণ্যকের সঙ্গে এর কোথায় ন মিল।

জন্ম ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বারভাঙ্গার পাণ্ডুল গ্রামে। পরে দ্বারভাঙ্গা শহরের সিন্দা হন। ১৯১২তে দ্বারভাঙ্গার রাজস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে লকাতার রিপন কলেজে পড়তে আসেন। ১৯১৪ সালে আই এ পাশ করে টনার বি এন কলেজে বি এ পড়েন। ১৯১৬-য় বি এ পাশ করে দ্বারভাঙ্গা জস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদে থাকা কালে রাজা রামেশ্বর সিং তাঁকে একান্ত সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই রাজ-রিবারের সঙ্গে তাঁর কেবল মুনিব-কর্মচারির সম্পর্ক ছিল না, ছিল অন্তরঙ্গতা। র আদর্শগত কারণে মতভেদ হওয়ায় এই চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

দীর্ঘ আট বছর পরে রাজা রামেশ্বর সিং বিভূতিভূষণের সঙ্গে রাজপরিবারের নরায় সেতুবন্ধন ঘটান। গৃহশিক্ষক হিসেবে তাঁকে নিয়ে আসেন। পরে রভাঙ্গা রাজপ্রেসে সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে বছর তিনেক ছিলেন, রাজস্কুলেও নরায় শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৩৯-৪২ পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার নেজারি করেন। ইংরেজ সরকারের রোষে পড়ে পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে লে চাকুরি জীবন ত্যাগ করে সাহিত্যকেই স্বাধীন ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। কটা কথা বলতে ভুলে গেছি, বিভূতিভূষণ একজন সক্রিয় ক্রীড়ামোদী। কলকাতায় লেজে পড়ার সময়েই একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্যের দিকে ঝোঁক এসেছে, অন্য কে খেলাধুলোয় মেতে উঠেছিলেন। ফুটবলে তাঁর রীতিমত দক্ষতা ছিল। তাঁর রবর্তীকালের অনেক রচনায় খেলা এবং খেলোয়াড়ের ছাপ পড়েছে।

অনিয়মিতভাবে হলেও তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। নি তখন পাটনায়, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রবাসীর গল্প প্রতিযোগিতায় তীয় স্থান অধিকার করায় তাঁর সেই গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়। এই য় 'মানসী ও মর্মবাণী'-তে 'দাদা' নামে একটি গল্প লিখে প্রভাতকুমার খোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়েন। এ সমস্তই ১৯১৪-১৫ সালের কথা। এই ৮।১৯ বছর বয়স থেকে তিনি গল্পলেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং জস্র গল্প লিখে চলেছেন। তাঁর বি এন ডব্লু রাঞ্চ লাইনে, তীর্থফেরত জান্তা, ফুটবল, রণরঙ্গিণী, শ্বশুর মন্দিরম, ঘুততত্ত্ব, জালিয়াত, ওরা ও আমরা, তকাব্য, প্রবাগড়ে, রাণুর প্রথম ভাগ, বর্ষায়, মধুলিড়, বরযাত্রী, বয়স হয়েছে প্রভৃতি প সেই কবে পড়েছি কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি।

এই জীবনরসিক বিভূতিভূষণকে শরৎ সমিতি 'শরৎ পুরস্কার' প্রদান করে ঙালী মাত্রকেই আনন্দিত সম্মানিত করলেন। সম্মানিত এই কারণে যে, বিভূতি-ণের প্রতি আমাদের মত সাধারণ মানুষের নীরব শ্রদ্ধা ও পক্ষপাতকে তাঁরা ীকৃতি দিলেন। সুখের বিষয় শরৎ পুরস্কারের কাঞ্চনমূল্য এবারে পাঁচ হাজার কে বেড়ে দশ হাজার টাকা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ইতিপূর্বে তিনি রও কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। 'এবার প্রিয়ম্বদা' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-রস্কার এবং 'কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসের উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৎ পুরস্কার পেয়েছিলেন। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ ১৯৫৮ সালে, যে বছর প্রথম ই পুরস্কার প্রথা চালু হয়, তাঁকে আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন। হিত্যের পুরস্কার অবশ্যই সাহিত্যের আগ মার্ক নয়, সাহিত্যকীর্তির ল্য তাতে বাড়ে বা কমে না, এটা প্রকাশ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র। হিত্যের আসল পুরস্কার সাহিত্যের পাঠক, লোকচক্ষুর অন্তরালে আর এক সদাজাগ্রত লোকচক্ষু আছে, তার দৃষ্টি। সাহিত্যের রস্কার, রোদে জলে পোড়খাওয়া সাধারণ হৃদয়ের অসাধারণ কষ্টিপাথরে আর াকালের ছাপাখানায়। সে পুরস্কার বিভূতিবাবু পেয়েছেন, পেয়ে চলেছেন। সৃষ্টি-জ থেকে একদিন হয়তো তাঁকে অবসর নিতে হবে, কিন্তু সাহিত্যের এই পেনশন র সেদিনও চালু থাকবে।
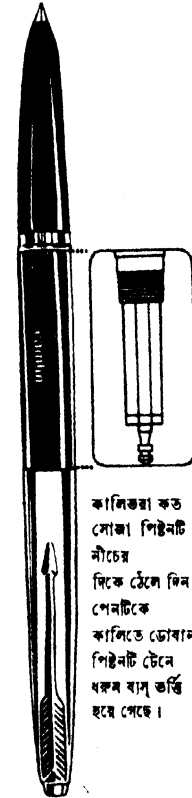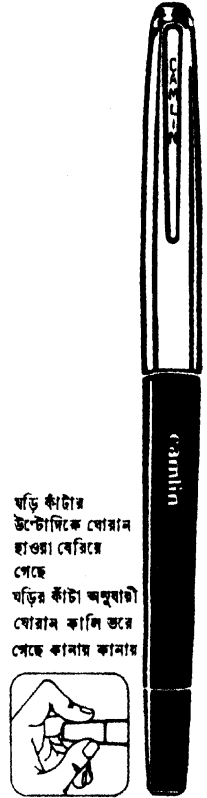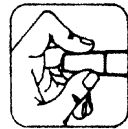
ভারতের সুবৃহৎ বালব্ প্রস্তুতকারী সংস্থা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছে সুসাশ্রয়ী এবং কার্যকরী সম্পূর্ণ আলোক-সম্ভার।

বেঙ্গল সুপার হোয়াইট বেছে নিন যার স্নিগ্ধ, কোমল আলো চোখকে দেবে নিশ্চিন্ত আরাম

যদি সবার চেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে মোলায়েম আলো চেয়ে থাকেন তো বেঙ্গল সুপার হোয়াইটের জুড়ি পাবেন না।

শুধু অভিজাত এবং আকর্ষণীয় আকৃতির জন্যই নয়, সুপার হোয়াইটের গায়ে মাখানো রয়েছে এক দুধ সাদা প্রলেপ যা আলোকে করে পরিষ্কার আর ঝকঝকে অথচ সব রকম তীব্রতামুক্ত।

ব্যাপক এবং কার্যকর আলোক সম্ভারের যদি প্রয়োজন হয় তো আসল জায়গায় আসুন। আমাদের যে কোনও ডীলারের সঙ্গে অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লাইটিং কনসালটেন্সী ডিভিশন
দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিমিটেড,
৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

যে কোন জায়গায় আমরা আপনার পাশে দাঁড়াব যাতে আপনার পয়সার সাশ্রয় হয় এবং দরকার মত ঠিক জিনিষটি পান।

ভারতের প্রথম আলোক প্রস্তুত সংস্থা

adsystems-BL-7A/78

পাক-ভারত টেস্ট ক্রিকেট

ভারত এবং পাকিস্তান দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য। এবং ভারতেরই প্রস্তাবে পাকিস্তান ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য হয়েছিল ১৯৫২। ১৯৫৬ সালে সেই ইম্পিরিয়াল ক্রিকেটের ইম্পিরিয়াল নামটি খসে গিয়ে হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্স। কনফারেন্সের টেস্ট খেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত সদস্য দেশগুলির মধ্যে ক্রিকেট সফরের ব্যবস্থা যথারীতি চলতে থাকলেও ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সফর কিন্তু বন্ধ ছিল দীর্ঘ ১৭ বছর। বলা বাহুল্য, উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া, যুদ্ধ, ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং রেষারেষির ফলেই এতদিন দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট সফর সম্ভব হয়নি। বহু আলাপ-আলোচনা এবং

বিষেণ সিং বেদী

আর্জেন্টিনায় বিশ্বকাপ হকির আগে দুই দেশের হকি দলের পারস্পরিক সফরের ফলে ক্রিকেট সফরের সম্ভাব্যতা রঙীন হয়ে ওঠে এবং অচলায়তনও ভেঙে যায়। ১৭ বছর পরে এই সফর হলেও ভারত কিন্তু পাকিস্তানে খেলতে গেছে দীর্ঘ ২৩ বছর পরে। ১৯৫৪-৫৫ মরসুমে ভারত একবার পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল সদ্য পরলোকগত ভিনু মানকড়ের নেতৃত্বে।

ওই সফরের পাঁচটি টেস্টই অমীমাংসিত ছিল। পরে, ১৯৬০-৬১ মরসুমে ফজল মামুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান শেষবার যখন ভারত সফর করে তখনও পাঁচটি টেস্টের ফলই ড্র থাকে। শুধু প্রথমবার (১৯৫২-৫৩) ভারতে পাঁচটি টেস্টের তিনটিতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়। ভারত সিরিজ জেতে ২—১ খেলায়। ভারতের অধিনায়ক ছিলেন লালা অমরনাথ। পাকিস্তানের আব্দুল হাফিজ কারদার। সেই রাবার এখনো আছে ভারতের হাতে। কিন্তু এবার ফল কি হবে?

ভারতের দল অবশ্যই শক্তিশালী। স্পিন আক্রমণেও বর্তমানে ভারত বিশ্বের সেরা। কিন্তু পাকিস্তান দল ভারতের চেয়েও শক্তিশালী, কেরী প্যাকারের ওয়ার্লড সিরিজের পাঁচজন কৃতী খেলোয়াড় পাকিস্তান দলভুক্ত হওয়ার ফলে। তা ছাড়া, পাকিস্তানের উইকেট স্পিন

সুনীল গাভাসকর

গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ

ব্রিজেশ প্যাটেল

দিলীপ বেঙ্গসরকার

বোলারদের অনুকূলে নয়। নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের পাল্লাটাই ভারি। ওয়ার্লড সিরিজের পাঁচজন—মুস্তাক মহম্মদ, আসিফ ইকবাল, মাজিদ খাঁ, ইমরান খাঁ ও জাহির আব্বাসের ক্রিকেট খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তা ছাড়া, হারুণ রসিদ, জাভেদ মিয়াদাদ, সরফরাজ নওয়াজ, ওয়াসিম রাজা প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটার। দুই স্পিনার ইকবাল কাশিম ও আব্দুল কাদিরের খ্যাতিও কম নয়। সরফরাজ এবং ইমরানের পেস অ্যাটাক ভারতের পেস অ্যাটাকের চেয়ে নিঃসন্দেহে ভাল। একটি ভবিষ্যৎবাণী করা যায়, শক্তি যাই হোক সিরিজ হবে আকর্ষণীয় এবং প্রকৃত অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। কেন না, কেরী প্যাকার নামক ধূমকেতুটির ক্রিকেট গগনে আবির্ভাবের পর এই প্রথম দুটি দেশ পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামছে।

পরে অন্য বিষয় আলোচনা করা যাবে। ভারতের যে ১৬ জন খেলোয়াড় পাকিস্তান সফর করছে আজ

ভগবত চন্দ্রশেখর

মহীন্দর অমরনাথ

সুরীন্দর অমরনাথ

কারসন ঘাওড়ি

তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও টেস্ট খেলার হিসাব দেওয়া হচ্ছে।

বিষেণ সিং বেদি (দিল্লি)—অধিনায়ক। জন্ম ২৫-৯-৪৬। বাঁ-হাতি স্পিনার। প্রথম টেস্ট আবির্ভাব কলকাতায় ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেমবর তারিখে.. ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। প্রথম জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯টি টেস্টে ভারতের অধিনায়কত্ব করে ৬টি টেস্টে জিতেছেন. হেরেছেন ৯টি টেস্টে। ড্র হয়েছে ৪টি টেস্ট। মোট ৫৮টি টেস্টে ২৪৬টি উইকেট পেয়েছেন। রান করেছেন ৬২১। সর্বোচ্চ রান ৫০ নট আউট, ১৯৭৬-৭৭ সিরিজে কানপুরে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। টেস্ট ক্যাচের সংখ্যা ২৪।

সুনীল গাভাসকর (বোম্বাই)—সহ-অধিনায়ক। জন্ম ১০-৭-৪৯। ওপেনার হিসাবে বিশ্ব একাদশে খেলার যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান। ৩৭ টেস্টে সর্বোচ্চ ২২০ রান সহ মোট ৩২২৬ রান। সেঞ্চুরির সংখ্যা ১৩। গড় রান ৪৮·৮৭। সফরকারী ভারত দলের কোন ব্যাটসম্যানের এত বেশি রান নেই, এত ভাল গড় রানও নেই। ক্যাচের সংখ্যা ৩৫।

গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (কর্ণাটক) জন্ম ১২-২-৪৯। অসাধারণ ট্যালেণ্টেড ব্যাটসম্যান। ভারতীয় ক্রিকেটে 'লিটল মাস্টার' নামে পরিচিত। ৪৩ টেস্টের ৮২ ইনিংসে মোট সংগ্রহ ৩১৫৪ রান। সর্বোচ্চ রান ১৩৯। গড় ৪২·০৫।

সুরিন্দার অমরনাথ (দিল্লি) জন্ম ১০-১২-৪৮। বিখ্যাত ক্রিকেটার লালা অমরনাথের প্রথম পুত্র। সাহসী এবং আক্রমণাত্মক ন্যাটা ব্যাটসম্যান। ৭টি টেস্টের ১৩ ইনিংসে মোট রান ৪০৩। গড় ৩১·০০। একটি সেঞ্চুরি নিউজিলাণ্ডের বিরুদ্ধে। বলা বাহুল্য, ১২৪ রানের ওই ইনিংসই সর্বোচ্চ ইনিংস।

মহীন্দার অমরনাথ (দিল্লি) লালা অমরনাথের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মতই ব্যাটে বলে প্রায় সমান দক্ষ। ১৮টি টেস্টের ৩৩ ইনিংসে মোট রান ১১৮২। গড় ৩৬·৯৩। ঠিক ১০০ রানের একটি সেঞ্চুরি আছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সুইং বোলার। টেস্ট-উইকেট ১৭টি। গড় ৪২·৭০। জন্ম ২৯-১২-৫১।

অংশুমান গায়কোয়াড় (বরোদা)। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক দত্তাজীরাও গায়কোয়াড়ের পুত্র। সাধারণত

সৈয়দ কিরমানি

ভরত রেড্ডী

চেতন চৌহান

এরাপল্লী প্রসন্ন

১৪ টেস্টের ২৬ ইনিংসে মোট রান ৭৪২। সর্বোচ্চ রান ৮৭ নট আউট। এখনো সেঞ্চুরি করতে পারেননি। তবে পঞ্চাশের উপর রান আছে ৪ ইনিংসে।

ভগবৎ চন্দ্রশেখর (কর্ণাটক) জন্ম ১৮-৫-৪৫। লেগ স্পিনার হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত। দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খেলোয়াড়। এ পর্যন্ত খেলেছেন ৫০টি টেস্ট। উইকেট পেয়েছেন ২২২টি। গড় ২৮·২৪। ভারতের বহু স্মরণীয় জয়ের নায়ক। ৫০টি টেস্টের ৭২ ইনিংসে রান কিন্তু মাত্র ১৬২। সর্বোচ্চ রান-২২। গড় মাত্র ৪·৩৭।

এরাপল্লী প্রসন্ন (কর্ণাটক) দলের সবচেয়ে সিনিয়র খেলোয়াড়। বয়স ৩৮ বছর। জন্ম ২২-৫-৪০। ডান হাতের দারুণ অফস্পিনার ব্যাট মোটামুটি ভালই করেন। ৪৭টি টেস্টে উইকেট ১৮৭টি, রান ৭২০। বোলিংয়ের গড় ২৯·৩৬, ব্যাটিংয়ের ১১·৪২।

শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবন (তামিলনাড়ু) ডান হাতের কৃতী অফ স্পিনার। ব্যাটের হাতও মোটামুটি ভাল। জন্ম ১৯৪৫ সালের ২১ এপ্রিল। ৩৭টি টেস্টে ৩৩.৫৯ গড়ে পেয়েছেন ১১৩টি উইকেট। মোট রান ৬৬০, সর্বোচ্চ ৬৪। ক্যাচ ধরেছেন ৩৫টি।

দিলীপ বেঙসরকার (বোম্বাই) সম্ভাবনাপূর্ণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান। বয়স মাত্র ২২ বছর। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ১১টি টেস্ট খেলেছেন। ২০ ইনিংসে মোট রান ৪৭৩। সর্বোচ্চ ৭৮, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। গড় ২৪.৮৯। বাঙ্গালোরে ইরানী ট্রফির খেলায় ১৫১ রানের এক উপভোগ্য সেঞ্চুরি উপহার দেন দর্শকদের।
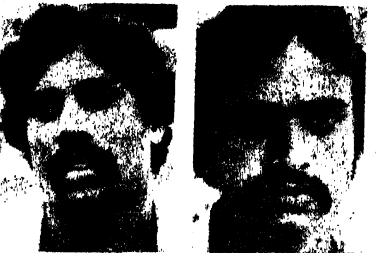
কপিল দেব

যশপাল

সৈয়দ কিরমানি (কর্ণাটক) জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর। দলের এক নম্বর উইকেট কিপার এবং বেশ নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। ২০টি টেস্টে মোট রান ৭৯৫। সর্বোচ্চ রান ৮৮, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। গড় ২৮.৩৯। উইকেটকিপার হিসাবে শিকার ৫০—ক্যাচ ৩৫, স্টাম্পিং ১৫।

কারসন ঘাউড়ি (বোম্বাই) জন্ম ১৯৫১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। বাঁহাতের মিডিয়াম পেস বোলার এবং পঁচিশ-তিরিশ রান দেওয়ার মত ব্যাটসম্যান। ১১টি টেস্টে ২৭.৭৬ গড়ে উইকেট পেয়েছে ৩০টি, ২০·৮১ গড়ে রান ৩৩৩। সর্বোচ্চ রান ৬৪, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

চেতন চৌহান (দিল্লি) ডান হাতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান। বয়স ৩১—জন্ম ২১-৭-৪৭। ৯টি টেস্টের ১৭ ইনিংসে মোট রান ৩৬৮। সর্বোচ্চ ৮৮, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। গড় ২১.৬৪। ক্যাচ ১২টি।

ভরত রেড্ডি (তামিলনাড়ু) দলের দ্বিতীয় উইকেট-কিপার। এখনো টেস্ট অভিষেক হয়নি, যদিও অস্ট্রেলিয়া সফর করে এসেছে। ১৯৭৩-৭৪এ গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা সফরে। যথেষ্ট সম্ভাবনাময় উইকেটকিপার। বয়স ২৪ বছর।

কপিল দেব (হরিয়ানা) সফরকারী দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় এবং ভারত দলের সঙ্গে এই প্রথম সফর। বয়স মাত্র ১৯। জন্ম ৬-১-৫৯। দীর্ঘকায় পেস বোলার এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে ত্রিপুল সেঞ্চুরির রেকর্ড আছে।

যশপাল শর্মা (পাঞ্জাব) চব্বিশ বছর বয়সী যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যাটসম্যান। ভারত দলে নবাগত। অনেকদিন থেকে রঞ্জি ট্রফির খেলায় ভাল রান করছে।

মুকুল

নিয়ে কিছু পরিসংখ্যান

প্রণবেশ সেন

১৯৭৮ সালের ২২ আগস্ট শেষ হল সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগ। আর ওই আগস্টের ২৬ তারিখে শুরু হয়েছিল শীল্ডের খেলা। শীল্ডের খেলা শেষে কলকাতায় এবারের ফুটবলের নটেশাকটি মুড়িয়েছে। আজ সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগের খেলা নিয়ে দু-একটা কথা বলা যেতে পারে—ভাবা যেতে পারে।

ভারতের প্রথম ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কলকাতায়। ১৮৮৪ সালের এপ্রিলে Calcutta Club of Civilans এবং Gentlemen of Barracpore-এর মধ্যে। এর ১২ বছর আগে ১৮৭২ সালে প্রথম ভারতীয় যুবক ফুটবলে পা ছোঁয়ালেন এবং স্কুল ক্লাব গড়লেন। এই ঐতিহাসিক পুরুষটির নাম নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। লীগ খেলা চালু হলো কিন্তু এর অনেক পরে। সেই সময় শুধু সাহেব দলই লীগ খেলতেন। ১৯১১তে মোহনবাগান দলের আই এ শীল্ড বিজয়, লীগে ভারতীয়দের খেলার পথ প্রশস্ত করে দিল। ১৯১৫ সালেই ঐ দল হলো রানার্স। প্রায় ১০ বছর মাত্র দুটি দল খেলতে পারত লীগে। ১৯২৫ সাল থেকে অবশ্য এই বিধিনিষেধ উঠে গেল। কলকাতার সিনিয়র ডিভিশন লীগে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনের গৌরব মহমেডান স্পোর্টিং-এর। ব্যাস, এর পর থেকেই লীগের খেলা ফুটবলের দর্শকদের কল্পনায় ছোঁয়া পেল। খেলার মান বিচারেও লীগই পেল প্রধান স্থান। বর্তমানে আই এফ এ চারটি লীগ পরিচালিত করছে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিশন। কিন্তু সবার চোখ থাকে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের দিকে। যদিও এই লীগ কলকাতারই তবু স্বীকার করতে হবে এ খেলার মান শুধু বাংলার নয়। ভিন্ন প্রদেশের বহু নামকরা খেলোয়াড় এতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তা ছাড়া, যে কোনো সর্বভারতীয় দল গঠন করতে হলে কম করে অর্ধেক খেলোয়াড় আসবেন এই সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগ থেকে। তাই কলকাতার লীগ, ভারতীয় ফুটবলেরও মান নির্ণয়ের সহায়ক।

এবারের লীগ, 'খেলা' এবং 'অ-খেলা' দুটোই ছিল বেশ জমজমাট। মাঠে খেলা শুরু হওয়ার আগেই দল বদলের পালা ঘিরেই তো রক্তারক্তি কাণ্ড। অতএব শুরুটা খুব একটা শুভ ছিল না—শেষটাও নয় মধুরেন। শেষ খেলাটা ছিল মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টার্ন রেলওয়ের মধ্যে যে খেলাতে মারপিঠ, পুলিস, ইটপাটকেল সবই ঘটেছে। আর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিন যা ঘটলো—থাক এখনই তা লিখছি না। তার আগে বরং লীগের খেলার ফলাফলের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা সেরে নিই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে।

এবারের লীগে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে মোহনবাগান। এক সময় তো ভাবা গিয়েছিল যে, এই সত্তর দশকে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানকে মাথা তুলতে দেবে না। ২০শের দশক থেকে দুই দলের খেলা চলে আসছে কিন্তু কোন একটি দশকে কোন একটি দলের এ রকম প্রাধান্য চোখে পড়েনি। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ এর মধ্যে এই দুই দলের মোট ১০বার খেলা হয়। তার মধ্যে একটি খেলা ছিল অমীমাংসিত, আর একটিতে জিতেছিল মোহনবাগান। বাকী ৮টি খেলাতে জয় ছিল ইস্টবেঙ্গলের। এই ৭৮য়ে মোহনবাগানের অন্য চেহারা। যারা ভেবেছিলেন প্রবীণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া মোহনবাগান মাঝপথে দম হারিয়ে ফেলবে, আর ইস্টবেঙ্গল অপেক্ষাকৃত নবীন বলে বাজী মাৎ করবে; তাদের দম ফেলবার সময় না দিয়ে মোহনবাগান জয়ের রথ ছুটিয়েছে দুর্বার গতিতে। আর সেই জয় যে কি বিরাট জয়, তা বুঝা যায়, যখন দেখি লীগের ২২টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান ১০টি খেলায় অন্তত গোলে), ৫টি খেলায় মোহনবাগান গোল দিয়েছে ৩... করে, তিনটি খেলায় দুটি করে, বাকী ৩টি খেলায় দিয়েছে ১টি করে গোল। তারা মোট গোল দিয়েছে ৭১টি। তার মানে, প্রতিটি খেলায় তারা গড়ে গোল করেছে ৩টিরও বেশী। ৭৬য়ে তাদের দেওয়া মোট গোলের সংখ্যা ছিল ৫৯টি। অর্থাৎ প্রতিটি খেলায় তারা গোল করেছে পৌনে তিনটের মত। ৭৭য়ে তাদের দেওয়া গোলের সংখ্যা ৬০। এবারেও প্রতি খেলায় পৌনে তিনটার মত গোল। বিপক্ষে ৭৬য়ে মোহনবাগান ১টি, ৭৭য়ে ৫টি, এবং এবার গোল খেয়েছে ৪টি। এই হিসেব বলে দিচ্ছে প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণ দুই ক্ষেত্রেই মোহনবাগান ছিল বেশ শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও মোহনবাগান সব কয়টি খেলা জিতে ইস্টবেঙ্গলের গৌরব স্পর্শ করতে পারলো না। পারল না কোনো গোল না খেয়ে লীগ জয়ের গৌরব ছুঁতে। ইস্টবেঙ্গল দুইবার পয়েন্ট না খুইয়ে এবং একবার কোনো গোল না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে লীগ জয়ের হিসেবে মোহনবাগান এবার এগিয়ে গেল। ইস্টবেঙ্গল লীগ জিতেছে ১৫ বার। এবার নিয়ে মোহনবাগান লীগ জিতলো ১৬ বার। মোহনবাগানের বয়সও বেশী। লীগ খেলছেও ১৯১৫ সাল থেকে। আর ইস্টবেঙ্গলের জন্মই ১৯২০ সালে। প্রথম ডিভিসন লীগ ১৯২৫ থেকে। মোহনবাগান প্রথম লীগ জয় করেছিল ১৯৩৯ সালে, ইস্টবেঙ্গল ১৯৪২ সালে।

এবার লীগে রানার্স হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান যেখানে ২২টি খেলায় ৪৩টি পয়েন্ট পেয়েছে, সেখানে ইস্টবেঙ্গলের সঞ্চয় ৩৯টি। যারা বলেন সকাল দেখেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে—তাঁরা এবার ভুল প্রমাণিত হয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে। ইস্টবেঙ্গল প্রথম খেলাতে পুলিসকে হারালো ৭—০ গোলে। কিন্তু তার পরেই দলটার কি যেন হয়ে গেল। দ্বিতীয় খেলাতে জিতলো স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ২—১ গোলে, আর তৃতীয় খেলাতে তাদের হার উয়াড়ীর কাছে ০—১ গোলে। গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ছাড়া অন্য কোনো দলের কাছে লীগে হারলো। এর পর থেকে দুই একবার হঠাৎ জ্বলে ওঠা ছাড়া তেমন খেলতেই পারলো না। ২২টি খেলার মধ্যে উয়াড়ী ছাড়া ওদের দ্বিতীয় হার মোহনবাগানের কাছে ০—১ গোলে। ড্র করেছে ১টি খেলায়। বাকী খেলাগুলোর মধ্যে ৫টিতে ওরা গোল করেছে কম করে ৫টি করে। আর ৩টি খেলায় গোল দিয়েছে ৩টি করে। ২২টি খেলায় ইস্টবেঙ্গল মোট গোল দিয়েছে ৫৩টি আর খেয়েছে ৭টি গোল। ৭৬এ তারা গোল দিয়েছিল ৪৮টি, খেয়েছিল ৬টি। ৭৭এ দিয়েছে ৪৩টি গোল আর খেয়েছে ৪টি। অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল গত ৩ বছরে প্রতিটি খেলায় গড়ে আড়াইটারও কম গোল করেছে। এবার তো খেলার উজ্জ্বলতায় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কাছে পাংশু।

মোহনবাগানের চেয়ে ৭ পয়েন্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে ৩ পয়েন্ট কম পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ওরা পেয়েছে ৩৬ পয়েন্ট। যদিও তিন প্রধানের এক প্রধান, তবুও ওদের খেলায় তেমন কোনো জৌলুস চোখে পড়েনি। ২২টি খেলার মধ্যে ওরা জিতেছে ১৭টি, হেরেছে ৩টি, অমীমাংসিতভাবে শেষ করেছে দুটি খেলা। ২২টি খেলায় ওরা গোল দিয়েছে ৩১টি, খেয়েছে ১০টি। ৭৭য়ে ওরা গোল দিয়েছিল ৩০টি, খেয়েছিল ৭টি গোল। ৭৬য়ে ওদের দেওয়া গোলের সংখ্যা ৫১, বিপক্ষে গোল হয়েছিল ১৩টি। এবার ওরা ১টি খেলায় গোল করেছে ৫টি দুটি খেলায় ৩টি করে, ৫টি খেলায় দুটো করে। দুটো হার ছাড়া বাকীগুলোর জয় ন্যূনতম গোলে। এই হিসাবে বোঝা যাচ্ছে গত ৩ বছরের মধ্যে এবছরে এই দলটি একেবারে আটপৌরে। তিন প্রধানের এক প্রধান—সে খ্যাতি শুধু অংকেরই হিসাবে।

অন্য দলগুলোর মধ্যে জর্জ টেলিগ্রাফ, খিদিরপুর আর বি এন রেলওয়ে যা একটু খেলেছে। বাকী দলগুলোর খেলা নিষ্প্রভ। এমনকি ব্যক্তিগত দক্ষতার নতুন কোনো নজিরও চোখে পড়েনি। অন্য সব বার

থাকেন।

গোল হবে না এমন জানলে আমরা বোধহয় কেউ মাঠেই যেতাম না। আসলে গোল এই দু অক্ষরের শব্দটাই ফুটবলের সাত রাজার ধন। আর পৃথিবীতে কোনো একটি শব্দকে যদি আন্তর্জাতিক শব্দ বলে অভিহিত করতে হয়—মানে যে শব্দটি পৃথিবীর সব ভাষাতেই একই অর্থ বোঝাতে উচ্চারিত, তবে বলবো সেই শব্দটি এই "গোল"। গোলই ফুটবলের প্রাণ। তা এবার আসা যাক গোলের কথায়। লীগের ২৩টি দলের অন্ততপক্ষে ২৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এবার সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলদাতার সম্মান পেয়েছে মোহন-বাগানের আকবর ২৪টি গোল করে। গত বছর এই সম্মান ছিল ইস্টবেঙ্গলের রঞ্জিৎ মুখার্জীর। তিনি করেছিলেন ১৭টি গোল। ৭৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লতিফউদ্দিন ২২টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এবার সামগ্রিক গোলের হিসাব হচ্ছে—লীগে ৫০৬টি ম্যাচের মধ্যে ড্র হয়েছে ১৭৬টি ম্যাচ, ৭৭য়ে ড্র হয়েছিল ১৬৬টি ম্যাচ, ৭৬য়ে ১৭৮টি ম্যাচ। অর্থাৎ এবার ৭৬এর চেয়ে দুটি ম্যাচ কম এবং ৭৭এর চেয়ে ১০টি ম্যাচ বেশী ড্র হয়েছে। এবার যে ১৭৬টি ম্যাচ ড্র হয়েছে তার মধ্যে ৬টি ম্যাচে কোনো গোল হয়নি। ৭৬য়ে ৫০৬টি খেলায় গোল হয়েছিল ৫০৫টি অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি খেলায় ১টি করে গোল। ৭৭য়ে ৫০৬টি খেলায় গোল হয়েছে ৪১৬টি। এবার ৫০৬টি খেলায় গোল হয়েছে ৪৫২টি। গড়ে প্রতি খেলায় একের চেয়েও কম।

এই গোল ভান্ডারে তিন প্রধান এবং অন্যান্য দলের অবদান কত? যে ৪৫২টি গোল হয়েছে তার মধ্যে তিন প্রধানের দেওয়া গোলের সংখ্যা ১৬৩। অবশিষ্ট বাকী ২০টি দল দিয়েছে ২৮৯টি। ৭৭এর হিসাবে দেখছি ৪১৬টি গোলের মধ্যে তিন প্রধান দিয়েছিল ১৪৩টি গোল। বাকী ২০টি দল দিয়েছিল ৭৩টি। আর ৭৬এর হিসাবে দেখছি মোট ৫০৫টি গোলের মধ্যে তিন প্রধানের দান ১৫৮টি। বাকী ২০টি দলের দেওয়া গোলের সংখ্যা ৩৪৭। এই গোলের হিসেব যদি কোনো ইঙ্গিত বহন করে তাহলে ৭৬য়ে তিন প্রধান ছাড়াও অন্যান্য দলগুলিও বেশ কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু ৭৭ ও ৭৮এর চেহারাটা অন্য। সেখানে তিন প্রধানের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। অন্য একটা হিসেব থেকেও ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। ৭৬য়ে ৫টি বা তার বেশী গোল হয়েছিল ৫টি খেলায়। তার মধ্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ১টি করে খেলায় ৫টি করে গোল দিয়েছিলেন। আর বাকী দুটি খেলায় একটিতে বি এন রেলওয়ে ৬টি গোল ও অন্যটিতে ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৫টি গোল দিয়েছিল। ৭৭য়ে ৫ বা তার বেশী গোল হয়েছিল ৮টি খেলায়। তার মধ্যে মোহনবাগান ৬টি খেলায় এবং ইস্টবেঙ্গল দুটি খেলায় গোল দেয়। ৭৮এ ৫ বা তার বেশী সংখ্যক গোল হয়েছে ১৫টি খেলায়। তার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ৫টি খেলায়, মহমেডান স্পোর্টিং ৪টি খেলায়, জর্জ টেলিগ্রাফ ১টিতে আর মোহনবাগান ৫টি খেলায় পাঁচ বা তার বেশী গোল দিয়েছে। এই হিসেবও বলছে ৭৮য়ে ছোট দলগুলি কোনো প্রতি-দ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করতে পারেনি। লীগ বলতে এখনো তিন প্রধানের খেলা, তার মধ্যে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল অনেকটা এগিয়ে, মহমেডান স্পোর্টিংএর চেয়ে। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় বরং বলবো খেলায় ফুটবলের মান যে পড়ে যাচ্ছে এটা তারই ইঙ্গিত। ইঙ্গিত যে ভুল নয় তাও বোঝা যায় স্থানীয় খেলোয়াড়দের দিয়ে দল গড়ার চেষ্টার চেয়ে ভিন দেশের নামী খেলোয়াড়দের দিয়ে দল গড়ার চেষ্টা দেখে।

৭০ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গল যে পর পর ৬ বার লীগ জয়ের অসম্ভব কৃতিত্ব অর্জন করেছিল তার মূলে কারণ এই কয় বছর তারা একটা দল নিয়ে খেলেছে। দলের সংহতি ছিল ইস্পাতের মত দৃঢ়। ইদানীং মোহনবাগান যে ইস্টবেঙ্গলকে রুখে দিল সে মোহনবাগানের জোরও কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের দল ভাঙা খেলোয়াড়রা। বলতে চাইছি, ইস্টবেঙ্গলের সংহতি ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু এখন এবার অনেকেই খেলোয়াড়জীবনের প্রৌঢ় প্রহরে পৌঁছে গেছেন। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দুটি দলকেই আজ নতুন দল গড়ার সমস্যার মুখে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এই ব্যাপারে একটা অ-শুভ প্রবণতা চোখে পড়ছে। সবাই চাইছেন নতুন খেলোয়াড় খুঁজে বের করে তাদের তালিম দিয়ে দল গড়ার বদলে অন্য রাজ্য থেকে নামী নামী খেলোয়াড়দের এনে দল করতে। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। এই দুটি দলই কারো কাছেই হার স্বীকার করবার ঝুঁকি নিতে চান না। এই মনোভাবটা কিন্তু খেলার মানের পক্ষে ভাল নয়। এর ফলে নতুন খেলোয়াড়দের বড় হবার সুযোগ যেমন সীমায়িত হয়ে পড়বে, তেমনি দলগত সংহতি কোনোদিন দানা বাধবে না। আধুনিক ফুটবলে দলগত সংহতি কিন্তু বড় কথা। তাছাড়া আরো একটা দিক আছে। বাঙালীর ফুটবলের একটা নিজস্ব শৈলী ছিল—যেটা তাদের স্বভাব থেকে উদ্ভূত। আধুনিক হতে গিয়ে সেই শৈলী অনেকটা বিসর্জিত। যেটুকু আছে, তাও শেষ হয়ে যাবে যদি বহিরাগত খেলোয়াড়দের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়—রাজ্যের ভিতর থেকে যদি নূতন খেলোয়াড় না তৈরী করা হয়।

এর জন্য শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের উপর দোষ দিলে চলবে না। দোষ রয়েছে সমর্থকদেরও। এই সমর্থকদের একটা মোটা অংশ খেলা দেখতে যান না—যান দলের জেতা দেখতে। সেই জয় না পেলে ওরা দক্ষযজ্ঞ বাধান। এবার বেশ কয়টি খেলায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। খেলায় হারলে কিংবা কোনোদিন ভাল না খেললে এই যদি কান্ড হয় তবে, "যেন তেন প্রকারেন" জয় ছাড়া অন্য দিকে মন দেবেন কে? মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিন তো একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটলো। রেফারী খেলা শুরুর বাঁশী বাজালেন কিন্তু সে বাঁশীতে সাড়া দেবার কেউ নেই। না নামলো মোহনবাগান—না নামলো ইস্ট-বেঙ্গল। টিক্ টিক্ করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চললো। দর্শকরা সেই সকাল থেকে অপেক্ষায়। বেতার ও দূর-দর্শনের ভাষ্যকাররা ভূমিকা হিসেবে যত কথা বলা সম্ভব তা শেষ করে, গলা ছেড়ে গাইবার কথা ভাবছেন "কি গাবো আমি কি শুনাবো"। শেষ পর্যন্ত কত পরে কী অবস্থায় খেলা হয়েছে সে কথা পুরনো, লেখাও হয়েছে 'দেশ'-এর পাতায়। যুক্তিবাদী এই ২০ শতকে ভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ দলের নামী দামী খেলোয়াড়দের মুখে আমরা শুনলাম, যে মাঠে আগে নামবে ভাগ্য নাকি তার উপর বিরূপ হবে।

জাতীয় ফুটবলের সময় আই এফ এ যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাতে বাংলা দলের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে আঁকা হয়েছিল বাঘের মুখ। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের বেশ কিছু খেলোয়াড় আমাদের জাতীয় দলে খেলেন ও খেলবেন। সেদিন আমরা মাঠে দেখতে পেলুম সত্যিকারের বাঘ নয়, কতকগুলি কাগজে বাঘকে নড়াচড়া করতে, ভাগ্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে কোনো রকমে "জয়"কে জয় করতে বা হার-কে এড়াতে। যাদের নিয়ে আমাদের সময় সময়ে এত গর্ববোধ, তাদের ওই মানসিকতা কি ক্রীড়াসংস্থানের প্রশ্নে অদ্ভুত রকমের বে-মানান নয়?

বই

গীতাঞ্জলির গান। ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন। মূল্য তিন টাকা।

গানের স্কুল বলতে সচরাচর যে-ধারণা হয়, ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন তার থেকে বেশ-একটু স্বতন্ত্র ধরনের। শুধু কণ্ঠ বা সুর-সম্পদ অর্জিত করেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, সংগীতের ঐতিহ্য ও আনুষঙ্গিক সমস্যা বিষয়েও তাঁরা শিল্পী ও শ্রোতৃবর্গকে 'শিক্ষিত' করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথোচিতভাবে। এই সচেতনতার সুবাদেই পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আমাদের উপহার দিয়েছেন তথ্য ও বিশ্লেষণ সমন্বিত এক-একটি পুস্তিকা—বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে ঠাকুরবাড়ির গান, বাঙলার সংগীত-শিল্পের পরিচয়ের জন্য এই গ্রন্থমালা অপরিহার্য।

তাঁদের সাম্প্রতিকতম গীতাঞ্জলির গান অনুষ্ঠান উপলক্ষেও প্রকাশিত হয়েছে একটি অত্যন্ত সুপাঠ্য ও প্রয়োজনীয় স্মারক। দুটি প্রবন্ধ শঙ্খ ঘোষের "নিভৃত প্রাণের দেবতা।" ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী-অনূদিত জিদের ফরাসী 'গীতাঞ্জলির ভূমিকা) ও একটি তথ্যপঞ্জী এই নিয়ে গীতাঞ্জলির গান' পুস্তিকা। ইন্দিরা দেবীর অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছিলো ষাট বছরেরও আগে, এই শহর থেকেই প্রকাশিত একটি পত্রিকায়। আজ পত্রপত্রিকার প্রতুলতার মধ্যেও তেমন ঘটনা দৈবাৎ। এ ছাড়া যে মৌলিক রচনাটি আছে, তা সেই জাতের প্রবন্ধ—বাঙলায় আজকাল যার বড়ো দুকাল—বিচার বুদ্ধি ও জ্ঞানই যার সম্বলমাত্র নয়, হৃদয়ের যোগেই যেখানে নিহিতার্থ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'গীতাঞ্জলি' বিশেষ অর্থে অপেক্ষা রাখে এই সহৃদয়তার।

একাধিক দিক থেকেই 'গীতাঞ্জলি'র আবির্ভাব ছিলো বহু-প্রতীক্ষিত। প্রগল্ভ উত্তর-রোমান্টিক-দের উত্তরোল বেদনাবিলাসের পর সারাৎসার কাব্যের সন্ধান বিক্ষত তরুণদের নিয়ে গেছে 'রিক্ত কাগজের শুভ্র স্বগত সংযমে'র ঊষরতায়। তাঁরা তখন একান্তভাবে চাইছেন সেই কবিতা—ভাষার অর্থসীমার বাইরে যার বিহার 'সঙ্গীতের মতন স্বাধীন', সেই চেষ্টার সুবাদেই আবিষ্ট হচ্ছেন গহন ব্যক্তিগত ও সেহেতু পবিত্র এক স্বগত উচ্চারণে—যা মন্ত্রের মতোই সংহত ও ওঙ্কারী। আত্মিক কারণেও ইয়োরোপ প্রত্যাশী ছিলো এমনই এক কবির, রুদ্রের তূর্যনিনাদের মধ্যেও যিনি স্নিগ্ধ হওয়ার 'প্রার্থনা করতে পারেন—রবীন্দ্র-কাব্যেরই সমালোচনা-সূত্রে সে সত্য অকপটে স্বীকার করেছিলেন ব্রেখ্‌ট। তাই ইয়েটস্ বা আন্ডারহিল যখন বড়ো ক'রে দেখেন শুধু এই অধ্যাত্ম তন্ময়তার দিকটাই, আপ্লুত বা নির্মলিন অভিভূত হন, দিক থেকে ব্যাখ্যা করা চলে, 'গীতাঞ্জলি'র গৌরবময় আবিষ্কার; কিন্তু উলটো দিক থেকে তাঁর স্বদেশীয় স্বভাবীরা যখন এই পর্বকে কবিজীবনের বনবাসের কাল বলে চিহ্নিত ক'রে পাঠাতে চান সন্ত-মোহান্তের আশ্রমিক নির্বাসনে তখনই বোঝা যায়, এই কবিতাগুলো দাঁড়িয়ে আছে এমন-এক সূক্ষ্ম অনেকার্থ অনুভূতি ও উপলব্ধির ওপর, যাকে ধর্মীয় ঈশ্বরের বহুবর্ণ বিভূতি মনে করাই সমালোচকের পক্ষে সব থেকে নিরাপদ।

অমনস্ক পাঠে মনে হ'তেই পারে, এই কবিতা বা গানগুলো লিখছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ও দ্বারকানাথের পৌত্র রবীন্দ্রনাথ—পিতামহের অর্জিত নিশ্চিন্ত বিত্তের আশ্রয়ে ও পিতৃদেবের রোপিত বিশ্বাস অবলম্বনে। তাঁর জীবনীপাঠক মাত্রেই কিন্তু জানেন কী মানসিক অস্থিরতা, চাপ আর সংগ্রামের মধ্যে স্তবকে-স্তবকে বেরিয়ে আসছিলো এই গীতি-গুচ্ছ। তবে বিস্ফোরণের মতো নয়, শঙ্খবাবুর ভাষায়, 'ভিতর দিকের ক্ষরণ'-এর মতো, বিপরীত দিক থেকে আবার যা তিনি আয়ত্ত করবেন শেষ দশকের কবিতায়।

'গীতাঞ্জলি'র আলোচনায় অজিত-কুমার চক্রবর্তীই প্রথম যিনি ধরতে পেরেছিলেন ভক্ত-প্রভু সম্পর্কের রহস্যিকতা। শ্রী আবু সয়ীদ আইয়ুব সে-সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেন পাঠকের সাহিত্যে বিশ্বাসের প্রাসঙ্গিক সমস্যার সূত্রে। এবার শ্রী শঙ্খ ঘোষের আলোচনায় আমরা পেলাম কবিতার আমি-তুমি সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য এই সমস্যার উন্মোচনঃ "নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার এই একটা পথ আছে বলেই 'গীতাঞ্জলি'র আস্তিকতাও আমাদের তার মুঠোয় ধরতে পারে। ঈশ্বরের অর্থে নয়, 'আমি'র অর্থেই" 'যাত্রী আমি ওরে'র যে-পান্ডুলিপি চিত্র দুটি মুদ্রিত হয়েছে এই পুস্তিকায়, সেখানেও সমর্থন মেলে আমি-তুমির এই বৈকল্পিক অর্থের। 'গীতাঞ্জলি'-তে সে মিলিত অর্থবলয় আমাদের কীভাবে নিয়ে যায় নিভৃত প্রাণের গভীরে এক নীরব জাগরণে তারই যুক্তিসিদ্ধ ও হৃদয়বেদ্য ব্যাখ্যা—বা আবিষ্কার—শ্রী শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ।

পুস্তিকার বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অত্যন্ত জরুরি একটি তথ্যপঞ্জী: বাংলা ও ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র তুলনামূলক সূচীপত্র এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলন করেছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' যে শুধু বাংলা বইটির অনুবাদ নয়, তার মধ্যে মিলেমিশে আছে অন্যান্য বইয়েরও কিছু সমভাবের রচনা, অথবা বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র অনেক কবিতা যে অনূদিত হ'য়ে স্থান পেয়েছে অন্যান্য ইংরেজি সংকলনে আমাদের অনেকেই সে-বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নন, আবার যাঁরা সচেতন তাঁদেরও সব অনুপুঙ্খ স্মৃতিতে থাকে না। অনাথবাবুর তথ্য-পঞ্জী দু-দলেরই নিত্যব্যবহার্য

কিন্তু তথ্য বলেই একটু বিপজ্জনক। এ-ধরনের কাজ করতে গেলে ভুল হ'তেই পারে—তাই ব'লে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। তবে অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে ঘটা ভুলের দায়িত্ব নিতেই হয় সংকলককে। যেমন, প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের উক্তির 'এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান' বলতে সংকলক যখন নির্বিচারে ৮-১০ সংখ্যক গানের উল্লেখ করেন, তখন তিনি সম্ভবত ধরে নেন 'প্রথম' শব্দটির শিথিল ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর সেইভাবেই ভুল করেন এই তথ্যটি জানিয়ে দিতে যে 'গান' বইতে সংকলিত হয়েছিলো আক্ষরিকভাবে প্রথম থেকেই কয়েকটি গান। ঠিক একই কারণে বিদেশী

অনুবাদের তালিকায় কোনো-কোনো প্রকাশকের নাম সূচীবদ্ধ হ'য়ে যায় অনুবাদক হিসেবে অথবা একই অনুবাদক বানান-বিভ্রাটে দু'জন হয়ে যান, একই বইয়ের সংস্করণ দুটি স্বতন্ত্র বইয়ের মর্যাদা পায়। সমতার অভাবেও অনেক সময়ে বিভ্রান্তি ঘটে। যেমন, বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র ২৪ থেকে ৩৩ রচনার স্থান বোল-পুর-ই তো? তাহলে উল্লেখ করা হলো না কেন? কোনো পঞ্জীই হয়তো সম্পূর্ণতা দাবি করতে পারে না; তবু বিদেশী অনুবাদের তালিকা আরো সম্পন্ন করা যেতো য়ুনেস্কো অনুবাদপঞ্জীর সহায়তা নিলে। আর ইংরেজি যে স্থান পেলো এশীয় ভাষা-গুচ্ছে, তার কারণ বোধহয় আমাদের সামাজিক ইতিহাসে নিহিত।

প্রসঙ্গত অন্য-একটি সমস্যার কথা বলি: শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'কে অগ্রাহ্য করা আজ কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর পরিবেশিত তথ্যের সঙ্গে অনাথবাবুর তথ্যপার্থক্য ঘটেছে। যেমন, অনাথবাবুর তালিকায় (এবং শঙ্খবাবুর প্রবন্ধেও) সুর-তাল সমন্বিত পঁচাশিটি গানের উল্লেখ আছে। প্রভাতকুমারের ছাপান্নটি। এমনই তফাৎ আছে স্থান-কালের প্রসঙ্গেও। কোনটা ঠিক? প্রভাতবাবুর ভুল হ'লে পাদটীকায় তা উল্লেখ করা সংস্করণগুলির সংযোজন-বর্জনের তালিকা থাকলে ভালো হতো। আর 'সারণী' বললে যদি তালিকার বেশি কিছু বোঝায় বা বর্ণানুক্রমিক সূচী আর 'বিষয়সূচী' অভিন্ন হয়, তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহ'লে পরিচিত শব্দগুলি ব্যবহার করতেই সংকলককে অনুরোধ করবো।

যে-কাজ করা উচিত ছিলো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের, ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী তা-ই ক'রে আমাদের সামনে এক বড়ো দৃষ্টান্ত তৈরি ক'রে দিলেন।

স্বপন মজুমদার

বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ। ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির। এ১৮-এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। মূল্য—বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এখনো পর্যন্ত বাংলা কথা-সাহিত্যের সমালোচনায় ঘটনা, চরিত্র, লেখকের দর্শন ইত্যাদি সিংহভাগ জুড়ে থাকে। লেখকের রচনাশৈলীর ওপর যে আলোচনা হয় না—তা নয়। কিন্তু গঠনতন্ত্রের ওপর, তার মৌলিকত্ব, কিংবা সেই গঠনতন্ত্রে লেখকের মনোভঙ্গী কতখানি ধরা পড়েছে—তার ওপর বিশদ কোন আলোচনা চোখে পড়ে না। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে য়ুরোপ-আমেরিকার কথাসাহিত্য সমালোচনার ধারাতেও এই মামুলী সমালোচনা-রীতি প্রচলিত ছিল। দুঃখের বিষয়, বাংলা সমালোচনার মূল স্রোতটি এখনো সেই পুরোনো পথেই বইছে। বর্তমান গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধের সেই প্রথাসিদ্ধ পথের ব্যতিক্রম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে (বাংলা কথসাহিত্যের) বিভিন্ন সময়ে লেখা দশটি নিবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। এর মধ্যে প্রকরণ সম্পর্কিত আলোচনা আছে তিনটি নিবন্ধে। এ বিষয়ের প্রথম নিবন্ধটির শিরোনাম (গ্রন্থের এটি দ্বিতীয় নিবন্ধ) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও গদ্য রচনায় ডায়েরির প্রকরণ ও প্রবণতা। 'আত্মাপের অন্বেষণরূপ' ডায়েরি বা দিনলিপির মধ্যে দিয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথের নিভৃত মর্মলোকে পৌঁছনোর প্রয়াসই নয়, ডায়েরির ভাব ও ভাবনা থেকে লেখক কবিতার জন্মসূত্রও বিশ্লেষিত করেছেন এই নিবন্ধে। রচনাটির মধ্যে দিয়ে গ্রন্থকার নিষ্ঠাসহকারে দেখিয়েছেন—সারা জীবনে বিভিন্ন লেখায় রবীন্দ্রনাথের ডায়েরি লেখার অন্তর্নিহিত মানসিকতা ও ডায়েরির আঙ্গিক প্রকরণের নানা লক্ষণ কি-ভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'তে এই বিশিষ্ট আঙ্গিকটিকে পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রয়োগ করে উপন্যাস দুটির আপাতবিশৃঙ্খলার মধ্যে এক ধরনের গঠনতান্ত্রিক ঐক্য (structural unity) গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের প্রেক্ষণবিন্দু (Point of View)।

লেখকের এই প্রেক্ষণবিন্দুতে পৌঁছনোর সোপানটি সম্পর্কে স্যার প্যারসি লুবক আমাদের প্রথম সচেতন করে তোলেন ১৯২১ সালে। বর্তমান গ্রন্থে তাই বারবার লুবকের উল্লেখ। 'দি ক্রাফট অফ ফিকশন' গ্রন্থে লুবক উপন্যাস সমালোচনার প্রচলিত কলমটি ভেঙে নতুন সমালোচনার কলমে দেখিয়েছিলেন যে, ঔপন্যাসিকের রচনার ঐক্য (unity), গভীরতা (emphasis) এবং সংগতি অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয় লেখকের ভাষণ-পদ্ধতি দ্বারা (narrative method)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই বর্তমান গ্রন্থটিতে আর একটি সুচিন্তিত নিবন্ধ সংযুক্ত হয়েছে— 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : প্রকরণের আলোকে'। প্রচলিত পথে শরৎ-উপন্যাসের বিষয়গত বিশ্লেষণ না করে, এর প্রকরণগত বিশ্লেষণ করায় আলোচনাটি নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা পেয়েছে। উপন্যাসের আঙ্গিকে শরৎচন্দ্র প্রথম পুরুষে লেখার সর্বজ্ঞতা অনুসরণ করেও বিশেষ কোন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বলার সীমায়িত সর্বজ্ঞতার প্রাধান্য এনেছেন। এতে এক ধরনের আত্মনিষ্ঠ ভঙ্গীর পরোক্ষ আভাস পাওয়া গেছে। Shifting of potint of view এনেছে শরৎ উপন্যাসে বৈচিত্র্য।

গ্রন্থের ষষ্ঠ সংখ্যক নিবন্ধ হল 'বিভূতিভূষণের শিল্পিসত্তা : দিনলিপিতে প্রতিফলন'। বাংলা সাহিত্যে দিনলিপি রচনায় বোধ হয় সবচেয়ে নিয়মিত লেখক বিভূতিভূষণ। গল্প-উপন্যাস রচনার পাশাপাশি আছে তাঁর দিনলিপি লেখা। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন ডায়েরি লেখার 'এই আঙ্গিক প্রকরণটি তাঁর মূল সাহিত্যসৃষ্টির ধারা থেকেও পৃথক কোন উদ্ভাবন নয়।' রচনার প্রকাশ-তারিখ উল্লেখ করে স্মৃতির রেখা, তৃণাঙ্কুর, ঊর্মিমুখর, উৎকর্ণ ও হে অরণ্য কথা কও-এর তালিকার মধ্য থেকে এদের শিল্পমূল্য যাচাই-এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার বিভূতিভূষণের উপন্যাস রচনার গঠনশিথিলতার মূল কারণে পৌঁছে গেছেন। এই আঙ্গিক প্রকরণে লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত দিকটির সঙ্গে সর্বজনীন দিকটির দ্বন্দ্ব তৈরী হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই দ্বন্দ্ব থেকে ঔপন্যাসিকের মনোজগতের পরিচয় স্পষ্ট উঠে আসে। বর্তমান নিবন্ধে এ সম্পর্ক আর একটু বিশদ আলোচনার প্রত্যাশা ছিল। গ্রন্থের অন্য আর একটি প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ আলোচিত হয়েছেন 'ছোট গল্পের দর্পণে'।

প্রকরণগত বিশ্লেষণকে প্রাধান্য না দিয়ে এই গ্রন্থে অন্যান্য যে সমস্ত নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে 'বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস' এবং 'শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য ও সমসাময়িক কাল' লেখা দুটি ছাড়া অন্য তিনটি আলোচনা স্থান পেয়েছে তারাশঙ্কর, মানিক ও বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে।

গ্রন্থটির শেষ নিবন্ধ 'রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ'। শেষ লেখাটির [illegible] উদ্রেক করে। অন্যান্য লেখার তুলনায় এ আলোচনাটিকে খুবই উপেক্ষিত বলে মনে হয়। যদিও প্রবন্ধকার আলোচনা 'এই সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়।' তবু লেখকের অন্যান্য নিবন্ধগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এ লেখাটিকে যথেষ্ট সতর্ক রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সবিনয়ে জানিয়েছেন—এ-জাতীয় প্রকরণনির্ভর আলোচনার খুবই অভাব। এই গ্রন্থের শ্রমনিষ্ঠ ও মেধাবী নিবন্ধগুলি সে অভাব বেশ খানিকটা পূরণ করবে বলে মনে হয়।

সুনীল দাশ

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের লখনউ আউধের তখতে তখন ওয়াজিদ আলি শাহ, ভারতের শেষ স্বাধীন নবাব। রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী 'সব লাল হো যায়গা' সত্যি হতে চলেছে। প্রায় সমস্ত ভারতকে গ্রাস করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাল-কুর্তা পল্টন তখন লখনউ-এর দোরগোড়ায়। কিন্তু লখনউ-এর লোকদের কোন হুঁশ নেই। রইস আদমী আর সাধারণ লোক, ছেলেবুড়ো সবাই আমোদ-আহ্লাদ মশগুল। গোলাপ, আতর আর অম্বুরী তামাক, জরদা, সুর্তি আর কিমামের গন্ধে বাতাস ভরপুর। ঠুংরী, খেয়াল আর কথক, খানাপিনা, ভেড়া, মোরগ আর তিতিরের লড়াই, তাস আর দাবা এই সব নিয়েই লোকেরা চুর। নবাবী আমল প্রায় অস্তমিত, কিন্তু হুতোমের ভাষায় তাতে সূর্যাস্তের সোনা।

মুনসী প্রেমচাঁদের বিখ্যাত ছোটগল্প শতরঞ্জ কে খিলাড়ী-কে ভিত্তি করে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম হিন্দি (রঙিন) ছবির এই হল পটভূমি। এই পটভূমিতে যে নাটকীয় দাবা খেলা দিয়ে লখনউ-এর নবাবী আমলের তামাম শোধ তা এই ছবির বিষয়। দাবা খেলা এই 'নাটকে' একই সঙ্গে দুদিকে চলছে। একদিকে মিরজা সাজ্জাদ আলি (সঞ্জীবকুমার) আর মির রোশন আলি (সৈয়দ জাফরি) এই দুই দাবা পাগলের অন্তহীন খেলা। ছবির শুরুতে দেখা যায় মিরজার বৈঠকখানায় দুজনে ঠিক তেমনি নিবিষ্টচিত্তে দাবার ঘুঁটি এগোচ্ছেন যেমন করে সেনাপতিরা রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেন। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে, টৌড়ির সময় গড়িয়ে ইমনের সময়ে পৌঁছুচ্ছে, ইমনের সময় মালকোষে। কিন্তু এই দুজনের নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, ঘুম নেই কেবল পান-জরদা, আলবোলায় টান আর দাবা আর দাবা।

মিরজার নবপরিণীতা বেগম দিনের পর দিন স্বামীর ব্যর্থ প্রতীক্ষায় অন্দরে নিদ্রাহীন চোখে বসে আছেন। অবশেষে একদিন তিনি দাবার ঘুঁটিগুলো লুকিয়ে ফেললেন। অগত্যা তাঁরা আলু-আপেল ইত্যাদি [illegible] দাবার ঘুঁটিগুলোকে ছুঁড়ে বৈঠকখানায় ফেলে দিয়ে গেলেন। পরাজিত সৈনদের মতন বন্দী গম নোকে বোড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

দুই দাবাড়ু তখন মিরজার বাড়ি ছেড়ে এক আম্বাটায় ভেড়ার চেষ্টা করে শেষকালে মিরের বৈঠকখানায় আবার দাবার ছক পেতে বসলেন। এঁদের হঠাৎ আক্রমণে মিরের স্ত্রী একটু ফাঁপরে পড়লেন কারণ এর ফলে মিরের যুবক ভাগ্নের সঙ্গে তাঁর আশনাই কেঁচে যাবার উপক্রম হল। কিন্তু পাকা খেলোয়াড় বেগম সাহেবের চালে তাঁদের সেখান থেকে পাট গুটিয়ে লখনউ-এর শহরতলীর এক পোড়ো বাড়িতে পালাতে হল। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখা যায় একটু ভীষণ ঝগড়ার পর আবার তাঁরা দাবায় বসেছেন। এবার খেলা মন্থর গতি ভারতীয় নিয়মে নয়, জোর কদম বিলিতি চালে। ঠিক তার একটু আগেই দেখা যায় লালকুর্তা ইংরেজ পল্টনের দল লখনউ-এ ঢুকছে।

ছবির দ্বিতীয় দাবা ব্যক্তিগত হারজিত নিয়ে নয়, এ খেলার কিস্তি মাত-এর ওপর নির্ভর করছে একটা রাজ্যের ভাগ্য। কলকাতায় বসে বড়লাট লর্ড ড্যালহাউসি ঠিক করলেন এইবার আউধ গেলবার সময় এসেছে। তাঁর কলকাঠি নাড়ার ফলে দাবার চালে জড়িয়ে পড়লেন লখনউ-এর ইংরেজ রেসিডেন্ট কর্নেল উটরাম (স্যার রিচার্ড অ্যাটেনবরা) আর ওয়াজিদ আলি (আমজাদ খান)। এ খেলা এতই অসমান যে ওয়াজিদ আলি প্রায় এক চালেই মাত হয়ে গেলেন। কুড়ি বছর আগের চুক্তি ভেঙে ইংরেজরা তাঁকে গদিচ্যুত করে কলকাতায় বন্দী করে নিয়ে গেল। তাদের অজুহাত ওয়াজিদ আলি একেবারে অপদার্থ শাসক, মদ মেয়েমানুষ আর নবাবীপনা ছাড়া কিছুই জানেন না ফলে আউধে ঘোর অরাজকতা দেখা দিয়েছে প্রজাদের দুর্দশার শেষ নেই। লখনউ এর নবাবী আমল শেষ হয়ে গেল।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী ঐতিহাসিক ছবি হলেও এর জোর ঘটনাবলীতে নয়, এর আসল জোর এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোতে জড়িয়ে পড়া মানুষদের কাহিনী। ছবিতে সত্যজিৎ রায় তাদের দোষগুণ, তাদের আবেগ অনুভূতি আশা আকাঙ্ক্ষা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আর হারজিতের মধ্যে দিয়ে একটা রাজ্যের পতন একটা যুগের শেষকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে আরিস্ততলের সেই বিখ্যাত উক্তিটির কথা মনে পড়ে যায় যাতে তিনি বলেছেন শিল্পীর চোখে দেখা ইতিহাস একটা যুগের মর্মস্থল পৌঁছতে পারে সেখানে ঐতিহাসিক তথ্য যেতে পারে না।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। কর্নেল স্লীমান থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ঐতিহাসিক আর লেখকরা ওয়াজিদ আলিকে 'এ ক্রাউন লোয়িং অ্যা নিগ্রো' বলে প্রচার করে এসেছেন [illegible] সত্যি যে ওয়াজিদ আলি রাজ্য

[illegible] ছিলেন, এমন কি সেদিকে তাঁর খুব মনও ছিল না। তাই বলে তিনি নির্বোধ ও শয়তান ছিলেন বললে সত্যের চূড়ান্ত অপলাপ হয়। তাঁর সঙ্গে আশ্চর্য মিল ছিল গোলকুণ্ডার শেষ রাজা আবুল হাসানের (১৬৭২-১৬৮৭)। আবুল হাসানের মতন তিনিও ছিলেন বিষয় কর্মে উদাসীন এবং একাধারে শিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, দরদী মরমী মানুষ। মতলবের কথা বাদ দিলেও উটরামের মতন স্থূল রুচিসম্পন্ন ইংরেজ ফিলিসটাইনরা যে তাঁকে বুঝতে পারবেন না তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ীতে সত্যজিৎ রায় একদিকে মানুষ ওয়াজিদ আলিকে তুলে ধরে ও অন্যদিকে ইংরেজদের বজ্জাতির মুখোশ খুলে দিয়ে একজন বহু-নিন্দিত মানুষ ও একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই দুটো জিনিস যে ইতিহাসের নিরস পাঠ না হয়ে অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক নাটকীয় রূপ নিয়েছে তার কারণ তাঁর শিল্পক্ষমতা ছাড়া তাঁর মোলায়েম বলবার ধরন। বলা বাহুল্য চড়া সুরে বললে এটা সম্ভব হত না।

উদাহরণস্বরূপ এখানে ছবিটির একটি অনবদ্য দৃশ্যের কথা বলা যায়। উটরাম ওয়াজিদ আলির কায়জারবাদ প্রাসাদে এসে তাঁকে একটা নতুন চুক্তিতে সই করে তিনদিনের মধ্যে সিংহাসন ছাড়বার হুকুম দিচ্ছেন। ওয়াজিদ আলি নির্বাক। তিনি কেবল তাঁর বিশাল কালো চোখের গভীর দৃষ্টি দিয়ে উটরামের দিকে তাকিয়ে আছেন। উটরাম ওয়াজিদ আলির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। তারপর নীরব ওয়াজিদ আলি আস্তে আস্তে সিংহাসন থেকে নেমে নিজের হাতে মাথার পাগড়ি খুলে উটরামের দিকে এগিয়ে দিলেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন : আমি আপনার জন্যে আমার মাথা নগ্ন করতে পারি, কিন্তু ঐ চুক্তিতে আমি দস্তখত দেব না। মুহূর্তের জন্যে হলেও ইংরেজ জবরজঙ্গী উটরামের অগাধ আত্মবিশ্বাস বিচলিত হল, তিনি বুঝলেন যে অন্তত এই একটি চালে ওয়াজিদ আলির কাছে হেরে গেলেন। নীরবতা যে কত 'বাঙ্ময়' হতে পারে এই দৃশ্যটি না দেখলে বোঝা যায় না।

ওয়াজিদ আলির ভূমিকায় আমজাদ খান পোশাকে-আসাকে, চলনে-বলনে, হাবে-ভাবে রাজকীয়, মনে হয় যেন জীবন্ত ওয়াজিদ আলি। 'শোলের' গব্বর সিং-এর এই রূপান্তর অবিশ্বাস্য। রিচার্ড অ্যাটেনবরার উটরাম, সুয়েজ খাল পার হওয়া ইংরেজ অর্থাৎ 'আলমুখো রাঙার' প্রতিমূর্তি। যারা সব দিক দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে অটল বিশ্বাসী ছিল, যারা কালাদের মানুষ বলে গণ্য করত না, যারা বছরের পর বছর এদেশে থাকলেও এদেশের ভাষা শেখার কোন চেষ্টা করত না। তবে সত্যজিৎ রায়ের হাতে উটরামকে একটু বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয়েছে।

সত্যজিৎ রায়

দিয়েছেন তাঁরা হলেন দুই দাবাড়ু মির ও মিরজা। এঁরা ট্র্যাজিক ও কমিকের অপূর্ব সমন্বয়। ওয়াজিদ আলির লখনউ-এ এদের চেয়ে ভাল প্রতীক আর হয় না। সংসার উচ্ছন্নে যাচ্ছে, দেশ রসাতলে যাচ্ছে কিন্তু এঁদের কোন কিছুতেই চৈতন্য নেই। বলা বাহুল্য এঁদের মতন লোকেরাই দেশের সর্বনাশের কারণ। কিন্তু তবুও এই দুই নিষ্কর্মার ধাড়ি, কুঁড়ের বাদশার ওপর ভীষণ মায়া পড়ে যায়। মির ও মির্জা ভাগারল্ফাফিতে কারুর চেয়ে কম যান না, এদের জবানী চুস্ত কিন্তু একজন মুখ ঘোরালেই অন্যজন দাবার ঘুঁটি সরিয়ে নিজের সুবিধেমত ঘরে বসিয়ে নিতে কসুর করেন না। মিরজার ভূমিকায় সঞ্জীবকুমার তাঁর স্বভাবসুলভ সুন্দর অভিনয় করেছেন। সৈয়দ জাফরির মির তুলনাহীন।

বলাবাহুল্য এই হাসি-কান্না মাখানো পুতুল নাচ, শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর নকীব হলেন সত্যজিৎ রায় যাঁর পরিমিতি বোধ ও শিল্পচাতুর্য ছবিটির সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শতরঞ্জ কে খিলাড়ী তাঁর পরিণত শিল্প ক্ষমতার প্রায় নিখুঁত নিদর্শন। 'প্রায়' কথাটা ব্যবহার করার কারণ যে ছবির গোড়ার দিকে কার্টুন ও অ্যানিমেশানের অংশটা একটু অস্বস্তিকর মনে হয়। কিন্তু তার পর থেকে ছবি জলের মতন চিকনভাবে পরিণতিতে পৌঁচেছে। শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর গতি ধীর বললে ভুল হবে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খাইয়েই এর ঢিমে লয়। আর ছবিটিতে সত্যজিৎ রায়ের বড় কৃতিত্ব হল যে এতে তিনি উনিশ শতকের মাঝামাঝির লখনউ চেহারাটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন যা হঠাৎ অসাধ্য বলে মনে হয়। তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছেন অসংখ্য ডিটেলের জামেয়ারের কাজ দিয়ে। ভোরের ঝাপসা আলোয় আকাশের গায় মিনার ও গম্বুজের সিলউয়েট, পুরনো গলির নিস্তব্ধ রূপ, চোখ ধাঁধানো সোনার সিংহাসন, মণিমুক্তো বসানো শতরঞ্জ, বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনে আলোর বিচ্ছুরণ, অরমোলু দেওয়া পুরনো ঘড়ি, রেশম ও মখমলের পাঞ্জা ঝালর, নয়নসুখ ও চিকনের চেকনাই, মুরগি ও ভেড়ার লড়াই—এই সব মিশিয়ে আবার বলতে সোনার ঝলমলে হয়ে উঠেছে। সরুণা-ভিয়ার রঙ আর ইমেজ মিশিয়ে দেখতে এমন সুন্দর এবং একজন বিদেশী সমালোচকের মতে এমন 'সেনসুয়াস' ছবি সত্যজিৎ রায় আগে করেননি।

অনেকে বলেন সত্যজিৎ রায় 'সমাজ-সচেতন' শিল্পী নন। শিল্পে সমাজ-চেতনা কিভাবে প্রকাশ হয় তা নিয়ে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে মানুষ যাঁর শিল্পের কেন্দ্রে, যিনি গরীব হরিহর, জমিদার বিশ্বম্ভর রায় ও নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের মতন বিভিন্ন স্রোতের জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষদের ট্র্যাজেডিকে অনুকম্পা ও অনুপম শিল্প দিয়ে ছবিতে প্রাণবন্ত করতে পারেন তিনি মহৎ শিল্পী।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

চিত্রকলা

"পেনটারস ফ্রন্ট"

আকাডেমী অব আর্টসে সেপটেম্বরের মাঝামাঝি ২০ জন শিল্পীর একটি যৌথ প্রদর্শনী দেখলুম। "জীবনমুখী চেতনাসমৃদ্ধ" প্রগতিশীল ভাবধারার বলে যেসব দাবীদাওয়া করেছেন এঁরা সব ছবির মধ্যে সেটা খুব পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ শিল্পীরা যে ছবিগুলো এঁকেছেন সেটা কতখানি জীবনমুখী হল এবং সেইসঙ্গে তাঁরা কতখানি নান্দনিক চেতনার ছাপ রাখলেন সেটা যদি মানুষকে দোলা দেয়, তবেই কী-না সেটা সার্থক। লাতিন আমেরিকা বা মেকসিকোতে যা হয়েছে তা শিল্পীর রাজনৈতিক বিশ্বাসজাত এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার ফল। রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যে মৃত্যুপণ করে এঁরা কাজে নেমেছিলেন এবং তাঁদের তুলি এবং কব্জির জোর ছিল। বিশ্বাসের জোর তুলির জোর বাড়িয়েছে।

এই প্রদর্শনী আমার কাছে সেভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে কয়েকটি ছবি আমার মোটামুটি ভাল লেগেছে। যেমন অজিতবিক্রম দত্তের "সূর্যমুখী" একটি বৃত্তের মধ্যে কয়েকটি দুঃস্বপ্নের মুখ, রচনাটি জমাট। এবং রঙলেপনের মধ্যেও বেশ উজ্জ্বলতা আছে। দিলীপেশ্বর ভট্টাচার্যের "ভাবনা" ছবিটার স্টাইল-এ অজিতবিক্রমের কিছু প্রভাব থাকলেও মোটামুটি ভাল। বিজন চৌধুরী এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ শিল্পী। এঁর "পরাজয় নয়" ছবিটি সবুজ লালে বিধৃত অদ্ভুত প্রতিমূর্তিস্বরূপ এক ঘোড়সোয়ার মুখোশের মধ্যে থেকে বেরিয়ে, মানুষকে দলতে চায়। রচনাটি পিরামিড-সদৃশ। বেশ বলিষ্ঠ কাজ। দিলীপ ভট্টাচার্যের "জীবন জিজ্ঞাসা" নাসকাটা ঘরের দৃশ্যটি এঁকেছেন মন্দ নয়—কালো লাল দিয়ে ৬ ফুট চওড়া পট ভাগ করে নিয়ে সাদা নীল মানুষগুলি এঁকেছেন। কাজটি [illegible] এবং অমর দে-র "শোষিত বাংলা" ছবিতে কৃষকের কুটিরের সম্মুখভাগটি অঙ্কিত। সবুজ হলুদ এবং বাদামী রঙে রচনাটি বিধৃত এবং মাঝখানে একটি দুঃস্থ কৃষক অবস্থানে ছবিটা রচনার দিক দিয়ে উৎরেছে। চিত্রটির "নাইভিটি" ছবিটিকে আরো উঠিয়ে দিয়েছে। পরিমল দত্তরায়ের "ঝড়" ছবিটির উপস্থাপন সবকিছু মিলে ভালই লাগল, তবে তেমন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। নির্মাল্য নাগের "বর্গাদার ৭৮" ছবির মধ্যে একটি ট্রাক্টরের দিল পেনটারসুলভ অসম্পূর্ণ ল্যান্ডস্কেপ পেনটিং ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। এছাড়া আর অন্যান্য ছবি, ভাল ভাল নাম থাকা সত্ত্বেও, মনকে টানেনি। আসলে উত্তাল সমুদ্র বা রুগ্ন মানুষ যাই আঁকো প্রথমে ছবি হওয়া চাই।

রথীন মৈত্র

"ভিসুয়াল আর্টস"-এর চিত্রপ্রদর্শনী

"কলেজ অব ভিসুয়াল আর্টস"-এর সাইত্রিশ জন তরুণ ছাত্রছাত্রী তাঁদের ছবির প্রদর্শনী করেছেন বিড়লা অ্যাকাডেমীতে। প্রদর্শনীতে ঢুকেই একাধিক গ্রামীণ কুটীরের ছবি চোখে পড়ে, এবং প্রায় প্রত্যেকটিই জলরঙে আঁকা। দু'একটি ছাড়া, এই পর্যায়ের অধিকাংশ ছবিই খুব গতানুগতিক। পরে প্রশ্ন করে জানলাম, ছাত্রছাত্রীদের মুকুটমণিপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, এবং সেখানকার বহির্দৃশ্যে যে-সব বাড়ি-ঘর ওঁরা দেখেছেন, তাদের ছবিই ওঁরা এঁকেছেন। কুটীরের ছবি আঁকা এমনিতে দূষণীয় কিছু নয়, বিশেষত শিক্ষার্থীদের পক্ষে। কিন্তু আঁকার পদ্ধতিতে ঈষৎ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ছিলো। সবাই একরকম ভাবে আঁকবেন কেন?

যে দুজন তরুণ শিল্পীর কাজ আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, তাঁরা হলেন অলক সর্দার এবং কাজী অনির্বাণ। অলক সর্দারের চোদ্দটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, এবং অনির্বাণের ছটি। অলক তেলরঙের ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন, এঁকেছেন তেলরঙের স্কেচ, জলরঙের ছবি, এবং লিনোকাট। প্রত্যেকটিই সুন্দর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, যিনি জলরঙের "কম্পোজিশনে" মই-শিশু-করোটি-সমন্বিত সুররিয়ালিস্টিক ছবি এঁকেছেন, তিনিই আবার আট নম্বর ছবিতে অতি-বাস্তবানুগ মোটরগাড়ি এবং বাড়িঘরের রূপ রচনা করেছেন। অর্থাৎ, তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বা শিল্পী-চরিত্র বুঝতে আমাদের ঈষৎ অসুবিধে হয়। অলকের ছবি বিষয়ে আমি যা বললাম, তা প্রদর্শনীর আরো তিনচারজন শিল্পী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তেলরঙের স্কেচগুলিতে অলক দ্রুত রেখার আঁকিবুঁকির সঙ্গে জড়ানো জেটানো রঙের [illegible]
[illegible]

ছবি. যেখানে দড়িতে কাপড় ঝুলছে—এ রকম অতি-সাধারণ বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে (১৪ নম্বর), সেখানেও রং-রেখার সাযুজ্যবোধ অত্যন্ত নয়নরঞ্জন মনে হয়।

কাজী অনির্বাণের ছবিও অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিময়। এক রধনের গভীরত্ব ও স্পর্শগ্রাহ্যতা খুব নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এই শিল্পী তাঁর প্রত্যেকটি ছবিতে। তেলরঙের ল্যাণ্ড-স্কেপগুলি, বিশেষত ৫৪ নম্বর, অত্যন্ত সার্থক ছবি। এই ছবিটিতে গাছপালার ভেতরকার রহস্য যেন বাইরের রং-রেখার আকীর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সমতলকে যেভাবে চাপ চাপ রঙের ঘনত্বে ভাগ করা হয়েছে, তা-ও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মিশ্রিত মিডিয়ায় আঁকা ছোট্ট ল্যাণ্ডস্কেপটিতে আবার এক-ধরনের অতীন্দ্রিয় আয়তন আভাসিত হয়েছে। আমাদের অনুভূতি স্নিগ্ধ হয়।

এরপরেই যে দুটি ছবির উল্লেখ করতে হয়, সে দুটি হলো গোপাল ঘোষের তেলরঙের "কম্পোজিশন", এবং শিবানী বসুর "কম্পোজিশন"। দ্বিতীয় ছবিটিও তেলরঙে আঁকা। প্রথমটি ঠিক বিমূর্ত ছবি নয়, ফিকে হলুদ রঙের জমিতে ঈষৎ সবুজাভ ছায়া-সম্পাত ঘটেছে, অথচ সব মিলিয়ে ছবিটিতে সার্থক বিমূর্ত ছবির ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। শিবানী বসুর ছবিটির জমিও হলুদ, তবে ফিকে নয়, গাঢ়। একটা বই, চশমা, আর সম্ভবত একটি মাটির পাত্র গাঢ়-হলুদ ড্রেপারীর পটভূমিকায় যেভাবে আঁকা হয়েছে, তার বলিষ্ঠতা আমাদের স্পর্শ করে।

মাঝারি-ভালো ছবির সংখ্যা কম নয় এই প্রদর্শনীতে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাদল সরকারের মনোরম ল্যাণ্ডস্কেপ, অশোক মল্লিকের প্যাস্টেল-স্কেচ (কিন্তু টেম্পেরায় আঁকা পুরস্কৃত ছবিটি কিছুতেই নয়), ইন্দিরা বসুর টেম্পেরায় "কম্পোজিশন", স্বপন রায়ের পেন্সিল স্কেচ, সন্দী[illegible] দাসের ফিগার স্কেচ, কেতকী বিশ্বাসের দুটি পা ও একটি ফলের প্রতীকাশ্রিত ছবি, দেবাশিস সেনগুপ্তর ছিন্ন অজমুণ্ডের আকর্ষণীয় জলরঙের কম্পোজিশন, ঈষৎ [illegible] ঘোষ প্রভাবি[illegible] রাণা [illegible]য়ের জল[illegible]ের ল্যাণ্ডস্কেপ (৭৫ নম্বর), এবং শ্যাম বড়ঠাকুরের পেন্সিল-পোর্ট্রেট।

শুভাপ্রসন্ন এবং [illegible]মতী করুণা সাহা যখন এই ছা[illegible]দের শিক্ষার ভার নিয়েছেন, তখন [illegible]দের ভবিষ্য[illegible] বিষয়ে আমরা আশ্বস্ত [illegible]তে পারি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞাপন চিত্র

পোস্টার বিজ্ঞাপনচিত্র। ইদানীং বিজ্ঞাপনচিত্রের একটি প্রদর্শনী মু[illegible] হয়ে দেখেছি অ্যামেরিকান সেণ্টারে। প্রাক্তন ইউসিস-এর যে কোন কারণেই হয় না। একসময় ইংলণ্ডে বাচ্চাদের বলা হতো, গবলিনরা যখন যায় তখন খবরদার ওদিকে তাকাবে না। জুজুর মতো গবলিনদের কোনো অস্তিত্ব নেই, তবু তারা মাঝে মাঝে উদয় হয়।

ওষুধের সংগে যেমন "লিটারি-চার" তেমনি মার্কিন মুলুকে প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর সংগে সচল এবং সবাক "লিটারিচার" পাঠানো নিয়ম। অজ্ঞ তৃতীয় বিশ্বের লোক যদি না বোঝে! মহিলার নাম সুজি গাবলিক। নু্য ইয়র্কের কোন এক হাণ্টার কলেজের স্নাতক! "পপ আর্ট রিডিফাইনড"। 'প্রগ্রেস ইন আর্ট" পুস্তকের রচয়িত্রী।

১২ই সেপটেম্বর, ১৯৭৮ সন্ধ্যা ছটায় স্লাইড-সচিত্রিত বক্তৃতা দিলেন সুজি গাবলিক। বিষয় : শিল্পকলার প্রগতি। সুয়েজের পূর্বপারে কোনো শিল্পকলা হয়েছে বলে বিশ শতকের শেষভাগে স্বীকার না করা মূর্খামি। ঔপনিবেশিক যুগে "স্টোরী অন ফিলজফি" বা ঐ ধরনের বই ভারতবর্ষ ও চীনের অবদান বাদ দিয়ে লেখা হয়েছে। গাবলিক কিন্তু বললেন, প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য এবং মিশর থেকে আরম্ভ করে গ্রীস হয়ে শিল্প-কলার ধারা, বিজ্ঞানদর্শকের ধারা ইউরোপে গেছে। এবং ইংগিতটা অস্পষ্ট ছিল না যে মুসা-খ্রীশাবর্জিত ভারত-চীন-জাপানে কিস্যু হয়নি। সাংস্কৃতিক ভূগোলে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড বাদ। তাছাড়া এখন তো দক্ষিণ এশিয়া "উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্ব" (অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় "অনুন্নত"), সুতরাং এখানে যা হচ্ছে তা মূর্ত। কিন্তু সরকারী অর্থে এসেছেন গাবলিক সুতরাং এঁর গলায় বিমূর্ত চিত্রকলার নামগান। অর্থাৎ মিশর থেকে ক্রমে সভ্যতার উন্নতির সংগে সংগে শিল্পকলার "প্রগতি" হল। ইউরোপে রেনেসাঁ পেরিয়ে, ইমপ্রেসেনিস্ট পেরিয়ে ধাপে ধাপে মানুষের সভ্যতার বিকাশের সংগে সংগে শিল্পকলার "প্রগতি" হল। শেষ কথা—তরুপের [illegible] অবশ্য মার্কিনীদের হাতে। মহিলা তাচ্ছিল্য করে বললেন যে এখনও "ফিগারেটিভ" কর তোমরা তৃতীয় বিশ্বের লোক। মহিলার বক্তৃতার সংগে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনচিত্রের সম্পর্ক পাওয়া গেল না। তাছাড়া শিল্পকলার সংগে সভ্যতার ক্রমবিকাশজনিত প্রগতির নিরিখ যোগ করা ভুল। কারণ গুহা-মানুষ রসোত্তীর্ণ কাজ করেছেন। আদিম উপজাতীয় কাজ আমাদের আজও নিভৃত মনে বিস্ফোরণ ঘটায়। না হলে পিকাসো আদিম আইবেরীয় শিল্পকীর্তি বা আফ্রিকার বেনিন উপজাতীয় ভাস্কর্য দেখে অনুপ্রাণিত হতেন না। মার্কস সাহেবের সংগে আমরা একমত—উৎপাদনের পদ্ধতি বদলাবার সংগে সংগে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। আদিম, বর্বর, সভ্য এবং আধুনিক মানব-সমাজের রূপান্তর হয়েছে উৎপাদন-পদ্ধতি বদলাবার সংগে সংগে—সেই উন্নতিকে "প্রগতি" বলা চলে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সংগে দেশের চেয়ে 'ভাল' বা 'উন্নত' হয়ে যায় না। যেমন গাবলিকের চিত্রচর্চার গুরু রবার্ট মদারওয়েল রেমব্রা বা ঐ ধরনের বড় শিল্পীর চেয়ে বড়, একথা শুনলে ঘোড়াও হাসবে। স্লাইডে দেখানো হল একজন লোক—গাবলিক তাঁকে শিল্পী বললেও আমি তাঁকে "সার্কাটন" বলি—ছটা লাঠি নানাভাবে সাজিয়ে "চলমান ভাস্কর্য" করছে। লাঠি সাজানো ভাস্কর্য ভারতবর্ষের খাজুরাহো, অমরাবতী, কোণার্কের চেয়ে প্রগতিশীল এই বিশ্বাস নিয়ে যিনি ইহলোক ত্যাগ করে মূর্খের স্বর্গে বাস করতে চান তিনি তাই করুন।

পোস্টারগুলো ভাল। পশ্চিম ইউরোপ আর আমিকার কাজ। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড আছে। চীন জাপান রাশিয়া ভারত লাতিন আমেরিকা আফ্রিকা বাদ। তবু কাজগুলি খুবই উন্নতমানের। চোখের পর্দা অনুরণিত হয়, সুজন-শিখা মরমে পশে আগুন ধরায়।

ম্যাক ইয়াংগারম্যান মিশকালো পটভূমিতে শুভ্র পদ্মকুসুম উপস্থাপিত করেছেন সাদা কাগজ কেটে সেঁটে। তাঁর জলচিত্র প্রদর্শনীর পোস্টার। সারল্যই এর জোর। আলেকজেণ্ডার কালডার লেখারেখ বন্ধনী (গ্রাফিক বাইন্ডিং লাইনে) মধ্যে বিধৃত লাল বেলুনের মতো দেখতে ডিম্বাকার আকারগুলো দারুণ। তাঁর জাতীয় জরুরী অবস্থার নাগরিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ সমিতির জন্যে সুন্দর স্লোগান দেওয়া ছবিটাও দুর্দান্ত ("যে লোকটিকে চুপ করিয়েছ সে তোমার মতাদর্শ মেনে নেয়নি")। এণ্ডি ওয়ারলের সবুজ কালো চকরা-বকরার মধ্যে চারটে [illegible]ল ফুল মন্দ নয়। উইল্স বার্নেট সাদার ওপর কালো রেখা দিয়ে একটি টেবিলের ওপর দাবার গুটি সাজিয়েছেন। একটি কিশোরী মেয়ে লাল জামা প[illegible] টেবিলের ওপর কনুই রেখে পরের চালটা ভাবছে। পেছনে বড় খোলা সিকহীন জানালায় নীল আকাশ আর কালচে সবুজাভ গাছের গুঁড়ি। জানালার ওপরে স্কাইলাইটটা খোলা তাতে একটা সাদা বেড়াল বসে। লাল জামা পরা মেয়েটির নিষ্পাপ একাগ্রতা ধক করে জ্বলে ওঠে। পেছনে নীল আকাশটা দিয়ে লালের সংগে জমানো হয়েছে। দুটো মৌলিক সমতল রঙের একঘেয়েমি কালচে সবুজ মিশ্রবর্ণ দিয়ে সূক্ষ্মভাবে ভেঙে বর্ণের ঐকতান তৈরী করা হয়েছে। মার্কিন শিল্পীদের মধ্যে ডি কুনিঙের ছিটকে ওঠা নরম রঙের মধ্যে তুলির কাজের বুনোট কাব্য তৈরি করেছে। রয় লিচেনস্টাই ঘোড়দৌড় জ্যামিতিক-দৃশ্যের মতো এঁকে সামান্য রঙ দিয়েছেন তবু তার মধ্যে ছায়ের কাজ বেশ লাগে। আরসিল গোর্কি গনগনে হলুদ চতুষ্কোণ এঁকেছেন, পেছনে। আর একটি চতুষ্কোণ আভাসে বাদামী প্রতিবেশ। পটভূমির মধ্যে চটি হলুদ কবিতার বইয়ের মতো মোটা হলুদ দাগ খাড়া উঠেছে।

ইউরোপীয়দের মধ্যে মাতিসের কাগজ কাটাসাঁটা ছবিগুলো এক একটা করা। কালোর মধ্যে ফুলের মতো একটা সবুজে আগুনের শিখা। অন্যটির মধ্যে সবুজ কুসুমের ঘন বেগুনির মধ্যে হাওয়ায় নুয়ে পড়ার ভংগী। আর একটিতে টানা লম্বা সাদা পটভূমিতে টুকরো কাগজে নারীর দেহ আর আপেল—এই [illegible]রনের কাজের সংগে বিনোদবিহারীর শান্তি-নিকেতনে করা শেষ ম্যুরালের ধরনটা মেলে। দুজনই রূপবন্ধর শুদ্ধতা খুঁজতে খুঁজতে একই সরল অভিব্যক্তিতে এসে পৌঁছেছিলেন। পল ক্লীর শিশুচিত্রের মতো করে আঁকা পাল তোলা নৌকাটি শেওলধরা পাথরের রঙের বুনোটের জন্য ভাল লাগে। তেমনি কালো লাল সাদায় করা রাখের তিনটে উড়ন্ত পাখি অসম্ভব সরল আর সবল। পিকাসোর ক্রেয়নে-কাঁপা কাঁপা রেখায় আঁকা মানুষের হাত ধরাধরি নৃত্য। আর মাঝখানে একটি পায়রা। আদিম মানুষের মতো আঁকা। আর একটি ছাপাই ছবির বিজ্ঞাপনচিত্রে নীল আকাশে নারী[illegible] দেহের মতো নরম মেঘ আছে। আর আছে কালো সবুজের মধ্যে কাট[illegible] ছেঁড়া দেহ মাঠে পড়ে। পারী[illegible] স্থায়ী বাসিন্দা মেরী ক্যাসো[illegible] ছিলেন ইমপ্রেসেনিস্ট দলভুক্ত যদি[illegible] জাতে মার্কিন। ছুটির দিনে সে[illegible] নদীতে নৌকায় ছোট পরিবার সুখ[illegible] পরিবারের ভ্রমণদৃশ্য জমাটি ইমপ্রেসে[illegible]নিস্ট কাজ। মীরোর শিশুর মতো করে আঁকা মুখটি মজাদার।

পোলাণ্ডের কাজগুলি অসাধারণ। ডাবলু জেমস্‌নিক-এ[illegible] বাঘটার লাল দেহে সবুজ হল[illegible] বেগুনী ফোটা দিয়ে জমানো। কা[illegible] [illegible]খ। আর সাদা দাঁত। আদিম[illegible] [illegible]ভিলম্পিকের প্রাথমিক ও মাধ্যমি[illegible] [illegible]র্ণের আঁকা দুটি সিংও র[illegible] জলুসে মুগ্ধ করে। এম আরকা[illegible] কের লাল প্রতিবেশে ঘোড়ার পি[illegible] সওয়ার সাদায় কালোয় আঁক[illegible] লাগামে সামান্য স[illegible]র ছোঁয়া।

পোস্টারে[illegible] প্রদর্শনীটি ভ[illegible] সত্যিই।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

শিল্পী সংসদের গানের আ[illegible]

রবীন্দ্রসদনের আবহাওয়া অন্যরকম লাগছিল সেদিন। অন্য[illegible] লাগছিল মঞ্চের শিল্পীদের, শ্রো[illegible] মণ্ডলীর এক উজ্জ্বল অংশকে[illegible] শিল্পীদের কারো মুখে কেয়ার[illegible] বিউটির মতো করে চুল ফেলে র[illegible] কারো বা নতুন শাড়ির অতিরিক্ত [illegible] খস, কেউ বা গানের বাঁধা ছক ছা[illegible] মাত্রাতিরিক্ত মেজাজ যোজনা ব[illegible] ছিলেন গানে—সেদিন যেন বড়ো [illegible] হয়ে উঠেছিল এমন কিছু [illegible] ঘটনা। আর উজ্জ্বল শ্রোতৃমণ্ড[illegible] একটি অংশ স্থান-কাল-গানের [illegible] বেশ ভুলে গিয়ে ভিড় জমাতে করছিলেন মঞ্চের দক্ষিণ কোণে, স্বেচ্ছাসেবকদের অবরোধ ভেদ ঢুকতে না পেরে দলবদ্ধভাবেই
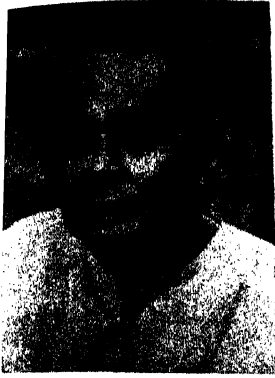
দেবব্রত বিশ্বাস

গান গেয়ে গেলেন অর্ঘ্য সেন, বাণী ঠাকুর, সাগর সেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রথম ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন মঞ্চের ডান কোণের জটলার দিকে, অসম্ভব সুন্দর গান গাইছিলেন তিনি। গানের মধ্য দিয়েই তিনি হয়তো ছোটখাট ইঙ্গিত তুলে ধরেছিলেন, যেমন, "কিছু বলব বলে এসেছিলেম" কিংবা 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি'—কিন্তু তার নাগাল পুরোপুরি পাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না, তাই মাত্রই চারটি গান গাইলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি গান শোনালেন মাত্রা বজায় রেখে, অনবদ্য পরিবেশন ভঙ্গিতে। কিন্তু 'বঁধু মিছে রাগ কোরো না'-তে তিনি যেন শ্রুতিকটু মেজাজ যোজনা করেছিলেন সেদিন। এরপর বিরতি। বিরতির পর সুচিত্রা মিত্র। ভ্রূক্ষেপহীন ভঙ্গি তাঁর। সতেজ সবল কণ্ঠ। পাঁচটি গানেই আসরের হাওয়া বদলে দিলেন। পর্দা বন্ধ হল। আবার যখন পর্দা সরল, ঘোষকের তোয়াক্কা না করে, সবাইকে চমকে দিয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসে আছেন উত্তমকুমার। এমন আকস্মিকভাবে হাজির হলেন তিনি যে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ কয়েক মিনিট লেগে গেল। সেই অবসরে উত্তমকুমার একটি গান শুনিয়েই উঠে পড়েছেন। গানটি অবশ্য খুবই ভালো গেয়েছিলেন তিনি—'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।' ভক্তদের প্রাণের কথাই বলতে হবে। কিন্তু উত্তমকুমারের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেক্ষাগৃহময় এক বিপুল উন্মাদনাময় আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। সকাল থেকে যাঁকে ঘিরে এত উত্তেজনা, তিনি এলেন, গান শোনালেন, চলে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই সেই আওয়াজে সমস্বর অনুরোধ শোনা গেল— 'আরেকখানা, আরেকখানা'। কিন্তু ততক্ষণে আসরে এসে পড়েছেন সুমিত্রা সেন। তিনি প্রথম গান ধরলেন—'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে।' সকাল থেকে যে চাপা উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল তাতে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছনো যে-কোনো শিল্পীর পক্ষেই অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে আসা, সন্দেহ কী। উত্তমকুমারের গানের শেষে রবীন্দ্রসদনের জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সুকুমার মল্লিক চুপি চুপি বললেন, "মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় গোল হয়ে গেল।" সেদিন বিকেলেই লীগে ওই খেলাটি ছিল। যাই হোক, সুমিত্রা সেনের গানের শেষে আসরের সব শেষ শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস এলেন। আরেকবার হইচই। মঞ্চের শিল্পীর ইঙ্গিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হল প্রেক্ষাগৃহের সব কটি আলো। নতুন ধরনের পরিবেশ রচিত হল। সেই পরিবেশে শুধু একটি এস্রাজ ও হারমোনিয়াম নিয়ে গান ধরলেন দেবব্রত বিশ্বাস। গান তো নয়, যেন মন্ত্র। সুগভীর মন্ত্রস্বর, সুরের পরম পারে পৌঁছে-যাওয়া এক অলৌকিক কণ্ঠ। বহুদিন এমন সজীব, সমৃদ্ধ কণ্ঠের গান শোনা হয়নি। এক আশ্চর্য সৌভাগ্যবান সেদিনের শ্রোতৃমণ্ডলী। এবং শিল্পী-সংসদ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে দেবব্রত বিশ্বাসের এই অসামান্য গানের অনুষঙ্গে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

সুবিনয় রায়ের একক

'রবীন্দ্রসংগীত পরিষদ' ১০ সেপ্টেম্বর আকাদেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে সুবিনয় রায়ের একক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীত গায়কদের মধ্যে সুবিনয় রায় অন্যতম যথার্থ শিল্পী এবং প্রবীণ সম্মানীয় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাগুরু, তাঁর গান শোনা নিঃসন্দেহে এক অভিজ্ঞতা।

সুপরিকল্পিত এই অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন প্রভাতী রাগাশ্রয়ী উপাসনার উপযোগী আটটি গান। শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠ ভৈরব রাগে আড়া-চৌতালে নিবদ্ধ 'শুভ্র আসনে বিরাজো' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন তিনি। পরে একে একে প্রধানত টোড়ি ভৈরবীর মিশ্রণে 'রজনীর শেষ তারা', ভৈরব রাগে 'তুমি আপনি জাগাও মোরে', আলাইয়ার সুরে 'ওই পোহাইল তিমির রাতি' মিশ্র টোড়ি রাগে নয় মাত্রায় ছন্দোবদ্ধ 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে' প্রভৃতি গানগুলি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে গেয়ে গেলেন। আয়ত্ত কণ্ঠ ক্রিয়াপর এই শিল্পীর গান ভাবে, ব্যঞ্জনায় ও অনুভূতির স্পর্শময়তায় এক অনির্বচনীয় সুরমণ্ডল সৃষ্টি করে। বিশেষ করে এই পর্যায়ের ধ্রুপদাঙ্গের গান তিনটি তাঁর কণ্ঠে আশ্চর্য রূপ পরিগ্রহ করে। এই গানগুলির বিপুল গভীরতা, আত্মদমন ও সুন্দর সমর্পণের ভাব তাঁর গায়নভঙ্গীর গুণে পূর্ণ সুষমায় বিকশিত হতে দেখি। নিখুঁত স্বরজ্ঞান, অলঙ্কারের সংযত প্রয়োগ এই গানগুলিকে অনায়াসে রসোত্তীর্ণ করে তোলে। পরিশীলিত কণ্ঠে অতি সূক্ষ্ম অলংকারের পরিচ্ছন্ন প্রয়োগ, নিবিষ্ট আত্মনিবেদনের ভঙ্গীর মর্মস্পর্শিতা আমাদের মনকে মাধুর্যে পূর্ণ করে। এই পর্যায়ে 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে' গানটির বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। এই গান রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়তম কনিষ্ঠ মধ্যেই লিখেছিলেন। আশ্চর্য এই গানের আবেদন যখন সুবিনয় রায়ের কণ্ঠে পরম মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে তখন ঈশ্বরানুভূতির প্রেরণার আকৃতি জাগে মনে। দ্বিতীয়ার্ধের জন্য নির্বাচন করেছিলেন বিচিত্র পর্যায়ের আটটি গান। কিন্তু নির্ধারিত সূচীর বদল করতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত অনুরোধে। অনুষ্ঠানের শেষ গান গাওয়ার আগেই আরো তিনটি গান সূচীভুক্ত করতে বাধ্য হন। তাঁকে গাইতে হল সেদিনের অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ গান 'শ্রাবণের পবনে বিষম আকুল সন্ধ্যায়'। এই গানের 'সাথিহারা ঘরে মন আমার' ছত্রের 'মন আমার'-এর স্বরবিন্যাসে [প জ্ঞা। পজ্ঞা ধা পা। পা মা।-।-।-।] মীড়ের সুষম প্রয়োগে সার্থক রূপদান করেন। সুরকার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মহত্ত্বকে তুলে ধরেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দে। ঘন বর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ বেদনার আর্তি এ গানের ছত্রে ছত্রে শ্রোতার চিত্তে আবেগ সঞ্চারিত করে, শিল্পীর সৃষ্টির গভীরতর উপলব্ধির সার্থকতা সেখানেই। পরে অনুরোধে 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' এবং 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' গান দুটি গাওয়ার পর অনুষ্ঠানের শেষ গান করেন 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী'। এই পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে নয় মাত্রার
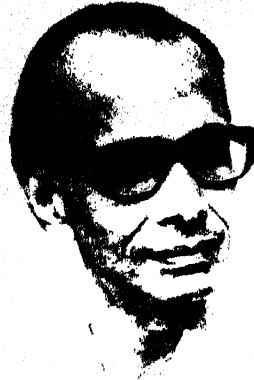
ছন্দে পূরবীর সুরে 'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে', 'আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে', 'পাখি বলে চাঁপা আমারে কও', 'হাটের ধুলো সয় না' গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গানের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ রস সঞ্চার করেন তা এমনি সংযত ও সুমিত যা আমাদের বিস্মিত করে।

প্রসঙ্গত দুটি কথা : সেদিনের অনুষ্ঠানে বারবার প্রমাণিত হয়েছে তিনি আজ নিঃসন্দেহে একজন অনাদৃত শিল্পী যা আমাদের মতো অনেক শ্রোতাকেই বিশেষভাবে আনন্দিত করেছে। উপযুক্ত শিল্পীর সম্মানে তাই আমরাই সম্মানিত বোধ করেছি। এই সমাদর তাঁর স্বোপার্জিত যা কোনো বিশেষ প্রচার বা আপসের সহায়তায় নয় একনিষ্ঠ সাধনায় লব্ধ। দ্বিতীয়ত 'স্বরলিপির নিখুঁত অনুসরণে গান প্রাণহীন হয়' এই কথা যে কত অর্থহীন সেদিনকার অনুষ্ঠানে। এ জন্যও তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে রবীন্দ্রসংগীত পরিষদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এমন একটি রুচিস্নিগ্ধ সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য।

ব্রেশ্‌টের গান

বের্টোল্ট ব্রেশ্‌টের অশীতি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ম্যাক্সমুলার ভবন-আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান প্রকল্পে ব্রেশ্‌ট সম্পর্কে বক্তৃতামালায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় দিনের (৩১ আগস্ট, ১৯৭৮) নির্দিষ্ট বিষয় ছিল : ব্রেশ্‌টের গান—উদাহরণ সহযোগে তিনি কবি-নাট্যকার হিসেবে বিশ্ববিজিত এই প্রতিভার গীতিকার-সুরকার যুগ্মসত্তাটির পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ব্রেশ্‌টের নিজের এবং দুই জার্মানির অগ্রণী গীত-শিল্পীদের রেকর্ডে আধারিত গান শোনান।

আলোচনার শুরুতেই অলোকরঞ্জন বলেন : রবীন্দ্রমুগ্ধ ব্রেশ্‌টের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো এরকম বলা হয়তো সম্ভব ছিল না : হাত দিয়ে নয়, গান দিয়েই দরজা খুলে দিতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রেশ্‌টের কাছে তাঁর গান নিঃসন্দেহে সামাজিক ও নান্দনিক দু অর্থেই হাতিয়ারবিশেষ ছিল। আধুনিক যুগে কবিতা ও গানের যে আমেরু বিভাজন জন্মে গেছে, ব্রেশ্‌ট সৃষ্টিশীলভাবেই তার বিরোধিতা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর গানগুলি কবিতা হিসেবেও স্বয়ংপূর্ণ মর্যাদা দাবি করে। তাঁর অসংখ্য কবিতায় স্বরচিত ও সতীর্থ সুরকারের সুর অর্পিত হয়েছে। আমরা যাকে সুরারোপ বলে থাকি, তাঁর গানে তার বদলে সুর স্বতঃসঞ্জাত হয়ে সুরকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধর্মের ভাবানুষঙ্গী। জীবনের বিভিন্ন স্তরে সংগ্রামরত মানুষের মধ্যে যে অন্তর্লীন সংগীতস্পন্দ লুকিয়ে আছে তা-ই উসকে তোলা হয়েছে তাঁর গানে গানে। লোকসংগীতের রহস্যটি তাই তাঁর গানে নতুন দিগন্তের আয়তনে উদ্ভাসিত। কিন্তু প্রধানুগত নৃতত্ত্বের আলোচনার লোকসংগীত বলতে জাদুঘরে সংরক্ষণযোগ্য কৌম কোনো লোকগোষ্ঠীর লুপ্ত অচল গীতিরীতির অনুশীলনে মাতেননি—তিনি সে ক্ষেত্রে সাদামাঠা Song শব্দটি পছন্দ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে প্রতীচী বিশ্বের মহানগরগুলিতে যে গীতিবন্ধ (Song) প্রচলিত ছিল, ব্রেশ্‌ট সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য সেই রীতিটির সঙ্গে প্রাগাধুনিক ব্যালাড-ধর্মী একটি গীতিরীতি মিলিয়ে নতুন এক রূপকল্প উদ্ভাবন করেছিলেন। এই গীতিরীতির অন্যতম শাখার নাম 'Moritat'। মধ্যযুগীয় জার্মানির চারণ-পটুয়ার দল গ্রামগঞ্জের মেলায় সমসাময়িক কোনো বিশেষ ঘটনা বা অপকীর্তির কড়া সমালোচনা করে গান বেঁধে মানুষজনকে জড় করে শোনাতেন 'মরিটাট'-এর

সংগীতের উপাদান তার মধ্যে অনুস্যূত করে দিয়েছেন। তার কারণ খুঁজতে দূরে যেতে হয় না। নগর-মানুষের আত্মবৈপরীত্য, দোলাচল ও অবক্ষয়কে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন বলেই তাঁর এই শিল্পময় কারসাজি। আজকের মানুষের পক্ষে প্রাচীন পল্লীগীতির অপ্রাসঙ্গিক পিছুটানে মেতে ওঠা অবকাশ বিনোদনের প্রলোভন ছাড়া আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে আজকের অবসন্ন নাগরিক মানুষ গান শুনতে চায় এই যন্ত্রযুগের মাধ্যমে নিজের চৈতন্য ও আত্মপরিচয়কে কয়েক মুহূর্তের জন্য ঝালিয়ে নিতে। তাই ব্রেশ্‌ট বলেছিলেন, 'আমি চাই যে, গানগুলি এক ধরনের যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় বেরিয়ে আসুক। বুটিক (Boutique)-এর যন্ত্রে পয়সা ফেললে যেমন অকস্মাৎ প্রিয় সুর ছলকে বেরিয়ে আসে।'

নাটকে গান ব্যবহার প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর ঈষৎ দেরি হয়েছিল। ১৯১৭—২০ নাগাদ তিনি যে গানগুলি লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে নিঃসঙ্গ কবির একটি স্বগত জগৎ উপস্থিত। এই পর্বের সুরকার প্রধানত তিনি নিজে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই পর্বের শেষে গ্রিমভাইদের রূপকথার মোটিফ তাঁর গানে প্রয়োগ করে তিনি লোক-জীবনের যৌথ উত্তরাধিকারে শামিল হলেন। দ্বিতীয় পর্বের গানে তাই কেটে গিয়েছে আত্ম-আচ্ছন্নতার মরবিড পরিবেশ। ১৯২৮-এ 'তিন পয়সার পালা' পর্যায়ে এই উত্তরণ। এক দিকে বাঁচবার তাগিদে মানুষের অবক্ষয়, অন্য দিকে তার অনর্পিত জীবনবিবেক একাধারে তাঁর এ-যুগের গানে প্রতি-ফলিত। কুর্ট ভাইলের সুরে ব্রেশ্‌টের গাওয়া এরকম একটি গানের অংশ : 'সত্যি বলতে, মানুষ বড়ো যা-তা টুপিতে ওর কাঁথিয়ে দে তো চাটা|চাঁটি দিলেই হয়তো একেবারে/মানুষ ভালো মানুষ হতে পারে/এই জীবনের তুলনায় যেহেতু / মানুষ তত ভালো কিছুই নয়...।' মনে রাখতে হবে, বেশ্‌টের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তাঁর কোনো গানে সুর সংযোজিত হয়নি। তাই 'মাদার কারেজ'-এর অন্যতম একটি গান পাউল দেসাউ-এর সংযোজিত আশ্চর্য সুর সন্নিবেশ সত্ত্বেও হান্‌স্‌ আইসলারকে দিয়ে তিনি নতুন সুরে ঢেলে সাজিয়েছেন। তার সার্থকতা তখনই বোঝা গেল যখন অলোকরঞ্জন পর পর দেসাউ ও আইসলারের সুর-ভেদ দেখাতে গিয়ে ব্রেশ্‌টের 'মেয়েমানুষ আর সৈনিক গান' -এর দুটি সুর আমাদের শোনালেন-- দ্বিতীয় সুরে যথোপযোগী অনুভাব-ব্যঞ্জক যন্ত্রানুষঙ্গে যুদ্ধবিপন্ন মানুষের ট্র্যাজিক বাস্তবতা তীব্র জীবন্ত। সত্যিকারের গান শুনলে সংবেদনশীল শ্রোতার তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এই প্রত্যাশায় ব্রেশ্‌ট থার্মো-মিটার পর্যন্ত ব্যবহার করে গানের অভিঘাতের অমোঘতা যাচাই করে নিতেন—এই গানেই তিনি তার প্রমাণ রেখেছিলেন।

তাঁর তৃতীয় পর্বের গান শুধু নাটকের প্রাসঙ্গিকতা বহন করে নি,

আমেরিকায় নির্বাসন পর্ব: 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবির মতোই ব্রেশ্‌টের মনে হয়েছিল ওই যান্ত্রিক প্রতিবেশের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে হ'ল ছোটোদের জন্যে লিখতে হবে। ভাষান্তরে এই ধরনের কিছু

একটি গানের সুর সৃষ্টির মুহূর্তে ব্রেশ্‌ট (উপবিষ্ট) ও সুরকার হান্‌স্‌ আইসলার (দণ্ডায়মান)

গানের উদাহরণ দেন অলোকরঞ্জন। ছোটোদের গান একই সঙ্গে যে রঙ্গ-কৌতুকী এবং রাজনৈতিক চেতনাবাহী হতে পারে, তার সাক্ষ্যবহ একটি নিদর্শন : "আদ্যিকালে ছিল একটা ছাগলী কোথাকার/বলে উঠত : 'ঘুম পাড়াবার দোলনায় আমার/শুনেছি আমি হঠাৎ এক শক্ত মানুষ এসে/খালাস করে দেবে আমায় শেষে'/সেই শুনে এক বলদ হেসেই খুন/এবং বলে শুয়োর মশাই শুনুন/শক্ত সে লোক আর কেউ নয় কসাই বাছাধন।"

পরিশেষে অলোকরঞ্জন 'ককেশিয়ান চক সার্কল' থেকে কয়েকটি গানের প্রতিবেদন রাখলেন। গ্রুশা-র গাওয়া এইসব গানে ব্রেশ্‌ট উত্তর আফ্রিকা ও দূরপ্রাচ্যের আখ্যায়িকার সুর-কল্পের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। গান-গুলিতে আজারবাইজানের ব্যালার্ডের প্যাটার্নের আশ্চর্য কুশল প্রয়োগ আমাদের বিস্মিত করে। ব্রেশ্‌টের গীতবিতান এইভাবেই কথা ও সুরের অব্যবহিত একাত্মতায় আধুনিক কবিতা ও গানের ইতিহাসে একটি অনন্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত।

সম্ভবত এর আগে 'ব্রেশ্‌টের গান' আমাদের দেশে এমন বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। উপরন্তু জার্মান ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী কবি অলোকরঞ্জন গানগুলি সরাসরি বাংলায় অনুবাদের বাড়তি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। এ ছাড়া তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গির সরসতা দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনাটি

শ্রাবণের গগনের গান

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান ও কবিতা —এই নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল 'জ্ঞানতীর্থ' সঙ্গীত শিক্ষায়তনের 'শ্রাবণের গগনের গায়'। অরবিন্দ বিশ্বাসের পরিচালনায় অল্প-কিছু দিন আগে পরিবেশিত হল কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রের শিশির মঞ্চে।

সুখের কথা, নাচের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সেই একঘেয়ে মুদ্রা, বৈচিত্র্য-হীন অভিব্যক্তি—এ আর দেখা যায় না। জ্ঞানতীর্থকে ধন্যবাদ, সরাসরি কানের ভিতর দিয়েই মর্মে প্রবিষ্ট হতে চেয়ে-ছিলেন তাঁরা। পেরেওছিলেন অনেক-খানি।

আয়োজনে কার্পণ্য ছিল না। শ্রাবণের আমন্ত্রণে জড়ো হয়েছিলেন বহু নামী শিল্পী। সম্মেলক গানগুলি ছিল জমজমাট। অরবিন্দ বিশ্বাস নিজে ছিলেন। ছিলেন দু-একজন নবীন শিল্পী, যাঁদের গান শুনে চমকে যেতে হয়। আর গ্রন্থনায় মুখ্যত ছিলেন দিলীপ ঘোষ—যাঁর মন্দ্রমধুর কণ্ঠ শ্রুতিকে বিবশ করে রাখতে সমর্থ।

আবার এর পাশাপাশি দু-একটা উলটো-পালটা ব্যাপারও ছিল। যেমন, দুই নবীন মহিলা শিল্পী গ্রন্থনায় কণ্ঠ দান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন —ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়—'মেঘ' বলতে গিয়ে বলেছেন 'মেগ'। 'ধারা' হয়েছে দারা, 'কিছু' শুনিয়েছে 'কিচু' তাঁর কণ্ঠে। গৌতম মিত্র একটি মাত্র গান শুনিয়েছিলেন। কিন্তু একটি গানেই যে-কোনও আসরকে রবীন্দ্রিক জলসা করে তোলার ক্ষমতা যে তাঁর রয়েছে, তার নির্ভুল ছাপ রেখে গেলেন। সম্পূর্ণ তালছাড়া, নিজস্ব এক উৎকট ভঙ্গিতে তিনি শোনালেন 'আমার সে দিন ভেসে গেছে' গানটি। তিনি যখন বলছিলেন—'তার ছিঁড়ে গেছে কবে/এক দিন কোন্ হাহারবে,/সুর হারায়ে গেল পলে পলে'—তখন স্বীকারোক্তির মতো শোনাচ্ছিল এই কথাগুলি। দিলীপ ঘোষের গলা যথেষ্ট গমগমে, তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে অকারণ পাখোয়াজ বাজিয়ে মেঘের গুরুগুরু শোনানোর প্রচেষ্টা হাস্যকর লেগেছে।

নতুনদের মধ্যে বিস্ময়কর ও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিপূর্ণ মনে হয়েছে সুব্রত সেনগুপ্তের গান। যেমন সুরেলা, তেমনই দৃপ্ত পৌরুষে ভরা তাঁর কণ্ঠ। অতনু সান্যালও ভালো গেয়েছেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার', গীতা ঘটকের 'বন্ধু রহো রহো সাথে', পূর্বা দামের 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে', পূরবী মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়ে যায় উড়ে যায়', বন্দনা সিংহের 'আমার দিন ফুরালো', দীপ্তি বিশ্বাসের 'অশ্রুভরা বেদনা' এবং সুপ্রিয়া রায়চৌধুরীর 'গহন রাতের শ্রাবণ ধারা'—সেই সন্ধ্যার বিশেষ স্মরণীয় নিবেদন।

মাঙ্গলিকের গানের আসর

মাঙ্গলিক সংস্থাটি নতুন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে আকাদেমি অব ফাইন আর্টস হলে যে-অনুষ্ঠানটি

অনুষ্ঠানেই তাঁরা যে সার্থকতার চূড়াটি স্পর্শ করতে পেরেছেন, একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে।

অনুষ্ঠানটি ছিল মিশ্র গানের। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি ও আধুনিক। কিন্তু আসরটি ছিল সুরে প্লাবিত। তিনজন শিল্পী। প্রত্যেকেই গুণী এবং বিশিষ্ট। তাই সমস্বরটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছিল, হয়েছিল এমন সুরেলা।

প্রথম শিল্পী ছিলেন অদিতি সেন-গুপ্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কণ্ঠ-স্বাতন্ত্র্যে তিনি অনন্যা। তীক্ষ্ণ ও তীব্র কণ্ঠ তাঁর। সর্বসপ্তকেই সুরের ওঠানামা অনায়াস। দক্ষতাও প্রশ্নাতীত। যে-আটখানি গান শোনালেন সেদিন, তার মধ্যে চারখানি তাঁর নিজস্ব রেকর্ডের গান। এই গানের মধ্যে ত্রিতালবদ্ধ গৌড়মল্লারে 'গেল গো ফিরিল না'তে আসরকে যেভাবে এক স্তব্ধ মাধুর্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন সেদিন অদিতি সেনগুপ্ত, সচরাচর গানের আসরে তেমন পরিবেশ সহজে রচিত হয় না। সেদিন তিনি পূর্ণতায় এক বিরল শিখরে যেন পেঁছে গিয়েছিলেন। আরেকটি অসামান্য পরিবেশন, বাহার সুরফাক্তায় 'বাজাও তুমি কবি'। দুরূহ গানেই অদিতি সেনগুপ্তকে যেন বেশী করে পাওয়া যায়। 'অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে' বা 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' কী সহজ লাবণ্যে পরিবেশিত হল তাঁর কণ্ঠে! অপেক্ষাকৃত সহজ গানের মধ্যে বেশী ভালো লেগেছে 'যিনি সকল কাজের কাজী' ও 'তোমার খোলা হাওয়ায়' গান দুটি। একমাত্র 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি' গানটি সেদিন তেমন জমে নি। তাঁর সঙ্গে তবলায় ও খোলে যিনি সহযোগিতা করেছেন সেই রূপেন ঘোষের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, কেননা তাঁর নিপুণ হাতের গুণে সঙ্গত একটি সংহত মাধুর্য হয়ে ফুটে উঠেছিল।

একই রকম মাধুর্যময় সংগত পরের শিল্পীর ক্ষেত্রে দেখা গেল। শিল্পী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সংগতে রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্রা না-ছাড়ানো সংগতে যে পরিবেশ কত ঝংকারময় হয়ে উঠতে পারে, তারই নমুনা দেখা গেল রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙুলের ওঠানামায়। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সেদিন বারবারই বল-ছিলেন, শরীর খারাপ, গলা দখলে নেই। কিন্তু তাঁর গানে সেই বেদখল কণ্ঠের বিন্দুমাত্র আভাস ছিল না। মাত্রই ছ-খানি গান শোনালেন তিনি, হয়তো ভেতরে-ভেতরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন। ছ-খানি গানই তাঁর কণ্ঠের চিরনবীন অর্ঘ্য। 'শূন্য এ-বুকে', 'নীলাম্বরী শাড়ি পরে', 'শাওন আসিল ফিরে', 'অঞ্জলি লহ মোর'। 'ফাগুনের বাঁশিখানি' এবং 'আমার যাবার সময় হল'। অনবদ্য তাঁর পরিবেশনভঙ্গি, অসামান্য তাঁর কণ্ঠ। নজরুলগীতির প্রধানতম এই শিল্পীর কণ্ঠে গান শোনা এক প্রজন্মের যে দুর্লভতম অভিজ্ঞতা, এতে কোনও সংশয় নেই।

আসরের শেষ পর্বে এলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। দ্বিজেন্দ্রগীতি দিয়ে শুরু, সব শেষে শ্যামাসংগীত, মাঝের নৈবেদ্য সাজালেন ধনঞ্জয়বাবু তাঁর একদা

[illegible] আধুনিক গান দিয়ে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য একাই একটি প্রতিষ্ঠান। এখনও তাঁর কণ্ঠ এতটুকু জীর্ণ হয়নি। তিনি যে-আধুনিক গানগুলি শোনালেন তা, এক দিক থেকে, তাঁরই পুরনো গান। এর মধ্যে ছিল 'ভুল করে তুই', 'বাসরের দীপ আর আকাশের তারাগুলি', 'হায় ছলনা', ছিল সুধীরলালের 'বিদায় দিতে যে পারিব না হায়'— এমন অনেক স্মৃতিতে তুমুল তুফান তোলা গান। একটি গানে তিনি যখন গাইছিলেন, আমি এসেছিনু তোমার সভায় দু-দিন শোনাতে গান', তখন বারবারই মনে হচ্ছিল, ভুল, ভুল। দু-দিনের গান শোনাতে যাঁরা এসেছিলেন, ধনঞ্জয়বাবুকে অন্তত সে-দলে ফেলা যাবে না।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাদল-ধারা হল সারা

যে সব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবীন শিল্পীরা সহৃদয় রসিক বোদ্ধাদের কাছে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন অথচ কোনো প্রতিষ্ঠানই যাঁদের সুযোগ দেন না, তাঁরা যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় দিতে পারেন তারই জন্য শিঞ্জিনীর প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত সৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'শিঞ্জিনী'র প্রথম প্রযোজনা 'বাদল-ধারা হল সারা' মঞ্চস্থ হল ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গোর্কি সদনে। উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে এই প্রযোজনার প্রশংসা করতে পারলে আন্তরিক সুখী হতাম। উদ্দেশ্য যাই হোক কার্যত দেখা গেল সংগীত পরিচালক বন্দনা ভট্টাচার্যের গান ও অঞ্জনা ভট্টাচার্যের নৃত্য প্রদর্শনই ছিল সেদিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই প্রয়োজনেই প্রধানত নৃত্যসহযোগে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান ও কয়েকটি কবিতা একটি সূত্রে গেঁথে গতানুগতিক অনুষ্ঠানসূচীর পরিকল্পনা। অনুষ্ঠান সৌকর্যার্থে ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না—নামী দামী গায়ক-গায়িকার সমাবেশ, যথেষ্ট যন্ত্রানুষঙ্গের আয়োজন, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পীর তত্ত্বাবধানে নৃত্য পরিকল্পনার ব্যবস্থা এমন কি, যোগ্য ব্যক্তির উপর আলোকসম্পাতের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল, তবু কোনো সময়েই এই অনুষ্ঠান নিম্নতম মান অতিক্রম করতে পারল না। যে ক'টি কারণে এমনটি হল তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

১। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অনুষ্ঠান শুরু করায় স্বাভাবিক কারণেই শ্রোতৃবর্গের ধৈর্যচ্যুতি হয়। মনে রাখা দরকার যে-কোনো অনুষ্ঠানেই শ্রোতা ও দর্শকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য;

২। দীর্ঘ আমন্থর অনুষ্ঠানসূচী অত্যন্ত ক্লান্তিকর;

৩। মহড়াহীন সম্মেলক গানগুলি অনুষ্ঠানে কোনো মাত্রা যোজনা তো করেই নি বরং গানগুলির ব্যর্থতা অনেক সময়েই হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এবং যে-কোনো সংস্থাই এই সত্য সম্বন্ধে অবহিত [illegible] [illegible] থাকে অবহেলার চিহ্ন সহজেই প্রকটিত হয়;

৪। 'অধিকারভেদ' কথাটি মানলে (যা সব সময়েই মানা উচিত) বন্দনা ভট্টাচার্যের সখী 'আঁধারে একেলা ঘরে' মনোশ্রী লাহিড়ীর 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার', সুজিত চক্রবর্তীর 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি গান শোনার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কি এঁরাই? মনোশ্রী লাহিড়ী সুরহীন, বন্দনা ভট্টাচার্যের গায়নভঙ্গী যান্ত্রিক, সুজিত চক্রবর্তী অত্যন্ত আড়ষ্ট;

৫। নৃত্য পরিচালক, তা তিনি যত বড়ো নৃত্যশিল্পীই হোন-না কেন, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নৃত্য রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট গানটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যে একান্ত অপরিহার্য এবং তা ব্যতিরেকে সমস্ত পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, তার প্রমাণ বারে বারে দেখা গেল সেদিনের অনুষ্ঠানে। অঞ্জনা ভট্টাচার্যের অধিকাংশ নাচ এই সত্যটিই প্রমাণিত করে। গান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, সমবেত নৃত্যগুলি সুশৃঙ্খল ও তার ছন্দোময়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের নৃত্যরূপদান প্রায় অসম্ভব আর যদিও বা তা সম্ভব হয় তা পারেন কেবলমাত্র কোনো অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী নৃত্য-পরিচালক।

৬। অনুষ্ঠানসূচীর জন্য রবীন্দ্রনাথের গান নির্বাচন আপাতদৃষ্টিতে যেমন সহজ মনে হয় আসলে ঠিক তার বিপরীত। এই অনুষ্ঠানেই অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি মাত্র 'কিছু বলব বলে এসেছিলেম'। মহিলা কণ্ঠে গীত গানটির সঙ্গে নৃত্যরূপদান করলেন একজন মহিলা নৃত্যশিল্পী।

তবু যে ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত শ্রোতারা অনুষ্ঠান শুনেছেন তা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের গানের আকর্ষণে। সাগর সেন, বাণী ঠাকুর, সুমিত্রা রায়, সুমিত্রা বসুর গানগুলি সুগীত। কল্যাণ রায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠও সুখশ্রাব্য। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। ত্রুটি ছিল নিষ্ঠার তাই সব মিলিয়ে 'শিঞ্জিনী' মধুর সুরে বাজল না।

সুভাষ চৌধুরী

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **রেকর্ড**

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

শুনলে প্রত্যয় হয় না, এই অকাল মৃত্যুর দেশে শিশু নাটকের শততম অভিনয়-সন্ধ্যা উদযাপিত হল। যে দেশে নানা রকম পরীক্ষা হয় নাটক নিয়ে, দেশ-বিদেশ সব মিলে মিশে একাকার যেখানে শিশুদের নাটক নিয়ে কেউ চিন্তা করেন না, নিছক হাসি বা গান নাচকে শিশু সুলভ ভাবাটাই রীতি সেই দেশে সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের শততম অভিনয় হয়ে গেল।

দেখলে প্রত্যয় হয়, অভিনয় শিল্প [illegible] অভিনেতারা স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বা দুর্গোৎসবের মণ্ডপে দু-এক দিনের মজাকে পিঠ চাপড়াতে পারেন—কিন্তু নিয়মিত অভিনয়কে প্রশ্রয় দেওয়া খুবই শক্ত। তা সত্ত্বেও এ নাটক চলেছে এবং চলছে ১৯৭১ সাল থেকে। সাত বছর আগে যারা শিশু ছিল তাদের বয়স বেড়ে গেলেও, মনের বয়স বাড়েনি, তাই আজও তারা সমর্থিত—এটাই পরম লাভ। নানা অঘটন ও বাধার মধ্যে দিয়ে তারা এতগুলি বছর পার করেছে—এবং ইয়.তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে (সম্ভবত এই দেশে শিশু নাটকের এই প্রথম শততম অভিনয়)। শিশির মঞ্চে সেদিনকার উৎসবে যে সার্বিক নৈপুণ্য দেখা গেল তাতে বোঝা যায় এরা কতগুলি স্তর পার হয়েছে

এবং যে পরিশ্রম করেছে তা অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে অতিরিক্ত। ভাবলে অবাক হতে হয় এবং প্রত্যয় দৃঢ় হয় যখন অভিনয় গান সব কিছু প্রযোজনাকে তর তর করে এগিয়ে নিয়ে যায়, মূল রচনাকে বিপথগামী না করে (নির্দেশনা সপ্ত [illegible] ও নৃত্য জয় সেনগুপ্ত)। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় রাবণের ভূমিকায় দীপঙ্কর দে, তারক মুখার্জী [illegible] প্রণব ব্যানার্জী (সুগ্রীব) তাপস [illegible] (জাম্বুবান) সকলেই উল্লেখযোগ্য। দুটি বাঁদরের ভূমিকায় কৃষ্ণেন্দু [illegible] ও শিবু দত্ত গানে নাচে অ. কথানিই জমিয়ে থাকে। তুলনায় রাম ও লক্ষ্মণের ভূমিকায় [illegible] দাশ ও শিবকৃষ্ণ মুখার্জি অনেক নিষ্প্রভ—সম্পূর্ণ প্রযোজনার তুলনায় ওরা পপাত চ মমার চ। সুকুমার রায়ের নাটকের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কয়েক জায়গায় আধুনিকতায় একটু ধাক্কা লাগে—কিছু কিছু গানের সুর এবং নাচের ভঙ্গিমা এই নাটকের মেজাজকে ক্ষুণ্ণ করে (প্রচলিত সাম্প্রতিক রঙ্গ নাটককে হয়ত মজাদার করে)। বাঁদরের কিচ কিচ বা উকুন খাওয়া অনেক জায়গায় বেশি, বেশি গানের সংখ্যাও যা অনেক সময় ক্লান্ত করে তোলে। বিশেষত শেষ গানটি 'রাবণ রাজায় মারো' অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ। নিতাই ঘোষের মঞ্চ পরিকল্পনা ও প্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করেছে। নির্দেশক যে আন্তরিকতায় কোন রকম আপোস না করে সুকুমার রায়ের সৃষ্টিকে শহরে গ্রামে পৌঁছে দিয়েছেন সেটা শিশু নাটক নিয়ে বালখিল্য প্রয়াস নয়—তাই বৃহত্তর পটভূমিকায় আরও অনেক দৃপ্ত প্রযোজনা আমরা দেখতে যাবো এই বিশ্বাস আমাদের আছে, কারণ সংস্থার নাম প্রত্যয়।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

একসপেরিমেণ্টাল 'ন'-এর চেতনা

প্রসেনিয়াম থিয়েটার বা প্রথাসিদ্ধ থিয়েটারকে ভেঙে দেওয়া বা অন্যভাবে বলা যায় নাটকের বাঁধাধরা নির্দেশকে না মানার নাটক ইদানীং নতুন কিছু নয়। এখন প্রশ্ন প্রথাসিদ্ধ বা প্রথাভঙ্গ যে ধরনের নাটকই হোক, শেষ পর্যন্ত তা নাটক' হয়ে উঠল কিনা তার ওপরই নির্ভর করে নাটকের সার্থকতা। সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে নৈহাটি 'রূপান্তর' নাট্য সংস্থা অভিনয় করলেন একসপেরিমেনটাল ন-এর চেতনা। নামের মধ্যেই নাটকের বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাস মেলে।

রূপান্তর-এর এই নাটকটি বিভিন্ন মফস্বল নাট্য প্রতিযোগিতা ও একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত নাটক। স্বাভাবিকভাবেই নাটক দেখার আগে কিছু আশা পোষণ করেছিলাম। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে আশাতিরিক্ত ফল পেয়েছি। নাটক দেখতে গিয়ে যে কথা বার বার মনে হয়েছে তা হল, নাটক আর ছোট গল্প বোধ হয় খুব কাছাকাছি সরে আসছে। ইদানীং কিছু ছোটগল্পের একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ঘটনার মূল্য এ সব গল্পে কম। এ নাটকের ঘটনায় ঠিক নাটকের মত একটা জমজমাট গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্রাম ছেড়ে জমি হারিয়ে এক চাষীর ভাইবোন সহ কলকাতায় চলে আসা, এবং কলকাতার স্টেশনে রাঁধতে গিয়ে বোনটির আগুনে পুড়ে যাওয়া —এইটুকু নাটকের কাহিনী। এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীটুকু যে কোন সময় নাটকের প্রচন্ড গতি লাভ করে, কোন সময় ভীষণ স্পর্ধায় নাটকের এযাবৎ মানা সমস্ত রীতিনীতি চুরমার করে নাটক হয়ে ওঠে তা লক্ষ করার মত।

নাটকের শুরু থেকেই বার বার নাটক বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মেকআপের উপাদানের অভাব, পয়সার অভাবে অভিনেত্রীর অনুপস্থিতি, ইত্যাদির জন্যে নাটক বার বার হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু এ সবের পরেও নাটক' বাঁচাতে পারে যদি 'ন'-এর চেতনা জাগ্রত হয়। 'ন' বলতে নাট্যকার নির্দেশক নাটকের 'ন'-কে বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নাটকের প্রতি ভালবাসা, নাটকের সাধনা। 'ন'-এর চেতনায় [illegible]

পর্যন্ত একই আঙ্গিকে। অভিনয় করেছেন বিভিন্ন চরিত্রে। নেই সেট-সেটিং, নেই অভিনেত্রী তবু কোথাও সেই অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। মাইমকে সেট-সেটিং-এর পরিবর্তে যে কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায় তা এ নাটকে দেখার মত। একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। নাটকে যদিও কোথাও শিয়ালদহ স্টেশন বলে উল্লেখ করা হয়নি, উল্লেখ করা হয়েছে 'রূপসী' স্টেশন বলে। শুধু মাইমের সাহায্যে একটা স্টেশনকে যে এত নিখুঁত করে তুলে ধরা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটারগুলো যে নাটকের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রয়াসী, হাজারো সমস্যার মধ্যেও তারা যে নাটক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন তার প্রকাশ এই সব নাটক।

বহু সংখ্যক অভিনেতা সমন্বিত প্রোডাকসানে টিমওয়ার্কের দুর্বলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। এ নাটকে টিমওয়ার্ক এক সম্পদ। এ নাটকের প্রেক্ষাপট এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অভিনেতাদের শৃঙ্খলা লক্ষ করার মত। ধ্বনি মাইম ব্যবহার যে কত অনিবার্য কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচ্য নাটক তার প্রমাণ। তবে কয়েকটা ক্ষেত্রে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে। যেমন দরজার থাম বা টিউবওয়েল এগুলো যদি দেখানো না হত তাহলে নাটকের এমন কি ক্ষতি হত? কোন কোন সময় মনে হয়েছে নির্দেশক মাইমের কাজে অভ্যস্ত বলেই যেখানেই সুযোগ মিলেছে সেখানেই মাইমের ব্যবহারে মনোনিবেশ করেছেন। নাটকের প্রয়োজনে মাইম যদি আসে, তাহলে অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যবহারের অভ্রান্ততার ওপর নির্ভর করে নাটকের সার্থকতা।

অভিনয় অংশে বোনের ভূমিকায় মিতা ভট্টাচার্যের অভিনয় বিস্মিত করে। একটি কিশোরী মেয়ের অভিনয় ও মাইমের যুগপৎ দক্ষতা লক্ষ করার মত। মিস শেলী ও চন্দ্রাবলীর ভূমিকায় অচিন্ত্য রায় চরিত্র দুটিকে জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। আসলে এ নাটক ঠিক চরিত্রপ্রধান নাটক নয়। বলা যায় সব কটি চরিত্র মিলে এ নাটকে একটিই চরিত্র। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন আশীষ দে, স্বপন বিশ্বাস। নাট্যকার-নির্দেশক বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী চাষী যুবকের চরিত্রটি নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ সৃষ্টি।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

ত্রিতন্ত্রীর 'তাসের দেশ'

সেদিন আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস হলে ঢুকে পড়ে সত্যিই এক-সময় মনে হচ্ছিল যে, এলেম নতুন দেশে। নতুন গানের তাল লাগাই যেতে ... আসছিল যে-সব কণ্ঠ, তাঁরা এই কলকাতায় নূতন যৌবনের দূত হয়েই এসেছিলেন। এসেছিলেন সেই দুর্গাপুর থেকে।

হ্যাঁ, দুর্গাপুরের এক সাংস্কৃতিক সংস্থার নাম 'ত্রিতন্ত্রী'। দশ বছর আগে গড়ে উঠেছিল এই সংস্থা। শিল্প-নগরীতে নানা বিচিত্রানুষ্ঠান, নাটক ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে সেদিন—৮ সেপ্টেম্বর—তাঁরা কলকাতার মঞ্চে প্রথম নিবেদন করলেন তাঁদের সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'তাসের দেশ'।

নতুন মুখ, তাই স্বাদও নতুন। সবাই দুর্গাপুর শিল্পনগরীর। নাচে-

গানে-সংগতে মঞ্চসজ্জায়-পোশাকে-সংলাপে এক সজীব স্বাতন্ত্র্য। প্রতি দিনের পথের ধুলায় তাকে যায় না, যায় না চিনা।

ছোটখাট ত্রুটি কি ছিল না? ছিল। যেমন, 'হে নবীনা' গানটিতে পূর্বোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে 'চিনা'কে 'চেনা' উচ্চারণে গাইলেন রাজপুত্রের নেপথ্য সংগীতশিল্পী প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় 'চেনা' অনেক চেনা শব্দ সন্দেহ কী কিন্তু 'নবীনা' সঙ্গে তার মিলের বিবাহ সম্পাদিত হল না। দ্রুত লয়ে গেয়'—স্বরলিপির এই নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে 'মন বলে চাই চাই'—চ চাই' শুনিয়েছে, অতি-দ্রুত লয়ের কল্যাণে। 'কানো-হানো তিরি ঘোর এবং 'রাঙা-মতো দুরি দাস'-এর দিকে যখন উঁচিয়ে উঠল সংলাপের তর্জনী সেখানে দুরি-তিরির বদলে দেখা গেল চার আর সাত ফোঁটার পোশাক-পরা তাসবংশীয়দের। আলোর সঙ্গে বুঝি মহড়া হয় নি, বার বারই আলোর বৃত্ত থেকে সরে যাচ্ছিলেন শিল্পীরা।

এগুলিকে তবু ছোটখাট ত্রুটি বলাই ভালো। কেননা, সামগ্রিক প্রযোজনায় সব-ছাপানো একটি উচ্চ আদ্যন্ত বজায় ছিল। পত্রলেখার গান খুবই সুন্দর গেয়েছেন মিনতি পান হরতনীরূপে কুমারী রত্না সরকার ভালো নেচেছেন, ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজপুত্র'ও নিপুণ, ভালো লেগেছে নেপথ্য সংলাপ, সম্মেলক সঙ্গীত ও নৃত্য। সব মিলিয়ে, এক কথায়, ভালো লেগেছে ত্রিতন্ত্রীর 'তাসের দেশ'।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আপনি
সত্যিই
সুন্দরী!
রেশম-কোমল
ফেস পাউডার আর কম্প্যাক্ট
ল্যাকমে তা জানে! তাই, আপনার সৌন্দ
ফুটিয়ে তোলবার জন্যে সৃষ্টি করেছে বহু
রকমারি সৌন্দর্য্য প্রসাধন ■ স্যাটিন গ্লো
লিকুইড মেক আপ : ছোটখাটো খুঁত ঢে
দিয়ে আপনাকে দেয় নিখুঁত রঙরূপ,
ফুটিয়ে তোলে দীপ্ত সৌন্দর্য্য ■ ফেস
পাউডার আর কম্প্যাক্ট : রেশমের মধ্যে
দিয়ে ছেঁকে তৈরী, তা দিতে পারে নিখুঁ
অনুজ্জ্বল ফিনিশ ■ চোখলাগা আই
মেক-আপ—আপনার চোখে জাগায়
মোহিনী মায়া, ঝিলিমিলিয়ে তোলে
আপনার চোখের তারা। আপনি মুগ্ধ
হবেন নিজের রূপে...
ল্যাকমের গুণে।
ল্যাকমে
সৌন্দর্য্য নির্মাতা
Lakmé

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম
শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্গ্রীব?
গ্ল্যাক্সোজ-ডি® নিমেষে শক্তি
যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!
গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে আপনি ঘরের দৈনন্দিন
কাজ-কর্ম করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে যান।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার ক্লান্ত শরীরে সেই
ভরপুর শক্তি যোগায় যা ফের চাঙ্গা হবার জন্যে
আপনার অবশ্যই দরকার। ডাক্তারদের সুপারিশ
করা গ্ল্যাক্সোজ-ডি'তে রয়েছে উচ্চমানের
গ্লুকোজ যা' ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও
ফস্ফরাসের গুণে সমৃদ্ধ।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার সব ক্লান্তি দূর করে
যার দরুন আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম
খুব ফূর্তির সঙ্গে করতে পারেন।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
আপনার পরিবারের
নিমেষে শক্তি যোগানদার
dCA/GL/54|BEN

যে 'খ্রীষ্টীয়কাল কিসার' ছিলেন তা-ই বারে বারে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে তাঁর ঈশ্বরত্বের ব্যাপারটা ইতিহাসের পৌরাণিকীকরণ। তাঁকে সাধারণ মাপের ধর্মগুরুও কোথাও বলা হয়নি। 'উল্লেখযোগ্য' ধর্মগুরুই তাঁকে বলা হয়েছে। 'যীশু যে ভারতের মনীষী ও চিত্রশিল্পীদের মনকে নাড়া দিয়েছেন, এ তো স্বাভাবিক। ভারত হোলো ভক্তদের দেশ। গুরুরা এদেশে ভক্তি পান, তাঁদের সাধারণত ক্রুশে তোলা হয় না। কিন্তু ভক্তদের ভক্তি থেকে গুরুর দেবত্ব প্রমাণিত হয় না। সেটা লজিক্যাল ফ্যালাসি।

ইনি লিখেছেন যে 'তর্ক চলছে অনেকদিন ধরে'। ঠিক। কিন্তু একথাও মানতে হবে যে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও ইহুদী-খ্রীষ্টান দুই দলের পণ্ডিতদের অভূতপূর্ব সহযোগিতায় ফলে তর্ক আজকে যে স্তরে পৌঁছেছে তা নতুন, ফলে পুনানি দাবি করে। ইনি আরও লিখেছেন যে 'তর্কটা খুবই জটিল', যেন আমাদের আলোচনা করার অধিকার নেই। তাসিতুসের 'গ্রন্থ' খ্রীষ্টানেরা 'নষ্ট করেছেন' এমন কোনো 'অভিযোগ' আমি করিনি। মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসী লিপিকরেরা খ্রীষ্ট-ধর্মবিরোধী কথা পুঁথিপত্র থেকে হামেশা বাদ দিতেন—এটা কোনো নতুন কথা নয়। তাসিতুস ও প্লিনি থেকে ইনি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু তর্কের বিচার হোলো তার প্রাসঙ্গিকতা। প্লিনি-র চিঠিটি সম্বন্ধে গ্রন্থের বিদগ্ধ লেখকদ্বয় এবং অধম আমিও সম্পূর্ণ অবহিত, কিন্তু তাসিতুস বা প্লিনি আমাদের মুখ্য বিষয়বস্তু নন, মুখ্য বিষয়বস্তু যীশুর ঐতিহাসিকত্ব; এবং সেটা প্রমাণ করতে গিয়েই লেখকেরা প্রসঙ্গত তাসিতুসের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি উদ্ধৃতি দিই:

Tacitus had Asian experience, was supposed to know about foreign cults, and had access to official records. So he probably knew a good deal about Christian origins. But when we turn back to his account of the reign of Tiberius, we find that the crucial years between 29 and 32 are missing. The medieval monks who transmitted Tacitus' manuscript presumably decided to leave it out. Tacitus certainly disliked Christians, so his account must have been pretty hostile. There are a number of other allusions in Roman historians—a letter of Pliny, a mention in Suetonius and so on—but Tacitus is the most important. (পৃষ্ঠা ১৩)

প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে বা চিঠি-পত্রের স্তম্ভে এর থেকে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। অনুসন্ধিৎসুদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, তাঁরা বইটি অর্ডার দিয়ে আনান, নিজেদের তরফে বা গ্রন্থাগারের তরফে, এবং পড়ুন, তারপর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় করুন, সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিরুচির ব্যাপার। যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

কেতকী কুশারী ডাইসন

অক্সফোর্ড

রাগ-অনুরাগ

বিশ্ববিখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর-এর ধারাবাহিক 'রাগ-অনুরাগ' প্রকাশিত হচ্ছে দেশ পত্রিকায়। সঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই রাগ-অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন তিনি। সঙ্গীতের রাগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারবো না তবে তিনি সঙ্গীতের যে একজন বিরাট শিল্পী সে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ নেই। তাঁর এই সাধনার পথে জীবন সান্নিধ্যে আসা মহান শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন।

এটা তাঁর একপ্রকার আত্মজীবনী বলবো। রাগ-অনুরাগ কথাটির মধ্যে তাঁর জীবনের সর্বদিকের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর এই বিবৃতিটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই। নিজের জীবন সম্বন্ধে তিনি অকপটে সমস্তই প্রায় লিখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুখ-দুঃখ প্রেম ভালবাসার বর্ণনা দিয়ে একটি বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যের জীবন নিয়ে আলোচনা করা সহজ কিন্তু নিজেকে পত্রিকার মাধ্যমে ভালমন্দ উভয় দিক প্রচার করার মধ্যে বাহাদুরি আছে। তবে তাঁর স্ত্রীর জন্য মনটা যেন কোথায় মাঝে মাঝে বেদনায় ভরে উঠে। আলী, আলাউদ্দিন খাঁ, যাকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনের চরম সাফল্য, তাঁর কন্যাটিকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। আবার কমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর স্ত্রীর সুন্দর একটা 'স্ত্রী রূপ' ফুটে উঠেছে যখন দেখতে পাই বিবাহ বিচ্ছেদ করে হয়ত তিনি সব চুকিয়ে ফেলতে পারতেন, বিচ্ছিন্ন হয়েও তিনি বিচ্ছিন্ন হননি, এটা বাঙালী মেয়েদের বৈশিষ্ট্যের একটা দিক।

আর, একটি উচ্চ মনের মহিলা ছিলেন রবিবাবুর মা। তাঁর পরিচয়ও পেলাম। মায়ের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হবার দিনটিতে অর্থাৎ বিদেশে খাঁ সাহেবের সঙ্গে চলে যাবার আগের মুহূর্তে শিল্পী আলাউদ্দিন-এর হাতে সঁপে দিয়ে বললেন, "আজ থেকে আপনি ওর বাবা," দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সবকিছু মিলিয়ে মায়ের অভিব্যক্তিটি সুন্দর। অনেকের হাতেই অনেককে সঁপে দেওয়া যায় কিন্তু বহু বছর আগে একজন হিন্দু ঘরের মহিলা বিজাতীয় একজন মুসলমান লোককে পিতার সম্মানে সম্মানিত করেছেন। অত্যন্ত উচ্চ ভাবাপন্না ও সত্যিকারের শ্রীরবিবাবুর মায়ের পরিচয়ই দিয়েছেন। এমনি মায়ের ছেলে বলেই হয়ত শ্রীযুক্ত রবিবাবু নিঃসঙ্কোচে, লজ্জা নিন্দা সবকিছু ত্যাগ করে একটি সুন্দর সরল অনাড়ম্বর মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

শেফালী বিশ্বাস

‍ুস্দ‍ুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি

গত ৯ সেপ্টেম্বরের দেশ পত্রিকায় ‍ধলাম শ্রীসুভাষ চন্দ (আমার পত্রের ‍ অগাস্ট) জবাব দিতে গিয়ে হিন্দু‍নী সঙ্গীত-পদ্ধতির আধুনিক ‍ণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেকে ‍জাসুজি আক্রমণ করেছেন।

সুভাষবাবু মন্তব্য করেছেন যে ‍ণ্ডিত ভাতখণ্ডে অনেকক্ষেত্রে শাস্ত্রকে ‍কৃত করেছেন।"

সঙ্গীতের একজন শিক্ষার্থী ‍সেবে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে, ‍তে আমি মনে করি পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ‍ার মত প্রচার করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ‍না করেননি। যে সময় নানা মত এবং ‍া ঘরানার মতবিরোধে সঙ্গীতের ‍ত্র এবং প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য ‍রিয়ে গিয়েছিলো, সেই সময় সারা ‍রতবর্ষ ঘুরে বহু শাস্ত্রকার এবং ‍াক্কিদের সংগে আলোচনা করে বর্তমান ‍গীতের প্রচলিত মতগুলি তিনি ‍গ্রহ করেছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে ‍গুলি অনুমোদন করিয়ে প্রচলিত ‍ীতের একটি নিয়মবন্ধ রূপ দেবার ‍টা করেছিলেন।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পাঠ করতে ‍য়ে ভাতখণ্ডে দেখেন যে সেগুলির ‍া প্রাঞ্জল নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ‍র্থবোধক। তাছাড়া তখনকার অনেক ‍রিভাষা এবং নিয়ম এখন অপ্রচলিত। ‍রগুলির নামও আজকাল শাস্ত্রের ‍গ পুরোপুরি মেলে না। এক কথায় ‍লিত সঙ্গীতের সংগে শাস্ত্রগ্রন্থ‍লির কোনও সঙ্গতি দেখতে পাওয়া ‍া না। এসব ব্যাপার ভাতখণ্ডের মনে ‍ান্তির সৃষ্টি করে। তাঁর মনে হলো ‍ব শাস্ত্রগ্রন্থ বর্তমান সঙ্গীতের ‍যোগী নয়, সেগুলি এত কষ্ট করে ‍ার প্রয়োজন কি? আমরা কি এখন ‍াকর', 'দর্পণ', 'রাগবোধ', ‍বিজাত' প্রভৃতি গ্রন্থের নির্দেশ ‍ুসারে সঙ্গীতচর্চা করি? তার চেয়ে ‍লের পরিবর্তনের সংগে সঙ্গীত যে ‍মান রূপ পেয়েছে, তাই নিয়ে বরং ‍া হোক, গবেষণা হোক এবং ‍গীতের আধুনিক শাস্ত্র তৈরি করা ‍ক। এইরকম সব চিন্তা তাঁকে ‍ুনিক সংগীতকে সুসম্বন্ধ করার ‍া ভাবিয়ে তোলে।

তবে এই কাজ ভাবা যত সহজ, ‍া তত সহজ ছিলো না। সবাই ‍নে আমাদের দেশে সংস্কারের বেড়া ‍ার বাধা অনেক। একদিকে প্রাচীন‍ীদের যুক্তিতে ঘা লাগায় তাঁদের ‍র আপত্তি, অন্যদিকে কলাবিদ ‍দায়ের ঘরের জিনিস বাইরে যাওয়ায় ‍দের আস্ফালন। এইসব দুর্দম বাধা ‍ক্রম করে প্রায় ৫০ বছরের অক্লান্ত ‍শ্রমে ভাতখণ্ডে হিন্দুস্থানী ‍ীতকে নিয়মবন্ধ করতে পেরেছেন। ‍ুস্থানের হাতে তুলে দিয়েছেন ‍ুনিক সংগীতের শাস্ত্র।

ভাতখণ্ডে রচিত "লক্ষ্যসংগীত" "অভিনব রাগমঞ্জরী" গ্রন্থ দুটিকে ‍ষবাবু শাস্ত্র বলতে রাজি নন। ‍প্রশ্ন "সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ ‍ই কি শাস্ত্র?" অবশ্যই নয়। ‍র আভিধানিক অর্থ হলো— ‍াত বিধি বিষয়ক গ্রন্থ। ভাতখণ্ডের ‍প্রচলিত [illegible]

রয়েছে। তাহলে তাঁর গ্রন্থ শাস্ত্র হবে না কেন?

ভাতখণ্ডের উদ্দেশ্য ছিলো ভারতবর্ষের সঙ্গীতপিপাসুদের শাস্ত্র এবং প্রয়োগের বিভ্রান্তির মধ্যে না রেখে সঠিক সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটানো। আগের দিনে সঙ্গীত ছিলো কতিপয় গোষ্ঠীর যেন বংশগত সম্পত্তি। তাঁদের খেয়ালখুশিমত তখন সঙ্গীত শিখতে হোত। ভাতখণ্ডেই সর্বপ্রথম এই বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে সঙ্গীতকে জনসাধারণের মাঝে পৌঁছে দিলেন। এইজন্য তাঁকে বহু জায়গায় অপ্রিয় হতে হয়েছে এবং বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই জন্যেই হয়ত সঙ্গীত প্রচারের আগিদে ছদ্মনাম প্রভৃতির সাহায্যে তাঁকে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিলো। তবে একথা ঠিক যে এই কৌশলের মধ্যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো। সঙ্গীতকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানাবার জন্যে অথবা বিকৃত করার জন্য কোনও কৌশল তিনি অবলম্বন করেননি।

সুভাষবাবু এক জায়গায় বলেছেন যে ভরতের ষড়জ গ্রামের শ্রুতি-বিভাগকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আধুনিক বিলাবল ঠাটের সংগে মেলাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর গ্রন্থে শ্লোকরচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্র খুললে দেখতে পাবেন ভরতের ষড়জ গ্রামের চেহারা বর্তমান কাফী ঠাটের মত ছিলো। অথচ প্রচলিত ষড়জ গ্রাম হিসেবে বিলাবল ঠাট আমাদের দেশে অনেকদিন আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর কারণ কি? ইতিহাস বলছে আমাদের সংগীতে বহুদিন আগেই য়ুনানী, আরবী, ফারসী ইত্যাদি যবন সংগীতের প্রভাব পড়েছিলো। ভারতীয় সংগীতে ফারসী বিদ্বান আমীর খুসরোর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। যবনরা সংস্কৃত শাস্ত্র বুঝতেন না, তাই ওদিকটাতে হাত দেননি, কিন্তু তাঁদের প্রভাব ভারতীয় সংগীতের প্রয়োগবিধিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিলো। তানসেন, বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল প্রভৃতিরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও খুব সম্ভবত শাস্ত্রজ্ঞান রাখতেন না। তাহলে এই পরিবর্তনের প্রসংগে নিজেদের মতামত অবশ্যই লিখে রেখে যেতেন। য়ুনানী স্বরসপ্তক (পীথাগোরিয়ান স্কেল) এবং ফারসী স্বরসপ্তক হলো হুবহু আমাদের বিলাবল ঠাটের মত এবং ষড়জ গ্রাম হিসেবে বিলাবল ঠাটের ব্যবহার চলে আসছে সেই হরিদাস, তানসেনের আমল থেকেই। স্পষ্টত এই সপ্তক ভারতের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র থেকে আসেনি, এসেছে ভারতের বাইরে থেকে। এও লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য সংগীতের স্বরসপ্তক (Major scale of C) আমাদের বিলাবল ঠাটের মত।

ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য রক্ষা করার খাতিরে এই সপ্তকের সংগে ভরতের সপ্তকের সম্বন্ধ দেখানো যায়। ভরতের ষড়জ গ্রামের (বর্তমান কাফী ঠাট) নৈষাদী মূর্ছনাটি (রঞ্জনী) বিচার করলে দেখা যাবে সেটি বর্তমান বিলাবল ঠাটের মত। এখন ভরতের [illegible]

২) যদি প্রচলিত সপ্তকের অর্থাৎ বিলাবল ঠাটের ওপর সাজানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে স্বরগুলির অবস্থান বদলে যাচ্ছে। ভরতের বর্ণিত সপ্তকে স্বরগুলি ছিলো তাদের শেষ শ্রুতির ওপরে। কিন্তু আধুনিক সপ্তকের (বিলাবল ঠাট) স্বরগুলি রয়েছে তাদের প্রথম শ্রুতির ওপর। সংগীতশাস্ত্রকে বর্তমান সংগীতের উপযোগী করতে গিয়ে ভাতখণ্ডে এইটাই বিচার করে দেখিয়েছেন এবং এই কারণেই বলেছেন "এতে শুদ্ধ স্বর সপ্ত স্বরাদ্য শ্রুতি সংস্থিতাঃ।" ভাতখণ্ডের উদ্দেশ্য ছিলো প্রচলিত সংগীতের শাস্ত্রগঠন করা। নিজের মতে বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধসপ্তক হিসেবে জোর করে প্রতিষ্ঠা করা নয়।

সুভাষবাবু এল এন গর্গ সম্পাদিত "সংগীত বিশারদ" গ্রন্থের (পৃঃ ২০) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভরত নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে সনাতন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। "সংগীত বিশারদ" বইটির অষ্টম সংস্করণ আমার কাছে আছে। দুঃখের বিষয় ওই বইয়ের ২০ পৃষ্ঠায় সুভাষবাবুর বর্ণিত উদ্ধৃতিটি পাওয়া গেল না। ওই পৃষ্ঠায় পৌরাণিক, বৌদ্ধকালীন, কালিদাসকালীন এবং রামায়ণ, মহাভারতকালীন সংগীতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। ওই বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় ভরত নাট্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তবে তা সুভাষবাবুর উদ্ধৃতির সংগে মেলে না।

যাই হোক, ভরত নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সনাতন একথা মানতে পারলাম না। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলির তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকারগণ অর্থাৎ শার্ঙ্গদেব, রামমাত্য সোমনাথ, পুণ্ডরীক, ব্যঙ্কটমখী, তুলজাধিপ, ভাবভট্ট, অহোবল, লোচন প্রভৃতির বর্ণিত স্বরসমূহের নাম, ধাম এবং বিচারের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। এর থেকে বোঝা যায় এইসব গ্রন্থকারেরা কেবলমাত্র নাট্যশাস্ত্রের সূত্র অবলম্বন করেই চর্চা এবং বিচার করেন নি। সংগীতশাস্ত্রের অগ্রগতিতে তাঁদের নিজেদেরও বুদ্ধি মিশেছিলো। তা নইলে প্রতিটি গ্রন্থই নাট্যশাস্ত্রের অনুলিখন হতো এবং সংগীতের প্রগতি হতো না।

নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সনাতন বলার পরমুহূর্তেই সুভাষবাবু নিজেই আবার বলেছেন, "ভরতের যুগের সংগীত কিরকম ছিলো তা আজ আমরা জানি না। সম্ভবত আজকের দিনের সংগীতের সংগে তার কোনও মিলই নেই। আজকের দিনের সংগীতচর্চায় ভরতের শ্রুতিবিভাগ জানাও প্রয়োজনীয় নয়।"

সুভাষবাবুর এই স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আবার বলছি যে বর্তমান সংগীতের বিচার করতে নাট্যশাস্ত্রকে টেনে আনবেন না।

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী
কটক-১

বিবাদী স্বর

গত ৫ই অগস্টের দেশ পত্রিকায় [illegible]

'বিবাদী' স্বরের আলোচনায় কিছু শাস্ত্রীয় ও প্রায়োগিক ভুল আছে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যে কোন পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন বিশেষে অর্থ বদল হয়। সেই অর্থে বিবাদী স্বর বর্জিত স্বর এবং বিশেষ রূপে ব্যবহৃত স্বরও বটে। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বাদী-সম্বাদী-বিবাদী-অনুবাদী বোঝাতে প্রয়োগস্থলে স্বরযোজনার প্রতি উল্লেখ করেছেন। অংশ স্বরই (সময় বিশেষে গ্রহ বা প্রথম স্বর) বাদী স্বর। বাদী স্বর হতে নবম ও ত্রয়োদশ শ্রু তি-অ ন্ত রা ল ষ্ বু স্ব স্বর সম্বাদী। বিবাদী সেই স্বর যেখানে দুই স্বরের মধ্যে কেবল দ্বিশ্রুতি অন্তরাল—যেমন ঋষভ গান্ধার ধৈবত-নিষাদ (ভরতকালীন স্বরগ্রাম বা স্কেল অনুযায়ী) এবং এই দুই স্বর-যুগ্মের অধিক প্রয়োগ অনুচিত। এ ছাড়া অন্য সমস্ত স্বর অনুবাদী। লক্ষণীয় যে, ভরত একথা বলেননি বিবাদী স্বরকে সর্বদা ত্যাগ করতে হবে। এখানে স্বরের প্রাধান্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। অভিনব গুপ্তও তাঁর টীকায় এই কথাই বুঝিয়েছেন—"যত্র বাদী স্বামী, অমাত্য ইবেতরোহনুবায়ী সম্বাদী, অরিবদ্‌ বিবাদী, অনুসারী পরিজন ইব যোগবাদী চেতি বিভাগঃ অনুবাদিনং লক্ষয়তি" (নাট্যশাস্ত্র, ২৮ ওরিয়েন্টাল সীরিজ)।

ভরত পরবর্তী মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে 'বাদী' ইত্যাদি স্বরের ব্যাখ্যায় রাগরূপ পরিস্ফুট করার মাধ্যম হিসেবে বিশেষ জোর দিয়েছেন তাঁর মতে "বাদ্যাদিভি স্বরৈর্ভেদ রাগস্য বাদিত্বং সম্বাদিত্বং প্রাপ্তম্; তদ্বিনাশকত্বং নাম বিবাদিত্বম্।" কিন্তু আবার এই মতঙ্গই গ্রামরাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিবাদী স্বরের প্রতি যে ইঙ্গিত করেছেন তা নিশ্চিতরূপে মাননীয়। 'ভিন্নষড়জ' গ্রামরাগে ঋষভ-পঞ্চম বর্জিত। কিন্তু রাগের বৈশিষ্ট্য দেখাবার সময় মতঙ্গ বলেছেন "পঞ্চমস্য স্থানে স্থানে বিবাদিত্বেন গৃহীতো ভবতি" (বৃহদ্দেশী, রাগ লক্ষণম্, অনন্তশয়নম্ গ্রন্থাবলি)।

কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, যদিও শাস্ত্রানুসারে বিবাদী স্বর ত্যাজ্য বা বর্জিত, কিন্তু প্রয়োগকালে এই বিবাদী স্বরই বিশেষরূপে বাদনীয়। অভিনব গুপ্তও মতঙ্গের মতকে প্রতিধ্বনিত করেছেন। বিবাদী স্বরের প্রয়োগ আধুনিক চিন্তাধারার ফল নয়। অতএব আজকের যুগে আমরা বর্জিত ও বিবাদী স্বরের অর্থ এইভাবে করতে পারি—যে স্বর রাগে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হয়, তা বর্জিত স্বর; এবং রাগের রূপ ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট না করেও কুশলতার সঙ্গে যে স্বরের কখনও কখনও প্রয়োগ হয় তা বিবাদী স্বর। এর প্রয়োগে মুনশীয়ানার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে অন্যথা রাগভ্রষ্ট হবার আশংকা।

আর একটি কথা, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এবং রাগ-রাগিণী পরম্পরায় ভরত মত (স্কুল)-এর প্রবক্তা ভরত এক নন। নাট্যশাস্ত্রকারের সময়ে জাতিগানের প্রচলন ছিল এবং গ্রামরাগ তখনও

মর্যাদা পায়। কাজেই শীলভ, বেহাগ, দরবারী ইত্যাদি দেশীরাগগুলির নিয়মাবলী নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মত বলে প্রচার করা অনুচিত ও অযৌক্তিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গীতা সুপ্রসার রচয়িতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিবাদী ও বর্জিত' স্বরের ব্যাখ্যা রাগানুসারী, কোন গোলমাল সৃষ্টিকারী নয়। বরং এতে বোঝা যায় পাঠকের বিষয়বস্তুর অর্থ গ্রহণক্ষমতার মাত্রা কতখানি। তাই বাঘ ও শার্দুলের উপমা কেবল চমক লাগানোর জন্য, এতে কোন সারতত্ত্ব নেই; কারণ শাস্ত্র ও প্রয়োগের দিকে তাকালে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে 'বিবাদীই বর্জিত এবং বর্জিতই বিবাদী' নয়, হতে পারে না।

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী
কুরুক্ষেত্র—১৩২১১৯

পুরাতন বাংলা গান

গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্রের লেখা "পুরাতন বাংলা গান" শীর্ষক প্রবন্ধটি খুবই তথ্যসমৃদ্ধ। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলা গানের রীতি-নীতি, গায়ন-পদ্ধতি ও আঙ্গিক প্রভৃতি বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং পুরাতন বাংলা গান ভাবে ও ভাষায় যে কত সমৃদ্ধ ছিল তা বোঝা যায়। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একজন মননশীল, গুণিজন; তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য সংযোজন প্রয়োজন মনে করি।

শ্রীমিত্র প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলেছেন "পুরাতন বাংলা গানের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম। প্রতিটি গানের বাঁধুনি এত নিটোল যে গান যখনই সমে পৌঁছাচ্ছে তখনই মনে হচ্ছে ঠিক এখানে এভাবে শেষ না হলে রসহানি ঘটত।" কথাটি খুবই ঠিক কথা, বিশেষত যে গানগুলি রাগভিত্তিক, সেগুলি সম্পর্কে। এ বিষয়ে অনেক গানের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ আমি শ্রীধর কথকের "মন যে দিল সে কি আর ফিরে এল না" গানটির উল্লেখ করতে পারি। 'দেশ' রাগের এই গানটিতে 'আর' কথাটির আগে সমের যে ঝোঁকটি আসে তাতে মনে হয় লেখকের কথায় "কাব্যের অনুপম আবেদন যেন ঠিক তার স্বাভাবিক আকৃতিকে নিয়ে সব চেয়ে অনুকূল সময়ে এসে মর্মে আঘাত হেনে গেল।"

লেখক বলেছেন "পুরাতন বাংলা গান সকলে যে সবগুলি একই সুরে গান এমন নয়"—এ প্রসঙ্গে উনি অনেক গানের উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আমি সামান্য একটু আলোকপাত করতে পারি, আরো দু'একটি উদাহরণ দিয়ে। দাশরথি রায়ের "কে জানে মা তব মায়া" গানটি সাধারণত কীর্তনাঙ্গ ঢঙেই প্রচলিত, কিন্তু একজন প্রখ্যাত পুরাতন বাংলা গানের শিল্পীর কাছে এ গানটি দরবারীতেও শুনেছি; অবশ্যই তাতে প্রাচীন বাংলা গানের রূপটি বজায় ছিল। ঐ কীর্তনাঙ্গ রূপেই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের "উজল কাজল কালো" গানটি আছে—আবার অন্য আশ্চর্যজনকভাবে পুরাতন বাংলা গানের স্টাইলটি দেখা যায়—কয়েকটি গানের উল্লেখও করেছেন। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, "আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়"—গানটিও উপরিউক্ত গান দুটির স্টাইলে, অর্থাৎ ঐ কীর্তনাঙ্গ ঢঙেই সুরারোপিত। আমরা রজনীকান্তের কয়েকটি গানেও পুরাতন বাংলা গানের রূপটি পাই যেমন, "আমায় ডেকে ডেকে ফিরে গেছেন মা", "ওই বধির যবনিকা" ইত্যাদি। এমনকি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান—"যাহা কিছু মম, আছে প্রিয়তম, সকলি নিও হে স্বামী"—পিলু খাম্বাজে রচিত, যৎ তালে নিবদ্ধ এই গানটি পুরাতন বাংলা গানের ঐ রাগের অনেক টপ্পাকে মনে করিয়ে দেয়। "স্বামী" কথাটি যেভাবে সমে এসে পড়ে এবং যেভাবে আরোহণে শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ এবং অবরোহণে কোমল নিষাদ ও কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উল্লেখ না করলে বোঝাই যাবে না যে এটি নজরুলগীতি। অবশ্য নজরুলগীতিকে আমরা নিশ্চয় পুরাতন বাংলা গানের পর্যায়ে ফেলতে পারি না। এটি বলার উদ্দেশ্য এই যে পুরাতন বাংলা গানের কিছু স্টাইল বা 'চলন' দ্রুত জনপ্রিয় যে কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেগুলি এ যুগের গানেও এসেছে।

শ্রীমতী নূপুর সেন
কলিকাতা-২৬

ঋত্বিক ও বিসর্জন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় শ্রীমতী শোভা সেন ও অন্যান্যদের চিঠি পড়লুম। তিনি নাট্যাভিনয়ের তারিখ (একটির অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন) বা স্থান উল্লেখ করেন নি। এমন কি শিল্পীদের নামও নয়। মঞ্চস্থ রবীন্দ্র নাট্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আ.ই পি টি এ-র কোন কাগজপত্র পাইনি (আছে নিশ্চয়ই কোথাও)। কিন্তু সাক্ষ্য বলছে 'বিসর্জন' ঋত্বিকবাবু ও উৎপলবাবু দুজনেই করেছেন। উৎপলবাবুর প্রোডাকশন যে র‍্যাডিক্যাল ধাঁচের ছিল এবং বেশ শোরগোল হয়েছিল এটা অনেকেই জানেন। এই নাট্যাভিনয়ের সময় ১৯৫২-৫৩, স্থান—মুসলিম ইনস্টিট্যুট, টেকনিশিয়ান স্টুডিও এবং রাঁচি। কিন্তু সঠিক তারিখ স্থানের নামসহ পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ নাট্যাভিনয়ের শিল্পীরা এখনও যদি মুখ (বা কলম) না খোলেন তো বিভ্রাট হবেই। এবং সেটা খুবই বেদনাদায়ক হবে।

নিমাই ঘোষ
কলকাতা-৩

মানুষ পাথর

'মানুষ পাথর' লেখাটির গত ৫ই অগাস্টের লেখায় কিছু বিভ্রান্তিকর মন্তব্য লক্ষ করেছি।

৩৩ পাতায় প্রথম কলমে সমরজিৎবাবু লিখেছেন—"ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য প্রথমেই দরকার ম্যাপিং। ওরা বলেন টপোগ্রাফি।" [illegible] আর Topography মানে ভূ-প্রকৃতি। সুতরাং ম্যাপিং মানে কখনই টপোগ্রাফি নয়। আশা করি আমার এই মতের সাথে সকলেই একমত হবেন। Topographic Mapping এবং Geological mapping দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যদিও ভূ-স্তরের সাথে ভূ-প্রকৃতির একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। একটিকে না বুঝে অপরটিকে বোঝা যায় না।

এই কলমেরই শেষের দিকে তিনি লিখেছেন—'দেখা যাবে সমতলচূড়া সেই পাহাড় হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন শেষ হয়ে গেছে। তার প্রান্ত নদীর খাড়া পাড়ের মত সরাসরি উপর থেকে নীচে সমভূমির মাটির গভীরে প্রবেশ করেছে। এ ধরনের অঞ্চলকেই ভূতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন ফল্ট বা চ্যুতি". কিন্তু যে কোন খাড়া অংশকেই চ্যুতি বা ফল্ট বলে না। ভূ-আন্দোলনের ফলে শিলাস্তরে টান ধরে এবং একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে উপরে উঠে পড়ে বা নীচেও যেতে পারে। অথবা কোন অংশই উপরে বা নীচে না গিয়ে পাশাপাশি বিচ্যুতিও ঘটতে পারে, যাকে ভূ-তাত্ত্বিকরা টিয়ার ফল্ট বলেন। মেঘালয়ের ডাউকি টিয়ার ফল্ট (Dauki Tear Fault) পূর্ব-পশ্চিমে ২৫০ কিঃ মিঃ বিচ্যুতির উদাহরণ।

সবশেষে ৩৭ পাতায় একটি ছবির নীচে সমরজিৎবাবু লিখেছেন—"শিলং থেকে শিলচরের পথে ঠিক এখানেই উনিশ শতকের শেষে বিখ্যাত ভূ-তাত্ত্বিক ওলডহ্যাম প্রথম প্রমাণ করেন, নদীও পাথরের চাঁই বয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

একথা উনি কোথায় পেলেন আমার জানা নেই, তবে ডেভিস, থর্নবেরী ইত্যাদি ভৌগোলিকরা নদীর বহনক্ষমতা আলোচনা করার সময় কোথাও ওলডহ্যামের নাম উল্লেখ করেন নি। নদীর বহনক্ষমতা মূলত নির্ভর করে নদীর ঢাল এবং জলের পরিমাণের উপর। বর্ষাকালে অনেক পাহাড়ী নদী বড় বড় পাথরের চাঁই (Boulder) বয়ে নিয়ে যায়। চাঁইগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে যায় বলে আস্তে আস্তে গোলাকার হয়। যত বেশী গোলাকার হয় পাথরগুলিকে নদী তত তাড়াতাড়ি বয়ে নিয়ে চলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাথরের আকৃতিও নদীর বহন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

কল্যাণ রুদ্র
কলকাতা-৬১

॥ ২ ॥

শ্রীসমরজিৎ করের "মানুষ পাথর" প্রবন্ধটির ১২ আগস্টের সংখ্যায় আছে—"শুনেছিলাম সার্থক শিল্প সব সময়ই নাকি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কথাটা যে কতখানি সত্যি তার পরিচয় পেয়েছিলাম একবার প্যারিসের লাভর মিউজিয়ামে। মনে পড়ে, বিরাট ঘর। তার দেয়াল জুড়ে ঐতিহাসিক ছবিঃ লাস্ট সাপার।" লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এই বিখ্যাত ছবিটি প্যারিসের লুভ্‌র মিউজিয়ামে নয়—উত্তর ইতালীর শহর মিলানের একটি দেওয়ালে আঁকা হয় এবং এখনো সেখানেই আছে।

সবিতা দাশগুপ্ত
নয়াদিল্লি

মানুষ পাথর

গত ১২ই আগস্টের সংখ্যায় (৩৮ পৃষ্ঠা) উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে শ্রীসমরজিৎ কর একটু ভুল করেছেন। প্রথমত, কবিতাটির স্রষ্টা ডরোথি (কবির ভগিনী) নন—স্বয়ং কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

ঐ পৃষ্ঠাতেই যে জলপ্রপাতটির উল্লেখ করা হয়েছে সেটার নাম "এলিফ্যান্টা"—এলিফ্যান্ট নয়।

দিলীপনারায়ণ দে
কলিকাতা-৩৪

মায়াবতী

'ধ্যানমগ্ন হিমালয় ধ্যানাসন মায়াবতী' লেখার জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই। সুদূর হিমালয়ে নিভৃত নির্জনে সাধনায় মগ্ন মায়াবতী আশ্রম সম্বন্ধে লোকের জানার পরিধিটা বেশ বড় মাপের নয়। ১৯৭৩ সালে আমার মায়াবতী আশ্রম দর্শনের সৌভাগ্য হয়। আলমোড়া আশ্রম থেকে বাস স্ট্যান্ডে আসার জন্য কুলি পাওয়া সত্যিই আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তবে শেষ রাত্রে আশ্রমের গায়ে বস্তা জড়িয়ে হঠাৎ কুলির আবির্ভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা কিনা কে জানে! অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল মায়াবতী আশ্রম যাত্রার প্রাক্কালে। গেট পাসের জন্য দেরি হওয়ায় আমাদের বাস লোহাঘাট পৌঁছায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। ফলে মায়াবতী যাওয়ার জন্য কোন কুলি পাওয়া গেল না। তাদের আপত্তির কারণ—মায়াবতী থেকে ফিরতে তাদের রাত্রি হয়ে যাবে। ঐ অরণ্যসঙ্কুল পথে অন্ধকারে আসতে কেউই রাজী নয়, বেশী পয়সার বিনিময়েও নয়। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি আধপাগলা লোক—তার মাথার তেল সর্বাঙ্গে গড়িয়ে পড়ছে, আমাদের সঙ্গী হতে রাজী হল। সেই লোকটি সেদিন আমাদের মায়াবতী পৌঁছে দেয়। আশ্রমে পৌঁছতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ এবং স্বামীজীরা বেশ উৎকণ্ঠিত আমাদের জন্য। মহারাজদের স্নেহ যত্ন তীর্থযাত্রার অমূল্য সম্পদ। আপেলের চাটনি রান্না করেছিলেন স্বামী বুধানন্দজী। খেতে বসে জানা গেল—। মধুসূদনবাবুর লেখায় চন্দন নামে তরুণ ব্রহ্মচারী অনুপস্থিত। মনে হয় তিনি চন্দনের সাক্ষাৎ পাননি। আশ্রম সংলগ্ন অতিথিশালা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য। আশ্রম থেকে কিছু দূরে অবস্থিত অতিথিশালায় মহিলারা আতিথ্য গ্রহণ করে থাকেন। মায়াবতীর অনুপম সৌন্দর্য আজও স্মৃতিতে অমলিন।

গীতা আচার্য
পোঃ-জেলা—হুগলি।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

রোমাঞ্চকর কিশোর-উপন্যাস

তিন নম্বর চোখ

দাম ৫.০০

ছোটদের জন্য গা-ছমছম রোমাঞ্চকর উপন্যাস রচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর সব লেখাই, এক-কথায়, ভয়ংকর সুন্দর। তার মধ্যে আবার 'তিন নম্বর চোখ' একেবারে নতুন স্বাদের। কেননা, এই উপন্যাসে যাঁদের মুখ্য ভূমিকা, তাঁরা হলেন গ্রহান্তরের অধিবাসী। দেবতারা গ্রহান্তরের মানুষ কিনা এ-নিয়ে যখন তুমুল হইচই চলছে, সেই সময় অন্য গ্রহের দুই দেবতা এসে এই পৃথিবীতে কী-সব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে গেলেন তারই দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী 'তিন নম্বর চোখ।' এর মধ্যে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা রয়েছে, রয়েছে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্পনা, তার থেকেও বেশী করে যা রয়েছে, তা হল নিটোল নিখুঁত আকর্ষণীয় একটি অসামান্য গল্প যার টান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একইরকম অপ্রতিরোধ্য এবং একইরকম দুর্বার।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য কিশোর-উপন্যাস :
সবুজ দ্বীপের রাজা ৫.০০ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬.০০ সত্যি রাজপুত্র ৫.০০ ভয়ংকর সুন্দর ৫.০০

শংকর-এর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বোধোদয়

দাম ৭.০০

'বোধোদয়'-এর শুরু বিদেশের এক বিমানবন্দরে, সমস্ত ঘটনা ঘটছে ভারত-গামী এক বোয়িং বিমানের অভ্যন্তরে, এবং শেষ দমদম এয়ারপোর্টের রানওয়েতে। শংকর-এর রচনার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় রয়েছে তাঁরা নিশ্চিত অনুমান করতে পারছেন যে, এই ধরনের পরিবেশে কী আশ্চর্য কৌতূহলকর কাহিনী উপহার দিতে পারেন 'কত অজানারে'র স্রষ্টা। বস্তুত, সে-অনুমানে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। 'বোধোদয়' শুধু কাহিনীর দিক থেকেই নয়, বক্তব্যের দিক থেকেও শংকর-এর এক বরণীয় সৃষ্টি।
আজকের যুগের এক-শ্রেণীর শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ভারতবাসী যে-সর্বনাশা সমস্যায় ভুগছেন, লেখক দারুণ নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে তার গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। এক দিকে স্বার্থ, অন্য দিকে ত্যাগ, এক দিকে ইন্দ্রিয়সুখ অন্য দিকে বোধোদয়ের স্বপ্ন—এরই মধ্যে কোন পথ বেছে নেবে আজকের যুবশক্তি ? সেই উত্তরই খুঁজতে চেয়েছে 'বোধোদয়।'

লেখকের আরেকটি উপন্যাস :
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৮.০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

দিব্যেন্দু পালিতের

বিশিষ্ট উপন্যাস

সন্ধিক্ষণ

দাম ৫.০০

একদিন ভোররাতে উদাসীন হাওয়া আর রহস্যময় আলোছায়ার মধ্যে নিঃশব্দে মৃত্যু হল কনকের। তারপরেই শুরু হয়ে যায় এক আশ্চর্য নাটকের আপাত-সরল অথচ রহস্যময় চরিত্রগুলির বিচরণ—নিজেদের সৃষ্ট স্বপ্ন-শিকারের এক দুরন্ত ও আত্মঘাতী প্রয়াস। মৃত্যু এই উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করেছে মাত্র, কাহিনীর মৌল বিস্তার আসলে জীবনকে নিয়েই।

যে-চরিত্রগুলি ভিড় করে ছিল কনকের চারপাশে, তাদের বেঁচে-থাকার এক করুণরঙীন ছবি এঁকেছেন শক্তিমান লেখক দিব্যেন্দু পালিত। উন্মোচিত করেছেন আমাদের বিষম চেনা অথচ সম্পূর্ণ অননুভূত পারস্পরিক সম্পর্কের এক দিগন্তকে। আজকের প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তমান অস্তিত্বের নাটকীয় ভূমিকায় দাঁড়ানো কয়েকটি নারী ও পুরুষের ভিতর-জীবনের এক রক্তমাংসময় উপাখ্যান 'সন্ধিক্ষণ।'

এই লেখকের অন্যান্য বই :
উড়োচিঠি ১০.০০ প্রিয়জন ৮.০০ একা ৬.০০ চরিত্র ৬.০০ বিনিদ্র ৬.০০ বৃষ্টির পরে ৬.০০ আমরা ৪.০০ কিছু স্মৃতি কিছু অপমান (কাব্যগ্রন্থ) ৫.০০

সুবোধ ঘোষের

চিরকালীন উপন্যাস

জিয়া ভরলি

দাম ৮.০০

জিয়াভরলি একটি নদীর নাম, যে-নদী দেখলে প্রাণ ভরে যায়। কথাটা বলেছে উপন্যাসের নায়িকা শুক্তি। কদমবাড়ি টি এস্টেটের মালিক প্ল্যান্টার সাহেব গগন বসুর ছোট মেয়ে শুক্তি বসু। তার জীবনের পথে পরিচয়ের সাধারণ স্পর্শ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল একাধিক যুবক-প্রাণ ; কিন্তু তেমন নিবিড়, গভীর ও একান্ত করে কি সেখানে রেখাপাত করতে পেরেছিল কেউ ? 'মিষ্টি একটি নদী, মিষ্টি একটি মেয়ের দুর্বোধ্য মন আর কলকাতা-তেজপুর-নেফার মানচিত্র নিয়ে এক চিত্তগ্রাহী উপাখ্যান গড়ে তুলেছেন যশস্বী লেখক। চীনা-হানার পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে গ্রন্থে।...সাংবাদিকের যে প্রতিবেদন অনিবার্যভাবে হারিয়ে যেত, সাহিত্যের জাদুকাঠি ছুঁইয়ে লেখক তাকে চিরকালের করে রাখলেন।'

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :
কালকেতু ৭.০০ বাসরদত্তা ৪.০০ বন উপবন ৬.০০ বসন্ততিলক ৫.০০ ভারত প্রেমকথা ১৫.০০ সেই অদ্ভুত অভ্রখনি (কিশোর উপন্যাস) ৫.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

নতুন কাব্যগ্রন্থ

আজ সকালে

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

পূর্ণেন্দু পত্রীর

অনন্য কিশোর-গ্রন্থ

ছড়ায় মোড়া কলকাতা

দাম ৪.০০

ছোটদের জন্য এক অনন্য উপহার পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা।' এর আগে তিনি শুনিয়েছিলেন রূপকথার মতো অপরূপ এক কাহিনী—কী করে গড়ে উঠল এই কলকাতা শহর। তেমনই আরেকটি দারুণ কৌতূহলকর বিষয় তিনি বেছে নিয়েছেন এই নতুন বইতে। কলকাতাকে নিয়ে যেসব বিখ্যাত-বিখ্যাত ছড়া আজ প্রায় প্রবাদের মতো মুখে মুখে ফেরে সেই সব ছড়া কোন পরিপ্রেক্ষিতে আর কীভাবে রচিত হয়েছিল আমাদের অনেকেরই জানা নেই। অথচ চলতি ঘটনা নিয়েই তখুনি-তখুনি ছড়া বানাতে ভালবাসে মানুষ। ফলে দেখা যায়, সেই সব ছড়ার মধ্যে সেই যুগের অনেক কাহিনী, অনেক গল্প-গাথা, অনেক ইতিহাস আছে লুকিয়ে। কলকাতাকে কেন্দ্র করেও এমন অনেক-অনেক ছড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যেমন, 'হাতী পর হাওদা/ঘোড়া পর জিন/ জলদি আও জলদি আও/ ওয়ারেন হেস্টিন'। কিংবা, 'ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত/ কলকাতাতে ফিটন রথ।' এমন সব বহু ছড়া আর তার ইতিহাস রেখা এবং লেখায় সাজিয়ে দিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর এই বইতে।

পূর্ণেন্দু পত্রীর আরেকটি বই :
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণ খান্না
প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতি শেষ পৃষ্ঠায়

পরবর্তী আকর্ষণ

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব
দুর্গাদাস ভট্টর রচনা
বাঙলা সাহিত্যে দুই সখী
অলক সান্যালের গল্প
পাখি
মিহির সিংহের প্রবন্ধ
কুসংস্কার, সংস্কার, প্রগতি
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ রচনা কলিকাতা
আছে কলিকাতাতেই

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

বিবাহযোগ্য নরনারীর বয়ঃসীমা

বিয়ের যোগ্য বয়সের ন্যূনতম সীমাঙ্ক নির্দিষ্ট করে দিয়ে সামাজিক জীবনের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করবার প্রয়াস অনেক দেশেই দেখা যায়। আইন প্রচলিত করে এই নির্দেশ জনজীবনের পক্ষে অবশ্যপালনীয় একটি কর্তব্য হিসাবে বিহিত করা হয়। লক্ষ করতে হয়, আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করে কেউ যদি বয়সের ন্যূনতম সীমাঙ্কের চেয়ে কম বয়সে বিয়ে করে, তবে তার সম্পর্কে প্রযোজ্য শাস্তিবিধিরও ব্যবস্থা থাকে। আমাদের ভারতেও ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়সের উপর সরকারী ইচ্ছার শাসন বিহিত আছে। এতদিন আইনের নির্দেশ ছিল, ছেলের পক্ষে অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে বিয়ের যোগ্য বয়েস হবে আঠারো বছর, তার কম নয়। অপর দিকে মেয়ের পক্ষে, অর্থাৎ নারীর পক্ষে বিয়ের যোগ্য বয়স হবে পনের বছর; তার কম নয়। বিয়ের যোগ্য বয়সের এই ন্যূনতম সীমাঙ্ক নতুন আইনে পরিবর্তিত হয়েছে। পুরুষের পক্ষে বিয়ের যোগ্য বয়সের সীমাঙ্ক ধার্য করা হয়েছে একুশ বছর। এবং মেয়েদের পক্ষে আঠারো বছর।

সরল করে না বললেও এ সত্য বুঝতে কারও অসুবিধে নেই যে, বিয়ের যোগ্য ন্যূনতম বয়সের সীমা ধার্য করবার, এক্ষেত্রে বাড়িয়ে দেখার প্রয়োজনে আইন সংশোধিত হয়েছে। আইনের এই সংশোধিত নির্দেশ ভারতের সকল সম্প্রদায় ও সমাজের উপর প্রযোজ্য হবে, এরকম সমদর্শিতার দাবিও নাকি এই আইনে সমাহত হয়েছে। বিশেষ একটি সামাজিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা স্বচ্ছন্দে সম্ভব করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের বয়সের ন্যূনতম মাত্রা বাড়িয়ে দেবার এই সরকারী প্রযত্নটিকে সমাদর ও সমর্থন করতে গিয়ে দেশের মানুষ অবশ্যই স্মরণ করতে পারবে যে, বিয়ের ন্যূনতম বয়সের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার মূলে বিধির সাথে দেশের জনসংখ্যার ভার লঘু করবার আদর্শিক দায়িত্বের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সরকারের ধারণা এবং বহু সমাজতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞেরও ধারণা এই যে, বেশী বয়সে বিবাহিত হবার প্রথা থাকলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ক্রিয়া অনেকটা প্রশমিত হয়। দম্পতির পক্ষে এ ক্ষেত্রে বেশী সন্তানের পিতা-মাতা হবার সময়-সীমা হ্রস্ব হয়ে যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়বে সর্দা আইনে (সার হরবিলাস সর্দা যে আইন প্রস্তাবিত করেছিলেন) যে-সকল সামাজিক কল্যাণ আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধানত জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রস্ব করবার কোন ইঙ্গিত ছিল না। সে-আইন ছিল বাল্যবিবাহের নিবারক আইন। বিবাহিত বালিকার স্বাস্থ্য, সম্ভাবিত সন্তানের স্বাস্থ্য এবং অন্যবিধ পারিবারিক কল্যাণের কামনা ছিল সর্দা আইনের প্রধান অভীপ্সা। মনে হয়, দেশের সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্তব্যবিধির দুরূহতা সম্পর্কে যথোচিত চিন্তা করবার দায়িত্ব একটু বেশী লঘু করে নিতে চান। বেশী বয়সে নর-নারী বিবাহিত হলে সন্তানের জন্মহার সত্যই যদি কম হয়, তবু প্রশ্ন করা চলে, কতটুকু বা কতখানি কম? উত্তর হলো সামান্য কম। এবং সেই কমের পরিমাণ এমনিতর নয় যে সেটা জন্মহার বৃদ্ধির দুরন্ত প্রকোপ নিতান্ত শান্ত হয়ে যাবার প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলে প্রতীত হবে না, প্রতীত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, নতুন বয়স-আইনের নির্দেশ যেন বড় রকমের অমান্যতায় বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ না হয়, সেজন্য কোন সতর্কতার শাসন কি সরকার বস্তুত সম্ভব করতে পারবেন? সন্দেহ করতে হয় পণবিরোধী আইন, অস্পৃশ্যতাবিরোধী আইন ইত্যাদি সামাজিক জীবনের সৌষ্ঠব উন্নত করবার যে-সকল আইন প্রচলিত আছে, তাদেরই মতো নিষ্ক্রিয় শক্তিমত্তা প্রকট করবে এই নতুন বয়স-আইন, তার বেশী নয়। অলস শাসন ও অসতর্কতার পক্ষে এরকম পরিবেশ যদি রচিত হয়, তবে বুঝতে হবে যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সামান্যতম সহায়তা নর-নারীর বিবাহের যোগ্য এই বয়ঃসীমার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া কোনটিরই সম্ভব হবে না। দেশের শিক্ষিত জনসমাজের সম্পর্কে এই মন্তব্য করা চলে যে, তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স এমনিতেই সহজ-ভাবে ও অবস্থার প্রভাবে আঠারো এবং একুশের বেশী হয়ে গিয়েছে। আদিবাসী জনসমাজের সাধারণ রীতিতে নর-নারীর বিবাহ একটু বেশী বয়সেই অনুষ্ঠিত হয়, এই সমাজে বাল্যবিবাহের কোন প্রকোপই নেই। প্রশ্ন হলো, নিম্নমানের শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত জনসমাজ, যাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের সংস্কার বেশী প্রবল, তাদের অভ্যস্ত মনোবৃত্তি সংশোধিত করতে এই নতুন আইনের নির্দেশ কি সার্থক প্রভাব হয়ে কাজ করতে পারবে? মনে হয়, এক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়সের মাত্রা সম্বন্ধে সংশোধিত আইনের নির্দেশ সাফল্যের শূন্যের ঘরেই পড়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের একাধিক প্রবক্তা, প্রধান ও অপ্রধান, বিগত সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জবরদস্তি ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতে গিয়ে এমনই প্রচণ্ড মুখরতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণ জনচিত্তের সহজ আগ্রহ শঙ্কাবিভূত হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বাভাবিক আগ্রহ পুনরুত্থোধিত হয়েছে বলে মনে হয় না। হলে ভাল হয়, হওয়াই চাই। কিন্তু বিয়ের ন্যূনতম বয়সের সীমা বাড়িয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহের পুনরুজ্জীবন সম্ভব করবার পন্থা নয়।

ব্যঙ্গচিত্র

কণ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৭৩ ॥

'আজ রাত্রে আজ্ঞে, আপনাদের কাকড়া ও মাছ ভাজা সেবা হবে।'

'সে কি! তোমরা রাঢ়ের লোক, রাত্তিরে ভাত থাকবে না?'

'আজ্ঞে, আজ রাত্তিরে ওই সেবাই করতে হবে।'

'আটা-ময়দাও নয়—খালি কাঁকড়া?'

'আজ্ঞে, কাঁকড়া নয়; কাকড়া।'

তারাশঙ্কর (বন্দ্যোপাধ্যায়) একটু করুণভাবে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে হচ্ছিল। আমরা একটি সভা করতে গিয়েছিলুম। সন্মথও (দত্ত) সঙ্গে ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার রায়পুর গ্রামের লোকদের কথা আমি কাকড়া জিনিসটা জানতুম। কিন্তু তখন ভাঙলুম না; ভাবলুম খাবার সময় তো টের পাবেনই। তবে উঠে গিয়ে গ্রামের লোকদের বলে এলুম যে, দু-একটা রুটি বা পরোটা যেন থাকে।

খাবার সময়ে তারাশঙ্কর পাতি-পাতি করে কাঁকড়া খুঁজছেন। কিন্তু তিনি চিনবেন কি করে? একটি থালায় আমাদের ভাইফোঁটার সময়ে যেমন প্যারাকির মত খাবার হয় সেই রকম আট-দশটি খাবার, এক কোণে কয়েকটি মাছভাজা, দুটি বাটি—একটি বাটিতে পায়েস এবং আর একটি বাটিতে আলু ও মাছের ডালনা। আমাদের প্রত্যেককে একটি করে থালা দেওয়া হয়েছে। আর একটি থালায় এক গোছা পরোটা। তারাশঙ্কর আর কাঁকড়া খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষে আমি বললুম, 'ঐ যে প্যারাকির মত খাবার, চালের গুঁড়ি বা ময়দা-আটা দিয়ে হয়। ভেতরে ক্ষীর বা ছানা বা নারকেল নাড়ুর পুর দেওয়া থাকে, কোথাও কোথাও ডালের পুর দেওয়া থাকে—এরই নাম কাকড়া। বাঁকুড়োর কোনও কোনও অঞ্চলে এটি অতি প্রিয় খাদ্য।'

বাঁকুড়ার এইসব অঞ্চল অত্যন্ত শুকনো। শোভা অতি মনোরম। চারদিক কত রকম গাছগাছালি দিয়ে ভরতি। মাঝে মাঝে মোরামের রাঙামাটির রাস্তা। কিন্তু বড্ড জলকষ্ট।

আহারাদি সেরে আমরা দুর্গাপুর অভিমুখে রওনা হলুম। বড়জোড়ার কাছে এসে দেখা গেল যে, রাস্তা কাটা—ডি ভি সি-র একটি খাল কাটা হচ্ছে। যাবার সময়ে দেখে গিয়েছিলুম; তবে খাল-খননকারীরা আশ্বাস দিয়েছিল যে, কাজ শেষ হলে ওরা গাড়ি যাতায়াতের পথ করে দিয়ে যাবে। কোথায় গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা, কোথায় লোকজন, খানিকটা রাতও হয়ে গেছে—মহা ফাঁপরে পড়লুম। তারাশঙ্করের কোনও উদ্বেগও নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। তখনও বড়জোড়ার চৌমাথার কাছে কয়েকটি দোকান আছে, দেখা গেল। ... চায়ের দোকানে বসলেন। আমি সন্মথবাবুকে সেখানে রেখে সঙ্গের সহকর্মীকে নিয়ে বড়জোড়া গ্রামে গেলুম। অনেকেই শুয়ে পড়েছিল, তাই একটু দেরি হল। কয়েকটি লোক, কয়েকটি কোদাল এবং কয়েকখানি বাঁশ নিয়ে ফিরে এলুম। দেখি, তারাশঙ্কর বেশ ভাল করে আড্ডা জমিয়েছেন। আট-দশ জন গ্রামের লোক—সবাই চাষী ঘরের লোক, ওঁকে ঘিরে বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছে; আর উনি মজলিসী গল্প চালাচ্ছেন। দেখে কে বলবে যে, উনি বাংলা দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মনে হল যে, আমরা যদি চেষ্টা না করি, তা হলে সারা রাতই উনি জমিয়ে ঐ আসর চালাবেন।

ওঁর লাভপুরের বাড়িতেও অনেকবার গিয়েছি। সেখানে যারা দেখা-টেখা করতে আসত, তাদের সঙ্গে হুবহু রাঢ়ী টানে কথা কয়ে যাচ্ছেন। আর সে কি উৎসাহভরে কথা—যারা এসেছে প্রত্যেকের বাড়ির খবর! অনেকেরই নাম জানেন। যাঁরা এসেছেন ঐ গ্রাম থেকে বা আশেপাশের থেকে, তাঁদের অনেকেরই এ জ্ঞান আছে দেখলুম যে, তারাশঙ্কর এখন লাভপুর-বীরভূমের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়েছেন। সেজন্য মনে একটা সম্ভ্রমবোধ আছে, কিন্তু কোনও পার্থক্যবোধের সৃষ্টি হয়নি। এই সম্পর্ক স্থাপন করা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এবং এটা বোধ হয় একমাত্র তারাশঙ্করের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমি বহুবার লাভপুর গিয়েছি। ভ্রাতা পার্বতীশঙ্করের আতিথেয়তা ভোলবার নয়। সব সময়েই এক পায়ে খাড়া। মাঝে মাঝে পার্বতীকে একটু বকতুমও। সে মিষ্টি হেসে বলত, 'এ আর বেশী কি করছি!' আর তার উপর তো তারাশঙ্করের নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব ছিল না। একটা জিনিস লক্ষ করেছি। কলকাতার সমাজেও যেমন আর পাড়াগাঁয়ের সমাজের মধ্যেও তেমনি, ওঁর স্বভাবের মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি। দিল্লীতে যখন পার্লামেন্টের সদস্যরূপে গেলেন, তখনও সেই একই ভাব। শক্ত শক্ত সমস্যার কথা এমন সাধারণভাবে বলতেন যে, তা ভোলা খুব শক্ত।

১৯৫২র যখন কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়, তখন কংগ্রেসের নির্বাচনী বোর্ডের তারাশঙ্কর একজন সদস্য ছিলেন। বোর্ডের মিটিং এমন জমে উঠত যে, মাঝে মাঝে মনে হত যেন এটা শুষ্ক নির্বাচনী বোর্ড নয়, যেন অন্য কোনও ঘরোয়া মজলিস। ডাঃ রায়, তারাশঙ্কর এবং

বোর্ডের সভাপতি নির্মলবাবু (চন্দ্র) এই তিনজনই মাত করে রাখতেন। মাঝে মাঝে আমরা কয়েকজন কলকাতার বাইরেও গিয়েছি। একবার শুশুনিয়া পাহাড়ে আমি, তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত (দাস), প্রমথনাথ (বিশী) এবং আরও কয়েকজনে ছিলুম। এই তিনজন সাহিত্যের মহারথী যখন একত্রে বসতেন, সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। তারাশঙ্কর ছিলেন বড়বাবু, আর প্রমথনাথ মাঝে মাঝে তারাশঙ্কর আর সজনীকান্তের মধ্যে লাগিয়ে দিতেন, আর নিজে গম্ভীরভাবে চুপ করে থাকতেন। তারাশঙ্কর আর সজনীকান্ত দুই রাঢ়ীকে লাগিয়ে দিয়ে বারেন্দ্র প্রমথনাথ মজা উপভোগ করতেন।

সজনীকান্ত সম্বন্ধে লেখা খুবই মুশকিল। খুব আড্ডাবাজ, মজলিসী লোক ছিলেন; তাস খেলতে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু যখন মনে হত পরিহাসের সুযোগ পেয়েছেন, তখন আর রক্ষে থাকত না। মনে হত জিবে যেন আলপিন আছে। প্রতি কথার সঙ্গে, যাকে পরিহাস করতেন, তার গায়ে একসঙ্গে অনেক আলপিন ফুটছে। বঙ্কিমযুগে অক্ষয়চন্দ্রের (সরকার) সমালোচনা মাঝে মাঝে খুব ধারালো হত। সমাজপতি (সুরেশচন্দ্র) তাকে আরও তীক্ষ্ণ করেছিলেন। আর সজনীকান্ত যেন তাতে পূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন। সময়ে সময়ে মনে হত লেখা এবং কথার মধ্যে যেন কোনও পার্থক্য নেই—দুইয়ের তীক্ষ্ণতাই সমান। অন্য দিকে শ্রদ্ধা জানাবার শক্তিও ছিল অদ্ভুত। 'শনিবারের চিঠি'র একটি ছবির কথা মনে পড়ছে। হ্যাট-কোট পরা বিদ্যাসাগর—নীচে লেখা 'I. C. Banerjee', আর ধুতি-চাদর পরা মাইকেল—নীচে লেখা 'শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত'। কার মাথা থেকে এই ছবির কল্পনা উদ্ভব হয়েছিল জানি না। আমার ধারণা হয় পরিমলবাবু (গোস্বামী) অথবা সজনীকান্ত—কিন্তু এ ছবি ভোলবার নয়। তারাশঙ্করের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ হলে কোনও ভয়ের কারণ থাকত না; কিন্তু সজনীকান্তর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ—সে কথা ভাবতে এখনও মনে ভয় হয়। অথচ এরকম সহৃদয় বন্ধু জীবনে খুব কম পাওয়া যায়।

সজনীকান্ত এবং পশ্চিম বাংলার এককালীন চিফ সেক্রেটারী সত্যেন্দ্রনাথ (রায়) ছিলেন সহপাঠী। এঁদের দুজনে নাকি পরীক্ষায় কে প্রথম এবং কে দ্বিতীয় হবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। সত্যেন্দ্রনাথও খুব মজলিসী, আড্ডাবাজ এবং রসিক লোক ছিলেন। সজনীকান্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ যখন একত্রিত হতেন—সে একটা খুব উপভোগ্য ব্যাপার। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না, কিন্তু শেষ অবধি সজনীকান্তেরই জয় হত। কোনও কথা তো সজনীকান্তের মুখে আটকাত না। এবং রাগের সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, এও ছিল ওঁর চরিত্রের এক বিশেষ গুণ। অবশ্য বোঝা শক্ত ছিল, কোনটা সত্যিকারের রাগ, আর কোনটা কপট গাম্ভীর্য। আর বয়সের বাছবিচার ছিল না।

আমার মনে আছে একবার হাজারীবাগে কান্ত এবং আমাদের এক অল্পবয়স্ক সহকর্মী দুজনকে রেখে আমরা অন্যত্র গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি আমাদের সেই অল্পবয়স্ক সহকর্মী মুখ ম্লান করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আসতেই বললে, 'সজনীদা ভয়ানক রেগে গিয়েছেন। কি যে হবে বলতে পারছি না।' আমার সঙ্গীরা হন্তদন্ত হয়ে সজনীকান্তের কাছে এসে দেখে যে, তিনি অত্যন্ত উৎসাহ করে রাত্রে কি রান্না হবে, রাঁধুনীর সঙ্গে তার আলোচনা করছেন। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল যে, আমাদের ঐ অল্পবয়স্ক সহকর্মীটি নাকি এক প্রকাণ্ড অন্যায় করেছে। তার প্রায় ত্রিশ বছর বয়স, কিন্তু তখনও সে বিয়ে করেনি। এইটা যে কত বড় সামাজিক অপরাধ এটা অনেকক্ষণ ধরে সজনীকান্ত তাকে বুঝিয়েছেন, এবং সেও ধারণা করে নিয়েছে যে, বিয়ে না করার জন্য সজনীকান্ত তার উপর ভয়ানক চটে গিয়েছেন।

আমি কয়েকবারই খুব বিপদে পড়েছিলুম—একবারের কথাই লিখছি। আমরা তখন আমার বাঁকড়োর বাড়িতে। সুরেন কর মশাইও ছিলেন। আমি কথাপ্রসঙ্গে সজনীকান্তকে জিজ্ঞেস করলুম যে, তাঁর 'কে জাগে' কবিতাটি কি এলিয়টের Rhapsody on a Windy Night কবিতা অবলম্বনে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'হতে পারে, এলিয়ট আমার কবিতাটি পড়ে তাঁর কবিতাটি লিখেছেন।' আর উত্তরটি এমনভাবে দিলেন যেন এটাই খুব স্বাভাবিক।

ডায়াবিটিস ছিল। অথচ খেতে খুব ভালবাসতেন। অবশ্য ডায়াবিটিসে যেগুলি নিষিদ্ধ সেগুলি খাবার দিকেই বেশী আকর্ষণ ছিল। নির্মলদা (বোস) মাঝে মাঝে ঐসব খাওয়া নিয়ে আপত্তি করার সজনীকান্ত আমাকে বলতেন, 'নির্মলদা তো ব্যাচিলর—আমরা সামাজিক লোক। ওঁর কথায় কান দেবার কোনও প্রয়োজন নেই।'

সজনীকান্তের কিছু কিছু লেখা পড়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, উনি হয়তো রবীন্দ্রবিদ্বেষী। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অপরিসীম। মুশকিল ছিল, উনি আঘাত করবার সুযোগ পেলে কাউকে রেহাই দিতেন না। অথচ এরকম সহৃদয় বন্ধু খুব কমই হয়।

প্রমথনাথের (বিশী) কথা আগেও অনেকবার বলেছি। সুখেদুঃখে সব কাজেই আমাকে সাহায্য করেছেন এবং পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। কংগ্রেসের এত বড় ভক্ত অনেক মার্কামারা কংগ্রেসসেবীও নন। ওঁর সাহিত্য-প্রতিভার কথা আমার লেখার প্রয়োজন নেই। অনেকে সে কাজ করেছেন এবং আরও অনেকে করবেন। আমরা ওঁর মধ্যে যে বন্ধুবাৎসল্য দেখেছি, তা সত্যিই চিরকাল মনে রাখবার মত। বহুবার একত্রে বহু জায়গায় কাটিয়েছি। গুরুগম্ভীর ভাষায় হাস্যরসের এমন সৃষ্টি করেন যে, যখন কথাটি আরম্ভ করেন তখন বোঝা শক্ত যে, [illegible]

নিকেতনে। শান্তিনিকেতনের প্রতি ওঁর অসীম মমত্ববোধ আছে। কিন্তু বর্তমা[illegible] কতগুলি বিষয় নিয়ে খুব মানসিক যন্[illegible] ভোগ করেন।

প্রমথনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ[illegible] এত বড় পণ্ডিত লোক, কিন্তু কথাবার্[illegible] কখনও কোনও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন না। অনেক সময়েই ঘন্টার পর ঘন্টা চুরুট মু[illegible] করে বসে থাকেন। মাঝে মাঝে এমন দু'একটা কথা বলেন যাতে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। আবার সময়ে সময়ে ভাবলেশহীন মুখে এম[illegible] সব কথা বলেন যার ধাক্কা সহ্য করা মাঝে মা[illegible] খুবই কঠিন হয়। ওঁর কিন্তু মুখভাবে কোনও পরিবর্তন হয় না। আমাদের বাড়ি[illegible] মাঝে মাঝে আসেন; বাড়ির ছোট-বড় সকলে[illegible] সঙ্গেই সমান প্রীতি। তারা সকলেই মনে ক[illegible] যে, এই একজন লোক যাঁর সঙ্গে মন খু[illegible] কথা বলা যায়। ইনি কখনও পাণ্ডিত্য [illegible] ব্যক্তিত্বে অভিভূত করেন না। অতি অনাড়ম্ব[illegible] জীবন।

এঁর সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবান্ধবদে[illegible] মধ্যে প্রচলিত কথা আছে যে, রাস্তায় বেরোলে আমাদের বউদি অর্থাৎ ওঁর সহধর্মিণী হা[illegible] ধরে ট্রামলাইন পার করান। কথাটা পুরো সত্যি না হলেও আংশিক সত্য। রাস্তায় বেরিয়ে কতবার আগুপেছু করেন, কতবার এদিক ওদিক তাকান, তার সংখ্যা ঠিক করতে বো[illegible] হয় গণিতজ্ঞদেরও বেগ পেতে হবে। কিন্তু এই লোকটি যখন রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা সাহিত্য বিষয়ে কথা বলেন, তখন তা[illegible] মধ্য দিয়ে এক বলিষ্ঠ সুর ভেসে ওঠে, বলিষ্ঠতার সঙ্গে আপসের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজনীতিতে আগের দিনে যাদে[illegible] 'স্বদেশী' বলত, উনি তাই। এবং সে বিষ[illegible] ওঁর যা মত, তা প্রকাশ করতে কোনও দ্বিধা করেন না। আবার এই লোকই যখন ছো[illegible] ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা কন, তখন মনে হয় যে, যত অবাস্তব ছেলেমানুষী গল্প করা বুঝি ওঁর পেশা। একসময়ে কংগ্রেস ভব[illegible] প্রায় নিত্য আনাগোনা ছিল এবং যে কাজ ওঁ[illegible] পক্ষে করা সম্ভব মনে করতেন একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সে কাজ করতেন। ত[illegible] সব সময়েই নিজেকে অলক্ষ্যে রাখতেন। আমা[illegible] প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে বহু সাহিত্যিকে[illegible] সংবর্ধনা দিয়েছি। আয়োজনের পুরোভা[illegible] প্রমথনাথ থাকতেন। কিন্তু আমরা কোন দিনই ওঁকে সংবর্ধনা দিতে সক্ষম হইনি। অনেকে অনেক চেষ্টা করেছেন, উনি কোন তর্কে যাননি; কিন্তু কোনও দিনই সম্মতি পাওয়া যায়নি। দেশে রাজনীতির আবর্ত বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, অনে[illegible] সময়ে উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, কিন্তু কোনও দিনই এইস[illegible] ঘটনা ওঁর নিজের মত থেকে ওঁকে সরা[illegible] পারেনি। অভিভূত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন কষ্ট পেয়েছেন—কিন্তু স্বদেশিকতার ব্যাপা[illegible]

[illegible]

কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ অপুত্রক হওয়ায় পুত্রার্থে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং গোভিলকে উদ্গাতা পদে বরণ করেন। গোভিলের সাম বেদ মন্ত্রের উচ্চারণে ত্রুটি দেখে দেবদত্ত কুপিত হয়ে বলেন, "মূর্খবৎ আপনার স্বরের ব্যতিক্রম"। গোভিল জবাবে শাপ দেন, "তুমি যখন আমায় মূর্খ বলিলে, তখন তোমার শঠ প্রকৃতি শব্দ জ্ঞান বিবর্জিত ঘোর মূর্খ পুত্র হইবে"। দেবদত্ত তারপর গোভিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং গোভিল সদয় হয়ে তাঁর শাপের প্রতিষেধক রূপে কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "মুনিগণ সতত ক্রোধবিহীন ও সকলের সুখপ্রদ হইয়া থাকেন......বস্তুত মহৎ ব্যক্তিদিগের ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী ও পাপিষ্ঠদিগের ক্রোধ কল্পান্তস্থায়ী হইয়া থাকে"।১

দেবী ভাগবতের এই উপাখ্যানটি দিয়ে শুরু করার কারণ এই যে শাপ দেওয়া নামক যে ঘটনা আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার সম্বন্ধে যে কয়টি প্রশ্ন এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই তাদের প্রায় সব কটিই এই উপাখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "মুনিগণ সতত ক্রোধবিহীন" হন। কিন্তু পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে যত শাপ দেওয়ার কাহিনী আছে তাদের প্রায় সব কটিতেই দেখা যায় যে শাপদাতা ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে শাপ দিয়েছেন। সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার অনুসারে কেউ কাউকে শাপ দিয়েছে এরকম ব্যতিক্রম খুবই কম।

শাপ সম্বন্ধে আর একটি ধারণার স্পষ্ট প্রকাশ এই কাহিনীতে পাই। তা এই যে শাপ কখনও ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। যত অযৌক্তিক, যত অন্যায়ই হোক, শাপ দেওয়ার পর শাপদাতা যতই উপলব্ধি করুন যে অন্যায় ও অবিচার করা হয়ে গেছে একবার শাপ হিসাবে যা উচ্চারিত হয়েছে তার একটুও এদিক ওদিক হওয়া সম্ভব নয়। শাপের এই লক্ষণটি পৌরাণিক সাহিত্যে ব্যতিক্রমহীন। তেমনি ব্যতিক্রমহীন অপর আর একটি লক্ষণ। তা হল এই যে শাপদাতা নিজেই শাপমুক্তির উপায় বাৎলিয়ে দিতে পারেন। শাপের অপনয়ন সম্ভব না হলেও খানিকটা ক্ষতিপূরণস্বরূপ এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যা বর দানের স্বরূপ। যেমন দেবদত্তের স্তবে তুষ্ট হয়ে গোভিল বলেন, "তোমার পুত্র মূর্খ হইয়াও পরে বিদ্বান হইবে।" শাপ দেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তি কী, শাপ কে দিতে পারে কে দিতে পারে না, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নিয়ম নেই। মুনি-ঋষিরা তো কথায় কথায় শাপ দিতেন। দেবতাদের মধ্যেও যাঁরা বেশী ওজনে ভারী তাঁরাও শাপ দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু অনেক উপাখ্যানে দেখা যায় যে, শাপদাতা একজন অতিসাধারণ ব্যক্তি। শাপ যাকে দেওয়া হচ্ছে তার স্থান তখনকার দিনের মূল্যবিচারের অনেক উপরে। সুতরাং, শাপ দেওয়ার ক্ষমতা সর্বত্র শাপদাতার সামাজিক বা আত্মিক মর্যাদার উপর নির্ভরশীল নয়। অপরপক্ষে যে কারণে শাপ দেওয়া তার ন্যায় অন্যায়ের বিচারও এই ক্ষমতার ভিত্তি নয়। অত্যন্ত তুচ্ছ, অত্যন্ত সামান্য এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় ধারণার বশবর্তী অবস্থায় এমন কি অত্যন্ত গর্হিত কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শাপ দেওয়া হয়েছে এমন ঘটনা ব্যতিক্রম তো নয়ই বরং খুবই সাধারণ। আবার প্রায়শই দেখা যায় যে, খুব সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং আত্মিক ও সামাজিক মর্যাদার বিচারে খুব উর্ধ্বস্থানের অধিকারী হয়েও শাপদাতা প্রতিপক্ষের কোন ক্ষতি করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ।

শাপ জিনিসটা একটা স্বয়ং গতিশীল যন্ত্রবৎ। বাক্য উচ্চারণের দ্বারা এই যন্ত্রের উদ্ভাবনা। একবার সৃষ্ট হওয়ার পর যন্ত্রের গতি প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সেই গতিটা কি হবে তা নির্ভর করছে তার জন্মদাতার বাক্যের উপর। কার বাক্যের দ্বারা এরকম যন্ত্রের সৃষ্টি হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন নিয়মই খুঁজে পাওয়া যায় না।

গান্ধারী যখন কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন তখন তিনি বলেন, "আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি সেই নিতান্তই দুর্লভ তপঃ প্রভাবে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি"।২ তেমনি রামকে উদ্দেশ করে বালী-পত্নী তারা বলেন, "পাতিব্রত্য গুণবত্তা বশত আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতে সমর্থ। বৈধব্যাভিভূতা আমার নিকটে তুমি অভিশাপ পাইতে পার না"।৩ এরকম দু-চার জায়গায় শাপ দেওয়ার ক্ষমতার উৎস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু অর্জুনকে যে উর্বশী শাপ দিয়ে ক্লীবে পরিণত করেছিল তার ক্ষমতার উৎস কি ছিল?৪ প্রেমের মহিমা কি? কিন্তু উর্বশীর তো সতীত্ব নামক নারীর যে পরম ধন তার কিছুই ছিল না।

শুধু যে স্বর্গের অপ্সরাও শাপ দেওয়ার ক্ষমতা রাখত তাই নয়, সামান্য একটি কুক্কুরীও রাজপুত্রদের শাপ দিয়ে শাস্তি দিতে পেরেছিল।৫ জনমেজয়ের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটি কুকুর সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর ভ্রাতৃগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রহার করেন। কুকুর তার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলে কুকুর-মাতা সরমা সেখানে উপস্থিত হয়ে রোষভরে বলেন, "আমার পুত্র যজ্ঞের হবিঃ অবেক্ষণ ও অবলেহন করে নাই, তোমরা নিরপরাধকে প্রহার করিয়াছ অতএব অনুপলক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে"।

এ ব্যাপারটা মনে হয় খুবই অনিশ্চিত ছিল। কে কখন কি ধরনের শাপ দিতে পারবেন সে সম্বন্ধে তখনকার মানুষের ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল বলতে হবে। কেন না, এমন অসংখ্য উপাখ্যান পাওয়া যায় যেখানে অকারণ কৌতুক বা দুর্মতির প্রেরণায় শাপদাতাকে ক্রুদ্ধ করা হয়েছে। শাপ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে জানলে যেচে নিশ্চয় কেউ সাংঘাতিক সাংঘাতিক কল্পনাতীত অবস্থায় নিজেদের পড়তে দিত না। কোন সাহসে বপু নামক অপ্সরা দুর্বাসার মত মুনির তপস্যা ভঙ্গ করাতে যায়? তাকে যে পক্ষী যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় সে তো প্রায় বেঁচে যাওয়া।৬ পরীক্ষিৎই বা কি মৌনব্রতাবলম্বী মুনির স্কন্ধে মৃত সর্প স্থাপন ...... এই অপরাধে তাকে জীবন্ত অবস্থায় মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করার ক্ষমতা ঐ মুনির পুত্রের ছিল?৭ আর নহুষেরই কি দুঃসাহস, সে বাঁ পা দিয়ে অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করে, যে মস্তকে জটার মধ্যে বাস করছিলেন ভৃগু।৮ ভৃগুর শাপে নহুষকে যে সর্পদেহ ধারণ করতে হয় এই অপরাধের তুলনায় সেকালের শাস্তির বিচারে কমই বলতে হবে। অগস্ত্যের মত মহামান্য মুনির শাপ দেওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে কুবেরও আশ্চর্য রকম অজ্ঞ ছিলেন। কঠোর তপস্যা মগ্ন মহর্ষির শিরে কুবেরের সখা মণিমান থুথু নিক্ষেপ করেন।৯ যদুবংশ যে ধ্বংস হল তার উপস্থিত কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদকে পরিহাস করার জন্য সারণ প্রভৃতি কয়েকজন কৃষ্ণতনয় শাম্বকে স্ত্রীবেশে তাদের কাছে এনে বলেন, "ইনি অমিত পরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভের নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন আপনারা বলুন ইনি কি প্রসব করিবেন"।১০ ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "এই বাসুদেব তনয় শাম্ব, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব করিবে"। এই মুষলকে উপলক্ষ করে কি করে যদু বংশ ধ্বংস হয় সে কাহিনী সকলেরই জানা। বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা—এই পাঁচ অপ্সরা কুম্ভীর যোনি প্রাপ্ত হয় এক ব্রাহ্মণের শাপে তার তপস্যা ভঙ্গ করার চেষ্টা করতে গিয়ে।১১ মুনি-ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করানোটা অপ্সরাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল, সুতরাং তারা যেচে বিপদ ডাকতে গিয়েছিল বলা যায় না কিন্তু কন্দর্প কি করে মহাদেবের ক্ষমতা সম্বন্ধে এত দূর অজ্ঞ হতে পারল যে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে অনঙ্গ দশা প্রাপ্ত হল?১২

শাপের যান্ত্রিকতার অন্য একটি দিক যা সব সময় কার্যকরী না হলেও প্রায়শই হয়ে থাকে, তা হল যাকে বলা যেতে পারে তার প্রতিবিম্ব বা অনুগম প্রবণতা। দুই-একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করব জমদগ্নির চার পুত্র পিতার আজ্ঞা মাতা রেণুকার মস্তক ছেদন করতে অস্বীকার
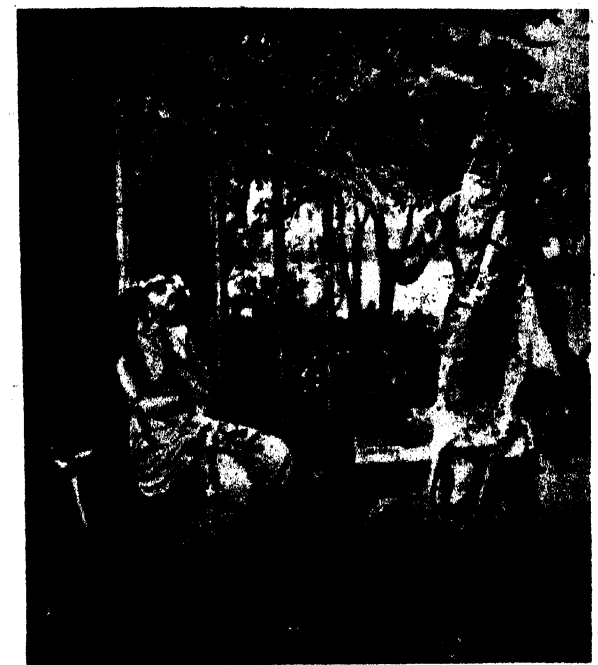
করে মূঢ় ও জড়ের ন্যায় বসে থাকায় জমদগ্নি তাদের এই বলে শাপ দেন, "তোরা জড়বৎ বসিয়া রহিলি, আমার কথা শুনিলি না, এই দোষে তোরা অচিরাৎ জড়ভাবাপন্ন হ"।১৩ প্রতিবিম্ব প্রবণতা বা অনুগামিতা বলতে কি বোঝায় তা শাপের ব্যবহৃত বাক্যের মধ্যেই পরিস্ফুট। পাণ্ডুর দ্বারা শরাহত মৃগরূপী কিন্দম মুনি যখন বলেন, "সংগম সময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রী সংসর্গ করিবে সেই সময় তোমার মৃত্যু হইবে।" তখনও ভবিষ্যৎ ঘটনাকে পশ্চাতের ঘটন অনুগামী করা হয়।১৪ ঠিক অনুরূপ প্রতিবিম্ববৎ শাপের উপলক্ষ এবং কারণে হয়েছিলেন রাক্ষস দশাগ্রস্ত কল্মাষপাদ রাজা যিনি কামক্রীড়ায় আসক্ত এক বিপ্র দম্পতিকে দেখতে পান এবং ব্রাহ্মণকে ধরে ভক্ষণ করেন।১৫ ব্রাহ্মণী তাঁকে এই বলে শাপ দেন, "আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্তার সহিত সংগত হইয়াছিলাম......তুই যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সম্মুখে প্রিয়তমের প্রাণ সংহার করিলি তোকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নী সহযোগ করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে"। আর কল্মাষপাদ যে রাক্ষস দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন তাও ঐ একই জাতীয় শাপের কারণে। রাজা মোহবশে মহর্ষির শক্তিকে প্রহার করলে ঋষি অভিশাপ দেন, "তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে প্রহার করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপ প্রভাবে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্য মাংসে লোলুপ হইয়া ভূমণ্ডলে এই পৃথিবী পর্যটন করিতে হইবে"।১৬

তাকে বলেন, "হে তাত, আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক হয় না।২৫ শিষ্যদের সম্মুখে এভাবে অপমানিত হওয়া কোন গুরুর পক্ষেই প্রীতিকর নয় নিশ্চয়ই কিন্তু তাই বলে নিজের সন্তানকে শাপ দিয়ে অষ্টাবক্র করে দেওয়াটা খুব শম, দম চর্চার পরিচায়ক কি? কিন্তু এই একই ধারা অষ্টাবক্র নিজেও অনুসরণ করে চলেন। উর্বশীর কন্যা চিত্রলেখা বালিকা অবস্থায় তাঁকে উপহাস করায় তিনি শাপ দেন "তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অন্ত্য অবস্থায় পুত্রন্বয় প্রসব করিবে।২৩

উপরে গোটা কয়েক মাত্র উদাহরণ দিলাম। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক শাপ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধ যদি বর্জনীয় দোষ হয়ে থাকে তো তা বর্জনের কোন প্রচেষ্টা তো নেইই, যে সব কারণে ক্রোধের উদ্রেক তার প্রত্যেকটি আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী একাধিক দোষের সূচনা করে। প্রায়শই শাপদাতার অহংবোধে একটু কিছু লেগেছে বা। অহমিকার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এও তো আমাদের শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান বাণী। কিন্তু মহা মহা মুনি-ঋষিরাও দেখা যাচ্ছে সংকীর্ণতম অহংবোধকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতেন। অহংবোধের গায়ে আঁচড়টুকু লেগেছে কি এমন শাপ দিয়ে বসতেন যা অচিন্তনীয়ভাবে অকল্যাণকর।

শুধু যে তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় শাপ দেওয়া হয়েছে তাই নয়, এমন অনেক উপাখ্যান আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে শাপদাতার ক্রোধের কারণ কোন অত্যন্ত নিন্দনীয় নারকীয়সম উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বাধা পাওয়া। যেমন বৃহস্পতি যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভস্থ পুত্রকে শাপ দিয়ে অন্ধ করে দিলেন তার কারণ কি? না সেই মহাপুরুষ ব্যক্তি বলপূর্বক মমতার সঙ্গে সংগম করতে চেয়েছিলেন, গর্ভস্থ পুত্র তাতে বাধা দিয়েছিল।২৭ এই মুনিবর যা করতে চেয়েছিলেন তাকে এই ঘোর কলিকালেরও ঘৃণ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, তার জন্য সভ্য সমাজে দশ বছর জেল খাটতে হয়। কিন্তু পৌরাণিক নীতি অনুসারে শাস্তি পেতে হল গর্ভস্থ পুত্রকে।

একই ধরনের ঘৃণ্য ব্যবহার কপোত মুনির। তিনি কামার্ত হয়ে তারাবতীকে কামনা করেন। কিন্তু তারাবতী চতুরতার দ্বারা কপোত মুনিকে ছলনা করে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেন। সে কথা জানতে পেরে কপোত মুনি ক্রোধে রুষ্ট হয়ে এই বলে শাপ দেন, "তুই সতীত্ব রক্ষার্থে আমার সহিত ছলনা করিলেও বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপালশোভী পলিতকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং দুইটি বানর মুখাকৃতি পুত্র প্রসব করিবি।"২৮

যযাতি যে তাঁর পুত্রদের সাংঘাতিক সব শাপ দিয়ে শাস্তি দিলেন তার কারণ কি? না, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্রদের কেউ তাঁর জরার সঙ্গে যৌবন বিনিময় করুক। কি চমৎকার আহ্লাদ, নয় কি? সারা জীবন ইন্দ্রিয় ভোগ করার পরও বৃদ্ধ পিতা যেন আরও ভোগ করতে পারেন সে জন্য পুত্রকে নিজের যৌবন দিয়ে দিতে হবে! না দেওয়াটা হয়ে গেল মহা অপরাধ।২৯ আর যযাতিকে জরাগ্রস্ত হতে হল যে শুক্রাচার্যের শাপে সে শাপও একেবারেই স্বার্থহীন নয়। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী যযাতির দুই পত্নীর এক পত্নী ছিল, অন্য পত্নী শর্মিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পিতার কাছে স্বামীর সম্বন্ধে নালিশ করতে গিয়েছিলেন। এই হল যযাতির শাপগ্রস্ত হওয়ার কারণ।৩০ জমদগ্নি যে পরশুরাম আর তার চার ভাইকে শাপ দিয়ে জড়ে পরিণত করলেন, সে কোন অপরাধে? তিনি পুত্রদের আজ্ঞা করেছিলেন মাতা রেণুকার মস্তক ছেদন করার জন্য। মাতৃহত্যা কাজটা কারো কাছে খুব প্রিয় নাও ঠেকতে পারে এবং শাস্ত্রানুসারে তা ঘোর পাপকর্মও বটে। রেণুকার যা-ই অপরাধ হয়ে থাকুক—তিনি নাকি রাজা চিত্ররথকে দেখে কামার্ত হয়েছিলেন—কিন্তু মাতৃহত্যা করতে না চাওয়াটা নিশ্চয় খুব বড় অপরাধ নয়। অপর দিকে জমদগ্নির মনোভাবে শম, দম, অহংবোধের ঊর্ধ্বে ওঠা এ সবের কোন ছায়াই নেই।৩১

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ক্রোধের সংগত কারণ ছিল। চ্যবন পুত্র প্রমতি যখন দুর্মতি নলকে শাপ দেন, "যেহেতু তুমি মদোন্মত্ত হইয়া আমার এই আশ্রমে মদীয় ভার্যাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলে সেই হেতু অচিরাৎ ভস্মীভূত হও"। তখন সেই শাপকে ন্যায়সংগতহীন বলা যায় না।৩২ ক্রোধের কারণ এবং শাপদ্বারা প্রদত্ত শাস্তির পরিমাণ এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রশ্ন না উঠে পারে না। ধর্মপরায়ণ মহাতপাঃ ত্রিতকে তাঁর দুই ভাই তাঁর গাভীর লোভে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যান। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে ত্রিতর "আমার শাপ প্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ করিয়া ইতস্তত বিচরণ কর"৩৩। এই অভিশাপকেও আতিশয্য যুক্ত নাও মনে হতে পারে যদিও মহাতপাঃ ঋষির মধ্যে ক্ষমার ছিটেফোঁটা তো দেখিই না, যা দেখি তা কেবল এক প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র মনোভাব।

গৌতম মুনির শাপে অহল্যা যে প্রস্তরে পরিণত হল সে কি চূড়ান্ত অবিচার নয়? ইন্দ্র তো গৌতম মুনির রূপ ধারণ করেই এসেছিলেন, সেটা ছদ্মবেশ তা জানার উপায় অহল্যার ছিল না, কিন্তু গৌতম মুনি জেনেছিলেন। পতি পরম দেবতা, তাঁর কামনা পূর্ণ করাই সতীসাধ্বীর পরম ধর্ম। ছলনাকারী কামুক ইন্দ্রকে "তোমার বৃষণদ্বয় পতিত হউক" এই শাপ দেওয়াটা খুবই ন্যায়সংগত হয়েছিল, দেবগণ যদি মেষের স্থূল বৃষণদ্বয়ের সাহায্যে তাঁকে আবার সবীর্য না করতেন তো আরো ভাল হত, স্বর্গের, মর্ত্যের অনেক নারী এই দুষ্কৃতকারীর লোলুপতার হাত থেকে রক্ষা পেত।৩৪

পরিচয় এই বিখ্যাত উপাখ্যানে পাওয়া যায়—কীট তাঁর ঊরুদেশ বিদীর্ণ করলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় সে শরীরকে নিশ্চল রাখে—এই সহ্যশক্তি ও এই গুরুভক্তির জন্য তাঁর কোন পুরস্কার মিলল না। পরন্তু নিজেরই গুরুর থেকে এমনই শাপ পেলেন যার দরুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্যায় সমরে অর্জুন তাঁকে নিধন করতে সমর্থ হলেন।৩৫

শাপ দেওয়ার একটা যে কারণ ঘুরে-ফিরে বেশ অনেক জায়গায় পাওয়া যায় তা সম্ভোগকালে বাধা পাওয়া জনিত ক্রোধ। এর আগেই বৃহস্পতি ও কপোতের বলাৎকারের চেষ্টায় বাধা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছি। আরো অনেক উপাখ্যান আছে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন এবং তাদের কাছে এই অবস্থায় বাধা পাওয়া অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে মনে হয়েছিল। তাই, একদা পার্বতী কামার্ত হয়ে মহাদেবের নিকট গমন করেন, কিন্তু কুম্ভী ও মহাকাল মহাদেবের দ্বারদেশে থাকায় দেবীকে লজ্জিত হতে হয় এবং উনি শাপ দেন যে ওদেরকে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে৩৬। পাণ্ডু ও কন্দমমুনি কি ভাবে সম্ভোগকালে বাধা দিয়ে শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন তার উল্লেখ করেছি। অরণ্যদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীকে অপহরণ পূর্বক তাঁর সতীত্ব ভঙ্গ করলে তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক৩৭। বিশেষ করে তিনি মুনি-ঋষিও নন এবং তাঁর উপর অত্যাচারটাও চূড়ান্ত রকমের নৃশংস। তথাপি তাঁর অভিশাপ, "তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে।" এটা একটু অতিরিক্ত মনে হয়। ভরদ্বাজ-তনয় যবক্রীতকে যে মহর্ষি রৈভ্য নিহত করান তাকে বরং অধিক ন্যায় বিচারসংগত বলে মনে করা যেতে পারে৩৮। যবক্রীত উক্ত মহর্ষির পুত্রবধূর সতীত্ব নষ্ট করেছিল, তাই নিজের অপরাধে তাকে একাই শাস্তি পেতে হয় এ ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অনেক সহজ।

শাপ দেওয়া ব্যাপারটা অনেক সময়ই নিতান্তই ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার। আজকালকার দিনে যেমন রাগ করে দুজন দুজনকে গালাগালি দিতে পারে বা হাতাহাতি করতে পারে তেমনি প্রাচীন কালে একই ধরনের শাপের বিনিময় চলত যেমন কচ ও দেবযানীর পরস্পরকে শাপ প্রদান৩৯। দেবযানী শাপ দিলেন "তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না।" কচ প্রতিশাপ দিলেন "অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণি গ্রহণও করিবে না।" দুই ভাইয়ে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে ঝগড়া হল৪০। বিভা বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীককে শাপ দিলেন, "তুমি কারণ যোনি প্রাপ্ত হও।" সুপ্রতীক জবাব দিলেন, "তুমিও কচ্ছপ যোনি প্রাপ্ত হও।" এইভাবে দুই ভাই গজ ও কচ্ছপে পরিণত হলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঝগড়ার মধ্যে মুনিসুলভ গুণ খুবই কম খুঁজে পাওয়া যায় ৪১। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে নাজেহাল করছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠকে এসে শাপ দিলেন, "তুই যখন বকবৎ বঞ্চনার্থ বৃথা ধ্যানপরায়ণ তখন বকদেহই ধারণ কর।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে শাপ দিলেন, "আমি যাবৎকাল বকদেহ ধারণ করিব তাবৎকাল তুমিও আড়ী পক্ষী হয়ে থাক।" সুতরাং উভয়ই মানস সরোবরতীরে আড়ী ও বকরূপী হয়ে একটি বৃক্ষে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে বাস করতে লাগল।

এতক্ষণ পর্যন্ত যত উদাহরণ দিলাম তার অধিকাংশই চেতনার অভাব সূচনা করে। শাপদাতারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজীতে যাকে বলে amoral। খুব কদাচিৎ কখনও সুনীতি দুর্নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। শাপের প্রসঙ্গে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ হিসাবে যমদেব ও মুনিবর অনীমাণ্ডব্যের উপাখ্যানের কথা ভাবতে পারি।৪২ মুনি বিনা দোষে কিছু দস্যুর হাতে নিগৃহীত হন। কেন জানতে চাইলে যমরাজ মুনিকে বলেন, "আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।" তখন মুনি যমরাজকে শাপ দিলেন, "যেহেতু তুমি লঘু পাপে আমাকে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে।" এই এক জায়গায় ছাড়া লঘুপাপে গুরুদণ্ড বা কি রকম পাপে কি রকম দণ্ড তার কোন উল্লেখ বা আলোচনা অন্য কোথাও আমরা পাইনি। বিদুর এক জায়গায় বলেছেন, "কেহই শাপ প্রদান করিলে তাহার উপর কদাচ প্রতিশাপ প্রদান করিবে না। বরং ক্রোধ সংবরণ করিবে।৪৩ কিন্তু এই উপদেশ যে অনেকে অনুসরণ করতেন এবং সুফল পেতেন তা তো কোথাও দেখি না।

আমরা বোধ হয় ভুল করছি। শাপের ব্যাপারে যদি শাস্ত্রকারেরা সম্পূর্ণ নীতিচেতনাহীন হতেন তো পৌরাণিক সাহিত্যে শাপকে যেভাবে অপব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা হোত না। আমরা অপব্যাখ্যা বলতে ইংরেজীতে যাকে র‍্যাশনালাইজেশন বলে তাই বোঝাচ্ছি। কোন একটা ঘটনা ঘটেছে যা আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের বিরোধী। কিন্তু ধর্ম যে ক্ষুণ্ণ হয়নি তা প্রতিপন্ন করতে হবে। এর জন্য এক একটা শাপের উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। অতীতে একটা শাপ দেওয়ার অর্থ ছিল যে, যাকে যা শাপ দেওয়া হচ্ছে সেটা তার ভবিতব্য। তার যে খণ্ডন সম্ভব নয়। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে অধর্মকে সাধারণ লোকের চোখে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে দেখানোর যে বহুগতির প্রচেষ্টা তা এক ধরনের দোষগ্রস্ত নীতিচেতনাই সূচিত করে।

কর্ণকে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করা হয়, এটা পাণ্ডব পক্ষের একটি কলঙ্ক। এই কলঙ্ক ঢাকতে কত না শাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন কর্ণকে যখন অর্জুন বধ করেন তখন কর্ণ রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে মেদিনীর গ্রাস থেকে [illegible]

নিয়ত স্পর্ধা করিয়া থাক এবং যাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সর্বশেষ চেষ্টা করিতেছ তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে।"৪৪ আর সেই অবস্থায় কর্ণ যে পরশুরামের কাছ থেকে লব্ধ ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতে পারলেন না সেই ঘটনাকেও যুক্তিসঙ্গত করার জন্য আনা হয়েছে কর্ণকে দেওয়া পরশুরামের শাপের উপাখ্যান যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্ণ যেহেতু কীট দ্বারা ঊরুদেশ বিদীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ করেননি সেই অপরাধে পরশুরাম শাপ দেন, "তুমি শঠতাচরণ পূর্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না।" কিন্তু নীতি সম্বন্ধে উপাখ্যানকারদের ধারণাগুলি কতটা যে গোলমেলে ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই একই উপাখ্যান থেকে। যে কীট কর্ণের ঊরুদেশ বিদীর্ণ করে তাকে শাপগ্রস্ত করালো সে আর কেউ না, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, যে তার পুত্র অর্জুনের হিতাভিলাষে এই কাজ করেছিল। দুর্যোধনকে যে অধর্ম যুদ্ধে ভীম পরাজিত করল এই কলঙ্ক ঢাকার জন্য নিম্নলিখিত শাপের উপাখ্যানের উদ্ভাবন করা হয়েছে।৪৫ ভগবান মৈত্রেয় দুর্যোধনের কাছে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার কথা বলতে গেলে দুর্যোধন "করিকরাকার স্বীয় ঊরুদেশে করাঘাত করে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। মহামুনি মৈত্রেয় ক্রুদ্ধ হয়ে ও "বিধিকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে" তাকে অভিসম্পাত দেন, "সেই যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদাঘাতে তোমার ঊরুভঙ্গ করিবেন।" রামের কবন্ধ রাক্ষস বধ করার সম্বন্ধে বলা হয়েছে এর দ্বারা বস্তুত কবন্ধের মঙ্গলই করা হয়েছিল।৪৬ কারণ এই ছিল তার শাপমুক্তির উপায়। কবন্ধ পূর্বে দনুর পুত্র ছিল, অচিন্তনীয় রূপ ছিল কিন্তু সে লোক ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করে বনবাসী ঋষিদের ভয় দেখাতো। এই অপরাধে স্থূলশিরা নামক মহর্ষি তাকে শাপ দেন, "তোর এই লোকনিন্দিত নৃশংস রূপেই থাকুক।" পরে কবন্ধ সেই ক্রুদ্ধ ঋষিকে প্রসন্ন করলে তিনি শাপমুক্তির উপায় বলে দেন—"রাম যখন তোর মুণ্ডচ্ছেদনপূর্বক নির্জন বন মধ্যে তোকে দগ্ধ করিবেন তখন তুই স্বীয় সুবিপুল মনোহর রূপে লাভ করিবি।" এভাবে শাপকে বরে পরিণত হওয়ার উদাহরণ পৌরাণিক সাহিত্যে অজস্র পাওয়া যায়। কৈকেয়ীর যে ঘৃণ্য ব্যবহারের জন্য রামকে বনবাসে যেতে হয়, যাকে পৌরাণিক সাহিত্যে ও মহাকাব্যে আগাগোড়াই নিশ্ছিদ্র নিন্দার ভাগী হতে হয়েছে, তারও কলঙ্ক মোচন করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে সংস্কৃত কাব্যে, ভাসের 'প্রতিমা' নাটকে। দশরথ মৃগ ভ্রমে শব্দভেদী বাণ দ্বারা যে অন্ধক মুনির একমাত্র পুত্রকে বধ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে অন্ধক মুনি যে শাপ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে কৈকেয়ী ভরতকে বোঝান যে মুনির শাপ অব্যর্থ, তিনি উপলক্ষ ছিলেন মাত্র। ভাসের নাটকে ভরত তার মাকে যত কটূকথা বলেছিলেন সবই ফিরিয়ে নেন এবং মাতা পুত্রের মিলন দেখান হয়।

এ জাতীয় অধর্মকে ধর্মসংযত করে দেখানোর প্রচেষ্টা ছাড়াও ব্যাখ্যা হিসাবে শাপকে অনেক জায়গাতেই ব্যবহার করা হয়েছে, যে ব্যাখ্যা অবৈজ্ঞানিক আদিম মনের কৌতূহলের পরিচায়ক। গাছেরা সংবৎসর ফুল দেয় না কেন? কারণ মহর্ষি স্থূলশিরা যখন সুমেরু পর্বতে ঘোরতর তপশ্চরণ করছিলেন তখন শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় মহর্ষি পরিতুষ্ট হন। বনস্পতিগণ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মহর্ষিকে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করেন এবং সেই কারণে ঋষির দ্বারা অভিশপ্ত হন।৪৭ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে প্রতি তিথিতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় কেন? কারণ দক্ষ তাঁর ষাটটি কন্যার সাতাশটিকে চন্দ্রকে প্রদান করেন কিন্তু চন্দ্র তাদের একজনের প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিলেন। ফলে দক্ষ তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন, "অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইবে।"৪৮

আমরা এবার আমাদের আলোচনার উপসংহারে আসব। শাপ নিয়ে এত আলোচনার কারণ আদিম মনকে বুঝতে গেলে সেই মনের উপর ইংরেজীতে যাকে ম্যাজিক বলা হয় তার প্রভাবের আলোচনা অত্যাবশ্যক। শাপ এক ধরনের ম্যাজিক। অবশ্য ম্যাজিক বলতে Frazer তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ The Golden Bough-এ বুঝেছেন, ঠিক সেই অর্থে ম্যাজিক শাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উক্ত লেখকের মতে ম্যাজিক এবং বিজ্ঞান সমধর্মী, কেননা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যে অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় এই মৌলিক ধারণা উভয়েরই ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মদের সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। ম্যাজিক-এ সেই নিয়মদের ভ্রান্তভাবে বোঝা হয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এই নিয়মাবলীকে নৈর্ব্যক্তিক বলে মনে করা হয়।

শাপের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তা একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর। একবারও কারও বাক্য উচ্চারণ দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার পর তা এমন নৈর্ব্যক্তিক অমোঘতা অর্জন করে যা একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ক্ষেত্রেই সত্য দেখা যায়।

আদিম মনে ম্যাজিক-এর প্রভাবের চেয়েও আমরা যে বিষয়টির দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট তা হল শাপের উপাখ্যানের মারফত যে নীতিচেতনার অভাব বা তার বিকৃতির প্রকাশ পায় সেই বিষয়। শাপ দেওয়ার ঘটনাটা ঘটতো মানবিক সম্পর্কের আদান-প্রদানের অংশ হিসাবে। সুতরাং শাপের ব্যবহার নীতিচিন্তার গণ্ডীর বাইরে হতেই পারে না। কি ধরনের নীতি চিন্তা শাপের উপাখ্যানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তা এইভাবে সংক্ষেপিত করে বলা যেতে পারে। প্রথমত আমরা দেখি যে নীতির প্রচার ও নীতির প্রয়োগের মধ্যে অচিন্তনীয় অসংগতিই যেন ছিল প্রাচীনকালের সমাজের ও আত্মিক জগতের শীর্ষস্থানে যাঁরা অবস্থিত ছিলেন তাঁদের নৈতিক ব্যবহারের মূল লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, ইংরেজীতে যাকে জাস্টিস বলে, যাকে হয়তো ন্যায় বিচার বলে বাংলায় বলা যেতে পারে, ঐ নৈতিক ধারণাটির অত্যন্ত সামান্য উন্মেষই আমাদের পৌরাণিক যুগে ঘটেছিল। বিকার বড় মাপে ছিল, যার প্রমাণ [illegible] প্রয়াসের মধ্যে।

এই মন্তব্যগুলির গুরুত্ব তেমন বেশী হত না যদি এমন হত যে ঐ যুগে কোন প্রকার নৈতিক ধারণারই বিশেষ উন্মেষ ঘটে নি। কিন্তু তা সত্য নয়। আমাদের দেশের পৌরাণিক সাহিত্যে ও মহাকাব্যে নৈতিকতা নিয়ে যে পরিমাণ চিন্তা ও ভাবনা রয়েছে তা অন্য কোন দেশের তুলনীয় কোন সাহিত্যে একেবারেই অনুপস্থিত বলে অনে বলা যেতে পারে। রামায়ণে মহাভারতে যে ধরনের নৈতিক সংকটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মানসিকতা পাওয়া যায় তার তুলনা বোধ হয় বিশ্বসাহিত্যে বিরল। এই বিষয়ে আমি অন্য প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি।৪৮

পৌরাণিক মনে চিন্তার আলোচনা আজকের দিনে করতে বসার বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রকম কারণ থাকতে পারে। আমাকে যে কারণটা এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে তা আমার এই ধারণা যে আজকের দিনে ভারতবাসীর ধ্যান-ধারণা বুঝতে গেলে সেই পৌরাণিক যুগের মানুষের ভাবনাচিন্তার অনুধাবন করতেই হবে। পরবর্তী যুগে আমাদের মনে যতই বহিরাগত ভাবধারার পলেস্তারা পড়ে থাকুক, একটু আঁচড় কাটলেই দেখা যায় যে তার ভিতরে সেই পৌরাণিক যুগের আদিম মন প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য সেই ওয়াজেদ আলীর প্রসিদ্ধ 'ভারতবর্ষ' নামক গল্পটির সমদৃষ্টিসম্পন্ন। আমি এই প্রবন্ধ, পূর্বপ্রকাশিত অন্য দুইটি প্রবন্ধ, যার উল্লেখ আগে করেছি (১৮) এবং ভবিষ্যতে আরও যে সব প্রবন্ধ লেখার বাসনা রাখি তাদের দ্বারা পৌরাণিক মনের মাধ্যমে আধুনিক ভারতবর্ষের মনকেই বুঝতে চেষ্টা করছি।

(১) দেবী ভাগবৎ, তৃতীয় স্কন্ধ, অধ্যায় ১০।
(২) মহাভারত, স্ত্রীপর্ব, অধ্যায় ২৫।
(৩) রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, বিংশ সর্গ।
(৪) মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ৪৬।
(৫) মহাভারত, আদিপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়।
(৬) মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রথম অধ্যায়।
(৭) মহাভারত, আদিপর্ব অধ্যায় ৪১।
(৮) মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১০০।
(৯) মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৬১।
(১০) মহাভারত, মৌষলপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়।
(১১) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২১৬।
(১২) রামায়ণ, আদিপর্ব, সর্গ ২৩ ও অন্যান্য অনেক।
(১৩) কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৮৩।
(১৪) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১১৮।
(১৫) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৮২।
(১৬) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৭৬।
(১৭) রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৫১।
(১৮) চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ় ১০৮২ ও শ্রাবণ-আশ্বিন ১০৮২।
(১৯) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৪৭।
(২০) মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ষষ্ঠ অধ্যায়।
(২১) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৬।
(২২) রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৩৫ এবং ব্রহ্মপুরাণ, অধ্যায় ২০১।
(২৩) কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৩২।
(২৪) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২০।
(২৫) মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৩২।
(২৬) কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৪৯।
(২৭) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১০৪।
(২৮) কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৫০।
(২৯) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৮৪।
(৩০) রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৫৮।
(৩১) কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৮৩।
(৩২) মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অধ্যায় ১১৫।
(৩৩) মহাভারত, শল্যপর্ব, অধ্যায় ৩৭।
(৩৪) শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ১১।
(৩৫) মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৪৩।
(৩৬) কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৪৭।
(৩৭) মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ১১।
(৩৮) মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৩৬।
(৩৯) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৭৭।
(৪০) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২৯।
(৪১) দেবী ভাগবৎ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, অধ্যায় ১৩।
(৪২) মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১০৮।
(৪৩) মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৩৫।
(৪৪) মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ২।
(৪৫) মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১০।
(৪৬) রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৭১।
(৪৭) মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩৪৩।
(৪৮) মহাভারত, ঐ।

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

সংগীত রক্তে নিয়েই জন্ম অন্নপূর্ণার, যেমন আলি আকবরের। খুব সুরে হাত ওর সুরবাহারে। খুব মিষ্টি; মেয়ে বলেই যে মিষ্টি তা নয়। তবে মহিলা-সুলভ একটা নমনীয়তা, কমনীয়তা, রসে-ভরা হাত ওর। এবং বাবার যে অংগটা বাজায় সেটা নিখুঁত বাজায়। ওর সুরবাহারকে যে pure বা বিশুদ্ধ সুরবাহার বলা হয় সেটা সত্যি। মুক্ত কণ্ঠে একটা কথা বলা বলব যে, যদি ভারতবর্ষে সত্যিকারের রীতি এবং পদ্ধতি রেখে সুরবাহার কেউ বাজায় তো সে একমাত্র অন্নপূর্ণা।

॥ ২৮ ॥

অন্নপূর্ণার বাজনা সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, তা অবশ্যই অতি উন্নত স্তরের বাজনা। কোনও বিশেষ পথে গেলে কিছু পাওয়া যায়, কিছু হারাতেও হয়। ওর যেটা সুবিধে সেটা হল, ওকে কখনও লোকের সামনে বাজাতে হয়নি বাজাতে চায় না সেটা আলাদা কথা ; বাজায় না বলে ওর যেটা তালিম, যেটা শিখেছে, জীবনে সেটা বজায় রাখতে পারে। ঠিক তালিম বাজায়। এবং ভগবানের একটা আশীর্বাদ যেন ওর সংগীতে, সব বড় ঘরের শিল্পীদেরই যেটা আসে না। কিন্তু যাদের আসে তারা তো যেন রক্তের ভেতর সংগীত নিয়েই জন্মায়। যেমন আলি আকবর ভাইয়ের কথা ধরো। সেই ভাবটা চিরদিন, সেই ছোট থেকেই অন্নপূর্ণার ছিল। খুব সুরে, খুব মিষ্টি হাত : এবং মেয়ে বলেই যে হয় তা নয়, তবে মহিলাসুলভ একটা নমনীয়তা, কমনীয়তা, রসে-ভরা হাত। এবং বাবার যে অংগটা ও বাজায় সেটা নিখুঁত বাজায় : কারণ লোক-জনের সামনে বাজালে মানুষকে যে কম্প্রোমাইজ করতে হয় সেটা তো ওকে করতে হয়নি। লোককে খুশী করতে হয়নি এটা-ওটা করে। এবং সেটা করতে হয়নি, করেওনি, সে যে-কোনও কারণেই হোক। সেই অসম্ভবটাই ও করতে পেরেছে : সেটা ওর বাজনায় আছেও। ওর সুরবাহারকে যে পিওর বা বিশুদ্ধ সুরবাহার বলা হয়, সেটা সত্যি। অন্তত আমি তো তাই বলব। তবে শেষ পর্যন্ত ঘুরে-ফিরে তো ঐ কথাটাই আসে, বিশুদ্ধ তুমি কোনটাকে বলতে চাও? বিশুদ্ধ কি?

আমি তো ওর সংগে জোড়ে বাজাতাম, একসংগে, বছরের পর বছর। আমরা ঐভাবেই তালিম পেতাম, একসংগে শিখতাম। একসংগেই সুরবাহারের—যন্ত্র সুরবাহারই বাজছে, কিন্তু তার ভেতরে বীণের অংশই প্রধান। সুরবাহারে বীণের অংগটাই প্রধান হয়। সুরবাহারের উৎপত্তি তো তুমি জানো। গুলাম মহম্মদ বলে একজন ছিলেন, সজ্জাদ মহম্মদ খাঁর বাবা। তিনি শিখতে গিয়ে-ছিলেন ওমরাও খাঁর কাছে। তিনি বললেন, বাবা শেখো, কিন্তু বীণ শেখাতে পারব না। শংকর, এসব তো স্মৃতি থেকে বলছি, পরে একবার বই থেকে নামগুলো ঝালিয়ে নিও। কোনও নাম যদি ফসকে গিয়ে এদিক-ওদিক হয়ে যায়। বীণেরই তালিম ওমরাও খাঁ গুলাম মহম্মদকে দেন, তবে বীণে নয়। কাজেই আমরা ঘুরে-ফিরে ঐ কথাটাই পাচ্ছি। বাবাও যে তালিম পেয়েছিলেন ওয়াজির খাঁ সাহেবের কাছ থেকে তা বীণেরই ওপর ; তবে উনি শিখেছিলেন সরোদের যন্ত্রে সুরশৃংগারের ওপর। পরে রবাবের তালিম যখন নেন তখন রবাবের ঢঙে সেসব শিখেছিলেন। সুরশৃঙ্গার এবং রবাবের মেলাবার ঢঙও বেশ আলাদা। তারপর রাগ-রাগিণীর রূপের চর্চা, প্রকাশ—সেও বীণকারদের ঘরে একদম স্বতন্ত্র। ওয়াজির খাঁ সাহেব জানতেন রবাবের বাজ, কিন্তু উনি নিজে বাজাতেন না। আমাদের ভেতরে যে সুরবাহারের চল, যেটা বাজাই আমরা, সেটা পারতপক্ষে বীণেরই বাজ। তবে মুক্ত কণ্ঠে একটা কথা বলব যে, যদি ভারত-বর্ষে সত্যিকারের কেউ রীতি এবং পদ্ধতি রেখে সুরবাহার বাজায় তো সে এক-মাত্র অন্নপূর্ণা। রাগের শুদ্ধতা, ধ্রুপদাংগের আলাপচারী ও জোড়—যা কিনা প্রাণকেও ছোঁয়—একমাত্র ওই বাজাচ্ছে। খেয়াল অঙ্গে, এমন কি তবলার সঙ্গেও কখনও কখনও কিছু লোক সুরবাহার বাজায় আজকাল। তবে তাদের আমি মানি না। এইজন্য মানি না যে, সেতারে অনেক কিছু নিশ্চয় বাজতে পারে এবং বাজেও—বীণ, সুরবাহারের বাজ বা অংগ—কিন্তু উলটোটা অর্থাৎ বীণের উপর বা সুরবাহারের উপর সেতারের ঢঙে, খেয়ালের ঢঙে হরকত, মুর্ড়কি, এবং দ্রুত তান বাজবে এটা আমার কাছে একটা sacrilege, অসহ্য! ঠিক যেমনটা লাগবে যদি কেউ পাখোয়াজের উপর কাহারবাতে লগ্গি বাজায়!

বীণেও এই জিনিস দেখেছি আলোয়ারের সাদিক আলি খাঁ এবং ইন্দোরের যেসব বীণকারদের শুনেছি তাঁদের বাজনায়। সরাসরি খেয়ালের প্রভাব বেশী ছিল ওঁদের বাজে।

অন্নপূর্ণা কেন নিজেকে প্রকাশ করে না? দেখো শংকর, এর আমি চট করে কি উত্তর দেব? এটা তো খুব পার্সোন্যাল বিষয়। তবে মনে হচ্ছে অন্নপূর্ণা অন্যকে শেখানোটাই বড় করে দেখে। তাই তো মনে হয়। দুঃখের বিষয় যে, ও কখনও বাইরে বাজায় না। বড় জলসায় না হোক, অন্তত ছোটখাট জলসাতেও কখনও কখনও বাজালে সত্যিকারের সমঝদার ও রসিক শ্রোতাদের সৌভাগ্য হত ওকে শোনার। আমরা দুজনে জলসায় জোড়ে সুরবাহার বাজিয়েছি বোম্বেতে ও দিল্লীতে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৫ সালের ভেতর বেশ ক'বার। সুর-বাহার ছাড়া ও সেতারও বাজিয়েছে। প্রথম দিকে তিন-চার বছর ও সেতার বাজিয়েছে, পরে সুরবাহারেই জোর দেয়। তবে সেতারও ও বাজাতে পারে এবং সেতার ও শেখাচ্ছেও অনেককে। অনেকেই তো ওর কাছে তালিম নেয়। এবং গানেতে অর্থাৎ গলার, বা বাঁশিতে, বা বেহালার তালিমও ও দিতে পারে, এবং দেয়ও। আসলে আমাদের ঘরে এসবের চলই তো আছে, কাজেই নিজের যন্ত্র ছাড়াও অন্য যন্ত্র বা গানের শিক্ষাও আমরা দিতে পারি। সেটাই করে ও। ভাল করে।

আলি আকবর ভাই সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, ওর মধ্যে একটা অতি-উচ্চ স্তরের জিনিয়াস, একটা অতুলনীয় শক্তি আছে। বাবার তালিম তো আছেই, তার ওপরে ওর যে একটা individual imagination—দারুণ ব্যাপার ভাই। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। আমার ইংরেজী বইতেও সে কথা লিখেছি যে, প্রথম যখনি ওকে আমি দেখি he did not strike me as a brilliant boy। তার কারণ ওর তখনকার লক্ষণ, ওর হাবভাব, কাজকর্ম দেখে ওর গান-বাজনা হবে না এরকম একটা কথা আমার মনে হয়েছিল। হাত খুব সুরে ছিল, ছোট্ট সরোদ বাজাত। ওর বাজনাও আমি প্রথম শুনি ঐ সময়টাতেই। তখন ওর ধরো বারো বছর বয়স ছিল। আমার চেয়ে দু বছরের ছোট। অন্নপূর্ণাকে যখন প্রথম শুনি ১৯৩৮ সালে, ও তখন সেতার বাজাত। ওকেও প্রথম দিকে অতটা মনে হয়নি আমার। কিন্তু তখন শিখছিল, বছর দুয়েক হয়েওছিল শেখার।

যা হোক, আলি আকবরের সম্পর্কে যা বলছিলাম। ওর প্রথম দিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে কখনও ভাবতেই পারিনি যে, ও পরে এই বিরাট একজন শিল্পীতে পরিণত হবে। তখন আমি দেখতাম আমাদের পাগল হয়ে শেখবার শখ ছিল, কিন্তু ওর কোনও শখ ছিল না। ওর শুধু খেলাধুলো—এইসব। হয়তো বাবা বাজার থেকে ফিরছেন, দেখাতে হবে খুব রেওয়াজ করেছি, অমনি গেলাসের থেকে জল নিয়ে গায়ে-মাথায় ঢেলে-ঢুলে একাকার। দেখাতে হবে কত না ঘেমেছি। একেবারে দ্রুত ঝালার রেওয়াজ করছে। হাঃ হাঃ হাঃ! এইরকম ওর হাবভাব। বুঝতেই পারছ গোড়াতে মেহনতের দিকে খুব একটা নজর ছিল না। আর বাবা, বেশ মনে আছে, সেই সময়টায় ওর ওপর খুব রাগ-টাগ করতেন। খুব মারধরও করতেন। এবং আসল যে বনিয়াদ সেটা তো একেবারে ছোটর থেকেই ছিল। তিন-চার বছরেই বাবা ওকে সরোদ ধরিয়ে-ছিলেন। বছর পাঁচেক বয়সে ও তো বাজাতই! গান ও তবলাও শিখেছিল, কিন্তু ভেতরে বাজনার ব্যাপারটা প্রবেশ করে থাকলেও ও নিজের থেকে চাড় দিয়ে কিছু যে করবে সেটা আদৌ ছিল না। আমাদের ট্রুপের সংগে এক বছরের জন্য বাবা বিদেশে গিয়েছিলেন, ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে। আমরা ডার্টিংটন

দরকার। কেননা, অল্প বয়স আলি আকবরের, বাজনার রেওয়াজে বসতে তার না, খেলাধুলোর শখ বেশী ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। বাবা তাতে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুরো এক বছর ট্রুপের সঙ্গে থাকতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গে আমেরিকাতেও যেতে পারলেন না। সেপ্টেম্বর মাসেই দেশে ফিরে এলেন। তারপর তো যা শুনেছি তাই বলছি। তিনি ফিরে এসে দেখলেন আমার sweet ভাই আলি আকবর তখন নতুন গ্রামোফোন কিনে মালিকা পোখরাজ, সাইগল, কে সি দে-র রেকর্ড শুনতে এবং খেলাধুলো করতেই ব্যস্ত। সরোদে প্রায় মরচে ও ধুলো জমেছে। তখন বাবা ধারণ করলেন তাঁর 'দুর্বাসা'র রূপ। আহা রে! আলি আকবরের নিজের মুখেই শুনেছি, কি মারধরটাই করলেন! একবার তো সারা দিন একটা গাছে বেঁধে, তাকে উপোসী রেখে, ঘণ্টা দু-ঘণ্টা অন্তর বেত দিয়ে ঠ্যাঙালেন। ঘণ্টা চারেকের বেশী তো ঘুমোতে দিতেন না, বাকী সারাক্ষণ বসিয়ে ওকে শেখাতে ও রেওয়াজ করাতে শুরু করলেন। সংগীত রক্তে নিয়ে তো জন্মেইছিল, তার ওপর অসম্ভব খাটালেন ওকে বাবা। ছোটবেলা থেকে তালিমের ভাল বনিয়াদও ছিল। কাজেই প্রায় দু বছর পর '৩৮ সালের জুলাই মাসে যখন আমি মাইহারে বাবার কাছে প্রথম শিখতে গেলাম এবং আলি আকবরকে শুনলাম, বিশ্বাস কর শংকর, আমি চমকে গেলাম। এই অল্প সময়ের ভেতর কি তফাত! বাঘের মত তৈরী বাজাচ্ছে ও তখন। তার ওপর ভগবানদত্ত ওর ওই সুরেলা হাত। সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি যে, সেই আলি আকবর, যাকে '৩৫ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বাইতে শুনেছিলাম, সে এত বড় শিল্পী হতে পারবে! তারপর তো আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেল। পরবর্তী কালে অনেকবার হয়তো আমাদের ভেতর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হটে যায়নি।

বাবা যখন বিলেতে-কিশোর আলি আকবর নতুন গ্রামোফোন কিনে মালিকা পোখরাজ, সাইগল, কে সি দে-র রেকর্ড বাজিয়ে তার খেলেধুলে সময় কাটিয়েছিল। বাবা ফিরে এসে তাই দেখে রেগে-মেগে ওঁর দুর্বাসার মূর্তি ধারণ করলেন। মেরেধরে ছেলেকে শেখালেন। আর তাই না আমরা এত বড় একটা জিনিয়াসকে পেলাম! বিলেত থেকে ফিরে আমি আলি ভাইয়ের বাজনা শুনে বিলকুল তাক খেয়ে গেলাম। ভগবানদত্ত সুরেলা হাত ওর। আর কি তৈরী, মেজাজী বাজাচ্ছে!

রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ওঁর বাড়ির পাশের একটা বাড়ি ভাড়া করে আমি থাকতাম। একাই থাকতাম। একটা ঝি রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার করে যেত। কিন্তু প্রথম প্রথম অন্তত মাস ছ'-সাত আমার বড় কষ্টে কেটেছে। প্রায় আট বৎসরকাল দাদার সঙ্গে সারা দুনিয়ায় ঘুরেছি, বড় থেকে বড় এবং দামী হোটেলে রাজার হালে বিলাসিতার সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি। অভ্যাস বিগড়ে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। ওই পাথরের একতলা বাড়িটায় দুটো অংশ ছিল, মাঝে একটা হল। আমি এদিকে থাকতাম সামনের ঘরে, পেছনের ঘরটাতে খাওয়া-দাওয়া সারতাম, ওদিককার অংশে বাবার কাছে যারা শিখতে আসত তারা থাকত। অবশ্য আগেই বলেছি, তারা বেশী দিন টিঁকতো না। বকুনি ও ঠ্যাঙানি খেয়ে কেটে পড়ত। আমি একটা দড়ি-লাগানো বাঁশের খাটিয়ার উপর শতরঞ্চি, পাতলা তোশক ও চাদর বিছিয়ে শুতাম। পিঠে লাগত। মশা, মাছি, পোকার উপদ্রবে মশারি লাগাতে হত। অভ্যাস ছিল না, দম বন্ধ হয়ে আসত মশারির ভেতর। প্রথম দিকে বেশ কিছু দিন রাত্রে ভয়ে ঘুমই আসত না। ইঁদুর, ছুঁচো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য আরশোলা। সাপও কয়বার দেখেছিলাম। তারপর বাবার মাইহার ব্যান্ডের ছেলেরা কত যে ভূতের গল্প শোনাত! বলত, ওই বাড়িতেই, যেটায় আমি থাকতাম, নাকি প্রেতাত্মা আছে। বুঝে দেখ, আমার কিভাবে কেটেছে সে সময়টা। ভয়ে ঘুম আসত না, কানে তুলো দিয়ে চোখে রুমাল বেঁধে ঘুমোবার চেষ্টা করতাম। সেই থেকে বদভ্যাস এমন হয়ে গেছে যে, আজও কানে তুলো এবং চোখে রুমাল না লাগিয়ে শুলে ঘুম আসে না। ভয়ের চোটে রাত্রে বসে যে রেওয়াজ করব, তাও পারতাম না। তা ছাড়া ওখানে চোরের ভয়ও খুব ছিল; দরজায় প্রচুর তালা লাগিয়েও শান্তি ছিল না। যেসব পলকা কাঠের দরজা—এক লাথি মারলেই খোলা যায়। রাতভর সেই বিভিন্ন পোকামাকড় জীবজন্তুর আওয়াজ, হাওয়ার চোটে দরজা-জানলার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আমার মনে বিভীষিকা জাগাত। কিছু দিন পরে যখন অল্প অল্প করে সব সয়ে যেতে লাগল তখন অন্যান্য বদভ্যাস নিপীড়ন করতে লাগল। নিঃসঙ্গতা, যৌন আবেগ এবং নারীসঙ্গের অভাব। উঃ! কি কষ্টই না পেয়েছি! রেওয়াজ-ফেওয়াজ মাথায় উঠে গিয়েছিল, মন ঘাবড়ে গিয়েছিল, সর্বদা পালাই পালাই ভাব।

অনেকের মুখে শুনেছিলাম সাধনার সময়ে এইসব নানারকম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে তাড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে গঞ্জিকা বা ভাঙ সেবন। বড় বড় সংগীতজ্ঞ, সাধু, ফকিরেরা নাকি একমাত্র এইসবেরই ব্যবহার করে সাধনা করেছেন এবং সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিছু লোক আমাকে মদ খেয়ে রেওয়াজ করার কথা বলল। তবে দাদার সঙ্গে ওই কয় বছর ট্রুপে থেকে সব ব্যাপার-স্যাপার যা দেখেছিলাম এবং নিজেও বেশ কিছু দিন খেয়ে আমার কিরকম মদের ওপর একটা বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। তা ছাড়া, জীবনে তিন-চারজন লোক যাদের খুব ভালবেসেছি তাদের ওপর মদের পরিণামও দেখেছিলাম। কি ভাল মিষ্টি মানুষ তারা সবাই, কিন্তু মদ পেটে পড়লেই অন্য রূপ। ওরে বাপ রে, সেই Dr. Jekyll and Mr. Hyde case যেন! অবশ্য কিছু লোক এমনও দেখেছি, সরাব খেয়ে যেন তারা আরও মিষ্টি, ভাবুক, introvert গোছের হয়ে যায়। মনে আছে এইরকম আমাদের ট্রুপে দুজন ছিলেন—মাতুল ও শিশিরদা। আমি ফরাসী ব্র্যান্ডি রেমি মার্ত্যা কনিয়াক খরচা করে কিনে এনে তাদের খাওয়াতাম; ওদের সুন্দর কথাবার্তা শুনতাম। কখনও কখনও অবশ্য প্রসাদও পেতাম। সেটা আমার ষোল থেকে আঠারো বছর বয়সের কথা। আমার প্রজাপতিপূর্ব সেটা। এইরকম লোক কিন্তু খুব কম দেখা যায়, বিশেষ করে ভারতীয়দের ভেতর। বেশির ভাগই আমরা মদ খেতে জানি না। দেখেছি সেই খালি পেটে মদ গিলবে, কখন থামা উচিত সে মাত্রাজ্ঞান নেই। তারপর রুদ্রমূর্তি, বেলেল্লাপনা, বমি করে একাকার। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, নেশা ছুটে গেলে এদের আর কিছুই মনে থাকে না। অথবা কিছু স্বীকার করে না। ভেতরের সত্যিকারের রূপ, অবচেতন মনের কথা, অবান্তর কথা মালের মুখে সবই এদের বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু পরে? সেই চিরন্তন অজুহাত—'আমি তো বলিনি' বা 'আমি তো করিনি'। আমার একটা বড় ভীতি হয়ে গেছে ভাই গান-বাজনার লাইনে। বিশেষ করে এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। সেখানেও আবার বিশেষ করে সন্ধ্যের দিকে। কেননা তাদের সঙ্গে বসলেই মদ্যপান করতে হবে, আর তারপর ওইসব কথাবার্তা, আর ইতরামি। আমার অসহ্য লাগে! তার জন্য তারা আমার দুর্নাম করে যে আমি অহংকারী, মিশুকে নই ইত্যাদি। সারা জগতে দেখেছি সেই একই জিনিস। কত বড় বড় শিল্পী এই মদের তৃষ্ণায় অকালে শেষ হয়ে গেল। আমিও মাঝে-মধ্যে পান করি না যে তা নয়। তবে খুব কম, এবং বেশির ভাগ ইউরোপ বা আমেরিকায় ঠাণ্ডার সময়ে। কখনও কখনও ভাল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন

মাইহারে প্রথম ছ-সাত মাস আমার খুব কষ্টে কেটেছে। তার আগে আট বছর দাদার সঙ্গে সারা দুনিয়ায় ঘুরেছি, বড়র থেকে বড় এবং দামী হোটেলে রাজার হালে, বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছি। অভ্যাস বিগড়ে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আর তার পরেই এসে পড়লাম মাইহারে বাবার ওই কঠিন জীবনের মধ্যে। ওপরের ছবিটা আমার নাচের জীবনের। ওতে আমি জোহরা সেগলের সঙ্গে নাচছি।

শ্যাম্‌পেন বা শোবার সময়ে কনিয়াক। ফ্রেঞ্চ দামী শ্যাম্‌পেন, ফ্রেঞ্চ পারফুম এবং ফ্রেঞ্চ মেয়ের প্রতি আমার চিরদিনই একটা দুর্বলতা আছে।

যা হোক, কি বলছিলাম যেন—হ্যাঁ, লোকজনের কাছ থেকে শুনে শুনে আমার মনে হল একবার দেখি না গাঁজার নেশা করে। জানার ইচ্ছে হল গাঁজা-ভাঙ খেয়ে রেওয়াজ করে আমার সাধনদৃষ্টি কিরকম চড়চড়িয়ে খুলে যায়। বাবার এক শাগরেদ—তবলা শিখত এবং আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে রেওয়াজে সংগত করত—সেই নিয়ে এল সব সরঞ্জাম। তারপর সন্ধ্যেবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে শুরু হল আমার নেশার অভিযান। প্রথমে সে কলকেতে কাঠকয়লার আগুন রেখে বিরাট স্বরে 'ব্যোম' বলে এমন একখানা টান মারলো যে, ভক করে আগুনের একটা হলকা উঠল ছিলিম থেকে। আমি তো ভয়ে কাঠ। তারপর ও ঢোক গিলে ধোঁয়াটা ভেতরে নিয়ে পরে আস্তে আস্তে কায়দা করে সেটা মুখ থেকে বার করতে লাগল। প্রায় মিনিট খানেক ধরে। তার মধ্যেই তার চোখ দুটো দেখি একবারে জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে। তখন গম্ভীরভাবে ছিলিমটা আমার দিকে এগিয়ে বলল, 'লিজিয়ে গুরুজী, পাইয়ে।' আরে সর্বনাশ! জীবনে সিগারেট আমি হয়তো বার পাঁচ-ছয় খেয়েছি মাত্র, ধোঁয়া ভেতরে নিতে পারি না, আর আমি ওই কায়দা করে ছিলিম ধরে গাঁজায় টান মারব! আমি বললাম, মাফ কর ভাই, আমার দ্বারা গাঁজা খাওয়া হবে না। তখন ও আর একটা ওই সর্বনেশে আগুনের টান মেরে ছিলিমটা মাটির উপর উপুড় করে রেখে বলল, 'কোই বাত নহি ওস্তাদ, দুস্‌রা ইন্তেজাম ভি হ্যায়।' বলেই পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বার করে তার থেকে একটা বিড়ি বার করল। এবং মিনিট খানেকের মধ্যে হাত দিয়ে বিড়ির সমস্ত তামাক বের করে নিয়ে একটা কাগজের মোড়ক থেকে কালচে কি একটা মলমের মত জিনিস নিয়ে হাতের চেটোয় সেই তামাকের সঙ্গে মিশোতে লাগল। যেমনটা এলগিন রোডে কলকাতায় একবার এক দারোয়ানকে দেখেছিলাম খইনি বানাতে। তামাকপাতা আর চুন দিয়ে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কি? ও এক গাল হেসে রামচার মত চোখ দুটো আমার দিকে মেলে বলল, 'চরস, সরকার।' বুঝলাম ব্যাটার চড়েছে। যা হোক, ফটাফট সেই মিক্‌স্‌চারটা বিড়ির খোলে আবার ভরে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লিজিয়ে, পিজিয়ে হুজুর।' বলেই ফস করে দেশলাই জ্বালাল। আমার তখন ভয়ে আর ওর গাঁজার ধোঁয়া শুঁকে বুক ধুক কিরকম ধুকপুক করছে। ও ধরিয়ে দিল আমার সেই স্পেশ্যাল বিড়ি; কিন্তু ফুকফুক করে টেনে ধোঁয়া বার করছি দেখে ও গর্জে উঠল, 'অন্দর খিঁচিয়ে মহারাজ!' অদ্ভুত একটা কড়া নেশালু গন্ধ, একবার চেষ্টা করলাম ভেতরে ধোঁয়া নিতে। আর যায় কোথায়! বিষম খেলাম, কি কাশির ধাক্কা রে বাবা! রাগ করে ছুঁড়ে ফেললাম, দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর গাঁজা আর চরসের। এই এক বাজে থিয়োরি এবং অভ্যাস কাশী-মথুরা অঞ্চলে, বিহারে এবং পাঞ্জাবে খুব চালু আছে—গাঁজা-ভাঙ খেলে খুব ভাল গান-বাজনার সাধনা করা যায়, খুব ভাল কন্‌সেণ্ট্রেশন হয় ইত্যাদি। ঠিক যেমনটা দেখা যায় ধর্মের মার্গে। তপস্যা, যোগ, প্রাণায়াম সাধনার সময়ে অনেক সাধু-টাধু এইসবই ব্যবহার করে। কিন্তু এইসব করার ফলে দেখা যায় পরবর্তী জীবনে এইসব সাধক এই বদভ্যাস থেকে মুক্ত তো হতে পারেই না, উপরন্তু মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এইসব নেশার দাস হয়ে যায়, আর নিজের কাজের সর্বনাশ করে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল দেখেছি এই শুকনো নেশা-প্রীতি ৩০এর দশকে, দেখেছি প্যারিসে ও নানান জায়গায়। এক-একসময়ে এক-এক দলকে—৫০এর দশকে এবং ৬০এর গোড়ার দিক অবধি দেখেছি বিটনিক্‌স্‌দের আর তারপর তো শুরু হল ৬০এর মাঝামাঝি থেকে হিপিদের জোয়ার। সকলেরই সেই এক দুর্বলতা—গাঁজা আর চরস, যাকে ওরা বলে ম্যারুআনা; আর তারপর তো শুরু হয়ে গেল এল এস ডি এবং আরও কত কত রাসায়নিক নেশা। কড়া কড়া ওষুধপত্তর। যা হোক, ফিরে যাই আবার মাইহারের কথায়। গাঁজার সেই প্রথম বিপর্যয়ের পর আর ওমুখো হইনি, তবে ব্যাণ্ডের ছেলেরা মাঝে-মধ্যে ভাঙের মিষ্টি অথবা শরবত করে আনত। বাবা যখন কোনও প্রোগ্রামে মাই-হারের বাইরে যেতেন তখন আমি ও আলি আকবর বার কয়েক খেয়েছি। খুব হাসতাম মনে আছে। পাগলের মত হাসতাম আর খেতাম। কি খিদে হত! চারগুণ খেতাম।

কাশীতে এখনও বছরে দু-একবার ভাঙের শরবত খাই। তবে ভাঙের অংশ কম থাকে তাতে। পেস্তা, বাদাম, গোলাপের পাপড়ি, দুধ, মালাই, রাবড়ি, এলাচ, আনারদানা, খরমুজদানা, আরও কত প্রকারের স্বাস্থ্যকর জড়িবুটি। সামান্য নেশা, বেশ লাগে। খুব হাসি পায়। ভাল খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি—পরদিন কি চমৎকার পেট পরিষ্কার! কিন্তু রোজ খেয়ে এর অভ্যাস করিয়ে এর দাস হয়ে যাওয়া—এটাতে আমার ঘোর আপত্তি।

(ক্রমশ)

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
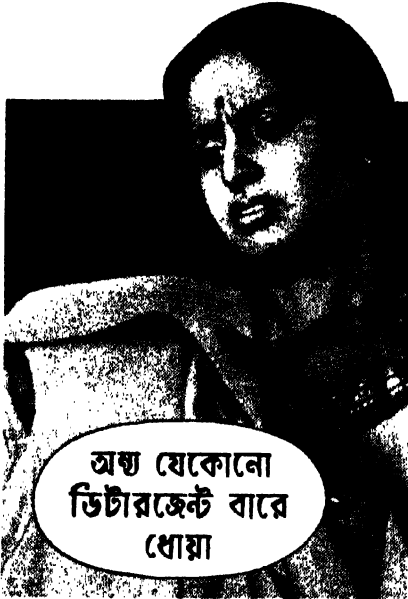
॥ ২১ ॥

বিন্দুবাসিনী একটা স্বপ্ন দেখছিল। স্বর্গের নকাননে সে শুয়ে আছে গোলাপের পাপড়ি নো তৃণ শয্যায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক তিষ্মান পুরুষ, মাথায় সুবর্ণ কিরীট, মুখখানি রূপ হাস্যময়। বিন্দু চিনতে পারলো, ইনিই জনার্দনরূপী বিষ্ণু স্বয়ং, যিনি সমস্ত জগতের ভ এবং বিন্দুবাসিনীর আরাধ্য। বিষ্ণু বিন্দু-সনীর দিকে হাত বাড়িয়ে ভুবনমোহন স্বরে লেন, উঠে এসো, কোন্ অভিমানে তুমি শুয়ে ছো, এই তো আমি দর্শন দিয়েছি।

শরীরে মানুষের স্পর্শ লাগতেই বিন্দুবাসিনী ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলো। দারুণ চমকে য়ে বললো, এ কি, তুই ?

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুর খুব কাছে মাটিতে হাত খে ঝুঁকে বসে একদৃষ্টে দেখছিল বিন্দুর ঘুমন্ত খানি। যেন একটি সাদা ফোটা পদ্ম, তাতে শারদ শিরের মতন কয়েকটি শ্বেত কণা। বিন্দুবাসিনী ন একবিংশতিবর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী, তার রূপ যেন টে পড়ছে। কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে নিবিড় র মেঘের মতন কেশভার, তার বুকে যৌবন যেন ন আগমনের কথা জানান দিচ্ছে শব্দ করে। তার র রেখাভঙ্গিমা পাশ্চাত্য দেশীয় খড়গের মতন।

অকৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বিন্দু প্রশ্ন করলো, গঙ্গা, তুই ঠাকুরঘরে ঢুকিচিস যে ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-ম বাইরে, তোর ঘুম ভাঙাতে চাইনি। কী রূপ লাবণ্যময়ী হয়িচিস তুই, বিন্দু! তাই আর মাথার ঠিক রাখতে পারলুম না।

বিন্দু ঈষৎ হাস্যে বললো, আহা হা, ঢং! তোর র খবর কী ? বাপের বাড়ি থেকে সে এয়েচে ?

অন্যমনস্কভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, না।

—তাকে আর কতদিন বাপের বাড়িতে ফেলে ? তাকে নিয়ে আয় এবার। আমরা একটু মতন করে তাকে সাজাই।

—সে আসতে চায় না।

—ওমা সেকি কথা ? বাড়ির প্রথম বউ, সে অ.র বাইরে বাইরে থাকবে। নতুন বউ পায়ে মল ঝম ঝম করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াবে, তবেই নন্দ।

সুপ্ত কণ্ঠে বললো, এখন তার কথা থাক। বিন্দু, তুই একটু আমার পানে চা।

বিন্দুবাসিনী গঙ্গানারায়ণের চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট হলেও ভাবভঙ্গিতে যেন অনেকখানি বড়। একুশ বৎসর বয়েসে গঙ্গানারায়ণ জীবনে প্রতি-ষ্ঠিত এবং উচ্চদায়িত্বসম্পন্ন পুরুষ হয়েও বিন্দুর সামনে সে আচরণ করছে বালকের মতন।

বিন্দুবাসিনী গঙ্গানারায়ণের আবেগ-ভাব অগ্রাহ্য করে পুনরায় খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, বাড়ির বউকে বেশী দিন বাপের বাড়িতে রাখা মোটেই কাজের কথা নয়। এবার লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আয়। তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে, এখন তো আর সে ছোটটি নেই।

গঙ্গানারায়ণ অপ্রসন্নভাবে বললো, আজো সে বালিকা। আমার কোনো কথাই সে বোঝে না। সে তার মায়ের আদরিণী মেয়ে, এ বাড়িতে এলেই মায়ের জন্য কাঁদাকাটি করে। এখনো সে পুতুল-খেলে।

বিন্দুবাসিনী সহাস্যে বললো, তুই এবার নিয়ে আয়, আমরা তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো। এখন সে তোকে নিয়েই পুতুল খেলবে। মেয়ে-মানুষের সবচেয়ে বড় পুতুল তো তার স্বামী।

—বিন্দু, সে কোনোদিনই আমার জীবন-সঙ্গিনী হতে পারবে না। সে লেখাপড়া কিছুই শেখেনি।

—তুই শিখিয়ে পড়িয়ে দিবি। তুই এত বড় বিদ্বান হয়িচিস।

—আমি তোর সাথে বসে অনেক বই পড়বো। মনে আছে, আমাদের এক সঙ্গে মেঘদূতম পাঠের কথা ছিল ? আজও তা হলো না।

—আমার আর লেখাপড়া। আমার মতন মেয়েরা লেখাপড়া করলে সে বাড়ির অকল্যাণ হয়।

—তোর সেই অভিমান এখনো আছে, না রে বিন্দু ? খুড়োমশাই তোর পড়া বন্ধ করে দিয়ে-ছিলেন........এবার থেকে আমরা গোপনে এক সাথে পড়বো আবার।

—আমার হাত ছাড়, বাইরে গিয়ে দাঁড়া। তুই ঠাকুরঘরে ঢুকিচিস, কেউ যদি দেখে।

—বিন্দু, তোকে বিনে আমি বাঁচবো না।

—মরণ! মাথায় বুঝি ভূত সেঁধিয়েচে ? যা, বাইরে যা বলছি!

—কেউ দেখবে না। বাড়িতে কেউ নেই। আমি কায়স্থ বলে তুই-ও আমায় ঠাকুরঘর থেকে তাড়িয়ে দিবি ? কেন, কায়স্থ হয়ে জন্মিচি বলেই আমি কিসে অপবিত্র ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিন্দু একটুক্ষণ উৎকর্ণ হলো। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এসেছে সে টেরও পায়নি। ঘরের মধ্যে এখন আবছা আবছা অন্ধকার। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ মনে হয়।

বিন্দু জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে কেউ নেই কেন ? সবাই কোথায় গেল ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ শ্রীরামপুরে আমার বড় মামার বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন, তুই জানিস না ? সবাই কেলাবেলি রওনা হয়ে গ্যাচে।

বিন্দুবাসিনী একটি সংক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। গঙ্গানারায়ণকে সে তার মনের ভাব বুঝতে দিতে চায় না। সে বিধবা, তাকে তো কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে না, তাই কোনদিন কবে নেমন্তন্ন থাকে সে কথা তাকে জানাবারও প্রয়োজন মনে করে না কেউ। ক্রমে ক্রমে এ বাড়ির অনেকেই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। সে তিনতলায় ঠাকুরঘরে নির্বাসিতা।

আবার মুখ ফিরিয়ে বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করলো, সবাই গ্যাচে, তুই যাসনি কেন ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমার যে জ্বর। তুই তো আমার খবরও রাখিস না, তিনদিন ধরে আমি জ্বরে শুয়েছিলাম।

নারীদের চিরকালীন —————

কপালে হাত ছুঁইয়ে বললো, ওমা, এখনো জ্বর রয়েচে দেকচি। তুই এই জ্বর-গায়ে বেরিয়ে এলি ?

উদ্ভিন্নযৌবনা বিন্দুকে এত কাছে পেয়ে গঙ্গানারায়ণ আর স্থির থাকতে পারলো না। তাকে আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নিল।

রীতিমতন ভয় পেয়ে বিন্দু বললো, এ কি গঙ্গা, তুই কি পাগল হয়ে গেলি ? জ্বরের জন্য তোর বিকার হয়েছে। ছাড়, ছাড় আমাকে।

—না, আমি আর তোকে কোনোদিন ছাড়বো না।

—তোর মাথায় পাপ ঢুকেচে। গঙ্গা, তুই ঠাকুরের সামনে....ছি, ছি, ছি, আমার মরে যেতে ইচ্ছে কচ্চে, তুই আমাকে ছাড়, নইলে আজই আমি আত্মঘাতিনী হবো।

বিন্দুবাসিনীর এই মুক্তি পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে কোনো প্রকার ছলাকলা নেই বুঝতে পেরে গঙ্গা-নারায়ণ ছেড়ে দিল তাকে। আহত, কাতর কণ্ঠে বললো, বিন্দু, তুই সত্যিই আমায় চাস না ?

বিন্দুবাসিনী বললো, আমার এই জনার্দন রয়েছে, আমি কি আর অন্য কোনো মানুষকে চাইতে পারি ?

গঙ্গানারায়ণ সরোষে সে মূর্তির দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, আমি ভেঙে ফেলবো এই পাথরের ঠাকুর।

বিন্দুবাসিনী তার হাত চেপে ধরে বললো, তুই কি সত্যি পাগল হলি ? এসব কথা তো তোর মুখে কখনো শুনিনি ? তোর কী হয়েছে আমায় সব বল তো!

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি কদিন জ্বরে পড়েছিলাম, আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। আমার বন্ধুরা এসেছিল, তাদের সঙ্গও আমার ভালো লাগেনি। মা বলেছিলেন, বাগবাজার থেকে লীলাবতীকে আনবেন, আমি বলেছিলুম, থাক মা। সে পুতুল খেলা নিয়ে আছে থাক। আমি তো সেবা চাইনি, আমি চেয়েছিলুম সাহচর্য। লীলাবতী তো আমায় তা দিতে পারে না, সে এখনও অবোধ বালিকা....আমার খুব অভিমান হচ্ছিল, তুই আমাকে ভুলে গেচিস।

—আমি কি তোকে কখনো ভুলতে পারি, গঙ্গা ? আমার আর কী আছে যে তোকে ভুলবো ?

—এই যে বললি, তোর জনার্দন আছে ? কিন্তু আমার আর কেউ নেই, আমি অনেক ভেবে দেখিচি, তুই দূরে থাকলে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না। আমার বিয়ের পরই আমি বুঝেছিলুম, আমি ভুল করিচি, তোর বক্ষ ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয় নেই, অথচ তুই বারবার আমাকে ঠেলে দিস.... কেন বিন্দু, কেন, আমার জন্য তোর টান হয় না ?

—চল গঙ্গা, আমরা ঠাকুরঘরের বাইরে যাই।

—তুই এখনো ভাবিচিস, আমি এখানে থাকলে তোর জনার্দনের ঘর অপবিত্র হয়ে যাবে ? আমি সত্যিই একদিন ছুঁয়ে আছড়ে তোর এ ঠাকুরকে ভেঙে ফেলবো।

—তুই বুঝি বেহ্মদের দলে নাম লিকিয়িচিস ? শুনলুম তুই দেবেন ঠাকুরের বাড়িতে যাতায়াত করিস আজকাল ?

—তোকে কে বললে ?

—তুই ভাবিস আমি তোর খবর রাখি না। কিন্তু আমি সব খবরই রাখি।

—শুধু আমি কাছে এলেই তুই দূরে ঠেলে দিস। আজ আমি তোকে ছাড়বো না। আজ আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

—ছিঃ। বাড়িতে কেউ নেই বলেই বুঝি তোকে চোরের মতন আসতে হবে। তুই তো রাজা, তুই যেখানে যাবি, রাজার মতন যাবি। তোর কত যাবার জায়গা আছে। আমি দূরেই থাকবো, সেই তো আমার নিয়তি।

—আমি নিয়তি মানি না।

—তুই মানিস না, কিন্তু আমায় মানতে

ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, গবাক্ষপথে বাইরে আকাশে জ্যোৎস্নাধারা।

—তুই হাসলি কেন ?

—আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করতুম, তোর মনে আছে হঠাৎ পণ্ডিতমশাই একদিন বলেছিলেন, আমি আর বালিকা নই, আমি স্ত্রীলোক। তখন অবাক হয়েছিলুম, রাগও ধরেছিল খুব। কিন্তু এখন তো সত্যিই আমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের অনেক কিছুই করতে নেই, এমনকি ছেলেবয়েসের খেলার সাথী যে তুই, সে তুই-ও এখন আমার কাছে পরপুরুষ, তার কাছাকাছি আমার বসতে নেই। তুই এটা বুঝিস না ?

—না। আমি বুঝবো না। বিন্দু, আমি তোকে চাই।

—এ জন্মে নয়।

—হ্যাঁ, এ জন্মেই।

গঙ্গানারায়ণ আবার বিন্দুবাসিনীর দু বাহু চেপে ধরে তার সুমেরু পর্বত সদৃশ স্তনের ওপর ব্যাকুল মুখখানি চেপে ধরলো।

নিশ্বাস রোধ করে শরীর শক্ত করে রইলো বিন্দু। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো, ছাড়, আমাকে একবার ছাড়, আগে আমার একটা কথা শোন।

—আমি আর তোর কোনো কথা শুনবো না।

—তুই একবার ছাড়, তারপর তোর সব কথা আমি শুনবো।

গঙ্গানারায়ণ ছেড়ে দিতেই বিন্দুবাসিনী ঝটিতি উঠে পড়েই ছুটলো ঘরের বাইরে। গঙ্গানারায়ণও তৎক্ষণাৎ তাড়া করে গেল তাকে। নীচের তলার দাসদাসীরা কেউ ওপরে আসবে না, দ্বিতল ত্রিতল সম্পূর্ণ ফাঁকা। বিন্দুবাসিনী কোথায় লুকোবে ? নীচে যাবার সিঁড়িতে পৌঁছোবার আগেই গঙ্গানারায়ণ তাকে ধরে ফেলবে বুঝতে পেরে সে ছুটতে লাগলো ছাদের মধ্যে।

খেলা। এক কালের দুই শিশু-খেলুড়ে এইরকম ভাবেই ছাদে ছুটোছুটি করতো। তবে তখন সব খেলাই ছিল উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু দুই যুবক-যুবতী আধো অন্ধকার ছাদে সে প্রকার অনাবিল উদ্দেশ্যহীন খেলা আর খেলতে পারে না।

গঙ্গানারায়ণ অচিরেই ধরে ফেললো বিন্দুবাসিনীকে। সবলে তাকে নিজ শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে ক্ষ্যাপার মতন তার সারা মুখে চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলো।

একবার ক্ষণেকের জন্য গঙ্গানারায়ণ নিবৃত্ত হতেই বিন্দু বসে পড়লো তার পায়ের কাছে। গঙ্গানারায়ণের জানু ধরে, এতক্ষণ বাদে এই প্রথম সে ব্যথিত গলায় বললো, গঙ্গা, আমি পাপ করতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। তুই আমার বন্ধু হয়েও এমন সর্বনাশ করবি ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, পাপ ? এই যদি পাপ হয়, তবে পুণ্য কী ? লোকে যাকে পুণ্য বলে, তার সব কিছু আমি পরিত্যাগ করতে রাজি আছি। আমার যথা যথাসর্বস্বের বিনিময়েও আমি তোকে চাই, এই কি পাপের চাওয়া ?

বিন্দু বললো, তুই এসব আর আমাকে বলিসনি। এ জন্মটা আমার এইভাবেই যাবে। আশীর্বাদ কর, যেন পরের জন্মে তোকে আমার নিজের করে পেতে পারি।

গঙ্গানারায়ণ নিজেও হাঁটু গেড়ে বিন্দুর মুখোমুখি বসে পড়ে বললো, পরজন্ম আছে কিনা কে বলতে পারে ? তার জন্য এ জন্মটায় নিজেকে বঞ্চনা করা মূর্খামি নয় ? আর বিন্দু, এই দেশ কিংবা এই সমাজের বাইরেও অন্য দেশ, অন্য সমাজ আছে, চল, আমরা সেরকম কোনো স্থলে চলে যাই। সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।

বিন্দু বললো, কিন্তু আমরা কি নিজের কাছ

এটা পাপ!

—না, পাপ নয়।

—গঙ্গা, তুই আমাকে ছাড়, আমি পারবো না কিছুতেই পারবো না।

—বিন্দু, তোকে আমি ছাড়তে পারি না তোর এই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, এমন দেবী নতুন মুখের শোভা—আমার বুকে তুই আগুন জ্বালিয়েছিস বিন্দু।

গঙ্গানারায়ণ ফের বিন্দুকে বক্ষে টানতে যেতে বিন্দু দু হাতে তাকে বাধা দিয়ে বললো, তুই যদি আমার ওপর জোর করিস, তবে তুই শুধু আমার শরীর পাবি, মন পাবি না। আর আজ রাতেই আমি গলায় ফাঁস বেঁধে মরবো। তুই তো আমার জেদ জানিস ?

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুকে ছেড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ ভাবে বিন্দুর মুখখানি পরীক্ষা করতে করতে বললো, এমন ? সত্য করে বল তো, অপর কারো ওপর তোর মন মজেছে ?

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই, গঙ্গা।

—বিন্দু, তুই আমাকে চাস না ?

—এমন নোংরা। কদর্যভাবে তোকে আমি চাই না। আমার কাছে তুই থাকবি শুদ্ধ, সুন্দর জ্যোতির্ময়রূপে।

উঠে দাঁড়িয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি চললুম। আর আমি তোর কাছে কোনো দিন আসবো না।

বিন্দুবাসিনী কোনো উত্তর দিল না।

গঙ্গানারায়ণ আবার বললো, আমার মাথার মধ্যে কেমন আগুন জ্বলছে, তুই কিছুই বুঝবি না। জানি না, এখন কিসে শান্তি পাবো। আমাকে না দেখলেই তুই খুশী হোস তো, আমি আর আসবো না তোর কাছে।

বিন্দু এবারও কোনো কথা বললো না। ছাদের

গঙ্গানারায়ণ পিছন ফিরে রুদ্ধভাবে চলে সিঁড়িতে তার পদশব্দ হতে লাগলো, তবু তাকে ফিরে আসবার জন্য ডাকলো না। পথ সে পদব্রজে ধাবিত হলো নিজের বাড়ির । এ গৃহও শূন্য। কারুর সঙ্গে কথা বলে যে তার মস্তিষ্ক জুড়োবে, তারও উপায় নেই। অথচ -বান্ধব কারো কাছে যেতেও তার ইচ্ছে হলো শান্ত, মৃদু স্বভাবের গঙ্গানারায়ণ আজ ন্ত চঞ্চল ও উদভ্রান্ত। শহরে স্ত্রীলোকের অভাব । ইচ্ছা হলে গঙ্গানারায়ণ এখনই জুড়ি গাড়ি চড়ে কোনো রূপসী সঙ্গীপটীয়সী বারা- র গৃহে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে. তার এখন রও অভাব নেই। কিন্তু বিন্দুবাসিনী ছাড়া কোনো রমণী তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। ; তার জীবনে শুধু নারীর প্রয়োজন মেটাবে বিন্দু তার চেয়েও বেশী অনেক কিছু। সেই ; তাকে ফিরিয়ে দিল।

সেই সন্ধ্যাকালেই নিজের শয্যায় শুয়ে ছটফট ; লাগলো গঙ্গানারায়ণ।

গঙ্গানারায়ণের এই চাঞ্চল্য এর পরের দিনেও কমলো না একটুও। অথচ মন শান্ত দরকার। অনেকটা শান্তি পাওয়া যায় দেবেন্দ্র- কাছে গিয়ে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি ন।

তার কলেজ জীবনের সহপাঠী রাজনারায়ণ এখন দেবেন্দ্রবাবুদের তত্ত্ববোধিনী সভার ন উপনিষদ অনুবাদকের চাকুরি করে। এক- রাজনারায়ণ অতিরিক্ত মদ্যপান শুরু করেছিল. কিছুটা শুধরেছে। রাজনারায়ণ একসময় ছিল বাদী, সকল ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো. যেন তার মন খানিকটা ফিরেছে ধর্মপথে। দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোকগুলি পাঠ করে র তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেন। সেই শুনে রাজনারায়ণ এই শ্লোকগুলি ইংরেজিতে দ করে। উপনিষদের দুরূহ শ্লোকগুলি দ্রবাবু এমনই প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় ব্যাখ্যা যে তা শুনবার জন্য অনেকেই সেখানে ভিড়

গঙ্গানারায়ণ একদিন তার বন্ধু রাজ- ণের সঙ্গে গিয়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আকৃষ্ট পড়েছে। দেবেন্দ্রবাবুও তাকে প্রীতির চক্ষে ।

কয়েকদিন সেখানে গিয়েও গঙ্গানারায়ণের মন হলো না। ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কার কিছুই মার তার ভালো লাগে না। মন সর্বক্ষণ বিন্দুর ধ্য যাবার জন্য ছটফট করে। নিজেকে শান্তি জন্য সে জমিদারি পরিদর্শনে চলে গেল ায়।

সেখানে পৌঁছেই বুঝলো, সে আরও ভুল । কলকাতায় তবু বরং এটুকু সান্ত্বনা ছিল বন্দু অদূরেই আছে, ইচ্ছা করলেই সে ছুটে বিন্দুকে একবার দেখে আসতে পারে। কিন্তু া যেন তার কাছে মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান কাজকর্ম সব অসমাপ্ত রেখে সে আবার ফিরে কলকাতায়।

আবার এক সায়াহ্নে সে বিন্দুর ঠাকুরঘরে বত হয়ে বললো, আমি হার মানলাম, বিন্দু। ছেড়ে আমি যে কিছুতেই দূরে রইতে, না।

বিন্দু রাগ করলো না, বরং সুমিষ্ট স্বরে বললো, আয়, দোরের কাছে বোস। শরীরের খুব বুঝি অযত্ন করছিস ?

কিন্তু শুধু বিন্দুর সুমিষ্ট বাক্য শুনলেই রায়ণের মন ভরে না আর। দূরে থাকার সে ভেবেছিল, বুঝি একবার বিন্দুর মুখখানি ই তার হৃদয় জুড়োবে। কাছে এসে বুঝলো. যেমন অগ্নিশিখার দিকে ধায়, তেমনি বিন্দুর

গঙ্গানারায়ণ যদি দূরে বসে তার সঙ্গে গল্পগাছা করতে চায় তার আপত্তি নেই, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তার হস্ত আকর্ষণ করলেই বিন্দু বলে, তুই কি চাস আমি মরি ? পাপের পথে যাওয়ার চেয়ে মরণও ভালো।

গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করে, আর কিছু নয়, আমি যদি তোর ক্রোড়ে মাথা দিয়ে শুই, তাও কি পাপ ?

বিন্দু বলে, অমন কথা উচ্চারণ করাও পাপ। এমন কি হাতে হাত ছোঁয়াও পাপ।

গঙ্গানারায়ণ উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলো। সে জিদ ধরলো, বিন্দুর এই প্রতিরোধ সে ভাঙবেই। বিন্দুকে না পেলে তার জীবনের আর সব কিছু ব্যর্থ। তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইলো না। অফিস-কাছারি থেকে সে যখন তখন চলে এসে বসে থাকে বিন্দুর কাছে। এ গৃহে তার অবারিতদ্বার। যে-কোনো সময় সে আসতে পারে, যার কাছে খুশী সে যেতে পারে, কেউ তাকে বাধা দেবে না। কিন্তু সে যে আর কারো কাছে নয়, শুধু সর্বক্ষণ বিন্দুর কাছেই নিভৃতে বসে থাকে, এটা যে দৃষ্টিকটু এ বোধ তার লুপ্ত হয়ে গেছে। বিন্দুকে ছাড়া এ জগতের আর কিছুই যেন সে এখন দেখতে পায় না।

এক নিঝুম দ্বিপ্রহরে গঙ্গানারায়ণ আবার বিন্দুর ওপর বলপ্রয়োগ করতে গেল। বিন্দু সেদিন কেঁদে ফেললো একেবারে। বিন্দু বড় অসহায়। সে চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারে না, কারণ গঙ্গা- নারায়ণ যে তার বড় প্রিয়, গঙ্গানারায়ণের সম্মান- হানি হোক, তাই বা সে চাইবে কী করে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, আমার মরণই ভালো। তুই কেন এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করছিস গঙ্গা ? তুই আমায় বিষ এনে দে।

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুকে বক্ষে আঁকড়ে ধরে বলতে লাগলো, আমি আর কিছু মানি না, আর আজ তুই আমি দুইজনে মরণ-উৎসবে মাতি।

বিন্দু ফিসফিস করে বললো, ছেড়ে দে, ওরে আমায় ছেড়ে দে, আমায় এমনভাবে নরকের দিকে নিয়ে যাসনি—

পক্ষকাল ধরেই এ বাড়ির দাসদাসী মহলে পাঁচরকম কথা কানাকানি হচ্ছিল। কথা পৌঁছেছিল বাড়ির গৃহিণীরও কানে। দাসী সমভিব্যাহারে বিন্দুর মা নিজে সেই সময় এসে এ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন। গৃহদেবতার সামনে ব্যভিচারক্রিয়া চলছে।

তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলেন, বিন্দু !

তারপর কপাল চাপড়ে বললেন, হা অদৃষ্ট এ কি করলে ? বিন্দু, পোড়ারমুখী, ঘরজ্বালানী, তুই মরলিনি কেন ? তোর মনে মনে এই ছিল ? গঙ্গা আমাদের সোনার টুকরো ছেলে, তুই তার ওপর বিষ নজর দিইচিস। ডাইনী !

গঙ্গানারায়ণের চৈতন্য উদয় হলো। বিন্দুর কাছ থেকে সরে এসে সে নতমস্তকে বললো, খুড়িমা, দোষ আমার। বিন্দুর কোনো দোষ নয়।

বিন্দু পাষাণমূর্তির মতন স্থির।

বিন্দুর মা গঙ্গানারায়ণকে বললেন, গঙ্গা, তুমি সরে এসো, ও ডাইনীর কাছে থেকো না। আমার পেটে আমি এই বিষপুঁটুলি ধরিছিলাম। ওফ !

গঙ্গানারায়ণ বাইরে বেরিয়ে আসতেই তিনি দরজা টেনে শিকলি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, ও থাকুক এখানে। কর্তা এসে ওকে নিয়ে যা করার করবেন। তুমি এসো, গঙ্গা, নীচে এসো—

দাসীর দিকে ফিরে গৃহকর্ত্রী কড়া সুরে বললেন, দেখিস, খবরদার যেন এ সব কথা পাঁচ কান হয় না। তাহলে তোর জিভ কেটে দেবো !

গঙ্গানারায়ণ আচ্ছন্নের মতন বললো, আপনি.... বিন্দুকে বন্ধ করে রাখলেন........দোষ যে সব আমার ....আমিই ওর ওপর জোর খাটাচ্ছিলুম........।

গঙ্গানারায়ণ কিছুতেই সেখান থেকে যাবে না। কথাবার্তা উচ্চগ্রামে উঠছে ক্রমশ। দৈবাৎ সেদিন ...সেন।

তাঁকে দেখে সবাই চুপ করে গেল।

গঙ্গানারায়ণ কম্পিতস্বরে বললো, খুড়োমশাই, বিন্দুকে ক্ষমা করুন। আমার মতিভ্রম হয়েছিল, আমি বিন্দুর উপর লোভ করিচিলুম, কিন্তু বিন্দু আমায় শেষ পর্যন্ত নিবৃত্ত করেচে.... যা শাস্তি দেবার আমার দিন........।

বিধুশেখর দরজা খুলে দেখলেন বিন্দুকে। বিন্দু ঠিক সেই একই রকম স্থির, আলুলায়িত বসনও ঠিক করেনি। যেন সে দক্ষের যজ্ঞ সভার সতীর মতন নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে।

বিধুশেখর বিন্দুকে কিছুই বললেন না, গঙ্গানারায়ণকে আদেশ করলেন, এসো আমার সঙ্গে।

সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য গঙ্গানারায়ণের নেই। সে বিধুশেখরের সঙ্গে নীচে নেমে এলো। বিধুশেখর পোশাক পরিবর্তন করলেন না পর্যন্ত। সেইভাবেই গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে তাঁর ল্যান্ডো গাড়িতে উঠলেন।

গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল, বিধুশেখর তাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে চলে আসবেন। পিতা রামকমল শহরে নেই। মাতা বিম্ববতীর সামনে গিয়ে কিছু একটা বোঝাপড়া করবেন বিধুশেখর। কিন্তু তিনি সহিসকে সোজা যাবার হুকুম দিলেন।

পথে একটিও কথা বললেন না বিধুশেখর। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে গঙ্গানারায়ণ যেন কুঁকড়ে যেতে লাগলেন। তবু তৎক্ষণাৎ সে মনে মনে একথাও ঠিক করে রাখলো, যদি তাকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করাও হয়, তবু সে বিন্দুবাসিনীকে কোনো শাস্তি দেওয়া সহ্য করবে না। সে রুখে দাঁড়াবে।

অনেকক্ষণ পর বিধুশেখরের নির্দেশে গাড়ি এসে দাঁড়ালো বউবাজারের সুবিখ্যাত কালীমন্দিরের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে গঙ্গানারায়ণকে বিধু- শেখর বললেন, এসো।

সন্ধ্যা হয় হয়। এস্থলে এখন ভক্তবৃন্দের খুব ভিড়। গেঁজেল ও সুরাপায়ীদের গদগদ চিৎকারে কান পাতা দায়। তবে এ মন্দিরের পান্ডা-পূজারীরা বিধুশেখরের পরিচিত। তিনি ভিড় ঠেলে উপস্থিত হলেন একেবারে গর্ভ গৃহে। প্রতিমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গঙ্গানারায়ণকেও বসতে ইঙ্গিত করলেন।

তারপর নিম্ন স্বরে বললেন, গঙ্গা, তুমি আজ যা করেচো, তা কোনো দিন কেউ জানতে পারবে না। তোমার পিতামাতা কিছুই টের পাবেন না। তোমার সংসারে কোনো অশান্তি ঘটুক আমি চাই না। শুধু তুমি শপথ করো, আর কোনো দিন তুমি বিন্দুকে দেখতে যাবে না, আর কোনো দিন তুমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলবে না।

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ ইতঃস্তত করে বললো, আমি এ শপথ করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনিও বিন্দুকে কোনো শাস্তি দেবেন না! সে নিরাপরাধ।

বিধুশেখর বললেন, বেশ, সেকথাও আমি দিলাম।

গঙ্গানারায়ণ তখন মূর্তির সামনে গড় করে বিড়বিড় করে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করলো।

কিন্তু এ ঘটনার তিন-চারদিন পরই গঙ্গা- নারায়ণ খবর পেল যে, বিন্দুবাসিনী তার নিজের বাড়িতে আর নেই। সে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

গঙ্গানারায়ণ ছুটে গেল বিধুশেখরের কাছে। উত্তেজিতভাবে বললো, খুড়োমশাই, আপনি যে কথা দিয়েছিলেন—

বিধুশেখর বললেন, আমি ঠিকই আমার কথা রেখেচি, গঙ্গা। বিন্দুকে কোনোরূপ শাস্তি দিইনি, সে ভালো আছে। আমি বরং তোমার শপথ রক্ষার ব্যাপারটা অনেক সহজ করে দিইচি। কাশীতে পাঠিয়ে দিইচি বিন্দুকে। সে আর কোনো দিন এখানে আসবে না। সেখানেই সে ভালো থাকবে।

(ক্রমশ)

বাবা বললেন "ডিস্‌টেম্‌পার চাই"

কয়েক টাকা বেশী খরচ ক'রে আমি লাগালাম ব্রিটিশ পেইন্টস্‌ ভাইনল

এখন আমাদের বাড়ীর চেহারাই পাল্টে গেছে !

ব্রিটিশ পেইন্টস্‌ ভাইনল হ'ল পলিয়েস্টারে সুসমৃদ্ধ ইমালসন পেইন্ট, যার ফিনিশ অন্য যে কোন অয়েল বাউণ্ড ডিস্‌টেম্‌পারের চেয়ে সত্যিই অনেক উৎকৃষ্ট, অথচ দাম মাত্র কয়েক টাকা বেশী !

সেজন্যে এখন বেশীর ভাগ লোক ব্রিটিশ পেইন্টস্‌ ভাইনল-এর দিকেই ঝুঁকছেন। পেইন্টস্‌ কারিগরীতে ব্রিটিশ পেইন্টস্‌ এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দিয়েছে।

"আমার সিদ্ধান্ত ফাইনাল পেইন্ট মানে, চাই ভাইনল"

ব্রিটিশ পেইন্টস্‌

VINYL WALL PAINT

LINTAS BP-VNL/33 2415-BG
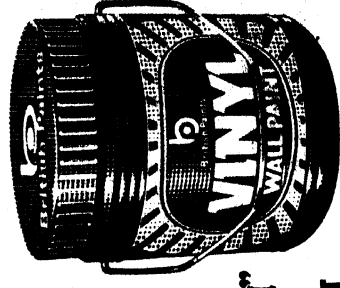
াফরি দেবব্রত মল্লিক

দূরে কোথায় যেন হরি সংকীর্তন হচ্ছে। বাতাসে গানের সুর। হরে কৃষ্ণ হরে ...... । মানসী আর অমল মুখোমুখি। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ওদের ছাদে। কিছু ক্ষণ আগে অমল অফিস থেকে ফিরেছে। এখন খোলা ছাদে বসে চা খাবে। প চলবে দুজনার। অমলের অফিসের কথা আর মানসীর বাড়ির।

—আজ তোমার মুখটা কিরকম যেন শুকনো শুকনো লাগছে। মানসী এগিয়ে লের কাছে এল। শরীর খারাপ লাগছে?

—উঃ যেভাবে বাসে করে আসতে হয় তাতে শরীর খারাপ না হয়ে উপায় ছে। রীতিমত যুদ্ধ বুঝলে। রীতিমত যুদ্ধ। আছ তো বাড়িতে বসে বুঝবে ?

—আহা, দাও না একটা চাকরী যোগাড় করে, দেখি বুঝতে পারি কি না। অমল থার কোন উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। মাঝে মাঝে এমন হয়। যেন ন কিছুই ভাল লাগে না। গলা শুকিয়ে যেতে থাকে। বার বার জল খেতে ইচ্ছে । অমল ভাল করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর মানসী কথা শুরু করল।

—জানো তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

—কি?

—তুমি রাগ করবে না বলো?

—বলই না।

—তোমার পুরোনো জামা প্যান্টগুলো দিয়ে একটা স্টিলের থালা রেখেছি।

অন্যদিন হলে হয়তো অন্য কিছু বলত অমল। এখন শুধু বলল, ভাল করেছো। লের উত্তর শোনার পরও মানসী বলতে থাকলো।

—জামা প্যান্টগুলো অনেক পুরোনো। তুমি সেগুলো একদমই পর না। তাই লাম শুধু শুধু ওগুলো ঘরে রেখে লাভ কি। এই জন তো, আমার সবসুদ্ধ ি স্টিলের থালা হল। পাঁচটা। মানসী ছেলেমানুষের মত আঙুলে তুলে ালো।

অমল মনে মনে হাসল। সত্যি, মানসী এখনো ছেলেমানুষই রয়ে গেল। লা সরল।

......হরে কৃষ্ণ হরে রাম। রাম রাম হরে হরে। কীর্তন জমে উঠেছে। খোল তাল এখন ঝমাঝম দ্রুত লয়ে বেজে চলেছে। রাত ভোর বেজে চলবে। অষ্টপ্রহর সংকীর্তন। অমলের শুনতে বেশ ভাল লাগছে। এ এক অন্য ধরনের মেজাজ। শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। বিভোর করে দেয়। হত করে তোলে।

প্রায় বছর দোলের আগের দিন থেকে যে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন শুরু হত তা ভোলার নয়। সেদিনটা যেন পাড়ায় এক উৎসব। দূর দূর থেকে দল আসতো গান গাওয়ার জন্য। একের পর এক গান গেয়ে তারা চলে যেতো। আসর জমে উঠত বিভিন্ন গাওনার সুরে সুরে। মেয়েরা মাঝে মাঝে উলু দিতেন।

এই আসরে একটা মজার ঘটনাও ঘটত। সেটা ভেবে অমলের এখন খুব হাসি পাচ্ছে। তার যেন কি নাম ছিল। কিছুক্ষণ ভাবার পর মনে পড়ল। মদন মাস্টার। কীর্তনের আসরে ওর ডাক বাঁধা ছিল। গান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর মদন মাস্টার ভাবে পড়ত। অর্থাৎ গান গাইতে গাইতে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু এইরকম একটা সময় আসার আগে উনি পাশের কাউকে জানিয়ে দিতেন তিনি এখন ভাবে পড়ছেন। তাকে যেন দেখা হয়। বিশেষ করে তার পকেটের জিনিসগুলো। একটা চাপা হাসি আসরের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত বয়ে যেত। তখন আরো জোরে বাজতে থাকতো খোল করতাল। গায়েনের গান তখন উঁচু পর্দায়। আসর জমজমাট।

ছোটবেলার কথাগুলো মনে হলে বেশ লাগে। মনে হয় বেশ ছিল সেই সব দিনগুলো। অমলের সে কথা মনে হলেই একটার পর একটা ছবি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। লাইনবন্দী সার সার ছবিগুলো এসে ভীড় জমায়। স্কুল যাওয়ার ঘটনা। মাঝে মাঝে স্কুল পালানোর বদমাইশি বুদ্ধি। ভাবতে বেশ লাগে। বিশেষ করে একদিনের কথা তো অমলের প্রায়ই মনে হয়।

প্রথম ঘণ্টায়ই হেড মাস্টারমশাইয়ের ক্লাস। ইংরিজী পড়াবেন। পড়া ছিল গ্রামারের টেন্স। একদম মুখস্থ বলতে হবে। না পারলেই বেত। বাড়ি থেকেই নানা অজুহাত তৈরী করে স্কুলে না আসার ফন্দি এঁটেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অজুহাত ধোপে টেকেনি। তাই পথে আসতে আসতে ঠিক করে ফেলল অমল আজ আর স্কুলেই যাবে না। সংগী জুটে গেল আরো দুজন। ওরাও ক্লাস করতে না পারলে বাঁচে। কোথায় যাবে ওরা? কাছাকাছি থাকলে কারো নজরে পড়তে পারে। তাই দূরে কোথাও যেতে হবে। ঠিক হয়ে গেল গান্ধীঘাট যাবে। একজন বলল এত দূর? দক্ষিণেশ্বর থেকে বারাকপুর। কম রাস্তা? হেঁটে হেঁটে এতটা পথ! ভাবলে কিরকম হাসি পায় এখন। স্কুলের কথা উঠলেই অমলের এ ঘটনার কথা মনে হয়।

সেদিন গান্ধীঘাট থেকে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

এ গল্প মানসীও অনেকবার শুনেছে। আর হেসেছে খুব করে। তোমরা পারও। আচ্ছা বাড়ি ফিরতে দেরি দেখে তোমায় কিছু বলল না?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি বললে?

—খেলা ছিল।

—তুমি আবার খেলতেও নাকি?

—শুধু খেলতামই নয়। রীতিমত প্রাইজও পেয়েছি। অমল বুক ফুলিয়ে বলে।

মানসী হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। তা হলে তো তুমি গুণধর!

আগে মাঝে মাঝেই বসে হাসি ঠাট্টা হত। এমন কি কখনো কখনো রাতে বেশিটা সময় কি ভাবে যে কেটে যেত বুঝতেই পারত না অমল আর মানসী। তখন ওদের এমন খোলা ছাদ ছিল না নিজের করে। একটা ভাড়া বাড়ির ফ্ল্যাটে বাসা। ফ্ল্যাট মানেই একটা বড় ঘর আর এক চিলতে বারান্দা। সংগে রান্নাঘর এবং বাথরুম যেমন থাকে। ছিমছাম। ছোট পরিবারের জন্য বেমানান নয়। মানসীর প্রথম প্রথম খারাপ লাগেনি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠল। সব সময় মনে হয় কিরকম দম আটকে আসছে। একটুখানি ঘর। দুপা ফেললে তিন পা ফেলার জায়গা নেই।

অমল মানসীকে বোঝাতে চেষ্টা করে। এটা শহর। এখানে এইরকমই সব। কারুরই তেমন তিন পা ফেলার মত জায়গা নেই।

মানসী বুঝতে পারে। তবু যেন অবুঝ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে। আমার প্রায়ই কি মনে হয় জান?

—কি

—নিশ্বাস নিতে নিতে একদিন এই ছোট্ট ঘরের সবটুকু অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে।

—ধ্যাৎ, বোকা কোথাকার। অমল মানসীর লম্বা কালো চুলে আঙুল দিয়ে চুলের জট ছাড়িয়ে দিতে থাকে।

মানসী তখনও বলে যেতে থাকে। তুমি হাসলে। কিন্তু এটা আমার মনের কথা সত্যি করে বলছি। ভাড়া বাড়িতে থাকতে একটুও প্রাণ চায় না। একদম অসহ্য। আমি তো আর বলছি না আমার প্রাসাদ চাই। ছোট টালির ঘর হলেই আমি খুশী। আমার নিজের করে ছোট্ট ঘর শুধু।

—এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি। এক্ষুনি আমি কি করে বাড়ি করব।

—আহা, আমি কি আর তোমায় এক্ষুনি করতে বলছি। হেসে দেয় মানসী। চেষ্টা করতে বলছি মাত্র। যেন কয়েক বছরের মধ্যে আমরাও বাড়ি করে ফেলতে পারি। তুমিই তো বল চেষ্টা করলে কি না করা যায়। আমরা চেষ্টা করলে একটা ছোট মোটো বাড়ি তৈরি করতে পারবো না?

অমলই কি চায় ভাড়া বাড়িতে থাকতে। কিন্তু উপায় কি। শুধু চাকরি করে বাড়ি বানানো সত্যি কঠিন কাজ। তবু কেউ কেউ করছে। দুএকজন অমলের বন্ধুবান্ধব বাড়ি করেছে। তাদের সবারই মত আজকের দিনে একটা বাড়ি করা বোকামি। তার চেয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকা অনেক ভাল। শুধু শুধু এক গাদা টাকা আটকে রাখা। সেই টাকা বরং ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দিলে অনেক লাভ। আর ধার করে করলে তো কথা নেই।

বাড়ি করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। তবু বাড়ি করা চাই। একান্তই নি
মত করে ছোট্ট একটা বাড়ি। মুখে যে যতই বলুক না কেন। ছোট্ট একটা
মাথা গোঁজার ঠাঁই—এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই আমরা অন্তরে অন্তরে এক।

মাঝে মাঝে অমল রাতে বাড়ি ফিরে দেখেছে মানসীর মুখ ভার।
সেই বাড়ি। বাড়ির গৃহিণী হয়তো কিছু বলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অ
বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। তারপর সান্ত্বনার সুরে মানসীকে বোঝার
নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? ভাড়া বাড়িতে থাকলে ও একটু আধটু কথা হবেই

—এই জন্যই তো বলি। মানসী রীতিমত উত্তেজিত।

—আহা, আমি জানি। কিন্তু কি করব বল। আমাদের মত লোকের সা
চাকরি করে বাড়ি করা কি সহজ কথা। তবে চেষ্টা আমি করছি। এ
তোমার বলে রাখছি মানসী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মানসীর রাগ জল হয়ে যায়। চেষ্টার কথা শুনলেই
খুশি। মানসী জানে অমল চেষ্টা করতে শুরু করলে, তা একদিন না
কিছুদিনের মধ্যে হবেই।

সঙ্গে সঙ্গে মানসী বাড়ির একটা প্ল্যান মাথার ছকে নেয়। অমলের কা
কাছে এসে বসে। তারপর আঙুল দিয়ে হাতের তালুর ওপর বোঝাতে থা
জান, এইভাবে দুটো ঘর পাশাপাশি হবে। রান্নাঘর হবে এইখানে। রান্না
আমার একটুখানি করে না। আমি প্রায় বাড়িতেই দেখি রান্নাঘরটা একটুখা
আমার ভীষণ রাগ হয়। একটা জিনিস বোঝা উচিত। একজনকে সারাদি
বেশির ভাগ সময়টুকু ঐখানে কাটাতে হবে।

একটানা কথাগুলো বলে যেতে থাকে মানসী। তুমিই বল, ঠিক বলি

—নিশ্চয়ই। অমল মাথা দোলায়।

—আর একটা জিনিস আমার ভীষণ ইচ্ছে।

—কি?

—সুন্দর দেখে জাফরি লাগাবো।

অমল হেসে ফেলে। কেন তুমি বেগম হবে নাকি?

—কেন, কেন?

—জাফরি তো সেই মোগল পিরিয়ডের জিনিস। বেগমদের যেন বাইরে থে
দেখতে না পাওয়া যায় তার জন্য বাড়ি কিংবা প্রাসাদের চতুর্দিকে জানা
বদলে জাফরি ব্যবহার করা হত। অথচ বেগমরা জাফরির ফাঁক দিয়ে বাই
সবকিছু দেখতে পেতেন।

—হ্যাঁ জাই না হয় বেগম। জাফরির ফাঁক দিয়ে আমি আমার বাদশ
দেখব। সে চাকরি করতে চলে যাবে। রাজপথ ধরে সোজা।

—আমার বেগম তখন ঘরে একা চুপচাপ।

দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে।

—বেশ মজা হবে তাহলে, না? মানসীর হাসি তখনো শেষ হয় না।

অমলের এক আর্কিটেক্ট বন্ধু জাফরির ব্যাপার নিয়ে বুঝিয়েছিল ও
আজকাল জাফরির ব্যবহার বেড়েছে। রোদ আটকে যায় সুন্দরভাবে। এবং বৃ
তাই। জল হলে একটু আধটু ছাট যা ঢোকে। অথচ হাওয়া খেলার অ
সুযোগ। দূর থেকে এক একটা বাড়ি দেখতে বেশ লাগে। ঠিক যে জায়
জাফরি লাগানো আছে মনে হয় যেন কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট আলো আঁ
মিশে একাকার হয়ে গেছে সেখানটায়।

অমল এখন ছাদে একা। মানসী নিচে নেমে গেছে ছেলেকে পড়া দেখা
জন্য। রাতে খাওয়ার আগে পর্যন্ত পড়াবে ওকে। ছেলের ভোরে স্কুল। দুপু
একবার নিয়ে বসে পড়াতে। কিন্তু এখন গরমের সময় দুপুরে পড়াতে
হয়। গুমোট গরম। জানালা দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে হয়।
হাওয়া গরম লাগে। তার ওপর যদি লোডশেডিং থাকে সোনায় সোহা
এইরকম আবহাওয়া চলবে যতদিন না বৃষ্টি শুরু হয়। তবে সন্ধ্যার পর শা
বিশেষ করে ছাদে এসে বসলে তো কথা নেই। অমল তাই অফিস থেকে আ
পর হাতমুখ ধুয়ে সোজা ছাদে বসে পড়ে। বসে থাকতে থাকতে এক
চোখ দুটো বুজে আসে। খাওয়ার আগে প্রায়ই একঘুম হয়ে যায়। ছেলে
পড়ানোর পর মানসী ছাদে উঠে আসে। আস্তে আস্তে পা টিপে অমলের সা
এসে দাঁড়ায়। অমল চোখ বুজে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে ডাকে না মান
খানিকক্ষণ পায়চারি করতে থাকে। আর ঠিক তখনই হয়তো অমলের ঘুম ভে
যায়।

—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অমল হেসে ফেলে। কটা বাজে?

—চল, খেতে চল। মানসী অমলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—খাওয়ার সময় হয়ে গেল? বাবুয়া কি করছে?

—ওর পড়া হয়ে গেছে। খাচ্ছে এখন।

—বাবুয়ার ইংরেজীর কি প্রশ্ন লিখতে হবে বলছিলে?

—কাল লিখে দিও। মানসী আস্তে করে উত্তর দেয়।

—জান, কিরকম ক্লান্ত ক্লান্ত লাগছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মানসী জানে। ইদানীং অমল অনেক পাল্টে গেছে। কিরকম যেন একটুতে
ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কথা কম বলে। সেদিন মানসী একটু দূরে বসে অমল
লক্ষ করছিল। ওর মুখটা লম্বা লম্বা লাগছে। থাড়টা অনেক সরু
গেছে। মানসীর থেকে থেকে একটা কথাই মনে হচ্ছিল। অমল হঠাৎ ক

একটা ভাবনা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমনি করেই হোক নিজের মত করে একটা বাড়ি চাই। চেষ্টা করে বিফল হয়নি অমল। বছর দেড়েকের মধ্যে মাথা গোঁজার মত একটা ঠাঁই করে ফেলল। কিন্তু কিভাবে যে ঠাঁই তৈরি হল, তা একমাত্র অমলই জানে।

টাকা ধার নেওয়ার যা যা রাস্তা ছিল তার একটাও বাকি রইল না। এমনকি ঘরের সোনাও সব শেষ। নাম মাত্র একটু ছাড়া। এ ব্যাপারে মানসীর তেমন খেদ নেই। ও বলেছে, আমার অলংকারের ওপর একটুও লোভ নেই। বাড়ি হলেই খুশি।

কিন্তু এখন? বাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও কোথায় যেন কি একটা হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে মনে হয়। মানসী অমলের দিকে তাকালেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারে। আর তখনই বার বার মনে হয় ওর চাওয়ায় কিছু ভুল থেকে গেছে। যা এই মুহূর্তে ও না চাইলেও পারতো। তাই সব সময় এখন অমলের কাছে নিজেকে কেমন যেন দোষী দোষী মনে হয়। প্রথম প্রথম একা নিজে নিজে ভেবে গুমরে মরছিল মানসী। তারপর একদিন অনেক ভেবে আর থাকতে না পেরে অমলের কাছে এসে মুখ খুলেছিল।

—আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও।

—হঠাৎ। অমল রীতিমত অবাক।

—আমি ভুল করে তোমার কাছে বাড়ি চেয়েছি।

—ধ্যাৎ, বোকা। জান না মধ্যবিত্তদের সব চাওয়াই ভুল করে চাওয়া। আমাদের এইভাবেই সবকিছু চাইতে হবে আর ভুলও করতে হবে। তুমি বুঝি বসে বসে এসব ভাবছ?

—তোমাকে দেখেই তো আমার ভাবনা আসছে।

হো হো করে অমল হেসে দিল। প্রাণখোলা হাসি। অনেকদিন এরকম হাসেনি অমল। কেন আমি পালটে গেছি?

—যাওনি?

—তাই বুঝি! আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না। যেটুকু তুমি দেখছো সেটা সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। একটু চিন্তা তো হবেই। অর্থকড়ি নামক সমস্যার কথাটা কি অত সহজে ভুলতে পারি? মাঝে মাঝে তাই ভাবিয়ে তোলে। অথচ এই ভাবনাগুলো আমাদের নাও হতে পারতো। যদি সমাজ ব্যবস্থার রূপটা অন্য কোন রকম হত।

মানসী চুপ করে বসে থাকে। কোন কথা বলে না। বসে বসে অমলের কথা শোনে। নিজেকে অনেকটা হালকা হালকা মনে হচ্ছে এখন। অমল বলে চলে। যে কোন ব্যাপার নিয়ে তুমি ভাবতে বসলেই তোমার অনেক কিছু মনে হবে। সাত পাঁচ আকাশ পাতাল আর কত কি। কিন্তু তুমি খুব সহজভাবে সহজ করে ভাবতে শেখ, এর মত আনন্দ নেই। অথচ দেখ কিরকম সব সাধারণ ঘটনা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। একটা বিরাট প্রভেদের রেখা টেনে দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেয় তোমার আমার মধ্যে বড় ফারাক।

নিচ থেকে বাবুয়া চীৎকার করে ডাকল, মা আমার খাওয়া হয়ে গেছে। মানসী অমলকে তাড়া দিল, চল চল তাড়াতাড়ি খেয়ে আসি। এরপর তরকারি মাছ সব নষ্ট হয়ে যাবে।

গরমের দিনে এই এক সমস্যা। একটু রাত হলেই রান্না নষ্ট হয়ে যেতে চায়। মানসী বিকেলে চা খাওয়ার সময় যদিও একবার সব গরম করে রাখে। তবু বিশ্বাস হয় না, এ ক'দিন যা গরম পড়েছে। সারাদিন গুমোট থাকে। দুপুরে লোডশেডিং থাকলে গরমটা ভাল করে মালুম হয়। বিশ্রী লাগতে থাকে। অসহ্য মনে হয় সবকিছু। ঘামে শরীরের কাপড় ব্লাউজ সব চ্যাপ চ্যাপে হয়ে যায়।

আবহাওয়ার খবরে এ কদিন ধরে রোজ বলছে। বিকেলে ঝড় জল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কই। বিকেল হলেই মানসী আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা একটু আধটু কালো হয়। ব্যাস্ ঐটুকুই। তারপর হাওয়া এসে সমস্ত মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। নিমেষেই আবার আকাশ পরিষ্কার। তখন গুমোট ভাবটা কিছুটা কমে যায়। শেষে সন্ধ্যার পর বাতাস আরো বাড়ে। অমল এখন নিজের বাড়ির ছাদে বসে বৈশাখী বাতাসের আমেজ অনুভব করে।

—বাড়ি ফিরে এসে আমার এই ছাদে বসা—পরম শান্তি। অফিসে গিয়ে আমার বার বার কি মনে হয় জান?

—কি? মানসী হালকা করে উত্তর দেয়।

—কখন বাড়ি ফিরে ছাদে যেয়ে বসবো।

মানসী মুখ টিপে আস্তে আস্তে হাসে। কোন কথা বলে না।

—বিশ্বাস করলে না?

—এবার বল, নিজের বাড়ির ছাদের হাওয়া কেমন মিষ্টি?

—সত্যি। এ ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই।

বাবুয়ার খাওয়া হয়ে গেলে আর বেশীক্ষণ বসতে পারে না। ও ঘুমিয়ে পড়ে। একদম রাত জাগতে পারে না। ঠিক বাবার মত। মানসী বলে, বাপকা ব্যাটা।

অমল একথার কোন প্রতিবাদ করে না। রাত জেগে কোন কিছু করা সত্যি পোষায় না। এটা একেবারেই অভ্যেস। কিন্তু খুব ভোরে উঠতে পারে অমল। যে কোন কাজ ঘুম থেকে ভোরে উঠে করতে ওর ভাল লাগে। এবং তাইতে অনুরাগ করে। তবে রাত জাগা রাত জেগে যে কোন কিছুই করতে পুরোপুরি নির্ভর করে ভাল লাগার ওপর। ভাল লাগাটা এমনই জিনিস যার জন্য সে সবকিছুর সংগে বোঝাপড়া করতে পারে।

একদিন রাত জাগা নিয়ে কথা ওঠাতে অমল এইসব যুক্তি রেখেছিল। সভা হয়েছিল তিনজনকে নিয়ে। অমল মানসী আর বাবুয়া।

বাবুয়া বাবার একটানা কথা শুনে হাততালি দিয়ে উঠল। তুমি ঠিক বলেছ, তুমি ঠিক বলেছ। তোমাকে একশোর মধ্যে একশই দিলাম। এবার মা'র পালা। বলো এর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তোমার মতবাদ।

মানসী চুপ করে হাসতে থাকে। তারপর বাবুয়াকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার মত কি তোমার বাবার মতের থেকে আলাদা হতে পারে?

খাওয়া দাওয়ার পরও কোন কোনদিন মানসী আর অমল ছাদে এসে বসে। বাবুয়া তখন ঘুমে অচৈতন্য। দুজনে বসে কিছু সময় আবার গল্প গুজব হয়। পাশের বাড়ির দোতলায় তখন রেকর্ডপ্লেয়ার বাজতে থাকে। ভদ্রলোকের গানের খুব শখ। একটু রাত করেই উনি বাড়ি ফেরেন। প্লেয়ার বাজতে থাকলেই অমল বুঝতে পারে উনি বাড়ি এলেন। শোয়া পর্যন্ত কখনো জোরে কখনো আস্তে প্লেয়ার বাজতে থাকে। প্রায় সবই ইংরেজী বাজনা। ঘরে একটা সবুজ আলো জ্বালিয়ে ভদ্রলোক বাজনা শুনতে থাকেন। ভদ্রলোককে অমলের অদ্ভুত মনে হয়।

প্রতিবেশী হিসেবে মাত্র দু একদিনই যা কথা হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম অনন্তমোহন পাকড়াশী। ব্যবসা করেন। ক্যানিং স্ট্রীটে দোকান। দোতলা বাড়ির ওপরতলায় ওঁরা থাকেন। নিচের তলায় দুজন ভাড়াটে।

ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পাকড়াশীবাবু বলছিলেন, একদম সময় পাই না, বুঝলেন। একদম সময় পাই না। ব্যবসার মত এমন বাজে জীবিকা আর নেই। খুব ভাল আছেন। যারা চাকরি করে তাদের দেখলেই আমার হিংসে হয়।

—পাকড়াশীবাবু, এটা নেহাতই আপনার বিনয়।

—বিশ্বাস করুন, এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। কি আছে বলুন আমাদের জীবনে। গুচ্ছের টাকাই শুধু রোজগার করি। কিন্তু শখ আহ্লাদ মেটানোর কোন সময় নেই।

অমল যুক্তি নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বাজনা খুব ভাল লাগে?

পাকড়াশীবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। সে এক ইতিহাস। ইচ্ছে ছিল বাজনা শিখে বাজিয়ে হব। সে কি আর আমাদের ভাগ্যে আছে। এখন তাই যেটুকু সময় পাই বাজনা শুনে সে সাধ মেটাই।

পাকড়াশীবাবু করুণ করে হাসলেন।

অমল রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ছাদে উঠে এসে দাঁড়ালে প্লেয়ারে বাজা ইংরিজী বাজনার সুর শুনতে পায় আর তখনই মনে পড়ে পাকড়াশীবাবুর সেই করুণ মুখ। ব্যবসায় গুচ্ছের টাকা রোজগার করতে করতে এখন যে ক্লান্ত।

কীর্তনের সুর এখন আরো স্পষ্ট। রাত বাড়ার গান অনেক পরিষ্কার শোনাচ্ছে। কথা সেই একই কিন্তু তার ভিন্ন ভিন্ন সুর। হরে কৃষ্ণ হরে রাম। রাম রাম হরে হরে। অমল যত ভাবছে ততই যেন মোহিত হয়ে যাচ্ছে। হরিসংকীর্তনের অদ্ভুত এক অনুভূতি অমলের দেহে মনে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। মানসী বলল, চল অনেক রাত হয়েছে।

—হ্যাঁ, চল।

কাছাকাছি অন্য কোন শব্দ নেই। দূরে রাস্তার ওপর একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। নতুন কাউকে দেখলেই কুকুরটা এরকম ডাকতে থাকে। কে একজন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। ওর হাঁটার ভঙ্গীটা খুব স্বাভাবিক লাগছিল না। ছাদ থেকে এটা বুঝতে পারছিল অমল।

মানসী একবার হাই তুলল। ঘুমে ওর চোখ দুটো আটকে আসছে। আজ সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে। সকালে জামা কাপড় কাচা। দুপুরে সেলাই। এখন তাই খুব ক্লান্ত লাগছে। মাথাটা কেমন যেন টিপ টিপ করছে। মানসীর মাঝে মাঝে এরকম হয়। দুপুরে একটু না ঘুমোলে বেশি করে হতে থাকে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হয়। তখন মানসীর অসহ্য লাগে।

সন্ধ্যায় ছাদে এক ঘুম দিয়ে নেওয়ার জন্য অমলের ঠিক এই মুহূর্তে ঘুম আসছে না। মানসী ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। তার পাশে বাবুয়া। একটা পা মা'র কোমরের ওপর রেখে ছেলে ঘুমোচ্ছে। কখনো পা কোলবালিশের ওপর দিয়ে কিংবা মা'র গায়ের ওপর তুলে ঘুমোয় বাবুয়া।

জানলা দিয়ে রাস্তার আলো ঘরে এসে পড়েছে। নেটের মশারির ভেতর সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অমল। মশারির ওপর বন্ বন্ করে পাখাটা ঘুরছে। হাওয়ায় দুলছে মশারির চাল। দুলে দুলে একবার ওপরে উঠছে একবার নিচে নামছে। নীল নেটের মশারিটাকে অনেকটা সমুদ্রের জলের মত মনে হচ্ছে। যেন একধার থেকে ঢেউ তুলে অন্যধারে গিয়ে আছড়ে পড়ছে।

ঢং ঢং করে বারোটার ঘন্টা বাজল।

অমল চেষ্টা করল জোর করে চোখ বুজতে। কাল ভোরে আবার অফিস আছে। ভাল ঘুম না হলে সারাদিন চোখটা জ্বালা জ্বালা করবে।

চোখ বুজতেই অমলের সামনে ভেসে উঠল অন্য একটা ছবি। খোলা ছাদের ওপর অমল একা বসে আছে। ছাদের চারদিকটা একদম খোলা। এখনো ঘেরা হয়নি। বাবুয়া কোত্থেকে যেন ছুটে এসে ছাদের ধারে দাঁড়াল। অমলের মুখ দিয়ে একটা চীৎকার বেরিয়ে এল—বাবুয়া। ভয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে নিল। বাবুয়া মা'র পাশেই আছে।

বিনী
শুভবার্ষিকী স্মরণীয় করার দুর্নিবার কাপড়
আপনাদের শুভবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখুন।
বিনীর দুর্নিবার কাপড়ের কোমল পরশ অনুভব
করুন…ভাব বিহ্বল করে দেওয়া রঙ, দারুণ ডিজাইন
ও বাহারের স্যুটিং, শার্টিং ও ড্রেস মেটিরিয়ালের নানান
শোভা। এমন কাপড় যা' শুভ উপলক্ষকে চিরস্মরণীয়
করে রাখে।
বিনী
পলিয়েস্টার মেশানো বস্ত্র
Interpub/BB/3/78 BN

॥ ২০ ॥

একটু সময় সামলে উঠতে দিয়ে অনি বলল, 'খুব ভয় পেয়ে গেছিস না? খুব দ্রুত খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে গায়ের চাদরটা শরীরে জড়িয়ে নিতে নিতে সীতা হাসতে চেষ্টা করল, জ্বরের ঘোরে গা দুর্বলতায় হাসিটা সচ্ছল হল না, 'শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে পড়ল?'

জবাব দিতে গিয়ে কথা আটকে গেল অনির। সীতা কেমন বড়দের মত কথা বলছে। এখন ও বসে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে কিন্তু তবু কেমন বড় বড় দেখাচ্ছে। যুৎসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে সামান্য হাসল অনি, 'জ্বর বাধিয়ে বসে আছিস?'

'ওই একটু। কখন আসা হল?' সীতার বোধ হয় অস্বস্তি হচ্ছিল, খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। অনি বলল, 'সকালে। তুই শো, উঠলি কেন?'

'সারাক্ষণই তো শুয়ে আছি। তা নিজের থেকে আমাদের বাড়িতে আসা হয়েছে না ঠাকুমা ডাকল?' সীতা চোখ বড় বড় করল।

এখন এই মুহূর্তে সত্যি কথাটা বলতে অনির ইচ্ছে করছিল না। ওকে ইতস্তত করতে দেখে সীতা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠাকুমা তুমি ওকে ডেকেছ, না?' বুড়ি প্রথমে ঠাওর না করতে পারলেও শেষে বললেন, 'ও আসব আসব করছিল আর আমিও ডেকে ফেললাম, কেন কি হয়েছে?'

সীতা বলল, 'জলপাইগুড়ির জিলা স্কুলে পড়ে তো, আমাদের এখানে আসাটা মানায় না।'

ঠাকুমা হেসে বললেন, 'পাগলি।'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক ঠিক। এখনও বাচ্চা আছিস তুই।'

চোখের কোণে তাকাল সীতা, 'তাই নাকি! এখনও হাফ প্যান্ট পরা হয় কিন্তু।'

অনি চট করে জিভটা সামলে নিল। ও সীতাকে বলতে পারত যে, সেও ফ্রক পরে কিন্তু ক্রমশ ও টের পাচ্ছিল সীতা যেন ওর চেয়ে অনেক বেশী বুঝে কথা বলে। সেই ছেলেবেলায় সীতা যে কিনা শক্ত হাতে হাত ধরলে কেঁদে ফেলত সে কেমন করে কথা বলছে দ্যাখ।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল অনি, 'বিষু বাপীদের খবর কি রে?'

পিঠের ফুলে থাকা ডানগোছের চুলটাকে সামনে এনে সীতা আঙুলে তার ডগা জড়াতে জড়াতে বলল, 'বিষু তো কুচবিহারে জেংকিন্স স্কুলে পড়ছে। চিঠি লেখালেখি পর্যন্ত হয় না?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'চমৎকার। আমি ভাবলাম শুধু আমিই বঞ্চিত। আর বাপীর কথা না বলাই ভাল। অন্যের কাছে শুনলেই হয়।' সীতা [illegible]

[illegible] বলে পড়ল। বোধ হয় দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

'কেন, কি হয়েছে ওর?'

'খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে বাপী। মেয়েদের টিটকিরি দেয়, সাইকেল নিয়ে পেছন পেছন ঘোরে। রাজারহাট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, যায়ই না।' মুখ বাঁকাল সীতা।

'তোকে কিছু বলেছে?' বাপীর চেহারাটা ও এই বর্ণনার সঙ্গে মেলাতে পারছিল না।

'ইস্, অত সাহস আছে? একদিন রাস্তায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল এই সীতা, রাবণ এলে খবর দিস; কি অসভ্য ছেলে।'

হেসে ফেলল অনি, 'তুই কি বললি?'

'আমি খুব চেঁচামেচি করে উঠতে ও পালিয়ে গেল। যাবার আগে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলে গেল তুই আমাদের সেই সীতা তো রে, বড় হলে গেলে তোরা সব কেমন হয়ে যাস। ও চলে গেলে দম ফেলে বাঁচি বাবা।' সীতা বুকে হাত রাখল, 'জানি না, আমার সামনে যিনি আছেন তিনি শহরে এ সব করেন কিনা। দেখে তো মনে হয়, খুব শান্তশিষ্ট।'

হঠাৎ অনি আবিষ্কার করল যে, সীতা ওকে এতক্ষণ ধরে তুই বা তুমি কোনটাই বলছে না। এভাবে সম্বোধন না করে কথা বলা খুব সহজ নয়, কিন্তু সীতা বেশ অবলীলায় তা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় সীতার মা এক ডিস খাবার হাতে ধরে এলেন। অনি দেখল, তিল আর নারকোলের নাড়ুতে ডিসটা সাজানো, সন্দেশও আছে।

সীতার মা বললেন, 'নাও, খেয়ে নাও। তুমি যা ভালবাস তাই দিলাম।'

খাবার দেখে আঁতকে উঠল অনি, এখনও পেট ভরাট, 'এত খেতে পারব না।'

সীতা হঠাৎ হেসে উঠল শব্দ করে, 'ও ঠাকুমা, শুনছ, তোমার নাড়ুগোপাল বলছে খেতে পারবে না, শহরের জল পেটে পড়লে সব পালটে যায়।'

অনি একটু ধমকের গলায় বলল, 'খুব পাকা পাকা কথা বলছিস তুই।'

সীতার মা বললেন, 'ঠিক বলেছ তুমি। ভীষণ অসভ্য মেয়ে। ভাবছি এবার ওকে এখানকার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে জলপাইগুড়িতে তপুদের স্কুলে পাঠিয়ে দেব। হোস্টেল আছে—বেশ হবে তখন।'

পাশের ঘরে খাটের ওপর বসে ঠাকুমা বললেন, 'মেয়ে হয়েছে যখন, তখন পরের ঘরে তো যাবেই একদিন, এখন থেকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কি দরকার?'

সীতার মা বললেন, 'না, এখানে ওর পড়াশুনো হচ্ছে না।'

ঠাকুমা বললেন, 'জন্মেছে তো হাঁড়িখুন্তি ঠেলতে—বিদ্যে নিয়েও তো সেই একই গতি। মেয়েকে পড়াশুনা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র হতে দেবে?'

চট করে কথাটার জবাব দিলেন না সীতার মা, 'যাই বলুন, শহরের ভাল স্কুলে পড়লে চেহারাই অন্য রকম হয়ে যায়। এই দেখুন আমাদের অনিকে, এখানকার ছেলেদের চেয়ে কত আলাদা, দেখলেই বোঝা যায়।'

সীতা ফুট কাটল, 'নাড়ুগোপাল, নাড়ুগোপাল।' সীতার মা মেয়েকে ধমক দিলেন।
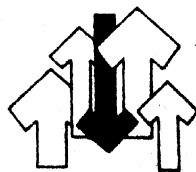
অনি জুতোটা পায়ে দিল তারপর খানিকক্ষণ গল্প করে চলে আসার জন্য উঠল। ঠাকুমা আবার দাদুকে বলার জন্য অনিকে মনে করিয়ে দিলেন। বাইরে এখন রোদ নেই বলা যায়। একটা বিরাট মেঘ ভুটানের পাহাড় থেকে ভেসে এসে এই স্বর্গছেঁড়ার ওপর চুপচাপ [illegible]

সীতা বাইরের দরজা অবধি হেঁটে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে যাওয়া হবে?' অনি বলল, 'বোধ হয় কাল।'

কেমন উদাস গলায় সীতা বলল, 'আজ বিকেলে কি বিষুর সঙ্গে আড্ডা মারা হচ্ছে?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল অনি, 'কেন?'

'এখানে এলেই হয়।' সীতা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর গায়ে এখন চাদর নেই। জ্বর না থাকলেও তার ছাপটা মুখে স্পষ্ট। ওর শরীর এবং পায়ের দিকে তাকাতেই অনির মনে হল—সীতা খুব বড় হয়ে গেছে। সেই কামিনটার মত সীতার শরীর এখন। চাহনিটা দেখে বোধ হয় সীতা সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'বিকেলে না এলে আর কথা বলব না। অসভ্য।' বলে সীতা দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল।

হঠাৎ অনির বুকের ভিতর কি যেন কেমন করে উঠল। সীতাকে আর একবার দেখার জন্য মুখ ফিরিয়ে ও দেখল জানলায় বসে ঠাকুমা ওর দিকে চেয়ে আছেন।
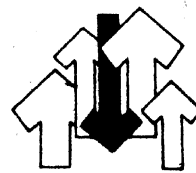
বাগানের এলাকা ছাড়িয়ে আসাম রোড ধরে বাজারের দিকে হাঁটতে বেশ অবাক হয়ে গেল অনি। দুপাশে এত দোকানপাট হয়ে গেছে যে, জায়গাটা চেনাই যায় না। আগে যেসব জায়গায় শুধু হাটবারে ত্রিপল টাঙিয়ে দোকান বসত সেখানে বেশ মজবুত কাঠের দোকানঘর দেখতে পেল সে। দোকানদারদের অধিকাংশই অচেনা, বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়ায় এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসেছে। শুয়োর-কাটার মাঠটা ছাড়িয়ে আগে নদী, ওপারের ধানক্ষেত স্পষ্ট দেখা যেত, এখন সব আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

বিলাসের মিষ্টির দোকানটা বেশ বড় হয়েছে এখন, নতুন শো-কেসের মধ্যে মিষ্টির থালাগুলো দূর থেকে দেখা যায়। বিলাসকে কাছেপিঠে দেখল না অনি। আঙরাভাসা নদীর পুলটার ওপর এসে দাঁড়াল অনি। নীচে লকগেটের তলা দিয়ে সেই রকম জল প্রচণ্ড স্রোতে ফেনা জড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে ওদের কোয়ার্টারের পেছন দিক দিয়ে ফ্যাক্টরীর হুইল ঘোরাতে। অনির মনে পড়ল বাপী একবার বলেছিল, এখান থেকে সাঁতরে বাড়ির পেছন অবধি যাবে, আর যাওয়া হয়নি। বাপীটা এরকম হয়ে গেল কি করে? মেয়েদের টিটকিরি দিলে কি লাভ হয়? বরং সীতার মত মেয়েরা তো চেঁচামেচি করবে। তা ছাড়া, খামোকা টিটকিরি দেবেই বা কেন?

ভরত হাজামের দোকানটা নেই। সেখানে এখন বেশ বড়সড় সেলুন হয়েছে, ওপরে সাইনবোর্ডে নাম পড়ল অনি, 'কেশচর্চা'। রাস্তা থেকেই ভেতরের বড় বড় আয়না, চেয়ার দেখা যায়। বুকে সাদা কাপড় বেঁধে তিনজন লোক চুল কাটছে খদ্দেরের। সেই ল্যাংড়া কুকুর বা ভরত হাজাম, কাউকেই কাছেপিঠে চোখে পড়ল না। নাচ বুড়িয়া নাচ, কাঁধে পর নাচ—অনি হেসে ফেলল।

চৌমাথায় এসে অনির চমক আরো বেড়ে গেল। স্বর্গছেঁড়া যেন রাতারাতি শহর হয়ে গিয়েছে। পুরো চৌমাথা ঘিরে পান সিগারেট, রেস্টুরেন্ট আর স্টেশনারি দোকানে ছেয়ে গেছে। ওপাশের পেট্রল-পাম্পের গায়ে অনেক নতুন নতুন সাইনবোর্ড ঝুলেছে। সকাল পেরিয়ে যাওয়া এই সময়টায় আগে স্বর্গছেঁড়ার রাস্তায় লোকজন থাকত না বললেই চলে, এখন জলপাইগুড়ির মত জমজমাট হয়ে আছে। এমন সময় কুচবিহার-জলপাইগুড়ি রুটের একটা বাস এসে সামনে দাঁড়াতে অনি সেদিকে তাকাল। কুলিকামিন [illegible] বইবার জন্য ছুটে গেল সেদিকে। তাদের [illegible] দিকে নজর পড়তে অনি সোজা হয়ে দাঁড়াল, [illegible]

বাসের মাথার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, স্বর্গছেঁড়ায় এখন কেউ মালপত্র নিয়ে নামল না। অনির মনে হচ্ছিল, ও ভুল দেখছে। সেই ঝাড়িকাকু এখন কুলিগিরি করছে। ভিড়টা একটু হালকা হতে ঝাড়িকাকু ঘুরে দাঁড়াতে রাস্তার এপাশে দাঁড়ানো অনির সঙ্গে চোখাচোখি হল। অনি দেখল, প্রথমে যেন চিনতে পারেনি চট করে, তারপর হঠাৎ ঝাড়িকাকুর চেহারাটা একদম অন্য রকম হয়ে গেল। যেন অনিকে দ্যাখেনি এমন ভান করে দ্রুত পা চালিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনি আর দেরি করল না। পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল 'ও ঝাড়িকাকু, ঝাড়িকাকু।'

কয়েক পা হেঁটে বোধ হয় আর এড়াতে পারল না, ঝাড়িকাকু দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনি, 'আরে, তুমি আমাকে দেখেও চলে যাচ্ছিলে কেন?' ঝাড়িকাকুর একটা হাত ধরল সে। খুব বুড়িয়ে গেছে ঝাড়িকাকু। মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গাল ভেঙে গেছে, হাতময় শিরা জড়ানো। অনি প্রথমেই টের পেল, ওর হাতে ধরা খড়খড়ে শক্ত হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তারপরই মুখ বিকৃত করে প্রাণপণে অতবড় মানুষটা একটা কান্না চাপবার চেষ্টা করে যেতে লাগল প্রাণপণে। কারো চোখে জল দেখলেই অনির চোখ কেমন করে ওঠে, 'এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

এবার হাউমাউ করে উঠল ঝাড়িকাকু, 'তোর বাবা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে রে, এই এট্টুখানি দেখেছি যে মহীকে সে আমাকে দূর করে দিল।'
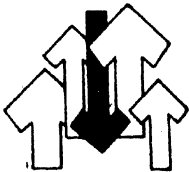
এরকম একটা দৃশ্য প্রকাশ্য চৌমাথায় ঘটতে দেখে মুহূর্তেই বেশ ভিড় জমে গেল। দু-তিনজন কুলি-গোছের লোক ঝাড়িকাকুকে বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি হয়েছে? কোন শালা মেরেছে? ঝাড়িকাকু কারো কথার জবাব দিচ্ছিল না বটে, কিন্তু অনির খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সবাই তার দিকে সন্দেহের চোখে যে তাকাচ্ছে এটা বুঝতে পারছিল সে। যারা অনিকে চিনতে পারছে তারা কেউ কেউ বলতে লাগল, 'নিজের হাতে মানুষ করেছে—এ বাবা নাড়ির বাঁধনের চেয়ে বেশী।' ভিড়টা যখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে এমন সময় দু-তিনটে সাইকেল খুব জোরে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ওদের পাশে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। 'কি খেলা হচ্ছে, পকেটমার নাকি?' গলাটা খুব চেনা চেনা মনে হল অনির, সামনে মানুষের আড়াল থাকায় দেখতে পারছিল না। আরো দুজন কি একটা বলে এগিয়ে আসতেই ভিড়টা চট করে হালকা হয়ে গেল। অনি দেখল, একটা লম্বাটে ছেলে এসে ওদের দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠল, 'ক্লাইং কেস!'

'সে আবার কি!' ওপাশে সাইকেলে ভর দিয়ে কথাটা যে বলল তাকে এবার দেখতে পেল অনি। চোখাচোখি হতে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর অনি কিছু বোঝার আগেই বাপী ওকে তীরের মত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ঝনঝন করে একটা সাইকেলকে মাটিতে পড়ে যেতে শুনল সে। সেদিকে কান না দিয়ে বাপী ততক্ষণ একনাগাড়ে কি সব বলে গিয়ে শেষ করল, 'গুড বয় হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুলে গেলি, অনি?'

ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল অনি, 'না, না, ভুলব কেন? তুইও তো আমাকে চিঠি দিস না।'

বাপী বলল, 'ভেবেছিলাম লেখ, কিন্তু এত বানান ভুল হয়ে যায় না, যে লজ্জা করে। আমি না খুব খারাপ হয়ে গেছি, সবাই বলে।'

'কেন? খারাপ হতে যাবি কেন?' অনির কেমন আমি এখন বীরপাড়ায় যাচ্ছি, একটা ঝামেলা হয়েছে সামলাতে হবে। বিকেল বেলায় দেখা হবে, হ্যাঁ।' অনি ঘাড় নাড়তেই বাপী দৌড়ে সাইকেলটা মাটি থেকে তুলে লাফিয়ে সিটে উঠল। অনি দেখল ওর দুই সঙ্গীকে নিয়ে তিনটে সাইকেল দ্রুত বীরপাড়ার দিকে চলে গেল।

বোধহয় অন্য একটা ঘটনা সামনে ঘটে যাওয়ায় ঝাড়িকাকু সামলে নিয়েছিল এরই মধ্যে। বাপীরা চলে গেলে কয়েকজন দূর থেকে ওদের দেখতে লাগল কিন্তু আগের মত কাছে এসে ভীড় করল না। অনি দেখল লঙ্কাপাড়া থেকে একটা প্রাইভেট বাস এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতেই কুলিরা সেদিকে ছুটে গেল। ঝাড়িকাকু একবারও বাসটার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলি? কর্তাবাবু কেমন আছে?'

'সকালে। দাদুর পা ভেঙে গেছে কাল, এমনিতে ভাল আছে।'

'সেকি? পা ভাঙল কেন? এই বুড়ো বয়সে—পড়ে গিয়েছিল?'

'না, রিকশায় ধাক্কা লেগেছিল।'

শুনে ঝাড়িকাকু জিভ দিয়ে কেমন একটা চুক চুক শব্দ করল।

'দিদি কেমন আছে?'

'ভাল। কিন্তু তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভাল নেই রে।' ঝাড়িকাকু ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগল স্কুলের রাস্তায়। যদিও শরীর দেখেই বোঝা যায় তবু অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমার যে কেউ নেই রে, একা একা কি ভাল থাকা যায়।' অনি কথাটা শুনে ঝাড়িকাকুর হাতটা চট করে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। ঝাড়িকাকু বলল, 'তুই আমার সঙ্গে হাঁটছিস দেখলে মহী রাগ করবে।'

'কেন, রাগ করবে কেন? তুমি কি আমার পর?'

'তুই যে কবে বড় হবি!'

'আমি তো বড় হয়েছি, তোমার চেয়ে লম্বা।'

'এই বড় নয়। যে বড় হলে মহীর মত আমাকে চড় মারা যায়!'

'কেন তোমাকে মেরেছিল বাবা? কি করেছিলে তুমি?'

'কি হবে সেকথা শুনে। হাজার হোক মহী তোর বাবা, বাবার নিন্দে কোন ছেলের শুনতে নেই।' মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝাড়িকাকু।

তবু অনি জেদ ধরল, 'মা বলত সত্যি কথা বললে শুনলে কোন পাপ হয় না!'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ঝাড়িকাকু, 'মা! তোর মায়ের কথা মনে আছে?'

অবাক হয়ে গেল অনি, 'কেন থাকবে না! সব মনে আছে।'

'আমি খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। এই সেদিন কর্তাবাবু মহীকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন তোর মাকে। তারপর তুই হলি—কি যে হয়ে যায় সব। তোর মা চলে গেলে মহীটা একদম ভেঙে পড়েছিল। তখন রোজ রাত্রে ওর ঘরে শুতাম আমি। একা শুলেই কান্নাকাটি করত। ওর খাটের পাশে মাটিতে শুয়ে আমি শুধু তোর মায়ের কথা ছাড়া সব গল্প করতাম।' ঝাড়িকাকু কথা থামিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। এসব খবর অনির জানা নেই। ঝাড়িকাকু কোন রকমে তখন বাবাকে রান্না করে খাওয়াচ্ছে—এই খবরটাই শুনেছিল শুধু। তাই বাকিটা শোনার জন্য বলল, 'তারপর?'

বাঁ হাতের ডানায় চট করে মুখটা ঘষে নিয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তারপর যখন মহীর আবার বিয়ের কথা উঠল তখন ও কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্তু অন্য বাবুরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর মত করিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল।' হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তোর নতুন মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।'

হেসে ফেলল অনি, 'বারে! কেন হবে না?'

ঝাড়িকাকু বলল, 'বড় ভাল মেয়ে রে। বিয়ের [illegible]

থেকে সংসার কাজও শিখে নিয়েছিল। যে গেছে তার জন্য মানুষ কতদিন দুঃখ করতে পারে! কিন্তু এই মেয়েটা রাতারাতি যেন এই বাড়ির লোক হয়ে গেল।'

'আরে! তুমি আমাদের বড়বাবুর নাতি না?'

অনি মুখ ঘুরিয়ে দেখল, একজন বৃদ্ধ মতন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

মাথা নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ।'

'বড়বাবু কেমন আছেন?' বৃদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে তার পিছনে বিরাট স-মিল। অনি এতক্ষণে চিনতে পারল। ওঁর নাম হারাণচন্দ্র পাল। খুব বড়লোক। দু-তিনটে স-মিল আছে, বাসফাস, জমিটমি আছে। দাদুর কাছে শুনেছে অনি একদম ছোটবেলায় ইনি স্বর্গ-ছেঁড়ায় এসে মুড়ি বিক্রী করতেন। পা ভাঙার কথাটা বলতে গিয়েও ঘাড় নাড়ল অনি। ক্লাসে সংস্কৃতের স্যার পড়া জিজ্ঞাসা করলে মন্টু এইরকমভাবে ঘাড় নাড়ে। হাঁ কিংবা না দুটোই হয়।

'ভাল, ভাল। তুমি তো বেশ বড় হয়ে গেছ হে। কিন্তু এত রোগা কেন? তালপাতার সেপাই! আরে দেশ গড়তে গেলে স্বাস্থ্য ভাল চাই। সেই পনেরই আগস্ট সকালে ফ্লাগ তুলেছিলে তুমি, যতই বড় হও, দেখেই চিনেছি। হেঁ হেঁ। বেশ বেশ।' বৃদ্ধ হাসি হাসি মুখ করে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ওরা আবার হাঁটতে লাগল। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের কথাটা বৃদ্ধ বলতেই ওর বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল। স্বর্গছেঁড়ার অনেকেই নিশ্চয়ই মনে করে রেখেছে তার কথা। উঃ, ক্লাসটা কি দারুণ উড়ছিল। ভবানীমাস্টারের মুখটা মনে পড়তেই ও দেখা করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝাড়িকাকু চুপচাপ কিছু ভাবছিল। ও বলল, 'চল, স্কুলে যেতে যেতে সব শুনব।'

'কেন, স্কুল কি হবে?' ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা পছন্দ করল না।

'ভবানীমাস্টারকে দেখে আসি।'

'কাকে?'

'ভবানীমাস্টার। আমাদের পড়াত না? ভবানী-মাস্টার, নতুন দিদিমণি!'

'ও! সে স্কুল তো উঠে গিয়েছে। এখন হিন্দু-পাড়ায় বিরাট স্কুল হয়েছে। তোদের সেই নতুন দিদিমণির বিয়ে হয়ে গিয়েছে মদারীহাটে। আর ভবানী-মাস্টারের খুব অসুখ, বাঁচবে না।'

'কি হয়েছে?' অনি সেই মুখ মনে করতে চেয়ে স্পষ্ট দেখে ফেলল।

'শরীর নাকি অবশ হয়ে গেছে। কলোনিতে আছে, আমি দেখিনি।'

একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা বোধ অনিমেষকে ঘিরে ধরল আচমকা। এইসব মানুষ এবং এই পরিচিত জায়গাটা যদি এমনি করে তারা চেহারা পালটে একদম অচেনা হয়ে যায় তাহলে সে কি করবে!

অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কলোনিতে কোথায় উনি আছেন তুমি জানো?'

ঝাড়িকাকু ঘাড় নাড়ল, না। তারপর বলল, 'কেন?

'আমি যাব। তুমি চল আমার সঙ্গে, খুঁজে নেব। অনি জোর করে ঝাড়িকাকুর হাত ধরে কলোনির দিকে হাঁটতে লাগল। দুপাশে কাঁচা কাঠের গন্ধ বেরুচ্ছে স-মিলগুলো থেকে একটানা করাত চালাবার শব্দ হচ্ছে। একটা ট্রাক্টর চা-পাতা বোঝাই ক্যারিয়ারকে টেনে নিয়ে ফ্যাক্টরীর দিকে চলে গেল।

অনি পুরোন কথায় খেই ধরে জিজ্ঞাসা করল 'তারপর কি হল? বাবা তোমাকে মারল কেন?'

ঝাড়িকাকু বলল, 'এসব কথা থাক।'

'তুমি বারবার থাক বল না তো!' অনি প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল।

ঝাড়িকাকু বিব্রত হয়ে ওর দিকে তাকাল। এই ছোট্ট মানুষটা খুব দ্বিধায় পড়েছে বোঝা যাচ্ছিল। তারপর যেন বাধ্য হয়ে বলল, 'তোর নতুন মাকে নিয়ে তোর বাবা মাঝে মাঝে কুচবিহারে যেত ডাক্তারের কাছে। শেষে একদিন দুজনের মাঝে কি ঝগড়া [illegible]

'আঃ। বলো বলছি।' আনি অধীর হয়ে উঠল।

'তারপর মহী মদ খেতে লাগল। প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত। কোথা থেকে ও একজন লোককে ধরে এনেছিল যে নাকি ছবির সামনে বসে ভূত নামাতে পারে। রোজ রাত্রে দরজা বন্ধ করে ওরা নাকি তোর মাকে নামাত। একদিন তোর মায়ের একটা ছবি বিরাট করে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে খুব ধূপ ধুনো দিতে লাগল। জানলা দরজা বন্ধ করে দিল। নাকি ও তোর মায়ের সঙ্গে ওখানে এলেই কথা বলতে পারে। কত অন্যায় করেছে সব নাকি এখন খেয়াল পড়ছিল। তোর নতুন মা কেমন চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল। একদিন ঘরে বাতি দিতে গিয়ে আমি জানলাটা খুলেছিলাম সেসময় ও মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল। জানলা খোলা দেখে কি হম্বিতম্বি, আমি আর পারলাম না। বললাম, এরকম করলে আমি কর্তাবাবুকে সব বলে দেব। এই শুনে ও আমাকে মারতে লাগল। বলল চাকর চাকরের মত থাকবি। একে মাতাল তারপর ইদানীং ওর মাথার ঠিক নেই, আমি চুপচাপ মার খেতে লাগলাম। তাই দেখে নতুন বউ ছুটে এসে ওকে ধরতে মহী বলল, ও খুব দরদ। এই মুহূর্তে তুই বেরিয়ে যা।'

'আমি চলে এলাম।'

'আসার সময় কিছু বলল না?'

'তোর নতুন মা আমাকে অনেক করে বলেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল মহীর হয়ে। কিন্তু যে বাড়িতে সারা জীবন কাটিয়ে এলাম নিজের দিকে না তাকিয়ে সেই বাড়ির ছেলে চড় মারলে আর থাকা যায়! কর্তাবাবু যাওয়ার সময় আমার যত মাইনের টাকা মহীর কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিইনি। চলে আসার সময় ও মনে করে দেয়নি। যদি কোনদিন ইচ্ছে হয় তো দেবে, আমি চাইব না।'

'কেন চাইবে না, তোমার নিজের টাকা নয়?' শক্ত হয়ে গিয়েছিল আনি এসব কথা শুনে। ছোটমায়ের মুখের কাটা দাগটা যে কোত্থেকে এল এতক্ষণে বুঝতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। আনি দেখল ও বাবার ওপর রাগতে পারছে না। অদ্ভুত নিরাসক্ত হয়ে বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। বাবা যেন অনেক দূরের মানুষ, তাঁর কোন ব্যাপারই তাকে স্পর্শ করছে না। কিন্তু ছোটমায়ের জন্য ওর কষ্ট হতে লাগল। বাবা যখন বিয়ে করেছিল তখনও ওর কিছু মনে হয়নি, এখনও হল না। শুধু ওর মনে হল ওবাড়িতে দুজন খুব কষ্ট পাচ্ছে, একজন ছোটমা আর একজন যাকে ছবিতে পুরে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আনি আবার প্রশ্নটা করতে ঝাড়িকাকু বলল, 'সব সময় কি চাওয়া যায়! টাকা চাইলেই তো ও চাকর বলে দিয়ে দিত। ও নিজে থেকেই দেবে।'

'দাদুকে বললে না কেন? তুমি তো জলপাই-গুড়িতে যেতে পারতে!'

'লজ্জা করছিল। তাছাড়া এসব শুনলে কর্তাবাবু কষ্ট পাবে। তাই একজনকে দিয়ে কাল খবর পাঠিয়েছিলাম যে দেখা হলে বলতে যে মহীর খুব অসুখ। এ বাড়ির ছেলে হয়ে মদ খায় কি করে? বড়দা যে ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে ভুলে গেল! আর মহীর মত শান্ত ছেলে, আঃ। এ নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে ওকে। এরকম হলে বাগানের কাজ থাকবে না ওর। লোকে বলছে ওর নাকি মাথার ঠিক নেই। আমি তো আর যাই না যে দেখব।'

আনি ঝাড়িকাকুর দিকে তাকাল। দাদুকে গিয়ে সব কথা বলতে হবে। শুনলে নিশ্চয়ই দাদু বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন। কিন্তু তাহলে ছোটমায়ের কি হবে? কি করা যায় বুঝতে পারছিল না আনি। বাবাকে কি ভূতে পেয়েছে? বন্ধ জানলা-দরজার অন্ধকার ঘরে বসে বাবা যদি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে তবে তো সে মায়ের ভূত! কথাটা মনে হতেই ও হেসে ফেলল। মা কখনো ভূত হতে পারে না। বতসব বুজরুকি। ও ঠিক করল ব্যাপারটা কি আজ রাত্রে দেখবে।

কলোনির মুখটায় এসে ঝাড়িকাকু কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল ভবানীমাস্টার কোথায় থাকেন। আগে স্বর্গছেঁড়ার এই অঞ্চলটায় লোক-

অবস্থা ছিল কিন্তু সে [illegible]। খুঁটিমারি ফরেস্টের গা ঘেঁষে স্বর্গছেঁড়া টি এস্টে অব্দি প্রান্ত। বাসমহলের এই জায়গাগুলো তখন আগ জঙ্গলে ভরতি ছিল। সাতচল্লিশ সালের পর ওপা মানুষেরা এপারে আসতে শুরু করলে এইসব জায় গুলোর চেহারা পালটে গেল রাতারাতি। আনি প্রথম এমন একটা জায়গায় এল যাকে কলোনি ব কলোনি শব্দটা এর আগে ও শোনেনি। ভিতরে ঢ ও দেখল সরু রাস্তার দুপাশে কাঠ আর টি ছোটছোট বাড়ি, এর উঠোনের গায়ে ওর শোওয়ার সদর অন্দর কিছু নেই। বোঝাই যায় যারা এসে তাঁরা বাধ্য হয়ে এখানে আছেন।
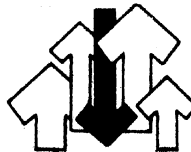
ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ির গায়ে আলকাতরা বোলানো, দরজা বন্ধ, ওরা জানল এখানেই ভবানী-মাস্টার থাকেন। একটা ভাঙা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা দরজার গায়ে এসে দেখল একটা মা-কুকুর তার তিন-চারটে বাচ্চাকে চোখ বুজে শুয়ে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। বোধহয় এসময় কারো আসার কথা নয় বলে সে খুব বিরক্ত হয়ে দুবার ডাকল। বন্ধ দরজায় শব্দ করতেই ভিতরে কেউ খুব আস্তে কিছু বলল। কয়েকটা বাচ্চা ওদের দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তাদের একজন বলল, দরজা খোলাই আছে জোরে ঠেললেই খুলে যাবে। সত্যি দরজাটা খোলাই ছিল। আনি ভিতরে ঢুকেই ভবানীমাস্টারকে দেখতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে অতিকষ্টে দরজার দিকে ঠিকরে বেরোন দুটো চোখে যিনি তাকিয়ে আছেন তাঁকে দেখে পাথর হয়ে গেল আনি। সমস্ত শরীর বিছানার সঙ্গে লেপ্টানো, বিছানাটা অপরিষ্কার। মাথার পিছনে জানলাটা খোলা।

'কে? সামনে এসো।' অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুল গলা থেকে। বুঝতে কষ্ট হয়।

আনি পায়ে পায়ে ভবানীমাস্টারের সামনে এল। ঝাড়িকাকু ঢুকল না ঘরে। আনি দেখল দুটো চোখ ক্রমশ তার মুখের ওপর স্থির হল এবং সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

আনি দেখল মাস্টারমশাইয়ের শরীর শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেছে কিন্তু মুখখানা প্রায় একইরকম আছে। যদিও কাঁচাপাকা দাড়িতে সমস্ত মুখ ঢাকা তবু চিনতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরুল [illegible] থেকে, 'অ-নি-মে-ষ'।

তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল আনি, 'হ্যাঁ।' ভবানীমাস্টার তাকে চিনতে পেরেছেন।

'অ-নেক বড় হ-য়ে-ছ।' ঘড়ঘড় শব্দটা উচ্চারণের অনেকটা ঢেকে দিচ্ছিল। কথা বললে হয়তো কষ্ট বেড়ে যাবে, আনি বলল, 'কথা বলবেন না।'

ভবানীমাস্টার হাসলেন, 'প্যা-স-কা-ইঁসিস।'

এমন সময় বাইরে থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, 'কে আইছে শুনলাম, দুদিন পরেই তো মর এখন আইয়া কামটা কি? অ। আপনার আইছে উনার কেউ হন নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িকাকু গলা শুনল আনি, 'না না। মাস্টারের ছাত্র এসেছে।' উত্তরে সেই মহিলাকণ্ঠ বিরক্ত হল, 'এখন আ পড়াইতে পারব নাকি উনি। উনি থাইলে আম পরান জুড়ায়, আর পারি না।'

ভবানীমাস্টার বললেন, 'তো-তো-মার মনে আ- পতাকা তু-লে-ছিলে?'

আনি বলল, 'হ্যাঁ। আপনার সব কথা মনে আ আমার।'

'বড় হও বাবা, বড় হও।' কথাটা বলতে বল চোখের কোল বেয়ে একটা সরু জলের ধারা বেরি এসে বালিশের দিকে চলে গেল। আনি আর দাঁড়া পারছিল না। শায়িত মানুষকে প্রণাম করতে নে ও চট করে এগিয়ে গিয়ে হাতের চেটো দিয়ে ভবা মাস্টারের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে দৌড়ে বাইরে চ

মানুষ পাথর

অমরজিৎ কর

॥ চোদ্দ ॥

আওয়ার পিপ্‌ল ওয়ার ইন শালামবার। নাও দেয়ার আইজ্‌ আর ওপেন্‌।

ফিরে যাওয়ার পথে লেংগা ল্যাংগের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তাঁর অফিস ঘর। যতক্ষণ আমরা সবাক ছিলাম, আমাদের সামনে নিজের আসনটিতে তিনি নিশ্চুপ বসেছিলেন। পাথরের মূর্তি। আত্মমগ্ন। ধ্যানস্থ যেন। আমরা যখন নিশ্চুপ হয়েছিলাম, তখনও তিনি পাথরের মূর্তির মতই বসেছিলেন কিছুক্ষণ। তারপরই তাঁর প্রথম সংলাপ : আওয়ার পিপ্‌ল ওয়ার ইন স্লামবার। নাও দেয়ার আইজ্‌ আর ওপেন্‌।

তাঁর এই কথায় আমরা চমকেই উঠেছিলাম। ঝড়ের সংকেত?

না। ঝড় নয়। নাগাল্যাণ্ডের বৈষয়িক উন্নতির জন্যে জিওলজিক্যাল সারভে অব ইনডিয়ার কাছ থেকে তিনি যা আশা করেন, কোন রকম ভণিতা না করে শুধু সেটুকুই বলে গেলেন তিনি।

—উই নিড রোডস্‌, পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারস ফর ইনডাসট্রিজ্‌।

শম্ভু সেন তাঁর এই কথায় মন্তব্য করলেন, কেন? তুয়েংসাং জেলার নিমিতে পাওয়া গেছে বিরাট চুনা-পাথরের স্তর। একশ মিটার পুরু, দশ কিলোমিটার লম্বা। এবং যেখানে চুনোপাথর, সেখানে বেশ বড়সড় একটি সিমেন্ট কারখানা তৈরি করাটা কিছু অসম্ভব নয়।

জানি। নিমির চুনাপাথর খুবই উৎকৃষ্ট। কিছু দিন আগে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছিলেন, নিমির চুনাপাথর এত বেশী উৎকৃষ্ট যে তা দিয়ে সিমেন্ট তৈরি করতে গেলে তার সংগে কিছুটা খাদ মিশিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বড়সড় একটা সিমেণ্ট কারখানা গড়তে গেলে তো প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি দরকার। সেটা আসছে কোত্থেকে? পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন মিঃ ল্যাংগ।

দোইয়াং জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। যার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে আশি মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সেখান থেকে পাবেন।

জিওলজিক্যাল সারভে এই কেন্দ্রটির স্থান নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, তার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ। কিন্তু সেই জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে দরকার আরও সাত আট বছর। এত দিন আমরা কি তা হলে বসে থাকবো? জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হোক, আপত্তি নেই। সেই সংগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরিরও তো ব্যবস্থা করা যেতে পারে? নাগাল্যাণ্ডে কয়লার তো অভাব নেই। আপনারা তা প্রমাণ করেছেন। মাঝখানে অবশ্য দেশের আইনমত কোল ইনডিয়া এসে হাজির হচ্ছেন। আপনাদের তথ্য তাঁরা যাচাই করবেন, তারপর ঠিক করবেন কোন কোন কয়লা খনি এলাকায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানো সম্ভব। এত সব করতে সময় [illegible]

গাঁওবুড়া

এ কাজটা জিওলজিকাল সারভে অব ইনডিয়াই তো করতে পারেন? তাতে সময় বাঁচবে অনেক। নাগাল্যান্ড হ্যাজ রাইট টু রিকোয়েস্ট অ্যাজ ও স্পেশাল কেস টু স্টাডি, এসটিমেট অ্যান্ড প্রুভ্‌ হার কোল ডিপোজিট বাই জি এস আই। আওয়ার পিপ্‌ল আর ভেরি মাচ কীন্‌, দে আর ভেরি মাচ কনসারন্‌ড...।

কোন অনুকম্পা নয়। মিঃ ল্যাংগের কথায় এটাই বুঝেছিলাম, নাগাল্যাণ্ডের মানুষ প্রস্তুত। তাঁরা খাটতে চান। অহেতুক নিয়মতান্ত্রিক বিধানের দাস হয়ে কালক্ষেপণ করতে রাজি নন।

রাজি যে নন, কোহিমা শহরের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে চলতে গিয়ে তা বোঝা গেল। মূল শহর তো বটেই, আশেপাশে তৈরি হচ্ছে উপনগরী। গড়ে উঠছে আধুনিক ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ছোট বড় কারখানা। এখানকার কুটির শিল্প অনবদ্য। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে নাগাল্যাণ্ডের মানুষ কোহিমাকে সাজিয়ে তুলছে। এই শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে কাজ করে চলেছে।

শহর ছেড়ে আবার ডিমাপুরের পথে গিয়ে পড়লাম আমরা। আমাদের কনভয়। প্রথমে আমাদের গাড়ি, তারপর মিঃ কাকের। তাঁর সংগে রয়েছেন তাঁর সহকারী মিঃ বরুয়া। পেছনে তিনটি

মিনিট দশেক পথ এগোতেই ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, এবার কিছুটা ঘুর পথে যেতে হবে আমাদের। সামনে রাস্তা তৈরির কাজ হচ্ছে। তাই ঘুর পথে যাওয়া।

এদিকের পথ আরও কিছুটা দুর্গম। এক একটি পাহাড়, তার ওপর আর একটি পাহাড়। মাঝে মাঝে তাদের চূড়া ত্রিভুজের ডগার মত আকাশের দিকে উঠে গেছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ। দুর্গম পথ। বড় বড় গাছওয়ালা অরণ্য বলতে যা বোঝায়—তেমন কিছু নেই। নাগাল্যাণ্ডে বৃষ্টি হয় প্রচুর। তবে সেটা বর্ষার সময়। এপ্রিল থেকে সেপটেমবর, কি বড় জোর অকটোবর পর্যন্ত। ওই সময় শুধু কোহিমাতেই বৃষ্টির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১৯৪৩ মিলিমিটারের মত। তখন পাহাড় বেয়ে ঝর্না নামে অজস্র। কিন্তু এখন—যদিও এটা এপ্রিল মাস—বর্ষার এখনও দেখা নেই। চারদিকে রুক্ষ পাথরের স্তূপ। তার ওপর রুক্ষ মাটি। মাটির ওপর ঝোপঝাড়। পথে লোকজন চোখে পড়ে না বললেই চলে।

কোহিমা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটি শহর। কেক্রিমা। শহর না বলে বরং বলি গ্রাম। নাগাদের গ্রাম। জীবন এখানে শ্লথ। এখানেও চায়ের দোকান আছে। আছে পুরুষদের ভিড়ই বেশী। ওরা শ্রমিক। কেউ কাঠ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। কেউ চলেছে বাজারে। সওদা বিক্রি করতে। কেক্রিমার কিছু দূরে পড়ল আর একটি ক্ষুদে শহর চক্ষবেমা। চক্ষবেমার পর ফুটসেরো।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, নাগাল্যাণ্ডের এটাই উচ্চতম গিরিশৃংগ।

কথাটা কানে যেতেই গায়ের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। ফুটসেরোর কথা আগে শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, এখানকার নাগারা নাকি এক সময়ে বিদ্রোহী হিসেবে নামাংকিত হয়েছিল। রিবেল। 'রিবেল'ই তখন ছিলো তাদের পরিচয়।

বলেন কি, ডঃ শ্রীবাস্তব? আমরা তো তা হলে একটা সাংঘাতিক জায়গা দিয়ে চলেছি। মনের উত্তেজনা রাখতে না পেরে বলেই ফেললাম আমি।

আমার কথায় নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার দিকে চোখ মটকিয়ে শম্ভুবাবু মন্তব্য করলেন, হ্যাঁ, খুব সাবধান! ভাবটা এমন, ঠাকুমা যেন দুরন্ত নাতিকে বর্গীর ভয় দেখালেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডঃ শ্রীবাস্তব। রাস্তার পাশে কিছু দূরে হাতের ইংগিতে বললেন, ওই যে, আপনার সেই সাংঘাতিক মানুষরা।

তাঁর ইংগিতে সামনের দিকে চাইতেই দেখি জন পাঁচেক পুরুষ। প্রত্যেকের পরনে খাকির হাফ প্যাণ্ট। একজনের গায়ে গাঢ় লাল রঙের চাদর। অবশিষ্টদের খালি গা। গায়ের রঙ তামাটে। মাথায় ছোট ছোট চুল। খুব যে লম্বা তা বলব না। প্রত্যেকের সংগেই একটি বন্দুক।

আমাদের গাড়ি তাদের কাছাকাছি হতেই তারা ক্ষিপ্রতার সংগে রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ালো। মনে হলো, পলকে দেখে নিলো একবার আমরা কারা।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, ওদের 'উইশ' করুন। বলেই নিজের সারা মুখে উচ্ছ্বাসভরা হাসির প্রলেপ ছড়িয়ে ডান হাত নেড়ে 'উইশ' করলেন তিনি।

—হ্যালো, হ্যালো! সব আচ্ছা হ্যায়।

আমরাও যন্ত্রের মত তাঁকে অনুসরণ করলাম।

দেখলাম লোকগুলি খাড়িংগাড়িতে ঝুঁকে আমাদের গাড়ির সামনের দিকটা দেখে নিলো। তারপর মিলিটারি কায়দায় অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট করল।

সব আচ্ছা হ্যায়। এবার আরও উচ্ছ্বসিত ভংগিতে স্যালুট করার কায়দায় হাত তুললেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

ওরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তারা বুঝি না। তাই কী বলল জানি না। বয়েস আর কত হবে? পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে?

আমরা ওদের পেরিয়ে গেলাম।

এরা সব নাগা। এক সময় রিবেল ছিলো। এখন গ্রামরক্ষী। দেখলেন না, হাতে বন্দুক? বেশীর ভাগই লোকাল মেড। রিবেলরা যাতে বাইরে থেকে না এসে এখানে কোন গোলমাল পাকাতে সে দিকে লক্ষ রাখাই এদের দায়িত্ব। এর জন্যে এরা মাইনে পায়। আর ওই যে দেখলেন লাল চাদর গায়ে একজন, ওই হলো ওদের সর্দার। [illegible]

মা, আমরা আমাদের আলমারিতেও ওডোনিল রাখি কেন?

তির একঘেয়েমিতা

অমন চিৎকার করে বললো কী ? আমার প্রশ্ন।

বলল, ভালো, ভালো। কোন ভয় । ভারী সরল মানুষ এরা, মশায়। কে একবার বিশ্বাস করলে, তো য় জীবন দেবে। তবে হ্যাঁ, ওই বাস চাই। নইলে মুশকিল। লেন না, আমাদের গাড়ি ওদের নে এলে কেমন নিচু হয়ে এরা াদের গাড়ির সামনেটা দেখে নিল ? কেন ?

দেখে নিল গাড়ির পরিচয় কী ? ড়র সামনে অশোকস্তম্ভ বসানো। থই বুঝলো, এ একেবারে ভারত কারের ব্যপার। অতএব ফ্রেন্ড। লেন কী না, মশায়। নাগাল্যান্ডে কারোর অসুবিধে হতে পারে, ওলজিস্টদের কোন ফ্যাসাদ নেই। দে র অল আওয়ার ফ্রেন্ডস। পুকপুরে লেই দেখবেন, কেমন হাত মিলিয়ে া আমাদের সংগে কাজ করছে।

হঠাৎ মনে পড়লো, তাই তো ? ডঃ বাস্তব বললেন, ওরা গ্রামরক্ষী। তো ই গ্রামটাই বা কোথায় ? কিছু তো খে পড়ছে না। আমাদের ডান পাশটা র ধার থেকে খাড়াই ঢাল হয়ে নিচে মে গেছে। আর বাঁ দিকটা পাঁচিলের উঠে গেছে একেবারে আকাশ বর। গ্রাম কোথায় ?

কথাটা বলতেই ডঃ শ্রীবাস্তব জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, ই যে, দেখুন, দেখুন। ঘাড়টা একটু চু করুন। একেবারে আকাশের দিকে।

ঠিক। চোখে পড়েছে এবার। এতো রাট গ্রাম ! পাহাড়ের ওপরটা যেন তালের মত। বিরাট এলাকা জুড়ে। র ওপর কাঠের দেওয়াল এবং খড়ে াওয়া পাশাপাশি অজস্র ঘরবাড়ি। ন্তু আশ্চর্য মনে হলো, ঘর বাড়িই ত, মানুষ কই ? না শোনা যাচ্ছিল ান সাড়াশব্দ, একআধজন মানুষও খে পড়ল না।

এই গ্রামের নামই ফুট সেরো (Phut Sero), মিঃ কর। আপনাকে আগেই বলেছি নাগাল্যান্ড পার্বত্য অঞ্চলের এটাই হলো উচ্চতম স্থান। উচ্চতা সাত হাজার ফুট। কোহিমা থেকে এই গ্রামটির দূরত্ব পঁয়ষট্টি কিলোমিটার। এটাই নাগাল্যান্ডের বৃহত্তম গ্রাম। কেমন দেখছেন ? পরিবেশটা সুন্দর, না ? এপ্রিলের এই গরমেও এখানে কেমন শীত শীত ভাব। বললেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

তা না হয় হলো। কিন্তু লোকজন তো দেখছি না ? আমার প্রশ্ন।
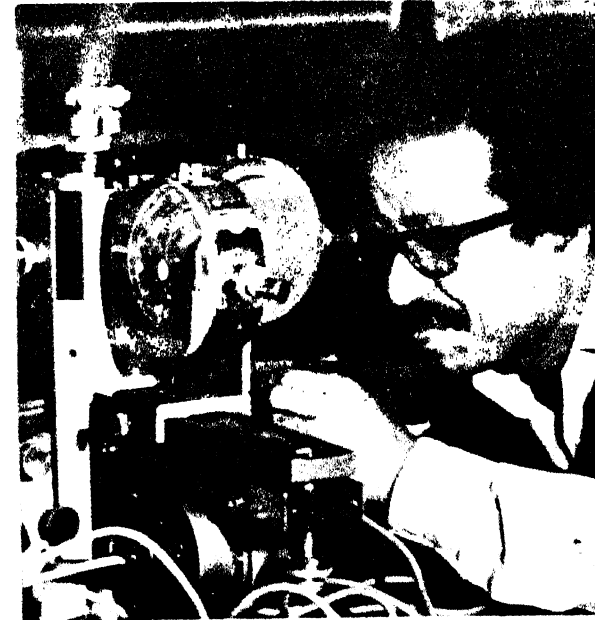
এ সব বুঝবেন না কিছু। এমনিতে এ অঞ্চলের মানুষের চালচলন ভীষণ শান্ত। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব বা আড্ডা দেবার সময়ও ওরা চিৎকার করে কথা বলে না। তবে এখন আমরা গ্রামটির পেছন দিক দিয়ে যাচ্ছি কী না, তাই লোকজন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। গ্রামের ভেতরে গেলে দেখবেন লোকজন আছে। তবে সবাই কিছু না কিছু কাজ করছে। মেয়েরা হয়ত গেছে জল আনতে। পুরুষরা ক্ষেতে ব্যস্ত। অথবা কাঠ কাটায়।

লক্ষ করলাম, রাস্তার পাশ থেকে পাহাড়ের গা খাড়া হয়ে উঠে গেছে প্রায় পাঁচ শ' ফুট। এমন খাড়াই যে, এ পাশের গা বেয়ে হাঁটা পথেও যে ওপরে উঠবেন তার জো নেই। একেবারে পাঁচিলের মত। তার গায়ে বড় বড় এক জাতের ঘাস এবং বন্য ঝোপঝাড়।

পরে শুনেছি। দেখেছিও। ওদের এক একটি গ্রাম এই ভাবেই তৈরি। গ্রামের জন্যে স্থান নির্বাচনের সময় ওরা বেছে নেয় এক একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া। সেই পাহাড়ের প্রায় সব দিকটাই খাড়া পাঁচিলের মত চূড়ার দিকে উঠে এসেছে। শুধু এক দিকের ঢাল তুলনায় কিছুটা বেশী। পাহাড়ের চূড়া থেকে সেই ঢালের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সংকীর্ণ পথ। একটিই পথ। বাইরের জগতের সংগে সেটাই গ্রামের যোগসূত্র। ওই পথ দিয়েই ওরা গ্রামের বাইরে যাতায়াত করে। যত রকম নিরাপত্তা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায়, তার বেশির ভাগই এই পথটুকুর জন্যে। কারণ ওরা জানে, শত্রুর পক্ষে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অন্য দিক থেকে গ্রাম আক্রমণ করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও যদি, সে কাজ খুবই কঠিন। গ্রামে ঢোকার একমাত্র সুযোগ ওই ঢালু পথ। অতএব সেটিকে জুতসই রাখা গেলেই ভাবনা কম।

নাগাল্যান্ডের বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর গ্রাম। তাদের সবারই অবস্থান প্রায় একই রকম। পাহাড়ের চূড়ায় যেন এক একটি দুর্গ। আছে নানা রকম ট্রাইব এবং সাব-ট্রাইব। এক সময় তাদের মধ্যে মারদাঙ্গা লেগেই থাকতো। কখনও সামাজিক কারণে, কখনও নিরাপত্তার প্রয়োজনে। বেঁচে থাকার ধারাও ছিল ওই রকম। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমুণ্ড সংগ্রহ ছিল বীরত্বের সূচক। যে পুরুষ যত বেশী নরমুণ্ড সংগ্রহ করতে সক্ষম হতো, সে সুন্দরী ললনার কাছে পরম কাম্য হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। বাইরের জগতের সংগে আদান প্রদানের সুযোগ যেখানে যত বেড়েছে, সেখানে ওদের জীবন ধারারও পরিবর্তন ঘটেছে।

পুরো পথটাই পর্বতবহুল। পাহাড়ের বৈচিত্র্য এদিকে কম। পাশাপাশি সাজানো সেই এক ধরনের পাথুরে ত্রিভুজ। শিলং-এর মত এদিকটা তেমন ঘন সবুজ নয়। বিরাট দুর্ভেদ্য অরণ্য বলতে যা বোঝায়, তাও নেই এদিকে। সব কিছুই একঘেয়েমিতে ভরা।

একঘেয়েমি শুধু কি চারপাশের প্রকৃতিতেই, এই পথ চলাতেও কি নয় ? ইতিমধ্যে ফুট সেরো থেকে উৎরাই পথে আমরা প্রায় হাজার দুই ফুট নিচে নেমে এসেছি। কখনও চার হাজার, কখনও পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। সে পথ কখনও একই পাহাড়ের চারপাশে ঘুরছে একবার, দুইবার, কখনও তিনবার। আর এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামছি, ওপরে উঠছি। এপ্রিলের শেষ। বর্ষার দেখা নেই। তাই ভৌগোলিক উচ্চতা থাকা সত্ত্বেও যতই বেলা বাড়ছিলো, সেই সংগে গরমও লাগছিলো খুব।

পথ চলার একঘেয়েমিতা দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে আমরা পায়চারি করছিলাম। আর সেই সংগে ডঃ শ্রীবাস্তব এবং শম্ভুবাবু নাগাল্যান্ডের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

শম্ভুবাবু বললেন, মন্ত্রী মিঃ ল্যাংগের কথাটা কিন্তু ঠিক। নাগাল্যান্ডের ওখা জেলার দোইয়াং নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানকার ভূতাত্ত্বিক গঠন এমন, আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে আরও অনুসন্ধান করা দরকার। জানেন তো, এ সব ভূমিকম্প অধ্যুষিত এলাকা ?

হ্যাঁ, নাগাল্যান্ডের মানুষের কাছে ওখা স্বপ্ন বৈকি।

জেলার নাম ওখা। জেলা শহরের নামও ওখা। নাগাল্যান্ডের পশ্চিমের কিছুটা অঞ্চল নিয়ে এই ওখা জেলা। এর উত্তর এবং পশ্চিমে আসাম সীমান্ত। কোহিমায় দাঁড়ালে ওদিকটা পড়বে দক্ষিণে। পূব দিকে জুনহেবোটো এবং মকোকচাং জেলা।

ওখার উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে যান। নাগা পর্বতমালা সেদিকে ক্রমে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে আসামের সমতল অঞ্চলে। দক্ষিণে পড়বে এবড়োখেবড়ো পাহাড়। এসব জায়গা খুব [illegible]

ভূস্তরে স্পন্দনের মাত্রা পরিমাপ পরীক্ষা করা হচ্ছে
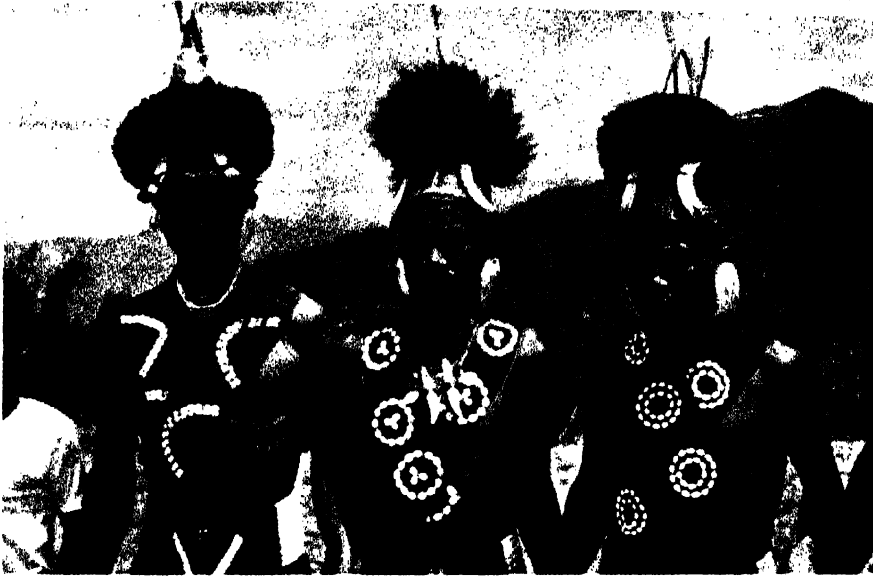
নাচের বেশে নাগা যুবক

বিচরণ ক্ষেত্র। ওখায় দেখতে পাবেন তিন রকমের ভূস্তর। ভূতাত্ত্বিকদের ভাষায় যাদের বলা হয় দিশাং গ্রুপ, বারিল গ্রুপ এবং তিপম গ্রুপ। দিশাং গ্রুপে পাবেন শেল এবং মাটি বা ক্লে-ঘটিত বেলেপাথর। বারিল গ্রুপও বেলেপাথর। তবে তার দানাগুলি খুবই সূক্ষ্ম এবং সে দানার মধ্যে মিশে রয়েছে কার্বন কণা। তিপম গ্রুপও বেলেপাথর। এর দানাগুলি মোটা এবং লোহা মিশ্রিত।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অনেক কিছুই খুঁজে পেয়েছেন এই জেলায়।

শম্ভুবাবু মাঝে মাঝে তার বিবরণ দিচ্ছিলেন। আর আমি শুনছিলাম।

শম্ভুবাবু বলছিলেন, এই জেলার নাগাফুটহিলস-এ আমরা কিছু কিছু ক্লে-র সন্ধান পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, কয়লা আছে প্রচুর। কয়লা পাওয়া গেছে লাখুনীতির পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বে, চেতমহান, চিনচুং, জেলুখান এবং স্যারতুপেবচু নদীর ধারে। কয়লা পাবেন মেকুলা, আকুক, চামপাং-এর পশ্চিমে এবং একবুতচুরো ও সারামপান জল-ধারার কাছে। দোইয়াং উপত্যকায় কাচ তৈরির বালির সন্ধানও পেয়েছি আমরা। বেশ কয়েক জায়গায় ভূস্তর থেকে তেল চোয়াচ্ছে তাও দেখেছি।

আপনি পেট্রোলিয়ামের কথা বলছেন? আমার প্রশ্ন।

অবশ্যই পেট্রোলিয়াম। ইমেনচে, ওখা-মেরাপানি পথের যেখানে বত্রিশ মাইল নির্দেশক পোস্টটি রয়েছে, সেখানে, ইমপাং ও লাখুনীটির মাঝা-মাঝি এক জায়গায়, সোরি গ্রাম, মেকুলা গ্রাম, এসব জায়গার মাটিতে তেলের চিহ্ন দেখেছি আমরা। সম্প্রতি তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন নাগাল্যান্ডে তেলের সন্ধানে ড্রিলিং-এর কাজও শুরু করেছে।

অথবা ধরুন মোকোকচাং জেলা। এটা নাগাল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। যার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে আসাম। এবং পূর্বে তুয়েংসাং জেলা। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে জেলা-শহর মোকোকচাং-এর চারপাশে। এটি পূর্বাঞ্চলের একটি স্বাস্থ্যনিবাসও বটে। মারিয়ানি থেকে জাতীয় সড়ক অথবা উত্তর সীমান্ত রেলের আমগুরি স্টেশনে নেমে এখানে যেতে পারেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ছড়িয়ে রয়েছে লম্বা ফালির মত ছোটবড় পাহাড়। বৃষ্টি পড়ে যথেষ্ট। কিন্তু সে জল দাঁড়িয়ে থাকার মত হ্রদ বা অনুরূপ আর কিছু না থাকায় বছরের অন্যান্য সময় পুরো পরিবেশটাই শুকনো হয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ের গা দিয়ে জল ঝরে। সেই জল উত্তর-পশ্চিমে গড়িয়ে এসে ক্রমে ক্রমে ধনশ্রী নদীতে গিয়ে মেশে।

মোকোকচাং জেলার বারিল শ্রেণীর ভূস্তরে পাওয়া গেছে ক্লে। বিশেষ করে চাংকিকং-জাপুকং এলাকায়। ওই একই এলাকায় কয়লাও আছে। কয়লা পাওয়া গেছে ওয়ারোমং-মংচেন এবং মিরিমকপো এলাকায়। তবে নিম্নমানের কয়লা। ডুবুইয়া, লংসেমতাং এবং আরও কয়েকটি অংশে বেশ কিছুটা পেট্রো-লিয়াম আছে বলেও ইদানীং সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু ওই একই সমস্যা। পাওয়ার। অর্থাৎ শক্তি। এবং রাস্তা। যতই প্রাকৃতিক সম্পদ থাক পথ না থাকলে তাদের আদান প্রদান চলে না। আর শক্তি না থাকলে তাদের নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব নয় শিল্প উদ্যোগ।

শম্ভুবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আসামের মত এদিকেও কি ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় না? যা দিয়ে অন্তত তিন থেকে পাঁচ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে?

সে চেষ্টাও চলছে। আপনাকে তো বলেছি, মিঃ কর, আমাদের জিও-টেকনিক্যাল ডিভিশন আছে। সেই ডিভিশন এই জেলার নানুং লাসা, মেলকা নালা, লুংগমাক নালা এবং ডিবু নদীতে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে [illegible] তৈরি করা যায় কী না, সেটা খতিয়ে দেখছে। এসব অঞ্চলের ভূস্তরের যা গঠন, তাতে মনে হয় হতেও পারে। খুশি হবেন টুইশর কাগজের মণ্ডের কারখানার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারেও আমরা কাজ করেছি। বললেন শম্ভুবাবু।

মন আর একটি জেলা। আয়তনে খুবই ছোট। আগে ছিলো তুয়েংসাং-এর মধ্যে। সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। বার্মার পূব দিকে তুয়েংসাং জেলার পশ্চিম এবং দক্ষিণ ঘেঁষে অবস্থিত এই জেলার উত্তর-পূর্বে আসাম এবং অরুণাচল। এই জেলার পার্লালিক শিলার বয়েস ছয় থেকে এগারো কোটি বছর। এই জেলাতেই রয়েছে বিখ্যাত সেই ডিকু উপত্যকার কয়লাখনি। সাধারণের কাছে যার পরিচয় নাজিরা-বেজান। খুব পুরনো কয়লাখনি এলাকা এটা। যা আজও নাগাল্যান্ডকে কয়লা সরবরাহ করে চলেছে। এ সব কয়লা বারিল শ্রেণীর ভূস্তরে পাওয়া গেছে।

শুনলাম, এই এলাকায় আরও দুটি কয়লাখনি রয়েছে। একটি কিছুটা নিচু এলাকায়। নাম ওয়াকতিং কয়লা-খনি। আর একটি উঁচু অঞ্চলে। কোংগান কয়লাখনি হিসেবে যার পরিচয়। জিওলজিক্যাল সার্ভের হিসেব মত কোংগানে কয়লা রয়েছে এক কোটি টনের মত। আর বোরজানের কথা তো আগেই বলেছি। এখানকার পুরো এলাকার প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টনের মত কয়লা রয়েছে।

কথা বলতে বলতে আমরা সিজ্জামি গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, এটা নাগাল্যান্ডের খুব পুরনো গ্রাম। এ গ্রামের মানুষ হাতের কাজে খুব পোক্ত। সময় তো কম, নইলে গ্রামটি একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতাম আপনাকে।

গাড়ির জানালা দিয়ে একবার বাইরে উঁকি মারলাম। লাভ হলো না। নাগাদের গ্রাম মানে তো পাহাড়ের ডগা। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেন খাড়াই পাঁচিলের গা বেয়ে আমাদের গাড়ি মাথায়। ঘাড় উঁচু করে তার পেছন দিকের ঘরবাড়ির কিছু অংশ শুধু দেখতে পেলাম। এই যা।

বললাম, তুয়েংসাং-এর কথা কিন্তু শোনা হলো না।

আরে শুনবেন, শুনবেন। আমরা তুয়েংসাং-এই যাচ্ছি। কিফুরে? সেটাই তো তুয়েংসাং-এর একটি সাবডিভিশন। দাঁড়ান, আমরা বোধ হয় জেসামিতে এসে গেলাম। হ্যাঁ, ঠিক। ওই যে। বাঁ দিকের ওই পাহাড়ের ওপরটা লক্ষ করুন। বাড়িঘর দেখছেন তো? দূরে একটি পাহাড়ী শহরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ডঃ শ্রীবাস্তব। —হেঁ, হেঁ, মশায়। নাগাল্যান্ড আমার চেনা। কম ঘুরেছি এখানে? লোকে বলে 'পীপল আর হোস্টাইল হেয়ার।' আমি বিশ্বাস করি না। শুধু কতক-গুলি নিয়ম মেনে চললেই হলো। এক নম্বর হলো, ওদের কোন মেয়ের দিকে খারাপ চোখে চাইবেন না।

তাঁর কথায় মৃদু হাসলাম। বললাম, এটা এমন আবার কি বিশেষ ব্যাপার। ভারতের কোথায় এ ব্যাপারে মানুষের সমর্থন আছে? মনে পড়ল মেঘালয়ের সেই বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের কথা : পৃথিবীর বড় বড় রক্তারক্তি কাণ্ড তো ওই টাকা আর মেয়েমানুষকেই নিয়ে— এ তো মানব সভ্যতার অতি প্রাচীন ঘটনা।

মনে হয়েছিল জেসামি বুঝি আরও

প্রকৃতির মুখ আমি দেখেছি

গায়ে তিনটে চক্কর মারতেই—ও মা! আমরা তো একেবারে খোদ লোকালয়ের মধ্যে। একেবারে পাঁচ হাজার ফুট পাহাড়ের ডগায়।

ডঃ শ্রীবাস্তব অনেকক্ষণ কথা বলে যাচ্ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে শম্ভুবাবু আমার পাশে নিশ্চুপ বসেছিলেন। ভেবেছিলাম, হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছেন তিনি। তা ও'র আর দোষ কি! কোহিমা থেকে জেসামি তো কম পথ নয়? প্রায় ১৩১ কিলোমিটার। শম্ভুবাবুর একবার একবার নাকডাকার শব্দও শুনেছিলাম যেন।

স্যার মনে হচ্ছে আউট। নাক ডেকেছে। কৌতুক মেশানো গলায়—বলতে পারেন প্রায় ফিস্ ফিস্ করেই কথাটা বললাম ডঃ শ্রীবাস্তবকে।

হায় ভগবান! সংগে সংগে কানের পাশে শম্ভুবাবুর গুরুগম্ভীর গলা।—নাক ডেকেছে! শম্ভু সেনের নাক ডাকে, শম্ভু সেন চোখ বুঁজে ঘুমোয়। কিন্তু তার কানটি জেগে থাকে। সিজামি—তাই না? সিজামি গ্রামটি ঘুরে দেখার শখ হয়েছিলো, তাই তো?

সর্বনাশ। আপনি জেগে ছিলেন নাকি? তাহলে তো আমাদের কথাও শুনেছিলেন?

কেন? গোপন কথা তো কিছু ছিলো না? বলছি না, শম্ভু সেনের চোখ বোজা থাকলেও কান থাকে খোলা। হা—হা—হা! আমরা তা হলে পড়ুন, নেমে পড়ুন। সুন্দর জায়গা। অ্যান্ড নাও উই আর অ্যামংগ দ্য নাগাজ।

মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, 'শম্ভুদা'।

কথাটা সংগে সংগে ক্যাচ করে নিলেন তিনি। বললেন, সেই ভাল। 'শম্ভুদা'। আমিও সমরজিৎ বলেই ডাকবো। মুশকিল হয়েছে, আমাদের এখন দুই সমরজিৎ। সমরজিৎ কুর আর সমরজিৎ চক্রবর্তী। ঠিক আছে একটা কমপ্রোমাইজ করা যাবে।

বলেই একেবারে ক্যামেরা বাগিয়ে নেমে পড়লেন তিনি। নেমেই শুরু হল ক্লিক্ ক্লিক্। জানতাম জি এস আই-এর তিনি ডেপুটি ডাইরেক্টার জেনারেল। জানতাম না, ফটোগ্রাফিতেও তিনি এক নম্বর।

আমাদের পেছনে ততক্ষণ কাঞ্জন সাহেব এবং মিঃ বরুয়াও এসে দাঁড়িয়েছেন। এসে গেছেন সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং অজিতবাবু। সমরজিৎ চক্রবর্তীর চোখের পাতা বেশ ভারী ভারী ঠেকলো। মানে পথ চলতি নিদ্রা দেবীর স্পর্শ। অজিতবাবু রীতিমত ম্যান অভ্ অ্যাকশন তখন। হাতে ক্যামেরা। দুই কাঁধে দুই ক্যামেরা। মুভি, রঙীন এবং সাদা কালো ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কমলবাবুও ছিলেন সংগে। তিনিও ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গাড়ি থেকে নামতেই মনে হলো জায়গাটা দার্জিলিং-এর মলের মত। পাহাড়ের মাথায় যেন বিছানো রয়েছে একটি মেঝে। তার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে দোকানপাট। তবে মলের মত অত জাঁকালো নয়। বরং পরিবেশটা কতকটা দার্জিলিং রেল স্টেশনের সামনে যেমন দেখায়, তেমন। কাঠের ঘর। ঝিঞ্জি দোকান। এটা সাবডিভিসন শহর। অতএব লোকারণ্য। ট্রাক এবং গাড়ির ভিড় লেগেই আছে। দোতলা তিনতলা বাড়ি। পরনে প্যান্ট এবং কালো চাদর গায়ে দশ বারোজন নাগা এক একটি দল বেঁধে বসে কোথাও গল্প করছে। এক পাশে নাগা মেয়েরা। রাস্তার ধারে বিছিয়ে বসিয়েছে দোকান। কাঁচা লংকা, জাম, বন্য ফল, আনাজ। ছোট ছোট থোকে সাজানো। ওজন বলে কিছু নেই। যাতে হাত দেবেন, সব এক দাম। মানে এক টাকা।

জাম দেখে লোভ হলো। একটি মেয়েকে বললাম কত দাম? হিন্দীতেই বললাম।

মেয়েটি হিন্দী জানে না। আমাদের কোন ভাষাই জানে না। একটা আংগুল দেখালো শুধু।

মানে এক টাকা।

একটা টাকা দিয়ে এক থোকা জাম তুলে নিলাম। কিন্তু তারপরই ফ্যাসাদ। জামের সংগে কিঞ্চিৎ নুন এবং একাধটা লংকা না হলে জাম খাওয়ার আমেজটাই তো মাটি হয়। তা থোকা থোকা লংকা নিয়ে তো বসেছে পাশে আর একটি মেয়ে। মেয়ে না বলে মহিলাই বলি বরং। বছর তিরিশ বয়েস। কোলে একটি মিষ্টি ছেলে। প্যাট প্যাট করে আমাদের দিকে চেয়ে।

জেসামিতে ছেলেদের সংগে

মহিলাটি বোধ হয় আমার হাবভাবে ব্যাপারটা বুঝলো। সংগে সংগে এক গোছা কাঁচা লংকা তুলে দিল আমার হাতে।

বললাম, দাম? কথা শুনে তো হেসেই অস্থির।

ইংগিতে জানালো, দাম দিতে হবে না।

কেমন কিন্তু কিন্তু মনে হলো আমার। এরা দরিদ্র। পয়সার প্রয়োজনে ব্যবসা করতে বসেছে। পয়সা না দিয়ে সওদা নিই কী করে? পাঁচ ছয়টা লংকা। তবু সওদা তো? আমি জোর করে তার হাতে চার আনা পয়সা গুঁজে দিতে গেলাম। সে-ও জোর করে আমার হাতটি ধরে সরিয়ে দিলো। তার সারল্য এর পর আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

নুন?

তাও পেলাম একটি দোকানে। দোকানী ভাগলপুরের মানুষ। বেশ কয়েক বছর হলো জেসামিতে দোকান খুলে বসেছে। দোকানে যেতেই বলল, বাবুজী, একটু নিমক নেবেন, তার জন্যে পয়সা কি?

তারপর জামে কামড়। এবং শিবরাম চক্রবর্তীর সেই সাহেবকে আম খাওয়ানর ব্যাপার। যিনি আমে একটা কামড় দিয়েই এমন লাফিয়ে উঠেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত সিলিং ফ্যানে আটকে গিয়ে তাঁকে বন বন করে পাক খেতে হয়েছিল। তবে তাতে তাঁর লাভও হয়েছিল। পাকের প্রচণ্ড ঠ্যালায় তাঁর পুরনো বাত সেরে যায়। আমরা অবশ্য কেউ বেতো রোগী নই। তবে জামে কামড় বসাতেই মনে হলো, দাঁত থেকে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুতের শক গিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে একটা হুল ফুটিয়ে দিয়েছে।

মু হাঁ ফাক করে আমি বললাম, টেরিবল্।

সংগে সংগে ডঃ শ্রীবাস্তব আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করলেন, ডোণ্ট থ্রো। ওদের আত্মসম্মানে লাগবে। বলে মেয়েটির দিকে এমন ভংগী করলেন, যেন কত সোয়াদ নিয়ে তার জাম উপভোগ করছেন তিনি।

শম্ভুদা বললেন, যত্ন করে রেখে দাও। কাজে লাগতে পারে।

তাঁর কথায় তাই করেছিলাম। পরে কাজেও লেগেছিল। ফিরতি পাহাড়ে পথের ধকলে মাঝে মাঝে যখন গা গুলিয়ে উঠছিল, তখন নুন-লংকা সহ এক একটি জামে জিভ ভিজিয়ে সমস্যার সমাধান করেছিলাম।

এই জেসামিতেই প্রথম দেখলাম কুকুরের রোস্ট। কুকুর নাগাদের কাছে উপাদেয় সামগ্রী। এর জন্যেই পথেঘাটে এ পর্যন্ত কোন কুকুর দেখি নি। এখানে দেখলাম, এক বাড়ির চত্বরে চারপাঁচজনে মিলে আস্ত একটা কুকুর রোস্ট করছে।

একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো কয়েকটি ছেলে। সুন্দর চেহারা। সাহেবী পোশাক। আলাপ করে জানলাম, ওরা সব হাই স্কুলে পড়ে। ইংরেজীতেই কথা হলো। এমনিতে ব্যবহার খুব বিনয়ী। কিন্তু সেই ভর দুপুরেও তাদের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল ভক্ ভক্ রসের গন্ধ। মানে দেশী মদ। তবে কোন বেচালতা নেই তাদের মধ্যে। ওরা বলল, পড়াশুনো করে ওরা চাকরি করবে।

আর এক দিকে দাঁড়িয়ে একদল তরুণী। কালো চাদর গায়ে। সেই লাল বর্ডার দেওয়া চাদর। পরনেও তাই। রীতিমত রোমান্টিক। তাদের সরল সৌন্দর্য শহর কলকাতায় আমরা ভাবতেই পারি না। কোন জড়তা নেই চালচলনে। 'একসেস'ও নেই। ওদের সংগে কথা বলেছি। ঘরসংসারের কথা। মস্ত পৃথিবী সম্পর্কে ওরা স্বপ্ন দেখে। প্রচণ্ড কর্মঠ। বড় ভাল লাগলো ওদের ব্যবহার।

পর পর তিনটে ট্রাক এসে দাঁড়ালো। মিলিটারি, উর্দি পড়া বছর আঠারো কুড়ির ছেলেরা নামল ট্রাক থেকে। হাতে অটোমেটিক রাইফেল, স্টেন গান। সবাই নাগা। কী প্রচণ্ড ক্ষিপ্র তাদের চালচলন। পরে শুনেছি, এদের অনেকেই এক সময়ে 'রিবেল' ছিলো। এখন শান্তিবাহিনীর লোক।

জেসামিতে ছিলাম ঘণ্টা তিনেক সময়। আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানকার সেনাবাহিনীর ক্যান্টিনে। লাঞ্চ সেরে ফিরবার পথে যখন যাত্রা করলাম ঘড়িতে তখন প্রায় চারটে।

(ক্রমশ)

অনুবাদ

শ্যামলকান্তি দাশ

অনুবাদ করতে করতে একটির পর একটি জীবন
ফর্সা হয়ে যায় আমার. একটির পর একটি জীবন
শুধু তোমাকেই আমি অনুবাদ করতে থাকি পাপিয়া।

অনুবাদ করি আর টেনে-হিঁচড়ে তোমাকে, ওগো শ্রেষ্ঠ জানালার
পাখি শুধু তোমাকে ছাড়িয়ে দিই এই রুদ্ধ পুঁথির সমুদ্রে
এই কালো অক্ষরের প্রতারণায়—
তুমি ছাড়া আর কোনো পাখিই নয় আমার উপমা
তুমি ছাড়া আর কোনো পাখিই নয় আমার চিত্রকল্প
দশ হাতে অনুবাদ করতে-করতে আমি শুধু তোমাকেই
উৎসর্গ করতে থাকি একটির পর একটি সঙ্গম
আর আমি মরে যাই।

মরে যাই আর সাতাশ বছর বেঁচে থাকি
কখন বেজে উঠবে তোমার কণ্ঠের প্রসাদ
আর কখন তোমার চক্ষুর করুণা
আর কখন কতকাল পরে তোমার দৃষ্টির ছায়ায়
ফুটে উঠবে আমার তৃতীয় নয়ন
আমি অপেক্ষা করতে থাকি তোমার একাচলতে স্বাধীনতার জন্য
অপেক্ষা করতে থাকি সাতাশ বছর।

অনুবাদ করতে-করতে একটির পর একটি জীবন
তুচ্ছ হয়ে যায় আমার. একটির পর একটি জীবন
শুধু তোমাকেই আমি দশ হাতে অনুবাদ করতে থাকি পাপিয়া!

ঘুমন্ত তোমার পায়ে

মৃণাল বসু চৌধুরী

যে ঠোঁটের হাসি ছিল ভ্রমর গুঞ্জন
সুবর্ণরেখার মতো অনাবিল
অফুরান
সেই ঠোঁট যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেছে
এ দৃশ্য দেখার নয়
ভেবে
একদিন
বাহির দরজা থেকে জেনেছি কুশল

তাই রাগ অভিমান
ঘুমন্ত তোমার পায়ে
শেষবার
মাথা ঠেকানোর সুযোগ না দিয়ে
নির্বিকার এই চলে যাওয়া—

তোমার তর্জনী

জীবিতেশ চক্রবর্তী

তোমার তর্জনী আজও আমার মুঠিতে কথা কয়.
নিত্য শুনি নীরব ভাষায় তার আদেশ-নির্দেশ।
এই তো চল্লিশ-উর্ধ্বে পেঁছে তবু সাবালক নই
আমি, সেই শৈশবের আমি, বড় তর্জনী-নির্ভর!
যখন চলতে গেলে পদে পদে স্খলন পতন
ঘটেছে, তখন শক্ত হাতে ধ'রে কত কাঁটাপথ
পার হ'য়ে গেছি। আর আজ আমি চলতে শিখেছি
তবু কেন জানি না তো তোমার তর্জনী স্থির হাতের মুঠোয়।
এ কি স্নেহ, এ কি আশীর্বাদ? না কি নাবালক ক'রে
রেখে দিয়ে দিনরাত নিজেকেই শুধু
আরও বড় ক'রে তোলা. আমাদের চোখে।
তোমাকে হারাতে চাই. তোমাকে ছাড়াতে চাই. তাই
মুঠোকে শিথিল ক'রে ধ'রে আছি.
তুলে নাও তোমার তর্জনী. আমি সাবালক.
আমার শিথিল মুঠি আজ থেকে স্বনির্ভর হোক।
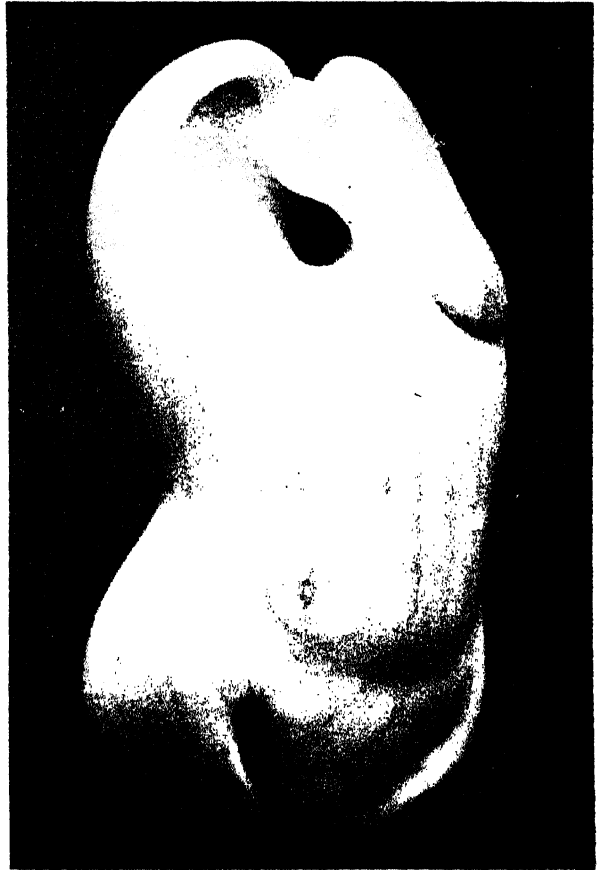
"দুগ্ধবতী মহাশয়া" (কাঠ ৩৬"×১৪"×১০")—অনিল সেনের ভাস্কর্য। জন্ম—১৯৫০। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৭০)। কাঠ, পাথর, ধাতু পোড়ামাটি সবেতেই সিদ্ধহস্ত। এখানে কাঠের দাগগুলো নিপুণভাবে কাজে লাগিয়ে মাতৃত্বের একটি দিককে [illegible]

গল্পের চুম্বক...
দোকানী জো ও তার বউকে আগুনের কবল থেকে বার করে আনলেন অরণ্যদেব.....

উঃ!
আর একটু হলেই...
দমাস্!

তিন গুন্ডা.....
দাগটা কিছুতেই উঠছে না!
শহরে ফিরে ওষুধ লাগালেই উঠে যাবে...
দেখা যাক..

কিন্তু লোকটা কে বলো তো?
অরণ্যদেব!
যত্ত সব গাঁজাখুরি কথা!

শহরে ফিরে... আরে, তেল ফুরিয়ে গেল যে!
তাহলে উপায়?
3/5

TRADER JOE'S
আপনি... আমাদের বাঁচিয়েছেন!
তুমি যাতে নতুন করে দোকানটাকে গড়ে তুলতে পারো, তার ব্যবস্থা আমি করব!

এখন গুন্ডাদের খোঁজে চললুম!
খুব সাবধান! ওরা ভয়ংকর লোক!

উঃ, কী ভাল লোক উনি!
গুন্ডাদের খুব শাস্তি দেবেন নিশ্চয়!
চলবে

স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

নরেশের বাড়ির পার্টি ভাঙতে সেদিন প্রায় রাত একটা। হাসি গল্প গান ছবি রাজনীতি সাহিত্য পরচর্চা সব মিলিয়ে একেবারে যাকে বলে জমজমাট। নরেশকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন এমন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি কোটিকে গুটিক। ঢালাও খাদ্যপানীয়ের সঙ্গে তার নিজের হার্দ্য ব্যবহার মিলেমিশে কোনো অতিথিকেই অতিথি বলে সচেতন করে রাখছিলো না। সবাই আনন্দিত ছিলো, সুখী ছিলো। এমন যে অমিয় চক্রবর্তী, যিনি বেশী হাসি পেলে মুখে রুমাল চাপেন, তিনিও ভুলে যাচ্ছিলেন সেকথা। আর বুদ্ধদেবের হাসিতে তো ইভানস্টোন শহরের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিলো।

দিন যায়, দিন ফিরে আসে না। ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ শোক-সান্ত্বনা শেষ পর্যন্ত স্মৃতির পাহাড়ে স্তূপীকৃত হয়।

মনোজ নামের একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলেও ছিলো সেই সভায়। হার্প বাজিয়ে গান গেয়ে মোহিত করে দিয়েছিলো সকলকে। এই ছেলেটি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র, নরেশ কিন্তু খুব ভালোবাসে ওকে, ও-ও ঐ প্রবাসে এইরকম একটি পরিবারের মমতা পেয়ে একেবারে ঘরের ছেলে। লিখতে লিখতে সেই ছেলেটিকে আবার ভীষণভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। শ্যামল রঙের কাঁচ চেহারার একটি নিষ্পাপ তরুণ যুবা।

কয়েক বছর বাদে পাঠ সমাপ্ত করে দেশে ফিরেছিলো সে। এই কলকাতা শহরেই নববিবাহিত হয়ে সুখের সাগরে ভাসছিলো। একদিন হঠাৎ চিনু এসে বললো, 'আপনার মনোজকে মনে আছে ?'

'মনোজ ? তোমাদের সেই ইভানস্টোনের মনোজ ? এসেছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, কবেই তো এসেছে, এসে বিয়েও করেছে, তারপরে দেখুন কী কান্ড হলো।'

'কী ?'

'একদিন শুনি ক্যানসার ধরা পড়েছে, কাল শুনলাম মারা গেছে।'

'অ্যাঁ!!!'

তারপর দুজনেই চুপ। মনোজ আমাদের কেউ না কিন্তু মৃত্যু আমাদের সকলের, তাই সব মৃত্যুই কষ্ট বয়ে আনে। তা থেকে নিষ্কৃতি কোথায় ?

এভানস্টোনে নরেশের বাড়ির সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় আড্ডায় তখন বঙ্গীয় আড্ডার মেজাজ দেখে গলওয়ে কিনেলের বন্ধু শার্লি ক্লাই একেবারে মুগ্ধ। যদিও সেই সভায় আমরা বাঙালীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে বাংলায় কথা বলে, বাংলায় গান গেয়ে অনেকটা সময়ই এই বিদেশীনীটিকে ভুলে মানে ব্যক্তিটিকে ভুলে থাকছিলাম না, তার ভাষাকে ভুলে থাকছিলাম। তথাপি দেখলাম, তার স্ফূর্তির কোনো অভাব নেই। কিছু কিছু ভঙ্গিতে বুঝে নিয়ে, কিছু কিছু না বুঝলে জিজ্ঞেস করে নিয়ে কখন আমাদেরই একজন হয়ে হাসছে, হাঁটু চাপড়াচ্ছে, পাশে উপবিষ্ট আমাকে মুহুর্মুহু জড়িয়ে ধরছে।

আড্ডা ভাঙবার কিছুটা আগেই উঠতে হলো তাকে। একা যাবে, অতটা পথ, আর শহরটি হচ্ছে শিকাগো। আমি রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে এলাম, বললাম; 'সাবধানে যেয়ো, শুনেছি শিকাগো খুব গুন্ডা অধ্যুষিত শহর।'

আঙুলে গাড়ির চাবি দোলাতে দোলাতে শার্লি বললো, 'আমি নিগ্রো পাড়া দিয়ে যাবো না, ওরা এখন খুব ক্ষিপ্ত।'

'কেন ?'

'মিসিসিপিতে যা হচ্ছে, অকথ্য। নিজভূমে পরবাসী বলতে যা বোঝায় সেখানকার নক্কক নিগ্রো অধিবাসীরাই হচ্ছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শোনো বাপু তোমাকে বলি, আমাদের মতো মানুষেরা হচ্ছে দুই দলেরই টার্গেট। অর্থাৎ নিগ্রোরাও সাদা বলে থুতু ছিটোয়, রক্ষণশীল সাদারাও গুলি করবার জন্য ঘুরে বেড়ায়।'

আসলে সেই সময়ে জাতীয় সরকার এই ভেদাভেদ লুপ্ত করার জন্য শক্ত হাতে লাগাম ধরেছিলো। এবং রক্ষণশীলরা যাই বলুক, অধিকাংশ মার্কিনীই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে সকল রকমের সহযোগিতা তো করছিলোই, লিখছিলো কাগজে কাগজে, বলছিলো পথেঘাটে, সভাতে। নাগরিক অধিকার আইনসম্মত হবার পরে সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শত শত নাগরিক-অধিকার আন্দোলনকারী শ্বেতাঙ্গ কর্মী নিগ্রোদের মধ্যে সমস্ত রকম [illegible] জন্য লড়িয়ে পড়েছিলো। সেই সঙ্গে যে সব সুখ সুবিধা [illegible] করে শুধু সাদারাই ভোগ করে আসছিলো, নিগ্রোরাও যাতে তার সমান অংশীদার হতে পারে, কেউ যাতে বাধা না দেয় সেজন্যও আন্দোলন চালাচ্ছিলো তারা। কিন্তু কেন্দ্রের নিয়ম অথবা এদের আন্দোলন রাজ্য সরকাররা সর্বত্র মান্য করছিলো না। কারো হাতে সামান্য একটা লিফলেট দেখলেও গুন্ডামীর অজুহাতে গ্রেপ্তার করে সকলকেই ফাটকে আটকাচ্ছিলো। এমন কি সমগ্র সৈন্য দিয়ে সেই সব শ্বেতাঙ্গদের ঘেরাও করে পর্যন্ত রাখছিলো। বোমা ফেলে নিগ্রোদের গির্জে ধ্বংস করা হচ্ছে খবর পেয়ে একবার তিনটি ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিলো সেখানে, তার মধ্যে একটি ছেলের বয়েস চব্বিশ, ম্যানহাটানে সেটেলমেন্ট হাউসে কাজ করতো, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সমিতির সভ্য হয়ে নিগ্রোদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে ব্রতী হয়। আর একটি ছেলে কুইন্স কলেজের ছাত্র, একশো আহাত্তর জন কর্মী নিয়ে সে মিসি-

এ দুজন শ্বেতাঙ্গ, অন্য ছেলেটি নিগ্রো, তার বয়েসও একুশ। একটি স্টেশন-ওয়াগনে করে মিসিসিপির দিকে রওনা হয় তারা। কিন্তু পথে রাজ্যের ডেপুটি শেরিফ তাদের থামান এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় অজুহাতে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে দেন। তখন ছিলো বিকেল, ছাড়া হলো গভীর রাত্রে। অত রাত্রে তারা আর কোথায় যাবে? গিয়েই বা কী করবে? ভেবেচিন্তে বাড়িই ফিরে আসছিলো, কিন্তু ফেরা আর হলো না। অতগুলো লোক কোথায় উধাও হয়ে গেল কর্পূরের মতো। কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। দুদিন বাদে শুধু স্টেশন ওয়াগনটি শহর থেকে খানিকটা দূরে একটা হাইওয়ের কাছে পোড়া অবস্থায় দেখা গেল।

আরো কিছুদিন বাদে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হলো তাদের মৃতদেহ। এই সূত্রে পুলিস যে উনিশজনকে গ্রেপ্তার করে তার মধ্যে রাজ্যের শেরিফ এবং ডেপুটি শেরিফকেও বাদ দেয়া হয় না। পুলিসের ধারণা এদের ষড়যন্ত্র অনুযায়ীই এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। কিন্তু মামলা যখন রাজ্য সরকারের বিচারালয়ের অধীন হলো, কোনো সাক্ষীই পাওয়া গেল না। স্বয়ং জজসাহেব সকলকেই নিরপরাধ বলে খালাস করে দিলেন।

অবশ্য জাতীয় সরকার ছাড়লো না। মামলাটা ওয়াশিংটনের গ্র্যান্ড জুরিতে তুলে নিয়েছিলো তবে নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যে যদি কোনো নরহত্যা হয় রাজ্য সরকারই হবে তার চরম বিচারক, এই ব্যবস্থা বদলানো খুবই কঠিন। তবু জাতীয় সরকার হস্তক্ষেপ করলো সেখানে। জাতীয় সরকারের পুলিস মোতায়েন হলো মিসিসিপিতে। মিসিসিপির রাজধানীর নতুন বাড়িতে গোয়েন্দা বিভাগের আপিসে অবিশ্রান্ত কাজ হতে লাগলো, সারা রাত আপিসের মাথায় উঁচু শক্তির আলো জ্বলতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

শার্লি গাড়ির পাদানিতে পা রেখে কথা বলছিলো, উঠতে উঠতে বললো, 'এ ব্যাপারটা আমাদের সারা মার্কিন দেশের দেহে একটি পাকা ফোঁড়ার মতো, বুঝেছো? সরকার তো কম চেষ্টা করছে না, হচ্ছে কই? এই তো সেদিন নিউইয়র্ক টাইমস কী রকম জুড়ে নিন্দে করেছে, টেলিভিশনে ধিক্কার দিচ্ছে দুবেলা, বার্কলির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এ নিয়ে কতো বড়ো একটা ধর্মঘট করে জিতে গেল, বলতে গেলে শতকরা আশিজন আমরা কেউ এটাকে সমর্থন করছি না, তাতে কী? মন্দের শক্তি সব সময়ে সর্বত্রই প্রবল। নেতৃস্থানীয়রা মনে করছেন কিউক্লুক্স্ক্ল্যান নামের কুখ্যাত সমিতিটিই হচ্ছে এর পিছনে আসল শক্তি। ঐ জন্যই তো বললাম আমরা হচ্ছি দুদিককারই টার্গেট। আন্দোলন-কারী শ্বেতাঙ্গরা তো বটেই, যারা আন্দোলনে নেই, শুধু সমর্থন এবং সহানুভূতিসম্পন্ন এমন কি সাদা-কালোর তফাত চায় অথচ এই ভায়োলেন্সটাকে অপছন্দ করে সেই সব শ্বেতাঙ্গরাও এই শ্বেতাঙ্গদের লক্ষ্যের বস্তু।'

'বাঃ, খুব ভালো।'

শার্লি ঠোঁট কামড়ে বললো, 'অনেকে ঠাট্টা করে বলে ওয়েদার ভালো নয় বলে যে অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন মিসিসিপির মাটির তলায় নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির গবেষণাটি স্থগিত রেখেছিল, ঐ আবহাওয়ার কথাটা তাদের অছিলা, আসলে কিউক্লুক্স্ক্ল্যান দলটিই চুরি করে নিয়ে গেছে সব। তার জোরে তারা ওয়াশিংটনকেও শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।'

একটু থেমে বললো, 'ডক্টর কিংয়ের সঙ্গে আমার দুবার দেখা হয়েছে। কী সাবধানে চলেন, কী ঠান্ডা মাথায় সব দিক বিবেচনা করে কাজ করেন, কতো ভেবে চিন্তে কথা বলেন, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। উনি তো জানেন, ওঁর ছোট্টো একটা ভুলেও কতোবড়ো সর্বনাশ সম্ভব। ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে না সবাই? যাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারাই কি ছেড়ে দেবে? তোমাদের গান্ধীকে দেখলে না? কী দোষ ছিলো তাঁর? তিনি শুধু সকলের ভালো করতে চেয়েছিলেন, এই তো? একটু লজ্জিতভাবে বললো, যাকগে, কতোক্ষণ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। তা রেখেছি, তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, যাকে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম, একেবারে ঠিক তাই। আজ চলি, কেমন?'

চুমু খেয়ে হাত নেড়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চক্ষের নিমেষে কোথায় চলে গেল। প্রকান্ড অজগরের মতো হয়ে গিয়ে জনহীন রাস্তাটা নিমেষে সুনসান। স্বদেশ-বিদেশ ভালো-মন্দ সাধু-অসাধু সব কিছুর একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আত্ম-সমালোচনায় আমেরিকানদের জুড়ি নেই। এখানে নিগ্রো বিদ্বেষ, ইয়োরোপে শ্রেণীবিদ্বেষ, তফাত নেই কিছু। তফাত শুধু এই যে এরা সেজন্য দুঃখিত লজ্জিত ভাবিত এবং সমালোচনায় ক্লান্তিহীন। কিন্তু ইয়োরোপ ভুলেও মুখ খুলবে না সেবিষয়ে।

এই ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ বা ঈর্ষার যূপকাষ্ঠে যে শুধু জাতিগতভাবেই একটা সমাজের গলা কাটা যায় তা নয়, ব্যক্তিগত ঈর্ষার আগুনও মানুষকে কম উন্মাদ বা মূঢ় করে তোলে না।

দ্বিতীয়বার প্রবাসকালে একদা এক সুন্দর সকালে আমাদের মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের লবিতে গিয়ে চিঠির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। খুব ভিড় জমেছে। প্রত্যেকের হাতেই চাবির রিং ঝুলছে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে। পাশে করিডোরের লম্বা দেয়ালে যার যার নাম লেখা চিঠির খোপ। জমাদার জ্যাকেট গায়ে বলিষ্ঠ পিয়নটি দাঁতে চুরুট কামড়ে চিঠি রাখতে রাখতে গুনগুন করে
... আবাসিকদের দিকে তাকিয়ে

হলো একটুখানি, এক ঝলক হিম ঢুকে পড়লো ভিতরে। পিয়নটি হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে চোখ টিপে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

আর আমরা, যারা চিঠির জন্য রুদ্ধ শ্বাসে দাঁড়িয়েছিলাম, যার যার খোপে গিয়ে চাবি ঘোরালাম।

আমার অপেক্ষাটা একটু অধীর ছিলো। প্রবাসে চিঠির মতো সুখটা যে অল্পই আছে তা বোধ হয় একাধিকবার উল্লেখ করেছি। সেই সুখ আর রোজ পাই কোথায় ? কিন্তু সেদিন হতাশ হতে হলো না। একটি পুষ্ট খাম দেখলাম ঠেস দিয়ে আছে কাচের গায়ে।

লবিতে বসেই পত্রপাঠে নিযুক্ত হয়েছিলুম। হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গায় এসে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে জোরে হেসে ফেললুম। পত্রলেখক একজন তরুণ কবি। অন্যান্য অনেক আজগুবি খবরের সঙ্গে একটি দুর্ধর্ষ আজগুবি খবর বিশেষ উত্তেজনার সঙ্গে পরিবেশন করেছে। তার চিঠির সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

'ওদেশে যেমন অশিক্ষিতরাও ততো মূর্খ হয় না, এদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে) তেমনি এম এ পাশ মূর্খের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কয়েকদিন আগে কলকাতার একটি দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয়তে বেরিয়েছে যে বুদ্ধদেব বসু নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য আমেরিকার সমস্ত লাইব্রেরী থেকে অন্য বাঙালী লেখকের বই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। দেশের অবস্থা কী দুঃসহ। মিথ্যা হিংসা আর অজ্ঞতায় ভরা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। দুরাচারের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। আপনি তো ওখানে বসে 'ওয়াশিংটনের চিঠি লেখেন, সেই পুজনীয় পন্ডিত সম্পাদকীয় লেখকটিকে কি দয়া করে জানাবেন যে, আমেরিকাটা বাংলাদেশ নয়। সেখানে থরে থরে বাঙালী লেখকের বই সাজানো থাকে না। অর্বাচীনটিকে একটু ভৌগোলিক শিক্ষা দেওয়াটাও আশু কর্তব্য। তার জানা দরকার একটা দেহের পক্ষে আমেরিকার সব লাইব্রেরীতে ঢুকতে হলে অশরীরী ভূত হতে হয়। সে দেশে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যের দূরত্ব তিন হাজার মাইলের উপরেও আছে। এবং মাত্র একটি শহরের লাইব্রেরীর সংখ্যাও গণনার অতীত। যদি কোনো মানুষ, কোনো লাইব্রেরীতে ঢুকে ইচ্ছে মতো কোনো বই টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় অথবা দেয়, গ্রন্থাগার রক্ষক যে অবিলম্বে তাকে পাগলাগারদে পাঠাবে অন্তত এ কথাটি অনুগ্রহ করে সেই উৎকৃষ্ট সংবাদদাতাটিকে আপনার জানানো নেহাৎ কর্তব্য বলে মনে করি আমি। একজন সাহিত্যিক তো দূরের কথা, (তা-ও বিদেশী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং লিন্ডন বি জনসনেরও কখনো সাহস হবে না একটা লাইব্রেরিতে ঢুকে এই রকম এটিকেট এবং আইন বিরুদ্ধ একটি কর্মে লিপ্ত হতে। কেন না তিনিও জানেন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দেশে এই অপরাধে তিনিও গারদবাস বা ফাটকবাসের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এবং এই বুদ্ধিটুকুও সংবাদদাতার মগজে ঢোকানো দরকার যে, অন্য বাঙালী লেখকের বই ছুঁড়ে ফেলা মাত্রই নোবেল পুরস্কার কমিটি মালা নিয়ে ছুটে আসবে না। আরো একটু গুণ যোগ্যতার চাহিদা থাকবে তাদের। তাছাড়া ঐ কমিটিতে আমাদের দেশের মতো তৈলমর্দনেরও কোনো জায়গা নেই।

শুনুন, সব সময় ওরকম নাক উঁচু করে এদের মূর্খ বলে অবহেলা ভরে চুপ করে থাকবেন না। অনেক পিঁপড়ে একত্র হয়ে একটা সিংহকেও মেরে ফেলতে পারে। মশাটাকেও চড় মেরে সজুত করতে হয়। জঙ্গলে বাস করলে জন্তুর সঙ্গে লড়াই না করে উপায় কী ? আর মানুষের সমাজে যাদের দাঁত পড়ে যায় তারা সব চাইতে বেশী ভয়াবহ।

ছাপার অক্ষরে মাননীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে এমন নিকৃষ্টতম মিথ্যা উক্তি আর যেই সহ্য করুক, একজন বাঙালী হিসাবে, সমধর্মী ঘনিষ্ঠ কবি হিসেবে আমার কাছে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। আর সেই কারণে আমি আমার সমস্ত তরুণতর লেখক বন্ধুদের নিয়ে কোনো সন্ধ্যায় একত্র হয়েছিলাম। জনসংখ্যা আমাদের মন্দ হয়নি। গুণে দেখেছি সবাই মিলে আমরা পঁচানব্বুই জন। ... যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়েছি, এখন অনুরোধ আর একজন লেখক হিসেবে আপনাকেও কি আমরা আমাদের মধ্যে পেতে পারি ? হলেনই বা স্ত্রী, যা সত্য তাতো বলতেই হবে।

চিঠি পড়া সমাপ্ত করে ভাঁজ করছিলুম, পার্শ্ববর্তিনী জিজ্ঞেসা করলেন, 'দেশ থেকে কী এমন মজার খবর এলো যে হাসি চাপতে পারছো না।'

মজা ? মজা কোথায় ? মানুষের অসূয়া মানুষকে কত দূরে নিয়ে যেতে পারে, তার একটা চরম নমুনা দেখে উচ্চৈঃস্বরে যে হাসি হেসেছিলাম, এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা অকথ্য কষ্টে মনটা ভরে উঠলো। এই আমার স্বজন। এই তাদের চরিত্রচিত্র ? তরুণ কবিটির যে উত্তেজনা এতোক্ষণ সস্নেহে কৌতুকে উপভোগ করছিলুম, সেই মুহূর্তে তার প্রতিক্রিয়া আর আমার প্রতিক্রিয়া অভিন্ন হলো।

লবির এককোণে বিরাট এক টেলিভিশন চলছিলো সজোরে, বাচ্চারা দেখছিলো, চোখ পড়লো সেদিকে। আরেঃ, এ যে মার্টিন লুথার কিং। নোবেল পুরস্কার কমিটির হাত থেকে শান্তি পুরস্কার নিচ্ছেন। পাথরের মতো শান্ত সমাহিত গম্ভীর ঠান্ডা চেহারা। এদেশের আইন মিলিয়ন হতভাগা নিগ্রোর নতুন জন্মদাতা পিতা।

কিন্তু এই পিতার জীবনেরই বা নিরাপত্তা কোথায় ? এঁকেও কতো লোক ঈর্ষা করছে, হিংসে করছে, ক্ষতির চেষ্টায় উদভ্রান্ত হচ্ছে

লোকবিশ্বাসে 'সাত'

সুধীর করণ

সংখ্যাটির নাম 'সাত'। লোকমানসে এই সংখ্যাটির প্রভাব খুবই গভীর। বলা চলে, সাত হচ্ছে একটি ক্ষমতাশালী সংখ্যা এবং একক সংখ্যার মধ্যে সব চেয়ে পবিত্র, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই লোকবিশ্বাস, সম্ভবত সংখ্যা আবিষ্কারের সেই আদিকাল থেকেই প্রবাহিত। বস্তুত বিজোড় সংখ্যা সংক্রান্ত ধারণা এক প্রকার যাদুবিশ্বাসেরই অঙ্গীভূত। তার মধ্যে 'সাত' সম্পর্কিত যাদুবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে 'সাত' সংখ্যাটিকে একটি পবিত্র সংখ্যারূপে চিহ্নিত করে রাখে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, এই লোকবিশ্বাস কোন-না-কোন রূপে পৃথিবীর সর্বত্র কম-বেশী প্রতিষ্ঠিত এবং সংখ্যাসূত্রের আদিকাল থেকেই এর সীমাহীন প্রভাব।

সাতের মহিমা মনে রাখার জন্য রূপকথার সাত রানীর সাত মহলা বাড়ির সন্ধানে না গেলেও চলবে; তাঁদের কণ্ঠের সাতনরী হারের শোভা না দেখলেও চলবে। এমন কি সাতভাই চম্পা পারুল বোনের কাহিনীকে উহ্য রেখে, সপ্ত ডিঙায় চড়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে গিয়ে সাত রাজার ধন মানিক খোঁজার প্রয়াস আমাদের নাই বা থাকলো কিংবা সাত ঘড়া মোহরের স্বপ্ন নাই বা দেখা গেল! কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সাতঘাটের জল খেতে অভ্যস্ত। সাতপাঁচ ভেবে সাত-সতেরো না বুঝে সাতে-পাঁচে না থাকলেও সাতকাহন কথা আমাদের শুনতেই হয়। সাত-পুরুষের ভিটের মায়া সহজে আমরা ছাড়তেও পারি না; ভাল মানুষ সে ত্র সাত চড়ে রা'টিও কাড়ি না; সাতপাকে বাঁধা পড়ার জন্য অনেকেই অতি ব্যগ্র হলেও সাত নকলে আসল খাস্তার ব্যাপারটা আমাদের মনেই থাকে না। কালে কালে অবশ্য অনেক বিশ্বাসের মূলেই ঘা লাগে, নইলে 'সাত-বেটার বাপ ভাগ্যবান, সাতবেটার মা ভাগ্যবন্তী'—এই গ্রাম্য প্রবাদ এখন আর কেউ মুখেও আনে না কেন!

প্রবাদ-প্রবচনের জগতে প্রবেশ করলে তো ঝাঁকে ঝাঁকে সাতের আবির্ভাব। সাতকান্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মা, সাতখুন মাপ, সাতচোরের মার হজম করা, সাতবার খেয়ে একদশী করা, সাতকে সতেরো করা, সাত গাঁ মেগে একপালি ধন পাওয়া, সাতঘাট ঘুরে এসে বাপের পুকুরে ডুবে মরা, সাত-ঘাটে ঘটি ডোবানো সাতঘাটের জল খাওয়ানো, সাত পুরুষের ভিটে ছাড়ানো তো আছেই,—ছড়া কেটেও বলা যায়—'সাতকুড়ের ঘর। গোসাই রক্ষা কর।', অথবা সাতপুরুষে বিয়ে নেই শ্বশুরবাড়ি যায়, কিংবা সাতভাই যারা, রণে জেতে তারা। একেবারে গ্রাম্য ভাষাতেও বলা যায়—"সাতভাতারী সাবিত্রী বারোভাতারী এয়ো; একভাতারী পোড়াকপালী দুয়োর দিয়ে যেও।"

এ সবই একালের কথা। কিন্তু সেই বৈদিক-কালেও সাত-এর প্রভাব মোটেই অল্প ছিল না। তখন অবশ্য সাত-এর আদিরূপ 'সপ্ত' শব্দের প্রাধান্য। পৌরাণিক যুগে এই প্রভাব আরো বহু বিস্তৃত। সপ্তস্বর্গ, সপ্তমহী, সপ্তপাতাল, সপ্তনদী, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসিন্ধু, সপ্তনদী, সপ্তপদী, সপ্তসুর, সপ্তরথী, সপ্তাশ্ব, সপ্তাহ, সপ্তর্ষি, সপ্তবর্ণ সপ্তরঙ, সপ্তশতী, সপ্তপর্ণী, সপ্তকান্ড, সপ্তমাতৃকা প্রভৃতি সপ্তযুক্ত শব্দগুলি আমাদের অপরিচিত নয়। বলা চলে,—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল থেকে শুরু করে নদী সমুদ্র ঋষি ছন্দ বর্ণ পর্ণ এবং আরো অনেক কিছুই 'সপ্ত' সংখ্যার সমাহারে গঠিত এবং বিশেষার্থে ব্যঞ্জিত। এই সব সমাহার দ্বিগু, দ্বন্দ্বের সমাসবদ্ধ পদগুলির ব্যাখ্যাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। যেমন,—সপ্তলোক বলতে বুঝি,— ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন সত্য তপঃ; সপ্ত-সিন্ধুর অর্থ লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ জল—এই সপ্তপদার্থময় সাতসমুদ্র। বেদে অগ্নিকে বলা হয়েছে সপ্তজিহ্ব যার সাতটি জিহ্বার নাম কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা উগ্রা এবং প্রদীপ্তা। পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের নাম জম্বু কুশ প্লক্ষ শাল্মলী ক্রৌঞ্চ শাক এবং পুষ্কর। সপ্তপাতাল হচ্ছে তল অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকবিশ্বাসে তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি সংখ্যাকে পবিত্র সংখ্যা বলে গণ্য করা হয়। এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বিশেষ করে তিন এবং সাতের মধ্যে যাদুশক্তি নিহিত আছে বলেও মনে করা হয় এবং 'সাত' সংখ্যাটি হচ্ছে যাদুশক্তির সেরা প্রতীক।

৭

ভারতীয় পরিমন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে তিন এবং তিনের গুণিতক, এবং সাত বরাবর উল্লেখিত। ঊর্ধ্বকালের বৈদিক বিভাগে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন স্বর্গের বা তিন লোকের ধারণাই স্পষ্ট কিন্তু ঋগ্বেদে সপ্তমহীর উল্লেখও আছে। পরবর্তীকালে মুণ্ডক উপনিষদেই প্রথম সপ্তস্বর্গের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নিকে যেমন সপ্তজিহ্ব বলা হয়েছে, তেমনি তার সপ্তশিখা এবং সপ্তপত্নীর কথাও বলা হয়েছে। বৈদিক সপ্তনদীর নাম,—সিন্ধু বিতস্তা পরুষ্ণী শুতুদ্রী বিপাশা অসিক্নী এবং সরস্বতী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পঁচাত্তর সংখ্যক সূক্তে 'নদী গণ দেবতা' সম্পর্কে বলা হয়েছে 'হে জলগণ, যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিন শ্রেণীতে চলিল। নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ।' সরস্বতী দেবতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'সপ্তনদীরূপা সপ্ত-ভগিনীসম্পন্না প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে সেবিতা আমাদিগের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিন্দক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন।' ঋগ্বেদের নবম মন্ডল একশো সাত সংখ্যক সূক্তে বৈদিক সপ্ত-ঋষির উল্লেখ আছে যাদের নাম—বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ, মরীচিপুত্র কশ্যপ, রহূগণপুত্র গোতম, ভৌমপুত্র অত্রি, গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র, ভৃগুপুত্র জমদগ্নি এবং মৈত্রাবরুণী বশিষ্ঠ। পরবর্তীকালে সপ্তনক্ষত্রের সঙ্গে যে সপ্তর্ষির নাম সংযুক্ত হয় তাঁদের নাম অত্রি অঙ্গিরা মরীচি বরাহ পুলস্ত্য ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। বেদে যে সাতজন মহিলা ঋষির নাম পাওয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন—লোপামুদ্রা বিশ্ববারা অপালা ঘোষা সূর্যা বাক্ ও ইন্দ্রাণী। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশো চৌষট্টি সংখ্যক সূক্তে সূর্যের সপ্তাশ্ব বা সপ্তরশ্মির বর্ণনা আছে—"সূর্যের এক-চক্র রথে সপ্ত অশ্ব যোজিত হইয়াছে, এক অশ্বই সপ্ত নামে রথ বহন করিতেছে।....যে সপ্ত এই সপ্তাক্র রথে অধিষ্ঠান করে তাহারাই সপ্ত অশ্ব এবং তাহারাই এই রথ বহন করে। সাতভগিনী এই রথাভিমুখে আগমন করেন এবং ইহাতে সপ্ত গো নিহিত আছে।"

অথর্ব বেদের যাদুমন্ত্রে এবং লোকবিশ্বাস-জনিত আচার আচরণের ক্ষেত্রে তিন এবং সাতে উল্লেখ বারংবার আছে।

বৌদ্ধযুগে এসে লক্ষ করা যায় সাত সংখ্যাটি একটি প্রতিষ্ঠিত পবিত্র সংখ্যা। মণিমুক্তাখচিত সাতটি সিঁড়ি বেয়ে, বুদ্ধ অবতরণ করেছিলেন স্বর্গ থেকে। বুদ্ধদেবের রত্নও সাতটি এবং সাত বুদ্ধের সাত বোধিসত্ত্ব। বৈশালী ও রাজ-গৃহে আছে সাতটি পবিত্র স্থান। বৌদ্ধধর্মে মনের প্রকারভেদ সাত এবং সাতজন মানুষী বুদ্ধের নাম,—বিপশ্যী শিখী বিশ্বভূ ক্রকুচ্ছন্দ [illegible] শাক্যসিংহ। বস্তুত সাত সংখ্যাটি বৌদ্ধধর্মে বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্বলাভের অধিকার অর্জন করেছিল।

ভারতীয় আর্যধর্ম বহির্ভূত লোকায়ত এবং অন-আর্যভাষী সমাজেও এই সংখ্যাটির গুরুত্ব অপরিসীম। লোকায়ত ধর্মাচরণে এবং ক্রিয়াকাণ্ডে সাত সংখ্যাটি অন্য যে কোন সংখ্যার চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী বলে মনে করা হয়। পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার আদি-বাসী প্রভাবিত ভূমিতে লৌকিক গ্রাম্যদেবী সা[illegible] বাহিনী বা সাত ভগিনীর কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ ক[রা] যেতে পারে। সীমান্তভূমিতে এই সাতভগিনীর প্রভা[ব] অসাধারণ। এই সপ্তভগিনী কখনো একত্রে, কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রাম্য-দেবতার 'থানে' অধিষ্ঠিত। রংকিনী, মনসা, শীতলা, বাশুলী, শংখিনী, চমু[ণ্ডা]কী এবং চণ্ডী-কে প্রধানত সাতভগ্নী রূপে অভিহিত ক[রা] হয়। অঞ্চল ভেদে এই সাত-নামের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে মুণ্ডা উপজাতির সপ্তদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সপ্তদেবী বা সপ্তভগ্নীকে, মুণ্ডা জাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করা বিধান আছে। মুণ্ডারী উপকথায় বলা হয়েছে,—মুণ্ডা সমাজের মানুষ যখন অসুর জাতির অত্যাচারে নিপীড়িত হচ্ছিল, তখন নিরুপায় হয়ে তারা—সি[ং] বোঙার শরণাপন্ন হলো। সিং বোঙা নানা কৌশলে অসুরদের ধ্বংসসাধন করেন কিন্তু অসুর-রমণীদে[র] তিনি নিষ্কৃতি দান করেন। অসুর-রমণীরা কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে সিং বোঙার কাছে আবেদন জানিয়েছিল সিং বোঙা যেন ওদের স্বর্গভূমিতে নিয়ে যান। সিং বোঙা ওদের আবেদনে বিগলিত হয়ে বলেছিলেন,—তোমরা এই মর্ত্যভূমিতে থেকেই সকলের পুজো পাবে আজ থেকে তোমরাও হবে 'বোঙা' বা দেবত্ব। অসুর রমণীরা কিন্তু সিং বোঙার সঙ্গে স্বর্গে যাবার জন্য বারংবার আবেদন জানাতে থাকে। সিং-বোঙা তখ[ন] বিরক্ত হয়ে ওদের চুলের মুঠি ধরে বিভিন্ন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন—দূর থেকে দূরে। কেউ পড়ল নদীতে, কেউ পাহাড়ে, কেউ প্রান্তরে কেউ-বা অন্য কোথাও। এদের মধ্যে সাতভগ্নী হয়ে গেল মু[ণ্ডা] দেবী—বুরু বোঙা, ইকির বোঙা, চান্ডী বোঙা, চাঁদে ইকির প্রভৃতি নামে এই সপ্তভগিনীর পুজোপাটের জ[ন্য] নির্দিষ্ট হলো 'জাহের থান'। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সাত বোনের মাধ্যমে সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতিকে বিশেষ একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ করা হয়েছে। অনুমান কর[া] যেতে পারে,—অরণ্যভূমির বিভিন্ন অংশকে মুখ্য সাতটি ভাগে ভাগ করে সাতটি ভাগের জন্য সাত দেবী ব[া] সাত প্রকৃতির কল্পনা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মাতৃকাদেবীদের বিবর্তনও এই সূত্রে লক্ষ হতে পারে।

৭

দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও সাত ভগ্নীর প্রভাব বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হবে। দক্ষি[ণ] ভারতীয় সপ্তদেবীকে বলা হয় 'আম্মা'— অর্থাৎ মা এই সপ্তদেবী কিন্তু পুরাণসম্মত নয়—সবাই গ্রাম দেবতা এবং অন্ত্যজা। দক্ষিণ ভারতের সাত ভগ্নী অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিতা হলেও এদের মুখ্য নাম—পোলেরাম্মা, অনাকাম্মা মুথয়ালাম্মা, ডিল্লিপোলাসি, বাঙ্গারাম্মা, মাথাম্মা এবং রেণুকা। এদের এক ভাইও বর্তমান—নাম পোতুরাজু। এই সাত বোনের নামের মধ্যে রেণুকা নামটি কেমন যে[ন] 'আকস্মিক' মনে হয়। এরা সবাই 'আম্মা' হলেও সবাই রক্তপায়িনী ডাকিনী। এদের মধ্যে পোলেরাম্মা হচ্ছে—বসন্তের দেবী। শীতলার সঙ্গে সাদৃশ্য অনেক।

মুসলমান সমাজের 'সাতবিবি'ও সাত ভগ্নীর মূল থেকেই উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে সাতের প্রাধান্য সমগ্র ভারত বর্ষে এমনভাবে বিস্তৃত যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ছাড়াও মর্ত্যভূমির বিশিষ্ট প্রাকৃতিক অনেক বস্তুকেই সাত

প্রাচীন ইরানেও সাত একটি পবিত্র সংখ্যা। আবেস্তার পরবর্তী পহ্লবী গ্রন্থাদিতে তিন এবং সাত সংখ্যাদ্বয় বারবার উল্লেখিত হয়েছে। গ্রীকপুরাণে সাত সংখ্যাটি শুধু তারকার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ও প্রাধান্য লাভ করেছে তিন, নয় এবং বারো। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর জন্ম হয়েছে সপ্তম মাসের সপ্তম দিবসে। গ্রীকপুরাণে সাত বীরের কাহিনীও প্রসিদ্ধ।

৭

ব্রিটেনের লোকবিশ্বাসে সাতের গুরুত্ব না থাকলেও বেজোড় সংখ্যাকে, বিশেষ করে তিন এবং তার গুণিতক সংখ্যাকে পবিত্র সংখ্যা বলে গণ্য করা হয়। তেরো নামক বিজোড় সংখ্যাটি কিন্তু দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। যীশুখৃষ্টের শেষ ভোজের টেবিলে ত্রয়োদশ ব্যক্তির উপস্থিতির ফলে যীশু বিপদগ্রস্ত হন—সম্ভবত এই ধারণা থেকেই তেরো সংখ্যাটি বিপজ্জনক বলে লোকবিশ্বাসে স্বীকৃত।

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তম সন্তানকে যাদুশক্তির ধারক বলে মনে করা হয়।

পূর্ব দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সুদূর জাপানেও সাত সংখ্যাটি অবহেলিত নয়। সাতের এই প্রভাব সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকেই বিস্তৃত হয়েছে। জাপানের 'সিচি ফুকুজিন' বা সৌভাগ্যের সাত দেবতা সৌভাগ্য এবং দীর্ঘজীবন দানের অধিকারী। এই সাত দেবতার নাম বেনতেন, বিশামনতেন, দাইকোকু, এবিসু, ফুকুরোকুজু, হোতেই এবং জোরোজিন। বেনতেন—শিল্পকলা, সৌন্দর্য এবং ধনের দেবী; বিশামনতেন সম্পদদাতা দেবতা; দাইকাকুও ধনকুবের দেবতা—যার কাঁধের উপর দু বস্তা ধান চাপানো; এবিসুকে বলা হয় মাছ ধরা এবং ফসল ফলানোর দেবতা; হোতেই এক পেটমোটা দেবতা, খুবই উৎফুল্ল, হাস্যময়—যার হাতে এক থলে রত্ন; জোরোজিন হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন দানের দেবতা।

ফরাসী লোকবিশ্বাসে সপ্তম সন্তানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সে নাকি হারানো জিনিসের সন্ধান বলে দিতে পারে। জিপসীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে, জিপসী নারীর সপ্তম কন্যার সপ্তম কন্যা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে এবং ভাগ্যগণনায় সে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ।

রুমানিয়ার লোকবিশ্বাসে সপ্তম সন্তানকে বিপজ্জনক মনে করা হয়।

বাইবেলের কাহিনীতে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান নোয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সাত দিন পরে যখন প্রলয়ংকর বৃষ্টিপাত শুরু হবে, নোয়া তখন যেন প্রত্যেক শুদ্ধ প্রাণীর সাত-সাতটি তার জাহাজে তুলে নেয়।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাত সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের বিস্তার পৃথিবীর সর্বত্র। কিন্তু সাত সংখ্যাটির এই ধরনের গুরুত্বলাভের কারণ সম্পর্কে তেমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা অনুপস্থিত। বিজোড় সংখ্যাকে পৃথিবীর সর্বত্রই পবিত্রসংখ্যা রূপে গ্রহণ করা হয় এবং সাত-ই তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী।

সংখ্যা গণনার পদ্ধতি সভ্য সমাজের দান হলেও আদিম সমাজেও তার প্রবর্তন ঘটেছিল এবং অতি প্রাচীনকাল থেকেই হাত-পায়ের আঙুলকে অবলম্বন করে সংখ্যা গণনার প্রাথমিক পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছিল। পরিমাপের ক্ষেত্রে হাত, পা, আঙুল, বিঘৎ প্রভৃতি এখনও সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিম সমাজে হাত-পায়ের আঙুলকে কেন্দ্র করেই পাঁচ, দশ এবং কুড়ি সম্পর্কে স্বাভাবিক একটি ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল।

পরবর্তী অধ্যায়ে, আদিম জাতির মধ্যেই সংখ্যাবাচক শব্দের উদ্ভব ঘটে থাকবে, যার হয়তো বিশেষ কোন অর্থ ছিল। কালক্রমে সংখ্যাবাচক শব্দগুলি তার মৌলিক অর্থ হারিয়ে ফেলে এবং কেবলমাত্র সংখ্যা বোঝানোর জন্যই তাদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকে।

সংখ্যাগণনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং সূত্র অবশ্য ভারতবর্ষেরই দান। এবং এই পদ্ধতি আরবদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যদেশে নীত হয়। একেবারে আদি পর্যায়ে এক এবং দুই ছিল মুখ্য সংখ্যা। সম্ভবত নারী ও পুরুষকে দেখেই এই সংখ্যা দুটির উদ্ভব ঘটে থাকবে। দুয়ের পরেই 'বহু'। ব্যাকরণের বচনেও এক বচন দ্বি-বচনের পরেই বহুবচন। কিন্তু কালক্রমে সাত সংখ্যাটিকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হলো কেন, তা কিন্তু নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই।

অনেকের ধারণা, আকাশের সপ্তম নক্ষত্রের অনুষঙ্গেই সপ্ত সংখ্যাটি গুরুত্ব লাভ করেছে। বৈদিক ঋষিরা কিন্তু সপ্ত নক্ষত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না যদিও তাঁরা জানতেন সপ্ত ঋষিকে বা সপ্ত হোতাকে। তবু, ঋগ্বেদ থেকেই সাত সংখ্যাটি বিস্তৃত হয়েছে এমন ধারণা করা যেতে পারে। কেউ কেউ এমনও অনুমান করেছেন যে, এক এবং দশক মধ্যে সবচেয়ে বড় একক হচ্ছে সাত, যা—অন্য কোন সংখ্যার গুণিতক নয় এবং যা একেবারেই ভাজ্য নয়। এই কারণে সংখ্যাটিকে পরমেশ্বরের প্রতীক বলেও গণ্য করা হয়। বলা বাহুল্য, এই জটিলতত্ত্বটি লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। তাই সাতের রহস্য এখনো রহস্যময়, যদিও আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারে সাত শব্দটি বহুবার উচ্চারিত হয়।

পাহাড়চুড়োয় পা

সুনীল দাশ
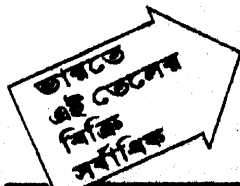
শেষ খবরটা শোনার পর থেকে সে আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। রাতে শুতে এসেছে দেরি করে। বিছানায় এসে আর কেয়াকে ডাকতে চায়নি। অথচ প্রতি রাতে, বিছানায় শুয়ে, কেয়ার নাভির ওপর হাত রেখে সে ইদানীং অনুভব করতে চায় মানুষের মধ্যে মানুষটাকে। দেখা যায় না। শুধু ভাবা যায়। খুব ছোট্ট। একেবারে খুদে খুদে টুকটুকে দুটো পা।

এখন কেয়া ঘুমিয়ে আছে।

চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে নীলাদ্রির পাশটিতে। নীলাদ্রির ঘুম নেই। তার বালিশটা খাটের মাথার দিকে খাড়া করানো। হলুদ রঙের ছোট্ট তোয়ালেটা খসে গেছে সাদা বালিশের থেকে। নীলাদ্রির মাথাটা অল্প তোলা। সে দেখছে ঘুমন্ত কেয়াকে।

দেখার হেরফেরে একই মানুষের মুখের স্লইং কেমন আলাদা আলাদা মনে হয়। কেয়ার মুখটা সবচেয়ে সুন্দর দেখায় লো-অ্যাঙ্গেলে। ভুরু দুটো একেবারে আঁকা মনে হয়।

পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল।

এতো রাতে কার ফোন এলো? সে উঠে গেল পাশের ঘরে। যেতে যেতে ভাবল, সেই ফোনটাই নয়তো, আজ ফিরতেই কেয়া যেটার কথা বলল?

রাতে ফোন বাজলে কানে বেশী লাগে। নীলাদ্রি পাশের ঘরে এসে আলো জ্বালল। রিসিভার তুলল।

ওপাশে মেয়ের গলা। খুব মিহি।
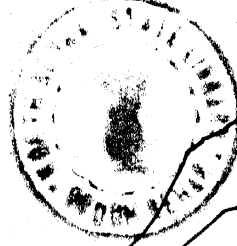
বোঝা গেল রঙ নাম্বার। মেয়েটি থানা চাইছে। এখন রাত কত হবে? সাড়ে বারো?

স্লইং রুমের আলোটা নেবাতে গিয়ে সে নেবাল না। ফটো স্ট্যান্ডটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ফটোস্ট্যান্ডে নীলাদ্রি আর জয়ন্তর ফটো। গতবারের এক্সপিডিশনে বেস ক্যাম্প ছাড়ার দুদিন পরে তোলা। চারপাশে সাদা বরফ। ওদের দুজনের চোখে মোটা কালো চশমা। মাথায় ক্যাপ। পরনে মাউন্টেনিয়ার্স জ্যাকেট। ভেন্টাইল। সঙ্গে অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট, আইস একস।

তিন বছর আগে তোলা ফটো।

সেই শেষবারের মতো পাহাড়ে যাওয়া। তারা সফল হতে পারেনি। পর্বতশিখর একেবারে পায়ের নাগালে পেয়েও শেষ পর্যন্ত পা রাখা গেল না। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে মরণের মুখ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল জয়ন্ত আর নীলাদ্রিকে। মাথা নিচু করে ফিরে আসার সময় ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল। আবার আসতে হবে। এই হেরে যাওয়ার শোধ নিতে হবে। ওই পাহাড়-চুড়োয় পা রাখতে হবে।

নীলাদ্রি কথা রাখতে পারল না। শোধ নিতে পারল না। জয়ন্ত রাখল। শোধ নিল।

খবর তেমন নজর কাড়ে না। তবু খবর শেষ করার আগে দু লাইন বলেছিল পরদিন সকালের কাগজগুলোতেও ছোট ছোট করে বেরিয়েছিল।

খবরটা শোনার পর নীলাদ্রি খুব অস্থির হয়ে গেছিল। আনন্দ না ঈর্ষা? কোনটা? ক্ষোভ, বিষণ্ণতা নাকি উত্তেজনা?

এই খবরটার মধ্যে নীলাদ্রির নামটাও তো থাকার কথা ছিল। সব ব্যবস্থাও হয়েছিল সেইমত। আগের বারের অভিযানে যারা যারা গেছিল তার সবাই যাচ্ছে, এমন কি পোর্টার কাম গাইড দুজনও আগের বারের সঙ্গী। কয়েক মাস ধরে ছোটাছুটি করে সব যোগাড় করতে হয়েছিল নীলাদ্রিকেই। এক্সপিডিশনের খরচপত্তর এবং আনুষঙ্গিক আর যা যা কিছু দরকার—সব মঞ্জুর হয়ে গেছিল হিসেবমত। কেয়া অবশ্য তাকে গোড়ার থেকেই বলে আসছিল, না তুমি যাবে না। এখন আর তোমার পাহাড় চড়তে যাওয়া হবে না কিছুতেই। বিয়ের আগে যা করে নেওয়ার নিয়েছ। এখন ওসব মাথার থেকে নামাও তো।

কেয়ার কথা শুনে নীলাদ্রি মাথার থেকে কিছু নামায়নি। এ সব ব্যাপারে খানিকটা একগুঁয়েমি কাজ করে। রোখ চাপলে থামানো মুশকিল। মেয়েরা ওরকম করে। বেশির ভাগ মেয়েই পাহাড় চড়ার নাম শুনলে শিউরে ওঠে। ভাবে এমন যেন মাউন্টেনিয়ারিং-এ গেলে—হয় ধস নামবে, না হলে তুষার ঝড়। কিছু না হলেও অন্তত অক্সিজেন ইকুইপমেন্টে কিছু একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়ে মারাত্মক ঘটনা ঘটবেই ঘটবে। উলটো ধরনের মেয়ে কি আর নেই? আছে। প্রত্যেক বছরেই তো দার্জিলিং আর উত্তর কাশী কোর্সে কত মেয়ে যাচ্ছে।

[illegible]

ছিলেন। নীলাদ্রি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ...
ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং-এর ইতিহাসে আর এক চ্যাপটার।' পরে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আরো দুজন বিখ্যাত পর্বতারোহীর সঙ্গে। ফু-দরজী আর লাটু দরজীর সংগে। এই দুজন ইন্‌সট্রাকটারের কাছেই নীলাদ্রির পর্বতারোহণের হাতেখড়ি।

ইন্‌সটিটিউটের মাঝখানে একটা হলঘর। তার দেওয়ালেতে টাঙানো বিশাল একটা বোর্ড। সেখানে আছে ভারতীয় পর্বতারোহণের সাফল্যের সালতামামি। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে নীলাদ্রি বলেছিল কেয়াকে, 'সামনের বছরে এসে দেখবে ওইখানে আমার নাম লেখা আছে।'

এই মুহূর্তে পায়ের শব্দ শুনে সে ফোটোস্ট্যান্ড থেকে চোখ সরাল। দেখল, কেয়া উঠে এসেছে।

কেয়া নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়েছিল, বলল, 'কি হয়েছে তোমার? এ ঘরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঘুম আসছে না?'

'একটা ফোন এসেছিল।' নীলাদ্রি ধীর গলায় বলল।

'এতো রাতে কার ফোন? ওই যে সন্ধ্যেবেলায়—'

'না। এটা অন্য। রঙ নাম্বার হয়ে গেছে। মেয়ের গলা। থানা চাইছিল।'

কেয়া চুপ থেকে নীলাদ্রির চোখ দেখল।

কোন কথা নেই। অস্বস্তি ভেঙে নীলাদ্রি আবার সন্ধ্যেবেলাকার ফোনের প্রসঙ্গে এলো, 'আচ্ছা—সন্ধ্যেবেলায় ফোনে ওই ভদ্রলোকটি—পরে আর ফোন করবে কিনা কিছু বলেছিল কি?'

'না। তেমন কিছু বলেনি। আমিই বরং বলে দিয়েছিলুম—তোমার ফিরতে ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা হবে।'

নীলাদ্রি আর কোন কথা বলল না। ড্রইংরুমের আলো নিবিয়ে শোয়ার ঘরে চলে এলো।

আবার শুয়ে পড়ার আগে, কেয়া টেবিলের ওপর সাদা প্লেট ঢাকা দেওয়া পাতলা সবুজ কাঁচের গ্লাস থেকে জল খেল অনেকটা।

'তুমি জল খাবে?' বিছানায় যেতে যেতে বলল।

নীলাদ্রি জানাল, 'না।'

বিছানার চাদরটা খুব সুন্দর। সর্ষে রঙের জমি। তার ওপর গোলাপী সুতো দিয়ে গাছের সারি। পাহাড়ী গাছ। পাইন জাতীয়। মাথার আর পায়ের দিককার গাছগুলো সাদা সুতোর। বাকি সব গোলাপী। এই চাদরটা পাতলে শোবার ঘরটাকে সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল লাগে।

আজ নীলাদ্রি অন্য দিনগুলোর মত কিছু বলছে না। অদৃশ্য ছোট্ট ছোট্ট পা দুটো কোথায় হতে পারে ভাবছে না। ভাবছে না পা দুটো কার মত হবে। নীলাদ্রির মত, না, কেয়ার মত। নীলাদ্রির নিজের পা তার বাবার মত হয়নি; হয়েছে মায়ের পায়ের আদলে। এ বাড়ির ঠাকুরঘরে নীলাদ্রির বাবার পায়ের পাতার ছাপ বাঁধানো আছে। অদৃশ্য পা দুটো ওই ছাঁচেরও হতে পারে। রঙ, আদল, উচ্চতা দু'তিন প্রজন্ম পর্যন্ত চলে না?

কেয়ার পায়ের আঙুলগুলো তলার দিকে কেমন ছুঁচোলো মতো। নীলাদ্রির পায়ের আঙুল এমন চোখা চোখা নয়। একটু গোল গোল। কেয়ার পায়ের আঙুলগুলো যেখানে পায়ের পাতার বাকি অংশের সঙ্গে এসে মিশেছে, সেখানে দুটো করে আঙুলের ফাঁকে যে ছোট্ট ছোট্ট চারটে গলি—তার আকার হয়েছে পানপাতার মত। নিচের দিকটা বড়, গোল হয়ে ওপরদিকে গম্বুজের চুড়োর মত মিশেছে। নীলাদ্রি কোন দিন সেই ছোট্ট ছোট্ট ফোকরগুলোতে নিজের ডান হাতের অনামিকার আগা গেঁথে গেঁথে দেয় যখন, কেয়া তার শরীরে টুকরো টুকরো ঢেউ তুলে কুলকুল করে হাসে আর মুখে নিষেধ করে 'এই পায়ে হাত দিও না কিন্তু।'

ইদানীং রাতে বিছানায় এসে কোন কিছু না কিছু অদ্ভুত কথা বলেই। চার-পাঁচ দিন আগে, হাসতে হাসতে বলল, 'এই জানো, আমার না, তোমার ছোটবেলাটা খুব দেখতে ইচ্ছে করে। এখানের মার কাছে কত গল্প শুনি তোমার ছোট বয়সের। পুরোনো অ্যালবামে ফটো দেখি কত। তবু সাধ মেটে না।' বলতে বলতে কেয়ার মুখের হাসি আরো নরম হয়ে এসেছিল। ঝিরঝির করে অনেকটা হাসি ফেলে দিয়েছিল, তারপর খুব নামানো গলায়, শব্দের ফাঁকে ফাঁকে আদর বুনে বুনে বলেছিল, 'এবার দেখবো। তোমায় শাসন করবো, আদর করবো।'

সেদিন অবশ্য নীলাদ্রিও সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, 'আমিও তোমার দেখতে পারি। তোমার ছোটবেলা। যে ছোট্টবেলাটা তোমারও মনে নেই—সেটা আমরা দুজনে একসঙ্গে দেখতে পারি।'

কিন্তু আজ—এই মুহূর্তে, কোন কথা থাকে না। মাথার ওপরে পাখাটা জোরে হাওয়া কেটে শব্দ করে। গোলাপী সুতোর পাহাড়ী গাছগুলোর ওপর কেয়া শুয়ে থাকে। সর্ষে রঙের জমি গড়িয়ে যায়। সে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে। তার মাথার মধ্যে পাখার শব্দটা একটা ঝড়ের শব্দ হয়ে ওঠে। তুষার ঝড়। ঝাপটা মারছে। টেন্টের তাঁবু উপড়ে ছত্রাকার। পোর্টার-কাম-গাইড চিৎকার করছে। সাদা কঠিন হিম সমুদ্র। অথৈ।

কতকালের স্বপ্ন! কত বছরের!

সুযোগ বারবার আসে না। সে কি ইচ্ছে করলে জোরজার করে বেরিয়ে যেতে পারত না? কেয়া না হয় একটু কান্নাকাটি করতোই। এখন তো গোড়ার দিক। ঠিকমত শেপ্‌ই পায়নি। কেন যে নীলাদ্রি গুটিয়ে নিল নিজেকে!

আগে কেয়া কিছু খুলে বলেনি। শুধু বলে গেছে, কেমন যেন তোমার

দিন। খুব উদ্বেগ নিয়ে বলেছিল, 'আমার এ অবস্থায় তুমি যাবে?'

'কি অবস্থায়?'

কেয়া শুধু হেসেছিল।

নীলাদ্রির যাওয়া বাতিল হওয়ার পর, জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বুঝেছো এবার—কেন বিয়ে করতে চাই না? তিন বছরের বাঁচিয়ে রাখা একাধিপত্য এতো সহজে হাত ছাড়া করি?' জয়ন্তর সেই হাসিটা নীলাদ্রি এই মুহূর্তেও স্পষ্ট মনে করতে পারছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি যেন কানের গোড়ায় জয়ন্ত হেসে উঠল।

জয়ন্তরা যেদিন রওনা হয়, নীলাদ্রি গেছিল হাওড়া স্টেশনে। মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের আরো অনেক সদস্য এসেছিল। খুব হইচই করে রওনা হল ওরা। স্টেশনে দেখা করতে এসে গাড়িটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গেলে বেশির ভাগ সময়ই মন খারাপ হয়ে যায়। সেদিন কি খুব খারাপ লেগেছিল?

কি বলা যায়? ক্ষোভ, না, ঈর্ষা?

বাড়ি ফিরে গুম হয়েছিল। কেয়ার সঙ্গে কথা বলেনি।

চাকরির জন্যে আজই যদি তাকে দুচার মাসের জন্যে বাইরে যেতে হতো, তা হলে কি সে যেতো না; নাকি এ অবস্থায় লোকে যায় না! সুচন্দ্রার বাচ্চাটা হবার দেড় মাস পরে মনোজিৎ কুয়েৎ থেকে ফিরল না? তাহলে? প্রয়োজনে সকলেই পরিস্থিতি মানিয়ে নেয়।

কেয়া বলবে—এটা প্রয়োজন নয়, এটা সখ।

হলেইবা সখ? সখটা যে কারো কারো কাছে বাঁচার চেয়ে কম নয়, এটা বোঝে না?

বুঝেছে। দুদিন আগে কেয়া বুঝেছে নীলাদ্রির চোখের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যে বেলা খবরটা পেয়ে নীলাদ্রিই জানিয়েছিল কেয়াকে, 'এবারের অভিযান সফল। জয়ন্তর শেষ চিঠিটাতেই বুঝতে পারছিলাম—এবার ওরা জিতবে।'

কেয়া খুব খুশি হয়ে বলেছিল, 'সত্যি? এবার খুব নাম হবে জয়ন্তদার।' বলেই চুপ করে গেছিল। কেয়ার মুখের রেখা পালটে গেছিল। চাউনি পালটে গেছিল। কেন না, কথাটা বলেই কেয়া নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে নীলাদ্রি বলেছিল, 'এই সুযোগটা আমার দরজাতেও এসেছিল।'

কেয়ার মুখের রক্ত তখন ফ্যাকাসে। ভয় থিকথিক করছে। নীলাদ্রি বুঝতে পারছিল তার চোখ দুটো হিংস্র হয়ে উঠেছে। ক্রোধ কিংবা ঈর্ষা কিংবা তারই কাছাকাছি একটা কিছু সেখানে জ্বলছে। সে জানে তার নিজের মুখের তলায় আরো অনেক মুখ লুকোনো আছে। সব সময় তাদের দেখা যায় না। একটা মুখের তলা থেকে লুকোনো আর একটা মুখ বেরিয়ে পড়ে।

এখন সবুজ আলোটা নিবিয়ে দিলেও ঘর অন্ধকারে ভরল না। আকাশের কোন এক জায়গায় চাঁদ বেরিয়ে আছে। খাটে শুয়ে, ঘরের জানলা দিয়ে তা দেখা যায় না। আলোর গাঢ়ত্ব দেখে বোঝা যায় চাঁদ বেশ বড় হয়েছে। চাঁদের আলো কেয়ার পেটের চামড়ার ফরসা রঙে হালকা নীল মিশিয়ে দিচ্ছে। বাঁ দিকের ঢালে ছায়াগড়ানো, নাভিচুড়োর কাছটায় বাঁ হাত রাখা। টানাটানা নরম আঙুলগুলোর ডগায় আলো। মাঝ শরীরের রঙে বড় চাঁদের মায়া জড়িয়ে কেমন অন্য একটা আভা বেরিয়ে আসে। বাকি শরীরটা থেকে কেমন যেন আলাদা হয়ে যায়। এক, তবু এক নয়। যেমন পাহাড়চুড়োয় জ্যোৎস্না বিঁধলে অল্প নিচের বরফের থেকে অন্যরকম হয়ে যায়, তেমনি।

শিখরে ওঠার তিন দিন আগে জয়ন্ত তাকে যে চিঠিটা লিখেছিল সেটা আজ পৌঁছেছে।

'...বরফ। শুধু সাদা। পা ফেলে ফেলে দড়ি টেনে টেনে এগোচ্ছি। ক্যারাবিনার মধ্যে দিয়ে নেমে যাচ্ছে দড়ি। সাদা আলো ঠিকরে চোখের সামনের কাচে ঝাপটা মারছে যেন। হঠাৎ আবার ঝোড়ো বাতাসে বরফের কুচি উড়তে শুরু করল। এই রকমই হচ্ছে মাঝেমধ্যে। আগেরকারের কথা মনে পড়ছে। তোর কথা।

সন্ধ্যের ছায়া লম্বা হতে শুরু করে দিল। টেন্টে ঢুকলাম। তারপর সাদা উপত্যকা জুড়ে শুধু নীল ছায়া। ভয়ংকর রকমের চুপচাপ।

ভোরবেলা আবার বরফ পড়ছে। সাদা বরফের কার্পেট পাতা। লাফাচ্ছি, নাচছি, খেলছি তার ওপর।'

আজ নীলাদ্রি তার অনুমানের খেলাটাও খেলেনি। ওপর থেকে হাত দিয়ে অনুমান করে বলেনি—এইখানে হবে মাথা, এইখানে হবে একজোড়া পা। বেশিটাই কল্পনা। মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে পুরোনো ঘটনা। তবু কেমন শিহরন লাগে। একটু একটু করে আকার নেবে। ফুল ফোটার মত। কিংবা যেন একটু একটু করে পা ফেলে ফেলে শিখরের দিকে উঠে আসার শিহরন।

ফোনটা আবার বাজছে না?

হ্যাঁ। একবার বেজে উঠল তো! নাকি ভুল শুনল সে! আজ এরকম হচ্ছে কেন?

শেষ খবরটা শোনার পর থেকেই তার এরকম হচ্ছে। শেষ খবরটা সে আর কেয়াকে জানায়নি। বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। অথচ বলে ফেলতে পারলে এখন, ভেতরকার এই অস্বস্তি এমনভাবে থাকত না। খবরটা কেয়াকে না জানানোর পক্ষে প্রথম থেকেই সে একটা যুক্তি তৈরি করে নিয়েছে নিজের মধ্যে। কেয়া এমনিতেই খুব ভীরু, তার ওপর যদি কোন সাংঘাতিক খবর শোনে—তবে ওর ওপর প্রতিক্রিয়াটা খারাপ হবে। কেয়াকে জানালে ও আঁৎকে উঠবে।

শেষ খবরে বলেছে, অভিযাত্রীরা ফেরার মুখে তুষার ঝড়ে পড়েছে। এখনো

আবার সে স্পষ্ট শুনতে পেল ফোনটা বাজছে।

এবারেও কি শোনার ভুল? আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলাকার ফোনটায় জয়ন্তর কোন খবর ছিল না তো? জয়ন্ত বলেছিল, পাহাড় থেকে নেমে সে প্রথম ট্রাঙ্ককল করবে নীলাদ্রিকে। এখন জয়ন্তর গলার আওয়াজ তার স্মৃতির মধ্যে পাক দিচ্ছে। জয়ন্তর লেখা মনের মধ্যে ছবি হয়ে যাচ্ছে।'......সাদা বরফের কার্পেট। লাফাচ্ছি, নাচছি, খেলছি তার ওপরে।......

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে মনে হয়। ঘুম আসে না। গোলাপী সুতোয় পাইন গাছের সারির ওপর গড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ঝড় বইছে। তুষার ঝড়। বরফের ঝাপটা। টেন্ট উড়ে গেছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। বরফের কুচি এসে ঘা মারছে চোখে মুখে। কোন এক সময় সে টলতে টলতে পাশের ঘরে চলে আসে।

রিসিভার তোলে। ডায়েল ঘুরিয়ে যায়। বারবার ঘুরিয়ে একটা নাম্বার পেতে চায়।

তারপরে, অনেকক্ষণ পরে, কেয়ার ঠান্ডা হাতটা কাঁধের ওপর আসতেই সে চোখ ফেরায়।

কেয়া উঠে এসেছে আবার।

নীলাদ্রির চোখের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'এতক্ষণ তুমি কাকে ফোন করতে চাইছিলে?'

তাই তো! এতক্ষণ কার নাম্বার ঘোরাচ্ছিল যেন? কার?

কেয়া হাসল না। নিরুত্তাপ গলায় বলল, তুমি আমাদের নাম্বারটাই ঘোরাচ্ছিলে বারবার।'

নীলাদ্রি কেয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সে বুঝতে পারল, তার নিজের মুখের রেখা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারল, কেয়া ভয় পেয়ে যাচ্ছে আরো। ভাবল, এখনই কেয়াকে দুঃসংবাদটা বলে দিই।

সে কিছু বলার আগে কেয়া ঠান্ডা গলায় বলল, 'তোমার এত কষ্ট হবে বুঝতে পারিনি। এর পর আর কোনদিন তোমায় আটকাবো না।'

নীলাদ্রি উত্তর দিতে পারে না। কেন যেন বলতে পারে না, পাহাড়চুড়ো থেকে জয়ন্ত আর ফিরতে পারেনি।

ওরা দুজনে আবার গোলাপী সুতোয় বোনা পাইন গাছের বনভূমিতে ফিরে আসে নিঃশব্দে। আর নিঃশব্দেই কেয়ার নরম শরীরের মধ্যচূড়ায় হাত রেখে রেখে নীলাদ্রি একজোড়া অদৃশ্য পা খুঁজে চলে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-CX.14-2415 BG

স্যামুয়েল বৌর্ন

অরুণকুমার ঘোষ

ভূভারতে এখন কতগুলো ফটো তোলার দোকান আছে? কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ—এই কটা শহরেই বেশ কয়েক হাজার হবে মনে হয়। শুধু শহর কলকাতাতেই 'দিবারাত্র ফটো তোলা হয়' এমন 'স্টুডিও' হয়ত কয়েকশ আছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, মায় শ্মশানঘাটে। মফস্বল শহরগুলোতেও এখন এ ধরনের দোকান প্রচুর। বর্ধিষ্ণু গ্রামে-গঞ্জেও এক আধটার সাক্ষাৎ পেতে পারেন।

খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা, টিভি, সিনেমা—এসবের প্রয়োজন ছাড়াও আজকাল সাধারণ মানুষের বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, শ্মশানযাত্রা, পুজোপার্বণ, যাত্রা থিয়েটার, পিকনিক, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাকার নানারকম অনুষ্ঠানে ফটো তোলা একটা সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাধারণ সচ্ছল পরিবারে একখানা ক্যামেরা থাকা একটা মামুলি ঘটনা। ফটোগ্রাফিরই বা কত বৈচিত্র্য! সাদা-কালো, রঙীন। স্টিল, মুভি। সাধারণ, তাৎক্ষণিক (ইনস্ট্যান্ট)। ছোট বড়, সরু চওড়া নানা আকারের ফিল্ম।

অথচ একশ বছরের কিছু আগে কলকাতা শহরে ফটো তোলার দোকান হয়ত একটাও ছিল না। ১৮৬৮ সালে ১০নং চৌরঙ্গীতে একটা দোকান খোলা হল—নাম 'বৌর্ণ অ্যান্ড শেপার্ড' (Bourne and Shepherd)। দোকানটা এখনও আছে—ঠিকানা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড।

সেই সময় সারা ভারতে ফটো তোলার দোকান হয়ত হাতে গোণা যেত। এইসব দোকানের মধ্যে একটা ছিল সিমলা শহরে—বৌর্ণ অ্যান্ড শেপার্ডের হেড অফিস। ১৮৬২ সালে[১] এই কম্পানির দোকান ছিল আগ্রা শহরে। নাম 'সি. শেপার্ড অ্যান্ড এ. রবার্টসন, ফটোগ্রাফিক আর্টিস্টস'। দুবছর পরে সেই দোকানের নতুন ঠিকানা হল এলাহাবাদ শহর, নতুন নাম 'হাওয়ার্ড অ্যান্ড শেপার্ড'। আরও এক বছর পরে আবার ঠিকানাবদল। এবার শহর সিমলা, নাম 'বৌর্ণ অ্যান্ড শেপার্ড'।

১৮৬৮ সালেরও তিরিশ বছর আগে, ভারত কেন, তামাম দুনিয়াতে ফটো তোলার দোকান বলুন, 'স্টুডিও' বলুন, কিচ্ছু ছিল না। আর ১৮২৬ সালের আগে কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর ছবি তৈরি করা সম্ভব, এমন কথা কিছু 'পাগল' ছাড়া সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত না। সেই বছরই ফরাসী দেশে নিসেফোর নীয়েপ্সে নামে এক ব্যক্তি পৃথিবীর প্রথম 'ফটোগ্রাফ' তোলেন[২]। নীয়েপ্সের তোলা ফটো এখনকার মত নয়—পিউটার (Pewter) প্লেটে অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

প্রথম সুস্পষ্ট ফটো তোলার কৃতিত্ব আরেক ফরাসী ভদ্রলোকের—নাম লুই দাগুয়েরে। ১৮৩৯ সালের ৭ জানুয়ারি ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমিতে তাঁর পদ্ধতি প্রথম দেখান। তার তিন হপ্তার মধ্যে, ২৫ জানুয়ারি, হেনরি ফক্স ট্যালবট ইংল্যান্ডে রয়াল সোসায়েটিতে তাঁর পদ্ধতি প্রদর্শন করলেন।

দাগুয়েরের পদ্ধতিতে কোনও বস্তুর একটাই ছবি উঠত। ছবিটা হত অনেকটা এখনকার হাফটোন ব্লকের মত (স্ক্রীন বাদে)। ট্যালবটের পদ্ধতি আজ-কালকার নেগেটিভ পজিটিভ পদ্ধতির মতই। কিন্তু সেলুলয়েড ত দূর অস্ত্, কাচের প্লেটে ফিল্ম তৈরি তখনও সম্ভব হয়নি। অর্ধস্বচ্ছ কাগজের ওপর রাসায়নিক প্রলেপ মাখিয়ে নেগেটিভ তৈরি হত। ফলে প্রিন্ট ঝাপসা ঝাপসা হত। বছর দশেক পরে (১৮৫০) গ্রেট ব্রিটেনে কলডায়ন (Collodion) নামে একটা স্বচ্ছ তরলের সাহায্যে কাচের প্লেটে ফিল্ম তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। পদ্ধতির নাম ওয়েট প্লেট (wet plate)।

ওয়েট প্লেট পদ্ধতিতে ফটো তোলার হাঙ্গামা অনেক। তখন ক্যামেরারও এত উন্নতি হয় নি। কলকাতার অনেক পুরনো দোকানে অবশ্য এখনও সেযুগের প্লেট ক্যামেরা দেখতে পাওয়া যায়। এসব ক্যামেরায় যান্ত্রিক শাটার থাকত না। লেন্সের ঢাকা হাতের আন্দাজে খুলে ছবি তুলতে হত। তৈরি প্লেট বাজারে কেনার প্রশ্ন ছিল না, কাচের ওপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফিল্ম তৈরি করে প্লেট ভিজে থাকতে থাকতে ছবি তুলতে হত। ফিল্ম যথেষ্ট সেনসিটিভ হত না—ফলে বেশ কয়েক সেকেন্ড এক্সপোজার দিতে হত।

সেই যুগে, ১৮৬৩ সালে, স্যামুয়েল বৌর্ণ নামে এক ফটোশিল্পী[৩] বিলেত থেকে এদেশে এসে হাজির হলেন। স্যামুয়েল বৌর্ণ অবশ্য এদেশে প্রথম ফটো-

[illegible]

আগে এদেশে আরো ফটোশিল্পী হয়ত এসেছেন। কেননা ১৮৫৮ সালে [illegible] কলকাতায় বেঙ্গল ফটোগ্রাফিক সোসায়েটি নামে রীতিমত একটা সংস্থা [illegible] এই সোসায়েটির তরফ থেকে ফটোশিল্পের প্রদর্শনী আয়োজন করা হত, পুরস্কার দেওয়া হত, ফটোগ্রাফিক ব্যাপারে নিয়মিত আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করা হত।

এবং শুধু সাহেবরা নন, দেশীয় রাজন্যবর্গেরও কেউ কেউ ফটোগ্রাফির চর্চা করতেন। পরে আমরা তার প্রমাণ পাব।

ভারতে আগত প্রথম ফটোশিল্পী না হলেও, স্যামুয়েল বৌর্ণ ফটোগ্রাফির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর তোলা ফটো সেই যুগের পৃথিবীর সেরা ফটোগ্রাফগুলির সমকক্ষ। বলা হয়:

"তাঁর কাজ চিরায়ত, নিখুঁত। উনিশ শতকের নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি যেসব ছবি তুলেছেন তার কিছু কিছু আধুনিক ছবির চেয়েও ভাল।

পৃথিবীর 'প্রথম ফটোগ্রাফ'। জানলা দিয়ে দুপাশের বাড়ির অংশবিশেষ ও মাঝের গোলাবাড়ির চাল দেখা যাচ্ছে। ছবিটি তুলতে গ্রীষ্মের দিনে আট ঘণ্টা এক্সপোজার দিতে হয়েছিল।

নিসর্গচিত্রকার হিসেবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি। তাঁর তোলা দেশীয় মানুষ, যথা টোডা বা তিব্বতীয়দের ছবিতেও যথেষ্ট সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিটি ছবি—সে স্টুডিয়োতে নেওয়া হোক বা সভ্যতা থেকে হাজার মাইল দূরে নেওয়া হোক—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং বর্ণবহুল।"

বৌর্ণের জন্ম ১৮৩৪ সালে। এদেশে আসার আগে নটিংহামে ব্যাঙ্কের কেরানি[৪] ছিলেন। অবসরকালে ফটো তোলার নেশা ছিল। ১৮৫৯ সালে নটিংহামে তাঁর তোলা ছবির এক প্রদর্শনীও হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি ল্যান্ডস্কেপ ফটো তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। তার বছর তিনেকের মধ্যেই তাঁর ভারতে আগমন।

ভারতে তিনি বছর সাতেক ছিলেন। ১৮৭০ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ কলকাতা থেকে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। এর মধ্যে ১৮৬৬ সালে তাঁর দেড় হাজার ভারতীয় ছবির এক ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। দেশে ফিরে নটিংহামে 'এস বৌর্ণ অ্যান্ড কোং' নামে তুলোর ব্যবসা খোলেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে বিয়ে করেন। ছেলের বয়স একুশ বছর হলে, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে ছেলে সাবালক হলে, অবসর নেন। অবসর জীবনে জলরঙে ল্যান্ডস্কেপ ছবি আঁকতেন। ১৯১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৬৩ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে হিমালয় ও কাশ্মীর অঞ্চলে বৌর্ণ তিনবার ফটোযাত্রা (তীর্থযাত্রার মত) করেন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে তিন দফায় বাইশটি কিস্তিতে এই ফটোযাত্রাগুলির বিবরণ ব্রিটিশ জার্নাল অব ফটোগ্রাফিতে প্রকাশিত হয়। বিবরণগুলির সঙ্গে কোনও ছবি মুদ্রিত হয় নি। সম্ভবত তখনও মুদ্রণের এত উন্নতি হয় নি। অথবা, ব্যবসার খাতিরে বৌর্ণ ছবিগুলি ছাপান নি।

"...(পাঠকদের) কেউ আমার দীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম এবং দূরের পার্বত্যপ্রদেশে কয়েকশ মাইল পরিক্রমণের ফসল ছবিগুলি দেখতে ইচ্ছুক হবে

ওয়েট প্লেট পদ্ধতি। ক. সাইজ করা কাচের প্লেট অ্যালকোহল ও পিউমিস পাউডারে পরিষ্কার করা। খ. আরক্তাকার কাচের যত্রে [illegible] প্রবল ভরে প্রায়ান্ধকার ঘরে সেনসিটাইজিং বাথ তৈরি করা। গ. এবার পরিষ্কৃত কাচের প্লেটে পটাশিয়াম আয়োডাইড মিশ্রিত কলডায়ন ঢেলে প্লেটটাকে [illegible] বাঁয়ে সরকারে [illegible] নেড়ে সেটাকে ভাল করে চারিয়ে দেওয়া। ঘ. এরপর কাচের তৈরি দুটো হুকের সাহায্যে প্লেটটাকে সেনসিটাইজিং বাথে ডুবিয়ে রাখা। [illegible] মিনিট পাঁচ-ছয় বাথে ডোবানোর পর হুকের সাহায্যে প্লেটটা তুলে নেয়া। যদি প্লেটের রং ক্রীমের মত সাদা হয় তাহলে প্লেট [illegible] [illegible]

[illegible]

পোছে। [illegible] কম্পানিই ইংল্যাণ্ডে এগুলির প্রকাশনের এজেন্ট।"

ছবিগুলি এখন অধিকাংশত লণ্ডনের ইণ্ডিয়া রেকর্ড অফিস, রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসায়েটি ও রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসায়েটির সংগ্রহে আছে।৫

ফটোগ্রাফি ছাড়াও বোর্ণের তুলি কলমে ছবি আঁকার ক্ষমতা ছিল। স্বভাব শিল্পীর অন্যতম গুণ—পর্যবেক্ষণক্ষমতা—যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করার ক্ষমতা। তাঁর লিখিত বিবরণগুলিতে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। বিবরণগুলির ভাষা অবস্থাবিশেষে কখনও আবেগপ্রবণ, কখনও রুক্ষ কর্কশ। পড়তে পড়তে মনে হয় আমরাও যেন তাঁর সঙ্গে অরণ্যসংকুল পার্বত্যপ্রদেশে অভিযানে বেরিয়েছি। নানারকম বাধা পেরিয়ে মাঝে মাঝে হিমালয় নামক নগাধিরাজের অপূর্ব সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাচ্ছি স্থানীয় লোকদের আচার ব্যবহার, ইয়োরোপীয় ভদ্রমহোদয় ও ছোটখাট রাজা-রাজড়ার ব্যবহার এবং তৎকালীন যানবাহনের প্রকৃতি—ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যের টুকরো এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

প্রথম অভিযানের শুরু ২৯ জুলাই ১৮৬৩। সিমলা থেকে। ব্যাপ্তিকাল দশ সপ্তাহ। শুরুতে বোর্ণ ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনে অনুরূপ যাত্রার পার্থক্যের তুলনা করছেন। ব্রিটেনে পার্বত্য অঞ্চলে যত্রতত্র থাকাখাওয়ার জন্য হোটেল পাওয়া যায়, যাতায়াতের ব্যবস্থাও অনেক ভাল। ভারতের হিমালয় অঞ্চলে সেধরনের সুবিধে নেই। তাই সব সাজসরঞ্জাম নিজেদেরই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। সব ব্যবস্থা করে তিনি যখন যাত্রা হলেন, দেখা গেল ৩০ জন মালবাহক দরকার। সঙ্গে চলেছে ক্যামেরা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, তাঁবু, খাবার-দাবার, বিছানাপত্র ইত্যাদি।

১৬ দিন হাঁটার পর ১৬০ মাইল উত্তরপূর্বে চীনী পৌঁছলেন। সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে না। তাঁর কাজ শুরু হল। ফটো তোলেন, এগিয়ে যান। ইচ্ছে তিব্বত পর্যন্ত যান। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়, গাছপালা নেই—দেখতে ভাল লাগল না। অগত্যা চীনীর দিকে পুনর্যাত্রা।

চীনী সমুদ্রতল থেকে ৯০০০ ফুট উঁচুতে মনোরম এক উপত্যকায় অবস্থিত। উপত্যকার একাংশ নিচু হয়ে ৩০০০ ফুট নিচে শতদ্রু নদী পর্যন্ত চলে গেছে। বিপরীত দিকে কৈলাস ও রলডং (২২০০০ ফুট) শিখর। কিন্তু ইতিমধ্যে চীনীতে মেঘ এসে হাজির। ঠিক করলেন শতদ্রু পার হয়ে উল্টোদিকে যাবেন। "প্রকৃতি মহৎ নদীগুলির জন্য যেমন খাতের সৃষ্টি করেন, শতদ্রু এখানে সে রকম একটা খাত বেয়ে চলে।" বোর্ণের সমস্যা হল এই "বিরাট অনুপম দৃশ্যে"র ফটো কী করে তুলবেন? "গ্লোব লেন্সের" প্রচণ্ড প্রচার, কিন্তু তা দিয়ে এর কিয়দংশেরও ছবি তোলা অসাধ্য ব্যাপার। শতদ্রুর তীর ধরে তিন সপ্তাহ চললেন। রাস্তা দুর্গম। কখনও কখনও সন্তর্পণে জলের ধার দিয়ে হাঁটতে হয়। মেঘও তাড়া করে চলেছে। একবার এমন হল, ছ'দিন অপেক্ষা করে বসে থেকে দুখানা মাত্র ছবি হল। এক জায়গায় হঠাৎ দেখলেন সব ডিস্টিল্‌ড্‌ ওয়াটার উবে গেছে। বোতলের ছিপিগুলো বোধহয় ঠিকমত বন্ধ করা হয় নি। কী করবেন? অগত্যা পাহাড়ী নদীর জলই ব্যবহার করলেন। তাতে ছবি শুধু সুন্দরই হল না, দেখা গেল মেঘের ছবিগুলো এই জলে গোলা ডেভলপারে আরো ভাল এসেছে। ছবি তোলেন ১২ × ১০ প্লেটে। একটা ছবি তুলতে ১৫ থেকে ৩৫ সেকেণ্ড এক্সপোজার দিতে হয়! সুতরাং বেশি হাওয়া থাকলে ছবি তোলা যায় না।

তিন সপ্তাহ পরে আবার চীনীতে প্রত্যাবর্তন। এখন পাহাড়ে চড়া রপ্ত হয়েছে। ঠিক করলেন তারী (Taree) গিরিপথের রাস্তায় স্পিটি যাবেন। শতদ্রু উপত্যকা ছিল খুব গরম। তারী পাস (১৫,২৮২ ফুট) একেবারে উল্টো—"নিজেদের গরম রাখাই সমস্যা"। "কী অপূর্ব পর্বতমালা! অন্তহীন পর্বতশ্রেণী, উপত্যকা—অব্যক্ত, অজ্ঞাত। শিখরের পর শিখর, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, ওপরে, নিচে, চতুর্দিকে গিরিশ্রেণী—অসংখ্য, অনন্ত—যতদূর চোখ যায় ততদূর। অনুধাবন করতে গেলে বুদ্ধি অবশ হয়ে আসে।...এখন যা দেখছি, ফটোগ্রাফি শুরু করার আগে আমি প্রকৃতির এত সৌন্দর্যের অর্ধেকও দেখি নি। এমন মহিমময় নিসর্গদৃশ্যের স্মৃতি আমার মনের কোনও কন্দরেই নেই। এমন দৃশ্য হয়ত আর কখনও দেখতে পাব না।"

তারী পাসে একটা বিরাট হিমবাহ। "অন্ধ করে দেওয়ার মত সাদা ঝকমকে "বরফ"। হাত পা ঠাণ্ডা, অবশ। তাঁবু খাটানোই সমস্যা। কোনওরকমে একখানা ছবি তুললেন। গিরিপথ অতিক্রম করে অপরদিকে ৫০০ ফুট নিচে নেমে ঠিক করলেন আর এগোবেন না, ফিরে আসবেন। দারুণ বরফ পড়তে শুরু করল। তাঁবুর চারদিকে এক ফুট বরফ জমে গেল। এমন সময় মালবাহকের দল, সম্ভবত ঠাণ্ডার জন্য চম্পট দিল।

একটুও আগুন নেই। কেবল শুয়ে থাকা। সময় কী আস্তে আস্তে কাটে! তিনদিন, তিনরাত্রি সেই দারুণ ঠাণ্ডায় কাটাতে হল। তারপর তাঁর ভৃত্যবর্গ স্পিটির নিকটতম গ্রাম থেকে নোতুন মালবাহকের দল নিয়ে এল।

এরপর শতদ্রু উপত্যকার আড়াআড়ি ওয়াংগু উপত্যকায় যাত্রা। এখানে 'চিয়েল' (Chiel) বা 'চিল' (Chil, স্থানীয় নাম) নামে খুব সুন্দর গাছের বন। গাছগুলো ১৫০ থেকে ১৮০ ফুট লম্বা, সোজা, ওপর থেকে নিচে পিরামিডের মত পত্রসজ্জা। ওয়াংগু থেকে প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় অভিযানের শুরু ১৭ মার্চ, ১৮৬৪। লাহোর থেকে যাত্রা শুরু। মোট দশ মাসের ফটোযাত্রা কাশ্মীর ও আশপাশের অঞ্চলে। ক্রিসমাসের ঠিক আগে লখনৌতে ফিরে আসেন। প্রতিবেদন শেষ করেন প্রায় দু'বছর পরে, ২৭ জুন ১৮৬৬। সিমলা থেকে প্রেরিত এই প্রতিবেদন ৫ অক্টোবর ১৮৬৬ সংখ্যা [illegible]

স্যামুয়েল বোর্ণ (১৮৩৪-১৯১২)

এবার সংগে নিলেন ১২ × ১০ প্লেট ২৫০ এবং ৮ × ৪½ প্লেট ৪০০। দু'বাক্স কেমিক্যাল—একটা বাক্স নষ্ট হলে অন্যটায় কাজ চলবে। দুটো ক্যামেরা। ফটোগ্রাফির জন্য পিরামিড আকারের তাঁবু—মাঝখানে ১০ ফুট উঁচু, ভূমি ১০ ফুট × ১০ ফুট। চারকোণে চারটে বাঁশ—তাঁবু অনেকটা ছাতার মত খোলে, বন্ধ হয়। শুধু ফটোগ্রাফির সাজসরঞ্জাম বইতেই ২০ জন লোকের দরকার হল। তারপর জামাকাপড়, বিছানাপত্র, রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু, বই, খাবারদাবার, বন্দুক, গুলি, তাঁবুর আসবাবপত্র। সব মিলিয়ে মোট ৪২ জন মালবাহক। এছাড়া ভৃত্যবর্গ (ক'জন?) ও ৬ জন ডাণ্ডীবাহক।

লক্ষ্যণীয়, এতজন লোক, এত মালপত্তর—এসবের ম্যানেজমেণ্ট কিন্তু একা বোর্ণই করছেন। ব্যাপারটা বেশ কঠিনই। রোজ রাতে নাম ডেকে হাজিরা বইতে মেলাতে হত সব লোকজন ঠিক পৌঁছেছে কি না। দ্বিতীয়ত, বিপদের ঝুঁকি। বিপদ কেবল পথের দুর্গমতার নয়—অন্যদিকেরও। এতদিনের যাত্রায় নিশ্চয়ই বোর্ণকে অনেক টাকা সংগে নিতে হত। এতগুলি ভৃত্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে বোর্ণ একা বিদেশী, দেশীয় ভাষা কিছু কিছু জানলেও ভাল জানেন না। পাহাড়ে অনেক জায়গায় ল' অ্যাণ্ড অর্ডারের অধিকর্তারা দূরে কথা, কয়েক মাইলের মধ্যে জনপ্রাণীও নেই। বছর সাতেক আগে "সিপাহী বিদ্রোহে"র মত একটা ভয়াবহ ঘটনা হয়ে গেছে। সেই স্মৃতি ইউরোপীয়দের মনে নিশ্চয়ই মলিন হয় নি। এছাড়া অসুখ বিসুখের সম্ভাবনা ত' আছেই।

লাহোরের ১৪০ মাইল দক্ষিণপূর্বে কাংড়া। গোরুর গাড়িতে লোকজন ও মালপত্র গেল দশদিন আগে। পরে বোর্ণ বোধহয় ডাকগাড়িতে গেলেন। কাংড়া থেকে পদযাত্রা। বোর্ণের অবশ্য এবার ডাণ্ডী আছে। ভীষণ গরম। যেতে যেতে এক স্বচ্ছতোয়া পাহাড়ী নদী পড়ল। এমন নদী দেখলে স্নান করতে ইচ্ছে হয়। বোর্ণ জলে নামলেন—সাঁতার জানা ছিল, তবে ভাল নয়। অল্প সাঁতার দিয়ে একটু গভীর জলে যেতেই হঠাৎ স্রোতের কবলে পড়লেন। দারুণ স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ভৃত্যেরা মোক্ষম সময়ে তুলে না আনলে তিনি পাথরে ধাক্কা লেগে চূর্ণ হয়ে যেতেন।

কাংড়ার দক্ষিণে বৈজনাথে দু'তিনটে প্রাচীন হিন্দু মন্দির আছে। তাঁর ফোটোগ্রাফির বাহুল্যে। পথে এক সুদর্শন পিপুল (অশ্বত্থ) গাছের নিচে কয়েকটা

বৈজনাথ থেকে হোলতা, সেখান থেকে ধরমশালা। ধরমশালা বড় সুন্দর জায়গা। নিচে অপূর্ব সুন্দর কাংড়া উপত্যকা, ওপরে তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী। এইখানে মেজর টম্যাস নামে এক ইয়োরোপীয়ানের সংগে তাঁর পরিচয় হল। টম্যাস বললেন, ১১,০০০ ফুট উঁচুতে কাররী (Kararee) তাল নামে এক হ্রদ আছে—তার সৌন্দর্য অনুপম। আবহাওয়া ভাল থাকলে ফটো তোলা যাবে, না থাকলে শিকার।

অতঃপর কাররী যাত্রা। রাস্তা দুর্গম, কিন্তু প্রকৃতি নয়নাভিরাম। অপূর্ব পাইন অরণ্য। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝরনা—কোথাও উন্মত্তের মত নেচে নেচে শতধারায় নিচে লাফিয়ে পড়ছে—কোথাও বা সবুজ মখমলের মত শৈবাল আচ্ছাদিত সরোবর রূপে সমাধিস্থ। হ্রদে যেতে গেলে তখনও ৩,০০০ ফুট উঠতে হবে—মালবাহকেরা আর যেতে নারাজ। ওপরে বরফ। টম্যাসও নারাজ। বোর্ণ যাবেনই—একজন ভৃত্য ও স্থানীয় এক শিকারী সংগে নিয়ে কাররী চললেন। কাররী পৌঁছে অবশ্য কিছুই লাভ হল না, পুরো হ্রদ বরফের মাঠ হয়ে গেছে! অতঃপর ধরমশালা প্রত্যাবর্তন।

ধরমশালায় লর্ড এলগিনের মৃত্যু হয়—সেখানেই তাঁর সমাধি। বোর্ণ তাঁর ছবি তুলতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন নেগেটিভ কিছুতেই ভাল হয় না—কেমন যেন কুয়াশার মত ঝাপসা ঝাপসা। পর্যায়ক্রমে পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড কমালেন, বাড়ালেন—কিছু হল না। পাহাড়ী জলের বদলে ডিস্টিলড ওয়াটারে ডেভলাপার গুললেন। নাঃ। হঠাৎ নজরে পড়ল, তাঁবুটা খটখটে রোদে খাটানো হয়েছে। সেটাকে তুলে এক গাছের ছায়ায় খাটালেন। এইবার ফল হল। তাঁবুর ভেতরে ছিল তিন স্তর হলদে রঙে ছোপান মার্কিন থানের কাপড়। রং কিছুটা রোদে জলে ফিকে হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি। আরও এক স্তর গাঢ় কমলা রঙের কাপড় যোগ করতে, তাঁবু রোদে খাটালেও, ছবি ভাল হতে লাগল।

ধরমশালা থেকে ডালহৌসি তিন দিনের রাস্তা। মালবাহকদের নিয়ে মুশকিল—প্রতি জায়গায় পুরনো দলকে ছুটি দিতে হয়, নোতুন দল জোগাড় করতে হয়। "প্রতি গ্রামে একজন চৌধুরী' থাকেন—তাঁর কাজই হল ভ্রমণকারিদের কুলি জোগাড় করে দেওয়া। এক জায়গায় পৌঁছে দেখলাম, ৫০ জন কুলি জড় করে তাদের একটা উঁচু জায়গায় তুলে মই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—যাতে তারা না পালাতে পারে। 'পাকড়াও' (puckeroed) করে নিয়ে যাওয়া থাকে বলে।" দু'তিন মাইল যাবার পর দেখা গেল, একজন মালবাহক রাস্তার ধারে মোট ফেলে ভেগেছে। দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আর একজন জোগাড় হল। কিন্তু ½ মাইল যেতে না যেতে আর একজন ঐভাবে ভাগল। এবার বোর্ণের রক্ত গরম হয়ে উঠল। একটা লাঠি হাতে নিয়ে তিনি কাছাকাছি গ্রামে পলাতক কুলিদের সন্ধানে চললেন। সেখানে দেখলেন, একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দু'জন মেয়ে তাঁর গতিবিধি নজর করছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, "নেহী সাহেব। কোঈ আদমী নেহী হ্যায় মেরা ঘর পর। কুলি নেহী হ্যায় (Nay Sahib; koee admee nahe hy mera ghur pur; coolie nahy hy)"। বোর্ণের সন্দেহ হল। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন, তাঁর 'বন্ধুরা' চারপাইয়ের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তাদের টেনে বার করে বোর্ণ তাঁর লাঠির গুণ ('Quality') বোঝালেন।

ধরমশালা থেকে ডালহৌসি যেতে দেশীয় রাজ্য চাম্বা (ছাম্ব?)। ছবির মত সুন্দর জায়গা। চারদিকে ঘাসের সবুজ স্তর মখমলের মত বিছানো। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে বাড়ি। পাহাড়ের কোলে বিশাল ময়দান—প্রায় ৫০০ গজ লম্বা, ২০০ গজ চওড়া। "এই জায়গাটার নাম 'চৌঘান' (choughan)—আগে এখানে ঘোড়ায় চেপে হকি (পোলো?) খেলা হত।" প্রায় ১৫০০ ফুট নিচে দেখা যায় ইরাবতী নদী। চাম্বার প্রায় ৫০টা হিন্দু মন্দির।

চাম্বার রাজা ফটোগ্রাফির চর্চা করতেন। সুতরাং একজন ফটোশিল্পীর আগমনবার্তা পেয়ে হাতিতে চড়ে তাঁর সংগে দেখা করতে এলেন। যাবার সময়

ভ্রাম্যমান ফটোশিল্পীর অর্কবৃত্ত তাঁবু। সমসাময়িক (আ. ১৮৬৫) চিত্রের অনুলিপি।

নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর প্রাসাদে। "তাঁর তোলা ফটো সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না—তিনি নিজেও সে ব্যাপারে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা আমাকে দেখানো। ক্যামেরা লেন্স খুবই মূল্যবা-

মুরেবাল দেখলাম। [illegible] মধ্য দিয়ে দেখার থেকে লেগ্‌লো দেখানোয় কিন্তেই মজার উৎসাহ বেশি।"

চাম্বা থেকে কাশ্মীরের পথ। পথে একটা নদী পার হতে হবে। কিন্তু সেতু বা নৌকো কই? দেখা গেল, জনাচারেক লোক চারটে মোষের চামড়া কাঁধে তাঁদের দিকে ছুটে আসছে। কাছে এলে দেখলেন, ওগুলো সত্যি সত্যি হাওয়াভরা আস্ত মোষের চামড়া (মশক)। তারপর মশকে করে নদী পার হওয়া।

চাম্বা থেকে বুদ্রওয়ার (বদরবার?) হাঁটাপথে চারদিন। সেখানে তহশিলদার এবং দুজন চাষি মাইলখানেক এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। "আমার প্রয়োজনীয় কুলির সংখ্যা শুনে তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন গুরুত্বের দিক থেকে আমি গবর্নর জেনারেলের ঠিক পরেই। প্রাচ্যদেশীয়রা সহগামী ভৃত্য ও অনুচরের সংখ্যা থেকে কোনও ব্যক্তির গুণপনা বিচার করতে অভ্যস্ত।" বুদ্রাওয়ারে এই বোধহয় তারা ক্যামেরা দেখল। অঞ্চলের প্রায় সকলে, ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ি, ভিড় করে ছবি তোলা দেখতে এল।

বিকেলে কাশ্মীর ফেরত দুজন ইংরেজ অফিসার বোর্নের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা পথের যা বর্ণনা দিলেন, তাতে বোর্ন মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু এগিয়ে যাওয়াই মনস্থ করলেন। "একটা ঘাসের ঢিবির ওপর বসে ভাবতে ভাবতে মনটা একধরনের বিষাদে ছেয়ে গেল।...আমি এক নিঃসঙ্গ ভবঘুরে, ভগবান জানেন কোথায় যাচ্ছি। চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ জনমানবহীন পর্বতমালা—মনে হয় যেন অন্তহীন। এদের জানা বা অপরের কাছে পরিচিত করান অসম্ভব। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণাকর উপলব্ধি—মনে হয় এই বিপুল পৃথিবীতে আমি নেহাৎই এক পরমাণু।"

বোর্ন হিন্দু দর্শনের ছাত্র নন। তবু হিমালয়ে তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত বৈরাগ্য থেকে বোঝা যায়, ধর্ম দর্শন নির্বিশেষে ভূমা সব কল্পনাপ্রবণ মানুষকে বোধহয় একইভাবে প্রভাবিত করে।

"সূর্যাস্তের ঠিক আগে মাঝে মাঝে যে ধরনের সুষমা দেখেছি তা চিরকাল মনে থাকবে। এসব দৃশ্য নিজে চোখে দেখে অনুভব করতে হয়। এই জাদুময় স্বপ্নিল দৃশ্যের বর্ণনা সম্ভব নয়। বস্তুত কেবল গোধূলির স্বল্পালোকেই হিমালয়ের সৌন্দর্যের প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব। মধ্যাহ্নের তীব্র আলোকে শিখরগুলির উত্তুঙ্গতা এবং অপূর্ব অবয়ব অনুভব করা যায় না। দিনের শেষে যখন দিনমণি কোনও শিখরের আড়ালে অবসর নেবার উদ্যোগ করেন, চারিদিক স্নিগ্ধ রক্তিম আলোয় উদ্ভাসিত হয়, যখন শিখরের পর শিখর সেই অপরূপ আলোকে স্নান করে, উপত্যকাগুলি ধীরে ধীরে বিষণ্ণতায় ডুবতে থাকে, তখনই পৃথিবীর এই মহত্তম অঞ্চলটির মহিমা উপলব্ধি করা যায়।... কতবার আমি এই ভেবে বিলাপ করেছি...যে ছবির অর্ধেক দৃশ্য এবং অর্ধেক কল্পনা, ক্যামেরা সেখানে কী করবে!"

তারপর চন্দ্রভাগার উপত্যকা। রাস্তা দুর্গম। আসলে রাস্তা বলতে কিছু নেই—কোনওরকমে পাথরের গর্তে পা দিয়ে দিয়ে চলা। নদীর জলে প্রচুর দেওদার গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। "হয়ত তিরিশটায় একটা গুঁড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়। কিন্তু কাঠের ব্যবসায় এত লাভ, তাতেও চলে যায়।"

কিস্টাওয়ার সমভূমি। সিংপুর গ্রাম। মোরিবল (মারবল?) গিরিপথ—১২,০০০ ফুটের কিছু কম। সেখান থেকে কাশ্মীর উপত্যকা দেখা যায়। কী দৃশ্য! পশ্চিমে পীরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, ডানদিকে আরেক পর্বতশ্রেণী, সম্ভবত লাডাক পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে (যেদিক দিয়ে বোর্ন গেছেন) পর্বত, উপত্যকা, ছোটবড় নানা শিখর।

গিরিপথ থেকে উৎরাইয়ে নামতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট। একজন টাল সামলাতে না পারায় কাচের প্লেটের বাক্স ভেঙে চুরমার। একজন বাহকের হাত, অন্যজনের পাঁজরের দুখানা হাড়ও তার সঙ্গে।

এরপর ভেরনাগ (ভেরিনাগ?)। সেখানে এক বিরাট জলপ্রপাত থেকে ঝিলম নদীর উৎপত্তি। নিচে জাহাঙ্গীরের তৈরি এক অষ্টভুজ পুষ্করিণী। মুসলমান-দের তীর্থ। পুকুরে প্রচুর পোষা মাছ, কয়েক কণা চাল ফেললে কয়েকশ দৌড়ে আসে।

ভেরনাগ থেকে আচাবল যেতে পথের দুধারে অজস্র গোলাপের বন। অপূর্ব সুগন্ধি লতা। অপরূপ চিনার বৃক্ষ শ্রেণী। আচাবলের কাছে মার্তণ্ড মন্দির—প্রাচীন হিন্দু মন্দির। সেখান থেকে ইসলামাবাদ। ইসলামাবাদ থেকে শ্রীনগর জলপথে চল্লিশ মাইল। নৌকাগুলি সুন্দর—মাথার ছাউনি, ধারে পর্দা। প্রতি নৌকায় ছজন দাঁড়ি, তার অর্ধেক কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা।

শ্রীনগর শহর বড় নোংরা, দুর্গন্ধে ভর্তি। লোকজনের গায়ে তেলচিটে চাদর। বোর্নের মনে হল, তাদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতটা বলা হয় তারা তত সুন্দর নয়। মুসলমানরা ভারতের অন্যান্য অংশে যেমন, এখানেও প্রায় সেরকমই দেখতে—হয়ত কিছুটা সুন্দর। কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণদের মেয়ে যতদূর সাধারণত সুন্দর। কেউ কেউ রীতিমত সুন্দরী—লন্ডন বা প্যারীর সুন্দরীদের সমতুল। ইউরোপীয়ান দেখলে তারা ঘোমটায় মুখ ঢেকে ফেলে। তবু নদীপথে যেতে আসতে বোর্ন দেখেছেন "তাদের সুন্দর গোল মুখ, গোলাপি গাল, কমনীয় ত্বক, কালো হরিণ চোখ এবং অঢেল চুল।"

কাশ্মীরীরা গান বাজনা খুব ভালবাসে। এই গান "ইংরেজের কানে যদিও একঘেয়ে লাগে, কিন্তু এর মধ্যে যেন কিছু মিষ্টি বিষণ্ণতা আছে।...একদিন রাতে শালিমারে আমার এক নাচ দেখার সৌভাগ্য হল। নর্তকীদের বেশভূষা উজ্জ্বল—দীর্ঘ ঘাঘরা, হ্রস্ব কাঁচুলি, নানারঙা ওড়না। পায়ে ঝালর সারি ঘুঙুর, কব্জিতে চুড়ি, আঙুলে আংটি।...বহু লোক নাচ উপভোগ করছে। মন ঘন [illegible] দিয়ে বা চিৎকার করে তারিফ করছে। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরছে।

সিন্ধু উপত্যকা

গরম কী যাত, সুন্দরী নর্তকীরাও নাচের ফাঁকে ফাঁকে এসে হুঁকোয় টান দিয়ে যাচ্ছে।"

অন্যান্য পর্যবেক্ষণ : বোধহয় ভূমিকম্পের জন্য শ্রীনগরে বাড়িগুলো কাঠের তৈরি। শ্রীনগরের লোকে অসম্ভব শশা খায়। কাশ্মীরে ভাল কাশ্মীরী শাল পাওয়া যায় না; ফরাসী বেনেরা সব বেছে প্যারীতে নিয়ে যায়। রাজা অবং উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেন; ব্রিটিশ রাজত্বে এই জুলুম কী করে সম্ভব! দেশীয় লোকজনের ছবি তোলা অসাধ্য ব্যাপার—"লোকগুলো ক্যামেরার সামনে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে জানে না; এমনভাবে বুক চিতিয়ে চিবুক উঁচু করে দাঁড়ায় যেন তাদের গলা কেটে ফেলার জন্য দাঁড় করানো হয়েছে।"

শ্রীনগর থেকে মানস বল (হ্রদ)। সেখান থেকে সিন্ধু উপত্যকা। মানস বলের পথে প্রত্যাবর্তন। বারামুলা হয়ে উলুর হ্রদ। সেখান থেকে মুরী, রাওয়ালপিণ্ডি ও শিয়ালকোট হয়ে ডাকগাড়িতে দিল্লি। দিল্লি থেকে রেলগাড়িতে কানপুর। কানপুর থেকে ডাকগাড়িতে লখনৌ।

প্রতিবেদন লেখার সময় জানাচ্ছেন, সেকালের এইসব ছবির জন্য বেঙ্গল ফটোগ্রাফিক সোসায়েটির ১৮৬৫ সালের প্রদর্শনীতে তিনি দুটি বিভিন্ন বিভাগে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পান।

তৃতীয় যাত্রার শুরু ৩ জুলাই ১৮৬৭। এবারে যাত্রাপথ বিপাশা নদীর উপত্যকা ধরে কুলু, স্পিটির মধ্য দিয়ে তিব্বত পর্যন্ত। তারপর চীনী এবং বাস্পা উপত্যকায় মধ্য দিয়ে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী। এবারে একজন সঙ্গী জুটল —আগ্রার ডঃ জি আর প্লেফেয়ার সাহেব। দুবছর পরে এই যাত্রার বিবরণ লেখার সময় বোর্ন জানাচ্ছেন, "যদিও দুবছর আগে আমি এই অভিযান করেছিলাম, এই লেখার তবু কিছু আকর্ষণ থাকতে পারে—কারণ কোনও ফটোগ্রাফার এই পথে আগে যান নি। পরেও কেউ যাবেন কিনা সন্দেহ।"

এবারে মালবাহকের সংখ্যা ৬০। আগেরবারের অসুবিধা থেকে শিক্ষা নিয়ে বোর্ন এবার কিছু বেশি পয়সা দিয়ে লাডাকের শক্তসমর্থ মালবাহক সংগ্রহ করেছেন। তারা সারা পথ তাঁর সঙ্গে থাকবে।

বর্ষাকালে যাত্রা কেন? —বছরের অন্য সময়ে একটা হালকা নীল কুয়াশা দূরের সব বস্তু আচ্ছন্ন করে রাখে। বর্ষাকালে বৃষ্টির মাঝে মাঝে যখন রোদ ওঠে তখনই এই কুয়াশা থাকে না। সেটাই ফটো তোলার আদর্শ সময়।

কোট (কুলু উপত্যকা)

[illegible] তারপর রোটাং গিরিপথ, বিপাশা উপত্যকা, বাজোরা। বাজোরা গিরিপথ দিয়ে কাংড়া উপত্যকা। বিপাশার তীর ধরে কুলুর রাজধানী সুলতানপুরে। কুলুতে নাকি একজন নারীও সতী নয়। মেয়েদের বহু পতি। তাদের দেখতে সুন্দর, বেশভূষাও ছবির মত। কুলু উপত্যকা অপূর্ব সুন্দর।

সুলতানপুর থেকে নাগের ক্যাসল, জুগাৎসুক, প্রিনি, হুমতা গিরিপথ। এইখানে একদিন দশ ঘণ্টা বসে থেকে মেঘ কাটতে একখানা ছবি হল। উৎরাই। ৭ মাইল নিচে চন্দ্রভাগার খাত।

সেখান থেকে কুনজাম পাস (১৪,৯৩১ ফুট)। তারপর ৮/৯ মাইল নিচে লোসার গ্রাম। তারপর কিব্বার। এখানে ১৩,০০০ থেকে ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে প্রচুর জলজ প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায়। কিব্বার থেকে ডুংকার গ্রাম—ব্রিটিশ রাজত্বের এখানেই শেষ। এই গ্রামের লোকেরা নাকি "চার বছর বয়সের পর স্নান করে না। তাদের বিশ্বাস, তারপর স্নান করলে নাকি তাদের ধনসম্পত্তি সব ধুয়ে মুছে চলে যায়।"

কিব্বার থেকে বন্ধু প্লেফেয়ার সাহেব তারী পাস এবং ওয়াংগু উপত্যকা পথে চীনী চলে গেলেন। বোর্ন কঠিন মনিরং পাস দিয়ে যাবেন। মনিরং পাসের নিচে মনি গ্রাম। গ্রামবৃদ্ধরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি যেন

মনিরং পাস (১৮,৬০০ ফুট)

মনিরং পাসের পথে না যান। পাসের ওপারের গ্রামে তখন নাকি মারীকসন্ত চলছে। বোর্ন দৃঢ়, তিনি যাবেনই।

প্রথমদিন তাঁরা ১৭,০০০ ফুট উঁচুতে তাঁবু ফেললেন। পরদিন সকালে দারুণ তুষারবৃষ্টি, ঝড়। একদিন সেখানেই অপেক্ষা। ফিরে যাবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। ভাগ্যক্রমে পরদিন আকাশ পরিষ্কার হল। ছ'টায় সময় যাত্রা করে সাড়ে আটটার সময় ১৮,৬০০ ফুট উঁচুতে মনিরং পাসে তিনি পৌঁছলেন। মালবাহকেরা ১১টার সময় এসে হাজির হল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আকাশ তখনও পরিষ্কার। তিনি ছবি তুললেন। "এত উঁচুতে আর কেউ ফটো তুলেছেন কিনা আমার জানা নেই।"

না, সত্যিই কেউ তোলেন নি। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বোর্নের এই রেকর্ড অম্লান ছিল।৬

একশ বছর পরে এখনও রসিকজন অবাক বিস্ময়ে ভাবেন, ফটোগ্রাফির শৈশবে, সেই সব-কিছু-নিজে-করে-নাও যুগে, দুস্তর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বোর্ন কী সব অসাধারণ ছবিই না তুলেছেন! এখনও তাদের সৌন্দর্য অম্লান।

---

১ হেলমুট এবং অ্যালিসন গার্নশাইম লিখেছেন, এই কম্পানির জন্ম ১৮৪৩ সালে সিমলা শহরে। মনে হয় তাঁদের বইতে (**The History fo Photography, H. and A. Gernsheim, Oxford University Press, 1955**) এখানে কিছু ভুল আছে। ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের চার বছরের মধ্যে সিমলায় এই ধরনের একটা দোকান হওয়ার সম্ভাবনা বোধহয় কম। আমি এখানে অপর এক ঐতিহাসিক রে ডেসমণ্ডের মতামত অনুসরণ করেছি।

২ নীয়েপ্সে তাঁর পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন **Heliogravure** বা সৌরলেখন। **Photograph** বা আলোকলেখন শব্দের জন্ম দেন বিখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার জন হার্শেল, ১৮৩৩ সাল নাগাদ।

৩ ফটোগ্রাফির প্রথম যুগে পারঙ্গম ব্যক্তিরা নিজেদের ফটোগ্রাফার বলার পরিবর্তে বোধহয় ফটো-আর্টিস্ট বলতে ভালবাসতেন।

৪ প্রসঙ্গত উল্লেখ, ফটোগ্রাফি জগতের আরেক জ্যোতিষ্ক (অন্য ক্ষেত্রে), 'কোডাক'খ্যাত জর্জ ইস্টম্যানও প্রথম জীবনে রচেস্টারে (নুা ইয়র্ক) একজন ব্যাঙ্ক-কেরানি ছিলেন।

৫ সম্প্রতি দুটি বইতে বোর্নের ছবির কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে : **The Last Empire, Gordon Fraser Gallery (London); Simla—a hill station in British India, P. Barr and R. Desmond, Charles Scribner's Sons (New York).**

৬ অবশ্য যাঁরা এই রেকর্ড ভেঙেছেন, তাঁরা কেউই বোর্নের মত বিরাটাকার প্লেট-ক্যামেরা নিয়ে যান নি বা ওয়েট প্লেট পদ্ধতিতে ছবি তোলেন নি। তাঁরা সকলেই ছোট ক্যামেরা এবং বাজার থেকে কেনা তৈরি প্লেট বা ফিল্ম ব্যবহার করেছেন।

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরল—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল…
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-LR.27-2416 BG

বড় চ্যালেঞ্জ

অমৃতসরের ক্রিকেট আবহাওয়ার মধ্যে শিখ শিশুটি বেড়ে উঠেছিল। 'অর্থডক্স' লেগ স্পিনার হিসাব ১৪ বছর বয়সে খেলেছিল পাঞ্জাব স্কুল ক্রিকেট দলে। রঞ্জিট্রফি ৬১-৬২ মরসুমে। তারপরে দিল্লিতে চলে এল এবং ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের নজরে পড়ল। ৬৬-৬৭ মরসুমে গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এল ভারত সফরে। পঞ্চনদীর তীরের আর এক সন্তান বসন্ত-অপেক্ষ ক্রিকেটার লালা অমরনাথ তখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি ছেলেটিকে পরখ করার জন্য ঢুকিয়ে দিলেন দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার জন্য আঞ্চলিক দলে। ছেলেটি অনেককেই অবাক করে ৬টি উইকেট পেল। তারপরই অমরনাথ ছেলেটিকে টেনে নিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতার টেস্ট দলে। তার আগে খুব পরিচিত মহল ছাড়া ছেলেটির নাম বিশেষ কেউ জানত না। টেস্ট দলভুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত এবং ক্রিকেট বিশ্ব জেনে গেল নব আবির্ভূত টেস্ট ক্রিকেটারটির নাম বিষেন সিং বেদি।

অনেকদিন থেকেই সেই বিষেন সিং বেদি বিরাট মাপের বোলার। ক্রিকেট পণ্ডিতদের মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাঁ-হাতি স্পিনার। শুধু বড় বোলারই নন, জ্ঞানে এবং গুণেও বড়। ক্রিকেট সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান, নেতৃত্বের দায়িত্বে সহজাত ক্ষমতার অধিকারী। ব্যক্তিত্বে এবং দলের মধ্যে সংহতি স্থাপনে একজন আদর্শ অধিনায়ক। এবং ক্রিকেটের মাধ্যমে দেশের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করার ব্যাপারে যোগ্য দেশদূত। তাই বেদি আজ ভারতের সর্ববাদিসম্মত ক্রিকেট অধিনায়ক।

টেস্ট ক্রিকেটে বোলার-অধিনায়ক বিরল দৃষ্টান্ত। নজির অবশ্যই আছে। ইংলন্ডের গাবি অ্যালেন, অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান জনসন, রিচি বেনোও ছিলেন মুখ্যত বোলার যদিও ব্যাটেও তাঁদের ভাল হাত ছিল। অ্যালেনের একটি এবং বেনোর তিনটি টেস্ট সেঞ্চুরিও (দুটি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে) আছে। ৬৭টি টেস্টে বেনোর যেমন অধিকারে আছে ২৪৮টি উইকেট, তেমন ঝুলিতে আছে ২২০১ রান। কিন্তু বেদি নিছকই বোলার। এই লেখার সময় পর্যন্ত ৫৮টি টেস্টে পেয়েছেন ২৪৬টি উইকেট, রান মাত্র ৬২১—যদিও ব্যাটের হাত আগের চেয়ে অনেক পরিমার্জিত। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নটআউট থেকে হাফ-সেঞ্চুরি করারও কৃতিত্ব আছে। তবে বোলার বেদিই বিশ্ব ক্রিকেটে সম্ভ্রম আদায়কারী ও সাড়া-জাগানো ব্যক্তি। একটু বিতর্কিত ব্যক্তিও বটে।

ইংলন্ডে বেদির বোলিং দেখে বিখ্যাত ক্রিকেট লিখিয়ে জন আর্লট বলেছিলেন—"আহা, কী বোলিং। স্বপ্নের উত্তীর্ণ। বোলিং দেখতে দেখতে মনে হয় যেন স্বপ্নের মধ্যে বাস করছি—ড্রিম অফ বোলিং।"

শুধু জন আর্লট কেন, বেদির বলের লেংথ, লক্ষ, নিশানা, ফ্লাইট এবং হাতের তালু ও পেলব আঙুলের কার্যকরণে ঘূর্ণপাক খাওয়ানো বলের রকমফের দেখে অসম্ভব সুখ্যাতি করেছেন সব দেশের ক্রিকেট [illegible] হয়েছেন বড় বড় ব্যাটসম্যান। সংগেই স্বীকৃতি বেদির স্পিনকে বশে আনা ভীষণ শক্ত। ভারতের সব চেয়ে ট্যালেন্টেড ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকর বলেন, বেদির স্পিন বলে যত রকমফের আছে পৃথিবীর আর কারো বলেই তা নেই। সাইড স্ট্রোক করা দারুণ শক্ত। একবার যদি ড্রাইভ করা যায়, আর একটি ড্রাইভ করার জন্য বহু সময় অপেক্ষা করতে হয়।

আবার এই বেদিকে নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইংলন্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড়াও তাঁর প্রতি অপবশ আনতে কসুর করেননি।

বেদি খেলতেন শীত মরসুমে স্বদেশে বা স্বদেশের হয়ে বিদেশে, গ্রীষ্ম মরসুমে ইংলন্ডের বহর মত, কাউন্টি দল নর্দাম্পটনশায়ারে। যে কারণেই হোক ১৯৭৪ মরসুমের পর নর্দাম্পটনের কর্তৃপক্ষ বেদির উপর বিরূপ হলেন। অভিযোগ উঠলো—বেদির বোলিং অ্যাকশান ত্রুটিযুক্ত নয়, মাঝে মাঝে ছুঁড়ে বল করেন। গোপনে বেদির বোলিং অ্যাকশানের ফিল্ম তোলা হল। সংগোপনে সে ফিল্ম জমা দেওয়া হল লর্ডসের দপ্তরে। বিশেষজ্ঞরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেও কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারলেন না। সেলুলয়েডের ছবি সাক্ষ্য দিল বেদির বোলিং অ্যাকশান নিখুঁত।

"তুই দল খেলা কারবার তো তোর খাল নিশ্চয়ই খোলা করেছে"—এই নীতিতে বিদায় নোটিশে এবং চুক্তি খেলাপ করে নর্দাম্পটন আঘাত করল বেদিকে। নিজের শক্তি-সামর্থ্য উজাড় করে যে নর্দাম্পটনকে বেদি সাহায্য করেছেন, প্রতি বছরই বেশী উইকেট নিয়েছেন সেই কাউন্টি ক্লাব তাঁর জন্য বেনিফিট ম্যাচের বন্দোবস্ত করবে এটাই ছিল বেদির প্রত্যাশা। উলটে সেই ক্লাবের কাছ থেকে পেলেন আঘাত এবং অপবশ।

ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের হয়েছিল লন্ডনের ট্রাইবুনাল আদালতে। বেদির পক্ষ হয়ে মামলা করেছিল ইংলন্ডের ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন।

সে মামলায় নর্দাম্পটনের উকিল বললেন—"বেদির বলের ধার কমে গেছে। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত। আগের মত বল করতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, এক সময়ে তিনি অসাধারণ বোলার ছিলেন।" উত্তরে বেদি বললেন—"এখনো আছি।" তার প্রমাণও দিলেন ভারতের অধিনায়ক হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে। ২৩·৫৫ গড়ে পাঁচটি টেস্টে একত্রিশটি উইকেট লাভ এবং জাঁদরেল অধিনায়ক ববি সিম্পসনের সঙ্গে টেস্টযুদ্ধে সমান সংগ্রাম। আম্পায়ারিং পক্ষপাতদুষ্ট না হলে বেদি হয়তো রাবার নিয়েও ফিরে আসতে পারতেন।

কি অবস্থার মধ্যে বেদি নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন হয়তো অনেকেরই মনে আছে। নর্দাম্পটন যখন তাকে বরখাস্ত করেছে এবং উদ্বাস্তুর মত লন্ডন থেকে তল্পিতল্পা বেঁধে বেদি স্বদেশে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ফতোয়া জারি করলেন—যেহেতু বেদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাদ্রাজের ফিটনেস ক্যাম্পে যোগ দেননি সেহেতু অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য দল গড়ার সময় তাঁর নাম বিবেচনা করা হবে না।

এই হচ্ছে আমাদের ক্রিকেট প্রশাসন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ঐ সময়ে বেদি কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজেও যোগ দিতে পারতেন। কিন্তু দেননি। ঐতিহ্যময় সরকারী টেস্ট ক্রিকেটের মধ্যেই থাকতে চেয়েছেন এবং বোর্ডে কিছু শুভবুদ্ধির [illegible] হয়েছেন পতৌদির [illegible]। [illegible] অধিনায়ক হয়ে দিয়ে খোলাতা [illegible]। ভারত দলের অবিসংবাদী নেতা হয়ে এখন পাকিস্তান সফর করছেন।

আর বত্রিশ বছর বয়সী উন্নত শির শিখ সন্তানটির সামনে রয়েছে দুই চ্যালেঞ্জ। একটি—সিকি শতাব্দী আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্জিত রাবারটি ধরে রাখা। দ্বিতীয়টি—টেস্ট ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশী উইকেট দখলে পৃথিবীর প্রথম পুরুষ হওয়ার দুর্লভ সম্মানের পথে এগিয়ে যাওয়া।

দুটিই শক্ত চ্যালেঞ্জ। কারণ কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পাকিস্তানের পাঁচ ক্রিকেটার—মুস্তাক মহম্মদ, মাজিদ খাঁ, আসিফ ইকবাল, ইমরান খাঁ ও জাহির আব্বাস ইংলন্ডের সঙ্গে সিরিজ না খেললেও ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছেন। পাকিস্তান দারুণ শক্তিশালী দল। তার উপর পাকিস্তানের পিচ স্পিন-সহায়ক নয়, যেটা ভারতের প্রধান অস্ত্র।

তবে বেদি যেভাবে এগোচ্ছেন, এভাবে এগোলে বেশী উইকেট প্রাপ্তির বিশ্ব রেকর্ড করা অবশ্য বেদির পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে হয় না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ল্যান্স গিবসের তিনশ নয়টি উইকেট দখলের বিশ্ব রিকর্ড ভেঙে তিনশ দশটি উইকেট পেতে বেদির দরকার আর চৌষট্টিটি উইকেট। গত কুড়িটি টেস্টে বেদি পেয়েছেন একশ উইকেট। গড়ে প্রতি টেস্টে পাঁচটি হিসাবে। এইভাবে চলতে থাকলে বিশ্বরেকর্ড করতে তাঁর দরকার তেরো-চোদ্দটি টেস্ট। আগামী কুড়ি মাসের মধ্যে তাঁর তেইশটি টেস্ট খেলার সুযোগ আছে। যদি কোন অঘটন না ঘটে, যদি তিনি প্যাকারের ডাকে সাড়া না দেন, যদি তাঁর স্পিনিং ফিঙ্গার অকে কর্মক্ষম তবে বিশ্বরেকর্ডের বিরল সম্মান তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

আর একটি চ্যালেঞ্জও আছে বেদির সামনে। ভারতের অধিনায়ক হিসাবে কে কটি টেস্ট জিতেছেন, কটি হেরেছেন তার একটি তালিকা দিচ্ছি এই লেখার সঙ্গে। তালিকায় দেখা যাবে নবাব পাতৌদি মনসুর আলি যেমন বেশী টেস্টে অধিনায়ক হয়েছেন, তেমন জিতেছেন এবং হেরেছেনও বেশী। ৪০ টেস্টে জয় ৯; পরাজয় ১১। বেদির ১১ টেস্টে জয় ৬; পরাজয় ৯। পাল্লা এখনো পতৌদির দিকেই ঝুঁকে আছে। আর কতখানি ঝোঁকাতে পারেন এবং একটি রেকর্ড করে রাখতে পারেন কিনা সেটাও আগ্রহের ব্যাপার। নির্বাচিত অধিনায়কের অসুস্থতায় সহ-অধিনায়কের দল-নেতৃত্বের হিসাবও দেওয়া হল, মোট ১৫৭টি টেস্টের হিসাব মেলাতে :

	অধিঃ	জয়	পরাঃ	ড্র
সি কে নাইডু	৪	০	৩	১
'ভিজি'	৩	০	২	১
ইফতিকার আলী	৩	০	১	২
লালা অমরনাথ	১৫	২	৬	৭
হাজারে	১৪	১	৫	৮
ভিনু মানকড়	৬	০	১	৫
গোলাম আমেদ	৩	০	২	১
পলি উমরিগড়	৮	২	২	৪
হেমু অধিকারী	১	০	০	১
ডি কে গায়কোয়াড়	৪	০	৪	০
পংকজ রায়	১	০	১	০
জি রামচাঁদ	৫	১	২	২
নরী কন্ট্রাক্টর	১২	২	২	৮
মনসুর আলী	৪০	৯	১৯	১২
চাঁদু বোরদে	১	০	১	০
বেঙ্কটরাঘবন	১	০	১	০
অজিত ওয়াদেকর	১৬	৪	৪	৮
গাভাসকর	১	১	০	০
বেদি	১১	৬	১	৪
	১৫৭	২৮	৬৫	৬৪

মুকুল

ক্লাব কর্মকর্তাদের লক্ষ্য "প্লেয়ার বেয়াড়া হলেও কাজ দিলে তাকে মাথায় করে রাখব।" আর ট্রাকি লিকারের দৌড়ে কে আর বেতো ঘোড়াকে আদর করতে চায়। মাঝে মধ্যে ওদের আদরের আলটপকা চুক-চুক-চুক আওয়াজ শোনা যায়— ছ বছর লীগ পেলে টি ভি পাবে। যদিও কেউ পায়নি। ত্রি-মুকুট হলেও টি ভি জুটবে। না, তাও হয়নি। প্লেয়ারদের ভবিষ্যত চিন্তা করে ইনসিয়োরেন্সের ব্যবস্থা হবে। সে গুড়েও কিচকিচে বালি। এ রকম ভাল-ভাল চিন্তা দুই বড় ক্লাব কর্মকর্তাদের মগজে মাঝে মাঝে হানা দেয়। কিন্তু যখনি প্লেয়ার ঘাড় শক্ত করে বেয়াদপি শুরু করে অমনি কর্মকর্তাও বোমকে যান। নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙাল-ঘটির নয়ন-মণিদের রঙিন ছবিই ওদেরকে একরোখা আবদারের খোকা তৈরীতে উসকে দেয়নি তো।

কত না গল্প ওদের নিয়ে রূপকথা হয়ে আছে।

জোড়া জোড়া মোজা, রুল, বুট থেকে শুরু করে কোনও কিছু আবদারেই প্লেয়ারদের অরুচি নেই। সস্ত্রীক কলকাতা থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার জন্য ক্লাব থেকে গাড়ির ব্যবস্থা থাকা চাই। পাউডার-সাবানও বিশেষ মার্কা হওয়া প্রয়োজন। ট্রান্সফারের আগে বনগাঁয়ে গা ঢাকা দিয়েও বোম্বাইয়ের হোটেলের খরচ নিতে সঙ্কোচ নেই। প্লেয়ারদের নিত্যদিনের কেউকেও মওকা বুঝে দাঁও মারে। বিশেষ দরের প্লেয়ার হলে ক্লাবের কাছে পুজোর আগে মন-ভর্তি বাজারে ফয়দা পাওয়া যায়। এ ছাড়া ঝবার অসুখ, ভায়ের চাকরি, পাড়ার ফাংশন সব কিছুতেই ক্লাবের সখ্যতা স্টার প্লেয়ারকে ঠিকমত উতরে দেয়।

এত আদরেও ওদের যেন আর্তি পূর্তি হয় না! বড় ম্যাচের ঘণ্টাখানেক আগেও মিঁউ মিঁউ গলায় তথাকথিত শান্ত প্লেয়ারটি টেলিফোন করে— 'এখুনি আরও পঞ্চাশটি টিকিট পাঠান, তা না হলে আমায় যে ছাড়ছে না। অথচ ক্লাবের তরফে ওই প্লেয়ারটিকে বহু আগেই পঞ্চাশখানি টিকিট দেওয়া হয়েছিল।

ভাল খেলে প্লেয়ারটি সব মুখ বন্ধ করে রেখেছে। হঠাৎ প্লেয়ারটির পায়ে চোট লাগল। এ বাবদ ক্লাবও খরচে পিছপা নয়। শেষমেশ পা সেরে গেলেও ক্লাব

Albert Hotel

ইস্টবেঙ্গলের কোষাধ্যক্ষ হরিপদ দাসকে লেখা কেমিস্টি লিম্যান এল এল জেকবের চিঠি। চিঠির দ্বুত উল্লিখিত পি সি জেকবের মাধ্যমেই এল এল জেকবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

বজাম্ব রথে—কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরে প্লেয়ারটির বাড়িতে যেতে ট্রেনের ধকলে আবার যাতে পায়ে না লাগে তাই ট্যাক্সি খরচের ব্যবস্থাও চুপি-চুপি করে ফেলে। অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়, খেলা শেষে ওই প্লেয়ারটিই সকলের পিছনে টেন্ট ছাড়ে। ট্যাক্সি করে যায় ঠিকই তবে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত। বাকিটা পথ ট্রেনে এবং বাকি টাকাটাও হজম হয় সেইভাবে। প্লেয়ারটির এত পয়সা বাঁচানোর মধ্যে আসো কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার কোনও হেতু নেই। ফুটবলই তাকে সচ্ছল করেছে, বাড়ি হাঁকাতেও সে কসুর করেনি।

শোনা যায় এক লিংকম্যান নাকি দারুণ লাল-হলুদের ভক্ত। একদিন প্র্যাকটিস শেষে সে ফুটবল সেক্রেটারির সঙ্গে পিত্তি জ্বলানো মস্করা করতে থাকে —"কি দাদা, আপনার গাড়ি নেই। ফুটবল সেক্রেটারি হয়েছেন অথচ গাড়ি নেই। এ কি রকম কথা। গাড়ি আনবেন। আমরা প্র্যাকটিস করব, পরে আপনার গাড়ি চড়ে অফিসে যাব।" গত বছর ট্রান্সফার মরশুমে মওকা বুঝে ওই প্লেয়ারটি প্রিয় ক্লাবের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা ২৫ অঙ্কটা টানতে টানতে ৩৫ পাঁচ করায়।

এই বছরে ক্লাবের ম্যাচ বেশি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরিচালকদের প্লেয়ারদের এ রকম

ভেতরে ... ... যোগাযোগ ছাড়া উপায় কিছু ছিল না। ওদেরই তব ইস্টবেঙ্গলের কোষাধ্যক্ষ হরিপদ দাসের কো জানি ওইসব প্লেয়ারকে নামজনকে বলে বে ক্লাবের জন্য তারা নাকি গ্যালন গ্যালন ঘাম ঝরিয়েছেন। অথচ তারা কিছুই পায়নি। ক্লাব সমথ দের রোজগারের কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সায় ওরা যে পুষ্ট কথাটা বলতে ওরা কেমন দিব্যি ভুলে যায়। ওরা যিনি পয়সার ক্লাবকে ভালবাসেনি। কে আর অন্যের ভুলে পরকে ডেকে আনবে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে অ পিছুটান রয়েছে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের রিক্রিয়েশন আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। কলেজ জীবনে একটু অ মোহনবাগানে মত্ত ছিলাম। কিন্তু পরে উপল করলাম ইস্টবেঙ্গলের পতাকাটির নীচেই আমা আদর্শ আশ্রয়। তা বছর কুড়ি কেটেছে।

প্রশ্ন—"ইস্টবেঙ্গলের নামের সঙ্গে বাঙ বাঙালীর ছোঁয়াচ বড় বেশি। এতে বাইরে প্লেয়ার এনে ক্লাবে একটা অদ্ভুত আকচা আক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। আর আপনারা গত সেপ্টেম্বর কলকাতার এক হোটেলে গুরুদেব-মনাঃ উইলিয়ামসকে একটু আপ্যায়িতের ব্যবস্থা ক ছিলেন।" অনুশোচনার সুর বেজে উঠল হরিপদবা গলায়—"সন্তোষ ট্রফি খেলে প্লেয়াররা ফিরলে বাইরের সব প্লেয়ার এক জায়গায় করে এ সমঝওতার আয়োজন করতে হবেই।"

এই কথোপকথনের কিছুক্ষণ আগে নাইজিরি ডেভিড উইলিয়ামসকে (২২) খুঁটিয়ে খুঁ দেখলাম হরিপদবাবুর নাকতলার বাড়িতে। স্থা প্রভাত সঙ্ঘের মাঠে ঘণ্টাখানেক প্র্যাকটিশ শেষে ডে উইলিয়ামস উইমকো মাদ্রাজ (১৯) ম জার্সিটা খুলে হরিপদবাবুর দাওয়ায় বসতে বসতেই এক গ্লাস সরবৎ হাতে দাঁড়ালেন হরি বাবুর স্ত্রী। মাত্র তিন সপ্তাহের চেনা জানা 'উইলি' যেন ওই বাড়ির সি-এ পড়ুয়া তপনেরই ভাই। বেগুন ভাজা, মুগের ডালসহ ভাত ওর রু আমল পেয়েছে। প্রয়োজনে জল গড়িয়ে নি উইলি পিছপা নয়। দক্ষিণ কলকাতার প্র

[illegible]

এলাকার আবহাওয়াটা ওর মন লাগছে না। শুধু ফলফুলো রূপ দেখিয়েছে। এরই মধ্যে মাস ক আমার মোহনবাগান কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাথো ক কথাটা সে তুলে নেতে চায়।" হাঁফিন্তা—"আব

নাজিব

বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন পেলে তবেই এখানে বছর চারেক থাকা হবে। তা না হলে এক বছর। তবে কলকাতার ফুটবল বেশ প্রহেলিকাময়, আজ যে রাজা, কাল সেই আবার ফকির।" হরিপদবাবুর সংসারে উইলি এরই মধ্যে মায়ার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ওর স্ত্রীকে উইলি 'মা' বলেই ডাকে।

এই রকম দুজন ইস্টবেঙ্গলের আপন হওয়ার তালিকায় রয়েছে—গুরদেব, ম্যাথুজ, দেবরাজ, হরজিন্দর, মনজিত। এই চারজনের মধ্যে ম্যাথুজ ও মনজিতকে নেওয়ার ঘটনা উপরোধে ঢেঁকি গেলার বৃত্তান্ত। এতে কার্যকরী হয় দেবরাজ ও হরজিন্দরের ইচ্ছাটি। গুরদেব-এর ইস্টবেঙ্গলে খেলার মধ্যেও নাকি কোন খিঁচ আছে। দাবিটা মহমেডান কর্মকর্তাদের। পাওনা-থোওনার ব্যাপারে সে মহমেডানের সঙ্গ-সম্পর্ক না চুকিয়েই ইস্টবেঙ্গলে সহি করেছে।

লিঙ্কম্যান দেবরাজকে এরই মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা 'দেবু' বলে ডাকছে। পাশাপাশি প্রশান্ত থাকলে আসছে বছরে মন্দ হবে না। তবে হরিপদবাবুকে লেখা এম এম জেকবের চিঠি প্রমাণ দিচ্ছে আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রের শেষ তারিখ এগিয়ে দিলে তার পক্ষে খেলা সম্ভব। দেবরাজ-এর খেলার সম্ভাবনায় বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। এই দেবরাজকেই গত '৭০ সালে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা পেতে চেয়েছিল।

হরজিন্দর ছাড়পত্রে সহি করার পর যেভাবে বাজনা বাজিয়ে কলকাতা মাতিয়ে গেল তার তুলনা নেই। কে বলবে এই হরজিন্দর গত মে মাসের ২০ তারিখে মোহনবাগানে খেলার জন্য ফুটবল সেক্রেটারী, জার কে তেওয়ারিকে এক হৃদয়-খোলা (এই লেখার সঙ্গে প্রকাশিত) চিঠি লিখেছিল। মোহন-ভক্তরা বলতে পারেন, ক্লাব কর্তৃপক্ষ কেন হরজিন্দরের এমন প্রস্তাবে আমল দিল না। কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যুক্তি দিয়েছেন, বর্ষার মাঠে হরজিন্দরকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ব্যাপারটা 'আঙুর ফল টক' ধাঁচের যুক্তি। যতদূর জানি বর্ষার মাঠে এই অচল হরজিন্দরের খোঁজে মোহনবাগান বার তিনেক চিঠি-টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। যে মরসে হরজিন্দরের প্রস্তাবকে মোহনবাগান আমল দেয় নি, কারণ তখন '৭৮ লীগের খেলা নিয়ে তারা দারুণ ব্যস্ত। এমনিতে হাতে সেট টিম। তবু হরজিন্দরকে কলকাতা ক্লাব সমর্থকরা দুশ্চিন্তে নিতে পারছে না। পাঞ্জাবী প্লেয়ারকে যে কেউ তার টিমে নিতে হ্যাণ্ডশেক দেখাতেই পারে। পাশাপাশি জেভিয়ার পায়াসের মোহনবাগানে অন্তর্ভুক্তিকে অসামান্যকাণ্ড বলা যায়। পায়াস দু-বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে এসেছে ওর এক কলকাতার আত্মীয়ের পীড়াপীড়িতে।

বাইরের থেকে এবারের প্লেয়ার আমদানি খিদেটা চাড়িয়ে যায় মহমেডান কোচ টি এ রহমানের উদ্যোগে। আটাত্তর মহমেডানে এসে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করেন যা মালমশলা দিয়েছেন তাতে লীগ জেতা যায় না। যদিও মরশুমের শুরুতে উনি এক কলক বাঁধার দেখান—"এবার চিংড়ি-ইলিশ দুই খাব।" আসল কথা, কলকাতা মাঠে এবার আসার আগে উনি ওজন করতে ভুল করেছেন যে, এখনকার ফুটবলার জেনারেশন তাদের আমলের চেয়ে আমূল পাল্টে গেছে। ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে ওদের কাছে ভক্তি আদায় করা যায় না। মক নাজিব, ফিলিপ, দীনকর নিয়ে '৭৯ কলকাতার ময়দানে কী ভেল্কি দেখাবেন সেটাই আকর্ষণ।

এ বছর লীগের লড়াইয়ে প্রথম দিকেই পা-হড়কে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা মুষড়ে পড়ে— এখানকার প্লেয়ারদের নিয়ে কিছু হবে না। শেষে সাবিরের খেলা-না-খেলার দোটানা। যে করে হোক একটা কিছু করার তাগিদে তারা তেতে ওঠে। প্লেয়ার আনার কাজে ইস্টবেঙ্গলে ওরা নতুন নজীর সৃষ্টি করলেন হই চই না করে। হরজিন্দর ও গুরদেবকে (মনজিত সহ) মহমেডানের বাগদান অবস্থা থেকেও তারা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এ নিয়ে মহমেডান কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিন পানজাবীর এক-চোট বচসা হয়ে যায়। মহমেডানের প্লেয়ার লিফটিং যন্ত্রটির অকার্যকারিতা আর একবার প্রমাণিত হল। মহমেডান এবারও সেই অনামী প্লেয়ার রিক্রুটমেন্টের তালিকায় দুজন কেরলের প্লেয়ারকে রেখেছে। এর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ঝাঁক থেকে কয়েকজন বুনো-কাটি প্লেয়ারেরও আসার সম্ভাবনায় তারা মালা জপছে।

বাইরের প্লেয়ারদের আনাগোনায় এমন রমরম। আসর উপভোগ করে ফুটবল পাগলের প্রলাপে কোনও ভাটা পড়েনি। ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষের ধারণা ভাল মানুষ অরুণ ঘোষকে তারা রাখবেই। ওদের সামনে তথাকথিত উঁচু মেজাজী প্লেয়ারদের মধ্যে ভাস্কর, চিন্ময়, মনোরঞ্জন, মিহির ও সুরজিত নাকি দিব্যি কেটেছে—"মোহনবাগানের জার্সি আমরা পরবই না।" এর সঙ্গে তারা আড়ালে সেই পুলিশ অফিসারকে দিয়ে গৌতমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছে। ওদের একমাত্র বক্তব্য—ওর উপর দু বছরের সাসপেনশনের মেয়াদ যখন শেষ হয়েই যাচ্ছে তখন আবার লাল হলুদ জার্সি পরতে বাধা কোথায়? সুরজিত সঙ্গে কোন এক বড় কোম্পানী ও জনৈক ক্রিকেটারকে দি প্লেয়ার্স রিলেশনস বজায় রাখতে চেষ্টা হয়েছে এতসব তৎপরতার পরেও ওদের সারকথা—প্লেয়ার কথা দিয়ে কথা সব সময় রাখে না। মোহনবাগানে প্রত্যাশা ওইখানে নোঙর করা রয়েছে। এরই মা তারা সুরজিতকে টোকা দিয়েছে। সুরজিতের প্রস্তা —"পরিস্থিতি বুঝে তবে এগোবো।" চিন্ম যদি ইস্টবেঙ্গল ছাড়ে তবে সঙ্গে ভাস্করকেও নিতে হবে। ওরা নাকি অভিন্নহৃদয়। মনোরঞ্জনের দৃষ্টিভ —"প্রদীপ চৌধুরী থাকতে মোহনবাগানে যাও ঠিক হবে না।" হাবিবের উপর মোহনবাগানে

কাঁপিয়েছেন কলকাতা। বয়স প্রায় ২১। '৭৪ এশিয়ান কাপে স্বর্ণপদক... টিমে খেলে উঠেছে খেলেছে। কলকাতায় ওর পড়াশুনার ঠিকঠা হলে '৭৮ ইস্টবেঙ্গল টিমে কলকাতা খেলবেই।

এখনো অগাধ আস্থা। এদিকে শ্যামল ব্যানার্জ পুরানো ক্লাবে ফিরে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে আসছে বছরে সম্ভাব্য অধিনায়ক দিলীপ পালি কেমন যেন অনিশ্চয়তায় ভুগছে! ক্লাবের কোন মুরুব্বির সঙ্গে তার কি যেন খিটির মিটির চলেছে এবার বোধহয় সুধীর কর্মকারকে রাখার বিষয় মোহনবাগানের কাছে তেমন ইজ্জতের লড়াইয়ের বিষ নয়। নাসির আহমেদ ও খাবাজি এদের সঙ্গে মোহনবাগান যোগাযোগ রাখছে। আসলে মোহনবাগা তার সেট-সেট নষ্ট করতে চায় না। তবে কথার এক কথা—শরতে বসে সেই বসন্ত কাে প্লেয়ারদের মানসিক ব্যাপারের হাবভাব আঁচ ক রছে।

একটাই নিশ্চিন্ত কলকাতার ময়দানের পায় চারিত্রের এতদিনের তেজানো দরজাটি সারা জায়গে দিক থেকে এবার কিছুটা খোলা হল। এই কলম থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে সন্তোষ ট্রফির খেলার পর্বে। ইতিমধ্যে এ একজন বিদেশীকে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘুর ঘুর করতে দেখা ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের কাছে ঘোরালো বন্ধ-প্লেয়ারটি লিঙ্কম্যান অথবা জেকট আউট, কে পছন্দের। শোনা যায় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দু-পক্ষই ইরান, জায়রে ও বর্মার দিকে টোপ ফেলেছে এতে ভারত রাতারাতি আন্তর্জাতিক খেলার সুযোগ পাবে না। অন্যরকম উপকার হবে—ফুটবল প্রফেশনালিজমের এতদিনের ঢাকঢাকিগুড়গুড় পর্দাটুকু হয়তো

মনজিত

শেষের সেদিন কি ভয়ংকর দিলীপ রায়

সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য জানি না, পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক আমার খুব একটা দীর্ঘদিনের নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা স্বল্প হলেও বিচিত্র। সম্ভবত ৬৭-৬৮ সালে শ্রীমতী কেতকী দত্ত আমাকে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নিয়ে যান 'নটী বিনোদিনী' নাটকে পূর্ণেন্দু বাবুর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। নাটকটি দীর্ঘায়ু হয়নি—এই অকালমৃত্যুর দেশে আর একটি সংখ্যা বাড়িয়েছে। তবে এই নাটকে কয়েকজন দিকপাল অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ আমার হয়েছিল। যেমন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি। অবশেষে একদিন শেষ রজনী ঘোষিত হল। আমারও প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

বছর তিন-চার বাদে ডাক এলো বিশ্বরূপা থেকে 'কোথায় পাবো তারে' নাটকে কালকূট অর্থাৎ সমরেশ বসুর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। কিন্তু 'তারে' বেশীদিন খুঁজতে হল না ১০০।৩৫টি সে খুঁজে পেল তার সন্ধান—পরিসমাপ্তি সমাপ্তিতে। (আমার হিসেবে ভুল থাকতে পারে) অভিনয়ের পর এরপর বিশ্বরূপাতে 'চৌরঙ্গী' নাটকে অর্থাৎ লেখক অথবা শংকরের ভূমিকায়। 'চৌরঙ্গী' কিন্তু চারশো "রজনী" পার করে দিয়েছিলেন। এই ফাঁকে একটা কথা—শনি রবি ও ছুটির দিন দুপুরে অভিনয় হলেও সব কিছুই কেন জানি না 'রজনী'র খাতায় জমা পড়ে। এইভাবেই ঘটা করে দিনদুপুরের অভিনয় যোগ করে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয় "৩০০|৪০০ ৫০০|৭০০ রজনী অতিক্রান্ত"।

আগের কথায় ফিরে যাই। "চৌরঙ্গী" নাটক অনেকদিন চললো। এই 'চৌরঙ্গী' নাটকেই প্রথম বিকাশ রায় এবং সম্ভবত শ্রীমতী মঞ্জু দেও সাধারণ রঙ্গালয়ে স্থায়ীভাবে যোগদান করলেন। এটা ব্যবসায়ী মঞ্চের একটা টার্মস। হঠাৎ বড় বড় হরফে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলেন "শ্রী অমুক এই মঞ্চে স্থায়ীভাবে যোগদান করলেন" যেন বাকি তমুকেরা অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী। যাই হোক বিকাশ রায় এবং সম্ভবত শ্রীমতী মঞ্জু দেও সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম এলেন 'চৌরঙ্গী' নাটকে। সেই সঙ্গে বহু আলোচিত, বহু নিন্দিত, বহু প্রশংসিত, বহু আন্দোলিত "ক্যাবারে" নাচ। তারপর তো ক্যাবারে ক্যাবারে ধুল পরিমাণ। অবস্থা এমন হলো যে "কান ছাড়া যেমন গীত নেই", তেমনি ক্যাবারে ছাড়া নাটক নেই। ঘুরিয়ে বলা যায়—নাটকে নাটক থাকুক বা না থাকুক, অভিনয় মাঠে মারা যাক, গল্পের গরুকে গাছে তুলে দিয়ে একটি রোগা বা মোটা—সাদা না হয় কালো—বেঁটে লম্বা যা হোক একটা মেয়ে চাই যাকে 'ক্যাবারে' নাচতে হবে, পরোক্ষভাবে দর্শককে নাচাতে হবে। যাতে টিকিটঘর থেকে থেকে থোক থোক টাকার শব্দে কাঁপতে থাকে। যে কাঁপুনীর ঠেলায় ক্যাশবাক্সো পর্যন্ত ক্যাবারে নাচের তালে তাল ঠুকতে পারে। আবার কখনো একা রুমে হয় না সুগ্রীব দোসরের ডাক পড়ে। তখন 'লাগ ভেলকী লাগ' শুরু হয়ে যায়। লাল আলো, নীল আলো, সবুজ আলো, হলদে আলো, বেগুনী আলো, কালো আলো, সাদা আলো পৃথিবীর যাবতীয় আলো দিয়ে নাকি স্বর্গের উর্বশীকে মর্তের 'স্টেজ' নাকি 'মঞ্চ' নাকি 'থিয়েটার' নামক তীর্থে নামিয়ে আনা হল। এবারে 'রূমানিকা' 'শ্যামলিকা' "মধুনিকা" তোমরা তোমাদের পোশাক 'পোস্টমর্টেম' করে কাটা ছেঁড়া করো। যেখান থেকে যেমন খুশি কাপড় ছেঁটে কেটে বাদ দাও। তাতে যদি লজ্জা নিবারণ না হয়—তা হোক—সে তো সোনায় সোহাগা। তখন দর্শক 'যা গেছে তা যাক, যাক যা গেছে তা যাক' আর মঞ্চ-মালিক বা প্রযোজক বা পরিচালক 'যা এলো তা থাক, তা থাক' বলে গোয়ালের পেট্রোল ভরা ভাঁড়ারতে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ভাবে বিভোর। এরপর ভাবের ঘোর কাটলে: রামকৃষ্ণ,

চৌরঙ্গী নাটকে দিলীপ রায় ও অনুভা

রূমাণিকা শ্যামলিকারা পা তুলে, শরীর কাঁপিয়ে, যৌবন দুলিয়ে (অপরাধ নিও না ঠাকুর—এটা একালে আর্টের কলায় খুব প্রয়োজন) এক ঘাটি লোককে (পেশাদারী মঞ্চের আর একটা টার্মস) নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। উত্তেজনায় ওরা প্রায় পাদপ্রদীপের এধারে উর্বশীর কাছে চলে আসে আর কি! তবে পারছে না কারণ, অমার লোকেরা আছে, তাদের দৃষ্টি সজাগ, মঞ্চের দিকে এগোলেই কাছার টান মেরে, অথবা প্যান্টের লুপ ধরে টেনে বসিয়ে দিচ্ছে। মা, ঠাকুর তোমাদের আশীর্বাদে দর্শকদের প্রায় খাঁচায় নিয়ে এতো দিনের বাংলা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্যকে পথে বসিয়ে একটা নতুন ঐতিহ্য, একটা নতুন ইতিহাস, নতুন ভাবধারা একটা নতুন ইয়ে-ইয়ে যাকগে একটা নতুন ইয়ে সৃষ্টি করেছি। ঠাকুর এবার আমায় ক্ষমা করো, ছুটি দাও, নাচ প্রায় শেষ হয়ে এলো—একটু নিজের চোখ দিয়ে চেখে আসি। জয় ঠাকুর, জয় মা" স্বগতোক্তি শেষ এবং সবেগে প্রস্থান।

শ্রদ্ধেয় সাগরদা, কি দরকার ছিল আমাকে দিয়ে পেশাদারী মঞ্চ সম্পর্কে কিছু লেখানোর। আপনি তো আমায় ভাল করেই চেনেন জানেন আমি রং মেখে অভিনয় করি, এই পেশায় আমার রেশন ওঠে, এই পেশা বা তার সমস্যা নিয়ে লিখতে বলে আমার ইহকালের রেশন তোলা বন্ধ করার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই আপনার নেই। রেশন যদি সাতিল হয়, হোক—তবু বলতেই হবে।

আচ্ছা, সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদামণি, শ্রীশ্রীকালী মাতার কি সম্পর্ক আমায় বলতে পারেন? গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, বিনোদিনী, রসরাজ অমৃতলাল, শিশিরকুমারের ছবির সার্থকতা বুঝি কিন্তু ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ক্যাবারে বা বারে বারে নাচের সম্পর্ক কি, কেউ আমায় বলতে পারেন?

নাম করাটা শালীনতায় আটকাচ্ছে, তাই নাম না করেই বলছি, আমি দুই তিনজন ধুরন্ধর অভিনেতাকে দেখেছি রামকৃষ্ণ, সারদামণির ছবিকে ভক্ত বিনম্র চিত্তে প্রণাম করে, স্টেজে উঠে দর্শকদের সামনে ফষ্টিনষ্টি বা অভিনয় বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে। এঁদের যা করতে দেখেছি, তা দেখে অভিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার কথা। কেন যে হারাইনি সেটা ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হই। নিয়ম, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সকলগুণে। অভিধানে তুলে রেখে, বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ধারক বাহক হতে পারলে তুমি টিকে যাবে, নচেৎ মঞ্চ থেকে বেগে প্রস্থান। তাই শুরুতেই পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে আমার স্বল্পস্থায়ী সম্পর্ক, ঠিক সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য তাই নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছি।

আমাদের প্রফেশনাল স্টেজে সমস্যা অন্তহীন। অবস্থা অবর্ণনীয়। একমাত্র স্টার থিয়েটার (অনেকে উচ্চারণ করেন "ঠিয়েটার") শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। বাকি সব অনিয়ন্ত্রিত। কোন কোন স্টেজের সঙ্গে গুদাম ঘরের (কোল্ড স্টোরেজ নয়) তুলনা করা যায়। ভ্যাপসা গরমে, ভিজে জ্যাবজেবে শরীর নিয়ে, মাথা থেকে সবেগে নেমে আসা ঘামের ধারাকে সামলে নিয়ে, আবেগ দিয়ে ভালবাসার সংলাপ আওড়াতে হয়। তার মধ্যে প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন মাপের, বিচিত্র আওয়াজ সহযোগে পাখা চলে। এই কলকাতায় অডিটোরিয়াম

বলতে, চাদরে দেওয়াল, [illegible]
পুরনো ছারপোকা সহ ছোবড়া বের করা আসন, ভীড় বেশি হলে অস্থায়ী কয়েকটি চেয়ার যার পেয়েকে কাপড় ছিঁড়বার সম্ভাবনা এবং সমস্ত কয়েকটি পাখা। জল ধরে মাথায় কোন পরিকল্পনা নেই। মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংলাপ শেষ সারিতে পৌঁছে দেবার। যদি না পৌঁছয়, তবে কপালে জুটবে 'লাউডার' 'জোরে' 'দিলীপদা কি সাবু খেয়ে নেমেছেন নাকি?' হায়, কলকাতা কবে তিলোত্তমা হবে?

বেশির ভাগ মেকআপ রুমগুলি অস্বাস্থ্যকর—নোংরা, জীর্ণ। কারুর মাথায় টিনের চাল। গ্রীষ্মে যখন বাইরে 'নাই রস নাই দারুণ দহন জ্বালা' ভিতরে তখন 'নাই স্বর নাই, চাল গরম চালা'। যেখানে টিনের চাল নেই সেখানেও অন্যরকম বিপদ। আসলে ওটা হাব ম্যানের একটা ভিড়। বাইরে যখন অঝোর বর্ষা, ভিতরও তখন জলবোঝাইয়ের ভিড়। এও একরকমের এলার্ম কাঁপুনি। তখন চেয়ার সরাও, বাতি আনো, উঠে দাঁড়াও—কত রকমের কসরত। স্টেজে অভিনয়ের সময় বৃষ্টি শুরু হল, ভিতরও রক্ষিত হল না। ভাবুন, বিরাট বড়লোকের বাড়ি, আসবাবপত্র সরাও জমাকালো সেট সামলাও শুধু যে যেখানে পারো দাঁড়িয়ে সংলাপ ছুঁড়ে দাও। আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমরা যেভাবে দিনের পর দিন ৪০০/৫০০ রজনী (?) এক একটি নাটকে অভিনয় করি পৃথিবীর যে কোন দেশের সম্মানীয় অভিনেতারা যাদের অভিনয় প্রতিভা সমস্ত দেশের বিস্ময়, ওঁদের যদি আমাদের কোলকাতার মঞ্চে যে কোন একটি রবিবার পর পর দুটি শো করতে অনুরোধ করা হয়—আমি স্থির নিশ্চয়, একটি শো-এর পর ওঁরা পালিয়ে বাঁচবেন। "এমন মঞ্চ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!"

সাগর দা, আপনারা তো সারাজীবন সাহিত্য নিয়ে ঘর করলেন। কতো স্মরণীয় সৃষ্টি আপনার চোখের সামনে ঘটেছে। আমাদের দেশের নাটকের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন—দেখবেন সেখানে আক্ষরিক অর্থে 'যাযাবরেরা' নাট্যকার হয়ে নাট্যশালার পাঠশালা ধারাপাত পড়িয়ে যাচ্ছেন। মঞ্চ নাকি সমাজ দর্পণ! দর্পণের যদি এই হাল হয়, তবে সমাজকে বোঝাবেন কে? অজল কমল বিমল এবং ইন্দ্রজিৎ অথবা শ্যামল সুনীল, সমরেশ-এর উপন্যাসের সর্বকিছু গুলিয়ে দেওয়া নাট্যরূপে চলচ্চিত্রের নামী অভিনেতা অভিনেত্রীদের জুটিয়ে, অচল পয়সা চালানোর কারবার চলে এই পোড়া দেশে। দৃষ্টিহীনতার সুযোগ যেভাবে নেওয়া যায়।

দৃষ্টিহীন বললাম কারণ ফিল্মের গ্ল্যামারে চোখ ধাঁধিয়ে যায় দর্শকদের। যদিও আমি দর্শক বলতে রাজি নই। কি দর্শন করেন তাঁরা। প্রথম চার-পাঁচ সারির ভাগ্যবান দর্শক ছাড়া বাকি বসেন তাঁদের ভাগে অভিব্যক্তির ছিটেফোঁটা কতটা জোটে? তাঁরা শুধু শোনেন, আর আন্দাজ করেন। সুতরাং গ্রাম দেশে যেমন বলে 'পালা গান শুনে এলাম' তেমনি এখানেও বলা উচিত 'থিয়েটার শুনতে যাচ্ছি'। যদি অবশ্য আমরা অর্থাৎ শিল্পীরা শোনাতে পারি। আরও একটা গুহ্য সংবাদ জানাই। সাধারণ রঙ্গালয়ে, মালিকপক্ষ, শিল্পী, টেকনিসিয়ান, কর্মচারী ছাড়া নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়, ছুঁচো, ইঁদুর, আরসোলা, বেড়াল। ওদের অবাধগতি। ওরা মঞ্চে প্রবেশ প্রস্থান করেন মর্জি মাফিক,—কোন মঞ্চ নির্দেশ ওরা মানেন না। খুশী হলে দর্শকদের সাথে বসে নাটকের পর্যালোচনা করেন। আমরা 'মানী' নিয়ে ঘর করি না—অবোলা জীবদের নিয়ে ঘর বাঁধি।

একটা সময় ছিল যখন পতিতাদের নিয়ে নাটক করা হত বলে, সমাজে অশ্রদ্ধা করা হত—এখন দিন পালটেছে, থিয়েটার সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু পেশাদারী রঙ্গালয় সেই সুযোগ নিতে পারেনি। মঞ্চ—সমাজ, সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম কিছুই তুলে ধরতে পারেনি। বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করে সে কি জীবন! সস্তা মার্কা নাটক, তাৎক্ষণিক আনন্দ দেবার বীভৎস প্রয়াস, সব মিল গোঁজামিল। থিয়েটারের নামে চূড়ান্ত বুজরুকি'

আজাদী হাজির নাটকে আরতি ভট্টাচার্য ও দিলীপ রায়

করে ঘি খেয়েছি সেই ভেবে কুৎসিৎ ঢেকুর তুলে যাচ্ছি আজও। যদি আমাদের দর্শক টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন ঐ সাজান তখত-এ-তাউশ থেকে, তবে একটা নাগরিক কর্তব্য পালন করা হবে।

এবার আমাদের মঞ্চে কি ধরনের নাটক হয় সেটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। একটা সময় ছিল যখন মঞ্চ দখল করে ছিল ঠাকুর দেবতারা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, রাম সীতা, কৃষ্ণ অর্জুন, ভীম ভীষ্ম কর্ণ কুন্তী দ্রৌপদী ইত্যাদি। ধর্ম আর অধর্মের লড়াই। তখন থেকেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ানো হতো। এবং ধর্ম নাট্যসাহিত্য মৌরসী পাট্টা পেয়ে গেল। কি নাটক কি যাত্রা ধর্মের ধ্বজা পত পত করে উড়তে লাগল। তারপর এলো বাদশা বেগম, রাজারানী, আমীর উজীর এবং প্রতিপক্ষ বিদেশী বণিক। সিংহাসন নিয়ে খামচা খামচি, মারদাঙ্গা, খুন খারাপি কামান গর্জনের বীররস সহ দেশাত্মবোধ। তারপর জমিদার, ব্যবসাদার বনাম আদর্শবাদ। সেও পাঁচমিশেলী জীবনবিচ্যুত ফরমায়েসী জনতাপসন্দ নাটক। সাধারণ মানুষ নিয়ে নাটক কোথায় লেখা হলো? নীলদর্পণের উদাহরণ গুনলে এক হাতেই শেষ হবে অথচ ঐতিহ্য একশ বছরের। স্বাধীনতা পরবর্তী এই দীর্ঘ সময়ে খুঁজলে হয়ত দু একটা নাটক পাওয়া যাবে। আত্মবিশ্লেষণ কোথাও হয় না। মোদ্দা কথা সাধারণ মানুষ থিয়েটার দেখলেও নাটকে তাঁদের প্রবেশ নিষেধ।

কেন?

কেন এখনো জীবন বিমুখ নাটক?

এখনো কেন নতুন বোতলে পুরোন মদ?

যেখানে কথাসাহিত্য এত সতেজ, প্রাণচঞ্চল সেখানে কেন নাটকের এমন হাল? জবাব একটাই—দর্শক চায় না।

তাহলে যে হাজার হাজার নিরক্ষর গ্রাম্য দর্শক যাত্রায় লেনিন দেখছেন, কার্ল মার্কস দেখছেন, সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, রাহুমুক্ত দেখছেন তাঁরা কারা? নবান্ন, নতুন ইহুদী, দলিল, দেবী গর্জন,

প্রজাপতি নাটকে দিলীপ রায়

করে [illegible] তিতুমীর, মারীচ সংবাদ, দানসাগর, কুটিকা, চাকভাঙা-মধু বা রাজা অয়দিপাউস হাটে মাঠে গ্রামে গঞ্জে রাতের পর রাত অগনন দর্শককে বিমুগ্ধ করে কি করে? সাধারণ রঙ্গালয়ে কেন এত দুর্গতি?

ব্যবসায়ী মঞ্চের কতকগুলো অদ্ভুত ট্র্যাডিশন আছে। পুরোপুরি তৈরি না করেই নাটক আরম্ভ করা যার অন্যতম। শিল্পীদের সংলাপ মুখস্থ নেই, সেট সম্পূর্ণ নয়, আলো তথৈবচ—নাটক উদ্বোধন হয়ে গেল। প্রযোজকরা সেয়ানা, তাঁরা জানেন নামী শিল্পীরা ৫।৭ দিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবেন। কম্পোজিশনের বালাই থাকবে না, ইচ্ছে মত জায়গা বেছে নিয়ে পার্ট বলা। ডাইনে বাঁয়ে যথেচ্ছ পরিক্রমা। কখনও বা একই লাইনে দাঁড়িয়ে 'জনগণমন' গাইবার মত করে ৪।৫ জন শিল্পী অভিনয় করে যাবেন। আরো মজা আছে। ধরুন সংলাপ আছে,

১ম শিল্পী—অনেক দিন বাদে আপনাকে কাছে পেয়ে ভালোই লাগছে। আজকে আপনাকে ছাড়ছি না রাত্তিরটা এখানে থেকে যেতেই হবে।

২য় শিল্পী— ইচ্ছে তো আমারও করছে সুনীল কিন্তু তোমার বৌদি যে ভাববেন, বাড়িতে ব[illegible] আসিনি।

১ম শিল্পী— আমি বৌদিকে ফোন করে দিচ্ছি আমি বললে বৌদি না-ই করতে পারবেন না।

এই যে সংলাপ, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বলবে দর্শকদের দিকে মুখ করে—অর্থাৎ কেউ কারো দিকে তাকাবেন না। এটা কেন?

জিজ্ঞেস করে উত্তর পেয়ে ছিলাম—এভাবে না বললে দর্শক শুনতে পায় না এবং আমার মুখটা ভালো করে দেখতে পাবেন না।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

আরো রহস্য আছে। ধরুন একটি দৃশ্যের স[illegible] লাগে ৯ মিনিট। ২৫টি অভিনয়ের পর সেটা লাগ[illegible] ১২ মিনিট—এইভাবে পঞ্চাশ রজনী পার হয়ে ১০[illegible] রাত্রির সময় দেখা গেল তার সময় দাঁড়িয়েছে [illegible] মিনিট।

মঞ্চ শিল্পীদের একটা দুর্বলতা আছে লোক হাসানো—তা হল যেভাবেই হোক না কেন দর্শক হাসাতে হবেই। সেটা চরিত্রের বাইরে গিয়েও [illegible] করতে হয়—করবেন! মঞ্চ শিল্পীদের পবিত্র ক[illegible] 'লোক হাসানো'। এই রোগে ভুগছে তামাম ছোট সব মঞ্চ শিল্পী।

এই সবের মধ্যে যখন আমি 'রাজদ্রোহী' ন[illegible] মঞ্চস্থ করি, তখন প্রতি পদে [illegible] কত অভ্যাস বদ অভ্যাসের মুখোমুখি [illegible] তার হিসেব [illegible] তবে বলতে দ্বিধা নেই—সমস্ত শিল্পী কলাকুশলী এক তালে এক সুরে বাঁধতে পেরেছিলাম অনেক [illegible] আর ধৈর্যের বিনিময়ে। সম্পূর্ণ আস্থা রেখে ব[illegible] পারি, রাজদ্রোহী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অচলায়ত[illegible] ভাঙতে পেরেছিল অনেকখানি—বিষয়বস্তুতে, অভি[illegible] কম্পোজিশনে আলোয়, আবহে বহু সাধারণ মান[illegible] স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন, রসিকজনের শুভেচ্ছা সা[illegible] রাজদ্রোহীর অকালমৃত্যু—বিনামেঘে বজ্রপাতের অকল্পনীয়—কিন্তু আমার কাছে অমোঘ সত্য। সে সন্তানের বিয়োগ ব্যথার মত।

তবু ভাবি আগামী দিনের কথা, যা এখনই হয়ে গেছে। দর্শকরা বিচার করেন আমাদের অপরা[illegible] নাটকের উন্নতি, প্রগতির নামে, থিয়েটারকে ভ[illegible] বাসার অজুহাতে নারী সংগঠনের লোলু[illegible] ব্যভিচারের বিচার করে যদি শাস্তি দিতে পারেন—নাট্যজগতের ইতিহাস আপনাদের মাথায় করে [illegible] নইলে আজকের অপসংস্কৃতির জন্য উত্ত[illegible] আপনাদেরই দায়ী করবে। আর আমরা যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন—যার ভাবুন, এই অপচ্ছায়ার অন্ধকার কি এ[illegible] আমাদেরও গলা টিপে ধরবে না? সেদিন যদি শ্বাস নিতে পারি—কিন্তু প্রশ্বাস ফেলার কি অবকাশ পাব?

'শেষের সে দিন কী ভয়ংকর।'

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

লালন ও তাঁর গান। অন্নদাশঙ্কর রায়। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। কলকাতা-৭৩। দাম দশ টাকা।

লালন ফকিরের দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লালন সংক্রান্ত আলোচনার এই সংকলন। সংগে লালনের চল্লিশটি সুনির্বাচিত গানের একটি সংকলনও আছে। কাজেই লালন সম্পর্কে অনুসন্ধানী ও তথ্য সংগ্রাহক ছাড়াও সাহিত্য-রসিকও গানগুলি পেয়ে খুশি হবেন। অবশ্য লালনের নামে প্রচারিত গানের সংখ্যা হাজার হাজার। মনে হতে পারে, তার থেকে চল্লিশটি গান নির্বাচন বৃথা চেষ্টা। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর সাধারণ সাহিত্যরসিক পাঠকের কথাই মনে রেখেছেন। চল্লিশটির বেশি হলে সাধারণের পক্ষে গুরুপাকই হতো। তাছাড়া এমন বহু গান আছে যাদের কয়েকটি পংক্তি চমক দিলেও অন্য অংশ ক্লান্তিকর। আর পুনরাবৃত্তিও অনেক। তাই সংগতভাবেই অন্নদাশংকরের উদ্দেশ্য হয়েছে সাহিত্যের বিচারে ফকিরের যে সব গান উত্তীর্ণ সেই সব গানগুলিরই সংকলন করা।

এই বই গবেষকের জন্যে লেখা নয় ঠিকই, কিন্তু সাহিত্যরসিক গবেষকের জন্যে লেখা অবশ্যই। কারণ, যে লালন ফকিরের জীবন-কাহিনী ও সাধনার ধারা নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কম হলেও নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের যিনি প্রেরণাস্থল এবং সেই প্রেরণাটুকু অবলম্বন করে যাঁর সম্পর্কে নানা আজগুবি কাহিনী তৈরি হয়েছে, সেই ফকিরের জীবনধারা ও সাধনধারাকে অত্যন্ত সহজ প্রাঞ্জল ভংগিতে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনেক সমস্যার জট খুলেছেন, খোলার ইতিহাসটুকুও বলে দিয়েছেন। যেখানে জট খোলবার নয় সেখানে অযথা অনুমানের দিকে তিনি কখনোই ঝোঁকেন নি।

অন্নদাশঙ্কর কর্মসূত্রে দেশবিভাগের পূর্বে যখন কুষ্টিয়াতে ছিলেন তখন থেকেই লালন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল বাড়তে শুরু করে। এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে তিনি তখন এসেছিলেন যাঁরা হয় লালন সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী কিংবা লালনকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করেন। লেখকের সেই কৌতূহল সদাজাগ্রত ছিল বলেই বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার পরেও ওখানকার নতুন প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমি ও নানা গবেষকদের সংগে তাঁর যোগাযোগ হয়। সেই সূত্র ধরেই লেখক সুযোগ ও সুবিধে মতো যে আটটি প্রবন্ধ লিখেছেন তারই সংকলন এই বইটি।

প্রথম প্রবন্ধটি লালনের জন্ম দ্বিশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে লেখা একটি লালন-পরিচিতি। কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি মিশিয়ে এই লেখাটি তথ্যভিত্তিক লালনের সাধন-পরিচয়ের চমৎকার ভূমিকা। এই প্রসংগে একটি ঘটনা বা রটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে

খাতাখানি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গেছেন এবং প্রার্থনা সত্ত্বেও ফেরত দিচ্ছেন না। তাঁদের কারো কারো ধারণা যে 'গীতাঞ্জলি' রচনার মূলে লালনের সেই খাতা। মনে হয়, লালনের আখড়া থেকে লালনের গানের একখানি খাতা কপি নিয়ে তাঁর কর্মচারীকে দিয়ে আর একবার কপি করিয়ে নেন। পরে ওর থেকে শুদ্ধ করে কতকগুলি গান 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন (১৩২২)। তখন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হয়ে গেছে। এবং এই ছাপানো গান থেকেই লালনেরই খ্যাতি বাড়ে। আরেকটি প্রসংগও এককালে বেশ চালিত ছিল। কেউ কেউ বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সংগে লালনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে-ও বোধহয় লালনের গান চুরি করে গীতাঞ্জলি লেখার রটনার সূত্রেই। কিন্তু এরও কোনো বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ নেই। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা লালনের একটি অসম্পূর্ণ স্কেচ আছে। তাও প্রত্যক্ষদর্শীর স্কেচ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

যাই হোক লালন সম্পর্কে যা কিছু তথ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বলে জানা যায় তা ১৮৯০ সালের ৩১ শে অক্টোবরের 'হিতকরী' পত্রিকার প্রথম ভাগ ত্রয়োদশ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে আছে। 'মহাত্মা লালন ফকির' নাম দিয়ে সেই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সেই নিবন্ধটি লালনের ছেঁউড়িয়ার আখড়াতেও ছিল। নষ্ট হয়ে যায়। সম্প্রতি মীর মোশারফ হোসেনের (তিনিই ওই সম্পাদকীয় নিবন্ধের লেখক বলে মোটামুটি যুক্তি-সংগত অনুমান করা চলে) প্রপৌত্রের কাছ থেকে ঢাকার বাংলার অধ্যাপক জনাব আলী আহমদ সাহেব সংগ্রহ করেছেন। অন্নদাশঙ্কর সেই লেখাটি সংগ্রহ করে বইটির পরিশিষ্টে যুক্ত করেছেন। তাতে বইটির মর্যাদা বেড়েছে।

প্রথম প্রবন্ধটি ছাড়াও অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে দুটি কথা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ লালনের গানকে মূল্য দিয়েছেন লালনের জাত-বেজাত-ঘোচানো মানবিকতার ওপর যদিও শেষপর্যন্ত বাউল হিসেবে লালনের মানুষতত্ত্ব আর রবীন্দ্রনাথের মানবিকবাদ এক নয়। দ্বিতীয়ত শিক্ষিত সমাজের বাইরে লোকসমাজে সাধকেরা যে মানসিক সমৃদ্ধি ঘটাচ্ছিলেন—অন্ধকার লোকমানসে দীপের ভেলা ভাসাচ্ছিলেন—লালন সেই ট্র্যাডিশানের একটি বড় দীপাধার। প্রকাশককেও ধন্যবাদ দিতে হবে এই মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলনটি পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করার জন্যে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

চাঁদ বণিকের পালা। শম্ভু মিত্র। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩। মূল্য আট টাকা।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কিংবা বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা প্রতিষ্ঠার ভক্তিবাদ ছাপিয়ে চাঁদ সদাগরের মনসা প্রতিরোধ দৈবশক্তির অন্যায় দাবীর মুখে মানুষের আত্ম-গরিমা প্রতিষ্ঠার কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। পুরাণে দেবতাদের সংগে মানুষের দেবতাদের গর্ব ততই খর্ব হয়। অন্য দেশের পুরাণে প্রোমিথিউসও এইভাবে সহ্য করতে করতেই দেবতাদের লজ্জা দেন। মানুষ ও দেবীর এই বিরোধে মনসাভক্ত কেতকাদাস স্বভাবতই দুঃখ পান, কিন্তু তবুও মানুষের এই আবিনাশী প্রতিরোধে অভিভূত না হয়ে পারেন না। তাঁর মনসামঙ্গলের মনসা-ভক্তি মানবপ্রেমে যেন না প্লাবিত হয়। তাঁর মনসামঙ্গলের বিন্যাসে চাঁদ-সদাগরের প্রতিরোধ অন্য মাত্রায় উত্থিত হয় বেহুলার সুবর্ণ সাতালির সুকৌশল সর্পতাড়নায়, বড় ভয়ংকর বড় ক্লেশকর তাঁর দীর্ঘ মান্দাস যাত্রায়। সেই দীর্ঘ যাত্রায় কলার মান্দাস ও লখিন্দরের শবদেহ দুইই ক্রমে ক্রমে স্খলিত হয়, জীর্ণ হয়, পচিত হয়। সেই মৃত শরীরে কামড়ে ধরে 'হাত্যা এক জোক', মৃত শরীর কুৎসিত ফুলে ওঠে, দুর্গন্ধ ছড়ায়, 'মড়া-মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ।' 'মড়া অংগে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে॥' 'দিবসে দিবসে তাহে কৃমি-কীট বসে। সমস্ত অংগের মাংস দিন দিন খসে॥' সেই বীভৎস মৃতদেহ কোলে নিয়ে তাকে কুক্কুরঘাটার কুকুর, জগাতি-ঘাট ছাড়িয়ে শেয়ালের পাল, বোয়ালিয়া-দহে রঘু বোয়ালের লোভী দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে ত্রিবেণীর গাংগে নেতা ঘাটে পৌঁছল বেহুলা। অপার সহনশক্তি ও প্রখর বুদ্ধি, এই দুই মানবগুণে বেহুলা যেন চাঁদসদাগরকে ছাড়িয়ে যান অথচ এই সহন, সে কি কেবল প্রেমের জন্য? রোম্যান্টিক কবিতার কোমল মায়ার আচ্ছন্ন কবিরা পারবেন না কেতকাদাসের জগতে পৌঁছতে। তাঁরা প্রেমের আত্ম-ত্যাগেই বেহুলার সার্থকতা খুঁজে পাবেন। কিন্তু কেতকাদাসের বেহুলা সংস্কারের অমোঘ শৃংখলায় মধ্যে নিজেকে স্থাপন করেন। তাঁর সমাজে সংস্কারের প্রবল অভিব্যক্তিই আমাদা-চরণের মানক। এই সংস্কারের দ্বৈত রূপ; এক রূপ চিরায়ত ভাবৎ মূল্যের সমাহার; অন্য রূপ প্রথাগত সমাজ-বিধানের তাড়না। পাতিব্রত্যের নিষ্ঠায় বেহুলা যেমন প্রায় অমানুষী আবার তেমনই মানুষী ভয়ে কাতরা—সকল ভাজের সংগে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে॥ দারুণ বিধাতা মোর কৈল কড়ে রাঁড়ী। কত বা ফেলিব নিত্য নিরামিষ হাঁড়ি।

মনসাপুরাণ লৌকিক দেবীর প্রতিষ্ঠাকল্পে কল্পিত লোকপুরাণ। তাই এই পুরাণে আধিদৈবিক ও লৌকিকের এমন সহজ সহবাস। কিন্তু এই সহবাস নিহিত জীবনসম্পৃক্ত নাটকীয়তার আকর্ষণ শম্ভু মিত্রকে টানে নি। তিনি চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দরকে মনসামংগলের জগৎ থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে এসেছেন। একটা সমাজে বিশ্বাসের পাঁচিলগুলো একে একে ভেঙে পড়ছে, যেনো জল ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে সব পুরনো মূল্যবোধ। নারী এখানে কেবল পশারিণী, নয়তো একচক্ষু জননী মাত্র; অধ্যাপক শাসকের কৃপাদৃষ্টির বশ আত্ম-বিক্রীত দালাল; জনতা ভীরু, কাপুরুষ; যুবক নিতান্তই নিষ্ঠুর সংশয়ী। এই নতুন জগতে চাঁদ সদাগরের নবপুরাণ প্রতিষ্ঠা করাতে গিয়ে [illegible]

[illegible] বণিক চাঁদ সদাগর তাঁর কল্পনায় হয়ে ওঠেন 'চিরকাল পাড়ি দিয়ে যাবার সংকল্পে অটল বীর। যদি মানুষের পুত্র হই, তো আমাদের ভবে থাকি অন্ধকারে শুই চক্ষু মেলো অজানার মধ্যি গিয়া আতিপাতি সন্ধান' টেনিসনের 'ইউলিসিসে'র একাধিক ছত্রের আদলে রচিত। স্বতই মনে আসে সেই সব ছত্র: 'ভ্রমণে ক্লান্তি সেই আমার; জীবনকে পান করে যাব আমি অবশেষাবধি;' কিংবা 'এই ধূসর সত্তা এখনও চায়, জ্ঞানকে অনুসরণ করে যাবে ডুবন্ত নক্ষত্রসম, মানুষের চিন্তার দূরতম সীমা পেরিয়ে।' বস্তুত এই নাটকের চাঁদ সদাগর যেন বণিক নন, যেন কেবলই উদ্‌ভ্রান্ত অভিযানবিলাসী, টেনিসনের ইউলিসিসের মতই। ১৮৫৫ সালে ইতিহাসবিৎ গোল্ড্‌উইন স্মিথ অনুযোগ করেছিলেন 'স্থির উদ্দেশ্য ও কর্মের প্রতিভূ হোমারের ইউলিসিস' টেনিসনের কবিতায় লক্ষ্যহীন ভবঘুরে, 'নিজের অতৃপ্তি লাঘব করার সাধে সঙ্গীদের টেনে নিয়ে বেড়ায়।' চাঁদের পাড়ি দেওয়ার সাধও

তেমনই ব্যক্তিগত ও গোপন মনে হয় তাঁর মুখে আদর্শের নির্বস্তুক ভাষা, সে-ভাষা পৌঁছতে চায় না মানুষের যুক্তিবোধের সুবুদ্ধির, মানুষের সহজাত আবেগের দ্বারে। নাট্যকার শিবু ও মনসার বিরোধকে যুক্তিবোধ ও অন্ধ বিশ্বাসের যে বিরোধের ভূমিতে স্থাপন করেছেন, তাও বড় নরম টলায়মান হয়ে যায় চাঁদ সদাগরের এই আত্মগোপনের দুর্বল খেলায়। 'অজানার মধ্যি গিয়া আতিপাতি সন্ধান,' 'দূরান্তরের পথে পাড়ি দেওয়ার সন্ধান,' 'খালি লড়াই আর লড়াই'—একা কোন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর পক্ষে এমন লক্ষ্য ধরে বেরিয়ে পড়ার একটা মানে থাকতে পারে, কিন্তু এতগুলো মানুষ কেন প্রাণ বিপন্ন করবে এমন শূন্যোগর্ভ আদর্শের ধুয়োয়? তাই একে একে তারা যখন সংসারের দায়ের দোহাই পেড়ে সদাগরকে ত্যাগ করে, বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি তাদের কলুষিত করে না। এ নাটকে চাঁদের আদর্শ কখনও ভাস্বর হয়ে ওঠে না আপন গৌরবে, স্পষ্টতায় ঋজু হয়ে দাঁড়ায় না কখনও। আলাদা আলাদা মানুষের শুধু বীর হওয়া কি এতই

[illegible] পাওয়া বীর ডন কীহোটের হাস্যকর বিলাস। চাঁদ একবার দাবি করেন, তিনি সব অর্পণ করেছেন, 'শুধু এদের জীবন আরো সুন্দর হবে বলো।' শুধু বীরেই কী সব সুন্দরতা? শুধু নিজেকে বীর বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে যা অনিবার্য, চাঁদের জীবনেও তা প্রতীত। শুধু অনুযোগের ক্লীবতা—'অদ্ভুত, অদ্ভুত পৃথিবী। আর কারো কোন কিছু দায় নাই। সব দায় শুধু এক চাঁদ বণিকের।'—আরো দুর্বল করে চাঁদ সদাগরকে।

প্রথম পর্বের শেষে পথভ্রান্ত নেতার ভূমিকায় চাঁদ সদাগর রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ'-এর স্মৃতি নিয়ে আসেন। অবিশ্বাসের সেই একই প্রচণ্ড আঘাত চাঁদ সদাগরকে বিচ্ছিন্ন, একা করে দেয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ 'প্রবঞ্চনা' শব্দটিও প্রায় একই পরিস্থিতিতে আবার উচ্চারিত হয়—'প্রবঞ্চক, পথ জানো কিনা বল।' 'পথ' ও 'উদ্দেশ্য' শব্দ দুটিও বারংবার উচ্চারণে 'শিশুতীর্থের' অভিজ্ঞতার অনুরণন বয়ে আনে। 'শিশুতীর্থের' যাত্রার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও হয়ত স্পষ্ট নয়, কিন্তু চিরায়ত অনুষঙ্গ ও কবিতার ব্যঞ্জনায় বাস্তবেতর যে স্তরে এই যাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ, সে-সম্ভাবনাও শম্ভু মিত্র নষ্ট করেন সমস্যা, পরিস্থিতি ও শব্দ ব্যবহারে সমকালীন অনুষঙ্গের অনাবশ্যক আতিশয্যিত প্রক্ষেপে। 'অতীত বাংলার গাঙ্গুড় নদীর তীরের চম্পকনগরী'র নাবিকেরা বলে 'আমাদের তরে ভাই চাকুরির গদি নাই।' শহরের নাগরিকেরা মাণ্ডলিকের বিরুদ্ধে ধ্বনি তোলে, 'নিপাত যাউক, নিপাত যাউক।' মাণ্ডলিকেরা দেশ গঠনে'র সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। লখিন্দর যেন প্রাজ্ঞোত্তর মনস্তত্ত্বের ভাষায় কথা বলে, 'এই সব সামাজিক পরিচয় পার হয়্যা অপরিবর্তিত কোন সত্তা নাই মানুষের? মানুষ কি শুধু কতগুল্যা প্রতিক্রিয়া? শুধু প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি? মানুষ?' একদা পার্লামেন্ট-বিরোধীদের পার্লামেন্টারি পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে বহুশ্রুত সেই যুক্তিও শোনা যায় মাণ্ডলিক বজ্রভাচার্যের মুখে: 'আমরা তো অনেকেই আছি ওই মহাধিকরণে। আমরা তো অভ্যন্তরে থিক্যা ক্রমে ক্রমে এইসব বদল করিয়্যা নিছি।' সমকালের সঙ্গে গ্রথিত এই প্রকট সূত্রগুলি যতই জমে জমে জটিল হয়, ভারী হয়, ততই যেন এক নিশ্ছিদ্র জালে নাটককে জড়িয়ে ফেলে সমকালের সীমার বন্ধনে। তখন 'রক্ত দেও,' 'মুখ বুজে কাজ করো যাও, কথা কয়ো নাকো' শুনলেই অস্বস্তিকর অনুষঙ্গ আসে কাছাকাছি সময়ের রাজনৈতিক মহানায়কদের বাণীর। পুরাণকল্পনার ব্যাপ্তি ক্রমশই সংকুচিত হয় রাজনৈতিক ব্যঙ্গনাট্যের মানসিকতায় নেতা ধোপানীর নাম থেকে নেতৃত্বের লোকরঞ্জনী প্রবণতার ইঙ্গিতেও এই সংকোচনেরই লক্ষণ।

সমকালীন সমাজের পাপগুলিকে সময়ের রাজনৈতিক ব্যঙ্গনাট্যের আড়ে ঠারে ঘা দিয়ে আদর্শবাদী একক বিদ্রোহীর মহাত্মকীর্তনই কি ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য? সে সামান্য লঘুক্রিয়ার পুরাণের বিপুল আয়োজন কি বড় অবান্তর ঠেকে না? না কি হয়ে যায়, বেহুলার অসামান্য কান্নার যাত্রার স্রোতস্বিনীর বিশালতা তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে যায়, কান্নকে দেবতাদের 'খাবার সরায়ে উদ্দেশ দেখায়ো, কাছুলি শিথিল করা, সব, সব কিছু করো' বেহুলা বাজারী গণিকার পারিশ্রমিক রূপে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে, এনে লজ্জায় মৃত্যু বেছে নেয়। মানুষকে ছোট করতে করতে কোথায় এনে দাঁড় করান শম্ভুবাবু! আর কিশোর বয়সে নিষিদ্ধ ক্লয়েড পড়ার অদ্ভুত উত্তেজনার যেন কামনার লজ্জা, যৌন প্রবৃত্তির অপরাধবোধ তথা আত্মধিক্কারে সমস্ত নারীকেই তিনি জান্তব নীচতায় টেনে আনেন। পুরাণসাহিত্যের সংস্কারের অটল ইমারতের দেয়ালে বিপুলায়ত ছায়ার প্রচণ্ড নৃত্য, সেই কল্পনা সহজ নয়। তাই আধুনিক নবভাষ্যে পুরাণকে নামিয়ে আনতে হয় অনেক ছোট মাপের মানুষের জীবনযাত্রার স্তরে। তবুও তো কক্‌তোর মত কবি নাট্যকারের কল্পনায় মৃত্যুরূপিনী মারিয়া কাজারেসের মায়া মোটরবাইকবিহারী মৃত্যুদূত সমভিব্যাহারে পুরাণপ্রতিম পৃথিবী রচনা করে অবলীলায়। কেবলমাত্র ভাষাপ্রয়োগের সমকালীন সাবলীলতায় জঁ আনুই আন্তিগোনে ও ক্রেঅনের বিরোধকে নতুন তাৎপর্য দেন। পুরাণ রচনার কল্পনা শম্ভুবাবুর অনায়ত্ত, পুরাণে অবগাহন করে তার স্বাদ স্পর্শ নিজের বুকে বহন করে আনার আত্মবিস্মরণও তাঁর অসাধ্য। তাই পুরাণের ছিন্ন ভিন্ন আভাসের আড়ালে তিনি গুঁজে দেন তাঁর অনেক ব্যক্তিগত বিষাদ, অনুযোগ, কিছু রাগদ্বেষও।

অথচ শম্ভুবাবু নিঃসন্দেহেই বাংলা থিয়েটারের অন্যতম প্রধান পুরুষ। ঊনবিংশ শতকের য়ুরোপীয় নাটকের ঐতিহ্য তিনি লালিত। মনস্তত্ত্বের নাটকীয়তায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সেই মনস্তত্ত্বের অবশ্য খানিকটা প্রায় প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক, কিছু সংস্কার, কিছু ধারণা, কিছু ভিক্‌টোরিয় অন্ধতার সঙ্গে প্রাথমিক বিজ্ঞানানুসন্ধানের সমাবেশ। এই মনস্তত্ত্বে নারী অন্ধকারের জীব, কিশোরেরা জনকজননী সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন। শিশুর জন্মের সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পর্কে রহস্যবোধ তখনও এতই ব্যাপ্ত যে, এই অজ্ঞতা থেকেই যে মনস্তত্ত্বের এই এক দশদর্শিতা, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবুও ঐ মনস্তত্ত্বের পরিধির মধ্যেই শম্ভুবাবু রচনা করেন চমৎকার নাটকীয় কয়েকটি মুহূর্ত। এই মুহূর্তগুলি রচিত হয় প্রধানত সংলাপের সুচারু বাক্যবন্ধে, যখন লখিন্দর মায়ের নামে কুৎসা শুনে উত্তেজিত হয়েও ছুটো খুঁজে পালিয়ে এসে আত্মগ্লানিতে নিজেকে ছিন্ন ভিন্ন করে, কিংবা চাঁদ যখন সনকার গোপন পুজো আবিষ্কার করেন, কিংবা দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় লখিন্দর যখন সনকাকে জেরা করে নিজেকে চিনতে চায়, কিংবা প্রত্যাবৃত্ত চাঁদ ও সনকা পরস্পরকে যখন নতুন করে চিনবার চেষ্টা করে। কখনো দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় লখিন্দর যখন কখনো এক একটা চিত্ররূপময় বাক্য চমকিত করে—বেহুলাকে লখিন্দর, 'আজ রাতে—যদি স্বাতী তারকায় একবিন্দু হবে;' সনকাকে চাঁদ, 'তোমাকে [illegible] করেছে। চক্ষেতে কাজল আর ঠোঁটেতে তাম্বুল, সর্ব অঙ্গে চন্দনের বাস, আর নাভিমূলে ত্রিবলির ঠাম, সেই রূপ দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আর তুমি অন্তরে অন্তরে মনসার পুজো করো গেছ। আমারি অঙ্কেতে শুয়্যা নারী, তুমি আন কথা ভেব্যো ভেব্যো গেছ?' এই অংশগুলিতে পুরনো কালের আমেজ রুচি ও ভাষার ধরন শম্ভুবাবু যেমন সহজে ধরে ফেলেন, তেমনই আবার কখনও প্রায় খবরের কাগজের ভাষাকে জোর করে ঢুকিয়ে দেন অস্বস্তিকর প্রতিকটু বিন্যাসে—'সাধারণ জীবনের জীবিকা-অর্জনকারী কর্মের প্রবাহে যেন অলৌকিক সঙ্গীতের ধারা সৃষ্টি করা অবিশ্রান্ত জীবনের জয়কার শুনায়।'

চাঁদ বণিকের পালা লেখা হয়েছিল অনেক দিন ধরে। তাই কি এমন অসম রচনা? সূত্রধার ও জুড়ির অংশগুলি তাই কি এমন বিচ্ছিন্ন নাটকের শরীর থেকে অন্য কোন নাট্যবিন্যাসের প্রলোভনে প্রক্ষিপ্ত যেন? না কি অভিনেতা শম্ভু মিত্র শুধু ভেবে গেছেন উচ্চারণের বৈচিত্র্যময় মাধুর্যময়তা। সম্ভাবনার কথা, ভাবেননি নাটকের সমগ্রতার কথা? শম্ভু মিত্রের সেই অসামান্য কণ্ঠস্বর যাঁদের চেনা, তাঁরা এ নাটক পড়তে পড়তে সেই কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, ঝোঁক, মোচড় সর্বক্ষণই শুনতে পাবেন। শেষ পর্যন্ত মনে হয়, এ নাটক খুঁটিয়ে না পড়ে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তিতে শুনে মুগ্ধ হবার সুযোগ পেলেই ভালো ছিল। সেই অপরূপ মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে পুরাণের অপব্যবহার, অনুযোগে ক্লান্তিকর সমাজদর্শন, নারীবিদ্বেষী মানস অস্থিতি, নাটকের বিন্যাসে অদ্ভুত শিথিলতা, কিছুই হয়ত এমনভাবে ধরা পড়ত না; চোখে পড়ত না অতগুলি মুদ্রণপ্রমাদ (বিশেষত পৃঃ ১৫, ২৫, ৬১, ৬৪ ৭৫)। সে-ই ভালো ছিল।

অমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজধানীর কবিতা। সম্পাদক: কল্লোল বিশ্বাস, হিমাদ্রি দত্ত। প্রকাশক: হিমাদ্রি দত্ত, সি৫০২ চিত্তরঞ্জন পার্ক নয়াদিল্লী-১১০০১৯। মূল্য আট টাকা।

অনাদিনের কবিতা। সম্পাদক: শিশির ভট্টাচার্য। অনাদিন, ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৭০০০৪৫ দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আয়নামহল। সম্পাদক: মতি মুখোপাধ্যায়। পত্রমিতা, ৫৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯। দাম চার টাকা।

কলকাতা কেন্দ্রিক কবিতার ধারার মধ্যে একটা নতুন বৃত্ত যোজনা করলেন 'রাজধানীর কবিতা'র সম্পাদকদ্বয়। কবিতা যেহেতু মানুষের জীবনের অকপট ভাষ্য, তার সামগ্রিক উপলব্ধির নির্ভুল সংহিতা, সেহেতু স্থানান্তরে এবং কালান্তরে কবির মন-মেজাজ-মর্জির এক স্বতন্ত্র স্বাদ এর মধ্যে মেলবার কথা। আলোচ্য সংকলনটি দিল্লী থেকে প্রকাশিত দিল্লীবাসী কবিদের কবিতার

তোলোয়ালের সঙ্গে থেকেই আমাদের দূরবর্তী স্থান নয়, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও। বাইশজন কবি এই সংকলনে উপস্থিত। এঁদের সকলেই যে তরুণ তা নয়, সকলেই যে সাম্প্রতিক কালের প্রবাসী তা নয়। সকলেরই কবিতায় হাত মকসো যে বিলেতেই হয়েছে তাও নয়। তবু পাষাণকায়া রাজধানীর পাথর-কংক্রিটের ব্যূহের মধ্যে জীবিকার প্রতিকূল উদাসীনের মধ্যে তাঁরা যে দুর্মর বটের চারার মত কবিতার শিকড় চারিয়ে দিতে পেরেছেন সেজন্য ধন্যবাদার্হ। জ্যোতির্ময় মৈত্র, শিশির দাশ, বটকৃষ্ণ দে-র কবিতার পাশাপাশি তরুণতর আশীষ ঘোষ, সৈয়দ হাসমত জালাল ও অরূপ চৌধুরীর কবিতা ভাল লেগেছে।

অনন্দিনের কবিতায় সম্পাদক শিশির ভট্টাচার্য অনেক নতুন কবিকে তার এই প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে গতানুগতিক রীতি ভেঙে দিয়েছেন। বহুখ্যাত এবং স্বল্প বা অখ্যাত কবিকে সমান স্থান এবং মর্যাদা দিয়েছেন সেটা লক্ষণীয়। ছিয়ানব্বুই কবির এই সংকলনে মোটামুটিভাবে বাংলা কবিতার একটি মানচিত্র তৈরি হয়েছে এ-কথা বলা যায়। তবে কবি নির্বাচনের চেয়ে কবিতা নির্বাচনের ওপরে অধিক গুরুত্ব দিলে ভাল হত। পরিচ্ছন্ন ছাপা এবং ধারালো প্রচ্ছদটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্পাদকের কথাটি সুলিখিত।

সাতচল্লিশজন কবির কবিতা নিয়ে আর একটি সুমুদ্রিত সুন্দর সংকলন অ্যালবাট্রস। এর মধ্যেও তরুণতম কয়েকজন কবির কবিতা চোখে পড়ল। কবিতা বাছাইয়ের ব্যাপারে কবিদের ওপরে নির্ভরশীল না হয়ে সম্পাদকের নিজের নির্বাচন দায়িত্বই মুখ্য হওয়া উচিত। কারণ কবিতার সংকলনে কেবল একটি পর্বের কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই আমরা চাই না, পূর্বযুগের সঙ্গে সমকালের বিবর্তনমূলক সংযোগের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতও প্রত্যাশা করি। সম্পাদক এ ব্যাপারে একটু নির্মম হলে ভাল করতেন।

আনন্দ বাগচী

A Selection of Graphics: Debabrata Mukhopadhyay: An Ebong Naikatya Publication, 70 Basak Bagan, Patipukur, Calcutta 48, Price: Rs 7|-.

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় শিল্পী হিসাবে লোকপ্রিয়। ইদানীং অসূর্যম্পশ্যা শিল্পকলা যে চিত্রশালায় হারেমে বন্দিনী এটা তাঁর সহ্য হয় না, অথচ কী এক অভিমানে তিনি শিল্পকলার মূল আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আজকাল প্রদর্শনীতে, শিল্পমেলায়, আলোচনাচক্রে তাঁকে প্রায় দেখাই যেতো না। স্ট্রোক হবার পর বর্তমানে অবশ্য তিনি খুবই অসুস্থ। তিনি কিন্তু "দেশের" পাঠকের কাছে লেখক হিসাবেও পরিচিত। "ধান্য থেকে মান্ডু" "খাজ" প্রভৃতি রচনা ধারাবাহিক এই পত্রিকায় পর্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থও তাঁর আছে। নানা জায়গায় ঘুরেছেন পরিব্রাজকের মতো। নানারকম ঘটনা,

চরিত্র এবং দৃশ্য দেখেছেন শিল্পীর চোখে। এই অ্যালবামে তার কিছু প্রমাণ আছে। ছাপাই ছবির মুদ্রিত অ্যালবাম। সবসুদ্ধ চোদ্দটা ছবি আছে। একেবারে কিছু না থাকার চেয়েও এই স্বল্প ছবির অ্যালবামও ভাল।

কালো সাদা ছবি। জোরালো রেখায় আঁকা। নর-নারীর প্রাত্যহিক ভঙ্গীর মধ্যে যে ছন্দ এবং চরিত্র তা ধরেছেন। রেখার তন্তু বুনেছেন কখনো, কখনো ঋজু রেখাকে ঈষৎ বেঁকিয়ে নিয়ে একটা মেজাজ তৈরী করেছেন। মানুষের খুবই ব্যক্তিগত জীবন যেমন তিনি কৌতূহল নিয়ে দেখেছেন, তেমনি উৎসবে কাজকর্মে তার যূথবদ্ধ জীবনটাও তাঁকে আকর্ষণ করেছে। "প্রণাম" ছবিতে সহজ রেখায় নারীর নত হওয়ার ছন্দ ধরেছেন। তেমনি 'পুজো' ছবিতে জনৈক মহিলা হাঁটু গেড়ে শাঁখ বাজাচ্ছেন। "উৎসব" ছবিতে ঢোল বাজিয়ে চলেছে মানুষ। "কয়লাখানি"-তে চাপ কালোতে কয়লা খনির কুলি কামিনদের এঁকেছেন। ভোরবেলায় খবরকাগজওয়ালা সাইকেলে দ্রুত চলার ভঙ্গীকে সুদক্ষ কারিকরের মতো উপস্থাপিত করেছেন—এটি বইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। বরং কার্ল মার্কস আর সুকান্তর প্রতিকৃতি দুটি আমার কাছে গতানুগতিক মনে হয়েছে। বইটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো। ছাপাই ছবির এমন সংগ্রহ এদেশে কমই প্রকাশিত হয়েছে।

সন্দীপ সরকার

ঋত্বিক। সুরমা ঘটক। আশা প্রকাশনী। আঠারো টাকা।

ঋত্বিক ঘটক আমার জীবনে একটা সত্য, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভাল বাসিলাম' উচ্চারণ করেছেন সুরমা ঘটক, ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী। উচ্চারণের গাঢ় প্রত্যয়ের নেপথ্যে বাজছে রবীন্দ্র-কণ্ঠ। ২৪-১-৬৭ তারিখে লেখা একটি নিবন্ধের খসড়ায় ঋত্বিক লিখেছিলেন: 'আমি সঙ্গীত যে ভাল কথা বেশী বলতে পারলাম না, তবে মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ, রবিবাবুর এই কথাটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। ভদ্রলোক কিছু ঠিকঠাক কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন।

এবং সে কথাকে তিনি নিজের জীবন-যন্ত্রণার মধ্য থেকে উৎসারিত করেছিলেন।

যাঁরা ঋত্বিক বলতে বোঝেন শুধুই নৈরাশ্য, বিদ্রোহ আর অসন্তোষ তাঁদের 'ঋত্বিক' বইটি অবশ্যই পড়তে হবে। প্রাণস্পর্শী এই বইয়ে সুরমা ঘটক তাঁর সাবলীল ভাষ্যে আমাদের কালের দুর্বার ও দুর্বোধ্য এক শিল্পীকে বোঝাতে চেয়েছেন। ঋত্বিকের অজস্র চিত্তস্পন্দী চিঠি, ফিল্মের খসড়া, প্রকল্প ও নিবন্ধের টুকরো রাশ ফিল্মের মত ব্যবহার করে তিনি লিখেছেন এক নির্ভরযোগ্য ও রঙিন ডকুমেন্টারি বইটি পড়তে পড়তে আমরা ভালবেসে ফেলি অপরিমিত শীধুপায়ী একজন স্রষ্টাকে যিনি পান করতেন 'কাজ পেলে আনন্দে, কাজ না পেলে দুঃখে।' তিনি বহুদিন বহুবার সর্বসহা স্ত্রীকে শাসাতেন: 'আমি মারা যাব। মাইকেল মধুসূদন, প্রমথেশ বড়ুয়া, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মারা গেছেন, সেইভাবেই মারা যাব।' আবার এই একই ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক গদ্যে ঘোষণা করেন: 'কথাটা হচ্ছে সব শিল্পকর্মেরই সত্যকারের শিল্প পদবাচ্য হতে হলে, সর্বপ্রথম হতে হবে সত্যবাদী।' এই সত্য ঋত্বিকের ব্যাখ্যায় শিব ও সুন্দরের সঙ্গে সমলগ্ন। 'শিবম কথাটার মানে হচ্ছে, যা কিছু শাশ্বত।... ......সেইটাই শাশ্বত, যেটা আপনি দুঃখ দিয়ে অর্জন করেছেন' আর 'সুন্দর! এর কোন সংজ্ঞা নেই — কিন্তু সত্য ও শিবকে অস্বীকার করে যে সুন্দর দাঁড়ায় তাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

এই একই বইয়ের নানা জায়গায় আমরা খুঁজে পাই আরেক ঋত্বিককে যিনি বর্ষাকাল ভালবাসেন, 'Productive members of Society হবার জন্য অকুতি জানায় সাঁওতাল আদিবাসীদের সান্নিধ্য পেয়ে লেখেন, 'কত বিত্তশালী মনে হয় নিজেকে দেশকে। মানুষের সম্পদে ধনী'। যাঁর কবিমন বিহঙ্গ চোখে দেখে নেয়: 'পাহাড়ের মাথার ওপরে সূর্য ডুবল, নীচে অপরূপ ওরাঁও-রমণী' ...

... জন্য ছিন্নভিন্ন করে।'

এই বই ঋত্বিক ঘটকের জীবনী নয়। ঋত্বিক সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচারণও নয়। এ এক বিচিত্র বর্ণের বই যা ঋত্বিকের মতই অসম্পূর্ণ অথচ গভীর। তাঁর বহুবর্ণী নানা টুকরো তথ্য ও ঘটনা পরম মমতায় সীবন করে দিয়েছেন নিজের প্রাণশিক্ত ভাবের রঙিন সুতো দিয়ে। নকশী কাঁথার মত বিচিত্র এই বই আমাদের আর্ত মুহূর্তে উত্তাপ দেবে। আমরা বারবার শুঁকে নেব আমাদের সোনা ছেলের প্রতিকূল গন্ধ।

প্রতিকূল শব্দটি ঋত্বিকের ক্ষেত্রে যথার্থ। তিনি খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থ দাবী করেন নি যদিও। 'আমি কলকাতা ছাড়তে চাই না' বোম্বাইয়ে ফিল্মিস্তানের গোলামির চাকরি করতে করতে ক্লান্ত ঋত্বিক স্ত্রীকে লিখছেন: 'এ জীবন আমাদের নয়। পয়সার জন্য করে যাওয়া, আগে কখনও।' বরং কলকাতাতেই 'যদি মাসে ৩।৪ শ' টাকা দুজনে মিলে আয় করতে পারি তাহলেই আমার স্বর্গসুখ হয়। .... কলকাতায় লিখে বা অন্য কিছু করে বা Documentary করে যদি মাসে ঐ টাকা পাই, আর দু-তিন বছর মাঝে মাঝে একটা ছবি করতে পাই, তাহলে একেবারে Ideal হয়। নিজেদের জীবনটাকে গুছিয়ে তাহলে Plan করতে পারি, বাঁচতে পারি।'

এই মাত্র? তবুও আমাদের বিত্তর চলচ্চিত্র সমাজ এই আশ্বাস তাঁকে দিতে পারে নি। বইয়ের শেষে সুরমা ঘটক মারফত ঋত্বিক ঘটকের ফিল্মপঞ্জীতে দেখিয়ে দিয়েছেন, ঋত্বিকের জীবিতকালে 'নাগরিক' মুক্তি পায় নি, 'কত অজানারে' অধিকাংশ চিত্রগ্রহণের পর পরিত্যক্ত হয়েছে, 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২)-তে সম্পন্ন হয়ে ১৯৬৫-তে মুক্তি পেয়েছে, 'আদিবাসী ... খান' সংক্রান্ত তথ্যচিত্রে প্রযোজক হরিসাধন দাশগুপ্তের সঙ্গে মতান্তরের ফলে ক্রেডিটস থেকে নাম বাদ গেছে, 'বগলার বঙ্গদর্শন' এক সপ্তাহ চিত্রগ্রহণের পর পরিত্যক্ত হয়েছে, 'আমার লেনিন' রাশিয়ায় প্রদর্শিত কিন্তু এদেশে নয়, 'ইয়ে কিউঁ' স্বল্প দৈর্ঘ্য হিন্দিচিত্র আজও মুক্তি পায় নি, 'তিতাস' এদেশে আসে নি। আমাদের কৃতকর্মের এই ধারাবাহিক লজ্জাকর দীর্ঘতার সঙ্গে সেন্সর বোর্ড ও কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রকের লালফিতার টেকনিককার ঋত্বিকের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

'ঋত্বিক' বইটি পড়ার অন্ত লাভ যে আমরা ঋত্বিককে অনেকটা বুঝতে পারি। অভিজ্ঞতাবে ইতিহাসের সাক্ষী হব, হাজার হাজার মানুষের ভাল করব এই ছিল যাঁর অভিলাষ, তিনি কোন ফিল্মিস্তানের বিশিষ্ট বাঁধা চাকরিতে থাকতে পারেন না, কোন ফিল্ম ইনস্টিটিউট হবেন, তার অনেকটাই, অর্থাৎ সেই যন্ত্রণার অনেকটাই বুঝতে পারি। ১৯৫৫ সালে লিখি লেখেন: 'আমি আমার কাজে ... আমার ... দি' জীবনের

যে মুহূর্তে হয়ত সেই বেদনাই কে কুরে খেয়েছে। ফলে ১১-৭-৬৫ তারিখে যে-মানুষ স্ত্রীকে জানান প্রাণভরা ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা' ২৭-৬-৭১ তারিখে সেই মানুষই স্ত্রীকে লিখেছেন : 'আর কিছু নেই না। ঘৃণা—ঋত্বিক'।

ঋত্বিককে ২৬ বছর ধরে অন্তরঙ্গভাবে যেমন দেখেছেন ও বুঝেছেন তা অত্যন্ত নির্মোহভাবে উপহার দিয়েছেন সুরমা ঘটক। এ কাজ কঠিন, হয়ত দুরন্ত ঋত্বিককে সামাল দেবার চেয়েও কঠিন। সুরমা সার্থক হয়েছেন। জ্যান গগের ভাই থিয়ো হয়ত এমন একটা বই লিখতে পারতেন। পারেন নি। সুরমা পেরেছেন। কঠিন সত্যকে ভালবাসার এই হয়ত যোগ্য প্রত্যুপহার।

কিন্তু ঋত্বিক সম্পর্কে আমাদের একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, কেন তিনি পারলেন না? চলচ্চিত্রে প্রতিকূলতা নতুন নয়, পরিবেশকদের কারসাজিও সত্য। কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন স্ববিরোধ ছিল না তো? কেননা শিল্পীদের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা, এবং সবচেয়ে অবাস্ত গভীর গোপন মস্ত আপন দুঃখ এই স্ববিরোধ। অস্ট্রিয়ান দুরক:র হুগো উলফ পুষ্পিত চেরি-গাছে গলায় দড়ি দিতে চাইতেন আর আওড়াতেন প্রিয় কবি ক্লিস্টের উচ্চারণ : 'Heaven gives either a whole talent or none at all. Hell had given me my half-talent.

ঋত্বিকের মধ্যে নিশ্চয়ই এই অর্ধ প্রতিভার আত্মবিলাপ ছিল না, তাছাড়া তিনি মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত কমিটেড স্রষ্টা। তবে কি শিল্প-মাধ্যম বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল? অতুল-প্রসাদ যে অর্থে নিঃসন্দিগ্ধ গীতকার, তারাশংকর ঔপন্যাসিক, জীবনানন্দ কবি; ঋত্বিক কি সেই অর্থে চলচ্চিত্র-কার? ঋত্বিক প্রথম জীবনে কবিতা ও গল্প লিখতেন। ১৯৬২ সালের ১০ই অক্টোবর একটা বড় আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সাংকেতিক খসড়াও বানিয়েছিলেন দেখা যাচ্ছে। গণনাট্য সংঘে পঞ্চাশের দশকে অভিনয় করেছেন, নাটক লিখেছেন। 'নাটক Immediate reaction তৈরি করে বলে দারুণ লাগছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে সেটাও মনে হল inadequate, মনে হল এটাও সীমিত।...তখন মনে হল সিনেমার কথা, সিনেমা লাখ লাখ লোককে একসঙ্গে একেবারে Complete মোচড় দিতে পারে। এইভাবে আমি সিনেমাতে এসেছি, সিনেমা করব বলে আসি নি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। I dont love film'। শেষ দুটি বাক্য বিধ্বংসী এবং আমাদের ঋত্বিক-ভাবনার স্থির-বিন্দুকে কাঁপিয়ে দেয়।

'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' পর্যন্ত ছবির ভাষায় যিনি নিজেকে উন্মোচিত করতে চেয়েছিলেন, এই বই পড়ে তার একটা সম্পূরক অংশ আমরা পেয়ে যাই। [illegible] পাই কত তিক্তিতায়, কত যন্ত্রণাতে ও বোম্বাতে চাকরির কলমের খাঁচড়ে। শশধর মুখার্জী ও পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে লেখা তাঁর দুখানা ইংরাজি চিঠি অনমনীয় অথচ বিনয়ী ঋত্বিককে মেলে ধরে। ইংরাজিতে লেখা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পাঠক্রম বিষয়ক অনুপুঙ্খ ভাবনা স্রষ্টা ও শিক্ষক ঋত্বিককে নতুন ডাইমেনশ্যনে দেখায়। বইয়ে সন্নিবিষ্ট ঋত্বিকের ছেলেবেলার ফটো, পরিজন-দের সান্নিধ্যস্মৃতির আলেখ্য, তাঁর নানা ফিল্মের খণ্ডচিত্র, তাঁর পুত্র-কন্যা স্ত্রী সমেত পারিবারিক চিত্র—এ সবই মূল্যবান।

সুরমা ঘটক এক দুরূহ ব্রতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দুর্লভ সংগ্রহ ও স্বর্ণময় স্মৃতি একজন সম্পূর্ণ ঋত্বিক ঘটককেই যেন আমাদের সামনে তুলে আনে। ঋত্বিক ঘটক নামক এক কঠিন সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে তিনি কোন কপটতার আশ্রয় নেন নি।

বইটি প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্য পাঠ্য ও শিরোধার্য হোক।

সুধীর চক্রবর্তী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

ধনরাজ তামাং

রঙিন ছবি। তৈরি করেছেন পীযূষ বসু। একেই ও'রা বলে থাকেন কমার্শিয়াল ছবি। টাকা খরচ ক'রে যা যা কিনতে চান সব আছে—সমর-খুলে থাকা মন্থরতা, একঘেয়েমি, ঘুমপাড়ানি গান, রুটিন-মাপা ঝাড়-পিট, থোরবড়িখাড়া গল্প, সেই উৎপল দত্তর শয়তানি, সেই উত্তমকুমারের রবিনহুডী কাজকর্ম এবং শেষ অংকের ট্রাজিক মেলোড্রামা। এবং এর সঙ্গে টাকা খরচ করে দেখার মতো আরো অনেক দ্রব্য রয়েছে, যেমন এলেবেলে এডিটিং, এলোমেলো ক্যামেরা, নড়বড়ে চিত্রনাট্য, রঙিন ফিল্ম-এর আবোল-তাবোল, এবং শেষ পর্যন্ত লাগে-তাক-না-লাগে-তুকের মতো একটি ফিল্ম রচনার দুঃসাহস। একদিকে টালিগঞ্জ গেলো-গেলো বলে রব তোলা আর অন্যধারে এই দুঃসহ অভাবের মধ্যেও এমনিভাবে রঙিন ফিল্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—টালিগঞ্জকে বাঁচাবার এই তো পথ, বাংলা সিনেমার প্রতি এই তো সত্যিকারের বন্ধুতা।

এ কাহিনী অতীব প্রাচীন। বুঝলাম কি করে বলুন তো? পরিচালক বুদ্ধি করে পুলিস অফিসার দিলীপ রায়ের ঘরে বিলম্বিত রাজারানীর ছবি টাঙিয়ে আরো বুদ্ধি করে সেটি ফোকাসের বাইরেও রেখেছেন—যাতে জর্জ বোঝা গেলেও পঞ্চম না ষষ্ঠ বোঝার উপায় নেই! সেই সঙ্গে দিলীপবাবুর টেবিলে একটা পুরোনো গড়নের টেলিফোনও দিয়ে দিয়েছেন, আর কি চাই? উত্তমকুমারের হাতে কালো ডায়েলের স্টিলের ব্যান্ডওলা এইচ-এম-টি? নেকটাইতে অ্যামেরিকান টর্চ? আরে দূর, ওসব কেউ দ্যাখেনা। কিন্তু জিপ গাড়ির মডেল? রাবিশ! কিন্তু পাহাড়ি ছেলেদের চুল ছাঁটা, তখনো কি তারা [illegible] কায়দার চুল ছাঁটতো?

আলোকপাত করেছে যা আগে আপনারা জানতেন না। সেটি হলো এই যে, আজ থেকে ধরুন পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে চা-বাগান অঞ্চলের পাহাড়িরা নিজেদের মধ্যেও বাংলা ভাষার আলাপ করতো এবং আধুনিক বাংলা গান গেয়ে চায়ের পাতা তুলতো, কিংবা নাচতো! সমগ্র ছবিতে কথায়-কথায় গান, কিন্তু পরিচালনার বিশেষগুণটি হলো, ভুলেও একটি সত্যিকার পাহাড়ি গান চলে আসেনি!

আরো একটি বিষয়ে আপনারা অব-গত হবেন—সেটি হলো কলেরা হচ্ছে একটি অতীব পরিচ্ছন্ন কাব্যিক অসুখের নাম। অসুখ না বলে সামান্য অসুস্থতা বললে ভাল হতো। উৎপলবাবুর মতো অভিনেতাকে (চা বাগানের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার) কলেরাক্রান্ত অবস্থায় করেকর্মিনিটের জন্য দেখা যায়। এই অতীব শান্তিময়, সুন্দর দৃশ্যের আমি একটি বর্ণনা দিচ্ছি। উৎপলবাবু একটি মূল্যবান র‍্যাগ গায়ে দিয়ে, একটি বর্ণময় বেডকভার আচ্ছাদিত বিছানায়, চোখ বুজে, চিৎ হয়ে বড় নিশ্চিন্তে কলেরাকে উপভোগ করছেন। তাঁর মসৃণ দাড়ি-কামানো গাল, তরপুর মুখমন্ডল, কোথাও কষ্টের চিহ্ন নেই। উত্তমকুমার পাশে বসে তাঁকে মাঝেমধ্যে চুকচুক ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। বমি করা তো দূরের কথা, এই ধরনের সিনেম্যাটিক কলেরায় তাঁর গা বমিবমি পর্যন্ত করছে না, এবং তাঁকে বারবার ইয়ে করতেও হচ্ছে না। শিয়রের টেবিলে কমলালেবু ও আঙুর রয়েছে—তিনি কলেরায় শুয়েশুয়ে দু-একটা মুখে ফেলতে পারেন। এবং পরের দৃশ্যেই তিনি সোজা কলেরা থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি চালিয়ে মেয়ে ধরতে বেরিয়ে যান। তাঁকে বেশ স্বাস্থ্যবান লাগে। আমরা বুঝতে পারি কলেরা অতি প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর বস্তু।

আমি এক জায়গায় বলছি, এলেবেলে এডিটিং, এলোমেলো ক্যামেরা। মাত্র দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি, কেমন? একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায়কে (পাহাড়ি মেয়ে! এবং বাঙালী গান) আমরা গাইতে-গাইতে নাচতে-নাচতে পথ চলতে দেখি। দৃশ্যটি সরাসরি শুরু হতে পারতো, কিংবা লং সটে একটি মেয়েকে পাহাড়ি পথে নামতে দেখিয়ে ক্লোজ সটে মেয়েটিকে চিনিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু সিকোয়েন্স-এর শুরুতে আমরা দেখলাম একখন্ড মেঘ, এবং ফটোগ্রাফি খুব সাধারণ! তারপর ক্যামেরা প্যান করে নেমে এলো পাহাড়ে এবং এরপর মেয়েটিকে দেখানো হলো। এইভাবে আকাশে-পাহাড়ে মূল দৃশ্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে ক্যামেরা প্যান করেছে একাধিকবার। একেবারে অপ্রয়োজনীয় রঙিন ফিল্ম-এর এই অপচয়। এবং এডিটিং-এ কেন যে এই প্যাডিংগুলিকে বাদ দেয়া হয়নি বুঝলাম না। আবার একাধিক দৃশ্যে রঙের সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নি—কোনোকোনো দৃশ্যে বড্ড বেশি নীলাভ, রঙের বাড়াবাড়ি পীড়াদায়ক। টাইটেল সিকোয়েন্স-এর [illegible] একেবারে জোলো [illegible]। ফলে [illegible]

কোথায় যেন একটা অভাব আছে বলে মনে হয়। ভালো কথা, শব্দগ্রহণের ব্যাপারে অমন অঘটন ঘটলো কি করে? সমস্ত ছবিতে তো শুধু কথা আর কথা। এবং মাঝেমধ্যেই মনে হয় যে শব্দের ঘাড়ে অর্থহীন শব্দের এলোমেলো ভিড়।

সবশেষে একটি বিনীত নিবেদন। উৎপলবাবুর পাহাড়ি বাসার সদরে মিডশটে আমরা একটি ঘোষণা দেখতে পাই ইংরেজীতে লেখা Asst. Manager's Bunglow (মূলের বানান 'Bunglow') বানানের কোনো শব্দ আমার জানা নেই। সঠিক শব্দটি যেন পীযূষবাবু একটু ঝালিয়ে নেন—অন্তত সায়েবদের আমলে অমন মারাত্মক ভুল হওয়া সম্ভব ছিলো না।

সত্যম শিবম সুন্দরম

"I like big breasts, but Zeenat has other things as well".

উক্তিটি রাজকাপুরের। এবং এই উদ্ধৃতি থেকে রাজকাপুরের সাম্প্রতিক ছবি সত্যম শিবম সুন্দরম-এর বিষয়-বস্তুর কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। সরাসরি পর্নো-ফিল্ম বানানো এদেশে সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যম শিবম সুন্দরম—এমনি একটি গঙ্গাজল ধোয়া তুলসী-গন্ধী নামের ক্যাপসুলের মধ্যে আদিরসের নির্যাস পুরে দেয়া যেতে পারে, বিশেষ করে প্রযোজক ও পরিচালক যদি একই সঙ্গে হন রাজ-কাপুর। শোনা যাচ্ছে এ ছবির যে-সংস্করণটি ভারতবর্ষের বাইরে দেখানো হবে সেটিকে সেনসর-এর কাঁচি প্রায় সম্পূর্ণ রেহাই দিয়েছে। ফলে, আশা করা যাচ্ছে সত্যম শিবম সুন্দরম-এর বিদেশী যাত্রার খুবই ভালো। ভারতীয় সংস্করণটি কাট-ছাঁটে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পুরো ছবিটাকেই কেন কেটে উড়িয়ে দেয়া হলো না সেইটেই সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন। কিন্তু সেন্সর যা পারেননি শিল্পী ও বম্বের দর্শক তা পেরেছেন। তাঁরা ছবিটাকে বেশী দিন টিঁকতে দেননি। এখন কলকাতায় কি হয় দেখা যাক।

সেকস একটি ছবিতে কত কদর্য ও অহেতুকভাবে আসতে পারে সত্যম শিবম সুন্দরম তার একটি চূড়ান্ত

ারতীয় উদাহরণ হিসেবে অনেকের
ন থাকবে। কোনো পরিচালকের
কটি বিশেষ অঙ্গতনের স্তন ও
তম্বের প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকতে
রে, কিন্তু সেই নিতান্ত নিজস্ব
হিদাকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে
কটি স্থূল কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ
া আর্ট নয়, পারভারসান। এ ছবির
ন্দশ্য মূলত দুটি। এক, পরি-
লকের নিজস্ব যৌন আকাঙ্ক্ষাকে
জার-হাজার মানুষের সঙ্গে ভাগ
রে নেবার অসুস্থ আনন্দ। দুই,
জার হাজার মানুষের অতৃপ্ত ও
স্বাভাবিক যৌন বাসনাকে খোঁচা
য়ে বাণিজ্য করে নেবার ধান্দা। এই
ন্যাই সত্যম শিবম সুন্দরম, তার
দসী-গন্ধী নামটি সত্ত্বেও, সমাজের
ক্ষ ক্ষতিকর। আমি এতদূর পিউ-
টান নই যে, যৌনতার কিঞ্চিৎ
ড়াবাড়ি আছে বলে ছবিটি বন্ধ হলে
লে খুশি হব। ছবিটির বিরুদ্ধে
মার প্রথম আপত্তি, যে-কারণে
বটাকে আমি পর্নোর পর্যায়ে
লতেও দ্বিধা করবো না, এই যে
খানে প্রায় প্রতি দৃশ্যে সেকস এসেছে
কেবারে অহেতুকভাবে, কাহিনীর
ক থেকে তার কোনো প্রয়োজনই
লো না। আসলে একটু ভুল
লাম, সমস্ত ছবিতে গল্প বলে
নো বস্তুই প্রায় নেই। জন্মদিনের
চিভাজা দিয়ে যে গল্পের শুরু এবং
ন্দরের চূড়ায় জাপটাজাপটি দিয়ে
র শেষ সেটা একেবারে না থাকলেও
নো ক্ষতি ছিলো না। শুধু বিভিন্ন
াংগেল এবং একটি মাত্র পাতলা
মাস-ধর্মী বস্ত্রের কৃপণ আবরণের
তের থেকে রমণীর সর্বাঙ্গ দেখানো।
ই চলে রীলের পর রীল, এবং
রতীয় পর্নো-সিনেমার প্রথম
ক্ষেপ সূচিত হয়।

কেন যে জিনাতকে সারাক্ষণ
নি মাংসলভাবে নিরাবরণ থাকতে
লা তা আমি অন্তত বুঝলাম না।
একান্ত বোকা-বোকা ও স্থূল
টি কাহিনীকে ভিত্তি করে সত্যম-
বম সুন্দরম তৈরি হয়েছে তার
হিদায় কিন্তু জিনাতকে একটি মাত্র
তকে কোনোভাবে জড়িয়ে নিয়ে
রাক্ষণ ঘুরতে হলো না। জিনাত
র্দার রূপা) একটি গরীব গায়কের
য়ে। এবং সে বেশ্যা নয়। তার মধ্যে
নো রকম অতৃপ্ত যৌন বাসনার
ড়না, বা অস্বাভাবিকতাও দেখানো
নি। সুতরাং শুধুমাত্র পরিচালকের
চ্ছ চরিতার্থ করতেই তাঁকে দৃশ্যের
র দৃশ্যে নিজেকে প্রদর্শন করতে
য়েছে। ছবিটি দেখতে-দেখতে একটা
য় আসে যখন মনে হয়, রাজকাপুর
ছবিটা নিজের জন্যে করলে
রতেন। তাহলে আমাদের অন্তত
নোর অতৃপ্ত কামনার ভারবাহী হতে
ত না ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে।

পরিশেষে একটি কথা বিশেষ-
বে উল্লেখ্য। এ ছবির অন্তিম
কোয়েন্স-এ একটি বন্যার দৃশ্য
য়েছে। প্রশংসার্হ ক্যামেরার কাজ
ন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক
ঘটনের প্রেক্ষিতে এই সিকোয়েন্সটি
মগ্র ছবিটি থেকে ছেঁটে নিলে অক্ষু-

শশী কাপুর

আমরা দেখছি পুরো একটি গ্রামের ভাঙন। এই সিকোয়েনস-এর শেষে মানুষ উজাড় হয়ে ভেসে গেল—শুধু জিনাত ও শশী পরস্পরে লাগোয়া অবস্থায় একটি মন্দিরের চূড়ায় লেপটে থেকে পরস্পরকে বড় আদর করতে লাগলেন। একটু করে জল কমে, তাঁরাও মর্তধামের দিকে নামতে থাকেন, এবং আদর ক্রমাগত চলতে থাকে সেই ঝুলন্ত অবস্থাতেও। সাসপেনডেড সেকস-এর এমন মহৎ উদাহরণ আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধবিরোধী জাপানী চলচ্চিত্র

সিনে সেনট্রালের সৌজন্যে গত ১৮ই সেপটেম্বর সরলা রায় মেমোরিয়ালে একটি ভালো জাপানী ছবি দেখা গেল। ছবিটির জাপানী নাম 'আ কোরেনাকি তোমো' (মাই ভয়েস-লেস ফ্রেন্ডস বা আমার নির্বাক বন্ধুরা)। ছবিটির পরিচালক ৬৬ বছর বয়স্ক তাদাশি ইমাই আমাদের অপরিচিত নন। ওঁর ছবি 'দ্য ব্রাদার অ্যান্ড সিসটার' ১৯৭৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেসটিভ্যালে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। এছাড়া বারলিন ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম ফেসটিভ্যালেও উনি গ্রাঁ প্রি পেয়েছেন ১৯৬৩ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর জাপানের পটভূমিকায় তোলা এই ছবিটিতে তাদাশি ইমাই দেখিয়েছেন যুদ্ধ, তার সংকট ও বিভীষিকা। অবশ্য ছবিটিতে যুদ্ধ কখনোই রঙিন সেলুলয়েডের পরদায় প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে নি। যুদ্ধকবলিত আর্ত অসহায় নিরপরাধ মানুষ, যারা জাপানী হয়েও কেবলমাত্র জাপানী নয় তাদের জীবনই ধরা পড়েছে। ছবিটি দেখতে দেখতে বার বার মনে পড়ে যায় কুরোশাওয়ার 'নো রিগ্রেটস ফর মাই ইয়ুথ' (১৯৪৬) এবং শিনডোর 'চিলড্রেন অফ হিরোশিমা'র (১৯৫৩) মতো যুদ্ধবিরোধী ছবির কথা।

১৯৪৪ সাল। প্লুরিসি রোগ ধরা পড়ায় মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জাপানে ফিরে আসে ছবির নায়ক যে একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র। ফ্রন্ট থেকে ফেরবার সময় সঙ্গে নিয়ে আসে মৃত্যুপথযাত্রী বারো জন বন্ধুর প্রিয়জনকে লেখা শেষ চিঠির গুচ্ছ। দেশে ফিরে বন্ধুদের চিঠি বিলি করতে করতে নিশি ইয়ামাকে দীর্ঘ সময় ধরে পরিক্রমা করতে হয় যুদ্ধোত্তর জাপানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। আর নিশি ইয়ামার সঙ্গী হিসেবে আমাদেরও পরিচয় হয় কিছু ক্ষমতালোভী মানুষের সৃষ্ট এক অন্তহীন দুঃখের পৃথিবীর সঙ্গে। একটি চিঠিতে লিখেছে এক আর্ত তরুণ পুত্র তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। আবার স্বামীদের লেখা কোন কোন চিঠি নিশি ইয়ামা পৌঁছে দিয়েছে তাদের পাগল হয়ে যাওয়া অথবা মরণোন্মুখ স্ত্রীদের কাছে। আবার কোন চিঠি এসেছে দাদার কাছ থেকে রাজদ্রোহের অভি-যোগে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ছোট ভাইয়ের কাছে, যে তরতাজা কিশোরটি অন্যায় মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন রকম আবেদন পর্যন্ত করতে চায় না। এক জীবন জিজ্ঞাসায় সে প্রশ্ন করে—কলুষিত এই পৃথিবীতে বেঁচে লাভ কী? সে বলে, জাপানের যুবরাজ ও তার জন্ম একই দিনে অথচ দুজনের পরিণতি কেন এত আলাদা? আর ভুলতে পারা যায় না হিরোশিমায় আণবিক বিস্ফোরণের (৬ আগস্ট '৪৫) বলি এক লহমায় দেখা পক্ষাঘাতগ্রস্ত কিশোরীটিকে, যাকে বাকী জীবন এমনই জীবন্মৃত অবস্থাতে বেঁচে থাকতে হবে। এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলে নিশি ইয়ামাকে—যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে আট বছর আগে, তবে আর যুদ্ধের অবাঞ্ছিত স্মৃতি এই চিঠিগুলোকে বয়ে বেড়াচ্ছো কেন?

হতাশ, তিক্ত, বিষণ্ণ ও অবিশ্বাসী নিশি ইয়ামা তাৎপর্যময়ভাবে জবাব দেয়—তাই নাকি?

নায়কের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একই জিজ্ঞাসায় তাড়িত হই : সত্যিই কি যুদ্ধের দামামা বন্ধ হয়েছে?

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

রনধীর রায়ের এসরাজ-বাদন

দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর বিবেকানন্দ হল-এ গত ১৬ সেপটেম্বর যন্ত্রসংগীতের যে-অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল, তার প্রধান আকর্ষণ ছিল রণধীর রায়ের এসরাজ-বাদন। আসরের শুরু রাজেন সরকারের ক্ল্যারিওনেট-বাদনে। তিনি প্রথমে ইমন (আলাপ), পরে পিলু ঠুংরি (তবলায় শংকর চট্টোপাধ্যায়) বাজিয়েছিলেন। আধ ঘন্টার এই অনুষ্ঠানের সংগীতিক উৎকর্ষ তেমন উল্লেখ করবার মতো নয়। তবে রাজেনবাবুর ক্ল্যারিওনেটের নিজস্ব একটি জাদু আছে, সেই জাদু আর ইমন রাগের শান্ত রস মিলে উপযুক্ত একটি সাংগীতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ক্ল্যারিওনেটে পিলু-উপস্থিত হলেন তরুণ শিল্পী রণধীর রায় তাঁর আশ্চর্য এসরাজখানি নিয়ে। সেই সন্ধ্যা আসরের বাকি সময়টুকু—দুই ঘন্টারও কিছু বেশী—তিনিই ভরিয়ে রাখলেন।

সংগীতের আসরে এসরাজ বাদ্যযন্ত্রটিকে বর্তমানে কদাচিৎ দেখা যায়। কখনও রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠানে সুর-সহযোগী হিসাবে, কখনও বা বৃন্দ-বাদনের অনুষ্ঠানে একটি যন্ত্র হিসাবে সে হয়তো স্থান পায়—কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তার অস্তিত্বটুকু যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ। সেতার, সরোদ, অথবা বেহালার মতো এসরাজও যে একাই নিজেকে ঘোষণা করতে সক্ষম, সে যে সগৌরবে নির্মাণ করতে পারে সুরসৌধ, বিচরণ করতে পারে সংগীতের ধ্রুবলোকে, এই সত্যটি বুঝি প্রায়-বিস্মৃত। আসলে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এসরাজ যে বাতিল হয়ে যেতে বসেছে, তার প্রধান কারণ এই যন্ত্রটি সম্পর্কে সাধারণভাবে শিল্পীদের তরফে আগ্রহের অভাব। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পেয়েছি উদ্যমী, শক্তিমান শিল্পী রণধীর রায়কে। সেতার - সরোদ - বেহালার সমমর্যাদায় এসরাজকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসে তিনি এগিয়ে এসেছেন। এ যেন তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। প্রখ্যাত যন্ত্রী অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিমপ্রাপ্ত, অধুনা শান্তিনিকেতন সংগীতভবনের অধ্যাপক রণধীর রায়ের প্রতিভা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনীয় তাঁর নিষ্ঠা। বস্তুত তাঁর বাজনা শুনে মনে হল, তাঁর সাধনা সার্থক পরিণতির পথে।

রণধীর রায়ের বাদনশৈলীতে যেমন, তেমনই তাঁর এসরাজ যন্ত্রটিতেও বিশেষত্ব লক্ষণীয়। শুধু রূপগত নয়, এর গুণগত স্বাতন্ত্র্যও অনুভব করা যায়। এই যন্ত্রে যে-সংযোজন তিনি করেছেন, তা তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও সাংগীতিক প্রতিভারই পরিচায়ক। তাঁর ছড়ের টানে কখনও যেন শুনলাম তারশানাইয়ের, কখনও-বা সারেঙ্গীর তীক্ষ্ণ মধুর স্বরধ্বনি। দ্রুত লয়ের কাজে ঝঙ্কারের যে-অনুরণন শোনা গেল, তা সেতার যন্ত্রটিকেই যেন মনে করিয়ে দেয়। মাধুর্য আর গাম্ভীর্যের সুষম সহাবস্থান তাঁর বাদনে।

সেদিন তিনি বেছে নিয়েছিলেন বেহাগ রাগটিকে। বাজালেন আলাপ, জোড়, ঝালা। দীর্ঘ আলাপে বেহাগ রাগের রূপটি সুন্দর ফুটে উঠল, সেই-সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত রস। এক

কথার অনবদ্য এই উপস্থাপন। বিশেষ করে উল্লেখ করবার মতো শ্রীদের কারুকর্ম যা আমার হয়েছে অনবদ্য ভঙ্গীতে। তাঁর জোড়ের অংশে ছন্দের লীলা খুবই হৃদয়গ্রাহী' আর তাঁর হাত যে কতখানি তৈরি, তা অনুভব করা গেল ঝালা-পর্যায়ে। রাগটির রূপ পরে বাজিয়েছিলেন গৎ—বিলম্বিত ও দ্রুত। বিলম্বিত গতের মুখটি চমৎকার' গতের পরিবেশনায় ছিল সুরের বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমাবেশ। শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন লখনউ ঘরানার তবলিয়া তিমির রায়চৌধুরী' তিনি সঙ্গত করেছেন যোগ্যতা এবং রসবোধের সঙ্গে। সব মিলিয়ে মনে রাখার মতো একটি অনুষ্ঠান।

জ্যোতির্ময় বসুরায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

ন্যায় অন্যায়

ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত নাটক প্রয়োজনায় কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলা মঞ্চে একটি প্রথা নির্ভুলভাবে অনুসরণ করা হয়। এই প্রথা নিয়মানুগত্যের।' অর্থাৎ নিয়ম মাফিক যে যে দোষ বাংলামঞ্চে হামেশাই দেখা যায়—অনূদিত নাটকেও সেইগুলি সযত্নে লালন করা হয়। পাত্রপাত্রীদের নাম ছাড়া কেউ বুঝতে পারবেন না অবলম্বনটি বিদেশী। যুক্তি থাকতে পারে দেশে দেশে শোষণের চক্রান্ত কিংবা শোষিতের প্রতিরোধ একই রকম। কিন্তু আমার মনে হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে "প্রতিভা যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাকেই সজীব করিয়া তোলে" (এক্ষেত্রে নির্জীব।)

ক্যামুর 'দি জাস্ট' অবলম্বনে কার্টুন থিয়েটার প্রযোজনা করেছেন 'ন্যায় অন্যায়'। মেকআপে নামে বিদেশী সাজার চেষ্টা থাকলেও প্রতি মুহূর্তে বাঙ্গালীয়ানা প্রকট হয়ে ওঠে মুভমেণ্টে ও অভিনয়ে। শীতের দেশ বা গরমের দেশ কিছুই বোঝা যায় না। মুক্ত অঙ্গনে যে নাটকটি আমরা দেখলাম তার সঙ্গে চলতি সংগ্রামী নাটকের তফাত কোথায়? এর জন্য ক্যামু অনুবাদের প্রয়োজন ছিল না। আসলে বিষয়বস্তুর জোর ছিল অন্য জায়গায়—সেই শক্ত জায়গাটি অনুবাদ (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়) বা উপস্থাপনায় (নির্দেশনা—কমল ঘোষ দস্তিদার) অনাবিষ্কৃত। অনুবাদ বার বার সেই আবেগের শব্দ যা ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, হতে, হতে, হতে এখন শুধুই হাসির খোরাক। অনেক জায়গায় আটপৌরে বাংলা শব্দ বিভ্রান্ত করে।

অভিনয়ে নানারকম প্রপ্রায়ণের সমন্বয়—কমল ঘোষ দস্তিদার অভিনয় করেন উচ্চগ্রামে, তাতে তার ক্রোধ কিছুটা চরিত্রানুযায়ী হলেও, গভীর যন্ত্রণা অস্পৃশ্য থেকে যায়। অজিত রায় ও খোকন ঘোষ দস্তিদার কাজ চালিয়ে যান। অসম্ভব ভাল অভিনয় করেন সুচারু দাস—যদিও অননুকরণীয় নয় কারণ তিনিই সর্বাংগে নাটকীয় অনুকরণ করেছেন। বরং চরিত্রে কৃষ্ণ রায়চৌধুরী পোশাক ছাড়া বিন্দুমাত্র বিদেশিনী নন—উপরন্তু পোশাকের জন্য তিনি আড়ষ্ট।

নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা কোন ক্ষতি করে নি। মঞ্চে অঙ্গনের পিছনের দেয়ালটি একবার ব্যবহার করলেই চলত (মঞ্চ—কমল ঘোষ দস্তিদার) আলো অনেক নাট্য মুহূর্তকে মাপক করেছে (আলো—চিত্ত সরকার), তুলনায় আবহ কোন সাহায্য করেনি আবহ, কীক ডাউট করা ছাড়া আর কোন দায়িত্বই আবহের ছিল না।

সবশেষে প্রশ্ন জাগে বিদেশী নাটকের আহরণে আমরা বারে বারেই নিজেদের সমৃদ্ধ করেছি কিন্তু সংলাপ অভিনয় সংগ্রামী ছিল যাবতীয় সাম্প্রতিক চালু টেকনিকে একটি সংখ্যাই যদি যোগ করি—তবে অনেক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদেশী ভণিতার মরুরূপচ্ছ ধারণ—ন্যায় না অন্যায়?

দেবাশিস দাশগুপ্ত

একসপেরিমেণ্টাল 'ন'-এর চেতনা

প্রসেনিয়াম থিয়েটার বা প্রথাসিদ্ধ থিয়েটারকে ভেঙে দেওয়া বা অন্যভাবে বলা যায় নাটকের বাঁধাধরা নির্দেশকে না মানার নাটক ইদানীং নতুন কিছু নয়। এখন প্রশ্ন প্রথাসিদ্ধ বা প্রথাভঙ্গ যে ধরনের নাটকই হোক, শেষ পর্যন্ত তা নাটক হয়ে উঠল কিনা তার ওপরই নির্ভর করে নাটকের সার্থকতা। সম্প্রতি রবীন্দ্র-সদনে নৈহাটি রূপান্তর নাট্য সংস্থা অভিনয় করলেন একসপেরিমেনটাল ন-এর চেতনা। নামের মধ্যেই নাটকের বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাস মেলে।

রূপান্তর-এর এই নাটকটি বিভিন্ন মফস্বল নাট্য প্রতিযোগিতা ও একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত নাটক। স্বাভাবিকভাবেই নাটক দেখার আগে কিছু আশা পোষণ করেছিলাম। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে আশাতিরিক্ত ফল পেয়েছি। নাটক দেখতে গিয়ে যে কথা বার বার মনে হয়েছে তা হল, নাটক আর ছোট গল্প বোধ হয় খুব কাছাকাছি সরে আসছে। ইদানীং কিছু ছোটগল্পের একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ঘটনার মূল্য এ সব গল্পে কম। এ নাটকের ঘটনায় ঠিক নাটকের মত একটা সম্পূর্ণ জমাট গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্রাম ছেড়ে জমি হারিয়ে এক চাষীর ভাইবোন সহ কলকাতায় চলে আসা, এবং কলকাতার স্টেশনে রাঁধতে গিয়ে বোনটির আগুনে পুড়ে যাওয়া—এইটুকু নাটকের কাহিনী। এই আকিঞ্চিৎকর কাহিনীটুকু যে কোন সময় নাটকের প্রচণ্ড গতি লাভ করে, কোন সময় ভীষণ স্পর্শায় নাটকের এযাবৎ মানা সমস্ত রীতিনীতি চুরমার করেও নাটক হয়ে ওঠে তা লক্ষ করার মত।

নাটকের শুরু থেকেই বার বার নাটক বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা অনুপস্থিত, ইত্যাদির জন্যে নাটক বার বার হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও নাটক বাঁচাতে পারে যদি 'ন'-এর চেতনা জাগ্রত হয়। 'ন' বলতে নাট্যকার নির্দেশক নাটকের 'ন'-কে বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নাটকের প্রতি ভালবাসা, নাটকের সাধনা। 'ন'-এর চেতনায় অন্যকেও নাটক ধরেকে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত একই অভিনেতা অভিনয় করেছেন বিভিন্ন চরিত্রে। সেই সেট-সেটিং, সেই অভিনেত্রী তবু কোথাও সেই অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। মাইমকে সেট-সেটিং-এর পরিবর্তে যে কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায় তা এ নাটকে দেখার মত। একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। নাটকে যদিও কোথাও শিয়ালদহ স্টেশন বলে উল্লেখ করা হয়নি, উল্লেখ করা হয়েছে 'রূপসী' স্টেশন বলে। শুধু মাইমের সাহায্যে একটা স্টেশনকে যে এত নিখুঁত করে তুলে ধরা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটারগুলো যে নাটকের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রয়াসী, হাজারো সমস্যার মধ্যেও তারা যে নাটক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন তার প্রকাশ এই সব নাটক।

বহু সংখ্যক অভিনেতা সমন্বিত প্রোডাকসানে টিমওয়ার্কের দুর্বলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। এ নাটকে টিমওয়ার্ক এক সম্পদ। এ নাটকের প্রেক্ষাপট এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অভিনেতাদের শৃঙ্খলা লক্ষ করার মত। ধ্বনি মাইম ব্যবহার যে কত অনিবার্য কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচ্য নাটক তার প্রমাণ। তবে কয়েকটা ক্ষেত্রে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে। যেমন দরজার থাম বা টিউবওয়েল এগুলো যদি দেখানো না হত তাহলে নাটকের এমন কি ক্ষতি হত? কোন কোন সময় মনে হয়েছে নির্দেশক মাইমের কাজে অভ্যস্ত বলেই যেখানেই সুযোগ মিলেছে সেখানেই মাইমের ব্যবহারে মনোনিবেশ করেছেন। নাটকের প্রয়োজনে মাইম যদি আসে, তাহলে অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যবহারের অভ্রান্ততার ওপর নির্ভর করে নাটকের সার্থকতা।

অভিনয় অংশে বোনের ভূমিকায় মিতা ভট্টাচার্যের অভিনয় বিস্মিত করে। একটি কিশোরী মেয়ের অভিনয় ও মাইমের যুগপৎ দক্ষতা লক্ষ করার মত। মিস শেলী ও চন্দ্রাবলীর ভূমিকায় অচিন্ত্য রায় চরিত্র দুটিকে জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। আসলে এ নাটক ঠিক চরিত্রপ্রধান নাটক নয়। বলা যায় সব কটি চরিত্র মিলে এ নাটকে একটিই চরিত্র। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন আশীষ দে, স্বপন বিশ্বাস। নাট্যকার-নির্দেশক বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী চাষী যুবকের চরিত্রটি নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ সৃষ্টি।

লং প্লেইং : দীর্ঘস্থায়ী অনুরাগ ও ক্লান্তি

এইচ্ এম্ ভি একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' সামান্য কিছু সম্পাদনা করে প্রকাশিত। আর বেশী দেরি হলে এই অনবদ্য রচনা হয়ত হারিয়ে যেত। অনেকেই লোকান্তরিত, শিল্পীও অনেকে কালক্রমে অবসর গ্রহণ করেছেন—সূচনায় যে সুর ছিলো কালক্রমে অনেক সুর পরিবর্তিত। বলতে বাধা নেই এইচ এম ভি অনেক যত্ন নিয়ে রেকর্ড প্রকাশ করেছেন, সেখানে আকাশবাণীর টেপ-এর অনেক ত্রুটি সংশোধিত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে চৈত্রের শুক্লা অষ্টমী প্রভাতে 'বসন্তেশ্বরী' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বিষয়বস্তু নেওয়া হয় শ্রীশ্রী মার্কণ্ডেয় চণ্ডী থেকে। হরিশচন্দ্র বালীর সুরারোপে বসন্ত, দেশী, দেবগিরি, বরাঠি, তোড়ী রাগ সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়। অন্য কিছু গানের সুর দেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, নাট্য-কথাসূত্রে গীতাংশ গ্রন্থন করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কিছু শ্লোক আবৃত্তি করেন আলেখ্য রচয়িতা বাণীকুমার স্বয়ং। এই অনুষ্ঠান অনুপ্রেরণায় সংস্কৃত রূপকের অন্তর্গত বীথি (oratoric) অনুসরণে মহিষাসুরমর্দিনী ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শুভ ষষ্ঠীর প্রত্যূষে প্রচারিত হয়। অধিকাংশ গান পঙ্কজকুমারের সুরারোপিত হলেও কিছু গানের সুর দেন হরিশচন্দ্র বালী এবং রাইচাঁদ বড়াল। চারদশক পার হয়েও মহালয়ার এই অনুষ্ঠানের জন্য বহির্বঙ্গেও সাগ্রহ প্রতীক্ষা। পঙ্কজকুমার-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও বাণীকুমারের এই তিলোত্তমা সৃষ্টি চিরকালীন সম্পদ হয়ে আছে। এই গান সারা বছর রেডিওতে বাজে না অথবা অ্যামপ্লিফায়ারে সারারাত ধ্বনিত হয় না—বছরে একবার বাজে—যাঁদের রেডিও থাকে তাঁরা সারিয়ে নেন উষালগ্নে একবার শ্রবণ ও মনকে পবিত্র করতে—এইভাবে গান কালজয়ী হয়। শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আছেন—তবু সায়গলের যদি 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' গান শুনে সুপ্রীতি ঘোষকে আবার মনে পড়ে যায়—বিমলভূষণের 'নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী' শুনে মনে আসে তিনিই একদিন 'জজ সাহেবের নাতনী'র হিট গান গেয়েছিলেন অথবা 'শুধু পথচলা এই অলস চৈত্র বেলা'। রবীন্দ্র সংগীত ছাড়া সুমিত্রা সেনের কোন গান এই মুহূর্তে মনে আসছে না, শুধু কানে বাজে 'মাগো তব বীণে সংগীত প্রেম ললিত'। উৎপলা সেনের শান্তি দিলে ভরি' গান শুনে আবার মনে আসে তাঁর গাওয়া পুরোন দিনের 'শুকতারা গো নিও না বিদায়', 'এক হাতে মোর পূজার থালা' অথবা 'প্রান্তরের গান'। বহু জনপ্রিয় গানের পাশাপাশি বিচার করে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারবেন 'হে চিন্ময়ি' গান গেয়ে তিনি কতখানি তৃপ্তি পেয়েছেন—অনুরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (বিমানে বিমানে আলো-

...স। গণজাগরণ থাকুন।' প্রাতঃকালের উষালগ্নে প্রথম তার সপ্তক কোমল রেখা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুপ্তচেতনা জাগিয়ে তোলে। মালবেশ্রু রাগাশ্রিত গানে লক্ষ প্রতিষ্ঠ কিন্তু কর্ণাটকী রীতিতে 'তব অচিন্ত্য রূপ চরিত মহিমা' গানের তুলনা আর আছে কি? সবশেষে কৃষ্ণ দাশগুপ্তার 'অখিল বিমানে তব জয় গানে' শুনে রেকর্ড কোম্পানীর উপর বিতৃষ্ণা জাগে। এই অসাধারণ শিল্পীর রেকর্ড খুবই সামান্য—এই অপরাধ আত্মহত্যার সামিল। সমবেত সংগীত এই অনুষ্ঠানের প্রাণ।

হারমনাইজেশন নামে আজকাল অনেক পরীক্ষা ও ছেলেমানুষী চলে অথচ কত সাবলীলভাবে সমুদ্রের বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মত স্বরবিন্যাস মিশে যায়, মিলে যায়—যেটা আদর্শ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। কালিকা পুরাণ অথবা মৎস্য পুরাণের দুর্গা ধ্যান জটাজুটসমাযুক্তাম—এবং ঋগ্বেদ-এর 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা' স্তোত্রের হারমনাইজেশন 'জয় জয় জপ্যাজয়ে' স্তোত্রের ছন্দবিভাগ মনে করিয়ে দেয় পঙ্কজকুমার মল্লিকের তিরোধান কতখানি শূন্য করে গেছে। বিশেষত তাঁর নিজের গাওয়া 'জয়ন্তী মংগলা কালী' স্তোত্রে যেভাবে সম্মেলক কণ্ঠের উপর সুর ধরে নিয়ে গান ধরা হয়, এই মুহূর্তে সেই নাটকীয়তার খুবই অভাব। (যে আত্মবিশ্বাসের অভাব রবীন্দ্র গীতিনাট্যে প্রায়ই ধরা পড়ে) বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পাশাপাশি সেই অভাব সমান ভাবে ধরা পড়বে—এই নাটকীয়তা এখানে অপরিহার্য। অনেক গানের পাশাপাশি তুলনা করার মত গান আজও লেখা গেল না।

সম্পাদনায় কিছু ত্রুটি আছে—স্কেল পরিবর্তন অনেক সময় 'জার্ক' আনে। মূল আলেখ্যে সপ্তশতী মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা' স্তবটির পরে গ্রন্থনা আছে—রেকর্ডে 'তব অচিন্ত্য রূপ চরিত-মহিমা' গানের আগেই স্তবটি হয়ে যায়, তার কিছু পরে গান—তারপর গ্রাস্থিক ব্যাখ্যা "তখন প্রলয়ান্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে তুষ্টা হয়ে..." স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—'তখন' মানে কখন? এই স্তবে মানে কোন স্তবে? পরিবর্তিত সুরের মধ্যে 'ওগো আমার আগমনী আলো' গানের ত্রিমাত্রিক ছন্দের সুরটি ভাল লাগত—শিপ্রা বসুর গাওয়াও খুব খারাপ—আসলে সম্পাদনা ত্রুটি এবং সমস্ত গানেই বন্দসঙ্গীত গানের অনুষঙ্গ না (তখন বোম্বের শচীন গুপ্ত গাইতেন) 'দরশন দাও মা' এবং "মোহ আবরণ তোলো" গান দুটি বাদ যাওয়ায় একটু আক্ষেপ থেকে যায়।

ডঃ ভূপেন হাজারিকার আটটি গান একটি মিনি লং প্লেইং রেকর্ডে সংকলিত। শিল্পীর অভিজ্ঞতা ব্যাপক, আত্মবিশ্বাস তবে তিনিই বলতে পারেন "আমি এক যাযাবর/পৃথিবী আমাকে আপন করেছে/ভুলেছি আপন ঘর/আমি গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভোলগার রূপ দেখেছি/অটোয়ার থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে প্যারিসের ধুলো মেখেছি/আমি ইলোরার থেকে রং নিয়ে শিকাগো শহরে দিয়েছি/গালিবের শের তাসখন্দের মিনারে বসে শুনেছি/মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে গোর্কীর কথা বলেছি/বারে বারে আমি পথের টানেই পথকে করেছি ঘর/তাই আমি যাযাবর।" যথার্থ আধুনিক গান—সুর কখনই ভঙ্গিসর্বস্ব নয়—গানের কথা কখনই নাবালক পটুত্ব নয়। নতুন গানের মধ্যে 'এ কেমন রঙ্গ যাদু, এ কেমন রঙ্গ' (কথা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং সুপর্ণকান্তি ঘোষের সুরে ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় 'ও মালিক সারাজীবন কাঁদালে যখন, আমার এবার মেঘ করে দাও/তবু কাঁদতে পারবো পরের দুঃখে অনেক ভালো তাও/মানুষ যেন কারো না আমায়', সহজ সুর অথচ কথার সৌকর্যে আধুনিক গানে নতুন পদক্ষেপ। এই রকমই আর একটি গান নিজের লেখা "মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্যে/একটু কি সহানুভূতি পেতে পারে না/মানুষ মানুষকে পণ্য করে মানুষ মানুষকে জীবিকা করে/পুরোন ইতিহাস ফিরে পেলে লজ্জা কি তুমি পাবে না"—গানের দিক বদল করা যায়—যদি প্রচেষ্টা আন্তরিক হয়। আর একটি গান "আজ জীবন খুঁজে পাবি/ছুটে ছুটে আয়" আগের সুরে করা একটি আধুনিক গানের (নির্মলা মিশ্র) ভাবান্তর অবশ্য বাংলাতেই। পুরোন গানের মধ্যে পাল্কীর গান 'হে দোলা হে দোলা' 'সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত' পুনঃ সংকলিত। এই গানগুলি এখন অনেকের মুখে শোনা গেলেও ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে গান যেন ছবি হয়ে ওঠে। 'হে দোলা' গানের প্রিলিউড মিউজিকটি ভাল নয়—তারসানাইয়ের প্রয়োগ অসাধারণ। সবশেষে 'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা' নির্দ্বিধায় বলা যায় এই একটি গান অনেক বছর পরেও একটি করুণ অধ্যায়কে মনে পড়িয়ে হয়ত অনেকের চোখকেই সজল করে তুলবে।

একটি লং প্লেইং রেকর্ডে লতা মঙ্গেশকর-এর বারোটি পুরোন গান সংকলিত; এখনও নতুন। বাংলা গানের সব পুরোন রীতি ভেঙে সলিল চৌধুরীর যেসব সুর লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে রূপ নিয়েছে আরও অনেকদিন তা নতুন হয়ে থাকবে। অথচ গানের সুর মোটেই সহজ নয়, এক্সপেরিমেন্টের সার্থক রূপ যোক বা কেন, সব জেনে যে মধুর রূপ দিয়েছে তাকে অতিক্রম করা আজও সম্ভব হয়নি। গানের কথায় কিছু একঘেয়েমি আছে। প্রতিটি গানের অর্কেস্ট্রাইজেশন লক্ষণীয় এবং নিশ্চিতভাবেই শিক্ষণীয়। পূর্ববর্তী পর্যায়ে সলিল চৌধুরীর গানের বাড়ি চলিতের বা বিভিন্ন জনপ্রিয় গানের অর্কেস্ট্রা এত উন্নত ছিল না। বোম্বাই চলচ্চিত্রে সে বিষয় জীবন-এর পর আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি বাজনা শিক্ষা ও সাধনাতে সম্পূর্ণ—যেটা পরবর্তীকালে হয়তো মূল্যায়ন হবে। অনেক শিশুকে 'সাত ভাই চম্পা' গাইতে শুনেছি প্রারম্ভিক মিউজিক সমেত।' আপাতত মনে পড়ছে না আজ কোন সুরকারের এই সৌভাগ্য ঘটেছে কিনা। সলিল চৌধুরী ছাড়া সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা ও হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুর করা একটি করে গান আছে—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরকৃত 'কত নিশি গেছে নিদহারা' স্মরণীয় গানটি থাকলে রেকর্ডটি সম্পূর্ণাঙ্গ হত।

সুনীল গাঙ্গুলী নিপুণ হাতে ইলেকট্রিক গীটারে পরিবেশন করেছেন বারটি হিন্দী ফিল্মের গান।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের পরিবেশনায় পাঁচটি গান শোনা গেল—তার মধ্যে একটি গান ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার আগেই রেকর্ড করেছেন। রেকর্ড কভারে পল রোবসনের 'ওল্ড ম্যান রিভার' এবং নাজিম হিকমতের কবিতার স্বীকৃতি জানান হয়েছে—(সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ নয়) প্রায়শই এটা জানানো হয় না—'পথে এবার নামো সাথী' (সলিল চৌধুরী) গানটি আগে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একক কণ্ঠে গেয়েছিলেন—সে গানেও যথেষ্ট উদ্দীপনা ছিল—কিন্তু এই সম্মেলক কণ্ঠে প্রথম ভোক্যাল দিয়েছেন—মিছিলের নয়—পিকনিক বা প্রমোদভ্রমণের হলেও হতে পারে—আর গান? সম্মেলক কণ্ঠে যেন ধমক দেওয়া চলছে—আর একক কণ্ঠে যেটুকু আছে সে কণ্ঠে উদ্দীপনা নেই—কদর্থে আধুনিক গানের দোষটুকু আছে। 'তোমার আমার ঠিকানা' (কথা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর—সুধীন দাশগুপ্ত) ও ওয়াই এস মূলকী সুরারোপিত 'ভারতবর্ষ এক সূর্যের নাম' বেশ ভাল পরিবেশন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একটি লং-প্লেইং রেকর্ডের একদিকে ছয়টি গান গেয়েছেন, লিখেছেন—মুকুল দত্ত, পরমানন্দ সরস্বতী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; সুর দিয়েছেন — অমল মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ। প্রতিটি গানের কথা পরিচ্ছন্ন এবং কাব্যিক। কিন্তু বিভিন্ন সুরকার সুর করলেও, শিল্পীর আগের অনেক গানের সুর বা মেজাজ মিলে যায়। যেমন 'তোমার ভুবনে মা গো এত পাপ', 'পথের ক্লান্তি ভুলে', 'নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবী', 'জানি না কখন তুমি আমার প্রাণে' প্রভৃতি অনেক গানের রূপান্তর খুঁজে পাওয়া যাবে— ... ... 'দুলালদুঃখ।' আর একটি হালাকর ব্যাখ্যা আছে (রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের মত) 'এক উদাসী আমার মনে' গাওয়ার পর বাঁশি বাজে তারপর গাওয়া হয় 'বাজায় বাঁশি।' রেকর্ডের অপর দিকে দীর্ঘতম আধুনিক গান গেয়েছেন শিল্পী নিজের সুরে—রজনীকান্ত দাসের 'কে জাগে' কিংবদন্তীর মত দীর্ঘ গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনেক করেছেন—'গাঁয়ের বধূ', 'রানার', 'পাল্কির গান' (সলিল চৌধুরী) অনুরূপো রায় (অনুপম ঘটক) এবং আরও কিছু গান। এবার নিজের সুরে হয়ত তিনি উপলব্ধি করবেন—দীর্ঘ গানে সুর করা কত পরিশ্রমসাধ্য কাজ

ভারতী রেকর্ড

সুপ্রকাশ চাকী ঠিক নতুন শিল্পী নন কিন্তু প্রচারও নেই বলে নতুনের পর্যায়ভুক্ত। অথচ গায়কী নৈপুণ্যে তিনি অনেকের থেকেই ক্ষমতাবান। শুধু পরিচ্ছন্ন গায়কী নয়—সুরকার হিসেবেও তিনি প্রতিষ্ঠিত না হলেও প্রায় পরিণত। প্রায় কথাটার প্রয়োগ এই জন্য, ঠিক তাঁরই সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত সুরকার অপরিণত ও পুনরাবৃত্ত কাজ করে চলেছেন। এবারের চারটি গানই নানা ধরনের—যা প্রমাণ করে সবরকম স্টাইলই তিনি রপ্ত করেছেন। সুরের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে 'শুধু বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি' গীতিকার অতুল ভৌমিকের কথায় নতুনত্ব আছে। আর সুরের মধ্যে একঘেয়ে লাগে (এই ধরনের গান অনেক শোনা গেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের কণ্ঠে)। 'সেই তো আগের মত সন্ধ্যা নামে' ভূপেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কথাও মামুলোর সাপ্লাই।

কল্যাণী চক্রবর্তী তিনটি দ্বিজেন্দ্রগীতি গেয়েছেন। নিশ্চিতভাবেই দ্বিজেন্দ্রগীতির একটি বিশেষ ধরনে তাঁর নৈপুণ্য আছে। কিন্তু গানের কথা ভেঙে তান দেওয়া (একি শ্যামল সুষমা) অথবা তানের নামে শুধু গলাকাঁপানো (পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে) অনেকের গলায় শুধু ঢংটাই আনে। 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমায়' গানটিতে দুবার কাশির শব্দ আছে—এটা নতুন নিঃসন্দেহে। রেকর্ড কভারে অনেক অভিজ্ঞজনের 'সার্টিফিকেট' আছে। কল্যাণী চক্রবর্তীর গানের ধরন বিগত যুগের—তাই অনেকে হয়ত স্মৃতিতে ডুব দিয়ে আনন্দ বোধ করেন। কিন্তু গান স্থাণু হতে পারে না—কালের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও এগোতে হয়—সুর পরিবর্তন বা আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গ দিয়ে নয়—গায়কীর উপযুক্ত ব্যবহারে কণ্ঠের পরিমার্জনায় আমরা সব সময় এগোতে চাই—পিছোতে নয়—তুলনামূলক আলোচনা স্বাস্থ্যকর হলেও থামাটা প্রগতি নয়।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

কৃষণ খান্না (১৯২৫—)

ভারতীয় শিল্পের আধুনিক পর্বের শুরু ১৯শ শতকের শেষাশেষি। কিন্তু এতে সমকালীন নাগরিক নৈরাশ্যের সংক্রমণ ঘটল যুদ্ধের সময় "ক্যালকাটা গ্রুপের" প্রতিষ্ঠার পর। যামিনী রায় থেকে পরবর্তী অমৃতা শেরগিল। বিনোদবিহারী এবং রামকিংকরের কাজে সমকালীন চেতনার উদ্ভাস ঘটেছিল। কিন্তু যুদ্ধে মন্বন্তরে বিধ্বস্ত মূল্যবোধের অভিজ্ঞতা এতে দিল নতুন মাত্রা। তীব্রতা। এরই পরে বোম্বাইতে তৈরী হল 'প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপ' (পি এ জি)—ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, হুসেন, আরা, আকবর পদমসী এবং কিষণ খান্না এই দলের সদস্য ছিলেন।

জন্ম অবিভক্ত পাঞ্জাবের লাহোরে। শিল্পশিক্ষাও। লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্ট এবং স্টুডিও গ্রাফিকসে। দেশ বিভাগের পর চলে আসতে হল কৃষণকে। এই ক্ষত থেকে এখনও রক্তক্ষরণ হয়। কৃষণের ছবির তীব্র আর্তি নৈরাজ্যের কারণ হয়ত এটাই। তিনি রাজনীতিবিদ, আমলাদের ক্ষমা করতে পারেননি। তারা কখনো জার্মান গেস্টাপোর মত ছবিতে উপস্থিত। কখনো ঘাতক, অন্যরা যুপকাষ্ঠের বলি।

১৯৫৪-৭৫ দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা এবং মাদ্রাজে তিরিশটি একক প্রদর্শনী হয়েছে তাঁর। ১৯৬০, ৬২, ৬৮ লণ্ডন, ১৯৬৩ ওয়াশিংটন ডি সি এবং ১৯৬৪ ন্যু ইয়র্কে তাঁর একক প্রদর্শনী হয়েছে।

১৯৬২-৬৩ রকফেলার কাউনসিলের ফেলো হয়ে ন্যু ইয়র্কে ছিলেন। ১৯৬৩-৬৪ অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি, ওয়াশিংটন ডি সি-তে আবাসিক শিল্পী। ১৯৬৪-তে ললিতকলার জাতীয় পুরস্কারলাভ।

একাধিক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধানগুলি শুধু দিলাম— টৌকিও বিয়ানালে (৫৭)। 'সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলা', এসেন, ডর্টমণ্ড এবং জুরিখ (৫৯)। 'আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা', কায়রো (৫৯)। সাও পাওলো বিয়ানাল, ব্রেজিল (৬০)। টৌকিও বিয়ানাল (৬১)। ভেনিস বিয়ানাল (৬২)। ১৯৬২-৬৩-র মধ্যে মার্কিন মুলুকে ভ্রাম্যমাণ ভারতীয় শিল্পকলার প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। নতুন দিল্লির ত্রিবার্ষিকী (৬৮)। "প্রাচ্য প্রতীচ্যের কথোপকথন : সমকালীন শিল্পকলা" ন্যাশনাল ম্যুজিয়াম অব মডার্ন আর্ট, টৌকিও (৬৯)। "ভারতীয় শিল্পী '৬৯" (ম্যাকস মুলার ভবন এবং বিড়লা আকাদমী, কলকাতা)। ১৯৭০-৭২ "এখনকার শিল্পকলা" ত্রিবেণী কেমেলড, নতুন দিল্লি। 'সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলা— '৭৩", ভারতীয় স্বাধীনতার স্মারক প্রদর্শনী, ওয়াশিংটন ডি সি, লস এঞ্জেলেস এবং টরেন্টো (৭৩)। নতুন দিল্লিতে ধূমিমল গ্যালারীতে যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ (৭৮)।

কৃষণ খান্না উবাচ :

"নন্দনতত্ত্ব" শব্দটি আমাকে ভয়ানক ক্লান্ত করে। ছবির ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্বর অর্থ চোখকে সুড়সুড়ি দেওয়া। যেন চিত্রকলার কাজই শুধু ঐ। শিল্পকলার বহুধা বিভক্ত উৎস এবং কাজ থেকে শিল্পকলাকে কেমনভাবে যেন বিযুক্ত করা হয়েছে। এই 'কাটা ছেঁড়ার' মধ্যে দিয়ে আমিও গেছি। শেষে দেখি মানুষ হিসাবে আমার ঘাটতি হয়েছে, কারণ আমি তখন নিজের কাজটুকুই করেছি যার সংগে অন্যের কাজের সম্পর্ক ছিল না। আবার যখন 'সাহিত্যধর্মী' বিষয় আঁকা ধরলাম তখন মনে হলো এক ঝলক হাওয়া এসে মুখে লাগল। অন্য সবাইয়ের মত সামাজিক ঘটনাগুলির সম্বন্ধে আমার সমান কৌতূহল। গালভরা যেসব শ্লোগান আদর্শরূপে প্রচার করা হয় এবং যা মানুষকে নবমন্ত্রে দীক্ষা দেয়, রাজনৈতিক খেলাধুলা, রাজকুমারদের পতন, নতুন শাসকগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা,

খাটো মানুষের অভ্যুত্থান, রক্তমাংসের কামনাবাসনায় নিহিত ক্ষয় এবং জরা আমাকে আকৃষ্ট করে। কী দারুণ উত্তেজক সময়ে আমরা বেঁচে আছি! চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরদৃষ্টির অভাবে ভুগব না—চিত্রশিল্পী হিসাবে ভোজ্য বস্তু অত্যাধিক। একা খেয়ে হজম করা মুশকিল। প্রত্যেক দিনে ভোজ্য তালিকায় নতুন বস্তুর আমদানি হচ্ছে। দুশো ডাইনীর হাঁড়িতে নতুন রান্না ফোটানো হচ্ছে যদিও খেলোয়াড়ের সংখ্যা অল্পই— একমুষ্ঠি উদ্ভাবক মানুষ যাদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন করা হয়। খেলার নিয়ম তাদেরই তৈরি। "গণতন্ত্র"-র মানে প্রত্যেকে খুশিমতো করে। তারপর ইচ্ছামতো কাজ করে যায়। ফলে ভুলে যাই "চিত্রকলার আত্মাই বিমূর্ত"—আমার দুর্বলতা ক্ষমা করুন মশাই।

"নামহীন ছবি" (তৈলচিত্র)— নীচের দিকে খাড়া আর অনুভূমিকভাবে ইতস্তত কিছু চৌকো ঘর। ইটের মতো পাতা যেন। একটা প্রাচীরের ব্যবধান। প্রাচীরের ওপাশে চাদর [illegible]। এর কি

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার!

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

সাধারণতঃ রঙ ময়লা হয় কি করে

বছরের পর বছর সাধারণতঃ আপনার রঙ একটু একটু করে ময়লা হতে থাকে। আর তাহয় দুভাবে: ভেতরের ও বাইরের প্রক্রিয়ায়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেল্যানিন নামে একটি শরীর রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু লোকের শরীরে অন্যদের তুলনায় বেশী ছড়িয়ে পড়ে। আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, রঙ তত ময়লা দেখায়। তাছাড়া, আপনি যতবার বাড়ীর বাইরে যান সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে, ফলে মেল্যানিন বেশী করে ছড়াতে থাকে আর আপনার রঙও হতে থাকে আরো বেশী ময়লা।

রঙ ফর্সা করার প্রচলিত উপায়

শত শত বছর ধরে ত্বকের রঙরূপের উন্নতির জন্যে মহিলারা রকমারি উপায় অবলম্বন করে এসেছেন। বেসন, দুধের সর, পাতিলেবু আর গ্লিসারিন, এমনকি শশার রস পর্য্যন্ত! এগুলি সম্ভবতঃ আপনার ত্বকের উন্নতি করে—ত্বক নরম করে, কিন্তু এসব দিয়ে কি সত্যিই রঙ ফর্সা হয়?

অপর পক্ষে আছে—ব্লীচ করার উপাদান। এগুলি যে ত্বকের কত ক্ষতি করে তা আপনাকে বলে দিতে হবে না। আচ্ছা, কোনো দামী আর নরম কাপড় কি আপনি ব্লীচ করবেন? আপনার ত্বকও তো কম দামী আর কোমল নয়।

আবিষ্কার! ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর রঙ ফর্সা করার প্রণালী—প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার—যা পৃথিবীতে এই প্রথম, প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে! আপনার ত্বকের ভেতরে কাজ করে এর 'ভিটামিন ক্রিয়া'। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীতে একটি ভিটামিন আছে, যা ক্রীম মাখবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বকে প্রবেশ করে। মেল্যানিনের বিস্তার রোধ করবার জন্যে এই ভিটামিন স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে, ফলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হয়ে ওঠে, যা নজরে পড়ে! এই ভিটামিনটির ক্রিয়া আর ফর্সা-ত্বক ওয়ালা লোকের ত্বকের ভেতরের মেল্যানিন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে প্রকৃতির যে ক্রিয়া তা বলতে গেলে একই রকমের। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ঠেকে বাদ দেয়। এইভাবে আপনার ত্বক রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, অথচ সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে।

৬ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মাখুন, তারপর দেখুন কি তফাৎ!

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল নিজে চোখে দেখা। ছ'সপ্তাহ নিয়মিত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী ব্যবহার করুন। তফাৎ নিশ্চয়ই নজরে পড়বে আপনার! অন্যদেরও! হাজার হোক, এটি প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে। আর সেইজন্যেই তো আপনার ত্বকে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কাজ এত সহজে হয়!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী রঙ ফর্সা করার ক্রীম তো বটেই...আরো কিছু

আপনি উপভোগ করবেন ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর কোমল স্পর্শ আর মনোরম সুগন্ধ! দিনে অন্ততঃ একবার ব্যবহার করুন, সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে দুবার! নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হবে, যা নজরে পড়বে, আর প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতিতে ঐ রকমই থাকবে!

লিনটাস-FALOV 8-2415 BG (R)

প্রাণের উচ্ছ্বাস ভরে সারা আকাশ
MORARJEE
MILLS

দেশ

হরলিক্‌স

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যা আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্‌স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্‌স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

আপনি এখন তরুণী; তাই এখন আপনার— এমন সুরক্ষা দরকার, যা শুধু কেয়ারফ্রী যোগাতে পারে

চিঠিপত্র

রাগ অনুরাগ

'রাগ অনুরাগে'র সমালোচনায় শ্রী রাধিকামোহন মৈত্র মহাশয় বিবাদী স্বরের মত আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন। আমরা যারা সঙ্গীত-সুধা শুধুমাত্র আনন্দপিপাসা নিয়ে শুনতে এসেছি এবং যারা সঙ্গীতের রাজনীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই না তাদের কাছে শঙ্করজীর 'রাগ-অনুরাগ' সুখপাঠ্য তো বটেই, অনেকভাবে instructive-ও। শঙ্কর-জীর যুক্তি, সৌন্দর্য চেতনা বা সঙ্গীত রসিকতা অনেকের সঙ্গে না মিলতে পারে, কিন্তু ওঁর কথা বলার (কেননা শঙ্করজী নিজে লিখছেন না) মধ্যে একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য আছে যে 'রাগ অনুরাগ' পড়ার পর আর যা-ই হোক এর পেছনে কোনো কূটমনের দুরভিসন্ধির গন্ধ পাওয়া যায় না। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলীর সম্বন্ধে ওঁর মন্তব্যে বাঙলার অনেক সঙ্গীত-রসিক ক্ষুব্ধ হয়েছেন, আলী সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ মুনাব্বর সোচ্চার প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, ওস্তাদ গোলাম আলীর উপর মন্তব্য করার সময়ও শঙ্করজীর শ্রদ্ধাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে শ্রীযুক্ত মৈত্র মশায়ের লেখায় সে সৌজন্য অনুপস্থিত—তীব্র অসাঙ্গী-তিকভাবে।

ওস্তাদ বড়ে গোলামের উপর শঙ্করজীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন মন্তব্য রাখা ধৃষ্টতা হবে, তবে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৮ সনের কলকাতার বহির জাগ সঙ্গীত আসরে উপস্থিত থাকার সূত্রে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার একটু নিবেদন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ করি। সেই সময়কার যে-কটা আসরে গোলাম আলী সাহেবের গান শুনেছিলাম তার অধিকাংশটিতেই খাঁ সাহেব খেয়ালের পর যখন ঠুংরি ধরতেন তখনই যেন আসরের গুমোট কাটত। মালকোষে পঞ্চম প্রয়োগ করেও খাঁ সাহেব শ্রোতাদের যত না তাজ্জব বানিয়ে দিতেন, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ দিতেন এবং নিজেও পেতেন মনে হয়—যখনই তিনি ঠুংরির হাল্কা চালে ফিরে আসতেন। এখানে শ্রোতাদের গ্রহণক্ষমতা এবং অনেক কূট-তর্ক সম্বন্ধে জানি, কিন্তু বড়ো কথা হচ্ছে—সহজ সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করাই ভালো। বাগবিস্তারে—এসব ক্ষেত্রে শিল্পীর অবমাননাই হয়—সত্য তো রক্ষা হয়ই না। যে যুক্তিতে ওস্তাদ আমীর খাঁর খেয়ালের পর শ্রোতারা ঠুংরির জন্য আব্দার করেন না, সেই যুক্তিতেই গোলাম আলী সাহেবের ঠুংরি—শোনার জন্য পাগল হয়ে যান।

আসল প্রসঙ্গে ফিরে এসে দেখা যাক মৈত্র মশাই 'রাগ অনুরাগে' কি প্রত্যাশা করেন। উনি কি 'রাগ অনুরাগ'কে সঙ্গীতের ফিলজফি হিসাবে চান? দেশের পাঠকরা নিশ্চিত-ভাবে বলতে পারি—ওঁর সঙ্গে একমত হবেন না। বাজারের সস্তা মালের জোগান আছে, শঙ্করজী তার চেয়ে দামী কিছু দিতে পারেননি বলে মৈত্র মশাই উষ্মা প্রকাশ করেছেন। মৈত্র মশাই বরং সঙ্গীততত্ত্বের উপর একখানি দামী পুস্তক প্রণয়ন করুন; আমরা সেটা কিনে পড়ব। বর্তমানে বাজারের সস্তা পাঠ্যপুস্তক এবং শঙ্করজীর 'রাগ-অনুরাগ' নিয়ে বেঁচে বর্তে থাকি।

সংস্কৃত উদ্ধৃতির ভুল, রিয়াজের পরিবর্তে রেওয়াজ বলা, ঐতিহাসিক ভুল শঙ্করজীর এর সব ভুলের উদ্ধৃতি দিয়ে মৈত্রমশাই যতই সাঙ্গীতিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে যাওয়ার চেষ্টা করুন, একটা কথা ওঁর মনে রাখা কর্তব্য যে, রাজনীতি দিয়ে বা কাদা ছিটিয়ে প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যারা শ্রীযুক্ত মৈত্র এবং শঙ্করজীর বাজনা একাধিকবার শুনেছি—তাঁরা জানি একই আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করলেই দুজন একই ক্যালিবার-এর শিল্পী—এ তথ্য প্রমাণিত হয় না। একই আকাশে একই সময় চাঁদ এবং তারা বিদ্যমান থাকে। এই সাদা কথাটা বোঝার জন্য অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা জ্ঞান-প্রকাশজীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই বোধহয়।

এ পর্যন্ত চব্বিশ কিস্তিতে প্রকাশিত রাগ অনুরাগে শঙ্করজী নিজের গুণপনার কথা যতটুকু বলেছেন, মাত্র তিন কলমের পরিসরে শ্রীমৈত্র নিজের জ্ঞান এবং গুণপনার বিষয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী বলার ইঙ্গিতে দিয়ে ফেলেছেন।

সর্বশেষে এ ধরনের একখানা পত্র লেখার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুতপ্ত। কিন্তু ভরসা রাখি, মৈত্র মহাশয় 'খেলোয়াড় সুলভ' মনোভাব নিয়ে একজন সামান্য শ্রোতাকে ক্ষমা করবেন।

বিশু ভট্টাচার্য

আসাম।

॥ ২ ॥

১৬ সেপ্টেম্বর ৭৮-এর 'দেশ'-এ শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র মহাশয় পণ্ডিত রবিশঙ্করের 'রাগ-অনুরাগ'-কে 'নানা অসঙ্গতিপূর্ণ, অর্ধসত্য এবং ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা' রচনা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের সপক্ষে তিনি শুধু তিনটি বাস্তব উদাহরণই দিয়েছেন তাঁর চিঠিতে : (ক) দুটি বানান ভুল ('রজায়তে' ও 'রেওয়াজ')। (খ) আমির খুসরৌ-এর তারিখ নিয়ে সন্দেহ। (গ) 'অন্য তালে গৎ বাজাবার প্রথম কৃতিত্বের দাবি তিনি (রবিশঙ্কর) কিছুতেই করতে পারেন না।' তৃতীয় উদাহরণে কিন্তু রাধিকাবাবু স্বয়ং অর্ধসত্য কথনের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। কেননা, পণ্ডিত রবিশঙ্কর তৃতীয় সর্গের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'সে সময়ে সেতারে মধ্য বিলম্বিতের তিন তালের গৎ এবং দ্রুত তিন তালের গৎ বাজানোরই প্রচলন ছিল। অন্য কোনো তালে গৎ বাজাতো না কেউ।' দেখা যাচ্ছে, পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুধু সেতারের কথাই বলেছেন। অথচ শ্রীযুক্ত মৈত্র সেতার-সম্বন্ধে এই উক্তিকে সরোদের এলাকায় নিয়ে গিয়ে সরোদ-শিল্পী [illegible] সহ বেন্দু, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ও তাঁর নিজের উদাহরণ দিয়েছেন। একজনও সেতার-বাদকের উল্লেখ তিনি করেননি। যেকথা পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেন নি, সেই কথাকেই তিনি অসত্য প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেছেন। ফলে, রাধিকাবাবুর উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত না হয়ে যেন আহত অভিমানের উক্তি বলে মনে হয় না?

গোপাল মিত্র

সোনা, ছাপরা

লালবিহারী দে

দেশ ৩৫ সংখ্যায় (১-৭-৭৮) শ্রীসুরজিতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধটি আগেই পড়েছিলাম। সম্প্রতি রেভাঃ লালবিহারী দের Recollections of Alexander Duff পড়ে মনে হলো শ্রীসেনগুপ্ত লালবিহারীর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য পরিবেশন করতে সমর্থ হননি। লালবিহারী বর্ধমান জেলার এক গণ্ডগ্রাম থেকে ন বছর বয়সে পিতার ইচ্ছানুযায়ী কোলকাতা আসেন লেখা-পড়া শিখতে। ওঁর পিতা তখন কোল-কাতায় সামান্য ব্যবসায়ী। পিতার ইচ্ছে ছিল লালবিহারী কিছু ইংরেজী লেখাপড়া শিখে একটা ভদ্রগোছের চাকুরি করে। এ প্রসঙ্গে লালবিহারী নিজে বলছেন—

... he did not intend to make a learned man of me, but to give me as much knowledge of English as would enable me to obtain a decent situation.

লালবিহারী কোলকাতায় এলেন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন ওখানে ভাল ইংরেজী স্কুল ছিল চারটি। হিন্দু কলেজ, জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস-টিটিউশন, স্কুল বুক সোসাইটির স্কুল (ডেভিড হেয়ারের) এবং ওরি-য়েন্টাল সেমিনারি। হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে মাইনে ছিল যথাক্রমে ৫ ও ৩ টাকা। আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য লালবিহারীর পিতা পুত্রকে উক্ত বিদ্যালয়দ্বয়ে ভর্তির কোন চেষ্টাই করেননি। হেয়ার সাহেবও তাঁর বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে নানারকম খুঁটিনাটি মেনে চলতেন। ওখানেও লালবিহারীকে ভর্তির জন্য ওঁর পিতা কোন চেষ্টা করেননি। জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস-টিটিউশনে শিক্ষা অবৈতনিক। তৎ-দিনে আলেকজান্ডার ডাফের কাছে ডিরোজিয়ান মহেশ ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে শহর কোলকাতায় তখন বাগবিতণ্ডার শেষ নেই। তাই লালবিহারীর পিতা যখন পুত্রকে ডাফ সাহেবের বিদ্যা-লয়েই ভর্তি করাবেন বলে স্থির করলেন তখন তাঁর সুহৃদরা ভয় দেখাতে আরম্ভ করলেন—ওখানে পড়লে ছেলে খৃষ্টান হয়ে যাবে। অনেক বাদানুবাদের পর লালবিহারীর ভাষায়, তাঁর ভাগ্যবাদী পিতা বললেন :

If it be written on my son's forehead that he will not become Christian, then he will not become a Christian. let son's forehead that he will become a Christian, then he will become a Christian, do what I can.

তারপরই রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছ থেকে সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করে ১৮৩৪-এর কোন একদিনে লাল-বিহারীর পিতা পুত্রকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেলেন ডাফ সাহেবের বিদ্যা-লয়ে। সুপারিশ পত্রের আদৌ প্রয়ো-জন হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে লাল-বিহারী কিছুই বলতে পারেননি কারণ ওখানে সবই ছিল অবারিত দ্বার। লালবিহারী তাঁর পরবর্তী সমস্ত শিক্ষাই পেয়েছেন জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশনে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

... at the time, I was admitted into the school, I did not know English alphabet—indeed I could not distinguish A from B, I never went to any other school, and that I got all my education in the General Assembly's Institution alone.

আর বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রায় একমাস পরেই তিনি ডাফ সাহেবকে খুব কাছে থেকে দেখতে পান।

উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীসেনগুপ্তের পরিবেশিত তথ্য বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসার শেষ নেই, আর সব সময়েই এ ব্যাপারে মূল পুস্তক পড়ে ঘটনা জানা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ সময়ই ইদানীং কালের প্রবন্ধ-পুস্তকাদি পড়ে জিজ্ঞাসার সমাধান করতে হয়। তাই প্রবন্ধাদিতে তথ্য যত সামান্যই হোক না কেন, তার বিকৃতি না ঘটাই বাঞ্ছনীয়। পাঠকজনের জ্ঞাতার্থে লাল-বিহারীর পুস্তকটিরও বিশদ বিবরণ দিয়ে দিলাম যা একটি আকর গ্রন্থ বিশেষ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের উপর।

Recollections of Alexander Duff D.D. Rev. Lal Bihari Day — Published by T. Nelson & Sons, London — 1879.

পীযূষকান্তি রায়

বোকারো স্টিল সিটি।

মানুষ পাথর

সমরজিৎ করের 'মানুষ পাথর'-এর জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।

সমরজিৎবাবু ২৬ আগস্ট সংখ্যায় লিখেছেন—'হঠাৎ একটি বড় রকমের সমস্যা দেখা দিল। জলাধার দুটি যে যে জায়গায় তৈরী হচ্ছে......কুণ্ডের নিচে রয়েছে অজস্র ফাটল।......সিংক হোল। ......এসব জায়গায় কঠিন গ্র্যানাইটের পরিবর্তে ছড়িয়ে রয়েছে চুনাপাথরের স্তর।' এ সমস্যাটা হঠাৎ দেখা দেবার কথা নয়। এই কর্পিলি সম্পর্কিত প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী এবং নকশার কাজ করেছেন সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার কমিশন। বছর দশবারো কথা তখনই যেসব অফিসাররা কাজটা করেন তাঁরাই বরাক প্রজেক্টেরও কাজ করছিলেন। তাদের কাছেই শুনেছিলাম কর্পিলির ওই চুনাপাথরের স্তরের কথা এবং জলের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া

কাশি স্তব্ধ

গ্লাইকোডিন কাশি স্তব্ধ করতে ভারতের সেরা ওষুধ।

everest/78/ACW/236-bn

করেছিলেন। বিকল্প জায়গা অনুসন্ধান করে একই চুনাপাথরের স্তর পেয়েছিলেন। যার জন্যে ওদের মতে কাঁপলি প্রকল্প রূপায়ণে হাত দেওয়াটা সমীচীন হবে না বলেও মন্তব্য করতে শুনেছি। কিন্তু, বরাক প্রজেক্ট সম্পর্কে তাঁদের অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য সম্পূর্ণ অনুকূল এ সব তথ্য প্রজেক্ট রিপোর্টে উল্লেখিত থাকার কথা। তবুও বরাক প্রজেক্টের নামগন্ধও নেই। কাঁপলির কাজ চলছে।

কয়েকটি ত্রুটির কথা না লিখে পারছি না। যেমন :

(১) ২২ জুলাই সংখ্যায় একটি ছবির নীচে লেখা : 'প্রস্তরাত্মক যুগে পূর্বাঞ্চলে দাঁতাল হাতিরা বাস করতো। দাঁতালরা এখনো আছে। অন্য কোনো প্রমাণে না গিয়ে ২৬ আগস্ট সংখ্যার ৩৮ পৃষ্ঠার ছবিটির উল্লেখ করবো। যার নীচে লেখা আছে—'অতিথিদের পিঠে করে কাজিরাংগা ঘুরিয়ে এনে বিশ্রাম করছে' যে হাতিটি সেটিও দাঁতাল।

(২) ৫ আগস্ট সংখ্যায় ৩৫ পৃষ্ঠায় ছবি—'খাসি পাহাড়ে অনেক মেয়ে এখন নিজেরাই সুতো কেটে নিজেদের কাপড় তৈরী করে।' এটা কেবলই খাসি পাহাড়ে নয়। সব ট্রাইবদের মধ্যেই বিলীয়মান হলেও অভ্যাসটি রয়েছে। কিন্তু কথা হল ছবির মহিলাটি কি খাসি? পরিচ্ছদ এবং আভরণ বলছে মহিলাটি নাগাদের সগোত্রীয়। তিরাপ বা তুয়েনসাং এলাকার।

(৩) ২৯ জুলাইর সংখ্যায় কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠায় ছবি—'অরুণাচলের নিশি সম্প্রদায়ের লোক'...। ওই নিশি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা আজও কোথাও পাইনি। চেহারা এবং মাথায় চুলের বিন্যাস ও কাঠি গোঁজার ধরনে মনে হয় লোকটি সুবনসিরির আপা-তানিদের সবংশ। নিশি কি নতুন নামকরণ। মিরি, মিজি, মিশিং, মিশমি আছে আরও অসংখ্য উপজাতির মধ্যে। কিন্তু নিশি খুঁজে পাচ্ছি না। ২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ৩৬ পৃষ্ঠার ছবিটি সম্পর্কেও একই জিজ্ঞাসা। নিশি কেন। ও তো আপাতানী।

জিষ্ণু চন্দ
শিলচর-১

কারপভ কত প্রতিভাধর

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সংখ্যায় 'মুকুল' বিরচিত 'কারপভ দেখালেন তিনি কত প্রতিভাধর' রচনাটি উপভোগ্য। দাবা খেলায় কারপভের প্রতিভা এবং বৈশিষ্ট্য তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন—তবে তাঁর অন্তত দুটি বক্তব্য সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ আছে। প্রথমটিকে আমি তথ্যগত ভুল বলেই উল্লেখ করবো। ফিলিপাইনসের ব্যাগুইওসিটিতে এবারে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ দাবা খেলার পঞ্চম গেমটিতে কারপভ, দাবা বিশারদদের বিভ্রান্ত করা তাঁর ৪২ নম্বর 'সিল' করা চালে প্রায় নিশ্চিত হার এড়াতে পেরেছিলেন—মুকুল এই কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য তার বিপরীত। কারপভ ঐ চালে দাবা অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু তাঁকে হার এড়াতে প্রবল সাহায্য করেন তাঁরই 'চ্যালেঞ্জার' ভিকটর করশনয়। '৫৫ নম্বর চালে' ভুল করে করশনয়ের গজের অপ্রত্যাশিত ভুল কিস্তিই কারপভকে ঐ খেলায় নিশ্চিত হারের হাত থেকে বাঁচালো এবং কারপভ দীর্ঘ 'বারো ঘণ্টা পনেরো মিনিট' এবং '১২৪ চালের সংগ্রামের পথে' খেলাটিকে টেনে নিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন। কাজেই বলা যায় পঞ্চম গেমটি যেমন, "দাবা ইতিহাসের এক অভাবনীয় সংগ্রাম" তেমনি দাবা ইতিহাসের এক অভাবনীয় প্রমাদ।'

ফিসার সম্বন্ধে মুকুলের বক্তব্য সে অর্থে তথ্যগত ভুল না হলেও ফিসার সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কিছুটা অকরুণ। ১৯৭২ সালে রেকজাভিকে ফিসার স্প্যাসকির "মনের উপর চাপ" সৃষ্টি করেছিলেন বটে—কিন্তু স্প্যাসকি সেই চাপ সহ্য করতে না পেরেই এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত হেরে যান'—এই বক্তব্যও বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিক ফিসার একমাত্র দাবার টেবিলেই কেন্দ্রমুখী; তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও স্বীকার করেন যে তিনি সেক্ষেত্রে ক্লাসিক শৃংখলার পক্ষপাতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে না তাকিয়ে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে খেলেন। খেলার আগে ফিসারের স্বভাবসিদ্ধ ঐসব স্নায়ুযুদ্ধ ঘটানোর ফলে তাঁর নিজেরও কম ক্ষতি হয়নি। প্রথম 'গেম' হেরে গিয়েছিলেন 'ড্র' মেনে না নেবার মারাত্মক জেদ নিয়ে। তুচ্ছ কারণে 'দ্বিতীয় গেম' স্প্যাসকিকে 'ওয়াকওভার' দিলেন—আর 'তৃতীয় গেম' কালো ঘুঁটি নিয়ে খেললেন—তাঁর জীবনের সবশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে—যাঁর সঙ্গে ইতিপূর্বে 'কালো ঘুঁটি' নিয়ে তিনি এমনকি 'ড্র' পর্যন্ত করতে পারেননি। কিন্তু রক্ষণমূলক খেলার পরিবর্তে সেই খেলার প্রথম থেকেই তাঁর আক্রমণাত্মক চাল এবং প্রায় ঐন্দ্রজালিক সাফল্য দেখে—রাশিয়ার পত্র-পত্রিকাও তাঁকে উল্লেখ করলো 'ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বী' রূপে। প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা যায়—১৯৭২ সালে রেকজাভিকে ফিসার-স্প্যাসকির দাবা ম্যাচগুলি বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচগুলির তুলনায় অনেক বেশি ছন্দে লয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো—এমন কি 'ড্র' ম্যাচগুলির মধ্যেও ছিলো গতিবেগসম্পন্ন নাটকীয়তা কারণ উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীই জেতার প্রবল আগ্রহ নিয়ে খেলেছিলেন—পক্ষান্তরে এবারে কারপভ এবং করশনয় উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেই জেতার চাইতেও 'যেন তেন প্রকারেণ' ড্র করার দিকেই আগ্রহ বেশি—সেজন্যে এবারে উভয়ের অধিকাংশ খেলাই মাথাভিরানার স্তর অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় বর্ধমান

বঙ্গভুক্তি প্রসঙ্গে

প্রশ্নের [illegible]

প্রাক্তন এম পি ভজহরি মাহাত মহাশয়ের 'বঙ্গভুক্তি প্রসঙ্গে' (৫ই নভেম্বর ১৯৭৭) এবং মিহির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি (১৯শে আগস্ট) পড়বার সুযোগ হয়েছে। অতুলাবাবু, শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের চিঠির জবাবে যে উত্তর দিয়েছেন তা আমার কাছে বিস্ময়কর। আমি নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে এবং পুরুলিয়া জেলার 'মাহাতো' সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করার জন্য বহু তথ্যের সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করছি। আমার প্রশ্ন নিম্নরূপ :

১. ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গে'র সময় বৃহত্তর বাংলা প্রদেশের দ্বিখণ্ডিত হবার কালে 'মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগনার' কথা কীভাবে উঠে। ১৯১২ সালে বিহার-উড়িষ্যা পৃথক রাজ্য হলে ঐ আদিবাসী ও চাষী অধ্যুষিত এলাকাগুলি কেন বিহারের সঙ্গে যুক্ত হলো?

২. ঘোষ, বোস, মিত্তির বাড়ুজ্জে, চাটুজ্জে বা দাশগুপ্ত বাবুরা তখন এই বিস্তীর্ণ এলাকায় 'এলাইট'। এরাই তখন দেশজ ও মূলবাসীদের প্রবক্তা। কারণ খৃষ্টানধর্মে ধর্মান্তরিত আদিবাসী ছাড়া তখনও মধ্যবিত্ত জীবন যাপনে এরা অভ্যস্ত হয়নি। উপরোক্ত 'বাবু' সম্প্রদায়, যাঁরা প্রায় সকলেই জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁরাই কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ পার্টি'তে যোগদান করেন এবং পরে কংগ্রেসী আন্দোলনে সক্রিয় হন। তৎকালীন এই উচ্চবিত্ত ও উচ্চজাতির লোকেদের সঙ্গে পঞ্চকোট, কাতরাস, বলভূম, বরভূম, পাতকুম ইত্যাদি দেশীয় সামন্তদের সম্পর্ক কি ছিল?

৩. খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে যখন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি তীব্রতর হতে আরম্ভ করেছিলো, তখন কি কি কারণে তা ভেঙ্গে গেলো এবং মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিতে 'হিন্দু-মহাসভা' ও 'আর্য্য সমাজের' উচ্চবর্ণের নেতারা আদিবাসী এলাকাতে ঝড়ের বেগে সকলেই দ্বিজ বা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার করেছিলেন কেন?

৪. ১৯৩০ সালে মানভূম জেলার ঝালদা থানাতে রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বেদীতে শহীদ হয়ে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মানভূমবাসী গোকুল মাহাতো এবং অন্যান্যরা। এর পর পুরুলিয়াতে কি এমন ঘটনা ঘটলো যে সরকারের 'আদিবাসী' তালিকা থেকে ১৯৩১ সালে 'মাহাতোরা' বাদ পড়লো, আর বাদ পড়লো আসামের 'কাছাড়ী' উপজাতি?

৫. বিহার-উড়িষ্যা পৃথকীকরণ নিয়ে ওড্যানেল কমিটি যখন পাটনা, রাঁচী, পুরুলিয়া, তমলুক, কাঁথি ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন উৎকল সম্মিলনীর নেতা গোদাবরীশ মিশ্র উড়িষ্যার সামন্তদের সমর্থনে ও গোপবন্ধু দাসের সহযোগিতায় তমলুক সহ খড়্গপুর, দীঘা কাঁথি উড়িষ্যা প্রদেশের অংশ হিসাবে দাবি করেছিলেন। মেদিনীপুরের তথা বাংলার নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, নলিনীরঞ্জন সরকার দাবি করলেন মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা বাংলার অংশ হিসাবে। ময়ূরভঞ্জের প্রধানমন্ত্রী ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী এবং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ময়ূরভঞ্জকে কেন উড়িষ্যাতে যোগদান করতে [illegible] সেরাইকেলা, সাঁওতাল পরগনার উপর দাবি অটুট রাখলেন। কিন্তু যাদের বাসভূমি নিয়ে এতো বড় খেলা, সেই মাল, মাহাতো, সাঁওতাল, ভূমিজদের তখন কি অবস্থা ছিল?

৬. ১৯৫৫ সালে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি 'অনুগ্রহ নারায়ণ সিং লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বক্তৃতা দিলেও মাহাতো তথা অন্যান্য মানভূমবাসী সম্পর্কে নীরব রইলেন কেন? বিহারের জাতিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে মাহাতোরা ভূমিহার, রাজপুতদের ছায়া হয়ে থাকবে না এই আশঙ্কা কি শ্রীসিং করেছিলেন?

৮. বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ পাটনাতে 'অঘোর-কামিনী' হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করছেন যখন তখনই রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত বোকারো ইস্পাত কারখানার ব্লুপ্রিন্ট ভারত সরকার পেয়েছিলেন। যে কারখানা পুরুলিয়াতে স্থাপিত হবার কথা, তা কেন গিয়ে পৌঁছলো চাস শহর থেকে ৭।৮ মাইল দূরে? অন্যদিকে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের বন্যারোধ, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ডি ভি সি ও কংসাবতী পরিকল্পনা প্রস্তুত (এখন যেমন উড়িষ্যার বন্যারোধ ও বিহারের বিদ্যুৎ চাহিদা, এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুরকে বাঁচাবার জন্য পুরুলিয়াতে আপার কংসাবতী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে)। লোকসেবক সংঘের নেতৃত্ব কিংবা কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্থানীয় অধিবাসীদের এই সমস্ত ব্যাপারে যুক্ত হতে দেননি কেন?

৮. জামসেদপুরে ধান, চাল পৌঁছানো ও চাণ্ডিলে সুবর্ণরেখা পরিকল্পনার জন্য 'উদ্বৃত্ত শ্রমিক' ও 'অভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্য' জোগানের জন্য চাণ্ডিল-ইচাগড়, পটমদা বিহারে যুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে চাস-চন্দনকিয়ারীও তাই। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী (বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিক নহে) নিয়ে কেন সীমানা পুনর্গঠনের প্রশ্নটি তুলছেন না? পুরুলিয়াকে ঘিরে দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শালতোড়, আসানসোল, বার্ণপুর, রঘুনাথপুর, ধানবাদ, ঝরিয়া, কাতরাস বোকারো, হাটিয়া, মুরি রাঁচী, টাটা ঘাটশিলা, বাদুগোড়া, মুসাবনী, বাদাম-পাহাড়ের শিল্পাঞ্চল। আর মাইথন পাঞ্চেৎ সুবর্ণরেখা, কংসাবতী পরিকল্পনা—সব মিলিয়ে কয়েক শত হাজার কোটি টাকার লগ্নী। আর পুরুলিয়া সিংভূম, ধানবাদের কয়েক লক্ষ মূলবাসী মানুষ 'উদ্বৃত্ত শ্রমিক'। ১৮৮৪ সালে এরা ইনডেনচার লেবার হিসাবে আসামের চাবাগানে কুলি, হিসাবে কাজ করতে গিয়েছে। ১৮৭২, ১৮৮৪, ১৮৮৬ সালের দুর্ভিক্ষে এরা ময়ূরভঞ্জের গভীর জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু এবার এরা কোথায় যাবে?

পরিশেষে আবার জানাই যে এই সমস্ত প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে একজন সত্যানিষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক গবেষক হিসেবে, সুযোগ সন্ধানী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নয়।

প্রকাশিত হল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

সব-নতুন কাব্যগ্রন্থ

আজ সকালে

দাম ৫·০০
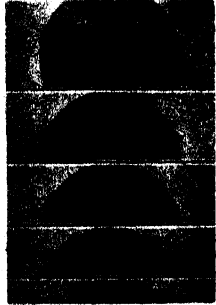
বিগত তিন দশকেরও বেশী কাল ধরে বাংলা কবিতায় যাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি এক লহমার জন্যও পাঠককে অমনস্ক হবার সুযোগ দেয় নি, নিয়ত সৃষ্টিশীল ও নিত্য পরিবর্তনশীল সেই কবির নাম নিঃসন্দেহে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রথম থেকেই তিনি আলাদা এবং বিশিষ্ট, প্রবল এবং নিজস্বতায় জ্যোতিষ্মান্। তাঁর কবিতার শব্দে-ছন্দে-মিলে-প্রকরণে-সুরে-ভাষায়-ভঙ্গিতে প্রথমাবধি এক প্রখর অনন্যতা। কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিমতার ধোঁয়াশায় কখনোই আচ্ছন্ন নয় নীরেন্দ্রনাথের কবিতা। তাঁর চিন্তা যেমন সুস্থির ও স্বচ্ছ, উচ্চারণও তেমনই যথার্থ ও সচ্ছল। কবিতায় নিজস্ব হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেখানোকেই তিনি শেষ কথা বলে মানেন না, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের পাশাপাশি সমসময় ও সমসমাজের একটি ব্যাখ্যাও একইসঙ্গে শুনিয়ে যান। যিনি কেবলই বদলে নেন নিজেকে, তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই নতুন তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়। 'আজ সকালে' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সব-নতুন কাব্যগ্রন্থ। এই কবিতাগ্রন্থও তাই 'এই যুগের সমাজের ব্যাখ্যাতা' ও 'এই দুঃস্থ দিবসের ভাষ্যকার' কবির গুণমুগ্ধ পাঠক-সাধারণের কাছে জরুরী এবং অপরিহার্য বলে গণ্য হবে।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

বুদ্ধদেব বসুর

কাব্যনাট্য-সংকলন

সংক্রান্তি প্রায়শ্চিত্ত ইক্ষ্বাকু সেন্নিন

দাম ৪·০০

এ বইয়ে তিনটি কাব্যনাট্য সংকলিত হয়েছে। প্রথম নাটক 'সংক্রান্তি'র উপাদান মহাভারতীয়, উপস্থাপনা গ্রীক ধরনের। দ্বিতীয় নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' ইয়েটস-এর একটি কাব্যনাটিকার অনুলিখন, সিপাহিবিদ্রোহের পটভূমিকায় স্থাপিত। শেষ নাটক 'ইক্ষ্বাকু সেন্নিন'-এর নায়ক ঋষ্যশৃঙ্গ॥

এই লেখকের অন্যান্য বই: অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ (নাটক) ৫·০০ পুনর্মিলন (নাটক) ৪·০০ বিপন্ন বিস্ময় (উপন্যাস) ৮·০০ কাল-সন্ধ্যা (নাটক) ৩·০০ কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক) ৬·০০ গোলাপ কেন কালো (উপন্যাস) ৫·০০

বিমল করের

নতুন উপন্যাস

এ আবরণ

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

কালকূটের

নতুন স্বাদের ভ্রমণোপন্যাস

শাম্ব দাম ৭·০০

কালকূটের এই নতুন ভ্রমণকাহিনীর স্বাদ যেমন অভিনব, পথ তেমনই গহন। এ-যাত্রা কাঁধে ঝোলা চাপিয়ে ঠেলাঠেলি করে রেলগাড়িতে যাওয়া নয়। এ-যাত্রাতেও তবু বাঁশি বাজে, নিশান ওড়ে। এই আমলের গার্ড-সাহেবের নিশান-বাঁশি সেটা নয়। এ-বাঁশি প্রাণের কোথায় যেন বাজে, দূরে ডাক দিয়ে ঘরের বাহির করে নিয়ে যায়।

নিশানটা চোখের সামনে ভাসে চিত্রের মতো। রৈবতক পর্বতের কৃষ্ণনীল মহীরুহের মাথা ছাড়িয়ে যেন পতপত করে ওড়ে সেই নিশান। সেই নিশান-বাঁশির ডাকে কালকূটের যাত্রা এবার পুরাণের পথে, দ্বারকা-নগরীতে। কৃষ্ণ সেখানে পার্শ্বচরিত্র। সেই ভ্রমণ কাহিনীর নায়ক কৃষ্ণতনয় শাম্ব। অসামান্য রূপবান বীর। কৃষ্ণের ষোলহাজার রমণী সেই নায়কের সঙ্গলাভে আকুল। পিতা কৃষ্ণের বিচিত্র অসূয়া তাই অভিশাপ হয়ে নেমে এল পুত্র শাম্বের জীবনে। সেই অভিশপ্ত জীবন থেকে কী করে মুক্ত হলেন শাম্ব—সেই অসামান্য কাহিনী শুনিয়েছেন কালকূট তাঁর এই নতুন ভ্রমণোপন্যাসে।

কালকূটের অন্যান্য উপন্যাসঃ

তুষার সিংহের পদতলে ৬·০০ অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ৮·০০ অমৃত বিষের পাত্রে ৮·০০ কোথায় পাবো তারে ৩৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

অনবদ্য প্রবন্ধগ্রন্থ

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

দাম ২·৫০

গত শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হয়েছিল, পক্ষান্তরে সেই আন্দোলন সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যও যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ একাধারে সেই জাতীয় ভাবধারার উত্তরাধিকারী এবং স্বয়ং বহুল পরিমাণে তার স্রষ্টা। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী এবং তাঁর সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনকে না বুঝলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যায় না, আবার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে না বুঝলে বাংলার জাতীয় আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনকেও সম্যক বোঝা যায় না। বর্তমান গ্রন্থ বাংলার জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম-প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনায় অনবদ্য॥

এই লেখকের অন্যান্য বই: প্রবন্ধ-সংগ্রহ ৫·০০ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪·০০ শ্রীগৌরাঙ্গ ৬·০০ লোকারণ্য (উপন্যাস) ৪·০০ ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

অম্লান দত্তের

চিন্তা-ঋদ্ধ আলোচনা-গ্রন্থ

পল্লী ও নগর

দাম ৩·০০
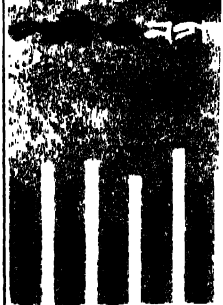
এ দেশে নগর ও পল্লীর ভিতর দূরত্ব অনেক বেশী। গ্রামে পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য, নগরের অসম ঐশ্বর্যের প্রভাবে যা আরও অসহনী[য়] মহানগরীতে বেড়ে চলেছে তাদের সংখ্যা, যারা একে ত্যাগ করতে পারে না অথ[চ] ঘৃণা করে। যেখানে বাস ক[রে] আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ, সেই অর্ধোন্নত দেশগুলিতে কি-সামাজিক, কি-সাংস্কৃতি[ক] কি-আর্থিক, যে-সব সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হ[য়ে] উঠছে তার মূলে আছে গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে[র] এক সামঞ্জস্যবিহীন সহাবস্থান। এদের ভিতর কোনো শর্তেই কি মৈত্রী সম্ভব নয়? মুখ্যত এই শর্তানুসন্ধানের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এই আলো[চনা] গ্রন্থের নাম-প্রবন্ধটি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি গভীর চিন্তাসম[ৃদ্ধ] প্রবন্ধ—যা নতুন করে অ[...] ফেলেছে কয়েকটি জরুরি ও মূল্যবান সমস্যার উপ[র]। এই-সব আলোচনার মধ্যে রয়েছে 'কর্মসংস্থান ও আর্থিক পুনর্গঠন', 'বা[...] সংকট ও কলকাতা', 'জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে', 'সত্যাসত্য', 'ধর্ম', 'কোন পথ', 'প্রেম ও নিয়ম' ও 'ইতিহাসচিন্তা।' লেখকে[র] সমাজদর্শনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত এই আলোচ[না] যুক্তি তথ্য ও যুক্তির, মনীষিতা ও মনোজ্ঞতার অনন্য উদাহরণ।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বর্ষ ৫২ সংখ্যা
১১ কার্তিক ১৩৮৫

চীপত্র

ছদ : গুলাম মহম্মদ শেখ
ছদশিল্পী পরিচিতি শেষ পৃষ্ঠায়

রবর্তী আকর্ষণ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
নন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
অলিতা রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
লকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
নন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
দ্রিত।
ম এক টাকা

সম্পাদকীয়

বয়স্ক নিরক্ষরের শিক্ষা

বয়স্ক নিরক্ষরের শিক্ষা ভারতের পক্ষে বস্তুত জাতীয় সৌষ্ঠবের আঙ্গিক সম্পূর্ণ করবার একটি অধ্যবসায়। হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহেনি কথা—কবির উক্তিটি ভারতের জাতীয় জীবনের একটি মূক বেদনার উক্তি হয়ে ধ্বনিত হতে পারে। ভারতের বিপুল পরিমাণের জনপ্রতিভার অবরুদ্ধ বেদনার উক্তি। কোটি-কোটি মানুষ নিজেরই ভাষায় লিখতে-পড়তে জানে না। এই অক্ষমতার যদি কোন তৌল করা সম্ভব হয় তবে সেটা হবে ভারতের জাতীয় প্রতিভার বিরাট এক বন্ধ্যাত্বের হিসাব। আবাদ করলে ফলতো সোনা, এ হেন গুণপ্রসূ এক বিরাট সম্বল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। একটি প্রশ্ন পণ্ডিত গবেষকদের দ্বারা বহু বিতর্কে বিচারিত হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, দেশে যদি জনসমষ্টির শতকরা দশজন অত্যন্ত ভাষাকুশল গুণী ও পণ্ডিত, এবং বাকি নব্বইজন নিতান্তই নিরক্ষর হয়, তবে সেই অবস্থাটা কি জনজীবনের পক্ষে নিতান্ত দীনহীন প্রকারের শিক্ষাগত অবস্থার প্রমাণ নয়? যুক্তি-তর্ক এক্ষেত্রে অনেক মুখরতা সৃষ্টি করেও শেষ পর্যন্ত সমাজতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার সত্যটিকেই স্বীকার করেছে। এটা জাতি ও জনতার পক্ষে অত্যন্ত নিম্নমানের শিক্ষিতত্বের পরিচয়, যদিও ওই শতকরা দশজন পণ্ডিত শিক্ষিতজনের মধ্যে দু'চারজন নিউটন থাকতে পারেন। ভারতীয় জনজীবনের শতযুগের একটি অভিশাপ হলো অধিকাংশজনের নিরক্ষরতা। জাতির সাংস্কৃতিক শক্তি ও সৌষ্ঠবের অনেক পুণ্য সৃষ্টি করেছেন অনেক মনস্বী। কিন্তু নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাবহুল অস্তিত্ব নিতান্ত পিছন-টান হয়ে সমগ্রভাবে জাতির মানসিক শক্তি ও প্রতিভার বিরাট হানি সম্ভব করেছে।

যাকে বলে লিখন-পঠন ক্ষমতা, এমনকি যেটা ন্যূনতম সাক্ষরতা, সেটা জাতীয় প্রতিভার সমষ্টি বিকাশের পক্ষে একটি প্রধান সহায়। আকবর, শিবাজী ও রণজিৎ সিং-এর নাম উল্লেখ করে কোন-কোন সমালোচক ব্যক্তিকে এই ধরণের সত্যতা প্রতিপাদিত করতে দেখা গিয়েছে যে, এঁরা নিরক্ষর হয়েও জ্ঞানে গুণে ও বুদ্ধিতে সাধারণের তুলনায় অতীব উচ্চমানের কৃতী। ঠিক কথা। কিন্তু এটা তো সত্য নয় যে, নিরক্ষর ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞানে গুণে ও বুদ্ধিতে শিবাজী-আকবর হয়ে যান। আকবর-শিবাজীর গুণ জাতির গুণ হয়ে কীর্তি প্রকাশ করেনি। এটা উচ্চমানের নেতৃত্বের গুণ। জাতির প্রত্যেক জনের পক্ষে উচ্চমানের নেতৃত্বের গুণ লাভ করা জাতির আদর্শিক প্রয়োজন নয়, জাতির জীবনচর্যার বাস্তব সম্বল নয়। তুলনা করে বলা চলে, সামান্য সাক্ষরতায় শিক্ষিত কয়েক লক্ষ সাধারণজন যেন কয়েক লক্ষ মৃৎপ্রদীপ, যার আলোকের বিস্তার সুদূরের বক্ষ স্পর্শ করতে পারে। এবং দশটি বেলোয়ারী ঝাড়বাতি নিতান্ত সীমায়িত স্থানের উপর প্রবল উজ্জ্বলতা সম্পাতিত করতে পারে।

দেশের সরকার নতুন করে বয়স্কের সাক্ষরতা বিধানের যে বিরাট পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তার শুভ উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। এহেন পরিকল্পনা ও উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ মৃৎ-প্রদীপের সাক্ষরিক আলোকের ব্রত বলে অভিহিত হতে পারে। পরিকল্পনার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়-সীমার স্বীকৃতি জনজীবনের পক্ষে আশান্বিত হবার একটি প্রধান হেতু। বিশেষ প্রকারে প্রশিক্ষিত হাজার-হাজার ব্যক্তি বয়স্কের সাক্ষরতা সৃষ্টির কর্তব্যে নিযুক্ত হবেন। এই অঙ্গীকারও পরিকল্পনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। উচ্চমানের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন যথাযোগ্য ও গুণী শিক্ষকের নিয়োগ বিহিত আছে, বয়স্ক নিরক্ষরের শিক্ষা পরিচালিত করবার প্রয়োজনেও তেমনই পদ্ধতি সম্বন্ধে যথাযোগ্য প্রশিক্ষিত ব্যক্তির নিয়োগ সম্ভাবিত করবার প্রথা চাই। কারণ, এক্ষেত্রেও শিক্ষার বিধান সুনিয়ন্ত্রিত না হলে সফলতার সহজ সম্ভাবনা বিঘ্নিত হবে। গৃহীত পরিকল্পনা এবং ঔদ্যোগী রীতি-নীতির মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু সেজন্য এহেন এক শুভংষু উদ্দেশ্যের গুরুত্বকে ছোট করে দেখবার কোন অর্থ হয় না। দলীয় রাজনীতির মতে ও মতবাদে প্রভাবিত ব্যক্তির পক্ষেও প্রসন্ন ও আশান্বিত হবার প্রয়োজন আছে; কারণ এই উদ্যোগের সার্থকতা 'সবার পরশে পবিত্র করা' তীর্থনীরের মতো সকলজনের ও সকলমনের সমর্থনে মর্যাদান্বিত হবার মতো একটি কল্যাণ। বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, ভারতের বৃহত্তর সমষ্টিজনের সকলের পক্ষে সাক্ষরতায় শিক্ষিত হওয়া একটি অভিনব ঐতিহাসিক সৌভাগ্যের ঘটনা। অতীতে কোনকালেই ভারতের জনজীবন এই মর্যাদার অভিষেক পায়নি। দেশে উচ্চশিক্ষা বিহিত করতে কুণ্ঠিত হয়নি যে বিদেশীয় ইংরেজ শাসক, সেও কিন্তু ব্যাপক জনশিক্ষা, বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষা প্রচলিত করতে বেশ শক্ত রকমের একটি কুণ্ঠার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। যে শিক্ষায় ভারতীয় জাতি মানসিক যোগ্যতায় এবং প্রতিভায় যথার্থ বলশালী হবে, সেটা বিদেশীয় শাসকের কোন মমতার সমর্থন পেতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় একত্রিশ বছরের স্বাধীন ভারতের সরকারী আচরণে বয়স্ক নিরক্ষরের শিক্ষা প্রশস্ত প্রকারে নিষ্পন্ন করবার তেমন-কোন আন্তরিক আগ্রহের জাগৃতি দেখতে পাওয়া যায়নি। উদ্যোগের প্রতি শুভেচ্ছার ঘোষণা এবং সাফল্যের কামনা করেই একটি সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করা যায়। কোন পরিকল্পনাকে নিছক শুভবুদ্ধির ঘোষণার দ্বারা সফলায়িত করা সম্ভব নয়। [illegible]

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

বরাহতন্ত্র

কি বললেন?

আজ্ঞে 'এখন নয়, তিনের বেশি কখনও নয়', হলদের ওপর লালে লেখা।

লেখা তো আপনারই বা কি আর আমারই বা কি! সরকারের পয়সা আছে লিখছে। লিখেছে বলেই মানতে হবে? সে তো প্রথম ভাগেও লেখা ছিল—সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ কাহাকেও কুবাক্য বলিবে না। শুনেছেন সে কথা! বুড়ো হয়ে তো মরতে চললেন!

এ বাক্যটা যে না মেনে উপায় নেই! একটি শিশু প্রতিপালনের খরচ জানেন! একটি শিশুর আগমনের হ্যাপা জানেন!

হ্যাপাটা কি জিনিস! এ আবার কোথাকার ভাষা!

এ যুগের ভাষা স্যার। ছেলের মুখ থেকে শিখেছি।

এই পি-এ, কাগজ লাও। ফিনানস তো খুব বাজেট দেখায়! দেখি এই মধ্যবিত্ত মানুষটির মুখ থেকে

বোকচন্দর, হাঁসের পেটি, পানজর্দা, নাকস তোমকা, টিফিন বকস, সহজপাঠ আলুপেঁয়াজ যার ব্যাগে মহাবন্ধন করে তিনি মধ্যবিত্ত

মানুষের খরচের একটা বাস্তব হিসেব নাও। নিন বলুন।

আজ্ঞে, কনসেপসান। মানে যেদিন তিনি সেই দুঃসংবাদটি দিলেন—ওহে মনে হচ্ছে থার্ড পার্সন ইজ কামিং সেই দিনই জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাঁক পাড়লুম—রিকশা। চালাও ডাক্তারখানা। আস্তে চালিও ভাই। ভাড়া এক টাকা প্লাস এক টাকা।

লেখো। প্রথমদিন ভাড়া বাবদ দু-টাকা। উঁহু আলাদা কলাম কর, আলাদা হেড। এতকাল বাজেট দেখছ, কিভাবে একসপেনডিচার হেড অনুসারে সাজাতে হয় জানো না? হ্যাঁ—দু-টাকা। বলুন তারপর।

ডাক্তারের ফী চার টাকা। এটা স্রেফ ফালতু। গম্ভীর মুখে বললেন—আমি হলুম গে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ডাক্তার। জন্ম দেবার ডাক্তার আলাদা, চলে যান সেখানে। রেশনকার্ডের মত একটি কার্ড করিয়ে রাখুন সময় থাকতে থাকতেই, তা না হলে শেষ মুহূর্তে বেগ যখন প্রবল হবে বউ ঘাড়ে করে মহাদেবের মত ঘুরে মরতে হবে। কেউ স্থান দেবে না। হাঁসের মত পুকুর পাড়ে ডিম পাড়তে হবে। তখন...লীড়ান। লেখো চার

কোলজিস্টের কাছে। ট্যাকসি যাওয়া আসা সাত টাকা প্লাস সাত টাকা ইজকলটু চোদ্দ।

লেখো চোদ্দ।

ডাক্তারের ফী বত্রিশ টাকা।

লেখো বত্রিশ।

ওষুধ হল গে, আয়রন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটীন গুঁড়ো, সব মিলিয়ে প্রথম চোটেই আটচল্লিশ টাকা।

লেখো ওষুধ—আটচল্লিশ।

এইবার হল গে পথ্য। হে হে বাবা যে কলে মানুষ আসে তার গ্যাড়াকল অনেক। নিজে যখন জন্মেছিলুম তখন কি আর বুঝেছিলুম কত ধানে কত চাল!

বলুন পথ্য—ডেলি হিসেব দিন।

সকালে মুরগীর ডিম, মাখন রুটি, দুধ। দুপুরে সরু চালের ভাত, আপনার রেশনের চালের ভাত জন্মেও চলে না, প্রান্তেও চলে না। বেশ বড় এক দাগা মাছ। প্লেইনটি অফ ভেজিটেবলস। ফের এগেন দুধ।

ফের এগেনটা কি।

ডবল বিশেষণ স্যার। ফের আবার দুধ? বিকেলে ছানা, বেশ বড় একটি তাল, চিনি দিয়ে মাখো মাখো।

একটি পালিশ করা আপেল। রাতে বেশ খসখসে গরম গরম ফুলকো আটার রুটি, পাতলা করে মাংসের স্ট্যু। বিশ্বাস করুন মাঝে মাঝে নিজেরই মা হতে ইচ্ছে করে!

একদম অসভ্যতা করবে না। একটি মিথ্যে কথাও বলবে না। সাপ্রেশান অর একজাজারেশান অফ ফ্যাক্টের দায়ে পড়বে। মাইন্ড ইট। কোনও মধ্যবিত্ত অত সব করে না। এসব বড়লোকের ব্যাপার। আমরা করতে পারি, ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররা করতে পারে, ওয়াগন ব্রেকাররা করতে পারে। সাধারণ মানুষ, যাদের নিয়ে এই ডেমোক্রেসি, তারা এসব করে না। একে বলে আদিখ্যেতা।

করে স্যার। প্রথম প্রথম নববধূর জন্য একটা আদিখ্যেতা সব স্বামীরই থাকে। নতুন নতুন সাইকেল চালানো, সিগারেট কি মদ খাওয়া, নতুন বাবা হওয়ার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি থাকেই। একটা নেশা। আট পাউন্ড মিনিমাম ওজন হওয়া চাই, ওই দুধের টিনের গায়ে আঁকা শিশুর মত। বলা যায় না কে এসে পড়ে। স্যার সুরেন বাঁড়ুজ্যে এ নেশান ইন দি মেকিং-এ লিখেছিলেন না—কে বলতে পারে সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে হয়তো হঠাৎ আবার দ্বিতীয় চৈতন্য দুম করে কোথাও জন্মে যাবেন। ওই প্রথমটার ব্যাপারেই একটু মেনেটেনে চলা। স্বপন-টপন দ্যাখা। তারপরই ওই ট্যাঁ আর ভ্যাঁ শুনতে শুনতে, গ্যাটের কড়ি গুনতে গুনতে স্ত্রী হয় বউ, বউ হয় গিন্নী, ছেলেমেয়েরা হয়ে যায়

হবে রাজভক্ত, জাঁকজমকের মার্কস, আর আদিখ্যেতার

পেটের শত্রুর, তখন আর ওসব নেই—যো আয়েগা আউক, যো যায়েগা যাউক।

কী হয়?

যো যায়েগা যাউক। যো আয়েগা আউক। হ্যাঁ স্যার—যো যায়েগা যাউক...খরচের চুল চেরা হিসেব থাক স্যার। মিথ্যে বলব না—বেশ খরচ। মানে চাকরির পয়সায় ছেলে হয় না, ঘুসটুস চাই স্যার। কলকাতার রাস্তার হলাগাড়ি না বের করলে বাপ হওয়ার খরচ ওঠে না। মেয়েদের কাছে প্রথম মা হবার অভিজ্ঞতা বড় আনন্দের। ছেলেদের কাছে আতঙ্কের। কত আতঙ্কে যে ছেলেরা বাপ হয়। আর বাপ হয়ে যে কত আতঙ্কে থাকে।

পি-এ। মার্ক ইট। এই হল মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য। সামলে থাকতেও পারে না, বেসামাল হয়েও সুখ পায় না। কই ফুটপাথের মানুষরা তো অত ভয়ে মরে না। মানুষে আর শুয়োরে, আই মিন ভারতবর্ষের মানুষে ও শুয়োরে তফাত থাকবে কেন! আমাদের সারি তোমাদের পুরাণে বলছে বরাহ হল অবতার। অবতারের কায়দায় বাঁচতে শেখো। আমি একটু ছোট্ট মত বক্তৃতা দিয়ে দেখি—ভীষণ ভাব এসে গেছে:

এই ভারতবর্ষে সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা, রাজ-

সিগারেট থাকলে দেশলাই থাকবে না—মধ্যবিত্তের লক্ষণ

নীতি, সমাজনীতির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকবে কারা। রাবিশ মধ্যবিত্তরা নয়, চোরিশঙ বড়লোক কী ব্যবসাদাররা নয়। বার্ডস অফ প্যারাডাইসরা কেন লোপাট হয়ে যেতে বসেছে! সারা পৃথিবী জুড়ে শৌখিন প্রাণীরা কেন আজ ধীর অবলুপ্তির পথে। তার কারণ রুচি নিয়ে, আভিজাত্য নিয়ে মধ্যযুগে বাঁচা সম্ভব হলেও, আধুনিক যুগে বাঁচা যায় না। এ যুগে বাঁচার টেকনিক আলাদা। এ হল শোরের যুগ। জেনুইন শুয়োরের বাচ্চা না হলেই মরতে হবে: শুয়োরেরা—এখন নয়, তিনের বেশি কখনই নয়'-তে কান দেয়নি, তারা এক একবারে সাতটা আটটার কম নামায় না। পাঁকের মধ্যে পরমানন্দে থাকে। জঞ্জাল দেখলে কাগজে প্রবন্ধ লেখে না, করপোরেশানের সামনে গিয়ে হল্লা করে না। মধ্যবিত্ত ভাই সব তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো শুকর হয়ে যাও। আমরা বিদ্যুৎ সাপ্লাই করতে পারিনি, আমরা ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে পারিনি, কিন্তু আমরা পরিবেশ সাপ্লাই করতে পেরেছি। নর্দমার পাঁক কত চাই! ম্যান-হোল থেকে তুলে তুলে আমরা রাস্তার পাশেপাশে ডাঁই করে রেখেছি। সব রাস্তা আর ফুটপাথ খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়ো কাদা তৈরি করে রেখেছি। অফুরন্ত জঞ্জালের ঢিবি চারদিকে। খুঁটে খেতে চাও খাও। শুকর হবে

পরিবেশ তৈরির এই প্রয়াস দেখে চটাপট

শুয়োরের জন্ম নার্সিং হোমে হয় না, হয় নর্দমায়। শুয়োর-শাবক বেবীফুড খায় না। শুয়োর-জনক প্রি-ন্যাটাল কেয়ার, পোস্ট-ন্যাটাল কেয়ার কেন্দ্রে পড়ে না। পড়ে না বলেই তারা নির্ভীক ফ্যামিলি ম্যান। নিরাশ হবার কিছু নেই। আমি বিশ্বাস করি চেষ্টায় মানুষ সব পারে। ঘুমিয়ে আছে শুয়োরতনয় সব মানুষের অন্তরে। তাকে জাগাও, জাগিয়ে তোলো। আমরা এই বরাহ-চন্দ্রকে সর্বতোভাবে মদত-দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, আরও হবে। অর্থের কৃপণতা আমরা করব না। সারা দেশটাকে আমরা শুকর বাসের উপযোগী করে তুলবই। আমাদের দাবি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র নয়। ওসব একটা বড় রকমের ধাপ্পা। আমাদের দাবি বরাহতন্ত্র। লেড়কা লোক এক দফে তালি বাজাও। উঃ অনেকদিন এরকম বক্তৃতা দিইনি। মডেল স্পিচ। যেমন ভাষা, তেমন বাচনভঙ্গী, তেমন বক্তব্য বস্তু! কি বল পি-এ সাহেব?

আমরা থ মেরে গেছি স্যার। কী ওয়ান্ডারফুল অ্যাপ্রোচ!

তারপর বী.কলাল ভয়ে ভয়ে তোমার এখনটাই ...ল। হয়েই যখন গেল তখন আর ভয়টা কিসের।

না স্যার, সবটাতো শুনলেন না। লেগে তো গেল তারপর! শুরু হল ভাবনা—ছেলে হবে না মেয়ে! যদি মেয়ে হয়!

মেয়ে হয় তো কি হয়! মেয়েও তো মানুষ রে বাবা। মেয়েমানুষ।

না, মানুষ তো বটেই তবে কিনা লোকসানের কারবার! খাইয়ে দাইয়ে বড়টি করে, গলায় কম করে তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বেঁধে তুলে দিয়ে এস পরের ঘরে। মেয়ের বাপ হল ট্রাস্টী। পরের সম্পত্তি আগলে বসে থাকো। শুধু তাই নয়—মেয়ে না হয় হল, এখন কার মত দেখতে হবে! বাপের মত না মায়ের মত! মায়ের মুখ আর বাপের রঙ নিয়ে যদি আসে—চক্ষু চড়ক গাছ। আবার যদি পুরোটাই বাপের মত হয় তাহলে আরো পাঁচ হাজার টাকা বেশী ধরে দিতে হবে—ময়লা রঙের খেসারত।

নিজে যখন বিয়ে করেছিলেন, দেখে করেননি?

আমাদের সময় অত দেখাদেখি ছিল কী। দেখা হল সেই পিঁড়েতে বসে, চাদরের তলায়। ড্যাবরা ড্যাবরা, বোকা বোকা, মাছের মত চোখ। নাকটা দেখে মনে হল আহা পকেটে যদি একটা সাঁড়াশি থাকত। ঠোঁট দুটো

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দরজায় বাঁধা ধর্না দেন—তাঁরা মধ্যবিত্ত

মধ্যবিত্ত সবচেয়ে নিলর্জ্জ জামাই ষষ্ঠীর দিন

দেখে মনে হল, পান-দোক্তা বা জমবে না! বুলি বা ছুটবে না।

তাহলে দোষটা কার! ম্যাচ মেকারদের, না আপনার নিষ্ক্রিয়তার?

দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

যাক্গে, দুঃখ করে আর কি হবে। রঙটা ফর্সা তো!

তেমন ফরসা আর কই। খুব ফরসা হলে আমার কালোর সঙ্গে মিশে ছেলে মেয়েদের রঙ মোটামুটি একটা ব্লু ব্ল্যাক মত দাঁড়াত! যাক সে যা হয় হবে বলে আর এক ভাবনা নিয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ করে বসলুম।

কখন বসলেন? না রোজই বসেন!

আমি অতীতের কথা বলছি স্যার। স্ত্রীর যখন ছ-মাস—শুয়ে আছেন খাটে ডিমঅলা ট্যাংরা মাছের মত। মাথার কাছে টেবিলে ওষুধ-বিষুধ। আমার হাতে ফেয়ারী চাইলডের অ্যাডমিসান টেস্টের প্রশ্নোত্তর।

ফেয়ারী চাইলডটা কী?

বিখ্যাত স্কুল স্যার। ছেলে, মেয়ে জন্মাবার আগেই যেখানে অ্যাডমিশনের জন্যে নাম লেখাতে হয় তারপর তিন দিন ধরে পরীক্ষা। সেই জন্যে সময় নষ্ট না করে, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, গর্ভস্থ সন্তানকে শেখাতে থাকি—বলো বলো বাচ্চে, ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্টের নাম, প্রাইম মিনিস্টারের নাম। দেশ স্বাধীন হয়েছিল কবে? প্রজাতন্ত্র কাকে বলে? ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কোন সালে হয়েছিল!

এটা আপনাদের বাড়াবাড়ি মশাই। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ!

মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। এটা মহাভারতের শিক্ষা। অভিমন্যু কুরুক্ষেত্রের কৌশল গর্ভে বসেই শিখেছিল। মা ঘুমিয়ে না পড়লে বেরিয়ে আসার কৌশলটাও শিখে ফেলত। ছেলে তো স্যার দুম করে জন্মেই চীৎকার করে জানিয়ে দিলে—স্টার ইজ বর্ন। একে ধর ওকে ধর। এর পায়ে তেল ওর পায়ে তেল। ছেলে ভর্তি করার যে যন্ত্রণা স্যার। আপনার সন্তান না হলে বুঝবেন না।

কোনও ধারণা নেই আপনার! দেশের ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন হল মন্ত্রীরা। ছেলেবেলায় রূপকথার গল্প পড়েননি—মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র। আর কোনো পুত্রের উল্লেখ ছিল কি! ছিল না। সেই এক সিসটেম চলে আসছে। চলছে, চলবে। চলবে, চলছে।

স্প্রিংটা কম জোর স্যার। এখুনি চিৎপাত হয়ে পড়বেন।

...চেয়ার মেরামত করে দিয়ে যাও। কত সুখ আমাদের দেশে। স্কুল আমাদের ছেলেদের জন্যে, কলেজ আমাদের ছেলেদের জন্যে, হাসপাতালের ভাল কেবিন আমাদের জন্যে, রাস্তা আমাদের জন্যে। দেশ হামারা হিন্দুস্তানী—আ—আ। আমি কি তুমি হে যে ছেলেমেয়ে নিয়ে ভেবে মরব?

আমাদের বড় চিন্তা স্যার। যখন সব এটুকু এটুকু ছিল আধ গজে জামা হত। প্যান্ট হত। এখন সব এত বড় বড় হয়ে গেছে। ফুল তিন মিটার লাগছে একটা ফ্রকে। এর পর যখন শাড়িতে প্রোমোশন পাবে উরে বাবারে! তিন প্যাকেট সিগারেট, দেড় প্যাকেটে নেমেছে। বউ বলছে আর একটা এলেই আধ প্যাকেটে নামাতে হবে। তিন কাপ চা'র এক কাপ কেটে দিয়েছে। দুধ এক সের থেকে এক পো করেছে। ড্রাইং ক্লিনিং বন্ধ করে দিয়েছে। রোববার রোববার কাপড় কাচিয়ে নিচ্ছে। কতদিন যে স্যার মার্বাড়ি দিয়ে ফুলকো ফুলকো লুচি খাইনি! বেশ জম্পেস করে সরু চালের ভাত আর মাংস।

আরে এর দেখি বেশ পেটের জোর আছে হে! অম্বল নেই! অ্যামিবায়োসিস জিয়ার্ডিয়াসিস নেই? কোলাইটিস নেই?

আছে আছে সব আছে! রাতে নো মিল। সকালে জলের মত ঝোল ভাত। পকেটে সেই থামা দেবার বড়ি। রোজ একটি করে না খেলেই মনে হয় এই পাচ্ছে, এই পাচ্ছে। সেও এক মারাত্মক ভয়। সব ভয়ের সেরা ভয়।

আ, এইটাই তো আমরা চাই। এই নার্ভাস ডায়েরিয়া দিয়েই তো আমরা সবরকম অভ্যুত্থান ঠেকিয়ে

কোন ডিটারজেন্টের সঙ্গে কোন কোম্পানী ফ্রি চামচ দিচ্ছে, কোন কোম্পানী ফ্রি তোয়ালে দিচ্ছে তার সব খবর রাখেন মধ্যবিত্ত গৃহিণী

রাখতে চাই। তা না হলে এ দেশটা কবে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা হয়ে যেতো। হই হই মিছিল করে এগিয়ে আসছে মধ্যবিত্তের দল—শিক্ষা চাই, সংস্কৃতি চাই, দুর্নীতি চাই, মাথা তুলতে চাই, নিচু করতে চাই, নীতি চাই, তেল দিতে চাই, নিতে চাই, লাথি খেতে চাই, মারতে চাই, সব এসে দাঁড়িয়েছে এই ক্ষমতার দুর্গের বাইরে। কি হচ্ছে ভাই? বিপ্লব, বিপ্লব। আমরা সব বিপ্লব করেছি।

আমরা তখন এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুলিশ বাহিনীকে বলব—ওহে কিস্যু করতে হবে না শুধু তোমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েকবার বুটের শব্দ কর। ওইলে আসছে! বাস বাকি কাজটা জিয়ার্ডিয়াসিস, ল্যাম্বিয়াসিসে করে দেবে। ওরে ভাই বিপ্লব এখন থাক, আগে বড় বাইরেটা করে আসি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্রী দেশাই বলেছেন,
গান্ধীজীর অভ্যাস ছিল তরুণী মেয়েদের কাঁধে
হাত রেখে চলাফেরা করা। এটা শ্রী দেশাই
পছন্দ করতেন না . . .

প্রকাত বিস্ময়— শিশুর জন্ম

অলোক সেন

॥ এক ॥

"ব্যাস বর দিয়েছিলেন গান্ধারীকে শত পুত্র হবে। যথাকালে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দুই বৎসরেও তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না এবং কুন্তীর একটি পুত্র (যুধিষ্ঠির) হয়েছে জেনে তিনি অধীর ও ঈর্ষান্বিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করলেন তাতে লৌহের ন্যায় কঠিন একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হল। তিনি সেই পিণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখলেন, তা থেকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একশ' ভ্রূণ পৃথক হ'ল। সেই ভ্রূণগুলিকে পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন।"

(মহাভারত ঃ আদিপর্ব—রাজশেখর বসু।)

মহাভারতের সেই আদি পর্বে সংবাদপত্রের জন্ম হয়নি। কিন্তু সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেই অভূতপূর্ব জন্মকাহিনী জনমানসে কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কিনা জানা নেই। মহাভারতকারও মৌন থেকেছেন।

গত ২৫ জুলাই লণ্ডন শহর থেকে প্রায় দেড়'শ মাইল দূরে ওলহ্যাম হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেছে আর একটি বিস্ময়-শিশু। তার জন্মবৃত্তান্তটি যে-ভাবে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে বোধ হয় তার কোনও নজির নেই সংবাদপত্রের ইতিহাসে। প্রচার হয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে রেডিও টেলিভিশন এবং ফিল্মে। নবাগতা অলংকৃতা হয়েছে 'টেস্টটিউব বেবি' 'নলজাতক' প্রভৃতি নানা নামে।

অলংকার যেমন চিরকাল প্রকৃত রূপকে বাড়িয়ে তোলে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে সারা পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মানুষের মনে অদ্ভুত রকমের নানা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এই কলকাতার বহু শিক্ষিত মানুষও ধরে নিয়েছেন, অনাগত ভবিষ্যতে হয়তো কারখানায় জন্ম হবে এমনই শত শত নবজাতকের। মাতৃজঠরের ভূমিকা একদিন হয়তো ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের সকল অহংকার।

ছোট্ট শিশু লুই ব্রাউনের জন্ম হয়েছে এ যাবৎ প্রসূত আর সব শিশুর মতোই মাতৃজঠরের কোমলতম আশ্রয়ে থেকে। পার্থক্য কেবল গর্ভাধানে। মা লেসলি ব্রাউনের দেহাভ্যন্তরে যে ত্রুটিটুকু এতকাল সন্তান ধারণের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, এ যুগের দুই অসামান্য প্রতিভা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক স্টেপটো ও এডোয়ার্ডের অসাধারণ নৈপুণ্য সে ত্রুটিটুকু অতিক্রম করেছিল। একই সঙ্গে কৃত্রিম পরিবেশে ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষের মিলন ঘটানো, মিলনজাত ভ্রূণকোষের বৃদ্ধিসাধন এবং মাতৃজঠরে সংস্থাপন—এ বিস্তৃত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতিটি স্তরে এঁরা সফল হয়েছিলেন—লুই ব্রাউন সে সাক্ষ্যই নিয়ে এসেছে তার জীবন্ত অস্তিত্বের সঙ্গে।

গর্ভাধান না মাতৃজঠর থেকে পৃথিবীর আলোতে বেরিয়ে আসা, মানবজীবনে জন্মক্ষণ কোনটি? লুই ব্রাউনের জন্ম কিংবা গর্ভাধানের কোনো পর্যায়েই কিন্তু আভিধানিক অর্থে কোনো টেস্টটিউব বা পরীক্ষানলের প্রয়োজন ঘটেনি। সম্ভবত গবেষণাগারের উজ্জ্বল ভূমিকাটিকে চিরস্থায়ী করতেই আলংকারিক 'টেস্টটিউব' শব্দটিকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অলংকরণের বিকৃত প্রয়াস এ নবাগতাকে নলজাতিকায় পরিণত করেছে। প্রচারযন্ত্রের অসামান্য কৃতিত্বে জনমানসে এ নবজাত শিশুটির পরিচয় যেন বিজ্ঞানীর প্রতিভাপ্রসূত অবয়বরূপে।

॥ দুই ॥

মাতৃজঠর থেকে একটি শিশুর আবির্ভাব সব সময়েই এক অপার বিস্ময় নিয়ে আসে। কোথা থেকে কেমন করে ছোট্ট এক মানব শিশু তার পূর্ণাঙ্গ জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, আকাশে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত প্রথম ক্রন্দনের অস্পষ্ট দুর্বোধ্য ভাষায়, সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ সে প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে পায়নি। তাই দেশে দেশে নানা সময়ে গড়ে উঠেছিল রহস্যে ভরা শত শত গল্প-কথা রূপকাহিনী।

যুগ যুগ ধরে অজ্ঞতা, কল্পনাবৃত্তি ও দৈবীবিশ্বাস মানুষকে প্রবর্তনা যুগিয়েছিল নানা অবৈজ্ঞানিক কর্মকল্পে, সন্তানলাভের বাসনায় জন্ম হয়েছিল সন্তান-দাত্রী দেবদেবীর, ধরণা প্রার্থনা উপাসনা এবং মাদুলী কবচ ঝাড়ফুঁক ঘটেছিল এখানে সেখানে। অন্যদিকে মানুষের অলস কল্পনা রচনা করেছিল বহু অভিনব রূপকাহিনীর।

এমনি ভাবেই একদিন ইউরোপে জন্ম হয়েছিল বহু কর্মকুশলী ফাউস্টের। বিশ্বকবি গোটের ফাউস্টও তাই গবেষণাগারে মানবকোষ সৃষ্টির সাধনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইউরোপে নবজাগরণের যুগেও ধর্মভীরু মানুষের কল্পনা মেনে নিয়েছিল আদি মানবী ইভের গর্ভে নিরবধিকালের আগত ও অনাগত সমস্ত মানব-শিশুর স্বর্গীয় অস্তিত্বকে। অতি আধুনিক যুগে অলডাস হাকসলেও হয়তো ঠিক এমন করেই কল্পনা

প্রথম বিস্ময়-শিশু লুই ব্রাউন

করেছিলেন আগামী দিনের অতি সাহসী এক মানব-কুলের, বিস্ময়কর নানা কর্মকাণ্ডের বহু সম্ভাবনা।

কিন্তু মানুষ কি তার অজ্ঞতা কল্পনা ও গল্পগাথা নিয়েই ক্ষান্ত ছিল? মানুষের জিজ্ঞাসা কি নিবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র কল্পনাসর্বস্ব অলস চিত্ত বিস্তারে? সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই মানুষ শত শত রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে চলেছে অসীম নিষ্ঠা ও অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে। কখনও দ্রুত কখনও বা ধীর সুস্থিত-লয়ে।

জীবনের উৎস সন্ধানে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল হাঁসের ডিম নিয়ে শুরু করেছিলেন এক অতি দীর্ঘ পরীক্ষা পর্বের। একের পর এক ডিমের খোলা ভেঙে মর্যাদাপূর্ণ ভ্রূণের ক্রমিক বৃদ্ধির পর্যায়গুলি পর্যবেক্ষণ করে মূল সমস্যাটির কোনো উত্তর না পেলেও প্রকৃতিতে জীবসৃষ্টির বিস্ময়কর এ পর্যায়-শৃঙ্খলটিকে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন এক অপরিসীম বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায়!

নারীদেহে ঋতুচক্রের আবর্তন, প্রসূতিদেহে ঋতুবন্ধ, মাতৃজঠরের ক্রমিকবৃদ্ধি এবং প্রতি ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একটি শিশুর আবির্ভাব তাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। মাতৃগর্ভে শিশুর আগমন ও বৃদ্ধি কীভাবে ঘটে, শিশুর জন্মে মাতা ও পিতার প্রকৃত ভূমিকাটি কী—এ জাতীয় কোনো প্রশ্নেরই সমাধান না পেয়ে তিনি লেখেন ঃ মাতৃজঠরে একটি মানবভ্রূণের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি যেন শিল্পীর তুলিতে তিলেতিলে রূপ পাওয়া একটি বহুবর্ণশোভিত চিত্রের মতো। যে কোনো একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সূচনা হয় প্রাথমিক এক অস্পষ্ট রূপরেখাকে অবলম্বন করে। ধীরে ধীরে পরতে পরতে রঙের প্রলেপ শিল্পীর কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলে সজীব সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতায়। কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্তে অনাগত শিশুটির অস্পষ্ট এক দেহ-রেখা হয়তো এমনি করেই ফুটে ওঠে মাতৃজঠরের গোপন গহনে। দিনে দিনে সে দেহরেখাটি রূপে-রসে কাঠিন্যে-কোমলতায় বেড়ে ওঠে মাতাপিতার পরম আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের নিবিড় আগ্রহে।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ শল্যবিদ উইলিয়াম হার্ভে এক হংসদম্পতির জীবনযাত্রার প্রতি নিবিড় নিষ্ঠায় দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ চালিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন ঃ যে কোনো একটি ডিম সৃষ্টিতে দম্পতির উভয় সদস্যের ভূমিকা সমান। অনুমানে জানালেন ঃ সম্ভবত পৃথিবীর যে কোনো জীবদম্পতিই সন্তান উৎপাদনে সব সময়েই সমান অবদান রেখে থাকেন।

আজ থেকে মাত্র তিনশো বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল মাতৃজঠরে শিশুর আবির্ভাব ঘটে তার পূর্ণাঙ্গ রূপে। অর্থাৎ শিশু তার সৃষ্টিক্ষণ থেকেই এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে মাতৃজঠরে আশ্রয় নেয়। যেন বৃদ্ধির কালে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোজন ঘটে না, ঘটে কেবল অতি ক্ষুদ্র অঙ্গগুলির ক্রমিক বৃদ্ধি দৈর্ঘ্যে বেধে ও ওজনে।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে লিউবেনহুকের জীবাণু আবিষ্কার থেকে শুরু হল জীববিজ্ঞানে প্রকৃত উন্নয়ন। পরবর্তী দু'শো বছরে জীববিজ্ঞান পেঁৗছে গেল ভ্রূণবিদ্যার স্তরে। কার্ল এরনস্ট ফন বের নামে এক জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম একটি নিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকে ভ্রূণবৃদ্ধির কৌশলটি লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন ঃ গর্ভাধানের সূচনা পর্বে কোষ থেকে সমজাতীয়, কিন্তু কোষবিভাজনের নানা পর্যায়ে চলতে থাকে কোষে কোষে শ্রেণীভেদ এবং এক একটি স্তর পরিণতি লাভ করে এক একটি দেহাঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশে।

ঠিক এ কারণেই মাতৃদেহ থেকে সংগৃহীত ডিম্বকোষের কৃত্রিম নিষিক্তকরণ খুব কঠিন নয়, কঠিন নয় কৃত্রিম পরিবেশে নিষিক্ত কোষের প্রাথমিক বিভাজন। কঠিন এই বিভাজন প্রক্রিয়াটিকে সচল রাখা—যে অবস্থায় ঐ বিভাজনের সঙ্গে চলবে বিভাজিত অপত্য-কোষে প্রয়োজনীয় শ্রেণীভেদ যার ফলে সৃষ্ট হবে নতুন নতুন কোষ-স্তর, জন্ম হবে আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক এক একটি দেহাঙ্গের। মাতৃজঠরে থাকে এ সংকেতবাহী পর্যায়ক্রমিক রসধারা, প্রয়োজনীয় তাপনিয়ন্ত্রণ, থাকে অদৃশ্য ও অজ্ঞাত এমনই বহুতর স্বয়ং সম্পূর্ণ নানা ব্যবস্থা, কৃত্রিম পরিবেশ যা দিতে পারে না। সে শত সহস্র সংকেত বিপুল রহস্যে ঢাকা। তাই গবেষণাগারে মানবজন্ম কেন কোন জীবসৃষ্টিই হয়তো সম্ভব হবে না কোনোদিন। 'নলজাতকে'র সম্ভাবনা তাই সুদূর পরাহত সন্দেহ নেই।

॥ তিন ॥

নারীদেহে মাসে মাসে বর্ষা। প্রকৃতিতে এ এক বিস্ময়কর পুনরাবর্তন ঃ মানবজন্মের মূল রহস্যটি নিহিত নারীদেহের এই ঋতুচক্রটিতে।

মানবদেহের বৃদ্ধি বিন্যাস প্রজনন প্রতিটি ঘটনাই ঘটে যায় যেন অদৃশ্য এক পরম শিল্পীর বিস্ময়কর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়। প্রকৃতিতে ঋতুর পরিবর্তন, শুকনো পাতা ঝরে যাওয়া কিংবা বসন্তের আগমনে গাছে গাছে ডালে ডালে নতুন কোরকের আবির্ভাবের সঙ্গে যেন এর কোথায় এক অস্পষ্ট মিল পাওয়া যায়। প্রকৃতির কোনো এক অজানা কারিগর এক নিয়মজ-পদসঞ্চারে এসে উদ্ভিদ কিংবা জীবদেহে যে নতুন প্রাণের জোয়ার আনে তা নিয়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অন্বেষণ চালিয়েছেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু

জীব ও উদ্ভিদ দেহে, আছে এক অদৃশ্য ঘড়ি, বায়োলজিক্যাল ক্লক, যার দুজ্ঞেয় নির্দেশে ডালে ডালে ফুল ফোটে, ফল ধরে, জীবদেহে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলে নানা নিঃশব্দ পরিবর্তন। দীর্ঘ সাধনার ফলস্বরূপ গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হল মানবদেহের অভ্যন্তরে স্বতঃ প্রবাহিত এক রসধারা যা কখনও উত্তেজনা কখনও বা অবচেতনা ঘটায়। এবং এ দুয়ের প্রভাবে সৃষ্টি হয় শারীরিক ও মানসিক নানা আবেগ অনুভূতির, নারীত্ব কিংবা পৌরুষের পরম বিকাশ। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন হর্মোন যা উত্তেজক রস। কথাটি চয়ন করা হয়েছিল মূল এক গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ : 'আমি জাগিয়ে তুলি'।

বয়ঃসন্ধিকালে হর্মোন প্রভাবেই কিশোর কিশোরীর দেহে অদৃশ্য-অদ্ভুত এক বিপ্লব ঘটে চলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্যন্তরেও চলতে থাকে নানা বিন্যাস ও বৃদ্ধি, নবযৌবনরসে উচ্ছল হয়ে ওঠে দেহমনের সামগ্রিক পরিমণ্ডল। জীবন বসন্তের সে এক উজ্জ্বল উন্মেষ।

হর্মোন প্রভাবেই কিশোরী ক্রমে ঋতুমতী হয়ে ওঠে। মানবমস্তিষ্কের ঠিক নীচে অবস্থিত পিটুইটারি গ্রন্থির রসপ্রবাহ কুমারীর অনুদেহে বয়ে আনে ভবিষ্যৎ-মাতৃত্বের শুভ সূচনা : প্রথম রজঃনির্দেশ, নারীদেহের পূর্ণ বিকাশ ও যৌবনপদ্মের প্রথম-উন্মোচন-বার্তা।

সুস্থ ও সবল নারীদেহে ঋতুচক্র ও সন্তান ধারণের জন্য আছে মূলত তিনটি যন্ত্রাংশ : মাতৃজঠর বা গর্ভ নামে পরিচিত অংশটির মূল নাম ইউটেরাস বা জরায়ু, সাধারণ অবস্থায় যা দৈর্ঘ্যে তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি, প্রস্থে দুই থেকে চার ইঞ্চি এবং আকৃতি একটি বায়ুহীন বেলুনের মতো। জরায়ুর উপরের দিকে উভয় প্রান্তে আছে দুটি সরু ফাঁপা নল যাদের নাম ডিম্ববাহী নল বা ফ্যালোপিয়ান টিউব। এদের দৈর্ঘ্য দুই থেকে পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে। নলের ভিতরের বেধ এক থেকে দেড় মিলিমিটার। প্রতিটি ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রান্তে আছে হাতের চেটোর মতোই কয়েকটি আঙুল যার একটি মাত্র ছিদ্রবৃত্ত। জরায়ুর দুই প্রান্ত থেকেই, ফ্যালোপিয়ানের সূচনা যেখানে, ঠিক তারই নীচে থেকে ফ্যালোপিয়ানের মুক্ত প্রান্তের কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি ক্ষুদ্র অংশ ডিম্বাশয় বা ওভারি নামে যা পরিচিত। এদের প্রত্যেকটির আকৃতি একটি বড় বাদামের থেকে বড় নয়।

প্রত্যেকটি ডিম্বাশয়ে থাকে বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র থলি, বিজ্ঞানের ভাষায় যাদের নাম ফলিকল্স। প্রত্যেকটি ফলিকলএ থাকে এক একটি অপুষ্ট ডিম্বকোষ যা সময়মতো পুষ্টতা লাভ করে বেরিয়ে আসে সন্তানসৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে। জন্মকালেই একটি শিশুকন্যা তার দুই ডিম্বাশয়ে নিয়ে আসে প্রায় চার লক্ষ অপুষ্ট ডিমের সারি। যৌবনকালে যোগ্যতার বিচারে ডিমের সংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক চারশো। অর্থাৎ একটি নারীদেহে ঋতু-উদ্গম থেকে ঋতুসমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র ঋতুচক্রটি ব্যাপ্ত থাকে আনুমানিক চারশো মাস বা তেত্রিশ বছর। ফলে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা আসে চারশো বার। দুটি ডিম্বাশয়ে এগুলি বিভক্ত থাকে প্রায় সমান সংখ্যায়। ঋতুচক্রের সূচনায় পর্যায়ক্রমে এক একটি ডিম্বাশয় থেকে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ এ ডিম্বগুলির এক একটি পুষ্টতা লাভ করে এগিয়ে আসে আত্মবিকাশের পথে।

পিটুইটারির প্রভাবেই একটি ফলিকল প্রসারিত হয় এবং ডিম্বটি পুষ্ট হতে শুরু করে। আবার ডিম্বটির পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ফলিকলটি তৈরি করে বিশেষ ধরনের স্ত্রী হর্মোন ইসট্রোজেন। উৎপন্ন ইসট্রোজেন একই সঙ্গে বহুবিধ পরিবর্তনের সূচনা করে। একদিকে এক বিপরীতমুখী সংকেত যায় পিটুইটারিতে যাতে নতুনভাবে আর কোনো ডিম্বের পুষ্টির সূচনা না হয়। অন্যদিকে জরায়ুর দেওয়ালে নতুন কোষস্তরের বিন্যাস শুরু হয়। এ যেন অনাগত তৃতীয় আর একটি সংকেতধারা চলে যায় এ দেশ দু' পাশে দুগ্ধ সৃষ্টিকারী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম থলিতে যাতে অনাগত ও সম্ভাব্য সন্তানটি দীর্ঘ ২৮০ দিনের গর্ভযাপনের পরে মাতৃস্তন্য ধারা থেকে বঞ্চিত না হয়।

একটি আঠাশ দিনের ঋতুচক্রে প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বটি পুষ্ট হয়ে তার বাসভূমি ফলিকলটি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এক অবিশ্বাস্য পারদর্শিতায় প্রায় নির্গমন মুহূর্তেই ডিম্বটি ধরা পড়ে নিকটস্থ ফ্যালোপিয়ান টিউবের আঙুলগুলির ফাঁকে। ডিম্বটি এর পর যাত্রা শুরু করে ফ্যালোপিয়ান নালীপথে এক অনির্দেশ অভিসার যাত্রায়।

ডিম্বটি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত ফলিকলটির মুখ্য ভূমিকাটি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রায় একই সময়ে এটি একটি ছোট্ট গ্রন্থিতে পরিণত হয়ে ইসট্রোজেনের সঙ্গে সঙ্গে প্রোজেস্টেরন নামে আর একটি স্ত্রী হর্মোন নিঃসরণ শুরু করে। দিনে দিনে প্রোজেসটেরনের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, ইসট্রোজেনের পরিমাণ কমে আসে। প্রোজেসটেরনের প্রভাবে জরায়ু প্রাচীরে কোষস্তরের প্রসারণ ঘটতে থাকে এবং সম্ভাব্য ভ্রূণটির বসবাস ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও বহু সূক্ষ্ম রক্তবাহী কৈশিক নলের সৃষ্টি হয়।

ঋতুচক্রের চতুর্দশ দিনে এভাবেই স্ত্রীজননতন্ত্রটি সামগ্রিক প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করে মাতৃডিম্বের সঙ্গে জনক শুক্রকোষের মিলন, নিষিক্ত ডিম্বকোষের বিভাজন, ভ্রূণসৃষ্টি, ভ্রূণের পরবর্তী গর্ভযাপন ও

একটি শিশুর নিরাপদ জন্মদানের শুভ মুহূর্তটির জন্য।

কিন্তু কত শত কুঁড়িই তো শুকিয়ে যায়, শত সহস্র ফুল ঝরে পড়ে অনাদরে অবহেলায়। ঠিক তেমনি করেই ঋতুচক্রের আগমন ও নির্গমন চলে মাসের পর মাস। ফ্যালোপিয়ান নলে দুটি বা তিনটি দিনের অনিমেষ প্রতীক্ষার পরেও শুক্রকোষের দর্শন না পেলে ডিম্বকোষটি ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে। ঋতুচক্রের তেইশ বা চব্বিশ দিনে ডিম্বসারির আর একটি ডিম্ব প্রস্তুত হয় নতুন চক্রের আগমন প্রতীক্ষায়। পুরোনো ব্যর্থ চক্রটি ডেকে আনে আপন মৃত্যু। এ মৃত্যু জন্ম দেয় এক বেদনার—নারীদেহের উদরপ্রান্তে। রক্তবাহী সূক্ষ্মতন্তুগুলি ছিঁড়ে পড়ে জরায়ু দেওয়ালে উৎপন্ন কোষস্তরের আকর্ষণ ত্যাগ করে। প্রসারিত জরায়ু ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। ডিম্বের মৃত্যু এবং গর্ভসঞ্চারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় জরায়ু যেন শোকে ভেঙে পড়ে অবিরাম কান্নায়। এ ক্রন্দন চলে একটানা পাঁচ কিংবা ছটি দিন যতক্ষণ না আর একটি নতুন ডিম্বের আত্মপ্রকাশ হয় আর একটি সন্তানের জন্ম-সম্ভাবনা নিয়ে।

ঋতুস্রাব প্রকৃত অর্থেই গর্ভের মৃত্যু। সম্ভাবনাছিন্ন এ মৃত্যুকে তাই বিজ্ঞানীরা বলেছেন "জরায়ুর অশ্রু"। কেউ বা ছিন্ন রক্তজালিকার বহির্গমনকে তুলনা করেছেন হেমন্তের পাতাঝরার সঙ্গে।

॥ চার ॥

ফলিকল থেকে বেরিয়ে আসা ডিম্বটিকে ঘিরে থাকে আবরণস্বরূপ বহুকোষনির্মিত বেশ কয়েকটি স্তর। স্তরগুলি আঁটালো যাতে ডিম্বটি ফ্যালো- [illegible]

[illegible] অন্যদিকে ফ্যালোপিয়ানের সূক্ষ্ম নালীপথে চলার সময়ে নলের সঙ্গে ঘর্ষণে ও প্রাণরাসায়নিক নানা জটিল পদার্থের সংস্পর্শে ক্রমশ অবরোধস্বরূপ ঐ আবরণগুলি দ্রবীভূত হতে থাকে। যাতে শুক্র সংস্পর্শে এলে বাধা না থাকে উভয়ের বহুপ্রার্থিত মিলনে।

ফ্যালোপিয়ান নলের প্রান্ত থেকে জরায়ু পর্যন্ত পথ পরিক্রমায় ডিম্বটির সময় লাগে দুই থেকে তিন দিন। জন্মের পর থেকে সময় যতো এগিয়ে যায় ডিম্বটি শুক্রকোষের সঙ্গে মিলনের জন্য নিজেকে ততো বেশী প্রস্তুত করে তোলে।

পিতার কাছ থেকে প্রতি ক্ষেত্রে শুক্রকোষ আসে একই সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ কোটি। একটি নায়িকার জন্য দাবীদারের সংখ্যা এতো কেন? প্রকৃতিতে এ ব্যবস্থাটিও বিস্ময়কর। বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের বিপদ বাধা পদে পদে। বাধা তো জরায়ুর প্রবেশ পথেই সব থেকে বেশী। জায়গাটি সাধারণত থাকে আম্লিক। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাজারে হাজারে এদের মৃত্যু হয়ে যায়। কতগুলি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে তার কটা সুস্থ থাকবে প্রথম প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে কতজনই বা এগোতে পারবে সে সংশয়ই তো সব থেকে গুরুতর। শেষ পর্যন্ত একজনকেও তো পৌঁছাতে হবে? প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এমনই যে সময়ে ডিম্ব ফ্যালোপিয়ানে এসে যায় ঠিক তখন থেকেই জরায়ুমুখের অম্লতা কেটে গিয়ে একটি ক্ষারকীয় পরিবেশ তৈরি হতে থাকে। স্থানীয় গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণে যাত্রাপথও হয় কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল। মিলনপিয়াসী জরায়ুও তখন আবেগে উদ্বেগে বহুগুণে প্রসারিত। তাই মুক্তিপ্রাপ্ত পঞ্চাশ কোটি শুক্রকোষ অদের ভারী বড় মাথা এবং সাঁতারউপযোগী মাথার তুলনায় দীর্ঘতর লেজটির সাহায্যে তীব্রগতিতে এগিয়ে চলে অপেক্ষমাণা নায়িকা অভিসারিকা ডিম্বকোষটির সন্ধানে। এদের এই চলার গতি খুব কম নয়। প্রতি আট মিনিটে প্রায় এক ইঞ্চি অর্থাৎ প্রতি মিনিটে এরা অতিক্রম করে নিজ দৈর্ঘ্যের অন্তত ছশো গুণ দীর্ঘ পথ।

একটি শুক্রকোষ আকৃতিতে কত বড়? এক ইঞ্চির প্রায় ছ' হাজার ভাগের এক ভাগ। তুলনায় তার নায়িকা ডিম্বটি রীতিমতো দীর্ঘাঙ্গিনী—কাগজে একটি আলপিন ফোটাতে যতোটুকু স্থান প্রয়োজন অন্তত ততো বড়।

সমগ্র যাত্রাপথটি অতিক্রম করে ডিম্বের কাছে পৌঁছাতে শুক্রকোষের সময় লাগে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট। পথযাত্রায় [illegible], বন্ধুরতা ও প্রতিকূলতায় এরা লাখে লাখে প্রাণ হারায়। জরায়ু থেকে সুড়ঙ্গপথে দুদিকে প্রসারিত দুটি ফ্যালোপিয়ান নলের কোন্ অলিন্দে যে নায়িকা অপেক্ষমাণা সে খবরটিও তো এদের অজানা, তাই দুই পথেই ছোটে অসমসাহসী বীরের দল। শেষ পর্যন্ত বীরভোগ্যা ডিম্বকোষটির কাছে যারা পৌঁছাতে পারে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক দু হাজার।

কোনো মৌচাকে যদি একটি বল হঠাৎ গিয়ে আঘাত করে তবে মুহূর্তের মধ্যে বলটিকে ঘিরে ধরে আক্রান্ত শত শত মৌমাছি। বলটিকে তখন মনে হয় যেন আর একটি ছোট্ট মৌচাক। দু' হাজার শুক্রকোষ ঠিক তেমনি করেই ঘিরে ধরে ঐ একমাত্র ডিম্বটিকে। প্রত্যেকেই আর তার পাণিপ্রার্থী হতে। পারস্পরিক লড়াই নয়, কে আগে ডিম্বকোষের দেহাবরণ উন্মোচিত করে ভিতরে প্রবেশ করে, চলে তারই প্রতিযোগিতা। দুর্ভেদ্য ডিম্বত্বকটিকে ভারী মাথা দিয়ে আঘাত করে এবং নিজ মস্তক নিঃসৃত রসায়নিকে দ্রবীভূত করে শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র জয়ী শুক্রকোষ নিজ শৌর্যের সাফল্যস্বরূপ লাভ করে তার প্রার্থিত নায়িকার প্রসন্ন সান্নিধ্য। বাসনাবিহ্বল নায়িকা শুধু জয়মাল্য দিয়ে নয় প্রার্থিত এ বীরকে বরণ করে নিজেকেই সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে। একেই বলে গর্ভাধান বা ডিম্বকোষের নিষিক্তকরণ।

ডিম্বকোষটির অভ্যন্তরে শুক্রকোষের প্রবেশমাত্র শুরু হয় এক নব শিহরণ। আর এ শিহরণ দুটি

অভ্যন্তরীণ বিভাজনে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এ যেন আত্মদানের পূর্বে বাছাইপর্ব। প্রত্যেকেই চায় নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশটি উৎসর্গ করতে যাতে মিলনসৃষ্ট নবাগতটি পায় বংশধারার সব থেকে সফল ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলি।

প্রত্যেক ডিম্বকোষের কেন্দ্রতে থাকে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম, যার বাইশ জোড়া প্রায় অনুরূপ ক্রোমোজোম বা অটোজোম এবং পৃথক আর একটি জোড়ায় থাকে একই লিঙ্গ নির্দেশক দুটি ক্রোমোজোম এক্স এক্স। মিলন পূর্ব-বিভাজনে বাইশ জোড়া থেকে বাইশটি এবং লিঙ্গ নির্দেশক জোড়া থেকে একটি, সর্বসমেত তেইশটি করে ক্রোমোজোম পৃথক হয়ে প্রস্তুত হয় শুক্রমিলনে।

প্রত্যেক শুক্রকোষের কেন্দ্রতেও থাকে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম যাদের বাইশ জোড়া প্রায় অনুরূপ অটোজোম কিন্তু বাকি একটি জোড়ায় থাকে সম্পূর্ণ দুই পৃথক লিঙ্গনির্দেশক ক্রোমোজোম এক্স এবং ওয়াই। এক্স স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশক এবং ওয়াই পুংলিঙ্গ নির্দেশক। মিলনের পূর্বমুহূর্তে শুক্রকোষের অভ্যন্তরীণ বিভাজনে দুটি পৃথক অংশে চলে যায় বাইশ জোড়া থেকে বাইশটি অটোজোম ও এক্স এবং অন্যটিতে, চলে যায় বাকি বাইশটি অটোজোম ও ওয়াই।

গর্ভাধানপর্বে ডিম্বকোষের দুটি অপত্য অংশের যে-কোনো একটির সঙ্গে শুক্রকোষের দুই অপত্য অংশের যে-কোনো একটির মিলন ঘটে। দুই তরফের বাকি দুই অংশ বর্জিত হয় সম্পূর্ণরূপে। গর্ভাধানে অংশগ্রহণকারী মাতাপিতার এই দুই ক্ষুদ্রতম অংশের সংযোগে সৃষ্টি হয় নতুন একটি কোষের, পরবর্তী অধ্যায়ে যে ভ্রূণে পরিণত হবে এবং শেষ পর্যন্ত যা শিশুরূপে আবির্ভূত হবে মাতাপিতার জন্মধারাকে সচল রাখতে।

যে কোনও সন্তানের ক্ষেত্রে মাতা ও পিতার অবদান তাই সব সময়েই সমান সমান। ফলে মানব-শিশু সব সময়েই পিতামাতারই মতো ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোমের অধিকারী হয়। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হলে শিশুটি হবে অস্বাভাবিক। সে পুরুষ বা নারী কোনো নির্দিষ্ট পরিচয়ের অধিকারী হবে না।

গর্ভাধানসৃষ্ট ভ্রূণকোষটিতে লিঙ্গনির্দেশক ক্রোমোজোম দুটি এক্স এক্স হলে সন্তানটি হবে কন্যা এবং এক্স-ওয়াই হলে সন্তানটি হবে পুত্র। তাই ডিম্ব ও শুক্রকোষের মিলন পর্বই নির্ধারিত হয়ে যায় অনাগত সন্তানের লিঙ্গপরিচয়। পরবর্তীকালীন কোনো প্রচেষ্টাই এর কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। গর্ভাধানে সংযুক্ত ক্রোমোজোমগুলির সঙ্গে থাকে লক্ষ লক্ষ পুঁতির মালার মতো সাজানো DNA বা জিন। ওরাই নির্দেশ দেয় সন্তান বাবা অথবা মা কার কোন গুণ নিয়ে জন্মাবে, দেহবর্ণ হবে কেমন, তার বুদ্ধিবৃত্তি, রোগভোগ এমন কি সম্ভবত তার জীবনকাল বা আয়ুও নির্দিষ্ট হয়ে যায় গর্ভাধানের এই শুভ মুহূর্তটিতেই।

গর্ভাধান স্বাভাবিকভাবে মাতৃজঠরে কিংবা কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে—যেখানেই হোক না কেন এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। জনক জননী এক জাতীয় না হলে অর্থাৎ তাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা এক না হলে সন্তান সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

কৃত্রিম পরিবেশে কোনো বিশেষ প্রজনন ঘটাতে গেলে প্রকৃতি তা মেনেও নেয় না। তাই সিংহ ও বাঘের মিলনে সন্তান একটি জন্মাতে পারে—কিন্তু সে সন্তানের থাকে না কোনো প্রজনন ক্ষমতা। এজন্যই চিড়িয়াখানার টাইগন জনন-ক্ষমতা শূন্য। তাকে দিয়ে একটি নতুন বংশধারা কিংবা জীবজগতে নতুন কোনো জাতি সৃষ্টি সম্ভব হবে না কোনোদিন।

গর্ভাধানসৃষ্ট নতুন এই জীবনকোষটিতে এর পর চলে ক্রমাগত বিভাজনের পালা। একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এই ক্রমিক বিন্যাসে প্রথম বাট ঘণ্টায় ভ্রূণকোষটি পরিণত হয় আটটি অপত্য কোষে। এবং তিনটি দিনের পরিসরে বত্রিশটি [illegible] এক অন্তরূপে। বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গেই চলে তার পথযাত্রা। নিরাপদ আশ্রয় চাই ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য। চাই আহার, রক্তসঞ্চালন, চাই তাপ, চাই বিভাজন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্মাণে নানা উপাদানসমৃদ্ধ পর্যায়ক্রমিক বিশেষ বিশেষ রসধারা। ভ্রূণকোষটি এসে পৌঁছায় জরায়ুর অভ্যন্তরে যেখানে তার আশ্রয় ও বৃদ্ধির অনুকূলে সকল রকম ব্যবস্থা আগে থেকেই প্রস্তুত। গাছের ডালে বাসা বাঁধা মৌচাকের মতোই বিভাজনশীল ভ্রূণকোষটি জরায়ু-দেওয়ালে এসে আটকে ধরে, বাসা বাঁধে। ভ্রূণটিকে ঘিরে তৈরি হয় এক স্বচ্ছ থলি যার মধ্যে জমা হয় এক জলীয় তরল অ্যামনিয়োটিক ফ্লুইড। এই তরলটিই ভ্রূণটিকে রাখবে সরস ও স্বচ্ছন্দে, জঠরবাসকে করবে সফল ও সমৃদ্ধ। মাতৃদেহ থেকে আসে খাদ্যরস, আসে রক্তপ্রবাহ, আসে রক্তে মিশে থাকা শ্বাসবায়ু। গর্ভাধান থেকে জন্মকাল পর্যন্ত প্রায় নয়টি মাসের পরিসরে চলে কোষবিভাজন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক নির্মাণ পৃথিবীর আলো হাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামগ্রিক প্রস্তুতিপর্ব। প্রস্তুতি সমাপ্ত হলে আসে বেরিয়ে পড়ার দিন। অন্ধকার থেকে আলোয়। বদ্ধতা থেকে মুক্তিতে। মাতৃজঠর থেকে প্রকৃতির কোলে। নিজ বংশধারাকে এগিয়ে নিতে বিবর্তনচক্রের গতিকে সচল রাখতে।

॥ পাঁচ ॥

আজকে পৃথিবী জুড়ে সব থেকে বড় সমস্যাটির নাম জনস্ফীতি। জন্মহার লাফে লাফে বাড়ছে। মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ খাদ্যপানীয় ও শ্বাসবায়ুতে মানুষই এসে ভাগ বসাচ্ছে। সীমায়িত স্থলভূমি স্ফীতির মানুষকে একদিন তার আশ্রয়স্থানটুকু জোগাতেও হয়ত অক্ষম হবে। এ শতকে তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার নাম জন্মনিয়ন্ত্রণ।
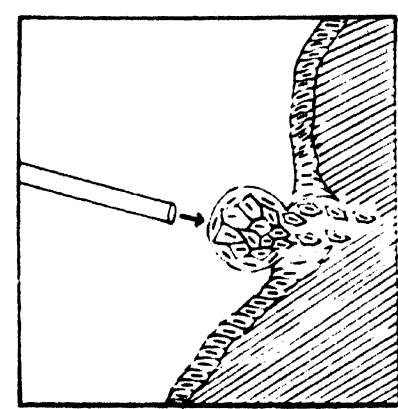
গবেষণাগারে প্রস্তুত ভ্রূণটি জরায়ুতে যেভাবে প্রোথিত হলো।

কিন্তু অন্যদিকে বন্ধ্যাত্বের সমস্যাটিও খুব কম জোরালো নয়। জন্মহার যদি শতকরা দেড়জন হয় তবে বন্ধ্যা দাম্পত্যের হার শতকরা প্রায় দশ। জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বার্থে প্রজননশীল জনক-জননীর প্রজনন ক্ষমতা যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে সীমায়িত করা সম্ভব হয় তবে সাধারণভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক অথচ বন্ধ্যা এমন দম্পতি কেন অন্তত একটি সন্তান লাভেও বঞ্চিত হবেন? চিকিৎসাবিজ্ঞান কি পারবে তাঁদের সে কামনা পূরণ করতে?

পৃথিবীর কোনো দেশেই সে ব্যাপারে আজও সাফল্যের কোনো গ্যারান্টি নেই। বন্ধ্যা নারীকে সফল করে তোলার মতো কোনো বৈজ্ঞানিক সাফল্য আজও মানুষ দাবী করতে পারে না। একজন দুজন চিকিৎসক নয়, সামগ্রিকভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানই অসহায়। তাই গল্পের রাজকন্যা নয় সারা পৃথিবী-জুড়ে বহু বন্ধ্যা নারীই ধুলিমুঠি-কাপড় পরার অধিকার থেকে চিরবঞ্চিতা।

পতি বর্জিত হলেও প্রকৃত অর্থে স্বামী ও স্ত্রীর দায় প্রায় সমান সমান। গড়ে তিনটি সন্তানহীন দম্পতির মধ্যে সাধারণত একজন পুরুষ ও একজন নারীকে এই বন্ধ্যাত্বের জন্য পুরোপুরি দায়ী করা চলে। আর বাকি একটি দম্পতির ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের কারণটি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না।

নারীদেহে বন্ধ্যাত্বের অসংখ্য কারণ থাকলেও পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা পনের থেকে বিশ জনের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের কারণ কেবলমাত্র ফ্যালোপিয়ান নলে প্রতিবন্ধকতা। তাঁদের জননাঙ্গের আর সব ব্যবস্থা স্বাভাবিক হলেও ফ্যালোপিয়ান নল দুটির অংশবিশেষ অথবা নল দুটি প্রায় সামগ্রিকভাবেই ছিদ্রহীন। প্রতিবন্ধকতা অংশ বিশেষ হলে তা হতে পারে নলের অগ্রভাগে, মধ্যভাগে বা অন্তে অর্থাৎ জরায়ুর সংযোগস্থলেও এ প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। আবার বহুক্ষেত্রে পুরো নলটি জমাটবাঁধা একটি দড়ির মতো হতে পারে। তাই নিয়মমাফিক ডিম্বকোষ উৎপন্ন হলেও অগ্রসর হতে পারে না। ফলে জরায়ুতে প্রবেশাধিকার কিংবা শুক্রকোষের সঙ্গে মিলনের অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়। সন্তান ধারণের কোনো সুযোগই আসে না সমগ্র দাম্পত্যজীবন অথবা তাঁর জীবনের সামগ্রিক প্রজনন অধ্যায়টিতে।

আধুনিক শল্যবিদ্যা অনেক সময়েই অগ্রণী হয়েছে ফ্যালোপিয়ান নলের আংশিক প্রতিবন্ধকতাটিকে মুক্ত করতে। ফ্যালোপিয়ান নলের মধ্যবর্তী অংশটি প্রতিরুদ্ধ হলে অংশটিকে কেটে বাদ দিয়ে দুপাশের সছিদ্র অংশ দুটিকে সরাসরি জুড়ে দেওয়ার একটি চেষ্টা প্রায়শই হয়ে থাকে। কিন্তু এভাবে শেষ পর্যন্ত বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটিয়ে রোগিণী আবার জননী হতে পেরেছেন এমন ঘটনা কিন্তু খুব সুলভ নয়। এর অন্যতর কারণ শল্যবিদ্যার যে সূক্ষ্মতা এই সূক্ষ্মতম যন্ত্রাংশটির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সুলভ হয় না।

জন্মনিয়ন্ত্রণে যে পদ্ধতিটি টিউবেক্টমি নামে খ্যাত অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে নারীর চিরস্থায়ী বন্ধ্যাকরণ করা হয় সেক্ষেত্রে এ কারণেই বিপরীত ব্যবস্থা পুনরায় সন্তানবতী হওয়ার প্রচেষ্টাটি সফল হবে এমন আশ্বাস তাই দেওয়া যায় না।

ফ্যালোপিয়ানের অগ্রভাগ কিংবা অন্তভাগে অনুরূপ ত্রুটি থাকলে একই পদ্ধতিতে তা ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু সফলতা? চিকিৎসক ও শল্যবিদরা এ-ব্যাপারে এখনও খুব আশাবাদী নন।

ফ্যালোপিয়ানের নলটি যদি সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ থাকে অর্থাৎ টিউবটি যদি দড়ির মতো জমাট ও নিরেট হয় স্বাভাবিক শল্যবিদ্যা সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহায়। কোনোমতেই তাকে কার্যকর করে তোলা সম্ভব হয় না।

অনেক শল্যবিদ আশা রাখেন ফ্যালোপিয়ান-ট্রান্সপ্লানটেশন বা ডিম্ববাহী নলের প্রতিস্থাপন হয়তো একদিন সফল হবে। সেদিন কোনো সুস্থ নারীর একটি ফ্যালোপিয়ান কেটে নিয়ে অন্য এক অসুস্থ ফ্যালোপিয়ানের বদলে প্রতিস্থাপিত করা যাবে। বন্ধ্যা নারীর ঊষর জঠরে পূর্ণজীবনের অসীম সম্ভাবনা নিয়ে একটি ভ্রূণকোষ বাসা বাঁধবে, একটি শিশুর শুভ আগমন ঘটবে মাতাপিতার চিরমলিনতাকে চিরমুক্ত করে।

কিন্তু সেদিন কি সুদূরাগত নয়? সারা পৃথিবীতে এমন বহু প্রচেষ্টাই বার বার বিফল হয়েছে। বহু শল্যবিদ এখনও এ চিন্তাকে নিছক কল্পবিজ্ঞানের পাতাতেই স্থান দিতে চান। বস্তুত সম্ভাবনা সত্যিই দূর অস্ত্।

॥ ছয় ॥

রোগিণী হিসেবে লেসলী ব্রাউন ছিলেন আদর্শস্থানীয়া। অন্তত দুই বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ডাঃ প্যাট্রিক স্টেপটো এবং রবার্ট এডওয়ার্ডস-এর এ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে স্বাস্থ্যবতী এবং সুঠাম দেহের অধিকারিণী এ মহিলার বয়স তখন ঠিক একত্রিশ বছর। খুব কমও নয় বেশীও নয়। জন্ম

আপনার ছেলেমেয়েদের
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়,
তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে...
কোকোর স্বাদে ভরা বোর্নভিটা!
বোর্নভিটাতে এখন পাবেন আরও বেশী কোকো, ফলে আরও বেশী স্বাদ আর পুষ্টিগুণ।
শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।
এক কাপ গরম দুধে দু' চামচ বোর্নভিটা দিয়ে এক সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় তৈরী করুন।
আপনার ছেলেমেয়েদের রোজই বোর্নভিটা খাওয়ান দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত দেহে মূল্যবান পুষ্টিগুণ দরকার, বোর্নভিটা তা যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার... ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।
৭৫ পয়সা বাঁচান
৫০০ গ্রামের কম খরচের রিফিল প্যাক কিনলে।
জরুরী কথা: বোর্নভিটা টাটকা রাখতে—রিফিল প্যাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার একটি সাধারণ টিনে ঢেলে রাখুন।
ক্যাডবেরিস
বোর্নভিটা
Bournvita
More Cocoa
OBM 8376 BEN
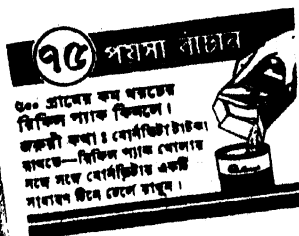
কিংবা শারীরিক অন্যান্য ব্যাপারে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে ধরনের পরীক্ষা চালাতে হবে, সেক্ষেত্রে রোগিণী নিতান্ত তরুণী হলে মানসিক স্থৈর্য, ঘাত-প্রতিঘাত সহনে দৃঢ়তা, একটানা দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রক্রিয়ায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া কিংবা চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীর পরীক্ষা নিরীক্ষায় যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে তাঁদের উপযুক্ত মনোবলের ঘাটতি দেখা যায়। আবার রোগিণীর বয়স যদি পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়ে যায়, দেহ তখন নিজেই নানাভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চলে। পড়ন্ত বেলায় জীবনের আলোও তো ক্রমশ কমে আসে।

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে ব্রিটিশ রেলওয়ের এক সাধারণ ট্রাকচালক গিলবার্ট জন ব্রাউন তাঁর স্ত্রী লেসলীকে নিয়ে এলেন বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্যাট্রিক স্টেপটোর কাছে। সমস্যা বন্ধ্যাত্ব। স্বামী ব্রাউন অবশ্য নিঃসন্তান নন। পূর্ববিবাহের ফলস্বরূপ বছর পনেরোর একটি কন্যা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি চান অন্তত আর একটি সন্তান। কন্যা অথবা পুত্র কোনোটিতেই তাঁদের আপত্তি নেই। অথচ দীর্ঘদিনের চিকিৎসাতেও শ্রীমতী ব্রাউন সন্তানবতী হতে পারছেন না। ডাঃ স্টেপটো পরীক্ষা করে দেখলেন, লেসলীর দেহে সন্তান ধারনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, দুটি ফ্যালোপিয়ান নলই সম্পূর্ণরূপে ছিদ্রহীন। যদিও অন্যান্য অঙ্গ পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত। একমাত্র ফ্যালোপিয়ানের ত্রুটির জন্যই ডিম্বাশয়ে একটি করে সুপুষ্ট ডিম্ব প্রতিমাসে উদ্ভূত হলেও তা শুক্রকোষের সঙ্গে মিলতে পারে না। ফলে সন্তানধারণ তাঁর পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হয় না।

চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়টি অতিক্রান্ত হলে ডাঃ স্টেপটো প্রথম সুযোগেই লেসলীর দেহে অস্ত্রোপচার করে তাঁর অসুস্থ ফ্যালোপিয়ান নলদুটি কেটে বাদ দিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল অসুস্থ এ নলদুটি দেহে থেকে গেলে সন্তানলাভে কোনো সুবিধা তো হবেই না বরং অন্য কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থাতেও হয়ত ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

অস্ত্রোপচারের পরে লেসলীর অবস্থাটি দাঁড়ালো এই যে যদি না কোনো কৃত্রিম উপায়ে তাঁর একটি ডিম্বকোষ নিষিক্ত করে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করানো যায় অর্থাৎ যদি না একটি তৈরী ভ্রূণ তাঁর জঠরে বসিয়ে দেওয়া যায় তবে তাঁর সন্তান কামনা সফল হওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না। সোজা কথায় তাঁর দেহ-নিঃসৃত ডিম্বকোষটিকে নিষিক্ত হতে হবে কৃত্রিম উপায়ে এবং সে নিষিক্তকরণ বা গর্ভাধানটিকে ঘটাতে হবে তাঁর দেহাভ্যন্তরে নয় গবেষণাগারে কৃত্রিম অথচ অনুকূল একটি পরিবেশে।

মাতৃজঠরের বাইরে ডিম্বকোষের নিষিক্তকরণ বা গর্ভাধান বিরল নয়। ব্যাঙ প্রভৃতি বহু প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটি অত্যন্ত সাধারণ একটি ঘটনামাত্র। স্ত্রী ব্যাঙের দেহনির্গত ডিম্বকোষ পুরুষ ব্যাঙের দেহ নিঃসৃত শুক্রকোষে দেহের বাইরেই নিষিক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু জীবজগতের উঁচু স্তরের বাসিন্দা অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিদেহী গর্ভাধানের নজির প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিরল।

জীববিজ্ঞানীরা কিন্তু থেমে থাকেননি। এ শতকের প্রথম থেকেই এ ধরনের প্রচেষ্টা বার বার হয়েছে। অনুসন্ধান ও গবেষণা চলেছে জীবনদায়ী এমন কোনো তরল পদার্থের যার মধ্যে স্ত্রীদেহ থেকে আহৃত ডিম্বকোষকে সংগৃহীত শুক্রকোষের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে নিষিক্ত করা যায়।

কিন্তু মানব ডিম্বকোষকে মাতৃজঠরের বাইরে এনে কোনো কৃত্রিম পরিবেশে কোনোদিন যে এভাবে নিষিক্ত করা যেতে পারে এমন অলস কল্পনাও বিজ্ঞানীরা করতে পারেন নি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি একটি সংবাদ জনশ্রুতির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। বোস্টন শহরে কর্মরত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ

ল্যাপারোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা

জন রক, যিনি বিজ্ঞানী মহলে জন্মনিরোধক ওষুধের আবিষ্কারক হিসেবেই অধিক পরিচিত, তিনি নাকি মাতৃজঠরের বাইরে একটি মানব ডিম্বকোষকে কৃত্রিম পরিবেশে নিষিক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ঘটনাটি বিজ্ঞানীমহলে আশা জাগালো, কিন্তু এক বিস্ময়কর অবিশ্বাস এর সত্যতা বিচারের কোনো প্রচেষ্টাকেই সমর্থন যোগালো না। ফলে ব্যাপারটি নিঃশব্দে তলিয়ে গেল অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির অতলে।

ষাটের দশকের মধ্যে এক মার্কিন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ল্যানড্রাম শাটলস দাবী করলেন, মাতৃজঠরের বাইরে একটি ডিম্বকোষকে তিনি কেবলমাত্র নিষিক্তই করেন নি, দীর্ঘ ছয় দিন ধরে গর্ভাধান সৃষ্ট ভ্রূণকোষটিকে বাঁচিয়ে রেখে স্বাভাবিকভাবে বিভাজিত করাতেও সক্ষম হয়েছেন। এর কয়েক বছর পরে ইতালীর এক বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল প্যাট্রুসি ঘোষণা করলেন, কৃত্রিম পরিবেশে নিষিক্ত একটি মানব ডিম্বকোষকে তিনি দীর্ঘ ঊনত্রিশ দিন ধরে জীবিত রেখে বিভাজিত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময়টুকুতে ভ্রূণকোষটি যেভাবে লাফে লাফে বাড়ছিল তাতে হয়ত অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন বিকট এক আকৃতি গ্রহণ করতো। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে তাকে জীবিত না রেখে তিনি নষ্ট করে ফেললেন। ইতিমধ্যে ভ্যাটিকানের ধর্মীয় আদেশ জারী হওয়ায় তাঁকে এ ধরনের গবেষণা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে আসতে হয়।

১৯৬৯-এ ওলডহ্যাম হাসপাতালের ডাঃ স্টেপটো এবং তাঁর সহযোগী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত শারীরবিদ্যা বিশারদ ডঃ রবার্ট এডওয়ার্ডস্ ঘোষণা করলেন এক বিস্ময়কর সাফল্যের সংবাদ। তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে জানালেন, গবেষণাগারে একটি মনুষ্য ডিম্বকোষের গর্ভাধান তাঁরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন এবং একটি কৃত্রিম পরিবেশে মাতৃজঠরের মতোই ঐ নিষিক্ত ডিম্বকোষের প্রাথমিক বৃদ্ধি ও বিভাজন সম্পন্ন করেছেন।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো সংবাদটি ধর্মবিশ্বাসী ও সংস্কারাচ্ছন্ন বহু মানুষের মনে বিক্রিয়া ঘটালো অপরিসীম। আতঙ্কিত স্টেপটো সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন : "আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্যটি একান্তভাবেই মানবিক। আমরা চাই সন্তানহীনা রমণীর ব্যর্থতার গ্লানি মোচন করতে। জননতন্ত্রের একটি ছোট্ট বাধাকে অতিক্রম করে বন্ধ্যা নারীকে দিতে চাই অন্তত একটি সন্তান।"

১৯৭২-এ আমেরিকার ম্যান হ্যাটন হাসপাতালে ডাঃ ল্যানড্রাম শ্যাটেল্স গবেষণাগারে এক কৃত্রিম পরিবেশে শ্রীমতী ডরিস ডেলজিও নামে এক বন্ধ্যা নারীর ডিম্বকোষকে তাঁর স্বামীর শুক্রকোষে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে নিষিক্ত করলেন। উদ্দেশ্য এই কৃত্রিম গর্ভাধান উদ্ভূত ভ্রূণটিকে তার জননীর জঠরে পুনঃস্থাপন। কিন্তু বাধা এল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। কোনো মানব মানবীকে নিয়ে এ গবেষণা তাঁদের বিবেকের কাছে বাধাস্বরূপ। ব্যাপারটিকে আদালতে আনলেন শ্রীমতী ডেলজিও। কোনো মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকায় নিষিদ্ধ হল এ জাতীয় সমস্ত গবেষণা।

১৯৭৪-এ ইংরেজ বিজ্ঞানী ডঃ ডগলাস বেভিস দাবী করলেন বৃহত্তর এক সাফল্যের। ডিম্বকোষকে গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে নিষিক্তভাবে করে এবং উৎপন্ন ভ্রূণকে মাতৃজঠরে প্রতিস্থাপিত করে তিনি বন্ধ্যানারীকে সন্তানবতী করেছেন। আর এ সাফল্য নাকি একক নয়; অন্তত তিনটি।

কিন্তু এ দাবীর ফল হল একেবারে বিপরীতমুখী। ভ্রূণতত্ত্বের দাবী সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হল প্রমাণাভাবে। শুধু তাই নয়, গবেষণাগারে মানবশিশুর উদ্ভাবন প্রচেষ্টা জনচিত্তে যে আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়ার ঝড় তুললো তার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানীরা নিজেদের গবেষণা বিষয়গুলি প্রকাশের সাহসও হারাতে লাগলেন। বিভিন্ন দেশে সরকার ও ধর্মীয় সংস্থাগুলির তরফ থেকে এ জাতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরুদ্ধে নানা নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হল। এ জাতীয় গবেষণার জন্য নির্ধারিত প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান ও সরকারী বেসরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে গেল। ডাঃ স্টেপটোর গবেষণা চলতে থাকলো একান্ত সতর্কতা ও গোপনতার সঙ্গে নিজস্ব উপার্জনলব্ধ অর্থে নির্ভর করে।

১৯৭৫-এ এলো কৃত্রিম গর্ভাধানজাত ভ্রূণকে মাতৃজঠরে সংস্থাপনের প্রথম সাফল্য। কিন্তু পুরোপুরি নয়। ভ্রূণটি জরায়ুতে আশ্রয় না নিয়ে বাসা বাঁধল ত্রুটিপূর্ণ ফ্যালোপিয়ান নলে। দীর্ঘ দশ সপ্তাহ গর্ভবাসের পরে গর্ভপাত ঘটলো অত্যন্ত আকস্মিকভাবে।

এ ব্যর্থতা বিজ্ঞানীদের এনে দিল দুটি নতুন সিদ্ধান্ত : এক, গর্ভাধান কৃত্রিম পরিবেশে ঘটলেও মাতৃজঠর ভ্রূণটিকে সাগ্রহে গ্রহণ করবে এবং যোগাবে দিনে দিনে একটি মানব শিশু হয়ে ওঠার মতো পরিবেশ ও রসদ, যদি ভ্রূণটির সংস্থাপনে কোনো ত্রুটি না থাকে।

দুই, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশসৃষ্ট ভ্রূণকে গর্ভে সংস্থাপনের আগেই মাতৃদেহ থেকে অসুস্থ ফ্যালোপিয়ান নলদুটিকে বাদ দিতে পারলে ভবিষ্যৎ শিশুর গর্ভাধান হবে অনেক নিরাপদ। ডাঃ স্টেপটো ঠিক এ কারণেই শ্রীমতী লেসলী ব্রাউনের দেহ থেকে প্রথম সুযোগেই বাদ দিয়ে দিলেন অসুস্থ দুটি ফ্যালোপিয়ান নল।

১৯৭৫ সালের আগেই ডাঃ স্টেপটো এবং ডাঃ এডওয়ার্ডস দীর্ঘ কয়েক বছরের পারস্পরিক সহযোগিতা ও একনিষ্ঠ গবেষণাকালে অন্তত বাটটি মনুষ্যডিম্বকোষকে কৃত্রিমভাবে নিষিক্ত করেছেন এবং বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ে সেগুলিকে সংস্থাপিতও করেছিলেন নিজ নিজ মাতৃগর্ভে। কিন্তু গর্ভধারণ সম্ভব হয়েছিল মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এবং স্থায়িত্ব ছিল

এক থেকে দুই সপ্তাহ যায়।

ভ্রূণ সংস্থাপনে এ অসাফল্যের কারণগুলি অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন তিনটি প্রধান ত্রুটির দরুণই বার বার তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন : এক, ডিম্বকোষটির পূর্ণতাপ্রাপ্তি বা ওভুলেশনের জন্য যে হর্মোন সব থেকে প্রয়োজনীয় তার সবিশেষ পরিচয় ও সঠিক মাত্রা জানা দরকার। এবং প্রয়োজনে তার নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানীদের হাতেই থাকা দরকার।

দুই, কৃত্রিম পরিবেশে সৃষ্ট ভ্রূণকোষটির জনতাত্ত্বিক ত্রুটি বা জেনেটিক অ্যাবনরম্যালিটি আছে কিনা, সংস্থাপনের আগেই তা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার।

তিন, ভ্রূণকোষটিকে বিভাজনপর্বের ঠিক কোন পর্যায়ে সংস্থাপিত করলে মাতৃজঠরের পক্ষে তা সব থেকে গ্রহণযোগ্য হবে, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আগে থেকেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

ঋতুচক্রের মধ্যবর্তী যে সময়টিতে কোনো একটি ডিম্বাশয় থেকে পরিপূর্ণ ডিম্বকোষটি বেরিয়ে আসে ঠিক সে সময়ে নারী দেহে অতি সূক্ষ্ম হলেও কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যেমন হঠাৎ প্রায় এক ডিগ্রি ফারেনহাইট দেহ-তাপমাত্রার হ্রাস এবং কিছু পরে স্বাভাবিকের তুলনায় অল্প পরিমাণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, স্তনবৃন্তে দৃঢ়তা, দেহে স্বল্প পরিমাণে স্পর্শকাতরতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অতিরিক্ত অনুভূতি সম্পন্ন মহিলারা অনেক সময়ে নাভিমণ্ডলের বাম বা ডানদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্প বেদনার অনুভূতিও পেয়ে থাকেন।

কিন্তু এ ধরনের গবেষণায় রোগিণীর এই সামান্য পরিমাণ অনুভূতিকে ভরসা করা চলে না। সুতরাং নিশ্চিত করে জানা চাই ঠিক কখন এবং বাম কিংবা ডান দিকে ঠিক কোন ডিম্বাশয়ে ডিম্ব-কোষটি পরিপূর্ণ হয়েছে এবং ফলিকল ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আবার ঐ নির্দিষ্ট সময়-টির জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না। তাই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না করতে পারলে গবেষণা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এছাড়া একটিমাত্র ডিম্ব-কোষকে নিয়ে নিষিক্তকরণ কিংবা ভ্রূণসৃষ্টির প্রয়াসও কিছু যুক্তিসংগত নয়। কৃত্রিম পরিবেশে নানা কারণেই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বহুদিন আগেই সুইডেনবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ডাঃ কার্ল একসেল জেম জেল এক বিশেষ ধরনের হর্মোন আবিষ্কার করেন নারীদেহে যা প্রয়োগ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ডিম্বাশয়ে একই সঙ্গে একাধিক ডিম্বকোষ পরিপূর্ণ করতে পারে। এই হর্মোনটি প্রয়োগ করে তিনি একসময়ে ডিম্বাশয়ে ত্রুটিজনিত বহু বন্ধ্যানারীর গর্ভ সৃষ্টিতে সক্ষমও হয়েছিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে শল্যবিদ্‌দের কাছে একটি নতুন যন্ত্রের আবির্ভাব ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এ যন্ত্রটির নাম ল্যাপারোস্কোপ। টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ এবং 'মাইক্রোস্কোপ' বা 'অনুবীক্ষণ' যন্ত্রের সমন্বয়ে নির্মিত দুয়েরই এক পরিবর্তিত রূপ। যন্ত্রটির মূল গঠন কৌশলটি খুব জটিল নয়। ফুটখানেক লম্বা একটি নলের প্রান্তভাগে থাকে একটি ঠাণ্ডা আলোক উৎস এবং প্রায় তারই সঙ্গে জোড়া লাগানো একটি আতশ কাচ বা আই পীস। নাভিমণ্ডলে ছোট একটি ছিদ্রের সাহায্যে যন্ত্রটির অগ্রভাগকে পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এবং আই পীসটিতে চোখ লাগিয়ে শল্যবিদ অনায়াসেই পেটের ভিতরে শারীরিক কোনো ত্রুটির সন্ধান পেতে পারেন। ফলে বড় আকারের কোনো অস্ত্রোপচার না করেই দেহাভ্যন্তরের বহু ত্রুটিরই অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে এই যন্ত্রটির সাহায্যে। পেটের ভিতরে সূক্ষ্মতম যন্ত্রাংশটিকেও যাতে পরিষ্কার দেখা যায় তার জন্য পরীক্ষাকালে পেটের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড অথবা কোনো নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বাতাসের চাপে একটি বেলুন যেমন ফুলে ওঠে, এই গ্যাস প্রয়োগে ঠিক তেমনি করেই পেটটি ফুলে [illegible] উঠে আসে বুকের দিকে এবং এর ফলে বহু [illegible] পরিসরে অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রগুলিও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে অতি সহজে।

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণায় ল্যাপারো-স্কোপের উন্নতিসাধন করার বহু প্রচেষ্টা চলেছে পৃথিবীর নানা-দেশে। শোনা যায় সারা পৃথিবীতে যে কটি ল্যাপারোস্কোপ সব থেকে ত্রুটিহীন বলে গণ্য তার মধ্যে শ্রেষ্ঠটিই ব্যবহার করেন ডাঃ স্টেপটো।

লেসলী ব্রাউনকে সন্তানবতী করতে যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার কোনো ত্রুটি রাখেন নি স্টেপটো এবং এডওয়ার্ডস জুটি। দীর্ঘ নটি বছর ধরে তাঁরা এই মহিলাকে পরীক্ষা করলেন চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের নানান মাপ-কাঠিতে। নিখুঁত পর্যবেক্ষণ চালালেন রোগিণীর ধৈর্য, মানসিক ভারসাম্য, সন্তান আকাঙ্ক্ষা এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে সহযোগিতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে। সবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার। শ্রীমতী ব্রাউনের দেহে প্রয়োগ করা হল একটি নিয়ন্ত্রক হর্মোন যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই সংগে উৎপাদন ঘটাবে একাধিক ডিম্বকোষের। প্রস্তুত করা হল গর্ভাধানের জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, বহু পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতায় নানাবিধ রাসায়নিক লবণ, খাদ্যরস ও রক্তরস সহযোগে প্রস্তুত হল সুনির্ধারিত একাধিক অনুকূল কৃষ্টিমাধ্যম বা কালচার মিডিয়াম যার মধ্যে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে চলবে গর্ভাধান ও কোষ বিভাজনের পর্বগুলি।

ডিম্বকোষ নির্গমনের নির্ধারিত সময়টিতে লেসলীর নাভীমণ্ডলে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করে ল্যাপরোস্কোপের সাহায্যে সঠিকভাবে দেখে নেওয়া হল ডিম্বকোষগুলির তৎকালীন অবস্থা ও অবস্থান। পরে নির্দিষ্ট ডিম্বাশয়ের নিকটতম অঞ্চলে আর একটি ছিদ্র সৃষ্টি করে সাধারণ পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত একটি সূক্ষ্ম পিপেট নলের সাহায্যে বার করে আনা হল সব কটি ডিম্বকোষ। গর্ভাধানের জন্য কৃষ্টি মাধ্যমে স্থাপন করার আগে ডিম্বাকোষের বাইরের আঠালো কোষস্তরগুলিকে পরিষ্কার করে নেওয়া হল কৃত্রিম-ভাবে প্রস্তুত একটি ধৌতকারক তরলের মৃদু ধারা স্নানে—ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে ফ্যালোপিয়ান নলে স্বাভাবিক পরিবেশে।

লেসলী-স্বামী জন ব্রাউনের কাছ থেকে অতি সতর্কতার সংগে সংগ্রহ করা হল শুক্রকোষ। ডিম্ব মিলনের পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় সেগুলি যেভাবে প্রস্তুত হয়, ঠিক সেভাবেই ঐ শুক্রকোষগুলিকেও প্রস্তুত করে নেওয়া হল। এল মিলন পর্ব। নির্ধারিত কৃষ্টিমাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি ডিম্ব-কোষের সংগে মিলন ঘটানো হল শুক্রকোষের। প্রতিটি অধ্যায়েই প্রয়োজন নানা সতর্কতা নানা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নারীদেহে যা ঘটে থাকে অত্যন্ত সহজ সাবলীলভাবে। চললো পর্যবেক্ষণ পরীক্ষানিরীক্ষা এবং পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য প্রতীক্ষাপর্ব।

গর্ভাধান সমাপ্ত হলে সৃষ্ট ভ্রূণকোষটিকে স্থানান্তরিত করা হল পরবর্তী কৃষ্টি মাধ্যমে। এ কৃষ্টিমাধ্যমটি রাসায়নিক পরিচয়ে ও গঠনে পূর্ববর্তী মাধ্যম থেকে অনেকটাই পৃথক ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফ্যালোপিয়ান নলে। এ পর্যায়ে চললো ভ্রূণকোষের বিভাজন পর্ব। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার। মিলনের পরবর্তী পঞ্চাশ ঘণ্টায় বিভাজিত অপত্য কোষের সংখ্যা দাঁড়ালো আট। পরীক্ষা চললো পৃথক পৃথক ভাবে বিভাজিত এবং একই পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি ভ্রূণকোষের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠটিকে বাছাইয়ের, যেটিকে সংস্থাপন করা হবে মাতৃজঠরে।

পূর্ববর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল বিভাজন পর্বের ঐ অষ্টম স্তরেই ভ্রূণটিকে সংস্থাপন করা হবে লেসলী গর্ভে। ভ্রূণটিকে গর্ভে স্থাপনের আগেই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় এবং প্রয়োজনীয় হর্মোন প্রয়োগে গর্ভাশয়কে করা হয়েছিল ভ্রূণধারণে যথেষ্ট আগ্রহী ও উপযোগী।

অতি সূক্ষ্ম একটি পিপেট বা কাচনলের সাহায্যে [illegible] প্রবেশ করানো হল লেসলীর জরায়ুতে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল না অস্ত্রোপচারের। স্বাভাবিক অবস্থায় যে পথে শুক্রকোষগুলি প্রবেশ করে সেই জরায়ুমুখ দিয়েই প্রবেশ করলো পরিণত ও পরিপূর্ণ ভ্রূণটি এবং মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার ব্যবধানেই সে বাসা বাঁধলো জরায়ু-দেওয়ালের একটি পছন্দমতো অংশে। বৃদ্ধি চললো সহজ স্বাভাবিক সাবলীল গতিতে।

নানা মনে প্রশ্ন উঠেছে সদ্যজাতা লুই ব্রাউনের জন্ম কি স্বাভাবিক? স্টেপটো এবং এডওয়ার্ডস তাই পাল্টা একটি প্রশ্ন রেখেছেন শত সহস্র সাংবাদিক এবং ঈর্ষাপ্রবণ সমালোচকদের কাছে : স্বাভাবিক নয় কেন? গর্ভাধান পর্বটিকে বাদ দিলে লুই-এর জন্মলতিকাটিতে অস্বাভাবিকতা কোথায়?

গর্ভাধান ঘটেছিল ১৯৭৭-এর নভেম্বর মাসের দশ তারিখ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের হিসেবে তার জন্মদিনটি হতে পারতো ১৯৭৮-এ আগস্ট মাসের চার তারিখ। এমনকি গর্ভকালীন পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুসারে লুই জন্মও নিত প্রকৃতি নির্ধারিত স্বাভাবিক জননপথ ধরেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনাবশ্যক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া আদৌ যুক্তিসংগত ছিল না। আর অস্ত্রোপচার-প্রসব তো সব সময়েই সাহায্য করে জন্মগ্রহণে। এ কারণেই তো সিজারিয়ান।

॥ সাত ॥

প্রশ্ন রেখেছিলাম বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের কাছে। আমাদের দেশেও বন্ধ্যা নারীর সংখ্যা কী বেশী? তাঁদের বন্ধ্যাত্ব মোচনের ব্যবস্থা কী কিছু আছে? এ দেশের শল্যবিদরাও কি ল্যাপারোস্কোপ নামক অতি আধুনিক এই পর্যবেক্ষণ যন্ত্রটি ব্যবহারের সুযোগ পান? বন্ধ্যাত্বমোচন সম্পর্কিত কোন গবেষণা কি এদেশেও চলেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তরগুলি খুব আশাব্যঞ্জক মনে হয়নি। বন্ধ্যা-নারীর সংখ্যা এদেশেও খুব কম নয়। নানা সংক্রামক রোগের আক্রমণ, পরিবেশ দূষণ, বহুবিধ কীটনাশকের অপরিণামদর্শী ব্যবহার বিশেষত ডিডিটি ফলিডল ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে বন্ধ্যাত্বের সংখ্যা বোধহয় বাড়ছে এবং দেশের সাধারণ জন্মহার যতোই বেশী হোক না কেন, প্রত্যেক বন্ধ্যা নারীই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে এদেশেও চান মা হ'তে।

এদেশে চিকিৎসাব্যবস্থা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তত চিকিৎসকের যোগ্যতা অন্যান্য যে কোনো উন্নত দেশের তুলনাতেই কম নয়। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা নানাবিধ। গোটা [illegible]ই ল্যাপারো-স্কোপ নামক এই যন্ত্রটির [illegible] হাতে গোনা যায়। প্রতি বারে এর ব্যবহার এমন কি এর পরিচালন ব্যয়টিও খুব কম নয়। যে যন্ত্রগুলি এদেশে আছে সেগুলিও একবার ভেঙে গেলে আর প্রতিস্থাপিত হয় না, সারিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও খুব সুলভ নয়। ফলে যন্ত্রতালিকায় এর থাকলেও প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশই অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। আমাদের এই কলকাতা শহরের যে বড় বড় হাসপাতালগুলি আছে তার মধ্যে মাত্র একটি বা দুটিতে শল্যবিদরা সুযোগ পান এ যন্ত্রটি ব্যবহারের। মফস্বলের বহু চিকিৎসক হয়তো এখনও এ যন্ত্রটিকে চোখে দেখারও সুযোগ পাননি।

আর বন্ধ্যাত্বমোচনে গবেষণা? একাধিক চিকিৎসক সখেদে জানালেন, যে দেশে অতিরিক্ত জন্মহার একটি সমস্যা, যে দেশে মানুষ হাজারে হাজারে বিনা খাদ্যে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, যে দেশে আজও শতকরা সত্তর আশিজন লোক ভোগেন পেটের অসুখে, ম্যালেরিয়ায়, কৃমি-হুকওয়ার্মের আক্রমণে ও কুৎসিত চর্মরোগে সে দেশে এ জাতীয় গবেষণা শুধু বিলাস বা সুখকল্পনাই নয় এর জন্য যে কোনো পরিমাণে অর্থব্যয় করাটাও অপরাধ বিশেষ।

কিন্তু বিজ্ঞান কি এদেশে থেমে আছে? অভাব কি কোনোদিন মানুষের জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহাকে অবদমিত করতে পারে? কোনো প্রতিবন্ধকই কি কোনোদিন সফল হয়েছে মানুষের জয়যাত্রার বিজয়কেতনকে অপহরণ করতে?

রাগ-অনুরাগ
রবিশঙ্কর

॥ ২৯ ॥

তো এই মাইহারের সময়টাতেই গড়ে উঠল আলি আকবরের সঙ্গে আমার গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ। ও বলত ওর সমস্ত মনের ব্যথার কথা, আমার পরামর্শ নিত। সেই ভালবাসার বুনিয়াদটাই তো যোগাত আমাদের যুগলবন্দীর খাদ্য!

তা যাক, আবার আলি আকবরের সেই পুরনো কথা বলছি। বাবা এসে দেখলেন যে, ও কিছু মেহনত-টেহনত করেনি, কিছু রেকর্ড-টেকর্ড কিনেছে, ঐ দায়গল-টায়গলের গান, আরও কত কি সব। বাবা সত্যি খুব চটে যান। এবং তারপরই ধরে বেধড়ক পিটিয়ে-পাটিয়ে শেখাতে শুরু করেন। সে ধরো ওকে গাছে বেঁধে, তিন-তিন দিন ধরে মেরে কি উপোস করিয়ে, শাস্তি দিয়ে, পরে সকাল-বিকেল মিলিয়ে বারো কি চোদ্দ ঘণ্টা করে ওকে রেওয়াজ করাতে লাগলেন। এবং ওটাই ওর জীবনের turning point হল। আমি ফিরে গিয়ে ওকে দেখে একদম স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি তখন ওকে দেখছিলাম প্রায় ১ বছর আট মাস পরে। আর যাকে আমি দেখে হতাশ হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বাবার উপযুক্ত ছেলে হবে কিনা সন্দেহ, সে তখন এমন দুর্ধর্ষ বাজাচ্ছে যে, আমি একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। তার মানে এত মেহনত বাবা করিয়েছিলেন বলেই আমরা এত বড় একজন শিল্পীকে হারালাম না। অবশ্য বলা যায় না কিছুই। জিনিয়াস যখন, একদিন-না-একদিন হতই। তাও আমি ভাবি যে, এরকম বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশের মধ্যে কত বড় একটা দান আছে বাবার। কসরত করে, জোর করে ওকে শিল্পের পথে এগিয়ে দিলেন।

'৩৮ সালে যখন আমি মাইহারে শিখতে গেলাম তখন প্রথম-প্রথম আমি উপযুক্ত ছিলাম না যে, বসি ওর সঙ্গে। বয়সে ছোট হলে কি হয়, বাজনায় তো ও আমার সিনিয়র ছিল। তখন আমি সেতার ও সুরবাহার দুটোই বাজাচ্ছি। বাবা একসঙ্গেই আমাদের শেখাতেন—আমাদের তিনজনকে। কখনও কখনও আমি আর আলি আকবর একসঙ্গে বসতাম, কখনও আমি আর অন্নপূর্ণা। এরকম করে আমার মনে হয় আমাদের, মানে আমার আর আলি আকবরের, যুগলবন্দীর সূচনা হয়। ঐ যে একসঙ্গে বসে বাজানো তাতে প্রথম-প্রথম আমাকে একটু অন্যভাবে সেতার মেলাতে হত, পরে রেওয়াজ করে করে আমরা প্রায় একই সুরে নিয়ে আসতে পারলাম। আমাকে নামাতে হল খানিকটা সুর, ওকে চড়াতে হল। অনেক দিন পরে আমাদের যুগলবন্দী যে

আলি আকবর ভাই হল গিয়ে এক অতি উচ্চ স্তরের জিনিয়াস। একটা অতুলনীয় শক্তি আছে ওর। বাবার তালিম তো আছেই, তার ওপরে ওর যে একটা individual imagination—দারুণ ব্যাপার ভাই। ওপরের ছবিতে আলি ভাই সরোদ বাজাচ্ছে বাবা আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে। তবলায় আমার শ্বশুর, অত্যন্ত গুণী তবলাশিল্পী, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। যার কাছে যিনি হীরুবাবু বলে জনপ্রিয়। এই চমৎকার জলসার আয়োজন করেছিলেন বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করল তার শুরু ঐ আমাদের একসঙ্গে বসে বসে শিক্ষা নেওয়ার মধ্যে। বাবার এক দিকে আলি আকবর বসত, আর এক দিকে আমি। আমরা অনেক জায়গায় ঐভাবে পাশাপাশি বসে বাজিয়েছি। ছবি দেখেছ নিশ্চয়ই। তানসেন, সদারঙ্গ, আরও নানান জলসায়। তাতেই আমাদের যুগলবন্দীর সৃষ্টি। তার আগে তো সেতার-সরোদ কোনও দিনই একসঙ্গে বাজেনি। প্রথম আমাদের যুগলবন্দী হয় ১৯৩৯এ, এলাহাবাদে। সকালের রাগ তোড়ী বাজিয়েছিলাম। পরে বাড়িতে শেখার সময়ে একসঙ্গে বসতাম আমরা। লখনৌতে আমি যখন প্রথম প্রোগ্রাম করতে যাই, আলি আকবর ভাই তখন লখনৌ রেডিও স্টেশনে স্টাফ আর্টিস্ট ছিল। সেটা ১৯৪১ থেকে '৪৩এর কথা। পরে কানপুর, এলাহাবাদ—এসব জায়গাতেও আমরা একসঙ্গে আরও বাজাই।

তা যা বলছিলাম। আলি আকবর ভাইয়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য কল্পনার ব্যাপার ছিল, যেটা আমি প্রথম দিকে চিনতে পারিনি বা বুঝতে পারিনি। ওটা ক্রমে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেল, তা সে বাবার তালিম এবং ওর একটা অসামান্য সংগীতচেতনা, সব মিলিয়েই। ও এত অদ্ভুত, নিজস্ব সুরের কল্পনা এবং

ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ জন্মই নিয়েছিলেন সরোদের ঘরে, এবং সরোদ নিয়েই তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন। নিজের ঘরের বাজনার তালিম ছাড়া উনিও রামপুরে এসে উজীর খাঁ সাহেবের কাছ থেকে ধ্রুপদ-ধামার এবং সুরশৃঙ্গারের শিক্ষা নেন। এই সূত্রে উনি এবং বাবা ছিলেন গুরুভাই। খাঁ সাহেবের গলাও ছিল খুব সুরে। আর ওঁর বাঁ হাতের টিপের কথা তো সবাই জানেন।

বিস্তার থেকে থেকে করতে পারে যে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাকে তাই দিয়ে বিলকুল মাত করে দেয়। ওর বাজনায় ঐ যে মাখো-মাখো ভাব, তার মধ্যে প্রচণ্ড ভালবাসা লুকিয়ে থাকে। ওর একটা প্রগাঢ় ডেপ্‌থ্‌ বরাবরই ছিল। আর সেই সঙ্গে কি করে যে হল বলতে পারব না, ওর সেই অদ্ভুত পরিমিতিবোধ, sense of proportion। যেটা আমার নিজেরও খুব ভাল, কিন্তু আমার হবার একটা কারণ আছে। কারণ, আমি ছোট থেকে নাচ শিখেছি এবং বিদেশে কত বড় বড় শিল্পীদের নাচগান দেখেছি শুনেছি। সব সময়ে যে একটা রাগকে লম্বা-চওড়া করে দেখাতে হবে, তার কোনই মানে নেই। কখনও তিন ঘণ্টা লাগছে যে রাগে, তাকেই দরকারমত আধ ঘণ্টায় পরিবেশন করা যায়। প্রয়োজনবশে গান-বাজনাকে সময়ের সীমার মধ্যে বাঁধতেই হয়। তাতে কোথায় কতটুকু লাগছে, কি কি রাখা দরকার, কি না বললেও চলে—এসব বুঝে-শুনেই একটা পরিবেশনের পুরো রূপ এবং মেজাজটা খুলে দিতে হয়।

এখানেই বলতে চাই একটা কথা। এ কথাটা কিন্তু বোদ্ধা লোকদের নিয়ে নয়; বরং আধা-সমঝদার যারা, তাদের নিয়ে; মানে যারা ঘড়ি দেখে বাজনা শোনে। কতক্ষণ আলাপ হল? না সত্তর মিনিটের আলাপ। আশি মিনিটের আলাপ হলে যেন আরও ভাল হত। ষাট মিনিটের আলাপ যেন একটু কম হয়ে গেল। এটা একটা অদ্ভুত মনোভাব এবং এটাই আজকাল সংগীতের সমস্যা। রাগ-সংগীত তো আর made to order entertainment না। বুঝছ না? শুধু আলাপ, আলাপ আর আলাপ হচ্ছে, বেশির ভাগ শ্রোতা ভাবছে আলাপটা খতম হলে বাঁচি, কখন গৎ ধরবে রে বাবা! এই ভাব নিয়ে কি দরকার বাহাদুরি দেখাবার? আর একটা কথা আছে। ধরো খানদানী রসময় জিনিস যদি হয়। পুরনো কথা আছে হিন্দীতে, বাবা খুব বলতেন—হনডি মে চাওয়ল পকা ক্যা নহি এক দানেসে পতা লগতা। চাল সেদ্ধ হল কিনা সেটা জানার জন্য তো গোটা হাঁড়ির

ভাত টেপার দরকার হয় না, এক-আধটা টেপলেই বোঝা যায়। এরকমই বাজনারও বাহাদ্বরি তার সংক্ষ্ম, রসোত্তীর্ণ কাজে, তার আবেদনে। তার ঘণ্টা-মাপা দৈর্ঘ্যে নয়। এই ধরনের ফলাও-করা পেশকারি আমার চিরদিনই খ্ব খারাপ লেগেছে। আমার কথা হল—স্বতঃস্ফ্র্তভাবে চালিয়ে যাও, তাতে যদি অনেক দ্বর যেতে হয় যাও। তাতে দেখবে হয়তো দ্ব ঘণ্টা বাজালে অথচ মনে হল দশ বা পনরো মিনিট বাজিয়েছ। শ্রোতার মন বলছে, আরও চাই, আরও চাই। বাজনা হল এটাই। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই যদি শ্রোতার প্রাণ আইঢাই করে, ঘ্বম পায়, তার মনের ভাবখানা হয় যেন ওব্বধ খাওয়ার মত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, সে বাজনা লম্বা হওয়ার প্রয়োজন কি? এই পরিমিতিজ্ঞানটা আমার দাদার থেকে পেয়েছি। He was an ideal artiste in this regard। দাদার মধ্যে এটা আমি চিরদিনই দেখেছি। লোককে কিছ্ব প্রেজেন্ট করতে হবে, সেখানে পরিমিতিজ্ঞান একটা খ্বব প্রয়োজনীয় জিনিস। অনেকে সেটা খারাপ অর্থে নেয়, কিন্তু সেটা মোটেই খারাপ কিছ্ব নয়। ভাল ভাল শিল্পী, যাঁদের আমি নাম করেছি আগে, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেটা ছিল। সে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কথা বল, কি এনায়েত খাঁ সাহেবের কথা বল, কি থেরকুয়া খাঁ সাহেবের বাজনা বল। অনেক বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন যাঁদের ভেতর একটা চমৎকার সময়জ্ঞান ছিল। তাঁরা জায়গা ব্বঝে এই অলংকার এইভাবে এই মাত্রায় কাজে লাগাতেন। এবং সেটার দরকারও ছিল। অনেকে যে সময়ের মাপ দিয়ে গানের উৎকর্ষ বোঝাতে চান সেটা ভুল। তুমিও নিশ্চয়ই ভেবেছ কখনও-না-কখনও যে, অম্বকের ঐ গান বা বাজনাটা আর একট্ব ছোট হলে ভাল হত। ভাবতে বাধ্য। এনায়েত খাঁরই কথা ধরো না কেন। যাঁরা ওঁকে সামনাসামনি শোনেননি তাঁরা অবধি জানতে পারেন ওঁর জিনিয়াস কতখানি ওঁর রেকর্ডগ্বলো বাজিয়ে শ্বনে। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবেরও রেকর্ডে ওঁর গানের যে নিচোড় সেটা তুমি পাবে। গ্বলাম আলি খাঁ সাহেবের যে ক'টা রেকর্ড আছে তার মধ্যে ওঁর কতখানি মাহাত্ম্য ফ্বটে আছে

নিখিল, অর্থাৎ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি খ্বব অ্যাডমায়ার করি। ওর ভেতর অনেক রকমের শিক্ষা মিলে একটা চমৎকার জিনিস গড়ে উঠেছে। তবে নিখিলের বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা যে, ওর চেষ্টাও ছিল, এবং ও শেষ অবধি অত বড় হতেও পারল। অনেকেই হতে পারত-পারত করে কিছ্বই হয় না।

ভীষণ পছন্দ করি আমি আমজাদের বাজনা। এ য্বগের একটা অদ্ভুত প্রতিভা বলতে পার। তা ছাড়া বড় বাপের বেটা ; প্রচণ্ড জেদ এবং মেহনত করে ও যে এত উপরে উঠেছে এর একমাত্র নজির দেখা যায় এ য্বগের বিরাট সেতারী বিলায়েত খাঁর মধ্যে। প্রিয়দর্শন আমজাদের একটা বিরাট asset ওর বেশভূষা এবং চমৎকার dignified ব্যবহার।

তুমি বল। কেন, আবদ্বল করিমের কথাই ধরো। প্রত্যেক বড় বড় শিল্পীই তাঁদের সাড়ে তিন মিনিটের রেকর্ডগ্বলোতে তাঁদের অক্ষয় স্মৃতি রেখে গেছেন। এবং আমি বলতে চাই যে, এটা প্রায়ই দেখা যেত সে য্বগে। আমার মনে আছে বেহেরে ওয়াহিদ খাঁর মত লোকেরা, যাঁরা এক-একটা রাগ পাঁচ ঘণ্টার মতনও গাইতে পারতেন, তাঁরাও কখনও পনরো মিনিট, কখনও বিশ মিনিট, বা কখনও আধ ঘণ্টার মধ্যে কি অদ্ভুত জিনিস দিয়ে গেছেন ছোট-খাটো জলসায় বা রেডিওর প্রোগ্রামে। একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! যে আসল বস্তুটা জানে সে-ই ঠিক বিচার করে, নির্বাচন করে, ছোটর ওপরে প্বরো জিনিসটাই অক্ষত রেখে জায়গা ব্বঝে সাজিয়ে তুলতে পারে। ব্বঝলে না!

যা হোক, এতগ্বলো কথা বলে সেই প্বরনো কথায় ফিরে আসছি। এই profundity এবং sense of limit আলি আকবর ভাইয়ের মধ্যে চিরদিনই ছিল। অদ্ভুত ছিল। কখনও যে বোরিং হয়ে যাচ্ছে কিছ্ব একটা, এরকম কোনও দিনও করেনি। ঠিক একইরকম, একই জিনিসই যে বাজায় তা নয়; তবে যতই বিচিত্র ঢঙে বাজাক না কেন, যত অভিনব কাজ কর্বক না কেন, এই sense of proportion এর গ্বর্বত্বটা ওর সর্বক্ষণ হাজির থাকে। এই জিনিসটাই অনেকটা অন্যরকমে বিসমিল্লার মধ্যেও আছে। ওঁর ক্যানভাসটা হয়তো খ্বব বড় নয়, কিন্তু ওরই মধ্যে ওঁর যে বৈচিত্র্য, ওটাকেই উনি স্বন্দর হিসেবের মধ্যে সাজিয়ে-গ্বছিয়ে পেশ করেন। এবং সেটাই ওঁর স্বর্প। উনি নিজের পরিমিত দায়রার মধ্যে একটা চরম উৎকর্ষে, মাহাত্ম্যে পৌঁছে গেছেন। রাগ দিয়ে শ্বর্ব করে, কাজরি বা অন্যান্য ধ্বন বাজিয়ে শেষ করে শ্রোতাকে একেবারে ম্বগ্ধ করে দেন। এক অতুলনীয় শিল্পী!

হ্যাঁ, নিখিল। নিখিলকে আমি ভীষণ অ্যাডমায়ার করি। আমার মনে হয় কোনও সংগীতজ্ঞের যদি জেদ না থাকে সে কখনও বড় হতে পারে না—নিখিলের মধ্যে এই জেদটা আমি বরাবরই খ্বব লক্ষ করেছি। ও আমার কাছে শিখতে এসেছিল, মনে আছে, ১৯৪৫ সালে, কলকাতায়। ওকে শিখিয়েও-ছিলাম ললিত, রামকেলি ইত্যাদি। ও অনেকের কাছ থেকে শিখেছে। আশা করি, ও স্বীকার করে সেটা। মানে ম্বস্তাক আলির কাছ থেকে, রাধিকামোহন মৈত্র, বীরেন্দ্রকিশোর ইত্যাদি অনেকের কাছ থেকেই ও তালিম পেয়েছে। এবং পরে মাইহারে গিয়ে বাবার কাছে কয়েক বছর থেকে শিখেছে। আলি আকবরের কাছে, অন্নপ্বর্ণার কাছেও খ্ববই শিখেছে। এখনও সময় পেলে তালিম-টালিম নেয়। যাই হোক, ওর ভেতরে অনেকরকমের শিক্ষা মিলে একটা চমৎকার জিনিস গড়ে উঠেছে। ওর এক ছোট ভাইও খ্বব ব্রিলিয়ান্ট ছিল, তবলা বাজাত। অকালে মারা গেল বেচারা। তবে নিখিলের বিষয়ে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার যে, ওর অত চেষ্টাও ছিল, এবং ও শেষ অবধি অত বড় হতেও পারল। অনেকেই তো কি হতে পারত-পারত করে কিছ্বই

না। কিন্তু নিখিল মেহনত করে নিজেকে বড় করতে পেরেছে। নিজের কটা ছাপ ফেলতে পেরেছে বাজনার ওপর, এটা খুবই সুখের কথা। শুরুরে কে ওর বাজনায় আমার ছাপই ছিল পুরোপুরি। পরে মেহনত আর ওয়াজ করে ও বিলায়েত খাঁরও অনেক কিছু বাজনায় নিয়েছে। বিশেষ রে বিলায়েতের তান, যেটাকে গায়কী অঙ্গ বলে প্রচার করা হয়। যা হোক, ব মিলিয়ে নিখিল একটা চমৎকার নিজস্ব বাজনা দাঁড় করিয়েছে। খুব তৈরী জায়। আমার খুব ভাল লাগে ওর বাজনা। আর তা ছাড়া ওর বাজনায় মাদের ঘরের আমেজটা সম্পূর্ণ আছে। আমাদের পরের জেনারেশনের বচেয়ে বড় শিল্পী বলে আমি ওকে মনে করি।

তারপর এদের মধ্যেই আছে বিলায়েতের ভাই ইমরৎ খাঁ। ইমরতের জনাও আমার খুব ভাল লাগে। ও বাপের যা কিছু তালিম ভাইয়ের কাছ কেই পেয়েছে। তা ছাড়া ওর বাজনায় আলাপের অংশে আমাদের ঘরেরও নেক প্রভাব আছে। এটা কেবল আমি মনে করি বলে বলব না। অনেকেই সেটা নে করে। এবং এটা কোনও খারাপ কথা না। সংগীতে এটা হয়। ইমরৎ াকটাও বড় ভাল। আমার ওর বাজনা এবং ব্যবহার দুটোই খুব ভাল াগে। ছোট থেকেই দেখেছি ও আমার বাজনায় চলে আসত, শুনত। শোনা, াখা, জানার আগ্রহ ওর চিরদিনের। মনের পরিধিটা বিস্তৃত করার জন্য রাবরের চেষ্টা ওর। এই সেইদিন লন্ডনে ওর একটা বাজনা শুনতে গিয়ে-ছলাম। সঙ্গে বাজাল বসে ওর দুই ছেলে। বড় ছেলে ষোল বছরের নিশাৎ ড়ের মত তৈরী বাজায়; ছোট ছেলে চোদ্দ বছর বয়সের ইরশাদ দেখতেও রকম মিষ্টি, হাতটাও ওর মিষ্টি এবং সুরে। ও সুরবাহারও বাজায়। াপের সঙ্গে একত্রে সুরবাহার বাজাল। সত্যি, সেদিন আমার খুব ভাল াগল ওদের শুনে। কি মেহনতটাই না করিয়েছে এবং করাচ্ছে ছেলে দুটোকে য়ে। শুনেছি বিলায়েৎ ভায়াও ওর ছেলে সুজাৎকে খুব তৈরি করেছে। বার কলকাতায় গেলে শুনব ব্যাটাকে। এটা কি ভাল কথা বল দেখি শংকর— ই যে একটা ট্র্যাডিশন বজায় রাখা পুরুষানুক্রমে! আমার এখন দুঃখ হয়—

ারিমিতিজ্ঞানের ব্যাপারটা সব বড় শিল্পী, সে ফৈয়াজ খাঁ, এনায়েত খাঁ, কি ধরকুয়া খাঁ সাহেবের মধ্যে ছিল। ওপরের ছবিতে ধেরকুয়া খাঁ সাহেব বাজাচ্ছেন দখা যাচ্ছে। ওঁর পাশে বসে আছেন আর একজন শিল্পী, যাঁর মধ্যেও এই ারিমিতিবোধটা অসাধভাবে ছিল। তিনি তবলাশিল্পী কেরামত খাঁ।

কন ছেলেবেলা থেকে জোর দিয়ে বসাইনি আমার ছেলে শুভকে। অন্নপূর্ণা বশ্য বেশ কিছু পরে, যখন শুভর আঠারো-উনিশ বয়স, খুব ওকে মেহনত রাতে শুরু করল এবং তৈরিও করল বেশ ক' বছর ধরে; কিন্তু পড়াশোনার াপ, এবং ছবি আঁকার নেশা—এইসব নানান কারণে সেটা যেন ঠিক ফুটে উঠল া। শুভ খুব বাজাচ্ছিল ক'বছর। বাজাচ্ছিল ভাল, খুব লয় ও সুরে। তবে র ওপর সংগীতটা যেন একটা বড় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল। দাদু, মামা, বাবা, মা— কলের নামের ভার, সারা জগতের এক্সপেকটেশন—এইসব ওর ওপর একটা াংঘাতিক স্নায়ুচাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি যখন ওকে ১৯৭০ সালে মেরিকায় নিয়ে গেলাম আর্ট পড়াবার জন্য তখন ও রীতিমতন বিভ্রান্ত হয়ে ড়েছে। আর লাইন চেঞ্জ তো আমাদের পরিবারে হামেশাই হয়েছে। ছবির াক দাদা নাচিয়ে হয়ে গেলেন। আমি নাচ ছেড়ে বাজনা নিলাম। আর শুভ বাজনা ছেড়ে ছবি-আঁকিয়ে হল। এ যেন একটা পুরো চক্কর সমে ফিরে এল। তখন অন্নপূর্ণা তো বটেই, আরও অনেকেই আমার উপর খুব রেগে গিয়ে-ছিল। শুভ লস এঞ্জেলসে একটি আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করে। এখন তো ও আমার তিন বছরের মিষ্টি নাতি সোমশঙ্করকে নিয়ে সুখেতেই আছে। সেতার বাজায়, এখনও বেশ ভালই বাজায়, তবে পেশা হিসেবে নয়, শখে বাজাতে চায়। তবে যেমনটা বললাম, ভুল আমরা দুজনাই করেছিলাম। হয়তো উচিত ছিল সেই দু-তিন বছর বয়স থেকেই তাকে বকে-ঝকে জোর করে শেখানো। যেমনটা নাকি বাবা ভাই আলি আকবরকে করেছিলেন। তবে তখন আমার হয়তো একটু অন্যরকম মনোভাব ছিল। তার ওপর সেতারের বিষয়ে ওর বিশেষ আগ্রহ না দেখে ভেবেছিলাম, কি দরকার! আমার ছেলে বলে কি ওকে সেতার বাজাতেই হবে!

যা হোক, আবার ইমরতের কথায় ফিরে যাই। হালে লন্ডনে ওর ছেলের সঙ্গে বাজনা শুনে আমার দারুণ ভাল লেগেছে। তবে একটা জিনিস খারাপ লাগল। সেটা অবশ্য বাজানো নিয়ে নয়। ওর দ্বিতীয় স্ত্রী বিলিতী মেয়ে ডায়ান যে ধরনের প্রচার করছিল সেই নিয়ে। এবং যে জিনিসগুলো ওদের ব্রোশিওরে লেখা দেখলাম। এবং তার ক'দিন পরে রোববার সকালের বি বি সি টেলিভিসনের প্রোগ্রামে ইমরৎ নিজের মুখেও বলল যে, সুরবাহার যন্ত্রটা নাকি তার প্রপিতামহ সাহেবদাদ খাঁ সৃষ্টি করেছেন। বুঝি না, কি প্রয়োজন এইসব মিথ্যা এবং ভুল তথ্য চারিদিকে ছড়াবার। সত্যিকারের সুরবাহারের আবিষ্কারক বেচারা গোলাম মহম্মদ এবং তাঁর ছেলে বিরাট সুরবাহার-বাদক সাজ্জাদ মহম্মদ নিশ্চয় তাঁদের নিজেদের কবরে এপাশ-ওপাশ করছেন। এটা বাদ দিয়ে কিন্তু বলবই যে, আমার স্নেহ এবং ভালবাসা অনেক বেড়ে গেছে ইমরতের ওপর। সেও সেদিন আমাকে ফোন করে কত যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাল!

আমজাদের বাজনা সামনে বসে আমি একবারই শুনেছি। রেডিওতে কয়েক-বার শুনেছি। রেকর্ড ওর সবই শুনেছি। ভীষণ পছন্দ করি ওর বাজনা আমি। এ যুগের একটা অদ্ভুত প্রতিভা বলতে পার। প্রিয়দর্শন আমজাদের একটা বিশেষ asset—লেখাপড়া ভাল শিখেছে, চমৎকার dignified ব্যবহার। Organiser ও ভাল। ভাল ভাল লোকের সঙ্গে ওঠাবসা। প্রত্যেকের সাহায্য নিয়ে বাবার নামে Hafiz Ali Khan Memorial Conference প্রতি বৎসর কলকাতা, বম্বে, দিল্লীতে চমৎকারভাবে করে। ওর সঙ্গে যোগা-যোগ হয়নি আগে; তবে ইদানীং আমাকে ও এবং ওর স্ত্রী শুভলক্ষ্মী ওদের মিষ্টি, স্নেহময় ব্যবহারে খুব আপন করে নিয়েছে। তা ছাড়া বড় বাপের ব্যাটা, প্রচণ্ড জেদ। মেহনত করে ও যে এত উপরে উঠেছে, এর একমাত্র নজির দেখা যায় এ যুগের বিরাট সেতারী বিলায়েত খাঁর মধ্যে!

আমজাদের কথা যখন উঠলই তখন অবশ্যই বলতে হয় ওর বাবা ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ সাহেবের সম্পর্কে। ওঁর কথা অবশ্য আগেই আসা উচিত ছিল। কারণ, উনি আমার গুরুদেবের একজন সমসাময়িক মহান শিল্পী। এখন যেমন আমার আর বিলায়েত খাঁর মধ্যে যখন-তখন তুলনামূলক কথাবার্তা হয়, ওঁদের নিয়েও তখনকার দিনের সব উন্নাসিক লোকজন আবোল-তাবোল তুলনা করতেন। কিন্তু তুলনাটা কি করে হয় শংকর? কারণ, দুজনেরই সাংগীতিক অ্যাপ্রোচ এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। হাফিজ আলি খাঁ জন্মই নিয়েছিলেন সরোদের ঘরে, এবং সরোদ নিয়েই তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন। নিজের ঘরের বাজনায় তালিম ছাড়া উনিও রামপুরে এসে উজীর খাঁ সাহেবের কাছ থেকে ধ্রুপদ-ধামার এবং সুরশৃঙ্গারের শিক্ষা নেন। এই সূত্রে উনি এবং বাবা ছিলেন গুরুভাই। যদিও বছরের পর বছর লোকের সামনে উনি এক ঢঙেই বাজাতেন! ছোট আলাপ করে পর্বত সিং-এর পাখোয়াজের সঙ্গে তিন তালের দ্রুত গৎ—কিন্তু আমি মনে আছে '৪২ কি '৪৩ সালে ভাই আলি আকবরের সঙ্গে ওঁর গোয়ালিয়রের বাড়িতে বসে ওঁর বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাজিয়েছিলেন অল্পক্ষণই, কিন্তু সেই আমাদের বীণকার ঘরের মিশ্রা কি তোড়ীর আলাপ এবং জোড়, যা কখনও ভুলব না। খাঁ সাহেবের গলাও ছিল খুব সুরে। আর ওঁর বাঁ হাতের টিপের কথা তো সবাই জানেন। যেরকম সুরেলা তেমনি মিষ্টি। আর এই সঙ্গেই ছিল ওঁর ভগবানদত্ত চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব। সব মিলিয়েই তিনি শ্রোতাকে মুহূর্তের ভিতরে বশ করে ফেলতেন। (ক্রমশ)

স্ত্রী বলেছিলেন— আর ডিস্‌টেম্‌পার নয় !

কয়েক টাকা বেশী খরচ ক'রে আমি আনালাম ব্রিটিশ পেইন্টস্ ভাইনল

এখন আমাদের বাড়ীর চেহারাই পাল্টে গেছে !

ব্রিটিশ পেইন্টস্ ভাইনল হ'ল পলিয়েস্টারে সুসমৃদ্ধ ইমালসন পেইন্ট, যার ফিনিশ অন্য যে কোন অয়েল বাউণ্ড ডিস্‌টেম্‌পারের চেয়ে সত্যিই অনেক উৎকৃষ্ট, অথচ দাম মাত্র কয়েক টাকা বেশী।

সেজন্যে এখন বেশীর ভাগ লোক ব্রিটিশ পেইন্টস্ ভাইনল-এর দিকেই ঝুঁকছেন। পেইন্টস্ কারিগরীতে ব্রিটিশ পেইন্টস্ এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দিয়েছে।

"আমার সিদ্ধান্ত ফাইনাল পেইন্ট মানে, চাই ভাইনল"

ব্রিটিশ পেইন্টস্

VINYL
WALL PAINT

LINTAS/BP-VNL/32/2415-BG

সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২২ ॥

দ্বারকানাথ আবার বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। স্বদেশে আর তাঁর মন টিকছিল না, জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। তাছাড়া এখানে তাঁর প্রাণের দোসর বলতে আর কেউ নেই। তাঁকে সকলে ভয় পায় বা শ্রদ্ধা করে, কেউ ভালোবাসে না। বাণিজ্যে ও জমিদারি পরিচালনায় কৃতিত্বে তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। উপার্জন করেছেন প্রভূত ধন-সম্পদ, কিন্তু এক সময় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবলেন, কী লাভ এত পরিশ্রমে? তাঁর উত্তরাধিকারীরা যদি এ সব রক্ষা করতে না পারে বা না চায়, তাহলে তিনিই বা আর লক্ষ্মীর পিছনে ছুটোছুটি করে আয়ুক্ষয় করবেন কেন? বরং এবার দু'হাতে খরচ করে যাবেন। ইওরোপে তাঁর অগাধ খাতির, রূপসী ললনারা তাঁকে ঘিরে থাকবে সেখানে। সেদেশের খাদ্য ও মদ্যও অতি উচ্চশ্রেণীর।

বিলাত যাত্রার সময় দ্বারকানাথ সঙ্গে প্রচুর ধনসম্পদ তো নিয়ে গেলেনই, তাছাড়া তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন যেন তাঁকে হাতখরচ হিসাবে প্রতিমাসে একলক্ষ টাকা পাঠানো হয়। এবং এবার তিনি কতদিন থাকবেন, তার কোনো ঠিক নেই। একলক্ষ টাকা অর্থাৎ যা দিয়ে পাঁচ হাজার ভরি সোনা ক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয়বার প্রবাস যাত্রার আগে দ্বারকানাথের মনে সামান্য একটু সংশয় ছিল, এবারেও তিনি পূর্বেকার মতন সমাদর পাবেন তো? প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় দ্বিতীয়বার অনেকটা কমে যায়। তাছাড়া, তিনি আগেরবার যখন এসেছিলেন, তখন ইওরোপের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁকেই প্রথম একজন হিন্দু বা ভারতীয় হিসেবে চাক্ষুষ দেখলেন। এক রূপকথার দেশ ভারত, সেখানকার মানুষকে দেখতে কেমন, এই কৌতূহলই ছিল প্রবল। এবারে ইওরোপে পৌঁছেই দ্বারকানাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য একেবারে বিলাসের স্রোত বইয়ে দিলেন।

দ্বারকানাথ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ছোটখাটো একটি দল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ, তাঁর ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র, একজন নিজস্ব ইংরেজ চিকিৎসক, একজন [illegible] ছাত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার জন্য তিনি তাদের পথ-খরচ এবং বিলাতে তাদের আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এসেছে সেই দুটি ছাত্র এবং সরকারী খরচে আরও দুটি ছাত্র। বিলেতে পৌঁছে তিনি প্রথমেই ঐ ছাত্রদের এবং তাঁর পুত্র ও ভাগিনেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের পৃথক পৃথক বাসা ভাড়া করে দিলেন। তারপর দায়িত্বমুক্ত হয়ে তিনি স্বেচ্ছামার্গী হলেন।

আগের বার এসে তিনি সাহেব জাতিরা কী কী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে এবং শিল্প-বাণিজ্যে কোন কোন অভিনব পন্থা অবলম্বন করে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বদেশেও সেসব পন্থা প্রয়োগ করবেন। কিন্তু দ্বারকানাথ স্বদেশের উন্নতি কিংবা নিজ পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদাসীন। এখন তিনি নৃত্য, গীত, ভোজের আসর কিংবা থিয়েটার, অপেরা সম্পর্কে বেশী আগ্রহী। রানী ও রানীর স্বামীর (বিলাত এমনই দেশ, যেখানে রানীর স্বামী সব সময় রাজা হন না) জন্য তিনি স্বর্ণনির্মিত বহুমূল্য সব উপহার নিয়ে এসেছিলেন, রানী ও যুবরাজ সেগুলি পেয়ে অতিশয় উৎফুল্ল হলেন। রাজপ্রাসাদে দ্বারকানাথের ঘন ঘন ডাক পড়তে লাগলো। তাছাড়াও প্রখ্যাত সব ডিউক ও ডাচেস এবং লর্ড ও লেডিগণ পরিবৃত হয়ে তিনি থাকেন প্রায় সর্বদা। কেউ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনিও সমান বা তার চেয়ে বেশী জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁদের পাল্টা নিমন্ত্রণ করেন। মাঝে মাঝে তিনি প্রখ্যাত সব সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের ডেকে আসর জমান নিজের গৃহে। তিনি চান, ইংলন্ডের লোক বুঝুক পরাজিত জাতির প্রতিনিধি হয়েও একজন ভারতবাসী তাদের সমকক্ষ হতে পারে সব দিক দিয়ে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন দেখে দ্বারকানাথের মনে একটি নতুন চিন্তা এলো। ব্রিটিশ প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পার্লামেন্টের আসন অলংকৃত করেন। তাহলে ভারতীয়রাই বা কেন সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না? আর ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কে হতে পারে? পার্লামেন্টে আসন পেলে দ্বারকানাথের বিলাতে অবস্থান স্থায়ী হতে পারে।

এক নৈশভোজের নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যর গ্ল্যাডস্টোন একদিন নিজে এলেন দ্বারকানাথের বাসভবনে। তখন কথা প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ পার্লামেন্টে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। অস্বস্তিতে পড়লেন গ্ল্যাডস্টোন। এই মহামান্য অতিথির মনে আঘাত লাগবে এমন কোনো কথা তিনি বলতে পারেন না। প্রকারান্তরে তিনি জানালেন যে সেখানে কোনো অ-ব্রিটিশের নির্বাচিত হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দ্বারকানাথ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, তিনি যে কোনো স্থান থেকেই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারবেন। গ্ল্যাডস্টোনকে তখন বলতেই হলো যে, ধরা যাক যদি সেরকমই হয়, তবুও কোনো হিন্দুর পক্ষে পার্লামেন্টে শপথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। খৃস্টান ছাড়া আর কারুর সে অধিকার নেই।

দ্বারকানাথ প্রশ্ন করলেন, হিন্দু খৃস্টানে তফাৎ কী? হিন্দুও একমাত্র এক পরমেশ্বরের ভজনা করে, খৃস্টানেও কি তা করে না? হিন্দু ও খৃস্টানে তো ধর্মবিশ্বাসের কোনো সংঘর্ষ নেই, তবে তারা পাশাপাশি কেন বসতে পারবে না পার্লামেন্টে?

গ্ল্যাডস্টোন বললেন, খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুকে কি আপনারা ঈশ্বরের পুত্র বলে মানেন? যারা তা মানে না, তাদের আমরা বিপথগামী বলে মনে করি।

আলোচনা অপ্রিয় দিকে মোড় নিচ্ছে বলে [illegible]

থেকে তাঁর মনে খৃস্টীয় ধর্ম সম্পর্কে একটা বিরূপতার ভাব এসে গেল। দেশে থাকতে তিনি ব্রাহ্মণদের ছুঁৎমার্গ ও কুসংস্কার দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবার তিনি পাদ্রীদের নাম দিলেন কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে যখনই তিনি পাদ্রীদের কোনো পদস্খলন বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কাহিনী দেখতেন অমনি সেগুলি কেটে কেটে গঁদ দিয়ে সেঁটে রাখতে লাগলেন একটা খাতায়। তাঁর কোনো ইওরোপীয় বন্ধু বা অতিথি খৃস্টধর্মের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি শুরু করলেই তিনি সেই খাতাটি খুলে দেখান।

মাঝখানে কিছুদিন দ্বারকানাথ ঘুরে গেলেন ফ্রান্সে। ফরাসী দেশের সম্রাট লুই ফিলিপ প্রায় তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু হয়ে গেলেন। ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরেও দ্বারকানাথের গতিবিধি, সম্রাটের পত্নী ও ভগিনীর সঙ্গে এর আগে আর কোনো বহিরাগত কথাবার্তা বলার সম্মান অর্জন করেননি, একমাত্র দ্বারকানাথ ছাড়া। দ্বারকানাথের অঙ্গে দেশীয় পোশাক এবং একটি বহুমূল্য কাশ্মিরী শাল, তা দেখে মহিলারা মুগ্ধ।

ফরাসী দেশে এক সান্ধ্য সম্মিলনীর আয়োজন করে দ্বারকানাথ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সমেত ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ অভিজাতদের নিমন্ত্রণ করলেন সেদিন। তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করলেন সকলেই যেন তাঁদের স্ত্রী বা প্রেয়সীদের নিয়ে আসেন। একটি বিরাট হলঘরে বসেছে সেই সান্ধ্যভোজের আসর। সেই হলঘরের সব দেয়াল বহুমূল্য সব কাশ্মিরী শালে মোড়া। অতিথিরা, বিশেষত রমণীরা সেই কারুকার্যখচিত শালগুলি থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। কাশ্মিরী শাল অঙ্গে জড়ানো এখন ফরাসীদেশে একটি দারুণ ফ্যাসানদুরস্তুর ব্যাপার। কিন্তু এমন চমৎকার শাল ফরাসিনীরাও দেখেননি। কোনো নীলনয়না সুন্দরী দেয়ালের কোনো কাশ্মিরী শালের সামনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেই দ্বারকানাথ এসে বলছেন, মহাশয়া, এই শালটি আপনাকে উপহার দিয়ে আমি ধন্য হতে পারি কি? তারপরই তিনি দেয়াল থেকে সেই শালটি খুলে নিয়ে বিস্ময়াপ্লুত সেই রমণীর শরীরে নিজের হাতে শালটি জড়িয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সব কটি শালই এইভাবে বিলি হয়ে গেল। এমন নিমন্ত্রণ উৎসব বহুকাল কেউ প্যারিসে দেখেননি।

প্যারিসে অবস্থানকালেই দ্বারকানাথের সঙ্গে পরিচয় হলো ম্যাক্সমুলারের। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রের চেয়েও ম্যাক্সমুলার বছর ছয়েকের ছোট। এই যুবকটি তখন জার্মানির লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করে ফ্রান্সে এসে অধ্যাপক বুর্ণুফের কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করছেন। সেই বুর্ণুফই একদিন ম্যাক্সমুলারকে নিয়ে এলেন দ্বারকানাথের কাছে। দ্বারকানাথ নিজে সংস্কৃত অবশ্য ভালো জানেন না, কিন্তু অধ্যাপক বুর্ণুফ এবং ম্যাক্সমুলার সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন সব কথা বলেন, যার সঙ্গে প্রকৃত ভারতবর্ষের সাদৃশ্য খুব কম—এ সব শুনে দ্বারকানাথ কৌতুক বোধ করেন। ম্যাক্সমুলার নামের যুবকটির কৌতূহলের আতিশয্য দেখে দ্বারকানাথ তাকে বললেন, যেদিন খুশী সকালবেলা সে তাঁর কাছে আসতে পারে। ম্যাক্সমুলার প্রায় নিয়মিতই আসতে লাগলেন। সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে না জানলেও পারিবারিক সূত্রে দ্বারকানাথ সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। তাঁর মুখ থেকে সেই সব কথা ম্যাক্স-

, দ্বারকানাথ সেই সময় গান-বাজনার চর্চায়
ত উঠেছিলেন। ফরাসী ও ইতালীয় অপেরা-
ত তিনি অনুকরণ করতে পারতেন অনবদ্যভাবে।
র কণ্ঠস্বর জোরালো। মাঝে মাঝে সেই সব গান
ন গেয়ে উঠলে ম্যাক্সমুলার শুনতেন মুগ্ধভাবে।
না কখনো ম্যাক্সমুলার ওঁর গানের সঙ্গে পিয়ানো
তেন। খুব একটা চর্চা না করলেও দ্বারকানাথের
 বেশ সুর ছিল। একদিন ম্যাক্সমুলার
কানাথকে অনুরোধ করলেন একটি ভারতবর্ষীয়
 সংগীত শোনাবার জন্য। ভারতীয় প্রিন্স
লন, ও গান বিদেশীরা বুঝবে না। তবু ম্যাক্স-
ার বারবার পেড়াপীড়ি করায় তিনি একটি গান
লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী, এর মর্ম
লে কিছু ?

ম্যাক্সমুলার অকপটে স্বীকার করলেন যে, ঐ
র তিনি কোনো রস পান নাই, ওটি কোনো
 বলিয়াই মনে হয় না। সুর তাল লয় কিছুই
।

অমনি চটে উঠলেন দ্বারকানাথ। রুক্ষ স্বরে
লন, এই তোমাদের এক দোষ। তোমরা সহজে
না নতুন জিনিস গ্রহণ করিতে পারো না। কোনো
নস যদি প্রথমবারেই তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে
পারে, অমনি তোমরা তার প্রতি বিরূপ হও।
ম যখন প্রথম ইতালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন মনে
াছিল উহা বিড়ালের চ্যাঁচামেচি। ধৈর্য ধারণ
রা আমি তাহার রস গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি।
মরা মনে করো আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের
 কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়, যেহেতু
মরা তা বোঝো না।

ম্যাক্সমুলার চুপসে গেলেন একেবারে।

ইদানীং দ্বরাকানাথের মেজাজ প্রায়ই ভালো
 না। দেশ থেকে টাকা আসতে সামান্য দেরি
, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে চিঠি
খন। দেবেন্দ্রকে তিনি জানিয়ে দেন, তিনি
ভালোই বুঝতে পেরেছেন যে দেবেন্দ্র যে পথে চলছে,
তাতে সে বিষয়সম্পত্তি কিছুই রক্ষা করতে পারবে
না। এদিকে সত্যিই সেইপ্রকার ব্যাপার চলছে। পিতা
বিদেশবাসী হবার পর দেবেন্দ্র বিষয়কর্ম থেকে মন
একেবারেই সরিয়ে ফেলেছেন যেন। সর্বক্ষণ তিনি
ধর্ম সাধনায় ও ধর্ম বিস্তারের জন্য উন্মুখ। ইতি-
মধ্যেই দীক্ষিত ব্রাহ্মর সংখ্যা পাঁচশত ছাড়িয়ে গেছে,
এখন শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলেও এই নব ধর্ম প্রচারের
আয়োজন চলছে।

একদিন সকালে দেবেন্দ্র তাঁদের বাহির বাটিতে
বসে সংবাদপত্র পাঠ করছেন, এমন সময় তাঁদের
হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ এসে তাঁর কাছে কেঁদে
পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, দেশে এত
বড় অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, অথচ তার প্রতিকার
করার কেউ কি নেই ?

কাগজ মুড়ে রেখে দেবেন্দ্র বললেন, কান্না
থামাও, আগে বৃত্তান্তটি কি তা খুলে বলো!

রাজেন্দ্রনাথ যে কাহিনীটি বললো, তা এই :

গত রবিবারে রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং তার ছোট
ভাই উমেশচন্দ্রের স্ত্রী এক পালকিতে চেপে কোথাও
নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিল এমন সময় তার ছোট
ভাই উমেশচন্দ্র পালকি থামিয়ে জোর করে নিজের
স্ত্রীকে নামিয়ে নিয়ে যায় এবং উভয়ে খৃস্টান হবার
নিমিত্ত পাদ্রী ডফ সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ
করে। উমেশচন্দ্রের বয়েস চোদ্দ এবং তার পত্নীর
বয়েস এগারো, উভয়েই নাবালক-নাবালিকা।
সুতরাং স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হবার অধিকার তাদের
নেই। উমেশচন্দ্রের পিতা ডফ সাহেবের কাছে গিয়ে
অনুনয় বিনয় করলেন, পুত্র ও পুত্রবধূকে ফিরিয়ে
দেবার জন্য। ডফ সাহেব তা শুনলেন না। তখন
সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করা হলো, সুপ্রীমকোর্ট
অচিরাৎ রায় দিয়ে দিল যে ছেলে যখন বাপের কাছে
ফিরে যেতে চায় না, তখন আদালত সেখানে জবর-
দস্তি করবে কেন ?

তখন রাজেন্দ্র এবং তার পিতা ডফ সাহেবের
কাছে অনুরোধ করে বললো, তারা আবার আদালতে
নালিশ আনবে, সেই বিচার সমাপ্ত হবার আগে
পর্যন্ত যেন ডফ সাহেব উমেশচন্দ্র ও তার স্ত্রীকে
খৃস্টান না করেন। ডফ সাহেব সে কথায় কর্ণপাত
করলেন না। গতকল্য সন্ধ্যাবেলা ডফ সাহেব ওদের
দু-জনকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে ফেলেছেন।

ঘটনাটি শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন
দেবেন্দ্র। আদালত এমত প্রকার রায় দিয়েছে ?
নাবালক-নাবালিকাকেও জোর করে ধর্মান্তরিত
করা যাবে। এ তো স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব। এই কি
ব্রিটিশ ন্যায়-এর উদাহরণ ?

তিনি তাঁর কর্মচারী ও বয়স্য অক্ষয় দত্তকে
ডেকে বললেন, আপনি এক্ষণেই এর বিরুদ্ধে কলম
ধারণ করুন। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরাও এইভাবে
ক্রমে ক্রমে স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ করবে? এই
সাংঘাতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও কি আমাদের চৈতন্য
হবে না

দেবেন্দ্র নিজে গাড়ি নিয়ে শহরের গণ্যমান্য
ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। তাঁদের
বোঝাতে লাগলেন যে, পাদ্রীরা বিনা পয়সায়
লেখাপড়া শেখাবার প্রলোভন দেখিয়ে ছোট ছোট
বালকদের নিজেদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছে এবং
তারপরই প্রথম সুযোগে তাদের খৃস্টান করে নিচ্ছে।
হাজার হাজার ছেলে এইভাবে খৃস্টান হচ্ছে। এই
ভাবে চললে যে এদেশের সবাই খৃস্টান হয়ে যাবে।
পাদ্রীদের সংস্পর্শ থেকে এখনি ছেলেদের সরিয়ে
আনা দরকার।

সম্ভ্রান্তদের মধ্যে অনেকেই দেবেন্দ্রকে সুনজরে
দেখেন না। ব্রহ্মধর্ম প্রচার করে তিনি সনাতন
হিন্দুধর্মকে আঘাত করার চেষ্টা করছেন বলে মনে
করেন অনেকে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের শিরো-
মণি রাধাকান্ত দেব ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধে একটি ধর্মসভা
স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনিও দেবেন্দ্রর এই

ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দু একজন শুধু প্রশ্ন তুললেন, খৃস্টান ধর্ম প্রসারে আপত্তি করার নৈতিক ভিত্তি কী? খৃস্টান ধর্মও তো একটি মহান ধর্ম। ধর্মবিশ্বাসে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন, সুতরাং কেউ যদি হিন্দুধর্মের বদলে খৃস্টধর্ম বরণ করতে চায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে কেন?

দেবেন্দ্র বললেন, খৃস্টধর্ম যে মহান তা আমি অবশ্য মানি। ধর্মবিশ্বাসে মানুষ স্বাধীন একথাও ঠিক। কিন্তু প্রধানত খৃস্টান হয় কাহাদের সন্তানেরা? খৃস্টান হয় গ্রামের দরিদ্র মানুষ অথবা শহরের নব্য শিক্ষিত যুবকেরা। গ্রামের মানুষ খৃস্টান হয় নানা প্রকার প্রলোভনে। আর শহরের যুবকেরা হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাহাদিগকে খৃস্টান করা সহজ কাজ বটে কিন্তু উচিত কাজ কিনা সেটাই প্রশ্নের বিষয়। পাদ্রীরা বেদান্তধর্ম সম্পর্কে নানা রকম গালাগালি করে এবং লোকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করায়। তাছাড়া রাজশক্তি এবং আইন তাহাদের পক্ষে। সেই জন্যই আমি বলি, হিন্দুধর্ম ও খৃস্টধর্মের মতামতগুলির সম্যক জ্ঞান দেশময় বিস্তারিত হোক। তারপর দুই ধর্মমত তৌল করে কেউ যদি একটিকে অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নেয়, তবে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই।

দেবেন্দ্রর ব্যাকুলতা ও জোরালো যুক্তি শুনে সকলেই উপলব্ধি করলেন বিষয়টির গুরুত্ব। এইভাবে ভালো ভালো পরিবারের যুবকেরা, এমনকি নাবালক নাবালিকারাও যদি মোহে পড়ে খৃস্টান হয়, তা হলে হিন্দুসমাজে ভাঙন রোধ করা যাবে কী প্রকারে? ঠিক হলো, পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে যেমন ছেলেরা পড়তে পারে, সেই রকম হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি পাঠশালা খোলা হবে, সেখানেও বালকরা বিনাবেতনে পড়বে। বালিকাদের জন্যও একটি পাঠশালার কথা অনেকের মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে, এর আগে দু-একবার চেষ্টা করেও সুফল পাওয়া যায়নি, কিন্তু আশা ছাড়েননি অনেকে।

শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভায় এই স্কুল খোলার প্রস্তাবে একদিনে চাঁদা ওঠে গেল চল্লিশ হাজার টাকা। এমনকি অন্তঃপুরের মহিলারাও এর জন্য তাঁদের দান পাঠিয়ে দিলেন। দেবেন্দ্রর একটি বড় রকমের জয় হলো।

পত্রিকা পরিচালনা ও ধর্মবিস্তার নিয়ে দেবেন্দ্র বেশ কয়েক বৎসর মত্ত হয়েছিলেন। অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় পাননি। নিজ পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও প্রায় যোগাযোগ শূন্য। শরীর ক্লান্ত। এই জন্য কিছুদিনের জন্য দেবেন্দ্র গেলেন নদীপথে পরিভ্রমণে। শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষায় তাঁর পত্নী সারদা দেবী এবং তিন পুত্র দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে আরও রইলেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ সদ্য ব্রাহ্ম হয়েছে এবং দেবেন্দ্রর বিশেষ প্রিয়পাত্র। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত এই রকম একজন সংগীর প্রয়োজন খুব অনুভব করছিলেন দেবেন্দ্র। অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু, এই দুজন যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে দেবেন্দ্রর মতামত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন।

একটি প্রকাণ্ড পিনিসে পত্নী ও পুত্রদের রেখে আর একটি ছোট বোটে দেবেন্দ্র রয়েছেন রাজনারায়ণের সঙ্গে। সারাদিনে দুইজনে নানা প্রকার বিশ্রম্ভালাপ হয়, সন্ধ্যার পর রাজনারায়ণ সেই সব কথা ও সারাদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তারপর আহারের সময় দুজনে কিঞ্চিৎ সুরা পান করতে করতে সেগুলি নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন আবার।

পরপর কয়েকটি দিন কাটলো। নবদ্বীপ ও

তোমার দিনলিপি লিখে লও বরং। রাজনারায়ণ বললো, এখনো বেলা শেষ হয়নি, এর মধ্যে আরও কত কাণ্ড কারখানা হতে পারে কে জানে!

বলতে বলতেই প্রায় দেখা গেল আকাশের পশ্চিম কোণ থেকে একখণ্ড জমাট কালো মেঘ যেন ডানা মেলে হু হু করে এগিয়ে আসছে। এখনি ঝড় উঠতে পারে ভেবে দেবেন্দ্র বললেন, ঝড়ের সময় ছোটো বোটে থাকা ভালো নয়, চলো আমরা পিনিসে যাই। মাঝিরা বোটটিকে পিনিসের গায়ে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলো, এমন সময় এক ভয়ঙ্কর দমকা হাওয়া উঠে পিনিসের মাস্তুলের এক অংশ ভেঙে তার পাল ও দড়িদড়া সমেত জড়িয়ে বোটের ছাদের ওপর পড়লো। বাকি পালে তীরের মতন ছুটলো পিনিস এবং বোটটাকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে দ্রুত চললো। অতবড় পিনিস অর্থাৎ বজরার টানে কাৎ হয়ে গেল ছোট বোটটি, এখুনি দড়িদড়া ছাড়াতে না পারলে ভয়ঙ্কর বিপদ। দড়িদড়া কেটে ফেলবার জন্য দা খোঁজা হতে লাগলো, কিন্তু ঐ হুড়োহুড়ির মধ্যে দা পাওয়া যায় না। একজন মাঝি লাগি দিয়ে গুণ ছাড়াতে যেতেই সে লাগি পড়লো দেবেন্দ্রর নাকের ওপর, দরদর ধারে রক্ত বেরুতে লাগলো।

এই সময় বাতাস একটু থেমেই আবার প্রবলতর হলো। ভয়ার্ত মাঝিরা চিৎকার করে উঠলো, ওরে, আবার তাই রে, আবার তাই রে। বোট একদিকে সম্পূর্ণ কাৎ হয়ে গেছে, আর দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই ডুবে যাবে। দেবেন্দ্র স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সামনে নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখছেন।

কোনোক্রমে একটা দা খুঁজে পেয়ে মাঝিরা কচাকচ করে কাটতে লাগলো দড়ি। শেষ দড়িটি কাটা হবার সঙ্গে সঙ্গে বোটটি পিনিসকে ছেড়ে তীরবেগে গিয়ে পাড়ের বালিয়াড়ির ওপর আছড়ে পড়লো। দেবেন্দ্র ও রাজনারায়ণ লাফিয়ে পড়লেন নীচে এবং একটুর জন্য বেঁচে গেলেন।

ইতিমধ্যে ঝড়ে ও অন্ধকারে কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। দেবেন্দ্রর স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে পিনিস কোনদিকে ছুটে গেল বোঝার উপায় নেই। এরই মধ্যে ছোট একটি ডিঙি নৌকো এসে ভিড়লো সেখানে। নিশ্চিত বোম্বেটের নৌকো ভেবে সবাই ভয়ার্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, কে ও? কে ও?

সেই নৌকো থেকে এক ব্যক্তি সত্বর লাফিয়ে পড়ে ছুটে এলো দেবেন্দ্রর দিকে। তার কণ্ঠস্বর শুনেই দেবেন্দ্র চিনতে পারলেন। সে ব্যক্তি তাঁদের বাড়ির স্বরূপ খানসামা। সে একটি জরুরী বার্তাবহ পত্র নিয়ে এসেছে।

অন্ধকারে পড়বার উপায় নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আলোয় দেবেন্দ্র কোনোক্রমে খানিকটা পাঠোদ্ধার করলেন।

চিঠিতে আছে, 'ইংলন্ড হইতে দুঃখের সংবাদ। দ্বারকানাথ আর নাই।"

দেবেন্দ্র মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন দেবেন্দ্র। পিতৃশোকের চেয়েও তিনি অন্য বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন বেশী। অবিলম্বে কলকাতায় না ফিরলে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হবে। তিনি অতি সম্প্রতি জেনেছেন যে, গত কয়েক বৎসরে দ্বারকানাথ বাজারে এককোটি টাকা দেনা করেছেন, এবার পাওনাদারগণ তাঁদের পরিবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পরদিনই সেই ঝড়-জলের মধ্যেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দেবেন্দ্র রওনা হলেন কলকাতার দিকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনোক্রমে পলতায় পৌঁছে, সেখানে ডাঙায় নেমে পেয়ে গেলেন অশ্বশকট। সেই

পৌঁছোলেন কলকাতায়। সেদিনের সেই ঝড় যেন তাঁদের পারিবারিক বিপর্যয়ের রূপক।

পাওনাদারেরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত আশেপাশে ঘুরতে লাগলো। দেবেন্দ্র সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে অশৌচদশায় তিনি টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই করবেন না।

কিন্তু এর আগেই দারুণ মতান্তর দেখা গেল শ্রাদ্ধপ্রণালী নিয়ে। দেবেন্দ্রর ছোটকাকা রমানাথ ঠাকুর বললেন, দেখো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এ সময় কোনো গোলমাল তুলো না। দাদার বড় নাম।

দেবেন্দ্র বললেন, তা কি করে হয়। আমি ধর্মব্রতের বিরুদ্ধে তো কোনো কাজ আমি করতে পারি না। আমি শ্রাদ্ধ করবো উপনিষদের মতে। শালগ্রাম শিলা আমি মানি না। পাথরের নুড়িকে আমি নারায়ণ বলে পুজো করতে পারবো না।

রাজা রাধাকান্ত দেব বললেন, সে হবে না, সে হবে না। তুমি অমন করলে শ্রাদ্ধ বিধিপূর্বক হবে না। তোমার পিতার পারলৌকিক কার্য অসম্পূর্ণ থাকবে।

দেবেন্দ্র তখন তাঁর মেজ ভাই গিরীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর মত। গিরীন্দ্র দাদার অনুবর্তী। দাদার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন তিনিও বললেন, আমরা যদি এমন করি, তাহলে সকলে আমাদিগকে ত্যাগ করবে, সকলে বিপক্ষে যাবে।

দেবেন্দ্র বিস্মিত, বিমূঢ় বোধ করলেন। সকলেই তাঁর মতের বিরোধী। এ দেশে ধর্ম আর সামাজিক প্রথা যেন পৃথক ব্যাপার। যারা ব্রহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, তারাও সামাজিক প্রথা অমান্য করতে ভয় পায়।

দেবেন্দ্র তখন নির্জনে বসে প্রশ্ন করতে লাগলেন নিজের বিবেককে। বারবার একই উত্তর পেলেন। লোকভয়, সামাজিক শিষ্টাচারের চেয়েও নিজের ধর্মবিশ্বাস অনেক বড়। এর মধ্যে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পরলোকগতা জননীকে। তিনি যেন জীবন্ত হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তোকে বড় দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিস? এর দ্বারা আমাদের কুল পবিত্র হয়েছে, তোর জননী কৃতার্থ হয়েছে। সারা শরীরে আনন্দ প্রবাহ নিয়ে জেগে উঠলেন দেবেন্দ্র।

শ্রাদ্ধের দিন বাড়ির পশ্চিম প্রাঙ্গণে মস্ত এক চালা তৈরি হয়েছে। দানসাগরের সোনা রূপার ষোড়শোপচারে ভরে গেছে সেই চালা। মাঝখানে পুরোহিত, আত্মীয় পরিজন সকলে শালগ্রাম শিলা স্থাপন করে বসে আছেন দেবেন্দ্রর অপেক্ষায়।

দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ দেবেন্দ্র পট্টবস্ত্র পরিধান করে গম্ভীরভাবে প্রবেশ করলেন সেখানে। উপনিষদের একটি শ্লোক উচ্চারণ করে তিনি সমস্ত দানসামগ্রী উৎসর্গ করে তিনি আবার পেছন ফিরলেন। আত্মীয়বন্ধুরা তাঁকে ডাকতে লাগলো যজ্ঞের আসনে এসে বসবার জন্য। দ্বারকানাথের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ শুদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সোজা উঠে গেলেন তিনতলায়।

একটু পরে তিনি শুনতে পেলেন তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথ তাঁর হয়ে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করে চলেছেন।

দেবেন্দ্র মনে মনে বললেন, জ্ঞাতি বন্ধুরা আমায় ত্যাগ করে করুক, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে

মশা সব পালায় দূর-ঘুমটি আসে মিষ্টি মধুর!

বালসারার ওডোমস হল মশা তাড়ানোর ক্রীম।
ওডোমস আপনার শরীরের চারপাশে
এক সুরক্ষার আবরণ তৈরী করে মশাদের দূরে
রাখে, যার ফলে আপনি নিশ্চিন্ত আরামে
ঘুমুতে পারেন।
বালসারার ওডোমস আধুনিক ও স্বাস্থ্য-সম্মত, এটি
শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ।

মশার শত্রু—বালসারার

ওডোমস

CHAITRA-BLS-243 BEN

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্মের একশ বছর পূর্ণ হতে চলল। নানাভাবে নানা জায়গায় তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, হবে। নতুন করে তাঁর কাজের মূল্যায়ন হবে। বিশ শতকের বিজ্ঞানের এই জনাকীর্ণ মন্ডলীতেও আইনস্টাইন একটি আশ্চর্য নাম—একক এবং অনেকটা নিঃসঙ্গ। কোন এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় এ যুগের মানুষের মনে এই একজন বিজ্ঞানী যেন সর্বকালের সমস্ত বিজ্ঞানের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আইনস্টাইনের নিজের গবেষণা দূরে থাক, সাধারণভাবে বিজ্ঞান সম্বন্ধেই যাঁরা প্রায় কিছুই জানেন না, তাঁরাও বিজ্ঞানী বলতে একবাক্যে এই একজনেরই নাম করে থাকেন। তাঁর এই অনন্য খ্যাতির সঙ্গে মিশে আছে বিশুদ্ধ ধীশক্তির সীমানা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনের রহস্যবোধ, নিঃসঙ্কোচে শ্রদ্ধা করবার মত মানুষ খোঁজার চেষ্টা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভয়ভক্তি বিস্ময়ে আর কুসংস্কারের জটিল রসায়ন। সর্বযুগে সর্বকালে অধিকাংশ মানুষ কিছু-না-কিছু রূপকথা চায়, নিজের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি আর কল্পনার বাইরে অন্য কোন আশ্চর্য জগৎ তার অন্বিষ্ট। এ যুগের মানুষ হয়ত আইনস্টাইনের মধ্যে সেই রূপকথার ইশারা পায়। প্রধানত যুক্তিসিদ্ধ স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে তাঁর সাহসী মন শুধু পদার্থবিদ্যা কেন দর্শনের কাঠামোটাকে যেভাবে বদলে দিল, তা নিয়ে তো আলোচনা অনেক হয়েছে এবং আরো হবে। তিনি আসবার আগে দেশ, কাল, জড় ও শক্তি, এই সব আদিম প্রত্যয় সম্বন্ধে যেভাবে চিন্তা করতাম, এখন আর সেভাবে করি না। কার্যকারণবাদ (causality), নানাকারণে যা আজও বিজ্ঞানের কাঠামোর একটা বড় অংশ, চতুর্মাত্রিক দেশকালের ধারণা তার রূপবন্ধকে বদলে দিয়েছে, অনেক বেশী শাণিত করেছে। জাড্য (inertia) এবং মহাকর্ষ (gravitation) যে আসলে একই জিনিস, মহাকর্ষের প্রভাবকে যে ভাষান্তরে আইউক্লিডীয় (non-Euclidean) জ্যামিতির সাহায্যে বর্ণনা করা যায়, আজ থেকে ষাট বছর আগে এই সব চিন্তা বিজ্ঞানের বিশ্বদৃষ্টিকে টলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অবিজ্ঞানী সাধারণ মানুষ যখন আইনস্টাইনের নাম উচ্চারণ করেন, তখন তাঁর এই সব কীর্তির অনুপুঙ্খ তাঁদের মনে থাকে না। আপেক্ষিকতা (relativity) কথাটা অনেকেই জানেন, কতকটা যেন কোন মায়াময় বীজমন্ত্রের মত। আসলে আইনস্টাইন নামটাই তাঁদের কাছে রূপকথার নাম, মানুষের দুর্মর সম্ভাবনার রূপকথা, অনিশ্চিত এই কালেও মোহিনী আশা জাগাবার মত রূপকথা।

অসংখ্য মানুষের মনে যখন কোন একজন মানুষ সম্বন্ধে তথ্য কল্পনা শ্রদ্ধা আর ভক্তি মিশিয়ে একটা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে, তখন তারও একটা নিজস্ব মূল্য থাকে। কেননা, তার মধ্যে আমরা জনমনের অভীপ্সার একটা চেহারা পাই। তবু এ প্রশ্নটা থেকেই যায় : এই কুজ্ঝটিকার আড়ালে কেমন ছিলেন সেই মানুষটি ? কি ছিল তাঁর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার গড়ন, জীবনের কাছে কি তিনি চেয়েছিলেন ? বিশেষ করে আমরা ভারতবর্ষের মানুষেরা, যে-কোন আশ্চর্য কৃতিত্বের সম্মুখীন হয়ে হয় ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নয় তপশ্চর্যা কিংবা এই দুয়ের যোগসাজস, এই ধরনের সুলভ কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েই কাজ সেরে দিই। যদি তা না করি, যদি ভাবতে চেষ্টা করি সেই তেইশ বছর বয়সে ৎসুরিখে কেরানীগিরি থেকে শুরু করে ছিয়াত্তর বছর বয়সে প্রিন্সটনে দেহত্যাগ পর্যন্ত নানা অবস্থায় তাঁর অবিচলিত নিঃসঙ্গ পরিশ্রমের কথা, যদি চেষ্টা করি প্রচলিত ক্লিশের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তাঁর যথার্থ জীবনযাত্রাকে জানতে, তবে হয়ত কিছু মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি পেলেও পাওয়া যেতে পারে। আর, বিজ্ঞানের ইতিহাসে যাঁদের কৌতূহল আছে, তাঁদের পক্ষে তো মানুষ আইনস্টাইন নিশ্চয়ই আগ্রহের বিষয়। ঔপন্যাসিক সল বেলোর জনৈক বন্ধু বলেছিলেন, "আমি যেটা করি, সেটাই সামাজিক ইতিহাস হয়ে যায়।" তেমনি, আইনস্টাইন যা করেন সেটা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের ইতিহাস হয়ে যায়।

প্রথমেই বলতে হয়, আইনস্টাইন খুব সরল, বাউন্ডুলে, আপনভোলা মানুষ ছিলেন না। কোন বুদ্ধিমান মানুষই সরল হন না। চরিত্রের দার্ঢ্য উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা, বিষয়ে অনাসক্তি এবং কাজে নিষ্ঠা, এগুলো সরলতার লক্ষণ নাও হতে পারে। ধরুন, প্রচণ্ড প্রতিভাশালী একজন মানুষ জীবনের শুরুতেই মোটামুটি ঠিক করে নিলেন যে সমাজের প্রচলিত আশা-আকাঙ্ক্ষার চৌহদ্দির মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না। এবং অন্য কোন নির্জন আদর্শকে তিনি সারাজীবন কায়মনে অনুসরণ করে চললেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাজকর্ম রীতিনীতি অধিকাংশ মানুষের চোখে কিঞ্চিৎ আচম্বা ঠেকবে। প্রতিক্রিয়াটা আরো উগ্র হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে ঐ ব্যক্তির ধৈর্য এবং সাফল্যের উপর। বিশেষ করে তাঁর সংকল্প যদি হয় বিমূর্ত কোন বিষয়ে আজীবন চিন্তা করা। এই ধরনের একটা সিদ্ধান্তের কথাই আইনস্টাইন বলেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে।

"আমি তখন সবে একজন অকালপক্ক কিশোর। অধিকাংশ মানুষকে যে-সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সারা জীবন অস্থিরভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তার নিষ্ফলতা সেই তখনই আমার চৈতন্যকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, অল্পদিনের মধ্যেই সেই তাড়নার নিষ্ঠুরতাও আমি আবিষ্কার করলাম। সে-যুগে অবশ্য তাকে ভণ্ডামি আর ঝকঝকে শব্দের মোড়কে আজকালকার [illegible] আনেক [illegible] সযত্নে [illegible] রাখা হত। শুধুমাত্র পেটের [illegible] যায়, কিন্তু [illegible] যে [illegible] এবং [illegible] সেই পরিমাণে সে অতৃপ্ত থেকে যায়।"

বলাই বাহুল্য, এগুলো ঠিক নিরীহ উদাসীন [illegible] কথা নয়। এই আত্মজীবনী তিনি লেখেন সাতষট্টি বছর বয়সে, [illegible] শিলপের অনুরোধে পড়ে। অতদিন পরেও চারপাশের স্থূল অস্তিত্বের [illegible] সংগ্রামের স্মৃতি তাঁর কাছে কোমল হয়ে আসেনি। বোঝা যায়, সেই দূর অতীতে কিশোর বয়সে একটা বিশ্বদৃষ্টি গড়ে তোলবার চেষ্টা তিনি শুরু করেছিলেন, পরিণত বয়সেও তার মূলগত কোন বদল হয়নি। তাঁর চরিত্রের আদল তৈরী হয়ে গিয়েছিল খুব অল্প বয়সেই।

এই বিশ্বদৃষ্টির সন্ধান প্রথমেই তাঁকে নিয়ে গেল ধর্মের সীমানায়। তাঁর মা-বাবা ছিলেন নামেই ইহুদী—কার্যত নাস্তিক। কোন পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রেরণায় নয়, কেবলমাত্র ছোটখাট ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ এবং অনুভূতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার তাগিদেই তিনি অল্পদিনের জন্য ইহুদী ধর্মবিশ্বাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তারপর বারো বছর বয়সে লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের কয়েকটি বই পড়ে সুখের এই স্বর্গ থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, বাইবেলের গল্পগুলি অনেকাংশেই অসত্য। ফলে যে শুধু প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁর আস্থা চলে গেল তাই নয়, যে-কোন ধরনের কর্তৃত্ব বা অনুশাসন সম্বন্ধেই তিনি বীতরাগ হয়ে উঠলেন। জার্মান ভাষায় অনুশাসন বা বিধিনিষেধের একটা সুন্দর প্রতিশব্দ আছে : ৎসোয়াং (Zwang) আজীবন তিনি এই ৎসোয়াঙের বিরোধিতা করে গেছেন। পদে পদে নিঃসঙ্গতার মূল্য দিয়ে। শুধু ধর্ম বিষয়ে আশাভঙ্গই নয়, ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাও তাঁকে কর্তৃত্ববিমুখ করে তুলেছিল। উনিশ শতকের ব্যাভেরিয়ার সেই উচ্চবিদ্যালয় (gymnansium) তাঁর মন মেজাজের পক্ষে অনুকূল ছিল না। মাত্র একটি বাক্যাংশে এ বিষয়ে তাঁর মনের ভাব তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রথাগত শিক্ষার যন্ত্র (traditional education machine) শুনলেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে। শুধু প্রথাগত পাঠাভ্যাসই নয়, জার্মান মিলিটারী মনোভাবের চর্চাও শুরু হত এই সব স্কুলে। আইনস্টাইন এ জিনিস হজম করতে পারেননি। তাঁর স্বাধীন মন এই যন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, পরিণামে আরো স্বাধীন এবং শক্তিশালী হয়ে।

স্কুলের পড়াশোনাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। আবার খেলাধুলাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল না। এই সময় তাঁর মনের গতি কোনদিকে যাচ্ছিল ? খুব বড় গণিতবিদ যাঁরা হন, তাঁদের কুশলতার লক্ষণ শৈশবেই দেখা যায়। আইনস্টাইনের শৈশবে ধীশক্তির কোন অসাধারণ প্রকাশ দেখা যায়নি। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল চরিত্রের দিকে। সেই জ্যামিতির বই পড়া, সেই কম্পাসযন্ত্র হাতে পেয়ে উৎসাহিত হওয়া, এগুলো তো তাঁর মনের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ঘটনা। এর বাইরে সমাজের যে কৃতিত্বের মাপকাঠি, সে সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল কিনা বলা শক্ত। বিশেষ করে স্কুলপাঠ্য কৃতিত্বের যে আদর্শে আমাদের এই ঔপনিবেশিক সমাজে আমরা অভ্যস্ত, সে-বিষয়ে তাঁর অনীহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আসলে তিনি এগোচ্ছিলেন অন্য এক দিকে। আবার সেই আত্মজীবনীতেই ফিরে আসা যাক।

"এ কথা আমার কাছে স্পষ্ট যে শৈশবের সেই ধর্মানুভূতির স্বর্গ, যা এইভাবে হারিয়ে গেল, সেটা ছিল আমার নিছক ব্যক্তিসত্তার শিকল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা। আশা-আকাঙ্ক্ষা আর আদিম অনুভূতির দ্বারা শাসিত একটা অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা। বা ঐ দূরে ছিল বিশাল একটা জগৎ, মানুষের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না, মহান এবং চিরন্তন একটা ধাঁধার মত সে আমাদের সামনে প্রসারিত, আবার দৃষ্টি এবং চিন্তা দিয়ে অন্তত আংশিকভাবে আমরা তাকে ছুঁতে পারি। সেই জগতের ভাবনা মুক্তির আশ্বাসের মত আমায় হাতছানি দিত। শীঘ্রই আমি লক্ষ্য করলাম, যে-সব মানুষকে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঐ জগতে মনোনিবেশ করে অন্তরের মুক্তি এবং স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তিসত্তার অতীত এই জগতকে প্রদত্ত সম্ভাবনার চৌহদ্দির মধ্যে মনের দ্বারা আয়ত্ত করা কিছুটা সচেতনভাবে কিছুটা অচেতনভাবে এটাই আমার কাছে মহত্তম অভীষ্ট হয়ে দেখা দিল। অতীতে এবং বর্তমানে যেসব মানুষ এই আদর্শকে বরণ করেছেন, এবং যেসব অন্তর্দৃষ্টি তাঁরা অর্জন করেছেন, এরাই হয়ে দাঁড়াল আমার অমূল্য বন্ধু। এই স্বর্গের পথ ধর্মীয় বৈকুণ্ঠের পথের তুলনায় হয়ত কম আরামের, হয়ত বা কম মায়াময়ও। তবু অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি, এ-পথ সমানভাবে নির্ভরযোগ্য। এবং একে বেছে নেওয়ার জন্য কখনো আমার অনুশোচনা হয়নি।"

এইখানেই আছে আইনস্টাইনের জীবনের যথার্থ ইতিহাস, এই তাঁর ব্যক্তিত্বের রহস্যের চাবিকাঠি। কোন আপনভোলা বাউন্ডুলে খাপাামির তাড়না নয়, জীবনের গোড়ার দিকেই ভেবেচিন্তে এই পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। হয়ত প্রৌঢ় বয়সে লেখা ইতিবৃত্তে খানিকটা র‍্যাশনালাইজেশন আছে, পশ্চাদ্দৃষ্টির সাহায্য খানিকটা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এও সত্য যে পরিণত বয়সে ব্যক্তিত্বের সমস্ত উপাদানই তাঁর মধ্যে বাল্যকালে বর্তমান ছিল। এবং তেইশ বছর বয়সের পর এ ব্যাপারে তিনি আর ফিরে তাকাননি।

পনের থেকে তেইশ বছর বয়সের মধ্যে আইনস্টাইনের জীবনের কিছু ঘটনা তাঁর রূপকথাকে আরো বর্ণময় করে তুলেছে। ঘটনাগুলির মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে ঠিকই। আবার এটাও মনে রাখা ভাল যে, একটু বৃহৎ অর্থে, আমরা যা চাই মোটামুটি সেটাই আমাদের জীবনে ঘটে। পরিবেশে

সঙ্গে আইনস্টাইনের যে বিজ্ঞতা তার থেকেই কি ষড়যন্ত্রগুলোর উদ্ভব হয়েছে ?

আইনস্টাইনের যখন পনেরো বছর বয়স, তখন ম্যুনিখে তাঁর বাবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারবার ভাল চলছিল না। অগত্যা অ্যালবার্টকে তাঁর পড়াশোনার খাতিরে ম্যুনিখে রেখে পরিবারের অন্য সকলে ইতালীর মিলান শহরে চলে গেলেন। সেখানে অবশ্য ব্যবসার অবস্থা আর একটু খারাপ হল। এদিকে ম্যুনিখে ছ'মাস একলা থেকে স্কুলের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা গেল আরো বেড়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি তিনটি সিদ্ধান্ত নিলেন : (১) ঐ স্কুলে তিনি আর পড়া শেষ করবেন না, (২) ইহুদী ধর্ম তিনি ত্যাগ করবেন এবং (৩) জার্মান নাগরিকত্বও ছেড়ে দেবেন। তিনটি সিদ্ধান্তই তাঁর ভাষায় সেই ৎসোয়াঙের বিরুদ্ধে এবং এর মধ্যে একটিও তিনি পরে বদলাননি। মজা হচ্ছে, ম্যুনিখ ছেড়ে দিয়ে যখন তিনি মিলানে তাঁর মা-বাবার কাছে গিয়ে এই সব সুদূরপ্রসারী বাসনা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁরাও কোন আপত্তি করলেন না। ঠিক এর পরেই তিনি ৎসুরিখ পলিটেকনিকে গিয়ে ভর্তি হবেন বলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন এবং ফেল করলেন। বাবার ব্যবসার অবস্থা তখন বেশ খারাপ, তাঁর পক্ষে খরচ চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং পরিবারের কিছু ধনী আত্মীয় তাঁর পড়াশোনার খরচ চালানোর মত একটা মাসোহারা তাঁর জন্য বরাদ্দ করলেন। ইহুদীদের মধ্যে পুরনো একটা প্রথা ছিল, পরিবারের মধ্যে একটি ছেলেকে অনেক সময় ধর্মশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনায় লাগিয়ে দেওয়া হত। তাকে বলা হত ইয়েশিভা ছেলে। পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ছিল তার দেখা-শোনা করা। যাতে সে নির্বিঘ্নে শাস্ত্রচর্চা সেরে ধর্ম এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে পারে। আইনস্টাইন অবশ্যই তালমুদ সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না। তবু ভাবতে মন্দ লাগে না, সেদিন তাঁর শুভার্থী আত্মীয়বর্গ কি জানতেন যে সারা পৃথিবীর জন্য তাঁরা একটি ইয়েশিভা ছেলে তৈরি করে দিচ্ছেন ?

যাই হোক, এই মাসোহারাকে ভরসা করেই আইনস্টাইন প্রথমে সুইজারল্যান্ডের একটি জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে একবছর ধরে পলিটেকনিকের পরীক্ষার জন্য পড়া তৈরি করলেন। তারপর পরীক্ষায় পাশ করে ভর্তি হলেন সেই ৎসুরিখ পলিটেকনিকে। পড়াশোনার মান এই প্রতিষ্ঠানটিতে ভালই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার অত্যাচারও ছিল যথেষ্ট। অর্থাৎ ৎসোয়াঙের নতুন সংস্করণ। শোনা যায় তিনি প্রায়ই ক্লাসে যেতেন না। মার্সেল গ্রোসমান ছিলেন তাঁর বন্ধু। সেই মার্সেলের হাতে লেখা ক্লাস-নোট পড়ে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতেন তিনি। বলা বাহুল্য, পরীক্ষায় পাস করলেও ফলাফল খুব আহামরি কিছু হল না। সম্ভবত আইন-স্টাইন সেজন্য খুব ব্যস্তও হননি। মাঝখান থেকে লাভ এই যে পাস করে নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কনিষ্ঠতম শিক্ষকের একটা পদও তিনি পেলেন না। এ বিষয়ে তাঁর কিন্তু একটু দুঃখ ছিল। চাকরি না পেয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। অসুবিধা তো হয়েছিলই। প্রায় দু বছর তাঁকে ছোটখাট টিউশনী করে খরচ চালাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ গ্রোসমানই তাঁর বাবাকে বলে পেটেন্ট অফিসের চাকরিটি জুটিয়ে দিলেন।

এই তো গেল ঘটনা। প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষায় ভাল না করলেও, ছাত্র হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন ? ১৯০৫ সালে যখন পেটেন্ট অফিসে এই কেরানীর কলম থেকে তিনটি যুগান্তকারী গবেষণা আনালেন ডের ফিজিক পত্রিকায় প্রকাশিত হল, তখন তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক মিনকাওস্কি স্বীকার করলেন যে তাঁর এই ছাত্রটি একটি জিনিয়াস। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন যে ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অলস প্রকৃতির। এদিকে সহপাঠী বন্ধুরা তাঁকে মহত্তর কোন প্রাণী বলে মনে করতেন। অবশ্য এইসব মতামত আইনস্টাইনকে বিশেষ বিচলিত করেছে বলে মনে হয় না।

আইনস্টাইনের মত মানুষের পক্ষে পেটেন্ট অফিসে চাকরি নেওয়াটা অবশ্যই ঘটনা হিসেবে কিঞ্চিৎ অসাধারণ। তার মানে কিন্তু এই নয় যে এ ধরনের কাজে তাঁর পটুত্ব ছিল না। বিশুদ্ধ স্বপ্নবিলাসী গণিতবিদ্ হিসেবে তাঁর যে ভাবমূর্তি অনেকের মনে স্থায়ী হয়ে আছে, সেটা ভুল। পেটেন্ট পরীক্ষার কাজে যে ধরনের বাস্তববুদ্ধির প্রয়োজন হয় সেটা তাঁর পুরো-মাত্রায় ছিল। বরং এ বাবদে সারাদিনের কাজ খুব অল্পসময়ে নির্ভুলভাবে সেরে নিয়ে বাকি সময়টা তিনি নিজের পড়াশোনা ভাবনাচিন্তা নিয়ে কাটাতেন। এমন কি এই চাকরিতে তাঁর উন্নতিও হয়েছিল।

আসলে, আইনস্টাইনের অনবদ্য গবেষণা পত্রগুলি পড়ে দেখলেই বোঝা যায়, বস্তুগত চিন্তার আশ্চর্য স্বচ্ছতা তাঁর একটা বড় গুণ। একেবারে প্রথম থেকেই তিনি যেন মনশ্চক্ষের সামনে একটি পরীক্ষাগারকে রেখেছেন—তাঁর যুক্তিগুলি সেই পরীক্ষাগারে সাধিত যে-কোন একটি সরল পরীক্ষার ধাপ-গুলিকে একে একে পর পর অনুসরণ করে চলেছে। এই পরীক্ষার ছক এমন-ভাবে পরিকল্পিত যে তার সপুঙ্খ বর্ণনার ভিতর দিয়েই পদার্থবিদ্যার কোন-না-কোন মূলগত প্রশ্নের মীমাংসা হয়। পরিভাষায় একে বলা হয় গেডাঙ্কে (Gedanken) বা থট এক্সপেরিমেণ্ট। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ এবং স্বাধীন কল্পনাশক্তি একসঙ্গে মিলিত না হলে এই ধরনের তত্ত্বালোচনা সম্ভব হতে পারে না। এইভাবে ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েই তাঁর তত্ত্ব অনেক সময় এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে বহু মানুষের প্রচলিত সহজ বুদ্ধির ধারণার সঙ্গে তার মিল হয়নি। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বজ্ঞা, তাঁর যুক্তি, তাঁর কল্পনাই বারবার অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানী হিসাবে এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত তাঁর রচনা থেকে দেওয়া
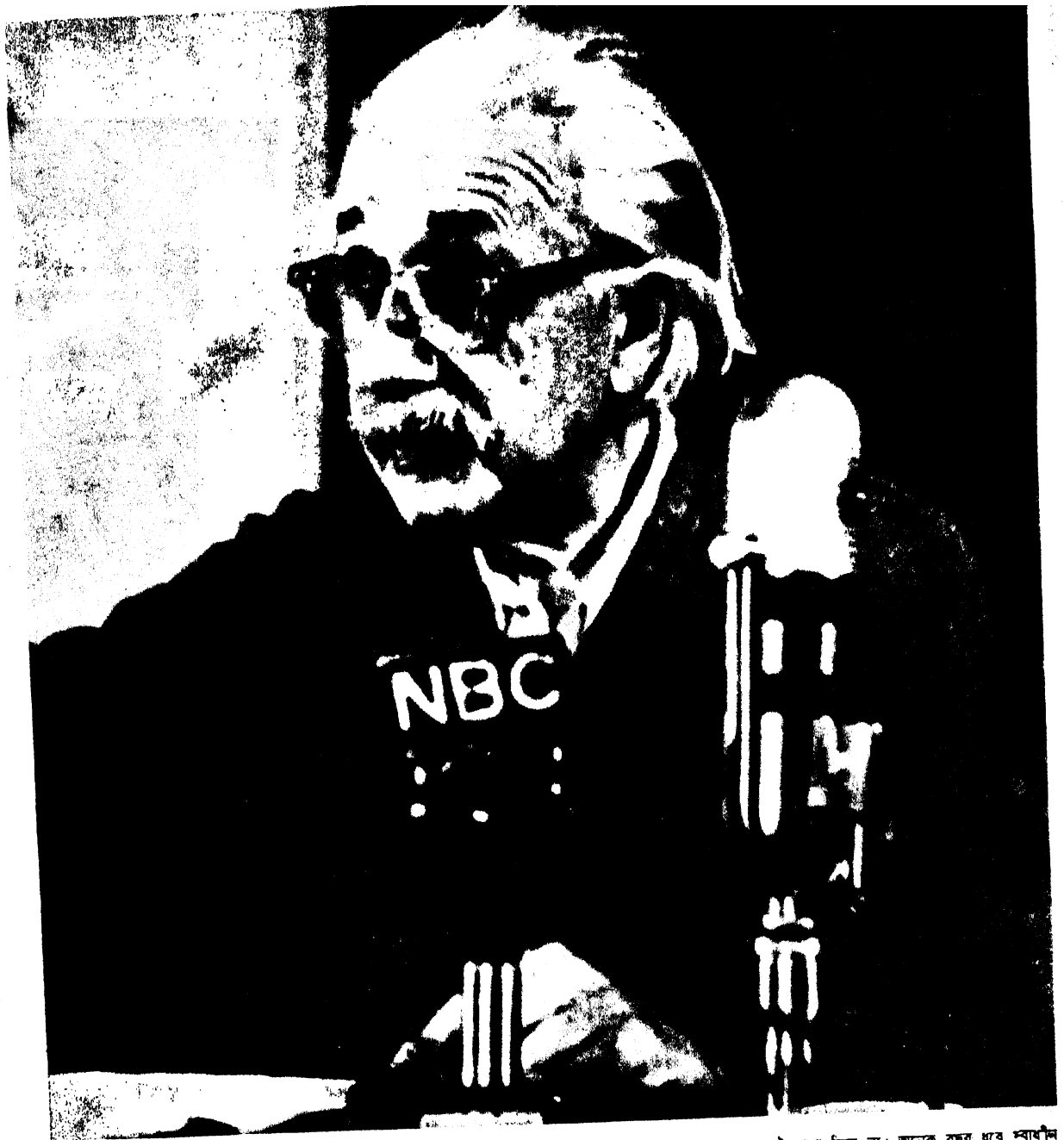
উল্লেখ করতে পারি। এটি তাঁর 'Out of my Letter years' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

বরং বিশুদ্ধ গণিতেই তিনি সেই অনুপাতে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন ধীরে ধীরে, পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করতে গিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে গণিতের কোন বিশেষ শাখার উপযোগিতা অনুভব করার ফলে। এসব বিষয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না—শুধু কেউ কেউ মনে করেন নিছক গণিতে তাঁর স্বাভাবিক পটুত্ব হয়ত ম্যাক্সওয়েল কিংবা হাইজেনবার্গের তুলনায় কমই ছিল। অবশ্য গণিতের প্রয়োগ তিনি অত্যন্ত সার্থকভাবে করেছেন তাঁর বিশেষ এবং সাধারণ আপেক্ষিকতার গবেষণায়। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন :

"গণিতের ক্ষেত্রে আমার স্বজ্ঞা এতটা মজবুত ছিল না যাতে আমি গভীর অন্ধকার সঙ্গে প্রধান এবং অপ্রধানের মধ্যে, মৌল গবেষণা এবং বাহ্য পাণ্ডিত্যের মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারি। তাছাড়া, প্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে আমার আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। পদার্থবিদ্যার মূলনীতি বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান [illegible]

ছাত্র বয়সে একথা আমার স্পষ্ট জানা ছিল না। অনেক বছর ধরে স্বাধীন গবেষণা করার ফলেই আমি কথাটা হৃদয়ঙ্গম করেছি।"

॥ দুই ॥

প্রথম জীবনে যেমন তাঁর কপালে স্বীকৃতি জোটেনি, তেমনি ১: সালে সেই বিখ্যাত গবেষণাগুলি প্রকাশের পর কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর ফিরে গেল। প্রথমে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯০৯), তারপর প্রাগের জা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১১), আবার জুরিখ পলিটেকনিক (১৯১২)—পর এই কটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর অধ্যাপকের পদ তিনি পেলেন। ১৯১৩ বার্লিনে প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সে শুধু গবেষণায় দায়িত্ব অধ্যাপক পদে তাঁকে মনোনয়ন করা হল। তখনকার দিনে এটি ছিল ব সম্মানের চাকরি। বার্লিনের এই পদে তিনি ছিলেন মোট কুড়ি বছর—
[illegible]

জীবনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্মান ও খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে তিনি পৌঁছেছিলেন। একদিকে তাঁর নাম পৃথিবীর অসংখ্য শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে। অন্যদিকে তাঁর মনের গড়ন, তাঁর কাজের চরিত্র, তাঁর জীবনযাত্রার ধরন তাঁকে নিঃসঙ্গতা বরণে বাধ্য করেছে। এই নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "কম বয়সে এটা কষ্টকর, কিন্তু পরিণত বয়সে উপভোগ্য।" বস্তুত নিঃসঙ্গতা তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী। একথাও হয়ত বলা যায় যে নিঃসঙ্গতা বহনের ক্ষমতাই তাঁকে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী বাঁচতে সাহায্য করেছে।

পরিণত জীবনে আইনস্টাইন নিঃসঙ্গ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মানুষের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মোটেই ছিলেন না। বরং ১৯২০ সালের পর থেকে উত্তরোত্তর নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে তাঁর সময়ের উপর দাবি দাওয়া ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। এদিক দিয়ে অন্য কোন বিজ্ঞানীর সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না। নিউটন কিংবা আর্কিমিডিসের জীবন রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু আইনস্টাইন যেভাবে একাই একটি প্রতিষ্ঠানের মত নানা রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন ব্যক্তিগতভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও সমষ্টির দায়দায়িত্ব নিয়ে ভাবতে থাকেন, সেটা একেবারে অন্য ধরনের ব্যাপার। আন্তোনিনা ভালোন্তিন বলেছেন, "আত্মার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত, কিন্তু নৈতিক দায়িত্বের বন্ধন তাঁর ছিল।"

ইহুদী ধর্মে তাঁর বিশ্বাস বাল্য বয়সেই চলে যায়, একথা আগেই বলেছি। তবু বিশের দশকে যখন প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য বাসভূমি আদায়ের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল, তখন নির্যাতিত এই সম্প্রদায়ের সপক্ষে যোগ দিতে আইনস্টাইন দ্বিধা করলেন না। এমন কি এই সূত্রে আমেরিকায় তিনি বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন বার্লিন থেকে। যুদ্ধবিরোধিতার আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ, শান্তি আন্দোলন এগুলির একটা দীর্ঘকালীন তাৎপর্য ছিল। মানুষের পৃথিবীকে যে একদিন আত্মরক্ষার খাতিরেই একরাট হতে হবে, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। সে-আমলে এইসব আদর্শ অধিকাংশে মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল (এখনও খুব একটা সুবোধ্য হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়)। ফলে তাঁকে কটুকথাও শুনতে হয়েছে প্রচুর। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে বার্ট্রান্ড রাসেলের অনুরোধে তিনি পরমাণুঘটিত অস্ত্রের বিপক্ষে নানাদেশের বিজ্ঞানীদের একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। বিখ্যাত পাগওয়াশ আন্দোলনের সূত্রপাত এইভাবে হয়েছিল।

এখানে আইনস্টাইনের জীবনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার : পরমাণু বোমার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে লেখা তাঁর চিঠি। ঘটনাটা আক্ষরিকভাবে সত্য—অর্থাৎ পরমাণু বোমা নিয়ে গবেষণা যে দরকার, বিশেষ করে হিটলারের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং বিপজ্জনক ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতে, একথা তিনি রুজভেল্টকে লিখেছিলেন (চিঠিটা অবশ্য বেশ কিছুদিন রাষ্ট্রপতির টেবিলে পড়ে ছিল)। কিন্তু চিঠিখানিকে যতখানি গুরুত্ব অনেকে দিয়ে থাকেন এবং আইনস্টাইনের উপর যতখানি দায়িত্ব আরোপ করেন, সেটা অতিরঞ্জিত। পরমাণুশক্তিকে যুদ্ধের কাজে লাগানোর বিষয়ে জল্পনা কল্পনা E=mc2 এই সমীকরণের চেয়ে অনেকটা পুরনো। তারপর ১৯৩৮ সালে অটো হানের গবেষণা এবং ১৯৩৯ সালে পরমাণু কেন্দ্রের বিভাজন বিষয়ে মাইটনার ও ফ্রিশের বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশের পর বোমার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। জার্মানী যে এ ব্যাপারে আমেরিকার তুলনায় এগিয়ে যেতে পারে, সে আশঙ্কাও অনেকের ছিল। জিলার্ড, ভিগনার, টেলার এবং ফের্মি, এঁরা ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগের কোন পথ তাঁদের সামনে ছিল না। তাই রুজভেল্টের উদ্দেশে একটি চিঠির খসড়া তৈরি করে তাঁরা আইনস্টাইনকে অনুরোধ করলেন তাঁর নামটুকু দিতে। আইনস্টাইনের ভাষায় : "আমি হলাম ডাকবাক্স"। পাদটীকা হিসাবে বলা যায়, হিটলারের জার্মানী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধী এবং আইনস্টাইনের মধ্যে খুব বেশী মতভেদ ছিল না। এবং বলাই বাহুল্য, আইনস্টাইনের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে একটু বেশী ছিল।

এই সবের ভিতর দিয়ে অসামান্য কৃতী এই মানুষটির যে চেহারা ফুটে ওঠে, সেটা কি রকমের? একদিকে তিনি বলছেন, "মানুষ আর তার ভাগ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা সমস্ত কারিগরী প্রচেষ্টার প্রধান আগ্রহের বিষয় হওয়া উচিত। তাই কেননা নকশা আঁকো আর সমীকরণ লেখো, এটি ভুলো না।" অন্যদিকে মনে মনে তিনি সমস্ত সংগ্রামের ঊর্ধ্বে। আদর্শের জন্য কলম ধরলেও দলের মধ্যে শামিল হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মকালে লর্ড স্নো একবার সমুদ্রতীরে আইনস্টাইনের লং আইল্যাণ্ডের বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় আইনস্টাইনের ঐ বয়সের একটা সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। খুব গরম পড়েছে। লিওপোল্ড ইনফেল্ড সে সময় আইনস্টাইনের সঙ্গে গবেষণা করছেন। স্নোর সঙ্গে তিনি আছেন, আর আছেন এক বান্ধবী। দুপুর প্রায় দুটো। বসবার ঘরে আসবাব বেশী কিছু নেই, শুধু বাগানে বসবার উপযোগী প্লাস্টিকের চেয়ার আর ছোট একটি টেবিল। জানলাতে ঝরোখা নামানো আছে, বাইরের তাপ যাতে কম আসে।

এঁরা গিয়ে পড়বার মিনিট দুয়েক পরেই আইনস্টাইন এলেন। কাজ থেকে থাকলে এই যুদ্ধের কি আশা করা যেত তা আমি কল্পনা করতে পারি না।" তবে সব চেয়ে বেশী স্নোকে বিস্মিত করেছিল আইনস্টাইনের মাথার গড়ন। তিনি তখন সদ্য নৌকো বেয়ে বাড়ি ফিরেছেন (পশ্চিমের দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা খেলাধুলা বর্জন করে চলেন না)। পরনে শুধু একজোড়া শার্টস। খুব সংহত পেশীবহুল তাঁর দেহ। কোমরের দিকে এবং বাহুর উর্ধ্বাংশে ঈষৎ পৃথুলতার আভাস দেখা দিয়েছে—ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যবয়সে যেমন হয়—তবু সেই আটান্ন বছর বয়সেও অসাধারণ শক্তিমান মানুষ তিনি। লর্ড স্নোর মনে হল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এতখানি শক্তিশালী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। ব্যবহারে সহৃদয়, সহজ, একেবারেই নিঃসঙ্কোচ। বড় বড় চোখ দুটি অতিথির উপর নিবদ্ধ, যেন তিনি ভাবছেন, কি চায় এ, কোন্ বিষয়ে কথা বলতে চায়?

এই যে বর্ণনা, এর মধ্যে ক্লিশে নয়, স্টেরিওটাইপ নয়, অসাধারণ সমৃদ্ধ একটি ত্রিমাত্রিক ব্যক্তিত্বের চেহারা দেখতে পাই। সেবারে প্রায় সারাটা দিন আইনস্টাইনের সঙ্গে কাটালেন স্নো। তাঁর ভাষাতেই বলি :

"প্রচণ্ড গরম। খাওয়া-দাওয়ার কোন ধরাবাঁধা সময় আছে বলে মনে হল না। সেই তখনই মনে হল, তিনি খুব কম খেতে শুরু করেছেন। মুখে কিন্তু পাইপটি রয়েছে। মাঝে মাঝেই রেকাবীতে করে নানাধরনের খোলা স্যাণ্ডউইচ আসছিল—জার্মান সসেজ, পনীর, শসা। নেহাৎ ঘরোয়া মধ্য ইয়োরোপীয় চালচলন। পানীয় বলতে শুধু সোডার জল। সেই গরমে, স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে, আমার শরীর যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। আট ঘণ্টায় সেদিন যতটা সোডা খেয়েছিলাম, সচরাচর আট মাসে তা খাই না।

"বেশির ভাগ সময় আমাদের কথা হচ্ছিল রাজনীতি নিয়ে। নীতিসম্মত এবং বাস্তব কি কি পন্থা আমাদের সামনে আছে, সামনে যুদ্ধের যে ঝড় আসন্ন তার থেকে কিভাবে কতটুকু বাঁচানো যায়। শুধু ইয়োরোপের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের কথা। যে ধরনের নৈতিক অভিজ্ঞতার ভার নিয়ে তিনি আগাগোড়া কথা বলছিলেন, ঠিক সে জিনিস আমি তার আগে কখনো দেখি নি। জীবনের এই পর্যায়ে এসে তাঁর মধ্যে আর অহংবোধের ছায়ামাত্র বাকী ছিল না। যেন ও জিনিস তাঁর মধ্যে চিরকালই অনুপস্থিত। মনে হল যেন হিব্রু পয়গম্বর আইজায়ার সঙ্গে কথা বলছি।

"পাঠকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার একটা আশঙ্কা এখানে রয়েছে। মানুষ হিসেবে অন্য সকলের থেকে তিনি এত বেশী স্বতন্ত্র যে ভুল ধারণা না হওয়াটাই শক্ত। বস্তুত তাঁর মধ্যে সেণ্টিমেণ্ট বা মোহ বলতে কিছু ছিল না। তাঁর জীবনদর্শনে মোহের কোন স্থান ছিল না। তাঁর বন্ধু পাস লাজেভাঁর তুলনায়ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেক বেশী সংশয়াকুল। প্রাণী হিসেবে মানুষ যদি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তবে আইনস্টাইনের মতে সেটা হবে ভাগ্যের কথা। তবু আমাদের পরম নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাওয়া।"

লিওপোল্ড ইনফেল্ড ছিলেন তাঁর শেষ জীবনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি লিখছেন :

"সারা পৃথিবীর বিবেকস্বরূপ এই মানুষটি মনে মনে যাবতীয় আত্মপ্রচার, অন্যের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন এবং নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে গভীর ঘৃণা পোষণ করেন। এর থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে তিনি একজন নিতান্ত অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, অবিচার বা হিংসার নাম শুনলেই উত্তেজিত হন। কথাটা একেবারেই সত্য নয়। তাঁর মত নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাপন করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁর মহতী হিতৈষণা, পরম সততা এবং সমাজ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা, বাইরে থেকে যেমনই দেখাক না কেন, আসলে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক, যেন অন্য কোন গ্রহে তাদের উদ্ভব। তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় না। তাঁর চোখে কান্না নেই।"

মনে যে গড়ন আইনস্টাইনকে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে বিশ্বরহস্যের সমাধানে প্রবৃত্ত করেছে, সেই একই গড়ন তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে মানুষের ইতিহাস এবং নিয়তিকে অনুধাবন করতে শিখিয়েছে। তাঁর হিতৈষণা এবং নৈতিকতাও মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগরহিত নিছক হৃদয়ের ব্যাপার নয়। সেই কারণেই তাঁর পক্ষে প্রাণী হিসেবে মানুষের ট্র্যাজেডির সম্ভাবনাকে ভোলা সম্ভব ছিল না।

॥ তিন ॥

আইনস্টাইনের এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর নাম মিশেল বেসো। বয়সে আইনস্টাইনের চেয়ে বছর ছয়েকের বড়। সুইৎজারল্যাণ্ডের মানুষ, মাতৃভাষা ইতালীয়ান। আইনস্টাইনের যখন সতেরো বছর বয়স, তখন বেহালা বাজানোর সূত্রে তাঁদের আলাপ হয়। আটান্ন বছর পরে আইনস্টাইনের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বেসো মারা যান। এই আটান্ন বছর ধরে তাঁদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। পেশায় বেসো ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। জুরিখের পেটেণ্ট অফিসে আইনস্টাইন তাঁকে একটি চাকরী জোগাড় করে দেন, ফলে বেশ কয়েক বছর তাঁরা সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। সম্প্রতি এই দুই বন্ধুর পরস্পরকে লেখা চিঠিপত্রের একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইনের লেখা একশ বাষট্টি এবং বেসোর লেখা একশ ঊনিশটি চিঠি এতে আছে।

আইনস্টাইনের গবেষণার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি তাঁর যুগান্তকারী কাজগুলিতে প্রায় কারো সাহায্য নেন নি। প্রথমদিকের কাজ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে খাটে। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে কোন গ্রন্থপঞ্জী বা উল্লেখপঞ্জী

নেই। কিন্তু শেষ ছত্রে তিনি জানাচ্ছেন : "এই বিষয়ে কাজ করবার সময় আমি আমার বন্ধু এবং সহকর্মী এম বেসোর সহায়তা পেয়েছি। কতকগুলি বিষয়ে কিছু কিছু মূল্যবান ইঙ্গিতের জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।" বোঝাই যাচ্ছে, পদার্থবিদ না হয়েও আইনস্টাইনের মত মানুষকে সাহচর্য দেবার ক্ষমতা বেসোর ছিল। বার্নের পেটেণ্ট অফিস থেকে তাঁরা একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন, পদার্থবিদ্যার আলোচনা করতে করতে। পরবর্তীকালে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের বিকাশের সময় আইনস্টাইন বেসোকে যেসব চিঠি লেখেন, তা থেকে ঐ তত্ত্বের ইতিহাস বুঝতে খুব সাহায্য হয়।

এই যে বেসো, এঁর কাছে আইনস্টাইন তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে এই চিঠিগুলিতে মানুষ আইনস্টাইনের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় পাই তা অন্যত্র দুর্লভ। সরল আপনভোলা রূপকথার কোন সন্ন্যাসী নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং জটিল একটি মানুষ। অন্য মানুষের জটিলতার খবরও ইনি রাখেন। ১৯১৭ সালে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী খুন হলেন জনৈক পদার্থবিদের হাতে। আইনস্টাইন তখন জগদ্বিখ্যাত মানুষ। এই হতভাগ্য বিজ্ঞানীকে বাঁচাবার জন্য তিনি একটি আবেদন করলেন। খুঁটিনাটি দায়িত্বের ভার পড়ল বেসোর উপর। একটি চিঠিতে আইনস্টাইন তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে মামলা খাড়া করতে হবে। আসামী যে একজন শ্রমশীল বিজ্ঞানী, বিবেকবান মানুষ হিসেবে তাঁর যে সুনাম আছে, অন্যেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, এই সব বিষয়ের উপর বেসোকে তিনি জোর দিতে বলছেন। তারপর লিখছেন : "তোমার জেনে রাখা ভাল, ওঁর মনটা ঠিক গোঁড়া পুরুতঠাকুরের মত, একগুঁয়ে, বাস্তবতাবোধবর্জিত। প্রেরণার মাত্রা একটু বেশী, আত্মনিগ্রহের ঝোঁক আছে, এমন কি আত্মহননের ভাবও আছে। একেবারে খাঁটি শহীদ টাইপ।"

আইনস্টাইনের জটিল এবং দুঃখময় ব্যক্তিগত জীবনকে কিছুটা সুসহ করে তোলার কাজে বেসোর সাহায্য তিনি বারবার পেয়েছেন। সকলেই জানেন, আইনস্টাইন দুবার বিয়ে করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রী মিলেভা মারীচ ছিলেন হাঙ্গেরীর মেয়ে, বয়সে তাঁর চেয়ে বছর চারেকের বড়, জুরিখের পলিটেকনিকে তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন। সুইস পেটেন্ট অফিসে চাকরি পাওয়ার আইনস্টাইন তাঁকে বিয়ে করেন। এই ঘটনার পরেই তিনি বেসোকে লিখছেন : "যাক, এখন আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি, সুখী স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য জীবনের অধিকারী। ঘরসংসার তিনি (অর্থাৎ মিলেভা) চমৎকার চালাচ্ছেন, রান্না ভালই করেন, মেজাজ সর্বদা প্রফুল্ল।" ব্যস্, অতঃপরেই পদার্থবিদ্যার প্রসঙ্গ। এটাও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ।

এই বিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুখের হয় নি। আইনস্টাইন যখন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিলেন, তখন তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। মিলেভার ছিল মেলাঙ্কোলিয়া—প্রাগে গিয়ে অসুস্থতা বেড়ে গেল। এরপর যখন আইনস্টাইন আবার জুরিখ হয়ে শেষে বার্লিনে চলে গেলেন, তখন মিলেভা আর সঙ্গে গেলেন না। দুই ছেলে নিয়ে তিনি সুইৎজারল্যাণ্ডেই থেকে গেলেন। বিয়ে ভেঙে গেল। এ তো গেল বাইরের ঘটনা, যা জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। ভিতরে ভিতরে কষ্ট গেছে অনেক। প্রথমদিকে মিলেভার অসুস্থতার সঠিক প্রকৃতিটা জানা ছিল না। ছাড়াছাড়ির পরে বেসো আইনস্টাইনকে লিখছেন, অসুখটা খুব সম্ভবত মস্তিষ্কের যক্ষ্মা। সঙ্গে মানসিক বিকারও আছে, কেননা মিলেভা তখন সম্পূর্ণ শয্যাগতা, একটুও নড়াচড়া করেন না। বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বেসোর উপরেই পড়েছিল। আইনস্টাইনের দুই ছেলের দেখাশোনার ভারও ছিল তাঁর উপর। এই কারণে ঘটনারও একটা পাদটীকা আছে। বিচ্ছেদের একটা শর্ত ছিল, আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কারের টাকা মিলেভাই পাবেন। যদিও সে পুরস্কার এসেছিল বিচ্ছেদের তিন বছর পরে, ১৯২১ সালে।

আইনস্টাইনের পারিবারিক জীবনের কথা এইখানেই শেষ হয় নি। ছোট ছেলে এডুয়ার্ডকে তেমন বিশেষভাবে ভালবাসতেন। মিলেভার অসুস্থতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এডুয়ার্ডও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারেরা বললেন, স্ক্রফুলা, অর্থাৎ লসিকাগ্রন্থির (lymph gland) যক্ষ্মা। পরে অবশ্য জানা গেল, রোগটা স্কিৎসোফ্রেনিয়া, অর্থাৎ উন্মাদ রোগ। দিনের পর দিন আইনস্টাইন এই নিয়ে ভেবেছেন। অনুশোচনায় ভুগেছেন এই ভেবে, স্ক্রফুলা রোগ বংশগতি মেনে চলে, একথা তাঁর আগেই জানা উচিত ছিল। বেসোকে তিনি লিখছেন : "জীবনে আমি আর সবকিছুকে হয় হাল্কাভাবে নিয়েছি, নয় সরাসরি নিজেকে দায়ী করি নি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নিজেকে দোষারোপ না করে পারছি না।"

এত সবের পরেও শেষ পর্যন্ত এক ধরনের পারিবারিক শান্তি তিনি পেয়েছিলেন দ্বিতীয়া স্ত্রী এলসার কাছে। এলসার নিজের প্রথম বিয়েও স্থায়ী হয় নি। দুটি ছোট ছোট মেয়েকে নিয়ে তিনি বার্লিনে তাঁর পিত্রালয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সম্পর্কে তিনি আইনস্টাইনের নিকট আত্মীয়া। আইনস্টাইন কি তাঁকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন? কে জানে। সুখী কিন্তু তাঁরা হয়েছিলেন। মিলেভা ছিলেন গণিতে অভিজ্ঞা, এলসার সঙ্গে আইনস্টাইনের পড়াশোনার কোন যোগ ছিল না। কিন্তু মানুষকে সুখী করবার জাদু তিনি জানতেন, খুব বেশী চাহিদা তাঁর ছিল না, স্বামীকে তিনি আজীবন অনেক কর্কশতা থেকে রক্ষা করে গেছেন। লর্ড স্নোকে সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আইনস্টাইন কথায় কথায় বলেছিলেন, "না, নিজের মনে শান্তি না থাকলে বিশ্বের কথা ভাবা যায় না।" এলসার সংস্পর্শে এসে আবার বিশ্বের কথা ভাববার সুযোগ যে তিনি পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই এলসাই একসময় সগর্বে তাঁর কিছু পদার্থবিদ অতিথিকে বলেছিলেন, "আপনাদের বুঝি কাজ করতে হলে এত সব যন্ত্র লাগে? আমার স্বামী তো দেখি শুধু কাগজ আর পেনসিল নিয়ে কাজ করেন।" এ কথা বলবার অধিকার তাঁর ছিল।

মানুষ আইনস্টাইনকে নিয়ে যে-সব বর্ণবহুল কাহিনী প্রচলিত আছে, তার মূল কোথায়? তার কতটা নির্ভরযোগ্য, কতটাই বা অতিরঞ্জিত?

আগেই বলেছি, আইনস্টাইন ছিলেন মনেপ্রাণে ননকনফর্মিস্ট। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি যেন ক্রমশই বেশী উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। তিনি যাকে বলতেন ৎসোয়াং (Zwang) তার দৌরাত্ম্যের পরিধি তাঁর কাছে যেন ক্রমশই বড় হয়ে আসছিল। অর্থাৎ এটা মানি না, ওটাকে বাহুল্য মনে করি, এই মনোভাব তাঁর আরো পাকা হচ্ছিল। হয়ত মানসিক নিঃসঙ্গতাকে সহনীয় করে তোলবার জন্য বাইরেও একটি বিদ্রোহী বোহেমিয়ান ভাবের আবরণ তিনি তৈরি করছিলেন। হয়ত আমিত্বকে আর সমস্ত ব্যাপারে দূর করে দিয়ে শুধু পোশাক-পরিচ্ছদ আর জীবনচর্যার স্বাধীনতার মধ্যে তার সামান্য আমেজটুকু রেখেছিলেন। তা নইলে, মোজা পরতে এমন আর কি অসুবিধা ছিল? তিনি কৈফিয়ত দিতেন, মোজা বড় ফুটো হয়ে যায়। ডিনার জ্যাকেট তিনি পরতেন না, দু চোখে দেখতে পারতেন না (প্রথম জীবনে অবশ্য স্যুট পরা ছবিতে তাঁকে দেখতে পাই)। আমেরিকায় চলে না এসে ইংল্যাণ্ডে তিনি বসবাস করলেন না কেন, স্নোর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সহাস্যে বলেছিলেন, "ডিনার জ্যাকেট, সুসজ্জিত খানসামা এই সব বড্ড বেশী আপনাদের দেশে। আপনাদের পক্ষে নিশ্চয় এটা ঠিকই, কিন্তু আমার তেমন আসে না।" ক্ষুরের সাহায্যে শার্টের হাতাদুটো কেটে বাদ দিয়ে সেই ভগ্নাংশটুকুকে ওয়েস্টকোটের মত করে পরতেন। গায়ে-মাখা সাবান দিয়ে কেন দাড়ি কামাচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আইনস্টাইন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন : "সে কি? দুরকমের সাবান আবার কেন?" এগুলো কি শুধুই সামাজিক বন্ধন থেকে একটি স্বতপ্রজ্ঞ মনের মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা? এর মধ্যে কি মানুষের এই সমাজ, মনের এই ছোট ছোট গণ্ডী, এই সবের সম্বন্ধে একটা মর্মান্তিক ঠাট্টা লুকিয়ে নেই? এমন কি শেকসপীয়রের বিদূষকের মত কিছুটা প্রজ্ঞার তির্যক প্রকাশ, কিছুটা অন্তর্বেদনার উর্ধ্বপাতন?

আইনস্টাইন যখন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তখন অনেক সময় বৈঠকী আড্ডায় তাঁকে দেখা গেছে। কাণ্ট, হেগেল, ফিখটেকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, চেম্বার মিউজিক শুনেছেন। মধ্য ইয়োরোপের সেই সমৃদ্ধির দিনে তাঁর জোরালো হাসি শোনা যেত কাফের কামরাতে। সেই সান্ধ্য জীবন তাঁর মনোমত ছিল। আবার বক্তৃতার মঞ্চেও তাঁকে দেখা যেত নবলব্ধ খ্যাতির কিরণ উপভোগ করতে।

সেই হাসি, সেই উজ্জ্বলতা আস্তে আস্তে থেমে গেছে। একদিকে ব্যক্তিগত জীবন একটু একটু করে নিস্তরঙ্গ হয়েছে। অন্যদিকে বৃহত্তর দায়, বৃহত্তর সমাজের অমোঘ দুঃখ তাঁকে অধিকার করেছে। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিজীবন বলে প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে নি। শরীরও অসুস্থ হয়েছে—যকৃতের পীড়ায় ভুগেছেন, অন্ত্রে টিউমার হয়েছে, হৃদযন্ত্রের পাশে মহাধমনীর আচ্ছাদন দুর্বল হয়েছে। তারপর একদিন ভোরে সেই আচ্ছাদন ফেটে গিয়ে সব শেষ হয়ে গেছে। সেটা তো নতুন কিছু নয়। যেটা আশ্চর্য, তা হল আগের দিন রাত পর্যন্ত তিনি সম্মিলিত ক্ষেত্রের তত্ত্ব নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর উচ্চাশা ছিল, এই একটি তত্ত্বের মধ্যে তিনি মহাকর্ষ আর তড়িৎচুম্বকের ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র চেহারাকে মিলিয়ে দেবেন। এই চেষ্টা তাঁর সমকালীন পদার্থবিদদের মধ্যে অনেকেরই স্বীকৃতি পায় নি। অনেকের মতে এটা ছিল তাঁর পণ্ডশ্রম। কিন্তু জীবনের শুরুতে যে প্রত্যয় নিয়ে তিনি বিশ্বের সুষমাকে নিয়ে ভাবনা শুরু করেছিলেন, সেই একই প্রত্যয় শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে একাগ্র চলাতে প্রবুদ্ধ করেছে। তাঁর চরিত্র কোনদিন বদলায়নি।

কষ্টকল্পিত
অতুল্য ঘোষ

॥ ৭৪ ॥

এখন মাঝে মাঝে গণ আদালতের কথা শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের এক সহকর্মী ও বন্ধুর গণ আদালতে বিচার হয়। তিনি সন্ধ্যের পর গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কতকগুলি লোক এসে চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল। চেনা, অচেনা—সবরকম লোকই ছিল। উনি স্বাভাবিকভাবেই কুশলপ্রশ্নাদি করলেন। কিন্তু মনে হল লোকগুলি যেন একটু অস্বাভাবিকরকমের গম্ভীর। ও'র কথার উত্তর না দিয়ে লোকগুলি একটু রুক্ষভাবেই বলল, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' উনি ভাবলেন যে, কোনও বিপদ-আপদ ঘটেছে অথবা কোথাও ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, তাই ও'কে ডাকতে এসেছে। একটু থেমে উনি বললেন, 'রাত তো বেড়ে যাচ্ছে, তোমাদের গাঁয়ে যেতে গেলে এখন বাড়িতে খবর দিতে হয়। তা কাল সকালে গেলে হয় না?' একটু গলা চড়িয়ে দুজন বলে উঠল, 'না, না। আজ রাত্রেই আপনাকে যেতে হবে। বাড়িতে খবর দেওয়ার কথা আমরা জানি না' উনি তখন বুঝলেন যে, ব্যাপারটি অন্যরকম; কিন্তু কারণ খুঁজে পেলেন না। আবার তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কি এমন কাজ যে, আজ রাত্রেই যেতে হবে! তখন তাদের রুক্ষতা রূঢ়তায় রূপান্তরিত হল। তারা একটু চেঁচিয়েই বলল, 'গণ আদালতের সামনে আপনাকে যেতে হবে। আপনার বিচার হবে আজ রাত্রে।' উনি তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। গণ আদালত? সেটা আবার কি? তারা বললে, 'সেখানে গেলেই আপনি বুঝতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে এখনই আপনাকে যেতে হবে।' আমার এই সহকর্মীটি যেমন ঠান্ডা স্বভাবের লোক তেমনি কড়া কড়া কথা শোনাতেও তাঁর পারদর্শিতার অভাব হয় না। উনি একটু শ্লেষভরেই বললেন, 'তোমরা তো বেশ বীর বটে। রাতের অন্ধকারে আমার মত একজন বয়স্ক মানুষকে এতজনে মিলে ধরে নিয়ে যেতে এসেছ। সাহস বটে! খুব বীর তোমরা। চল আমি যাচ্ছি।' একটু দূরেই ওদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর চেনা গ্রাম। তখন রাত হয়ে গেছে। গ্রামের লোকজনও বিশেষ চলাফেরা করছে না। গ্রামের এক প্রান্তে উপস্থিত হয়ে দেখেন—পাঁচজন লোক বসে আছে। তার মধ্যে দুজন ও'র পরিচিত, আর বাকী তিনজন সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে হল ও জেলারই লোক নয়। ও'কে বসতেও বলা হল না। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে একজন বললে, 'তুমি...গ্রামের...। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তুমি কংগ্রেসের হয়ে গ্রামে গ্রামে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দল বাড়াচ্ছ। এবং দেশের গণশক্তির বিরুদ্ধে কাজ করছ।' উনি একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে বাপু? দুজনকে তো চিনতে পারছি। কিন্তু তিনজনকে তো এ অঞ্চলে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, এই গ্রামে অনেকবার এসেছি। যেবার আকাল হয়েছিল সেবারে, যেবারে গ্রামে অনেকগুলি ঘর পুড়ে গিয়েছিল সে সময়ে। একবার গাঁয়ে কলেরা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সময়ে। বহুবারই তো এসেছি। আর আপদে বিপদে গ্রামের লোকেরা তো অনেকবারই আমায় ডেকে এনেছে। এর আবার বিচার কি?' যে দাঁড়িয়ে ছিল সে বললে, 'তোমার কথা আমরা শুনেছি, এটি গণ আদালত। গণ আদালতের বিচারে তুমি দোষী সাব্যস্ত হলে।' এই কথা বলে সে আর চারজনের মুখের দিকে চাইল। সকলেই বলে উঠল, 'ঠিক কথা বটে।' এবং সঙ্গে সঙ্গে রায় দেওয়া হল—তাঁর অপরাধের জন্য তাঁর শিরচ্ছেদ হবে। উনি তখন একটু হেসে ফেলেছেন। বললেন, 'তা শিরচ্ছেদ তো হবে বাপু, কিন্তু গাঁয়ের আর সব লোক কই? তুমি তো এখানকার লোক নও।' তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে গম্ভীর স্বরে আবার রায়টি শোনানো হল: 'যেহেতু বর্তমানে শিরশ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না, অতএব ওর শিখা ছেদ করে ওর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হউক।' উনি তখন একটু গোলমালে পড়ে গেছেন। একবারও ভাবেননি যে, ব্যাপারটা এত দূরে গড়াবে। যাই হোক, দণ্ডাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে একজন একটি কাঁচি এনে ও'র শিখা ছেদ করল। ও'র শিখা অবশ্য বরাবরই বেশ সুপুষ্ট। সেজন্য ছেদনে কোনও অসুবিধা হয়নি। তারপর যারা ওকে সঙ্গে করে এনেছিল, তারাই গ্রামের বাইরে রেখে দিয়ে আসল।

তিনি একবার ভাবলেন গাঁয়ে গিয়ে লোকজনদের ডেকে এই রাত্রেই একটা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তখন রাতও অনেক হয়ে গেছে আর সারা দিনের পর শরীরও অবসন্ন। তিনি আস্তে আস্তে বাড়ি চলে গেলেন। পরের দিন কংগ্রেস ভবনে আমরা খবর পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে জেলা কংগ্রেস কমিটিকে বলে দেওয়া হল যে, দু দিনের মধ্যে ঐ গ্রামে যেন জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই গ্রামে আমার এই শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল, তবু কাঁদরের ধার দিয়ে দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে মোষের গাড়ি করে সকলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সভায় বেশ জনসমাগম হয়েছে। কিন্তু মনে হল যে, ঐ গাঁয়ের লোক সব আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। সভাস্থলে বিশেষ নেই। সভা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে আমরা বললুম যে, 'এই জেলার খ্যাতনামা কংগ্রেসসেবী, যিনি এই গ্রামের সকলের বহুপরিচিত,...দিন রাত্রিবেলা পাঁচ-ছ'জন লোক গিয়ে অন্য গ্রামের রাস্তা থেকে তাঁকে ধরে এনে এই গ্রামে গণ আদালতের নামে তাঁকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য ঐ লাঞ্ছনায় ও'র ব্যক্তিগত অসম্মান কিছুই হয়নি; বরং বোঝা গেছে যে, কংগ্রেস-বিরোধীরা ও'র ভয়ে ভীত। যাই হোক, উনি তো একা নন। আজ অনেক কংগ্রেস-কর্মী এসেছেন সেই গণ আদালতে পাঁচজন বিচারকের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য।' এইভাবে ঘন্টা খানেক সভার কাজ চলবার পর গ্রামের কয়েকজন লোক এসে আমাদের জানাল তারা কিছু বক্তব্য রাখতে চায়। আমরা ভাবলুম এরাই বুঝি গণ আদালতের বিচারক ছিল। যাই হোক, একে একে গ্রামের ঐ ক'জন আমাদের সহকর্মী যাঁকে লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল এবং গণ আদালতের সঙ্গে গ্রামের যে কোনও সম্পর্ক নেই সে কথাও বললে। দেখা গেল যে, গ্রামের অধিকাংশ লোকের সঙ্গে আমাদের সহকর্মীর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সভাশেষে যখন আমরা গ্রাম ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আবার গ্রামের লোকেরা এসে উপস্থিত। এবারে প্রায় ঘেরাও বললেই চলে। তাদের অনুরোধ—সে রাত্রে গ্রামেই থাকতে হবে এবং সেখানেই আহারাদি করতে হবে। আমাদেরও কোনও উপায় ছিল না। ঘটনাটা যেভাবে মোড় নিল তাতে সে সময়ে গ্রাম থেকে চলে এলে গ্রামবাসীরা সত্যিই মনঃক্ষুণ্ণ হত। তারপর দীর্ঘ রাত ধরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানা আলোচনা হল। আর রাত্রে খাওয়াটা সত্যিই রাজকীয় হয়েছিল।

গ্রামটি বীরভূম জেলায়। নাম 'খিব'। এবং কংগ্রেস-সেবী হলেন আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ও বীরভূম জেলার খ্যাতনামা নেতা শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। এরকম আরও ঘটনা জানা আছে। কিন্তু আমি মনে করি একটা উদাহরণই যথেষ্ট। এ হল দেশ স্বাধীন হবার পর।

দেশ স্বাধীন হবার আগে মাঝে মাঝে বেশ মজার মজার ঘটনা হত। ১৯৩৬এ জেল থেকে বেরিয়ে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে আমরা সাত দিন ধরে সভা করছিলাম। চতুর্দিকে সংবর্ধনা, মালা, তোরণ, বাদ্যভান্ড। গোঘাট থানায় একটি গ্রাম থেকে আর একটি গ্রামে যাবার পথে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে দেখা গেল কতকগুলি পোস্টার। এবং আশেপাশে কিছু লোকের অস্ফুট গুঞ্জন ও বক্রোক্তিও শোনা গেল। পোস্টারগুলিতে অবশ্য কংগ্রেস-বিরোধী কথাই লেখা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্থির করলুম যে, ঐ গ্রামেই আমাদের সভা করতে হবে। ব্যস! সেখানেই থেমে গেলুম। সঙ্গে ছিলেন অগ্রজপ্রতিম অনুকূলদা (চক্রবর্তী)। তিনি গাঁয়ের কয়েকটি জানা-শোনা বাড়িতে গেলেন। ফিরে এসে আমায় বললেন, 'বেশ ভালো লাগলো না। আমরা সভা করবো শুনেও বন্ধুরা কিছু উৎসাহ দেখাল না। শুনে আমাদের সভা করার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। আমরা একটি পড়ো ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে উনুন কাটা হল। দোকান থেকে হাঁড়ি, চাল-ডাল প্রভৃতি কিনে রান্নার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। দোকানী অবশ্য বলেছিল যে, ঐ ক'জন লোকের খাওয়া তার বাড়িতেই হতে পারে। আমরা সবিনয়ে জানিয়ে

দিয়েছিলুম যে, না, আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নেব। অনুকূলদা রান্নার ব্যবস্থায় লেগে গেলেন; আর দুজন কর্মী—আমার মনে হয় শান্তি (শ্রীশান্তিমোহন রায়) ও দুর্গা (শ্রীদুর্গা চক্রবর্তী)—এরা ঢুলিদের পাড়া থেকে দুটি ঢোল সংগ্রহ করে আরও কয়েকজন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে জনসভার কথা প্রচার করতে বেরিয়ে যায়। আহারাদির পর গ্রামে সাধারণত যে জায়গায় সভা হয় আমরা সে জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দোকান থেকে একটি শতরঞ্চি ও হ্যারিকেন এনে সভাস্থলে বসে পড়লাম। আশেপাশের দশ-বারোখানি গ্রামে জনসভার কথা প্রচার হয়েছে এবং ঢোল দিয়েছেন কর্মীরা নিজেরা। সন্ধ্যের আগে থেকেই বেশ মানুষজন আসতে আরম্ভ হল। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের পরিচিত। অনেকে আবার কংগ্রেস-কর্মী। যে গ্রামে ঐদিন সভা করবার কথা ছিল, সে গ্রামের লোকেরা একটু ক্ষুব্ধ। তাদের সব কথা বুঝিয়ে বলার পর একটু শান্ত হল। কিন্তু আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বললে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আশেপাশের গ্রাম থেকে কয়েকটি হ্যাজাক ও শতরঞ্চি এল। সঙ্গে কংগ্রেসের পতাকাধারী বহু লোক। সভা তখন বেশ গমগম করছে; আর ঐ গাঁয়েরই দু-চারজন করে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। আমরা যারা গ্রাম পরিক্রমা করছিলুম তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ উত্তেজিত। তীব্র ভাষায় শাণিত কথা বলবার জন্য তৈরী। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে উঠলেন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন যে, 'এই গ্রামে এসে আমরা শিক্ষালাভ করেছি এবং আমরা যে অহংকারের অন্ধকারে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছিলুম সেখান থেকে উদ্ধার পেয়েছি। চতুর্দিকে সংবর্ধনা, ফুলের মালা, বাদ্যভাণ্ড, স্তুতিবাদ—এইসবে আমাদের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছিল। আমরা মনে করেছিলাম—বুঝি আমরা আমাদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে সক্ষম হয়েছি। এই গ্রামে এসে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের কাজ অনেক বাকী। কংগ্রেসের আদর্শ স্বাধীনতার কথা বহু গ্রামে এখনও আমরা পৌঁছে দিতে পারিনি। কিছু সময় জেলে কাটিয়ে অহংকারে স্ফীত হয়েছিলাম। এই গ্রাম আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, এখনও সংবর্ধনা পাবার যোগ্যতা আমরা লাভ করিনি। স্বাধীনতার কথা এখনও বহু জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। সেইজন্যই এই গ্রাম এবং এই গ্রামের অধিবাসীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আজ আমাদের প্রতি তাঁদের ঔদাসীন্য আমাদের পরম সম্পদ। এই গ্রামবাসীদের কাছে আমরা আশীর্বাদ চাইছি—আমরা যেন আমাদের কাজে কোনরকম অলসতা না রাখি। বহু দূরে এখন যেতে হবে। বহু কাজ এখন বাকী। এই গ্রামের অধিবাসীরা যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হন তাঁদের সম্পর্কে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই।

এক ঘণ্টা সভা চলে। শান্ত, ধীর এব নিস্তব্ধতার মধ্যে। সকলে ধৈর্য ধরে ভাষ শোনে। সভা শেষ হবার পর আমরা যখন গ্রামে থাকবার কথা ছিল, সে গ্রাম অভিমুখে যাচ্ছি তখন আবার প্রতিরোধ। গ্রামের বহ লোক একত্রিত হয়েছে। তাদের কথা শুনতে হবে। অগত্যা আবার আমাদের বসতে হল গ্রামের লোক একে একে বলে গেলেন যে, আমর যখন জেলে ছিলুম সেই সময়ে বিভিন্ন শহরে কিছু কর্মী এসে তাঁদের ওখানে ঘাঁটি গাড়ে এবং তাঁদের প্রচারেই গ্রামবাসীরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। দুটো মূল কথা ছিল। কংগ্রেসে আন্দোলনে জমিদাররা শক্তিশালী হবে, আ অহিংসা আন্দোলনে কংগ্রেস কখনও স্বাধীনত অর্জন করতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ গোঘাট থানারই এক জমিদার জেলা কংগ্রে কমিটির সভাপতি শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা ও সম্পাদকরূপে আমার বিরুদ্ধে ১০৭, ১০৯ ১১০ ধারা অনুযায়ী মামলা করেছিলেন জমিদারদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক-সম্প্রীতি আমাদের ছিল না। এ কথা ও গাঁয়ের লোকেরাও জানতেন। তবু, গ্রামের লোক প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ঐ গ্রামেই অবস্থান এবং রাজসিক ভোজ।

মরজিৎ কর

॥ পনেরো ॥

নাগারা যেন স্বতন্ত্র মানুষ। প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মানুষের মুণ্ডু শিকার প্রভৃতি এক সময় ওদের সামাজিক রীতি-নীতি হিসেবে পরিগণিত ছিল ঠিকই, এসব বাদ দিলে মানুষ হিসেবে ওরা নিতান্তই সরল। এবং শান্তিকামী। বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য রেড রিভার অ্যান্ড দ্য ব্লু হিলস' এর লেখক হেম বড়ুয়া নাগাদের কথা লিখতে গিয়ে এ ধরনেরই মন্তব্য করেছিলেন এক সময়।

কেন ওদের নাগা বলা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মানব বিজ্ঞানী ফন ফুরের-হাইমেনডর্ফ। তিনি লিখেছেন, সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। পাহাড়ে বাস করে বলেই হয়ত তাদের বলা হয় নাগা। অনেকে আবার নাগা বলতে মনে করেন উলঙ্গ মানুষ।

শেষোক্ত এই ব্যাখ্যাটি কীভাবে এলো জানি না। কারণ এখনও পর্যন্ত নাগাল্যান্ডের যতটুকু দেখেছি, সেখানে পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখি নি।

প্রবাদ? হ্যাঁ, তাও আছে অনেক। যেমন ধরুন, আঙ্গামীদের কথা। খেজখেনোমা একটি গ্রামের নাম। এক সময়ে সেখানে ছিল একটি বিরাট পাথর। আঙ্গামীরা মনে করে সেই পাথরের ভেতর থেকেই একদিন নাকি তাদের জন্ম হয়েছিল। তারপর দিন যায়। সেই গ্রামে জন্মালো তিন ভাই। ভাইয়েরা বড় হয়ে ধান চাষ করতে শুরু করল। রোজ তারা একটি পাথরের ওপর ধান শুকোতে সারাদিন। আর সন্ধ্যের সময় সেই ধান তুলে আনতে গিয়ে দেখতো, এক বোঝা ধান দুই বোঝায় পরিণত হয়েছে।

এইভাবে বেশ দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কি কারণে তিন ভাইয়ের মধ্যে বাধল ঝগড়া। ব্যাপার স্যাপার দেখে তাদের বুড়ো বাবা মা প্রমাদ গুণলো। তারা ভাবলো এর পর একটা অনাসৃষ্টি না বেধে যায় না। একদিন তারা ছেলেদের অলক্ষ্যে সেই পাথরটি খড়-কুটোয় ঢেকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাথর গেল ফেটে। পাথরটির মধ্যে ছিল একটি দানব। এবার সে পাথরটি ছেড়ে চলে গেল। আর পাথরটিও তার মহিমা হারিয়ে ফেলল।

এবার ভাইয়েরা গেল আরও রেগে। তারা ঝগড়াঝাঁটি করে তিনজন তিন পৃথক গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগল। নাগাদের বিশ্বাস এদের ছেলে-মেয়েরাই পরে আঙ্গামী, সেমা এবং লোটা হিসেবে পরিচিত হয়। আঙ্গামীরা নিজেদের বলে টেঙ্গিমা। এদের জনসংখ্যাই বেশী। এরা ভুট্টা, যব, সিম, ধান, কুমড়ো, শশা, লঙ্কা সরষে প্রভৃতি চাষ করে। কখনও পাটেরও চাষ করে। পাটের সুতো দিয়ে তৈরি করে কাপড়।

মজার দেশ এই নাগাল্যান্ড। বাইরে থেকে এদের সম্পর্কে নানান বীভৎস গল্প শোনেন আপনারা। আপনি এসেছেন দু দিনের জন্যে। এত কম সময়ে একটা দেশের মানুষকে কি জানা যায়, না তাদের বোঝা যায়? ওদের বুঝতে গেলে ওদের ভেতরে যেতে হবে। নিজের মত করে ওদের সঙ্গে দু দিন কাটান। তবে তো বুঝবেন জাতটা কি মহৎ।

ভদ্রলোক বললেন, এই মিরি নাগাদের কথা ধরুন না। ওসব প্রবাদ টোবাদ ছেড়ে দিন। অনেকের বিশ্বাস ওরা এসেছিল ব্রহ্মদেশ থেকে। তারপর নানা ভাগে ওরা ভাগ হয়ে যায়। যেমন, সাংটং, চ্যাং, ইয়ামফি, ফোম, চাকিক কনিয়াক, আউসেট, ইয়েমসাম, ইত্যাদি। কি সুন্দর চেহারা এদের। ওই চ্যাংদের কথাই ধরুন না। ওদের পুরুষ, মশায়, যেমন লম্বা গড়ন, তেমন মজবুত দেহ।

রক্ষীরাই এখানকার জনতা। আর আছে সেন্ট্রাল পি ডব্লু ডি। ওরা চুটিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আছে স্কুল। দোকান পাট। সরকারী আবাস। গত কয়েক বছরে এখানে নানা রকম সরকারী অফিসও গড়ে উঠেছে।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, আমরা সি পি ডব্লু ডির ইনসপেকশন বাংলোতে থাকবো। দেখি, আমাদের অ্যাডভান্স পার্টি কি বন্দোবস্ত করেছে।

সুন্দর আবহাওয়া। জায়গাটা প্রায় হাজার চারফুট উঁচু। সন্ধ্যের দিকে বেশ শীত শীত করছিল।

বাংলোয় পৌঁছতেই ফ্যাসাদ। কোথায় অ্যাডভান্স পার্টি? কারোর টিকিটির দেখা নেই।

কী ব্যাপার, ডঃ শ্রীবাস্তব? ভৌমিক কোথায়? দে হ্যাভ নো ট্রেস। বললেন শম্ভুবাবু।

ডঃ শ্রীবাস্তব তো থ। তাই তো,

একেবারে রেশন। তাঁরা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি কিচেনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এই ফাঁকে আমরাও ফ্রেশ হয়ে নিলাম।

এর পর সৌজন্য সাক্ষাৎকার। ডঃ শ্রীবাস্তব হই হই করতে করতে হাজির। সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক।

ইনি মিঃ এস লিমা আয়ার। কিফ্রের অ্যাসিট্যান্ট ডেপুটি কমিশনার। আর ইনি মিঃ এন টি লঙ্গকুমার। এখানকার পি ডব্লু ডি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। শম্ভুবাবু এবং আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

মিঃ আয়ার বেঁটেখাটো মানুষ। কিছুটা স্থূলকায়। মিঃ লঙ্গকুমার তুলনায় বেশ লম্বা। এদের সঙ্গে আধ-ঘন্টার মত গল্পগুজবে সময় কাটলো।

মিঃ আয়ার বললেন, কাল সকালে আমরাও আপনাদের সঙ্গে পুকপুর

বাঁ দিক থেকে : মিঃ লঙ্গকুমার, শম্ভু সেন, মিঃ আয়ার এবং ডঃ শ্রীবাস্তব

আর বিউটি। কনিয়াক বিউটির কোথায় নজির পাবেন, মশায়? তামলু, ওয়ানচিং, ওয়াকচিং যান না। দেখবেন, এক একটি নাগা মেয়ে—ওরা কনিয়াক—একেবারে টপ সুন্দরী। আপনি তো পুকপুর যাবেন। সেখানে দেখবেন আউসেট নাগা। আপনার ভালই লাগবে। চাকিক নাগাও দেখবেন। ওরা বাস করে বার্মা পাহাড়ের কাছে। ভারী দুর্গম জায়গা। তিজু নদীর পাশ দিয়ে তো যাবেন—যাবেন কেন, তিজু পেরিয়েই যেতে হবে আপনাকে। তিজুর পশ্চিম তীরে দেখবেন সেমা নাগা। ডিকো নদীর কাছে বাস করে আউ নাগা। এদের আবার আটটা শাখা। লংখুম, চামী, আলং, পুমন, পাউছেন, লুংচা, উনামফু এবং লুনতো। মুখের গড়ন চীনেদের মত। পুরুষরা ভারী শক্ত। নেঙটি পরে ঘুরে বেড়ায়। আর কোমরে দা'।

কিফ্রের দিকে যেতে যেতে সেই ভদ্রলোকের কথাই মনে পড়ছিল বার-বার। জেসামিতে যাদের দেখলাম তারা তো পরিবর্তিত সংস্করণ। শহরের পরিবেশে তারা তো কৃত্রিম।

কিফ্রেতে গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধ্যের কিছু আগে। ছোট্ট শহর। আমরা এখন

তাই তো—আমাদের অনেক আগে আসার কথা ছিল ওদের। ডঃ শ্রীবাস্তব আমতা আমতা করতে লাগলেন।

বলতে বলতেই জীপ আর ল্যান্ড রোভারের শব্দ। আর তার পর মুহূর্তেই অসিত ভৌমিকের জীপ এসে দাঁড়ালো ক্যাচ করে ব্রেক কষল আমাদের পাশে।

জীপ থেকে লাফিয়ে নামলেন মিঃ ভৌমিক।

আমি রসিকতার লোভ সামলাতে না পেরে বললাম, কী খবর, ভৌমিক সাহেব? শেষে অ্যাডভান্স পার্টির অ্যাডভান্স পার্টি হতে হলো আমাদের?

আর বলবেন না। পথে ল্যান্ড রোভারের টায়ার ফুটো। ইঞ্জিনটিও বিগড়ে গিয়েছিল কিছুটা। আবার জেসামিতে ফিরে গিয়ে সব সারিয়ে এই আসা।

শম্ভু সেন বললেন, যাক। তবু এসেছো তোমরা। রবিকুমার কোথায়?

পেছনে ল্যান্ডরোভারে আছে।

এরপর শুরু হয়ে গেল লম্বা রুটিন।

রবিকুমার এবং অসিতবাবু দারুণ কাজের মানুষ। আধঘন্টার মধ্যে রাতের

যাচ্ছি, মিঃ সেন। সেখানে আপনাদের জন্যে একটা কালচারাল প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আই হোপ, ইউ উইল ফাইনড দ্য পীপল ইন্টারেস্টিং।

অমায়িক ভদ্রলোক। মিঃ আয়ার এবং মিঃ লঙ্গকুমার দুজনই। ওঁরা দুজনই নাগাল্যান্ডের অধিবাসী। বয়স চারের কোটায়। হয়ত পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। দুজনই খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বী।

কথা হলো নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকার মানুষ সম্পর্কে। মিঃ আয়ার বললেন, জানেন তো, আমাদের এদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাই সব মাটি করেছে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাবেন তার রাস্তা নেই। এসব পাহাড়ে অঞ্চল। পথ চলতে গিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে যে কোন সময় মানুষ আহত হতে পারে। কিন্তু তাকে যে তখন ফার্স্ট এইড দেবেন গ্রামাঞ্চলে তেমন ব্যবস্থাই নেই। এমন জায়গা আছে এখানে, যেখানে জীবনের প্রাচীন ধারা আঁকড়ে বেঁচে থাকা ছাড়া কোন পথ নেই। বিশ্বাস? হ্যাঁ, অপরকে তারা চট্ করে বিশ্বাস করতে পারে না। অজ্ঞতাই যার কারণ। দে নিড এডুকেশন, মিঃ কর।

কিন্তু সব চাইতে আগে দরকার

আপনি যখন কারো পথ চেয়ে থাকেন, তখন বারবার
যে মুখখানির দিকে তাকান তা যেন বিরক্তিকর না হয়!

মার্কেটিং ডিভিশন

hmt

জাতীয় সময়রক্ষী
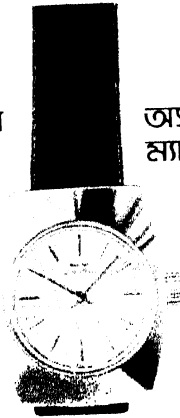
আপনার যদি ইচ্ছে থাকে,
আমাদের আছে অনেক সময়! এইচ এম টি ঘড়ি!

পারে।

শম্ভুবাবু বললেন, এটাই তো এখনও পর্যন্ত মস্ত বড় সমস্যা। এই যে তুয়েনসাং জেলা, এর সবটাই দাঁড়িয়ে আছে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত ভারত-বার্মা পার্বত্য অঞ্চলে। উঁচু পর্বতশৃঙ্গ, গভীর গিরিখাত, সংকীর্ণ উপত্যকা এবং ছোট ছোট কয়েকটি মালভূমি এই নিয়ে এই জেলা। পূর্ব দিকে আটত্রিশ শ' মিটার উঁচু সারামাটি গিরিচূড়া। সে জায়গায় যাওয়া আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়ার পক্ষে সেখানে সম্ভব হয়নি ঠিকই। কিন্তু সেখানেও তো মানুষ বাস করে। তারা নাগা। তারা আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত।

ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করতে গিয়ে সার্ভের লোকদের মনে হলো পুকপুরের ভূস্তরে লোহা, নিকেল, কোবল্ট এবং প্লাটিনামের চিহ্ন রয়েছে যেন? হ্যাঁ, ড্রিল করতে হবে। দেখতে হবে তাদের অনুমান সত্যি কি না।

শক্ত কাজ। ড্রিল করার ভারী যন্ত্রপাতি যে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে, তার রাস্তা কোথায়? শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হলো। এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করলো ভারতীয় বিমানবাহিনী। হেলিকপ্টার ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নামিয়ে দিলেন পুকপুরে। সেখান থেকে তাদের কুলির মাথায় করে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে সেই মাতুংগসেকিন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তবেই ড্রিলিং-এর কাজ শুরু করা হলো। প্রচুর ঝামেলা। প্রচুর ঝক্কি। কাছে কোলে কোন বাজার হাট নেই। না আছে লোকালয়। কী খাবেন তার না আছে কোন ঠিক ঠিকানা। এভাবে আর কতটা কাজ এগোবে?

রাত আটটা নাগাদ বিদায় নিলেন মিঃ আয়ার এবং মিঃ লংগকুমার। যাওয়ার সময় বলে গেলেন সকাল সাত-টার মধ্যে আমরা যেন রওনা দিই। নইলে যেতে যেতে বেলা বেড়ে যাবে।

ডঃ শ্রীবাস্তব ভরসা দিয়ে বললেন, কেন ভাবনা করবেন না। আমরা ঠিক সাড়ে সাতটার মধ্যেই রওনা হবো।

সাড়ে সাতটা নয়, সাতটা। তাঁর ভুল শুধরে দিলেন মিঃ লংগকুমার।

সরি। সাতটা। মনে থাকবে। হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই আমরা কথা রাখতে পারি নি। সারাদিন পথ চলার ক্লান্তিতে সবাই কুম্ভকর্ণের ঘুম মেরে উঠতে উঠতে পরদিন বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আমরা যখন যাত্রা করলাম, ঘড়িতে তখন আটটা।

রোদ ঝলমলে দিন। স্নিগ্ধ বাতাস। সবাই আমরা গায়ে চামড়ার জ্যাকেট এবং মাথায় টুপি পরে নিয়েছি। উদ্দেশ্য, কিছুটা ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানো। এবং তার চেয়েও বেশী, ধুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। কারণ, যে পথ ধরে এবার আমরা চলেছি, সে পথ কিফুরের পথের মত পীচ ঢালা নয়। একেবারে কাঁচা। একেবারে ধুলার ঝড় তুলে আমরা পথ চলতে লাগলাম।

কখনও খাড়াই, কখনও উৎরাই। কখনও বাহাত্তর ডিগ্রি কোণ করে উপরে

কিফুরের পথে নাগা গ্রাম...

পুকপুরের সাংস্কৃতিক আসর
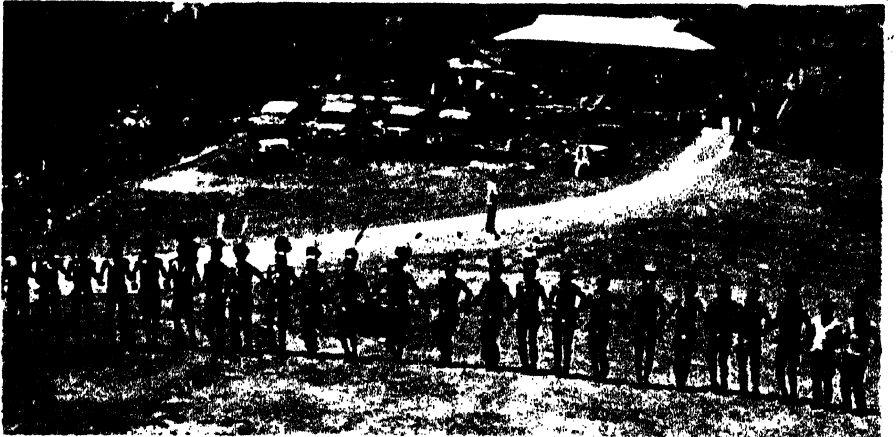
ভূতাত্ত্বিক নমুনা

কাশ করে আবার নেমে আসা। মাঝে মাঝে শম্ভুবাবু ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছেন, হুঁশিয়ার ভাই। নো স্পিড। ডান দিকটা সামলে চলুন, ইত্যাদি।

কারণও ছিল। পুরোটাই কাঁচা রাস্তা। সরু। একখানা জীপ কোন রকমে চলতে পারে। একটু বেসামাল হলে এক পাশে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে হবে আর এক পাশে গভীর পরিখাতের মধ্যে একেবারে বেপাত্তা। পথে পড়ল জুমকি নদী। ছোট নদী। কিন্তু ভীষণ স্রোত। বছরখানিক আগে রাজ্য সরকার এর ওপর একটি সেতু তৈরি করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর বয়ে গিয়ে এই নদী টেজু নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিফুরে থেকে পুক-পুরের দূরত্ব প্রায় বাহাত্তর কিলোমিটার। মাঝে পড়ল ছোট্ট একটি শহর। নাম পুঙ্গারো। পুঙ্গারো থেকে পুকপুর পর্যন্ত তেইশ কিলোমিটার পথে কাজ চলছে রাজ্য সরকারের।

পুকপুর থেকে আসলে যেখানে আমাদের যাওয়ার কথা সেটি একটি গ্রাম। নাম জাংগর। সেখানে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম প্রায় সাড়ে এগারোটায়।

অবিশ্বাস্য। এত মানুষ। এত আদের প্রাণ! মানুষ এত আনন্দও করতে পারে? ছোট্ট একটা উৎরাই পথে আমাদের জীপ যখন উঠতে লাগলো প্রথমেই পড়ল একটি তোরণ। তিনটি গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি। দুটি খাড়া করে পোঁতা। একটি আড়াআড়িভাবে তাদের মাথায় বেঁধে রাখা হয়েছে। আর সেখানে সাদা কাগজের ফালি কেটে ইংরেজি হরফে লিখে রাখা হয়েছে, অতিথিরা, স্বাগতঃ!

সেই তোরণের ভেতর দিয়ে আমরা হাজির হলাম একটি খুদে মালভূমির ওপর। মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটি মাঠ। তার মাঝখানে বিচিত্র রঙিন পোশাকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় সত্তরজন যুবক। ফর্সা গা খালি পা। কোমর থেকে যৎসামান্য নিচে যৎসামান্য বাস। তাদের কোমর থেকে পা পর্যন্ত— বর্শের ক'রে জানু যেন কোন শিল্পী নিখুঁতভাবে তৈরি করে দিয়েছেন। কোমরে ঝোলানো দা। গায়ে নানা রকম গহনা। মাথায় পালকের বাহারে টুপি। তারা হাত ধরাধরি করে তালে তালে নেচে চলেছে। আর মুখে শব্দ করছে— হুম্-ইয়া-হা। হুম্-ইয়া—হা।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

জিওলজিকেল সার্ভের লোকেরা কয়েকটি চেয়ার টেবিল এবং বেঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের পেছনে উঁচু র‍্যামপার্টের মত একটি জায়গায় গ্রামের যত ছোট ছোট বাচ্চা ভীড় করে বসে। মাঝে মাঝে উল্লাসে চিৎকার করছে তারা। মাঠের পেছনে একটি টিলা। উপর থেকে ঢালু হয়ে মাঠের দিকে নেমে এসেছে। সেই টিলার ওপর গ্রাম। কাঠ আর খড়ে ছাওয়া বাড়ি। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে মেয়েরা ভীড় করে নাচ দেখছে।

মিঃ আয়ার এবং মিঃ লঙ্গকুমার আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মিঃ আয়ার হাসতে হাসতে বললেন, ইউ আর লেট্। দে হ্যাভ স্টার্টেড দেয়ার কালচারাল শো।

এলো গাঁওবুড়া। বছর চল্লিশ ... লঙ্গকুমার তার ইংরেজী তর্জমা করলেন, ওরা চায়, আমরাও ওদের নাচে অংশ গ্রহণ করি।

সর্বনেশে কাণ্ড। নাচ। মানে আমাকেও নাচতে হবে ওদের সঙ্গে? যার ডান দিকের ধাপ বাঁয়ে পড়ে, তাকেও নাচতে হবে শেষ পর্যন্ত?

শম্ভুবাবু চোখ মটকালেন। —নো অলটারনেটিভ। ওরা যেহেতু চায়, আমাদের নাচতেই হবে। নইলে মনে মনে ক্ষুন্ন হবে ওরা।

ডঃ শ্রীবাস্তব দেখি অনেক স্মার্ট। তিনি ততক্ষণ নাচের আসরে নেমে পড়েছেন।

আমার পাশ থেকে কে যেন মন্তব্য করলেন, বুঝলেন না? ডঃ শ্রীবাস্তব হলেন গিয়ে এ অঞ্চলের জিওলজিক্যাল সার্ভের ডাইরেকটর। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এভাবে না মিশলে তাঁর এ অঞ্চলের লোকজন কখনও কাজ করতে পারবে?

অগত্যা। নাচের আসরে যোগ দিতে হলো। শম্ভুবাবু, মিঃ লঙ্গকুমার, মিঃ আয়ার অন্যান্য জিওলজিস্ট এবং আমি। নাচের পোশাক না থাক। একটা করে পালকের টুপিই যথেষ্ট। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় এক একটি টুপি পরিয়ে দিলো ওরা। তারপর শুরু হলো আর এক প্রস্থ নাচ।

ততক্ষণ অজিতবাবুর মুভি চলতে শুরু করেছে।

নাচ চলল প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ। তারপর সভা। শম্ভুবাবু, ডঃ শ্রীবাস্তব এবং আমাকে ওদের হাতে তৈরি এক একটি লাল বর্ডারের কালো শাল দিয়ে ওরা সম্বর্ধনা জানালো। ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, মিঃ কর, এটা বিরাট সম্মান। মানে ওরা আমাদের আপনার করে নিল।

শম্ভুবাবু দিলেন গিফট। নুনের বস্তা, চার্মিনার সিগারেট এবং টফির বাকসো।

কী সরল। কত আনন্দিত তারা। শিশুর মত মনে ওরা গ্রহণ করল সব। না, এতটুকু চেঁচামেচি নেই। এতটুকু হল্লাও শুনলাম না। না ছিল ওদের মধ্যে একটুকু উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন।

এর পর বক্তৃতার পালা। আপনারা বাইরে থেকে এসেছেন। আপনাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই। গাঁওবুড়া চেপে ধরলেন আমাদের।

শম্ভুবাবু বক্তৃতা করলেন। ওদের বললেন, আমরা জিওলজিস্টরা সব সময়ই আপনাদের সাহায্য পেয়ে আসছি। আসুন এই পুকপুরে আমরা এক সঙ্গে কাজ করি। এখানকার পাথরে চাপা পড়ে আছে মূল্যবান ধাতু। তাদের উদ্ধার করতে পারলে আপনাদেরই লাভ। হিন্দীতে বললেন তিনি। মিঃ লঙ্গকুমার অনুবাদ ক'রে দিলেন।

মিঃ কর, আপনিও কিছু বলুন। মিঃ আয়ারের অনুরোধ।

কিন্তু আমি কি বলব? আমি তো এসেছি দেখতে। শুনতে।

দেখলেন এবং শুনলেনও তো। এবার বলুন, আপনি কী বুঝলেন? ওরা শুনতে চায়। শুনে খুশি হবে।

অতএব বলতে হলো। ওদের সান্নিধ্যে হৃদয়ে যে স্পর্শ পেলাম, সেটাই প্রকাশ করলাম। যে হৃদয়ের মধ্যে সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা—তার কথাই বললাম।

একজন বললেন, আপনাকে আমরা নেমন্তন্ন করছি। আজকের দুপুরের খাওয়াটা আমার বাড়িতে খেতে হবে। তিনি নাগা। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক।

শম্ভুবাবুর আবার চোখ মটকানি। —কি চলবে? দারুণ শক্ত কাজ। বাংলাতেই বললেন।

ডঃ শ্রীবাস্তব চুপ। ভাবছে, আমি কি বলি।

আমি বললাম, কাজটা যদি ওদের কাছে শক্ত না হয়, আমার কাছেও হবে না।

বেশ। গুড লাক্। বলেই ডঃ শ্রীবাস্তব, শম্ভুবাবু, মিঃ আয়ার এবং আর সবাই নিজেদের ক্যাম্পের দিকে পা বাড়ালেন। এবং অজিতবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ লঙ্গকুমার এবং আমি নাগা-বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

খড়ে ছাওয়া ঘর। একটিমাত্র দরজা। নিচু হয়ে ঢুকতে হয়। ঘরের মধ্যে এক একটি গাছের গুঁড়ি কেটে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলি বসার জায়গা। সামনে একটি করে তক্তা। মানে টেবিল। আমরা গিয়ে বসলাম

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গৃহকর্তার ব্যস্ততা। এক একটি কলাই-এর থালা এলো। তার ওপর ভাত। প্রথমে পরি-বেশন করা হলো আলুর তরকারি। শুনলাম এটা অতিরিক্ত। শুধু অতিথ-দের জন্যে। তারপর মাংস। শুয়োরের মাংস। লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা এবং নুন দিয়ে সেদ্ধ।

এক ঘন্টা ধরে চলল খাওয়া এবং গল্প।

যে আন্তরিকতা পেলাম, তার যেন তুলনা নেই। দেখলাম, ঘরের মধ্যে একটা ধুনি জ্বলছে। পাশে ছোট্ট একটি ঘর। মাঝে মাঝে তার দরজা দিয়ে দুখানা হাত বেরিয়ে আসছে। সেই হাত থেকে পাত্র করে খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন গৃহকর্তা। বুঝলাম, দরজার আড়াল থেকে যে হাত দুটি দেখতে পাচ্ছি, তা গৃহকর্ত্রীর। অবাক লাগলো। এরাও কি তা হলে সংরক্ষণশীল?

খাওয়া দাওয়া সেরে খানিকটা কৌতুক করার জন্যে গৃহকর্তাকে বললাম, সবই তো হলো, শুধু একটি গোলমাল থেকে যাচ্ছে যে।

গৃহকর্তার ভাষা বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝলাম, আমার কথা শুনে একটু যেন বিচলিত হলেন তিনি।

বললাম, শুনুন, স্যার। আমাদের পরিবারে একটি নিয়ম আছে। আমরা যখন কারোর অতিথি হই, আতিথ্য পাওয়ার পর তাঁর পরিবারের গিন্নি কর্ত্রী, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে সেটি বাদ থেকে যাচ্ছে।

মিঃ লঙ্গকুমার সঙ্গে সঙ্গে আমার বক্তব্য নাগা ভাষায় অনুবাদ করলেন।

পড়ে গেল হাসির রোল। আমাদের স্যারও এবার হাল্কা হলেন যেন। নিজের ভাষায় স্ত্রীকে আহ্বান জানালেন তিনি।

কয়েকটা মুহূর্ত। এটুকু কাল ক্ষেপণের মূলে কারণ হয়ত সংকোচ। তারপর পাশের ঘর থেকে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

স্কার্ট ব্লাউজ। চুলে বিনুনী। কোন চাপল্য নেই। স্নিগ্ধ, স্নেহময়ী মূর্তি। যাঁর সান্নিধ্যে মাথা আপনা থেকেই নত হয়।

তাঁর হাত দুটি আমার দুহাতে চেপে ধরলাম। তারপর মাথা নত করে বললাম, ভগিনী, আপনার সংসারে এসে বড় তৃপ্তি পেলাম।

আমার কথা অনুবাদ করলেন মিঃ লঙ্গকুমার।

তিনি মাথা নত করে আমাকে প্রতি নমস্কার করলেন। তাঁর মুখের ওপর ভেসে উঠল মৃদু হাসির রেখা।

বাইরে বেরোতেই আবার রিসেপসন। দেখি একদল ছেলে এবং মেয়ে পরিচ্ছন্ন পোশাকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলেরা ফুলপ্যান্ট এবং জামা পরা। মেয়েদের পরণে মেখলা এবং স্কার্ট। মেয়েদের হাতে ছোট্ট এক একটি ছাপানো বই। দু হাত দিয়ে বইগুলি চোখের সামনে ধরে তারা সুর করে গান করছে। দেখলাম, বইগুলির ভাষা নাগা। হরফ ইংরেজী।

মিঃ লঙ্গকুমার বললেন, আপনাকে এরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। এখন আপনি এই গ্রামেরই অতিথি। তাই এই বিশেষ অভ্যর্থনা। বলেছিলেন, নাগা গ্রাম দেখবেন। চলুন, গ্রামটা দেখে নিন।

আমাদের সঙ্গে এসে হাজির হলেন এক তরুণ নাগা যুবক। পরিচয় হতেই জানলাম তিনি একজন ডাক্তার। কলকাতা থেকে এম বি বি এস পাশ করে এখন পুঙ্গারোর সরকারী ডেয়ারির মেডিকেল অফিসার। নাম ডঃ মেরেন সাংগতাম। ভদ্রলোক বললেন, কলকাতা থেকে এসে এখানে দেখছেন তো, পার্থক্যটা কোথায়? এখানকার মানুষ বড় গরীব, মিঃ কর।

তাঁর কথায় বললাম, গরীব। টাকা পয়সার দিক দিয়ে গরীব ঠিকই। কিন্তু যে সম্পদ মানুষকে মানুষ করে তোলে, সে দিক দিয়ে এখানকার মানুষ অনেক বেশি ধনী। একেবারে পাথরের মত চিরায়ত।

ইউ আর ইমোশন্যাল। মন্তব্য করলেন ডঃ সাংগতাম।

জানি না, আপনি কি বলতে চাইছেন। তবে আমার মনে হয়, জীবনটা শুধু যুক্তিতর্কের বিষয় নয়, জীবন বিশ্বাসের সামগ্রী। আর যেখানেই বিশ্বাস, সেখানেই ইমোসন। আপনাদের শহরগুলির কী অবস্থা, আমি জানি না। তবে এই গ্রামে, এদের একান্ত সান্নিধ্যে এসে আমার মনে হয়েছে এখানকার মানুষের আত্মবিশ্বাসের ভিত বড় শক্ত। এদের সংস্কৃতির প্রতি এদের প্রচণ্ড ভালবাসা। হ্যাঁ, সংস্কৃতি। আমার কি মনে হয় জানেন, একটা মানুষের আইডেনটিটি তার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। আর তা গড়ে তুলতে সময় লাগে বিস্তর। যেভাবেই হোক এটা আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, ডঃ সাংগতাম। বিদেশ থেকে আমদানি করা সংস্কৃতি নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। বাঁচতে যে পারে না, সে তো আমাদের বড় বড় শহর দেখলেই বুঝতে পারেন। যাক বক্তৃতা হয়ে গেল। মাফ করবেন। চলুন, গ্রামটা ঘুরে দেখি। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কয়েকটি জরুরী ঘোষণা

পূর্ণেন্দু পত্রী

আগামী চোদ্দ বছর মহিষ কিংবা নেউল রঙের মেঘের মুখদর্শন করব না কেউ।
আগামী চোদ্দ বছর আমাদের কবিতা থেকে হিঁচড়ে-নাচন বৃষ্টির নির্বাসন।
স্বেচ্ছাচারী এবং হামলাবাজ হাওয়াকে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছি আমি
আর পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় টেলিফোনে ট্রাঙ্ককলে রেডিওগ্রামে জানিয়ে দিয়েছি
সমস্ত বিক্ষুব্ধ জলস্রোত যেন মাটিতে নাক-খত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়
দুর্গত মানুষের কাদা-পায়ে।
প্রত্যেক নদীর বাঁধকে বলে দিয়েছি হতে হবে হিমালয়ের কাঁধ সমান
প্রত্যেকটা নদীকে হতে হবে পাড়াগাঁর লাজুক বৌ
প্রত্যেকটা ব্যারেজকে জননীর গর্ভ।
ভবিষ্যতে আর কোনদিন যদি মানুষকে ভাসতে দেখি শিকড়হীন উলঙ্গ
আর কোনদিন যদি মানুষের সাজানো-নিকোনো স্বপ্নসাধের ভিতরে ঢুকে পড়ে
দুঃস্বপ্নের খল খল হাসি, আঁকাবাঁকা সাপ, মরা কুকুরের কান্না আর ভাঙা শাঁখা
আর কোনদিন যদি মানুষের শ্রেষ্ঠতম সংলাপ হয়ে ওঠে হাহাকার
আর কোনদিন যদি মানুষের আলতা-সিঁদুর পরা সতী-লক্ষ্মী গৃহস্থালিকে
হেলিকপটার থেকে মনে হয় ছেঁড়া-কাঁথা-কানির টুকরো
আমি বাধ্য হবো সভ্যতার বিরুদ্ধে ফাঁসীর হুকুম দিতে।
যতদিন মানুষের গায়ে দুর্দিনের দুর্গন্ধ এবং নষ্ট জলরেখা
রোদের কামাই করা চলবে না একদিনও।
মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমি দেখে যেতে চাই
সমস্ত পুরুষ সূর্যমুখী, নারীরা ঝুমকো জবা আর শিশুরা
কমলা রঙের বোঁটায় সাদা শিউলি।

কোয়ান

রাজলক্ষ্মী দেবী

ঝেন্—মহাপ্রভুর বিচারে—
আমি আছি—
ক্ষুধা পেলে খাই—
ঘুম এলে ঘুমাই—
এ সর্কালি মহাসত্য,
বিস্ময়ের মূলতত্ত্ব
গণ্য হ'তে পারে।
বৈদান্তিক কবির ভাষায়
বলা যায়—
'প্রকান্ড বন,
প্রকান্ড গাছ,—
বেরিয়ে এলেই
নেই।'

তাহ'লে, সর্বদা এই যে ওয়ান বাই ওয়ান বাই ওয়ান
বাস ট্রাম ঠেলাগাড়ী সাইকেল মোটরকার জীপ,—
সর্বক্ষণ পদচারী দ্বিধাগ্রস্ত, সর্বক্ষণ হর্নের পিঁ-পাঁপ
এখন পাঁচমিনিট স্তব্ধ, শূন্য বড়রাস্তা?
কেমন কোয়ান?

বালক

সুধেন্দু মল্লিক

যখনি ত্রুটি হয় তখনি বালক ভর্ৎসনা করে বলে
যা চলে যা, আসিস না, কখনো আসিস না
তুই আর।
দরজায় ঠেস দিয়ে অভিমানে বেঁকে দাঁড়ায়
মুখ রাঙা করে।

সিঁড়িতে নামতে থাকি ক্লান্ত পায়ে। শরীরে
শেকল বাজে। নেমে যাই। আর শেকল বাজে।
কেন ভুল হয়! কেন বারবার হাত কেঁপে ওঠে,
সরে যায় চোখ! কেন বারবার জেগে থাকতে
থাকতে নেমে আসে অভিশাপের ঘুম! তবে যাই।
দেখো যেন আর না ফিরে আসি চোখের জলে
গোধূলির ঘন্টায়, নিঃসঙ্গ উচ্চারণে। সহসা বৃষ্টির
মতো পুষ্পল ছোঁয়ায় থেমে যায় বিশ্বের হাহাকার।
দ্যাখরে ব্যর্থ কবি সব শেষের সোপান
অবরোধ করে পা ছড়িয়ে বসা নিশ্চিন্ত পরম বালক
হাসতে হাসতে বলছে—
কি আনলি আমার জন্যে।

বিশ্বপতি মাইতী (জন্ম ১৯৪৬) সরকারী চারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৭০
বহুবার পুরস্কৃত। প্রাদেশিক সরকারের চাকুরে। 'সূর্যমুখী এবং চন্দ্রালো

ও যাতে নতুন করে আবার দোকান করতে পারে, তার জন্য অরণ্যদেব ওকে সাহায্য দিলেন..
হীরে...
খাঁটি হীরে!
তারপর চললেন দুর্বৃত্তদের সন্ধানে...
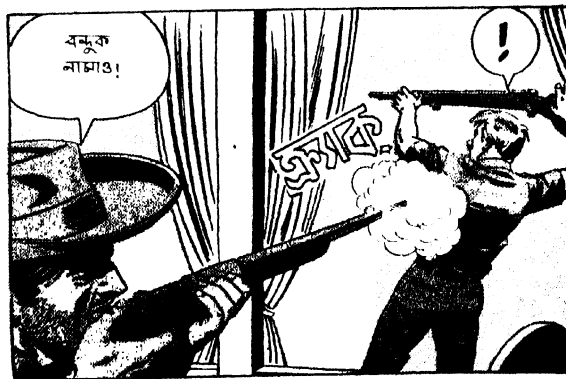
উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

॥ ২১ ॥

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর কাঁঠাল গাছতলায় এসে দাঁড়াল অনি। বাড়ি ফেরার পর থেকে ছোটমার সঙ্গে কথাই হচ্ছে না প্রায়। এমন কি অনিকে খাবার দেবার সময় মনে হচ্ছিল রান্নাঘরে ও'র খুব কাজ, সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় পাচ্ছেন না। উঠোনে ডাঁই করা বাসন অথচ বাড়িতে কাজের লোক নেই—বাবার ওপর অনি ক্রমশ চটে যাচ্ছিল। ছোটমাকে এখন সব কাজ করতে হয়। বিয়ের পর পায়েসের বাটি হাতে নিয়ে ওর ঘরে আসা ছোটমার সঙ্গে এখন কেমন রোগা জিরজিরে হয়ে যাওয়া ছোটমার কোন মিল নেই। সত্যি বলতে কি ছোটমার জন্যে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

অনির খাওয়া হয়ে যাবার পর মহীতোষ এলেন। ভাগ্যিস একসঙ্গে খেতে বসা হয়নি! তখন বাবার পাশে বসে চুপচাপ শব্দ না করে চিবিয়ে যাওয়া, একটা দমবন্ধ করা পরিবেশে কথা না বলে খাবার গেলা—অনির মনে হল ও খুব বেঁচে গেছে। কাঁঠাল গাছতলায় দাঁড়িয়ে বাবার গলা শুনতে পেল সে, 'অনি কোথায়?' ছোটমার জবাবটা স্পষ্ট হল না। মহীতোষ গলা চড়িয়ে বললেন, 'এই রোদ্দুরে টো টো করে না ঘুরে মায়ের কাছে গিয়ে বসতে তো পারে। ভক্তি নেই, বুঝলে, আজকালকার ছেলেদের মাতৃভক্তি নেই।' ছোটমার গলা শোনা গেল না।

অনি ঘুরে দাঁড়াল। ও ভাবল চেঁচিয়ে বাবাকে বলে যে মাকে ও যেরকম ভালবাসে তা বাবা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু বলার মুহূর্তে যেন অনির মনে হল কেউ যেন তাকে বলল, কি দরকার, কি দরকার! কিছুদিন হল অনি এই রকম একটা গলা মনে মনে শুনতে পায়। যখনই কোন সমস্যা বড় হয়ে উঠে, তার খুব অভিমান বা রাগ হয়, তখনই কেউ একজন মনে মনে তাকে নিষেধ করে। এই নিষেধ যদি চুপচাপ মেনে নেওয়া যায় তা হলে কোন ক্ষতি হয় না। ক'দিন আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল। ওদের স্কুলে একজন নতুন টিচার এসেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে, খুব ভক্ত লোক। অনির বেশ ভাল লেগেছিল দেখতে। একদিন হলঘরে প্রেয়ারের পর উনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন 'ওঁ, ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' ওরা ভেবেছিল এটা নিছক খেয়াল মাস্টারমশাই-এর। দিন সাতেক পরে হঠাৎ ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন লাইনটা কার স্পষ্ট মনে আছে, কে লিখতে পারবে? কেউ খেয়াল করেনি, ফলে এখন ঠিকঠাক সাহস পাচ্ছিল না। অনি সঠিক জবাব দিতে উনি ওকে কাছে ডেকে বললেন, 'চিরকাল লাইনটা মনে রাখবে। সুখে কিংবা দুঃখে, বিপদে-আপদে মনে মনে লাইনটা বলে নিজে কপালে মা শব্দটা লিখবে। দেখবে, তোমার অমঙ্গল হবে না।' কথাটা বলে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ কে ছিলেন জানো ত?' ঘাড় নেড়েছিল অনি।

'শুদ্ধ। তিনি ছিলেন পরমসত্য, পরম আনন্দ। তার আলোর কাছে কোন কালো ঘেঁষতে পারে না।'

কথাগুলো তখন ভাল করে বুঝতে না পারলেও মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছিল অনি। তারপর থেকে এই প্রক্রিয়াটাকে অনেকবার কাজে লাগিয়েছে ও। যেমন, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেরী করে বাড়ি ফেরার জন্য বুকটা যখন ঢুকবুক করে ওঠে তখন চট করে ওই চারটে শব্দ আওড়ে কপালে মা লিখলে অনি লক্ষ করেছে কোন গোলমালে পড়তে হয় না। এই আজকে যখন ঝাড়িকাকুকে চৌমাথায় ছেড়ে ও বাড়ি ফিরল তখন মনে হচ্ছিল এখন বাবার মুখোমুখি হতে হবে, একসঙ্গে খেতে হবে। বাড়িতে ঢোকার আগে প্রক্রিয়াটা করতে ফাঁড়া কেটে গেল।

রামকৃষ্ণকে ভগবান মনে করে প্রণাম করার একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা অনিমেষের কাছে স্পষ্ট নয় মাস্টারমশাই কেন 'মা' শব্দটা কপালে লিখতে বলেছিলেন? আশ্চর্য, শব্দটা লেখার পর সারা শরীরে মনে কেমন একটা নিশ্চিন্তি সৃষ্টি হয়।

সারাটা দুপুর ওর প্রায় টো টো করেই কেটে গেল। ওদের বাড়ির পেছনের বাগানের সেই চেনাচেনা গাছগুলো অদ্ভুত বড়সড় আর অগোছালো হয়ে গিয়েছে। সেই বুনো গাছগুলো যাদের বুকে জোনাকির মত হলুদ ফুল ফুটতো তেমনি ঠিকঠাক আছে। এই দুপুরে ঘুঘুগুলো একা একা হয়ে যায় কেন? এমন গলায় কি কষ্টের ডাক যে ডাকে। অনি ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দেখল জলের এখনও তেমনি চুপচাপ বয়ে যায়।

এক সময় সূর্যটা খুঁটিমারির জঙ্গলের ওপাশে মুখ ডোবালে স্বর্গছেঁড়া ছায়া ছায়া হয়ে গেল। এখন একরাশ পাখির চিৎকার আর মদেশিয়া কুলি কামিনদের ভাঙা ভাঙা গান জানান দিচ্ছিল রাত আসছে। নদীর ধার ধরে অনি চা বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছিল। ছোট ছোট পায়ে চলা পথ, দু পাশে ঠাসবুনোট কোমর সমান চায়ের গাছে ফুল ফুটেছে, শেডট্রিগুলোকে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি বসে সবুজ করে দিয়েছে। এখন চা-বাগানের মধ্যে কেউ নেই। লাইনে ফেরার জন্য পথ সংক্ষেপ করে কোন কোন কামিন মাথায় বোঝা নিয়ে দূরে দূরে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এই নির্জন পরিবেশে বিশাল সবুজের অন্তর্ভূত ঢেউ-এ দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে অনির মনে হতে লাগল ও খুব একা, ভীষণ একা। ওর মা নেই, বাবা নেই, কোন আত্মীয় বন্ধু নেই। ঠিক এই মুহূর্তে ও দাদু বা পিসীমার কথা ভাবতে চাইছিল না। ও'দের বিরুদ্ধে অনির কোন অভিযোগ নেই কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও'রা যেন কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর কিছুই যেন তাঁদের স্পর্শ করে না তেমন করে। তোমাদের দুটো জননী, একজন গর্ভধারিণী অন্য জন ধরিত্রী—যিনি তোমাকে বুকে ধারণ করেছেন। নতুন স্যারের সেই কথাগুলো মনে হতেই অনি এই নির্জন সন্ধ্যা-নামা সময়টায় চা-বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে গলা কাঁপিয়ে গাইতে লাগল, 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।'
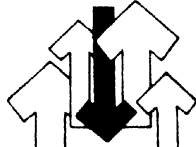
না, বাড়িতে ইলেকট্রিক আসেনি। অনিরা প্রথম যখন জলপাইগুড়িতে গেল তখনই মহীতোষ সব বন্দোবস্ত করে কলকাতা থেকে ডায়নামো আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত আসেনি। ফলে এখন রাত্রে এ বাড়িতে হ্যারিকেন জ্বলে। দুটো নতুন জিনিস দেখল অনি, সন্ধ্যে চলে গেলেও ক্লাবঘরে হ্যাজাক জ্বলল না, কেউ এল না তাস খেলতে। আর সব বাবুরা সাইকেলে চেপে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেলেও মহীতোষ ফিরলেন না। অথচ রাত হয়ে গেছে বেশ চা-বাগানে যে রাস্তায় কুলি লাইনে মাদলবাজা শুরু হয়ে যায়। অনি বুঝতে পারছিল না ও কোন ঘরে থাকবে। যদি বাইরে ঘরে থাকতে হয় তা হলে মহীতোষ ফেরার আগে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লেই হয়। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরলে ছোটমা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খিদে পায়নি না?' সত্যি সারাদিন এত ঘুরেও একটুও খিদে পায়নি অনির। ও না বলেছিল, ছোটমা আর কথা বাড়ায়নি। সামনের মাঠে গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। আসাম রোড দিয়ে মাঝে মাঝে হুস হুস করে হেড লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। অনি ঠিক করল কাল সকালে ফার্স্ট বাসে ও জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে।

একটু বাদে ও খিড়কি দরজা খুলে উঠোন পেরিয়ে ভেতরে এল। ঘরের মধ্যে দিয়ে এলে মায়ের ছবির ঘর পার হতে হবে যেটা অনি কিছুতেই চাইছিল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে ও দেখল দরজাটা খোলা। ভেতরে কাঠের উনুনে কিছু একটা ফুটছে আর উনুনের পাশে উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে ছোটমা বসে আছে। জ্বলন্ত কাঠের লাল আগুনের আভা এসে পড়েছে গালে, কেমন স্থির হয়ে কোন ভাবনায় ডুবে থাকা চোখের পাতায়, চুলে, কাপড়ে। চারপাশে অন্ধকারে ছোটমাকে কাঠের উনুনের আঁচ মেখে একদম অন্য রকম দেখাচ্ছিল। অনি এসে দরজায় দাঁড়াতেও ছোটমার হুঁশ হল না। ভাগ্যিস এখানে চুরিচামারি বড় একটা হয় না!

অনি রান্নাঘরে ঢুকতে ছোটমা চমকে সোজা হয়ে বসল, তারপর অনিকে দেখে আঁচলটা ঠিক করে নিল, 'ওমা, তুমি? সারাদিন কোথায় ছিলে?'

'ঘুরছিলাম।' অনি খুব আস্তে উত্তরটা দিল। রান্নাঘরটা দেখছিল। মা যখন ছিল তখন এরকম ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় কাজ করার সুবিধে অনুযায়ী মানুষ সব কিছু নিজের মত করে নেয়। ছোটমা ওর মুখের ওপর দৃষ্টিটা রেখেছিল, চোখাচোখি হতে বলল, 'খিদে পেয়েছে?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'না। আচ্ছা, একটা লম্বা কাঠের পিঁড়ি ছিল, ওপরে গোলাপ ফুল আঁকা, সেটা'

অবাক হল ছোটমা 'কেন?'

অনি বলল, 'ঐ পিঁড়িটায় আমি বসতাম। রাত্রি বেলায় খুব ঘুম পেয়ে গেলে এই ঘরে পিঁড়িটায় বসে খেয়ে নিতাম।' কথাটা শুনে ছোটমা হাসল তারপর উঠে পাশের ঘরে গিয়ে সেই পিঁড়িটাকে এনে মাটিতে পেতে দিল, 'বসো, গল্প করি।'

অনি পিঁড়িটায় বসে বেশ আরাম পেল, 'আজকাল ক্লাবে তাস খেলা হয় না?' প্রশ্নটা করতেই ছোটমা ঘাড় নাড়ল, না।

'কেন?'

তরকারিতে হয়তো খুন্তি চালাবার কোন দরকার ছিল না তবু ছোটমা সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তারপর বলল, 'জানি না।'

'বাবা কখন আসবে?'

অনির দিকে পিছন ফিরে তরকারি নামাতে নামাতে ছোটমা বলল, 'ও'র ফিরতে দেরী হবে, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। কালকে আবার যেতে হবে তো।'

এখানে থাকতে যদিও তার একটুও ইচ্ছা করছিল না তবু এখন অনির কেমন রাগ হয়ে গেল, 'বাঃ, তুমি তো আমাকে এক সময় আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলে এখন চলে যেতে বলছ কেন?'

মুখটা পলকে কালো হয়ে গেল ছোটমার। অনি দেখল নিজেকে খুব কষ্টে সামলে নিচ্ছে ছোটমা। তারপর বলল, 'তখন তো তোমার এত পড়াশুনা ছিল না?'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অনি, 'ঝাড়িকাকুকে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে কেন?' ছোটমা দু চোখ তুলে ওকে দেখল, 'তাড়িয়ে দিয়েছে কে বলল?'

'আমার সঙ্গে ঝাড়িকাকুর দেখা হয়েছিল!' অনির কেমন জেদ ধরে যাচ্ছিল। ছোটমা কি ওকে খুব বাচ্চা ভাবছে? এভাবে কথা লুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, আমি বলতে পারব না।'

'তুমি আমাকে বন্ধু বলেছিলে না?'

ছোটমা কোন উত্তর দিল না। উঁচু করে রাখা

... হঠাৎ ... চুপ করে রইল। অনি বলল, বাবা আগে এমন ছিল না, মা থাকতে বাবা একদম অন্য রকম ছিল।'

খুব গাঢ় গলায় ছোটমা বলল, 'কি জানি! বোধ হয় আমি খারাপ, তাই।'

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল অনি, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

হঠাৎ কট করে উঠে বসল ছোটমা, 'বেশ, আমি মিথ্যে কথা বলছি। আমার খুশী তাই বলছি।'

'কেন? মিথ্যে কথা বললে—।' অনি কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ অন্যায় করছে এবং একরকম ... সঙ্গে স্বীকার করছে—কখনো ভাবেনি সে।

খুব কান্না কাটা গলায় ছোটমা বলল, 'উনি যা করছেন করুন তবু আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমার পেটে বিদ্যে নেই যে রোজগার করব। ভাইদের কাছে গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে এখানে অপমান সহ্য করা অনেক সুখের। নিজের জন্যে আমাকে মিথ্যে বলতে হবে, আমাকে আর প্রশ্ন করবে না তুমি।'
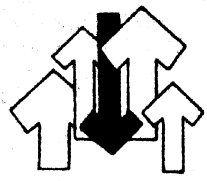
অনি চুপ করে গেল। ছোটমার কথাগুলো বুঝে উঠতে সময় লাগল। ওর হঠাৎ মনে হল এতক্ষণ ও যে ভাবে কথা বলেছে ছোটমার সঙ্গে সেটা ঠিক হয়নি। জলপাইগুড়িতে প্রথম পরিচয়ের দিন যাকে বন্ধু এবং নিজের চৌহদ্দির মধ্যে বলে মনে হয়েছিল এখন এই রাত্রে তাকে ভীষণ অচেনা বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু ছোটমা তাকে একটা চূড়ান্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল যে! বাবার এই সব কাজ, কারণ না বলে অত্যাচার বলা ভাল, ছোটমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে কারণ তার ভাইদের কাছে গিয়ে থাকা সম্ভব নয় বলে। ছোটমা যদি লেখা পড়া অনেক শিখতো তা হলে চাকরি করতে পারত, সেটাও সম্ভব নয়। আচ্ছা, ও-র যদি বাবা তাকে—। সঙ্গে সঙ্গে অনি যেন চোখের সামনে সরিৎশেখরকে দেখতে পেল, পেয়ে বুকে বল এল। দাদু জীবিত থাকতে তার কোন ভয় নেই। কিন্তু দাদুকে আজকাল কেমন অসহায় লাগে মাঝে মাঝে, পিসীমার সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে প্রায়ই চাপা কথা কাটাকাটি হয়। হোক, তবু তার দাদু আছে কিন্তু ছোটমার কেউ নেই। ও গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি চিন্তা করো না, আমি পাস করে চাকরি করলে তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে। বাবা কিছু করতে পারবে না।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ছোটমা বলল, 'ছি! বাবাকে কখনো অসম্মানের চোখে দেখতে নেই, ভুল বুঝতে পারলে তিনি ঠিক হয়ে যাবেন।'

অনি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, বাবার বিরুদ্ধে কিছু বললেই ছোটমা একদম সমর্থন করেন না কেন? ছোটমা উঠে মিটসেফ থেকে একটা বিরাট জামবাটি বের করে ওর সামনে এনে রাখল, 'তোমার জন্যে করেছি। বাড়িতে তো আর দুধ হয় না, দুপুরে অনেক কষ্টে এটুকু যোগাড় করতে পেরেছি।' অনি দেখল জামবাটির বুক-টৈটম্বুর পায়েসের ওপর কিসমিসগুলো ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে, একটা তেজপাতা তিনভাগ শরীর ডুবিয়ে কালো মুখ বের করে আছে। চোখাচোখি হতে ছোটমা বলল, 'ভাল না হলেও খেতে হবে অনি, দিদির মত হয়নি আমি জানি।'

অনি হাসল, ছোটমা সেই প্রথম দিনের কথাটা এখনও মনে রেখেছে।

'এ বেলা একদম নিরামিষ, তোমার খেতে অসুবিধে হবে খুব।' ছোটমার কথা শুনে হাসল অনি, 'এতকাল পায়েস খেলে আমার ... খাবারের আর দরকার নেই।' একটা চা-চামচ নিয়ে ধরের দিকে একটু পায়েস নিয়ে মুখে দিয়ে বলল, 'ফাইন।' তারপর চোখ বুজে সেটাকে ভালভাবে আস্বাদন করে বলল, 'পিসীমার চেয়ে একটু কম ভাল হয়েছে তবে মায়ের চেয়ে অনেক ভাল। পিসীমা ফার্স্ট, তুমি সেকেণ্ড, ... থার্ড।'

অনির কথা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল ছোটমা সারাদিন এবং এই একটু আগেও যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল ছেলেটা থেকে আরম্ভ করা পর থেকে সেটা টুপ করে চলে গেল। যে খুব ভালবাসে তাকে সেটা তৈরী করে খাওয়াতে যে এত ভাল লাগে এর আগে এমন করে জানা ছিল না। কি তৃপ্তি সঙ্গে খাচ্ছে ছেলেটা। আর এই সময় প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ উঠল, কেউ যেন মদের সঙ্গে দরজায় লাথি মারছে। খেতে খেতে চমকে উঠে অনি বলল, 'কিসের শব্দ?' ছোটমার খুশীর মুখটা মুহূর্তেই কালো হয়ে গেল যেন, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কোন রকমে বলে গেল, 'তুমি খাও, আমি আসছি।'

শব্দটা থামছে না, ঘড়ির আওয়াজের মত বেজে যাচ্ছে। তারপর দরজা খোলার শব্দ হতে একটা হুংকার এদিকে ভেসে এল। খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে অনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর এক ছুটে বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। ছোটমার ঘরে একটা ছোট্ট ডিমবাতি জ্বলছে, এত অল্প আলো

যে লোকটা অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকে বাবা ঘরের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়ালেন ও। বাবা কথা বলছেন, জড়িয়ে জড়িয়ে, কোন কথায় শেষটা ঠিক থাকছে না, একথায় আজ মারছিলেন. আমি দু ঘণ্টা ধরে নক্ করছি খেয়াল নেই, অ্যাঁ?'

ছোটমা বলল, 'অনিকে খেতে দিচ্ছিলাম।'

'অনি? হু ইজ অনি? মাই সন? সন বড় না কালার বড়, অ্যাঁ? আমার আসবার সময় কেন দরজায় বসে থাকনি, অ্যাঁ?'

ছোটমা খুব আস্তে বলল, 'কাল ছেলেটা চলে যাবে, অন্তত আজকের রাতটায় এসব না করলেই নয়?'

'জ্ঞান দিচ্ছ? সেদিনকার ছুঁড়ি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে, অ্যাঁ। বিয়ে পর্যন্ত না হয়েছে, মা-গিরি দেখাচ্ছ? ভাল, ভাল। মাধু ঠিক আজ প্রতিশোধ নিয়েছে। নইলে একটা বাঁজা মেয়েছেলে কপালে জুটল।' গলাটা টলতে টলতে মায়ের ঘরে চলে এল, 'ধ্যাই, ধূপ জ্বলছে না কেন?'

ছোটমা দৌড়ে মহীতোষের পাশ দিয়ে এসে বোধ হয় ধূপ জ্বেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার গলা থেকে একটা আর্তনাদ উঠল, 'উঃ।'

কৌতূহলে অনিমেষ এক পা বাড়াতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছোটমার ডান হাতের কবজিটা বাবার মুঠোয় ধরা, বাবা সেটাকে মোচড়াচ্ছেন। সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারছে না। বাবা সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাস্তি দিচ্ছি, অন্যায় করলেই শাস্তি পেতে হবে, হুঁ হুঁ বাবা।'

বাবার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনি মাধুরীর ছবিটা দেখতে পেল। অতবড় ছবিটার ওপর দুটো চাইনিজ লণ্ঠনের আলো পড়ায় মুখটা একদম জীবন্ত। সকালে ছবিটায় অদ্ভুত একটা বিমর্ষভাব দেখতে পেয়েছিল অনি, এখন সেটা নেই যেন। বরং উল্লাস নয় এক ধরনের উপভোগ করার অভিব্যক্তি মায়ের মুখে। চোখ দুটো কি খুব চকচক করছে? না আলো পড়ায় ওরকম হয়েছে! ছবির মাকে ওর একদম পছন্দ হচ্ছিল না। ও মহীতোষের দিকে তাকাল। এখনও উনি ছোটমাকে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছেন, ছোটমা ইচ্ছে করলে ঠেলে ফেলে দিতে পারে বাবাকে কিন্তু দিচ্ছে না। অনি যেন শুনতে পেল কে যেন তার কানের কাছে বলে গেল, বল, বল, ভয় কিসের? অনি সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষকে বলল, 'ছোটমাকে মারছেন কেন?'

মহীতোষ পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, দু চোখ কুঁচকে লক্ষ করার চেষ্টা করলেন কে কথা বলছে। এই সময় তাঁর শরীরের নিম্নভাগ স্থির ছিল না। অনিকে চিনতে পেরে বললেন, 'আমি যে মারছি তোমাকে কে বলল? তোমার এই মা বলেছে? তুমি একে মা বলতো, অ্যাঁ?'

অনি দেখল ছোটমা সামান্য জোর দিয়ে নিজের হাতটা বাবার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল। মহীতোষ বলল, 'গতরে জোর হয়েছে দেখছি!'

'মেরে ছোটমার গালে দাগ কে করে দিয়েছে?' অনি প্রশ্নটা এমন গলায় করল যে মহীতোষ প্রাণপণে সোজা হবার চেষ্টা করলেন। ছোটমা মুখে আঁচল দিয়ে বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। দুই পা এগিয়ে এক হাত বাড়িয়ে মহীতোষ বললেন, 'অনি, পুত্র, পুত্র আমার। এখানে এস, এই বুকে মাথা রেখে শুনে যাও।'

অনি কিছু বোঝার আগেই মহীতোষ কয়েক পা টলতে টলতে হেঁটে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনির স্পর্শ শরীরে পেতেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি, 'মাধু, দ্যাখো, কে আমার বুকে এসেছে, অ্যাঁ!'

এই প্রথম অনিমেষ জানত পিতার আলিঙ্গন পেল এবং সেই আলিঙ্গনে ওর সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল যেন। বাবার মুখ দিয়ে যে বিশ্রী ক্লেদাক্ত গন্ধ বের হচ্ছে তা সহ্য করতে পারছিল না অনি। তীক্ষ্ণ গলায় ও চিৎকার করে উঠল, আপনি মদ খেয়েছেন?'

প্রশ্নটা শুনেই ছোটমা পিছনে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। মহীতোষ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড় দুলিয়ে তাকে প্রায় ঝাঁকি দিলেন, 'আঃ, ফাট ফাট করো না তো, পিতা পুত্রের কথাবার্তার মধ্যে ম্যাচিওরিটি হাই বাবা, ইয়েস, আমি ড্রিংক করেছি। ইউ সে আস্ক মি, হোয়াই? লুক অ্যাট হার', এক হাতের আঙুল তীরের মত মাধুরীর ছবিটার দিকে বাড়িয়ে মহীতোষ বললেন, 'দ্যাখো ও কেমন খুশী হয়েছে। ইওর মাদার! তোমাকে ও পেটে ধরেছিল, হোলি মাদার! ওর খুশীর জন্য খেয়েছি।'

'আপনি কি ওঁর খুশীর জন্য ছোটমাকে মারেন?' গলাটা এত জোরে যে মহীতোষ দু হাতের মধ্যে দাঁড়ানো প্রায় তাঁর চিবুক অবধি লম্বা ছেলের মুখ দেখবার চেষ্টা করে বললেন, 'ইউ আনফেথফুল সন, কোনদিন নিজের মাকে ছোট করে দেখবে না। আমি প্রত্যেক রাত্রে মাধুরীর সঙ্গে কথা বলি। এখানে, এই ঘরে দাঁড়িয়ে, ডু ইউ নো?'

অনির আর সহ্য করছিল না গন্ধটা, এক ঝটকায় মহীতোষের হাতের আড়াল সরিয়ে ও বলল, 'আমার মা কখনো খুশী হতে পারেন না। আপনি মিথ্যে বলছেন?'

'কি? আমি মিথ্যে বলছি? আমি মিথ্যে বলছি!' হাত বাড়িয়ে খিমচে ধরলেন মহীতোষ ছেলেকে। মাতাল হলেও বাবার গায়ের জোরের সঙ্গে পেরে উঠছিল না অনি, 'মাকে যদি আপনি এত ভালবাসেন, মা যদি—না, তাহলে আপনি মদ খেতেন না, ছোটমার ওপর অত্যাচার করতেন না। শুনেছি ছুঁতে ধরলে মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়, আপনার সেরকম হয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে মহীতোষ ছোটমার দিকে ছুটে গেলেন, 'তুমি ওকে এসব শিখিয়েছ, আমার ছেলেকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছ।' দু হাতের আড়ালে মুখ রেখে ছোটমা সেই চাপা কান্নার মধ্যে গলা ডুবিয়ে বলে উঠল, 'আমি বলিনি, বিশ্বাস করো, আমি কিছু বলিনি।' কিন্তু কথাটা একদম বিশ্বাস করলেন না মহীতোষ, রাগে উন্মাদ হয়ে বলে চললেন, 'কাল সকালে বেরিয়ে যাবে, তোমাকে আমার দরকার নেই, একটা বাঁজা মেয়েছেলের মুখ দেখা পাপ। তোমার জন্য সে এই কয় বছর আমার কাছে আসছিল না, তুমি আমার ছেলেকে—।' প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠল ছোটমা, 'আমি কাউকে কিছু বলিনি।' বোধ হয় সমস্ত শরীরের ওজন দিয়ে মহীতোষ ডান হাতখানা শূন্যে তুলেছিলেন, যেটার লক্ষ্য ছিল ছোটমার গাল। ঠিক সেই পলকে অনিমেষ যেন শুনতে পেল, যাও, ছুটে যাও। কিছু বোঝার আগেই সে তীরের মত এগিয়ে গিয়ে মহীতোষের ডান হাত চেপে ধরে ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যালেন্স সামলাতে না পেরে মহীতোষ ছেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন, অনি নিজেকে বাঁচাতে দুহাতে ওঁকে দূরে ঠেলে দিতে নেশাগ্রস্ত শরীরটা দুম করে মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়াটা এত দ্রুত ঘটে গেল এবং একটা মানুষ যে পুতুলের মত সোজা চিৎ হয়ে পড়তে পারে অনি বুঝতে পারেনি। মেঝের ওপর পড়ে থাকা নিথর শরীরটার দিকে ওরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল। এটা যেন বিশ্বাস করাই যায় না যে এই লোকটাই এতক্ষণ এখানে ছিল। অনির আগে ছোটমা চিৎকার করে ছুটে গেলেন মহীতোষের কাছে। অনি দেখল ছোটমা বাবার মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে প্রাণপণে ডাকছেন। বাবার মাথাটা একটা পাশে বার বার ঘুরে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে। হাত পা টানটান, শরীরে কোন আলোড়ন নেই। প্রথমে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল অনিমেষ, বাবার ওপর আর কোনরকম শ্রদ্ধা ছিল না তার, এই মুহূর্তে। বাবা মদ খায়, ছোটমাকে মারে, তার মৃতা মায়ের নাম করে যা ইচ্ছে বলে—। এখন যে এভাবে পড়ে আছে তা স্বাভাবিক নয়। বাবার জোরের সঙ্গে সে পারবে না কিছুতেই, তাই ওই সামান্য ঠেলায় এভাবে পড়ে যাওয়াটাও বিশ্বাস করা যায় না।

'তুমি, তুমি ওকে মারলে?' হঠাৎ ফোঁস করে উঠল ছোটমা। থতমত হয়ে অনি দেখল ছোটমার শাড়ি ভিজে যাচ্ছে বাবার মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে।

'আমি!' কোনরকমে বলল সে:

'কেন মাতাল মানুষটাকে ঠেলে দিলে। আমাকে মারলে তোমার কি এসে যায়। ও যদি আমাকে সুখ পায়, পাক না। তোমার কি হয়েছে?' আঁচলটা বাবার মাথায় চেপে ধরে ছোটমা কথাগুলো বলল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনি চারপাশে তাকাল। মুখ দেখল, মরে-মরে তেলেও চুপ কেন? নাকি একজনের মুখ হঠাৎ দেখা দিল। শিরদাঁড়ায় একটা শীতল বোধ ওর শিরশির করে মুহূর্তেই কপাল ভিজে যাচ্ছে ঘামে। ও দেখল মায়ের ছবিটা, বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন।

অদ্ভুত একটা ভয় যেন ডানা ঝাপটিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও কি বাবাকে ফেলতে চেয়েছিল না, কখনো নয়। ইচ্ছে কি ও বাবাকে সামান্য ঠেলে দিয়েছে শুধু। গলা বুজে যাচ্ছিল অনির, ও কথা বলল, 'বিশ্বাস আমি ইচ্ছে করে করিনি।'

হঠাৎ যেন ছোটমার গলার স্বর বদলে গেল। ধীরে ছোটমা বলল, 'ওকে একটু ধরবে অনি! খাটের ওপর শুইয়ে দিই।'

মহীতোষকে শুইয়ে দিতে ওদের একটু কষ্ট হল, দেহটা বেশ ভারী। ছোটমার হাত মাথায় কেটে যাওয়া জায়গায় আঁচল চেপে রেখেছে। অনি বলল, 'আমি একছুটে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি।' ও যেই বেরিয়ে যাবে এমন সময় ছোটমার ডাক শুনল। দরজা অবধি পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল সে। ছোটমার মুখটা অস্পষ্ট। পাশে বাবার শরীরটা আবছা দেখা যাচ্ছে। ওদের পিছনে দেওয়ালে মায়ের ছবিটা কথা বলার সামনেটা কেমন হয়ে গিয়েছে। ছোটমা অনেক দূর থেকে তাকে বলল, 'অনি, আমার একটা কথা রাখবে?' গলার স্বরে এমন একটা মমতা ছিল অনি স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন তাকে বলছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি ঠেলে দিয়েছ বলে ও পড়ে গেছে একথা যেন কেউ না জানতে পারে, কেউ না।' ছোটমার প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট।

'মানে?'

'ও নিজেই তার সামলাতে পারেনি, একথাই সবাই জানবে?'

'কিন্তু বাবা—।'

'মাতাল মানুষের কোন খেয়াল থাকে না। ও উঠলে যা বলব বিশ্বাস করবে।' অনি বুঝতে পারল না কেন ছোটমা একথা বলছে। সবাই যদি জানে ও বাবাকে ফেলে দিয়েছে তাহলে—। ওর বুকের ভিতর থেকে অনেক অনেক অনেকদিন পরে একটা কান্না দমক উঠে এল গলায়, 'কেন?'

ছোটমা বলল, আমার জন্য। আর জানতে চেয়ো না, কেউ যেন জানতে না পারে, মনে থাকে যেন। আর দেরী করো না, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো।'

কখনো কখনো অন্ধকার বন্ধুর মত কাজ করে। এখন স্বর্গছেঁড়ায় গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকিরা ঘুরে বেড়ায়, লাইনে মাদল বাজে। দেওয়া কোয়ার্টারের দরজাগুলো বন্ধ। মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে ছুটে যেতে এই অন্ধকারটা যদি শেষ না হতো তাহলে ও বেঁচে যেত। বাবার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কি করবে সে? ডাক্তারবাবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। তারপর অন্ধকারে উচ্চারণ করল, 'ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' একটা মন্ত্রের মধ্যে ও মা বললে আঙুলের ডগা দিয়ে কপালে লিখতেই অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল শরীরটা। মা যেন ওকে জড়িয়ে ধরলে যেমন হতো।

নিশ্চিন্তে ডাক্তারবাবুর দরজার কড়া নাড়ল অনিমেষ।

ঠিক যে তেলটি আমি চাই।

লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ
করা, অজস্র চিঠি পত্র
লেখা, সব বিষয়ে চটপট
সিদ্ধান্ত নেওয়া···সারাদিন
অফিসে কত কাজ।
এত কাজের মধ্যেও মাথা
ঠাণ্ডা রাখতে হয় আবার চুলও
পরিপাটি থাকা চাই।
আর তাই আমার পছন্দ
মৃদু সুবাসিত
কেয়ো-
কার্পিন
কেয়ো-কার্পিনে চুল
চটচটে হয় না।
A HAIR OIL OF
DISTINCTION
DEY'S MEDICAL STORES LTD.
O/KB-7/78

একমাস দুমাস করে প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেল। শীতটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। জানুয়ারী মাস। সকাল থেকেই কনকনে শীত। একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প তাপ বাড়ছে। এখন গায়ের কার্ডিগানটা অল্প আলগা করে দেওয়া যায়। পাশের বেতের টিপয়ে গলার লাল উলের মাফলারটা খুলে রাখল ঝর্ণা।

পূবের জানলাটার ঠিক নিচে মোজেক করা ঝকঝকে মেঝের ওপর এক মনে সংসার সাজিয়ে বসে আছে খুকুন। ওর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তার রঙিন পুতুল আটকান কোণাভাঙা একটা প্লেট। রামখাড়াটা হারিয়ে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের থালা, বাটি, গেলাস, কড়াই,উনুন। প্যাথরকুচি পাতার টুকরো। নানা রঙের শাড়ির ফালি। রান্নাঘর থেকে চেয়ে নিয়ে আসা রাক্ষার সাইজের একটা ময়দার তাল। খুকুনের চারপাশে এলোমেলো ছড়ানো পুতুলের সংসার।

এর মাঝখানে বসে খুকুন, ঝর্ণার ড্রেসিং টেবিল থেকে তুলে আনা ভুরু আঁকার পেন্সিলটা দিয়ে একমনে বড় ডল পুতুলটাকে কাজল পরাচ্ছে। বড়দের মতই পুতুলের মাথাটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে কাজলটা ঠিকঠাক পরান হল কী না।

ঝর্ণা খুকুনের দিকে এক অদ্ভুত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সবকিছুই দেখছে অথচ দেখছে না। হাতে আনমনে ধরা আছে আজকের খবরের কাগজ। খুকুনের হাবভাব একেবারে বড়দের মত। সে বেশ বিজ্ঞ গলায় বলল, —মা! এই বেনারসী শাড়িটা আজ তুতুনকে পরাই?

খুকুন তার পুতুল-মেয়ের নাম রেখেছে তুতুন। ঝর্ণা এবার পরিষ্কার চোখে ওর মেয়ের চোখে চোখ রাখল। খুকুনের প্রায় নির্জীব নিরুত্তাপ, ফ্যাকাশে বড় বড় দুই চোখে হাল্কা কাজল পরান। ফর্সা সরু সরু হাত পা। হাতে রোঁয়া রোঁয়া সোনালী লোম। গায়ে ব্রোকেডের চিকমিকে ফ্রক। মাথায় লাল ইলাস্টিক রিবন বাঁধা। শুকনো ফর্সা মুখে বিশাল একজোড়া চোখ। ঝর্ণা ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল, ঐ মেয়েটা কার? প্রায় সারাদিন ঘরের এক কোণে বসে নিরুত্তাপ ভাবে খেলে যাওয়া মেয়েটা কী আমারই সন্তান? মেয়েটা তো একেবারে সুশোভনের মেয়ে। সেই নাক, সেই একরকম কঠিন নিরুত্তাপ চোখ, সেই দু ভাঁজ হওয়া জেদী চিবুকের ডৌল। একেবারে সুশোভনের মেয়ে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে ঘাড় নাড়াল ঝর্ণা। এর মানে 'হ্যাঁ' হতে পারে নাও হতে পারে। মাথা নাড়ানটাকে সম্মতি ধরে নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খুকুন একটা বেনারসী শাড়ির পাড় দিয়ে পুতুল-তুতুনকে শাড়ি পরাতে লাগল।

ঝর্ণার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে আছে একফালি নরম সোনালী রোদ্দুর। আকাশের রঙ টলটল করছে নীল। অনেক উঁচুতে কালো কালো কয়েকটা বিন্দুর মত চিল ঘুরপাক খাচ্ছে। সামনের বাড়ি থেকে লগিতে কাপড় বেঁধে একটা লোক পায়রা ওড়াচ্ছে। পায়রার ঝাঁক ঝটপট করে এক একবার দেখা দিয়েই আবার চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে। সামনের ব্যালকনিতে রঙ মেলানো মোজাইক টবে ঝকঝকে বেগুনী গুচ্ছ গুচ্ছ ক্রিসানথিমাম। ব্যালকনির একপাশ দিয়ে উঠে গেছে ম্যাজেন্টা রঙের বোগনভেলিয়ার ঝাড়। কালো সাদা খোপকাটা চৌখুপ্পি মোজাইক টালি বসানো মেঝে। পুরনো বালিগঞ্জের বনেদি বাড়ি। সামনের ছোট্ট বাগানে গন্ধরাজ, শৌখিন ঝাউ আর রক্ত ও শ্বেত করবীর ঝাড়। সামনের গেটের দুপাশে একজোড়া যমজ পামগাছ প্রায় চারতলা সমান উঁচু হয়ে পাতা দোলাচ্ছে। তাদের পাতার মধ্যে দিয়ে আসা ট্যারচা রোদ্দুর ঝর্ণার পায়ের কাছে আরছা জাফরি কাটা আলোছায়া তৈরী করেছে।

ঝর্ণাদের পৈতৃক আমলের ঝি সুখদা আজকাল চোখে ভাল দেখতে পায় না। কী অপরিষ্কার ভাবে মেঝে পরিষ্কার করেছে! দরজার কাছে, সিমেন্টের চৌকাঠের কোণে ঘুমের বড়ির মেটে রঙের ধাতব কাগজটা পাকিয়ে পড়ে আছে। কাল রাতে বিছানা থেকে ওষুধ খেয়ে কাগজটা মেঝের ছুঁড়ে ফেলেছিল ঝর্ণা। কিন্তু বাপের আমলের ঝি, সুখদাকে কিছু বলা যাবে না। বললে হয় চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে নয় কাঁদতে বসবে।

—কিন্তু! সুশোভন কেন ছোট্ট একরত্তি একটা মেয়ে-খুকুন হয়ে গিয়ে মেঝের এক কোণে ব্রোকেডের ফ্রক পরে বসে গম্ভীর ভাবে পুতুলকে শাড়ি পরাচ্ছে?

ঝর্ণার মাথায় হঠাৎ এই প্রশ্নটা চলে এল। খুকুন তার পুতুলের দিক থেকে একবারও চোখ না সরিয়ে বলল, —মা! আমি কিন্তু ব্রেস দিয়ে পরালাম বেনারসীটা—

ঝর্ণা নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, —ঠিক একরকম নিষ্ঠুর আবেগ-শূন্য গলার স্বর মেয়েটার। একেবারে ওর বাপের মত। ও একেবারে সুশোভনের মেয়ে। আমার পেটে কমাস ছিল মাত্র! তবু তো আমার কাছে থাকে। কী আশ্চর্য! ওর বাপের কাছে নয়।...

ক'দিন আগের ঘটনা, খুকুনকে ইস্কুলে ভর্তির দৃশ্যটা মনে পড়ল ঝর্ণার। একটা ছোট্ট নার্সারী স্কুল। এক ঝুড়ি কিচ্‌মিচ্‌ করা ছানা মুরগীদের মত মানুষের বাচ্চায় ভর্তি ঝুড়িটার নাম 'হ্যাপী হোম্‌ নার্সারী'। খুশি খুশি পালক ফোলানো মা মুরগীদের মত নিজেদের ছানা পোনা সামলে গার্জেনরা ঘোরা ফেরা করছেন। সাদা, মোটা[illegible] রোঁয়া ফোলানো, আদুরে, একটু বুড়ি

মুখে সব ছেলেমেয়েদের নাম ধাম টুকে রেজিস্টার তৈরি করাচ্ছেন।

খুকুনকে নিয়ে ঝর্ণা ওঁর সামনে দাঁড়াতেই কলের পুতুলের মত একটু দাঁত দেখিয়ে হেসে ভদ্রমহিলা বললেন, —বাঃ! আপনার মেয়ে খুব ফর্সা তো!

এর উত্তরে হ্যাঁ বা না বলা যায় না। মিটমিট করে হাসতে হয়। এবার খুকুনের দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা আদুরে সুরে হাসিমুখে বললেন, —বলো, নাম বলো তোমার?

—সংঘমিত্রা রায়।

খুকুন আস্তে ভাঙা ভাঙা গলায় জবাব দিয়ে গুটিশুটি মেরে মায়ের গায়ের সঙ্গে লেপটে দাঁড়াল। ওর গায়ে সেদিন ফুল ভয়েলের ওপর সুন্দর ছাপা ছাপা, লেসের কাজ করা একটা ম্যাক্সি। বুকের কাছে ক্লিপ দেওয়া লেসে সাদা সুতোর মত লম্বা হয়ে আটকে আছে চিবোন চুইংগামের আঠা। কিছুই হয়নি এরকম মুখে, কেউ যেন দেখতে না পায়-এভাবে, খুকুন আঠাটাকে নখ দিয়ে খুঁটে তোলার চেষ্টা করছে এবং তার থেকে আরো লম্বা সাদা সুতো বেরোচ্ছে। ঝর্ণার গা সির সির করছিল চাপা রাগে।

ভদ্রমহিলা লম্বা খাতার নামটা টুকে নিয়ে আবার সেই বাঁধানো হাসি সমেত প্রশ্ন করলেন, —তোমার বাবার নাম কী, সংঘমিত্রা?

বিদ্যুৎ চমকের মত ঝর্ণার মাথার ভেতরটা চিরে ফালা ফালা হয়ে গেল। খুকুন ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মেয়ের ডান হাতের তর্জনীতে নখের ডগায় চুইংগামের আঠার খানিকটা উঠে জামা থেকে নখ পর্যন্ত একটা সাদা ক্রমবর্ধমান রবারের সুতো ঝুলছে। ঘরের বাইরের ছোট্ট খেলার মাঠে একদল মরসুমী ফুলের মত বাচ্চাদের হুল্লোড়। স্লিপ আর ঢেঁকির ওপর ছেলেমেয়েরা লাফাচ্ছে।

—বলো, ভয় কী সংঘমিত্রা! তোমার বাবার নাম কী?

ঝর্ণা ভেতরে ভেতরে পাথরের মত কঠিন হয়ে গেছে। খুকুন আড়ে আড়ে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। জোর করে টেনে আনা হাসিমুখে ঝর্ণা উত্তর দিল, —আমার নাম ঝর্ণা সেন। আমিই সংঘমিত্রার গার্জেন।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে ঝর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার রেজিস্টারের পাতায় চোখ নামিয়ে খুকুনের নামটা দেখে, আবার বললেন, —আপনি, মানে

—মানে, আমি সংঘমিত্রার মা। আমিই ওর গার্জেন। ঝর্ণা কঠিন মুখে জবাব দিল।

—ওঃ।

ভদ্রমহিলার মুখের হাসি চলে গেল। তারপর নিরুত্তাপ পেশাদারী চোখে কয়েক মুহূর্ত ঝর্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, —স্কুল ফর্মালিটি অনুযায়ী ক্যান্ডিডেটের বাবার নাম বলতে হয়।

ঝর্ণা আড়চোখে একবার খুকুনের মুখের দিকে তাকাল। ঠিক একই রকম বড় বড় চোখে খুকুন ওর দিকে তাকিয়ে জামার চুইংগামের আঠা খুঁটছে। টেবিলের ওপারে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল সুশোভনের ছায়া-শরীর। ঠোঁটে লেগে আছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি। অসহায় ক্রোধে ঝর্ণা একবার ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। ভদ্রমহিলা কলম বাগিয়ে একদৃষ্টে ঝর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিয়ে, টেবিলের কোণায় উঠে যাওয়া সবুজ রেক্সিনের একটা কোণ খুঁটতে খুঁটতে ঝর্ণা কেটে কেটে বলল, —লিখুন, বাবার নাম, সুশোভন রায়।

সঙ্গে সঙ্গে ওর সামনে থেকে সুশোভনের ছায়া শরীর মাটিতে ঢুকে গেল।

আজ সকাল থেকে ঝর্ণা ওর ঘরের পুবের বারান্দার সামনে বেতের আরাম চেয়ারে বসে আছে। কাল রাত্তিরের ঘুমের ওষুধের রেশ এক আচ্ছন্ন অবসাদের মত মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে পলি ফেলে রেখেছে। সবশেষে বড়দাও তার গাড়িটা নিয়ে অফিস বেরিয়ে গেছে। ঝর্ণারা তিন বোন। ঝর্ণা, বর্ণা, অপর্ণা। আজ দুপুরের দিকে বর্ণা এ বাড়িতে আসবে। বর্ণার বিয়ে হয়েছে নিউ আলিপুরে এক উঠতি ব্যবসায়ী পরিবারে। বর্ণা ওর থেকেও ফর্সা কিন্তু মানসিক ভাবে মোটা দাগের মেয়ে। ওদের তিন বোনের মধ্যে ঝর্ণাই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ছিল।

অবশ্য বর্ণাকে অনেকেই ওর থেকে সুন্দরী বলত। কারণ ও বেশি ফর্সা একটু মোটাসোটা গোলগাল আহ্লাদী পুতুল পুতুল গড়ন। কিন্তু ঝর্ণার একটা দীর্ঘ ছন্দের গ্রানীর মত গড়নের উজ্জ্বল শ্যাম তনু, তীক্ষ্ণ রুচি ও অভিজাত চালচলন, দীর্ঘ গ্রীবার সুন্দরী রাজহংসীর মত সকলকার দৃষ্টি কেড়ে নিত। লম্বা পালক বসানো একজোড়া ভোমরার মত চোখ ছিল ঝর্ণার। এখনও আছে তবে সেই দৃষ্টি নেই।

দিদির রুচি ও ব্যবহারের প্রশংসা বর্ণাকে একটু ঈর্ষাকাতর করে তুলত। সবচেয়ে মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ছোট বোন অপর্ণা। ঝর্ণার ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পেত অল্প দাম্ভিকতা। ঝর্ণা এবং বর্ণার মধ্যে একটা অদেখা রেষারেষি ছিল। অপর্ণা অন্ধভাবে ভালবাসত এবং অনুকরণ করত তার বড়দি ঝর্ণাকে। মাত্র সতেরো বছর বয়সের সময় আসল গুটি বসন্তে একেবারে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছিল অপর্ণা। কিন্তু তার ত্বকের উজ্জ্বল মসৃণতা আর একটা চোখ ফিরে পায়নি। ওর বিয়ে হয়নি। এবং একটা অদ্ভুত হীনমন্যতাবোধ নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হয়েছিল। বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোতে চাইত না। ব অনেকদিন মারা গেছেন। মা বাবার পর অপর্ণাই এ বাড়িতে দাদাদের সংসার সামলায়। বড়দা অবশ্য বিয়ে করেছে। তবে বৌদি একটু আলাভোলা গোছের।

সুশোভনের সঙ্গে সেপারেশনের পর ঝর্ণা আবার পাকাপাকিভাবে তার বাপের বাড়ির এই পুরোনো বালিগঞ্জের পাড়ায় প্রায় বারো বছর বাদে, মেয়ে খুকুনকে নিয়ে ফিরে এল। ফিরে আসবার পর আবার ধীরে ধীরে ছোট বোন অপর্ণার সঙ্গে বিয়ের আগেকার হার্দিক দিনগুলোতে ফিরে এসেছিল। এখন অপর্ণা ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরোয়। ময়দানের দিকে গিয়ে বসে। নিউ-মার্কেট থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফেরে।

কিন্তু সবচেয়ে তিক্ত ব্যাপার আজ বর্ণা বাপের বাড়ি বেড়াতে আসবে। এক গা মোটা মোটা সোনার গয়না, আরো মোটা হয়ে যাওয়া ফুলো ফুলো সুখী শরীর। চোখ গোল গোল করে গাল ফুলিয়ে জাঁক করে গল্প করবে, ওর বরের ব্যবসার উন্নতি, ছোটনাগপুরে বেড়াতে গিয়ে দুবেলা মুর্গি খাওয়া, ওদের বারাসাতের বাগানবাড়ির গোলাপ বাগান কাটিয়ে বেগুন চাষ করে কী দারুণ ফলন পাওয়া গেছে, এইসব। এই জাঁক করে বলা গল্পের মধ্যে ঝর্ণার প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া অনুকম্পাও থাকে। সেটাই সবচেয়ে অসহনীয়। এখন বর্ণার আদরই এ বাড়িতে বেশী। ওর সারাদিন খাওয়া, শোওয়া, গয়না, শাড়ি, হিন্দী সিনেমার গল্প। এই বৃত্ত-চক্রের জগতেই বর্ণা বাস করে।

ঝর্ণা আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার কোনের মোজাইক টবের ক্রিসান-থিমাম গাছগুলোর তলার মাটি নেড়েচেড়ে চৌরস করে দেয়। বেলা বাড়ার গন্ধ পায় ঝর্ণা। এবার উঠে অন্য কাজ করা উচিত। পায়ের সামনে পড়ে থাকা ঝিলিমিলি রোদ্দুর কখন চুপিসারে বারান্দা থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু নিজের ভেতর থেকে নড়েচড়ে কিছু করার তাগিদ পায় না।

—দিদিভাই, এবার উঠে চান করে নাও লক্ষ্মীটি—আর খুকুন তুমি আমার সঙ্গে এসো—

দাগ লাগা হলদে গোলাপ ফুলের মত একখানা মুখ পাশের দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। ওর ঝকঝকে সুগঠিত দাঁতের শ্রেণী, হাসলে হাল্কা গোলাপী রঙের একটু মাড়ি দেখা যায়। বেলা বেড়ে যাওয়া শীতের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওর সারা মুখে। সদ্য স্নান করা মুখ চকচকে পরিষ্কার। মাথা বেড়ে টান টান করে একটা লাল গামছা চুলের গোড়ার জল শুষে নেবার জন্যে বাঁধা আছে। ওর সমস্ত মুখটা যেন একটা ফ্রেমে আঁটা ছবির মত। একটা চোখ চঞ্চল, তাতে হাসির ঝিলিক, অন্যটা নিষ্প্রাণ। বাঁ গালের যেখানে আগে হাসলে টোল পড়ত এখন সেখানে বসন্তের দাগে এবড়ো খেবড়ো। থুতনির ওপর একবিন্দু পরিষ্কার জলে রামধনু ঝিকিয়ে উঠল।

—যাও দিদিভাই, এবার চান করতে যাও। বারোটা কখন বেজে গেছে—

অপর্ণা মায়ামমতা ভরা হাসিমুখে বলল, ঝর্ণার বুকের মধ্যে কোথাও যেন এক গভীর গোপন কক্ষে, একটি কিশোরীর বড় সাধের বেলোয়াড়ি চুড়ি ভেঙে যাওয়ার মত দুঃখ রিন রিন করে বেজে উঠল। 'আহা রে...এই মুখ! ঈশ্বর, তুমি দিয়েও কেড়ে নিলে? একটু কষ্ট হল না তোমার! একটা বড় নিঃশ্বাস চেপে উত্তর দিল ঝর্ণা, —যাই রে...

দোতলায় স্নানের ঘরের এদিকটায় নিচে বাগান। একটা ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছ জানলা আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও গাছে ফুল আসতে শুরু করেনি। এই দিকটার জানলা খুলে রেখেই নিশ্চিন্তে স্নান করা যায়। মাথার ওপর থেকে ঝিমঝিমে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে শাওয়ারের জল। ছাদের ট্যাংকের জল সকাল থেকে রোদ খেয়ে খেয়ে বেশ গা সওয়া কুসুম কুসুম গরম হয়ে আছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাতার মধ্যে দিয়ে সুন্দর নক্শাকাটা রোদ্দুর গরাদ পেরিয়ে ঝর্ণার বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওর বাদামী চকচকে টান টান ত্বকের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে জল, সাবানের ফেনা, রোদ্দুর, নক্শাকাটা জানলার গরাদের ঢেউতোলা ছায়া, পায়ের নিচে আবছা আলোয়, মার্বেলের টালির ওপর ঝিমঝিমে জলের শব্দ, সমস্ত ব্যাপারটাই কিরকম মোহময়, নেশা নেশা। শংখের ঘোর লাগা সাপিনীর মত দুলে দুলে গুণ গুণ করে গাইছে ঝর্ণা। মুখে জল ঢুকে গিয়ে মাঝে মাঝে কথা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত দুঃখ ধুয়ে গিয়ে পায়ের তলায় সাবানের ফেনা মেশা জলের স্রোতের সঙ্গে মিশে এঁকেবেঁকে ঘুরে কমোডের পাশ দিয়ে টালি বসানো নালির মধ্যে অস্পষ্ট শব্দ করে নেমে যাচ্ছে।

স্নান করা ঝর্ণার একটা বিলাস। এখানে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। এই স্নানঘরটায় তার কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে ওঠার সময় আটকে আছে। সুশোভনদের বাড়ির স্নান ঘরটাও বিশ্রী ছিল। চৌবাচ্চা থেকে মগে জল তুলে তুলে মাথায় ঢালা ওর ভাল লাগত না। বছর দশেক আগেও এই কলঘরটার ওদিকের দেওয়ালে একটা বড় আয়না লাগানো ছিল। সেই সময় বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটাও এত হয়নি। তখন স্নানের সময় জানলা বন্ধ করতে হত। নয়ত দত্তদের বাড়ির ছেলেটা ছাদে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারত। এখন সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।

সেই বয়েসটা, যখন সবে শরীরের কুঁড়িরা ফুটে ফুল হচ্ছে, তখন স্নান করার সময় ওই আয়নাটায় চোখ পড়লে সারা গায়ে সির সির করে কাঁটা দিত। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হাত ভাঁজ করে বুক ঢাকা দিয়ে যেন অন্য কাউকে চুরি করে দেখছে এভাবে নিজেকে খুঁটিয়ে ফিরিয়ে দেখত। মা বাইরে থেকে ডেকে সারা হতেন, 'মুখপুড়ির চান করা আর হয় না আজ' কিংবা 'কীরে পুকুর কেটে চান করছিস, না কী?'

আজ আর আয়নাটা নেই। বড় বৌদির অযত্নে জল লেগে লেগে পেছনের পারা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় খুলে ফেলা হয়েছে। থাকলে আজ আর একবার নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত ঝর্ণা। সেই তখনকার দু বেণী ঝোলানো কিশোরী আজ দু সন্তানের মা। দু বছর হল তিরিশ পেরিয়ে শরীরের মাঝে, পেটের কাছে একটু মেদ জমে যাওয়া [illegible] নিজে দাঁড়িয়ে। ভালই হয়েছে আয়নাটা নেই। আয়না ভীষণ অতীতকে মনে পড়ায়!

সেই ঝর্ণাই কী এখন স্নানঘরে দাঁড়িয়ে যে পনেরো বছর আগে সন্ধ্যার অন্ধকারে একা একা বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে দীঘার ঝাউবনে ঢুকে গিয়েছিল পূর্ণিমার চাঁদ দেখবে বলে?

শাওয়ারটা বন্ধ করে গা মুছে নিচ্ছিল ঝর্ণা। পায়ের নিচে চকচকে ভিজে মসৃণ মেঝেতে একটা এবড়ো খেবড়ো খাবড়া ছায়া নড়েচড়ে ওকে ব্যঙ্গ করছিল। বাইরে অপর্ণার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

—দিদিভাই, ভাত দেওয়া হয়েছে—

—যাই।

সাড়া দিয়ে ঝর্ণা বেরিয়ে এল।...

খাওয়ার পর চুপ করে হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে ঝর্ণা শুয়ে ছিল। দুপুর গাঢ় হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে কর্কশ গলায় ডেকে উঠছে কাক। সামনের রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন। সমস্ত পাড়াটা তার অভিজাত দ্বিপ্রাহরিক বিলাস নিয়ে অলস বিশ্রামে চুপ করে আছে। পাশের কোন একটা বাড়িতে একটানা বেজে যাচ্ছে টেলিফোন। একটানা অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে রী ক্রিং ক্রিং, রী ক্রিং ক্রিং। ঝর্ণা বুকের ওপর বইটা খুলে ধরে আনমনে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখছিল।

আজ দোসরা জানুয়ারী। আজ খোকার স্কুল খুলবে। খোকার নতুন ক্লাস, নতুন বই। খোকা কী আজ খুব হাসিখুশি হয়ে ইস্কুলে গেছে! কে ওর টিফিন ভরে দিল? ঝর্ণা জানে, এবার ঐ পার্কের ধারের হলুদ স্কুল বাড়িটায় গৌতম রায় বলে একটা ছেলে, যার চুল আঁচড়ে দিলেও একটু পরে এলোমেলো হয়ে গিয়ে কপাল ঢেকে ফেলে, যে ফুটবল খেলে হাঁটুতে কাটা নিয়ে বাড়ি ফিরে গম্ভীর মুখে চোখের জল চেপে হাঁটুতে ডেটল লাগায়, সে এবার ফার্স্ট না হয়েই ক্লাস ফাইভে উঠেছে।

হেডমাস্টার মশাই বোধহয় সেপারেশনের ব্যাপারে কিছু জানেন না। কারণ ঝর্ণা ছেলের রেজাল্টের দিন স্কুলে ফোন করতেই হেডমাস্টার মশাই খবরটা দিয়ে খুব দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে মিসেস রায় যেন ছেলের পড়াশোনার দিকে একটু নজর রাখেন। পরীক্ষার আগের কমাস ও মোটেই পড়ত না। প্রচুর কামাই করেছে আর স্কুলে এলেও পড়া না শুনে অন্যমনস্ক থাকত। মা যদি ছেলের দিকে একটু না দেখেন তো ছেলে খারাপ রেজাল্ট করবেই। শুনে ঝর্ণার বুক ফেটে গিয়েছিল। কারণ ওই কমাসই সুশোভনের সঙ্গে তার চলমান খারাপ অবস্থাটা চরমে উঠেছিল।

গৌতম ঝর্ণার ছেলে। ওর মত নরম স্বভাব। ওর মুখের আদলেই ওর মুখ গড়া। আর খুকুন একেবারে সুশোভনের মেয়ে। অথচ গৌতম সুশোভনের কাছে আর খুকুন ওর কাছে। চশমার গাম্ভীর্যে পণ্ডিত ধর্মাবতার আদালতে বসে খাতার কলমে এই বিধান দিয়েছেন।

সেপারেশনের পর একদিন স্কুল ছুটির সময় খোকার সঙ্গে দেখা করতে ঝর্ণা গিয়েছিল। লকগেট খোলা বাঁধের জলের মত ছেলের দল স্কুলের দরজা দিয়ে মুখে খুশির হাসি ও কলশব্দ নিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে। একটু আগেই মন্দিরের শেষ আরতির মত ঘণ্টায় ছুটির শব্দ ধ্বনিত হয়েছে। আর ঝর্ণা উন্মুখ, ব্যগ্র চোখে, চিবুক তুলে, হো হো করে ছুটে বেরিয়ে আসা ছেলের দলের মধ্যে তার ছেলেকে খুঁজছিল। গৌতম সবার শেষে সাদা জামা, সাদা প্যান্ট, কালো জুতো, পিঠে বাঁধা ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে পা ঘষতে ঘষতে আনমনা বিষণ্ণতায় বেরিয়ে আসছে। ঝর্ণার শরীরের সমস্ত রক্ত বুকের মধ্যে ধুক ধুক করছে। নির্বাসিত রাজপুত্রের মত ওর ছেলে ওর দিকে গাঢ় বিষণ্ণতায় পা ফেলে ফেলে কপাল ঢাকা চুল নিয়ে এগিয়ে আসছে।

মাকে দেখেই খুশিতে জ্বলে ওঠা চোখ নিয়ে ছুটে এল গৌতম। ঝর্ণার দু' চোখে আনন্দে চিকমিক করছিল জল। কাছে এসেই হঠাৎ থমকে থেমে গেল গৌতম। তীব্র অভিমানে কুঁচকে গেল কপাল। ফুলে থর থর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকেই, মার খাওয়া কুকুরের মত মাথা নিচু করে, যেন ওকে চেনেই না এমনভাবে পাথরের মূর্তি হয়ে ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল গৌতম। ঝর্ণা সমস্ত হৃৎপিণ্ড ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, 'খোকা—খোকারে...'

চেনা হর্নের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখল, সেই ইঁটরঙা ফিয়াট, ছাই ছাই রঙের স্যুটপরা নিখুঁত দীর্ঘ ভদ্রলোক সুশোভন রায় অফিস ফেরত গাড়ির দরজা খুলে ওর ছেলে গৌতম রায়কে তুলে নিচ্ছেন। খোকার কপাল ছাপিয়ে ঝুলছে এলোমেলো চুল। কিন্তু ঐ বালকের চোখের কাঠিন্যে, চিবুকের ভাঁজে একটা বয়স্ক পুরুষের জেদী ভাব। সে ঘাড় সোজা করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বহুদূরে তাকিয়ে রয়েছে। গাড়ি ঘুরে চলে গেল। তার সঙ্গে খোকার দৃষ্টি ফুঁড়ে স্কুলের দেওয়ালে গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া টর্চের আলোর মত ঘুরে ঝর্ণাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সেই রাত্রেই সুশোভন ফোন করল।

—তুমি যদি গৌতমের মানসিক অবস্থা আরো খারাপ না করতে চাও তবে আর ওকে দেখতে স্কুলে এসো না।

—মা ছেলেকে দেখলে ছেলের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়?

—বাজে কথা বলার আমার সময় নেই। যদি বাড়াবাড়ি কর তবে ছেলেকে আমি দূরের কোন বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেব।

তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসা সুশোভনের গলা, জহ্লাদের মত নিষ্ঠুর।

—ও তোমার নিষ্ঠুরতার জন্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যা বললাম তা মনে রেখো।

ঝর্ণা আর কোন কথা না বলে ফোন নামিয়ে রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিড় বিড় করেছিল, 'আমি নিষ্ঠুর—আমিই নিষ্ঠুর'।

...কিন্তু আজকে যে একবার খোকাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। খোকার আজ নতুন ক্লাস হল। প্রতি বছর এইদিনে স্কুলে যাবার সময় ও একটা আস্ত বড় খাঁজকাটা চকোলেট টিফিনের সঙ্গে দিত বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাবার জন্যে। এবছর ওকে কে দেবে?

সুশোভনের সঙ্গে আদালতে ভাগাভাগি হবার আগের সময়ে ও যখন বাপের বাড়িতে এসে ছিল তখনও স্কুল ফেরত, ঠাকুর্দার আমলের লোক দুলালের হাত ধরে মাঝে মাঝেই মামার বাড়িতে পালিয়ে আসত খোকা। সারারাত ওকে জড়িয়ে শুয়ে থেকে সকালে উঠে লাল চোখ নিয়ে এখান থেকেই স্কুলে গেছে। ওকে স্তোক দিয়েছে ঝর্ণা, 'বিকেলে গিয়ে আমাকে ও-বাড়িতে দেখতে পাবে।'

তখন আরো ছোট ছিল খোকা, যখন খুকুন হল। প্রথম প্রথম একটু হিংসে করত খুকুনকে যে ওর মা ভাগ হয়ে গেছে। মাকে পুরোপুরি পাওয়া যায় না। পরে ধীরে ধীরে খুকুনকে গভীরভাবে ভালবাসল। গম্ভীর মুখে বড়দের আদরের নকলে বোনকে আদর করত গৌতম। কিন্তু বুকের দুধ দেবার সময় আড়চোখে অপছন্দের দৃষ্টিতে খুকুনকে চোখ সরু করে দেখত। আর রাত্রে মায়ের ঢাকা দেওয়া বুকের কাছটায় ঘেষটে ঘেষটে চলে আসত। চুপি চুপি একটু মায়ের বুকে মুখ না দিয়ে ঘুমত না গৌতম। ঝর্ণা হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বলত,—তুমি কিন্তু এখন বড় হচ্ছ গৌতম।

এই সব সময়ে খোকাকে 'গৌতম' বলত ঝর্ণা। আর গৌতম অবুঝ পশুর মত মার বুকে একটা হাত দিয়ে মুখ সরিয়ে নিয়ে শান্ত গভীর বড় বড় চোখ মেলে ওর মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে তাকাতে ঘুমিয়ে পড়ত। ঝর্ণার বুকটা টনটন করে ওঠে। ওরা সবাই মিলে ওর নাড়ি ছেঁড়া ধন, প্রথম সন্তান খোকাকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।...

তীব্র আবেগে জ্বলজ্বল করছে ঝর্ণার চোখ। বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে। অপ্রকৃতস্থের মত উঠে দাঁড়িয়ে ঝর্ণা দ্রুত শাড়ি বদলাতে থাকে। আজ যে খোকার নতুন ক্লাসে প্রথম দিন। 'আজ একবার খোকাকে দেখে আসি দূরে থেকে। একবার দেখব ও কেমন দেখতে হয়েছে। একবার দেখব আর চলে আসব। ওকে ডাকব না, সামনে দাঁড়াব না, দেখা দেব না, শুধু দূরে থেকে একবার মাত্র দেখব।'

দ্রুত চিরুনি চালিয়ে আয়নার সামনে চুলটা ঠিক করে নেয়। [illegible] খুচরো টাকা পয়সার লাল ব্যাগটা হাতে তুলে নিতেই, নিচে গাড়ি দাঁড়ানোর আওয়াজ শুনতে পায়। বর্ণা এসে নামল। তার চিৎকার করে বড় বৌদির সঙ্গে একতলায় কথা বলা শুনে আতঙ্ক হয়ে চোরের মত দরজার পাশে লুকিয়ে দাঁড়াল ঝর্ণা। ওরা কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। বর্ণার গলার আওয়াজ কিরকম অবাঙালী ব্যবসাদারদের বাড়ির মোটাসোটা সুখী বউদের মত উচ্চগ্রামে বাঁধা হয়ে গেছে।

—দিদি ভাই কই রে? শোন্ অপর্ণা, আজ ইভনিং শোতে একটা জমাটি হিন্দি বই দেখবো।

চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে বর্ণা মোটাসোটা হাঁসের মত হেলেদুলে ভারী গয়না পরা গোল ফর্সা হাত ঘুরিয়ে পুবের বারান্দার দিকে এগোলো। খুকুন ঘুম থেকে উঠে অপর্ণার ঘর থেকে বেরিয়ে 'মাসিমনি মাসিমনি' বলতে বলতে ওর পেছন পেছন গেল। সেই ফাঁকে চটি হাতে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চটি পরে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে এল ঝর্ণা।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল, তিনটে দশ। ঠিক সাড়ে তিনটের ওদের স্কুল ছুটি হয়। শীতের দুপুর মরে যাচ্ছে বাড়ির কার্নিশে, পামগাছের মাথায়, দূরের উঁচু বাড়ির কাচের জানলায়। ঝর্ণা হাঁটছিল তীব্র আবেগে, পা তার মাটিতে ঠেকছিল কী ঠেকছিল না। ছেলেদের হুল্লোড়, গাড়ির হর্নের তীব্র আওয়াজ, অল্প মানুষ জন চলা রাস্তা, হলুদ নিবে আসা দিন, পার্কে আয়াদের প্যারাম্বুলেটরে বাচ্চাদের ঠেলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, ফুচকাওয়ালার বিকেলের পশরা সাজান কিছুই তার নজরে ভাল করে পড়ছিল না।

ওর সামনের সারা আকাশ জুড়ে ভাসছিল গৌতমের মুখ। তার কপাল ছাপিয়ে নামা এলোমেলো চুল, সারাদিন স্কুলের ক্লান্তি লেগে থাকা মুখ, শীতের আঁচড়ে ফেটে যাওয়া শুকনো ঠোঁট। সুশোভন হয়ত এবার কোন ক্রীম কেনেইনি। পায়ে কালো জুতো, পিঠে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, সাদা প্যান্টে কালির ছিটে লেগেছে। গৌতমের গলা আকাশ থেকে কানে এল,—মা ক্লাস ফাইভে উঠলে আমাকে একটা টেবল টেনিস ব্যাট কিনে দেবে?

সমস্ত আকাশ, বাতাস, ট্রামবাসের ঘর্ঘর, অজস্র শব্দের বেড়াজাল ছিঁড়ে চিৎকার করে মনে মনে উত্তর দিল ঝর্ণা—

—হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়ই কিনে দেব। ফার্স্ট হতে হবে কিন্তু।

ঝর্ণার খোকা এবার ফার্স্ট হয়নি। তোমরা আমার গৌতমকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও দেখবে ও কী হয়! সুশোভন তুমি ওকে আমার মধ্যে বপন করেছিলে মাত্র, কিন্তু কোন জমিতে গৌতম অঙ্কুরিত হয়েছে? কোথা থেকে রস টেনে ও তিলে তিলে বড় হয়ে উঠেছে? গৌতম, খোকারে...আমি আসছি।

ঝর্ণা একটা রিকশায় চড়ে বসে স্কুলের নামটা বলে তাড়াতাড়ি যেতে বলল। রিকশা দ্রুত চলছে, হাতের ঘড়িটা একবার দেখল ঝর্ণা। আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে। অনেক সময়। এখান থেকে পাঁচ মিনিটও লাগে না। নিশ্চয়ই গৌতমের সব বই সুশোভন কিনে দিয়েছে। এ বছর থেকে ওর জ্যামিতি শুরু হবে। সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বৃত্ত। আমরা সবাই একই বৃত্তে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরে আসি। আচ্ছা! আমি যদি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স চুপিচুপি ওদের কালিঘাটের বাড়ির জানলা দিয়ে গৌতমের নাম লিখে ফেলে দিয়ে আসি তবে ও পাবে? আমার নাম লিখব না।...

রাস্তার ধারে সাজানো একটা মনিহারী দোকানে কাচের বোয়েমের মধ্যে থাক দিয়ে দাঁড় করানো গাঢ় বেগুনী সাদাতে মেশান চকচকে প্যাকেটে সাজানো সেই দামী চকোলেট। নেমে একমিনিটে একটা কিনে নিয়ে এসে আবার রিকশায় বসল ঝর্ণা। হঠাৎ মনে পড়ল এটা তো আমার খোকাকে দেওয়া যাবে না, আমি তো দূরে দাঁড়িয়ে শুধু ওকে একবার দেখব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে হাতে শক্ত করে ধরল চকোলেটটা। 'আমি যদি দিই, দেখা করি তাহলে সত্যিই কী সুশোভন ওকে অনেক দূরের বোর্ডিং ইস্কুলে পাঠিয়ে দেবে!'...

দূরের স্কুলটা তার শ্যাওলা হলুদ রঙ নিয়ে ধীরে ধীরে চোখের সামনে বড় হয়ে যাচ্ছে। পাশে পার্কের গরাদ কাটা সবুজ রেলিং রিকশার গতির সঙ্গে তাল রেখে ছুটছে। ওপরে বসে আছে একজোড়া শালিখ। পার্কে বাচ্চাদের চিৎকার। আর একটুখানি। ঝর্ণা গলা বড় করে টান হয়ে রিকশায় বসে।

—আস্তে, রোখকে, রোখকে।

রিকশা দাঁড়াল। সমস্ত স্কুলটা খাঁ খাঁ করছে। বড় সবুজ দরজাটা বন্ধ। কার্নিশে খাঁ খাঁ করে ডাকছে একটা বুড়ো কাক। মাঝবয়সী, হাসিখুশি, পাকানো গোঁফ দারোয়ানের গায়ে খাঁকি কোর্তা নেই। সে সাদা ফতুয়া আর ধুতি পরে খৈনী ডলতে ডলতে হাসিমুখে কাছে এসে ঝর্ণাকে সেলাম করল।

—আপ্ আভি কাঁহাসে, মায়ী? আজ তো পহেলা রোজ হাফ্ ছুট্টি হ্যায়। গৌতমবাবু, আপকি বুড্ডা নৌকরকে সাথ্ ঘর্ চলা গিয়া।

তারপর বিনয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে হাত ঘষে বলল,—হামারা এ সাল পুজাকা বখশীষ নেই মিলা, মায়জী। গৌতম বাবুনে বোলা, বখশীষ মায়জীসে মিলেগা—

ঝর্ণা নিষ্পলক চোখে একটা পাঁচ টাকার নোট দারোয়ানের হাতে দিল। তারপর যন্ত্রের মত দারোয়ানের সেলাম ফেরত দিয়ে রিকশাওলাকে বলল,

—চলো, ওয়াপাস্ ফিরো—

হাতের তেলোর মধ্যে তীব্র চাপে কখন দামী চকোলেটের চকচকে প্যাকেটটা চটকে ভেঙেচুরে দলা পাকিয়ে গেছে। চারপাশের স্বচ্ছন্দ হাসিখুশি শীতের মনোরম জগতের মধ্যে দিয়ে ফিরে চলল রিকশা। আস্তে একটু ঝুঁকে নর্দমার ধারে দলা পাকানো চকোলেটের প্যাকেটটা ফেলে দিল ঝর্ণা। দু ডানা শুনো

আজকের হল্যাণ্ড— নূতন প্রধানমন্ত্রী 'ভ্যান্ আক্ত্'

সুনীল রঞ্জন দত্ত

এখন হল্যাণ্ডের যিনি প্রধান মন্ত্রী ওঁর নাম আর্নান্ড্রস ভ্যান আক্ত্। ইনি ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক (C D A) দলের নেতা। একটু অদ্ভুত ধরনের মুখাকৃতি বিশিষ্ট এই দীর্ঘকায় মানুষটিকে প্রথম দর্শনে অনেকের ভালো মানুষ বলে মনে নাও হতে পারে। তবে এই মুখে এখন সব সময় খুশির হাসি লেগে আছে।

ভ্যান আক্ত্-এর মনটা খুশিতে ভরে থাকার কারণ অন্য। এই যে প্রধানমন্ত্রীর গদিটা তিনি দখল করে বসে আছেন সেটা কি কিছুটা ভাগ্যের জোরেই তিনি পাননি? গত বছর (১৯৭৭) মে মাসে দেশে যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল তাতে কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেন্ আউল-এর লেবার পার্টি (PVDA) বেশী জনসমর্থন লাভ করেছিল। বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে ডেন আউলের উপরই পড়েছিল মন্ত্রিসভা গঠনের ভার। তবে লেবার পার্টি বৃহত্তম দল হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল না। এবার নিয়ে ডেন্ আউল তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু এবারের সুযোগটা তিনি কাজে লাগাতে পারলেন না। দপ্তর বণ্টনের ব্যাপারে অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিল না। বেশ কিছুদিন চেষ্টা করার পর নিরাশ হয়ে তিনি সরে দাঁড়ালেন। গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছিল নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকেই। তখন তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নির্বাচনে বিরাট জনসমর্থন নিয়ে ফিরে আসতে পারলে সবরকম গণ্ডগোল মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। নির্বাচনের পরেও কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। ডেন আউলের সময় ভ্যান আক্ত্ ছিলেন 'মিনিস্টার অব জাস্টিস'। গত নির্বাচনে তাঁর ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক দল ছিল লেবার পার্টির পরেই। ডেন আউলের মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যর্থতার জন্য ভ্যান আক্ত্-এর উপর এসে পড়ল মন্ত্রিসভা গঠনের ভার। ভ্যান আক্ত্ সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগালেন। তৃতীয় বৃহত্তম দল 'পিপলস ডেমোক্রেটিক অ্যাণ্ড ফ্রিডম পার্টি' এবং আরো কয়েকটি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছুটা নির্বিঘ্নে মন্ত্রিসভা গঠন করে ফেললেন। পিপলস ডেমোক্রেটিক অ্যাণ্ড ফ্রিডম পার্টির নেতা ভ্যান ঈগল-এর হাতে ছেড়ে দিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার, এ ছাড়া তাঁকে করা হল সহ-প্রধানমন্ত্রী। একটা দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের লোকরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ডেন আউল কিন্তু দমলেন না, তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন— "মনে রাখতে হবে দেশের অধিকাংশ লোক আমাদেরই সমর্থন করেছিল।" কিন্তু ভ্যান আক্ত্ প্রধানমন্ত্রী হবার পর দেখা গেল ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি নির্বাচনে ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। ফলে হল্যাণ্ডের জনসাধারণ এখন ধরেই নিয়েছে যে ভ্যান আক্ত্-এর পক্ষে চার বছর গদিতে টিঁকে থাকায় আর কোন অসুবিধা হবে না। ভ্যান আক্ত্ গদিতে বসার পর যে ব্যাপারে তাঁকে সবচেয়ে বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হল ব্রাজিলকে ইউরেনিয়াম বিক্রি নিয়ে। হল্যাণ্ডের "আলমেলো" নামে একটা জায়গায় জার্মান এবং ব্রিটিশদের সহায়তায় ইউরেনিয়াম তৈরী হচ্ছে।

১৯৮২ থেকে আলমেলোর ইউরেনিয়াম ব্রাজিলকে বিক্রি করার কথা আছে। ব্রাজিল মিলিটারি শাসিত দেশ, আণবিক অস্ত্রের দিকে তাদের ঝোঁক থাকা খুবই স্বাভাবিক। কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার না করে আলমেলোর ইউরেনিয়ামের সাহায্যে ব্রাজিল আণবিক অস্ত্র তৈরি করে হল্যাণ্ডের জনসাধারণ এটা চায় না। জনতা রাস্তায় মিছিল বের করে এই চুক্তির বিরুদ্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেনি। এই ব্যবসায়িক চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেন আউল-এর সময়। এতদিন ব্যাপারটা জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত ছিল। জনসাধারণ আরো বেশী ক্ষুব্ধ হল এই দেখে যে কোন রকম শর্ত ছাড়াই হল্যাণ্ড সরকার ব্রাজিলকে ইউরেনিয়াম বিক্রি করতে রাজী হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নীতি এবং পরিকল্পনাগুলি অদল-বদল করার কিছু নেই। অনেকটা ছকে বাঁধা। যিনিই প্রধানমন্ত্রী হোন না কেন আজকের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার জ্বালা যন্ত্রণা মাথায় নিয়ে তাঁকে গদিতে বসে থাকতে হবে। যেসব কারণে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তার সমাধানের চাবিকাঠি সরকারের হাতে নেই। জনসাধারণ এটা ভালো করে জানে বলেই এ ব্যাপারে তারাও সরকারের উপর বিরাগ নয়। এ ছাড়া প্রতি বছর করের বোঝা বাড়ানোর ফলে জিনিসপত্রের দাম এবং দেশের লোকের আয় বেড়ে যাওয়া, বেকার ভাতা, বয়স্কদের পেনশন এ সব ব্যাপারেও কোন সরকারেরই নূতন কিছু করার নেই। তবে ভ্যান আক্ত্-এর সরকার এই গতানুগতিকতার মধ্যেও নূতন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। দেশের লোকের আয় যে হারে বাড়াবার কথা ছিল সে হারে বাড়ানো হল না। অর্থাৎ মজুরি কমিয়ে দেওয়া হল। ভ্যান আক্ত্-এর সরকার যুক্তি দেখালেন—এর ফলে হল্যাণ্ডে তৈরী যে সমস্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় তার দাম অনেক কম হবে এবং বিশ্বের বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। এটা দেশের পক্ষে কল্যাণকর। যুক্তিটা দেশের সাধারণ মানুষের মাথায় কতটা ঢুকেছে সেটা বোঝা না গেলেও তারা যে এটা মেনে নিয়েছে কোন রকম প্রতিবাদের গুঞ্জন না ওঠায় সেটা বোঝা গেল।

রাজপরিবারের ঐতিহ্য এবং হল্যাণ্ডের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার রাজপরিবারের প্রধান (রাজা অথবা রানী) সোনার কাজ করা ঘোড়ার গাড়ি চেপে হেগ-এ সংসদ উদ্বোধন করতে আসেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভ্যান আক্ত্ এই প্রথম এই অনুষ্ঠানে রানী জুলিয়ানার সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেলেন। এদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয়েছে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। তারপর বহুবার সংবিধান পরিবর্তন করা হয়। শেষ পরিবর্তন করা হয়েছে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে রাজা বা রানীর ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা নির্ধারণ করা হয় বলে হল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রকে বলা হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী যে কোন দল থেকেই মনোনীত হতে পারেন, কিন্তু রাজা বা রানী থাকবেন সকলের উপর এবং তিনি থাকবেন জাতীয় সংহতির প্রতীক রূপে। বর্তমান রানী জুলিয়ানা "হাউজ অব অরেঞ্জ" পরিবারের। এই পরিবার ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে হল্যাণ্ডের সিংহাসন দখল করে আছেন এবং তখন থেকেই হল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র শুরু হয়।

হল্যাণ্ডের মত সভ্য দেশেও ধর্মান্ধতা মানুষের জীবনকে যে কি সাংঘাতিক পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায় এবারের পোলিও এপিডেমিকের প্রাদুর্ভাব দেখে সেটা ভালোভাবে বোঝা গেল। এখনও এ দেশের বহু অধিবাসী ধর্মের গোঁড়ামির জন্য রেডিও শোনে না, টেলিভিশন দেখে না, কোন কোন রোগের প্রতিষেধক গ্রহণ করা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ মনে করে। তারই ফলে এখন ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে পোলিও রোগ। ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক লোককে পঙ্গু করে দিয়েছে এ রোগ। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দেও একবার পোলিও রোগ দেখা দিয়েছিল কিন্তু এবারের রোগাক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশী। অনন্যোপায় হয়ে গির্জায় গির্জায় ধর্মযাজকরা প্রচার করতে লাগলেন—"রোগের প্রতিষেধক গ্রহণ করা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ নয়।" অবশ্য সরকারের তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি নেই। ইতিমধ্যে এই খাতে সরকার প্রায় আড়াই মিলিয়ন গিল্ডার খরচ করেছেন। এদেশের প্রতিটি শিশুরই পোলিও প্রতিষেধক গ্রহণ করা একরকম বাধ্যতামূলক। এখনো এদেশের বহু অধিবাসীর অন্তরে লুকিয়ে আছে আদিম যুগের এক

FREE BELT INSIDE
Comfit
SANITARY
ECONOMY PACK SAVE Rs.2/-

পাখি অলক সান্যাল

হলুদ-পাখিটাকে ধরবে বলে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়েছিল রসময়। মাত্র পাঁচ ইন্‌চি গাথ্‌নির নড়বড়ে সরু পাঁচিল, এখানে ওখানে ইট খসে গিয়ে পলেস্তারা চটে-মটে বিতিকিচ্ছিরি ব্যপার; দেখে ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে যে-কোন মুহূর্তে, এখনো যে কেন দাঁড়িয়ে আছে—সেটাই আশ্চর্য!

তো, সাহস খুব রসময়ের, সেই পাঁচিলে উঠে সার্কাসের ক্লাউনের মত অপা-চপিগ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। টালমাটাল অবস্থা, প্রতি মুহূর্তে ভয়—এই পড়ে কি সেই পড়ে; সেই ভয়ে আমি ওপর দিকে চোখ রেখে পাঁচিলের গা ঘেঁষে এমন-ভাবে হেঁটে যেতে লাগলাম যেন ও পড়ে গেলেই টুপ্‌ করে লুফে নেব।

রসময় হাবাগোবা ধরনের অনাথ ছেলে। এই আঠেরো-উনিশ বছরেও কথা আধো আধো, জিভে জড়তা, যখন তখন সরাৎ সরাৎ করে লালা ঝরে আর খেয়ে নেয়, প্যাণ্টের বাঁধন আলগা হয়ে যায় আর যাচ্ছেতাই রকমের বুদ্ধি কম, কখন কি করতে হয় জানে না। পাঁচিলে ওকে আমি উঠতে দিতে চাই নি, ও-ই ওস্তাদি করে উঠে পড়েছে কোন্‌ ফাঁকে।

দেওয়ালের লাগালাগি একটা নিচু ডালে বসেছিল পাখিটা। সম্ভবত সকালের রোদটুকু উপভোগ করছিল। রসময় যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা সে দেখে না। খুব নিশ্চিন্ত-আরামে একবার এ-পাখনায় একবার ও-পাখনায় ঠোঁট ঠুকে ঠুকে শীতের সকালের জড়তাটুকু কাটিয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় ঘটে গেল কাণ্ডটা। ঘটাল রসময়ই। কিন্তু তার আগে পটভূমিটা বর্ণনা করা দরকার, বুঝতে সুবিধে হবে।

অঘ্রাণের মাঝামাঝি আমাদের এদিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যায়। ভোরের দিকে এক এক দিন এত কুয়াশা পড়ে যে, প্রথম প্রথম কিছুই চোখে পড়ে না। তারপর একটু একটু করে কুয়াশা ভেদ করে রোদের ঝিলিক ফুটলে মনে হয় বুঝি সব কিছু মিঠে-নরম হলুদ কি কমলা রঙে চুবিয়ে গেছে। পাখিটাকে যখন প্রথম দেখি তখন এই রকমই মনে হয়েছিল—এটা বুঝি সেই রোদের কারসাজি কিন্তু সে-ভুলটা ধরা পড়ল খানিক বাদে, কুয়াশা সরে যেতেই।

রসময়ই প্রথম আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখায়। বেশী কথা-টথা পারতপক্ষে বলে না ও, যতক্ষণ পারে ইশারাতেই কাজ চালায়। ভেবেছিল, আমি বোধ হয় বন্দুক তুলে ধরে টিপ করব। কিন্তু, এমন চটকদার ছোট্ট রঙীন পাখিটিকে মারতে আমার মন চাইল না, মাথায় হঠাৎ খেয়াল চেপে গেল, পাখিটাকে ধরলে তো হয়। এই রকম সুন্দর পাখি এর আগে কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না। দেখে থাকলেও খেয়াল করি নি বা এমন করে নজর কাড়েনি কেউ। কি পাখি ওটা কে জানে!

প্রতি বছর শীত পড়ার মুখে আমাদের এদিকে দলে দলে নানা রকমের পাখি এসে যায়। এসে পড়ে নদীর চরে, বিলের ধারের জল-ডোবা জিজে জঙ্গলে, দিগন্ত কলমী মাঠের ধারে ধারে; ঝাঁক বেঁধে বেঁধে কত রঙের আর কত দেশের যে পাখি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার [illegible]

সব। কেউ হয়ত এল কোন পাহাড়ের কোটর থেকে, কেউ বা তরাইয়ের জঙ্গলের, কেউ কেউ আরও দূর—বহু দূর কোনও সমুদ্র ডিঙিয়ে অজানা কোন দ্বীপের অরণ্য থেকে অথবা কেউ সেই সুদূর সাইবেরিয়ার।

মাথার ওপর দিয়ে 'কোঁওক্‌-কোঁক্‌' শব্দে ঝংকার তুলে যখন উড়ে যায় রাজহাঁস কি চখা-চখির দল, সারিবদ্ধ বক কিংবা বালিহাঁসের ঝাঁক তখন বুকের ভেতরে তোলপাড় করে ওঠে শিকারি রক্তের মাতলামি; মন বলে, তৈরী হও হে, মরসুম এসে গেছে!

অবশেষে একদিন র‍্যাকের ওপর থেকে নামিয়ে আনতে হয় বন্দুকটাকে। ঝেড়ে মুছে তেল দিয়ে, দু' চারবার ট্রিগার টিপে পরখ করে দেখে নিতে হয় কল-কব্জা ঠিক ঠাক আছে কি না। চোখের সামনে ভাসতে থাকে তখন খুব পরিচিত একটি দৃশ্য—পাখা ঝাপটে উড়ে যেতে গিয়ে লাট খেতে খেতে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে হাজার মাইল পাড়ি-দিয়ে-আসা কোনও দূর দেশী আগন্তুক যার ক্লান্ত ডানায় রক্তের ফোঁড় তুলে দিয়েছে আমারই অব্যর্থ নিশানা আর তার আধ-বোজা চোখে শেষ বারের মত ফুটে উঠেছে শীতের আকাশের নিষ্কলঙ্ক-নীল প্রতিচ্ছবি।

এই হল, পাখি-শিকারিদের মরসুম। এ বছর এই মরসুমে আমার শিকারের সঙ্গী হয়ে গেছে রসময় যার আদি-বৃত্তান্ত ঠিক জানি না, সম্ভবত কেউ-ই জানে না এ অঞ্চলের। একেক সময় এক-একটা কুকুর ছানা যেমন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বে-পাড়ায় চলে আসে অথবা কেউ ফেলে যায়, তারপর পাড়া-প্রতিবেশীদের অবহেলা কুড়োতে কুড়োতে কি করে যেন 'পাড়ার-কুকুর' হয়ে গিয়ে কাজে-অকাজে লেগে যায়, রসময়ও কতকটা সেই রকম, অসম্ভব সার্বজনীন।

রসময়কে বললাম, 'হাসছিস কেন, যা এগিয়ে। খুব আলতো হাতে ধরবি, দেখিস যেন চেপটে না যায়।'

রসময় কোনও উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল। ভরসা না পেয়ে আবার বললাম, 'খুউব সাবধান। এখন আর লালঝোল-টোল টানিস না, শব্দ হবে, শব্দ পেলেই কিন্তু উড়ে যাবে!'

রসময় এবার ঘাড় কাত করে আমাকে ভরসা দিল, তারপর এগিয়ে যেতে লাগল। আর, কয়েক পা যেতে না যেতেই ধপ—

রসময় করল কি, লোভ সামলাতে না পেরে খানিকটা দূর থেকেই তাড়াহুড়ো করে হাত বাড়াতে গিয়ে টাল খেয়ে পড়ে গেল, পড়বি তো পড় সেই গাছটার ডালে যেখানে পাখিটা বসে ছিল। গাছটা বাঁকানো আর নীচু তাই রক্ষে; একটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে কোনরকমে বাইরের জঙ্গলের দিকে লাফিয়ে পড়ল রসময় আর সেই ফাঁকে ফুড়ুত্‌ করে উড়ে গেল পাখিটা।

তাড়াতাড়ি করে পাঁচিলের ধারের খিড়কি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, রসময় দিব্যি উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে শিশিরে-ভেজা ধুলো মাটি ঝাড়ছে। রাগ হল। বললাম, 'পারবি না তো উঠতে গেলি কেন হারামজাদা, দিলি তো উড়িয়ে—'

নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তাতে রাগ আরো বেড়েই গেল। ইচ্ছে হল, দিই একটা ঠাস করে চড় কষে বোকা বুদ্ধুটার গালে। কিন্তু তার আগেই সামনের বাড়িতে

ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরল—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-LR.28-2416 BG

তুলেছিলাম সেই হাতে ওকে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে চুপিসাড়ে বঁইচি-ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলাম। মাত্র দশ হাতও দূরে নয়, হলুদ পাখিটা এখন ওখানেই পিছন করে বসে আছে। ধরা খুব সোজা কিন্তু সেটা রসময়ের কম্ম নয়।

এত সন্তর্পণে এগিয়ে যাই যে, পাখিটা কিছুই জানতে পারে না। পায়ের তলের শুকনো পাতায় একটুও মচমচানি শব্দ না করে, দম আটকে, একটু একটু করে কাছে গিয়ে ঠিক দু'-ইঞ্চি দূর থেকে যেই খপ্ করে—এইয্যা!'

আমার মুখ দেখে ফস্ করে শব্দটা বেরিয়ে যেতেই রসময় খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠে শুধোল, 'কি অ'ল, বাবু?'

চোখ পাকিয়ে বলি, 'কী আবার হবে, দেখছিস তো, উড়ে গেল। বাঁদর!'

হাতের মুঠো তখনো আমার বন্ধ। খেয়াল হতে মনে হল, এত শক্ত মুঠোর ভেতরে অত ছোট্ট পাখিটা বোধ হয় পিষে মরেই যেত। ঠিক তখনই, আবার দেখলাম ওকে। তিন পাক ঘুরে গিয়ে নাচতে নাচতে বসে পড়ল একটা আমগাছের ডালে। গজ বিশেক দূরে হবে বোধ হয়, খুব সরু আর নীচু ডাল, যেন ইচ্ছে করেই এবারেও পিছন করে বসেছে ধরা দেবার জন্য। ধরতে গেলাম—ফুড়ুৎ!

আবার দেখলাম ওকে। তারপর আবার...আবার!

দুই-আড়াই মাইল লম্বা নানা জাতের গাছ পালার জঙ্গলে তখন আলো ছায়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে। দলা দলা কুয়াশা ঘন জঙ্গলের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ধোঁয়াটে-নীল মেঘের মসলিন। পায়ের কাছে ছোট ছোট আশশেওড়া, বঁইচি-ঝোপ, কোথাও কোথাও কণ্টিকারীর ঝাড়। ঠিক তার আশেপাশেই সকালের এক আঁজলা রোদ্দুর মেখে নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল পাখিটা, যেন পাখি নয়, বড় সাইজের হলুদ একটা প্রজাপতি।

আমার পায়ে ছিল হানটিং শু, কাঁধে বন্দুক, পকেট ভরতি টোটা—শিকারে যাব বলে বেরিয়েছি অথচ আধ ঘণ্টা ধরে এ-ই করছি! এই আছে হাতের কাছে, আবার নেই। বেশী দূরেও যায় না, দশ কি বিশ হাত বড় জোর তিরিশ হাত—গিয়েই টুপ করে বসে পড়ে কোনও সরু ডালে আর ধরতে গেলেই ফস করে ফসকে যায়: আশ্চর্য! কত কষ্ট স্বীকার করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে আর কাদায় কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে পাখি শিকারের তিক্ত অভিজ্ঞতা যার আছে সে এই খুদে পাখিটাকে বাগে পাবে না—এটা কেমন কথা হল!

দেখতে দেখতে পাখিটাকে ধরবার নেশায় আমার রোখ চেপে যায়। তখন আর ওর সৌন্দর্যের জন্য নয়, ওটা যেন 'অধরা' বলেই!

'নে, বন্দুকটা ধর।' রসময়ের হাতে বন্দুকটা ধরিয়ে দিয়ে বলি, 'দেখি—আর একবার চেষ্টা করে। দিস ইজ মাই লাস্ট চানস—লাস্ট ট্রাই।'

এই একটা মিথ্যে কথা দুম করে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে—'লাস্ট চানস।' এদিকে পাখিটা দিব্যি পাক দিয়ে দিয়ে এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে সেখান বনের ভেতর ভেতর হালকা কুয়াশাময় আলো-আঁধারিতে দুটো মানুষকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

দেখতে দেখতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে যায়, ঘণ্টা ছুঁই-ছুঁই, কোথায় কী! এখন লাস্ট ট্রাই মানেই লাক ট্রাই। প্রতিবারেই মনে হয়, দেখাই যাক না, আরও একবার! রসময়ও এক মুখ হাসি নিয়ে লালা ঝরিয়ে ধুঁকে ধুঁকে পোষা কুকুরের মত আমার পিছন পিছন ছুটে বেড়াতে লাগল।

বনের উত্তর দিকে অনেকখানি দূরে ঝিকমিক করছিল হঠাৎ বাঁক-নেওয়া নদীর জল আর বালুচর, তরাতরন্ত সকালের রোদে। সেখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে বনের ধার পর্যন্ত চলে এসেছে নদীর বহু কাল আগের পরিত্যক্ত একটি খাত, বা বিল, যেখানে এসে আমরা দাঁড়ালাম। বলা উচিত, পাখিটাই আমাদের সেখানে টেনে নিয়ে এল। গাছের ফাঁক দিয়ে এখান থেকে পশ্চিমে দূরের মাঠ ও এক-আধটা খোয়াই চোখে পড়ে। সেই দিক থেকে পাখিরা উড়ে আসছিল বিলের ধারে ঝাঁক বেঁধে, ঝংকার তুলে, পাখা ঝাপ্টিয়ে।

'পাকী! পাকী-ঈ!' রসময় চেঁচিয়ে ওঠে, 'অ-ই দ্যাখো বাবু, তথা তথা। বালি হাঁথ্! আ-রে-খালা, ক-তো!'

রসময়ের লালা ঝরছিল। বললাম, 'মুছে ফ্যাল।'

আমার কপালেও অল্প অল্প ঘাম জমেছিল। রুমালে মুছে, পুলওভার খুলে ওর হাতে দিলাম, তারপর বন্দুক তুলে তাগ্ করলাম। শিকারে বেরিয়েছি সেটা যেন প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এতক্ষণ!

টোটা ভরতি ছর্‌রা আছে তবু কারো-না-কারো ওপর নিশানা করতেই হয়। ফায়ার হলে একটা না একটা তো পড়বেই, তেমন যুতসই লেগে গেলে তার বেশীও—এই ভেবে, হাঁটু মুড়ে বসে নলের আগায় মাছিতে চোখ রেখে যেই ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়েছি অমনি বনের নির্জনতা ভেঙে খিল খিল করে হেসে উঠল কেউ, যেন পাখিটাই!

এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে বিলের ধারে পাখিগুলো সেই হাসি শুনতে পায়নি কিন্তু চমকে উঠি আমি; আমি ও রসময় দুজনেই, কারণ আমাদের কাছেই, বেশ কাছে। চমকে যেতে নিশানাও কেঁপে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারও হয়ে গেল দুম্ করে। গুলির আওয়াজ পেয়ে হুস হুস করে পাখা ঝটপটিয়ে নাগালের বাইরে উড়ে চলে গেল পাখিরা। বিলের নিস্তরঙ্গ জলের দিকে তাকিয়ে মেজাজ গেল খিঁচড়ে—কোথাও নেই এক ঝলক টাট্‌কা রক্ত না এক চিলতে খসা-পালক পাখিরা অনেক দূরে উড়ে গিয়ে আবার বসেছে, এখান থেকে বন্দুকের রেনজ-এর বাইরে। আমি থ' করে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি, রসময় তার আগেই।

আর কী আশ্চর্য, আমরা দুজনেই অবাক হয়ে দেখতে পেলাম সেই হলুদ পাখিটাকে আবার! ছোট্ট, চঞ্চল, মন-ভোলানো! উড়ে উড়ে, নেচে নেচে, চক্কর মারি-ছুঁড়ে-আসা কোনও বনস্পতির বিনম্র ডালে। এবং আরো দেখলাম, [illegible] ধরতে গিয়ে হালকা পায়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে একজন [illegible] মেয়ে। [illegible] পাকিস্টিকের বালা-পরা হাত দুটোকে কখনো ছাড়িয়ে দিচ্ছে সামনের দিকে, কখনো ডাইনে বাঁয়ে, কখনো বা মাথার ওপর আর খপ্ করে ধরতে গেলেই পাখিটা [illegible] উড়ে।

বেশ মজার খেলা। পাখিটাকে সে ছুটে ছুটে ধরতে যায়, ধরতে গিয়ে [illegible] উঠে যায় হাঁটুর কিনারায়, মাথার এক রাশ রুক্ষ চুলের বিনুনিটা ছটফট করে রাগী কেউটের মত। ছেঁড়া ফোঁড়া ঘাগরা তাতে কত রকমের তালি মারা, কত রকমের রঙ, তেলচিটে ময়লা না হলে বোধ হয় জলুসটা আরো বাড়ত। বুকের কাঁচুলিটা খাটো এবং আঁটো, হলুদে-কালোয় বুটিদার ছাপ মারা, চিতা বাঘের গায়ের মত। ওড়নাও আছে একটা, যা এখন কণ্ঠলগ্ন হয়ে পিঠের দু দিকে ছড়ানো।

মেয়েটা বোধ করি আমাদের দেখেনি অথবা দেখেও দেখেনি, পাখি নিয়েই ব্যস্ত। আমরা ওকে দেখছিলাম। এমন এক বাঁধন-ছেঁড়া রুক্ষ সৌন্দর্য ছিল ওর মধ্যে যা সহজেই চোখ টেনে নেয়। তা ছাড়া, আরও একটা কারণে কৌতূহল হচ্ছিল, যে-পাখিটাকে আমরা ধরতে পারিনি, ধরতে গিয়ে বোকার মত হয়রান হয়েছি অনেকক্ষণ ধরে, দেখাই যাক না—সেটাকে নিয়ে ও কী করে!

রসময়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, ওর কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। ইশারায় মুছে নিতে বলি।

রসময় মুছলো না, যতখানি পারল জিভ দিয়ে চেটে নিল, বাকিটুকু লেগে রইল। ঠিক সেই সময় খিল খিল করে আবার হেসে উঠল মেয়েটা, যেন রসময়ের কাণ্ড দেখেই, কিন্তু তা না, দেখি কি, গায়ের ওড়নাটা ফেলে দিয়েছে একটা ছোট্ট ঝোপের মাথায় আর তার নীচেই জালে আটকা-পড়া কই মাছের মত ছটফট করছে পাখিটা। আশ্চর্য, মেয়েটা ঠিক যাদু জানে, নইলে আমরাও তো পারতাম!

রসময় হাসছিল। হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে ওঠে আনন্দে। তাই শুনে মেয়েটা একবার ঘুরে তাকায় এদিকে। একটু মুচকে হেসে আবার পাখির দিকে মন দেয়। পাখিটাকে জব্দ করতে পারায় খুশী ওর চোখেমুখে।

এই ফাঁকে ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ পাই। ধূসর দো-আঁশলা মাটির মত গায়ের রঙ, টান টান চামড়া, সামান্য লম্বা ধাঁচের মুখ, পুরু ঠোঁট ঈষৎ চাপা নাক। নাকের একটি পাশ ছিদ্রিত কিন্তু খালি, নাকছাবি-টাবি ছিল হয়ত আগে, এখন নেই। দুই কানে বড় বড় গোল মাকড়ি, গলায় হাঁসুলির হার—বেদেদের মেয়েরা সাধারণত যা পরে, যে রকম হয় সেই রকমই, তার চেয়ে অন্য রকম কিছু না। যেটা লক্ষণীয় তা হল ওর চোখ দুটো। চেরা চেরা আর সরু, সুর্মা দিয়ে দীর্ঘ করে টানা এবং নাকের দু পাশ থেকে এমন কোণাকুণি ভাবে ওপরের দিকে উঠে গেছে যা সাধারণত প্রাচীন পটের ছবিতে দেখা যায় বা পাথরে খোদাই-করা পুরাকালের মূর্তিতে। আর, অস্বাভাবিক রকমের পিঙ্গল তার মণি জোড়া, চিতার কপিশ চোখের মত, বন্য আর অন্তর্ভেদী।

এর আগেও বেদেরা কয়েকবার এসেছে এ-অঞ্চলে। হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে, দু' চার দিন থাকে তারপর চলে যায়। যে-ক'দিন থাকে তুম্বুরি বাঁশি বাজিয়ে সাপ খেলিয়ে বাঁদর নাচিয়ে হাত-কি-সাফাই-এর খেল-টেল দেখিয়ে গাঁয়ের লোকেদের তাক লাগিয়ে দেয়; তারপর গলা-কাটা দামে জড়ি বুটি বিক্রী করে বেশ কিছু পয়সা কামিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। ওদের মেয়েগুলো ছলাকলা দেখাতে ওস্তাদ। রঙ-বেরঙের ঘাগরায় আর ওড়নায়, খাটো কাঁচুলির আদিম উদ্দামতায়, সুর্মা-দেওয়া কটা চোখের ঝিলিক-হানা নজরে দেখনেওয়ালাদের বুকের রক্ত তেজী ঘোড়ার মতন টগ্‌বগ্ করে। বাঁশি বাজে, ডুগডুগি বাজে, হাটে-বাজারে রীতিমত ভিড় জমে যায়। এই মেয়েটাও নিশ্চয় সেই দলের!

আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে ও। বুকের ওপর ওড়না টেনে দেয়। কপালের উড়ন্ত চুল সরাতে সরাতে পাখিটাকে নিয়ে উঠে আসে। বলে, 'বহোৎ নাদান চিড়িয়া হ্যায়, বাবু। ব-হোৎ তক্‌লিফ দিয়া—' ঝির ঝির করে হাসে।

আমাদেরও খুব ছুটিয়েছিল পাখিটা। সে-কথা ওকে বলতেই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানায়, সেটা ও জানে, খানিক আগে দেখেছে। কাঠ কুড়োতে কুড়োতে গাছ-পালার আড়াল থেকে লক্ষ করেছিল, তখন কিন্তু সাহস করে কাছে আসতে পারেনি যদি শব্দ পেয়ে পাখিটা উড়ে যায়, নইলে, তখনই ও ধরে ফেলতে পারত সেটাকে। বনের পাখি যাই যত সোজা, ধরা তত সহজ নয়, কায়দাকরণ জানা চাই। বলতে বলতে পাখিটাকে এগিয়ে দেয় আমার দিকে। আমি খুব অবাক হয়ে যাই। দোনোমনো করি নেব কি নেব না। এত কসরৎ করে পাখিটাকে ধরে শেষ পর্যন্ত কি না দান করে দেবে আমাকে! না কি, সুযোগ বুঝে দাম-টাম হেঁকে বসবে ইচ্ছে মতন?

রসময়ের তর সইছিল না। ঝটপট হাত বাড়িয়ে দেয়।

'যা ভাগ্। পাগলা কাঁহিকা!'

তাড়া খেয়ে রসময় হাত সরিয়ে নেয়।

'উঁহু নেহি সকেগা, তুম পকড়ো, বাবু!'

আমি একটু হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে।

'আরে-রে! পকড়ো না জলদি—বহোৎ কাম হ্যায় মেরা!'

বস্তুত, পাখিটার প্রতি আমার লোভ আছে ঠিকই, সেটা ও বুঝেছে কিন্তু ওর-ও যে পছাবার আগ্রহ কম নয় আমিও সেটা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং, খানিকটা নির্লিপ্তভাব দেখিয়ে একটা সিগারেট ধরাই যাতে ও আর বেশী বুঝতে না পারে [illegible]

...। মেয়েটা যেন অবাক হল। একটু থেমে থেকে হেসে বলল, 'কমসে কম তো দশ লাখ...উঁহু, আউর জ্যাদা। ...তুম্ দে নেহি সকোগে...পকড়ো—' বলে নিজের থেকেই আমার হাত টেনে নিয়ে পাখিটাকে গুঁজে দিল যত্ন করে। সদ্যফোটা এক গোছা হাজারি গাঁদার ফুলে যেন নতুন ডানা গজিয়েছে, ফুরফুর করে ওঠে মুঠোর ভেতরে। ভারি মুশকিলে পড়ে যাই, কি করে সামলাব ভেবে পাই না।

'আরে-রে! ঠিক্ সে ধরো, ঠিক্ সে ধরো—তব্ তো চিড়িয়া মান যায়েগী উর নেহি তো—'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় মেয়েটা। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনছিলাম, সেটা লক্ষ করেই কি না জানি না, দু মুহূর্তে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল চোখে চোখে, সেই চিতার চোখে; তারপর চোখ সরিয়ে নিয়েই দ্রুত হেঁটে চলে গেল বনের আড়ালে।

কয়েক পলকের ঘটনা। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। খানিকক্ষণ বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রসময়কে ডেকে বললাম, 'রসো, বাড়ি চ।'

এক এক সময় খুব পরিষ্কার আকাশেও চিরিক্ চিরিক্ করে আবছা মতন বিদ্যুৎ চমকে যায়। নিশ্চয় কোথাও মেঘ থাকে দূরের কোণে-টোনে কিন্তু কিছুতেই তাকে আর দেখা যায় না। আমারও কতকটা সেই রকম হচ্ছিল, থেকে-থেকেই বুকের মধ্যে বিজলী, কিন্তু কেন যে...!

এতদিন জঙ্গল থেকে পাখি মেরেই এনেছি, পুষব বলে জীবন্ত ধরে আনি নি, এই প্রথম। তা যে এত কষ্টদায়ক বোঝা হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।

খাঁচা ছিল না। সারা রাত ধরে তারের ঢাক্‌নার তলে ছটফট করেছে পাখিটা। ঘুমোতে দেয়নি। ঘুমোতে পারিওনি। কী জানি কি হয়, কোনওভাবে ফাঁক পেয়ে যদি উড়ে যায় অথবা বেড়ালে এসে আক্রমণ করে...একে রাখাও জ্বালা আবার না-রাখাও দুঃখের।

পরদিন সকালে উঠে তাই আমার প্রথম কাজ ছিল রসময়কে দিয়ে একটা খাঁচা কিনতে পাঠানো। অন্য সময় হলে কাজটা আমি নিজেই করতাম, রসময় ঠিক মত পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু আমার তখন বনের ধারে মন টানছিল...

বিলের জলে অসংখ্য পাখি এসেছে, আজও। এখন মরসুম! পাখিরা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে, বসছে, সাঁতরাচ্ছে। ডানা কাঁপিয়ে জল ছিটোচ্ছে। অন্য দিন হলে এই দৃশ্যই আমার কাছে লোভনীয় ঠেকত। আজ ঠেকল না। সঙ্গে বন্দুক আনি নি, শিকারীর ধরাচুড়োও বেঁধে আসিনি। আসলে, আজ আমার শিকারে মন ছিল না। এক এক সময় এই রকম হয়, পুরোনো অভ্যস্ত কাজগুলো অর্থহীন, বিস্বাদ লাগে। অথচ, কী যে ভাল লাগে, জানি না।

জঙ্গলের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় অনেক দূরে এসে এক জায়গায় একটা বড় গাছের নীচে কতকগুলো ছন্নছাড়া দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। দৃশ্যটা ছিল কতকটা শ্মশানের দৃশ্যের মত। এখানে সেখানে ছড়িয়ে-থাকা গুটি কতক কালিঝুলি মাখা পোড়া ইট, কিছু আধ-পোড়া কাঠ খড়, আগুনে ঝলসানো পশু পাখির হাড়গোড়ের টুকরো টাকরা আর স্তূপীকৃত ভাঙা মাটির হাঁড়ির খোলামকুচি। বাতাসে অতি ক্ষীণ আঁশটে দুর্গন্ধ ভাসছিল। কেউ কোথাও ছিল না। একটা শকুনও না। চারিধার ফাঁকা আর অসম্ভব নিরালা নির্জন লাগছিল। সারা বন জুড়ে কেবল গাছের ডালে-পাতায় একটানা শব্দ উঠছিল ঝির ঝির, ঝির ঝির করে।

এখানে বনভূমি তেমন ঘন নেই আর। বন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছাড়া ছাড়া গাছপালা। খানিক দূরে টানা লম্বা জাতীয় সড়ক আর সড়কের দু ধারে কালচে-সবুজ বাড়ন্ত অড়হরের ক্ষেত। মাথার ওপর ফিরোজা রঙের টান-টান অফুরন্ত আকাশ। এখান থেকেও বিলের একাংশ দেখা যায়, দূরে, চড়া-বেলার রোদ পড়ে চিক্ চিক্ করছিল জল।

পরে, সড়কের রাস্তা ধরে ফিরে আসতে আসতে কতকগুলো অসংলগ্ন চিন্তা আমাকে তাড়িত করেছিল...

যাযাবর বেদেরা এই রকম, কখন আসে কখন চলে যায় কেউ জানতে পারে না...তাদের সব কিছুই খুব গভীর রহস্যে ঘেরা, প্রচ্ছন্ন। সহজ সত্য বলে কিছু নেই সেখানে। এমন কি, একশো ভাগ সত্যি বলে তারা যা গছিয়ে দেয় পরে দেখা যায় তার সবটাই ফাঁকি, অথচ দেবার সময় সেটা কিছুতেই ধরা যায় না, এমন চমক লাগায়।...আমি ভাবছিলাম, আমার এই পাখিটা তা হলে কী! সেখানে তো কোন রকম ভেলকি দেখানোর অবকাশ ছিল না, জল-জীয়ন্ত একটা বনের পাখি ধরে দিয়ে গেছে মেয়েটা। যার দাম 'দশ লাখ' কি তারও চেয়ে বেশী, কিংবা, যার কোন দাম হয় না! এবং, যাকে পাওয়ার পর থেকে একটা ক্ষীণ সংশয়ের কাঁটা ক্রমাগত ফুটেই যাচ্ছে মনের মধ্যে যার সঙ্গে আশ্চর্য এক স্মৃতি বিজড়িত...তা সুখের না দুঃখের, মধুর না যন্ত্রণার জানি না...কারণ তা প্রচ্ছন্ন, মোহের আবরণে ঢাকা।

এই আবরণ খুলে দিতে পারত যে, আমি তাকেই খুঁজছিলাম। কিন্তু সে চলে গেছে। এখন পাখিটা আমার কাছে একটি সংশয়ের প্রতীক মাত্র, বাহ্যত যাকে সত্য বলে মনে হলেও আসলে সে যাদুরই পাখি!

রসময় গিয়েছিল খাঁচা কিনতে। এখনো ফেরেনি। কি জানি কী করছে রসময়। হয়ত আর-খানিকটা বাদে খাঁচা নিয়ে ফিরে এসে দেখবে যে, তার আর কোন প্রয়োজন নেই, পাখিটাকে আমি উড়িয়ে দিয়েছি।

রসময়কে কী করে বোঝাব যে, অযথা সংশয় পুষে রেখে কোনও লাভ নেই। খাঁচায় বন্ধ করে দিলে সেটা তো পাখি নয়, উড়ে গেলেই পাখি।

ঘরে এসে তারের ঢাকনা তুলে তাই সেটাকে উড়িয়ে দিলাম।

দেখতে দেখতে যাদুর-পাখিটা সত্যিকারের পাখি হয়ে উড়ে গেল...

ছবি অনুপ রায়

প্রত্যেক শীতেই কি আপনি খসখসে গা-হাত-পা আর ঠোঁট ফাটার কষ্টে ভুগবেন ?

আপনার ত্বককে রক্ষা করার উপায় চারটি !
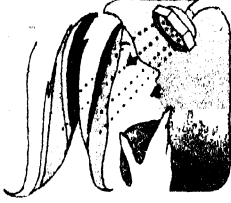
১ শীতের দিনে খুব গরম জলে স্নান করলে কিন্তু আপনার ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট হবে আর ত্বক হয়ে উঠবে রুক্ষ, শুকনো ও খসখসে। ঠাণ্ডা জল যদি সহ্য না হয় তাহ'লে সামান্য গরম জল মিশিয়ে স্নান করতে পারেন।

২ যদি আপনি গায়ে তেল মাখার সময় না পান তাহ'লে একটি চটপট সহজ উপায় নিন। স্নানের পর কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল এক মগ গরম জলে মিশিয়ে গায়ে ঢালুন। তারপর তোয়ালে দিয়ে আলতো করে জল মুছে নিন, ব্যস্।

৩ সাধারণত শীতের দিনে গায়ে ভীষণ ময়লা জমে। তার উপর ফাটা ত্বকে ধূলো-ময়লা পড়লে তো মারাত্মক ব্যাপার! এর জন্য ঘরোয়া উপায় আছে। যেমন, দুধে একটু ময়দা মিশিয়ে লেই তৈরী করে ত্বকে ঘষতে পারেন। দেখবেন, ময়লা বেরিয়ে গিয়ে আপনার ত্বক ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

৪ শীতকালে বোরোলীন অপরিহার্য। এই রেশম-কোমল ক্রীম সারা শরীরে যেমন, মুখে, ঠোঁটে, গলায়, হাতে, কনুইয়ে, কোমরে বা পায়ে লাগান। ত্বক ফেটে যাওয়া, র‍্যাশ ওঠা থেকে রক্ষা করে বোরোলীন। তাছাড়া অল্প কেটে বা ছড়ে গেলে বোরোলীন অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে এবং ফাটা ত্বককে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

আপনার ত্বকের সুরক্ষার জন্য সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

BOROLINE
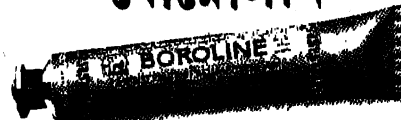
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
বোরোলীন হাউস কলকাতা ৭০০০০৩

GD 9910

দুর্গাদাস ভট্ট

কিছুদিন আমাকে যেন খোঁজার নেশায় পেয়েছিলো। সামান্য একটু সূত্র থেকেই আবিষ্কার করলাম এক অপূর্ব সম্পর্ক—দুই লেখিকার—অনুরূপা আর নিরুপমার। সাহিত্যে এ এক আশ্চর্য সখিত্ব। দুটো গাছই পাশাপাশি বেড়েছে একসময়, কিন্তু কেউ কারো পথ জুড়ে দাঁড়ায় নি।

আমাদের বহরমপুরের উকিলপাড়ার বাড়ির (১০২নং নিরুপমা দেবী রোড) দোতলায় বিস্তৃত ঢাকা বারান্দায় পুরোনো বইয়ের র‍্যাক থেকে ক্রমাগত প্রাচীন পত্রিকাগুলি হাতে নিচ্ছি এবং পাশের একটা উঁচু জায়গায় রাখছি, ধুলো উড়ছে, এই সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা, পুরোনো 'বিচিত্রা', 'সবুজপত্র', 'যমুনা', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', সরলা দেবী সম্পাদিত ক্রাউন সাইজের 'ভারতী' পত্রিকা। তখনকার দিনেও সুদূর বারাণসী থেকে 'উত্তরা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। এমনি করে ভিতরে আরো ভিতরে —'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'কোচবিহার দর্পন', 'উপাসনা'। ক্রমাগত দেখছি আর ভাবছি—এর অধিকাংশই এখন নেই; কিন্তু কারা আছে? ভাবতে ভাবতেই রেক্সিনে বাঁধানো ক্রাউন সাইজের একটি বই পত্র-পত্রিকার ফাঁক থেকে হাতে জুলো। এটি উপন্যাস, নাম 'উচ্ছৃঙ্খল', প্রকাশকাল ৫ই আশ্বিন ১৩২৬, লেখিকা নিরুপমা দেবী। আমি জানতাম এটি আমার পিসীমা নিরুপমা দেবীর লেখা প্রথম উপন্যাস। কিন্তু নিজে আমি ইতিপূর্বে কোনও দিনই চোখে দেখিনি। তখনো পর্যন্ত কাউকে ওই বইটির বিষয়ে আলোচনা করতেও শুনিনি। মলাট উলটানোর পর উৎসর্গপত্রে এসে আমার চোখ একটি জায়গায় স্থির হয়ে গেলো। পিসীমা বইটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর পরম প্রিয় 'গঙ্গাজল' অর্থাৎ খ্যাতনাম্মী লেখিকা অনুরূপা দেবীকে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—শতছিন্ন কীট-দীর্ণ খাতা হইতে কতকাল পরে এ গল্পের উদ্ধার, তুমিই তাহা ভালো জানো। সে হিসাবে ইহার নাম অষ্টাদশী রাখাই উচিত ছিলো। ইহার অধ্যায়ও অষ্টাদশ, ইহার উদ্ধারও অষ্টাদশ বৎসর পরে এবং আরো একটি কথা তোমার জানা আছে, তোমার বন্ধুর এই প্রথম লেখা উপন্যাসটি ত কত না ত্রুটিতে ভরা। জন্মাষ্টমী ১৩২৬।

মনে রাখা প্রয়োজন, নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২রা আগস্ট, ১৯১৩ সালে। 'দিদি' উপন্যাস ২৫ এপ্রিল ১৯১৫ সাল (যদিও এর পূর্বেই উপন্যাসটি প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।) ইতিমধ্যেই সাহিত্যসম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর 'মা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিতা করেছিল।

অনুরূপা দেবী

কিন্তু তিনি যে তাঁর পরম প্রিয় গঙ্গাজলের কথা সব সময়েই মনে রেখেছিলেন, শুধু মনেই রাখেননি, নিরুপমার কীটদীর্ণ প্রাচীন খাতা থেকে উদ্ধার করে প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এর দাম যে কত আজকের যুগের দাঁড়িপাল্লায় কোনও উত্তরই হয়ত সেখানে মিলবে না।

উৎসর্গপত্রটি পড়ার পরই আমি বইখানা হাতে করে আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে চলে এসেছিলাম। আমার পিতা বিভূতিভূষণ ভট্ট সকাল দশটার ট্রেনে আসা সেদিনের খবরের কাগজটির ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন। দেওয়াল সংলগ্ন র‍্যাকে ঠাসা বই। ঘরের বাঁদিক ঘেঁষা একটা চৌকিতে সব সময়েই একটা বিছানা পাতা থাকত। তার ওপরেই পা গুটিয়ে বসে খবরের কাগজটা চোখের ওপর তুলে ধরেছিলেন। আমাকে ওই অবস্থায় আসতে দেখে মুখ না তুলেই বললেন— "কি রে?" উত্তরে আমি কথা না বলে বইখানা তাঁর সামনে ধরেছিলাম। বইটির মলাটের ওপর চোখ রাখার পরই, আমি লক্ষ করলাম, ওঁর চোখ দুটো কেমন যেন হয়ে গেল। মলাট না উলটেই তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। অপর হাতে যে গড়গড়ার নল রয়েছে এটাও বোধহয় ভুলে গিয়েছেন। আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পারলাম—তাঁরও সেই বাল্যস্মৃতির দিনগুলির কথা মনে পড়েছে, যেদিনের অনেকেই আজ আর নেই। ভাগলপুরে আছে, সেই বাঙালীটোলার আমগাছঘেরা বাড়িটি হয়ত আছে, যমুনীয়া নদীও আছে। নেই শরৎচন্দ্র, রাজেন মজুমদার, গিরীন, সুরেন, উপেন, নিরুপমা, আর নেই তাঁদের সেই চাঞ্চল্যময় বয়ঃসন্ধি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমার বাবা বললেন, "জানিস বুড়ির (নিরুপমার) এই উপন্যাসটার একটা ইতিহাস আছে।" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলাম—"জানি, উৎসর্গপত্রে সেই কথা লেখাও আছে।"

"লেখা হয়ত কিছুটা আছে, কিন্তু সবটা নেই।"

আমার চোখেমুখে কৌতূহল উপচে উঠতে দেখে তিনি আবার বললেন— "বুড়ি এই গল্পটা অনুরূপা আর তার দিদি সুরূপার (স্পর্শমণির লেখিকা ইন্দিরা দেবী) উৎসাহেই প্রথম লেখে।"

"ওদের সঙ্গে পিসীমার খুব বন্ধুত্ব ছিল?"

নিরুপমা দেবী

কি কারণ জানি না, বিশেষ করে বুড়ির সঙ্গে অনুরূপার সম্পর্কটা যে কি
রূপ ছিলো সেটা তোদের বুঝিয়ে বলা শক্ত।"

"আসলে ওঁরা দুজনেই সমসাময়িক লেখিকা ছিলেন। সেই জন্যই হয়ত..."

"তাই বা বলি কি করে, আমিও তো তখন নিয়মিতই লিখতাম। কিন্তু কই?
আমার সব কথা তো শুনতো না! তাহলে একটা গল্প বলি শোন—

"বাবা তখন চুঁচড়ো থেকে ভাগলপুরে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে
রাও ভাগলপুরের বাঙালীটোলার একটা আমগাছ ঘেরা বাড়িতে চলে এলাম।
রমপুরের এই বাড়িটার তখন সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এর কিছুদিন
ই বুড়ি বিধবা হ'ল। ওকে প্রথমে বহরমপুরে তারপর ভাগলপুরে আনা
। ভাগলপুরে আসার পর বুড়ি প্রথম ক'দিন কারও সঙ্গে কথাই বলল
। অমন হাসিখুশী মেয়েটা কোণের ঘরে চুপ করে বসে থাকে। মা গিয়ে ওই
ই ওর খাবার দিয়ে আসেন। আমাকে বলেন—'তুই একবার অন্তত যা, কথা
।' আমার হৃৎকম্প শুরু হ'ত। এই বয়সে বুড়ির বৈধব্যবেশ দেখতে
হ—এটা ভাবতেই আমার মাথা ঘুরতো। কি করে তার সামনে দাঁড়াবো, কথা
বো ভাবতে ভাবতে আমি অস্থির হয়ে পড়তাম।

"এর কয়েকদিনের মধ্যেই চুঁচড়ো থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে নিরুপমার নামে
কটা প্যাকেট এলো। ওটা পাঠিয়েছে অনুরূপা। অনুরূপার সঙ্গে নিরুপমার
গেই আলাপ হয়েছিল। বাবা নফরচন্দ্র ভট্ট হুগলীতে সাবজজ হিসেবে
ছুদিন কাজ করেছিলেন। সেইখানেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে
মাদের আলাপ হয়। অনুরূপা নিরুপমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এত বেশী হয় যে
চড়োর গঙ্গার দাঁড়িয়ে ওরা গঙ্গাজল পাতায়। সে যাই হোক, প্যাকেটটা হাতে
ওয়ার কিছু পরেই বুড়িই এসে আমার সঙ্গে কথা বলল। ও বলল—দেখলে
টদা গঙ্গাজল কি লিখেছে?

—কি লিখেছে তোর গঙ্গাজল?

—যত সব তর্কের কথা। বিধবা হ'লেই যে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল এ কথাটা
ঠিক নয় সেই কথাই লিখেছে।

—বটেই তো। মানুষের জীবন কি দুটো একটা ঘটনার ওপর নির্ভর করে?

—সেই সঙ্গে গঙ্গাজল দ্বিজু রায়ের একটা কবিতাও পাঠিয়েছে। আমি
কবিতাতেই ওই কবিতার জবাব দেবো।

আমিও মহা উৎসাহে ওই প্রসঙ্গটার ওপর জোর দিয়েছিলাম। সাহিত্য
এসে সাময়িকভাবে ওর এতবড় দুঃখটাকে ভুলিয়ে দেয়। ও কি লেখে জানিস?
এই দ্যাখ্।" বলেই বিভূতিভূষণ একটা ফাইল খুলে সযত্নে একটি কাগজ
বাড়িয়ে দেন। তাতে নিরুপমার স্বহস্তে লেখা একটি কবিতা রয়েছে। আমি
পড়তে থাকি—

চাঁদের শোভা, জ্যোৎস্নারাতি
কৃষ্ণবাসা হীরার পাঁতি
বিভূষিতা মধুরগন্ধা নিশা,
ভোরের আলো তরুণ রবি
নিমেষমাঝে নতুন ছবি
ভাবীর চিত্ত হারায় চাহে দিশা।
এ কার সৃষ্টি? ভুবনমাঝে
দুখের পাশে মধুর সাজে
কে দিয়েছে হেথায় এমন সুখ,
জন্ম যে দেয় মৃত্যু দেবে
কাজ কি তবে এত ভেবে
সুখের সাথে মাথায় তোল দুখ।

অনুরূপা দেবীর সঙ্গে আমার নতুন করে দেখা হয় আরো অনেক পরে।
তখন আমি কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে আছি। পিসীমা নিরুপমা দেবী
লোকান্তরিতা হয়েছেন তার বেশ ক'বছর আগে (১৯৫১)। যখনই কোনও কাজে
উত্তর কলকাতায় আসতাম ইচ্ছা করত পিসীমার সেই গঙ্গাজলকে দেখে আসি।
কৈশোরের কথা মনে পড়ত। তখন পিসীমা কলকাতায় এলে সাধারণত কোন
আত্মীয়ের বাড়িতে উঠতেন না। উঠতেন অনুরূপা দেবীর বাড়িতে। অনুরূপাও
কলকাতার বাইরে যাওয়া মনস্থ করলে একবার বহরমপুর না ঘুরে আসতেন না।
কিন্তু একটা কথা আমি আজো বুঝতে পারিনি। নিরুপমা যেদিন থেকে
বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন সেদিন থেকে অনুরূপার সঙ্গে
যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এল কি করে? অবশ্য নিরুপমা তাঁর দেশে ফিরলে দেখা
হত না এমন নয়। কিন্তু সেটা কদাচিৎ। হয়ত এমনও হতে পারে নিরুপমার
লেখালেখির জগৎ থেকে দূরে চলে যাওয়াটা অনুরূপা পছন্দ করেন নি।

তবু একদিন সাহসে ভর করে আমি অনুরূপা দেবীর উত্তর কলকাতার
বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সেটা ছিল একটা মেঘলা দিন। মাঝে মধ্যেই
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার পরিচয় দেওয়া মাত্রই একজন প্রসন্নদর্শন
ভদ্রলোক স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অনুরূপা দেবীর সামনে হাজির
করেছিলেন। আমি মাথা নুইয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। যাঁর কথা এত
শুনেছি, যাঁর লেখা এত পড়েছি, দশ-বারো বছর বয়সে যাঁকে অনেকবার দেখেছি
এইসবে মিলে সেদিনের ধারণার সঙ্গে এক করে মেলানোর যখন চেষ্টা করছি
তখন প্রশ্ন এল, 'বল দেখি এটি কে?'

অনুরূপা দেবী আমার চিবুক ধরে আলোর সামনে রেখে বললেন, 'চিনতে
পারলাম না তো!'

'তোমার পুঁটুরানীর (বিভূতিভূষণ ভট্ট) ছোট ছেলে, গঙ্গাজলের ভাইপো।'

'অ্যাঁ...!'

বহরমপুরের বালিকা গোরাবাজারস্থিত শিল্প মন্দির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
সভায় সভানেত্রী অনুরূপা দেবী ও প্রধান অতিথি নিরুপমা দেবী। সন ১৯৩৯।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল সারা বাড়িতে লোডশেডিং হল। যদিও
তখন লোডশেডিং কথাটা আমাদের জানা ছিল না। ঘরের আলো তেমনিই
জ্বলছিল। অনুরূপা দেবী ধপ্ করে ততক্ষণে বিছানায় বসে পড়েছেন। কি
বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কিংবা এত কথা বলার আছে যে কোনটা আগে
বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তারপর কোনও রকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোকে
তোকে কি আগে কোনদিন দেখেছি?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'দেখেছেন। আপনি বহরমপুরে গিয়ে বাতাবী
লেবু খেতে চেয়েছিলেন আমি গিয়ে পেড়ে এনে দিয়েছিলাম।'

'ঠিক ঠিক, কিন্তু তুই তো তখন আরো ফরসা ছিলি, আর বেশ মোটাসোটা।'

'তখন তো আমি মা-বাবার কাছে থাকতাম।'

'ওঃ। এখন কোথায় থাকিস?'

'একটা মেসে।'

'ওরা কি খেতে দেয়?'

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাকে কি কি খেতে দেয়, তাঁর ফিরিস্তি দিতে
হল। এর ভেতর কত যে খাবার, শরবত ইত্যাদি এল সে সব এখন ঠিকমত মনে
পড়ছে না।

শুধু চলে আসার সময় উনি বললেন, 'আমিও একবার তোদের ওই বৃন্দাবনের
পুরোনো শহরের গোবিন্দকুঞ্জে যাবো। গঙ্গাজল আমাদের সবাইকে ছেড়ে কি
নিয়ে ছিলো, সেটা এখনো আমার দেখতে ইচ্ছে করে।'

ঠিক সেই দিনই মেসে ফিরে ১৩৫৭ সালের পৌষ সংখ্যা কথা সাহিত্যে
নিরুপমা দেবীর লোকান্তর প্রসঙ্গে অনুরূপা দেবীর লেখা প্রবন্ধটি আবার
পড়লাম। ওটার একটা জায়গা বার বার পড়তে ইচ্ছে করল—যেখানে দীর্ঘ বিরহের
পর দুই প্রিয় বান্ধবীর পুনর্মিলন হচ্ছে। যখন নিরুপমা দেবীর পিতা নফরচন্দ্র
ভট্ট ভাগলপুরের সাবজজ। এবং অনুরূপা দেবীর পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
তখন সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

অনুরূপা দেবীর ফটো শ্রীগোপীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে।

শিল্পী ক্রিকেটার আসিফ ইকবাল

ভারত ও পাকিস্তান—দুই দেশের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন তিনজন—আব্দুল হাফিজ কারদার, গুল মহম্মদ ও আমীর ইলাহি। আসিফ ইকবালও হয়তো খেলতেন, যদি ভারতে টেস্ট অভিষেকের পর পাকিস্তানে পাড়ি দিতেন। কারণ আসিফের মত ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার ভারতে প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করে নিতেনই। পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধাও ছিল প্রচুর।

অনেকেই হয়তো জানেন না, আসিফ ইকবাল হচ্ছেন বিখ্যাত বোলার এবং এখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক গোলাম আমেদের ভ্রাতুষ্পুত্র। হায়দরাবাদ ঘরানার ক্রিকেটার। ভারতের জাতীয় ক্রিকেট রঞ্জি প্রতিযোগিতায় খেলেছেন হায়দরাবাদের পক্ষে। ১৯৬০—৬১ মরসুমে পাকিস্তান যখন শেষবার ভারত সফর করে তখনই হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ১৮ বছরের ছেলেটির বোলিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন পাকিস্তান দলের ম্যানেজার ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, এক সময় যিনি ছিলেন ভারতের চৌকস টেস্ট ক্রিকেটার। অধিনায়ক ফজল মামুদেরও নজর পড়েছিল আসিফের উপর। আসিফ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছিল দক্ষিণাঞ্চল দলে। কানে কানে কিছু কথা হয়েছিল কিনা কেউ জানে না। তার কিছু পরে ক্রিকেটার কাকা গোলাম আমেদের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে আসিফ চলে যায় পাকিস্তানে।

অফ্ স্পিনার কাকার কাছে ক্রিকেটের হাতে খড়ি হলেও আসিফ বল করত জোরের উপর। মিডিয়াম পেসার হিসাবেই নাম করেছিল। পাকিস্তানে গিয়ে দেখল সেখানকার পিচ তার ব্যাটের পক্ষেও বেশ উপযোগী। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আসিফ হয়ে উঠল নতুন বলের বোলার এবং পাঁচ-ছয় নম্বর ব্যাটসম্যান। ফিল্ডিং আগেও ভাল করত, এখন হয়ে উঠল দুর্দান্ত ফিল্ডার। ১৯৬৩-তে পাকিস্তান ঈগলের দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় হয়ে আসিফ গেল ইংল্যান্ড সফরে। সফরে সবচেয়ে বেশী উইকেট পেয়েছিল ইন্তিখাব আলম এবং আসিফ ইকবাল। ১৯টি করে। কিন্তু ইন্তিখাবের গড় ছিল ২৩.১৫, আসিফের ১৪.৭৩। কেন্ট কাউন্টির বিরুদ্ধে ঈগলেটস জিতেছিল ইনিংসে। ওই খেলায় আসিফ ৭৪ রানে নট আউট ছিল এবং ২১ রানে পেয়েছিল ৪টি উইকেট। কেন্ট কাউন্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিউক অফ কেন্টের কানেও নাকি আসিফের প্রশংসা পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গেও কানাকানি তখনই হয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে আসিফ যোগ দেয় কেন্ট দলে। ওই সফরেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে পেয়েছিল ৪৫ রানে ৬টি উইকেট।

আসিফের প্রথম টেস্ট আবির্ভাব ১৯৬৪-৬৫ মরসুমে করাচিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। মহিদ খাঁর সঙ্গে সূচনাকারী বোলার হিসাবে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের যথেষ্ট সম্ভ্রম আদায় করেন। ইনিংসের শেষ দিকে ব্যাট করতে নেমে দুই ইনিংসে করেন ৩৬ ও ৪১ রান। দেখা যায় বোলার আসিফের চেয়ে ব্যাটসম্যান আসিফ অনেক প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক। এর পর ব্যাটিংয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ায় বোলিংয়ের ধার কিছু কমে যায়। হাঁটু এবং পিঠের ব্যথাও বলের প্রতি আসিফকে বিমুখ করে তোলে। ফলে আস্তে আস্তে হয়ে ওঠেন মুখ্যত ব্যাটসম্যান।

৪৫টি টেস্টে অনেক বড় ইনিংস খেলেছেন আসিফ। ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আছে ৮টি রাজসিক টেস্ট সেঞ্চুরি। কিন্তু স্বল্পপরিসরে, বিশ-তিরিশ-চল্লিশ রানের মধ্যেও দর্শকদের সৌন্দর্যসত্তা আলোড়িত করে তোলেন। বল কাট করেন দক্ষ সার্জেনের সূক্ষ্মতায়। ড্রাইভে তোলেন সৌন্দর্যের শিহরন, পুলে থাকে প্রচণ্ড শক্তি এবং ফুটওয়ার্কে নৃত্যছন্দ। ব্যাটিংকে যাঁরা শিল্পের মহিমায় উত্তীর্ণ করেছেন আসিফ ইকবাল তাদেরই একজন। [illegible] সৌন্দর্যময়, পরিস্থিতিতে সদা চঞ্চল। বোলারকে সংহার করার জন্য ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যান কেতাবী খেলার শাসন উপেক্ষা করে। সে খেলা মুহূর্তের জন্য দেখারও সুখ আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেখলেও দেখার পিপাসা মেটে না, দেখার পর হয়ে থাকে স্মৃতির সম্পদ।

বিপর্যয়ের মধ্যে বিক্রম দেখাবার ব্যাপারে আসিফের জুড়ি কম। টেস্ট খেলায় অনেকবার দেখিয়েছেন। টেস্টের বাইরে একটি খেলার কথা বলা যাক। ১৯৭১ সালে লর্ডসে গিলেট কাপের ফাইনালের কথা।

জ্যাক বন্ড-এর ল্যাংকাশায়ার কাউন্টি ৬০ ওভারে করল ৭ উইকেটে ২২৪ রান। ৬৮ রানের মধ্যে কেন্টের ৪টি উইকেট পড়ে গেল। আসিফ খেলতে এলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাট, ড্রাইভ, হুক, পুল করে সংগ্রহ করলেন ৮৬ রান। তারপর আউট হলেন এমন একটি ক্যাচে যে ক্যাচ দেখা যায় কালেভদ্রে।

কেন্ট ওই ফাইনালে হেরে গেল কিন্তু লর্ডসের

দর্শকরা ক্রিকেটের শিল্পমুখ উপভোগ করলেন আসিফের ব্যাটিংয়ের মধ্যে।

তার আগে ৬৭-তে ওভাল টেস্টের দর্শকদের পাগল করে তুলেছিলেন এক অসাধারণ ইনিংস খেলে। পাকিস্তানের পরাজয় অবধারিত। ম্যাচ বাঁচাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টি উইকেট পড়ে গেছে মাত্র ৫৩ রানের মধ্যে। আশঙ্কা করা হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানকে তার সর্বনিম্ন ইনিংসের লজ্জা স্বীকার করতে হবে এবং পরাজয় ঘটবে ইনিংসে। কারণ তখনও ইনিংস পরাজয় এড়াতে ১৬৭ রানের দরকার। ৯ নম্বর ব্যাটসম্যান আসিফ এলেন ব্যাট করতে। ৬৫ রানের মাথায় অষ্টম উইকেটও পড়ে গেল। ইংলন্ড ইনিংসে জয়ের মুহূর্ত গুনছে। তখন আসিফের সঙ্গে যোগ দিলেন অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম। তারপর সানাইয়ের পোঁ ধরার মত ইন্তিখাব শুধু একদিকের উইকেটে ব্যাট পেতে রেখেছিলেন, অন্যদিকে ব্যাটে-বলে সঙ্গীতের সুর তুলে ওভালকে সম্মোহিত করে রেখেছিলেন আসিফ ইকবাল। অত্যন্ত দক্ষ একজন ব্যাটসম্যান পাড়ার ক্রিকেটে যেভাবে পাড়ার ছেলেদের সোজা যা বল সংহার করেন সেইভাবেই আসিফ সংহার করেছিলেন হিগস, আর্নল্ড ও ডলিভেরার বল। যখন আউট হলেন নামের পাশে তখন ১৪৬ রান এবং নবম উইকেটে ১৯০ রানের নতুন বিশ্ব রেকর্ড। আসিফের ব্যক্তিগত ১৪৬ রানও ৯ নম্বর ব্যাটসম্যানের বিশ্ব রেকর্ড। ইংলন্ডের জয় অবশ্য আটকে থাকেনি কিন্তু ইংলন্ডের জয়ের খবরে সংবাদপত্রগুলি যতখানি জায়গা দিয়েছিল তার দ্বিগুণ জায়গা জুড়ে করেছিল আসিফের ক্লাসিক ইনিংসের প্রশস্তি। তারপরই ব্যাটিং অর্ডারে আসিফ অনেক উপরে উঠে আসেন। সাধারণত চার নম্বরে। এখন অবশ্য নামেন ৬ নম্বরে, মজিদ, সাদিক, জাহির হারুন ও মুস্তাকের পরে।

সম্ভবত কারণেই ১৯৭৫-এ প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আসিফ ইকবাল পাকিস্তানের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু খেলেননি শারীরিক অসুস্থতার কারণে। কেউ কেউ বলেন, পাকিস্তানের তৎকালীন ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ড প্রেসিডেন্ট আব্দুল হাফিজ কারদারের সঙ্গে মতবিরোধই অধিনায়কের পদ থেকে সরে যাওয়া এবং না খেলার কারণ।

১৯৭৬-৭৭ মরসুমে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও তাকে অধিনায়ক করা হয়নি। কিন্তু লাহোরে প্রথম টেস্টে তিনি যে ইনিংস খেলেন এবং একদিনেই জাভেদ মিয়াঁদাদকে বিশ্ববিখ্যাত করে দেন তার তুলনা খুব বেশী নেই। মিয়াঁদাদ অবশ্যই অসাধারণ ব্যাটসম্যান। তবে জীবনের প্রথম টেস্টে তার ১৬৩ রান করার মূলে আসিফের অবদান ছিল অনেকখানি। মাত্র ৫৫ রানের মধ্যে পাকিস্তানের ৪টি উইকেট পড়ে গিয়েছিল। আসিফ খেলতে নেমে মিয়াঁদাদকে আগলাতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝেই উপদেশ দেন, কার বল কীভাবে প্লেট করতে হবে। আসিফ নিজে করেন ১৬৬, মিয়াঁদাদ ১৬৩—দুজনে একত্রে ২৮১—পঞ্চম উইকেটে যে কোন দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নতুন রেকর্ড।

৭৬-এ অস্ট্রেলিয়া সফরে এডিলেড টেস্টে পাকিস্তান পরাজয় থেকে অব্যাহতি পায় দ্বিতীয় ইনিংসে আসিফের অপরাজিত ১৫২ রানের ফলে এবং মেলবোর্ন টেস্টে পাকিস্তান ৮ উইকেটে বিজয়ী হয় মুখ্যত আসিফের ১২০ রানের সুবাদে। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট জয়। তিনটি টেস্টের পাঁচ ইনিংসে করেন ৩১৩ রান। ৭৮.২৫ গড়ে ব্যাটিং তালিকায় শীর্ষস্থান। ৭৭-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজে অবশ্য আসিফ তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেননি। তবু কিংসটনে শেষ টেস্টে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন ১৩৫ রানের এক উপভোগ্য ইনিংস। এখন ৪৫ টেস্টের ৭৭ ইনিংসে তার মোট রান ২৭৪৮। গড় ৩৭.৬৪। ৮টি সেঞ্চুরির কথা আগেই লিখেছি। উইকেট ৫০টি, গড় ২৮.০৪।

ব্যাটিং সম্পর্কে ৩৫ বছর বয়সী আসিফ ইকবালের দার্শনিক মতবাদ : ব্যাট হচ্ছে ব্যাটসম্যানের হাতের যন্ত্র। বলকে আঘাত করার জন্যই সে যন্ত্র। এবং দর্শকরা যা উপভোগ করার জন্য মাঠে আসেন তা উপভোগ করতে দেবার জন্যই সে অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত। কী হবে অ্যাভারেজের দিকে লক্ষ রেখে ব্যাট করে? তাতে কি দর্শকরা আনন্দ পাবে? না, নিজের আনন্দ হবে?

মেদবিহীন দীর্ঘকায় আসিফ ইকবাল সম্ভবত এখন ব্রিটেন দ উইকেটস সবচেয়ে ফাস্ট রানার। শুধু ফিল্ডিংয়ের জন্য টেস্ট দলে আসতে পারেন এত ভাল ফিল্ডিং। সাধারণত কভারে ফিল্ড করেন। হরিণের মত গতি। ছুটন্ত বলকে দুরন্তগতিতে ধরে একই অ্যাকশানে নিক্ষেপের ভঙ্গিটি অত্যন্ত সুন্দর।

গত বছর পাকিস্তানের আর পাঁচজনের [illegible] কেরি প্যাকারের ওয়ার্লড সিরিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার ফলে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে স্বদেশে বা বিদেশে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। আশা করা যায় ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে আসিফ তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রাখবেন। তিনিই পাকিস্তান দলের সহ-অধিনায়ক।

মুকুল

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

সংগীতের শিল্পদর্শন। অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক : দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা-১২। পনের টাকা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতবিভাগের অধ্যাপকের লেখা 'সংগীতের শিল্পদর্শন' একটি দুরূহ প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক গ্রন্থ। প্রথমেই স্বীকার্য যে, এ বই সর্বসাধারণের জন্য প্রস্তুত হয়নি। সংগীতের উচ্চতর শিক্ষার্থী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও বিশেষজ্ঞরা অমিয়রঞ্জনবাবুর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন, 'সংগীত বিষয়ে দুই ধরনের লোক অধিকারী—এক তিনি যিনি সংগীতবিদ্যার পারদর্শী আর এক তিনি যিনি সংগীতশাস্ত্রের সারদর্শী'। অমিয়বাবু একইসঙ্গে দুই ব্যাপারে দক্ষ। তাঁকে সাধুবাদ এইজন্যেই জানাতে হয় যে, আমাদের দেশে সংগীতের পারদর্শীরা সাধারণত তত্ত্বদর্শী হন না।

অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কঠিন ব্যাপারে হাত দিয়েছেন এবং দেশীবিদেশী সংগীত তত্ত্ব ও দর্শনের অনেক বই তাঁর আলোচনায় কাজে লাগিয়েছেন। এককথায় তাঁর গ্রন্থের উপজীব্য হল, শিল্পতত্ত্বের পটভূমিকায় সংগীতের স্বরূপ বিচার। তাঁর চিন্তায় স্বকীয়তা ও প্রাক্তন পণ্ডিতদের অভিমতের স্বীকরণ তারিফ করার মত। কিন্তু বিশ্লেষণমূলক এই রচনার ভাষাবিন্যাস যথেষ্ট প্রাঞ্জল ও অন্তরস্পর্শী নয়। উদাহরণত তাঁর ভাষার নমুনা : 'শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থে সঙ্গীত সম্বন্ধে যা পাওয়া যায় তা খুবই অপর্যাপ্ত, বা সঙ্গীত সৌন্দর্য তত্ত্বের গ্রন্থে পাওয়া যায় তা কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সঙ্গীত-সমীক্ষার নিদর্শন বা সাধারণ সঙ্গীত তত্ত্বের গ্রন্থে যা পাওয়া যায় তা বৈয়াকরণিক বিধিবিধান সংক্রান্ত, যা পাওয়া যায় না তা হল শিল্পের মূল সূত্রগুলি নিয়ে সঙ্গীতশিল্পের সমীক্ষা বা বিপরীতভাবে সঙ্গীতশিল্পের আধারে শিল্পের মূল সূত্রগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংগীততত্ত্বের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি বিশেষভাবে দেখা দেয় সেগুলিকে তুলে ধরা ও তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা।'

প্রাঞ্জলতা যেকোন রচনার শ্রেষ্ঠগুণ এ কথা লেখককে বুঝতে হবে। তা না হ'লে এমনকি তাত্ত্বিক ব্যক্তিও এমন গ্রন্থ পড়বেন না। তাঁর রচনায় ভাষাগত অসতর্কতা টুকটাক অনেক আছে। যেমন একজায়গায় লিখেছেন : 'প্রতিটি শিল্পকলা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (স্থূলাক্ষর আমার) নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে'।

সংগীতের শিল্পদর্শন বলতে লেখক গ্রীক ইমিটেশন থিয়োরী থেকে আধুনিক ফর্মালিজম পর্যন্ত প্রসারিত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সংগীতের স্বরূপ-সন্ধান বুঝেছেন। এর মধ্যবর্তীকালে ভাববাদও কল্পনাবাদকেও আলোচনার সূত্র হিসাবে নিয়েছেন। পরিশেষে সংপৃক্ত প্রসঙ্গ সমালোচনার দুটো অধ্যায় যুক্ত করেছেন। লেখকের যুক্তিনিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বচিন্তা আমাদের সম্ভ্রম উদ্রেক করে। আমরা তাঁর প্রয়াসকে সম্পূর্ণ সাধুবাদ জানিয়ে মাত্র দুটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, সংগীতের স্বরূপ সন্ধানে চিত্র কাব্য ও ভাস্কর্যের পরস্পর সাপেক্ষতা ও সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা ও ইতিহাস আমাদের জানতে ইচ্ছে করে। লেসিং থেকে আধুনিকতম চিন্তার অগ্রগতি পর্যন্ত ধারাবাহিক বিস্তার খুবই আকর্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থের উৎসনির্দেশ ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীতে Curt Sachs-এর 'CommonWealth of Arts' এবং অমিয়নাথ সান্যালের 'Ragas Raginis' বই দুটির অনুল্লেখ আমাদের বিস্মিত করেছে। সংগীতের শিল্পদর্শন বিষয়ে এই মহান গ্রন্থ দুটি অমিয়রঞ্জন বাবুকে হয়ত অনেকটাই জাগিয়ে দিতে পারত।

যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। আশা প্রকাশনী। দশ টাকা।

বাংলাভাষায় এখন দুরকমের গবেষণার বই পাওয়া যায়। একরকম হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ-ডি থিসিসের জন্য প্রণীত। এ গুলির বেশিরভাগ আকারে পৃথুল, ফুটনোট কণ্টকিত ও তথ্যমূলক। আরেকরকম গবেষণা অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের বাইরে থেকে লেখা। প্রায়ই সুখপাঠ্য কিন্তু অসম্পূর্ণ। অবশ্য এই দুই রীতির গবেষণা বইয়ের কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছে তবে তা সংখ্যায় কম। শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় রীতির গবেষক। তিনি ইতিপূর্বে বাংলা সঙের ওপর এক চমকপ্রদ বই লিখেছিলেন। 'যাত্রা গানের ইতিবৃত্ত' তিনি খুব আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে লিখেছেন। কিন্তু পড়া শেষ হলে মন অতৃপ্ত থেকে যায়। কারণ ডিমাইয়ের তিরানব্বই পৃষ্ঠার মিতায়তনে বাংলা যাত্রাগানের দীর্ঘ-প্রচল ধারাকে উপস্থাপিত করা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

অবশ্য এখানে আমার একটু ভুল হ'ল। কারণ লেখক গ্রন্থনামে বলেননি যে এটি বাংলা যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত। তাঁর বইয়ের প্রথম বাক্য হ'ল : 'একেবারে আদি থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যাত্রার একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া কঠিন।' এখানেও অনুল্লেখ থেকে গেল কোথাকার যাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের না পূর্ববঙ্গের, না অখণ্ডবঙ্গের? যাইহোক, বইটি পড়তে পড়তে অনেক তথ্য মেলে, যা ঝকঝকে ও নতুন। তবে কিছু তথ্যের গায়ে তিনি 'অনেকে বলেন' বা 'শোনা যায়' জাতীয় গোঁজামিল শব্দ জুড়ে আমাদের মনে সন্দেহের কাঁটা বিঁধে দেন। খাঁটি গবেষকের কাছে কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত ও অসন্দিগ্ধ তথ্য খুঁজি।

বইটি পনেরোটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। থিয়েটিকাল যাত্রা, সখের যাত্রা, মেয়ে যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, স্বদেশী যাত্রা প্রভৃতি বাংলা যাত্রার বিভিন্ন থিমেটিক পর্যায়কে তিনি বর্ণনা করেছেন পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে। তবে কোন কোন প্রসঙ্গ মাত্র ছুঁয়ে পড়েছে তথ্যের নামাবলী। বিস্তৃত যাত্রা-পালাকার ঠাকুরদাস দত্ত ও কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংক্রান্ত অধ্যায় দুটি বইটির সমুজ্জ্বল অংশ। তবে বাংলা যাত্রাগানের ঐতিহ্যে হিন্দুস্থানী রামলীলা পালার প্রসঙ্গ একটু খাপছাড়া।

বইটির শেষাংশে মুর্শিদাবাদ জেলার 'আলকাপ' সম্পর্কে একটি সংযোজনী অধ্যায় আছে। অধ্যায়টি সুলিখিত, তথ্যবহুল ও মূল্যবান। কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা লোকনাট্য ও যাত্রার আরেকটি ঐতিহ্যসম্পন্ন ধারা 'বোলান' সম্পর্কে একেবারে নীরব কেন বুঝলাম না। ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি বাংলা যাত্রাগানের অন্যান্য লোকায়ত শাখা সম্পর্কে পরিপূরক আলোচনা করলে আমাদের ক্ষোভ মিটবে। সেইসঙ্গে শহরের যাত্রা ও গ্রামীণ যাত্রার থিমেটিক ও ফর্মাল মিল অমিল কোথায় ও কতটুকু তা বিশ্লেষণ করলে আমরা উপকৃত হব।

কলকাতার 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস' সংস্থার আর্থিক অনুদানে সম্পন্ন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গবেষণা-কর্ম উল্লেখযোগ্য ও পথিকৃৎ প্রয়াস। ভবিষ্যতে এই শীর্ণ বইটিকে পরিবর্ধিত রূপে দেখতে আমাদের মন চায়। তাই অগ্রিম কিছু সংশোধনী প্রস্তাব লেখকের সহৃদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা যায়। বইয়ের গোড়ায় আধুনিক যাত্রার (চিৎপুর-আশ্রিত) অনেক আলোকচিত্র রয়েছে। সেইসঙ্গে পুরানো যাত্রার কিছু ছবি সংযোজন করলে ভাল হয়। কলকাতার বর্তমান যাত্রাদলগুলির সম্পূর্ণ ও কালানুক্রমিক তালিকা এবং পালাকারদের সম্পূর্ণ তালিকা এই বইয়ে ভবিষ্যতে দেখতে পাব ভরসা করি। লেখক কাজটি অংশত করেছেন এবং নিজেই স্বীকার করেছেন যে তালিকা সংকলনটি 'এলোপাতাড়ি' ভাবে হয়েছে। দেশ ভাগের আগে পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত এই বইয়ে সম্পূরক তথ্য হিসেবে যুক্ত হলে পাঠক হিসাবে আমরা পুরো দেশের যাত্রা-সংস্কৃতির পূর্ণ রূপ রখা পাব।

সবশেষে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাঁর বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠার অন্তিম বাক্যের প্রতি, যেখানে তিনি কলকাতার বর্তমান যাত্রাগানের বিবরণ সাঙ্গ করে মন্তব্য করেছেন : 'ছোটবড় সব শিল্পীরা আজও একমনে বাংলার অন্যতম লোকসংস্কৃতির ধারাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সাধনা করে চলেছেন।' বিনীত জিজ্ঞাসা, বর্তমান যাত্রাশিল্প কি কোন অর্থেই লোকসংস্কৃতির ধারাকে বহন করছে? আমাদের তো মনে হয়, বর্তমান বাংলা যাত্রা নগরসভ্যতা, চলচ্চিত্রপ্রভাব ও শিল্পনগরীগুলির অমিত অর্থে পুষ্ট এক মিশ্র সংস্কৃতির জগাখিচুড়ি।

সুধীর চক্রবর্তী

টেনিদার অভিযান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক : নবীন বল। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩। মূল্য দশ টাকা।

আর একটি অদৃশ্য জগৎ আছে, আমরা যারা সংসারী, বিষয়রসের ব্যাকড়সারা সব সময় দেখতে পাইনা। সে জগৎ ল্যাভ ক্যাত্তর, ডেবিট ক্রেডিটের জগৎ নয়। কোন ফন্দিফিকির ফাঁকি সেখানে চলে না। সেটা সনাতন সুকুমার মনের জগৎ। আমাদের কাছে যা যা তুচ্ছ-ক্ষুদ্র-অসংলগ্ন-অর্থহীন তার সত্যিকারের মূল্যায়ন ঘটে সেখানেই। এই সরল সত্যের জগতের কথা লেখা কঠিন, সকলের সাধ্যে কুলোয় না, কারণ আমাদের হিসেবী পর্যবেক্ষণ অনেক সময়েই তার তল খুঁজে পায় না। ছোটদের জন্যে যদি বা কেউ কেউ ফরমাসে-অফরমাসে লেখেন, ছোটদের মত করে সবাই লিখতে পারেন না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এ যুগের সেই বিরলপ্রায় সাহিত্যিকদের একজন যিনি নিজের কিশোরবেলাকে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর ছোটদের জন্য লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে।

তিনি লিখতেন ছোটদের কলমে। ছোটদের হাসির গল্পে শিবরাম চক্রবর্তীর পরেই তিনি। তাঁর গল্প শুধু গল্প নয়, নাটক; তাঁর নাটকের কুশীলবরা কেবল গল্প মঞ্চের চরিত্র মাত্র নয়, তারা বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী বংশধর। উত্তর কলকাতার চিরকালের কিশোরদের তারা এখনো আছে এবং থাকবে। দুঃখের বিষয় এই টেনিদা-হাবুল-ক্যাবলা আর প্যালারাম এই চারমূর্তির জীবনে নতুন-নতুন হর্ষ-রোমাঞ্চ আর ঘটবে না, প্যালারাম বাঁড়ুজ্জের মুখ দিয়ে আর নতুন রহস্য উপাখ্যান বেরোবে না। তাদের গল্প থেমে গেছে, নারায়ণবাবুর থামার সঙ্গে সঙ্গে। আর সেই কারণেই এই গল্পগুলির মূল্য আমাদের কাছে আরও বেশী। সেগুলি আমাদের সাহিত্যের সিন্দুকের শেষ ঐশ্বর্য, মাঝে মাঝে বের করে নেড়ে চেড়ে দেখি।

এই চারমূর্তিকে নিয়ে কিছুকাল আগে ছায়াছবি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেটা লেখার রসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। সম্প্রতি চারমূর্তির তিনটি দীর্ঘ অনবদ্য কাহিনী একত্রে বই হয়ে বেরোলো 'টেনিদার অভিযান' এই নাম নিয়ে। এতে আছে চারমূর্তি, চারমূর্তির অভিযান আর ঝাউ বাংলোর রহস্য। তিনটি জমজমাট কাহিনী। হাস্য এবং রহস্য একসঙ্গে। এই গল্পগুলি কেবল ছোটদের জন্যই বাঁধা বরাদ্দ নয়, মুখোরোচক খাবারের মত অবসর সময়ে বড়দেরও চেখে দেখবার জিনিস। আশা দেবী একটা মজাদার মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। মজবুত এবং মনোরম সিল্ক স্ক্রীনে ছাপা প্লাস্টিক-প্রচ্ছদের তলায় আরও ভাল ছাপা আশা করেছিলাম। ভেতরে গল্পের অনুচিত্রণ থাকলে গ্রন্থটি আরও চিত্তাকর্ষক হত।

অজন্দ বাগচী

নাট্যবিজ্ঞান। (প্রথম খণ্ড : নাট্য স্থাপত্য) প্রবোধবন্ধু অধিকারী। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য পঁচিশ টাকা।

নাট্যবিজ্ঞান (দ্বিতীয় খণ্ড : অভিনয় বিজ্ঞান)। প্রবোধবন্ধু

পাঁচ
মিটারের
মোহিনীমায়া
টেম্পট্রেস শাড়ী
সুগার 'এন'
স্পাইস্ শাড়ী
সত্যম্, শিবম্,
সুন্দরম্, শাড়ী
১০০%
পলিয়েস্টার
শাড়ী
বোম্বে ডাইং
পলিয়েস্টার
জর্জেট
শাড়ী
BD. 3542

অধিকারী। হেমলতা প্রকাশনী। ১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য তিরিশ টাকা।

নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে বাঙালীর একটা সহজাত অনুরাগ আছে। পসার ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বাংলা নাটক ও রঙ্গালয় সারা ভারতে অগ্রণীর সম্মান অর্জন করেছে এবং বাঙ্গালীর নাট্যপ্রীতি প্রায় কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। সারা বাংলায় বেশ কয়েক হাজার নাট্য দল নিয়মিতভাবে অভিনয় করে। বাংলার বাইরেও যেখানেই বাঙালীর সমাবেশ ঘটেছে সেখানেই নাট্যাভিনয়ের একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

নাটক ও অভিনয়রীতি নিয়ে যেমন নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তেমনি ঐসব বিষয়ে লেখা-জোখাও বিশেষ কম হয় নি। তবে শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অভিনয় সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের সামগ্রিক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন তা শুধু অভিনব নয়, বাঙ্গালীর নাট্যপ্রীতি ও অভিনয় প্রচেষ্টাকে সব দিক দিয়ে সুসংহত করবার একটি অভূতপূর্ব প্রয়াস বললে ভুল হবে না।

প্রথম গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে মঞ্চ স্থাপত্য—যে ব্যাপারটি মোটামুটি সেট-নির্মাতা বা মিস্ত্রির কাজ হিসেবে অভিনয় শিল্পী ও নির্দেশকদের কাছে অবজ্ঞাত থেকেছে। অথচ মূল নাট্যরসের বিস্তারে মঞ্চ স্থাপত্যের জ্ঞান শুধু যে অত্যাবশ্যক তাই নয়, অপরিহার্য বলা চলে। গ্রন্থকার তাই মন্তব্য করেছেন: আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যবহৃত মঞ্চ স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো দেখলে মনে হতেই পারে ব্যাকরণ না জেনে লেখা হচ্ছে সাহিত্য। নাট্য না জেনে লেখা হচ্ছে নাটক। নাট্য বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে অনুধাবন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার একান্ত সরল ভাষায় ও আঁকা ৩ শতাধিক ডায়াগ্রাম সহযোগে মঞ্চস্থাপত্যের মূল বিষয়গুলি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। এদেশে এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা না হওয়ায় অনেক কুশলী প্রযোজকই বিদেশ থেকে ধার-করা আংশিক জ্ঞান সম্বল করে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হন। বিদেশী ভাবনার অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের বিড়ম্বনা থেকে বর্তমান গ্রন্থ শুধু যে তাঁদের মুক্তি দেবে তাই নয়, মঞ্চ স্থাপত্যের বিজ্ঞানসম্মত বিকাশে নতুন উদ্ভাবনী শক্তিকেও উন্মুখ করে তুলবে—গ্রন্থকারের এই আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নয়।

মঞ্চ-পরিভাষায় একটি অধ্যায় যুক্ত করে নাট্যবিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। মঞ্চস্থাপত্য বিষয়ক অভিধানের কাজ করবে এই অধ্যায়টি।

নাট্যবিজ্ঞান / দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু অভিনয়ের নানা বিভাগের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা। পরবর্তী আরো দুই খণ্ডে সংগীত, পোশাক পরিচ্ছদ, আলোকসম্পাত ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপারের বিশদ আলোচনা হবে না—এ ধরনের বিশ্লেষণ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ অন্তত এদেশে এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি।

অভিনয় বিজ্ঞানের আলোচনায় শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব থেকে শুরু করে অভিনয়-শিল্পীর কণ্ঠ সম্পদ, উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ দৈহিক যোগ্যতা ইত্যাদি কোন বিষয়ই উপেক্ষিত হয়নি। উপরন্তু অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে নারী-পুরুষের দৈহিক অভিব্যক্তি বিষয়ক অধ্যায়টি অভিনয় শিল্পী মাত্রেরই কাজে লাগবে। প্রবোধবন্ধুবাবুর ভাষায়—"এ-দেশের নাট্য বিজ্ঞান মুখে মুখে প্রচারিত এবং তা কেবল বন্ধ হয়ে আছে প্র্যাকটিক্যালের চৌহদ্দির মধ্যে। এই প্রথার অবলুপ্তি নয়, দুই-ই (থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল) যাতে পাশাপাশি চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা" বর্তমান প্রকাশনার লক্ষ্য।

অনুজেন্দু দত্ত

সুষমা হরিণ। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। অধুনা সাহিত্য, হালিশহর, চব্বিশ পরগণা। চার টাকা।

নষ্ট অরণ্যে ইউক্যালিপটাস। সৈয়দ কওসর জামাল। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, ৪-১ আফতাব মস্ক লেন, কলকাতা-২৭। চার টাকা।

ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর। মৃত্যুঞ্জয় সেন। বিশ্বজ্ঞান, ৯-৩ টেমার লেন, কলকাতা ৯। পাঁচ টাকা।

সুষমা হরিণের কবি হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় বোধ করি শান্ত স্বভাবের। সামান্য কিছু রচনার কথা বাদ দিলে তাঁর এই স্বভাব আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় প্রতিবিম্বিত। মানসিক অস্থিরতাকেও তিনি প্রকাশ করেছেন একরকম সহন-ভঙ্গিমায়। 'অপেক্ষার কালে' কবি বলেন, 'অপেক্ষায় থাকি অপেক্ষা অপেক্ষা/সুদীর্ঘ সময় জুড়ে বেলা/বেলা-বেলা ভাব, অপরাহ্নের হলুদ রোদে নম্র সুষমা মেশানো... এই ধরনের উচ্চারণ তাঁর কবিতায় পাঠক হিসেবে আমাদের ঝিমিয়ে পড়তে প্রশ্রয় দেয়, তুলনায় ঝিম ধরায় কম। সে কারণেই অন্যত্র কবি যেমন বলেন, ...চাই শব্দের শরীরে/সুর আর রক্তের উন্মেষ'—তা সত্যি কাম্য। এ-ব্যাপারে আলোচ্য কবি সচেতন হলেও সামর্থ্য সর্বদা তাঁর মুখ রক্ষা করেনি হয়তো কিন্তু কাব্য-অহমিকা প্রকাশের জন্য তিনি আধুনিকতার কোনো স্থূল মোহের দিকে ঝোঁকেন নি, 'সুষমা হরিণে'র পাঠক হিসেবে যা আমাদের সত্যি ভাল লেগেছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় (মীনা মুখোপাধ্যায়) কাব্যরুচির পরিচয় আছে।

বর্তমান সময় প্রায় নগরকেন্দ্রিক এক যুবাকে কিভাবে লালন-পালন করছে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে তার কিছু ছবি তুলে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছেন সৈয়দ কওসর জামাল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নষ্ট অরণ্যে ইউক্যালিপটাস'এ। আসলে, 'এক যুবা' বিভিন্ন যৌবনে শতধা। ঘুরিয়ে বললে, একাধিক যৌবনের মূল স্বরটি অনুরণিত হয়ে উঠেছে একটি যুবকের সমানুভবী দৃষ্টিতে। তাই গুলো আত্মকেন্দ্রিক মনে হলেও, আসলে তা নয়। 'রাস্তায় নামলে জড়িয়ে যায় পা, নোংরা জলের মধ্যে/ছিটকে পড়ে আমার কবিতা লেখার কলম, বুকের ভিতর থেকে শুধু অবিরাম ঝরে যায় শোক/ঝরে যায় শিল্পের অভিজ্ঞান, আমার কাচের চোখ।' তবু এর মধ্যেই আবার বেড়ে ওঠে মানুষের আরেক শিল্পের অনুকাঙ্ক্ষা—ইউক্যালিপটাস যার প্রতীক ক্ষয়ের মধ্যেও স্থিতি তার নিজস্ব গঠন-ভঙ্গিমায়,—এ যেন অন্ধকারের মধ্যে স্বপ্ন, যা ধরে রেখেছে আগামী কোনো সকালের স্বরূপ। আলোচ্য গ্রন্থে নামকরণের এই মূল ব্যঞ্জনাটি বাঙ্ময়, ধরা পড়েছে শুভাপ্রসন্নর অঙ্কিত প্রচ্ছদে।

জীবন-যাপনে প্রবহমান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অতিক্রমনে টুকরো টুকরো যে অনুভব, উপলব্ধি তাই মৃত্যুঞ্জয় সেন আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। কবি তাঁর রচনায় বিষয় সন্ধানে বাইরের দিকে তাকান নি বিশেষ, বরং নিজের ভেতরেই মুখ লুকিয়েছেন বেশি। যে কারণে অনেক হারানো দিন স্মৃতি হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে, উচ্চারণে। বর্তমান সময়-চেতনায় তাই কবি একটু দিশেহারা, যা তাঁর আক্ষেপ বা শ্লেষ প্রবণতায় মূর্ত। 'বয়সের সঙ্গে সন্ধি করি/জীবনকে ছোঁয়ার জন্যে/দিন চলে যায়/রাত আসে/দিন আসে না'। আলোচ্য কবির মনটি বেশ সংবেদনশীল। কোনোকোনো ক্ষেত্রে তাঁর চিত্রকল্পও ভালো। কিন্তু অনেকাংশে চটুল আঙ্গিক প্রবণতা তাঁর উৎকর্ষের পথে প্রতিকূলাচারী হয়ে উঠেছে। যা এড়াতে পারলে কবির 'ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর' হয়তো সত্যি 'প্রতিনন্দন' হত। প্রণবেশ মাইতির প্রচ্ছদ বেশ আকর্ষণীয়।

রাণা দাশ

এসো হাত ধরো। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। মূল্য: পাঁচ টাকা।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে নিজস্ব বোঝাপড়া করে কবিতা লিখেছেন। প্রতিটি কবিতাতে মিশে আছে তাঁর 'আনন্দ এবং দীর্ঘশ্বাস।/একান্ত গোপন কিছু অভিজ্ঞতা, অহংকার, স্মৃতি,/অভিমান-পরাজয় / কিছু কিছু।/কিছু ব্যর্থতার গ্লানি আর সফল প্রণয়।' 'দর্পণে যেভাবে পড়ে মুখের আদল' ঠিক সেভাবেই এই সমস্ত অনুভব নিয়ে রচিত হয়েছে প্রণবকুমারের কবিতা।

প্রণব খুবই আন্তরিক। তাঁর কবিতা সহজ-সরল সুন্দর। কিন্তু যে কোন শিল্পস্রষ্টার মতই তিনি জানেন 'শুধুর পারবে না কাজল যেভাবে/ফোটার প্রজ্ঞায়' সেভাবে 'কিছুটা মিথ্যের মায়া'ও প্রয়োজন কবিতার। এটুকু শিল্পীর একান্ত নিজস্ব দেখা—আর তারই মধ্যে প্রস্ফুট হয় অজস্র কবির জনারণ্যে আপন স্বকীয়তার একাকিত্ব।

এই সময়ে কবিতা নিয়ে একধরনের শৃঙ্খলাহীনতাকে ডেকে এনে সিংহাসন পেতে দেওয়া হচ্ছে। শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল যে ভাবে ভাবুক, প্রণব ভাবেন না। তিনি জানেন—'শিল্পের স্বচ্ছন্দ টানে জেগে ওঠে নিহিত শৃঙ্খলা'। আর তার জন্যে দরকার 'গোপন অথচ অনায়াস' এক চতুরালি। ছন্দের মধ্যে ঢুকে—ছন্দ থেকে বেরিয়ে—ছন্দ ভেঙে 'অনাত্মর মন্ত্র-আয়তনে' অসম্ভব দক্ষতায় প্রণব কবিতা লিখেছেন। আর এসব করতে গিয়ে তাঁকে কখনো হোঁচট খেতে হয়নি। কারণ 'নিহিত শৃঙ্খলা' তাঁর আয়ত্তে।

প্রণবের কবিতায় ভাবানুষঙ্গ এক আশ্চর্য মাত্রা পেয়েছে। সাম্প্রতিক অনুষঙ্গ থেকে চিরন্তন অনুষঙ্গ এসেছে। আবার বিপরীতে চিরন্তন থেকে সাম্প্রতিকে হেঁটে যাওয়া খুবই সুন্দর। যেমন 'উট' কিংবা 'কিছুই হল না' কবিতা দুটি।

প্রণব কিছু কিছু কবিতায় এক ধরণের পরীক্ষা করেছেন যেখানে 'মতো,' 'মতোন' বা সাবেকি ধরনের উপমা বর্জন করে সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। যেমন নাম কবিতাটি। কিছু পংক্তি উদ্ধার এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় 'নিত্যবহমান অভিজ্ঞতা/মানুষকে সমস্ত শেখায়।/...শেখায় প্রথম ভাগ, নারীবন্দনার ভাষা, গভীর/সমুহ চরণ।' 'উপমাই কবিত্ব' এ ধারণা বদলে যায় যখন এমনি সব সার্থক চেষ্টা দেখি।

একটা কথা তবু বলতে ইচ্ছে হয়—প্রণব যেন একটি রূপোলি বলয়ে আবদ্ধ। আমরা চাই তাঁর কবিতায় ঋতু পরিবর্তন এবং যে পরিবর্তনকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মানি।

অজয় দাশগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

দুজন উজ্জ্বল "ক্যালকাটা পেণ্টার"

ক্যালকাটা পেণ্টার্স-এর দুজন উজ্জ্বল সদস্য, রবীন মণ্ডল এবং প্রকাশ কর্মকার, তাঁদের ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন বিড়লা অ্যাকাডেমীতে। রবীন মণ্ডল যে ছবিগুলি টাঙিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরনো, অর্থাৎ এইসব ছবি আমরা আগে দেখেছি। প্রদর্শনীটি রেট্রোসপেকটিভ-ও নয়, সুতরাং পুরোনো ছবি টাঙানোর সার্থকতা কী তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। রবীন মণ্ডল সাধারণত গাঢ় রং দিয়ে ছবি আঁকেন, তাঁর অনেক বিখ্যাত ছবিই খুব বর্ণিল, কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ছবির নিদর্শন হিসেবে তিনি যে চারপাঁচটি ছোটো ছবি টাঙিয়েছেন (হেড সিরিজ) তাদের প্রত্যেকটিতেই তিনি ঠান্ডা, [illegible] ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর ছবির উপরিভাগে যে উচুনিচু রেখাবিন্যাস থাকে কখনো কখনো, তা-ও এইসব ছবিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অর্থাৎ তিনি ছবির কর্ম এবং বর্ণব্যবহার বিষয়ে যে সচেতনভাবে ভাবছেন সে-

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্তের সৃষ্টি হবে।

সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।

সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2,1-2416 BG

তবে ছবিগুলি আরো বড়ো ক্যানভাসে আঁকা হলে, এই সমস্ত রঙের রসোত্তীর্ণতা বিষয়ে আমরা আরো খোলাখুলিভাবেই মতামত দিতে পারতাম। অ্যাক্রিলিকে আঁকা তাঁর 'অ্যানিমাল' সিরিজের তিনটি ছবিই নতুন। ছবিগুলি (পশুর মাথা ইত্যাদি) ভালোই, তবে তাতে নতুন কোনো আরম্ভ বা পথনির্দেশ নেই।

তাঁর পুরনো কোলাজ কাজটি (ম্যাজিশিয়ান সিরিজ) আবার নতুন করে ভালো লাগলো। রঙিন কাগজের টুকরোর চারপাশে রঙিনতর রং। সব মিলিয়ে, খুব উজ্জ্বল। নয়নরঞ্জন। যীশুখৃষ্টকেও তিনি একটি ছবিতে জাদুকর হিসেবে কল্পনা করেছেন, এবং যিনি অঘটনঘটনপটীয়সী মিরাকল-এর জনক, তাঁকে একজন জাদুকর হিসেবেও ভাবাও যেতে পারে। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে, ছবিটি সার্থক। কিন্তু ছবি হিসেবে সার্থকতর হ'লো সেই চিত্রটি, যেখানে জাদুকরটি মুখোশ-পরিহিত। কেমন একটা গা-ছমছম করা অনুভূতি হয় ছবিটি দেখলে। নবীন মণ্ডলের নরনারীর ছবিতে—বিশেষত নারীর ছবিতে—ঈষৎ আদিমতার আভাস থাকে কখনো কখনো। এই প্রদর্শনীর ট্রাইবাল ছবিটি আমার মন্তব্যকে সমর্থন করবে। "ওম্যান-৩" ছবিটিও। 'কিং অ্যান্ড কুইন' (যদিও পুরনো ছবি) আমার কাছে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ছবি বলে মনে হয়েছে। পাশাপাশি দাঁড়ানো রাজা ও রানীর ভাবগম্ভীর ছবি—কিংবা কোনো সাধারণ মানুষ ও সাধারণ মানুষীর ছবি, যারা কোনো বিশেষ মুহূর্তে রাজকীয় অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত হয়—ফিকে হলুদ ও ফিকে সবুজের পরিবেশে রেখাজটিল ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে। সুন্দর।

'ইমাজিনেশন অফ ডিসাস্টার" ছবিটিতে প্রলয়ের ছবি একটু বেশি সুনিশ্চিতভাবে আঁকা হয়েছে ব'লে আমার মনে হলো।

অনেকদিন ধরেই আমি প্রকাশ কর্মকারের ছবির অনুরাগী। সাম্প্রতিক বাঙালি শিল্পীদের মধ্যে তিনি যে অন্যতম প্রধান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর ছবি দেখতে গিয়েছিলাম
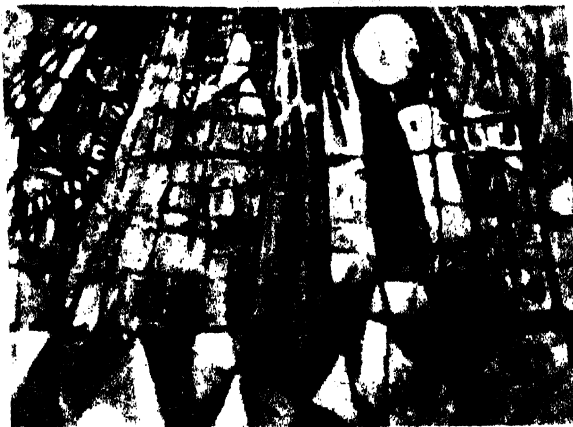
মধুর মুহূর্তে—প্রকাশ কর্মকার

এই প্রদর্শনীতে। ঘরে ঢুকেই তাঁর প্রতিটি ছবি আলাদা আলাদাভাবে দেখবার আগেই একটা হলুদ রঙের ঝলক চোখে এসে লাগলো। মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে 'গেসটাল্ট' প্রক্রিয়া বলেন অর্থাৎ অনুপুঙ্খ বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত হবার আগেই কোনো বস্তুর একটা সামগ্রিক আন্দাজ যে চকিতে পাওয়া যায় সেই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে আমি "হলুদ" রংটি অনুভব করলাম। বলা বাহুল্য পরে অধিকাংশ ছবিতেই দেখলাম প্রকাশ হলুদ রংটিকেই প্রধান রং হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর প্রিয় থীমগুলি (রমণী এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যৌনতা) থেকে তিনি বিশেষ সরে আসেন নি। কিন্তু তাঁর ছবি আমার কখনোই অশ্লীল বা অশ্লীল বলে মনে হয় না—যৌনতা বা নগ্ন নারীর দেহজ কামনার চাপা ইন্দ্রিয়জতাকে তিনি বিরল ব্যঞ্জনায় আশ্লিষ্ট করে দেন তাঁর ক্যানভাসে। তিনি অবশ্য কয়েকটি পুরনো ছবি টাঙিয়েছেন প্রদর্শনীতে। একটি পুরনো ছবি (কম্পোজিশন ৮নং) আমার কাছে আবার নতুন করে অসাধারণ লাগলো। নীল-ছেটানো চাপ চাপ অর্ধ-বৃত্ত আকারের মাঝখানে একটি যোনির আভাস। ছবিটি আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে সঞ্জীবিত করে। তারই উলটো দিকে আরেকটি পুরনো ছবি (কম্পোজিশন ১নং) অত্যন্ত অসার্থক—নারীর শরীরকে বাস্তবানুগভাবে আঁকতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন প্রকাশ। অবশ্য ছবিটি অনেক পুরনো।

প্রকাশের নতুন ছবিগুলো দেখতে দেখতে মনে হলো যে প্রকাশের অধিকাংশ ছবিরই মেরুদণ্ড হলো অর্ধ-বৃত্তাকার বঙ্কিম রেখা (curve)। শুধু তাই নয় তিনি এই বক্ররেখাশ্রিত আকারকে তেরছাভাবে—না কোনাকুনি ক্যানভাসে উপস্থাপিত করেন এবং এই বঙ্কিম-বলয়িত অর্ধ-বর্তুলাকার আকারের সঙ্গে সরল রেখার tension-এ তাঁর অধিকাংশ ছবির প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি এই পদ্ধতিটি খুব সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছেন। তাঁর অধিকাংশ ছবির নাম হচ্ছে 'ভিশন' অথবা স্বপ্ন দেখছে আবার কোনো ছবিতে পুরুষ নারীকে। ভিশন সিরিজের যে ছবিটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটি হলো ১৩নং ছবিটি—তেরছাভাবে আঁকা নারীর আশিংকে অঙ্গসংস্থাপনকে প্রায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের আয়তন দেয়া হয়েছে। ভিসন ১টিও খুব সুন্দর—ডান দিকের কোণায় একটি মানুষ (না মানুষী?) দাঁড়িয়ে আছে এবং ছবিটির পুরো ভারটি এবং তল-বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে এই কৌণিক মানুষ। ভিশন ২-তে একটি স্ফীতোদরা হলুদ রঙের মেয়ের ছবি খুব সফল হয়েছে

আঁকা হয়েছে বলে আমার মনে হলো। 'উন্মেষ' সিরিজের মধ্যে ৪ এবং ১৬নং আমার সবচেয়ে সার্থক বলে মনে হয়েছে—প্রথমটিতে পেয়ালা হাতে একটি নারী তাঁর বিশাল হলুদ কেশভার নিয়ে নিজেকে যেন কারো কাছে উৎসর্গ করছে এবং দ্বিতীয়টি আমার ভালো লেগেছে প্রধানত [illegible] অলং-কারিত্বে—হলুদ রঙের সঙ্গে গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণের সার্থক বৈপরীত্যের জন্য।

নারীকে আমরা প্রকৃতি বলেই জানি আবার গাছপালা-পাহাড়-সমুদ্রও প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতির মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাকে প্রকাশ সাংকেতিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন কোনো কোনো ছবিতে। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর কোনো একটি গ্রন্থে খেদ করেছিলেন যে অনেক আধুনিক চিত্রকরই কিভাবে ছবি আঁকতে হয় জানেন কিন্তু কী আঁকবেন তা জানেন না। প্রকাশ কর্মকারকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মনে হলো। মনে হলো তিনি ছবি নিয়ে ভাবেন। কিন্তু এবার তাঁরও পালা বদলের সময় হলো।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

এঞ্জিনিয়ার ভাস্কর এবং চিত্রকর বন্ধু

ভারতবর্ষে পেশাদার শিল্পী অল্পই আছেন। অন্নসংস্থানের জন্য অধিকাংশই অন্য কাজ করেন। সুব্রত পাল

এবারের শীতে কারা কটসউল
পরবে বলুন তো?
বুদ্ধিমতী মেয়েরা—যারা কটসউল
প্রিন্ট ও প্লেন—মিলিয়ে-মিশিয়ে,
মানানসই ক'রে পরতে ভালবাসে।
কেতাদুরস্ত পুরুষগণ—
রঙদার পোশাক যাঁরা
ভালবাসেন। যাঁরা গাঢ় রঙের
শীতের স্যুটের নিচে গরম কটসউলের
ঝলমলে চেকের পোশাক চান।
ফ্যাশনদুরস্ত মহিলাগণ—
যাঁরা নরম ও উষ্ণ কটসউল
শালের আরাম সদ্য-সদ্য
অনুভব করেছেন।
এবং, ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা—
যারা চিরটাকাল কটসউল পরে
আসছে। হালকা নানা রঙা ও
ঝলমলে এক রঙা, ফুলকাটা প্রিন্ট
ও ঝকমকে ডোরাকাটা পোশাক
যারা ভালবাসে। যাদের অঙ্গে শোভা
পায় শীতের ডিজাইনের রকমারি বাহার!
OBM 4316 BEN
DS
বিনামূল্যে!
একটি ২০ পৃষ্ঠার কটসউল ক্যাটালগ
পাবেন—"ডিজাইন কর এ ওয়ার্ম, ব্রাইট
উইন্টার।" কুপনটি আপনি ডাকযোগে
এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন:
বিনী লিমিটেড
পোস্ট বক্স নং ২৩০১ বাঙ্গালোর-৫৬০ ০২৩
নাম
ঠিকানা
বিনি
কটসউল
রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক
পশমের উষ্ণতা আর
সুতীর কোমলতার মিশ্রণ

...প্রাজ্ঞনমের। ছোটবেলা ... আর কাঠের ভাস্কর্য ... জামাটি ঘাটতেন। ইংলন্ডে মোটর কারখানার শিক্ষানবিস থাকার সময় বাতিল যন্ত্রাংশ দিয়ে ভাস্কর্য গড়ার কথা তাঁর মাথায় আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উড়োজাহাজের সামরিক যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ বিভাগে থাকাকালীন ফেলে দেওয়া যন্ত্রাংশ ঝাল দিয়ে কিছু ভাস্কর্য করেন। তারপর কাঠকুটো পাথর প্ল্যাস্টার প্রভৃতি পরম্পরাগত মাধ্যমেই টুকিটাকি ভাস্কর্য করেছেন। ইদানীং নিজের মোটর সারাই কারখানায় স্বর্ণখনি থেকে রূপবন্ধ (ফর্ম) খুঁজেপেতে ঝাল দিয়ে রঙ করে ভাস্কর্য করেছেন। যন্ত্রাংশের আবর্জনার স্তূপে কত বিচিত্র রূপ আর আকার থাকে মুখ থুবড়ে পড়ে। ষাট বছরের এই যুবক, ডুবুরীর মতো রূপসায়রে ডুব দিয়ে তুলে আনেন প্রাচীন কোনো জাহাজডুবির ধ্বংসাবশেষে সঞ্চিত অমূল্য রত্নরাজি।

বিড়লা আকাদমীতে এই প্রদর্শনী চলছে ১লা—৫ই নভেম্বর। সাধারণ মাপের ভাস্করদের থোড়বড়ি-খাড়া প্রদর্শনীর চেয়ে এ অনেক ভাল। রূপ-বন্ধের সারল্য তাঁর অভিপ্রেত—যদিও "সত্যিকারের হাতির" মতো বাস্তব-সম্মত কাজ করে তিনি নিজের কব্জির জোরের প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর "মেম সাহেব", "ফুটফুটে মেয়ে", "ক্যাকটাস পরিবার", "বক", "গরু", "মহিষের মাথা", "জাবর কাটা", "কাঠবিড়ালি", "শুয়োর", "দম্পতি" দারুণ কাজ। "বুদ্ধদেব" এক অসাধারণ ভাস্কর্য। প্রভাস সেন এবং শর্বরী রায়চৌধুরীর মতো বড় দরের ভারতীয় ভাস্করার সুরত রায়ের ভক্ত। তাঁর ছোট বড় কাজ আমাকে তাঁর অন্ধ স্তাবক করে ফেলেছে। পাঠক এ প্রদর্শনী আপনার অবশ্য দ্রষ্টব্য।

ভাস্করের অনুজপ্রতিম বন্ধু উদীয়মান চিত্রকর আনন্দ রায়। আনন্দের তৈলচিত্রের রঙের জেল্লা ইতিমধ্যে রসিকজনকে বশীভূত করেছে। এবারে তাঁর রেখাচিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেলের কাজ হচ্ছে একই সময়ে পাশের ঘরে। পরিণত কাজের পাশেই ঝুলিয়েছেন শিক্ষার্থীসুলভ কাজ। যদিও মোটামুটি তিনি যে আন্তরিক-ভাবে কাজ করেন তা বেশ বোঝা গেল। তাঁর নদ্দ মর্কেটের মুরগি-স্টল, ভিখারি এবং সাধারণ মানুষের ওপর কাজগুলি মন্দ নয়। একটি মানুষের কালো সাদা তুলি কালির অংকন আছে প্রদর্শনীতে—এইখানে তিনি যে কুশলধর সেটা বেশ বোঝা যায়। রেখার জোর আছে। লেখনরেখ (ক্যালিগ্রাফি) এবং চাপচাপ কালো আর পটভূমির সাদা নিয়ে তিনি এক জমাটি নান্দনিক ...প্রদর্শন করেছেন। এই রকম কাজ বেশী থাকলে তাঁর একক প্রদর্শনী আরও জমতো। বরং যে-ধরনের কল্প-চিত্র আঁকায় ডুবে থাকেন সেই ধরনের কোনো রেখচিত্র না দেখে কিছুটা অবাক হয়েছি।

...দীপ সরকার

...ত সঙ্গীত

...তিজনেষু,

সালটা বোধহয় পঁচাত্তর বা ছিয়াত্তর হবে। তোমরা তখন সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে বিড়লা আকাদমীতে একটা অনামী দলীয় প্রদর্শনী করেছিলে। তোমরা তখনও শিল্পী-মহলে পরিচিত নও। তোমাদের দলে রেবন্ত গোস্বামী, প্রশান্ত নিয়োগী এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া একটি ছেলে ছিল—যার মুখটা মনে পড়লেও এই মুহূর্তে কিছুতেই নামটা মনে পড়ছে না। তোমাদের কাজ দেখে আকৃষ্ট হয়ে সমালোচকদের মধ্যে আমিই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। একেবারে না-পাওয়ার চেয়ে একটু-আধটু প্রশংসা পাওয়া ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত হয়ে গেলেই আবার মুশকিল। সমালোচকরা যখন বাড়াবাড়ি করবে তখন সাবধান! হয়তো অনেক সময় না-জেনে তাঁরা তোমাদের ক্ষতিই করেন। বরং যিনি তোমাদের নিন্দা করবেন তাঁর কথা মন দিয়ে শুনবে। তেতো বা কড়া হলেও রোগ হলে তো ওষুধ খেতে হয়।

তিলক মণ্ডল, তোমাকেই ভাই আগে বলি, তোমার বড় গুণ হল তুমি টাটকা মৌলিক এবং মাধ্যমিক বর্ণগুলো ব্যবহার কর। অনেকটা ফভিস্ট বা যামিনী রায়ের মতো ভঙ্গীতে। সিঁদুর লাল দিয়ে মুখ রাঙিয়ে তুমি গায়ে সবুজ দিতে পার। রঙের যে আলাদা ভূমিকা আছে তা তুমি জান। কিন্তু তোমার অংকন কাঁচা, বিষয়বস্তু এবং নির্মিতি দুর্বল এবং রঙীন ছবির ক্ষেত্রে রঙের জলুস দিয়ে তুমি চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারলেও শুধু কালো-সাদা অংকনে এলে তোমার ছবি অনেক সময় দাঁড়িয়ে মার খায়। ফলে এবার আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে তোমাদের দুজনের প্রদর্শনীতে (সেপটেম্বর,২৫-৩০) তুমি জলরঙ এনেছ। রঙের জলুস বাড়াবার জন্যে শেষে পোস্টার রঙ জল রঙের সঙ্গে ব্যবহার করেছ। কিন্তু তোমার কালো-সাদা ছবিতে—বিশেষত বহু রেখার মধ্যে ওলোট পালোট খাওয়া দেহগুলোর অঙ্কনে—নিখিল বিশ্বাসের ছায়া পড়েছে। তোমার সার্কাসের ভাঁড়দের ভঙ্গী নিখিলের কথা মনে করায়। বাদামী কাগজে কালো রেখা আর জল-রঙে করা ছাতা হাতে জানালার নীচের টবের সামনে যে লোকটাকে দেখলাম, সে বরং তোমার নিজস্ব রীতিতে আঁকা। কিংবা কালোর ওপর স্লিপিঙ থেকে যে কুঁজো হয়ে দ্রুত নামছে, যা খাটে শুয়ে থাকা মহিলার চারপাশে উলঙ্গ মানুষের দেহের জটলার দৃশ্য আমার মনে হয়েছে তোমার নিজস্ব। কী আঁকবে এসব বিষয়ে তুমি তেমন ভাবো না বলেই মনে হয়। স্বতঃস্ফূর্ত যা আসে তাই আঁকো। তোমার সীমায়িত অভিজ্ঞতার জন্যে তোমার ভেতর থেকে আসা জিনিসগুলো ফুরিয়ে আসছে। তোমার আগের ছবির মতো এগুলো আর ধাক্কা মারছে না আজকাল।

অশোক ভৌমিক, তুমি ভাই আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চাইছ তুমি স্বতন্ত্র নগর-রাষ্ট্রের নাগরিক। যেখানে টলকিনের "হোবিট"-রা বাস করে। তোমার ছবিতে পোকামাকড়, গিরগিটি, টিকটিকি, প্রজাপতি, বড় বড় পাইপ, নিসর্গ আছে। তোমার নিজস্ব কায়দায় রূপারোপ ডঃ সুলের বাচ্চাদের বইয়ের সচিত্রকরণের কথা মনে আনে। বিলিতি ম্যাগাজিন, কমিক স্ট্রিপ স্বভাবত এ-সবের কথা মনে আসে। কখনো তুমি কালো দিয়ে ওপারের পটের অর্ধেকটা ঢেকে দাও। কিংবা গোটা রচনার ওপর চৌকো ঘর কাটো। কখনো একটা অনুভূমি রেখা টানো মাঝখানে। কখনো দুটি সমান্তরাল অনুভূমি রেখা টানো। প্রত্যেকটি ছবির মূল প্রতিমূর্তিতে কালো থেকে হালকা ছাই পর্যন্ত ছায় (টোন) নিয়ে খেলা আছে। কিন্তু মূলত তোমার ছবি গুটি কয়েক এবং বেশির ভাগই এসবের রকমফের। তুমি প্রথম প্রদর্শনীর পর পরিণত হয়েছিলে। এখন তুমি ছবির চেয়ে নিজের ভাবমূর্তির বিষয় ভাবছ বেশী।

পরিশেষে বলছি, নিজের চারপাশে তাকাও। নিজের ঐতিহ্যকে, ঐতিহ্যের রচনাসম্ভারের ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাবার কথা ভাবো। ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কিন্তু বলছি না। ভেতর দুয়ারে আগল দিয়ে বাইর দুয়ার খোলা রাখলেও যেমন তেমনি বাইর দুয়ারে আগল দিয়ে ভেতর দুয়ার খোলা রাখলেও ঠিক চলে না। ভেতর বাইর দুই দুয়ারই প্রয়োজন মতো খোলা আর বন্ধ রাখতে হবে। তোমাদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করি না বলেই আমি তোমাদের এত কথা বলছি। যেনো জলে ভেসে যদি যাও, তাহলে যেহেতু আমি কাগজে কলমে প্রথম তোমাদের আবিষ্কার করেছিলাম তাই আমার দুঃখটা হবে বেশী। তোমরা বড় শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলে আমিই সবচেয়ে বেশী সুখী হবো জেনো। ইতি

তোমাদেরই
সন্দীপদা
(সন্দীপ সরকার)

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

গোরুর গাড়ির হেডলাইট

প্রচারপত্রে নাম ও নামের কষ্ট-কল্পনা দেখেই ধারণা হয়েছিল জগাখিচুড়ি কিছু একটা! হায়, আমার কল্পিত ধারণাকে সম্পূর্ণ ধারণাসিদ্ধ করে ছাড়লেন নটসেনা! যা দেখলাম তা যে জগাখিচুড়িরও বাড়া অবশ্য তাদের বাড়া ভাতেএ স্থূল খিচুড়ি?) আমি ছাই দিতে চাই না, কারণ উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অনেকেই যে সত্যি হেসেছেন! শুধু জিজ্ঞাস্য নাট্য-আন্দোলন নিয়ে যারা বিশেষ ভাবিত বলে জানান, সেই নটসেনার কর্মীরা কি এই হাসির ময়না তদন্ত করে দেখবেন একবার?

এ-ই যদি নতুন ধরনের প্রযোজনা হয়, আমার দিক থেকে বলতে দ্বিধা নেই, দর্শক হাসাবার জন্য একটি নাটকে ছ্যাবলামো আর ভাঁড়ামো কতখানি পাঞ্চ করা যায় তারই 'পরীক্ষা নিরীক্ষার' নাটক নটসেনার আলোচ্য প্রযোজনা (রচনা ও নির্দেশনা : সরোজ রায়)। সম্প্রতি মাইম অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এই নাট্যানুষ্ঠানের সাক্ষী থেকে যে প্রভৃতি স্মৃতিতে রয়ে নিয়ে সংলাপ উদ্ধার করা যাক,—রিহ্যাসাল দেয়া মানে প্রেমের প্রক্সি দেয়া। ভগবান নিশ্চয়ই ওকে নিজের হাতে তৈরি করেনি, কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে তৈরি করে ছেড়েছে/ ধোলাই দিয়ে পোস্টার করে ছেড়ে দেব। হৃদয় হাসতে হাসতে বনে চলে গেল বা গিভিং হ্যান্ড টু লেগ। স্বরচিত রামপ্রসাদী সংগীত ইত্যাদি।

তা এইসব সংলাপগুলো যথাক্রমে শোনা গেছে চুমকি চাটার্জী, জুলফি জোয়ারদার, লটকা তরফদার, অতএব সান্যাল, ও ইত্যাদি ব্যানার্জীর মুখে। হ্যাঁ পাত্রপাত্রীর নামকরণের মধ্যেই মজা ছড়ানোর চেষ্টা রয়েছে' এ ছাড়া আরো অনেক মজার ব্যাপার আছে, যেমন মজা ধরবার চেষ্টায় বংশসন্তান হয় বংশ মস্তান, কনসেপশন বলতে একসেপশন, অনুমতি বলতে অবগতি, টয়লেট বলতে টয়লেট, দারুণ বলতে করুণ উচ্চারিত হয়!

এতকিছু এল যা থেকে এবার সে কথাই বলি, 'তুবড়ির মতো জ্বলে' ওঠা (নাটকে ব্যবহৃত) এক তরুণী (চুমকি) একালের যুবক-যুবতীদের পারস্পরিক ভালোলাগা-ভালোবাসার উপর গবেষণা চালাতে গিয়ে একটি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে সে তার সাজিয়ে রাখা রঙিন ফাঁদে অনায়াসে আটকে নেয় বিভিন্ন চরিত্রকে, সর্বশেষে এক সুদখোরের সঙ্গে তার বৈবাহিক পরিণতিতে নাটকের পরিসমাপ্তি।

খুব রক্ষা নটসেনার কর্মীরা অভিনয়ে পারঙ্গম। লোক হাসান লঘু ও দুর্বল সংলাপকে তাঁরা অভিব্যক্তির রসে কিছুটা সবল করে তোলার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন তাঁদের অভিনয়ে। উত্তমবাক দত্তের ভূমিকায় অমিত ভট্টাচার্য, রোমিও বটব্যালের রূপদানে অসিত বসু রায়, চন্দ্রবদন রায়ের চরিত্রস্রষ্টা সত্য চ্যাটার্জী এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যন্ত্রের সাহায্যে নাটকে যে সংগীত প্রয়োগ সেও এক যন্ত্রণা বিশেষ!

আলোর পাখি

স্বভাবের আন্তরিকতায় ব্যতিক্রম কিছু প্রযোজনার কথা বাদ দিলে চিন্তান্বিত করার নামে যাঁরা বিমিশ্র দর্শককে চিন্তাক্লিষ্ট করে ছাড়েন চর্চায় তাঁদের অভিনিবেশ সম্পর্কে রসগ্রাহীর মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতেই পারে! সূচনায় যে কথাটা বলে নেয়া দরকার, 'আলোর পাখি' প্রযোজনা করতে নেমে 'সংবর্ত' নাট্যগোষ্ঠী আর যাই হোক তেমন কোনো সন্দেহ জাগান না। আলোচ্য নৃত্যরূপক রচয়িতা ও নির্দেশক সুনীল দাশ। ডাইভারসনের প্রতি খোলাখুলি গুরুত্ব দিয়েই তিনি তাঁর এই ডান্স-ফ্যানটাসিতে শৈল্পিক ভারসাম্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন নাটকীয় ইলিউমিনেশন। যদিও প্রয়োগকৌশল কিছু ত্রুটিতে রচয়িতার নির্দেশনা-কুশলতা কিছুটা মার খেয়েছে, যে কারণে সংবর্তের এই নিবেদন সর্বাংশ থেকে ভেবে দেখলে শেষ পর্যন্ত সর্বতোভদ্র রূপ পায় না, সে প্রসঙ্গে

"নিখুঁত পরিষ্কার"

আগেকার দিনে বাড়ীর সকলের কাপড়চোপড় সাবান দিয়েই ধুতাম। কিন্তু কাপড় যেন কিছুতেই তেমন পরিষ্কার হত না।

তারপর, সাবানের দামে যে সব ডিটারজেন্ট বার পাওয়া যায় তাই ব্যবহার করে দেখলাম...তাতেও ভালো পরিষ্কার হল না।

এখন আমি হুইল পেয়েছি! সবুজ ডিটারজেন্ট বার! এতে দারুণ ফেনা হয়...আর টেঁকেও বেশী...আর সাবানের চেয়ে কত বেশী কাপড় যে ধোয়...তাও নিখুঁত পরিষ্কার ক'রে!

সাবান বা সমমূল্যের ডিটারজেন্ট বারের চেয়ে পরিষ্কার করার শক্তি বেশী

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.3-2415 BG (R)

য় আত্মপ্রকাশ যখন দ্রুণে
কেই সে সাড়া দেয় আলোর
তাই একদিন জরায়ু ছিন্ন
তার জন্ম। অতএব বলা বাহুল্য,
ার সঙ্গে প্রাণের আত্মীয়তা
কথিত বোধবুদ্ধির অতীত।
কটা সে কাণ্ডই আলোচ্য
্যরূপক কাহিনীতে যে
ত-ফ্যানট্যাসি তা আমাদের বুদ্ধিকে
প করেনি, বরং জীবনের একটা
প তাতে প্রতিভাত হওয়ায় তা
বিষ্ট করেছে স্বতঃস্ফূর্ত এক
াবেদনে।

সভ্যতার ধারক মানুষ একটি
ালোর জগতে পৌঁছবার জন্য
দাই উন্মুখ হয়ে থাকে, কিন্তু
মায়ারূপী অন্ধকার বারবার ঢেকে
য় তাকে। বাইরে যেমন যুদ্ধবন্ধ
তমনি একটা আত্মিক লড়াই চলছে
ার অন্তরে। তার একপাশে ভালো
ন্যপাশে মন্দ। ভালোর পক্ষে যে সুর,
াকে দেখে অট্টহাসে মন্দরূপী
সুর। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকলে
কসময়ে সেই অসুর দৈত্য হার মানে,

খন অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়া
ানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়— আলোচ্য
্যরূপকে এ বক্তব্যেরই প্রক্ষেপ।

তাৎক্ষণিক অসুবিধাগুলো এড়াবার
ন্য এর সংলাপ ও সংগীত
াগেই টেপ করা হয়েছে কিন্তু কন্ঠ-
শিল্পী বা ভাষ্যকার উভয়ক্ষেত্রেই
রের উচ্চতা বেঁধে দেয়া হয়নি, যে
রণে প্রেক্ষাগৃহের প্রক্ষেপণ যন্ত্র
চ্যুতি ভীষণভাবে মূর্ত হয়ে উঠে
ট্যাগাতির টেটোল এফেকটকে বারবার
ষ্ণে দিয়েছে। নৃত্যে শুভাশিস
াচার্যের (পক্ষী বিক্রেতা)
স্থিতিতে যে নান্দনিক কুশলতার
রচয় পাবো বলে প্রথমে আশা
গে তা ক্রমশ চুপসে যায় শিল্পীর
া একই ধরনের নৃত্যভঙ্গি ও
াম; অন্যদিকে ঋত্মিক রায় (গ্রাম-
াক) নৃত্যে তাঁর আকর্ষণীয় মুখশ্রী
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যেভাবে কাজে
গিয়েছেন তা চটুল সিনেমারই
যুক্ত। বলতে কি এ ধরনের
্ষ্ঠানে ঠিক খাপ খায়
অবশ্য সামান্য কিছু ক্ষেত্রে
শীর অভিনয়ের সাত্ত্বিক অংশ
িল্পকের তুলনায় দর্শকদের সত্যি
া করেছে। তাঁর কন্ঠসংলাপ
রতেও আমাদের ভালোলাগে। একই
শে প্রশংসনীয় গৌতম দে (পক্ষী
ক্রেতা)। পুলক দাস, ঋত্মিক রায়,
র্মা লাহিড়ী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য
শিস পাল আলোচ্য রূপকের
না যথেষ্ট যত্ন নিয়েই পরিবেশন

কিন্তু মঞ্চ থেকে তাঁর অন্তর্ধানে ত্রুটি থেকেই যায়। উপস্থাপনার অনেক ত্রুটি অবশ্য পুষিয়ে দেন আলোর পরিকল্পনায় প্রদীপ কর। ফ্যানট্যাসি-ধর্মী এই নাটক মঞ্চায়নে তাঁর পরিকল্পিত আলো যে সত্যি জরুরী ছিল তা স্বীকার করে শিল্পীকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

অথ মউলি সংবাদ

ছাঁচে ঢালা কাহিনী সম্পর্কে আমাদের যে আপত্তি 'রঙরূপ' প্রযোজিত 'অথ মউলি সংবাদ' দেখে (মাইম অ্যাকাডেমিতে) তা একটু চড়া হয়, যখন দেখি পুরোই কাহিনীর ছাঁচ আদৌ ভাঙেনি এতে, বরং এ আরেক ভাঙা ছাঁচের কাহিনী।

যেমনি গতে বাঁধা এর নাট্য রচনা, তেমনি গতে বাঁধা শিল্পীদের অভিনয় এতে, যা উপস্থিত দর্শকদের ক্রমশ ক্লান্ত করে ছেড়েছে।

গুটিকয় নীরসীকৃত (তথাকথিত) মানুষ, তাদের আর কারো না থাকলেও একজনের একটি কুমারী কন্যা এবং তার প্রতি শোষিত যুবকের প্রেম বনাম মহাজনের লোভ—এতে আর যাই হোক, মউলিদের জীবনকাহিনীর বিশেষ কিছুই জানা হয় না আমাদের, হায়, তবু এর নাম অথ মউলি সংবাদ।

আবদুল জব্বারের 'সাগর দ্বীপের মহাজন' এর নাট্যরূপ এটি। রূপকার সুব্রত মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার সুব্রতবাবু এবং নির্দেশক সাগর সেন যদি একটু সতর্ক সচেতন থাকতেন সেক্ষেত্রে আলোচ্য প্রযোজনায় মউলিদের নামে প্রচলিত অন্য একটি নাটকের প্রতিচ্ছায়া আমরা দেখতে পেতাম না, কিন্তু দেখলাম! অন্যদিকে ছাঁচে বাঁধা কাহিনীর মধ্যে এসে অভিনয়ে শিল্পীরা যদি ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন তাহলেও অন্তত আলোচ্য উপস্থাপনায় একটা বিশেষত্ব আমরা খুঁজে পেতাম; খুবই আফসোসের কথা, মফঃস্বলের একটি গোষ্ঠী হিসেবে রঙরূপ পরিশ্রম ও অর্থের বিনিময়ে মাইম অ্যাকাডেমির যে সন্ধ্যাটা করায়ত্ত করেছিলেন তার মর্যাদাটা রাখলেন না।

আলোচ্য প্রযোজনায় একমাত্র যা প্রশংসাযোগ্য তা হচ্ছে সেট পরিকল্পনা। কোনরকম বাহুল্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে কয়েকটি পোস্টার কার্ড (শিল্পী : মাঃ টুবু) শো করায় যে দৃশ্যপটপ্রকল্প তা আর্থিক সংকটের মুখোমুখি একটি সুচিন্তিত প্রয়াস বলা যেতে পারে।

রানা দাস

বিজাতীয়

বলার ভঙ্গি-ই বক্তব্যকে কবিতা করে তোলে। বক্তব্য আর ভঙ্গির মিলনই শ্রেষ্ঠ শিল্পের সার্থকতার গোপন কথা। গণশিল্পী সংসদ প্রযোজিত বিজাতীয় নাটক হয়েও কখনও কখনও কবিতার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। লোভ বোধহয় রাইফেলের

বিরাট ভোগ সম্পদের মধ্যে থেকেও কুকুরের মতন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধহয় এই স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও একটা বেদনা গোপন ক্ষতের মত বাজে। সেই গোপন ক্ষতের যন্ত্রণায় ভেতরের মানুষটা সব কিছু ভেঙে ফেলতে চায়— এটুকুই এ নাটকের কাহিনী। কিন্তু কর্ণ সেন রচিত এ নাটকের বলার ভঙ্গি অন্য এক মাত্রা যোগ করেছে। অজেয় এ নাটকের প্রধান চরিত্র। যে এই লোভের শিকার। কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্লেষণের মুহূর্তটি এক কথায় অসাধারণ। অজেয় তার আগের জীবনের এক বিরাট ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সেখানে সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছে আগের জীবনেই বা তার আত্মস্বাতন্ত্র্য ছিল কোথায়?· একটি দৃশ্যের কম্পে জিশন গোটা নাটকের সুরকে ধরে রেখেছে। মঞ্চের দুই কোণে দুজন। একদিকে একজন শক্তিমান রাজনৈতিক নেতা। অপর দিকে অজেয়। দুটি জোনে অভিনয় চলছে। রাজনৈতিক নেতার নির্দেশ অজয়ের প্রতি, নির্বাচনে জেতবার জন্যে আজ রাত নটায় একজন সক্রিয় কর্মীকে খুন করতে হবে। যে খুন হবে সে অজয়ের বন্ধু। এ সময় অন্য জোনে অজেয়র সংলাপ যেন সমস্ত রাজনৈতিক ভণ্ডামির মধ্যে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। অজেয় বলেছে ছোটবেলায় আমার আবৃত্তি শুনে সকলে বলতো ছেলেটা বড় হয়ে শিল্পী হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার বড় প্রিয়। অন্ধকার মঞ্চ থেকে ভেসে আসে ঝুলন কবিতার পংক্তি দে দোল দোল।

কাহিনীকার পরিচালক কর্ণ সেন কিছু টুকরো টুকরো ঘটনাকে উপস্থিত করেছেন। ঘটনাকে সাজানো এবং উপস্থাপনার কৌশলে নাটকে সঞ্চারিত হয় এক দুরন্ত গতি। দলগত অভিনয়, জোনাল অভিনয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিচালকের দক্ষতা প্রকাশিত। নির্বাচনী প্রচারের দৃশ্যে খুব সাধারণ সেটের ব্যবহার করেও একটি নির্বাচনী দৃশ্যকে হুবহু তুলে ধরেছে। মিঃ নারায়ণ সামন্তের ভূমিকায় অর্জুন ভট্টাচার্যের অভিনয়ের সংযত সুন্দর রূপটি বহুদিন মনে রাখার মত। যে কোন মুহূর্তে চরিত্রটি ভাঁড়ে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু চরিত্রটির স্বরূপকে তিনি প্রকাশ করেছেন যথাযথ। কুশিলা চটরাজের ভূমিকায় মিলন মুখারজি চরিত্রটিকে যথাযথ বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়নি। এই জাতীয় চরিত্রের যুগ্ম ব্যক্তিত্বটিকে তিনি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুদর্শনার ভূমিকায় মৈত্রেয়ী ঘোষ কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন স্বপন দাস, দুলাল চক্রবর্তী ও শিপ্রা শর্মা। সুশান্ত দত্ত ও সঞ্জয় দত্ত কৃত সঙ্গীত নাটকের অন্যতম সম্পদ। তবে নাটকের শেষে দর্শকদের কাছে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখার কোন প্রয়োজন ছিল কি? নাটক যদি বক্তব্য বিষয় দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারে তাহলে সেটা নাটকের ব্যর্থতা। নাটকের শেষে এই জাতীয়
বক্তব্য রাখার অর্থ ...

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **রেকর্ড**

কিছু কথা কিছু গান

একটি সংশ্লেষিং রেকর্ডে বিরাট যাত্রা নাটকের সঙ্কুলান দুরূহ কর্ম— স্বভাবতই সম্পাদনায় বিশেষ একটি অংশকেই প্রাধান্য দিয়ে সম্পূর্ণ নাটক রচনা করতে হয় শাখা-প্রশাখা বাদ দিয়ে। ই-ই-আই পরিবেশিত নিউ রয়াল বীণাপাণি অপেরার 'এণ্টনী কবিয়াল' রেকর্ডে এণ্টনীর প্রেম কাহিনীর বিস্তার (নাটক—দীপেন মুখোপাধ্যায়) মুখ্য কবিয়াল এণ্টনী গৌণ। এই ভাল-কবিপ্রতিভার পিছনে ঐশী মহিমা থেকে সৌদামিনীর প্রেম-

মহিমা প্রাধান্য পাওয়ায় একটা মানবিক রূপ পেয়েছে। প্রথমে একটি অবান্তর ফ্ল্যাশব্যাকের অবতারণায় ফিরিঙ্গী কালীর মানরক্ষা করা হয়েছে। যাত্রা নাটক বলা হলেও যাত্রার ছাপ খুব কম। এণ্টনীর ভূমিকায় নীলোৎপল দে বা সৌদামিনীর ভূমিকায় অনন্তী চট্টোপাধ্যায় যে রোম্যান্টিক অভিনয় করেছেন সেটা সিনেমার আর ভোলা ময়রার ভূমিকায় বিজন মুখোপাধ্যায়, নটবরের ভূমিকায় রাজকুমার, ছবি রায়, প্রণয়কুমার, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের যাত্রাকেই অনুসরণ করেছেন। গান ও সুর সব গত কয়েক বছরের আধুনিক গানের ককটেল। প্রচলিত গান ছাড়া গান লিখেছেন লক্ষ্মীকান্ত রায়, সুর দিয়েছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। এই আধুনিক গান শীতল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী চট্টোপাধ্যায় জমিয়ে গেয়েছেন। ক্লারিওনেট প্রায় নেই বললেই হয়, আছে ইলেকট্রিক অর্গান। জাইলোফোন—অর্থাৎ যাত্রার মেজাজ খুব কম। এমন কি কবিগানের যে আধুনিক কায়দার সুর, তা গাইতে শ্রদ্ধেয় শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় অস্বস্তি ভোগ করেছেন। আধুনিকত্ব নাটকেও আছে। এণ্টনী প্রথমে ভাঙা বাংলায় কথা বলে কিন্তু গান গায় পরিষ্কার। সৌদামিনী 'বৌদি' বলে ডাকে—আর সৌদামিনীকে অন্য সকলে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী 'বৌঠান' বলে। সর্বোপরি রেকর্ড খাপে ... উল্লেখ নেই কিন্তু ব্যবস্থাপনা ও অধিনায়কের ... উল্লেখে যাত্রার রীতি অনুসৃত।

দেবাশিস ...

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

ফিলহারমোনিক থিয়েটারে (রাশিয়া) অনুষ্ঠান

এগিয়ে যাবার লক্ষ্য ও প্রার্থনা যে-কোনো অনন্যতন্ময় শিল্পীর অন্তরের এক নির্মোহ বাসনা। এই বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথের। এই বাসনা ছিল উদয়-শংকরের—যিনি দেশে-বিদেশের সর্ব-সমক্ষে ভারতীয় নৃত্যকলাকে সমাদরে সম্মানীয় করে তোলেন। শিল্পের জগতে কোনো স্রষ্টাই চান না, তাঁর সৃষ্টি ক্ষুদ্র সময়সীমায় বাঁধা পড়ে থাক; কিন্তু, ভেবে দেখলে অস্বীকার করার উপায় থাকে না, কলা হিসেবে নৃত্য বেশ কিছুটাই কালের গণ্ডিতে বাঁধা। তাই, সৃজনীর দিকে ক্রমশ ধেয়ে আসে যে নশ্বরতা, তার যাপনয়নে অমরতা উদ্দিষ্ট হয় বুঝি অন্য এক স্বপ্নে..তাই জীবনের শেষ পর্বে নৃত্য আর উদয়শংকরের দেহে নয়, মস্তিষ্কে ধরা পড়েছিল। যার এক বিশেষ বাস্তব রূপ—'উদয়শংকর ইনডিয়া কালচার সেনটার'।

এই সেনটারেরই আঠারো জন কলাকুশলী সমেত শ্রীমতী অমলাশংকর সোভিয়েট রাশিয়ায় এক সাংস্কৃতিক সফর শেষে সম্প্রতি ... ফিরে এলেন। রাশিয়ায় পৌঁছবার ...বই অবশ্য শ্রীমতী শংকর ইনটার...নাল সোসাইটি ফর মিউজিক্যাল এডুকেশন-এর পক্ষ থেকে এক বিশেষ আমন্ত্রণে ভারত ছাড়েন কানাডার উদ্দেশ্যে। কানাডা সফরে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন উদয়-তনয়া মমতাশংকর। সেখানে বিভিন্ন দেশের এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তিনি 'হাউ ইন্ডিয়ান চিলড্রেন ডান্স টু মিউজিক' এই শিরোনামায় একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

'আজ পঁচিশে সেপটেমবর, আপনারা জানেন, গত বছর ঠিক এই দিনটিতে আমার জীবনের সব চাইতে বড় সম্পদ হারাবার এক আয়োজন চলছে, আজকের দিনটি তাই আমার কাছে এক চরম শূন্যতার, তবু এই দিনই আমি আপনাদের ডেকেছি—এই দিনই আমি আপনাদের জানাবো, আমার জীবনের একটি পূর্ণতার খবর, এও তাঁরই ইচ্ছে, কারণ তিনি সর্বদাই ... বলতেন, 'কিপ অন—কিপ অন ক্রিয়েটিং।'

উদয়শংকরের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর সেদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে দুঃখ-সুখের বিপরীত টানে আবেগতাড়িত কণ্ঠে প্রাগুক্ত কথা-গুলো উচ্চারণ করেন অমলাশংকর। আলোচ্য ভ্রমণের অনিবর্চনীয় এক জানান, সোভিয়েট রাশিয়ায় বিভিন্ন গ্যালারি বা প্রেক্ষাগৃহে এই মেয়েরা (তাঁর চারপাশে প্রআগত নৃত্যশিল্পীরা বসে ছিলেন) তাঁদের যেসব নাচ পরি-বেশন করেছেন তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেখানকার শিল্পরসিক দর্শকদের পক্ষ থেকে মিলেছে এক অভূতপূর্ব সাড়া; কোনো কোনো অনুষ্ঠানে পাঁচ মিনিটেরও বেশী সময় একটানা হাততালি পড়েছে, কোথাও কোনো উচ্ছ্বসিত দর্শক আসন ছেড়ে ছুটে এসে একটি ফুল হাতে ধরে বলেছেন, পৃথিবীর সব ফুল তোমাদের দিলাম।

উদয়শংকর ইনডিয়া কালচার সেনটারের শিল্পীরা সোভিয়েট রাশিয়ার যে সকল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মসকো একজিবিশন গ্রাউন্ডের ইন্ডিয়ান ট্রেড ফেয়ার প্যাভিলিয়ন ও কাস্পিয়ান সাগর পাড়ে সিটি হলের অনুষ্ঠান। এ ছাড়া তাঁদের উপস্থিতি ছিল মস্কো টি ভি সেন্টার। ফিলহারমোনিক থিয়েটার, লারমেনটফ গ্যালারি, সামার প্যালেস হল, ওপন এয়ার থিয়েটার, পুশকিন গ্যালারি ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে।

বিদেশে নৃত্য পরিবেশন সম্পর্কে অমলাশংকর বলেন, বর্তমান সফরের প্রাক মুহূর্তে অনেকেই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তিনি যাতে সেখানে কোনোরকম স্লো-ডান্স পরিবেশন না করেন, কারণ ওখানকার নৃত্যামোদীরা শুধু চায় রিদম; কিন্তু, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীমতী শংকর জানান, এই মেয়েরা যখন ওখানে স্লো-ডান্স পরিবেশন করে তখন সেখানকার দর্শকগণ বিহ্বল হয়ে পড়েন, পরে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রকাশ করে তাঁরা জানতে চান, এর ধাত্রী ভারতীয় কোনো যোগ কিনা; অর্থাৎ তাঁরা আমাদের স্লো-ডান্সকেই আশাতীতভাবে গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় আলোচ্য সাংস্কৃতিক সফরে অমলাশংকর ছাড়া অন্যান্য শিল্পীদের ... ছিলেন—নৃত্যে মমতাশংকর, শিবপাশী ... রায়, আনমিতা সেন, পিয়ালী রায় মহাশয়, ভাস্বতী দাশ, মহুয়া ভৌমিক, ইন্দ্রাণী মুখার্জী, শুভ্রা ঘোষ, শুক্লা ঘোষ, সুনীতা ব্যানার্জী; সঙ্গীতে নন্দিতা নন্দী; যন্ত্রসঙ্গীতে রবীন দাস, সেতারে দে, সৌরেন ঘোষ প্রমুখ।

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

গুলাম মহম্মদ শেখ (১৯৩৭—)

তিনি গুলাম শেখ বলে পরিচিত বেশী। চিত্রকর, ছাপাইকার (প্রিন্ট-মেকার), কবি এবং শিল্পকলা-বিষয়ক লেখক। বারোদায় প্রকাশিত চারুকলার পত্রিকা "বৃশ্চিকের" সম্পাদক ছিলেন (১৯৬৯-৭৩)। বরোদার শিল্পকলা বিভাগের স্নাতক। স্নাতকোত্তর পাঠ লণ্ডনের রয়েল কলেজে। ইয়োরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি-বিনিময় সূচীতে রাশিয়া এবং বুলগারিয়া ঘুরেছেন। বরোদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিল্পকলা বিভাগে চারুকলার ইতিবৃত্তের অধ্যাপক। একক প্রদর্শনী বোম্বাইতে ১৯৬০, ১৯৬৩, ১৯৬৯। রাজধানীতেও ১৯৬৩, ১৯৭০ ১৯৭১। দেশেবিদেশে নানা যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন (১৯৬২)। অন্যান্য যৌথ প্রদর্শনী—'১৮৯০ প্রদর্শনী', 'আজকের শিল্প-কলা' ১ এবং ৩ (১৯৬৮, ৭১), 'গ্রুপ এইট'-এর প্রদর্শনী, স্মিথসোনিয়মে ওয়র্কশপ, প্যারী এবং টোকিও বিয়ানাল, আই সি সি আর আয়োজিত প্রদর্শনী বেলজিয়ম, বুলগারিয়া এবং পোল্যান্ড (১৯৭৪), নয়াদিল্লি (১৯৭৪), ৩য় ত্রিয়ানাল নয়াদিল্লি (১৯৭৫), ত্রিয়ানালের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ শিল্পীদের প্রদর্শনী, নয়াদিল্লি (১৯৭৮)।

সেই প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে গুলামের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম দেখে যে রাজ-ধানীতেও বিদ্যুৎ সরবরাহকারীরা ভার লাঘব করেছিলেন বলে প্রদর্শনীতে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল এবং বিনি পয়সার তাৎক্ষণিক কফি দর্শক এবং ক্রেতাকে ঠিক ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আড্ডা জমে উঠল। ডঃ নীহার রায়, রথীন মৈত্র এসে তাতে যোগ দিয়ে-ছিলেন। অন্য শিল্পীরাও।

সৌরাষ্ট্রের প্রাদেশিক পরিবেশে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে। আবছা কুয়াশার চাদর ঢাকা শৈশব। উবড়ো-খাবড়া নিসর্গের মধ্যে কেটেছে কল্পনার কত বেলা অবেলা। বাস্তবের সুখ দুঃখ প্রেম অপ্রেম বুনেছে স্মৃতির জরি। আর এর মধ্যে কবে যেন রূপ-স্পর্শময় অনুচিত্রের জগতের ছাপ পড়ে গেছে। কোন এক অজ্ঞাত সময়। ছেলে-বেলার দুঃখসুখের স্বপ্নমোহের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বারবার চিত্র-ভাষায় এসব স্মৃতির তর্পণ করেছেন অবচেতন ফল্গু ধারায় অবগাহন করে। গাছের ওপর থেকে সময়ের ... করে ... রূপকল্প ... প্রতিকৃতি ... "ঘরে ফেরা" ছবিতে মায়ের উপস্থিতি যেন নিবিড় অভিজ্ঞতায় দ্যোতক হয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে ... মসজিদে। চুলহীন আকাশে ... "বুরাক" নামে অর্ধনারী-অশ্ব।

চিরন্তন রূপকল্পের ... কালজয়

চারুকলার আদর্শ তাঁকে ... নাড়া দিলেও বর্তমান ঘটনা... কৃতির নির্মীয়মান নতুন ঐতিহ্য ... সমকালীন ঘটনা এবং বেদ থেকে ... নিজেকে মুক্ত করতে পারে... অন্তর্মুখী কিন্তু বাইরের ... সংবেদে আক্রান্ত। চিরন্তন ... সামরিক-এর স্বপ্নসমন্বয় তাঁর ... এবং চিত্রকে সমকালীন করে... প্রকৃতির দিক থেকে যে মুহূর্তে ... ফিরিয়েছেন তখনই তাঁর ছবিকে ... 'পপ' এবং তথাকথিত অ... আন্দোলনগুলির যান্ত্রিকতার ... আক্রমণ করেছে। অন্যদিকে ঐ... সচেতনতার আত্যন্তিকতা যে ... নষ্ট এবং ভ্রষ্ট করে এবং ... মুদ্রাদোষের ছায়াপাত ঘটায় এও ... কিছু ছবিতে দেখা গেছে। এর ... পলায়নবাদী অধিবিদ্যার শরণ ... গত্যন্তর থাকে না। ভারতীয় চারুক... ঐতিহ্য নবাভিযানের দিকদর্শন ... হতে পারে যদি তার সাফল্যের প... বৃত্তির প্রতি মনযোগ না দেওয়া ... সদর্থে ঐতিহ্য নতুন নতুন উদা... তৈরী করার অনুপ্রেরণা দেয়।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে যেমন ...

এবং মুসলমানদের মিলিত উ... তৈরি ভারত শিল্পের রত্নভাণ্ড... চাবি ছিল, তেমনি ইউরোপ এবং জাপানের সম্ভারও তাঁর নাগালের ... ছিল না। পৌরাণিক, দরবারী লৌকিক এই ত্রি-ধারার সংগম ঘটে তাঁর হৃদয়ে। ভিতরের সঙ্গে বাই... সমন্বয়ের প্রয়োজন অবনীন্দ্রনাথের ... থেকে এখন যেন অনেক বেশী। ... উৎপাটিত-মূল বৃক্ষের মতো অ... ধরাশায়ী হয়ে নতুন শিকড় গজা... চেষ্টা করছি। কিন্তু এ-বিষয়ে গ... শেখ সচেতন।

"দেওয়াল" (তৈলচিত্র ১৯৭৬) চৌকো পুটে আঁকা। একটা ঘর এবং ... অনুভূমি রেখা পটকে তিন ভাগে ... করেছে। দরজা খোলা। ভেতরে ... আলখাল্লা বাইরে গাছের ডাল ... । ফুলন্ত বৃক্ষ। অনুভূমি থেকে ৯০ ডিগ্রী কোণে সোফা। ... চেয়ে সমতল রঙ বেশি ... ভারতীয় অনুচিত্রের সংবেদ, ... অনুসন্ধান বাড়াবার ... আধুনিক। কালের ... ছবিতে। ...

Amul
PASTEURISED
BUTTER